

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [১ম সংখ্যা

হিন্দু-ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই বিশ্বে চৈতন্যই আদি সত্তা, সেই চৈতন্য হইতেই জড়ের উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ সেই আদিম অনন্ত চৈতন্য-সমুদ্রের যখন সিসৃক্ষা বা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, তখন তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তি হইতে জড়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। হিন্দুরা বলেন যে, সেই অনন্ত চৈতন্যই পরব্রহ্ম। উহা অনির্ব্বচনীয়। মানুষ উহাকে ধারণা করিতেই পারে না। সসীম বুদ্ধি লইয়া অসীমের ধারণা অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ততো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তবে হিন্দুরা এই কথা বলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু বা সত্তা আছে, তাহার ভিতরই এই চৈতন্যশক্তি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সেই জন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়াও অভিহিত। বিষ্ণু শব্দের মৌলিক অর্থ অনুপ্রবিষ্ট। বিশ ধাতুর অর্থই হইতেছে প্রবেশ করা। সেই জন্য হিন্দুরা বলিয়া থাকেন, এই চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিষ্ণু অনুপ্রবিষ্ট (Immanent)। এমন কি, প্রত্যেক জীবের মধ্যেও পরব্রহ্ম বিরাজিত। সেই জন্য হিন্দু বলিয়া থাকেন—

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥'

আমিই দেবতা, আমি অপর কেহই নহি, আমিই ব্রহ্ম, আমি শোকশূন্য, আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্যমুক্ত এবং আত্মস্বভাবসম্পন্ন। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে লোকের মনে এমন একটা তন্ময়তা উপস্থিত হয় যে, তখন তাহার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হয়। তোমাতে

আমাতে এবং অন্যান্য জীবে ও প্রাকৃত বস্তুতে কোন পার্থক্য-বোধ থাকে না। তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। অবশ্য এই কথাগুলি বলা কঠিন নহে। অনেক ব্রাহ্মণ এই কথাগুলি শয্যা ত্যাগ করিবার সময় আওড়াইয়া থাকেন। অবশ্য উহা বলিলে অথবা উহার শব্দার্থ বুঝিলেই ঐ ভাবটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা হয় না। উহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে জন্ম-জন্ম-ব্যাপিনী সাধনা চাই। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই, অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন হিন্দুর সর্ব্বত্র। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন :—

'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'

ইহার অর্থ—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জীবে পরমেশ্বর সমভাবে অবস্থিত আছেন অথচ ঐ সকল প্রাণী বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না, ইহা যিনি সম্যক্‌ভাবে দর্শন (উপলব্ধি) করেন, তিনিই এই বিশ্বকে ঠিকভাবে দেখিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে ভগবান্‌কে বা পরব্রহ্মকে অবস্থিত দেখিয়া (অর্থাৎ দেখার ফলস্বরূপ) আপনাকে অধঃপাতিত করেন না, তিনি পরমগতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন; অর্থাৎ যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মময়, এই ধারণা লোকের মনে বেশ উপলব্ধ হয়, তখন তাহার অবিদ্যা বা মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া যায়; কাযেই সে মুক্তিলাভ করে। উপনিষদ্‌ও তারস্বরে বলিতেছেন :—

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"

তিনি এই বিশ্বচরাচরের অন্তরেও রহিয়াছেন, আবার বাহিরেও রহিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি এই বিশাল বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ইহার সহিত বিরোধ করিতে পারেন নাই। হিন্দুর মতে এই পরমব্রহ্ম যে কিরূপ, তাহা মানুষ ধারণা করিতেই পারে না। বুদ্ধি তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, ভাষা তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে পারে না; এক কথায় তিনি বাক্যের এবং মনের অতীত। তবে তত্ত্বদর্শীরা তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সেই পরব্রহ্ম হইতেই মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই আদ্যাশক্তিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। এই শক্তির অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্যই সেই মহাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইতেছে। এই শক্তির সহিত পরব্রহ্মের যোগ রহিয়াছে, সুতরাং এই শক্তি জড় নহে—অজ্ঞও নহে। কারণ, চৈতন্যই জ্ঞান। সেই পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে শক্তি কার্য্য করিতেছে,—সে শক্তি কখনই অচেতন বা জ্ঞানহীন হইতে পারে না। আর সেই শক্তি কর্ত্তৃক সংসাধিত সৃষ্টিকার্য্যে যে একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাতেই আমাদের বুঝা উচিত, শক্তি জ্ঞানময়ী। উদ্দেশ্য-সাধক কার্য্য কখনই জ্ঞান ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। আর চৈতন্য ব্যতীতও জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না।

তবে জড়বাদীরা এখানে বলিয়া থাকেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? যেখানে উদ্দেশ্য কিছুই দেখা যাইতেছে না,—সেখানে উদ্দেশ্য কল্পনা করা কি গোঁড়ামী নহে? জড়বাদীদিগের এই উক্তি ঠিক নহে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এতই প্রকাণ্ড যে, উহার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই জন্মিতে পারে না। যাহার সম্বন্ধে আমাদের সাকল্যে কোন ধারণাই জন্মিতে পারে না, তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা অবধারণ করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে ঘোর ধৃষ্টতামাত্র; একমাত্র ঐ আদ্যাশক্তি ভিন্ন আর কেহই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ করিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহাকে বিশ্বমাতা অর্থাৎ বিশ্বের পরিমাপ-কর্ত্রী বলা হয়। * ভগবতী মহাশক্তির সেই বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না। তবে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, আমরা তাঁহার ছোট ছোট কাযগুলি দেখিয়া যদি তাহাতে কোন উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই, তাহা হইলে এই বিশ্বসৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি। এ সম্বন্ধে একটা চলিত গল্প আছে—একটা লোক এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে শয়ন

* যথা—দুর্গাপ্রণামে—বিশ্বেশ্বরীং ত্রিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমাতা অর্থে বিশ্বজননী নহে। তাহা হইলে বিশ্বমাতরম্ এইরূপ হইত।

করিয়া চিন্তা করিতেছিল যে, বিশ্বস্রষ্টার কি অবিচার! তিনি লাউ, কুমড়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল ক্ষুদ্রশক্তি লতায় জন্মিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর এত প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের ফলগুলি এত ছোট করিয়াছেন। লোকটা সেই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় সেই অশ্বত্থবৃক্ষের একটি ফল তাহার নাসিকার উপর আসিয়া পড়ে। সে তখন বলিয়া উঠিয়াছিল,—ভগবানের অবিচার নহে, আমারই ভুল।

এই বিশ্বব্যাপারের ভিতরে যে একটা উদ্দেশ্য আছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইতে পারে। মহাকবি টেনিসন পার্থিব ব্যাপারে যুগ-যুগান্তরের গতি দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহার ভিতর একটা অভিসন্ধি বা লক্ষ্য আছে। * বৈজ্ঞানিকরা কল্পনাপ্রিয় কবির কথা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা পাথুরে প্রমাণ চাহেন। কিন্তু যদি কূটতর্ক ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সরলভাবে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই জাগতিক ব্যাপারের ভিতর একটা অভিপ্রায় আছে। সীমাবদ্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের বুদ্ধি তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না সত্য, কারণ, সসীমের পক্ষে অসীমের ধারণা কখনই সম্ভবে না। কিন্তু মানুষ যদি সেই অসীমকে কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই সে কথা বুঝিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, যাহা পরিণত করিবার একটা অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য একটা ব্যবস্থাও করা হয়; কারণ, তাহা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমি একটি বৃক্ষ রোপণ করিলাম। তাহার উদ্দেশ্য উহার ফলভোগ। যদি গাছটা গোরুতে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। সেই জন্য আমি গাছটিকে বৃতির দ্বারা ঘিরিয়া রাখি। অপায়-নিবারণ উদ্দেশ্যসাধনের একটা অঙ্গ। এখন দেখা যাউক যে, এই জগতে অপায়-নিবারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি না? তাহা যে আছে, তাহা যাঁহারা বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন। সকলেই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জিনিষই শীতে ঘন হইয়া জমিয়া যায়। যথা—ঘৃত, নারিকেল তৈল প্রভৃতি শীতে জমিয়া গুরুত্ব বশতঃ ডুবিয়া নিম্নে যাইয়া পড়ে। কিন্তু জলের পক্ষে তাহা হয় না। জল একই নিয়মে যতই শীতল হইতে থাকে, ততই উহার ঘনত্ব এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ কতক দূর অগ্রসর হইয়া (৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত) জল আর শীতে সঙ্কুচিত ও গুরু হইতে থাকে না। তখন উহা যতই শীতল হইতে থাকে, ততই উহা প্রসারিত ও লঘু হইতে থাকে। তাহার পর যখন উহা জমিয়া যায়, তখন তরল জল অপেক্ষা উহা লঘু এবং প্রসৃত হয়। সেই লঘুত্ব হেতু বরফ জলে ভাসিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা এক সময়ে উহাকে সাধারণ নিয়মের এক ব্যতিরেক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমফলে প্রকৃতির রক্ষাকার্য্য কিরূপ সুন্দরভাবে সংসাধিত হয়, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না, ভাবিয়াও দেখেন না। যদি অন্যান্য তরল দ্রব্যের ন্যায় জল শীতে ক্রমশঃ ঘন ও গুরু হইয়া জমিয়া যাইত, তাহা হইলে সমুদ্রের এবং অন্যান্য জলাশয়ের জলের উপরিভাগ জমিয়া বরফ হইলে সেই বরফ জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া যাইত। ঐ জমাট-বাধা জল বা বরফ তলে পড়িয়া যাওয়ার ফলে উপরের জল তাপ-বিচ্ছুরণ (Radiation) হেতু আবার জমিতে থাকিত, আবার উহা নিম্নে পড়িয়া যাইত। এই প্রকার অতি শৈত্য হেতু সাগরের এবং অন্যান্য জলাশয়ের জল সমস্ত জমিয়া যাইত এবং তাহার ফলে সমস্ত জলজন্তু মরিয়া যাইত। কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে উহা উপরে ভাসিতে থাকে বলিয়া অত্যন্ত শীতল আর মেরু প্রদেশের, সাগরের এবং গভীর জলাশয়ের জলের উপরিভাগ জমিয়া ছাদের মত আঁটিয়া যায়। তাহার ফল এই হয় যে, নিম্নস্থিত জল আর তাপ-মোক্ষণ (Radiate) করিতে পারে না। সুতরাং ঐ জল আর জমে না। জল-জন্তুগুলি তখন স্বচ্ছন্দে সেই জলে বিচরণ করিতে থাকে। ইহার দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টিরক্ষাকার্য্য কিরূপ সুন্দরভাবে সাধিত হইতেছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গমাত্রই অবগত আছেন যে, উত্তর এবং দক্ষিণ

* I doubt not through the ages one increasing purpose runs, And the thoughts of man are widened with purpose of the suns,

Locksley Hall,

মেরুপ্রদেশ যখন কয়েক মাসব্যাপী রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার কিছুই নয়নগোচর হয় না। জীবের চক্ষু আলোকের প্রভা সহ্য করিতে অনভ্যস্ত হইবার সম্ভাবনা জন্মে। ঐরূপ অনভ্যাসের ফলে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা ঘটে। সেই হেতু প্রকৃতিদেবী তথায় মেরুপ্রভার (Aurora Borealis) সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ অপূর্ব্ব আলো মেরুপ্রদেশে অনেক সময় দেখা দেয়। উহা প্রথমে নীলাভ হইয়া প্রকাশ পায়। যদি উহা তীব্র শুভ্রবর্ণে প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে সেই মেরু-নিশীথিনীর গাঢ় তমিস্রার পর শুভ্র আলোক দিগন্তবিসারী তুহিনরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া বহু জীবের চক্ষু-পীড়ার কারণ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। তাহার কারণ, ঐ মেরুপ্রভা জ্যৈষ্ঠ-মাসের প্রখর ভানু-কিরণের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে না, ইহা প্রথমে নীলাভ শ্বেতবর্ণে, পরে কখন নীল-লোহিতবর্ণে (purple), কখনও বা বেগুনে বা আরও একটু নীলাভ রক্তবর্ণে (violet), কখনও বা রক্তবর্ণে, কখনও হরিদ্বর্ণে প্রকাশিত হওয়াতে সেই বৈচিত্র্যবিহীন তুষারাচ্ছন্ন মেরু-প্রদেশে এক অতি সুন্দর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহা যে মেরুপ্রদেশে জীবরক্ষার এক বিস্ময়কর উপায়, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। জড়-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে উহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ নিয়মকর্ত্তার যে উহাতে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায় নাই, তাহা বলা ঘোর মূর্খতার কার্য্য। আর এই রক্ষাকার্য্যের এত ব্যবস্থা যে উহার একটা মুখ্য উদ্দেশ্যের সূচনা করে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। জগতের তথ্যগত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে করিতে এক দিন বিজ্ঞান ভগবানের চরণতলে যাইয়া উপনীত হইবে, এ বিশ্বাস অনেকের আছে। *

* And Reason, now through number, time and space
Darts the keen lustre of her serious eye.
And learns from facts compar'd the laws to trace
Whose long procession leads to Deity.

হিন্দুধর্ম্ম বলেন যে, অনন্ত চৈতন্য হইতে জড় এবং প্রকৃতি উভয়ই উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই অনন্ত চৈতন্যই পরব্রহ্ম। হিন্দু-শাস্ত্রকার বলেন :—

> ‘ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তুর্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
> নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা ॥”

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যেমন মাকড়সার দেহ হইতে তাহার জালের সূতা জন্মে, সেইরূপ চৈতন্য হইতে জড় জন্মিয়াছে। আর সেইরূপ নিত্যপ্রবুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতিও উদ্ভূত হইয়াছেন। অবশ্য মাকড়সা ও তাহার জাল এক নহে। অথচ মাকড়সা হইতেই জালের উদ্ভব। সেইরূপ চৈতন্য ও জড় এক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও চৈতন্য হইতে জড়ের আবির্ভাব হইয়াছে। অধিকন্তু প্রকৃতি ত সেই পরব্রহ্ম হইতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি-রূপে এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। এই মতের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ করিবার কিছুই নাই। তবে বিজ্ঞান যেখানে পৌঁছিতে না পারে, ধর্ম্মমত সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে একটা মত প্রকাশ করিয়া থাকে। মানব-জাতির মধ্যে জ্ঞানের স্থান আছে বলিয়া যে বিশ্বাসের স্থান নাই, এ কথা মনে করা ভুল! আসল কথা, ধর্ম্মের সহিত, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের সহিত, বিজ্ঞানের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল-তত্ত্বকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এ সব কথা আমি পরে আলোচনা করিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।



জুতাওয়ালা বাট্যা

জগতের প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে জুতাওয়ালা টমাস্ বাট্যা যে এক জন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন কোনও দেশ নাই, যে দেশে বাট্যার কারখানায় তৈয়ারী জুতার দোকান না আছে। অল্পদিন আগে টমাস বাট্যা ভারতবর্ষে আসিয়া এখানেও তাঁহার জুতার দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেশে ফিরিয়া গিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন টমাস বাট্যার পুত্র ছোট টমাস বাট্যা এই কারখানার মালিক। কোন্ গুণে বাট্যার জুতার কারখানা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং বাট্যার পসার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বিবরণ ইংলণ্ডের 'স্পেক্‌টেটর' নামক সাপ্তাহিক পত্রে মেজর এভেলিন রেঞ্জ দিয়াছেন। আমরা তাঁহার কথারই সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।



টমাস বাট্যা

টমাস বাটা—তাঁহার দেশের শব্দ উচ্চারণে বলিতে গেলে বাট্যা—এক জন ছেঁড়া জুতা-মেরামত-করা মুচির ছেলে। তিনি নিজে জুতা তৈয়ারির দোকান খুলিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। য়ুরোপের মধ্যদেশে অষ্ট্রিয়ার উত্তরে ও জার্ম্মাণীর দক্ষিণে চেকো স্লোভাকিয়া রাজ্য। সেই চেকো প্রদেশের পশ্চিমাংশের নাম বোহেমিয়া, আর পূর্ব্বাংশের নাম মোরাভিয়া। সেই মোরাভিয়া উপপ্রদেশের প্রধান সহর জিলন্। টমাস বাট্যা জিলন্ সহরে জুতার ছোট দোকান খুলিয়া তাঁহার ব্যবসা আরম্ভ করেন। এক্ষণে সারা জিলন্ সহরটাই বাট্যার কারখানা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেই কারখানায় ২০ হাজার কারিগর আর মজুর নিত্য কায করে।

চেকো স্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ হইতে রেলগাড়ীতে চড়িয়া মোরাভিয়ার দিকে রওনা হওয়ার পরে সকলের মুখে কেবল এক কথাই শুনা যায়,—বাট্যা, বাট্যা। বাট্যা মোরাভিয়া অঞ্চলের মুকুটহীন মহারাজা! তাঁহাকে লোকে য়ুরোপের হেন্‌রী ফোর্ড বলিয়া অভিহিত করে! হেন্‌রী ফোর্ড যেমন আমেরিকার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তক, তেমনই টমাস বাট্যা য়ুরোপের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ মূর্ত্তিমান্। বাট্যা কোনও বিশেষ প্রদেশের ব্যবসাদার নহেন, তিনি সমগ্র জগতের ব্যবসায়ী, তাঁহার কাছে কোনও দেশের সীমা-চৌহদ্দী নাই। তাঁহার কারখানায় দশখানা এরোপ্লেন আছে, তিনি নিজে ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা মুহূর্ত্তের নোটিশ পাইয়াই দেশদেশান্তরের কারখানা বা দোকান পরিদর্শন করিতে চলিয়া যান। আজ তিনি পোল্যাণ্ডে, কাল তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে দেখা যাইবে; এই ত গত মাসেই তিনি প্রাচ্যপ্রান্তের দেশসমূহে

বাট্যা এবং তাঁহার ম্যানেজাররাও সর্ব্বদা উৎকৃষ্টতর উপায়ের সন্ধানে অবহিত থাকেন। যেই কোনও নূতন কলের সন্ধান পান বা তাঁহাদেরই কাহারও মাথায় আসে, অমনই পুরাতন কল সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন কল বসানো হয়, তাতে খরচ যতই লাগুক, এবং সেই বাতিল কল যত নূতনই হউক না কেন।

ফোর্ডের ন্যায় বাট্যাও মনে করেন, মাদক-সেবায় মানুষের কর্ম্মশক্তি হ্রাস হয়, মানুষ অমানুষ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহার কারখানার সিঁড়ির গায়ে মাদক-সেবনের যে কি নিদারুণ কুফল, তাহা চিত্রে ও বাক্যে প্রদর্শিত হয়।

কারখানার মধ্যেই কল-মেরামতের কারখানা আছে, মাঝে মাঝে কল খুলিয়া কলের হাঁসপাতালে পাঠানো হয়, এবং দক্ষ মিস্ত্রীরা তাহা ঝাড়িয়া, মেরামত করিয়া, ফিট করিয়া পাঠায়। বড় বড় ট্রলিতে করিয়া কল-মেরামতের হাঁসপাতাল হইতে কল-কব্জা যাওয়া আসা করিতেছে। কোন কল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে বা অচল হইলে, অমনই টেলিফোনে কেন্দ্র-অফিসে খবর দেওয়া হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কল সরাইয়া তাহার স্থানে নূতন কল স্থাপন করা হয়, এইরূপ আকস্মিকতার জন্য বাট্যা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, এবং কলের বিভিন্ন অংশ কারখানায় মজুত থাকে।

বাট্যার যেন লোহার শরীর। তাঁহার খেলা ও বিশ্রাম হইতেছে কায, আর কাযই হইতেছে তাঁহার খেলা আর বিশ্রাম। তিনি কখনও অলস হইয়া সময় অপব্যয় করেন না। এমন ঘটনাও বিরল নহে যে, তিনি দু'তিন দিন ক্রমাগত কায করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আহার-নিদ্রার অবসর তাঁহার হয় নাই।

পূর্ব্বে এই কারখানার সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০০০। আর এই কারখানা করার পরে ছয় সাত বৎসরের মধ্যে জ্লিন্ সহরের লোকসংখ্যা হইয়াছে ৩৬ হাজার। দুটি প্রকাণ্ড অনেক-তলার বাড়ীতে কারখানার লোকদের আবশ্যক সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান খোলা হইয়াছে, সেই দুই দোকানে পাখীর পালকের লেপ, তোষক হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের বই বা সিনেমা অভিনেতার ছবি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই দোকানের মধ্যে খাবার জিনিষও বিক্রয় হয়। সব চেয়ে দর্শনীয় হইতেছে ঐ দোকান-বাড়ীর ডেয়ারী-বিভাগ, সেখানে বহু মজুর পরিষ্কার পাত্রে শুচি স্বাস্থ্যকর খাঁটি দুগ্ধ পান করে। বাট্যা মনে করেন যে, যে লোকরা কঠিন পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে খাঁটি ভেজালহীন শুচি পবিত্র দুগ্ধের তুল্য আর কোনও খাদ্য নাই। এই সমস্ত দুধই তাঁহার নিজের গোহালের গোরু দুহিয়া আনা হয়।

অন্য দেশের কারখানার মালিকরা কারখানা হইতে দূরে বাস করেন। কিন্তু বাট্যার ক্ষুদ্র বাসভবনখানি কারখানারই কাছে, কারখানা হইতে ঢেলা ছুড়িলে সেই বাড়ীতে গিয়া পড়ে। তিনি মনে করিলেন যে, মজুরদের ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিবার জন্য কারখানার কাছেই একটি বাগান থাকা উচিত। অমনি তাঁহার আদেশ হইল, কারখানার মধ্যস্থলে একটি বাগান রচনা করিতে হইবে, এবং তুরন্ত—অতি সত্বর করিতে হইবে। সেই যায়গায় বহু বাড়ী ছিল। কিন্তু তাহাতে কি? স্বয়ং বাট্যার হুকুম হইয়াছে,—দেখিতে দেখিতে বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সেই স্থানে সুন্দর উদ্যান রচিত হইয়া গেল। এই উদ্যান রচনা করিতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল।

বাট্যার জীবনের মূল মন্ত্র হইতেছে কায আর সেবা।

ধনকুবের ফোর্ডের নূতন ধনোপার্জ্জনের উপায়

য়ুরোপীয় আদি আবিষ্কারকরা দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়া দেখিল, সে দেশের বাসিন্দারা এক রকমের বল মাথা হইতে মাথায় লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, সেই বলটা মাথায় পড়িলেই লাফাইয়া উঠে; এবং পরে জানিল যে, সেই বল এক প্রকার গাছের আঠা জমাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই গাছের নাম দেশী ভাষায় ছিল কাউট-চাউক, পোর্ত্তুগীজরা নাম রাখিল সেরিঙ্গা বা পিচকারী এবং ইংরাজরা তাহার নাম রাখিল রবার বা যাহা দ্বারা কিছু ঘর্ষণ করিয়া মুছিয়া ফেলা যায়। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা হইতে প্রাচীন য়ুরোপ-এসিয়ায় চারিটি দ্রব্য নূতন আসিয়াছে—গোল আলু, ভুট্টা বা মকাই, তামাক, এবং কোকো। তার পরে আসিয়াছে রবার, এবং তাহা জগৎ জুড়িয়া অত্যাবশ্যক কাযের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে কেবল জুতা আর বর্ষাতি জামা তৈয়ারী করিতে রবার ব্যবহার করা হইত। কিন্তু বাইসাইকেল ও মোটর-গাড়ী আবিষ্কারের পর হইতে রবারের আবশ্যকতা শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকায় যাহারা স্বর্ণ-খনির সন্ধানে ঘুরিয়া দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের উদ্যম ও অদৃষ্টের বিবরণ লইয়া কত নাটক উপন্যাস রচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার জঙ্গলে যে অসভ্য দরিদ্র নিরীহ আদিম অধিবাসী ও য়ুরোপীয়দের সঙ্করবংশ রবার আহরণের জন্য জীবনপাত করিতেছে, তাহাদের কাহিনী কোনও কবি এখনও গান করেন নাই। উহারা প্রভাতে নিজেদের তাল-পাতার ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর ছাড়িয়া রওনা হয়, সঙ্গে থাকে একটা করিয়া থলিয়া, একখানা ধারালো দা, আর একটা বন্দুক। তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করে, গভীর স্রোতস্বিনীর উপর পতিত গাছের উপর দিয়া দেহভার সমান রাখিয়া পার হয়, একবার পদস্খলন হইলে নীচে কুম্ভীরের কবলে বা হাঙ্গরের গ্রাসে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া তাহারা চলে। জঙ্গলের মধ্যে জাগুয়ার নামক চিতা-বাঘ অথবা অজগর বোয়া সাপ তাহাদের আক্রমণ করে। ইহাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও হিংস্র ঝুমঝুমি সাপ, কত রকমের বিষাক্ত পোকা-মাকড় তাহাদের পাদুকাহীন খালি পায়ে দংশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে! এ সকলকেই উপেক্ষা করিয়া তাহারা বনে জঙ্গলে নির্ভয়ে পেটের দায়ে বিচরণ করে। প্রত্যেকে এক শত হইতে দেড় শত রবার-গাছ জঙ্গলের মধ্যে বাছিয়া লয় এবং তাহাদের মসৃণ শ্বেত বাকলের উপর খাঁজ কাটিয়া কাটিয়া চলে এবং খাঁজের তলে ছোট ছোট টিনের মগ ঝুলাইয়া দেয়। পরে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিবার পথে সেই সব গাছ হইতে সেই টিনের মগগুলি সংগ্রহ করে। যেমন আমাদের দেশে খেজুরগাছ কাটিয়া শিউলীরা রসপূর্ণ ভাঁড় সংগ্রহ করে, সেইরূপ সেই টিনের মগগুলি ঘন সাদা মিষ্ট দুগ্ধবৎ নির্য্যাসে পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইগুলি সংগ্রহ করা হয়। এই আঠা বাড়ীতে লইয়া গিয়া উহারা ধোঁয়া দিয়া জমায়, এবং সেই আঠা জ্বাল দেওয়ার বিষাক্ত ধূম সেই কুঁড়ের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলে নিশ্বাসে গ্রহণ করে। এর জন্য কোনও ধনী তাহাদের যৎসামান্য মজুরী দিয়া থাকে।



মিঃ হেনরী ফোর্ড

যে কবি এই রবার আহরণের কাব্য লিখিবেন, তাঁহাকে দান্তের নরক-বর্ণনার অনুরূপ অকথ্য যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। রবার আহরণের জন্য কঙ্গোদেশে বেল্‌জিয়ান যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের আগে রোজার কেসমেণ্ট নামে আইরিশ বীর পুটুমায়ো দেশে রবারের জন্য যে অত্যাচার, হত্যা, নৃশংসতা, দাসত্ব প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন লোক ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু কতিপয় ধনশালী লোকের আরও অধিক ধনাগমের লোভের কাছে নিরীহ শান্ত সঙ্কর জাতির লোকদের বলিদানের কাহিনী সেইখানেই শেষ হয় নাই।

যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত যত রবার সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা উষ্ণ মণ্ডলের জঙ্গল হইতেই হইয়াছে, আমাজন নদের তীরে তীরে এবং কঙ্গোদেশে যে সকল জঙ্গল আছে, তাহার মধ্যেকার বন্য রবার-বৃক্ষ হইতেই রবার সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আমাজন হইতে রবারের কিছু বীজ ইংলণ্ডে লইয়া যান, এবং সেই বীজ হইতে লণ্ডনের কিউ গার্ডেনের লতাগৃহে সেইগুলির গাছ উৎপাদন করা হয়, এবং পরে সেই সব চারা সিংহলে, ইন্দো-চীন দেশে এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চালান করিয়া সেখানে রবার-চাষ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এখন এই চাষের রবার বুনো রবারের চেয়ে অধিক পরিমাণে বাজার দখল করিতেছে। এখন বনদেশের সহরগুলি পরিত্যক্ত ও সঙ্কর জাতির লোকরা নিরুপদ্রব হইয়াছে।

বাট্যা এবং তাঁহার ম্যানেজাররাও সর্ব্বদা উৎকৃষ্টতর উপায়ের সন্ধানে অবহিত থাকেন। যেই কোনও নূতন কলের সন্ধান পান বা তাঁহাদেরই কাহারও মাথায় আসে, অমনই পুরাতন কল সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন কল বসানো হয়, তাতে খরচ যতই লাগুক, এবং সেই বাতিল কল যত নূতনই হউক না কেন।

ফোর্ডের ন্যায় বাট্যাও মনে করেন, মাদক-সেবায় মানুষের কর্ম্মশক্তি হ্রাস হয়, মানুষ অমানুষ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহার কারখানার সিঁড়ির গায়ে মাদক-সেবনের যে কি নিদারুণ কুফল, তাহা চিত্রে ও বাক্যে প্রদর্শিত হয়।

কারখানার মধ্যেই কল-মেরামতের কারখানা আছে, মাঝে মাঝে কল খুলিয়া কলের হাঁসপাতালে পাঠানো হয়, এবং দক্ষ মিস্ত্রীরা তাহা ঝাড়িয়া, মেরামত করিয়া, ফিট করিয়া পাঠায়। বড় বড় ট্রলিতে করিয়া কল-মেরামতের হাঁসপাতাল হইতে কল-কব্জা যাওয়া আসা করিতেছে। কোন কল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে বা অচল হইলে, অমনই টেলিফোনে কেন্দ্র-অফিসে খবর দেওয়া হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কল সরাইয়া তাহার স্থানে নূতন কল স্থাপন করা হয়, এইরূপ আকস্মিকতার জন্য বাট্যা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, এবং কলের বিভিন্ন অংশ কারখানায় মজুত থাকে।

বাট্যার যেন লোহার শরীর। তাঁহার খেলা ও বিশ্রাম হইতেছে কায, আর কাযই হইতেছে তাঁহার খেলা আর বিশ্রাম। তিনি কখনও অলস হইয়া সময় অপব্যয় করেন না। এমন ঘটনাও বিরল নহে যে, তিনি দু'তিন দিন ক্রমাগত কায করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আহার-নিদ্রার অবসর তাঁহার হয় নাই।

পূর্ব্বে এই কারখানার সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০০০। আর এই কারখানা করার পরে ছয় সাত বৎসরের মধ্যে জিলন্ সহরের লোকসংখ্যা হইয়াছে ৩৬ হাজার। দুটি প্রকাণ্ড অনেক-তলার বাড়ীতে কারখানার লোকদের আবশ্যক সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান খোলা হইয়াছে, সেই দুই দোকানে পাখীর পালকের লেপ, তোষক হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের বই বা সিনেমা অভিনেতার ছবি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই দোকানের মধ্যে খাবার জিনিষও বিক্রয় হয়। সব চেয়ে দর্শনীয় হইতেছে ঐ দোকান-বাড়ীর ডেয়ারী-বিভাগ, সেখানে বহু মজুর পরিষ্কার পাত্রে শুচি স্বাস্থ্যকর খাঁটি দুগ্ধ পান করে। বাট্যা মনে করেন যে, যে লোকরা কঠিন পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে খাঁটি ভেজালহীন শুচি পবিত্র দুগ্ধের তুল্য আর কোনও খাদ্য নাই। এই সমস্ত দুধই তাঁহার নিজের গোহালের গোরু দুহিয়া আনা হয়।

অন্য দেশের কারখানার মালিকরা কারখানা হইতে দূরে বাস করেন। কিন্তু বাট্যার ক্ষুদ্র বাসভবনখানি কারখানারই কাছে, কারখানা হইতে ঢেলা ছুড়িলে সেই বাড়ীতে গিয়া পড়ে। তিনি মনে করিলেন যে, মজুরদের ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিবার জন্য কারখানার কাছেই একটি বাগান থাকা উচিত। অমনি তাঁহার আদেশ হইল, কারখানার মধ্যস্থলে একটি বাগান রচনা করিতে হইবে, এবং তুরন্ত—অতি সত্বর করিতে হইবে। সেই যায়গায় বহু বাড়ী ছিল। কিন্তু তাহাতে কি? স্বয়ং বাট্যার হুকুম হইয়াছে, —দেখিতে দেখিতে বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সেই স্থানে সুন্দর উদ্যান রচিত হইয়া গেল। এই উদ্যান রচনা করিতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল।

বাট্যার জীবনের মূল মন্ত্র হইতেছে কায আর সেবা।

ধনকুবের ফোর্ডের নূতন ধনোপার্জ্জনের উপায়

য়ুরোপীয় আদি আবিষ্কারকরা দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়া দেখিল, সে দেশের বাসিন্দারা এক রকমের বল মাথা হইতে মাথায় লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, সেই বলটা মাথায় পড়িলেই লাফাইয়া উঠে; এবং পরে জানিল যে, সেই বল এক প্রকার গাছের আঠা জমাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই গাছের নাম দেশী ভাষায় ছিল কাউটচাউক, পোর্ত্তুগীজরা নাম রাখিল সেরিঙ্গা বা পিচকারী এবং ইংরাজরা তাহার নাম রাখিল রবার বা যাহা দ্বারা কিছু ঘর্ষণ করিয়া মুছিয়া ফেলা যায়। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা হইতে প্রাচীন য়ুরোপ-এসিয়ায় চারিটি দ্রব্য নূতন আসিয়াছে—গোল আলু, ভুট্টা বা মকাই, তামাক, এবং কোকো। তার পরে আসিয়াছে রবার, এবং তাহা জগৎ জুড়িয়া অত্যাবশ্যক কাযের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে কেবল জুতা আর বর্ষাতি জামা তৈয়ারী করিতে রবার ব্যবহার করা হইত। কিন্তু বাইসাইকেল ও মোটর-গাড়ী আবিষ্কারের পর হইতে রবারের আবশ্যকতা শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকায় যাহারা স্বর্ণ-খনির সন্ধানে ঘুরিয়া দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের উদ্যম ও অদৃষ্টের বিবরণ লইয়া কত নাটক উপন্যাস রচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার জঙ্গলে যে অসভ্য দরিদ্র নিরীহ আদিম অধিবাসী ও য়ুরোপীয়দের সঙ্করবংশ রবার আহরণের জন্য জীবনপাত করিতেছে, তাহাদের কাহিনী কোনও কবি এখনও গান করেন নাই। উহারা প্রভাতে নিজেদের তাল-পাতার ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর ছাড়িয়া রওনা হয়, সঙ্গে থাকে একটা করিয়া থলিয়া, একখানা ধারালো দা, আর একটা বন্দুক। তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করে, গভীর স্রোতস্বিনীর উপর পতিত গাছের উপর দিয়া দেহভার সমান রাখিয়া পার হয়, একবার পদস্খলন হইলে নীচে কুম্ভীরের কবলে বা হাঙ্গরের গ্রাসে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া তাহারা চলে। জঙ্গলের মধ্যে জাগুয়ার নামক চিতা-বাঘ অথবা অজগর বোয়া সাপ তাহাদের আক্রমণ করে। ইহাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও হিংস্র ঝুমঝুমি সাপ, কত রকমের বিষাক্ত পোকা-মাকড় তাহাদের পাদুকাহীন খালি পায়ে দংশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে! এ সকলকেই উপেক্ষা করিয়া তাহারা বনে জঙ্গলে নির্ভয়ে পেটের দায়ে বিচরণ করে। প্রত্যেকে এক শত হইতে দেড় শত রবার-গাছ জঙ্গলের মধ্যে বাছিয়া লয় এবং তাহাদের মসৃণ শ্বেত বাকলের উপর খাঁজ কাটিয়া কাটিয়া চলে এবং খাঁজের তলে ছোট ছোট টিনের মগ ঝুলাইয়া দেয়। পরে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিবার পথে সেই সব গাছ হইতে সেই টিনের মগগুলি সংগ্রহ করে। যেমন আমাদের দেশে খেজুরগাছ কাটিয়া শিউলীরা রসপূর্ণ ভাঁড় সংগ্রহ করে, সেইরূপ সেই টিনের মগগুলি ঘন সাদা মিষ্ট দুগ্ধবৎ নির্য্যাসে পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইগুলি সংগ্রহ করা হয়। এই আঠা বাড়ীতে লইয়া গিয়া উহারা ধোঁয়া দিয়া জমায়, এবং সেই আঠা জ্বাল দেওয়ার বিষাক্ত ধূম সেই কুঁড়ের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলে নিশ্বাসে গ্রহণ করে। এর জন্য কোনও ধনী তাহাদের যৎসামান্য মজুরী দিয়া থাকে।



মিঃ হেনরী ফোর্ড

যে কবি এই রবার আহরণের কাব্য লিখিবেন, তাঁহাকে দান্তের নরক-বর্ণনার অনুরূপ অকথ্য যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। রবার আহরণের জন্য কঙ্গোদেশে বেল্‌জিয়ান যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের আগে রোজার কেস্‌মেণ্ট নামে আইরিশ বীর পুটুমায়ো দেশে রবারের জন্য যে অত্যাচার, হত্যা, নৃশংসতা, দাসত্ব প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন লোক ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু কতিপয় ধনশালী লোকের আরও অধিক ধনাগমের লোভের কাছে নিরীহ শান্ত সঙ্কর জাতির লোকদের বলিদানের কাহিনী সেইখানেই শেষ হয় নাই।

যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত যত রবার সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা উষ্ণ মণ্ডলের জঙ্গল হইতেই হইয়াছে, আমাজন নদের তীরে তীরে এবং কঙ্গোদেশে যে সকল জঙ্গল আছে, তাহার মধ্যেকার বন্য রবার-বৃক্ষ হইতেই রবার সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আমাজন হইতে রবারের কিছু বীজ ইংলণ্ডে লইয়া যান, এবং সেই বীজ হইতে লণ্ডনের কিউ গার্ডেনের লতাগৃহে সেইগুলির গাছ উৎপাদন করা হয়, এবং পরে সেই সব চারা সিংহলে, ইন্দো-চীন দেশে এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চালান করিয়া সেখানে রবার-চাষ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এখন এই চাষের রবার বুনো রবারের চেয়ে অধিক পরিমাণে বাজার দখল করিতেছে। এখন বনদেশের সহরগুলি পরিত্যক্ত ও সঙ্কর জাতির লোকরা নিরুপদ্রব হইয়াছে।

কিন্তু আমেরিকার মোটরগাড়ীওয়ালা ব্যবসাদারেরা পরদেশীর হাতে রবারের বাজার থাকা বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। যদি কখনও আমেরিকার সহিত য়ুরোপের যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে আমেরিকার মোটরগাড়ী রবার বিনা অচল হইয়া যাইবে, এই সম্ভাবনা সমগ্র দেশকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, রবারের গাছ আবার উষ্ণ দেশ ভিন্ন অন্য দেশে উৎপন্ন হয় না।

দুই বন্ধু—টমাস আল্‌ভা এডিসন এবং হেনরী ফোর্ড—একত্র মিলিয়া এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের এক জন বৈজ্ঞানিকশিরোমণি ও অপর জন ব্যবসায়ি-শিরোমণি; একের উদ্‌ভাবনী প্রতিভা ও অপরের ব্যবসায়বুদ্ধি একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। অদ্ভুতকর্ম্মা এডিসন তাঁহার আশ্চর্য্য জীবনের শেষ কয়েক বৎসর, প্রাচ্য রবারের অনুরূপ কোনও আমেরিকান গাছ হইতে রবার উৎপাদন করিতে পারা যায় কি না, তাহারই পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং বহু বৃক্ষের আঠা-নির্য্যাস পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মোটররাজ ফোর্ড একটা মীমাংসায় উপনীত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, যদি উত্তর-আমেরিকায় রবার উৎপন্ন করা না-ই যায়, তাহা হইলে অগত্যা দক্ষিণ-আমেরিকারই শরণাপন্ন হইতে হইবে; এবং সেই দেশে আগের মতন বুনো রবার সংগ্রহ নহে, বৃটিশ ব্যবসাদারদের মতন রবার-গাছের চাষ করিয়া তাহা হইতে রবার সংগ্রহ করিতে হইবে। শীঘ্রই এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ফোর্ড সাহেব ব্রেজিল গবর্মেণ্টের নিকট হইতে প্রকাণ্ড একটা জমী জমা লইয়া তাহাতে রবারের চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই ভূমিখণ্ডের নাম হইয়াছে ফোর্ডল্যাণ্ডিয়া। এই ফোর্ডল্যাণ্ডিয়া অপেক্ষা অনেক স্বাধীন রাজ্য আয়তনে ছোট। এই ফোর্ডল্যাণ্ডিয়ার আয়তন ৩০ লক্ষ একার বা প্রায় এক কোটি বিঘা জমী, এবং এই বনভূমি তাপাজোজ নদীর তীর বাহিয়া ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লোকে বলাবলি করে যে, এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে অনেক সোনা আর হীরকের খনি আছে, এই সংবাদ পাইয়া ফোর্ড সাহেব এই জমী জমা লইয়াছেন। নতুবা তিনি বুনো রবার সস্তায় সংগ্রহ না করিয়া এত টাকা জলের মতন এই বনের পিছনে কেন ঢালিতেছেন?



এডিসন্

কিন্তু ফোর্ড দেখিয়াছেন যে, রবারগাছের আদিম উৎপত্তিস্থান হইতেছে দক্ষিণ-আমেরিকা। স্বদেশে এই গাছের যেরূপ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা বিদেশে হইবার কথা নয়, আর তাহা ভিন্নও স্বদেশে গাছের পীড়া ও মৃত্যু কম হয়।

ফোর্ড ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জমী লইয়া বন কাটাইয়া রবারের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক বেশী মজুরী দিয়া তিনি ঐ কার্য্যের জন্য ৩০০০ ব্রেজিল-দেশীয় মজুর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি মজুর নিযুক্ত করিয়াই তাহাদের মধ্যে মদ খাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। তাহার ফলে মজুরদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং অনেক মজুরকে বরখাস্ত করিতে হয়। রবার-চাষের কায একেবারে স্থগিতপ্রায় হইলে ব্রেজিলের লোকরা সন্তুষ্ট হইল, কারণ, তাহারা বিদেশীর দ্বারা দেশে কোনও বড় ব্যবসায়ের পত্তন পছন্দ করিতেছিল না। কিন্তু ফোর্ড প্রথম তিন বৎসরে তাঁহার চাষে ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় দু কোটি বারো লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন। টাকার জোরে সকল বাধা তিনি অতিক্রম করিলেন। গত বৎসরে ৩০০০ একার জমী পরিষ্কার ও চাষ হইয়াছে, এ বৎসরেও ২০০০ একার জমীর জঙ্গল সাফ হইয়া তাহাতে রবারের চাষ আরম্ভ হইয়া যাইবে। গত অক্টোবর মাসে ১২ লক্ষ রবার-গাছ রোপণ করা হইয়া গিয়াছে, এবং গাছের নার্সারীতে এখনও এক কোটি

চারা রোপণের জন্য মজুত আছে। কঁপাঞহিয়া ফোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল দো ব্রাজিল অর্থাৎ ব্রেজিলের ফোর্ড-ব্যবসায় কোম্পানীর প্রধান আড্ডা যে স্থানে হইয়াছে, সেখানে আগে কেবল কতকগুলি তালপাতার কুঁড়েঘর ছিল। কিন্তু এখন সেখানে একটি ক্ষুদ্র আধুনিকতম সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে মজুরদের জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, কেরাণীদের জন্য সুন্দর সুন্দর বাংলা-ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল বাড়ী জাল দিয়া এমন করিয়া ঘেরা হইয়াছে যে, সে দেশের বিষম মশা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন ভাবে যে মশকের উপদ্রব নিবারণ করা যায়, ইহার আগে ব্রেজিলে তাহা কেহ অনুমানও করিতে পারে নাই। এই নব নগরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট বসিয়াছে, কলের জল রিফাইন করা হইতেছে, সকলের ধারাযন্ত্রে স্নানের ব্যবস্থা হইয়াছে, সর্ব্ববিধ উপকরণসমন্বিত একটি হাঁসপাতাল করা হইয়াছে, স্কুল এবং হোটেলের কথাও ভুল হয় নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, ঐ সহরে আমেরিকার আধুনিকতম সকল প্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

এই বোয়াভিষ্টা নগর হইতে জঙ্গলের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেল-গাড়ী চলিতেছে। ইহার ফলে ফোর্ড্‌ল্যাণ্ডিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে একটি নূতন নগর প্রাদুর্ভূত হইতেছে, এবং পরে সেইটিই প্রধান সহর হইয়া উঠিবে। জঙ্গলের ভিতর দিয়া উত্তম পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এবং সেই পথে বহু ফোর্ড্‌ মোটর-গাড়ী আর লরী-বাস্‌ নিয়ত ছুটাছুটি করিতেছে। বোয়াভিষ্টা হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত বহু এরোপ্লেন প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে। শীঘ্রই জলপ্লেনের বহর চলাচল করিতে আরম্ভ করিবে, এবং নদীতে নদীতে তাহারা যাতায়াত করিবে। ফোর্ড্‌ কেবল নিজের মোটর-কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী রবার উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হইবেন না। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত রবারের চাহিদা মিটাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ যে ব্রেজিলে রবার উৎপন্ন হইত, এবং রবারের ব্যবসায় যাহার একচেটিয়া ছিল, সেই ব্রেজিলে যে পরিমাণ কাঁচা রবার উৎপন্ন হয়, তাহার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ রবারের দ্রব্য সেখানে আমদানী হইতেছে।

ফোর্ড যে কাযে যখন হাত দিয়াছেন, সেই কাযেই সফলকাম হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোনও কাযে তিনি বিফল হন নাই। এই বনভূমিতে তিনি মানবের সঙ্গে প্রকৃতির যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা সফল হইলে মানবের অদ্ভুত শক্তির আর একটি পরিচয় প্রচারিত হইবে।

সোভিয়েট রাসিয়ার নূতন ঔপন্যাসিক

আধুনিক রুসীয় সাহিত্যে ইউজেন জামিয়াটিন এক জন বড় নামজাদা লোক। তাঁহার বয়স এখন ৪৮ বৎসর, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে ৩৫ বৎসরের বেশী মনে হয় না। তিনি সম্পূর্ণ নব রাসিয়ার লোক। তিনি খুব কর্ম্মঠ, চটপটে, এবং অসাধারণ দক্ষ লোক, তাঁহার মধ্যে স্বপ্ন-বিলাসী পুরাতন স্লাভ জাতির কোনও চিহ্ন অবশেষ নাই।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ানের' এক জন প্রতিনিধি সম্প্রতি জামিয়াটিনের সহিত প্যারিসে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে জামিয়াটিন তাঁহাকে বলিলেন, আপনি লেখক জামিয়াটিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আমি চেকভের মতন দ্বিপত্নীক। চেকভের এক প্রেয়সী ছিল সাহিত্য আর অপর প্রেয়সী ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। তেমনই আমার এক প্রিয়া হইতেছে সাহিত্য ও অপর প্রিয়া হইতেছে, জাহাজ-নির্ম্মাণ।

জামিয়াটিন দক্ষ জাহাজ-নির্ম্মাতা, তিনি যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ছিলেন এবং একটি প্রসিদ্ধ জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানার প্রধান পরিচালক ছিলেন। ইঁহারই প্রস্তুত বরফ-ভাঙা জাহাজে উত্তর-মেরুর বহু স্থানের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে আর কোনও কারখানায় জাহাজ-নির্ম্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকিলেও তিনি লেনিনগ্রাডের জাহাজ-নির্ম্মাণের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

জামিয়াটিনের দক্ষতা জাহাজ-নির্ম্মাণে অসামান্য হইলেও সাহিত্যে তাঁহার দান আরও অসাধারণ ও অধিক মূল্যবান্‌। তাঁহার রচনার সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহার গুণপনা প্রচুর। তাঁহার রচনা-ভঙ্গীর জন্য তিনি রুসীয় সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ও যশস্বী লেখক বলিয়া পরিগণিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্য বহু। তিনি ব্যঙ্গ-রসিক। একবার ব্যঙ্গের

মাত্রা একটু বেশী হইয়া যাওয়াতে তাঁহাকে কয়েক দিন কারাবাস করিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধতম উপন্যাস "আমরা" ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া আমেরিকা হইতে এবং ফরাসীতে তর্জ্জমা হইয়া প্যারিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই বইখানি খোদ রাসিয়াতে এখনও ছাড়পত্র পায় নাই, ইহাতে আমেরিকার কলকারখানার তৈরী সভ্যতাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে,—ইহা অ্যালডাস হাক্স্লির "সাহসী নব-জগৎ" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের বিষয়ের অনুরূপ। ইহা রাসিয়াতে অচল হইয়া এখনও সেন্সরের কবলে আছে। কিন্তু তাঁহার অন্য বইগুলি রাসিয়াতে খুব চলিতেছে ও সমাদৃত হইতেছে। তাঁহার দুইখানি নাটকের অভিনয়ও বহু সহরে সমারোহে হইতেছে।

রাসিয়াতে সাধারণ লোকের মধ্যে খাদ্যের ও পরিধেয়ের অভাব আছে, বাসস্থানেরও অসুবিধা অত্যন্ত—যদিও সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট বহু বস্তি নির্ম্মাণ করিয়া লোকের বাসের সুবিধা করিয়া দিতেছেন, তথাপি এখনও সহরে এক এক ঘরে তিন চার জন লোককে ঠাসাঠাসি করিয়া বাস করিতে হয়। এমন অবস্থায় জামিয়াটিন লেনিনগ্রাডের মতন প্রধান সহরে একটি তিন-ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাটে বাস করেন, ইহাতে তাঁহার অবস্থার স্বচ্ছলতা ও রাসিয়াতে সাহিত্যিকের সমাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসিয়াতে যে-লেখকের নাটক অভিনয় দর্শনে লোকের আগ্রহ দেখা যায়, তাঁহারা থিয়েটারে টিকিট বিক্রয়ের মুনাফার শতকরা ৬ বা ৭ টাকা মান-মূল্য পাইয়া থাকেন। ঔপন্যাসিক পিল্নিয়াকও মস্কোসহরে একটি পাঁচ-ঘরা গৃহতল ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করেন। রাসিয়াতে সাধারণ লোককে মাখন বা পনীর কিনিবার অধিকার দেওয়া হয় না, পাছে তাহারা বিলাসের বা লালসার মোহে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করিয়া বসে। কিন্তু লেখকদিগকে এক একখানি বিশেষ অনুজ্ঞাপত্র "পায়োক" দেওয়া হয়, তাহা দেখাইয়া তাঁহারা দোকান হইতে মাখন পনির প্রভৃতি সুখাদ্য ক্রয় করিবার অধিকার পান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট লেখকদের প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমগ্র লেনিনগ্রাডে ৭৫ জন ও মস্কোতে ১ শত জন নামজাদা লেখক এই পায়োক ছাড়চিঠি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে রাসিয়াতে নামজাদা লেখকের সংখ্যা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। রাসিয়ার পুস্তক-প্রকাশকরা নামজাদা ও নূতন-ব্রতী লেখকের বই সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তারতম্য করে না, তাহারা সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া সকলের পুস্তকের মূল্য নিরূপণ করে, খ্যাতির বহর দেখিয়া নহে। এক জন নবীন অখ্যাত লেখক প্রথম সংস্করণের একখানি বই ৫০০০ কপি প্রকাশ করিয়া প্রতি ১০ হাজার কথার জন্য ২০০ রুব্‌ল্ হিসাবে মূল্য পান, এবং তা ছাড়া আবার বিক্রয়ের মূল্যের উপর তাঁহাদের রয়াল্‌টি দেওয়া হয়। ২০০ রুব্‌ল প্রায় ২০ পাউণ্ড বা আমাদের ভারতের ২০০, ২৫০ টাকার সমকক্ষ। এক জন নামজাদা লেখক ইহার অপেক্ষা দু'তিন গুণ বেশী পাইতে পারেন, কিন্তু তার বেশী নয়। সম্পন্ন ধনী লেখক তাঁহারা—যাঁহাদের বই একেবারে একসঙ্গে ত্রিশ হাজার কপি ছাপা হয় ও দাম খুব সস্তা করা হয়—যাহাতে সেই সব বই শীঘ্র সকলে কিনিয়া লইতে পারে। এ রকম বই অবশ্য খুব অল্প, এবং যে বইয়ের মধ্যে রাষ্ট্র-ব্যাপারের গন্ধ থাকে, তাহারই কাটতি বেশী হইয়া থাকে। রাসিয়ার জন-সাধারণ, এমন কি, চাষীরা পর্য্যন্ত এখন লেখাপড়া জানে, এবং সকল বই কিনিয়া পড়ে। এই অল্পদিনের মধ্যে দেশটা যেন নব-জীবন লাভ করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। চাষীগিন্নীরা এখন একলার চাষ আর দশে মিলিয়া যৌথ চাষের বিষয় আলোচনা করে, এবং এই সব গরু-ভেড়া সম্বন্ধে কথা বলিতেছে। পঞ্চ-বার্ষিক উন্নতি-ব্যবস্থায় রাসিয়ার বয়স্ক লোকেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের জড়তা আর অলসতা দূর হইয়াছে, তাহারা আত্ম-নির্ভরতা লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা আমেরিকার যান্ত্রিকতার উপযোগিতা অনুভব করিয়া যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

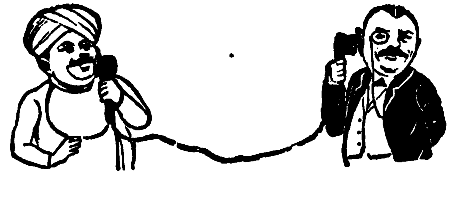
রাসিয়ার এই অতি দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগমনের মূলে আছে সাহিত্যিকদের সাহায্য ও আন্দোলন। আবার এই নবযুগে বহু নবীন সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহারা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা দেশকে আলোক দান করিতেছেন। এই নবযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকরা স্বদেশে 'পোপুচিকি' নামে পরিচিত। রাসিয়ার ভাষায় ঐ শব্দটির অর্থ 'সহযাত্রী', তাঁহারা দেশের জনসাধারণের সহযাত্রী,

পরিচালক নহেন, এই হইতেছে তাৎপর্য্য ও গূঢ় অর্থ। এই সব লেখকের মধ্যে প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন স্বেবোলোড্, ইভানোভ, এবং বাবেল; ইঁহারা দেশের অন্তর্দ্রোহের বিষয় লইয়া যে উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাতে মহাকাব্যের আবেগ ও প্রাণশক্তির গতি ও সরসতা সজীবতা আছে। জোশেস্কো নব-রাসিয়ার চেকভ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অগ্নেভ "সাম্যবাদী স্কুল-পড়ুয়ার ডায়ারী" নামক পুস্তক লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সেই বই ইংরাজীতে 'কমিউনিষ্ট স্কুলবয়েজ ডায়ারী' নামে অনুবাদিত হইয়াছে। পিল্‌নিয়াক আর এক জন ক্ষমতাশালী লেখক। বুল্‌গাকভ এক জন দক্ষ নাট্যকার এবং লিওনোভ এক জন প্রথম শ্রেণীর লেখক। আধুনিক রাসিয়ার অধিকাংশ লেখকই কমিউনিষ্ট অর্থাৎ সাম্যবাদী, ইঁহাদের দলে বৃদ্ধ লোকও আছেন। বৃদ্ধ গ্লাড্‌কভ ব্যবসায়-বাণিজ্য-বিষয়ক প্রথম নভেল লেখেন 'সিমেণ্ট'। শোলেখোভ 'শান্ত জমীদার' নভেল লিখিয়া যশস্বী; ইহাতে মহাকাব্যের গুণ বিদ্যমান আছে। ফাডেইভ 'ধ্বংস' নামে গত অন্তর্দ্রোহের বিষয় লইয়া একটি অত্যুত্তম নভেল রচনা করিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই অতি সরল ভাষায় সোজাসুজি ভঙ্গীতে রচনা করেন। ইঁহাদের আদর্শ হইতেছেন টলষ্টয়। ইঁহারা সকলেই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা সোভিয়েট রাসিয়ার অন্তরের বার্ত্তা ও আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া ইঁহাদের প্রভাব দেশের উপরে অত্যন্ত বেশী। ইঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, অতঃপর সাহিত্যই দেশে পথ ও বার্ষিক প্ল্যানের স্থান অধিকার করিয়া দেশোন্নতিসাধন করিবে। এই যে সাধারণ লোকের মধ্য হইতে আবির্ভূত লেখক-সম্প্রদায়, তাঁহারা একটি সমিতি করিয়া নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই সমিতির নাম দিয়াছেন 'রাপ্'। এই 'রাপ্' দেশের সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকা দখল করিয়া বসিয়াছেন, সকল রকম সমালোচনা তাঁহাদের হাতেই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে।

তরুণদের এই সর্ব্বগ্রাস দেখিয়া দেশের কর্ত্তারা ভীত হইতেছেন এবং বোধ হয়, গোর্কির প্ররোচনায় এই 'রাপ্' সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তরুণদের একচেটিয়া অধিকার বন্ধ ও রোধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তরুণদের সাহিত্য-সাধনায় দেশের যে কোন উপকার হয় নাই, এমন কথা কেহ বলে না, তাঁহাদের রচনার ফলে অনেকে এখন শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিতেছে, অনেক প্রাচীন লেখক নবীনের আদর্শ অবলম্বন করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হইতেছেন। এখন রাপের সভ্যরা একটি লেখক-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহাতে নবীন প্রবীণ দুই প্রকারের লেখকই সম্মিলিত হইয়াছেন। ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ, নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রবীণের অতিসাবধানতা উভয়ের পারস্পারিক প্রভাবে মধ্যপন্থী হইতেছে। ইহাতে আশা হয় যে, ভবিষ্যতে সাহিত্য নবীনের বাস্তবতা ও প্রবীণের ভাব-বিলাসিতা ও কল্পনাকুশলতা মিলাইয়া একটি অপরূপ সৃষ্টি হইবে। অচিরেই রাসিয়ায় একটি সাহিত্যিক নব-যুগের আবির্ভাব হইবে এবং তাহাতে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ)।





চয়ন

খাদ্যরক্ষার ব্যবস্থা

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, রঙ্গীন আধারে খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিলে উহা দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। যে সকল বর্ণ ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে, সেই বর্ণের আধারে খাদ্যদ্রব্য শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। তৃণ-শ্যামল বর্ণ এবং কালো রঙ্গ ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ

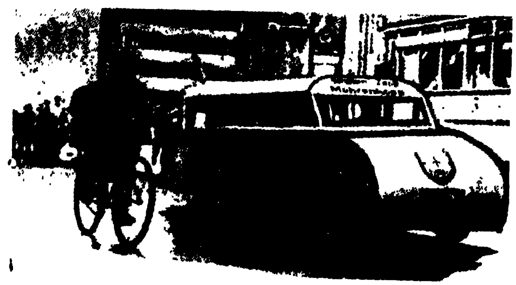


খাদ্যদ্রব্য কালো আধারে রাখা হইতেছে

করিতে পারে না। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে তৈল বা স্নেহ-পদার্থ বিদ্যমান থাকে, আলোকের প্রভাবে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এবং আলোক প্রবেশ করিতে না পারায় তাহা দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে, ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একই জাতীয় দ্রব্য কাচের বোতলে রাখিয়া যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে পারে এমন অবস্থায় স্থাপিত হয়। সেই জাতীয় দ্রব্যও কালো বোতলে রাখা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এক বৎসর পরে কালো বোতলের খাদ্য তাজা অবস্থায় রহিয়াছে। সাদা বোতলের খাদ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাখনও ঐভাবে রাখিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। ফল একই প্রকার দেখা গিয়াছিল। তৃণ-শ্যামল এবং কালো রঙ্গের আধারই খাদ্যদ্রব্যকে অবিকৃত অবস্থায় রাখে।

পাদচালিত "জেপ" গাড়ী

বার্লিনের রাজপথে জেপলিন আকারের পাদচালিত গাড়ী দেখা দিয়াছে। এই গাড়ীর ৪ জন আরোহী পাদচালনার সাহায্যে



পাদচালিত 'জেপ' গাড়ী

ঘণ্টায় সাড়ে ছয় মাইল করিয়া এই গাড়ী চালাইতে পারে। সমগ্র জার্ম্মাণী পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে চারি জন বেকার উল্লিখিত গাড়ীখানি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

দারুনির্ম্মিত গৃহ

যাহারা অধিক ব্যয় করিতে পারে না, স্বল্পমূল্যে তাহাদের জন্য বাস-ভবন নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। শিরিষের আঠার সাহায্যে



দারুনির্ম্মিত গৃহ

পাতলা তক্তা জুড়িয়া তিনটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বাড়ীটি ৪ শত ডলার মুদ্রায় মার্কিণদেশে প্রস্তুত

হইয়াছে। কীলকবর্জ্জিত এই সুদৃঢ় গৃহ বাসোপযোগী করিতে দুই দিনের অধিক লাগে না। ইহা অনায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া চলে।

ঝড়-উৎপাদক যন্ত্র

হলি উডের চলচ্চিত্র কার্য্যালয়ে কৃত্রিম ঝড় উৎপাদনের জন্য

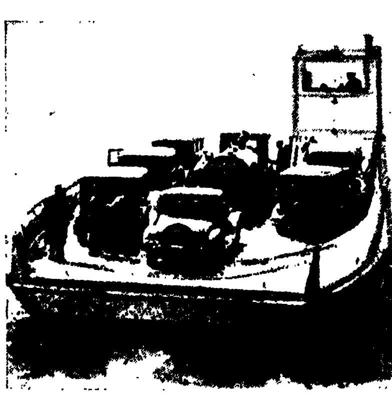


ঝড়-উৎপাদক যন্ত্র

একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্র হইতে প্রবল ঝড়ের গতিবিশিষ্ট বায়ুপ্রবাহ নির্গত হইয়া থাকে। ছোট-খাট অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত করিতে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। যে অঞ্চলে জলের অভাব, তথায় এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম ঝড় সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রভাবে বালুকারাশি নিক্ষেপ করিতে পারা যায়। নিক্ষিপ্ত বালুকারাশি অগ্নির উপর পড়িলে তাহা নির্ব্বাপিত হয়।

ইস্পাতের খেয়া নৌকা

হডসন নদে ইস্পাতের খেয়া নৌকায় মানুষ ও যানাদি পারাপার করা হয়। এই নৌকার মধ্যে জল-প্রবেশের কোনও উপায় নাই। অভিজ্ঞগণের মতে উহা কখনও জলমগ্ন হইতে পারে না। মোটর এঞ্জিন ৭০ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট। ডেকের উপর ১২খানি মোটর গাড়ীর জন্য স্থান আছে। এই প্রকার দুইখানি খেয়া নৌকা হডসন নদে পারাপারের কার্য্যে নিযুক্ত আছে।



ইস্পাতের খেয়া নৌকা

গ্রাম্য ডাকবাক্স



গ্রাম্য ডাকবাক্স

উইস্‌কন্‌সিনের কোনও এক জমীদারের প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বারে একটি ডাক-বাক্স স্থাপিত আছে। অবশ্য রাত্রিকালে চিঠিপত্র বিলি হয় না। ডাকবাক্সটি একটি ছোট বাড়ীর আকারে নির্ম্মিত। তাহার চারিধারে অনুন্নত রেলিং বেষ্টিত। দিবা-ভাগে এই বাড়ীটিতে চিঠিপত্র সংগৃহীত হয়, রাত্রিকালে আলো জ্বলিতে থাকে। অতিথিরা সেই আলোকের সাহায্যে জমীদার-ভবনে প্রবেশ করে।

শিশুর অস্থায়ী ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ

ছোট ছোট শিশুদিগকে নিরাপদে রক্ষার জন্য বেড়া ঘেরা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ আমেরিকার বাজারে দেখা দিয়াছে। এই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ এক স্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইতে অতি অল্প সময় লাগে। চারিটি কোণ ভূমধ্যে প্রোথিত থাকে, সুতরাং সহসা তাহাকে স্থানচ্যুত করা চলে না। প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বারপথ আছে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে শিশুরা প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আসিতে পারে না।



শিশুর অস্থায়ী ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ

অতিকায় দূরবীক্ষণ-যন্ত্র

জার্ম্মাণীর পটস্‌ডাম সহরে একটি অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র



অতিকায় দূরবীক্ষণ-যন্ত্র

সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রায় একশত বৈজ্ঞানিক জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা নক্ষত্রালোক ও সূর্য্যালোকের পরীক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আইনষ্টাইনের মতবাদের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এই প্রচেষ্টা চলিতেছে। এমন বৃহৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্র পৃথিবীতে নাই বলিলেই চলে।

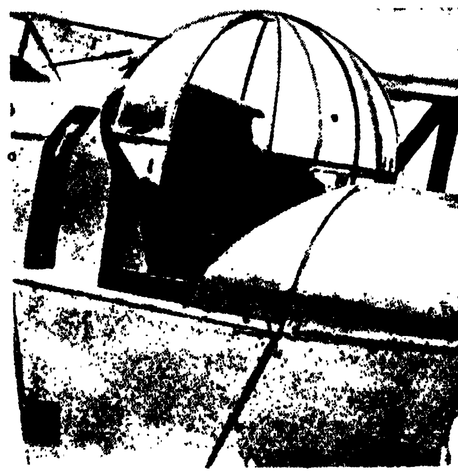
রঞ্জনরশ্মির প্রভাব



রঞ্জনরশ্মির প্রভাব

রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে প্রাচীনযুগের মিশরীয় মমির দেহ পরীক্ষা করা হইতেছে। এই রশ্মিপ্রভাবে সে যুগের মানুষ কি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার রহস্যের উদ্ভেদ সম্ভব হইয়াছে। আধার মধ্যে শায়িত সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন মানবদেহকে অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কারণ, আধার হইতে শবদেহ বাহির করিলেই তাহা বাহিরের বাতাসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু রঞ্জনরশ্মি আধার ভেদ করিয়া শবদেহের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মমি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, আধুনিক যুগের রোগ-বীজাণু সে যুগেও রোগ সৃষ্টি করিয়া মৃত্যু ঘটাইত।

যুদ্ধ-বিমানে কাচ নির্ম্মিত খাঁচা



যুদ্ধ-বিমানে কাচের খাঁচা

বৃটিশ যুদ্ধ-বিমানে অধুনা কাচের খাঁচার মধ্যে অবস্থান করিয়া গোলন্দাজ অগ্নিবর্ষণ করিয়া থাকে। বাতাস ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোলন্দাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, কাচ আবরণের মধ্যে থাকিয়া অগ্নিবর্ষণ করিলে লক্ষ্য আরও সুনিশ্চিত ও অভ্রান্ত হইয়া থাকে। অস্ত্র-সঙ্কোচের যুগে—যখন সকল প্রতীচ্য সভ্যদেশ নরহত্যার অবসান ঘটাইবার জন্য মারণাস্ত্র হ্রাসের চেষ্টা করিতেছেন, তখনও অভ্রান্ত লক্ষ্যে কিরূপে সফলতা লাভ করা চলে, তাহার ব্যবস্থাও বন্ধ হয় নাই। ইহা বিচিত্র নহে কি?

উদ্বেগ

১

কলেজ হইতে সত্যব্রত সন্ধ্যার অনেক পরে বাসায় ফিরিল। এমন তাহার প্রায় হইত। বেলা ৪টায় কলেজ বন্ধ হইলেও প্রায়ই সে কলেজ-পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোন না কোন বিষয়ের গবেষণা করিত। এ জন্য বৈকালের জলযোগ সে কলেজেই সম্পন্ন করিত। অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় অপরাহ্নে বাসায় জলযোগ করিবার প্রয়োজন হইত না।

গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। লুকারগঞ্জের একটি সুদৃশ্য, উদ্যানপরিবেষ্টিত বাড়ী সে ভাড়া লইয়াছিল। অধিকাংশ ভদ্র বাঙ্গালী এই অঞ্চলে বাস করিতেন। পল্লীটি জনবহুল হইলেও তাহার শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী এবং ভদ্রভাবে জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। সন্ধ্যার পর অনেকের গৃহে এস্রাজ, বেহালা বা হারমোনিয়মের মধুর ঝঙ্কারে সঙ্গীত-লহরী সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাত্রার পরিচয় দিত।

সত্যব্রত গৃহে ফিরিয়া দেখিল, ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। পুরাতন পাচক রন্ধনে রত, দাসী তাহার কার্য্যে নিযুক্ত। বৈঠকখানার ঘর তখনও ধূপের গন্ধে আমোদিত।

পার্শ্বের ঘরে সত্যব্রত কলেজের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অন্দর-মহলে চলিয়া গেল। বাংলো বাড়ী। অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর ব্যবধান অতি সামান্য। শয়নকক্ষ অন্ধকার। অমলা যে ঘরে বসিয়া কাযকর্ম্ম করে, পড়ে, গল্প করে, সে কক্ষে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। কিন্তু ঘর শূন্য।

অমলা প্রায় প্রতিবেশীদিগের বাড়ী বেড়াইতে যায়, প্রতিবেশিনীরাও গতায়াত করেন। আজ সাত বৎসর একই পল্লীতে বসবাসের ফলে অনেকের সহিত অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ অমলার সতীর্থ শৈলবালা এলাহাবাদে লুকারগঞ্জে আসার পর দুই সখীর মধ্যে পূর্ব্ব-প্রীতিবন্ধন নূতন করিয়া নিবিড়তর হইতেছিল। শৈলবালার স্বামী লাটের দপ্তরখানায় মোটা বেতনে কায করিত।

বাবুকে মায়ীজীর ঘরে আসিতে দেখিয়া লছমনিয়া পাকশালা হইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার মায়ীজী ও-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। তাহার উপর হুকুম ছিল, বাবু গৃহে ফিরিলেই সে যেন মায়ীজীকে সংবাদ দেয়। বাবুকে সে সংবাদ জানাইয়া লছমনিয়া গিরিধারীকে ডাকিল।

বাঙ্গালী পরিবারে কায করিয়া লছমনিয়া বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা কহিতে শিখিয়াছিল। সে গিরিধারীকে বলিল, "তুই বাবুকে চা-তামাক দে। আমি মায়ীজীকে আনতে গেলাম।"

সত্যব্রত সহসা গমনোদ্যতা লছমনিয়াকে ডাকিয়া বলিল, "তোর এখন যেতে হবে না। আরও খানিক পরে যাস্। তোর মা-জী কখন্ গেছেন?"

লছমনিয়া জানাইল, তাহার মাইজীর মিতা-মাইজী আসিয়াছিলেন। তিনি কি একটা জরুরী কাযে মাইজীকে সন্ধ্যার কিছু আগে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিতেই গিরিধারী এক পেয়ালা গরম চা মনিবের সম্মুখে টেবলের উপর রক্ষা করিল। ইহা সত্যব্রতর নিত্যনিয়ম।

গিরিধারী চমৎকার চা তৈয়ার করিতে পারিলেও অমলা দুই বেলাই স্বামীর চায়ের পেয়ালা নিজে আনিয়া দিত। সে নিজে চা-পানের ভক্ত না হইলেও স্বামীর আহার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। এ বিষয়ে—তা চা-ই হউক, অথবা কোন আহার্য্যই হউক, কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিত না। ইদানীং অপরাহ্নে চা-সম্বন্ধে দীর্ঘকালের নিয়মের প্রায়ই পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সত্যব্রতের মনে চা-পানের সময় আজ সে কথাটা স্মরণ হইল কি?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সত্যব্রত শূন্যদৃষ্টিতে প্রাচীর-বিলম্বিত পত্নীর তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া রহিল। আজ তিন বৎসর হইল, সে পত্নীর আলোকচিত্র তুলাইয়া পরিচিত শিল্পীর সাহায্যে একখানি বড় তৈলচিত্র রচনা করাইয়াছিল।

অমলা সুন্দরী। তারুণ্যের দীপ্তি ও তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাহার দেহতটে সমুজ্জ্বল আলোকমালা বিকীর্ণ করিয়া লীলায়িত হইতেছিল। শিল্পীর নিপুণ তুলিকার অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়।

কয়েক চুমুক চা-পানের পর সত্যব্রতের বৈজ্ঞানিক চিত্ত যেন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য নিবিষ্ট

ও নিবিড় হইয়া উঠিল। টেবলের উপর পেয়ালার বাকী চা জুড়াইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাহার খেয়ালই ছিল না।

অকস্মাৎ কক্ষের নিবিড় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত যৌবনের কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—

"বাঃ, তুমি চুপ ক'রে ব'সে আছ! আমার আস্‌তে বড় দেরী হয়ে গেছে!"

অমলা স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দৃষ্টি চায়ের পেয়ালার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সে বলিয়া উঠিল, "চা খাও নি? আজ ভাল হয় নি বুঝি?"

বৈজ্ঞানিক স্বামীর মীমাংসা-তৎপর নয়নের দৃষ্টি পত্নীর অনিন্দ্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। পত্নীর দীর্ঘায়ত নয়নের প্রসন্ন দৃষ্টির মাধুর্য্য তাহার সমস্ত অন্তর-রাজ্যে পুলকপ্রবাহ বহাইয়া দিল।

সে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, "বিজ্ঞানের একটা প্রশ্ন মনটাকে এমন অভিভূত ক'রে রেখেছিল যে, চায়ের পেয়ালার মর্য্যাদা রক্ষা করতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

অমলা স্বামীর স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "আমি লছমনিয়াকে ব'লে গিয়েছিলুম, তুমি এলেই সে যেন আমাকে খবর দেয়; কিন্তু সে বল্‌লে, তুমি তাকে যেতে বারণ করেছিলে। কেন?"

সত্যব্রত হাসিয়া বলিল, "তুমি সইয়ের বাড়ী গেছ, দু'দণ্ড ব'সে আলাপই যদি না করতে পারলে, তবে যাওয়ায় লাভ? তাই একটু দেরী ক'রে যেতে বলেছিলুম।"

এতক্ষণ সমগ্র বাড়ীটা যেন প্রাণহীন মনে হইতেছিল। অমলার আবির্ভাবে জীবনপ্রবাহ যেন সগৌরবে, দ্রুততালে বহিয়া চলিল।

অমলার সংস্পর্শে বিষাদের মালিন্য, ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস, ব্যথার বেদনা যেন রূপান্তরিত হইয়া যাইত। পত্নীর লঘু-চঞ্চল গতি, লাবণ্যোজ্জ্বল দেহলতিকার পেলবতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সত্যব্রতের গম্ভীর আননে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

২

শৈলবালার স্বামী দেবপ্রসাদ সত্যব্রত ও তাহার পত্নীকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিল। তাহার সতীর্থ, খ্যাতনামা সাহিত্যিক দেবেন মিত্র এবং দর্শনের অধ্যাপক বিমলচন্দ্র পূজার ছুটীতে বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল।

রবিবারের অপরাহ্ণ চারি বন্ধুর আলোচনায় কোথা দিয়া অন্তর্হিত হইল, কাহারও সে বিষয়ে খেয়াল ছিল না। আহারের ব্যবস্থা ছিল রাত্রিতে।

চায়ের আয়োজন হইয়াছিল। চারি জন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর আসরে আলোচনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ব্যাপারেই চলিতেছিল। সঙ্গীতের অমোঘ শক্তির কথা বিশ্ববিশ্রুত, দেবেন মিত্র ইহা জোর গলায় প্রমাণ করিল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়া দর্শনের অধ্যাপক বিমলচন্দ্র কথার সূত্র ধরিয়া বলিল, "সংসারে মানুষ নিজেই অশান্তির সৃষ্টি করে, নিজে দুঃখ পায়, অন্যকেও দুঃখ দেয়।"

সাহিত্যিক দেবেন মিত্র বলিল, "খুব খাঁটি কথা। সুখ-দুঃখ মনের একটা বিকার অবস্থা। মানুষ ইচ্ছা করলে, বিরুদ্ধ অবস্থাতেও মনের অসুখ দূর করতে পারে।"

দেবপ্রসাদ নিম্‌কির শেষখণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিল, "তোমরা দু'জনেই মানব-মনোবৃত্তির শাস্ত্র নিয়ে অনেক আলোচনা করেছ। আমি ভাই ও-সব ধার ধারি না। তবে এইটুকু বুঝি যে, যত দিন বেঁচে থাকা যায়, জীবনের পথে যা কিছু এসে পড়ে, হাসিমুখে, সহজভাবে তা নিতে পারলে দুঃখের পীড়া মনকে অবসন্ন করতে পারে না।"

সত্যব্রত বন্ধুত্রয়ের কথা শুনিয়া যাইতেছিল। সে এবার ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিল, "তত্ত্ব হিসাবে কথাগুলি বলা সহজ, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন নয় কি?"

কথা-সাহিত্যিক দেবেন নিঃশেষ-পীত পেয়ালাটা টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "সেটা ঠিক। কিন্তু বন্ধু, আজ তোমাকে এক জন ঋষিকল্প ঔপন্যাসিকের একখানা উপন্যাসের প্রথম কয়েকটা ছত্র উদ্ধৃত ক'রে বল্‌তে পারি, মানুষ ইচ্ছে করেই দুঃখ সৃষ্টি করে। কাউণ্ট টলষ্টয়ের আনাকারনিনা বইখানা বোধ হয় পড় নি। তোমরা বৈজ্ঞানিক মানুষ কি না। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক সুখী পরিবারের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু প্রত্যেক দুঃখী পরিবার নিজের নিজের মনগড়া ব্যাপার নিয়ে দুঃখ ভোগ করে। কথাটা অত্যন্ত মূল্যবান্ নয় কি?"

দেবপ্রসাদের সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ দেহে আনন্দের উচ্ছ্বাস

যেন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রকাশ পাইল। সে বলিল, "বড় চমৎকার কথা।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্র এই কথারই ব্যাখ্যা নানাভাবে দিয়েছে।"

সত্যব্রত ভাবিতে লাগিল, কথাটা কি অভ্রান্ত? সত্যই কি মানুষ নিজের মনগড়া দুঃখ সৃষ্টি করিয়া অসহ্য বেদনায় দিন কাটায়?

বন্ধুত্রয়ের যৌবনোৎফুল্ল দেহে স্বাস্থ্য ও বলের পরিচয় আপনা হইতেই পাওয়া যায়। তাহারা সুখী। অপাঙ্গে সত্যব্রত একবার তাহার দুর্ব্বল, ক্ষীণ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কোনও বিশেষ ব্যাধি তাহাকে দুর্ব্বল করে নাই—প্রকৃতির খেয়ালেই সে এই পরিণত যৌবনে বৃদ্ধের দেহ ও মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়াছে।

চিন্তাসূত্রের ঊর্ণনাভজালে তাহার সমগ্র মন যেন আবদ্ধ হইয়া গেল। সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে দেখিল, নানা অবান্তর চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজালে সে কোথায় চলিয়াছে—বাহির হইবার যেন কোনও পথ নাই।

তিন বন্ধু তখন আলোচনাপ্রসঙ্গে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, বৈজ্ঞানিক বন্ধুর নির্লিপ্ততা তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিল না। নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা সম্বন্ধে কথা-সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ এমন সব কথার সন্নিবেশ করিতে লাগিল যে, তর্ক তাহাতে উচ্চসপ্তকে সুর চড়াইয়া চলিতে লাগিল।

দেবপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, "নারী-চরিত্র কি সত্যই দুর্জ্ঞেয়?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "পুরুষের পক্ষে স্ত্রীজাতির মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলেই আমার মনে হয়।"

দার্শনিক বন্ধু বলিল, "কিন্তু তোমার উপন্যাস বা ছোটগল্পে যে সব নায়িকার কথা বলেছ, সেগুলি তা হ'লে বস্তুতান্ত্রিকতাবর্জ্জিত?"

গম্ভীরভাবে দেবেন্দ্র বলিল, "তা হ'তে পারে। তবে আজ দশ বৎসর ধ'রে আমি জানবার চেষ্টা করছি। সে জন্য অনেক অসাধ্যসাধন করতে হয়। জানি না, অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলদেশ হ'তে কোন দিন অমূল্য রত্ন আহরণ করতে পারব কি না।"

কথাটা সত্যব্রতের চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করিয়া দিল। সে বন্ধুর কথাটা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিল। তার পর বলিল, "বিজ্ঞান কি এ বিষয়ে পুরুষকে সাহায্য করতে পারে না?"

বিমলচন্দ্র একটা পাণ মুখে ফেলিয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিল, "যদি দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ক'রে, সাহিত্যিক প্রাণ দিয়ে তত্ত্বান্বেষী হওয়া যায়, তা হ'লে হয় ত সম্ভবপর হ'তে পারে।"

সত্যব্রত তাহার দীর্ঘায়ত নয়নের দৃষ্টি বাতায়নপথে প্রসারিত করিয়া দিল।

৩

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

বিমল দেবপ্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আকাশের প্রান্তে 'ক্ষীণশশাঙ্করেখা' দেখা যাচ্ছে। বন্ধু, এখন তর্ক থাক্, তোমার গান আরম্ভ কর।"

দেবেন্দ্রনাথ সত্যব্রতকে বলিল, "দেবু চমৎকার কীর্ত্তন গাইতে পারে। সত্যবাবু কি দেবুর গান শুনেছেন?"

দেবপ্রসাদ যে সুগায়ক, এ কথা সত্যব্রতের জ্ঞানের অগোচর ছিল। আজ এক বৎসর সে এলাহাবাদে আসিয়াছে, কিন্তু দেবপ্রসাদ সুগায়ক, এ কথা লুকারগঞ্জের বাঙ্গালী সমাজে অপ্রচারিত ছিল। কাযেই সত্যব্রত সবিস্ময়ে বলিল, "না, তা ত জান্‌তাম না।"

দেবপ্রসাদ অনুরুদ্ধ হইয়া বন্ধুদিগের প্রস্তাব এড়াইতে পারিল না; কিন্তু কীর্ত্তনের সঙ্গে শ্রীখোলের অঙ্গাঙ্গী প্রীতি, এ কথাটা সকলকে জানাইয়া দিতে ভুলিল না। খোল না হইলে কীর্ত্তন জমে না।

বিমল বলিল, "খোল যখন এখন পাবার সম্ভাবনা নেই, তখন দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হবে। হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে তোমাকে অনেকবার কীর্ত্তন করতে শুনেছি, দেবু।"

দেবপ্রসাদ হাসিয়া বলিল, "সে যেন পেঁয়াজের পায়স। খেতে সুস্বাদু হলেও দেবতার ভোগ দেওয়া যায় না।"

দেবেন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "চমৎকার উপমা! কিন্তু তবু মধুর অভাবে গুড় দিয়াই কাযটা শেষ করার বিধি ত আছেই।"

বাড়ীতে একটা হারমোনিয়ম ছিল। শৈলবালা মাঝে মাঝে তাহার সাহায্যে গান করিত। ভৃত্য হারমোনিয়ম্ আনিয়া উপস্থিত করিল।

দেবপ্রসাদ তখন সুর সংযোগ করিয়া গান ধরিল—

"সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম!"

শৈলবালার স্বামীর সঙ্গীতে এমন অধিকার!

বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সত্যব্রত চণ্ডীদাসের এই চিরসুন্দর গানের মাধুর্য্যে আত্মহারা হইল।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"—

এই অংশটি নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 'আখর' দিয়া দেবপ্রসাদ যখন গাহিয়া চলিয়াছে, তখন সত্যব্রত দেখিল, দরজার ওপারে শৈলবালা ও তাহার স্ত্রী অমলা নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুরে সুরে ঝঙ্কার তুলিয়া দেবপ্রসাদের কণ্ঠ হইতে যেন সুধাধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সুন্দর, বলিষ্ঠ-দেহে যেন ভাবাবেশ তরঙ্গ তুলিতেছিল। গায়কের নয়ন নিমীলিত, কিন্তু সমগ্র আননে ভক্তের, প্রেমপিপাসুচিত্ত মানবের আবেদন যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবপ্রসাদ যখন গাহিতেছিল,—

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!—"

তখন গায়কের নিমীলিত নয়নপথে ধারার পর ধারা নামিয়া আসিতেছিল। রুমালে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া সত্যব্রত দেখিল, তাহার পত্নী দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছে।

সহসা সত্যব্রত বিমনা হইয়া পড়িল। এই সুস্থ সবলদেহ প্রিয়দর্শন যুবক গায়কের এমন সুকণ্ঠে কাহার চিত্ত না আকৃষ্ট হইবে? কিছু পূর্ব্বেই সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে কথা-সাহিত্যিক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে?

নারী-চরিত্র দুর্জ্জের, ইহা ত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। যদি সত্যব্রত নারী হইত, তাহা হইলে এই প্রিয়দর্শন যুবকের মন-মাতান সঙ্গীত তাহাকে মুগ্ধ, অভিভূত এবং বিচলিত করিত না কি?

বৈজ্ঞানিকের চিত্ত সমস্যাসমাধানের জন্য উদগ্র হইয়া উঠিল।

এমন সময় ভিতর হইতে ডাক আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। গান অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল। বন্ধুবর্গ স্তব্ধভাবে সঙ্গীতের মাধুর্য্যরস পরিপাক করিতেছিল।

পরিচারকের আহ্বানে সত্যব্রতের চমক ভাঙ্গিল। দেবপ্রসাদ হাস্যমুখে বন্ধুদিগকে ভিতরে আসিবার জন্য আহ্বান করিল।

৪

ইদানীং সত্যব্রতের কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনিয়ম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। সে নিজেই বুঝিতে পারিত না, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি তাহার অনুরাগ কেন প্রতিদিন হ্রাস পাইতেছিল। অমলা প্রত্যহই তাহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেও, কার্য্যকালে এমনই আত্মবিস্মৃতভাবে সে গবেষণাগারের কাযে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিত যে, কোনও মতেই সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময়কে শৃঙ্খলাধীন করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত সময় আগ্রহ সহকারে ও মন দিয়া যে সে কায করিত, এ কথা সে নিজেই হলপ করিয়া স্বীকার করিতে পারিত না। কায করিতে করিতে অনির্দ্দিষ্ট চিন্তাজালে সে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া গবেষণার সূত্র হারাইয়া ফেলিত।

চিন্তা—অবয়বহীনা মায়াময়ীর ইন্দ্রজাল ভরা, অদৃশ্য সূক্ষ্মতম তন্তুগুলি যেন তাহার মনকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া স্বাধীন, সুস্থ, সবলভাবে কোন বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে দিত না। আহারে, বিহারে, শয়নে, কার্য্যে প্রত্যেক ব্যাপারেই অশ্রান্ত চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, তাহার দেহে সুস্থতার স্পর্শানুভূতি ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আসিতেছে; কিন্তু দুর্ব্বল দেহের অন্তরালস্থিত তাহার মন এমন সহিষ্ণুভাবে নীরবতার অঞ্চলচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত যে, বাহির হইতে কেহই তাহার রাবণের চিতার মত অনির্ব্বাণ চিন্তার অগ্নির দাহিকা শক্তির পরিচয় পাইত না।

সে দিন সে অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরিয়াছিল। নিঃশব্দে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া সে

অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কিছু দিন হইতে তাহার গতি লঘু, সতর্ক এবং শব্দহীন হইয়া উঠিতেছিল।

পত্নীর বসিবার কক্ষের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সে দেখিতে পাইল, শৈলবালা ও অমলা আলোচনায় মগ্ন। অমলার ক্রোড়ে শৈলবালার শিশু পুত্র।

সত্যব্রত নিঃশব্দে বাহিরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া অমলা অজস্র চুম্বনে তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল, "কি সুন্দর হয়েছে ভাই, তোর খোকা!"

শৈলবালা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তার পর তেমনই ভাবে বলিল, "তোর কোলে ছেলে এমন সুন্দর মানায়! তুই যেন গণেশজননী।"

অমলা শিশুকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ ভাই, খোকার চোখ, মুখ, নাক, কাণ, রং সব যেন ওর বাপের মত।"

অমলা গভীর আবেগভরে খোকার মুখে আবার চুম্বন-ধারা বৃষ্টি করিতে লাগিল।

খোকা আদর পাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

অমলা আবার তাহাকে বুকের মধ্যে সন্তর্পণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ওরে আমার সোনা-মাণিক, সাতরাজার ধন, খোকা।"

বন্ধুর সে দিনের আলোচনার কথা সত্যব্রত নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। নারীচরিত্র পুরুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। সত্যই কি তাই? সাত বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করিয়া সত্যব্রত কি তাহার পত্নীর হৃদয়ের কোনও পরিচয় পায় নাই? সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী অমলা পূর্ণ-যৌবন-জোয়ারে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের ক্ষুধার তৃপ্তি-সাধন করিতে সত্যব্রত বোধ হয় পারে নাই। তাই কি নারীচিত্তের দুর্জ্ঞেয় মনোভাব শিশুর আদরে আংশিকভাবে প্রকাশ পাইতেছে?

দীর্ঘ দিনের চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক যেন প্রবল আঘাত-বেদনায় জ্ঞানের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গেল। অকস্মাৎ চারিদিক্ যেন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আলোকোজ্জ্বল কক্ষ যেন নিভিয়া অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

"মা গো!—"

গুরুভার পদার্থের পতনশব্দে আকৃষ্ট হইয়া অমলা শিশুকে সখীর ক্রোড়ে ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুইচ টিপিয়া বাহিরের আলো জ্বালিতেই সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার স্বামীর দেহ ভূমিতলে লুটাইতেছে।

আর্ত্তনাদ করিয়া অমলা স্বামীর পাশে বসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সে দাসী ও ভৃত্যকে আহ্বান করিল।

শৈলবালাও ছুটিয়া আসিল। পাচক, ভৃত্য, দাসী ও শৈলবালার সাহায্যে অমলা সন্তর্পণে ক্ষীণকায় সত্যব্রতের দেহ শয্যায় স্থাপন করিল। ডাক্তার ডাকিবার জন্য ভৃত্য দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অমলার বুক ফাটিয়া ক্রন্দনবেগ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। অতি কষ্টে অশ্রুধারাকে ফিরাইয়া সহধর্ম্মিণী স্বামীর শিয়রে আসনগ্রহণ করিল। বিজলীপাখা খুলিয়া দেওয়া হইল।

৫

জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষে কাল ক্ষুব্ধশ্বাস ফেলিয়া চলিতেছিল। বিস্মৃতির অন্তরালে মগ্নচৈতন্য হয় ত ছিল। কিন্তু বাহিরে তাহার কোনও পরিচয় নাই।

সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দুই বেলা আসিতেন, গম্ভীর-ভাবে ঔষধপরিবর্ত্তন করিয়া যাইতেন। আশার কোনও বাণী তিনি সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শিয়রে উপবিষ্টা অমলার নিপুণসেবা চিকিৎসককে বিস্ময়-বিমূঢ় করিত। তাহার ধ্যানস্থ মন শুধু স্বামীর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, অথবা অসংলগ্ন কথার মধ্যে যেন নিমগ্ন হইয়া থাকিত। সেই পরিহাস-রসিকা, সদা উৎফুল্ল কমলের ন্যায় আনন্দময়ী নারীমূর্ত্তি কয় দিনে যেন ক্ষোদিত পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শৈলবালা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে স্নানাহার না করাইলে সে মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিত না।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক স্বল্পভাষায় জানাইয়াছিলেন, উৎকট মানসিক শ্রম বা দুশ্চিন্তার আঘাতে মস্তিষ্কের গহ্বরগুলি সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারই তাড়নায় প্রবল জ্বর এবং নিদ্রাহীন অবস্থা রোগীকে সঙ্কট-সঙ্কুল প্রান্তদেশে টানিয়া আনিয়াছে।

আজ দশম দিবস। যে ঔষধ আজ দেওয়া হইল, ইহারই প্রভাবে মস্তিষ্কের কক্ষগুলি শান্ত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর কমিয়া আসিয়াছে। গাঢ় নিদ্রার পর প্রাণস্পন্দন স্বাভাবিকভাবে রোগীকে জীবনের রাজ্যে টানিয়া আনিবার সংবাদ ঘোষণা করিতে পারে।

অন্ধকার কক্ষমধ্যে রোগী একা থাকিবে। সামান্য-মাত্র শব্দও যেন তাহার কর্ণেন্দ্রিয়ে আঘাত করিতে না পারে। যদি এ সময়ে সামান্যরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে—

চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শীর্ণদেহ রোগী শয্যালীন হইয়া রহিল। মৃদুগতিতে পাখা চলিতেছিল।

শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে মগ্ন চৈতন্যকে প্রকাশরাজ্যের সীমান্তদেশে আকর্ষণ করিতেছিল।

* * * * *

কর্দ্দমাক্ত জলধারা অতি ক্ষীণগতিতে বহিতেছিল। জীবন-জোয়ারের স্রোত বিপরীত দিক্ হইতে খালের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্রোতোবেগও বাড়িতে থাকে। মগ্ন চৈতন্য, বিস্মৃতির যবনিকা পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আঃ! কি শান্তি—কি মধুর এই জাগরণ!

নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল। না, শরীরে যেন কোন গ্লানি নাই। দুর্ব্বলতা দেহে আছে, কিন্তু মন যেন সকল প্রকার বোঝা নামাইয়া দিয়া লঘু ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

রোগ-শয্যায় কাহারও কাহারও শ্রবণেন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। অতি সামান্য শব্দও সে যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পায়।

পাশের ঘরে কাহারা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল, কিন্তু সত্যব্রত তাহার প্রত্যেকটি শব্দ শুনিতে পাইল। তাহার অনুমান হইল, তখন রাত্রি সমাগত, ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

"তোর সে সদানন্দময়ী মূর্ত্তি কোথায় গেল, অমু?"

সত্যব্রত কোন শব্দ করিল না—উৎকর্ণ হইয়া উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে উত্তর হইল, "ওঁর এই অসুখ। উৎস যে শুকিয়ে গেছে!"

"কিন্তু তুই যদি এমনভাবে মুষড়ে পড়িস, তা হ'লে—"

বাধা দিয়া অমলা গাঢ়স্বরে বলিল, "যাঁর জন্য আমার সব, তিনিই যে ফাঁকি দিতে বসেছেন: তুই ত মেয়েমানুষ, স্ত্রীর কাছে স্বামী যে কি, তা তোকে ব'লে বোঝানর দরকার নেই। ছেলে-মেয়ে হয়নি ব'লে ওঁর মনে একটা অভাব বোধ হয় ছিল; কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি কি না জানিনে, আমার সকল অভাব আমি ওঁকেই খাইয়ে, পরিয়ে, সেবা ক'রে চরিতার্থ ক'রে এসেছি। আমার মনের কোথাও কোন দুঃখ নেই।"

রোগী সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ণে কেন্দ্রীভূত করিয়া শুনিতেছিল। সত্যই নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, সত্যই পুরুষ বৃথা আস্ফালন করিয়া বলে, সে নারীজাতি—মাতৃজাতিকে বুঝিয়াছে! প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্রতার মর্ম্ম জানিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করা মূর্খতা নহে কি?

একটা বিচিত্র আনন্দরসের অনুভূতি সত্যব্রতের দুর্ব্বল দেহে যেন শক্তিসঞ্চার করিতেছিল।

সে কাণ পাতিয়া শুনিল, তাহার পত্নী বলিতেছে, "বড় চাপা মানুষ। মনের সুখ-দুঃখ জানাতে চান না। তবু তাঁর মনের দরজা আমার কাছে মুক্ত হয়েই গিয়েছিল। বেশ ছিলেন, মাস কয়েক আগে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই ওঁর মনের কোথায় যেন কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। চেষ্টা করেও ঠিক ধরতে পারি নি। উনি যদি না বাঁচেন, আমারও যেন সব শেষ হয়ে যায়—ভগবান্‌কে রোজ এই নিবেদনই জানাচ্ছি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, শৈল!"

চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে যত্নে রুদ্ধ ক্রন্দনশব্দ সত্যব্রতের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারিল না।

"শোন!—"

পার্শ্বের কক্ষ সহসা শব্দহীন হইল।

"তুই বোস্, ভাই, উনি বুঝি উঠেছেন!"

শৈলবালা বলিল, "কৈ, কোন শব্দ শুনলুম্ না ত!"

"না, না, উনি আমায় ডাকছেন।"

দ্রুত লঘু গতিতে অমলা রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বক্ষ তখন শঙ্কা ও উদ্বেগে দ্রুততালে স্পন্দিত

হইতেছিল। সঙ্কট-মুহূর্ত্ত ভগবানের অপার অনুগ্রহে কি কাটিয়া গিয়াছে? তাহার আকুল আবেদন দয়াময়ের করুণার আশীর্ব্বাদে কি ধন্য হইয়াছে?

সন্তর্পণে স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইতেই ক্ষীণ কণ্ঠে সত্যব্রত বলিল, "অন্ধকার ভাল লাগ্‌ছে না। আলোটা জ্বালো, তোমায় দেখি, অমলা!"

হাঁ, সত্যই চির-সুন্দরের আশীর্ব্বাদ সে পাইয়াছে। ডাক্তার যেমন বলিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নীল কাচের ফানুস ঢাকা টেবল-ল্যাম্প সে জ্বালিয়া দিল।

কাছে আসিতেই অমলার কোমল, পুষ্ট করতল শীর্ণ করতলে চাপিয়া সত্যব্রত পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। অশ্রু-বিন্দু তখনও আয়ত নয়নের ভ্রমর-কৃষ্ণ-পল্লবপ্রান্তে টলমল করিতেছিল।

"রাণি, তুমি আমার কাছ থেকে চ'লে যেও না। আমি তোমায় দেখি। বড় কষ্ট দিয়েছি তোমায়। আর ভয় নেই, আমার রোগ সেরে গেছে।"

অমলার হৃদ্‌যন্ত্র সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। সে সর্ব্বাগ্রে ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া লুটাইয়া কাহার উদ্দেশে অন্তরের সমগ্র প্রার্থনা নিবেদন করিল। সত্যব্রত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার উদ্বেগের অবসান ঘটিয়াছে—তাহার ভ্রান্তি জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। নারী দুর্জ্ঞেয়া সত্য, কিন্তু মাতৃজাতিকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করার মত স্পর্দ্ধা তাহার জীবনে যেন কখনও না আসে।

অমলা স্বামীর রুক্ষ কেশরাজির মধ্যে সস্নেহে তখন অঙ্গুলিচালনা করিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

চলন্তিকা

পশ্চিম নভে মলিন তপন,—মলিন রশ্মিরেখা,
প্রান্তর পথে ব্যথিত মানসে ছুটিছে পান্থ একা;
ধূলায় ধূসর,—মলিন বসন শিহরিছে কটিতটে
ভাবনার রেখা বিদরি উঠিছে শ্রান্ত ললাট-পটে।

ব্যাকুলতা ফুটে মুখে,
পাগল পথিক ছুটে প্রাণপণে অদূরে পল্লী-বুকে।
ক্লান্ত চরণ পশ্চাতে তারে রাখিছে সবলে টানি'
তবু বেগভরে ছুটে বাধা ঠেলি' বিপদ ঘনায় জানি'।
সম্মুখে দূরে শ্যামলের শিরে জ্বলিছে অনলশিখা!
বুঝি চিরতরে ফেলে দিবে তার জীবনের যবনিকা।
জন কোলাহলে মুখরিত পথ,—ক্রুদ্ধ বাতাস বহে,
উতলা ঊর্ম্মি পাশে নদীটিকে বিষাদের কথা কহে।

কত কথা জাগে মনে,
সাগরের কোলে লহরীর মত একে একে ক্ষণে ক্ষণে,
চমকি' পথিক দেখিল নিকটে বিশাল বটের তলে
ঘরগুলি তার ঘিরেছে নিঠুর নির্ম্মম কালানলে

হু-হু হুঙ্কারে গর্জ্জন করি'—নাচিছে বহ্নিমালা
গগনের কোলে কালধূমে রচি' প্রলয় যজ্ঞশালা।
রুদ্ধ দুয়ার—করে হাঁকাহাঁকি রুগ্না জননী ঘরে,
করুণ কাতর বুক ভাঙা রবে মুক্তি পাবার তরে,

আঁখি করি ছল ছল
ব্যর্থ প্রয়াসে শত এত লোক অবিরত ঢালে জল।
সহসা বিষাদে অন্ধ পথিক পশিল দুয়ার খুলি'
রণপ্রাঙ্গণে মহাবীর সম নিমিষে আপনা ভুলি'
হাসিয়া উঠিল দগ্ধভবন বিকট কঠোর রবে,
তাথৈ তাথৈ নাচিল অনল মাতি মহা-উৎসবে
লোলুপ কক্ষ মেলিল হর্ষে করাল কুটিল আঁখি—
বেদনা-বিধুরা শোক ভারানতা পল্লীরে দিয়ে ফাঁকি,

সন্ধ্যা নামিল ধীরে,
ধবল জোছনা বিদ্রূপ করি' খেলিল আঁধার শিরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

আমেরিকায় ভারতীয় ঠগী

(লোমহর্ষণ সত্যঘটনা)

মিঃ এইচ এইচ ডন্ লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে আমেরিকার কালিফর্ণিয়া নগরস্থিত একদল ঠগী দস্যুর অত্যাচারকাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিবরণ এরূপ অদ্ভুত, বিস্ময়াবহ ঘটনায় পূর্ণ যে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ কাহিনী লোমাঞ্চকর উপন্যাসেও কদাচিৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু লেখক বলিয়াছেন, ইহার এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। মধ্যভারতে এক সময় ঠগী দস্যুদের অত্যাচারে বহুসংখ্যক নিরীহ পথিকের ধন প্রাণ বিপন্ন হইত, সেই সকল লোমহর্ষণ কাহিনী এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অক্ষরে লিখিত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান ঠগী-কাহিনীর তুলনায় সেগুলি তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। কালিফর্ণিয়ার ঠগী দস্যুদের অত্যাচার-কাহিনী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মিঃ ডন বলেন, কালিফর্ণিয়ায় প্রায় আড়াই হাজার হিন্দুর বাস। ঠগীরা এই সকল হিন্দুকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিয়া বৎসরে লক্ষাধিক ডলার উপার্জ্জন করে। তাহারা অভয়দান করিয়া অনেকের নিকট হইতে মাসিক কর আদায় করে, তাহার পরিমাণ পঁচিশ ডলার হইতে সহস্র ডলার। কোন কোন ধনাঢ্য হিন্দু তাহাদের পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে মাসিক এক শত ডলার উৎকোচ দিয়া থাকে। সেই সকল ঠগী দস্যু উত্তরে কানাডার সীমা হইতে দক্ষিণে মেক্সিকোর সীমা পর্য্যন্ত নানাভাবে জনপদবাসীদিগকে নিপীড়িত করিয়া থাকে। এমন কি, ওয়াসিংটন, ও রিগণ প্রভৃতি নগরেও তাহাদের গুপ্ত আড্ডা আছে। সেই সকল আড্ডায় মা কালীর এক একটি মন্দির আছে, ঠগীরা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সেই সকল মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সে দেশের ঠগী দস্যুরা অদ্ভুত উপায়ে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সতের জন ঠগী সানফ্রানসিস্কোর বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতের বিচারে কঠোর দণ্ড লাভ করিয়াছিল। তাহারা না কি ভারতে বিদ্রোহ-প্রচারের জন্য জর্ম্মাণীর অনুকূলে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহারা সকলেই একটি রাজনীতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দলের এক জন বিদ্রোহীর নাম রামসিংহ; আদালতে যখন তাহাদের বিরুদ্ধে বিচার চলিতেছিল—সেই সময় রামসিংহ একখানি হিন্দুস্থানী সংবাদ পত্রের সম্পাদক রামচন্দ্রকে এজলাসের ভিতর গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। রামচন্দ্র নিহত হইবামাত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের পুলিস-কর্ম্মচারী মার্সাল জেম্স বি হালাহান আততায়ী রামসিংহকে সেই স্থানেই গুলী করিয়া হত্যা করেন।

সেই মামলার বিচারের সময় বিদ্রোহিদলভুক্ত ডাক্তার সি, কে, চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের জর্ম্মাণ এজেন্টরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চৌষট্টি হাজার ডলার তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিল। কালিফর্ণিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ এই সময় অভিযোগ করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিক দল ভারতে বিদ্রোহ প্রচারের জন্য এবং এ দেশে কম্যুনিষ্টিক গবর্ণেমণ্টপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রুসিয়ার বিপ্লববাদীদের নিকট হইতে যে অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

কালিফর্ণিয়ার এই রাজনীতিক দল 'গদর' দল নামে অভিহিত হইত। ইহারা ১৯১৬ বা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এই সকল ঠগী দস্যুও নানা দলে বিভক্ত হইয়া গোপনে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২২ এ মার্চ্চ কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তারকনাথ দাস ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, ভারতে বৃটিশ-শাসন বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ট্রস্কির সাহায্য গ্রহণের জন্য এবং বলসেভিকদের দলে যোগদানের অভিপ্রায়ে যে ষড়্যন্ত্র হইয়াছিল, তিনি তাহার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইটি বিদ্রোহী দলের মিলন-সংঘটনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই অভিযোগে ঠিক ঐ দিনই ব্লুমা ক্রাউস্ নাম্নী একটি রুসীয় যুবতীকে সান্‌ফ্রান্‌সিন্‌কো নগরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক দিন প্রভাতে সানফ্রানসিস্‌কোর অদূরবর্ত্তী ওয়ালনট গ্রোভ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রধান রাস্তার ধারে এক জন হিন্দুর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। গলায় ফাঁস দিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। পুলিস মৃতদেহটি সনাক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জানিতে পারে—মৃত-ব্যক্তির নাম ভোলা সিংহ। কিন্তু কে কি উদ্দেশ্যে ভোলা সিংহকে ঐ ভাবে হত্যা করিয়াছিল, তাহা নির্ণীত না হওয়ায়



পাগড়ী আকর্ষণ করিতেই অনেক জিনিষ পড়িয়া গেল

পুলিসের ধারণা হইয়াছিল, ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে এই প্রবাসী হিন্দু নিহত হইয়াছিল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সাক্রামেণ্টোর একটি পথের উপর প্রকাণ্ড দিবালোকে আর এক জন প্রবাসী হিন্দু নিহত হইয়াছিল, তাহার নাম নাঙ্গনী রামধনী। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পুলিস অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিল; এবং তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, এই নিহত ব্যক্তিদ্বয় বিদ্রোহী 'গদর' দলের গতিবিধির সন্ধান লইয়া কালিফর্ণিয়ার সরকারকে গোপনে সাহায্য করিতেছিল—এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় বিদ্রোহীদের গুপ্তচররা তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল।

প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে 'অফিশিয়াল ইন্‌ফরমার' অর্থাৎ সরকারের গুপ্তচরেরও অভাব ছিল না, ইহার আরও প্রমাণ আছে। শান্তরাম পাণ্ডের বয়স পঁচিশ বৎসর, সে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাজিয়া 'আন্তর্জাতিক ভবনে' বাস করিত, কিন্তু সরকারের গোয়েন্দাগিরিই তাহার অবলম্বন ছিল। সে এরূপ সতর্ক-ভাবে ও গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিত যে, মিঃ রবার্ট ব্লেককেও এই বিদ্যায় তাহার নিকট হার মানিতে হইত! শান্তরাম পাণ্ডে ভোলা সিংহ ও নাঙ্গনী রামধনীর পরম বন্ধু ছিল। ভোলা সিংহ ও রামধনীর মৃত্যুর পর শান্তরাম পাণ্ডে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর 'বেদান্ত মঠে' (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মঠে?) আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই মঠে সে শুদ্ধি-ক্রিয়ার পর প্রতিজ্ঞা করে, তাহার বন্ধুদ্বয়ের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডদানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পাণ্ডেজী কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত বার্কেলির পুলিস আফিসে উপস্থিত হইয়া পুলিসের অধ্যক্ষ মিঃ অগষ্ট ভল্‌মারের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। মিঃ ভলমার তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার দেহের মাপ লইয়া, তাহার অঙ্গুলীর ছাপ ও ফটো সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

পাণ্ডেজী পুলিসের অধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া সঙ্কল্প-সাধনে যাত্রা করিবার সময় ধীরভাবে তাহাকে বলিয়াছিল, "শীঘ্রই আমাকে নিহত হইতে হইবে। আমার মৃতদেহের সন্ধান হইলে আপনি যাহাতে তাহা সনাক্ত করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম।"

পুলিস তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় পাইয়াও তাহারা যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই। শান্তরাম কিরূপ প্রবল শক্তিসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত, এই জন্যই সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল।

পাণ্ডেজী অতঃপর ফৌজদারী সনাক্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে তাহার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল;

১৯৩১ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ প্রভাতে রিওভিষ্টা নগরের প্রান্তবর্ত্তী নদীবক্ষে একটি মস্তকহীন মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। পুলিস মৃতদেহটি জল হইতে তুলিয়া পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে, সেই ব্যক্তিকে প্রথমে ফাঁসের সাহায্যে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার



পর তাহার মস্তকটি এভাবে ছেদন করা হইয়াছিল যে, কোন অভিজ্ঞ অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্ ভিন্ন অন্যের তাহা অসাধ্য। মৃতদেহটি প্রায় দুই সপ্তাহ জলে পড়িয়া থাকিবার পর আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা এরূপ

যাহারা তাহার বন্ধুদ্বয়কে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের পরিচয়ও সংগ্রহ করিয়াছিল। সে কর্ত্তৃপক্ষকে হত্যাকারীদের পরিচয় জানাইয়া এক দিন রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্নে পুলিস আফিসের বাহিরে আসিল, তাহার পর আর কেহ তাহাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে দেখি.. না।

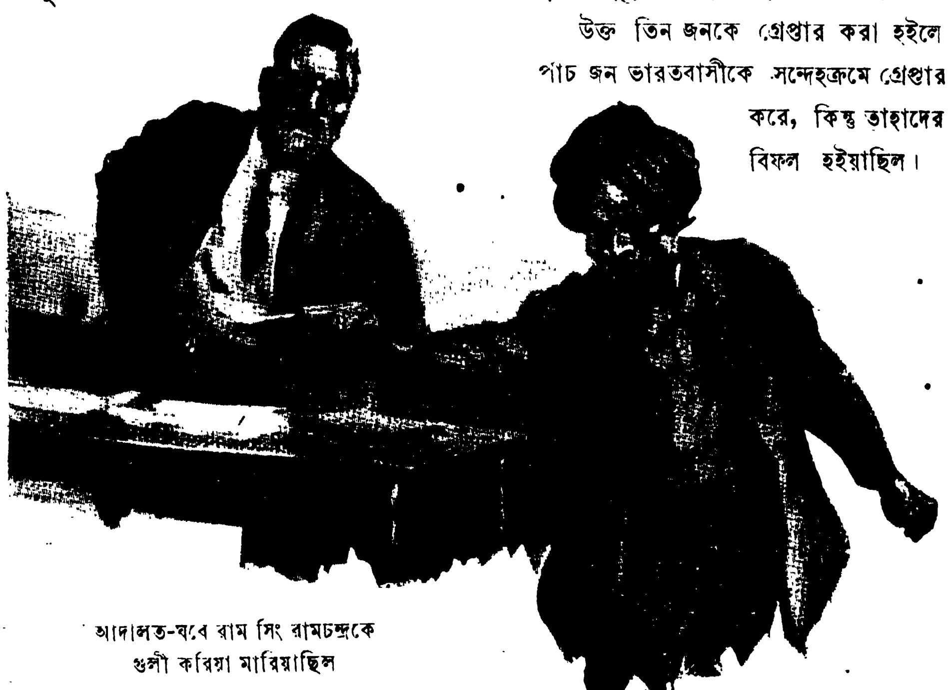
বিকৃত হইয়াছিল যে, তাহা সনাক্ত করা অসাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে সরকারের এক জন তদন্তকারী কর্ম্মচারী (হত্যাকারীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম চিহ্নিত করিয়া রাখায় তাঁহার নাম গোপন করা হইয়াছিল) হত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার জন্য এরূপ কৌশল ও

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল—ইউনাইটেড ষ্টেট্সেও তাহা অতুলনীয়। তাহার পরীক্ষা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, উহা শান্তরাম পাণ্ডেরই মৃতদেহ।

প্রাচীনকালে ভারতীয় ঠগীরা যে ভাবে নরহত্যা করিত, ঠিক সেই ভাবে চতুর্দ্দিকে নরহত্যা হইতেছে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধীদের দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুলিস বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, শান্তরাম পাণ্ডে যে দিন সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই দিন তাহাকে সাক্রামেণ্টোর কালীমন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি সভার কার্য্যে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। শান্তরাম সেই সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল —সেই সভায় যোগদান করিতে তাহার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু কালীমন্দিরের পুরোহিত তাহাকে নিমন্ত্রণ করায় সে সেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, সেই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য, ইহাও সে জানিত। শান্তরাম কালীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে সেই মন্দির ত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই।

কয়েক দিন পরে রামধনীর হত্যাকারী সন্দেহে নারায়ণ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইল। অবশেষে ১০ই মার্চ্চ তারিখে সাক্রামেণ্টোর সেরিফ জে, আর, থর্ণটন আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করেন, তাহাদের নাম—মার্জ্জন সিংহ, তারা সিংহ এবং উদ্দাম সিংহ। এই তিন জন লোক এরূপ দুর্দ্দান্ত ও ভীষণপ্রকৃতি যে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেরিফ থর্ণটন দশ জন সহকারীর সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ভাবে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহারা মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহারা ধরা পড়িলে তাহাদের নিকট তীক্ষ্ণধার ছোরা এবং তিনগাছা রেশমী ফাঁস পাওয়া গিয়াছিল। রেশমী ফাঁসগুলি স্থূল ও সুদৃঢ়। উহা নরহত্যার সাংঘাতিক অস্ত্র।

উক্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হইলে পুলিস আরও পাঁচ জন ভারতবাসীকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। অবশেষে ১৬ই মার্চ্চ তারিখে তাহারা মেরিসভিলা নামক স্থানে এক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহার নাম মুকুন্দ সিংহ। মুকুন্দ সিংহ তাহার বাসগৃহে ধরা পড়িয়াছিল। পুলিস তাহার বাসকক্ষে একখানি শোণিতরঞ্জিত কিরীচ, একখানি ছোরা, একখানি করাত ও এক বোতল শেঁকো বিষ পাইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, মুকুন্দ সিংহ সেই বোতলটি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্রয় করিয়াছিল। পুলিসের ধারণা হইয়াছিল, ঐ সকল অস্ত্রের



আদালত-ঘরে রাম সিং রামচন্দ্রকে গুলী করিয়া মারিয়াছিল

সাহায্যে পাণ্ডের মস্তকটি দেহচ্যুত করা হইয়াছিল এবং শেঁকো বিষের সাহায্যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দশমুদা সিং নামক একটি লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। যে কালীমন্দিরে হতভাগ্য শান্তরাম পাণ্ডে নিহত হইয়াছিল, সেই মন্দিরে 'আমেরিকান হিন্দুস্থানী ট্রেডিং কোম্পানী' নামক একটি কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারীর নাম সংগৃহীত হইয়াছিল। দিলীপ সিংহ এই কোম্পানীর সভাপতি ছিল, যে তিন জন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিল—তাহাদের নাম মাকন্দি সিংহ, হরনাম সিংহ এবং নরঞ্জন সিংহ; এতদ্ভিন্ন ম্যানেজারের নাম রামসিংহ এবং হিসাবরক্ষকের নাম জয়সিংহ।

এই লোকগুলিকে ধরিয়া জেরা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয় নাই। কিন্তু মোহর সিংহ নামক এক ব্যক্তি পাঁচ জন স্বদেশবাসীকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তাহার ফাঁসী হইয়াছিল, যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সে ব্রাহ্ম সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল; অবশিষ্ট চারি জনের হত্যাকাণ্ড সপ্রমাণ হয় নাই।

লক্ষ্মণ সিংহ নামক এক জন সাক্ষীর জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া মোহর সিংহকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই মামলার বিচার শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণ সিংহ অদৃশ্য হয়!—এইরূপ বিস্ময়কর ঘটনার কথা কৌতুকাবহ ডিটেক্‌টিভের গল্পেই পাঠ করা যায়। বস্তুতঃ লক্ষ্মণ সিংহ যে আসামীদের দলের আদেশে নিহত হইয়াছিল —এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যাহা হউক, এইবার আমরা শান্তরাম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে হিন্দুর দল ক্ষেপিয়া উঠিয়া কি ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণে দুরভিসন্ধির পরিচয় দিতেছে—আর সে দেশের ভারতীয় ঠগগুলাই বা কি রকম পাজি, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ইংরাজ লেখকটি যে অমোঘ সত্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কোন অংশ বাদ দিলে রসভঙ্গের আশঙ্কা আছে। অতএব পাঠক-পাঠিকা হিন্দুর প্রতি এই সাহেব লেখকটির অগাধ প্রীতির পরিচয় গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করুন। সাহেবের স্মরণ রাখা উচিত ছিল, তাঁহার গোয়েন্দা শান্তরাম ও তাঁহার spy বন্ধুদ্বয় হিন্দু। সরকারের সাহায্যকল্পে তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাম ও ভোলা নামক দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, পুলিসের কর্তৃপক্ষ সেই সময় অনুসন্ধানে জানিতে পারেন, আরও চারি জন হিন্দুকে হত্যা করিবার জন্য তাহাদের নাম চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই চারি জনের মধ্যে এক জনের নাম মিঃ এল্ সুব্রহ্মণ্য। তিনি মেরিসভিলাপ্রবাসী ধনাঢ্য হিন্দু। তিনি প্রাণভয়ে দিবারাত্রি প্রহরিবেষ্টিত থাকিতেন। তিনি বাহিরেই যাউন বা ঘরেই বসিয়া থাকুন, দুই জন আমেরিকান জোয়ান দেহরক্ষী সর্ব্বদা তাঁহার পাহারায় থাকিত। তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্রত্যাগ করিত না।

কালিফর্ণিয়া-প্রবাসী হিন্দু 'কমিউনিষ্ট' গুণ্ডার দল পনের জন স্বদেশীকে হত্যা করিবার জন্য তাহাদের নামের যে তালিকা করিয়াছিল, সেই তালিকার সর্ব্বনিম্নে সুব্রহ্মণ্যের নামটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি ভিন্ন অন্য সকলেই নিহত বা অদৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদের কাহারও মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই সকল কারণে সুব্রহ্মণ্যকেও প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বিপ্লববাদীরা এই ভাবে বহুসংখ্যক ভারতবাসীর জীবন বিপন্ন করায় এক দল ভারতবাসী প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিপ্লববাদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে এক জন চতুর ও বহুদর্শী স্বদেশবাসীকে তাহাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিল। বৃটিশ সরকার পূর্ব্বেও একবার ঐরূপ কার্য্যে সেই ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লোকটি মুসলমান হইলেও হিন্দুর ছদ্মবেশে স্থানীয় কালীমন্দিরের পুরোহিতের চেলা সাজিয়াছিল। এই লোকটির প্রকৃত নাম গোপন করিয়া প্রবন্ধলেখক তাহাকে 'মেহের আলী' নামে পরিচিত করিয়াছেন।

'মেহের আলী' হিন্দুর ছদ্মবেশে মন্দিরের পুরোহিতের চেলাগিরি করিলেও বিপ্লববাদীদের দলভুক্ত হইয়া তাহাদের মন্ত্রণাসভায় যোগদান করিয়াছিল। সে জানিত, বিপ্লববাদীরা কোন কারণে তাহাকে সন্দেহ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; তথাপি সে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই লোকটি ইংরাজী, হিন্দুস্থানী, পুস্ত, আরবী ও অন্যান্য

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিল। সে ইংরাজ সরকারের প্রতি অনুরক্ত ও তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন ছিল। 'মেহের আলী' শান্তরাম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায়, শান্তরাম এক দিন সাক্রামেণ্টোর পুলিস আফিসে উপস্থিত হইয়া ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল, তাহার পর সে সেই অট্টালিকার সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় কালীমন্দিরে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাইল।

বিপ্লববাদীরা তাহাদের শত্রুগণকে হত্যা করিবার জন্য যে সকল পরামর্শ-সভায় যোগদান করিত, সেই সকল সভার অধিবেশনের স্থান ছিল—সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো, সাক্রামেণ্টো, কোলফাক্স, মেরিসভিল, লস্ এন্‌জেলস্ প্রভৃতি নগরের কালীমন্দির। ধর্ম্মালোচনার ছলে এই সকল স্থানে তাহারা নানা প্রকার রাজনীতিক ষড়্‌যন্ত্রে যোগদান করিত। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সরকার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করেন না, তাহাদের ধর্ম্মালোচনায় বাধা দেওয়াও তাঁহাদের শাসননীতির অঙ্গ নহে; এই জন্য কালীমন্দিরের বদ্ধ দ্বারের অন্তরালে যে সকল গুপ্ত পরামর্শ চলিত, কর্তৃপক্ষ তাহার সন্ধান পাইতেন না। এই কারণে বিপ্লববাদীরা কালীমন্দিরগুলি সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়াই মনে করিত। পুলিস কোন কালে সেই সকল মন্দির খানা-তল্লাস করিত না। বা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র করিত না।

শান্তরাম পাণ্ডে একটি 'অটোমেটিক' পিস্তল ও একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বগলের ভিতর লুকাইয়া লইয়া সাক্রামেণ্টোর কালীমন্দিরে বিপ্লববাদীদের আড্ডায় উপস্থিত হইল। তাহারা কিছু দিন পূর্ব্বেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত করিয়াছিল। বিপ্লববাদী ঠগী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রামপৎ সিংহই শান্তরামকে হত্যা করিবার আদেশ পাইয়াছিল; কারণ, বিপ্লববাদীরা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল—সে তাহার বন্ধুদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এ জন্য সে জীবিত থাকায় হত্যাকারীদের বিপদের সম্ভাবনা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

সেই দিন সায়ংকালে শান্তরামকে কালীমন্দিরের ভিতর উপস্থিত দেখিয়া তাহার শত্রুরা তাহার দেহে এরূপ একটা উগ্র আরোক প্রবিষ্ট করাইল যে, সেই রাত্রিতে সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। সেই অবস্থায় তাহাকে মেরিসভিলের কালীমন্দিরে প্রেরণ করা হইল। সেখানে তাহার আট জন শত্রু সমবেত হইল, রামপৎ সিং তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার ভার গ্রহণ করিল। এই মন্দিরে আনিয়া উত্তেজক ঔষধপ্রয়োগে শান্তরামের অস্বাভাবিক নিদ্রা ভঙ্গ করা হইল। সেই সময় তাহাকে তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইল। অতঃপর মন্ত্রপূত রেশমী ফাঁসের সাহায্যে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইল, সেই ফাঁসের রেশমী রজ্জু তাহার শ্বাসনালীতে দৃঢ়রূপে আঁটিবার জন্য একটি কৃষ্ণবর্ণ দণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই উপায়ে তাহাকে হত্যা করিবার পর তাহার মস্তকটি স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইল।

অতঃপর শান্তরামের দেহের সহিত ভারী লোহা বাঁধিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করা হইল। মৃতদেহটি কি উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তাহাদের নাম জানিতে পারিলেও মেহের আলী তাহা গোপন রাখিয়াছিল। বোধ হয়, সে নিজের বিপদের আশঙ্কাতেই এইরূপ করিয়াছিল। কালিফর্ণিয়ার সরকার তাহাদের দলপতির নাম জানিত, কিন্তু সে অতঃপর দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। ঐ দলের তিন জনকে পুলিস হত্যাকারী সন্দেহে জেরা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই।

বিপ্লববাদীদের দলের আট দশ জন লোক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছু দিনের মধ্যে কুড়ি পঁচিশ জন স্বদেশবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকান গবর্মেণ্টের গোয়েন্দা-বিভাগের চেষ্টায় যখন জানিতে পারা গেল—এই বিপ্লববাদীরা জার্ম্মাণীর এজেণ্টগণের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল, সেই সময় মার্কিণ সরকার এক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের দল নির্ম্মূল করিয়াছিল।

বিপ্লববাদীরা 'গদর'দল নামে পরিচিত ছিল। এই শব্দটির অর্থ 'বিপ্লববাদ' বা 'বিপ্লববাদী'। নরহত্যাই তাহারা সঙ্কল্পসিদ্ধির একমাত্র উপায় মনে করিত।

সানফ্রান্‌সিস্‌কো নগরের উড ষ্ট্রীটে এই বিপ্লববাদীদের প্রধান আড্ডা। একটি দোতলা বাড়ীতে তাহাদের আড্ডাটি সংস্থাপিত। সেই আড্ডায় যে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

আছে, তাহা হইতে 'হিন্দুস্থানী গদর' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; ভারত সরকারকে আক্রমণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। মুদ্রাযন্ত্রটি একতলায় সংস্থাপিত, দোতলায় সম্পাদকের আফিস, বিপ্লববাদীদের গুপ্ত আড্ডা এবং কালীমাতার ঘর। যাহারা কালী-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা ভিন্ন অন্য কোন লোক সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে পারে না। নিধান সিংহ নামক এক ব্যক্তি এই দলের অধিনায়ক; কিন্তু সে নামে মাত্র দলপতি।

বিপ্লববাদীদের এই সদর আড্ডা হইতে প্রচারক কর্ম্মিদলকে পৃথিবীর সকল দেশে প্রেরণ করা হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ নানা জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশে দেশে প্রেরিত হয়; এমন কি, ভারতেও অবাধে তাহা প্রচারিত হইয়া থাকে!—এই প্রবন্ধের লেখক এরূপ অজ্ঞ যে, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত, রাজদ্রোহ-সূচক প্রবন্ধপূর্ণ কোন সংবাদপত্র বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না, এ সংবাদও তাঁহার জানা নাই। তিনি লিখিয়াছেন, বিপ্লববাদীরা হিন্দুস্থানী, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজী ও ডচ্ ভাষায় বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থাদি মুদ্রিত করে। (the party publications in Hindustani, Italian, German, French, English and Dutch) এতদ্ভিন্ন কখন কখন চীনা ও জাপানী ভাষাতেও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। সানফ্রান্সিসকোতে যে সকল প্রাচ্য-দেশীয় লোক বাস করে, তাহাদের পরিচালিত দোকানে বিক্রয়ের জন্য সময়ে সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ও কম্যুনিষ্টিক আন্দোলনের অনুকূলে এই বিপ্লববাদীরা যে কিছু কায করিয়া থাকে, তাহার উৎপত্তিস্থান এই আফিস।

কালিফর্ণিয়ায় যে সকল ভারতীয় ঠগী নরহত্যায় লিপ্ত থাকে, তাহাদের কেহ কেহ গণ্ডয়ানা জেলার অধিবাসী। কয়েক জন বান্তারের (বেরার?) দান্তেওয়ারা হইতে আসিয়াছে। এই শেষোক্ত স্থানে কালীমাতার (Black Mother) একটি সুবৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মন্দির আছে। এই ঠগীর দল চড়কপূজা উপলক্ষে 'বাণ ফোঁড়ায়' অভ্যস্ত। তাহারা চড়কপূজার সময় পাঁজরে লোহার তীক্ষ্ণাগ্র বাণ ফুঁড়িয়া শূন্যে পাক খায়। তাহাদের প্রত্যেকেই পেশাদার নরহন্তা (Professional murderer)। তাহারা রজ্জুর ফাঁসের সাহায্যেই সাধারণতঃ নরহত্যা করে; কেহ কেহ বা ছুরী ও পিস্তল ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঠগী দস্যুরা বহুদিন পূর্ব্বে ভারত হইতে নির্ম্মূল হইয়াছে, অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে তাহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নথিপত্রের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। ঠগীদস্যুরা অল্পদিন পূর্ব্বে যে সকল ভারতবাসীকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের দুই এক জনের হত্যার বিবরণ সরকারী নথিপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ গুজর সিং ও ঠাকুর সিং কালিফর্ণিয়ার উইলোজ নামক গ্রামে তাহাদের গৃহে ফাঁস দ্বারা নিহত হইয়াছিল। হত্যাকারীরা তাহাদের মস্তক মৃতদেহ হইতে অপসারিত করিবার পূর্ব্বেই তাড়া খাইয়া পলায়ন করে। এই অপরাধের জন্য রামকিষণ ও আলি হাসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহারা মুক্তিলাভ করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামনাথ সিং, কিষণ ও হাসেনকে গুজর সিং ও ঠাকুর সিংএর হত্যাকারী বলিয়া প্রকাশ করায় সহসা নিহত হইয়াছিল; কারণ, এই রামনাথই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী ছিল। রামনাথকে ফাঁস দিয়া হত্যা করা হইলে তাহার মস্তকটি কালীর নিকট বলি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার দেহ কালীমন্দিরের নীচে সমাহিত হইয়াছিল।

নেহার সিং জার্সি দ্বীপে চারি জনকে হত্যা করায় তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে এই চারিটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নেহার সিংহের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় আদালতের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইল বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী লক্ষ্মণ সিং ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের মুসলমান এজেণ্ট ক্বিগ্ আমেদ কোলফাক্সে যামদাদ নামক বিপ্লববাদী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। যামদাদ ধরা পড়িলে বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে চিরনির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়।

ইশী সিং কালিফর্ণিয়ার কুইন্‌সি পল্লীর শান্তিপ্রিয় নিরীহ অধিবাসী। তাহার অপরাধ, সে ঠগী দস্যুদের দাবীর টাকা (রক্ষা-কর ?) প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ডখণ্ড করা হইয়াছিল। এই অপরাধে সাঁতরা সিং ও ইন্দ্র সিং অভিযুক্ত হইলে তাহারা উভয়েই প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু কটা সিং তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাহাকে অদৃশ্য হইতে হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে কন্‌ট্রাকস্টায় একটি মুণ্ডহীন গলিত দেহ



ভারতীয় লোকটিকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করা হইল

আবিষ্কৃত হইলে অনেকে তাহা কটা সিংএর দেহ বলিয়া অনুমান করিয়াছিল।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর দেলেন কর্দ্রা নামক এক জন ফিলিপিনো হিন্দু (?) হেনরী সিং নামক আর এক জন ধনাঢ্য ও নিরীহ হিন্দুকে গুলী করিয়া হত্যা করে। কর্দ্রার ক্রোধের কারণ অজ্ঞাত, কিন্তু সে নিঃস্ব শ্রমজীবী (জন-মজুর) হইলেও আদালতে আত্মসমর্থনের জন্য বহু অর্থব্যয়ে এক জন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব নিযুক্ত করিয়াছিল। দরিদ্র কুলী এত অধিক টাকা কোথায় পাইল ? এই গুপ্ত রহস্য কেহই জানিতে পারে নাই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর চারি জন অজ্ঞাতনামা হিন্দু একটি মেসিন গান লইয়া একখানি দ্রুতগামী মোটরকারের সাহায্যে দুই জন হিন্দুকে আক্রমণ করিয়া আহত করে। আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র সিংকে আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় আসামী আমীর সিং সেই মোটর-গাড়ীর আরোহী ছিল।

অধিকাংশ স্থলেই বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া যায় না, প্রাণভয়ে কেহ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয় না; আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া অনেককেই নিহত হইতে হইয়াছে। এ জন্য অপরাধীরা অনেক সময় বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করে। ইহাতে তাহাদের সাহস বর্দ্ধিত হয়, তাহারা নির্ভয়ে অন্যান্য লোককে হত্যা করে। এখন অবস্থাপন্ন হিন্দু নাগরিকবর্গ দলবদ্ধ হইয়া ঠগীর আক্রমণে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে।

বিপ্লববাদী দলের অধিনায়ক রামপৎ সিং পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; বাল্যকালেই সে ঠগী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে বলে, তাহার প্রকৃত নাম মাখনদাস, এখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে কালিফর্ণিয়ায় দেখা গিয়াছিল; সেই সময় সে বরেন সিং নাম ধারণ করিয়া কালিফর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়াছিল। সে এ কাল পর্য্যন্ত কুড়ি বাইশ জনের হত্যাকাণ্ডর ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এবং স্বহস্তে ন্যূনকল্পে দশ জনকে হত্যা করিয়াছিল। কালিফর্ণিয়ার রাজপুরুষরা জানেন, সে ভীষণপ্রকৃতি বিপ্লববাদী এবং পালের গোদা ! কিন্তু সে নির্ভয়ে তাহার স্বাধীন মত প্রচার করিতেছে। রামপৎ সিংএর দুই জন সহকারী আছে, তাহাদের এক জনের নাম আকবর সিং—সে এখন ফেরারী আসামী। দ্বিতীয় সহকারী বসন্ত সিং নির্ভীক-চিত্তে মেরিস্‌ভিলে বাস করিতেছিল, অথচ পুলিস জানিত, সে শান্তরাম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডে বিজড়িত ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এই বসন্ত সিং ভ্যাঙ্কুবরের কারাগারে অবস্থানকালে কোন অজ্ঞাতকারণে তাহার কারাপ্রকোষ্ঠে আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শান্তরামের হত্যারহস্যভেদের সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই সকল লোক প্রথম-যৌবনে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়াছিল। কালিফর্ণিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমান, যে আড়াই হাজার ভারতবাসী সে দেশে বাস করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা কুড়ি জন ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবশেষে অসৎপথ অবলম্বন করে। নরহত্যায় ও বিপ্লববাদে তাহারা আনন্দলাভ করে। নানা কারণে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করা কর্ত্তৃপক্ষের অসাধ্য হয়। অপরাধীরা সাধারণ ভারতবাসীদের দলে মিশিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনতা উপভোগ করে। ঐ সকল ছাত্রের দাড়ি-গোঁফ গজাইলে তাহারা স্বদেশীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। অনেকে ইংরাজী ভাষা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। রামধনী ও ভোলা সিং এই শ্রেণীর লোক। তাহারা ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছু দিন পরে ঠগীদের দলে যোগদান করে। তাহারা শান্তরামের বন্ধুদ্বয়কে হত্যা করায় শান্তরাম তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ভাগ্যদোষে নিহত হইয়াছিল। নরহন্তাগণের পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের বন্ধুরা অনেক সময় তাহাদিগকে এরোপ্লেনে তুলিয়া দেয়। পুলিস সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছে, তিন জন হিন্দু এরোপ্লেন-পরিচালনে অভ্যস্ত, তন্মধ্যে দুই জন চালক লাইসেন্সের অধিকারী।



দ্রুতগামী মোটরবোটে তাহারা পলায়ন করিল

শান্তরাম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের পর রামপৎ সিং এরোপ্লেনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালিফর্ণিয়া হইতে মেক্সিকো রাজ্যের প্রান্তস্থিত কালেক্সিকো নগরে পলায়ন করে। কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল সংবাদ জানিতেন, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহার সহকারী আকবর সিংও এরোপ্লেনে প্রথমে ওয়াসিংটন নগরে পলায়ন করে। সেই নগর হইতে সে বৃটিশ কলম্বিয়ায় গমন করে এবং নির্ব্বিঘ্নে কালিফর্ণিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। কর্ত্তৃপক্ষ প্রবাসী হিন্দুর হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং 'মাকড় মারিয়া ধোকড়' হইল।

রামপৎ সিং মেক্সিকো নগরে উপস্থিত হইলে তাহাকে দক্ষিণ-আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য তিন হাজার ডলার পাথেয় প্রদান করা হইয়াছিল, সেই টাকায় সে বিভিন্ন পথে দক্ষিণ-আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিল। মেক্সিকালি নগরে তাহার পদার্পণ করিবার অব্যবহিত পরে সেই নগরের প্রান্তভাগে এক জন হিন্দুর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটির গলায় ফাঁস আঁটিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল; এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই লোকটির অপরাধ এই যে, সে সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে বিপ্লববাদের প্রতিবাদ করিত।

কালিফর্ণিয়ার বিপ্লববাদীরা সেই অঞ্চলের হিন্দু-অধিবাসিগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বিপ্লববাদের প্রচারের জন্য তাহাদের নিকট হইতে ন্যূনকল্পে বার্ষিক এক লক্ষ ডলার চাঁদা আদায় করে। এই ভাবে তাহারা যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে, তাহার কিয়দংশ ঠগী দস্যুরা আত্মসাৎ

করিলেও অধিকাংশ অর্থ তাহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহে নিয়োজিত হইয়া থাকে। বিপন্ন বিপ্লববাদীদের সাহায্যের জন্যও সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করা হয়।

এতদ্ভিন্ন এক জন রুসিয়ান এজেণ্ট বিপ্লববাদীদের অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকে। এই লোকটি সাক্রামেণ্টো উপত্যকায় ফলের চাষ করিয়া থাকে। এই লোকটি সাত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় আসিয়া নানাভাবে বিপ্লববাদীদের সাহায্য করিতেছে। সে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিজমের পক্ষসমর্থন করে। আমেরিকান সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারীরা তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছেন; কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত তাহার কোন অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক দিন সায়ংকালে লক্ষ্মণ দাস নামক একটি হিন্দু কালিফর্ণিয়ার কালেক্সিকো নগরের একটি হোটেলে প্রবেশ করে। সে সেই হোটেলের পান-কক্ষে উপস্থিত হইয়া দুই জন আমেরিকানকে সেখানে পরামর্শ করিতে দেখিতে পায়। তাহাদের এক জন হঠাৎ সেই আগন্তুক হিন্দুর মাথার পাগড়ীর এক প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল; তাহার মাথা হইতে পাগড়ীটা খুলিয়া পড়িবামাত্র সেই পাগড়ীর ভাঁজের ভিতর হইতে মেক্সিকোর প্রান্তসীমা হইতে সাক্রামেণ্টো পর্য্যন্ত প্রসারিত ভূগর্ভস্থ রেলপথের একটি নক্সা বাহির হইয়া পড়িল। সেই নক্সাখানি রেশমী রুমালে সুকৌশলে অঙ্কিত ছিল। এতদ্ভিন্ন পাগড়ীর ভাঁজের ভিতর পাঁচ হাজার ডলারের নোট, কয়েকখানি মূল্যবান্ জহরত এবং কালিফর্ণিয়ার কয়েকটি নগরের কতকগুলি লোকের নাম ও ঠিকানা সংগুপ্ত ছিল; সেইগুলির সঙ্গে কতকগুলি কাগজের পুরিয়া ছিল; সেই সকল পুরিয়া খুলিয়া প্রায় এক পোয়া 'মরফাইন' অর্থাৎ অহিফেনের শ্বেতসার দেখিতে পাওয়া গেল। সরকারের কর্ম্মচারিদ্বয় ঐ ভাবে কাহারও পাগড়ী খুলিয়া দিলে, সে অপমান বোধ করিয়া তাহাদের এই প্রকার অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ করিত, কিন্তু পাগড়ীধারী লক্ষ্মণ দাস তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে পলায়নের জন্য ব্যাকুল হইল। পাগড়ীহীন লক্ষ্মণ দাস সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সরকারের কর্ম্মচারিদ্বয় তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাকে সেই হোটেলে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহার নিকট যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গেল, তাহা পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ তাহার স্বীকারোক্তি হইতে যে সকল গুপ্ত সংবাদ সংগৃহীত হইল, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"যে ঠগী সম্প্রদায় কালিফর্ণিয়ায় বহু প্রবাসী ভারতবাসীকে নানা ভাবে হত্যা করিতেছে, তাহারা যে কেবল নরহত্যার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, এরূপ নহে। তাহারা গোপনে নানা প্রকার নিষিদ্ধ পণ্যের চালানী কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আবগারী আইন অনুসারে এই সকল পণ্যের আমদানী-রপ্তানী নিষিদ্ধ। উহারা যে সকল নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য গোপনে মেক্সিকো হইতে আমদানী করিয়া ইউনাইটেডষ্টেট্সের বিভিন্ন অংশে বিক্রয় করে, তাহাদের মধ্যে গঞ্জিকা, কোকেন, অহিফেন, মরফাইন এবং 'মারিহুয়ানা'র নাম উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেডষ্টেট্সে ঐ সকল মাদক দ্রব্যের আমদানী আইনানুসারে নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এই সকল ভারতীয় অপরাধী গোপনে গুপ্ত পথে মেক্সিকো হইতে মানুষ চালান দিয়া থাকে, এই ব্যবসায়েও তাহারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহারা প্রায় সাত শত হিন্দুকে মেক্সিকো হইতে গুপ্তপথে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন সাড়ে তিন শত হইতে চারি শত চীনাম্যানও মেক্সিকো হইতে ঐ পথে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।"—ডিটেক্টিভ উপন্যাসে এই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা কাল্পনিক ঘটনার বিবরণ ভাবিয়া অবিশ্বাস করেন; কিন্তু সরকারী কাগজপত্র পাঠে জানিতে পারা যায়, এই সকল বিবরণ সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

এই আখ্যায়িকার লেখক মিঃ ডনের আর একটি উক্তি কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের বিবেচনা-সাপেক্ষ। তিনি লিখিয়াছেন—ভারতের হিন্দু বিপ্লববাদীরা বা যাহারা পূর্ব্ব হইতে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহারা ভারত হইতে বেশ্বরচায় (free of charge) এ দেশে আনীত হয়। অর্থাৎ আমেরিকার বিপ্লববাদী হিন্দুরা তাহাদের জাহাজভাড়া, আহার্য্যব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ভারই বহন করে। কিন্তু যে সকল হিন্দুর রাজনীতিক মত ভিন্ন প্রকার অর্থাৎ যাহারা বিপ্লববাদের সমর্থন করে না, তাহাদিগকে ঐরূপ

বে-খরচায় আমেরিকায় লইয়া যাওয়া হয় না। কোন চীনাম্যান এই ভাবে সে দেশে যাইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এক হাজার ডলার অগ্রিম গচ্ছিত করিতে হয়। তাহার পর তাহাকে জাহাজে তুলিয়া কালিফর্ণিয়ার কোন চীনা উপনিবেশে নামাইয়া দেওয়া হয়।”

বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ,—তিন জন ভারতীয় গোয়েন্দা বিপ্লববাদীদের কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষার জন্য বিপ্লববাদীর ছদ্মনামে ভূগর্ভস্থ রেলপথে ভ্রমণ করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় তাহারা কালেক্সিকো ও লস এঞ্জেলেসের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই জন্য অনেকের ধারণা, এই সংবাদটি সত্য নহে; কিন্তু কালিফর্ণিয়ার ঠগীর দল এরূপ কার্য্যে অনভ্যস্ত নহে। ভারতীয় ঠগী ও বিপ্লববাদিমাত্রেই সে দেশে ‘হিন্দু’ নামে পরিচিত, সুতরাং সেই দূরদেশেও ‘হিন্দুর’ দুর্নামের সীমা নাই।

যে সকল ভারতবাসী সে দেশে বিপ্লববাদের প্রচার করে বা ঠগীরূপে নরহত্যায় প্রশ্রয় দান করে, তাহাদের বাড়ীঘর খানাতল্লাস করিয়া অপরাধের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, তাহারা যে সুবৃহৎ পাগড়ী দ্বারা মস্তক আবৃত করে, তাহার ভাঁজের ভিতর তাহাদের টাকাকড়ি, গোপনীয় কাগজপত্র, হীরা-জহরত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লুকাইয়া রাখে। তাহাদের পাগড়ী খুলিয়া ফেলিলে অনেক সময় তাহাদের অপরাধের প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের পুলিস ও ডিটেক্‌টিভরা তাহাদের পাগড়ী লইয়া টানাটানি করিতে সাহস করে না, কারণ, ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের আইন অনুসারে ভারতবাসীর পাগড়ীধারণ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; পাগড়ী বলপূর্ব্বক অপসারিত করিলে তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করা হইবে, এই ধারণায় তাহারা ভারতবাসীর পাগড়ী অপসারিত করে না। তবে কোন কোন সময় তাহারা বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা সন্দেহের কারণ সত্ত্বেও ভারতবাসীর পাগড়ী স্পর্শ করে না। কিন্তু সরকারের কর্ম্মচারীদের এই সঙ্কোচ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। লক্ষ্মণ দাসের মত লোকের পাগড়ী পরীক্ষা করিয়া পুলিস রহস্যের অনেক সূত্র আবিষ্কার করিতেছে। সে দেশে গুপ্ত হত্যা ও দস্যুবৃত্তি ঠগীর অত্যাচার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

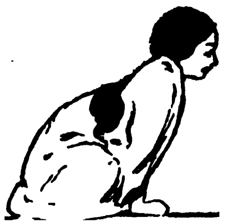
স্মৃতির বেদন

মুখুয্যেদের বেবা-দীঘির ঐ যে ভাঙ্গা-ঘাট
কাঁটাঝোপ আর আগাছাতে ভরা,
ফাটল-ধরা ভাঙ্গাচোরা সোপানগুলো যেন
জীর্ণ-বুকের পাঁজরা বাহির করা।

স্তব্ধ বিজন দ্বিপ্রহরের মর্ম্মে গিয়ে পশে
ঘুঘুর করুণ বিলাপ অবিরত,
ব্যথাহত দমকা হাওয়া উঠছে হাহা শ্বাসে,
শোকাতুরা কোন্ বিধবার মত।
কলসী-কাঁখে তরুণী-দল আস্‌তো হেথায় স্নানে
আর তো তা'দের যায় নাকো হায় দেখা!
শ্যাওলা-সবুজ ঘাটের বুকে আর পড়ে না বধূর
আল্‌তাপরা রক্ত-চরণ-লেখা।
কুসুম-কোমল করপুটের কাঁকন রিনিঝিনি,
চপল হাসি, মিঠে কলস্বরে—
সকাল-সাঁঝে স্তব্ধ এ-ঘাট নিথর শ্মশান সম
প্রাণের সাড়ায় রাখতো মুখর ক'রে।

মুকুর-সম স্বচ্ছ-দীঘির স্নিগ্ধ অমল জল
পচা পাতা পানায় গেছে ছেয়ে;
কোথায় বা সেই সরস-রাঙা কমলিনীর দল
ফুট্‌তো যা'রা অরুণ-পরশ পেয়ে!
ফাগুন-হাওয়ায় মৃদুল-দোলায় শিথিল বকুলরাশি
ঘাটের বুকে বৃথাই পড়ে ঝ'রে,
নেয় না কেহ কুড়িয়ে তা'রে ব্যগ্রপায়ে আসি'
গন্ধ-ফুলের মালা-গাঁথার তরে!
ঝড়ের রাতে ব্যাকুল দীঘির উতল কালো ঢেউ
আছড়ে পড়ে ভগ্ন-সোপানতলে,
পুরানো সেই স্মৃতির বেদন-শিখা আজো বুঝি
অতৃপ্ত তা'র মর্ম্মমাঝে জ্বলে।

শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী



মরণ ভোমরা



বড়দিনের ছুটী শেষ হইতে আর দেরী নাই। গত কয় দিন হইতে 'পছিয়াঁ' বাতাস দিয়া দুর্জ্জয় শীত পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিন জন ক্লাবের সভ্য চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া চিম্‌নীর গন্‌গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। বাহিরের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও প্রবল বায়ু মিলিয়া একটা দুর্যোগ-সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল।

অমূল্য বলিল—"আজ আর কেউ আসছে না, চল, বাড়ী ফেরা যাক। তিন জনে ভূতের মত ব'সে থেকে কোনও লাভ নেই—চারজন হলেও না হয় ব্রিজ্ খেলা যেত।"

বরদা স্তিমিতনেত্রে আগুনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই বলিল,—"সেবারে এই ডিসেম্বর মাসে কসৌলী গিয়েছিলুম—বাপ! কি শীত! মাথার ঘিলু পর্য্যন্ত জ'মে যাবার উপক্রম। পালিয়েই আসতুম—যদি না একটা ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘ'টে সব ওলট্-পালট্ ক'রে দিত।—আচ্ছা, কত বড় গঙ্গাফড়িং তোমরা দেখেছ বল দেখি?"

অমূল্য বলিল,—"হুঁ, আষাঢ়ে গল্প ফাঁদ্‌বার মৎলব। ওসব চালাকী চলবে না বরদা, আমি উঠ্‌লুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কসৌলী গিয়েছিলে কেন?"

বরদা বলিল,—"কুকুরে কামড়েছিল; সেই কথাই ত—"

অমূল্য বলিল,—"জানি, সে বিষ এখনও তোমার শরীর থেকে বেরোয় নি। আমি আর এখানে থাক্‌ছি না, তোমার গঙ্গাফড়িং নিয়ে তুমি থাক।"

অমূল্য উঠিয়া পড়িল, শালখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটার মত করিয়া মাথায় দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বার বন্ধ ছিল, ঠেলা দিয়া খুলিয়াই অমূল্য চমকিয়া বলিয়া উঠিল—"কে রে!"

—"মশায়, আস্‌তে পারি কি?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখিলাম, ওভারকোট ও মঙ্কি ক্যাপে সর্ব্ব অবয়ব আচ্ছন্ন করিয়া একটি লোক দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মুখচোখ কিছুই দেখা গেল না, শুধু ব্যালাক্লাভা ও ওভারকোটের কলারের অন্তরালে একজোড়া কালো গোঁফের আভাস পাওয়া গেল মাত্র।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান?"

লোকটি বলিল, "এইটি কি বাঙ্গালীদের ক্লাব?"

বরদা আহ্বান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। অমূল্য, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো হে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।"

লোকটি ঘরে আসিয়া প্রথমে মঙ্কি ক্যাপ ও পরে ওভারকোট খুলিয়া চেয়ারের পিঠের উপর রাখিল; তখন প্রকাণ্ড খোলের ভিতর হইতে অতি ক্ষুদ্র শামুকের মত তাহার চেহারাখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মানুষ যে এত শীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই লোকটিকে না দেখিয়া ধারণা করা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি বা মানসিক দুশ্চিন্তা তাহার নিরতিশয় ক্ষীণ শরীরটির প্রতি অবয়বে যেন জরার ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মাংসহীন মুখের উপর ঘনকৃষ্ণ একজোড়া গোঁফ মুখখানাকে আরও শুষ্ক শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। কপালে গভীর কালো রেখা—মুখের রং ফ্যাকাশে পীতবর্ণ। মাথার দুই পাশে বড় বড় একজোড়া কাণ যেন পাখা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাহার মুখের সমস্ত প্রত্যঙ্গই মৃত বলিয়া মনে হয়—কেবল কালিমাবেষ্টিত বড় বড় দুইটা চক্ষু যেন দেহের শেষ প্রাণশক্তিটুকু হরণ করিয়া জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অজীর্ণ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির তাড়ায় যাঁহারা শীতকালে সুজলা বাঙ্গালা দেশের মায়া কাটাইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরণের চেহারা দুই একটা দেখিয়াছি—তাই বড় বিস্মিত হইলাম না। বুঝিলাম, ইনিও এক জন স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ুভুক্ জীব। মনে মনে ভাবিলাম, কেবলমাত্র মুঙ্গেরের জলহাওয়া এই কঙ্কালের

উপর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি? ঘোর সন্দেহ হইল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ক্লাবের কোনো সভ্যকে খুঁজছেন?"

লোকটি একবার আমাদের তিন জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার গোঁফ-জোড়া নড়িয়া উঠিল। তার পর অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হাসিয়া বলিল,—"তা হতেও পারে, এখনও ঠিক বলতে পারছি না।"

আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। লোকটি পুনশ্চ বলিল,—"আমি এ সহরে নবাগত। আজ তিন দিন হ'ল এসেছি—ডাকবাংলোয় আছি। কিন্তু এ ক'দিন বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা না কয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, মশায়। আজ সন্ধ্যেবেলা বেয়ারার কাছে খবর পেলুম, এখানে বাঙ্গালীদের একটা ক্লাব আছে, তাই খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছি। আর থাকতে পারলুম না।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছেন। যত দিন থাকেন, নিয়মিত আসবেন, আমরা খুব খুশী হব। তা—স্বাস্থ্য উপলক্ষে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?"

লোকটি বলিল, "না, স্বাস্থ্য ত আমার বেশ ভালই।"—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটা তুলিয়া বলিল—"সে জন্য নয়, মশায়; মৃত্যু আমাকে তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভারতবর্ষময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি; কিন্তু রেহাই নেই। যেখানেই যাই, মৃত্যু আমার পিছনে লেগেই আছে। মনে ভাবি, আর বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করব না; কিন্তু পারি না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

কথাটা খাপছাড়া ঠেকিল, কিন্তু তবু মৃত্যু যে তাহাকে তাড়া করিয়াছে এবং অচিরাৎ ধরিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তথাপি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "এখানকার জলহাওয়া খুব ভাল, কিছু দিন থাকুন, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।"

লোকটি পকেট হইতে একটা চামড়ার সিগার-কেস্ বাহির করিয়া বলিল, "ধূমযাত্রা করেন কি?"—বলিয়া তিনটি ভীষণদর্শন সিগার আমাদের তিন জনকে দিয়া একটি নিজে ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই শরীরের উপর এইরূপ বিকটাকৃতি বিষাক্ত কড়া সিগার টানিয়া লোকটা কয় দিন বাঁচিবে?

আমাদের মুখের প্রতি কিন্তু তাহার নজর ছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনারা ভুল করছেন। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। ধরুন ত আমার পাঞ্জা।"—এই বলিয়া কাঠির মত অঙ্গুলিযুক্ত কঙ্কালসার হাতখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

পাগলা না কি? আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না, না, সে কথা বলি নি। আমি বলছিলুম—"

"ধরুন পাঞ্জা—"লোকটার চক্ষু দুটা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা মনে মনে প্রমাদ গণিলাম, কোথা হইতে একটা পাগল আসিয়া জুটিল! আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতেছি দেখিয়া লোকটা নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, "আপনারা ভাবছেন, রোগা ব'লে আমার গায়ে জোর নেই। ভুল! ভুল! পাঞ্জায় গামা পালোয়ানও আমাকে হারাতে পারে না। ধরুন পাঞ্জা!"

কি করি, নিরুপায় হইয়াই তাহার পাঞ্জা ধরিলাম। নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে ভাল ধারণাই ছিল, ভয় হইল, বুঝি একটু চাপ দিলেই ঐ প্যাঁকাটির মত আঙ্গুলগুলা মট্-মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার হাতে হাত দিয়াই বুঝিলাম, সে আশঙ্কা অমূলক। তাহার আঙ্গুলগুলা ইস্পাতের তারের মত আমার আঙ্গুলগুলাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি যতই বলপ্রয়োগ করি, তাহার কব্জি ততই লোহার মত শক্ত হইতে থাকে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ নির্ব্বিকার, দাঁতে সিগার চাপিয়া স্বচ্ছন্দে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে।

ক্রমে আমার হাত অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর সবিস্ময়ে দেখিলাম, হাতখানা অজ্ঞাতসারে ঘুরিয়া যাইতেছে।

আমার কব্জির কাছে মট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। "ব্যাস্! কাবার!" বলিয়া লোকটা পাঞ্জা ছাড়িয়া দিল। আমি স্তম্ভিতভাবে অবশ হাতখানা তুলিয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না, লোকটা অর্দ্ধ-মুদিতনেত্রে সিগার টানিতে লাগিল।

অবশেষে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের নামটি কি?"

সে বলিল,—"ভূতনাথ সিকদার। দেখলেন ত, যা বল্‌লুম, সত্যি কি না? রোগ আমার শরীরে নেই মশায়, রোগ এইখানে।" বলিয়া নিজের কপালে তর্জ্জনী ঠেকাইল।

বরদা নিজের চেয়ারখানা ভূতনাথ সিকদারের পাশ হইতে একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল,—"আপনি যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিলেন, তা ত চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না; ভোজবাজী ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু শরীর যদি আপনার নীরোগই হয়, তবে আপনি এত রোগা কেন? মাথার কি কোনও অসুখ আছে?"

ভূতনাথ সিকদার বলিল, "মাথার অসুখ নেই, অসুখ আমার কপালের, ভাগ্যের। বলেছি ত, মৃত্যু আমাকে তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

বরদা বলিল, "কথাটা আর একটু খোলসা ক'রে না বল্লে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সিকদার চুরুটে তিন চারটা টান দিয়া যেন কি চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "আচ্ছা, বলছি, কিন্তু এ কথা শোনবার পর আর আপনারা আমার মুখদর্শন করতে চাইবেন না। এই ভয়েই ত দেশদেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—বাঙ্গালীর ছায়া মাড়াতে চাই না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পেরে উঠি না। আপনারা আমায় মাফ করবেন, আমি একটা মহা অলক্ষণ, যাদের সঙ্গে মিশি, তাদেরই অমঙ্গল হয়।"

তাহার কথাগুলা এমন একটা অবসন্ন করুণ রেখা রাখিয়া গেল যে, কিছু না বুঝিয়াও আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। হয় ত লোকটি জীবনে অনেক দুঃখশোক পাইয়াছে, তাই মাথাটা কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে—মনে করে, যাহার সহিত কথা কহিবে, তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমার এইরূপ হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে স্বামী, তিন পুত্র ও সাতটি নাতি-নাতনী হারাইয়া তিনি প্রায় পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সর্ব্বদা চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, বলিতেন—আমি কাহারও মুখ দেখিব না, আমার দৃষ্টি যাহার উপর পড়বে, সে আর বাঁচবে না। ভূতনাথ সিকদারেরও হয় ত সেই রকম কিছু হইয়া থাকিবে।

আমি বলিলাম, "তা হোক্, আপনি বলুন। ও সব অলক্ষণ-কুলক্ষণ আমরা মানি না।"

সিকদার বলিল, "আপনাদের তরুণ বয়স, ও সব না মানাই স্বাভাবিক। ভূত-প্রেত, পরকাল, সূক্ষ্মদেহ এ সব আপনাদের মানতে বলছি না, কিন্তু আসন্ন দুর্ঘটনা যে আগে থাকতে মানুষের জীবনে ছায়াপাত করে, এ কথাও কি আপনারা স্বীকার করেন না?"

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। সিকদার বলিতে লাগিল, "তবে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। আমার জীবন কেন যে মনুষ্যসমাজ থেকে একটা উর্দ্ধশ্বাসপরাংণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুনলে আপনারা হয় ত আমাকে পাগল মনে করবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমি পাগল নই, আপনাদের মত সহজ মানুষ। পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে, হেসে-কেঁদে সাধারণ মানুষের মত জীবন কাটাতে চাই; কিন্তু পারি না। কেন পারি না, জানেন? ভয়! দারুণ ভয়ে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। একটা মহা আতঙ্ক সব সময় আমাকে গ্রাস ক'রে আছে। যখন একলা থাকি, বেশ থাকি, কিন্তু আপনারাই বলুন ত, মানুষ একলা সঙ্গিহীনভাবে কত দিন থাকতে পারে? তাই মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয়।

"আমি বিবাহ করি নি, কেন করি নি, তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বাপ-মা অনেক দিন গত হয়েছেন, আত্মীয়স্বজনও এখন বড় কেউ নেই, চিৎপুর রোডের পৈতৃক বাড়ীখানা এখনও বিক্রী করি নি, টাকাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবু একটা সৃষ্টিছাড়া অন্ধকার ধূমকেতুর মত কেবল শূন্যের মাঝখানে ছুটে বেড়াচ্ছি—কেন?

"যখন আমার ষোলো বছর বয়স, তখন এক দিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলা তিন জন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ীর তে-তলায় একটা ঘরে ব'সে তাস খেলছিলুম। সেই দিনটা হচ্ছে আমার জীবনের একটা অভিশাপ। স্কুলে গরমের ছুটী হয়ে গেছে, রোজই আমাদের এই রকম খেলা বসে। তে-তলার এই ঘরটি দিব্যি নিরিবিলি, চিৎপুর রোডের চীৎকার সেখান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, শুধু মাঝে মাঝে ট্রামের ঢং ঢং শব্দ শোনা

যায়। সে দিন আমরা চার জন নিবিষ্টমনে ব'সে খেল্‌ছি, এমন সময় খোলা জানালা দিয়ে একটা কালো ভোমরা ঘরে ঢুকে আমাদের ঘিরে ভন্‌ ভন্‌ ক'রে ঘুরতে লাগল। খেলায় এত তন্ময় ছিলুম যে, প্রথমটা লক্ষ্যই করি নি, কিন্তু সেটা যখন মাথার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলে, তখন আমরা চার জনেই উঠে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সেও কিছুতেই যাবে না; পাখা দিয়ে—ব্যাড়মিণ্টনের ব্যাট দিয়ে যতই তাকে মারবার চেষ্টা করি, সেও ততই আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে কখনও নীচুতে, কখনও প্রায় কড়িকাঠের কাছে উঠে ঘুরতে থাকে। আমরা যেই আবার খেলতে বসি, অমনই আমাদের কাণের কাছে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দ ক'রে উড়তে আরম্ভ করে।

"প্রায় আধ ঘণ্টা তার পিছনে লেগে থাকবার পর যখন আমরা হয়রাণ হয়ে পড়েছি, তখন ভোমরাটা ভন্‌ন্‌ ক'রে এসে একবার আমাদের মাথার চারদিকে চক্র দিয়ে নিজে থেকেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরের তপ্ত বাতাসে তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

"গোপাল বললে—'দেখ ভাই, আশ্চর্য্য ভোমরা। একবার আমি ব্যাডমিণ্টন ব্যাট দিয়ে মারলুম, ঠিক মনে হ'ল, ভোমরাটা তাঁতের ভেতর দিয়ে গ'লে গেল।'

"বীরেন বললে—'দূর! অত বড় ভোমরা কখনও অতটুকু ফাঁক দিয়ে গলতে পারে?'

"হরিপদ বললে—'কিন্তু এই কলকাতা সহরে ভোমরা এল কোত্থেকে, ভাই? কাছে-পিঠে কোথাও বাগানও ত নেই!'

"সত্যিই ত' ভোমরাটা এল কোত্থেকে? আমরা নানা রকম আঁচ-আন্দাজ করতে লাগলুম, কিন্তু কোনটাই বেশ লাগসৈ হ'ল না। তখন আমাদের বয়স কম, ভোমরা কোথা থেকে এল, এ সমস্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামালুম না। কিন্তু ভোমরাটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতেও পারলুম না।

"পরদিন দুপুরে গোপাল তাস খেলতে এল না। তিন জনে খেলা ভাল জমল না, সারা দুপুর গল্প ক'রে আর গোপালকে গালাগাল দিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

"গোপাল গ্রে ষ্ট্রীটে থাকত। বিকেলবেলা তার বাড়ী গিয়ে দেখলুম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছে। আমায় দেখে চিন্‌তে পারলে কি না, বোঝা গেল না,—চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাল। শুধু একবার গেঙিয়ে গেঙিয়ে কি একটা কথা বললে—মনে হ'ল যেন বললে—ভোমরা!

"তার চারদিকে ডাক্তার আর বাড়ীর লোকে ভিড় করেছিল; কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, গোপালের কি হয়েছে। পরে শুনেছিলুম—সর্দ্দিগর্ম্মি। সান্‌-ষ্ট্রোক্‌।

"আমি চুপি চুপি চোরের মত বাড়ী ফিরে এলুম; তার সেই অস্পষ্ট কথাটা আমার মাথার মধ্যে কেবলই গুমরে গুমরে উঠতে লাগল—ভোমরা! ভোমরা!

"পরদিন গোপাল মারা গেল। সেই থেকে, কি ক'রে জানি না, আমার মনে গেঁথে গেল যে, সেই ভোমরাটা ছিল মৃত্যুর দূত। গোপালের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, এই খবরটা সে আমাদের দিতে এসেছিল।

"তার পর থেকে এই কুড়ি বছরের মধ্যে কতবার ভোমরা দেখেছি জানেন?—তিন'শ একুশবার। আর একবারও আমার ভোমরা দেখা নিষ্ফল হয় নি!"

নির্ব্বাপিত সিগারটা আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সিকদার আর একটা সিগার ধরাইল। আমরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সিকদার বলিল, "প্রথম প্রথম মনে হ'ত, বুঝি আমার মনের ভুল। কিন্তু তা নয়—ভোমরাটাকে সকলেই দেখতে পায় এবং দেখার তিন দিনের মধ্যে যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু অনিবার্য্য। বাবা মারা যাবার আগে ভোমরা দেখলুম,—মা'র বেলাতেও দেখা পেলুম।

"ক্রমে মানুষের সঙ্গ আমার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠল—সর্ব্বদাই আতঙ্ক, কি জানি কখন্‌ ভোমরা দেখে ফেলি। হয় ত পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধব মিলে গল্প করছি, হঠাৎ ভোমরা দেখা দিলেন। দুম ক'রে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার এই সুস্থ সবল বন্ধুদের মধ্যে এক জনের মেয়াদ ফুরিয়েছে—তিন দিনের মধ্যে তাঁকে যেতে হবে।

"একটা উৎকট কৌতূহল হ'ত; জানতে ইচ্ছা করত, এদের মধ্যে কাকে ভোমরা নোটিশ দিয়ে গেল। মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম,—এবার কার পালা।

কিন্তু আন্দাজ ঠিক হ'ত না। ভোমরার মৃত্যু-পরোয়ানার মধ্যে ঐটুকুই ছিল কৌতুক—কার উপর শমন জারি ক'রে গেল, শেষ পর্য্যন্ত বোঝা যেত না।

"একবারকার ঘটনা বলি। বর্দ্ধমানে মামার বাড়ী গিয়েছি; মামার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। পৌছনোর পরদিন সকালবেলা আমরা সকলে মিলে বারান্দায় ব'সে চা খাচ্ছি, এমন সময় ভোমরার আবির্ভাব হ'ল। আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় ক'রে উঠ্‌ল। সুবী ব'লে মামার একটা বছর দশেকের মেয়ে দেয়ালের ধারে ব'সে চা তৈরী করছিল, ভোমরাটা উড়তে উড়তে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে টপ্‌ ক'রে পড়ল একেবারে সুবীর মাথায়। সুবী হাউমাউ ক'রে উঠে দাঁড়াতেই জ্বলন্ত ষ্টোভটা উল্টে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন ধ'রে গেল। ভোমরা ভোঁ ক'রে উড়ে পালাল।

"আমরা পাঁচ জনে মিলে সুবীর কাপড়ের আগুন নেবালুম বটে, কিন্তু তার পা দুটো ঝল্‌সে শাদা হয়ে গেল। ডাক্তার এসে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ব'লে গেলেন—সিরিয়াস্‌ কিছু নয়, খুব বেঁচে গেছে।

"আমি মনে মনে বললুম—বেঁচে মোটেই যায় নি,—এ ভোমরার নোটিশ, ব্যর্থ হবার নয়। ঘা থেকে সেপ্‌টিক্‌, তার পরেই সাফ্‌।

"দুপুরবেলা সুবী'র জ্বর এল। সন্ধ্যের সময় আমি একটা ছুতো ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে বর্দ্ধমান ছেড়ে পালালুম। সুবীটা বড় ভাল মেয়ে ছিল, মামাত ভাইবোনদের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতুম।

"বাড়ী ফিরে এসে কাউকে কিছু বললুম না। যথাসময় টেলিগ্রাম এল—সুবীর কিছু হয় নি, মামা হঠাৎ হার্ট্‌ ফেল্‌ ক'রে মারা গেছেন!

"ভোমরার অভিসন্ধি বোঝ্‌বার চেষ্টা করেছিলুম, তাই সে আমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি ক'রে গেল।

"আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন,—সর্ব্বদা যেন মৃত্যুর দূতকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক ভেবে ভেবে একটা মৎলব ঠিক করলুম,—দিনের বেলা যতদূর সম্ভব একলা থাক্‌তুম, রাত্তিরে বাড়ী থেকে বার হতুম। মনের ভাবটা এই যে, রাত্তিরে ত আর ভোমরা আস্‌তে পারবে না!

"কিন্তু আমার ফন্দি খাট্‌ল না। দিন-রাত্রি নির্ব্বিচারে ভোমরা আসতে লাগল—রাত্তিরে কাণামাছির মত টাউরি খেতে খেতে আসে, আবার টাউরি খেতে খেতে চ'লে যায়।

"আমার মানসিক অবস্থা ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই জিজ্ঞাসা করে, তুই অমন কুঁজো হয়ে যাচ্ছিস কেন? চেহারাটাও দিনদিন ভূতে পাওয়া গোছের হয়ে যাচ্ছে। হয়েছে কি?

"আমি চুপ ক'রে থাকি—কি বলব? সত্যি কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বল্‌তে পারি না।

"অতঃপর বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মৃত্যু-দূত আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এক এক সময় হাত যোড় ক'রে ডাকি, মরণ ভোমরা! তুমি এবার আমাকে নাও, এই দুঃসহ শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।—কিন্তু আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। এ সংসারে কেবল আমিই যেন অমর, আর সকলের মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

সিকদারের কণ্ঠস্বর একটা গভীর নিরাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল। তাহার কথাগুলা ঘরের মধ্যে যেন একটা অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জাল বুনিয়া দিয়াছিল। আমরা আগুনের দিকে তাকাইয়া মোহাচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি শেষ কবে মরণ ভোমরা দেখেছেন?"

সিকদার চোখের উপর দিয়া ডানহাতখানা একবার চালাইয়া বলিল, "সাত দিন আগে, আগ্রায়। তাজ দেখতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি বাঙ্গালী দম্পতির সঙ্গে দেখা হ'ল। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে তাজ দেখ্‌তে এসেছে—ছেলেমানুষ, নবপ্রণয়ী। প্রণয়ের মহাতীর্থে নিজেদের সম্মিলিত ভালবাসা বোধ হয় নিবেদন করতে এসেছিল। তার পর সেই রাত্রেই আগ্রা ছেড়ে চ'লে এলুম।"

চার জনেরই সিগার নিভিয়া গিয়াছিল, পুনশ্চ ধরাইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিলাম।

মিনিট পনের সকলেই চুপচাপ।

হঠাৎ সিকদার বলিল, "একটু গরম বোধ হচ্ছে না? জানালাটা খুলে দিতে পারি?"

বন্ধ ঘরে সিগারের কটু ধোঁয়া ও আগুনের উত্তাপে সত্যই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেই সিকদার উঠিয়া পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলিয়া দিল।

বরদা আমার কাণে কাণে বলিল, "একেবারে বদ্ধ পাগল—মনোম্যানিয়াক্। ওর চোখের চাউনি দেখছ?"

সিকদার জানালা খুলিয়া দিতেই একটা এলোমেলো কন্‌কনে হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাদের উত্তপ্ত মুখের উপর যেন ঠাণ্ডা হাত বুলাইয়া দিল। টেবলের উপর আলোটা নিব-নিব হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

সিকদার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছে, এমন সময়—

ভন্‌ন্‌—

ও কিসের শব্দ? চারি জনেই চেয়ারের উপর সোজা শক্ত হইয়া বসিলাম।

পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়া একটা কালো কুচকুচে ভোমরা পাখার শব্দে আমাদের মগজ ভরিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভোমরা টেবলের উপরের বাতিটাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; তার পর সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ছাদে বাধা পাইয়া টপ করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার গুঞ্জন নিস্তব্ধ।

আবার ভন্ করিয়া শব্দ হইল। ভোমরা মেঝে হইতে উঠিয়া একবার বিদ্যুদ্বেগে ঘরময় উড়িয়া বেড়াইল। তার পর আমাদের কাণের পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গুঞ্জন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল।

সিকদার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটা পাগলের মত। প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল—"ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—আমি একটা অভিসম্পাত। আর কখনও আমার দেখা পাবেন না।"—বলিয়া ওভারকোট ও টুপী ফেলিয়াই ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা তিন বন্ধু বিহ্বল জিজ্ঞাসুভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। বুকের ভিতর তোলপাড়্ করিতে লাগিল।

তিন দিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে? *

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল)।

* কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

পথ-প্রেম

আমার অজ্ঞাতে আমি কবে নাকি মাখিয়াছি ধরণীর ধূলি
পৃথ্বীর মৃত্তিকা স্পর্শি' লভিয়াছি নিয়মের তুলা-দণ্ড করে,—
আজো তাই পদে পদে অন্তহীন সমস্যার ব্যবধান তুলি'
ন্যায় নীতি দিবারাত মোরে দেখি' সন্দেহের অট্টহাস্য করে।
আমারে চিনিতে আমি পারি নাই; আজ তাই পরাণ-স্পন্দন
উন্মাদ ক'রেছে মোরে,—পরিচয়-প্রহেলিকা পথের সন্ধান
খুঁজে লব' এই লক্ষ্যে পথে দেখি দ্বিধা দ্বন্দ্ব জর্জ্জর বন্ধন
সৃষ্টির রহস্য ল'য়ে পথিকেরে নিত্য হানে দৃষ্টির কৃপাণ,
বিকাশের স্ফূর্ত্তি নিয়ে যে পথের ক'রেছিনু প্রাণের বন্দন,
সেথাকার ধর্ম্ম এই কে জানিত বল' বন্ধু,
পুরস্কার অশ্রান্ত ক্রন্দন?

আনন্দের পৃথিবী এ, দিবারাত্র সুখে দুখে প্রণমামি তারে
আমার যাত্রার গানে লীলায়িত সুর-সুধা পাথেয় মধুর
দিয়াছে ধরিত্রী এই; সংশয়ের সম্ভাষণ তবু বারে বারে
অচল করিতে চায়, আমি চলি খোঁজে মোর বাঞ্ছিত বঁধুর
নিরুদ্দেশ এ যাত্রীর যাত্রাপথ কে ক'রেছে দুর্গম পিচ্ছিল
জানি বন্ধু, শৃঙ্খলার ঝুট্ নামে কি শৃঙ্খল পরায়েছে পায়—
পৌরুষের প্রাণ-গর্ব্বে কেন করে খর্ব্ব হিংসা নির্লোভ নিখিল
জানি জানি শয়তানী সে রহস্য;—পৃথিবীর ফাঁকা আঙিনায়
চিরন্তন দাবী নিয়ে জন্মে নিত্য বন্ধনের তৃণ-সূত্রগুলি
খেয়ালী পথিক আমি আমারি মূর্খতা ভাই
এ পথের মাখিয়াছি ধূলি

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৪৩

গঙ্গার ধারে ছোট একটা বাসা ভাড়া লইয়া সত্য সপরিবারে বাস করিতেছে। তীর্থদর্শন করিতে বিশু, রঙ্গ তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। কাশী আসিয়াই হিমু জ্বরে পড়িয়াছিল। কয়েক দিন বাড়াবাড়ির পর সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু অন্নপূর্ণার সাবধানতা এখনও যায় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হিমুকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কারণ, এখনও কাশীতে অত্যন্ত শীত।

বিশু ও রঙ্গ পথ-ঘাট চিনিয়া লইয়াছে, আপনার মনে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। মা সত্যকে ঘরে রাখিয়া মাঝে মাঝে দেবদর্শনে বাহির হন।

সে দিন সত্য একাকী বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন দিনান্তের রাঙ্গা ছবি পরপারে নারিকেলকুঞ্জের আড়ালে নামিয়া গিয়াছে। মেঘশূন্য নীলাম্বর এক অপরূপ বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। যুবকের দল স্বচ্ছ অতল গঙ্গাগর্ভে নৌকায় হাওয়া খাইতে খাইতে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে। পুণ্যকামী নর-নারী ঘাটের নিম্নসোপানে কেহ সন্ধ্যাহ্নিকে, কেহ মালাজপে রত।

সত্য সবিস্ময়ে দেখিল, সিঁড়ির এক পার্শ্বে বিশু ও রঙ্গ জপের মালা লইয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে। হস্তে মালা থাকিলেও তাহাদের আলাপ-আলোচনার কিছুমাত্রও ব্যাঘাত হইতেছে না। সত্যর দিকে চোখ পড়িতেই উভয়ে মনোযোগের সহিত মালাজপে নিবিষ্ট হইল।

সত্য মৃদু হাসিয়া সোপানের চত্বরে গিয়া বসিল।

ক্ষণকাল পর একটি সুন্দর সুবেশ যুবক আসিয়া সত্যর অদূরে উপবেশন করিতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া হাত তুলিয়া নমস্কারান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে আপনাকে একা দেখছি, সুরেশ্বর বাবু? আমাদের বংশীদাদা কোথায়? সেই বিকেল থেকে বংশীদার হু'টো কীর্ত্তন শোনবার আশায় ব'সে আছি। আহা, কি গানই শিখেছেন, শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।"

আগন্তুক বৃদ্ধের নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া জবাব দিলেন, "বংশীদা বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে দুর্গাবাড়ীতে গেছেন, আজ আর গান শোনা হবে না। সত্যি বলেছেন—সঙ্গীতে বংশীদার অসাধারণ ক্ষমতা, যেমন কণ্ঠস্বর, তেমনই মিঠে হাত।"

সত্য চমকিয়া সুরেশ্বরের দিকে তাকাইল। সুরেশ্বর নামটি যে পরিচিত। সুরেশ্বরের সহিত বংশীনাম সংযুক্ত হইয়া সত্যর কাছে সত্য সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল। সত্য ভাবিতে লাগিল, ইনি সুরেশ্বর রায়, সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পদে ইঁহাকে বড় করিয়া রূপেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, সত্যই এ রূপরাশি দুর্ল্লভ। সুনন্দাকে দোষ দেওয়া চলে না; এ প্রলোভন সংসারে কয় জন জয় করিতে পারিয়াছে?

সত্য শুনিল, সুরেশ্বর বলিলেন যে, বংশীদা মেয়েদের লইয়া দুর্গাবাড়ী গিয়াছেন। মেয়েদের ভিতর নিশ্চয় সুনন্দা আছে, নতুবা বংশীদা লইয়া যাইবে কেন? দৈবের ঘটনা মানুষের অচিন্তনীয়, অভাবনীয়। কোথায় নন্দা, কোথায় সত্য, স্বয়ং বিধাতা যাহাদিগকে ফুলের মালায় গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন, ভাগ্যই তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আবার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় স্রোতের ফুলের মত কাশীর গঙ্গাতটে উভয়ে ভাসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ আসার কি সার্থকতা? ইহা ত সত্যর আকাঙ্ক্ষিত নহে। সত্য জীবনে অথবা মরণে আর নন্দার দর্শনপ্রার্থী নহে। ভগ্ন-প্রতিমায় পূজারীর কোন্ প্রয়োজন? যে বারি লবণাক্ত, তাহা দিয়া পিপাসিত কি করিবে? সাধের কণ্ঠমালা কণ্টকে গঠিত হইলে কে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে চাহে? না, না, সত্য নিমেষের তরেও নন্দাকে দেখিতে চাহে না। দেখিবার কল্পনায় তাহার চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়।

"আচ্ছা বাবা, আপনি কি আমাদের বংশীদাদাকে চেনেন? বংশীদা কি এখানে এসেছেন? তাঁর পূরা নামটি কি? তিনি আপনার কে হন?"

রঙ্গর প্রশ্নে সত্যর চিন্তায় বাধা পড়িল। সে আপনার ভাবে বিভোর হইয়াছিল। এতক্ষণ ইহাদের আলাপ-আলোচনায় কাণ দিতে পারে নাই। ইহাদের কোন্ প্রসঙ্গে রঙ্গ অযাচিতভাবে সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছে, তাহাও সে জানে না। না জানিলেও রঙ্গর গায়ে পড়িয়া কথা বলিবার দুঃসাহসে সে মনে মনে কম কৌতুক বোধ করিল না।

রঙ্গ সেকেলে, আজীবন পল্লীবাসিনী, সহরের "হুজুর" "বাবু" "আজ্ঞে" "মশায়" তাহার জানা ছিল না। বংশী শব্দ শোনামাত্র সে সরল অন্তঃকরণে সুরেশ্বরের পাশে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

সুরেশ্বর অপরিচিতা নারীর আগ্রহে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমরা যে বংশীদার কথা বল্‌ছি, তিনি আমার দাদার চেয়ে—আপনার জনার চেয়ে বেশী। তাঁর পুরা নাম বংশীধর গোস্বামী, বাড়ী পাড়াগাঁয়ে বুড়া শিবতলা, অনেক দিন হ'ল বংশীদা এখানেই আছেন।"

রঙ্গ হর্ষোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "এখানে আছে, আমাদের বংশীদা এখানে আছে? আচ্ছা, বংশীদা কোথা থাকে? সে কত দূর হবে?"

রঙ্গর পশ্চাৎ হইতে বিশু অগ্রসর হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাদের বংশীদার খবর জানেন, বাবু? বংশীদার বোন্ নন্দাদিদির কথা বল্‌তে পারেন? আমরা একখানেরই লোক, ঐ আমাদের সতুদা—সত্যপ্রিয় বাবু বংশীদার ভগ্নীপতি হন। বংশীদার খুড়তোত বোন্ হিমুদির সাথে ওনার বিয়ে হয়েছে।"

সুরেশ্বর সহসা সত্যর নিকটবর্ত্তী হইয়া চিরপরিচিতের ন্যায় সত্যর হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের সতুদা! বংশীদাদাদের কাছে আপনাদের কত গল্প শুনেছি। গল্প শুনে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে ভারী ইচ্ছা হয়েছিল, বিশ্বনাথ সে ইচ্ছা আজ পূর্ণ করলেন। কত দিন আপনারা এখানে এসেছেন? কোথায় আছেন? বংশীদা-বর্ণিত ঐটি বুঝি আপনাদের বিশুদা, আর সহকারিণীটি—রোসো মনে করি—মনে হয়েছে, রঙ্গদি।"

বিশু ও রঙ্গ এক অপরিচিত মহামান্য ব্যক্তির নিকটে 'দাদা' 'দিদি' সম্বোধনে আপ্যায়িত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া সন্তোষের হাসি হাসিল।

সত্যর কিন্তু সুরেশ্বরের আত্মীয়ভাব সহজভাবে গ্রহণ করিতে সময় লাগিল। তাঁহার মুঠায় আবদ্ধ হাতখানি যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। সুরেশ্বরের নিশ্বাস গায়ে বিষ ছড়াইতে লাগিল। এমন সুন্দর রজতগিরিনিভ যুবকের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিও সত্যর চোখে ভাল লাগিল না।

কিয়ৎকাল পরে সত্য একটা রুদ্ধ নিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার অনুমান মিছা নয়। ওরাই বিশুদা আর রঙ্গ দিদি। আমরা মাসখানেক হ'ল এখানে এসেছি, বাসা কাছেই। আপনি ত আমাদের দিব্যি চিনেছেন, কিন্তু আপনার—"

সুরেশ্বর বাধা দিয়া বলিলেন, "ও, আমার পরিচয় যে আপনাকে দেওয়াই হয় নি। আপনাদের জানবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে জানাবার কথা ভুলেই গেছি। আমার নাম সুরেশ্বর রায়, আসাম অঞ্চলে বাড়ী। সম্প্রতি এখানেই রয়েছি। ষ্টেশনের ওদিকে আমাদের বাসা, বংশীদা, আমি—আমরা দু'ভাই এক যায়গাতেই থাকি।"

সত্য মস্তক অবনত করিল। সুরেশ্বরকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। আর জিজ্ঞাসা করিবার কি-ই বা আছে; যতটুকু জানিবার, তাহা বিলক্ষণরূপেই জানা হইয়াছে।

সত্যর জানিবার কিছু না থাকিলেও বিশু ও রঙ্গর অনেক জানিবার ছিল। বিশুই প্রথমে বুড়াশিবতলা হইতে সুরেশ্বর রায় নামটি শুনিয়া আসিয়াছিল; নাম শুনিবার অনেক দিন পর অবধি সুরেশ্বর নামের প্রতি বিশুর একটা দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছিল। সুরেশ্বরের নামের সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা নামও সে মনের মধ্যে হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে নামটা দিনে দিনে তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; মুছিতে চাহিলেও কিন্তু তাহা মুছিতে পারে নাই। অনেক দিনের রুদ্ধ স্নেহের ধারা আজ একটুখানি নাড়া পাইয়া কল-কল শব্দে উচ্ছ্বসিত হইল।

বিশু কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সম্ভ্রম রাখিয়া বিনীতভাবে কহিল, "নন্দাদিদি কোথা আছেন, বাবু? তেনার শরীর কেমন আছে?"

"তিনি এখানেই আছেন, ভাল আছেন। তোমাদের কত কথা বলেন।"

সত্য সুরেশ্বরের মুঠা হইতে হাতখানি টানিয়া লইয়া হঠাৎ উঠিয়া বলিল, "আজ তা হ'লে আসি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। এখন আপনারা ত এখানেই আছেন, আবার দেখা হবে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সত্য সে স্থান পরিত্যাগ করিল। তাহার এ অদ্ভুত আচরণে সুরেশ্বর অবাক্ হইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

৪৭

পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় সংক্রান্তির দিন জেদ করিয়া গঙ্গা-স্নানের পরেই কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ হিমু পুনরায় জ্বরে পড়িল। কেবল পুণ্যসঞ্চয়ের আশাতেই যে হিমু রুগ্নশরীরে স্নান করিতে গিয়াছিল, তাহা নহে। তাহার অন্তরে আর একটি আশার প্রদীপ ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল।

সে দিন সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের সমস্ত বৃত্তান্ত হিমু রঙ্গর মুখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া শ্রবণ করিয়াছে। সত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংক্ষিপ্ত 'হাঁ-না'র বেশী জানিতে পারে নাই। এই কাশীতেই এত কাছে নন্দা রহিয়াছে, এটুকু জানিবার পর তাহার হৃদয়-উচ্ছ্বাসকে কিছুতেই সে দমন করিতে পারিতেছিল না। স্বামী যাহার প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকেন, শাশুড়ী নিঃশব্দে উঠিয়া যান, বিশুও ভাসা-ভাসা উত্তর দেয়, এক রঙ্গর সহিত কত আলোচনা চলে? আলোচনার খোরাকই বা সে কতখানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

হিমুর আশা ছিল, সংক্রান্তির দিন নিশ্চয়ই সুনন্দা গঙ্গা-স্নান করিতে আসিবে। যে ঘাটে সুরেশ্বর বেড়াইতে আসেন, সে ঘাট ছাড়া নন্দা আর কোথায় স্নান করিবে? হিমু যে নন্দাকে একবার দেখিতে চায়। সুরেশ্বরের সহিত তাহার বিবাহের বিবরণ স্বকর্ণে শুনিতে চায়। সেই সুনন্দা চিরতপস্বিনী, তাহার ভালবাসার দিদি, তাহার কি এই কায? সত্যর অর্দ্ধ-পরিণীতা কিরূপে সুরেশ্বরকে বরণ করিয়াছে? বঙ্গরমণীর আদর্শ সে ভুলিয়াছে, সত্যর নির্ম্মল প্রেম ভুলিয়াছে! তাহার সহিত একটিবার দেখা করিবার কথা সে কাহারও কাছে বলিতে সাহস না করিয়া অগত্যা কৌশলেরই শরণাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বালিকার চির-পোষিত আশালতায় ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত গঙ্গার ঘাট অন্বেষণে ব্যাকুল নয়নে চাহিয়াও হিমু বাঞ্ছিত মুখখানি দেখিতে পাইল না। অধিক-কাল শীতল জলে অবগাহনের পর বাসায় ফিরিয়াই তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

বধূর শীর্ণ দুর্ব্বল শরীরের উপর পুনর্ব্বার জ্বরের আক্রমণে অন্নপূর্ণা চিন্তিত হইলেন। সত্যর বিষণ্ন মন আরও বিষণ্ন হইল।

শুদ্ধ দ্বিপ্রহরে হিমুর জ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া সে একবারে জ্ঞানশূন্য, অভিভূত হইল। জ্বরের প্রাবল্যে বালিকা প্রলাপ বকিতে লাগিল, "দিদি, তোমায় আমি একটিবার দেখতে চাই, এত কাছে থেকে তোমায় না দেখে আমি থাকবো কি ক'রে? এস দিদি, এস, তুমি আমার কাছে এস। মা, মা, তুমি এ কি করলে? দিদির সুন্দর জীবনপথে আমায় কাঁটা ক'রে রাখলে কেন?"

বিহ্বলা বালিকার ন্যায় হিমু কখনও মা মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কখনও বলিল, "দিদি, তোমার এই কায, তুমি সুরেশ্বর বাবুকে বিয়ে করলে? ছিঃ ছিঃ, বড় লজ্জা, বড় লজ্জা!"

অন্নপূর্ণা ভীত হইয়া কহিলেন, "দেখ সতু, হিমু এমন করে কেন? দিদি দিদি করেই বাছা আমার সারা হ'ল, এমন ভালবাসা আমি জন্মে দেখি নি। দিদি কি আর দিদি আছে, সে যে পাষাণ হয়ে গেছে। সুরেশ্বর রায়ের কাছে সব শুনে সে একটা খবর পর্য্যন্ত কল্লে না, আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করুক না কেন, কিন্তু হিমু যে তার বোন্। রাজার রাণী হয়ে তাও সে ভুলে গেছে!"

সত্য ম্লানমুখে বলিল, "এর আগে জ্বর হ'লে ত এমন করে নি মা, রঙ্গদির কাছে খবর পেয়েই ও ভারী চঞ্চল হয়েছে। জ্বরের ঝোঁকে মনের কথা বেরিয়ে আস্‌ছে। আমি একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনি, দেখি তিনি কি বলেন।"

অনতিবিলম্বে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "বড্ড হাই ফিবার হয়েছে, তাই প্রলাপ বক্‌ছেন, মাথায় বরফ দিন। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আনিয়ে দু'ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। বিকেলে আবার খবর দেবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই।"

সমস্ত দিন-রাত্রি জ্বরভোগের পর পরদিন সন্ধ্যায় হিমুর জ্বর ছাড়িয়া গেল, কিন্তু দুর্ব্বল মস্তিষ্ক তখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত-নয়নে মৃদুস্বরে ডাকিল, "দিদি!"

সত্য হিমুর শিয়রে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতেছিল। কুলঙ্গীর ভিতর লণ্ঠনের আলো মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। সত্য ত্রস্তে পাখা রাখিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, হিমুর মুখের কাছে মুখখানি নামাইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "তুমি কাকে ডাকছো, হিমু? তোমার কাছে ত আর কেউ

নেই, আমিই রয়েছি। এখন কেমন লাগছে, মাথার যন্ত্রণা একটু কম হ'ল ?"

হিমু চোখ মেলিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল।

সত্য সস্নেহে হিমুর বাহুতে একটু চাপ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছো, হিমু! কাকে খুঁজছো ?"

হিমু অত্যন্ত শ্রান্তভাবে জবাব দিল, "এতক্ষণ চোখ বুজে বুজে আমি কত কি দেখছিলাম, বাবা যেন ফিরে এসেছেন, মা বেঁচে আছেন, দিদি আমার কাছে ব'সে বাতাস দিচ্ছেন। আহা, সব যদি সত্যি হ'ত।"

"যা সত্যি হবার নয়, কেউ তাকে সত্যি করতে পারে না। যতটুকু সম্ভব, সেটুকু পেলে কি তুমি আরাম পাবে, হিমু ? মা'র এত স্নেহ, তাতেও তোমার ক্ষোভ মেটে না। যাকে এত ভাব, এত মনে কর, তাঁকে একটি-বার দেখতে পেলেই কি তোমার দুঃখ যাবে ?"

হিমু স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সত্যর পশ্চাতে আলো ছিল, মুখ ভাল দেখা গেল না। তাই হিমু আশান্বিত হইয়া আবেগের সহিত বলিতে পারিল, "দিদিকে একটিবার দেখতে পেলেই আমার মনে আর কোন কষ্ট থাকবে না। দেখ, এখনও আমার মনে হয়, সেই দিদি, সে আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না। আচ্ছা, দিদির কথা বললেই তুমি অমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নাও কেন ? আমি দিদিকে ভালবাসি ব'লে তোমার এত রাগই বা হয় কেন ? মা ভালবাসেন, তুমিও বাস, তাই ব'লে কি আমি দিদিকে ভুলতে পারি, তুমিও যে ভুলতে পার নি।"

সত্য কাতর হইয়া কহিল, "অসুখের ভেতর এ সব কথা নয় হিমু, এখন একটু দুধ-বার্লি খেয়ে তুমি ঘুমিয়ে থাকো, মা আনতে গেছেন। কালই আমি তোমার বংশীদাকে—দিদিকে তোমার অসুখের খবর দেব,—তাঁরা বোধ হয় কেন, নিশ্চয় তোমায় দেখতে আসবেন।"

"খবর পেলে তারা কি না এসে পারবে ? দেখ, আজ দু'দিন আমি মোটেই তোমার সঙ্গে কথা বলি নি, এখন মাথার যন্ত্রণা নাই, ভাল বোধ করছি, আমায় দু'টো কথা বল্‌তে দাও। কথা বল্লে অসুখ বাড়বে না গো, বাড়বে না। দিদির ওপর তোমার এত রাগ কেন ? যাকে ভালবাস, তার প্রতি রাগ রাখতে নেই। আচ্ছা, দিদি এতটা আত্মত্যাগ ক'রে যদি বিয়ে না করতেন, তা হ'লে তুমি কি করতে ?"

দুষ্ট হিমু রোগে ভুগিয়াও দুষ্টামি ভুলিল না। কথাটা বলিয়াই টিপি টিপি হাসিতে লাগিল।

সত্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া উত্তর করিল, "তা হ'লে দেবী ব'লে মনে মনে তাঁকে পূজো করতাম। আমায় এখনই একবার ডাক্তার বাবুর বাসায় যেতে হবে। তুমি পথ্য ক'রে ঘুমোও। আমি রঙ্গদিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সত্য বাহির হইয়া গেল।

৪৮

রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বধূর আগ্রহে অন্নপূর্ণা পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া রঙ্গকে 'যোগমায়া আশ্রমে' পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়া রঙ্গ ও বিশু যোগমায়া আশ্রম চিনিয়া আসিয়াছিল।

যাহারা অন্নপূর্ণাকে এক দিন অতি বড় বিমুখ করিয়া দাগা দিয়াছে, তাহাদের মুখ দেখিতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা ছিল না, তাহাদের নাম মুখে আনিতেও অন্নপূর্ণার জিহ্বা আড়ষ্ট হইত।

বধূর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে অপ্রিয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। তিনি সাধ করিয়া তীর্থে আসিয়া ভারী নাকাল হইয়া পড়িয়াছেন, হিমু তাঁহাকে বড় চমকানটাই চমকাইয়া দিয়াছে। তীর্থ মাথায় থাকুন, এখন সুভালহালে পুত্র ও বধূকে লইয়া ঘরের মানুষ ঘরে ফিরিতে পারিলেই তিনি বাঁচিয়া যান।

ইদানীং বধূর ব্যবহারে তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না। এত আদর-যত্নে ভালবাসায় বধূ তৃপ্ত নহে, তাহার মুখে এক বুলি দিদি দিদি, শুনিতে শুনিতে কাণ যেন ঝালাপালা হইয়া যায়। ইহাকেই বলে এক গাছের বাকল আর এক গাছে লাগে না। রক্তের টান ষোল আনার যায়গায় আঠারো আনা টানিয়া থাকে।

ছেলেকে অতি সস্তাদরে বিকাইয়াছেন ভাবিয়া আজ-কাল অন্নপূর্ণা সময় সময় অনুতপ্ত হইয়া থাকেন। গ্রামান্তরে বেড়াইতে গিয়া তাহাদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া মা তাঁহার অমূল্যরত্ন এক জনের আঁচলে বাঁধিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

বাহিরের লোভ আসিয়া—মোহ আসিয়া যেমনই সম্মুখে

উপনীত হইল, অমনই তাঁহার মাণিক অঞ্চলচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। তিনি পরিত্যক্ত রত্ন পুনরায় যাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন, সে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিল না। যাহা সহজে আয়ত্ত হয়, কে তাহার মূল্য বোঝে? ক্ষোভে দুঃখে অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

রঙ্গকে পাঠাইয়া অন্নপূর্ণা কাপড় ছাড়িয়া, নামাবলীখানা গায়ে জড়াইয়া, তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া লইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া তাহারা হয় ত সংবাদদাত্রীর সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। মনে যাহাই থাকুক না কেন, বাড়ীতে কেহ আসিলে তাহাদের সহিত শিষ্টাচার না করিয়া উপায় নাই। হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া হাসিমুখে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতে হয়।

এমন সময় বাহিরে যাইবার বেশভূষা করিয়া সত্য আসিয়া বলিল, "আমি একবার কুমুদের ওখানে যাচ্ছি মা, সে দিন কুমুদের মা আমাকে খাবার কথা বলেছিলেন, আমি বলেছিলাম, 'সুবিধামত এক দিন এসে আমি নিজেই চেয়ে খাব।' আজ তাঁর কাছে খাব মনে করছি।"

যাহারা আসিবে, তাহাদের এড়াইবার নিমিত্ত সত্যর এ ছলনা মায়ের কাছে গোপন রহিল না। ক্ষুব্ধ না হইয়া মা সন্তুষ্ট-চিত্তে বধূর কক্ষের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আজ কুমুদের ওখানে খাবি, বেশ ত, তাই খাস, কিন্তু রঙ্গ যে বংশীদের ওখানে গেছে, তারা হয় ত এখনই আসবে, তুই থাকবি নে?"

সত্য কহিল, "আমি থেকে কি করবো, মা? তোমরাই রয়েছ, এক ওষুধ খাওয়ানো—তা আমি খাইয়ে দিয়ে গেলাম। বেলা একটায় এক দাগ খাওয়াতে হবে। সন্ধ্যায় আর এক দাগ, তা আমি এসেই দেব।"

মা ছেলেকে বিদায় দিয়া অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি সহসা কঠিন আকার ধারণ করিল। বধূর প্রতি সহানুভূতির লেশও রহিল না। নন্দা ও বংশীর আশু আগমনের সম্ভাবনায় মা'র বহুদিনের আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষত হৃদয়ে আবার নূতন আঘাত লাগিল। সে দিনের সেই লাঞ্ছনা অপমান চোখের সমক্ষে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিয়া উঠিল।

হিমু শাশুড়ীর ও স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না। তাহার দিদি আসিবে, এই আনন্দে সে নিত্যকার তুচ্ছ ঘটনাগুলি তুচ্ছতম ভাবিয়া মনের মধ্য হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দিদি তাহাকে সাজাইয়া রাখিতে বড় ভালবাসিতেন। হিমুর মলিন বেশ তিনি দেখিতে পারিতেন না। আজ এত দিনের পর সাক্ষাৎ, দিদির অপ্রিয় বেশে হিমু কি তাঁহাকে দেখা দিতে পারে?

পায়ের দিকের দেয়ালে পেরেকের গায়ে একখানি ছোট আয়না ঝুলান ছিল। হিমু দেয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে গিয়া আয়নাখানি পাড়িয়া আনিল।

শুইয়া থাকিতে থাকিতে বরফ-জলে তাহার চুলগুলি একবারেই জটাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল শীর্ণ হস্তে সে জটা ছাড়ান হিমুর শক্তিতে কুলাইল না। সম্মুখভাগ আঁচড়াইয়া জটাবদ্ধ রুক্ষ চুলের রাশি খোঁপার আকারে জড়াইয়া রাখিল। চুলের সংস্কার করিয়া বালিসের উপর হইতে শুভ্র তোয়ালেখানি তুলিয়া লইয়া হিমু মুখ মুছিতে মুছিতে মুখখানি রাঙ্গা করিয়া ফেলিল। চুল বাঁধিবার ও মুখ মুছিবার পর তাহার দৃষ্টি পড়িল পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি। সাড়ী, সেমিজ তেমন ময়লা না হইলেও তাহার পছন্দ হইল না। দিদি যে অপরিষ্কার দেখিতে পারেন না।

আবার হিমুকে উঠিতে হইল। তক্তপোষের নীচ হইতে টিনের তোরঙ্গটা টানিয়া লইয়া একখানা ভোমরা-পাড়ের শান্তিপুরে সাড়ী ও একটি রঙ্গীন খদ্দরের জামা বাহির করিয়া শ্রান্ত হিমু অতিকষ্টে প্রসাধন শেষ করিল। কিন্তু আরসীতে মুখ দেখিয়া হিমু একবারেই খুসী হইতে পারিল না। সেই প্রস্ফুটিত প্রভাত-পদ্মের মত ঢলঢলে মুখখানি এ কি হইয়া গিয়াছে! গোলাপের পাপড়ীর ন্যায় অধরোষ্ঠ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দিদি দেখিলে কি বলিবে? কত রাগ করিবে।

দালানের পার্শ্ব দিয়া বিশু বাজার লইয়া ফিরিতেছিল। হিমু ডাকিয়া বলিল, "বিশুদা, আমায় একটা পাণ সেজে দেবে? মুখটা বড় বিশ্রী হয়ে আছে।"

বেশভূষা সারিয়া, পাণের রসে শুষ্ক অধরোষ্ঠ রাঙ্গা করিয়া হিমু পথের পানে চাহিয়া রহিল।

অনেক বেলায় রঙ্গ একাকিনী ফিরিয়া আসিল। রঙ্গকে একা দেখিবামাত্র হিমুর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল আশা-পথ পানে চাহিয়া থাকা! কোথায়

গেল প্রসাধনের পারিপাট্য! অবসাদে ও অভিমানে হিমু বিছানায় শুইয়া পড়িল, অশ্রুধারায় বালিস ভিজিয়া গেল।

রঙ্গর সাড়া পাইয়া অন্নপূর্ণা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে রঙ্গ, এত বেলা হলো কেন? তাদের দেখা পেলি?"

রঙ্গ হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া কহিতে লাগিল, "নন্দা দিদির দেখা পেয়েছি মা, বংশী দাদার পাই নি। এতক্ষণ তেনার জন্যে ব'সে ছিলাম, দেখা না পেয়ে চ'লে এলাম। কি বাড়ীতেই আমায় পাঠিয়েছিলে গো, এমন বাড়ী জন্মে দেখিনি। সোনা-রূপো যেন চারিদিকে ঝল্-মল্ করছে। ঘর-দুয়োরেরি বা কি বাহার! খাট-পালঙেরি বা কি বাহার! বাড়ীর লোক-জনদেরি বা কি পোষাক গো! টগর ব'লে একটা ঝি আছে, ঝি ত নয় যেন মা'ঠান, হাতে এই এত্তগুলো চুড়ি, মোটা মোটা তাগা, গলায় মোটা গোটহার। বুড়ো মাগী এই এতখানি কস্তা পেড়ে সাড়ী পরেছে, সাড়ীর নীচে এই হিমু দিদিরা যা পরে, এই যে সামিজ না খেলুকা কি বলে, তাই পরা। মা গো মা! দেখে আর লজ্জায় বাঁচি না।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত লজ্জায় বাঁচছিস্ না রঙ্গ, কিন্তু যাদের কাছে গেলি, তারা কি বল্লে?"

"বল্‌বে আবার কি গা! কত আদর ক'রে আমায় রাজভোগ খাওয়ালে, সে সব দ্রব্য মনিষ্যিতে কোনো দিন চোখেও দেখে নি। কি যে তার স্বোয়াদ, আর কি যে তার গন্ধ! বাড়ীর গিন্নী যেন মা দুগ্‌গা, ঠিক তখুনি সিংহীর ওপর থেকে নেমে এয়েছেন। আমায় কইলেন, 'এদের কাছে আমি তোমার সব গল্পই শুনেছি, রঙ্গ। দুঃখের কথা যে, বাঙ্গালা মুল্লুকে তোমার মত মেয়ে ঘরে ঘরে জন্মায় না।' শুনে লজ্জায় যেন খুন-খুন হলাম। গিন্নী বললে, 'তোমাদের মাকে আমার পেন্নাম দিও। আমি সুবিধামত এক দিন যেয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসব। বংশী এখন ঘরে নেই, দুপুরে ফিরবে। বিকেল নাগাদ এদের তোমাদের ওখানে পাঠিয়ে দেব।' এত বড় যে রাজরাণী, কি মিষ্টি বাক্যি মা, শরীল যেন জুড়িয়ে যায়। নন্দা দিদির বড় ভাগ্যি ছিল মা, বড় পুণ্যি ছিল, তাই অমন যায়গায় আছে।"

রঙ্গর শেষের কথায় অন্নপূর্ণার মুখ গম্ভীর হইল, ঐশ্বর্য্যের জমকে সকলেই ভোলে, ঐশ্বর্য্যহীনের অন্তরে যে মহা ঐশ্বর্য্য লুকানো থাকে, জগতের কয় জন তাহার সন্ধান জানে?

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোর হিমুদির কাছে বড়লোকদের টাকা-গয়নার গল্প কর গে রঙ্গ, ও সব শোন্‌বার এখন আমার সময় নেই। ঢের বেলা হয়ে গেছে, এখনও রান্না চড়্‌ল না।"

রঙ্গ সরিয়া গিয়া—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, বেলা হয়েছে বৈ কি, অনেক বেলা হয়েছে। আর একটা কথা তোমার শুনে যেতে হবে, যেটা আসল কথা, সেইটেই ভুলে গিয়েছিনু গো, এমনই ছাই ভোলা মন! বললে প্রত্যয় করবে না মা, আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি! অত টাকাকড়ি পেয়ে আমাদের নন্দাদিদির মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে! সত্যি বল দেখি মা, নন্দা-দিদি এমন কেন গা?"

অন্নপূর্ণা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, "তুই কি আজ আমায় রান্না করতে দিবি না, রঙ্গ? যা বলতে হয়, বল্ না বাপু, শুধু শুধু দেরী করিয়ে দিচ্ছিস কেন? কে কেমন, তা না বললে জানবো কেমন ক'রে?"

"তাই ত বলছি মা, তাড়াতাড়ি করতে গেলেই আমার মনের সব কথা গুলিয়ে যায়। সেই যে কোন্ কালে তুমি কি দুইখানা চুড়ি পরিয়ে দিয়েছিলে, তাই হাতে রয়েছে, আর সারা গায়ে দূর্ব্বোর একটা আংটীও নেই। পরণেও ফ্যাকাসে পেড়ে একখানা মোটা বস্তর, সীঁথেয় সিঁদুর নেই, কিচ্ছু নেই। একবার ভাবনু জিজ্জেস্ করি—তা অত লোকের ভেতর জিজ্জেস্ করতে লজ্জা লাগলো। লোকে ভাববে, মাগী একালের ফ্যাসান জানে না।"

"কি জানি মা, কেন সে গয়না সিঁদুর পরে না।" বলিয়া অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। অতুল বৈভব পদতলে পাইয়াও নন্দা কোন অলঙ্কার না পরিয়াও তাঁহারই দত্ত তুচ্ছ কঙ্কণ দু'খানির সম্মান রাখিয়াছে, ধনি-গৃহের বিলাস ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে তাঁহার স্নেহের দান যে হারাইয়া যায় নাই, ইহা মনে করিতেই অন্নপূর্ণার বিমুখ-চিত্ত স্নেহে করুণায় আর্দ্র হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

তুষারতীর্থ—অমরনাথ

উলারের পশ্চিম-উত্তর কোণে ১৬৯০০ ফুট উচ্চ 'হরমুখ' পর্ব্বত আটটি চূড়ায় আটটি তুষার-কিরীট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। Dr. E. F. New এবং Mr. G. W. Millais ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কেহই এই পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে উঠিতে পারেন নাই। হরমুখের দক্ষিণে বন্দীপুর সহর। বন্দীপুরের গায়ে "উলারের" জলে বহু "হাউস বোট" বাঁধা আছে। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বহু শ্বেতাঙ্গ নর-নারী এখানে বাস করেন। বন্দীপুরের পূর্ব্বে "হাফকিলেনমার্গ", "নাথ মার্গ" প্রভৃতি কয়েকটি অধিত্যকাভূমি আছে। এখানকার কয়েকটি যায়গার নাম দেখিয়া মনে হয় জোর বাতাস বহিতে আরম্ভ করে। বিরাট জলরাশি ছাড়া উলারের অন্য কোনও সৌন্দর্য্য এখন চোখে পড়িল না। উলার ছাড়িবার সময় দূরে "শিউপুর" নামে একটি গ্রাম চোখে পড়িল। বেলা হওয়ায় আমরা নৌকাতেই রান্না চড়াইলাম। বেলা ১০॥ টার সময় নৌকা 'সোপুরে' পৌছিল। নৌকা হইতে নামিয়া আমরা দুধ দই আনিবার জন্য বাজারে গেলাম। বাজারটি এ দিকের মধ্যে বেশ বড়—প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায়। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। বারামুল্লা, শ্রীনগর, ওরামার্গ যাইবার রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা এই জেলার প্রধান সহর।



উলার হ্রদের সাধারণ দৃশ্য (সোপুরের পথে)

যে, সেগুলি শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত। তাহা ছাড়া হাউস বোট, কিচেন বোট প্রভৃতি নামেও য়ুরোপীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সর্ব্বনিম্ন পাস বা গিরিবর্ত্ম "গিলগিৎ" বন্দীপুর হইতে যাওয়া যায়। উহা এখান হইতে ১৯৩॥ মাইল। যাইবার পথে বিশ্রামস্থান প্রভৃতি আছে। বন্দীপুরের গদিয়া, উলারের তীর ধরিয়া ধরিয়া আমরা চলিলাম। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উলারের জলরাশি পদ্মে ঢাকিয়া যায়, তখন "পৃথিবীর উদ্যানের" এই বিশাল জলরাশি যে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, তাহা কল্পনাতীত।

মাঝিরা তাড়া দিতে লাগিল। কারণ, বেলা হইলে এখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত সোপুর সহর পুড়িয়া যায়। এ দিকে ঘরের প্রায় সমস্ত অংশই কাঠ দিয়া তৈরী আর সে কাঠ অধিকাংশই চীর—যাহার মত সহজদাহ্য পদার্থ আর নাই। চীর হইতে তারপিণ তেল হয়, কাজেই সে কাঠ যে কত শীঘ্র জ্বলে, সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাড়ীর দেওয়ালের ফ্রেম, ছাদ, মেঝে, দরজা-জানালা, বারান্দা সবই কাঠের তৈরী। এমন কি, বড় বড় সেতুগুলি পর্য্যন্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত। বাজারে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই দোকান আছে। আমরা কাঠ, দই, দুধ এবং সারদার পথের জন্য কিছু আলু, আটা, ঘি, তেল, চিনি কিনিয়া লইলাম। সোপুর বাণিজ্যের জন্য বেশ বড় সহর;

কিন্তু ইহা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহে। কাশ্মীরের অন্যান্য সহরের মতই নোংরা।

আমি ও শঙ্করনাথজী ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বিশ্বনাথজী ও সদানন্দজী আমাদের নৌকার সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণীতে মহানন্দে স্নান করিতেছেন। পুষ্করিণীর জল পদ্মপাতায় ও পদ্মকুঁড়িতে ঢাকিয়া গিয়াছে। এই জঞ্জাল আমাদের পছন্দ না হওয়ায় আমরা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া নৌকা লইয়া নদীর অপর তীরে গেলাম ও নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীতে সাঁতরাইতে লাগিলাম। নদী-যাত্রার আরাম ছাড়িয়া আবার ভীষণ পাহাড় চড়াই করিতে হইবে বলিয়া নদীটিকে আজ যেন বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছিল। স্নান সারিয়া আমরা আবার মোটর ঠিক করিতে গেলাম। ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী "হান্দোয়ারা" (Handowara) যাইবার বাস-ভাড়া মাথা পিছু ।৵৹ দশ আনা স্থির হইল। পরে বুঝিয়াছিলাম, হান্দোয়ারা না গিয়াও টাঙ্গাতে করিয়া একবারে "ট্রেগাম" আসিলে একটা দিন বাঁচিয়া যায়। 'সোপুরে' যথেষ্ট টাঙ্গা পাওয়া যায়।



সারদার পথে লতার ঝোলা পুল

বেলা প্রায় ২টার সময় সোপুর হইতে যাত্রা করিলাম। এখানে বাসওয়ালাদের সঙ্গে একটু হাঙ্গামা হইয়াছিল—যত যাত্রী লইবার নিয়ম, তাহার অপেক্ষা বেশী যাত্রী ঠাসাঠাসি করিয়া বাসওয়ালারা চাপাইতেছিল। প্রথমে আমরা আপত্তি করি নাই, কিন্তু যখন পেষণের মাত্রা সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, তখন আমরা উহাতে আপত্তি করিলাম। বাস-ড্রাইভার আমাদের কথায় অভদ্রভাবে উত্তর দিল। ইহাতে আমরা সাত জন যাত্রী বাস হইতে নামিয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ লোকজন জমা হইল, পুলিসও আসিল। পুলিসকে বলিলাম, "তুমি যদি এমনই বে-আইনীভাবে যাত্রী লওয়া দেখিয়াও কিছু না কর, তাহা হইলে তোমার নামে রিপোর্ট করিব।" তাহার নম্বর লইলাম—সে ইহাতে ভীত হইয়া পড়িল ও বাস আটক করিল। বাসের কর্ত্তৃপক্ষ আসিলেন ও আমরা আগে সিট রিজার্ভ করিয়াছি এবং তাহা সত্ত্বেও আমাদের বসিবার অসুবিধা হইয়াছে শুনিয়া ড্রাইভারকে খুব ধমকাইলেন ও অন্য ড্রাইভার পালটাইয়া আমাদিগকে চাপিতে অনুরোধ করিলেন।

বাস ছাড়িল। সমতল রাস্তা, দুই ধারে শস্যক্ষেত্র ও মাঝে মাঝে বাগান। বহু আখরোট ও আপেলের গাছ দেখিলাম।

বিকালবেলা বাস হান্দোয়ারা পৌঁছিল। একটি জীর্ণ ধর্ম্মশালার নিকট আমাদিগকে নামাইয়া দিল। আমরা মালপত্র লইয়া ধর্ম্মশালার দুই তলায় উঠিলাম। উপরে দুইটি ঘর, উহা ধুলা এবং আবর্জ্জনায় পূর্ণ। ঘরের মেঝেতে প্রকাণ্ড ফাঁক। চালের অবস্থাও শোচনীয়। অবস্থা বুঝিয়া বরুণদেবও রহস্য আরম্ভ করিলেন—বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি মাথায় করিয়া একটি আখরোট-গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিলাম ও ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে লাগিলাম। স্বামীজীরা কাছের একটি ঝরণা হইতে জল আনিতে গেলেন। কিন্তু জলের বদলে এক পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণকে লইয়া হাজির হইলেন। পণ্ডিতজী আসিয়া সবিনয়ে জানাইলেন যে, তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, "আমাদের দলটি দেখিয়াছেন ত।" তিনি সবিনয়ে জানাইলেন যে, কাশ্মীরে "করমকা শাক ও নসিবকা ভাণ্ডার অভাব হইবে না।" এই কদর্য্য ঘরটিতে থাকিতে হইবে না ভাবিয়া সত্যই আনন্দ হইল। স্বামীজী ও আমি তাঁহার বাড়ীটি দেখিতে গেলাম। পোড়ো ধর্ম্মশালা অপেক্ষা যে বসতবাটী ভাল হইবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আসিয়া মা'দিগকে লইয়া সর্ব্বদানন্দজীকে কিছু মালপত্র সহ পণ্ডিত মুকুন্দ বাবুর বাড়ী রওনা করিয়া দিলাম। পরে আমরা একে একে নিজেরাই ঘাড়ে করিয়া মাল বহিতে আরম্ভ করিলাম; ইহা নূতন নয়, অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, কাযেই কষ্ট হইল না।

আমরা রান্না করিবার জন্য যায়গার খোঁজ করিতে পণ্ডিতজী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন যে, "আমার বাড়ীতে থাকিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইবেন, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অপমানজনক আর কিছুই নাই"। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা তাঁহার বাড়ীতে থাইতে রাজী হইলাম।

মুকুন্দ বাবুর শাশুড়ী ও শালী মায়েদের সহিত আলাপ করিতে আসিলেন, কিন্তু বায়োস্কোপের মত নির্ব্বাক্ অঙ্গভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই হইল না। তাঁহারা হিন্দী ভাষাও বুঝেন না। দুই পক্ষই নিজেদের অক্ষমতায় হাসিতে লাগিলেন। এ দিকে পুরুষমানুষরা সাধারণতঃ তিন রকম ভাষা শিখিয়া থাকে—সারদা বা কাশ্মীরী, হিন্দী ও ফার্সী এই কয় ভাষাই তাঁহাদের প্রয়োজন হয়। নিজেদের মাতৃভাষা সারদা ব্যবসা বাণিজ্যে, বাহিরের লোকের সঙ্গে হিন্দী ও রাজভাষা বা আদালতপত্রের ব্যাপারে ফার্সীর ব্যবহার হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকরা কেবল সারদাই শিখিয়া থাকেন। সারদা ভাষা সংস্কৃতেরই অনুরূপ।

কাশ্মীরের গ্রাম্য নারীর সৌন্দর্য্য ভালভাবে দেখিবার সুযোগ

এখানে পাইলাম। ময়লা ঢিলেঢালা পোষাকের মধ্যেও তাহাদের প্রতিমার মত ছাঁচে গড়া মুখশ্রী অনির্ব্বচনীয়। আয়ত চোখ, সরল সুন্দর নাক, পাতলা টকটকে ঠোঁট, বাদামী মুখমণ্ডল, সর্ব্বোপরি দুধে-আলতায় গোলা রং দেখিয়া চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুকুন্দ বাবুর একটি শ্যালীকে (বয়স আন্দাজ ৭।৮ বৎসর) দেখাইয়া মা বলিলেন, "এসি মাফিক একঠো লাড়কি মিল্‌তা ত হামারা দেশমে লে যাতা।" মুকুন্দজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কোন্ দেগা ?"

মুকুন্দ বাবুর পারিবারিক জীবন কিছু রহস্যপূর্ণ। আশ্রয়-দাতার পারিবারিক রহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়, কাযেই সে কথা থাক। তিনি শ্বশুরবাড়ীতে থাকেন



হান্দোয়ারার ব্রাহ্মণ-পরিবার

এবং একটি নবমবর্ষীয়ার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ। তাঁহার আরও তিনটি শ্যালী আছেন, এক জন স্ত্রীর ছোট, অপর দুই জন বড়। ইহারা সকলেই আমাদের সম্মুখ দিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া আমাদের অদ্ভুত কথাবার্ত্তা শুনিয়া হাসিতেছিল। যদিও এ দিকে মেয়েরা পর্দ্দাহীন, তথাপি কাহারও মধ্যে নির্ল্লজ্জতা লক্ষ্য করি নাই, সকলের মধ্যেই একটা নারীসুলভ লজ্জা আছে। পণ্ডিতজীর স্ত্রী মাত্র একবার ছাড়া আর আমাদের সম্মুখে আসেন নাই। পণ্ডিতজীর বাড়ীর কাছেই একটি প্রকাণ্ড তুঁতগাছ ছিল। ৪টি পয়সা দিয়া কিছু তুঁত পাড়াইয়া আমরা মহানন্দে ভোজন করিলাম। বিকালবেলা বাজার দেখিতে গেলাম। এটিও এ দিকের পথে একটি বড় সহর। জেলখানা, পোষ্ট আফিস, কোর্ট ইত্যাদি আছে। বাজারটি খুব বড় নহে। আখরোট খুব সস্তা, আমরা কিছু আখরোট কিনিয়া রাখিয়া এখানকার শাসনকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিলাম। তাঁহার বাসায় গিয়া শুনিলাম, তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন। তখন তাঁহার নিম্নস্থ নায়েবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও বাড়ীতে ছিলেন না। সন্ধ্যা হইয়া আসায় আমরা পণ্ডিতজীর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিদেশী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামের অনেকেই ক্রমশঃ জমা হইতে লাগিলেন। নানা কথা আলোচনা হইতে লাগিল। এ দেশের প্রথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে এখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। ২।২। বৎসর হইতে সর্দ্দা আইন কাশ্মীরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ দিকে বিবাহিতা স্ত্রীলোকরা মাথার সম্মুখে কপালের উপরে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া সাদা রংএর সেলুলইডএর এক রকম গহনা পরে, মাথার উপর দিয়া দুইটি ফিতা কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। তাহাতে অবস্থানুসারে সোনা-রূপার নানা প্রকার গহনা থাকে। কুমারীরা ইহা ব্যবহার করে না। বিধবারা অবশ্য ইহা পরে, কিন্তু রংদার বা বাহারে নহে। এখানকার মেয়েদের চুল বাঁধাও দেখিবার। সামান্য সামান্য চুল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনুনী করিয়া সেগুলি লইয়া একটি বিনুনী করে, তাহা পিঠের উপর ঝোলে। কাশ্মীরী মেয়েদিগকে যদি বাঙ্গালার নারীর বেশবিন্যাসে সাজাইয়া সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরে ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক নাই,—ভাসুরকে ভাদ্রবউরা দাদার মত দেখে এবং সেবা-যত্ন করে। বাস্তবিক ভাসুর ও মামাশ্বশুরের দল বাঙ্গালায় যে কি মহাপাপ করিয়াছে, তাহা জানি না। কাশ্মীরীরা ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে আমাদের অপেক্ষা ঢের বেশী গর্ব্বিত। কিন্তু তবু ভাসুরকে দেখা বা স্পর্শ করায় তাহাদের নরক-দর্শনের ভয় থাকে না। আর একটি অদ্ভুত প্রথা এখানে প্রচলিত আছে। মুসলমান যদি ব্রাহ্মণের ভাত লইয়া যায়, ব্রাহ্মণরা তাহা আহার করে, ধর্ম্ম বা সমাজে বাধে না। বাড়ী হইতে থালায় বা গামলায় ভাত ঠিক করিয়া দিয়া কাপড়ে তাহা বাঁধিয়া দিবে, মুসলমান চাকরে লইয়া যাইবে, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু যদি মুসলমানে ঐ কাপড় খোলে, তবে তাহা অস্পৃশ্য হইয়া যাইবে। অবস্থাপন্ন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা মুসলমান চাকরের আনা জল খায়। হিন্দু চাকর পাওয়া যায় না বলিয়াই এ ব্যবস্থা। কাশ্মীরীদিগের বাহিরের আচার দেখিয়া (ব্যবহার দেখিয়া নহে) কদাচারী মনে হয়, কিন্তু তাহাদের রাঁধিবার সময়কার আচার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যেখানে রাঁধিবে, তাহার চারি পাশে (ঘরের ভিতরও) একটি গণ্ডী দিয়া দেয়, পরে কাপড় ছাড়িয়া কেবল লেংটীটি পরিয়া (শীতকালেও) সেই গণ্ডী বা 'চৌকার' মাঝে ঢুকিবে, তাহার মাঝে বাড়ীর অন্য কেহই (যাহারা স্নানাদি করে নাই) ঢুকিতে পাইবে না।

সন্ধ্যার কিছু পরে এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল, "নায়েব-সাব আপলোককো দর্শন মাংতা।" জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তিনি ফিরিয়াছেন ?" সে বলিল, "হাঁ, ফিরিয়াই আপনাদের সংবাদ পাইয়া আপনাদের দর্শন চাহিতেছেন।"

একটি বাড়ীর দোতলায় তিনি বসিয়াছিলেন, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। তিনি ছাড়া আরও ৩।৪ জন পণ্ডিত বসিয়া ছিলেন। আমরা চারি জন (তিন জন স্বামীজী ও আমি) ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাঁহারা সসম্ভ্রমে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, নমস্কার করিয়া কহিলেন, "নমো নারায়ণায়", আমরাও প্রতিনমস্কারে "নমো নারায়ণায়" কহিলাম। আমাদের দেশে এ কথাটি কেবল সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ-বালক পর্য্যন্ত নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে "নমো নারায়ণায়" (আমাদের চৌকীদারের মত) উপর একটি আদেশপত্র চাই— যাহাতে সে আমাদের প্রয়োজনমত কুলী সংগ্রহ করিয়া দেয়। তিনি বলিলেন, "এ অতি সামান্য ব্যাপার, তত্রাচ এ হুকুমনামা কাল সকালে তহশীলদার সাহেবেরই কাছ হইতে দেওয়াইব।" ইহার পর তাঁহারা সকলে নীচে কিরূপ "স্বরাজ" আন্দোলন চলিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা কাঁথি, মহিষবাথান প্রভৃতি যায়গার নুণ তৈয়ারীর কথা, সত্যাগ্রহীদের অসীম সহিষ্ণুতার কথা, নারী সত্যাগ্রহী ও গ্রামবাসীদের উপর অনাচারের কথা বলিলাম, শুনিয়া তাঁহারা সকলে কাণে আঙ্গুল দিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিতে লাগিলেন। সত্যাগ্রহীদের



সিংটম নদী ও তদুপরিস্থ সেতু

বলে। বসিবার পর নায়েব সাহেব "চা ভোজন" করিব কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা সম্মতি জানাইতে তিনি চা আনিতে হুকুম করিলেন।

চা আসিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইখান করিয়া দেশী রুটী আসিল। এক জন লোক একটি খালি বালতি ও এক গাড়ু জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকে গিয়া সেই বালতিতে হাত ধুইয়া আসিলাম। পরে রুটী ও চা খাইতে লাগিলাম। নায়েব সাহেব আমাদের নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সহিত কেন দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম যে, ট্রেগ্রামের নম্বরদারের সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়া তাঁহারা সোৎসাহে বলিলেন,— "স্বরাজ জরুর হোগা।" অতঃপর সকলে মহাত্মা, জহরলাল, মতিলাল, প্যাটেল সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নীচুকো আন্দোলনমে আপকো সহানুভূতি হ্যায় ?" তাঁহারা সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "জরুর! বাকী হাম বাহারমে প্রকাশ করনে নেহি শেক্তা।" নায়েব অন্য কথা পাড়িলেন। স্বামীজীদের সহিত আত্মার সংস্কার প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা চলিল। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমরা উঠিলাম।

মুকুন্দ বাবুজী আসিয়া জানাইলেন, "ভোজন পাইয়ে",

আমরা প্রস্তুত ছিলাম। একটি মই দিয়া তিন তলায় উঠিলাম। একটি লুই পাতিয়া দিয়া সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে হাত বুলাইয়া যায়গা করা আছে। আমরা বসিলাম, একটি কাণা-উঁচু থালা ও এক ঘটী জল লইয়া পণ্ডিতজীর এক শ্যালক আমাদের সকলের সম্মুখে থালা ধরিতে লাগিল ও হাতে জল দিতে লাগিল। হাত ধোয়ার পর কেবলমাত্র কৌপীন পরিয়া মুকুন্দ বাবু ভাতের থালা লইয়া আসিলেন।

গরীব হইলেও বাঙ্গালী নিমন্ত্রিতকে নিজের দৈনিক আহার্য্যের অপেক্ষা ভালভাবে খাওয়াইবারই চেষ্টা করে এবং বাঙ্গালী নাই। এই সরল অকপট ব্যবহার বড় মধুর লাগিয়াছিল। অতিথির জন্ত এ দেশবাসীকে বেশী কিছু করিতে হয় না বলিয়াই অতিথি-আতঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। ক্ষেতের চাউল আর বাড়ীর পাশেই সযত্নরক্ষিত করমকা শাকের ঝোল (আমাদের ডালের কায করে) আর তারই পাতা তরকারী—দরিদ্র দেশবাসীর উপযুক্ত খাদ্য !

ইহার পাশেই শ্রীনগরের হাউস বোটে যখন অজস্র অর্থের অপব্যয়ে বাইজীর নাচ চলে, কাশ্মীর-সুন্দরীর রূপভোগ চলে, আহার-বিহারে অসংযম ও ব্যয়ের তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে,



কৃষ্ণগঙ্গা বা কিষণ-গঙ্গা

অতিথিও ভাল আহার্য্য প্রত্যাশা করে, ফলে অতিথিসংকার ক্রমশঃই বাঙ্গালার সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে একটি সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমে ও কাশ্মীরে এই জিনিষটি নাই। সেখানে গৃহস্থ যাহা খায়, প্রায়ই তাহাই অতিথিকে দেয়, অতিথিও অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করে না। তাই সেখানে গৃহস্থ ও অতিথির মধ্যে প্রাণের সম্পর্ক আজও আছে, বাঙ্গালার মত আজ প্রাণহীন ভদ্রতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। আমাদের অতিথিপরায়ণ আশ্রয়দাতা ভাত 'করমশাককা রসা' অর্থাৎ ঝোল দিয়া গেলেন, পরে করমশাক সিদ্ধগুলি তরকারীরূপে দিয়া গেলেন। ব্যস্, আর কোনও উদ্যোগ আয়োজন আড়ম্বর তখন সত্যই মনে হয়, ধনী ধ্বংস হউক, লুপ্ত হউক, অথবা জলে ডুবিয়া যাক্, তাহাদের ঐশ্বর্য্য—যা' দরিদ্রের রক্তমাংস নিংড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে অথচ প্রতিদানে তাহাদিগকেই নির্ম্মম নির্লজ্জ বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিয়া ক্ষুধাতুর বুভুক্ষুর চোখের উপর বিলাস-ব্যসনে জলস্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে।

পরদিন বিকালবেলা এখান হইতে বাসে ১৬ মাইল দূর ট্রেগ্রাম যাত্রা করিলাম। আমরা যে বাসে উঠিলাম, তাহাতে আমরা ছাড়া আর সকলেই শ্রীনগরের ব্রতী দল (scouts)। এখানে স্কাউট আন্দোলন ক্রমশঃ আরম্ভ হইয়াছে। এই দলটি কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।





সাধন

১

কান্ত-বর্ষণ শ্রাবণ-গোধূলি। শ্রাবণ-ধারা পক্ষাধিক অশ্রান্ত কলচ্ছন্দে বাজিয়া সে দিন কেবল লয়ে থামিয়াছে। অস্ত-রাগের মাধুরীতে পশ্চিম আকাশ দীপ্ত ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। নীতীশ তখন পাঠ-কক্ষে বসিয়া একান্তমনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিল। পত্নী এষা আসিয়া বলিল, "এস দেখবে, কেমন রং-বাহার হয়েছে।"

অপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া নীতীশ পুস্তক হইতে মুখ তুলিল। এষা মনে করিল, অনন্যমনা স্বামী তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই। তাই পুনরায় বলিল, "পড়া রাখো, চল, বারান্দায় ব'সে আকাশের শোভা দেখবে, তুমি যে সে দিন কবিতা লিখেছ 'বাদল মেঘের নৌকা বেয়ে কে এল আজ অপ্সরী', আজ আমার বার বার সেই কথাটি মনে পড়ছে।"

নীতীশ তাহার স্বভাব-চটুল ভাষায় উত্তর দিল না—অন্য সময় হইলে হয় ত বলিত, 'হে কটাক্ষময়ি, সে অপ্সরী ত তুমিই, অজানা অমৃত-সাগর পাড়ি দিয়ে তুমিই আমার জীবনের বালুতীরে এসে থেমেছ।"

নীতীশ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "ও সব আর ভাল লাগে না, এষা!"

স্বরের ও ভাবের অস্বাভাবিকতা এষাকে চমকিত করিল। যে স্বামী এত দিন ভাব ও রসের উচ্ছ্বাসে দিন-রাত্রিকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মুখে এ কি কথা? এষা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

স্বামী ও স্ত্রী দুই জনে কর্ম্মস্থলে থাকে। কয়েক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। নীতীশ এত দিন সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া অবসরসময় কাটাইত; কিন্তু হঠাৎ কয়েক দিন সে ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। নীতীশের মনে গ্রহের দশার মত ভাবের নানা স্রোত বহে। যখনই যে স্রোত আসে, তাহাতেই সে আত্মহারা হইয়া উঠে। বিবাহের পর দিনকতক সে পত্নীকে লইয়া এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, লোকের নিন্দা ও গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়াও প্রণয়-চর্চ্চা করিত। উচ্ছল প্রেম-বন্যা থামিলে সে সাহিত্য লইয়া পড়িয়াছিল। এখন সাহিত্য ছাড়িয়া দর্শন ও ধর্ম্মের চর্চ্চায় সে তৎপর।

এষা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তোমার অসুখ করে নি ত?"

নীতীশ মুখে খানিক হাসি আনিয়া বলিল, "না, এষা, তুমি যাকে অসুখ বল, সে অসুখ হয় নি, তবে অন্য অসুখ হয়েছে।"

স্বামীর হেঁয়ালি এষার ভাল লাগিতেছিল না। সে কাঁদ-কাঁদ মুখ করিয়া বলিল, "যাও, অমন যদি চালাকি কর, তা হ'লে আমি রাগ করব বলছি।"

"রাগ করবে কেন, এষা? তুমি কি কখনও ভগবান্ সম্বন্ধে ভেবেছ?"

এষা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা কখনও ভাবি নি বোধ হয়।"

নীতীশ ধীরে ধীরে বলিল, "ঐ চেয়ারটায় ব'স, বলছি। ভগবানের জন্য মানুষের মনে পিপাসা আসে, তখন মনে হয়, তাঁকে না পেলে আর কিছুতেই শান্তি নেই। তখন কিছুই ভাল লাগে না। আমার মনের এখন সেই অবস্থা।"

এষা চেয়ারে বসিয়া একান্ত বিস্ময়ে স্বামীর মুখে এই একান্ত অপরিচিত কথা শুনিতে লাগিল। ভগবৎ-পিপাসা এ যুগে একান্ত বিরল। ভাবপ্রবণ স্বামীর এই ভাবোন্মত্ততা তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। এষা নীতীশের মনকে ফিরাইবার জন্য বলিল, "তা ভগবান্‌কে না হয় চাই নে; কিন্তু স্বভাবের এই সৌন্দর্য্যের মাঝেই ত তিনি আছেন, তোমাদের কবিই ত বলেছেন,—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি নয়, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও গানকে অবজ্ঞা ক'রে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না।"

নীতীশ একটু ফাঁপরে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের বাণীই এত দিন সে যুগমন্ত্র মনে করিয়া যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রচার করিয়া বেড়াইত। এষা তাহার কথারই পুনরুক্তি করিতেছিল।

নীতীশ উত্তর দিল, "এ কথা সত্য যে, এত দিন আমি ঐ কথাটাই মেনেছি। কিন্তু এখন আর মন এতে সাড়া দিচ্ছে না। যিনি প্রাণারাম, তাঁর সঙ্গে যাতে প্রাণের ও মনের সংযোগ হয়, তার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।"

এষা চিত্রার্পিত মানুষের মত নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল, স্বামীর মুখে এক অভূতপূর্ব্ব দীপ্তি খেলিয়া যাইতেছে। এষা বিনম্রচিত্তে স্বামীর এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের কোথাও সে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল যে, তাহার একান্ত প্রিয়তম স্বামী তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। তাই বিরক্তির স্বরে কহিল, "ভগবান্‌কে চাও, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যে মাধুর্য্য রচনা করেছেন, তাকে উপেক্ষা করবে কেন?"

"উপেক্ষা ঠিক নয়। তবে জান কি, এষা? অখিল-রসামৃতসিন্ধু যিনি, তাঁকে না পেলে কোন রসই পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে না। তাঁকে পাওয়ার জন্য মনকে তৈরী করতে হবে। যিনি প্রেমময়, তাঁকে দেখবার দৃষ্টির জন্য মনকে বিষয়-বিমুখ ক'রে ভগবন্মুখ করতে হবে। এর জন্য চাই যোগ—চাই তপশ্চর্য্যা।"

এষা চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। নীতীশ বলিয়া চলিল, "ফাঁকি দিয়ে ত তাঁকে মিলবে না। তাঁকে পাবার জন্য সাধনা চাই। সাধনা না হ'লে হয় না, আমি তাই ভাবছি—"

কথা কাড়িয়া লইয়া এষা বলিল, "কি, যোগাভ্যাস করবে? বেশ যোগী মহারাজ! তা হ'লে পরের মেয়েকে ঘাড়ে করা হয়েছিল কেন?"

আপন কথার রূঢ়তায় এষা আপনিই অবাক্ হইয়া গেল। শান্ত, নম্র, মধুরভাষিণী পত্নীর এই কঠোরবাক্যে নীতিশ বিচলিত হইয়া পড়িল। আঘাত সামলাইয়া লইয়া সে ধীরস্বরে বলিল, "রাগ করো না, এষা! কি করবে বল। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলছে জান? স্ত্রীজিত ব্যক্তির বিদ্যা, তপস্যা সকলই বৃথা।"

এষা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দুঃখে, অভিমানে ও ক্রোধে সে বলিয়া উঠিল, "আমিই তোমার পথের জঞ্জাল। বেশ, তা হ'লে তুমি তোমার পথে চল, আমি আমার পথে চলি।" এই বলিয়া সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

নীতীশ নিশ্চল হইয়া আপন কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল।

২

এষা তাহার কথা রাখিল।

রাত্রিবেলা নীতীশ দেখিল, তাহার জন্য পৃথক্ শয্যা হইয়াছে। মাঝে বসিবার ঘর; দুই পাশে দুইটি শয়নকক্ষ। এই ব্যবধানকে নীতীশ ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিল। ব্রহ্মচর্য্য, সংযম চাই; তাহা না হইলে মুক্তির আশা নাই। সে হঠযোগ-প্রদীপিকা, ঘেরণ্ড-সংহিতা কিনিয়া প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিল।

নীতীশ মাছ-মাংস ছাড়িয়া দিল। বৃথা জল্পনা ত্যাগ করিয়া অবসরকালে যোগচর্চ্চায় মন দিল। কয়েক দিন পরে সে এষাকে বলিল, "দেখ এষা, তোমার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, তুমি না হয় দিন কতক বাপের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এস।"

শুনিয়া এষার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। বিবাহের পর হইতে এক মাসের জন্য সে বাপের বাড়ী যাওয়া ছাড়া মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া থাকে নাই। প্রীতিমান স্বামীর মুখে এই কথা তাহার বুকে শেলের মত বাজিল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে বলিল, "তা হচ্ছে না, আমি আমার ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।"

রাত্রিকালে শয্যায় শুইয়া এষা কাঁদে, চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অতীত স্মৃতির স্বপ্নজাল বোনে। কপোত-কপোতীর মত তাহাদের একান্ত বিহ্বল প্রেমের মাঝে এ কি অভিশপ্ত ব্যবধান! সে মনে মনে বিশ্ববিধাতাকে গালাগালি দেয়। ভাবিতে চেষ্টা করে, ভগবান্ যদিই বা থাকেন, তাঁহার জন্য প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইবে কেন? বিধাতা কি এতই পরশ্রীকাতর যে, তিনি তাঁহার ভক্তকে আর কাহাকেও ভালবাসিতে বলিবেন না? যদি তাই তাঁহার ইচ্ছা, তবে কেন অচেনা দুইটি প্রাণকে এমন করিয়া মিলিত করেন? ভাবনার কূল-কিনারা নাই—সংশয়ের তরঙ্গ-দোলায় দুলিতে দুলিতে ক্লান্ত হইয়া এষা ঘুমাইয়া পড়ে।

নীতীশ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে পড়িল, দেবতা এবং মহাপুরুষরা নিশীথের শেষ যামে দেখা দেন। তাই সন্ধ্যাকালেই শুইয়া পড়িয়া রাত্রি দুইটায় উঠিয়া বসিয়া সে প্রাণায়াম করে।

সে দিন দুইটায় উঠিয়া নীতীশের মনে হইল, এষার ঘর হইতে চাপা কান্নার সুর আসিতেছে। নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সে এষার ঘরে আসিল। এষা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বোধ হয় কাঁদিয়াছিল, বাতায়নের ফাঁকে চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। নীতীশ দেখিল, এষার সুগৌর গণ্ডে জল-রেখা চক্‌চক্ করিতেছে। নীতীশের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পত্নীর বিশৃঙ্খল চুলগুলিকে সমান করিয়া রাখিল, স্থান-চ্যুত কাঁথাটিকে গায়ে জড়াইয়া দিল। ফিরিবার সময় হঠাৎ ভাবাবেগে সে অধীর হইয়া পড়িল; পত্নীর গোলাপী অধর তাহাকে আকৃষ্ট করিল; নিদ্রিতা পত্নীকে আদর করিবার প্রলোভন সে সংবরণ করিতে পারিল না।

পরমুহূর্ত্তেই নীতীশের মনে হইল, অন্যায় হইয়াছে। লালসা এবং মোহ জয় না করিতে পারিলে কোন আশাই নাই। ইন্দ্রিয়ের যে আকুল আহ্বান, সেই ত মানুষকে অমঙ্গল এবং অকল্যাণের পথে লইয়া যায়, তাহাকে জয় করিয়াই মানুষ সফল-কাম হইবে। ধ্যান করিতে বসিয়া সে একান্তমনে ভগবচ্চরণে কৃপার প্রার্থনা করিল!

ব্যাপারটি ক্রমে পাড়ায় জানাজানি হইল। সে দিন এষার সখী বেড়াইতে আসিল। সুরমা নব্যা মহিলা। তাহার স্বামী নিজেকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করে। সুরমাও স্বামী অক্ষয় বাবুর মতে চলে। সুরমা আসিয়া সব শুনিয়া বলিল, "তুই নেহাৎ আনাড়ী! মেনকা রম্ভা যদি মুনি-ঋষিদের যোগ ভাঙ্গতে পারে, তুই আর নীতীশ বাবুর পাগলামীটা দূর করতে পারবি নে?"

এষা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "পারি কৈ দিদি! কি যে মনে হয়, তা আর বলব কারে?"

"বোকা মেয়ে কোথাকার, স্বামীকে জয় করবার মন্ত্র শিখতে হয়। পুরুষের দর্প ভাঙ্গতে ভগবান্ আমাদের যে সব অস্ত্র দিয়েছেন, তা প্রয়োগ করতে হয়।"

এষা শূন্যদৃষ্টিতে সখীর পানে চাহিয়া রহিল। সুরমা সখীর সরলতা এবং বিহ্বলতা দেখিয়া বুঝিল, তাহাকে দিয়া হইবে না। এষা এত দিন স্বামীর অজস্র প্রেমে অভিভূত ছিল, মনোজয়ের ছলা-কলা সে শেখে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই। এত দিন সহজে যে প্রেমের বন্যা পাইয়াছে, আজ তাহার উৎস শুকাইতে দেখিয়া হাহাকার করা ছাড়া সে গত্যন্তর দেখিতে পায় না।

সুরমা এষাকে কাণে কাণে কি বলিল। এষা বলিল, "না দিদি, ও সব আমি পারব না, নিজেকে ছোট ক'রে আমি কিছু পেতে চাই নে, তার চেয়ে বরং চির-কাঙ্গালিনী হয়ে থাকব।"

সুরমা বলিল, "তা হ'লে তোর ভাগ্যে তাই হবে দেখছি।"

যাইবার সময় সুরমা এষাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভয় নেই, আমি ওঁকে পাঠিয়ে দেবো'খন। ওঁর শাণিত যুক্তিতে এ সব পাগলামী থাকবে না। ভাবুকতাকে এই জন্যে ভাই দু'চোখে দেখতে পারি নে। এরা যখন যেটা নিয়ে পড়বে, তাতেই গা ঢেলে দেবে।"

সুরমার আশ্বাসে এষা অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল।

৩

অক্ষয়কে নীতীশ সমীহ করিত। অক্ষয়ের পড়াশুনা যথেষ্ট, তার উপর ক্ষুরধার বুদ্ধি; কাযেই তাহার প্রভাবকে এড়ান কষ্টকর। অক্ষয় সে দিন বৈকালে আসিয়া নীতীশকে পাকড়াও করিল।

একখানি কৌচে বসিয়া সে আদেশ করিয়া পাঠাইল, "বৌমা, গরম গরম ফুলকো লুচি আর চা পাঠিয়ে দাও, তা না হ'লে গল্প জমবে না।"

সদাপ্রসন্ন অক্ষয় হাস্য ও কৌতুকে সকলকে মাতাইয়া রাখে। সে যেখানে যায়, সেখানে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য আনন্দের লহর বহিয়া যায়। নীতীশ বলিল, "আমরা ত আর চা খাই না।"

"তার মানে? গোল্লায় যেতে চাও বুঝি। চা ত আর ফুরিয়ে যায় না, তোমার আবার অব্যাপারে হাত কেন, ভাই? তার পর এ সব কি পাগলামী হচ্ছে শুনি?"

নীতীশ উত্তর দিল, "পাগলামী কি ভাই? তবে কিছু ধর্ম্মপিপাসা হয়েছে, তার জন্য একটু সাধন-ভজন আরম্ভ করেছি।"

অক্ষয় টেবল চাপড়াইয়া বলিল, "সাধন-ভজন মধ্যযুগের কুসংস্কার, ওর ভিতর কিছুই নেই, ভাই। ও সব বুজরুকী। এ মাকাল-ফলে তোর মতি হ'ল কিরূপে?"

নীতীশ কহিল, "যদি ভগবান্ থাকেন, তা হ'লে তাঁর জন্য যে কোন সাধনই ভাল, যে কোন ত্যাগই বড় ত্যাগ। আর তিনি যদি না থাকেন, তা হ'লে ক্ষণিকের খেলা-ঘরে যা খুসি করি, তাতে ক্ষতি নেই।"

অক্ষয় এবার জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "ভগবান্ আছেন, তাই বা কে মানছে। ভগবান্ ত মানুষের দুর্ব্বলতার মিথ্যা আশ্রয়। যুগবাণী হচ্ছে মনুষ্যের বাণী, মানুষের জয়গান। ভগবান্ একটা মন-গড়া কল্পনা, আসলে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই।"

নীতীশ অবাক্ হইয়া বলিল, "বল কি, ভাই?"

"যা সত্য, তাই বলছি, মানুষের জ্ঞান যখন বাড়ে নি, তখন মানুষ একটা কল্পিত আশ্রয় খুঁজেছে, যুগে যুগে দেশে দেশে সেই মিথ্যা আশ্রয়ের পিছনে মিথ্যা ধর্ম্মমত গ'ড়ে উঠেছে। মানুষের বড় ধর্ম্ম, দেবতা আর নেই। এখন পৌরাণিক দেবতাও যেমন মিছে, ভগবান্ও তেমনই মিছে।"

অক্ষয়ের বলিবার ভঙ্গীটি অসাধারণ। সে যাহা বলে, তাহা তাহার মনের সরল অভিব্যক্তি, তাই তাহার জোর শ্রোতার হৃদয়কে অবনমিত করে।

নীতীশ স্তম্ভিত হইয়া শুনিল। নাস্তিকতার হাওয়ায় তাহার মনও অবিশ্বাসে দুলিয়া উঠিতেছিল। সে ব্যাকুল অধীরতায় প্রশ্ন করিল, "এই যে চমৎকার সৃষ্টি, যা দেখে মানুষের কবি, ঋষি ও যোগী ভক্তি-গদগদ হয়ে ভগবানের রাতুল চরণে অর্ঘ্য দিয়েছে, তা কি সবই ফাঁকি?"

অক্ষয় অদম্য বিশ্বাসে বলিল, "ফাঁকি বৈ কি, ভাই! তার একটা সহজ প্রমাণ—ভগবান্কে দেশে দেশে মানুষ দেখেছে বলছে, কিন্তু যা সত্য, যা বর্ত্তমান, তা সব মানুষের কাছেই একই রূপে প্রতিভাত হবে, কৈ, তা কোথাও হয় নি। সকল মুনিরও এক মত নয়। অবতার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের বাণীও এক নয়। ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধই বা কেন, এত মতান্তর কেন, এত সাম্প্রদায়িকতা কেন?"

নীতীশ কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। ব্যাপারকে এ দিক্ দিয়া সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। সংশয় ও দ্বিধায় তাহার সমস্ত মন আর্ত্ত হইয়া উঠিল, তথাপি আস্তিক্য-বুদ্ধির অবলম্বন করিতে যুক্তি খাড়া করিল। নীতীশ উত্তর দিল, "জান কি, ভাই, বিধাতার অনন্ত রূপ, যে যে দিক্ দিয়ে দেখেছেন, সেই দিক্ দিয়ে তা সত্য। অনন্ত এমন যে, তাতে সব রূপ, সব কল্পনা, সব যুক্তিরই সমন্বয় হয়।"

অক্ষয় হাসিয়া বলিল, "আইডিয়া আর যুক্তি এক নয়, ভাই। অনন্ত সম্বন্ধে একটা আইডিয়া করা যেতে পারে—যার মধ্যে বিরোধের সামঞ্জস্য হ'তে পারে, কিন্তু আইডিয়া আর সত্য এক নয়। ধর্ম্মপ্রচারকরা চিরকাল বলেছেন, তাঁরা বিশেষ বাণী পেয়েছেন। সে বাণী যদি ভাগবত বাণী হ'ত, তা হ'লে তার ভিতর বিরোধ ও পার্থক্যের স্থান থাকে কেমন ক'রে? ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য সবাই বলেছেন যে, তাঁরা জগৎ উদ্ধার করতে এসেছেন, কিন্তু কেউ ত জগৎ উদ্ধার করতে পারলেন না। জগতের পাপ-তাপ যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেছে। 'The kingdom of God' ধরায় কখনও হয় নি, ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন হয় নি।"

এমন সময় এষা চা ও লুচি লইয়া আসিল। একটা টিপয়ে স্বহস্তনির্ম্মিত আসন বিছাইয়া তাহার পর শ্বেত পাথরের রেকাবে করিয়া এষা জলখাবার গুছাইয়া দিল। অক্ষয় বলিল, "এ যে দেখছি, আমার একার?"

এষা লজ্জামধুর কণ্ঠে বলিল, "উনি ত এখন কিছু খাবেন না।"

"না খেলেন বয়ে যাবে। বৌমা, তুমি এখানে ব'স।

বৈরাগী ঠাকুরের সমস্ত কুবিশ্বাস যুক্তির ঘায়ে কাহিল ক'রে দিয়েছি।"

লুচি-সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অক্ষয় বলিল, "তার পর বড় যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করছ, বৌমার প্রতি কি কোনই কর্ত্তব্য নেই? লক্ষ্মীর মনস্তাপে তোমার সাধনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে না?"

নীতীশ কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। পত্নীর সম্মুখে এই সব অপ্রিয় আলোচনা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। শুধু অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে উত্তর করিল, "কর্ত্তব্য নেই, এ কথা বলি নে, কিন্তু তাঁর ডাক পেলে আর কোন বাঁধনই বাঁধন নয়। বুদ্ধ গোপাকে ছেড়েছিলেন, চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়েছিলেন। তিনি যখন ডাক দেন, তখন সংসারের কোন ত্যাগই বড় নয়।"

এষা লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। পতির একান্ত মধুর প্রেম যে এমনই একটা ফাঁকি, তাহা সে কখনই অনুভব করিতে পারে নাই। অক্ষয় এষার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত হইয়া বলিল, "বৌমা, ঐ পাষণ্ডের কথা শুনে তুমি দুঃখিত হয়ো না। আমাদের দেশ যে অধঃপাতে গিয়েছে, তার একটা কারণ নারীর প্রতি অপমান। যে দেশে লোক নারীর পূজা করে, তারাই সমৃদ্ধ। আমাদের ইহকালও নেই, পরকালও নেই, তার কারণ—আমরা কেবল মিথ্যার পিছনে ছুটেছি।"

পরে নীতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি যে শাস্ত্র মান, তাতে পত্নী সহধর্ম্মিণী, তাকে ক্লেশ দিলে তোমার ভাল হবে না বলছি, নীতীশ।"

এষা এবার লজ্জিত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া বলিল, "যাই, আপনার জন্য পাণ নিয়ে আসি।"

এষা চলিয়া গেলে অক্ষয় বলিল, "নীতীশ, লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি, হাস্য-মধুর এই সুন্দর মুখে বিষাদ ও কাতরতার ছায়া পড়েছে? সংসারের এই নিশ্চিত আনন্দকে নিষ্প্রভ ক'রে অনিশ্চিতের পিছনে ছোটা বুদ্ধিমানের কায নয়।"

অক্ষয়ের ব্যঙ্গ নীতীশের অন্তর স্পর্শ করিল। এষাকে সে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিল। এমন ভালবাসা হয় ত কোন পুরুষ কোন নারীকে দেয় নাই। অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটের মত চোখের সম্মুখে ভাসিয়া গেল।

শুভদৃষ্টির শুভলগ্নে যে লাবণ্য-পেলব মাধুরী দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ধরণীর সমস্ত সুষমা সেই মুখের কাছে হার মানে, এষার সেই অপূর্ব্ব কমনীয়তা আজ আর নাই।

যে প্রিয়ার ক্ষণিক বিচ্ছেদ তাহার সহিত না, চোখের আড়াল হইলে ধরাকে শূন্য মনে হইত, তাহার সঙ্গ আজ আর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না।

এষার পিসতুতো বোনের বিবাহের সময় এষাকে লইতে চাহিয়াছিল। নীতীশ বিরহ-ব্যথা সহিবার ভয়ে এষাকে কিছুতেই পাঠায় নাই; লোকগঞ্জনাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছিল।

সেই এষার দুঃখ আজ অপরে নীতীশকে বলিতেছে! নীতীশ বিচলিত হইয়া উঠিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সদ্য সমাগত এই ভগবৎ-পিপাসা কি তাহার পাগলামী?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নীতীশ নিশ্চল মূর্ত্তিতে বসিয়া এই সব কথা তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিল।

এষা পাণ লইয়া আসিল। পাণ তুলিয়া লইয়া অক্ষয় বলিল, "আজ আসি ভাই, কিন্তু মনে রেখো, সতীর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয় না।"

অক্ষয় চলিয়া গেলে, নীতীশ ও এষা 'ড্রয়িংরুমে' বসিয়া রহিল। ফুলদানী হইতে একটি গোলাপ-কোরক তুলিয়া নীতীশ নাচাইতে লাগিল। এষা দেওয়ালের একখানি ছবির দিকে চাহিয়া রহিল।

অতি-পরিচিতের মাঝে অপরিচয়ের দুরতিক্রম্য আড়াল যেন সহসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। যাহাদের কথা কখনও ফুরাইত না, সেই বাচাল দম্পতি আজ বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে নীতীশ এষাকে ডাকিল।

আগ্রহ ও আনন্দ-ভরা সে আহ্বানে এষার অন্তর দুলিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া কহিল, "কি?"

"আমি কি তোমায় কষ্ট দিচ্ছি, বল, আমার প্রাণের যে ব্যাকুলতা এসেছে, তার জন্যে হয় ত তোমায় ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু এই ব্যাকুলতার কথা মনে ক'রে কি তুমি আমায় ক্ষমা করবে না?"

এষার মন জল হইয়া গেল। সে হঠাৎ উদার হইয়া বলিল, "না, সত্যিই যদি তোমার বেদনা জাগে, তা হ'লে আর কি করবে। ভগবান্ তোমার সাধনা সফল করুন।"

এই বলিয়া এষা আপন উচ্ছ্বসিত আবেগ থামাইবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

২

ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রি।

মেঘহীন আকাশে আলোর অনন্ত-বিথার। স্নিগ্ধ-শ্যামভূমির বুকে শ্যাম দিগ্বলয়, তাহার পরে স্নিগ্ধ বিচিত্র আকাশ। চন্দ্ররশ্মির অমল প্রবাহে দিগ্‌দিগন্তে হাসি ও আনন্দ বহিয়া যাইতেছে। এষা বারান্দায় দাঁড়াইয়া চাঁদের শোভা দেখিতেছিল। চাকররা খাইয়া চলিয়া গিয়াছে; স্বামীও শুইতে গিয়াছে। নিস্তব্ধ পুরীর নীরবতার মাঝে এষার মন না জানি কোন্ সুদূরে ভাসিযা যাইতেছিল।

এষা ভাবিতেছিল—নর ও নারীর এই যে একান্ত-নিবিড় ভালবাসা, ইহা কি ঘৃণ্য? ইহা কি হেয়? তাহার মন সায় দিতেছিল না। ঝুলনের দিনে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা মনে জাগিল।

যাঁহাকে মানুষ ভগবান্ বলিয়া মানে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ ত ভালবাসাকে অবজ্ঞা করেন নাই। অতলস্পর্শ সমুদ্রের মত প্রেমের মহিমাও অতলস্পর্শ। প্রিয়ের জন্য এই যে অসীম আকুলতা তাহার বক্ষে স্পন্দিত হইতেছে, ইহার কি কোনও মূল্য নাই? নর ও নারীর সহজ প্রেমের মধ্য দিয়াই ভগবৎপ্রেম বাড়িয়া উঠিবে না কি? এই প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবৎপ্রেম পাওয়া যায়? মানুষের শিরায় শিরায় এই যে আকুল আকর্ষণ, এ আকর্ষণ কি তুচ্ছ?

সাদা মেঘের ফাঁক দিয়া চাঁদ হাসিয়া উঠিল। অলক্ষিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।

হায়! সৌন্দর্য্য-দেবতা যে অনবদ্য সুষমার অর্ঘ্য ঝুলনের রাতে অমৃতময়ের চরণে নিবেদন করিতেছে, তাহার ছিঁটে-ফোঁটা অনুভব করিতে পারিলেও মানুষ ধন্য হইয়া যায়।

বৈকালে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে এষা ঝুলন দেখিতে গিয়াছিল। সুন্দর রথে রাধা ও কৃষ্ণ দোল খাইতে-ছেন। পুষ্পগন্ধমধুর আসনে রাধা ও কৃষ্ণকে বেশ দেখাইতেছিল।

প্রেমের দেবতার সেই হৃদয়-মনোহর ছবি জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে এষার মনে জাগিতে লাগিল। দূর হইতে ঝুলনের শানাইয়ের আলাপ তখনও শুনা যাইতে-ছিল। পথে পথিক গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

'সখি লো পড়েছে মনে শ্যামরায়ে, পড়েছে আজি মনে।'

সুকণ্ঠ পথিকের গান এষার মর্ম্মে আসিয়া সহানুভূতির কম্পন জাগাইয়া তুলিল। কত দিন সে গান গায় নাই, তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল, স্বামীকে জাগাইয়া সে মন খুলিযা গান গাহে। এমন চাঁদের আলো, এমন মধুর রাত্রি, সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে দিবে না।

অভিসারিকার মত চুপে চুপে সে স্বামীর শয়ন-কক্ষে গেল। নীতীশ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার শান্ত সুন্দর মুখে এতটুকু অশান্তির রেখা নাই। সে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। নীতীশকে জাগাইবার ইচ্ছা থাকিলেও এষা সাহস করিয়া তাহা করিতে পারিল না।

ক্ষুব্ধচিত্তে সে বাহিরে আসিয়া বসিল। এসরাজটি বাহির করিয়া আলাপ করিতে বসিল। এষার হাত বড় মিঠা। চাঁদিনী রাত্রির পুলকের মাঝে এসরাজের করুণ বেদনামাখা সুর বড়ই মিঠা লাগিতেছিল।

এষা জগৎসংসার ভুলিয়া এসরাজ বাজাইতে আরম্ভ করিল। এসরাজের সুরে নীতীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া কোমল অনুযোগের স্বরে কহিল, "তুমি ঘুমুতে যাও নি, এষা?"

এষা আপন বিস্রস্ত বসনকে সংযত করিয়া বলিল, "না, আমার ঘুম আসছে না।"

এ কথায় নীতীশ কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে না চলে স্নেহের শাসন, না চলে আব্দার।

অপ্রতিভ নীতীশ বলিল, "তোমার শরীর খারাপ লাগছে কি?"

এষা দৃঢ় অথচ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

কথা যেন কিছুতেই জমিল না। প্রীতির যে যোগ উভয়ের অন্তরকে এক করিয়া রাখিত, উভয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমতা করিত, সে যোগ আজ বিচ্ছিন্ন।

পত্নীকে খুসী করিবার জন্য সে বলিল, "একটা ভাল রাগিণী বাজাও।"

এষা পুলকিত হইয়া বলিল, "শুনবে, বেশ, একটা নূতন রাগিণী সে দিন শিখেছি, সেইটে বাজাই।"

এষা বাজাইয়া চলিল, নীতীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত এষার মিঠা হাতের মিঠা বাজনা শুনিল। বাজনা শেষ হইল। সুরের আবেশ তবু যেন ফুরায় না।

খানিক পরে নীতীশ বলিল, "যাও এষা, এইবার শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে।"

স্বামীর কণ্ঠে এষা যেন পুরাতন আদরের সুর শুনিতে পাইল। সে প্রেমবিহ্বল কাতরতায় বলিল, "চল না, তুমি এই ঘরে শোবে।"

পুলকের আতিশয্যে এষা অভিমান ও লজ্জা ভুলিয়া গিয়াছিল। দয়িতের জন্য যে বেদনা এত দিন তাহার চিত্তকে তুষের আগুনে পুড়াইয়াছে, সে বেদনা অসহ হইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

চাঁদের আলোকে এষাকে মনোমোহিনী দেখাইতেছিল। নীতীশের মন করুণ ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে কথা কহিল না, ধীরে ধীরে এষার সঙ্গে চলিল।

এষার জন্য নীতীশের মনে স্নেহ ও ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। শয়নকক্ষে গিয়া এষা বলিল, "তুমি ঘুমাও, আমি ব'সে তোমায় বাতাস করি, ভাপসা গরমে তোমার মাথা ধরেছে হয় ত।"

নীতিশ কৌশলে পত্নীর আহ্বান এড়াইয়া গেল। ক্ষোভে ও বেদনায় এষা মুহ্যমান হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে ক্লান্তিহরা নিদ্রা আসিয়া এষার সমস্ত জ্বালা দূর করিল।

অনেক রাত্রিতে জাগিয়া দেখিল, স্বামী নাই। আকাশে চাঁদের আলোও নিভিয়া গিয়াছে। রিমঝিম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল। একটা অব্যক্ত হাহাকার তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এষা পুনরায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

মনোজয়ের আশা নাই। এষা আপনাকে কেবলই ধিক্কার দিতে লাগিল। সে আর কাঙ্গালিনী হইয়া গ্লানি বহন করিবে না।

৫

ভাদ্র মাসের শেষে নীতীশ আপন অভ্যাসে মনোনিবেশ করিল। কয়েক দিন ধরিয়া নির্ব্বিবাদে সময় কাটিয়াছিল। এষা আর দ্বন্দ্ব-কলহ করে না। নীতীশ এষাকে ধর্ম্মের জন্য জিজ্ঞাসু হইতে বলিয়াছিল। তখন তাহার উত্তরে সে বলিয়াছিল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাহার ভাল লাগে না।

কিন্তু দিন কাটে না বলিয়া সে পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ রমানাথ বাবুর নিকট হইতে কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ চাহিয়া আনিয়াছিল। অবসরমত তাহাই পড়িয়া দিন কাটাইত।

সে দিন এষা নরোত্তম দাসের প্রার্থনায় পড়িতেছিল,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥"

পড়িতে বসিয়া এষা ভাবিতে লাগিল—'ভগবৎ-পিপাসায় কি মানুষ এমনই আকুল হয় যে, মানুষের অন্তরে এমনই পুলক উপস্থিত হয়?' সে ক্ষণিকের জন্য যেন এক অননুভূত আনন্দ অনুভব করিল। এমন সময় নীতীশের কাতরকণ্ঠ শুনা গেল, 'এষা!'

এষা পুস্তক ফেলিয়া স্বামীর কক্ষে গেল। আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করিতে গিয়া নীতীশের সে দিন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

সুকৌশলী ও সুশিক্ষিত যোগীর নিকট ভিন্ন আসন শিখিতে নাই বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে। নীতীশ শাস্ত্রের নিষেধ না মানিয়া পুস্তক পড়িয়া যোগাভ্যাস করিতে গিয়া বিপদে পড়িল।

এষাকে দেখিয়া নীতীশ বলিল, "এষা, আমার বিছানাটা তাড়াতাড়ি পেতে দাও, আমার মাথা ভয়ানক ঘুরছে।"

এষা স্বামীকে সন্তর্পণে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় অডিকোলন দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

আসন ও মুদ্রার প্রক্রিয়া সহজ নহে। গুরুর উপদেশ ভিন্ন তাহা অভ্যাস করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। নীতীশের সেই যে মাথা ধরা হইল, কয়েক দিনের মধ্যে তাহা ছাড়িল না। শরীরে জ্বরভাব হইল।

দুঃখে ও বিপদের দিনে আমাদের সংযত মন আপন বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চপল ও দুরন্ত হইয়া উঠে, নীতীশেরও তাহাই হইল। এত দিন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে কেবল পত্নীকে দূর করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মাঝে এষাকে তাহার পরম প্রিয় লাগিতে লাগিল।

এষাকে আদর করিতে করিতে নীতীশ অনেক সময় বলিত, "এষা, তোমায় ব্যথা দিয়েছি, বোধ হয়, এই জ্বালা তার ফল।"

এষা স্বামীকে যেন নূতন পাইয়াছে, এমনই লজ্জা-মধুর-ভাবে উত্তর দিত, "না, তা হবে কেন ?"

ডাক্তার আসিয়া বলিল, "বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্ত্তন করিলেই শরীর ভাল হবে। সামনেই পূজার ছুটী, পুরী চ'লে যান।"

নীতীশ ডাক্তারের কথায় আগ্রহে সম্মতি দিল। পূজার আর কয়েক দিন বাকী। সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে নীতীশ এষাকে বার বার তাগিদ দিল। নূতন এক আনন্দ, নূতন এক আশা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামিয়া আসে, শিরঃপীড়া তখন বাড়ে, নীতীশ অস্থির হইয়া পড়ে, এষাকে ডাকিয়া সংলগ্ন অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতে থাকে। এষা কোন কথার উত্তর দেয়, কোনটার উত্তর দেয় না।

এক দিন নীতীশ প্রশ্ন করিল, "এষা, তোমার কি মনে হয় বল ত ?"

বাতাস করিতে করিতে এষা বলিল, "কোন্ বিষয় ?"

"ভগবানের সম্বন্ধে, তোমার কি মনে হয় না যে, তাঁকে না পেলে চলবে না ? তোমার কখনও কি এমন অনুভূতি হয় না ?"

উপেক্ষা বা ব্যঙ্গ করিয়া এষা আর কোন দিন নীতীশকে আঘাত করে নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি পড়িয়া এষার মনেও ধর্ম্মের প্রতি কিছু টান হইয়াছিল।

সে ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, আমি ত কিছুই বুঝি নে, আর এ সম্বন্ধে কিছুই ভাবি নি, তবে চিরদিন মানুষ যখন ভগবান্‌কে চেয়েছে, তখন হয় ত এটা সত্যি হবে।"

নীতীশ এষার কথায় আনন্দ-বিহ্বল হইল। এষার হাত দু'খানি আপন হাতের ভিতর রাখিয়া নাড়িতে নাড়িতে স্নেহমধুর কণ্ঠে কহিল, "ঠিক বলেছ, এষা। আমিও ঠিক এই কথা ভাবি। মানুষ যখনই ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই ভগবান্‌কে চেয়েছে, নানা দেশে, নানা যুগে ভগবানের জন্য মানুষ পাগল হয়েছে, এ সব ফাঁকি হ'তে পারে না।"

স্বামীকে সুখী করিবার জন্য এষা সায় দিল, "না, বোধ হয় ফাঁকি নয়।"

আনন্দের আতিশয্যে নীতীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। এষাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "না, ফাঁকি নয়, এষা, আমি হয় ত ভুল করেছি, তোমাকে বাদ দিয়ে সাধন করতে গিয়েছিলাম, তাই হয় ত শাস্তি। চল, আমরা দু'জনে কোনও সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে ধর্ম্মসাধন করি।"

এষা স্বামীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "তুমি ঠাণ্ডা হয়ে শোও। ডাক্তার তোমায় উত্তেজিত হ'তে বারণ করেছেন।"

"চুলোয় যাক সে বারণ। বল এষা, তুমি রাজী ত ?"

এষা নীতীশের ভাববিহ্বল মুখের দিকে ক্ষণিক তাকাইয়া রহিল, পরে উত্তর দিল, "তুমি ভাল হও, তার পর যা বলবে, তাই হবে।"

৬

এষা ও নীতীশ পুরী আসিয়াছে। স্বর্গদ্বারের নিকট একটি ছোট-খাট বাসা লইয়াছে। পুরীতে আসিয়া নীতীশ যেন আপন-হারানো কবি-মন ফিরিয়া পাইয়াছে। সকাল ও সন্ধ্যায় এষাকে লইয়া সমুদ্রের বালুবেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গোধূলির সময় যখন সূর্য্য নীল নভশ্চক্রের কাছে সমুদ্রের বুকে ডুবিয়া যায়, তখন সে কি অনুপম দৃশ্য ! প্রভাতের সূর্য্যোদয়ও অপূর্ব্ব। নীতীশ এষাকে নিসর্গের শোভা দেখাইয়া ফিরে।

পূর্ণিমার দিন উভয়ে সন্ধ্যার পরও বাসায় ফিরিল না। তীর-ভূমে বসিয়া জ্যোৎস্নারাশি পান করিতেছিল। নীল আকাশের অসীম বুক ছাপাইয়া চাঁদের আলো সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানেই নবীন বাবুর সহিত দম্পতির আলাপ হইল।

নবীন বাবু প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। পুরীতে থাকিয়া সাধন-ভজন করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার একটুও গোঁড়ামি নাই। যেমন সরল প্রকৃতি, তেমনই অমায়িক আচরণ।

আলাপ জমিলে নবীন বাবু মাঝে মাঝে নীতীশের বাসায় আসিতেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেন। নীতীশ নবীন বাবুকে এক দিন আপনার

মনের কথা সব বলিল। নীতীশ কিছুই লুকাইল না। নবীন বাবু শুনিয়া বলিলেন, "গোস্বামী প্রভু এই জন্য গুরুর আদেশ বিনা যোগাভ্যাস করতে বারণ করেছেন। যোগ অবশ্য খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু উপদেষ্টা না থাকলে সাধনে বহু অন্তরায় হয়। যাক্, ভগবানের দয়ায় আপনি অল্পেতেই রক্ষা পেয়েছেন।"

নীতীশ প্রশ্ন করিল, "আপনি কি সাধন করেন?"

নবীন বাবু কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলেন, "আমাদের আবার সাধন, কেবল ভগবানের নাম করি, তাতে যদি তাঁর প্রতি আসক্তি হয়।"

এষা আগ্রহভরে কথা শুনিতেছিল, সে বলিল, "আপনার কথায় ছোট বয়সের কথা মনে পড়ছে। ঠাকুরমা শতনাম গাইতেন, শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে—

'নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের মাঝারে বৈসে আপনি শ্রীহরি॥'

আপনাদের সাধন এই নাম-সাধন তা হ'লে?"

নবীন বাবু বলিলেন, "হাঁ মা, আমাদের সাধন এই সহজ-সাধন। অনুক্ষণ এই নাম-গান, এই নাম-জপই আমাদের মন্ত্র।"

নীতীশ বলিল, "আপনার কথা আমার বড়ই ভাল লাগে, আপনি মাঝে মাঝে আপনার সাধন-কথা আমায় জানাবেন।"

নবীন বাবু বলিলেন, "সাধন-কথা কি বলা যায়, ভাই! আর আমি ত কিছুই জানি নে!"

এষা বলিল, "না, আপনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না।"

"ফাঁকি দেব কেমন ক'রে, মা? সহজ-সাধন হলেও নাম-সাধন সহজ নয়।"

নীতীশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, "আমি ভুল পথেই চলেছিলাম।"

নবীন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভুল পথেই ত চলেছেন। মাকে অবজ্ঞা ক'রে ভাল কায করেন নি। আপনি গৃহী, গৃহধর্ম্মকে অবজ্ঞা করলে আপনার চলে না। গোস্বামী প্রভু বলতেন, নারীকে অবজ্ঞা ক'রে দেশ রসাতলে গিয়েছে। তাঁর উপদেশ ছিল যে, স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করবে, আর স্বামী স্ত্রীকে ভগবৎ-শক্তি ব'লে সম্মান করবে।"

নীতীশ বলিল, "কিন্তু আমার মনে দাবদাহের মত একটা জ্বালা জেগেছে, আমি শান্তি চাই, কি হ'লে শান্তি মিলবে বলতে পারেন?"

"শান্তি এক ভগবান্‌ই দিতে পারেন, তিনি শান্তি না দিলে আর কে শান্তি দেবে? সদ্‌গুরুর সন্ধান ক'রে দীক্ষা নিন, দীক্ষা নিয়ে নাম-সাধন করুন, তা হলেই শান্তি পাবেন।"

নীতীশ ও এষা আগ্রহে নবীন বাবুর কথা শুনিল। উভয়ের অন্তরে একটা ব্যাকুলতা জাগিয়াছে—উভয়ে দীক্ষার জন্য যেন প্রস্তুত। নীতীশ এষার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বল, এষা?"

এষা বলিল, "আমি কি বলিব, তোমার যা মত, আমার তাই মত।"

নবীন বাবু শুনিয়া বলিলেন, "তার সময় হয় নি। বাড়ী ফিরে যান। প্রত্যহ নাম-কীর্ত্তন করুন, আর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করুন। সময় হ'লে সদ্‌গুরু আপনিই মিলে যাবে।"

নবীন বাবুর কথায় উভয়ে আশ্বস্ত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধের কথার অন্তরালে যে আন্তরিক মাধুর্য্য ছিল, তাহাতে নীতীশের তপ্ত হৃদয় শীতল হইল।

৭

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে নীতীশ বাড়ী ফিরিল। হেমন্তের মনোমোহন দ্যুতির সহিত দম্পতির মনের অবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শস্যসম্ভারসমৃদ্ধ প্রকৃতির মাঝে প্রাচুর্য্যের এক গরিমা উদ্ভাসিত ছিল। দম্পতির প্রাণেও আনন্দ-উজ্জ্বল প্রেমোচ্ছ্বাস।

সুরমা সে দিন বেড়াইতে আসিয়া এষাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, বোন্?"

এষা উত্তর না দিয়া স্মিত-হাস্যে বান্ধবীকে অভিনন্দন করিল। সুরমা পুলকিত হইয়া বলিল, "তোর হাসি দেখে বুঝেছি, শিবের ধ্যান-ভঙ্গ হয়েছে।"

এষা হেঁয়ালি করিয়া উত্তর দিল, "শিবের ধ্যান ভেঙ্গেছে কি গৌরীর তপস্যা আরম্ভ হয়েছে, বলা মুস্কিল, ভাই।"

সুরমা চমকিত হইয়া সখীর মুখের দিকে চাহিল; পরে কহিল, "ব্যাপার কি?"

এষা ব্রীড়াভিরাম মধুরতায় উত্তর দিল, "বিশেষ কিছু নয়, তবে স্বামীর অনুবর্ত্তন করতে চেষ্টা করছি।"

ব্যঙ্গ-উচ্ছল তীব্রতায় সুরমা জবাব দিল, "বলিস কি! আমি মনে করেছিলাম, তোর ভিতর পদার্থ আছে। নীতীশ বাবু যে ভণ্ডামীর গর্ত্তে পড়েছেন, তুই তাঁকে তা থেকে তুলবি। তা না, তুইও তাঁকে বিপথে চালাতে প্ররোচিত করছিস? অবাক্ ক'রে দিলি, এষা!"

এষা প্রত্যুত্তরে রোষবর্ষণ করিল না, তর্ক করিয়া জিতিতে চাহিল না। মৌন নিবেদনের মত সম্ভ্রমে বলিল, "সুপথ বিপথ কি, তা কে জানে? মানুষের সভ্যতার গোড়া থেকে এই নিয়ে ত তর্ক চলেছে। কিন্তু মনের যে আনন্দ স্বর্গীয়, সেটাকে অবজ্ঞা করতে পারি নে।"

"তার মানে?"

এষা বলিতে লাগিল, "উনি যোগাভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা দুজনে নামগান করি। নামকীর্ত্তনে সত্যই বড় আনন্দ হয়। এ এক অপূর্ব্ব রস, যতই ভজি, ততই আনন্দ বাড়ে।"

সুরমা প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে শেষে ভেক নিয়ে বৈরেগী হয়েছিস্?"

"না, ভেক নয় দিদি, সংসারে ত মিছামিছি সময় কাটছে, তা না ক'রে যদি ভগবানের নাম ক'রে আনন্দ হয়, তাতে ক্ষতি কি?"

এমন সময় নীতীশ কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিল। সুরমা উঠিয়া বলিল, "এখন আসি ভাই, পাগলামী যে করে, সে মনে করে, কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, তাই ব'লে ত আর পাগলামী ভাল নয়। মানুষের বুদ্ধিটাকে অবহেলা করলে মানুষের গৌরব হয় না।"

নীতীশ হাত-মুখ ধুইয়া শান্ত হইয়া বসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হচ্ছিল?"

"তা তোমার শুনবার দরকার?"

"আহা, বলই না, কি গোপন কথা হচ্ছিল?"

এষা বলিল, "আমাদের গল্প-গুজব শুনে তোমার কি হবে?"

নীতীশ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবে না। এষা তখন সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া নীতীশ বলিল, "পাগলামী কি বুদ্ধিমানের কায, কে তার বিচার করে, এষা? অনুভূতিই পরশমণি, সেই পরশ-পাথরে ক'ষে দেখতে হবে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ।"

এষা বলিল, "ও নিয়ে আর তর্ক কেন, অপরে যা বলে বলুক গে।"

নীতীশ বলিল, "তুমি ঠিক থাকলেই হয় বটে, কিন্তু অপরের বলাকে একেবারে বাদ দিলে যে চলে না। আচ্ছা, তর্ক যখন তোমার ভাল লাগছে না, তখন তর্ক থাক। আজ কোন্ গানটা গাইবে?"

এষা লজ্জা-মধুর ভাষে উত্তর দিল, "বিদ্যাপতির একটা গান নিজে নিজে সুর দিয়েছি, ভাল হয়েছে কি না, কে জানে!"

নীতীশ কহিল, "ও নিয়ে ভাবনা করো না, গানের স্বরগ্রামের চেয়ে তার মর্ম্মকথাটি ফুটাতে চেষ্টা করবে। কণ্ঠ না গেয়ে যদি মর্ম্ম গেয়ে ওঠে, তা হলেই ঠিক হবে।"

এষা হারমোনিয়ম লইয়া আসিল। তাহার পর খানিকটা সুর সঙ্গত করিয়া গান জুড়িয়া দিল। সে সারা প্রাণ দিয়া গান গাহিল। সুরের তালে তালে তাহার প্রাণও আনন্দে ও হর্ষে মাতিয়া উঠিতেছিল। সুরের মাদকতা তাই শ্রোতার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল।

এষা গাহিতেছিল :—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে।—"

শুনিতে শুনিতে নীতীশের দুই চোখ বহিয়া দরবিগলিত-ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। যখন সুর-ঝঙ্কারে এষা গাহিতেছিল— 'তোহে ভজব কোন বেলা', ভাবের আতিশয্যে নীতীশও সুরে সুর দিয়া আবেগে কম্পিত হইতেছিল।

গান থামিলে অনেকক্ষণ নীতীশ চুপ করিয়া রহিল। ভাবের ও রসের যে আবহাওয়া সৃষ্ট হইল, সে যেন আকণ্ঠ তাহাই পান করিতে লাগিল। পরে ভাবগদ্গদ স্বরে বলিল, "এষা! কৃচ্ছ্রসাধনের যে পথে চলেছিলাম, সে ভুল হয়েছিল। এমনই আশা ও আনন্দের গান রচনা করব, আর তুমি তাতে সুর সংযোগ ক'রে ভাবের ও রসের মধু লোকে নিয়ে যাবে। কেমন, পারবে না? এই সহজ সাধন; আমার সাধন হোক আর তুমি তায় সহধর্ম্মিণী হও।"

এষা কথা কহিল না। অশেষ তৃপ্তিভরে স্বামীর আনন্দ-বিভাত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ, বি, এল্)।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

চতুর্থ পর্য্যায়

তৃতীয় পর্য্যায়ে যে সকল নাট্যশালার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি এ-যুগের বড় বড় নাট্যশালা। এগুলি ছাড়া কলিকাতা ও মফঃস্বলে সেই কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছিল, কতকগুলি নাট্যশালারও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কোন স্থায়ী ফল দেখা যাক আর না-ই যাক, সে যুগের বাঙ্গালীদের মধ্যে নাট্যশালা ও অভিনয়ের দল গঠন করা সম্বন্ধে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলেরা সখের থিয়েটার ফাঁদিয়া বসিতেন, তাঁহাদের অনুকরণে মফঃস্বলবাসী সম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিনয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হুজুককে ব্যঙ্গ করিয়া সেকালের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক মাসিকপত্রে লেখা হইয়াছিল :—

> "দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক [যদুনাথ তর্করত্ন প্রণীত]।— নগরে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জ্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিঃসৃত 'গোলাপকান্ত,' 'নলিনীকান্ত,' 'কামিনী-বিলাস,' 'দূতীবিলাস,' প্রভৃতি কাব্যকরকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গ-ভাষানুরাগীমাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ্ হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলা-বৃষ্টিতে প্রায় সেই রূপ আপদ উপস্থিত; প্রায় প্রত্যেক গলীতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম্ম-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন; এবং এমত লোকও বর্ত্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।" *

নানা কারণে এই সকল অভিনয় ও নাট্যশালার সম্পূর্ণ ইতিহাস-সঙ্কলনে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ এই সকল অভিনয়ের সকলগুলিরই বিবরণ যে সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছে, তাহা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেগুলির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও সবগুলি সংগ্রহ করা দুরূহ; কারণ, সেকালের অনেক সংবাদপত্রের ফাইলই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অযত্নে পড়িয়া আছে। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির ফাইলও সম্পূর্ণ নহে। তাহা সত্ত্বেও, পুরাতন সংবাদপত্রে এ-যুগের ছোটখাট অভিনয় ও নাট্যশালার যে-সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত কম নহে। বাঙ্গালা দেশে পেশাদারী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সখের নাট্যশালার ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল অভিনয় ও নাট্যশালার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতায় নাট্যাভিনয়

(১) এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় যে সকল অভিনয় হয়, তাহার মধ্যে বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক কালিদাস সান্যাল প্রণীত 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয় একটি। এই নাট্যসমাজের পরিচালক ছিলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; তাঁহারই উদ্যোগে, ১৮৬৪ সনে বাগবাজার মদনমোহনতলায় 'নলদময়ন্তী' অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই তারিখটি ভুল। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসের গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'নলদময়ন্তী' নাটক আছে। তাহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৬৮ সন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এখনও 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয়ের কোন উল্লেখ পাই নাই।

১৮৬৮ সনে এই নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ইন্দুপ্রভা' নাটকের অভিনয় হয় নাটকখানি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; ইহার 'মঙ্গলাচরণে' আছে:—

> "বাগবাজার নাট্যসমাজের সভ্যগণ অভিনয়ের কারণ আমাকে এই গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন; এবং লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উক্ত সভার সভাপতি মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর গ্রন্থরচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলির সুর্ প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।...মহেশতলা। ১০ই ফাল্গুন, সন ১২৭৪ সাল।"

'ইন্দুপ্রভা' নাটক একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল।

(২) ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর, সোমবার, তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে মাইকেল মধুসূদন

* রহস্য-সন্দর্ভ, ১৯২৩ সংবৎ, ৪৬ খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ পাই। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছেন,—

"বিগত শনিবার পাথরিয়াঘাটা নিবাসী কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পদ্মাবতী নাটকের পুনঃ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর দুইবার অত্রত্য কোন কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে ঐ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিগত শনিবারের অভিনয় পূর্ব্বেকার ন্যায় হয় নাই। অনেক বিষয়ে ক্রটি হওয়াতে অভিনয়ের কোন কোন অঙ্গের ব্যাঘাৎ হইয়াছে।···পদ্মাবতী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তান্ত অনবগত ছিলেন। কোন পৌরাণিক গল্প না হইলে স্বভাবতঃ এ দেশীয় লোক তাহাতে আস্থা করেন না। পদ্মাবতীর ভাগ্যে সেইটী ঘটিয়াছিল।···"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর গরাণহাটার জয়চাঁদ মিত্রের বাটীতে পদ্মাবতী নাটকের অভিনয় হয়,—এ কথা কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।* গরাণহাটার অভিনয়কে অনেকে ভুল করিয়া পদ্মাবতী নাটকের প্রথম অভিনয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিনয়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে পদ্মাবতীর কয়েকটি অভিনয় যে হইয়াছিল, তাহা উপরি-উদ্ধৃত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র বিবরণে প্রকাশ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের অভিনয়গুলির মধ্যে একটি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুঁড়ীপাড়ার জনার্দ্দন সাহার বাড়ীর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। জনার্দ্দন সাহার বাড়ীর অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, ইহাও খুব সম্ভব ঠিক নয়।

(৩) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে (?) জনাইয়ের পূর্ণ মুখোপাধ্যায়ের আহীরিটোলাস্থিত বাসভবনের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হয় বলিয়া জানা যায়।

(৪) 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" প্রবন্ধে প্রকাশ:—

"পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা আড়পুলিতে 'আড়পুলি-নাট্যসমাজ' স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে 'মহাশ্বেতা', পরে 'শকুন্তলা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত হয়। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এই দলে শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের 'চন্দ্রাবলী' নাটক ও 'এঁরাই আবার বড়লোক' প্রহসন অভিনীত হয়। 'প্রাণীবৃত্তান্ত' প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন।"

(৫) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে (? জুন মাসে) ভবানীপুরে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'সীতার বনবাস' নাটকের অভিনয় হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের নিবন্ধ হইতে জানা যায় যে, এই অভিনয়টি ভবানীপুরের নীলমণি মিত্রের বাড়ীতে হইয়াছিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে এক জন দর্শক এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভবানীপুরে 'সীতার বনবাস' নাটকের প্রথম অভিনয় মোটের উপর খুব ভাল হইয়াছিল। পত্রখানিতে আরও প্রকাশ, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় বহু নাট্যাভিনয় হইয়াছিল।*

(৫) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'শকুন্তলা' নাটক পুনর্ব্বার অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয় কাঁসারিপাড়ায় একটি বাড়ীতে [কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের] হইয়াছিল, কিন্তু সিমলার অভিনয়ের মত এ অভিনয়ও তেমন ভাল হয় নাই।† ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের 'ন্যাশন্যাল পেপারে' কিন্তু অভিনয়টির প্রশংসাই করা হয়। এই সংবাদপত্র বলেন,—"দু-একটির কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই আশানুরূপ হইয়াছিল। এই নাট্যশালাটি

*"The Modern Hindu Drama"—*Calcutta Review*, 1873, p. 262.

*"...Look at the many dramatic performances which have already taken place in Calcutta during the last six months. Look again at the innumerable dramatic works which have lately come out of the Vernacular Press......I welcome with extreme joy the first performance of a tragedy, entitled 'the Exile of Seeta,' at Bhowanipore. On the whole, the performance was worthy of our best commendation."—The *Bengalee* for July 7, 1866.

† এখানি নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক বলিয়া মনে হইতেছে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও একখানি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক ছিল। উহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকখানি "কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।"

সর্ব্বজনপ্রশংসিত।" রাধামাধব করের স্মৃতিকথায় আছে যে, এই বাড়ীতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল, এবং সেই রঙ্গমঞ্চে 'শকুন্তলা'র সহিত মাইকেলের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনও অভিনীত হয়।

(৬) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়ীতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত 'বুঝলে কি না' প্রহসনখানার অনুকরণে রচিত। এই প্রহসনের মুখবন্ধে লেখক বলিতেছেন :—"কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ-বৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন-বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।" লেখক নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেও পুস্তকখানির বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ সমাজসংস্কার নয়। যে-কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির সর্ব্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল। প্রহসনখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত করিবার সময়ে এই সকল অংশের অনেক বর্জ্জন করা হয়; বিশেষ করিয়া দন্তবক্রের চরিত্র—যাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—তাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই। এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ধর্ম্মদাস সুর, এবং দন্তবক্র মুরাদআলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অতিশয় নিপুণভাবে অভিনয় করেন। অভিনয়স্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের সফলতা দেখিয়া তিনি না কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"মৃত্তিকে রে বাবা মৃত্তিকে!" অর্থাৎ, এই অভিনয়ের তুলনায় পূর্ব্বে কার আর-সব অভিনয় একেবারে মাটী!

ইহার কিছুদিন পরে প্রিয়নাথ ঘোষের বাড়ীতে 'রত্নাবলী'র অভিনয় হয়। এই সঙ্গে একটি প্রহসনও অভিনীত হইয়াছিল। এই প্রহসনের গানগুলি প্রিয়মাধব বসু মল্লিক রচিত। এই প্রহসনটি আবার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কিছু কিছু বুঝি'র জবাব।

(৭) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অনেকগুলি ছোটখাট অভিনয় হয়। ইহার কয়েকটির সন্ধান আমি পাইয়াছি :—

(ক) এই বৎসরের ২৫শে জানুয়ারী চোরবাগান সখের নাট্যশালা কর্তৃক মণিমোহন সরকার প্রণীত 'উষানিরুদ্ধ' নাটকের অভিনয় হয়। *

(খ) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখের 'ন্যাশন্যাল পেপারে' প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, সেই বৎসর আহীরিটোলার রাধামাধব হালদারের বাড়ীতে 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' † নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়।

(গ) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'জানকী-বিলাপ' অভিনীত হয়। ‡

(ঘ) এই বৎসরের ১৮ই এপ্রিল এবং তৎপূর্ব্ববৎসরে শিবপুরে লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। §

(ঙ) এই বৎসরের ৯ই মে ঠনঠনিয়া নাট্যশালায় [২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ী?] নিমাইচাঁদ শীল রচিত 'এঁরাই আবার বড়লোক' [১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত] নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৫) তারিখের

---

* "On Saturday before last, being invited by some friends to attend the theatrical performances of Ushaniruddha..."—The *National Paper* for February 5, 1868 (Wednesday).

উষানিরুদ্ধ নাটক মণিমোহন সরকারের রচিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় ইহা প্রকাশিত হয়।

† "*Vesyanurakti vishama vipatti*. The Fruits of Immorality. pp. 66. Calcutta, 1863."—India Office Library Catalogue of Bengali Books.

‡ "On Saturday last I lounged in an opera house to witness the theatrical performance of *Janokee Beelap*..."—The *National Paper* for April 29, 1868.

§ "৯ই বৈশাখ সোমবার।—গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অভিনয়টি আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ গত বৎসরের কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা এবারের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় অনেক গুণে উত্তম হইয়াছিল।"—সোমপ্রকাশ, ২৭ এপ্রিল, ১৮৬৮ (১৬ই বৈশাখ, ১২৭৫)।

'সোমপ্রকাশে' জনৈক দর্শক ইহার অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার তথায় 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামে এক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।
>
> নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসার্হ। সুরাপানের দোষোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে লোককে পরাঙ্মুখ করা ও সুরাপান প্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলপ্রযত্ন ও পরিণামে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য।......
>
> গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিনয় অতি সুন্দর ও যাবতীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী, আর্ত্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শয়ন এবং সূর্য্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। 'মাষ্টার কেষ্টোকিশোর' অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন।..."

(৮) ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়াস্থিত উদ্যানে চৈত্রমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১৮৬৯, ৯ই এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে প্রকাশ, এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্রকর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটক বেণী-সংহার অভিনয়ের কথা হয়। পরবর্ত্তী ১৬ই এপ্রিল তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লিখিয়াছিলেন,—

> "বহুকাল হইল, আমাদিগের দেশে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই মেলায় এ বৎসর বেণী সংহার নামক সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইবার উদ্‌যোগ হয়।..."

কিন্তু ভিড়ের গণ্ডগোলে অভিনয় অল্পক্ষণ হইবার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

(৯) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দোলপূর্ণিমার দিন আহীরিটোলাস্থিত জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভ্যালারে মোর বাপ' নামক প্রহসন (১২৮৩ সালে প্রকাশিত) অভিনীত হয়। *

(১০) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাসের এক রাত্রিতে বেণেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে হাবড়া-ব্যাটরার এক থিয়েটারের দল 'প্রভাবতী' নাটকের (শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে লিখিত) অভিনয় করেন। *

(১১) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূজার সময় চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হয়।

মফঃস্বলে নাট্যাভিনয়

এখন যেমন, সেকালেও তেমনি কলিকাতাই সব বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতায় নূতন কোন ফ্যাশন্ বা নূতন কোন হুজুক দেখা দিলে অনতিবিলম্বে তাহা মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িত। নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতায় নাট্যাভিনয় প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মফঃস্বলের ধনী ব্যক্তিরাও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর (১৭ পৌষ ১২৭৩) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই,—

> "আগড়পাড়ার নাট্যশালা।—আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে।......
>
> ৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর সংগীত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটী নূতন হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সংগীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি।... ..
>
> যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার সুখে যাপন করিয়াছিলাম।......"

এই নাট্যাভিনয়ই সে যুগে মফঃস্বলে একমাত্র অভিনয় নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জনাইয়ের জমীদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সেই গ্রামে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অভিনীত হওয়ার কথা বলিয়াছি। সেই বৎসরেই "(১২৬৪ মাঘ) জেলা যশোহরের অধীন রাঁড়ুলি গ্রামের রাজকীয় বাঙ্গালা পাঠাশালার ছাত্রেরা অতি উৎকৃষ্টরূপে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেকের মন মুগ্ধ করে।" † আবার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের

* মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা (১৩০৭); রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)"—বিশ্বকোষ।

* ঐ

† সংবাদ প্রভাকর—১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)।

কাছাকাছি জনাইয়ের উকীল ও জমীদার শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'সোশ্যাল ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটী' নামে একটি সভা গঠিত হয়। এই সভার একটি নাট্যবিভাগ ছিল। এই নাট্যাভিনয়ের দল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মে (?) মাসে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয় করে। *

ইহার পর আমরা কৃষ্ণনগর হইতে অভিনয়ের সংবাদ পাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজ-গৃহে ছাত্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অভিনয়ের শেষে উপসংহার হিসাবে যে কবিতাটি পঠিত হয়, তাহাতে দীনবন্ধুর প্রশংসাসূচক এই দুইটি পংক্তি ছিল :—

"ধন্য কীর্ত্তি দীনবন্ধু রেখেছ ধরায়।
একাধারে এত গুণ দেখা নাহি যায়॥"

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৭০, ২৯এ জুলাই তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য থাকায় সমগ্র পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"সম্পাদক মহাশয়! গত কল্য বজনীযোগে কৃষ্ণনগর কলেজ-গৃহে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। কয়েক বৎসর অতীত হইল কৃষ্ণনগর কলেজের কতকগুলি ইংরাজী সাহিত্যানুরাগী ছাত্র ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনা ও পাঠের নিমিত্ত 'সাহিত্য সংসৎ' নামক একটী সভা সংস্থাপিত করেন। উক্ত সভার জন্মদিনের স্মরণার্থ বর্ত্তমান ও বিগত বর্ষের মে মাসে দুইটী ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বারে য্যাডিশনের 'কেটো' ও দ্বিতীয় বারে মহাকবি সেক্সপিয়র বিরচিত 'বিনীসীয় বণিক' অভিনীত হয়। দুই বারেই 'সাহিত্য সংসৎ' নাটকাভিনয়ে অচিন্তিতপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া অত্রস্থ ইংরাজগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সাহিত্য সংসতের কৃতকার্য্যতা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া উক্ত কলেজের মাতৃভাষানুরাগী কয়েকজন ছাত্র বঙ্গনাটকের অভিনয়ার্থ দলবদ্ধ হইয়া 'গোয়াড়ি বঙ্গ নাট্যাভিনয় সভা' নামক একটী অভিনব সংসৎ সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই যত্ন ও পরিশ্রমে গত কল্যের মহোৎসব সংসাধিত হইয়াছে। অভিনয়স্থলে কৃষ্ণনগরস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ শুভ্রশীর্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীও দর্শকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। অভিনীত নাটকের প্রণেতা মান্যবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শুনিলাম, তিনি উক্ত অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ২০০৲ টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছেন। অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই। প্রথমব্রতীদিগের পক্ষে ইহাই উত্তম বলিতে হইবে। কৃষ্ণনগরে আর কখন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয় নাই। এই ইহার প্রথম সূত্রপাত। আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের নবপ্রসূত সমাজটী দীর্ঘজীবী হয়। একান্ত বশম্বদ— আমি একজন নাট্যপ্রিয়। কৃষ্ণনগর ১৮।৭।৭০।"

ইহার পর আমরা হুগলীতে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১২৭৭ সালের "৩০এ আশ্বিন [১৫ই অক্টোবর] শনিবার হুগলীর ঘুটিয়া-বাজারের নব-নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে।……"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহেশপুর গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে পাইতেছি,—

"মহাশয়—বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাটকাভিনয় পুনঃ সংস্করণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।…শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা। কৃষ্ণনগর, ১৩ই জানুয়ারি।"

পরবৎসর ১৮৭২, ৩০এ মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭২, ৫ই এপ্রিল (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ :—

---

* "*Saturday, 23rd May.*—We are glad to learn that a Social Improvement Society has been established at Jonye through the exertions of Baboo Atulchunder Mookerjea, one of the leading Zemindars of that place and a promising member of the Sudder bar…The Society proposes among other things to encourage a taste for the drama among the local gentry…The Dramatic Section of the Society lately brought out a very successful performance of Mr. M. M. S. Datta's brilliant farce *Ekai Ki Bale Savyata*…"—The *Hindoo Patriot* for May 25, 1868.

"চুঁচুড়ায় লীলাবতী নাটকাভিনয়।

সম্পাদক মহাশয়! প্রচলিত জঘন্য যাত্রাদির পরিবর্ত্তে নাটকাভিনয় দেশমধ্যে লব্ধাধিকার হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বিগত শনিবারে চুঁচুড়া শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটস্থ মল্লিকবাটীতে বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাড়ীটী অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মহা কোলাহল হইয়াছিল। অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি শেষ করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও এবং সুচারুরূপে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় পূর্ব্বোক্ত নাটকাভিনয় কার্য্য আরম্ভ হইল। ঐকতান বাদ্যকরেরা আপনাপন যন্ত্রে সুর মিলাইয়া বাজনা আরম্ভ করিল। বাদ্য শুনিয়া দর্শকবৃন্দের অন্তরে বিকটভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল।......

দৃশ্যগুলি বড় মন্দ হয় নাই।......

হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার। } কস্যচিৎ দর্শকস্য।
২২ শে চৈত্র, ১২৭৮। } শ্রী :—"

১৮৭২, ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল।... আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী।"

অন্যান্য যায়গার মত ঢাকাতেও নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন,—

"সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্য পান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। বিষ ও বিষহরি বিধাতা একেবারে সৃষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...

ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন।...ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্য্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা এক দিন ইঁহাদের কয়েক জন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন, টিকিট চারি দুই এবং এক টাকা মূল্যে থাকিবে। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাঁহারা দেশের সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাঁহারা টিকিট বিক্রয়ের প্রথা বাহির করিয়া দেশের একটী অভাব যেমন দূর করিতেছেন, তেমন সৎকার্য্যানুষ্ঠানের একটা প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা উপার্জ্জনকারীদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে।"

ঢাকায় মনোমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ তারিখে। পরবর্ত্তী ৪ঠা এপ্রিল (২৩ চৈত্র ১২৭৮ বৃহস্পতিবার) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় দেখিতেছি,—

"গত শনিবারে ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েক জন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব। এবং পোগোজ সাহেব বলেন যে অভিনয়ের টিকিট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা তিনি অতি সৎকার্য্যে লাগাইয়াছেন। সকল বিষয় অতি সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।...'

এত অর্থ, এত যত্ন, পরিশ্রম করিয়া যে ঢাকার অভিনয়টী সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তমোলুকে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ২৬এ এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন,—

"গত ২ রা বৈশাখ শনিবার ময়নার রাজার তমোলুকস্থ ভবনে শিবপুরের রামাভিষেক নাটকের দলের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম

প্রায় ছয় শত দর্শকে সভামণ্ডলী পরিপূর্ণ হইয়াছে।··· সংক্ষেপতঃ নাটকাভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল,···শিবপুরের এই দল বিশেষ প্রসিদ্ধ সন্দেহ নাই।···"

গীতাভিনয় (অপেরা)

নূতন ধরণের নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবে পুরাতন যাত্রা কি ভাবে নূতন রূপ ধারণ করিতেছিল, সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের প্রথম পর্য্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার 'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার অভিনয় এ দেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পূরাদস্তুর নাটকেরই মত; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্য-পটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এ দেশে খুব জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এ বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ-স্থাপন সম্ভব ছিল না।

গীতাভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতে পাই :—

"প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি-গণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ-প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘণীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।"

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ মে তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'ও এই সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে এ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মামুলি কালুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালাস্থাপন সম্ভব নয়, সে জন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেছেন। এইরূপ কয়েকটি অভিনয়ের সংবাদ ও কয়েকটি গীতাভিনয় পুস্তকের সন্ধান আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে পাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন কর্ম্মকার রচিত 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' পুস্তক এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তক বলিয়া মনে হয়।* ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'শকুন্তলা' নামে আরও একখানি গীতাভিনয় পুস্তক অভিনীত হয়। ইহার রচয়িতা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই পুস্তক-খানিকেই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অপেরা (গীতাভিনয়) বলিয়াছেন। †

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে জানিতে পারি যে, সে বৎসর জগদ্ধাত্রী-পূজার সময়ে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীতে 'সাবিত্রী সত্যবান' ‡ নাটকের গীতাভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ২৫এ নভেম্বর (১১ই অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে এই গীতাভিনয় শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে অভিনীত হয়। §

ইহার পর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বৌবাজারের দত্ত-বাড়ীতে একটি গীতাভিনয় হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'—উভয় পত্রিকাতেই এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। নীচে 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণটি উদ্ধৃত হইল :—

"···গত মঙ্গলবার কার্ত্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। শুদ্ধ যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। নট, নটী,

* "Ratnavali gitabh'naya. Based on Ramnarayana Tarkaratna's version of the Sanskrit Drama. By Harimohana Karmakara. pp. 2, 110. Cal. 1865."—*Catalogue of the Library of the India Office*, Vol. II, Pt. IV.

† "We acknowledged in our last issue the receipt of *Sakontol'ah* by Baboo Unodapersad Barerjee. This is the first Opera in Bengalee. It has been written in a simple and elegant style, and the interest is well sustained throughout. The songs are appropriate and exquisite. We had the pleasure of witnessing the performance more than once, and we must say that it did credit to those who were engaged in it. We hope the Opera will supersede the degenerate *jattra*."—The *Hindoo Patriot* for May 22, 1865.

‡ খুব সম্ভব ইহা 'নবপ্রবন্ধ' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক তিনকড়ি ঘোষাল কৃত 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়'। ১৮৬৭ সনের নভেম্বর মাসের 'নবপ্রবন্ধে' ইহার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

§ সংবাদ প্রভাকর—২৭ নভেম্বর ১৮৬৫।

বিদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব্ববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগত্তৃপ্তিকর সঙ্গীত বিদ্যার নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" *

ইহার কয়েক দিন পরেই আরও দুইবার 'পদ্মাবতী'র গীতাভিনয় হওয়ার সংবাদ আমরা পাই,—একবার বৌবাজারের দত্ত-বাড়ীতে ২৫এ নভেম্বর তারিখে, † এবং আর একবার তালতলার রামধন ঘোষের বাড়ীতে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে। ‡ একই দল দুই যায়গায় অভিনয় করিয়াছিল।

সে-যুগে আর একখানি গীতিকা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহা হরিমোহন কর্ম্মকারের 'জানকী-বিলাপ'। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল ৮৬৭ সন। § 'মানিনী' গীতিকায় (১৮৭৫ খৃঃ) হরিমোহন রায় (কর্ম্মকার) লিখিয়াছেন :—

> 'অপারা', অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল, আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ 'অপারার' আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই।

বাগবাজার এমেচার থিয়েটার

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে সকল নাট্যশালার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একটি নাট্যশালার উল্লেখ করা হয় নাই। সেটিই অবশেষে কলিকাতার প্রথম পেশাদারী নাট্যশালায় পরিণত হয়। উহার নাম—বাগবাজার এমেচার থিয়েটার। সে যুগে কলিকাতার চারিদিকে যখন নাট্যাভিনয় হইতেছিল, তখন বাগবাজারের জনকয়েক যুবকের মনেও নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা জাগে। ইঁহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সকলেই পরবর্ত্তী কালে অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাগবাজারের সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তমী-পূজার রাত্রিতে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে এই অভিনয় হয়। সে দিন অভিনয় তেমন ভাল হয় নাই, সেজন্য নূতন আয়োজনের পর পরবর্ত্তী কোজাগর-পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে আর একটি অভিনয় হয়; এই অভিনয় দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন। পর-বৎসর শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়; দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন। ইহা ছাড়া এই দল আরও দুইবার 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিয়াছিলেন।

'সধবার একাদশী'র অভিনয় শেষ করিয়া বাগবাজারের সখের দল তখন লীলাবতী নাটকের মহলা দিতেছিলেন। এমন সময় চুঁচুড়ায় লীলাবতী নাটকাভিনয়ের সুখ্যাতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় বাহির হইল। অর্দ্ধেন্দু, গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর প্রভৃতি সকলেই বিশেষ উদ্যমের সহিত লাগিয়া গেলেন—অভিনয়-পারিপাট্যে চুঁচুড়ার দলকে

---

* 'The opera was preceded by a play on the pianoforte by the trained but gentle hands of Mrs. Berigny. At about one in the morning commenced the opera. The concert which inaugurated the performance was excellent; in fact it reminded us of the Belgachia orchestra. Then began the play…the actors acquitted themselves on the whole successfully and creditably. This we can say boldly and sincerely that of the three dramas which have been popularized in the form of opera, the performance of *Puddabuttee* was decidedly the best and most successful."—*The Hindoo Patriot* for November 20, 1865.

† সংবাদ প্রভাকর—২৭এ নভেম্বর ১৮৬৫।

‡ সংবাদ প্রভাকর— ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৬৫।

§ 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রে (১৯২৩ সংবৎ, ৪৩ খণ্ড, পৃ. ১১১) ১৮৬৭ সনে (?) লিখিত হইয়াছিল :—

'জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়' ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়' নামক দুইখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকার রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়' খানি 'সিমুলিয়া সখের যাত্রা কোম্পানী দ্বারা' প্রকাশিত ও অভিনয়কৃত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সম্প্রতি 'জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়' প্রস্তুত করত শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। বোধ করি, উক্ত মহোদয়ের বাটীতে ইহা অভিনয়িত হইবে।"

হারাইতে হইবে। তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯)। রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল—শ্যামবাজারে রাজেন্দ্র পালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে। এই অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী-লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এই অভিনয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে দেখিতে পাই :—

"বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা আছে। আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি, টিকিট প্রাপ্ত ও অনুরুদ্ধ হইয়াও দর্শন করিতে যাইতে পারি নাই। অস্থি চর্ণকারী ডেঙ্গুজ্বরের অবশিষ্ট পরাক্রমই আমাদের এ সুখের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। শুনিলাম বঙ্গভূমি সুসজ্জিত ও অভিনয় কার্য্যটী সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রকার বিষয় প্রত্যক্ষ ব্যতীত বিশেষ রূপে সমালোচ্য হইতে পারে না। অভিনেতৃ সমাজ কিছু দিন পূর্ব্বে এই অভিনয় প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। এখন গ্রীষ্মরাজ ভীষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, প্রদর্শক ও দর্শক উভয় পক্ষেই প্রচুর কষ্ট।"

পর পর তিনটি শনিবারে লীলাবতী নাটক রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। ১২৭৯ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখের 'অতিরেক মধ্যস্থে' প্রকাশিত একটি পত্রে একটি অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"লীলাবতী নাটকাভিনয়।

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবসাবধি বাগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাঁহাদের অভিনয়ে কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও অদ্যাবধি যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহাদেরও এক্ষণে গণনা করিতে হইবে।

অভিনেতৃবর্গের মধ্যে হরবিলাসবাবু, ক্ষীরোদবাসিনী, ললিতমোহন, হেমচাঁদ, লীলাবতী, শ্রীনাথ, রঘুয়া, নদেরচাঁদ, শারদাসুন্দরী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রশংসাভাজন। হরবিলাসবাবু, ক্ষীরোদবাসিনী ও ললিতমোহনের ন্যায় অভিনেতা অতি বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

লীলাবতীর অভিনয় যদিও অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাহা অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার কতগুলিন পাঠ অতীব সুন্দর।

ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে, তচ্ছ্রবণে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ ও শ্রীনাথের বক্তৃতা ও রসিকতা শ্রোতৃবর্গের অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

নাটকোল্লিখিত কতকগুলিন কবিতা, বোধ হয়, অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত, কারণ অনেকে কবিতার প্রাচুর্য্য বশতঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

অভিনয়-ত্রয়-দিবসে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের সজ্জাতেই রঙ্গভূমির বহির্ভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য থাকে না। অভিনয়ের সময় বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আদ্যোপান্ত ভিতরে থাকিলেই ভাল হয়। অথবা অন্য বেশে বাহিরে আসা উচিত।

কলিকাতা ৮ আষাঢ়, ১২৭৯ সাল। কশ্চিৎ দর্শকঃ।"

স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, লীলাবতীর অভিনয়গুলি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হয়,—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নয়, এবং তখন এই দলের নাম ছিল,—শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। যে যে অভিনেতা যে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল,—

হরবিলাস ও দাসী	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
ক্ষীরোদবাসিনী	...	রাধামাধব কর
ললিতমোহন	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলাবতী	..	সুরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীনাথ	...	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঘু উড়িয়া	...	হিঙ্গুল খাঁ
নদেরচাঁদ	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শারদাসুন্দরী	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)
ভোলানাথ	...	মহেন্দ্রলাল বসু
মেজ খুড়ো	...	মতিলাল সুর
রাজলক্ষ্মী	...	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
যোগজীবন	...	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

উপরে যে পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লীলাবতীর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে (শুক্রবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত একখানি পত্রেও এই অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়। পত্রখানি হইতে তখনকার দিনের নাট্য-সমালোচনার একটা

ধারণা করা যায়, সে জন্য দীর্ঘ হইলেও সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল :—

"মহাশয়! বিগত ৩০শে বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটক শ্যামবাজারস্থ ৺বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটীতে অভিনীত হয়। কিছু দিন হইল চুঁচুড়াতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, কিন্তু তাহা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই। বাগবাজারস্থ কতকগুলি উৎসাহী যুবকবৃন্দের যত্নে উহার অভিনয় কার্য্য এখানে সম্পাদিত হইয়াছে।

রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দৃশ্য ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ, 'সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়' ও 'অনাথবন্ধুর মন্দির' এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ ভোলানাথ চৌধুরী নামধেয় জমীদার মহাশয়ের ভাগিনেয়দ্বয় নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের প্রবেশ দেখিলাম। উভয়েরই অভিনয় হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু গাত্র ঝাঁচড়ানি কিছু অধিক হইয়াছিল। হেমচাঁদের বক্তৃতা নদেরচাঁদের অপেক্ষা হাস্যজনক হইয়াছিল। হেমচাঁদের অভিনয় সকল সময়েই উত্তম হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী সারদাসুন্দরীর অভিনয় মনোহর বটে, কিন্তু বোধ হইল যেন তাহার ভালরূপ শিক্ষা হয় নাই। অনেক স্থলে অপ্রীতিকর হইয়াছিল। কর্ত্তা হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ উথলিয়া উচ্চহাস্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক এই জমীদার মহাশয়েতে তাহার সমস্তই বিদ্যমান ছিল। কি অঙ্গভঙ্গি, কি কথার পারিপাট্য, কি মধুর স্বর ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়।

তাঁহার শ্যালক শ্রীনাথ বাবুরও অভিনয় অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে মুখের ও কথার ভঙ্গিমাগুলি উত্তম হইয়াছিল। কর্ত্তার বধূমাতা দুঃখিনী ক্ষিরোদবাসিনীর অভিনয় আদ্য-অন্ত কোন স্থানেই সদোষ বোধ হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাহার দুঃখ শ্রবণে অনেক শ্রোতাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কথাবার্ত্তা অনেকটা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছিল। কর্ত্তার ভবনে প্রতিপালিত ললিতমোহনের অভিনয় অতি মনোহর হইয়াছিল, লীলাবতীর সহিত তাহার কথোপকথন ও নদেরচাঁদের প্রতি তাঁহার উপদেশ দান অতি উত্তম হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লীলাবতী ও ললিতমোহনের প্রেমালাপ অতি শ্রবণসুখকর বোধ হইয়াছিল। লীলাবতীর স্বপ্নবিবরণ অতি মনোহর হইয়াছিল, তাহার স্বর আরও একটুকু মধুর হইলে ভাল হইত, এবং তাহার অবয়বও কিছু দীর্ঘাকার বোধ হইয়াছিল।

ভোলানাথ বাবুর অভিনয় বড় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমোদ প্রমোদ কিছু বেশী হইয়াছিল। রঘুয়া ভৃত্যের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল; তাহাতে উড়িয়ার সকল প্রকৃতিগুলিনই বজায় ছিল। ব্রহ্মচারিদ্বয়ের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের অভিনয় অতি উত্তম হইয়াছিল, কোন অংশেই প্রায় সদোষ বোধ হয় নাই। সিদ্ধেশ্বর বাবুর অভিনয়ও প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় নাই। দর্শকবর্গ প্রায় কেহই তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পান নাই। দাসী পণ্ডিত এবং অন্যান্য অভিনায়কেরা শ্রোতৃবর্গের ভাল রূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘটক চূড়ামণির অভিনয় দর্শনে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন; তাঁহার কথোপকথন তাঁহার পদের ন্যায় যথার্থ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! সকলই প্রায় ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরচিত গীতগুলি ভালরূপে গীত হয় নাই; এবং তাহার দুই একটি বোধ হয় অশ্লীল বোধে বাদ দিলেও ভাল হইত।

আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটী 'দেশীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পাবেন, এবং দেশেরও অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।

১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ সাল। }
কলিকাতা। } কশ্চিৎ দর্শকঃ।"

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"লীলাবতী অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—ভূয়ো বঙ্কিম!" *

লীলাবতী নাটকের অভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় টিকিটের জন্য দলে দলে উমেদার আসিতে লাগিল—স্থানাভাবে অনেককেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। এই অবস্থায় টিকিটের দাম করিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব লইয়া দলের ভিতরে একটু মতান্তর হয়। অভিনয় দেখিবার জন্য টিকিট বিক্রী করা হউক—ইহা অনেকেরই মত ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, একটি ভাল বাড়ীতে ভাল রঙ্গমঞ্চ করিয়া তবে টিকিট বিক্রী করিলেই শোভন হয়, নচেৎ কেহই টিকিট কিনিতে চাহিবে না। উত্তরে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি বলেন যে, বড় বাড়ী ও ভাল রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন সাধারণভাবেই নাট্যশালার কায আরম্ভ করা উচিত।

* নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশ গ্রন্থাবলী, ৭ম ভাগ।

পরিশেষে শেষোক্ত মতই বজায় থাকে ও ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীর দোতলার হলে অভিনয়ের জন্য মহলা চলিতে থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অমৃতলাল বসু পাটনা হইতে আসিয়া এই দলে যোগদান করেন। এই দল জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর (ঘড়ীওয়ালা বাড়ী) একতলা ভাড়া করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের সহিত, 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামে কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যশালার সূত্রপাত করেন।

যে মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা দীনবন্ধু মিত্রের নিকট কতটা ঋণী, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্র হইতে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাপ্ত

* এই প্রবন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত কোন কোন অংশ বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন।

মধুরতা

সে কি শুধু কামিনীর কটাক্ষ কুহক?
ছিল না কি তাহে তার প্রাণের আহ্বান?
ললিত ছলনাকলা সুধাভরা ভাণ
জ্বালাইতে লালসার জ্বলন্ত নরক?

অতৃপ্ত প্রেমের মায়া এ তপ্ত-হৃদয়ে
মাধুরীর ছায়া ধরি গড়ে মরীচিকা
এই কামবদ্ধ দেহে তার শেষ শিখা
জ্বলিয়া হতেছে শেষ প্রেম দেবালয়ে।

দেবাশ্রিত সত্য প্রেম চাহে শুধু প্রাণ
কাম-অগ্নি উদ্দীপন চায় ভোগ-দেহ
ভালবাসি যদি তারে আমার এ স্নেহ
মোর দেবী পূজা নহে নরক সন্ধান।

তার স্মৃতি নহে শেল—প্রীতি নহে ব্যথা
হয়েছে মদনভস্ম প্রাণে মধুরতা।

৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ



একাদশ পরিচ্ছেদ

বিনতার দৌত্য

দু'দিন পরের কথা। মাখন টাল সামলাইয়াছে। ডাক্তাররা বলিলেন,—আর যদি কোনো উপসর্গ না ঘটে, তা হলে এ যাত্রায় রক্ষা পেলো!

দুশ্চিন্তার যে গুমট-ভাবে সারা গৃহ আচ্ছন্ন ছিল, সে ভাব ডাক্তারের এ কথায় কাটিল।

ডাক্তার আরো বলিলেন, নার্শটি চমৎকার। এত যত্ন, এমন দরদ—নার্শদের বড় দেখা যায় না।

প্রভাতের মা কহিলেন,—বাড়ীতে আছে যেন ঘরের মেয়ে! যা দাও, খাবে! যখন দাও, যেমন রাখো, সদাই প্রসন্ন মুখ! মেয়েটি বেশ!

বৈকালের দিকে বিনতা বেদানার রস করিতেছিল, প্রভাতের মা কহিলেন,—তুমি মা, একটু ফাঁকায় যাও, ছেলে তো ভালো আছে! ছাদে হাওয়া পাবে, একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

হাসিয়া বিনতা কহিল,—আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, মা···

প্রভাতের মা কহিলেন,—তা হলেও মানুষের শরীর! যাও দিকিনি, বাছা, কথা শোনো···

বিনতা কহিল,—আপনি যখন বলচেন, তখন যাবো বৈ কি। আগে এই বেদানার রসটুকু খাইয়ে দি। তার পর···এই অবধি বলিয়া বিনতা ঘড়ির দিকে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় স্পঞ্জিং করতে হবে। বেশ, আমি সাড়ে ছ'টায় আসবো।

প্রভাতের মা কহিলেন,—সাতটায় এসো।

বিনতা কহিল,—সাড়ে ছ'টায় এসে জলটা ফুটিয়ে নেবো, জলে আবার ভিনিগার ওডিকলোন মিশুতে হবে, তার পর জলের টেম্পারেচার নেবো।···আধ ঘণ্টা আগে না এলে হবে না, মা!

মা হাসিয়া কহিলেন,—তাই করো মা। সাড়ে ছটাতেই এসো।···

প্রভাতের মা ও খুড়িমা মাখনের কাছে বসিলেন, বিনতা রোগীকে বেদানার রস খাওয়াইয়া কাপ ধুইয়া তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল। ঘরের বাহিরে মস্ত টানা দালান। এই দালানের পর খানিকটা খোলা ছাদ। ছাদে আসিয়া বিনতা দেখে, একখানা চিঠি হাতে প্রভাত অত্যন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতেছে। তার মুখে-চোখে দারুণ উদ্বেগ!

বিনতা চকিতের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তার পর একেবারে প্রভাতের সামনে আসিয়া কহিল,—বেড়াতে যান্ নি যে!

প্রভাত চিন্তাকুল নেত্রে বিনতার পানে চাহিল, কোনো কথা কহিল না।

বিনতা তার চোখের সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল, কহিল,—কি ভাবচেন?

প্রভাত তেমনি দৃষ্টিতেই চাহিয়া রহিল। একটা চিন্তা তার বুকের কোণে আলোর রক্ত-বিন্দুর মত ফুটিয়া উঠিল।···এ কথা এ সময় কাহাকে জানাইবে? জানাইয়া পরামর্শ চাহিবে? অথচ, কি চকিত এ আহ্বান এবং এখনি সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া চাই! অনন্ত বেচারী একা চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়াছে!···

বিনতাকে যদি সব কথা খুলিয়া বলে? বিনতার যেটুকু

পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, বিনতা বুদ্ধিমতী এবং···

বিনতা কহিল,—আজ উনি ভালোই আছেন। ভাবনা অনেকখানি কেটেচে। শুনেচেন তো, ডাক্তার সাহেব কি বলে গেছেন ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত কহিল,—শুনেচি।

বিনতা বুঝিল, প্রভাতের চিন্তা লঘু নয়, মাখনের আরোগ্য-সম্ভাবনায় এতখানি আনন্দের মধ্যেও সে চিন্তা মনকে এতটুকু ছাড়িতে চায় না! কিসের এ চিন্তা ?···

বিনতা কহিল,—কি হয়েচে আপনার, বলুন দিকিনি ? এমন তো আপনাকে কখনো দেখিনি! সত্যি···

প্রভাত কহিল,—চিন্তার কারণ আছে, মিসেস সেন···

মৃদু হাস্যে বিনতা কহিল,—আবার মিসেস্ সেন বলচেন! আমিও বিলাত-ফেরত নই, আপনারাও নন্—বলেচি তো, সকলে যে নামে ডাকে, সেই বিনতা বলেই আমায় ডাকবেন। তাতে আমার মানের এতটুকু হানি হবে না!

থাকিয়া থাকিয়া বিনতা এই যে কেমন অন্তরঙ্গতার পরিচয় দেয়, ইহাতে প্রভাতের সারা মন অত্যন্ত উদ্বেল হইয়া ওঠে—তার সব কথা, সাহচর্য্যের সহজ ভাব কেমন যেন ইহাতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে!

প্রভাত কহিল—আপনার সময় আছে ? মানে, একটু অবসর···?

বিনতা কহিল—কেন বলুন তো ?

—তা হলে আপনাকে ব্যাপারটা বলতুম। বলে পরামর্শ চাইতুম···

—পরামর্শ! আনন্দে-গর্ব্বে বিনতার বুকখানা দুলিয়া উঠিল—চকিতের জন্য! তার পরামর্শ চাহিয়াছে প্রভাত··· বন্ধুর মত! একটা উদ্যত নিশ্বাস কোনোমতে রোধ করিয়া বিনতা কহিল- আমার বুদ্ধিতে কুলোয়, বেশ···সাধ্যমত পরামর্শ দেবো।

প্রভাত কহিল—মানে, একমাত্র মার কাছেই সব কথা বলতে পারতুম···কিন্তু মার সঙ্গে এখন এ পরামর্শ চলতে পারে না! অথচ নিজের বুদ্ধিতে ঠিক কুলিয়ে উঠচে না···

সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রভাত বিনতার পানে চাহিয়া রহিল।

বিনতা কহিল—বেশ, বলুন···

চারিদিকে চাহিয়া প্রভাত কহিল—কথাটা একটু গোপন···মানে, অন্য পরিবারের সম্ভ্রম এর সঙ্গে জড়িত। আপনিও এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না—আমার অনুরোধ!

কুতূহলী দৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য প্রভাতকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনতা কহিল—বেশ! এ বিশ্বাসটুকু আমায় করতে পারেন!

প্রভাত আবার চারিদিকে চাহিল, ছাদে কেহ নাই। আলিশার ধারে ধারে টবের রাশি···টবে নানা জাতীয় ফুলের গাছ, পাতাবাহার গাছ! দিন-শেষের স্নিগ্ধ বাতাসে তারা খেয়ালের ভরে মাথা দুলাইয়া খেলা করিতেছে।

প্রভাত কহিল—এইখানে তা হলে আলশেয় বসুন···

বিনতা বসিল। প্রভাতও তার সামনে বসিয়া পড়িল—বসিয়া লাটু-পরিবারের সহিত আলাপের কাহিনীটুকু সংক্ষেপে খুলিয়া বলিল,—নাম-ধাম অবশ্য গোপন রাখিল; তার পর সে দিন সন্ধ্যায় অনন্তকে পাঠাইয়া তার হেতুয়ায় প্রতীক্ষা করার কথা···কিন্তু অকস্মাৎ এখানকার টেলিগ্রাম ও বিনতাকে লইয়া তার চলিয়া আসার ফাঁকে যা ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া অনন্তর চিঠিখানা বিনতার হাতে দিয়া প্রভাত কহিল—এই চিঠি পড়ুন। পড়ে কি কর্ত্তব্য, আমায় বলুন!

বিনতা সকৌতূহলে চিঠি হাতে লইয়া দু'চারি ছত্র পড়িবামাত্র চমকিয়া উঠিল···! সে চোখ তুলিয়া প্রভাতের পানে চাহিল—প্রভাতের দৃষ্টি তাহারি পানে! বিনতা আবার চিঠি পড়িতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে বিনতা প্রশ্ন করিল,—আমায় কি করতে হবে ?

প্রভাত কহিল—কি উপায় করা যেতে পারে ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টি প্রভাতের মুখে নিবদ্ধ করিয়া বিনতা কহিল—আমি কি উপায় বলতে পারি ?

প্রভাত কহিল- মানে, আমার কি করা উচিত ?

বিনতা কহিল,—টাকা দিন।

প্রভাত ভ্রূ কুঞ্চিত করিল,—তার পর কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—কিন্তু এ তো দু'শো এক'শো টাকা নয়! বহু টাকা—হয় তো দু' হাজার পাঁচ হাজার! এ টাকা কোথা থেকে কি করে পাবো, বলুন তো ?

বিনতা সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রভাতের পানে চাহিয়াছিল, তার সে উদ্বেগ লক্ষ্য করিল।

সে কহিল,—বাড়ীতে বলুন···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত কহিল,—ওঁরা হেসে উড়িয়ে দেবেন। কোথাকার কে···দু'দিনের আলাপ···

বিনতা কহিল,—তা হলে আর কি উপায় আপনি করবেন!

প্রভাতের অস্বস্তি ধরিল। এমন বিপদে পরামর্শ চাহিয়া তাহা না পাইলে অস্বস্তি ধরা স্বাভাবিক! সে কহিল,—এক কাজ করতে পারেন?

—কি?

—মার কাছে আপনি কোনো রকমে কথাটা পাড়তে পারেন না? মানে, একটু গুছিয়ে···

বিনতা কহিল,—আমি?

- হ্যাঁ। কুতূহলী দৃষ্টিতে প্রভাত বিনতার পানে চাহিল।

বিনতা কহিল,—আমি হঠাৎ এ কথা কি বলে তুলবো?···না, না···

প্রভাত কহিল,—আপনি যেন চিঠিখানা দেখেচেন···

বিনতার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। বিনতা কহিল,—সে কি আমার পক্ষে ভদ্রতা হবে! ওঁরা কি ভাববেন না, মাহিনা-করা নার্শ বাড়ীর বাবুদের চিঠি হাতড়ে বেড়ায় কি স্পর্দ্ধায়!

এ কথাটা প্রভাতের মাথায় আসে নাই! প্রভাত কহিল,—তা বটে!···আবার তার অস্থিরতা বাড়িল, সে অধীরভাবে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

বিনতা তাকে লক্ষ্য করিতেছিল। একটা দুষ্ট বুদ্ধি, না খেয়াল তার মাথায় উদয় হইল। বিনতা কহিল,—আর একটা উপায় করতে পারেন?

তৃপ্তির নিশ্বাস! অধীর আগ্রহে প্রভাত কহিল,—কি বলুন তো?

বিনতা কহিল,—মেয়েটিকে রক্ষার একটি মাত্র উপায় আছে। মেয়েটিকে রক্ষা করাই প্রধান কাজ। তা সে উপায়···

কি উপায়?···প্রভাতের স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ যেন বিদ্যুৎ-শিখার মত তীব্র হইয়া উঠিল!

বিনতা কহিল,—তাকে বিবাহ করা!

বিবাহ! প্রভাতের বুক কাঁপিয়া উঠিল।···শরীরের সমগ্র রক্ত চকিতে গিয়া মাথায় উঠিল, মুখ বিবর্ণ! যেন সে কত বড় অপরাধ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে—এমনি ভাব!

সবলে মাথা নাড়িয়া সে কহিল,—না, না। এ আপনি কি বলচেন, মিসেস সেন···

কথাটা বলিয়া বিনতার পানে সে চাহিল—দৃষ্টি সরিয়া গেল, চাহিতে পারিল না!···সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসহ্য ঠেকিতেছিল। সে অধীরভাবে ছাদ হইতে চলিয়া গেল। বিনতা তার পানে চাহিয়া রহিল, তার দৃষ্টি উদাস!

বাহিরে গোধূলির আলোর উপর সন্ধ্যার কালো পর্দ্দা ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মত নামিয়া আসিতেছিল!···

তখন অনেক রাত্রি। প্রভাতের চোখে ঘুম নাই! বিছানায় চক্ষু মুদিয়া সে শুইয়াছিল। অনেক কথা ভাবিতেছিল! কলিকাতায় কি যে ঘটিতেছে! যাইবার জন্য চঞ্চলতার সীমা নাই, কিন্তু কি করিয়া যায়? মাখনের এই অসুখ···তা ছাড়া সে গিয়া তাঁদের এ বিপদে কি সাহায্যই বা করিতে পারে! মূর্ত্তিখানা লইয়া তাঁদের সামনে উদয় হইলেই তাঁদের দুঃখ ঘুচিবে না!···

বিনতার কথা মনে পড়িল। বিবাহ!···সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!···কি করিয়া তা হয়? ওঁরা কেমন লোক, জানা নাই। বাড়ীতে এঁরা রাজী হইবেন কেন? তাও যদি হন্···

কিন্তু না হওয়ার আশঙ্কাই বেশী! সে তো জানে, বিবাহের ব্যাপারে কত সব জটিল তত্ত্বের আলোচনা চলে, বিশেষ তাদের ঘরে! সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তার কোনো আভাস না পাইলে এ ব্যাপার লইয়া কোনো কলরব তোলা—সে চিন্তাতেও প্রভাত যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল! চারিদিকে সকলের দৃষ্টি এমন কৌতুক, এমন বিশ্রী কৌতূহলে ভরিয়া উঠিবে, সে দৃষ্টির স্মৃতি অবধি যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত মনে বিঁধিয়া ধরিল!···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিল, সবলে মনকে কহিল,—না, ও চিন্তা আর নয়। ও চিন্তায় কোনো ফল নাই!···

সহসা খুট্ করিয়া একটা শব্দ !···স্পষ্ট !

চোখ খুলিয়া প্রভাত কহিল,—কে ?

—আমি !···ল্যাভেণ্ডারের শিশি নিতে এসেছিলুম।

এ বিনতার স্বর ! প্রভাত উঠিয়া বসিল, কহিল,—আলো জ্বালেন নি কেন ? অন্ধকারে···

বিনতা কহিল,—আলো জ্বাল্‌লে যদি আপনার ঘুম ভেঙ্গে যায়···তাই জ্বালিনি !

প্রভাত কহিল,—আমি ঘুমোই নি···

—ঘুমোন নি !···দিয়াশলাইটা কোথায়, বলুন তো ?

—কেন ?

—আলো জ্বালি।···

—টেবিলের উপর বাতি আর দিয়াশলাই আছে।

বিনতা বাতি জ্বালিল, জ্বালিয়া কহিল,—কেন ঘুম হচ্ছে না, বলুন তো ? কোনো অসুখ করে নি ?

বিনতা খাটের কাছে আসিয়া প্রভাতের পানে চাহিল। প্রভাতের দৃষ্টি উদাস !

প্রভাত কহিল,—ভালো কথা, না—সে বিষয়ে কোনো উপায় স্থির করতে পারলেন না ?

বিনতা কহিল,—মার কাছে আমি এক রকম করে কথাটা পেড়েছিলুম···

প্রভাত তীব্র আগ্রহে বিনতার পানে চাহিল।

বিনতা কহিল,—এমনি কথায় কথায় বললুম, আমাদের ওখানে একটি ভদ্রলোক আছেন, এক কালে খুব ভালো অবস্থা ছিল, এখন গরীব হয়ে পড়েচেন। তাঁদের একটি মাত্র মেয়ে, চমৎকার মেয়ে,—রূপে-গুণে তুলনা নেই। মেয়েটি ডাগর হয়েচে। বিয়ে না দিলে নয়। কিন্তু পাত্র পাচ্ছেন না, পয়সা নেই বলে !···এক বুড়োর হাতে বুঝি সে মেয়েকে দিতে হয় !···যদি প্রভাত বাবুর সঙ্গে···

কথাটা বলিয়া বিনতা চুপ করিল।

প্রভাত কহিল,—মা কি বললেন ?

বিনতা কহিল,—মা বললেন, বেশ তো মা, মাখনের অসুখ সারুক, তুমি কলকাতায় ফিরে কথাবার্ত্তা কয়ো। বেশ তো, তুমি যখন মেয়ে পছন্দ করচো, ভালো, ত্যাখো।

প্রভাত বিনতার পানে চাহিয়াছিল, বিনতার মুখে হাসির ঝিলিক !

তার লজ্জা বোধ হইল। সে কহিল,—আপনি এত কথা বলেচেন ?

বিনতা সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, এবং বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিল,—কেন ? অন্যায় করেচি ?

প্রভাত কহিল,—না। মানে, তাঁরা তো এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না ! তা ছাড়া আমি···বিবাহ···

বিনতা কহিল,—তা হলে তো অন্যায় হয়েচে। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি !···তা বেশ, এ বিষয়ে কোনো কথা আর না কইলেই চলবে !

প্রভাত কহিল,—না, না, তা বলচি না। তবে তাঁদের যে রকম বিপদ চলছে, সে বিপদ থেকে মুক্তি কি-ভাবে মিলতে পারে, তা ঠিক এখানে বসে বুঝতে পারচি না।

বিনতা কহিল,—আপনার বন্ধুকে লিখুন না, কি হলো ! তার পর নয় ভেবে দেখবেন !···

প্রভাত কহিল,—এ কথা মন্দ নয় !···

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রিতা লতা

পরিমলের মনের গতি দেখিয়া অনন্ত প্রমাদ গণিল। এই আসন্ন বিপদ—এ কি তার জিদ ! নিজের উপর আরও রাগ ধরিল। কি বলিয়া এমন অসহায় সে ইহাদের এ ব্যাপারে মাথা গলাইতে আসিল ! তবু আসিয়া যখন পড়িয়াছে, এখন ফেরা চলে না !

মিনতি জানাইয়া অনন্ত কহিল,—ঘণ্টা দুই সময় আমায় দিন। আমি কি করতে পারি, দেখুন। আর মা-বাপের উপর আপনার এ অভিমান খুবই স্বাভাবিক। আমি হলেও এই কথা বলতুম। তবু আমি যে কাল থেকে এতখানি ছুটোছুটি করচি, সে খাতিরেও নয় আমার অনুরোধ রাখলেন···

অশ্রুমুখী পরিমল কহিল,—কি অনুরোধ, বলুন ?

অনন্ত কহিল,—আমায় দু'ঘণ্টা সময় দিন। একটু আশ্রয়···তার পর আপনি ভেবে দেখুন—তখন যা করবেন, আমি তাতে বাধা দেবো না !

চোখের জল মুছিয়া পরিমল কহিল,—এ আশ্রয় আপনার বাড়ীতে ?



তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস

বসুমতী-চিত্রবিভাগ

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

—যদি তাই হয় ?

—না। লোকালয়ে কারো সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না। আপনার বাড়ীতে হয় তো দরদ পাবো, স্নেহও। কিন্তু ঐ দরদই আমার পক্ষে এ অবস্থায় গ্রহণ করা শক্ত হবে। বিশেষ আপনার বাড়ীতে শুধু আপনার মা আর আপনিই থাকেন না! আরও পাঁচ জন আছেন। তাঁদের আহা-উহু কথার সামনে আমি দাঁড়াবো না, দাঁড়াতে পারবো না! বলিতে বলিতে রুদ্ধ অভিমানের অশ্রু আবার তার দুই চোখে উথলিয়া উঠিল।

অনন্ত কহিল,—বেশ, আমার বাড়ীতে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি যদি অন্য ব্যবস্থা করতে পারি?

পরিমল কহিল,—কিন্তু কেন নিজেকে এত দায়ে বিব্রত করবেন, বলুন তো?

অনন্তর রাগ ধরিল, সাধ করিয়া কি সে বিব্রত হইতেছে! যেমন কাজ করিয়াছে, তার ফল ভোগ করিবে বৈ কি!

কিন্তু ঐ বিষাদময়ী তরুণী···সে কথা মুখে বলিতে পারিল না। শুধু বলিল, এ আমার কর্ত্তব্য বলে বুঝেচি, তাই!···গল্প-উপন্যাসে পড়া অনেক বড় বড় কথা তার মনে জাগিয়া উঠিল। ভাবিল, সেই সব কথা বলিয়া খুব একটা করুণ দৃশ্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে। রাগও তার বাড়িয়া ছিল তীব্র রকম,—নিজের উপর, লাটু-গৃহিণীর উপর! সরিয়া দিব্য দায় এড়াইলেন, চিঠিতে একেবারে স্বামি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন! স্বার্থপর!

পরিমল আবার চোখের জল মুছিল; মুছিয়া কহিল,—কোথায় নিয়ে যাবেন, শুনি? তাতে খরচ আছে···

মনের জ্বালা কোনোমতে মনে চাপিয়া অনন্ত কহিল,- আমি একেবারে নিঃস্ব নই!

—কিন্তু কত দিন এমন···

অনন্ত কহিল,—দু'দিন! দু'দিন শুধু! তার মধ্যে চিন্তা করে উপায় স্থির করবেন'খন! এখানে তা বলে থাকা চলে না!···মানুষ যদি আত্মরক্ষায় তৎপর না হয়, সে তার দুর্বুদ্ধি। এ দুর্ব্বুদ্ধির বশে যা-তা করে বসবেন না—এর পরে হয়তো অনুতাপের সীমা থাকবে না।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত স্খলিত স্বরে পরিমল কহিল,—বেশ, আপনার কথাই রাখবো!

—দু'ঘণ্টার বেশী দেরী আমার হবে না।

অনন্ত বাহির হইয়া গেল। তার ভাগ্য ভালো, পথে বাহির হইতে রিক্‌শ মিলিল। রিক্‌শয় চড়িয়া প্রথমে সে গেল গৃহে। কাল রাত্রি হইতে বুকে বেদনা বহিয়া মা বসিয়া আছেন!

গৃহে ফিরিতে কাকার সঙ্গে দেখা। কাকা কহিলেন,—রাত্রে কোথায় ছিলে?

পথে জবাবটা আগে হইতেই অনন্ত স্থির করিয়া লইয়াছিল। বিনা-দ্বিধায় সে জবাব দিল,—একটি বন্ধুর অসুখ হয়েচে। একলা এখানে থাকে। সেই খপর পেয়ে গেছলুম—

জবাব শুনিয়া কাকা চুপ করিলেন।

অনন্ত গিয়া মার কাছে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া মা কহিলেন,—এ বাড়ীতে তো আনতে পারবি না। যে সব লোক!

অনন্ত কহিল,—তিনি তা আসতেও চান্ না।

—তবে? পরের সোমত্ত মেয়ে—কোথায় তাকে রাখবি, বাবা! মার চোখের সামনে বিপদের পাথার উত্তাল তরঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

অনন্ত কহিল,—কিছু টাকা দিতে পারো? দু'দিনের জন্য তা হলে একটু জিরেন মেলে। তার পর আমার দু'চার জন বন্ধুকেও বলি—তারা যদি তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পারে।

মা কহিলেন,—টাকা কতই বা দিতে পারি। গোটা পনেরো হবে।

—তাই দাও মা···

—তুই চান্‌টান কর্···কিছু খা···

অনন্ত কহিল,—সময় নেই মা। এ আঘাত তাঁর যে রকম বেজেচে, তাতে আত্মহত্যা বিচিত্র হবে না।

মা পনেরোটা টাকা আনিয়া অনন্তর হাতে দিলেন, কহিলেন,—শীগ্‌গির ফিরিস বাবা—আমার মন পড়ে থাকবে পথে তোর উপর!···

অনন্ত দাঁড়াইল না, টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পথে আসিয়া সে ভাবিল, পনেরোটা মাত্র টাকা—এ কতটুকু বা সম্বল! দু'চারি জন বন্ধুর কাছ হইতে আরো দু' দশ টাকা ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা সম্বল লইয়া সে বাগমারিতে ফিরিল।

পরিমল ততক্ষণে মুখ-হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে।

অনন্ত কহিল,—গাড়ী ডেকে আনি···এবং একটু আস্তানা দেখি।

—এখনও ঠিক হয় নি?

অনন্ত কহিল,—ঢ' ঘণ্টা টাইম দিয়ে গেছি। কাজেই সে সময়ের মধ্যে আসা চাই তো।

অনন্ত আবার বাহির হইয়া গেল, এবং ফিরিল ঘণ্টাখানেক পরে। ফিরিয়া কহিল,—গাড়ী এনেচি। বাড়ীও পেয়েচি। পুলের দক্ষিণে গলির মুখে ছোট্ট একতলা বাড়ী···

পরিমল কহিল,—চলুন···

অনন্ত কহিল,—জিনিস-পত্র ফেলে রেখে যাবো?

—থাক্ গে। নেবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—সে পাসণ্ডকে দিয়ে যাই কেন?···

অনন্ত কাপড়-চোপড় এবং খুচরা যাহা কিছু পাইল, সংগ্রহ করিয়া গাড়ীতে চাপাইল, চাপাইয়া পরিমলকে লইয়া নূতন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরিমল অবাক্ হইয়া গেল, একটা দাসী অবধি অনন্ত ইহার মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে!

অনন্ত কহিল,—খাবার কিনে আনি।···তার পর ওবেলায় সব ব্যবস্থা হবে!···ভালো কথা, আপনি রাঁধতে জানেন? না, একটা বামুনের ব্যবস্থা করি···

পরিমল কহিল,—বামুনের দরকার নেই। আমি রাঁধবো।···

অনন্ত কহিল,—একটা কুকার কিনে আনি—হাঙ্গাম কম হবে।

পরিমল কহিল,—কেন মিছে বাজে খরচ করবেন!

—বাজে নয়, খুব কাজে লাগবে!···

বেলা প্রায় দশটা। অনন্ত বিদায় লইল। গৃহে ফেরা চাই, বলিয়া গেল, হুটা-তিনটার মধ্যে ফিরিবে।···

বৈকালের মধ্যে ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। কুকার আসিল, সেই সঙ্গে চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী।··· দাসীটি পাকা। সেই বাজার করিয়া আনিল। শুইবার খাটও একখানা জোগাড় হইল। অনন্ত গিয়া বাগমারির বাগান হইতে বিছানা-পত্র—কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার, অর্গান প্রভৃতি আনিয়া ছোট বাড়ীখানিকে ভরাইয়া দিল।

পরিমল কহিল—রাত্রে কিন্তু আপনার নেমন্তন্ন—এইখানে খাবেন।···

অনন্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল—রাত্রি হইতে বিলম্ব নাই। পরিমলের গৃহের চৌকিদারী কে করিবে···এ চিন্তা কাঁটার মত তাকে বিঁধিতেছিল।···

আহার এইখানেই করিতে হইল। কুকারে ভাত, ডাল, ঝোল···

তৃপ্তিভরে আহার-কার্য্য চুকিলে, পরিমল কহিল—এবার বাড়ী যাবেন তো?

অনন্ত কহিল—আপনি একলা থাকবেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পরিমল কহিল—তা ছাড়া উপায় কি, বলুন? এ অনুগ্রহ যদি আপনি না করতেন, তা হলে তো পথে দাঁড়াতুম! তখন?

সে স্বরে কি বেদনা!

অনন্ত কহিল,—আমি বাড়ী গিয়ে বলে আসি—আমিও রাত্রে এইখানে থাকবো।···

বিস্ময়-ভরা স্বরে পরিমল কহিল,—বাড়ীতে কি বলবেন?

অনন্ত কহিল,—মাকে বুঝিয়ে বলে আসবো ঠিক···মা নিশ্চিন্ত হবেন।···

পাশাপাশি হুটা ঘর। বিছানার অভাব ঘটে নাই। হু'জনে হু' ঘরে শয়ন করিল।···

এমনি ভাবে হু'দিন কাটিল। অনন্ত সকালে বাহির হইয়া যায়—গৃহে স্নানাহার করিয়া কলেজে বাহির হয়, কলেজ হইতে গৃহে ফিরিয়া মার সঙ্গে হুটা কথা কহিয়া আবার এখানে আসে। মা সত্য কথা জানেন। আর সকলে জানে, বন্ধুর অসুখে তার গৃহেই বাধ্য হইয়া অনন্তকে হাজিরা দিতে হইতেছে!···

চার দিনের দিন। বেলা দশটা। অনন্ত স্নান করিতে গিয়াছে। দেবর আসিয়া ডাকিল,—বড় বৌ—

মা কহিলেন,—কেন?

—ছেলেকে মোটে দেখচো না! ও যে বিগড়ুতে বসেচে!

মার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মা দেবরের পানে চাহিলেন···

দেবর কহিলেন,—আমাদের পাড়ায় লাটু বাবু ছিল, জানো? তার এক মেয়ে···বেশ ডাগর মেয়ে। সেই মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনন্ত বাবু কাল মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। আমার এক বন্ধু দেখেচে, সকালে এসে আমায় বলে গেল!···

মা কোনো কথা কহিলেন না।

দেবর কহিলেন,—ওরা লোক ভালো নয়। একটি স্ত্রীলোক আছে, তাকে স্ত্রীর পরিচয়ে চালিয়ে বেড়ায়··· কিন্তু সে স্ত্রী নয়—লাটু বাবুর রক্ষিতা! কথাটা এ পাড়ায় প্রকাশ পেতে ওরা পাড়া ছেড়ে পালায়।

কথার শেষাংশটুকু মার কাণে গেল না। তাঁর চোখের সামনে আলো নিবিয়া গেল। মার পা কাঁপিল। কোনো মতে দেওয়াল ধরিয়া সেইখানে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দিবা-স্বপ্ন

দুপুরে কি আজ এসেছিল ঘুম? ভাল তো পড়ে না মনে,
তবে এই সব কি দেখিনু আজ—স্বপনে না জাগরণে!
মিছে নয় বোন্! এই এইখানে আমার শিয়রে হেথা,
দেখিলাম তাঁরে কাঁদিতে নীরবে, বুকেতে কি যেন ব্যথা!

এমন সত্য কেমন করিয়া মিছে হয়ে যায় ভাই,—
দেখ্ দেখি এই শিয়রে তাঁহার পরশ কি লেগে নাই?
রোগের যাতনা ভুলে গিয়েছিনু,—সব কথা মনে আছে,
চোখে তাঁর জল—দেখিনু নীরবে বসিয়া মাথার কাছে।
হাতখানি হাতে নিয়ে কহিলাম,—"মুখপানে চেয়ে মোর—
এ কি এ কি তব আঁখি-পল্লবে কেন এ বিষাদ-লোর!
এ কি উদ্বেগ—এ কি কাতরতা—বুক-ভরা সংশয়—
আমার লাগিয়া তোমার চক্ষে অশ্রুর ধারা বয়!
অসুখ হয়েছে? এমন ধারা সে অসুখ হয় না কার—
কি আছে তুচ্ছ এরি তরে তবে এত বেশী ভাবনার!
এরো চেয়ে বেশী চিন্তা তোমার আজি যে রয়েছে হায়,
এগ্জামিনের দেরী আর—সাঁ সাঁ ক'রে দিন যায়!
তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লে এলে কেন—দেখেছ দুস্বপন?
তোমরাও ছাই বিশ্বাস কর? হায় রে অন্ধ মন!
না-না—তুমি যাও—এমন করিলে দুষিবে পাড়ার লোক,
দু'চার দিনেই ভাল হয়ে যাব,—ও কি—ফের মোছে চোখ!
এই ক'টা দিন ভুলে থাক মোরে,—এই কটা দিন আর,
মনে ভাব শুধু,—'বেলা' ব'লে কেউ কোথা নাই দুনিয়ার!
মাথা খাও মোর মুখ রাখ শুধু—পড়ায় ক'রো না হেলা,
'বড়দি'র কাছে বাজি রেখেছি যে সে দিন সন্ধ্যাবেলা!
দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে—কামনা করেছি কত,
'পাশ' হয়ে তুমি মুখ রাখ মোর—ক'রো নাক আশাহত!
তোমারি লাগিয়া কত বঞ্চনা করেছি যে মোরে নিজে,
আমি জানি সব—ভাবিতে সে কথা আঁখি দুটি আসে ভিজে!
কত না সাধের আশার কুসুম কুঁড়িতে ছিঁড়েছি হায়—
তন্দ্রাবিহীনা কত না রাত্রি কেটে গেছে বেদনায়।
সুখের বেদনা সে সব আমার ফুল হয়ে ফোটে যেন,
অনেক সয়েছি—কটা দিন আর কষ্টে সহিব কেন!"
চিঠি আছে ব'লে কে যেন সহসা গেল জোরে কড়া নাড়ি,
তার পর দেখি, হাতে হাত নাই—হয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি।
জেগে কি ঘুমায়ে—বুঝিতে নারিনু,—তবে এ কিসের ঘোর—
আর কোনো দিন দেখেছিস্ বোন্ এত ভুল হ'তে মোর?

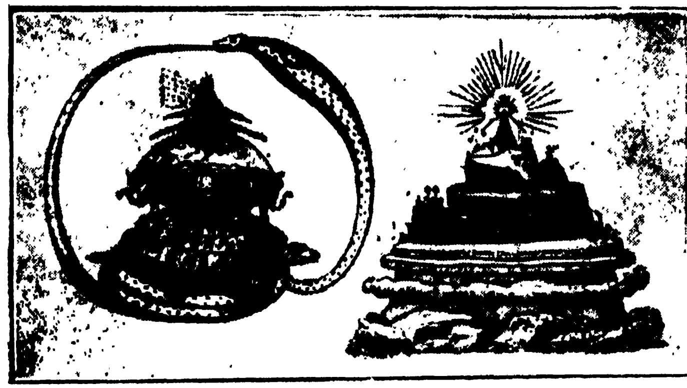
দিনের স্বপন? আহা তাই হোক—স্বপনে ডুবিয়া রই—
অষুধ এনেছ! ঘুমের অষুধ? কই—বোন্—কই—কই!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ)।

প্রাচীন ফরাসী-গ্রন্থে ভারতীয় চিত্র

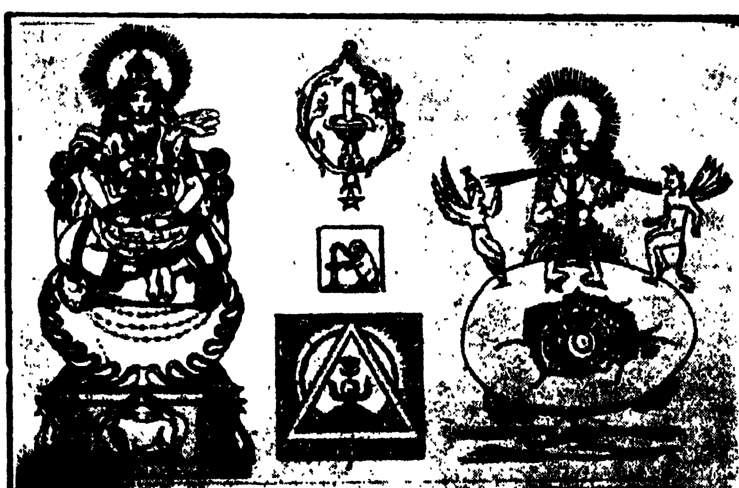
দুই বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিনের 'মাসিক বসুমতীতে' "প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র" নাম দিয়া প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলাম। হিন্দুর অসংখ্য দেবতার মধ্যে আমরা সচরাচর কতিপয়ের প্রতিমা বা ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে অল্প কতকগুলি কাল্পনিক চিত্র মাত্র দেখিতে পাই। ধ্যানের সহিত সে সকলের কতদূর মিল আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কদাচিৎ কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেও তদ্বোক্ত দেবদেবীর ছবি পাওয়া যায়। * কিন্তু সে সকলের তুলনায় কতিপয় পুরাতন পাশ্চাত্য গ্রন্থে বহুসংখ্যক দেবদেবীর চিত্র দেখা যায়। বলা বাহুল্য, সে সকল কাল্পনিক ছবির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্যোদ্দীপক পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইলেও, সেই সকল গ্রন্থের কল্যাণে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবদেবীর ছবিও দেখিবার সুযোগ হয়।

Voyage aux Indes Orientales et a la Chine (Toma Premier) নামক ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং Inde par M. Dnbois de gangigny নামক ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থদ্বয়ে ভারতবর্ষসংক্রান্ত বহু বিষয়ের বহু চিত্রমধ্যে ভারতের দেবদেবী ও ধর্ম্মবিষয়ক কতিপয় এবং সেকালের ভারতীয় শ্রমশিল্পী প্রভৃতির কতিপয় চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিলিপি দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ভূষিত করিলাম।



১ম চিত্র—সপ্ত স্বর্গ

প্রথম চিত্রখানি হিন্দুদের সপ্ত স্বর্গের যে ধারণা, ইহা তাহারই পরিকল্পনা। সর্প, কূর্ম্ম, হস্তী এই স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছে। এ দেশীয় পরিকল্পনায় এই সপ্ত স্বর্গের চিত্র কখন অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।



২য় চিত্র—ব্রহ্মার সৃষ্টি-প্রকরণ

দ্বিতীয় চিত্রে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়—যথা, ব্রহ্মার সৃষ্টি, ত্রিমূর্ত্তি, প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতির প্রতীক অতীব সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। ইহার সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

---

* ১৩৩১ সালের ফাল্গুনের "বঙ্গ-বাণীতে' মল্লিখিত "ওপ্রোভ দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধে এইরূপ অনেকগুলি ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল।



৩য় চিত্র—যাগ-যজ্ঞের যন্ত্রাদি



৪র্থ চিত্র—কৃষ্ণ অবতার

তৃতীয় চিত্রে যাগযজ্ঞ ও হোমাদিকার্য্যে যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত, তাহার ছবি আছে। ইহার বহু কারুকার্য্যময় সুন্দর গঠন দৃষ্টে প্রাচীন যুগের ধাতু-শিল্পের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে একটা বেশ ধারণা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত তিনখানি চিত্রের বিষয় বাঙ্গালা ভাষার কোন পুস্তকে আছে কি না সন্দেহ।

চতুর্থসংখ্যক চিত্র হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত সকল চিত্রই অবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর। এ সকল বিষয়ের চিত্র অনেক স্থলেই দেখা যায়, কিন্তু কতকগুলি কিছু অভিনব। চতুর্থ চিত্রের বিষয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ অবতার। ইহা বাঙ্গালার কৃষ্ণ নহে, মুরলীধারী, কিন্তু দ্বিভুজ নহে, চতুর্ভুজ, অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন। বংশীধ্বনি-শ্রবণে বনের হিংস্র জন্তুও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর বামদিকে যুক্তকরে যষ্টি হস্তে হিন্দুস্থানী ভিখারীর ন্যায় এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অবিকল এইরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। তাহাতে অনুমান হয়, এই কল্পনার মুল একই। পঞ্চম চিত্র শ্রীশ্রীরাম অবতার। ধনুর্ব্বাণ হস্তে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, পার্শ্বে হনু-মান্। ইহার মধ্যে অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। ষষ্ঠ চিত্রে শ্রীশ্রীবলরামের একখানি সুন্দর দেবভাবপূর্ণ ছবি। সপ্তম চিত্রে কল্কি অবতার চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মুখাবয়ব অশ্বের ন্যায়, কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থে ইহার কল্পনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। তাহাতে পক্ষবিশিষ্ট একটি অশ্বের স্বতন্ত্র চিত্র আছে। অষ্টম চিত্র বরাহ অবতার, ইহাতে বরাহমুখবিশিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থে বরাহ অবতারে দন্ত দ্বারা পৃথিবী ধারণের কল্পনা দেখা যায়।

পরবর্ত্তী চিত্রগুলিতে পরশুরাম, কূর্ম্ম, মৎস্য ও বামন অবতার চিত্রিত আছে। ইহাদের অন্যরূপ কল্পনা গ্রন্থান্তরে দেখা যাইলেও মূলতঃ চিত্রগুলি প্রায়ই এক, পার্থক্যের মধ্যে ইহাতে পারিপার্শ্বিক অন্য কিছু অঙ্কিত নাই। ত্রয়োদশ চিত্রের বিষয় নরসিংহ অবতার—সচরাচর এই চিত্রে পশ্চাতের স্তম্ভটি দ্বিখণ্ডিত দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে তাহা নাই।*

* ১৩৩৭ সালের আশ্বিনের 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত মল্লিখিত "প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধে প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে।



৫ম চিত্র—রাম অবতার



৭ম চিত্র—কল্কি অবতার



৬ষ্ঠ চিত্র—বলরাম



৮ম চিত্র—বরাহ অবতার



৯ম চিত্র—পরশুরাম



১১শ চিত্র—মৎস্য অবতার



১০ম চিত্র—কূর্ম্ম অবতার



১২শ চিত্র—বামন অবতার



১৩শ চিত্র—নৃসিংহ অবতার



১৫শ চিত্র—কর্ম্মকার



১৪শ চিত্র—স্বর্ণকার



১৬শ চিত্র—তৈলকার



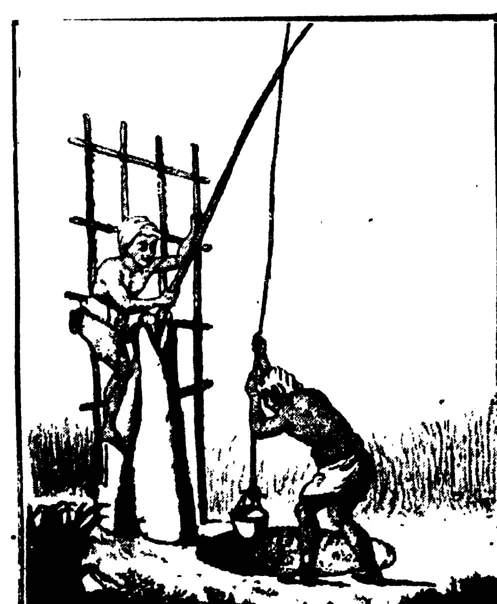
১৭শ চিত্র—ধুনুরি



১৯শ চিত্র—সেচ দেওয়া



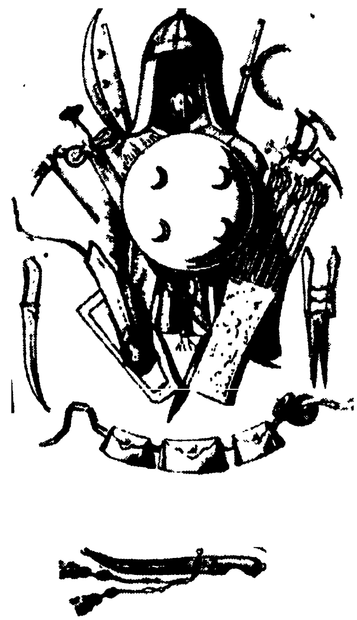
১৮শ চিত্র—তন্তুবায়



২০শ চিত্র—কূপ হইতে জলোত্তোলন



২১শ চিত্র—লিপিকার



২৫শ চিত্র—অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম্ম

চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ চিত্রে সূত্রধর, কর্ম্মকার, ধুনুরী ও তন্তুবায়ের ছবি আছে এবং সকলেই তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিরত রহিয়াছে। শিল্পী-গুলির আকার অবয়ব হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাহারা পশ্চিমদেশীয়। কোন কোন শিল্পীর কর্ম্মপদ্ধতিতে আমাদের কাছে সামান্য পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইলেও অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। কেবল কর্ম্মকারদ্বয়কে উপবীতধারী দেখা যায়।



২২শ চিত্র—সতী-দাহ

উনবিংশ চিত্রে জলসেচের ব্যবস্থা এবং বিংশ চিত্রে কূপ হইতে জলোত্তোলনবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। একবিংশ চিত্রে পূর্ব্বকালের লিপিকার অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কাগজের পরিবর্ত্তে তখন বৃক্ষপত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমিত হয়।

দ্বাবিংশ চিত্রে একটি সতীদাহের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সতীদাহের সকল ব্যাপারের এমন বিশদ চিত্র কমই দেখা যায়।



২৩শ চিত্র—হারেম



২৪শ চিত্র—পান্থ-নিবাস ফকির ও যাত্রিগণ বিশ্রাম করিতেছে

ত্রয়োবিংশ চিত্রে মুসলমানদের হারেমের একটি সুন্দর দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশ চিত্রে একটি পান্থনিবাসে ফকীর ও যাত্রিগণ বিশ্রাম করিতেছে, তাহাই পরিষ্কাররূপে চিত্রিত হইয়াছে। পঞ্চবিংশ চিত্রের বিষয় প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম। তখনকার দিনের বিবিধ প্রকার অস্ত্রের সহিত একটি আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

হেথা কেন আসিয়াছি আমি

হে মোর আমিত্ব!
উড়ায়ে পথের ধূলি ওই দেখিতেছি হেথা নিত্য,
ছুটে চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে আগে, পিছে কভু, সমতালে
অগণন যাত্রী দল, কোন্ দিগ্বিজয়ে? দগ্ধ ভালে
পরিতে কি গৌরবের টীকা? যেন শুভলগ্ন যায়,
সম্মুখে রাখিয়া তাই দূর লক্ষ্য ব্যগ্র দৃষ্টি, হায়,
তুচ্ছ করি শত ঝঞ্ঝা,—মরণেরে করি অবহেলা
বল, চলিয়াছে কোথা?—কাহার সন্ধানে সারা বেলা?

জাগো, জাগো, প্রিয়
বিস্মৃতির কোল থেকে তোলো মুখ, খোলো উত্তরীয়
সংশয় না রাখি চিতে, ভুলি লজ্জা, অভিমান ভয়
এসো বন্ধু, দোঁহে আজি হউক প্রথম পরিচয়।
ঘরেরে ঠেলিয়া দূরে পরেরে চাহিলে বক্ষ-মাঝ,
ক্ষুদ্রতর?—সে-ও ভালো; বৃহত্তরে নাহি নাহি কাজ।
জীবনের কূল ঘিরে' আসে সন্ধ্যা ওই আসে নামি'
বল গো অন্তরতম,—হেথা কেন আসিয়াছি আমি?

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।



ক্লোরোফর্মের ঘোর



ট্যাক্সি-গাড়ীর জানালা দিয়া শরীর বাহির করিয়া বাহিরে ঝুঁকিয়া সে হাত নাড়িয়া বিদায় লইল। বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বকালের অভ্যাসবশতঃ অথবা কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে। সে ত হেলেনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল—দু মাস কি তিন মাস পূর্ব্বে। হেলেন ত প্রথমে বলিয়াছিল, 'না'; পরে আবার বলিয়াছিল— 'আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।' হেলেন যে ক্রমশঃ সম্মতির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, তাহার জন্যই সে তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। কি জানি, হেলেন যদি এখন বলিয়া বসে 'হাঁ'। তাহা হইলে সে কি আনন্দিত হইবে? সে তাহা ঠিক জানে না। বাধা ও বিরুদ্ধতা তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল, এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে ত আর সমস্যাই রহিল না, তবে আর তাহার আকর্ষণই বা কি রহিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল বাধা পাইতে, বাধার সহিত বিরোধ করিতে, লড়াই করিতে, এমন কি, ঘৃণা করিতে—কোন্ ব্যাপারকে বা কোন্ লোককে তাহা নাই বা তাহার মনের সাম্‌নে সুস্পষ্ট হইয়া থাকিল। সর্ব্বদা বিরুদ্ধ হইয়া থাকা, ব্যস—তাহার বেশি আর কিছু নয়। সে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া দিল। ভালোবাসা, ভালোবাসা মানেই মিলিয়া মিশিয়া কায করা, ত্যাগ করা, দান করা। কিন্তু আমি ত কিছুই ত্যাগ করিতে, কেবল দান করিতে পারিব না। সে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—আমি ইহার জন্য আমাকে ঘৃণা করি। সে নিজেকেও ঘৃণা করিতে পাইয়া খুসী হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজের কাছে তাহা স্বীকার করিতে হইল বলিয়া নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও উঠিল। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে বলিতে লাগিল যে, তাহার একটা ভুল হইতেছে। কিন্তু ভুল আবার কাহাকে বলে? হ্যাঁ, ভুল আবার কি? হয় সেটা কিছুই নয়, অথবা এমন একটা কিছু—যাহা মানব-চরিত্রে গভীরভাবে বিদ্ধ হইয়া আছে। একটা নিয়মাপেক্ষী পরস্পর-সম্বন্ধ-যুক্ত প্রতিক্রিয়া, একটা প্রতিফলন, একটা সামাজিক প্রথা, একটা বেড়া যাহার আড়ালে থাকিয়া বেশ আনন্দে নিরাপদে ওপারে উঁকি মারিয়া দেখা যাইতে পারে, যে ক্ষীণ বাধাটুকু থাকাতে উগ্র ভোগ-বাসনাকে একটি কবিত্বময় আবরণ দেয়, কিম্বা.........? সে উচ্চস্বরেই কথাগুলি বলিয়া গেল। তাহার নিজের কণ্ঠস্বর গাড়ী ভরিয়া গমগম করিতে লাগিল। সে ট্যাক্সির আসনে হেলান দিয়া বসিল এবং তাহার সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল। পৃথিবীটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে; এইরূপ ত লোকে বলে। একটা বিন্দুমাত্র জগতের দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে। এক সময়ে পৃথিবীর অন্তরের উত্তাপ লোপ পাইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জীবন-লীলা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইবে। সে হয় ত একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রন-কণা, সমাজ নামক একটি সমষ্টির মাঝখানে কেন্দ্র-বীজরূপে অনিশ্চিত ভাবে প্রকম্পিত হইতেছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে সে হয় ত ছিট্‌কাইয়া অভাব্য বেগে মহাশূন্যে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে চিরনির্ব্বাণ লাভ করিবে। রসায়ন আর পদার্থ-বিজ্ঞান না কি জগতের সব রহস্য ফাঁস করিয়া দেয়, এমন কথা লোকে বলে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কি আরামের, কি আশ্বাসের, কি শীতল ব্যাপার! তবে আর কোনও চেষ্টা করা কেন? বাঁচাই বা কেন? তুমি যখন নিরুপায় নিঃসহায়, তুমি যখন বিধান খণ্ডন করিতে পারিবে না, তখন আর চেষ্টা-চরিত্র কিসের জন্য? তুমি ত জীবন আর অজীবনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনীয় প্রতিক্রিয়া মাত্র। কি মধুর অঙ্গ-শীতল-করা তত্ত্ব! শীতলতার বিপরীত হইল তাপ। তাপে প্রতিক্রিয়া প্রবল

হয় এবং শীতলতা তাহা শিথিল করিয়া তুলে। সেই রাত্রিতে বুদা-পেস্তের একটা রেস্তর্ঁায় যখন জিপ্‌সী বাদ্যের কান্নাভরা টানা সুর তাহাকে বলিয়া দিল যে, সে হেলেনকে ভালোবাসে, তার পর সে উহাকে লইয়া দানিউব-নদের তীরে তীরে বেড়াইতে গেল, বুদা সহরের পাহাড়ের গায়ে যে শত শত আলোক-ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সে হেলেনরই মুখখানি দেখিতে পাইতেছিল, হাসিভরা, প্রফুল্ল, মিনতিময়, বিষণ্ণ; আর সম্মুখে প্রবাহিত ঐ নদটিকে মনে হইতেছিল, হেলেনের দেহের মধ্যে যে জীবন-প্রবাহ মহিমা বিতরণ করিয়া বহিতেছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি। হয় ত চতুর বৈজ্ঞানিকরা এই-সব ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারিবে। তাহাদের কাছে সকল ব্যাপারেই ব্যাখ্যা মজুদ থাকে, প্রত্যেক কল্পনা ও চিন্তার পশ্চাতে তাহারা দেখে একটা ঘটনা, প্রত্যেক মানসিক অবস্থা ও ভাবের পশ্চাতে তাহারা দেখে একটা প্রণালীহীন মাংস-গ্রন্থি—ডাক্টলেস্ গ্ল্যাণ্ড! সে লক্ষ্য করিল যে, তাহার চিন্তা হেলেনকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়া বহু বিষয়ের—হয় ত বা অবান্তর ও অসংলগ্ন ভাবনার ভিতর দিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে আবার সেই হেলেনের কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ট্যাক্সিখানা কুইন অ্যান ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া থামিয়া গেল।

'ধন্যবাদ হুজুর।' বক্‌সিস পাইয়া ট্যাক্সিওয়ালা খুশী হইয়া গিয়াছিল।

'আমাকে ধন্যবাদ দিবার কিছু নাই। তুমি আর আমি দুজনে একটা বড় যন্ত্রের দুটা টুকরা অংশ মাত্র, একটা নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে পরস্পরে মিলিয়া কায করিয়া চলিয়াছি। তোমার এই ট্যাক্সিটার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, আমরা ওর চেয়ে শীঘ্র এবং অল্পে ভাঙ্গিয়া পড়ি। অন্ততঃ এই রকম কথা উহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেমন, তুমি কি বিশ্বাস কর?"

'খাসা ভদ্রলোক!' নার্স্ যখন তাহাকে ডাক্তার ক্যাণ্ডলারের পরীক্ষা-কক্ষে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতেছিল, তখন সে ভাবিতেছিল, খাসা ভদ্রলোক! একটু লাজুক, মুখচোরা, কিন্তু এ তোমাকে এমন ভাবে দেখে না যেন তুমি একটা অশরীরী স্বচ্ছ পদার্থ, তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার জন্য তুমি উহার সম্মুখে উপস্থিত নাই। মশায়, আমি ডাক্তারকে কি নাম বলিব?'

'তাহার নাম হেলেন।'

'আজ্ঞে, আপনার নাম কি?'

সে লজ্জা পাইয়া লাল হইয়া উঠিল, এবং ভ্রূকুটি করিল। 'অ্যাঁ—হ্যাঁ, অ্যাম্‌ব্রোজ, জন অ্যাম্‌ব্রোজ।'

ডাক্তার ক্যাণ্ডলার তাহার দুই হাত তাহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে পুরিয়া বুক চিতাইয়া কাঁধ দুটা চওড়া করিয়া লইয়া দাঁড়াইল। সে আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে প্রীত-দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া লইল। তাহার কাঁধ চওড়া, বুক বিস্তৃত। ইহা দেখিয়া তাহার রোগীরা তাহার উপর বিশ্বাস করে, নির্ভর করে,—ডাক্তার ভাবিল। বেচারারা এই ত চায়। সে দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইল, এবং হাঁটু দুটা সটান করিল। সে যেন সুর-বাঁধা সেতারের মত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

'হ্যাঁ, আমি আপনার এক্‌স্-রে প্লেটগুলি দেখিয়াছি। বিশেষ কিছু হয় নাই। একটু ক্লোরোফর্ম্ করিয়া আপনার শরীরটাকে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। সে কিছু নয়। দুবার জোরে জোরে নিশ্বাস লওয়া, আর তার পরে আপনি ঘুমাইয়া পড়িবেন। তাহার পর আর কিছুই টের পাইবেন না।' ডাক্তার হাসি-মুখে অতি সহজে বলিয়া গেল।

এই রকম লোককে কখনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা কাবু করিতে পারে না। অ্যাম্‌ব্রোজ ভাবিল। একেবারে বিশ্বাসে ভরা, নিরেট লোক; তাঁহার মেহগিনী-কাঠের ডেস্‌কটার মতই নিরেট বস্তুময়; তাঁহার ঘরের দেওয়ালে যে সব জল-রঙের ছবি আর এচিং ছবি আছে, সেইগুলিরই মত বেশ উঁচু দরের মান্য-গণ্য। বেশ সুশ্রী—সুস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, ব্যায়ামের দিক হইতে। ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বরপরায়ণ, হয় ত রাজভক্ত, হবে বা; এমন কি, তাহার নিজের স্ত্রীও তাহাকে শ্রদ্ধা করে, প্রশংসা করে, এবং তাহার কর্ম্মীরা তাহাকে ভাল লোক বলিয়া স্বীকার করে। হাঁ, তাহাকে দেখিলেই তোমার মনে হইবে, হাঁ, এই রকম লোকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। হাঁ, এই রকম লোকই তাহার কর্ত্তব্য বেশ জানে। টেবিলের উপর রোগীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, তাহার অঙ্গ কাটিয়া, হাড় কাটিয়া, রক্তপাত করিয়া এবং তাহার

পরে আবার কাটা সেলাই করিয়া, ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিয়া, উৎসারিত রক্ত-প্রবাহ বন্ধ করিয়া এই রকম লোকরা একটা আত্মশক্তি লাভ করে। কিন্তু কেমন করিয়া ইহারা জানে যে, কতখানি চিরিতে হইবে, কতখানি কাটিতে হইবে, আর কখন্ রক্ত কেমন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে?

'আমার মনে হয়, অচেতন হইবার ঔষধে অজ্ঞান হইয়া পড়ার মধ্যে বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই।'

ডাক্তার ক্যাণ্ডলার ঈষৎ হাস্য করিল। সুবিন্যস্ত শুভ্র দন্ত-পংক্তি ঈষৎ বিকশিত হইল। রোগীর অনাবশ্যক ভয় দেখিয়া সে মজা অনুভব করিতেছিল।

'কিছু ভয় নাই আপনার। ক্লোরোফর্ম্মে অচেতন হওয়ার মধ্যে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই। অন্ততঃ আমি ত কখনও কোনও বিপদ ঘটিতে দেখি নাই। আমি'—সে গলা খাঁখারি দিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—'আমি ত দুই হাজার সাত শত একটি কেস্ দেখিয়াছি গত দুই বৎসরে। গড়পড়তা নেহাৎ খারাপ অভিজ্ঞতা নয়।'

অ্যাম্‌ব্রোজ তাহার পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিল, বাক্সটা একবার খুলিল, এবং তাহার পরে উহা বন্ধ করিয়া আবার পকেটে রাখিয়া দিল। ইহা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বলিতে হইবে, অস্ত্র করিবার টেবিলের উপর শত শত লোককে অজ্ঞান অচেতন হইয়া যাইতে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারস্থ হইতে দেখা, এবং তাহার পরে আবার ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে, আবার কথা বলার শক্তি ফিরিয়া আসিতে দেখা। সে ভাবিতে লাগিল, ইহার ফি বা দক্ষিণা কত? তাহাকে জিজ্ঞাসা করা অভব্যতা হইবে, এমন কি, অকৃতজ্ঞতা হইবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না।

'অচেতন করিবার সময় এক জন লোককে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখিলে আপনার মনে কোনও রকম ভাবের উদয় হয় না?' অ্যাম্‌ব্রোজ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল। সে যে ভয় পাইয়া ঐ প্রশ্ন করিল, তাহা নহে, সে কেবল কথা চালাইবার উদ্দেশ্যেই কথা বলিল।

ডাক্তার হাসিয়া উঠিল। রোগীর মনোভাব দেখিয়া তাহার কৌতুক বোধ হইল। 'বলেন কি, কিছুই মনে হয় না। কেবল কয়েকটা নিশ্বাস টানা, আর তাহার পরে চমৎকার প্রশান্ত নিদ্রা, আপনি জানিতেও পারিবেন না যে কিছু ঘটিয়াছে।'

অ্যাম্‌ব্রোজের মনে হইল, সে এই লোকটাকে ঘৃণা করিতে পারিতেছে না, লোকটা এমন প্রতাপশালী ক্ষমতাশালী। বা রে, সে কোনও কিছুকে ঘৃণাই বা করিবে কেন? সম্ভবতঃ সে জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব মতবাদ পাঠ করিয়াছে, তাহা এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহার মনে ঘৃণা করিবার বাসনা উদয় হইতেছিল। জগদ্‌বিধানের মধ্যে উদ্দেশ্য, প্রগতি, সৌন্দর্য্য, আদর্শ প্রভৃতির ত একটা কিছু অর্থ থাকা উচিত। সে যখন অস্ত্র করিবার টেবিলের উপর চড়িতেছিল, তখন সে মনে করিতেছিল যে, জীবনটা জটিল কলের চেয়েও অন্য রকমের ভালো একটা কিছু নিশ্চয়।

'বাঁধানো দাঁত, অথবা কৃত্রিম চক্ষু নাই ত?' মোটা, ঘুমে ঢুলুঢুলু-চোখ ক্লোরোফর্ম্ম করিবার লোকটি সহানুভূতি দেখাইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করিল। সে বলিল, 'খাসা সুন্দর ছোট্ট এই মুখোসটা, সহজেই মুখে আঁটিয়া দেওয়া যাইবে। এই রবারের বাঁধনগুলি দিয়া মুখোস বাঁধিয়া লইলেই আপনার দুই হাত বেশ মুক্ত হইয়া যাইবে, ইহা ধরিয়া থাকিতে হইবে না।'

সেই লোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত অ্যাম্‌ব্রোজের হার্টের শব্দ শুনিল। তাহার পরে সে ধীরে সন্তর্পণে অ্যাম্‌ব্রোজের মুখের উপর মুখ ও নাক ঢাকিয়া মুখোসটি পরাইয়া দিল। 'ঠিক হইয়াছে ত, কোনও অসুবিধা বোধ হইতেছে না?' অ্যাম্‌ব্রোজ মাথা নাড়িল। 'বেশ! এখন আপনি জোরে জোরে নিশ্বাস টানুন আর ফেলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ রকম করিয়াই নিশ্বাস লইতে হয়। এখন আপনি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবেন।'

অ্যাম্‌ব্রোজ ভাবিতে লাগিল—শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িব! কিন্তু রবারের গন্ধটা ভালো লাগিতেছে না। শীঘ্রই শীঘ্রই ঘুম আসিবে। কি আরাম! অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পরমা বিস্মৃতি! সব ভুলিয়া যাওয়ার পরমা শান্তি! সে শুনিয়াছিল যে, কোন কোন লোক ক্লোরোফর্ম্মে অচেতন হইয়া ধস্তাধস্তি করে, গালাগালি পাড়ে, অশ্লীল কথা বলে, শপথ করে। সে হয় ত অমন কেলেঙ্কারী করিয়া নিজেকে বোকা বানাইবে না। সে শেষ মুহূর্ত্ত

পর্য্যন্ত সচেতন থাকিতেই চেষ্টা করিবে। সে জোরে নিশ্বাস লইল। একটা ভারী মিষ্ট গন্ধ। তাহার মাথা যেন শূন্যে সাঁতার কাটিতেছে, যেন সে নেশা করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখোসটা খুলিয়া একবার তাজা বাতাস টানিয়া নিশ্বাস লইবে। একটা কণ্ঠস্বর যেন বিস্তীর্ণ জলরাশি পার হইয়া তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল—হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানুন আর ফেলুন। সেই আদেশ অমান্য করিবার কোনও উপায় নাই। তাহার পা দুইটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের পেশী শিথিল হইয়া আসিতেছে। একটা অতি-সুখকর সুড়সুড়ি পায়ের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঢেউ খেলাইয়া উরু বহিয়া পেটের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার মাথা ক্রমাগত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধির বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তাহার মন পাগল-করা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, সে সকলকে ডাক দিয়া বলিবে যে, সে তখনও সচেতন আছে। কিন্তু না, সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিবে। দুইটা কি তিনটা সাপ তাহাদের কুণ্ডলীর পাক খুলিয়া তাহার দুই গালের উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। সেগুলা নিশ্চয় সেই মুখোসের রবারের বাঁধনগুলা। হায় ভগবান্, সে তবে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। সে প্রাণপণে সচেতন থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃথা চেষ্টা, উহারা তাহার উপর প্রবল প্রভাবে জয়ী হইতেছে, সে ত নিজেকে তাহাদের হাতে একেবারে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। তাহার চেতনায় আর কিছু রহিল না, কেবল ঘূর্ণ্যমান মহাশূন্য মহাকাশ তাহার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সে মহাশূন্যের মধ্যে লঘু-শরীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার জীবন তাহার দেহের ভিতর হইতে ছাঁকিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মৃত্যু বোধ হয় এই রকম। তবে সে মরিতেছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, তাহার বিনাশ তাহা হইলে অনিবার্য্য! তাহার টলটলায়মান মন অবশিষ্ট চিন্তাগুলি কুড়াইয়া লইবার জন্য হাতড়াইতে লাগিল—অনেক সমস্যাই যে জীবনে অমীমাংসিত রহিয়া গেল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্যা, জীবনের অর্থ, ভগবান মহাদার্শনিক অথবা মহাকৌতুকী? সকল সমস্যার সমাধান তাহার শেষ মুহূর্ত্তে হইয়া গেল, তাহার মনের মধ্যে মীমাংসা প্রকাশলাভ করিল, দৈবাদেশের ন্যায় অতি সহজ—সহজ বলিয়াই সত্য। সব একটা মহা হাস্য! কি মহান্ সমাধান! হাস্য! যে সূক্ষ্ম সূত্রে সে মহাশূন্যে প্রলম্বিত ছিল, সেই সূত্র প্রকম্পিত হইতে লাগিল ভয়ানক-ভাবে। হাসি!—বুদ্ধি নয়, বিচার নয়, কেবল হাসি—মানুষকে দেবতার মহাদান! অথচ মানুষ কাঁদে, বেচারারা কি আহাম্মক, তাহারা বিশ্ব-রহস্যের নিগূঢ় সত্য না জানিয়া কাঁদিয়া মরে। কেউ তা বুঝিতে চায় না। কি হাস্যকর ব্যাপার! কি অদ্ভুত! কিন্তু সে ত মরিয়া যাইতেছে, সে ত এই সত্য-সংবাদটি কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারিল না। সে এই মহাসংবাদ তাহার সঙ্গে লইয়া মহাপ্রস্থান করিবে, এই সত্য তাহার কবরে সঙ্গের সাথী হইবে। সেই কেবল একমাত্র সেই জীবনের মহারহস্যের নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়া গেল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ ছিল তাহার হাতে, কিন্তু মূঢ় উহারা ত তাহাকে বধ করিতেছে! এবং উহারা বস্তুশূন্য অসীম আকাশের মধ্য দিয়া সকল আদিকারণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিতেছে ও চলিবে, উহারা সমস্ত বস্তুপুঞ্জ ধ্বংস করিয়া নিজেদের বীক্ষণাগারে টেষ্ট-টিউবের মধ্যে জীবন উৎপাদনের চেষ্টা করিবে, অবশেষে এক দিন তাহাদের নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া সূর্য্য মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ রসহীন শীতল হাসি হাসিবে, এবং মানব কঠিন আড়ষ্ট ও নিষ্ফল হইয়া হিম পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়িবে। ভগবান, কি অপরূপ মূর্ত্তি! না না, অদ্ভুত নয়, বিষম হাস্যকর কৌতুকময়। সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, যদি যাহারা তাহাকে বধ করিতেছে, তাহাদিগকে এই সার সত্যটি বলিয়া যাইতে পারে। উহারা যে তাহাদেরই শেষ উপায়টি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের কি মঙ্গল হইবে? কিন্তু বৃথা চেষ্টা, সে মরিতেছে, প্রায় মরিয়াই গিয়াছে, মরিল সেই, একমাত্র যে তাহাদের কাছে নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু ইহাও ত এই জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান রঙ্গ, মহা বিদ্রূপ! সে ত আর না হাসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদিগকে কারণ না জানাইয়া হাসাটাও ত রূঢ় আচরণ হইবে। কিন্তু সে হাসিলে তাহারা হয় ত কারণ আন্দাজ করিয়া লইতেও পারে। সে আর আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার হাসিতে পেট ফুলিয়া

উঠিতে লাগিল, অসম্বরণ আনন্দে তাহার পঞ্জর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। যে সূত্রে সে শূন্যে প্রলম্বিত ছিল, সেই সূত্র আন্দোলিত হইতে হইতে অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া গেল, আর সে মহাশূন্যের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

ক্লোরোফর্ম্ম দেওয়ার লোকটি বলিল—সে কত শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িল। না জানি কোন্ রসিকতায় তাহার এমন হাসি পাইল।

ডাক্তার ক্যাণ্ডলার বলিল,—বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ যখন আবার চেতনা ফিরিয়া পাইবে, তখন কিছুই মনে করিয়া বলিতে পারিবে না। কি মজার ব্যাপার, কেহই তাহাদের স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না।

ডাক্তারের হাসির শেষ প্রতিধ্বনি বাতাসে বিলীন হইয়া গেল। অ্যাম্‌ব্রোজ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সে যেন একটা খাড়া পাহাড়ে চড়িতেছে, মৃত্যুর কারণ আর অর্থ অনুসন্ধানের জন্যই তাহার এই অভিযান। মরিয়া যাওয়ার উপক্রমটি বেশ আনন্দময়, কিন্তু মৃত্যুটাকে কেমন জটিল হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইতেছে। জীবনের মধ্যে যে সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাই মৃত্যুর সঙ্গেও লাগিয়া আছে। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল যে, মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তাহার কাছে জীবনের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সে মনে করিয়া আনিতে পারে। যদি জীবন ও মরণের সমস্যা একই হয়, তবে তাহাদের সমাধানও একই হইবার কথা। সেই পাহাড়ের পথে অন্য অনেক লোক উঠা-নামা করিতেছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের গোপন গহন চিন্তার অন্তরালে পরস্পরের কাছে অজানা গোপন হইয়াই থাকিতেছিল। অ্যাম্‌ব্রোজ চলিতে চলিতে এক জন শুভ্রকেশা বৃদ্ধাকে অতিক্রম করিয়া গেল, দেখিল, সে একটা কাঠি দিয়া মাটীতে শিশুদের ছবি আঁকিতেছে। তাহার মনে হইল, ঐ মহিলাটি তাহারই মাতা, কিন্তু তাহাদের দু'জনের যখন চোখোচোখি হইয়াছিল, তখন ত তাহাদের কেহই কাহাকেও চিনিতে পারিল না। সে যেই তাহার চোখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিল, অমনি সে দেখিতে পাইল, হেলেন পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে। হেলেন ছেলেদের খেলাঘরের ইট দিয়া একটা ঘর গাঁথিতেছিল। সে যতই গাঁথিতেছিল, ততই কাহার একটা হাত বাহির হইয়া বারম্বার গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, এবং হেলেন হতাশভাবে আবার গাঁথিতেছিল। অ্যাম্‌ব্রোজ চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিল, কিন্তু সে তাহার ডাক শুনিতেই পাইল না, কিম্বা সে তাহাকে চিনিতেও পারিল না। অ্যাম্‌ব্রোজ আবার জোরে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু এবারে সে নিজের কণ্ঠস্বরই শুনিতে পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাইয়া বলিল—হেলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। তাহার ঠোঁট নড়িল, সে অনুভব করিল যে, তাহার মুখ-বিবরে ঐ কথা কয়টি উৎপন্ন হইল, কিন্তু কোনও শব্দ তাহার মুখ-বিবর হইতে বিনির্গত হইল না। সে কথা বলিতেছিল, কিন্তু কাহাকেও শুনাইতে পারিতেছিল না। তাহার ভয় হইল; সে উল্টাইয়া পড়িয়া পাহাড়ের উপর দিকে গড়াইয়া চলিতে লাগিল। পাহাড়ের চূড়াটাই কি জীবন, আর পাহাড়ের যে পাদদেশে দাঁড়াইয়া সে মৃত্যু-রহস্য অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা মৃত্যুই! সে পাহাড়ের গায়ে গড়াইয়া গড়াইয়া উঠিতে উঠিতে মধ্যদেশে পাহাড়ের কটি-বেষ্টনী একটা বনের মধ্যে গিয়া ঢুকিল, এবং সেই বনের মধ্যে একটা নদী ছিল, সেই নদী পার হইবার সময় সে দেখিল যে, সেই নদীর জল স্থির নিশ্চল। সেই বনের মধ্যভাগে একটা পরিষ্কৃত স্থানে একটা গ্রীক ধরণের মন্দির রহিয়াছে। সে মন্দিরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে যখন সেই মন্দিরে প্রবেশ করিল, তখন শুনিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস মন্দিরের থামের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে থামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—সেই শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে, সেই প্রতিধ্বনির উৎস-ধ্বনিটি কোথায়? তাহার পরে সে দেখিল যে, সে মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এবং সেখানে অনেকগুলা লোক ক্রুদ্ধ বিতর্ক করিতে করিতে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতেছে। সে নিজেকে নিজেই দেখিতেছিল বলিয়া বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হইল না। মরিয়া যাওয়ার ত ইহাও অন্যতম পরিণাম যে, তুমি তোমাকে নিজের বাহিরে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখিতে পাইবে।

'যদি এ স্থির করিতেই না পারে যে, সে পাহাড়ের শিখরে জীবনের মধ্যে থাকিবে, অথবা পাহাড়ের নীচে মৃত্যুর মধ্যেই থাকিবে, তবে ইহাকে আমাদেরই বিনাশ করিতে হইবে।' যে লোকটা এই কথা বলিল, অপরদের উপরে তাহার বেশ প্রভুত্ব আছে বোধ হইল।

'এ আমাদের কাছে কিছুতেই থাকিতে পারে না,

ইহার যোগ্য কোনও পুণ্য সে করে নাই।' এই কথা যে বলিল, সে অতি কৃশ, তাহার মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কদমফুল করিয়া ছাঁটা, তাহার মুখ তপস্বীর মত শুষ্ক কঠোর।

'ইহার সন্দেহ সহ্য করিবার মত শক্তি নাই।' সেই প্রথম বক্তা বলিল।

সকলে মৃদু মর্ম্মরধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল—'এ ত এখনও বালুকার বুকে রেখার মত হইয়া আছে।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মন্দিরের থাম হইতে থামে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল। যাহারা মন্দিরের গর্ভগৃহে ছিল, তাহারা সকলে স্তব্ধ হইয়া সেই দীর্ঘশ্বাস শুনিতে লাগিল। তাহার পরে উহারা বলিল, 'ইহাকে ফিরিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।'

অ্যাম্‌ব্রোজ দেখিতে লাগিল, উহারা তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং মন্দিরের বাহিরে বহন করিয়া লইয়া চলিল। উহাদের অনুসরণ করিয়া তাহারও যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইল, কারণ, তাহার কৌতূহল হইতেছিল যে, উহারা তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া কি করিবে, তাহা দেখিবে। তাহার দেহ-বাহক সেই লোকগুলির পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে সেই আগের নদীটি পার হইবার সময় তাহার মনে হইল যে, তাহার জল এবার অলস মন্থর গতিতে নড়িতেছে। পিছন ফিরিয়া সে হেলেনকে দেখিতে পাইল, তাহার বাড়ী গাথা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সে মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিল—'আহা! কি সুন্দরী এই হেলেন!' সে তাহার পথ হইতে গতি ফিরাইয়া হেলেনের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার যে দেহটাকে লোকরা পাহাড় বাহিয়া নীচে নামাইতেছিল, সেই দেহটাকে ছাড়িয়া সে অন্য দিকে কিছুতেই যাইতে পারিতেছিল না। তাহার কাণে অতি অদ্ভুত রকমের কি শব্দ হইতে লাগিল, এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য সে কিছুই দেখিতে পাইল না। যখন তাহার দৃষ্টির কুহেলিকা-জাল অপসৃত হইয়া গেল, সে দেখিল, সেই দেহ-বহন-যাত্রীরা একটা লম্বা বারান্দার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে এক প্রান্তে গিয়া উপনীত হইল, এবং তাহাদের পাণ্ডা সেখানে থামিয়া একটা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। সকলে তাহার দেহ বহন করিয়া লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ঘরের মধ্যস্থলে স্থাপিত শ্বেত বস্ত্রাবৃত একটি টেবিলের উপর তাহার দেহ স্থাপন করিল। তাহার পরে দু'জন ছাড়া আর সকল লোক সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। লোক দু'জনের মধ্যে এক জন তাহার মুখের উপর হইতে একটা কিছু সরাইয়া লইল, এবং সে দেখিল, সে উঠিয়া বসিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। সে চোখ মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস টানিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে সে এবং টেবিলের উপরকার দেহটা এক হইয়া গেল।

সে ডাক্তারের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু হেলেন কোথায়?'

ডাক্তার বলিল—'সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, বেশ ভালোই হইয়াছে।'

'ক্ষমা করিবেন। আমি মনেই করিতে পারিতে-ছিলাম না যে, আমি কোথায় আছি। আমি মনে করিতে-ছিলাম আপনি বুঝি ·····আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। হ্যাঁ, নিশ্চয় স্বপ্নই দেখিতেছিলাম। আপনি একটা মন্দিরে ছিলেন, আর—হ্যাঁ···এক মিনিট সবুর করুন—আমাকে মনের মধ্যে সব কথা গুছাইয়া লইতে দিন। হ্যাঁ, আমার মনে আসিবে।'.

ডাক্তার ক্যাণ্ডলার বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া উঠিল। 'থাক, উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনার আর কিছুতেই স্মরণ হইবে না। কেহই স্মরণ করিতে পারে না। এখন দেখি, আপনি আপনার পাটা নাড়ুন ত।'

অ্যাম্‌ব্রোজ পা নাড়িল। সে বলিল—'কিন্তু একটা পাহাড়ের উপর কাহাকেও দেখিয়াছি। আমি কোনও রকম উৎপাত উপদ্রব করি নাই বোধ হয়। মানে, লোকে কখনো কখনো—'

'না না, একটুও না। আপনি যখন অচেতন হইয়া যাইতেছিলেন, তখন আপনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কিসে যে সেই হাসি পাইয়াছিল, সেই হাস্যকর কথা আর মনে আনিতে পারিবেন না। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, নিশ্চয় খুব উত্তম আমোদের কথা আপনার মনে আসিয়াছিল।' *

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ)।

* [শ্রীযুক্ত হিউ এণ্টনী বিরচিত ও লণ্ডনের লাইফ এণ্ড লেটার্স নামক ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্পের ভাবানুবাদ।]

২০

পরদিন সুন্দরীমোহন পুষ্পিতাকে আপনার বাসায় লইয়া গেলেন। এ দারুণ আঘাত পুষ্পিতার হৃদয়কে সহস্রভাগে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এত কাল দুঃখের সামান্য আঘাতও তাহাকে পাইতে হয় নাই। এই তাহার প্রথম ও ভীষণতম দুঃখ। দুঃখের ভারে সে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার অমন স্নেহময়—অমন প্রেমময় স্বামী—যে তাহাকে মুহূর্ত্তও চোখের আড়াল হইতে দিত না, এত দিন একত্রবাসের মধ্যে কোন দিন একটিও কঠিন কথা যাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, সে এমন নির্ম্মমভাবে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এ দুঃখ কি ভুলিবার ?

এইরূপে ক্রমাগত কাঁদিয়া, ভাবিয়া, না খাইয়া, না ঘুমাইয়া পুষ্পিতা শয্যা গ্রহণ করিল। তাহাকে কঠিন রোগে ধরিল। জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যে বহু দিন কাটিয়া গেল। সরোজ এক মাসের ছুটী লইয়া পুষ্পিতাকে দেখিবার শুনিবার জন্য রহিয়া গেল। সে ছুটী কাটিয়া গেল। রোগের তখনও উপশম হইল না। সরোজ চাকরী ছাড়িয়া দিয়া শুধু ডাক্তার, ঔষধ ও রোগিণী লইয়া পড়িল।

তিন মাস পরে পুষ্পিতার হাঁটিবার অবস্থা হইল; কিন্তু তখনও তাহার শোকের ভার লঘু হইল না। সর্ব্বক্ষণ যে স্বামীর পাশে পাশে ঘুরিত, সে স্বামী যে এমনই অতর্কিতভাবে এমনই কঠিন হইয়া চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না, আর একবার চোখের দেখাও দেখিবে না, এত দিনেও সে কথাটা তাহার যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইত না। হয় ত সে কোথাও লুকাইয়া আছে, জীবনে কোন দিন পরীক্ষা করে নাই, তাই বুঝি পরীক্ষার জন্য কিছু দিন দূরে সরিয়া গিয়াছে; যেমন অতর্কিতভাবে গিয়াছে, তেমনই অতর্কিতে ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে এক দিন হয় ত ফিরিয়া আসিবে; এইরূপে নানাবিধ চিন্তা-কল্পনা তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সারাদিন ক্রিয়া করিত।

মা বলিলেন, "হ্যা রে, এমনই ক'রে আর কি করবি, শেষে কি মারা পড়বি ?"

পুষ্পিতার মন বলিল, আর বাঁচিয়া লাভ কি, মা! মুখে কিন্তু সে কিছুই বলিল না; শুধু জলভরা চোখে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "কেন দিন-রাত এমন মন গুমরে রইছিস, মা; একটিবার না হয় ডাক ছেড়ে কাঁদ, মনটা হাল্কা হয়ে যাবে।"

পুষ্পিতার দুই চক্ষু বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বুকের মাঝে ঝড় বহিল।

মা পুষ্পিতাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "যে গিয়েছে, শরীরপাত করলেই কি সে আর ফিরে আসবে, মা ? তবে কেন নিজের শরীর নষ্ট করছিস এমন ক'রে ? হিমাদ্রি ত এক দাগা দিয়ে গিয়েছে, দাগার উপর তুই আর দাগা দিসনে, মা।"

পুষ্পিতা এবার কথা কহিল, বলিল, "খাচ্ছি-দাচ্ছি, সবই ত করছি, আর আমায় কি করতে বল, মা ?"

মা বলিলেন, "দিন-রাত শোক বুকে ক'রে থাকিসনে, মা! একটু মন খুলে কথা ক। পাঁচ মাস সে গিয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটা দিন কাউকে ডেকে কোন দিন একটা কথা করেছিস্ কি ?"

পুষ্পিতা বলিল, "কি কথা বলব মা—কাকে কি বলবার আছে আর!"

মা বলিলেন, "সে কথা বল্‌লে কি চলে! বাঁচতে হ'লে সবই রাখতে হয়। যে যায়, সেই চ'লে যায়, মা—আর সবই যে প'ড়ে থাকে, মা। এই যে সংসারের নিয়ম!"

পুষ্পিতা বলিল, "তা হোক্ মা! তাই ব'লে সে মন ত আর ফিরে আসে না।"

মা বলিলেন, "তুই যে দিন-রাত দুঃখকে আঁকড়ে ধ'রে রইছিস, সে কি ভাল? তোমার বাবার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো দিকি, মা। কি ছিলেন আর কি হয়েছেন। সরোজ—অমন বন্ধু মানুষের হয় না, কি সেবাই তোর করেছে, আর তোদের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়ে রয়েছে। শুধু তুই সুস্থ হবি, সেরে উঠবি, একটু ভাল থাকবি—এই না তার চেষ্টা। তার কথাও একবার ভাবা উচিত, মা! সবাইকে কেন দুঃখ দিস্, মা ?"

পুষ্পিতা বলিল, "আমি ত কাউকে দুঃখ দিতে চাইনে। তোমরা আমার কথা ভেবো না। তা হ'লে আর আমার জন্য দুঃখ পাবে না। কেন আমার কথা ভেবে তোমরাও মিছামিছি দুঃখ পাও?"

মা বলিলেন, "ছেলে-মেয়ের ম্লান মুখ দেখলে মা-বাপের মনে যে কি হয়, তা জানিস্ নে, তাই এমন কথা বল্‌তে পারলি। জানলে পারতিস্ না। তুই আমার বড় আদরের মেয়ে; হেসে খেলে বেড়াবি, আনন্দে থাকবি, এই আশাই ছিল। সে আশায় ছাই পড়লে মায়ের প্রাণ যে কি হয়, তা যদি বুঝতিস্, মা!"

এবার পুষ্পিতার মায়ের চোখে জল আসিল।

পুষ্পিতা কিছু নরম হইয়া বলিল, "আমি ত তোমায় কোন দুঃখ দিতে চাইনে, মা। তবে তুমি কেন এমন বল্‌ছ?"

মা বলিলেন, "যদি দুঃখ দিতে না চাস্, দুঃখ ভুল্‌তে একটু চেষ্টা কর। একটু লোকজনের সঙ্গে মেশ, দুটো মন খুলে কথা ক'। বাহিরে যেতে না চাস্, আমাদের সঙ্গে একটু গল্প কর। সরোজ ত প্রায় সর্ব্বক্ষণই আছে, তার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প কর। দেখবি, বুকে যে পাথরের বোঝা আছে, তা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যাবে।"

পুষ্পিতা বলিল, "সরোজ বাবুর ছুটী ত ফুরিয়ে গেছে, তিনি কেন আর কাযের ক্ষতি ক'রে রয়েছেন?"

মা বলিলেন, "সরোজ ত সে কায ছেড়ে দিয়েছে। হিমাদ্রি যে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তাতে ত সরোজের আর কিছু করবার উপায় নেই। এত বড় গ্রন্থালয়ের সব ব্যবস্থা সেই ত সব করছে এখন।"

হিমাদ্রি মৃত্যুকালে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, যে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা পুষ্পিতার হঠাৎ মনে পড়িল। সে সরোজ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। স্বামীর প্রতি তাহার এক অভিমান জাগিতে লাগিল। এত দিন একত্র বাস, ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের ফলে তাহার স্বামী তাহার সম্বন্ধে এই ধারণা লইয়া গেলেন যে, সে এমন অসহায় ও শক্তিহীন যে, আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিবে না।

পুষ্পিতার আঁখি ছলছল করিয়া উঠিল, মুখে কিছুই বলিল না। কিন্তু এ ভাবটা ফুটিয়া উঠিল যে, সরোজের কথাটা না তুলিলেই ভাল হইত। পুষ্পিতার মাতা বুদ্ধিমতী, তিনি তখনকার মত সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

পুষ্পিতার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন সরোজ পুষ্পিতার পিত্রালয়েই থাকিত। পুষ্পিতার যখন জীবনের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছিল, অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল, তখন সে হিমাদ্রির বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করিতেছিল। এ সময়েও প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সে এখানে আসিত, পুষ্পিতার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সুন্দরীমোহনের কাছে সন্ধান লইত, পুষ্পিতার কাছে কিছুক্ষণ বসিত। গ্রন্থালয়ের কোন সংবাদ থাকিলে দিত। তার পর উঠিয়া যাইত। ইদানীং বাড়ীখানা ভাড়া দিবার কথা সরোজ বারকয়েক বলিয়াছিল, পুষ্পিতা তাহাতে সম্মতি দেয় নাই। অসুখ হইতে উঠিয়াই সে বাড়ীখানা একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে শোকের বেগ বাড়িবে বৈ কমিবে না, ইহা স্থির করিয়া সুন্দরীমোহন তাহাকে যাইতে দেন নাই।

মায়ের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তার পরদিন প্রভাতে সরোজ আসিতেই পুষ্পিতা বলিল, "আজ একবার ও বাড়ীতে যাব। নিয়ে যাবেন?"

'নিয়ে যাবেন?' কথাটা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তাহার মনে হইল, সত্যই ত সে পূর্ব্বের মনের জোর সব হারাইয়াছে; নহিলে সে এইটুকু যাইতে সরোজের সঙ্গে যাইবে কেন?

সরোজ ম্লানমুখে বলিল, "তা যাব; কিন্তু আর দিন কতক পরে গেলে ভাল হ'ত না?"

পুষ্পিতা ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিল, "কেন?"

সরোজ বলিল, "এখনও আপনার শরীর বড় দুর্ব্বল; তাই বল্‌ছিলাম।"

পুষ্পিতা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "মা বাবা তাঁকে ততখানি জান্‌তেন না, আপনি যত জানতেন। কি ভাবে তিনি আমার জীবনে ছিলেন, আপনি ত তার অনেকটা জানেন। আপনি কি ব'লে বল্‌ছেন, এখন তাঁর বাড়ীতে গেলে আমার আর শরীরে সইবে না? তাঁকে ছেড়ে যখন দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, বেঁচে আছি, তখন সে শূন্য বাড়ীতে গেলে আর আমার বেশী কি হবে? তিনি যে এক সময়ে ছিলেন, এ কথাটা অস্বীকার করলেই কি বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখা হবে?"

এ কঠিন তিরস্কারে সরোজ লজ্জিত হইল। একটু

স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আপনার কথা ঠিক, কিন্তু আমি কিছু অন্যায় ভেবে বলিনি। আপনি যখন যাবেন, আমি তখনই যাব'খন।"

কথাটা বেশ একটু কঠিন হইয়াছিল, ইহা পুষ্পিতাও বুঝিল। কিন্তু তখন আর উহাকে কোমল করিবার কোন উপায় ছিল না। পুষ্পিতা একবার উঠিয়া মাকে বলিয়া আসিল যে, সে একবার সরোজ বাবুর সঙ্গে বাহিরে যাইবে।

মা অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ মা, একটু ঘুরে এস, আমিও ত তাই বলি।"

দীর্ঘ ছয় মাস পরে পুষ্পিতা প্রথম বাড়ীর বাহির হইল।

পুষ্পিতা যাইতে যাইতে ভাবিল, কত দিন সে পথে একাকী বাহির হইয়াছে; সরোজের সঙ্গেও কত দিন কত স্থানে গিয়াছে; কোন দিন কোন সঙ্কোচ হয় নাই। কিন্তু আজ ইহা যেন বড় অনভ্যাস বলিয়া মনে হইতেছে। বিনা কারণে এ সঙ্কোচ আসিতেছে। কেন এমন হয়? পূর্ব্বে যে পরিচ্ছদে সে পথে বাহির হইত, আজ তাহার অপেক্ষাও অনেক সাদা-সিধা পরিচ্ছদে সে বাহির হইয়াছে; তবু ইহাই যে আজ বাজিতেছে। লজ্জা-রক্ষার ভার যাহার উপর ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে—তাই কি আজ প্রতি পদে লজ্জা!

দুয়ারের সম্মুখে এক ভৃত্য বসিয়াছিল, তাহারা আসিতেই ভৃত্য দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইল। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ছয় মাস পূর্ব্বে যে গৃহ হইতে পুষ্পিতা বাহির হইয়াছিল, আজ ছয় মাস পরে সজল-নয়নে আবার সে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

সরোজ নতমুখে একটা ঘর দেখাইয়া বলিল, "আমি এই ঘরটাতেই থাকি।" সরোজ পুষ্পিতার চোখে জল দেখিয়াছিল বলিয়া, ইচ্ছা করিয়াই তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল না।

পুষ্পিতা তাহার সজল চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিল, "আমি একবার উপর থেকে ঘুরে আসি। আপনি ততক্ষণ এখানে বসুন।"

সরোজ ধীরস্বরে বলিল, "ঘরগুলি সব তালা-বন্ধ, চলুন আমি খুলে দিয়ে আসি" বলিয়া সরোজ অগ্রসর হইল। অশ্রু মুছিয়া পুষ্পিতা সরোজের পশ্চাতে চলিল। সরোজ সব কক্ষের দুয়ার খুলিয়া দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "আমি নীচে রহিলাম, আপনার বোধ হয় বেশী দেরী হবে না?"

পুষ্পিতার কণ্ঠের ভাষা তখন চলিয়া গিয়াছিল। সরোজ তাহা বুঝিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

পুষ্পিতা শূন্য কক্ষগুলির পানে কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল। শূন্য কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে যেন সে সাহস পাইতেছিল না। ম্লান কক্ষগুলির সদ্যোমুক্ত প্রতি দ্বারে প্রতি বাতায়নে কে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে—সে নাই, সে নাই! যে এই গৃহের সর্ব্বত্র মধুর হাস্যধারায় উচ্ছ্বসিত করিত, সে আজ চিরতরে চলিয়া গিয়াছে!

কম্পিত-পদে স্পন্দিতবক্ষে পুষ্পিতা আপনাদের পুরাতন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

সরোজ নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে যেন প্রতি মুহূর্ত্ত গণিতেছিল। কেবল ভাবিতেছিল, পুষ্পিতাকে এই তীব্র স্মৃতির দংশনের মধ্যে একা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। এখনও তাহার স্মৃতির ক্ষত বেদনাপ্লুত, হয় ত এ আঘাতে ক্ষতমুখে তখনই রক্ত ছুটিবে। পুষ্পিতা বিরক্ত হইবে—আঘাত পাইবে, এই ভাবিয়া সে বহুক্ষণ আপনার কক্ষতলে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন মনে হইল, আর বেশী দেরী করিতে দিলে বিপদের সম্ভাবনা, তখন আর পুষ্পিতার বিরাগের ভয় না করিয়া সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। যেখানে সে পুষ্পিতাকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেখানে সে নাই। সেখান হইতে যে কক্ষগুলি দেখা যাইতেছিল, সেগুলি সবই শূন্য মনে হইল। কি ভাবিয়া সে তাহাদের শয়ন-গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। একটা অর্দ্ধস্ফুট রোদনের আর্ত্তস্বর কাণে আসিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সরোজ দেখিল, যে পালঙ্কের উপর পুষ্পিতা ও হিমাদ্রির শয্যা রচিত হইত, সেই শয্যাহীন শূন্য পালঙ্কের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া পুষ্পিতা মণিহারা ফণিনীর মত লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে।

২১

সরোজ দুয়ারের কাছে বহুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুষ্পিতার মর্ম্মন্তুদ রোদন দেখিল। যাহার এক বিন্দু অশ্রু

নিবারণের জন্য সে হাসিমুখে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে পারিত, তাহাকে লুটাইয়া লুটাইয়া অশ্রুসাগরে ভাসিতে দেখিয়াও তাহার কিছু বলিবার সামর্থ্য হইল না।

এই নারীকেই সে জীবনে প্রথম ও শেষ ভালবাসিয়াছিল! সে ভালবাসা প্রকাশ করিবার অধিকার কোন দিনই পায় নাই। যখনই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল, তখনই জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহার প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি সে অনুরাগিণী। সেই দিন হইতে সে ভালবাসাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে সমাধি দিয়া রাখিয়াছিল। কোন দিন ঘুণাক্ষরেও সে ইহাদের জানিতে দেয় নাই যে, জীবনে সে কাহাকেও কোন দিন ভালবাসিয়াছিল। তার পর অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস—হিমাদ্রির মৃত্যুকালের সেই অনুরোধ তাহাকে বিস্ময়ে অভিভূত ও নির্ব্বাক্ করিয়াছিল। ইহার পর হইতে পুষ্পিতার সহিত যতখানি ঘনিষ্ঠতা তাহার ছিল, সেটুকু রাখিতেও তাহার সঙ্কোচ হইত। পুষ্পিতার অসুখের সময় সমস্ত সঙ্কোচ ভুলিয়া সে পুষ্পিতার সেবা করিয়াছিল। সেই কয়টি দিনই তাহার জীবনের স্বর্গ ও সম্বল। পুষ্পিতা সুস্থ হওয়া অবধি আবার তাহাকে দূরে সরিয়া আসিতে হইয়াছে।

পুষ্পিতার সহিত তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত করিয়া দিবার হিমাদ্রির যে প্রয়াস, তাহাই ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিত করিয়া দিতেছে। এটুকু যদি হিমাদ্রি জানিত! পুষ্পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে পাছে সে মনে করিয়া বসে, আপনার স্বার্থের জন্য সে এরূপ করিতেছে, এই ভাবিয়া সরোজ পুষ্পিতাকে সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারিল না। কিন্তু আজ এ ভাবে তাহার সম্মুখে পুষ্পিতাকে এতক্ষণ লুটাইয়া লুটাইয়া রোদন করিতে দেখিয়া সরোজ আর স্থির থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "উঠুন, এ ভাবে অস্থির হ'লে আবার অসুখে পড়বেন। আপনাকে এটুকু বলবারও কি আমার অধিকার নাই?"

সরোজকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য পুষ্পিতার শোকাবেগ বৃদ্ধি পাইল। আরও খানিকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া পুষ্পিতা শান্ত হইল; আরও কিছুক্ষণ নির্জ্জীব হইয়া সেই পালঙ্কের উপর পড়িয়া রহিল। সরোজ চিত্রার্পিতের মত পালঙ্কের একটা অংশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বলিল, "এবার উঠুন। চলুন, ও বাড়ী যাই। আমি কঠিন পুরুষ, আমিই হিমাদ্রির শূন্য কক্ষের দৃশ্য সইতে পারি না। আপনি কি ক'রে পারবেন?"

পুষ্পিতা এবার উঠিল; তাহার অশ্রুবিগলিত মুখ তুলিয়া একবার সরোজের পানে চাহিল। তার পর ধীরগতিতে সে কক্ষ ত্যাগ করিল। কক্ষখানি পুনরায় তালা বন্ধ করিয়া সরোজ পুষ্পিতাকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

পিত্রালয়ে ফিরিবার পথে পুষ্পিতা একটি কথাও কহিল না। যেমন নীরবে স্বামি-গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, তেমনই নীরবে পিতৃ-গৃহে আসিয়া পৌঁছিল।

দুই জনকেই ম্লানমুখে ফিরিতে দেখিয়া পুষ্পিতার মা একটু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, দুই জনে এতক্ষণ একসঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া যদি এতটুকু প্রফুল্লতাও না ফিরিয়া আসিল, তাহা হইলে লাভ কি হইল?

পুষ্পিতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দিকে গিয়েছিলে, মা?"

পুষ্পিতা মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে একবার গিয়েছিলাম, মা।"

পুষ্পিতার মা আরও চিন্তিত হইলেন। ইহারই জন্য তিনি দুই জনকে একত্র পাঠাইয়াছিলেন? অনুকম্পাভরে একবার সরোজের পানে চাহিলেন। মুখে এই ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, এমনই করিয়াই তুমি পুষ্পিতার শোকের ভার লাঘব করিবে? প্রকাশ্যে বলিয়াও ফেলিলেন, "ওকে এ শরীরে ওখানে কেন নিয়ে গিয়েছিলে, বাবা? এখন ওখানে গেলে ওর শোক বাড়বে বৈ ত কমবে না।"

সরোজ চুপ করিয়া রহিল। সে যে পুষ্পিতার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল, সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিল না। পুষ্পিতাকে বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করায়, সে যখন কঠিন কথা বলিয়াছিল, তখনও যেমন নীরব ছিল, এখনও পুষ্পিতার মাতা পুষ্পিতাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুযোগ করিলেও তেমনই নীরব রহিল।

পুষ্পিতা একবার ভাবিল, সে বলে যে, সে স্বেচ্ছায় বাড়ী গিয়াছিল,—সরোজ বাবু বরং নিষেধ করিয়াছিলেন;

তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ঐ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সে আপনার কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া তাহার নবীভূত শোকাবেগের মধ্যেও পুষ্পিতা এই চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না যে, সরোজ তাহার জন্য অনেক কষ্ট—অনেক অনুযোগই সহ্য করিতেছে। কিন্তু কেন? সে বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া, না তাহাকে স্বামী যে শেষ অনুরোধ করিয়াছিল, সেই সুবিধাকর অনুরোধের কথা মনে করিয়া? সরোজের প্রতি তাহার চিত্ত একটু কোমল হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাহার স্বামীর অনুরোধের কথা মনে হইবামাত্র, আবার তাহার সারাচিত্ত সরোজের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

দগ্ধা

সুখ্যাতি দাও সম্মান দাও
উপকার যারা করে,
নিন্দা এবং অপমান রাখো
তুলি অপকারী তরে,
উপকার সেই করিবারে গিয়া
দৈব-দুর্ব্বিপাকে,
অপকার হায় ক'রে ফেলে প্রভু
বল কিবা দাও তাকে?

ব্যথা নিবারিতে ব্যথা দিয়া ফেলে
হিতে বিপরীত হয়,
নিতি প্রতিকূল দৈব যাহার
জয়ে হয় পরাজয়!
তৈল দিতে গিয়া নিভায় প্রদীপ
জল দিতে ভাঙ্গে ঘট,
ধূলা ও কালিমা মুছিতে গিয়া
ছিঁড়ে ফেলে যেই পট,
পুণ্য চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা যার
ধরায় পেলে না দামই,
তুমি তারে হায় কিঁ দিয়ে ভুলাও
বলো অন্তর্য্যামী?

চরণ সেবিতে নখাঘাত হয়
কাঁটা রয়ে যায় ফুলে,
পিছল পথেতে আছাড়িয়া ফেলে
কোলে নিতে গিয়ে তুলে।
উপশম হায় করিবারে গিয়া
বাড়াইয়া ফেলে রোগ
ভাগ্যে যাহার এমনি লেগেছে
নষ্টচন্দ্র-যোগ।
ভাল করিতে সে মন্দ ঘটায়
চির-মঙ্গলকামী
তুমি তারে হায় কি দিয়ে বুঝাও
বলো অন্তর্য্যামী?

হে প্রভু, কাজের দর্পণে কেন
হৃদয় উঠে না ফুটি?
তা হ'লে হয় ত থাকিত না হেথা
এত মাথা-কুটাকুটি।
যযাতি ত ভাল যুবকের দেহে
দিয়াছিল শুধু জরা,
চকোরে এমন শ্যেন সাজাইয়া
একি এ আমোদ করা।
মনে হয় মোর এদেখি দুঃখে
তুমি উঠেছিলে ঘামি'
সত্য মিথ্যা আমি ত জানি না
জানো অন্তর্য্যামী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



বেকার-সমস্যা

যতই দিন যাইতেছে, জগতের বেকার-সমস্যা ততই প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের মত অর্থসম্পদে সম্পন্ন দেশ অধুনা জগতে নাই বলিয়া শুনা যায়। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে প্রতীচ্যের প্রায় সকল দেশই মার্কিণের নিকট ঋণী। সে ঋণ তাহারা কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেই মার্কিণ মুল্লুকের ডিয়ার-বোর্ণ সহরে বেকার শোভাযাত্রার বিপক্ষে পুলিসের অভিযানে কি বক্তারক্তি কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজধানী ওয়াসিংটন সহরে বেকার মার্কিণ সেনা ও সেনানীগণের অভিযান ও তাহাদের গতিরোধে সাধারণতন্ত্র সরকারের বলপ্রয়োগের কথাও সুবিদিত।

বৃটেন মার্কিণের পরেই অর্থসম্পদে জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। সেই বৃটেনের রাজধানী লণ্ডন এবং গ্লাসগো, লিভার-পুল, বার্ম্মিংহাম, ব্ল্যাকপুল প্রভৃতি সহরে বেকারের সহিত পুলিসের সংঘর্ষের কথাও মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাষ্ট সহরে কিছুদিন পূর্ব্বে বেকার ও পুলিসে কি ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহাও অনেকে জানিয়াছেন। বেলফাষ্ট জেলাটি যে খুব বড়, তাহা নহে; অথচ এই সামান্য একটু স্থানের বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষেরও উপর! বেলফাষ্টের হাঙ্গামায় ৭ লরি বোঝাই সৈন্য আনয়ন করিতে হইয়াছিল, মেসিন গান ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তবে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল!

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্? সম্প্রতি লণ্ডনে আবার বেকারগণ অভিযান করিয়াছিল। বৃটেনের দিকে দিকে বেকারের সংঘের তাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। জল, ঝড়—প্রকৃতির ভীষণ দুর্য্যোগ গ্রাহ্য না করিয়া বেকাররা রাজধানীর অভিমুখে প্রাণের ব্যথা জানাইবার জন্য ছুটিয়াছিল! পুত্র-কলত্র অনাহারে থাকিলে মানুষ ধৈর্য্যহারা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ প্রতীচ্যে প্রাচ্যের মত জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদের শিক্ষা নাই। অবস্থা এমনই গুরু যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পুত্র প্রিন্স জর্জ্জ পপলার নামক স্থানে কোন এক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে গেলে শত শত বেকার নর-নারী চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল,—"তোমাদের মোটর আছে, আর আমরা খাইতে পাই না?" ইহা অপেক্ষা অভাব ও দুঃখ-দৈন্যের আর কি অধিক পরিচয় পাওয়া যায়? এক দিন ফরাসীবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভার্শাইলের পথে বুভুক্ষু নর-নারী রাজা ষোড়শ লুইএর শকটের গতিরোধ করিয়া 'রুটী দাও' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল! এখন জগতের সে অবস্থা নাই, এ কথা সত্য, এখন সকল সভ্যদেশেই গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজা বা রাজবংশ থাকিলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রজার প্রতিনিধি-সভা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত। সুতরাং অব্যবস্থার অপরাধ যদি কাহারও হয়, তবে সে পার্লামেণ্টের।

বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট যখন পূর্ব্ববর্ত্তী লেবার গভর্ণ-মেণ্টকে পরাজিত করিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতিতে (১) বেকার-সমস্যা সমাধান, (২) আশ্রয়হীনের আশ্রয়-ব্যবস্থা, (৩) বৃদ্ধদের পেন্সন্ ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কাযের প্রতিশ্রুতি ছিল। বস্তুতঃ লেবার গভর্ণমেণ্ট এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া আসনচ্যুত হইয়াছিলেন। ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট এ যাবৎ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারেন নাই। সমর্থ হওয়াও অসম্ভব—বিশেষতঃ জগতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়। বিশেষতঃ যে ভাবে প্রতীচ্য রণসাজে সাজিয়া অনুক্ষণ আপনাদের সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থ, ইজ্জৎ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে, তাহাতে তাহার ব্যয়সঙ্কোচ সাধন করিয়া এ সকল কঠিন সমস্যার সমাধান করা একবারেই সম্ভবপর নহে! ঘরে বাহিরে অসন্তোষ ও অশান্তির অনল প্রজ্বালিত রাখিয়া মুখে শান্তি ও অস্ত্রসংবরণের কথা কহিলে কোন ফল হইবে কি?

গভর্ণমেণ্টের দল ভাঙ্গাভাঙ্গি

দেশের অর্থনীতিক-সমস্যার সমাধানে ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যেন ভাঙ্গনের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। অবশ্য ইহা ভাঙ্গনের মূলকারণ নহে। অটোয়া-চুক্তি এবং ধর্ষণনীতি যে কতক পরিমাণে এ বিষয়ে সহায়তা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ অটোয়া-চুক্তি বৃটিশ অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থন করা আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, উহাতে বৃটেনের কিছু লাভ হয় নাই, বরং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার উপনিবেশসমূহই ইহাতে বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শক্তিসমূহ এই চুক্তি হেতু বৃটেনের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। ট্যাঁকে হাত পড়িলে অথবা পেটের ভাত মারিলে কে চুপ করিয়া থাকে? বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থ দেশসমূহের ব্যবসায়-বাণিজ্যের শুল্কাদি সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীর পণ্যের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করার ফলে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। তাই

তাহারা সহ্য করিবে কেন ? বিদেশী শক্তিগণকে এইভাবে শত্রুরূপে পরিণত করার অপরাধে সার হার্কার্ট স্যামুয়েল প্রমুখ কয়েক জন উদারনীতিক দলীয় সদস্য ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছেন।

বিলাতের সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এ যাবং ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের তুইটি সদস্যের পদ লেবার দল অধিকার করিয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ৪ শত ৬১ রক্ষণশীল দলীয়, ১৩টি ন্যাশানাল লেবার দলীয়, ৩৬টি লিবারল ন্যাশানাল দলীয় এবং ৩টি ন্যাশানাল দলীয় ভোট পাইবার সম্ভাবনা। গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা মোট ৫৭টি হইবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে লেবার ৪৯টি, অবশিষ্ট ৮টি ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট লেবার ও লিবারল দলীয় সদস্যের। তাহা ছাড়া ৩৩টি সার হারবার্ট স্যামুয়েলের দলের লিবারল ও ৬টি ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট সদস্য কোন কোন বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিবেন। অবশ্য এই হিসাবে এখনও গভর্ণমেণ্ট পক্ষে রক্ষণশীল দলীয় ভোটের প্রাধান্য আছে। কিন্তু ভাঙ্গন যখন ধরিয়াছে, তখন আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে।

ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেও মতবিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতের শাসন-ব্যাপার-সংক্রান্ত নীতি লইয়াই এই বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে। মন্ত্রি-মণ্ডলীর মধ্যে ৭ জন লর্ড আরউইনের প্রবর্ত্তিত আপোষের নীতিরই পক্ষপাতী, এই ৭ জনের নাম :—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, লর্ড স্যাঙ্কি, মিঃ টমাস, মিঃ বলডুইন, লর্ড আরউইন, মিঃ রান্সিম্যান এবং সার কানলিফ্-লিষ্টার। বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় ৬ জন, তাঁহাদের নাম :—লর্ড হেলস্যাম, মেজর ইলিয়ট, সার স্যামুয়েল হোর, সার জন সাইমন, সার আয়ার্স মনসেলস এবং মিঃ নেভিল চেম্বারলেন। অবশিষ্ট ৬ জন মন্ত্রী বিশেষ কোন পক্ষভুক্ত নহেন।

তবেই বুঝা যাইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ধর্ষণনীতির সাহায্যে ভারতশাসন করার সম্বন্ধে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ একমত নহেন। তাহার উপর বিলাতের সংবাদপত্র মহলের প্রচারকার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের সংবাদ সেখানে বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করা হয়। কাযেই সেখানকার জনসাধারণও ভারতের প্রকৃত অবস্থার কথা কিছুই জানিতে পারে না। তবে অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীরা এবং মিঃ এণ্ড্রুজ প্রমুখ ভারত-বন্ধুরা সেখানে যে ভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে বিলম্ব হইবে না। যখন তাহা হইবে, তখন ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব থাকিবে ত ?

আইরিশ সমস্যা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্যা একটি নহে, অনেকগুলি। সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তন্মধ্যে কতকগুলি সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সাম্রাজ্যগর্ব্বী শাসক-সম্প্রদায়ের স্বহস্তে রচিত। যে সকল সমস্যা সামান্য কিছু হৃদয়ের পরিচয় দিলে অপসারিত হয়, কঠোর ইজ্জৎরক্ষার সঙ্কল্প সে পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আইরিশ সমস্যাটিকে কোন কোন বৃটিশ রাজনীতিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে ভাবে ইজ্জৎরক্ষার খাতিরে মার্কিণ যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্য ছাড়া হইয়াছে, সেইভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডটিও হইবার উপক্রম করিতেছে। বর্ত্তমানে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের কর্ত্তা প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরার আচরণ ও মতামত দেখিয়া তাহাই মনে হয় বটে।

অবশ্য বৃটিশ শাসনকর্ত্তৃপক্ষ এ কথা স্বীকার করেন না, করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত আপোষে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ডি ভ্যালেরা এমন অসম্ভব দাবী করিতেছেন যে, আপোষ হওয়া একবারে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

বস্তুতঃ সম্প্রতি বৃটিশ ও আইরিশ পক্ষের মধ্যে লণ্ডনে যে আপোষের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল ; সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এত দিনে বুঝি এই কঠিন সমস্যার অবসান হইল। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বার্থের সংঘর্ষ যেখানে প্রবল, সেখানে এইরূপই হইয়া থাকে।

বৃটিশ পক্ষে মিঃ টমাস বৃটিশ পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন,—"ডি ভ্যালেরা বরাবরই জিদ করিতেছেন যে, সম্মিলিত আইরিশ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত কিছু সম্পর্ক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা হইলে অ্যাংলো-আইরিশ সমস্যা সমাধান হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে উভয় দেশের মধ্যে আপোষ হওয়া অসম্ভব। ইহা দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে যে সন্ধিসর্ত্ত আছে, তাহা ভঙ্গ হইবে, কারণ, উহাতে বৃটেনকে আয়ার্ল্যাণ্ডের দেয় অর্থ দানের কথা অস্বীকৃত হইবে। ডি ভ্যালেরা সেই সকল পুরাতন সর্ত্ত তুলিয়া দিয়া নূতন করিয়া সর্ত্ত করিতে চাহেন, অথচ বৃটেনের পূরা দাবীর পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড। বৃটিশ সরকার এইরূপ সর্ত্ত গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের দাবী যদি ন্যায়যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি বৃটিশপক্ষের কোন অবিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বৃটেন কিরূপে পুরাতন সর্ত্ত তুলিয়া দিয়া নূতন সর্ত্ত গ্রহণে সম্মত হইতে পারেন ?"

ডি ভ্যালেরা আইরিশ 'ডেলে' বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৃটিশ সরকার বৃটেনের আইরিশ-বিদ্বেষীদের এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায্য দাবী ন্যায়যুক্তির দ্বারা সুবিচার করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন না। যদি আমরা ভিখারীর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারে দয়া ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে হয় ত তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের দাবীর কিছু কিছু মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা ন্যায়বিচার কখনই করিতেন না। বৃটিশ সরকার এখন ১৯২৩ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের গুপ্তসন্ধির দোহাই পাড়িতে-ছেন। আমরা আমাদের দাবীর দুইখানি স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়া বর্ত্তমান আপোষ কথার পূর্ব্বে তাঁহাদের সকাশে প্রদান

করিয়াছিলাম। বৈঠকে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, উভয় পক্ষই আপোষে সম্মত হইতে পারেন না। বৃটিশ সরকার আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সাইলকের মত ব্যবহার করিতেছেন, অথচ য়ুরোপীয় দেশসমূহের প্রতি দয়াবতী নারীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের কাছে দেয় ঋণ মকুব করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিতেছেন। চমৎকার! পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে যখন পূর্ব্বকৃত ঋণের কথা ধামা চাপা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই, তখন আয়ার্ল্যাণ্ডই বা অতীতের দেয় অর্থের দাবী মানিবে কেন?"

উভয়পক্ষে বাগ্‌বিতণ্ডা এইভাবেই চলিয়াছে। সুতরাং এদিকে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ভারতের শান্তিপ্রতিষ্ঠারই মত সুদূরপরাহত। ভারতও যদি নতজানু হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ভিক্ষা চাহে, আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া দ্বারস্থ হয়, তাহা হইলে হয় ত খানার টেবিল হইতে দুই একখানা রুটীর বা হাড়ের টুকরা তাহার হাতে পড়িতেও পারে!

শ্লেট মুছিয়া ফেল

নব্য ইটালীর দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ফ্যাসিষ্ট দলপতি সিনর মুসোলিনি জগতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া সকলকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতের অর্দ্ধেকেরও উপর অশান্তি অসন্তোষের অবসান হইয়া যায়। তাঁহার ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদীর মুখে এরূপ সাবধানবাণী যখন উচ্চারিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় না হইলে তিনি কখনও এ কথা বলিতেন না।

মুসোলিনি বলিয়াছেন,—জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পর হইতে য়ুরোপীয় শক্তিরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ক্ষতিপূরণের নৌকাখানির কর্ণ ধারণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লুজান বন্দরে উপনীত করিয়াছেন। এখন মার্কিণের মত মহৎ জাতি নৌকাখানিকে উল্টাইয়া দিয়া বহু জাতির শোকদুঃখ ও রক্ত-সমুদ্রের মাঝে নিমজ্জিত করিবেন কি? জার্ম্মাণী অস্ত্রসংবরণে সকল জাতির সমান দায়িত্বের কথা পাড়িয়াছেন, তাহা কি সমর্থনযোগ্য নহে? ন্যায়বিচারের ভিত্তির উপর জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা, ইটালীর ইহা আন্তরিক কামনা? জাতিসঙ্ঘ এক জবড়জঙ্গ প্রতিষ্ঠান,—উহা হইতে প্রকৃত কার্য্যফলের আশা করা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে আমাদের মত চারিটি শ্রেষ্ঠ শক্তি (মার্কিণ, ফরাসী, ইংরাজ ও ইটালী) যদি একযোগে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে য়ুরোপে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মুসোলিনি টিউরিণ সহরে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সম্মুখে এই বক্তৃতা করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দর্শকরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে জাতিগণ ক্লান্ত, অবসন্ন ও অর্থকষ্ট হেতু ভগ্নাশ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সকলেই এখন শান্তির জন্য লালায়িত। কিন্তু অন্তরায় যে প্রত্যেকের স্বার্থ. এই জন্যই ত মুসোলিনির কথায় কোথাও ভারতবর্ষের মত দেশের নামগন্ধও শুনা যায় না। কিন্তু ভারতকে বাদ দিয়া জগতে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর কি?

অটোয়া-চুক্তি

বৃটিশ কানাডার অটোয়া সহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদারগণের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া আপনাদের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি করিয়া লইয়াছেন। বৈঠকে বৃটিশ কমন্স্‌ওয়েলথের ৮টি জাতির প্রতিনিধিরা আলোচনার্থ বসিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে ১২ খানি বাণিজ্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এই চুক্তির ফলে বৃটেনের কি লাভ-লোকসান হইয়াছে? যে কানাডায় বৈঠক বসিল, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-প্রতিবেশী মার্কিণ যুক্তরাজ্য। মার্কিণ এ যাবৎ কানাডায় যে মাল চালাইয়াছে, তাহার কতটা কমিল বাড়িল, তাহাই দেখা যাউক, তাহার পর বুঝা যাইবে, বৃটেন এই ব্যাপারে কি লাভ করিলেন। মার্কিণ ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিদ্‌রা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অটোয়া-চুক্তির ফলে মার্কিণ ও কানাডার মধ্যে যে ব্যবস্থায় বাণিজ্য চলিত, প্রতি বৎসর তাহা হইতে ৫ কোটি ডলার হইতে ১০ কোটি ডলার মূল্যের ব্যবসায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। আর সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদারগণের মধ্যে যে চুক্তি হইল, তাহার ফলে মার্কিণের ৩০ কোটি ডলার মুদ্রার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে।

একা মার্কিণের এই ক্ষতি। তাহার পর রুসিয়া, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেরও প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রথমেই গমের কথা ধরা যাউক। রুসিয়া হইতে প্রচুর গম বৃটেনে আমদানী হয়। অটোয়া-চুক্তির ফলে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী গমের এক 'বুসেলএ' ৬ সেণ্ট হিসাবে বিদেশ হইতে আমদানী গম অপেক্ষা সুবিধা দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার ফলে রুসিয়া ও অন্য গম আমদানীকারক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফরিকা হইতে যে মদ্য আমদানী হয়, তাহারও জন্য বিদেশের আমদানী মদ্য অপেক্ষা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। এ যাবৎ ডেনমার্ক ও অন্যান্য বিদেশ হইতে গো-দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি আহার্য্য পক্ষী এবং শূকরমাংস বৃটেনে রপ্তানী হইত। চুক্তির ফলে এখন ঐ সকল পণ্য রপ্তানী করিতে কানাডা, নিউজিলাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। মেষ ও গোমাংস সম্বন্ধেও নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে এইরূপ সুবিধা দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষকে কার্পেট, রাগ, শোধিত চর্ম্ম, পাটজাত পণ্য ও চন্দন-তৈল রপ্তানীতে সুবিধা দেওয়া হইবে। এ সকল ব্যাপারে বিদেশসমূহ সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইহার বিনিময়ে বৃটিশ উপনিবেশসমূহ বৃটেনকে কলজাত পণ্য রপ্তানী করিতে সুবিধা করিয়া দিবে। কানাডায় কলজাত পণ্য অল্প উৎপন্ন হয় না। অথচ এই কানাডাই বৃটেনের নিকট বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ২ শত ২০ প্রকার কলজাত পণ্য

রপ্তানী করিতে দিবে। তবে বৃটেন কাঠের ব্যবসায়ে কানাডার পরামর্শ বা প্রার্থনামত বিদেশী কাঠের উপর শতকরা ১০ টাকা শুল্ক বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু বৃটেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বাজারকে রাসিয়ার কাঠের চালানে ভরাইয়া দিতে (dumping) দিবেন না।

অটোয়া-চুক্তি মানিয়া লওয়া হইলে বৃটেনের কি লাভ-লোকসান হইবে, ইহা হইতেই বুঝা যায়। মার্কিণের বিখ্যাত সংবাদপত্র "নিউ ইয়র্ক টাইমস" এ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "আইরিশ ফ্রি ষ্টেট ব্যতীত অন্য সমস্ত বৃটিশ উপনিবেশের রপ্তানী পণ্যের উপর এত দিন বৃটেনের শুল্ক বসাইবার যে অধিকার ছিল, তাহা বৃটেন চুক্তির ফলে হারাইলেন। বৃটেন অবাধ-বাণিজ্যনীতি পরিহার করিয়া পক্ষপাতিত্বমূলক বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, বৃটেন বিদেশী সমস্ত জাতির পণ্যের উপর অন্যায় পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্ক বসাইয়া তাঁহাদিগকে শত্রুতে পরিণত করিলেন।" ভবিষ্যতে নিখিল জগতের সকল জাতির প্রতিনিধির সমবায়ে যে অর্থনৈতিক বৈঠক বসিতেছে, তাহাতে বৃটেনের কি স্থান হইবে, তাহাও কি বৃটেন বুঝিতেছেন? অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণের প্রথা তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল জাতির সমবায়ে এই বৈঠক বসাইবার কথা হইয়াছিল। এখন বৃটেন যদি আপনার 'ঘরের লোকের' সুবিধা করিয়া দিয়া পরের উপর অন্যায় শুল্কের চাপ দেন, তাহা হইলে বৈঠকে তাঁহার কথা কহিবার কি মুখ থাকিবে?

জাপানের শিল্পোন্নতি-প্রচেষ্টা

স্বাধীন অধ্যবসায়ী জাতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। প্রাচ্যের নবীন জাপান তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মহাচীনের নিদ্রাঘোরও ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। মহাচীনও জাপানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছে।

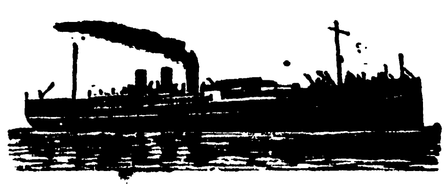
জাপানের সামুরাইরা আমাদের দেশের যোদ্ধজাতি ক্ষত্রিয়েরই মত; তাঁহারা জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়। দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য তাঁহারা কিরূপে এক দিনে সমস্ত বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, রুস-জাপান যুদ্ধকালে তাঁহারা অদ্ভুত আত্মত্যাগ দ্বারা জাপানের সাধারণ সৈন্যগণকে কিরূপে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহাও সকলের সুবিদিত।

বর্ত্তমানে ব্যবসায়ক্ষেত্রে জাপানের আপামর জনসাধারণের দেশের ও জাতির জন্য সমবেত উদ্যম, অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একমাত্র তুলাজাত পণ্যের ব্যবসায়ে জাপানের টেকোর সংখ্যা হইয়াছে ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ শত ৭৮টা, যন্ত্রচালিত চরকার সংখ্যা হইয়াছে ৭৩ হাজার ১ শত ৩৮টা, কাপড়ের কলের সংখ্যা হইয়াছে ২ শত ৫২টা। মোট প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ হইয়াছে ৩৮ কোটি ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ২ শত ৯২ ইয়েন। ইহা ছাড়া সংরক্ষিত তহবিলে আছে ২৪ কোটি ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শত ৭৬ ইয়েন মুদ্রা। ইহা খোদ জাপানের হিসাব। তাহা ছাড়া চীনদেশে যে সকল কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের টেকোর সংখ্যা ১৭ লক্ষ হাজার ৭ শত ৪৮টা এবং যন্ত্রচালিত চরকার সংখ্যা ১৫ হাজার ৬৯টা। চীনে জাপানী কাপড়ের কলওয়ালা ব্যবসায়ী কোম্পানী আছে ৪১টি, কল আছে ১ শত ৪৭টি এবং প্রদত্ত মোট মূলধন হইতেছে ৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত ৯৫ ইয়েন ও সংরক্ষিত তহবিল হইতেছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত ইয়েন-মুদ্রা। এই বিরাট ব্যবসায়ে জাপান ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৩৫ লক্ষ ৭০ হাজার গাঁইট তুলা ব্যবহার করিয়াছে। জগতে ইংলণ্ডই বস্ত্র-ব্যবসায়ে প্রধান; অথচ ইংলণ্ডও ঐ বৎসরে এত তুলা ব্যবহার করিতে পারে নাই!

অথচ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জাপানের মাত্র ২১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭ শত ৪৮টি টেকো, ২১ হাজার ৮ শত ৯৮টি যন্ত্রচালিত চরকা, ৪১টি ব্যবসায়ী কোম্পানী, ১৪৭টি কল, প্রদত্ত মোট মূলধন ৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত ৯৫ ইয়েন এবং সংরক্ষিত মূলধন ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত ১৪ ইয়েন মুদ্রা ছিল। কিরূপ উন্নতি কয় বৎসরে হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন।

কিন্তু মহাচীনে জাতীয়তার উদ্বোধন হইবার পর হইতে চীনে জাপানের বস্ত্রব্যবসায়ের অধঃপতন হইয়াছে। চীনের বর্জ্জন আন্দোলনে বর্ত্তমানে জাপানের একখানি বস্ত্রও চীন দেশে ব্যবহৃত হয় না! কেবল উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্মসূতার কিছু বস্ত্রের এখনও চলন আছে মাত্র! চীন এখন স্বয়ং তাঁহার বস্ত্র-ব্যবসায়ে এত দ্রুত উন্নতিসাধন করিয়াছেন যে, তাঁহার আর বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর প্রয়োজন হয় না।

ইহা হইতে প্রাচ্যের অন্যান্য জাতির দেখিবার ও শিখিবার কিছু নাই কি?



সিরাজ ও ইংরাজ

৪

সঙ্ঘর্ষারম্ভ

আমরা গতবারে সিরাজের প্রতি তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর অন্তিম উপদেশের কথা বলিয়াছি এবং ইহাও বলিয়াছি যে, এই উপদেশই সিরাজকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে সন্দিহান হইয়া থাকেন। * আমরা প্রধানতঃ তৎকালীন ইংরাজ দরবারের অন্যতম প্রধান সদস্য কলিকাতার জমীদার হলওয়েল সাহেবের উক্তির কথাই বলিয়াছি। হলওয়েল সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হওয়ার পরে যখন মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আলিবর্দ্দীর উপদেশের কথা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হলওয়েলের এ কথা আমরা আরও কাহারও কাহারও উক্তি হইতে সমর্থিত দেখিতে পাই। আমরা গতবারে ডাক্তার ফোর্থের সহিত আলিবর্দ্দীর যে কথোপকথনের কথা বলিয়াছি, তিনিও ড্রেক সাহেবকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। ডাক্তার ফোর্থ বলিতেছেন যে, প্রচারিত সংবাদে বিশ্বাস করিতে হইলে তিনটি য়ুরোপীয় জাতিকে—বিশেষতঃ ইংরাজদিগকে দমন করিবার জন্য বৃদ্ধ নবাবের তাঁহার পুত্রের প্রতি উপদেশ এই সকল ব্যাপারের কারণ। বৃদ্ধ নবাবের ইংরাজদিগের প্রতি কেন সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। † তবে আলিবর্দ্দীর যে ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা ছিল না, ফোর্থ সাহেব তাহাও বলিয়াছেন। ইংরাজ-লিখিত বিবরণ ভিন্ন আমরা ফরাসী-লিখিত বিবরণ হইতেও এ কথা জানিতে পারি। চন্দননগরের ফরাসী অধ্যক্ষ মসিয়ে রেণল্টের মার্কুইস ডিউপ্লেকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি আলিবর্দ্দীর য়ুরোপীয়দিগের প্রতি বিরক্তির কথা ও সিরাজকে তাহাদিগকে দমন করিবার উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। * সৈদাবাদ—ফরাসডাঙ্গা ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসিয়ে লা তাঁহার স্মরণ-লিপিতে আলিবর্দ্দীর ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রতি সন্দেহের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি য়ুরোপীয়দিগের সহিত ব্যবহারে আলিবর্দ্দী খাঁর স্বাধীনতা প্রকাশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আলিবর্দ্দী নিজেকেই বাদশাহ ও উজীর বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি ফরাসী ও ইংরাজদিগের করমণ্ডল উপকূলে ও দক্ষিণাত্যে উন্নতি দেখিয়া ক্রোধ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণে ফরাসী ও ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ যখন চন্দননগর ও কলিকাতায় কোনরূপ প্রাকারাদি নির্ম্মাণ, এমন কি, সামান্য সংস্কার বা দুর্গের নিকট কোন বাটী ভূমিসাৎ হইতে দেখিলে চমকিত হইয়া উঠিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত

---

* কলিকাতা দরবারের অন্যতম সদস্য বীচার সাহেব ও আরও কেহ কেহ ইহাতে সন্দেহ করিয়াছেন।

† "If the reports are to be credited it was the advice of the old Nabab to his son to reduce the power of the three nations, but more particularly ours, for what with our conquests on the coast, the destroying of Angria, and the libertys granted us in Bengal by our pharmand, he was apprehensive that at last we should demand after his death all those branches of trade cut off from us by him and former Nababs which our pharmand give us a right to, and if not granted might involve his son in troubles by bringing our forces into his country, and the consequence might be a conquest of it to the ruin of his family, and that he thought a timely severity would prevent it." Indian Records (Bengal) Vol II. S. C. Hill P. 66,

* "Aliverdikhan his predecessor took the greatest umbrage against the Europeans for what had passed upon the (Madras) Coast. Old age prevented him from executing his designs, but he took care to suggest them to the present Nawab, as I have been assured in reccommending him to humiliate the Europeans and to act so to reduce them to the condition of the people of the country." Ibid Vol. I. P. 211.

হইত। তবে যদি নবাব বুঝিতেন যে, তাহা বিশেষ গুরুতর নহে, তখন তাঁহাকে কিছু নজরানা প্রদান করিলে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। য়ুরোপীয়দিগকে কোন প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে না দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সর্ব্বদা ফরাসী ও ইংরাজ উকীলদিগকে বলিতেন যে, তোমরা ব্যবসায়ী, তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন কি? আমার তত্ত্বাবধানে থাকায় তোমাদের কোন শত্রুভয়ের কারণ নাই। তিনি অনেক দিন জীবিত থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার উত্তরাধিকারীকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী যেরূপভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি আলিবর্দ্দী খাঁর উপদেশদানের ফল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। * এ সকল প্রমাণ থাকিতে কিরূপে সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশের কথায় সন্দেহ হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশে সিরাজউদ্দৌলা যে চালিত হইয়াছিলেন, ইহাই মনে হইয়া থাকে বটে, তবে ইংরাজদিগের প্রতি সিরাজের ক্রোধ-সঞ্চারের আরও কতকগুলি উপস্থিত কারণ ছিল। আলিবর্দ্দীর জীবিতকালে যদিও ইংরাজরা সিরাজউদ্দৌলাকে মধ্যে মধ্যে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে উপেক্ষাই করিতেন। তাঁহারা দরবারে নিজেদের কার্য্যের জন্য কখনও সিরাজউদ্দৌলাকে পত্রাদি লিখিতেন না। কোন কোন সময়ে তাঁহাদের কাশীমবাজার কুঠীতে ও পল্লীভবনে সিরাজকে প্রবেশ করিতে দিতেন না, পাছে সিরাজ তাঁহাদের আসবাবাদি ভাঙ্গিয়া ফেলেন বা লইয়া যান। সিরাজের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা সিরাজ মনে রাখিয়াছিলেন। কাশীমবাজার অবরোধের পর তিনি দরবারে ইংরাজদিগের দাম্ভিকতার কথা উল্লেখও করিয়াছিলেন। * তাহার পর যে কারণে সিরাজ-ইংরাজের সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া উঠিল, আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁ ও সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিপূর্ব্বে সিরাজের পিতা জৈন্নুদ্দীন আহম্মদ খাঁ যে আফগানদিগের হস্তে নিহত

* "Aliverdikhan was none the less jealous of his authority. He especially affected a great independence whenever there was question of any affair between himself and the Europeans To speak to him of firmans or of privileges obtained from the Emperor was only to anger him. He knew well how to say at the proper moment that he was both King and Wazir.

* * * *

He saw with equal indignation and surprise the progress of the French and English nations on the Coromandel coast as well as in the Deccan, for by means of his spies he was informed of everything that happened there.

* * * *

This disposition of the Nawab showed itself especially when he came to know by his spies that some fortifications or other was being erected in Calcutta or Chandernagore, the least repair or pulling down of house near the fort was enough to alarm him. An order was immediately issued to stop the work.

* * * *

He would probably have tried to carry out his ideas if he had thought he would live long enough to finish the business, but he was old. Not wishing to risk anything he contented himself with instructing his successor elect in a line of conduct in which we have had opportunities of seeing what lessons he received from Alibardikhan Ibid Vol III P 160 to 62 Law's Memoir

* "They (English) never addressed themselves to Siraj-Uddaula for their business in the Durbar, but on the contrary avoided all communication with him. On certain occasions they refused him admissions into their factory at Cossimbazar and their country-houses, because, in fact, this excessively blustering and impertinent young man used to break the furniture or if it pleased him, take it away But Siraj-uddaula was not the man to forget what he regarded as an insult. The day after the capture of the English fort of Cossimbazar, he was heard to say in full Darbar : 'Look now at those English-men who were once so proud that they did not wish to receive me at their houses.'" *Ibid.*

হইয়াছিলেন এবং সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার স্থানে বিহারের শাসনকর্ত্তা ও রাজা জানকীরাম তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন, সে কথা আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আলিবর্দ্দীর পরিবারে সিরাজ, তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার এক শিশুপুত্র এবং সৈয়দ আহম্মদ খাঁর পুত্র শকৎজঙ্গ জীবিত রহিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে, সিরাজ তাঁহার পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন; কিন্তু যখন নবাবের শেষ সময় উপস্থিত হইয়া আসিল, তখন তাঁহার পরিবারের মধ্যে মুর্শিদাবাদের মসনদ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। গতবারে আমরা এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। শকৎজঙ্গ ও ঘসিটি বেগম এ বিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করেন। রাজবল্লভ ঘসিটিকে সাহায্য করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, সিরাজ তাঁহার নিকট হইতে হিসাব নিকাশ বুঝিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে আটক করিয়া রাখেন। রাজবল্লভ সিরাজকে মনে মনে ভয় করিতেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া রাজবল্লভ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তিনি ঢাকা হইতে আপনার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেবকে দিয়া কলিকাতা দরবারে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রাজবল্লভ হাতে থাকিলে ইংরাজদের অনেক সুবিধা হইবে, বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা। ওয়াটস্ সাহেব এ সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন; ইংরাজ দরবার ওয়াটস্ সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ (কৃষ্ণদাস) ধন-সম্পত্তি, কাগজপত্র ও পরিবারবর্গ লইয়া জগন্নাথদর্শনচ্ছলে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পত্নীর সন্তান-প্রসবকাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবেন প্রকাশ করিলেন। সে সময়ে অধ্যক্ষ ড্রেক উপস্থিত ছিলেন না। হলওয়েল ও ম্যানিংহাম কৃষ্ণবল্লভ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন। এইরূপ গুজব উঠিয়াছিল, তাঁহারা দুই জনে কৃষ্ণবল্লভের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। পরে তাহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা হয়। সিরাজ-উদ্দৌলা ঘসিটি বেগমকে ইংরাজদের সাহায্য করা সন্দেহ করিয়া আলিবর্দ্দীকে তাহা জানাইয়াছিলেন। আর ইংরাজদের দুর্গ-সংস্কারের কথাও বলিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী তখন তাঁহাকে শান্ত হইয়া থাকিতে উপদেশ দেন। গত বারে আমরা তাহা বলিয়াছি।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রিল আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়, সিরাজ মসনদে বসিয়া প্রথমে ঘসিটি বেগমকে লক্ষ্য করিলেন। ঘসিটি মতিঝিলের প্রাসাদে রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সিরাজ কিন্তু অবিলম্বে মতিঝিল আক্রমণ করিয়া বেগমের সমস্ত ধন-সম্পত্তিসহ তাঁহাকে আনিয়া নিজ অন্তঃপুরে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। বেগমের লোক জন সকলে পলায়ন করিল, এমন কি, তাঁহার প্রিয়পাত্র নজর আলিও সিরাজের সেনানীদিগকে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। রাজবল্লভের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। সিরাজ অবশ্য তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিরাজ শকৎজঙ্গের দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু অর্দ্ধপথে গিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কারণ ইংরাজদিগকে দমন করা। কি কারণে সহসা ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল, তাহা বলা যাইতেছে।

সিরাজ-উদ্দৌলা মসনদে বসিলে যদিও ইংরাজরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন এবং সিরাজ তাহা গ্রহণও করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেওয়ায় তিনি তাঁহাদের প্রতি বিরক্তও হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে এ বিষয় লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছিল। ওয়াট্স সাহেব কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতা হইতে সরাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা দরবারে লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা হইল না, আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ঘসিটি ও সিরাজের মধ্যে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করে, কলিকাতার ইংরাজ দরবার তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন। কাযেই রাজবল্লভকে হাত-ছাড়া করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইলেন না। অতঃপর মসনদে বসিবার দুই এক দিন পরে সিরাজ-উদ্দৌলা দৌত্য বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মেদিনীপুরের নায়েব রাজারাম সিংহের ভ্রাতা নারায়ণ সিংহকে দিয়া

পরিবারবর্গসহ কৃষ্ণবল্লভকে পাঠাইবার জন্য এক পরোয়ানা পাঠাইলেন। নারায়ণ সিংহ বাঙ্গালী পাইকারের বেশে উপস্থিত হন বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, আবার তাঁহার সাহেবী পোষাকের কথাও জানা যায়। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করেন। অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব উপস্থিত ছিলেন না, জমীদার হলওয়েল সাহেব ড্রেক সাহেবের নামের পরোয়ানা লইলেন না। পরদিন ড্রেক সাহেব আসিলে দরবারে স্থির হইল যে, নারায়ণ সিংহ গুপ্তভাবে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে পরোয়ানা লওয়া হইবে না, এবং তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করারও আদেশ প্রচারিত করা হইল। বলা বাহুল্য, সে আদেশ প্রতিপালিতই হইয়াছিল। নারায়ণ সিংহের সহিত এরূপ ব্যবহার কেহ কেহ সমর্থন করিলেও কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। হলওয়েল প্রভৃতি ইহার সমর্থন করেন, এবং কৃষ্ণবল্লভও তাঁহার পরিবারবর্গকে না দিবার কারণ বলেন যে, তখন পর্য্যন্ত সিরাজ ও ঘসিটির বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। * সুতরাং রাজবল্লভকে তাঁহারা অসন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণবল্লভকে না দেওয়ায় যে সিরাজ ইংরাজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, হলওয়েল তাহা স্বীকার করেন না। তিনি আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশদানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে রাজনৈতিক কারণ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। † বীচার সাহেব বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশের কথা বিশ্বাস করেন নাই। অবশ্য আমরা হলওয়েলের উক্তি ব্যতীত আরও প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সে যাহা হউক, বীচার সাহেব কৃষ্ণবল্লভকে না দেওয়া ও নারায়ণ সিংহের অপমানের জন্য সিরাজের ক্রোধের কথাই বলিয়াছেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসিটি বেগম বা রাজবল্লভের সহিত আনুগত্য তিনি কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করেন নাই। নারায়ণ সিংহের ছদ্মবেশ সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাইকার ও খৃষ্টানদের পোষাকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। * নারায়ণ সিংহের ছদ্মবেশের কথা অমিচাঁদের কারসাজি বলিয়া বীচার সাহেবের মত। নারায়ণ সিংহের অপমানে সিরাজ-উদ্দৌলা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ যে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, ইহাও সত্য। সুতরাং হলওয়েল ও বীচার উভয়ের কথাই সিরাজ-উদ্দৌলাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে চালিত করিয়াছিল। তাহার পর যে কারণে সিরাজ-উদ্দৌলার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আমরা এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

আমরা বলিয়াছি যে, আলিবর্দ্দী খাঁ য়ুরোপীয়দিগকে কোন প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ না করিতে দিবার জন্য সিরাজ-উদ্দৌলাকে উপদেশ দিয়া যান। এই সময়ে সিরাজ-উদ্দৌলা শুনিতে পান যে, ইংরাজরা কলিকাতায় ও ফরাসীরা চন্দননগরে গড়খাই ও প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শকৎজঙ্গকে দমন করিতে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজ ইংরাজ ও ফরাসীদের উকীলদিগকে দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। দুই দিন এ বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্কের পর সিরাজ-উদ্দৌলার আদেশ হইল যে, আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর হইতে ফরাসীরা যে সকল কায করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং ইংরাজদিগের কৃত খাত পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। † ইংরাজদিগের নূতন প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশও জানা যায়। কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্স সাহেবকে

* "That the same reasons that before forbid the family being turned out of the place after the Suba's death still subsisted equally strong against delivering them up, as the contest was yet undecided between Surajud-Doula and the young Begum (Ghaseti) —"

Holwell's letter to the Court of Directors—India Tracts.

† "I believe, Honourable Sirs, it will by this appear clearly evident to you, that the governing principle in the Suba was political, and the real object of his proceedings the demolition of your forts and garrisons, as his demands always expressed." *Ibid.*

* "There can not well be a greater distinction in dress, than between a Christian and a Bengall picar." *Letter from Richard Becher to concil Hill II, p. 159.*

† Law's Memoir.

জানান হইয়াছিল। * তিনি নবাবের প্রাকারাদি ভঙ্গের আদেশ কলিকাতা দরবারে জানাইয়াছিলেন। † কিন্তু ওয়াট্‌স সাহেব পূর্ব্বে এ কথা জানান নাই বলিয়া যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইরূপ একটা কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে ড্রেক সাহেবের প্রতি নবাবের এক কড়া পরোয়ানা জারিও হইয়াছিল। ফকীর তুজার বা খোজা বাজিদ তাহা লইয়া যান বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজরা খোজা বাজিদকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেন। ‡ সে যাহা হউক, ফরাসীরা অনুনয়-বিনয় করিয়া নবাবকে শান্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদেরও নূতন প্রাকারাদি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইল। ইংরাজেরা সেরূপ ভাবে কোন উত্তর দেন নাই। অধিকন্তু এইরূপ একটা কথা রাষ্ট হইয়াছিল যে, কলিকাতার ইংরাজ অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন যে, খাত পূর্ণ করা হইবে সত্য, তবে মুসলমানদের মাথা দিয়া তাহা করা হইবে। অবশ্য ড্রেক সাহেবের এরূপ উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন কোন উদ্ধত ইংরাজ যুবক এ কথা বলিয়া থাকিতেও পারে। * সে যাহা হউক, শকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে সিরাজ-উদ্দৌলা রাজমহলে পৌছিলে ড্রেক সাহেবের এক পত্র পাইলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে, ইংরাজরা যে কলিকাতার চারিপার্শ্বে নূতন প্রাকার নির্ম্মাণ করিতেছেন বলিয়া নবাব অবগত হইয়াছেন, তাহা নহে এবং আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার জন্য যে খাত করা হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন অন্য কোন খাত কাটা হয় নাই। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের গত যুদ্ধে তাহারা ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া মাদ্রাজ অধিকার করায়, আবার তাহাদের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় এবং বাঙ্গালাতেও তাহা ঘটিতে পারে বলিয়া তাঁহারা নদীর ধারে কামান পাতিবার স্থানগুলি মেরামত করিতেছেন মাত্র। সিরাজ-উদ্দৌলা রাজমহলে এই পত্র পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ড্রেক সাহেবের এরূপ ভাবে পত্র লেখা যে সঙ্গত হয় নাই, তাহা হলওয়েল প্রভৃতিও স্বীকার করিয়াছেন। ফরাসীদের আক্রমণ নিবারণ করিতে নবাব অক্ষম, পত্র হইতে তাহাই প্রকাশ পায়। ইহাতে নবাবের ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। সিরাজ পূর্ণিয়া-যাত্রা স্থগিত করিয়া ইংরাজ-দমনের জন্য আপনার গতি ফিরাইলেন ও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ইংরাজের প্রতি সিরাজ যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে খোজা বাজিদকে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। রাজমহল হইতে লিখিত একখানি পত্রে তিনি স্বহস্তেও এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "আমি আল্লা ও পয়গম্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, যদি ইংরাজরা তাহাদের খাত পূর্ণ করিতে ও প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদকুলী) সময় যে ভাবে বাণিজ্য করিত, সেই ভাবে বাণিজ্য করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষের কোন কথাই

* Hasting's Mss. নামে British Museumএ রক্ষিত কাগজপত্র। ল সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায়, সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজ ও ফরাসীদের উকীলদিগকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আর হেষ্টিংস দপ্তরে দেখা যায়, ওয়াট্‌স সাহেবকে দরবার হইতে বলিয়া পাঠান হইয়াছিল—"He was told from the Durbar." কোন স্থানেই ওয়াট্‌সের দরবারে যাইবার কথা নাই। অক্ষয় বাবু তাঁহার সিরাজউদ্দৌলায় এই সময়ে ওয়াট্‌সের দরবারে যাইবার যে কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

† Hasting's Mss.

‡ "The Nabab at the same time sent to the President and council, Fuckeer Tougar, with a message much to the same purport, which as they did not intend to comply with, looking upon it as a most unprecedented demand, treated the messenger with a great deal of ignominy and turned him out of their bounds without any answer at all." *Hasting's Mss.*

হলওয়েলের পত্রে (Court of Directorগণকে লিখিত) পরওয়ানা জারির কথা আছে। হেষ্টিংস্ দপ্তরে ফকীর তুজারকে সংবাদ দিয়া পাঠাইবার কথা আছে। সুতরাং ফকীর তুজার পরওয়ানা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, এই ফকীর তুজারই খোজা বাজিদ। বেভারিজ সাহেব এই কথা বলেন, কিন্তু Mr, S. C. Hillই সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন।—"Coju-Wajid known amongst the nations as Fakhr-ul-tujar." প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদিগকে এই উপাধি দেওয়া হউক—*I. R. vol III. Index and Glossary.*

* "The rumour ran that Mr. Drake replied to the spies that, since the Nawab wished to fill up the Ditch, he consented to it, provided it was with the heads of the Moors. I do not believe he said so, but possibly some thoughtless young Englishmen let slip these words, which being heard by the harkaras or spies reported to the Nawab." *(Law) I. R. vol III, p. 165 F. N.*

শুনিব না, এবং তাহাদিগকে আমার দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" * মুর্শিদাবাদ হইতে লিখিত আর একখানি পত্রে তিনি উক্ত খোজা বাজিদকে জানান যে, ইংরাজদিগের এ দেশ হইতে মূলোচ্ছেদ করার তাঁহার প্রধান তিনটি কারণ আছে। একটি, তাহারা প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বাদশাহের রাজ্যে দৃঢ় প্রাকার নির্ম্মাণ ও খাত খনন করিয়াছে। দ্বিতীয়, তাহারা তাহাদের দস্তকের সুবিধার অপব্যবহার করিয়া বাদশাহের শুল্কের ক্ষতি করিয়াছে। তৃতীয় কারণ এই যে, বাদশাহের যে সকল কর্ম্মচারী হিসাবের জন্য দায়ী, তাহাদিগকে তাহারা না পাঠাইয়া আশ্রয় দান করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহাদিগকে এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহারা যদি এই সকল আপত্তির ব্যবস্থা করে এবং জাফর খাঁর সময় অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যে ভাবে বাণিজ্য করিত, সেই ভাবে করিতে ইচ্ছা করে; তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া এ দেশে থাকিতে দিতে পারি, নতুবা সত্বরই তাহাদিগকে বিতাড়িত করিব। ঐ পত্রে সিরাজ নিজ হস্তে লিখিয়াছিলেন—"আমার এই অভিপ্রায় ইংরাজদিগকে জানাইবে। তাহারা যদি এই সকল সর্ত্তে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা থাকিতে পারে, অন্যথা তাহারা এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে।" † এই দুর্গ-প্রাকারাদি নির্ম্মাণ হইতে য়ুরোপীয়দিগকে বিরত করা যে আলিবর্দ্দী খাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি সিরাজকে যে তাহাই বলিয়া গিয়াছিলেন, সিরাজের এই সকল পত্রাদি হইতে তাহা বিশেষরূপেই বুঝা যায়। অবশ্য য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজদিগকে এ দেশ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিতে আলিবর্দ্দী ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহাদিগের বণিকের ন্যায় অবস্থান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সিরাজের পত্রাদি হইতেও তাহাই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে সিরাজের আরও কোন কোন পত্রের কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব। তবে ইংরাজদিগের ঔদ্ধত্য তাঁহার যে অসহ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজরা আলিবর্দ্দীর জীবিতকাল হইতেই যে সিরাজকে অগ্রাহ্য করিতেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

ড্রেক সাহেবের পত্র পাইয়া সিরাজ-উদ্দৌলা রাজমহল হইতে কাশীমবাজার কুঠী অবরোধের জন্য মুর্শিদাবাদে লিখিয়া পাঠান। রায় দুর্ল্লভের আদেশে মির্জ্জা ওমারবেগ কাশীমবাজারের ইংরাজ, কালিকাপুরের ওলন্দাজ ও সৈদাবাদের ফরাসী কুঠী অবরোধ করিয়া বসেন, কিন্তু পরদিন ফরাসী ও ওলন্দাজ কুঠী হইতে সৈন্য অপসৃত করিয়া কেবল ইংরাজ কুঠীই অবরোধ করা হয়। কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব কলিকাতায় সৈন্যের সাহায্য চাহিয়া পাঠান, কিন্তু কাশীমবাজার দুর্গ রক্ষার জন্য যথেষ্ট লোকজন ও গোলাগুলী বারুদ আছে বলিয়া কলিকাতা হইতে কোন সাহায্য আসিল না। ডাক্তার ফোর্থ সাহেব রায় দুর্ল্লভের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন যে, বাগবাজারে যে টানা পুল ও পেরিং পইণ্টের নূতন প্রাকার এবং কেলশাল সাহেবের বাগানে যে অষ্টভুজ সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার জন্য নবাবের ক্রোধ হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে স্বীকার করিলে নবাব শান্ত হইবেন। ওয়াট্‌স সে কথা কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান, কিন্তু যথাসময় তাহার উত্তর না আসায় কাশীমবাজার কুঠী অবরোধের ব্যবস্থা হয়। সিরাজ-উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে আসিয়াই রায় দুর্ল্লভকে কাশীমবাজার কুঠী অধিকারের জন্য পাঠাইয়া দেন। কাশীমবাজার কুঠী পূর্ব্বে সুরক্ষিত ছিল না, পরে তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র দুর্গে পরিণত করা হয়। রায় দুর্ল্লভ দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া তাহাতে আর প্রবেশ করিলেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রহরীদের সহিত সজ্ঘর্ষের ভয়ে তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু সেই অমিত সৈন্যের অধিনায়ক সামান্য কয়েক জন প্রহরীর ভয়ে যে দুর্গে প্রবেশ করেন নাই, ইহা নিতান্ত হাস্যকর কথা। সে যাহা হউক, রায় দুর্ল্লভ দুর্গমধ্যে প্রবেশ না করিয়া অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবকে সাক্ষাৎ করার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। অবশ্য তাহাকে অভয় দেওয়াও হইল। ওয়াট্‌স ডাক্তার ফোর্থকে পাঠাইয়া

* "I swear by the Great G d and the Prophets that unless the English consent to fill up their ditch, raze their fortifications and trade upon the same terms they did in the time of Nabab Jaffeir Cawn, I will not hear anything in their behalf and will expel them totally out of my country" *I. R. vol I. pp 3-4.*

† "Please to acquaint the English minutely of my resolutions. If they are willing to comply with those terms they may remain, otherwise they will be expelled the country."—*I. R. vol I. page 5.*

দিলেন। নবাবকে অর্থ-প্রদানে শান্ত করার চেষ্টা হইতেও লাগিল. কিন্তু এবার তাহাতে কোনই সুবিধা হইল না। রায় দুর্ল্লভ ওয়াট্‌সকে আসিবার জন্য ফোর্থকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। তখন কুঠীর সদস্যগণের পরামর্শে ওয়াটসের যাওয়াই স্থির হইল, কেবল সেনানী ইলিয়ট ইহার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হয়। এ দিকে ওয়াটস-পত্নী কাঁদাকাটি করিয়া ওয়াটসকে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করেন। অগত্যা ওয়াট্‌স ডাক্তার ফোর্থের সহিত রায় দুর্ল্লভের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। নবাব-কর্ম্মচারীদের পরামর্শক্রমে ওয়াট্‌স হস্তে রুমাল বাঁধিয়া নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।* নবাব তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া অবস্থিতি করিতে বলিলেন। তাহার পর তাঁহাকে দিয়া এক মুচলেকাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হইল।

সেই মুচলেকা পত্রের মর্ম্ম এই যে—কলিকাতার নবগঠিত পেরিং প্রাকার প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সরকারের যে সকল কর্ম্মচারী অব্যাহতি-লাভের জন্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে নবাবের নিকট পাঠাইতে হইবে। দস্তকের অপব্যবহারে সরকারের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে।† ওয়াট্‌স মুচলেকা-পত্রে স্বাক্ষর করিলে কুঠীর কর্ম্মচারী কলেট্‌ ও ব্যাটসনকে আনাইয়া মুচলেকার স্বাক্ষরের কথা বলিলে, তাঁহারা কলিকাতা দরবারের অনুমতি ব্যতীত স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহাদিগকে বন্দী করা হইল। তাহার পর কাশীমবাজার কুঠী দুর্ল্লভরামের হস্তে অর্পণ করার জন্য আবার কলেটকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কুঠীর কামান, গোলাগুলী প্রভৃতি নবাব-শিবিরে প্রেরিত হয়। এইরূপ অবমাননায় সেনানী ইলিয়ট আত্মহত্যা সম্পাদন করেন। কলেট ফিরিয়া আসিলে ব্যাটসনকে ফেরত পাঠান হয়। তাহার পর ওয়াট্‌স ও কলেটকে সঙ্গে লইয়া সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। সিরাজ-উদ্দৌলা বুঝিয়াছিলেন যে, কাশীমবাজারের কর্ম্মচারীদের মুচলেকায় কায হইবে না, কাযেই অগত্যা তাঁহাকে কলিকাতা পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে হইবে। কলিকাতার সদস্যরা নূতন প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সম্মত হইয়াও ওয়াট্‌সকে জানাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাশীমবাজার অবরোধের জন্য সে পত্র ওয়াট্‌সের হস্তে পৌছায় নাই বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সিরাজ-উদ্দৌলা যখন আপনার বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন চারিদিকে খুবই সোরগোল পড়িয়া গেল। তাঁহার সহিত ৫০ হাজার বা তদধিক সৈন্য যাইতেছে বলিয়া রাষ্ট্র হইল। ইংরাজরা মনে করিলেন, সিরাজ-উদ্দৌলা এবার সত্য সত্যই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহারাও উদ্যোগী হইলেন। নবাব কলিকাতায় পৌছিবার পূর্ব্বে ইংরাজরা যদি তাঁহার আদেশে সম্মত আছেন বলিয়া পথিমধ্যে কোন স্থানে দূত পাঠাইতেন, তাহা হইলে ব্যাপার ভিন্নরূপই ধারণ করিত। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইলেন। ইংরাজরাই প্রথমে পথ দেখাইলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থ নবাবের থানা দুর্গটি তাঁহারা আক্রমণ করিয়া বসিলেন। নবাবের লোকরা পলাইয়া গেল, ইংরাজরা তাহার জিনিষপত্র লুঠিয়া লইলেন। পরে হুগলী হইতে নবাব-সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আবার দুর্গ অধিকার করিল। কৃষ্ণবল্লভ ও অমিচাঁদকে নবাবপক্ষীয় সন্দেহ করিয়া বন্দী করা হইল। অমিচাঁদের এক জন জমাদার প্রভুর বাটীর স্ত্রীলোকদের লাঞ্ছনার ভয়ে কতকগুলিকে হত্যা করিয়া নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করিল। এ দিকে নবাব হুগলীতে আসিয়া পৌছিলেন, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে সাহায্য করার জন্য তলপ দিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইলেন। ইংরাজরাও তাঁহাদের সাহায্য চাহিলেন, তাঁহারা তাহাতেও সম্মত হইলেন না। নবাব নদী পার হইয়া ক্রমে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদিগের সঙ্গসমেত পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয়াদিগকে লইয়া ৫ শত ১৫ জন মাত্র যুদ্ধার্থী

* মসিয়ে লাব স্মরণ-লিপিতে আছে যে, নবাবের লোকরা পাগড়ী দিয়া ওয়াট্‌সকে বাঁধিয়া বন্দী করিয়াছিল। কিন্তু হেষ্টিংস দপ্তরে লিখিত আছে যে, নবাব-কর্ম্মচারীদের পরামর্শে ওয়াটস নিজেই হাতে রুমাল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

† এই হলওয়েল সাহেবের প্রভুত্ব খর্ব্ব করার কথাটি কেবল হেষ্টিংস দপ্তরেই দেখা যায়।

ছিল, ১৫ শত সিপাহীরও সংগ্রহ হইল। ইহা লইয়াই তাঁহারা বিপুল নবাব-বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। ইংরাজ যে চিরদিনই অসমসাহসিক, ইহাও তাহার একটি প্রমাণ। ১৫ই জুন নবাব-সৈন্য কলিকাতা বাগবাজারের সম্মুখীন হইল ও আক্রমণ আরম্ভ করিল। ইংরাজরা জল ও স্থল উভয়ত্র হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, নবাব-সৈন্যেরা উত্তর দিতে লাগিল। রাত্রিতে তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, ইংরাজ সৈন্য গোপনে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হঠাইয়া দিল। অমিচাঁদের আহত জমাদার নবাব-সৈন্যদিগকে পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের অরক্ষিত স্থানের সন্ধান বলিয়া দিলে, পরদিন প্রাতে সেই স্থান দিয়া দলে দলে নবাব-সৈন্য নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা নগরের অনেক স্থান অধিকার করিয়া বসিল ও বাজারে আগুন লাগাইয়া দিল। নবাব-সৈন্য ইংরাজদের তোপমঞ্চগুলিও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করিল না। ইংরাজরা তোপের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। নবাব-সৈন্যরা তোপমঞ্চের কামানগুলি সারিয়া লইয়া দুর্গমধ্যে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলী ছাড়িয়া দুর্গরক্ষীদিগকেও নিহত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গের নিকট নদীতে যে সকল জাহাজ ও ডিঙ্গি নৌকা ছিল, রাত্রিতে ইংরাজ মহিলাদিগকে তাহাতে করিয়া সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। অনেক সাহেবও তাহাতে আশ্রয় লইলেন। রাত্রিতে নবাব-সৈন্য দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিল, তখন দুর্গ হইতে পলায়নেরই চেষ্টা চলিল। তহবিলপত্র ঐ রাত্রিতেই স্থানান্তরিত করা হইল। পরদিন প্রাতে ফিরিঙ্গী রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দিবার জন্য দুর্গের গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইলে সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং জাহাজ ও নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিল। কতকগুলি নৌকা উল্টাইয়া গিয়া অনেকের সলিলসমাধির ব্যবস্থা ঘটাইল। যাহারা পারিল, জাহাজ ও নৌকায় উঠিল, যাহারা পারিল না, তাহারা পড়িয়া রহিল। অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবও পলায়ন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও কেহ কেহ সেই পথ ধরিলেন।

ড্রেক সাহেবের পলায়নের পর হলওয়েল সাহেব অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন, তিনি সাধ্যমত দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২০শে জুন প্রাতে নবাব-সৈন্য নূতন উদ্যমে দুর্গমূলে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সকলের অনুরোধে হলওয়েল বন্দী অমিচাঁদকে দিয়া নবাবের সেনাপতি রাজা মাণিকচাঁদকে যুদ্ধ স্থগিত করিতে ও তাঁহারা নবাবের আজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাইয়া এক পত্র লিখাইলেন এবং দুর্গের বাহিরে তাহা ফেলিয়া দিলেন। সে পত্রের কি হইল, তাহা বুঝা গেল না, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নবাব-সৈন্য আক্রমণ চালাইল। অপরাহ্নে উভয় পক্ষ হইতে সন্ধিসূচক পতাকা উত্থিত হইল। হলওয়েল দুর্লভরামের নামেও পূর্ব্বপত্রানুযায়ী এক পত্র লিখিয়া ফেলিয়া দিলেন। নবাব-সৈন্যরা তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। দুর্গের পশ্চিম দিকের দ্বার এক দল অবরুদ্ধ সৈন্য উন্মুক্ত করিলে নবাব-সৈন্য তাহা দিয়া দলে দলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াও তাহারা আসিতে লাগিল, দুর্গমধ্যস্থিত লোকরা আর যুদ্ধ না করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। পাঁচটার পরে সিরাজ-উদ্দৌলা পাত্রমিত্র সহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমেই কৃষ্ণবল্লভ ও অমিচাঁদকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের প্রতি সমাদর দেখাইলেন। হলওয়েল সাহেবকে আনাইয়া তাঁহাকে অভয় দেওয়া হইল; কিন্তু কেবলমাত্র ৫০ হাজার টাকা দুর্গমধ্যে পাওয়ায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাও হইল। আর্ম্মাণীয় ও পর্ত্তুগীজ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নবাব মাণিকচাঁদের উপর ইংরাজ বন্দীদেরও দুর্গরক্ষার ভার দিয়া শিবিরে গমন করিলেন। মাণিকচাঁদ অন্ধকূপ নামে এক ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে ইংরাজবন্দীদিগকে রাখিবার আদেশ দিলেন, বন্দীদের মধ্যে অবশ্য অনেকে আহতও ছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন প্রাণত্যাগ করিলেন। কয়েক জন বাঁচিয়াও ছিলেন। ইহাই ইতিহাসে অন্ধকূপহত্যা নামে কথিত। আমরা আগামী বারে অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নিখিলনাথ রায়।



তীর্থ-দর্শন

প্রয়াগে পূর্ণ-কুম্ভ।

সারা ভারতবর্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মকামী-দিগের অন্তর ইতিমধ্যেই প্রয়াগের পথে ত্রিবেণী-সঙ্গমের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইয়াছে।

সুবিস্তীর্ণ চরে অস্থায়ী নূতন নগর বসিয়াছে। আমারও অন্তঃপুরের যবনিকা এই বায়ুবেগে দুলিয়া উঠিল এবং প্রতিদিন আফিস হইতে বাসায় ফিরিতেই সেই মৃদু-বায়ুবেগ কাণের ভিতর দিয়া এমন এক যায়গায় গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল যে, বাহির হইবার ছিদ্র আর কোথাও সে পাইল না।

মুক্ত বায়ু জীবের জীবন, কিন্তু বদ্ধ বায়ু পেটের মধ্যে আশ্রয়লাভ করিলে ডাক্তার-কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হয়; অন্যথায় জীবন-সংশয়।

স্থির করিলাম, সস্ত্রীক প্রয়াগ যাইব।

ধর্ম্মাচরণের এই বিধান যাঁহারা সে কালে দিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় ত রেল-ষ্টীমারের কল্পনাও তখন করিতে পারেন নাই এবং পুণ্যকর্ম্মে মাশুলের গুরুভারটাও মসীজীবীর পক্ষে কতটা মর্ম্মান্তিক, তাহারও হিসাব তাঁহাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অগোচরেই ছিল। শুনিলাম, ভিড় হইবে অসম্ভব। পূর্ব্বে যাত্রা না করিলে কষ্ট-বিপদ অনিবার্য্য।

অফিসের এক সহকর্ম্মী বলিলেন, "কোন কষ্ট হবে না। আমার এক দাদা থাকেন সেখানে; তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিলেই—ব্যস্।"

রাজার হালে না হউক—পথচারীর নাকাল হইতে রক্ষা পাইব।

হাসিমুখে বলিলাম, "কিছু দিন আগে ছুটী নেওয়াই ভাল। পশ্চিমের আর সব তীর্থ দেখবার ইচ্ছেও রয়েছে কি না?"

বন্ধু বলিলেন, "অর্থাৎ পুণ্য তুমি আঁটি বেঁধে সঞ্চয় করতে চাও না, একেবারে বোঝাই ক'রে আন্‌বে। দেখো ভাই, সামান্য কেরাণী, সে ভারে মাথা যেন ট'লে না যায়।"

বলিলাম, "মাথা থাকলে ত টলবে? আরও পুঁচিয়ে কাটানোর চেয়ে এক কোপে যা হয় হয়ে যাক্। তীর্থলোভ—সব লোভের মধ্যে বড় লোভ। পুণ্যের লালসায় না কি দোষ-পাপ কিছু হয় না। অনর্থরূপ অর্থ যদি তা'তে অযথা খরচ হয়ই ত ভয় পাবার কিছু নেই। ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষ, লোটা-কৌপীন কিন্‌তে খরচ আর কতই বা!"

বন্ধু হাসিলেন। আমিও হাসিলাম। সমঝদার যিনি, তিনি যেন দয়া করিয়া হাসিবেন না!

নির্দ্দিষ্ট দিনে নূতন একটি সংসার লইয়া মা ও গৃহিণী ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

নূতন সংসারের বিস্তারিত ফর্দ্দটা আর দিলাম না, সেটা বিরক্তিজনক হইবে, এই আশঙ্কায়। আমারই যখন এই সব দেখিয়া লোটা-কম্বলের কথা বার বার মনে হইতেছিল, তখন 'অন্যে পরে কা কথা!'

চাল, ডাল, তেল, মসলা, তৈজসপত্র, আনাজ-পাতি, কাপড়, জামা, বিছানা, বালিস, লণ্ঠন, বালতি প্রভৃতিতে মোট উঠিল—চৌদ্দটি।

গাড়োয়ান সারাপথ গজর-গজর করিতে করিতে চলিল। অস্পষ্ট ভাষা তাহার বোধগম্য না হইলেও, অর্থহীন নহে। সুতরাং, থলিতে হাত দিয়া দেখিলাম, ভাঙ্গানি রেজ্‌কি আছে কি না? দেখিলাম—আছে। না থাকিলে পথের ধারে গাড়ী থামাইয়া পাণ-বিড়ি কিনিবার ছলে টাকাটা ভাঙ্গাইয়া লইতে হইত! কারণ, আস্ত টাকা দিলে, যে প্রকৃতিরই গাড়োয়ান হউক না কেন, বাকীটা বকশীসের জমায় না ফেলিয়া সে নিশ্চিন্ত হয় না। তদুপরি এই চৌদ্দ দফার চারু-সুযোগ।

চৌদ্দ জিনিষটাকে আমরা চিরকালই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। মেয়েরা এই সে দিন পর্য্যন্ত চলিত কথায় বলিয়াছে, 'ইস্—ভারী ত—প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা!' কিন্তু সময় এবং সুযোগ পাইলে এই চৌদ্দই যে চৌদ্দ-ভুবন হইতে আলোকরশ্মি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, তাহা বোধ হয়, আজিকার দিনে কাহাকেও আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না।

গাড়ী হইতে নামিয়াই কুলীর হাসি দেখিয়া ও চৌদ্দর পানে চাহিয়া ভুবন আমার অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। অথচ এই সমুদ্র পার হইবার অন্য উপায়ই বা কি! যথাস্থানে পৌছিয়া কুলীরা বত্রিশপাটী দাঁত বাহির করিয়া বকশীস্ চাহিল।

বলিলাম, "বৎসগণ, এইটুকু আসিয়া ত জোঁকের মত দেহের লহু শুষিয়া লইয়াছ, আবার কেন হাত পাত?" সর্দ্দার কুলীটার রসবোধ ছিল। সঙ্গিগণকে উদ্দেশ করিয়া এবং আমাকেও শুনাইয়া বলিল, "চল্ রে চল্,—বাঙ্গালী বাবু এইসান্ হ্যায়!"

রাগ, না লক্ষ্মী।

ভিড় ইহারই মধ্যে হইয়াছে—তদুপরি চৌদ্দের ঠেলা। সারাদিন সারারাত্রি শোয়া ত চুলায় যাক, পাশ ফিরিবার সুযোগটুকু পাইলাম না। মেয়েদের বিরক্তি-প্রসন্ন (?) মুখের পানে চাহিয়া সে কথাটা বুঝিলাম। পুণ্যকর্ম্মে বিরক্তির ছায়া পড়িলে পরকালের পথ না কি কাঁটায় ভরিয়া উঠে, তাই প্রসন্নতাটুকু জোর করিয়া অধরের কোণে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস।

এলাহাবাদে পৌছিতে হইল রাত্রি ১০টা। অজানা অচেনা সহর; শীতকাল। আরাম-শয়নে অর্দ্ধেকের উপর নর-নারী সুখ-নিদ্রা দিতেছে। এ সময়ে ঠিকানা খুঁজিয়া তাঁহাদের দুয়ারে 'হানা' দেওয়ার অর্থ উৎপীড়ন ছাড়া আর কি! রাত্রির মত ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলে ধর্ম্মদেব প্রসন্ন হইবেন ভাবিয়া গাড়োয়ানকে সেই দিকেই যাইতে বলিলাম।

ধর্ম্মদেব হয় ত প্রসন্ন হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মশালার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল,—অন্তরীক্ষবাসী দেবতা কোন দিনই ইহার পানে কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করেন নাই। সার্ব্বজনীন কথাটা বড় সুন্দর। দুর্গাপূজা-কালীপূজায় খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তোলে। কিন্তু কিছুক্ষণ ধরিয়া মুখোমুখি তাহার পরিচয় লইতে গেলে দেহ এবং মন দুই-ই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ছত্রিশ জাতির ছাপ্পান্ন রকমের কলরব,—মানিলাম, নিতান্ত অসহ্য বোধ হয় না, কিন্তু ছত্রিশ রকমের ব্যবহারের কোনও সামঞ্জস্যই ত খুঁজিয়া পাই না! ধর্ম্মশালার দুয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া একতল, দ্বিতল এবং ত্রিতল পর্য্যন্ত কুটনার খোসা, পাণের পিক্, থুথু, বমি, ডাঁটার ছিবড়া, ডালের ধারা, তরকারী, ভাত বা রুটীর ছড়া এবং মল-মূত্রের প্রলেপ এমন ঘনভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত যে, পা রাখিবার ঠাইটুকু নাই। চক্ষু মুদিয়া এই পরম রমণীয় সার্ব্বজনীনত্ব উপভোগ করিতে করিতে দ্বিতলের একখানি জানালাহীন ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকিতে কেমন যেন গা পাক দিয়া উঠিল। একটা চাম্‌সে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। চারিদিকে চীনাবাদামের খোসা ছড়ানো, দেওয়ালের গায়ে থুথু-গয়ের।

কি করি, শীতকালের রাত্রি—ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া সেই ঘরে ঢুকিতেই হইল।

অনিদ্রায় অনাহারে পরমসুখে সকলেরই সারারাত কাটিয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়াই জিনিষপত্র টানিয়া বারান্দায় আনিয়া গাড়ীর সন্ধানে নীচে নামিলাম।

দুখানা গাড়ীতে জিনিষপত্র চাপাইয়া সেই প্রত্যুষেই সহরের পথে বাহির হইলাম।

শীতের প্রভাত হইলেও সহরবাসীরা জাগিয়াছেন। বারান্দায়, রোয়াকে এবং পথের ধারে বসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া অনেকেই চা-পান করিতেছেন। শীত এবং আরাম দুইটাই যে উপভোগ করিবার জিনিষ, এ কথা তাঁহাদের দেখিয়া আমার মনে হইল। এ দিকে গাড়ী চলিয়াছে ত চলিয়াছেই; ঠিকানার ঠিকানা আর মেলে না। অবশেষে সহরের শেষ প্রান্তে প্রায় যমুনার ধারে—পত্রোল্লিখিত রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। হরি হরি! নম্বর মিলানই যে কঠিন ব্যাপার। ১৫০ পর ২৫,—তার পর—৫০। হতাশ হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। চাহিতেই দেখি, অদূরে খর্ব্বকায় এক ব্যক্তি দুয়ারে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মিটি মিটি চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া পথচারী সকলকেই তিনি কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করিতেছেন ও মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছেন। বাড়ীর সন্ধান ইঁহার নিকট লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিলাম।

গাড়ী থামিতেই লোকটির ক্ষুদ্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের গাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িল।

তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গরম কাপড়ে ঢাকা। মাত্র চক্ষু ও নাসিকা বাহির করিয়া সেই অদ্ভুত খর্ব্বকায় ব্যক্তিটি আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাতেই রুক্ষতা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায়, দয়া ক'রে বলতে পারেন, ভবেন বাবুর বাড়ী কোথায়?"

লোকটির তীক্ষ্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনিই কি অবনী বাবু—কলকেতা থেকে আসছেন?"

তাঁহার রূঢ় স্বর শুনিয়া আমার ত আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, গাড়ী হাঁকাইয়া ঐ অপ্রিয়দর্শন অভদ্র লোকটার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ি। কিন্তু ধর্ম্মশালার দৃশ্য নয়নে প্রতিফলিত হইবামাত্র সমস্ত বিরাগ নিমেষে কোথায় যেন অন্তর্দ্ধান করিল।

বিনীতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ। কাল সারা রাত্রি ধর্ম্মশালায় যা কষ্ট হয়েছে—"

কথা শেষ না হইতেই রূঢ়স্বরে একরূপ ধমক দিয়াই তিনি বলিলেন, "হয়েছে ত? বেশ' এখন নামবেন, না গাড়ীর মধ্যে ব'সে বকর-বকর করবেন?"

আমি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "এতগুলো মোট,—ভবেন বাবুর বাড়ীর কাছে গিয়ে নামলেই—"

তেমনই রূঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "ভয় নেই—চোর-ডাকাত নই, লুটে নেব না। দিনে-দুপুরে এই সহরের বুকে কলকাতার বাবু আপনারা—পুলিস ঐ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে—এত ভয়ই বা কিসের? রাত্রিকালে ধর্ম্মশালায় চোর-গাঁটকাটার মধ্যে গিয়ে রাত কাটাতে সাহস হ'লো, আর ভদ্রলোককে দেখে এত ভয়?"

কি মুস্কিল! নামিয়া বলিলাম, "ভবেন বাবু,—" লোকটি মুখ-চোখ খিচাইয়া কহিলেন, "আমিই গো আমি, চোর-ডাকাত ভেবে রাত্রিকালে এ গলিতে আসেন নি—খুব বুদ্ধিমানের কাযই করেছেন। এখন এসেছেন—এই আমার পরম ভাগ্যি। এখন দয়া ক'রে ঐ বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন দেখি।" বলিলাম, "গাড়ী থেকে মোটগুলো নামাতে হবে। মেয়েরা—"

ভবেন বাবু উচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন, "সে মাথাব্যথা মশায়ের কেন? আপনি দয়া ক'রে ব'সে ব'সে দেখুনই না—কাযগুলি এই অধমের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় কি না?"

বলিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া স্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া মাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা, নেমে পড়ুন। যে ডাকাতে ছেলের পাল্লায় পড়েছিলেন,—কাল রাত-ভোর না খাওয়া, না ঘুম, ও মুখ দেখেই টের পেয়েছি। আবার দিনে-দুপুরে আমার কথায় নামতে গিয়ে শতবার জিজ্ঞাসা? কেন রে বাপু, কাল রাতে ষ্টেশনে গিয়ে যখন গরু খোঁজা করলাম, তখন ত একবার ডেকেও জিজ্ঞেস করলি না, ওগো—মশায়, অমুক বাবুর বাড়ী কোথায় জানেন? তা হ'লে ত সব ল্যাঠা চুকে যেত। সেই রাত্তিরে নরককুণ্ডে বাস না করালেই কি তোর উপযুক্ত ছেলের কায হ'তো না?"

মা আমার পানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে নামিলেন, স্ত্রীও নামিলেন।

ভবেন বাবু হাঁক দিলেন, "ক্ষান্ত—ওরে ক্ষান্ত!"

ক্ষণকালমধ্যে এক কুব্জা দাসী আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

ভবেন বাবু তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মায়েদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যা। আর দেখ, ভজুয়া ও গোবিন্দকে জলদি পাঠিয়ে দিবি—মোট নামাবে।"

ভজুয়া আসিল—একচোখ কাণা। গঠন বলিষ্ঠ হইলেও সারা গায়ে কালো কালো বসন্তের দাগ। সম্ভবতঃ একটি চক্ষু উহাতেই নষ্ট হইয়াছে। কি বীভৎস চেহারা!

ভবেন বাবু বলিলেন, "গোবিন্দ কৈ? তুই একা সামলাতে পারবি কেন? কলকেতার বাবুরা বিদেশে বেরুবার সময় ভাবেন, যা কিছু জিনিষ-পত্তর সেই সহরেই মেলে, ত্রিভুবনে আর কোথাও মেলে না। আর লোকের বাড়ী অতিথি হ'লে—তারা যদি উপোস করিয়ে রাখে।" বলিয়া তীক্ষ্ণ চোখের খোঁচায় আমায় বিঁধিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

লোকটির রকম দেখিয়া অবাক্ ত হইয়াছিলামই, কুব্জা দাসী, কাণা চাকর ও তাঁহার বচনবিন্যাসের ধারা দেখিয়া হাসিও বড় কম পাইল না। মাথায় ভদ্রলোকের বোধ হয় 'ছিট' আছে।

ভবেন বাবু হাঁকিলেন, "গোবিন্দ—গোবিন্দ—ওরে গোবিন্দ!"

টলিতে টলিতে গোবিন্দ আসিয়া দাঁড়াইল।

আহা! কিবা মনোহর মূর্ত্তি! ত্রিভঙ্গিম ঠাম—বাঁকা শ্যাম আর কি! হাত নুলা—পা খোঁড়া—মুখখানিও বাঁকা। ত্রয়ীর সমাবেশ ভবেন বাবু ভালরূপেই করিয়াছেন। নিজের যেমন কন্দর্পকান্তি—তেমনই কি জুটিয়াছে চাকরগুলা! যে নিজের ভারে নিজেই টলিয়া পড়িতেছে—সে আবার সাহায্য করিবে মোট নামাইতে?

হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

ভবেন বাবু গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইয়া সরোষে কহিলেন, "মানেটা কি হ'লো? হাসলেন যে বড়?"

হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিলাম, "আপনার চাকরগুলো দেখে। কুঁজো ঝি, কাণা বামন, খোঁড়া চাকর—এদের দিয়ে যে কি কাযটা পান—"

তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "অর্থাৎ কাণা-খোঁড়া ব'লে ওরা না খেয়ে মরুক—এই আপনার ইচ্ছে, নয়? শুধু আপনি কেন,—পৃথিবীর লোকের বিবেচনাই ঐ রকম। যত দিন কায করতে পারে, তত দিন আদর, তার পর—মারেন লাথি। খুব হয়েছে, আর হেসে মুখে কালি মাখাবেন না। ওরে গোবিন্দ, গেল—গেল বুঝি মোটটা প'ড়ে।" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কম্পমান খোঁড়ার মাথা হইতে নিজের মাথায় মোটটি তুলিয়া লইলেন।

আমি ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেই রূঢ়স্বরে ধমক দিয়া কহিলেন, "থাক, থাক, আর দরদে কায নেই। কাণা-খোঁড়া ব'লে এইমাত্র না হেসেই ফুটিফাটা হচ্ছিলেন!"

অতঃপর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মোট লইয়া সোজা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। চাকররাও একে একে মোটগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল।

গাড়োয়ান-বিদায় পর্ব্বও মিটিল।

বৈঠকখানায় আসিয়াই উপবিষ্ট আমাকে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন করিলেন, "তার পর, দয়া ক'রে এখানে ক'দিন থাকা হবে বাবুর?"

প্রশ্নের ধরণে অন্তর জ্বলিয়া গেল। বেশ উষ্মাভরেই উত্তর দিলাম, "দিন-টিন নয়, আজও যেতে পারি—কালও যেতে পারি।"

তিনি উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, "বটে! তা দয়া ক'রে এ অধীনকে কষ্ট দেবার জন্যে এখানে দর্শন দেওয়ার প্রয়োজন? এটা হোটেল বা মেস নয়। এত যদি তাড়া—ওরে গোবিন্দ, ডাক ত দু'খানা গাড়ী, বাবুরা এখনই যাবেন।"

গোবিন্দ কাণা চোখ লইয়া গেটের বাহিরে যায় আর কি!

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "থাক, থাক, না হয় দু'দিন থেকেই যাব।"

তিনি গোবিন্দের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে থাক।"

কি মুস্কিল! লোকটাকে এখনও ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কি চান ইনি? এই যদি ভদ্রতার নিদর্শন হয় ত দস্যুতা আর কাহাকে বলে?

আমায় চিন্তান্বিত দেখিয়া ভবেন বাবু বলিলেন, "ভাবনা থাক, যখন জলে পড়েন নি। বলি, সকালের কাযগুলো সারা হয়েছে, না গাড়ুতে জল দিতে বলবো?"

আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেই কুব্জাসুন্দরী ডিসে করিয়া সেরখানেক গরম হালুয়া ও বড় এক কাপ চা লইয়া দর্শন দিলেন।

খোনা ভাষায় বলিলেন, 'খাঁও গোঁ বাঁবু, খাঁও।

এক সের হালুয়া খাইব কি? অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া কহিলাম, "বাবুর হালুয়া আলাদা ক'রে দাও নি কেন?"

ঝি এক গাল হাসিয়া কহিল, "পোড়া কঁপাল, বাঁবু কি এঁখন কিঁছু খাঁবেন? সেঁই বেঁলা তিঁনপঁর! চাঁন আঁহ্নিক—"

"কি রে ক্ষান্ত, কি বলছিস"—বলিতে বলিতে ভবেন বাবু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ক্ষান্ত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গেল।

আমার পানে চাহিয়া ভবেন বাবু বলিলেন, "কুটুম্বিতে হচ্ছে বুঝি? নিন্—নিন্—শীগ্‌গির খেয়ে নিন।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, "আমি রাক্ষস না কি? ক্ষিধে পেলেও এই এক সের হালুয়া—"

ভবেন বাবু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, "ওরে বাবা! বাবুর রাগ দেখ আবার! কলকাতার বাবু কি না। বলি, দয়া ক'রে যা পারেন দুটি মুখে দিয়ে আমার মাথা রক্ষে করুন।"

যা পারিলাম, খাইলাম। বরং ক্ষুধার তাড়নায় অতিরিক্তই খাইলাম, তথাপি ভবেন বাবুর গম্ভীর মুখের ভ্রূকুটি মিলাইল না।

আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আপনার কোন হোটেলে যাওয়াই উচিত ছিল। সে বেচারীর দু'পয়সা লাভ হ'তো, আপনিও কম খেয়ে বাঁচতেন। যাক, এখন দয়া ক'রে একটু বেড়াতে যাবেন কি?"

নিরাপত্তিতে উঠিলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া পথের দুই ধারের দ্রষ্টব্য জিনিষের পরিচয় দিতে দিতে তিনি চলিলেন।

বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি বলিলেন, "কেমন, এখন বুঝেছেন ত? পেট চুঁই-চুঁই করছে ত? তখন বলা হলো—ওরে, বাপ্‌রে, এক সে—র হালুয়া! কেমন জব্দ!"

আমি হাসিলাম। এতদূর ভবিষ্যদৃষ্টি আমার ছিল না সত্য, তা বলিয়া পেটটাকে মোটের সমতুল্য জ্ঞান করিতে পারি নাই।

আহার প্রস্তুত ছিল। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আহারে বসিলাম।

বসিয়া ত আমার চক্ষুস্থির! যাকে বলে ঊনপঞ্চাশ ব্যঞ্জন! থালা-বাটি-রেকাবে ভোজনের স্থল এতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, হেঁট হইয়া হাত বাড়াইয়াও সম্মুখের সর্ব্বশেষ বাটিটার নাগাল পাইলাম না।

মা নিকটে বসিয়াছিলেন, বাটিটা ঠেলিয়া আগাইয়া দিলেন।

কিন্তু অতগুলি রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য নিঃশেষ করা আমার মত ভোজন-বিলাসীর পক্ষেও এক দুরূহ ব্যাপার! চারটি বেলার খোরাক।

উঠিবার উপক্রম করিতেছি, ভবেন বাবু চক্ষু পাকাইয়া একরূপ গর্জ্জন করিয়াই কহিলেন, "বলি—ব্যাপার কি? গরীবের জিনিষগুলো ক্ষেতি-অপ্‌চো না করলে কি হ'তো না?"

ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলাম, "কি করবো বলুন, পেট আর নিতে নারাজ।"

ভবেন বাবু মায়ের পানে চাহিয়া সক্ষোভে কহিলেন, "কি ছেলেই তৈরী করেছিলেন মা, না খেতে দিয়ে ইহকাল একেবারে ঝরঝরে ক'রে দিয়েছেন! কি দরকার ছিল আপনাদের—এখানে উঠবার? তার চেয়ে দিই একখানা গাড়ী ডাকিয়ে,—কোন হোটেলে গিয়ে থাকুন গে। আমার এ কর্ম্মভোগ কেন?"

মা মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি করি বাবা,—খেতে ওরা তেমন পারে না! (এটি মায়ের মায়া-প্রসূত মিথ্যা। সন্তান যতই ভোজনবিলাসী বা শ্রীমন্ত হউক না কেন, মায়ের মুখে সেই কীর্ত্তি-কাহিনীর সুবিস্তার আলোচনা কেহ কোন দিন শুনিবে বলিয়া ভরসা নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালী মায়ের নিকট হইতে।) নৈলে তোমাদের এত যত্ন-আত্তি—"

ভবেন বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "ছাই যত্ন! মানুষের বাড়ী মানুষ গেলে—দুটো ডাল-ভাত আর কেউ খাওয়ায় না? তার নাম যত্ন?"

আমি বিরক্ত হইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিলাম, "এ রকম অযত্নের সমারোহে মানুষের হাঁফ লাগাই সম্ভব। সত্যি বলছি মশাই, দয়া ক'রে যত্ন একটু কম করুন। আমার দেহ, উদর এগুলির দিকে চেয়ে দেখাও মশায়ের উচিত। ওরাও যে আপনার অতিথি।"

তিনি গম্ভীর মুখখানা বারেকমাত্র বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কহিলাম, "দয়া ক'রে রাত্রিতে খাবার বন্দোবস্ত আর করবেন না। তা যদি করেন, গাড়ী আমাকেই ডাক্‌তে হবে।"

উত্তর না দিয়া গুম্ গুম্ শব্দে পা ফেলিয়া ভবেন বাবু কক্ষত্যাগ করিলেন।

মা বলিলেন, "বোয়ের মুখে শুনলুম, লোককে পথ থেকে ধ'রে নিয়ে এসে খাওয়ানো ওঁর একটা নেশা। সে না খেতে পারলে অমনি চ'টে-ম'টে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। পাগল ছেলে!"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "এ রকম বাজে খরচ করলে উপার্জ্জনের এক পয়সাও যে জমবে না।"

মা বলিলেন, "বৌটিও তাই বলছিল! মাসে উপায় করে তিন চারশ টাকা, কিন্তু মাসকাবারে দোকান-দেনা সব দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। মেয়ে চৌদ্দয় পা দিয়েছে, এক পয়সা কোথাও জমা নেই। বললে বলে, যার ভার, তিনি দেখ্‌বেন—আমি কেন মিছে ভেবে মরি?"

একটু থামিয়া বলিলেন, "বাড়ীর এ ধারটা দেখিস্ নি বুঝি! পাচ-ছটি রুগী প'ড়ে প'ড়ে কাতরাচ্ছে। যারা ভদ্র-লোক অথচ গরীব, হাঁসপাতালে যেতে লজ্জা করে, তাদের সন্ধান নিয়ে নিজের বাড়ীতে যায়গা দেবার জন্য ঐ ঘর-গুলো তৈরী করিয়েছে। পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার রেখেছে, নিজের হাতে পথ্যি তৈরী ক'রে দেয়।"

শুনিতে শুনিতে ঐ অপ্রিয়দর্শন রূঢ়ভাষী লোকটির উপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটি আমার ভরিয়া উঠিল। উঁহার হৃদয়টুকু যেন কঠিন আবরণের মধ্যস্থিত সুশীতল ডাবের জল। কিন্তু একটা সন্দেহ--

বলিলাম, "এতই যদি খরুচে লোকটি ত বাড়ীতে কুঁজো ঝি, কাণা বামুন ও খোঁড়া চাকর রেখেছেন কেন?"

মা বলিলেন, "সে কথাও শুনলুম! বলেন, ভাল বামুন চাকর ত সবাই রাখে, কাণা-খোঁড়ার পানে কে আর চায়? আমার কায চ'লে গেলেই হ'লো। এই উপলক্ষে অক্ষমকে যদি দু' মুঠো দিতে পারি—"

চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল। মুখ-হাত ধুইতে বাহিরে আসিলাম।

সে দিনের মধ্যে ভবেন বাবুর আর দেখা পাইলাম না। পরদিনও না।

শুনিলাম, তিনি আফিসের কাযে লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। ফিরিতে দিনকয়েক বিলম্ব হইবে। মাঝে মাঝে এমন হয়।

তিন দিনের দিন এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলাম। বিদায়কালে তাঁহার দেখা না পাইয়া মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু ও দিকে তীর্থভ্রমণের তাড়া ও আফিসের নাগপাশ। অপেক্ষা করিবার যো কি!

এলাহাবাদ ষ্টেশনে দিল্লীগামী গাড়ীতে চাপিয়া চারি-দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এমন সময় ঠিক ওপাশে ডাউন গাড়ীখানি আসিয়া লাগিল। অনেক লোক উঠানামা করিতেছিল; সহসা দেখিলাম, ভবেন বাবু।

চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম।

তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "চল্লেন আজই? খুব ভদ্রলোক ত! আমার সঙ্গে দেখাটা না করেই—"

হাসিয়া বলিলাম, "এইমাত্র মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকছিলুম—যাতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা না হ'লে সত্যিই আপশোষের ঠাঁই আমার থাকতো না। আপনার মত মহৎ হৃদয়—"

তিনি সরোষে কহিলেন, "অর্থাৎ আবার ফিরে এসে আমার আশ্রয়ে উঠবেন, তাই এই খোসামুদি!—উঃ, কলকাতার লোকগুলো কি চালাক গো! যান যান মশাই;—ওবার এলে আর আমার বাড়ী নয়, সোজা হোটেল।"

হাসিয়া বলিলাম, "পারবেন প্রাণ ধ'রে আমাদের হোটেলে পাঠাতে? ও সব বাইরের ধমকানিতে ভুলি না মশাই, ভেতরের জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রয়াগে এসে সব চেয়ে বড় তীর্থের খোঁজ আমি পেয়েছি।"

তিনি কটমট দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, "মানে?"



ঝড়

বসুমতী-চিত্রবিভাগ।

বলিলাম, "মানে, আপনার হৃদয়-তীর্থ। জ্বালামুখীর জলের মত ওর উপরটি ফস্‌ফরাসের আগুন। লোককে দাহ করে না, তৃপ্তিই দেয়। ফেরবার পথে আবার আসব।"

তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। খানিক দূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "হাত যোড় ক'রে বলছি মশায়, আমার এখানে আর আসবেন না। দোহাই আপনার,—আসবেন না।" বলিয়া দ্রুতপদে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

রূঢ়ভাষীর কণ্ঠে এমন সুকোমল স্বর আমি এক দিনও শুনি নাই। চোখের কোলে জলের রেখাও চিক্‌-চিক্‌ করিতেছিল যেন! তাঁহার বিদায়কালের কথাগুলি তখনও আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছিল—"আসবেন, আবার আসবেন।"

মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি কত তীর্থই না দর্শন করিলাম। আগ্রার তাজের পানে চাহিয়া ঘণ্টাকয়েক বিস্ময়-বিমুগ্ধভাবে বসিয়াও ছিলাম। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে সব ভুলিতে একটুও দেরী হইল না! শুধু এলাহাবাদের সেই কুদর্শন রূঢ়ভাষীকে আর একবার দেখিতে পাওয়ার ইচ্ছা আজও মাঝে মাঝে মনটাকে আমার ব্যাকুল করিয়া তুলে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমের বাড়ী

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
যে মাল-মসল্লা দিয়া, গিয়াছে সে নিরমিয়া,
তার জোরে সে যে দেবে কাল-সিন্ধু পাড়ি।
যত ঝঞ্ঝা যত ঝড় লাগিবে তাহার পর
ততই সৌন্দর্য্য তার উঠিবে রে বাড়ি',
তাহারে ভাঙ্গিতে চায়, কে রে সে আনাড়ী?
দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে পলে পলে যার তরে
কোটি কোটি বঙ্গবাসী হৃদয় নিঙাড়ি'
ঐ দেখ্‌ ধীরে ধীরে মুক্তিমন্দাকিনী-তীরে,—
সোনার আনন্দমঠ উঠিতেছে গড়ি,
স্তুতি-নিন্দা তোষামোদ রাজভক্তি রাজরোষ
তুচ্ছ অতিতুচ্ছ—যত ধূলা-বালি ঝাড়ি'
আকাশ ভেদিয়া দূর উঠিছে সে মঠচূড়,
কে তারে করিবে গুঁড়া? বৃথা বাড়াবাড়ি,
দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
বঙ্কিম গড়েছে যাহা, অনন্ত অক্ষয় তাহা,
কে পারে রে খসাইতে একচুল তারি,'
নহে ত গড়া সে খালি দিয়ে কাঠ চূণ বালি
ঘুণে জরা এ মাটীর ইট কাঁড়ি কাঁড়ি।
কোটি অনশন-ক্লিষ্ট ভারতের "শান্ত শিষ্ট"
প্রাণের ভিতরে আছে যে প্রাণ, তাহারি'
উপরে বনেদ করি' বঙ্কিম গিয়াছে গড়ি'
তাহার সাধের বঙ্গ-ভারতীর বাড়ী।
কোটি বিশ্বকর্ম্মা নারে ফেলিতে উপাড়ি॥

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
যে বাড়ীর অধিরাণী মহীয়সী দেবী রাণী
রাজ-রাজেশ্বরীরূপে শোভে বলি হারি;
দিবা-নিশি সখী তার, তুলনা মিলে না যার,
যে বাড়ীতে সূর্য্যমুখী—পতিব্রতা নারী।
সরলা কমলমণি অনন্ত প্রেমের খনি
উজ্জ্বল করিয়া আছে, সতত যে বাড়ী,
তাহারে ভাঙ্গিতে চায় কে রে সে আনাড়ী?

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
যে বাড়ীর আঙিনাতে জীবন-সুরভি-প্রাতে
কুন্দ-কুসুমের কলি পড়িতেছে ঝরি,'
রক্তমাখা খাঁড়া হাতে রুদ্র কাপালিক সাথে
কপালকুণ্ডলা যেথা সদা প্রতিহারী,
যে বাড়ীর পুরদ্বার রক্ষিতেছে অনিবার,
কুমার জগৎসিংহ বক্ষ পরসারি'
বজ্র-মুষ্টি-করে ধরি তীক্ষ্ণ তরবারি।

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যেথা নারী-কুলোত্তমা বিরাজিতা তিলোত্তমা
অকপট প্রণয়ের পসরা বিথারি,'
মুক্তকণ্ঠা আয়েষার সুকণ্ঠ-বীণার তার
কাঁপি যেথা পেশে আনি জোর করি কাড়ি'
কত সেনা-পতি-প্রাণ পদতলে পাড়ি'
প্রতিহিংসানল চক্ষে প্রতিহিংসা অসি কক্ষে
বিমলা যেখানে আততায়ি-বক্ষ ফাড়ি'
রক্তমাখা-করে করে নৃত্য মনোহারী।

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর পুরোদ্যানে বীণাপাণি বসি ধ্যানে ;
ঐ শোন্—কি করুণ বাজে বীণা তারি।
"কণ্টকে গঠিল" বলি' মৃণালের মুখে গলি
ঝরিছে দেবীর অশ্রু-মুক্তা সারি সারি
যে বাড়ীতে,—পীঠস্থান সে যে বাঙ্গালারি।
"মেঘেতে বিজলী হাসি আমি বড় ভালবাসি"
বলি যেথা গিরিজায়া গায় গলা ছাড়ি'
বঙ্কিমের অবিনাশী মেয়ে সুকুমারী॥

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যাহার চত্বর-মাঝে নবীন সন্ন্যাসি-সাজে
আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি উপাড়ি'
ব্রাহ্মণ অনলে ঢালে গ্রন্থ কাঁড়ি কাঁড়ি।
প্রাবৃট চাঁদিনী রাতে ভাসি প্রতাপের সাথে
ডুবিল রে শৈবলিনী—ডুবিতে না পারি
যে বাড়ীর পরিখায় উন্মাদিনী নারী॥

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর শূন্য ঘরে, অন্তিম শয্যায় প'ড়ে
এখনো ভ্রমর কাঁদে আছাড়ি পিছাড়ি,
যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণীর ইন্দ্রজাল
ভেদিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-প্রাণে আসি তাড়াতাড়ি
শিহরি শিহরি কাঁদে ভ্রমরে নেহারি।
যে বাড়ীর চারি ধারে যাহার তোরণদ্বারে
ইন্দিরার করে ধরি চঞ্চলকুমারী
বিদ্যুদ্‌বিলাসে ফেরে যেন প্রতিহারী॥

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
কুটিল-কৌটিল্য-বীর চন্দ্রচূড় জ্ঞানবীর
বজ্র-দৃঢ়-করে ধরি প্রজ্ঞা-তরবারি
যে বাড়ীর পুরদ্বারে ভ্রমিতেছে পাদচারে
সিংহের মতন দীপ্র নয়ন বিস্ফারি।
উপকণ্ঠে যে বাড়ীর প্রিয় পুত্র ভবানীর
ভবানী পাঠক—দশা বঙ্গের নেহারি'
নীরবে ফেলিছে হায়, নয়নের বারি।

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যথা ভাগীরথী-জলে ধীরে ধীরে কুতূহলে,
অন্ধ রজনীরে ঐ নামিতে নেহারি
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায় শচীন্দ্র অবশকায়
বিস্ময়ে নিরখিছে সে "অপূর্ব্ব নারী"।
কে পারে রে বঙ্কিমের ভাঙ্গিতে সে বাড়ী ?

যে বাড়ীর বাঁধাঘাটে, কি জাঁক-জমক-ঠাটে
কত ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্য-বেপারী—
পুরন্দর বাঁধিয়াছে ডিঙ্গা সারি সারি।
ভেটিতে সে মনোহরে যুগল-অঙ্গুরী করে
কণ্টকিত-দেহে হিরণ্ময়ী সুকুমারী—
তীরে দাঁড়াইয়া যেন রাজার ঝিয়ারী।
দূর দূর—বঙ্কিমের কে ভাঙ্গে সে বাড়ী ?

দূর দূর—কে ভাঙ্গিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর পুরোভাগে সাজাইয়া ভাগে ভাগে
মায়ের পূজার পূত পাদ্য-অর্ঘ্য-ঝারি,
জলদ-প্রতিমস্বনে থাকি থাকি ক্ষণে ক্ষণে
"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র সন্তান উচ্চারি'
পূজিছে মায়ের পদ—সর্ব্বদুঃখহারী।
যে মন্ত্রের ধ্বনি কাণে পশিলে অসাড় প্রাণে
ত্রিশ কোটি শবদেহ মোহনিদ্রা ছাড়ি
উৎসাহে বসিতে চায় উঠি তাড়াতাড়ি,
দূর দূর—বঙ্কিমের কে ভাঙ্গে সে বাড়ী ?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।



প্রাচীন বঙ্গের বহির্ব্বাণিজ্য

স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাচীন বঙ্গদেশ যে বহির্ব্বাণিজ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, পুরাণেতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের দিক্ দিয়া ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া পরিচিত। তিনি এই বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে সিংহলে গিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের পরবর্ত্তী পর্য্যটক হিউয়েন সাঙও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাণিজ্য-বন্দর তাম্রলিপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের বহুপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে যে পাঠ লিখিত হইয়াছে, তাহার শ্লোকাংশ এই :—

"তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি।"

সুতরাং ইহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণের সময়েও তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতটবর্ত্তী বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল।

সে যাহা হউক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ফা-হিয়ান, হিউয়েন সাং, ইৎসিং, তাওলিন প্রভৃতি চৈনিক পর্য্যটকগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের বন্দর হইতে সমুদ্রপথে ভারত সমুদ্রের নানা দ্বীপে, সিংহলে ও চীনে প্রাচীন বঙ্গের বণিক্‌গণের সুবিস্তৃত বাণিজ্যের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তৎকালীন প্রাচীন বঙ্গের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিচয়-চিহ্ন হইয়া রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী যুগে সপ্তগ্রাম বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দরে পরিণত হয়। এক সময় তাম্রলিপ্তের মত সপ্তগ্রামও অসামান্য প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন জলপথে, তেমনই স্থলপথে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য তখন সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। বঙ্গের পাল ও সেন-বংশীয় অধিপতিগণের অভ্যুদয়কালে সপ্তগ্রামের বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তৎপূর্ব্বেও, এমন কি, তাম্রলিপ্তের খ্যাতি-প্রতিপত্তির সময়েও যে সপ্তগ্রাম অপরিচিত ছিল না, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমীর কাহিনীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়।

খৃষ্টীয় ১২৯৮ অব্দে সপ্তগ্রাম মুসলমান শাসনাধীনে আসে এবং তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৈদেশিক বণিক্‌গণের গতিবিধিও আরম্ভ হইতে থাকে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা অভূতপূর্ব্ব প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বসেন। পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রাম দুই স্থানেই তাঁহারা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া একাধিপত্য প্রকাশে প্রয়াসী হইয়া উঠেন।

পাঠানগণের শাসনকালেই সপ্তগ্রামের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রামেরও পতন আরম্ভ হয়। ইহার অন্যতম কারণ, সরস্বতীর বেগবতী স্রোতোধারা এই সময় মন্দীভূত হইয়া আসে,—কাযেই বড় বড় বাণিজ্য-পোত সরস্বতী নদীর উপর দিয়া সপ্তগ্রামে আসিতে বাধা পায়। বণিক্‌গণ তখন বর্ত্তমান হাওড়ার সান্নিধ্যে অবস্থিত বেতোড়তীরে অর্ণবপোত-সমূহ ভিড়াইতেন ও সেখান হইতে ছোট ছোট নৌকাযোগে বা স্থলপথে যানাদির সাহায্যে সপ্তগ্রামের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ রক্ষা করিতেন। ফলে, বেতোড় এইভাবে সপ্তগ্রামের অঙ্গস্থানীয় হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের এই বাণিজ্য-কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে থাকে।

এই সময় পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ জলপথে প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। তাহাদের অভ্যুদয়ই যে বঙ্গের বণিক্‌গণের বহির্ব্বাণিজ্যে ভীষণ অন্তরায়স্বরূপ হইয়া উঠে ও সেই সূত্রে সপ্তগ্রাম ও বেতোড়ের যুগপৎ পতন ঘটে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার পরই পোর্ত্তুগীজগণ বাদশাহের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হুগলীতে পশ্চিম-বঙ্গের বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠা করে।

সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলীর বাণিজ্য-বন্দর জাঁকিয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানগুলিও বিদেশীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্য-প্রভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে থাকে।—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, সন্দীপ, বাঙ্গালা নগর (ঢাকা), বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতিও অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ফলতঃ, প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গের বণিক্‌গণ যে তাঁহাদের বাণিজ্যতরণী সমুদ্রে ভাসাইয়া দেশদেশান্তরে অভিযান করিতেন এবং কি বহির্ব্বাণিজ্য, কি অন্তরবাণিজ্য উভয় বিষয়েই তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু বঙ্গের বণিক্‌গণের সেই ভুবনবিশ্রুত বাণিজ্য ধ্বংস হইল কেন, তাহাই দারুণ সমস্যার বিষয়!

কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এরূপ অন্ধ ধারণা পোষণ করেন যে, বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষী স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়াতেই বঙ্গের বণিক্‌গণ তাঁহাদের বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। সুতরাং সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বিধির প্রবর্ত্তনই বঙ্গের বণিক্‌গণের সমুদ্র-বাণিজ্য-ধ্বংসের একমাত্র কারণ।

কিন্তু, এই ধারণা ভিত্তিহীন, তাহা বলাই বাহুল্য। সমুদ্রযাত্রার নিষেধবিধি যে সময় হইতে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই সমুদ্রপথে প্রাচ্য বণিক্‌গণের বাণিজ্যতরণী বিদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমাইয়া আসিয়াছে। ইহাতেই মনে হয়, সমুদ্রযাত্রার নিষেধবিধি বণিক্‌জাতির উপর প্রযুজ্য

ছিল না। মহর্ষি বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বিপর্য্যস্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপ হইয়া যে সময় আবির্ভূত হন, দেশ তখন স্বাধীনতা হারাইয়া পাঠান শাসকগণের আধিপত্য মানিয়া লইয়াছে; হিন্দুর ধর্ম্ম তখন বিপন্ন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী হিন্দু-সমাজ তখন স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদের আচার-রক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাত্মা রঘুনন্দন তাঁহার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গের বণিক্‌গণ তখনও তাঁহাদের পণ্যতরী লইয়া সমুদ্রপথে গতিবিধি করিতেন, রঘুনন্দনের ব্যবস্থা তাঁহাদের বাণিজ্যব্যাপারে কোনও বাধা উপস্থাপিত করে নাই। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে বঙ্গের হিন্দু বণিক্‌গণের বাণিজ্য ধ্বংসের একমাত্র কারণস্বরূপ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহারা ক্ষমার পাত্র, সন্দেহ নাই।

তবে, হিন্দু বণিক্‌গণের সুবিস্তৃত সমুদ্রবাণিজ্য ধ্বংস হইবার কারণ কি? আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বিজেতা মুসলমানরা যেমন দেশের উপর একাধিপত্য-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মুসলমান বণিকগণ বহির্ব্বাণিজ্যের উপরও তেমনই প্রভাববিস্তারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমুদ্র-বাণিজ্যে মুসলমান বণিক্‌গণের প্রতিষ্ঠাও অসামান্য। মুসলমান রাজশক্তিও যে স্বরাজ্যের বণিক্‌দের প্রতি চিরদিনই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সিন্ধুরাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিয়া আরবদেশীয় বণিক্‌গণ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তত্রত্য রাজশক্তি বণিক্‌গণের লাঞ্ছনার প্রতীকারে যে বিপুল রণবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার অবিদিত নহে। সুতরাং বঙ্গদেশের রাজতক্তে বসিয়া মুসলমান রাজশক্তি স্বজাতীয় বণিক্‌দের বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এই সময় হইতেই বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ 'বেণে' আখ্যাধারী বণিক্‌গণ—যাঁহারা সমুদ্রবাণিজ্যে এ পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—অপ্রতিহতপ্রভাবে যাঁহারা সমুদ্রপথে পণ্যতরী লইয়া দেশে বিদেশে ব্যাপার করিয়া বেড়াইতেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইতে থাকে।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করিবার জন্য জয়চাঁদ যেমন বৈদেশিক শক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কতিপয় মুসলমান বণিক্‌ও তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু বণিক্‌দিগকে জব্দ করিবার জন্য বৈদেশিক পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌দিগকে ভারতে বাণিজ্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

William Vincent লিখিত 'The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean এবং James Bunce প্রণীত Travels to Discover the Source of Nile নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন, পেড্রো কভিলহাম নামক জনৈক পোর্ত্তুগীজকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের পথ অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। আফ্রিকার উপকূল হইতে জলপথে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে যাইবার সুযোগ সন্ধান, বন্দর ও পণ্যবীথিকাসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কভিলহামের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ঘটনাচক্রে ভারতীয় জনৈক মুসলমান বণিকের নিকট হইতে এমন একখানি মানচিত্র প্রাপ্ত হন, যাহাতে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত বন্দরই চিহ্নিত ছিল। কভিলহাম এই সূত্রে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিবারও অবকাশ পাইয়াছিলেন। ভারত হইতে পোর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কভিলহাম রাজার নিকট ভারতের অতুল সম্পদ্ ও সেই সূত্রে বাণিজ্যে নিশ্চিত সাফল্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করেন, তাহার ফলেই ভাস্কো-ডি-গামা ভারতের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ দলে দলে ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়।

পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ যখন বঙ্গদেশে বাণিজ্যের সন্ধানে উপস্থিত হয়, তখন সপ্তগ্রামের ভগ্নদশা হইলেও, বঙ্গের বণিক্‌গণ বেতোড়কে বাণিজ্য-কেন্দ্র করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছিলেন। মহাসমুদ্রের তখনও আরব, পারস্য, মিশর, চীন ও ভারত দ্বীপপুঞ্জে বঙ্গের বেণেদের পণ্যতরী গতিবিধি করিতেছিল। ভিনিসদেশীয় পর্য্যটক সিজার-ডি-ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—এই বন্দর হইতে প্রতি বৎসর বহু অর্ণবপোত বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইয়া থাকে। বিবিধ বস্ত্র, চাউল, চিনি, গালা, নানাবিধ শুষ্ক ফল, সির্‌কাসিক্ত সুরক্ষিত ফল, মরিচ, তৈল প্রভৃতিই সাধারণতঃ ঐ সকল অর্ণবপোতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। বিবিধ হর্ম্ম্য ও নানাজাতীয় ধর্ম্মমন্দির সমন্বয়ে এই নগরী যেমন অপূর্ব্ব শোভান্বিত, বহুবিধ পণ্য-সংগ্রহের পক্ষে সেইরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন।

ইংরাজ বণিক্‌গণের মধ্যে র‍্যাল্ফ ফীজই প্রথম ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসেন। আগ্রা তখন ভারতের রাজধানী; আগরা ও ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৫৮৬ অব্দে তিনি সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি যখন আগ্রা হইতে সপ্তগ্রাম যাত্রা করেন, সেই সময় এক শত আশীখানি পণ্য-তরী বিবিধ পণ্যসম্ভার লইয়া আগ্রা হইয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের শোভা ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও র‍্যালফ্ ফীজ বহু প্রশংসা করেন। ফলতঃ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রকাশ করেন, তাহার ফলেই পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ বণিক্‌গণ ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Marshman তাঁহার History of Bengal গ্রন্থে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

It was known to Romans, It was the great mart of Bengal to which all the sea-bourne trade was brought.

এরূপ শোভা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্য-বন্দরে পঙ্গপালের মত পোর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ উপনীত হইয়া শুধু যে চড়াদরে পণ্যসম্ভার

ক্রয় করিয়া বঙ্গীয় বণিকগণকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে, সমুদ্রবক্ষে এদেশীয় বণিকগণের পণ্যপূর্ণ অর্ণবপোতগুলি এবং উপকূলবর্ত্তী অরক্ষিত পণ্যবীথিকাসমূহ তাহাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইবামাত্র, বুভুক্ষু ব্যাঘ্র অসতর্ক মেষপালের উপর আপতিত হইয়া যে ভাবে তাহাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে, ঠিক সেইভাবে বিধ্বস্ত হইত। পোর্ত্তুগীজ বণিকগণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গীয় বণিকগণকে তাহাদের পণ্যতরীসহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইত। (Reports on the old records in the India office) ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থাশাস্ত্র বঙ্গদেশের বেণেদের সমুদ্র-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধক হয় নাই,—হইয়াছিল শস্ত্রধারী পোর্ত্তুগীজ বেণেদের জলপথে ভীষণ অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ভয়াবহ বিভীষিকা! যাহারা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদশাহী শক্তিকেও গ্রাহ্য করিয়া চলিত না, বাদশাহের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণে সঙ্কুচিত হইত না, তাহারা যে বঙ্গদেশের নিরীহ ধর্ম্মভীরু শান্তিপ্রিয় বণিকদের মধ্যে বিভীষিকা উপস্থিত করিয়া সমুদ্রপথে তাহাদের গতিবিধি বন্ধ করিয়া দিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

নিরপেক্ষ ওলন্দাজ বণিক্ লিনসোটেন বঙ্গের বাণিজ্য-বন্দরগুলির সৌভাগ্য-শ্রী পোর্ত্তুগীজদের নিষ্ঠুর হস্তে বিধ্বস্ত হইবার শোচনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি পোর্ত্তুগীজদের অত্যাচারকেই বঙ্গীয় বণিকগণের বহির্ব্বাণিজ্যের অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—পোর্ত্তুগীজগণের ভীষণ অত্যাচার ও লুণ্ঠন-বিভীষিকা সমুদ্রপথে বঙ্গীয় বণিকগণের গতিবিধি বন্ধ করিয়া দেয়!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অযথা নিন্দা

আশ্বিনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রথম পূজা" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। তাহাতে উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের নিম্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া কবিবর তাঁহার নিজের হিন্দু-বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির। এ মন্দির কিরাতজাতের গড়া। দেবতা তাহাদের স্থাপিত। কিন্তু এক ক্ষত্রিয় রাজা দেশ জয় করিয়া মন্দির কাড়িয়া লইলেন, এবং তদবধি উহা হিন্দুর মন্দিরে পরিণত হইল। কিরাতেরা নদীর পূর্ব্বপারে থাকে, তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাহারা দূর হইতে প্রণাম করে। তাহারা শিল্পকার্য্য করে, আর কৃষ্ণলীলার মূর্ত্তি গড়াইবার ছন্দটা তারাই জানে।

কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় পূজার উৎসব। মন্দিরের কাছে মস্ত মেলা বসিয়াছে। পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—তামার পাত্র, রূপার অলঙ্কার, মাটীর পুতুল, কাঠের ডমরু, রেশমের কাপড়, পূজার উপকরণ কত বেচা কেনা হইতেছে। বাজিকর বাজি দেখাইতেছে, কথক রামায়ণ পড়িতেছে, সন্ন্যাসীর দল পঞ্চবটের তলায় বসিয়াছে। উদ্ধত বেশে রাজপ্রহরীর দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাল শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা আসিবে, তাহার আয়োজন হইতেছে।

কিন্তু কি দৈববিড়ম্বনা! সে দিন হঠাৎ গম্ভীর শব্দ শুনা গেল। মাটীতে কাঁপন লাগিয়া ঢেউ উঠিল। প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া দেবতার বেদীর উপর পড়িল।

পরদিন রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত্তপণ্ডিত এল,—পণ্ডিত বলিলেন, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্ব্বে, নচেৎ দেবতা তাঁর মূর্ত্তিকে পরিহার করিবেন। রাজা বলিলেন, সংস্কার কর। মন্ত্রী বলিলেন,—

"ঐ কিরাতরা ছাড়া কে করিবে পাথরের কায।
ওদের কলুষ দৃষ্টি থেকে দেবতাকে রক্ষা করবো কি উপায়ে?
কি হবে মন্দির-সংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গ-মহিমা?"

কিন্তু এটা কোন্ শাস্ত্রের ব্যবস্থা, মন্ত্রী তাহা বলিলেন না, আবার এক জন স্মার্ত্তপণ্ডিত যে ছিলেন, রাজা তাঁহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে কবি স্মার্ত্তপণ্ডিতকে সেখানে কেন টানিয়া আনিয়াছেন, বুঝা গেল না। যাহা হউক, রাজা সেই কিরাতদের দলপতি মাধবকে ডাকাইলেন, তাহার মত শিল্পী কেউ ছিল না। রাজা বলিলেন,—"চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,—দেবমূর্ত্তির উপর দৃষ্টি যাতে না পড়ে। পারবে?"

মাধব বলিল—"অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কায করিয়ে নেবেন অন্তর্য্যামী, যতক্ষণ কায চলবে, চোখ খুলবো না।"

মাধব মন্দিরের ভিতরে বসিয়া কায করিতে লাগিল। মন্ত্রী এসে বলে—ত্বরা করো। মাধব বলে,—"যাঁর কায, তাঁরই নিজের আছে ত্বরা, আমি ত উপলক্ষ।" এইরূপে যথাসময়ে কায শেষ হইল। মাধব রাজার নিকট সংবাদ দিতে প্রহরীকে পাঠাইল। প্রহরী গেল। মাধব চোখের বন্ধন খুলিয়া ফেলিল।

"মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত যোড় ক'রে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল! আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেবতার সঙ্গে দেখা ভক্তের।" তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন, প্রতিমাস্থ দেবতা তাঁহার পৌত্তলিক ভক্তকে দেখা দেন?

রাজা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন,—অমনি,

"রাজার তলোয়ারে মুহূর্ত্তে ছিন্ন হলো সেই মাথা
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।"

এই চিত্রটি অদ্ভুত কারুণিক হইত, যদি ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। কোন কোন নীচজাতির দেবমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ আছে স্বীকার করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হিন্দুজাতিকে অন্যের চোখে নিতান্ত হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এখানে মিথ্যা ও উদ্ভট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ভট কল্পনার মূল কোথায়? আমার বোধ হয়, তিনি পুরীর জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের কথা শুনিয়াছেন। এই গল্পটির সেই আখ্যায়িকার সঙ্গে কতকটা মিল আছে। পুরাণে আছে, জগন্নাথদেব এক সময়ে বন্য শবর-জাতির দেবতা ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল নীলমাধব। পরে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বনের মধ্যে আবিষ্কার করিল, এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে যাইয়া বলিল। রাজা খুব সমারোহের সহিত

জগন্নাথদেবকে লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তির "নব কলেবর" যখন হয়, তখন এক নিভৃত স্থানে সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়, এবং পুরাতন মূর্ত্তির মধ্যে কোন একটি মহামূল্য বস্তু আছে, তাহা এক জন লোক হাত দিয়া বাহির করিয়া লইয়া নূতন মূর্ত্তির মধ্যে স্থাপন করে। পাছে সেই ব্যক্তি উক্ত মহামূল্য বস্তুটি জানিতে পারে, এই জন্য তাহার চোখ কাপড় দিয়া বাঁধা হয় ও তাহার দুই হাতে কাপড় জড়ান হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ বস্তুটি বুদ্ধের দাঁত,—আবার কেহ বলেন "বিষ্ণুপঞ্জর"। যাহাই হোক, এইরূপে জগন্নাথদেবের নব কলেবরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে, সে মূর্ত্তি সকলেই দেখিতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিবার বাধা নাই।

আমার বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার কবিত্বের সাহায্যে মিথ্যার জাল বুনিয়াছেন। ইহাকেই ইংরাজীতে বলে—"Give the dog a bad name and hang it"—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

অবগুণ্ঠন-প্রথা

প্রবাসে একটি উচ্চপদস্থ বন্ধুর বাটীতে অতিথি হইয়াছিলাম। দেখিলাম, বন্ধু পর্দ্দাপ্রথা তুলিয়া দিয়াছেন। বন্ধুপত্নী বন্ধুর বন্ধুদের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করেন। ব্যাপারটা আমার চক্ষুতে নূতন ঠেকিল। ভাবিলাম, নূতন বলিয়া ইহার নিন্দা করা উচিত নহে। কিন্তু পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বেশ একটু ভাবিত করিয়া তুলিল।

সে দিন দোল-পূর্ণিমা। বন্ধু সস্ত্রীক কয়েকটি বন্ধুর বাটী যাইবেন বলিয়া বাহির হইলেন; আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। দেখিলাম, তাঁহারা হোলি খেলিতে বাহির হইয়াছেন। বন্ধুগণ এবং বন্ধুপত্নীগণ একত্র হোলি খেলিতে লাগিলেন। কোনও রমণী তাঁহার স্বামীর বন্ধুর মুখে আবির মাখাইয়া দিতেছেন, কোনও পুরুষ তাঁহার বন্ধুর পত্নীর গায়ে রঞ্জিত বারি ঢালিবার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছেন,—ছুটাছুটি, উচ্চহাস্য, কাড়াকাড়ি,—দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। পাশ্চাত্য সাহিত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্যের অনুকরণে রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিপুষ্ট আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমস্ত সামাজিক নিয়ম অবহেলা করিবার সুযোগ পাইয়া যথেচ্ছাচারের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তাহা আমার ধারণা ছিল না।

মনে পড়িল রবি বাবুর লেখা, হিন্দু সমাজের পুরুষজাতি পুরুষ ও রমণীর মধ্যে এক প্রাচীর তুলিয়া দিয়া কতখানি আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা তাহারা নিজেই জানে না। পরস্ত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয়, হাস্য-পরিহাস, সুমধুর কটাক্ষপাত, ইহাতে আনন্দ আছে নিশ্চয়। এই আনন্দের কথা জানিতেন না বলিয়া যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সমাজে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু আনন্দের পর বিষাদ,—এই সুখের পর দুঃখ আসিতে পারে কি না, শাস্ত্রকারগণ ইহাই যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এই আপাত-সুখের পশ্চাতে বহু দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাই তাঁহারা দৃঢ়হস্তে এই সুখের পথ বন্ধ করিয়াছেন। "যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব" যাহা অগ্রে অমৃতের ন্যায়, পরে বিষের ন্যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সুখের জন্য লালায়িত হন না। যাঁহারা মনে করেন, রমণী-জাতির প্রতি অবিশ্বাসের উপর অবগুণ্ঠন-প্রথা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা ভ্রান্ত। অবগুণ্ঠন-প্রথার কারণ ইহা নহে যে, রমণী-জাতি অবিশ্বাসযোগ্য; ইহার কারণ এই যে, মানবপ্রকৃতি অতি দুর্ব্বল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল গতিরোধ করিতে পারে, এরূপ শক্তি কি স্ত্রী কি পুরুষ কম ব্যক্তিরই আছে। হিন্দুশাস্ত্র দুই দিক দিয়া এই সমস্যাকে আক্রমণ করিয়াছেন। এক দিকে পুরুষদের শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা এবং রমণীদের ব্রতপূজাদির নিয়ম করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ইন্দ্রিয়সংযমের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অপর দিকে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষেধ করিয়া পদস্খলনের সুযোগ ও সম্ভাবনা কমাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যাহাতে দুর্ব্বল ব্যক্তিও নিজের ও সমাজের অনিষ্ট করিতে না পারে। দোষ পুরুষের বেশী কি রমণীর বেশী, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কোথাও পুরুষের দোষ, কোথাও রমণীর দোষ, সম্ভবতঃ রমণী অপেক্ষা পুরুষের দোষই বেশী। দোষ যে সব সময় ইচ্ছাকৃত, তাহাও নহে। মানুষ অনেক সময় অবস্থার অধীন। অন্যায় করিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখে না। প্রবৃত্তির অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া হঠাৎ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অন্যায় করিয়া ফেলে। "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" ইন্দ্রিয়সমূহ অতিশয় বলবান্, বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও ইহারা বিপথে চালিত করিতে পারে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ ক্ষমতার সীমা বুঝিয়া সাবধান হইয়া থাকেন। যে বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হইতে জ্ঞানী ব্যক্তিও ভয় পান, সেখানে যাঁহারা ছুটিয়া যান, তাঁহারা মূর্খ।

এই কারণে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষেধ করিয়াছেন। কার্য্যোপলক্ষে পুরুষকে প্রায় বাহিরে যাইতে হয়, স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য গৃহমধ্যে। এ জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, স্ত্রীলোক বাহিরে যাইবার সময় অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিবে। হিন্দুরা মুসলমানের নিকট এই প্রথা গ্রহণ করিয়াছে, এ ধারণা ভ্রান্ত। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসমাজ মুসলমান-প্রথা অল্পই গ্রহণ করিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ পাড়লে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় এ প্রথা প্রচলিত ছিল। লঙ্কায় অগ্নি-পরীক্ষার সময় শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—

"ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ।"

• বিপদের সময়, অভাবের সময়, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহের সময় রমণী সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলে তাহা দোষাবহ নহে। অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ইহা দোষাবহ। সত্য বটে, দাক্ষিণাত্যে এ প্রথা নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রথা প্রামাণ্য আর্য্যপ্রথা নহে। মনু বলিয়াছেন, আর্য্যাবর্ত্তের

প্রথাই প্রামাণ্য। দাক্ষিণাত্যে ইহা ভিন্ন অন্য অনার্য্য প্রথাও প্রচলিত আছে, যথা—ভগিনীর কন্যাকে বিবাহ করা (ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এই প্রথা আছে), রমণীর একাধিক পুরুষ গ্রহণ করা (নেয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা আছে)। প্রবল দ্রাবিড় সভ্যতার সহিত আপোষ করিতে গিয়া দাক্ষিণাত্যের আর্য্যগণকে কিছু অনার্য্য প্রথা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অপিচ, দাক্ষিণাত্যে অবগুণ্ঠন না থাকিলেও রমণী পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করে না।

অপর দিকে প্রয়োজন হইলে হিন্দুনারীর অবরোধ হইতে বাহিরে আসিবার নিষেধ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি এ বিষয়ে প্রমাণ। দেবদর্শন, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে হিন্দুরমণী সর্ব্বদাই অবরোধের বাহিরে আসিয়া থাকেন। যে স্থলে বাহিরে গেলে কোন লাভ নাই, অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, সে স্থলেই ইহা নিষিদ্ধ।

আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক এ সকল কথা জানেন না, জানিবার প্রবৃত্তিও নাই। শাস্ত্র তাঁহারা পড়িলেন না। ইংরাজ এবং ইংরাজদের মন্ত্রশিষ্যের নিকট তাঁহারা জানিয়াছেন, শাস্ত্র কেবল কুসংস্কাররাশি। স্বেচ্ছাচার আপাততঃ বেশ ভাল লাগে। ইহাতে পরিণামে যে ভয়ের কারণ আছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। কেবল প্রবাসে নহে, বাঙ্গালা দেশেও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের অবাধে মেলামেশা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাঁহারা এই চেষ্টা হইতে বিরত হইবেন এবং পরিণামে অনেক দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)

প্রার্থনা

আমারে দিয়েছো যাহা ফিরে লও আজ—
কেড়ে নাও সর্ব্বচিহ্ন, সর্ব্ব আভরণ
মর্ম্মে মর্ম্মে আজি মোর হানিতেছে লাজ—
নির্ব্বাসিত, কুণ্ঠাভরা—জীবন ধারণ!

পারি না পারি না আর সহিতে এ জ্বালা
চারিদিকে উঠিতেছে করুণ চীৎকার!—
কাঁটার মতন বিঁধে কুসুমের মালা—
চাহি না একেলা তব স্নেহ-অধিকার।

ভালো লাগে নাক আর ফুলের শয়ন,
আহারে বসিলে অন্ন উঠে নাক মুখে;
শতকোটি ক্ষুধার্ত্তের কাতর নয়ন
কোথা হ'তে ভেসে উঠে চোখের সম্মুখে।

বেদনার জয়টীকা ললাটে আঁকিয়া
ভিক্ষা ঝুলি তুলি দাও রিক্ত দুটি হাতে,
দীনতার চীর বাস অঙ্গে জড়াইয়া
মিলাইয়া দাও মোরে সকলের সাথে,

মোরে নিয়ে চল দেব, উন্মুক্ত বাতাসে,—
মানবের বুকে দাও প্রেমের আলোক!
দেখিতে পারি না নিত্য উৎসবের পাশে
কাতর, করুণ দৃষ্টি, ব্যথা-ভরা চোখ,

তিল তিল করি যারা মরিতেছে আজ
ক্ষুদ্রতার কারাগারে মানবেরে ঘিরে,
কঠোর প্রচণ্ডতম তব ভীম বাজ
গর্জ্জিয়া নামুক আজি তাহাদের শিরে।

শ্রীখোন্দেকার আবুল কাসেম

রবীন্দ্র-বিদূষণ

'বিচিত্রা' নামক মাসিকের ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিকের সংখ্যায় "নবীন কবি" নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যে সকল সমালোচক তাঁহার রচনার বিরুদ্ধ আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সুতীব্র শ্লেষ ও অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—

"অনেক কাল থেকে কাগজপত্র পড়া আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেন, সে কথাটা একটু বিস্তারিত ক'রেই বলব। এর কারণ ঔদাসীন্য নয়, ব্যর্থ বিক্ষোভ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছা। প্রশংসাবাক্যে খুসী হইনে, মনের এমন অসারতা ঘটেনি, তবু প্রশংসার লালসা থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু সাহিত্যিক রূঢ়তা বা অসৌজন্যকে যাঁরা ডিমক্রাসির শৌর্য্যলক্ষণ ব'লে গণ্য করেন, আমি তাঁদের দলের নই। অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রে ফসলের চর্চ্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধার দ্বারা অবমানিত দেখলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি।"

"কিছুকাল থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাঁটাগাছের আবাদ চলেছে। যে জাতের লোকের চরিত্র দুর্ব্বল, তা'রা মানুষকে পীড়া দিয়েই বাহাদুরী করে। আমাদের দেশে বরযাত্রদের ব্যবহারে বাঙ্গালী বহুকাল থেকে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। যে-পক্ষ শত্রু-পক্ষ নয়, কেবলমাত্র অপর-পক্ষ, তাকে কটুবাক্যে ও উদ্ধত ব্যবহারে উৎপীড়িত অবমানিত করাকে তারা স্ব-পক্ষের জিৎ ব'লে মাতামাতি করতে ভালবাসে। কে কাকে দুয়ো দিতে পারবে এই নিয়ে তাদের আস্ফালন। অর্থাৎ কোন এক পক্ষের মাথা হেঁট হ'য়ে গেল এতেই ভারি খুসী। সে-পক্ষ অপরাধ ক'রেছে ব'লে নয়, সে পক্ষ আমার পক্ষ নয় ব'লে, এমন কি, তার কোন পক্ষীয় হবারই দরকার নেই। এই পীড়নের, এই অবমাননার অভদ্রতায় দর্শকদেরও মহা আনন্দ। সে আনন্দের মূল শত্রুতায় নয়, কটুবাক্য সম্ভোগের এবং কারও অসম্মানের দৃশ্যটা দেখবার অহেতুক পুলকে। আমাদের দেশ কবির লড়াইয়ের দেশ, তর্জ্জার দেশ, এ দেশে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় মানুষকে অপমান করবার নৈপুণ্য কেবলমাত্র হতভাগ্য নিরপরাধ কন্যাকর্ত্তার ঘরে নয়, সাহিত্যের আসরেও জয়মাল্য সন্ধান করে। এই গ্রাম্যপ্রবৃত্তি আমাদের পলিটিক্‌স্‌কে কলুষিত করেছে এবং সকল প্রকার লোকানুষ্ঠানের মর্য্যাদা এবং অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত শরশয্যা-শায়ী ক'রতে উদ্যত। নিঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্ছনায় সে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হ'লে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হোত আমাদের সেই দুয়ো দেবার দুর্দ্দম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষ্যেই ভোগ করবার চেষ্টা করি ব'লে, বাঙ্গালাদেশে কোনও বড় কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে উঠ্‌বার সুযোগ পেল না; নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব্ব করবার সখ আমাদের কিছুতেই মিট্‌তে চায় না। এই সখ বিছুটির মত গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্র-সভায়, ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্ম্মে, ছাত্রদের হোষ্টেলে। আমাদের সাহিত্য-বিচারে মননবস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই দুয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভাল ব'লতে চাই তাকে ভাল ব'লেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত ক'রে নিই এবং আর একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া ক'রে তবে আমাদের সখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনদিন আমি যোগ দিইনি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের অনেক সময় এ দেশে কাটাইয়া থাকিলেও তিনি কোন দিন খাঁটি 'নেটিভ' বাঙ্গালীদিগের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন নাই; তাই হতভাগ্য কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা এবং বরযাত্রগণের প্রতি অযথা এইরূপ অসংযত ও অসঙ্গত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কবির এবং তর্জ্জার লড়াই একবেলার আসরেই নিবদ্ধ থাকে; আসরের বাহিরে কবিওয়ালারা এবং তর্জ্জাওয়ালারা আসরের কথা লইয়া কলহ করে না; বরং পালা সাঙ্গ হওয়ার পরেই দুই পক্ষ মিলিত হইয়া কর্ত্তার কাছে বক্‌সিস চায়। 'কন্যাকর্ত্তার ঘরে' বরযাত্রদের

নিষ্ঠুরতাই বা কতক্ষণের জন্য? বরযাত্রগণ কন্যার বাড়ী পৌঁছিবার দু'এক ঘণ্টা পরে বিবাহ হইয়া গেলে, বর যখন বাসরঘরে প্রবেশ করে, তখনই সকল গোল মিটিয়া যায়। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালাদেশকে দয়া করিয়া "আমাদের দেশ" বলিলেও তাঁহার "আমরা" দেশজোড়া নহে, অতি ক্ষুদ্র দল; তাই তিনি এ দেশের দোষকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে এত আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই যে এক জন নবীন কবির 'পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে' সমস্ত বাঙ্গালী জাতির খ্যাতিকে 'ধূলিশায়ী করবার উৎসাহ' দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ,—

(১) "অনেক কাল থেকে কাগজ-পত্র পড়া' আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

(২) কিছুকাল থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাটাগাছের আবাদ চলেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যদি স্বয়ং "কাগজপত্র" পড়িতেন, তবে বোধ হয়, ইহুদিগুরু জেরেমিয়ার যোগ্য অকরুণ ভাষায় হতভাগ্য বাঙ্গালীজাতির বংশানুগত গ্রাম্যবৃত্তির এমন নিন্দা করিতেন না। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার কিছু কম তিন মাস পরে, জয়ন্তী-সত্রের উপলক্ষে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ছাত্র-ছাত্রীগণ কবির যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তিনি একটি প্রতিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। জানিতে পারা গিয়াছে, ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৫ বৎসর বয়স হইতে পদ্য-গদ্য রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' পত্রিকার আবির্ভাব-কাল হইতে রবীন্দ্রনাথ যে রচনা-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা আজ ৫৬ বৎসর পরেও সেই স্রোত দিন দিন প্রবলতর বেগে বহিতেছে। প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইয়া এই স্রোতের বেগ অক্ষুণ্ণ রাখুন। রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবন দুইটি প্রধান যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগ বা সেকাল, ১২৮৪ হইতে ১৩০০ সালের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত। তাহার পরবর্ত্তী এ কাল—দ্বিতীয় যুগ। প্রথম যুগসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিভাষণে বলিয়াছেন—

"বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁপিয়ে উঠেনি।

"সে দিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে সব চেয়ে ছোট, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি, আধ আধ বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশ মাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

"সে দিনকার খ্যাতিহীনতায় স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল।" (প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, ৫১১পৃঃ)

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার শূন্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে হইল। এ কালের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিভাষণে বলিয়াছেন—

"অবশেষে এক দিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্ন রৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমে বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় এক বারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশী আবিল হ'য়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মত আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেচে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লাঞ্ছিত করেনি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন, এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানি নে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে, কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন, সেই

উৎসাহে আমার মন আনন্দিত।" (প্রবাসী ১৩৩৮ সাল ৫১২ পৃঃ)।

এই আত্মচরিতটুকুতে রবীন্দ্রনাথ একটি পুরাতন শব্দ, বিদূষক অপ্রচলিত যৌগিক নিন্দুক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাহার ব্যবসায়কে বলিয়াছেন বিদূষণ; অর্থাৎ তাঁহার প্রতিকূল সমালোচনা সম্যক্ আলোচনা নহে, বিদূষণ মাত্র। আমরা এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচককে তাঁহার বিদূষক বলিব—যদিও জানি তিনি এই বিদূষকগণকে কাছে যাইতে দিবেন না—এবং তাঁহাদের রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনাকে বলিব,—বিদূষণ। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ছাত্র-ছাত্রীগণের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার সার কথা এই—

সে কালে তাঁহার কোন বিদূষক ছিল না এবং তাঁহাকে বিদূষণ শুনিতে হয় নাই। সেকালে প্রায় কেহ তাঁহাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, বিচারকের দণ্ড নিয়ে অপ্রিয় আঘাত দিয়াছে।

এ কালে খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী অখ্যাতি বা বিদূষণ ঘটিয়াছে; এমন 'অনবরত, অকুণ্ঠিত, অকরুণ, অপ্রতিহত অসম্মাননা আর কোন সাহিত্যিককেই সহ্য করিতে হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের মত অনবরত সম্মাননাও অবশ্য আর কোন বাঙ্গালা লেখকের ভাগ্যে কস্মিন্‌কালে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন, বিদূষণের অবিরল আক্রমণ তাঁহাকে পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি জয়ন্তীর সপ্তাহেও বিজয়ী যোদ্ধার মত পরাজিত বিদূষকগণের জন্য সার্ব্বজনীন ক্ষমা (amnesty) ঘোষণা করিতে পারেন নাই। সুতরাং মনে হয়, তিনি পরাজিত না হইয়া থাকিলেও তাঁহার শত্রু পরাজিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহার সংশয় আছে। বন্ধুদের সমুজ্জ্বল সুপ্রসন্ন মুখ দেখিয়াও বিদূষকগণের উত্তোলিত কালো পর্দ্দাখানি তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এত খ্যাতির, এত সম্মাননার, এত বন্দনার মধ্যে এইরূপ বিক্ষোভ বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। এই প্রকার বিক্ষোভের নানা কারণ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে একটি কারণ, রবীন্দ্রনাথ যেন নিপীড়িতের অসম্মানিতের ভূমিকা ভালবাসেন; তাঁহার যেন বদ্ধমূল সংস্কার, যে কবি নূতন ধরণের বিস্ময়াবহ কাব্য সৃষ্টি করেন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাঁহার প্রধান পুরস্কার। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিব।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর যে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের 'সাধনায়' এই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত ছাপা হইয়াছিল। আমরা সাধনা হইতে এই প্রবন্ধের কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।......এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভাল মন্দ সকল (বাঙ্গলা) গ্রন্থই নির্ব্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধা-ভাণ্ড হস্তে লইয়া, আমাদের সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোন কালে ভুলিতে পারিব না।

"তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ মনে নাই। যেটুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয়, বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর এক দল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল।"......

বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ-নন্দিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে (১২৭১-৭২)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। "কপালকুণ্ডলা" তাহার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং "মৃণালিনী" প্রকাশিত হয় আরও দুই বৎসর পরে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৮ বৎসর ৬ মাস মাত্র। ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৯ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে যে উপহাস-বিদ্রূপ-গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল, শিশু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বয়ং তাহার খোঁজখবর রাখা বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের দ্বাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৯ সালের বৈশাখমাসে 'বঙ্গ-দর্শনের' প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের নিকট তখনকার খবর কতটা পৌঁছিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। পরে সম্ভবতঃ

রবীন্দ্রনাথ অগ্রজগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়া থাকিবেন। 'সাধনায়' মুদ্রিত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনও কথার জন্য অন্য কাহারও উপর বরাত দেন নাই। কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে এই প্রবন্ধটি "আধুনিক সাহিত্য" নামক রবীন্দ্রনাথের গদ্য গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। এই "আধুনিক সাহিত্যে" পুনর্মুদ্রিত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে উক্ত উদ্ধৃত অংশ এই আকার ধারণ করিয়াছে—

"যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাঙ্গালা দেশের সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

"সে দিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস-বিদ্রূপ-গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর এক দল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল" (আধুনিক সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৩৪, ১ পৃষ্ঠা)।

মূল প্রবন্ধ লিখিবার সময় যে ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের "সম্পূর্ণ মনে নাই" মনে হইয়াছিল, পুনর্মুদ্রণের সময় তাহা সম্পূর্ণ মনে পড়িয়াছে এবং "বোধ হয়" বাদ গিয়াছে। বঙ্কিম-সমালোচকের অসম্মান-সূচক কথায় অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রাচীনগণ বঙ্কিমকেও গোড়ায় নিশ্চয়ই বিস্তর উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বি-দূষকের বিদ্রূপে বিরক্ত বা অসম্মানসূচক কথায় ক্ষুণ্ণ হইবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু প্রাচীনদিগের পক্ষ হইতে না হউক, এক দল নবীনদিগের পক্ষ হইতে বিদূষণ যে ছিল, ১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনের' অগ্রহায়ণের সংখ্যায় "কাব্যমালা" নামক পুস্তকের সমালোচনায় তাহার এই আভাস পাওয়া যায়—

"যাহা শারীরিক কু-প্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এ দেশে কতকগুলিন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতিপ্রেম—যাহা সংসারের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থি এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরসঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ কথা কহিলেই লোকে ইংরাজীওয়ালা এবং সুসভ্য বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ডমূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্ব-চিত্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চক্ষুতে সকলই সমল। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কু-ক্রিয়ায় অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কু-প্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে।"

"আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণীমধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্ম্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশুমধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।" (পৃষ্ঠা ৩৮৬)

'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রতিবাদীকে "গণ্ডমূর্খ" "পাপাত্মা" বলা কটূক্তির একশেষ। কিন্তু এই মন্তব্যের মধ্যে ক্রোধ প্রকাশিত হইলেও কাঁদুনীর লেশমাত্র নাই এবং লাঞ্ছিতের সাজে সাজিয়া শ্রোতৃগণকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার কোন চেষ্টারও পরিচয় নাই।

বিদূষকের বিদূষণে রবীন্দ্রনাথের এতটা বিচলিত হইবার আর এক কারণ বোধ হয়, তাঁহার মনে একটা অসম্প্রজ্ঞাত আশঙ্কা আছে, এত কাল যাবৎ অবিরত এই এই যে বিদূষণ চলিতেছে, তাহা হয় ত' ভবিষ্যতে তাঁহার খ্যাতিকে খর্ব্ব করিবে। যিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে দিগ্বিজয়ের মাল্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, স্বদেশে তাঁহার সাহিত্যের এই পীড়াদায়ক বিদূষণ বড় বিস্ময়জনক। এই বিস্ময়ের প্রধান কারণ—রবীন্দ্রনাথের অনুকূল অনুরক্ত শত শত বিদূষকগণের সহস্র চেষ্টা, নিত্য সম্বর্দ্ধনা, জয়ন্তী-স্তুতি জন কয়েক বিদূষকের এই বিদূষণ চাপা দিতে পারিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ কাগজপত্র পড়া বন্ধ করিয়া থাকিলেও বিদূষণের প্রতিধ্বনি তাঁহার কাণে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই রবীন্দ্র-বিদূষণ আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাসের অতি জটিল রহস্য। বাঙ্গালীকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে শুধু কবি তর্জ্জা শুনিলে চলিবে না, এই রবীন্দ্র-বিদূষণ-রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এক বৎসরের বা দশ বৎসরের দূষণ-বিদূষণ

আলোচনা করিয়া এই জটিল রহস্য উদ্ঘাটিত করা সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহার আদ্যোপান্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আমি এই প্রস্তাবে যথাসম্ভব উভয় পক্ষের নিজের ভাষায় এই ইতিহাসসঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি কাব্য, "কবি-কাহিনী," "বনফুল" এবং "ভগ্ন হৃদয়ে"র কোন সমালোচনা আমি দেখি নাই। ১২৮৮ সালের ৩য় (আষাঢ়) সংখ্যা 'বান্ধব' পত্রিকায় "রুদ্রচণ্ড" নাটিকার সমালোচনায় সমালোচক-শিরোমণি বান্ধব-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশে এক জন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয়, বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।" (১৪৩ পৃষ্ঠা)।

এই কথা কয়টি যখন লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র ২১শ বৎসরে পা দিয়াছেন। প্রবীণ বান্ধব-সম্পাদকের এমন 'নিরবচ্ছিন্ন' প্রশংসা কবির পক্ষে খুবই উৎসাহপ্রদ হইয়া থাকিবে। ১২৯০ সালে পুরাতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শন, বান্ধব বন্ধ হইয়া গেলে, আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি যুগ শেষ হইল। পাশ্চাত্য-শিক্ষা এ দেশে যে রাষ্ট্রীয় ভাবের বীজ ছড়াইয়াছিল, অতীতপ্রায় যুগে বঙ্কিম, হেম, নবীন কাব্যরসধারা ঢালিয়া তাহাকে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই তখন বাঙ্গালাদেশ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে অগ্রগামী ছিল। লর্ড রিপণের শাসন-নীতির গুণে সেই গাছটিতে ফুল-ফল ফলিবার অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম বৎসরের (১২৯১-১২৯২) "প্রচার-পত্রিকায়" "লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ" নামক প্রবন্ধে লাভের অঙ্কের খতিয়ানরূপে তখন দেশে রাষ্ট্রীয় ভাব কতটা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার এই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

"প্রথমতঃ, আমরা এই উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজ-ভক্তি।"

"আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় ঐক্য। এই বোধ হয়, ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা এক জাতি।"

"তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শক্তি।…… যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই শক্তি আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ, লর্ড রিপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।"

"আমাদের চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ—সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল।" (২১৯ পৃষ্ঠা)

তৎকালে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা হিন্দু-ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণের দেশভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন সভ্যতার উপর একটা অনুরাগও উদ্রিক্ত হইয়াছিল। হিন্দু-সভ্যতার উত্তমাঙ্গ হিন্দুধর্ম্ম। শিক্ষিত হিন্দুরা তখন ৺শশধর তর্কচূড়ামণির মত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যে স্মার্ত্ত এবং তান্ত্রিক-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, তাহার সমুদয়টা শিক্ষিত সমাজের রুচি-সঙ্গত নহে। তাই তখন হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারের একটা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই আন্দোলনে নায়ক হইলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। এই সংস্কারক দলের বিরুদ্ধে এক দিকে দাঁড়াইলেন গোঁড়া হিন্দুগণ, এবং আর এক দিকে দাঁড়াইলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কেন্দ্রীভূত আদি ব্রাহ্মসমাজ। তৎকালে ২৩ বৎসর মাত্র বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। নব্য হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারকদলের প্রথম মুখপত্র 'নব-জীবনের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল ১২৯১ সালের শ্রাবণের আরম্ভে এবং দ্বিতীয় মুখপত্র 'প্রচার' প্রকাশিত হইল তাহার ১৫

দিন পরে। ইহার অব্যবহিত পরেই আদি ব্রাহ্মগণের সহিত হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারকগণের যে বাদ-বিতণ্ডা, বিদূষণ প্রতিবিদূষণ আরম্ভ হইল, ক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং যত দিন না প্রতিদ্বন্দ্বিগণ একে একে নীরব হইলেন, তত দিন বরাবর তিনি মসীযুদ্ধ চালাইলেন। রবীন্দ্র-বিদূষণের কাহিনীর প্রথম পর্ব্বের উপলক্ষ হিন্দুধর্ম্ম। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাহিত্যপ্রসঙ্গও চলিয়াছিল। বিদূষণ ব্যাপার প্রথমে আরম্ভ হইল নব-জীবনের সূচনা লইয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই কাহিনী বর্ণনা করিব। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যে বিদূষণের বিনিময় আরম্ভ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাহার আখ্যান বলিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"গত শ্রাবণ মাসে 'নব-জীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রশংসা ছিল, বঙ্গ-দর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গ-দর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

"তার পর 'সঞ্জীবনীতে' একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নব-জীবন-সম্পাদককে এবং নব-জীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন প্রধান লেখক এই পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন; অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

"নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয়বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন।

"তদুত্তরে 'সঞ্জীবনীতে' আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল 'র'। লোকে কাষেই বলিল, পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু 'ইতর' শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।" (প্রচার প্রথম বৎসর, ১৭০-৭১ পৃষ্ঠা)

১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যার ভারতীতে "কৈফিয়ৎ" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বিদূষণ-প্রতিবিদূষণের কোন কৈফিয়ৎ না দিয়া একটি পাদটীকায় লিখিয়াছেন— "সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল, তাহার সহিত বঙ্কিম বাবুর কি যোগ, বুঝিতে পারিলাম না। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল, সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটা অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" (৪০৭ পৃষ্ঠা)

নবজীবনের সম্পাদক প্রথম সংখ্যা নবজীবনের সূচনায় হিন্দুর যে নবযুগের অভ্যুদয় আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই নবযুগে তাঁহার নিজের, বঙ্কিম-চন্দ্রের এবং ৺চন্দ্রনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আনন্দমঠের স্থপতি সেই নবযুগের এক জন অগ্রদূত এবং নায়ক ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নবীন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ যে এই নবযুগ স্বীকার করিবেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে যে একটা ঐক্য ছিল এবং এই তিন জনই যে হিন্দুর নবজীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত (serious) ছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অকারণে তাঁহার সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর যে বিবাদ, তাহা তিনি নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন।

নবজীবন-সম্পাদক সঞ্জীবনীর লেখালেখি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-ভাবে কিছু না বলিলেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারি-লেন এবং প্রথম বৎসরের নবজীবনের সপ্তম (মাঘ) সংখ্যায় "ভাই হাততালি" নামক প্রবন্ধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র সেনের এবং রমা বাইএর পতনের জন্য হাততালিকে দোষ দিয়া লিখিতেছেন,—

"ভাই হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিনকতক গোটা দুই তিন লোককে স্থির থাকিতে দাও।"

এই "গোটা দুই তিন" লোকের মধ্যে লেখক প্রথম নাম করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার পর—

"আর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, 'বঙ্কিম বাবু' বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ানগণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই; তাই হাততালি তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য আজ তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

"রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপ-শিখা, ধীরে, স্থিরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি-তৈল-নিবেশিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ-লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী-বিনায়িত চিকুর-ঝলঝল মুখ-মণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি-খুসী-ভরা অধর-প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চট্‌চটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ-সন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে? ভাই, স্বীকার করিলাম, তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?" (নবজীবন ১ম ৮৯, ৪৩২ পৃষ্ঠা)। *

বাঙ্গালা-সাহিত্যে কোন জীবিত ব্যক্তির এইরূপ সুন্দর চিত্র আর দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের অন্তর-বাহির তুল্য কৌশলের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্রে শিল্পীর হৃদয়ের স্নেহ এবং মুখের ঈষৎ হাস্য উভয়ই সুন্দর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্নেহমাখান হাসি বোধ হয় পরিহাস বলিয়া গণ্য হইল। ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপশিখা আর কখনও নবজীবনের পত্র আলোকিত করিল না। ইহা কি হাততালির প্রতিশোধ?

তৃতীয় বৎসরের (১২৯৩ সালের) অগ্রহায়ণের নবজীবনের সম্পাদক মহাশয় "কাব্যি-সমালোচনা" লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে উপহাস করিয়াছিলেন। "কড়ি ও কোমল" প্রকাশিত হইবার পর এবং "মানসী" প্রকাশিত হইবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে, "কাব্যি-সমালোচনা" লিখিত হইয়াছিল।

এই সমালোচনা যে অসঙ্গত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ নব প্রকাশিত সঞ্চয়িতার ভূমিকায় (পৌষ, ১৩৩৮) তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের (সান্ধ্য-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান) যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল, তা ছাড়া আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে, কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেচে।

"তার পর মানসী থেকে আরম্ভ ক'রে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

১২৯৩ সালে অবশ্য নিজের সে কালের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্যরূপ মত ছিল। চৈত্র মাসের ভারতী ও বালকে "কাব্যি-সমালোচনার কাব্য।" "স্পষ্ট ও অস্পষ্ট" নামক জবাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। জবাবে বিদূষণের অভাব ছিল না। যথা—

"ফুলের মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে, কিন্তু বাছুর আসিয়া যখন তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি, তাহার বৃন্ত, তাহার

* "ভাই হাততালি" রূপক ও রহস্যে (হৃষীকেশ—সিরিজ নং ৬) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (১০২-১০৮ পৃষ্ঠা)।

আশপাশের গোটা পাঁচ ছয় পাতা শুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে, সানন্দমনে হাম্বারব করিতে থাকে, তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়, এমন কে আছে।" (৭১৪ পৃষ্ঠা)

এই হতভাগ্য কবির এবং তর্জ্জার লড়াইএর দেশে মধুকরের বিরুদ্ধধর্ম্মী প্রাণীর নাম করিতে হইলে কেহ বাছুরের নাম করেন না, ঘুণের নাম প্রায়ই করেন। বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ নবজীবনের সম্পাদকের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন বয়সে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বপক্ষকে ইঙ্গিতে বাছুরের সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। গো-জাতির বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ নাই, গোরুর যেটুকু বুদ্ধি আছে, বাছুরের তাহাও নাই, বাছুর অধিকতর নিরেট, এই জন্যই কি গোরুর পরিবর্ত্তে গো-বৎসের অবতারণা? যাঁহারা নবীন, যাঁহারা কাঁচা, তাঁহারা স্বভাবতঃই অসহিষ্ণু—বিদূষণপ্রিয়।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (এম এ)।

দীপান্বিতা

অমানিশা,—ঘোরা রাত্রি ঘন অন্ধকারা।
কোজাগরী—স্বপ্নশেষ-স্মৃতি মাত্র, সখি!
—ও কি,
দীপ হাতে নিয়ে কোথা যাও,
বাতায়নে প্রদীপ দেখাও
অন্ধকারে—
কারে?
দূর স্বর্গ-বাতায়নে ছন্দাকারে জাগে তারকারা।

মৃন্ময়ীর পত্র-পুষ্প তৃণ-শস্পদল শিশির-সজল—
কুহেলির ধূঙল অঞ্চলে
চাপি' চাপি' শোকাশ্রু প্রবল, সেই অশ্রুজলে
শ্যাওল কপোল, বক্ষ,—সিক্ত করতল।
মহামৌন ধূসর আকাশ—বিরাট সমাধি যেন কার!
কালো কেশভার
অন্ধকারে লুটাইয়া সে সমাধি-মূলে
কালো মেয়ে কাঁদে ফুলে' ফুলে',—
আপনারি দীর্ঘশ্বাস লাগি'
হয় ত' নিভেছে দীপ আপন হাতের।—হতভাগী!

দূর স্বর্গ-বাতায়নে অন্ধকারে চাহে তারকারা;
তা'রা
আলোকের অবোধ্য সঙ্গীত-
স্বরলিপি রচনার ছলে,
নভস্তলে
লিখিছে ইঙ্গিত
আঁধারের পারের ভাষায়।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকাময়ী বুঝিতে কি নাহি পারে তায়?

বাতায়নে প্রদীপ দেখাও,—ধর সখি, দীপ তুলে' ধর,
এ মহামৃত্যুর স্রোত আজি দীপ্ত কর
তুমি তব প্রাণের আলোকে।
লিখো অভিনব শিখা-শ্লোকে—
"মৃত্যু নহে চিরন্তন,—আঁধারের আছে অবসান।
অমৃত-আলোকবাহী নিত্য সত্য প্রেম আর মৃত্যুজয়ী প্রাণ।
এ অমারাত্রির পারে আছে হৈম দিবা।"
—তোমার প্রদীপ তুমি তুলে' ধর, দীপা!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।



পঞ্চদশ প্রবাহ

অকূলে কূল

মিঃ লক সমুদ্রতটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাহা হইতে তিনি বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস হইল না ; তিনি কূলে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সাঁতরাইয়া কয়েক গজ অতিক্রম করিলেন, সেই সময় তিনি তটসন্নিহিত কিল্লার দিকে চাহিয়া তাহার উচ্চ চূড়ায় কামান রাখিবার ফুকরে ফুকরে দীপালোক দেখিতে পাইলেন ; সেই উজ্জ্বল আলোকমালায় সমুদ্রের জল বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত। বহু লোকের হুঙ্কার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কিল্লার সৈনিকরা দল বাঁধিয়া সমুদ্র-তটে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। সেনাপতি কলভেটি প্রকৃতিস্থ হইলে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার ভূতের ভয় অমূলক, মিঃ লক কোন কৌশলে সৈনিকগণের গুলী ব্যর্থ করিয়া জীবিত আছেন ; তিনি তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

মিঃ লক ফিরিলেন ; তিনি স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণের চেষ্টা করিলেন। দূরে তিনি যে জাহাজ দেখিয়াছিলেন, সেই দিকেই তাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইলেন ; দিবসের প্রখর উত্তাপ সত্ত্বেও রাত্রিতে শীত বোধ হইতেছিল ; সমুদ্রের জল তখন অত্যন্ত শীতল, মিঃ লকের হাত-পা শীতে আড়ষ্ট হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থল দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রাণের মমতায় প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, কলভেটির কবলে পড়িয়া কঠোর মৃত্যুদণ্ড সহ্য করা অপেক্ষা সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কলভেটি এবার ধরিতে পারিলে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে ; এবার আর তিনি কোন কৌশলে বা কাহারও সাহায্যে তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না।

মিঃ লক চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার হাত দু'খানি সীসায় নির্ম্মিত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি কয়েকবার তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, বিস্বাদ সমুদ্র-জল তাঁহার নাকে মুখে প্রবেশ করিল ; তাঁহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। জোরে জোরে তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল ; তাঁহার মনে হইল, কেহ তাঁহার বুকে হাতুড়ি ঠুকিতেছে। তাঁহার শ্রান্তদেহের শোণিত-প্রবাহের শব্দ তাঁহার শ্রবণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "আর ত পারি না ; হাত-পা ছাড়িয়া ডুবিয়া যাই, সমুদ্রের অগাধ জলের নীচে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করি। জীবনের সকল আশাই ফুরাইয়াছে, এই শ্রান্ত দেহ-ভার আর ক্ষণকালও বহন করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ লকের চেতনা-বিলোপের উপক্রম হইল ; শুনিয়াছি, জলে ডুবিয়া মরিবার পূর্ব্বে নানা প্রকার রঙ্গীন স্বপ্ন অপগত-প্রায় চেতনাকে প্রলুব্ধ করে ; মিঃ লকের তখন সেই অবস্থা। তাঁহার মনে হইল, তিনি সমুদ্রতটে আশ্রয় লাভ

করিয়াছেন, তাঁহার হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া গানের মজলিসে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে তখন নৃত্যগীত চলিতেছিল, দর্শকগণ, উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলী চারিদিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি যুবক একটি নর্ত্তকীর সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল। সঙ্গীতের স্বর-তরঙ্গ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মুদিত-নেত্রে উদ্যত কর্ণে শুনিতে লাগিলেন,—

"আমি প্রেম-ভোলা এক পথিক এসেছি,
দেখে আমার প্রাণের প্রিয়া ভালবেসেছি!"

এ গান তিনি আর কোন দিন কোথায় শুনিয়াছেন? এই কণ্ঠস্বর যে তাঁহার পরিচিত। অবশেষে স্বপ্ন ও সত্য যেন একাকার হইয়া গেল! মিঃ লক প্রবল চেষ্টায় মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জলের উপর মাথা তুলিলেন, ক্ষীণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, এ সঙ্গীত তিনি তাঁহার সহচর প্রেমিক নাবিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এই অন্ধকার নিশীথে সমুদ্রবক্ষে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলেন—ইহার কারণ কি? এ কি রহস্য?

সেই মুহূর্ত্তে তিনি কয়েক গজ দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, সাগরতরঙ্গের অশ্রান্ত কলধ্বনি ডুবাইয়া কে উচ্চকণ্ঠে গায়িতে লাগিল—

"শেষে দেখি সে বাস্‌লো ভালো—
একটা ছুঁচো ফচ্‌কে ছোঁড়া!
ওরে—আমার প্রাণের কথা শোন্ রে তোরা।"

সত্যই ইহা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। স্বপ্ন নহে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিভ্রমও নহে, অদূরে কোন জীবিত মনুষ্য সেই সঙ্গীতে সমুদ্র-বক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

মিঃ লক সমুদ্রতরঙ্গের ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সর্টি, সর্টি, এ যে তোমারই গান, তোমারই কণ্ঠস্বর, কোথায় তুমি?"

মিঃ লক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই বিশাল সমুদ্রে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না; কেহই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল না। কিন্তু গান হঠাৎ থামিয়া গেল।

মিঃ লক রুদ্ধশ্বাসে পুনর্ব্বার বলিলেন, "সর্টি! সর্টি!"

একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী মোচার খোলার মত সমুদ্র-তরঙ্গশিরে ভাসিয়া উঠিল। মিঃ লক উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে ডিঙ্গীর মাথায় এক জন লোক দেখিতে পাইলেন, সে কর্ণধার।

সে কি অকূল সমুদ্রে মগ্নপ্রায় মিঃ লকের জীবন-তরীরও কর্ণধার?

মিঃ লক অদূরে সেই ডিঙ্গী দেখিয়া আশ্বস্ত-হৃদয়ে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ডিঙ্গীতে কে ও? তুমি কি সর্টি?"

সর্টি ডিঙ্গীর হাল চাপিয়া ধরিয়া উৎসাহভরে বলিল, "পরমেশ্বর, তোমার দয়ার সীমা নাই। এ যে আমাদের কর্ত্তার কণ্ঠস্বর। আমি আসিয়াছি, কর্ত্তা!"

সর্টির সাড়া পাইয়া মিঃ লকের দেহে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হইল। এরূপ মধুর কণ্ঠস্বর জীবনে আর কখনও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই; নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত সর্টির কণ্ঠস্বরের তুলনায় তুচ্ছ মনে হইল। তাহা যেন তাঁহাকে নব-জীবনদানের জন্য সঞ্জীবনীমন্ত্র।

সর্টি ডিঙ্গীখান ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে ভিড়াইল। সে মিঃ লককে বলিল, "এই যে কর্ত্তা, আমি আপনার জন্য বোট আনিয়াছি। আমার ধারণা ছিল, আপনি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সমুদ্রে ভাসিয়া জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনি এত দূর সাঁতরাইয়া যাইতে পরিশ্রান্ত হইতে পারেন ভাবিয়া আমি এই বোট লইয়া চারিদিকে আপনাকে খুঁজিতেছিলাম। আপনি স্থির থাকুন, আপনাকে বোটে তুলিয়া লইতেছি।"

সর্টি ডিঙ্গী হইতে জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিঃ লকের মাথার কাছে দুই হাত বাড়াইয়া দিল, এবং তাঁহার কাঁধ ধরিয়া তাঁহাকে ডিঙ্গীর উপর টানিয়া তুলিল।

মিঃ লক ডিঙ্গীর খোলা পাটাতনের উপর দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন; তখন তাঁহার একটি আঙ্গুল নাড়িবারও শক্তি ছিল না। কিছুকাল তিনি সেই ডিঙ্গীর উপর জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। ডিঙ্গীখান কালিম্পো জাহাজের দিকে চলিতে লাগিল। সর্টি হালে বসিয়া গান ধরিল—

"আমি প্রেমভোলা এক পথিক এসেছি,
আমি পথ-ভোলা এক প্রেমিক এসেছি,—
সেই ডবগা ছুঁড়ীর রূপসাগরে ভেসে চলেছি।"

মিঃ লকের মনে হইল, সেই সঙ্গীত তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে।

* * * *

'কালিপ্সো' জাহাজ মুক্ত সমুদ্রে ধাবিত হইতেছিল। মিঃ লক শুষ্ক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গরম চা পান করিয়া, সুস্থ হইয়া স্কুডারকে তাঁহার অদ্ভুত অভিযান ও বিপদের কাহিনী শুনাইলে, স্কুডার তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তাঁহার গোচর করিল।

সে বলিল, "আমরা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাতে কোন খুঁত ছিল না; কিন্তু একটা বিষয়ে ভুল হইয়াছিল। আপনাকে গুলী দ্বারা হত্যা করিবার অভিনয় শেষ হইলে আপনাকে শবাধারে পুরিয়া সেই শবাধার কিল্লার বাহিরে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহার পর আপনি সুযোগ বুঝিয়া সেই শবাধার ত্যাগ করিবেন এবং অন্যের অলক্ষ্যে সমুদ্রতটে পলায়ন করিবেন—এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, আমাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আপনার 'মৃতদেহ' যে শবাধারে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেনাপতির প্রহরিগণের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কিল্লার বাহিরে লইয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই; কিন্তু রিগো আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, সে ভূ-বিবরস্থ সুড়ঙ্গ দিয়া গোপনে আপনার শবাধারের নিকট উপস্থিত হইবে এবং কোন্ গুপ্তপথে আপনার পলায়নের সুযোগ হইবে—সেই পথ দেখাইয়া দিবে। রিগো আপনাকে সাহায্য করিয়াছে এবং আপনি সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া আমার জাহাজে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই ধারণায় সটি আপনাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া লইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী লইয়া আমার জাহাজ হইতে সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু আপনি অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত থাকায় এখানে আসিতে আপনার অনেক বিলম্ব হইয়াছে। সটি দীর্ঘকাল আপনার সন্ধানে ডিঙ্গী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও আপনাকে দেখিতে পায় নাই; এজন্য তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, আপনি সমুদ্র-তরঙ্গে অন্য দিকে ভাসিয়া গিয়াছেন, অথবা কলভেটির ষড়যন্ত্রে নূতন কোন বিপদে পড়িয়া সমুদ্রকূলে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু সে নিরুৎসাহ বা হতাশ না হইয়া ডিঙ্গী লইয়া সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে তাহার এই পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আপনি আমার জাহাজে আশ্রয় গ্রহণের পর-মুহূর্ত্তেই আমি বন্দরের সীমার বাহিরে জাহাজ পরিচালিত করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম; এ জন্য আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ ভাসাইয়া মুক্ত সমুদ্রে চলিয়াছি। আমি জাহাজ হইতে দেখিতে পাইলাম, সমুদ্র-বক্ষে উহাদের সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলোক বিকীর্ণ হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রজল আলোকোদ্ভাসিত করিয়াছিল এবং সেই সার্চ্চ লাইটের আলোক আমার জাহাজের উপরেও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; এই জন্য আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, উহারা সন্দেহক্রমে আমার জাহাজ আক্রমণ করিয়া ইহার উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারে। আমার তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার ইহাও একটি কারণ বটে।"

মিঃ লক বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু বলিভার জাহাজের সংবাদ কি? বলিভারের কাপ্তেন সন্দেহক্রমে তোমার জাহাজের অনুসরণ করিবে না ত?"

স্কুডার বলিল, "তাহা করিতে পারে; কিন্তু আমি জানি, কাল সকালে তাহার কাপ্তেন জাহাজের আগুন নিবাইয়া ফেলিয়াছে। পুনর্ব্বার বাষ্পের ব্যবস্থা করিয়া সেই জাহাজ চালাইতে অনেক সময় লাগিবে; সুতরাং সে আমার জাহাজের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বেই আমরা সমুদ্রোপকূলের কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইতে পারিব।"

মিঃ লক বলিলেন, "তুমি জাহাজ লইয়া দূরে পলায়ন করিবে না, নিকটেই কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এ সংবাদে আমি আনন্দিত হইলাম। উহাদের দুই জনের উদ্ধারের জন্য তোমার আন্তরিক আগ্রহ আছে কি?"

স্কুডার উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ মিঃ লক, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; এ জন্য যদি আমাকে বিপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলেও আমি চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিব না। আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার অভ্যাস নাই। আমি জানি, বয়েলটা অত্যন্ত বদ লোক, সে সত্যই উহাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া এই রাজ্যের বিস্তর হীরা-জহরৎ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে; সে দয়ার অযোগ্য। কিন্তু তাহার সেই সুন্দরী মেয়েটির বিপদের কথা চিন্তা করিয়া বিচলিত না হইয়া থাকা যায় না। এই জন্যই তাহাদিগকে শত্রু কবল হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়াছি। এই অসভ্য

বর্ব্বরগুলা বয়েলের নিরপরাধ সুশীলা কন্যার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিবে, নরপিশাচ কলভেটি কামান্ধ হইয়া তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে,—এ চিন্তা অসহ্য; যে কোন আমেরিকান, আমেরিকান দূরের কথা, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যে কন্যা-ভগিনীর সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করে—সে জীবন দিয়াও এই যুবতীর সম্মান রক্ষা করিবে। যাহারা নিতান্ত কাপুরুষ, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, আত্মসম্মানে বঞ্চিত, তাহারাই প্রাণভয়ে নারী-নির্য্যাতনে উপেক্ষা প্রদর্শন করে; পৃথিবীর কোন দেশে সেরূপ অপদার্থ নরাধমের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা আমার জানা নাই।"

বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে এই তেজস্বী আমেরিকানের অভিজ্ঞতা থাকিলে সে বলিতে পারিত, পৃথিবীর মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে এই একটি দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ নরাধম কাপুরুষ অনেক আছে—যাহারা প্রাণের মমতায় দূরে দাঁড়াইয়া স্ত্রী ও কন্যা-ভগিনীর 'ইজ্জৎ নাশ' প্রত্যক্ষ করে, দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া সেই 'পতিতাকে' সমাজ হইতে কি ভাবে নির্ব্বাসিতা করা উচিত, সামাজিক বৈঠক বসাইয়া তাহাই পরামর্শ করে!

স্রুডার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিঃ লক, আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই, এ জন্য আপনার আরও কিঞ্চিৎ উত্তেজক পানীয় পানের প্রয়োজন আছে, তাহা আপনার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া একবার রেডিওরুমে যাইব। কলভেটির চাকায় একটা শিক পুরিবার যোগাড় করিয়া আসি।"

মিঃ লক বলিলেন, "মতলবটা কি, শুনি।"

স্রুডার বলিল, "আমি রটাইয়া আসি যে, আমরা নিউইয়র্কে ফিরিয়া যাইতেছি; যদি কলভেটি বিশ্বাস করে যে, আমরা সত্যই স্বদেশে ফিরিতেছি, তাহা হইলে সে কোন জাহাজ আমাদের অনুসরণে পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। আমাদের স্বদেশযাত্রার এই মিথ্যা সংবাদটা যাহাতে সে জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

ষোড়শ প্রবাহ

আগল্ হাস

'কালিপ্সো' জাহাজ সারা রাত্রি সম্মুখে অগ্রসর হইল; কিন্তু সে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে মিঃ লক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, জাহাজখানি কালেসো বন্দর হইতে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। সারা রাত্রি জাহাজ চলিল, অথচ তাহা কয়েক মাইল মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এই সংবাদে মিঃ লক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মিঃ লক প্রভাতে জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাহাজ তখন একটি অপ্রশস্ত প্রণালীর ভিতর দিয়া তটভূমি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে।

ব্রীজের উপর স্রুডারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্রুডার তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখিতেছেন কি? এক রাত্রেই আমরা নিউ ইয়র্কের এলাকায় পাড়ি জমাইয়াছি; ঐ যে তটরেখা দেখা যাইতেছে, উহাই আমাদের লক্ষ্য স্থল। ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে জাহাজ তটের নিকট উপস্থিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই স্রুডার মিঃ লকের উপদেশে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তটে অবতরণ করিল; তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট দূরবীণ সঙ্গে লইলেন। সেই প্রণালীর তটভূমি উচ্চ, তাহা একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সেই পাহাড় বহিয়া তাহার একটি দুরারোহ অংশে আরোহণ করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা একটি উচ্চ স্তূপে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সেই স্থান হইতে দূরবীণের সাহায্যে কালেসো বন্দরের প্রত্যেক অংশ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

মিঃ লক দূরবীণের সাহায্যে বন্দরস্থিত বলিভার জাহাজের চিমনী হইতে উদ্গত কৃষ্ণবর্ণ ধূমকুণ্ডলীও দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকট দুই তিনখানি পিনিস ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মিঃ লক তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "জাহাজখানা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয়, আমাদের জাহাজের অনুসরণ করাই উহাদের উদ্দেশ্য। এক মিনিট অপেক্ষা কর, ওটা কি দেখি।"

মিঃ লক কয়েক মিনিট চোখের উপর দূরবীণ ধরিয়া রহিলেন ; তাহার পর দূরবীণ নামাইয়া স্ক্রডারকে বলিলেন, "না, উহারা আমাদের অনুসরণের জন্য উৎসুক বলিয়া ত মনে হইতেছে না, উহারা সেই গুপ্ত ধনের সন্ধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

স্ক্রডার বলিল, "আপনি কিরূপে তাহা বুঝিলেন ?"

মিঃ লক বলিলেন, "শেষের পিনিসখানা কিল্লার জেঠী হইতে চলিয়া আসিল, তাহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। সেই পিনিসে আমি সশস্ত্র প্রহরী সহ কাপ্তেন বয়েল ও তাহার কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছি। ব্যাপার কি, বুঝিয়াছ ? কাপ্তেন বয়েল তাহার কন্যার নির্য্যাতনে বিচলিত হইয়া তাহার গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। সে উহাদিগকে লইয়া সেই গুপ্ত ধনের সন্ধান দিতে যাইতেছে।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা দেখিলেন, বলিভার জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া বন্দরের বাহিরে আসিল।

অতঃপর তাঁহারা জাহাজে ফিরিয়া আসিলে স্ক্রডার মিঃ লককে বলিল, "আমরা বলিভারের অনুসরণ করিতে পারিব না ; যে মুহূর্ত্তে আমরা এই নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মুক্ত সমুদ্রে প্রবেশ করিব, সেই মুহূর্ত্তে বলিভার আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিবে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; অধিক কি, আপনার সঙ্গে বাজী রাখিতে রাজী আছি।"

মিঃ লক দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বাজী রাখিবার প্রয়োজন নাই, তোমার অনুমান সত্য, আমিও ইহা স্বীকার করিতেছি ; তবে এখন একটামাত্র উপায় আছে,—সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে ?"

স্ক্রডার আগ্রহভরে বলিল, "কি উপায় ?"

মিঃ লক বলিলেন, "বলিভারকে কোন কৌশলে আগলহাস দ্বীপে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পার ?"

কালিম্পো জাহাজের কাপ্তেনকে ডাকিয়া আগলহাস দ্বীপের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি ঐ দ্বীপের নামও কখন শুনি নাই ; আমার ধারণা, উহা কোন পাহাড়। সমুদ্রের নক্সায় এই দ্বীপের নাম দেখিতে পাই নাই ; আমেরিকান বা বৃটিশ—কোন নক্সাতেই উহার নাম পাওয়া যায় না।"

লাইটওয়ে জাহাজে নাবিকের কায করিত ; সে সেই দ্বীপ দেখিয়াছিল ; কিন্তু সে জাহাজ পরিচালিত করিতে জানিত না। কিন্তু সে বলিল—সে জাহাজ চালাইতে না পারিলেও কাপ্তেনকে পরিচালিত করিয়া সেই দ্বীপ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তদনুসারে কাপ্তেন তাহাকেই পথ-প্রদর্শকের ভার গ্রহণ করিতে বলিল। অনন্তর বলিভারের চিমনী-নিঃসারিত ধূমপুঞ্জ গগনপ্রান্তে অদৃশ্য হইবামাত্র কালিম্পো জাহাজ তাহার আশ্রয়তট পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণবেগে মুক্ত সমুদ্রে ধাবিত হইল ; কিন্তু বিচালীর গাদা হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করিবার মত কাযটি কঠিন হইল। সে দিন সারাদিন সারারাত্রি এবং তাহার পরদিনও অবিশ্রান্তভাবে চলিয়া তাঁহারা আগলহাস দ্বীপের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। কোন দিকে তাহার সন্ধান মিলিল না। বলিভার জাহাজ বে-তারের সাহায্য গ্রহণ না করায় সে কত দূরে এবং কোথায় গিয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

মিঃ লক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; স্ক্রডার উত্তেজিতভাবে জাহাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাটানিয়ান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতে লাগিল। তাহার সকল রাগ কলভেটির উপর। কাপ্তেন বার্টন দিবা-রাত্রি সমুদ্রের নক্সা ঘাঁটিতে লাগিল। নক্সায় যাহার নাম পর্য্যন্ত নাই, অকূল সমুদ্রে সে কোথায় সেই দ্বীপের সন্ধান পাইবে ? বলিভার জাহাজ হইতে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় কি না, তাহা জানিবার জন্য 'রেডিও-অপারেটার' আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বে-তারের উপর লক্ষ্য রাখিল।

অবশেষে তৃতীয় দিন সায়ংকালে কালিম্পো জাহাজের কাপ্তেন জাহাজের দক্ষিণ পার্শ্বে দিক্‌চক্রবাল-সীমায় কৃষ্ণবর্ণ মসীবিন্দুবৎ একটি পদার্থ দেখিয়া তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

লাইটওয়ে ব্রীজে দাঁড়াইয়া মিঃ লককে উৎসাহভরে বলিল, "উহাই আগলহাস দ্বীপ।"

তাঁহারা দূরবীণের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিভার জাহাজের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা সেই মসীবিন্দু লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকীর্ণ দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বীপটি পরীক্ষা করিবার জন্য জাহাজ হইতে অবিলম্বে বোট নামাইয়া দেওয়া হইল।

তাঁহারা উপলবহুল কঙ্করাকীর্ণ তটে উঠিলে লাইটওয়ে তাঁহাদের পথপ্রদর্শনের ভার গ্রহণ করিল। তাঁহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করিবার জন্য জাহাজ হইতে সার্চ্চ লাইটের আলোক বিকীর্ণ করা হইল।

লাইটওয়ে একটি অনুর্ব্বর, ধূসর আগ্নেয়গিরির একটি উপত্যকার অভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, সেই স্থানটি ঐ উপত্যকাতেই অবস্থিত। কাপ্তেন বয়েল যে দিন সেই হীরা-জহরৎগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে দিন তাহাকে ঐ উপত্যকায় উঠিতে দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ লক, স্ক্রডার ও কাপ্তেন লাইটওয়ের অনুসরণ করিলেন। পাটানিয়ানরা পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল কি না, দেখিবার জন্য তাঁহারা চারিদিক্ লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহারা কোন দিকে অন্য কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। সেই দ্বীপে বিন্দুপরিমাণ নরম মাটীও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। কঠিন পার্ব্বত্য-ভূমিতে কাহারও পদচিহ্ন লক্ষিত হইল না।

সর্ট লাইটওয়ে চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং উৎসাহভরে শিষ্ দিল। সেই আগ্নেয়গিরির উপত্যকার একটি সঙ্কীর্ণ অংশে উপস্থিত হইয়া সে সম্মুখে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। অন্য সকলে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা সেখানে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, তাহা অতি ভীষণ, মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য!

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কলভেটি পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। উপত্যকার প্রান্ত-সীমায় তাঁহারা একটি গভীর গহ্বর দেখিয়া গহ্বরটি যে নূতন খনন করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না। সেই গহ্বরের নিকট খন্তা, কোদালী প্রভৃতি অস্ত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া ছিল।

সেই গহ্বর হইতে গুপ্তধন উত্তোলিত হইয়াছিল কি না, জানিবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবিত হইয়াছেন, এরূপ নহে। সেজন্য তাঁহারা ভয়ে বিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করেন নাই।

সেই গহ্বরের ধারে কাঠের একটি দীর্ঘ খুঁটি প্রোথিত ছিল, সেই খুঁটায় একটি পাটানিয়ানকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার উভয় হস্ত এবং পদদ্বয়ও রজ্জুবদ্ধ। তাহার হাত-পা নাড়িবার বা নড়িবার শক্তি ছিল না। দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে এবং রাত্রির তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহে তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল!

মিঃ লক লাইটওয়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে সেই লোকটির নিকট উপস্থিত হইলেন।

মিঃ লক সেই হতভাগ্য বন্দীর চক্ষুর পাতা স্পন্দিত হইতে দেখিয়া ব্যাকুল-স্বরে বলিলেন, "লোকটা এখনও জীবিত আছে!"—তিনি পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহার বন্ধন মোচন করিলেন। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "নরপিশাচ কলভেটি কি উদ্দেশ্যে এই প্রকার ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

লাইটওয়ে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আমি তাহা বলিতে পারি, কর্ত্তা! এই হতভাগা আমার পুরাতন সঙ্গী মাজাডো!" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



সাংহাই

নিখিল বিশ্বের এক-অষ্টমাংশ মানবজাতি যে দেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই দেশের সাংহাই বন্দর সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে যে জলাভূমির উপর পর্ণ ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহ বিরাজিত ছিল, এখন সেখানে আকাশচুম্বী ইস্পাত ও কংক্রিটের অট্টালিকাসমূহ উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান। সুপ্রশস্ত বাঁধের উপর দিয়া অসংখ্য মোটর, বিদ্যুৎচালিত ট্রামগাড়ী ও অন্যান্য যান সশব্দে ধাবিত হইতেছে। ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে—তদুপরি বিবিধ জাতীয় বিচিত্র পতাকা উড্ডীন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিও তথায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন। ব্যবসায়ি-প্রতিষ্ঠানের এখন সংখ্যা নির্ণয় করাই কঠিন। অসংখ্য ধর্ম্ম-প্রচারক সাংহাই বন্দর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

নব্বই বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লীর—ধীবর-পল্লী বলিলেই চলে—এই অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে এই

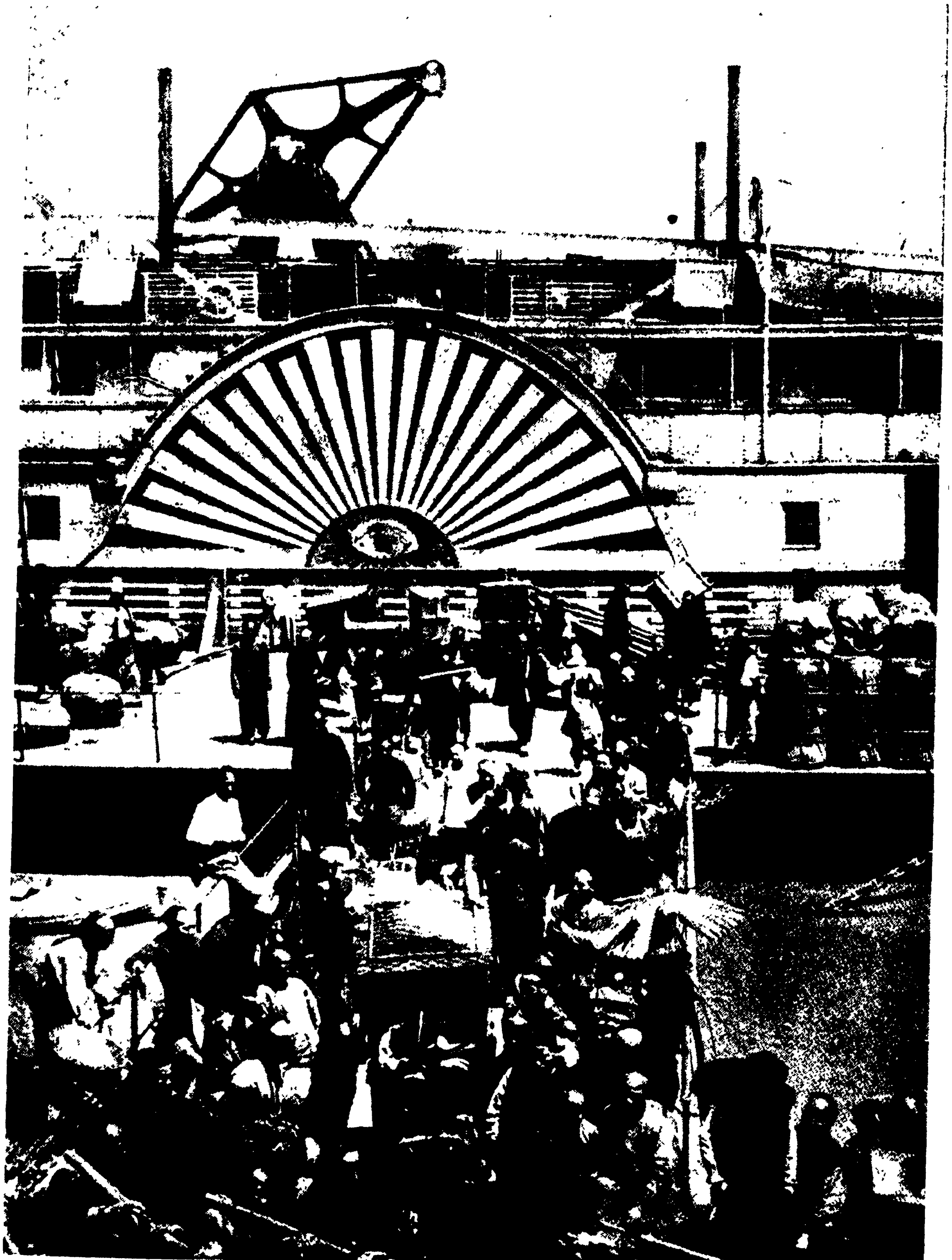


সাংহাই ঘোড়দৌড়-ক্ষেত্র

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সাংহাই সর্ব্বশক্তির বন্দর হিসাবে প্রথম যখন ঘোষিত হয়, তাহার এক বৎসর পরে তথায় বৈদেশিক শ্রমশিল্পের প্রচেষ্টার হিসাব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ২৩টি বৈদেশিক আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি বৈদেশিক শক্তির পতাকা তখন পররাষ্ট্র-ভবনের শীর্ষদেশে উড্ডীন হইতে দেখা গিয়াছিল। ব্যবসায়ি-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তখন মাত্র ১১টি এবং দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক তথায় গিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে তথায় ৬০ হাজার বৈদেশিক স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। ১৭টি বৈদেশিক শক্তির কথন ধীবর-পল্লী—অত্যুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। পাছে জাপানী জল-দস্যুরা পল্লী আক্রমণ করে, সেই জন্য সুদৃঢ় প্রাচীরের প্রয়োজন ছিল। চীন-জলদস্যুদিগের সহায়তায় জাপানী জল-দস্যুরা লুণ্ঠনের জন্য এই পল্লী আক্রমণ করিত। সে সময়ে জঙ্কযোগে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে অতি সামান্য-ভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। কিন্তু নব্বই বৎসরে ক্ষুদ্র ধীবর-পল্লী আজ পৃথিবীর বন্দরসমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা বিশেষ বিস্ময়কর নহে কি?

কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল? মানচিত্রের



সাংহাই নদের বক্ষে জল-যাত্রীদিগের দৃশ্য

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকে না। সাংহাই যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে চীনদেশে ইহা সর্ব্বপ্রধান বন্দরে পরিণত হওয়াই উচিত।

চীনের উপকূলভাগের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে সাংহাই অবস্থিত। সুতরাং এখানে প্রধান বন্দর স্থাপিত হওয়াতে চারিদিকে এই বন্দর হইতে মালপত্র প্রেরণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে এখান হইতে দ্রব্যাদি চালান দিবার এমন সুবিধা অন্যত্র বন্দর স্থাপিত হইলে কখনই ঘটিত না। বিশেষতঃ সমগ্র ইয়াংসি নদ যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, সাংহাই তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান হইতে এই নদের সর্ব্বত্র বাণিজ্য-উপকরণ প্রেরণ করার সুবিধাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই সুবিধাই সাংহাইকে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দরে পরিণত করিয়াছে।

ইয়াংসি নদ যে ভাবে নানা জনপদের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত, পৃথিবীতে অন্য কোনও নদ-নদীর অদৃষ্টে তেমন সুবিধা ঘটে নাই। এই একই নদের উপর দিয়া কত অসংখ্য লোকের বাণিজ্য-উপকরণ বাহিত হয়, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হইবে। প্রায় ২০ কোটি নর-নারীর এই একমাত্র নদ অবলম্বন। চীনের সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক ইয়াংসি জলপথেই তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ন্ত্রিত করে! চীনদেশের যে সকল অংশ বিশেষ উর্ব্বর, ইয়াংসি নদ তাহার শাখা-প্রশাখা এবং খনিত খালসমূহসহ সেই সকল অংশকে অভিষিক্ত করিয়া প্রবাহিত। ইয়াংসির শাখা, উপশাখা এবং খাল ব্যতীত সেই সকল স্থানে কোন জিনিষ প্রেরণ করিবার অন্য জলপথ নাই। উল্লিখিত স্থানসমূহে উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারও ঐ নদীর উপর দিয়াই অন্যত্র প্রেরিত হয়।



ঝুড়ি-বোঝাই শূকর বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত

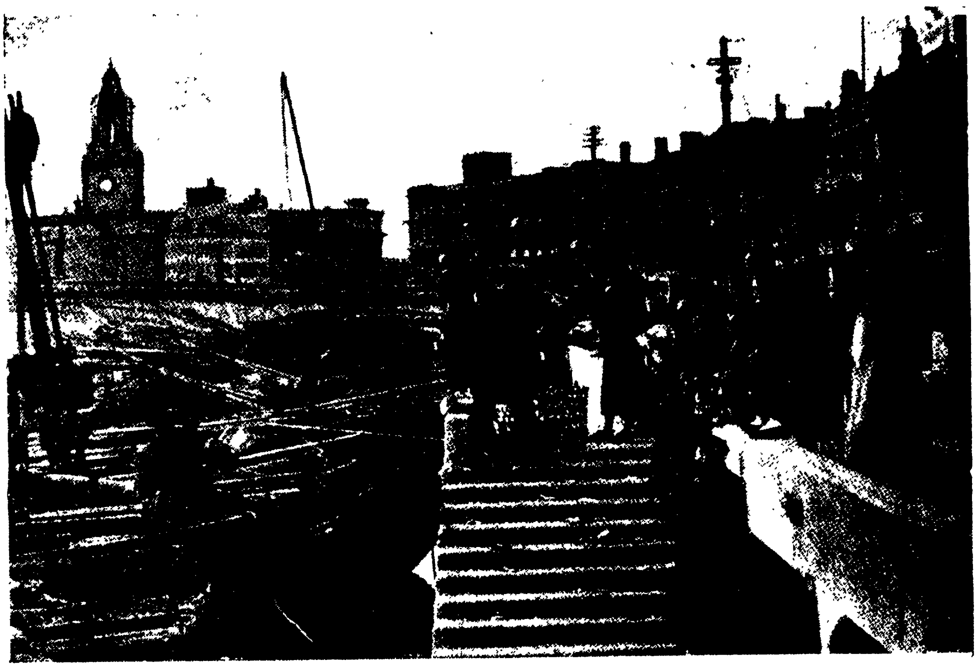
চীনের "ইয়াং-সি-কিয়াং বেসিন"ই সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান। এই ভূ-ভাগের জলবায়ুর অবস্থা উন্নত কৃষিজ-পণ্য উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। অনেক স্থানে মূল্যবান্ খনিজ ধাতু বিদ্যমান। সেই সকল স্থানের কোন কোন অংশে খনির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোথাও বা কার্য্যারম্ভের পরিকল্পনা চলিতেছে। অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই এই কার্য্য চলিতেছে।

ইহার সমতুল্য স্থান অত্যন্ত দুর্লভ। সমগ্র চীন দেশের

ইহা হৃদ্‌যন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বৈদেশিক ব্যবসাজাত দ্রব্যের শতকরা ৬০ অংশ এই স্থানেই বিক্রীত হইয়া থাকে, এ জন্য সাংহাই বন্দর এত দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, যাহাই কেন ঘটুক না, সাংহাইএর ব্যবসা-বাণিজ্য তদনুপাতেই আঁকাবাঁকা পথে চলিতে থাকে। পারদ-যন্ত্রের পারদের উত্থান-পতনের ন্যায় সাংহাইএর ব্যবসা-বাণিজ্যের জোয়ার-ভাটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

নদীর তটভাগের উভয় অংশেই তৈল-সরবরাহকারী গুদাম অবস্থিত।

সাংহাই নগরের অট্টালিকাগুলি ক্রমেই গগনচুম্বী হইয়া উঠিতেছে। স্থানের অভাব বশতঃই এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় ক্রমশঃ স্থানাভাবে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে না। কাষেই উপরের দিকে অট্টালিকাগুলি শির উন্নত করিয়া চলিয়াছে। ১০ হইতে ১৫ তলা অট্টালিকা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে।



বাঁধাকপির ঝুড়ি নামান হইতেছে

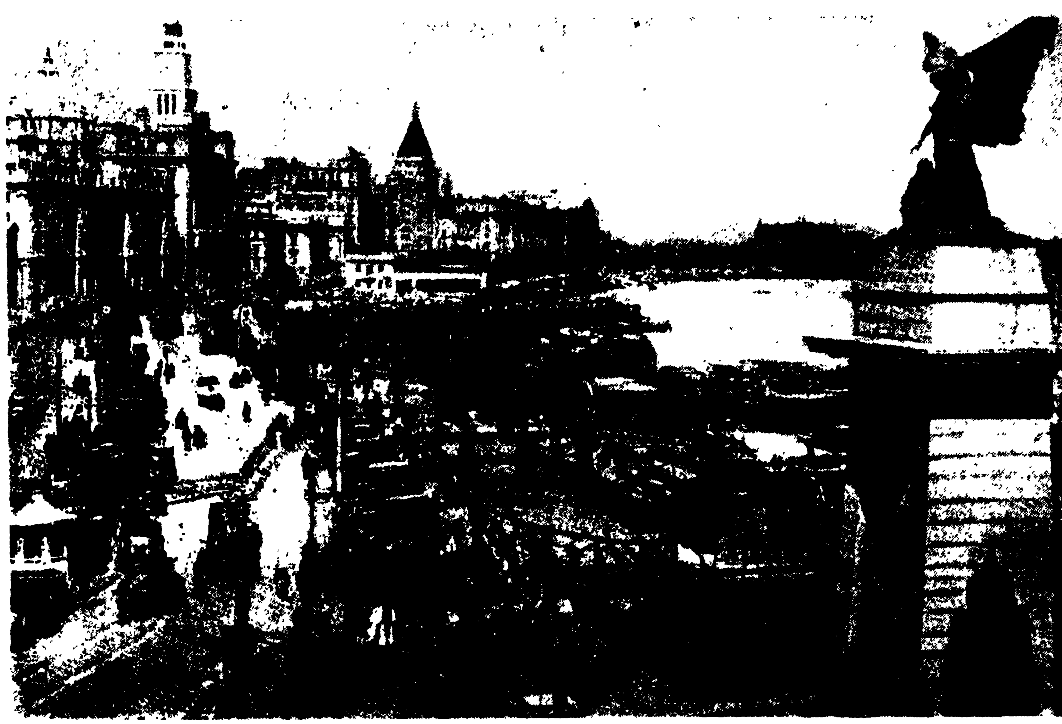
সাংহাই চীন দেশের সহর হইলেও, তাহাকে চীনা সহর বলা চলে না। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই সহরের উন্নতিবিধান করিয়াছে। চীনার সহিত বৈদেশিক ধাতু-প্রকৃতির সমবায়ে এই সহর গঠিত; এই প্রকাণ্ড সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পদার্পণ করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। ইয়াংসির কর্দ্দমাক্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া হোয়াংপুতে আসিয়া যখন সাংহাই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, কাহারও মনে হইবে না যে, চীনা বন্দরে প্রবেশ করা যাইতেছে। সেই সময় যদি ঝঙ্কগুলি দল বাঁধিয়া ষ্টীমারের সম্মুখে উপনীত না হয়, তাহা হইলে চীনা সহর বলিয়া অনুমান করিবার কোনই হেতু মনে উদিত হয় না।

সাংহাইএর আধুনিকতম অংশ হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে নগরের যে অংশ নেত্রপথে পতিত হইবে, তাহাতে পরিবর্ত্তনের বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বৈদেশিকগণের প্রথম আগমনকালে নগরের যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে।

সাংহাইএর দক্ষিণাংশে নান্‌টাং। এইখানে প্রাচীন চীনা উপনিবেশ বা দেশীয়গণের বাসস্থান। এই অংশে এখনও আধুনিকতার জয়যাত্রা শ্লথ গতিতে আসিতেছে। দেশীয়গণের জীবন-যাত্রা পূর্ব্বাপর একই ভাবে চলিয়াছে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, নগরের প্রাচীর ধ্বংস করা হইয়াছে। এই অংশে দীনবেশী ভিক্ষুকের সংখ্যা



চীনা নর-সুন্দর



বাঁধের দৃশ্য



ভূতপ্রেতের উপদ্রব নিবারণার্থ চীনাপুত্রের পৃষ্ঠদেশে মন্ত্রঃপূত বস্ত্রখণ্ড



চীনা সংবাদপত্র-বিক্রেতা



চীনা নৌকা হোয়াংএর তীব্র স্রোতে চলিয়াছে

হ্রাস পাইলেও, যাহা আছে, তাহা অল্প নহে। মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড ঘটায় বহু রোগের জন্মস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন তথায় অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেশীয়গণ নগরের যে সকল অংশে বসবাস করে, তথায় প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্ত্তে নূতনত্বের আমেজ অত্যন্ত মৃদুগতিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র, আঁকাবাঁকা পথ-গুলির স্থানে প্রশস্ত রাজপথের বিস্তার ঘটিতে বহু বিলম্ব আছে। বড় বড় আধুনিক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়াও দেশীয়রা তাহার অনুকরণের জন্য ব্যস্ত নহে।

আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশের উত্তরাংশে ঘনবসতিপূর্ণ চীনা পল্লী চাপেই অবস্থিত। সম্প্রতি চাপেই আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিয়াছিল। এইখানে চীনাদিগের আমদানী-রপ্তানীর বিরাট কেন্দ্র—চীনা ব্যবসাবাণিজ্য এইখানেই বিশেষ-ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয় কলকারখানা, ছাপা-খানা এইখানেই বিদ্যমান। চীন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক-প্রকাশ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান চাপেইতে অবস্থিত। চীনা "কমার্সিয়াল প্রেস" নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের মূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ ডলার মুদ্রা হইবে! সাংহাই রেল-ষ্টেশনও এই স্থানে বিদ্যমান।



উপনিবেশের শিখ পুলিস

কিন্তু তথাপি বৈদেশিক উপনিবেশই সাংহাই-এর গৌরব-কেন্দ্র। আধুনিক বন্দরটি যে এত বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার হেতু বৈদেশিক উপনিবেশের ব্যয়বহুলতা। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নানকিং সন্ধির সর্ত্তানুসারে সুচু-ক্রিকের দক্ষিণাংশে একখণ্ড ভূমি বৈদেশিক উপনিবেশের জন্য নির্দ্ধারিত হয়।

বৃটিশগণ ব্যবসায়বিষয়ে সুবিধা করিয়া লইবার জন্য তথায় অনেক অর্থ-ব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি রচনা করিয়া স্থানটিকে বাসযোগ্য করিয়া লইয়াছিল।

উহার ৬ বৎসর পরে ফরাসীরা বৃটিশ উপনিবেশের পাশে স্থান সংগ্রহ করিয়া লয়। তার পর মার্কিণগণ হংকিউ অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ উপনিবেশ বৃটিশ উপনিবেশের সহিত এক হইয়া যায়। এই ভাবে আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। ফরাসীরা কাহারও সহিত মিলিত না হইয়া তাহাদের উপনিবেশভাগ নিজেদের পরিচালনায় রাখিয়াছে।

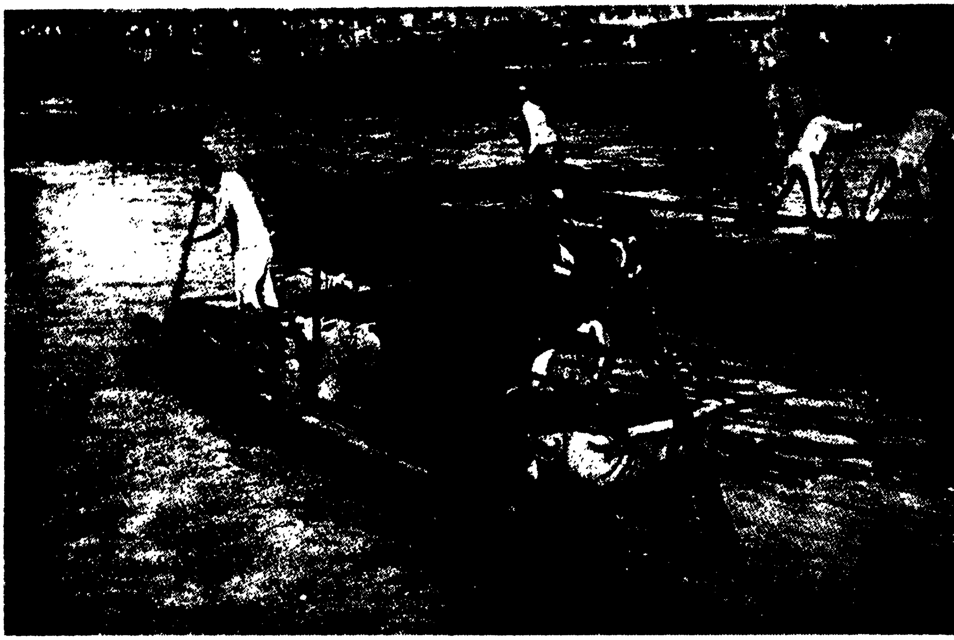
আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ খুব ভাল ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। ইহার মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ, মার্কিণ, জাপানী, চীনা প্রভৃতি জাতির করদাতাদিগের মধ্য হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ১৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য ১০ লক্ষ ৮ হাজার নাগরিকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়া থাকেন। ফরাসী উপনিবেশে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার নাগরিকের জন্য ১৭ জন সদস্য মিউনিসিপাল কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।



চীনা ব্যাণ্ড-বাদক

সাংহাই নিরুপদ্রব স্থান নহে বলিয়া ৪টি প্রধান বৈদেশিক শক্তি এখানে সৈন্য রাখিয়া নাগরিকগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এক দল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আছে। তাহাদের সংখ্যা ২ হাজার। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে টাইপিং বিদ্রোহের সময় উহা গঠিত হয়।

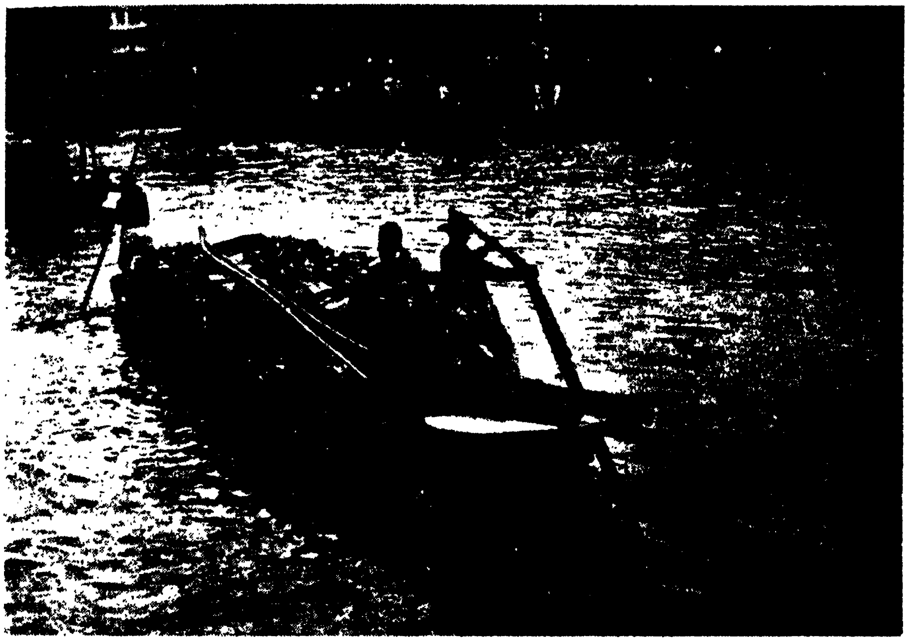
এই বন্দর-সীমায় ৫০টি বিভিন্ন জাতীয় লোক বসবাস করিতেছে। চীন দেশের নানা স্থানে যত প্রকার ভাষা



চীনা নৌকা-পরিচালন-পদ্ধতি



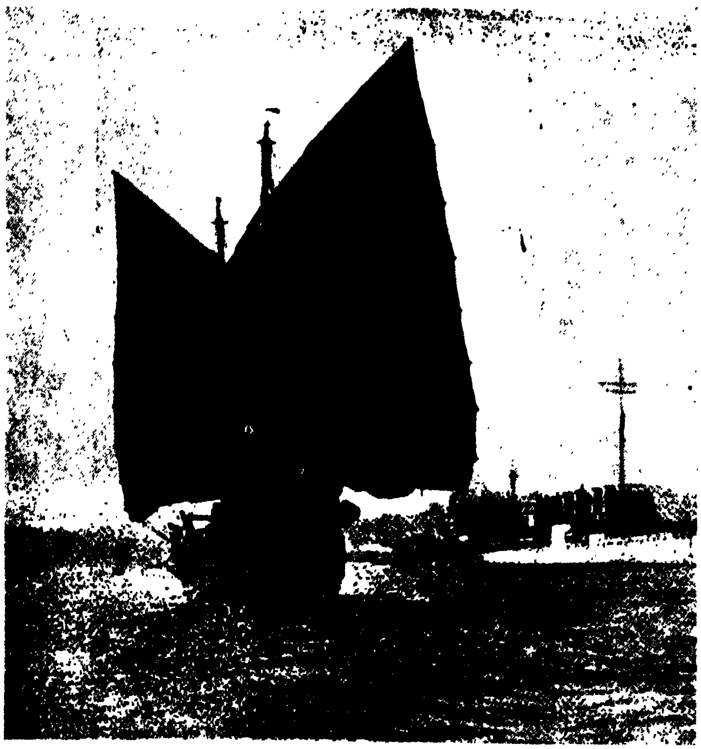
কুলীরা বোঝা টানিতেছে



প্রাচীনকালের নৌকা মাল বহন করিতেছে



সাংহাই বন্দরে মাল বোঝাই চীনা নৌকা



হোয়াংপু নদীবক্ষে চীনা জঙ্ক জাহাজ

ন্যায় ভারবহন করিয়া দলে দলে পথ অতিক্রম করিতেছে।

পথে চীনা বিবাহের শোভাযাত্রাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। শব-শোভাযাত্রাও দর্শনীয়। এই দুই বিষয়ে চীনারা দলে দলে যোগ দিয়া থাকে। যানবাহন ও পথচারী লোকের সংখ্যা এত অধিক যে, নূতন পথ নির্ম্মাণ না করিলে প্রায়ই পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে—যান ও মানুষের ভিড় সরাইতে অনেক সময় চলিয়া যায়।

ইংরাজ যে দেশে গিয়াছে, তথায় তাহাদের ক্রীড়ার প্রচলনও করিয়াছে। সাংহাইএ ঘোড়দৌড়-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদেরও অভাব নাই। সাংহাই ঘোড়দৌড় বিখ্যাত। ঘোড়-দৌড়ের দিনে অনেক ব্যাঙ্ক ও আফিস বন্ধ থাকে।

সাংহাই সহরে প্রমোদোদ্যানের অভাব নাই। সবাক্ চলচ্চিত্রালয়ে আধুনিক চিত্রগুলিও প্রদর্শিত হইতেছে। বড় বড় বহু হোটেল এই সহরে

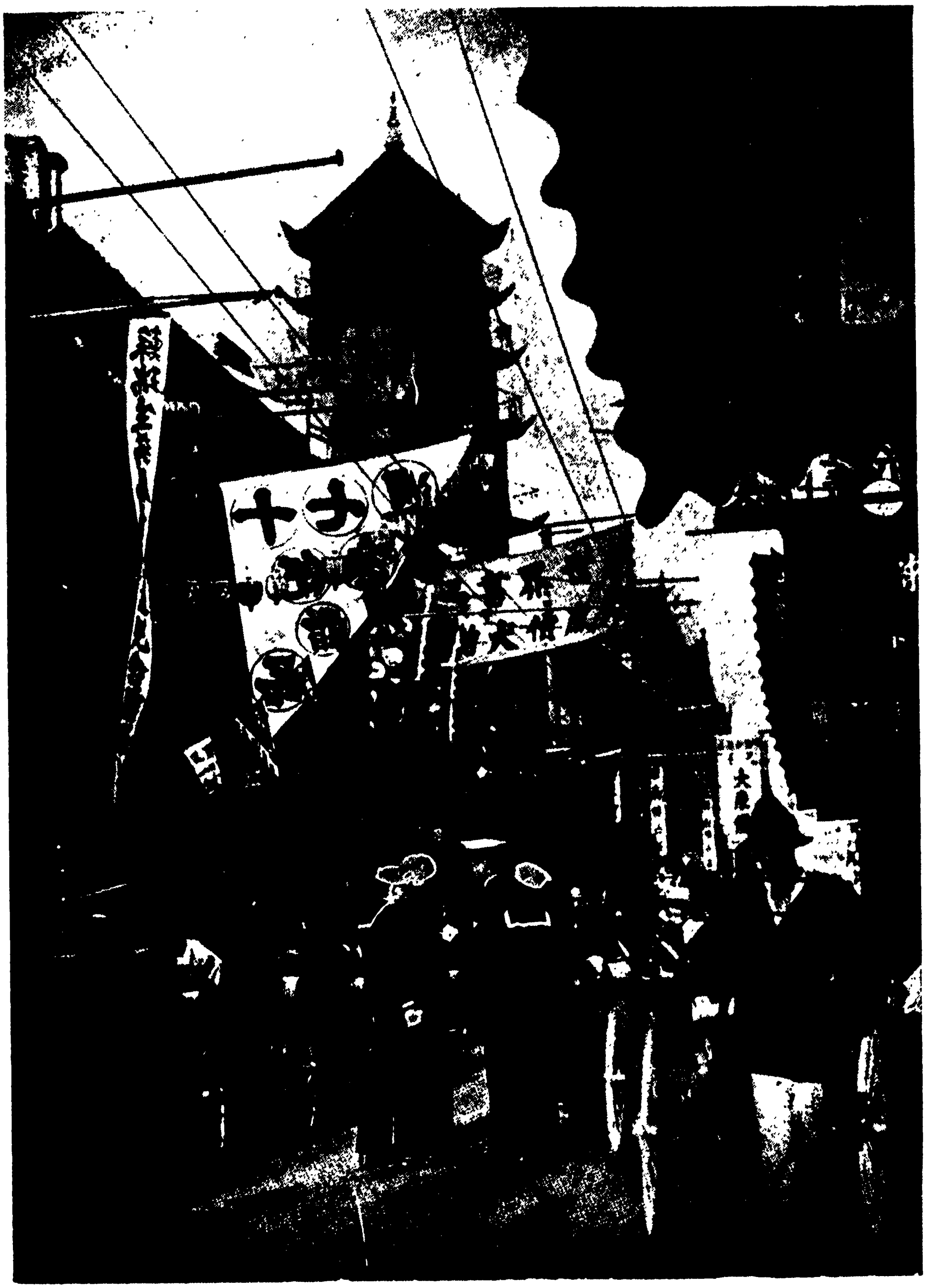
প্রচলিত আছে, সেই সকল ভাষাভাষী লোক এখানে বিদ্যমান।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রথম যুগে নিংপু প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল সাংহাই বন্দরের প্রতিপত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিংপুর খ্যাতি নামিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ সাংহাইএর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিংপু ত্যাগ করিয়াছে।

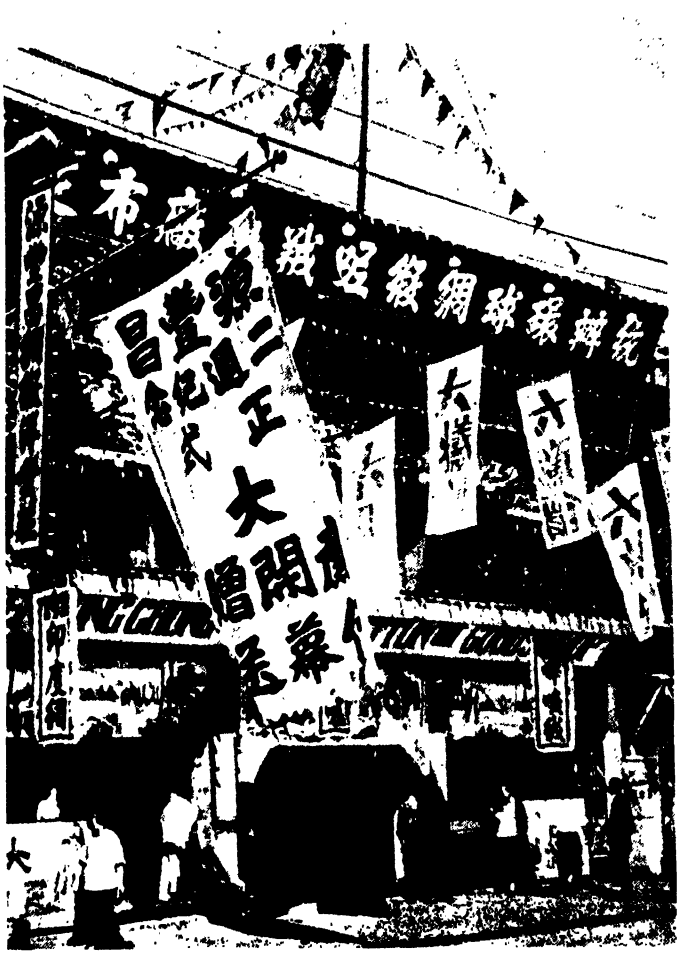
বাঁধের উপর দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, দীর্ঘাকার শ্মশ্রুল শিখ ট্রাফিক পুলিস যানবাহন নিয়ন্ত্রণকার্য্যে নিযুক্ত। বিদ্যুৎ-চালিত ট্রামগাড়ী, যাত্রিপূর্ণ বাস-গাড়ী, মোটর, ট্রাক্ অবিশ্রান্ত-গতিতে চলিয়াছে। কুলীরা পশুর



মার্কিণ সৈনিক চীনা শিশুকে আদর করিতেছে



কু চু রাজপথে চীনা দোকান



চীনা দোকানে বিজ্ঞাপনের বহর

পথ ছাড়িয়া জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, অসংখ্য চীনা নৌকায় চীনারা ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিতেছে। অনেক নৌকা মাল লইয়া নদীপথে চলিয়াছে।

হোয়াংপু পথে ৩৫ লক্ষ টন মাল জাহাজ-বোঝাই হইয়া যাতায়াত করে। শত শত জঙ্ক নদীর বুকের উপর দিয়া মাল বহন করিতে থাকে। বন্দরে ১ শত ৫৬খানা সদাগরী জাহাজ অবস্থান করিতে পারে। ইহা ছাড়া ২২ খানি রণপোত এবং বহুসংখ্যক অন্যান্য পোতও বন্দরে রাখিবার স্থান আছে।

সাংহাই ও হাংচাউএর মধ্যে একটি রেলপথ আছে। সাংহাই ও মাঞ্চুরিয়ায় সম্প্রতি যে গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে সাংহাই হইতে প্যারিস বা মস্কৌএ পৌছিতে ১৫।১৬ দিন লাগিত। সাংহাই হইতে ১৬ দিনে যে কোনও য়ুরোপীয় রাজধানীতে ডাক পৌছিবার ব্যবস্থা এখন হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ডাকঘরের বিলোপসাধন ঘটিয়াছে। চীনা ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইদানীং সকল দেশের চিঠিপত্র বিলি করিবার বা গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বিদ্যমান। ইহা ছাড়া চীনা রেস্তোরাঁও অসংখ্য আছে। পথের নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারকরা ধর্ম্মকথা প্রচার করিয়া থাকে।

বড় বড় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভিক্ষুকের অভাবও এ দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই পথে বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে!

সাংহাই দিনদিন উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হইতেছে। যে রকম অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরকালে সাংহাই আরও উন্নতি লাভ করিবে। চীনারা যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় ক্রমশই পরিস্ফুট হইতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

গত ১৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিগণ গোঘাটে জুবিলি ব্রিজ হইতে ভোর ৬টার সময় সন্তরণ করিতে আরম্ভ করেন। সংখ্যায় তাঁহারা ১১ জন ছিলেন, এক জন যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

প্রতিযোগিগণের মধ্যে ৭ জন দীর্ঘ ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কুমারটুলী ঘাট পর্য্যন্ত পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বসুমতী আফিসের কর্ম্মচারী আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য শ্রীমান্ সুধীরকুমার ঘোষ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কুমারটুলী ঘাটে পৌছিতে তাঁহার ১১টা ৩৬ মিনিট হইয়াছিল। তাঁহার নিম্নেই ছিলেন খিদিরপুর সুইমিং এণ্ড রোয়িং ক্লাবের সদস্য নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, তিনি পৌছিয়াছিলেন ১১টা ৪০ মিনিটে।

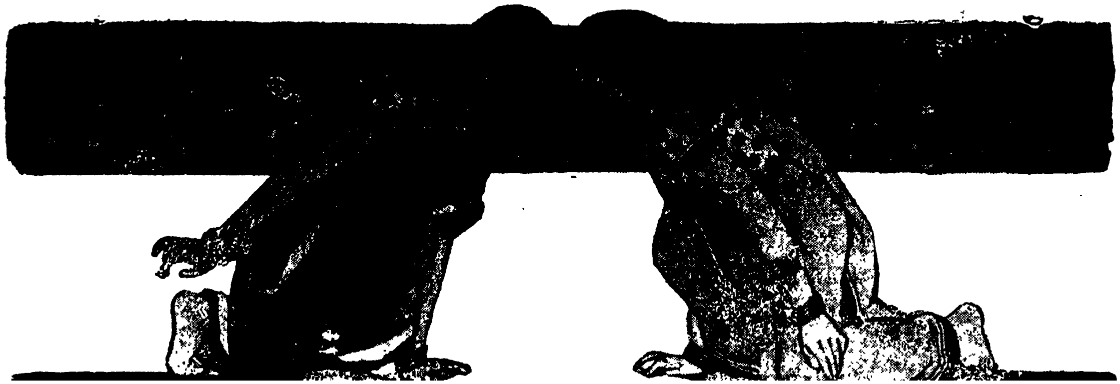
সুধীর ও নৃপেন্দ্রের মধ্যে নদীবক্ষে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। প্রায় ৮।১০ মাইল উভয়ে সমান বেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তৃতীয় স্থানের অধিকারী শ্মশানেশ্বর সুইমিং ক্লাবের সুশীলকুমার নাথও বহুক্ষণ প্রথম ও দ্বিতীয়ের সহিত সন্তরণে সমান স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে সুধীরকুমার সকলকে পরাস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হন। তিনি গত বারও এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।



শ্রীযুত সুধীরকুমার ঘোষ

এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখিতে গঙ্গার উভয় তটে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল। সকলেই হর্ষভরে সন্তরণকারীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালী ক্রমশঃ এই প্রকৃতির পুরুষোচিত ব্যায়ামে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আধুনিক জীবন-সংগ্রামের যুগে বাঙ্গালীর ছেলেকে যে ঘরের মধ্যে পুতু পুতু করিয়া রাখিলে জাতির উন্নতি সম্ভবপর হইবে না, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এজন্য এই সকল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ক্রমশঃ বাঙ্গালী তরুণদের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করা যায়।

সুধীরকুমার বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছেন, এজন্য আমরা আনন্দিত এবং পাঠকবর্গকে সেই আনন্দ পরিবেষণ করিতেছি।



স্পর্শের প্রভাব

১৬

"তার পর ?" কালীনাথ জিজ্ঞাসুনেত্রে গুপীনাথের দিকে তাকাইয়া রহিল। রণেন্দ্রের শ্যামপুকুরের বাসার বসিবার কক্ষে কথা হইতেছিল।

গুপীনাথ টেবলের উপরে অবস্থিত বোতল হইতে গেলাসে সরস রক্ত মদিরা ঢালিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "তার পর আর কি ? কাশীর আটঘাট ঠিক ক'রে ফেলেছি—বাছাধনের সে দিকে আর চালাকিটি চলবে না। গুপীনাথ যে কাযে হাত দিয়েছে"—

কালীনাথ এবার গুপীনাথের হাতের গেলাস ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, না, আর খায় না, যথেষ্ট হয়েছে। কাশীর ব্যাপার সবই কি সামলে নেওয়া গেল, আর এ দিকে ? ছোঁড়াটা—তারকটা ? সেটা কি এখনও তার বৌদির অপমানে—বংশের অপমানে হন্যে কুকুর হয়ে তার সন্ধানে ঘুরছে ?"

গুপীনাথ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "টাকা ছাড়ো বাবা—টাকা ছাড়ো। আর কেবল মুখের কথায় গুপে গুণ্ডা ভিজছে না। সেই বাবা, সেই বাবা ছুঁড়ীটাকে নিয়ে কাশী স'রে পড়বার আগে যা ঝেড়েছিলে কিছু"—

কালীনাথ পুনরায় বাধা দিয়া বলিল, "বটে রে নেমক-হারাম ? তার পর তারকা ছোড়াকে লেলিয়ে দেবার আগে কাশীর কংগ্রেসে চর পাঠাবার সময় ?"

গুপীনাথ মুখভঙ্গী সহকারে বলিল, "বাঃ বাঃ, সে সব ত বখরা হয়েই গেল, শর্ম্মা পেলেন কি বাবা বল ত ? ও সব হবে না, নগদ পাঁচশোখানি ঝাড় ত এতে আছি, নইলে—উঃ, তারকা ছোঁড়াকে বাগ মানাতে যা ফিকির করতে হয়েছিলো ! না বাবা, পাঁচশোতেও শানাবে না"—

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন গেলাস রাখ দিকি, সন্ধ্যে থেকেই ত গিলছিস"—

"কৈ বাবা, সবে ত আধ বোতল দিয়েছ, এতেই বদনাম ?"

"আচ্ছা রে বেটাচ্ছেলে, যত চাস্ পাবি, আগে আসল কাযটা হাঁসিল কর দিকি।"

গুপীনাথ হঠাৎ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "রোখো, রোখো, একবারে অত কথা না, সব গুলিয়ে দিচ্ছ, বাবা। কি কি করতে হবে, সাফ ব'লে যাও দিকি, শম্মা কিছুতে পেছুপা হবে না।" গুপীনাথ দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া বলিল, "শালা, পাড়ার মধ্যে দশ জনের সামনে অপমান করেছে—গুপে গুণ্ডা তা ভুলবে ? মনেও ভেবো না তা। হুঁ !"

কালীনাথ এইবার নিজেই মদের গেলাস আগাইয়া দিয়া বলিল, "তারকটা কি কাশীর সন্ধান পেয়েছে ?"

"কোথায় ? তা কি জানতে দিয়েছি। সে জানে, রণেন ব্যাটা তার বৌদিকে নিয়ে হিল্লী-দিল্লী হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! কিন্তু এবার সন্ধান দিতেই হবে বাবা, না হ'লে চলছে না, বেটা সন্ধানের জন্যে সত্যিই এবার ক্ষেপে উঠেছে"—

"না, না, বলি শোন না। ওসব গোঁয়ারতুমি চালের চেয়ে বুদ্ধির মার-পেঁচ খেলে দেখদিকি, বেটাকে ঘাল করতে কতক্ষণ ?"—

হঠাৎ গুপীনাথ মদের ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "আচ্ছা বাবু, ও শালার ওপর তোমার এত আখোচ কেন বল দিকি? এ দিকে ত বল তোমার ভাই।"

কালীনাথের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "যা, যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমার কি? আমি আজ আছি, কাল নেই। বলেছি ত, বুড়োর জন্যেই সব করা যাচ্ছে—বুড়োদের কি কম শাস্তি দিয়েছে। আহা, বুড়োর মেয়েটা!"

"তা যা বল বাবু, ও মেয়েটাকে দেখলে কি জানি কেন বুকখানা কেঁপে ওঠে। তোমার সঙ্গে যা দুচারবার ওদের গাঁয়ে গিয়েছি, তাতে ওকে দেখে—এত বড় দুর্দ্দান্ত যে গুপে গুণ্ডা, তারও মুখ দিয়ে রা সরে নি।"

"নে, নে বেটা, তোর সবই বাড়াবাড়ি। গলা টিপলে দুধ বেরোয়, সেদিনকার মেয়ে—তবে যা বলেছিস, ওর বাপটা এমন ভাল লোক, ওটা কিন্তু ভিন্ন রকমের, গুমরে মটমট করছে যেন! তা হোক গে, ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? হচ্ছে বুড়োকে নিয়ে কথা। আহা, মা-মরা মেয়ে—জামাইটা বয়ে যাচ্ছে, মেয়েটা ভেসে ভেসে বেড়াবে। দেখ, চেষ্টা ক'রে যদি ভন্দ-মন্দ ক'রে ছোঁড়াটাকে ফিরাতে পারা যায়—তা হ'লে বুড়োর ঘরটা বজায় থাকে।"

গুপীনাথ হঠাৎ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বটে! ও শালা জাহান্নামে যাক না কেন, আমার কি বয়ে গেল তাতে? ও সবে আমি নেই। শালাকে জেল খাটাবো, তবে ছাড়বো। গোড়ায় সর্ত্ত ক'রে এখন পেছুনো, বাবা? দাও বাবা মজুরী ফেলে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই, আর ওতে থাকছি নি, বাবা।"

কালীনাথ এবার এক গেলাস ঢালিয়া বলিল, "আহা, ছেলেমানষি করিস কেন বল দিকি? নে ধর, এই নোটের তাড়া। মোদ্দা তারকা ছোঁড়াটাকে শীগ্‌গির কাশীর সন্ধান দিস নি—কি জানি, যদি রাগের মাথায় খুন-খারাপি ক'রে বসে!"

গুপীনাথ নোটের তাড়া বাগাইয়া লইয়া গণিয়া দেখিল, তাহার পর গুম্ফে হাত বুলাইয়া কহিল, "পড় বাবা আত্মারাম! কত কেরামতই জান রে বাবা, কত কেরামতই জান। সেই ভয়ে ত ঘুম হচ্ছে না তোমার! বল বাবা, কি মতলব ঠাওরেছ নতুন?"

কালীনাথ বিস্মিত হইবার ভাব দেখাইয়া বলিল, "মতলব? আমি? সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, বাবা! ছোঁড়াটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে—বিষয়টা যাতে রক্ষা হয়, তারই জন্যে।"

গুপীনাথ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গুপে গুণ্ডাকে হাত করেছ? যাক গে বাবা, কে থাকে রাজারাজড়ার কথায়—আমার পাওনা গণ্ডা যা হয় বাবা, মিটিয়ে দেও—বস্!"

কালীনাথ হঠাৎ বলিল, "চুপ! সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি। ঐ ভবেশ বেটা বুঝি! মার চেয়ে আপনার জন, তাকে বলি ডান। যা, যা, বারান্দার ও-পাশ দিয়ে বাঁকা সিঁড়িটে দিয়ে স'রে পড়, যেন না দেখতে পায়।"

আগন্তুক ততক্ষণ কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়াছে। তাহার মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মিপাত হইবামাত্র কালীনাথ চমকিত হইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুক ইত্যবসরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া নীরবে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সে রণেন্দ্রনাথ। কালীনাথ তাহাকে অতিমাত্র পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন দেখিল।

কালীনাথ মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আরে, রণেন যে, তুমি কোত্থেকে হে? কাশী থেকে রওনা হয়েছ কবে, কৈ, কিছুই জানাও নি ত!"

রণেন্দ্র ক্ষীণ অবসন্ন বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "না, জানান হয় নি।"

ভাবগতি দেখিয়া সামলাইয়া লইয়া কালীনাথ বলিল, "ইস! মুখ-চোখ যে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, চুল রুক্ষ,—ব্যাপারখানা কি? খাওয়া-দাওয়া হয় নি না কি, রাতে ঘুমোও নি না কি?"

রণেন্দ্র কেবল একটি ছোট 'হুঁ' দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া টেবলের উপর মাথা রাখিল।

কালীনাথ সত্যই এবার শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "সত্যি কি হয়েছে, রণেন? তুমি ত সহজে এমন হও না। চান করবে? আমি বলি, আগে এক কাপ চা—"

হস্তসঙ্কেতে নিষেধ করিয়া রণেন্দ্র তদবস্থায় থাকিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই।"

"একটু সরবৎ? তাও না? ওহো হো, তৈরীই ত রয়েছে, খুব ঠাণ্ডা—এটা বিয়ারের পক্ষ—খেয়ে ফেল দিকি ঢক ক'রে এক গেলাস—একে মদ বলে না, অথচ শরীরটাও জুড়িয়ে যাবে'খন।" কালীনাথ রণেন্দ্রের হস্তে সুরাপাত্র দিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বড় সুদিং এফেক্ট এর—ওতে নেশাও হয় না, অথচ সব অবসাদ কষ্ট দূর হয়ে যায়, আমরা প্রায়ই ত খাই"—

রণেন্দ্র যন্ত্রচালিতবৎ আধারের পানীয় গলাধঃকরণ করিল। মুহূর্ত্তকাল মুখ বিকৃত করিয়া সে পূর্ব্ববৎ আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল, "আর এক গ্লাস, কালীদা! বরফটা বেশী ক'রে দিয়ো।"

কালীনাথ আগ্রহভরে গ্লাস তুলিয়া দিল, রণেন্দ্র নিমিষে তাহা মুখে ঢালিয়া দিল। এবার আর সে মাথা গুঁজিল না, তাহার অবসাদের ভারটা যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হইল, নয়ন হইতে একটা তীব্র জ্যোতি নির্গত হইল, সে আনন্দ-ভরে বলিল, "বাঃ বাঃ কালীদা—ভারী সুন্দর ত! দাও, দাও।" সে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিল। এই ভাবে আরও দুই একবার চলিল।

ইত্যবসরে কালীনাথের আদেশে কিছু আহার্য্যও আনীত হইল। রণেন্দ্রের তখন আর আহারের আপত্তি ছিল না। স্নিগ্ধ বাতাসে তখন তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অপ্রত্যাশিত স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। সে উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মনের আনন্দে একটা অভ্যস্ত গানের সুর ভাঁজিতেছিল।

আহার্য্য মুখে দিয়া সে বলিল, "কালীদা, মন্তর জান তুমি নিশ্চয়। আঃ, প্রাণটা বাঁচালে তুমি! দাও, দাও,—ঐ সরবৎ এক গেলাস।"

কালীনাথ এক গাল হাসিয়া বলিল, "কি আর আমি করতে পারলুম তোর বল্! বাপ-পিতামহের জমীদারীটা, তাও দেখলিনি, কেবল হো-হো-টো-টো ক'রে"—

রণেন্দ্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আঃ! আবার কি কথা নিয়ে এসে ফেল্‌লে—ও সব ত তোমার উপর ভার দেওয়াই রয়েছে, কালীদা। নাও, তুমি এ গেলাসটা খাও।"

কালীনাথ গেলাসটি হাতে লইয়া সোডা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "সে ত তুমি ব'লে খালাস, কিন্তু কাযের সময় আমায় মানে কে? এ সব কাযে মুখের হুকুমে ত ফল হয় না, ভাই।" কালীনাথ স্বয়ং গেলাস নিঃশেষ করিয়া রণেন্দ্রের হস্তে পুনরায় পূর্ণ পাত্র প্রদান করিল।

রণেন্দ্র সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আরে বাস রে, এই কথা? কি চাই তোমার বল না, কালীদা, সব তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। ওঃ, কি আরাম!"

কালীনাথ টানার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া টেবলের উপর পাতিয়া বলিল, "দাও দিকি একটা সই ক'রে। ভাবছ আমার নামে দান-পত্তোর? তোমার কালীদা তেমন হ'লে এতদিন অনেক কিছু করতে পারতো, ওটা আমমোক্তারনামা—এতে—আমায় ক্ষমতা না দিলে তোমারই লোকজন মানে না—কায করবো কোত্থেকে?"

রণেন্দ্র বলিল, "দাও"। কাগজে সে কম্পিত হস্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনরূপে সহি করিল। সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তাহা হইলে সে সময়ে সে কালীনাথের মুখে যুগপৎ আনন্দ, তৃপ্তি ও হিংসা-ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইত। যতক্ষণ সহি চলিল, ততক্ষণ কালীনাথের হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ বোধ হয় কালীনাথ স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছিল!

কলমটা রণেন্দ্রের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, রণেন্দ্র যেন তন্দ্রাঘোরে টেবলের উপর এলাইয়া পড়িল। কালীনাথ তৎক্ষণাৎ ভৃত্য-পরিজনকে আহ্বান করিয়া রণেন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া সোফার উপর শয়ন করাইয়া দিল, তাহার হিংসা-পরিপূরিত কুটিল দৃষ্টি তখনও রণেন্দ্রকে অনুসরণ করিতেছিল।

বুভুক্ষু বহুদিন পরে সম্মুখে আহার্য্য দেখিলে যেরূপ ভাবে সেই দিকে অপলক-নেত্রে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, কালীনাথ কিছুক্ষণ সহি-করা মোক্তারনামাখানা ঠিক সেই ভাবে দেখিতে লাগিল। তৃপ্তি আর হয় না! একবার এদিক, আরবার ওদিক করিয়া, নানারূপে নাড়িয়া চাড়িয়া সে সহিটি পরীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কক্ষে সে ও রণেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

পরীক্ষা সাঙ্গ হইলে তাহার মুখমণ্ডল বিদ্যুতের আলোকে বিদ্যুতেরই মত হাসিয়া উঠিল। এ আনন্দ অংশ করিয়া ভোগ করিবার এখানে কেহ নাই, ইহাই তাহার সুখ!

একটা লোক রাজপথ দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে গাহিয়া যাইতেছিল,—"মন তোর এ ভ্রম গেল না"—রণেন্দ্র তন্দ্রা-জড়িত স্বরে বলিল, "ভ্রম ? ভ্রম, না সত্যি ? ও কে গেল, কালীদা ?"

কালীনাথ বলিল, "ঘুমো, ঘুমো, মিছে বকে না।"

রণেন্দ্র সোফায় হঠাৎ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বলিল, "বলবে না কে গেল ? বেশ, বয়েই গেল !" রণেন্দ্র আবার শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটি হেঁচকী উঠিল।

কালীনাথ ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বলিল, "কি মিছিমিছি জ্বালাতন করছ ? বলছি ত চুপচাপ শুয়ে থাক, কাল তখন কথা হবে।"

কালীনাথ বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারপ্রান্ত হইতে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে স্পষ্ট শুনিল, যাহাকে সে সংজ্ঞাহীন বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে বলিতেছে,—"গুপে গুণ্ডা—আমার এখানে কেন ?"

কালীনাথ স্তম্ভিত হইয়া দ্বারপথে দাঁড়াইয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

বিরহে

হাসতে তো তুই বলিস্ সখি
আমায় অনুক্ষণ,

কেমনে হায় ফুটবে হাসি
হৃদয় আমার উপবাসী
বিনে বঁধুর অধর-সুধা
মধুর আলিঙ্গন।

রঙ্গরসে লাগছে না মন,
সঙ্গে নিয়ে গেছে সে জন
আমার যত সুখ হাসি
রঙ্গ-আলাপন।

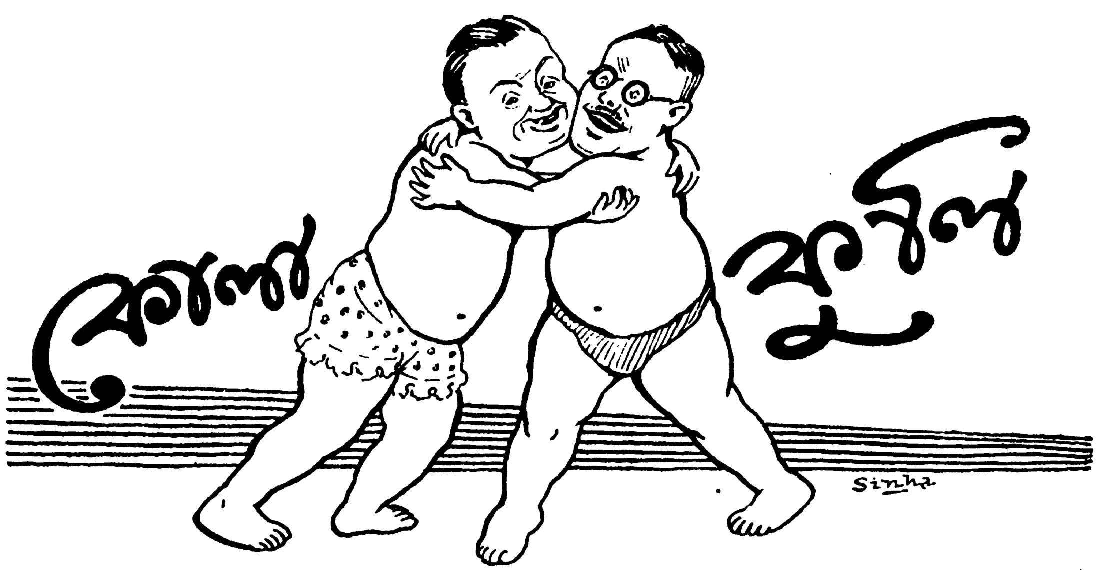
বাঁধব না চুল—যা তুই ফিরে
জ্বালাস না আর অভাগীরে,
আল্‌তা-টিপের কৌটা জলে
দে গে বিসর্জ্জন।

সাঁঝের রবি ঐ ডুবে যায়—
সন্ধ্যা-আঁধার নামছে ধরায়,
বুক যে আমার কেমন করে
আস্‌ল কু-লগন।

কি হবে ভাই প্রদীপ জ্বালি ?
ঘুচবে না তায় মনের কালি,
আঁধার ঘরেই তাহার ধ্যানে
রইব নিমগন।

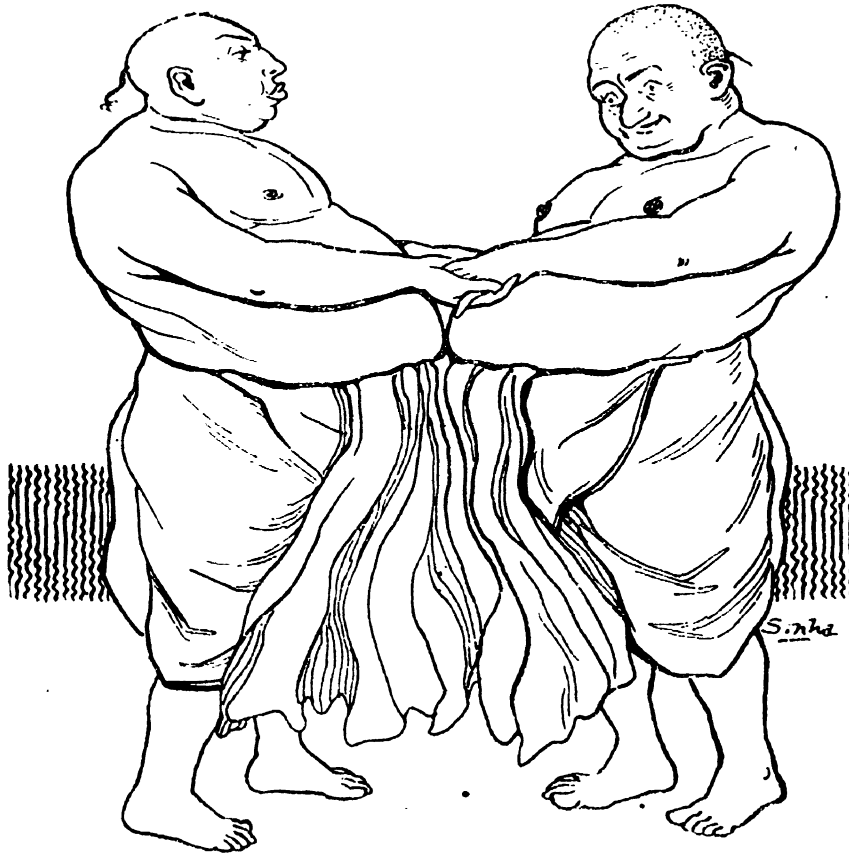
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কোলাকুলি



মনের মিলেই কোলাকুলির হলো প্রথম সৃষ্টি !
এখন শুষ্ক প্রথার দাস্য—কাষ্ঠ-হাসির বৃষ্টি !

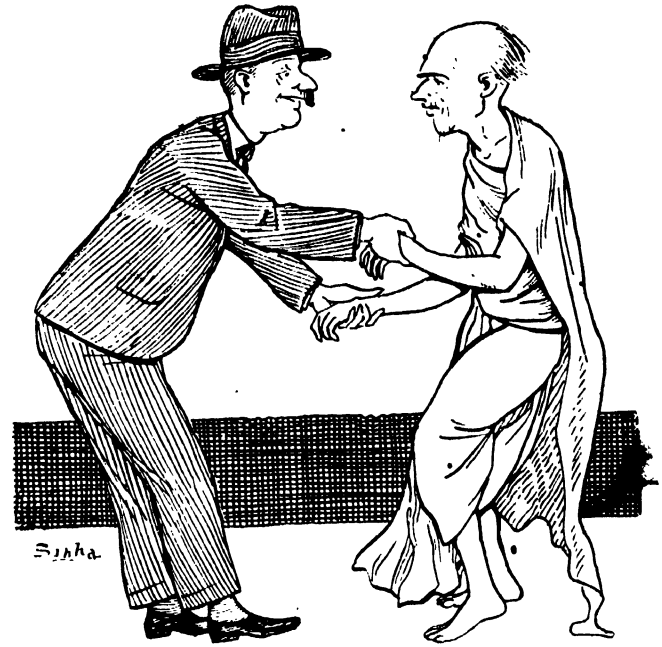
মন বলচেন, মারো ডাণ্ডস্, গাট্টা লাগাও কষে !
মুখ বলচেন, মিষ্টি-মুখটা করা চাই বে ব'সে !



ফুট্‌পাথেতে ঠাঁই নাই আর গতিবিধি বন্ধ।
দুই ভুঁড়িতে কোলাকুলি—দেখে কে আনন্দ॥



টুলে উঠেও বন্ধু না পায় গরাণ-খুঁটির থাই।
গরাণ-খুঁটি বাবু কোঙা হয়ে পড়ছেন ভাই॥



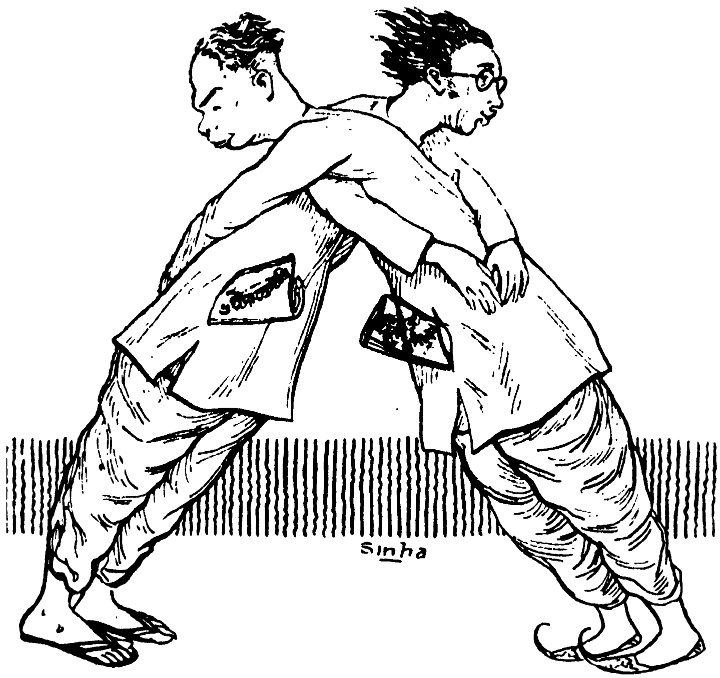
চিঁড়ে-চ্যাপ্টা চটরাজ কহে চট্টোপাধ্যায়কে
'টেক কেয়ার প্লিজ হামরা সুট্‌ বাঁচায়কে'



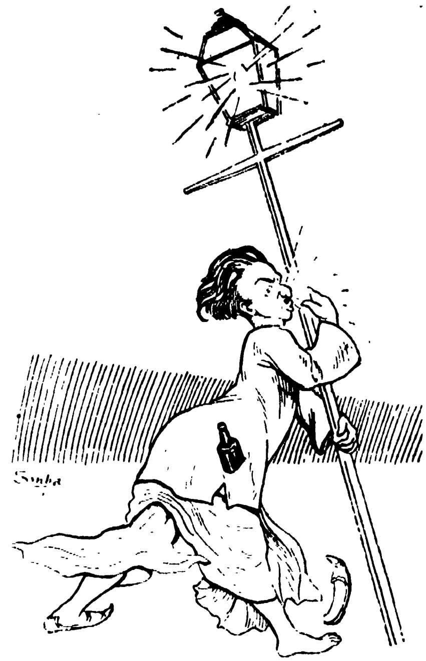
আলিঙ্গনের তরে হেসে এগোয় স্থূলকায়।
দোহাই ভায়া, আস্তে সারো ক্ষীণজীবী কয় তায়॥



নিত্য মামলা-মকর্দ্দমায় বন্ধ মুখের বুলি—
পিছন থেকে দু'সন্নিকে করেন কোলাকুলি।



পঙ্কে পড়ে অঙ্কুরেতে উঠচে যা'রা পচি'।
নতুন ঢঙে পড়ল হেলে কাচা এবং কচি ॥



জাপ্‌টে ধ'রে গ্যাস-পোষ্ট বল্লে সুরপতি :
'শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কেন, একি রে তোর মতি'!

সত্যের গান

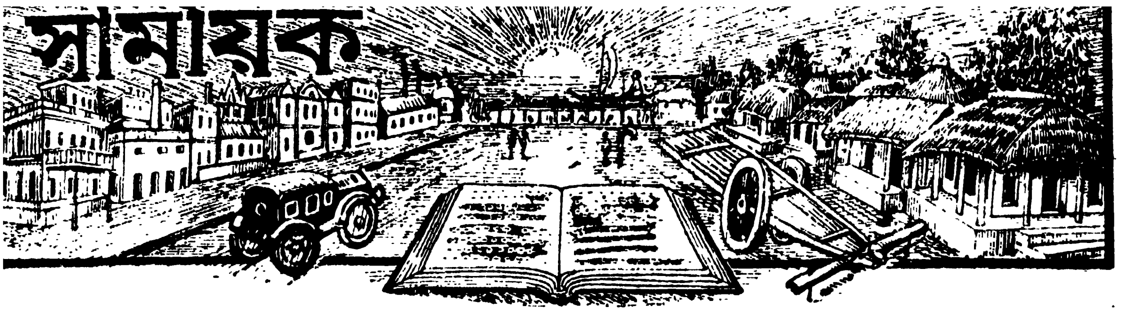
গাহি সত্যের গান,
দৈত্যের সাথে যুগে যুগে যার দুর্জ্জয় অভিযান,
পদতলে যার হাসে রাঙ্গা মাটী,—রক্তিম শতদল,
মস্তকে যার বিজয়-মুকুট মুক্ত গগনতল,
সম্মুখে যার হাসে রাঙ্গা রবি শান্তির শশধর,
পুলকে সিন্ধু পশ্চাতে যার বিস্তারে কলেবর,

গাহি তার জয়গান,
খর্ব্ব করিল মহাভারতে যে কৌরব অভিমান;
তমসা-পুলিনে দস্যু কবির বীণা গাহে যার গুণ
বেদীতলে যার নিখিল বিশ্ব ঢেলে দেয় তাজা খুন,
রুষ, আমেরিকা, রোম্, গ্রীক, প্যারী বন্দিল পদ যার,
মিসর জাপান দিল গলে যার রক্ত-কুসুম-হার,

গাহি আজি তার গান,
যাহার পরশে শুষ্ক মরুর পুষ্পিত হয় প্রাণ,
লৌহের মত হৃদয় যাহার, পাষাণের মত বুক,
চাহনি যাহার বহ্নির মত, সরস সৌম্য মুখ,
ঝঞ্ঝা তড়িৎ বজ্র ব্যসনে উন্নত যার শির
সিংহেরে দলি' পথ চলে যে গো ধন্য সে মহাবীর,

গাহি সে বীরের গান,
মঙ্গল করে দিই গলে তার বিজয়-মাল্য দান ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।



চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ জেলার একটি বালক কতকগুলি লাল পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছিল বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই অপরাধে তাহার পিতা এবং পিতৃব্যও দণ্ডিত হইয়াছেন। পিতা ও পিতৃব্য সরকারী আদালতের আমলা ছিলেন বটে, কিন্তু উভয়ে এক স্থানে থাকিতেন না বা এক পরিবারভুক্ত ছিলেন না, বরং উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। পিতার না হয় পুত্রের অপরাধে দণ্ড হইতে পারে, কেন না, বর্ত্তমান অর্ডিনান্স আইনের মহিমায় উহা সম্ভব হইতেছে, কিন্তু পিতৃব্যের কি অপরাধ হইয়াছিল? ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরকে পার্লামেন্টে অর্ডিনান্স-মহিমার বিরুদ্ধে চাপাচাপি করিয়া ধরিলে তিনি injured innocence-এর ভাব ধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন,—"আপনারা উদ্বিগ্ন হইবেন না, উহাতে আইনভীরু শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের কোন ভয় নাই। যতদূর সম্ভব সুবিবেচনার সহিত উহা ব্যবহার করা হইতেছে।" যদি এই ভাবের কৈফিয়ৎ জগতের দরবারে এবং বৃটিশ জনসাধারণের সকাশে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে এ কথা তুলিবারই প্রয়োজন হইত না। বর্ত্তমান ঘটনায় ভ্রাতুস্পুত্রের অপরাধে তাহার সহিত সম্বন্ধহীন পিতৃব্যের চাকুরী গিয়াছে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় না কি যে, ঈসপের গল্পের ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের গল্প নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে?

চট্টগ্রামের শান্তিপ্রিয় আইনভীরু হিন্দু জনসাধারণের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে ময়মনসিংহের খুল্লতাত-ভ্রাতুস্পুত্র-ঘটিত ব্যাপারটি স্বতঃই মনে উদয় হয়। সেখানেও মুষ্টিমেয় গুপ্ত চক্রান্তকারী বিভীষিকাবাদী বিপ্লবীদের অপরাধে হিন্দু জনসাধারণের দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেল ইনষ্টিটিউটে বিপ্লবী অনাচার সংঘটিত হইবার পর গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় জানানো হইয়াছে যে,—যদি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে জনগণের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নাগরিকের কর্ত্তব্য অনুসারে এই ভাবের বিপ্লবী অনাচারের কিনারা করিতে অসমর্থ হয় এবং এই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখতার জন্য যে শ্রেণীর লোক দায়ী,—চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী, পাহাড়তলী রেল উপনিবেশ এবং কয়েকখানি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সেই শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হইবে।

এই শ্রেণীর লোকের উপর সন্দেহ এই জন্য যে,—"বিপ্লবীরা এই সকল স্থানের হিন্দু অধিবাসীদের দ্বারা আশ্রয়প্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।" এই ঘোষণার পূর্ব্বে যখন স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রামের হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণীর তরুণদিগকে সারা রাত্রি স্ব স্ব গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে এবং সাইকল ব্যবহার না করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তখনই বুঝা গিয়াছিল, খড়্গ পড়িবে কাহাদের উপর।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই হতভাগ্য হিন্দু ভদ্রলোক-শ্রেণীর অধিবাসীদের অপরাধ কি? বলা হইয়াছে, তাহারা বিপ্লবীদের সন্ধান রাখে, তাহারা সাহায্য ও আশ্রয় না দিলে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। সরকার এই তথ্য-সংগ্রহের ভিত্তি কোথায় পাইলেন?

এ দেশের মফঃস্বলে নিত্য ডাকাতী ও লুণ্ঠন হইতেছে। দস্যুরা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ী পড়ে, নানারূপ নির্য্যাতন করিয়া গৃহস্থকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চম্পট দেয়। যখন দল বাঁধিয়া ডাকাতরা এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করে, তখন গ্রামবাসীরা তাহাদের সন্ধান পায় না কেন? এ ক্ষেত্রেই বা গুপ্ত চক্রান্তকারী বিপ্লবীদের সন্ধান পাইবে কিরূপে?

তাহার পর সরকারের রীতিমত সাহায্যপুষ্ট গোয়েন্দা বিভাগ রহিয়াছে। তাহারাও ত অহোরাত্র বিপ্লবীদের সন্ধানে ফিরিতেছে। তবে তাহারাই বা বিপ্লবীদের সন্ধান পায় না কেন? সেইভাবে বুঝা যায় যে, চট্টগ্রামের জনসাধারণও গুপ্তপথের পথিক বিপ্লবীদের কোন সন্ধান পায় না।

সন্ধান পাইলে সে তথ্য লুকাইয়া রাখিবার তাহাদের কি স্বার্থ আছে? বিপ্লব যে দেশের উন্নতির পথ রোধ করিতেছে, বিপ্লবে যে দেশবাসীরই সমধিক ক্ষতি হইতেছে, এ কথা সামান্যবুদ্ধির লোকও বুঝে। তবে সন্ধান পাইলে তাহারা নীরবে থাকিবে কেন? চট্টগ্রামের জননায়ক কামিনীকুমার প্রমুখ বহু হিন্দু মুসলমান অধিবাসী যে কেবল মুখের কথায় নহে, হাতেকলমে সন্ধানের চেষ্টায় প্রাণপণ করিতেছেন, তাহাও ত সরকারের অবিদিত নহে। সদিচ্ছা আছে সকলেরই, কিন্তু পথ যে কঠিন। কিন্তু এই সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের মাথার উপর ভবিষ্যৎ নিষ্ফলতার দণ্ডস্বরূপ জরিমানার খড়্গ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে কি সরকার জনসাধারণের সাহায্যের আশা করেন? না, ধর্ষণ চালাইলেই বিপ্লবীরা উচ্ছিন্ন হইবে?

বাঙ্গালায় ধর্ষণ-নীতি

বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগ্যে বাঙ্গালার একাধিক স্থানে বিভীষিকাবাদী বিপ্লবীদের পর পর কয়টি অনাচার সংঘটিত হইয়াছে। বাঙ্গালা যে হিংসামূলক বিপ্লবীদের কর্ম্মভূমির মূল কেন্দ্র, তাহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর হইতে এ যাবৎ অনেক অনাচার-সংঘটনের

ফলে লোকের মনে বিশ্বাস হইয়াছে। বিপ্লবীরা মুষ্টিমেয়, না হইলে দেশবাসী নিশ্চিতই তাহাদের সন্ধান পাইত। তাহারা গুপ্তপথে চলাফিরা করে, গুপ্ত চক্রান্ত করে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামূলক অসহযোগ আন্দোলন তাহারা পছন্দ করে না। এই হিংসামূলক ভ্রান্ত পথ হইতে তাহাদিগকে অহিংসার পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু কংগ্রেস-নেতা চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকারের ধর্ষণনীতি সে পথে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে, এ কথা মহামতি এণ্ড্রুজ, অধ্যাপক ল্যাস্কি ও মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ একাধিক মনীষী বিদেশীই বলিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহাদের সুপরামর্শ বা শান্তির জন্য আবেদন-নিবেদন অরণ্যে রোদনেই সার হইয়াছে। সরকার বিপ্লবী আন্দোলন দমনকল্পে অল্পের অপরাধে বাঙ্গালার বহু অধিবাসীকে সন্ত্রস্ত ও ভীত করিয়া তুলিবার উপযোগী দমন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে সাধারণ শান্তিরক্ষকদের পরিবর্ত্তে ফৌজ বসান হইয়াছে। ইহাতে নিরপরাধ আইনভীরু শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মনে কি আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্যবস্থা বহাল হইবার পূর্ব্বে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহাতে বরং অধিবাসীরা অধিক নিরাপদ মনে করিবে, তাহাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই মেদিনীপুরে এক ভদ্রলোক উকীলকে বাইসিক্‌ল্ সমেত যে ভাবে বিপন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, মাঝে মাঝে এখন মফঃস্বল হইতে এই ভাবের সংবাদ পাওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

ধলঘাটের ব্যাপার উপলক্ষে গ্রামবাসীদের উপর যে গুরু জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে, তাহাও বিপ্লবী দমনের কার্য্যপন্থার অন্যতম অঙ্গ। ইহাতেও অল্পের অপরাধে বহুর দণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। কত দিন যে বাঙ্গালার নির্দ্দোষ শান্তিপ্রিয় জন-সাধারণকে এই অসুবিধা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

আন্দামান

বাঙ্গালা হইতে এক শত জন রাজবন্দী আন্দামানে চালান হইয়াছেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিছু দিন তাঁহাদের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি কোন এক রাজ-বন্দীর পত্রে তাঁহার আত্মীয়রা অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহা-দিগকে আন্দামানের কারাগৃহের ত্রিতল আবাসের সর্ব্বনিম্নতলে বাস করিতে দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের সকলকে মিলামিশা করিতে দেওয়া হয়। তাঁহাদিগকে খেলা করিতে ও নির্ব্বাচিত পুস্তক আদি পাঠ করিতে দেওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য তাঁহাদিগকে নিজব্যয়ে ক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গালার এক জন সিভিলিয়ানের উপর তাঁহাদের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

এ সকল কথা মন্দের ভাল। কিন্তু আন্দামানের জলবায়ু কেমন অথবা তাঁহাদের স্বাস্থ্য কেমন, সে সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সচিব মহাশয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—"আন্দামানের স্বাস্থ্য ভাল, রাজ-বন্দীদের স্বাস্থ্য ও সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় এবং আন্দামানে নির্ব্বাসন-প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না।"

অতি উত্তম কথা। কিন্তু আমরা জানি যে, সরকারের নিযুক্ত কমিটী রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, আন্দামানের স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নহে। ইহা নির্ব্বাসন তুলিয়া দিবার কল্পনার অন্যতম কারণ। তবে হঠাৎ কিসে আন্দামানের স্বাস্থ্যের এরূপ পরি-বর্ত্তন ঘটিল? রাজবন্দীদের আগমনেই কি আন্দামানের দিগ্-দিগন্ত স্বাস্থ্যে হাসিয়া উঠিল, না রাজবন্দীদিগকে তথায় রাখা হইবে বলিয়া তথাকার অস্বাস্থ্যের কারণ তাড়াতাড়ি দূর করা হইল? নির্ব্বাসন-প্রথা তুলিয়া দিবার নীতিটা অক্ষুণ্ণ রহিল বটে, তবে আপাততঃ কাঁঠালের আমসত্বের মত রাজবন্দীদিগকে তথায় রাখা হইল, কেমন না?

প্রেস অর্ডিনান্স

ফ্রি প্রেসের নিকটে প্রথমে ৬ হাজার টাকা জামিন লওয়া হইয়া-ছিল। উহা বাজেয়াপ্ত হইবার পর আবার ১০ হাজার টাকার জামিন লওয়া হয়। সে টাকাও বাজেয়াপ্ত হইল এবং পুনরায় ২০ হাজার টাকার জামিন চাওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ফ্রি প্রেসকে এ যাবৎ একুনে ৩৬ হাজার টাকা সরকারের অর্ডিনান্স আইনের তহবিলে জমা দিতে হইল! সদানন্দ সদানন্দই বটে, না হইলে এই ঘা খাইয়া এখনও তিনি হাসিমুখে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন কিরূপে? বস্তুতঃ সদানন্দের ন্যায় কৃতী কর্ম্মী পুরুষ অধুনা এ দেশে বিরল। তিনি স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে বিরাট প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু অর্ডিনান্সের খড়্গ এই ভাবে তাঁহার মস্তকে পড়িতে থাকিলে কত দিন তাঁহার পক্ষে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব হইবে, তাহাও বিবেচ্য।

না

মওলানা শৌকৎ আলি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার পরি-কল্পিত এলাহাবাদের মিলন-বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডনের সকাশে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি-প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা বিফল হইয়াছে, বড় লাট বলিয়াছেন, না। যে কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা মামুলী, ভারত-সচিব এই কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন, বড় লাট স্বয়ং সার শিবস্বামী আয়ারকেও সেই কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "গভর্ণমেণ্টের শান্তিস্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা আছে, মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস ইচ্ছা করিলেই দ্বিতীয় গোল-টেবিলের সময়ের অবস্থা পুনরায় আনয়ন করিতে পারেন; গান্ধী-আরউইন চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিয়া মিঃ গান্ধীর চেলারা (Lieutenants) ভারতে ও বিলাতে যখন আপোষ কথা চলিতেছে, তখন নানা স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে অচল করিবার চেষ্টা করিল। কোন

সরকারই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই অর্ডিনান্স ব্যবহার করা হইতেছে। কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে এখনও আন্দোলন ত্যাগ করিতে পারে, মিঃ গান্ধী কংগ্রেসকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বলিতে পারেন। তাহা হইলে আপোষের পক্ষে আর কোনও অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আইন অমান্য আন্দোলন ভবিষ্যতে আর কখনও প্রবর্ত্তন করা হইবে না।" সার স্যামুয়েল হোর ইহার উপরেও আরও কিছু ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—"গভর্ণমেণ্ট পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন না, কংগ্রেসকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে, তাহার পর আপোষের কথা হইবে।" অর্থাৎ কংগ্রেস দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা উঠিতেই পারে না!

যখন যারবেদা জেলে নেতৃবৃন্দের সহিত মহাত্মাজীর হিন্দু-মিলন-সমস্যার আলোচনা চলিতেছিল, তখন প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কোনও বন্ধুর প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমিও সরকারের সহিত আপোষ কথাবার্ত্তায় খুবই সম্মত আছি, তবে যদি সরকারের নিকট হইতে এ বিষয়ে 'উপযুক্ত' (worthy) 'সাড়া' (response) পাই।" এই worthy কথাটার মধ্যে মহাত্মাজী তাঁহার সকল কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার আত্মসম্মানের হানিকর কোনও সর্ত্ত না দিয়া যদি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে সকল পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপনে তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন। এখন সরকার পক্ষ সার শিবস্বামী আয়ার ও মওলানা শৌকৎ আলির মারফতে যে 'সাড়া' দিয়াছেন, তাহাতে মহাত্মা গান্ধী কি করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকরও এইরূপ 'সাড়া' সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহাও কেহ বিস্মৃত হন নাই!

কেবল ইহাই নহে, মওলানা সাহেব মস্ত আশাবাদী বলিয়া ইহার পরেও যারবেদা জেলে দুই এক দিনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি সে অনুমতিও প্রদান করেন নাই! কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে এই যে,—"হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টায় এই প্রার্থনা, ইহা জানি। কিন্তু ১৯৩১ হইতে ১৯৩২ জানুয়ারীর মধ্যে মিঃ গান্ধী এ বিষয়ে বহু সুযোগ পাইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় গোলটেবিলে তিনি নিজের 'অপমান' (humiliation) এবং ব্যর্থতা (failure) স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধানের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিলেন।"

সকলেই জানে, গোলটেবিলের গঠন কি ভাবে হইয়াছিল। সরকার তাঁহাদের মর্জ্জিমত সদস্য বাছাই করিয়া বৈঠক গড়িয়াছিলেন। এই হেতু প্রথম বৈঠকের সাফল্য সাধিত হয় নাই। সার তেজ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত জয়াকর বলিয়াছিলেন, তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ ধারণা অনুসারে ভারতের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার যদি তাঁহাদের দাবী গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে মডারেটদিগকে) নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে হইবে। তাই গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের প্রতিভূরূপে দ্বিতীয় গোল টেবিলে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেই বৈঠকে মহাত্মা ভারতের পক্ষ হইতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল, লর্ড রেডিংএর মত শ্রেষ্ঠ বৃটিশ রাজনীতিকও তাঁহার কথার জবাব দিতে পারেন নাই, চার্চ্চহিল লর্ড লয়েড ত দূরের কথা। তিনি সাধারণ নীতির (মূল নীতির) দিক্ হইতে কথা কহিয়াছিলেন, খুঁটিনাটি লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু বৈঠকের মুসলিম-বেম্থল চুক্তিতে (Minorities Pact) তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই, উহা জাতীয়তা ও গণতন্ত্র-শাসনের সম্পূর্ণ বিরোধী। উহারই জন্য কি তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধানের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইলেন? তাহার পর মহাত্মাজী এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা শান্তিকামনার পরিচায়ক নহে কি? সে প্রার্থনা কি মঞ্জুর হইয়াছিল? তৎপরিবর্ত্তে বিনা অপরাধে বিনা বিচারে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাই ত ইতিহাস। তবে?

ফল কথা, অধুনা রক্ষণশীলদলীয়দের প্রাধান্য হেতু উভয়পক্ষে সম্মানজনক রফায় অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। এই নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিতে সরকারপক্ষ হইতে এইরূপ উত্তর পাওয়ারই সম্ভাবনা। মওলানা সাহেবের ইহাতে দুঃখ ও ক্ষোভ হইতে পারে, কিন্তু উপায় কি? তাঁহার আশা ছিল, অন্য যাহারই অনুরোধ উপেক্ষিত হউক, তাঁহার হইবে না। কেন না, বর্ত্তমানে মুসলিম পক্ষের যেরূপ আদর-আপ্যায়ন চলিতেছে, তাহাতে এরূপ আশা হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু মওলানা সাহেবের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি ক্ষোভে রোষে বলিতে পারেন যে, সরকার পক্ষের এ জবাব যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়?

ভারতবর্ষ ও অটোয়া-চুক্তি

অটোয়ার সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য-বৈঠকে ভারতেরও 'আমন্ত্রণ' হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সার অতুল চ্যাটার্জ্জি ভারতের 'প্রতিনিধি'রূপে তথায় স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি না কি 'ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে' চুক্তিতে মত দিয়া আসিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে!

অন্যতম বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বার্লেন অটোয়া-চুক্তি মানিয়া লইবার জন্য পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করার কালে বলিয়াছিলেন যে, চুক্তি গ্রহণ করিলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধনধান্যে উথলিয়া উঠিবে, দেশের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর হইবে, লোকের আর অর্থকষ্ট থাকিবে না। তিনি যদি তাঁহার স্বদেশের পক্ষ হইতে এ কথা বলিতেন, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তিনি ঐ সঙ্গে ভারতের পক্ষ হইতেও বে-পরোয়াভাবে বলিয়াছেন যে,—"ভারতবর্ষ এইবার সর্ব্বপ্রথমে সাম্রাজ্যমধ্যে পক্ষপাতিতা-পূর্ণ বাণিজ্যনীতির সমর্থন করিল।" চমৎকার! এ কোন্ ভারতবর্ষ? সরকার তাঁহাদের যে

কর্ম্মচারীকে ভারতবর্ষের 'প্রতিনিধি' করিয়া বৈঠকে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই কি ভারতবর্ষ ? তাঁহার সহিত ভারতের জনমতের সম্পর্ক কি ?

বৃটেনের পক্ষেই যে অটোয়া-চুক্তি সুফলদায়ক হইবে, তাহা বহু উদারনীতিক স্বীকার করেন না, এবং সেই হেতু সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল প্রমুখ লিবারলদলীয় কয় জন সদস্য ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। লেবার দলীয় মিঃ ল্যান্সবারি ও লিবারলদলীয় সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল বলিয়াছেন,—"এই চুক্তিতে সাম্রাজ্যের উন্নতি ত হইবে না, পরন্তু আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে; ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট এই ভাবের 'হাতুড়ে আর্থিক বন্দোবস্ত' করিবার জন্য জাতির নিকট কোন অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন নাই।" প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য জবাবে বলিয়াছেন যে, "চুক্তি করিয়া গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচনকালের কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই।" কিন্তু বিপক্ষদলীয়রা সে কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতেছেন না।



সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল

ইহার পর চুক্তিতে ভারতের যে মঙ্গল হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মিঃ ল্যান্সবারি বলিয়াছেন,—"ভারতের জনসাধারণ অটোয়ার প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করে নাই, কারণ, তাহারা এই চুক্তি কখনও চাহে নাই। আমি বহু ভারতীয় ব্যবসায়িসঙ্ঘ ও ভারতীয় বণিকের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের নামে যে সকল ভারতীয় প্রতিনিধিকে অটোয়া-বৈঠকে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের কেহ নহেন।"

কেন ভারতীয়রা অটোয়া-চুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার অনেক যুক্তি আছে। শ্রম-শিল্পজ পণ্যের বিনিময়ে যদি শ্রম-শিল্পজ পণ্যের বিনিময় হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে দেশের উপকার হয়; কিন্তু কোন দেশকে যদি কৃষিজ পণ্যের বিনিময়ে শ্রম-শিল্পজ পণ্য আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে সে দেশকে ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হয়। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ, সেখানে কৃষিজ পণ্যই সমধিক। বর্ত্তমানে ভারত-বাসীকে বিদেশ হইতে শ্রমশিল্পজাত পণ্য অধিক মাত্রায় আমদানী করিতে হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে বিদেশীকে সেই পরিমাণ কৃষিজ পণ্য (তন্মধ্যে কাঁচা মালই সমধিক) দিতে হয়। যদি ভারতে অন্যান্য বিদেশী শ্রমশিল্পজ পণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্ক-ব্যবস্থার ফলে কেবল বৃটিশ শিল্পজ পণ্য আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে বৃটিশ শিল্পজ পণ্য যে পরিমাণে ভারতে কাটে, নূতন ব্যবস্থায় তাহা হইতে আরও ৩৩ কোটি টাকা মূল্যের অধিক পণ্য কাটিবে। ফলে ইহাতে বিলাতে বেকার-সমস্যা অনেকটা ঘুচিবে। কিন্তু ভারতের কি হইবে ? ভারত এই অধিক বৃটিশ পণ্যের বিনিময়ে বিলাতে আরও ১৩ কোটি টাকার পণ্য কাটাইতে পারিবে বটে, কিন্তু ৩৩ কোটি টাকার মাল কিনিয়া যদি ১৩ কোটি টাকার মাল বেচিতে হয়, তাহা হইলে লাভ না ক্ষতি ? অবশিষ্ট ২০ কোটি টাকার মাল কে কিনিবে ? অন্যান্য বিদেশ ত কিনিবেই না; কারণ, তাহাদের উপর যে অধিক শুল্কের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইবে, তাহার ফলে তাহারা ভারতে বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় মাল কাটাইতে না পারিয়া ভারতের মালও গ্রহণ করিবে না।

এই ব্যবস্থা কি ভারতের পক্ষে কখনও সুবিধাজনক হইতে পারে ?

বাঙ্গালায় বেকার-সমস্যা

দেশের শাসন-সংস্কার-সমস্যা অথবা আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার সমস্যা হইতে বেকার-সমস্যা কম জটিল, বোধ হয়, তাহা কোন অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। প্রথমে উক্ত দুই সমস্যার সহিত শেষোক্ত সমস্যা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের তরুণরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও অন্নসংস্থানের উপায় খুঁজিয়া না পাইলেই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আধুনিক কালেজী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত তরুণগণকে উদরান্ন-সংস্থানের জন্য যে কয়টি পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে পথ কয়টি রুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অসন্তোষ ও অশান্তিবৃদ্ধি এবং তাহারই ফলে বিপ্লববাদের দিকে তরুণদের আকর্ষণ স্বাভাবিক, এ কথা সরকারও অস্বীকার করেন না।

সুতরাং এই সমস্যা-সমাধানে যত্নবান্ হওয়া সরকারের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এ কথা আমরা বহুবারই বলিয়াছি। সকল দেশের সভ্য সরকারই, তাঁহাদের দেশের তরুণগণকে কালেজী শিক্ষা ব্যতীত অন্নসংস্থানের উপযোগী কারিগরি বা শিল্পবাণিজ্যিক বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। আধুনিক কালের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে এইরূপ শিক্ষা বিস্তার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ে যখনই দেশবাসীর পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে, তখনই সরকার পক্ষ তহবিলে অর্থাভাব প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বাঙ্গালা সরকারের শিল্পবাণিজ্য-বিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় বাঙ্গালার বেকার-সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিরূপে বাঙ্গালার তরুণগণকে এই দিকে শিক্ষাদান করা যায় এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, এই পরিকল্পনায় অতি সামান্য ব্যয়ে উদ্দেশ্য

সাফল্যমণ্ডিত করিবার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকার সেই পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গালার আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিসাধনোদ্দেশে একটি কার্য্যপন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া যদিও দেখা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা বিরাট অভাব-অভিযোগ দূর করিবার পক্ষে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু তুল্য, তথাপি বাঙ্গালা সরকারের এই প্রথম প্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইলে তরুণদের যে কিছু উপকার হইবে এবং ভবিষ্যতে অধিক উন্নতির পথ মুক্ত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শিল্পবাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী নবাব ফরোকী সাহেবের এবং গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সনের উদ্যম প্রশংসনীয়।

এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। তবে এ বিষয়ে কেবল পরিকল্পনা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকিলে কিছুই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা না গেলে এ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায় না। তাহার পর দেশের তরুণগণকেও উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত এই সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমে বৎসরে ১ লক্ষ টাকা করিয়া এতদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অবশ্য ইহা যে দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে সামান্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। পরন্তু উহা দ্বারা যে বিরাট প্রকৃতির শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সম্ভাবনা হইবে, তাহাও নহে। তথাপি মুখপাতে এই যৎসামান্য কিছু উপকারসাধন করিবে। এই টাকায় বাঙ্গালার প্রধান কেন্দ্রসমূহে ভদ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী তরুণদিগকে কুটীরশিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষাকাল অল্প হইলেও সারবান্ শিক্ষা দেওয়া হইবে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কুটীরশিল্প শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা অন্যান্য দেশে হইয়াছে, এ দেশেও সেইরূপ হইবে। প্রধানতঃ পাট ও পশমজাত পণ্যের উৎকর্ষসাধনেই চেষ্টা করা হইবে। পাটের ও পশমের আসন, সতরঞ্চি, জাজিম, পর্দ্দা, টেনিসের ও ব্যাডমিণ্টনের জাল ইত্যাদি এবং পিত্তল ও কাঁসার বাসন, মাটীর খেলানা ও গৃহব্যবহার্য্য দ্রব্য-সমূহ প্রস্তুত করার বিষয়ে শিক্ষা দান করা হইবে। ইহা ছাড়া আরও নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইবে।

কিন্তু তাহার পরে? এ দেশে বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু তরুণ আসিয়া কার্য্যাভাবে অন্য চাকুরী লইতে বাধ্য হয়। যাহাতে মূলধন পাওয়া যায় এবং সেই মূলধনে নূতন নূতন কারকারবারের সৃষ্টি করিতে পারা যায়, তাহার উপায় কি? সরকারকে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকার পক্ষ হইতে আপাততঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারদিগকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য দান করিয়া কারবার আরম্ভ করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাও মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

——

শরৎ-বন্দনা

৩১শে ভাদ্র বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক উপন্যাস-সম্রাট্ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মদিন। এবার ঐ দিন তাঁহার গুণমুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা তাঁহার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মবাসরোৎসবে বন্দনার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু ৩১শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর ছিল হিজলী দিবস,—বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় ব্যথা-বেদনার দিন। এ জন্য এক শ্রেণীর তরুণের পক্ষ হইতে ঐ দিবস উৎসব স্থগিত রাখিবার আন্দোলন হইয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উৎসব-আয়োজন বন্ধ করাও অন্যতম কারণরূপে দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রকে সে বিষয়ে নিবেদন করিলে তিনি উৎসবস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে দিনের উদ্যোগ-আয়োজন পণ্ড হইয়াছিল।



শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরে যথারীতি শরৎবন্দনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান অসীম। গল্প-উপন্যাসে সরল সহজ স্বচ্ছন্দগতি ভাষা অথচ গভীর হৃদয়স্রাবী ভাবের সমাবেশ বোধ হয় শরৎচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রযুগে প্রতীচ্যের অনুকরণে এ দেশেও, বিশেষতঃ নাগরিক জীবনে, পুরুষ ও নারীর জীবন-সংগ্রামে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইতেছে, তাহার বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নারীচরিত্রের ব্যথা-বেদনা শরৎচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সমবেদনায় অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত হয়, নয়ন স্বতঃই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। তাঁহার পাঠক তাঁহার মানস পুত্রকন্যাগণের সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে, আপনার অন্তর দিয়া তাহাদের অন্তর অনুভব করে। তাঁহার

'রামের সুমতি', তাঁহার 'বিন্দুর ছেলে', 'পণ্ডিত-মশাই,' ,বৈকুণ্ঠের উইল', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ',—কোন্‌খানি রাখিয়া কোন্‌খানির নাম করিব? বাঙ্গালীর অধঃপতিত সমাজের দুষ্টব্রণ দেখাইয়া দিবার সময় তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তাঁহার সেই অনন্যসাধারণ লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

বাঙ্গালী এ জন্য শরৎচন্দ্রের নিকটে কৃতজ্ঞ। এই বন্দনা তাহারই অভিব্যক্তি। কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ এতদুপলক্ষে শরৎচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের স্বদেশবাসিনী এবং স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রও প্রতিভাষণে তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র জীবিতকালে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর আনন্দেরই কথা—গৌরবের কথা।

নিখিলনাথের লোকান্তর

বঙ্গভারতীর আর একটি বরপুত্র তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়া গেলেন! বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক প্রথিতযশা



নিখিলনাথ রায়

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিখিলনাথ রায় গত ১৮ই কার্ত্তিক বেলা ৮টার সময় সপ্তষষ্টি বর্ষ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয় গৌরবে অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর ও নীরস প্রাচীন পুঁথি ও কিম্বদন্তীর তপোবনে ধ্যাননিরত তপস্বীর ন্যায় যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি আজ তাহার ফলভোগ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে করিবে সন্দেহ নাই। যে জাতীয়তা-বোধ—যে দেশপ্রেম—যে দেশগৌরবের অনুভূতি বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উন্মেষ-উত্তেজনা ও পথ-নির্দ্দেশে নিখিলনাথ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক যুগের তরুণ বাঙ্গালী হয় ত তাহা বিদিত না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের ঋণ যে নিখিলনাথের নিকটে অপরিশোধ্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার পুঁড়া গ্রামের অভিজাত-বংশে নিখিলনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর স্বাধীনতার প্রতীক মহারাজা প্রতাপাদিত্য যে রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, নিখিলনাথ তাহারই বংশধর। সম্ভবতঃ এই হেতু বাঙ্গালীর অতীত কীর্ত্তিগাথা ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবার প্রবল বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া, ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি দীর্ঘকাল আইন ব্যবসায়ে অর্থার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার দেশপ্রেম, জ্ঞানপিপাসা ও সাহিত্যচর্চ্চার আকর্ষণ তাঁহাকে ভিন্নপথে চালিত করিয়াছিল। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিয়া স্বার্থ-সর্ব্বস্ব বিদেশী ঐতিহাসিকের ভ্রমপ্রমাদ ও অতিরঞ্জন যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণ সহ খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ স্বনামপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মত নিখিলনাথও সেই উপদেশমত বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সাধনা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। এ জন্য তিনি ভারতের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দুর বিবিধ শাস্ত্রপুরাণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব-সরকারের দপ্তর ঘাঁটিয়া বহু পরিশ্রমে বহু লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতির ভাবধারা ও কৃষ্টি প্রতীচ্যের প্রদর্শিত গবেষণার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার সাধনার পথ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী,' 'সোনার বাঙ্গালা' 'জগৎশেঠ,' 'প্রতাপাদিত্য' প্রমুখ গ্রন্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যৌবনে ভারতের ইতিহাস আলোচনার ফলে তিনি বাঙ্গালী সাহিত্য-রসপিপাসুকে তাঁহার 'রাজপুতকুসুম' উপহার দিয়া গিয়াছেন। পরিণতবয়সে রচিত 'কবি-কথা' ও 'ইতি-কথা'ও তাঁহার গবেষণা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

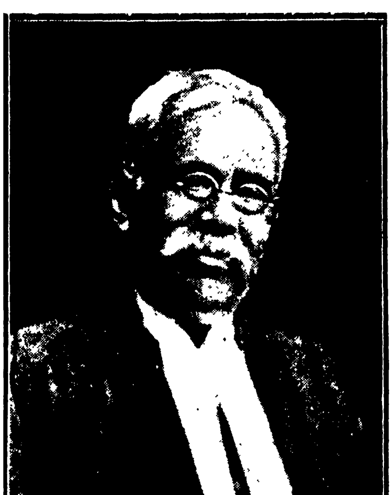
সুকবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর সহিত একযোগে নিখিলনাথ বসিরহাট মহকুমা হইতে "পল্লীবাণী" নামক মাসিক পত্রিকা প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। সৎসাহিত্যের প্রচার ও পুষ্টিকল্পে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা 'মাসিক বসুমতীর' অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাঁহার 'সিরাজ ও ইংরাজ' প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে "মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশিত হইতেছিল। বর্ত্তমান কার্ত্তিক সংখ্যাতেও তিনি উক্ত

প্রবন্ধের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না!—এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? 'সাহিত্য' প্রমুখ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মাসিক পত্রসমূহে তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'মীরণের মৃত্যুরহস্য' প্রবন্ধ ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

নিখিলনাথ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মৃদুভাষী, বিনয়ী, স্বজন ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। মনুষ্যজীবনে পরম প্রার্থনীয় সাধ্বী পত্নী ও পিতৃবৎসল পুত্রলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পনেরো মিনিট পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন! পিতৃমাতৃবৎসল পুত্রের পক্ষে ইহা যে দারুণ আঘাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আজ তাঁহার বিয়োগে স্বজনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে নিখিলনাথ বাঙ্গালী জাতিকে আরও কিছু সম্পদ্ হয় ত দিয়া যাইতে পারিতেন, কেন না, কিছু দিন হইতে রোগে আক্রান্ত হইলেও তিনি সাহিত্যসেবা হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহার বিয়োগে সান্ত্বনা এই যে, তিনি বাঙ্গালীর অতীত গৌরবগাথা যে ভাবে বাঙ্গালীকে পরিবেশণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিবে!

কর্ম্মবীর যদুনাথ

বাঙ্গালার আকাশ হইতে আর একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। যশোহরের স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব, কর্ম্মবীর,



কর্ম্মবীর যদুনাথ

সাহিত্যিক এবং অবিসম্বাদী নেতা ও বাগ্মী রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বিদ্যাবারিধি ত্রিসপ্ততিবর্ষ বয়সে গত ২৪শে অক্টোবর সোমবার রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময়ে সজ্ঞানে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। রাজঘাট গ্রামে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছিল। যখন তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র যশোহরে আনয়ন করা হয়, তখন শত শত নর-নারী আকুল আগ্রহে তাঁহার শবশোভাযাত্রায় যোগদান করিতে ছুটিয়াছিল।

মানুষ মানুষের মত কর্ম্মজীবনে জনসেবা—নরনারায়ণসেবা করিতে পারিলে মরণেও তাহার মৃত্যু হয় না।—'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে', কবির কথা যদুনাথে সার্থক হইয়াছিল, তাই তাঁহার মৃত্যুতে যশোহর—কেবল যশোহর কেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশই আজ আত্মজনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছে।

যদুনাথ সফলকাম ব্যবহারাজীব, সার্থক দেশপ্রেমিক, পরম পণ্ডিত, অক্লান্ত কর্ম্মী, চিন্তাশীল লেখক ও বাগ্মী এবং আন্তরিক জনসেবক ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথের ও কংগ্রেসের প্রথম যুগে যে কয় জন বাঙ্গালী মনীষী তাঁহার পার্শ্বচররূপে দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন, যদুনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

সন ১২৬৬ সালে খুলনা জেলার দশানি গ্রামে যদুনাথ বারুজীবী দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, মজুমদার তাঁহাদের বংশের বাঙ্গালার নবাব-প্রদত্ত উপাধি। যদুনাথ যশোহরে প্রথম বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবার পর ১৮৮২ খৃঃ এম, এ ও বি, এল উপাধি লাভ করেন; উহাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার অনুরোধে ১৮৮৮ খৃঃ যশোহরে ওকালতী করিতে আসেন এবং কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী উভয় বিভাগেই অসাধারণ প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃঃ তিনি ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ স্মার্ত্ত-শিরোমণির সহিত একযোগে "United India" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ ১৮৮৩ খৃঃ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার দেশ-সেবা বা কর্ম্মজীবনের অবসান হয় নাই। যদুনাথ লাহোরের 'Tribune' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে গেলে United India 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সহিত মিলিত হয়।

১৮৮৯ খৃঃ তিনি 'সম্মিলনী' পত্র প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ষ্টেটসম্যান প্রমুখ সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন সুন্দর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইত, তেমনই ইংরাজীতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতর্কসমন্বিত সন্দর্ভ রচিত ও প্রকাশিত হইত।

১৮৮৯ খৃঃ যশোহরে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। নীলকরদের অনাচারই যে উহার মূল কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদুনাথ দরিদ্র প্রজাদের পক্ষ হইতে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যে পার্লামেণ্টে আবেদন করেন এবং তাঁহার পক্ষে মহামতি ব্রাডলা মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। ফলে পার্লামেণ্ট হইতে বাঙ্গালা সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হয় এবং পরে তথ্যানুসন্ধানে এক 'কমিটী' নিযুক্ত হয়। যদুনাথ ঐ কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটীর রিপোর্টের ফলে গোলযোগের অবসান হয়। ইহার পর নীলকরর। ক্রমশঃ যশোহর ত্যাগ করেন। ইহা যদুনাথের অতুল কীর্ত্তি।

যদুনাথ সরকারী উকীল হইয়াও ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেসে' মনে-প্রাণে যোগদান করিতে বিরত হন নাই। কংগ্রেসের সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার পরিণতবয়স পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের জন্য অর্থ, সময়, শ্রম ও চিন্তা দান করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের মডারেট দলের অন্যতম নেতৃরূপে গণ্য ছিলেন বলিয়া ইদানীং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রকাশ্য যোগদান বিরল ছিল। তাঁহার দেশপ্রেমের কথা তাহা বলিয়া অস্বীকৃত হয় নাই। কংগ্রেসের সৃষ্টিকর্ত্তা মহামতি হিউম Statesman পত্রে যদুনাথের দেশ-প্রেমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯২২ খৃঃ তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে প্রথমে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন উহা গৃহীত হয় নাই, কিন্তু এখন উহার জন্য গোলটেবিল বসাইতে হইয়াছে!

যদুনাথ যশোহরের জেলাবোর্ডে বাঙ্গালার প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন এবং যশোহরের পল্লী-সমূহের দারুণ জলকষ্ট নিবারণ, ভৈরব সংস্কার, বালক-বালিকার জন্য স্কুল-প্রতিষ্ঠা এবং দাতব্য ঔষধালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের আমলে ভৈরব-সংস্কারের জন্য বাজেটে অর্থ-ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সার এণ্ড্রু হঠাৎ বিলাত চলিয়া যাওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে 'এড়োন বিলের খাল' এবং 'যমুনার' সংস্কার তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল বটে। কূপ ও তড়াগ-খননে তিনি জেলা বোর্ড হইতে ৩ বৎসরে ৯০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

যদুনাথ চিন্তাশীল লেখকরূপে 'হিন্দু পত্রিকা' ও 'ব্রহ্মচারী'তে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশন হইয়াছিল। হাওড়া সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি দর্শন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সকলে তাঁহার সাহিত্যে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত।

স্বদেশজাত পণ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে যশোহরে চরকার প্রচলন করিয়াছিলেন।

শিক্ষকরূপেও তিনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপনাকার্য্যে এবং অন্য এক সময়ে তিনি নেপাল কাটমাণ্ডো কালেজের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

আজ তাঁহার বিয়োগে যশোহর নেতৃহীন হইল সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাব পূর্ণ হইতে কত কাল লাগিবে, তাহা কে বলিবে?

—

ডাক্তার য়ুন্সান

এই সহরের স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার য়ুন্সান গত ২২শে অক্টোবর তারিখে পরিণতবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরে তাঁহার ন্যায় অসাধারণ যশস্বী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবসায়ী আর কেহ হইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অবশ্য কেবল লোক-সেবার জন্য শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র সিংহের মত সদাশয় ধনীর সন্তান এই চিকিৎসায় যশের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য এই ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার য়ুন্সান অধুনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বিদিত ছিলেন। এই চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার



ডাক্তার য়ুন্সান

অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; শুনা যায়, তিনি জীবনে হতাশ বহু রোগীকে স্বাস্থ্যদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু গণ্যমান্য এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসক অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন।

ডাক্তার য়ুন্সান সুধী, সজ্জন, সদালাপী, সৌম্যদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি বিদেশী ছিলেন বটে, কিন্তু এদেশীয়েরই সহিত তাঁহার অধিক সৌহার্দ্দ ও মিলামিশা ছিল। তিনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-সম্মেলন হইয়াছিল, ডাক্তার য়ুন্সান তাহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যোগ্য জনেই এই সম্মান অর্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান তাঁহাকে সহরের

চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। এ দেশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-জগতে তাঁহার স্থান শূন্য রহিল।

মহারাণী সুনীতি দেবী

গত ১০ই নভেম্বর শেষ রাত্রিতে রাঁচী সহরে কোচবিহারের নাবালক মহারাজার পিতামহী মহারাণী সুনীতি দেবী



মহারাণী সুনীতি দেবী

উনসপ্ততিবর্ষ বয়সে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সুনীতি দেবীর কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সমাজসংস্কারক ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র এই বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া সেই সময়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

মহারাণী সুনীতি দেবী রাজ্যাধিপ স্বামীর পার্শ্বচারিণীরূপে রাজ্যের ও রাজ্যের বাহিরের সর্ব্ববিধ সাধারণ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের জুবিলি উৎসব উপলক্ষে স্বামীর সহিত বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন।

মহারাণীর দীর্ঘ জীবন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা যুগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই যুগের প্রথম প্রভাতে বাঙ্গালার নারীজাতির শিক্ষোন্নতিকল্পে তিনি মনে প্রাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশান তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার সৌজন্য ও আতিথেয়তা সুবিদিত ছিল। আশ্রিতপালনে, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রীতিবিধানে, যোগ্য প্রার্থীর পুরস্কার ব্যবস্থায়, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত ধর্ম্মাচরণে তিনি প্রাচীন রাজবংশের গৃহিণীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

জীবনে তিনি অনেক শোক পাইয়াছেন। পতি-বিয়োগের পর তিনি উপর্য্যুপরি তিনটি পুত্রশোক পাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বরোদার মহারাজা গাইকবাড়ের কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরারাজার বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে মহারাণী ইন্দিরারাজা নাবালক পুত্রের রাজমাতা ও রাজ-অভিভাবিকারূপে সকাউন্সিল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

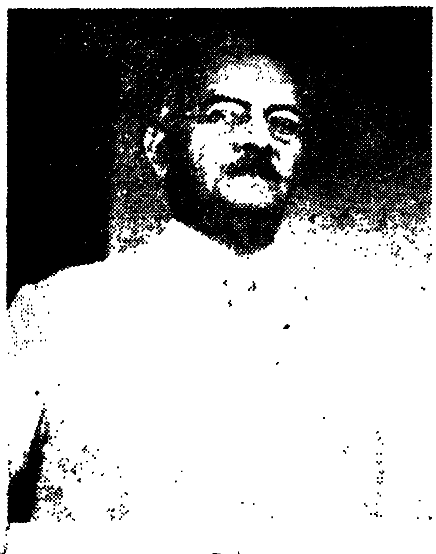
মহারাণী সুনীতি দেবীর তিরোধানে বাঙ্গালার প্রাচীন ও নবীন যুগের নারীদিগের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। আমরা বাঙ্গালার এই প্রাচীন রাজবংশের এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

স্যর সৈয়দ আলি ইমাম

ভারতের সুসন্তান, বিহারের জননায়ক, স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব, দেশপ্রেমিক সার সৈয়দ আলি ইমাম সাহেব গত ৩০শে অক্টোবর রাঁচী সহরে ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতের একতা ও স্বরাজের জন্য যে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে নিখিল ভারত দেশনেতৃগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সকলেই শ্রদ্ধানতশিরে স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই। তবে তিনি বিহারবাসী ছিলেন এবং বিহারের স্বার্থের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া বিহারকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সহজাত বংশগত ঔদার্য্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ দেশপ্রেমের সহায়তায় সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে দেশসেবাকে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন, নবভারতের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাকে তিনি চিরজীবন ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় সাধনা করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মোহপাশ হইতে অতি সন্তর্পণে আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন, পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছেন। লর্ড মিন্টোর আমলে যদিও তিনি অন্যান্য

সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিমের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী রাজপ্রতিনিধির সকাশে পেশ করিতে গিয়াছিলেন, তথাপি পরে তিনি উহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, ভারতের জাতীয়তায় আমি দৃঢ় বিশ্বাসী কেন, তাহা হইলে আমি বলিব, উহা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতালাভ অসম্ভব।



সার আলি ইমাম

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা জাতীয়তার বিরোধী। ভেদ ও অনৈক্যের মধ্য হইতে কখনও জাতীয়তার উদ্ভব হয় না।" জাতির জীবনের এই সঙ্কটসঙ্কুল সন্ধিক্ষণে তাঁহার ন্যায় দেশনায়কের তিরোভাবে দেশ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যে সময়ে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে ভারতে জাতীয় মহামিলনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তিরোধান অতর্কিত বজ্রপতনের মতই অনুমিত হইল। সার আলি জাতি বা বর্ণগত পার্থক্য মানিতেন না, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, জৈন—সকলকেই তিনি ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। আজ তাঁহার অভাবে দেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই।

মহাত্মার প্রতি বিদেশী মুসলমান

মহাত্মা গান্ধীর দেশে একতাপ্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানের সংবাদে মিশর ও ইরাক প্রমুখ বিদেশের মুসলিম জনগণের শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের সংবাদে মনে হয়, ভারতের এক শ্রেণীর মুসলমানের এবং অর্দ্ধস্বাধীন বিদেশী মুসলমানের মনোভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মিশরের পরলোকগত স্বনামধন্য জননায়ক জগলুল পাশার সহধর্ম্মিণী, জাতীয়দলের বর্ত্তমান নেতা নাহাস পাশা, মিশরীয় দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি এবং অন্য কয় জন সংবাদপত্রসেবী মহাত্মাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার পরার্থে এই স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানব, এসিয়ার আলোক,—এমন কি, পয়গম্বর পর্য্যন্ত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এ সম্মান অধুনা জগতে আর কোন মানুষ পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। দ্বিতীয় গোল টেবিলের সময়ে বিলাতে মহাত্মাজী এইরূপ সম্মানই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও জগতের লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ও আত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জগতের শান্তিদূত বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রীতিনতশিরে অভিনন্দিত করিয়া থাকে। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, তাঁহাকে তাঁহার দেশেরই এক শ্রেণীর মানুষ শান্তির অন্তরায় বলিয়া মনে করে। মিশরের কবি তাঁহাকে সক্রেটিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তবে সক্রেটিস বাধ্য হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী স্বেচ্ছায় তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রভেদ। মার্কিণের ও য়ুরোপের বহু ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে দ্বিতীয় খৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা আনন্দ ও গৌরবের কথা নহে কি?

বর্ত্তমান অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ

বিলাতের India Conciliation Group বা ভারতে সন্তোষ-প্রতিষ্ঠা-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে মিঃ কার্ল হিদ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখিয়া শান্তি-প্রচেষ্টায় তাঁহাকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে যে সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বহুদিন পরে তাঁহার মনুষ্যত্ব ও নির্ভীক সত্যবাদিতার তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা মিঃ হিদ্ তাঁহার দেশবাসীকে করিলেই উপযুক্ত হইত। ভারতবর্ষকে আর বলপ্রয়োগের দ্বারা শাসন করা যাইবে না। যত বড় শক্তিশালী সরকারই হউন, আর তাঁহাদের যত বড় আধুনিক বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্রই থাকুক, ইহা আর সম্ভব হইবে না। এখন বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে কিছুতেই ভারত শাসন করা চলিবে না। ভারতবাসীরা সহযোগের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতবাসীকে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সমানের আসন দান করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের ভাগ্য আপনি নিয়ন্ত্রণ করিতে দিলে ইহা সম্ভবপর হইবে। মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের প্রভাবই অশান্তি উপদ্রব প্রশমন করিতে এবং বৃটেন ও ভারতের মধ্যে অবিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইবে। রাজনীতিক চালে উহা আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। সত্য সত্য হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অনুসৃত নীতি বর্জ্জন করিয়া আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং ভারতকে 'স্বাধীনতার কায়া' প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

কবির অন্তরের কথা গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় নির্গত হইয়াছে, বৃটিশ শান্তিদূতরা তাঁহার পরামর্শমত প্রচারে ব্রতী হইতে পারেন। ফলের আশা না রাখিয়া চেষ্টা করাই ত মনুষ্যত্ব।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বসুমতী চিত্র-বিভাগ] উষা [শিল্পী—৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ



সচিত্র মাসিক

বসুমতী

১১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ [২য় সংখ্যা

মিশরের প্রতিমা

মিশরে এক প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালাদেশের দুর্গাপ্রতিমার প্রায় অনুরূপ, কেবল গণেশপ্রতিমা নাই, আর দুর্গা প্রভৃতির মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায়। গণেশের অভাব ও মুখের বৈজাত্য উল্লেখ করিয়া য়ুরোপের কোন কোন সুধী বলিতেছেন,—উহা দুর্গাপ্রতিমা নহে। পক্ষান্তরে, প্রাচীন লিপি-বিশারদ কোন কোন মনীষী প্রতিমাপীঠে উৎকীর্ণ বর্ণাবলী পাঠ করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীদুর্গা মা' অথবা "শ্রীদুর্গাম্বা" লিখিত আছে। প্রতিমা সাড়ে বারো হাজার বৎসরের, এই প্রকার নিশ্চয় হওয়ায় দেবতা-প্রতিমার নবীনত্ববাদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ দুর্গাপূজার আধুনিকত্ব মতবাদের বিরুদ্ধে একটা অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত হওয়াতে বিদেশের ঐতিহাসিক মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

সেই প্রতিমা বিষয়ে আমার বক্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

গণেশের অভাব নানা কারণে ঘটিতে পারে,—গণেশঘটের পৃথক্ স্থাপনের ন্যায় গণেশ-মূর্ত্তি প্রতিমাসমীপে পৃথক্ স্থাপিত হইতেন,—এরূপও হইতে পারে, অথবা কোন কারণে সেই মূর্ত্তি স্খলিত হইয়াছে, এমনও হইতে পারে। বর্ত্তমানেও কচিৎ কার্ত্তিক-গণেশহীন দুর্গাপ্রতিমা যেমন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তৎকালে গণেশহীন দুর্গাপ্রতিমাও কচিৎ হইত, এরূপ নির্ণয়ও অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, গণেশের অভাব নিদর্শনে দুর্গাপ্রতিমার অস্তিত্ব বিলোপ করা যায় না।

অতঃপর ব্যাঘ্রমুখের বিচার করা যাইতেছে ;—সাধকের ধ্যানানুসারে ভগবান্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ হয়েন, সাধকের সাধনা সফল হয়, সাধক সিদ্ধি লাভ করেন।

সাধক শাস্ত্রের স্পষ্টবাক্যে বা ইঙ্গিতে প্রতীক অবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থ হয়েন।

চণ্ডীতে আছে—"দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ" মহিষাসুর-সেনানী করাল-বধের সময়ে ঐশ্বরী দুর্গামূর্ত্তির দন্ত কিরূপ ছিল, দুর্জ্জয়দানবঘাতী দন্তাবলি কিরূপ মুখে সংবদ্ধ ছিল, কোন ভক্ত সাধকের মনে হইল, তাঁহার মুখ তখন বৃকের ন্যায় ছিল,—বৃক-বদন-বিকসিত দন্তাবলির আঘাতেই অসুর করালের নিধন হয়। এই ভাবনায় সাধক অনুক্ষণ রত থাকিয়া সিদ্ধিলাভের সময়ে দেখিলেন, বৃকবদনা দুর্গা সম্মুখে আবির্ভূতা। ইহা অসম্ভব নহে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—সেই সাধকের নাম আমরা ভুলিয়াছি, কিন্তু তৎকৃত স্তোত্রের পরিচয় অন্ততঃ একটি নামে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। 'অন্ততঃ' বলিতেছি কেন ?—ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে একটি দুর্গাস্তোত্র আছে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন তাহা পাঠ করেন, এই কথাই সেখানে আছে, অর্জ্জুন যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নাই। সংস্কৃত ভাষায় 'পাঠ' ও 'রচনার' যে ভেদ আছে, বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহার ব্যবহার প্রচলিত। 'চণ্ডীপাঠ' শব্দ সুপ্রচলিত। চণ্ডী পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহারই পাঠ—চণ্ডীপাঠ, দুর্গাস্তোত্র পাঠ বা দুর্গাস্তোত্র উচ্চারণ ঠিক্ সেইরূপ। পূর্ব্বপ্রচলিত দুর্গাস্তোত্রই অর্জ্জুন পাঠ করেন। যথা—

"শ্রীভগবানুবাচ।

শুচির্ভূত্বা মহাবাহো! সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥
এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা।
অবতীর্য্য রথাৎ পার্থঃ স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥"

'স্তোত্রমুদীরয়' ইহা স্তোত্রপাঠের আদেশ। 'স্তোত্রমাহ' ইহার অর্থ স্তোত্র বলিলেন বা স্তোত্রপাঠ করিলেন। নিজের রচিত স্তব হইলে—'স্তুহি' এইরূপ আদেশ, এবং 'তুষ্টাব' এইরূপে তাহার পালনের বর্ণনা থাকিত। এই প্রাচীন স্তোত্র—'নমস্তে সিদ্ধসেনানি' হইতে 'বেদান্ত উচ্যতে' পর্য্যন্ত।

বিরাটপর্ব্বের ষষ্ঠাধ্যায়ে যুধিষ্ঠির-কৃত দুর্গাস্তোত্র আছে, সেখানে 'স্তোত্রমাহ' এরূপ নাই,—'অস্তুবৎ' (অস্তৌৎ) আছে। চণ্ডীতেও দেখা যায়, ব্রহ্মার, ঋষিগণসহ দেবগণের ও কেবল দেবগণের কৃত যে যে দেবীস্তব আছে, তাহার প্রসঙ্গে 'তুষ্টাব' 'তুষ্টুবুঃ' এইরূপ উক্তি আছে, 'যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ, ব্রহ্মণা চ কৃতাঃ" ইহাও আছে।

ব্রহ্মাদি দেবগণ চণ্ডীস্থিত স্তব পাঠ করেন নাই, তাঁহারা সেই সকল স্তবের রচয়িতা; আমরা তাহা পাঠ করি। যুধিষ্ঠির যে স্তব করেন, তাহা তাঁহার রচিত, সে রচনায় প্রাচীন স্তোত্র হইতে সংগৃহীত পদ পদার্থ অনেক ছিল, এ কথাও স্পষ্টাক্ষরে আছে, যথা—

"স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ"

অর্জ্জুন-পঠিত প্রাচীন দুর্গাস্তোত্রে 'কুমারি' 'দুর্গে' 'শিখিপিচ্ছধ্বজধরে' 'খড়্গাখেটকধারিণি' 'গোপেন্দ্রস্যানুজে' 'কালি' 'মহাকালি' ইত্যাদি পদ আছে; যুধিষ্ঠিরকৃতস্তবে এইরূপ পদ বা পদার্থ দেখিতে পাই (পাদটীকায় দুইটি স্তোত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল) * অতএব নিশ্চয় হইতেছে—অর্জ্জুন-পঠিত ভীষ্মপর্ব্বস্থ দুর্গাস্তোত্র যুধিষ্ঠিরও জানিতেন, সেই স্তোত্রের পদপদার্থ লইয়া এবং অন্য স্তোত্র হইতেও ভাব সংগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠির যে দুর্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, বিরাটপর্ব্বে সেই স্তব আছে। এই সমস্ত উক্তির সারাংশ এই যে, ভীষ্মপর্ব্বে বিবৃত অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্র প্রাচীন, মহাভারত-রচয়িতা তাহা উদ্ধৃত করিয়া

---

* অর্জ্জুন-পঠিত দুর্গাস্তোত্র (ভীষ্মপর্ব্ব ২৩ অঃ)

"নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।...
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে...খড়্গাখেটকধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে।
অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি।" ইত্যাদি

যুধিষ্ঠির-রচিত দুর্গা-স্তোত্র (বিরাটপর্ব্ব ৬ অঃ)

"অস্তুবন্ মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।...
যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং...
স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ।
নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।
ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কালি কালি মহাকালি মধুমাংসপশুপ্রিয়ে।
দুর্গাৎ তারয়সে দেবি তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।"

ইত্যাদি

দেখাইয়াছেন। এই স্তোত্র ব্যাঘ্রমুখী দেবীর সেই সিদ্ধ সাধকের হইতে পারে।

অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্রে আছে,—

"অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে।"

অভিধানে আছে—"কোক ঈহামৃগো বৃকঃ" কোক বৃকের নামান্তর, বৃকের মুখ একজাতীয় ব্যাঘ্রেরই সদৃশ।

দুর্গার ব্যাঘ্রতুল্য বদন এক সময়ে যে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা মহাভারতস্থ প্রাচীন স্তোত্রে 'কোকমুখে' এই নাম দ্বারা প্রমাণিত। প্রসিদ্ধির কারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

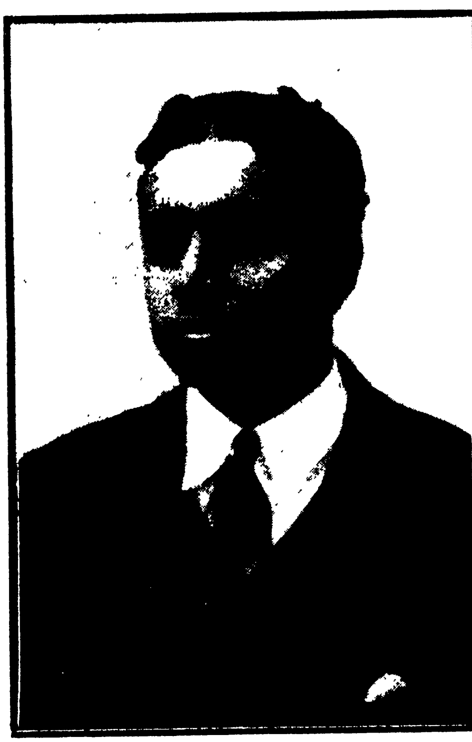
লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গারই অংশ, ত্রিরূপে চিত্রিত হইলেও মূলতঃ তিনি এক—এই ভাব লইয়া লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখও দুর্গার অনুরূপ করা অসম্ভব নহে।

মিশরে আবিষ্কৃত উক্ত প্রতিমা সাড়ে চারি হাজার বৎসরের। ইতিহাস—রাজতরঙ্গিণীর মতে ভারত-যুদ্ধের সময়ও প্রায় ঐরূপ। প্রায় একই কালে দুই সুব্যবহিত বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নাম ও মূর্ত্তির সূত্র ও উদাহরণের অস্তিত্ব একটা সত্যের আলোক আমাদিগের দৃষ্টিতে ফুটাইয়া দিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। বিরুদ্ধ-বাদীরা যাহাই বলুন, ব্যাঘ্রবদনা দুর্গামূর্ত্তি সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে পৃথিবীব্যাপিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র

যে কয়টি কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র এ দেশ হইতে প্রতিভাগুণে বৃত্তি লাভ করিয়া বিদেশে বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন এবং সেখানেও গুণের পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেন, এম, এস্, সি অন্যতম। তিনি জার্ম্মাণীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এ দেশ হইতে টাটা বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি জার্ম্মাণী যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে অতি অল্প জনের ভাগ্যেই এই গৌরবলাভ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে মিউনিকের বিমান-প্রতিষ্ঠানে ও কারখানায় হাতে-কলমে বিমানবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। মিউনিকে এই বিদ্যায় ডাক্তার উপাধি লাভ করিবার পর তিনি গটিনজেন বিমান ইনিষ্টিউটে গবেষণা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আবহবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গুণী তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত বৃত্তি প্রদান করেন। বাঙ্গালী ছাত্রের এই কৃতিত্বে বাঙ্গালীর আনন্দ করিবারই কথা। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন এবং অতীত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিয়া দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই কামনা।



অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেন



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বুঝা-পড়া

স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া অনন্ত আসিয়া দেখে, মা কেমন বিমর্ষ মুখে বসিয়া আছেন। সে কহিল,—বসে কেন মা? অসুখ হলো না কি?

মা ম্লান নয়নে ছেলের পানে চাহিলেন, তাঁর মুখে কোনো কথা বাহির হইল না।

অনন্ত তখন মার কপালে হাত দিয়া কহিল,—না, গা তো ভালো!···

মা তবু নীরব, চোখের দৃষ্টি কাতর!

অনন্ত কহিল,—হলো কি? এই দেখে গেলুম, বেশ আছো! আর স্নান করে আসতে না আসতে···যাক্, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। ভাত দিতে বলো।

মা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। অনন্ত একখানা আসন পাতিয়া তাহাতে বসিল, বসিয়া ডাকিল,—মানু···

মানু দাসী। সে-ই ঠাঁই করিয়া দেয়। কাছেই সে ছিল, অনন্তর আহ্বানে আসিল, আসিয়া কহিল,—ও মা, দাদাবাবুর আর স্বর সইলো না! নিজে থেকেই আসন পেতে নেছ! তা দি দাদাবাবু, জল দি···

মানু জল আনিয়া আসনের সামনে রাখিল, ওদিকে ভাতও আসিল। অনন্ত খাইতে বসিল। মা আসিয়া এক পাশে নিঃশব্দে বসিলেন।

অনন্ত কহিল,—কি হয়েচে, মা?

মা আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—একটা কথা বলবি···সত্যি করে?

অনন্তর মনটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। অনন্ত কহিল,—তোমার কাছে কবে মিথ্যা কথা বলেচি যে, ও কথা তুলচো! বলো, কি বলবে?

মা কহিলেন,—এই যে মেয়েটির দেখাশুনা করচিস্, এ কাদের মেয়ে?

অনন্ত কহিল,—তোমায় বলেচি তো! ঐ লাটু সাহেব ছিল···

মা কহিলেন,—লাটু সাহেবের স্ত্রী নেই, শুনচি। যাকে স্ত্রী বলে, সে নাকি বিয়ে-করা স্ত্রী নয়!

অনন্ত বিস্ময়ে ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে কহিল,—কে বললে?

মা কহিলেন,—যারা ওদের জানে, তারাই বলেচে!

অনন্ত কহিল,—তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হলো কোথায় যে বলতে এলো!

মা কহিলেন,—যেমন করেই হোক দেখা হয়েচে, আর তারা ওদের পরিচয়ও আমায় দিয়েচে।

অনন্ত কহিল,—অত বংশ-পরিচয় আমি জানি না, জানবার কোনো দরকারও কোনো দিন বোধ করি নি! কিন্তু হঠাৎ এ কথা?

মা চারিধারে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন,—তোমার কাকা রাগ করছিল—আমায় বলে গেল, তার কে বন্ধু তোমায় দেখেচে ঐ লাটু সাহেবের মেয়ের সঙ্গে মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ! তোমার কাকাকে সেই কথা সে বলে গেছে।

অনন্ত কোনো কথা কহিল না, মার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা কহিলেন,—এ সব ভালো কথা নয়, বাবা। অসহায়,

বেশ, তাকে সাহায্য করো। কিন্তু তোমাদের এখন যে বয়স, সে বয়সে ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা তেমন হয় না! মনের ঝোঁকে কাজ করে বেড়াও! তোমার এ কাজ যে মন্দ, তা আমি বলচি না—এ বেড়ানোয় দোষেরও কিছু নেই। তবে আপনার জন সতর্ক করে—তার কারণ, এ-বয়সে দুজনের একসঙ্গে বেড়ানো বা বসে গল্প করায় নানা ঘটনা ঘটতে পারে। সে কথা যাক্! ধরো, ঐ মেয়েটির এখনো বিয়ে হয়নি, তুমি সোমত্ত ছেলে—তোমার সঙ্গে একা এই পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এর পরে কোথাও বিয়ের কথা উঠলে তারা যদি বলে, মেয়ে মন্দ—তাহলে ও-মেয়ের বিয়ে হওয়াই দায় হবে। আমাদের দেশে এ রীতির চলন নেই—মানুষ কু-টাই আগে থেকে গড়ে নেয়। বোঝো বাবা···তুমিই যদি আর কোনো মেয়েকে বাইরের কারো এমনি বেড়াতে ছাখো,—তোমার মনে কি হয়?

অনন্ত কহিল—মাপ করো মা—আমার মন এমন নীচ নয় যে, সব-বস্তুর কদর্থ গড়ে নেবো!···আমি তো এতে দোষের কিছু দেখি না···এতে দোষও কিছু নেই···

মা কহিলেন,—আমি তা জানি বাবা—কিন্তু আমায় নিয়েই তো সবার মন নয়, সমাজ নয়।

অনন্তর বুকের মধ্যে একরাশ কথা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিল। ইতর অভদ্র মানুষ-জনের তুচ্ছ কথার ধার সে ধারে না···কালিমাখা মন লইয়া দুনিয়াকে কালো দেখিতে যারা নিপুণ, তাদের কথায় ভয় করিয়া চলিলে জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করাই সার হইবে—শুধু নিজের জীবন নয়, সকলের জীবন! কিন্তু মার কাছে সে-সব কথা তুলিয়া ফল নাই! মাকে সে জানে···মার মনে যে ও-সব ইতর সংশয় স্থান পায় না, তাও সে জানে। জানে বলিয়াই পরিমলের বিবরণ অকপটে মার কাছে সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিয়াছে!

মা কহিলেন—মেয়েটিকে সাহায্য করচো, করো। সে কথা তুমি জানো, আমি জানি। তবে পথে-ঘাটে ঘোরা—ওটুকু করো না বাবা···পাঁচজনে মন্দ কথা বলবে,—মিছে হলেও আমার পক্ষে তা সহ্য শক্ত!

অনন্ত কহিল—কিন্তু মা···

কথাটা শেষ হইল না; কাকা আসিয়া দেখা দিল, কহিল—সন্ধ্যার সময় আজ-কাল মাঠে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে?

অনন্ত কোনো জবাব দিল না। কাকা কহিল—যখন স্বাধীন হবে, তখন যাকে-তাকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ালে কিছু না বলতে পারি, কিন্তু এখন আমাদের মেনে চলাই তোমার উচিত। যা-তা মেয়ের সঙ্গে ও-রকম বেড়াও যদি, তাহলে আমাদের মাথা হেঁট হয়!···

অনন্ত কহিল,—আপনি ভুল বুঝচেন···

কাকা কহিল—তোমরা আজকাল ঐ কথাই বলবে,—তা জানি। তোমাদের সাহিত্যও দেখি বেপরোয়া হয়ে উঠেচে—সম্ভ্রম, মর্য্যাদা—এ কথাগুলো ঐ সাহিত্য শেখাচ্ছে, কুসংস্কার! কিন্তু আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ···সাহিত্যের জীব নই—জগৎটাও সত্য জগৎ, সাহিত্য-জগৎ নয়···কাজেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য আমাদের মেনে চলতে হয়। তুমিও যখন সাহিত্য-জগতের জীব নও, তখন তোমারও উচিত এ-সব মেনে চলা। তাছাড়া তোমার এখন পড়ার সময়—পড়ে পাশ করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। কলেজ যাওয়ার সঙ্গে অপরের যুবতী মেয়ে নিয়ে রোমান্সের চর্চ্চা···উপন্যাসের পাতাতেই এ-সব সম্ভব হয়···বাস্তব জগতে নয়। আশা করি, এ কথাগুলো খেয়ালে রাখবে।

এই সব ইতর সংশয়ের কথায় অনন্তর রাগ ধরিতেছিল, কিন্তু কি তর্ক করিবে? কাজেই নীরবে এ-সব কথা শুনিতে হইল। শেষের কথাগুলায় ধৈর্য্য রাখা দায় হইল, প্রতিবাদ তুলিয়া সে কহিল,—কিন্তু আমি বুঝচি না, এ-সব ইতর কথা···

কাকা ফোঁশ্ করিয়া উঠিল, কহিল—ইতর!···তাই যদি মনে হয়, বেশ, কলেজ ছেড়ে দাও, দিয়ে রোমান্সে গা ভাসিয়ে চলো। মন যদি এমন উন্নত হয়ে থাকে, মিছে কেন বইয়ের আড়াল তুলে বসে থাকা! তোমাদের এ বয়সের শাস্ত্র এ-সব ব্যাপারকে moral courage বলবে, তাও আমি জানি।···

অসহ্য! তবু না—কার সঙ্গে বৃথা তর্ক করিবে! অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। কাকা কহিল—এ-সব কথা মানুষ ছেলের সঙ্গে এ-ভাবে কখনো কয়নি—কবার প্রয়োজন কখনো বোধ করেনি। এখন যে-হাওয়া বইতে দেখচি,—কিন্তু

যাক্—সে কথার প্রয়োজন নেই। তবে আমি যতক্ষণ মাথার উপর আছি, এবং যতক্ষণ আমায় লোকের চোখে অন্ততঃ খানিকটা দায়িত্ব বইতে হচ্ছে, ততক্ষণ এ-সবের প্রশ্রয় আমি দেবো না, এই বুঝে ব্যবস্থা করো।···

কাকা চলিয়া গেল। অনন্ত গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল—তার পর সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মা কহিলেন—কিছুই খেলিনে যে!

অনন্ত কহিল,—খাবার প্রবৃত্তি নেই মা।

অনন্ত মুখ-হাত ধুইল। মা ডাকিলেন,—অনন্ত···

অনন্ত কহিল,—না মা, কোনো অপরাধ করিনি, অথচ তার তিরস্কার সহ্য করবো, সে শক্তি আমার নেই! কাকা যা বলে গেল,—বেশ, তাই হবে। ওঁর যেমন দায়িত্ব আছে, আমারও তেমনি একটা দায়িত্ব আছে—সকল বিষয়েই!···

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। মা কহিলেন,—কলেজে যাচ্ছিস?

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ।

—তার পর?

অনন্ত কহিল—যা হয়, একটা ব্যবস্থা করবো। এখন কিছু বুঝতে পারচি না।

মা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—অনন্ত চলিয়া গেল।

সে কলেজে গেল না—ট্রামে চড়িয়া সোজা ময়দানে গিয়া নামিল।

মাঠের মাঝখানে একখানা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে গিয়া সে বসিল। চারিদিকে নগরের কর্ম্মপ্রবাহ ছুটিয়া বহিয়া চলিয়াছে—অধীর চঞ্চল গতিতে! ধরণী ভেদ করিয়া এক উত্তেজনার সুর ফুটিয়াছে—কোলাহল-কলরবের অন্ত নাই! শুধু চলা, শুধু ছোটা—কাহারো দাঁড়াইবার অবসর নাই! কেহ কাহারও পানে ফিরিয়া দেখিবে, সে অবসর কোথায়? ইহারই অন্তরাল দিয়া হাসির একটু ঝিলিক্, অশ্রুর একটা বিন্দু! বিশ্বগ্রাসী এ কোলাহলে সে-হাসি, সে-অশ্রু কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া যাইতেছে!

সে ভাবিল, কাকার উপর রাগ করিয়াছিল—কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্য কি কিছু নাই? তার সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ—মাটীর তালের মত পড়িয়া আছে। সময় থাকিতে সে-মাটী ঘাঁটিয়া কাটিয়া ছাঁচে ফেলিতে না পারিলে কিছুই গড়া হইবে না, মাটীর তাল সামনে রাখিয়াই দিন কাটাইতে হইবে! এখন কি তার এ কাজ সাজে—কোথায় কে অসহায়া তরুণী দুঃখে-বেদনায় সারা হইতেছে, তার সে দুঃখ দূর করিতে ছোটা!

কতটুকু তার শক্তি! কার কতটুকু দুঃখ সে ঘুচাইতে পারে! এই যে, পরিমলের জন্য এখান হইতে ওখান হইতে টাকা জোগাড় করিয়া শূন্যতা ঢাকিবার প্রয়াস পাইতেছে—এই ভিক্ষার সাহায্যে কত শূন্যতা কতক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে! হাতের পুঁজি দুদিনে ফুরাইবে। তখন···?

প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের প্রতি কাজ, প্রতি কথা তার মনে পড়িল! পয়সা খরচ করিয়া পরিকে লইয়া বায়োস্কোপে যাওয়া, মাঠে বেড়ানো,—প্রাণে ইহাতে আনন্দ জাগিয়াছে খুবই। একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যও ফুটিয়াছিল—কিন্তু এ-সবে তো দুঃখ ঘুচিবে না! এ তো মনের বিলাস-লীলা।···এমনি চিন্তার পর চিন্তায় তার মন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল···চোখের সামনে যেন অকূল সমুদ্রের আভাস জাগিল! এ পয়সা ফুরাইলে, কার কাছে গিয়া হাত পাতিবে? কাহাকে বলিবে যে, ওগো, আমায় কিছু ধার দাও—এক অসহায়া তরুণীকে আমি আশ্রয় দিয়াছি? আমি নিজে অসহায়—পয়সার সামর্থ্য আমার নাই!···যদি তারা বলে,—এ পয়সায় তাকে লইয়া বায়োস্কোপে যাইবে তো? ময়দানে হাওয়া খাইতে যাইবে তো?···

ঠিক! আশ্রয়ের সহিত এ-সবের কোনো সম্পর্ক নাই! এ সে কি করিয়াছে!···তরুণী পরিমল—তাই সকল দিক দিয়া তার মনে আনন্দ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এ প্রয়াসের অর্থ? তার চিত্ত-হরণ···? ছি! কাকা যে কথাগুলা বলিল—ঐ বাস্তব-জগৎ, সাহিত্য-জগৎ, সে কথা তবে···

মন তার গ্লানিতে ভরিয়া এতটুকু হইয়া গেল। পরিমল তরুণী, তাই তার সঙ্গ-কামনায় সে এত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে। বিধবা মা···অনন্তর মুখ চাহিয়া তিনি বসিয়া আছেন! আর অনন্ত সহসা যৌবন-লীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে! কাল রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত দুজনে বসিয়া কবিতার বহি পড়িয়াছে। লাইব্রেরী হইতে বই আনিয়াছে—কতকগুলা উপন্যাসও কিনিয়া দিয়াছে!

কেন? কেন? কেন এ সমারোহ?…মনকে বহু প্রশ্ন করিয়া, মনের সঙ্গে বহু ভাবে বুঝাপড়া করিয়া সে বুঝিল, এ তো জীবনে সে সাহিত্য রচিয়া বেড়াইতেছে! কলেজে-পড়া তরুণ নায়ক—আশ্রিতা-লতা তরুণী নায়িকা—একান্তে নিরালায় বসিয়া এই কাব্যচর্চ্চা! ইহাকে বলে বিপন্নকে আশ্রয়-দান?

মন গর্জ্জন তুলিয়া বলিল—না, না!

উপায়? পরিমলকে ত্যাগ করিয়া যেমন ছিল, তেমনি থাকিবে? তাকে বলিবে, আমার যাহা করিবার, করা হইয়াছে, আর আমার শক্তি নাই! আমায় ক্ষমা করো, বিদায় দাও…? তার অর্থ, পরিমল অকূলে ভাসিবে।

যদি ভাসে—তার কি! এমন তো অনেকে ভাসিতেছে। …কিন্তু…না, এ-দায় তার—এ-দায় অনন্তর। পরিমল তো যাচিয়া শৃঙ্খল হইতে আসে নাই। পরিমল নিজের পথ বাছিয়া লইবে বলিয়াছিল…অনন্তর সাহায্য সে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিল! অনন্তই জোর করিয়া তাকে এখানে আনিয়া আশ্রয়-নীড় রচিয়া দিয়াছে! আর আজ কাপুরুষের মত পরিমলকে বলিবে—তুমি চলিয়া যাও…এ নীড় আমি ভাঙ্গিয়া দিব? খেয়াল হইয়াছিল, দু'দণ্ডের জন্য নীড় বাঁধিয়া ছিলাম! এখন খেয়াল ভাঙ্গিয়াছে, নীড় তাই ভাঙ্গিয়া দিব।…

তা হয় না!

তবে উপায়?…

অনন্ত ভাবিল, কি নিরুপায়, হতভাগা সে! বিপন্নকে সাহায্য করিবে, সে-শক্তিরও তার এমন অভাব!…কিন্তু তার সম্মুখেও বিপদ যে পাহাড়ের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! নিজেকে রক্ষা করিবার শক্তি যার নাই, সে চায় অপরকে রক্ষা করিতে!…

কিন্তু না—পরিমলকে কিছু জানিতে দেওয়া হইবে না! প্রভাতকে আজই চিঠি লিখিবে…তার হাতে যদি পরিমলের ভার দিতে পারে, ভালো! নহিলে যাচিয়া এক বার যখন এ ভার মাথায় লইয়াছে, তখন তার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, পরিমল নিজে কিছু না করিলে এ-ভার সে মাথায় বহিবে—চিরদিন—চিরদিন!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুখরা

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনন্তর হুঁশ হইল, পরি তাকে বলিয়াছিল, বাগমারির দিকে একবার সন্ধান লইতে, মার ও বাবার কোনো খবর যদি পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অন্নদাবাবুই বা কি করিতেছেন? চুপ করিয়া গেলেন? না…

অনন্তর আজ সকাল-সকাল ছুটী হইবার কথা ছিল, তাই এমন পরামর্শ হইয়াছিল।

সে কথা মনে পড়িতে অনন্ত ভাবিল, বাগমারি যাইব কি? যাওয়া উচিত। যদি তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিমলের ভার মাথা হইতে নামাইতে পারিবে! তাই সে ট্রামে চড়িয়া হেদুয়ার ধারে আসিয়া নামিল।

বাগমারিতে সস্ত্রীক লাটুবাবুর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। সেই উড়িয়া মালী বলিল, এক বুড়া বাবু আসিয়া মাল-পত্র বাহির করিয়া লরির উপর চাপাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খালি, সেই বাবুর লোক আসিয়া বড় তালা লাগাইয়া দিয়াছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত আসিয়া পরিমলের কাছে সে কাহিনী বিবৃত করিল।

পরি কহিল,—কিন্তু এ তো ভারী আশ্চর্য্য কথা! বাবা-মা এমন নিরুদ্দেশ রইলো! এক বার আমার কথা মনেও হয় না! তার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

অনন্ত কহিল,—তোমার ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন বলেই…

বাধা দিয়া পরি কহিল,—কিন্তু এ কি স্বার্থপরতা! সে ভার বইবার আপনার কতটুকু সাধ্য! আপনার নিজের কাজ আছে, ঘর আছে, দোর আছে, আত্মীয়-স্বজন আছেন, কদ্দিন আপনি আমার ভার মাথায় বইবেন! না, না, আপনাকে এ-ভাবে বিব্রত করতে আমার ভারী বাধচে!

অনন্ত ম্লান নেত্রে পরিমলের পানে চাহিল। ঘরে ল্যাম্প জ্বলিতেছে, তাহারি অনুজ্জ্বল আলোয় অনন্ত দেখে, পরির মুখে বেদনার ছায়া! নিজেকে সে ধিক্কার দিল, লোকের কথায় এমন অসহায়কেও ত্যাগ করার কথা তার মনে উদয় হয়! অনন্ত কহিল,—আমায় কোন্‌খানটায় বিব্রত দেখলে তুমি?

পরি কহিল,—হু'দিনে হয় তো আপনি তা বুঝচেন না, কিন্তু আমি বুঝচি।

—কি বুঝচো?

ছোট একটা নিশ্বাস কষ্টে রোধ করিয়া পরি কহিল,—বুঝচি বৈ কি! আপনি কলেজে পড়েন, রোজগার করেন না, আমার জন্য একটা খরচ আছে। সে-খরচ···

অনন্ত কহিল,—সে-খরচে যখন বাধবে, তখন না হয় সে-চিন্তা করবো···

পরি কহিল,—হুঁ! বলিয়া সে চুপ করিল। চুপ করিয়া কি ভাবিল, অনেকক্ষণ। তার পর নিশ্বাসটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—মানুষের জীবন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ধরে চলে না চিরদিন। আজ আপনার গণ্ডী ছোট—বুঝতে পারচেন না! পরে যখন সংসার বড় হয়ে দেখা দেবে, স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়াবে,—সেই সঙ্গে নানা কর্ত্তব্য—জীবন যখন আর ছেলেখেলা থাকবে না—তখন···? চিরকাল যদি আমার মা-বাপ আমার কোনো সন্ধান না নেয়? আমার জীবনও দীর্ঘ হবে না, এ-কথা কে বলতে পারে? আমার সারা জীবন ধরেই কি আপনি আমার সকল ভার মাথায় বইবেন?

একাগ্র দৃষ্টিতে অনন্ত পরির পানে চাহিয়াছিল···অখণ্ড মনোযোগে পরির প্রত্যেক কথা সে শুনিল, শুনিয়া কহিল—অত সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষ কোনো দিন করে না—করতে পারে না। করলে তার হাত পা এলিয়ে যেতো—সে বিভ্রান্ত হতো! অত সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা নাই করলুম! না করে, বর্ত্তমানে যতক্ষণ কোনো বাধা এসে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ এই বর্ত্তমানকেই সমঞ্জস করা উচিত নয় কি? ভবিষ্যতের বাধা-বিপত্তি কল্পনা করে পঙ্গু হওয়া কি ঠিক হবে?

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া পরিমল কহিল—আপনি অত দূর-ভবিষ্যতের কথা না ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার তা না ভাবলে নয়! অনিশ্চিতকে সম্বল করে মানুষ দিন কাটাতে পারে? আপনি পারেন না, আমিও না। মানুষ না চললেও, চলার পথের একটা হদিশ সে রাখে। আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন, তাহলে বুঝতেন, আমায় চলতে হবে—এবং সে চলার পথে কত বড় বড় বাধা-বিপত্তি!··· সামনের পথে তারা এমন আড়াল তুলে ধরেচে যে, ওদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামনে পথ আছে কি নেই, তাও আমি বুঝতে পারচি না···আর তা বুঝতে পারচি না বলেই আমার মন একদণ্ড সুস্থির নয়—সারাক্ষণ আতঙ্কে ছম্‌ছম্ করচে!

কথাগুলা অনন্ত নিঃশব্দে শুনিল, শুনিয়া চিন্তা করিয়া দেখিল, পরির এ আতঙ্ক সত্যই অমূলক নয়। তার সারা জীবন সত্যই অনিশ্চিত—পরের করুণার উপর ভর করিয়া দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নাই! যে-কথা সে বলিয়াছে, গল্পে-উপন্যাসে সে কথা মানায়—পড়িতে শুনিতে ভালোও লাগে—কিন্তু জীবন সত্যই উপন্যাস নয়! জীবনে মানুষের কত বৈচিত্র্য ঘটিয়া যায়···ঘটনাচক্রে মনের গতি বাঁকিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তার কি কোনো স্থিরতা আছে! তাই সে পরির কথার জবাব দিতে পারিল না।

পরি কহিল—সারা দুপুরবেলাটা একলা থাকি—তখন নিজের নিঃসঙ্গতায়, এই নিঃসম্পর্কতায় সত্যই আমি শিউরে উঠি!···আজ অনেক কথা মনে আসছিল। দেখলুম, আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিত! এত অনিশ্চিতের মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না, অনন্তবাবু!

কথার শেষে অশ্রুর বাষ্পে পরিমলের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল।

অনন্ত কহিল—কি হলে এই অনিশ্চয়তার আতঙ্ক কাটে, বলতে পারো?

করুণ দৃষ্টিতে পরি অনন্তর পানে চাহিয়া রহিল—তার চোখের উপর বাষ্প জমিয়া চারিদিক অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা করিয়া তুলিল।

অনন্ত কহিল,—বলো পরিমল···অনন্তর স্বরে স্নেহ, মায়া, প্রীতি একেবারে উথলিয়া উঠিল।

সে কথায় পরিমলের মন দুলিল। সে কহিল,—না, তা বুঝতে পারচি না। বলিয়া সে চুপ করিল, তার পর গদগদভাবেই কহিল,—এক-এক সময় নিজের উপর এমন ধিক্কার ধরে, মা-বাপ মুখের পানে চাইলো না! নিজেদের দুঃখ এত বড় হলো যে মেয়েকে পথে একেবারে অসহায় দাঁড় করিয়ে সরে গেল! এমন ঘটনা উপন্যাসে কখনো পড়েচেন? না, এমন অসহায়তার কল্পনা কখনো করেচেন?

উদাস নয়নে অনন্ত পরির পানে চাহিয়া রহিল। তার

চোখের সামনে হইতে পরির মূর্ত্তিখানা অদৃশ্য হইয়া ছায়ার পিছনে সরিয়া যাইতেছিল, আর তার জায়গায় যেন এক অকূল সমুদ্রের অসীম উত্তাল তরঙ্গমালা নাচিয়া ছুটিয়া ফুঁশিয়া বহিয়া চলিয়াছে !

দাসী আসিয়া ডাকিল,—দিদিমণি···

পরির চেতনা হইল। এতক্ষণ সেও যেন ঐ সমুদ্র দেখিতেছিল ! কণ্ঠ সম্বৃত করিয়া পরি ছোট্ট জবাব দিল,—কেন ?

দাসী কহিল,—কয়লা যে সব পুড়ে গেল। রান্না চাপাবে না ?

পরি কহিল,—যাই।

দাসী কহিল,—হ্যাঁ, এসো। আজ আবার আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, কাল ভোরের গাড়ীতে আমার ঐ বোনপো দেশে যাবে কি না ! তার সব গোছ-গাছ করে রাখতে হবে, ভাই।···দাসী চলিয়া গেল।

অনন্ত কহিল,—আজ রাত্রে ও থাকবে না ?

পরি কহিল,—না। ও তো রোজই বাড়ী যায়। দু'দিন শুধু ছিল। বোনপোর বউয়ের সঙ্গে কি না কি ঝগড়া হয়েছিল, তাই !

অনন্ত কহিল,—হুঁ !

পরি কহিল,—কেন, বলুন তো ?

অনন্ত কহিল,—মানে, বাড়ীতে মার শরীরটা ভালো নেই, আমার পক্ষে আজ রাত্রে বাড়ী যেতে পারলেই ভালো হতো ! তাই···

পরি কহিল,—তা যান না।

ঘাড় নাড়িয়া অনন্ত কহিল,—তা হয় না।

—কেন হয় না ? পরি মৃদু হাসিল।

অনন্ত কহিল,—পাগল !

পরি কহিল,—আমায় আগলাবে কে, তাই ?···এই যে কি মিছে ভাবনা আপনি ভাবেন ! সেই প্রথম দিনেই বলেছিলুম না, ভগবান যাকে পথে এনে দাঁড় করিয়েচেন, তার জন্য চৌকিদারীর কথা মনে আনবেন না ! আপনাদের সঙ্গে সেদিন আলিপুরের জুয়ে যদি দেখা না হতো ? ভাবুন তো, তা হলে কি আর এমন দুগ্রহের মত আপনার জীবন-পথে এসে আমি দাঁড়াতে পারতুম ! তা হলে কি হতো আজ ?

অনন্ত কহিল,—ঘটনা-চক্রে জীবন-পথে এমন ভাবে যখন এসে পড়েচো, তখন দেখতে হবে বৈ কি ! দুজনে এখন এক পথের পথিক···

অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে অনন্তকে নিমেষের জন্য লক্ষ্য করিয়া পরি কহিল—না, না ! পাগলামি রাখুন—বাড়ী যান্। সত্যি, মার অসুখ। এ-কাজের মত সে-কাজও আপনার কর্ত্তব্য ! তাছাড়া এ-কথা শুনে আপনাকে কিছুতেই আমি এখানে আজ রাত্রে থাকতে দেবো না। যদি থাকেন তো ভারী রাগ করবো—আড়ি হয়ে যাবে, সত্যি বলচি।

পরির কথায় কি সারল্য ! অনন্তর চিত্ত গলিয়া গেল। না, না, জীবনে তার যাহা ঘটে, ঘটুক—মিথ্যা অপযশের কালিমায় ডুবিয়া যদি তাকে কলঙ্কিত করিয়া দেয়, তবু সে পরিকে নিঃশঙ্ক নিরাপদ না দেখা পর্য্যন্ত তার ভার ত্যাগ করিবে না ! নিজেকে সে জানে—কোনো দুর্ব্বল মোহ তার এ-চিত্তে ছায়াপাত করিবে না। তেমন আশঙ্কার কারণ যদি ঘটে, তাহা হইলে নিজে সুপাত্র খুঁজিয়া তার হাতে পরিকে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে—নিজেকে স্বার্থের বিষে মলিন করিবে না—কখনো না ! কাকার সংশয় যে কতখানি অহেতুক, তাহা সে প্রমাণ করিয়া দিবে !

পরি কহিল—আজ বোধ হয় কলেজ থেকে বাড়ী ফেরেন নি !

অনন্ত কহিল—না। বাগমারি গেছলুম।

পরি ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল,—বিকেলে কিছু খান্‌নি—নিশ্চয় ? দেখুন তো অন্যায় ! না, আর কোনো কথা নয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে কাব্য-রচনাও নয়, বর্ত্তমান নিয়েই খুশী থাকা যাক। আসুন—খানকতক লুচি ভেজে দি আপনাকে। খান্—খেয়ে বাড়ী যান !

পরি গমনোদ্যত হইল। অনন্ত কহিল—বেশ,—তাই হবে। তুমি লুচি ভাজো গিয়ে, আমার দু'একখানা চিঠি লেখবার আছে, ততক্ষণে সেই চিঠি লিখে ফেলি।

পরি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। অনন্তও প্রভাতকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল,—

মাখন যদি ভালো থাকে, তাহা হইলে আসিতে আর একদিন দেরী করিয়ো না। কলেজ কামাই করা উচিত নয়—লেকচার ভালো হইতেছে। তাছাড়া এখানে

লাটুসাহেব-ঘটিত সমস্যা খুবই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না! এসো। বন্ধু, এসো। তুমি ভিন্ন সহায় আর কেহ নাই!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-চক্র

গৃহে আবার সেই কলরব! মা বলিলেন—আমি বাবা পাঁচজনের কথায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচি। মেয়েটিকে ফেলতে বলি না, দেখাশুনা কর্। তবে রাত্রে বাড়ী আয়।

অনন্তর রাগ ধরিল—এ-ব্যাপারে দুনিয়ার এত মাথা-ব্যথা ধরে কেন? কাহারো অধিকারে তারা হস্তক্ষেপ করিতেছে না, কাহারো কোনো অসুবিধা ঘটাইতেছে না! তবু? তাছাড়া সে যদি মন্দই হয়—আর কাহাকেও তো ধরিয়া মন্দ করিতে যাইতেছে না!

খুড়িমা কহিলেন—এই বয়সে ভারী সাবধানে থাকতে হয়, না থাকলে বয়ে যেতে দেরী হয় না। ঐ যে আমাদের শ্যামলাল…

উত্তরে একরাশ ঝাঁজালো কথা মনে উদয় হইয়াছিল—কিন্তু মার চোখে করুণ মিনতি দেখিয়া অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। রাগে তার গা জ্বলিতেছিল। তাকে এরা এমন অভদ্র ইতর নীচ মনে করে! এক অসহায়া তরুণীর রক্ষার ভার লইয়া…

ছি!

সকালেও চারিদিক হইতে অজস্র উপদেশ-বাণী উৎসারিত হইল। খুড়িমা স্নেহ দেখাইয়া কহিল,—ছেলে বড় হয়েচে, দিদি, সত্যি। ভালো একটি মেয়ে দেখে এবার ওর বিয়ে দাও!

অসহ্য! এ কথার পিছনে কতখানি ইতর ইঙ্গিত! রাগিয়া অনন্ত কহিল—থাক্—আর হিত-কথা শোনাতে হবে না কাকেও। দুনিয়া টলে গেলেও আমি বাড়ীর বার হবো না—সুবোধ গোপাল হয়ে বাড়ীতেই থাকবো। তাহলে তোমাদের আতঙ্ক ঘুচবে তো?

কথাটা বলিয়া সে পড়ার ঘরে চলিয়া গেল; গিয়া এক-খানা কাগজ টানিয়া চিঠি লিখিতে বসিল।—চিঠি পরিকে।

অনন্ত লিখিল—তোমায় বিপদের মুখে ফেলি নাই বলিয়া বাড়ীতে মহা-দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। কাজেই আমি এখন দু'চারদিন যাইতে পারিব না। দেখা হইলে সব কথা বলিব। প্রয়োজন বুঝিলে কলেজের ঠিকানায় খামে আমায় লিখিয়া জানাইয়ো। একটা চাকর ঠিক করিবে চৌকিদারীর জন্য। তোমার বয়সে একা থাকায় আশঙ্কা যে নাই, এমন নয়। আমরা বড় ইতর, বড় অভদ্র…

মনের আবেগে এমনি নানা কথা লিখিয়া চিঠিখানাকে সে দীর্ঘ করিয়া ফেলিল। চিঠি লিখিয়া লেফাফায় আঁটিতে যাইতেছে, হঠাৎ খেয়াল হইল, কি লিখিলাম, পড়িয়া দেখি। পড়িয়া দেখিতে মাথা ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! এ কি লিখিয়াছে! আত্মগ্লানিতে পরি তো একেই মরিয়া আছে—তার অভিমানের সীমা নাই—তার উপর সেও পরিকে এই সব যা-তা লিখিয়া বসিয়াছে? সর্ব্বনাশ! এ চিঠি পড়িলে এক মুহূর্ত্ত সে আর গৃহে থাকিবে না…হয় গিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, নয় মুক্ত পৃথিবীর বুকে নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইবে!

চিঠিখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল—ছিঁড়িয়া ভাবিতে বসিল। সত্য, এখন কি করা যায়? পরিও ভয়ের যে সব কথা বলিয়াছে!…কেন অমন কথা বলিল? অনন্ত জিদ করিয়া তার ভার গ্রহণ করিয়াছে—তাকে পরি এমন হীন ভাবে যে স্বেচ্ছায় এ ভার লইয়া নিজেকে সে আজ বিব্রত উৎপীড়িত ভাবিতেছে! তার উপর তুমি কত অসহায়—তুমি তাহা জানো না! জানো না, দুনিয়ার পথে নারীর বিপদ কতদিকে কতখানি! এমন অবস্থায় এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাও কি বলিয়া? কোথায় বা যাইবে? উপন্যাসে এমন কিছু যদি পড়িয়া থাকো, এবং পৃথিবীর মুক্ত প্রান্তরের বর্ণনায় যদি বা তাকে নিরাপদ, মনোহর ভাবিয়া থাকো…সে ভুল! জীবন সত্যই উপন্যাস নয়, জীবন্ত মানুষ-গুলা উপন্যাসের আদর্শ ঘেঁষিয়া কোনোদিন চলিতে জানে না! তাই না অনন্তর এত আরাধনা—তোমায় ধরিয়া রাখিতে! তাই সে যাইতে দিবে না—দিতে পারে না! তোমার ভার আনন্দেই সে বহন করিতেছে। তুমি তাহা জানো, এবং জানো বলিয়াই এ-কথা বোঝো না যে, যে-সব কথা অনন্তকে বলিয়াছ! সব কথায় তাহাকে আঘাত দেওয়া হয় কতখানি, তাহা কি…

অনন্তর অভিমান হইল… তার উপর গৃহে ঐ বিশ্রী কলরব। মা—তার মনের সকল তথ্য, এবং তাকে

ভালো করিয়া জানিয়া পরের কথায় বিচলিত হন্! অনন্তর জন্য তাঁর দরদ হয় না? সে যে এতখানি মহত্ত্ব করিতে বসিয়াছে—কতটুকু শক্তি লইয়া···

নানা কথা বুকের মধ্যে ঝড় তুলিল।···

সে ঝড় শান্ত হইলে অনন্ত পরিকে লিখিল—মার অসুখ বেশী—তাই দু'একদিন হয় তো যাইতে পারিব না—যতক্ষণ ভালো না দেখি। আমি ছাড়া মাকে দেখিবার আর কেহ নাই, তাহাও তুমি জানো! একান্ত প্রয়োজন হইলে খামে চিঠি দিয়ো। বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। দাসীকে বলিয়ো, যে কয়দিন আমি যাইতে না পারি, সে যেন দিবারাত্র থাকে···সেজন্য তাকে দু'টাকা ধরিয়া দিব। আমার এ কথাটুকু রাখিয়ো, একান্ত অনুরোধ, লক্ষ্মীটি!···

লিখিয়া চিঠিখানা দু'বার তিনবার পড়িল; 'লক্ষ্মীটি' কথাটা ভারী মিষ্ট বোধ হইল। কিন্তু···

না, ভালো দেখায় না! এ-কথার সঙ্গে···

মন কাঁপিল। না—না! 'লক্ষ্মীটি' কথা কাটিয়া তলায় নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানা খামে আঁটিয়া সে কলেজের বইয়ের মধ্যে রাখিল—কলেজে যাইবার পথে টিকিট লাগাইয়া ডাকে দিবে।···

তার পর তিনদিন রীতিমত যুঝিয়া আপনাকে সে গৃহে আটকাইয়া রাখিল···পরির কাছে গেল না। মনে অসহ্য আকুলতা—কি করিয়া তা রোধ করিল, ভাবিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া গেল!···

রাত্রে বিছানায় পড়িয়া ধিক্কারে নিজেকে সে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। মানুষ সে? অধম, কাপুরুষ! কার উপর রাগ করিয়া কাহাকে সে পীড়ন করিতে বসিয়াছে! না, আর নয়—কাল সকালেই সে মাণিকতলায় যাইবে—পরির সঙ্গে দেখা করিবে! আপনাকে সে প্রশ্ন করিতে লাগিল, বিবিধ প্রশ্ন।···এবং সে প্রশ্নের যে উত্তর মন তাকে দিল, তাহাতে লজ্জায় সে একেবারে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু কিসের লজ্জা! পরিকে সে জানে। তার যে-পরিচয়ই থাকুক—হাঁ, পরির ভার সারাজীবনের জন্য সে গ্রহণ করিবে! বিবাহ? প্রয়োজন হয়, বিবাহই করিবে—পরির যদি আপত্তি না থাকে! পরির মত মেয়েকে অজানা কে আসিয়া বিবাহ করিবে—তাকে যে জানে না, এমন লোক! যদি ঐ মা-বাপের সত্য পরিচয় তাই হয়—সে পরিচয় জানিলে সে পাত্র যদি পরিকে পরে ঘৃণা করে? পরি কি তাহা হইলে বাঁচিবে? না।···বাঁচিয়া থাকিতে পরিকে এমন বিপদের মুখে সে কখনো ঠেলিয়া দিবে না। এজন্য সমাজ যদি বিদ্রোহ তোলে—তুলুক! সমাজের আগে পরিকে সে মানিবে! মা? মা যদি অবুঝ হন···পরের কথায় বিচলিত হন্! ভালো করিয়া বুঝাইলে মা নিশ্চয় বুঝিবেন। যুক্তি-তর্কে না বুঝুন—স্নেহ-দরদে মাকে বুঝানো কঠিন হইবে না। তা যদি না হয় তো সে কাহাকেও কেয়ার করিবে না! কেন করিবে?

কাকা? কাকার তো বড় দরদ! খুড়িমা? তিনি তো পলিটিসিয়ান্!

সকালে যখন অনন্তর ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আটটা বাজে। টেবিলের উপর পেয়ালায় চা ঢাকা। অনন্ত শিহরিয়া উঠিল, ইস্, এত বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি সে মুখ-হাত ধুইতে গেল।

ফিরিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া দেখে, চা নয়, শরবৎ, ঠাণ্ডা কন্কন্ করিতেছে। রাগ হইল। ইচ্ছা হইল, একবার চাকরটাকে ডাকে, ডাকিয়া ভর্ৎসনায় বিপ্লব বাধাইয়া দেয়। কিন্তু না, তার আগে অন্য কাজ আছে, মস্ত কাজ। মাণিকতলায় যাইতে হইবে।

বেশ-ভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইতেছে, হঠাৎ সামনে দেখে, প্রভাত!

প্রভাত কহিল,—খপর কি? কোথায় চলেছো এ সময়?

অনন্ত নিমেষের জন্য স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

প্রভাত কহিল,—কি দেখচো?

অনন্ত কহিল,—তুমি!···স্বপ্ন নয়!

হাসিয়া প্রভাত কহিল,—জেগে তুমি স্বপ্ন দেখা সুরু করেচো কবে থেকে?

অনন্ত কহিল,—এসো আমার সঙ্গে। খুব সময়ে এসেচো! আমি ভারী সমস্যায় পড়েচি। চলো···যেতে যেতে সব কথা বলি।···তার আগে ভালো কথা, মাখন কেমন আছে?

প্রভাত কহিল,—ভালো!···কিন্তু যাচ্ছো কোথায়?

অনন্ত কহিল,—পরির ওখানে যাচ্ছি। এসো, ট্রাম ধরি।

—ও!···তা, ট্যাক্সি নাও না···

অনন্ত কহিল,—না, মিছে ট্যাক্সি নিয়ে কি হবে! ট্রামই ভালো, অনেক কথা আছে, বলবার সুবিধা হবে যেতে যেতে।

দুই জনে গিয়া ট্রামে চাপিল; তার পর ট্রাম হইতে নামিয়া মাণিকতলার বাড়ী!

সদর-দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। অনন্ত দ্বারে করাঘাত করিল।

দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তার মুখ একেবারে এতখানি! সে কহিল,—কোথায় ছিলে দাদাবাবু দু'দিন! দিদিমণি একেবারে জ্বরে বেহুঁশ!

সে কি! অনন্তর বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—জ্বর! আমায় খপর দাও নি কেন?

দাসী কহিল,—আমি কি ঠিকানা জানি যে খপর দেবো! দিদিমণিকে বলি, তা দিদিমণি বলে, কাজ আছে তাঁর, অনর্থক ভাববেন! হুঁঃ! আমি বলি, এই মানুষ···

অনন্ত কহিল,—ডাক্তার-টাক্তার কেউ এসেছিল?

দাসী কহিল,—কি করে আসবে? কে আনবে? আমার আবার বৌটোর অসুখ, আমার টানাপোড়েনের কি পোড়া বিরেম আছে!

চিন্তাকুল মনে প্রভাতকে লইয়া অনন্ত ঘরে আসিল। পরি বিছানায় শুইয়া। মুখ একেবারে রাঙা! সে জাগিয়াই আছে। অনন্তর কণ্ঠস্বরে চোখ খুলিয়াছিল।

অনন্ত আসিয়া তার ললাটে হাত দিল, কপাল পুড়িয়া যাইতেছে! অনন্ত যেন পাগল হইয়া উঠিল! সে কহিল,—কবে থেকে জ্বর হলো?

পরিমল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আজ দু'দিন।

—বেশ!···অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—বসো প্রভাত। আমি একজন ডাক্তারের সন্ধান করি।···তার পর আবার পরির পানে ফিরিয়া কহিল,—কে এসেচে, দেখেচো! আমার সেই বন্ধু প্রভাত!

পরির চোখের দৃষ্টি প্রভাতের 'পরে। মাথা নাড়িয়া পরি তাকে অভ্যর্থনা করিল, কহিল,—বসুন···

প্রভাত এক-পা অগ্রসর হইল, অগ্রসর হইয়া স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল!

অনন্তর পানে চাহিয়া পরি কহিল,—মা কেমন আছেন?

অনন্ত কহিল,—ভালো আছেন।···তাহলে প্রভাত বসচে। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

মৃদু হাস্যে পরি কহিল,—ডাক্তার কি হবে?

—বটেই তো! বলিয়া অনন্ত প্রভাতের পানে আবার চাহিল, চাহিয়া কহিল,—বসো ভাই, ভগবান তোমায় খুব সময়ে এনে দেছেন···

অনন্ত দাঁড়াইল না, তখনি ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরি কহিল,—বসুন···

প্রভাত বসিল। তার মন যেন পাথর হইয়া গেছে! ইহাদের এমন অন্তরঙ্গতা! অথচ সে যখন দেখিয়া গিয়াছিল!···হয়তো দু'জনে খুব গভীর প্রেম! এমন অবস্থায় প্রেম কেন না হইবে? এমন সব ঘটনা!···অজ্ঞাতে তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

পরি কহিল,—অবাক হয়ে গেছেন, না? এ আবার কোথা থেকে এলো! আপনার বন্ধুকে তাই বলি, কেন যে এ দুর্গ্রহ ভোগ করচেন আমায় মাথায় বয়ে···

প্রভাত গুম্ হইয়া রহিল, যেন একখানা নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মাঝখানে হুম্ করিয়া তাহাকে আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে! প্রথম দু'অঙ্কে কি ঘটিয়া গেছে, জানা নাই! কাজেই চোখের সামনে এই যে তৃতীয় অঙ্ক দেখা দিয়াছে, তাহাতে তার কি ভূমিকা, এবং সে-ভূমিকায় কি কথা কখন্ বলিবে, কিছুই বোঝে না!

তার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া পরি কহিল,—অবাক্ হবার কথাই! জানেন না তো, দু'দিনে এখানে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে!

প্রভাত এবার কথা কহিল; কোন মতে বলিল,—এসে অনন্তর মুখে সব শুনলুম। আমি এখানে ছিলুম না কি না!

পরি কহিল,—জানি। আপনি থাকলে আপনার বন্ধু মস্ত সহায় পেতেন। সে কথা প্রায় বলেন।

পরি চুপ করিয়া রহিল। চোখের পাতা আপনা হইতে বুজিয়া আসিল। কথা কহিতে কষ্ট হয়!

প্রভাত কহিল—কথা কবেন না! কষ্ট হবে।

পরি একটা নিশ্বাস ফেলিল—কোনো কথা বলিল না। প্রভাত তার পানে চাহিয়া রহিল। পরির দুই চোখ মুদ্রিত···প্রভাত ভাবিতেছিল—অনেক কথা। কথাগুলার মধ্যে শৃঙ্খলা নাই! তবে সে কথার ভিড় ঠেলিয়া বিনতার কথাটাও সাড়া দিতেছিল···ট্রেণে তার সঙ্গে বিনতাও ফিরিয়া আসিয়াছে; তাকে তার গৃহে পৌঁছাইয়া তবে প্রভাত মাতুলালয়ে যায়। নামিবার সময় বিনতা বলিয়াছিল—কাল একবার তাঁদের খপর নেবেন। আর পারেন যদি, আমায় সে খপর দেবেন। দেখি—মার কাছে বলে এসেচি,—যদি ঘটকালি করতে পারি!

বিনতার এ-কথা তার মনে এমন গভীর রেখা আঁকিয়া দিয়াছে···কিন্তু সে রেখা আর কেন! আসিয়া সে যাহা দেখিতেছে···

হৈ-হৈ শব্দে অনন্ত তখনি ফিরিল—সঙ্গে ডাক্তার। তিনি রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন—ষ্টেথেশ্‌কোপ্‌ দেখিয়া পথ হইতে অনন্ত তাঁকে ধরিয়া আনিয়াছে।

পরিকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—একটু patchও হয়েচে, দেখচি। নিউমোনিয়া!

কথা নয়, বাজের হুঙ্কার! রোগ তবে সামান্য নয়! কে জানে···

ঔষধ-পথ্য নির্দ্দেশ করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ভিজিট মিটাইয়া দিয়া অনন্ত কহিল,—কখন্ আবার আসচেন?

ডাক্তার কহিলেন,—বিকেলে আসবো।

—ডাকতে যেতে হবে না?

—না।

অনন্ত কহিল,—তুমি তা হলে বসচো তো প্রভাত! বসতেই হবে। আমি ওষুধটা আনি। পরি একা!

পরি কহিল,—আবার বেরুনো হচ্ছে? বন্ধু এলেন··· তাঁর যত্ন···আমি বিছানায় পড়ে আছি···

অনন্ত কহিল,—অসুখ করলে কেন?

পরি কহিল,—বা রে, অসুখ বুঝি কেউ সাধ করে করে!

—তা যদি নয় তো হলো কেন? দেখে গেলুম, সুস্থ মানুষ···

হাসিয়া পরি কহিল,—তবে বলবো?

—বলো।

—বকবেন না?

—না।

পরি কহিল,—সেদিন রাত্রে সেই একা রইলুম তো—আপনি বাড়ী চলে গেলেন। আমার ঘুম আর হয় না! এত দুর্ভাবনা জাগলো! শেষে গা জ্বলতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথা! ভারী সে কষ্ট! কি করি? একা ভয়ও হয়! তবু আস্তে আস্তে উঠে চৌবাচ্ছায় গিয়ে পড়লুম। থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজতে হুঁশ হলো, তাইতো! এত রাত্রে চৌবাচ্ছায় পড়ে আছি! মাগো! যদি অসুখ করে···

হাত তুলিয়া শাসনের ভঙ্গীতে অনন্ত কহিল,—ছেলে-মানুষে এ কাজ করলে কি শাস্তি দেয়, জানো? চড়···

হাসিয়া পরি কহিল,—আমায় চড় মারবেন? বেশ, মারুন···

অনন্ত কহিল,—আগে সেরে ওঠো। এর সাজা তোলা রইলো। কিন্তু না, দেরী নয়। আমি ওষুধ আনি। প্রভাত, তুমি বসো ভাই···

অনন্ত আবার বাহির হইয়া গেল। পরি চক্ষু মুদিল। আর প্রভাত? সে তেমনি স্তব্ধ, যেন ছবিতে আঁকা মানুষ!

পরি চোখ মেলিয়া চাহিল, কহিল,—কি ভাবচেন?

প্রভাত একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে যা ভাবিতেছিল—না! পরিকে তাহা বলিবার নয়! সে ভাবিতেছিল, ইহাদের এই হাসি দিয়া রচা নীড়ের মধ্যে কেন এ দীর্ঘ-নিশ্বাসের বোঝা লইয়া সে আসিয়া দেখা দিল! অথচ আসিবার পূর্ব্বে মনে তার কতখানি আগ্রহ, কি উৎসাহ···

মনকে দাবিয়া সে কহিল,—না, খবর্দ্দার! অনন্ত তোমার বন্ধু! সে কথা ভুলিয়ো না।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চয়ন



ভূগর্ভস্থ খালে নৌ-চালনা

হ্যাম্‌বার্গ হইতে মিউনিক্ পর্য্যন্ত একটি ভূগর্ভস্থ খাল আছে। সেই জলপথে প্রত্যহ শ্রমজীবীরা নৌকা করিয়া গতায়াত করিয়া থাকে। এই জলপথের দৈর্ঘ্য ৪ শত মাইল। গৃহ ও রাজপথের নিম্নভাগ দিয়া এই খাল প্রবাহিত। নৌকা-চালনাকালে শ্রমজীবীরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে—কোথাও কোনও স্থানে ছিদ্রাদি হইয়াছে কি না। কারণ, ঐরূপ ছিদ্র হইলে সাংঘাতিক



ভূগর্ভস্থ খালে নৌ-চালনা

বিষবাষ্প নির্গত হইতে পারে। এই প্রকার কোনও ছিদ্র দেখিলে শ্রমজীবীরা তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া ফেলে।

কুম্ভীর ও মানুষের লড়াই

সেমিনাল্ ইণ্ডিয়ান্‌রা কুম্ভীরের সহিত স্থলের উপর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া কুম্ভীরকে পরাজিত করিয়া থাকে। শুধু স্থলভাগে নহে, জলের মধ্যেও মৎস্যখাদক কুম্ভীরদিগের সহিত তাহারা হাতা-হাতি লড়াই করিয়া জয়লাভ করে। সেমিনাল ইণ্ডিয়ান কুম্ভীরের লাঙ্গুলের আঘাত ও ব্যাদিত বদনের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। সাধারণতঃ কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইণ্ডিয়ান্, কুম্ভীরটাকে জল হইতে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকে। একবার ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলিতে শক্তিশালী ইণ্ডিয়ানের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কুম্ভীর ও মানুষের



কুম্ভীর ও মানুষের লড়াই

এই লড়াই নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ খেলায় মানুষের বিশেষ বিপদের আশঙ্কাও থাকে।

পনীরের চাকা

কোন জার্ম্মাণ পনীর কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ, কারখানায় উৎপাদিত পনীরের বিজ্ঞাপন দিবার অভিপ্রায়ে চিত্রপ্রদর্শিত উপায়ে

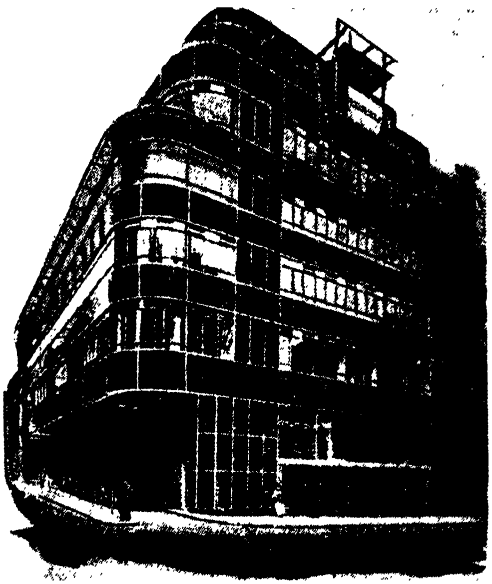


পনীরের চাকা

পনীরের চাকা রাজপথে বাহির করিয়াছেন। এই বিরাট পনীর দুই ব্যক্তি রাজপথে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। এইভাবে এই পনীর-চক্রটি সমগ্র দেশের মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কালো কাচের অট্টালিকা

অধুনা বাতায়নে কালো কাচ ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষতঃ কাচ-নির্ম্মিত অট্টালিকায় ইহার বহুল প্রচলন ঘটিয়াছে। মানুষের ধারণা, কালো কাচ ব্যবহার করিলে ঘরের বহির্ভাগ দেখিতে খুব সুন্দর ও মহার্ঘ্য হয়। তাহা ছাড়া ঘরে আলো



কালো কাচের অট্টালিকা

প্রবেশ করে, কিন্তু চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। লণ্ডনের ডেলি একপ্রেসএর ভবনটি সম্প্রতি এইরূপ কালো কাচের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখভাগের সমস্ত অংশই জানালাময়।

পরিচ্ছদ পরিষ্কারের যন্ত্র

আমেরিকায় রেল-ষ্টেশনের ধারে অথবা অন্যান্য সাধারণ স্থানে পরিচ্ছদের ধূলা-ময়লা পরিষ্কারের জন্য যন্ত্র স্থাপিত থাকে। যন্ত্রের একটি ছিদ্রপথে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা নিক্ষেপ করিলে যন্ত্র কায করিতে আরম্ভ করে। যন্ত্র-বিলম্বিত একটি ব্রাস পরিধেয় বস্ত্রের উপর ধারণ করিলে উহা সমগ্র পরিচ্ছদের



যন্ত্রসাহায্যে পরিচ্ছদ পরিষ্কার

ধূলা-ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিবে। যন্ত্রের সঙ্গে একটি দর্পণও থাকে। বিলাসী ও বিলাসিনীদিগের পক্ষে ইহাতে বিশেষ সুবিধা।

ঢাক, ঢোল ও বাঁশী

এক জন মানুষ একাই বাঁশী ও ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সঙ্গত করিতে পারে। ঢাক-ঢোলত্রয় এমন ভাবে স্প্রীংএর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত যে, বাদক পায়ের চাপ দিবামাত্র তাল-মান-লয়ে



ঢাক, ঢোল ও বাঁশী

যন্ত্র তিনটি হইতে সুমিষ্ট শব্দ উত্থিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বাঁশী বাজানও চলিবে। এই চারিটি যন্ত্র হইতে একযোগে যে বিভিন্ন সুরসৃষ্টি হয়, তাহা শ্রুতিসুখকর।

সাজোয়া গাড়ীর লম্ফ

আমেরিকায় সামরিক কর্ম্মচারিগণ একটি সাজোয়া গাড়ীর অপূর্ব্ব লম্ফপ্রদানশক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মোটর-চালিত সাজোয়া গাড়ী ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া ৩৫ ফুট লাফাইয়া একটি ১২ ফুট দীর্ঘ খাত উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

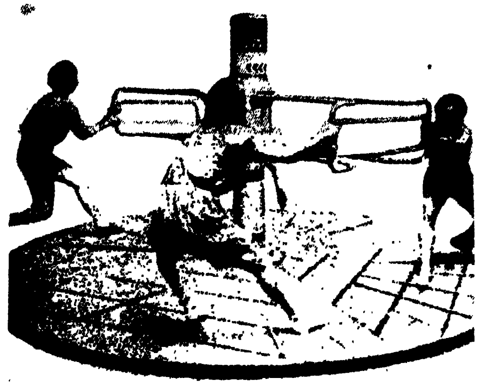


সাজোয়া গাড়ীর লম্ফ

এই সামরিক যানের অধিকারী জে ওয়ালটার ক্রিষ্টি বলেন যে, তাঁহার গাড়ী ঘণ্টায় ১ শত ২৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতে পারে। ইহা এত লঘুভার যে, বিমানযোগে এক স্থান হইতে অন্যত্র ইহাকে লইয়া যাওয়া যায়। এই সাজোয়া গাড়ী ৩ ইঞ্চি কামান বহন করিয়া থাকে।

নূতন প্রকার ব্যায়াম-পদ্ধতি

সমগ্র দেহকে ব্যায়ামপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য একপ্রকার নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রসাহায্যে একযোগে ৪ জন



নূতন ব্যায়াম-পদ্ধতি

ব্যক্তি ব্যায়াম করিতে পারে। প্রত্যেকে লৌহদণ্ড আকর্ষণ করিয়া আপনার দিকে টানিতে থাকে। ইহাতে অঙ্গের প্রত্যেক মাংস ও শিরাপেশীর ব্যায়াম হইয়া থাকে।

প্রকৃতির খেয়াল

বিচিত্র আম্র



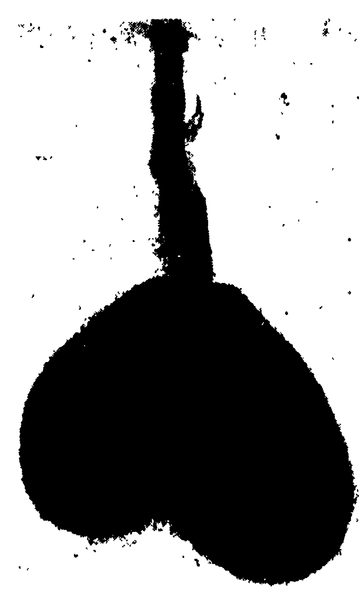
এই অদ্ভুত আকৃতির আমটি শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র পাল শ্রীযুত হরিহর শেঠকে উপহার দিয়াছেন।

পঞ্চমুখী পেঁপে



শ্রীযুত হরিহর শেঠকে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নন্দীর সাদর উপহার।

যমজ কাঁঠাল



শ্রীযুত হরিহর শেঠকে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান্ শিবরাম শেঠের উপহার।



নারীজন্ম

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাধে।

ঝগড়া বাধিবার কারণ এমন বিশেষ কিছুই নয়। প্রায় দশ-বারো বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, অথচ সন্তানাদি এখনও কিছুই হয় নাই। স্ত্রীর বিশ্বাস, কবচ-মাদুলী ধারণ করিলে ছেলে-মেয়ে যা হোক্ একটা কিছু হইবেই হইবে, অথচ স্বামীর ধারণা—কবচ-মাদুলীতে কিছুই হয় না, ও-সব শুধু ফাঁকি দিয়া পয়সা আদায় করিবার ফন্দী।

কঙ্কাবতী বলে, "আমাদের সেই পুতুলকে ত' চেনো! বাবা ভৈরবনাথের মাদুলী নিয়ে পুতুলের হয়েছিল।"

অপূর্ব্ব বলে, "না নিলেও হ'তো।"

এ রকম কথা সে কতবার শুনিয়াছে, তবু বলিতে ছাড়ে না। বলে, "না বাপু, ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বেস নেই, এমন মেলেচ্ছ ত' আমি কখনও দেখি নি! একবারটি এনেই ঢ্যাখো না! না হয় না হবে। তখন ত' আর তোমায় আমি বলতে যাব না।"

হায়রাণ হইয়া গিয়া শেষে অপূর্ব্ব বলে, "আচ্ছা, তাই দেবো এনে।"

কিন্তু ঐ মুখেই বলে আনিয়া দিবে, শেষ পর্য্যন্ত কাযে কিছুই করে না।

লজ্জায় ও-কথা বার-বার বলাও চলে না, অথচ না বলিলেও নয়। বাড়ীতে অন্য কোনও লোক নাই—যাহাকে দিয়া আনাইতে পারে। মা নাই, বাবা নাই, হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ কোথাও নাই, পোড়া তাহার এই অদৃষ্টের জন্য কঙ্কাবতী এক-এক দিন কাঁদিতে বসে।

অপূর্ব্ব কত রকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে। বলে, "ঢ্যাখো, ছেলে হওয়া-না-হওয়া ভগবানের হাত। কেন তুমি এমন করছ বল ত'? এই ত' আমরা বেশ আছি দু'জনে।"

কঙ্কাবতী বলে, "বেশ আবার কোথায় আছি? ছেলে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে ওঠে। তাও যদি পরের একটা ছেলেও পেতাম ত' তাই নিয়েই দিন কাটতো।"

আগে তাহাদের বাসা ছিল কলিকাতার একটা বড় রাস্তার উপর। কর্ম্মব্যস্ত কোলাহলময়ী মহানগরীর কোন্ অতল তলায় তাহারা তলাইয়া থাকিত, কেহ কাহারও খবর রাখিত না। কিন্তু এবার তাহারা উঠিয়া আসিয়াছে ছোট্ট একটি গলির মধ্যে। গলিতে গাড়ী ঘোড়া চলে না। পাথর দিয়া বাঁধানো বন্ধ গলি। দু'পাশে মাত্র সারি সারি কয়েকখানি বাড়ী। কোনটি একতলা, কোনটি বা দোতলা।

এত দিন ধরিয়া কঙ্কাবতী যাহা চাহিতেছিল, এ-পাড়ায় আসিয়া তাহার তাহাও মিলিয়াছে।—আড়াই-তিন বছরের চমৎকার একটি ফুট্‌ফুটে ছেলে।

ছেলেটি দেখিতে এত সুন্দর যে, দেখিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

প্রথম দিন তাহাকে সে কেমন করিয়া দেখে, সেই কথাই বলি।

সে দিন বৈকালে এক বিস্কুটওয়ালা আসিয়াছে বিস্কুট বেচিতে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কঙ্কাবতী তাহার একতলা বাড়ীর জানালার পর্দ্দাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ছোট বড় নানান্ বয়েসী ছেলে-মেয়ে, বিস্কুট কিনিবার জন্য প্রত্যেকেই একটি করিয়া পয়সা লইয়া আসিয়াছে। কঙ্কাবতী ভাবিল, হায় রে অদৃষ্ট, তাহারও যদি এমনই একটা ছেলে থাকিত ত' আজ সে তাহাকেও এমনই বিস্কুট কিনিতে পাঠাইত। ভাবিতে ভাবিতে সেই ছেলে-মেয়ের দলের মধ্যে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—অত্যন্ত সুন্দর একটি ছেলে চুপ করিয়া তাহাদেরই একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। বিস্কুট লইয়া সকলেই একে-একে চলিয়া গেল। গেল না শুধু সেই ছেলেটি। হাতে তাহার পয়সা নাই এবং পয়সা না থাকিলে বিস্কুট যে পাওয়া যায় না, তাহা সে জানে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া সে বিস্কুটওয়ালার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ একটি পয়সা লইয়া জানালার পথে হাত বাড়াইয়া ডাকিল, "খোকা, নিয়ে যাও!"

নিঃসঙ্কোচে ছেলেটি আগাইয়া আসিল এবং হাত পাতিয়া পয়সা লইয়া গিয়া বিস্কুট কিনিল।

কঙ্কাবতী ভাবিয়াছিল, সে বিস্কুট লইয়াই চলিয়া যাইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য, খোলা দরজার পথে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্কুট দুইটি তাহার হাতের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "নিন্।"

এমন ছেলে কঙ্কাবতী কখনও দেখে নাই। হাসিয়া বলিল, "আমি কি নিজের জন্যে আনিয়েছি রে ক্ষ্যাপা ছেলে? খাও, তুমি নিজে খাও, এইখানে ব'সে ব'সে।"

তাহার পর দু'জনের কত কথা! কঙ্কাবতী কতক বা বুঝিতে পারিল, কতক বা পারিল না।

"তোমার নাম কি, বাবা?"

"পিনুটু পাপু।"

"পিনুটু বাবু?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হাঁ।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়, পিনুটু বাবু?"

ছোট্ট একটি কচি আঙ্গুল বাড়াইয়া পাশের বাড়ীখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "উ—ই!"

কঙ্কাবতী তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া চুমা খাইয়া একবার এখানে দাঁড়াইল, একবার ওখানে দাঁড়াইল, কি যে করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। স্বামী তাহার অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে, এইবার ফিরিবে হয় ত'। আজ সে পিনুটু বাবুকে দেখাইয়া তাহাকে অবাক্ করিয়া দিবে।

কাযেও ঠিক তাহাই হইল। কিছুক্ষণ পরেই অপূর্ব্ব আসিল।

কঙ্কাবতীর কোলে এমন সুন্দর একটি ছেলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ছেলে গো? আহা, বেশ ছেলেটি ত'!"

কঙ্কাবতী হাসিয়া বলিল, "নিজের ছেলে চিন্‌তে পার না? এ যে আমার ছেলে গো! না পিনুটু বাবু?"

পিনুটু বাবু কি বুঝিল কে জানে, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

"দেখলে?" বলিয়া দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

পরিচয় তাহাদের আজকাল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কাবতী হইয়াছে পিনুটু বাবুর কাকীমা, আর অপূর্ব্ব হইয়াছে কাকাবাবু।

তবে কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব হইয়া অবধি ছেলেটার পক্ষপাতিত্ব যেন তাহার উপরেই একটুখানি বেশী। কাকাবাবুর সঙ্গে বসিয়া বসিয়া ছবির বই যখন সে দেখে, তখন আর সে ভুলিয়াও তাহার কাকীমার দিকে ফিরিয়া তাকায় না।

অপূর্ব্ব যে শুধু তাহাকে ছবি দেখায়, তাহা নয়, মাঝে মাঝে কাগজের উপর ছবি তাহাকে আঁকিতেও হয়।

পিনুটু বলে, "হাঁচ্ কৈ, হাঁচ্?"

পাতার পর পাতা উল্টাইয়া অপূর্ব্ব হাঁসের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হাঁস যখন কোথাও আর পাওয়া গেল না, তখন সে নিজেই একটা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া হাঁস আঁকিতে বসিল। একটা শেষ হইলে পিন্টু বলিল, "আদেক্‌তা।"

অপূর্ব্বকে আবার আর একটা আঁকিতে হইল।

আঁকিতে আঁকিতে হঠাৎ এক সময় অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া দেখিল, দূরে দাঁড়াইয়া কঙ্কাবতী তাহাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। দু'জনের চোখোচোখি হইতেই কঙ্কাবতী হাসিয়া ফেলিল।

অপূর্ব্ব বলিল, "কি দেখছ অমন ক'রে?"

কঙ্কা বলিল, "দেখছি, কেমন মানিয়েছে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "ছেলের সঙ্গে ত' আলাপ হলো, এইবার ছেলের মা'র সঙ্গে পরিচয়টা কোরো।"

কঙ্কাবতী তাহার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল, "করেছি।"

"অত চুপি চুপি কেন?"

কঙ্কাবতী বলিল, "দরজায় হয় ত দাঁড়িয়ে আছে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি ঐখানে।"

তা সে মিথ্যা বলে নাই। গলিতে ঢুকিলেই দেখা যায়, কালো রঙের পাতলা ছিপছিপে একটি মেয়ে চট্‌ করিয়া দরজার আড়ালে লুকাইয়া দড়াম্‌ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। ঐ পিন্টুর মা,—উহারই নাম সুন্দরী।

তবে সুন্দরী নাম যে তাহার কেন রাখা হইয়াছিল, সুন্দরীকে দেখিয়া সহজে সে কথা বুঝিবার উপায় নাই। গর্ব্বের বস্তু শুধু তাহার ঐ ছেলেটি। এত সুন্দর ছেলে যে তাহার কোন দিন হইতে পারে, সে কথা সে নিজেও জানিত না। তাই মুখে তাহার ছেলের কথা চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়াই আছে।

"ছেলেটাকে ভাই সবাই ভালবাসে। ঐ যে ঐখানে ঐ লালরঙের বাড়ীটা আছে দেখেছ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "না দিদি, আমি ত' বাড়ী থেকে বেরোই না। কেমন ক'রে দেখবো বল?"

সুন্দরী বলিল, "বেরোতে হয় না ভাই, দরজায় দাঁড়ালেই দেখা যায়।"

কঙ্কাবতী বলিল, "তার পর?"

সুন্দরী বলিল, "ঐ বাড়ীর যিনি মালিক—সেই কিশোরী বাবু ভাই পিন্টুকে আমার বড্ডো ভালবাসে। কাপড় দেয়, জামা দেয়, পয়সা-কড়ি এটা-সেটা ত' হরদম্‌ দিচ্ছেই দিচ্ছেই।"

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

সুন্দরী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "বিশ্বেস হ'লো না, না কি? চুপ ক'রে রইলে যে?"

কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ছ্যাখো দেখি দিদি, বিশ্বাস কেন হবে না?"

সুন্দরী কিছুতেই থামিতে চাহিল না। বলিল, "বরটি কোথায়? রয়েছে না কি?"

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

সুন্দরী বলিল, "আচ্ছা, তবে আর এক দিন আসব। ব'সে ব'সে গল্প করা যাবে।"

শেষে এক দিন সত্যই আসিল।

আসিয়াই ছেলের গল্প! পিন্টুকে কে কবে একযোড়া জুতা কিনিয়া দিয়াছিল, কখন্‌ সে একবার কাহার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এই এ—ত বড় বড় পুতুল আনিয়াছিল—এই সব!

বলিল, "ষ্টোভে তোমার এক পেয়ালা চা তৈরি কর না, ভাই। দুজনে খাওয়া যাক্‌। খেতে খেতে গল্প করি।"

কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, "সেই যে সে দিন কিশোরী বাবুর কথা বললাম না, ঐ কিশোরী বাবুর বৌকে আমার পিন্টু বলে সই-মা। সইএর কাছে গিয়ে মাঝে-মাঝে আমি ভাই চা খেয়ে আসি। সই কিন্তু আমাদের বয়েসী নয় ভাই, আমাদের চেয়ে অনেক বড়। মাগীর ছেলেপুলে হ'লো না।"

এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুন্দরী বলিল, "সেই জন্যেই ত' পিন্টুকে ওরা অত ভালবাসে। তা ভাই, মাগীর হাতেও পয়সা আছে, মিন্‌ষের হাতেও পয়সা আছে। বাড়ীঘরদোর সবই নিজের। কে যে খাবে, তার ঠিক নেই।"

কঙ্কাবতী বলিল, "আছে হয় ত কেউ ভাইপো, ভাগ্‌নে, বিষয়-সম্পত্তি থাকলে খাবার আবার লোকের ভাবনা !"

ঘাড় নাড়িয়া সুন্দরী বলিল, "না ভাই, সে সব খবর আমি নিয়েছি। কেউ কোথাও নেই।"

এই বলিয়া সুন্দরী একটুখানি থামিয়া একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইল। তাহার পর আবার বলিতে সুরু করিল, "তা ভাই, তোমরা দুটিতে বেশ আছ। ছেলেপুলে হয় নি, তাই জানো না, নইলে হ'লে একবার বুঝতে মজা ! ছেলে হওয়ার ভাই অনেক জ্বালা। এ কেমন একেবারে ঝাড়া-হাত-পা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, খাও-দাও ফুর্ত্তি কর। আর আমার ছ্যাখো-দেখি, চার-চারটে দেওর, কাষ নেই, কর্ম্ম নেই, বিধবা মেয়ের মত দুবেলা খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে।"

কঙ্কাবতী বলিল, "ছেলের ঝঞ্ঝাট ত' তোমাকে পোয়াতে হয় না, দিদি। ছেলে ত' দেখছি মা-ছাড়া যার-তার কাছে বেশ থাকে।"

ঠোঁট উল্‌টাইয়া সে এক অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া সুন্দরী বলিল, "তা আর থাকতে হয় না ! ভাল যে বাসে না, তার কাছে ও কৈ এক দণ্ড থাকুক দেখি ? তোমরা ভালবাসো, তোমাদের কাছে থাকে।—তা ভাই মিছে কথা বলব কেন, তোমাদের ও বড্ডো ভালবাসে। বাড়ী গিয়ে অবধি শুধু কাকাবাবু আর কাকাবাবু, কাকীমা আর কাকীমা"—

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিল, "কেন, চুপ ক'রে রইলে যে ? ভালবাসে না ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "ও ছেলের আবার ভালবাসা, দিদি ! ও দুদিন বাদেই ভুলে যাবে।"

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, ও ভোলে না। ঐ যে ঐ কাঁঠালগাছ-ওলা বাড়ীটা, ঐ বাড়ীতে এক জন ভাড়াটে এসেছিল ভাই, লোকটি ভারি ভালমানুষ, বাপ না কে ম'রে গেল, তাই দেশে চ'লে গেল। পিন্টুকে আমার সে-মিন্‌ষেও খুব ভালবাসতো, বুঝলে ? পিন্টু তখন আরও ছোট। সে এক দিন পিন্টুকে না বাজারে নিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো থেকে আরম্ভ ক'রে কোট, পেণ্ট্‌লুন্, মায় মাথার একটা টুপি পর্য্যন্ত দিলে কিনে। পিন্টু সে কথা আজও ভোলে নি ভাই, ওর মনে আছে, আশ্চর্য্যি কাণ্ড !—ছ্যাখো, তোমার চায়ের জল হয় ত' ফুটছে।"

ষ্টোভ নিবাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী চা তৈরি করিতে বসিল।

সুন্দরী কিন্তু তখনও থামিল না। বলিল, "আজ না দাও, তোমরাও ত' এক দিন ওকে জামা-কাপড় সবই দেবে, তখন ও আর কিছুতেই ভুলবে না ভাই তুমি দেখো।"

প্রকাশ্যে কঙ্কাবতী হাসিতে পারিল না, কিন্তু এ-কথা শুনিয়া মনে-মনে মানুষের হাসিবারই কথা।

চায়ের পেয়ালাটি সুন্দরীর হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী বলিল, "খাও দিদি।"

ভাবিল, এবার বুঝি সে থামিবে।

কিন্তু চা তাহার ঠাণ্ডা জল হইয়া গেল, কথা কিন্তু তখনও ফুরাইল না।

এমন সময় বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"আমি। খোলো !"

অপূর্ব্ব আসিয়াছে।

সুন্দরীর সম্মুখে কঙ্কাবতী দরজা খুলিতে ইতস্তত করিতেছিল। কিন্তু সুন্দরীই আগে বলিয়া উঠিল, "দাও না খুলে ভাই, ঠাকুরপোর সাম্‌নে বেরোব, কথা বলব, তাতে আর লজ্জা কিসের ? আমার ভাই ও-সব বালাই নেই।"

কঙ্কাবতী দরজা খুলিয়া দিল।

অপূর্ব্বই লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল, সুন্দরী কিন্তু নিঃসঙ্কোচে হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাতে তোমার ও কি জিনিষ, ঠাকুরপো ?"

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার একটি খেল্‌নার হাঁস। দেখিতে অবিকল জীবন্ত হাঁসের মত। দম দিয়া মাটীতে ছাড়িয়া দিতেই হাঁসটা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া হাঁটিতে সুরু করিল। বলিল, "পিন্টুর জন্যে কিনে আনলাম।"

সুন্দরী বলিল, "দাম নিশ্চয়ই অনেক নিয়েছে ? এ-সব ঠুন্‌কো জিনিষ কি জন্যে আন্‌লে, ঠাকুরপো ? এ ত' ও এক্ষুনি হাতে পাবা মাত্র দেবে ভেঙ্গে ! তার চেয়ে ঐ দামে ওর একটা সিল্কের জামা হ'তো।"

পিন্টুর জন্য চমৎকার একখানি সিল্কের জামাও অপূর্ব্ব আনিয়া দিয়াছে। ভাল ভাল পাখী, কুকুর, হাঁস, কত

মজার খেল্‌না, পেট টিপিলেই কথা কয়, স্প্রিংএ দম দিলেই চলিতে আরম্ভ করে,—সে সব ত' ধরিতে গেলে রোজই আসে।

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিতেই পিন্টু তাহার কাকাবাবুর বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘুমন্ত অপূর্ব্বর গায়ে হাত দিয়া ডাকে, "কাকাবাবু!"

হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অপূর্ব্ব তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনে। আদর করিয়া চুমা খাইয়া তৃপ্তি যেন তাহার আর কিছুতেই হয় না!

শয্যাত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব বলে, "আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি, তুমি ততক্ষণ তোমার কাকীমার সঙ্গে গল্প কর।"

পিন্টু তাহার কাকীমার কাছে গিয়া বসে।

তাহার পর অপূর্ব্বর সঙ্গে বসিয়া পিন্টু চা খায়, বিস্কুট খায়, হাসে, গল্প করে, ছবি দেখে, খেলা করে। দু'জনেই খেলা করিতে করিতে এত বেশী উন্মত্ত হইয়া ওঠে যে, অপূর্ব্বকে বাজার যাইতে হইবে, সে কথা তাহার আর মনেই থাকে না।

কঙ্কাবতী বলে, "ওঠো, বাজারে যাও, না ওর সঙ্গে খেলা করেই দিন তোমার কাটবে?"

পিন্টু ঝোঁক্ ধরিয়া বসে, কাকাবাবুর সঙ্গে সেও বাজারে যাইবে। বড় রাস্তার উপর বাজার। চারিদিকে গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের হট্টগোল। এই এতটুকু ছেলেকে লইয়া বাজারে গেলে তাহাকে সাম্‌লাইতেই সময় যাইবে। অনেক করিয়া বুঝাইয়াও অপূর্ব্ব কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারে না। শেষে বাধ্য হইয়া বলে, "চল তবে নিয়েই যাই।"

শেষে এমন হয় যে, প্রত্যহই তাহাকে বাজারে লইয়া যাইতে হয়।

পিন্টুকে বুকে করিয়া বাজারের থলি হাতে অপূর্ব্ব সে দিন বাড়ী ফিরিল—বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কঙ্কাবতীর উনান তখন কতবার যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আবার কতবার যে নূতন করিয়া কয়লা দিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

"হ্যাঁগা, আমি ত' ভেবে ভেবে মরি। আজ এত দেরি হ'লো যে?"

পিন্টুকে কোল হইতে নামাইয়া অপূর্ব্ব বলিল, "নাঃ, কাল থেকে আর তোমায় নিয়ে যাচ্ছি না।"

কঙ্কাবতী দেখিল, অপূর্ব্বর নূতন জামার হাত দুইটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন জামা ছিঁড়লো কেমন ক'রে? কৈ, যাবার সময় ত' ছেঁড়া ছিল না!"

অপূর্ব্ব বলিল, "মারামারি করলাম একটা লোকের সঙ্গে। ব্যাটাকে খুব মেরেছি। আর সেই মারতে গিয়েই জামাটা গেল ছিঁড়ে।"

"সে কি গো! কেন?"

"কেন! জুতো পায়ে দিয়ে ব্যাটা তাকিয়ে পথ চলে না, পিন্টুর পা'টা দিয়েছিল মাড়িয়ে।"

"জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে? পায়ে তা হ'লে লেগেছে বল? কৈ দেখি বাবা।" বলিয়া কঙ্কাবতী পিন্টুর পা দুইটি দেখিতে যাইতেছিল। অপূর্ব্ব বলিল, "মাড়ায় নি। আর একটু হলেই মাড়াতো।"

কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বাজারের জিনিষপত্র বাছিতে বসিল। যে স্বামী তাহার কাহাকেও জোর করিয়া একটা কথা বলিতে পারে না, সেই আজ একটা অতি তুচ্ছ কারণে মারামারি করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে!

পিন্টুকে খাওয়াইয়া তাহার মা'র কাছে পাঠাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, ছেলেটাকে তুমি খুব ভালবেসে ফেলেছ, না?"

অপূর্ব্ব থতমত খাইয়া কি যে জবাব দিবে, খুঁজিয়া পাইল না। বলিল, "ওকে দেখলেই ত' ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কেন, তুমি ভালবাস না?"

আর কিছু না বলিয়া কঙ্কা চলিয়া যাইতেছিল, অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "ও কথা কেন জিজ্ঞেস করলে বল ত?"

কঙ্কাবতী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এম্‌নি।"

কিন্তু ছেলেটাকে অপূর্ব্ব সত্যই ভালবাসিয়াছে। বেশীক্ষণ আজকাল সে আর বাড়ীর বাহিরে থাকে না। ফিরিয়া আসিয়াই জিজ্ঞাসা করে, "আমায় দেখতে না পেয়ে ছেলেটা খুব কাঁদছিল, না?"

কঙ্কাবতী বলে, "না, কাঁদবে কেন? জিজ্ঞেস করছিল, কোথায় গেল কাকাবাবু?"

"হ্যাঁ, খুঁজেছিল তা হ'লে বল। খুঁজবেই ত'! ও যা ছেলে, কাকাবাবু কাকাবাবু করেই অস্থির।"

কঙ্কাবতী বলে, "কিন্তু কি হবে ভালবেসে? একে ত' পরের ছেলে, তায় আবার আমাদের বাসা-বাড়ী, আজ আছি, কাল নেই।"

"হুঁ" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব বলে, "শেষ পর্য্যন্ত এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমাদের ভারি মুস্কিল হবে দেখছি।"

কঙ্কাবতী বলে, "অথচ এ বাড়ী আমাদের ছাড়তেই হবে।"

"কেন?"

"কেন আবার! উঠোনটা সিমেণ্ট ক'রে দেবার কথা ছিল, তা ত' দিলে না, জলের কলটায় ভাল জল আসে না, তা ছাড়া বর্ষাকাল আসছে, একতলা বাড়ীতে থাকলে বেরিবেরি হবে দেখো।"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলে, "পাগল, তাই আবার হয় না কি? কত বড় বড় লোক একতলা বাড়ীতে থাকে।"

এমনই করিয়া বাড়ী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেই অপূর্ব্ব হাসিয়া উত্তর দেয়। আর অপূর্ব্ব যতই হাসিয়া উড়ায়, কঙ্কাবতী ততই দোষ বাহির করিতে থাকে।

বলে, "ঝি আজ আসবে না ব'লে গেছে, ঐ রইলো প'ড়ে তোমার ঐ বাসনের গাদা কলতলায়। মাজতে আমি পারব না।"

অপূর্ব্ব বলে, "কেন গো, এত রাগ কেন?"

"রাগ হবে না? এমন বাড়ী নিলে শেষকালে যে, কলে জল পর্য্যন্ত আসে না। ছির্-ছির্ ক'রে এম্‌নি সরু ধারায় জল পড়ছে।"

মিস্ত্রী ডাকিয়া কলটা সেই দিনই অপূর্ব্ব ঠিক করিয়া দিল।

কঙ্কাবতী তখন ক্রমাগত উঠানের উপর হোঁচট খাইতে থাকে। বলে, "বাবা রে বাবা! কলকাতা সহরে যে এমন বাড়ী থাকতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। খোয়ায় আমার পা একেবারে গেল। একযোড়া জুতো এনে দিও, পায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াব।"

কোন দিন বা দরজা-জানালার কপাটগুলা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়।—"যেমন বাড়ী, তার তেমনই কপাট! বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে এম্‌নি হাঁ হয়ে গেছে যে, জোড়ে-জোড়ে লাগতে পর্য্যন্ত চায় না।"

অপূর্ব্ব দেখে আর হাসে।

কঙ্কাবতী বলে, "হ্যাঁ, তা হাসবে বৈ কি! আমার হয়েছে মরণ! দেখবে তোমার বাড়ীর গুণ?'

বলিয়া হন্ হন্ করিয়া কঙ্কাবতী ভাঁড়ার-ঘর হইতে চিনির টিনটা আনিয়া অপূর্ব্বর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলে, "দ্যাখো!"

চিনিতে পিঁপড়া ধরিয়াছে। অপূর্ব্ব বলে, "কি দেখব?"

"কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আদ্ধেক জিনিষ ত' পিঁপ্‌ড়েতেই খেয়ে ফেললে।"

"সেও কি বাড়ীর দোষ না কি?"

কঙ্কাবতী বলে, "তা তুমি জানবে কেমন ক'রে বল? হালদারপাড়ার বাড়ীতে আমাদের একটা পিঁপড়ে ছিল? আর শুধু কি পিঁপড়ে না কি? ইঁদুর দেখেছ এ বাড়ীতে? এক-একটি ইঁদুর এই এ্যা—ত বড়-বড়, ঠিক এক-একটি বেড়ালের মত। প্লেগ হলেই বুঝবে মজা!"

এবার অপূর্ব্ব হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।—"সে কি গো! কলকাতায় প্লেগ হবে কি?"

কঙ্কাবতী বলে, "কেন, শরৎ বাবুর শ্রীকান্ত বই-এ পড়নি? ইঁদুর থাকলে প্লেগ হয়! হবে যখন, তখন এ বাড়ী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।"

এই বলিয়া সে চিনির টিনটা লইয়া আবার তেমনই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

তাই বলিয়া কঙ্কাবতী যে পিন্টুকে ভালবাসে না, তাহা নয়।

অপূর্ব্ব হয় ত বাড়ীতে নাই, এমন সময় পিন্টুর কচি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "কাকীমা, দদা খোলো!"

তাড়াতাড়ি হাতের কায ফেলিয়া দিয়া কঙ্কাবতী দরজা খুলিয়া তাহাকে ঘরে আনিল। ঘরে আজকাল ছেলে ভুলাইবার কোনও বস্তরই অভাব নাই। হাতের কাছে তাহার ছবির বই খুলিয়া ছবি দেখাইতে দেখাইতে কঙ্কাবতী চুপি-চুপি ডাকে, "পিন্টু!"

"উঁ।"

কঙ্কাবতীর ধারণা, ছোট ছেলে তাহার মুখ দিয়া যাহা বলে, অনেক সময় তাহাই সত্য হইয়া ফলিয়া যায়, তাই সে

তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমার কবে ছেলে হবে বল ত' বাবা ?"

পিন্‌টু কিছুই বুঝিতে পারে না, ছবির বইএর পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বলে, "থেলে দেখব।"

ছোট একটি ছেলের ছবি বাহির করিয়া কঙ্কাবতী বলে, "এই ছেলে আমার হবে, না পিন্‌টু ?"

পিন্‌টু বলে, "না, আমাল্ হবে।"

"দূর্ হাবা ছেলে! এসো, তোমায় ছেলে দেখাই।" বলিয়া পিন্‌টুকে কোলে লইয়া কঙ্কাবতী দেওয়ালের বড় আর্শীটার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। বলে, "ও কে রে ?"

আঙুল বাড়াইয়া পিন্‌টু তাহার নিজের চেহারাটিকে দেখাইয়া বলে, "পিন্‌টু পাপু।" বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে।

কঙ্কাবতী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারকম করিয়া নিজেকেই বারে বারে দেখে আর ভাবে, এই ছেলে আজ যদি তাহার নিজের ছেলে হইত! "এমনি একটি পিন্‌টু বাবু আমারও হবে, না পিন্‌টু ?"

কি জানি কি ভাবিয়া পিন্‌টু বলিয়া বসে, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে কঙ্কাবতী তখন পিন্‌টুকে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরে। চাপিয়া ধরিয়া মুখে তাহার সশব্দে একটি চুমা খায়।

অপূর্ব্বর দালালীর কায। আপিসের কেরাণীর মত ঠিক দশটার সময় বাড়ী হইতে সে বাহির হয় না। কিন্তু যখন হউক্ বাহির তাহাকে বাড়ী হইতে একবার হইতেই হয়। অথচ এই বাহির হইবার সময় প্রত্যহ পিন্‌টুকে লইয়া কি বিপদে যে পড়ে, তাহা আর বলিবার নয়। ছোট ছেলে, না বুঝিয়া নির্ব্বোধের মত কাকাবাবুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রতিদিন সে কাঁদিতে সুরু করে। কোনও দিন বা অপূর্ব্বকে চোরের মত লুকাইয়া পলাইতে হয়, আবার কোন কোন দিন কঙ্কাবতী দয়া করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখে।

সে দিন অমনি অনেক কষ্টে অপূর্ব্ব বাহির হইয়া গিয়াছে, পিন্‌টুকে কোলে লইয়া কঙ্কাবতী কিছুতেই আর ভুলাইতে পারিতেছিল না। বাসিনী ঝি দূরে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বলিল, 'দাও দিদিমণি, ওকে তা হ'লে আমার কাছে দাও, আমি হুমু-বুড়োকে ধরিয়ে দিয়ে আসি।'

হুমু-বুড়োর নামে পিন্‌টু চুপ করিল।

কঙ্কাবতী বলিল, 'এইবার তুমি এইখানে ব'সে ব'সে ছবি ছাখো পিন্‌টু, আমি ততক্ষণ তোমার ঐ জামাটা সেলাই ক'রে ফেলি। কেমন ?'

পিন্‌টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

কঙ্কাবতীর গলাটা সে দুহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। নীচে সে কিছুতেই বসিবে না।

বাসিনী অনেকক্ষণ হইতেই এই দিকে মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিল। বলিল, 'বেশ মানিয়েছে দিদিমণি! এমনি যদি তোমার একটি হ'তো! আচ্ছা, হাঁ দিদিমণি, তোমার কি একেবারেই হয় নি ?'

হয় নাই সত্য। কিন্তু সেই সত্য কথা বলিতে কঙ্কাবতীর লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। বলিল, 'হয়েছিল বাসিনী, হয়েই ম'রে গেছে। বাঁজা আমি নই।'

বলিতে গিয়াই চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

বাসিনী বলিল, 'আমারও এক বোন্‌ঝির, দিদিমণি, ঠিক তোমার মত। একটি হয়ে সেই যে ম'রে গেছে, তার পর আর হয় নি। বাবা তারকনাথের মাদুলী দিলাম, অনেক যায়গায় অনেক কিছু করলাম, দিদিমণি। এইবার সরষেবাড়ীর অষুধ দিয়েছি, পেয়ারাপাতার সঙ্গে বেটে খেতে হয়, তিন দিন আঁশ অম্বল বন্ধ। দেখি কি হয়।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদিমণির মা আছে ?'

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িল,—'না।'

'দিদি ?'

'না।'

বাসিনী বলিল, 'তবে আর ও-সব কে করবে বল দিদিমণি। মা বেঁচে থাকলে এত দিন হয় ত' তোমায় কত ওষুধ খাওয়াতো।'

এমন সময় ওদিকের বারান্দার রেলিং ধরিয়া সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইল।—'কি কথা হচ্ছে গো তোমাদের ?'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল। বাসিনী বলিল, 'দিদি-মণির অমনি একটি ছেলের কথা হচ্ছে, মা।'

সুন্দরী বলিল, "আ! ছেলে ছেলে আর করিস নি মা, ছেলের জ্বালা আমি বুঝি। আমারও যদি না হতো ত' আমি আর চাইতাম না বাছা, পরের ছেলে মানুষ করতাম।"

বাসিনী ও কঙ্কা কেহ কোনও কথা বলিল না দেখিয়া সুন্দরী চলিয়া গেল।

বাসিনী একবার সেই দিক্ পানে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল, সে গিয়াছে কি না, তাহার পর চুপি-চুপি বলিল, "দেখলে দিদিমণি, শুনলে ওর কথা? ছেলেটা ও তোমাকে দিয়ে মানুষ করিয়ে নিতে চায়।"

এ সহজ কথাটুকু বাসিনীও বুঝিয়াছে। কঙ্কাবতী বলিল, "চুপ!"

বাসিনী চুপ করিল না। বলিল, "কি যে বল দিদিমণি, তার ঠিক নেই। আমি চুপ করবার মানুষ নই, দিদিমণি। পাখিকে পয়সা দিও, আমি তোমায় সরষেবাড়ীর ওষুধ এনে দেবো, পেয়ারাগাছ আমাদের বাড়ীতেই আছে।"

তাহার পর বাসন মাজিয়া বাসিনী চলিয়া যাইতেছিল। বলিল, "দরজাটা ভেজিয়ে দাও, দিদিমণি!"

কঙ্কাবতী দরজা বন্ধ করিতে গিয়া চুপি-চুপি ডাকিল, "বাসিনী, শোনো!"

"আমায় ডাকছ, দিদিমণি?"

"হ্যাঁ ডাকছি।" বলিয়া দু'টি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া একটা ঢোক গিলিয়া একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া ঠিক চোরের মত চুপি চুপি বলিল, "তোমার সেই সরষে-বাড়ীর ওষুধ আমায়—"

বাকী কথাটা সেও আর শেষ করিতে পারিল না, বাসিনীরও আর শুনিবার প্রয়োজন হইল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, দিদিমণি।"

রাত্রিতে সে দিন আহারাদির পর অপূর্ব্ব বিছানায় শুইয়া ছিল। ঘরের কাষ-কর্ম্ম সারিয়া কঙ্কাবতীও খাটের উপর স্বামীর কাছে গিয়া বসিল। বলিল, "আজ একটা ভারী মজা দেখলাম। পিন্টু কিছুতেই যেতে চায় না, তবু ওর কাকা আজ ওকে কাঁদাতে কাঁদাতে তুলে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলো ওর সই-মার কাছে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "সই-মা ওকে ভালবাসে না, ভালবাসে ঐ কিশোরী বাবু। পিন্টুর মা ভাবে, বুড়ো বুঝি ওর বাড়ীখানা পিন্টুকেই দিয়ে যাবে, তাই ওকে ও জোর ক'রে ওখানে পাঠিয়ে দেয়।"

কোনও কথা না বলিয়া অপূর্ব্ব একটুখানি হাসিল মাত্র।

কঙ্কাবতী বলিল, "তুমি আর ওরকম ক'রে ভালোবেসে ছেলেটাকে ধ'রে রেখো না। বুঝলে? ওতে ওর মা হয় ত রাগ করে। ভাবে, বাড়ীটা যদি বা পেতো ত' তোমার জন্যেই হয় ত' পাবে না।"

অপূর্ব্ব এবারেও শুধু হাসিল।

"না গো হাসি নয়, সত্যি।"

অপূর্ব্ব বোধ হয় রাগ করিয়াই বলিল, "তা হ'লে কি করতে হবে শুনি? মেরে তাড়িয়ে দিতে হবে?"

"তাই কি আমি বলছি না কি?"

"না বললেও মতলব খানিকটা আমি বুঝতে পারি।"

কঙ্কাবতী বলিল, "ছাই পার।"

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল।

কঙ্কাবতীও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, "ঘুমোলে না কি?"

অপূর্ব্ব বলিল, "না।"

"বল—কি বুঝতে পার!"

অপূর্ব্ব বলিল, "তোমার ইচ্ছে, ছেলেটাকে আমি যেন না ভালবাসি। বল—সত্যি কি না?"

ঘাড় নাড়িয়া কঙ্কাবতী বলিল, "হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু কেন বল দেখি?"

"কেন আবার! পরের ছেলে, কোন্ দিন হয় ত আমরাই চ'লে যাব কি ওরাই চ'লে যাবে, তখন কষ্ট পেতে হবে। কেমন, এই না?"

কঙ্কাবতী মাথা হেঁট করিয়া স্বামীর হাতের আংটীটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "না। আমার কষ্ট হয়। মনে হয়, আমার ছেলে হ'লো না ব'লেই—"

অপূর্ব্ব চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। খানিক পরেই তাহার হাতের উপর টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল পড়িতেই সে চোখ চাহিয়া হাত বাড়াইয়া কঙ্কাবতীর মুখখানি তুলিয়া ধরিতেই দেখিল, সে কাঁদিতেছে। বলিল, "এ কি! তুমি কাঁদছ, কঙ্কা?"

আঁচলে চোখ মুছিয়া কঙ্কা বলিল, "না।"

বলিয়াই সে তাহার স্বামীর বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

পিন্‌টুকে এমন করিয়া ভালবাসিলে কঙ্কাবতীর যে কষ্ট হয়, তাহার যে সন্তানাদি হয় নাই, সেই কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে, সে কথা অপূর্ব্ব বুঝিয়াছে; এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই সেই দিন হইতে পিন্‌টুর জন্য যাহা কিছু সে কিনিয়া আনে, কঙ্কাবতীর সম্মুখে তাহা সে পিন্‌টুর হাতে দিতে পারে না। আড়ালে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলে, "চট্ ক'রে এইটি নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ীতে রেখে এসো। নইলে ভেঙ্গে যাবে। যাও।"

পিন্‌টু সেটি তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে আবার ফিরিয়া আসে। সম্মুখে কঙ্কাবতীকে দেখিবামাত্র তাহার পা দুইটা দু'হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "দেখে এলুম।"

"কি দেখে এলে, বাবা?"

পিন্‌টু বলে, "মোটোরকার।"

কঙ্কাবতী বুঝিতে না পারিয়া বলে, "বেশ। আজ আমরা মোটরে চ'ড়ে বেড়াতে যাব।"

"তবে নিয়ে আচি।" বলিয়া পিন্‌টু আবার তাহাদের বাড়ীর দিকে ছুটিতে থাকে; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে টিনের একটি রংকরা মোটরকার আনিয়া কাকীমার কাছে নামাইয়া দিয়া বলে, "চলো।"

অপূর্ব্ব তখন বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "এ গাড়ী তোমার কখন্ এলো, বাবা? কে দিলে?"

পিন্‌টু বলিল, "কাকাবাবু ডিলে।"

কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব আসিবামাত্র কঙ্কাবতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় একটা মোটরগাড়ী এনে দিতে পার?"

"কেন?"

"পিন্‌টুকে দেবো।"

ব্যাপার যে কি ঘটিয়াছে, অপূর্ব্ব তাহা বুঝিতে পারিল। বলিল, "ওটা যে এনেছি, তা আমার মনেই ছিল না কঙ্কা, তাই বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ওটা তার হাতে দিয়ে চ'লে গেলাম।"

কঙ্কাবতী বলিল, "বুঝতে তা হ'লে পেরেছ?"

"কি বুঝতে পেরেছি?"

কঙ্কাবতী বলিল, "আমায় লুকিয়ে দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "লুকিয়ে ত' দিই নি।"

কঙ্কাবতী বলিল, "দিয়েছ। কিন্তু আর যেন দিও না। ওতে ভাবছ, আমি সুখে থাকব, কিন্তু না, ওতে কষ্ট আমার আরও বাড়বে। যা দেবে, দেখিয়েই দিও।"

এই কথার পর পিন্‌টুকে কিছু দেওয়া এক রকম বন্ধই হইয়া গেল। অপূর্ব্ব আর বাজার হইতে তাহার জন্য কিছুই কিনিয়া আনে না। পিন্‌টু ঘরে আসিয়া ঢুকিলে অপূর্ব্ব প্রাণপণে নিজেকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া রাখে। একান্তই পিন্‌টু যখন 'কাকাবাবু' বলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসে, দু'হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছবি দেখিতে চায়, তখন আর সে কোনও প্রকারেই নিজেকে বিমুখ করিয়া রাখিতে পারে না, কঙ্কাবতীর দিকে একবার তাকাইয়া বলে, "ওগো দেখেছ? এ আমি কি করি বল দেখি?"

এই বলিয়া পিন্‌টুকে সে তাহার বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সেই সুকোমল সুন্দর মুখখানির দিকে, সেই কাচের মত স্বচ্ছ সুগভীর চঞ্চল দুটি ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-তারকার দিকে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার সেই আরক্তিম ওষ্ঠপ্রান্তে একটি চুম্বন করিয়া বলে, "যাও, এবার তুমি তোমার কাকীমার কাছে যাও।"

কিন্তু পিন্‌টু সেখানে কিছুতেই সহজে যাইতে চায় না, কাকাবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এমন করিয়াই দিন চলে।

এক-এক দিন সব-কিছু ভুলিয়া গিয়া পিন্‌টুকে লইয়া ছেলেমানুষের মত খেলা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া অপূর্ব্ব

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। শেষে কঙ্কাবতী যখন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হঠাৎ তাহার সে দিনের সেই কথাটা মনে পড়িয়া যায়। মনে পড়ে, নিঃসন্তান কঙ্কাবতীর শুষ্ক ম্লান মুখখানি, তাহার সেই ব্যাকুল মিনতি, আর আকুল ক্রন্দন।—সত্যই ত! পাগলের মত এ কি সে করিতেছে? বলে, "হ্যাঁ, এইবার হয়েছে পিন্টু, অনেক খেলা হয়েছে, আর খেলে না। যাও, তুমি তোমার মা'র কাছে যাও।"

ছেলেটার মুখখানা নিমেষেই কেমন যেন ম্লান হইয়া উঠে, অভিমানক্ষুব্ধ দুটি কাতর চক্ষু তুলিয়া অপূর্ব্বর মুখের পানে কেমন যেন একরকম করিয়া চাহিয়া থাকে।

কঙ্কাবতী বলে, "হ্যাঁগা, তা হ'লে ও-সব তুমি আমার মন ভোলাবার জন্যে বল; না?"

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া বলে, "কি সব?"

কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে কঙ্কাবতীর প্রথমে লজ্জা করে, তাহার পর একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলে, "এই যে বল, তোমার ছেলে না হ'লে কোনও দুঃখু নেই…"

"হ্যাঁ, নেই-ই ত! নাই বা হ'লো ছেলে।" বলিতে বলিতে পিন্টুর হাতে ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব বলে, "চল, তোমায় দিয়ে আসি। বড্ডো বেশী বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, চল।" বলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজাটা অপূর্ব্ব তাহার মুখের ওপরেই ধড়াস্ করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

অপূর্ব্বর জামা-কাপড় গুছাইতে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিল, সাদা জামার গায়ে অসংখ্য লাল লাল পিঁপড়া উঠিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার পকেট হইতে বাহির করিল একটা কাগজে মোড়া কয়েকটি 'লজেঞ্জ'। পিন্টুর জন্য আনিয়া হয় ত তাহা আর কঙ্কাবতীর ভয়ে দিতে পারে নাই।

মোড়কটি কঙ্কাবতী পকেট হইতে বাহির করিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া পিঁপড়া তাড়াইতেছিল, এমন সময় গুট্-গুট্ করিয়া পিন্টু আসিয়া হাজির!

মুখ তুলিয়াই কঙ্কাবতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দরজা বন্ধ ছিল, কেমন ক'রে এলি? কে খুলে দিলে?"

পিন্টু বলিল, "কাকাবাবু।"

"কোথায় তোর কাকাবাবু?"

কচি কচি হাতের ছোট্ট একটি আঙ্গুল বাড়াইয়া পিন্টু কলতলাটা দেখাইয়া দিল। বলিল, "ঐ যে!"

অপূর্ব্ব তখন কল-ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে।

বাহিরে আসিতেই কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, ও কখনই বা ডাকলে আর তুমি কখনই বা দরজা খুলে দিলে? কৈ, ওর ডাক ত' আমি শুনতে পাই নি!"

অপূর্ব্বই কি শুনিতে পাইয়াছিল না কি? ও-বেলা যাহাকে এমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ-বেলায় সে যদি আবার না ডাকিতেই আসিয়া দাঁড়ায় ত' তাহার জন্য দরজা তাহাদের খুলিয়া রাখা উচিত ভাবিয়াই সে অন্যমনস্কের মত বন্ধ দরজাটি হঠাৎ খুলিতে গিয়াই দেখে, নিতান্ত অপরাধী চোরের মত ছেলেটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

স্বামী তাহার কোনও কথা বলিতেছে না দেখিয়া কঙ্কাবতী বলিল, "কাযকর্ম্ম সবই ত' তোমার গেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, কি আছে আমার কপালে শেষ পর্য্যন্ত।"

কথাটা শুনিবামাত্র অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কাহার উপর রাগ করিয়া জানি না, সে তাহার বসিবার ঘরে গিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

এমন সময় শুনিল, পাশের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কে একটা লোক যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কে রয়েছেন মশাই বাড়ীতে?"

অপূর্ব্ব উঠিয়া গিয়া বলিল, "কেন?"

দেখিল, জানালার পর্দ্দা সরাইয়া যিনি মুখ বাড়াইয়াছেন, তিনি কিশোরী বাবু। তাঁহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে কঙ্কাবতী সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছে, ঘরের মাঝখানে একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া আছে মাত্র পিন্টু। পিন্টুর হাতে মুখে লজেঞ্জ। কথা বলিবার উপায় নাই।

কিশোরী বাবুকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি খুব রাগিয়াই আসিয়াছেন। চোখ দুইটা বড় বড় করিয়াই বলিলেন, "দেখুন মশাই, ছেলেটাকে আমার যা-তা' খাইয়ে খাইয়ে দিলেন আপনারা শেষ ক'রে। ওকে আর যেন কিছু

খাওয়াবেন না। আপনার বাড়ীতে খেলেই ওর পেটের অসুখ হয়। বুঝলেন ?”

জবাব দিতে গিয়া অপূর্ব্বর গলার আওয়াজ আটকাইয়া আসিতেছিল, সে অতি কষ্টে তবু বলিল, “বুঝলাম।”

“শুধু বুঝলাম নয়, আমি অনেক দিন থেকেই দেখছি, কিছু বলছি না তাই! আমি বলি কি—আপনাদের ভালবাসা একটুখানি কম করুন।”

অপূর্ব্বর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। পা দুইটা তখন তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাত যেন অবশ। রাগের মাথায় কি যে তাহার হইল, কে জানে, কাঁপিতে কাঁপিতে পিন্টুর কচি একখানি হাত সে তৎক্ষণাৎ সজোরে চাপিয়া ধরিল এবং হিড়্ হিড়্ করিয়া ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “নিয়ে যান্ মশাই আপনার ছেলে! এক্ষুনি নিয়ে যান।”

পিন্টু কাঁদিল না, মুখে একটি কথাও বলিল না, সজল-নয়নে শুধু সে তাহার কাকাবাবুর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কাকাবাবু তাহার সে দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ ধরিয়া গুম্ হইয়া চুপ করিয়া শুইয়া-ছিল, চা তৈরি করিয়া আনিয়া কঙ্কাবতী তাহার হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, “নাও, চা খাও, ওঠো।”

“খাই।” বলিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিল। কিন্তু সে কি মূর্ত্তি! মুখের পানে তাকাইতে ভয় করে—এত গম্ভীর। বলিল, “আখো, ছেলেটা যদি কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়েও ওঠে, তা হ’লেও তুমি দরজা খুলো না।”

কঙ্কাবতী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, “বেশ।”

“বেশ নয়, খুলেছ কি এবার তোমাকেই আমি শাস্তি দেবো।”

কঙ্কাবতী বলিল, “দিও।”

অপূর্ব্ব বলিয়া উঠিল, “কিন্তু আমি ওকে প্রথমে ডাকতে যাই নি, তুমিই ডেকেছ।”

এ কথার কি আর জবাব দিবে? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দু’জনেই চুপ!

চা খাইতে খাইতে অপূর্ব্বই আবার প্রথমে কথা কহিল। বলিল, “আখো ত’! কিশোরী বাবু এলো আমায় শাসন করতে! বেশ করেছি, ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।”

কঙ্কাবতী এবারেও কোনও কথা বলিল না।

অপূর্ব্ব ঠিক উন্মত্তের মত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, “ঠিক হয়েছে। আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, কঙ্কা। যেমন পরের ছেলেকে ভালবাসতে গিয়েছিলাম, ঠিক তার উপযুক্ত প্রতিফল আমি পেয়ে গেছি।”

এই বলিয়া আবার সে আপন মনেই বিড়-বিড় করিয়া কি যেন বলিতে বলিতে চা খাইতে সুরু করিল।

সে দিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পাইয়া কঙ্কাবতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, স্বামী কখন্ তাহার বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বলিল, “কৈ গো, কোথায় গেলে তুমি? দরজা খুললে কি জন্যে?”

“নাঃ, কিছু না।” বলিয়া অপূর্ব্ব আবার ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। বলিল, “হঠাৎ কি মনে হ’লো জানো? মনে হলো—ছেলেটা যেন ডাকছে। তা ও ছেলেকে বিশ্বাস ত’ নেই, এসেছে হয় ত’ এই রাত্রিতে বিছানা থেকে উঠে! তাই না ভেবে আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। দেখলাম, না, কোথাও কিছুই নেই, বাতাসে বোধ হয় অমনি শব্দ হচ্ছিল।”

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব বলিল, “দিনের বেলা হ’লে আমি খুলতাম ভেবেছ? কখ্খনো না। ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে ঐখানে যদি মাথা খুঁড়ে রক্ত বের করতো—তবু খুলতাম না। খবরদার বলছি, তুমিও যদি খোলো কোন দিন ত’ কিছু বাকী রাখব না ব’লে দিচ্ছি।”

ঠোঁটের ফাঁকে কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “ঘুমোও।”

কিন্তু অন্ধকারে তাহার কথাটাই মাত্র শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার হাসি কেহ দেখিল না।

পরদিন প্রাতে বাহিরে রাস্তার উপর পিনুটুর কান্নার শব্দ পাইয়া অপূর্ব্ব আর স্থির থাকিতে পারিল না; জানালার কাছে গিয়া কপাট দুইটা একটুখানি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, হাতের ইসারায় ছেলেটাকে একবার ডাকিবে।

কাঁদিতে কাঁদিতে পিনুটু বলিতেছিল, "কাকাবাবু কাথে দাব।"

কিন্তু তাহার নিজের কাকা তখন তাহাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। জোর করিয়া তাহাকে কিশোরী বাবুর বাড়ী দিয়া আসিবে।

পাশের দরজা হইতে পিনুটুর মা সুন্দরীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।—"কাঁদুক্ গে ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওকে দিয়ে এসো ওর সই-মার কাছে। কাকাবাবু! কাকাবাবুর ও শুক্‌নো ভালবাসায় দরকার নেই, ভাই। আমাদের ঠুনকো দুটো খেলনায় ওর পেট ভরবে না। তার ওপর আবার মা'র! অতটুকু ছেলেকে আমার মেরে সে দিন বের ক'রে দিয়েছে বাড়ী থেকে—বুড়ো মিন্‌ষে!"

অপূর্ব্বর পায়ের তলা হইতে সমস্ত পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। মাথার ভিতরটা এমনভাবে ঘুরিয়া গেল যে, সে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

কঙ্কাবতী রান্নাঘরে কায করিতেছিল, তাই রক্ষা, সুন্দরীর কোনও কথাই সে শুনিতে পায় নাই। এ ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে অমন ক'রে ব'সে যে? তাই ডাকো বাপু ছেলেটাকে একবার, এসে খানিকক্ষণ ব'সে না-হয় চা-টা খেয়েই যাক্। নইলে তুমি যে অমন ক'রে ম'রে যাবে।"

অপূর্ব্ব রাগিয়া উঠিল।—"মরার ওপর খাঁড়ার ঘা তুমি আর দিও না, কঙ্কা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। ও ছেলের নাম তুমি আর আমার মুখের সামনে কোরো না বলছি।"

অপূর্ব্বর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কঙ্কাবতী ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, এ কি! তবে কি ঐ ছেলেটার জন্য স্বামী তাহার পাগল হইয়া যাইবে না কি?

কিন্তু পাগল সে হয় নাই।

সে দিন গেল, তাহার পরদিন গেল, তাহার পরদিন। উপরি-উপরি তিনটা দিন নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেল। এই তিন দিনের মধ্যে অপূর্ব্ব একটিবারের জন্যও পিনুটুর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিল না।

তিন দিন পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব কোনোরকমে প্রাণপণে মুখ বুজিয়া ছিল, চারদিনের দিন আর পারিল না। দুপুরে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিল রাত্রিতে।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "মুখখানি অমন শুক্‌নো যে?"

"কি জানি।" বলিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া জামা-জুতা খুলিয়া সে হাত-পা ধুইয়া গামছা খুঁজিতে গিয়া দেখিল, আন্‌লার উপর পিনুটুর ছোট্ট একখানি জামা ঝুলিতেছে। জামাখানি একবার নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "এটা আর এখানে কেন? ওর মা ত' দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশঘণ্টা রাস্তায়, ওকে দিয়ে দিও।"

কঙ্কাবতী বলিল, "দেবো।"

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। রাস্তার একটা গ্যাসের আলো হইতে প্রচুর আলো তাহার উঠানে আসিয়া পড়ে, সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর সে আবার কথা কহিল। বলিল, "ছেলেটাকে কৈ আর রাস্তাতেও দেখা যায় না, কোথাও গেছে না কি?"

কঙ্কাবতী বলিল, "যাবে কেন? তুমি বেরিয়ে যাবার পর আজ ওকে দেখলাম যে!"

এতক্ষণ ধরিয়া অপূর্ব্ব বোধ করি এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। আনন্দে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখলে? আজই দেখলে? কোথায়? হতভাগা ছেলেটাকে কৈ আমি ত' কোনও দিন দেখতে পাই না!"

কঙ্কাবতী বলিল, "বিকেলে তখন আমি জানালার কাছে ব'সে ব'সে চুল বাঁধছিলাম, অনেকক্ষণ থেকেই জানালাটা কে যেন খুট্ খুট্ ক'রে নাড়্‌ছিল, বললাম, কে? কোনও সাড়া পেলাম না। ভাবলাম, বাতাসে অমন করছে হয় ত। কিন্তু চুপ করতেই আবার শুনি তেম্‌নি খুট্ খুট্ শব্দ। আবার ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম—পিনুটুর গলার আওয়াজ। খুব চুপি-চুপি বলছে,

'কাকীমা, দাবো ?' আমি বাপু আর পারলাম না থাকতে, মুখখানি শুক্নো, দেখে ভারী দয়া হলো, বললাম, 'এসো।' ধীরে-ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। এসেই কি বললে শুনবে ? বললে, 'কাকাবাবু আমাকে মার্বে না, কাকীমা ?' এমন মুখখানি ক'রে বললে বাপু যে আমার চোখে তখন জল এসে গেছে।"

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারও দু'চোখ ছাপাইয়া তখন জল আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর কাছে তাহার এ দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্যই বোধ করি সে আর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল, একবার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, একবার কলতলার দিকে গেল, বিনা প্রয়োজনেই একবার দরজার কাছে গিয়া হাত দিয়া দেখিল, দরজাটা ভাল করিয়া ভেজানো আছে কি না, তাহার পর অতি সন্তর্পণে চোখ দুইটা একবার মুছিয়া লইয়া আবার সে কঙ্কাবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বললে ?"

কথাটা প্রথমে সে ভাল বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "বলব আবার কি ? কিছুই বললাম না।"

অপূর্ব্ব চীৎকার করিয়া উঠিল, "কিছুই বললে না ? তুমি ত' বেশ মানুষ তা হ'লে ! কেন, বললেই পারতে, না, মারবে না। কাকাবাবু মেরেছে কখনও যে মারবে ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "না বাপু, তা বলি নি। বেশীক্ষণ ত' ছিল না। 'মা বক্‌বে' ব'লে সে চ'লে গেল।'

অপূর্ব্ব বলিল, "হুঁ। তা হ'লে লুকিয়ে এসেছিল। ভারি চালাক ছেলে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ যে !"

এই বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কঙ্কাবতীকে অপূর্ব্ব আবার বকিতে সুরু করিল, "কিন্তু তোমার মত বোকা মেয়ে আমি আর কখনও দেখি নি। ছেলেটাকে একটা জবাব দিতে পারলে না ? ছি !"

কঙ্কাবতী বলিল, "ওগো, চুপ কর। ছোট ছেলে, ও তোমার জবাবের কি বোঝে ? জবাব নাই বা দিলাম।"

অপূর্ব্ব রাগিয়া উঠিল। বলিল, "জানি। ও ছেলের ওপর তোমার কি মনোভাব, তা আর আমার জানতে বাকী নেই। বুঝলে ? জবাব তুমি দেবে কেন ?"

"কি মনোভাব শুনি ?"

"সে যাই হোক্।" অপূর্ব্ব বলিল, "সে তোমার শুনে কায নেই।"

"তবু শুনি ?"

দাঁত কিস্-মিস্ করিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "নিজের ছেলে হয় নি ব'লে হিংসেয় তুমি ম'রে যাচ্ছ, তা কি আর আমি বুঝি না ভেবেছ ? ও ছেলেকে তুমি কোন দিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতেও পার।"

স্বামীর মুখে এ কথা শুনিবে, তাহা সে কোনও দিন ভাবে নাই। কঙ্কাবতীর সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া সে নিজেকে কোনও প্রকারে সামলাইয়া লইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপূর্ব্ব কিন্তু তখনও থামে নাই। তখনও সে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "খবরদার বলছি ডাইনী,তুমি ও ছেলেকে কোনো দিন তোমার কাছে ডাকবে না। আমার অসাক্ষাতে কোনও দিন যদি ডেকেছ শুনতে পাই ত' তোমায় আমি খুন ক'রে ফেলব।'

স্বামী তাহার নিশ্চয়ই পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে ঐ কথা বলে কখনও ?

কঙ্কাবতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পিন্টুকে তাহার কাছে ডাকা দূরে থাক্, সে আর ও ছেলের কোনও কথাতে পর্য্যন্ত থাকিবে না।

কিন্তু অপূর্ব্বর সেই দিন হইতে কি যে হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না, অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরেই থাকে, বাড়ী যদি বা ফেরে ত কঙ্কাবতীর দিকে একবার ফিরিয়াও তাকায় না, শুধু পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

তাই বলিয়া কঙ্কাবতীরও রাগ করিয়া পড়িয়া থাকা চলে না। খাইবার সময় স্বামীকে তাহার উঠাইতেই হয় ; অথচ উঠাইলেও খায় না। খাইতে বসিয়া এটা-সেটা একবার মুখে দিয়া নাড়া-চাড়া করিয়াই উঠিয়া পড়ে।

কঙ্কাবতী বলে, "ও কি ! হয়ে গেল খাওয়া ?"

"হুঁ" বলিয়া এমন গম্ভীরভাবে অপূর্ব্ব চুপ করিয়া

থাকে যে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে কঙ্কাবতীর ভরসা হয় না।

অথচ অপূর্ব্বর শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোনও কাযেই আর তাহার ভাল করিয়া মন নাই। সকালে বাজার করিতে যায় ত' দুইটা জিনিষ আনে আর পাঁচটা ভুলিয়া বসিয়া থাকে। কঙ্কাবতী কিছু বলিলে বলে, "নাও না বাপু, ওতেই কোন রকমে চালিয়ে!"

কঙ্কাবতী বলে, "আমার না হয় ওতেই চলবে, আমার জন্যে ত' ভাবি নি, ভাবছি তোমার জন্যে।"

নিতান্ত উদাসীনের মত অপূর্ব্ব বলে, "থাক, আর ভেবে কিছু হবে না।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতীকে সে আরও বেশী করিয়া ভাবাইয়া তোলে।

কঙ্কাবতী ভাবে, বুঝি শুধু তাহারই জন্য স্বামীর এই দশা। সে যদি বন্ধ্যা না হইত, পেটে যদি তাহার ছেলে মেয়ে যা হোক একটা কিছুও হইত, তাহা হইলে স্বামী হয় ত' তাহার এমন করিয়া পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া কষ্ট পাইত না। মনে হয়, ইহার জন্য সমস্ত অপরাধ—সমস্ত দোষ যেন তাহারই।

কিন্তু কি করিবে সে, হে ভগবান্!—কঙ্কাবতী এক এক দিন পড়িয়া পড়িয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া শেষে রাত্রির অন্ধকার আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া হাত যোড় করিয়া তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়—"তুমিই ইহার একটা উপায় করিয়া দাও ঠাকুর!"

নিজের ছেলে না হউক্, পরের ছেলে পিনুটুকে লইয়া দিন তাহাদের বেশ ভালই কাটিতেছিল। তাহার নিজের না কাটুক, স্বামী তাহার বেশ ভালই থাকিত, মুখে অন্তত তাহার হাসি দেখিতে পাইত। আর আজকাল তাহার সেই মুখ হইয়া গিয়াছে ম্লান, এ লোক তাহার জীবনে কোন দিন হাসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কঙ্কাবতীর মনে হইল, তা হোক্ তাহার কষ্ট, পিনুটু আসুক।

কিন্তু পিনুটুকে কোন দিন স্বামী তাহার নিজে ডাকিবে বলিয়া মনে হয় না, অথচ তাহারও ডাকিবার যো নাই। ছেলেটা যদি নিজে হইতে আসে তবেই। নিজে হইতে আসিলে তাহাকে সে যে তাড়াইয়া দিবে না, এ কথা সত্য।

পিনুটুকে আজকাল আগলাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু ছোট ছেলে, ফাঁক পাইলেই তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়। বৈকালে যখন ফিরিওয়ালাদের ডাক সুরু হয়, সাধারণতঃ সেই সময়েই দেখা যায়—বাড়ী হইতে পিনুটু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। কিন্তু অপূর্ব্ব আজকাল আর সে সময় বাড়ী থাকে না।

ছেলেটাকে ডাকিতে অপূর্ব্ব সে দিন তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। কঙ্কাবতীর মনে হইল, উহা তাহার দুরন্ত অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পিনুটুকে তাহার চোখের সম্মুখে দেখিলে মান অভিমান ভাসিয়া যাইবে।

এই ভাবিয়া কঙ্কাবতী সে দিন জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, বিকেলে চারটের পর তুমি বাড়ী ফিরতে পার না?"

অপূর্ব্ব বলিল, "কেন?"

কঙ্কাবতী বলিল, "বিকেলটা বড় একা-একা ঠেকে। বাসিনী ঝি আজ দু'দিন হলো আসে না, কোথায় গেছে।"

"আচ্ছা, দেখব চেষ্টা ক'রে।" বলিয়া অপূর্ব্ব বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিনুটু কখন্ বাড়ী হইতে বাহির হইবে ভাবিয়া সে দিন হইতে কঙ্কাবতী রোজ বৈকালে তাহার জানালার কাছটিতে পর্দ্দা সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পিনুটুকে দেখিবা-মাত্র ডাকে, "এসো।" পিনুটু ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়ায়।

কঙ্কাবতী ঠিক আগেকার মতই আবার তাহাকে কোলে লইয়া আদর করে, খাবার খাওয়ায়, বই খুলিয়া ছবি দেখায়। আসল কথা—স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ছেলেটাকে কোনরকমে ছলে কৌশলে ধরিয়া রাখে।

তাহার পরে যখন দেখে, অপূর্ব্ব আর কিছুতেই আসিল না, তখন সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

এমনই করিয়াই দিন চলে।

তাহার পর, দিন তিন চার পরে কঙ্কাবতীর অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়াই কি না জানি না, হঠাৎ এক দিন বৈকালে অপূর্ব্ব বাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

কিন্তু সর্ব্বনাশ কাণ্ড, আসিয়াই দেখে, এত নিষেধ সত্ত্বেও পিনুটুকে তাহার কোলের কাছে বসাইয়া কঙ্কাবতী কি যেন তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়াছে।

অপূর্ব্বকে দেখিবামাত্র কঙ্কাবতী পিন্টুকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "যাও, তোমার কাকাবাবু এসেছে।"

ছেলেটা কিন্তু খাবার ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহিল না।

অপূর্ব্ব বলিল, "এত ক'রে বারণ করলাম, তবু ডাকলে?"

কঙ্কাবতী বলিল, "নিজের জন্যে ডাকি নি গো, ডেকেছি তোমার জন্যে। নইলে যে গেলে!"

"আর আমার অপমানটা বুঝি কিছু নয়? কিশোরী বাবু বাড়ী এসে অপমান ক'রে গেল, ওর মা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে—"

কঙ্কাবতী বলিল, "তুমি ভালবাস জানলে ও সব এক দিন সবাই ভুলে যাবে। যা রে যা, তোর কাকাবাবু ডাকছে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "না, ডাকি নি। তুমি আগে জবাব দাও, আমার বারণ তুমি শুনলে না কেন?"

কঙ্কাবতীর হঠাৎ রাগ হইয়া গেল। বলিল, "জানি তোমার মরণ-দশা ধরেছে, তা নইলে তুমি এমন করবে কেন? বেশ করেছি, ডেকেছি। যে যা বলে, আমায় বলবে। তুমি যাও।"

অপূর্ব্ব চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি বললে?"

"বললাম, বেশ করেছি ডেকেছি। তুমি যাও বাপু, তোমায় কিছু বলি নি, তোমার মাথার ঠিক নেই।"

অপূর্ব্ব রাগে একেবারে অধীর হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "মুখের ওপর জবাব! বেশ করেছ? এই নাও তবে তার শাস্তি।" বলিয়া পায়ের কাছে কাঁসার যে গ্লাসটা পড়িয়া ছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া সজোরে তাহাই সে কঙ্কাবতীর দিকে ছুড়িয়া মারিল।

সর্ব্বনাশ! ধাঁ করিয়া গ্লাসটা লাগিয়াছে ছেলেটার কপালে!

পিন্টু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কপাল কাটিয়া গিয়া গল্ গল্ করিয়া কাঁচা রক্ত বাহির হইয়া আসিয়াছে। কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া জল আনিয়া ধুইতে বসিল। ছেলের কান্না শুনিয়া সুন্দরী ছুটিয়া আসিল, তাহার দেওররা আসিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে একটা হৈ-চৈ গোলমাল পড়িয়া গেল

আসল ব্যাপারটা কঙ্কাবতী গোপন করিতেছিল।—"ছেলেটা হঠাৎ আছাড় খেয়ে···"

কিন্তু ছেলে বলে, "না, কাকাবাবু মেলে।"

কাকাবাবু! অপূর্ব্ব! সবাই অবাক্!

গলাগালি দিতে দিতে সুন্দরী তাহার ছেলে লইয়া চলিয়া গেল এবং তাহার পিছু পিছু বাড়ী হইতে অন্যান্য সকলেই বাহির হইয়া গেলে পর কঙ্কাবতী দেখিল, সে একাই পড়িয়া আছে, স্বামীও তাহার সেই গোলমালের সময় লজ্জায় বোধ করি মুখ দেখাইবার ভয়ে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে।

কিন্তু সে গেল কোথায়? মনের অবস্থা তাহার যে রকম হইয়াছে, তাহাতে এ সময় বাড়ীর বাহিরে থাকাও বিশেষ নিরাপদ নয়।

কঙ্কাবতী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল এবং ছেলের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া স্বামীর ভাবনা ভাবিতেই সে যেমন পারিল, চারটি রান্না করিয়া বদ্ধ ঘরের মধ্যে উন্মাদিনীর মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

বাহিরে রাস্তার উপর জুতার শব্দ হইলেই সে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়ায়, আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। পিন্টুর কান্না থামিয়াছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য একবার তাহাদের দেওয়ালের কাছে কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকে, একবার বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া খানিকটা কাঁদে, একবার ঘড়ির পানে তাকায়, একবার শোয়, একবার উঠিয়া বসে,—এমনই করিয়া কয়েক ঘণ্টা অতিক্রম করিবার পর, ধীরে-ধীরে চোরের মত অপূর্ব্ব যখন তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, পাড়াটা তখন একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, রাত্রি তখন একটা।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে?"

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল।

"খেতে দিই?"

"দাও।"

ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করিতে অপূর্ব্বর ভয় করিতেছিল।

কঙ্কাবতী নিজেই বলিল, "ভাল আছে।"

নিতান্ত উদাসীনের মত অপূর্ব্ব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ক'রে জানলে?"

কঙ্কাবতী বলিল, "কাঁদতে কাঁদতে চুপ ক'রে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কৈ, আর ত কোনও শব্দ পাচ্ছি নে!"

গায়ের জামাটা খুলিয়া অপূর্ব্ব কঙ্কাবতীর হাতে দিল। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে অসাবধানে সেটা রাখিতে গিয়া জামার পকেট হইতে ঠক্ করিয়া ছোট একটি শিশি মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব হাত-পা ধুইবার নাম করিয়া কলতলায় গিয়া পিন্টুদের দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ঔষধের তীব্র গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিতেই তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া দেখিল, কঙ্কাবতী তখন একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া কাচের টুকরাগুলা কুড়াইতেছে।

"ভাঙ্‌লে ত? বেশ করলে!" বলিয়া অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি তাহার পকেট হইতে আরও গোটাকতক শিশির মত কি যেন বাহির করিয়া আলমারির মাথার উপর লুকাইয়া রাখিয়া আবার কলতলার দিকে চলিয়া গেল।

কঙ্কাবতীর কৌতূহল হইতেই হাত বাড়াইয়া জিনিষগুলা বাহির করিয়া দেখিল, কোনটাই এমন কিছু গোপনীয় বস্তু নয়।—কাগজে মোড়া এক প্যাকেট তুলা, একটা ব্যাণ্ডেজ, আর ছোট-বড় কয়েকটা শিশিতে কি-সব যেন ঔষধ। একটা শিশির গায়ে মাত্র কাগজের লেবেলে বাঙ্গালায় লেখা—অপূর্ব্ববাবুর ছেলের জন্য, দুঘণ্টা অন্তর, চারবার।

গত কয়েক দিন ধরিয়া বাসিনী-ঝি কোথায় গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। একা-একা কঙ্কাবতীর কষ্ট হইতেছিল। অপূর্ব্ব বলিল, "অন্য ঝি নিয়ে আসব?"

কঙ্কাবতী বলিল, "আহা, মানুষটি বড় ভাল। ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া কি ভাল হবে? গেছে কোথায় বোনের বাড়ী, আসবে হয় ত' আজ-কালের মধ্যেই।"

অপূর্ব্বর মেজাজ আজকাল সর্ব্বদাই রুক্ষ। বলিল, "বেশ। তবে কষ্টের কথা আমায় আর বোলো না।"

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব বলিল, "এ বাড়ীতে ত' আমরা আর ছ' সাত দিন আছি। মাস শেষ হ'লেই ত' চ'লে যাব। তখন তোমার ও ভাল ঝি থাকবে কোথায় শুনি?"

কিন্তু এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার কথা অপূর্ব্ব তাহাকে এক দিনও বলে নাই। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

অপূর্ব্ব বলিল, "নিশ্চয়। এ-পাড়ায় আবার মানুষ থাকে!"

কঙ্কাবতীর তাহাতে আপত্তি নাই, বরং ভালই। ছেলেটার কাছ হইতে দুরে চলিয়া যাওয়াই উচিত। বলিল, "তবে আর এ ক'টা দিনের জন্যে কেন বাপু, বাসিনীই আসুক্।"

বাসিনী আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর আনন্দের আর সীমা নাই।

সে দিন সকালে কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, আজ মঙ্গলবার ত'?"

অপূর্ব্ব বলিল, "হ্যাঁ, কেন?"

"এম্‌নিই জিগ্যেস্ করলাম।"

তাহার পর দেখা গেল, সে দিন অতি প্রত্যুষেই কঙ্কাবতী স্নান করিয়াছে। স্নান করিয়া একপিঠ কালো চুল এলাইয়া দিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া আবার সে তাহার স্বামীর কাছে আসিয়া হাতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া বলিল, "এতে একবার পায়ের আঙ্গুলটা দাও না ডুবিয়ে। পাদোদক নেব।"

অপূর্ব্বর মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, "হঠাৎ এত ভক্তি যে?"

পাদোদক খাইয়া হাঁটু গাড়িয়া একটি প্রণাম করিয়া কঙ্কাবতীও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন, ভক্তি কি তোমায় করি না না কি?"

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কত পাপ হয় ত করেছি জীবনে, তাই তোমায় একটা ছেলেও দিতে পারলাম না। দেখি যদি ভক্তি করলে কিছু হয়।"

তাহার পর রান্না শেষ করিয়া অপূর্ব্বকে খাওয়াইয়া নিজে খাইতে বসিল। অপূর্ব্ব তখন বাড়ী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

কঙ্কাবতী কিন্তু খাইতে বসিয়াই উঠিয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! উঠলে যে?"

কঙ্কাবতী তাড়াতাড়ি হাতটা তাহার ধুইয়া আসিয়াই কিসের যেন যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঝের উপর

বসিয়া পড়িল। বলিল, "আমার শরীরটা কেমন যেন করছে।"

অপূর্ব্বকে আজকাল সহজে সে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে দিতে চায় না, ভাবিল, হয় ত বা ইহাও তাহারই জন্য একটা ছল। বলিল, "কি, হচ্ছে কি?"

কঙ্কাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া বলিল, "ভয়ঙ্কর পেট কামড়াচ্ছে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "পাদোদক খেয়েছ কি না, সেই জন্যেই। ও এক্ষুনি সেরে যাবে, একটু ঘুমোও। আমি আসি।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজায় কড়া নাড়িয়া প্রথমে সাড়া পাইল না। অন্য দিন জানালার পথে আলো দেখা যায়, আজ আলোও জ্বলে নাই। তবে কি যাহা ছল ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা সত্য? পেটের যন্ত্রণা কঙ্কাবতীর বাড়িয়াছে কি না, তাই বা কে জানে! জানালার পথে ডাকিল, "কঙ্কা!"

ওদিকে দরজা খোলার শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখে, আলু-থালু বেশে কাপড়-চোপড় অসামাল অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে কঙ্কাবতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে এবং অতি কষ্টে দরজা খুলিয়া সে সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। "তবে কি তোমার সত্যিই অসুখ, কঙ্কা?"

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কঙ্কাবতী বলিল, "জ্ব'লে গেল।"

"কি হয়েছে বল ত? জ্বর?"

গায়ে হাত দিয়া দেখিল, জ্বর নয়।

"ওঠো এখান থেকে।" বলিয়া তাহাকে এক রকম আড়কোলা করিয়া তুলিয়াই অপূর্ব্ব বিছানার উপর আনিয়া শোয়াইল। তাহার পর তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হচ্ছে, কঙ্কা?"

তন্দ্রাচ্ছন্ন কঙ্কাবতীর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

"কঙ্কা! কঙ্কা!" বলিয়া বার-কতক নাড়িয়া দিতেই কঙ্কাবতী চোখ চাহিল। চোখ দুইটা লাল!—"কি হচ্ছে বল ত?"

অতি কষ্টে কঙ্কাবতী বলিল, "এসেছ? এসো।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "কি হচ্ছে তোমার?"

কঙ্কা বলিল, "ম'রে যাব। বাসিনীকে দিয়ে ছেলে হবার ওষুধ—" এই বলিয়া মাথাটা একবার এপাশ ওপাশ করিয়া অপূর্ব্বকে জড়াইয়া ধরিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "পেয়ারাপাতা দিয়ে বেঁটে খেয়েছি।"

অপূর্ব্ব আর কিছু শুনিতে চাহিল না। তাহাকে তেমনই ফেলিয়া রাখিয়াই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি করিয়া এক জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তার বলিলেন, "এক্ষুনি হাঁসপাতালে নিয়ে চলুন!"

তাহার পর তাহারা দু'জনে তৎক্ষণাৎ সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়াই কঙ্কাবতীকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে লইয়া চলিল।

হাঁসপাতালে গিয়া কি হইল, সে শোচনীয় দুঃসংবাদ আর শুনিয়া কায নাই। সামান্য একটা গাছের শিকড় খাইয়া যে হতভাগী তাহার নারীজন্ম সার্থক করিতে চাহিয়াছিল, সমস্ত দিবারাত্রি প্রাণপণে যুঝিয়াও তাহাকে আর বাঁচানো গেল না। বাসিনী-ঝির সন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল, সে পলায়ন করিয়াছে। পুলিস তাহার পিছু লাগিয়া রহিল।

কঙ্কাবতীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত গৃহে আর একাকী সে বাস করিতে পারিবে না বলিয়া সেই যে অপূর্ব্ব হাঁসপাতালে গিয়াছিল, সেই অবধি আর বাসায় ফিরে নাই। তালা-দেওয়া দরজা তেমনই বন্ধই পড়িয়া ছিল।

বাসা বদল করিবার জন্য দিন দুই তিন পরে কোথা হইতে যে অপূর্ব্ব ফিরিয়াছে, কিছুই জানি না। কিন্তু কঙ্কাবতীর যে কি হইল, কোথায় গেল, তাহার সংবাদ কেহ একবার ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না।

শুধু এই জীবন-নাট্যের মূল কেন্দ্র সেই ছেলেটির কপালের ঘা তখন শুকাইয়া গিয়াছে, সে-ই শুধু বৈকালে জানালার কাছে আসিয়া খুট্ খুট্ করিয়া আওয়াজ করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল,—"কাকীমা! কাকীমা! দাবো?"

সে আওয়াজ অপূর্ব্বর কাণে যাইতেই সে ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব, প্রাণ ভরিয়া ছেলেটাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার

আগেই দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাহার চোখের সম্মুখে সব কিছু ঝাপ্‌সা হইয়া গেল।

পিন্টু হঠাৎ মুখ তুলিতেই দেখিল, তাহার কাকাবাবু দাঁড়াইয়া আছে। সে দিনের মায়ের কথা বোধ হয় সে এত শীঘ্র ভুলে নাই। কাকীমার বদলে কাকাবাবুকে দেখিয়া তাই বোধ করি সে মায়ের ভয়েই ছুটিয়া পলায়ন করিল।

অপূর্ব্ব কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাঠের মত শক্ত হইয়া জানালার শিক ধরিয়া তেমনই নিস্তব্ধভাবে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিল, পিন্টুদের বাড়ীর ঝি মাগী বোধ করি সুন্দরীকে শুনাইয়া শুনাইয়া চীৎকার করিতেছে,—"ব্যথা উঠেছে ত' আমি কি কর্‌ব মা! ছেলে যদি তোমার হাঁসপাতালেই হয় বলছ,—এ কথা দেওরকে বলো না, গাড়ী ডেকে হাঁসপাতালে দিয়ে আসুক!"

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-গয়ায়

রাজার ছেলে, রাজ্য ফেলে এসেছিলে পালিয়ে হেথা,
'মহাবোধির' অন্তরালে, মুক্তি ছিল লুকিয়ে যেথা!
জরা-মরণ যন্ত্রণাময়—পারলে নাকো দেখতে তুমি
বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে খুঁজতে কোথা অশোক-ভূমি!
এই গো সে এই পুণ্য-দেশে—এইখানে, সে এইখানে
চরণ তোমার থাম্‌লো যেথা 'অমরলোকের' মাঝখানে!

গোপার রূপে মন ওঠে নি, স্বভাব তোমার কেমন ধারা
বনের মাঝে কি রূপ পেয়ে হ'লে অমন আত্মহারা?
মহাপ্রেমিক নাম নিয়েছ, এমনি তোমার স্বার্থবোধ,
আসল দেনা রইলো বাকি, পারলে না তা করতে শোধ!
সুধাই আমি তোমায় জ্ঞানি! হয় নি কি সে মস্ত পাপ
বইলো ঘরে নয়ন বয়ে সাধ্বী-সতীর মনস্তাপ?

বন্ধু তুমি সবার বটে বল্‌তে পারি হলপ্‌ ক'রে,
নইলে কি আর রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষে করতে দোরে দোরে!
যুক্তি তোমার সবার উঁচু, এ-কথাটা সবাই বলে,
মুক্তি তোমার কিন্তু আজও দেখছি আমি অগাধ জলে!
একটা কথা বন্ধু, তুমি বল্‌তে পার শপথ নিয়ে,
সত্যি কি ও কাযটা ভাল, বাপের প্রাণে কষ্ট দিয়ে?

নেহাৎ তুমি লক্ষ্মী-ছাড়া, তোমায় করি নমস্কার,
'ভিক্ষু' করা তোমার পেশা—করাও তুমি কপ্‌নী সার!
বশ মানে গো বনের পশু, মানুষ সে ত ঘরের ছেলে,
তোমার টানে থাকতে পারে, এমন প্রাণী কোথায় মেলে!
শাক্য-ঠাকুর! বল্‌ছি শোনো, গোটাও তোমার আস্তানাটি
মূর্ত্তি অমন পড়লে চোখে, সরল লোকে হবেই মাটী!

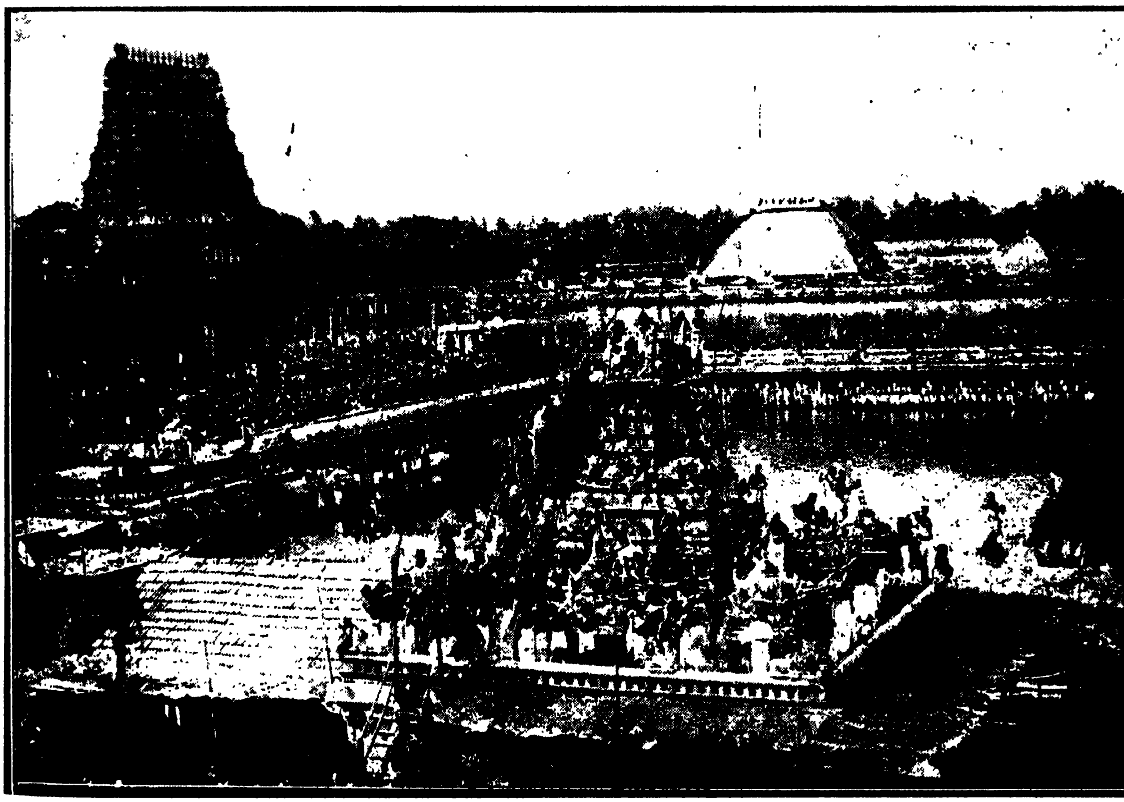
চতুর তুমি মস্ত বড়, তোমার কাযে যাচ্ছে জানা
রাজ্য যদি ছেড়েই এলে, সত্র কেন সঙ্গে আনা?
যেথায় প'ড়ে বিষ্ণুচরণ, ঠাঁই নিলে ঠিক পাশেই তার
বইছে যেথায় ফল্গু নদী, ডুবিয়ে দিলে সেথায় "মার!"
সন্দেহ হয় বেজায় মনে, এটি তোমার স্পষ্ট ছল,
বিষ্ণুচরণ সবার শরণ জান্‌তে তুমি—চতুর, খল!

নিত্য তুমি—নিত্য তরুণ, বড়াই যদি এতই কর
বুঝবো কেমন লক্ষ্মীছেলে—পারের আলো সাম্‌নে ধর!
সত্যি আমার হয় না রুচি, হাত পাত্‌তে তোমা' কাছে
পারবে কি হে সর্ব্বত্যাগী! কাড়তে তা' যা আমার আছে?
বুক ঠুকে কি বল্‌তে পার, ডাক্‌লে আমি পাবোই সাড়া
'ভিক্ষু' ক'রে, রিক্ত করে—করবে আমায় ছন্ন-ছাড়া?

শ্রীচরণদাস ঘোষ।

চিদম্বরম্

মান্দ্রাজ নগরে প্রায় তিন মাস কাটাইবার পর হুকুম পাইলাম, তাঞ্জোর যাইতে হইবে। পথে চিদম্বরম্ দর্শন করিয়া যাইব স্থির করিলাম। সন্ধ্যার সময় এগ্‌মোর ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতে হইবে। মান্দ্রাজ নগরীতে দুইটি প্রধান ষ্টেশন, একটির নাম সেন্‌ট্রাল ষ্টেশন। ইহা মান্দ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ের ষ্টেশন। এখান হইতে কলিকাতা ও বোম্বাই যাইবার গাড়ী ছাড়ে। অপরটি সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন, নাম এগ্‌মোর। এখান হইতে রামেশ্বরম্, উটাকামাণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইবার গাড়ী ছাড়ে। আমরা যথাসময়ে এগ্‌মোর ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ীগুলি ছোট, তাহার উপর গাড়ীর এক পার্শ্বে এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার পথ, ফলে ছোট ছোট কক্ষগুলি বড়ই সঙ্কীর্ণ বোধ হইল। সান্ধ্য ভোজন শেষ করিয়া আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোর পাঁচটার সময় চিদম্বরমে নামিবার কথা। এত সকালে পাছে ঘুম না ভাঙ্গে, এ জন্য রাত্রি তিনটা হইতে ছেলেরা উঠিয়া বসিল, আমাদিগকেও ঘুমাইতে দিল না। কাবেরীর শাখা কোলাদাম নদ পার হইয়া, পোর্টোনোভো এবং ঝিল্লী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী যখন চিদম্বরম্ পৌছিল, তখনও বেশ রাত্রি ছিল। চিদম্বরম্ ছোট ষ্টেশন, গাড়ী অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, আমাদের জিনিষপত্র হইয়া গিয়াছিল অনেক। তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। এত সকালেও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী ও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার দুইটি মোটর লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। মেয়েছেলেদের একটি মোটরে তুলিয়া আমরা অপর মোটরে উঠিলাম। জিনিষপত্রের জন্য তিনটি কাণ্ডি বা গো-যান নিযুক্ত হইল। সুপ্তিমগ্ন নগরের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ীগুলি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইল। মন্দিরের

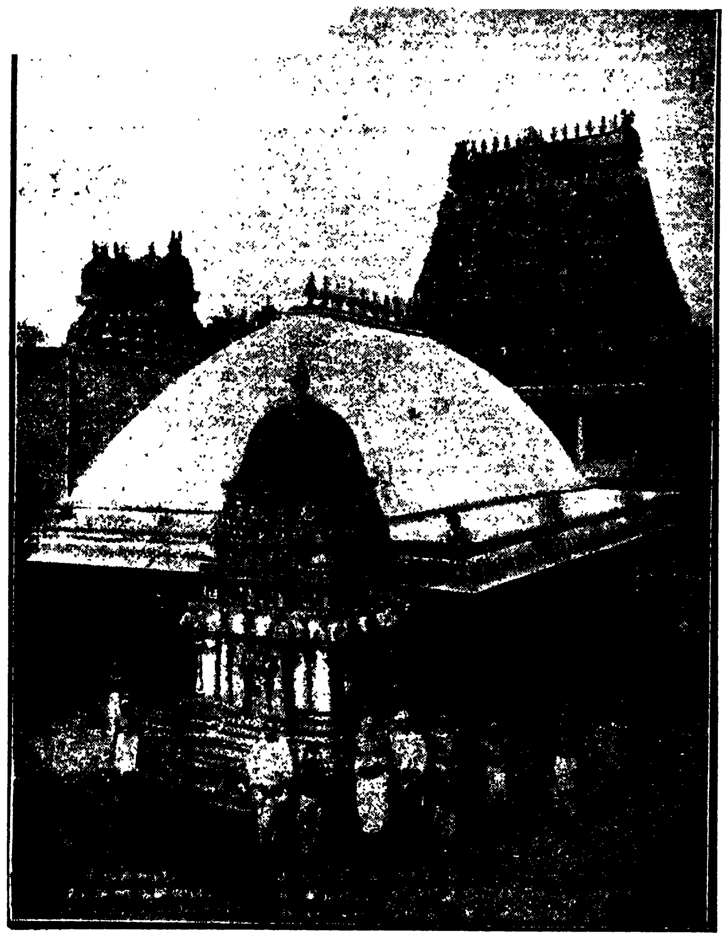


চিদম্বরমের মন্দির,—উৎসবের সময়

পাশে একটি বাগান-বাড়ী আমাদের জন্য স্থির হইয়াছিল। আমরা সেখানে নামিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঊষার আলোকে জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল, পূর্ব্বগগনে ঈষৎ রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল, বিহগকুলের হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ প্লাবিত হইল। অনন্তর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমরা মন্দিরে চলিলাম।

মন্দিরের চারি পাশে চারিটি প্রশস্ত রাজপথ। ইহারা 'নর্থ কার ষ্ট্রীট' (North Car Street), সাউথ কার ষ্ট্রীট প্রভৃতি নামে পরিচিত; কারণ, উৎসবের সময় মন্দিরের সুবৃহৎ রথগুলি এই পথে নগর পরিভ্রমণ করে। মন্দিরে প্রবেশ করিবার চারিটি পথ আছে, তাহার উপর চারিটি গোপুর। গোপুরের চূড়াগুলি খুব উচ্চ এবং সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত। আমরা দক্ষিণের গোপুর দিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটির পর একটি, দুইটি প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত। দ্বিতীয় প্রাচীরের গায়ে সারি সারি কক্ষ, একতলায় একসারি, দোতলায় আর এক সারি। কক্ষগুলি জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীরবেষ্টিত ভূমির মধ্যস্থলে মূল মন্দির, ইহা কনকসভা নামে পরিচিত। কারণ, ইহার শীর্ষদেশ সুবর্ণ-মণ্ডিত। "দীক্ষিত" বলিলেন (এখানের পাণ্ডার নাম "দীক্ষিত"), যে, ২১, ৬০০ স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা ইহার শিরোভাগ মণ্ডিত করা হইয়াছে। * মানুষ না কি দিবা-রাত্রিতে ২১, ৬০০ বার নিশ্বাস ফেলে। মন্দিরের উপর কয়েকটি কলসযুক্ত চূড়া আছে। বিমানমন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া আমরা দেব-দর্শন করিলাম।

ভোগমূর্ত্তির নাম নটরাজ। মহাদেবের চতুর্ভুজমূর্ত্তি। ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন। বাম পা মাটীর উপর, ডান পা বাম জানুর সম্মুখ দিয়া বামদিকে প্রসারিত আছে। সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ এবং মণি-মুক্তার আভরণ। কপালে মণিময় তিলক। পাণ্ডা বলিলেন, "নৃত্যাবসানে নটরাজ-রাজো"। ইহার অর্থ তখন বুঝিলাম না। পরে

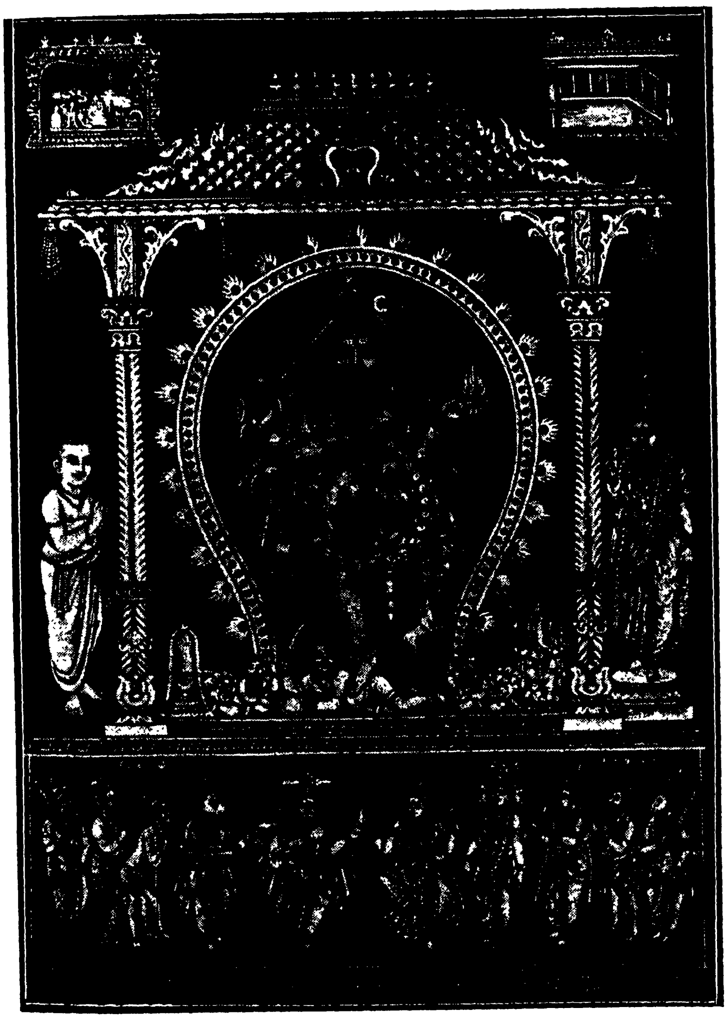


কনক-সভা—চিদম্বরম্

গল্প শুনিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বে এ স্থানে মা কালীর আধিপত্য ছিল, পরে মহাদেব যখন আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে নৃত্যের প্রতিযোগিতা হইল, তাহাতে মহাদেব জয়লাভ করেন এবং সে জন্য এই স্থানের প্রভুত্ব মা কালীর নিকট হইতে মহাদেব প্রাপ্ত হন। বোধ হয়, কোন পুরাণে এই গল্প কথিত হইয়াছে

* খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চোলরাজ পরন্তপ মন্দিরের শিরোভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছিলেন, Leyden Grent এ ইহা লিখিত হইয়াছে।

এবং গল্পের শেষে পাণ্ডা মহাশয়ের উদ্ধৃত পংক্তিটি আছে। নটরাজের মূর্ত্তির পশ্চাতে একটি কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা। সাধারণতঃ ভোগমূর্ত্তির পশ্চাতে প্রধান বিগ্রহ থাকে। পাণ্ডা আমাদিগকে প্রধান বিগ্রহ দেখিতে বলিয়া যখন যবনিকা অপসারিত করিলেন, তখন দেখিলাম, যবনিকার পশ্চাতে কিছুই নাই, মন্দিরের পশ্চাতের দিকের পাথরের



চিদম্বরমের উৎসব-মূর্ত্তি,—নটরাজ

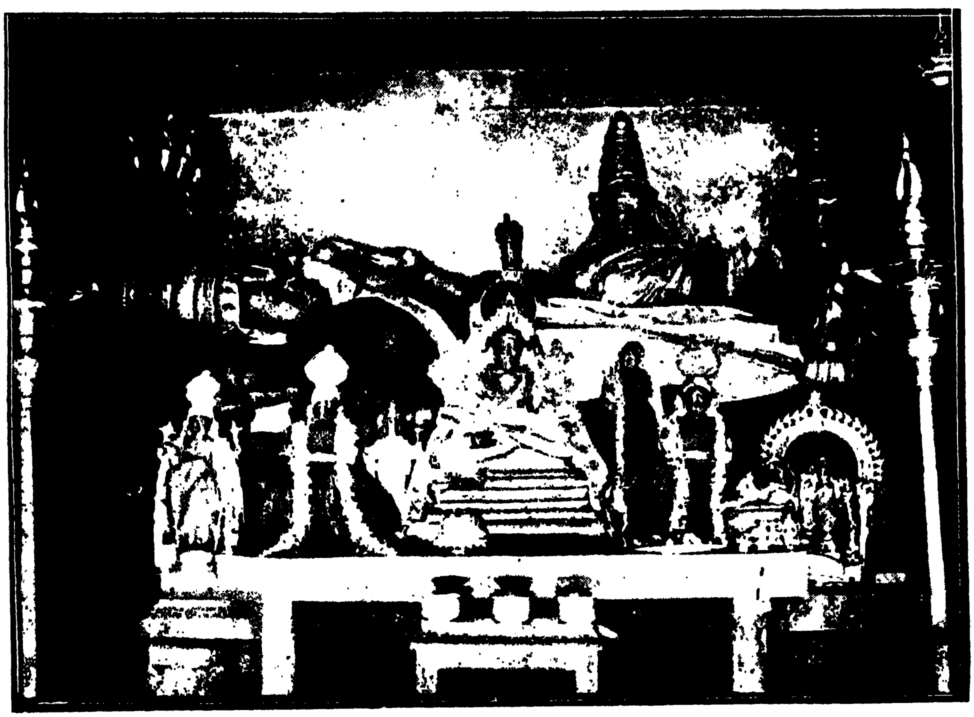
দেয়াল মাত্র দেখা যাইতেছে, তাহার উপর কয়েকটি স্বর্ণময় বৃহৎকায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিতেছে। পাণ্ডা বলিলেন, এখানে মহাদেবের আকাশময় বিগ্রহ। * মনে পড়িল উপনিষদের বাক্য—"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, যদেব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং" "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ (কং), ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ (খং), যাহা আনন্দ, তাহাই আকাশ, যাহা আকাশ, তাহাই আনন্দ।" প্রধান বিগ্রহটি আকাশস্বরূপ—"খং", ভোগমূর্ত্তিটি আনন্দস্বরূপ—"কং"। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার সময় "নেতি" "নেতি" বলিয়া বিচার করা হয়।—ব্রহ্মের স্বরূপ "এরূপ নহে" "এরূপ নহে" বলিয়া জগতের যাবতীয় গুণময় পদার্থ হইতে তাঁহাকে বিভিন্ন স্বভাবের বলা হয়। এইরূপে সকল বিশেষণ নিরস্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" "যাহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে।" চিদম্বরমের মন্দিরে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বোধ হইল।

মন্দিরে একটি ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যে একটি স্ফটিকলিঙ্গ দেখিলাম। প্রত্যহ ছয়বার করিয়া তাঁহার পূজা হয়। অভিষেকের সময় এই লিঙ্গটির উপর যে কত দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, চন্দন ঢালা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার অন্ন দ্বারা মূর্ত্তিটি ঢাকিয়া ফেলা হয়, আবার সব ধুইয়া ফেলা হয়। এই ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিষেক হইল দেখিলাম। সে সময় কয়েক জন পাণ্ডা সুর করিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। এই স্ফটিকলিঙ্গ ব্যতীত নটরাজের একটি মণিময় ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখিলাম। ইহা দিবসে একবারমাত্র বেলা ১০।১১টার সময় পেটিকা হইতে বাহির করিয়া পূজা করা হয়। মূর্ত্তিটি যখন বাহির করিয়া পূজা ও অভিষেক করা হইল, তখন ভাবিলাম, ইহা বুঝি কালো পাথরের মূর্ত্তি। তাহার পর নাটমন্দিরের চারিদিক বন্ধ করিয়া অন্ধকার ঘরে

* দক্ষিণভারতে পাঁচটি তীর্থে মহাদেবের পাঁচটি মূর্ত্তি আছে,—ক্ষিতিময়, অপ্‌ময়, তেজোময়, মরুৎময় ও ব্যোমময়।

মূর্ত্তির পশ্চাতে যখন প্রজ্বলিত কর্পূরখণ্ড ধরা হইল, তখন দেখা গেল, মূর্ত্তিটি কালো পাথরের নহে, কোনও অৰ্দ্ধস্বচ্ছ (translucent) রক্তিমাভ উপাদানে গঠিত। ইহাকে মণিময় বিগ্রহ (ruby image) বলা হয়।

কনক-সভার নিকটে একটি মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি চতুর্ভুজ এবং কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত। পার্শ্বের কক্ষে নারায়ণের অনন্তশয্যা। শেষের দেহের উপর নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন, নারায়ণের মস্তকের উপর শেষের সহস্র ফণা শোভা পাইতেছে, নাভিকমলের উপর ব্রহ্মার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, পদপ্রান্তে লক্ষ্মীদ্বয় সেবানিরতা, ইঁহাদের নাম শ্রীদেবী ও ভূদেবী। শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত রঙ্গনাথ স্বামীর মূর্ত্তি এবং ত্রিপতির গোবিন্দরাজস্বামীর মূর্ত্তিও এইরূপ; কিন্তু সে মূর্ত্তি দুইটি আরও বড়। জানিয়াছিলাম, দক্ষিণ-ভারতে শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রবল বিরোধ। একই মন্দিরে পাশাপাশি শিব ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, বাস্তবিক তত বিরোধ নাই। কনক-সভার চারিদিকে পরিক্রম করিবার পথ আছে। দুই পার্শ্বে সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ-সমন্বিত বৃহৎ বারান্দা, মধ্য দিয়া পথ। এই পরিক্রম করিবার পথের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। কোনটি কার্ত্তিকের, কোনটি গণেশের, কোনটি আম্মান অর্থাৎ মাতার (দুর্গাদেবীর)। মন্দির-প্রাকারের মধ্যে একটি প্রাচীন সরোবর আছে, তাহার চারিধার পাথর দিয়া বাঁধান। প্রবাদ এই যে, প্রাচীনকালে শ্বেতবর্ণ নামক রাজা এখানে স্নান করিয়া শ্বেতকুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা হেমতীর্থ নামে পরিচিত ছিল। উক্ত রাজাই না কি এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সরোবরের পূর্ব্বদিকে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ আছে। মণ্ডপটি সুবৃহৎ এবং নানাবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত। আমরা ইহার অবস্থা জীর্ণপ্রায় দেখিলাম। উৎসবের সময় নটরাজের মূর্ত্তি মন্দির হইতে আনিয়া এখানে রাখা হয়। সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপের সম্মুখে সারি সারি উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ আছে, ইহাদের মাথায় ছাদ নাই, উৎসবের সময় ইহাদের উপর বৃহৎ সামিয়ানা টাঙ্গান হয়।



চিদম্বরমের বিষ্ণুমন্দিরের বিগ্রহ—শ্রীগোবিন্দরাজ

দক্ষিণভারতে এইরূপ অসংখ্য সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ

করিতে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয়, বহু শতাব্দী ধরিয়া একটা জাতি তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় সংগ্রহের জন্য যে উদ্যমের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত সমগ্র উদ্যম দেবসেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। রাজারা এ জন্য তাঁহাদের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, স্থপতিগণ সুবৃহৎ মন্দির, গোপুর ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শিল্পিগণ উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি গঠিত বা উৎকীর্ণ করিয়াছেন, সাধক জ্ঞানী মন্দির ও বিগ্রহের মৌলিক প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং ভক্তগণ তাঁহাদের পবিত্র জীবন দিয়া দেবসেবার সকল আয়োজন সার্থক করিয়া দিয়াছেন। বহু দিন পর্য্যন্ত বিজাতীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া দক্ষিণ-ভারত হিন্দুর বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে যেরূপ সমর্থ হইয়াছে, ভারতের অন্য প্রদেশ সেরূপ পারে নাই।

চিদম্বরমের সুবিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণের এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত নটরাজের মূর্ত্তি আছে। নৃত্যের ভঙ্গীতে ইঁহার দক্ষিণ পাদ সোজা মাথার উপরে তোলা হইয়াছে, এবং বাম হাত উর্দ্ধে তুলিয়া দক্ষিণ পাদের সহিত যোগ করা হইয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখের নাট-মন্দিরের এক পার্শ্বে দেয়ালগাত্রে একটি দেড় হাত উচ্চ কালো পাথরের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির দুই হাতে, গলায় ও মাথার উপরে রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত, মুখে ভক্তি ও আনন্দের অপূর্ব্ব সম্মিলন। ইনি যে "পারিয়া" বা অস্পৃশ্য-কুলসম্ভূত, তাহা ইঁহার হাতের একটি দণ্ড দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল। ইঁহার নাম নন্দ। প্রায় ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে আদাপুর নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার খেলা ছিল মাটী দিয়া মহাদেবের মূর্ত্তি গড়া, এবং মহাদেবের লীলাবিষয়ক গান গাহিয়া নৃত্য করা। তিনি এক দল বালক-ভক্ত গঠন করিয়াছিলেন, তাহারাও এই সব খেলায় যোগদান করিত। মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিয়া ঠাকুরকে লইয়া শোভাযাত্রা করিতেন। আদাপুরে একটি শিবের মন্দির ছিল। নন্দ অস্পৃশ্য বলিয়া সেখানে ঢুকিতে পাইতেন না। তিনি গোপুরের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বাহির হইতে উদ্দেশ্যে মহাদেবকে প্রণাম করিতেন। নন্দ সর্ব্বদাই ভাবিতেন, কি করিয়া তিনি মহাদেবের সেবা করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক করিতে পারিবেন। তাঁহার মনে হইল, মন্দিরের ঢাকের জন্য চামড়ার প্রয়োজন। তাই তিনি মৃত জন্তুর চামড়া পরিষ্কার করিয়া মন্দিরে দিয়া আসিতেন। বয়সের সহিত তাঁহার ভক্তি বাড়িয়া চলিল। কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী তিরুপুঙ্কুরের বড় মন্দিরে তিনি মধ্যে মধ্যে যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং যদি দৈবাৎ বাহির হইতে দেবদর্শন পান, সেই আশায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রবাদ এই যে, নন্দর ভক্তি দেখিয়া মহাদেব নন্দীকে একটু সরিয়া বসিতে বলিয়াছিলেন, এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত মন্দিরের বৃষভ-মূর্ত্তি ঠিক মধ্যস্থলে নাই, এক পাশে সরিয়া আছে। নন্দ তাঁহার সঙ্গী ভক্তদের সাহায্যে তিরুপুঙ্কুরে মহাদেবের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করিলেন।

এক দিন তিরুপুঙ্কুরে এক কথকের মুখে নন্দ চিদম্বরমের মাহাত্ম্য শুনিলেন। শুনিলেন, মহাদেব এখানে আনন্দময় অপরূপ নর্ত্তনশীল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাব উদ্বোধন করিয়া বিরাজ করেন। আপ্পার, মাণিক্কর, পট্টনাথর, থায়ুমানবর প্রভৃতি বিখ্যাত শৈব সাধুর স্মৃতি-বিজড়িত চিদম্বরম্ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কবে তিনি জীবন সফল করিতে পারিবেন, বাড়ী ফিরিয়া নন্দ কেবল তাহাই দিবারাত্রি ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, নন্দ পারিয়া, অতএব তাঁহার প্রভু ভূস্বামীর সম্পত্তিমাত্র, প্রভুর অনুমতি ব্যতীত নন্দ কোথাও যাইতে পারেন না। চিদম্বরমের চিন্তায় তন্ময় থাকিতে থাকিতে এক দিন নন্দর সমাধি হইল। জাতি-ভাই আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন, ঠেলেন; কিন্তু কোন উত্তর পান না। তিনি সকলকে সংবাদ দিলেন, নন্দকে ভূতে পাইয়াছে। পঞ্চায়েৎ বৈঠক হইল, স্থির হইল, পরদিন দেবতার পূজা হইবে। তমোগুণাচ্ছন্ন পারিয়াদের দেবতাও সেইরূপ "ভূতান্ প্রেতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।" যাহাই হউক, ভীষণদর্শন দেবমূর্ত্তি গঠিত হইল এবং তুমুল শব্দে বাদ্য বাজাইয়া মদ্য, মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা হইল। পূজার পর পুরোহিত দৈবাবিষ্ট হইয়া ডমরু নাড়িয়া বলিল, বাজারের মধ্যবর্ত্তী তেঁতুলগাছের লম্বা চুলওয়ালা ভূত নন্দকে পাইয়াছে, ১ শত ভেড়া এবং ২ শত মোরগ বলি পাইলে সে খুসী হইয়া নন্দকে ছাড়িয়া দিবে। ভেড়া ও মোরগ বলি হইল। তাঁহার জন্য এতগুলি

নিরীহ প্রাণী হত্যা হইল দেখিয়া বেচারী নন্দ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন।

অনেক ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া নন্দ জমীদারকে বলিলেন, তিনি চিদম্বরম্ যাইতে চাহেন। ব্রাহ্মণ জমীদার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার এত দূর আস্পর্দ্ধা! তুমি ব্রাহ্মণের দেবতা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চাও!" নন্দ মাঠে গিয়া গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাবিলেন, আত্মহত্যা করিবেন, কিন্তু শেষে স্থির করিলেন, তিনি নিশ্চয় এখনও ভগবানের দর্শন পাইবার উপযুক্ত হন নাই। উপযুক্ত হইলে ভগবান্ অবশ্য দর্শন দিবেন।

মাঠে শস্য পাকিল। পারিয়ারা নন্দকে লইয়া ব্যস্ত, কাযেই ধান কাটার ক্ষতি হইল। জমীদার রাগ করিয়া প্রজাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকল ব্যাপার বলিল। তখন নন্দর ডাক পড়িল। নন্দ বলিলেন, একবার চিদম্বরম্ যাইতে পাইলে তাঁহার ভূত ছাড়িয়া যাইবে। নন্দর একাগ্রভক্তি প্রভুর হৃদয় ঈষৎ স্পর্শ করিল। প্রভু কহিলেন, "আচ্ছা, যাও। আজ রাত্রির মধ্যে যদি সব ধান কাটিয়া দাও, তাহা হইলে চিদম্বরম্ যাইতে দিব।" তিনি মনে মনে জানিতেন, ইহা অসম্ভব। ৫০ জন লোক দশ দিন খাটিলেও উহা পারিবে না। কিন্তু নন্দর সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান ছিল না। তিনি পাগলের মত ছুটিয়া ধান কাটিতে গেলেন। ধান নন্দ কাটিল, না নন্দর ভূতে কাটিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু রাত্রির মধ্যে সব ধান কাটা হইল। প্রভাতে নন্দ আসিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল। প্রভু প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু মাঠে গিয়া যখন দেখিলেন, সত্য সত্যই সব ধান কাটা হইয়াছে, তখন অবাক্ হইয়া নন্দর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল, বলিলেন, "নন্দ, তুমি মহাপুরুষ। অনুগ্রহ করিয়া তোমার ভক্তির এক কণা আমাকে দাও। আজ হইতে তুমি আমার দাস নহ। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।"

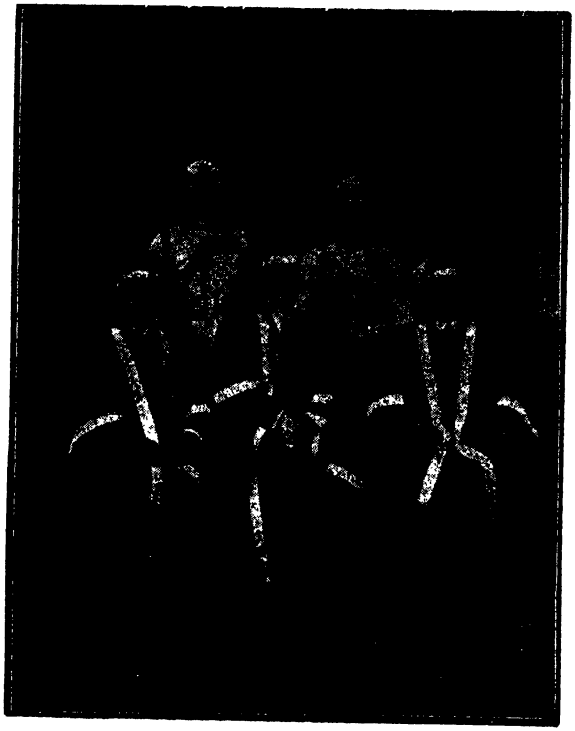
নন্দর আর বিলম্ব সহিল না। সেই মুহূর্ত্তেই নটরাজের নাম করিতে করিতে ছুটিয়া নাচিয়া চিদম্বরম্ অভিমুখে চলিলেন। ক্রমে চিদম্বরমের নিকট কাবেরীর শাখা কোলাদাম নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে চিদম্বরম্ মন্দিরের গোপুরমের চূড়া দেখা যাইতেছিল। নন্দ খেয়া-নৌকায় উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। নদী পার হইয়া যখন মাঝিকে পয়সা দিতে গেলেন, মাঝি পয়সা লইল না, নন্দর ভাব-ভক্তি দেখিয়া সে নন্দকে এক মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছিল। নন্দের ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া কৃষক, ব্যবসায়ী, ধনী, পথের পথিক সকলে নিজ নিজ কায ভুলিয়া শিবনাম গাহিতে গাহিতে নন্দর সঙ্গে চলিল। নন্দ চিদম্বরম্ পৌঁছিলেন। মন্দিরের নিকট গোপুরের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সে রাত্রিতে মন্দিরের পুরোহিতরা সকলেই স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নটরাজ তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "নন্দকে ব্রাহ্মণ করিয়া লও এবং মন্দিরে ঢুকিতে দাও।" পরদিন প্রভাতে পুরোহিতদের সভা হইল। তাহাদের সংখ্যা ২হাজার ৯ শত ৯৯, নটরাজকে লইয়া ৩ হাজার সংখ্যা পূর্ণ হয়। সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধ আপ্পিয়ার দীক্ষিতার স্বপ্নের কথা বলিলেন। তাহার পর কুপ্পাল্লা, সুব্বা, নটরাজ, পরে পরে সকলে এক কথাই বলিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া নন্দকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইবে।

এ দিকে মন্দিরের দরজার বাহিরে পড়িয়া নন্দ কাঁদিতেছিলেন, "হে ভগবান্, এখনও কি তোমার দয়া হইল না?" এমন সময় দীক্ষিতাররা আসিয়া নন্দকে স্বপ্নের কথা বলিলেন। শুনিয়া নন্দ আনন্দে অধীর হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই অগ্নিতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। মন্দিরের দক্ষিণে রাজপথের উপর যেখানে আগুন জ্বালা হইয়াছিল, সকলে সেখানে নন্দকে লইয়া চলিল। নন্দ নটরাজের নাম করিতে করিতে অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন এবং অক্ষতদেহে আগুন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দীক্ষিতাররা নন্দকে সসম্মানে মন্দিরে লইয়া চলিলেন। মণ্ডপ, মন্দির, সরোবর, প্রাঙ্গণ এই সব দেখিতে দেখিতে নন্দ অভিভূতের মত চলিলেন। অবশেষে নন্দ নটরাজের মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এত দিন স্বপ্নে ও জাগরণে নন্দ যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতেন, আজ নন্দ সে মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দুই পার্শ্বে কনক-সভার ঘণ্টাগুলি বাজিতেছিল। আপ্পিয়ার দীক্ষিতার প্রদীপ জ্বালিয়া বিগ্রহের আরাধনা

করিতেছিলেন। নন্দ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া নটরাজকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

আমরা এক দিন চিদম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম রাজা স্যর, আন্নামালই চেটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে নাট্টুকোট্টা চেট্টিয়া প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী—ধন-কুবের। ইঁহারা অনেকটা কলিকাতার মাড়োয়ারী-দের ন্যায় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজা স্যর আন্নামালই চেটি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে প্রান্তরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড

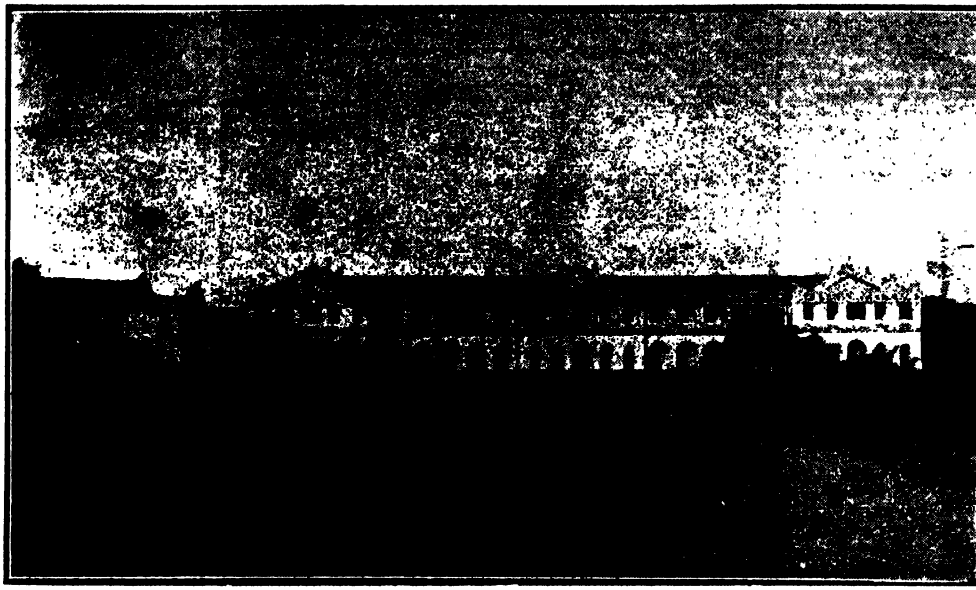


আন্নামালই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারত্রয়

প্রাসাদ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকদের বাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ক্রীড়াক্ষেত্রে ছেলেরা খেলা করিতেছিল। ক্লাব-গৃহে বসিয়া অধ্যাপকরা গল্প করিতেছিলেন। শুনিলাম, এখানে দুই জন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট সরোবরের তীরে একটি মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের নাম শুনিলাম পার্ব্বতীশ্বর কোয়েল (তামিল ভাষায় 'কোয়েল' মানে মন্দির)। প্রবাদ, এখানে অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন মন্দির



আন্নামালই বিশ্ববিদ্যালয়—সাধারণ দৃশ্য



আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ



আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস

ছিল। সম্প্রতি স্যর আন্নামালই মন্দিরটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। প্রস্তরাবদ্ধ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় আমরা মন্দির ও নাটমন্দিরের শীর্ষে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মূল মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। পার্শ্বে আম্মা (অর্থাৎ মাতার) মন্দির। এখানে দুর্গামূর্ত্তি পূজিত হয়। মন্দির দেখিয়া আমরা নিকটে রাজার প্রতিষ্ঠিত Music College বা সঙ্গীতবিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। এখানে ৩০।৪০টি ছাত্র বিনা ব্যয়ে অবস্থান করে এবং উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করে। বিদ্যালয়-গৃহে বীণাপাণির একটি বৃহৎ মূর্ত্তি এবং নটরাজের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। অধ্যাপকগণ ছাত্রদের দ্বারা কিছু গীতবাদ্য শুনাইলেন। সন্ধ্যার সময় আমরা আন্নামালই-নগর হইতে ফিরিয়া আসিলাম। *

পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে আমরা তাঞ্জোর রওনা হইলাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

---

* আন্নামালই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার এম-এ যত্নপূর্ব্বক আমাকে চিদম্বরমের সকল স্থান দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

—প্রবন্ধ-লেখক।

কাযের মানুষ

কাটি ফুলবন বসায়েছি হাট,
বেণু বীণা ভেঙ্গে গড়ায়েছি খাট।

চিত্র বেচিয়া কিনিয়াছি পাট,
তুলেছি গুদাম বিশাল বিরাট।
পোষা পাখীগুলি বিনিময় করে,
ভেড়া ও ছাগল আনিয়াছি ঘরে।
পটগুলি কাটি নাট্যশালার,
করেছি চাঁদোয়া গদীতে আমার।
ফুলদানীগুলি ভাঙ্গিয়া এখন,
খেলিছে বসিয়া সোনার খোকন।
কবিতার খাতা করি ইন্ধন,
হতেছে খুকীর ভাত রন্ধন।

কসি আজি ব্যজ লাভ লোকসান,
মিলাই রোকড় বিল খতিয়ান।
কলাবিৎ এলে তখনি তাড়াই,
পাটের দালালে সাদরে বসাই।
বহু লাভ হ'ল বেচি তিসি তুষ,
বলে কত লোক "হয়েছে মানুষ"
হাসি পায় আজ নামে কবিতার;
কথার ঝরণা কিবা দাম তার?
ফাল্গুন রাতে কোকিলের গান,
কিবা ওতে হয় লাভ লোকসান?

ফুলের গন্ধ চন্দ্র কিরণ,
বাড়ায়েছে টাকা কারো কি কখন?
বাজে ও সকল করি বর্জ্জন,
কাযের মানুষ হয়েছি এখন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়



সপ্তদশ প্রবাহ

নৈশ অভিযান

লাইটওয়েরের পূর্ব্বতন সহযোগী মাজাডো কালিম্পো জাহাজে আশ্রয়লাভ করিয়া লাইটওয়েরের পরিচর্য্যায় শীঘ্র সুস্থ হইল। সকলেই তাহার ভীষণ নির্য্যাতনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কলভেটি মাজাডোকে এই কথা বলিয়া আতঙ্কে অভিভূত করিয়াছিল যে, যে মুহূর্ত্তে সে কালেসো বন্দরে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে গুলী করিয়া মারিবে; কিন্তু কলভেটি কি কারণে তাহার এই নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা পালন করে নাই, তাহাই জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল প্রবল হইল।

মাজাডো বলিতে আরম্ভ করিল, "কলভেটি আমাকে বলিভার জাহাজের একটি নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ করিয়াছিল; আমি সেই জাহাজে ছিলাম, এ সংবাদও সে গোপন রাখিয়াছিল; কারণ, আমি পাটানিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছি—এ সংবাদ প্রেসিডেণ্ট যাহাতে জানিতে না পারেন, এইরূপই তাহার ইচ্ছা ছিল।—আমার এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় আপনারা ওভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। হাঁ, আপনারা একটু ধাঁধায় পড়িয়াছেন। আপনারা আমাকে প্রতারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে আমার প্রতি অবিচার করিবেন; কিন্তু আমি সত্যই প্রতারক নহি। আমার সহযোগী নাবিক লাইটওয়েরের সহিত আমি কপট ব্যবহার বা বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আপনারা একটি কথা কোন দিন জানিতে পারেন নাই—কিন্তু আমি সত্যই প্রেসিডেণ্টের গুপ্তচর ছিলাম, এবং চর-বিভাগের চাকরীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। এই জন্য আমি জানিতে পারিয়াছিলাম—কলভেটি আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য অপহৃত হীরা-জহরত ও ধনরত্নগুলি এ দেশে লইয়া আসিবে বলিয়া যতই জাঁক করুক, সেগুলি আত্মসাৎ করিয়া নিজের সিন্দুক পূর্ণ করিবে, স্বদেশের প্রাপ্য সম্পদে তাহার মাতৃ-ভূমিকে বঞ্চিত করিবে—ইহাই ছিল তাহার আন্তরিক কামনা। হাঁ, এই গুপ্ত সংবাদ আমি—কেবল আমিই জানিতাম; এবং আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কলভেটির সন্দেহ হইয়াছিল—আমি তাহার দুরভিসন্ধির সন্ধান পাইয়াছি। কেবল এই গুপ্ত সংবাদ নহে, আমি এ সংবাদও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, কলভেটি সেই বিপুল অর্থের সাহায্যে পুনর্ব্বার একটি রাষ্ট্র-বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে এবং সেই বিপ্লবে জয়লাভ করিতে পারিলে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টকে কোন কৌশলে হত্যা করিয়া পাটানিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পদ অধিকার করিবে।"

তাহার কথা শুনিয়া ক্রডার বলিল, "তাহার প্রথম আশা সফল হইয়াছে; গুপ্ত ধনরত্নগুলি সে কৌশলে হস্তগত করিয়াছে।"

মাজাডো বলিল, "হাঁ সিনর, তাহার সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তাহার সকল আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। আমি উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তাহার সকল দুরভিসন্ধি এখনও বিফল করিতে পারি। যদি একখান

'ডেষ্ট্রয়ার' পাই, অভাবে একখান জাহাজও পাই, তাহা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হইলেও আমি আমার মাতৃভূমির মহাশত্রু, আত্মম্ভরী, যথেচ্ছাচারী নরপশুটাকে চূর্ণ করিতে পারি। বিশেষতঃ সেই নিরপরাধ যুবতী ও তাহার পিতাকে সেই নারীনির্য্যাতক পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার করাও অবশ্যকর্ত্তব্য।"

স্ক্রডার তাহার কথা শুনিয়া মিঃ লককে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি এই পাটানিয়ানটার কথা শুনিলেন ত? উহার কথা কি নির্ভর-যোগ্য?"

মিঃ লক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, উহার সকল কথাই সত্য।"

স্ক্রডার মাজাডোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ মাজাডো, তুমি বলিলে, একখান জাহাজের সাহায্য পাইলে সেই নরপশুটাকে চূর্ণ করিতে পারিবে। যদি সত্যই তোমার সেরূপ সাহস ও শক্তি থাকে, এবং আমার এই ক্ষুদ্র জাহাজখানি তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহা হইলে আমি এই জাহাজ তোমার হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার আদেশেই এই জাহাজ পরিচালিত হইবে। যদি তুমি এখন তাহার জাহাজের অনুসরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে সাইরস কে স্ক্রডার ও তাহার সহযোগিবর্গ আনন্দের সহিত এই কার্য্যে যোগদান করিবে।"

স্ক্রডারের কথা শুনিয়া মাজাডো মহা উৎসাহে তাহার করমর্দ্দন করিল, আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল; সে উৎফুল্লভাবে বলিল, "সিনর, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আপনি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আমি সত্যই সেনাপতি ম্যানুয়েল গার্ডা কলভেটিকে চূর্ণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আমার প্রতি তাহার পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিফল দিব, মিঃ লকেরও সঙ্কল্পসিদ্ধি হইবে—আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

অতঃপর মাজাডোর আদেশে কালিপ্সো জাহাজ সেই স্থানে নঙ্গর ফেলিয়া নিশাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর নৈশ অন্ধকারে জলস্থল সমাচ্ছন্ন হইলে জাহাজের আলোকগুলি নির্ব্বাপিত করিয়া তাহাকে সমুদ্রের তটভূমির দিকে পরিচালিত করা হইল। সেই সময় জাহাজের প্রহরিসংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইল। কালেসো বন্দরের দক্ষিণাংশে একটি ক্ষুদ্র উপসাগর আছে, জাহাজ সেই উপসাগরের সন্ধানে চলিল। কারণ, মাজাডো পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, সেনাপতি যে পর্য্যন্ত পাটানিয়ায় বিপ্লবের আয়োজনে লিপ্ত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত বলিভিয়া জাহাজ সেই উপসাগরের কোন অংশে লুকাইয়া থাকিবে।

কালিপ্সো জাহাজ যখন বিশাল সমুদ্রে মসীলেখার প্রায় ক্ষুদ্র আগলহাস দ্বীপের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিল, সেই সময় সেই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহাকে কয়েক দিন সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল; কিন্তু সেই দ্বীপ হইতে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল। অবশেষে কালিপ্সো সমুদ্রতটবর্ত্তী গিরিশ্রেণীর সমুন্নত চূড়ার ছায়ায় ছায়ায় অতি সন্তর্পণে সমুদ্রকূলে আসিয়া নিঃশব্দে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জাহাজ থামিলে মাজাডো অদূরবর্ত্তী তটভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিঃ লককে বলিল, "আকাশের সীমান্তরেখায় ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ স্তূপের ন্যায় পদার্থটি দেখিতে পাইতেছেন, উহাই এই উপসাগরের তটভূমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বলিভার জাহাজ উহারই সন্নিহিত কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এই জাহাজের মালিক আমেরিকান মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণ করিয়া জাহাজের কয়েকখানি বোট জলে নামাইয়া দিব, এবং সেই সকল বোটে আরোহণ করিয়া নিঃশব্দে বলিভারের সন্ধানে ধাবিত হইব। বলিভার জাহাজে আমার বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই; তাহারা আমাদের রাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্টের পক্ষপাতী, তাহারা অন্তরের সহিত তাঁহার হিতকামনা করে। আমার বিশ্বাস, আমি তাহাদের সহায়তায় বঞ্চিত হইব না, এবং তাহাদের সহায়তায় আমরা বলিভিয়া জাহাজ অধিকার করিতে পারিব।"

অতঃপর যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। মিঃ লক, স্ক্রডার এবং কালিপ্সো জাহাজের কাপ্তেন বার্টন এক একখানি বোটের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক বোটে দশ বারো জন নাবিক গ্রহণ করা হইল। প্রত্যেক বোটের দাঁড়গুলি নিঃশব্দে চালাইবার জন্য তাহাতে পুরু করিয়া কাপড় জড়াইয়া লওয়া হইল। বোটগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

কিছুকাল পরে সেই বোটগুলির আরোহীরা উপসাগরের অন্ধকারাচ্ছন্ন তটভূমি অতিক্রম করিয়া, কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে আলোকমালা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, উহা বলিভিয়া জাহাজের আলোক। বলিভিয়া প্রায় এক মাইল দূরে নঙ্গর করিয়াছিল।

মাজাডো যে অদ্ভুত উপায়ে আগলহাস দ্বীপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, কিংবা বলিভার জাহাজ উপসাগরের সেই নিভৃত অংশে লুকাইয়া ছিল—এ সংবাদ কেহ জানিত, ইহা কলভেটি পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই; এ জন্য সে রাত্রিকালে জাহাজে প্রহরি-নিয়োগের ব্যবস্থা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। বলিভার জাহাজ হইতে সার্চ-লাইটের আলোক বিকীর্ণ করিয়া উপসাগরের জলরাশি আলোকোদ্ভাসিত করা হইলেও জাহাজের প্রহরীরা সতর্ক থাকিলে তাহারা বহু দূর হইতে কালিম্পো জাহাজের বোটগুলি দেখিতে পাইত, তখন সেই সকল বোটের আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসাধ্য হইত। কিন্তু বলিভার সেই প্রকার সতর্কতাবলম্বন না করায় কালিম্পোর বোট তিনখানি মিঃ লক, স্কডার ও কাপ্তেন বার্টন দ্বারা পরিচালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বলিভারের পার্শ্বে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল। বলিভার জাহাজ হইতে জনপ্রাণীও সেই তিনখানি বোটের সন্ধান লইল না।

বোটগুলি বলিভারের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে মিঃ লক মাজাডোকে বলিলেন, "জাহাজে গভীর শান্তি বিরাজিত, অধিক লোক জাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না; কেবল দুই এক জনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় আমরা কি—"

মিঃ লকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাহাজের ডেকের উপর হইতে সহসা একটা হুঙ্কার-ধ্বনি বোটের আরোহিগণের কর্ণগোচর হইল, সঙ্গে সঙ্গে ডেকের উপর অনেকের পদশব্দও তাঁহারা শুনিতে পাইলেন।

মিঃ লক মাজাডোকে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "উহারা আমাদের দেখিতে পাইয়াছে, এখন জাহাজ চড়াও করা ভিন্ন আমাদের আর কিছুই করিবার নাই।"

মিঃ লক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, তাহা দেখিয়া মাজাডো তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া পশ্চাতে টানিয়া আনিল এবং তাঁহার কাণে কাণে বলিল, "না সিনর, আপনি অত ব্যস্ত হইবেন না; উহারা আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই।"

মিঃ লক অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই? তুমি বলিতেছ কি? যদি আমাদিগকে দেখিতেই না পাইবে, তাহা হইলে ঐ ভাবে হুঙ্কার করিবার কারণ কি? ডেকের উপর সকলে দৌড়াইয়া বা আসিল কেন?"

মাজাডো ঈষৎ হাসিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালুতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল, "আমার কোন কোন নিজের লোক কায আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কলভেটি জাহাজের কর্ত্তা বলিয়াই যে তাহার আদেশে সকল কায সম্পন্ন হইবে, এরূপ মনে করিবেন না মিঃ লক! জাহাজে সে স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইতে পারিবে না।"

সেই মুহূর্ত্তে এক ঝাঁক গুলী জাহাজের উপর বর্ষিত হইল। উচ্চ চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। স্তব্ধ সমুদ্র যেন মুহূর্ত্তমধ্যে জীব-কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যে বলিভার জাহাজ জনমানববর্জ্জিত ও পরিত্যক্তবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু কণ্ঠের মিশ্র চীৎকারে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জাহাজের নাবিক, সৈনিক, রক্ষী, প্রহরী প্রভৃতি দলে দলে ব্যগ্রভাবে জাহাজের উপর দাপাদাপি করিতে লাগিল।

মিঃ লক বোটের উপর যে স্থানে দাঁড়াইয়া জাহাজের জন-কোলাহল শুনিতেছিলেন, তাহার অদূরে জাহাজের একটি রজ্জু-সোপান দোদুল্যমান দেখিলেন। তিনি সেই সিঁড়ি ধরিবার জন্য লাফাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "উঠিয়া পড়, উঠিয়া পড়।"

অন্য দুইখানি বোট হইতে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিল। মিঃ লক পূর্ব্বোক্ত রজ্জু-সোপানের সাহায্যে জাহাজের ডেকে উঠিলেন, জাহাজের অন্য দিক্ হইতে স্কডার ও কাপ্তেন বার্টন সদলে রেলিং লাফাইয়া পার হইয়া জাহাজে প্রবেশ করিল।

মাজাডো উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিল, "সকলে জাহাজের পশ্চাতে যাও।"

মাজাডো সর্ব্বাগ্রে জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে ধাবিত হইলে সকলে ডেকের উপর দিয়া তাহার অনুসরণ করিল। জাহাজের দুই তিন জন নাবিক মাত্র তাহাদের সম্মুখে

আসিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু ঝটিকাবর্ত্তে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহাদের অবস্থাও সেইরূপ হইল। জাহাজের এক জন সামরিক কর্ম্মচারী সোনার জরীর ফিতা-খচিত আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া স্রুডারের সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল এবং তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতের পিস্তল উদ্যত করিল। মিঃ লক স্রুডারের ঠিক পশ্চাতে ছিলেন, জাহাজের সামরিক কর্ম্মচারী তাহার পরিচ্ছদ সামলাইয়া লইয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই মিঃ লক এক লম্ফে তাহার সম্মুখে পড়িয়া দৃঢ় মুষ্টিতে পিস্তল সহ তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং অন্য হস্তে তাহার একখানি পা ধরিয়া তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া চক্ষুর নিমেষে রেলিং ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর বোটের আরোহীরা ঝড়ের মত বেগে লৌহ-নির্ম্মিত 'কম্প্যানিয়ন' সোপান অতিক্রম করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইলে জাহাজের কয়েকটি পাটানিয়ান সৈন্য তাহাদের বাধাদানের চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে বিতাড়িত হইল।

অবশেষে বোটের নাবিকরা যখন টুইন ডেকে উপস্থিত হইল, সেই সময় শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে যে বাধা দান করিল, তাহা অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইল। সেই জাহাজের যে অংশে বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, মাজাডো সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জাহাজের সেই অংশ আক্রমণ করিবার জন্য তাহার অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিল। তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জাহাজের নাবিকরা চারিদিক্ হইতে দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

মিঃ লক ও তাঁহার অনুচরবর্গের হাতে কাঠের মোটা মোটা নাদনা ভিন্ন কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল না; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে তাঁহারা নরহত্যা করিবেন না। পাটানিয়ানগণ তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা তাহাদের উপর সবেগে লাঠী চালাইতে লাগিলেন। বোটের দুই এক জন নাবিক শত্রু-হস্ত-পরিচালিত ছোরার আঘাতে সামান্য আহত হইলেও তাহাদের লাঠীর সম্মুখে পাটানিয়া নাবিকরা তিষ্ঠিতে পারিল না, তাহারা লাঠীর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বোটের নাবিকগণকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। বোটের নাবিকরা দলপতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

অষ্টাদশ প্রবাহ

কলভেটির কর্ম্মফল

কাপ্তেন বয়েল ও তাহার তরুণী কন্যা জাহাজের একটি কক্ষে আবদ্ধ ছিল বলিয়া মাজাডোর সন্দেহ হইয়াছিল।—মাজাডোর অনুচররা তাহার আদেশে জাহাজের সেই কক্ষের সম্মুখীন হইলে জাহাজের সৈনিকগণের কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক দল সৈনিক দ্রুতবেগে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল; তাহাদের সকলেই পিস্তল লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, এবং কয়েক জন সামরিক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছিল। তাহারা বোটের নাবিকগণের সম্মুখে আসিয়া গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল।

কালিম্পো জাহাজের এক জন নাবিক একটি গুলীতে আহত হইয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লোহার পাটাতনের উপর লুটাইয়া পড়িল। মিঃ লক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অটোমেটিক হইতে গুলী বর্ষণ করিলেন, গুলীটা তাঁহাদের নাবিকের আততায়ীর জানুতে বিদ্ধ হইবামাত্র সে মিঃ লকের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সেই সময় স্রুডার কল্টের বন্দুক তুলিয়া সম্মুখস্থ শত্রুদলকে লক্ষ্য করিয়া বে-পরোয়া গুলী চালাইতে লাগিল!

আহত সৈনিকগণের আর্ত্তনাদে ও মিশ্র কণ্ঠের কলরোলে জল, স্থল এবং নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বারুদের ধূমের গন্ধে জাহাজের বায়ুস্তর পূর্ণ হইল। জাহাজের লৌহমণ্ডিত ডেক উভয় পক্ষের যোদ্ধৃগণের পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল।

মিঃ লক সহসা দৃষ্টি ফিরাইতেই সটি লাইটওয়েকে তাঁহার পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন।

লাইটওয়ে শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য দর্শনে একটু দমিয়া গিয়াছিল; সে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, উহাদের যোগাড়যন্ত্রের ঘটা দেখিয়া মনে হইতেছে, জাহাজ দখল করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না।

আমাদের রীতিমত প্রস্তুত হইয়া আসা উচিত ছিল। কতকগুলা 'নাদ্না' বগলে পুরিয়া মানোয়ারী জাহাজ দখল করিতে আসা পাগলামী ভিন্ন আর কি ?"

মিঃ লক তাহাকে কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িলেন। তিনি তখন একাকী এক ঝাঁক সশস্ত্র শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহারা তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সহসা একটা লোক পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিল। মিঃ লক সেই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। সে কলভেটি। কলভেটি মিঃ লককে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল।

মিঃ লক কলভেটিকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিলেন, কিন্তু সেনাপতি মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

মিঃ লক কলভেটিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই নরাধমকে একবার নিশানা করিবারও সুযোগ পাইলাম না ! কোনও উপায়ে আমাকে একবার উহার সম্মুখে যাইতেই হইবে।"

কিন্তু লকের এই আশা পূর্ণ হইল না ; পাটানিয়ানরা ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। কালিপ্সো জাহাজের কয়েক জন নাবিক লাঠীর সাহায্যে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পাটানিয়ানদের গুলীতে আহত হইল ; তাহারা ডেকের উপর পড়িয়া শোণিত-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। মিঃ লক শত্রু-সৈন্যের উপর পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিতে করিতে একবার দক্ষিণে, একবার বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনুচররা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিল, তিনি হয় ত তাহাদিগকে পশ্চাতে হঠিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ করিবেন। বস্তুতঃ মাজাডো পূর্ব্বে শত্রু-সৈন্যের শক্তির পরিমাণ বুঝিতে না পারায় অপরিণাম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। সে আশা করিয়াছিল, বলিভার জাহাজের অসতর্ক প্রহরিগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিবে এবং অতি সহজে জাহাজ অধিকার করিবে।—ভুল।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী মিঃ লকের প্রতি প্রসন্না ছিলেন। মিঃ লক শত্রু-সৈন্যকে সম্মুখ-যুদ্ধে বিতাড়িত করা অসাধ্য মনে করিয়া যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জাহাজের এক দল সশস্ত্র নাবিকের সুগম্ভীর হুঙ্কার ও জয়ধ্বনি শুনিয়া শত্রুদল আতঙ্কে অভিভূত হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পশ্চাতে হঠিতে আরম্ভ করিল। মিঃ লক চক্ষুর নিমেষে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া মহা উৎসাহে জয়ধ্বনি করিলেন, এবং নবোৎসাহে পলায়নোৎসুক শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ লকের পশ্চাতে যে নূতন সৈন্যদল আসিয়া তাঁহার বোটের নাবিকগণের সহিত যোগদান করিল, তাহারা তাহাদের প্রেসিডেন্টের পক্ষভুক্ত পাটানিয়ান। তাহারা মাজাডোর আদেশে মিঃ লককে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। তাঁহাদের সাহায্যে মিঃ লক শত্রু-সৈন্যগণকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন।

মিঃ লক শত্রু-সৈন্যের পশ্চাতে যেখানে কলভেটিকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, সম্মুখের বাধা অপসারিত হওয়ায় দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই স্থানের প্রায় এক গজ দূরে থাকিতেই একটি কক্ষের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত হইতে দেখিলেন। কলভেটি প্রাণভয়ে সেই কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কলভেটি সেই দ্বারটি উদ্ঘাটিত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মাথা বাড়াইয়া দিল, এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে সেই দ্বারের অদূরে মিঃ লককে আসিতে দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া মাথা টানিয়া লইল, এবং কম্পিত-হৃদয়ে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই কাপুরুষ পাটানিয়া রাজ্যের প্রধান সেনাপতি !

সেনাপতির মনে এরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, সে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য পলায়ন করিবার সময় কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল, অথবা তাহার সেরূপ অবসর হয় নাই। মিঃ লক সেই দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে সেই দ্বারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং তাহা সবেগে পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্যত পিস্তলসহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কেবিনের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইয়া উজ্জ্বল দীপালোকে সেই কক্ষের এক কোণে কলভেটিকে পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অদূরে একখানি ভারী চেয়ারে বয়েলের কন্যাকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি তাহার অবস্থা দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে

বুঝিতে পারিলেন, তাহার হাত-পা সেই চেয়ারের সঙ্গে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ।

মিঃ লক পিস্তল হস্তে কলভেটির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কলভেটি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখ লক, যদি তুমি এ দিকে পদমাত্র অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি এই রজ্জুবদ্ধা বন্দিনীকে গুলী করিয়া হত্যা করিব। তফাৎ যাও লক, তফাৎ যাও।"

কিন্তু মিঃ লক কিরূপ সতর্ক ও চটপটে, তাহা সেই স্থূলবুদ্ধি আত্মাভিমান-দর্পিত পাটানিয়ানের ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। মিঃ লক চক্ষুর নিমেষে সেনাপতির মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলীবর্ষণ করিলেন। কলভেটির কথা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই পিস্তলটা তাহার আহত মুষ্টি হইতে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল, এবং পিস্তলের গুলী বাহির হইয়া অদূরবর্ত্তী চৌকাঠে বিদ্ধ হইল। সেনাপতির আহত মুষ্টি হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া আহত হাতখানি যন্ত্রণায় আন্দোলিত করিতে করিতে লগুড়াহত কুকুরের মত চীৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ লক নির্নিমেষ-নেত্রে কলভেটির মুখের দিকে চাহিয়া পদাঘাতে পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাহার পর তাহাতে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া এ ভাবে দাঁড়াইলেন যে, বাহির হইতে দ্বার ঠেলিয়া কাহারও সেই কক্ষে প্রবেশের উপায় রহিল না। তিনি সেই ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রায় এক মিনিট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পাটানিয়ান সেনাপতির ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর চক্ষুর নিমেষে দ্বারটি অর্গলরুদ্ধ করিয়া কলভেটির পিস্তলটি পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর তাঁহার নিজের পিস্তলটি নিঃশঙ্কচিত্তে পকেটে ফেলিয়া নিরস্ত্র ও ভয়কম্পিত সেনাপতির সম্মুখে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ লককে সেই ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কলভেটি কম্পিত-পদে পশ্চাতে হটিতে লাগিল; অবশেষে সেই কেবিনের কাঠের প্রাচীর তাহার পিঠে ঠেকিলে সে বুঝিতে পারিল—আর পশ্চাতে সরিয়া যাইবার উপায় নাই, মিঃ লক তাহাকে 'কোণ-ঠাসা' করিয়াছেন। ভয়ে সেনাপতির মুখ চা-খড়ির মত সাদা হইয়া গেল; সে আতঙ্কবিস্ফারিত-নেত্রে মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে ভয়ে ঘামিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! সেনাপতির সেই সঙ্কটকালে তাহাকে পাখার বাতাস দিয়া সুস্থ করিবার জন্য তাহার কোন অনুচর সেখানে উপস্থিত ছিল না!

মিঃ লক একবার পকেটের পিস্তলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কলভেটির ঠিক সম্মুখে আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলার কলার চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে নরপিশাচ, আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে তোকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে পারিতাম, যদি তোর বারোটা প্রাণ থাকিত, তাহাও আমি বিনষ্ট করিতাম; কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করিব, আমি এরূপ ইতর, এরূপ কাপুরুষ নহি, কিন্তু তোর মত কাপুরুষের প্রতি আমার ঘৃণা প্রদর্শনের নিদর্শন এই—"

তিনি কলভেটির কলার ছাড়িয়া দিয়া তাহার গালে যে চপেটাঘাত করিলেন, তাহাতে তাহার গাল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল।

কলভেটি মিঃ লকের সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাতে অভিভূত হইয়া গালে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মিঃ লক্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চড়টা তেমন জুৎ-সই হয় নাই; আমি তোমার আক্ষেপ রাখিব না; তবে তোমাকে এ কথাও বলি যে, যদি তোমার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি এই মুহূর্ত্তে এই অসহায়া উৎপীড়িতা বালিকাকে মুক্তিদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

কলভেটি তাঁহার অনুরোধে বা আদেশে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল, এবং দুই হাতে তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

মিঃ লক তৎক্ষণাৎ তাহার অন্য গালে সেইরূপ প্রচণ্ড বেগে পুনর্ব্বার চপেটাঘাত করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওরে ভীরু, কাপুরুষ, ওরে নারী-নির্য্যাতক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, চোর, ইতর 'নিগার'! তুই না সেনাপতি? যুদ্ধ করিতে তোর সাহস হয় না? যুদ্ধ! তোকে পদাঘাত করিয়া আমার পদ-মর্য্যাদা নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই; এ জন্য এখনও তোর মুখে পদাঘাত করি নাই।"

এ রকম অপমান করিলে মরা মানুষেরও রাগ হয়। কলভেটি একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। মিঃ লকের কঠোর তিরস্কারে সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইল, এবং মিঃ লকের দেহের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গালে মুখে নখরাঘাত করিয়া অভিনব সমর-কৌশল প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ লক তাহার নখরাঘাতে বিব্রত হইয়া তাহার ললাটে এরূপ এক ঘুসি মারিলেন যে, কলভেটি আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাত দূরে চিৎ হইয়া পড়িল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রোধাতিশয্যে দুই কস হইতে ফেনা বাহির করিয়া পুনর্ব্বার লককে আক্রমণ করিল। এবার লক বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার বাঁ পাঁজরায় প্রচণ্ড বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তাহার পঞ্জরের কয়েকখানি অস্থি বসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দীর্ঘ দেহ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ লক তাহার এই শাস্তি যথেষ্ট মনে করিলেন না। তিনি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সে কাতরভাবে পাঁজরে হাত বুলাইতে লাগিল। মিঃ লক তাহার নাকে এক ঘুসি মারিয়া সেই কক্ষের একটি খাটিয়ায় তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিলেন।

এইবার সেই রজ্জুবদ্ধ আতঙ্কবিহ্বলা তরুণীর প্রতি মিঃ লকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি তাহার সাক্ষাতে কলভেটির প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ করিয়া শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বুঝিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "মিস্ বয়েল, তোমার বন্ধনমোচন করা প্রথমেই আমার উচিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।"

তিনি দুই মিনিটের মধ্যেই মিস্ বয়েলকে মুক্তিদান করিয়া বলিলেন, "তোমাকে বোধ হয় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে মিস্ বয়েল! আশা করি, তোমার সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।"

মিস্ বয়েল বলিল, "হাঁ, আমাকে এত অধিক দুঃখ-কষ্ট ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে যে, কখন কখন মনে হইয়াছে, পৃথিবী সয়তানের মুল্লুক, পরমেশ্বর এখানে শক্তিহীন! যে নির্য্যাতনে পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইতে হয়, তাহা কিরূপ কঠোর, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। এখন বুঝিয়াছি, পরমেশ্বর অতি দুর্দ্দিনেও আমাদিগকে ত্যাগ করেন না। আপনি তাঁহারই করুণা বহন করিয়া আনিয়াছেন। আপনি কি আমাদিগের উদ্ধার করিয়া দেশে লইয়া যাইবেন?"

মিঃ লক তাহাকে স্রুডারের সাহায্যের কথা জানাইলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, তিনি তাহাকে অবিলম্বে স্রুডারের জাহাজে আশ্রয় দান করিতে পারিবেন।

মিঃ লক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার কি হইয়াছে, মিস্! তিনি কোথায়?"

মিস্ বয়েল বলিল, "আমি তাঁহার কোন সংবাদ জানি না। আমাদের উভয়কেই এই জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু পরে তাঁহাকে জাহাজের অন্য দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।"

মিঃ লক এক হাতে পিস্তল লইয়া ও অন্য হাতে মিস্ বয়েলকে আশ্রয়দান করিয়া সেই কেবিনের বাহিরে আসিলেন।

কলভেটি শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তিনি তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল। কালিপ্সো জাহাজের নাবিকরা আহত সহযোগিগণের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া আহত শত্রুগণের পরিচর্য্যায় রত হইয়াছিল।

স্রুডার তাহাদের অদূরে দাঁড়াইয়া নাবিকগণের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিতেছিল। সে মিঃ লককে তাহার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, মিঃ লক, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমরা আপনাকে আধ ঘণ্টা ধরিয়া খুঁজিয়াও আপনার সন্ধান পাই নাই! এই কি মিস্ বয়েল? মিস্, তোমার বাবা কোথায় আছেন, জানিতে পারিয়াছ কি?"

মিস্ বয়েল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি তাঁহার সংবাদ জানি না।"

মিস্ বয়েল মুহূর্ত্ত পরে মুখ তুলিয়া সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাবা ঐ যে এই দিকেই আসিতেছেন! কিন্তু এ কি মূর্ত্তি উঁহার?"

মিস্ বয়েলের কথা শুনিয়া মিঃ লক ও স্রুডার উভয়েই পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা ঝুলকালী-মাখা ভূতের মত একটি দীর্ঘ মূর্ত্তিকে দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিলেন। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন। কালো চর্ব্বি তাহার পরিচ্ছদে ও হাতে মুখে লিপ্ত। তাহার চক্ষু দুটি

অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম! সে উত্তেজিত স্বরে কি অসংলগ্ন কথা বলিতেছিল—তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া চীৎকার করিতেছিল, বলিতেছিল—"গেল! সব গেল!"—বস্তুতঃ তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই তখন বলিতে পারিল না—এই ব্যক্তি লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ-ওয়ালা ধনকুবের জন বয়েল!

জন বয়েল তাহার কন্যাকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া দ্রুত-বেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "সকলে এই মুহূর্ত্তে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়। নতুবা কাহারও জীবন রক্ষা হইবে না। এই জাহাজ মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ হইয়া ধূলার মত আকাশে উড়িয়া যাইবে।" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

সভ্যতা-প্রশস্তি

সকাল হলে ফুটলো আভা নীল আকাশে!
শ্যামলিমা বাগ্-বাগিচায় ঘাসে-ঘাসে!
শাখে-শাখে উঠলো গেয়ে কতই পাখী—
সাজলো বনে ফুল-পরীরা গন্ধ মাখি!
বইলো বাতাস ঢেউ তুলিয়ে নদীর জলে—
কি মাধুরী জাগলো মরি, জলে-স্থলে!

পঁচিশ বছর পরে এ-সব থাকবে কি রে?
বনে লতা-পুষ্প-মুকুল শোভায় ঘিরে?
কালো দীঘি জলের বুকে কমল-ডালা?
কণ্ঠে পাখীর বুক-জুড়ানো সুরের মালা?
মানুষ যত শক্তি পেয়ে উঠচে ফুলে—
আরাম খুঁজি গর্ব্বে মেতে উপড়ে তুলে
ফেলচে বনের লতা-পাতায় মূল্য কি তার?
স্বপন বুনে ভুল আনে—সব তুচ্ছ! অসার!

ওই যে দ্যাখো উচ্চ গিরি গগন ছুঁয়ে—
অস্ত্রপাশে চূর্ণ করি পাড়বে ভুঁয়ে!
গিরির সকল চিহ্ন মুছে ধরার বুকে
কল বসাবে, কারখানা সে হাস্য-মুখে!

সবুজ বনের শ্যামল রেখা—গাছে গাছে
গাইছে পাখী, বকুল-চাঁপা ফুটে আছে—
দেখলে মরি, চিত্ত জুড়ায়, মুগ্ধ আঁখি—
ভাঙ্গবে সকল; কিছু কি হায় রাখবে বাকী!
বারুদখানা গড়বে হোথায়, তোপের পরব
বানাবে—নয় দিগ্বিজয়ে খর্ব্ব গরব!

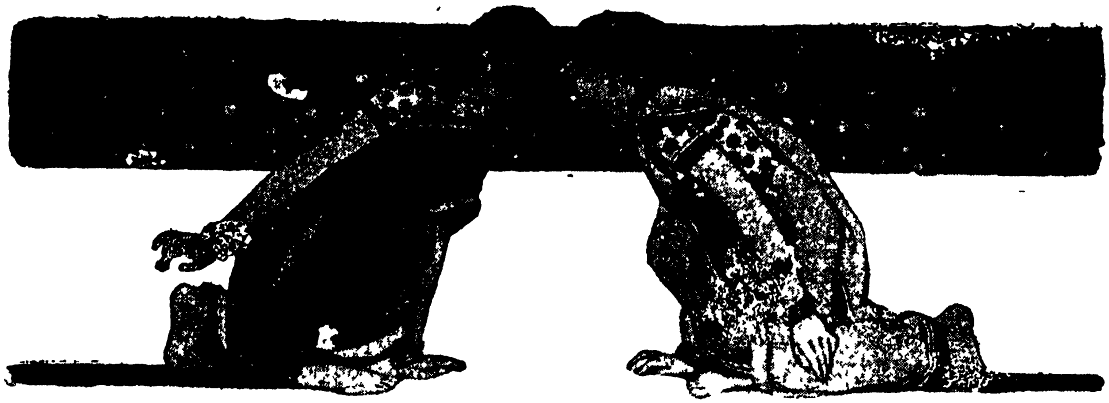
কল্লোলিয়া ওই যে নদী হাস্য-মুখী
চপল স্রোতে চলেছে গো উপল রুখি—
বন্ধ-বাধা জানে না সে, মানেও না কো—
লৌহ-পাশে বাঁধবে তারে—তুলবে সাঁকো!
জাহাজ-প্লেনে ফেলবে ছেয়ে অঙ্গ উহার—
গমকে থেমে রইবে নদী কর্দ্দম-ভার।

হীরার মালা দুলিয়ে বুকে নির্ঝরিণী—
দুষ্ট মেয়ে তুলছে লীলায় কলধ্বনি!
মুক্তা-ঝুরি হাসিতে তার পড়চে ঝরে—
রৌদ্র মেখে রাম-ধনুকের রঙের সুরে!
কিন্তু ও সব তুচ্ছ খেলা! নেহাৎ অসার!
বসাবে পাম্প, ইলেক্‌টিরির মস্ত পাওয়ার!

মুক্ত আকাশ-তলে বিপুল হাওয়ায়-লোটা
মুক্ত বিশাল প্রান্তর ঐ অবাধ ছোটা—
শ্রান্তি-হরা স্নিগ্ধ আঁচল ধরণী-মার,—
ঘর-হারা হায় কত জীবের শয্যা-বিথার!
প্রান্তর ওই মিলিয়ে যাবে দু'দিন পরে,
কারখানা-মিল-বস্তীতে বুক উঠবে ভরে।

পল্লীর বাট, কুঁড়ে, পুকুর, মুক্ত হাওয়া,
ঘোমটা-মুখে বৌদি-দিদির জল্‌কে যাওয়া,
ঘাটের কূলে বাবলা-মূলে বাঁধা তরী,
ছায়ায় ঢাকা আম-কাঁঠালের বাগান, মরি,
সকল যাবে, রয় যদি হায়, রইবে স্মৃতি
কবির মনে ছন্দে গাঁথা পুরাণ-গীতি!
ধরার বুকে মিলিয়ে যাবে গাঁয়ের রেখা—
ট্রামের রেলের লাইন শুধু থাকবে লেখা!
আকাশ-নীলে ঢাকবে ধোঁয়া, ঢাকবে ধূলা,
স্বপ্ন-ভোলা ব্যস্ত-বাগীশ মানুষগুলা
খুঁজবে, কোথা আরাম? প্রীতি? দরদ? মায়া?
মাথার পরে তপ্ত রবি—কোথায় ছায়া?
সভ্যতা তার উড়িয়ে ধ্বজা হাঁকচে জোরে,
ভাঙ্গো হাসি-বাঁশি, ভাঙ্গো অকেজোরে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



বিধিলিপি

নরহরি সোজা অন্দরে আসিয়া ডাক দিলেন,—"মাসীমা কোথায় গো ?"

কেতকী 'ভাতের' জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, হঠাৎ পশ্চাতে রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া দুই পা সরিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আকস্মিক সচল হইয়া তাহাদের খাবার দালানটায় হানা দিয়াছে।

নরহরি কেতকীর বিস্ময়টাকে ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসীমা বুঝি পূজায় বসেছেন ?"

কেতকী এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, এই মানব-হস্তীটির মাসীমা এ বাড়ীর কোন্ প্রাণীটি। কিন্তু তাহার চিন্তা দীর্ঘক্ষণস্থায়ী হইল না। নরহরি তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন, কহিলেন,—"তুমি না মাসীমার নাতনী ? কনকের মেয়ে, তা মুখের আদলেই ধরেছি।" বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। অপর পক্ষর কিন্তু তাহাতে তাক লাগে নাই, তুষ্টিও হয় নাই। কেতকী শুধু উত্তর করিল, "হ্যাঁ, দিদিমণি পূজা কচ্ছেন।"

ঠাকুর 'ভাত' বাড়িয়া আনিয়াছিল, কহিল, "আসুন, দিদিমণি।"

নরহরি ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—"এত সকালে ভাত খাবে, ঘড়ীতে ত সবে ন'টা।"

তাচ্ছীল্যভরে চাহিয়া কেতকী কহিল, "আমাদের গাড়ী ফার্ষ্ট টি পে আসবে।"

"বাপ রে বাপ, আপিসের কেরাণীর বাড়া যে। এর মাঝে পড়লে কতটুকু। সাজ-গোজ কত্তে যুগ কাটিয়েছ বোধ হচ্ছে।"

কেতকীর অন্তরে বিরক্তি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুগৌর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। নরহরির মুখের পানে চাহিয়া আহারে বসিবার আসনখানার কাছে সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রস্থান করিবার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটাকে নরহরি কিন্তু গায় মাখিলেন না, কহিলেন, "আমার সামনে আবার লজ্জা কি বাছা, আমি তোমার মামা হই ; নাও, খেতে ব'স। কনক ভাল আছে ?"

"আছে" বলিয়া কেতকী আসনে বসিল। এই অপরিচিত আত্মীয়ের সম্মুখে খাইতে তাহার কেমন একটা কুণ্ঠা আসিতেছিল, এবং তাহা দূর করিবার কষ্টভোগটুকু আর করিতে হইল না। রাস্তা হইতে পরিচিত হর্ণ-ধ্বনি শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরহরি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—"ও কি হ'ল, ও কি হ'ল" শব্দে। তাঁহাব ব্যগ্রতা ও কলরব দেখিয়া মেঘের ফাটল হইতে উঁকি মারা চাঁদের মত কেতকীর অপ্রসন্ন মুখখানিতে একটা হাসির আভাস দেখা দিল। কহিল, "বাস এসেছে।"

"এলেই বা, একটু দাঁড়াতে বল,—তুমিও চট ক'রে খেয়ে নাও।"

"অতক্ষণ দাঁড়াতে ও পারবে না।" বলিয়া কেতকী হাত ধুইতে গেল। বাসন্তী সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন, দৌহিত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"কেয়া, খাওয়া হ'ল ?"

কেতকীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নরহরি কহিলেন, "খাওয়া আর কোথা হয়েছে, ভাতটি সবে ভেঙ্গেছিল।"

বাসন্তী আসিয়া দালানে ঢুকিলেন, কহিলেন, "বাস ফিরে যাক, ঘরের মোটরে কলেজ যাবি। খেতে ব'স।"

অপ্রসন্ন-মুখে কেতকী কহিল, "ফার্ষ্ট পিরিয়ডের পারসেণ্টেজ থাকবে না। তার চেয়ে টিফিনটা তুমি একটু বেশী ক'রে দিও, দিদিমণি "

নরহরি কহিলেন, "তা কি হয়, মা। ক্ষিদের সময় না খেয়ে পিত্তি চুয়ে কেউ কি গিল্‌তে পারে, না শরীর টেকে ?"

অযাচিত উপদেশের মূল্য অবজ্ঞা। নরহরি গায় পড়িয়া কথা কহিতেছিলেন, মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাই কেতকীর তাঁহার উপর বিরক্তির সীমা ছিল না। তথাপি মনের রাগটাকে তাহাকে সংযমের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে হইয়াছিল, নিজের সংস্কারের জন্য। কিন্তু সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। তাহা অতিক্রম করিলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কেতকী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, "আপনি থামুন।" কণ্ঠস্বরে অন্তরের ক্রোধটা চাপা রহিল না।

দৌহিত্রীর এই অবিনয়টুকু বাসন্তীকে ঈষৎ রুষ্ট করিল। অঙ্কুর-উদ্গমে তিনি ইহা দমন করিতে শাসন-কণ্ঠে কহিলেন, "থামবে কি, নরু না তোর মামা হয়।" ঝিয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন, "মাতু, ব'লে আয়, মাসীমা ঘরের মোটরে কলেজ যাবেন।"

কেতকী হতাশ হইয়া পড়িল। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে আপীল চলে না। তথাপি শেষ মিনতি জানাইয়া কহিল, "দাদুর ফিরতে বেলা এগারটা।"

বাধা দিয়া বাসন্তী কহিলেন, "না, না, তিনি আজ সকাল সকাল ফিরবেন বলেছেন।" তার পর নরহরির পানে চাহিয়া কহিলেন,—"অনেক দিন পরে, নরু, খবর সব ভাল ?"

সুবিশাল বপু এইবার অবনত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। বাসন্তীকে প্রণাম করিয়া নরহরি করুণ-কণ্ঠে কহিলেন,—"মাসীমা, আমার আবার ভাল—লক্ষ্মীকে হারিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছি।"

বাসন্তী যেন আকাশ হইতে খসিয়া পড়িলেন। তিনি ভয়ানক বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"এঁ্যা, বল কি! বউমা নেই? কত দিন হ'ল এ সর্ব্বনাশ!"

সাপের নিশ্বাসের মত ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকের উড়ানীটা ঈষৎ দোলাইয়া নরহরি কহিলেন, "সে কথা আর জিজ্ঞেস কর কেন, মাসীমা।" বলিয়া চোখে উড়ানী চাপা দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাসন্তীর মুখখানা বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশের মত ম্লান হইয়া থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল। চোখ দুটাও বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল।

কেতকীর দৃষ্টি কিন্তু সে দিকে ছিল না। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কে নিরীক্ষণ করার মত কেতকী দুই চোখের আশ্চর্য্য দৃষ্টি মেলিয়া নরহরির উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দেখিতেছিল। পুরুষমানুষের এমন ভাবে ক্রন্দন, ইহা তাহার চোখে অভিনব—স্বপ্নাতীত! তথাপি যে শোকটা অনাবিল চোখের জলে নিজেকে প্রকাশ করিতেছিল, তাহা যেন কেতকীকে বুঝাইয়া দিল। আসলে মানুষ কত দুর্ব্বল! দুঃখের বেদনায় সকল মানুষই এক! প্রভেদ নাই।

* * * *

টিফিনে বসিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেয়া, আজ ফার্ষ্ট পিরিয়ডটায় আসিস নি কেন?" চোখে মুখে তাহার কৌতুক-হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

কেতকী তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"মরণ আর কি, যা ভাবছ, তা মোটেই নয়! আমার ভিজিলেণ্ট দিদিমা এখনও কাশীবাস করেন নি।"

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল, সকল কথার মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি তাহার একটা অভ্যাস ছিল। কহিল,—

—"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পানে খেয়া তরীর ভাসা।"

কেতকীও হাসিতে লাগিল, কহিল,—"অপি, ও একটিও আমার কাছে স্বপ্ন, অলীক।"

অপর্ণা আবার আরম্ভ করিল,—

—"আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্যি আছে
যে তুমি দূরের মানুষ সেই ত তুমি কাছের কাছে।"

কেতকী কহিল,—"দোহাই তোর, কবিতা থামা। আজ একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য দেখ্‌লুম।"

কৃত্রিম আগ্রহ সহকারে অপর্ণা কহিল,—"বর হবার উমেদার না কি?"

রাগ করিয়া কেতকী কহিল,—"তোর সবতাতে ঠাট্টা। আজ আমার এক সম্পর্কীয় মামা এসেছিলেন।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অপর্ণা কহিল, "মামা—? না, ওর ভিতর মজা কিছু পাব না বোধ হচ্ছে।"

কেতকী কহিল,—"মজা না হোক, শোনবার কিছু পাবি।" বলিয়া পত্নীহারা নরহরির চোখের জলের বন্যার বিবরণ দিয়া সে মন্তব্যে কহিল, "স্ত্রীকে বোধ করি বড্ড ভালবাসত।"

অপর্ণা কহিল—"চোখের জলটা যদি ভালবাসার পরিচয় হয়, তা হ'লে বলতে হবে, সম্রাট্ সাজাহানের সহিত তিনি এক আসনে বসতে পারেন।"

কেতকী কহিল,—"কেন, সম্রাট্ তাজমহল গেঁথেছিলেন ব'লে কি তাঁর ভালবাসাটা শ্রেষ্ঠ হবে? আমি যদি বলি, তিনি বাদশা, তাঁর অর্থ, শক্তি, প্রতিপত্তিটাকে প্রকাশ করতে, তাঁর শিল্পী প্রাণ এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিল। এর ভেতর আছে দম্ভ, ঐশ্বর্য্য এবং রাজরুচির বিকাশ।"

অপর্ণা হাসিয়া কহিল, "বলাকা পড়েছিস্?

'সম্রাট-মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি করেছে মহীয়সী
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্ব্বলোকে
জীবনের অমর আলোকে।'—"

এমন সময় ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল। ভালবাসার তাজমহল লইয়া কথার তাজমহল গড়া তাহাদের তখন বন্ধ হইয়া গেল।

* * * *

কলেজ হইতে ফিরিয়া কেতকী দেখিল, নরহরি মামা নিজের বাস ইচ্ছাটা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শোক-সন্তপ্ত বোন্‌-পোকে কাছে রাখিয়া সান্ত্বনা-প্রলেপে তাহাকে শীতল করিতে বাসন্তীও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। এ বিষয় লইয়া কেতকীর বলিবার কিছু ছিল না। মন্তব্য কিছু সে করিল না। নিজের দিনগুলি নিজের নিয়মেই অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু, অকস্মাৎ তাহাতে বাধা পড়িল।

সে দিন সকালে বাসন্তী কহিলেন, "কেয়া, আজ কলেজ যাস্ নি। তোকে দেখতে আসবে—বারোটা হ'তে ছুটোর মধ্যে।"

বিস্ময়ে স্তব্ধ অভিভূত হইয়া কেতকী ক্ষণেক বাসন্তীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল, "তা কিছুতে হ'তে পারে না। আমাদের থিয়েটারের আজ ফুল রিহার্শাল, দিন তুমি পেছিয়ে দাও, দিদিমণি।"

বাসন্তী কহিলেন, "সে কি ক'রে হ'তে পারে? আমি তাদের কি ব'লে পাঠাব?"

উত্তর হইল, "যা খুসী। আমি এ সপ্তাহে কনে দেখা দিতে পারবো না।"

বাসন্তী রাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এমন অনাছিষ্টি কথা কখনও শুনি নি। তারা এই অঘ্রাণে বিয়ে দিতে চায়। তাদের তাড়া আছে।"

তাচ্ছীল্যভরে কেতকী কহিল, "বেশ ত, পাত্র অরক্ষণীয় হয়, অন্য যায়গায় যেতে পারে।"

নরহরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসন্তীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "মাসীমা, ওদের যেন খুব খাতির-যত্ন করা হয়। আমি বলেছি, আমার মাসীরা যেমন বড়লোক, তেমনই ভদ্রলোক।" কেতকীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "আর তোমার কথা কি বলেছি জান, মা লক্ষ্মি! বলেছি, আজকালকার সভ্য-ভব্য ছেলে তোমরা ঠিক যেমনটি খোঁজ, আমার ভাগ্নী ঠিক তেমনই আপ্-টু-ডেট। এখন শুধু সুনজরে পড়ার অপেক্ষা।"

কেতকীর চোখের সম্মুখ হইতে বিস্ময়ের পর্দ্দাটা সরিয়া গেল। সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, মাতামহীর অকস্মাৎ তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ততার হেতুটা কি। আদুরে বোন্‌পোর আনীত সম্বন্ধ বলিয়াই এতখানি আগ্রহ তাঁহার। সারা চিত্তটা কেতকীর জ্বলিয়া উঠিল এবং নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে, অগ্নি-দৃষ্টিতে একবার নরহরির পানে চাহিয়া কেতকী কক্ষ হইতে ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল।

মাতামহের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কেতকী ডাকিল,—"দাদু—"

আত্মক্ষৌরকার্য্যে নিবিষ্ট শশিনাথ হাতের ক্ষুরটা নামাইয়া কহিলেন,—"কি দিদি?"

কোন ভূমিকা বা দ্বিধা না করিয়া কেতকী কহিল,—"বাবা আমাকে তোমাদের কাছে রেখেছেন লেখাপড়ার জন্য। তোমরা জান, তিনি আমাকে বিলেত যাবার অবধি আশা দিয়ে রেখেছেন। আর তোমরা সবাই মিলে শত্রুতা ক'রে আমার মাথা খাবার ব্যবস্থা করছ!"

দৌহিত্রীর কথায় শশিনাথ একটু আহত হইলেন, তথাপি মুখের প্রসন্নতা বজায় রাখিয়া কহিলেন,—"এখন তোর মাথা গরম হয়েছে, তাই ও কথা বলছিস।"

মানুষ সমস্ত আগ্রহ ঢালিয়া নিজের কথাটা বলিতে আসে বা বলে, শ্রোতা যদি সেটা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন ক্রোধটা বিচালি-স্তূপে অগ্নি-নিক্ষেপের মত মনের মাঝে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কেতকীর মনের রাগটা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মাতামহ যে তাহার অভিযোগটাকে সম্পূর্ণ তাচ্ছীল্য করিলেন, শুধু ছেলেমানুষী বলিয়া হাসিলেন! তখন মনের রাগে কেতকী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তিক্ত-কণ্ঠে কহিল, "হোক আমার মাথা গরম, তুমি কিন্তু এ রকম করতে পাবে না ব'লে দিচ্ছি। আর যদি কর—"

কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া শশিনাথ কহিলেন, "সম্বন্ধ এলেই কি বিয়ে হয়? শুনেছি, বড়মানুষ পাত্র, জার্ম্মাণীতে থেকে ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ারি পাশ ক'রে এসেছে। মোটা মাইনেও পাচ্ছে। দেখতে শুনতে ভাল। তার পর খোঁজ-খবর নেব।"

নিবিড় ঘৃণায় ওষ্ঠ বাঁকাইয়া কেতকী কহিল, "খোঁজ তোমরা যত ইচ্ছা নাও। কনে দেখা আমি দেব না।"

বিরক্ত হইয়া শশিনাথ কহিলেন, "কেন দেখা দেবে না শুনি?"

কেতকীর এইবার প্রতিশোধ দিবার পালা আসিয়াছিল। মাতামহের বিরক্তিটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কহিল, "আমার খুসী।"

* * * *

শীতের কুয়াসা স্নিগ্ধ-মধুর রৌদ্রকে যেমন ঢাকিয়া রাখে, তেমনই ধারা নরহরির আগমন এবং বিবাহের ঘটকালিটা কেতকীর কৌতুকপ্রিয় চিত্তের আনন্দটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। ক্লাসের ছুটীর পর আপনাকে একাকী পাইয়া, কেতকী তাহার মনের দুঃখটাকে ব্যক্ত করিল, চক্ষুঃ-শূল নরহরির দুরভিসন্ধিতে ইহা ঘটিতেছে। সে-ই যে তাহার ভাগ্যাকাশের রাহু, এ কথাও বলিতে কেতকী ভুলিল না।

অপর্ণা চকিত হইয়া উঠিল। "কি নাম বললি কেয়া, নরহরি? আমি এক নরহরিকে জানতুম। ভুলেও গেছলুম। কাল দাদার কথায় আবার তাকে মনে পড়ল। সেই থেকে খালি তার স্ত্রীর কথাই মনে পড়ছে। ঐ যে রবিবাবুর লেখা পড়েছিলুম—

'ঘুমাই বা জেগে রই মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষম প্রাণী দিন-রাত ব'সে আছে।'"

কেতকী কৌতূহলী হইয়া উঠিল। কে নরহরি, এবং তাহার সম্বন্ধে অপর্ণা যাহা জানে, তাহা গ্লানির বাষ্পে মলিন কিম্বা গৌরব-দীপ্তিতে উজ্জ্বল, ইহা জানিবার অদম্য ইচ্ছার বাতাস কেতকীর মনের চিন্তার মেঘখানাকে সরাইয়া দিল। উজ্জ্বল চোখে অপর্ণার পানে সে চাহিয়া কহিল, "এত ক'রে যাকে মনে পড়ে, নিশ্চয়ই তাতে একটা রোমান্স আছে। অপি, বাগ্‌দেবীকে স্মরণ ক'রে তোর রোমান্সটা শোনা।"

অপর্ণা হাসিল, নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, "ধৈর্য্যং সখী ধৈর্য্যং! অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর; আর স্মরণ রেখ, মানুষের বাইরেটা দেখে তার সম্বন্ধে ধারণা করলে কতখানি ভুল হয়। আমাদের নরহরিকে দেখে, আমার মনে হয়েছিল,—

'দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি
অলস দেহে ক্লিষ্টগতি গৃহের প্রতি টান।'

দাদাও বলেছিলেন, লোকটা নেহাৎ বেচারী। পরিবারের জেদে শুধু আমাদের নীচের তলাটা ভাড়া নিচ্ছে। কম ক'রে এই কথাটা এক'শবার আমায় জানালে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মাথায় ছোট বহরে বড়' বাঙ্গালী সন্তানটি কি করেন?'

"দাদা বললেন, 'বর্ত্তমানে বেকার। তবে অতীতে ছিলেন শুনলুম, বাজার-সরকার এবং অচির-ভবিষ্যতে না কি কেরাণী হবার সম্ভাবনা ঘটেছে।'

"আমি হাসলুম, বললুম, পরিবারটি তাই দেশের বাড়ীর সন্ধ্যা জ্বালা বাতিল ক'রে রোজগারে স্বামীর ভাত রাঁধতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে?

"দাদাও হাসলেন, বললেন, 'ঠিক তাই। আমরা অবস্থাকে ডিঙ্গিয়ে চলি বলেই দরিদ্রতার আগুনে এমনি ক'রে পুড়ি। স্ত্রীর জেদ, উপায় নেই, কুড়ি টাকা ভাড়া ওকে সইতেই হবে।'

"বৌদি বললে, 'তা হোক! তোমরা যতই হাস, ওকে

দেখতে যেমনই হোক, ওর মাঝে একটা দরদ আছে। সেই ওর বোয়ের স্বর্গ।'

"দাদা বৌদির দিকে চেয়ে বললে, 'পরের স্বর্গটাই চোখে পড়ে।'

"নরহরির কথা নিয়ে আর আমাদের জটলা স্থায়ী হ'তে পেল না। তিনি তাঁর স্ত্রীটিকে নিয়ে হাজির হলেন। উপরের বারান্দা হ'তে আমরা অবাক্ হয়ে গেলুম। বুঝলাম, নরহরির স্ত্রীর নাম নিয়ে, হাসি ক'রে আমরাই হাস্যাস্পদ হয়েছি। তবে তিনি যে এক জন অসাধারণ সুন্দরী, তা নয়। রংটা শ্যামবর্ণকে পিছনে ক'রে গৌরবর্ণের দিকে এগিয়ে গেছে। তা ব'লে স্বর্ণচাঁপা বলা চলে না। গড়নে মুখেও খুঁৎ আছে। তবু সেই একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ মেয়েটির দেহে, আয়ত চোখে সুষমা যেন ধরে না। কিছু না জেনেও সহজে মনে হয়, প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদায় সে মূর্ত্তি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নিজের সুখ-সৌভাগ্য, সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনা ক'রে সমস্ত মুখখানা যেন স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল।

"নরহরি পরিবারকে ঘর ক'খানি দেখিয়ে, বাজার করতে বার হলেন। সঙ্গে লোকজন আর কোন প্রাণী আসে নি। বউটি নিজের হাতে, ধোয়া-মোছা ক'রে তার গৃহস্থালীকে নিপুণ ক'রে সাজাতে লাগলেন, আমরা উপর হ'তে যত দেখছিলুম, বউটির উপর শ্রদ্ধায় চিত্ত ভ'রে উঠছিল। একটা টিনের বাক্সকে তিনি ভাঁড়ার ক'রে এনেছিলেন। ষ্টোভ জ্বেলে জলখাবার করতে বসলেন। কচুরি, সিঙাড়া, নিমকি কিছুই বাদ পড়ল না। পরিপাটী ক'রে সেগুলা রেকাবীতে সাজিয়ে, আসন পেতে স্বামীর জন্য গুছিয়ে রাখলেন। পাখা হ'তে পাণটি অবধি রাখতে ভুল হ'ল না। রোয়াকের উপর স্নানের আয়োজনে টবে ভরা জল, সাবান, টোয়ালে, দাঁত-মাজন সবই ঠিক ক'রে রাখলেন। শুধু যে দেবতার জন্য এতখানি সেবার অর্ঘ্য থরে থরে সাজান হ'ল, সেই রইলেন অন্তর্দ্ধান। মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণে গড়িয়ে এল। আমরা বলাবলি করলুম, নরহরি বাবুর পথে কি কিছু বিপদ হ'ল?

"বউটির মনে কি হচ্ছিল, কে জানে। কিন্তু সকালের তোলা ফুল যেমন সারাদিনের তাপে বিকালে ম্লান হয়ে যায়, তেমনই সারা মুখখানা তার বিষণ্ণতায় ঢেকে গেল। চোখে উৎসাহের আলো ম্লান হ'য়ে শেষে মুছে গেল। দৃষ্টিতে পৃথিবীটা বোধ করি কালো ঠেকছিল। যে ঘরটায় শোবে ব'লে বিছানা পেতেছিল, সেই ঘরে ঢুকে ভেতর হ'তে দোরটা বন্ধ ক'রে দিলে।

"মা ঝিকে পাঠালেন, কি হয়েছে জানবার জন্যে। তিনি দোর খুললেন না, বন্ধ দোরের ভেতর হ'তে সাড়া দিয়ে, জানলা গলিয়ে খামে আঁটা একখানি চিঠি ফেলে দিলেন। বল্লেন, তেষট্টি নম্বর, সুকিয়া ষ্ট্রীটে দিও। বলো সুধা দিয়েছে।

"আমরা আর তাঁকে দোর খুলতে অনুরোধ করলুম না। একান্ত আপনার জন যখন পাশ হ'তে স'রে যায়, অবিশ্বাসী হয়, সেই দুরদৃষ্টের চোখে, জগৎটা তখন প্রবঞ্চনায়—নিঃসহায়তায় ভ'রে উঠে। এটা স্বাভাবিক। সে আত্ম-সাবধান করেছে, ভালই করেছে।

"চিঠিখানা ঠিকানামত গেল। আর খানিকটা পরেই একখানা সুদৃশ্য মোটর এসে উপস্থিত। ভিতর থেকে এক জন যুবা আর এক জন প্রৌঢ়া নামলেন। তাঁরা সুধার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। যুবা বল্লেন,—'সুধা, দোর খোল, মা এসেছেন।'

"দরজা খুলল। প্রৌঢ়া মেয়ের হাত ধরলেন। আর তাদের কোন কথা হ'ল না। কেউ কাউকে একটা প্রশ্ন অবধি করলে না। সুধার মুখখানা ঘোম্‌টাতে ঢাকা ছিল। যাবার সময় দেখলুম, পা দুটা তাঁর কাঁপছে। একটা দুর্নিবার লজ্জাকে এড়াতে আপনার লোকের কাছে মুখ ঢেকেছেন, এটুকু বুঝতে আর বাকী রইল না।"

কেতকী রুদ্ধ নিশ্বাসে কাহিনীটা শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিল, সেই নরহরিবাবু—?

"নরহরিবাবু—? তাঁর সন্ধান ত আমরা জানি না। ওরা তাঁর জন্যে কোন উদ্বেগও প্রকাশ করলেন না। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের জিনিষগুলা—? ভদ্রলোক জবাব দিলেন।—আমাদের চাকর আসবে। দাদা বুঝেছিলেন, ওরা এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চান না। তাই তিনিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। নরহরির ঘটনাটা আমাদের চোখে হেঁয়ালীর মতন ঠেকল।

"তার পর একটা বছরের কিছু বেশী কেটে গেছে। কাল দাদা কোর্ট হ'তে ফিরে এসে, হঠাৎ আমায় বললেন,—'অপু, নরহরিকে মনে আছে?'

"আমি বল্লুম, কেন, কি হয়েছে ?"

"আমাদের কেসের যিনি এটর্ণী দাঁড়িয়েছেন, সেই শিরীষ মল্লিকের ভগ্নীপতি না কি নরহরি।"

"আমি বল্লুম,—ইস্, বল কি। এ আজগুবি তোমাকে কে বল্‌লে ?"

"দাদা হেসে বল্লে,—যার ভগ্নীপতি, সেই নিজেই বল্লে, আজ যে নরহরিকে দেখলুম।"

"আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, ভদ্রলোক বেঁচে আছেন ?"

"দাদা বললে,—বেঁচে থাকাটা অবশ্য উচিত নয়, অন্ততঃ অমন সুস্থ দেহে নির্ব্বিঘ্নে।

"জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় দেখলে ?

"দাদা বল্লে,—ঐ যে এঞ্জিনিয়ার দত্ত সাহেব, তার মোটরে। বপুর আয়তন বেশ বৃদ্ধি হয়েছে। তেমনই শান্ত নির্ব্বিকার মুখে অত বড় গাড়ীর আধখানা তিনি দখল ক'রে ব'সে আছেন। মল্লিককে দেখতে পেয়ে দত্ত সাহেব টুপী খুলে সম্ভাষণ করলেন। মল্লিক নিজের টুপীটা একবার ছুঁয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে গেল। সারা দিনটা আপিসের কাযে কেটে গেল। মল্লিক খুব গম্ভীর। বিকালে ছুটীর পর যখন একসঙ্গে ফির্‌ছি, মল্লিক হঠাৎ বল্লে,—'নিখিল বাবু, নরহরি না আপনার ভাড়াটে হয়েছিল ?'

"দাদা বল্লে,—'হ্যাঁ, এক দিনের। তার পরেই ভদ্রলোক হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন। আমি ভেবেছিলুম, কোন বিপদ হ'ল।'

"মল্লিক একটু চুপ ক'রে রইলেন। তার পর বল্লেন,—'সে দিন থেকে চুপ ক'রে গেছি। ভেবেছিলুম, এমনি চুপ ক'রে গেলে ব্যাপারটা চাপা প'ড়ে যাবে। কিন্তু দেখছি তা নয়। সব জিনিষ চুপ ক'রে গেলেই চুপ হয় না। বিপরীত হয়ে ওঠে। এমন কালো হয়ে সেটা লোকের চোখে দাঁড়ায়, যাতে মনে হয়, প্রকৃত পরিচয় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করি। নরহরি আমার ভগ্নীপতি। সুধা আমার সহোদরা। বিয়েটা তাদের লুকিয়ে হয় নি। সম্প্রদান আমরাই করেছিলুম।'

"দাদা জিজ্ঞাসা করলেন,—'সেদিনকার ব্যাপারটার অর্থ কি ?'

"তিনি বল্লেন,—'অর্থ আর কিছুই নয়, সুধা স্বামীকে বলত, তোমার যেমন অবস্থা, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে আমি তোমার কাছে থাক্‌ব। বাপের বাড়ীর বড়-মানুষী আমার ভাল লাগে না। এতে যদি উপোস ক'রে গাছতলায় থাকতে হয়, সেও ভাল।'

'তাই নরহরি এই জুয়াচুরি খেল্‌লে। আমাদের বল্‌লে, একতলা বাড়ী ভাড়া করেছি। লোকজন রাখতে পারবো না। সুধাকেই সব করতে হবে। পাঠাবে মেয়ে? সুধার মুখ দেখে 'না' বলতে পারলুম না। বোনটির আহ্লাদ ধরে না। সকল দুঃখকেই মানুষ অনায়াসেই মাথা পেতে নিতে পারে, স্বাধীনতার সুখটুকুর জন্য। সে চায়, নিজের গৃহের অধীশ্বরী হ'তে। তা হোক না একতলা। এ চার তলা বাড়ী তার কাছে তুচ্ছ।

'আমি কিন্তু নরহরিকে বিশ্বাস করতুম না। কেন, তা জানি না। আমাদের বাড়ীর সব্বাই তাকে বলতো, সরল-প্রকৃতি, গোবেচারা। আমার কিন্তু কথাটা ভাল লাগত না। মনে হ'ত অকর্ম্মণ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকগুলার মত বজ্জাত। আর কিছু নেই। কিন্তু সুধার সাম্‌নে এ নিয়ে কিছু বলতে পারতুম না। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হেয় করার চাইতে জঘন্যতা কি আছে? নরহরি আমাকে জানত, ভেবেছিল, আমি সুধাকে তার সঙ্গে যেতে দেব না। সে স্ত্রীর কাছে বড় গলায় সাফাই গাইবে, দাদা তোমায় গরীবের ঘরে পাঠাবেন না। আমি কি করবো। কিন্তু সে পথ যখন সুবিধা হ'ল না', তখন সোজা এই পথ ধ'রে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

"দাদা জিজ্ঞাসা করলেন,—'আপনার বোন্‌টি সব শুনেছেন ?

"মল্লিক খানিকটা দাদার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন,—'কি শুনবে? কি শোনাব? আমি জান্‌তে পেরেছিলুম, নরহরি পালিয়েছে। আমার এক বন্ধু তাকে কাশীতে দেখেছিল। তবু সুধাকে কি বলেছিলুম জান? বললুম, নরহরি মোটরে চাপা পড়েছে। তবু তাকে বল্‌তে পারলুম না, তার স্বামী প্রবঞ্চক! পাষাণ! একটা শয়তানের প্রতীক। উঃ, এ আঘাত কি দেওয়া যায়। সুধা হাতের নোয়া খুললে, সীঁথের সিঁদুর মুছলে—সবই আমার চোখের উপর। আমি ভাবতুম, এ ভাল। যে দুর্ভাগ্য তাকে গ্রাস করেছে, তার চেয়েও এ প্রার্থনীয়।'

"তার মনটা অনেক দিন ভেঙ্গে গেছলো। এইবার দেহটার ভাঙ্গন ধরল। এক দিন সে চ'লে গেল। কিন্তু বুকভরা এই বিশ্বাস নিয়েই যাত্রা করলে।—স্বামী তাকে নিজের কুঁড়েতে রাণী করতে চেয়েছিল। মন্দ-ভাগ্য পথ-রোধ করেছে। মৃত্যু কাল-হাতে তার ভবিষ্যতের রঙীন ছবি মুছে দিয়েছে। তাই শেষ মুহূর্ত্তে সে ভগবানের নাম করতে পেরেছিল। ঘৃণায় মন তার কুঁচকে উঠে নি।'

"কাল দাদার কাছে এই শুনলুম।"

কেতকী কথা কহিল না। আবিষ্টের মত চাহিয়া রহিল। অতীব দুঃস্বপ্নের আঘাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখিলেও সেই স্বপ্নচ্ছায়া দৃষ্টিপথ হইতে মিলাইয়া যায় না। মর্ম্ম-পীড়িতা একটি তরুণীর বেদনা-পাণ্ডুর মুখখানি, নিরাশায় ম্লান দুইটি আয়ত নেত্র তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিতে লাগিল।

অপর্ণা ঠেলা দিয়া কহিল,—"কেয়া, রবিবাবুর একটা কবিতায় পড়েছিলুম—

'আমি রহি একধারে তুমি যাও পরপারে
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি
একেবারে ভুলে যেও শত গুণে ভাল সেও
ভাল নহে প্রেমের বিকৃতি।'"

* * * *

অবসন্ন দিনের বিদায়-বিষণ্ণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া, পশ্চিম আকাশের বুকখানা বেদনায় রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। কেতকী নিজের কক্ষে বসিয়াছিল।

ছোটবেলা হইতে কেতকী অত্যন্ত জেদী ছিল, যাহা ধরিত, তাহাই করিত। নিজে যেটা বুঝিত, পরের অনুরোধের চাপে বা তিরস্কারের তাড়নায় সে কিছুতেই তাহা ত্যাগ করিত না। কিন্তু তাহা লইয়া ভবিষ্যতের কোন আশঙ্কা কাহারও মনে জাগিত না। শুধু বাসন্তী বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে বলিতেন, "যশোরে জন্মেছে, লঙ্কাখাকী মেয়ের ঝাল তাই অত।"

কেতকী বলিত, "দিদিমণির বাড়ী মধুপুরে, কথাতে তাই পিঁপড়ে ধরে।"

এমনই করিয়াই দিদি-নাতনীর ঝগড়া হইত। আবার তাহা মিটমাট হইয়া যাইত, বাসন্তী নিজের হাতে সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া দৌহিত্রীকে ডাকিয়া পাকটা চাকিতে বলিতেন, এবং সন্ধ্যায় কেতকী দিদিমার কাছে পদাবলীর কীর্ত্তন করিত। মাঝে মাঝে এমনও ঘটিয়াছে, অসন্তুষ্ট দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে শশিনাথের কাছে নালিশ জানাইয়াছে। কিন্তু মামলা বোর্ডে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারক তাহা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিতেন। গোল চুকিয়া যাইত।

কিন্তু দৈবাৎ বলিয়া একটা অবস্থা আছে। যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, স্বপ্নাতীতভাবে কখন্ যে চুপে চুপে আসিয়া সে আপনাকে প্রকাশ করে, তাহা কিছু নির্ণয় করা যায় না। তাই দৈবের পথরোধ হয় না।

কেতকীর ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়াছিল। সে বিবাহ কিছুতেই করিবে না। তাহার এই সঙ্কল্পের জন্যই যে ভয়ানক কিছু তাল পাকাইয়া উঠিবে, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল। তথাপি হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত যেমন চেষ্টা করিয়া নিজের দুঃখ-কান্নাকে উপশম করিতে পারে না, কেতকী তেমনই নিজের মনটাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। জগতের অনেক শোকাবহ ঘটনা, অনেক বিয়োগান্ত কাহিনী সে পুস্তকে পড়িয়াছে, কাণে শুনিয়াছে, সিনেমাতে দেখিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ কিছু কিছু নিরীক্ষণ করিয়াছে। তথাপি অপর্ণা-কথিত এক নরহরিকে কেন্দ্র করিয়া, সমগ্র পুরুষজাতির উপর তাহার বিরক্তি, বিদ্বেষ, ঘৃণার যেন অন্ত নাই। এই প্রবঞ্চক হৃদয়হীন পাষাণদের পদতলে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা নারীর অপমান ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। এমনই একটা উদ্ভট কল্পনা চীনের প্রাচীরের মত খাড়া হইয়া সংসারের ভাল মন্দ দেখিবার পথটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রমানাথ শ্বশুরকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছেন, "আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।" কনক পোষ্ট করিয়া মেয়ের নিকট এক রাশ তিরস্কার পাঠাইয়াছেন। তাঁহার চারি পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার সুস্পষ্ট বিস্ময় ও অনাবিল উপদেশের অন্ত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, ছেলেটি এঞ্জিনিয়ার, দেখতে সুপুরুষ, পয়সা আছে, নিজে রোজগার করে, ওর গলায় তুমি যদি মালা দিতে পার, জানবে, তোমার বরাত ভাল। আমারও পুণ্যির জোর আছে। একজামিন ত তুমি প্রাইভেটেও দিতে পার। তার জন্যে অবাধ্য হয়ে, আমাদের মনে দুঃখ দিতে চাইবে,

এ স্বপ্নাতীত। তোমার আপত্তির আমরা কি অর্থ করবো? তুমি আমার এই ভয়ানক মিথ্যেটা বিশ্বাস করতে বল, পুরুষদের উপর ঘৃণায় তুমি বিয়ে করতে অসম্মত? এতে আমাদের কি মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় যে, তোমার মাথার গণ্ডগোল হচ্ছে? আরও অনেক কথা কনক মেয়েকে লিখিয়াছেন।

জননীর এই চিঠিখানা লইয়া কেতকীর সারাটা দিন কাটিয়াছে। তথাপি এই যুক্তি-যুক্ত বাণীগুলি কেতকীর মনের চিন্তাটাকে মোড় ফিরাইতে পারে নাই। যুপকাষ্ঠে মাথা গলানর মত বিবাহটা তাহার কাছে একটা ভয়ানক অপ্রীতিকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিতেছিল। ইহাকে ব্যর্থ করিবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে তাহার মগজের মাঝে রকমারি চিন্তা ভিড় করিয়া পরস্পরকে দলিত—পিষ্ট করিতেছিল।

হঠাৎ কেতকীর মনে হইল, অপর্ণার নরহরি ত এই নরহরি নহেন? ইনিও ত পত্নীহারা। একটা স্ফুলিঙ্গ যেমন বাহ্য অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে, তেমনই এই আকস্মিক সন্দেহ দেখিতে দেখিতে কেতকীর সারা চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল।

কেতকী সোজা গিয়া নরহরি মামার কক্ষে উপস্থিত হইল।

নরহরি তখন মধ্যাহ্ন-নিদ্রাটা সায়াহ্নের মুখে শেষ করিয়া সবে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ কেতকীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "কি গো মা লক্ষ্মি! আজ বুঝি কলেজ বন্ধ?"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ঘরের কোণে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া কেতকী তাহাতে বসিল। পূজনীয় নিম্ন আসনে বসিলে, উচ্চ আসনে যে বসিতে নাই, এ নীতিটা স্মৃতিপথে আসিল না বা আসিয়াও মানিল না।

কেতকী প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "নরহরি মামা, তুমি বিয়ে করেছিলে কোথায়?"

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া নরহরি কহিলেন, "কেন বল ত?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা চমক ছিল, কেতকীর কাণে ধরা পড়িল। সন্দেহটা মূর্ত্তি ধরিল।

কেতকী কহিল, "তুমি আমাদের আত্মীয়, তাই জানতে চাইছি। হয় ত একটু কারণও আছে।"

"সেই কারণটা কি, জানতে পারি না?"—নরহরি কেতকীর পানে চাহিলেন।

"কারণটা যদি না প্রকাশ করি, তোমার শ্বশুরের নাম, বাড়ীর ঠিকানাটা জানতে পাব না?"

কেতকীর কণ্ঠস্বর তপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহার তীক্ষ্ণতা অপরের কাণে বাজিয়া উঠিল, নরহরির বুকটাও বোধ হয় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

নরহরি প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াই থামিয়া গেলেন। কহিলেন, "না, জানতে পাবে না।"

ক্রূর হাসিতে কেতকীর মুখ ভরিয়া উঠিল। কহিল, "তুমি 'না' বলবে, জানি। কিন্তু আমার অজ্ঞাত নেই, তুমি কোথায় বিয়ে করেছিলে। আরও জানি, তুমি কত বড় সেলফিশ, কত বড় কাওয়ার্ড।"

উত্তেজনায় কেতকী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই এতখানি অপমানপূর্ণ তিরস্কারের পরও নরহরির মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া, কেতকীর ক্রোধটা দ্বিগুণ হইয়া তাহাকে যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তীব্র শ্লেষভরে সে কহিল, "তাই সাধু সেজে এসেছেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। মাথা খেতে! দাঁড়াও, তোমার ইতিহাস দাদুকে ব'লে এ বাড়ীতে তোমার থাকা বন্ধ করি। তবে আমার নাম কেতকী বোস।"

*　　*　　*　　*

শশিনাথ দৌহিত্রীর মুখে সবটুকু শুনিয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা-ভরা কালো মেঘের মতই অন্ধকার মুখেই ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তার পর নরহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিতেই কোন ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি শিরীষ মল্লিক এটর্ণীর বোনকে বিয়ে করেছিলে?"

নত দৃষ্টিতে নরহরি কহিল,—"হ্যাঁ।"

শশিনাথ আর কোন কৈফিয়ৎ করিলেন না। সংক্ষিপ্তসারে তিক্তকণ্ঠে শুধু কহিলেন, "তুমি কি প্রকৃতির লোক, তা বুঝতে পেরেছি।"

তাঁহার এই কথাটার পশ্চাতে যে অর্থ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা বুঝিতে বাসন্তীর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। ত্রস্তে তিনি কহিলেন, "সে ও যা খুসী করুক, আমার কাছে ত—"

কথাটাকে শেষ হইবার অবকাশ না দিয়া শশিনাথ

কহিলেন, "আগুনকে আর সাপকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।"

তাঁহার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা নিস্তব্ধ কক্ষ-দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া যেন গৃহমধ্যে ঝিঁ-ঝিঁ করিয়া উঠিল। লজ্জায় বাসন্তী এতটুকু হইয়া অধোবদন হইলেন। কেতকীও নিজের মাঝে কেমন অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল। দাদুর মূর্ত্তি যে এতখানি কঠিন হইবে, তাহা সে আশঙ্কা করে নাই। অপমানিত, ঘৃণিত, বাক্যহীন নরহরির নিস্তব্ধ বক্ষঃপঞ্জর মথিত করিয়া কি একটা উত্তর বাহিরে আসিবার জন্য বার বার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইহার আভাসে দুই চক্ষু তাহার একবার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। পলকমাত্র যত্নে আত্মসংবরণ করিয়া সে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতেই শশিনাথ ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি কাশী হ'তে এসেছিলে, এই নাও সেখানকার ফিরে যাবার গাড়ীভাড়া। আর যদি কিছু বেশী খরচপত্র লাগে," বলিয়া তিনি হাতবাক্স খুলিয়া দশ টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া নরহরির দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

বিনয়পূর্ণ একটা নমস্কার সারিয়া নরহরি কহিল, "আজ্ঞে, কাশীতে আমি এখন যাচ্ছি না। যখন যাব, তখন ওটা আপনার কাছ হ'তে নেব। এখন পথে ঘাটে যদি হারিয়ে যায়।"

কেতকী স্তম্ভিত হইয়া গেল। দাদুর সাহায্যটা যে প্রচ্ছন্নভাবে নরহরি প্রত্যাখ্যান করিল, তাহা অসংশয়ে সে বুঝিয়াছিল। এতখানি লাঞ্ছনার পরও এই অযাচিত দানটা নরহরি যে সাগ্রহে গ্রহণ করিবে, ইহাই ছিল কেতকীর দৃঢ় বিশ্বাস। নিদারুণ ঘৃণার বশে সে নরহরিকে এমনই লোভী ও স্বার্থপররূপে কল্পনা করিয়াছিল।

নিষ্ফল আক্রোশে অগ্নিদীপ্ত দৃষ্টিতে বাসন্তী কেতকীর পানে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, হিংস্র জয়োল্লাসে যে চক্ষু-তারকা এতক্ষণ দীপ্তিময় হইয়া জ্বলিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা কেমন ম্লান হইয়া গিয়াছে।

নরহরি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। বাসন্তীও তাহার অনুসরণ করিলেন। একা দাঁড়াইয়া কেতকী আর কি করিবে, নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। যুদ্ধে তাহার পরিপূর্ণ জয় হইয়াছে। পরাজিত প্রতিপক্ষের স্থান আর এ গৃহে নাই। তথাপি সমস্ত মুখখানা তাহার কালি হইয়া গেল। একটা গভীর শ্রান্তিতে পা দুটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। আন-মনে সে বিছানার উপর আসিয়া বসিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে নরহরির কণ্ঠ-স্বরেই কেতকী চকিত হইয়া উঠিল। কক্ষ-দুয়ারে দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন,—"চল্লুম গো, মা-লক্ষ্মি!

তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে উত্তেজনার আগুন বা বিদ্রূপের বাষ্পমাত্র ছিল না। প্রথম আগমনের দিনের মতই সহজ স্নেহময় সে স্বর।"

কেতকী মুখ ফিরাইল না; এই বিদায়-সম্ভাষণের উত্তরে কোন কথাই বলিল না। যেমন অনড় হইয়া বসিয়াছিল, তেমনই রহিল।

নরহরি একটু অপেক্ষা করিলেন। বোধ করি, আশা করিয়াছিলেন, কেতকী কোন কথা কহিবে বা তাঁহাকে একটা নমস্কার করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া কহিলেন,—"তোমায় যারা ভালবাসে, তারা তোমার শুভটাই খোঁজে। ভেবে দেখ, সম্বন্ধটা ভাল। মাসীমা, মেসমশাই, তোমার বাবা, মা সকলেরই ইচ্ছে, ঐখানে যাতে বিয়ে হয়। অনেক বড় বড় কেতাব পড়, কিন্তু সংসারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তুমি নিজেকে ছেলেমানুষ জেনো।"

নরহরির উপদেশ দেওয়া অভ্যাস, কেতকী তাহা নরহরির প্রথম আগমনের দিনেই জানিয়াছিল, এবং সেই কারণেই চিত্তটা তাহার গোড়া হইতেই বিরক্তিতে ভরিয়া থাকিত। তথাপি আজ এই বিদায়-মুহূর্ত্তে তাঁহার শেষ উপদেশবাণীগুলিকে প্রচণ্ড উপেক্ষাভরে সে মধ্যপথে থামাইয়া দিতে পারিল না।

নরহরি চলিয়া গেলেন। কেতকীর মনে হইল, আকস্মিক অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি যেমন এক দিন আসিয়াছিলেন, তেমনই আচম্বিতে তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেতকী বিস্মিত হইয়া গেল, অসম্ভাবিত বেদনায় তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

কেতকী অবাক্ হইয়া গেল। নরহরির জন্য মমতা তাহার কোন দিনই ছিল না। বিপরীত একটা বিরক্তি তাহার বিরুদ্ধে মনের মাঝে জমা হইয়া অন্তরের সমস্ত বিবেককে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। নরহরিকে



বসুমতী চিত্র-বিভাগ] সুসজ্জিতা [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

তাড়াইতে হইবে, ইহা লইয়া মাতামহীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধিবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া নরহরি অনেক মিথ্যাকে সত্যের আকার দিতে চাহিবে। তার পর কেমন করিয়া চোকা চোকা বাক্যবাণে আসল তত্ত্বটা প্রকাশ করিয়া কেতকী, বাসন্তী ও নরহরিকে পরাজিত করিবে। নরহরি পলাইতে পথ পাইবে না। কল্পনায় ইহাই আলোচনা করিয়া কেতকীর উৎসাহের সীমা ছিল না।

কিন্তু অভিযুক্ত হইয়াও নরহরি বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আত্ম-দোষ ক্ষালন করিতে সে একটা সামান্য চেষ্টা অবধি করিল না। কথাটা সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবধি প্রকাশ করিল না। তখন কেতকীর মনের চিন্তাটা হঠাৎ যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। সহসা সন্দেহ হইল, সে কিছু ভুল করিয়া বসে নাই ত? যাহাকে সে শুধু ঘৃণা করিয়া অপদার্থ জ্ঞান করিয়াছে, নরহরি কি যথার্থ তাই? তাহার বিপুল দেহের অন্তরালে যে হৃদয় আছে, তাহার দুঃখের কোন ইতিহাস আছে কি? কেতকী ত তাহার কোন খবর লয় নাই।

*　　*　　*　　*

কেতকীর বিবাহে আর আপত্তি রহিল না। অকস্মাৎ একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তাহার পর সেই ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার বরটিকে পাইবার জন্য আগ্রহে তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল। ঘটনাটা যে খুব রোমাঞ্চকর ছিল, তাহা নহে; অতিসাধারণ। কিন্তু তুচ্ছকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কিছু বৃহৎ কাণ্ড ঘটিতে দেখা যায়। তনুহীন দেবতাটি কখন্ কিসের মধ্য দিয়া তাঁহার অব্যর্থ শরটি নর-নারীর বুকে নিক্ষেপ করেন, তাহা তিনিই জানেন।

শশিনাথের মোটরটা বিগড়াইয়াছিল। কাযেই কারখানায় মোটরখানাকে বাস করিতে হইয়াছিল। শশিনাথ বাহির হইবার কাযটা ট্রামে বা বাসে সারিতেছিলেন, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে তিনি সহজে নারাজ। কেতকীও মহাজনের পদানুসরণ করিয়াছিল। বাসন্তী রাগ করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ রে কেয়া, তুই সমর্থ মেয়ে, বাসে চ'ড়ে কলেজ যাবি কি ক'রে?"

একটুখানি উপেক্ষার হাসিতে ওষ্ঠ বাঁকাইয়া কেতকী কহিল,—"কেন, আমায় কি লোকে গিলে খাবে না কি? আমি সন্দেশ না রসগোল্লা?"

—"তারও বেশী" বলিয়া বাসন্তী চলিয়া গেলেন। সে দিন কেতকী ট্রামে উঠিয়াছিল। কনডাক্টর আসিয়া টিকিট চাহিল। পয়সা দিতে গিয়া সে জানিতে পারিল, অর্থাধারটি সে ফেলিয়া আসিয়াছে। কেতকীর সমস্ত দেহটা ঘামিয়া উঠিল। সুগৌর মুখখানার উপর কে যেন অদৃশ্য হাতে সিঁদুরের পোঁচ মাখাইয়া দিল। কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিলেও সে বুঝিতে পারিতেছিল, অনেকগুলি চোখের কৌতূহল-দৃষ্টি তাহার উপর আবদ্ধ। কেতকী উঠিতে উদ্যত হইল। সম্মুখের একটি যুবক ব্যাগ খুলিয়া সপ্রতিভ-কণ্ঠে কহিলেন, "কাল আমায় দিলেই হবে, আজ যখন পার্স টা হারিয়েছেন। অনুগ্রহ ক'রে এটা গ্রহণ করুন।"

টিকিটের মূল্যটা সে কনডাক্টারের হাতে দিল।

কেতকী যেন বাঁচিয়া গেল। কাল পয়সাটা দিলেই চুকিবে, এমন সুন্দর সোজাপথ রহিয়াছে। লোকটিকে সে ধন্যবাদ জানাইল।

কলেজের সম্মুখে ট্রাম থামিতেই কেতকী সেই স্বল্প কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচিত উপকারক বন্ধুকে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার দিয়া নামিয়া গেল। তিনিও হাসি-মুখে একটা প্রতিনমস্কার দিলেন। কথা রহিল, পরদিন তিনি কেতকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

কলেজের কোলাহলের মধ্যে কেতকী নিজেকে সঁপিয়া দিল। কিন্তু অন্য দিনের মত চিত্ত তাহার ইহার মাঝে ডুবিয়া গেল না। পড়া-শোনা, রঙ্গ-রহস্যের ফাঁকে ফাঁকে ট্রামের ঘটনাটা তাহার মনোমধ্যে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। কেতকী লোকটিকে একাধিকবার মনে মনে ধন্যবাদ দিল। তথাপি তাহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তিটি কেতকীর মানস চোখে যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার হাসি-ভরা মুখে নমস্কার, সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার, সপ্রতিভ বাণী, ভুলিয়া যাওয়া কবিতায় ভাঙ্গা-চোরা রেলের মত রহিয়া রহিয়া, অকারণ কেতকীর মনের মাঝে সারাদিন ধরিয়া আনাগোনা করিতে লাগিল এবং একান্ত সংগোপনে অন্তর তাহার পরদিনটার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল।

পরদিনও আসিল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্ত্তিতে। কেতকীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাসন্তী বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই; তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর, পৌষের শীত লইয়া, হাড়-ভাঙ্গা কাঁপুনিতে

তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। শশিনাথ লেপ, কম্বল, সুজনী যাহা পাইলেন, সমস্তই গৃহিণীর গাত্রে চাপাইয়া কেতকীকে থার্ম্মোমিটার দিতে বলিলেন। জ্বর উঠিল একশ' পাঁচ ডিগ্রী!

শশিনাথ কহিলেন, "কেয়া, আজ তোমার কলেজ যাওয়া হবে না। ডাক্তার আসবে, আমার জরুরী কায, থাকতে পারব না।"

কেতকী মাতামহের মুখের পানে চাহিয়া 'না' বলিতে পারিল না। অন্তরটা কিন্তু ভয়ানক ব্যাকুল হইয়া উঠিল! তিনি যে আজ কলেজে আসিবেন। ইচ্ছা হইল, ট্রামের ঘটনাটা দাদুকে খুলিয়া বলে; কিন্তু লজ্জা যেখানে, বিপত্তি সেখানে। মনের দুর্ব্বলতা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ব্বলতা। কথাটাকে বলি বলি করিয়াও একটা দুর্নিবার সঙ্কোচে ওষ্ঠে তাহার কথা ফুটিল না। দাদু কি বিশ্বাস করিবেন, গুটিকতক পয়সার ঋণ শোধ করিবার জন্যই কেতকী ব্যস্ত হইয়া একটি অপরিচিত যুবকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছে?

বাসন্তীর জ্বর ছাড়িবার পর একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কেতকীর চিত্ত শান্তি-স্বস্তিহীন হইয়া পড়িল। সেই অপরিচিতের দর্শন আর সে পায় নাই। লোকটি কেতকীকে কি ভাবিতেছে, ইহাই হইল কেতকীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুশ্চিন্তা। এই রকম জুয়াচুরি আজকাল অনেক শোনা যায়। লোকটি হয় ত একটু হাসিয়া ভাবিয়াছেন, কেতকী তাহাদেরই এক জন—যাহারা পথে ঘাটে নানা অছিলায় লোক ঠকানর ফাঁদ পাতিয়া থাকে। সে দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিতেই কেতকী দেখিল, পিতামাতা উপস্থিত। তাঁহাদের আগমনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও কেতকী জানিত না। বিস্ময়-ব্যাকুল-নেত্রে কহিল,—"এমন হঠাৎ—?"

রমানাথ গম্ভীরমুখে কহিলেন, "দুমাস ছুটী নিয়েছি, কেয়া।"

কনক কহিলেন, "তুমি বাছা নাকে দড়ি দিয়ে আনালে।"

কেতকী আর কোন কথা কহিতে পারিল না। অপরাধিনীর মত চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

বৈকালের দিকে রমানাথ কহিলেন, "খুকি, একটু পরিষ্কার হয়ে নাও, তোমায় দেখতে আসবে।"

কনক কহিলেন, "ছ'বছর জার্ম্মাণীতে ছিল। দেখতেও যেন সাহেব। নরহরি দাদা বল্‌লে, লোকটিও তেমনই ভাল।"

কেতকী রাগিয়া উঠিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, "ঠিক তোমার নরহরি দাদার জুড়ী!"

রমানাথ হাকিম মানুষ। বাজে কথা সহিতে পারিতেন না। কহিলেন, "লোককে চোখে না দেখে, তার সম্বন্ধে কিছু না শুনে তার প্রতি ধারণা করা অত্যন্ত অন্যায়, খুকি।"

সন্ধ্যার পর, পিতার নির্দ্দেশমত প্রস্তুত হইয়া কেতকী মাতামহের হাত ধরিয়া বাহিরের বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিল। পিতার দিকে মুখ করিয়া যে আগন্তুক এতক্ষণ গল্প করিতেছিলেন, তিনি যখন নিজের চেহারাটা ঈষৎ কেতকীর দিকে ফিরাইয়া লইলেন, তখন কেতকীকে একটা নমস্কার করিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া, বর্ষার ম্লান আকাশ শরতের সোনালি আলোর পরশে যেমন হাসিয়া উঠে, পলকে কেতকীর অপ্রসন্ন মুখের উপর তেমনই ভাবে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

রমানাথ কহিলেন, "কেয়া বেথুন থেকে এই বছর আই, এ দেবে, অসিত বাবু।"

প্রত্যুত্তরে কেতকীর মুখের পানে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "তা জানি।"

অসিতের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির মাঝে যে মুগ্ধতাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেতকীর দৃষ্টিতে গোপন রহিল না। কে যেন তাহার মুখে এক মুঠা আবীর ছড়াইয়া দিল। কেতকীর মনে হইল, পয়সা কয়টা এই বেলা ভদ্রলোককে দিয়া দি।

* * * *

নরহরি মামার কোন সংবাদই কেতকী রাখিত না; রাখিবার যে কিছু প্রয়োজন আছে, তাহাও সে মনে করিত না। তথাপি নরহরি যে বরটি তাহার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাকে পাইয়া কেতকী যে সর্ব্বান্তঃকরণে সুখী হইয়াছে, এ কথা অসংশয়ে সে নিজের কাছেও স্বীকার করে।

মাঝে মাঝে সুধার কাহিনীটা কেতকীর মনে পড়ে। কিন্তু পরিপূর্ণ সুখের মাঝে সে দুঃখের কাহিনী দাঁড়াইতে পারে না, মনের দুয়ারে আসিয়াই সরিয়া যায়।

কেতকী মা হইয়াছে। পুত্রের অন্ন-প্রাশন। অনেকেই নিমন্ত্রিত। উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনটা আসিতে মাঝে আর দুইটি দিন বাকী আছে। অপর্ণা আসিতে পারিবে না। স্বামীর সহিত সে এখন প্রবাসে অবস্থান করিতেছে। ক্ষুণ্ণ-মনে কেতকী সেই সহাধ্যায়িনী সখীকেই ভাবিতেছিল।

অসিত আসিয়া কহিলেন, "কেয়া, নরহরিবাবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এলুম।"

অন্য সময় হইলে হাসি-মুখে কেতকী কহিত, "বেশ করেছ।" এখন কহিল, "তাঁর সন্ধান তুমি পেলে কোথায়?"

"কেন, তিনি কি অজ্ঞাতবাস করছিলেন? আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ তিনিই করলেন।" অসিত হাসিলেন।

কেতকী কহিল, "তিনি আমার মামা হন। নেমন্তন্ন করেছ, বেশ করেছ। কিন্তু তাঁকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। অবশ্য তিনি আমার কোন মন্দ করেন নি।"

"তবে এত বিরাগ?" অসিতের স্বরে বিস্ময়ের আভাস ছিল। কহিল, "সরলপ্রকৃতির গো-বেচারী বলেই আমি জানি।"

"সরলপ্রকৃতি?—তুমি যদি জানতে ও কত বড় সয়তান।" কেতকীর মনে নিভিয়া-আসা বিদ্বেষ-বহ্নিটা হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

হাসি-মুখে অসিত কহিলেন, "সয়তানী করতে পেলেও বুদ্ধির দরকার, ও একটা নিরেট, কেয়া।"

তিক্ত কণ্ঠে কেতকী কহিল, "না গো না, ও-সব লোকের সয়তানীতে বুদ্ধি খোলে। ওর স্ত্রী সুধার ওপর যা করেছে।"

অসিত চমকিয়া উঠিলেন। কিসে যেন তাঁহাকে কঠিন আঘাত করিল। অস্ফুট বিস্ময়ে বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কার উপর?"

—"ওঁর স্ত্রী সুধার উপর।" বলিয়াই কেতকী থামিয়া গেল। স্বামীর বিবর্ণ, পাংশু মুখ, ব্যথাহত চোখের পানে চাহিয়া কহিল, "তোমার কি হ'ল?"

—"না, কিছু না। কে কার স্ত্রীর উপর কি করেছে, তা শোনবার আমার কিছু আবশ্যক নেই। কেয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে শুধু প্রার্থনা করি, আমাদের আচরণে কোন বিকৃতি, কোন দ্বিধা না আসে।"

* * * *

ভোর হইতে সানাই তাহার মিষ্ট সুরে প্রভাতী আলাপ করিতেছে। কর্ম্মরত কেতকীর ব্যস্ত মন সে সুরে থাকিয়া থাকিয়া যেন উদাস হইয়া পড়িতেছে। ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল। সবিস্ময়ে কেতকী শিরোনামাটার উপর চাহিল, অপরিচিত হস্তাক্ষর। বেলা বাড়িলে অবসর থাকিবে না, ভাবিয়া খামখানি সে তখনই খুলিয়া ফেলিল এবং চিঠিটার উপর চক্ষু বুলাইতেই মনটা তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া পড়িল।

"মা লক্ষ্মি—

তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ তোমার স্বামীর মারফতে পেলুম। আশীর্ব্বাদ করি, সে তার পিতার মত যশস্বী হোক। জীবনের দীর্ঘ পথ শান্তি-তৃপ্তি ভোগ করুক. আজ তোমায় যদি একটা কথা বলি, এই শুভ দিনে তোমার জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে চেয়ে আমায় তুমি ক্ষমা করবে।

আমার দুঃখের ইতিহাস, আমার অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানে না। ভেবেছিলুম, কোন দিন কেউ জানবে না। আমার ব্যথার আগুন আমার চিতার আগুনে মিশে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হ'ল না। বুকের ব্যথার একটি সাক্ষী পৃথিবীর বুকে বোধ করি রেখে যেতে হয়। বিশ্ব-বিধানের ধারা এই।

মা কেয়া,—আমার জীবনের বাইরের দিক্‌টাই তুমি জেনেছিলে। কেমন ক'রে তা জেনেছিলে, তা জানবার কৌতূহল নেই। মানুষ যা জানতে পারে, তুমি ত তাই জেনেছ। মানুষে যা বিচার করে, তুমিও তাই করেছ। আমি জানি, এতে তোমার অপরাধ নেই।

সুধাকে আমি পাব ব'লে পাই নি। তাকে পাবার যোগ্যতা ছিল না। শুধু তাকে পেয়েছিলুম প্রজাপতির পরিহাস, বুড় বিধাতার ভীমরতির জন্যে। আর যে তাকে বুক দিয়ে ভালবাসলে, সেই তাকে হারালে।

অসিত তখন এম-এস-সি ক্লাসের ছাত্র, সুধাকে যখন সে ভালবাসে। সুধা তার বোনের সহপাঠিনী ছিল। কথাটা জানাজানি হয়ে অভিভাবকদের কাণে উঠল। বিপত্তি ঘটল না, বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি হয়ে গেল। আমি ওদের বাড়ীর বাজার-সরকার, আমার কাছেও কিছু অবিদিত ছিল না। খুসীতে অসিতের মন ভ'রে উঠেছিল।

আমাকেই সে গরদের জোড় বকসিস দিলে। ওরা আমায় বড্ড স্নেহ করত।

বিয়ের দিন দুপুর হতে হঠাৎ অসিতের ভেদবমি আরম্ভ হ'ল। কোথা হ'তে তার দেহে যে বিসূচিকার বিষ ঢুকলো, তা ডাক্তাররাই জানে। সন্ধ্যার মাঝে সেই দুরন্ত ব্যাধি ভয়ানক মূর্ত্তি ধরলে। ডাক্তারদের মোটরে বাটীর সম্মুখের রাস্তাটি ভ'রে উঠল। নবতের লোকগুলা টাকা না নিয়ে যন্ত্রপাতি হাতে ক'রে চুপে চুপে পালাল। অসিতের জীবন-দীপ নিভ-নিভ। সালাইন কায করছে না, ডাক্তাররা ভয় পেয়েছে।

কনের বাড়ীতেও তেমনই বিভ্রাট। এইটা শেষ লগ্ন। সামনে ভাদ্রমাস, গায় হলুদ হয়ে গেছে, মেয়ে রাখবে কি ক'রে? আজ রাত্রেই বর চাই। না হ'লে এর পর মেয়েকে নেবে কে? অসিতের যদি কিছু ভাল মন্দ ঘটে।

কিন্তু বর কোথা? ওকে পাওয়া ভারত-সিংহাসন পাওয়ার মতই সাধ্যাতীত। হঠাৎ কার মনে হ'ল, নরহরি আছে। আমার সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা রইল না। জিজ্ঞাসা করাটাও কেউ প্রয়োজন মনে করলে না। কনের বাপের জাত-কুল বজায় রাখতে অসিতের বাড়ীরই এক দল লোক, অসিতের দেওয়া গরদের জোড় পরিয়ে, আমায় বরের আসনে টেনে আনলে।

অনেক তাড়া-হুড়া খেয়ে শুভদৃষ্টি করবার জন্যে চোখ খুললুম। মনে হ'ল, মৃত মানুষকে ধ'রে আমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে। সুধার মুখ এমনি সাদা! চোখ শুধু যেন চেয়ে আছে, তাতে দৃষ্টি নেই, জীবনের লক্ষণ নেই, মনে হ'ল। এ নিয়ে সুধাকে দোষী করতে পারি না। তার অবস্থাটা অনুভব করতে গেলে আমারই বুকটা কেঁপে উঠে। ব্রহ্মা না বিশ্বকর্ম্মা কার হাতে যে এ অপূর্ব্ব রত্ন নির্ম্মিত হয়েছিল, জানি না। এ বিরাট বপুকে কোন দিন আমি নিজেই ভালবাসতে পারি না। পরে একে সইবে কি ক'রে?

যাক্, বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যা অবধি বাদ পড়ল না। ও দিকে অসিতও একটু একটু ক'রে সামলে উঠতে লাগল।

অসিতকে আমি দেখতে যেতুম, সে তখনও জানে না, সুধা আমার হয়েছে। এক দিন একা পেয়ে চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'সুধার খবর জান?'

আমি বল্লুম, 'ভাল আছে।' তার কাছ হ'তে উঠে এলুম। বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়ল। উঃ, ভগবান্! দুটি ভালবাসা-ভরা নিষ্পাপ প্রাণকে তুমি দলে দিয়ে কি শুভ করলে!

অসিত ভাল হ'ল। সব ব্যাপার বুঝতে পারলে। আমি তার সামনে বার হ'তে পারতুম না। আমার সাম্‌নে বার হ'তে সেও বোধ হয় লজ্জা পেত। সে জার্ম্মাণীতে পাড়ি দিলে।

সুধা বিশ্বাসী স্ত্রী ছিল। আমায় নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে চাইত। কিন্তু তরুণ বয়সের বেদনা অনেকখানি। মনকে প্রবোধ দিলেই কি প্রবোধ মানে?

সুধা বোলত, 'তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও। এখান ভাল লাগে না।' এই ভাল না লাগাটা পিতৃগৃহের অনাদর নয়। বাজার-সরকারের স্ত্রীর আত্ম-গোপন। কিন্তু সঙ্গতি-হীন আমি নিয়ে যাব কোথা?

দেখতে দেখতে ছটা বছর কেটে গেল। অসিত ফিরে এল। সুধা সব শুনলে। দেখলুম, সে ভয়ানক চঞ্চল হয়েছে। রাত্রিতে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে,—'তুমি যেমন ক'রে পার, আমায় অন্যত্র নিয়ে চল। শুকিয়ে মরতে রাজি আছি।'

বুঝতে পারলুম, তার এ কান্না কিসের; কোন্ অব্যক্ত বেদনায় সুধার বুক ফেটে যাচ্ছে। স্বীকার করলুম, কালই নিয়ে যাব। মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি এল। সংস্কারের লোহার জুতা এঁটে, চল্‌বার শক্তিটাকে ওর নষ্ট ক'রে দেব না। বর্ত্তমানের আবহাওয়ায় ও মুক্তি নিয়ে বাঁচুক। এমনি একটা উদ্ভট আদর্শকে আঁকড়ে ধ'রে আমি ক্ষেপে গেলুম। মনে রইল না, ও সেই জাতের মেয়ে, যারা এক দিন স্বামি-সহমৃতা হ'ত। ও যত যন্ত্রণাই নিজের মনে পাক, মৃত্যু ছাড়া ওর শান্তি-মুক্তি নেই। সুধাকে একা ফেলে সোজা চম্পট দিলুম। ইচ্ছা, পরিচিতদের চোখে আমি মৃত হ'ব।

মা কেয়া,—এ কথাটা স্বীকার করছি, এই কদাকার বুকের মাঝে যে প্রাণ ছিল, সে সুধার দুঃখেই পাগল হয়েছিল। প্রচণ্ড ভালবাসা আত্ম-বিস্মৃতি আনে।

তার পর জানতে পারলুম, সুধা নেই। রোগের ঘোরে সে নাকি আমাকে খুঁজেছিল। অসিত এ কথা আমায়

গল্প করে ছিল। আমি যেমন তার ব্যথার ইতিহাস জানতুম, সেও তেমনই আমার দুঃখের কাহিনী জানত। সুধার দাদা শিরীষ মল্লিক অসিতের বন্ধু ছিল। আক্ষেপ ক'রে বলেছিল, মেয়েগুলকে বিশ্বাস নেই। 'বন'-মানুষের শোকটা সে যে এমন ক'রে নেবে, কে জানত। আমি ত ভাবতেই পারি না। স্বামী হলেই তিনি সব হবেন।

তার পর মা কেয়া, আমি তোমায় দেখি। দেখেই আমার মনে হ'ল, সুধা জীবনে সুখ পায় নি। অসিত যদি সুখ পায়, তার আত্মা একটু হয় ত তৃপ্তি পেতে পারে।

আমি অসিতকে নিয়ে পড়লুম। প্রথমে সে সম্মতি দিচ্ছিল না। শেষ অবধি তার জেদ বজায় রইল না। কারণ, মানুষ ত পাথর নয় যে, তার বুকে একবার যা কোঁদা হবে, শিলালিপির মত দীর্ঘকাল সে অক্ষয় থাকবে।

মা কেয়া, আমার সব কথা তোমায় বলা হয়েছে। অসিত এখন সব প্রাণখানি দিয়ে তোমায় ভালবাসে, তাই এ কথা তোমায় বললুম। আর জানি, মেয়েমানুষ যা একবার দেয়, তা আর ফেরাতে পারে না। সুধার নাম নিয়ে তোমার ছেলেকে আর একবার আশীর্ব্বাদ করছি। কারণ, সুধার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নেই। ইতি—

শ্রীনরহরি মিত্র।"

সুদীর্ঘ পত্রখানা শেষ হইল। কিন্তু জমাট আনন্দভরা দিনটা কেতকীর চোখে ফাঁকা হইয়া গেল। অসিত কক্ষে প্রবেশ করিতেই ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, নরহরি মামাকে তুমি আগে গিয়ে নিয়ে এস।" তার কণ্ঠস্বরে গভীর মিনতিটা যেন কান্নার মতই শুনাইল।

সবিস্ময়ে অসিত কহিলেন, "কাকে?"

"নরহরি মামা। আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি তাঁকে আনতে।"

কেতকী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীর ব্যগ্রতা দেখিয়া ব্যথিত-কণ্ঠে অসিত কহিল,—"আনতে গেলেই সবাইকে আনা যায় না, কেয়া। নরহরি কাল শেষ রাত্রে হার্টফেল করেছে। মোটা মানুষ, হার্টের ব্যায়রামে ভুগছিল। চিকিৎসা করাতেই তোমাদের কাছে গেছল!"

কেতকী বসিয়া পড়িল। এই মৃত্যুবার্ত্তা তাহার বুকের মাঝে যেন সীমাহীন শোকের হাহাকার তুলিল। উৎসব-উজ্জ্বল দিনটা চোখের সম্মুখে কালো হইয়া গেল। মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারে, ক্ষমা চাহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, ভগবান্ তখন ক্ষমা পাইবার পথটা রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে তাহার যন্ত্রণাটা নিরীক্ষণ করেন। কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের ধারাই এই।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

কোথা রাখি?

ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলি
ভাবি সিঁদুর-কৌটাতে কোন
রাখবো গো তুলি!
মুক্তা সম দেখতে কি খাসা,
দানা যাদের বাঁধলো নাক
এমন সব আশা,
ডানা যাদের উঠলো নাক
এমন বুলবুলি!

সাজনা দিয়ে জমল না যে দই,
খোলায় দিয়ে ফুটলো না যে খই,
সখের ঘুড়ি উড়লো না যে
লাটাই না খুলি!
যে সব অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা
পূর্ণ তাহা করতে ধরার ছিল না শঙ্কা,
অলসভরে সজল চোখে
পড়লো যা ঢুলি।

ভাবছি সোণার দোলনাতে কোন
রাখবো গো তুলি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গোড়ার কথা ও "শেষের কবিতা"

১২৭৯ সনের বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গ-দর্শন মাসিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে বঙ্গীয় পাঠক সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকেই সাহিত্য-গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তিনিও এই ভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিঞ্চিন্ন্যূন বিশ বৎসর পরে (১২৯৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসে) সাধনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সে ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনাভঙ্গী হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাধনার মলাটের উপর "শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত" লেখা ছিল, এবং "সাধনের সূর্য্যালোক" নামক পত্রসূচনা লিখিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু প্রথম হইতেই প্রতি সংখ্যায় "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার প্রথম পরিপক্ক ফল—উৎকৃষ্ট খণ্ড-কবিতা এবং অনুপম ছোট গল্পও মাসের পর মাস অবিশ্রান্তভাবে সাধনায় প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যামোদী পাঠক সমাজকে পরিতৃপ্ত ও বিমোহিত করিয়াছিল। তার উপর সাময়িক আন্দোলন এবং সাময়িক সমালোচনা সম্বন্ধে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তাঁহার রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং প্রবন্ধও থাকিত। বাঙ্গালা দেশে এক জন গুরুদেবের অভাব রবীন্দ্রনাথ সে কালে তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। ১৩০০ সনের কার্ত্তিক মাসের সাধনায় প্রকাশিত "ইংরাজ ও ভারতবাসী" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাহার পর নির্জ্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও বহুকাল খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হৌক্ সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম। যেটাকে সম্মানের শৈলশিখর জ্ঞান করিয়াছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা।

"আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে প্রলোভন হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোন একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; তিনি আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।" (৫৪৪—৫৪৬ পৃষ্ঠা)

চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে, তৎকালের জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউসনের হলে আহূত একটি সভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমরাও সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি এবং পঠনভঙ্গী আমাদের বড়ই চমৎকার লাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধের এই উপসংহার ভাগ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমাদের মনে বড় আশা হইয়াছিল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেশের সেই গুরুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথাটি বলিলেন না। তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর সভাপতি উঠিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার ফলে রবিস্তুতি ও তাঁহার প্রশংসাগীতি শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার ন্যায় সভাস্থলে বর্ষিতে আরম্ভ হইল। কোন কোন বক্তা বলিলেন, রবীন্দ্রনাথই আমাদের সেই গুরুদেব। অনেকক্ষণ এইভাবে বাক্যধারা বর্ষণের

পর সভায় ভীষণ মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। অনেকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা বঙ্কিম বাবুর কথা শুনিতে চাই।" সুতরাং বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে কিছু বলিলেন। কিন্তু আমরা তাহা শুনিতে পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পরে চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে তিনি এই সভার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্ব্বেই যে সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে! কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ! একদিন আমার প্রথম বয়সে কোন নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সে দিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদরবাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, যে, আজ তাহা লইয়া সর্ব্বসমক্ষে গর্ব্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে আমার শেষ পুরস্কার হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

এই "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধটি ১৩০১ সনের বৈশাখের সাধনায় (৫৩৬—৫৬৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই অংশটি "আধুনিক সাহিত্য" নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার কোন সঙ্গত কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি নাই; তবে যে সময় "আধুনিক সাহিত্য" ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল, অর্থাৎ গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার জ্যোতিঃ প্রাচ্যগগন অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য জগতের দিগন্ত সীমা পর্য্যন্ত ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল; সেই প্রখর জ্যোতির তুলনায় পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যদি তখন খদ্যোতদ্যুতির ন্যায় ম্লান ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'সকল উৎসাহ বাক্য সাহিত্যপথযাত্রার পাথেয়স্বরূপে' রবীন্দ্রনাথের 'স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত' হইয়াছিল, এবং 'তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে' পারিবেন না বলিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেও, সাহিত্য-সাধনায় অপূর্ব্ব সাফল্যলাভের পর সেই পুরস্কারের কথা পুনরুল্লেখ না করা—তাহা চাপিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না কি? সুতরাং 'আধুনিক সাহিত্য' নামক পুস্তকে উহা পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় আমরা বিস্মিত হই নাই।

বর্ত্তমান যুগে যিনি দেশগুরু হইবেন, তাঁহাকে হয় বক্তা, না হয় লেখক হইতে হইবে। সেই লেখা যদি সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, তবে গুরুগিরি ব্যবসায়ের খুব সুবিধা হইতে পারে। আজন্ম সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে সাহিত্যিক দেশগুরুর পরিকল্পনাই স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধপাঠের ২।৩ মাস পরেই (১৩০০ সন, ২৬শে চৈত্র) বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একবারে গুরুদেব না হউক, সাহিত্যগুরুর পদ অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। এখন দেখা যাক্, সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য বা কাব্য-সাহিত্য কি পদার্থ, এই সম্বন্ধে ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"সত্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জান্তে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্চে। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্ত্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্, তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মত দেখাবে না।

"আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোন একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে করে' তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয় তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়।" (সাধনা, ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ৩২৫ পৃষ্ঠা)।

৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় ইহার অর্থ বুঝিয়াছিলেন, "তুমি দেখছি সাহিত্যকে লেখকের দিক থেকে দেখছ। তোমার মতে সাহিত্য হচ্ছে লেখকের আত্মপ্রকাশ। তা হলে সেক্‌সপিয়রের নাটক কি সাহিত্য নয়?" (সাধনা, ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ৪৫০ পৃষ্ঠা)।

আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, "সাহিত্যের তাৎপর্য্য" "সাহিত্যের সামগ্রী" ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ

এই কথাটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছেন। আত্ম-প্রকাশ গীতিকবির মুখ্যব্রত। তাঁহার নিকট উত্তম পুরুষই পুরুষোত্তম; তিনি নিজের মধ্যেই বিশ্বরূপ দর্শন করেন। "সাহিত্যের তাৎপর্য্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই। যেমন জঠরে জারক-রস অনেকের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভালো করিয়া আপনার শরীরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না" (সাহিত্য, ১ম পৃষ্ঠা)।

গীতিকবির হৃদয়বৃত্তির জারকরস শুধু জগৎকে জারিয়া তাঁহার মন-গড়া জগতে পরিণত করে না, তাঁহার নিজেকেও এমন মত্ত অবস্থায় রাখে যে, এই মন-গড়া জগৎ ছাড়া যে একটা স্বয়ম্ভূ জগৎও আছে, তাহা সে ভুলিয়া যায়।

গীতিকবির কাছে বাহ্য জগৎ যেমন তাঁহার হৃদয়বৃত্তির জারক-রসে জারিত হইয়া দেখা দেয়, পরকীয় সাহিত্যও সেই দশা প্রাপ্ত হয়। সে পরকীয় সাহিত্যকে পরের (লেখকের) হিসাবে দেখিতে পারে না, স্বীয় হৃদয়বৃত্তির জারকরসে জারিয়া তোলে। ১২৯৯ সনের কার্ত্তিকের সাহিত্যে প্রকাশিত "একটি পত্রে" রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বোঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগে। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয়, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—কিরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না—যিনি বিশেষ কৌশল-পূর্ব্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝেন তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।" (৪৩০ পৃষ্ঠা)

এই পত্রেই আবার লিখিয়াছেন—

"কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্ম বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া, নিজের ভাল-মন্দ লাগাকে খাতির না করিয়া বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূল পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।" (৪৩১ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথ যে নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া, নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝিতে পারিতেন না বা বুঝিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সাধনায় প্রকাশিত তাঁহার ৺চন্দ্রনাথ বসুর লেখার সমালোচনায় এবং প্রতিবাদে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সৌরমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহিত্য-গগনের জ্যোতিষ্ক-সমূহের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু শ্রেষ্ঠ কাব্যসমালোচক বলিয়া গণ্য হইতেন। চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলা-তত্ত্ব" বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগ্রন্থরূপে তৎকালে আদর লাভ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র "সঞ্জীবনী সুধা" (প্রথম ভাগ) নামক পুস্তকে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের দুইটি ছোট গল্প, এবং "পালামৌ" নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুনর্মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং চন্দ্রনাথ বসুর রচিত তাঁহার রচনার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৩০১ সনের পৌষের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকের অন্তর্গত পালামৌ বৃত্তান্তের একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আধুনিক সাহিত্য" নামক পুস্তকে (১৩৩৪) এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (৪৬—৫৭ পৃষ্ঠা)। এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন স্বর্গগত; সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বেই মহা-প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রবন্ধে নিবদ্ধ সমালোচনা সঞ্জীব-চন্দ্রের অনুকূল, কিন্তু তাঁহার সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর একান্ত প্রতিকূল। চন্দ্রনাথ বসুর "পালামৌ" সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল অভিযোগ :—

"চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, সঞ্জীব বাবু তাহাই দেখিতেন—ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি সঞ্জীব বাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোনো আবশ্যকতা নাই।" (আধুনিক সাহিত্য ৫০ পৃষ্ঠা)

যে সাহিত্যে সে বিশেষত্ব নাই, সে সাহিত্যের বিশেষ কোন আবশ্যকতা আছে কি? সচরাচর লোক যাহা দেখিতে পায় না, তাহার সন্ধান পাইবার জন্য সাহিত্যের শরণ লয়; সচরাচর মানুষ যাহা দেখে, তাহা অনেক সময় দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময়কর অনুভূতির সঞ্চার করিতে পারে না। সাহিত্য সৌন্দর্য্যের নূতন আকরের সন্ধান দিয়া দর্শককে মুগ্ধ করে। তার পর চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার মতের সমর্থনে যে উদাহরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারও বিচার করিয়া-ছেন। উদাহরণটি এই—

"এখন দেখি, এ বেগ (নিত্য অপরাহ্লে লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসার আগ্রহ) আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে;—জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম।"

ইহার উপর রবীন্দ্রনাথ টিপ্পনী করিয়াছেন—

"চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, 'জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে?' আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয় তো, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয় তো, নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, সাধারণের স্থূল দৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না।" (আধুনিক সাহিত্য, ৫২ পৃষ্ঠা)

"আমরা" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই "বেলা যে প'ড়ে এল, জ'লকে চল" ডাক শুনিয়া কলসীর জল ফেলিয়া জল আনিতে যাওয়া লক্ষ্য করাটা প্রশংসার যোগ্য মনে করেন না। সঞ্জীবচন্দ্র কুলবধূর জলকে যাওয়ার কথা তুলিয়াছেন অপরাহ্লে তাঁহার নিজের মনে লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসার জন্য বেগের বা আগ্রহের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কলসে জল থাকিতেও সেই জল ফেলিয়া দিয়া জল আনিতে যাওয়া কুলবধূর হৃদয়বেগ যেমন সুন্দররূপে প্রকাশ করে, এই সম্পর্কে আর কোন কাযে বোধ হয় তাহা তেমন প্রকাশ করিতে পারে না। সঞ্জীবচন্দ্র এখানে কুলবধূর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছে এই জলফেলাটুকুর কথায়। সুতরাং সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনার এই অংশটুকুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রশংসা না করিয়া পারি না। রবীন্দ্রনাথ যদি চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনার খুঁত ধরিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার সমালোচনারীতির অনুসরণ করিতেন, তবে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) পালামৌ সমালোচনা অধিকতর পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী হইত। সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে; মুখের নিকট সুন্দর নখরযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।"

চন্দ্রনাথ বসু যে ভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টিরীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই ভাবে লিখিতে হইলে এই নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা সম্বন্ধে লিখিতে হয়—

"মুখের নিকটবর্ত্তী বাঘের থাবার উজ্জ্বল নখগুলি এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে এবং কয় জনই বা তাহার কারণ অনুমান করিতে যায়?"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থাবার উজ্জ্বল নখের এবং ঘুমাইবার পূর্ব্বে বাঘের থাবাটি চাটার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"আহার-পরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ঐ যে মুখের সামনে একটা থাবা উল্টাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, এমন আর কিছুতে হইতে পারিত না।"

এই কথা যদি রবীন্দ্রনাথ না লিখিয়া চন্দ্রনাথ বাবু লিখিতেন, তবে নিশ্চয় তাঁহার দোষ হইত। কেন না, সুস্পষ্ট ছবি বা ফটোগ্রাফ আর্ট নহে। চন্দ্রনাথ বাবুর হিন্দুধর্ম্ম এবং সামাজিক আচারসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের উদারতার অভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। মতভেদ এই অনুদারতার প্রকৃত কারণ নহে; নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া, অপর পক্ষ যে কোন দিক হইতে দেখে (angle of vision), তাহা বুঝিবার অক্ষমতা বশতঃই এইরূপ অনুদারতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস যে অনেক হিন্দুর মতিগতিকে কোন্ দিকে চালিত করে, রবীন্দ্রনাথ তাহা কখনও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর রচনার প্রথম সমালোচনা করেন ১২৯৪ সনে। চন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য, হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমের সকল কর্ম্মই পরকালমুখী, মোক্ষপথের সোপানস্বরূপ। বিবাহও ঐহিক সুখের বা সুবিধার জন্য নহে, পারত্রিক মঙ্গলের জন্য। রবীন্দ্রনাথ এই মতের প্রতিবাদে বিবাহের ঐহিকতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার একদেশদর্শিতা সুপরিস্ফুট। তিনি লিখিয়াছেন—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে।" (ভারতী, ১২৯১, আশ্বিন, ৩২৩ পৃষ্ঠা)।

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্।" এই শাস্ত্রোক্তির প্রধান

লক্ষ্য পিণ্ড বা পুত্র কর্তৃক পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পিণ্ডলোপ করিয়া নিজের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। সাধনার প্রচারের আরম্ভকাল হইতে চন্দ্রনাথে এবং রবীন্দ্রনাথে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহার সমুচিত পরিচয় দিতে হইলে একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। সুতরাং এখানে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের লেখার সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র সঙ্কলিত হইল।

১২৯৮, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, "আহার" চন্দ্রনাথ বসু, ৩৫৭—৩৬৩ পৃষ্ঠা।

১২৯৮ সাধনা, পৌষ, "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৭১ ১৮১ পৃষ্ঠা। প্রবন্ধের আরম্ভের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই রসিকতাটুকু করিয়াছেন—"লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্ব্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু" (১৭২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এইখানেই প্রবন্ধ শেষ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ তার পর সাড়ে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। উপসংহার এইরূপ—"একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্যস্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।" চন্দ্রনাথ বসু যত অপরাধই করিয়া থাকুন, তিনি কখনও গুরুদেব সাজিতে সম্মত হয়েন নাই।'

১২৯৮, সাহিত্য, ফাল্গুন, "আহার" ৩ (২), শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, ৫৬২—৫৬৯ পৃষ্ঠা।

১২৯৮, সাধনা, চৈত্র "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা", শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৬০ ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

১২৯৮, সাহিত্য, মাঘ, "লয়", শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, ৪৬৫—৪৭৪ পৃষ্ঠা। বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ১৯ অধ্যায়, ৮৮—৮৬ শ্লোক অবলম্বনে "লয়" ব্যাখ্যা।

১২৯৮, সাধনা, ফাল্গুন, "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩৭১—৩৭৫ পৃষ্ঠা। লয়ের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি, "ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা-রক্ষার বিরোধী।"

১২৯৯, সাহিত্য, বৈশাখ, "লয়," শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, ৬৭—৭৯ পৃষ্ঠা। উপসংহারে—"আমাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয়ের মধ্যে অনেকে যে বিষম স্বজাতিবিদ্বেষ, বিষম হিন্দুবিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন" তজ্জন্য রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ।

১২৯৯, সাধনা, আষাঢ়, "চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫—১৩১ পৃষ্ঠা। "স্ব" অর্থ এখানে অবশ্য চন্দ্রনাথ বসু নহেন, বিষ্ণুপুরাণকার। চন্দ্রনাথ বসুর লয়-ব্যাখ্যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ, "সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্ব্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।" রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তখনও "অচিন্ত্য ভেদাভেদের" খবর পান নাই।

১২৯৯, সাধনা, শ্রাবণ, "হিং টিং ছট্ (স্বপ্নমঙ্গল)," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩—১৯৯ পৃষ্ঠা। এই কবিতায় যেটুকু রস আছে, তাহা ৯ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ায় অত্যন্ত পান্সে হইয়া উঠিয়াছিল। টীপ্পাগুলিও অতি দীর্ঘ। এই কবিতার মধ্যে স্মরণীয় এই কয় পংক্তি—

"অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।

* * *

অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ !
এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।"

১২৯৯, সাহিত্য, শ্রাবণ, "আমার 'স্বরচিত' লয়তত্ত্ব" শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, ২৫১—২৫৬ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাহিত্য, ভাদ্র, "নব্য লয়তত্ত্ব," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৯৬ ৩০০ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাহিত্য, শ্রাবণ, "আদর্শ সমালোচনা," ২৪০—২৪২ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাধনা, শ্রাবণ, "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৪৫—৪৪৬ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাহিত্য, কার্ত্তিক, "কড়াক্রান্তি [সুদূরগামিতা]," শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, ৪১৩—৪২০ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাধনা, পৌষ, "কড়ায় কড়া কাহন কানা," শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৫৬—১৬৫ পৃষ্ঠা।

১২৯৯, সাধনা, মাঘ, "বাঙ্গালা লেখক" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮১ ১৮৯ পৃষ্ঠা। "কড়ায়—কড়া কাহন—কানা" প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"চুল-চেরা হিসাবে ফেলিয়া দ্রুতগামী মানব পথিকেরা এক এক দীর্ঘ পদক্ষেপে" যেমন চলিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য আমাদেরও রীতিমত চলা উচিত। "আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়-যাপনের একটা উপায় বটে।" "অন্ধ আত্মাভিমানে"র স্থানে "উজ্জ্বল আত্মজ্ঞান" বসাইলে মুমুক্ষু হিন্দুমাত্রই এই তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইবে। সুদীর্ঘ মুখবন্ধের পর "বাঙ্গালা লেখক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "উদাহরণস্বরূপ কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'কড়াক্রান্তি' প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন……সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই ? অন্য কোন দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য্য তর্কচাতুরী সহ্য করিত ?"

'নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধার-সহিত' বিঘোষিত এই 'নির্লজ্জ' 'তর্কচাতুরী' বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অসহ্য হইল। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। (১২৯৯ সাহিত্য, ফাল্গুন, "তর্কবৈচিত্র্য," শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬৭৬—

৬৮০ পৃষ্ঠা)। চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"অবস্থাটা বাহির হইতে দেখিতে এইরূপ;—চন্দ্রনাথ বাবু যদি পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন, অমনি রবীন্দ্রনাথ বাবু পশ্চিমমুখ হইলেন; চন্দ্রনাথ বাবু হস্তে লেখনী ধারণ করিলেই, রবীন্দ্রনাথ বাবু একেবারে খড়্গ-হস্ত! চন্দ্রনাথ বাবু যদি লয়তত্ত্ব লেখেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ বাবু সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন; যদি চন্দ্রনাথ বাবু ঋষিদিগের সুখ্যাতি করেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ বাবু সাহেবদিগের গুণগান করেন।"

"হিংটিং ছট" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্র বাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথ বাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বাবু। ঐ কথা যদি রবীন্দ্রনাথ বাবু অস্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না।"

১২৯৯, সাধনা, চৈত্র, "সাহিত্য-পাঠকদের প্রতি" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৫৪—৪৫৫ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"উক্ত (হিংটিং ছট্) কবিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বর কল্পনার যাহা অগোচর ছিল, সেই সময়ের সাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই কল্পনার সাহায্য না লইয়াও ইঙ্গিতটা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল; নগেন্দ্রনাথ বাবু অসঙ্কোচে তাহারই আভাস দিয়াছিলেন। ১৩০০ সনের বৈশাখের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল "রবীন্দ্রনাথ বাবুর পত্র," (৮১—৮৪ পৃষ্ঠা) এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর চন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের (Seven years war) বিরাম হইয়াছিল।

অনেকেই হয় ত' বলিবেন, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে যে সঙ্কীর্ণ মত প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৎকালের পরবাদের আলোচনায় যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, অনেক দিন যাবৎ তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া, অনেকগুলি মহাকাব্য—উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সুতরাং পুরাতন কথার আলোচনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনা বুঝিবার পক্ষে কোন সহায়তা করে না। এই আশঙ্কা সত্য কি না, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ গীতিকবির হৃদয়বৃত্তি মহাকবির হৃদয়বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উপন্যাসের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এখানে অবশ্য তাঁহার সকল উপন্যাসের সমালোচনা সম্ভব নহে; এই প্রস্তাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সকলের শেষ উপন্যাস, "শেষের কবিতার" আলোচনা করিব।

"শেষের কবিতা"র নায়ক অমিত রায়, এবং শেষকালে অমিতের সহিত বিবাহ না হইলেও নায়িকা, লাবণ্য। অমিতটি প্রাণহীন প্রাণী, অথবা অদ্ভুত রকম সংযমী, কেন না, বিকারের হেতু বর্ত্তমানেও তাঁহার বিকার ছিল না, অথচ রসের কথা বলিয়া মেয়েদের চিত্তবিকার উৎপাদন করিবার জন্য তিনি সতত যত্নবান্ ছিলেন। তবে সত্য কথা বলা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁহার প্রেমের কথায় "যতখানি সত্য, সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যে।" একদিন লিলি গাঙ্গুলীর সঙ্গে এইরূপ রসিকতা করিতে গিয়া অমিত পাথার বাড়ি তাড়না খাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই সমাজে যুবক-যুবতীর মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই। এই নির্জীব জীবটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন তখনই দেখা যায়, যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের অংশাবতারের মত কথা কহেন। যথা—

"অমিত বলে, ফ্যাশানটা হ'লো মুখোস্, ষ্টাইলটা হ'লো মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, নিজের মন রেখে চলে, ষ্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমী ষ্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন।"

The Concise Oxford Dictionary of current English এ 'ষ্টাইলের' এই সংজ্ঞা আছে—

"Collective characteristics of the writing or diction or artistic expression or way of presenting things or decorative methods proper to a person or school or period or subject, manner of exhibiting these characteristics."

লেখা, শিল্প প্রভৃতির বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সমষ্টি 'ষ্টাইল' নামে কথিত হয়। এই সকল লক্ষণ দেশগত, কালগত, বস্তুগত, ব্যক্তিগত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অমিত

'ষ্টাইল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রীতি অর্থে। "যারা নিজের মন রেখে চলে," অর্থাৎ ১২৯৯ সনের কার্ত্তিকের সাহিত্যে প্রকাশিত চিঠির ভাষায়, যাঁহারা "নিজেকে নিজে লঙ্ঘন" করেন না,'ষ্টাইল' তাঁহাদেরই। পুরুষ-চরিত্রে পুরুষ সাহিত্যিকের নিজেকে নিজে লঙ্ঘন না করিয়া শুধু বিশ্লেষণের জোরে উপন্যাস লেখা চলিতে পারে। কিন্তু পুরুষ লেখক নিজেকে লঙ্ঘন করিতে না পারিলে স্ত্রী-চরিত্র গড়িতে পারেন না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-চরিত্র-সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নায়িকা লাবণ্য এক জন কলেজের অধ্যাপকের মেয়ে; এম্-এ পাশ করিয়া বিপত্নীক বাপকে বিধবা-বিবাহ করাইয়া, মাষ্টারী করিতে-ছিল। রাস্তায় মোটর ঠোকাঠুকি হওয়ায় শিলংএ অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের দেখা হইয়াছিল; এবং ক্রমে খুব আলাপ হইয়াছিল। এক দিন নির্জ্জনে অমিত লাবণ্যের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল; লাবণ্য হাত ছাড়াইয়া লয় নাই; অমিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, কিছুই বলে নাই।

কিন্তু যখন অমিত কর্ত্তামার (যোগমায়ার) দোহাই দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল, তখন লাবণ্য অসম্মত হইল। এই অসম্মতির কারণস্বরূপ লাবণ্য যাহা বলিল, তাহা, হাত চাপিয়া ধরিলে যে নীরবে নায়কের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, এমন যুবতীর মুখে শোভা পায় না; মানব-মনের বিশ্লেষণক্ষম (psycho-analyst) বৈজ্ঞা-নিকের মুখে শোভা পায়। কিন্তু লাবণ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ ভক্ত ছিল, এবং ঐ কবিতার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পুরাতন সুরই ধরিয়াছিল। এক দিন অমিত যেমন বলিল, "তোমরা সবাই মিলি তাকে (রবিঠাকুরকে) নিয়ে বড় বেশি,"—লাবণ্য তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কথা বলো না, মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর কারো সঙ্গে অমিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ?" অর্থাৎ মনে মনে লাবণ্যও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া রবীন্দ্রনাথ বনিয়াছিল। সুতরাং অমিতের চিত্ত বিশ্লেষণ করিয়া সে বুঝিয়াছিল, অমিত সহধর্ম্মিণী চায় না, চায় কাব্যে সাধনার এক জন—স্থায়ী উত্তরসাধক। লাবণ্য জানিত, অমিতের মতে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা নহে; কবিতা রচনার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। "যে সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে চায়।" যখন কর্ত্তামা—যোগ-মায়া স্বয়ং লাবণ্যকে এই বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন লাবণ্য সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল, —

"কিন্তু উনি ত' আমাকে চান না। যে—আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখ্‌তে পেয়েছেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেচি, অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা ক'য়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গ'ড়ে তুলেচেন।…বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

তার পর অমিত বাসা বদল করিল। যোগমায়া সেই ভাঙ্গা ঘরে লাবণ্যকে লইয়া গিয়া অমিতের হাতে সম্প্রদান করিলেন। কলিকাতায় মুক্তা-বসান আংটীর অর্ডার গেল! "ঠিক হয়ে গেলো আগামী অঘ্রাণ মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।" এখন সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, হঠাৎ এটা হইল কি? আমরা বলিব, এটা হ'ল সৃষ্টি-বিভ্রাট,—তার পর ঘটিয়াছিল বিবাহ-বিভ্রাট। সাত বৎসর পূর্ব্বে অমিত যখন অক্সফোর্ডে ছিল, তখন সেখানে কে, টি, মিটার (কেতকী মিত্র) নাম্নী একটি বাঙ্গালী মেয়ে ছিল। অক্সফোর্ডে "এক জন পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়-মুগ্ধ।" এক দিন অমিতের সঙ্গে আপোষে সেই পাঞ্জাবী যুবকের নৌকা-বাচখেলা হইয়াছিল, এবং অমিত জিতিয়াছিল। ইহাতে সে কেটিকেও জিতিয়া লইল এবং তাহার হাতে আংটী পরাইয়া দিল। অমিতের বোনেরা এবং কেটি যখন শুনিল, লাবণ্যের সহিত অমিতের বিবাহ স্থির, তখন তাহারা শিলংএ আসিল এবং এক দিন যোগমায়ার বাসায় গিয়া কেটি সকলের সামনে আংটীটি টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহার ফলে লাবণ্যের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।

যোগমায়া এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি। তিনি 'হোটেলে চপ্-কাটলেট্ খাওয়া রামলোচন বাঁডুজ্জ্যের কন্যা।' রামলোচন বাঁডুজ্জ্যে, হোটেলে ছাড়া আর কোথাও, বিশেষতঃ বাড়ীতে চপ-কাটলেট্ খাইতেন কি না, গ্রন্থকার তাহা সুস্পষ্ট করিয়া

লেখেন নাই! সুতরাং চপ্-কাটলেটের এনবাইরনমেণ্টে (environment) বা সৎসঙ্গে যে যোগমায়ার শৈশব কাটিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। যোগমায়ার স্বামী বরদাশঙ্কর—

"মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা ব'লে ঠাণ্ডা করতে চান। মাছুলি ধুয়ে জল খাওয়া সুরু হলো, সহস্র দুর্গা-নাম লিখতে লিখ্‌তে দিনের পূর্ব্বাহ্ণ যায় কেটে,..."

"অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্ম্মে, জপে, তপে, আসনে, আচমনে, ধ্যানে, স্নানে, ধূপে, ধূনোয়, গো-ব্রাহ্মণসেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র ক'রে বানালেন। অবশেষে গো-দান স্বর্ণদান ভূমিদান কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে তিনি লোকান্তরে গেলেন, তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।"

৩৭ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সুর ধরিয়াছিলেন, এখানে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। চরিত্র-সৃষ্টির বেলা যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে অক্ষম, হিন্দুয়ানির বিচার-কালেও তেমনি নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে অসম্মত। বরদাশঙ্কর সাতাশ বছরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যোগমায়ার কি দশা ঘটিয়াছিল? রামলোচন বাঁড়ুজ্জ্যের বাড়ীর বাইরে বেরোন' "মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার বিসর্গের ভুল চুক না থাকে সে চেষ্টায় লাগ্‌লেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত রক্ষার নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাস্‌পোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লো। চোখের উপর তাঁর ঘোমটা নাম্‌লো, মনের উপরেও।...এই পৌরাণিক লোহার সিন্ধুকের মধ্যে নিজেকে সেফ্‌ডিপজিটের' মতো ভাঁজ ক'রে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন।" দীনশরণ পণ্ডিত যোগমায়াকে বলিতেন, হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্ম জঞ্জাল,—কিছু নয়, এবং কখনও গীতা কখনও ব্রহ্মভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তার পর—

"এমনি ক'রে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেলো। জীবনটা আগা-গোড়াই হ'য়ে উঠলো আজকালকার খবরের কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে 'বাধ্যতামূলক'। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশঙ্কর এবং মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন। শীতের সময় থাকেন কল্‌কাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে।"

দেখা যাইতেছে, বরদাশঙ্কর যত দোষই করিয়া থাকুন, এই বেরিয়ে পড়ার—কলিকাতায় এবং পাহাড়ে আনাগোনার খরচার টাকাটা রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরদাশঙ্করের মৃত্যুর সময় যোগমায়ার বয়স বোধ হয় বিশের কম ছিল না এবং পঁচিশের বেশী ছিল না। তার পর ১৫।২০ বৎসর পরে যোগমায়ার দেখা পাই আমরা শিলংএর একটি বাড়ীতে।

"চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েচে। গৌরবর্ণ মুখ টস্ টস্ করচে। বৈধব্য-রীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ।"

"পায়ে জুতো নেই (ফ্যাশান?), দুটি পা নির্ম্মল সুন্দর।" যোগমায়া সকালে স্নান করে, এবং ফুল তুলিয়া আহ্নিকও (পূজা) করে। মোটরে ধাক্কা লাগার পর অমিত যখন লাবণ্যের সঙ্গে যোগমায়ার বাসায় আসিল, তখন—

"অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হ'তে না হ'তেই তিনি ঠিক ক'রে ব'সে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই।"

যদিও বিবাহটা ফ্যাশানের সামিল, তথাপি যোগমায়ার অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহ ঘটাইবার সঙ্কল্পকে ষ্টাইল বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে দশের অর্থাৎ বর-কন্যার আত্মীয়স্বজনের মন রাখার কোন কল্পনাই ছিল না। বরদাশঙ্করের মৃত্যুর পর, ১৫।২০ বৎসরকাল যোগমায়া যে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেকার অবস্থার কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, হিন্দু সমাজের কতকগুলি শাসন তাঁহার অভ্যাসসিদ্ধ হওয়া সম্ভব। দীনশরণ বেদান্তরত্নের উপদেশ সত্ত্বেও যোগমায়া আহ্নিক করিতেন, এবং ফুল যখন তুলিতেন, তখন বোধ হয়, পূজাও করিতেন। এইরূপ চরিত্রের প্রৌঢ়া বিধবার পক্ষে বর-কন্যার আত্মীয়স্বজনকে উপেক্ষা করিয়া সম্বন্ধ ঠিক করা অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয় না কি?

তার পর যে দিন লাবণ্য অমিতের বুকে মাথা রাখিয়া নিজের আঙ্গুল হইতে অমিতের দেওয়া আংটী খুলিয়া বিনা

বাধায় তাহার হাতে পরাইয়া দিল, তাহার সাত দিন পরে অমিত যোগমায়ার বাসায় গিয়া দেখিল, "ঘর বন্ধ, সবাই চ'লে গেছে। কোথায় গেল, তার কোনও ঠিকানা রেখে যায় নাই।" তার পর এই পরিবারের এক জন—যতিশঙ্করের দেখা পাই কলুটোলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাহাকে প্রায়ই বাড়ীতে লইয়া আসেন। ক্রমে সে অমিতের ছোট বোন্ লিলির স্বহস্তে ঢালা চা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেটি মিত্রের সঙ্গে অমিতের বিবাহ ঠিক হইল। লাবণ্যের সহিত শোভনলালের বিবাহের খবরও আসিল। কিন্তু কেহ আর যোগমায়ার নাম মুখে আনিল না; তাঁহার পাতান বোন্‌পো অমিতও আনিল না, তাঁহার পুত্র যতিশঙ্করও না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের শেষভাগে যোগমায়ার জন্য কোন স্থান করিতে পারেন নাই, তাই যতিশঙ্করকে প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে রাখিয়া যোগমায়াকে সৃষ্টি-ছাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, এত ত্রুটি সত্ত্বেও "শেষের কবিতা" কাব্যাংশে মন্দ নহে। কবি যাহা দেখাইবার জন্য এই উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, পুরুষ কবি যদি স্বাধীনভাবে সুশিক্ষিতা যুবতীর সহিত মেলামেশা করিতে পারেন, এবং ভালবাসাবাসির খেলা খেলিতে পারেন, তবে অতি সহজে তাঁহার কবিত্বশক্তি উদ্দীপিত (inspired) হইতে পারে। গোল বাঁধিয়াছে বিবাহ লইয়া। লাবণ্য এবং কেটি মিটার এই দুই জনের মধ্যে কেহই "সবলা" ছিলেন না; ইহারা কেহই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেন না—"যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে বাজায়ে কিঙ্কিণী, আমার প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।" লাবণ্য এবং কেটি উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অবলা বলিয়াই "শেষের কবিতা" গল্পে বিবাহ-বিভ্রাট অনিবার্য্য হইয়াছে।

যিনি নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া অপরকে বুঝিতে অসমর্থ, তিনি আত্মপ্রকাশে যতই পটু হউন, সাহিত্য-গুরুর পদারূঢ় হইয়া তিনি যদি অপরকে আত্মপ্রকাশের পথ দেখাইতে যায়েন, তবে বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথকে গুরুবরণ করিতে গিয়া অনেক উদীয়মান সাহিত্যিকের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বৃত্তির জারক-রসে জারিত হইয়া তাঁহারা আলোহীন তাপবিহীন রবিখণ্ডে পরিণত হইয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দেশের গুরুদেবের যে অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অভাবও তিনি পূরণ করিতে পারেন নাই। অবশ্যই অন্যের প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা-মোচনের অন্দোলন প্রভৃতিতে যোগদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে আন্দোলনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তরুণ-তরুণীগণ চিরকালই তাঁহার জয় ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু দেশ বা হিন্দু-সমাজ বলিতে যে, অতরুণ সমাজকে বুঝায়, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কখনও দীক্ষাগুরু না হউক, শিক্ষাগুরু বলিয়া সমাদর করিয়াছে কি? এরূপ না করিবার কারণ, তাঁহার সহিত মতের অমিল নয়, তাঁহার সঙ্কীর্ণতা ও সমবেদনাবিহীন সুতীব্র কশাঘাত। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া অতরুণ হিন্দুর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে চাহেন না বা পারেন না বলিয়া তিনি নিজের দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান পাদরীদিগের অসংযত ভাষা রাজা রামমোহন রায়ের মনে যেরূপ আঘাত দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের অসংযত ও শ্লেষপূর্ণ কঠোর মন্তব্যগুলি গত ৪২ বৎসর যাবৎ নিত্যই হিন্দুর মন সেইরূপ কঠোর আঘাতে নিপীড়িত করিতেছে। এক জন পাদরীর আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণ-সেবধি"তে যে কথা লিখিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করিলে রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-বিদূষণের সুন্দর পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। যথা—

"আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে, 'এ দেশস্থ মানুষেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন—যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়' আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থবিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্কশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গালা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে, ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই, যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিশনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।"

হিন্দুর উত্তমত্বের দিকে রবীন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিত দেখিয়া চন্দ্রনাথ বসু ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। "শেষের কবিতা" এবং রবীন্দ্রনাথের এই শেষ কালের কবিতা পাঠ করিলে মনে হয়, সে চক্ষু এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। এখন সবই উল্‌টা। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে অনেক সতী স্বেচ্ছায় সানন্দে মৃত পতির চিতায় আত্মোৎসর্গ করিতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এক জন সাহেব নাগপুরে এক জন ব্রাহ্মণ-যুবতীর অসাধারণ ধৈর্য্যের এবং সংযমের সহিত পতির চিতায় আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

She was a saint on earth, and about to be one in heaven." *

"এই রমণী ধরাতলে 'সেণ্ট' (পুণ্যাত্মা) ছিলেন, এবং স্বর্গে 'সেণ্ট' হইতে চলিয়াছেন।"

* Selections from the Calcutta Gazette, vol. v, p. p. 255.

কাদম্বরী-রচয়িতা বাণভট্ট এবং মনু-ভাষ্যকার মেধাতিথির মত রামমোহন রায় এই বীভৎস তামাসা দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শ্রুতির এবং স্মৃতির প্রমাণের বলে সহমরণের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে এই নৃশংস প্রথা রহিত করিতে সম্মত করিয়াছিলেন। আজ যদি রাজা রামমোহন রায় জীবিত থাকিতেন, তবে সেই ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতির মহাবাক্য কেহ অসার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান যুগের অনেক ঋষির হৃদয়ও বিচলিত করিয়া তুলিত—

"তস্মাত্ন পুরায়ুষঃ স্বর্গকামী প্রেয়াৎ।"

"আয়ুঃশেষ হইবার পূর্ব্বে স্বর্গকামনায় আত্মহত্যা কর্ত্তব্য নহে।"

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

"যে সকল মানুষ আত্মহত্যা করে, তাহারা অসূর্য্য নামক অন্ধতমসাচ্ছন্ন লোক সকলে (নরকে) গমন করে।"

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (বি, এ)।

"তোমারে ফুটায়ে তুলেছি কুসুম!"

তোমারে ফুটায়ে তুলেছি কুসুম,
এ মোর অহঙ্কার!
বুকে ঢেলে মধু পরায়েছি বধূ
ফুলের অলঙ্কার!

সঙ্কোচভরা, কুঞ্চিত দল,
কোথা সৌরভ, কোথা পরিমল!
ক্রীড়নক হয়ে ছিলে ত কেবল
আশা ও আশঙ্কার!
সেই সন্দেহ করেছি মোচন—
এ মোর অহঙ্কার!

আজি যেন তুমি জানিতে পেরেছ
মলয়া কোথায় বয়,
চন্দন-বন- গন্ধ এসেছে
সারা মালঞ্চময়!

ঊষার সোণালী আলোক লাগিয়া
পাপ্‌ড়ী তোমার উঠেছে রাঙিয়া,
কলিকার লীলা ফুরালো বালিকা,
জীবনের হোলো জয়,—
এ যে গো আমার তৃপ্তি পরম
শুধু আনন্দ নয়!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

৪৯

বহু দিন পরে সত্য ও কুমুদ দুই বন্ধু একত্র হইয়াছে। আবার তাহারা যেন প্রথম-যৌবনের উদ্দাম আনন্দ ফিরাইয়া আনিল। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দুই ঘণ্টা-ব্যাপী সাঁতার কাটিয়া সমস্ত দ্বিপ্রহরটি হাসি-গল্পে চারিদিক সরগরম করিয়া তুলিল।

কুমুদ অধ্যাপক মানুষ, সাদাসিধা ধরণের স্বভাব। বন্ধুর এত হাসি-চাঞ্চল্যের মাঝখানে যে কি বিষাদ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কর্ম্মস্রোতের আবর্ত্তে সংসারে প্রবেশলাভ করিয়া এখানেও সত্যের মনে তারুণ্যের দক্ষিণা সমীরণ হিল্লোলিত হইতেছে দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইলেন। কুমুদের মা হাসিয়া বলিলেন, "কুমুদ এরি ভেতর গম্ভীর অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু সতু আমার তেমনই আছে। মনে হয়, বয়স যেন আরও ক'মে গেছে।"

কিন্তু সত্যর হৃদয়ের সংবাদ যে সকলেরই অজ্ঞাত! সত্যর যে মানসী প্রতিমা এক দিন তাহার সমস্ত হৃদয়াকাশ বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিব্য কমনীয় মূর্ত্তিতে নয়ন-পথে আসিয়া বাহুবন্ধনে ধরা দিতে উদ্যতা হইয়াছিল, সেই অপরের হৃদয়াসন আলো করিয়া আজ সত্যর দীন আবাসে তাহার দীন হৃদয় নিরীক্ষণ করিতে আসিবে। সত্য কেমন করিয়া কোন্ লজ্জায় সেখানে থাকিবে? কি বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে? ইহলোকে অথবা পরলোকে কোথাও আর সত্য সুনন্দার দর্শনপ্রার্থী নহে, তাই সে আজ ভয়ে ভয়ে কুমুদের গৃহে আত্মগোপন করিতে আসিয়াছিল। তাহার স্বভাবের বহির্ভূত হাসি-গল্পে অন্যকে ভুলাইয়া নিজে ভুলিয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে হিমুর রোগপীড়িত আনন তাহার অন্তরে উঁকি দিতে লাগিল।

সত্য মনে ভাবিয়াছিল, হিমুর প্রতি খুব রাগ করিবে। যাহাতে তাহার এত বড় ক্লেশ, হিমু তাহারই প্রতি আগ্রহান্বিত কেন? তাহাকে বয়সে কলিকাজ্ঞানে বালিকা ভাবিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষা করা চলে না। সে এইটুকু বয়সেই যেমন ভাবে সত্যর জীবনের খাতার প্রত্যেকটি অক্ষর জলের মত মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে, আর কেহ তাহা পারে নাই; আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। জানিয়া শুনিয়া যে ব্যথার উপর ব্যথা দিতে চাহে, তাহাকে একটু শাস্তি না দিলে চলে না। কিন্তু সমস্ত দিনের শাস্তিই সত্যর পক্ষে যথেষ্ট মনে হইল, তাহার বেশী দিতে বিবেকে বাধিল।

সত্যর ধারণা ছিল, পূর্ণ একটি দিন হাতে পাইয়া, রঙ্গর ন্যায় উদ্যমশীলা দূতী পাইয়া হিমু এতক্ষণ আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা সাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে। তাই নিতান্ত লঘু-চিত্তে কুমুদের নিকটে বিদায় লইয়া সত্য গৃহাভিমুখে চলিল।

কুমুদের বাসাটি একবারে সহরের বাহিরে, হিন্দু কলেজের নিকটবর্ত্তী, সেখান হইতে সত্যর বাসা বহু দূরে অবস্থিত। রাস্তাটি পাড়ি দিয়া আসিতেই ফাল্গুনের অনাগত রাত্রির স্নিগ্ধ মাধুরী তীর ও নীরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শুভ্র আকাশের বক্ষে শুক্লপক্ষের চন্দ্রদেব অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিলেন। উজ্জ্বল চন্দ্ররেখা পৃথিবীর বক্ষে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দূর ও নিকটের দেবালয় হইতে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টার মিলিত তান আসন্ন রাত্রির শান্ত গাম্ভীর্য্যকে আহত করিতে লাগিল।

সত্য পথের বাঁকে ফিরিতেই এক ফুলওয়ালা তাহার সম্মুখীন হইয়া হাঁকিল, "বাবু, ফুলের মালা, চাই ফুলের টাটকা মালা।"

সত্য পকেট হইতে কয়েকটা পয়সা বাহির করিয়া দুইগাছি মালা কিনিয়া লইল। ফুলের কুঁড়িগুলি তখনও ফোটে নাই, কিন্তু মৃদু কোমল গন্ধটুকু লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। মালা দুইটি রুমালে জড়াইয়া সত্য পাঞ্জাবীর পকেটে লুকাইয়া রাখিল।

অন্নপূর্ণা পূজার ছোট ঘরটিতে ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যার যোগাড় করিতেছিলেন। ছেলের পদশব্দে দ্বারদেশে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতু এলি না কি রে? হিমু আজ ভালই আছে। দুপুরে এক দাগ ওষুধ খাইয়েছি, তুই ফিরে এসে আর এক দাগ দিবি ব'লে আমি দেই নি। তুই ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, আমি চট ক'রে সন্ধ্যাটা সেরে আসি। তার পর তোর খাবার গল্প—কুমুদের মা'র রান্নার গল্প শুনবো। আজ সারা দিনটাই সেইখানেই কাটিয়ে এলি।"

"হ্যাঁ মা, আজ যে তুমি আমায় ছুটী দিয়েছিলে। অনেককাল পর ছুটী পেয়ে পূরোপূরিই দখল করা গেল।

তুমি সন্ধ্যা সেরে এস, আমার ছুটীর গল্প বলছি।" বলিয়া সত্য হাসিয়া ঘরে ঢুকিল।

তক্তপোষের উপর কয়েকটা বালিস রাখিয়া হিমু বালিসে হেলিয়া মুক্ত বাতায়নপথে রাস্তার পানে চাহিয়াছিল! জানালার নীচেই সঙ্কীর্ণ গলিপথ, এ পথে দিবাভাগেই বেশী লোক-চলাচল হয় না। সন্ধ্যায় প্রায় নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ সু-উচ্চ বাড়ীগুলির ছাদ ডিঙ্গাইয়া গ্যাসপোষ্টের পাশ দিয়া এতটুকু জ্যোৎস্না-রেখা ভয়ে ভয়ে হিমুর মুখের পানে উঁকি মারিতেছে। সত্য দড়ির আলনায় পাঞ্জাবীটা রাখিয়া গেঞ্জির উপর কোঁচার কাপড় গায়ে জড়াইয়া হিমুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছ, হিমু?"

হিমু বাতায়ন হইতে দৃষ্টিটা স্বামীর মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বেশ ভাল আছি। তোমার দেরী দেখে আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আসবে না। তোমার রুমালে ও কি?"

"এ ফুলের মালা, তোমার খোঁপায় দিতে নিয়ে এলাম। আমি আসবো না কেন ভাবছিলে, হিমু? সমস্ত দিন ত তোমার সাথীর অভাব হয় নি। আমি থাকলে পাছে সঙ্গিনী-সম্মিলনে ত্রুটি হয়, সেই জন্যেই না আমার দূরে গিয়ে থাকা। এস, তোমার চুলে মালা পরিয়ে দিই।"

হিমুর ম্লান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্বামীর উদ্যত হস্ত হইতে মালা দুইগাছা কাড়িয়া লইয়া একটুখানি স্নিগ্ধ হাসিল, হাসিয়া কহিল, "তুমি ত আর কখ্‌খনো আমায় ফুল-টুল দাও নি, আজ যখন প্রথম দিতে এসেছ, তা এম্‌নি নেব কেন, নির্ম্মাল্য ক'রে দাও।" বলিতে বলিতে ত্বরিত হস্তে মালা দু'টি সত্যর গলায় পরাইয়া দিল।

নিমেষে সত্যর মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল। হিমুর বাক্‌পটুতায় সত্য বিস্মিত হইল। অকথিত অনেক কথাই কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, কিন্তু সত্য তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত করিয়া ম্লানমুখে হাসি ফুটাইয়া সত্য গলার মালা খুলিয়া হিমুর মাথায় পরাইতে গেল, হিমু কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না।

মালা দুইগাছা সে কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "এখন বুঝি মালা পরবার সময়, মা যে এক্ষণি ঘরে আসবেন, হঠাৎ যদি দেখে ফেলেন? অত রাগ ক'রে গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে না। আমায় যখন দিয়েছ, আমার ইচ্ছামত আমি পরবো। দেখ, আজ দুপুরে একটা কাণ্ড হয়েছে।"

কি কাণ্ড যে, সেটা অনুমান করিতে সত্যর বিলম্ব হইল না। যাহা হিমুর নিকটে কাণ্ড, তাহা যে সত্যর কাছে শ্রুতিপ্রিয় নহে, তাহা সত্য বিলক্ষণরূপে জানিলেও নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাণ্ড হিমু?"

হিমু বলিতে লাগিল, "দুপুরবেলা সকলে ঘুমুলে আমি এই জানালার ধারে বসেছিলাম, সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে এক জন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী গোছের লোক যাচ্ছিলেন, লোকটি বুড়ো হয়েছেন, তবু কি সুন্দর চেহারা আছে। তাঁকে দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়লো। বাবা ত এই কাশীতেই অনেক দিন ছিলেন, উনি হয় ত আমার বাবাকে জান্‌তেন। ওঁকে ডাক্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হলো, কিন্তু পার্‌লাম না। বাবা ত এই কাশীতেই ছিলেন, আজ আমরা এখানে এসেছি, কিন্তু যদি এক বছর আগে আস্‌তাম, তা হ'লে বাবার সঙ্গে দেখা হ'ত।" হিমু চুপ করিল, ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মাতৃহীনা, আজন্ম পিতৃস্নেহহারা বালিকাকে সত্য একটি সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। নিরন্তর যে অনন্ত, অসীম ক্ষুধা মাতৃপিতৃহীনার অন্তরে জাগ্রত হইয়া আছে, তাহাকে নিদ্রিত করা সত্যর সাধ্য নহে। এ জগতে এক জনের অভাব আর এক জন পরিপূর্ণ করিতে পারে? তাহা পারিলে অভাব বলিয়া কিছুই থাকিত না, দুঃখ বলিয়া পদার্থটির অস্তিত্ব একবারেই লোপ পাইত।

অনেকক্ষণ পরে সত্য হিমুর অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আর কেঁদ না হিমু, অনেকক্ষণ কেঁদেছ। এখন চুপ কর, বেশী কাঁদলে মাথা ধ'রে আবার জ্বর আসবে। আমারও বাবা নেই। এখানে কেউ কি চিরকাল থাক্‌তে আসে? তার জন্যে এত কান্না কিসের?"

"কান্না যে কিসের, তা বলি কি ক'রে! ধর্ম্মের জন্যে যে বাবা আমার মাকে, আমাকে ত্যাগ ক'রে সংসার ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন। মা তাঁকে একবার কাছে পেতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে একটিবার শুধু দেখতে চেয়েছিলাম। এ জীবনে ত তা হ'ল না।"

সত্য হিমুর রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "তুমি এত জান, এত বিশ্বাস কর,

এখানে কেন ভুল করছ? মা এখন তাঁকে কাছে পেয়েছেন। আমরাও এক দিন তাঁদের দেখা পাব।"

হিমুর মলিন মুখ শান্তশ্রীতে উদ্ভাসিত হইল।

৩০

অন্নপূর্ণা সন্ধ্যা সারিয়া ঠাকুরঘরের প্রদীপ নিবাইয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহার চোখে পড়িল, ভেজান সদর-দুয়ার খুলিয়া কাহারা যেন অগ্রসর হইতেছে।

সমস্ত দিন বংশী ও নন্দার প্রতীক্ষায় থাকিয়া রঙ্গ বিরক্ত হইয়া বিশুর সহিত বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছে। অন্নপূর্ণা ভাবিলেন, তাহারাই বুঝি ফিরিয়া আসিতেছে।

দ্বারে শিকল দিয়া তিনি কহিলেন, "এত সকালেই কি তোদের আরতি-দর্শন হলো, রঙ্গ? হুজুগ ক'রে বিশুকে নিয়ে গেলি, পথ থেকেই বুঝি ফিরে আসছিস?"

"আমরা বিশু, রঙ্গ নই মা, তোমার অধম সন্তান," বলিয়া বংশী নন্দাকে লইয়া অন্নপূর্ণার পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

কত দিনের পর সাক্ষাৎ। মাঝখানে যেন একটি যুগ চলিয়া গিয়াছে। যেখানে বাক্যের প্রবাহ কলকল তানে বহিয়া যাইত, সেখানে আজ সে প্রবাহ স্রোতোহারা হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। সেই বংশী, সেই নন্দা—তাহারা আজ পদপ্রান্তে উপনীত, কিন্তু অন্নপূর্ণা যে কথা খুঁজিয়া পান না। কথা খুঁজিয়া না পাইলেও অভ্যাগতদের প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্যে তিনি ত্রুটি হইতে দিলেন না। দালানে মাদুর বিছাইয়া শুষ্ককণ্ঠে ডাকিলেন, "এস, তোমরা বস্‌বে এস। তোমাদের শরীর ভাল আছে? বাড়ীর সব ভাল?"

যে মা অন্নপূর্ণা, স্থানবিশেষে তিনিই খর্পরধারিণী মহাকালী।

বংশী দালানে উঠিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। নন্দা ধীরে জিজ্ঞাসিল, "হিমু কোথায়?"

নন্দার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অন্নপূর্ণা নন্দার মুখপানে চাহিলেন। বসন্তের শুক্ল চন্দ্রমা তখন সব আলো খোলা দালানটিতে ঢালিয়া দিয়ছিলেন। সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণস্নাত নন্দার কৃশ, শুষ্ক মুখখানি অন্নপূর্ণার রুদ্ধ স্নেহের দ্বারে অকস্মাৎ আঘাত করিল। এ কি সেই নন্দা! মহাধনীর আদরের বধূ, কোথায় ইহার বেশ, কোথায় ইহার ভূষা? সীঁথির সীমায় এতটুকু একটু কাপড়, সর্ব্বাঙ্গ মোটা বিছানার চাদরে আবৃত। অনাবৃত দক্ষিণ বাহুমূলে অন্নপূর্ণার প্রদত্ত সেই কঙ্কণ। কি রহস্যে এই নারীমূর্ত্তিটি নিজেকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে? এ রহস্য কি ভেদ হইবে?

অন্যমনা অন্নপূর্ণা অঙ্গুলী তুলিয়া বলিলেন, "ঐ ঘরে হিমু আছে।"

নন্দা সেই দিকে চলিয়া গেলে বংশী মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল।

* * * *

নন্দা নির্দ্দেশমত কক্ষে প্রবেশ করিয়া সত্যকে দেখিয়া মরমে মরিয়া গেল। এ সময়ে যে সত্য গৃহে থাকিবে, নন্দা তাহা মনে করিতেই পারে নাই। দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সত্য বেদানা ছাড়াইয়া হিমুর হাতে দিতেছে। হিমু প্রসারিত হস্তে বেদানা লইতে উদ্যত হইয়াছে। এমন সময় নন্দার অতর্কিত আবির্ভাবে হিমুর কণ্ঠোচ্চারিত 'দিদি' ডাকে সত্য চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইতেই একবারে নন্দার চোখের সহিত চোখো-চোখি হইল।

সত্য তেমনই চাহিয়াই রহিল। পরস্ত্রীর মুখ হইতে অবাধ্য আঁখি দুটিকে ফিরাইয়া লইবার কথা তাহার স্মরণ হইল না। অভ্যাগতের প্রতি ভদ্রতার সম্ভাষণের কথাও স্মরণ হইল না।

সত্য চাহিয়া থাকিলেও নন্দা পারিল না। তাড়াতাড়ি চক্ষু নামাইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় হিমুর বিছানার পাশে বসিয়া আপনার দুর্নিবার লজ্জাকে যেন হিমুর আড়ালে লুকাইতে ব্যগ্র হইল।

মুহূর্ত্তকাল পরে বাঁধ-ভাঙ্গা ক্ষিপ্র জলরাশির মত হিমু নন্দার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, "দিদি, তুমি কি আমার সেই দিদি? তুমি এত নিষ্ঠুর, এমনই ক'রে আমাদের ত্যাগ ক'রে এসেছ! কিসের লোভে কি ফেলে গিয়েছিলে, তা কি একবার মনেও হয় নি? এক জনের সঙ্গে তোমার অর্দ্ধেক বিয়ে হয়েছিল, কোন্ ধর্ম্মের বিধানে সুরেশ্বর বাবুকে

আবার বিয়ে করেছ? মানুষ কি নিজেকে এম্‌নি ক'রে ভুলতে পারে?"

সত্যর ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করে। যে লজ্জাকর বিষয় উত্থাপিত হইবার ভয়ে সে সাবধান হইয়াছিল—সতর্কতার সহিত দীর্ঘ দিবাটা বন্ধুর গৃহে কাটাইয়া আসিল, তাহার ভাগ্যবিধাতা সেইটুকুই কি তাহার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন? ছিঃ ছিঃ! এ দারুণ অপমান যে সত্যর অসহ্য—একবারেই অসহ্য!

অসহ্য হইলেও সত্য সে স্থান হইতে এক পদও নড়িতে পারিল না। কঠিন মেঝে যেন দৃঢ়বলে তাহার কম্পিত অবশ পা দুইটাকে চাপিয়া ধরিল। শুধু পদদ্বয়ই তাহার সহিত বিদ্রোহ করিয়া ক্ষান্ত হইল না। যে পরস্ত্রীর বিষময় স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিবার নিমিত্ত সে অহর্নিশি চেষ্টা করিতেছিল, সেই পরনারীর তপম্লান, পাণ্ডুর, অথচ পবিত্র জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল হইতে সত্যর লুব্ধ নেত্র কিছুতেই অন্যত্র নিবদ্ধ হইতে পারিল না। কর্ণযুগল সেই কণ্ঠের অনুচ্চারিত একটি বাণী শ্রবণ করিতে উৎসুক হইল।

হিমুর মাথা বুকে লইয়া নন্দা তেমনই নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। হিমুর মৃদু তিরস্কার অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। সে নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হিমু পুনরায় কহিল, "দিদি, রাগ করলে? তোমার ব্যবহারে আমার ভারী দুঃখ হয়েছে, তাই এত কথা বল্লাম। অন্যায় বল্লে মাপ কোরো।"

"কিসের মাপ, কিসের অন্যায় হিমু? আমি রাগ করি নি। আমাদের একত্রে থাকা ভগবানের অনভিপ্রেত, তাই দূরে স'রে আছি। ও সব কথা থাক্। কাশীর মত সুন্দর যায়গায় এসেও তোর এত অসুখ হচ্ছে কেন? তুই কি রোগা হয়ে গেছিস! এমন রোগা কখনও দেখি নি।"

"তোমার স্নেহহারা হয়ে এম্‌নি হয়ে গেছি, দিদি। সে সব তোমায় কেমন ক'রে বল্‌বো? সে সব শুন্‌তে এখন তোমার ভাল লাগ্‌বে না। তুমি কার সঙ্গে এসেছ? বংশীদাদার সঙ্গে এসেছ না সুরেশ্বর বাবু নিয়ে এসেছেন?"

নন্দা নত মুখখানি একটু তুলিয়া উত্তর করিল, "দাদাই আমায় নিয়ে এসেছেন। বাইরে মা'র সঙ্গে গল্প করছেন। সুরদা আসেন নি, আর এক দিন আস্‌তে চেয়েছেন।"

'সুরদা'! উত্তেজনায় সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্ত হইতে বেদানার দানাগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

হিমু নন্দার বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "দিদি, আর আমাদের সন্দেহে রেখো না, তা হ'লে সুরেশ্বর বাবুর সাথে তোমার বিয়ে হয় নি, আমরা যা শুনেছি, সব মিছে, তবে কার সাথে তোমার"—

"কারুর সাথে নয়, হিমু, আমি কুমারী-ব্রত নিয়েছি। সুরেশ্বর দাদা আমাদের বড় ভাইয়ের মতন, তাঁর মাকে আমি মাসীমা বলি। তিনিই আমাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। ওঁদের মত ত্যাগী উদার লোক সচরাচর দেখা যায় না। এর পর যে দিন আসবো, সুরদাকে সঙ্গে ক'রে আনবো। তুই এখন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, হিমু। দিদি দিদি করছিলি, এই ত দিদি এসেছে।"

হিমুর নয়নে ঘন মেঘ ঘনাইয়া আসিলেও সে তাহা বর্ষিতে দিল না। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া সত্যকে ধরিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, "তুমি যে পালাবার মতলবে রয়েছ, এখন সেটি হচ্ছে না। দিদি তোমাকে কোন কথা না ব'লে আমার সাথে কথা বল্‌ছেন ব'লে তোমার বুঝি রাগ হয়েছে? বংশীদার কাছে যাবে,—সেখানে মা রয়েছেন, পরে গেলেই চল্‌বে, এখন এইখানে একটু বোস, আমার কথা আছে।"

স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া হিমু ক্ষণকাল ভাবিয়া নন্দাকে বলিল, "দিদি, আমার সন্দেহ তোমায় মাপ করতে হবে। আমি ভাল ক'রেই জানি, আমাদের দিদি আমাদেরই আছে। সুরদাদাকে তোমার আনতে হবে না, যাঁর বাসা, তিনিই আনবেন। তোমার সেখানে আর যাওয়া হবে না। আপনার ঘর ছেড়ে পরের ঘরে অনেক দিন থেকে এলে। তোমার কুমারীব্রত আমার ঢের জানা আছে। জেনে শুনেই মা তোমার হাতে আমায় দিয়ে গেছেন। তোমার ধর্ম্মের কায তুমি করেছ দিদি, বাকীটুকু করতে দাও। আমি তোমাদের দু'জনার নামে শপথ ক'রে বলছি, তুমি যদি এখন দূরে স'রে থাকো, তা হ'লে কিছুতেই আমি বাঁচবো না, কেউ আমায় বাঁচাতে পারবে না। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, দিদি?"

সত্য শিহরিয়া উঠিল। নন্দার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইবার উপক্রম করিল। হিমু বলে কি? ভ্রমেও যে নন্দার হৃদয়ে এ কথা স্থান পায় নাই। সে যাহা কখনও অনুমোদন করে না, কিছুতেই যাহার পক্ষপাতী নহে, কুলীনের একাধিক পত্নীত্বের বিরুদ্ধে চিরকাল ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাহারই জীবনে কি সংঘটিত হইবে? সত্যর সহিত ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া নন্দা যে পরলোকের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছে। এখন এ বিড়ম্বনা কেন? পূর্ব্বে ইহার আভাস পাইলে সে হিমুর কাছে কখনই আসিত না।

সুনন্দা অবশপ্রায় হাতখানা বাড়াইয়া হিমুকে জড়াইয়া ধরা গলায় কহিল, "ছিঃ হিমু, এখন পাগলামী করো না। এখন ত তুমি অবুঝ নও, বুঝতে শিখেছ। আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? ও কথা বলতে নেই। তোমার মত অমন মাথার মুকুট স্বামী আর কে পেয়েছে? তোমার মত শাশুড়ী কার আছে? তোমার কিসের দুঃখ, হিমু?"

"দিদি, কিসের দুঃখ, তা কি তুমি বোঝ না? আমার শাশুড়ী—আমার স্বামী—সে কি আমার? সবই যে তোমার দিদি, মা আমাকেও তোমায় দিয়ে গেছেন। উনি আমার মাথার মুকুট হলেও তুমি যে আমার সেই 'মুকুটের মণি'। আজ ওঁকে তুমি গ্রহণ কর, দিদি। সাথে সাথে আমাকে দূরে না ঠেলে কাছে টেনে নাও।" বলিয়া হিমু ফুলের মালা দু'টি নন্দার গলায় পরাইয়া সত্যর হাতের মধ্যে নন্দার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া নন্দার কোলে মুখ লুকাইল।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

সমাপ্ত

মর্

দরিদ্রতা—দুঃখ, ব্যথা,—রুগ্ন দেহে চীর,—
চিন্তে বালুচর!
মরণ যদি তোরণ হয় অমৃত-নগরীর,—
মরিতে কেন ডর?
সর্ব্বহারা—সবার পিছে,
পায়ের নীচে;
কি ফল বেঁচে অমন করে' ভাবনা-নত শির?
কহিল মন—'মর্!'

কক্ষে-শিশু শিশুর মাতা—বক্ষে নাহি ক্ষীর,—
কণ্ঠে ক্ষীণ স্বর,—
বালক দুটি ও বালিকাটি করেছে পাশে ভীড়—
বালিকাটির জ্বর;
অর্দ্ধাশনে ক'দিন সবে।—
"আজি কি হবে!"
চমকি' উঠে গৃহস্বামী—পায় না খুঁজে' তীর!
কহিল মন—'মর্!'

রথ্যা জুড়ি' ছুটিছে জুড়ী—শব্দ শ্রুতিপীড়;
সারথি হাঁকে 'সর্।'
স-সমারোহ সাজিয়া চলে যতেক ধনবীর
পক্ষে করি' ভর।
দু'ধারে শত সৌধ-সারি,
দুয়ারে দ্বারী;
বিজলী-বাতি ঘুচায় ভেদ দিবা-বিভাবরীর
লাঞ্ছি' নিশাকর।
মলিনবেশী কে খায় ঘুসি হস্তে প্রহরীর?
কহিল মন—'মর্!'

পায়রাখোপী ঘুলঘুলিটি—সে এক ক্ষুদে নীড়—
একটি এঁধো ঘর;
পক্ষিণী-মা পক্ষে ঢাকে শাবকে সুনিবিড়,—
দৃষ্টি ভীরুতর!
"ফিরিল না ত' সে! অনাহারে
কাহার দ্বারে—?"
শ্রান্ত শ্রমী আসিল ফিরে' ব্যর্থ,—চোখে নীর।
কহিল মন—'মর্!'

নিশীথ-রাতি,—না-বাতি গৃহ,—শরীরী সে তিমির
মৃত্যু-মোহকর!
সহসা গৃহী উঠিয়া বসে নিশ্বাস রোধি'—ধীর;
থামিয়া,—তুলি' কর
ঠেকায় ঠোঁটে কিসের শিশি—
বিষের শিশি?
এখনো আঁটা ছিপি যে—? দ্বিধা! বুকেতে লাগে চীড়!
কহিল মন—'মর্!'

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ব্যাঘ্রের চাতুরী

(শিকার-কাহিনী)

মিঃ ব্রাউন সিংহলের কোন কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন; কিন্তু ব্যাঘ্র-শিকারে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র শিকার করিতেন; বাঘ যতই দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ ও নরশোণিত-লোলুপ হউক, তিনি তাহাকে ভয় করিতেন না; অসঙ্কোচে তাহার সম্মুখীন হইতেন। একবার তিনি একটা সার্কাসের দলের মালিকের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা নরভুক্ বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঘটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, এবং তখন পর্য্যন্ত পোষ মানে নাই। সকলেই মনে করিয়াছিল, বাঘটা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে, তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অক্ষতদেহে খাঁচার বাহিরে আসিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি খাঁচায় প্রবেশ করিয়া এরূপ নির্ভীকভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, সে এক পাশে সরিয়া গিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। সেই দিন হইতে ব্রাউনের উপনাম হইল—"বাঘ।" "বাঘ" বলিলে ব্রাউনকেই বুঝাইত। অনেকে বলিত, "বাঘ ব্রাউন"।

ব্রাউনের বিশ্বস্ত ভৃত্য ও পরম ভক্ত মেহুমাবান্দা সিংহলী। সে ব্রাউনের জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিত। ব্রাউন সেই দুর্দ্দান্ত নরভুক্ বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করিলে সে খাঁচার অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার মনিবের দুঃসাহসের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল। সে নিশ্চিতভাবে বলিল, "কর্ত্তার দেহ সুরক্ষিত, কারণ, উনি বনদেবীর অনুগৃহীত; জঙ্গলের জানোয়ার উঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যে জানোয়ার কোন রকমে আহত না হইয়াছে, সে উঁহাকে জখম করিতে পারিবে না।"—ব্রাউনের সেই কঠোর পরীক্ষায় তাঁহার সিংহলী ভৃত্যের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

ব্রাউনেরও বিশ্বাস ছিল, তাঁহার দেহ সুরক্ষিত, কোন হিংস্র শ্বাপদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তিনি শিকারে যাইবার সময় একটি 'ষোল বোরের' রাইফেল এবং একটি 'বারো বোরের' বন্দুক ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। তাহাই তিনি আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন। তিনি অসমসাহসী অক্লান্ত শিকারী ছিলেন। তিনি শিকার করিবার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কখন কখন ভীষণপ্রকৃতি বন্য হস্তীর কবলে পড়িয়াছেন; কিন্তু সে তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। একবার তিনি দুই মাসের অবকাশ পাওয়ায় শিকারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন।

মিঃ ব্রাউনের এই অভিযান উপলক্ষে মিঃ ডবলু, জি, আডাম নামক তাঁহার এক জন সহযোগী শিকারী লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে লিখিয়াছেন, "আমি, 'বাঘ' এবং মেহুমাবান্দা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জাহাজে বোম্বে যাত্রা করিলাম। ব্রাউন বোম্বে নগরে পদার্পণ করিয়াই স্মার্ট নামক সবজান্তা ও সর্ব্বকার্য্য-বিশারদ ইংরাজকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন—কোথায় দুর্দ্দান্ত ও ভীষণপ্রকৃতি ব্যাঘ্র-শিকারের সুবিধা হইতে পারে?

স্মার্ট সংবাদ দিলেন, আসল নরভুক্ বাঘ সে সময় কোথাও পাইবার আশা নাই। কিন্তু আমরা একখানি সংবাদপত্র খুলিয়াই অন্যরূপ সংবাদ পাঠ করিলাম। একটি প্যারাগ্রাফে পাঠ করিলাম, পূর্ব্ব উপকূলের কোন গ্রামে—(আমি সেই গ্রামের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু স্মরণ আছে—তাহা পুরীর সন্নিহিত কোন গ্রাম—) একটি বৃদ্ধ নরভুক্ ব্যাঘ্র চারি জন মনুষ্যকে হত্যা করিয়া পঞ্চম ব্যক্তিকেও ভক্ষণ করিয়াছে; সেই ব্যক্তি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দেশীয় ভৃত্য। এই কর্ম্মচারীও শিকারী।

শিকারের জন্য তিনি একটি মাচান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একটা বলদকে বাঘে ধরিয়া তাহার দেহের কিয়দংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল, অবশিষ্টাংশ পড়িয়াছিল, তাহারই অদূরে সেই মাচানটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিকারী কর্ম্মচারী বাঘের গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সেই মাচানে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দেশীয় ভৃত্যটি তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য মাচানের সিঁড়িতে উঠিতেছিল, সেই সময় বাঘটা তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে হত্যা করিয়া মুখে লইয়া এত শীঘ্র দূরে প্রস্থান করে যে, তাহার মনিব মাচানে বসিয়া তাঁহার রাইফেলে টোটা ভরিবারও সুযোগ পাইলেন না।

এই নরভুক্ ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিতে হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলাম। স্মার্ট নানাভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার মুসলমান অনুচর সুবাব-আলি আমার বন্দুকবাহক হইয়া আমার সঙ্গে চলিল। লোকটি সাহসী, ধীরপ্রকৃতি, বিশ্বাসী; এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদতত্ত্বে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং সে অসাধারণ গল্পবাগীশ ছিল।

আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, স্থানটি নদী-তীরে অবস্থিত এবং জলজ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন; নদীটি অসংখ্য কুম্ভীরে পূর্ণ। নদীর অদূরবর্ত্তী জলায় যে জঙ্গল ছিল, তাহাতে বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র নির্ভয়ে বাস করিত। নিকটে যে লোকালয় ছিল, তাহার জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

যে ব্যাঘ্রটি উক্ত কর্ম্মচারীর ভৃত্যকে তাঁহার মাচানের তলায় হত্যা করিয়াছিল, তাহার আর কোন নূতন অত্যাচারের সংবাদ শুনিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষত্বের সংবাদে আমরা অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করিলাম। শুনিলাম, সেটি 'রঙিন্' বাঘ! অর্থাৎ তাহার দেহে ব্যাঘ্রচর্ম্মের অনুরূপ ডোরা ডোরা দাগের পরিবর্ত্তে পীতাভ বাদামী রঙের ছোপের উপর কালো কালো চক্র ছিল। বাঘটার চর্ম্মের এত বর্ণ-বিশেষত্বের জন্য সুবাব-আলির ধারণা হইয়াছিল, বাঘটা অনৈসর্গিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। সে তাহার রূপকথার ঝুলী হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিল, 'যে ব্যক্তি অরণ্য-দেবতার সুরক্ষিত, সে ভিন্ন অন্য কেহ এই বাঘ মারিতে পারিবে না! যে সেই বাঘ

মারিবে, তাহাকে মাটীতে দাঁড়াইয়া গুলী চালাইয়া মারিতে হইবে, মাচান হইতে গুলী চালাইলে সেই গুলী বিফল হইবে, ও বাঘ সে গুলীতে মরিবে না।'

ব্রাউন তাহার এই উক্তি শুনিয়া বলিলেন, উহা কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির প্রলাপমাত্র। তাঁহার বন্দুক বাঘের চামড়ার রঙের খাতির করে না। সুতরাং পরদিন পূর্ব্বোক্ত মাচানের সম্মুখে একটি বলদ বাঁধিয়া রাখিয়া শার্দ্দূলবরের দর্শনাশায় আমরা সেই মাচানের উপর দীর্ঘরাত্রি যাপন করিলাম। কিন্তু বারো ঘণ্টার মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটিল না।



প্রত্যূষে আমরা বিরক্তিভরে আমাদের বন্দুক হইতে টোটা বাহির করিয়া লইয়া মাচান হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ও ব্রাউন সবে মাত্র মাচানের নীচে নামিয়াছি, স্মার্ট তাঁহার অনুচর সহ বন্দুক ঘাড়ে লইয়া মাচানের সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতেছিলেন, সেই সময় নীচের জঙ্গল সশব্দে আন্দোলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের আকৃতিবিশিষ্ট একটি বিশালদেহ বিদ্যুদ্বেগে দূরে লাফাইয়া পড়িল। বলদটা একবারমাত্র কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বাঘটা যখন তাহাকে পিঠে ফেলিয়া অদৃশ্য হইল, তখন বলদটা গতাসু!

এই সকল কাণ্ড এরূপ অল্পসময়ে ঘটিল যে, আমরা বাঘটাকে দেখিয়াও গুলী করিতে পারিলাম না। বলদটা শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলেও বলদটিকে লইয়া যাইতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হয় নাই। সেই সুদৃঢ় রজ্জু সে সূক্ষ্ম কার্পাসতন্তুর মত অতি সহজে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। বাঘটা অদৃশ্য হইলে আমরা এই ভাবিয়া সান্ত্বনালাভ করিলাম যে, আমরা যে জানোয়ারটাকে শিকার করিতে আসিয়াছি—তাহাকে চিনিবার সুযোগ পাইলাম ত! তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্যেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম।

যাহা হউক, আমি ও ব্রাউন বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে বাঘটার অনুসরণ করিলাম। তাহার দেহের ঘর্ষণে বনের ভিতর শব্দ হইতেছিল; কিন্তু আমরা প্রায় আধ মাইল চলিবার পর আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। অতঃপর সুবার-আলি আমাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। সে বলিল, আমরা সতর্ক না হইলে আমাদের বিপদ অপরিহার্য্য। বাঘটা অত্যন্ত চতুর, আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে বলদটাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোন ঝোপে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমরা সতর্কভাবে অগ্রসর হইয়া একটা ফাঁকা যায়গায় কতকগুলি ঘাসের ভিতর বলদটার মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম। আমরা অদূরবর্ত্তী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। ব্রাউন নিঃশব্দে মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই স্থানের নরম মাটীতে বাঘের পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাঘ বামদিকে দীর্ঘ তৃণরাশির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। আমি বলদটার মৃতদেহের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। ব্রাউন একটা সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাওয়ায় সেই পথে যাইবার পূর্ব্বে তাহা দেখিতে লাগিলেন। স্মার্ট ও যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে ছিল, সকলেই পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই পথেই আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

বাঘটা অদূরবর্ত্তী ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছিল, সে গভীর গর্জ্জন করিয়া, স্মার্টকে লক্ষ্য করিয়া লাফাইয়া পড়িল। স্মার্ট তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী করিলেন, কিন্তু তাঁহার গুলী বাঘের দেহ স্পর্শ করিল না। স্মার্ট সৌভাগ্যক্রমে একটা চারা-গাছের আড়ালে থাকায় বাঘের গতিরোধ হইল। স্মার্ট তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই বাঘটা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিল। তাহার সুতীক্ষ্ণ নখরে তাঁহার বাঁ গাল ক্ষত-বিক্ষত হইল, তিনি ধরাশায়ী হইলে বাঘটা তাঁহার কোট ও সার্ট বিদীর্ণ করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ দংশন করিল। তাঁহার বন্দুকের দ্বিতীয় নল হইতে গুলী বাহির হইয়া ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইল, তাহা বাঘের দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। কিন্তু বাঘটা স্মার্টকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া গেল, এবং স্থানীয় একটি লোককে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া এক লাফে তাহাকে আক্রমণ করিল; সেই অবস্থায় তাহার পাঁজর কামড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে মুখে তুলিয়া



বাঘটি লম্ফ দিতেই ব্রাউন তাহার আক্রমণে মাটীতে পড়িয়া গেলেন

ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল; অবশেষে আমরা যখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম, সেই সময় সে সেই হতভাগ্য গ্রামবাসীর দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ গ্রাস করিয়াছিল।

ব্রাউন সর্ব্বপ্রথমে বাঘটাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র পর পর দুইবার তাহার দেহ লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিলেন; কিন্তু তিনি দীর্ঘপথ দৌড়াইয়া যাওয়ায় এরূপ হাঁপাইতেছিলেন যে, সেই অবস্থায় গুলী বর্ষণ করিয়া কোন ফল পাইলেন না, তাঁহার নিক্ষিপ্ত কোন গুলী বাঘের দেহ স্পর্শ করিল না, বাঘটা অক্ষত-দেহে সাঁ্যাতা বনপথ দিয়া দূরে পলায়ন করিল। আমরা তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণ করিলাম, কিন্তু দুই ঘণ্টাকাল চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান পাইলাম না।

লইল, তাহার পর ঝড়ের মত বেগে অদূরবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্র-কবলিত হতভাগ্য গ্রামবাসীর কাতর আর্ত্তনাদে সেই অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্মাট ও তাহার অনুচররা আমার সম্মুখে থাকায় আমি বাঘটাকে গুলী করিতে পারি নাই। এমন কি, আমার সম্মুখে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া থাকায় ও বৃক্ষের শাখা-পত্রাদিতে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হওয়ায় বাঘটার পলায়নের সময় তাহার দেহের সকল অংশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতেও পাই নাই।

বাঘটাকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া ব্রাউন উঠিয়া দাঁড়াইয়াই তাহার অনুসরণ করিলেন, সুবাব-আলি ও মেহ্নাবান্দা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল, তাহাদের পশ্চাতে আমিও বাঘের সন্ধানে চলিলাম। আমরা সকলে তিন ঘণ্টা ধরিয়া জঙ্গলের ভিতর বাঘটার অনুসন্ধান করিলাম। বাঘ যে হতভাগ্য গ্রামবাসীকে মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, বহু পূর্ব্বেই সে নীরব হইয়াছিল। বাঘটা আমাদিগকে পশ্চাতে

অর্দ্ধভুক্ত গ্রামবাসীকে যেখানে ফেলিয়া রাখিয়া বাঘটা পলায়ন করিয়াছিল, মৃতদেহটি সেই স্থানেই পড়িয়াছিল। আমরা ফিরিয়া আসিয়া নিহত ব্যক্তির বাসগ্রামে সংবাদ পাঠাইলাম—তাহার আত্মীয়স্বজনকে যেন তাহার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করা হয়; এতদ্ভিন্ন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও এই সংবাদ প্রেরিত হইল। পরে জানিতে পারিলাম, সেই গ্রামে নিহত ব্যক্তির কোন আত্মীয় ছিল না, কেহই তাহার মৃতদেহের ভার গ্রহণ করিল না; অগত্যা গ্রাম্য সর্দ্দারের সম্মতি লইয়া আমরা মৃতদেহটি স্থানান্তরিত করিলাম না, তাহা সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল।

অতঃপর আমরা সেই মৃতদেহের প্রায় কুড়ি ফুট তফাতে তাড়াতাড়ি একটি মাচান নির্ম্মাণ করিলাম। বিকালে প্রায় চারিটার সময় মাচানটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। আমরা অবিলম্বে সেই মাচানে উঠিয়া মৃতদেহের পাহারায় থাকিলাম এবং বাঘের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এরূপ ভীষণ কার্য্যে আমাকে আর কখনও প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতীত হইল; কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, মাচানের উপর বসিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় চন্দ্রোদয় হইল, কিন্তু সেই অস্ফুট আলোকে বৃক্ষচ্ছায়ার ব্যবধান-পথে সুস্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। রাত্রি বারোটা এই ভাবে কাটিল। তাহার পর সুবাব-আলি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমাকে সতর্ক করিলে, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে ছায়ার মত কি নাড়িতে দেখিলাম, মনে হইল, কোন জানোয়ার গুঁড়ি মারিয়া সেই মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রাউনও তাহা দেখিতে পাইলেন; তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকায় কিছুই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন, অনুমানে নির্ভর করিয়া দৃষ্টির অগোচর ছায়াবৎ পদার্থে গুলীবর্ষণ করা নিষ্ফল।

যাহা হউক, আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই ছায়াবৎ পদার্থটা ক্রমশঃ অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার পর চক্ষুর নিমেষে তাহার মস্তক উর্দ্ধে উঠিল, তখন আমরা চন্দ্রালোকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাহা সেই বাঘটারই চক্ষু! তাহা দেখিবামাত্র আমরা দুই জনেই একসঙ্গে গুলীবর্ষণ করিলাম। সেই মুহূর্ত্তে একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, চারি পার্শ্বের জঙ্গলও সবেগে আন্দোলিত হইল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে চতুর্দ্দিক্ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। আমরা মাচানে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে কয়েক মিনিট পরে অস্ফুট খস্-খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম; শব্দটা ক্রমশঃ মাচানের নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় একখণ্ড মেঘে চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তাহার পর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আমরা আর আলোক পাইলাম না, আমাদিগকে মাচানের উপর অন্ধকারেই বসিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু মাচানের নীচে সেই খস্-খস্ শব্দের বিরাম হইল না। আমাদের বক্ষঃস্থল দ্রুত-বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অবশেষে অতি প্রত্যূষে ঊষালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইলে আমরা অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার অদূরে যেখানে আমরা পূর্ব্বরাত্রিতে গুলীবর্ষণ করিয়াছিলাম—সেই স্থানে একটি ব্যাঘ্রের মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহার দেহচর্ম্মের বর্ণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা যে বিচিত্র বর্ণের বাঘ শিকারের আশায় সারা রাত্রি জাগিয়া মাচানের উপর বসিয়াছিলাম, যে বাঘ হতভাগ্য গ্রামবাসীর মৃতদেহ অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, উহা সেই বাঘের মৃতদেহ নহে, অন্য একটি বাঘের মৃতদেহ। আমাদের ধারণা হইল, এই দ্বিতীয় বাঘটি আমাদের গুলীতে নিহত হইলে নরভুক্ বাঘটা আমাদের মাচানের নীচে আসিয়া, আমরা কেহ মাচান হইতে নামিলে তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া যাইবে, এই আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং সে জঙ্গলের ভিতর দিয়া গুঁড়ি মারিয়া আসিবার সময় তাহার দেহের সহিত শাখা-পত্রের ঘর্ষণে যে খস্-খস্ শব্দ হইয়াছিল, তাহাই আমরা মাচানে বসিয়া শুনিতে পাইয়াছিলাম। সে অর্দ্ধভুক্ত বাসি মৃতদেহ স্পর্শ করে নাই, টাট্‌কা নরমাংসের লোভেই সে মাচানের নীচে বসিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিল।

প্রভাতে আমরা মাচান হইতে নামিবার পূর্ব্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জঙ্গলের চতুর্দ্দিক্ পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন দিকে বাঘটাকে দেখিতে পাইলাম না, তাহার কোন সাড়া-শব্দও পাইলাম না। বুঝিলাম, প্রত্যূষেই বাঘটা দূরে পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং তখন সতর্কতা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া আমরা মাচান হইতে নামিয়া পড়িলাম, এবং অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহটি সমাহিত করিয়া মৃত ব্যাঘ্রটির চর্ম্ম উন্মোচিত করিলাম। তাহার পর আহার ও নিদ্রায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা ছয়টার সময় মাচানে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের আশা ছিল, আমাদের মাংসের লোভে বাঘটা সেই রাত্রিতে পুনর্ব্বার মাচানের নিকট উপস্থিত হইবে, কিন্তু আমাদের রাত্রিজাগরণ বিফল হইল।

আমাদের সঙ্গে আমাদের অনুচরদ্বয়কেও সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল; ইহাতে আমরা এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, প্রভাতে স্থির করিলাম, সেই রাত্রিতে আমরা মাচানে না আসিয়া বিশ্রাম করিব।

আমি ও ব্রাউন সারারাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমরা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের ক্লান্তি ও অবসাদ অন্তর্হিত হইয়াছে, আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম। সেই দিন প্রভাতে স্থানীয় গ্রাম্য সর্দ্দার আমাদিগকে সংবাদ দিল, একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় হরিণ আসিয়া তাহার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিতেছিল। সে আমাদিগকে হরিণ শিকার করিতে অনুরোধ করায় আমরা সুশীতল বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিধারা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার ক্ষেতে হরিণ শিকার করিতে চলিলাম। সে দিন কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টির বিরাম ছিল না।

সে দিন ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্রাউনের অল্প জ্বর হইল এবং তাঁহাকে শয্যার আশ্রয় লইতে হইল; পরদিন রাত্রিতেও তিনি উঠিতে পারিলেন না। তৎপরদিন প্রভাতে তিনি সুস্থ হওয়ায় আমাকে তাঁহার সহিত হরিণ-শিকারে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা হরিণ তাড়াইয়া বাহির করিবার জন্য লোকজন সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম; কিন্তু সুবাব-আলি ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল, আমরা কোন রকম সোরগোল না করিয়া নিঃশব্দে বনের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে নিশ্চিতই সেই 'রঙিন' বাঘের কবলে পড়িব। সে এই সুযোগ ত্যাগ করিবে না। আমরা যেরূপ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম, সে-ও সেইরূপ আমাদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে। সে আমাদিগকে আমাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল।

আমার বন্ধু ব্রাউন তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন,

তিনি তাহাকে বলিলেন, তিনি বনদেবতার অনুগৃহীত, যে জন্তু কোন দিন আহত হয় নাই, সেরূপ কোন বন্য জন্তু ভিন্ন অন্য কোন জন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তিনি বৃষ্টিধারা হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথাযোগ্য পরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আমার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেতে হরিণ শিকার করিতে চলিলেন। ব্রাউনই সর্ব্বাগে চলিলেন, স্মাট তাঁহার পশ্চাতে, মেহুমাবান্দা ও সুবাব-আলি তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল, আমি তাহাদের সকলের অনুসরণ করিলাম। সেই চতুর বাঘটা নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতে পারে ভাবিয়া সুবাব-আলি একটা রাইফেল সঙ্গে লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় আমি তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাইফেল লইয়াছিলাম।

আমরা নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম্য সর্দ্দারের ক্ষেতের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় পার্শ্বস্থ জঙ্গল খস্ খস্ শব্দে নড়িয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ব্রাউন মুহূর্ত্তমধ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই স্মাটের ঘাড়ে পড়িলেন; স্মাট সেই ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া মেহুমাবান্দার দেহের উপর কাত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত পরে একটা প্রকাণ্ড দেহ একটা কাঁটা ঝোপের অন্তরাল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এরূপ বেগে আমাদের আক্রমণ করিল যে, আমরা সেই বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তিন জনেই ধরাশায়ী হইলাম; উল্কাবেগে ধাবমান সেই দেহের বর্ণ পীতাভ বাদামী রঙের উপর কালো কালো চক্র! ইনিই সেই সুরঞ্জিত শার্দ্দূলরাজ!

সেই আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, আমরা কেহই তাহাকে গুলী করিতে পারিলাম না। আমার রাইফেল ও স্মাটের বন্দুক ভিন্ন অন্য কাহারও বন্দুকে তখন টোটা ছিল না। আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই বাঘটা তাহার সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা ব্রাউনের পুরু কোট কামড়াইয়া ধরিল এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে মুখে তুলিয়া লইয়া মুক্ত প্রান্তরাভিমুখে ধাবিত হইল।

বাঘটা যখন ব্রাউনকে মুখে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়, তখন আমার সম্মুখে তিন জন লোক, প্রকাণ্ড বাধা! তথাপি আমার গুলী করা উচিত ছিল; সে জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সুবাব-আলি আমাকে পিস্তল তুলিতে দেখিয়া পাছে গুলী তাহারই দেহে বিদ্ধ হয়, এই ভয়ে চক্ষুর নিমেষে আমার রাইফেল দূরে ঠেলিয়া দিল, মুহূর্ত্তের জন্য আমি সুযোগ হারাইলাম! স্মাট সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া পাগলের মত চীৎকার করিতেছিলেন। একমাত্র মেহুমাবান্দাই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল। স্মাটের বন্দুকটা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া কিছু দূরে পড়িয়াছিল। সে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে কুড়াইয়া লইয়া বাঘটার অনুসরণ করিল; বাঘটা তখনও খোলা মাঠে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাঘটার অনুসরণ করিয়া ব্রাউনের সেই বিশ্বাসী ও সাহসী ভৃত্য যে ভাবে দৌড়াইতে লাগিল, মানুষ যে ঐরূপ দৌড়াইতে পারে, ইহা আমি পূর্ব্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই।

অনেকেই বোধ হয় আমার এ কথা বিশ্বাস করিবেন না যে, বাঘটা ব্রাউনকে মুখে লইয়া দুই শত গজ দূরে যাইতে না যাইতেই ব্রাউনের প্রিয় ভৃত্য মেহুমাবান্দা তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু পাছে তাহার মনিবের দেহে গুলী বিদ্ধ হয়, এই ভয়ে তাহাকে গুলীবর্ষণে বিরত থাকিতে হইল। অবশেষে সে যখন বাঘটার ঠিক লেজের নিকট আসিল, সেই সময় সে তাহার মলদ্বারে বন্দুকের উভয় চোঙের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া যোড়া ঘোড়া টিপিল। বাঘের দেহের অন্য স্থানে গুলী বর্ষণ করিতে তাহার সাহস হয় নাই।

বাঘটা সেই দুই গুলী মুখের বিপরীত দিক্ দিয়া আহার করিয়া, যেন বিদ্যুৎচালিত হইয়া সম্মুখে দশ গজ লাফাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউন তাহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি আহত হইলেন না। তাহার পর বাঘটা খরগোসের মত কয়েকবার মাটীতে গড়াইতে গড়াইতে সর্ব্বাঙ্গ সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিল; সেই সময় তাহার কি ভীষণ গর্জ্জন!

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঘটা যখন ব্রাউনকে মুখে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য মাঠের দিকে দৌড়াইতেছিল, সেই সময়ে সেই ভীষণ সঙ্কটেও ব্রাউনের বুদ্ধিভ্রংশ বা মোহ হয় নাই; তিনি তখনও দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার বন্দুকটা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ সাহস, এই রকম ঠাণ্ডা মাথা কয় জনের দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কত বড় শিকারী—ইহাই তাহার নিদর্শন।

বাঘটা ক্ষণকাল পরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই আমাদের দিকে রুখিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া ব্রাউন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াই এরূপ অকম্পিত হস্তে বাঘটাকে গুলী করিলেন, যেন তিনি একটা ঘুঘু কি পায়রাকে গুলী করিলেন!

বাঘটা আহত হইলেও কাহাকেও না মারিয়া একাকী মরিতে যেন তাহার ইচ্ছা হইল না। তখন তাহার আর লাফাইবার শক্তি ছিল না; কিন্তু সে দ্রুতপদে ব্রাউনের দিকে অগ্রসর হইল, এবং অবশেষে তাহার পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া তাঁহার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাউন তখনও সম্পূর্ণ অচঞ্চল। বাঘটা সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি চক্ষুর নিমেষে তাহার বাঁ দিকে আসিয়া তাহার পীতবর্ণ বক্ষঃস্থলে বন্দুক ঠেকাইয়া ডান দিকের ঘোড়া টিপিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শার্দ্দূল-রাজ পঞ্চত্ব লাভ করিল। এইরূপে সুবাব-আলির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

ব্রাউন একটু তোৎলা ছিলেন, এ জন্য তিনি অধিক কথা বলিতেন না। বাঘটা নিহত হইলে তিনি মেহুমাবান্দাকে বলিলেন, "ব-ব-বলিহারি সে-সে-সেকেলে ল-ল-লঙ্কা! সিলোনের কো-কোন গ্রা-গ্রাম তো-তোমার মত বন্ধু দি-দিতে পারে, তা-তা জানিতাম না।"—তাঁহারা পরস্পরকে চিনিতেন, মনিবের কথায় মেহুমাবান্দার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিঃ ডবলু, জি, আডামের প্রকাশিত এরূপ শিকার-কাহিনী আর কোথাও পাঠ করিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না; কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ইহার এক বর্ণও অত্যুক্তি নহে, সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

MILTON

Milton ! thou shouldst be living at this hour :
England hath need of thee : She is a fen
Of stagnant waters : altar, sword and pen,
Fireside, heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness. We are selfish men ;
Oh ! raise us up, return to us again ;
And give us manners, virtue, freedom, power.
Thy soul was like a star, and dwelt apart :
Thou hadst a voice whose sound was like the sea :
Pure as the naked heavens, majestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness ; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

—Wordsworth.

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম ! শোভিতে তুমি ভারতের ভালে যদি আজি মহাপ্রাণ !
হারানো দুলালে পেয়ে ভারতী উঠিত হাসি' ; দেশ আজি হায়,
নিঃস্রোত পল্বল-সম বিগত বৈভব-শৌর্য্যে, শ্রদ্ধায়, পূজায়,
বাণীর ঐশ্বর্য্যে ; তার মন্দির নীরবশঙ্খ, রসকুঞ্জ ম্লান।
কৌলীন্যের সনাতন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার—অন্তর নিহিত
প্রসাদ-সম্পদ তার নাহি আর ; মোরা হায়, স্বার্থান্ধ বামন ;
এসো ফিরে হে দিশারী ! হাতে করি লও তুমি বিপ্লব-পাবন !
শিখাও কাহারে বলে শালীনতা, ধর্ম্ম মুক্তি, শক্তি সমাহিত।

ভাস্বর নক্ষত্র-নিভ জ্বলিত তোমার আত্মা একা—সাথীহারা ;
স্বরিত মূর্চ্ছনা তব সান্দ্র কণ্ঠে ঝঙ্কারিত মন্দ্রে জলধির,—
উন্মুক্ত অম্বর সম শুভ্র—বাধাবন্ধহারা—উদাত্ত—গম্ভীর।
জীবনে সামান্য পথে ভ্রমিয়াছ হেন ছন্দে বর্ষি' দীপ্তিধারা
সদানন্দ পুণ্যশ্লোক ! নাহি ছিল অভিমান তথাপি তোমার,
হাসি-মুখে আমরণ বহেছ নগণ্যতম কর্ত্তব্যের ভার।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

৭

জগবন্ধু লোকটির আকার-প্রকার দেখিলে তাহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়াই চেনা যায়, সাধারণতঃ বাঙ্গালার যে শ্রেণী হইতে জমীদারী সেরেস্তার নায়েব, বড়লোকের বাড়ীর গোমস্তা, আদালতের কিম্বা উকীলের মুহুরী নিযুক্ত হইয়া থাকে। বেতন অল্প, উপরি যথেষ্ট, সেই উপরি-লাভের জন্য অধীনস্থদের রীতিমত দলন-পীড়ন এবং উপরওয়ালাদের নির্লজ্জভাবে তোষামোদ করা যে শ্রেণীর লোকের জন্মগত বিশেষত্ব, এ লোকটিও ঠিক সেই দলেরই এবং সেই ভাবের সাধনায় এক দিন যে সিদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এখনও তার চিহ্ন এর উপর একটিমাত্র কটাক্ষপাত করিলেই পাওয়া যায়। আজীবনব্যাপী দুরভিসন্ধি এবং কঠোরতায় মিশ্রিত হীনতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ, পরিষ্কার ওঠা শিল-মোহরের মতই তার এই জরা-বার্দ্ধক্য-স্খলিত জীর্ণ দেহেও স্পষ্টতররূপে যেন ছাপিয়া রহিয়াছিল! অনিমেষের মনটা ঈষৎ যেন ভিতরের দিকে গুটাইয়া আসিল। সে যে স্মিত-প্রফুল্লমুখে পদ্মমালার সহিত ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে মুখের ভাব তার আচম্‌কাই গাম্ভীর্য্য-বিরস হইয়া গেল, আপনা হইতেই যেন তুলনা করিবার হিসাবেই তার চোখ দুইটা ঈষৎ বিস্ময়ভরে একবার তার পিতামহের প্রতি এক নিমেষের মধ্যেই ঘুরিয়া আসিল, কি যেন একটা অসামঞ্জস্য এবং অস্বাভাবিকতায় তার উৎফুল্ল উদ্যত চিত্ত বিস্ময়ে ও বিতৃষ্ণায় সহসাই বিমুখ হইয়া পড়িল, তা সে নিজেও বুঝিল না। মন যেন বলিল,—এ কি? এ কে? এই সুন্দরী হৃদয়বতী বালিকার উৎপত্তি হইয়াছে ইঁহারই বংশে? পদ্মরাগের আকরে কাচ জন্মে না, কিন্তু কাচের কারখানায় কি পদ্মরাগের সৃষ্টি হয়?

ততক্ষণে পদ্মমালা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জগবন্ধুর পাশে হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে এবং তার কাণের কাছে নত হইয়া বলিতেছে, "দাদামশাই! এই ইনিই তিনি, যিনি আমাদের খিড়কির ডোবাটা কাটিয়ে দেবেন বলেছিলেন, এই ইনিই তিনি।"

জগবন্ধু প্রথমবারে পদ্মমালার কথা বুঝিতে পারিল না, অসন্তোষপূর্ণ কুটিল কটাক্ষে সে অনিমেষকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল; তার পর পদ্ম যখন পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিয়া তাহাকে সমস্তটা বুঝাইয়া দিল, তখন জগবন্ধুর সেই স্তিমিত ও কোটরগত চোখ দুটি দিয়া একটা কিসের জ্যোতি যেন জোনাকী জ্বলার মতই তার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ-মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া তার পর প্রশ্ন করিল, "ব্রাহ্মণ?"

অনিমেষ ঈষৎ মাথা ঝুঁকাইয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

জগবন্ধু হাত দিয়া তার ময়লা বিছানার একটা প্রান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে কহিল, "বসো।"

অনিমেষের কাছে এই কালো চিটচিটে খেরোর তোষকও কম আরামপ্রদ নয়; এর চাইতেও কত অস্থানে কুস্থানেও তাকে আসন করিতে হয়। বসিয়া পড়িয়া পদ্মমালার মারফৎ তার বক্তব্য সে জানাইয়া দিল। অর্থাৎ এই আগামী সপ্তাহ হইতেই সে তাদের খিড়কির ঐ ডোবাটার সংস্কার আরম্ভ করিতে চাহে, এ বিষয়ে তাঁর কোন আপত্তি আছে কি না?

জগবন্ধু তার ছোট ছোট চোখ দুটি অর্দ্ধমুদ্রিত রাখিয়া সব কথা মন দিয়া শুনিল, তার পর সেই গজচক্ষুবৎ চোখ দুটি মিট-মিট করিতে করিতে স্থূল ওষ্ঠাধরকে গুটাইয়া স্থূলতর করিয়া তুলিয়া তার ভিতর হইতে কেমন যেন এক রকম চিটানো সুরে কথা কহিয়া বলিল, "আমার ডোবা কেটে তোমার লাভ?"

প্রশ্ন কিন্তু সত্যই অসঙ্গত নয়। এই কলিযুগের পঞ্চ-সহস্রাব্দেরও পরে এমন নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত কোথায় কবে কে কতই দেখিতে পায়? অন্ততঃ এই ভদ্রলোকটির ত তা' দেখা ছিল না। এক সময় ছিল বটে, যে দিনে এই প্রায়নিরীহ ভগ্নদেহ স্থবিরটি পুকুরকাটা, গাছকাটা, আরও হয় ত অনেক কিছুই কাটাকুটি করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সে সমস্তই নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত রাখার জন্য নয়। তাদের মধ্যে এত বড় কামনা সুস্পষ্ট হইয়া থাকিত যে, তার জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু এই সুস্থ সবল দীর্ঘচ্ছন্দ লোকটির উদ্দেশ্যও কি ঠিক তাঁহারই সঙ্গে একই রকম, অথবা এর মধ্যে আরও কিছু নূতনতর প্যাঁচ আছে? জগবন্ধু বৃদ্ধ এবং অক্ষমও বটে; তথাপি বুদ্ধিশুদ্ধি তার এখনও লোপ পাইয়া যায় নাই।

অনিমেষ অল্প একটু ইতস্ততঃ করিল, সেটুকু এই সতর্ক

বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়াইল না,—তার পর সে তার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সহিত জবাব করিল, "দেশের ম্যালেরিয়া দূর হয়, লোকে ভাল জল পায়, আমার সেই মস্ত লাভ।"

পদ্মমালা বেশ গুছাইয়া এই কথাটাই আরও বিশদ-ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলে জগবন্ধু পুনশ্চ একবার তার সেই সন্দেহভরা ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি অনিমেষের আগা-পাশতলা বেশ করিয়া বুলাইয়া দিল, তাকে দেখিতে দেখিতে তার সেই ছোট ছোট দুই চোখে যেন ঈর্ষার আগুন ফিন্‌কি দিয়া ফুটিয়া উঠিল, তার মুখের শিথিল পেশী কঠিন হইয়া দেখা দিল, বুকের মধ্যে তার একটা অনির্দ্দেশ্য ঈর্ষার জ্বালা যেন বদ্ধ পাত্রের ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতে লাগিল। তার মনে যে ভাবটা দেখা দিল, সেটা বোধ হইল যেন ঠিক অনিমেষের উপর নয়, তার সেই সুদীর্ঘ এবং সবল যৌবনবলদৃপ্ত উন্নত শরীরের উপর নিজের এই অসহায় বৃদ্ধত্বের অক্ষমতার ঈর্ষা। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া সেই উগলিত বিদ্বেষটাকে কথঞ্চিৎ হজম করিয়া লইয়া তার পর সে কথা কহিল, বলিল, "ও সব ত বাইরের কথা, মুখের মুখোস। ভেতরকার কথাটি কি ? যেটি আসল ?"

কথার সুরে এবং চোখ-মুখের ভাবে অনিমেষ নিজেকে অপমানিত বোধ করিতে পারিত; কিন্তু সে নিজেকে অনেকটাই তৈরী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশেষ এই লোকটির কাছে যে তাকে ধাক্কা খাইতে হইবে, সে যখন আসে, কতকটা পদ্মমালার কাছে জানিয়াই আসিয়া-ছিল, বাকী যেটুকু ছিল, এ ঘরে পা দিয়াই সেটুকুও তার জানা হইয়া যাইতে বাকী থাকে নাই। এ রকম লোকের কাছে যে এই রকমেই অভিনন্দিত হইতে হইবে, এতে আর বৈচিত্র্য কোথায় ? বরং এর ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেটা কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারিত বটে! যথাপূর্ব্ব সংযত কণ্ঠেই সে জবাব করিল,"আসল নকল এর ত দুটো দিক্ নেই। এর যা উদ্দেশ্য, তা ত আপনাকে বলাই হয়েছে ; ডোবার জল পচে গেছে, দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে এ রকম ডোবা রাখা সঙ্গত নয় ; হয় বুজিয়ে ফেলে টিউবওয়েল্ বসান, না হয় ডোবাটিকে ঝালিয়ে ফেলাই সঙ্গত। এই এঁকেই জিজ্ঞেস করুন না, জল খারাপ হওয়াতে কি রকম এঁর কায করতে কষ্ট হয়।"

জগবন্ধু আপনা হইতেই কথাগুলো শুনিতে পাইল। অনিমেষ বেশ চড়া সুরেই কথাগুলা বলিয়াছিল। শুনিয়া তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরণের সচকিত ভাব প্রকাশ পাইল, সে যেন ঈষৎ চমকের ভাবে বলিয়া ফেলিল, "ওঁর কষ্ট হয়! ওঁর কষ্ট হয়! তা' ওঁর জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? ও তোমার কে ?"

অনিমেষ মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথায় সে বিলক্ষণ চটিয়াও গেল, কিন্তু সে যে রাগিবে না বলিয়া নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; রাগ করার ত তার উপায় নাই। রাগ হইলেও প্রাণপণে রাগ চাপিতে হয়!

জগবন্ধুর শ্লেষবিমিশ্র অভদ্র প্রশ্নের উত্তরে তাই সে সুভদ্রভাবেই শান্ত স্মিত হাস্যের সহিত প্রত্যুত্তর করিল, "উনি যে আমার বোন্, আমরা যে এক মায়ের সন্তান, ওঁর কষ্টে আমার মাথাব্যথা হবে না ত কার হবে ?"

পদ্মমালা এই কথাটা বুঝাইয়া দিলে জগবন্ধুর ঈর্ষা-জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টি একটা আকস্মিক বিস্ময়াতঙ্কে যেন ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিল, সে অকস্মাৎ ভাল করিয়া উঠিয়া বসিতে বসিতে যেন লাঞ্ছিতের মতই আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ, কি বল্লে তুমি! কে হও ? পদির ভাই ? তোমরা একমায়ের সন্তান ? না না, হ'তে পারে না, হ'তে পারে না, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা! সে ত নেই, সে যে মরেছে—মরেছে, নিজের চোখে তাকে মরতে দেখেছি, দাঁড়িয়ে থেকে লাস জ্বালিয়ে দিয়ে তবে নড়েছি। আর আজ এদ্দিন পরে কোত্থেকে না কোত্থেকে এসে তুমি বল্‌ছো কি না তুমি ওর মারপেটের ভাই! জোচ্চোর!"

অমিমেষ অবাক্ হইয়া পদ্মর মুখের দিকে চাহিল, পদ্ম তার ডাগর দুটি চোখের ইসারায় তাকে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়া নিজেই তার হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিয়া দিল। কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বেশ গৃহিণীর মতই গুছাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি বুঝতে পারছো না, দাদামশাই! এই ভদ্দর লোকটি বল্‌ছেন,তিনি দেশসেবক কি না,তাই দেশমাতাকেই তিনি মা ব'লে থাকেন। দেশমাতা যদি মা হলেন, তা হ'লে দেশের সকল ছেলেমেয়েই ত পরস্পরের ভাই-বোন হলো, হলো না ? আমি ওঁর সেই রকম মা'র পেটের বোন হই কি না,সেই জন্যে আমার অসুবিধে দেখে ঐ ডোবাটি কাটিয়ে দিতে চাইচেন। তা' শুধুই ত আর আমাদেরই

ডোবাটিই নয়; দেশের যত পচা ডোবা আছে, একে একে সবই ওঁরা পরিষ্কার ক'রে দেবেন। আমি বলছি ব'লে তাই আমাদেরটাও করতে রাজী হয়েছেন। তা' তুমি যদি মত না দাও, তা হ'লে নয় ওটা থাক গে।"

জগবন্ধু এতক্ষণে যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছে, এমনই ভাবে একটা নিশ্বাস ছাড়িল, তোষকেরই অনুরূপ একটা মোটা খাটো তেলের পালিস করা তাকিয়া—উপরের সাদা ওয়াড় ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহারই উপর হেলিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসির ভাব মুখে টানিয়া আনিয়া অনিমেষকে বলিল,—"ওঃ, তোমরা সেই মুক্তি-ফৌজদের মতন ভাই-বোনের দলের লোক না? সেই যে কলকেতার রাস্তায় রাস্তায় সেই যে 'পাপীটোস, পাপীটোস, কেয়া করোগে উসি রোজ মুক্তি-ফৌজমে আও মিলো' ব'লে ব'লে পা খালি করা পাদরী মশাইরা ঘুরে বেড়ায় না, তারাই ত ঐ রকম 'ব্রাদার ব্রাদার' 'সিস্টার সিস্টার,' ক'রে কেঁদে খুন হয়, তুমি কি তাদের দলেরই, না অন্য দল?"

অনিমেষের হাসি পাইতেছিল, কিন্তু সে না হাসিয়াই কহিল, "অন্য দল।"

জগবন্ধু ঘৃণার সহিত ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল, "তাই বুঝি ডোবা কাটিয়ে দিয়ে তার বদলে ভবপারাবারের খেয়া পার করবার উপায় ক'রে দিচ্ছো? ওদের একটা গান শুনেছিলাম না,—

'ও মন পাতকী ভবপারাবারের উপায় করলি কি?
ও তোর কৃষ্ণ সুরেন্দ্র, আর ব্রহ্মা মহেন্দ্র,
তারা আপন পাপেই হাবুডুবু,—
তোমার উপায় করবে কি?'

সেই মতন যীশু ভজাতে এয়েছ বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ! সে হচ্ছে না বাপু! সেটি হচ্ছে না। যীশু ভজাবে? তুমি? আমিই কত লোককে কত কি ভজিয়েছি, বলে ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি ত!"

পদ্মমালা এই ব্যাখ্যা ও গান শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, অনিমেষও ঈষৎ হাসিল, তার পর সে সহাস্যস্মিত-মুখে নিজের খদ্দরের পাঞ্জাবী তুলিয়া গায়ের উপর হইতে এক গোছা সাদা পৈতা বাহির করিয়া দেখাইল এবং আর কিছুই বলা দরকার বোধ করিল না।

পদ্মমালাও এই সময় হাসি থামাইয়া কহিল, "ইনি জন-মঙ্গল সমিতির এক জন সেবক হচ্ছেন, দাদামশাই! এঁদের কায হচ্ছে পল্লী-সংস্কার। এঁরা বলেন, পল্লী-সংস্কার না হ'লে সমাজ রাষ্ট্র কিছুই সংস্কৃত হ'তে পারে না। সেই জন্যে এঁরা দেশের যত পচা ডোবা খাল-খন্দ আছে, সব পরিষ্কার করাতে চান, আর কোন উদ্দেশ্য এঁদের নেই গো, নেই।"

জগবন্ধু এতক্ষণে কথাটা বুঝিল, বুঝিয়া তার মিট-মিটে চোখে একটুখানি করুণার আভাস দেখা দিল, পাঙ্গাস রংয়ের মোটা ঠোঁটের পাশেও ঈষৎ কৃপার হাসি অতি সন্তর্পণে দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে তখন অতিশয় ভারি চালে গম্ভীর-মুখে রায় দিল, "গেরো; স্রেফ গ্রহের ফের! যাক্ গে, তা, হ্যাঁ, ওতে কিন্তু আমার বিস্তর ল্যাঠা-মাছ আছে, সেগুলো যেন নষ্ট হয় না। পদি! কালই হরে জেলের ব্যাটাকে ডাকবি, মাছগুলো আগে ধরিয়ে নিয়ে, তার পর তোমরা যা' করতে হয় করো। নে' যা, আমায় এক ঘটী খাবার জল দিয়ে যা, আঃ, তেষ্টা পেয়ে গেছে।"

অনিমেষ এতক্ষণ পরে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া জগবন্ধুকে নমস্কার জানাইল এবং "যে আজ্ঞে, তাই হবে" বলিতে বলিতেই লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ধাঁ করিয়া চৌকাঠ পার হইয়া আসিল। এই স্পষ্ট ইতরভাবাপন্ন লোকটার হীন সঙ্গ তাহাকে রীতিমত পীড়ন করিতেছিল। আর বেশী করিয়াই তাহাকে ব্যথা দিতেছিল যে, এই লোকটাই ঐ স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্যময়ী এবং অপরিসীম করুণাপূর্ণা কিশোরীর অত্যধিক নিকটতম আত্মীয়। ইহাকে সহাও যায় না, অথচ ঘৃণা করিতেও বাধে।

বাহিরে আসিয়া পদ্ম তার পদ্মের মতই স্মিত-প্রফুল্ল মুখটি তুলিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, "আপনিই ত আমায় বোন্ ক'রে নিয়েছেন, বেশ, এবার হ'তে আমি আপনাকে দাদা বলেই ডাকবো।"

একটুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, "আমার যে ভাই ছিলেন, মারা গেছেন, এ সব কথার আমি কিছুই জানি নে, এই সবে আজই শুনলুম।"

সে ঈষৎ বিমনা হইয়া রহিল।

ইত্যবসরে অনিমেষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে

কহিল, "আজ তা হ'লে এখন আমায় বিদায় দাও, দিদি! আরও অনেক যায়গায় যেতে হবে।"

এই 'দিদি' সম্বোধনে পদ্মর মুখখানি ম্লান হইতে গিয়াও যেন হইতে পারিল না, সে সোৎসাহে ও আনন্দে দ্বিধাহীন চিত্তে অনিমেষের হাত ধরিল; কহিল, "আবার কবে আসবেন, দাদা! ব'লে যান।"

অনিমেষ স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্যের সহিত তার হাতের উপরকার হাতখানির উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহভরা কণ্ঠে জবাব করিল, "আবার আসবো, দিদি! সুবিধা পেলেই আবার আসবো, আজ বিদায় দাও।"

হাতখানি সরাইয়া লইয়া বিষণ্ণ-মুখে পদ্ম ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর কোন কথা স্মরণ হওয়াতে যেন কিছু ব্যগ্র হইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিছু খেয়ে যান না, দাদা! আজ আমাদের এখানে এবেলা দুটি ভাতই না হয় খেয়ে যান।"

হাসিয়া অনিমেষ কহিল, "তা হয় না, দিদি! আজ অন্যত্র নেমন্তন্ন আছে। আর এক দিন তোমার কাছে তখন খেয়ে যাব।"

"মনে থাকবে ত?" বলিয়া পদ্ম ছলছল-চোখে গমনোদ্যত অনিমেষের মুখের পানে করুণভাবে চাহিয়া রহিল।

"নিশ্চয়" বলিতে বলিতেই অনিমেষ এক লাফে পৈঠা কয়টা পার হইয়া ঘাস-জমীটুকু ছাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে সদর রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। দেখিতে দেখিতে রাস্তার বাঁকের ভিতর পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুইটি বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল ঝরিয়া পদ্মর গালের উপর নিটোল মুক্তার মত দুলিতেছিল, সে দুটিকে হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া পদ্মমালা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কেমন করিয়া যেন তার মনে হইতে লাগিল, বহু দিনের প্রতীক্ষিত কোন প্রিয়জনকে সে যেন হঠাৎ পাইয়াছিল, আবার তখনই হারাইয়াছে। তার প্রাণ যেন কি রকম করিতে লাগিল।

৮

অনিমেষ সে দিন বিদায় লওয়ার সময়টায় কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। সুচারু অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছিল, তার মধ্যে অধিকাংশই অনিমেষের কাছে অসার কথা। মধ্যে মধ্যে সে যখন সুরুচিকে ক্ষ্যাপাইতেছিল, আর সুরুচি তাহাতে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কখনও তার কথার প্রতিবাদ, কখনও বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিতেছিল, আবার কখনও বা অসহায়ভাবে অনিমেষকেই মধ্যস্থ মানিয়া করুণ সুরে বলিতেছিল,—"দেখুন ত, সুচারু বাবু আমায় নিয়ে কি রকম জ্বালাচ্ছেন। আপনি আপনার বন্ধুটিকে একটু বারণ ক'রে দিন না।" তখন তাহাকে অগত্যাই তাদের দিকে তার বিমনা মনকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইতে হইতেছিল এবং ঈষৎ স্নেহার্দ্রভাবে ঐ মধুর প্রকৃতির মেয়েটির নালিশ সমর্থন করিয়া লইয়া সুচারুকে অনুযোগ করিতেও হইতেছিল,— "আঃ, কি করিস্ চারু! তোর কি কোন দিনই ঐ খুনসুটী করা রোগটি যাবে না?"

সুচারু বারেবারেই হাসিয়া এই এক কথাই জবাব দেয়, "বলে 'স্বভাব যায় না মলে,'—আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার স্বভাব বদলাবে?"

অনিমেষ এক সময় এর প্রতিবাদে বলিল, "বয়স বাড়ছে না কি?"

সুচারুও তার জবাব দিল, "তার সঙ্গে রসবোধও ত বেড়ে যাচ্ছে। আমি আর করেছি কি? ভাবী শ্যালিকার সঙ্গে অল্প-স্বল্প সুরুচি-সঙ্গত রসালাপই করেছি না? তোমার যদি শ্যালিকা থাক্‌তো, তুমি যে তুমি, তুমিও এ কার্য্য না ক'রে থাকতে পারতে না, এ আমি তামা তুলসী হাতে নিয়েও বলতে পারি। শ্যালিকা বস্তুটি এতই সরস যে, এদের সংস্পর্শে 'রাং রূপো' হয়! এমন কি, এরা 'মূকং করোতি বাচালং।' হয় নয় পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাও? রাজী আছ ত বল দেখিয়ে দিচ্ছি, এক্সপেরিমেণ্ট করিয়ে।"

অনিমেষ হাসিয়া তার জবাব দিল,—"না।" এবং সুরুচিকে বলিল,—"দেখছেন ত আমি নাচার! আমার আশ্রয় নেওয়া আপনার পক্ষে অনর্থক।"

সুরুচি সেই পর্য্যন্ত নিজেই যা পারে করিতেছে, অনিমেষকে আর এর মধ্যে জড়ায় নাই।

কিন্তু তাতেই কি তার নিষ্কৃতি আছে? দু'একবার দুচারটা বাক্যবাণ ছুড়িয়া দিয়া সুরুচিকে অপ্রতিবাদে নীরব দেখিয়া তার মন খিঁচড়াইয়া গেল। এক তরফা

কখনও যুদ্ধ হয়? তখন সে সুরুচিকে আরও জ্বালাইবার জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিল। সুরুচিকে রাগাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া অনিমেষকে শুনাইয়া বলিল, "কি রুচি! এরই মধ্যেই যে আমাদের মতন লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করায় অরুচি ধ'রে গেল! এখনই এই, এর পরে একহপ্তা ধ'রে ত আমাদের সঙ্গে আর কথাই কইবে না। শোন অনিমেষ! গেল হপ্তায় আমাদের রুচি দেবী আমার সঙ্গে ছদিনে পাঁচটি কথা বলেছিলেন; আর সেই পাঁচটি কথা কি কি, তাও আমি তোমায় ব'লে দিতে পারি। কি বল? বলবো, সুরুচি।"

সুরুচি সহজ ঔদাস্যের ভাবে সংযত থাকিতেই চেষ্টা করিয়া প্রত্যুত্তর করিল,—"বলুন না।"

সুচারু নিজের দক্ষিণ করতল বিস্তৃত করিয়া অঙ্গুলীর পর্ব্বে হিসাব করিতে করিতে আরম্ভ করিল, "এক, 'হ্যাঁ সুচারুবাবু! ওঁর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ? খুব ছোটবেলা থেকেই কি? আচ্ছা, আপনাদের কি এক দেশেই বাড়ী?' দুই, 'ওঃ, কলেজ থেকে আলাপ? এম এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছিলেন? তার পর আর দেখা হয় নি? চিঠিপত্রও লেখা ছিল না? বাঃ, বেশ বন্ধুত্ব ত!' তিন, 'আপনার সঙ্গে ওঁর সকল বিষয়েই অত অমিল, তবু আপনাদের মধ্যে অত বন্ধুত্ব হয়েছিল, এটা কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য!' চার,—কি সুরুচি দেবি! বলি?—" সুচারু হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে ঈষৎ সলজ্জায় সুরুচির পানে তাকাইল।

সুরুচি যদিও এ আলোচনায় লজ্জা পাইতেছিল, তথাপি জোর করিয়া নিজেকে সহজ রাখিতে চাহিয়া ঈষৎ ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল,—"বলুন গে, কিই বা আর বলবেন? কি আর আমি বলেছি?—"

সুচারু কৌতুকস্মিত প্রোজ্জ্বল নেত্র তাহার মুখে স্থির রাখিয়াই মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত কহিতে লাগিল, "ওঃ, কিছুই তা হ'লে বলো নি? বেশ, না বলেছ নাই বলেছ, আমার পক্ষে ভালই হলো, আমায় তা হ'লে কিন্তু এর পরে আর বিট্রেয়ার ব'লে গাল দিতে পারবে না। আচ্ছা, তা হ'লে যা বলছিলুম। চার,—'হ্যাঁ সুচারু বাবু! উনি কি কক্ষনোই বিয়ে করবেন না? আচ্ছা, উনি কি মনে করেন, বিয়ে করলে আর দেশের কায করা যায় না? যদি এমন হয়, ধরুন, যদি কোন মেয়ে ওঁরই মতন দেশকে ভালবাসে, সে যদি ওঁকে বিয়ে ক'রে ওঁর সঙ্গে ওঁর সহকর্ম্মিভাবে দেশসেবা করে, তা'তে ক'রে ত ওঁর কাযেরও আরও সুবিধাই হয়? তেমন মেয়ে কি আর দেশে নেই?' এই পর্য্যন্ত শুনে আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে বল্লেম, তথাস্ত দেবি! তেমন মেয়ে দেশে আছেন বৈ কি, এই আপনিই আছেন; তবে প্রকাশ্য কথাটা বলতে—"

সুরুচি ক্রমশই মনের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত, খোলা-স্বভাব, আমুদে লোক সুচারু এখনই কি বলিতে গিয়া কি না কি বলিয়া বসিবে, তাই ভাবিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছিল. এখন তারই সংশয়কে সফল হইতে দেখিয়া ঘোর রক্তবর্ণ-মুখে উৎক্ষিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"সুচারু বাবু!—"

"ওঃ হ্যাঁঃ, স্বগতোক্তিটা এমনভাবে তোমায় শোনানো আমার সঙ্গত হয় নি, না? আচ্ছা, তা' যখন হয়েই গেছে, তখন কি আর করৃছি বল? বল ত, দাঁতে কুটো ক'রে তোমার কাছে ক্ষমা চাই, না বল যদি, তবুও না হয়, এম্‌নই এম্‌নি চাইছি। আর তুমি অনিমেষ! তুমিও যেন আমার সেই কথাটা শুনতে পাওনি, জান্‌লে? কোন্ কথা বুঝতে পেরেছ ত? ঐ যে হঠাৎ শ্রীমতী দেবীর কথার ব্যাখ্যা করতে করতে বেফাঁসভাবে নিজের একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে ফেলেছিলুম না? এতেও যদি তোমার মনে না পড়ে, স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেলাই ভাল; না হ'লে কি না কি আবার উল্টো ভেবে বসবে? তোমার বিয়ের সম্বন্ধে দেবী যে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে মন্তব্যটি প্রকাশ করেন, তাঁর সেই ব্যাকুল প্রশ্নটির উত্তরে আমার মনে যে সরল উত্তরটি উদিত হয়েছিল, সেইটির কথা আর কি! নাঃ,! সুরুচি দেবী অত্যন্ত বেশী রকম রাগ করছেন, ওঁর চোখে জল এসে পড়েছে; কাযেই ইতি,—আহা যাবেন না, যাবেন না, শুনুন দেবি!"

সুরুচি সত্য সত্যই চলিয়া গেল, কোন দিকে আর সে ফিরিয়াও চাহিল না। অনিমেষ তার চলন্ত মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত কহিল, "কি যে বাজে ইয়ার্কি দিস্! কেন মিথ্যে ওঁকে লজ্জা দিলি?"

সুরুচির এমন ভাবে চলিয়া যাওয়াতে সুচারু কিছু অপ্রতিভ নিশ্চিতই হইয়াছিল, কিন্তু মুখে সে তাহা স্বীকার

করিল না, হাসিয়া বলিল, "বেশ লাগে! বড্ড নরম মনটি না? একটু বাতাসের ঘায়ে যেন নুয়ে পড়ে! এই যে রেগে গেছে, এখনই একটা কাষ পড়ুক দেখি, দিব্যি সহজ হাসিমুখে এসে কথা কইবে। তা না হ'লে কি আমিই অত ভরসা ক'রে যখন তখন চটাতে পারি?"

অনিমেষ কোন কথা কহিল না, তার একবার ইচ্ছা হইল যে, জিজ্ঞাসা করে যে, ওঁর দিদি লোকটিও কি অমনই সহজ? কিন্তু না, যে তার প্রতি তীব্র ঘৃণায় একবার তার ছায়া মাড়াইয়া পর্য্যন্ত গেল না, দাক্ষিণাত্যের পারিয়ার মতই তাকে দূরে পরিহার করিয়া রহিল, সে তার সম্বন্ধে কোন উল্লেখও করিতে পারে না। মতদ্বৈধ বড় জিনিষ নয়; এ সব পথে যিনি আসিয়াছেন, বহু মতের খণ্ডনচেষ্টা ও স্বমতস্থাপনের জন্য প্রাণপণ তাঁকে করিতেই হইবে। তা' যত বড়ই তিনি হোন, আর যত ছোট হোক। এই মত-বিরোধের জন্য সে তার বিভিন্ন মতবাদীকে কোন দিনই হেয় ভাবে নাই। জগতে প্রত্যেকেরই জন্য ভিন্ন মত এবং বিভিন্ন পথ প্রস্তুত রহিয়াছে, কেহ নিজের মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিবে, তার কায হইতেছে প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা সেই পরমত খণ্ডন এবং স্বীয় মত সংস্থাপন করা। তার জন্য যুক্তি-তর্ক যত দূর যা করিতে হয়, সে করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি তোমার পথের পথিক নহি বলিয়া তুমি আমাকে আমার পক্ষ সমর্থন পর্য্যন্ত করিতে না দিয়া যদি আমাকে একেবারে আলোচনারই অযোগ্য ধরিয়া লও, আমার অহঙ্কারে—তা' সে যত বড় ত্যাগীই হউক আঘাত লাগিবে। অনিমেষও তাই কোনমতে আর তার বন্ধুর বাগ্‌দত্তার সম্বন্ধে সহজভাব মনে রাখিতে সমর্থ হইতেছিল না। সে নীরব হইয়া রহিল।

বিদায়কালে সুচারু প্রস্তাব করিল, "চল, তোমায় একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসি।"

জুতা-জামা বদলাইয়া, এসেন্স-সুবাসিত চাদর পরিয়া সে তাহাকে ডাকিয়া লইল, ইতিপূর্ব্বেই মাসীমার কাছে অনিমেষ বিদায় লইয়াছিল, আগামী রবিবারে সে আর আসিতে পারিবে না বলায় মাসীমা বলিয়াছিলেন, যখনই এ দিকে আসবে বাবা, মনে ক'রে একবার দেখা দিয়ে যেও, তোমার মত দেশসেবক ত্যাগী ছেলে—তা' সে নিজের পেটের ছেলের মত হলেও চোখে দেখলেও পুণ্যি হয়।"

ঈষৎ সলজ্জ মিনতিতে অনিমেষ তাঁর দেবীপ্রতিমার মতই সুগঠিত চরণ দুটির ধূলা লইয়া মাথায় রাখিতে রাখিতে মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ও কথা বলবেন না, মাসীমা! মাকে কত দিন হলো দেখিনি, আপনার স্নেহে সে অভাব যেন ভুলে গেছলাম।"

"হ্যাঁ বাবা! তোমার মা আছেন?"—মাসীমা প্রশ্ন করিলেন।

"আছেন, মাসীমা!"

"বাবা? বাবাও আছেন ত?"

অনিমেষ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, না।

তখন মাসীমা একটু যেন তিরস্কারের সঙ্গেই অথচ বেশ হাসি-মুখেই মন্তব্য করিলেন, "মা রয়েছেন, তবু তুমি এই দস্যিপানা ক'রে বেড়াচ্ছো, বাবা! আহা, না জানি দিদির আমার মনটির ভেতর কি রকমই হচ্ছে! মা বর্ত্তমানে তোমার এ পথে আসা কি ঠিক হয়েছে, অনিমেষ?"

অনিমেষ নত-মুখে সবিনয়ে উত্তর করিল, "মা যে আমার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন, মাসীমা! তাঁদের সন্তানদের জন্য যে খাটবার বড্ড দরকার, শুধু একটি মায়ের আঁচলের তলায় শুয়ে থাকার যে আর দিন নেই, মা!"

মাসীমা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁর আর কথা বলার মত শক্তি থাকিল না। দুই বন্ধু চলিয়া গেল।

৯

পথে চলিতে গিয়া সুচারু দেখিল, সে অনিমেষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না, অনিমেষ আস্তে চলিয়াও ক্রমাগত তার সঙ্গ হইতে আগাইয়া পড়ে, আবার সে দ্রুত চলিয়া তার নাগাল ধরে, ক্রমাগতই তাকে তার গতি বর্দ্ধিত করিতে হয়, হার মানিয়া হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছা ছিল, দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা কইবো, কিন্তু যা ঐ তোমার লম্বা ঠ্যাং, ওর কাছে আমায় হার মানতে হলো!"

অনিমেষ আরও একটু গতি হ্রাস করিয়া এবার তার ঠিক পাশে পাশেই চলিতে চলিতে ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "সুখের কথা বল, দুঃখের কথা আবার তোমার কি আছে যে, কইতে যাবে? সে কইতে পারুক,—তোমার যদি শত্রু থাকে সেই"

সুচারু এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, "তা হ'লে সেটা আপাততঃ তোমাকেই সইতে হয়, যেহেতু আপাততঃ তুমি ভিন্ন আমার আর কোন শত্রু আছে ব'লে আমি দেখতে পাচ্ছি নে।"

কথাটাকে নিছক নির্দ্দোষ রসিকতা বোধে অনিমেষও হাসিতে লাগিল।

সুচারু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল, "হাসি নয়, হাসি নয়, অনিমেষ! সত্য সত্যই আজ তুমি আমার সঙ্গে রীতিমত শত্রুতা করছো। কি ক'রে শুনবে? তোমার এই জন-মঙ্গল সমিতি ক'রে। বিস্মিত হচ্ছো যে, তা'তে ক'রে তোমার সঙ্গে শত্রুতা কিসে হলো? তাই হচ্ছে ভাই! তাই হচ্ছে! শোন তা হ'লে বলি, একটু দূর থেকেই বলতে হবে। তুমি ত জান, আমি মা-বাপের এক ছেলে, ভাই-বোন আমার জন্মায় নি। বাবার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন উদ্ধবপুরের জমীদার-গোষ্ঠীরই এক জন। তাঁর এক জ্ঞাতি-ভাই তখন উদ্ধবপুরের ষোল আনারই মালিক, খেতাব তাঁদের ছিল কুমার। তাঁর বাপ ছিলেন রাজা। তুমি এ সব কথা আমার কাছে আগে শুনেছ কি না, জানি নে, জগতে কতই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, তাই বলছি; হঠাৎ এক দিন রাত্রিতে কলেরা হয়ে কুমার বাহাদুর মারা গেলেন। আমি তখন ছোট, কিন্তু বেশ মনে আছে, সে কি কাণ্ড! নিদ্রিত সহর যেন কামান-গর্জ্জনে জেগে উঠল, ঘরে ঘরে হাহাকার প'ড়ে গেল। কুমার লোক না কি বড্ড ভাল ছিলেন। দয়া-ধর্ম্মে প্রজাপালনে খুবই সুনাম ছিল তাঁর।"

অনিমেষ তাদের পাঠ্যাবস্থায় এ সব খবর জানিত বলিয়া তার মনে ছিল না, সে জানিত, সুচারুর বাবা বেশ বড় জমীদার, জমীদারের ছেলে হইয়াও সুচারু যখন বি, এ পাশ করিয়া এম, এ পড়িতে লাগিল, আর তার সঙ্গে কবিতা লেখা, তখন তার খ্যাতির সীমা রহিল না। সে একটু কিছু বলিবার জন্যই কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর বুঝি ছেলে ছিল না?"

সুচারু কহিল, "ছিল বৈ কি! তা নইলে আর বলছি কি? ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল, স্ত্রীও ছিলেন। ছেলেটি তখন অন্ততঃ বছর দশেকের। এক দিন বৈকালে এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে হয় ত কিছু বিষাক্ত জিনিষ খেয়ে এলো না কি যে হলো, ফিরে পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে ক'ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়লো। আমার চাইতে বছর তিনের ছোট ছিল, সুবিমলকে এখনও যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি!"

সুচারু যেন কেমন একটু বিমনা হইয়া গেল। ক্ষণপরে কহিল, "আমার এখনও মধ্যে মধ্যে মনে হয়, অনিমেষ! সে যদি বেঁচে থাকতো, আমরা যেমন ছিলুম, তাই থাকতুম, সে যেন ভালই হতো। আমার ভাগ্যই যেন তাঁদের দুজনকে অমন ক'রে টেনে নেওয়ালে! বাবা ওঁদের ম্যানেজার ছিলেন, আমিও না হয় তাই করতুম। না হয় অন্য কিছুই করতুম। হয় ত এই তুমি যা করছো, এ দিকেও মন চ'লে আসতে পারাও সে অবস্থায় বিচিত্র ছিল না। টাকার আর মানুষের কতটুকুই বা দরকার যে, একটা পরিবারের সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তা পাওয়ার প্রয়োজন থাকে?"

সুচারু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অনিমেষের মনটা সুচারুর মনের এই ভাব দেখিয়া এবং তার খেদপূর্ণ এই নিঃস্বার্থ কথাগুলি শুনিয়া হঠাৎ যেন এক নিমেষেই সুচারুর উপরে অত্যন্ত স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। এ কয় দিনের দেখাসাক্ষাতে এই সুচারুর আলস্যবিলসিত ভাব ও চাপল্য তার আদৌ ভাল লাগে নাই, মিথ্যা মিথ্যা এরই সঙ্গে পড়িয়া তার দুটো দিনকে সে যেন নষ্ট করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে, এই মনে করিয়া সে একটু বিশেষ-ভাবেই অনুতপ্ত হইয়াছিল। এই মুহূর্ত্তে সে কথা ভুলিয়া সে সমবেদনার সহিত কহিল,—"সে জন্যে ত তুমি দায়ী নও, সুচারু! তার জন্য তোমার মন খারাপ করা বৃথা, ভাগ্য যদি অঘটন ঘটিয়ে তোমায় জোর ক'রে দেয়, তুমি কি ফেলে দেবে?"

সুচারু বিমনা হইয়াছিল, সে কোন কথা কহিল না, তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে অনিমেষ তাহাকে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"হ্যাঁ, আর তুমি যে বলছিলে, তাঁর মেয়ে ছিল, স্ত্রী ছিল, তাঁরা সব আছেন ত? মেয়েটির বোধ করি এত দিনে ভাল ঘরে-বরেই বিয়ে হয়ে গেছে?"

সুচারুর মুখ এই প্রশ্নে যেন কি এক রকম হইয়া গেল, ক্ষণকাল সে কোন কথাই বলিল না, তার পর কণ্ঠস্বর মৃদু

করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"কখন কারুকে বলি নি, তবে তোমার কাছে বলায় দোষ নেই, সাধু-সন্ন্যাসী গোছ মানুষ তুমি, 'ফ্যামিলি স্ক্যাণ্ডাল্' কারুর কাছে জানাতে যাচ্ছো না, না ভাই, তা হয় নি, আর তারই জন্যে আমার মনের মধ্যে সব চাইতে বেশী একটা ব্যথা লেগে আছে। সে মেয়েটি ঐ দুই ঘটনার পরেই হঠাৎ হারিয়ে যায়, এ পর্য্যন্ত আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।—অবশ্য খোঁজও যে খুবই ভাল ক'রে হয়েছিল, তা' মনে হয় না। আমার বয়স ত তখন বেশী নয়, সেই বছরই যেন সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠেছি না কি।"

অনিমেষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "হারিয়ে গেল! হারালো কি ক'রে? কোন ঝি-টি—"

সুচারু গম্ভীর ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া জবাব করিল,—"না, সে রকম কিছু নয়, এইখানেই এর সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি। সে ঠিক হারায় নি, তার মা—আমার জ্যেঠাইমা এক দিন রাত্তিরবেলা তাকে নিয়ে হঠাৎ বাড়ীর বার হয়ে গেছেন। সেই পর্য্যন্ত তাঁরা আমাদের কাছে মৃত। সবাই হয় ত তাদের ভুলেছে, আমি কিন্তু আজও পারছিনে।"

সুচারুর দুই চোখ যেন হঠাৎ ঈষৎ সলিলার্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চশমা খুলিয়া চোখ মুছিল, তার পর আবার দুজনে চলিতে লাগিল।

অনিমেষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "কিন্তু এমন ঘটনা ত শোনা যায় না যে, মেয়ে নিয়ে কেউ কুলত্যাগ করেছে! এটা কি একটু অস্বাভাবিক নয়?"

সুচারু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "অস্বাভাবিক ত বটেই! তা' ছাড়া যার সঙ্গে তাঁর কুলত্যাগের কথা বলা হয়, সে লোকটা একেবারেই বাজে লোক। দেখতেও কদাকার, আর আমার জ্যেঠা ছিলেন সাক্ষাৎ কন্দর্পের মতন। তেমনই অনুরক্ত ছিলেন ঐ স্ত্রীর, এও শুনেছি। কিন্তু প্রমাণ যা পাওয়া গেছে, তা'তে আর কোনই সংশয় থাকে না। যাক্, সে সব কথা ব'লে আর তোমার সময় নষ্ট করবো না। কি বলছিলুম? ভুলে গেছি, একেবারেই ভুলে গেছি। যা বলতে গিয়ে এ সব কথা বেরিয়ে পড়লো, সে যেন এর চাপে কোথায় তলিয়ে চ'লে গেছে। সত্যি বলছি অনিমেষ, এত যে আমি হাসিখুসী নিয়েই থাকি, কিন্তু যখনই এঁদের এই বিয়োগান্ত নাটকখানির উপর চোখ প'ড়ে যায়, মন যেন আমার শিউরে ওঠে; আমার হাসির উৎস শুকিয়ে আসে। উঃ! কি ভয়ানক ভেবে দেখ দেখি একবার!"

অনিমেষ অন্যমনস্কভাবে শ্রুত কাহিনীর কথাই ভাবিতেছিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সত্যি।"

কিছুক্ষণ আর দুজনের মধ্যে কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। কথিত ও শ্রুত কাহিনীর হৃদয়বিদারণকারী অশ্রুপ্লুত সকরুণতায় যেন এই দুইটি তরুণেরই চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। এর পরে আর অন্য কথা যেন কওয়া চলে না, কহিতে গেলে যেন নিজেকে নিতান্ত লঘু করিয়া ফেলা হয়, তাই দুজনের এক জনও সে চেষ্টা পরিহার করিয়া নিঃশব্দে কেবল পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহারা তখন গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া আসিয়া প্রথম আশ্বিনের শ্যামলিমামণ্ডিত ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা আলের পথ বাহিয়া চলিতেছিল। ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বিকালবেলার মন্দ বাতাস অতি-মৃদু কাঁপন আনিতেছিল। এ পাশে ও পাশে আলুর ক্ষেত, ভুঁই শসা, আর কুমড়ো-লতার চাকা চাকা সাদা হল্‌দে ফুলগুলিতে বেশ একটি সুন্দর শোভা ধরিয়া রহিয়াছে। গরু-বাছুর তখন গলার ঘণ্টা বাজাইয়া ঘরের পানে ফিরিয়া চলিয়াছে। পাঁচনবাড়ি হাতে লইয়া এই রকম এক দল গরু চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে একটি রাখাল-ছেলে গলা ছাড়িয়া মেঠো সুরে গান হাঁকিয়া দিয়া চলিয়াছে। এই জনকোলাহলহীন, শান্ত প্রকৃতির বিশালতার মাঝখানে, রবিকরহীন সুস্নিগ্ধ অপরাহ্নের প্রশান্ততার মধ্যে একসঙ্গে দুই বন্ধুর কাণেই সেই তাললয়হীন গ্রাম্য সঙ্গীতের রেশটুকু যেন একটু বিশেষভাবেই প্রবিষ্ট হইল। আর কোথাও হইলে হয় ত এ গান তাহারা কাণেও তুলিত না। রাখাল-ছেলেটি একান্ত করুণ সুরে ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতেছিল—

"তোর তরে মোর মন কাঁদে রে, রামশশি!—
কোথায় রইলি বনের মাঝে হয়ে উদাসী রে।"—

সুচারুর বক্ষ মথিত করিয়া তার অজ্ঞাতসারেই একটা গোপন দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত ও পতিত হইল। তার—আর

একবার তারই তখনকার উল্লেখকরা সেই মায়ের সঙ্গে হারাইয়া যাওয়া তাদেরই বংশের ছোট্ট মেয়েটির কথা আচম্‌কা মনে পড়িয়া গেল, যার আইনসঙ্গত সমস্ত অধিকার আজ, সে তার ইচ্ছায় না হোক, অনিচ্ছাতেও দখল করিয়া রহিয়াছে।

পশ্চিমের আকাশ নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়া আসন্ন সন্ধ্যাকে যেন দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, তথাপি পুবের প্রান্তে হাসি হাসিমুখে চাঁদের মুকুট মাথায় পরিয়া সন্ধ্যাদেবী দর্শন দান করিলেন। বাতাস বেশ মিঠা হইয়া আসিল, গলঘণ্টার রব ও গানের সুর সুদূরে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

তখন বহুক্ষণকার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে সুচারুই কথা কহিল; বলিল, "আমি যাই, তোমার হয় ত অনেক পথ যেতে হবে, দেরি হয়ে গেল।"

অনিমেষও যেন কোন সুগভীর চিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সুপ্তোত্থিতের মতই সুচারুর মুখের দিকে চাহিল, সুচারুর কথা না তুলিয়াই সে অন্য প্রশ্ন করিল,— "আচ্ছা সুচারু, তাদের কেউ মেরে ফেলে ঐ কথা রটায় নি ত? তা' কি হ'তে পারে না?"

সুচারু প্রথমটা ঈষৎ চমকিয়া উঠিয়াছিল, তার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "মেরে ফেলবে কে? না না, খুন তারা হয় নি, সে ঠিকই, তবে যদি পরে কিছু ঘ'টে থাকে, সে কথা জানি না। আজ তবে ফিরি আমি, তুমিও বাড়ী যাও, মিথ্যে তোমার দেরী ক'রে দিলুম।"

অনিমেষ কহিল, "তা হোক গে, কিন্তু তোমার আসল কথাটাই ত শোনা হলো না, কি তোমার আমি শত্রুতা করলুম?"

সুচারু তখন জোর করিয়া মনটাকে সহজ করিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া হাসি-মুখেই জবাব দিল, "ওঃ, সেই কথাটা গায়ে লেগে রয়েছে দেখছি যে! কিন্তু থাক, অনিমেষ! আজ আর হবে না, সময়ও নেই, মনটাও কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তখন আর এক দিন, এবার যে দিন দেখা হবে, সেই দিন বলবো। আবার কবে আস্‌ছো?"

যদিও আর শীঘ্র আসার অথবা একেবারেই আসার ইচ্ছা ইতিপূর্ব্বে অনিমেষের ছিল না, কিন্তু সুচারুকে সে যে এই নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল, এর পর তার মন তার সম্বন্ধে আর এক ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাই তার মত বদলাইতে সময় লাগিল না, সে সহজেই স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, "আর হপ্তায় হবে না, তার পরের হপ্তায় আসতে চেষ্টা করবো।"

দুই জনে দুদিকের পথ ধরিল বটে, মনের মধ্যে কিন্তু দুজনকারই গভীর চিন্তার স্রোত বহিতেছিল; তবে হয় ত ঠিক একইভাবে না হইতে পারে। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

যৌবনে জানাই আজি প্রাণের প্রণতি

পূর্ণ অবকাশ! কর্ম্ম নাহি দেয় তাড়া।
সহসা বিস্মৃত সুখ ঝরে হিয়া'পরে।
যৌবন ফিরায়ে পেয়ে দু'দণ্ডের তরে,
ভুঞ্জিল বিস্ময়ে বক্ষ, বসন্তের সাড়া।

অলস অক্ষম স্মৃতি করে কি বিলাস?
অথবা যৌবন ঋষি অমর অক্ষয়,
গুপ্ত মর্ম্ম-বৃন্দাবনে ধ্যানমগ্ন রয়!
মাঝে মাঝে ছাড়ে বুঝি তৃপ্তির নিশ্বাস?

আত্মার নাহিক জরা—সে চির-যৌবন!
সে সুন্দরে ঢাকা নাহি যায় চর্ম্মে লোল,
সর্ব্বকালে থাকি সে যে দেয় মর্ম্মে দোল,
সাজায় সহসা পুষ্পে মনো-যৌবন।

যৌবন! তোমারে আজি দিবসের শেষে,
জানাই প্রাণের নতি সুখের আবেশে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

স্বরলিপি

(গান)

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে!
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে, আনন্দ আজ আনন্দ রে!
আকাশ-ভরা জ্যোস্না-ধারা, বাতাস বহে বাঁধন-হারা—
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন—ব্যথা-বেদন ঘুচিল রে!

মরণ-নীল সাগর হতে জীবন বহে সুধাস্রোতে—
মরণে জীবন, জীবনে মরণ,—ভয় কিবা, কিবা দুঃখ রে!
আকাশে পাখী কহিছে গাহি, "মরণ নাহি, মরণ নাহি!"
রজনী-দিন জীবন-ধারা ওই যে ঝরে, ওই যে ঝরে!

কথা—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সুর—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।



* এই গানটি নিউ থিয়েটার্সের নব-চিত্র-নাট্য "চণ্ডীদাসের" জন্য বিশেষভাবে লিখিত এবং সুরলয়ে গঠিত।



বসুমতী চিত্র-বিভাগ

সাগরেদ

[শিল্পী—শ্রীসমর দে ।

ঈশ্বর

বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরবাদটা যেন উন্নত চিন্তার বহির্ভূত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা সাধারণভাবে শিক্ষিত, তাঁহারা নিরীশ্বরবাদের বা নাস্তিকতার দিকে বড় বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। সকল বিষয়ে ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে শিক্ষিত জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা সম্ভবে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা নিতান্ত সেকেলে লোকের লক্ষণ। সুতরাং ঈশ্বরবাদের সমর্থন করিতে যাইলে শিক্ষিত সমাজে বিড়ম্বনা-ভোগ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। উহা না কি অর্দ্ধ-শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কারের একটা লক্ষণ।

বহুসংখ্যক স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিক মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিলেও, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাসিত হইতে চাহিতেছেন না। মানুষের চিন্তাশক্তি নিরীশ্বরতার পথে কতকটা ছুটিয়া যাইয়া যেন হাঁপাইয়া পড়িতেছে এবং ঈশ্বরবাদের চরণপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। ফলে ঈশ্বরবাদকে বিসর্জ্জন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যিনি যত বড় প্রত্যক্ষবাদী এবং জড় বিজ্ঞানভক্ত হউন না কেন, তিনি এ কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এই বৈশ্ব ব্যাপারের মূলে একটা অতি বিশাল এবং বিপুল শক্তির লীলা চলিতেছে। মানুষের ধারণার অতীত সেই অতি বিপুল মহতী শক্তির প্রভাবে এই অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র উঠিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। সে শক্তির চিন্তা করা বা তাহা অংশতঃ ধারণা করা, এমন কি, তাহার লীলা সম্বন্ধে একটু ধারণা করাও মনুষ্যবুদ্ধির ক্ষমতা-বহির্ভূত। কিন্তু তাই বলিয়া উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভবে না! জড় পদার্থের সহিত এই শক্তি জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বিশ্বের ব্যাপারে শক্তির গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিলে মানুষের বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে,—নিজ সামর্থ্যশূন্যতায় নিজেই লজ্জিত হয়। এই বিশ্বে শক্তির লীলা বিস্ময়কর। শক্তির লীলায় ইলেক্‌ট্রন (ele tron) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত—অসীম শক্তিশালী যোগী ঋষি পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইতেছে,—সেই অভিব্যক্তির গতিভঙ্গী ও বিকাশের পারম্পর্য্য যিনি অনুভব করিতে পারেন,—কতকটা ধারণার মধ্যে যিনি আনিতে পারেন,—তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। আর একটা কথা এই যে, বিশ্বের এই বিপুল ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শক্তির বিকাশপথ বা গতির ছন্দ সমান নহে। উহা বৈচিত্র্যময় এবং বৈষম্যবহুল ; একের সহিত অন্যের যেন সুর মিলে না। অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে যেন উহারা পরস্পর বেসুরা বোধ হয়। ব্যষ্টিতে বেসুরা মনে হইলে সমষ্টিতে যেন সুর মিলিয়া যায়। বিস্তীর্ণা বনস্থলী। তথায় বহুবিধ বিটপীতে নানা জাতীয় বিহগের বাস। প্রভাতে যখন বিহঙ্গমকুল জাগিয়া নিজ নিজ সুরে কূজন করিতে থাকে, তখন কেহ কাহারও সহিত সুর মিলাইতে চাহে না। সকলেই বিভিন্ন তালে বিভিন্ন রাগিণীতে নিজ নিজ সুর ভাঁজিতে থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারই সম্মেলনে কেমন যেন একটা একতানতা ফুটিয়া উঠে, তাহার মাধুর্য্য মনুষ্যকৃত কোন সঙ্গীতে বা ঐকতানবাদনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ এই বিশ্বের বৈচিত্র্যময়ী শক্তির লীলা নানা পথে নানামতে প্রধাবিত হইলেও সমষ্টিতে উহার সুর সমস্তই মিলিয়া যায়। কোন কিছুই বেসুরা বলিয়া মনে হয় না। বনস্থলীতে কাকের সুরের সহিত কোকিলের সুর যেমন মিলিয়া যায়, এই বিশ্বের বিভিন্ন ভঙ্গীতে শক্তির লীলাসম্মেলন অনেকটা সেইরূপ। শক্তির গতি নানা দিকে নানাভাবে হয়,—যেখানে যেরূপ রাগিণীতে শক্তির সুর বাজিবার প্রয়োজন, সেইখানে সেইরূপ রাগিণীতেই তাহা বাজিয়া উঠে। প্রকৃতি বা মহাশক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি বিনা প্রয়োজনে কোন কায করেন না ; প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু করা আবশ্যক মনে করেন না। তবে এই বৈশ্ব ব্যাপারে একতানতা প্রদান করে কে ? ঈশ্বর। যিনি মহাশক্তিরই উৎস, তিনি। তিনিই এক হিসাবে প্রকৃতির ব্যষ্টিগত বেসুরা কার্য্যে সমষ্টিগত একতানতা প্রদান করিয়া থাকেন। সঙ্গীতের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যের যে একটা সাদৃশ্য আছে,—তাহা য়ুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়া

থাকেন। * হিন্দু যোগিগণও বলিয়া থাকেন যে, ওঁকার-ঝঙ্কারে এই বিশ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে প্রণবধ্বনি মহা-শক্তির কণ্ঠ হইতে সমীরিত।

মানুষের মধ্যে চিরকালই দ্বিবিধ প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল লোক আছেন—যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিলেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করেন না। আর এক দলকে মোটামুটি ধর্ম্মবাদী বলা যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারা যে-সকল তথ্য দেখিতে পান, সেই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই চলেন। সেই তথ্য ছাড়িয়া তাঁহারা আর কিছুই মানিতে চাহেন না। যাঁহারা নিখুঁত প্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর কোন কিছু সত্তাই স্বীকার করিতে চাহেন না। উঁহারা যে কেবল কল্পনা বা অনুমানকে একেবারেই আমল দেন না, তাহা নহে, পরন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহা হইতে তাঁহাদের পরিচ্ছিন্ন-কৃত সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যেটুকু অনুমান বা কল্পনাকে আশ্রয় না করিলে চলে না,—তাহার অতিরিক্ত এক চুলও অধিক কল্পনাকে আমল দিতে চাহেন না। দ্বিতীয় প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। ইঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ তথ্য লইয়া বিচার বা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করেন না। ইঁহারা প্রত্যক্ষ তথ্যকে যে একেবারেই বাদ দেন, তাহা নহে। তবে তাহাকে ইঁহারা প্রধান স্থান দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং উহার দ্বারা নিষ্পন্ন যে জ্ঞান, তাহাকে নির্ব্যূঢ় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এই বৈশ্ব ব্যাপারকে মিথ্যা বা মায়াকল্পিত বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী পৃথ্বীতে আমরা যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর করিতেছি, তাহার প্রকৃত সত্তা আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছে না,—তাহার একটা বিকৃত রূপ বা মিথ্যা রূপ আমাদের মানস-ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হই-তেছে। সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা সত্য হইতে পারে না। ইঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত;—বৈদান্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী। এই অজ্ঞেয়বাদী দুই দিক্ দিয়াই হয়। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক হইতেও অজ্ঞেয়বাদীর উদ্ভব হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এখন আমরা এই মনুষ্য-প্রকৃতিকে যে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাই, তাহার এক ভাগকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক আর এক ভাগকে খাঁটি বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সকল মানুষ এক প্রকার হয় না। মানুষের আকৃতিরও যত প্রকার ভিন্নতা লক্ষিত হয়, প্রকৃতিরও তত প্রকার ভিন্নতা দেখা যায়। কাযেই এই ধরায় এক দল লোক খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির আর এক দল লোক নিছক বৈদান্তিক, ইহা ঘটে না। অধিকাংশই মিশ্র প্রকৃতির হয়। সেই মিশ্রভাবও একরূপ হয় না। সুতরাং যত মানুষ, তত প্রকৃতি হইয়া থাকে। ঠিক খাঁটি বৈজ্ঞানিক বা খাঁটি বৈদান্তিক-প্রকৃতির লোক অতি অল্পই মিলে। কাযেই কতক লোক গোড়াতেই ঈশ্বরবাদী আর কতক লোক গোড়াতেই নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ মত গঠন করে না। অধিকাংশই গতানুগতিক ভাবে এক একটা মত ধরে এবং পরে নিজ মত সমর্থনের জন্য নানারূপ যুক্তিজাল বিস্তৃত করিয়া থাকে। ফলে কোন মতই অভ্রান্ত হয় না। যে যুক্তি এবং যে তথ্য বৈজ্ঞানিকের নিকট অভ্রান্ত, সে যুক্তি বৈদান্তিকের নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কাজেই অনেক সময় উভয় মতের সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে।

মানুষের মন এবং বুদ্ধি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। উহার বিকাশের একটা ক্রম আছে। যাহার বুদ্ধি উন্ন-তির যে ধাপে উঠিয়াছে, সে সেইরূপই বুঝে যাহার

* The God-stream of energy, like music, surges through cosmic space and time, communicating its quanta of energy to matter which in turn renders back the debt in the passing of the cosmic seasons. This stream is harmony it is love, it is beauty. It beats upon matter, life mind, everywhere. It creates as it may through the history and inertia of matter It establishes healing, atonement where it may. Here and there it is fruitful of advance. It destroys what can not be healed—as light destroys that which is not in harmony with it, as music shatters the walls that are not attuned to it. Terrible is the holiness of God the love and beauty of God. You can be sure that the stream of divinity runs pure. It distroys sordidness, filth, but it is tender as the sun in spring to stimulate to life creativeness, beauty.

Pofessor T. E, Boodin.

বুদ্ধি বিশেষ বিকাশ লাভ করে নাই, সে একটা ব্যাপার দেখিয়া যেরূপ বুঝে ও যে সিদ্ধান্ত করে, যাহার বুদ্ধি তদপেক্ষা উন্নত, সে তাহা হইতে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। প্রত্যেক স্বাধীন সিদ্ধান্তের মূলে সিদ্ধান্তকর্ত্তার একটা ব্যক্তিত্ব থাকে। কাযেই সকলে সকল কথা সমান ভাবে বুঝে না। সকল তথ্যের সমান ব্যাখ্যা করে না। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেরই আলোচনা করা যাউক। বৈজ্ঞানিকরা ত' তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। তাহা হইলে একই তথ্য হইতে তাঁহারা কত প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্যুতের দ্বারা আজকাল কত প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ যে কি, তাহা এখনও কোন বৈজ্ঞানিকই জানিতে পারেন নাই। ইহার সম্বন্ধে কত মতই যে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, কত সিদ্ধান্তই যে শুনা যাইতেছে,—তাহার সংখ্যা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বলেন, উহা এক প্রকার তরল পদার্থ (fluid), আবার কেহ বলেন, উহা ইথারের বিস্তারজনিত একটা ভাব ('a kind of ether tension')।' এই বিদ্যুৎসম্বন্ধে বহু মতই প্রচারিত হইতেছে,—কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই নির্ব্যূঢ় জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিতেছে না। আমরা ত' পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবিত হইয়া জড়বাদী হইয়া পড়িতেছি,—কিন্তু সেই জড় পদার্থটা যে কি, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছেন কি? কয়েক বৎসর অন্তরই জড় পদার্থের (matter) স্বরূপ এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি, তাহা লইয়া নূতন নূতন মত প্রচারিত হইতেছে। আজ যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত, কাল তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যজ্য হইতেছে অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি যতই বিকাশ লাভ করিতেছে, ততই এই জগতের তথ্য-সম্বন্ধে জ্ঞান বিকসিত হইতেছে বটে, কিন্তু মানুষ এই সম্বন্ধে চরম জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে না; কস্মিন্‌কালে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ, মানুষের সান্ত বুদ্ধি অনন্তকে আয়ত্ত করিতে অক্ষম।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আত্মবোধে বলিয়াছেন,—

"সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাভিভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥"

আত্মা সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তিনি সকল স্থানে প্রকাশ পান না। স্বচ্ছ বস্তুতে যেমন মূর্ত্তিমান বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বুদ্ধিতেই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কথাটা সূত্রাকারে লিখিত হইলেও উহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বহু বস্তু রহিয়াছে। বস্তুহীন স্থান ব্রহ্মাণ্ডে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও স্বচ্ছ বস্তু (দর্পণাদি) ভিন্ন অন্য বস্তুতে যেমন মূর্ত্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না,—সেইরূপ বুদ্ধি ভিন্ন অন্য বস্তুর উপর আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে না। বুদ্ধিতেই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যের লক্ষণ জ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধিই জ্ঞান প্রতিফলিত করে। এখন এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দর্পণ বা আয়নাখানি যদি ছোট হয়, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বটিও অত্যন্ত ছোট আকারে পড়ে। আর যদি উহা বড় হয়, তাহা হইলে প্রতিবিম্বটিও বড় আকারে পড়িয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধি যদি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অতি ক্ষুদ্রাকারে বা অল্পমাত্রায় জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। যদি বুদ্ধি বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধিতে জ্ঞানও অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত করিবে। কেবল তাহাই নহে। দর্পণে যদি ময়লা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে পতিত প্রতিবিম্ব যেমন অস্পষ্ট এবং বিকৃত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি যদি মলিন হয়, তাহা হইলে জ্ঞানও বিকৃত এবং ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। দর্পণে ময়লা যত অধিক পড়ে, ততই উহাতে পতিত প্রতিবিম্ব যেমন অস্পষ্ট হয়, বুদ্ধি যত মলিন হয়, ততই উহাতে প্রতিফলিত জ্ঞানও ভ্রান্ত বা অস্ফুট হয়। অতিমাত্র মলিন দর্পণে যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনই অতিমাত্র বিকৃত বুদ্ধিতে নির্ম্মল জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় না, বা কোন জ্ঞানই প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সকলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝেন না বা সকলের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন অনুভূতি নাই এবং সকলের ঈশ্বরজ্ঞান সমান নহে বলিয়া যাঁহারা ঈশ্বর নাই, এ কথা বলিতে চাহেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত এবং অসীম। কথাটা বলিলেই কথাটা বুঝা যায় না। এই বিশ্বের বিস্তার সম্বন্ধে আমরা ধারণা করিতে অক্ষম, এ কথা সত্য। সেই বিস্তার

কতখানি, তাহা না বুঝিলেও তাহার সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ত' মানুষের থাকা উচিত। যাঁহারা জ্যোতির্বিজ্ঞান জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই সৌর জগৎ অর্থাৎ সূর্য্যদেব তাঁহার সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভীমবেগে ভেগা (Vega) নামক নক্ষত্রের দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন। সে গতির শান্তি নাই বা বিরাম নাই। সে গতির বেগ কিরূপ, তাহা ধারণা করাই মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। মোটামুটি এ গতির বেগ প্রতিদিনে প্রায় ১০ লক্ষ মাইল বলিয়া ধরা হয়। উহার ঠিক পরিমাণ এখনও যথাযথভাবে ধার্য্য হয় নাই। আর কত কাল ধরিয়া আমাদের এই সৌরমণ্ডল এইরূপ ভীমবেগে ঐ নক্ষত্রের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাও ঠিক হয় নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, যখন বলিযজ্ঞে বামন ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, যখন দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যখন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, যখন কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন এবং যখন বুদ্ধদেব এই ভারতভূমিতে অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও যেরূপ ভীমবেগে আমাদের এই সৌর জগৎ ঐ ভেগা নক্ষত্রের দিকে প্রতিদিন ১০ লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতেছিল, এখনও উহা ঠিক সেইরূপ বেগে উহার অভিমুখে ধাইয়াছে। আমাদের একটি শব্দ লিখিতে—একটি কথা বলিতে—যে সময় অতিবাহিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই সৌর জগৎ শত শত মাইল ঐ গন্তব্য পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। কত দিন ধরিয়া ইহাকে এই ভাবে ছুটিতে হইবে, তাহারও ঠিক নাই। বৈজ্ঞানিকরা কোন কথাই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, এখনও আর প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর লাগিবে; কেহ বলেন, অন্ততঃ ৫ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইবে। যাঁহার কল্পনাশক্তি আছে, তিনিই ভাবুন, এই গতিবেগ কি ভীষণ। এত প্রচণ্ডবেগে সূর্য্যদেব ধাবিত হইলেও তাহার পার্শ্বচর বা অধীন গ্রহ উপগ্রহগণ সমান বেগে এবং সমান বিক্রমে একই নিয়মে নিজ নিজ কক্ষপথ পরিক্রমণ করিতেছে। এই মহাবিশ্বে এইরূপ কোটি কোটি সৌরমণ্ডল নিজ নিজ গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে। যে মহাশক্তির দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে, তাহা ধারণা করা কি মানুষের সাধ্য? উহা ভাবিতে যাইলেও যে আমাদের ধারণাশক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু তথাপি মানুষের মনে উহা জানিবার ইচ্ছা আছে, বুঝিবার জন্য ব্যাকুলতা বিদ্যমান। এই ইচ্ছা এবং ব্যাকুলতা আছে বলিয়াই মানুষ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে সমর্থ হইতেছে। এই অনন্তকে জানিতে যাইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি পদে পদে প্রতারিত হইতেছে, ধারণাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তথাপি মন উহা জানিতে চায়। এই জিজ্ঞাসাই মনুষ্যত্বের বনিয়াদ। আমাদের এই ধারণাশক্তি সসীম বলিয়া এই অসীম জগৎকে আমরা পরিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া ও বিচার করিয়া আমাদের ধারণাশক্তির আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাই। বৈজ্ঞানিকও তাহাই করেন, দার্শনিকও তাহাই করেন। এই সত্য অস্বীকার কেহই করিতে পারেন না। সেইরূপ আমরা এই অসীম আদ্যাশক্তি যাঁহার ইচ্ছায় উদ্ভূত, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ভাবে ধারণা করিবার প্রয়াস পাই। সেই আদ্যাশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইলেই প্রকৃতি বা মহামায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * সেই মহামায়া কর্ত্তৃক উপহত ব্রহ্মই ঈশ্বর। সেই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা মহামায়ারই সৃষ্টি। 'শক্তির্হি জগতো মূলং সৈব জগৎপ্রসবিনী।' অর্থাৎ শক্তিই জগতের মূল এবং শক্তিই জগতের প্রসূতি। সুতরাং এই মহাশক্তির ভিতর দিয়া যে চৈতন্য এই বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারে বিনিযুক্ত, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার তিন রূপ, যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। একে তিন, তিনে এক। এই ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বশক্তি এবং নিয়ন্তৃত্বশক্তি বিরাজিত। পরব্রহ্ম মায়াতীত, সুতরাং নির্গুণ,—ঈশ্বর মায়া-উপহত। সুতরাং সগুণ। হিন্দু-ধর্ম্মের এই ঈশ্বরতত্ত্ব অন্যান্য ধর্ম্মের ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে পৃথক্।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

* নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সংতিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামন্যেঽপরে ত্বণুম্।

২২

অনেক রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, সুন্দরীমোহন ও তাঁহার স্ত্রী চপলার কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

চপলা বলিলেন, "আমি যে আর পুষ্পিতার মুখের দিকে চাইতে পারছি নে; অথচ তোমায় দিয়ে আজ পর্য্যন্ত এর কোন ব্যবস্থাই হলো না।"

সুন্দরীমোহন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, এ সব ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ, তাড়াতাড়ি করতে গেলে সব পণ্ড হয়েযায়।"

চপলা বলিলেন, "প্রথমে বল্‌লে, একটা বৎসর যেতে দাও। চুপ ক'রে রইলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেড় বৎসর হয়ে গেল। আরও কত দিন চুপ ক'রে থাক্‌তে চাও? আরও কিছুকাল কেটে গেলে ওর এইরকম নিঃসঙ্গ জীবনই অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন কি আর ও বিয়ে কর্‌তে চাইবে?"

সুন্দরীমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দেখ, এ গভীর মনস্তত্ত্বের বিষয়। জোর এখানে চলে না। নীরবে অগাধ ধৈর্য্য নিয়ে, এর জন্য অপেক্ষা কর্‌তে হবে। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে—যদি এর জন্য বেশী চেষ্টা কর, তার ফল এই হবে যে, চেষ্টা একবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

চপলা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তোমার ও সব কেতাবী কথা রেখে দাও। চেষ্টা কর্‌লে না কি কোন কায হয় না! ওর মত কত মেয়ের যে সবে বিয়ে হচ্ছে।"

সুন্দরীমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকেও যদি বোঝাতে হয় যে, ২২।২৩ বৎসর বয়সে প্রথমবার বিবাহ ও ঐ বয়সে বিধবা হওয়ার পর বিবাহ, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, তা হ'লে ত নিরুপায়।"

চপলা বলিলেন, "ঘরে ত ও কথা বল্‌বেই। বাহিরে সমাজে বক্তৃতা দেওয়ার সময়, বিধবা-বিবাহের কথায় পঞ্চমুখ। আর নিজের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেবার সময় ওজরের অন্ত নেই। এ নইলে সংস্কারক কি ক'রে হবে? ওর চেয়ে তুমি সাফ ব'লে দাও, তোমার দ্বারা হবে না। আমি নিজে চেষ্টা ক'রে দেখি।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "বেশ, সে ত ভাল কথাই। আমি এটাকে খুব সহজসাধ্য কায ব'লে মনে করছি না. যদিও এর জন্য চেষ্টা আমি ছাড়্‌ছি নে। এতে তোমার যদি বিলম্ব না সয়, বা মনে কর, বিলম্ব হ'লে এ চেষ্টা বিফল হবে, তোমার নিজে চেষ্টা করা মন্দ নয়। তোমার মেয়ের উপর তোমারও ত দায়িত্ব আছে। একলা আমার উপরই বা তুমি নির্ভর কর্‌বে কেন?"

চপলা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বেশ, তাই চেষ্টা কর্‌ব।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "তবে একটা কথা ব'লে রাখি, তাড়াতাড়ি কর্‌তে গিয়ে চেষ্টা পণ্ড করো না। কাযটা খুবই কঠিন, এটা মনে রেখো।"

চপলা বলিলেন, "খুব কঠিন কেন শুনি? আমাদের সমাজে এটা নূতন নয়। তা ছাড়া হিন্দু সমাজেও এটা যে একেবারে চল্‌ছে না, তা নয়।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজে নূতন নয় এবং হিন্দু-সমাজেও এটা কখন কখন অচলভাবে চল্‌ছে, তাও মানি। পুষ্পিতাকে পুনরায় বিবাহ কর্‌তে রাজী করান কেন যে কঠিন, এ বল্‌লে একপ্রকার এ বিবাহের বিরুদ্ধেই বলা হবে। সেজন্য তা হ'তে নিরস্ত হলাম। শুধু এইটুকু তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, ব্রাহ্মসমাজেও এমন অনেক যুবতী বিধবা আছেন, যাঁরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি।"

চপলা বলিলেন, "দ্বিতীয়বার বিবাহ না করার কারণ অনেক স্থলে অনিচ্ছা না হতেও পারে। সুযোগ হয় নি, হয় ত কোন বর পায় নি, নয় ত বা বিধবার অর্থ বা রূপ কিছুই ছিল না। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে এ সবের একটা অসুবিধাও ত নেই।"

সুন্দরীমোহন উদাসভাবে বলিলেন, "নেই স্বীকার করি। তুমি চেষ্টা কর; আমি ও সম্বন্ধে আর তর্ক কর্‌তে চাই নে। দরকার হ'লে আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌ব।"

পরদিন প্রাতে চপলাসুন্দরী মনঃস্থির করিয়া পুষ্পিতার বিবাহের চেষ্টায় নামিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুষ্পিতাকে একা ডাকিয়া চপলা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, আজকাল সরোজ তেমন আসেন না কেন?"

পুষ্পিতা একটু যেন বিরক্তস্বরে বলিল, "আমি তা কি ক'রে জান্‌ব, মা ?"

চপলা বলিলেন, "এ কথায় বিরক্ত কেন হচ্ছ মা? সরোজ তোমার অসুখের সময় যা করেছে, তেমন আমরা কেউ কর্‌তে পারি নি। তা ছাড়া তুমি সরোজের দুঃখময় জীবনের সব চেয়ে বড় কথা কি, তা জান না, মা।"

পুষ্পিতা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তুমি কিসের কথা বল্‌ছ, মা ?"

চপলা গৃহান্তর হইতে একখানি পত্র আনিয়া পুষ্পিতার হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ মা। আমি নিজে কিছু বল্‌তে চাই নে।"

চপলা চিঠিখানা পুষ্পিতার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

একখানা খাম, উপরে পুষ্পিতার পিতার ঠিকানা লেখা। চিঠিখানা খুলিয়া পুষ্পিতা পড়িল।

"পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার যুক্তিও নির্দ্দোষ এবং নির্ভুল। হিমাদ্রির মত সর্ব্বাংশে উত্তম পাত্র সত্যই অতি দুর্লভ। পুষ্পিতাকে লাভ করা পরম সৌভাগের কথা সন্দেহ নাই। সেই সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত হইলেও আমার প্রিয়তম বন্ধু হিমাদ্রি যে পুষ্পিতাকে লাভ করিবেন, ইহা আমার দুর্ভাগ্যের অন্ধকারের মধ্যেও আলোকের প্রকাশ। আমার বিনীত নিবেদন—আমি যে পুষ্পিতা দেবীকে কখন প্রার্থনা করিয়াছিলাম বা তাঁহার অনুরাগী ছিলাম, এ কথা যেন হিমাদ্রির কাণে কিছুতে না উঠে। উঠিলে তাহার উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। আপনার ইচ্ছামত আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার জীবনের এই অংশটি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভুলিবার চেষ্টা করিব। ভগবৎকৃপায় যেন আমি সফল হই।

আপনার স্নেহার্থী—সরোজনাথ।"

পত্র পড়িয়া পুষ্পিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সরোজের এত দিনকার পরম স্নেহপূর্ণ বাবহার সত্ত্বেও হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার একটা অর্থ সে এত দিন পরে খুঁজিয়া পাইল। সরোজ তাহাকে ও তাহার স্বামীকে—দু'জনকেই আন্তরিক ভালবসিত, এ কথাও আজ তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এত দিন পরে পুষ্পিতা বুঝিতে পারিল, কেন সরোজকে এক এক সময়ে বড়ই ক্লিষ্ট ও কাতর দেখাইত, কেন তাহার মুখের করুণ গান শুনিতেই সরোজের নয়নে অশ্রু দেখা দিত। এক এক সময়ে সরোজের চক্ষুদ্বয়ে কিসের যেন এক আলোক সে দেখিতে পাইত; সে আলোক তাহা হইলে অনুরাগেরই আলোক সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা দিনের জন্যও সে এত বড় একটা কথার এক কণা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। বন্ধুর প্রতি প্রণয় ও বন্ধুর বিশ্বাসকে সরোজ কিছুতে ম্লান করে নাই,—ইহা জানিয়া তাহার প্রতি সম্ভ্রমে পুষ্পিতার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পুষ্পিতা চিঠিখানা দুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। তার পর চিঠিখানি সযত্নে ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে রাখিয়া দিল। একবার মনে হইল, স্বামী কি এ কথা জানিতেন? সেই জন্য কি তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে এই অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন ?

এই সময়ে চপলা আবার ফিরিয়া আসিলেন; পুষ্পিতার মুখের পানে একবার চাহিলেন। মুখে কোনরূপ কঠোর ভাব নাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি পড়েছিস্, মা ?"

পুষ্পিতা মাথা নীচু করিয়া পত্রখানির দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল,—"হঁা।"

চপলা বলিলেন, "ও চিঠি সেই থেকে তোমার বাবার হাত-বাক্সে তোলা ছিল। আজ আমি বার ক'রে এনে তোমাকে দেখাচ্ছি। এ কথা তোমার বাবাও কাউকে বলেন নি, সরোজও এর পর থেকে এ কথা কোন দিন উচ্চারণ পর্য্যন্ত করে নি। সরোজ যে কি ধরণের লোক, এর পর আর তোমাকে তা বল্‌তে হবে না,—মা।"

পুষ্পিতা সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সব কথা বাবা কখন ওঁকে বলেন নি, মা ?"

চপলা বলিলেন, "না মা! আমাকে ছাড়া এ কথা তিনি কোনদিনই কাহাকেও বলেন নি। চিঠিখানি তিনি পেয়ে প'ড়ে আমাকে পড়ান্। তার পর আবার একখানা বড় খামে রেখে শীলমোহর ক'রে বাক্সে রেখেছিলেন। আজ আমি তাঁর মত নিয়ে শীলমোহর ভেঙ্গে এই চিঠি নিয়েছি। ঐ দেখ সেই বড় খাম।"—বলিয়া একখানা বড় মোটা

কাগজের খাম পুষ্পিতার সম্মুখে ধরিলেন। খামখানিতে তখনও শীলমোহরের দাগ ছিল।

পুষ্পিতার বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে বুঝিল, স্বামী তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়াই, শুধু রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভাবিয়াই, মৃত্যুকালের সেই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। সে চিঠিখানি মাতার হাতে ফেরৎ দিল।

চপলা চিঠি লইয়া বলিলেন, "এখন সরোজের কথাটা ভেবে দেখ, মা! সরোজ তোমাকে হিমাদ্রির থেকেও বেশী ভালভাস্‌ত। তুমি এতে সঙ্কোচ করো না, মা! হিমাদ্রির হাতে তোমাকে দেওয়া হবে, জান্‌বামাত্র তৎক্ষণাং সে নিজের সমস্ত দাবী উঠিয়ে নিলে। একবার বল্‌লেও না যে, সে তোমাকে কতখানি ভালবাসে,—তোমাকে না পেয়ে তার কতখানি ক্ষতি হবে। এর পরেও, যেমন সে হিমাদ্রির বন্ধু ছিল, চিরদিন তেমনই রহিল। কোন দিন তোমাদের কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। তোমরা দুজনেই সরোজকেই তোমাদের সব চেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী মনে করেছিলে, কিন্তু সেই থেকে সরোজ সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী হয়ে রইল। সরোজের মত সর্ব্বাংশে সুপাত্রের জন্য সব রকমে সুপাত্রীর বড় অভাব হ'ত না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে বিবাহের নাম পর্য্যন্ত কর্‌লে না। আর হিমাদ্রি সরোজকে এত ভালবাস্‌ত,—এত বিশ্বাস কর্‌ত যে, মৃত্যু-কালে সে একরকম তোমাকে তার হাতে তুলে দিয়ে গেল। সরোজ ছাড়া অন্য কেউ হ'লে এ কথাটার উল্লেখ তোমার কাছে নিশ্চয়ই কর্‌ত। কিন্তু তুমিই সব চেয়ে বেশী জান যে, সে এ বিষয়ে কি রকম নির্ব্বাক্ আছে!"

এতক্ষণে পুষ্পিতা কথা কহিল। বলিল, "সরোজ বাবু মহৎ, আর তাঁর কোন বিষয়ে কোন দোষ নেই,—এ আমি স্বীকার কচ্ছি, মা। কিন্তু তাঁর কথা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ। যিনি আমাকে সবখানি দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্য মৃত্যুকালে এ কথা ব'লে যান, তাঁর প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নেই?"

চপলা বলিলেন, "কেন থাকবে না, মা? তাঁর প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হবে, তাঁর শেষ ইচ্ছা পালন করা। আর সেই সঙ্গে তোমার বাপ-মার ইচ্ছাও পালন করা হবে।"

হিমাদ্রির মৃত্যুর পর বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে প্রকাশ্যে এই প্রথম অনুরোধ করা হইল। কিছুক্ষণ পুষ্পিতা স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর তার দুই চক্ষু বহিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

চপলা সস্নেহে কন্যার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "কেন এত কাতর হচ্ছ, মা? যত দিন সে বেঁচে ছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত ইচ্ছা ক'রে তার কাছ-ছাড়া হও নি বা তার প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি কর নি। সে যাবার দিন এত ক'রে তোমায় অনুরোধ ক'রে গেল, তুমি যেন সরোজকে বিবাহ করো। সে নির্ব্বোধ নয়, না ভেবে কোন কায কর্‌ত না, একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌ত না। সে যখন সবদিক্ ভেবে তোমাকে অনুমতি,—না অনুরোধ—ক'রে গেছে, তখন তার কথা না রাখ্‌লে তার আত্মা কি তৃপ্ত হবে? সে কি ভাব্‌বে না—আমি আজ কাছে নেই, তাই তার নিজের ইচ্ছাটাই বড় হ'ল?"

পুষ্পিতা বলিল, "মা! তুমি অমন ক'রে বোলো না; তাঁর কোন কথার আমি অমান্য করেছি, এ মনে হলেও আমার বুক ফেটে যায়। যত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, আমার একটা সামান্য ইচ্ছাও তিনি অপূর্ণ রেখে যান নি। কিন্তু তাঁর কথা মান্‌তে গিয়ে, তাঁকে ভুলে যাব, আবার অপরের স্ত্রী হব, এ কি নারীর কর্ত্তব্য?"

পুষ্পিতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

চপলা থামিয়া গেলেন। আর বেশী কথা বলা আজ সঙ্গত নহে, তিনি বুঝিলেন। তার পর পুষ্পিতাকে ছোট মেয়ের মত বুকের মাঝে টানিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।



মার্কিণ ও সমর-ঋণ

এই ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রাপ্য সমর-ঋণ য়ুরোপীয় দেনদার শক্তিপুঞ্জকে পরিশোধ করিতে হইবে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হুভার এজন্য জোর তাগিদ দিয়াছেন। বৃটেন ও ফ্রান্স দিন পিছাইয়া দিবার জন্য অথবা সম্ভব হইলে ঋণ মকুব করিবার জন্য—মার্কিণকে যুক্তকরে গললগ্নীকৃতবাসে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে। মার্কিণ তিন বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়াছেন, আর করিবেন না, —এই স্পষ্ট কথা বলিয়া দিয়াছেন।

তবে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এইটুকু দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদি য়ুরোপ সত্যসত্যই যুদ্ধসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া অস্ত্রসঙ্কোচসাধন করে, কেবল মাত্র দেশের শান্তিরক্ষার প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য-সামন্ত ও রণ-সম্ভার রাখিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তিনি ঋণ-মকুবের বিষয় বিবেচনা করিবেন। কিন্তু সকলে মুখে শান্তি শান্তি করিয়া ক্রমাগত আপাদমস্তক রণসজ্জায় সাজিয়া থাকি-বার প্রতিযোগিতা করিলে তিনি কোনও রূপ দয়াপ্রদর্শনই করিবেন না।

অবশ্য মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবার মার্কিণের সাধারণ নির্ব্বাচনে অধিকাংশ কেন্দ্রে জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের শেষ নির্ব্বাচনফল তাঁহারই পক্ষে সন্তোষজনক হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মিঃ হুভার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই বলবৎ থাকিবে। পরন্তু মিঃ রুজভেল্টও এ বিষয়ে তাঁহার নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপীয় শক্তিরা মার্কিণের দ্বারে কান্নাকাটি করিয়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন না।



ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট

বৃটেনের দুই এক জন রাজনীতিক বর্ত্তমান ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন,—"তোমরাই বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছ। এত ধর্ম্মজ্ঞান তোমাদের যে, অন্যান্য শক্তিরা মার্কিণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না বলিয়া সাফ হাত গুটাইল, কিন্তু তোমরা ঠিক ওয়াদা-মত এ যাবৎ টাকা গণিয়া আসিতেছ। দিবার সামর্থ্য না থাকিলেও ঘরের বেকারবৃদ্ধি করিয়া পরের ঋণ শোধ করা কিরূপ বাপু ?"

অপর পক্ষে কোন কোন রাজনীতিবিশারদ অর্থনীতিক বলিতেছেন,—বর্ত্তমানে জগতের অর্থের বাজারের যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মার্কিণের পক্ষে প্রাপ্য সমর-ঋণ মকুব করা ভিন্ন জগতের বাঁচিবার অন্য উপায় নাই। মার্কিণ বিলক্ষণ জানে যে, জিদ করিয়া চাপিয়া ধরিলেও টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই ; কেন না, য়ুরোপের টাকার বাজারের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা এত মন্দ যে, প্রায় সকল জাতিই দেউলিয়া হইবার উপক্রম করিতেছে, সুতরাং টাকা দিবে কোথা হইতে ? ইচ্ছা থাকিলেও কেহ দিতে পারিতেছে না। বৃটেন অবশ্য দিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তাহার পাউণ্ডের মূল্য কি দাঁড়াইবে, বা তাহার বেকার ও বাজেট সমস্যা কিরূপ আকার ধারণ করিবে ? মার্কিণও যে এ কথা বুঝে না, তাহা নহে। তবে তাহার দেশেরও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যব-সায়-বাণিজ্যের অবস্থাও সুবিধাজনক নহে ; কেন না, য়ুরোপের যদি অর্থাভাব হয়, তাহা হইলে মার্কিণ তাহার মাল বেচিবে কোথায় ? ইহা সত্য যে, মার্কিণ ঋণের টাকা আদায় করিয়া এবং ফরাসী-জার্ম্মাণীর নিকট যুদ্ধের অপচয় বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া আপন আপন তহবিলে অনেক সুবর্ণ সঞ্চয় করি-য়াছে। ফলে জগতের টাকার বাজারের স্থৈর্য্য (equilibrium) নষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রায় অর্দ্ধ জগৎ সুবর্ণমান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে মার্কিণের ব্যবসায় না চলিলেই বা য়ুরোপ তাহার ঋণ শোধ দিবে কিরূপে ? জগৎই বা দাঁড়াইবে কিরূপে ?

এ সকল অতি বড় সমস্যার কথা। বড় বড় অর্থনীতিবিশারদ রাজনীতিক এজন্য মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহারা দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করেন। জগৎকে বাঁচাইতে হইলে, (১) মার্কিণকে একেবারেই ঋণ আদায়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে,

সমগ্র য়ুরোপীয় শক্তিকে সাম্রাজ্য, উপনিবেশ, জমীদারী, স্বার্থ, ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ভেদাভেদ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া সত্যযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাক্তার ওয়ারেণ বলিতেছেন,—"জগতের আর্থিক দুরবস্থার ফলে মার্কিণ কৃষাণ ও কৃষিজপণ্য-বিক্রেতাদিগকে ১ শত ৫০ কোটি ডলার মুদ্রা লোকসান দিতে হইয়াছে। যদি জগতের এই আর্থিক দুরবস্থার অবসান করা কোনরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে লোকের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তখন মার্কিণ পণ্যবিক্রেতারা য়ুরোপের বাজারে খরিদ্দার পাইবে। অতএব মার্কিণের বিরাট কৃষি-বাণিজ্যের পণ্য সমূহ যাহাতে জগতের বাজারে কাটিতে পারে, তাহাই দেখা এখন মার্কিণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যদি মার্কিণ একবার বুঝিতে পারে যে, তাহার পণ্যের খরিদ্দার পাইবে, তাহা হইলে অনায়াসে সে তাহার প্রাপ্য ঋণের টাকা মকুব করিতে পারে।"

এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলে অপর পক্ষে বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রমুখ শক্তিপুঞ্জেরও ত কিছু ত্যাগস্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঘরে অভাব, বাহিরে দেনদার,—অথচ লম্বাই চওড়াই ত কেহ ছাড়িতে চাহেন না। সাম্রাজ্যগর্ব্ব, ইজ্জৎ, একচেটিয়া অধিকার, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ভেদাভেদ, ঈশ্বরের জানিত জাতি বলিয়া অপরের উপর মুরুব্বিয়ানা—এ সকল ত ঘুচিতেছে না। শান্তি শান্তি রব আছে বটে, জাতিসঙ্ঘের বৈঠক বসিতেছে বটে, অস্ত্রসংবরণের কথা উঠিতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহ একচুল স্বার্থ বা তেজ ছাড়িতে সম্মত কি?

ডি-ভ্যালেরা ও আইরিশ জাতি

বৃটেনের সহিত মনোমালিন্যের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রি ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বৃটেনে আয়ার্ল্যাণ্ডের আমদানী বহু পণ্যের উপর অসম্ভবরূপ শুল্কবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। যে সকল আইরিশ কৃষাণ ও শিল্পী ব্যবসায়ী বৃটেনে গৃহপালিত বা আহার্য্য পশু, মাংস, মাখন ইত্যাদি রপ্তানী করিতেন, তাঁহাদিগের উপর নূতন শুল্ক চাপিয়া বসায় তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে এবং সেজন্য তাঁহারা বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছেন। প্রেসিডেণ্ট ডি-ভ্যালেরা ইহার মূল কারণ, কেন না, তিনিই বৃটেনের প্রাপ্য টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে বহুসংখ্যক কৃষাণ ও ব্যবসায়ী তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ডাবলিন সহরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিযান করিয়াছিল।

ইহাতে অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এইবার আইরিশ পার্লামেণ্ট 'ডেলে' এ বিষয়ে তীব্র আলোচনা হইবে এবং হয় ত ডি-ভ্যালেরা সেই তোড়ের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইবেন। হয় ত ডেলের সদস্যগণ তাঁহার কার্য্যের নিন্দা (Censure motion) করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সবই উল্টাইয়া গেল।

১৫ই নভেম্বর ডেলের অধিবেশন হইল। আয়ার্ল্যাণ্ডের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা পূর্ণ সংখ্যায় ডেলে উপস্থিত হইলেন। কি হয়, কি হয়, সকলের মনেই এই উৎকণ্ঠা। প্রথমেই কথা উঠিল, আয়ার্ল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত মদের কারবারের মালিক শুল্কের ভয়ে ইংলণ্ডে কারখানা তুলিয়া লইয়া যাইতেছেন বলিয়া কথা রটিয়াছে। এরূপ আরও অনেকে করিতে পারেন। ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের কি দশা হইবে? সরকার বৃটেনে আয়ার্ল্যাণ্ডের রপ্তানী মালের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে 'বাউন্টি' বা সাহায্য প্রদান করুন, অন্যথা ব্যবসা আর টিকিবে না। কৃষি-সচিব বলিলেন,—রপ্তানী ভেড়ার জন্য সরকার 'বাউন্টি' দিতে প্রস্তুত নহেন। সরকারের বিপক্ষ দল বলিলেন,—তাহা হইলে আইরিশ মেষ-ব্যবসায়ী মহাজনরা মারা যাইবে। এইরূপ অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডা হইল।



ডি-ভ্যালেরা

শেষে সরকারের বিপক্ষ দলের নেতা মিঃ কস্‌গ্রেভ (যিনি মিঃ ডি-ভ্যালেরার পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ড শাসন করিয়াছিলেন) Censure motion অথবা সরকারের কার্য্যের নিন্দার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন, যদি দেশ এই সরকারকে শাসনপীঠ হইতে সরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। এই সরকারের কল্যাণে দেশে ভীষণ কষ্ট ও ক্ষতি হইবে। সসম্মানে বৃটেনের সহিত সন্ধি করিবার পূর্ণ সুযোগ এই সরকার অবিমৃশ্যকারিতার ফলে হারাইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ডি-ভ্যালেরা উত্তরে বলিলেন, "আইরিশ জাতি যে সরকারকে পছন্দ করিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছে, সেই সরকারকে আসনচ্যুত করিয়া বৃটেনের সমর্থক সরকারের প্রতিষ্ঠা করা বৃটেনের উদ্দেশ্য।"

উভয় পক্ষে আরও কথা-কাটাকাটি হইল। শেষে ভোটের উপর উভয় পক্ষ শেষ মীমাংসার জন্য নির্ভর করিলেন ভোটের ফলে দেখা গেল যে, উভয় পক্ষই প্রায় সমান সমান, তবে মিঃ ডি-ভ্যালেরার পক্ষে হইল ৭৫টি, মিঃ কস্‌গ্রেভের পক্ষে ৭০টি। সুতরাং বুঝা গেল, আইরিশ জনসাধারণ ডি-ভ্যালেরার ব্যবস্থায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও এখনও ডি-ভ্যালেরার পক্ষাবলম্বী।

ডি-ভ্যালেরা সুতরাং এইবার দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন।

অস্ত্র-সংবরণ

জেনিভার শান্তি-বৈঠকে শক্তিপুঞ্জের অস্ত্র-সংবরণের বিচার আলোচনা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতেছে, কিন্তু আজিও সুমীমাংসা কিছু হইল না। শক্তিপুঞ্জই জাতিসঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন, তাঁহারাই শান্তি-বৈঠক বসাইয়াছেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে শক্তিপুঞ্জ জগদ্বাসীকে জানাইয়াছিলেন যে, সকল যুদ্ধের অবসানের নিমিত্ত এই যুদ্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। যুদ্ধান্তে জগতের সকল ক্ষুদ্র পরাধীন জাতিকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে, ইত্যাদি।



মিঃ বলড্‌ইন

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, শান্তি-প্রতিষ্ঠা বা অস্ত্র-সংবরণের প্রস্তাব উঠিলেই তাহার বিপক্ষে বড় বড় অন্তরায় উপস্থিত হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যগর্ব্ব, উপনিবেশলিপ্সা, রাজ্য-বিস্তারলালসা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ভেদাভেদ, জাতিগত বৈষম্য, ইজ্জৎ ও একচেটিয়া অধিকার—এক একটি যেন হিমালয়ের মত অভ্রভেদী ব্যবধান!

ফরাসী প্রস্তাব করিলেন, সকল শক্তিকেই জাতিসঙ্ঘের নামমাত্র হেফাজতে আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভার জমা রাখিতে হইবে। যে জাতি আক্রান্ত হইবে, জাতিসঙ্ঘ তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবেন। এই প্রস্তাবটি একবারে কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া সকল দিক হইতে পরিত্যক্ত হইল। বৃটিশ পক্ষের 'টাইমস' পত্র এই কল্পনার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল,—"জার্ম্মাণী সকলের সহিত সমান অবস্থায় থাকিতে চাহিতেছে। জার্ম্মাণী যে ভাবে এখন তাহার সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার সহিত অন্যান্য শক্তির কোন চিরস্থায়ী পার্থক্য যাহাতে না থাকে, তাহারই জন্য বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিণ শক্তিরা একযোগে উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু ফরাসী যে ভাবে জাতিসঙ্ঘের দ্বারা সামরিক ও বে-সামরিক বিমানশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে বলিতেছেন, তাহাতে জাতিবর্গের মধ্যে শীঘ্র আপোষ হওয়া অসম্ভব। কোন্ শক্তি বলপ্রকাশ করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কে?"

মিঃ বলডুইন বৃটিশ পক্ষ হইতে সামরিক বিমানযুদ্ধ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিমানযুদ্ধের ফলে বে-সামরিক শান্তিপ্রিয় বহু গ্রামনগরবাসীর বিপদ ও ক্ষতি হয়। বর্ব্বর প্রথায় অল্পের অপরাধে বহুজন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। ইহা ন্যায়ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে।

মার্কিণ পক্ষ য়ুরোপের কথায় না থাকিলেও বলিয়াছেন, ডুবো জাহাজের যুদ্ধ তুলিয়া দেওয়া উচিত। বিষবাষ্পাদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় মারণাস্ত্র সংবরণ করার প্রস্তাব রাসিয়া প্রমুখ একাধিক শক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

প্রস্তাব এমন অনেক হইতেছে। কিন্তু আপত্তিও উঠিতেছে বিস্তর। লর্ড হ্যালসবারি পার্লামেণ্টের লর্ড-সভায় বলিয়াছেন, বৃটিশ প্রতিনিধিরা জেনিভায় যে কথাই বলুন, যেন পূর্ব্বাহ্নে পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া পাকা কথা না দেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের এ ভাবে স্বাধীনতাহরণে লর্ড সিসিল এবং লর্ড হেলস্যাম আপত্তি তুলিয়াছেন।

মার্কিণ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, যদি য়ুরোপীয় শক্তিরা যথার্থ অস্ত্র-সংবরণের সুবন্দোবস্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে তিনি ঋণের প্রাপ্য টাকা কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করিয়া লইবেন।

কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব পালিত হইবে কি? ইজ্জৎ ও সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ণ থাকিতে উহা একবারেই অসম্ভব। ব্যবসায়-বাণিজ্য ডুবিল, অর্থের টানাটানিতে অনেকের উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা, অথচ কেহ কাহারও কোট ছাড়িতে চাহেন কি? ইটালীর নিয়ামক মাসোলিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, "যাহারা সকল যুদ্ধের অবসান কর বলিয়া চেঁচাইতেছে, তাহারা নিরেট বোকা (idiots)! অর্থাৎ যাহা হইবার নহে, তাহা হউক বলিয়া জিদ করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মাত্র।

সে দিন লণ্ডনের Royal Naval Volunteers Reserve নৌ-সৈনিকদের বার্ষিক মিলন-সভায় এড্‌মিরাল সার চার্লস ম্যাডেন বলিয়াছেন, "এই প্রকৃতির জঘন্য নারকীয় বৈঠকগুলির অধিবেশনের অর্থ কি? সবাই চাহে বৃটেনের নৌ-শক্তি খর্ব্ব করিতে। বহু জাতি আমাদিগকে হীনবল দেখিতে চাহে। অথচ রণসাজে সাজিয়া থাকা আমাদের নীতি, যেহেতু রাসিয়ান সোভিয়েট ও নবশক্তিমান জার্ম্মাণী পররাজ্য আক্রমণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।" শকুনি-গৃধিনী ভাগাড়ে পচা মরা গরু পাইলে আনন্দিত হয়। নৌ-সেনাপতি সার চার্লসও যে রণসাজে সাজিয়া থাকিতে ভালবাসিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সেই সভায় হংসমধ্যে বকো যথা হইয়াও তরবারি (না থাকিলেও) আস্ফালন করিয়াছেন। তিনি সাম্রাজ্যের পরম শুভানুধ্যায়ী রাজনীতিকরূপে গম্ভীরচালে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছেন,—"রাম! রাম! তাও কি হয়? আমাদের সাম্রাজ্য কিছুতেই অস্ত্র সংবরণ করিতে পারে না। সুখাসনে উপবিষ্ট রাজনীতিক বক্তাদের নীতি সাম্রাজ্যের শক্তিসংবরণ নীতির সম্বন্ধে একবারেই অনভিজ্ঞ। যাহারা অস্ত্রসংবরণ করিতে বলে, তাহারা শান্তিকামী বলিয়া আপনাদিগকে জাহির করে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা কাপুরুষ।"

এ বয়সে মহারাজাধিরাজ যে বীরপুরুষ হইয়াছেন, ইহা খুবই

আনন্দের কথা। তিনি ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছেন। প্রথম-যৌবনে "My relations with the British Raj are cordial and friendly," অর্থাৎ বৃটিশ রাজের সহিত তখন তাঁহার রাজ্যের সম্বন্ধ খবই আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তাহার পর মধ্য-যৌবনে তিনি সাম্রাজ্যের chorus girl হইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে সাম্রাজ্যের বীরপুরুষ হইলেন! হয় ত ইহার পর আরও দুই চারিটা ধাপও দেখা দিবে।

জার্ম্মাণীর গণতন্ত্র

যে জাতি বহুদিন স্বৈরাচারমূলক শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিয়াছে, তাহার পক্ষে গণতন্ত্রমূলক শাসন হজম করা দুই এক দিনের কায নহে। নবগঠিত জার্ম্মাণ সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক দলাদলির ব্যাপার দেখিয়া নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই বলিবেন যে, জার্ম্মাণী এখনও পূর্ণ গণতন্ত্রমূলক শাসনের উপযুক্ত হয় নাই।

ভন প্যাপেন জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের চ্যান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জার্ম্মাণীতে রাজনীতিক দলাদলি এত অধিক যে, বোধ হয়, জগতে তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। সোসালিষ্ট পার্টি, সেণ্টার পার্টি, পিপল্‌স পার্টি, খৃষ্টান সোসাল, বাভেরিয়ান পার্টি, ন্যাশানালিষ্ট,—এমন কত যে দল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। জার্ম্মাণ রিস (পার্লামেণ্ট) এই দলাদলির ফলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, জার্ম্মাণী বিভিন্ন দলের দ্বেষাদ্বেষি ও রেসারেষির ফলে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের সহায়তায় চ্যান্সেলার ভন প্যাপেন কড়া শাসন করিয়া অনেকটা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু নাজিদল তাঁহার এমন শত্রুতা করিতে লাগিল যে, তাঁহার স্বপদে তিষ্ঠিয়া থাকা দায় হইল; পরন্তু তাঁহার নিজের দলের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরিল। কাযেই বাধ্য হইয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

এখন কে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন এবং জার্ম্মাণীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ নাজি দলের দলপতি হার হিট্‌লারকে ডাকাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলেন, তিনিও সম্মত হন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এজন্য পাঁচটি সর্ত্ত দিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য মান্য করা হইবে এবং মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহার অনুমোদিত হইবে, প্রধান সর্ত্ত। তাহার পর দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদে জেনারল ভন শ্লেসারকে এবং বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে ব্যারণ নিউর‍্যাফকে মনোনয়ন করিতে হইবে, ইহাও এক প্রয়োজনীয় সর্ত্ত। অর্থাৎ সকল ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া না চলিলে প্রধান মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা সহজ হইবে না।

কিন্তু এ সকল কঠিন সর্ত্ত পালন করিতে গেলে রিসে নাজি-নেতার স্বপক্ষে ভোটের প্রাধান্য বজায় রাখা বড়ই কঠিন। হার হিটলার বিলক্ষণ জানেন যে, সোসালিষ্ট ও সেণ্টার পার্টিরা তাঁহাকে প্রাণপণে বাধা দিবে। তিনি রিসব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হার স্যাক্টের ও তাঁহার নিজের অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ আঁটিতেছিলেন। যদি তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন ভাল, নতুবা জার্ম্মাণীতে গণতন্ত্র-শাসনের অবসান হইবে, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গকে সকল দল হইতে বাছাই করিয়া নিজস্ব মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ সেণ্টার পার্টির দলপতি ডাক্তার কেয়ামকে তিনি চ্যান্সেলার করিবেন। হার হিটলারই হউন বা ডাক্তার কেয়ামই হউন, যিনিই প্রধান মন্ত্রী হউন, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গই সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবেন, তাঁহার হুকুমেই সকলকে চলিতে হইবে। মজা এই, ভারতেও রাজ-নীতিক দলাদলি আছে বলিয়া ভারত গণতন্ত্র-শাসনের অনুপযুক্ত বলা হয়! শেষ খবর, জেনারল শ্লেসার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, অর্থাৎ হিণ্ডেনবার্গই ডিক্‌টেটার হইলেন।

জাতিসঙ্ঘ ও জাপান

জগতের নাবালক নালায়েক জাতিগণের 'অভিভাবকরূপে' প্রতীচ্যের প্রবল শক্তিরা নানা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে রাজ্যজয়ই তাঁহার ভিত্তি ছিল, এখন জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে জাতিসঙ্ঘের Mandate বা অনুজ্ঞা বলিয়া একটা নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনুজ্ঞাবলে 'অভি-ভাবকরা' নাবালকদের রাজ্য তাহাদের মঙ্গলের জন্য, পরন্তু জগতের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের হইয়া শাসন করিয়া থাকেন! এ পরম অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ই না কি তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া এই গুরু দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন।

প্রাচ্য জাতির মধ্যে জাপান এ বিষয়ে প্রতীচ্য গুরুর অনুকরণ করিয়া পাকাপোক্ত 'অভিভাবক' হইয়াছেন। তাঁহার জনসংখ্যা হুহু বাড়িতেছে, আহার্য্যেরও অভাব হইতেছে। খাস জাপানে তাহাদের স্থান কোথায়, তাহাদের আহারই বা জোটে কোথা হইতে? রাসো-জাপ যুদ্ধের পর দ্বীপবাসী জাপান এসিয়া মহাদেশের খানিকটা অংশে শুভপদার্পণের সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। কোরিয়া, পোর্ট আর্থার, লাইওয়াং উপদ্বীপ—শনৈঃ পন্থা, গুরুদের মধুর Peaceful penetration নীতি!

তাহাতেও কুলাইল না। মাঞ্চুরিয়াটি বেশ সুন্দর মোলায়েম-রূপে উদরস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষার সকল লক্ষণই দেখা দিয়াছে। তাঁহার গুরুরা যে ভাবে বেশ অলক্ষ্যে Peaceful penetration করিয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে শিষ্যের তাহাতে কোনও ত্রুটিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। একই কথা,—মাঞ্চুরিয়ার অরাজকতা, চীনা দস্যুরা বিদেশীদের শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে দেয় না, জাপান সকল জাতির পক্ষ হইতে তথায় শান্তিরক্ষা করিতেছে,—ইত্যাদি কারণ-প্রদর্শন। জাপানের যে ইহাতে কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই, তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু দুষ্ট চীন সে কথা শুনে না, সে ক্রমাগত জাতিসঙ্ঘের দরবারে অভিযোগ করিতে লাগিল। ফলে জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশে লীটন কমিশন বসিল। বিলাতের লর্ড লীটন তাহার চেয়ার-ম্যান হইলেন। লীটন কমিটী মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন। তাঁহাদের রিপোর্ট জাপানের অনুকূল হইল না। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় যে 'স্বাধীন' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কমিটী তাহা অনুমোদন করিলেন না.

তাঁহারা জাতিসঙ্ঘের তরফ হইতে মাঞ্চুরিয়ার শান্তিরক্ষা হউক, এইরূপ আভাস দিলেন।

জাতিসঙ্ঘ জেনিভার বৈঠকে মাঞ্চুরিয়ায় চীনের নামমাত্র প্রভুত্ব রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অমনই জাপানের প্রতিনিধি মিঃ মৎসুয়োকো রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "মাঞ্চুরিয়ার সহিত জাপানের প্রীতিবন্ধনের তুলনা জগতের কুত্রাপি নাই। এ সম্বন্ধ জাপান ত্যাগ করিতে পারে না। আজ ৮ মাসকাল যাবৎ জাপান মাঞ্চুরিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন জাপান উহা অরাজকতার হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন না।" চীনের পক্ষ হইতে ডাক্তার ওয়েলিংটন কু বলিয়াছেন, "জাপান এসিয়া জয় করিবার দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই হেতু সে চীনকে সম্মিলিত ও শক্তিশালী হইতে দিতে চাহিতেছে না। কিন্তু চীনও বিনা যুদ্ধে জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও ছাড়িয়া দিবে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ চীন জাপানকে মাঞ্চুরিয়ায় বাধা দিবে।"

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় চীন ও জাপানে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি পক্ষে ৩৫ হাজার করিয়া সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। জাপান বলিতেছেন, তাঁহারা রণে জয়লাভ করিয়াছেন।

অবশ্য চীনের পক্ষে জাতীয় দলের সৈন্যরা এ যুদ্ধে অবতরণ করে নাই, চীনা ভলান্টিয়াররাই স্বাধীনতা-যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছে। জাপানীরা বলিতেছেন, উহারা দস্যু, চীন গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করিতেছেন।

সে যাহাই হউক, এই সংঘর্ষ কি অবশেষে সর্ব্বনাশকর বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিতেছে? য়ুরোপের দক্ষিণে ক্ষুদ্র বোসনিয়া রাজ্যের সেরাজেভো সহরে এনার্কিষ্ট যুবক প্রেভিলো প্রিন্সেপের গুলীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমগ্র বিশ্বে কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং অতি সামান্য ব্যাপার হইতে যখন ইহা সম্ভব হইতে পারে, তখন মাঞ্চুরিয়ার এই ক্ষুদ্র সংঘর্ষণের ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই সূত্রে জাতিসঙ্ঘের ক্ষমতা খুবই বুঝা গিয়াছে। তাঁহাদের নির্দ্দেশের (Mandate) সার্থকতা কি? ইটালীর মসোলিনির ধমকের ভয়ে একবার জাতিসঙ্ঘ মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। ফরাসীও একবার তাঁহাদের আজ্ঞা প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। প্রতীচ্যের মন্ত্রশিষ্য জাপানই বা পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? তবে অনর্থক জেনিভার এই প্রহসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন কি?

খৃষ্টানের বহু বিবাহ

প্রাচ্যের পুরুষদের একাধিক বিবাহের প্রথা বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতীচ্য প্রাচ্যকে অসভ্য এবং তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে নিকৃষ্ট বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন এখন কিরূপ শিথিল, বিবাহব্যাপারটাকে তাঁহারা যে স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের ঘর-সংসারের সুখশান্তি কিরূপ ব্যাহত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের মনীষী লেখকদিগের রচনাতেই পরিস্ফুট, পরন্তু তাঁহাদের দেশের 'পুলিস গেজেটের' পারিবারিক মামলার বিবরণ-সমূহ পাঠ করিলে বিশেষরূপে জানা যায়। তাঁহাদের Co-edecation, Companionate marriage, Foundling Hospitals প্রভৃতির বিস্তর পরিচয় আমরা দিয়াছি, তাহা হইতেও তাঁহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার গতি-প্রকৃতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

আজ সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিব না। আজ কেবল তাঁহাদেরই দেশের লোকের বিবরণ হইতে দেখাইব যে, তাঁহাদের পুরুষরাও যে বহু বিবাহ করেন না, তাহা নহে। নামে 'বিবাহ' না হইলেও তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই কত "বহুবিবাহ" হয়, তাহার পরিচয় তাঁহাদের গার্হস্থ্য উপন্যাসাদিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মার্কিণ মুলুকের Salt Lake City ও তাহার আশে-পাশে Mormon সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। অবশ্য আইনের তাড়নায় এখন এই শ্বেতকায় Mormonদের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু গোপনে এখনও Mormon বিবাহ-প্রথা প্রতীচ্যের কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি মিঃ উইলিয়াম এলবার্ট রবিনসন নামক মার্কিণ যুবক তাঁহার "Deep Water and Shoal" নামক গ্রন্থে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিবরণে খৃষ্টান মিশনারীদের বহু বিবাহের যে বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, আইনের ভয় না থাকিলে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে এই খৃষ্টভক্ত চূড়ামণি শ্বেতাঙ্গরা একাধিক নারীগ্রহণে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন না।

মিঃ রবিনসন তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"নিউগিনি দ্বীপের উত্তরাংশে একটি মিশন কেন্দ্র আছে। তথায় ফিরিঙ্গীদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বীপের আদিম নিবাসী অসভ্য জাতির যুবতীদের গর্ভে শ্বেতাঙ্গদের যে সকল সন্তান হইয়াছে, তাহারাই Half caste & Half breed অথবা ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিচিত। মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, আর এইভাবে দ্বীপের বংশবৃদ্ধি করেন!

"আমি পূর্ব্বাংশের একটা দ্বীপে এক বিখ্যাত মার্কিণ খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি বহু দেশীয় যুবতীর সহিত একত্র বসবাস ও বিহার করিতেছেন। অথচ তাঁহার নিষ্ঠাটুকুও আছে। লোকের কাছে বলেন, আমি উহাদিগকে পারিবারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছি!

"এই সকল দেশীয় শ্রমিককে সারাদিন খাটাইয়া মাসিক ১ শিলিং বেতন দেওয়া হয়। দেশীয়দের নিকট নানা উপায়ে অর্থ আদায় করা হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষাদানের জন্য একটা 'ফিস্' লওয়া হয়। আবার স্বেচ্ছায় দান নামক এক প্রথা আছে। উহাতে যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে দান করিতে হয়, নতুবা লজ্জায় তাহাদের সমাজে স্থান হয় না। 'যীশুর বস্ত্র' নামে এক-প্রকার বস্ত্র কিনিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়। 'এসপিরিটু স্যান্টো' নামক নিউ হেব্রিডিস দ্বীপের একটা অঞ্চলে দেশীয়রা রবিবারে নদী হইতে জল তুলিলে তাহাদের জরিমানা হয়। ব্যবহৃত বস্ত্রাদি মার্কিণ মুলুকে দীন-দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়ার রীতি আছে। এই সকল দ্বীপে অনেক

টাকা দাম লইয়া দেশীয়দিগকে উহা বিক্রয় করা হয়। খৃষ্টমাস পর্ব্বে উহাদের মধ্যে মার্কিণ হইতে যে সকল 'খৃষ্টমাস বাক্স' বিনামূল্যে বিতরিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়, মিশনারীরা তাহাও উহাদিগকে বিক্রয় করে।

"অর্থ সম্পর্কে মিশনারীদের এই ব্যবহার বরং সমর্থন করা গেলেও পারে, কিন্তু নৈতিক চরিত্র? যাহারা পৌত্তলিক নর-খাদক অসভ্য আদিম নিবাসীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া উন্নত করিবার জন্য মোটা বেতন পাইতেছে, তাহারা পাঁচ সাত দশটা 'নেটিভ'-যুবতী লইয়া প্রকাশ্যে ঘর করিতেছে আর নবাবী চালে বাস করিতেছে, এ দৃশ্য অসহ্য!"

কেন, মন্দ কি? যাঁহারা বহুবিবাহ ও ক্রীতদাস-প্রথার ঘোর বিরোধী এবং নৈতিক চরিত্রের আদর্শ দেখাইয়া জগতের অসভ্য 'নেটিভ'দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের এই সদৃষ্টান্তে জগৎ অনুপ্রাণিত হইতেছে না কি?

বিবাহিতের অশান্তির কারণ কি?

যৌন সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব-প্লাবিত প্রতীচ্যে পারিবারিক অশান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রতীচ্যের মনীষীদের মধ্যে অনেকে এজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে বক্তৃতায় ও রচনায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এরূপ অশান্তির কারণ কি? যখন এ মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইত না, তখন ত এত অশান্তি ছিল না। তবে?

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের 'লস এঞ্জেলেস' সহরে একটি Institute of Family Relations অথবা পারিবারিক সম্বন্ধ সম্পর্কে এক গবেষণালয় আছে। অধ্যাপক পল পোপেনো তাহার Director বা নিয়ামক। তিনি "বিবাহিত জীবন" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি অনেকের—বিশেষতঃ এ দেশের এক শ্রেণীর আধুনিক লেখকের চিন্তার খোরাক যোগাইতে পারে! এই হেতু তাঁহার মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অধ্যাপক পোপেনো মার্কিণ দেশের সর্ব্বত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রে Marriage clinics প্রতিষ্ঠা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানে দম্পতি বিবাহের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরাগকালে) এবং বিবাহের পরে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে উপদেশ গ্রহণার্থে যাইতে পারেন। কেবল যে যৌন সম্বন্ধের মনস্তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা নহে, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি কি এবং জগতের অন্যান্য দেশে পারিবারিক জীবনযাত্রা কিরূপে সফল হয়—সে সম্বন্ধেও শিক্ষা গ্রহণ করা দম্পতির কর্ত্তব্য। অধুনা বিবাহিত জীবন এবং পারিবারিক জীবনযাত্রার বিপক্ষে ধ্বংসমূলক আলোচনা সাহিত্যের মারফতে অবাধে চলিয়াছে। ফলে দম্পতি নানা অবাঞ্ছিত সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রহসনে, সিনেমা-থিয়েটারে, সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে, বিবাহিত জীবনে দম্পতির কলহ অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত হইতেছে, ফলে বিবাহিত জীবনের সাফল্যের দিকটা একবারেই প্রদর্শিত হইতেছে না। উহা যেন সংসারে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে না। বর্ত্তমান যুগের তরুণ-তরুণীদের নারীপ্রগতির দিকে ঝোঁকটাই আছে বেশী, সংসার বা গৃহস্থালী আপনার সুবিধা আপনি খুঁজিয়া লউক, ইহাই হইল মনোভাব।

কেন বিবাহিত জীবন সফল হইতেছে না, অধ্যাপক পোপেনো তাহার কতকগুলি মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—(১) স্বামি-স্ত্রীর শারীরিক অসামঞ্জস্য, (২) একঘেয়ে গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা, (৩) স্বামী বা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যাইবে, এই আশঙ্কা, (এই ভয়টা সন্তানসন্ততির জননীর সমধিক), (৪) অবসরকালটা কোন গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত করিবার সুবিধার অভাব। ইহা ছাড়া আহারে অসংযম, দন্তরক্ষায় অবহেলা, নারীর সাজসজ্জার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার অভাব, সংসার-খরচ লইয়া নিত্য কলহ, ক্রমাগত খিটখিট করার স্বভাব, —এ সবও আছে।

বিবাহিত জীবনে এই অভিসম্পাতে জাতিহিসাবে মার্কিণ ক্রমশঃ হঠিয়া যাইতেছে, এ কথা শ্রীমতী উইলহেলমিনা কে নাম্নী মার্কিণ মহিলা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "পূর্ব্বের highly gifted American families মরিয়া যাইতেছে। পরন্তু মার্কিণ নারীদের সন্তানজনন ও প্রতিপালনের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। কাযেই বৃহৎ পরিবার এখন আর সচরাচর দেখা যায় না। বৃহৎ পরিবার হইলে তাহার মধ্যে বস্তুতঃ দুই এক জনও highly gifted হইতে পারে। তাহাও হইতেছে না।"

চিত্রখানি মার্কিণ দেশের—যে দেশ অধুনা সভ্যতার জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। দেশ কিরূপ অধোগতির দিকে ধাবিত হইলে চিন্তাশীল দেশবাসীরা এই ভাবে চিন্তা করেন, তাহা বুঝাইতে হয় না। এই আদর্শ এ দেশের সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিলে এ দেশও পরিণামে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহাও বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। একেই যন্ত্রযুগ সভ্যতার কল্যাণে ধনী ও দরিদ্রের ভীষণ সংগ্রামে জগৎ পিষ্ট হইতেছে, যত্র তত্র বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার উপর সংসার ও গৃহস্থালীর মধ্যে প্রতীচ্যের আদর্শের প্রচার হইতে থাকিলে এ দেশও যে দ্রুত প্রগতি লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?



স্পর্শের প্রভাব

১৭

রাজেশ্বর বাবু কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কন্যার শ্বশুরকুলের অন্য যে দোষই থাকুক, তাহারা যে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পারে, ইহা সম্ভবপরই নহে। বিশেষতঃ রণেন্দ্র পিতৃপিতামহের বংশের ধারা যতই অনুসরণ করুক, সে যে রাজনীতিক ডাকাতীতে লিপ্ত, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? তারকনাথ তাহার বিপক্ষে এই যে অভিযোগ করিতেছে, ইহা কি সত্য? তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাযেই সে তাঁহাকে একবার রণেন্দ্রের বাগানবাড়ীটা সার্চ্চ করিতে বলিতেছে, অন্ততঃ মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ কথা জানাইতে বলিতেছে যে, বাগানবাড়ীতে বোমার আড্ডা ছিল, কলিকাতা শ্যামপুকুরের বাড়ীতেও তাই। এখানে সার্চ্চ হইবার পর কলিকাতার ব্যবস্থা পরে করা যাইতে পারে। রণেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতার বয়স্যদের লইয়া এই বাগানবাড়ীর ভাঙ্গা কুঠুরীতে আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থান করিত, সে অঞ্চলে ভৃত্য-পরিজন কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জ্যোৎস্নাও তাঁহাকে বলিয়াছে যে, রণেন্দ্র জ্যোৎস্নাকে বাগানবাড়ী দান করিবার কথা পাড়িয়াও মাঝে মাঝে ঐ ভাঙ্গা দিক্‌টায় দুই এক দিনের জন্য আসিয়া বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহার অর্থ কি?

আরও এক সমস্যা ছিল। কালীনাথ দুঃখ করিতেছিল, এত দিন রণেন্দ্রকে যে রোগ ধরে নাই, এবার কাশী হইতে ফিরিবার পর সে তাহার সেই রোগ দেখিয়াছিল। সে মদ্যপ হইয়াছে, গেলাসের উপর গেলাসেও তাহার তৃপ্তি হয় না!. পূর্ব্বে সে জানিত, রণেন্দ্র মাঝে মাঝে পরিমিত সুরাপান করিত, কিন্তু এমন বেহেড মাতাল হইতে সে তাহাকে কখনও দেখে নাই। কথাটা বলিতে বলিতে কালীনাথ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। আহা, সে যে তাহার জগতে আত্মীয়-বন্ধু বলিতে মাত্র এক জন! কিন্তু স্বদেশীওয়ালারা যে অপরাধই করুক, তাহারা চরিত্রহীন বা মদ্যপ, এমন কথা ত এ যাবৎ শুনা যায় নাই। তবে রণেন্দ্রে এই দুইটাই সম্ভব হইল কিরূপে? কিন্তু একটা কথা, আমড়াগাছে কি আম ফলিয়া থাকে?—আমড়াই পাওয়া যায়। শয়তানের বংশে শয়তানই জন্মিয়া থাকে।

কথাগুলা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে রাজেশ্বর বাবুর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাসাপথে একটা স্বস্তির নিশ্বাসও নির্গত হইয়া গেল। উঃ, ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে, আজ যদি তাঁহার প্রাণসমা কন্যাকে উহার গৃহে বাস করিতে হইত, তাহা হইলে কি হইত!

সত্যই সে রণেন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু দাম্পত্য-জীবন যাপন করিবার সুযোগ না হওয়াতে স্বামীর প্রতি পত্নীর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুতরাং রণেন্দ্রের অধোগতির সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রাণসমা দুহিতার মনে বেদনার জ্বালা ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে না। পিতার এই সাবধানতা ও বিজ্ঞতার জন্য উত্তরকালে কন্যা কি একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

"বাবা!" কন্যার কণ্ঠস্বরে রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আগ্রহভরা স্নিগ্ধ শান্ত স্বরে বলিলেন, "এস মা, এস, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমায় কিছু বলবে ব'লে এসেছ কি?"

জ্যোৎস্না বলিল, "হাঁ বাবা, কথাটা তোমায় বলতেই এলুম। সনাতন বলছিল, কালী বাবু না কি খুবই বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছেন।"

"তার মানে?"

"লোকজনের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করছেন, জমীজমা ইচ্ছেমত বিলিবন্দোবস্ত করছেন—"

রাজেশ্বর বাবুর প্রসন্ন মুখ হঠাৎ অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "তাতে আমাদের কি এলো গেল?"

জ্যোৎস্নার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, সে নতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেশ্বর বাবু যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, বিধির ইচ্ছায় তাহাই জুটিয়া গেল। তিনি গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও

গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "দেখ মা, ওদের গুণের কথা ক্রমে একটির পর একটি অনেকটিই প্রকাশ পাচ্ছে। কালী ছোকরা ভাল, ও আছে ব'লে বিষয়টা ওদের রক্ষে পাচ্ছে, নইলে ও বিষয় ত উড়েই গিয়েছিল। এখন ও কড়া হয়েছে বলেই চাকর-গোমস্তারা চেঁচামেচি করছে। যাক্ গে, মরুক গে, ওদের ও বিষয় থাকলো কি গেল, তাতে আমাদের কিছুই এসে যায় না। যা গুণ সব বেরুচ্ছে—ভগবান্ রক্ষে করেছেন, ওর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের আপদবালাই ঘুচে গেছে।"

জ্যোৎস্না কোন কথার উত্তর না দিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল; রাজেশ্বর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "চ'লে যেয়ো না, সবটা শুনে যাও। শোন নি বোধ হয়, এখন একবারে চরিত্রহীন মাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল তাই নয়, কাশীর কেলেঙ্কারীর পর এখানে ফিরে এসে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করে নি! অধঃপাতের শেষ ধাপে না নামলে এমন প্রবৃত্তি ভদ্রসন্তানের হয় না। এখানে এসে শুনলুম, শ্যামপুকুরের বাসায় সাত দিন ধ'রে না কি মদেই ডুবে রয়েছে। তার উপর—থাক্ গে, সে আর তোমার শুনে কায নেই, সে—"

সেই মুহূর্ত্তে দ্বারসান্নিধ্যে একটা লোক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীগ্‌গির আসুন—"

রাজেশ্বর বাবু ও জ্যোৎস্না বিস্ময়ে প্রায় নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া জ্যোৎস্না আকুল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে পঞ্চানন? কার সর্ব্বনাশ হয়েছে?"

পঞ্চার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়াছিল, সে প্রায় বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আর কি হবে মা, যা বলেছিল কালী বাবু, তাই করলে—সোনা দাদাকে আজ মেরেছে, মেরে আবার পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে—"

লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে দিন-মজুর, সনাতনের সহকারিরূপে বাগানবাড়ীতে কার্য্য করে।

রাজেশ্বর বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তা, আমরা তার কি করবো?"

জ্যোৎস্না সে কথায় মনোযোগ না দিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "সোনাদাকে মেরে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে, কালী বাবু? কেন? সে কি করেছে?"

পঞ্চানন দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি জানি দিদিমণি, কদিন থেকে দুজনে ঝগড়া-বিবাদ খুবই চলছিল কি সব জমী-বিলির বন্দোবস্ত নিয়ে—বিশেষ এবারে কলকাতা থেকে ফিরে অবধি কালী বাবু একবারে আগুনের মূর্ত্তি ধরেছে, কালও ঝগড়া বেধেছিলো, বচসা হতে হতে কালী বাবু সোনাদাকে বলে,—বেরো হারামজাদা আমার বাড়ী থেকে। শুনেই সোনাদা একবারে বুনো মোষের মত ছুটে গিয়ে বললে, 'হারামজাদা? মুখ সামলে কথা কোয়ো ব'লে দিচ্ছি! ও লাট সাহেব এলেন যেন, তবু যদি বাড়ী-বাগানের মালিক হোতো!' এই আর যায় কোথা! কালী বাবু রেগে বল্‌লে, 'যত বড় মুখ তত বড় কথা ছুঁচো বেটা কোথাকার, জুতিয়ে লাট ক'রে দেবো জানিস!' সোনাদাও সামলাতে পারলে না, যা মুখে এলো, তাই ব'লে ফিরিয়ে গাল দিলে, কালী বাবুও জুতো ছুড়ে মারলে, সোনাদা ফিরিয়ে মারতে গেল, সবাই মিলে আমরা ধ'রে ফেললুম—"

রাজেশ্বর বলিলেন, "তা, ঠিকই ত করেছে কালীনাথ। চাকরের এত বড় স্পর্দ্ধা—"

বাধা দিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "তা, এতে পুলিস এল কেন?"

পঞ্চানন বলিল, "ঐ যে গো দিদিমণি, আজ ভোর হতেই কালী বাবু গোল তুললে, টাকা-কড়ি আর দলীল-পত্তোর খোয়া গেছে। পুলিস এলো, দারোগা-চৌকীদার এলো, ঘর-দুয়োর খোঁজা-খুঁজি হলো,—তাই ছুটে এলুম দিদিমণি। এতক্ষণে কি হলো কে জানে বাবু।"

জ্যোৎস্না পিতার মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি হবে, বাবা? তুমি একবার যাও না—সোনাদা—"

এই সময়ে বহির্দ্বারে একটা কলরব উঠিল, অনেক লোক যেন একসঙ্গে কথা কহিতেছে। কক্ষস্থ সকলে সবিস্ময়ে বহির্দ্দেশের দিকে চাহিয়া রহিল, রাজেশ্বর বাবু আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"নমস্কার, আপনার কাছেই আস্‌ছিলুম আমরা, কেসটা ত খারাপই দাঁড়াচ্ছে—যাকে বলে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো। জানলেন, মশাই—" দারোগা বাবু কথাগুলি বলিতে

বলিতে বারান্দার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কয় জন গোমস্তা ও পল্লীবাসীর সঙ্গে কালীনাথও তাহাদের পশ্চাতে ছিল।

দারোগা বাবু আসন পরিগ্রহ করিলে পর রাজেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, দারোগা বাবু?"

দারোগা বাবু হাতের ছড়িটার উপর দক্ষিণ হস্তটি রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরের পর কালী বাবু থানায় খবর পাঠান যে, বাগানবাড়ীতে খুব বড় রকমের একটা চুরি হয়েছে—কেমন, না কালী বাবু?"

কালীনাথের দৃষ্টি তখন কক্ষমধ্যে আবদ্ধ ছিল, সে কি ভয়চকিত দৃষ্টিতে খুঁজিতেছিল, তাহার ভয়ের মানুষটি সেই স্থানে অবস্থান করিতেছে কি না? সে দারোগা বাবুর অতর্কিত প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, কি বলছেন?"

দারোগা বাবু সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"এসে কালী বাবুর কাছে শুনলুম, কি কি জিনিষ চুরি গেছে, তার লিষ্টিও তৈরী ক'রে রেখেছি, এই দেখুন। বাড়ী আর বাগানে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন কালী বাবু বললেন, বাগানবাড়ীর পোড়ো দিক্‌টায় তালাবন্ধ থাকে, হয় ত সেই দিকেই চোরাই মাল থাকতে পারে। সে দিক্‌টার চাবী সোনা মালীর কাছেই ছিল। সার্চ্চ ক'রে সেখানে কেবল যে চোরাই মাল পাওয়া গেল, তা নয়, তার সঙ্গে মস্ত একটা বোমার কারখানাও বেরিয়ে পড়লো!"

রাজেশ্বর বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বোমার কারখানা? সত্যি?"

দারোগা বাবু বলিলেন, "হাঁ, তাই। জীবন্ত বোমা, বোমার মাল-মশালা আর কতকগুলো তরোয়াল আর রিভলভার টোটা!"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দারোগা বাবু তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন, "এ অবস্থায় ঐ লোকটাকে গ্রেফ্‌তার করা ছাড়া অন্য উপায় দেখতে পাই না। সে বলছে, কিছুই জানে না, ও দিক্‌টা তালাবন্ধই থাকত, কখনও কখনও ওর মনিব দুচারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ও দিক্‌টায় থাক্‌ত। দুচারজন পাড়ার ভদ্র লোককে সাক্ষী রেখে সার্চ্চ ক'রে এসেছি, যেমন অবস্থায় ছিল, ঘরদুয়োর তেমনই অবস্থায় রেখে তালা দিয়ে পাহারা রেখে এসেছি। এখন আপনি গিয়ে একবার দেখে এই লিষ্টিটা সই ক'রে দিলেই হয়। আর সোনা মালীর সম্বন্ধে কি করা যায়, তাও ঠিক ক'রে আসতে হবে আপনাকে।"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় তখনও অপনোদিত হয় নাই। তিনি বলিলেন, "গাঁয়ের ভিতর এত বড় একটা কাণ্ড হচ্ছে, কেউ তা এদ্দিন জানতে পারলে না—"

এই সময়ে কালীনাথ বলিল, "আমি ঘরে থেকেই কিছু জানতে পারি নি, বাইরের লোক কি ক'রে জানবে?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তাই ত!"

দারোগা বাবু বলিলেন, "চলুন, বাগানবাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্। আপনি—"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "দেখুন, আমি গিয়ে ত কিছু করতে পারবো না, আমি সবে এই পদ পেয়েছি, তার উপর প্রথম শ্রেণীর নই।"

দারোগা বাবু বাহিরের ফটক পার হইতে হইতে বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? লিষ্টি আপনি সই করলে ওর আর মার নেই। আপাততঃ ঐ লোকটাকে পুলিস কাষ্টডিতে রাখতেই হবে, তার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেপুটী বাবুর কাছে হাজির করলেই হবে।"

রাজেশ্বর তখনও আপনার বাগানের ফটক পার হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। দারোগা বাবু তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে বলিলেন, "দেখুন দারোগা বাবু, আমার যেতে অন্য বাধা নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন একটা পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে—"

দারোগা বাবু বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সব সরকারী কাযে পারিবারিক প্রশ্ন আসতেই পারে না। আসুন, বেলাও প'ড়ে এলো।" রাজেশ্বর বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে অগ্রসর হইলেন।

সকলেই স্থানত্যাগ করিয়াছে, কক্ষমধ্যে জ্যোৎস্না কেবল একা। সে কক্ষমধ্যে থাকিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। সে বিস্ময়-স্তিমিত-হৃদয়ে ভাবিতেছিল, এই ব্যাপারের মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে? ইহার

কতটুকু সম্ভব? যাহাই হউক, অপরাধী যিনিই হউন, তাহার সনাতন দাদা নির্দ্দোষ—যদি জগতের আর সকলে বলে সে দোষী, তাহা হইলেও সে তাহা বিশ্বাস করিবে না—সোনা দাদাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

কিন্তু জ্যোৎস্না বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

১৮

"যাও, মিছরি পোখরা।—"

ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে ট্যাক্সী যাত্রিবহন করিয়া ছুটিল।

আরোহী রণেন্দ্রনাথ। কিন্তু কয় দিনে তাহার সে কান্তশ্রী কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। কালীনাথের কৃপায় বিস্মৃতিরাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত রাখিবার পর, আজ সে কাশীতে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার একমাত্র আপনার জন,—দেবতা, অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াও, যখন বিনা অপরাধে তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—ইহ-জন্মে মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া আসিয়াছে, তখন কাহার জন্য সে আপনাকে ঐহিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিবে? পবিত্র, সংযত জীবন যাপনের মূল্য যদি অপমান, লাঞ্ছনা, মিথ্যা অপবাদ, তবে সেই অবস্থা-কেই বা সে কেন বরণ করিয়া লইবে না?

কালীদাদা তাহাকে যে অমৃত-সেবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, কয় দিন তাহারই প্রভাবে সে হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার তীব্রজ্বালা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিল। এমন বিশল্যকরণী আর নাই। গাড়ীর মধ্যে সে সহযাত্রীদিগের উপস্থিতি বশতঃ অমৃতধারা পানের সুযোগ পায় নাই। সারা রাত্রি তাহাকে সেজন্য দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এখন কেহ কাছে নাই। ট্যাক্সী দ্রুতবেগে ঈপ্সিত রাজ্যের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

রণেন্দ্র পকেট হইতে তার দ্বারা সুরক্ষিত বোতলটি বাহির করিয়া তরল অমৃতধারার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিল।

আঃ!—

রণেন্দ্র একবার বাহিরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাতাসে তাহার রুক্ষ কেশগুলি অন্দোলিত হইতে লাগিল। বোতলবাহিনীর ঐন্দ্রজালিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

না—এত দিন সে ব্যর্থ জীবনই যাপন করিয়া আসি-য়াছে। ভুল—প্রকাণ্ড ভ্রান্তি!

কেন সে জীবনকে উপভোগ করিবে না? এই সূর্য্যা-লোকসমুজ্জ্বল ধরণীর বিচিত্র শোভা, বস্তুতান্ত্রিক জগতের বহুবিধ ভোগ্য বস্তুকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন না করিয়া সে নির্ব্বোধের ন্যায় যৌবনের মূল্যবান্ দিন-গুলি অপব্যয় করিয়াছে।

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"—অতি চমৎকার বাণী। যে ঋষি এ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, এ যুগে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব উপেক্ষিত সত্য; কিন্তু তিনিই যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনকে উপভোগ করিবার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা কিসে মিথ্যা, কেন ভ্রান্ত ধারণা?

মৃত্যুর পর আবার জন্ম হইবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব ঘোষণা করেন, তাঁহারাই যে অভ্রান্ত, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়? সবই ত অনুমান।

তবে সেই অনুমানের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ঐহিক ভোগসুখে বঞ্চিত থাকার কতটুকু মূল্য আছে?

কিছু না, কিছু না।—

তরলা!—এই তরুণী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কেন? স্বামিগৃহে তাহার সুখ ছিল না। শাশুড়ীর গঞ্জনায় তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়াই কি সে স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়াছে? না, আরও কিছু?

রণেন্দ্র আপন মনে হাসিয়া উঠিল। চক্রনির্ঘোষশব্দে চালক সম্ভবতঃ তাহার হাস্যধ্বনি শুনিতে পায় নাই।

এই নারী নিশ্চয়ই "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতির ভক্ত। তাই বিবাহিতা স্বামীকে—স্নেহময় দেবরকে ত্যাগ করিয়া সুখের সন্ধানে আসিয়াছে। তাহার কুল-ত্যাগের সঙ্গত হেতু থাকুক বা না-ই থাকুক, তাহার আচরণ সমর্থনের যোগ্য হউক বা না-ই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? সে যখন একান্তভাবে রণেন্দ্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহার দেহ ও মন, জীবন ও

যৌবন তাহারই সেবার জন্য উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর, তখন কেনই বা সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে ?

এত দিনের সংযত জীবনযাত্রার ফলে, যখন খালি নৈরাশ্য, তিরস্কার, অপমান, লাঞ্ছনাই পুরস্কার মিলিয়াছে, তখন অসংযত জীবনযাত্রার প্রবাহে দেহ ও মনকে ভাসাইয়া দিবে না কেন ? বরং তাহাতে লাভের আশাই আছে।

প্রাণ ও মন দিয়া এক জন তাহাকে চাহিতেছে, হউক তাহা অন্যায়, হউক তাহা পাপ, সে এখন পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ করিয়া চলিতে চাহে না। যে তাহার একান্ত উপাসিকা, একান্ত অনুগত, তাহাকে সে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

গাড়ী মোড় বাঁকিয়া মিছরি পোখরার দিকে চলিল।

রণেন্দ্র অকস্মাৎ সোজা হইয়া আসনের উপর বসিল। কিছু দূর যাইবার পর সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী হইতে নামিল। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে অগ্রসর হইল। এক-বস্ত্রে সে কলিকাতায় গিয়াছিল, একবস্ত্রেই সে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই প্রাঙ্গণতলে তরলাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

স্নান-অবসানে, আলুলায়িতকুন্তলা তরলার স্নিগ্ধ দেহ-জ্যোতি তাহাকে মুগ্ধ করিল। শ্যামা তরুণীর দেহে যৌবনের জোয়ার কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, তাহার আয়ত কৃষ্ণতার নেত্রযুগলে কি মদির দৃষ্টি !

তরলা রণেন্দ্রকে অকস্মাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি ? কি হয়েছে আপনার ?"

দ্রুত-চরণে তরুণী রণেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

রণেন্দ্রের মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। সে বলিয়া উঠিল, "তোমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তাই ফিরে এলাম। চল, আমায় নিয়ে চল।"

বোধ হয়, রণেন্দ্রের দেহ দুই একবার টলিয়া উঠিয়াছিল। তরলা তাহার হাত ধরিয়া সোপান বহিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিল।

রণেন্দ্র গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "এখানেই থাকব। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না, তরলা !"

বেপথুমতী তরলা কোন কথা বলিল না। শুধু বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার রণেন্দ্রের আকৃতি কয় দিনে এমন অসম্ভবরূপে পরিবর্ত্তিত হইল কিরূপে, বোধ হয়, তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

১৯

"আর খেয়ো না—দেখ দিকি, চোখ দুটো কি হয়েছে।"

তরলা রণেন্দ্রের হস্ত হইতে সুরাপাত্রটি কাড়িয়া লইয়া সরাইয়া রাখিল। রণেন্দ্র বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ, কর কি, দাও।" কিন্তু তাহার কম্পিত হস্ত উত্তোলিত হইয়া আপনিই অবনত হইয়া পড়িল।

তরলা অনুযোগের সুরে বলিল, "দেখ দিকি, কি চেহারা হয়েছে ! খাওয়ার সঙ্গে খোঁজ নেই,—খালি মদ, রাতদিনই মদ !" রণেন্দ্র পুনরায় কম্পিত হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিল, "দাও, মদ দাও।"

তরলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, আর দেব না। চল, চান করবে চল। বিশে, ও বিশে—"

"যাই মা," বিশ্বম্ভর নিম্নতল হইতে সাড়া দিল।

রণেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে যথাসম্ভব চীৎকার করিয়া বলিল, "ড্যাম ইওর বিশে ! এইও বিশে, মদ লাও !"

বিশ্বম্ভর সাবানের বাক্স ও গামছা-তৈল লইয়া দ্বার-প্রান্তে দেখা দিল। রণেন্দ্র তীরের ন্যায় শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া আবার শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "এই বিশে, মদ আনলি নি ? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো, নিয়ে আয় বলছি, হারামজাদা !"

বিশ্বম্ভর কিছু না বলিয়া একটু হাসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাবুর এ মেজাজ যে কৃত্রিম, তাহা সে জানিত। বিশ্বম্ভর ইহাও জানিত যে, গালি-গালাজের পর বাবুর হাতে বকসিসটা খুবই মিষ্ট !

তরলা স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "ছি, ছি, কি করছ বল দিকি। নাও, ওঠ, একটু তেলজল মাথায় দিয়ে দুটো ভাতে বসবে চল। কি ছিলে, কি হয়েছ বল দিকি ?"

"কি ছিলাম আর কি হয়েছি" বলিয়া রণেন্দ্র বিকট হাস্য করিয়া নিজেই চমকিত হইল। এবার সত্যই চেষ্টা করিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ হস্তপ্রসারণ করিয়া তরলার একখানি হস্ত ধারণ করিল, পরে তাহার

হস্ত কম্পিত করিয়া বলিল, "ব্র্যাভো মাই ডিয়ার! উঃ, কে বলে এ্যাক্‌টিং মানুষকে শেখাতে হয়! হোঃ হোঃ!"

তরলা সবলে হাতখানা ছিনাইয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত অভিমান-বিজড়িত স্বরে বলিল, "এ্যাক্‌টিং কি? সত্য কথা বল্‌লেই বুঝি দোষ হয়? না হয় কথা বলবোই না। যা বিশে, চ'লে যা, বাবুর যখন ইচ্ছে হবে নাইবে।"

ততক্ষণ বিশ্বম্ভর দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়াছে। রণেন্দ্র শয্যা হইতে নামিয়া ঈষৎ টলিবার ভান করিয়া ক্রোধস্ফুরিতাধরা প্রস্থানোদ্যতা তরুণীর পথরোধ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তরলা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "যাও, যাও, আর জুতো মেরে গরু দান করতে হবে না।"

রণেন্দ্র তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আদরের সুরে বলিল, "সে কি তরু? কোথায় ফেলে যাচ্ছ? এস না, একটু বসি দুজনে, নাওয়া-খাওয়া ত আছেই"—

রণেন্দ্র শয্যায় উপবেশন করিলে পর তরলা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, তা ত আছেই। শরীরের প্রতি যদি একটু দৃষ্টি থাকে!" সত্যই তাহার নয়নপ্রান্তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

রণেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আরে, সত্যিই কেঁদে ফেল্লে, তরু? না না, ছিঃ ছিঃ, কাঁদে না—ঐটে—ঐটে—ঐটে কিছুতেই সইতে পারি না, বাবা। চল, নাইতেই যাওয়া যাক্।" রণেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া দুই পদ অগ্রসর হইল। ঈষৎ টলিয়া বলিল, "ভাবছ, মাতাল হয়েছি? আরে রাম! মাতাল আমার চোদ্দপুরুষে হয় নি। কি জান, কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভারী ব্যায়রামটা হলো—ডাক্তারে একটু একটু খেতে বল্‌লে—"

"তাই বুঝি এখন গেলাস থেকে বোতলে উঠেছে? ছিঃ ছিঃ, ও পাপ আর মুখে দিও না বলছি। শরীরের যে আধখানাও নেই এই দু'মাসে।"

রণেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "শরীর? শরীর? হুঁ!"

নিম্নতলে এই সময়ে কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল। রণেন্দ্র উপর হইতেই বলিল, "প্রতাপ! এই ও প্রতাপ—চুপ? বিশ্বম্ভর, প্রতাপকে ছেড়ে দাও।"

মুক্তি পাইবামাত্র প্রতাপ লম্ফের পর লম্ফ দিয়া সোপানারোহণ করিয়া প্রভুর পদতলে মুখ রক্ষা করিয়া আনন্দভরে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, কখনও বা সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া প্রভুর বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া প্রভুর মুখমণ্ডলের সান্নিধ্যে আপন মুখ রক্ষা করিয়া মৃদুস্বরে যেন প্রীতির সম্ভাষণ জানাইল। রণেন্দ্র তাহার মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে আদরের সুরে বলিল, "দেখতে পাস নি, না? কি করবো বল, ব্যায়রাম—উঠি নি কদ্দিন বিছানা থেকে"—

তরলা বলিল, "ঐ জন্যেই ত বলি, ও ছাই-পাঁশ খেয়ো না। মা গো, সে কি কম্প দিয়ে জ্বর! রাত যেন কাটে না, এমনই কদ্দিন। ভাগ্যে সেই সময়ে মোক্ষদা দিদিকে পেয়েছিলুম, ও বাড়ীর ভুতো দিদির চেষ্টায়, না হ'লে কি যে করতুম, একলা মেয়েমানুষ—"

রণেন্দ্র হঠাৎ তরলার একখানি হাত ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তরলা, সে ঋণ তোমার শুধতে পারবো না। যখন যমে-মানুষে আমায় নিয়ে টানাটানি করছিল, তখন তুমি—"

তরলা ঈষৎ কোপের সহিত বলিল, "যাও। ও সব বলো গিয়ে ভুতো দিদিকে, যে তোমার রাঁধুনী-চাকর এনে দিলে, ডাক্তার-কবিরাজ ডাকালে!—বাসিন্দে কি না, কাশীবাস করেছে যে। এমন লোক কি আর হয়!"

ততক্ষণ বাহিরের বারান্দায় জলচৌকীর উপর রণেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভর তাহাকে তৈল-মর্দ্দন করিয়া দিতেছিল। রণেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিবার পর হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। তাই সহজ সুরে রসিকতা করিয়া বলিল, "দাতা দানই করে, আত্মপ্রসাদই তার পুরস্কার, তোমার কি তাতেও বঞ্চিত থাকতে হবে? এ কেমন কথা?" তরলা কোন উত্তর দিল না।

নিম্নতলে বাহিরের দ্বারে কড়া নড়িয়া উঠিল, প্রতাপ চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষণপরেই মোক্ষদা দিদি মিহি-সুরে জানাইলেন, এক জন কলিকাতা হইতে চিঠি লইয়া আসিয়াছে, বাবুর হাতে দিতে চাহিতেছে।

রণেন্দ্র বলিল, "আসতে বল এখানে।" তরলা কক্ষ-মধ্যে সরিয়া গেল।

আগন্তুক উপরে উঠিয়া রণেন্দ্রকে মুহূর্ত্তকাল ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "ভবেন বাবু পত্র দিয়েছেন। বড় জরুরী, আপনার হাতে দিতে বলেছেন। আমি

কাশীতেই বাস করি, দশাশ্বমেধে আমার মণিহারীর দোকান আছে। ভবেন বাবু আমার আত্মীয়।"

রণেন্দ্র বলিল, "জরুরী চিঠি? কেন? আপনি আমার ঠিকানা জানলেন কি ক'রে?"

আগন্তুক বলিল, "ভবেন বাবু চিঠিতে জানিয়েছেন। জবাব দেবার দরকার হ'লে দশাশ্বমেধে আমার খোঁজ নেবেন, ইয়ংম্যান কোম্পানীর দোকানে।"

লোকটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে রণেন্দ্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর-ভাব ধারণ করিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আপন মনে বলিল, "বিপদ? পালাবো? কেন?"

তরলা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে উৎকণ্ঠা-ভরে বলিল, "বিপদ? সে কি? এই যে বলেছিলে, জগতে কেউ তোমার ঠিকানা জানে না।"

"এবার আসবার আগে ব'লে এসেছিলুম ভবাকে—সে আর আমি ভিন্ন নই। নামতে যখন বসেছি, তখন তার কাছে আর লুকোচুরি কেন করবো? সে পালাতে বলছে—এখনই, এই মুহূর্ত্তে। কেন, পালাবো কেন? আমি কি ফৌজদারীর আসামী?"

তরলা ভীতিব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, "দেখ, আমারও যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আজ কদিন ধ'রে দেখছি, একই চেহারার একটা লোক আমাদের বাড়ীর সামনে প্রায়ই পায়চারী ক'রে বেড়ায়—"

রণেন্দ্র হো হো হাসিয়া বলিল, "ভবাটারও যেমন, তোমারও তেমনই মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু পালাবো কেন? সে রকম কোন কায জীবনে করি নি। পাপের পথে নেমেছি সত্য—খুব সোজা, খুব সরল পথ—হু হু নামছি, তা জানি। কিন্তু সে জন্য পালাবো কেন? পাপের ফল ভোগ করতে হবে? বেশ ত, সে জন্য দণ্ড নিতেও ত মাথা পেতে রেখেছি!"

বিশ্বম্ভর তৈলমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল। রণেন্দ্র স্নানে নামিবার পূর্ব্বে তরলাকে বলিল, "এমন সুন্দর থাকা যাচ্ছে! পালান না কি মুখের কথা! ভবাটা আসল গাধা! কি সব লিখেছে, বাগানবাড়ী সার্চ্চ হয়েছে, সোনাদা ধরা পড়েছে,—যাক্ না সব উচ্ছন্নে, তাতে আমার কি? তুমি আমি থাকলেই হ'ল, কি বল তরলা? আমরা দুজনে নরকের আগুন গুলজার ক'রে থাকবো, সমাজের তাতে কি? বয়ে যাক্ সমাজ! সমাজ যাদের চায় না, তারা সমাজের কি ধার ধারে? ভবাটা নিরেট গাধা! চল তরু, চানেই যাই। যাবার আগে আর এক গেলাস—"

তরলা রণেন্দ্রের হাত ধরিয়া সোপানাবতরণ করিতে করিতে বলিল, "দেখ, মাথা খুঁড়ে মরবো বলছি, ও কথা মুখে এনো না। চল দিকি নাইয়ে দিই গিয়ে।"

রণেন্দ্র যেন আপনাকে সম্পূর্ণভাবে তরলার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, তাই চল!" [ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

ছোটর বাধা

দিন তার সোনালি আঁচলে বেঁধে দেয় যবে লীলাচ্ছলে
ধরণীর আঁখি,
লক্ষ কোটি সূর্য্য-গ্রহ-তারা তার কাছে হয় অর্থহারা—
শূন্যে রহে ঢাকি!
তার পরে রাত্রি ফেলে টানি আলোকের সে অঞ্চলখানি—
খুলে যায় চোখ,
অসীম আঁধারে ঝলমল দেখা দেয় অসংখ্য উজ্জ্বল—
নব নব লোক!
দু'দণ্ডের মোহ কেটে যায়, বিস্ময়ে সে বহু দূরে চায়,
দেখে চারি পাশ—
অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ডের দ্বার খুলে গেছে সম্মুখে তাহার
উদার আকাশ!

ক্ষুদ্র স্নেহ ক্ষুদ্র মমতায় মানুষেরে সহজে ভুলায়—
সঙ্কীর্ণ বন্ধনে,
আপনার গৃহকোণটিতে শুধু চাহে যতনে রাখিতে
নিজ প্রিয়জনে;
তার পরে দুঃখ যবে আসি ক্ষুদ্র সুখ সমূলে বিনাশি
অগ্নি দেয় গেহে,
বিচ্ছেদের নিদারুণ শোকে অন্ধকারে সে চায় সম্মুখে
কাতর সন্দেহে;
সে দিন সহসা হয় মনে, বিশ্বজোড়া প্রীতির বাঁধনে
বদ্ধ সে সদাই,
যে আছে যেখানে—তার চোখে স্নান করি নূতন আলোকে
সবে হয় ভাই!

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইচ, মিটার

(গল্প)

পূজার মরশুমে দ্বিজনাথ চলিয়াছিল বেনারসে, হাওয়া খাইতে!

বয়সে তরুণ, থাকে সে বৈঠকখানা বাজারের এক মেশে, পেশায় লেখক। লিখিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ রোজগার করে, একা মানুষ—তাহাতেই চলিয়া যায়। এ-কালের যত মাসিকে তার লেখা ছোট গল্প নিত্য ছাপিয়া বাহির হয়। পূজার মরশুমে যে মাসিক খোলো, দেখিবে, দ্বিজনাথের লেখা গল্প বাহির হইয়াছে। তার উপর দৈনিক আর সাপ্তাহিকের দল মহাপূজায় বিপুল কলেবরে বিশিষ্ট সংখ্যা কাগজ বাহির করিবার উদ্যোগ বাধানোয় সেদিকেও দ্বিজনাথের ডাক পড়িয়াছে, এবং এ-ডাকে সাড়া দিয়া গল্পও সে পাঠাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পূজার বাজারে তার লেখা আনকোরা তাজা উপন্যাস "প্রাণ যা চায়" বেশ মাজা-ঘষা ছাঁদে ছাপিয়া বাহির হইয়াছে। এমনি বিবিধ ব্যাপারে পয়সা যা আসিয়াছে, সেই পুঁজি লইয়া দ্বিজনাথ বেনারসে চলিয়াছে।

কলিকাতার বাহিরে নিজের গ্রাম ছাড়া আর কোথাও সে কখনো যায় নাই, অথচ দেশে-বিদেশে ঘুরিতে পাইলে ভাবের রাজ্য বিস্তার লাভ করে, এমন কথা যত্র-তত্র শুনিয়া আসিতেছে।

আরো সে শুনিয়াছে, বেনারসে বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা আছে। যে-সব কাগজে তার লেখা গল্প বাহির হয়, সে সব কাগজের ক'জন গ্রাহক-গ্রাহিকার নাম-ঠিকানাও দ্বিজনাথ সংগ্রহ করিয়াছে; তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য যদি মিলিয়া যায়, ছুটীটা মন্দ কাটিবে না।

সেকণ্ড ক্লাশের একখানা বার্থ সে রিজার্ভ করিয়াছে। উদ্দেশ্য ছিল; প্রথম, সাহিত্য-জগতে তার একটা নাম-ডাক হইয়াছে; সে নাম রক্ষা করিতে গেলে একটু স্বাতন্ত্র্য চাই। তার উপর এ-যাবৎ বস্তী-জীবনের কথাই সে লিখিয়াছে; বড় অর্থাৎ অভিজাত সমাজের সঙ্গে পরিচয় নাই! তাহার যে ছবি কল্পনায় বিরাজ করে, সে ছবির দীপ্তিতে মন ভরিলেও ভাষায় সে দীপ্তি ফুটাইতে তার মনে কেমন দ্বিধা জাগে! এই ট্রেণের কামরার মারফৎ পূজার হিড়িকে উক্ত সমাজের সঙ্গে পরিচয় মেলার সম্ভাবনা বড় অল্প নয়! নাগরা-পরা প্রাণ-চঞ্চলা কিশোরীর দর্শন ট্রেণের এ কামরায় সহজ। অন্ততঃ আর পাঁচজনের লেখা গল্প-গাথা পড়িয়া এমনি তার ধারণা!

কিন্তু ভূমিকা লইয়া এত বেশী কথা বলা বোধ হয় ঠিক হইতেছে না। একালে এ রীতি উঠিয়া গিয়াছে, সেকালে চলিত। একাল হুড়াহুড়ির কাল! গল্প স্বল্প হওয়া চাই। ঢিমা চালে গল্প বলিলে পাঠক-পাঠিকা ধৈর্য্য হারাইয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া সিনেমায় ছুটিবেন! অতএব দ্বিজনাথের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না। দ্বিজনাথকে আপনারা ভালো করিয়াই জানেন। তার লেখা গল্প কে না পড়িয়াছেন? তা ছাড়া আমরা তাঁর জীবন-চরিত লিখিতে বসি নাই! অতএব···

রাত্রি সাড়ে দশটায় দেরাদুন এক্সপ্রেশ হাওড়া ছাড়ে। দশটার পূর্ব্বে দ্বিজনাথ ষ্টেশনে আসিয়া কামরায় ঢুকিয়া দেখে, তার ভাগ্যে মাঝখানের বার্থ জুটিয়াছে। দু'পাশের বার্থের একটায় টিকিট আঁটা—স্নেহলতা মিত্র (মিস্ বা মিসেস্ লেখা নাই); অপরটায় এইচ, মিটার। স্বামি-স্ত্রী? বোধ হয়!

দ্বিজনাথ ভাবিল, তাই যদি তো এমন ছাড়াছাড়ি কেন? মাঝের বার্থে যে বসিবে, সে তো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিয়া তুলিবে! স্বামি-স্ত্রী বলিয়াই এ ব্যবধান? ঠিক! মিলন হয় অপরিচিত-অপরিচিতায়। কালের হাওয়া! গল্পে-গাথায় এ-কথা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য তারাও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গৃহ-বিবরেই স্বামি-স্ত্রী পাশাপাশি থাকুক, বাহিরে মুক্তির অবাধ প্রসার!

উপরের বার্থ দুটা? দুটা বিদেশী নাম। এক জন উঠিবে বর্দ্ধমানে, আর এক জন আসানসোলে। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন স্নেহলতা! যাত্রা বোধ হয় বিরস হইবে না!

লগেজগুলা বেঞ্চের তলায় ঠাশিয়া দ্বিজনাথ শয্যা বিছাইল, তার পর সেই শয্যায় বসিয়া ক'খানা সাপ্তাহিক

(পূজার বিশিষ্ট সংখ্যা) পত্র তদুপরি রক্ষা করিয়া "জয়দ্রথ" খানা খুলিল।

'জয়দ্রথ' সাপ্তাহিক কাগজ। এ কাগজখানা তার এখনো পড়া হয় নাই। মেশ হইতে বাহির হইবার মুখে পিয়ন দিয়া গিয়াছে। কামরা খালি; অপর যাত্রীরা এখনো আসিয়া পৌছায় নাই!

কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে পাঁচ মিনিট মাত্র সময়। তার পর একা দ্বিজনাথের কেমন অসহ্য বোধ হইল! এখনো ইঁহারা আসেন না কেন? পথে নানা বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা! হাওড়ার পুলের উপর গাড়ীর কি অসম্ভব ভিড়! রাত্রেও কি নিস্তার আছে! এই তো, সে যখন আসিতেছিল, একখানা লরি তার আগের ট্যাক্সিটায় বিষম ধাক্কা লাগাইয়া দিল—তাহারি চোখের সামনে! ট্যাক্সিতে যাত্রী ছিল অনেকগুলি—এই স্নেহলতা মিত্র ও এইচ মিটারকে যদি তাঁদের মত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়!

দ্বিজনাথ শিহরিয়া উঠিল।...

নিমেষের শিহরণ! পরক্ষণেই সে এই স্নেহলতার মূর্ত্তিটুকু কল্পনায় রচনা করিতে লাগিল। শিল্কের শাড়ী পরা,—লাল শিল্ক—তন্বঙ্গী! সে অঙ্গে রূপের জ্যোৎস্না-কিরণ! অধরে মৃদু হাসি সর্ব্বক্ষণ উথলিত, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের প্রভা! এইচ, মিটারটিকে পদে পদে বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন! আর এইচ মিটার? গায়ের রঙ কালো, দেহ স্থূল, সাহেবী পোষাক পরে, স্নেহলতার বিদ্রূপ-বাণীতে হাঃ-হাঃ অট্টহাসি তোলে, একটা রীতিমত cad!...দ্বিজনাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, তাই হয়! দুনিয়ায় সকল ব্যাপারেই এমনি বৈষম্য! দারুণ গদ্য! তাও সেই তারাশঙ্করী ষ্টাইলের ভীষণ গদ্য! একালের ঝরঝরে হাল্কা গদ্য নয়! পদ্য? হায়, এ জীবনে নাই! সাধে তারা বিদ্রোহ তুলিতে চায়!

সহসা প্লাটফর্ম্ম হইতে কে ডাকিল,—দ্বিজ বাবু না কি!

সে আহ্বানে দ্বিজনাথের কল্পনার সুর কাটিল। চমকিয়া সে চাহিয়া দেখে, প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন বাবু—'বজ্রাঙ্কুশ' পত্রের সম্পাদক।

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—কোথায় চলেছেন?

দ্বিজনাথ কহিল,—বেনারস।

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—শ্বশুরালয়ে বুঝি?

দ্বিজনাথ কহিল,—আজ্ঞে না।

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—বেড়াতে?

মৃদু হাস্যে দ্বিজনাথ কহিল,—হ্যাঁ।

—কোথায় উঠবেন?

—কোনো হোটেলে।

—কোন্ হোটেলে, স্থির করেন নি?

দ্বিজনাথ কহিল,—না।

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—আমাদের এক এজেণ্ট ওখানে থাকেন, মিষ্টার সেন। ঠিক, ঠিক—তাঁর স্ত্রী মিসেস্ সেন মস্ত কবি। আমাদের কাগজে ফী-মাসেই তাঁর কবিতা ছাপা হয়। তাঁর ওখানে গিয়ে উঠতে পারেন। আপনার মত অতিথি—বরণীয় করে রাখবেন।

মিসেস্ সেন! গোবর্দ্ধন কহিলেন,—শ্রীমতী তড়িতা সেন।

দ্বিজনাথ কহিল,—বটে! যাঁর ঐ নূতন কাব্য-গ্রন্থ 'রক্ত মাংস'?

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

দ্বিজনাথ কহিল,—বেশ। আপনি তা'হলে এক ছত্র পরিচয়-লিপি লিখে দিন...

গোবর্দ্ধন কহিলেন,—নেমে আসুন। পাশের ইণ্টারে আমি আছি। ফ্যামিলি নিয়ে দেশে চলেছি—বর্দ্ধমান হয়ে যাবো।

দ্বিজনাথ নামিল,—গোবর্দ্ধন তাকে ইণ্টার কামরার সামনে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, করাইয়া ডাকিলেন,—ওরে খ্যাঁদা...

হাড়-জিরজিরে করিতেছে একটি ছোকরা—সে কহিল,—কি বাবা?

—একখানা কাগজ দে তো, আর ষ্টাইলোটা...

কাগজ-পত্র গোবর্দ্ধন সর্ব্বক্ষণ হাতের কাছে মজুৎ রাখেন। এটুকু অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। সম্পাদক লোক—মনে কখন্ কি আইডিয়া আসে!

২

পরিচয়-লিপি লইয়া নিজের কামরায় ফিরিয়া দ্বিজনাথ দেখে, স্নেহলতা মিত্র আসিয়াছেন। আর এইচ মিটারের বার্থে দশ বছর বয়সের একটি ছেলে বসিয়া। তার পরণে হাফ প্যাণ্ট, গায়ে সিল্কের সার্ট—ছেলেটির বিছানা পাতা—বিছানায়

বসিয়া সে চকোলেট খাইতেছে। পাশে একটা চকোলেটের খোলা টিন পড়িয়া আছে।

স্নেহলতা মিত্র? বার্থে ছোট বিছানাটি পাতা। তিনি বসিয়া একখানা ইংরাজী বইয়ের পাতায় চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সামনে বিছানার উপর বেতের ছোট একটা বাক্স—একখানা টাইম-টেব্‌ল্ ও রঙীন মোটা একখানা খদ্দরের চাদর।

দ্বিজনাথ অবাক! যেন ভেলকি! ক'মিনিটের জন্য সে কামরা ছাড়িয়া গিয়াছিল, বার্থ দুটা তখন ছিল খালি। আর ক'মিনিট পরে ফিরিয়া দেখে, বার্থে এমন খাশা সহযাত্রিণী! একেবারে ফিটফাট্ বসিয়া আছেন! যেন আলাদীনের প্রদীপ ঘষিবামাত্র জিনিতে ইহাঁকে আনিয়া যথাযোগ্য ভাবে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে!

সাথী দুজনের পানে দ্বিজনাথ চাহিল—নিমেষের জন্য! স্নেহলতা মিত্র চোখ তুলিয়া চাহিলেন না—কামরায় একজন মানুষ আসিয়াছে, সে-বোধও যেন তাঁর নাই—বইয়ের পাতায় এমন তন্ময়! ছেলেটি? চকোলেট-সিক্ত লালা দুই ঠোঁটে ল্যাপ্‌টানো—ছেলেটি একবার দ্বিজনাথের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই চকোলেটের টিনের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বিজনাথ আসিয়া নিজের বার্থে বসিল। বসিয়া স্নেহলতার পানে আর একটা দৃষ্টি—স্নেহলতার তন্ময়তা তেমনি অটুট! ছেলেটির পানে চাহিয়া তখন সে মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল—কি, মাষ্টার মিটার···

মাষ্টার মিটার দ্বিজনাথের পানে চাহিল—দৃষ্টি খুব প্রসন্ন মনে হইল না!

দ্বিজনাথ কহিল—কদ্দূর যাবে? মানে, কোথায় নামবে?

সে কথার জবাব না দিয়া ছেলেটি এমন মুখভঙ্গী করিল যে দ্বিজনাথ শিহরিয়া উঠিল! অভিজাত-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র একটা প্রতিবিম্ব—তার এমন প্রতাপ! কিন্তু হটিলে চলিবে না! এই এইচ মিটার—ঐ স্নেহলতা মিত্রেরই স্বজন! মনিবকে যদি ভালো বাসিতে চাও তো তার কুকুরকে ভালো বাসো! এ বড় চলিত কথা···! অমান্য করা চলে না!

কিন্তু কি করিয়া এই এইচ মিটারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করা যায়? বস্তীর ছেলে নয় যে দুটা মিষ্ট কথায় বশীভূত হইবে! এ-সমাজের বিধি-ব্যবস্থা দ্বিজনাথের জানা নাই! এ-সমাজের ব্যাপার লইয়া যে-সব গল্প-উপন্যাস লেখা হয়, সেগুলা দ্বিজনাথের পড়া নাই। পণ করিয়া পড়ে নাই, তাহা নহে। এমনি! সমালোচকের দল বলেন, সব গল্পে বাঙলার প্রাণের পরিচয় মেলে না। বাঙলার প্রাণ নাকি ঐ বস্তীর পাঁকে পোঁতা আছে—তাই তারা সদলে সেই পাঁক ঘাঁটিয়া ফিরিতেছে, বাঙ্‌লার গোপন-প্রাণের সন্ধানে!

সন্ধান কি পায় নাই? পাইয়াছে! সে পাঁকে কিশোরী নারী কি জীবন্ত প্রাণ লইয়াই না বিচরণ করিতেছে! কথা কও, তখনি তারা সাড়া দিবে! আর ঐ স্নেহলতা মিত্র···?

দ্বিজনাথ স্নেহলতার পানে আবার চাহিল। চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল—কি কাঠ হইয়াই বসিয়া আছেন! ঐ বিলাতী কেতাবখানায় কি এমন পাইয়াছেন? কেতাব তো ঘরেও পড়া চলে। ঘরের বাহিরে এই কোলাহল-ভরা ষ্টেশন, ট্রেণের নির্জ্জন কামরা, অপরিচিত সহযাত্রী—এ সবের মধ্যে কত বৈচিত্র্য! সে বৈচিত্র্যের পরিচয় লইবার জন্য প্রাণে সাধ জাগে না? আশ্চর্য্য!

দ্বিজনাথ ভাবিল, ঠিক! এ ঔদাস্য! উপেক্ষা! তাচ্ছল্য! হেয়জ্ঞান! অর্থাৎ ভাবে-ভঙ্গীতে বলিতে চান, আমরা বহু উর্দ্ধ-লোকের জীব···যেন মুক্ত গগন-বিহারিণী, আর তোমরা নীচ কালো মাটীর ময়লা কীট—তোমরা কি আমাদের আলাপের পাত্র? না, আলাপের সে যোগ্যতা তোমাদের আছে? নেহাৎ নাকি উপায় নাই, যে পয়সা ফেলিবে, সে-ই সেকণ্ড ক্লাশের কামরায় আসিয়া বসিবে! কিন্তু তা বসিলেও আমাদের মান আমরা ছাড়িব কেন? এ তাই!

ক্ষোভে তার প্রাণ রী-রী করিয়া উঠিল। ভাবিল, লিখিবে—এই মূঢ় দর্প লইয়া এবারে সে এমন উপন্যাস লিখিবে, প্রাণের জন চাহিয়া গরবিণী ধনী দুহিতা দুনিয়ার পথে পথে বিচরণ করিতেছে,—তবু তার প্রাণের পানে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না! রূপসী তরুণী নায়িকা··· তাকে একেবারে মনস্তাপের চরম বেদনায় জর্জ্জরিত করিয়া এ তাচ্ছল্যের প্রতিশোধ তুলিবে প্রচণ্ড রকম!

দ্বিজনাথ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল—বাহিরের পানে তাকাইয়া!···ও কি, অন্ধকারের বুকে কালো কালো কি

ওগুলা নাচিয়া ছুটিয়া সরিয়া সরিয়া যায় ?···পটে রঙ্ নাই, শুধু কালির আঁচড়—কোথাও ঘন, কোথাও তরল ?

দ্বিজনাথের চেতনা হইল। তাই তো, ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া যাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছে! খুব বেগে চলিয়াছে—মাঝে মাঝে আলোর ঝাপ্টা। ছোট ষ্টেশনগুলা! তাদের তুচ্ছ করিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। দ্বিজনাথের মনে হইল, ছোটদের তুচ্ছ-তাচ্ছল্য না করিলে বড়দের পথ চলায় বাধা ঘটে! চারিদিকে তাই আজ এই উপেক্ষার সুর!

স্নেহলতার পানে আবার সে চাহিল। বার্থের নীচে লাল নাগরা জোড়া খোলা। স্নেহলতা পিঠ ঠাশিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়াছেন—পা দু'খানি বিছানায় বিলম্বিত। কোমর হইতে পায়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই রঙীন খদ্দরটায় আবৃত করিয়াছেন। চোখের দৃষ্টি সেই বইয়ের পাতায়! বইখানার লেখকের উপর হিংসা হইল—কি যাদু মিশাইয়াছে তার রচনায় যে, কিশোরী স্নেহলতা পথের এ বিচিত্র দৃশ্যের পানে ফিরিয়া তাকান্ না! কাহারো পানে চাহিয়া দেখেন না! কেতাবের মধ্যে দুনিয়াকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন!

ছোট একটা নিশ্বাস পড়িল। ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বে বরাবর সে ভাবিয়াছিল, বার্থে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিবে এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া যে ষ্টেশন প্রথম চোখে দেখিবে, সেই ষ্টেশনেই এবার গল্পের প্লট ফাঁদিবে!—কিন্তু কিশোরীর এই পাঠতন্ময়তা···

স্যুট-কেশটা টানিয়া খুলিয়া সদ্য-প্রকাশিত নিজের লেখা নভেল "প্রাণ যা চায়" একখানা বাহির করিল; বাহির করিয়া দেখে, মাষ্টার এইচ মিটার সেই চকোলেটের লালায় ভরা হাতে পূজার সংখ্যা 'দন্তবক্র'খানা তুলিয়া লইয়া ছবি দেখিতেছে। কাগজময় বিশ্রী দাগ···

আর কেহ এমন কাণ্ড করিলে রাগে তার টুঁটি হয়তো···কিন্তু এইচ মিটার! ঐ স্নেহলতা মিত্রের আপন-জন! কাজেই দ্বিজনাথ রাগ করিতে পারিল না, বরং খুশী হইল। খুশী হইয়া কহিল,—ছবি দেখচো ?

মাষ্টার মিটার কহিল—হাঁ।

দ্বিজনাথ ডাকিল,—এসো, আমার কাছে এসো। ওর চেয়ে ভালো ছবি আমার কাছে আছে। ছবির বই। দেখাবো।

মাষ্টার মিটার 'দন্তবক্র' রাখিয়া দ্বিজনাথের সামনে আসিল এবং তার গা ঘেঁসিয়া কহিল,—ইস্! কৈ ছবির বই ? দেখি।

দ্বিজনাথের নূতন তৈয়ারী পাঞ্জাবিতে সেই চকোলেটের সুস্পষ্ট দাগ—মাষ্টারের কর-রেখায় মুদ্রিত হইল। দ্বিজনাথ লক্ষ্য করিল। কিন্তু যে সাধন তার লক্ষ্য, তাহাতে ইহার চেয়ে ভীষণতর বিঘ্ন আসিয়া উদয় হইলেও সে কাতর হইবে না! এ তো সামান্য চকোলেটের দাগ··· ধুইলে মুছিয়া যাইবে!

দ্বিজনাথ কহিল,—আমার বাক্সে সে বই আছে—দেখাবো। তার আগে আমার কথার জবাব দিতে হবে।

মাষ্টার কহিল—কি কথা ? শীগ্গির বলো।

দ্বিজনাথ কহিল—তোমার নাম কি ?

মাষ্টার কহিল—হিরণ্ময় মিত্র।

দ্বিজনাথ কহিল—কোন্ স্কুলে পড়ো ?

হিরণ্ময় কহিল—হেয়ার স্কুলে।

—কোন্ ক্লাশ ?

হিরণ্ময় বাঁকিল, কহিল—এগজামিন দিতে হবে নাকি ? ছবি আমি দেখতে চাই না। ওঃ! ভারী তো ছবি!

হিরণ্ময় নিজের আসনে ফিরিবার জন্য উদ্যত হইল। দায় দ্বিজনাথের! কাজেই সে কহিল—রাগ করতে হবে না। বসো, দেখাচ্ছি!

স্যুটকেশ্ খুলিতে হইল। স্যুটকেশ খুলিয়া দ্বিজনাথ এ-মাসের 'গন্ধবহ' মাসিকপত্র বাহির করিয়া কহিল,—এই বই। এই ছাখো ছবি—বলিয়া সে কয়খানা পাতা উল্টাইয়া সে-সব পাতায় প্রকাশিত তিন রঙা, দু'রঙা ছবি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল।

হিরণ্ময় এক-মনে ছবি দেখিতে লাগিল। যেখানা ভালো লাগে, সে-খানায় সেই হাতের পরশ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না!—সঙ্গে সঙ্গে মুখে চকোলেট পোরা সমানে চলিয়াছে। কাজেই 'গন্ধবহ'র চিত্রগুলি বিচিত্র রেখায় এমন মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল···

ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে কিশোরী স্নেহলতার প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিতে তার কার্পণ্য ঘটে নাই! কিশোরী একবার মাত্র বই হইতে চোখ তুলিয়া তাদের পানে চাহিয়াছিলেন—চকিতের জন্য! সেই চকিত মুহূর্ত্তে মৃদু হাসির একটি রেখাও যেন···! সে হাসির স্পর্শে সে মুহূর্ত্তটুকু

দ্বিজনাথের মনে অসীম কাল-তরঙ্গ রচিয়া চলিল !…তার ছবি দেখানোর উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল !

এমনি ছবি দেখার মধ্যে সহসা দ্বিজনাথ প্রশ্ন করিল—তুমি কোথায় যাচ্ছো ? মানে, কোন্ ষ্টেশনে নামবে ?

অভিজাত-সম্প্রদায় যত হৃদয়হীন হোক—দ্বিজনাথের ধারণা-মতে—মাষ্টার মিটার কিন্তু ছবি দেখিয়া অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল না, কহিল—কাশী।

কাশী ! বেনারস ! দ্বিজনাথের মন প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। একসঙ্গে তাহা হইলে সারা পথ—দীর্ঘ কাল—ট্রেণের এই একই কামরায় ! আঃ !

একখানা ছবির পাতা খুলিয়া সাগ্রহ দৃষ্টিতে দ্বিজনাথ হিরণ্ময়ের পানে চাহিয়া রহিল। প্রাণ-চঞ্চল দিব্য ছেলেটি ! কেমন অনায়াসে তার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে ! কিন্তু তার ঐ দিদি ? ট্রেণের কামরায় একত্র চলিয়াছে,—একটু আলাপও নয় ! একালে মুক্তির পতাকাতলে দাঁড়াইয়াও এমন ? বই পড়িতেছেন ? পড়ার সখ ভালো—তাই বলিয়া…?

দ্বিজনাথের মনে হইল, বাঙলা মাসিক কাগজগুলার প্রতি বিরাগ আছে না কি ? পড়েন না ? পড়িলে…… দ্বিজনাথের ফটো কোন্ মাসিকে বাহির হয় নাই ? সে একজন মস্ত লেখক—তার ছবি দেখেন নাই ? গোটা মানুষটির পানে ফিরিয়া তাকান্ নাই, এমন নয় ! মাসিক-পত্রে তার ছবি দেখিয়া থাকিলে একটা কৌতুহলও মনে জাগিত ! সেই সঙ্গে ছোট একটা প্রশ্ন—আপনি দ্বিজনাথ বাবু ? লেখক ? নিত্য যাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে ?

মলিন নয়নে সে কিশোরীর পানে চাহিল। কিশোরী তখনো তেমনি অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া সেই বই পড়িতেছেন। দ্বিজনাথের মনে হইল—বইখানা কাড়িয়া ছুড়িয়া সে বাহিরে ফেলিয়া দেয় ! বর্ব্বরতা ? হোক্ বর্ব্বরতা ! স্পষ্ট ভাষায় সে বলিবে, এ চাল বিলাতী সমাজে চলে,—বাঙলায় নয়। বাঙালী চিরদিন কথা কয় !…

হিরণ্ময় বলিল—হাঁ করে কি ভাবচেন ? এ ছবি দেখা হয়ে গেছে। দিন বই আমার হাতে…

কথার সঙ্গে সঙ্গে বইখানা সে কাড়িয়া লইল। দ্বিজনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল। তরুণীকে বলিবে কি…যে, বাঙালী হইয়া বাঙলার প্রাণের পরিচয় নিন: আমার বই পড়িয়া ? এই 'প্রাণ যা চায়' উপন্যাস পড়ুন—তরুণ-তরুণীর প্রাণের অবাধ মেলায় মনকে ছাড়িয়া দিন ! তা না…

ট্রেণ সহসা গতির বেগ কমাইয়া থামিয়া পড়িল। হিরণ্ময় জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল—তরুণীও। বাহিরে অন্ধকারে ঘেরা ধূ-ধূ মাঠ…কালোয় কালো !

হিরণ্ময় কহিল—সিগনাল পড়ে নি…নিশ্চয় !

তরুণী তার পানে চাহিলেন, মৃদু স্বরে কহিলেন—ও ! তার পর আবার সেই বইয়ের পাতায় দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

পরক্ষণে ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বিজনাথ কহিল—তুমি ঘুমোবে না ?

হিরণ্ময় কহিল—ট্রেণে চড়লে আমার ঘুম হয় না !

স্বরে যথাসম্ভব দরদ মিশাইয়া মৃদু হাস্যে দ্বিজনাথ কহিল,—তা বলে সারা রাত জেগে থাকবে ? অসুখ করবে যে !

বিজ্ঞের ভঙ্গীতে হিরণ্ময় কহিল—ঘুম পেলে ঘুমোবো। এখন তো ছবি দেখি।

বইখানার পাতার সংখ্যা নেহাৎ সীমাবদ্ধ—কাজেই ছবি ফুরাইল। বই বন্ধ করিয়া হিরণ্ময় কহিল—আর বই নেই ?

বইখানার দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ কহিল—বই দেবো… কিন্তু তার আগে তুমি হাত ধুয়ে এসো দিকিন্ ! বইখানায় চকোলেট মাখিয়ে কি করেচো—দেখেচো ?

কথাটা সে খুব শান্ত মিষ্ট ভাষেই কহিল—কথায় বিরক্তি না প্রকাশ পায় !

প্যাণ্টে দুই হাত ঘষিয়া সে-হাত চোখের সামনে হিরণ্ময় প্রসারিত করিয়া ধরিল, তার পর দ্বিজনাথের দিকে সে হাত তুলিয়া কহিল,—কৈ দাগ ? দেখুন তো—পরিষ্কার ! হিরণ্ময় হাসিল।

দ্বিজনাথও হাসিল, হাসিয়া কহিল—ইজেরে ঐ হাত মুছলে তো ! ছি ! এমন নোংরা কেন ?

কথাটা বলিয়া চকিতের জন্য সে কিশোরীর পানে চাহিল—কিশোরী বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া এ দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাঁর অধরে কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা ! আনন্দে দ্বিজনাথের

বুক দুলিয়া উঠিল। জাগিয়াছে—ঐ…ঐ…তাদের এ আলাপে তাঁর প্রাণের যোগ ঘটিয়াছে!…চমৎকার সুযোগ! এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই…

হিরণ্ময় কহিল,—আমার কেমন মনে থাকে না! এর জন্যে দিদি কম বকে…

কিশোরীর পানে আর একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিজনাথ কহিল,—তোমার দিদি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন…না?

কথাটা বলা হইল হিরণ্ময়কে—মন কিন্তু উদগ্র রহিল কিশোরীর দিকে! যদি ও-মুখে ছোট একটু হাসি, ও-চোখে চকিত একটা দৃষ্টি?…কিছু না! যেন পাষাণে রচা ঐ স্নেহলতা!

হিরণ্ময় জবাব দিল,—খু-উ-ব!

দ্বিজনাথ কহিল,—দিদির কথা শোনো না কেন? দিদি গুরুজন…

হিরণ্ময় কহিল,—সবতাতে টিক্‌টিক্‌ করলে মানুষের ভালো লাগে কখনো?

দ্বিজনাথ কহিল,—তুমি তা হলে ছেলেটি খুব শান্ত নও—না?

হাসিয়া হিরণ্ময় জবাব দিল,—না।

দ্বিজনাথ কহিল,—গল্প-টল্প পড়তে তোমার ভালো লাগে?

হিরণ্ময় কহিল,—লাগে। তার চেয়েও ভালো লাগে মোটর গাড়ী হাঁকাতে।

দ্বিজনাথ কহিল,—তুমি মোটর হাঁকাও না কি?

হিরণ্ময় কহিল,—হাঁকাতে দেয় না। দিলে পারি। স্কুলে যাবার সময় ড্রাইভারের পাশে বসি, ষ্টীয়ারিং করি তো…

দ্বিজনাথ স্নেহলতার পানে চাহিল,—স্নেহলতার দৃষ্টি বইয়ের পাতায়—অধরে মৃদু হাসির ঝিলিক!

কৌতুকের হাসি! বইয়ের পাতায় এমন কিছু কৌতুকের ঘটনা ঘটিল? না, তাদের কথায়?

দ্বিজনাথ কহিল,—তোমাদের বাড়ী এই 'গন্ধবহ' কাগজ আসে?

—আসে।

—তুমি পড়ো?

—না। দিদি পড়ে।

দিদি পড়েন! আঃ! তাহা হইলে নিজের পরিচয়টুকু এই সূত্রে…! উন্মুখ দৃষ্টিতে স্নেহলতার পানে আবার সে চাহিল। চকিতের চাওয়া! ও-দিকে স্নেহলতা তেমনি পাষাণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন!

দ্বিজনাথ কহিল,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেচো?

হিরণ্ময় কহিল,—শুনেচি! ঐ যাঁর গান আছে, আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি!—তিনিই তো লিখেচেন। গ্রামোফোণেও তাঁর রেকর্ড শুনেচি,—আজি হতে শত বর্ষ পরে,—সে আমি শুনেচি। বাড়ীতে আছে। আমিও বলতে পারি সবটা। শুনবেন?

দ্বিজনাথের উত্তরের প্রত্যাশা মাত্র না রাখিয়া হিরণ্ময় গড়-গড় করিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া চলিল। স্নেহলতা মাঝে মাঝে সকৌতুক দৃষ্টিতে হিরণ্ময়ের পানে ফিরিয়া চাহিতেছিল। দ্বিজনাথ সে-দৃষ্টিতে নিজের হাসি মিশাইবার প্রয়াসে বিপুল সাধনা জুড়িয়া দিল! কিন্তু…

আবৃত্তি থামিলে হিরণ্ময় কহিল,—উল্টো পিঠেরটা শুনবেন? তাও জানি। শুনুন…বহু দিন হলো কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়!

আবৃত্তি চলিল। আবৃত্তি-শেষে দ্বিজনাথ কহিল,—বেশ!

স্নেহলতা? দ্বিজনাথ ক্ষণে ক্ষণে তাঁর পানে সমানে চাহিতেছিল! ভ্রমর-পাঁতির মত তাঁর ভ্রূ-যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত! কেন? কেন? এই এক প্রশ্ন সহস্র তরঙ্গ তুলিয়া দ্বিজনাথের চিত্তকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

দ্বিজনাথ তখন নিজেকে প্রসারিত করিয়া ধরিবার প্ল্যান ভাবিতে লাগিল।

হিরণ্ময় কহিল,—আর একখানা ছবির বই বার করুন না…বলিতে বলিতে বেঞ্চের তলা হইতে দ্বিজনাথের স্যুটকেশটা টানিয়া সে কহিল,—দিন, চাবি দিন। আমি বার করচি।

দ্বিজনাথ কহিল,—কাল সকালে দেখো। এইটুকু বলিয়া থামিয়া সে স্নেহলতার পানে চাহিল, স্নেহলতার মুখে-চোখে কোনো ভাব নাই! তার বুক কেমন ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দ্বিজনাথ কহিল,—কাল সারা দিন ট্রেণেই থাকতে হবে। তখন কি করবে?

হিরণ্ময় কহিল,—দিনের বেলায় চারিদিক্ দেখা যাবে! তাই দেখবো।

৩

ট্রেণ বর্দ্ধমানে থামিল। চট্ করিয়া দ্বিজনাথের মনে পড়িল, গোবর্দ্ধন বাবু এইখানে নামিবেন! একটু খাতির করা···ঠিক!

দ্বিজনাথ কহিল,—বসো, এসে আমি বই বার করে দেবো! আমি এখনি আসবো। একটি ভদ্রলোক এখানে নামবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তিনি একজন মস্ত লোক। 'বজ্রাঙ্কুশ' কাগজ আছে, জানো? সেই কাগজের তিনি সম্পাদক। সম্পাদক কাকে বলে, জানো? ··

প্রশ্নের সহিত স্নেহলতার পানে দৃষ্টি—স্নেহলতা বই রাখিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন—বসিয়া জানালা দিয়া ওদিককার প্ল্যাটফর্ম্মে চোখের কুতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছেন!

দ্বিজনাথ নামিয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন বাবুর কামরার সামনে ভারী ভিড়। মোটা দেহ লইয়া গোবর্দ্ধন বাবু প্ল্যাট-ফর্ম্মে নামিয়াছেন, পাশে গৃহিণী, কলেবর তেমনি বিপুল—যোগ্য স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী! পাশে একরাশ ছেলেমেয়ে—যেন এক বিপুল অক্ষৌহিণী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে! গৃহিণীর কোলে অবধি একটি শিশু! আর জিনিষ-পত্র? বাক্স, তোরঙ্গ, পুঁটলি, লাঠি, ছাতা, হাঁড়ি, কুঁজা, ঘটি, বোতল—গোটা মুর্গীহাটাটা যেন প্লাটফর্ম্মে জড়ো করিয়াছেন!

গোবর্দ্ধন বাবু চীৎকার করিতেছেন,—আমার সেই তামাকের টিন্‌টা কৈ রে? তামাক? বালাখানার তামাক? একজন দিয়ে গেছে—কাগজে তার কবিতা ছাপানোর জন্ম! তামাকটা ঢ্যাখ্ না রে খ্যাঁদা।

গৃহিণী প্রতিবাদ তুলিতেছেন,—বুড়ো মিন্সে! নিজে দেখতে পারো না! ও উঠুক—তার পর রেল ছেড়ে দিক!···গোবর্দ্ধন কহিলেন—আমি উঠলে বুঝি রেল দাঁড়িয়ে থাকবে! ও তবু ছেলেমানুষ—সিড়িঙ্গে আছে—রেল ছেড়ে দিলে তড়াক করে লাফিয়ে পড়তে পারবে। আমি তো তা পারবো না।—

অগত্যা খ্যাঁদাকে কামরায় প্রবেশ করিতে হইল। গৃহিণী কহিলেন,—খুকীর দুধের বাটি আর ঝিনুকটাও নামেনি যে রে! ভালো গেরো! ঢ্যাখ্, ঢ্যাখ্, ওরে আগে ঢ্যাখ্—নাহলে যাবে! ওঁর তামাক গেলে তত ক্ষতি নেই,—যত ক্ষতি দুধের বাটি গেলে। বাছা আমার দুধ না পেলে ককিয়ে মারা যাবে!

এমনি ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে দ্বিজনাথ আসিয়া দে দিল।

গোবর্দ্ধন কহিলেন—তাই তো, তুমি কোথায় যাবে বললে? সাসারাম?

সবিনয়ে দ্বিজনাথ কহিল—আজ্ঞে না,···বেনারস।

গৃহিণী হাঁকিলেন—ওরে নাম্ না রে হতভাগা—দুধে বাটি, ঝিনুকটা ঐ বেঞ্চির তলায় রেখেছিলুম। পেলিনে নিয়ে নাম্, নাম্···এখনি রেল ছেড়ে দেবে—মরবি তখন!

দ্বিজনাথ কহিল—না, ট্রেণ এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

খুকী ককাইয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন কহিলেন—একটু ভিড় থেকে সরে দাঁড়াও না বাপু! নাঃ, তোমাদের নিয়ে দিগ্‌দারী ধরে গেল! এমন জ্বালা···

গৃহিণী হুঙ্কার দিলেন—জ্বালা যদি তো কে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিল নিয়ে আসবার জন্যে! পুজোয় পাওনাদার ঠ্যাকাবার জন্য তোমারই তো মাথাব্যাথা ধরলো! কি? না, চলো গো, চলো, নাহলে ছাপাখানার তাগাদাতে মারা যাবো! হুঁঃ, বলে, আমি ভেবে মরচি, পাড়াগাঁয়ে এসে ম্যালেরি নিয়ে যাবো···

গৃহিণীর তীব্র বাক্যোচ্ছ্বাস খুকীর ককানি ভেদ করিয়া দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল—কর্ত্তা একরূপ হাত দিয়া ঠেলিয়া তাঁকে সরাইয়া দিলেন। বিপুল-বাহিনী গৃহিণীর অনুগমন করিলে খ্যাঁদা কামরা হইতে নামিল—তার এক হাতে বাটি-ঝিনুক, অপর হাতে তামাকের টিন।

দেখিয়া গোবর্দ্ধন আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন—পেয়েচিস? আঃ বাঁচালি! বলুন তো দ্বিজবাবু, ভালো বালাখানার তামাক ফেলে গেলে কম আপশোষ হতো! ঐ নিতাই হাজরা আছে—তার কবিতা ছাপানোর জন্য তিতি-বিরক্তি ধরিয়েছিল—তাদের তামাকের দোকান আছে—খপর পেয়ে বললুম,—কবিতা ছাপাতে এসেচো—তামাক খাওয়াতে পারো না বাপু? তাই সে এই তামাক দিয়ে গেল। দিলুম তার কবিতা এই পুজোর নাম্বারে এক জায়গায় গুঁজে—বর্জ্জয়েসে অবশ্য! হা-হা-হা···

কবির মর্য্যাদা-দর্শনে দ্বিজনাথ মুহূর্ত্ত কেমন থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল—কখন্ বাড়ী পৌছুবেন?

গোবর্দ্ধন কহিলেন—বলো কেন!

একটা ট্রেণে গিয়ে চড়বো।···তা নামতে সেই রাত একটা। সঙ্গে এই মোটঘাট···

দ্বিজনাথ কহিল—সত্যি। এ যে দেখচি কলকাতার বাসা তুলে চলেছেন।

—ওঁদের সখ! নাঃ, সেকালের মেয়েগুলো একদম বদ, সৃষ্টিছাড়া! হতো একালের···

গোবর্দ্ধন-সম্পাদকের কথায় একালের যে-মূর্ত্তি দ্বিজনাথের মানস-নয়নের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল,···চমৎকার! সে মূর্ত্তি ঐ স্নেহলতা মিত্রের! কেমন অল্প মালপত্র লইয়া ট্রেণে চলিয়াছেন! নিজের বেশ-ভূষায় যেমন শ্রী, সঙ্গের মালপত্রেও তেমনি—যেন একটি লিরিক কবিতা চরণে-চরণে সহজ লীলায় ব্যঞ্জিত হইয়া চলিয়াছে!

গোবর্দ্ধন কহিলেন—অনেক দূর তোমায় যেতে হবে। সেই কাশী! এখানকার সীতাভোগ, মিহিদানা কিনে সঙ্গে রাখো—কাল তাতেই জলযোগ চলবে। এর পরে ইটের মত প্যাঁড়া আর চামড়ার মত পুরী ছাড়া আর কিছু পাবে না হে! তবে হ্যাঁ, পাঁউরুটী আর কলা মিলতে পারে—তাতে মোদ্দা বাঙালীর চলে না। মনটা western হলে কি হবে, পেটগুলো যে আজও বাঙলার রুচি ছাড়তে পারে নি। কাগজ চালিয়ে দেখচি তো! হা-হা-হা!

সৈন্য-সামন্ত জড়ো করিয়া গোবর্দ্ধন গণিয়া লইলেন, তার পর কুলিকে কহিলেন—চ'। কাটোয়ার গাড়ীতে চাপিয়ে দিবি সব!

৪

মিহিদানা-সীতাভোগের দুটা চ্যাঙারি হাতে কামরায় ফিরিয়া দ্বিজনাথ দেখে, বর্দ্ধমানের যাত্রী সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসিয়া উপরের বার্থ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে একা হইলে কি হইবে, তার মালপত্র গন্ধমাদন-তুল্য এক বিরাট ব্যাপার! সামনেই ষ্টীলের একটা বড় বাক্স—তার উপরে নাম লেখা কাগজ—ডব্লু মেলিন্স, পে-ক্লার্ক—ই, আই, আর। ব্যস্! ভাবিয়াছিল, বিক্ষিপ্ত মাল-পত্র লইয়া ইংরাজীতে দুটা তর্ক তুলিবে, সে আশায় বাদ ঘটিল! স্নেহলতা মিত্র এই বিপুল মাল-পত্রের ভিড়ে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছেন!

দ্বিজনাথ দেখিল, দেখিয়া কহিল,—মিষ্টার মেলিন্স···

উপরের বার্থে লম্বিত-দেহ ব্যক্তিটি কহিল,—ইয়েস···

বক্তব্যটুকুর ইংরাজী তর্জ্জমা মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়া দ্বিজনাথ কহিল,—লেডির সামনের ঐ জিনিষগুলা আমি স্বহস্তে বহিয়া যদি ওদিকটায় রাখি, আপত্তি হইবে?

পরের বার্থের কোট-পাৎলুন-পরা মূর্ত্তি কহিল,—But I get down at Dhanbad.

দ্বিজনাথ কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—আমি তখন তোমার সাহায্য করিব!

সে কহিল,—All right বাবু!

বাবু তখন সীতাভোগ-মিহিদানার চ্যাঙারি দুটা নিজের বার্থের উপরে রাখিয়া প্রসন্ন-চিত্তে মেলিন্সের বাক্স-পত্র টানিয়া হিরণ্ময়ের বার্থের দিকে জড়ো করিল।

বিস্ফারিত নেত্রে হিরণ্ময় কহিল,—বাঃ!

দ্বিজনাথ বুঝিল, বুঝিয়া জবাব দিল—তুমি আমার বার্থে এসো। তাহলে ভালোই হবে।

হিরণ্ময় কহিল,—কাল সকালে কিন্তু আবার এ-বেঞ্চে এসে বসবো।

হাসিয়া দ্বিজনাথ কহিল,—তা বসো···

জিনিষ-পত্র ঠিক-ঠাক করিয়া শান্ত হইয়া দ্বিজনাথ চাহিয়া দেখে, তার চ্যাঙারি দুটার বাঁধন হিরণ্ময় খুলিয়া ফেলিয়াছে। দ্বিজনাথের দৃষ্টির সহিত হিরণ্ময়ের দৃষ্টি মিলিল। দ্বিজনাথ স্নেহলতার পানেও ফিরিয়া চাহিল। স্নেহলতার দৃষ্টি এদিকে নাই, তাঁর কোলের উপর একখানা ন্যাপকিন খোলা; আর সেই ন্যাপকিনের উপর ছোট প্লেটে ক'খানা লুচি, একটু তরকারী, মাছ-ভাজা ও সন্দেশ! স্নেহলতা তাহারি সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত!

দ্বিজনাথ কহিল,—ও-সব তুমি খাবে না?

চোখে প্রতিবাদের ভঙ্গী তুলিয়া হিরণ্ময় কহিল,—না।

দ্বিজনাথ কহিল,—এ খাবার খাবে?

—কি?

—মিহিদানা সীতাভোগ।

—সেই বর্দ্ধমানের?

দ্বিজনাথ কহিল,—সেই বর্দ্ধমান নয় এই বর্দ্ধমান! ট্রেণ এখন বর্দ্ধমানে দাঁড়িয়েচে। এ হলো খাশ বর্দ্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ!

হিরণ্ময়ের দৃষ্টিতে আনন্দ ও বিস্ময়! সে কহিল,—বেশ তো! খাবো…

ছোট্ট কথা! কথার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় চ্যাঙারির মধ্যে হাত পুরিয়া এক তাল মিহিদানা তুলিল। দ্বিজনাথ কহিল,—খাও, যা পারবে। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। দ্বিজনাথ বাথরুমে প্রবেশ করিল। তার পর যখন ফিরিল,…হিরণ্ময় ততক্ষণে একটা চ্যাঙারি একেবারে প্রায় খালি করিয়া ফেলিয়াছে। বিছানায় মিহিদানার টুক্‌রা পড়িয়া! হিরণ্ময়ের জামাতেও…

দ্বিজনাথ বিস্মিত হইল। তার পর স্নেহলতার পানে এক-বার চাহিয়া লইয়া সে কহিল,—অসুখ না করে! বুঝে খেয়ো…

মুখে মিহিদানা ঠাশা—দুটি গাল যেন ডিমের আকার ধরিয়াছে! হিরণ্ময়ের মুখে কথা বাহির হইল না! মাথা দীর্ঘভাবে নাড়িয়া সে জানাইল, তাই হইবে!

ছোট একটা টুক্‌রী হইতে নাশপাতি বাহির করিয়া দ্বিজনাথ বার্থের উপর রাখিল। হিরণ্ময় কহিল,—জল নেই?

—আছে বৈ কি!

—একটু দিন।

দ্বিজনাথ জল গড়াইয়া দিল। প্রায় দেড়টা চ্যাঙারি শেষ করিয়া হিরণ্ময় নাশপাতিটা তুলিয়া তাহাতে কামড় দিল। বিস্ময়ে দ্বিজনাথের দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে, এমন দশা! সীতাভোগের যা কিছু অবশিষ্ট রহিল, চ্যাঙারি-সমেত দ্বিজনাথ বার্থের এক পাশে সরাইয়া রাখিল।

হিরণ্ময় কহিল,—আপনি খাবেন না?

দ্বিজনাথ কহিল,—না, রাত্রে কিছু খাবো না।…তুমি সোদ্দা এবারে ও-ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধোবে।

হাসিয়া হিরণ্ময় কহিল,—আচ্ছা।

হিরণ্ময় হাত-মুখ ধুইতে গেলে দ্বিজনাথ বার্থ দুটির শয্যা পাল্‌টাইয়া লইল; তার পর শয়নের উদ্যোগ করিল। ওদিককার বার্থে স্নেহলতা মিত্র তখন বই রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, সেই রঙীন খদ্দরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া। তাঁর দুই চোখ মুদ্রিত! মুখে আলোর একটুকরা রশ্মি গিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যা দেখাইতেছে, চমৎকার! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বিজনাথ ভাবিল, পাষাণেই প্রতিমা রচা হয় কেন?…

হিরণ্ময় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দ্বিজনাথ কহিল, শুয়ে পড়ো…

সে কহিল,—রেলে আমার ঘুম হয় না।

একটা ব্যাপার কিন্তু দ্বিজনাথের আশ্চর্য্য ঠেকিতেছি… এতখানি পথ!…ভাই-বোনে কথা নাই কেন? কহিল,—তোমার দিদির সঙ্গে তোমার ভাব নেই—না?

হিরণ্ময় কহিল,—না। আসবার সময় আমায় মেরে খুব। তাই আড়ি হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে দিদি ক… কবে না বলেচে,—আমিও বলেচি, বেশ!

ও, তাই?…কিন্তু এ কি সর্ব্বনেশে পণ!…

স্নেহলতা পাশ ফিরিলেন! তিনি ঘুমান নাই। ট্রেণে… কামরায় তাঁরও কি তাহা হইলে ঘুম হয় না? কিন্তু…

এই যে 'কিন্তু' দেরাদুন এক্সপ্রেসের চাকায় আ… লট্‌কাইয়া গিয়াছে…কি বিশ্রী! দুনিয়ার সৌন্দর্য্য এ… কিন্তুর আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে চিরদিন!

তবু আশা কি একেবারে নাই? মানুষ আশার সু… ধরিয়াই দুলিতে চায়, দোলেও!

দ্বিজনাথ কহিল,—একটা গল্প বলি, শোনো…

—বলুন।

দ্বিজনাথ কহিল,—তুমি শোও, শুয়ে শুয়ে গল্প শোনো আমিও শুয়ে শুয়ে গল্প বলি!

তাই হইল। দ্বিজনাথ কহিল,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেচো, বললে তো?

—হ্যাঁ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গল্প লিখেচেন—জানো? এখনও লেখেন।

—কাগজে দেখেচি। তাঁর লেখা বই দিদি পড়ে।

—বটে! দ্বিজনাথের নৈরাশ্য-তিমির-প্লাবিত চিত্তে আবার একটু আলোর রেখা ফুটিল।

দ্বিজনাথ কহিল,—তাঁর মত আমিও গল্প লিখি—বুঝলে! ঐ কাগজে দেখবে, গল্প আছে—ছাপার অক্ষরে। সে গল্পের তলায় নাম দেখবে, শ্রীদ্বিজনাথ মিত্র। সে গল্প দ্বিজনাথ মিত্রের লেখা। আমি হলুম সেই শ্রীদ্বিজনাথ মিত্র। আমার নাম দ্বিজনাথ!

নামের উপর বার-বার দ্বিজনাথ জোর দিতে লাগিল; এবং কথার শেষে দ্বিজনাথ স্নেহলতার পানে চাহিল।

তেমনি অবিচল তিনি শুইয়া আছেন—চোখ ছুটি তেমনি মুদ্রিত ! মুখে ভাবের চিহ্ন নাই ! না অনুরাগ, না বিরাগ ! এতটুকু কৌতূহলও নয় !

আবার একটা নিশ্বাস ! নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বিজনাথ কহিল,—আমার তৈরী গল্প শুনবে ? না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ?

হিরণ্ময় কহিল,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প তো বইয়ে ছাপা আছে। দিদি বলেচে, বড় হয়ে পড়বি। আপনার গল্প তো পড়তে পাবো না। আপনার গল্পই শুনি !

বেশ ! দ্বিজনাথ চিন্তা করিতে লাগিল, কি গল্প বলিবে ? হাসির ? না, না ! এমন গল্প বলা চাই, যাহাতে ঐ প্রতিমার পাষাণ বুক গলিয়া যায় ! যে-গল্প শুনিয়া বাক্-হীনতার দুর্গম নিবিড় অন্তরাল ছুই হাতে ঠেলিয়া দ্বিজনাথকে প্রীতির বচনে উনি বিমোহিত করিয়া দেন ! তা যদি সে না পারে, বৃথা এত কাল কাগজে কাগজে গল্প লিখিয়া ছাপাইয়া আসিয়াছে ! কিন্তু চট্ করিয়া তেমন কোনো গল্পও যে মনে পড়ে না !···

অপরের লেখা গল্প···নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবে ? ভয় করে ! যদি স্নেহলতা রুখিয়া তখনি প্রতিবাদ তোলেন ! ভাবেন, ভণ্ড ! বুজরুক ! অক্ষম ! দুর্ব্বল ! না। এইচ মিটার বলিল, তার দিদি মাসিক পত্র পড়েন ! সুতরাং···

হিরণ্ময় তাগিদ দিল—বলুন, গল্প বলুন···

—বলি !

ক্ষণেক ভাবিয়া দ্বিজনাথ গল্প সুরু করিল,—

কলকাতার এক গলি। গলির দু'ধারে দু'খানা বাড়ী। একখানা বাড়ীতে থাকে শঙ্কর। সে কলেজে পড়ে। খুব ভালো ছেলে—কিন্তু গরীব।

হিরণ্ময় বাধা দিল, কহিল—গরীব যদি তো একলা একখানা বাড়ীতে থাকে কেন ? কারো বাড়ীতে না থেকে ? দিদির বাড়ীতে একজন গরীব থাকেন। বাড়ী তাঁর নয়। বাড়ী দিদিদের। তিনি কলেজে পড়েন। আমায় পড়ান্। আমায় পড়ান্ বলেই ও-বাড়ীতে থাকেন।

দ্বিজনাথ দেখিল, মুস্কিল ! ছেলেটি ভারী চতুর—ইহার কাছে ফাঁকি চলিবে না। কার্য্য-কারণে শৃঙ্খলা রাখিয়া গল্প বলিতে হইবে ! নহিলে এ-ছেলে জেরা করিবে ! তর্ক তুলিবে !

সে কহিল—শঙ্করও ঐ বাড়ীর একটি ছেলেকে পড়াতো।

হিরণ্ময় কহিল,—তাই বলুন।

দ্বিজনাথ কহিল—তাই। গলির ওধারের বাড়ীটা একজন বড়লোকের। সে বাড়ীতে থাকে মায়া। বাপ-মা ভাই-বোন সকলের সঙ্গে সে থাকে। মায়ার ভাই শশী। সে ভারী দুরন্ত। মায়া তাকে শাসন করে। একদিন শশিপদ মায়াকে মেরে বসলো। মায়া বললে—আমায় মারলি ! শশিপদ বললে,—বেশ করেচি মেরেচি।

বাধা দিয়া হিরণ্ময় কহিল—আমি কিন্তু দিদিকে মারি না। দিদি যে বড়—কাজেই দিদির মার সয়ে থাকি। তবে ভ্যাংচাই, চোপা করি। তাতে দোষ কি ! গুরুজনের গায়ে হাত তো তুলি না।

দ্বিজনাথ স্নেহলতার পানে চাহিল। তিনি তেমনি অবিচল শুইয়া আছেন—ছুই চোখ তেমনি মুদিত ! উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া দ্বিজনাথ কহিল—শঙ্কর নীচের বৈঠকখানায় বসে সে বাড়ীর ছেলেকে পড়ায়—আর এ বাড়ীর খড়খড়ির পানে চেয়ে থাকে ! মায়ার সঙ্গে ভাব করবার তার ভারী ইচ্ছা ! কিন্তু কি করে তা হবে ? সেদিন শশিপদ যে মায়াকে মার্লো, তা শঙ্করের দেখতে বাকী রইলো না। তার বুকটা ব্যথায় ঝন্-ঝন্ করে উঠলো ! কিন্তু কি করে সে ? বেচারী প্রাইভেট টিউটর বৈ তো নয় !

একে মেরেচে, তার উপর চোপা—মায়া রাগ করে শশিপদর খেলার বলটা পথে ফেলে দিলে। যেমন দেওয়া, অমনি শশিপদ মায়ার চুলের ফিতা, চিরুণী, বই-খাতা ছুড়ে পথে ফেলতে লাগলো। শঙ্কর চুপ করে থাকতে পারলো না—ছুটে গিয়ে সেগুলো কুড়িয়ে আনলে। মায়া তা দেখলো। দেখে মায়া নেমে এলো তাদের বাড়ীর দোরে। শঙ্কর তাকে দেখে জিনিষ ফিরিয়ে দিতে এলো। সব ফিরিয়ে দিলে—শুধু চুলের ফিতেটা বুকে চেপে ধরে শঙ্কর বললে,—এটি আমায় দিন—আপনার কেশের সুগন্ধ-ভরা স্মৃতি···চিরদিন এটি বুকে রাখবো···আমার সব দুঃখ, সব অভাব ঘুচে যাবে। কথা শুনে মায়ার চোখে জল এলো। মায়া বললে—আপনার এত দুঃখ !

সহসা এক রূঢ় তীব্র তিরস্কার ! কে কথা কয় ?

চমকিয়া দ্বিজনাথ চারিদিকে চাহিল। দেখে, স্নেহলতা মাথা তুলিয়াছেন,—তুলিয়া তার পানেই চাহিয়া··· !

দুজনের দৃষ্টি মিলিতে স্নেহলতা কহিলেন—'ও কি হচ্ছে ? ঐ একফোঁটা ছেলে—তাকে যা-তা হতভাগা গল্প বলে তার মাথা না খেলে বুঝি চলছে না ?···

হায় স্নেহলতা মিত্র ! হায় তরুণী !—দ্বিজনাথের এত-দিনের চিত্ত-সাধনা······

সে একেবারে হতভম্ব ! মুখে তার কথা ফুটিল না। হিরণ্ময় চক্ষু মুদিল।

স্নেহলতা কহিল—গল্প শোনাতে হয়, ইতিহাস আছে, রূপকথা আছে। তা নয় যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া কথা ! একজন মহিলা এ-কামরায় আছেন—তাও ভুলে গেছেন, দেখচি।

স্নেহলতা তখনি মাথা নামাইয়া বালিশে রক্ষা করিলেন, করিয়া চক্ষু মুদিলেন। স্তব্ধ কামরা। বাহিরে শুধু চলন্ত ট্রেণের একঘেয়ে কর্কশ শব্দ !···

হিরণ্ময় মিটি-মিটি চোখ খুলিল। দ্বিজনাথ কহিল—ঘুমোও। আর গল্প নয়। আমার ঘুম পাচ্ছে !

লজ্জায় ক্ষোভে দ্বিজনাথের বুকটা এখনি যেন ফাটিয়া চুরমার হইবে—এমনি কাঁপিতেছিল। সে চক্ষু মুদিল। ট্রেণ চলিতে লাগিল।···

৫

বাহিরে একটা কলরব। ঘুম ভাঙ্গিয়া দ্বিজনাথ দেখে, ট্রেণ থামিয়াছে। ওদিককার বার্থ খালি—স্নেহলতা মিত্র নাই ! তাঁর জিনিষপত্রও অদৃশ্য ! হিরণ্ময় ? মাঝের বার্থে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

ব্যাপার কি ?

সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উপরকার বার্থে সে মেলিঙ্গও নাই। অপর বার্থে আর-একজন সাহেব—নীচে তার গল্‌ফ্‌-ষ্টিক্ এবং কতকগুলা লগেজ ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে।

কামরার দ্বার খুলিয়া বাহিরে চাহিয়া দ্বিজনাথ দেখে, প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া স্নেহলতা মিত্র···

তাঁর একটু দূরে মাথায় পাগড়ী-আঁটা একটা বেয়ারা—ও একজন কুলি। স্নেহলতা কুলিকে লগেজের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন ! ইহার অর্থ ?

তার সেই অবিনয় ! তাহাতে এমন বিরক্ত হইলেন যে কামরা ছাড়িয়া···

কিন্তু হিরণ্ময় ? ভাই হিরণ্ময় ? মনে পড়িল,—হিরণ্ময় বলিয়াছিল, রাগ করিয়া দিদির সঙ্গে কথা বন্ধ···

ছি ছি, তাও কি করে ? এ কি দুর্জ্জয় পণ ! লাফাইয়া প্লাটফর্ম্মে নামিয়া সে একেবারে স্নেহলতার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—উঠে পড়ুন। ট্রেণ এখনি ছেড়ে দেবে।

প্লাটফর্ম্মে আলো ছিল। সে আলোয় স্নেহলতার মুখের পানে চাহিয়া দ্বিজনাথ দেখে, সুন্দর মুখে কি দারুণ বিরক্তি !

ঠিক ! এ সেই তার লক্ষ্মীছাড়া গল্পের ফলে ! সে একেবারে বিনয়ে আনত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিল,—ক্ষমা···আমায় ক্ষমা করবেন। আমার সে অবিনয়···অন্যায় হয়েচে···ক্ষমা চাইছি। দয়া করে গাড়ীতে উঠে বসুন। রাগ করে নেমে যাবেন না !

ক্ষিপ্র দৃষ্টি ফিরাইয়া স্নেহলতা কুলিকে কহিলেন,—উঠাও···

বিষম ক্রোধ ! তা বলিয়া···

ওদিকে গার্ডের হাতে সবুজ আলো ! নিরুপায় দ্বিজনাথ কামরায় উঠিয়া হিরণ্ময়কে সবলে ধাক্কা দিল, ধাক্কা দিয়া কহিল,—ওঠো, ওঠো, ট্রেণ এখনি ছেড়ে দেবে।

বিষম ধাক্কায় হিরণ্ময় উঠিয়া বসিল ; বসিয়া কহিল,—কাশী এসেচে ?

—না, না, কাশী নয়। এটা হাজারিবাগ রোড ষ্টেশন। কিন্তু তোমার দিদি যে রাগ করে নেমে গেছেন তোমায় ফেলে। ওঠো, ওঠো, আমিও নামচি এখানে। না হলে এই রাত্রে···অজানা জায়গায়···তোমার দিদি একা···

—দিদি ! হিরণ্ময়ের চোখে যেন বিস্ময়ের পাহাড় নামিয়াছে ! সে কহিল,—কে আমার দিদি ?

দ্বিজনাথ কহিল,—কেন···ঐ স্নেহলতা মিত্র—ও বার্থে যিনি বসে ছিলেন···

মুখ বাঁকাইয়া হিরণ্ময় কহিল,—ও কেন আমার দিদি-হবে ?

—তবে···উনি তবে কে ?

—কেউ নয় ! আমি ওকে চিনি না।

ট্রেণ চলিতেছিল। বাহিরের ঘন অন্ধকার যেন কালো পাখায় ভর দিয়া ট্রেণের কামরায় ঢুকিতেছিল হু-হু বেগে !

দ্বিজনাথ কহিল,—তুমি একা ট্রেণে চলেছো ! ছেলে মানুষ !

হিরণ্ময় কহিল,—হাওড়ায় আমার ভগ্নীপতি আর দিদি এসে আমায় ট্রেণে তুলে দিয়ে গেছে। কাশীর ষ্টেশনে ছোট কাকা আর তেওয়ারি দরোয়ান গাড়ী নিয়ে আসবে—আমায় নামিয়ে নেবে। আরো ক' বার আমি এমনি এসেচি-গেছি।

তাই ?···তাই ? এই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা তবে ? স্নেহলতার কেহ নয় ! আর তাকে লইয়া দ্বিজনাথ এমন হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছিল !

ট্রেণখানা যেন পাহাড়ের ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া গিয়াছে, উল্টাইয়া একেবারে কাৎ ! সঙ্গে সঙ্গে একটা টাল ! বিষম টাল ! সে টাল সামলাইতে না পারিয়া দ্বিজনাথ বেঞ্চের উপর হেলিয়া পড়িল। কামরার আলোটুকু যেন বাহিরের অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। কি জমাট কালো অন্ধকারের স্তূপ ! সে অন্ধকার দ্বিজনাথকে সবলে চাপিয়া ধরিল, তার নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যায় !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অভিনন্দন *

হে সুধী, মঙ্গল-শঙ্খ আর হুলুধ্বনি
ঘোষিছে অশীতিতম জন্মতিথি তব,
প্রশংসার প্রার্থী নও তুমি যে আপনি,
তাই এই উৎসব এ বঙ্গে অভিনব।

পাশ্চাত্যের জ্ঞান-রত্নে হৃদয়-ভাণ্ডার
পূর্ণ করি' আসি' বাণী-বরপুত্র মত,
জ্ঞান-বিতরণ নিজ জীবনের সার
করিয়া, লইলে বাছি সেই মহাব্রত।

আহারে বিহারে ব্যবহারে পরিচ্ছদে,
স্বদেশীর সমাদর জীবনে তোমার,
দেখাইলে বঙ্গবাসিজনে প্রতি পদে
জাতীয়তা কি যে বস্তু, কি যে মূল্য তার।

হে সাধু, সজ্জন, পূর্ণ-জ্ঞান-পারাবার,
পূর্ণ শত বর্ষ আয়ুঃ হউক তোমার।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

* বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, মহাশয়ের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে

হাড্‌রামট্‌

বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই এই নামের সহিত পরিচিত নহেন। কিন্তু এক সময়ে এই জনপদ শিক্ষা-দীক্ষা ও ঐশ্বর্য্যে দেশবিশ্রুত ছিল। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ ও পারস্য হইয়া যে সকল বাণিজ্যপথে মিশর, সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগরের সন্নিহিত স্থানসমূহে দ্রব্যসম্ভার প্রেরিত হইত, তাহার একটি পথ হাড্‌রামট্‌ জনপদের মধ্য দিয়া প্রসৃত ছিল। এই জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার এককালে প্রাচীন জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-বাধ্য হইত। শুধু যাহারা কঠোর শ্রমসহিষ্ণু এবং সে অঞ্চলে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাহারাই ঐ সকল দুর্ম্মূল্য সুগন্ধী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিত। উল্লিখিত গন্ধকাষ্ঠ ভগবানের প্রীতির জন্য এবং মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইত।

হাড্‌রামটের সন্নিহিত কোনও স্থানে ওফির আত্ম-গোপন করিয়া আছে। উহা স্বর্ণের জন্য এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থে ইহার পরিচয় আছে এবং প্রতীচ্য জাতিরা ঐ ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র উহার



মুকালার দৃশ্য

ছিল। এই পণ্যদ্রব্যের মধ্যে গন্ধ-কাষ্ঠই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

পার্ব্বত্য মালভূমির অনুর্ব্বর অঞ্চলেই সুগন্ধী জ্বালানী কাষ্ঠ বৃক্ষসমূহ হইতে সংগৃহীত হইত। অন্য কোনপ্রকার বৃক্ষই সে সকল অঞ্চলে দেখা যাইত না। এই সকল কাষ্ঠ অত্যন্ত মূল্যবান্‌ বলিয়া, অনেকেই উহা সংগ্রহের জন্য প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া শুষ্ক নদীর বেলাভূমিতে গমন করিত কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই অঞ্চলে উহা সংগ্রহ করিতে আসা বাতুলতামাত্র। কারণ, প্রায়ই অনভিজ্ঞরা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে সূর্য্যতপ্ত অনাবৃত মরুস্থানে প্রাণত্যাগ করিতে কোনও পরিচয় পায় নাই। উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আর একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়। সেই স্থানটি এই অঞ্চলেরই কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাণী—রাণী সেবা, রাজা সলোমনের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের সংবাদ পাইয়া জেরুসালেমে আসিয়া সাবা নামক স্থানে বাস করেন। উক্ত সাবা বা সেবা হাড্‌রামট্‌ এইং ইনেসের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। রোমকগণ এই সকল প্রদেশকে "আরাবিয়া ফেলিক্স", "আরাবিয়া ডেসার্টা", এবং "আরাবিয়া পেট্রিয়া"—সুখী আরব, মরুভূমি এবং প্রস্তরপ্রদেশ নামে অভিহিত করিত।

আবিষ্কারকগণ ধীরে ধীরে পৃথিবীর অনেক অজ্ঞাত প্রদেশে পদার্পণ করিয়া তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাহসী কতিপয় ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া অতিদ্রুত চলিয়া গিয়াছেন। ওফির কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। সাবার প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির ধ্বংসস্তূপ কোথায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। আরবদেশের রহস্যগুলির উদ্ভেদ করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ব্যাপারে ইহা হাড্রামট্ যে পাশ্চাত্য জগতে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই।

বর্ত্তমান যুগে বহু আরববাসী যবদ্বীপে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জন্য ডচ সরকার আরব-দেশের রহস্যময় স্থানসমূহ আবিষ্কারের সুযোগ পাইয়াছেন। হাড্রামটের এক জন আরব অধিবাসী জীবনোপায় সংগ্রহের জন্য যবদ্বীপে গমন করে। সে প্রভূত পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করে। সে হজরত মহম্মদের বংশধর



মুকালা বন্দর

যেমন দুরধিগম্য, ধর্ম্মসংক্রান্ত উন্মাদনাও আরবজাতিকে এমন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, রহস্যের উদ্ভেদ সহসা সম্ভবপর নহে।

প্রস্তর ও বালুকাপূর্ণ সীমাহীন মরুভূমি মনুষ্য বা কোনও প্রকার জীবের খাদ্য ও পানীয়-বর্জ্জিত। সুতরাং বেদুইন পথিপ্রদর্শক ব্যতীত সে অঞ্চলে গমন করা অসাধ্য। তাহারা সহসা অন্যদেশবাসীকে বিশ্বাস করে না বলিয়া তাহাদিগকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে চাহে না। কাযেই কাহারও পক্ষে ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে। সুতরাং বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া সাধারণের সম্মানভাজন হয়।

যবদ্বীপের অধিবাসী হইয়া সে সন্তুষ্ট ছিল না। সে ক্ষমতালাভের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নিজজন্মভূমিতে গিয়া সে স্বাধীন নরপতি হিসাবে বাস করিবে, ইহাই ছিল তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয়। খানকয়েক গ্রাম ও কিছু যায়গার মালিক হইয়া কয়েক শত পল্লীবাসীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিলেই সে সুখী হইবে ভাবিয়াছিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধির মানসে সে এক দল সিপাহী ভাড়া করিল;

অস্ত্রশস্ত্রও সংগৃহীত হইল। সে রাজ্যজয়ে তার পর যাত্রা করিল।

যে অঞ্চলে গিয়া সে ডেরা ফেলিল, তত্রত্য অধিবাসীরা মুকালার সুলতানের কাছে আবেদন জানাইল। সুলতান এক দল সুশিক্ষিত বাহিনী ও একটি কামান পাঠাইয়া দিলেন। গ্রাম ধ্বংস করা হইল, অর্থভুক্ সিপাহীরা ভয়ে পলায়ন করিল; এবং ভাবী নরপতি বন্দী হইয়া সুলতান-সকাশে নীত হইল। ৮০ হাজার ফ্লোরিন মুদ্রা প্রদান করিলে করিতে সম্মত হইলেন না। অন্য উপায়ে এই হাড্রামিকে উদ্ধার করা হইল। কিন্তু এই ব্যাপার উপলক্ষে হাড্‌রামট্‌ আবিষ্কারে অভিযান প্রেরণের সুযোগ পাশ্চাত্য জাতির অদৃষ্টে ঘটিয়া গেল।

ওলন্দাজ উপনিবেশ-সমূহে প্রায় ৮০ হাজার আরব প্রজা আছে। তন্মধ্যে হাড্‌রামটের অধিবাসীই অধিক। উহারা দীর্ঘকাল উপনিবেশে বসবাস করায় ওলন্দাজ জাতির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে।



ঘল বা উয়াজীর—প্রাচীরবেষ্টিত নগর

তবে সে মুক্তি পাইতে পারে, সুলতানের এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল।

কিন্তু আরববাসী প্রাণ থাকিতে অর্থ প্রদান করে না। লোকটির যবদ্বীপপ্রবাসী আত্মীয়গণ ডচ্‌ সরকারের কাছে আবেদন জানাইল। তাহারা এমন প্রার্থনাও করিল যে, লোকটিকে মুক্ত করিবার জন্য একখানি রণপোত পাঠাইতে হইবে। ডচ্‌রাজ্যের প্রজাকে সুলতানের আটক করিয়া রাখিবার কোনও অধিকার নাই!

কিন্তু ডচ্‌ সরকার সহসা এমন একটা সাংঘাতিক ব্যবস্থা

হাড্‌রামট্‌ আবিষ্কার করিবার অনুমোদনলাভ ঘটিলেও উহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে—বরং অসম্ভবই বেশী। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লেফটেনাণ্ট ওয়েলস্টেড এবং সি ক্রুটেনডেন সর্ব্বপ্রথম হাড্‌রামটে যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আডলফ্‌ ভন রীড্‌ তার পর লুপ্ত নগরীর আবিষ্কার-চেষ্টায় কার্য্যারম্ভ করেন। দুই মাস ধরিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নানা বিপদ ও দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈপ্সিত স্থানে তিনি পৌছিতে পারেন নাই। কারণ, ঠিক

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই এক জন ধর্ম্মান্ধ বেদুইন তাঁহাকে বিদেশী বলিয়া চিনিতে পারে। সে তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া নির্য্যাতনের পর তাঁহাকে সমুদ্রতীরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করে। কিন্তু এই সাহসী ব্যক্তি যে সকল বৈজ্ঞানিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে পরবর্ত্তী অনুসন্ধিৎসুগণ প্রকৃত স্থানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আডলফ্ ভন রীড স্বদেশে এ বিষয়ে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, সকলের কাছে নিন্দা ও বিদ্রূপই লাভ করিয়াছিলেন। মনের দুঃখে বিদেশে তিনি অজ্ঞাত পরিচয়ে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহারা বিরাট উপত্যকাভূমির প্রথম নগর শিবম্‌এ উপস্থিত হইলেন বটে; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন! তার পর আরও অনেকবার বহু প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিমান নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর উড়িয়া গিয়া কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে মানুষের মনে মরুভূমি ও পাহাড়বেষ্টিত নিষিদ্ধ নগরীর সম্বন্ধে কৌতুহলই সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অবশেষে ওলন্দাজদিগের প্রেরিত অভিযানকারীরা উক্ত স্থান দর্শনের জন্য গমন করেন। বিদেশীর পক্ষে সে দেশে



কোয়েডন সহর

উক্ত ঘটনার ৫০ বৎসর পর লিও হিরস্চ্, ভন রীডের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ছয় মাস ধরিয়া তিনি সমুদ্র-উপকূলের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা হাড্‌রামটে প্রবেশের পথ আবিষ্কার করেন। তত্রত্য তিনটি বড় সহরে প্রবেশ করিয়া এক জনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া নগর ত্যাগ করিতে আদেশ করায় কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় সমুদ্র-উপকূলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মিঃ থিয়োডর বেণ্ট পত্নী সহ সদলবলে হাড্‌রামটের রহস্যসমাধানে চেষ্টা করেন। গমননিষেধ তখন রহিত হইয়াছিল। হাডরামি তীর্থযাত্রীরা প্রতি বৎসর কোয়াবার হুড দর্শনে গমন করিয়া থাকে। মিঃ ডি ভ্যান্ ডার মিউলেন দলবল সহ উক্ত তীর্থ দর্শনে গমন করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কোনও প্রতীচ্য-দেশবাসী তথায় গমন করিতে পারে নাই। গুপ্তনগরীর চমৎকার প্রাসাদ এবং দুর্গগুলি প্রতীচ্য সভ্য-সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সাবিয়ান ও মিনিয়ান্ যুগের ধ্বংসস্তূপ সমূহ আছে, ইহা মানুষ শুধু অনুমানই করিত। বীর বারসত, "নরকের মুখ"—যথায় অবিশ্বাসী আত্মা-সমূহ কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত

হয় নাই। এমন কি, মানচিত্রে হাড্রামটের উল্লেখ যেখানে আছে, তাহাও যথার্থ নহে।

গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ মিউলেন এডেনে ডাঃ এইচ ভন উইসম্যানের সাক্ষাৎ পান। তাঁহারা হাড্রামটে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এডেন হইতে তাঁহারা ষ্টীমারযোগে মুকালা গমন করেন। সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী এই নগরের উপকূলবর্ত্তী গৃহগুলির পাদমূলে সমুদ্রতরঙ্গ প্রতিহত হয়। নিদারুণ গ্রীষ্ম সমুদ্রশীকরসিক্ত পবনে অনেকটা হ্রাস পাইয়া থাকে। বর্ষাকালে তরঙ্গভঙ্গজনিত গর্জ্জন সন্নিহিত বাজারের কলরবকে প্রশমিত করিয়া দেয়। বেদুইনগণ এই বাজারে আসিয়া আরব এবং ভারতীয় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। সহরের প্রকাণ্ড তোরণদ্বারে বেদুইনগণ বন্দুকগুলি সমর্পণ করিয়া তবে নগরে প্রবেশ করিতে পায়। তার পর তাহারা ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য আরম্ভ করে। ময়দা, চাউল, শুষ্ক মৎস্য, হাঙ্গর-মাংস প্রভৃতিই প্রধানতঃ তাহারা ক্রয় করিয়া থাকে।

এই বেদুইনদিগের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত নহে। তাহারা শুধু কটিবাস ধারণ করিয়া থাকে—মাথায় একটা চর্ম্মনির্ম্মিত বেষ্টনী। কুঞ্চিত, দীর্ঘ, তৈলাক্ত কেশরাজি উপরের দিকে আবদ্ধ রাখিবার জন্যই এই চর্ম্মবন্ধনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের কণ্ঠদেশে চর্ম্মবন্ধনী-বিলম্বিত একখানি পদক দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যতাপ এবং শুষ্ক বাতাস হইতে গাত্রচর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বাঙ্গে নীলরঙ্গ মাখিয়া থাকে। এজন্য তাহাদের কৃষ্ণদেহ আরও কদর্য্য দেখায়। প্রত্যহ অপরাহ্নকালে তাহারা নীলরঙ্গের উপর চর্ব্বি মালিশ করিয়া গাত্রচর্ম্মকে আর্দ্র করিয়া রাখে।

অভিযানকারীরা এক সপ্তাহ মুকালায় অপেক্ষা করিয়া এক দল সার্থবাহের সহিত দেশের অভ্যন্তরভাগে যাত্রা করেন। মুকালার সুলতান অধিকাংশকাল হায়দ্রাবাদে যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার উজীর তথায় থাকেন। নেদারল্যাণ্ড সরকারের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা আছে। উজীর অভিযানকারীদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রদান করেন। তথাপি তাঁহাদের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল যে, হয় ত অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে।

যাত্রার প্রারম্ভে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে,



গন্ধকাষ্ঠ—অধুনা বিলুপ্তপ্রায়



সুডেরা যুবক



আয়ববাসী কাফ্রী



খুরাইজ নগর

এক দল বেদুইন অভিযানকারীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। কারণ, যে সার্থবাহদলের সহিত তাঁহারা যাত্রা করিতেছিলেন, তাহাদের সহিত অপর বেইদুন দলের মনোমালিন্য আছে। উজীর এই সংবাদ পাইয়া অনেক চেষ্টায় কয়েক সপ্তাহের জন্য তাহাদিগকে আক্রমণে নিরস্ত করেন। কিন্তু পাছে আবার তাহারা মতপরিবর্ত্তন করে, এই আশঙ্কায় উজীর পরামর্শ দিলেন যে, অভিযানকারীরা সুলতানের মোটর-গাড়ীতে অগ্রসর হইয়া, যেখানে বিপদের হইয়াছিল। রাত্রিকালে সার্থবাহ বেদুইনগণ নানাস্থানে সতর্ক প্রহরী স্থাপন করিত।

অভিযানকারীরা অবশেষে শুষ্ক পার্ব্বত্য নদীপথ অতিক্রম করিয়া বালুকাপূর্ণ সমতলক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেখানে কোনও প্রকার তৃণগুল্মের দর্শন তাঁহারা পাইলেন না। জলের নামমাত্রও সেখানে ছিল না। সমগ্র ভূমি যেন ধাতুময় প্রস্তরে নির্ম্মিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অসংখ্য উষ্ট্রের চরণচাপে পথ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।



ডিজ্জার আল বুকরি

আশঙ্কা, তাহা পার হইয়া, সার্থবাহদলের প্রতীক্ষা করিবেন। সেই পরামর্শানুসারে তাঁহারা যাত্রা করেন।

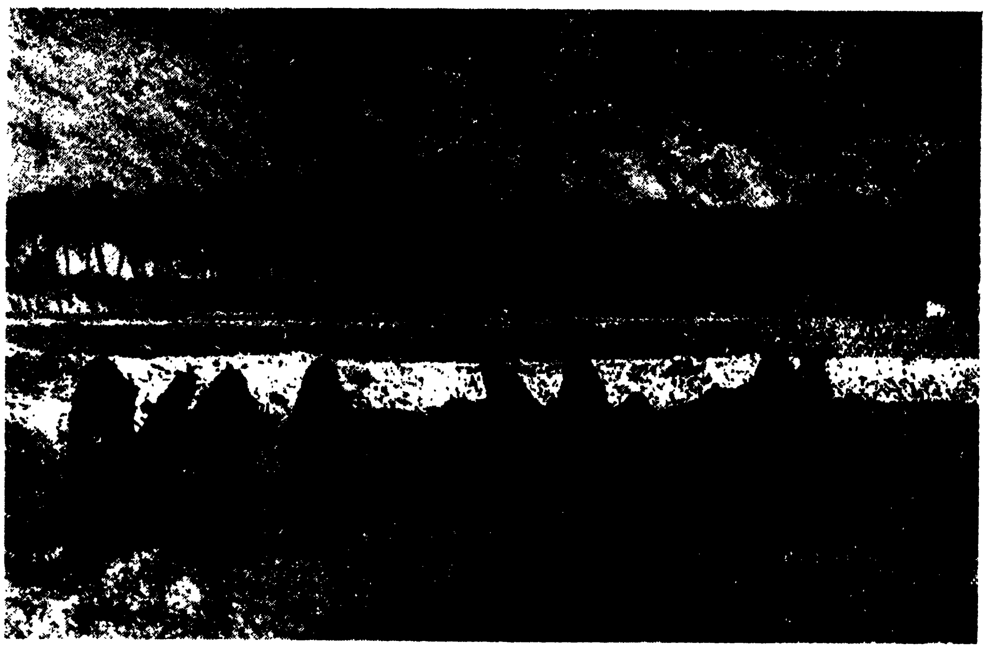
দিনের পর দিন ধরিয়া তাঁহারা শুষ্ক নদীর প্রস্তরাকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। বাতাসের আদ্রতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। ইহাতে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণাশঙ্কাও তিরোহিত হইয়া গেল। দিবাভাগে উত্তাপ অসহ্য বোধ হইলেও রাত্রিকালে বেশ স্নিগ্ধতা অনুভূত হইত। এই শুষ্ক নদীপথগুলি তেমন নিরাপদ নহে। অভ্যস্ত উষ্ট্রগণ ব্যতীত এতদঞ্চলে কোনও বাহনই নিরাপদ নহে। অভিযানকারিগণকে অনেক সময় হামা দিয়া চড়াই উত্তীর্ণ হইতে এই স্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁহারা যে স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় কোনও মনুষ্যাবাস নাই; কিন্তু উহার এক পার্শ্বে যেন জমী ঢালু হইয়া গিয়াছে। তথায় সামান্য বারিপাতবশতঃ কর্দ্দম ধৌত হইয়া জমা হইয়া রহিয়াছে। দুই একটা জ্বালানী কাঠের গাছও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

এইখানে আসিয়া একটা বেদুইন-শিবিরের সহিত তাঁহাদের প্রথম সংস্রব ঘটিল। এই যাযাবর সম্প্রদায় আরবদেশের অন্যান্য যাযাবর সম্প্রদায়ের ন্যায় বস্ত্রাবাসে বাস করে না। ইহারা কোনও গুহা অথবা কোথাও খুঁটি

পুতিয়া তাহার উপর বস্ত্রাচ্ছাদন টানাইয়া, তাহার নিম্নে বিশ্রাম করিয়া থাকে।

অভিযানকারীরা অতি সন্তর্পণে তাহাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা কি ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সে সময়ে সমর্থ পুরুষ ও নারীরা তথায় ছিল না। তাহারা পশুপাল চরাইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিল। শিবিরে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং শিশুগণ ছিল। অভিযানকারীরা তাহাদিগের নিকট দেখিল, সেখানেও শুভ্র তুষারবৎ বর্ণ বিদ্যমান। মিঃ মিউলেন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহারা শ্বেতকায়।

তাহারা তাঁহাদিগকে তথায় রাত্রিবাসের জন্য অনুরোধ করিল। নৃত্যগীতে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রস্তাবও করিল; কিন্তু বিশ্রাম করিবার উপায় তাঁহাদের ছিল না। সে কথা তাহাদিগকে তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন। তথাপি তাহারা বলিল, "আপনারা থাকুন। প্রত্যেকের জন্য এক একটি রমণী প্রদান করিব।" অভিযানকারীরা



শস্যক্ষেত্রে ওয়াডি ডুয়ানের মুসলমান নারী

হইতে অসদ্ব্যবহার পাইলেন না। সকলে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

এক জন বৃদ্ধা অভিযানকারীদিগের নেতা মিঃ মিউলেনের মুখের মধ্যে স্বর্ণ দেখিয়া অন্যকে তাহা দেখাইল। সকলেই হাসিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার বাঁধান দাঁত খুলিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন। সকলেই তাহাতে হাসিতে লাগিল। এইরূপে ভন উইস্‌ম্যানের মুখের অভ্যন্তরভাগও তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। এক জন মিঃ মিউলেনের গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ করিয়া দেখিল, উহা বর্ণানুরঞ্জিত কি না। কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িল—রং উঠিল না। সার্টের হাত তুলিয়া তাহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এক জন চতুরা বৃদ্ধা বলিল, "এরা নহে। তরুণীরা পশু চরাইতে গিয়াছে, সন্ধ্যায় তাহারা ফিরিয়া আসিবে।"

তার পর তাঁহারা ওয়াডি ডুয়ানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই নদী ওয়াডি হাড্রামট্ নদীর শাখা। এই স্থানে আসিয়া তাঁহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। এখানে নদীগর্ভে শ্যামলিমার রেখা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। নদীর প্রস্তরাকীর্ণ তটদেশে তাঁহারা তাল-শ্রেণীর বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এইখানেই সহর নির্ম্মিত। বাড়ীগুলি চারি পাঁচতলা উচ্চ। দ্বিপ্রহরে সহর আছে বলিয়া বুঝা



হাডরামি পুরুষ

যায় না। কারণ, যে পাহাড়ের গাত্রদেশে ঘরগুলি নির্ম্মিত, উভয়ের বর্ণ একই প্রকার। দ্বিপ্রহরে ভীষণ রৌদ্রে কেহ ঘরের বাহির হয় না। কাযেই কোনও জীবিত প্রাণীর দর্শন সে সময়ে পাইবার উপায় নাই। অভিযানকারীরা কোনও শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, নগরটি যেন অভিশপ্ত হইয়া পুনর্জ্জাগরণের দিনের জন্য সুপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।

উপত্যকা-ভূমিতে অবতরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পথটি এমন ভাবে নামিয়া গিয়াছে, উষ্ট্রগণ পর্য্যন্ত সে পথে চলিতে সম্মত হইল না। অবশেষে বেদুইন পথিপ্রদর্শকরা এক একটি উষ্ট্রকে উৎসাহ দিয়া তাহাদের মুখ-রজ্জু ধারণ করিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। অতি কষ্টে, অত্যন্ত শ্লথ-গতিতে অবশেষে তাঁহারা উপত্যকা-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

বেদুইন চর স্থানীয় বৃদ্ধ এবং অন্ধ শাসকের নিকট সংবাদ লইয়া গমন করিল তাঁহার নাম "বা-সুররা"। তিনি হিরস্চ্ ও বেনুটস্‌এর আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পূর্ব্বে যে ইঁহারা এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা অভিযানকারীরা শাসকের নিকট জ্ঞাত হইলেন। ধূসরবর্ণ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাসাদে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

দুই তিনটি দরজা পার হইয়া—সেনা-নিবাস অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা অবশেষে সর্দ্দারের উপবেশন-কক্ষে নীত হইলেন। তিনি পারিষদ ও অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ সেখানে ছিল।

বা-সুররার অতিথি হইয়া কয়েক দিন তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু অপরিচিত হাড্‌রামট্ সহর দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন।



জোলএর ছোরাধারী বেদুইন



বা-সুররার প্রাসাদ

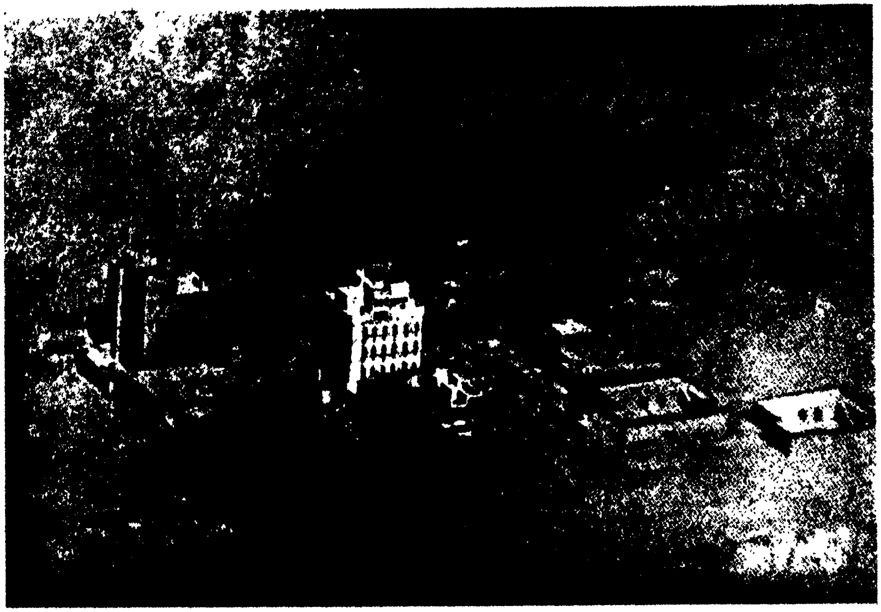
হাজারেন নামক সহরে পৌছিতে তাঁহাদিগকে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে পৌছিয়া তাঁহাদিগকে সে সকল কষ্টের কথা বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। জনৈক হাড্রামি যবদ্বীপে দীর্ঘকাল বাস করিয়া পোর্ত্তুগীজ জাতির অন্তর্গত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির বাসভবনে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

অপরাহ্ণকালে বিশ্রামের পর, তাঁহারা পুনরায় যাত্রারম্ভ করিয়া শেবিয়ান্ ও মিনিয়ান যুগের বড় বড় ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইভাবে মানাদ নামক পল্লীতে তাঁহারা উপনীত হইলেন। এইখানে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ দস্যুর আড্ডা ছিল; কিন্তু এখন সে স্থান সুশাসিত এবং নিরাপদ। হাড্রামুটে যাইবার ইহাই তোরণদ্বার। কিন্তু হাড্রামটে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অভিযানকারীরা হুরেডার সৈয়দ পরিবারের সহিত দেখা করিতে গমন

সিফ্ নামক স্থানে ভন রীডএর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতেই বেন্‌টস্ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অভিযানকারীরা সেই সিফ্ নগর নিরাপদে অতিক্রম করিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহারা খৃষ্টান, সুতরাং কেহ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রার্থনীয় মনে করে না।



বেদুইন রক্ষিদল



মরুমধ্যে তিনটি দুর্গ



হাড্রামট্ বেদুইন



হাড্রামি উপত্যকার টুপীধারী বেদুইন



হুরেডার সন্নিহিত মরু সহর

করিলেন। যবদ্বীপের পোর্ত্তুগীজ সরকারের সহিত এই সৈয়দ পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

হুরেডায় পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপীয় প্রবেশ করেন নাই। অভিযানকারীদিগের জন্য সৈয়দ পরিবার একটা উৎসবের আয়োজন করিলেন। তাঁহাদিগকে সমগ্র রাজপথে সসম্মানে ভ্রমণ করান হইল। এখানে ৩০ ফুট গভীর কূপ হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হইয়া থাকে। যবদ্বীপের নাগরিকগণ অর্থ প্রেরণ করায় নগরটি এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। এখানে বহু মসজেদ ও বাসগৃহ আছে।

প্রগতিবাদী সৈয়দ-বংশধর আবু বকর এল-কাফ টারিমএ অবস্থান করেন। তিনি মোটরগাড়ী দেখাইয়া তাঁহার দেশবাসীকে শান্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে টারিম হইতে দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত মোটর-চালনার উপযোগী পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনিই মোটরগাড়ীর জন্য পাহাড়ের উপর দিয়া হাড্রামটে যাইবার পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মরু-সমুদ্রের মধ্য দিয়া মোটরযোগে গমন সুখকর নহে। তাঁহারা বালুকা-বাত্যায় পীড়িত হইয়া পড়িয়া-



উচ্চশ্রেণীর হাড্রামট্ নারী-দল

হাড্রামট্ যাত্রার কষ্ট লাঘবের জন্য সৈয়দ পরিবারের কোনও বন্ধু অভিযানকারীদিগের জন্য মোটর-গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পথ এত কদর্য্য যে, স্থানে স্থানে মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। এ দেশের লোক মোটরগাড়ী কখনও দেখে নাই। গাড়ী দেখিবার জন্য অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া মহিলারা পর্য্যন্ত বাহিরে আসিয়াছিল।

এ সকল অঞ্চলে মোটরগাড়ী আনয়ন করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। কারণ, সমুদ্রতীর হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মোটরগাড়ীর ভিন্ন অংশ বোঝাই দিয়া আনিতে হয়। প্রসিদ্ধ ধনী এবং

ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা অদূরে একটি ধূসরবর্ণের দুর্গ দেখিতে পাইলেন। বালিয়াড়ীর উপর ডিজার আল্ বুকরি নামক এই উন্নত দুর্গে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা শত্রুবেষ্টিত হইয়া যাপন করিতেছিলেন।

অভিযানকারীদিগের বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। মোটক-চালক শৃঙ্খধ্বনি করিতেই দুর্গ-প্রাকার হইতে প্রহরীরা বিস্ময়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা দুর্গমধ্যে অভ্যর্থিত হইলেন।

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা হেনান নামক ক্ষুদ্র সহরে রাত্রিবাস করিলেন। বিন মার্ট নামক এক জন

ধনী হাড্রামি তাঁহাদিগকে আপনার বাসভবনে আশ্রয় দিলেন। এককালে এই সহর শ্যামশ্রী-পূর্ণ ছিল; কিন্তু বালুকারাশি ক্রমশই তালকুঞ্জকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

পরদিবস হাড্রামট উপত্যকায় মোটরযোগে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। বালিয়াড়ির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে শ্যামল দৃশ্য তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। খর্জ্জুর-বীথির নিম্নস্থ কূপ হইতে কপিকলের সাহায্যে জল উত্তোলনের দৃশ্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মনুষ্য-আবাসে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন। সেখানে গাছে গাছে পাখীও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। মরুভূমির দৃশ্য তখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। নগরে স্থপতি-শিল্প প্রচুর, নগরটিও দুর্ভেদ্য। অট্টালিকাগুলি আকাশচুম্বী, পথগুলি সঙ্কীর্ণ। সমগ্র অট্টালিকা ধূসরবর্ণের।

নগর-প্রাচীরের সম্মুখেই সুলতানের প্রাসাদ অবস্থিত। উহা সুবৃহৎ এবং সুন্দর। শুধু সাধারণ কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকার সাহায্যে এইরূপ চমৎকার প্রাসাদ নির্ম্মাণ হাড্রামি শিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচায়ক। সামান্য কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত—মসজেদ বাগানবাড়ী সবই সূর্য্যতাপে শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত। বেনটস্ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সুলতান-প্রাসাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া-



হাড্রামটের মসজেদ-শোভিত সহর

তাঁহারা তখন আল্ কোয়াটান নামক প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইখানে শিবমের সুলতানের একটা সুন্দর প্রাসাদ বিদ্যমান। তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল। সুলতান তখন শিবম্এ অবস্থান করিতে-ছিলেন। সুলতান-পরিবারের এক জন আত্মীয় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

কিন্তু সেখানে অবস্থান না করিয়া তাঁহারা শিবমএর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপত্যকাভূমিতে এই সহরই

ছিলেন। এই প্রাসাদ এক শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া সুলতান দাবী করিয়া থাকেন।

শিবমএ বিশ্রাম করিবার পর তাঁহারা সেয়ন্ যাত্রা করিলেন। এই নগরটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হাড্রামট্ প্রদেশের মধ্যস্থলে এই নগর অবস্থিত। কাথিরি সম্প্রদায়ের সুলতান এইখানে বাস করেন। এই সুলতান বিশেষ শক্তিশালী হাড্রামি স্থপতি শিল্পের নিদর্শন তাঁহার প্রাসাদে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যবদ্বীপের প্রভাব এ অঞ্চলে প্রবল। সুলতানের



গুরেডা সহরের বহির্ভাগে বেদুইন রক্ষিদল



রহস্যময় নগর



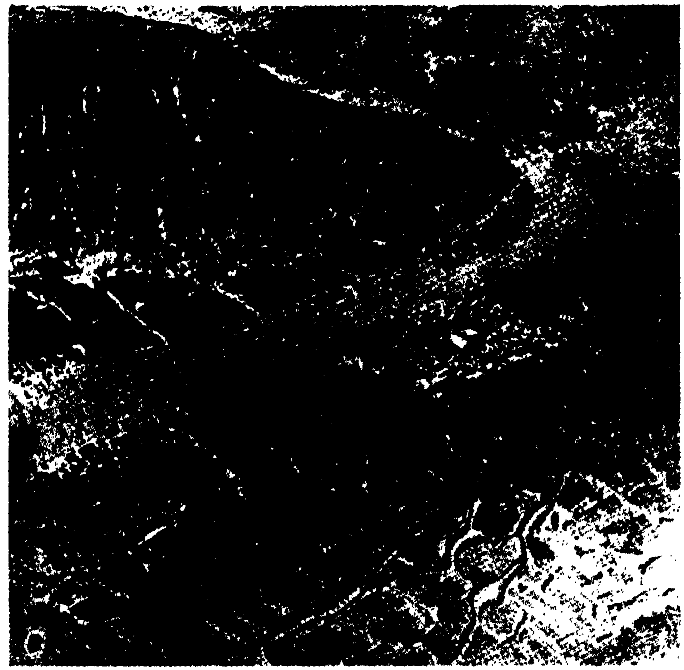
টারিম নগর



শিবম্‌এর সুলতানের প্রাচীন প্রাসাদ

সভায় মালয় ভাষা প্রচলিত। নাগরিকগণের বেশভূষাও যবদ্বীপের অনুকরণে। আহার্য্য ব্যাপারেও যবদ্বীপের প্রভাব বিদ্যমান। শত শত পোর্ত্তুগীজ আরব এখানে বাস করিয়া থাকে। সুলতান অভিযানকারীদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সুলতানের শাদা বাগানবাড়ীতে কয়েক দিন তাঁহারা পরম সুখেই যাপন করিলেন।

তথা হইতে টারিম অভিমুখে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হিরস্চ এখানে অল্পক্ষণের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার পর কোনও শ্বেত জাতির লোক এতদঞ্চলে আসেন নাই। শুধু গগনপথে বিমানযোগে এডেন হইতে কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ ইহার



শিবম নগর



সাইউন্ ও টারিমএর মধ্যবর্ত্তী মারিয়ামা ধ্বংসস্তূপ



আল কোয়াটানএ স্থলতানের প্রাসাদ

আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিরস্চ যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় এক দল ধর্ম্মোন্মত্ত লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি যাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি অনতিবিলম্বে হিরস্চকে নগর হইতে বিদায় দিবার ভার লইয়াছিলেন বলিয়াই সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবু বকর বিন্ শেখ আল-কাফ্ টারিমের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সৈয়দ। তিনি অভিযানকারীদিগকে সাদরে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন। শুধু পান-ভোজনে আপ্যায়িত করা নহে, তাঁহারা যত দূর ভ্রমণ করিবেন, যাহাতে নিরাপদে সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থার ভারও গ্রহণ করিলেন। বেদুইনদিগের উপর



স্থলতানের সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ

তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। টারিম ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ৩ শত ৬০টি মস্‌জেদ এককালে বিদ্যমান ছিল। এখন অবশ্য এতগুলি মস্‌জেদ না থাকিলেও, সংখ্যা বড় অল্প নহে। অভিযানকারীরা একটা মস্‌জেদের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, উহা ১ শত ৭৫ ফুট উচ্চ। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বৃত্তাকার সোপানপথে উপরে আরোহণ করিতে হয়। অভিযানকারীরা সেখান হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টারিমএ বহু ধনী হাড্‌রামি বাস করিয়া থাকে। তাহারা ব্যবসায় উপলক্ষে হল্যাণ্ড, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি স্থানেও বসবাস করিয়া থাকে। ইহাদের ঐশ্বর্য্য সুলতানের অপেক্ষাও অধিক বলিয়া সুলতান তাঁহার খুল্লতাত সৈইয়ন-এর সুলতানের সহরেই অবস্থান করেন।

টারিম স্থপতিশিল্পে ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর এবং যবদ্বীপের প্রভাব বিদ্যমান। মৌলিক হাড্‌রামি শিল্প বিলুপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অন্য শিল্পে উহা রূপান্তরিত হইয়াছে। দরজা, জানালা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়েই নির্ম্মিত।



শিবমের তুষারধবল মসজেদ

দুইখানি মোটর-গাড়ীতে অভিযানকারীরা বেদুইন রক্ষিপরিবৃত হইয়া উপত্যকাভূমির পূর্ব্বভাগে যাত্রা করিলেন। নিদারুণ গ্রীষ্ম তাঁহাদিগের সংকল্পে বাধা জন্মাইতে পারিল না। মধ্যযুগের দুর্গে কাসম্‌এর হাকিম বাস করিতেছিলেন। মোটর তথায় পৌঁছিল। বোর্ণিও দ্বীপে তাঁহার দুইটি পুত্র মারা গিয়াছিল।

কাসম্ হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহারা আরও পূর্ব্বভাগে যাত্রা করিলেন। নবী হুড্ যে উপত্যকায় থাকিতেন, তথায় উপনীত হইয়া তাঁহারা কবের হুড্ সহরে গমন করিলেন। ৩ হাজার মৃতদেহের কবর এইখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হাড্‌রামটের পবিত্র তীর্থস্থানে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা নমাজ-রত বহু ব্যক্তিকে দর্শন করিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিল না। মিঃ মিউলেন ভাবিয়াছিলেন, অতি প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ী এখানে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, সহরটি বড় বড় অট্টালিকায় পূর্ণ। প্রত্যেক বাড়ী সযত্ন-রক্ষিত এবং মনোরম।

বৎসরে কয়েক দিনের জন্য এখানে বেদুইনরা তীর্থযাত্রা করিতে আসিয়া থাকে। তখন সহরবাসীদিগের সহিত তাহাদের পূর্ব্ব-শত্রুতা তাহারা বিস্মৃত হয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্বেষ, হিংসা, কলহ কিছুই থাকে না।

হুড্ এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা। আল্লা তাঁহাকে হাড্‌রামটের আদিম অধিবাসীদিগের শুদ্ধির জন্য পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি আসিয়া অধিবাসীদিগের



সুলতানের প্রাসাদ হইতে শিবম্‌ নগরের দৃশ্য

করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশীয় ভৌগোলিকগণ বলেন যে, ঐ স্থানে একটি আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান আছে। সে আগ্নেয়গিরি নীরব নহে। যদি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত মানিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র আরব-মালভূমির মধ্যে উহাই একমাত্র আগ্নেয়গিরি। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের কাছে ঐ স্থানের মূল্য অধিক। অভিযানকারীরা বীর বারাহুটে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন।

পরদিবস কতকগুলি সাহসী আরবও তাঁহাদের সহিত ঐ স্থানে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। উষ্ট্র-পৃষ্ঠে জলপূর্ণ চামড়ার আধারগুলি স্থাপন করিয়া অভিযানকারীরা গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। বেদুইন সর্দ্দার মালাহিন তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বৈদ্যুতিক মশাল তাঁহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন। হিংস্র জন্তু ও সর্পের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বেদুইন রক্ষীরা অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ বীর বারাহুতের কালো মুখ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এইখানে শুষ্ক নদীমুখ অত্যন্ত প্রশস্ত। পর্ব্বতের মাঝে মাঝে কালো গুহাও

মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল লোক উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে এইখানে নানাভাবে নির্য্যাতিত করে; কিন্তু আল্লা তাঁহার উদ্ধারের জন্য একটি পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মোপদেষ্টা তাহার মধ্যে অন্তর্হিত হন। তিনি যে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার দুগ্ধ পানে তিনি জীবন ধারণ করিতেন। প্রভুর সমাধি-পার্শ্বে সেই উষ্ট্রী বিগতজীবন হইয়া পড়িয়া যায় এবং অবশেষে প্রস্তরে পরিণত হয়।

কোয়াবার হুডএর পরই পার্ব্বত্য উপত্যকার আরম্ভ। উহার শেষে ভয়ঙ্কর স্থান অবস্থিত। সেই স্থানের কথা প্রাচীনকালের লেখকরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের আত্মার জন্য এই স্থান আল্লা নির্দ্দিষ্ট

দেখা যাইতেছিল। রহস্যপূর্ণ গুহামুখ পরীক্ষার জন্য সকলেই তাড়াতাড়ি পাহাড়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সেখানে কোনও প্রকার নিশ্বাসরোধকারী বাষ্প বা শব্দ আবিষ্কৃত হইল না।

প্রসিদ্ধ গুহামুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, ভিতরে অতলস্পর্শ অন্ধকার। বৈদ্যুতিক আলোক অন্ধকার ভেদ করিয়া তলদেশ নির্ণয় করিতে পারিল না। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল, গুহার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে, সেজন্য অদৃষ্টে হয় ত অনেক দুর্ভোগ থাকিতে পারে।

ভন্‌ উইসম্যান কম্পাস ও ফিতা লইয়া পথ মাপিয়া একটা নক্সা প্রস্তুত করিলেন। সমস্ত স্থানটাই ভয়ানক



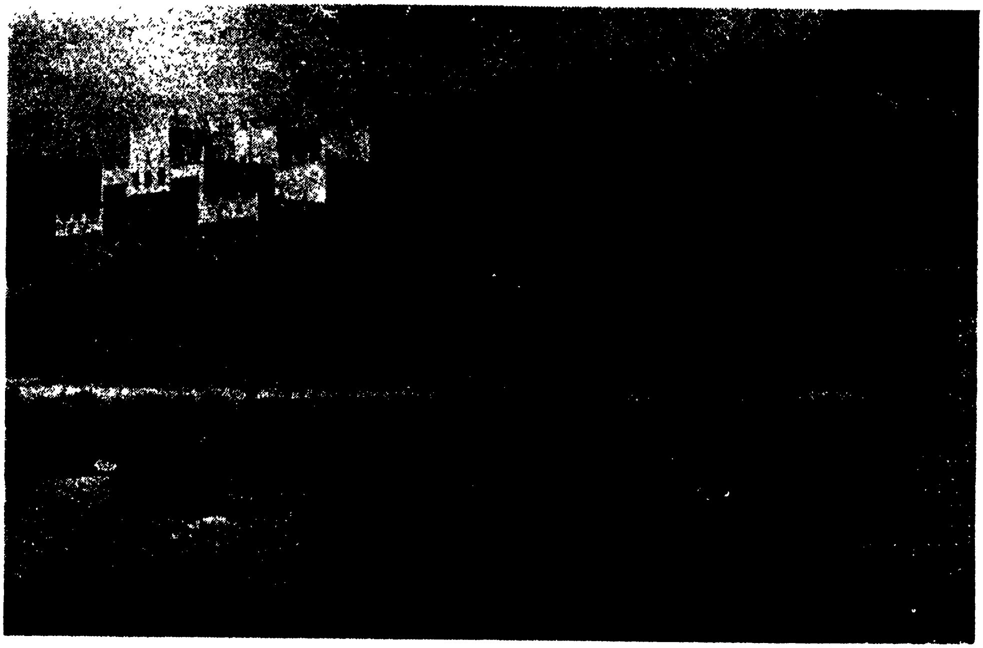
টারিমের সহরতলী

উত্তপ্ত। ভন উইসম্যান এবং এক জন আরব সাহসে নির্ভর করিয়া গুহার মধ্যে অবতরণ করিলেন। অন্যান্য সকলে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ শুনা গেল না বা বিজলী মশালের আলোক দেখা গেল না।

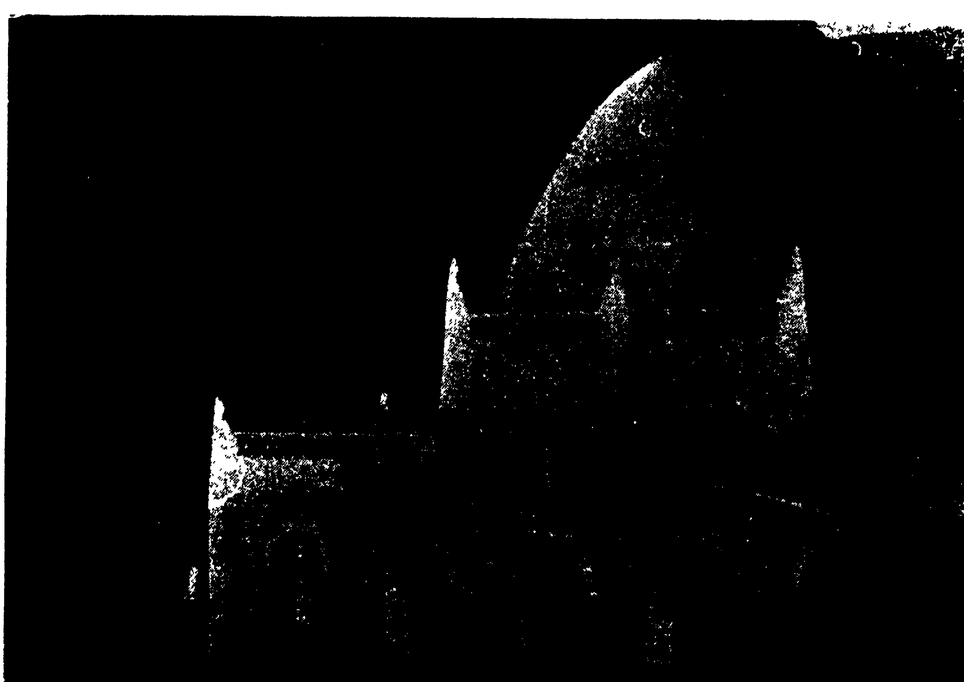
বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আলোকরশ্মি দেখা গেল। তার পর সকলে মিলিয়া দুই জনকে গুহামুখ হইতে উপরে তুলিলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টার পর সকলে প্রবেশমুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, উহা আগ্নেয়গিরির মুখও নহে বা নরকের দ্বারও নহে। আবিষ্কারকার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহারা এডেনে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার স্থলপথেই তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন। কোনও বেদুইন শেখের ভবনে, মরুমধ্যে তাঁহাদিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেখানে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। সেখান হইতে শুষ্ক নদীপথ ধরিয়া তাঁহারা যাত্রা করিলেন; কিন্তু ভন উইসম্যান পাড় বাহিয়া উপরের দৃশ্য দেখিবার জন্য উঠিতেই



শিবমএর অপর দৃশ্য



সাইউন্‌এর সৈয়দ প্রাসাদ



ধর্ম্মপ্রচারক হুডএর সমাধির বিশেষ দৃশ্য

বিপদ ঘনাইয়া আসিল। পাড়ের উপরে অপর দিকে শত্রুপক্ষের প্রহরীরা রক্ষাকর্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা শত্রুবোধে গুলী নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসায় তাঁহারা খাতের মধ্য দিয়া চুপিচুপি পলায়ন করিতে লাগিলেন।

যে পথিপ্রদর্শক তাঁহাদিগকে খাতের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছিল, অবশেষে সে পথ হারাইয়া ফেলিল। অভিযানকারীরা প্রভাত পর্য্যন্ত খাতের মধ্যে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কাযেই তাঁহারা সতর্কতা সহকারে ও কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন, ডিজার আল-বুকরিতেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। পথিপ্রদর্শক আগাইয়া গেল। সে সঙ্কেতশব্দ উচ্চারণ করিতেই অপর দিক্ হইতে তাহার উত্তর আসিল। অল্পক্ষণ পরেই অভিযানকারীরা সেনাদলের দ্বারা বেষ্টিত হইলেন। সকলেই আনন্দে তাঁহাদের সহিত করমর্দ্দন করিল। পূর্ব্বে যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার নিকট তাহারা তাঁহাদের আগমনসংবাদ আগেই পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাদের সন্ধানেই আসিতেছিল।



কোয়াবার হুডএ ধর্ম্মপ্রচারকের সমাধি

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন কি, মিত্রপক্ষ ভ্রমক্রমেও তাঁহাদিগকে দূর হইতে গুলী করিতে পারে, এমন আশঙ্কাও তাঁহাদের ছিল। রাত্রিকালে ডিজার আল্-বুকরিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ চৌকীদার কুকুরগুলিকে তখন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

উৎকণ্ঠা, শ্রান্তি ও পিপাসায় পীড়িত হইয়া তাঁহারা তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহারা অগ্রসর হইয়াই চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তাঁহারা মনুষ্যপদশব্দ

মিত্রপুরীর ছাদে বসিয়া তাঁহারা শ্রান্তি দূর করিবার অবসর পাইলেন। আল্-বুকরির ভ্রাতৃবৃন্দ শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সুলতান ও সৈয়দগণের নিকট হইতে তাঁহারা কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা বিবৃত করিয়া তাঁহারা সকলের আনন্দবিধান করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে বিদায় লইয়া তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঘোষ।

সে কালের স্মৃতি

কোন পূজনীয় সুহৃদ্ এক দিন প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছিলেন, ষাট বৎসরেই আমাদের আয়ুঃশেষ; তাহার পর যদি কেহ দুই দশ বৎসর জীবিত থাকেন—তাহা তাঁহার পরমায়ুর 'ফাউ' মাত্র। সুতরাং ভগবান্ এই জীবনসন্ধ্যায় বহু শোক-দুঃখ ও অশান্তি ভোগের জন্য অঞ্জলি ভরিয়া আয়ুর যে ফাউ দান করিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার আহ্বানের প্রতীক্ষায় দুঃসহ জীবন-ভার বহন করিতে হইতেছে। আশা, উৎসাহ, উদ্যম, সুখশান্তি সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর ওপার হইতে মৃত্যুর করুণ সঙ্গীত কাণে আসিয়া বাজিতেছে; এখন 'মরিতে ঝরিতে শুধু বাকী।'

সে কালের স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় দৈনিক 'বসুমতী'তে সার চার্লস্ টেগার্টের বিলাতী বক্তৃতার সার মর্ম্মের কিয়দংশ পাঠ করিলাম। সার চার্লস্ এখন বিলাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ; তিনি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী; কিন্তু তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন; শ্রীঅরবিন্দকে বিপ্লববাদীদের অন্যতম নেতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন। আমি জানি, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইবে না এবং অরবিন্দের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা বহুবার ঘটিয়াছে। তিনি কোন দিন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই; এখন তিনি সাধনমার্গের যে স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সার চার্লসের ন্যায় শক্তিশালী বৈষয়িকের সহস্র আক্রমণেও সেই স্থান হইতে তাঁহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই।



শ্রীঅরবিন্দ

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রীঅরবিন্দ যে সময় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিনে সর্ব্বোচ্চ নম্বর (record mark) পাইয়া সসম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় সার চার্লস্ সাধারণ 'মিঃ টেগার্ট'রূপে বঙ্গীয় পুলিসের একটি ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত ছিলেন; তখন তাঁহার অরবিন্দের কার্য্যপদ্ধতির সমালোচনা করিবার শক্তি বা অধিকার ছিল না; ইংলণ্ডে তখন সার চার্লস্ টেগার্টের নামও কেহ জানিত না, কিন্তু অরবিন্দের

পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বশক্তিতে ইংলণ্ডের যুবকসমাজ তখন মুগ্ধ। সত্য বটে,অরবিন্দ অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের অযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অরবিন্দ ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃ বৃটিশ গবর্ণেণ্টের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করিতেছিলেন, সার চার্লসের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অরবিন্দ চিরদিনই আপনা-ভোলা, সংসারের সুখ-দুঃখে তিনি চিরদিনই উদাসীন। সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, উন্নতি, পদ-গৌরব—তিনি চিরদিনই তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন। সত্য বটে, অরবিন্দ বরোদা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বরোদার চাকরী লাভের জন্য কোন দিন লালায়িত হয়েন নাই, বরোদার বর্ত্তমান মহারাজা গুণগ্রাহী সার সয়াজি রাও গায়কবাড় সেনাখাস্ খেল সমসের বাহাদুর অরবিন্দের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরোদা সার্ভিসে নিযুক্ত করেন ; এবং সেই সময় বরোদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপল লিট্‌লডেল সাহেব ছুটী লইয়া দেশে যাওয়ায় যদিও অরবিন্দ তাঁহার পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ গায়কবাড় তাঁহার কলেজে 'মাষ্টারী' করিবার জন্যই অরবিন্দকে এ দেশে লইয়া আসিয়া চাকরীতে বাহাল করেন নাই। চাকরীর প্রতি কোন দিন অরবিন্দের স্পৃহা ছিল না। যে মনুভাই মেটা অরবিন্দের অধস্তন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি পরবর্ত্তী যুগে ও পরিণতবয়সে বরোদা সার্ভিসের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ চাকরী দেওয়ানের পদ এবং 'সার' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন ; অরবিন্দের যেরূপ যোগ্যতা ও তাঁহার প্রতি মহারাজার যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাহাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম, অরবিন্দ এক দিন বরোদা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ পদে আরূঢ় হইবেন। কিন্তু মহারাজা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অরবিন্দকে বরোদায় রাখিতে পারিলেন না। অর্থলোভ ও খ্যাতির মোহ অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। সিভিল সার্ভিসে ইহার অধিক কি হইত ?

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, অরবিন্দ বরোদায় কোন দিন রাজনীতিচর্চ্চা করিতেন না, বিপ্লববাদেরও কোন ধার ধারিতেন না। তবে সেই সময় তিনি কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটির সমালোচনা করিয়া বোম্বের অন্যতম প্রধান পত্রিকা 'ইন্দু প্রকাশে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধগুলি এরূপ সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ যে, তাহা বোম্বে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসের ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহামতি তিলক তাঁহাকে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার অমোঘ লেখনীকে বিরাম দান করিয়াছিলেন। মহামতি তিলকের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল ; এই অপরাধে তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহ করা অসঙ্গত। তিনি কোন দিন রাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই ; গরজের অনুরোধে সার চার্লস্ তাঁহাকে আজ বিপ্লববাদীর পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না !

অরবিন্দ আজন্ম সন্ন্যাসী। বাল্যকাল হইতে প্রায় পচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে ইংলণ্ডে বাস করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু বিলাস-লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পাঁচ টাকা মূল্যের একখানি লোহার খাটিয়ায় একটি পাতলা তোষক ও একখানি কম্বল বিছাইয়া রাত্রিশেষে কয়েক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার পরিচ্ছদের বিন্দুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। আমি দুই বৎসরের অধিককাল তাঁহার বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি ; কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখি নাই ; মূল্যবান্ জুতা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি তিনি কোন দিন ক্রয় করেন নাই। তাঁহার একমাত্র সখ ছিল—সিগারেট-ধূমপান। তাঁহার গৃহে রাশি রাশি সিগারেটের বাক্স সঞ্চিত থাকিত। বোম্বের বিভিন্ন পুস্তকবিক্রেতার দোকান হইতে প্রতি মাসেই রেল-পার্শেলে কত পুস্তক আসিত—তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশই উপন্যাস ; কেবল ইংরাজী উপন্যাস নহে, এবং ইংরাজী কাব্য ও উপন্যাসেরই যে তিনি অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, এ কথাও বলিতে পারি না ; ফরাসী, জর্ম্মাণ, রুসিয়ান, ইংরাজী, ইটালিয়ান, গ্রীক, কত ভাষার পুস্তক আসিত, তাহা আলমারীতে ধরিত না ; ঘরের চতুর্দ্দিকে তাহা পুঞ্জীভূত হইত। তিনি যখন গ্রীষ্মাবকাশ কিংবা অন্য কোন ছুটী উপলক্ষে দেশে আসিতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যে সকল ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি আসিত, তাহা

নানাভাষার পুস্তকেই পূর্ণ থাকিত, তাহা বস্ত্রাদি বা পরিচ্ছদের বাহুল্যবর্জ্জিত।

অরবিন্দকে কোন দিন কোন ব্যায়াম করিতে দেখি নাই; তিনি সায়ংকালে তাঁহার বাংলোর প্রকাণ্ড বারান্দায় ঘণ্টাখানেক দ্রুতপদে ঘুরিয়াই ব্যায়ামের অভাব পূরণ করিতেন। কলেজে যখন চাকরী করিতেন, তখন সকাল সকাল কলেজ হইতে আসিয়া কাগজ-কলম লইয়া টেবিলের কাছে বসিতেন, এবং কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতার খাতা ছিল; রামায়ণ-মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন, এবং ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া দ্রুত লিখিয়া যাইতেন। তাহার পর যখন পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। রাত্রি নয়টা বা দশটার মধ্যে টেবিলে বসিয়া যৎসামান্য আহার শেষ করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতেন, রাত্রি একটা, কোন দিন দুইটা পর্য্যন্ত একই ভাবে পাঠ করিতেন; তাহার পর একটি ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ বালিস মাথায় দিয়া সেই সঙ্কীর্ণ লোহার খাটিয়ায় শয়ন করিতেন। প্রভাতে উঠিয়া এক গ্লাস ইসবগুল-মিশ্রিত শীতল জল পান করা তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল।

অরবিন্দ কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন, কোন কোন দিন মহারাজার তুরুক-সোয়ার তাঁহার নিকট পত্র আনিত, মহারাজা কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্য তাঁহাকে প্রাসাদে যাইতে অনুরোধ করিতেন। কোন কোন দিন অরবিন্দ সাহিত্যালোচনায় এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে, মহারাজার আদেশপালনেও বিলম্ব হইত। মহারাজ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না; তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেন; তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধ মধুর ছিল বলিয়াই মনে হইত।

দুই বৎসরের অধিককাল একত্র বাস করিয়াও আমি অরবিন্দকে কোন দিন আমার সহিত বা অন্য কাহারও সহিত রাজনীতি-সংক্রান্ত কোন আলোচনা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা কোন কোন দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, কখন কখন ক্লাসের পাঠ জানিয়া লইত; তাহাদের সহিত তাঁহার কাব্য ও সাধারণতঃ সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইত, তিনি তাহাদের নিকট রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। বরোদায় তাঁহার বন্ধুসংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত ছিল। কলেজের কোন কোন অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। বরোদার যাদব পরিবারের সহিত অরবিন্দ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহারা মহারাজার হিতৈষী অমাত্য ছিলেন। বড় যাদব পুলিস বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, আমি তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই, দুই এক দিন দেখিয়া থাকিলেও তাঁহার কথা আমার স্মরণ নাই। দ্বিতীয় যাদব খাসেরাও বরোদার কাড়ি প্রান্তের (জেলা) 'সুবা' বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে তিনি বরোদার 'সার সুবা' বা শাসন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি বিলাতের কৃষিকলেজ হইতে কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে আসিয়া বরোদা সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি বরোদায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক এক দিন তাঁহার গরুর গাড়ীতে অরবিন্দের বাংলোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। সেই গরুর গাড়ী আমাদের দেশের গরুর গাড়ীর মত নহে। গাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ীর মত স্প্রিং ছিল, গাড়ীর উপর সুদৃশ্য আচ্ছাদন, আর গাড়ীর বলদ দুইটি যেন এক একটা হাতী। তাহাদের শিং উজ্জ্বল ধাতু দ্বারা বাঁধানো, গলায় ঘণ্টার মালা। তাহারা ঘোড়ার মত দ্রুতবেগে গাড়ী টানিত। খাসে রাও সাহেবের সহিত অরবিন্দের যে সকল গল্প হইত, তাহা পারিবারিক বা বৈষয়িক; তাঁহাদের কথাবার্ত্তা অধিকাংশ সময় ইংরাজীতেই হইত; কখন কখন উভয়েই মারাঠী ভাষা ব্যবহার করিতেন।

কিন্তু ছোট যাদব লেফ্‌টেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের সহিতই অরবিন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন, ইহাও এইরূপ ঘনিষ্ঠতার অন্যতম কারণ। মাধব রাও বিলাতের সামরিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে আসিয়া বরোদার 'মিলিটারি সার্ভিসে' প্রবেশ করেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি লেফটেনাণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; তিনি যখন অরবিন্দের বাংলোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পদোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতাম। তিনি জানিতেন, আমি গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখি, এ জন্য তিনি আমাকে 'পোয়েট' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অরবিন্দের সহিত

তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে সে গল্প আর ফুরাইত না, হাসির গর্‌রা উঠিত ; বলা বাহুল্য, সেই সকল গল্পে রাজনীতির সংস্রব থাকিত না। এক দিন আমি তাঁহাদের উভয়কে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে দেখিয়া অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, "তোমরা উভয়েই ভয়ঙ্কর গম্ভীর-প্রকৃতির লোক, কিন্তু তোমাদের হাসির ঘটা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি!" আমার কথা শুনিয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, "এ আর কি হাসি দেখিলে! দাদামশায় (স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু) ও তাঁহার বন্ধু দ্বিজেন্দ্র বাবু (স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা) যখন গল্প করিতে করিতে হাসেন, তখন মনে হয়, তাঁহাদের হাসির চোটে ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইবে।"—বস্তুতঃ খোলাপ্রাণের ওরকম মুক্ত হাসি এ কালে প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

অরবিন্দ যে অতবড় এক জন বিপ্লববাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া কোন দিন কল্পনা করিবারও সুযোগ পাই নাই ; এ জন্য সার চার্লস্ টেগার্টের অভিমত পাঠ করিয়া আমি বিস্ময় দমন করিতে পারি নাই।

অরবিন্দের আহারেরও কোনরূপ পারিপাট্য দেখিতে পাইতাম না। আমরা উভয়ে একত্র আহার করিতাম, কোন দিন রন্ধন এরূপ কদর্য্য হইত যে, আমার তাহা খাইতে কষ্ট হইত ; কিন্তু অরবিন্দ বিনা প্রতিবাদে প্রশান্তভাবে তাহা গলাধঃকরণ করিতেন। তাঁহার বাংলোতে কিছু দিন একটি পাচিকা পাকশালার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ; তাহার পর একটা গুজরাটী চাকর জুটিয়া যায়। তাহার নাম 'কৃষ্ণা', ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাতে রূপার বালা, কাণে মাকড়ি, অপরিচ্ছন্নতার সজীব মূর্ত্তি। আহার হইত ডাল, ভাজা, কোন একটা তরকারী, মাছের ঝোল, ভাত ও রুটী। কোন কোন দিন পাঁটার মাংস।

ও দেশের পাচকের একঘেয়ে রন্ধনে অবশেষে সহিষ্ণু অরবিন্দেরও অরুচি ধরিয়া গেল ; এ জন্য একবার গ্রীষ্মাবকাশে আমরা দেশে আসিয়া একটি পাচক ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিলাম ; সে বাঁকুড়াবাসী। আহার, বাসস্থান এবং কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের লোভে সে আমাদের সহযাত্রী হইয়া সেই বান্ধববর্জ্জিত গুজরাটে চলিল বটে, কিন্তু সে দেশে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, সে বড় কঠিন ঠাঁই। কেহ তাহার বাঙ্গালা কথা বুঝিতে পারে না, কাহারও সহিত সে মিশিতে পারে না। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে মাছের যে অবস্থা হয়, তাহার অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইল। কয়েক দিন বরোদায় বাস করিয়া সে কাঁদাকাটি আরম্ভ করিল, তাহার উপর তাহার রন্ধন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া আমাদের চক্ষুস্থির! এক দিন তাহাকে গল্‌দা চিংড়ির কারি রাঁধিতে বলা হইলে সে প্রায় এক পোয়া ঘি ঢালিয়া চিংড়ি মাছগুলি ভাজিয়া এমন রান্না রাঁধিল যে, আঁস্‌টে গন্ধে তাহা মুখে করা গেল না! চিরসহিষ্ণু অরবিন্দ অবশেষে তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

দীর্ঘকালের মধ্যে অরবিন্দকে কোন দিন রাগ করিতে দেখি নাই, তাঁহার অসাধারণ সংযমের পরিচয়ে বিস্মিত হইতাম। দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিলেও মদ্যের প্রতি তাঁহার আসক্তির কোন পরিচয় পাই নাই। বাসায় তিনি সিগারেট ভিন্ন অন্য কোন নেশার জিনিষ স্পর্শ করিতেন না। মহারাজের সহিত ভোজনে যোগদানের জন্য তিনি কখন কখন নিমন্ত্রিত হইতেন, বিলাতী আদর্শে ভোজন টেবিলে শুনিয়াছি, অতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ সুরা পরিবেষণ করা হইত, কিন্তু রাজভোজের পর বাসায় ফিরিয়া অরবিন্দ সম্পূর্ণ অবিচলিত ও প্রকৃতিস্থ থাকিতেন।

অরবিন্দের চিঠিপত্র লিখিবার অভ্যাস অত্যন্ত অল্প ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনের নিকট কদাচিৎ চিঠিপত্র লিখিতেন ; তিনি এক দিনে একখানি খাতার চারি পাঁচ পৃষ্ঠা কবিতা লিখিতে পারিতেন, কিন্তু কাহাকেও একখানি চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলে তিন চারি দিনেও তাহা শেষ হইত না। 'গ্রে গ্রেনাইট' নামক ধূসর বর্ণের চিঠির কাগজেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন ; সেই কাগজে তিনি মুক্তার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে পত্র লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার কোন পত্রই প্রায় দীর্ঘ হইত না। তিনি সাধারণতঃ তাঁহার ভগিনী সরোজিনী ও মাতুল যোগীন্দ্র বাবুকেই চিঠিপত্র লিখিতেন। যোগীন্দ্র বাবু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ; ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, এবং তিনি খ্যাতনামা সাংবাদিক (জর্ণালিষ্ট) ছিলেন। এই ব্যবসায়েই তাঁহার জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। অরবিন্দ তাঁহার মাসী ও মাসতুতো ভগিনীদের নিকটও চিঠিপত্র লিখিতেন। সার চার্লস্ টেগার্ট বিপ্লববাদিগণের নেতা বারীন্দ্রকে অরবিন্দের

উপদেশে ও পরামর্শে পরিচালিত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বারীন্দ্রকে তিনি কদাচিৎ পত্র লিখিতেন, এমন কি, তাঁহাকে দুইচারি মাসেও একখানি পত্র লিখিতেন কি না সন্দেহ। বারীন্দ্র অরবিন্দের উপদেশে রাজনীতিক মত সংগঠন করিয়াছিলেন বা সরকারের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দল পাকাইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগ বা সন্দেহ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই মনে হয়। বারীন্দ্র দ্বারা কোন দুরূহ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ভ্রাতার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে এরূপ ধারণা কোন দিন আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি যত দিন বরোদায় ছিলাম, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে বারীন্দ্র একবারও বরোদায় গমন করেন নাই। আমি দেশে ফিরিয়া 'বসুমতী'র কর্ণধার কর্ম্মবীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর সহযোগিতায় বসুমতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরে অরবিন্দ বরোদার চাকরীর মায়া ও উচ্চপদের আশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'বন্দে মাতরমে'র পরিচালন-কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন; সেই সময়ের পূর্ব্বে এবং আমার বরোদা-ত্যাগের পর বারীন্দ্র বরোদায় গিয়াছিলেন কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু অরবিন্দ যত দিন বরোদায় ছিলেন, তত দিন কলিকাতার সাহিত্য বা রাজনীতিক সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি অবকাশ উপলক্ষে দেশে আসিয়া অধিকাংশ সময় দেওঘরেই অতিবাহিত করিতেন, কখন কখন ভাগলপুরে তাঁহার এক কাকার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, কদাচিৎ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের গৃহে অবস্থিতি করিতেন।

আমি যখন বরোদায় ছিলাম, সেই সময় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার পত্র-ব্যবহার ছিল। সে সময় আমি 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতাম; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে আমার নিকট অরবিন্দের সংবাদ লইতেন, কিন্তু অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল না।—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'—এই কবিতা এই ঘটনার বহু পরে—বঙ্গভূমি যখন অরবিন্দের প্রতিভা ও ত্যাগের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় রচিত হইয়াছিল। তবে মনে হয়, বিশ্বকবি অরবিন্দের প্রতিভার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, নতুবা তিনি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই অরবিন্দের সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন? অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পক্ষপাতী ছিলেন, তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীতে যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সকলগুলি প্রকাশযোগ্য কি না, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিয়া একটি ইংরাজী 'সনেট' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ সেই সময় ঢাকা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল কবিতা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে,—অরবিন্দ কোন দিন এরূপ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই। শিক্ষা-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক ঘোষ বিবাহ করিয়াছিলেন, অরবিন্দ হাসিয়া বলিতেন, উহা দাদার 'ব্যয়-বহুল বিলাসিতা (এক্সপেন্সিভ লকসারী)।' বরোদার চাকরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহার প্রকৃতি চিরদিনই সন্ন্যাসীর প্রকৃতির অনুরূপ, কোন বন্ধন যাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তিনি কেন যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। তিনি কলিকাতার 'বঙ্গবাসী কলেজে'র সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয় আসামের কৃষিবিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। কারণ, কিছু দিন পরেই অরবিন্দের পত্নী-বিয়োগ হইয়াছিল।

আমরা যখন বরোদায় ছিলাম, সেই সময় চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস চিত্রশিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া য়ুরোপ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সুপারিস-চিঠি লইয়া বোম্বে হইতে প্রথমেই বরোদায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বরোদার গায়কবাড় মহারাজা দাদাভাই নৌরজীর সেই সুপারিস-চিঠি পাইয়া পরম সমাদরে শশিকুমার বাবুর অভ্যর্থনা করেন; বরোদার গায়কবাড় মহারাজের একটি সুদৃশ্য ও

সুসজ্জিত 'অতিথি-ভবন' (গেষ্ট হাউস) আছে—সেই ভবনে শশিকুমার বাবুর বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শশিকুমার বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সুপরিচিত ছিলেন, তিনি য়ুরোপপ্রবাসকালে তাঁহার অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহা সেই সময়ের 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হইত। শশিকুমার বাবু ময়মনসিংহের অধিবাসী; প্রথম জীবনে তিনি ময়মনসিংহের কোন বাঙ্গালা স্কুলে পণ্ডিতি করিতেন, কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। তাঁহার শিল্পানুরাগের পরিচয় পাইয়া ময়মনসিংহের স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার য়ুরোপে চিত্রশিল্প-শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শশিকুমার বাবু বরোদায় আসিয়া এক দিন অপরাহ্ণে আমাদের বরোদা ক্যাম্পের বাংলোয় উপস্থিত হইলেন, এবং অরবিন্দের সহিত পরিচিত হইলেন। কয়েক দিনের পরিচয়ে আমাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইল। শশিকুমার বাবু 'গেষ্ট হাউসে' বাস করিবার সময় বরোদা সরকার হইতে প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ী পাইয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া তিনি নানাপথ ঘুরিয়া 'গেষ্ট হাউসে' ফিরিয়া যাইতেন, এবং সন্ধ্যার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আলাপ চলিত। শশিকুমার বাবু ফরাসীদেশে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, স্বাধীন দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া তিনি পরাধীনতার কষ্ট বুঝিতে পারিতেন, এ জন্য তিনি ইংরাজ সরকারের তেমন পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই। তিনি কোন কোন দিন বৃটিশ সরকারের শাসন-নীতির প্রতিকুল সমালোচনা করিলেও অরবিন্দ কোন দিনও তাঁহার কোন উক্তির সমর্থন করেন নাই। সার চার্লস যাঁহাকে বিপ্লববাদীদের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে বা কথায় এক দিনও ঐরূপ কোন ভাব পরিস্ফুট হইতে দেখি নাই, এ অবস্থায় কি করিয়া তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি? শশিকুমার বাবু য়ুরোপ-প্রত্যাগত হইলেও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন না। তিনি ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; এবং মিস্ ফ্লামা নাম্নী একটি ফরাসী তরুণীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। হেস মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, মিস্ ফ্লামা এ দেশে আসিলে ব্রাহ্ম-মতে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, কিন্তু শশী বাবু বলিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালকগণ সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা মহিলার সহিত ব্রাহ্ম-মতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই, এ জন্য শশী বাবু অরবিন্দের নিকট অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুদারতার নিন্দা করেন। অরবিন্দ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন; কিন্তু তিনি শশিকুমার বাবুর পক্ষসমর্থন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মিস্ ফ্লামা এ দেশে আসিয়া ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন; শুনিয়াছি, তাঁহার চেষ্টাতেই বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শশিকুমার বাবু যে সময় বরোদায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এক জন ইংরাজ চিত্রকর শিমলা-শৈল হইতে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সুপারিস-চিঠি লইয়া কিছু কাযের চেষ্টায় বরোদায় আসিয়াছিলেন; গায়কবাড় মহারাজ সেই ইংরাজ শিল্পীকে অনেকগুলি কাযের ভার দিয়াছিলেন, এ জন্য শশিকুমার বাবু সেখানে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই; তবে মহারাজ তাঁহাকে কয়েকখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিয়া তাঁহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা লইয়াই তাঁহাকে বারোদা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বরোদা-ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি 'গেষ্ট হাউসে' বসিয়া অরবিন্দের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা এরূপ অল্পসময়ে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাঁহার তুলি-চালনার নৈপুণ্যে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। শশিকুমার বাবু কলিকাতায় আসিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাসা লইয়াছিলেন। আমি এক দিন তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার ফরাসী পত্নীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সময় তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছিল, সে ঠিক তাহার মায়ের মত হইয়াছিল। শশিকুমার বাবুও অতি সুপুরুষ; অরবিন্দ বলিতেন, তাঁহাকে দেখিলে ইটালিয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার শিল্প-দক্ষতার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাইব, কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত একখানিমাত্র চিত্র সে কালের 'প্রদীপ' নামক মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একখানি পৌরাণিক

চিত্র, স্মরণ হইতেছে, তাহা কুন্তীর চিত্র। বঙ্গদেশ এখন শশিকুমার বাবুকে বিস্মৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এখন তিনি মধ্য-ভারতের কোন মিত্র-রাজ্যের চিত্রশিল্পীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার স্বদেশ বঙ্গদেশে তাঁহার অন্ন জুটিল না, বাঙ্গালার ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

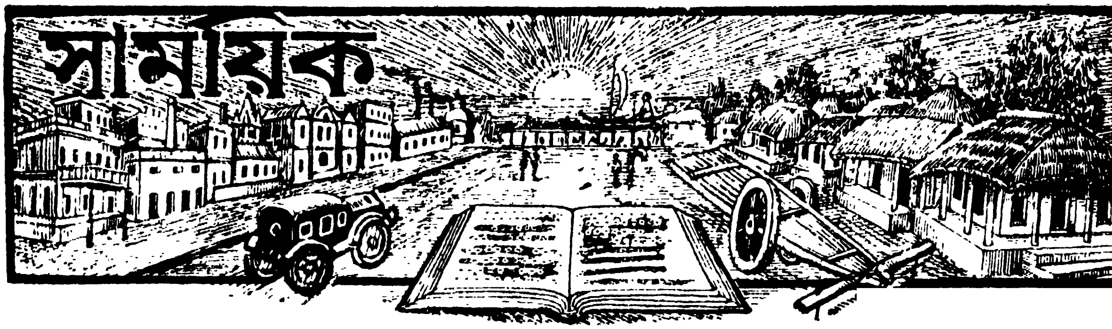
বরোদায় অবস্থিতিকালে এক জন গুজরাটী ব্যারিষ্টার মধ্যে মধ্যে বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন; তাঁহার নাম বাপুভাই মজমুমদার। তিনি পরে কোন দেশীয় রাজ্যের প্রধান বিচারপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোক; গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি যথারীতি আহ্নিক-পূজা করিতেন, কিন্তু সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া যখন ইংরাজী ভাষায় আলাপ করিতেন, তখন মনে হইত, কোন খাঁটি ইংরাজ কথা বলিতেছে! তিনি অত্যন্ত সুরসিক ও সরলপ্রকৃতি আমুদে লোক ছিলেন; তিনি বেশ মজার গল্পে সকলকে হাসাইতে পারিতেন। তিনি দুই একটা বাঙ্গালা বুলি শিখিয়াছিলেন, যখন তখন তাহা আওড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। আমাকে দেখিলেই বলিতেন, "নভেলিষ্ট, আপনি কেমন আছে?"—"বাবু, আপনি কল্‌কাতা যাবে?" আমরা এক এক দিন পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া বহুদূর ঘুরিয়া আসিতাম। সেই সময় এবং বাসাতেও অনেক সময় আমাদের নানারকম গল্প চলিত,কিন্তু রাজনীতি বা ইংরাজের শাসননীতি প্রসঙ্গে কোন আলোচনা আমাদের গল্পে স্থান পাইত না। অরবিন্দ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। বস্তুতঃ, কথায় বা ব্যবহারে কোন দিন এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই, যাহাতে অরবিন্দকে বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদকামী ভয়ঙ্কর বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারিত। 'বন্দে মাতরম্' দেশাত্মবোধের বিকাশ-চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন দিন গুপ্তহত্যার সমর্থন করে নাই; অরবিন্দের হৃদয় প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি গুপ্তহত্যার সমর্থনের আরোপ করা কেবল অন্যায় নহে, গর্হিত বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দ নরহত্যার সমর্থন করিতে পারেন—ইহা ধারণার অতীত। অরবিন্দের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বিরোধ নিরীহ সাহিত্য-সেবীর এরূপ কলঙ্কপ্রচার অল্প নির্লজ্জতার পরিচয় নহে!

স্বাধীন দেশে আবাল্য প্রতিপালিত হইয়া অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি প্রখর হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আজ বহুদিন পরে মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা—যে দিন আমরা "ষ্টার থিয়েটারে" স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সময় 'বসুমতীর সম্পাদন'ভার আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। সুহৃদ্বর স্বর্গীয় পণ্ডিত সমালোচকশ্রেষ্ঠ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। গ্রন্থকার ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরোধে সুরেশ বাবু আমাদিগকে প্রতাপাদিত্যের অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রিতে 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে লইয়া গিয়াছিলেন। অনেক দিনের কথা ঠিক স্মরণ নাই, তবে মনে হইতেছে—সেই দলে অরবিন্দ, শশিকুমার হেস, রাজসাহীর কান্তকবি, স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন, সুরেশ বাবু, আমি এবং আরও দুই এক জন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলাম। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র প্রতাপাদিত্যের এবং স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি বিক্রমাদিত্য ও রডার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে অভিনয়ের অপূর্ব্ব সাফল্য দর্শনে অরবিন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন—সেই সুগভীর জলধিতে যেন জোয়ারের বান ডাকিয়াছিল। অভিনয়-শেষে ক্ষীরোদ বাবু সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অভিনয় কেমন দেখিলেন?'—সুরেশ বাবু বলিলেন, "প্রতাপাদিত্য কেমন লাগিল, তাহাই জিজ্ঞাসা করুন, আজ নয়—ইহার উত্তর পরে পাইবেন।"

তাহার পর দুই সপ্তাহ ধরিয়া সাপ্তাহিক 'বসুমতীতে' প্রতাপাদিত্য নাটকের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সুরেশ বাবু আর কোন নাটকের সেরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই! সেই সমালোচনাটি সুরেশ বাবুর সমালোচন-শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আজ যাঁহারা ভারতীয় পুথিগত অভিজ্ঞতা ও উচ্চপদের সুযোগ লইয়া অরবিন্দকে বিপ্লবপন্থীদের পথিপ্রদর্শক বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত করিতেছেন—অরবিন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকিলে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা বলিতে লজ্জা অনুভব করিতেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



একতা-বৈঠক

পুণার যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগ-প্রচেষ্টার অপূর্ব্ব প্রভাবে হিন্দু উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে চুক্তি হইয়া যাওয়ার পর ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটা আপোস-বন্দোবস্তের কল্পনা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জনসাধারণ আপনাদের ঘর সামলাইতে পারে না, তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ লইয়া মারামারি করে, এই হেতু বাধ্য হইয়া বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী ভারতের সম্পর্কে একটা সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন,—এই ভাবের একটা কথা জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং বৃটিশ সরকারের নির্দ্ধারিত তৃতীয় বা ক্ষুদ্র গোলটেবিলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণের মধ্য হইতে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মডারেট মতাবলম্বীদের মধ্য হইতে কয়েক জন সদস্য মনোনয়ন করা হইয়াছিল। ভারতের অসংখ্য জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের এ সম্বন্ধে মনের কথা বলিবার উপায় ছিল না, কেন না, যাঁহারা সে কথা কহিবার উপযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কারারুদ্ধ, অবশিষ্ট যাঁহারা বাহিরে আছেন, তাঁহাদেরও মাথার উপর অহরহ অর্ডিনান্সের খড়্গ ঝুলিতেছে। এই সকল কারণে যাঁহারা জেলের বাহিরে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান স্থির করিলেন যে, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের মধ্যে একটা আপোস বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মিথ্যা প্রচারের অন্তর্জ্জলি করিবেন। সে বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইলেন মওলানা শৌকৎ আলি সাহেব ও তাঁহার খিলাফৎ কমিটীর সম্পাদক মৌলবী আবদুল মজিদ খাঁ সাহেব এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, আর তাঁহাদের সহকর্ম্মী হইলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারিয়ার এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার প্রমুখ নেতৃবর্গ।

মওলানা শৌকৎ আলি প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ বৈঠকের আয়োজন করিলেন। তথায় সকল শ্রেণীর মুসলমান নেতারা সমবেত হইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া হিন্দু শিখ ও খৃষ্টানদিগের সহিত কয়েকটা সর্ত্তে আপোষ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। মুষ্টিমেয় দুই চারি জন নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের নেতা তাহাতেও সম্মত হইলেন না, তাঁহারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থচালিত হইয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের স্বার্থ আঁকড়িয়া ধরিলেন।

যাহা হউক, তাহাতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটিল না। ত্রিবেণীর সঙ্গম তীর্থে এলাহাবাদে একতা-বৈঠক বসিল। ভারতের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সেই পুণ্যতীর্থে সমবেত হইলেন। বহুদিন ধরিয়া নেতাদের মধ্যে বিচার আলোচনা চলিল। মওলানা শৌকৎ আলি প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সভাধিবেশনকালে মার্কিণ যাত্রা করিলেন, কিন্তু সভার উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি রহিল।

বাঙ্গালা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধান করাই কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু পরিণামে দেশের মঙ্গলের জন্য সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগস্বীকার সাফল্য আনয়ন করিল। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা যে ত্যাগের পরিচয় দিলেন, তাহার তুলনা জগতে বিরল। সিন্ধু-পাঞ্জাবের মুসলমানরাও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন না। সম্প্রদায়ের স্বার্থ অপেক্ষা জাতির স্বার্থটাকে তাঁহারা বড় করিয়া দেখিলেন। জাতীয়তা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মোটামুটি এই কয়টি বিষয়ে বৈঠক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—(১) দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র, (২) ধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে প্রজার অধিকার, (৩) সৈন্য, বিচারালয় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা, সরকারী চাকুরী, অবশিষ্ট ক্ষমতান্যাস, মন্ত্রিমণ্ডলে ও সরকারী চাকুরীতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের নিয়োগ এবং গভর্ণমেণ্ট কি প্রকৃতির হইবে,—এই সম্বন্ধেই তুমুল তর্কবিতর্ক উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের দুরূহ সমস্যার সমাধান হইয়া গেলেও সিন্ধুবিচ্ছেদ-সমস্যা লইয়া বৈঠক এক সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইবারই উপক্রম হইয়াছিল।

যাহা হউক, বৈঠক যে কমিটীর উপর শেষ মীমাংসার ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ১০ বৎসরের জন্য পরলোকগত মওলানা মহম্মদ আলির নির্ব্বাচনব্যবস্থা সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে, এই ১০ বৎসরকাল মিশ্র নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত থাকিবে, তবে পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের শতকরা অন্যূন ৩০টি ভোট পাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার ভোট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন। দশ বৎসর পরে এই শতকরা ৩০এর নিয়ম আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এই নিয়ম অনুসারে কায হইলে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকদের সঙ্কীর্ণতার আর কোনও অবসর থাকিবে না। জাতির পক্ষে ইহা মহা লাভ। মন্ত্রিমণ্ডল নির্ব্বাচনেও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী চাকুরীর জন্য এক নিরপেক্ষ Public Service Commissionএর হস্তে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা নির্দ্ধারণকালে প্রার্থীর যোগ্যতার বিচার করিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন

ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, যাহার ফলে কোথাও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা না হয়।

অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) লইয়া খুবই বাদানুবাদ হইয়াছিল। কেহ কেহ ঐ ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকার-সমূহের হস্তে দিতে চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক সরকার-সমূহের হস্তে ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা বণ্টন ভাল, কিন্তু বহু দিন যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার যে ক্ষমতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহার একবারে ওলট-পালট করা শাসনযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন-ব্যাপারে একবারে নিয়মমত বাঁধাধরা ব্যবস্থা করাই সমীচীন। কিন্তু এমন এক একটি সমস্যা সময়ে সময়ে উঠিতে পারে, যাহা বাঁধাধরা নিয়মকানুনের মধ্যে পড়ে না। সে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সম্বন্ধের সান্নিধ্যের অনুপাতে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইবে, মিলন-বৈঠক কমিটী ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দেশের শাসনযন্ত্র কি প্রকৃতির হইবে, তাহাও কমিটী স্থির করিয়া দিয়াছেন। সরকার জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন থাকিবেন এবং তাঁহাদের পূর্ণ সার্ব্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তন যুগের সময়ে কিছু কিছু বাঁধনকষণ থাকিবে বটে। কিন্তু সেই বাঁধনকষণ এই দেশের স্বার্থেই রাখিতে হইবে।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে কমিটী গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা মূল বৈঠক সমর্থন করিলে পর ডিসেম্বর মাসেই এলাহাবাদে যে বৃহত্তর সকল দলের সম্মেলন হইবে, তাহাতে রিপোর্ট ও অনুমোদন পেশ করা হইবে এবং সম্মেলন উহা গ্রহণ করিলে উহাই ভারতের প্রকৃত গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদের ইচ্ছামত ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করিয়া গোলটেবিল বৈঠক বসাইয়াছেন, তাহারও কার্য্য চলিতেছে, কিন্তু ভারতবাসীর প্রকৃত জনমত যত দিন উহার সমর্থন না করিবে বা উহার সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য না করিবে, তত দিন উহা সরকারী গোলটেবিলই থাকিয়া যাইবে বলিলে বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইতে হয় কি ?

—

বাঙ্গালার ব্যবস্থা

কমিটী বাঙ্গালার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়টি বিশেষ লক্ষ্য করিবার :—(১) কয়েকটি সদস্যপদ সংরক্ষিত করিয়া মিশ্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা, (২) মুসলমানরা আইনসভায় শতকরা ৫১টি এবং হিন্দু ও অন্যান্যরা ৪৪'-টি সদস্য-পদ পাইবে, (৩) ১০ বৎসর পরে সংরক্ষিত পদ ও বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অবসান হইবে, (৪) মুসলমানরা শতকরা ৫১টি পদ পাইলে মিশ্র নির্ব্বাচন গৃহীত হইবে, (৫) সংরক্ষিত পদের অবসান হইলে বয়ঃপ্রাপ্তমাত্রেরই ভোটাধিকার থাকিবে।

—

সামাজিক না রাজনীতিক ?

সার শিবস্বামী আয়ার ও মওলানা শৌকৎ আলি প্রমুখ নেতারা মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিসাধনের জন্য অনেক সুপারিশ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। তাহার পরেও বহু জনের ও বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একই দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু এপারের ও ওপারের কর্ত্তাদের কথা এই যে, যতক্ষণ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অসহযোগ ও আইনভঙ্গ আন্দোলনের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ না করিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে বা কংগ্রেসের অন্য কোন নেতাকে ছাড়া হইবে না।

মওলানা শৌকৎ আলি আরও একটু উপরে গিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, মহাত্মাজীর পরামর্শ এ বিষয়ে খুবই উপযোগী হইবে। কিন্তু ইহাতেও তিনি মুখ-তাড়া খাইলেন। কর্ত্তারা বলিলেন,—উহুঁ, তাও কি হয় ? শাকের কড়ি মাছের কড়িতে মিশাইয়া যাইবে যে! পুনা-চুক্তির সময় হিন্দু নেতাদের জেলে 'মিঃ গান্ধীর' সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কারণ সেটা সামাজিক ব্যাপার, এটা একবার নিছক রাজনীতিক।

কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক এই চালবাজীর মর্ম্ম বিলক্ষণ জানে। তথাকথিত উন্নত ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে ঘরোয়া ঝগড়া চলিতেছে বলিয়া যদি কর্ত্তারা এই ভেদের ব্যবস্থা করিতেন, শাকের কড়িকে মাছের কড়ি হইতে তফাতে রাখিতেন, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু আসল কথা কি তাই ? প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মরজিমত যে সাম্প্রদায়িক award বা নির্দ্ধারণ দিলেন, তাহাতে এই হতভাগ্য দেশের ভাগাভাগি দলাদলির পরিমাণটা আরও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা,—হিন্দুদের মধ্যেই রাজনীতিক অধিকারের স্বার্থ লইয়া ব্যবধানের সাগর আরও বাড়িয়া মহাসাগরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা,—এই আশঙ্কায় না মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিরোধের অবসান করিতে চাহিয়াছিলেন ? একেই ত হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের কলসীর ছিদ্র আছেই, তাহার উপর হিন্দু হিন্দুর কলহ বাড়াইয়া কলসী শতচ্ছিদ্র করিলে ভারতের লাভ না ক্ষতি ? দূরদর্শী দেশপ্রেমিক নেতা এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া যেরূপেই হউক, হিন্দুদের মধ্যে একতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে উন্নতশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ জাগাইতে প্রায়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ব্রত-গ্রহণের মূল কারণ রাজনীতিক, সামাজিক নহে। এ কথাটা যতই ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করা হউক, উহা চাপা থাকিবে না। সরকার পক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মহাত্মা গান্ধীই বলিয়াছেন, তাঁহার ব্রতগ্রহণ সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে, রাজনীতিক কারণে নহে ; এই হেতু কারাগারের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সহিত সকল শ্রেণীর হিন্দুনেতাদের মিলনে এবং তাঁহার বিবৃতিপ্রচারে বাধা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টানের কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ রাজনীতিক, সেই হেতু সে ক্ষেত্রে তাঁহার জন্য কারাগারের নিয়মভঙ্গ করা হয় নাই।" কথাটা কতদূর সত্য, তাহা আলোচনা করা যাউক।

উন্নত ও অনুন্নত

এই কথা দুইটি বৃটিশ শাসনেরই আমদানী। হিন্দুদের মধ্যে শুচি ও অশুচি কথা আছে বটে। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল, প্রায়শ্চিত্ত, জন্মমৃত্যুর বিধান, বিবাহ ও আহারের বিধান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কথাও হিন্দুসন্তানকে মানিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী বর্ণাশ্রমী হিন্দু বলিয়া আপনাকে স্বীকার করেন। তিনি হিন্দু হিসাবে জাতিভেদ এবং আহার ও বিবাহের বিধিনিষেধ স্বীকার করেন। তবে তিনি কোন কোন বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিতে পারে, তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কারণ নাই।

বিধি-নিষেধের পরিমাণ কতটুকু হইতে পারে বা পারে না, তাহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। সে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সহিত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাহি যে, হিন্দুদের মধ্যে এই যে বিদ্বেষের ভাব আছে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, এ কথা বেশী দিন পূর্ব্বে শুনা যাইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রিজলের census report এর ফলে যেমন কায়স্থ ও বৈদ্যের ছোট বড় লইয়া বিদ্বেষের হলাহল উঠিয়াছে, তেমনই অন্য কারণে অন্যান্য জাতির ছোট বড় লইয়া হিংসা-ঘৃণার কোথাও কোথাও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মূল রাজনীতিক স্বার্থের ভাগাভাগি লইয়া দ্বন্দ্ব। এই ভাবে মর্লে-মিণ্টো ও মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার হইতে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয় নাই কি?

বাঙ্গালায় উন্নত অনুন্নত বলিয়া হিন্দুর মধ্যে ভেদাভেদ অতীতে ছিল বলিয়া জানা নাই, এখনও আছে বলিয়া জানা যায় না। তবে শুচি অশুচি বলিয়া প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভেদাভেদ আছে। এ ভেদাভেদ প্রত্যেক হিন্দু সংসারেই দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ব্রাহ্মণের ঘরেও সংসারের সকলের পূজার ঘরে বা রান্নার ঘরে প্রবেশাধিকার নাই। ঘরের ব্রতচারিণী গৃহিণীরা শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া শুদ্ধ কার্য্যে ব্রতী হইলে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাঁহাদের আপনার অতিপ্রিয় পুত্র-পৌত্রাদিরও নাই। সুতরাং ঘরের বাহিরেও পূজা-পার্ব্বণাদিতে ঐরূপ ভেদাভেদ বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ঘরের লক্ষ্মীও ঋতুমতী হইলে নির্দ্দিষ্টকাল তাঁহাকে কিরূপ quarantine আইন পালন করিতে হয়, তাহা প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই জানেন। তাঁহাকে সে সময়ে 'বিষ-নারী' বলে। স্বাস্থ্যের কারণে তাঁহার সে সময়ে স্পর্শদোষ হইয়া থাকে। এইরূপ আহার ও বিবাহে পবিত্রতা রক্ষার্থে স্পর্শদোষ অতিক্রম করিতে হয়। উহাতে বংশের ও কুলের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় এবং স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কম থাকে। ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা আসে না। যে যাহার কুল বা বংশ হিসাবে উন্নত। এ হিসাবে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে অনুন্নত কেহ নাই। মাদ্রাজে উন্নত-অনুন্নতদের ভেদাভেদ খুবই আছে, ইহা আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেখানে শ্রীরঙ্গম্, বরদরাজ, পার্থসারথি, মীণাক্ষীসুন্দরম্ অথবা রামেশ্বর-মন্দিরের গর্ভগৃহে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণেরও প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে পথে-ঘাটে, কূপে-তড়াগে, দেউল-মন্দিরে অনুন্নতদের গতায়াত ও জল ব্যবহার সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম আছে। এমন কি, মালাবারের কোন কোন অঞ্চলে পূর্ব্বে পঞ্চমদিগকে পথাতিক্রম করিতে হইলে শব্দ করিতে করিতে যাইতে হইত, পাছে ব্রাহ্মণ সম্মুখে পড়েন! অনেক স্থানে পঞ্চমদিগকে পথ হইতে খানায় নামিয়া যাইতে হইত, আবার ধর্ম্মগুরু পথ দিয়া গেলে পথে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত! কোন কোন স্থানে পঞ্চম নারীদের ব্রাহ্মণ দেখিলে বক্ষ অনাবৃত করিয়া যাইতে হইত, এখন এ সব প্রথা অনেক উঠিয়া গিয়াছে। তবে কূপোদক ব্যবহার করা বা মন্দিরের ত্রিসীমায় যাওয়ার নিষেধ এখনও বলবান্ আছে।

বাঙ্গালায় কূপের বালাই নাই। কিন্তু পুষ্করিণী বা খাল বিল নদীতে কোন জাতির জল-ব্যবহারে নিষেধ নাই। মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাওয়ার কাহারও নিষেধ আছে বলিয়া শুনি নাই। আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও কোথাও কড়াকড়ি নিয়ম আছে বটে, দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কিন্তু এজন্য কোন যুগে বিদ্বেষ-হিংসার হলাহল উত্থিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। রাজনীতিক অধিকারের ভাগাভাগি লইয়া যে দিন হইতে কলহের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই ভেদাভেদের কথা শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালায় আমরা বাল্যকালে গ্রামে দেখিয়াছি, হিন্দুর নিজেদের মধ্যে ত কথাই নাই, হিন্দু-মুসলমানও পরস্পর দাদা, খুড়া প্রভৃতি আত্মীয়-সম্বন্ধসূচক কথা ব্যবহার করিত, পরস্পরের পূজা-পার্ব্বণে আনন্দ করিত, পরস্পরের সুখে দুঃখে বুক দিয়া দাঁড়াইত।

এই মনের ভাবটা এখন উঠিয়া যাইতেছে। গ্রামত্যাগ ও সহরবাস, প্রতীচ্যের cultural conquest এবং রাজনীতিক অধিকারের ভাগাভাগি ইহার মূল কারণ। সত্যই যেগুলি অন্যায় আচরণ বলিয়া সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, সেগুলি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। যাহা বাকী আছে, তাহাও আপনার অন্যায্যতা হেতু কালে উঠিয়া যাইবে। সেজন্য রাজনীতির সহিত উহাকে জড়াইবার প্রয়োজন নাই, জড়াইলে অনিষ্টের অধিক সম্ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী এই হেতু বলিয়াছেন যে, তিনি হিন্দুদের সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গোড়ায় যদি প্রধান মন্ত্রীর হিন্দু সমাজের ভাগাভাগিমূলক নির্দ্ধারণের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে মহাত্মাজীর এ ক্ষেত্রে ব্রত গ্রহণেরও অবসর হইত না। সুতরাং সরকার পক্ষ যতই বলুন, এই ব্যাপার এলাহাবাদ বৈঠকের হিন্দু-মুসলমান আপোষ-সিদ্ধান্তের মত রাজনীতিমূলক নহে, তাঁহাদের কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না।

অর্ডিনান্স আইন

অস্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করিয়া সরকার দেশ শাসন করিতেছেন—দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার কথা ভাবিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে। সেই বিধিবজ্র বা অর্ডিনান্সের নির্দ্দিষ্টকাল ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বে সরকার উহাকে দেশের সাধারণ আইনের অঙ্গীভূত করিবার জন্য যে আইনের

পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছিলেন এবং বে-সরকারী সদস্যদের পক্ষ হইতে বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও যাহা সিলেক্ট কমিটীর মারফতে রিপোর্টরূপে দাখিল হইয়াছিল, তাহার ধারাগুলি নবমীর বলির কোপের মত ছাগের পরিত্রাহি চীৎকার সত্ত্বেও একে একে বিধিবদ্ধ হইল। মূলতঃ বিপ্লব ও আইন অমান্য আন্দোলন চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু ইহার জোরে শান্তিরক্ষকদের হস্তে যে অবাধ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, তাহাতে আইনভীরু শান্তিপ্রিয় লোকেরও যে কত বিপদ ও কষ্ট সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা অর্ডিনান্স-শাসনের ভুক্তভোগীরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। ইণ্ডিয়া লীগের সদস্যরা এ দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতেই বর্ত্তমান অর্ডিনান্স ও পুলিস-শাসনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন অর্ডিনান্সেরই ধারাগুলি মূলতঃ সংরক্ষিত হইল এবং সেই মত দেশের সাধারণ আইনে দেশ শাসিত হইতে থাকিবে, তখন দেশের লোক পদে পদে কি আতঙ্কের মধ্যে বাস করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে থানাতল্লাস, ধর-পাকড়, পিটুনি পুলিস, ফৌজের ছাউনি, প্রেস অ্যাক্ট, সভা-সমিতি শোভাযাত্রার ১৪৪ ধারা, পিকেটিং আইন, থানায় হাজিরা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি কত রকমের ভয় থাকিবে, তাহা সকলেই জানেন। স্বয়ং বাঙ্গালার লাটই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যাপকভাবে বেড়াজাল ফেলিলে কোন কোন ক্ষেত্রে দোষীর সহিত নির্দ্দোষেরও লাঞ্ছনা ও দণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছেলের দোষে বাপের শাস্তি—অথবা বাপের সহিত পৃথগন্ন খুড়ার শাস্তি হইলেও কথা কহিবার উপায় নাই। কোনও বে-সরকারী সদস্য পরিষদে বলিয়াছিলেন, ছেলে সামলাইতে বাপকে এমন শাসন করা অপেক্ষা শিক্ষামন্ত্রীকে শাসন করাই সমীচীন; কেন না, এখনকার শিক্ষার দোষেই ছেলে বিগড়াইতেছে। আর এক সদস্য বলিয়াছিলেন, হতভাগ্য বাপরা এখন হইতে জনন-নিয়ন্ত্রণ করুক, এমনই একটা বিধান করা হউক! ক্ষোভে দুঃখে নিতান্ত অসহায়রা এইরূপ বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রেসে ত কিছু লিখিবার উপায় নাই। প্রথম ধমক, তার পর জামিন তলব, শেষ বাজেয়াপ্ত। ফ্রি প্রেস মহাত্মা গান্ধীর একটা রচনা উদ্ধৃত করিয়া বিপদে পড়িল, অমৃতবাজারেরও অবস্থা তদ্রূপ। কখন্ কাহার মাথায় খাঁড়া পড়ে, কেহ জানে না।

কিন্তু এমনই বর্ত্তমান পরিষদের গঠন যে, এই বিষম শৃঙ্খলটিকে পায়ে পরিতে তাঁহারা পা বাড়াইয়া দিলেন। বলিবার কিছু মুখও রাখিলেন কি তাঁহারা? যে দুই চারিটি সদস্য সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপক্ষতার প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। যে ভাবে বাঁধন-কষণের কথা গোলটেবিলে হইতেছে, তাহাতে এই ভাবের স্বরাজ-আইন-সত্তাই যে কায়েম মোকাম হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বাঙ্গালায় "সাধারণ শান্তিরক্ষা-আইন" এবং বোম্বাইএর স্থানীয় 'অর্ডিনান্স আইনও' এই প্রকৃতির হইতেছে, তাহাও সকলে জানিতেছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ব্রহ্মকে ভারতের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে ভাবে ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী গোলটেবিলে 'প্রতিনিধি' মনোনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের দিকে মতাধিক্য হইবে, ইহা জানা কথা। এই ভাবে ভারত হইতেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়নের ফল ফলিয়াছে।

সম্প্রতি ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিনির্ব্বাচন পর্ব্বের ফলাফল দেখিয়া কর্ত্তাদের চক্ষুস্থির হইয়াছে। ভারতের সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ থাকিবার পক্ষে যে অধিকাংশ ব্রহ্মবাসীরই অভিমত, তাহা নির্ব্বাচনের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ ইউ, মংমংগাই বিচ্ছেদবিরোধী দলের নায়ক। তিনি গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে এক বিবৃতিপত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার কথা এই,—"২৪শে জুন (১৯৩২ খৃঃ) আমরা বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের পর যে বিবৃতি-পত্র প্রকাশ করি, তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ৬টি বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু যদি সরকার সকলকে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আর সকলে নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কোন্ দিকে ভোট বেশী। আমরা বিচ্ছেদের এত বিরোধী যে, বর্জ্জন সত্ত্বেও আমরা নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে সম্মত হইতেছি, কেবল ইহাই দেখিবার জন্য আমরা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না।"

তাহার পর নির্ব্বাচনপর্ব্ব। নির্ব্বাচনের ফল এইরূপ দাঁড়ায়:—

বিচ্ছেদ-বিরোধী—৪২ জন
বিচ্ছেদকামী—২৯ „
নিরপেক্ষ—৯ „

নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া সরকার পক্ষ বিস্মিত, স্তম্ভিত,—এ যে উল্টা বুঝিলি রাম! যাহা হউক, প্রথামত ব্রহ্মের লাট বিজয়ী দলের নেতাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পার্লামেণ্টের কোন কোন সদস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, ব্রহ্মবাসীদের সমক্ষে প্রধান সমস্যা কি এখন বিচ্ছেদের পরীক্ষা? এখন আমরা বলিতে পারি যে, যদি কখনও একটা সমস্যা-সমাধানের জন্য নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিচ্ছেদের পরীক্ষাই তাহার একমাত্র নিদর্শন। নির্ব্বাচনের ফলে অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ ভাগ্যসূত্র ভারতের সহিত গ্রথিত থাকাই ব্রহ্মবাসীর ইচ্ছা, বৃটেনের সহিত নহে। এই হেতু গোল টেবিল বৈঠকের আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উহাতে ব্রহ্মের প্রতিনিধি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভারতের সকল সম্প্রদায় যেমন এলাহাবাদে আপনাদের মধ্যে আপোষ-চুক্তি করিয়া লইয়াছে, ব্রহ্মের উভয় দলকেও তেমনই করিয়া লইয়া গোলটেবিলে ব্রহ্মের দাবীর কথা বলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ যাবৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে নীতি পোষণ করিয়া আসিয়াছে এবং

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ব্রহ্মের নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া যেরূপ সানন্দে ব্রহ্মকে অভিনন্দিত করিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্রহ্মেরও একটা স্থান হইবার পথে কোনও বাধা নাই।”

এই প্রাণখোলা কথার পরেও সাগরপারে ও এপারে কর্ত্তারা নানা বাধা-বিঘ্নের আশঙ্কা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্ম কাউন্সিল বসিলে ভোটের পরিমাণ তুলনা না করিয়া এখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাহা হইলে কাউন্সিলে যে এখনও ‘যোগাড়’ ও তদ্বিরের চেষ্টা চলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মবাসীর মন কোন্ দিকে, তাহা হাজার চেষ্টার ধামা-চাপাতেও কেহ চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

চট্টগ্রাম ও গভর্ণর

চট্টগ্রামে বিপ্লবীর অনাচার হেতু চট্টগ্রামবাসী হিন্দুর উপর পাইকারী জরিমানার আদেশ হইয়াছে। পূর্ব্বে এক স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগের নিকট ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় হইয়াছিল। ইহার পর চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার দুই তিনটি স্থানের অধিবাসীদিগের উপর পাইকারী ভাবে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় দিবার আদেশ হইয়াছে। প্রথমে যে সময়ের মধ্যে টাকা আদায়ের কথা ছিল, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যদের চেষ্টায় বিপ্লবদমন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের দ্বারা বিপ্লব দমনের চেষ্টা হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইতিমধ্যে যদি সমিতি বিপ্লবীদের সন্ধান দিতে পারেন অথবা ছেলেদের অভিভাবকদের মারফতে ছেলে শায়েস্তা করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তবেই জরিমানা লোক-বিবেচনা করিয়া মকুব করা হইবে, এইরূপ ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। সমিতি এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা সভা করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলকে বিপ্লবের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বিপ্লবীর চক্রান্তজাল ভেদ করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সরকারের সবজান্তা গোয়েন্দা পুলিস যাহাদের সন্ধান করিতে পারে নাই, তাহাদের অল্পসময়ের মধ্যেই হউক বা দীর্ঘ সময়েই হউক—সন্ধান করা সহজ কথা নহে। যাহারা এমন গুপ্তভাবে কায করে যে, তাহাদের দলের লোকই জানে না কি জন্য কি হইতেছে (সে বিষয়ে সরকারী বিবরণেও বহু বিস্ময়জনক কথা শুনা যায়), তাহাদের সন্ধান কে করিতে পারে? অথচ সরকার সে কথা বিবেচনা করিলেন না। কাকুতি-মিনতি, যুক্তি-তর্ক,—কিছুই তাঁহাদের মন টলাইতে পারিল না। নির্দ্দোষের উপর জরিমানার দণ্ড চাপিলে অসন্তোষ ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে, এ কথাও বলা হইল। অসন্তোষ ও অশান্তি বিপ্লবীর দল পুষ্ট করে, ইহাও বুঝান হইল, কিন্তু ভবী ভুলিবার নহেন! সরকারের বন্ধু সহযোগকামী রায় বাহাদুর কামিনীকুমার দাসের প্রার্থনাও ভাসিয়া গেল। অন্য পরে কা কথা, যিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন সাহেব এক বিরাট সভার সভাপতিরূপে এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, অল্পের অপরাধে বহুর দণ্ডবিধান করিলে আসল রোগের কোনও উপশম হইবে না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সরকার ১লা ডিসেম্বর হইতে জরিমানা আদায় করিবার নোটিশ দিলেন।

কলিকাতায় সেণ্ট এণ্ড্রুজ উৎসবের ভোজে গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন বিপ্লবীর অনাচার সম্পর্কে সরকারের মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার কথা এই:—সমষ্টিগত জরিমানার নীতির ব্যবহার কিছু রূঢ় ও অসন্তোষজনক, এ কথা আমি বুঝি। কারণ, যাহারা নির্দ্দোষ, তাহারাও দোষীদের সহিত ইহাতে সমান কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পাইকারী জরিমানার মধ্যে কোনওরূপ বর্ব্বরতা বা অন্যায় নাই। মুসলমান সম্প্রদায় এই বিপ্লবী আন্দোলন হইতে মুক্ত। কাযেই তাঁহাদের সম্প্রদায়কে সঙ্গতভাবেই জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহাও বলা ভুল যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই বিপ্লববাদ সমর্থন করেন বা উহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তবে হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই—যদিও তাঁহারা বিপ্লবকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন না বা কার্য্যতঃ যোগ দেন না—মনের মধ্যে উহার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন এবং উক্তকার্য্যে বিশেষ আনন্দসূচক মনোভাব প্রকাশ করেন। এই মনোভাব দূর না হইলে স্থানীয় শাসকদের কঠোর কার্য্য নিন্দনীয় হইতে পারে না।”

যিনি শাসনপাটের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহার এইরূপ মনোভাব হিন্দু প্রজার পক্ষে কিরূপ আতঙ্কজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এত দিন মানুষের কায্য দেখিয়া তাহাদের দোষ-গুণ যাচাই করা হইত, এখন হইতে তাহাদের মনোভাবকে দোষী নির্দ্দোষ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালী হিন্দুর ভাগ্যবিধাতা এখন বাঙ্গালী হিন্দুকে এই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইবার মত সামর্থ্য দিন, ইহাই কামনা

নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার উপায় প্রদান

বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে পুলিস ছাড়া ফৌজ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কোথাও কোথাও পিউনিটিভ পুলিস বসান হইয়াছে। শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষরা আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা কেন্দ্রীয় সরকারে যে টাকা দেয়, তাহার উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্যের উসুল পায় না, এই হেতু বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে এত দিন বাঙ্গালী অহোরাত্র যে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করিত—সর্ব্বদা অনাচারীর ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া থাকিত, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালী এখন নিশ্চিন্ত হইয়া সরকারের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া হাসিয়া খেলিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাইতে পারিবে। খুবই ভাল কথা। এখন বাঙ্গালার যত্রতত্র যেভাবে দিনে ডাকাতি হইতেছে, তাহাতে এমন সাহায্য পাওয়া ত' সুখেরই কথা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মেদিনীপুর, ঢাকা,

কুমিল্লা প্রভৃতি কয়টি কেন্দ্র হইতে এমন ভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে মনে হইতেছে, 'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল' ছিল। কোথাও পথচারী পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কোথাও সাইকেলচারীকে ছড়ির মোলায়েম স্পর্শ অনুভব করিতে হইয়াছে, কোথাও বা নিরীহ দরিদ্র পাণ-বিক্রেতাকে বন্দুকের গুলী অঙ্গে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ইহা ছাড়া খানাতল্লাসেও অনেকপ্রকার নির্ভরতার আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের লোক বলে, পুলিস কোথাও কোথাও খানাতল্লাস করিতে গিয়া হিন্দুদের সহিত দেড় শত মুসলমানের বাড়ীও খানাতল্লাস করিয়াছিল। আইন-সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকারপক্ষ বলিয়াছেন,—না, দেড়শত না, মাত্র ৫০ খানি বাড়ী। কেন এমন হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করা হইলে সরকারপক্ষ বলেন,—"পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধান করিতে। অত বড় পল্লীতে কোথায় তাহারা লুকাইয়া আছে, তাহা দেখিতে গেলে বাছিয়া হিন্দুদের বাড়ী খানাতল্লাস করা ত' চলে না, তাই এইভাবে অবস্থিত মুসলমানদের বাড়ীও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। অথচ ফলে একটি বিপ্লবীও ধরা পড়ে নাই; পরন্তু মাত্র ৪ খানি বাইসিকল ব্যতীত না কি আর কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই! গভর্ণর বলিয়াছিলেন, জরিমানা হইতে মুসলমানরা অব্যাহতি পাইবে, কিন্তু খানাতল্লাস ত জরিমানা নহে!

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' পত্র চট্টগ্রামের দুই একটি স্থানে শান্তিরক্ষার অনাচারের বিষয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং এমন ভাবের অনাচার যে হইতেছে না, তাহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? ইহার ফলে নির্ভরতা না অসন্তোষের উদ্ভব হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে কি?

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র

বঙ্গবাসী কালেজের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আগামী ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে উৎসব ও অভিনন্দনের আয়োজন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র স্বনামধন্য পুরুষ, বাঙ্গালী প্রবীণ ও তরুণ শিক্ষার্থিমাত্রেরই নিকটে তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তবে হয় ত সুদূর পল্লীর নিভৃত বাটে অথবা প্রবাসে অনেক বাঙ্গালী এই প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ বাঙ্গালীর পরিচয় বিদিত না থাকিতে পারেন, এই হেতু তাঁহার চরিত্রের মহান্ দৃষ্টান্ত আধুনিক বাঙ্গালীর সম্মুখে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে বহু বাঙ্গালী স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতায় অভ্যস্ত হইতে পারেন—মানুষের মত মানুষ হইয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন—এই আশায় বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সকাশে তাঁহার গুণগাথার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বর্দ্ধমান জেলার দামোদরতটে বেড়ুগ্রামে গিরিশচন্দ্রের জন্ম ও বাল্য-শিক্ষা। তৎপরে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে বিদেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে তাঁহার যাত্রা এবং ইংলণ্ডে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন,—এ সকল ঘটনা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের, হয় ত এ যুগের বহু তরুণ বাঙ্গালী শিক্ষার্থী সে সকল কথা অবগত নহেন। ইচ্ছা করিলে গিরিশচন্দ্র সে সময়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় গতানুগতিক পথে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিতেন। কিন্তু আবাল্য স্বাধীনচেতা তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সে পথের পথিক হইলেন না, ভাগ্যের সহিত তাঁহার পুরুষকারের সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তিনি অকুতোভয়ে অতি সামান্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেশের তরুণগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার গ্রহণ করিলেন।



অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র

এই মহৎ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বঙ্গবাসী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন যেখানে নাড়াজোলের কলিকাতার রাজবাটী অবস্থিত, উহার পশ্চাদ্দিকে বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রথম বঙ্গবাসী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর স্কুল ও কালেজ কিছু পূর্ব্বে ঠিক ডাক্তার জগবন্ধু লেনের সম্মুখে উঠিয়া গিয়াছিল। অতি সামান্য অবস্থা হইতে সেই বঙ্গবাসী কালেজকে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় কালেজ-সমূহের ন্যায় উন্নীত করা কি অসাধারণ অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের ফল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

বহু গুণের অধিকারী না হইলে যে এই অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, তাঁহার ন্যায় স্বজাতিবৎসল দেশপ্রেমিক অধ্যাপক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখনকার কালে 'বিলাত-ফেরতা' বাঙ্গালীকে কেহ বাঙ্গালী বলিয়া চিনিত না, স্বীকার করিত না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বিলাত-ফেরতার নিখুঁত চিত্র তাঁহার অমর কবিতায় সজীব করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই—পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাইতে বড়ই ভালবাসি, অথবা আমরা সেজেছি বিলাতী বানর—এখনও বাঙ্গালীর কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া বিমল রসানন্দ প্রদান করে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে কেহ কখনও এক দিনের জন্য বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর ছাড়া অন্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে দেখিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ঘরে বাহিরে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী গিরিশচন্দ্র, তাঁহাতে এতটুকুও পরানুকরণপ্রিয়তা ছিল না। আহারে-বিহারে, প্রসাধনে,—সকল ক্ষেত্রেই তিনি খাঁটী বাঙ্গালী, খাঁটী স্বদেশী! বঙ্গবাণী জননীর চরণকমলে তিনি ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় সাধনা করিয়াছেন এবং অবচিত কুসুমনিচয়ে পবিত্র নির্ম্মাল্য গ্রথিত করিয়া পূজা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা তাঁহার 'বিলাতের পত্রে' ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক 'পূর্ণিমা মিলন' উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের গৃহে যে দিন সুধী বাঙ্গালী সাহিত্যিক সমাজের সভার অধিবেশন হইত, সে দিন গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসি মুখে অতিথি অভ্যাগতগণকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেন, তাঁহার কাছে সাহিত্যিকের ছোট বড় ছিল না। অধুনা যেমন বালিগঞ্জ লেক রোড প্রমুখ পল্লীতে 'ব্যারিষ্টোক্রেশী' গজাইয়া উঠিয়াছে এবং যাহার ঝাঁঝের কাছে সাধারণ বাঙ্গালীর অগ্রসর হইবার সাহস হয় না, দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই রোগ সেই সময়ে দেখা দিয়াছিল। ইহার মধ্যেও একটা 'সাহিত্যক্রেশী' গজাইয়া উঠিয়াছিল। কোন স্থানে সাহিত্যসম্মেলন হইলে নামজাদা মুষ্টিমেয় কয় জন সাহিত্যিকের সেই স্থানে মুখ শোঁকাশুঁকি হইত, বাকী অজানারা অজানা অচেনা হইয়াই কক্ষকোণে পড়িয়া থাকিতেন। গিরিশচন্দ্রের আলয়ে সেইটি হইবার উপায় ছিল না, তিনি সকলকেই সমান আদরে অভ্যর্থনা করিতেন, পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। আর তাঁহার আলয়ে বাঙ্গালী গৃহিণীর সুনিপুণ হস্তে প্রস্তুত বাঙ্গালীর সরস রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যপেয়েরই পরিবেষণ হইত।

ছাত্রবাৎসল্যে তিনি অতীতের গুরুর সমতুল। কি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে তিনি এ দেশের ছাত্রচরিত্র গঠন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরণতলে বসিয়া যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। আজ তাঁহার ছাত্রবর্গের অনেকে জীবনসংগ্রামের নানাক্ষেত্রে সাফল্যের গৌরবমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছেন, কত জন তাঁহারই মত ছাত্র-চরিত্রগঠনের অথবা লোকশিক্ষা প্রচারের কঠিন কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানোন্মেষের উৎস যে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

গিরিশচন্দ্র স্বজনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, খাঁটী সামাজিক বাঙ্গালী, তাঁহার আদর্শের বাঙ্গালী অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। নাগরিক-রূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র বহু গুরুকর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্বাধীনতা ও স্পষ্টবাদিতা বহুক্ষেত্রে শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, সাধুতা, নিরপেক্ষতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্র কি প্রাচীন কি আধুনিক সমগ্র বাঙ্গালী ছাত্রমহলে সুবিদিত।

তাঁহার অশীতিতম জন্মবাসরের উৎসব। বাঙ্গালী প্রাচীন ও আধুনিক ছাত্রমাত্রেরই ইহা পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন সন্দেহ নাই। তাঁহারা সানন্দে সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়া শুভ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন,—এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

জলে উঁচু নীচু

এখনকার ব্যবস্থা পরিষদের অবস্থা দেখিয়া সে কালের নবাব-বাদশার পরিষদের কথা মনে পড়ে। দুই চারি জন বে-সরকারী সদস্যকে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, গণ্ডায় এণ্ডা দিতে হাত উঠে প্রায় সবগুলি। অর্ডিনান্স বিল পাশ হইয়া গেল, এখন রাষ্ট্রীয় পরিষদে একবার নামমাত্র ছোঁয়াইয়া ঐখানিকে বড়লাটের সহি করান হইবে, বাকী রহিল এইটুকু মাত্র। অটোয়া বিল-খানিও ঐ ভাবে পাশ হইয়া গেল, কেবল চুক্তি হইল ৩ বৎসরের মত, এইটুকু ব্যবস্থা অনুগ্রহ করিয়া করা হইয়াছে মাত্র। অথচ ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেনই 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রে ভারতের ঘাড়ে অটোয়ার বোঝা চাপাইতে (force Ottawa on India) নিষেধ করিয়াছেন। মিঃ বেন ঐ সম্পর্কে ভারতের সহিত বৃটিশ উপনিবেশগুলির অধিকারের পার্থক্য বেশ সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন, এ সব চুক্তি মিশামিশিতে মৃন্ময় পাত্রেরই কাংস্যপাত্র অপেক্ষা ভাঙ্গিবার ভয় সমধিক। উপনিবেশে গভর্ণমেণ্ট সত্যই স্বাধীন, সেখানে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদের ভোটই সব, ভারতে ভারত-সচিবই সব। যখন ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অটোয়া-চুক্তিতে বৃটেন ও উপনিবেশগুলিরই লাভ হইবে বেশী, ভারতের প্রায় কিছুই না, এ অবস্থায় যত দিন ভারতের অবস্থাও উপনিবেশগুলির সমান না হয়, তত দিন এ সব চুক্তি ভারতকে ঔষধের মত গিলাইয়া দিলেই যে রোগ সারিবে, তাহা নহে। রোগ যে উহাতে সারিবে না, বরং বৃদ্ধিই হইবে, তাহা নিশ্চয়। পরিষদে সরকারী ও মনোনীত সদস্যদের পল্টন এবং তাহার সঙ্গের লেজুড় খয়েরখাঁরা থাকিতে এমন বিল পাশ হওয়া বিচিত্র নহে। এ বিষয়ে ডাক্তার হরিসিং গৌর, শ্রীযুক্ত সম্মুখম চেটি এবং শ্রীযুক্ত মোদি যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইলেন, তাহা চিরদিন এই পরিষদের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিবে। সার হরিসিং যে রফার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অটোয়া-কমিটীর সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৩ জন অর্থাৎ সার আব্দার রহিম, দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সরদা এবং শ্রীযুক্ত সীতারাম রাজু তাহার রিপোর্টে মাইনরিটি হিসাবে তাঁহাদের আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সকলেই আপোষে সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ প্রথমে অটোয়া-চুক্তির প্রস্তাবে কি

আপত্তিই না উঠিয়াছিল! এই ব্যাপারে পরিষদের ন্যাশানালিষ্ট ও ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট দলের মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। ইহা যে সরকারের ও অটোয়া প্রতিনিধিদের পক্ষে কত সুবিধার হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সরকারের কার্য্যতৎপরতায় বিপক্ষ দলের পরাজয় এমন ভাবে আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ!

সিন্ধুর ব্যবস্থা

(১) সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে (বোম্বাই হইতে) পরিণত করা হইবে, (২) সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল একযোগে আইন-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন, (৩) অন্ততঃ ১ জন হিন্দু মন্ত্রী থাকিবেন, (৪) পঞ্জাবের সম্পর্কে যে (৩) ও (৪) সংখ্যক ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সিন্ধুপ্রদেশেও প্রযুক্ত হইবে, (৫) ১০ বৎসর মন্ত্রিমণ্ডল ও নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রদেশের জনসংখ্যার মতের অনুযায়ী হইয়া চলিবার চেষ্টা করা হইবে, (৬) বিশেষ নির্ব্বাচনকেন্দ্র সমেত হিন্দুরা কাউন্সিলে শতকরা ৩৭টি সদস্য-পদ পাইবেন এবং ঐ সঙ্গে মিশ্র নির্ব্বাচনও প্রবর্ত্তিত হইবে, (৭) ১০ বৎসর পরে যদি হিন্দুরা মনে করেন যে, লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্যপদ সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে তাহাই থাকিবে; কিন্তু উহা ছাড়াও অন্য পদের জন্য হিন্দুরা প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আপাততঃ এই সকল ব্যবস্থা মন্দের ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। কোথাও হিন্দুরা, কোথাও বা মুসলমানরা ইহার ফলে ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে মোটের উপর মওলানা মহম্মদ আলির ১৪ পয়েণ্টের প্রায় সকল পয়েণ্টই গৃহীত হওয়ার ফলে হিন্দুরা যে সমধিক স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন এই ত্যাগস্বীকার না করিলে একতা-প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন উপায় কি?

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

স্বদেশ-কল্যাণে আত্মনিবেদিতপ্রাণ দেশনায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইল, ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই আনন্দের কথা। জনসাধারণের, করপোরেশানের, সাহিত্য-পরিষদের এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। ইহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। বাঙ্গালী ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক,—এমন কেহ নাই, যিনি কোন না কোন প্রকারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্যাগ ও উপদেশের নিকট ঋণী নহেন।

দেশে যখন যে আধি-ব্যাধি দেখা দিয়াছে, আচার্য্য তখনই তাহাতে বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। আত্রাইএর দারুণ বন্যার সময়ে অথবা বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষের সময়ে,—সর্ব্বত্র তাঁহার উপস্থিতি সকল কর্ম্মীকে উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছে। পরিণতবয়সে শীর্ণদেহে তিনি দেশের ডাক পাইলেই সকল কায ফেলিয়া বালকের উৎসাহে মাতিয়া সাধ্যমত কর্ত্তব্যপালন করিতে ছুটিয়া থাকেন। চরকা ও খদ্দর প্রচারে তাঁহার অকৃত্রিম কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথা বিস্মৃত হইবার নহে। বাঙ্গালী-বেকারের অন্নসংস্থানে, বাঙ্গালী দুঃস্থ ছাত্রের শিক্ষা-বিধানে, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্যে উন্নতিলাভ করাইতে তিনি অহরহঃ যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আজ যে বাঙ্গালী জাতি মহতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, প্রকৃত মানুষের সম্মানবিধানে যত্নবান্ হইতেছে, ইহা জাতির পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এখনও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের সুখে-দুঃখে সমব্যথী হউন, স্বাস্থ্য ও সুখ উপভোগ করুন, ইহাই কামনা।

দানীবাবু

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাঙ্গালীর পরম আদরের দানীবাবু অথবা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার বাগবাজারস্থ গিরিশ-ভবনে চতুঃষষ্টি বর্ষ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র দানীবাবু পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে নাট্যকলা কৌশলের অধিকারী হইয়াছিলেন, অভিনয়ের রস-সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে দানীবাবু বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের গৌরবস্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক অভিনয়ে চরম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, হাস্যরসের ভূমিকাতেও তিনি পরম বৈশিষ্ট্যের শক্তি বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লের 'সুরেশে'



দানীবাবু

এবং 'যোগেশে' এক দিন তিনি গভীর ভাবোন্মেষকারী হৃদয়-দ্রাবী অপূর্ব্ব চরিত্র চিত্রাভিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবার সরলার 'গদাধরে' ও বলিদানের 'দুলালে' বিমল হাস্য-রসের অমিয়-ধারায় দর্শকের চিত্ত স্নাত—প্লাবিত করিয়াছিলেন, সে গাঢ় রস-সমাবেশে দর্শক হৃদয়ে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরিণত বয়সেও তিনি পোষ্যপুত্রের 'শ্যামাকান্তে' ও সাজাহানের 'ঔরঙ্গজেবে' অসামান্য কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দীকাল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্থান অধিকার করিয়া তিনি নবীন অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষাদানে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দানীবাবুর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ-প্রয়াসের পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রবাবু, অমৃত মিত্র প্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃগণের অভিনয় রস-সৃষ্টির প্রাণবন্ত যুগের উপর যবনিকাপাত হইল। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা কত কালে পূর্ণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বরিশালের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বরিশাল বলিতেই যেমন অশ্বিনীকুমারকে বুঝায়, তেমনই যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই বলিবেন, অশ্বিনীকুমার বলিতে তাঁহার নামের সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দেহান্তর ঘটিয়াছে, আজ তাঁহার বিয়োগে বরিশাল—কেবল বরিশাল কেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যেন এক অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা, আর জগদীশচন্দ্র ছিলেন বরিশালের শিব। তিনি অশ্বিনীকুমারের পার্শ্বে বসিয়া দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যানুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছিলেন। বরিশালবাসী সেই মণিকাঞ্চন-যোগাযোগ দেখিয়া এক দিন ধন্য হইয়াছিল। তাঁহাদের আদর্শে বরিশালবাসী অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের যশোরাশি ভারত-বিস্তৃত হইয়াছিল, জগদীশচন্দ্রের নাম বরিশাল ও বাঙ্গালাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি বরিশালকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে অশ্বিনীকুমার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বহু কষ্ট-বিপদ বরণ করিলেন, জগদীশচন্দ্র সে পথে পদার্পণ করিলেন না, তিনি শিক্ষাদানের সাহায্যে বরিশালের শিব-প্রতিষ্ঠায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তিনি নীরব কর্ম্মিরূপে দেশসেবা করিয়াছিলেন বলিয়া সে সময়ে অশ্বিনীকুমারের সহকর্ম্মীদের মধ্যে একা তিনিই সরকারের কঠোর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যখন বরিশালের অশ্বিনীকুমারের সহিত প্রথম পরিচিত হন, তখন তিনি রুগ্ন, নিরীহ, দরিদ্র ছাত্র। প্রথম-সাক্ষাতেই অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে অতি আপনার জন বলিয়াই বুঝিতে পারেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে জগদীশচন্দ্র বি-এ পাশ করিলেন, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন। তদবধি তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় যেমন এক দিকে ছাত্রদের সহিত আপনিও ছাত্ররূপে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চায় একবারে তন্ময় হইয়া রহিলেন।

তাঁহার এই সরল শান্ত পবিত্র জীবনের আদর্শ তিনি বরিশালে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্রই অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছে। এমন নির্ম্মল, সাধু, পবিত্র চরিত্র সকল দেশেই আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে। কবির কথায় তিনি 'এনেছিলে সাথে করি মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান'—কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



গোলাপের কাঁটা

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—সুরেশচন্দ্র ঘোষ



সচিত্র মাসিক

বসুমতী

১১শ বর্ষ]　　পৌষ, ১৩৩৯　　[৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজ্যপাদ রামলাল চট্টোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল পিতৃব্যের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সাধক অবস্থায় এবং তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের অভিভাবক ছিলেন—তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়। বলিতেন, তখন আমি হৃদের অণ্ডার-(under)এ। কিছু দিন শ্রীভবতারিণীর পূজা করিতে করিতে এই লোকোত্তর পুরুষের দিব্যোন্মাদ অবস্থা উপস্থিত হয়। কখন গঙ্গাকূলে, কখন পঞ্চবটীমূলে, কখন আমলকী-বৃক্ষতলে, কখন দেবী-দেউলে পড়িয়া উচ্চ ক্রন্দন-রোলে মা-মা বলিয়া কাঁদিতেন। কখন কণ্টক-কঙ্করময় স্থানে মা দেখা দাও, দেখা দাও, বলিয়া মুখ ঘষিতেন। বাহ্যজগতে দৃষ্টি নাই। সূর্য্য উঠে, পাখী গায়। নিশি আসে, শশী হাসে। মেদিনী কখন কৌমুদী-মালিনী, কখন কালরূপা করালিনী। পাগলের ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল গঙ্গার পরপারে স্বর্ণহারে সন্ধ্যা যখন দেখা দেন, পাগল হাহাকার করিয়া উঠেন—আর এক দিন বিফলে চ'লে গেল, কৈ মা, দেখা দিলি! মন অনুক্ষণ আত্মহারা, নয়নে অনিবার প্রেমধারা, ক্ষুৎপিপাসায় উদাসীন। হৃদয় সে সময় পরমযত্নে মাতুলকে স্নানাহার করাইতেন ও সেবা করিতেন।

হৃদয়ের পর পিতৃব্যের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন, রামলাল। তখন লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে ভক্ত-সমাগম ও 'যত মত, তত পথ', এই উদার ধর্ম্মনীতির প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসমাজে ইনি 'রামলাল-দাদা' নামে সুপরিচিত এবং এখনও ভবতারিণীর পূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ইহার জীবনের ব্রত।

দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান সংসারতপ্ত ভক্তের জুড়াইবার স্থান—যেন

শান্তি দেবীর নিলয়। অতি নিকটেই আলমবাজার শ্রবণ বিদীর্ণ করিয়া কলের বাঁশী বাজাইতেছে, বরাহনগর দোকানপাট খুলিয়া হট্টগোল বাধাইয়াছে। অদূরে কলিকাতা সহর ব্যবসা-বাণিজ্য-বিলাসের লহর তুলিয়া, ধূলি-ধূম-ধূসর-অঙ্গ চাক্‌চিক্যে ঢাকিয়া বারাঙ্গনার ন্যায় রঙ্গ করিতেছে। কিন্তু দেব-ঋষির এই পবিত্র তপোবনে সংসারের কোলাহল নাই, আছে কেবল পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর মৃদু কলনাদ। এখানে অসন্তোষের ক্ষুব্ধ স্বর নাই, আছে কেবল তরুপত্রের তরতর ঝরঝর, আর হতাশের তপ্তশ্বাসের পরিবর্ত্তে আছে বাতাসের সুশীতল সঞ্চরণ-মর্ম্মর।

ঐ দেখ, শ্রীশ্রীভবতারিণীর নবচূড়-মণ্ডিত মন্দির—পরমপ্রিয় পুত্রের তপস্যায় যিনি জাগ্রত হইয়া ভক্তগণকে অভয়-দান করিতেছেন। তৎপশ্চাতে বিষ্ণু-ঘর—শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর বিলাস-বাসর। ভাগীরথীতীরবর্ত্তী ঐ দেখ, দ্বাদশ শিব-মন্দির—যেখানে দেবদেব মহাদেব মুক্তি-দানে মুক্তহস্ত। তৎপশ্চাতে সিদ্ধাসন-সমন্বিত পঞ্চবটী, তৎসন্নিকটে গদাধরের সাধন-কুটীর—রাণী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্য-নাথ ইষ্টকের আবেষ্টনে যাহাকে স্থায়িত্ব-দান করিয়াছেন। আর ঐ দেখ, গঙ্গা-তীরে শিবমন্দিরের উত্তরভাগে শ্রীরাম-কৃষ্ণের কক্ষ—যাহা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের পূত আলোচনায় আজিও তরঙ্গায়িত। প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন কার অলক্ষিত সত্তার কক্ষ পরিপূর্ণ রহিয়াছে; যেন কার অদৃশ্য পুণ্যপ্রভাব সংশয়ীকে বিশ্বাস, পাপীকে আশ্বাস, তাপিতকে শান্তি দিবার জন্য এখনও বিদ্যমান। সংসার-বাসনা লইয়া এ কক্ষে প্রবেশ করিতে অন্তর শিহরিয়া উঠে। তাঁহার শ্রীচরণপূত এ কক্ষের মৃত্তিকা স্পর্শে শরীর পবিত্র হয়।

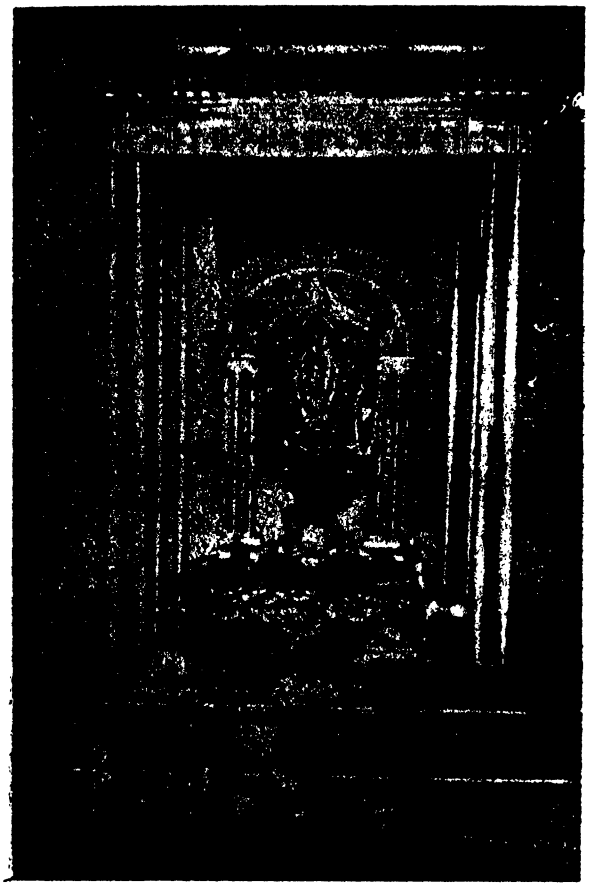
রামলাল দাদা বলিলেন, দিব্যোন্মাদ অবস্থা কেটে যাবার পর ঠাকুর মথুর বাবুর (রাণী রাসমণির জামাতা) কুঠীবাড়ীর উপর তলায় থাক্‌তেন। এক দিন মথুর বাবু বল্‌লেন, বাবা, এ বাগান-বাড়ীটি হেষ্টিংস্‌ সাহেবের কাছ থেকে কেনা হবার পর আর ঘরগুলিতে চূণকলি দেওয়া



শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায়

হয় নি, তাই মনে করেছি, ঘরগুলিতে একবার কলি ফিরিয়ে নেব। আপনি একবার নীচে আসুন, যে-ঘরে থাক্‌তে ইচ্ছা করবেন, ব্যবস্থা ক'রে দেব। চূণকাম হয়ে গেলে আবার উপরে এসে থাকবেন। ঠাকুর একতলার সব ঘর দেখে কোণের ঘরটি পছন্দ ক'রে বল্‌লেন, এই ঘরটি হ'লে বেশ হয়। পাশেই গোলবারান্দা থেকে গঙ্গা-দর্শন, ঘর থেকে

বেরিয়ে এলেই মায়ের মন্দির। উত্তরদিকের দরজা খুল্‌লেই পঞ্চবটী। মথুর বল্‌লেন, বেশ ত! এই ঘরই ব্যবস্থা ক'রে দেব। এ ঘরে তখন শ্যামসুন্দরের ভাঁড়ার ছিল; আর ঘরের মেঝেও ছিল ইটের খাদিকরা—এখন মা কালীর ভাঁড়ার ঘর যেমন দেখতে পাও, তেমনি।



শ্রীশ্রীভবতারিণী

তার পর ঘর থেকে শ্যামসুন্দরের জিনিষ-পত্তর সরিয়ে ঠাকুরের খাট-বিছানা পাতা হ'ল।

কিছু দিন পরে মথুর এসে বল্‌লেন, বাবা, কুঠীবাড়ীর কলি-চুণকাম হয়ে গেছে, এখন আপনি উপরে চলুন। ঠাকুর বল্‌লেন, এ ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? এই বেশ আছি। তোমরা বাবু-মানুষ, ও-সব ঘর তোমাদের জন্যে। তা ছাড়া ওপর-নীচে করা আর পারি না। এ-ঘর বেশ নির্জ্জন, এক পাশে প'ড়ে আছি। এই ভাল। তা বেশ ব'লে মথুর বাবু হাস্‌তে লাগলেন। সেই অবধি ঠাকুর এই ঘরেই থাক্‌তেন।

এই সব ঘটনা যখন হয়, তখন কি আপনি এখানে ছিলেন, প্রশ্ন করায় দাদা বল্‌লেন, না। ঠাকুর আর তাঁর মার মুখে সব শুনেছি। এমনি আগেকার ঘটনা ঠাকুরের মুখে অনেক শুনেছি। দাদা বলিলেন, কামারপুকুর থেকে গ্রামবাসীরা কল্‌কাতায় কাপড় আর নানারকম জিনিষ-পত্তর বিক্রী করতে আস্‌ত। তারা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসে কালী দর্শন করত আর ঠাকুরকেও দেখে যেত। তারা একবার ঠাকুরের উন্মাদ অবস্থা দেখে তাঁর মাকে গিয়ে জানালে যে, তোমার গদাই পাগলের মত হয়েছে। কেবল মা-মা ব'লে চীৎকার ক'রে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। তুমি শীঘ্র তার কাছে যাও, নইলে সে কোথাও চ'লে যাবে। ঠাকুরের মা এই সব কথা শুনে কল্‌কাতায় চ'লে এলেন। ঠাকুরকে বল্‌লেন, গদাই, তুমি কেন এমন করছ? তোমার কষ্ট যে আমি সহ্য করতে পারছি না। শুনেছি, তুমি মধ্যে মধ্যে কোথায় ছুটে চ'লে যাও। তুমি যদি চ'লে যাও আর এ রকম কর ত আমি গঙ্গায় ডুবে মরব। ঠাকুর মা'র কথা শুনে বলেছিলেন, না, মা, আমি এ স্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। আপনি আর কিছু ভাববেন না। আমি ভাল হয়েছি।

ঠাকুর অনেক রকমের অনেক সাধনা করেছেন। মুসলমানের মস্‌জিদে গিয়ে তাঁর সাধনা করবার ইচ্ছা হয়। কাছেই মস্‌জিদ। এক দিন ভোরে মুসলমানরা সেই মস্‌জিদের দরজা খুলে দেখলে, কে এক জন ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে এক গজ কাপড়, কাছা নেই। মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে? কোথায় থাক? তাদের মধ্যে এক জন বল্‌লে, ও, এঁকে জানি! উনি মন্দিরে থাকেন, পূজা করেন। তার পর ঠাকুর তাদের সঙ্গে নেমাজ পড়লেন। এমনি তিন দিন সাধনার পর ঠাকুর দেখলেন, এক বৃদ্ধ ফকির, আলুথালু পরা, গোঁফ-দাড়ি, মাথার চুল সব সাদা, হাতে লাঠি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ফকির ঠাকুরকে বল্‌লেন, তুমি এসেছ,

বেশ বেশ! তার পর হেসে ঠাকুরকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

শক্তি-সাধনার পূর্ব্বে ঠাকুর এক দিন ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছিলেন আর আপনা আপনি বলছিলেন, শক্তি-সাধনা করবি? আচ্ছা, আচ্ছা! তার পরেই এক ব্রাহ্মণী এল;—সুন্দরী, গেরুয়াধারী, হাতে ত্রিশূল, কাঁধে ঝুলি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি বেলতলায় পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন স্থাপন ক'রে তার উপর ঠাকুরকে বসিয়ে সাধনার ক্রিয়াগুলি একে একে ঠাকুরকে দেখিয়ে দেন। তার পর যখন দেখলেন, ঠাকুর বেশ সাধনা করছেন আর মধ্যে মধ্যে দর্শন পাচ্ছেন, তখন তিনি অন্তর্ধান হলেন। এমনি অনেকবার এসে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে অনেক প্রকার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঠাকুর কি চমৎকার নৃত্য করতে পারতেন। তিনি সকালসন্ধ্যায় হাত-তালি দিয়ে নাচতেন আর মুখে বল্‌তেন,—

জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন-দয়াল।
হরে মুরারে গোবিন্দ, বসুদেবকী-নন্দন গোবিন্দ,
হরে নারায়ণ গোবিন্দ হে, হরে কৃষ্ণ বাসুদেব।

আবার কখন বল্‌তেন,—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
রাম রাঘব পাহি মাং, কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং, রাম রাঘব পাহি মাং।



পরমহংসদেব ও হৃদয়

রাম শব্দের অর্থ কি? ঠাকুর বলতেন, 'রা' শব্দে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, 'ম' শব্দে ভগবান্ অর্থাৎ রাজা। রাম, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা। এক দিন আমি এক যায়গা থেকে শুনে এলুম, তারা বলছে—

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গৌরী শঙ্কর সীতা রাম।

ঠাকুরকে এটি শোনাতে তিনি বল্লেন, বাঃ, বেশ ত নাম! ঠাকুর খুব পছন্দ করতেন ব'লে আমি নিত্য তাঁকে ঐটি শোনাতুম।

মায়ের মন্দিরে এসে কেউ কেউ চোখ বুজে ধ্যান-জপ করে। ঠাকুর তা দেখে বল্‌তেন, এখানে আবার ও-সব



দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী



ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের একাংশের দৃশ্য

করা কেন গো? সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নাও। ও-সব বাইরে চলে—যেখানে অনুভূতি হবে না। এখানে ও-সব কোর না। মনে কর, তুমি তোমার আপন মাকে দেখতে গেছ। তুমি তাঁকে দেখবে, না, চোখ বুজে মালা জপ করতে বস্‌বে?

জপ করিবার নিয়ম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, আঙ্গুলের পর্ব্বতে ঠেক্‌বে না, নখে স্পর্শ হবে না। আঙ্গুলগুলি পরস্পর ফাঁক থাকবে না, তা হ'লে জপের ফল সব বেরিয়ে যায়। কাযকর্ম্ম সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে



পরমহংসদেবের ঘর

জপে বসতে হয়। বলতেন, কর্ম্ম সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি। তিনি আরও বলতেন, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, এই পঞ্চপর্ব্ব আর কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষে শনি-মঙ্গলবার বিশেষ প্রশস্ত।

কলিযুগে উপবাস ক'রে ও-সব চলে না। তাতে ঠিক ঠিক মন বসে না। ঠাকুর বলতেন, তাই সামান্য কিছু আগে খেয়ে নিতে হয়—মার পায়ের বিল্বপত্র কি প্রসাদী দ্রব্য কিছু খেলে দোষ থাকে না। পেট চুঁই-চুঁই করছে—তাতে কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম চলে? একে কলিকাল,

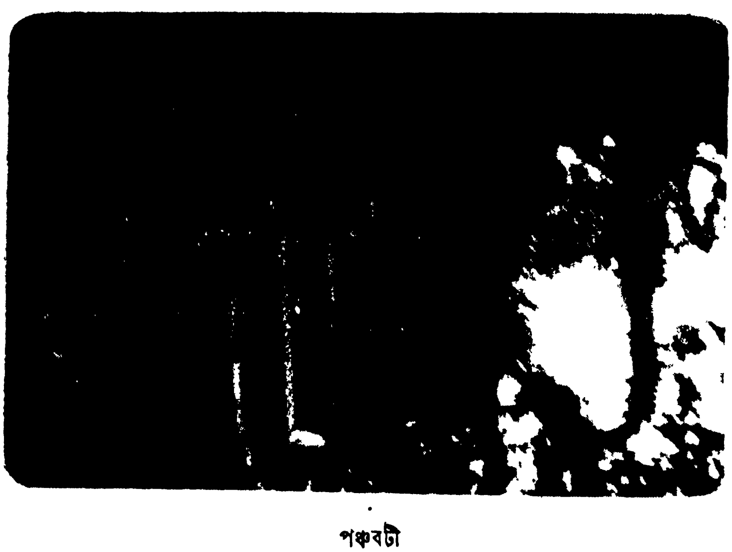
অনুগত প্রাণ। যদি ঠিক ঠিক মন বসে, তবে ত ফল হবে!

রামলাল দাদা বললেন, এক দিন ঠাকুর আমাকে মিঠে-কড়া তামাক, যোয়ান আর কাবাবচিনি কিনতে আলম-বাজারে পাঠালেন। যেতে যেতে পথে দেখি, এক জন খৃষ্টান পাপের বিষয় বক্তৃতা দিচ্ছে আর মথি-লিখিত সুসমাচার বিলি করছে। আমিও একখানি নিলুম। ঠাকুর দেখে বল্লেন, ওটা কি বই রে? পড় না, একটু শুনি। আমি পড়তে লাগলুম। খানিক শুনতে শুনতে তিনি বললেন, থাক্ থাক্, কেবল পাপ আর পাপ, এই সব কথা। ওটা বল ত রে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' ব'লে একটি গান করলেন—'যিনি মহারাজা, এই বিশ্ব যাঁর প্রজা, জান না রে মন, আমি পুত্র তাঁর।'
—(ব্রহ্মসঙ্গীত)

রাণী রাসমণি ছিলেন—মা-কালীর অষ্ট সখীর এক সখী। মা থাকবেন ব'লে তিনি এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করান। এ স্থান মায়ের অন্দর-মহল, আর কালীঘাট তাঁর সদর কাছারী। মা ভোরে এখানে মাখম-মিছরী খেয়ে সেখানে যান ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে। কত লোকে সেখানে কত রকম কামনা করে। মা সেখানে যান ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতে। তার পর রাত্রি ৯টার সময় ফিরে এসে মন্দিরের চূড়ার ওপর ব'সে গঙ্গা দর্শন করেন আর হাওয়া খান।



কালীমন্দিরের একাংশ



পঞ্চবটী

ঠাকুর বলতেন, সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় আর সমুদ্র বড়। পাহাড় দেখা হয়েছে, কিন্তু সমুদ্র দেখা হয় নি। তবে একবার ষ্টীমারে আসবার সময় রূপনারাণের গাঙ্ (গঙ্গা, দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীর মোহানা) দেখে আমার সমুদ্র দেখবার সাধ মিটেছে। ব্রহ্ম কি রকম জানিস?—যেমন জলে জল, কূল-কিনারা নেই।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র।

[পূজনীয় শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।]

উইল

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধোপা-বউর ঘাট থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হ'ল। সে, তার স্বামী আর মেয়ে একটা বড় ঝিলে কাপড় ধুতে যেত। এক পাশে কলাবাগান আর মাঝে মাঝে সুপারি-গাছ, তার তলায় কতকগুলা আগাছা। এক দিকে অল্প একটু ঘাটের মত আছে, সেই স্থানে দু'পাশে দুইটা বড় বড় নিমগাছ, দুপুরবেলা তার ছায়া বড় শীতল। খানিকটে দূরে পা-বাঁধা দুইটা গাধা চর্‌ছে। মাঠের মাঝখানে মস্ত মস্ত গামলায় সাজিমাটী-গোলা জল টগবগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে, তাতে রাশি রাশি ময়লা কাপড় চুবানো আছে। ঘাট থেকে একটু দূরে জলের ভিতর দুই তিনটে আঁজি কাটা কাটা তক্তার পাট, ধোপা আর তার মেয়ে আছড়ে কাপড় কাচ্ছে। মেয়ের বয়স সতেরো আঠারো হবে, হাতে রূপার বালা, তার উপর গালার চুড়ী, কপালে টিকুলি, মাথায় এক ধ্যাবড়া সিন্দুর। কোনকালে তারা ছিল হিন্দুস্থানী, এখন বাঙ্গালাদেশে থেকে থেকে বাঙ্গালা কথাই কয়।

হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ধোপা আর তার মেয়ে পাটের উপর কাপড় কাচে। কাপড় আছ্‌ড়াবার সময় মুখে একটা হিস্‌ হিস্‌ করে শব্দ হচ্ছে। সাজিমাটীর জল আর কাপড়ের ময়লা ঝিলের জলে মিশ্‌ছে, থেকে থেকে কাপড় মুচ্‌ড়ে, জল নিংড়ে ফেলে আবার ঝিলের জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাটে আছাড় দিচ্ছে। যখন কাচা হয়ে গেল, তখন নিংড়ে পাকিয়ে নিয়ে ঘাসের উপর ফেলে দিচ্ছে। ধোপা-বউ সেই কাপড়গুলা তুলে নিয়ে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিচ্ছে। সূর্য্য যখন অস্ত গেল, সেই সময় ধোপানী কাপড়গুলা তুলে পোঁটলা বেঁধে গাধা দুটোর পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁকিয়ে দিলে। ধোপা আর মেয়ে হাত-পা ধুয়ে পিছনে আস্‌বে। সেইখানে একটা কুকুর বসেছিল, উঠে ধোপানীর সঙ্গে চল্‌ল। খানিক বেশ যায়, আবার ছুটে ঘাটের দিকে যায়, আবার দৌড়িয়ে পিছনে আসে। ধোপানী হেসে বল্‌লে, ধোবি কা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা।

বাড়ী পৌঁছিতে ঘোর-ঘোর হয়ে এল। ধোপাদের খোলাঘরে বাইরে একখানি ছোট ঘর, ভিতরে তার চেয়ে একটু বড় ঘর। ছোট ঘরের এক পাশে কাঠের একটা ছোট টেবিলের মত, তার উপর কাপড় ইস্ত্রী করে। আর এক কোণে একটা উনুন, সেইখানে রান্না করে। সেই দিকে কতকগুলা ঘুঁটে, আর কিছু কুড়ানো কাঠ: টেবিলের কাছে ইস্ত্রী গরম করবার জন্য কাঠকয়লা জড় করা আছে। ধোপানী কাপড়ের পোঁটলাগুলা এক কোণে নামিয়ে, গাধার পায়ে দড়ী বেঁধে ছেড়ে দিলে। গাধা দুটো বেরিয়ে গিয়ে, একবার ডেকে, মাঠে যা অল্প-স্বল্প ঘাস ছিল, খেতে আরম্ভ করলে। ধোপানী তামাক সেজে তামাক খেতে বসল।

ধোপা আর মেয়ে এলে পর ধোপা বল্‌লে, আমি একবার বাইরে থেকে আস্‌ছি।

ধোপানী রেগে উঠে বল্‌লে, তাড়িখানায় যেতে হবে? রোজ রোজ তাড়ির পয়সা আসে কোত্থেকে?

—বেশী নয়, চার পয়সার খাব। সারা দিন খেটে খেটে গায় ব্যথা হয়েছে।

—আমরা বুঝি খাটি নে? বড় মেহনত হ'ল, একবার তামাক খেলাম।

—তুই তাড়ি খাবি? এক ভাঁড় নিয়ে আসব?

—তোর মুখে আগুন।

ধোপা চ'লে গেল। মেয়ে উনুনে আগুন দিয়ে, চাল ধুয়ে ভাত চড়িয়ে দিলে। ধোপানী ঘরের ভিতর থেকে ইস্ত্রী বা'র করে তাতে কয়লা পুরে আগুন ধরালে। কাপড় কলপ দেবার জন্য টেবিলের নীচে হাঁড়িতে ফেন ছিল। হাঁড়ি বা'র করে একখানা ভিজে কাপড় টেবিলের উপর সমান ক'রে পেতে পোঁটলা থেকে শুক্‌নো কাপড় নিয়ে ইস্ত্রী দিতে আরম্ভ করলে। কতক অমনি নরম ইস্ত্রী, আর কলপ দেবার হলে ফেন ছিটিয়ে ইস্ত্রী, কাপড় বেশ ধপ্‌ধপে মড়্‌মড়ে হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যেমন ইস্ত্রী করা হয়ে যায়, অমনি বেশ পাট ক'রে এক পাশে রেখে দেয়।

খানিকক্ষণ পরে ধোপা গান গাইতে গাইতে ফিরে এল। তাড়ি খেয়ে তার একটু ফূর্ত্তি হয়েছে। বল্‌লে, আজ রাত্রে ইস্ত্রী দেবার কি দরকার? কাল সকালবেলা দিলেই হবে।

—কালকে বক্‌শীদের আর রায় সাহেবদের কাপড় দিতে হবে মনে নেই? তোর কি, তুই মনে করিস্, তাড়ি খেলেই সব কায হয়ে গেল।

—তবে ঘাটে যাবে কে?

—কেন, রাধিয়া যাবে। আর আমি কাপড় দিয়ে দোসরা খেপের কাপড় নিয়ে ঘাটে যাব।

—আমি তোর সঙ্গে যাব?

—তুই কি কর্‌তে যাবি? দু বাড়ীর কাপড়, বড় মোট হবে না। তুই ঘাটে যেমন যাস্, তেমনি যাবি।

—আচ্ছা। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, রাধিয়া, ভাত দিবি নে?

রাধিয়া ভাতের ফেন গাল্‌ছিল। পাছে ফেন প'ড়ে যায় ব'লে আর একটা হাঁড়িতে সাবধানে ফেন গড়াচ্ছিল। বল্‌লে, ব'স, ভাত হয়েছে, দিচ্ছি।

গরম গরম ভাত বেড়ে রাধিয়া ওবেলাকার ডাল এনে দিলে। ধোপা অমনি খেতে ব'সে গেল।

রাধিয়া বল্‌লে, ব'সে খাও বাবা। লঙ্কা আর রসুনের চাট্‌নি এনে দিচ্ছি।

তিন জনে একত্রে ব'সে খেলে। তার পর আবার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিন জনেই কাপড় ইস্ত্রী কর্‌তে লাগ্‌ল। শেষে প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে তিন জনেই শুয়ে পড়্‌ল। ধোপা শুলো একখানা ছেঁড়া দড়ীর খাটে আর মায়ে-ঝিয়ে মাটীতে বিচালি পেতে তার উপর কাপড় পেতে শুয়ে রইল। যেই পড়া, আর অমনি ঘুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকালবেলা ধোপা-বউ দু' বাড়ীর কাপড় গুণে নিয়ে মোট বেঁধে মাথায় ক'রে বেরিয়ে গেল। ধোপা আর রাধিয়া গাধার পিঠে ময়লা কাপড় চাপিয়ে গেল ঘাটে।

ধোপানী আগে গেল বক্সী-বাড়ী। বক্সীরা দুই ভাই;—গোপাল বক্সী আর মদন বক্সী। দুই ভাইয়ের হাঁড়ি আলাদা, মহল আলাদা, তবে এখনও পাচীল তুলে বাড়ী ভাগ হয় নি গোপালের এক মেয়ে সরলা আর এক ভাগিনা অমৃত। মদনের ছেলে-পুলে হয় নি, শুধু কর্ত্তা আর গৃহিণী। মদন বড়, গোপাল ছোট।

বাড়ী ঢুক্‌তে ডান হাতে গোপালের অংশ, ধোপা-বউ সেই দিকে ঢুকল। গৃহিণী কাদম্বিনী ব'সে তরকারি কুটছিলেন। ধোপানী উঠানে এসে দাঁড়াতেই বল্‌লেন, সকালবেলা যার নাম করতে নেই, সেই সুমুখে। তুই কি আস্‌বার আর সময় পাস্ নি?

ধোপা-বউ বল্‌লে, তা যদি তোমাদের এখন সময় না হয়, তা হ'লে আমি যাই, কিন্তু আবার সেই আট দিন পরে আসব।

সরলা তাড়াতাড়ি এসে বল্‌লে, না মা, ওকে ফিরিয়ে দিও না। এই দেখ না, কালো কিষ্টি কাপড় প'রে রয়েছি, এবার অনেক কাপড় ময়লা হয়েছে। তোমাকে আর উঠতে হবে না, আমি কাপড় মিলিয়ে নিচ্ছি।

—দেখ দেখি ওর আক্কেলখানা! সকালবেলা কি ধোপার মুখ দেখতে আছে, না তার নাম করতে আছে?

—থাক্ থাক্, ও কথায় আর কায নেই। এস ত ধোপা-বউ, এদিককার বারান্দায় এস।

মাথার মোট নেড়ে ধোপাবউ বল্‌লে, আমার কি আর কায নেই? আমাকে এখ্‌খুনি ঘাটে যেতে হবে!

সরলা বারান্দায় গিয়ে ধোপার বাড়ীর কাপড়ের খাতা নিয়ে এল, বল্‌লে, ধোপাবউ, অন্য সময় তুমি বিকেলবেলা এস, সেই ভাল। তা হোক্, তুমি কাপড় বের কর, আমি মিলিয়ে নিচ্ছি, আর ঝিকে ময়লা কাপড় জড় ক'রে আন্‌তে বল্‌ছি।

এ দিকে কাপড় মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু গিন্নী নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারবেন কেন? তাড়াতাড়ি কুটনো কোটা সেরে এসে বস্‌লেন। ধোপানী যখন এল, তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে অমৃতও খাবার খাচ্ছিল, সেও এসে দাঁড়াল। তার মত জ্যাঠা ছেলে ছুটি খুঁজে পাওয়া ভার। কাপড় প্রায় মেলানো হয়ে গিয়েছে, আলাদা আলাদা থাক্ থাক্ ক'রে কাপড় সাজানো রয়েছে, এমন সময়ে গিন্নী এসে বস্‌লেন। পিছনে পিছনে অমৃত। এসে বল্‌লে, আচ্ছা, মামীমা, সকালবেলা ধোপার নাম কর্‌তে নেই কেন, আর ঘুম থেকে উঠে ধোপার মুখ দেখতে নেই কেন?

—তোর সব কথায় একটা ফ্যাকড়া তুলতে হবে। কেন, তা আমি কি জানি? চিরকাল যা হয়ে আসছে, তাই ত হবে।

—কোন শাস্ত্রে ত কিছু লেখে না।

—নে বাপু, তোর সঙ্গে আমি আর নেই করতে পারি নে।

—আচ্ছা, এ যেন সকালবেলা ধোপার নাম করতে নেই, আর যদি ধোপা দু'চার মাস না আসে, কিম্বা এই যেমন চারিদিকে ধর্ম্মঘট হচ্ছে, সেই রকম ধর্ম্মঘট ক'রে কাপড় ধোয়া বন্ধ করে? তখন? তখন যে হা ধোপা জো ধোপা ক'রে অস্থির হবে, সকলের মুখে ভোরবেলা থেকে আর রাত দুপুর পর্য্যন্ত ধোপার নাম ছাড়া অন্য নাম থাক্‌বে না।

—ওরে বাপু, তুই থাম্, কাণের পোকা বের ক'রে দিলে। আচ্ছা ধোপাবউ, সরলার এই ভোমরা পেড়ে সাড়ীখানার পাড় জ্বালিয়ে ফেল্‌লি কেমন কোরে?

—ভাটিতে একটু ধ'রে গিয়ে থাক্‌বে। আমরা ত কখনও কাপড় নষ্ট করি না। তোমাদের কাপড় আমি নিজে ইস্ত্রী করি, ধোপাকেও কর্‌তে দি নে। পাড় ত জ্ব'লে যায় নি, কেমন দিদিমণি?

—দিদিমণি আবার কি বল্‌বে? আমার কি চোখ নেই?

সরলা বল্‌লে, মা, কাপড়খানা অনেক দিনের, এই দেখ না ছিঁড়্‌তে আরম্ভ হয়েছে। এর জন্য ধোপাবউকে বক্‌ছ কেন?

কাদম্বিনী বল্‌লেন, তা যেন হ'ল, আর খেপে আমার যে কস্তা পেড়ে সাড়ীখানা দেয় নি, সেখানা কোথায়?

অন্য কাপড়ের তলা থেকে সে সাড়ীখানা বার ক'রে ধোপানী বল্‌লে, এই ত রয়েছে মা ঠাক্‌রুণ, না দেখেই রাগ কর কেন?

কাপড় মিলিয়ে দিয়ে ময়লা কাপড়ের পোঁটলা বেঁধে নিয়ে ধোপানী মদন বক্‌শীর মহলে গেল। স্ত্রী শৈলবালা একখানা ময়লা খাটো কাপড় প'রে সুপারি কাট্‌ছিলেন। ধোপানীকে দেখে বল্‌লেন, এখন নাইবার খাবার সময়, এমন সময় তুই এলি?

কাপড়ের মোট নামিয়ে ধোপা-বউ বল্‌লে, বড় মা, আজ অনেক কায আছে, ঘাটে যেতে হবে, এমন সময় এসেছি ব'লে কিছু মনে ক'রো না। আর তোমাদের ত বেশী কাপড় নয়, এখনই দিয়ে ফেল্‌তে পার্‌বে।

—যাদের বেশী কাপড় আছে, তাদের থাকুক। আমাদের কম কাপড় ব'লে কি সেই খোঁটা দিতে এসেছিস্?

—ও মা, এর নাম কি খোঁটা দেওয়া? তোমাদের লোক কম, তাই কাপড় কম।

—আচ্ছা, তবে দে, মিলিয়ে নি।

এমন সময় কর্ত্তা মদন বক্‌শী এলেন। তাঁর পরনে গিন্নীর চেয়েও খাটো কাপড়, গায়ে পিরাণ নেই। বল্‌লেন, ধোপার খরচ মাসে মাসে বেড়ে যাচ্ছে, এ রকম হ'লে কুলোবে কেমন ক'রে?

শৈলবালা বল্‌লেন, আমি ত যে কখানা না দিলে নয়, তাই ধোপার বাড়ী দি।

—তবু ত কোনও মাসে তিন টাকা, কোনও মাসে আড়াই টাকা ধোপানীকে দিতে হয়।

ধোপা-বউ হেসে বল্‌লে, বড় বাবু, এর কম হবে? ছোট বাবুদের কোন মাসে সাত টাকা, কোন মাসে আট টাকা হয়।

—ওরা ভারি বড় মানুষ কি না, তাই দুযোড়ো খরচ করে। দেখ্‌ব দু'বছর পরে কেমন বড়মানুষী থাকে। আমরা গরিব, দুটি মানুষ, আমাদের এই টাকাই বেশী মনে হয়।

শৈলবালা বল্‌লেন, আমরা ত দু'জনেই দুখানা ময়লা খাটো কাপড় প'রে আছি, আর কত টানাটানি কর্‌ব বল?

—যাক্ যাক্, ধোয়া কাপড় নিয়ে ওকে ময়লা কাপড় দিয়ে বিদায় ক'রে দাও। ধোপা-বউ, আমাকে একখানা ধোয়া কাপড় দে ত, আমি এ কাপড়খানা ছেড়ে দি।

ধোপা-বউ একখানা কাপড় বা'র কোরে দিলে, তাতে সাতটা তালি। হেসে বল্‌লে, এখানা ত ছিঁড়ে গিয়েছে, আবার ধুতে দিলে কুটিকুটি হয়ে যাবে।

—ও এখনও আমার অনেক দিন যাবে, ব'লে তাড়াতাড়ি কর্ত্তা ঘরের ভিতর কাপড় ছাড়্‌তে গেলেন।

ধোপা-বউয়ের রায় সাহেবদের বাড়ী পৌঁছুতে বেলা সাড়ে দশটা হ'ল। তাঁরা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে উঠেছেন অনেকক্ষণ। মিষ্টার রায় ঘরের ভিতর চুরুট-মুখে খবরের

কাগজ পড়্ছিলেন, দোতলার ঘরে মিসেস রায় পিয়ানোটা টং-টং করছিলেন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নীচেকার বারান্দায় ব'সে গল্প করছিল। বারান্দার আর এক পাশে ধোপানী কাপড় নামিয়ে রাখল। তাকে আস্তে দেখে আয়া সঙ্গে সঙ্গে এল, বল্লে, তুই কপড়া নিকাল, মেমসাহেবকে খবর দিচ্ছি।

খবর পেয়ে মেমসাহেবের বাজনা থামল, খাতা হাতে নেমে এলেন। মেমের মত বিদ্ঘুটে সরু গলা ক'রে ডাক্লেন, বেয়ারা!

আয়া হুজুর, ব'লে বেয়ারা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধোপা-বউকে দেখে ঘরের ভিতর ঢুকে ময়লা কাপড়ের বাস্কেট থেকে ময়লা কাপড় দুই হাতে পুরে নিয়ে এল, মেমসাহেবের কাপড় আয়া আর একটা ঝুড়ি থেকে নিয়ে এল।

মেমসাহেব হুকুম দিলেন, কপড়া মিলাও।

কাপড় বা'র ক'রে মিলিয়ে সাজাতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। কলার মেলে ত রুমাল একখানা কম পড়ে, তোয়ালে যদি ঠিক হ'ল ত ঝাড়ন একখানা পাওয়া যায় না। মেয়ের ফ্রক, মেমসাহেবের পেটি কোট, ছেলেদের হাফপ্যান্ট, সাহেবের ওয়েষ্টকোট, মোজা সব একে একে মেলানো হ'ল। ময়লা কাপড় লেখা হ'লে ধোপানী সেগুলা জড় ক'রে বাঁধলে। তার পর বল্লে, মেমসাহেব, তলব মিলে গা?

—তলব তো দিয়া।

—হুজুর, দো মাহিনা হুয়া, তলব নহি মিলা।

মেমসাহেবের ত মহা রাগ। ধোপানী মাগী আবার তলবের জন্য তাগাদা করে। বললেন, আগেকা হপ্তামে মিলে গা।

ধোপানী আর কি করবে, কাপড় নিয়ে চ'লে গেল। এ হ'ল সাহেববাড়ী, এখানে গোলমাল করলে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিসেস্ রায়ের বাঙ্গালা নাম তরুবালা। তিনি আর শৈলবালা—তাঁকে ত আর মিসেস্ বক্শী বলতে পারি নে—সহোদরা ভগিনী। তরুবালাও এককালে ছিলেন বাঙ্গালী, কিন্তু সেকালে মিষ্টার রায় বিলাতের ইন্দ্রজালের দেশে পদার্পণ করেন নি। কোনও কোনও দেশের লোকের মুখে শুনেছি যে, কামরূপ-কামাখ্যায় ভারী জাদুওয়ালী সব আছে, সেখানে কেউ গেলে তাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলে। আর বিলাত গেলে আর কোনও জাদুতে সাহেব বানিয়ে দেয়। বড় দুঃখের কথা যে, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে, যে দেশের গুণ গানে গানে কথায় কথায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে, এমন কোনও জাদু নেই—যাতে সাহেবকে বাঙ্গালী ক'রে ফেলে। ও বড় হাড়-শক্ত জাতি, যেখানে গিয়ে যত দিনই থাকুক না কেন, সেই সাহেবকে সাহেবই থেকে যায়।

মিষ্টার রায় ত দেশে ফিরে এসে হলেন সাহেব, আর সেই সঙ্গে কায়ে-কায়েই তরুবালা হলেন মেমসাহেব। তা, সাজতে যা ইচ্ছা হয় সাজ, কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপা সাজের নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সমান। এখন এই তিনটি হয়েছে আর ভবিষ্যতে যে আরও দু' চারটি হবে না, এমনও কোন কথা নেই। এই ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে—সাহেবের ছেলেমেয়ের মত। মিষ্টার রায় বিলাত গিয়ে সাহেব হয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু যে চাকরী করেন, তা থেকে আয় তেমন বেশী নয় অথচ সাহেবিয়ানার খরচ খুব বেশী; কোন রকম ক'রে আয় বাড়ানো যায় কি না, সাহেব-মেমের সদাসর্ব্বদাই সেই ভাবনা।

শৈলবালা বয়সে তরুবালার চেয়ে অনেক বড়, পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। মদন বক্শীর বয়স ষাটের কাছাকাছি, দারুণ কৃপণ আর অগাধ টাকা। শৈলবালার ঐ এক বোন্, ভাই নেই, বাপের বাড়ী আর কেউ নেই। এ দিকে মদন বক্শী আর গোপাল বক্শীতে মোটে বনে না, মাঝে মাঝে কত দিন কথাবার্ত্তাই বন্ধ, অন্ন ত পৃথক্ অনেক দিন থেকে, আবার সময় সময় পাঁচীল তুলে দিয়ে বাড়ী ভাগ করবার কথাও ওঠে। তার উপর গোপালেরও ছেলে নেই, এক মেয়ে, তাকেও পরের ঘরে দিয়েছেন, তাকেই বা মদন বক্শী নিজের সম্পত্তি দিতে গেলেন কেন? কিন্তু যদি উইল না ক'রে চক্ষু বোজেন, তা হ'লে তাঁর বিষয় গোপালের আর গোপালের মেয়ের হাতে যাবে। শৈলবালা ছোট ভগিনীকে ভালবাসেন, মদনও ছোট শালীকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করেন, তবে

বিষয় তাঁদের দিতে দোষ কি? এই কথাটা নিয়ে মিষ্টার আর মিসেস রায় নাড়াচাড়া করতেন।

সাহেব বলতেন, তুমি তোমার ছেলেদের নিয়ে মাঝে মাঝে তোমার দিদির কাছে যাও না কেন?

মিসেস রায় বলতেন, আমি ত যেতে পারি, কিন্তু ছেলেরা তাঁদের রকম-সকম দেখে যদি হাসে, তা হ'লে বক্শী মশায় চ'টে যাবেন, সেই জন্য ছেলেদের নিয়ে যেতে সাহস হয় না।

—তাদের আগে থাকতে ব'লে কয়ে শাসন ক'রে নিয়ে যাবে।

এই পরামর্শ এঁটে দুই ছেলে আর মেয়েকে ডাকা হ'ল। মিসেস রায় বললেন, তোমাদের সঙ্গে ক'রে মেসো মশায়ের বাড়ী নিয়ে যাব।

মেয়ে বললে, হম লোগ তো কভি গেয়া নহি, মমা!

মেয়ের নাম সুপ্রভা, বয়স বছর বারো হবে। ডাক নামটা ইংরাজী—সোফি।

তরুবালা বললেন, সেখানে গিয়ে হিন্দী কথা কোস্ নে, আর আমাকে মা বলবি। মাসীমা আর মেসো মশায় মনে থাকবে ত?

—মউসী আর মউসা?

—হাঁ, হাঁ, বাংলা কোরে বলতে পারিস নে?

—পারব।

তার পর কয়েক দিন তরিবৎ আর শিক্ষায় গেল, মাঝে মাঝে রিহার্শালও হ'ত। এক দিন তরুবালা সাহস ক'রে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভগিনীর বাড়ী গেলেন। ছেলেরা ধুতি, মেয়ে সাড়ী পরেছে, তরুবালার শুধু পা, তাতে একটু তরল আলতাও দেওয়া হয়েছে। সমস্ত পথটা তরুবালা ছেলে-মেয়েদের শেখাতে শেখাতে নিয়ে গেলেন, মাসীমা মেসোমশায়কে কেমন ক'রে নমস্কার করতে হবে, কেমন ক'রে ভব্যিযুক্ত হয়ে বসতে হয়, কেমন ক'রে বাচালপনা করতে নেই, কেমন ক'রে ছটফট করতে নেই।

শৈলবালা দেখে আহ্লাদ ক'রে বললেন, এই যে তরু, এস, কত দিন তোমায় দেখি নি। ছেলেমেয়েদেরও সেই কবে ছোট বেলায় দেখেছিলাম। নরেন ত বিলাত থেকে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। শুনলুম, তোমরা না কি ভারি সাহেব হয়েছ, তা কৈ, আমি ত কিছু সাহেবিয়ানা দেখছি নে। ছেলে-মেয়ে যে খাসা দেখতে হয়েছে। ব'স, ব'স।

ওদিকে ছেলে-মেয়ে সব শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। চেয়ার নেই, টেবিল নেই, সোফা নেই, কুছ নহি হয়, মৌসীকা কয়সা মকান!

তরুবালা বললেন, মাসীমাকে প্রণাম কর।

তখন তিন জনে হুড়মুড় ক'রে গিয়ে মাসীমাকে প্রণাম করলে। সুপ্রভা এক পায় হাত দিয়ে নমস্কার করলে আর দুই ছেলে সুরেন আর দেবেন যোড়া হাত পায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

শৈলবালা হাসতে লাগলেন, ও কি, এক পায়ে হাত দিলে যে গোদ হয়! তা মাসী বুড়ো হয়েছে, হ'লই বা!

ঝি এসে একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে দিলে, আর একখানা তক্তপোষ ঘরে ছিল, ছেলেরা তাইতে বসল, তরুবালা বোনের সঙ্গে মাদুরে বসলেন।

এ দিক্ ও দিক্ নানা কথার পর তরুবালা বললেন, বক্শী মশায় কোথায়, তাঁকে যে দেখতে পাচ্ছি নে?

—তিনি একবার বেরিয়েছেন বাড়ী ভাড়া আনতে। এলেন ব'লে।

সহরে মদন বক্শীর কয়েকখানা বড় ছোট বাড়ী, মাসে মাসে ভাড়া অনেক আসে।

খানিকক্ষণ পরে বক্শী মশায় বাড়ী ফিরে এলেন। একখানা আধময়লা ধুতি পরনে, গায়ের জামাও সেই রকম, গলার বোতাম নেই। পায়ের জুতায় অষ্ঠে-পৃষ্ঠে তালি। তরুবালাকে দেখে বললেন, এই যে তরু, পথ ভুলে না কি?

তরুবালা উঠে তাঁকে নমস্কার করলেন, ছেলেমেয়েদের বললেন, মেসো মশায়কে প্রণাম কর। তারা উঠে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম করলে।

তরুবালা বললেন, বক্শী মশায়, আপনি ত আমাকে বলছেন, কিন্তু আপনিও ত কখনও আমাদের খোঁজ-খবর নেন না।

—বাস্ রে, তোমরা হ'লে সাহেব মানুষ, আমি গেলে হয় ত দরওয়ান হাঁকিয়ে দেবে।

—আপনার যেমন কথা, চিরকালই ঠাট্টা-তামাসা করা অভ্যাস। আমরা কি সত্যি সাহেব হয়েছি? তবে ওঁর যে রকম চাকরী, একটু ঐ রকম ক'রে থাকতে হয়।

আপনি ছেলেবেলা থেকে আমাদের দেখেছেন, এখন যদি কখন কখন আসেন, তা হ'লে কত আহ্লাদ হয়।

—তা যাব বৈ কি। এই যে তোমার ছেলে ছুটি আর মেয়ে বেশ হয়েছে। তুমি ব'স, আমি আস্‌ছি।

বক্‌শী মশায়ের কাছে বাড়ীর ভাড়ার টাকা ছিল, সেইটে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখ্‌তে গেলেন।

শৈলবালাও উঠলেন, বল্‌লেন, ব'স তরু, ওঁর ধুতিখানা আল্‌না থেকে পেড়ে দিয়ে আস্‌ছি।

ভিতরে গিয়ে ধুতি পেড়ে স্বামীর হাতে দিয়ে শৈলবালা বল্‌লেন, ওরা এসেছে, ওদের ত কিছু জলখাবার আনিয়ে দিতে হবে।

—তোমার যে যেখানে আছে, এই রকম দু চারবার এলেই ত আমাকে ফতুর করবে।

—ওরা ত রোজ রোজ আসে না। আর আমার সাত কুলে কে আছে যে এখানে আসবে?

—এই নাও, চার পয়সার খাবার আনিয়ে দাও।

—চার পয়সার খাবার কার মুখে দেব?

—তবে এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও, সিন্দুক খুলে সর্ব্বস্ব ওদের বিলিয়ে দাও।

—তুমি রাগ করছ কেন? আমি নিজের পয়সা দিয়ে ওদের খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

—তাই দাও গে। তোমারই ত বোন্ আর তার গুষ্টী।

শৈলবালা নিজের দশটি পয়সা দিয়ে জলখাবার আনতে দিলেন। কাপড় ছেড়ে এসে মদন বক্‌শী শালীর সঙ্গে গল্প-সল্প করতে লাগলেন। তরুবালা কোন কথাও মুখ ফুটে বলতে পারেন না, তবে ঠারে-ঠোরে কথার ভাবে বোঝালেন যে, বড় বোনের উপর আর ভগিনীপতির উপর তাঁর খুব টান। বক্‌শী মশায়ের-ছেলেপুলে নেই, তরুবালার ছেলেমেয়েরা সদাসর্ব্বদা তাঁদের কাছে আসবে, আর দু'চার-বার এলেই মাসীর আর মেসোমশায়ের ন্যাওটো হবে।

বক্‌শী মশায় এ সব কথার কোন উত্তর দিলেন না। বললেন, কৈ, নরেনকে ত আর বড় একটা দেখ্‌তে পাই নে।

—উনি বলেছেন, শীগ্‌গির আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। যে কাযের খাটুনি, একটুও সময় হয় না।

আবার আসবেন ব'লে তরুবালা সেদিনকার মত বিদায় নিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পূর্ণিমার চাঁদ

নীল-নভ-হ্রদ-বক্ষ করিয়া উজ্জল
ভাসে ও কি জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতশতদল?
অথবা অপ্সরা কোন করিছে গাহন
আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে? বর্ত্তুল গঠন

রজত-দর্পণখানি নীলাঞ্চলপরে
রেখেছে কি শচীরাণী প্রসাধন তরে?
বুঝি বা ও মধ্য-মণি তারকার হারে
ঝলমল করিতেছে নীলিমা বিথারে?

কিম্বা ও মর্ম্মরভাণ্ডে ফেনোচ্ছল সুধা,
রেখেছে দেবতা কোন মিটাইতে ক্ষুধা?
পারিজাত-মধুপূর্ণ মধুচক্র কি রে,
তারা মৌমাছিদল আছে তাই ঘিরে?

বুঝিতে পারি না কিছু মুগ্ধ দুনয়ন,
আনন্দে বিস্ময়ে শুধু দেখিছে স্বপন।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।



চয়ন

মোটর-চালিত লৌহ-হস্তী

জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক লৌহ-নির্ম্মিত একটি হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জীবিত হস্তীর আকার যেরূপ বৃহৎ, এই লৌহ-হস্তীর আকারও তদ্রূপ। হস্তিদেহে পাঁচ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট মোটর-যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। হস্তী যে ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করিতে করিতে অগ্রসর হয়, মোটর-যন্ত্রের সাহায্যে লৌহ-হস্তীও সেই ভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে দর্শকদল বিশেষ কৌতুক অনুভব করিয়া থাকে।



মোটর-চালিত লৌহ-হস্তী

শিক্ষিত যুবকের বাহাদুরী

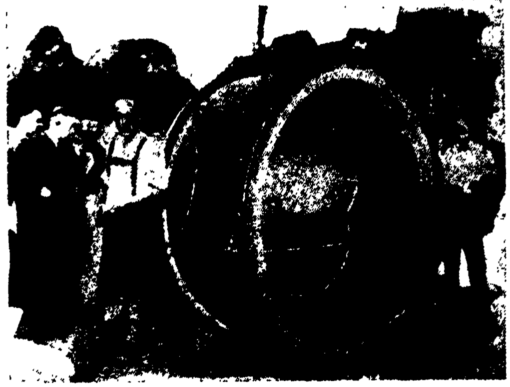
যে সকল অশ্বারোহী ঘোড়ার পৃষ্ঠে থাকিয়া ভূমি হইতে বোঝা তুলিয়া লইবার প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অশ্বকে অতি অদ্ভুতভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অশ্ব দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে, সেই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আরোহীকে ভূপতিত বোঝা তুলিয়া লইতে হইলে অশ্বের শরীরকেও তদনুসারে এক পাশে হেলাইয়া দিতে হয়। সে অবস্থায় ভূপতিত জিনিষ তুলিয়া লওয়া অত্যন্ত সাহসের কার্য্য। কারণ, ঘোড়াও যদি বিশেষভাবে শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে বাহন সহ আরোহীকে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পাইতে হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, শিক্ষিত অশ্ব ৪৫ ডিগ্রি শরীর হেলাইলেও তাহার চক্ষু-যুগল ভূমির সহিত সমান্তরাল থাকে।



শিক্ষিত অশ্বের বাহাদুরী

আবর্ত্তনশীল গৃহ

দুই জন জার্ম্মাণ মল্ল দেশদেশান্তরে মল্ল-ক্রীড়া দেখাইয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা এক বৃহৎ বর্ত্তুলাকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করেন। এই বর্ত্তুলাকার গৃহ অশ্ব বা গর্দ্দভ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বর্ত্তুলাকার বস্তুটির মধ্যে তাঁহাদের যে শয়ন-গৃহ আছে, তাহা সকল সময়েই সোজা অবস্থায় থাকে।



আবর্ত্তনশীল গৃহ

শূন্যপথে খেয়া

ওরিগন ও পুডিং নদীর এক স্থানে শূন্যপথে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। এক জন লোক নদীর উপর দিয়া তার খাটাইয়া, নিজের মোটর গাড়ীর চাকার টিউব নল খুলিয়া ফেলিয়া

সেই গাড়ী তারের উপর দিয়া চালাইতেছেন। মোটর-গাড়ীতে চাকার দুই পার্শ্বে রবারের বেষ্টনী থাকে। দুইটি তারের উপর চারিখানি চাকা এবং উপরের তারের সহিত একটি চক্রদণ্ড আবদ্ধ থাকে। ইহাতে গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার



শূন্যপথে খেয়া

কোনও আশঙ্কা থাকে না। এই নদীপথটি ১ শত ২০ ফুট দীর্ঘ। এক গ্যালন গ্যাসোলিন সাহায্যে ৬ হাজার ৫ শতবার গাড়ী যাত্রি-বহন করিয়া থাকে।

নমনীয় কাঠের কেদারা

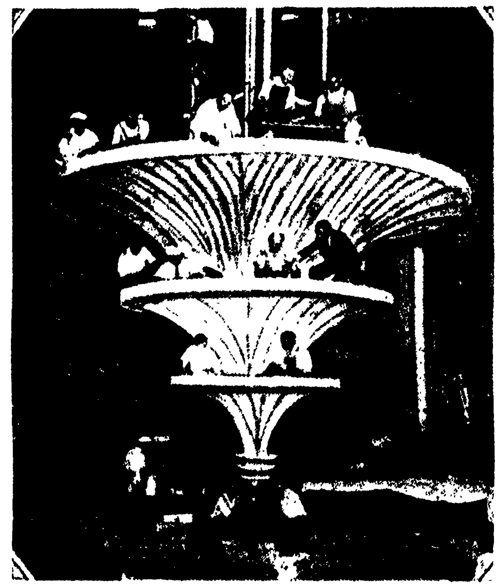
এই চেয়ার বা কেদারা দারু-নির্ম্মিত, কিন্তু স্প্রীংএর ন্যায় নমনীয়। ইহাতে উপবেশন করিলে মানুষের ভারে উহা ঈষৎ আনমিত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই চেয়ারে উপবেশন করিলে বেশ আরাম অনুভূত হইয়া থাকে।



নমনীয় কাঠের চেয়ার

বৃহত্তম বাতিদান

নিউ ইয়র্ক সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীতাগার নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে আলোকদান করিবার জন্য একটি বাতিদান তৈয়ার হইয়াছে। এই বাতিদানটির ওজন ১ শত ৭৫ মণেরও উপর। ইহার ব্যাস ২৫ ফুট। এক শত জন কারিগর ৩ মাস



বৃহত্তম বাতিদান

ধরিয়া উহার নির্ম্মাণকার্য্যে রত ছিল এবং ১৫ জন শ্রমিক শিল্পী এক সপ্তাহব্যাপী পরিশ্রম করিয়া উহার অংশগুলি সংযোজন করিয়াছে।

হংসাকৃতি গৃহ

লং দ্বীপে একটি পথের ধারে এক জন গৃহপালিত পক্ষি-ব্যবসায়ী ১৪ ফুট উচ্চ একটি হংসাকৃতি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গৃহপালিত পক্ষী উক্ত স্থানে বিক্রীত হয়, এই বিজ্ঞাপন দিবার অভিপ্রায়েই উক্ত ব্যবসায়ী এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মোটর চালাইবার সময় উক্ত গৃহ সকলেরই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। হংসের বক্ষোদেশে

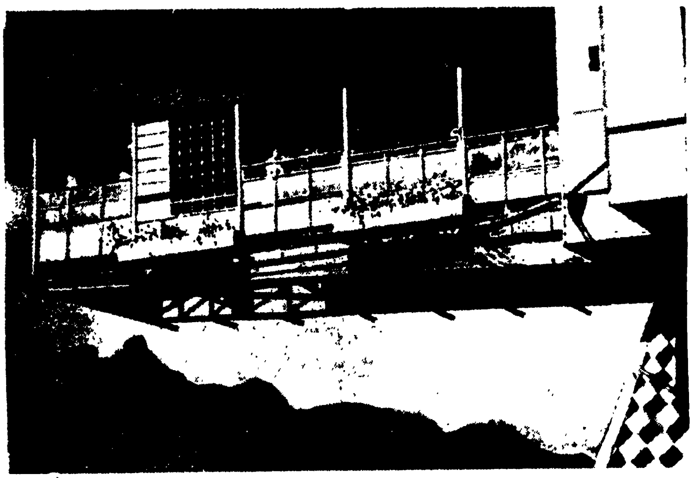


হংসাকৃতি গৃহ

একটি দ্বার আছে। উক্ত হংসাকৃতি গৃহমধ্যে আপিস-ঘর ও বিক্রেয় পণ্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

আবর্ত্তমান হাসপাতাল

ফ্রান্সে একটি উচ্চ সৌধের সঙ্গে একটি আবর্ত্তমান হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইস্পাত ও কাচের সাহায্যে এই হাসপাতাল নির্ম্মিত। ইহা এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, ইচ্ছামত ইহাকে যে কোনও দিকে আবর্ত্তিত করা যায়। সূর্য্যালোক যাহাতে পূর্ণমাত্রায় এই

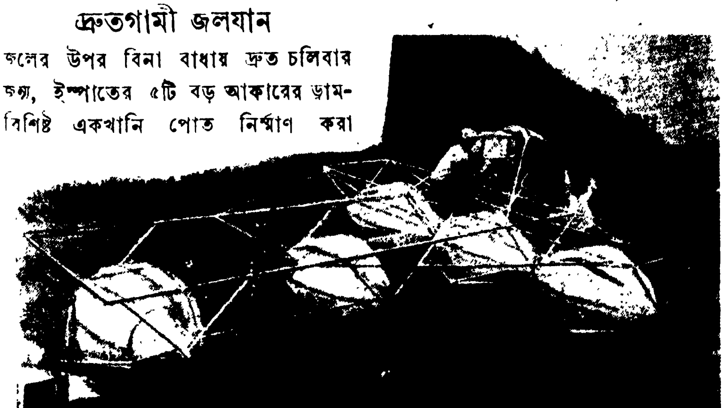


আবর্ত্তমান হাসপাতাল

হাসপাতালের রোগীরা ব্যবহার করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সূর্য্যালোক রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে অনেক ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে।

দ্রুতগামী জলযান

জলের উপর বিনা বাধায় দ্রুত চলিবার জন্য, ইস্পাতের ৫টি বড় আকারের ড্রাম-বিশিষ্ট একখানি পোত নির্ম্মাণ করা

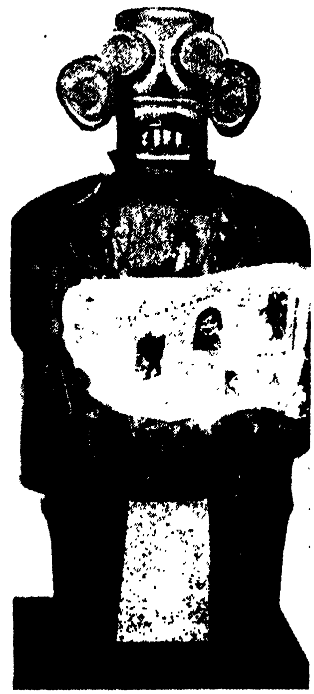


দ্রুতগামী জলযান

হইয়াছে! ড্রামগুলি যাহাতে স্থানভ্রষ্ট না হইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে চিত্রে বর্ণিত আকারে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জলের উপর নৌকা চলিবার সময় ড্রামগুলি আবর্ত্তিত হইতে থাকে। মোটর-গাড়ীর চাকা যেমন আবর্ত্তিত হয়, জলের উপর ড্রামগুলি সেইভাবেই আবর্ত্তিত হয়। ৬০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট মোটরে নৌকাখানি চালিত হয়। ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত।

কলের মানুষ

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রম করিয়া জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ১৮ হাজার ডলার মুদ্রা ব্যয়ে একটি যন্ত্র-মানব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মানুষের ন্যায় এই যন্ত্র-মানবটি অনেক কায করিতে পারে। উদ্ভাবনকারী বলেন যে, এই যন্ত্র-মানব কথা কহিতে পারে, গান গাওয়া, শিস দেওয়া, হাস্য করা অথবা একযোগে অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া কথা বলিবার শক্তিও ইহার আছে। এই যন্ত্র-মানবটির আরও একটা গুণ আছে যে, সংবাদপত্র পাঠ এবং ঘড়ীতে কত বাজিয়াছে, তাহাও সঠিক-



কলের মানুষ

ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে। হাতে রিভলবার দিলে যন্ত্রের মানুষ তাহার দ্বারা গুলী নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ। বিজ্ঞানের বাহাদুরী নহে কি?

রবারের নৌকা

মৎস্য ও হংস-শিকারীদিগের জন্য রবারের একপ্রকার নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে মোটরযন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। দুই জন,

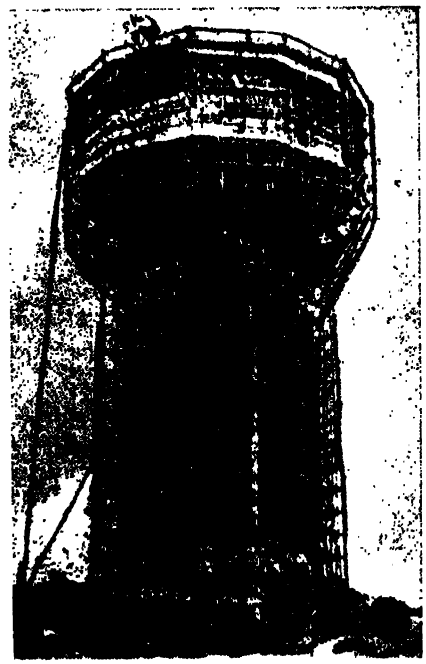


রবারের নৌকা

চারি জন বা ৬জন লোক বসিতে পারে, এমন বিভিন্ন আকারের নৌকাও আছে। নৌকার পাশগুলি বায়ুপূর্ণ করিবার ব্যবস্থা আছে। বসিবার আসনগুলি রবার-নির্ম্মিত এবং বায়ুপূর্ণ। নৌকাগুলি ভারবহনে সমর্থ এবং উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও নাই। সমুদ্রে ঝড় উঠিলেও বিপদের আশঙ্কা নাই।

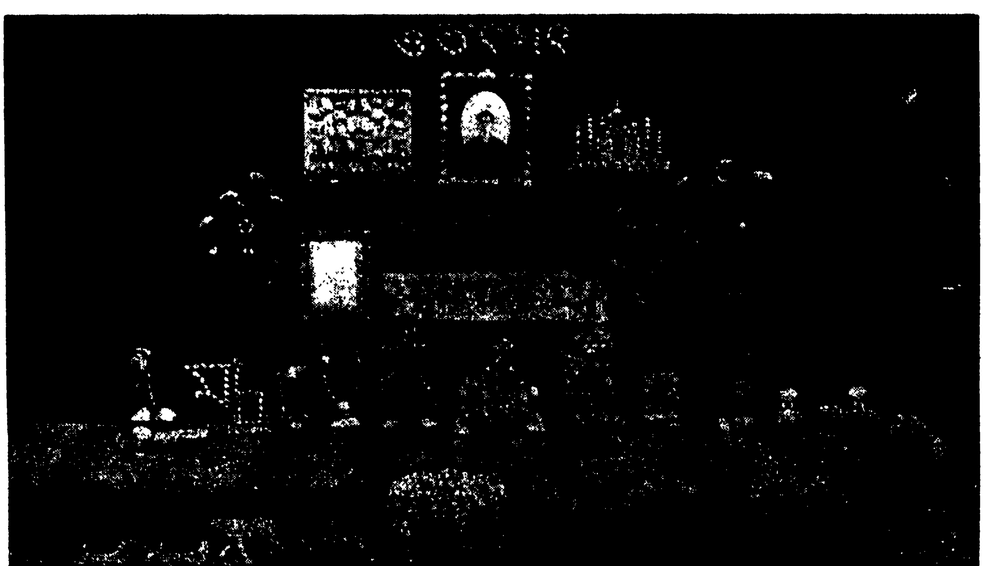
বৃহৎ জল-মঞ্চ

ইংলণ্ডের গ্রেট ইয়ার মাউথের যে সুবৃহৎ জলমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার মত বড় জলমঞ্চ কুত্রাপি নাই। উহার উচ্চতা ১ শত ৬২ ফুট। চৌবাচ্ছায় ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার গ্যালন জল ধরে। ক্যাইষ্টার হইতে গর্লেষ্টোন পর্য্যন্ত নর্থসির উপকূল ভাগস্থিত সমগ্র স্থানে ঐ জলমঞ্চ হইতে জল সরবরাহ করা হইবে।



সুবৃহৎ জলমঞ্চ

শিল্প-নিদর্শন



দেশীয় শুক্তি সমূহের সমবায়ে নিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় ভক্তিভূষণ এই সুন্দর শিল্প-রচনা করিয়াছেন

বসন্ত-উৎসব

১

'বাগবাজার, বাবু, আহিরীটোলা,'—ঘাটের মাঝিরা খুবই হাঁক-ডাক করিতেছিল। ঘাটে ও ঘাটের সম্মুখের চাঁদনীতে যেন রথ-দোলের ভিড়, আশে-পাশেও অবিরাম জনস্রোত, যেন জাহ্নবী-স্রোতেরই মত অনন্ত, অবিশ্রান্ত। শিশুর ক্রন্দন, বালক-বালিকার হুড়াহুড়ি, পুরনারীদের হাস্যকলরব, বৈরাগীর খঞ্জনীর সঙ্গে গান, ভিখারীর একতারার নিক্কণ, ছোকরা বাবুদের থিয়েটার-সঙ্গীত, গঞ্জিকার চড়-চড় দম, মাতালের হল্লা, এ সকলের সহিত দাঁড়ি-মাঝিদের যাত্রী শিকারের চীৎকার দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দিরের ঘাটটিকে গুলজার করিয়া রাখিয়াছিল।

অনিলবরণ ঘাটের উত্তরপার্শ্বস্থ পোস্তার উপর একান্তে ভাদ্রের ভরা গঙ্গার অনন্ত প্রবাহের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাতের তুলিটি অযত্নে ধৃত—সে যেন এই কর্ম্ম-কোলাহল হইতে কোথায় কোন্ অজানা জগতে চলিয়া গিয়াছে!

হঠাৎ পার্শ্বে বৈরাগীর একতারা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গান,—

"এই কলেবর, জেনো পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে আছ ভাড়াটে ঘরে।"

অনিল স্মিত-মুখে সে দিকে চাহিবামাত্র বৈরাগী বলিল, "একটি পয়সা দাও, বাবা!"

অনিল হাসিয়া বলিল, "ঠিক গাইছিলে বাবাজী! কলেবরটা ভাড়াটে ঘরই বটে, কবে আছি, কবে নেই, কে বা কার, কি বল?"

"গরীব-দুঃখী, ভিক্ষে ক'রে খাই, বাবা। একটি পয়সা দাও বাবা, ধনে পুত্রে"—

অনিল ভিক্ষাটা দিবার সময় বলিল, "ভাড়াটে ঘর বটে, কিন্তু ভাড়া যোগাবার জন্যে ভিক্ষের ঝুলিটাও কাঁধে করতে হয়, না বাবাজী?"

বৈরাগী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনিলকে শত বৎসর পরমায়ু এবং ধনে পুত্রে লক্ষ্মী প্রদান করিয়া অন্যত্র শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেল।

চিত্রশিল্পী হইলেও অনিল কাঁচা বয়স হইতেই সংসারের ঝড়-ঝাপ্টায় নাকানি-চোবানি খাইয়া বস্তু-তান্ত্রিকতায় বিলক্ষণ পাকাপোক্ত হইয়াছিল। সে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে কেবল বলিল,—"এমন ভিখিরী সন্ন্যিসীর ঘটা আর কোথায় আছে?"

"আরে!"—হঠাৎ বিস্ময়সূচক সম্ভাষণে অনিল ভয়ানক চমকিত হইল, সম্মুখে যাহাকে দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, সেও সমান ওজনে বলিল, "আরে! অনিল, তুই এখানে?"

"আর তুমি প্রণব, তুমি কোত্থেকে ভাই?"

আগন্তুক অনিলের অঙ্কোপরি দুইটি হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "উঃ, দশ দশটা বছর—একটা যুগ, না রে, অনিল? কোথায় ছিলি তোরা এদ্দিন? কি করিস? কোথায় থাকিস? পুষ্প! সে কোথায়?" ঝড়ের বেগে কথাগুলি বাহির হইয়া গেল।

অনিল তন্ময়চিত্তে বাল্য ও কৈশোরের অভিন্ন-হৃদয় সতীর্থ বন্ধুর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতেছিল। প্রণব? তাহার আদর্শ প্রণব? রমণীসুলভ কমনীয় লাবণ্য এখনও তাহার সুন্দর সুগৌর আননে, দীর্ঘায়ত নয়নে, কুঞ্চিত কেশদামে, প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীতে, প্রতি পাদবিক্ষেপে লীলায়িত হইতেছিল। এখনও চিন্তালেশহীন মুখমণ্ডল বালকের সরল হাসির আলোকে সমুজ্জ্বল,—স্বভাবকবি কিশোর সাহিত্যিক প্রণবকুমার দীর্ঘ দশ বৎসরেও ত বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পরিবর্ত্তন যাহা কিছু, তাহা কেবল বহিরাবরণে, বেশপ্রসাধনে। আর—আর—সে কি তাহার হাস্যপ্রফুল্ল নয়নের কোলে কালিমা-রেখা লক্ষ্য করিতেছে, তাহার প্রশস্ত ললাট কি রেখাঙ্কিত বলিয়া মনে হইতেছে?

"কি রে, হাঁ ক'রে আমায় তাকিয়ে দেখছিস কি? আমি কি চিড়িয়াখানার জন্তু? হাঃ হাঃ! যা জিজ্ঞাসা করলুম, জবাব দিলি নি ত।" প্রণব পাঁসনেখানা সুদৃশ্য রেশমী রুমালে মুছিয়া লইল; সমস্ত বাতাসটা মূল্যবান্ এসেন্সের গন্ধে ভরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গুরীয়ের হীরকখণ্ডগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তাহার জরিদার

দিল্লীয়াল লপেদির উপর অযত্নবিন্যস্ত সিল্কের চাদরখানা লুটাইয়া পড়িয়াছিল, অনিলবরণ সেখানা তুলিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, বলিল, "আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছো? সে সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছবেলা পেটের অন্ন জোটানই যাদের দায়, তাদের আবার চাল-চুলো!"

অনিলবরণের মৃদু-মন্দ হাস্যে ব্যর্থ জীবনের তিরস্কার-রেখা ফুটিয়া উঠিল কি?

প্রণব তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বাগানের গেটের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "চল, বাড়ী ফিরে যাই, যেতে যেতেই সব শুনবো। তোরা সেই যে কালীঘাট থেকে হঠাৎ চ'লে গেলি, তার পর কোনও খবর পাই নি। এখন কি কলকাতায় আছিস? পুষ্প! সে কোথায়? শ্বশুরবাড়ী বোধ হয়?"

অনিলের মুখে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিল। সে বলিল, "হুঁ, কাঙ্গালের রাজতক্ত! গরীব-দুঃখীর ঘরের কালো মেয়ে, তার আবার বিবাহ!"

"কালো মেয়ে? তার মানে?"

"মানে যা, তাই। ছোট বোনের মত দেখতে, ভাল-বাসতে তাই, না হ'লে বাঙ্গালীর ঘরের শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায়, তাই নয় কি, ভাই? কে নেবে বিনি পয়সায় তাকে বল ত?"

এত তরুণ বয়সে এ কি বিষাদের সুর? প্রণবের সদা সুখান্বেষী তরল মন যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে অন্য কথার অবতারণা করিয়া বলিল,"হাতে এটা কি রে? তুলি? ছবি আঁকিস্ না কি? কি আঁকছিলি?—মন্দির? না, বালিব্রিজ? সখ ত কম নয়, এই ভিড়ে"—

অনিল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "হুঁ, সখই বটে, ব্যবসাদারদের বিজ্ঞাপনের ছবি যুগিয়ে কোন রকমে পেটের ভাত যোগাড় করাকে যদি সখ বলতে চাও বল, তাও সব দিন যোটে না।" অনিল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল।

প্রণবের প্রাণে দাগ পড়িল কি? সে কিন্তু কোনও জবাব না দিয়া সুবর্ণশীর্ষ হস্তিদন্তের ছড়িটি তুলিয়া গেটের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চল ঐ দিকে, ঐখানে গাড়ী আছে।"

অনিল বলিল, "বাঃ, আমি যাব প্রায় বালিগঞ্জের কাছাকাছি—চক্রবেড়ে"—

"বটে! তা, আমিও ত যাব বেলতলা, তোকে পৌঁছে দিয়ে যাব, অমনি পুষ্পের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো'খন। এলি কিসে?"

"কেন, বাসে।"

"আরে রাম! উঃ, যে ধূলো আর যে ভিড়, আমি হ'লে ত দম আটকেই মারা যাব। তোর তোড়যোড়?"

"এই ক্যাম্বিসের ব্যাগে—তোড়যোড় ত ভারি!" অনিল অন্যমনস্কভাবে জবাবটা দিল বটে, কিন্তু সে তখন ভাবিতেছিল, কালীঘাট সানগরে তাহাদেরই চালার পার্শ্বে প্রণবদের জীর্ণ পর্ণ-কুটীরের কথা, পথের ধূলায় তাহাদের খেলাধূলা! আজ প্রণব বাসের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল!

মোটরের দ্বার মুক্ত হওয়ার আওয়াজে সে চমকিয়া উঠিল—সম্মুখে প্রকাণ্ড সুদৃশ্য মোটর। এ কি প্রণবের? উহার মূল্য কত হাজার হাজারই না হইবে!

মোটরে চাপিতে গিয়া কি ভাবিয়া প্রণব সোফারকে বলিল, "এই ব্যাগটা নাও, আর দেখো, গাড়ী নিয়ে বাগ-বাজারে খোড়ো পোস্তার ঘাটে হাজির থেকো। আমরা নৌকোয় যাব।"

এ কি খেয়াল! অনিল প্রণবের সঙ্গে ঘাটে প্রত্যা-গমনকালে বলিল, "সত্যি নৌকায় যাবে না কি?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যে? বেশ ছজনে আরামে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চাঁদের আলো ফুট ফুট করছে, তার উপর গঙ্গার খোলা হাওয়া—আঃ!"

"আরতিটা দেখে যাবে না?"

"সে তখন আর এক দিন হবে। দেখ্, খালি খালি 'তুমি তুমি' করছিস যে? এবার বল্‌লে জবাব দোব না।"

ছই জনে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া পড়িল, নৌকা হেলিয়া ছলিয়া গঙ্গা-প্রবাহ ভেদ করিয়া চলিল। প্রণব হাসিয়া বলিল, "ভয় করছে না কি রে টলছে ব'লে? হাঃ হাঃ! যদি দিনের পর দিন জলের রাশ ঠেলে সাগরে পাড়ি দিতিস আমার মত, তা হ'লে কি করতিস, ভেবে পাইনে। গান-টান আসে তোর? স্কুলে পড়তুম যখন, তখন ত গুণ-গুণ করতিস রে। আঃ, কি হাওয়া, কি ফুটফুটে

জোছনা! ঐ নৌকোটায় কি চমৎকার বাঁশী বাজাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, গলা ছেড়ে গান ধরি।"

বলিতে বলিতে প্রণব বালকেরই মত কমনীয় কোমল-কণ্ঠে গান ধরিল,—

"চারু রূপরাশি, মধুমাখা হাসি,
বড় ভালবাসি শশি!"

গাহিতে গাহিতে সে তন্ময় হইয়া গেল।

অনিলের কর্ণ-কুহরে সে সুর পশিল কি? সে তখন সুখস্মৃতিভরা কোন্ এক সুদূর অতীতে চলিয়া গিয়াছিল। মাতৃহারা তাহারা দুটি ভাই-বোন্, পিতা মোড়লদের সেরেস্তার মুহুরী, আর তাহাদেরই গঙ্গাতীরের ক্ষুদ্র পর্ণশালার গায়ে যে চালাখানা কোনমতে খোঁটা-খুঁটির সাহায্যে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানা ছিল প্রণবদের। পিতার উদয়াস্ত চাকুরী—কদাচিৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত, পিতৃষ্বসা তাহাদের খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, পুষ্পকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া পাড়ার পাঠশালে পাঠাইয়া দিতেন, প্রণবও তাহাদের সহিত যাইত। সে আজ চৌদ্দ বৎসরের কথা, তখন পুষ্প পাঁচ বছরের ছোট মেয়েটি, আর তাহারা দশ বৎসরের। প্রণবের পিতা ছিলেন মায়ের মন্দিরের পূজারী পাণ্ডা। প্রণবরা ভাই-বোন্ অনেকগুলি, কিন্তু তাহাদের সহিত প্রণবেরই ছিল বেশী মিশামিশি। তাহারা তিন জনে পথের ধূলায় খেলা করিত, গঙ্গায় সাঁতার কাটিত, ঝগড়া-মারামারি করিত, আবার গলাগলি করিয়া ভাব করিত। প্রণব পুষ্পর পড়া বলিয়া দিত। পাড়ার ছেলেরা পুষ্পকে প্রণবের বৌ বলিয়া ক্ষেপাইত, প্রণব হাসিত, পুষ্প রাগিয়া যাইত। কিন্তু অনিল তাহার সমবয়স্ক হইলেও সংসারের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল, তাই সে জানিত, প্রণবের সহিত পুষ্পের বিবাহ হইতে পারে না, কেন না, তাহারা বারেন্দ্র আর প্রণবরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

সুখে দুঃখে তাহাদের দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ কোথা হইতে সব ওলট-পালোট হইয়া গেল। এক দিন তাহার পিতা তাহাদের অকুল পাথারে ভাসাইয়া বিসূচিকা-রোগে ইহলোক ত্যাগ করিলেন, পিতৃষ্বসা তাহাদিগকে লইয়া পল্লীর পরিত্যজ্য ভদ্রাসনে চলিয়া গেলেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা। সে বাল্যকাল হইতেই চিত্রাঙ্কনে অনুরাগী ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সেই সে লেখাপড়া ছাড়িয়া চিত্রাঙ্কনেই মগ্ন হইল। পল্লীচিত্র অঙ্কনে সে সিদ্ধ-হস্ত হইল। পিতৃষ্বসার দেহান্তের পর ভগিনীকে লইয়া সে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল। সে আজ চারি বৎসরের কথা। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে—

"কি রে, একবারে মসগুল হয়ে ভাবছিস কি? গা না একখানা, জানতিস ত গান আগে।"

অনিল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "গান? গানের রস শুকিয়ে গিয়েছে অনেক দিন। তোর খবর কি বল্ দিকি? কলকাতায় ফিরে এসে শুনেছিলুম, বড়লোকের ঘরে বিয়ে করেছিস্—তোর না কি সানগরের ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।"

প্রণব বিরক্ত হইয়া বলিল, "ও সব কথা পরে হবেখন। এখনকার কালে অতীত নিয়ে কে থাকে রে, বর্ত্তমানের কথা বল"—

অনিল বিস্মিত হইল, তাহার সমস্ত প্রাণ প্রণবের কথাটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু নৌকা ঘাটে ভিড়িতেই তাহাদের চমক ভাঙ্গিল, দুই বন্ধু গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। পথে প্রণব দেশের কথা ছাড়িয়া বিদেশের কথাতেই মসগুল হইয়া রহিল।

২

ছয় মাস পরের কথা। স্কুলের চাকুরী ও টিউসানি সারিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুষ্প তাহাদের চক্রবেড়ের বাসায় ফিরিয়া উনান ধরাইবে কি না ভাবিতেছিল। একে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তাহার উপর তাহার বিষম মাথা ধরিয়াছিল, সে ভিজা গামছাখানা কপালে জড়াইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিল। তাহার আহারের প্রয়োজন হইবে না সত্য, কিন্তু দাদা? তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সারাদিন পরে যখন ঘরে ফিরিবেন? না, যাহা হয় কিছু রন্ধন করিতেই হইবে। আজ পিতৃষ্বসা জীবিত থাকিলে কি এ ভাবনা ভাবিতে হইত, না তাহাকে দাদার সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইত? দুঃখবেদনাজড়িত অতীত—বর্ত্তমানও তাই, ভবিষ্যতে হয় ত আরও কি সঞ্চিত

আছে! অলক্ষ্যে নয়নপ্রান্তে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

জন-বিরল পল্লীর জরাজীর্ণ একতল বাসাবাড়ী—তাও মাসিক ভাড়া আঠারো টাকা! ভাই-ভগিনী উভয়ে পরিশ্রম করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতেছে। তাও দাদার আয়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই; ফুরণের কায,—যেমন জোটে, তেমনই আয়।

ভোঁ ভোঁ মোটরের হরণ বাজিল,—তাহাদের কুটীর-দ্বারেই না গাড়ী থামিল? কে আর,—নিশ্চিতই বৌদি, প্রণবদার বৌ আহ্লাদী পুতুল! পুষ্প গামছাখানা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নে, নে পুষ্প! চট্ ক'রে কাপড়টা ছেড়ে নে, সাড়ে ৬টায় আরম্ভ। চল, চল, সবাই ব'সে আছে তোর জন্যে"—আগন্তুকা গাড়ী হইতেই ব্যস্তভাবে পুষ্পকে আহ্বান করিল। সে শৈলজা, তাহার প্রণবদার স্ত্রী।

পুষ্প বিস্মিত হইয়া বলিল, "যাব? কোথায় বৌদি? এস বসো।" পুষ্প তাহার বৌদিদির নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে নামাইয়া আনিল। হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, চোখ দুটি গোলগাল, স্থূল ওষ্ঠ-নাসিকা, মুখখানি হাসি হাসি; মনে হয়, সংসারের ঝড়-ঝাপটার অভিজ্ঞতা কখনও তাহার হইয়াছে কি না সন্দেহ। সেই মাথায় কখনও গভীর চিন্তা দেখা দেয়, এ কথা তাহার অতি বড় শত্রুও কখনও বলিবে না। পুষ্প নিরর্থক তাহাকে আহ্লাদী পুতুল আখ্যা দেয় নাই।

পুষ্প তাহাকে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে বলিল, "না ভাই, আজ না। জানিস নি কি, আজ সিলেস-চিয়াল টকি হাউসে জর্জ্জ বার্ণাড শয়ের রিসেপসান সিন দেখানো হবে? ডাবলিন য়ুনিভার্সিটির লেডী গ্রাজুয়েটরা অভিনন্দন করবেন। তাই আজ আমরা সবাই যে যাচ্ছি রে—দীপ্তি যাবে, অণিমা যাবে, বীণা যাবে, মনীষা যাবে। ওরা কি রকম ক'রে বন্দনা করে, সেটাও দেখে রাখা ভাল। আর তা ছাড়া টকি হাউসে বসেই ত আমাদের বসন্ত-উৎসবের প্রোগ্রাম তৈরী করবার কথা—তোর পার্টটাও ঠিক করা হবে। তোর ও-বাড়ীর দাদা, গুরুদেবের যে প্রশস্তি কবিতাটি লিখেছেন—সেইটে তোকে আবৃত্তি করতে দেওয়া হবে ব'লে কথা হচ্ছে। তিনি প্রায় ত আসেন এখানে, নিজেই শিখিয়ে দিয়ে যাবেন রোজ এসে"—

গৈরিক-নিঃস্রাবের মত কথার অনন্ত স্রোত বহিয়া যাইতেছিল, পুষ্প বাধা দিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিল, "আজ যে ভাই দাদার এখনও খাওয়া হয় নি"—

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, গিয়েই বামুন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দোবো'খন, জান্‌লি? উঃ, স'ছটা হয়ে গেল, নে লক্ষীটি, কাপড়টা ছেড়ে নে।"

ফাল্গুনের গোধূলি, তখনও বেশ আলো রহিয়াছে, সেই আলোকে রিষ্টওয়াচটা দেখিয়া শৈলজা আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "আরও দেরী করে বাঁদরী কোথাকার! তোর কি একটু উৎসাহ নেই? রাজ্যির লোক আসবে উৎসব দেখতে, তার মধ্যে এতবড় একটা পার্ট করবি,—কত মেয়ে যে ওটা চেয়েছিল, তা কি বলবো! কত লোকের চোখ তোর উপর পড়বে বল দিকি! তার উপর স্বয়ং গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ—কত জন্ম তপস্যা করিছিলি বল দিকি যে যাঁর একটা মুখের কথা পেলে লোকে জন্ম সফল মনে করে, তিনি গায়ে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন,—বল দিকি, এ সৌভাগ্য কে পেতে না চায়?"

ঝড়ের মত কথা বহিয়া যাইতেছিল—চিন্তা নাই, ওজন নাই, সহজ অনায়াসগতি ভাবনালেশহীন জীবনপ্রবাহের অনুরূপই সেই কথার প্রবাহ। তাহার অন্ত কখন্ হইত, তাহা কেহই বলিতে পারিত না, কিন্তু হঠাৎ এক জন বাহির হইতে দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"ওঃ, তুমি? মোটর দেখে ভাবলুম, প্রণব এসেছে। কতক্ষণ এসেছ, শৈল?" সে অনিলবরণ।

শৈলজা তাহাকে দেখিয়া আবদারের সুরে বলিল, "বলুন না অনিল বাবু, পুষ্পকে যেতে!"

"যেতে? কোথায়?"

"সিলেসচিয়াল টকি হাউসে—এই দেখুন না, ৬টা কুড়ি হয়ে গেল"—

পুষ্প বলিল, "না দাদা, আর এক দিন যাব, আজ বড্ড মাথা ধরেছে"—

শৈলজা ধমক দিয়া বলিল, "তোর মুণ্ডু ধরেছে! দেখুন অনিল বাবু, ও আপনার খাওয়া হয় নি ব'লে যেতে চাইছে না।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "যাও না পুষ্প, বলছেন অত ক'রে। আমি এইমাত্র অরবিনদের ওখানে ভরপেট খেয়ে আসছি।"

"তোর কোন কথা শুনছি কি না," বলিয়া পুষ্পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শৈলজা তাহাকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। যাত্রাকালে বলিল, "একটু রাত হবে, অনিল বাবু। আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আসবে, জানলেন?" গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অনিল ঘরে আসিয়া আপন মনে বলিল, "পুষ্প বলে মিথ্যে নয়—আহ্লাদী পুতুল। যেন প্রজাপতিটি! বড় লোকের মেয়ে, ভাবনা-চিন্তে নেই ত!"

এইটিই পুষ্পের শুইবার ঘর। সেই ঘরেই তাহাদের সংসারের ভাণ্ডার, ড্রয়িংরুম, 'আসবাবপত্র' যাহা কিছু সবই, পশ্চাতে সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দরমাঘেরা রান্নাঘর। পার্শ্বের ছোট কামরায় তাহার নিজের শয়নকক্ষ, কোন-রকমে সেখানে তাহার ক্যাম্পখাটখানির স্থান হইত, আর তাহারই তলে তাহার চিত্রাঙ্কনের সাজসরঞ্জাম কষ্টেসৃষ্টে আপনাদের স্থান করিয়া লইয়াছিল।

যাহাদের এই অবস্থা, তাহারা মোটরে চড়ে, টকি হাউসে যায় উৎসবে যোগ দেয়! শৈলজা পুষ্পকে লইয়া গিয়া ভাল করিল কি? কেন, এমন ত অনেক দিনই লইয়া যায়। এই কয় মাসের ঘনিষ্ঠতায় পুষ্প ত এখন শৈলজা-দেরই হইয়া গিয়াছে। সে ত ভাল কথা। সে অকৃতী, দরিদ্র, স্নেহময়ী সহোদরাকে এক দিনও সুখের মুখ দেখিতে দিল না—নারী হইয়াও তাহার কেবল হাড়ভাঙ্গা খাটুনি! তাহার সমবয়স্কারা যে বয়সে জীবনে আনন্দ ও সুখই উপ-ভোগ করিতে পায়, তাহার অনুজার ভাগ্যসূত্র তাহার নিজের ব্যর্থ জীবনের সহিত গ্রথিত হওয়ায় সে ত সেই বয়সে নারী-জীবনের প্রথম প্রভাতের কোনও আলোক, কোনও উত্তাপই পাইল না! নীরস কঠোর দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম! অনিল পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিল কেন? যদি স্নেহকরুণাময়ী শৈলজা হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের উত্তাপ ও আলোকসম্পাতে এই অনাদৃতা লতাটিকে সরস ও সজীব করিয়া তুলিবার নিমিত্ত বিশ্বনিয়ন্তার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে সে ত আনন্দেরই কথা।

না, তাই কি? কাংস্যপাত্রের সহিত মৃন্ময়পাত্রের হৃদ্যতা কাহার পক্ষে অনিষ্টকর? ধনীর বিলাস-লালসার সহিত তাহাদের এই দরিদ্র জীবন-সংগ্রামের সামঞ্জস্য কোথায়? এ প্রলোভন পতঙ্গের নিকটে দীপ্ত অনলশিখারই মত প্রাণঘাতী—এ মোহ, এ আকর্ষণ ত্যাগ করাই ত ভাল।

দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের সন্তান প্রণব—বাল্যের ও কৈশো-রের খেলার সাথী হৃদয়বান্ প্রণব—বিলাসের প্রলোভনে আজ তাহার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! ধনী শ্বশুরের অর্থে তাহার য়ুরোপযাত্রা—অসম্পূর্ণ শিক্ষা—শ্বশুরের অকালে পরলোকগমন—তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—পত্নীর অগাধ সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব—সাহিত্যক্ষেত্রে কবিযশঃপ্রার্থিতা—তাহাও খেয়াল, তাহাও সৌখীন ধনীর বিলাসিতার তৃপ্তি-সাধনের চেষ্টা মাত্র!—এ সংসর্গ যদি প্রাণঘাতী না হয়, তবে কি হইবে? যে বিবাহের পর হইতে পিতার দরিদ্র সংসারকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিল, সে সংসার হাজিয়া মজিয়া গেলেও তত্ত্ব লওয়ার যাহার সুযোগ ঘটিত না, তাহার ভালবাসা ত বালির বাঁধ! না, না, এ মোহঘোর কাটাইতেই হইবে।

ভোঁ ভোঁ হরণের আওয়াজ দিয়া দ্বারের সম্মুখে মোটর দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে প্রণব কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনিলের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "ইস্! অন্ধকারে যে? প্রাণ হাঁপাচ্ছে না? পুষ্প কোথায়?"

অনিল বলিল, "অন্ধকার আবার কোথায় পেলি—এখনও ত বেশ আলো রয়েছে।"

প্রণব শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "এখানে বসলে যে আমি আকাশ দেখতে পাইনে, ভাই!"

ব্যঙ্গের সুরে অনিল বলিল, "দেখিস! বিলেতে থাকতে কি করতিস? সেখানে ত আকাশ মুখ পুড়িয়েই আছে শুনতে পাই।"

প্রণব বলিল, "সত্যি বলবো, শুনবি? তোদের গোল-টেবিল যখন বসেছিল আর এ দেশ থেকে লীডাররা লণ্ডনে গিয়েছিল, তখন হাজার হাজার লোক তাদের ষ্টেশনে দেখতে গিয়েছিল। আমি তখন কোথায় ছিলুম জানিস?"

"না, তা জানবো কি ক'রে?"

"আমি তখন হাইড পার্কে ব'সে আকাশ দেখছিলুম, পাখীর ডাক শুনছিলুম আর দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছিলুম। ও-সব ভিড়ভাড় আমার ভাল লাগে না।"

"সত্যি বলছিস? তোর মাথার রোগের চিকিৎসা করা

দরকার। তোদের কি সবই ন্যাকামি? এই বলছিলি, পুষ্প কোথায়। পুষ্পকে ত তোরাই নিয়ে গেলি।"

"আমরা নিয়ে গেলুম? তার মানে?"

"তুমি না নিয়ে যাও, তোমার স্ত্রী ত বটে—সে ত একই কথা। তুমি কি তা জান্‌তে না?"

প্রণব বিরক্তিভরে বলিল, "ইডিয়ট! একই কথা হলো? তিনি কি করেন, না করেন, আমি তা জান্‌বো কি ক'রে? তিনি কি তাঁর সব কায আমায় জানিয়ে করেন, না, আমিই তাঁকে আমার সব কায জানিয়ে করি? আমি টু-সীটারখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম, শুনলুম, তিনি তার আগে ডেলমারখানা নিয়ে বেরিয়েছেন, এই পর্য্যন্ত! যাক্, এসেছিলুম একবার পুষ্পকে নিয়ে লেকটা ঘুরে আসতে। সারাদিন বেচারী মুখটি বুজে খেটেই যাচ্ছে—একটু রিক্রিয়েশানও চাই ত! এখানা কি রে? দেখি রে হারিকেনটা। ওঃ, আমারই "বাসর-শয্যা" বাঃ, গোড়ার গোটা তিন চার পাতা কাটা, বাকীটা যে খোলেই নি একবারে! প্রথম গল্পটার মাথায় কি লিখেছে পুষ্প—'ছিঃ ছিঃ!' তার মানে?"

"পুষ্প কেন ও কথা লিখেছে, পুষ্পই বলতে পারে। তবে তোর 'বর্ত্তমান' কাগজে কে এক জন অচ্যুত না কি, একটা গল্প লিখেছিল, পুষ্প খানিকটা পড়েই বলেছিল 'রাবিশ'। কেন জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, 'প্রণবদারা যেন কি! বাড়ীর ভেতরে না কি এ সব ছাঁইপাশ পড়তে দেয়?'"

"রাবিশ? পুষ্প বলেছিল রাবিশ?"

"হাঁ! আর তোদের অগ্রাণের সংখ্যায় কি 'শিহরণ' না কি একটা কবিতা বেরিয়েছিল, তা নিয়ে পুষ্প যা করলে, তা যদি শুনিস্"—

"এ্যাঁ? শিহরণটা পছন্দ হ'ল না? যা এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব'লে আদর পেয়েছে?. এ্যাঁ, বলিস কি?"

"পছন্দ কি, বল্‌লে নর্দ্দামা। আমি ত হেসেই খুন। কবিতা-টবিতা বুঝি নে ত।"

"এ্যাঁ, নর্দ্দামা? রিয়্যাল লাইফে যা ঘটছে, তাই ফুটিয়ে তোলাই ত আর্ট! নাঃ, এখনও যে জঙ্গলী তাই আছে দেখছি। যাক্, আজ উঠলুম। পুষ্পকে কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক হয়ে থাকতে বলিস্, বেড়াতে নিয়ে যাব।"

বাহিরে আসিয়া প্রণব তন্ময়ভাবে বলিল, "কি সুন্দর!"

অনিল বলিল, "কি সুন্দর রে?"

প্রণব গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "ঐ আকাশের কোণে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের বুকে কাস্তের মত চাঁদ! আহা হাঃ!"

অনিলের হাস্যরবে প্রণবের ধ্যানভঙ্গ হইল, সে বলিল, "হাসলি যে? যাক্, ছবির কদ্দূর কি করলি? জানিস ত আর সময় নেই?"

অনিল বলিল, "ছবি? ও হয়ে এলো। তবে তোদের উৎসব-ওয়ালাদের মনের মত হবে কি না, জানি নি। ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি তোদের মত থাকতো"—

প্রণব নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা থাকবে কেন —সে সৌভাগ্য হলে ত'! দেশশুদ্ধ লোক মাথা নোয়াচ্ছে —এ যুগের অবতার"—

"তা ঠিক। কি জানি ভাই, এই পাষণ্ড মন কেন ও রসে বঞ্চিত! তবে আমার মত নগণ্য গরীব একটা লোক কি ভাবলে না ভাবলে, তাতে তোদের গুরুদেবের ত বড্ড বয়েই গেল।"

"সে কথা হচ্ছে না। দেশটা এত ব্যাকওয়ার্ড যে, হিরোওয়ার্সিপ করতে শিখলে না—জাতটা বড় হবে কি ক'রে বল দিকি? সোয়েডেনবর্গ, নেপোলিয়ান, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, গান্ধী,—যাঁরাই জগতে একটা নতুন আইডিয়া এনেছেন, একঘেয়ে ভাবের স্রোত ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরই লোকে প্রথমটা চিনতে পারে নি। পুরাণোটা ভেঙ্গে দিয়ে তার উপর চির-নতুন চির-সবুজ বর্ত্তমানটাকে গ'ড়ে তোলাতেই শিক্ষা-গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। কত কত নতুনের বাণী—কত কত সবুজের বার্ত্তা!—তাঁর চির-সবুজ মনের কোথাও একটু টোল খেয়েছে কি? মনটা সবুজ থাকলেই পৃথিবীটাকে যথার্থ ভোগ করা যায়—এ ত তোদের মুনি-ঋষিদের গল্পেও পাওয়া যায়।"

উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রণবের নয়নদ্বয় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল।

অনিল উহাতে সায় দিয়া বলিল, "তা ঠিক। পৃথিবী-টাকে এমন ক'রে ভোগ করা কি সহজ কথা?"

প্রণব সগর্ব্বে সানন্দে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল,

"ক্ষমতা চাই, মনুষ্যত্ব চাই, দেহ পুরাতন হলেও মনটা সবুজ রাখা চাই। ধনজন মিথ্যে, সংসার মিথ্যে,—কি শিক্ষাই পেয়েছি আমরা! সাধে কি দেশটা উৎসন্ন গেল!"

অনিল অমনই বাল্যের পাঠ্য হইতে রচনা আবৃত্তি করিল,—"ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্—এটা কে শিখিয়েছে রে? এ শিক্ষাটাও যদি এ দেশে না থাকতো, তা হ'লে দেশের এই দুর্দ্দিনেও এত জয়ন্তী ময়ন্তী হতো কি ক'রে? ও সব টাকার খেলা রে!"

প্রণব যেন তন্দ্রোত্থিতের ন্যায় বলিল, "ও হো-হো, আজ যে উৎসব একজিকিটিভের মিটিং এখনই। জয়ন্তী হবে না? যাঁরা সাহিত্যজগতের বা কাব্যজগতের গুরু, তাঁদের জয়ন্তী ত হবেই। আর আমাদের গুরুদেব কেবল সাহিত্য বা কাব্যজগতের নয়, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম্ম, সকল জগতেরই গুরু। তাঁর যে এদ্দিন জয়ন্তী উৎসব হয় নি, এইটেই আশ্চর্য্য। এই মধুমাসেই তাই আমরা তাঁর জন্য উৎসবের আয়োজন করেছি জানিস। এমন সৎকার্য্যে যদি টাকা খরচ হয়, তবে তোদের চোখ টাটায় কেন বল দিকি? যাক্, আজ আর দাঁড়াব না, চললুম রে, ছবির কথা যেন মনে থাকে। আর পুষ্পকে বলিস, কাল আসবো।"

প্রণব চলিয়া গেল। অনিল ঘরে ফিরিয়া ভাবিল, সত্যই বিরাট পুরুষ—তবুও তাহার মন সেই পাদমূলে নত হইতে চাহে না কেন? কোথাকার সে দরিদ্র মূর্খ, তাহার কিসের এত অহঙ্কার? অসংখ্য অনুরক্ত ভক্তের মাথা যাঁহার চরণরেণুতে লুটাইয়া পড়িতেছে, যাঁহার সামান্য একটি বাণীর আশায় দেশ-বিদেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার প্রতিভাদীপ্ত নয়নকমলের একটি কটাক্ষের জন্য শত শত নর-নারী লালায়িত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি-লীলার ভাবসমন্বিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভক্তজনের প্রাণোন্মাদকর,—তাঁহার কাছে কে সে তুচ্ছ নগণ্য জীব? তবু, তবু, কি জানি কেন, কোথায় কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, সে অভাবের কথা তাহার মনের কোণে কেন রহিয়া রহিয়া দেখা দিয়া মনঃপীড়া দেয়? বিরাট প্রতিভা—বিরাট মনীষা—তবু, তবু সে যেন তাহা হইতে হৃদয়ের সাড়া পায় না। তাহার নিজের হৃদয় নাই বলিয়াই কি?

৩

আজ বসন্ত-উৎসবের রিহার্সাল। শৈলজাদের বেল-তলার বিশাল্ প্রাসাদোপম ভবনের মার্ব্বেল হলে সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে একে একে বহু সুবেশা সুন্দরী তরুণীদের সমাগম হইতেছিল।

মাঙ্গলিক ফুলে-ফলে, লতায়-পাতায়, ধ্বজা-পতাকায় ফটক হইতে হল-ঘর পর্য্যন্ত সুসজ্জিত। চিত্র-বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা রজনীর গাঢ় অন্ধকারকে দিনের আলোকে পরিণত করিতেছিল। সকল কার্য্যই যন্ত্রচালিতবৎ অনুমিত হইতেছিল।

শৈলজা পুষ্পকে সাজাইতেছিল। পুষ্পের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নহে, কেন না, সেই ত প্রশস্তি কবিতা আবৃত্তি করিবে, পরন্তু পঞ্চ কুমারীর অন্যতমারূপে গুরুবরণ করিবে, আরতি করিবে। এই প্রথম একত্র রিহার্সাল—শিক্ষার এখনও অনেক প্রয়োজন। আজ কেবল নারী-সম্মেলন, তবে বিচারকরূপে কয় জন নিতান্ত আত্মীয়-স্বজন পুরুষ উপস্থিত থাকিবেন।

পুষ্পের কেশপ্রসাধন করিতে করিতে শৈলজা বলিল, "কি লো, এর মধ্যেই কেঁপে মরছিস যে! মরণ!"

পুষ্প সত্যই কাঁপিতেছিল, বক্ষের গুরু গুরু স্পন্দন সত্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। সে বলিল, "সত্যি বৌদি, আমার বড্ড ভয় করে, শেষ যদি কথাই না বেরোয়?"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখি! ইস্কুলে পড়াস কি ক'রে? আমাদের ত এ সব ভাত-ডালের মত হয়ে গেছে।"

পুষ্প কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "তা হোক্ বৌদি, আমার বুক কাঁপছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমরা বাদ দাও। কত ভাল ভাল মেয়ে রয়েছে"—

শৈলজা ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আ মর্! ডেঙ্গার কাছে এসে ভরা ডুবি করবি না কি? সে হবে না, সময় কোথা আর? কাকেই বা দিই তোর পার্ট বল্ ত?"

এক গাল হাসিয়া পুষ্প বলিল, "কেন, দীপ্তি দিদি। কি সুন্দরই মানাবে ওকে! আমার মত কালিন্দীকে গুরুদেব হয় ত পছন্দই করবেন না।"

শৈলজা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "কেন, গুরুদেব কি

তোকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন না কি? মামলা ত পাঁচ মিনিটের—একবার তোর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যাবেন। দীপ্তির পার্ট নেই? তাকে আরও চাপালে চলবে কেন? বলে কি না কালো! এমন ঢলঢল মুখখানি, এমন ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি দেখলে মুনির মনও ট'লে যায়। নে, আয়, এইবার সাড়ী-জামা পরিয়ে দিই।"

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মুখে আগুন! এলবামখানা যে নীচে লাইব্রেরীতেই ফেলে এলুম। বোস্, এখনই আসছি।"

কাহারও উপর ভারার্পণ না করিয়া শৈলজা স্বয়ং দ্রুতপদে নিম্নতলে অবতরণ করিল। কক্ষটি এমনই স্থানে অবস্থিত যে, গৃহের উৎসবের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই কক্ষই প্রণবের একান্তে বাণীসাধনার স্থান ছিল। স্বামি-স্ত্রী ভিন্ন তথায় অপর কাহারও বিশেষ গতিবিধি ছিল না।

কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতর অন্ধকারাচ্ছন্ন, শৈলজা আলোকের সুইচটা টিপিয়া দিতেই কক্ষ আলোকোদ্ভাসিত হইল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার স্বামী গবাক্ষের একটি পাখী খুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া তৎপার্শ্বে বসিয়া আছে। প্রথম আলোকসম্পাতেই প্রণব চমকিত হইয়া বিরক্তিভরে বলিল,—"আঃ, কে রে?" তাহার পর শৈলজাকে দেখিয়া ঈষৎ রুষ্ট স্বরে বলিল, "এখানে আবার কি দরকার? পাঁচটি বন্ধুবান্ধব এসেছে"—

শৈলজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "ওখানে অন্ধকারে ব'সে কি হচ্ছে?"

প্রণব বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ, সব মাটী করলে! শুনতেই দিলে না দেখছি!"

"ও মা! জানলার ধারে অন্ধকারে ব'সে ওৎ পেতে কি শুনছিলে আবার?"

প্রণব গম্ভীর স্বরে বলিল, "বস্তীর ঝগড়া—এ মাসের 'বর্ত্তমানে' একটা গল্পের মালমশলালা যোগাড় করছি। তা, নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু করবার যো আছে কি?"

শৈলজা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "অবাক্! ঐ ছাইপাঁশ ছোটলোকের ঝগড়া হবে মালমশালা? বাঁচি নি বাবু!"

প্রণবের দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সে পরুষকণ্ঠে বলিল, "ছোটলোকদের মুখে গরল থাকতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের মতন অন্তরটাও গরল নয় ত তাদের! ঢাকা দিয়ে রাখলেই পচার দুর্গন্ধ যায় না, মনের অগোচর পাপ নেই ত!"

শৈলজা বিস্মিত হইল, সে প্রণবকে কখনও এমন ধৈর্য্যহারা হইতে দেখে নাই। নিতান্ত উপেক্ষাভরে বলিল "তোমাদের মালমশালা নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ওতে দরকার নেই। পুষ্প নেহাৎ মিথ্যে বলে না, অমন ছাইপাঁশ লেখা গেরোস্তোর ঘরের মেয়েরা পায়ে ক'রে ঠেলে ফেলে দেয়।"

কথাটা বলিয়া সে অজান্তার এলবামখানা লইয়া ক্রোধে দ্রুতপদক্ষেপ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। প্রণব নীরব বিস্ময়ে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

আপনার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই তাহার মুখের গুরুগম্ভীরভাব কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। সে স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখেই পুষ্পকে আবার সাজাইতে বসিল, বলিল, "নে, এমনই ক'রে পাশ ফিরে দাঁড়া, এই যে অজান্তার ছবির মত—"

পুষ্প সলাজে বলিল, "ছিঃ ছিঃ বৌদি—ঐ রকম ক'রে? না, না, আমি পারবো না। ও যে গায়ে কাপড় নেই বল্‌লেই হয়—না, না, বড় লজ্জা করে"—

"দূর বাঁদরী! গুরুদেব বলেছেন, এ হচ্ছে আর্ট—যতটা সম্ভব স্বভাবের মত থাকতে পারা যায়"—

"তা ব'লে"—

এই সময়ে দীপ্তি ব্যস্তসমস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"বা রে, তোমাদের এখনও হয় নি, সবাই ব'সে আছে তোমাদের জন্যে? বাঃ, বেশ মানিয়েছে পুষ্পকে—তোর বাহাদুরী আছে, শৈল।" দীপ্তি প্রাচীর-বিলম্বিত দীর্ঘ দর্পণে আপনাকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল, একটি অলক তুলিয়া ধরিয়া কাণের পাশে বসাইয়া দিল, একবার পীবর উন্নত বক্ষের উপর হইতে ওড়নাখানিকে সরাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিল।

শৈলজা পুষ্পের মুখমণ্ডলে শেষ একবার পাউডার পাফটি বুলাইয়া লইয়া বলিল, "এই হ'ল ভাই। আচ্ছা ভাই, বীণাকে কেমন গুরুদেব সাজিয়ে দিয়েছি বল দিকি।"

দীপ্তি বলিল, "চমৎকার! গেরুয়ার থান, গেরুয়ার আলখাল্লা ঠিক কি মানিয়েছে! আর সত্যি বলতে ভাই

গলার মিষ্টি আওয়াজটিও কি পোড়ারমুখী অবিকল নকল করেছে ?”

“সেফালী বড্ড কাঁদছে মা, কিছুতে রাখতে পারছি নি আমরা, কেবল ‘মা যাবো মা যাবো’ করছে, মা !” প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া তিনুর মা কথাটা জানাইয়া নিতান্ত অপরাধীর মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, “তা আমি কি কোরবো ? তোমরা সবাই রয়েছো কি করতে ? আজকের দিনটেও রেহাই দেবে না আমায় ?”

দাসী আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, ধুলা পায়েই কক্ষ ত্যাগ করিল। পুষ্পের প্রাণের মধ্যে কেমন আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল, বলিল, “যাও না বৌদি একবার, মেয়েটার তিন দিন ধ’রে বেহুঁস জ্বর, মাকে একবারও খোঁজ করবে না ?”

শৈলজা সক্রোধে বলিল, “না, করবে না। এমন কিসের আব্দার ? জ্বর যেন কারুর হয় না ! ‘মাল কাতে দাবো’—আড়াই বছরের খুকী !”

দীপ্তি তাড়া দিল,“নে, নে, চল তোরা, সবাই ব্যস্ত হয়েছে।”

সকলে কক্ষ ত্যাগ করিল, কাযেই সেফালীর তুচ্ছ কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। পুষ্প মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার মনটা ভার হইয়া রহিল।

পুষ্পোদ্যানের লতায় পাতায় লাল নীল সবুজ বেগুনি রঙ্গ-বিরঙ্গের স্থির-বিজলী জোনাকীর মালা। কত রঙ্গ-বিরঙ্গের মানুষ, কত ধ্বজা-পতাকা। গুবাক-বীথিকার লাল সুরকীর উপর লাল বনাত আস্তৃত, তাহার উপর আবীর-কুঙ্কুমের রাশি এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নাতিপ্রশস্ত রেখাকারে বিন্যস্ত। তাহার উভয় পার্শ্বে সুরূপা সুবেশা তরুণীরা মাঙ্গলিক ঘট, শঙ্খ, পঞ্চ-প্রদীপ, কাঁসর, ঘণ্টা, বরণডালা, ছত্র, চামর প্রভৃতি হস্তে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মানা। শৈলজা স্রক-চন্দন পুষ্পমাল্যাদির সুবর্ণাধার, দীপ্তি ধূপ-কর্পূরাদির থালি এবং পুষ্প প্রশস্তি-পত্র ও পঞ্চপ্রদীপ হস্তে তাহাদের সহিত মিশিয়া গেল।

ঘণ্টার সঙ্কেত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতান-বাদন আরম্ভ হইল। ক্ষণপরে সাঙ্কেতিক শব্দ হইল, ঐক্যতান বাদ্য থামিয়া গেল, বীথিকার এক প্রান্তের যবনিকা সরিয়া গেল,—অমনই যবনিকার অন্তরাল হইতে ধর্ম্মগুরুর বেশে বীণা রায় ধীর মন্থরগতিতে আস্তৃত আবীর-কুঙ্কুমের উপর পাদবিন্যাস করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন—উহা মরাল-গমনের মতই অনুমিত হইতেছিল। মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ধূপ-ধূনা-কর্পূরের সুগন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত হইল। তরুণীরা আবক্ষ মস্তক অবনত করিয়া গুরুদেবের বন্দনা করিল। তিনিও কাহারও সযত্নবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদামের উপর কোমল অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া, কাহারও কমলদলতুল্য আরক্তিম গণ্ডে চম্পকাঙ্গুলী অবমর্ষণ করিয়া, কাহারও বা অঙ্গে করকমলাগ্রে মঙ্গলাশিস বর্ষণ করিয়া, একবার দক্ষিণে, একবার বামে মৃদুহাস্যে করুণা-কটাক্ষে সকল তরুণীকেই আপ্যায়িত করিতে করিতে বেদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং হাস্যস্ফুরিতাধরে বেদীর উপর আসন পরিগ্রহ করিলেন।

কিন্তু তিনি যতই নিকটবর্ত্তী হন, পুষ্পের বক্ষস্পন্দন ততই দ্রুত হয়, মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়, নয়নে আতঙ্ক-রেখা প্রস্ফুট হয় ! কি আশ্চর্য্য—এ যে বীণা, তাহাকেও ভয় ? পুষ্প প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু অলঙ্ঘ্য বিধির বিধান,—গুরুদেব পার্শ্বে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কম্পিত হইল,—বুঝি বা পড়িয়াই যায় ! তাহার করধৃত প্রশস্তিপত্র কম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল, সে যতই প্রাণপণে প্রশস্তি উচ্চারণ করিতে যায়, ততই যেন কে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া রুদ্ধ করিয়া দেয় ! তাহার ললাটে ও কপোলে স্বেদাশ্রু নির্গত হইল, মুখচক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল,—অকস্মাৎ প্রশস্তি-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরাত্রিকের পঞ্চপ্রদীপ সশব্দে ভূতলে নিপতিত হইল। চতুর্দ্দিকে অস্ফুট বিরক্তিগুঞ্জন গুঞ্জরিয়া উঠিল। জলপ্রবাহমুখে বেতসপত্রের মত কৃশাঙ্গী তরুণী কম্পিতকলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতেছিল, অমনই প্রণবের বাহুযুগল তাহাকে সেই বিপত্তি হইতে রক্ষা করিল, প্রায় বিগতচেতনা হইয়া সে চারিদিকের বিক্ষোভের কথা সৌভাগ্যবশতঃ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তমাত্র ! মোহভঙ্গের পর পুষ্প চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, চারিদেকে তরুণীর দল মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সে মরমে মরিয়া গেল, লজ্জিত ও সঙ্কুচিত-ভাবে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় আশ্রয় ও করুণাপ্রার্থী হইয়া শৈলজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। শৈলজা বিষম ক্রুদ্ধ

হইয়াছিল, শ্লেষের স্বরে বলিল, "কি, হলো কি? যেন লজ্জাবতী লতাটি! ভাগ্যে এটা রিহার্সাল!"

প্রণব তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমরা পুষ্পকে নিয়ে ঘরে যাও। আজ আর হবে না। আর তুই এক দিন আমি নিজে পুষ্পকে নিয়ে রিহার্সাল দিয়ে লজ্জাটা ভেঙ্গে দেব।"

কৃতজ্ঞ-নয়নে প্রণবকে নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পুষ্প উপরে চলিয়া গেল। অনিল যখন পুষ্পকে বাসায় লইয়া যাইতে আসিল, তখন শৈলজার রাগ পড়িয়া গিয়াছে, অধিকক্ষণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে যখন পুষ্প তাহার 'দুটি পায়ে পড়িয়া' সেদিনকার মত ক্ষমা করিতে বলিল, তখন শৈলজা হাসিয়া বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে? ও অমন হয়ে থাকে। আমাদেরও প্রথম প্রথম হতো। যাক্, আসল দিনে হয় নি, এই যা ভাগ্যি!"

পুষ্প বলিল, "তোমার পায় পড়ি বৌদিদি, আমায় বাদ দাও, এ জঙ্গলী ভূতকে নিয়ে কোন কথা হবে না।"

"দূর পাগলি! আজ বাদে কাল উৎসব, এখন আর অদল-বদল হয় না। তোর এ বাড়ীর দাদারা বলেছে, নিরিবিলি ব্যায়লার বাগানবাড়ীতে তোকে নিয়ে রিহার্সাল দেওয়া যাবে এ কটা দিন। কি বলিস?"

সোপান অবতরণ করিতে করিতে পুষ্প বলিল, "যা ভাল বোঝো কর, বৌদি। আচ্ছা, উৎসবের দিনও কি এমনই ক'রে গায়ে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করা হবে? তোমাদের গা শিউরে ওঠে না?"

শৈলজা হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "মনটাকে যদি বড় ক'রে নিয়ে সব জিনিষ দেখিস, তা হলে ও সব ছোট কথা মনে আসবে না। যিনি ছোট সংসারটাকে বড় ক'রে দেখতে শিখিয়েছেন, তাঁকে আমাদের অদেয় কি আছে?"

৪

"কৈ, বৌদি ত আসেন নি এখনও, প্রণবদা?" পুষ্প উৎসুকনেত্রে প্রণবের দিকে চাহিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। বাগান-বাড়ীর দ্বিতলে পদার্পণের পর শৈলজাকে না দেখিয়া পুষ্প কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এত বড় বাগান, কিন্তু মালীরা ছাড়া কেহ ত নাই!

প্রণব সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া সিগারেট টানিতেছিল। সে বলিল, "তাঁদের ত আগে আসবার কথা। বোধ হয়, দীপ্তিদের সকলকে তুলে আনতে দেরী হচ্ছে। এই এলেন ব'লে। প্রশস্তিটা বেশ মুখস্থ হয়েছে ত'? ব'লে যাও দিকি।"

পুষ্প একবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইয়া কবিতাটি বলিয়া যাইতে লাগিল। তরুণীর কোমল কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সে যেন বীণার ঝঙ্কারের মতই অনুমিত হইতেছিল। প্রণব মাঝে মাঝে, "বাঃ! সুন্দর! উহুঁ, ওখানটা একটু থেমে,—আরও জোর দিয়ে" —বলিয়া আবৃত্তির সমালোচনা করিতে লাগিল। সে একবার উঠিয়া কবিতাটি লইয়া বলিল, "দেখি, এমনই ক'রে চাও দিকি আমার দিকে! ও কি, চোখ নামিয়ে নিচ্ছ যে? এখনও লজ্জা, ছিঃ! ও কি, স'রে যাচ্ছ কেন, এস।"

পুষ্পের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল,প্রণবের নয়নে এমন চাহনি সে ত কখনও লক্ষ্য করে নাই। ভীত কণ্ঠে বলিল, "প্রণবদা, আমায় বাড়ী রেখে এস, আজ কেমন ভাল লাগছে না।"

প্রণব হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলি! আর দিন কোথায়? নাও, ব'লে যাও ছত্র কটা আর একবার।" তখন প্রণব যেন আর সে মানুষ নহে, তাহার নয়নে সে বক্র কুটিল কটাক্ষ আর নাই। পুষ্প আশ্বস্ত হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল। প্রণব একবার বলিল, "বাইরের খোলা আকাশে খোলা বাতাসে আরও ভাল হবে। যাক্, একটু রোদ পোড়ে আসুক।" আবৃত্তি চলিল, প্রণব মাঝে মাঝে আবৃত্তি এবং আবৃত্তির অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। একবার বলিল, "অমন ক'রে চোখ নামিয়ে বোলো না বার বার ব'লে দিচ্ছি।" পুষ্প অপরাধীর ন্যায় বলিল, "বলছি ত বাদ দাও আমায়, নইলে তোমাদেব দুর্নাম হবে।" প্রণব বলিল, "সে কথা হচ্ছে না, অভ্যাসে কি না হয়? গুরুদেব বলেন, দর্শকদের ভেড়ার পাল মনে না করলে বড় দরের বক্তা হওয়া যায় না।"

পুষ্প বলিল, "তিনি মহাপুরুষ—তাঁর সঙ্গে কার কথা? দেখ না, যারা পায়ের নখের যোগ্য নয়, তারাও খুঁড়িয়ে বড় হচ্ছে, তাঁকে খেলো ক'রে গেরুয়া রুদ্রাক্ষি নিয়ে গুরু সাজছে। তাদেরও তিনি পিঠ চাপড়াতে ছাড়েন না। বোধ হয় কারুর বাহবা তিনি ফেলতে চান না।"

প্রণব বলিল, "হ্যাঃ, বয়ে যাচ্ছে তাঁর! তাঁর পাদোদক খেলে কত মুনি-ঋষি ত'রে যায়!"

পুষ্প বলিল, "তা বটে! নইলে বড় বড় লোক মোটর জুড়ীতে এসে তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে দেয়? আমাদের জাত ত তাঁর নাম করতে অজ্ঞান—তাঁকে নাকি তাদের অদেয় কিছুই নেই!"

কথাটার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল কি? থাকিলেও প্রণব তাহা বুঝিল না, সে প্রসন্নচিত্তে বলিল, "তা হলে বুঝতে পেরেছো? যাক্, তার পর? না, ওরকম না। এই, এই এমনই ক'রে বাঁ পাটা বাড়িয়ে—মাথা নীচু ক'রে এমনই ভাবে—কিন্তু মাথা নীচু থাকলেও চোখ যেন নামে না। ঠিক, এই রকম ক'রে"—

আবার! পুষ্পের আপাদমস্তক লজ্জায় ক্ষোভে শিহরিয়া উঠিল—সে দুই হস্ত সরিয়া আসিয়া রুষ্টস্বরে বলিল, "ও কি, প্রণব দা?" এতক্ষণে সে প্রণবের মুখ হইতে তীব্র সুরার গন্ধের উৎস খুঁজিয়া পাইল।

প্রণব মৃদু হাসিয়া বলিল, "আরে ছ্যাঃ, নেহাৎ ছেলে-মানুষ!—এ যে অভিনয় রে?"

পুষ্প দারুণ ক্রোধে বলিল, "হাত ছেড়ে দাও বলছি—আমি এখনই বাড়ী যাবো। তোমরা এমন?" সে কথার মধ্যে কতখানি ঘৃণা, ক্রোধ ও উপেক্ষার ভাব লুক্কায়িত ছিল, প্রণব প্রকৃতিস্থ থাকিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত।

প্রণব দ্বার রোধ করিয়া কুটিল হাসিয়া বলিল, "ছিঃ পুষ্প! মনে পড়ে কি ছেলেবেলার কথা?"

পুষ্প বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভুলে যাচ্ছো কি আমি তোমার কে? নাও, পথ ছাড়ো। ছিঃ!"

প্রণব আবার পুষ্পের হস্ত ধারণ করিল, মুখখানি উন্নত করিয়া ধরিয়া লালসাজড়িত স্বরে বলিল, "পুষ্প! পুষ্প! আমায় দয়া করো—আমার এই বুকে খাণ্ডবের ক্ষুধা জ্বলছে"—

পুষ্প সবলে তাহার কবলমুক্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি না তোমার ছোট বোন?"

প্রণব সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। তরুণী পুষ্পের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিদ্যুৎশিখা যেন তাহার সমগ্র দেহ হইতে নির্গত হইতেছিল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। প্রণব আবার দুই পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু পুষ্পের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। পুষ্প ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় নয়নে অনল বর্ষণ করিয়া বলিল, "তোমরা এত নীচ, এত কাপুরুষ? দাদা না বিশ্বাস ক'রে তোমার সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিয়েছেন? তা হ'লে তোমরা যা লেখো, তা মিথ্যে নয়? তোমাদের কাছে সম্বন্ধের বাচবিচার নেই?"

প্রণব বাধা দিতে যাইতেছিল, পুষ্প কোন অবসর না দিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল,—"ভাব কি, তোমাদের মনের মাপকাটিতে মা-বোনদের যেমন ক'রে মাপো, সত্যিই তাঁরা তাই? ছিঃ ছিঃ, তোমাদের লজ্জা করে না মুখ দেখাতে? চল্লুম বৌদির কাছে, দরকার হ'লে হেঁটেই যাবো"—

ক্রোধে ঘৃণায় পুষ্পের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রণব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল, "ভুল বুঝেছো, পুষ্প! তোমার বৌদি শুনলেও কিছু করবেন না! তিনি তাঁর খেয়াল নিয়ে থাকেন, আমিও আমার খেয়ালে থাকি, কেউ কারুর কাযে মাথা ঘামাই না"—

পুষ্প সোপান অবরোহণ করিতে করিতে বলিল, "আগুন সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছেন না?"

প্রণব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "বিবাহ? পয়সার সঙ্গে বিবাহ—আগুন কেন, কোনও সাক্ষীই মানে না। এ বিবাহে সুখ কি, এর বন্ধনই বা কি—প্রাণ যা চায়,"—

"ও মা, তোরা এরই মধ্যে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিস? আয় ভাই দীপ্তি, ওদের নিয়ে উপরেই চ'লে আয়,"—কল-হাস্যের রোলে সোপানশ্রেণী মুখরিত করিয়া শৈলজা সখীদের সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। প্রণব কোনও রূপ বিকৃতির ভাব না দেখাইয়া হাসিয়া বলিল,—"এই যে, আমরা নীচেই যাচ্ছিলুম তোমাদের এগিয়ে আনতে, গাড়ীর আওয়াজ পেলুম কি না। পুষ্প বলছিল, বাগানেই রিহার্সাল দিতে।"

ইহা কি মনের উপর অদম্য শক্তি-প্রয়োগের পরিচয়, না ইহাদের এ সকল বিষয় গা-সহা হইয়া গিয়াছে?—পুষ্প বিস্মিত স্তম্ভিত হইল! সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শৈলজাকে বলিল, "তোমার সোফারকে আমায় বাড়ী রেখে আসতে ব'লে দাও, বৌদি।"

শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি?"

পুষ্প ধরা গলায় বলিল, "কিছুই না, তোমাদের উৎসবে আমি থাকতে চাই নে। গরীবের এ খেয়াল সইবে না, বৌদি।" পুষ্প দাঁড়াইল না, দ্রুতপাদ-বিক্ষেপ করিয়া নামিয়া গেল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং বহির্ভারতের কতকগুলি প্রদেশ

নগর, গ্রাম ইত্যাদি

বাবেরু—জাতকে (১) বাবেরু রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাকালে ভারতবর্ষ এবং বাবেরু রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য চলিত। বাবেরু এবং প্রাচীন ব্যাবিলন অভিন্ন।

হংসাবতী—হংসাবতী নগরে ধম্মদিন্না, উব্বিরিয়া এবং সেলা নাম্নী থেরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। বর্ত্তমানে ইহার স্থান-নির্ণয় কঠিন। হংসাবতী নামে নিম্ন-ব্রহ্মদেশে একটি নগর ছিল। এই নগর এবং বর্ত্তমান পেগু অভিন্ন।

লঙ্কাদ্বীপ—সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। দীপবংস, মহাবংস এবং অন্যান্য গ্রন্থে লঙ্কারাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাই বর্ত্তমান সিলোন্।

সুবর্ণভূমি—সোন এবং উত্তর নামে দুইটি থের সুবর্ণভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সুবর্ণভূমি এবং নিম্নব্রহ্মদেশ (Pegu and Moulmein districts) অভিন্ন। সুবর্ণভূমির অপর একটি নাম সুধম্ম নগর (৩)। ইহা সিত্তাং (Sittaung) নদীর মোহনায় অবস্থিত থ্যাটন্ নামে পরিচিত।

তম্বপণ্ণি—অশোক অনুশাসনে (৪) ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তম্বপণ্ণি দেশের সহিত সম্রাট্ অশোকের মিত্রতা ছিল। স্মিথ্ সাহেবের মতে তম্বপণ্ণি এবং তাম্রপর্ণি অভিন্ন (৫)। আমাদের মনে হয় যে, তম্বপণ্ণি এবং লঙ্কা অভিন্ন। পূর্ব্বে লঙ্কা অর্থে পারসমুদ্র (৬) এবং তাম্রপর্ণিকে বুঝাইত। লঙ্কা, দক্ষিণ-ভারতবর্ষের তামিল রাজগণ এবং ভারতের বাহিরে কতকগুলি দেশের রাজাদিগের সহিত অশোকের মিত্রতা ছিল, যথা, Antiochus Theos, Ptolemy (Turamayo), Magas (Maga বা Maka) এবং Alexander (Alikasudara)। কাহারও কাহারও মতে অশোক-অনুশাসনে লিখিত অলিকসুন্দর এবং করিন্থের রাজা আলেক্জাণ্ডার অভিন্ন (১)।

অনুরাধপুর—দীপবংসে (২) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা লঙ্কার প্রাচীন রাজধানী।

নল্লদ্বীপ—দীপবংসে (৩) ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ আরব্য সমুদ্রে ইহা অবস্থিত।

দ্বারমণ্ডল—মহাবংসে (৪) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা অনুরাধপুরের পূর্ব্বদিকে চেতিয় পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত।

পুলিন্দ—কলম্বো, কলুতরা, গল এবং পর্ব্বত সকলের মধ্যস্থিত দেশে পুলিন্দগণ বাস করিত; তাহারা অসভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত (৫)।

অম্বত্থল—মহাবংসে (৬) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা মিহিন্তল পর্ব্বতের ঠিক নিম্নে অবস্থিত।

নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি—

কল্যাণী—ইহা লঙ্কাদ্বীপের একটি নদী (৭)। এই নদী এবং বর্ত্তমান কিলনিগঙ্গা অভিন্ন।

কদম্ব নদী—মহাবংসে (৮) ইহার উল্লেখ আছে। দীপবংসে (৯) ইহা কদম্বক নামে পরিচিত। ইহা এবং বর্ত্তমান Malwatte-oya অভিন্ন।

করিন্দ নদী—বর্ত্তমানে ইহার অপর একটি নাম কিরিন্দ-ওয়। ইহা সিংহলের দক্ষিণদেশে প্রবাহিত (১০)।

---

(১) Jataka, III, 126.
(২) Theri—Gatha Commentary, pp. 15, 53, 61.
(৩) Sasanavamsa, p. 10
(৪) Rock Edicts, II and XIII.
(৫) Asoka, 3rd Ed, p 162.
(৬) Indian Antiquary, 1919, pp. 195-96,

(১) JRAS, 1914, pp. 943.
(২) Pages 57, 58, Etc.
(৩) Page 55.
(৪) Page 77.
(৫) Mahavamsa, Geigersti, p. 60, note 5.
(৬) Mahavamsa, p. 102.
(৭) Jat, II, 128.
(৮) Page 66.
(৯) Page 82.
(১০) Mahavamsa, p 258.

গম্ভীর নদী—অনুরাধপুরের সাত বা আট মাইল দূরে এই নদী প্রবাহিত (১)।

খোণক নদী—ইহার অপর একটি নাম হোনক। ইহা সিংহলের একটি নদী। ইহার বর্ত্তমান নাম কড়ু-ওয় (২)।

মহাগঙ্গা—এই নদী এবং সিংহলের বর্ত্তমান মহাবেলি গঙ্গা নদী অভিন্ন (৩)।

দীঘবাপী—দীপবংস (৪) এবং মহাবংসে (৫) ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহার বর্ত্তমান নাম কন্দিয়-কট্টু পুষ্করিণী।

কালবাপী বা কালিবাপী—কড়ু-ওয় বা খোণ নদীকে বাঁধ দিয়া বন্ধন করিয়া রাজা ধাতুসেন ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৬)।

তিস্‌সবাপী—মহাবংসে ইহার উল্লেখ আছে ইহা সিংহলের মহাগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণী (৭)।

মণিহীরা—ইহার বর্ত্তমান নাম মিন্নেরিয়। ইহা সিংহলের পোড়োন্নরুবের নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণী (৮)।

অরণ্য, পর্ব্বত ইত্যাদি

মলয়—দীপবংস (৯) এবং মহাবংসে (১০) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সিংহলের মধ্যবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ।

অভয়গিরি—অনুরাধপুরের উত্তর দ্বারের বহির্ভাগে ইহা অবস্থিত (১১)।

সীলকূট—ইহা সিংহলের মিহিন্তাল পর্ব্বতের উত্তর চূড়া (১২)।

(১) Ibid, p. 66.
(২) Ibid, p. 290.
(৩) Ibid, p. 82.
(৪) Page 25.
(৫) Page 10.
(৬) Mahavamsa, p. 299.
(৭) Ibid, p. 160.
(৮) Ibid, p. 324.
(৯) Page 60.
(১০) Page 69.
(১১) Dipavamsa, p. 101 and Mahavamsa, p. 275.
(১২) Dipavamsa, p. 89 and Mahavamsa, p 102.

চেতিয় পব্বত—সিংহলের মিস্‌সক পর্ব্বত এই নামে পরিচিত (১)।

মিস্‌সকগিরি বা মিস্‌সক পব্বত—ইহা সিংহলের অনুরাধপুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত মিহিন্তাল পর্ব্বত (২)।

নন্দনবন—ইহা মহামেঘবন এবং অনুরাধপুর নগরের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত (৩)।

মহামেঘবন—অনুরাধপুর নগরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল (৪)।

আরাম, বিহার ইত্যাদি—

আকাশ চৈত্য—সিংহলের চিত্তল পর্ব্বত বিহারের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতের উপরে ইহা অবস্থিত ছিল (৫)।

পঠম চেতিয়—অনুরাধপুর নগরের পূর্ব্বদ্বারের বহির্ভাগে ইহা অবস্থিত ছিল (৬)।

থুপারাম বিহার—ইহা অনুরাধপুরের একটি বিহার (৭)।

তিস্‌স মহাবিহার—হম্বন্‌তোটের উত্তর-পূর্ব্বে দক্ষিণ সিংহলে ইহা অবস্থিত ছিল (৮)।

জেতবন বিহার—ইহা অনুরাধপুরের অভয়-গিরি-স্তূপের নিকটে অবস্থিত (৯)।

ইহা ব্যতীত ছোট ছোট অনেক নগর, চৈত্য, আরাম, বিহার, অরণ্য, পর্ব্বত, নদী, পুষ্করিণীর উল্লেখ মহাবংস এবং দীপবংসে পাওয়া যায়; সেগুলি আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করি নাই।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা (এম্, এ, বি, এল্, পি, এইচ, ডি।)

(১) Dipavamsa, p. 84 and Mahavamsa, p. 130.
(২) Dipavamsa, p. 64 and Mahavamsa, p. 101.
(৩) Dipavamsa, p. 69 and Mahavamsa, p. 126.
(৪) Mahavamsa, p. 10.
(৫) Ibid, p. 172.
(৬) Ibid, p. 107.
(৭) Ibid, p. 324.
(৮) Ibid, p 172.
(৯) Ibid, p. 322.

চক্রায়ুধ ঈশানবর্ম্মার ঘৃণিত জীবনকাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্ম্মা পাটলিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক প্রান্তে এক অর্দ্ধশুষ্ক কূপমধ্যে ঈশানবর্ম্মা নামধারী আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কূপের মুখ ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহজাল দ্বারা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কূপের দুর্গন্ধ পঙ্কে আ-কটি নিমজ্জিত হইয়া ভেক-সরীসৃপ-পরিবৃত হইয়া আমি তিন মাস কাটাইয়াছিলাম।

জয়ন্তী নাম্নী পুরীর এক দাসী চণ্ডালহস্তে শূকর-মাংস আনিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমার জন্য কূপে ফেলিয়া দিয়া যাইত। এই জয়ন্তীর নিকট আমি রাজ-অবরোধের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। জয়ন্তী সোমদত্তার সহচরী কিঙ্করী ছিল; সে সোমদত্তার মনের অনেক কথা জানিত, অনেক কথা অনুমান করিয়াছিল। সে কূপমুখে বসিয়া সোমদত্তার কাহিনী বলিত, আমি নিম্নে অন্ধকারের কীটদংশন-বিক্ষত অর্দ্ধগলিত দেহে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতাম।

এক দিন জয়ন্তীকে বলিয়াছিলাম,—'জয়ন্তি, আমায় উদ্ধার করিবে? আমার বহু গুপ্তধন মাটীতে পোঁতা আছে, যদি মুক্তি পাই, তোমাকে দশ হাজার স্বর্ণ-দীনার দিব। তোমাকে আর চেটীবৃত্তি করিতে হইবে না।'

ভীতা জয়ন্তী আমাকে গালি দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আর আসে নাই। অতঃপর চণ্ডাল একাকী আসিয়া মাংস দিয়া যাইত।

আমি একাকী এই জীবন্ত নরকে বসিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহা বলিবার এ স্থান নহে। তবে সোমদত্তা আমার চিন্তার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। ভাবিতাম, সোমদত্তার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল কেন? যদি চন্দ্রগুপ্তকে এত ভালবাসিত, তবে বিশ্বাসঘাতিনী না হইয়া আত্মঘাতিনী হইল না কেন? রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে বলিবে? তখন এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পাই নাই।

কিন্তু আজ বহু জীবনের পরপারে বসিয়া মনে হয়, যেন সোমদত্তার চরিত্র কিছু কিছু বুঝিয়াছি। সোমদত্তা গুপ্তচরভাবে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল। কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তকে অবজ্ঞভরে দেখিতেন, ইহা যে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, চন্দ্রবর্ম্মাকে দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়া পরে স্বামীর জন্য পাটলিপুত্র-রাজ্য ভিক্ষা মাগিয়া লইবে। কুমারদেবীর প্রভাব অস্তমিত হইবে। চন্দ্রগুপ্ত সত্যই রাজা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সোমদত্তাও স্বামিসোহাগিনী হইয়া পট্টমহিষীর আসন গ্রহণ করিবে।

আমার দুরন্ত লালসা যখন তাহার গোপন সঙ্কল্পের উপর খড়্গের মত পড়িয়া উহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইল, সহজেই অনুমেয়। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রকারিণী হীন গুপ্তচর বলিয়া কোন্ রমণী ধরা পড়িতে চাহে? সোমদত্তা দেখিল, ধরা পড়িলে স্বামীর অতুল ভালবাসা সে হারাইবে, সে যে চন্দ্রগুপ্তকেই রাজ্য ফিরাইয়া দিবার মানসে চক্রান্ত করিয়াছে, এ কথা চন্দ্রগুপ্ত বুঝিবে না। হীন বিশ্বাস-ঘাতিনী বলিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এ দিকে চক্রায়ুধের হস্তেও নিস্তার নাই, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ধর্ম্মনাশ নিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় অসহায়া জালবদ্ধা কুরঙ্গিণী কি করিবে?

অপরিমেয় ভালবাসার যূপে সোমদত্তা সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিল। ভাবিল, আমার ত চরম সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই মর্ম্মভেদী লজ্জার কাহিনী স্বামীকে জানিতে দিব না। এখন আমার যাহা হয় হউক, তার পর যে আমার জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া নিজেও নরকে যাইব। কিন্তু স্বামীকে কিছু জানিতে দিব না।

ইহাই সোমদত্তার আত্মবিসর্জ্জনের অন্তরতম ইতিহাস। কিন্তু আর না, সোমদত্তার কথা এইখানেই শেষ করিব। এই নারীর কথা স্মরণ করিয়া ষোল শত বৎসর পরে আজও আমার মন মাতাল হইয়া উঠে। জানি, সোমদত্তার মত নারীকে বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করেন নাই—সে দেবভোগ্যা। জন্মজন্মান্তরের ইতিহাস খুঁজিয়া এমন একটিও নারী দেখিতে পাই না—যাহার সহিত সোমদত্তার

তুলনা করিব। আর কখনও এমন দেখিব কি ন', জানি না।

আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্তার সহিত যদি আবার আমার সাক্ষাৎ হয়, জানি, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব। নূতন দেহের ছদ্মবেশ তাহাকে আমার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে? তাহার ললাটে কি স্মৃতির ভ্রূকুটি দেখা দিবে? অধরে কি সেই অন্তিমকালের অপরিসীম ঘৃণা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে? জানি না! জানি না!

* * * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। আপনারও হয়, আমারও হয়। আপনি তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন না। মনে করেন, পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। এই পূর্ব্বে যে কোথা এবং কত দিন আগে, আপনি তাহা জানেন না। আমি জানি। ভগবান্ আমাকে এই অদ্ভুত শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অন্ধকার চিত্রশালায় চিত্রের ছায়াবাজি আরম্ভ হইয়া যায়। যে কাহিনীর কোনও সাক্ষী নাই, সেই কাহিনীর পুনরভিনয় চলিতে থাকে। আমি তখন আর এই ক্ষুদ্র আমি থাকি না, মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মত ভাসিয়া চলি। সে যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল, জানি না, কত দিন ধরিয়া চলিবে, তাহাও ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকায় প্রচ্ছন্ন। তবে ইহা জানি যে, এই যাত্রা সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন, অব্যাহত। মাঝে মাঝে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে যতি পড়িয়াছে মাত্র—সমাপ্তির 'সম' কখনও পড়িবে কি না এবং পড়িলেও কবে পড়িবে, তাহা বোধ করি বিধাতারও অজ্ঞেয়।

মহাঞ্জোদারোর নগর ও মিশরের পিরামিড যখন মানুষের কল্পনায় আসে নাই, তখনও আমি জীবিত ছিলাম। এই আধুনিক সভ্যতা কয় দিনের? মানুষ লোহা ব্যবহার করিতে শিখিল কবে? কে শিখাইল? প্রত্নতাত্ত্বিকরা পর-মুণ্ড পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাইতেছেন না। আমি বলিতে পারি, কবে লোহার অস্ত্র ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সন-তারিখ দিয়া বলিতে পারিব না। সন-তারিখ তখনও তৈয়ার হয় নাই। তখন আমরা কাঁচা মাংস খাইতাম।

চারিদিকে পাহাড়ের গণ্ডী দিয়া ঘেরা একটি দেশ, মাঝখানে গোলাকৃতি সুবৃহৎ উপত্যকা। যজ্ঞবাড়ীতে কাঠের পরাতের উপর ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া ঘি ঢালিবার সময় তাহার মাঝখানে যেমন নামাল করিয়া দেয়, আমাদের পর্ব্বতবলয়িত উপত্যকাটি ছিল তাহারই একটি সুবিরাট সংস্করণ। আবার বিধাতা মাঝে মাঝে আকাশ হইতে প্রচুর ঘৃতও ঢালিয়া দিতেন; তখন ঘোলাটে রাঙ্গা জলে উপত্যকা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত। পাহাড়ের অঙ্গ বহিয়া শত নির্ঝরিণী সগর্জ্জনে নামিয়া আসিয়া সেই হ্রদ পুষ্ট করিত। আবার বর্ষাপগমে জল শুকাইত, কতক গিরিরন্ধ্রপথে বাহির হইয়া যাইত; তখন অগভীর জলের কিনারায় একপ্রকার দীর্ঘ ঘাস জন্মিত। ঘাসের শীর্ষে ছোট ছোট দানা ফলিয়া ক্রমে সুবর্ণ-বর্ণ ধারণ করিত। এই গুচ্ছ গুচ্ছ দানা কতক ঝরিয়া জলে পড়িত, কতক উত্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হংস আসিয়া খাইত! সে সময় জলের উপরিভাগ অসংখ্য পক্ষীতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিত এবং তাহাদের কলধ্বনিতে দিবারাত্রি সমভাবে নিনাদিত হইতে থাকিত। শীতের সময় উচ্চ পাহাড়গুলার শিখরে শিখরে তুলার মত তুষারপাত হইত। আমরা তখন মৃগ, বানর, ভল্লুকের চর্ম্ম গাত্রাবরণরূপে পরিধান করিতাম। গিরিকন্দরে তুষারশীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিত। পাহাড়ে শুষ্কতরুর ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অগ্নি তৈয়ার করিতে তখনও শিখি নাই। অগ্নিকে বড় ভয় করিতাম।

আমাদের এই উপত্যকা কোথায়, ভারতের পূর্ব্বে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস করিতাম; পর্ব্বতচক্রের বাহিরে কখনও যাই নাই, সেখানে কি আছে, তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ এই গিরিচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পাহাড়ে বানর, ভল্লুক, ছাগ, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু

বাস করিত, আমরা তাহাই মারিয়া খাইতাম ; ময়ূর-জাতীয় একপ্রকার পক্ষী পাওয়া যাইত, তাহার মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু ছিল। তাহার পুচ্ছ দিয়া আমাদের নারীরা শিরোভূষণ করিত। গাছের ফলমূলও কিছু কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহা যৎসামান্য ; পশুমাংসই ছিল আমাদের প্রধান আহার্য্য।

চেহারাও আহারের অনুরূপ ছিল। মাথায় ও মুখে বড় বড় জটাকৃতি চুল, রোমশ কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্য্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশী। এরূপ আকৃতির মানুষ আজকালও মাঝে মাঝে দু'একটা চোখে পড়ে, কিন্তু জামা-কাপড়ের আড়ালে স্বরূপ সহসা ধরা পড়ে না। তখন আমাদের জামা-কাপড়ের বালাই ছিল না, প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম্ম। তাহাও গ্রীষ্মকালে বর্জ্জন করিতাম, সামান্য একটু কটিবাস থাকিত।

আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী। তাম্রবর্ণা কৃশাঙ্গী ক্ষীণকটি। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে প্রস্তরফলকাগ্র বর্শা পঞ্চাশহস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ক লোহিত ফলের কর্ণাভরণ দুলাইয়া মৃদুগুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত। আমরা প্রস্তরপিণ্ডের অন্তরালে লুকাইয়া নিষ্পন্দবক্ষে শুনিতাম—বুকের মধ্যে নামহীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত!

এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র শ্বাপদের মত পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল—

কিন্তু গোড়া হইতে আরম্ভ করাই ভাল। কি করিয়া এই অর্দ্ধপশু জীবনের স্মৃতি জাগরূক হইল, পূর্ব্বে তাহাই বলিব।

* * * *

পূজার ছুটীতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রেলের চাকরীতে আর কোনও সুখ না থাক, ঐটুকু আছে—বিনা খরচে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া আসা যায়। আমি হিমালয়ের কোন্ দিকে গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই,—তবে সেটা দার্জ্জিলিং কিম্বা সিমলা পাহাড় নহে। যেখানে গিয়াছিলাম, সে স্থান আরও নির্জ্জন ও দুরধিগম্য ; রেলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দশ বারো মাইল রিক্‌শ কিম্বা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া উত্যক্ত পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না ; সচরাচর আশ্বিনমাসে পাহাড়ের অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু নহে। গিরিক্রোড়ের এই ক্ষুদ্র জনবিরল সহরটি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, মানুষের হাতের কায খুব কমই চোখে পড়ে। যে পথটি সর্পিল গতিতে কখনও উঁচু, কখনও নীচু হইয়া সহরটিকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাইন-গাছের শ্রেণীর দ্বারা তাহা এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহার শীর্ণ দেহটি সহসা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট পাথরের বাড়ীগুলি পাহাড়ের অঙ্গে মিশিয়া আছে। মাঝে মাঝে পাইনের জঙ্গল, তাহার মধ্যে পাথরের টুকরা বসাইয়া মানুষের বিশ্রামের স্থান করা আছে। রাত্রিকালে কচিৎ ফেউয়ের ডাক শুনা যায়। শীত চমৎকার উপভোগ্য।

সে দিন পাইন-গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধ-খানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইনবনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপী পরিয়াছিলাম। এ দেশের পাহাড়ীরা এই রকম টুপী তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটীতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জঙ্গলী শিকারীর চেহারা,—হাতে একটা ধনুক কিম্বা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাৎ থাকিত না।

এখানে আসিয়া অবধি কোনও বাঙ্গালীর মুখ দেখি নাই, অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হয় নাই, তাই একাকী ঘুরিতেছিলাম। বাহিরের শীত-শিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি আমাকে গভীর রাত্রিতে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিম্বা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া

এই অর্দ্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যেন যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মত ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

এ বন রাত্রিকালে খুব নিরাপদ নহে জানিতাম, ফেউয়ের ডাকও স্বকর্ণে শুনিয়াছি; কিন্তু তবু এক অদৃশ্য মায়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর একটি গাছের ছায়ায়, পাথরের বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসে গাছের পাতা অল্প নড়িতেছে; দু'একটা ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটীতে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া জগতে আর শব্দ নাই।

আমি ভিন্ন এ বনে আরও কেহ আছে; বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার যে ছক পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর একটি নিঃশব্দে সঞ্চরমাণ শুভ্র মূর্ত্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছিল। মূর্ত্তি কখনও তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল, কখনও অবাস্তব কল্পনার মত চন্দ্রালোক-কুহেলির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে একটি ক্ষীণ তন্দ্রামধুর কণ্ঠস্বর কাণে আসিতে লাগিল,—ঐ ছায়ামূর্ত্তি গান করিতেছে। গানের কথাগুলি ধরা গেল না, কিন্তু সুরটি পরিচিত, যেন পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছি। ঘুম-পাড়ানি ছড়ার মত সুর, কিন্তু প্রাণের সমস্ত তন্দ্রা চিরপরিচয়ের আনন্দে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে।

গান ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এই গান যতই কাছে আসিতে লাগিল, আমার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলেও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। সে অবস্থা বর্ণনা করি, এমন সাধ্য আমার নাই। সে কি তীব্র অনুভূতি। আনন্দের কোন উদ্দামতম অবস্থায় মানুষের শরীরে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে, জানি না, কিন্তু মনে হইল, দেহের স্নায়ুগুলা এবার অসহ্য হর্ষবেগে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইবে।—যে গান গাহিতেছিল, সে নারী এবং যে ভাষায় গান গাহিতেছিল, তাহা বাঙ্গালা, কিন্তু সে জন্য নহে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্য কারণ ছিল। এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি—বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেক শব্দটি আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাৎ এই যে, যে ভাষায় এ গান পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গালা ভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি! কিন্তু গান ভুলি নাই। কোথায় অন্তরের কোন্ নির্জ্জন কন্দরে এত কাল লুকাইয়া ছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মত জাগিয়া উঠিল। গানের কথাগুলি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়া অসংযুক্ত ছড়ার মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এক দিন উহারই ছন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিত। গানের কথাগুলা এইরূপ :—

'বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী
　　ধারালো তীর হেনে!
চাম্‌ড়া তাহার আমায় দেবে এনে
　　পরবো গায়ে আমি,
আমার চুলে বিনিয়ে দেব ওরে
　　তার ধনুকের ছিলা।
স্বামী আমার—নিটোল দেহ তার
　　কঠিন যেন শিলা।'

গায়িকা আরও কাছে আসিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোমাঞ্চিত-দেহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ওঃ, কত দিন, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল! আমার প্রিয়া—আমার সঙ্গিনী—আমার রুমা! এত দিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম?

যে তরুচ্ছায়ার নিম্নে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে গাহিতে গাহিতে ঠিক সেই ছায়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, চাঁদের দিকে চোখ তুলিয়া গাহিল,—

'স্বামী আমার, নিটোল দেহ তার
　　কঠিন যেন শিলা!'

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া আর আমার হৃদয় ধৈর্য্য মানিল না। আমি বাঘের মত লাফাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু সহসা কিছুই বলিতে পারিলাম না। যে ভাষায় কথা বলিতে চাই, সে ভাষার একটা শব্দও স্মরণ নাই! অবশেষে অতি কষ্টে যেন অর্দ্ধজ্ঞাত বিদেশী ভাষায় কথা কহিতেছি, এমনই ভাবে বাঙ্গালায় বলিলাম, "তুমি রুমা—আমার রুমা!"

তাহার গান থামিয়া গিয়াছিল, সে ভয়-বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে ? কে ?"

তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, "আমি, আমি ! রুমা, চিনতে পারছ না ?"

সভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে সে বলিল, "না। কে তুমি ? তোমাকে আমি চিনি না। হাত ছেড়ে দাও।"

জলবিম্ব যেমন তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, তেমনই এক মুহূর্তে আমার মোহ-বুদ্‌বুদ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বর্ত্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া লজ্জিত অপ্রতিভ-ভাবে বলিলাম, "মাপ করুন। আমার ভুল হয়েছিল।"

রুমা চিত্রার্পিতার মত স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার পানে চাহিলাম। এই আমার সেই রুমা ! পরিধানে শাদা শালের শাড়ী, আর একটি ত্রিকোণ শুভ্র শাল স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর ব্রূচ দিয়া আঁটা, পায়ে শাদা চামড়ার জুতা। মস্তক অনাবৃত, কালো কেশের রাশি কুণ্ডলিত আকারে গ্রীবামূলে লুটাইতেছে। মুখখানি কুমুদের মত ধবধবে শাদা, বয়স বোধ করি আঠারো উনিশের বেশী নহে। একটি তরুণী রূপসী শিক্ষিতা বাঙ্গালীর মেয়ে !

কিন্তু না, এ আমার সেই কথা ! যাহাকে আমি তাহার স্বজাতির ভিতর হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলাম, যে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এ সেই রুমা। আজ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে আমার কাছে আসিল, আমাকে সে চিনিতে পারিল না ?

আমার গলার পেশীগুলা সঙ্কুচিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল। আমি রুদ্ধস্বরে আবার বলিয়া উঠিলাম, "রুমা, চিনতে পারছ না ?"

রুমা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মোহাবিষ্ট স্বরে কহিল, "আমার নাম রমা।"

"না—না—না, তুমি রুমা ! আমার রুমা ! মনে নেই ? সেই গুহার মধ্যে আমরা থাক্‌তুম, ওপরে পাহাড়, নীচে উপত্যকা। তুমি গান গাইতে—যে গান এখনই গাইছিলে, সেই গান গাইতে ! মনে নেই ?"

রুমার দুই চক্ষু আরও তন্দ্রাতুর হইয়া আসিল। ঠোঁট দুটি একটু নড়িল,—"মনে পড়ে না—কবে— কোথায় !—"

মাথার টুপীটা অধীরভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আমি ব্যগ্রস্বরে কহিতে লাগিলাম,—"মনে পড়ে না ? সেই উপত্যকায় তোমরা এক দল যাযাবর এসেছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ ক'রে খেতে ও হ্রদের জলে যে লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরী করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে ! ভেড়ার লোম থেকে কাপড় বোনবার কৌশল যে আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলুম ! মনে পড়ে না ? এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম ! তোমার দলের সব পুরুষ ম'রে গেল ! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এইখানে মারলে—"

কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। আমার মনে ছিল না যে, কপালের ঠিক ঐ স্থানটিতেই আমার একটা রক্তবর্ণ জড়ুল আছে। কপালে হাত পড়িতেই স্মরণ হইল, নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। বহু পূর্ব্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "গাক্কা ! গাক্কা !"

গাক্কা ! হাঁ, ঐ বিকট শব্দটাই তখন আমার নাম ছিল। বজ্রকঠিন বন্ধনে তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া বলিলাম,—"হাঁ, গাক্কা—তোমার গাক্কা। চিনতে পেরেছ, রুমা ! ওঃ, আমার জন্মজন্মান্তরের রুমা !"

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। এক সময় সযত্নে তাহার মুখখানি বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলাম,—রুমা মূর্চ্ছা গিয়াছে।

* * * *

তিত্তিকে লইয়া হুড়ার সহিত আমার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিত্তিকে আমি ভালবাসিতাম না, তাহাকে দেখিলে আমার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছিল আমাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা যুবতী,—সুন্দরী-কুলের রাণী। আর আমি ছিলাম যুবকদের মধ্যে প্রধান, আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তিত্তিকে

যে আমিই গ্রহণ করিব, এ বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না—আমারও ছিল না।

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্যা যুবতী ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ডাইনী বুড়ী রিক্‌থা তাহার গুহার সম্মুখের উঁচু পাথরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত দিন গান করিত—

"আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মরবে—এ জাত মরবে! হে পাহাড়ের দেবতা, বর্ষার স্রোতে যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মরবে! মেয়ে নেই—মেয়ে নেই!"

রিক্‌থার দন্তহীন মুখের স্খলিত কথাগুলা গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী দৈববাণীর মত বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সঙ্গিনীর জন্য সকলে পরস্পর লড়াই করিত বটে, কিন্তু তিত্তির দেহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। দূর হইতে লোলুপ ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সকলে সরিয়া যাইত। তিত্তির রূপ দেখিবার মত বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নবপল্লবের মত বর্ণ, কালো হরিণের মত চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ—ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও ছিল অতিশয় চপল। সে নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরুবেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অজিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। বৃক্ষগুল্মের অন্তরাল হইতে অদৃশ্য চক্ষু তাহার নিরাবরণ দেহ বিদ্ধ করিত। কিন্তু তিত্তি দেখিয়াও দেখিত না—শুধু নিজ মনে অল্প অল্প হাসিত। সে ছিল কুহকময়ী চিরন্তনী নারী।

আমার মন ছিল শিকারের দিকে, তাই আমি তিত্তির চপলতা ও স্বৈরাচার গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ক্রমে আমারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার কারণ হুড়া। হুড়া ছিল আমারই মত এক জন যুবক, কিন্তু সে অন্যান্য যুবকদের মত আমাকে ভয় করিত না। সে অত্যন্ত হিংস্র ও ক্রূর-প্রকৃতির ছিল, তাই শক্তিতে আমার সমকক্ষ না হইলেও আমিও তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম। সে-ও আমাকে ঘাঁটাইত না, যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তিত্তিকে লইয়া সে এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, আমার অহঙ্কারে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে নিঃসঙ্কোচে তিত্তির পাশে গিয়া বসিত, তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, চুল ধরিয়া টানিত, তাহার কাণ হইতে পাকা বদরীফলের অবতংস দাঁত দিয়া খুলিয়া খাইয়া ফেলিত। তিত্তিও হাসিত, মারিত, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু সত্যকার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হুড়াকে নিরুৎসাহ করিত না।

এইরূপে হুড়ার সহিত আমার লড়াই অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সে দিন প্রকাণ্ড একটা বরাহের পিছনে পিছনে বহু ঊর্দ্ধে পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে তীর-ধনুক ছিল। কিন্তু বরাহটাকে মারিতে পারিলাম না। সিধা যাইতে যাইতে সহসা সে একটা বিবরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় চোখে পড়িল, নীচে কিছু দূরে একটি সমতল পাথরের উপর দুটি মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। স্থানটি এমনই সুরক্ষিত যে, উপর হইতে ছাড়া অন্য কোনও দিক্ হইতে দেখা যায় না। মানুষ দুটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। ইহারা কে, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তিত্তি এবং হুড়া! তিত্তির মাথা হুড়ার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, হুড়ার একটা হাত তিত্তির কোমর জড়াইয়া আছে। দুই জনে মৃদুকণ্ঠে হাসিতেছে ও গল্প করিতেছে।

আমি সাবধানে পিঠ হইতে হরিণের শিঙের তীরটি বাছিয়া লইলাম। এটি আমার সবচেয়ে ভাল তীর, আগাগোড়া হরিণের শিং দিয়া তৈয়ারী; যেমন ধারালো, তেমনই ঋজু। এ তীরের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ তিত্তি ও হুড়াকে এক তীরে গাঁথিয়া ফেলিব।

ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছি, এমন সময় তিত্তি মুখ ফিরাইয়া উপরদিকে চাহিল পরক্ষণেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইল। হুড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে হিংস্র জন্তুর মত দাঁত বাহির করিল। গর্জ্জন করিয়া কহিল, "গাক্কা, তুই চ'লে যা, আমার কাছে

আসিস না, আমি তোকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌ব।"

আমি ধনুঃশর ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম, হুড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্ব্বিতভাবে বলিলাম, "হুড়া, তুই পালিয়ে যা। আর যদি কখনও তিত্তির গায়ে হাত দিবি, তোর হাত-পা মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে পাহাড়ের ডগা থেকে ফেলে দেব। পাহাড়ের ফাঁকে ম'রে প'ড়ে থাকবি, শকুনি তোর পচা মাংস ছিঁড়ে খাবে।"

হুড়ার চোখ দু'টা রক্তবর্ণ হইয়া ঘুরিতে লাগিল, সে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল, "গাক্কা, তিত্তি আমার! সে তোকে চায় না, আমাকে চায়। তুই যদি তার দিকে তাকাস্, তোর চোখ উপড়ে নেব। কেন এখানে এসেছিস, চ'লে যা! তিত্তি আমার, তিত্তি আমার!" বলিয়া ক্রোধান্ধ হুড়া নিজের বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তুই তিত্তিকে আমার কাছ থেকে চুরি ক'রে নিয়েছিস। যদি পারিস, কেড়ে নে। আয়, লড়াই কর!"

হুড়া দ্বিতীয় আহ্বানের অপেক্ষা করিল না, বন্য শূকরের মত আমাকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই চত্বরের ন্যায় সমতল ভূমির উপর ঘোর যুদ্ধ বাধিল। দুটা ভল্লুক সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গেলে যে ভাবে যুদ্ধ করে, আমরাও সেই ভাবে যুদ্ধ করিলাম। সেই আদিম যুদ্ধ, যখন নখ-দন্ত ভিন্ন অন্য অস্ত্র প্রয়োজন হয় না। হুড়া কামড়াইয়া আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তিতে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে নিস্তেজ করিয়া আনিলাম। তার পর তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলাম।

নিকটেই এক খণ্ড পাথর পড়িয়া ছিল। দুই হাতে সেটা তুলিয়া লইয়া হুড়ার মাথা গুঁড়া করিয়া দিবার জন্য ঊর্দ্ধে তুলিয়াছি, হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া রাক্ষসীর মত তিত্তি আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। দুই হাতের আঙ্গুল আমার চোখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রখর দন্তে আমার একটা কাণ কামড়াইয়া ধরিল।

বিস্ময়ে যন্ত্রণায় আমি হুড়াকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিত্তি কিন্তু গিরগিটির মত আমার পিঠ আঁকড়াইয়া রহিল। চোখ ছাড়িয়া দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কাণ ছাড়িল না; ওদিকে হুড়াও ছাড়া পাইয়া সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল। দুই জনের মধ্যে পড়িয়া আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তিত্তিকে পিঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত-পা দিয়া সে এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া একবারে অসম্ভব। তাহার উপর কাণ কামড়াইয়া আছে, ছাড়ে না। এ দিকে হুড়া আমার পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডটা তুলিয়া লইয়া আমারই মস্তক চূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার আর সহ্য হইল না, রণে ভঙ্গ দিলাম। রাক্ষসীটাকে পিঠে করিয়াই পলাইতে আরম্ভ করিলাম।

অসমতল পাহাড়ের উপর একটা উলঙ্গ উন্মত্ত ডাকিনীকে পিঠে লইয়া দৌড়ানো সহজ কথা নহে। কিন্তু কিছু দূর গিয়া সে আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া পিঠ হইতে পিছলাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি আর ফিরিয়া তাকাইলাম না, পিছনে তিত্তি চীৎকার করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।

'গাক্কা ভীতু, গাক্কা কাপুরুষ। গাক্কা মরদ নয়! সে কোন্ সাহসে তিত্তিকে পেতে চায়! তিত্তি হুড়ার বৌ! হুড়া তিত্তিকে গাক্কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তিত্তির ভয়ে গাক্কা পালিয়েছে। গাক্কা ভীতু! গাক্কাকে দেখে সবাই হাসবে। গাক্কা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে না। গাক্কা কাপুরুষ! গাক্কা মরদ নয়।" তিত্তির এই তীব্র শ্লেষ রক্তাক্ত কর্ণে শুনিতে শুনিতে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলাম।

সেই দিন, সূর্য্য যখন উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িল, তখন আমি চুপি চুপি নিজের গুহা হইতে পাথরের ফলকযুক্ত বর্শাটি লইয়া গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিলাম। তিত্তিকে হারাইয়া আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু গ্রামের সকলে, যাহারা এত কাল আমাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিবে, তিত্তি করতালি দিয়া হাসিবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা গোষ্ঠী ত্যাগ করাই শ্রেয়। উপত্যকার

পরপারে ঐ যেখানে সূর্য্য ঢাকা পড়িল, ওখানে একটি ছোট গুহা আছে, এক দিন শিকার করিতে গিয়া উহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। গুহার পাশ দিয়া একটি সরু ঝরণা নামিয়াছে, তাহার জল চাক-ভাঙা মধুর মত মিষ্ট। ও দিকে শিকারও বেশী পাওয়া যায়। এ দিক্ হইতে তাড়া খাইয়া প্রায় সকল জন্তুই ও দিকে গিয়া জমা হয়, সুতরাং ঐখানে গিয়াই বাস করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, বুড়ী ডাইনী রিক্‌থা তাহার চাতালে বসিয়া গাহিতেছে—

"মেয়ে নেই! মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ক'রে মরছে। এ জাত বাঁচবে না। হে পাহাড়ের দেবতা, মেয়ে পাঠাও! মেয়ে পাঠাও।"

উপত্যকা পার হইয়া ও দিকের পাহাড়ে পৌঁছিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে, দুই তিন দিনের মধ্যেই নিটোল আকার ধারণ করিবে। এখন শরৎকাল, আকাশে মেঘ শাদা ও হাল্কা হইয়াছে, আর বৃষ্টি পড়ে না। উপত্যকার মাঝখানে হ্রদ, ঠিক মাঝখানে নহে, একটু পশ্চিম দিক্ ঘেঁষিয়া, তাহার কিনারায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। ঘাসের আগায় শীষ গজাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। আর কিছু দিন পরে ঐ শীষ পীতবর্ণ হইলে উত্তর হইতে পাখীরা আসিতে আরম্ভ করিবে।

হ্রদের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, হরিণের দল জল পান করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো চক্ চক্ করিয়া উঠিল। ক্রমে যেখানে আমার ক্ষীণা ঝরণাটি হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম। এ দিকে হ্রদের জল প্রায় পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ হাতের বেশী নহে। সম্মুখেই পাহাড়ের জঙ্ঘার একটা খাঁজের মধ্যে আমার গুহা। আমি ঝরণার পাশ দিয়া উঠিয়া যখন আমার নূতন গৃহের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চাঁদের অপরিপুষ্ট চক্রটি গুহার পিছনে উচ্চ পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইল।

নূতন গৃহে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আমি একাকী মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত দেখা হয় না—হরিণের অন্বেষণেও এ দিকে কেহ আসে না। তাহার প্রধান কারণ, পাহাড়-দেবতার করাল মুখের এত কাছে কেহ আসিতে সাহস করে না। আমাদের জাতির মধ্যে এই চক্রাকৃতি পর্ব্বতশ্রেণী একটি অতিকায় অজগর বলিয়া পরিচিত ছিল, এই অজগরই আমাদের পর্ব্বত-দেবতা। পর্ব্বত-দেবতার মুখ ছিল দংষ্ট্রাবহুল অন্ধকার একটা গহ্বর; বস্তুতঃ দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, যেন বিশাল শল্কাবৃত একটা সরীসৃপ কুণ্ডলিত হইয়া তাহার ব্যাদিত মুখটা মাটীর উপর রাখিয়া শুইয়া আছে। প্রাণান্তেও কেহ এই গহ্বর-মুখের কাছে আসিত না।

গ্রীষ্মের অবসানে যখন আকাশে মেঘ আসিয়া গর্জ্জন করিত, তখন আমাদের পাহাড়-দেবতাও গর্জ্জন করিতেন। উপত্যকা জলে ভরিয়া উঠিলে তৃষ্ণার্ত্ত দেবতা ঐ মুখ দিয়া জল শুষিয়া লইতেন। আমাদের গোষ্ঠী হইতে বর্ষা-ঋতুর প্রাক্‌কালে দেবতার প্রীত্যর্থ জীবন্ত জীবজন্তু উৎসর্গ করা হইত। দেবতার মুখের নিকটে কেহ যাইতে সাহসী হইত না—দূর হইতে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জন্তুগুলা ছাড়িয়া দিত! জন্তুগুলাও দেবতার ক্ষুধিত নিশ্বাসের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখে প্রবেশ করিত। দেবতা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করিতেন।

দেবতার এই ভোজনরহস্য কেবল আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, জন্তুগুলা কিছুকাল পরে দেবতার মুখ হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। পর্ব্বত-দেবতার মুখ যে প্রকৃতপক্ষে একটা বড় গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম; তাই তাহার নিকটে যাইতে আমার ভয় করিত না। একবার কৌতূহলী হইয়া উহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইলেও উহার ভিতরটা অত্যন্ত অন্ধকার, এ জন্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু রন্ধ্র যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই পাহাড়-দেবতার মুখ আমার গুহা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে উত্তরে পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এ প্রান্তে দেবতার ভয়ে কেহ আসে না, অথচ এ দিকে শিকারের যত সুবিধা, অন্য দিকে তত নহে। রাত্রিতে

ঝরণা ও হ্রদের মোহানায় লুকাইয়া থাকিলে যত ইচ্ছা শিকার পাওয়া যায়—শিকারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। আমার গুহাটি এমনই চমৎকার যে, অত্যন্ত কাছে আসিলেও ইহাকে গুহা বলিয়া চেনা যায় না। গুহার মুখটি ছোট—লতাপাতা দিয়া ঢাকা; কিন্তু ভিতরটি বেশ প্রশস্ত। ছাদ উচু—দাঁড়াইলে মাথা ঠেকে না; মেঝেটি একটি আস্ত সমতল পাথর দিয়া তৈয়ারী। তাহার উপর লম্বাভাবে শুইয়া রন্ধ্রপথে মুখ বাড়াইলে সমস্ত উপত্যকাটি চোখের নীচে বিছাইয়া পড়ে। শীতের সময় একটা পাথর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুহামুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে হিংস্রজন্তুর অতর্কিত আক্রমণও এই উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়।

এইখানে নিঃসঙ্গ শান্তিতে আমার কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আবার ক্ষীণ হইতে হইতে এক দিন মিলাইয়া গেল। হ্রদের কিনারায় লম্বা ঘাসের শস্য পাকিয়া রং ধরিতে আরম্ভ করিল। পাখীর ঝাঁক একে একে আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতে লাগিল, তাহাদের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি আমার নিশীথ নিদ্রাকে মধুর করিয়া তুলিল।

এক দিন অপরাহ্ণে, আমার গুহার পাশে ঝরণা যেখানে পাহাড়ের এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে লাফাইয়া পড়িয়াছে, সেই পৈঠার উপর বসিয়া আমি একটা নূতন ধনুক নির্ম্মাণ করিতেছিলাম। দুই দিন আগে একটা হরিণ মারিয়াছিলাম; তাহারই অন্ত্রে ধনুকের ছিলা করিব বলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ে একপ্রকার মোটা বেত জন্মে, তাহাতে খুব ভাল ধনুক হয়, সেই বেত একটা ভাঙ্গিয়া আনিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত আমার বর্শার ধারালো পাথরের ফলা দিয়া তাহারই দুই দিকে গুণ লাগাইবার খাঁজ কাটিতেছিলাম। অস্তমান সূর্য্যের আলো আমার ঝরণার জলে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছিল; নীচে হ্রদের জলে পাখীগুলি ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝরণার চূর্ণ জলকণা নীচের ধাপ হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া অত্যন্ত মিঠাভাবে আমার অনাবৃত অঙ্গে লাগিতেছিল। মুখ নত করিয়া আমি আপনমনে ধনুকে গুণ-সংযোগে নিযুক্ত ছিলাম।

হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব্ব চিঁহি চিঁহি শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মত একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।

আগন্তুকগণ বহু নিম্নে উপত্যকায় ছিল, অত দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আমি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া ঝরণার তীর হইতে আমার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম। গুহার মধ্যে লুকাইয়া দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া নবাগতদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

মানুষ হইলেও ইহারা যে আমার সগোত্র নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাহিরের কোনও অজ্ঞাত জগৎ হইতে রন্ধ্রপথে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। কিন্তু যেখান হইতেই আসুক, এমন আশ্চর্য্য চেহারা ও বেশভূষা যে হইতে পারে, তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। জন্তুদের কথা পরে বলিব, প্রথমে মানুষগুলার কথা বলি। এই মানুষগুলার গায়ের রং আমাদের মত মধুপিঙ্গল বর্ণ নহে—ধবধবে শাদা। ইহাদের চুল সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ অতিশয় দীর্ঘ ও সুগঠিত। পশুচর্ম্মের পরিবর্ত্তে ইহাদের দেহ একপ্রকার শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহারা সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত জন ছিল, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক নারী। নারীগণও পুরুষদের মত উজ্জ্বল কেশযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি। তাহারা বস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের হাতে ধনুর্ব্বাণ ও ভল্ল আছে, ভল্লের ফলা সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করিতেছে। বর্শার ফলা এমন ঝক্‌মক্ করিতে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

ইহাদের সঙ্গে তিন প্রকার জন্তু রহিয়াছে। প্রথমতঃ একপ্রকার বিশাল অথচ শীর্ণকায় জন্তু,—তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ দেহ আশ্চর্য্যভাবে ঢেউখেলানো। দেহের সন্ধিগুলা যেন অত্যন্ত অযত্ন সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে, মুখ কদাকার। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। ইহাদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার দ্রব্য চাপানো রহিয়াছে। উদ্গ্রীবভাবে গলা বাড়াইয়া

ইহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় জন্তু ইহাদের অপেক্ষা অনেক ছোট,—তাহাদের দেহ রোমশ ও রক্তবর্ণ, আঁটসাঁট মজবুত গঠন। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু বহু মনুষ্য-শিশুও ইহাদের পিঠের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। এই জন্তুগুলাই গুহামুখ হইতে হ্রদ দেখিয়া অদ্ভুত শব্দ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে কতকটা পাহাড়ী ছাগের মত, কিন্তু ইহাদের দেহ ঘন রোমে আবৃত। এমন কি, ইহাদের রোম পেটের নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহারা একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চলিয়াছে ও মাঝে মাঝে 'ব্যা ব্যা' শব্দ করিতেছে।

এই সকল জন্তুর আচরণে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ইহারা মানুষ দেখিয়া তিলমাত্র ভয় পাইতেছে না বা পলায়ন করিতেছে না, বরং মানুষের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। মানুষ ও বন্য পশুর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে এই প্রথম দেখিলাম।

আগন্তুকের দল গুহাবিবর হইতে বাহির হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষগুলা হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গী করিতেছিল ও উত্তেজিতভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা এত দূর হইতে শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহারা এই উপত্যকার সন্ধান পাইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহাদের মধ্যে এক জন হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তারস্বরে একটা শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতেছিল, শুধু তাহাই ক্ষীণভাবে কাণে আসিল—"বিহি! বিহি!" বোধ হইল, যেন হ্রদের ধারে লম্বা ঘাসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথাটা বলিতেছে।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া কিছুক্ষণ কি জল্পনা করিল, তার পর সদলবলে আমার ঝরণার মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহারা এই স্থানেই ডেরা ডাণ্ডা গাড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দিবাশেষের নির্ব্বাপিত-প্রায় আলোকে ইহারা ঠিক আমার গুহার নিম্নে—ঝরণার জল যেখানে পাহাড় হইতে নামিয়া স্বচ্ছ অগভীর স্রোতে উপত্যকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া হ্রদের জলে মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পশুগুলির পৃষ্ঠ হইতে ভার নামাইল। ভারমুক্ত পশুগুলি ঝরণার প্রবাহের পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্ত্তভাবে জল পান করিতে লাগিল।

ইহারা আমার এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এই প্রদোষালোকেও আমি প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। আমার গুহা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বোধ করি, তাহাদের মাথায় ফেলিতে পারিতাম। তাহাদের কথাবার্ত্তাও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু এক বর্ণও বোধগম্য হইতেছিল না।

রাত্রি হইল। তখন ইহারা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার করিল। এক খণ্ড পাথরের সহিত আর এক খণ্ড অজ্ঞাত পদার্থ ঠোকা-ঠুকি করিয়া স্তূপীকৃত শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নি জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে সেই অঙ্গারে মাংস পুড়াইয়া সকলে আহার করিতে লাগিল। দগ্ধ মাংসের এক প্রকার অপূর্ব্ব গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জিহ্বাকে লালায়িত করিয়া তুলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ইহারা পশুগুলির দ্বারা অগ্নির চারি পাশে একটি বৃহৎ চক্রব্যূহ রচনা করিল। তার পর সেই চক্রের ভিতর অগ্নির পাশে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল এক জন লোক ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া ব্যূহের বাহিরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ইহারা ঘুমাইল বটে, কিন্তু বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। এই বিচিত্র জাতির অতি বিস্ময়কর আচার-ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আগন্তুকরা কাযে লাগিয়া গেল। ইহারা অসাধারণ উদ্যমী; এক দল পুরুষ উপত্যকার উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের টুক্‌রা গড়াইয়া আনিয়া প্রাচীর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল, আর এক দল ধনুর্ব্বাণ-হস্তে শিকারের অন্বেষণে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অবশিষ্ট অল্পবয়স্ক বালকগণ পশুগুলাকে লইয়া উপত্যকার বাষ্পাচ্ছাদিত অংশে চরাইতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকরাও অলসভাবে বসিয়া রহিল না, তাহারা হ্রদের জলে নামিয়া লম্বা ঘাসের পাকা শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল।

এইরূপে মৌমাছি-পরিপূর্ণ মধুচক্রের মত এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ম্মপ্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে চক্রাকৃতি প্রস্তর-প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রাচীর কোমর পর্য্যন্ত উঁচু হইল। কেবল হ্রদের দিকে দুই হস্ত-পরিমিত স্থান নির্গমনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় শিকারীরা একটা বড় হরিণ ও দুইটা শূকর মারিয়া বর্শাদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া আসিল। তখন সকলে আনন্দ-কোলাহল সহকারে অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস দগ্ধ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

আর একটা অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। নারীগণ এক প্রকার বর্ত্তুলাকৃতি পাত্র কক্ষে লইয়া ঝরণার তীরে আসিতেছে এবং সেই পাত্রে জল ভরিয়া পুনশ্চ কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা কেহই ঝরণায় মুখ ডুবাইয়া কিম্বা অঞ্জলি করিয়া জল পান করে না, প্রয়োজন হইলে সেই পাত্র হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আর একটা রাত্রি কাটিয়া গেল, নবাগতগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই উপত্যকাটি তাহাদের বড়ই পছন্দ হইয়াছে; সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আশু অভিপ্রায় তাহাদের নাই। আর একটা মনুষ্য জাতি যে সন্নিকটেই বাস করিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই, এবং সেই জাতির এক পলাতক যুবা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া অহরহঃ তাহাদের গতিবিধি কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহা সন্দেহ করিবারও কোনও উপলক্ষ হয় নাই। দিনের বেলা আলো থাকিতে আমি কদাচ গুহা হইতে বাহির হইতাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। বরাহ-দন্তের মত বাঁকা চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিল।

ইহাদের মধ্যে যে সব রমণী ছিল, তাহারা সকলেই সমর্থা; বৃদ্ধা বা অকর্ম্মণ্য কেহ ছিল না। নারীগণ অধিকাংশই সন্তানবতী এবং কোনও না কোনও পুরুষের বশবর্ত্তিনী; কিন্তু কয়েকটি আসন্ন-যৌবনা কিশোরী কুমারীও ছিল। ইহাদের ভিতর একটি কিশোরী প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই কিশোরীর নাম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম,—রুমা। রুমা বলিয়া ডাকিলেই সে সাড়া দিত। রুমার রূপ কেমন ছিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না, যে চোখে দেখিলে নিরপেক্ষ রূপবিচার সম্ভব হয়, আমি তাহাকে সে চোখে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিলাম যৌবনের চক্ষু দিয়া—লোভের চক্ষু দিয়া। আমার কাছে সে ছিল আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মত সুন্দর। তিত্তি তাহার পায়ের নখের কাছে লাগিত না।

এই রুমার চরিত্র অন্যান্য বালিকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিল। কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে প্রায় যৌবনের প্রান্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তাই তাহার চরিত্রে উভয় অবস্থার বিচিত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে যথারীতি কাষ করিত বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই লুকাইয়া খেলা করিয়া লইত। তাহার সঙ্গিনী বা সখী কেহ ছিল না, সে একাকী খেলা করিতে ভালবাসিত। কখনও হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইত। তাহাকে আসিতে দেখিয়া জলে ভাসমান পাখীগুলি উড়িয়া আর এক স্থানে গিয়া বসিত। সে জলে ডুব দিয়া একবারে তাহাদের মধ্যে গিয়া মাথা তুলিত, তখন পাখীরা ভয়সূচক শব্দ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

কিন্তু এ খেলাও তাহার মনঃপূত হইত না। কারণ, তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বালক-বালিকারা জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিত। সে তখন জল হইতে উঠিয়া সিক্ত কেশজাল হইতে জলবিন্দু মোচন করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিত।

কখনও একটু অবসর পাইলে সে চুপি চুপি কোনও পুরুষের পরিত্যক্ত ধনুর্ব্বাণ লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যাইত। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইতাম না, তার পর আবার সে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত। দেখিতাম, চুলে বনফুলের গুচ্ছ পরিয়াছে, কর্ণে পক্ক ফলের দুল দুলাইয়াছে, কটিতে পুষ্পিত লতা জড়াইয়া দেহের অপূর্ব্ব প্রসাধন করিয়াছে। ভীরু হরিণীর মত এদিকে ওদিকে চাহিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিত, তার পর ঈষৎ হাসিয়া ত্রস্ত-চকিত-পদে প্রস্থান করিত। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সকলের অজ্ঞাতে একাকিনী কোনও কাষ করিতে পারিলেই সে খুসী হয়। ইহা যে তাহার বয়ঃসন্ধির একটা

স্বভাবধর্ম্ম, তাহা তখনও বুঝি নাই। কিন্তু আমার ব্যগ্র লোলুপ চক্ষু সর্ব্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিত। এমন কি, রাত্রিকালে প্রস্তর-ব্যূহের মধ্যে ঠিক কোন্ স্থানটিতে সে শয়ন করিয়া ঘুমায়, তাহা পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

পাখীরা যেমন খড়কুটা দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ার করে, ইহারাও তেমনই গাছের ডালপালা দিয়া ব্যূহের মধ্যে একপ্রকার কোটর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয়, অধিক শীতের সময় উহার মধ্যে রাত্রিবাস করিবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সেগুলির নির্ম্মাণ তখনও শেষ হয় নাই, তাই উপস্থিত মুক্ত আকাশের তলেই শয়ন করিতেছিল।

ইহাদের আগমনের পঞ্চম দিনই বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমার মনের মধ্যে যে অভিসন্ধি কয়েক দিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই দিন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যে তাহা এমন অচিন্তনীয়ভাবে ফলবান্ হইয়া উঠিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? আগন্তুকদের নির্ভয় অসন্দিগ্ধ চিত্তে কোনও অমঙ্গলের ছায়াপাত পর্য্যন্ত হয় নাই। এ রাজ্যে যে অন্য মানুষ আছে, এ সন্দেহই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

সে দিন দ্বিপ্রহরে পুরুষরা সকলে নানা কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। এক দল শিকারে বাহির হইয়াছিল, আর এক দল কাষ্ঠ আহরণের জন্য পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকরা পশুগুলিকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল। নারীগণ শিশু কোলে লইয়া অর্দ্ধ-নির্ম্মিত দারু-কোটরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। হ্রদের জলে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল ও জল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উত্থিত হইতেছিল।

আমি অভ্যাসমত গুহামুখে শয়ান হইয়া ভাবিতেছিলাম, রুমাকে যদি হাতের কাছে পাই, তাহা হইলে চুরি করি। রাত্রিতে যে সময় উহারা ঘুমায়, সে সময় যদি চুরি করিয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু একটা লোক সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়, তাহার উপর আবার আগুন জ্বলে। লোকটাকে তীর মারিয়া নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতে পারি—কেহ জানিবে না; কিন্তু আগুনের আলোয় চুরি করিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাইব। তার চেয়ে রুমাকে কোনও সময়ে যদি একলা পাই,—সন্ধ্যার সময় নির্জ্জনে যদি আমার গুহার কাছে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করি। এ গুহা ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া এমন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি যে, তাহার জাতি-গোষ্ঠীর কেহ আমাদের খুঁজিয়া পাইবে না।

সূর্য্যতাপে গুহার বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণা-বোধ করিতে লাগিলাম। পাশেই নির্ঝরিণী, গুহা হইতে বাহির হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেই শীতল জল পাওয়া যায়। কিন্তু গুহার বাহিরে যাইলে পাছে নিম্নস্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বাহির হইলাম। উঠিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব, দাঁড়াইলেই এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝরণার দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া দ্রুত নিজের কোটরে ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম।

ঝরণার ধার দিয়া দিয়া রুমা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহামুখের লতাপাতার আড়ালে থাকিয়া আমি স্পন্দিত-বক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সে ধাপে ধাপে লাফাইয়া যেখানে ঝরণার জল প্রপাতের মত নীচে পড়িয়াছে, সেই-খানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার গুহার পাশেই ঝরণার জল প্রপাতের মত নীচে পড়িয়াছে। যেখানে এই প্রপাত সবেগে উচ্ছলিত হইয়া পতিত হইয়াছে, সেইখানে পাথরের মাঝখানে একটি গোলাকার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাতিগভীর গর্ত্তটি পরিপূর্ণ করিয়া স্বচ্ছ জল আবার নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রুমা এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সতর্কভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে বর্ত্তুলাকৃতি জলপাত্রটি নামাইয়া রাখিল, তার পর ধীরে ধীরে দেহের বস্ত্র উন্মোচন করিতে লাগিল।

সন্দিগ্ধচিত্ত হরিণীর পানে অদূরবর্ত্তী চিতাবাঘ যেরূপ লোলুপ ক্ষুধিতভাবে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকিরণে তাহার শুভ্র যৌবনকঠিন দেহ হইতে যেন লাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সে অলসভাবে দুই

হাত তুলিয়া তাহার সোমলতার মত উজ্জ্বল কেশজাল জড়াইতে লাগিল। তার পর শূকরদন্তের মত বাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ঝক্‌ঝকে অস্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্রের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

এইরূপে কুণ্ডলিত কুন্তলভার সম্বরণ করিয়া রুমা শিলা-পট্টের উপর হইতে ঝুঁকিয়া বোধ করি জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিল। তার পর হর্ষসূচক একটি শব্দ করিয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

দুর্নির্ব্বার কৌতূহল ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ইহারা যে দিন প্রথম আসে, সে দিন আমি যে শিলা-পৈঠার উপর বসিয়া ধনুকে গুণ সংযোগ করিতেছিলাম, গিরৃগিটির মত গুড়ি মারিয়া সেই পৈঠার উপর উপস্থিত হইলাম. ইহার দশ হাত নীচেই জলের কুণ্ড। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, রুমা আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজের ভাষায় গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছে।

নির্নিমেষ-নয়নে এই নিভৃত স্নানরতার পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, বলিতে পারি না। অগ্নিগর্ভ মেঘ আমার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিতে লাগিল।

ক্রীড়াচ্ছলে দুই হাতে জল ছিটাইতে ছিটাইতে হঠাৎ এক সময় রুমা চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গান ও হস্তসঞ্চালন একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। আমার বুভুক্ষু ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার বিস্ফারিত ভীত চক্ষু কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিল। তার পর অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে জল হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

এই সুযোগ! আমি আর দ্বিধা না করিয়া উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলাম। রুমা তখনও জল হইতে উঠিতে পারে নাই, জল-কন্যার মত সিক্ত শীতল দেহ আমি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম।

কিন্তু সিক্ত পিচ্ছিলতার জন্যই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে তাহার দেহটিকে সংসর্পিত বিভঙ্গিত করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইল, তার পর বিদ্যুদ্বেগে তীরে উঠিয়া এক হস্তে ভূপতিত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া পশ্চাদ্দিকে একটা ভয়চকিত দৃষ্টি হানিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ব্যর্থ-মনোরথে নিজের গুহায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, নিম্নে ভীষণ গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। অসম্বৃত-বস্ত্রা রুমা নারীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছে এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া উপরদিকে দেখাই-তেছে। নারীগণ সমস্বরে কলরব করিতেছে। ইতিমধ্যে এক দল পুরুষ ফিরিয়া আসিল। তাহারা রুমার বিবৃতি শুনিয়া তীর-ধনুক ও বল্লম হস্তে দলবদ্ধভাবে আমার গুহার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এ স্থানে থাকা আর নিরাপদ নহে দেখিয়া আমি গুহা ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। গাছ-পালার আড়ালে লুকাইয়া, পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরিয়া বহুদূর দক্ষিণে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর এতদূর পর্য্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করিবে না ঝুঝিয়া এক ঝোপের মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইখানে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে উদয় হইল। তীর-বিদ্ধের মত আমি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—এ কথা এত দিন মনে হয় নাই কেন? শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের গ্রামের কিনারায় আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন গোধূলি আগতপ্রায়। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, ডাইনী বুড়ী রিক্‌থা গাহিতেছে—

'রাত্রিতে পাহাড়-দেবতার মুখে আগুন জ্বলে। কেউ দেখে না, শুধু আমি দেখি। দেবতা কি চায়? মানুষ চায়—মানুষের তাজা রক্ত চায়! এ জাত বাঁচবে না, এ জাত মরবে! দেবতা রক্ত চায়—জোয়ানের তাজা রক্ত! কে রক্ত দেবে—কে দেবতাকে খুসী করবে? এ জাত মরবে—মেয়ে নেই! এ জাত মরবে—দেবতা রক্ত চায়! হে দেবতা, খুসী হও, তোমার মুখের আগুন নিভিয়ে দাও! মেয়ে পাঠাও! মেয়ে পাঠাও!'

রিক্‌থার গুহা গ্রামের একপ্রান্তে, আমি চুপি চুপি পিছন হইতে গিয়া তাহার কাণের কাছে বলিলাম,—"রিক্‌থা, দেবতা তোর কথা শুনেছে—মেয়ে পাঠিয়েছে।"

রিক্‌থা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল,—"গাক্কা! তুই ফিরে এলি? ভেবেছিলাম, দেবতা তোকে নিয়েছে।—কি বল্লি —আমার কথা দেবতা শুনেছে?"

"হ্যাঁ, শুনেছে। দেবতা অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে। শোন রিক্‌থা, গাঁয়ের ছেলেদের গিয়ে বল যে, পাহাড়-দেবতার

মুখ থেকে একপাল মানুষ বেরিয়েছে—তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক মেয়ে। রাত্রিতে উপত্যকার ও-ধারে যেখানে আগুন জ্বলে, সেইখানে ওরা থাকে। মেয়েদের চেহারা ঠিক ঐ চাঁদের মত,—নীল তাদের চোখ, চুলে আলো ঠিকরে পড়ে। আমি দেখেছি। তুই ছেলেদের বল, যদি বৌ চায়, আমার সঙ্গে আসুক। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের গাঁয়ে যত জোয়ান আছে, সবাইকে ডাক ; আজ রাত্তিরেই আমরা পুরুষগুলোকে মেরে ফেলে মেয়েদের কেড়ে নেব।"

আকাশের খণ্ডচন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই শত জোয়ান অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিঃশব্দে আগন্তুকদের গৃহপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীরের মধ্যে সকলে সুপ্ত—কোথাও শব্দ নাই। ধুনীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া সূক্ষ্ম ভস্ম আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহারই অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, ছায়ামূর্ত্তির মত চারি জন প্রহরী সশস্ত্রভাবে প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম, আজ দ্বিপ্রহরে আমাকে দেখিবার পর ইহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। আমরা চারি জন তীরন্দাজ এক একটি প্রহরীকে বাছিয়া লইলাম। একসঙ্গে চারিটি ধনুকে টঙ্কার-ধ্বনি হইল—অন্ধকারে চারিটি তীর ছুটিয়া গেল। আমার তীর প্রহরীর কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। নিঃশব্দে প্রহরী ভূপতিত হইল।

তার পর বিকট কোলাহল করিয়া সকলে প্রাচীর আক্রমণ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতা সহসা শতধা ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি জানিতাম, ব্যূহের কোন্ দিকে রুমা শয়ন করে। আমি সেই দিকে গিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলাম, ভিতরে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া গৃহ-প্রাচীরের দিকে ছুটিতেছে। এক জন পুরুষ দীর্ঘ অস্ত্রের আঘাতে ভস্মাচ্ছাদন দূর করিয়া দিল, অমনই লেলিহান অগ্নির আরক্তচ্ছটায় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার পর রুমাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন সে সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া হতবুদ্ধির মত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার চারিপাশে সদ্যোত্থিতা নারীগণ আর্ত্ত-ক্রন্দন করিতেছে। আমি লাফাইয়া গিয়া তার উপর পড়িলাম, তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রাচীরের দ্বারের দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। কয়েক পদ যাইতে না যাইতে দেখিলাম, এক জন পুরুষ শাণিত দীর্ঘ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। রুমাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। আমার হাতে অস্ত্র ছিল না, ক্ষিপ্রহস্তে মাটী হইতে এক খণ্ড পাথর তুলিয়া লইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারিলাম। মস্তকে আঘাত লাগিয়া সে মৃতবৎ পড়িয়া গেল। রুমা চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া ছুটিলাম।

আমাদের দলের অন্য সকলে তখন প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে—ব্যূহের কেন্দ্রমূলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দুই পক্ষেরই মানুষ পড়িতেছে, মরিতেছে—কেহ আহত হইয়া বিকট কাতরোক্তি করিতেছে। আমি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে জীবিত কেহ নাই, কয়েকটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এমন সময় রুমা সহসা যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল, নিজের কেশের মধ্যে হাত দিয়া সেই উজ্জ্বল বাঁকা অস্ত্রটা বাহির করিল, তার পর ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া আমার কপালের পাশে সজোরে বসাইয়া দিল।

কপাল হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহার হাত হইতে অস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে মাটীতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—"তুই আমার বৌ! তুই আমার রুমা! এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমার ক'রে নিলাম।" বলিয়া আমার ললাটস্রুত রক্ত হাতে করিয়া তাহার কপালে চুলে মাখাইয়া দিলাম।

ও-দিকে তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—বিপক্ষ দলের একটি পুরুষও জীবিত নাই। আমাদের দলের যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা রক্তলিপ্ত-দেহে উন্মত্ত গর্জ্জন করিয়া নারীদের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। *

* মাসিক বসুমতীর কার্ত্তিক সংখ্যায় শরদিন্দু বাবুর 'মরণ ভোমরা' নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে, লেখক জানাইয়াছেন, তাহা 'কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে' রচিত নহে—তাঁহার মৌলিকরচনা।— মাঃ বঃ সঃ

সিংহের মেলা

(শিকার-কাহিনী)

বৃটিশ মধ্য-আফ্রিকায় নিয়াসাল্যাণ্ড নামক একটি প্রদেশ আছে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের এক দিন অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে একখানি লরী কতকগুলি মালপত্রের বোঝাই লইয়া নিয়াসাল্যাণ্ডের একটি মেঠো পথ দিয়া গন্তব্য স্থলে ধাবিত হইতেছিল—সেই সময় স্থানীয় সর্দ্দার সেই লরীর শ্বেতাঙ্গ চালককে কোন কথা বলিবার জন্য লরী থামাইতে ইঙ্গিত করিল। লরীর চালকই সেই লরীর মালিক, তাহার নাম উ—। উ—নবীন যুবক, তাহার বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক নহে। আমাদের দেশের যুবকরা যে বয়সে বি, এ, পাশ করিয়া জীবিকার সংস্থানের অভাবে 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে' মহা উৎসাহে সরকারী দপ্তরখানায় চাকরীর উমেদারীতে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই বয়সে উ—নিজের চেষ্টায় নিয়াসাল্যাণ্ডের গহন-কাননে তামাকের আবাদ করিতেছিল। সে তখন সেই কৃষি-ক্ষেত্রের মালিক। তাহার আবাদের বারো মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না।

উ—সর্দ্দারের ইঙ্গিতে লরী থামাইয়া তাহার নিকট শুনিতে পাইল, তাহার বস্তীর অদূরে একটি সিংহ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে খড়ের মাঠে আগুন লাগিয়াছিল—সেই আগুনে সিংহটা আধপোড়া হইয়াছিল, এ জন্য সর্দ্দার অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; কারণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত জনশ্রুতি যে, সিংহ কোনরূপে আহত হইলে তাহার নরমাংস-ভোজনের স্পৃহা প্রবল হয় এবং সমগ্র জিলার অধিবাসিগণের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে। তামাকের আবাদের মালিক উ-জানিত, গ্রাম্য সর্দ্দার গাওয়ালীর এ কথা অত্যুক্তি নহে। এই জন্য সিংহটা নর-শোণিতের আস্বাদন লাভ করিয়া অধিকতর ভয়াবহ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য গাওয়ালী উ—কে অনুরোধ করিল? উ—তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিল—সন্ধ্যা-সমাগমের আর বিলম্ব নাই, সেই রাত্রিতে সিংহ-শিকারের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না, পরদিন প্রভাতে সেই গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সিংহ-শিকারের চেষ্টা করিবে।

উ—সেই রাত্রিতে তাহার বাংলোয় ফিরিয়া আসিয়া শিকারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আশ্রিত বন্দুকধারীদের বন্দুকও শিকারের জন্য প্রস্তুত রাখিতে বলিল, কি প্রণালীতে শিকার আরম্ভ করা হইবে—তৎসম্বন্ধেও দীর্ঘকাল ধরিয়া পরামর্শ চলিল।

পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশ অনুদিত অরুণের সুলোহিত কিরণে সুরঞ্জিত হইবামাত্র উ—শয্যাত্যাগ করিয়া সদলে গাওয়ালীর গ্রামে যাত্রা করিল। সে সেই গ্রামে প্রবেশ করিতেই গ্রামবাসীরা মহানন্দে 'মর্ণিং বাওয়ানা!' বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। গ্রাম্য সর্দ্দার গাওয়ালী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, শিকারী দলকে পরবর্ত্তী বস্তীতে যাইতে হইবে; কারণ, সেই বস্তীর এক জন গৃহস্থ সিংহটার আশ্রয়স্থানের সন্ধান জানিত। গাওয়ালী পরবর্ত্তী গ্রামে যাইবার পথ দেখাইলে উ—সদলে সেই পথে যাত্রা করিল।

উ—প্রধান শিকারী, সে সর্ব্বাগ্রে চলিল; তাহার বেতন-ভোগী বন্দুকধারীদের সর্দ্দার তাহার ঠিক পশ্চাতে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল। অন্য সকলে তাহাদের উভয়ের অনুগমন করিতে লাগিল। পাঁচ জন শিকারী লইয়া এই দল গঠিত হইয়াছিল। উ—স্বয়ং, তাহার তিন জন বন্দুকধারী অনুচর এবং গ্রাম্য সর্দ্দার গাওয়ালী। তাহারা যে পথে চলিল, তাহার উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ তৃণরাশিপূর্ণ প্রান্তর; তাহারা সেই তৃণরাশির ভিতর দিয়া প্রায় চারি শত গজ অতিক্রম করিয়াছে, সেই সময় উ—এর পশ্চাদ্বর্ত্তী বন্দুকধারী সহসা তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ষাট গজ দূরবর্ত্তী তৃণবিহীন এক খণ্ড ফাঁকা জমীর দিকে নিঃশব্দে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল!

উ—নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বৃহৎ সিংহ দেখিতে পাইল, সেটা তখন সেই ফাঁকা ময়দানে প্রবেশ করিতেছিল। সেই সিংহটাকে নিশানা করিয়া গুলীবর্ষণ করিবার জন্য সেই দিকে আর কত দূর অগ্রসর হওয়া উচিত—এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উ—সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই আর একটা সিংহকে সেই ফাঁকা ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল।

উ—দুইটি সিংহকে অত্যল্পকালের ব্যবধানে সেই ফাঁকা ময়দানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাইফেলটি তুলিয়া লইয়া প্রথমোক্ত সিংহের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিল। রাইফেলের গম্ভীর গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি ধরাশায়ী হইল। রাইফেলের গম্ভীর নির্ঘোষে দ্বিতীয় সিংহটি ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে তৃণরাশির অন্তরালে অদৃশ্য হইল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আর একটি সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত! দ্বিতীয় সিংহটি পলায়নের পূর্ব্বে উ—ক্ষিপ্রহস্তে তাহার দেহে দুইটি গুলীবর্ষণ করিয়াছিল, তথাপি সে অদূরবর্ত্তী তৃণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৃতীয় সিংহও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

প্রথম সিংহটি উ—র অব্যর্থ গুলীতে 'পপাত চ' হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'মমার চ' হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল। সে সেই ফাঁকা মাঠের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইতেই দেখিল—'উরুভঙ্গ কুরুরাজ' খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অন্য দিকের তৃণক্ষেত্রে আশ্রয় লইতে যাইতেছেন! তাঁহার একখানি ঠ্যাং গুলীর আঘাতে জখম হওয়ায় কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার উত্থানশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অন্য তিনখানি পদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকায় তিন পায়ে ভর দিয়া তিনি এরূপ বেগে সুদীর্ঘ তৃণরাশির ভিতর অদৃশ্য হইলেন যে, উ—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দেহে দ্বিতীয় গুলী বিদ্ধ করিতে পারিল না। শিকারী বেচারা সেই স্থানে হতভম্বভাবে

দাঁড়াইয়া পস্তাইতে লাগিল। সিংহটা খোঁড়া হইয়া যে সময় মাঠে পড়িয়াছিল, সেই সময় সে যদি তাহার দেহ লক্ষ্য করিয়া আর এক গুলী মারিতে পারিত, তাহা হইলে আর তাহাকে উঠিতে হইত না। কিন্তু সে চেষ্টা না করিয়া দ্বিতীয় সিংহকে দুই গুলী মারিল, তথাপি সে পলায়ন করিল, তৃতীয়টি অক্ষত-দেহে তাহাকে কদলী প্রদর্শন করিল, এবং যাহার মৃত্যু সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, তাহাকেও আয়ত্ত করিতে পারিল না। উ— অতঃপর একাকী তিন তিনটা সিংহকে আক্রমণ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া নিরুৎসাহ-চিত্তে সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং গাওয়ালী সর্দ্দারের সহিত পূর্ব্বোক্ত আবপোড়া, নরশোণিতলোভী সিংহের সন্ধানে চলিল। এইরূপ প্রতিকূল ঘটনার পর কুড়ি বৎসর বয়সের তরুণ শিকারীর পক্ষে এরূপ সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইবার যোগ্য! উ— যে আহত সিংহটার অনুসরণ করিল না, তাহারও একটি সঙ্গত কারণ ছিল। বহুদর্শী শিকারীদের উপদেশ এই যে, সিংহ আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা বিপজ্জনক, কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া, আঘাতের ফলে যখন তাহার আহত দেহ আড়ষ্ট হয়, সেই সময় পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিলে সেই আক্রমণ প্রায়ই বিফল হয় না। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ ঘাসের ভিতর কয়েক গজের অধিক স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না, সেখানে আহত সিংহ আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার অনুসরণ করায় সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা থাকে।

উ— সদলে সেই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে একটি লোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাদিগকে জানাইল, ঝল্‌সানো সিংহটি কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা সে জানে এবং সেই স্থানটি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবে। সে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইল এবং একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, সিংহটি পূর্ব্বদিন সেই স্থানে লুকাইয়া ছিল, সে সেই স্থানের অদূরবর্ত্তী একটি উই-ঢিপি দেখাইয়া বলিল, সিংহ তখন সেই ঢিপির আড়ালে লুকাইয়াছিল বলিয়াই তাহার বিশ্বাস, সেই স্থানের ঘাসগুলি অনেক স্থান ব্যাপিয়া পুড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং সিংহটা সেখানে লুকাইয়া থাকিলে তাহাকে গুলী করা সহজ হইবে বলিয়াই শিকারীর ধারণা হইল। উই-ঢিপিটির আকার বৃহৎ, এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ঘাসগুলি অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল।

উ—সেই স্থানটি সুস্পষ্টরূপে দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইতেই সিংহটা গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিল। সে শিকারীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে লাফ দিতেই উ— তাহার গলায় গুলী মারিল, এবং দ্বিতীয় গুলী তাহার মাথায় মারিতেই তাহার ইহলীলার অবসান হইল। তাহার মৃত্যুর পর জানিতে পারা গেল, সেটা সিংহ নহে, সিংহী। সিংহী পঞ্চত্বলাভ করায় স্থানীয় লোকগুলির হর্ষ-কোলাহলে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু উ—একটির পরিবর্ত্তে অনেকগুলি সিংহ দেখিতে পাওয়ায় স্থির করিল, সে প্রথমে যে দুইটি সিংহ দেখিয়াছিল, তাহাদের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আরও কিছু টোটা লইয়া আসিবে, এবং আহত সিংহগুলি যদি দূরে পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা প্রচুর সময়-সাপেক্ষ, সুতরাং আহারাদি শেষ করিয়া শিকারে বাহির হওয়াই সে কর্ত্তব্য মনে করিল।

উ—সন্নিহিত গ্রাম-সমূহের অধিবাসীদের নিকট সংবাদ পাঠাইল—তাহারা গ্রামের যতগুলি সাহসী লোক সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাদিগকে এক স্থানে সমবেত করিবে। তাহারা আহত সিংহ দুটিকে তাড়াইয়া প্রকাশ্য স্থানে বাহির করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া উ—বাংলোতে ফিরিয়া চলিল।

সিংহটাকে তাড়াইয়া বাহির করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গাওয়ালীকে তাহার প্রয়োজনানুযায়ী সময় দিয়া উ—আহার ও বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে যাত্রা করিল; কিন্তু সে গাওয়ালীর কার্য্যদক্ষতায় সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাহার আবাদের সমুদয় কুলী-মজুরকেও সঙ্গে লইল। সে নির্দ্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হইয়া সন্নিহিত গ্রাম-সমূহের অধিবাসীদের এক স্থানে সমবেত দেখিল, তাহারা আগ্রহভরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। উ—গ্রাম্য সর্দ্দারকে ডাকিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নপ্রকার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিল।



সিংহের মেলা

যে তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে সিংহগুলিকে প্রথমে

দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, সেই ক্ষেত্রটি তেমন বৃহৎ নহে। জানিতে পারা গিয়াছিল যে, সেখানে যে সকল সিংহ লুকাইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি উ—র গুলীতে আহত হয় নাই। উ—সেই ক্ষেত্রে আগুন দিয়া ঘাসগুলি পোড়াইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল, ঘাসগুলি দগ্ধ হইলে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহারা আহত সিংহের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিতে পারিবে।

অতঃপর সম্মিলিত গ্রামবাসীরা উ—র আদেশে আগুনের বোঁদলা লইয়া সেই ক্ষেতখানি ঘিরিয়া ফেলিল, এবং ঘাসে আগুন লাগাইবার জন্ম আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উ—তাহার বন্দুকধারীদের সঙ্গে লইয়া, যে দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া, সেই তৃণক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘাসগুলিতে রস না থাকায় তাহা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। উ—র ইঙ্গিতে তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিবামাত্র ক্ষেতের ঘাসগুলি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে সিংহটি পূর্ব্বে আহত হয় নাই, সে কখন্ ফাঁকা যায়গায় বাহির হইয়া আসে, তাহা দেখিবার জন্ম সকলেই সেই দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিল। যে বন্দুকধারী অনুচর উ—র বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে সর্ব্বপ্রথমে সিংহটাকে দেখিতে পাইল। সিংহটা ঘাসের আড়াল হইতে বাহির হইয়া ধীরে চলিতেছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র সেই অনুচর তৎপ্রতি উ—র দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। উ—তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের এক গুলী মারিতেই সিংহটা সাংঘাতিক আহত হইয়া ঘুরিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল।

কিন্তু উ—বন্দুক নামাইবার পূর্ব্বেই তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের বন্দুকধারী অনুচর তাহার বাহুমূলে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া আর একটি সিংহের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল, সেই সিংহটা ঘাসের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সেই দিকে যাইতেছিল।

উ—তাহার রাইফেল তুলিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই তাহার দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে আরও কতকগুলি সিংহ বাহির হইয়া আসিল; যেন সেই স্থানে সিংহের মেলা বসিয়া গেল! এই অদ্ভুত দৃশ্যে উ—স্তম্ভিত হইল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া গণিয়া দেখিল, দুই পাঁচটি নহে, চতুর্দ্দশটি সিংহ সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে! এক স্থানে ১৪টি সিংহের একত্র সমাগম কল্পনাতীত ব্যাপার! সে তাড়াতাড়ি পাঁচটি সিংহকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিতেই অবশিষ্ট নয়টি তাহার দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অতগুলি সিংহ সেখানে একসঙ্গে আসিয়া জুটিলেও গুলী খাইয়া একটাও তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না। সেই চতুর্দ্দশটি সিংহের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সে কয়েক শত গজ দূরে অর্দ্ধদগ্ধ তৃণরাশির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

যে সিংহটা সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া বাহির করিবার জন্ম উ—এক দল লোককে ক্ষেতের চারিদিকে পাঠাইয়া রাইফেল হস্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিংহটা আহত হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে সুদীর্ঘ তৃণরাশি মথিত করিয়া সবেগে উ—র সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। উ—সেই সময় বন্দুকধারী অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রায় ত্রিশ গজ দূরে একটা ফাঁকা যায়গায় দাঁড়াইয়াছিল। সিংহটা বিদ্যুদ্বেগে কুড়ি গজ দৌড়াইয়া আসিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িল এবং উ—র দশ গজ দূরে থাকিতেই লাফাইবার উপক্রম করিল। উ—রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিল, সিংহটাকে গুড়ি মারিয়া লাফাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের গুলীবর্ষণ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, তাহা তাহার দেহের কোন অংশ স্পর্শ করিয়া থাকিলেও তাহাতে সিংহের গতিরোধ হইল না। সে চক্ষুর নিমেষে ঝড়ের মত বেগে উ—র দেহের উপর আসিয়া পড়িল।

সিংহটা উ-কে আক্রমণ করিয়া তাহার ঘাড়ে বা মুখে থাবল মারিবার জন্ম মুখব্যাদান করিল; সে সিংহের শুভ্র সুতীক্ষ্ণ দন্ত-শ্রেণী তাহার মুখের অদূরে উন্মুক্ত দেখিল! উ—তখন তাহাকে গুলী করিবার সুযোগ না পাওয়ায় এবং আত্মরক্ষার



উ—সিংহের মুখের মধ্যে হাত পুরিয়া দাঁত চাপিয়া ধরিল

কোন উপায় না দেখিয়া তাহার মুখের ভিতর হাত পূরিয়া দিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার দাঁত চাপিয়া ধরিল। সিংহ তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। উ—সিংহের দেহের চাপে ধরাশায়ী হইল, সিংহ তাহার বক্ষঃ-স্থলে চাপিয়া বসিল, কিন্তু সেই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও উ—তাহার দাঁত ছাড়িল না। সে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার দাঁত ধরিয়া সিংহের বুকের নীচে পড়িয়া রহিল। সিংহ তাহার চুয়াল হইতে উ—র হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

অতঃপর সিংহটা তাহার সম্মুখস্থ ডান পায়ের থাবা দ্বারা উ—র উরু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে পিঠে ফেলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু উ—শক্ত হইয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল, এজন্য সিংহ তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারিল না।

উ—সেই ক্রুদ্ধ সিংহের দেহের নীচে পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যু অপরিহার্য্য বুঝিয়াও হতবুদ্ধি বা হতচেতন হয় নাই; তখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। সে পাশে চাহিয়া দেখিল, তাহার এক জন অনুচর একখান প্রকাণ্ড মোটা লাঠি হাতে লইয়া, তাহার মনিবের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে হতবুদ্ধি হইয়া ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উ—তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতেছ কি, সিংহটার পিঠে এক ঘা লাঠি বসাও।"

উ—র আদেশ শুনিয়া তাহার অনুচরটা সেই প্রকাণ্ড লাঠি দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া তদ্দ্বারা সিংহের পিঠে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল।

সেই প্রচণ্ড আঘাতে উ—র প্রতি পশুরাজের আর লক্ষ্য রহিল না। সে সেই মুহূর্ত্তে মাথা ঘুরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, সেই সুযোগে উ—তাহার মুখের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া লইয়া চক্ষুর নিমেষে গড়াইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। সিংহটা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, একটা লোক একটা গাছের তলায় দৌড়াইয়া গিয়া গাছে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। উ—র সৌভাগ্যবশতঃ সিংহটা সেই লোকটাকে ধরিবার জন্য সেই বৃক্ষমূলে ধাবিত হইল। উ—সেই সুযোগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাইফেলটা কুড়াইয়া লইল, এবং সিংহ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যে গুলী মারিল, তাহাতেই তাহার সিংহলীলার অবসান হইল।

উ—তাহার ক্ষতস্থানগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত সিংহের তীক্ষ্ণদন্তের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছিল, ক্ষত গভীর হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন তাহার হাতের মণিবন্ধ ও উভয় উরুও সিংহের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কোন অস্থি চূর্ণ বা স্থানচ্যুত হয় নাই। সেই অবস্থাতেও সে পদব্রজে বাংলোয় ফিরিয়া আসিতে পারিল। তাহাকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া তাহার উৎকণ্ঠিতা পত্নী তাহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। সে তাহার ক্ষত ধৌত করিয়া বিষ-ক্রিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা তাহা বাঁধিয়া দিল। তাহার পর উ—আর অধিক বিলম্ব না করিয়া দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগরে গিয়া সুচিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করিল। সেই অঞ্চলের প্রধান নগর সেই স্থান হইতে আরও কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। জেলার কমিশনর তাহার বিপদের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে সেই নগরে লইয়া গিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই নগরে এক জন পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীর সহিত উ—র সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম এস্—, তিনি অত্যুৎসাহী পাকা শিকারী। তিনি উ—র শিকারকাহিনী শুনিয়া শিকারের লোভে উ—র কার্য্যক্ষেত্রে গমনের জন্য উৎসুক হইলেন। যেখানে চৌদ্দটা সিংহ একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল, সেখানে গিয়া কি তিনি একটিও সিংহ শিকার করিতে পারিবেন না? তাঁহার সিংহ-শিকারের লোভ অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। উ—বলিল, সে আটটা সিংহকে আহত করিয়াছিল।

জেলা-কমিশনর ও পরিদর্শক কর্ম্মচারী আর বিলম্ব না করিয়া পরদিনই শিকারে বাহির হইলেন। তাঁহারা অতি প্রত্যুষে গাওয়ালী সর্দ্দারের গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উ—যে যে স্থানে সিংহের দেখা পাইয়াছিল, সর্দ্দার তাঁহাদিগকে সেই সেই স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহারা মাঠে মাঠে ও বিভিন্ন তৃণক্ষেত্রে ঘুরিয়া তিনটি সিংহের মৃতদেহ আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কোন জীবিত সিংহ দেখিতে পাইলেন না।

উ—পূর্ব্বে চারিটি সিংহ শিকার করিয়াছিল, এই তিনটি মৃতদেহ আনীত হইলে সকলে জানিতে পারিল, সে এক দিনে সাতটি সিংহ শিকার করিয়াছিল। একটি আহত সিংহের তখনও সন্ধান হইল না। উ—বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বসমেত সতেরটি সিংহ দেখিতে পাইয়াছিল। এই সিংহগুলিকে কয়েক শত গজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শিকারীরা অনুমান করিলেন, সবগুলিই একই পালের অন্তর্ভূত। যাহা হউক, এক দিনে সতেরটি সিংহের সাক্ষাৎলাভ এবং একই রাইফেলের গুলীতে এক দিনে সাতটি সিংহ শিকার, শিকারের ইতিহাসে অতুলনীয় ব্যাপার!

উ—যে সিংহটাকে জখম করিলে সে অদৃশ্য হইয়াছিল, দুই জন 'আস্কারী' অর্থাৎ দেশীয় সৈনিক-যুবক তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিল; কিন্তু নিহত হইবার পূর্ব্বে সে একটি দেশীয় লোককে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল।

উ—কিছু দিন হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ক্ষতচিহ্নগুলি চিরজীবন তাহার শিকার-স্মৃতি জাগরূক রাখিবে। এই শিকার-কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য, ইহার কোন অংশ অতিরঞ্জিত নহে—জেলা-কমিশনর ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই কাহিনী 'নিয়াসাল্যাণ্ড টাইমস্' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রেও যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন গোপনীয় কারণে শিকারী ও তাহার সহযোগিগণের নাম প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল; সুতরাং এক বৎসর পূর্ব্বের এই ঘটনা অনেকেরই স্মরণ আছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জীবন-জুড়ন

ত্রেতার মহর্ষি এমনই চেহারা—কান্ত, নধর, গম্ভীর, জ্যোতির্ম্ময়। আনাভি পাকা দাড়ি, নাক-কাণ-কপাল শাদা-চন্দনে সুন্দর। আধুনিকদিগের পৈতার মত তাঁহার পৈতা নিরাকার-প্রায় নহে, পরিধি রীতিমত এক ইঞ্চি। গো-চর্ম্ম পায়ে দিয়া তিনি মহাপাতক করিতে পারেন না, এ কারণেই নগ্নপদ। দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের উপর আট-দশটি মাদুলি—রক্ষাকবচ হয় ত,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গেরুয়া থান পরিধানে, দুই কাঁধে দুইখানি উত্তরীয়, শাদা একটি, একটি গেরুয়া। রাস্তায় মন্ত্র-পাঠ করিতে করিতে হাঁটেন। নাম শ্রীজীবন-জুড়ন ভট্টাচার্য্য।—

মুনি-ঋষির মতই তিনি নিঃসম্বল, বাড়ী-বাগান ধন-দৌলত কিছুই নাই। নিত্যকার প্রয়োজন নিত্য সাধনার ফলে জুটে।

কিন্তু, সে-সাধনাটি ত্রেতাযুগের নহে, কলিকালের।

এক দিনের হিসাব লইলেই কথাটা বোধগম্য হইবে।—

পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিবার আগেই তিনি স্নান-স্নিগ্ধ, চন্দন-চর্চ্চিত, মা-গঙ্গার ঘাটে উপবিষ্ট—নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিয়া বৈ কি।—ঘাটে বেলার সঙ্গে লোক বাড়িতেছে,—অবশ্য স্ত্রীলোক ও বিদেশী বেশী। জীবন-জুড়নের মুখও 'হর-হর' 'বম্-বম্' শব্দে উত্তরোত্তর ফুলিয়া উঠিতেছে। ভক্তিমতী মহিলারা স্নান-শেষে গলায় কাপড় দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে।

কেহ বা জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, পা ছোঁব, বাবা?

দুই এক জন হয় ত বলিল—মৌনী গো মৌনী,—কেন বিরক্ত কর?

সম্মুখে দুইটি পয়সা বিছান আছে।

আর কি! পয়সার পর পয়সা পড়িতে থাকে।

জীবন ভট্ট হাত-পা নানা ভঙ্গীতে বাঁকাইয়া সাধনা করিতে থাকেন।

·

যখন ধ্যান-ভঙ্গ হইল, সূর্য্য ওপারের বুড়া-শিবের মন্দিরের চূড়ায়। পয়সা প্রায় এক টাকা জড় হইয়াছে।

মৌনী সাধক মিটিমিটি চাহিলেন। ঘাটে বড় একটা লোক নাই। গেরুয়া চাদরের খুঁটে পয়সা বাঁধিয়া, তিনি রাস্তায় নামিলেন।

রাজপথে তখন কেরাণী, ছাত্র, ব্যবসাদাররা সারি সারি চলিয়াছে।

জীবন-জুড়ন মুখটা এমন বিকৃত করিলেন, যেন মাস দুই অভুক্ত।

পাশাপাশি একটি ছাত্র আসিতে বলিলেন—"দাদা, একটা কথা শোন। দু'টো পয়সা দাও না, কাল খাওয়া হয় নি, ভাই। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, গরীবের মা-বাপ।"

আরও দুই পয়সা বাড়িল ত! এরূপ চাহিয়া চার ছয় আনা বাড়ে।—

বড় রাস্তা ছাড়িয়া জীবন এক সরু পথ ধরিলেন।

নিজের বাড়ীর গলি ফেলিয়া, উঠিলেন সাতান্ন নম্বরের এক অট্টালিকায়। ডাকিলেন—"ও দিদি! দিদিমণি! বহুদিন তোমাকে দেখি নি—পাঁচ তালে আসতে পারি না, কিন্তু তোমাদের কথা ভাবি, খবর নি সব সময়। মা জগদম্বা,—মায়ের হাতের একটু সন্দেশ পেলুম, তাই একবার না এসে থাকতে পারলুম না—সব কাযের আগে এ কায। নাও দিদি—কর্ত্তাবাবু কোথায়? বেশ সুস্থ আছেন?"

শিবানী সন্দেশটুকু মাথায় ছোঁয়াইল। বলিল—"হ্যাঁ, এখন আছেন,—চলুন, ওপরে চলুন!"

দোতলায় উঠিয়া জীবন কহিলেন—"প্রণাম মুখুয্যে মশাই। শিবতুল্য ব্যক্তি, দেখলেও আপনাকে পুণ্য। আর বিপদে-আপদে গরীবের মুখ চাইতে কে আছে আর। তা' আপনার শরীরটা যেন খারাপ মত লাগছে! হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে—"

মুখুয্যে-মশাই উত্তর দিলেন—"কৈ না। বহুদিন পরে দেখছেন, তাই—"

—"না, অবহেলা করার দ্রব্য নয়। দিদিমণি, দেখো, কাহিল মত নয়?"

সুরে সোহাগ দিয়া শিবানী বলিল,—"না ত কি? শরীর একটু খারাপই ত দেখছি। আজ আর আপিস না গেলে।"

মুখুয্যেমশাই নিজের হাত-বুক-পেটের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন—"হুঁ, একটু খারাপই ত হয়েছে। না, আপিস যাব না আজ—"

জীবন আত্মীয়তা জানাইতে লাগিলেন, "মা জগদম্বাকে সকাল-সন্ধ্যে জানাচ্ছি, দিদি, তোমাদের কথা, অনিষ্ট হবার কি যো আছে ? কিছু না—রাধামাধব ! তা' আমি এখন আসি দিদি,—ঘরে অসুখ হয়ে প'ড়ে রয়েছে, কোথায় ডাক্তার আর কোথায় পথ্য !. কার কাছে কিছু ধার পাই আবার দেখি—"

শিবানীর মনে কোথায় একটু মমতা জাগিল। সে বলিল, "ক্ষমতা তেমন থাকলে আপনার মত ব্রাহ্মণকে দিলে কত পুণ্যি। এই এক টাকার ফল কিনে দেবেন আপনার বৌকে !"

"এই লাখ টাকা দিদি, লাখ টাকা। তোমাদের যে কত—যাক, জগদম্বা জানেন।"—আবার রাস্তা—বাড়ীর দিকে নহে, একটা প্রসিদ্ধ দই-সন্দেশের দোকানের দিকে।

দোকানে উঠিয়া জীবন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইলেন। ডাকিলেন, "ও বড় ঘোষ, সব কুশল ত, বাবা ? জগদম্বাকে সকল সময় তোমাদের কথা জানাচ্ছি।"

ঘোষ গড়গড়া টানিতেছিল। ঔদাসীন্যের সুরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আশীর্ব্বাদ করবেন একটু। ঠাকুর-মশাই, আজ ত কোন বায়না নেই,—পরশু ননী দত্তদের আছে একটা।"

"কি, নাতির ভাত বুঝি ?"

"না, শ্রাদ্ধ, তাঁর বৌদির।"

"আচ্ছা, এখন আসি, মঙ্গল হোক বাবা তোমাদের।"

পরশু একটা নিমন্ত্রণের ঠিক হইল তবু। কিন্তু আজ ও কাল আপন-খরচে খাইতে হইবে ?

জীবন চৌমাথার হাঁড়ির দোকানে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব মঙ্গল ত, বেহারী ? আচ্ছা, বাবা, তা হ'লেই আমার আনন্দ। খুরী-গেলাস কোথাও দিলি না কি ?"

বিহারী বলিল, "আজ্ঞে না, কাল দিতে হবে—দাদা-ঠাকুদ্দার বাড়ী—নাতির পৈতে হয়েছে না ?"

জীবন ঠাকুর কহিলেন, "হ্যাঁ, নাতির পৈতে, নাতির পৈতে। বেশ-বেশ, বেঁচে-বর্ত্তে থাক্, বাবা তোরা।" খাওয়ার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না,—তাই ত ভোজের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয়।

আহারে বসিয়া ডাকিলেন, "ও বৌমা, একছিটে গাওয়া ঘি দেবে মা,—এ পাঁশ রান্নার ছিরি দেখ না, মুখে দেবার আগেই গা বিড়িয়ে আসে। গেলার পাট ছাই তুলে দেওয়া যেত ! উড়ের হোটেলটায় ব্যবস্থা করলে হয়—কৈ, মা !"

বৌমাটি পাশের ঘরের ভাড়াটে। কিন্তু, বক্তৃতা তাহার উপর মন্ত্রের মত কায করিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। এইবারেই দমকা খরচ।

জীবন-জুড়ন শিব-তলায় বসিতেন। সেই আব-হাওয়ায় গঞ্জিকা-সেবনের অভ্যাস বোধ হয়। একটু আফিমও খাইতেন। একটু দুধ না খাইলে চলিবে কেন ?

অন্ধকার হইতেই তিনি দুধের দোকানে আসিলেন।

বিধিমতে আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। কিন্তু দোকানদার বলিল, "ঠাকুর মশাই, একটু অপেক্ষা করুন, সন্ধ্যে পড়েনি দোকানে।"

জীবন-জুড়ন তামাক খাইতে লাগিলেন।

ধূপ-ধুনা-গঙ্গাজল দেওয়া শেষ হইল।

ঠাকুর মশাই বলিলেন, "আমায় এই গেলাস্‌টাতে গরম দুধ দে, বাবা, এক পয়সা। দে রে, বাবা, ওটুকু আর রাখিস্ নি, দে। তোদের উন্নতি হোক্—এ মাকে দু'বেলা"—

দোকান-দার দুধ-টুকু না দিয়া পারিল না।

গেলাস হাতে লইয়া জীবন-ঠাকুর বলিলেন, "কি দিলি, বাবা, গেলাসের তলাটাও ভিজল না যে !"

গয়লা বিরক্ত হইল বৈ কি। বলিল, "একটা পয়সা দিয়েছেন, ঠাকুর, দু'পয়সার দুধ হয়েছে।"

"আফিঙ্‌-খোরকে কি পেট্ ফুলিয়ে মারবি রে, বাবা ! পয়সা ত একটা দিয়েছি, আশীর্ব্বাদের মূল্য কত, সেটা ভাবিস না, তাই ত আমার দুঃখ হয়। দে, বাবা, একছিটে সর দেখে দে। গরীব বামুনকে দিলে মা-কালী তোর মুখ চাইবেন।"

স-পৈতা দুই হাত তিনি আকাশ পানে তুলিলেন।

দোকানদার আরও একটু দুধ দিল।

অন্য কয়েক জন খরিদ্দার বিদায় হইলে, একটু কাঁচু মাচু-ভাবে ঠাকুর বলিলেন, "বাবা ঘোষের পো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভক্তি করিস বলেই তোকে বলি, বুঝিস ত। একটু আধটু রাবড়ির ঝোল দে না, বাবা আমার !"

"নাঃ ! সন্ধ্যেবেলা ই কি ঝামেলা লাগালেন আপনি ! এক পয়সায় এক-পো দুধ হ'ল, আবার রাবড়ির ঝোল !"

"ইঁদুরে-বাঁদরে তোর কত খাচ্ছে, বাবা। ব্রাহ্মণকে

খাওয়াতে কিন্তু করিস নি, ধন। দে, তোর যতটুকু খুসী দে।"

"না, ঠাকুর, আমি পারলুম না। আপনার পয়সা নিন্, দুধ অন্য দোকান থেকে—"

"মুখ ফুটে চাইলুম, ব্রাহ্মণকে দিতে প্রাণ না সরে ত চললুম্। তা' হ'লেও আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, সব মঙ্গল হোক্।"

দোকানদার ডাকিল, "ও ঠাকুর-মশাই, নিয়ে যান, নিয়ে যান।"

এক-দিনের অসাধারণ ঘটনা এইরূপ—

জীবন ঠাকুর পথ চলিতেছিলেন। নিকুঞ্জের সহিত দেখা।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, আজ কোথাও আছে না কি?"

তিনি একটু বিরক্তই বুঝি হইলেন। বলিলেন, "না।"

"ওঃ! আলিপুরে ত আজ বিরাট আয়োজন,—গাড়ীর আড্ডার পাশে বড় শাদা বাড়ীটাতে।"

জীবনের মুখ হাসিতে ছাইয়া গেল—রাজ্য-লাভের খবর আসিল যেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই না কি? কি রকম আয়োজন, বাবা?"

"ওঃ! ভীম নাগের সন্দেশ, কৃষ্ণ-নগরের সর-পুরিয়া, বড়-বাজারের রাবড়ী, জনাইয়ের মনোহরা, কাশীর ল্যাংড়া"—

ঠাকুরের রসনা ভিজিয়া উঠিল বোধ হয়। বলিলেন, "এ বেলা, না ও বেলা?—"

মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ আছে, কোনমতে এ খবরটি বাড়ীতে পৌছাইয়া তিনি চলিলেন।

হাঁ, এই না হইলে আয়োজন! তবু সব শোনা হইল না।

আজ কি পদ্ধতিতে খাইবেন, অনেক ভাবিতে হইল হয় ত। মিষ্টান্ন খাওয়ার সময় দাঁতে লবণ ঘষা, চাদরে কিছু কিছু সঞ্চয় করা—এ সকল কথাও তাঁহার মনে আসিয়াছিল বৈ কি।

ব্যাপারটা সত্যই বিরাট। জীবন-ঠাকুরের একটা নূতন অভিজ্ঞতা হইল। ঝক্-ঝকে, বড়-ছোট মোটর-গাড়ীর মেলা যেন। ঘোড়ার গাড়ীই বা কম কি? কত মোটর-সাইকেল ছুটাছুট করিতেছে। নিমন্ত্রিতদের মুখ দেখা শক্ত, এত ভিড়। অনেকগুলি সাহেব-মেমও আছে।

জীবন-জুড়ন প্রথমটা হক্-চকাইয়া গেলেন। পরে গুটি গুটি সিঁড়ির এক-পাশে বসিলেন। ঘণ্টাখানেক কাটিল, কেহ ডাকে না।

মোটরে বসিয়া আসেন নাই, এ জন্য তাঁহার সমাদর হইল না,—বটে! ভারী চটিয়া গেলেন তিনি। রাস্তায় পায়চারী করিতে লাগিলেন।

হাওয়া-গাড়ীতে দলের পর দল আসে,—আহারাদি সারিয়া চলিয়া যায়। বেলা পাঁচটা বাজিতে যায়, তাঁহার নাড়ীতে মোচড় দিতেছে যে!

এ অবস্থায় লোকের সাহস নহে, দুঃসাহসও হয়। তিনি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলেন। ভিতরে যাইবেন,—দরজায় এক জন বলিল, "আপনার নম্বরটা?"

মুখে খানিকটা বীভৎসতা আনিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আরে নম্বর, মশাই! ক্ষিদেয় নাড়ী ছেঁড়ে, পাঁচটা বাজ'ল ও সব খাবার পর দেখবেন,—ব্রাহ্মণকে অমন দিক্ করবেন না। পৈতে দেখুন—এই দেখুন—"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি, মশাই। কিন্তু এখানে ত খানার ব্যবস্থা নেই,—আপনি অন্যত্র দেখুন।"

"কি! তা' হলে ব্রাহ্মণকে খেতে দেবেন না ত? আপনারা হিন্দু ন'ন?—নাই হলেন। আপনারা মানুষ ন'ন? তা'—"

এক ভদ্রলোক বলিলেন, "আরে মুস্কিল! খাবেন কি ক'রে? এখানে যে—"

ঠাকুর কহিলেন, "কেন, আমার কি নেমন্তন্ন হয় নি মনে কচ্ছেন, আপনারা?"

"কে নেমন্তন্ন করেছে আপনাকে, মশাই?"

"কেন, নিকুঞ্জ করেছে। আমি অমনি অনাহূত এসেছি?"

হাসির দমকে ভদ্রলোক বাঁকিয়া পড়িলেন

এক জন বলিল, "বামুন-ঠাকুর, এখানে ভোট নেওয়া হচ্ছে,—খাওয়া-দাওয়া নয়।"

জীবন-জুড়নের মাথাটা চন্ করিয়া উঠিল।—এঁ্যা! একেবারে বেয়াকুব!

ফেরার পথে তাঁহার আর পা চলে না। কিন্তু, নিকুঞ্জের সম্বন্ধে গালাগালি দিতে মুখ বেশ চলে—"শূয়োর! হারামজাদাটা! নরকের কীট! বালতির বেটা পব না!…

যে ব্যাপারটি জীবন-ঠাকুরকে অমরত্ব দিয়াছে হয় ত, সেটি রীতিমত নাটক একখানি। মাত্র একটি মেয়ে তাঁহার,—নাম দিয়াছিলেন নয়নতারা। দেখিতে নয়নতারা নয় অবশ্য—সুন্দরীই।

একে একে মেয়ে তের বৎসরে পড়িল, মা ত অস্থির হইবেই। জীবন-ঠাকুর কিন্তু শান্ত, সুস্থির।

বলিতে লাগিলেন, "বাপু, সবে মাত্র সন্তান—একটু দেখে শুনে দিতে হবে ত? ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন?"

বেশ, ইহাতে আর আপত্তি কি আছে?

নয়নকে কত যায়গা হইতে দেখিতে আসিল, কত উকীল, এ্যাটর্ণী, কত আপিসের বড়বাবু। সকলেই তাহাকে পছন্দ করে, কিন্তু জীবন ঠাকুরের মন উঠে না।

মাসের পর মাস যায়। অবশেষে এক কলিকাতার জমীদার একমাত্র ছেলের জন্য নয়নকে দেখিতে আসিলেন। পছন্দ অবশ্য হইল। তবে তাঁহাদের ঘরের মত দেনা-পাওনা ত আছে। হাটখোলার যতীন বাঁড়ুয্যের নামডাক কত!

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "রাজ-যোটক মিল হয়েছে! এ রকম মিল বড় হয় না। আর আমার একমাত্র মেয়ে, দেওয়া-থোয়ার কথা কি আর বলব, দেখবেন, বেয়াই মশাই।"

যতীন বাবু বলিলেন, "তা ত বটেই। তবে এ সব কথা পরিষ্কার থাকাই ভাল, বুঝলেন না?"

"একশ'বার, একশ'বার। আপনি বলুন, কি দিতে হবে?"

যতীন বাবু কহিলেন, "এই ধরুন, ছ'শ ভরির গিনি সোনার গয়না এক সেট, একসেট জড়োয়া গয়না, এই গেল মেয়ের। ছেলের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটী, চেলীর জোড়, টেবিল-অরগ্যান একটা, একটা ডবল খাট, একটা দেরাজ, পাঁচটা সো া, রোলটেবিল একটা—এই মোটামুটি। আর যদি বাড়ে দুটো একটা—"

"আজ্ঞে, তা' এ না দিলে আপনার মর্য্যাদা রক্ষে হবে কেন?"

"এই, আর খরচের পাঁচ হাজার টাকা, প্রণামীর খান-পঞ্চাশ গরদ।"

জীবন ঠাকুর একটু চিন্তিত হইলেন বোধ হয় বলিলেন, "তা' দিতেই হবে। আমার যা কিছু শেষ-কালে মেয়েই ত সব পাবে। হ্যাঁ, বরযাত্রীর সংখ্যা কত হবে, বেয়াই মশায়? এই একটুখানি বাড়ী, দেখছেন ত।"

"না, বেশী না, শ'তিনেক।

হাত কচলাইতে কচলাইতে জীবন ঠাকুর বলিলেন, "একটা অনুরোধ রাখতে হবে, বেয়াই মশায়। আমাদের দুজনেরই একটিমাত্র সন্তান, বাজনা-টাজনা আলো-টালো—মানে একটু ঘটা হয় যেন।"

বিবাহের দিন ঠিক হইল খুব কাছাকাছি।

বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল। এত রকমের বাজনা যে, কাণে তালা লাগে, আলোকই বা কত! প্রায় এক শত গাড়ী, কত ঘোড়্‌সোয়ার, বিচিত্র সং কত!

জীবনজুড়ন গরীব মানুষ, বেশী হাঙ্গামা করেন নাই। কয়েক জন ধনী প্রতিবেশীকে জানাইয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার কথা।

শোভাযাত্রাটা দেখিয়া তাঁহারা ভ্যাবাচ্যাকা খাইলেন। এ বর-পক্ষকে সমাদর করার ধারণা তাঁহারাই করিতে পারেন না ত জীবন! এত লোকজন কোথায় বসিবে? ইঁহাদের খাওয়াইবার আয়োজন কৈ? সদর-দুয়ারে ত একটি গ্যাসের আলোক জ্বলিতেছে টিম্-টিম্, পাত্রীর মা একলা শাঁখে ফুঁ দিতেছে!

যাহাই হউক, যতদুর সম্ভব সাদর আহ্বানে তাঁহারা বর-পক্ষকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। ছোট ঘরখানিতে বরকে বসাইলেন। বর-যাত্রীদের বসিবার যায়গা নাই, তাঁহাদের অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে বসান হইল।

ব্যবস্থা দেখিয়া যতীন বাবু বড় বিরক্ত হইলেন।

জীবনজুড়নের খোঁজ পড়িল। এ সময়ে কোথায় গেলেন তিনি?

ভবতোষ যতীন বাবুকে লইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। ডাকিলেন, "ওহে, ও জীবন! বড় বেয়াক্কেলে লোক ত হে তুমি! এই সময়টাই ভেতরে রইলে! হ্যাঁ!"

একটি মেয়ে, নয়নের সাথী বোধ হয়, ভাঁড়ার ঘরের দিকে দেখাইয়া দিল।

ঘরে ঢুকিয়া যতীন বাবুর আপাদমস্তক রি-রি করিয়া উঠিল। এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর জীবনজুড়ন কম্বল মুড়ি দিয়া আছেন।

ঠেলাঠেলিতে উঠিয়া তিনি কাঁপিতে সুরু করিলেন।

যতীন বাবু বলিলেন, "কি মশাই! এ কি কাণ্ড আপনার? আমার মান-ইজ্জৎ সব—"

জীবন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "মহাপাতকী আমি, বেয়াই মশায়, নইলে এ শুভ কাযের সময় চার দিন জ্বরে বেহুঁস প'ড়ে রয়েছি! ঘা' কতক মারুন, বেয়াই মশায়, মারুন, তাতে যদি ছাড়ে জ্বরটা—"

"আপনার ত কোন কিছুরই আয়োজন দেখছি নে, মশাই! কি অপদস্থই আমায়—"

"ভগবানের মার, উঃ! আচ্ছা, বেয়াই, অভাব উপস্থিত কিসের, আজ্ঞা করুন, মরতে মরতেও করব, করতেই হবে—"

"কিসের অভাব নয়, মশাই? আদর অভ্যর্থনার, বসবার যায়গার, খাওয়ানর ব্যবস্থার, সবেরই ত অভাব! উঠোনে ত দু'কড়া জল ফুটছে দেখছি—"

"আজ্ঞে না, কিছু ভাববেন না। বেয়াই মশায়, ভবতোষ দাদা থাকতে কিছু ভাববেন না।"

ভবতোষের নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল।

যতীন বাবু বলিলেন, "তা যা হয় হোক গে! বাইরে যেতে পারবেন, না?"

"আজ্ঞে, চলুন। মহাপাতকী! মহাপাতকী!"

ভবতোষের কাঁধে ভর দিয়া জীবনজুড়ন চলিতে লাগিলেন। বগলের রসুনটা পড়িয়া গেল। যদি যতীন বাবু দেখিতেন?

কয়েক পা গিয়া, জীবনঠাকুর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "উ-হু-হু-হু! কি কাঁপুনি! নাঃ! ভগবানের শাপ! উঃ হু-হু! ভবতোষ-দা, ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার ক'রে দাও, ভাই, তোমরা। দেখা-শুনো করব কি, সে বরাত নয়! উঃ হু-হু-হু!"

যতীন বাবু সমব্যথা জানাইলেন। বলিলেন, "ছি ছি! আপনি এত দুর্ব্বল জানলে কি আর আপনাকে বাইরে আসতে—চলুন, আপনি শোবেন চলুন।"

পল্লীতে ভবতোষ প্রখ্যাত লোক। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া যে গুরুভার তাঁহার উপর নামিল, তাহা সুসম্পন্ন করা ছাড়া তাঁহার উপায় কি?

নয়নের দিদিমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রান্না কোন্‌খানটায় বলুন ত? আটটা বাজল, বেশী দেরী করা ত—"

দিদিমা মড়া-কান্না কাঁদিয়া উঠিলেন, "আ পোড়া কপাল আমার! লক্ষীছাড়াটা কি কিছু কেনা-কাটা করেছে, বাবা! বলে, বড্ড জ্বর এসেছে, যেখানে টাকা আছে, আনতে পারব না, জোগাড়-জাগাড়ও সব হবে না, আমি ছাড়া ত আর একটা লোক নেই, বেয়াইকে, ভবতোষদা-দের বুঝিয়ে বোলো, যে রকম কাঁপুনি, বোধ হচ্ছে অজ্ঞান হব! ঐ দেখ, বাবা, চুলোয় দুটো কড়া জলই ফুটছে, জলই ফুটছে!—"

ভবতোষ বসিয়া পড়িলেন। কি সর্ব্বনাশ! উপায়?

আর কি উপায়! ছয় সাত জন লোক লাগাইয়া, জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়া গরীব ব্রাহ্মণের ও নিজের মান রক্ষা করা।

এ দিকে যদি বা টালে-মাটালে তিনি সামলাইলেন, ওদিকে এক গণ্ডগোল বাধিল।

ভবতোষ বাবু আসিয়া দেখিলেন, ব্যাপার গুরুতর। পাত্রী-পক্ষের ভট্টাচার্য্য পাত্রকে সম্প্রদানের ঘরে আনিয়াছে, নয়নকে সম্মুখে বসান হইয়াছে, তাহার দিদিমা সম্প্রদান করিতে বসিয়াছেন, কয়েক জন পাত্রের বন্ধু মাঝে মাঝে উল্লসিত হাসি হাসিতেছে! যতীন বাবু অনুপস্থিত, বরযাত্রীদের খাওয়াইতে ব্যস্ত বোধ হয়। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া, তিনি এক প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছেন। মুখবিকৃতির সঙ্গে চীৎকার করিতেছেন, "ঠগ্‌বাজি! লোক চেন না! আমায় না বলা, না কওয়া, চুপি চুপি সম্প্রদান! শাঁখা হাতে দিয়ে মেয়ে পার করার যায়গা পাওনি আর, না? ও সব চলবে না। বেয়াইকে তুলে নিয়ে এস। ফর্দ্দ মিলিয়ে দান-সামগ্রী না দিলে, আমি ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। জুচ্চুরি!"

দিদিমা আছড়াইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে কান্না। "ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ কোরো না, বাবা! মেয়েটার অমঙ্গল কোরো না, বাবা!"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কি হয়েছে, বাঁড়ুয্যেমশাই ?"

যতীন বাবু উত্তর দিলেন, "মতলবটা দেখুন ত একবার ! দু'সেট গয়নার যায়গায় মেয়ের হাতে শাঁখা, খাট-বিছানা-দেরাজ-সোফা নেই, মান্ধাতা আমলের দু'টো কলসী আর গাড়ু—পাঁচ হাজার টাকা দেবার কথা, ঐ দেখুন, একান্নটি টাকা ! কত বলব মশায়, সর্ব্বশরীর কাঁপছে !"

"এই সব দেবে বলেছিল জীবন ?"

"হ্যাঁ, মশাই। আরও অনেক কিছু।"

যতীন বাবুর মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যই নিশ্চয়। জীবন-জুড়ন ঘরে ঢুকিয়া, ভূমিকম্পে জীর্ণ বাড়ীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বেয়াই মশায়, আপনি এক জন দেবতার মত লোক—সবই বুঝছেন, চার দিন প'ড়ে রয়েছি, গয়নাপত্তর কিছুই—"

একটা হুঙ্কার দিলেন যতীন বাবু, "থামুন, মশায় ! আর ও সব কথা চলবে না। আপনি যদি চুক্তিমত সব জিনিষ আধঘণ্টার মধ্যে হাজির না করেন ত এখানে আমি ছেলের বিয়ে দেব না—"

"সব জোগাড় আছে বেয়াই। কাল কড়িটি পর্য্যন্ত বাকি থাকবে না। কুটুম্বিতের আজ সবে সুরু বৈ ত নয় ? ফর্দ্দ মিলিয়ে কাল—"

ভবতোষ বাবু তাড়া দিলেন, "আরে তোমার এখনও চালাকী যায় না !"

যতীন বাবু ছেলেকে ডাকিলেন, "ননী, উঠে আয়। আমাদের বংশের মর্য্যাদা নিয়ে এ লোকটা যে খেলা করলে, তার বিনিময়ে পুরস্কার আমি দিচ্ছি কালই ! উঠে এস, বাবা।"

ননী সভক্তি আপত্তি জানাইল, "এ কায আপনার মত লোকের করা উচিত হবে কি, বাবা ? ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক হবার অবস্থা ত আপনার নয়, হরতুকি নিয়ে বিয়ে দেওয়াই বড় লোকের কর্ত্তব্য। আর এ অবস্থায় আমি যদি যাই, মেয়েটির কতখানি অকল্যাণ ! আমার মতে, বাবা—"

যতীন বাবু হয় ত বুঝিলেন। রমেশকে বলিলেন,—"ওরে, এখনই গিন্নীমাকে গিয়ে বল, গয়না আসবাব-পত্র টাকা-কড়ি পাত্রীর বাপ কিছুই দেয় নি, দাদাবাবুর মত কিন্তু এখানেই বিয়ে হয়। যদি তোর গিন্নীমারও মত তাই হয়, তা হ'লে সিন্দুক থেকে ভাল জড়োয়া গয়নার সেটটা চেয়ে নিয়ে আসবি। মোটর নিয়ে যা।"

পঙ্কজিনী ব্যাপার শুনিয়া বলিল, "ছি ! বিয়ে দিতে গিয়ে ফিরে আসা বড় খারাপ। গরীবের মেয়ে আনলে ঘরের লক্ষ্মী হবে। যা, যা, গয়না নিয়ে যা'।"

কাযেই ননীগোপালের সঙ্গে নয়নের বিবাহ হইয়া গেল।

পরদিন একটু মনোমালিন্য ঘটিল।

স্বামিগৃহে যাইতে নয়নকে তাহার মা, দিদিমা ও কয়েকটি সাথী মোটরের দিকে আনিতেছে। তাহার ফুটফুটে চেহারা অলঙ্কারাদিতে সুন্দরতর হইয়াছে, সুস্মিতা প্রতিমাটি যেন।

জীবনজুড়ন এক পাশে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিলেন।

নয়ন কাঁদিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে, তিনি বলিলেন, "কেঁদো না, মা। দু'এক দিনের মধ্যেই ত যাচ্ছি আমি—"

যতীন বাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, "কাল রাত্রে কিছু বলিনি, তাই একছিটে আক্কেল হয় নি, না ? খবরদার, বামুন ! তোমার মেয়েটির মুখ চেয়েই বিয়ে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই !"

জীবনজুড়ন গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "অসুখ হয়ে প'ড়ে কথা রাখতে পারি নি ব'লে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবেন না, বেয়াই মশাই !"

"ফের আবার সাধু সাজছ !"

"আমার কপালটাই এই রকম, বেয়াই মশাই ! তা জোড়ে আনবার আমি ছাড়া যে আর কেউ নেই।"

যতীন বাবু মুখটা কুশ্রী করিয়া বলিলেন, "মেয়েকে বউ করলুম, এই না কত—আবার জোড় ! আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় গেলে মার খাবে ব'লে দিচ্ছি।"

এ কথা শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল।

যতীন বাবু এতটুকু নরম হইলেন না, পুত্রবধুকে লইয়া গেলেন।

পাকস্পর্শের, ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ আসিল না যখন, তখন সম্বন্ধ না রাখাই সিদ্ধান্ত বৈ কি।

জীবন-ঠাকুর ও তাঁহার স্ত্রী হা-হুতাশ করেন ও দিন কাটান।

মায়ের প্রাণ মাস দুইয়ের মধ্যে ব্যাকুল হইল।

স্বামীকে নয়নের মা বলিল, "দেখো, একটু সাহস ক'রে যাও, মেয়েটার কি দশা হ'ল, একবার দেখে এসো। মানুষের বাড়ী মানুষ গেলে কি খেয়ে ফেলবে? মুখে বলেছে ব'লে কি আর সত্যি সত্যিই মারবে?"

জীবন-ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যদি মারে ত করব কি? বড় লোকের বাড়ী ভালই আছে, নয়ন ভালই আছে।"

"তা বেশ, তবে আমি যাব, তাতে মান বাড়ে বাড়ুক!"

উভয়-সঙ্কট! এমন বিপদে জীবনজুড়ন কখন পড়েন নাই নিশ্চয়!

পরদিন সকালে, বিপদ-ভঞ্জন দেবতাগণকে স্মরণ করিয়া জীবন-ঠাকুর বৈবাহিকের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশ্য সুস্নাত, চন্দন-চর্চ্চিত, হাতে রুদ্রাক্ষের মালাটাও ছিল।

বাহির হওয়ার সময় সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু যতীন বাবুর বাটীর যতই কাছে আসিতে লাগিলেন, জীবন-জুড়নের বুকটা ততই দুর-দুর করিতে লাগিল। যদি ধরিয়া প্রহার দেয়! বাঁধিয়া রাখে যদি!

বৈবাহিকের বাড়ীর ফটকে কীচকের মত প্রকাণ্ড এক দরোয়ান। ভয় ত হইবারই কথা।

কয়েক মিনিট এধার-ওধার ঘুরিয়া তিনি ঠিক করিলেন, না, কিসের ভয়? মেয়েকে দিয়ে কি চোর হয়েছি? দেখি ত কে অপমান করে আমায়!

গলার গেরুয়া চাদর সুবিন্যস্ত করিয়া গম্ভীরভাবে ফটক পার হইলেন।

অকস্মাৎ তীব্র একটা চীৎকারে তাঁহার সাহস আবার উবিয়া গেল। চীৎকারটা দরোয়ানের হাঁক, "এ-ই! কিধার ঘুসতা!"

তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "আমাকে জান্‌তা নেই?"

ভ্রূভঙ্গীর সহিত দরোয়ান বলিল, "আরে, জান্‌তা তো হ্যায়! বা-কি পুজা-উজা ত এ কোঠিমে আভি হোতা নেহি। তুম্ ত হাম্‌কো বোলাভি নেহি, একদম্ ভিতর ঘুস্‌তা!"

"তুম্‌কো কি বোলেগা? আমি যতীন বাবুর বেয়াই হোতা।"

"আরে চলো বাবু, বেয়াই-উয়াই কা কুছ কাম নেহি হ্যায়।"

জীবন-ঠাকুর একটু সাহস পাইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বলকে তোম্‌কা নকরী ঘোচাতা, দেখো।"

দরোয়ান হাঁকিল, "আরে চলো! ঝামেলা হাটাও!"

"কি বল্‌তা! আমায় অপমান করতা! ননীগোপালকা আমি শ্বশুর, জান্‌তা নেই!"

যতীন বাবু বাহিরের ঘরে ছিলেন। গোলমালে উঁকি দিয়া বলিলেন, "বাবুকো ইধার লেয়াও।"

তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জীবন-জুড়ন একদমে বলিলেন, "এমন চোয়াড় দরোয়ান রাখা আপনার উচিত হয় নি, বেয়াই মশাই! খামাকা আমায় অপমান করলে একেবারেতে!"

যতীন বাবুর মুখের প্রতি রেখাটি হইতেই যেন কোমলতা মুছিয়া গিয়াছে। তিনি ডাকিলেন, "লক্ষ্মণ, হাণ্টারটা নিয়ে আয়।"

হাণ্টার!

জীবন-ঠাকুরের হৃৎকম্প ত হইবেই। আহা হা! দরোয়ান যখন হাঁকাইয়া দিতেছিল, তিনি তখন যদি চলিয়া যাইতেন! এখন উপায়?

কোনমতে তিনি বলিলেন, "তা অন্যায় যখন করেছি, আপনি সবই করতে পারেন। মারুন বেয়াই মশায়, কিন্তু নয়নকে একবার দেখতে দিন দয়া ক'রে।"

"ওঃ! আপনার সাহসের সীমা নেই যে! আবার নয়নকে দেখতে চান! লক্ষ্মণ, তোর গিন্নীমাকে একবার আসতে বল, ছেলের ডাকাত শ্বশুরকে দেখতে চেয়েছিল একবার।"

দুয়ারের পর্দ্দা সরাইয়া বেয়াইকে দেখিতে পঙ্কজিনীর বুক শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। ছি! ছি! এমন সদ্‌ব্রাহ্মণকে অপমান করিলে নরকেও যে স্থান হইবে না!

স্বামীকে ভিতরে ডাকিয়া সে বলিল, "যেন মহাদেব! আমি ত বড্ড খুশী হলুম দেখে। দেখ, গরীব হলেও খাঁটী ব্রাহ্মণ, আর আমাদের বেয়াই। বেশ আদর-আপ্যায়িত কর, কেমন?"

যতীন বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই! রীতিমত! হান্টার নিয়ে গেছি।"

"ছি! ছি! মুখ দিয়ে বেরুল অমন কথা!"

"আরে পাগল! অমন ঠকান্‌টা ঠকালে আমায়, একটু ভয় দেখাব না?"

"না, না, কেলেঙ্কারি কোরো না, বলছি!"

ব্যস্‌! জীবন-জুড়নের বিধিমতে সমাদর আরম্ভ হইল।

ভোজনের সময় তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সবই যদি ক্ষমা করলেন ত নয়নকে দু'এক দিনের জন্যে পাঠিয়ে দিন, ওর মা একেবারে পাগলের মত হয়েছে।"

যতীন বাবু কহিলেন, "আপনি যে—"

পঙ্কজিনী বাধা দিয়া বলিল, "তা যাবে বৈ কি, এত দিন হয়ে গেল!"

"তা যায় যাক্‌, কিন্তু গয়না সব খুলে রেখে যাবে, বৌমাকে বোলো।"

"তোমার সকল কথাতেই ঠাট্টা!"

প্রকৃতই, এ রকমের শ্লেষ বা নিন্দাকে জীবন-ঠাকুর ঠাট্টা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন, লজ্জা মেয়েলী গুণ।

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় (এম-এ-বি-এল)।

শিল্প

মানুষের সুখ-দুঃখ, ছোট-ছোট বাসনা বেদনা
সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে নিশিদিন করে আনাগোনা।
আকাঙ্ক্ষার পঙ্কতলে মগ্ন হয়ে নিজ-ক্ষুদ্রতায়
ক্ষুদ্র নর আপনার সব শক্তি সে-মাদকতায়

নিঃশেষে হারায়ে ফেলে; হাসে কাঁদে দু'দিনের তরে
ভালোবাসে, ঘৃণা করে, ভুলে যায় দু'টি দিন পরে।
এই পরিণতি তার—সব তৃপ্তি সব আবেগের,
সর্ব্ব আশা-বৈরাগ্যের; সন্ধ্যারাগ পশ্চিম মেঘের
মুহূর্ত্তে মিলায় যথা রজনীর অন্ধকার-তলে—
সেই মত হাসি তার অপরে হাসায়; আঁখিজলে
সেই মত মুহূর্ত্তেকে অপরেরে দেয় কিছু ব্যথা—
যারা থাকে কাছাকাছি তারা শুধু জানে তার কথা—
আর কেহ নাহি জানে। বিপুল এ ধরণীর তাহে
কিছু নাহি আসে যায়, মানবের জীবন-প্রবাহে

অনন্ত কালের লাগি কোনো দান যায় না সে রাখি
একের অন্তরাবেগ অন্ধকারে মরে সে একাকী!
শিল্পীর হৃদয়-তলে সুখ দুঃখ আসে অবিকল
অপর সবারি মত—শুধু সেথা হয় না নিষ্ফল,
বিধিদত্ত সেই পঙ্ক সঙ্কীর্ণতা অতলেতে রহে
কল্পনা-মৃণালে কবি ঊর্দ্ধ মুখে তারি রস বহে
সৌন্দর্য্যের সূর্য্যপানে ছন্দে গানে, অন্তর মথিয়ে
অরূপে সে রূপ দেয়, ভাষা দেয় অনির্ব্বচনীয়ে;
মানস-মন্থন ধন অপরূপ উঠে যে অমৃত—
তাহে নাহি কোনো স্বার্থ, সে তাহার সুখ-দুঃখাতীত!

শিল্পীর সফল স্বপ্ন—চিরন্তন আকাশের তলে—
সমস্ত বিশ্বের লাগি ফুটে ওঠে শিল্প-শতদলে!

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।



বিশ্বকবির আধ্যাত্মিক সাধনা

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীতে' রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব ক'রে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে, আমি স্বীকার করিনে।"…"মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব, সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে।"…"পূর্ণকে উপলব্ধি করিতে যদি চাই, তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি।"…"গুহাবাসের সন্ন্যাসীকে আমি মানিনে; গুহার বাইরে বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি।"

এই বিচিত্র বিশাল জগৎ যে ঈশ্বর হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তিনি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে পাইতে হইলে যে জগতের সকল অংশের সহিত যোগস্থাপনা করিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। প্রথমতঃ ইহা সম্ভব নহে। জগৎ অতি বিশাল, মানবের ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং সকলেই জগতের ছোট বা বড় কোনও একটা অংশে চৈতন্যকে প্রসারিত করিতে পারে মাত্র, সমগ্র জগতের মধ্যে চৈতন্য প্রসারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা কোনও মানবেরই নাই।

দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রয়োজনও নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।"

জগতের যখন প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান আছে, তখন একটিমাত্র পদার্থের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাকে পাওয়া গেলে সমগ্র-রূপেই পাওয়া যাইবে, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার অংশ নাই, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" অর্থাৎ "তাঁহার কলা বা অংশ নাই, কর্ম্ম নাই, তিনি শান্ত, নির্দ্দোষ এবং নির্লিপ্ত"। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যখন ঈশ্বর বিদ্যমান, তখন কাহাকেও বাহিরে গিয়া ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতে হইবে না, নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঠিকমত অনুসন্ধান করিলেই ঈশ্বরলাভ হইতে পারে।…

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

"এক ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, (আবার) সকল ভূতের অন্তরাত্মা হইয়া থাকেন।"

"স বা এষ আত্মা হৃদি" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ "এই আত্মা (ঈশ্বর) হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন।"

"অথ যদিদং অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম
দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ
তস্মিন্ যদন্তস্ত তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"

(ছান্দোগ্য)

"এই ব্রহ্মপুর (শরীরে) যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম আছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশ আছে, তাহার মধ্যে যে বস্তু (ব্রহ্ম) আছেন, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—তাঁহাকেই জানিতে হইবে।"

যদিও ঈশ্বর হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করেন, তথাপি তাঁহাকে উপলব্ধি করা অতি দুরূহ। কারণ, স্বভাবতঃই আমাদের ইন্দ্রিয়-গণের বৃত্তি সকল বহির্মুখী, বিশেষ চেষ্টা না করিলে তাহাদিগকে অন্তর্মুখী করা যায় না। এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

"প্রজাপতি ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখী করিয়াছেন, এ জন্য ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু দেখিতে পায়, অন্তরাত্মা দেখিতে পায় না। কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায় দৃষ্টি অন্তর্মুখিনী করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে পায়।"

এই যে দৃষ্টি বহির্জ্জগৎ হইতে ফিরাইয়া অন্তরভিমুখে চালনা করা, ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনা। ইহাতে বহির্জ্জগতের সহিত যোগ কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। তাহার কারণ ইহা নহে যে, বহির্জ্জগতে ঈশ্বর নাই। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত বহির্জ্জগতে নানাবস্তুতে বিক্ষিপ্ত হইলে অন্তরমধ্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা দুরূহ হয়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তেমৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥"

"অবিবেকী ব্যক্তিগণই বাহ্য শব্দাদি বিষয় অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা বারম্বার মৃত্যুপাশবদ্ধ হয়। এই কারণে ধীরগণ মোক্ষের স্বরূপ বিদিত হইয়া এই জগতে অধ্রুববস্তুর মধ্যে ধ্রুববস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন না।"

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া দুরূহ হয়, কারণ, তিনি

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ"

আধ্যাত্মিক সাধনা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ বলিতেছেন —

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

ধনুতে যেরূপ শরযোজনা করিয়া একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করিতে হয়, সেইরূপ ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রণব মন্ত্রের দ্বারা আত্মাকে ঈশ্বরাভিমুখে প্রেরণ করিয়া, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। "অপ্রমত্ত" শব্দের অর্থ এই যে, বাহ্য জগতের রূপরস-গন্ধে চিত্ত যেন আকৃষ্ট না হয়। "তন্ময়" হইতে হইবে;—অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল—অনবরত ঈশ্বরচিন্তা না করিলে তন্ময় হওয়া যায় না।

শ্রুতি পুনরপি বলিতেছেন,—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

"একমাত্র তাঁহাকেই জানিবে। অন্য বাক্য ত্যাগ করিবে। তিনি অমৃতের প্রাপক, অর্থাৎ তাঁহাকে পাইলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

"অন্য বাক্য ত্যাগ করার" অর্থ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বাক্য ত্যাগ করা বুঝিতে হইবে। দেখা যায়, সাধুগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মগ্ন থাকেন, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে তাঁহাদের অভিরুচি থাকে না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর সব 'আলুণা' লাগে।

মনে করুন, কোনও ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দিবারাত্র ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন আছেন; ধরুন, তিনি ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া হৃদয়মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিবার চেষ্টা করেন; অথবা অন্ধকার গুহার মধ্যে বসিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, তিনি সে সকলের সংবাদ রাখেন না। ভাল ভাল কবিতা ও উপন্যাস তিনি পড়েন না, Einsteinএর Theory of Relativityর কথা শুনেন নাই, ব্রাউনিংএর কবিতা বা ইবসেনের নাটক তিনি পড়েন নাই। সর্ব্বদা কেবল একরূপ ভাবধারা তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে,—ভগবান্, আমাকে দেখা দাও, তোমাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইবে, ধন মান সুখ যশ কিছুই আমি চাহি না, এ সকলে আমার তৃপ্তি নাই।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।"—তিনি ধন জন চাহেন না, কবিতাও চাহেন না। এইরূপ ব্যক্তি উপনিষদুক্ত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত আছেন বলিতে হইবে। ঐকান্তিকতার সহিত এই ভাবে সাধনা করিলে তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, এবং ঈশ্বরলাভ হইলে তাঁহার আর কিছুই পাইতে বাকি থাকিবে না। "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি। অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"—যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু সমুদায়ই শ্রুত হয়, অচিন্তিত (বস্তু) চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত (বস্তু) জ্ঞাত হয়। সুতরাং সাধনার সময় যদিও তাঁহাকে বহির্জগৎ হইতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সিদ্ধিলাভের পর নিখিল বিশ্বের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়—সিদ্ধিলাভ না করিলে নিখিল বিশ্বের সহিত সে ভাবে যোগস্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ, এক ব্যক্তি যতই কেন মেধাবী আর পণ্ডিত হউন না কেন, এই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-সমন্বিত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশই তিনি জানিতে পারিবেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অল্পসংখ্যক জীবের সুখদুঃখই তাঁহার হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারিবে। সুতরাং মানবের পরিপূর্ণতার যদি কোনও আদর্শ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষই সেই আদর্শ। যিনি এ ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহার বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক জ্ঞান যত বেশীই হউক, পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে তিনি বহু নিম্নে পড়িয়া থাকিবেন।

কিন্তু এইরূপ সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, শুনুন। "প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে কেবল একটি মাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে, আমি স্বীকার করিনে।" কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—ঠিক এই ভাবেই সাধন করা দরকার—"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ"—অবিবেকীরাই "প্রকৃতির অন্য সকল দিকে" চিত্ত নিবিষ্ট করে,—ধীর ব্যক্তিগণ "আবৃত্তচক্ষুঃ" হন, দৃষ্টি বাহির হইতে ফিরাইয়া অন্তরভিমুখে প্রেরণ করেন—"তন্ময়ো ভবেৎ"—তন্ময় হইতে হইবে,—তন্ময় হইবার উপায়ই হইতেছে "একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার (অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তার) প্রবল উৎকর্ষসাধন করা"—শ্রুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অন্য চিন্তা অন্য কথা ছাড়িতে হইবে। সুতরাং উপনিষদ্ যে সাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাহা মানেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সংকীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দিব, সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে।" সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, বাহিরের দিক হইতে সেগুলির সাধনা লক্ষ্য করিলে তাহার অতি অল্প অংশই লাভ করা সম্ভব হইবে। সে সব ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়া, সাধনার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ করিয়া কেবলমাত্র হৃদয়মধ্যস্থিত আত্মার মধ্যে চিত্ত নিবদ্ধ করিলে, মানুষ যে কেবল পঙ্গু হয় না, তাহা নহে, পরিপূর্ণ মানব হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা করে না বলিয়াই আমাদের ন্যায় শতকরা ৯৯ জন মানব পঙ্গু হইয়া যায়!

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পেটুক বলতে পারে, জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ। তেমনই মাতাল বলে, খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয়, সেটা বন্ধ ক'রে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটান চাই।" আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যাঁহারা সমস্ত সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে পেটুক এবং মাতালের সহিত তুলনা করা রবীন্দ্রনাথের উচিত হইয়াছে কি? আধ্যাত্মিক

সাধকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, গম্ভীরনাথ, রামদাস কাটিয়া প্রভৃতি বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চ্চা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম আধ্যাত্মিক সাধানায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে ঐকান্তিক সাধনাকে পেটুকের লোভ এবং মাতালের নেশার সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করা যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকমাত্রই স্বীকার করিবেন।

ঈশ্বরভক্তির উৎকর্ষ বুঝাইতে "হরিপ্রেমে মাতোয়ারা" এরূপ বাক্যের প্রয়োগ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু এরূপ বাক্য শ্রদ্ধার সহিতই প্রয়োগ হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে শ্লেষ ও বিদ্রূপ সুস্পষ্ট। ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বিদ্রূপ করা শিষ্টাচারসম্মত নহে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,"গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানিনে। গুহার বাহিরে বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি।" যাঁহারা গুহার মধ্যে বসিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা কেহই মনে করেন না যে, গুহাই সত্য, বাহিরের জগৎ মিথ্যা। বাহিরের জগতে চিত্তবিক্ষেপ হয়, এজন্য তাঁহারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উপনিষদের বাক্য অনুসারে সাধনা করিতে হইলে "আবৃত্তচক্ষু" হওয়া প্রয়োজন, দৃষ্টি বহির্জ্জগৎ হইতে ফিরাইয়া অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এইরূপ সাধনার জন্য গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাতে আপত্তিজনক কিছুই নাই। গুহার বাহিরে আসিলেও বাহিরের বিরাট জগৎকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সহজ নহে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণের সাহায্যেও মানব সমগ্র বিশ্বজগতের উপলব্ধি করিতে পারে না। গুহার মধ্যে বসিয়া সাধনা করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই বিরাট বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি সম্ভব হয়, কারণ, "তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

এই গুহার মধ্যেই যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, একটিমাত্র উপাদান হইতে এই বিচিত্র বিশাল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তাহার সহস্রাধিক বৎসর পরে আড়ম্বরপূর্ণ বৈজ্ঞানিকগণ বহু ভুল করিয়া এক্ষণে মাত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। আর এক কথা, বাহিরের বিরাট জগৎ যে খুব বেশী সত্য, তাহাও নহে, কারণ, সত্য জিনিষ চিরকাল একভাবে অবস্থান করে, যাহা আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ, যাহা আজ আছে, কাল নাই, তাহা খুব বেশী সত্য নহে,—"তৎ সত্যং"—সত্যবস্তু সেই ব্রহ্ম, আর কিছু নহে। এই কারণেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের চক্ষুতে গুহা এবং বাহ্য জগৎ উভয়ই পারমার্থিক সত্তাবিহীন। আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে গুহা-প্রবেশ করিবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, উপনিষদ্ ব্রহ্মকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি গুহার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের কামনা বাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেইরূপ বাহ্য-জগতের কোলাহল ছাড়িয়া স্থির নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অনেক বড় সাধক গুহার মধ্যে তপস্যা করিয়াই ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা লোভের পরিচায়ক, অতএব নিন্দনীয়। শ্লোকটি এই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

"বিশ্বের যাবতীয় নশ্বর বস্তু পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। অন্য কাহারও সম্পদে লোভ করিবে না।" এখানে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনার কোনই নিন্দা নাই। রবীন্দ্রনাথ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"চলমান জগতে যা কিছু চলচে সমস্তকেই অধিকার করে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব মা গৃধঃ লোভ কোরো না, এই হোল ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি।" ঈশোপনিষদের শ্লোকটির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—পরধনলোভ ত্যাগ করিতে হইবে। উহার মধ্যে "একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ" করবার কোন কথাই নাই। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান্ বিরাজ করেন। সেখানে তাঁহাকে অন্বেষণ করাকে রবীন্দ্রনাথ "একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ" করা বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না। ঈশ্বরকে লাভ করিবার সাধনা অন্য সাধনা-নিরপেক্ষ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন"—ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না, বিদ্যা দ্বারাও লাভ করা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় ঈশ্বরের দয়া,—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—ঈশ্বরের দয়ালাভ করিবার উপায়—অন্য সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ঈশ্বরের শরণ লওয়া। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চা না করিলে যে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আর ঈশ্বরলাভের অত্যন্ত আগ্রহকে "লোভ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করাও ঠিক নয়। লোভ শব্দের অর্থ পরদ্রব্যগ্রহণে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বর ত' পরদ্রব্য নহেন, তিনি পরমাত্মা,—আত্মারও আত্মা—সুতরাং ঈশ্বরলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলা যায় কি?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বেগবান্ চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়।" আধ্যাত্মিক সাধনা যে সহজ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ভোগ করা, সে প্রবৃত্তি সংযত করিয়া "আবৃত্তচক্ষু" হইয়া আত্মান্বেষণ করা অতি দুরূহ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মিথ্যা বা ভ্রান্ত নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ যে একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনার নিন্দা করিয়াছেন, উপনিষদে তাহাই সমর্থন করা হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একনিষ্ঠভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা

করিয়াছিলেন,—যেমন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বদেব, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইত্যাদি। সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় যে ইঁহারা তুল্যভাবে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা যথার্থ নহে। * ভারতের বাহিরেও যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারাও সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির যথেষ্ট অনুশীলন করেন নাই,—যথা যীশুখৃষ্ট, Thomas a Kempis, St Francis of Assissi। যুক্তি দ্বারা বিচার করিলেও রবীন্দ্রনাথের উক্তি সারবান্ বলিয়া প্রতীতি হইবে না। কারণ, প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত আদর্শ-মানব হইতে হইলে বিজ্ঞানে কতখানি পারদর্শিতা লাভ করা প্রয়োজন? আজ যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য স্কুলের বালকরাও জানে, ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও তাহা জানিতেন না। তাহা হইলে সে যুগে কি আদর্শ-মানব হওয়া কাহারও সম্ভব ছিল না? আবার ৫শত বৎসর পরে হয় ত অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, এখন সে সকল কেহই জানে না। অতএব এখনও কি কোনও মানবের পক্ষে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা সম্ভব নহে? এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে যে, কোনও একটা বিশেষ যুগেই মানবের পক্ষে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে বহির্জগতের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, কারণ, বহির্জগৎ অতি বিশাল, এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা জ্ঞান-বারিধির সৈকতভূমিতে উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। গেটে (Goethe) মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন Light—more light (আলো—আরও আলো)। তাহার কারণ, তিনি বহির্জগতের জ্ঞানের দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরমধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোক না জ্বালিলে সকল সংশয় কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

"সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মকে) দেখিতে পাইলে সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়," এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিবার জন্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনাই যথেষ্ট; সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্যক্ সাধনার প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যেরূপ আদর্শ-মানবের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তব জগতে সেরূপ মানুষ একটিও দেখা যায় না। আজকাল জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির অসংখ্য শাখাপ্রশাখা। কাব্য, দর্শন, উপন্যাস, নাটকের, ইংরাজী, বাঙ্গালা, ফার্সি, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্ম্মাণ, গ্রীক, লাটিন, রুসিয়ান সকল ভাষায় কত অসংখ্য ভাল গ্রন্থ আছে। Physics, Chemistry, Geology, Botany, Biology, Zoology, Astronomy, Statics, Dynamics, প্রভৃতি বিজ্ঞানের কত বিভিন্ন শাখায় কত জ্ঞান আহৃত হইয়াছে, আবার নিত্য নূতন কথা আবিষ্কৃত হইতেছে। গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি কত রকম শিল্প আছে। এক ব্যক্তির এই সকল বিদ্যায় তুল্যভাবে পারদর্শী হওয়া কি সম্ভব? তাহার জন্য যে সময় ও উদ্যমের প্রয়োজন, একটি মানবের পক্ষে তাহা নিয়োগ করা অসম্ভব। * আবার শুধু এই সকল বিদ্যায় খুব পারদর্শী হইলে হইবে না, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে। তাহার সময় পাইবেন তিনি কোথায়? আধ্যাত্মিক সাধনা খুব সহজ জিনিষ নহে। ইহার জন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী একাগ্রসাধনার প্রয়োজন। শুধু সময় নহে, একাগ্রতাও চাই,—বিবিধ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে সে একাগ্রতা বিনষ্ট হইয়া যায়, নাচ-গান শিখিবার চেষ্টা করিলে, নিয়মিতভাবে Theatre Bioscope Radio শুনিলে (এ সকল না হইলে রবীন্দ্রনাথের মতে মানব পঙ্গু হইয়া যাইবে) চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে না, তন্ময় না হইলে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সে পথ অতি দুরূহ,—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ঈশ্বরলাভ করিবার পথ ক্ষুরধারার ন্যায় সূক্ষ্ম। সে পথ অতি দুর্গম।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমার এই সব কথা বলিবার কি ইহাই উদ্দেশ্য যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প এ সকল চর্চ্চা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি এই সকল চর্চ্চা করিয়া থাকে, ঠিকমত চর্চ্চা করিলে ইহাতে সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই সকল বিদ্যার মধ্যে কেবলমাত্র একটি বিদ্যার অত্যন্ত চর্চ্চা এবং অপর সকল বিদ্যার সম্পূর্ণ অবহেলা করিলে মানব-চরিত্রের সুশোভন পরিণতি হয় না। কিন্তু মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা যে ঈশ্বরলাভ, তাহাতে এই সকল বিদ্যার একটি অথবা সকলগুলি যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত ঈশ্বরলাভের জন্য যে একাগ্র-চিত্ততা এবং দীর্ঘ সাধনা প্রয়োজন, তাহাতে এই সকল বিদ্যার বেশী রকম আলোচনা অন্তরায় হইবে। গ্রাম্য সুখভোগ অপেক্ষা সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা ভাল, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা অপেক্ষা ঈশ্বরলাভার্থ একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা শ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অভিনব মত-প্রচারের ফলে কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে কিরূপ উৎকট রবীন্দ্র-ভক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রাবণের 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য নামক এক জন লেখকের লেখা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"রবীন্দ্রনাথ কি যে কোনও ঋষির চেয়ে কম না কি? বরঞ্চ শুধু ঋষি বললেই তো তাঁকে খাটো করা হয়। আমি তো মনে করি সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁরা আর্ষ প্রয়োগ করে গেছেন, এমন

* ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাহিত্য রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা সিদ্ধিলাভ করিবার পরে। সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারাও একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা করিয়াছিলেন।

* গীতা বলিতেছেন,

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।"

... রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসবার সৌভাগ্য হ'লে কৃতার্থ হ'য়ে যেতেন।"

ঋষিগণ সাধারণতঃ "প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব ক'রে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মনন-চর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধন" করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা সাধনার জন্য "গুহাবাস"ও করিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রণীত কবিতা, উপন্যাস, নাটকে এইরূপ সাধনার বহু নিন্দা করিয়াছেন। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ভক্তের মনে ঋষিগণ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা নাই। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করেন,—কবিতা—উপন্যাস নাটক—বিজ্ঞান সকল বিষয়েরই চর্চ্চা করেন। ঋষিগণ এত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিতেন না। সুতরাং কোন কোন ভক্তের দৃষ্টিতে যে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ আদর্শ-মানব বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, এবং ঋষিগণ তাঁহার তুলনায় বহু নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এবং এইরূপ ভক্ত যে তাঁহার উদ্ভট কল্পনায় ঋষিগণকে 'রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায়' বসাইয়া তাঁহার মানস-চক্ষু চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। বিচিত্র ইহাই যে, 'বিচিত্রার' সম্পাদক এইরূপ হীন ও লজ্জাকর রবীন্দ্র-স্তুতি তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)

পাল-রাজত্বসময়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প

বঙ্গের পাল রাজবংশ গৌড়-মগধ-বঙ্গে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল প্রবল পরাক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াই রাজ-ধর্ম্ম শেষ করেন নাই। দেশ যাহাতে শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান্ ও মনোযোগী ছিলেন। পাল-রাজগণ যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, তেমনই গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান্, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও শিল্পিগণেরও আশ্রয় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সুবৃহৎ পাল-সম্রাজ্য যে বহু গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান্, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পীর সমুজ্জ্বল প্রতিভায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ-প্রদত্ত বিবরণ এবং পাল-রাজগণের রাজত্বসময়ে উৎকীর্ণ শিল্প ও তাম্রলিপি সকল হইতে জানিতে পারা যায়। (১)

প্রাচীন ভারতে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, তক্ষশিলা, শ্রীধন্য-কাতক, নালন্দা যেমন আর্য্য-সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থান ছিল, মধ্যযুগে বৌদ্ধবিহারগুলি তেমনই ভারতীয় জ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতার কেন্দ্র হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বা ধর্ম্মপ্রচার অতীব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই কারণে তিনি মুক্ত আকাশতলে, মুক্ত বায়ুতে, ছায়ামণ্ডিত ঘনপল্লবিত বৃক্ষতলে বসিয়া সাধারণ্যে শিক্ষা বা ধর্ম্মপ্রচার প্রথার প্রচলন

(১) Indian Antiquiry Vol. XV, P. 162.

করেন। ছায়ামণ্ডিত উপবনকুঞ্জের তরুতলে বসিয়া যিনি জ্ঞান বিতরণ করিতেন, তিনি 'অঙ্কুরিক' নামে সম্মানিত ছিলেন। এই উপবন বা আরাম প্রাচীন বৌদ্ধ-ভারতের প্রাথমিক ও প্রাচীন সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।—এই আরামই পরবর্ত্তী যুগে সংঘারামে পরিণত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বৌদ্ধ পাল-নৃপতিগণও বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই সকল বিহারে যেমন ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মালোচনা হইত, তেমনই শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা প্রদানও করা হইত। এই বিহারগুলি শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারত ও বহির্ভারতে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়াছিল।

পাল-নবপালগণ শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিহার বা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; শিক্ষার্থিগণের জন্য বিহারের এক অংশে ছাত্রাবাস ও সত্র প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ যেমন বিনা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তেমনই বিনা ব্যয়ে সত্র হইতে আহার্য্য পাইত, ও ছাত্রাবাসে বাস করিত।

পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত, শক্রাদিত্য, বালাদিত্য, বুদ্ধ গুপ্ত, তথাগত গুপ্ত প্রভৃতি নবপালগণ-পরিসেবিত সুবিখ্যাত নালন্দা বা নরেন্দ্রবিহার—বিশ্ববিদ্যালয় পাল-রাজবংশের অভুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল-রাজগণের কর্তৃত্বাধীনে আইসে এবং তাঁহারাই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

পাল-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মগধে দুইটি ও বঙ্গদেশে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল-রাজবংশের প্রথম ভূপাল প্রথম গোপালদেব মগধে উদন্তপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। (১) এই বিহারও বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। উদন্তপুরী গঠন-সৌন্দর্য্যে ও ভাস্কর্য্যে এতই অতুলনীয় ছিল যে, নালন্দা ও বজ্রাসন বিহারও ইহার তুলনায় নিম্ন শ্রেণীর ছিল। তিব্বত দেশের রাজা তাঁহার গুরু-দেব গৌড়নিবাসী বাঙ্গালীর গৌরব আচার্য্য শান্তরক্ষিতের উপদেশ অনুসারে ৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নিজদেশে এই বিহারের আদর্শে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। (২) এই বিহারটীর নাম—সাম-ই। উদন্তপুরী যেমন পাল-রাজবংশের প্রথম বিহার, সাম-ই বিহারও সেইরূপ তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগণের প্রথম বিহার। শান্তরক্ষিত এই বিহারের প্রথম বাঙ্গালী অধিনায়ক। (৩)

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে ও দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে উদন্তপুরী বিহারে হীন-যান সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক

(১) Archeological Survey Reports Vol. XV, Preface P. III.

(২) L A. Waddell, Lamaism P. 28.

(৩) History of Mediaeval School of Indian Logic: S. C. Vidyabhusan, P. 125.

এবং মহাযান সম্প্রদায়ের পাঁচ সহস্র ভিক্ষু বাস করিত। (১) ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত সুবিখ্যাত আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই বিহারের মহা সজ্ঘিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ যে নামে তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য জগদ্বিখ্যাত, সেই বিশ্ববিশ্রুত "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধিভূষণে আচার্য্যদেব তাঁহাকে ভূষিত করেন। (২) এই বিহারের গ্রন্থাগার হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহে পূর্ণ ছিল। নালন্দা, উদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার বিরাট গ্রন্থাগার হইতেই তিব্বতীয়গণ ভারতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশের গ্রন্থাগার যেমন পূর্ণ করেন, তেমনই বিরাট তিব্বতীয় সাহিত্য সৃষ্টিও পুষ্ট করেন। (৩) ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণে এই বিহার ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারও ধ্বংস হইয়া যায়। (৪) এই বিহারের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক জন অধ্যাপক ও তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার নাম প্রভাকর। তিনি ভারতের কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহাও জানা যায় না। তিনি 'সামুদ্রিক বিজ্ঞানবর্ণনা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। (৫) ভারতের বহু জনপদের বহুসংখ্যক ছাত্র এই বিহারে আসিয়া অধ্যয়ন করিত।

পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় নরপাল ধর্ম্মপাল সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমশিলা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। (৬) মহারাজা ধর্ম্মপাল নালন্দা ও বিক্রমশিলা উভয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন। এই সময় হইতে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ (Intercourse) ছিল। (৭) একই অধ্যাপক উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, আচার্য্য জেতারী, পণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়।

বিক্রমশিলা বিহার তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থান হয়। নালন্দার মত বিক্রমশিলা বিহারেও ভারত ও বহির্ভারতের বহু জনপদ হইতে বহুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র অধ্যয়নার্থ আগমন করিত। বিক্রমশিলা বিহার ছয়টি কলেজে বিভক্ত ছিল। (৮) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিত ও বিনা ব্যয়ে সত্র হইতে আহার্য্য লাভ করিত। (১) *নালন্দা হইতে যেমন বহুসংখ্যক* ধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ চীনদেশে গমন করিয়াছিল, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তেমনই বহুসংখ্যক প্রচারক তিব্বতদেশে গমন করিয়াছিল। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই তিব্বত-রাজের অনুরোধে তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও সংস্কার করিবার জন্য প্রথমে তিব্বতদেশে গমন করিয়াছিলেন। গৌড়নিবাসী নালন্দা বিহারের অধিনায়ক, তান্ত্রিকাচার্য্য শান্তরক্ষিত প্রথমে তিব্বতে গমন করিয়া রাজ-গুরুপদে বরিত হয়েন। (২) ইহার কিছুকাল পরে আচার্য্য দীপঙ্কর পরবর্ত্তী তিব্বত-রাজের অনুরোধ-আমন্ত্রণের ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারার্থ চিরতুষারাবৃত তিব্বতদেশে গমন করিয়াছিলেন। (৩) বিক্রমশিলা চারি শত বৎসরকাল অক্লান্তভাবে সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রচার করেন। মুসলমান আক্রমণে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বিহারের মত ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলাও ধ্বংস হইয়া যায়। (৪) এই সময় কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত আচার্য্য শাক্যশ্রী বিক্রমশিলা বিহারের শেষ অধিনায়ক ছিলেন। (৫) বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল। পাদ্মসম্ভব, শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, জেতারী, জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, শুভাকর প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

বৌদ্ধ বিহারগুলিই ভারতের সহিত বহির্ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুদূরকে অতি নিকটবর্ত্তী করিয়াছিল। বৌদ্ধ নৃপতিগণ দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতেন। যাঁহারা জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় অসাধারণ ছিলেন, তাঁহারাই বিপুল দায়িত্বপূর্ণ প্রচারকর্ম্মে বিহার হইতে বিহার-অধিনায়ক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেন। এই সকল ভিক্ষু—প্রচারকই সুদূর মহাচীন, জাপান, কোরিয়া, বোখারা, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভারতের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া তদ্দেশবাসিগণকে নিবিড় প্রেম-ধর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

মগধে যেমন নালন্দা, উদন্তপুরী, বিক্রমশিলা বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশেও তেমন পাল-নরপাল রামপাল কর্ত্তৃক জগদ্দল মহা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিহার এক শতাব্দী ব্যাপিয়া, জ্ঞান, সভ্যতা, শিক্ষা বিতরণ করিয়াছিল। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, বসুধার শীর্ষস্থান বরেন্দ্রভূমির রামাবতী

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1882 P. 1-18 ; Hindusthan Review 1906 March. P. 190.

(২) Indian Pandits in the Land of Snow P. 51. S. C. Das.

(৩) Journal of the Buddhists Text and Research Society 1906, Vol. VII, Part IV P. 21.

(৪) Indian Antiquiry Vol, IV. PP. 366-67 ; Early History of India 3rd Edition, V. A. Smith.

(৫) Catalogue du Fand Tebetain iii, P. 484.

(৬) Early History of India V.A. Smith P 308.

(৭) History of the Mediaeval school of Indian Logic P 146. By Satish Ch. Vidyabhusan

(৮) Hindusthan Review 1906. March P. 191.

(১) History of Education in Ancient India P 98. by N. N. Mazumdar.

(২) Indian Pandits in the Land of Snow P 49. S. C. Das.

(৩) Indian Pandits in the Land of Snow P 50. S. C. Das.

(৪) Early History of India, By V. A Smith.

(৫) History of Mediaeval School of Indian Logic by M. M. Satish Chandra Vidyabhusan P 151.

নগরে এই বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) রামাবতী নগরী গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। শতাব্দীকাল জীবদ্দশার মধ্যে এই বিহার হইতে বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর, মোক্ষকর গুপ্ত প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

পাল-রাজত্বসময়ে যেমন শিক্ষার উন্নতি ও প্রচার হইয়াছিল, তেমনই সাহিত্য ও শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। হিন্দু অমাত্যনিয়োগ, বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে তাঁহাদিগের হিন্দু-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাল-রাজত্বকালে হিন্দুর স্বাধীনভাবে মৌলিক চিন্তা বা গবেষণা অথবা সাহিত্যসৃষ্টির পথে কোনপ্রকার বাধা উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও উহা সাহিত্যসৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ হইয়া আছে।

পালরাজবংশ বঙ্গদেশে রাজপদ গ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সমাধা করিবার জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ যে বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই ব্রাহ্মণগণ এক শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

পাল-রাজবংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাল-রাজত্বের সাহিত্য তিন শ্রেণীর সাহিত্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া (ক), হিন্দু সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতীয় বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া (খ), বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া (গ) বৌদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

ব্রাহ্মণগণ যেমন সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই বঙ্গভাষাতেও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় লিখিত ব্রাহ্মণগণ-রচিত কোন গ্রন্থ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ বা পূজাদি কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সেই সকল মন্ত্রের টীকা রচনা করেন। মন্ত্রের টীকা রচনার কাল অজ্ঞাত হইলেও যে টীকাকারের নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম নগুড়।

ইঁহার পর নারায়ণ ও ভবদেব সামবেদীয় সূত্রের দুই খণ্ড টীকা রচনা করেন। টীকাকার ভবদেব ও নারায়ণ মহারাজ দেবপাল দেবের সমসাময়িক ছিলেন। মাধব ভট্টের পুত্র গোবিন্দরাজ মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে সুবিখ্যাত জীমূতবাহন দায়ভাগ রচনা করেন, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আজিও ইংরাজ-রাজত্বে পঠিত হইতেছে। (২)

দায়ভাগ ব্যতীত জীমূতবাহনের যজ্ঞ ও পূজাদির সময়-নিরূপক আর একখানি গ্রন্থ এই যুগেই রচিত হয়। রাজা মহীপালদেবের রাজত্বসময়ে তাঁহার বিজয়োৎসব উপলক্ষে আর্য্য ক্ষেমীশ্বর 'চণ্ডকৌশিক' নামক নাটক রচনা করেন। (১) আর্য্য ক্ষেমীশ্বর বাঙ্গালী ছিলেন। এই যুগেই বেণীসংহার নাটক রচিত হয়। হিন্দুকবিরা নাটকের ন্যায় অনেক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়েই কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে ধোয়ী কবির পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল।

এই যুগে দর্শনের ক্ষেত্রেও হিন্দু-বাঙ্গালীর মনীষা, প্রতিভা কম স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই। দর্ভপাণির বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে পালসম্রাটগণের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। জীবিকা সংগ্রহের জন্য ইঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও প্রত্যেকেই দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌত্র কেদারমিশ্র বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ মেধাশক্তিসম্পন্ন ও চতুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। গুরব মিশ্র বেদ, আগম ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদিগের রচিত দর্শনের টীকা বা ভাষ্য পাওয়া না গেলেও ইঁহারা প্রত্যেকেই দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

পালরাজত্বসময়ে অনেকগুলি দর্শন-গ্রন্থও রচিত হয়। বৈশেষিক দর্শনের টীকা রচিত এবং প্রচারিত হয়। সুবিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়ন পালরাজত্বকালেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (২) ভৈষজ্য বিজ্ঞানেরও সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বৈদ্য চক্রপাণি এই যুগেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বসূরিগণ-রচিত বহুসংখ্যক চিকিৎসা-গ্রন্থের টীকা রচনা, সম্পাদন ও নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। (৩)

পালরাজত্বকালে হিন্দু-সংস্কৃত-সাহিত্যের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইয়ছিল, তেমনই বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। মহারাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বসময়ে তাঁহারই উৎসাহে, যত্নে ও অনুরোধে ত্রৈকূটক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিভদ্র নাগার্জ্জুনের সুবিখ্যাত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক'। (৪) বৌদ্ধ পণ্ডিত মৈত্রেয়নাথ কারিকা আকারে অষ্টম অধ্যায়ে "অভিসময়ালঙ্কার" শাস্ত্র রচনা করেন। (৫) এই উভয় গ্রন্থই ধর্ম্মপালের রাজত্বসময় তাঁহার কনৌজ জয় করিবার পর রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। (৬) মহারাজা নয়পালদেবের

---

(১) Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol, III.

(২) Journal of the Behar Orissa Research Society vol 5, Part, II.

---

(১) Journal of the Asiatic Society Bengal vol. L XII, 1893 Part I P, 250.

(২) Journal of the Behar Orissa Research Society Vol. 5 Part II P I.

(৩) Introduction to Ram Charita Edited by M. M. Haraprosad Sastri p. 12.

(৪) Journal of the Behar Orissa Research Society Part II. P, I..

(৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৩ ২য় সংখ্যা ৮৪ পৃঃ।

(৬) Introduction to Ram Charita P, 5-6

রাজত্বসময়ে রাজ্ঞী উদ্দাকারের যত্ন ও ব্যয়ে সংস্কৃত ভাষায় "পঞ্চরক্ষা" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়। (১)

নরপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। মন্ত্রযান মতবাদের মত এই যে, যোগসাধন, দর্শনশাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ধারণা দ্বারা যেমন লোকে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, মণ্ডল অঙ্কন, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাও সেইরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে। (২) উড়িষ্যার এক রাজা মন্ত্রযান মতবাদ প্রবর্ত্তন করেন। ইহাই বজ্রযান নামে ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার পুত্র পদ্মসম্ভব তিব্বতীগণকে বজ্রযান মতবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁহার জামাতা গৌড়নিবাসী সুবিখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য্য শান্তরক্ষিত এই মতবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পদ্মসম্ভবের ভগিনী এই মতবাদ প্রচারে ভ্রাতার সহায় হইয়াছিলেন। (৩) মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান এই চারিটির সাধারণ নাম তন্ত্র। (৪)

পালরাজগণের রাজত্বকালীন বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের রচিত বহুসংখ্যক তন্ত্র-গ্রন্থ প্রচারিত হয়। বিক্রমশিলা বিহারের জন্মসূচনা হইতে এই জ্ঞানের মন্দির বৌদ্ধতন্ত্র-সাহিত্যের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল। লামা তারানাথ বলিয়া গিয়াছেন, এই বিহারের অধিনায়কগণ প্রত্যেকেই মন্ত্রবজ্রাচার্য্য ছিলেন। (৫) এই মন্ত্রবজ্রাচার্য্যগণ অসংখ্য তন্ত্র-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেন।

নালন্দা বিহার তন্ত্র-সাহিত্যের জন্মস্থান হইলেও তন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নালন্দা অপেক্ষা বিক্রমশিলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। (৬)

পালরাজত্বকালে বৌদ্ধ ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রেরও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র যথাক্রমে, অতি প্রাচীন (৩০০ খৃঃ পূঃ ৪০০ খৃঃ), মধ্য (৪০০ খৃঃ—১২০০ খৃঃ) এবং আধুনিক (১২০০ খৃঃ—১৮৫০ খৃঃ)—তিনটি স্তর বা যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের ন্যায়শাস্ত্র জৈন ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের রচনাসম্ভারে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণই মধ্যযুগের বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের প্রকৃত জনক।

মালবের উজ্জয়িনী, গুজরাটের বল্লভীনগর, পাটলীপুত্র, এবং দ্রাবিড় যেমন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়স্থ জৈন নৈয়ায়িকগণের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, গান্ধার (আধুনিক পেশোয়ার), দ্রাবিড় (দাক্ষিণাত্য), কাশ্মীর এবং বঙ্গ-বিহার, তেমনই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল।

পালরাজত্বকালীন বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের দ্বারাই সম্যক্ পরিপুষ্ট হয়।

মধ্যযুগে পালরাজত্বসময়ে বঙ্গ-বিহারে বহুসংখ্যক নৈয়ায়িকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গ-বিহারের নৈয়ায়িকগণের মধ্যে বরেন্দ্রদেশনিবাসী (আধুনিক রাজসাহী) সুবিখ্যাত চন্দ্র গোমিনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ; তিনিই এই যুগের প্রথম নৈয়ায়িক। তাঁহার রচিত "ন্যায়ালোকসিদ্ধি" প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়াছে; তিব্বতী ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। পণ্ডিত সীতপ্রভ এবং তিব্বতীয় দ্বিভাষী বৈরচন উভয়ে মিলিয়া এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। (১) চন্দ্র গোমিনের পর সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক শান্তরক্ষিতের আবির্ভাব হয়। শান্তরক্ষিত-রচিত ন্যায়গ্রন্থের মধ্যে "তত্ত্বসংগ্রহকারিকা" সুবিখ্যাত গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। কুমারশ্রী ভদ্র তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। (২) ধর্ম্মপালের রাজত্বসময়ে কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খৃঃ) মহীপালের রাজত্বের সময়ে দানশীল (৮৯৯ খৃঃ) ও প্রভাকর গুপ্ত (৯৫০ খৃঃ) সুবিখ্যাত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০ খৃঃ) নয়পালের রাজত্বসময়ে জমারী (১০৫৯ খৃঃ) প্রভৃতি সুবিখ্যাত নৈয়ায়িকের প্রাদুর্ভাব হয়।

সাধারণের ধারণা, বঙ্গসাহিত্য আধুনিক—ইহার বয়স কিঞ্চিদধিক শতাব্দী মাত্র। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমণকাল পর্য্যন্ত পাল-রাজত্বসময়ে গৌড়-বঙ্গে যেমন বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য—তেমনই প্রবল বঙ্গসাহিত্যও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বঙ্গসাহিত্য আধুনিক নহে বা ইহার বয়স শতাব্দী মাত্র নহে—পরন্তু সহস্রাধিক বৎসর।

বৌদ্ধ ও শৈব যোগী সম্প্রদায়ের রচনাসম্ভারে এই যুগের বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। শৈব যোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্য সম্প্রদায় পদ, গীতি, গাথা, দোঁহা রচনা করিয়া বিরাট বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। পালরাজত্বে যদি কিছু গৌরবের জিনিষ থাকে, তবে তাহা এই বিরাট বৌদ্ধ-বঙ্গ-সাহিত্য।

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্য যেমন প্রথম ও প্রধান, সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথও তেমনই প্রধান ও প্রথম। বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধ পুরুষগণের কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল, তাহার পরিচয় গোবিন্দচাঁদের গীত, মাণিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া প্রভৃতিতে পরিস্ফুট।

---

(১) Bendol's Cambridge Catalogue of Buddhist Sanscrit Manuscripts, P. 175. No 1688.

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৩ ২য় সংখ্যা ৮৫ পৃঃ।

(৩) Indian Historical Quarterly Vol. I, 1925, No, 3, P. 469-70

(৪) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৩ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৮৫।

(৫) Kern's Manual of Buddhism P. 132.

(৬) Magodhan Literature P, 131, M. M. Hara prosad Shastri.

---

(১) History of the Mediæval School of Indian Logic M. M. Satish chandra Vidyabhuson, p. 123.

(২) Ibid p 125.

উভয় যোগী সম্প্রদায় যেমন দোঁহা, পদ, গাথা প্রভৃতি রচনা করেন, তেমনই তাঁহারা এই সকল পদ, গীত, গাথা দোঁহার টীকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ-গ্রন্থও রচনা করেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণও বাঙ্গালাভাষায় দেহতত্ত্ববিষয়ক অসংখ্য গীত রচনা করেন; তৎকালে এই সমস্ত সঙ্গীতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। এইরূপে পাল-রাজত্বকালে গৌড়বঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

পালরাজত্বকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে যেমন শিক্ষার অসামান্য উন্নতি ও প্রচার, সাহিত্যের সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনই ভাস্কর্য্য, ধাতব ও চিত্রশিল্পেরও চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। এই চরমোৎকর্ষের ফলে গৌড় ও মগধ সমগ্র ভারতবর্ষে—বহির্ভারতেও সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তাঁহার সুবিখ্যাত ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজত্বসময়ে ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল নামক দুই জন শিল্পী ভাস্কর্য্য, ধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও চিত্রাঙ্কনে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মিত প্রস্তর, ধাতু-মূর্ত্তি ও অঙ্কিত চিত্রসমূহ নাগজাতির প্রস্তুত শিল্পের তুল্য উচ্চ-শ্রেণীর ছিল। ধীমান ও বীতপালের প্রস্তুত মূর্ত্তি-শিল্প ও অঙ্কিত চিত্র-শিল্প তৎকালীন যুগে আদর্শস্থানীয় হয়। পিতা ও পুত্রের প্রবর্ত্তিত শিল্পপদ্ধতি বা ধারা বিশিষ্ট বহু শিল্পী সম্প্রদায় গঠন করে। বীতপাল বঙ্গদেশে বাস করিতেন, তাঁহার নির্ম্মিত প্রস্তর অথবা ধাতুনির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বদেশের শিল্পকলা (Eastern style) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে যে সমস্ত চিত্রশিল্পী ধীমানের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির অনুসরণ করিত, তাঁহাদিগের অঙ্কিত চিত্র-সমূহও পূর্ব্বদেশের চিত্রকলা নামে সুপরিচিত হয়। যে সমস্ত চিত্রশিল্পী বীতপালের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে আদর্শ করিয়া চিত্রাঙ্কন করিত, তাহাদিগের অঙ্কিত চিত্রাবলী মধ্যদেশের চিত্রকলা নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। (১)

যে দুই জন শিল্পীর অসামান্য শিল্পপ্রতিভাচ্ছটায় গৌড়-মগধ-বঙ্গ—তথা সমগ্র ভারতবর্ষ আলোকিত হইয়াছিল, সেই শিল্পি-গণের আদর্শ—ধীমান ও বীতপাল উভয়েই বাঙ্গালী এবং তাঁহারা গৌড়—বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

(১) Indian Antiquiry vol. 4 p. 102.

মুক্তি-বাঁধন

বিশাল বিশ্বে প্রতি অণু পরমাণু-মাঝে
কি এক আসঙ্গ-লিপ্সা রহিয়াছে ভরা—
সকলের মাঝে শত বন্ধন বাসনা রাজে,
আপন দয়িতে সবে সঙ্গ দেয় ধরা।

জলদ সে আপনার প্রেমবাহু বিস্তারিয়া
সযতনে চপলারে বুকে বেঁধে রাখে,
রৌদ্র-ধারাতপ্ত-ধরা শীতল কৌমুদী দিয়া
সুধাংশুর স্নেহরাশি সারা অঙ্গে মাখে।

অরুণ-হিরণ-পুঞ্জে রঞ্জিয়া উঠিলে দিক্,
হেম-করে কমলিনী করে জল-কেলি,
আকাশে হাসিলে চাঁদ সাগর সে নির্নিমিখ্
আগ্রহে ধরিতে যায় ঊর্ম্মি-বাহু মেলি'।

প্রণয়-আবেগভরে মরমের কল-তানে
স্রোতস্বিনী ছুটিয়াছে সাগর-সঙ্গমে,
বাঁধনের ইন্দ্রজাল রচিত বিশ্বের গানে—
বন্ধন—বন্ধন শুধু স্থাবর-জঙ্গমে!

অযুত বন্ধনমাঝে মুক্তির আনন্দ-রূপ
উদ্ভাসি' উঠেছে দিব্য জ্যোতিঃ পরকাশি',
মোহন মায়াবী ঐ নিখিল বিশ্বের ভূপ
প্রেমের বন্ধনে দেছে মুক্তি অবিনাশী।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এস্-সি)।



ঊনবিংশ প্রবাহ

উপসংহার

কাপ্তেন বয়েলের কথা শুনিয়া মিঃ লক ও ক্রডার বিস্ময়-স্তম্ভিত হইলেও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; কিন্তু তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি তাহার কন্যার দুই হাত ধরিলেন এবং তাহাকে লইয়া দ্রুতবেগে প্রধান ডেকের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা চলিতে চলিতে তাঁহাদের দলের লোকগুলিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

বয়েল তাঁহাদের আদেশের সমর্থন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "শীঘ্র যাও, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না। যদি আর এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণরক্ষা হইবে না। আমি অস্ত্রাগারের বারুদে আগুন দিয়া আসিয়াছি।"

মিঃ লক তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই কার্য্যের ফল কিরূপ ভীষণ হইবে। তিনি দ্রুতবেগে জাহাজের ডেকের কিনারায় উপস্থিত হইয়া রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা যে কয়েকখানি বোট লইয়া সেনাপতি কলভেটির বলিভার জাহাজ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই বোটগুলিকে বলিভার জাহাজের পার্শ্বে ভাসিতে দেখিয়া বোটের মাঝিদের বোট লইয়া দূরে পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন; গভীর উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। বোটের মাঝিরা তাঁহার আদেশের কারণ বুঝিতে না পারিলেও তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি দূরে প্রস্থান করিল।

মিঃ লক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া অনেকগুলি আরোহী ও নাবিককে সেখানে জটলা করিতে দেখিলেন; তাহারা কিছুই বুঝিতে না পারিলেও আতঙ্কাভিভূত হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কেহ কেহ মিঃ লকের নিকট অগ্রসর হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়! আমরা ত নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ অধিকার করিয়াছি, তবে—"

মিঃ লক তাহাদিগকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "জাহাজ হইতে এই মুহূর্ত্তেই সমুদ্রে লাফাইয়া পড়। এ জাহাজ এখনই গুঁড়া হইয়া উড়িয়া যাইবে। ইহার অস্ত্রাগারের বারুদে আগুন লাগিয়াছে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া কেহই আর কোন প্রশ্ন করিল না। সকলেই তাড়াতাড়ি রেলিং ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল। যাহারা ডেকের নীচে ছিল, তাহারাও মিঃ লকের আদেশ শুনিতে পাইয়াছিল; তাহারা সকলেই, এমন কি, বলিভার জাহাজের নাবিক ও রক্ষীর দলও প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া জাহাজ হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল! জাহাজের কোন আরোহী মুহূর্ত্তকাল জাহাজে থাকিতে সাহস করিল না।

মিঃ লক ক্রডারকে বলিলেন, "এখনও ওখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ? কেন জীবন বিপন্ন করিতেছ? এই মুহূর্ত্তেই সমুদ্রে লাফাইয়া পড়। আমি মিস্ বয়েলের রক্ষার ভার লইব।"

ক্রডার বলিল, "আমরা একসঙ্গেই লাফাইয়া পড়িব মরিতে হয়, একত্র ডুবিয়া মরিব আপনি প্রস্তুত?"

মিঃ লক তাঁহার পার্শ্বস্থিতা তরুণীর মুখের দিকে চাহিলেন, ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে লাফাইয়া পড়িতে হইবে শুনিয়া তাহার বক্ষঃস্থল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল; সে তাহার পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে মিঃ লককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু মিঃ লক তাহাকে কথা বলিবার অবসর দিলেন না, হঠাৎ দৃঢ়-মুষ্টিতে তাহার দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া জাহাজের ডেকের কিনারা হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িলেন। জলে পড়িয়া প্রথমে তাঁহাদের উভয়কেই ডুবিতে হইল, কিন্তু লক মিস্ বয়েলের হাত ছাড়িলেন না, তাহাকে লইয়াই ভাসিয়া উঠিলেন। তিনি পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নুডারকে ভাসিতে দেখিলেন। সে তাঁহাদের সঙ্গেই সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ লক ও স্নুডার মিস্ বয়েলকে মধ্যে রাখিয়া, তাহার দুই পাশে থাকিয়া সাঁতার দিয়া দূরস্থ বোটের দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা যুগপৎ শত বজ্রনিনাদের ন্যায় শ্রবণ-বিদারক সুগম্ভীর শব্দ শুনিয়া মিঃ লক মাথা ঘুরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন, বলিভার জাহাজের মধ্যস্থল হইতে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় ধূমরাশির একটি স্তম্ভ ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার ঊর্দ্ধে অগ্নিরাশির লোল জিহ্বা মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় নৃত্য করিতে-ছিল এবং তাহার আলোক-প্রভায় আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মিঃ লক সেই আলোকে দুই জন লোককে তখনও সেই জাহাজের ডেকে পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে দেখিলেন। তাহাদের এক জন জাহাজের রেলিং ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আর এক জন তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাহার আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; তাহারা উভয়ে জাহাজের রেলিংএর পাশে ডেকের উপর পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে লাগিল। মিস্ বয়েলও সাঁতার দিতে দিতে মাথা ঘুরাইয়া অগ্নিজিহ্বার উজ্জ্বল আলোকে তাহাদের উভয়কে দেখিতে পাইল; সে সন্ত্রাসে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! বাবা এখনও জাহাজে! উনি নরপশু কলভেটিকে জাহাজের উপর আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে পলায়ন করিতে দিবেন না! হায়, হায়, কিরূপে বাবার প্রাণরক্ষা হইবে?"

মিঃ লক বলিলেন, "এখন তোমার আক্ষেপ নিষ্ফল। কলভেটি তোমাদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, তোমার পিতা সেই অত্যাচারের ও অপমানের প্রতিফল না দিয়া ছাড়িবেন না। উহাকে মারিয়া মরিবেন, এইরূপই বোধ হয় উঁহার সঙ্কল্প। এখন আর উঁহাকে ফিরাইবার উপায় নাই।"

মিঃ লকের কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরেই সমগ্র জাহাজ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জাহাজখানি বিশাল অগ্নিরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। সেই অগ্নিতে সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। যে সকল লোক জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সমুদ্রে সাঁতার দিতেছিল, তাহারা জ্বলন্ত জাহাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিল। সে অতি ভীষণ দৃশ্য! মুহূর্ত্ত পরে বোমা ফাটিবার মত মহাশব্দে জাহাজ ফাটিয়া ফাঁসিয়া গেল, এবং তাহার বিভিন্ন অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অগ্নিমুখ হাউইয়ের মত মহাবেগে ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইল।

মিঃ লকের মনে হইল, সমুদ্রের জলরাশি মহাবেগে ঊর্দ্ধাকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা যেন গিরিচূড়ার ন্যায় উচ্চ তরঙ্গরাশির ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তরঙ্গশিখর হইতে অতল জলধিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া তলাইয়া যাইতে হইবে। জাহাজ ফাঁসিবার শব্দের সহিত আলোড়িত মহাসমুদ্রের গর্জ্জনধ্বনি মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে বধির করিল। তাঁহাদের মস্তকের উপর উদ্দাম ঝটিকা মহাশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মিঃ লকের মনে হইল—প্রলয়কাল সমুপস্থিত। তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। মিঃ লক সবেগে উদ্দাম সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন, কিন্তু তখনও তিনি মিস্ বয়েলের হাত ছাড়িলেন না। বারংবার তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল—আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; কোন কারণে একবার তিনি মুষ্টি শিথিল করিলে মিস্ বয়েল তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া ছিটকাইয়া দূরে ভাসিয়া যাইবে, আর তিনি তাহাকে ধরিতে

পারিবেন না। বহুবার তাঁহাদিগকে তরঙ্গাভিঘাতে নাকানি-চুবানী খাইতে হইল; কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ ডুবিয়াও মিস্ বয়েলকে ছাড়িলেন না।

কিছুকাল পরে ঝটিকাবেগ প্রশমিত হইল, উন্মত্ত সমুদ্রও শান্তভাব ধারণ করিল। পূর্ব্বাকাশ আসন্ন উষার অস্ফুট আলোকে ঈষৎ রঞ্জিত হওয়ায় সমুদ্র-তরঙ্গের ঊর্দ্ধ-স্থিত নৈশান্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। মিঃ লক সেই অস্ফুট উষালোকে কিছু দূরে কতকগুলি লোকের মাথা দেখিতে পাইলেন। তাহারা একখানি ভাসমান বোট ধরিয়া সমুদ্রে সাঁতার দিতেছিল, বোটখানি কিছুকাল পূর্ব্বে ঝটিকাবেগে উল্টাইয়া গিয়াছিল। উহা কালিম্পো জাহাজেরই বোট। বোটখানি উল্টাইয়া যাওয়ায় তাহার আরোহীরা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিতেছিল।

অবশেষে মিঃ লক অদূরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সর্টি লাইটওয়ে সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে একখানি বোট ধরিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেই বোটের দাঁড়ি-মাঝিদের মিঃ লকের নিকট পরিচালিত করিল। সে উষালোকে মিঃ লককে মিস্ বয়েলের সঙ্গে ভাসিতে দেখিয়াছিল। সমুদ্র তখন শান্ত, স্থির এবং অনুদিত অরুণের লোহিতালোকে সুরঞ্জিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইটওয়ে ও বোটের দাঁড়ি-মাঝিরা মিঃ লক ও মিস্ বয়েলকে সেই বোটে তুলিয়া লইল। তাহার পর বোটখানি কালিম্পো জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। অন্য দুইখানি বোটও বিপন্ন আরোহিগণকে তুলিয়া লইয়া কিছু কাল পরে জাহাজের পাশে ভিড়িল।

বোটের আরোহীরা কালিম্পো জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাদের হাজিরা লওয়া হইল। কেবল তিন জন নাবিকের সন্ধান হইল না; সম্ভবতঃ তাহারা বলিভার জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িবার পর সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছিল। দশ জন নাবিক আহত হইয়াছিল। স্ক্রুডার ডুবিতে ডুবিতে অতি কষ্টে একখানি বোটে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। মাজাডোর কাঁধে একটি গুলী বিঁধিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। লাইটওয়ের একটি চক্ষুর নীচে আঘাত লাগিয়াছিল এবং অল্প রক্তপাত হইয়াছিল, কিন্তু চক্ষুটি রক্ষা পাইয়াছিল।

তাহারা তিনখানি বোট লইয়া যে অসমসাহসের কায করিতে গিয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাহাদের হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। কেবল মিস্ বয়েল তাহার পিতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল। মিঃ লক তাহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে সে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মিঃ লকের নিকট স্বীকার করিল, কাপ্তেন বয়েল সেনাপতি কলভেটিকে শাস্তিদানের জন্য বলিভার জাহাজ ত্যাগ না করায় জাহাজের আগুনে তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যদি সে অন্য সকলের ন্যায় জাহাজ হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহাদের অতীত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইতে হইত, তাহার অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। তাহা অপেক্ষা তাহার এই মৃত্যু অধিকতর প্রার্থনীয়, কিন্তু পিতাকে হারাইয়া তাহার হৃদয়ের হাহাকার সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে; বিশেষতঃ সংসারে পিতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

মাজাডো আহত হইলেও কাতরতা প্রকাশ করিল না। সে রেডিওর সাহায্যে প্রেসিডেণ্টের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি কলভেটির পরাজয় ও মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার গোচর করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। স্ক্রুডার জাহাজের ডেকে আসিলে সে প্রেসিডেণ্টের নিকট সেই সংবাদটি প্রেরণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।

স্ক্রুডার বলিল, "তুমি প্রেসিডেণ্টের নিকট একটি কেন, দশটি সংবাদ পাঠাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি প্রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, ইহাতে তোমার লাভ কি? আমার বিবেচনায় তোমার নীরব থাকাই উচিত, তুমি ধরা না দিলেই বুদ্ধিমানের কায করিবে। তুমি তাঁহার একখানি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট জাহাজ নষ্ট করিয়াছ, এ সংবাদ প্রচারিত হইলে তিনি কি তোমাকে সহজে ছাড়িবেন? এই অপরাধে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইবে, তাহা হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। সখ করিয়া বিপদে পড়া নির্ব্বোধের কায।"

মাজাডো বলিল, "না সিনর, সে জন্য তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি তাঁহার গুপ্তচর, আমার সাফল্যের

কথা তাঁহাকে জানাইতে চাহি। যদি বলিভার জাহাজ ধ্বংসের জন্য আমাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হয়, আমি সহজেই তাহা করিতে পারি।"

ক্রডার বলিল, "হাঁ, যদি সেই সকল গুপ্ত ধনরত্ন তোমার হাতে পড়িত, তাহা হইলে ও কথা তোমার মুখে শোভা পাইত; কিন্তু তাহা ত তুমি আত্মসাৎ করিতে পার নাই।"

মাজাডো হাসিয়া বলিল, "আপনি কিরূপে জানিলেন, আমি সেগুলি আত্মসাৎ করিতে পারি নাই?"

ক্রডার সবিস্ময়ে বলিল, "তবে কি সেগুলি তোমারই হাতে পড়িয়াছে?"

মাজাডো বলিল, "না সিনর, আমার হাতে পড়ে নাই বটে, কিন্তু আমরা বলিভার জাহাজে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টের দলভুক্ত লোকরা তাহা তীরে লইয়া গিয়াছিল। আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার জাহাজ সেই দিকে লইয়া গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বোট পাঠাইব।"

ক্রডার বিস্মিতভাবে মাজাডোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কলভেটি অপেক্ষা ইঁদুরের শয়তান! তুমি তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ!"

মাজাডো বলিল, "এবং বয়েলের সুন্দরী কন্যাও তাহার কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে।"

ক্রডার বলিল, "হাঁ, মিঃ লকের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে।"

মিঃ লক বলিলেন, "কিন্তু তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আমেরিকানরা চিরদিনই বিপন্ন ইংরাজের বন্ধু।"

মিঃ লক হোবোকেন বন্দরে আসিয়া মিস্ বয়েলকে যে জাহাজে তুলিয়া দিলেন, তাহা নিউইয়র্ক হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিল। মিঃ লক ও লাইটওয়ে ক্রডারের অতিথিরূপে আরও কয়েক দিন নিউইয়র্কে বাস করিলেন।

রিভারসাইড ড্রাইভ নামক পথের ধারে ক্রডারের বাসভবন। মিঃ লক লাইটওয়েকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে ক্রডারের গৃহে যাইবার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সটি, এখন তুমি কি করিবে? পিড্রোর সেই নাচ-গানের আড্ডায় গিয়া স্ফূর্ত্তি করিবে কি?"

লাইটওয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, এখন সেই জঘন্য স্থানে যাইলে কি আমার সম্মান থাকিবে? পাটানিয়া রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট আমাদের সকলকে এস্, ও, কে, সি, (ষ্টার অফ দি অর্ডার অফ দি নাইট অফ কালেসো) পদক দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। আমরা এখন এই রাজ্যের সম্মানিত অতিথি, এখন যদি ওরকম ইতর লোকের আড্ডায় স্ফূর্ত্তি করিতে যাই, তাহা হইলে আমার সম্মানের হানি হইবে। উহা অপেক্ষা একটা ভাল ফন্দী আমার মাথায় আসিয়াছে। আমি মাজাডোর নিকট যে নগদ টাকা পুরস্কার পাইয়াছি, সেই টাকায় নিজেই ঐ রকম একটা হোটেল খুলিব; কারণ, আপনার স্মরণ থাকা উচিত"—বলিয়াই সে গলা ছাড়িয়া গায়িতে আরম্ভ করিল—

'আমি প্রেম-ভোলা এক পথিক এসেছি
আমি পথ-ভোলা এক প্রেমিক এসেছি,
জেনিরোর এক ডব্‌গা ছুঁড়ীর প্রেমে পড়েছি;
দেখে তাকে পথের মাঝে ভালোবেসেছি।'

দেখুন মিঃ লক, কিল্লার সেই কারারক্ষীকে আমার কারবারের অংশীদার করিয়া লইব স্থির করিয়াছি। আপনি কি বলেন?"

মিঃ লক বলিলেন, "হাঁ, সে তোমার যোগ্য বখরাদার হইবে। কারবার তোমার ভালই চলিবে; কিন্তু তুমি গান বন্ধ করিলে কেন? শেষটুকু গাও, শুনি।"

লাইটওয়ে বলিল, "আমার রাগিণী শুনিয়া লোকে ভয়ে কাণে আঙ্গুল দিয়া পলায়নের চেষ্টা করে! তবে এখন আমরা ট্যাক্সিতে চলিয়াছি, এ সঙ্গীত অন্য লোকের কর্ণগোচর হইবার আশঙ্কা নাই; বিশেষতঃ, আপনার মত সহিষ্ণু শ্রোতা বোধ হয় আর একটিও পাইব না, অতএব শ্রবণ করুন"—

লাইটওয়ে তাহার রাসভকণ্ঠে নদীতীরস্থ পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়িতে লাগিল,—

"আমি প্রেম-ভোলা এক পথিক এসেছি,
আমি পথ-ভোলা এক প্রেমিক এসেছি,
জেনিরোর এক ডবগা ছুঁড়ীর প্রেমে পড়েছি,
দেখে তাকে পথের মাঝে ভালোবেসেছি।
শেষে দেখি সে বাস্‌লো ভালো—
একটা ছুঁচো যচ্চুকে ছোঁড়া!
ওরে, আমার খেদের কথা শোন্ রে তোরা।"

হঠাৎ সে গান বন্ধ করিয়া বলিল, "শেষ চরণটা এখন মনে পড়িতেছে না। মিঃ লক ! আপনি সাহিত্য-চর্চ্চা করেন, আপনি শেষ চরণটা বলিয়া দিলে আমি তাহা গাহিয়া শুনাইতে পারি,—'ওরে, আমার খেদের কথা শোন রে তোরা !' এই চরণের সঙ্গে ঠিক মিল থাকা চাই—ভাবটি যেন বজায় থাকে।"

মিঃ লক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"সে যে এক কিলেতে ভাঙ্গলো আমার—
এমন শক্ত দাঁতের গোড়া।"

লাইটওয়ে খুসী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক মিলিয়াছে—

'ওরে আমার খেদের কথা শোন রে তোরা !
সে যে এক কিলেতে ভাঙ্গলো আমার—
এমন শক্ত দাঁতের গোড়া'।"

সমান উৎসাহে তাহার গান চলিতে লাগিল। কিন্তু এই সঙ্গীত শুনাইবার জন্য সে আর কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাপ্ত

শ্মশানের গান

শোন গো বন্ধু, শোন শোন আজি, শোন শ্মশানের গান,
জ্বালা'য়ে যাতনা মোর বুকে হেথা, সবাকার অবসান !
পাষাণ সমান শ্মশানের হিয়া কুলিশ-কঠোর তাই,
চারিধারে জাগে শ্যামলা ধরণী, কোন কোমলতা নাই।
শত নয়নের নিঝর ঝরিছে সতত বুকের 'পর—
তথাপি তো জ্বালা থামে না—হানিছে শত নিদারুণ শর !
দিন, রাত, মাস, বর্ষ কাটিছে, কুলু কুলু রব শুনি',
কল্লোলিনীর কোলে শুয়ে তবু জ্বলুনীর জাল বুনি !
স্কন্ধে আরোহি' বধির কর্ণে আসিবে হেথায় যবে,
শত কলরব পশিবে না কাণে, শোন আজি কিছু তবে।
কি দেখেছি আমি শুনিতে চাহিছ ? কি দেখি নি ভাবি তাই,
রূপসী ধরার দেখি আগাগোড়া ছাইয়ের উপরে ছাই।
স্বামীর বুকের কত আদরিণী ত্যজি মৃত্তিকা-গেহ,
এ বুকে আসিয়া মিশাল হাসিয়া কর্দ্দমে নিজ দেহ।
কত পতি হেথা বুক পাতি দিল—সতীর সেবার ফল !
রাত দিন ধ'রে তাই তা'র ঝরে দুই নয়নের জল।
বিধবা নারীর শেষ সম্বল মায়ের নয়ন-নিধি,
এ পোড়া বুকেতে শেষ হয়ে গেছে জ্বালা'য়ে পোড়া'য়ে হৃদি।
কত কচি শিশু, কত নব-বধূ, নবীন জামাতা কত,
বেঁচে মরা প্রাণ প্রবীণ কত না মিশা'ল হেথায় ক্ষত !
রাখি এক পাল পোষ্য পিছনে, মুদিয়া নীরবে আঁখি,
ছাপোষা মানুষ হিসাব-নিকাশ চুকাইল ;—নাহি বাকী ;
বুক-ফাটা সুখে নয়নে তা'দের পুলক-অশ্রু ঝরে,
থরে থরে তাহা রয়েছে সাজানো মম বক্ষের 'পরে !
রাবণের সাথে মন্থরা আসে,—কৈকেয়ী, দুর্ম্মুখ !
শূর্পণখার নাসিকা জুড়িয়া দিয়াছে এ মোর বুক ;
কীচকের কাম, শকুনির লাজ, ঢেকেছে এ মোর দেহ,
দুর্য্যোধনের ভাঙ্গা উরু আজ দেখা'তে পারে কি কেহ ?
তাহাদেরি পাশে দশরথ, রাম, বিভীষণ হনুমান্,
অগ্রে কেহ বা, পশ্চাতে কেহ, দিল দরশন দান !
সবারে লুকায়ে রাখিয়াছি মোর হৃদয়ের মাঝে পূরে,
শত্রু তা'দের, মিত্র তা'দের—কা'রে রাখি নাই দূরে।
এইরূপ কত যুগ যুগ 'ধরি' এসেছে, আসিবে কত,
বুকে ধরি' জ্বলি—সবার 'জ্বলুনি', জ্বলিব রে অবিরত !
চিবিয়া চিবিয়া, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া, তাহারা খুঁড়িয়া খায়,
ক্ষণ তরে শত, সে বেদনা ক্ষত—তাহাও জুড়িয়া যায় ;
যে দিন ব্যথীর বুকের আগুন চিতার আগুনে আসি'—
নিজ কণ্ঠের পরিণয়-মালা যতনে পরায় হাসি' !
ক্ষণেকের তরে, আনমনা করে, বিস্মৃত হ'য়ে জ্বালা,—
নির্ব্বিষ প্রাণে নীরবে নেহারি—সে মধু মিলন-মালা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।



শিবনাথের গল্প

সুরেশ আমার বাল্যবন্ধু। উভয়ে গ্রামের স্কুলে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু এক কলেজে নহে। থার্ড ইয়ারে পড়িতে পড়িতে সে পড়া ছাড়িয়া দেয় আর আমি গ্রাজুয়েট হইয়া বাহির হইয়া আসি। আমার কাম আমি করিয়াছি অর্থাৎ বি-এ ডিগ্রি লাভ করিয়া পাটনায় মোটা মাহিনার চাকরী করিতেছি। সুরেশ গ্রামের ইংরেজী স্কুলে মাষ্টারী করিতেছে। তাহাকে স্কুলের পাকাখাতায় পঁয়তাল্লিশ টাকা সই করিতে হয়—কিন্তু তাহার প্রকৃত পাওনা সাড়ে সাইত্রিশ টাকার অধিক নহে। এ গুপ্ত সংবাদ আমি সুরেশের মুখেই অবগত হইয়াছিলাম। নিরীহ, গো-বেচারা, সামান্য স্কুল-মাষ্টার সুরেশকে আমি কৃপার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতাম। আহা বেচারা, কেবল স্কুলের ঘানি ঘুরাইয়াই দুর্লভ মানবজন্মটা অতিবাহিত করিল। তাহাকে কোন বিষয়ে আমি আমার প্রতিযোগী মনে করিতে পারিতাম না।

ছেলেবেলা হইতেই সুরেশ মাতৃভাষার অনুরাগী ছিল। পল্লীগ্রামে দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করাটাকে আমি নিছক পাগলামি মনে করিতাম। আমি জানিতাম, নোট মুখস্থ করিয়া যে কোন উপায়ে হউক আমাকে বি-এ পাশ করিতে হইবে এবং চাকরী করিয়া টাকা জমাইতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইয়াছি, কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের বহির্ভূত কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই। অন্য ছেলেদের দেখাদেখি কলেজ-লাইব্রেরী হইতে দুই একখানি বই লইতাম বটে, কিন্তু পড়িতাম না। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর সহিত আমি পরিচিত নহি। মাইকেল, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির কবিতা দুই একটা যা নির্ব্বাচিত পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছি, তাহার অধিক নহে। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা ভালো বুঝিতে পারি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই। তাঁহার গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস অল্পস্বল্প পড়া আছে। কিরণের অনুরোধে আধুনিক লেখকদিগের দুই একটা গল্প পড়িয়াছি—ঐ পর্য্যন্ত। ইহার অধিক কিছু বলিতে রাজী নহি। কারণ, এই স্বীকারোক্তি দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত আমার কোনই সংস্রব নাই এবং বাঙ্গালা বইও পড়ি না।

আমার জীবনে দুইটি মাত্র লক্ষ্য ছিল—চাকরী করা এবং টাকা জমানো। উক্ত দুই উদ্দেশ্যই সফল হইয়াছে।

সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া সুরেশ চিরদরিদ্র রহিয়া গেল—সাহিত্য-সেবার প্রতি আমার প্রবল বিদ্বেষের ইহাও অন্যতম কারণ বটে। সাহিত্যের ধার দিয়া না গিয়াও আমি বি-এ পাশ করিয়াছি এবং সংসারের মধ্যে যা একমাত্র সারবস্তু অর্থাৎ টাকা চিনিয়াছি। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের বাজারে সস্তা দরে বিঘা পনেরো জমী এবং তালগাছ-সমেত ছোটখাট একটা পুষ্করিণী কিনিয়াছি। বছর তিনেকের ভিতর দালান-কোঠা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা আছে।

সুরেশের সেই মান্ধাতার আমলের মাটীর ঘর এবং খড়ের চাল 'যথা পূর্ব্ব তথা পর' ভাবে বজায় রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখি নাই। তবু সুরেশ সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছে এবং নামমাত্র মাহিনার সিকি পরিমাণ টাকা মাসিকপত্র ও খবরের কাগজে উড়াইতেছে! বাতিক আর কাহাকে বলে? ঐ ত ঘরের দশা! বেহায়াটার লজ্জা করে না? যে সময়টুকু পড়াশুনায় ব্যয় করে, সেই সময়টা কাহারও ছেলে পড়াইলে যে বাহিরের দু'পয়সা ঘরে ঢোকে! হায় হতভাগ্য, টাকা চিনিল না!

দুঃখের বিষয়, আমার স্ত্রী কিরণবালা আবার ঐ রোগগ্রস্ত। সেও রাত্রি জাগিয়া শিয়রে আলো জ্বালিয়া কত কি ছাইপাঁশ নভেল পড়ে—যার একখানারও আমি নাম জানি না। সম্প্রতি কিরণের মুখে শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "বিশ্ববন্ধু"তে সুরেশের না কি দুই একটা গল্প ছাপা হইয়াছে। গল্পগুলি করুণ-রসাত্মক এবং এ ধরণের পল্লীচিত্র ইতিপূর্ব্বে কাহারও হাত দিয়া বাহির হয় নাই।

প্রথমটা আমি বিশ্বাস করি নাই; হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। এ নিশ্চয় অন্য কোন সুরেশচন্দ্র। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—কথাটা সত্যই বটে। এ যে অসম্ভবও সম্ভব হইল! আমার বাল্য-সুহৃদ্ দরিদ্র সাহিত্যসেবী সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-জগতে একটু স্থান করিয়া লইতেছে—এ সংবাদে খুসী হইবারই কথা। কিন্তু কেন জানি না, সুরেশের এ কৃতিত্বে আনন্দ হওয়া দূরে থাক্, বরং তাহার উপর রাগ হইতে লাগিল। তার পর মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম—ভারী ত একটা না দুটা গল্প ছাপাইয়াছে, তাহাতে কি আসে যায়? আর কোন্ বিষয়ে সে আমার অপেক্ষা বড়? গল্প লেখা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে—একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় থাকিলে যে ইচ্ছা করে, সেই পারে! আজকাল ত হাটে মাঠে ঘাটে গল্প-লেখকের ছড়াছড়ি যাইতেছে; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সবই বুঝি, তবু কিরণের মুখে সুরেশের গল্পের সুখ্যাতিটা আমার কাণে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। আমি ত পড়ি না—কেবল কিরণের জন্যই নিকটবর্ত্তী পাঠাগারে মাসিক এক টাকা হিসাবে চাঁদা দিয়া আসিতেছি—চাকরটাকে দিয়া

কিরণ বই ও মাসিকপত্র আনাইয়া পাঠ করে। কিরণের আগ্রহাতিশয্যে আমি এই অপব্যয়টুকু স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। শেষটা তাহার ফল যে এমন হইবে, ইহা ভাবিলে কখনই উক্ত লাইব্রেরীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতাম না।

এক দিন দাবা খেলিয়া অধিক রাত্রি করিয়া বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, কিরণ তখনও আলো জ্বালিয়া তন্ময় হইয়া কি একখানি মাসিকপত্র পড়িতেছে। কিরণ আমার জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই, একটু রাগ হইল। কহিলাম—"এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছো?"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কিরণ বলিল, "তুমি কখন্ এলে? আমি এই মাসের 'বিশ্ববন্ধু' পড়ছিলাম। সুরেশ বাবুর একটা গল্প বেরিয়েছে—কি সুন্দর গল্প গো—লক্ষ্মী বৌটির দুঃখে না কেঁদে থাকা যায় না—"

তাহার বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অশ্রু-ছলছল চোখ দুইটির পানে চাহিয়া আমি বিরক্তি দমন করিতে পারিলাম না। দূর হইতে সুরেশ এ কি উৎপাত আরম্ভ করিল! বলিলাম, "চুলোয় যাক গল্প—চল, আমাকে খেতে দেবে। যত সব লক্ষ্মীছাড়া অকর্ম্মার ধাড়ী লেখক জন্মেছে—মাসিকে গল্প ছাপিয়ে জন্ম সার্থক হবে আর কি?"

আমার রাগ দেখিয়া কিরণ বিস্মিত হইল। কহিল—"তুমি রাগ করছো কেন? এ ত তোমার ভারী অন্যায়! সুরেশ বাবুর গল্পটা একবার প'ড়ে দেখ—তুমিও কাঁদবে।" কহিলাম, "আমার হয়ে তুমিই ত কেঁদে নিলে! আমার অত পান্‌সে চোখ নয়। চল, খাবার দেবে।"

ইহার পর কি ভাবিয়া কিরণ চুপ করিয়া গেল। ঐ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলিল না।

* * * *

কোথাকার কোন্ অজ্ঞাত পল্লীর গৃহ-কোটরে বসিয়া প্রদীপের আলোয় সুরেশ যে গল্প লিখিয়াছে, সুদূর পাটনায় বসিয়া "বিশ্ববন্ধু"র মারফৎ কিরণ সেই গল্প পড়িয়া কাঁদিতেছে। এ বড় অসহ্য কথা। কাগজের পৃষ্ঠায় মিথ্যা কথার কুহকজাল সৃষ্টি করিয়া সুরেশ যে সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিবে, ইহা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারি নাই। সুরেশ স্কুল-মাষ্টার রহিল না কেন? কেন সে গল্প লিখিতে গেল? তাহার এতটা বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ হইল না। সুরেশ গরীব বলিয়া তাহার প্রতি আমার যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল এবং ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতাম; কিন্তু এই ঘটনার পর কেন জানি না, তাহার প্রতি আমার সমস্ত মন বিরূপ হইয়া উঠিল।

এই সময় একটা সন্দেহ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কিরণ কি সুরেশের অপেক্ষা আমাকে ছোট ভাবিতেছে? হয় ত তাই!

কিরণের কাছে সুরেশ যে এক জন কথাসাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইতেছে, ইহা আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সাহিত্যিকদের প্রতি আমার যে পরিমাণ বিরাগ ছিল, কিরণের ঠিক সেই পরিমাণ অনুরাগ ছিল। সাহিত্যসেবীদিগকে কিরণ বরাবর উঁচু নজরে দেখিয়া আসিতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার এ মোহ কাটাইতে পারি নাই! আমি বি-এ পাশ করিয়াছি এবং মোটা মাহিনার চাকরী করিয়া তাহার গা-ভরা গহনা গড়াইয়া দিয়াছি; তথাপি কিরণ আমাকে সামান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় ছোট ভাবে—এই সন্দেহ আমার সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

কিরণের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার কোন সৎ উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া বেদনাভরে হৃদয়ে যেন রক্ত ঝরিতে লাগিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—আমিও সাহিত্যিক হইব এবং "বিশ্ববন্ধু"তে গল্প ছাপাইয়া কিরণের কাছে প্রমাণ করিব যে, এক জন বি-এ পাশের কাছে গল্প লেখাটা কিছুই নহে। ডিগ্রীলাভের সঙ্গে সঙ্গে ও ভেল্কী তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে আপনা আপনি আসিয়া যায়।

কিরণের মত পাঠিকা আমি খুব কমই দেখিয়াছি। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে কিরণ যে কত বই পড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বটতলার 'ভীষণ রক্তারক্তি' পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেয় নাই। বাঙ্গালা মাসিকপত্রগুলির সে একনিষ্ঠ পাঠিকা—তাহাতে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, এমন কি, বিজ্ঞাপনের পাতাগুলিও সে নির্ব্বিচারে হজম করে। এ হেন কিরণের স্বামী হইয়া আমি এ বয়স পর্য্যন্ত একখানিও বাঙ্গালা নভেলের পাতা উল্টাই নাই।

সাহিত্যজগতে সুরেশ নাম করিয়াছে। এত দিন যাহাকে গরীব স্কুলমাষ্টার বলিয়া জানিতাম, সে এখন কথাসাহিত্যিক সুরেশ বাবু। আর আমি—মুখে যতই বড়াই করি না কেন, নিজের ক্ষুদ্রতার কথা ভাবিয়া বুকের মধ্যে কি যেন গড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

লুকাইয়া লুকাইয়া আমিও সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলাম। শুধু পড়িলেই চলিবে না, গল্প লিখিয়া ছাপাইতেও হইবে—নহিলে কিরণের কাছে আর মান থাকে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকপত্র "বিশ্ববন্ধু"র প্রবীণ সম্পাদক মহোদয় যে চট্ করিয়া আমার মত আনাড়ীর লেখা মনোনীত করিয়া ছাপাইতে দিবেন, এ বিশ্বাস আমার নাই।

গোপনে একখানি খাতা বাঁধিয়া গল্প লেখায় হাত পাকাইতে আরম্ভ করিলাম। জিনিষটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিলাম—কাগজকলম লইয়া বসিয়া দেখিলাম, তত সহজ নহে। প্রথমতঃ আরম্ভ করাই কঠিন। যদি বা সাহস করিয়া দুই চারি লাইন লিখিয়া ফেলি, তাহা হইলে শেষ আর হইতে চাহে না। চারি পাঁচটা গল্প অসমাপ্ত রহিয়া গেল—খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আর শেষ করিতেই পারিলাম না।

অহঙ্কার চূর্ণ হইল। বুঝিলাম, বি-এ ডিগ্রী সহজলভ্য এবং চাকরীও জগৎসংসারে দুষ্প্রাপ্য নহে; কিন্তু কল্পনা-সুন্দরীর প্রসাদলাভ যাহার তাহার ভাগ্যে ঘটে না। আমার কল্পনা নাই. কোন একটি বিষয় লইয়া আমি বেশীক্ষণ ভাবিতেই পারি না; সুতরাং আমার দ্বারা আর যাহাই সম্ভবপর হউক না কেন, গল্প লেখা কখনই হইবে না।

মান-সম্পদে সুরেশ আমার অপেক্ষা অনেক বড়—মনে মনে এ কথাটা আর অস্বীকার করিতে পারিলাম না। নিজের মানসিক দরিদ্রতার কথা চিন্তা করিয়া নিজের প্রতি নিজের রাগ

হইতে লাগিল। সুরেশের গল্প পড়িয়া কিরণ কাঁদে—রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি অক্ষম লেখককেও সে সম্মানের চোখে দেখে। বলে—ইহাদের ক্ষমতা নাই থাক, যেটুকু সাধ্য, সেটুকু দিয়া ত ভাষা-জননীর সেবা করে। ইহারা দরিদ্র পূজারী হইলেও ঘৃণার্হ নহে।

আমাকে তবে কি কিরণ কিছুই মনে করে না? আমি কেবল টাকা রোজগার করিয়া তাহার গহনা গড়াইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি?

সংসারে আমার কোন ভাবনা ছিল না। মাসান্তে মাহিনার মোটা টাকাটা হাতে আসে—যতদূর সম্ভব কম খরচে ঘরকন্না চালাই। চব্বিশ বৎসর বয়সেও কিরণ নিষ্ফলা আছে; সুতরাং বাড়তি খরচ এক রকম নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কে হাজার পাঁচেক টাকা মজুত হইয়াছে। আমার মত লোকের ইহার অপেক্ষা অধিক কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? সংসারের অধিকাংশ লোক এইটুকু সুবিধা পাইলেই নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে। এত সুখশান্তি সত্ত্বেও আজকাল আমার অশান্তি ও মর্ম্ম-বেদনার সীমা-পরিসীমা নাই। তাহার কারণ এই যে, কেন আমি সাহিত্যিক হইলাম না? কেন আমি গল্প লিখিতে পারি না? এই অক্ষমতায় নিষ্ফলরোষে আমার হৃদয় ছাইচাপা আগুনের মত ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সুরেশের তিন চারিটা গল্প পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহার গল্পের উপাদান এমন কিছু অসামান্য বা অত্যাধিক নহে, যে বস্তুর সহিত সে নিত্য পরিচিত, তাহাই লইয়া তাহার কারবার; যা সে ভালো জানে না, তাহা লইয়া সে মাথা ঘামায় না। সে সমাজের যে স্তরের মানুষ, তাহার গল্পের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকাও সেই স্তরের। এই একমাত্র গুণে তাহার একটি গল্পও সামঞ্জস্যহীন নহে। সরল, অনাড়ম্বর, ছোট ছোট পল্লীচিত্র!

ধানের ক্ষেত, পানাপুকুর, নদীতীর, তালবাগান, বাবলাবন, মেটে ঘর, সজনে গাছ, বাঁশের ঝাড়, পল্লীবধূ, দরিদ্র গৃহস্থ, অশিক্ষিত চাষী—এই সব তুচ্ছ উপকরণ লইয়া সে যে কয়েকটি গল্প দাঁড় করাইয়াছে, পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না।

ঐ সব গাছপালা, নদী, বন, বাঁশের ঝাড়, কলাবাগান আমিও দেখিয়াছি—বরং তাহার অপেক্ষা বেশী অনেক দেখিয়াছি। আমি পাটনায় থাকি—নালন্দা ও রাজগীর দেখিয়াছি। মুঙ্গের, সীতাকুণ্ড, ভাগলপুর, মন্দার পর্ব্বত, দেওঘর, মধুপুর, সাহেবগঞ্জ, তিনপাহাড়, সক্রীগলি ঘাট, রাঁচি, মোরাদবাদী পাহাড়, হুড্রুজলপ্রপাত ও তথাকার গভীর অরণ্য এবং সাঁওতাল পরগণার লালকাঁকর-বিছানো ছোট বড় প্রস্তর-সঙ্কুল দিগন্তচুম্বিত ঢেউ-খেলানো উষর প্রান্তর, মহুয়া ও শালের বন, ত্রিকূট শৈল, নীলাভবনশ্রেণী, সাঁওতাল পল্লী, পার্ব্বত্য ঝরণা, অড়হরক্ষেত্র, উপলমুখর বঙ্কিম গিরিনদী প্রভৃতি বহু দৃশ্য দেখিয়াছি। আজ বুঝিতেছি—দেখা মাত্র সার হইয়াছে—মনের মধ্যে কোন ছবিই আঁকিয়া লইতে পারি নাই। সুরেশকে ভগবান্ দেখিবার যে দৃষ্টি দিয়াছেন, আমার সে দৃষ্টি নাই। সেই তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ মনের চোখ যা আমার আজও ফুটে নাই। আমি যা কিছু দেখি, ভাসা ভাসা ভাবে দেখি। সুরেশ যা কিছু দেখে, একবারে মনের পটে আঁকিয়া লইয়া দেখে; তাই তাহার গল্প এমন লোকপ্রিয়।

* * * *

প্রোফেসর ভবতোষ বাবুর বাড়ী হুগলী জেলা। সপরিবারে এখানে থাকেন। অধ্যাপক মহাশয়ের দাবা-খেলার সখ আছে—সেই সূত্রে আমার সহিত আলাপ।

প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁহার এখানে দাবার মজলিশ বসে। আমিও মাঝে মাঝে খেলিতে যাইতাম—ফিরিতে রাত্রি হইত।

এক দিন দেখিলাম, ভবতোষ বাবু একাকী বসিয়া তদ্গতচিত্তে কি একখানি বাঙ্গালা মাসিক পড়িতেছেন। তখনও আর কেহ আসিয়া পৌঁছে নাই।

আমি দাঁড়াইয়াছিলাম; আমাকে বসিতে বলিয়া আবার মাসিকের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলেন। একটি চৌকী টানিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া আমি বলিলাম, "কি পড়ছেন?"

চোখ তুলিয়া ভবতোষ কহিলেন, "দেখুন শিবনাথ বাবু, সুরেশচন্দ্র যে দেখতে দেখতে এক জন বড় দরের লেখক হয়ে উঠলেন। এ মাসের 'বিশ্ববন্ধু'তে তাঁর একটি গল্প ছাপা হয়েছে—আঃ, ভদ্রলোক চমৎকার লেখেন—ভারী মিঠে হাত।"

সুরেশচন্দ্র যে আমার বাল্যবন্ধু, ছেলেবেলার সহপাঠী, স্বগ্রামবাসী—ভবতোষের কাছে সে কথা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম না।

আমি বলিলাম, "কি জানি মশাই, গল্প-টল্প আমার ত আদৌ ভালো লাগে না; তা ছাড়া বাঙ্গালা মাসিকে কিছুই থাকে না—"

ভবতোষ বলিলেন, "কেন থাকবে না—খুব থাকে। অনেক ভালো ভালো গল্প, প্রবন্ধ বেরোয়। আপনি পড়েন না বলেই এ কথা বলছেন—"

আমি বলিলাম, "দুই এক জন লেখককে বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে পড়বার মত লেখা আর কে লেখে?"

উত্তেজিত হইয়া ভবতোষ কহিলেন,—"বলেন কি শিবনাথ বাবু! বাঙ্গালা সাহিত্যে দুএকজনের ঢের বেশী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি শিক্ষিত লোক হয়ে যদি এতটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তা হ'লে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হ'তে এখনও বহুদিন লাগবে।"

এত দিন ভবতোষকে চিনিতাম না—লোকটিকে ইংরেজী-নবিশ বলিয়াই জানিতাম। আজ বুঝিলাম, ইনিও মনে প্রাণে এক জন মাতৃভাষার অনুরাগী—অকপট সাহিত্যসেবী—সুরেশের গল্পটি পর্য্যন্ত বাদ দেন না।

সে দিন আর খেলা জমিল না। দুই এক বাজী খেলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল—ভবতোষ বাবুও বাঙ্গালা পড়েন—তাঁহার মুখেও সুরেশের প্রশংসা, বিশ্বদুনিয়ায় সবাই সুরেশকে চিনিয়াছে—আর আমার নাম কয় জনই বা জানে? সে কোন্ মন্ত্র! যে মন্ত্রে সুরেশ দীক্ষিত হইয়াছে। যে মন্ত্রগুণে তাহার লেখনীমুখে ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, নদী, বন, পর্ণকুটীর, ধানের ক্ষেত, তরুপল্লব প্রভৃতি নির্জ্জীব পদার্থ সজীব হইয়া উঠে। কাগজের উপর কালীর আঁচড় টানিয়া কথার পর কথা

সাজাইয়া কেমন করিয়া এই সব ছবি ফুটাইয়া তুলে—আমি ত ভাবিতেও পারি না। সে শিল্পী—কথা-শিল্পী—কথার যাদুমন্ত্রে ছবি আঁকিয়া সে লোক ভুলায়। তাহার কথায় রূপ আছে, রস আছে, বর্ণ আছে, গন্ধ আছে। কথার মোহজাল সৃষ্টি করিয়া সুরেশ পাঠকের মন কাড়িয়া লয়। সে ভাবুক, সে কবি। তাহার দৃষ্টিটাই কবির দৃষ্টি। আমি তাহার ঈর্ষা করি।

হে দেবি, হে বীণাপাণি, আজ আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। আমি তোমার অন্ধ ভক্ত, তুমি আমার মনের চোখ খুলিয়া দাও। এত দিন তোমাকে চিনি নাই—বৃথা গর্ব্বে দিন কাটাইয়াছি—সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে তোমার চরণ-সেবার যোগ্য করিয়া লও। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না—আড়ম্বর চাহি না—ধন চাহি না—মান চাহি না, 'আমি কেবল ফুল জোগাবো তোমার দুটি রাঙ্গা পায়ে।' আমার ভাষা নাই—তুমি আমাকে ভাষা দাও, আমি মূক—তুমি আমার কথা ফুটাও, আমাকে এমন একটুখানি শক্তির অধিকারী কর—যার বলে তোমার সভাতলে কিঞ্চিৎ স্থান লাভ করিতে পারি।

* * * *

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি—এমন সময় পিয়ন একখানি পোষ্টকার্ড দিয়া গেল। কিরণের নামে ঠিকানা লেখা—লেখক কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র।

তলে তলে এ কি কাণ্ড! সুরেশ কিরণকে চিঠি লিখিয়াছে? বিস্মিত হইলাম। ব্যাপারটা কি পড়িয়াই দেখা যাক।

"সবিনয়-নিবেদন,

আপনি 'বিশ্ববন্ধু'তে আমার সামান্য গল্পগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনার স্বামী শিবনাথ আমার বাল্যবন্ধু—যদিও আজকাল তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হয়। বলাই বাহুল্য, বরাবর তাহার খোঁজ রাখি। তাহার হইয়া আমাকে এই আনন্দ জানাইবার জন্য আপনারা উভয়ে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এ চিঠি সুরেশকে দেখাইবেন। আশা করি, কুশলে আছেন। ইতি—

বিনীত—
সুরেশচন্দ্র"

এ চিঠিতে রাগ করিবার বা সন্দেহ করিবার চিহ্নমাত্র নাই। সুরেশ যে কত মহৎ—তাহার হৃদয় যে কত উন্নত—চিঠির ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু কিরণ কেন আমাকে লুকাইয়া সুরেশকে গোপনে চিঠি লিখিয়া তাহার গল্পের প্রশংসা করিতে গেল? এতটা স্বাধীনতা তাহাকে কে দিয়াছে? আমাকে জানাইয়া লিখিলে কি আমি বারণ করিতাম? আমি কি এমনই ক্ষুদ্রচেতা? যাহা হউক, আমাকে গোপন করিয়া এটা করা কিরণের উচিত হয় নাই—ইহাই বারবার মনে হইতে লাগিল। বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

সরাসর উপরে উঠিয়া কিরণের হাতে চিঠি দিয়া বলিলাম,—"এই নাও তোমার চিঠির উত্তর—সুরেশ দিয়েছে। আমাকে লুকিয়ে কখন্ সুরেশকে চিঠি লিখেছিলে—এ কথা ত এক দিনও আমাকে ঘুণাক্ষরে জানাও নি?"

শরতের স্বচ্ছ আকাশে লঘু মেঘখণ্ডের মত মুহূর্ত্তের জন্য কিরণের মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল। কহিল,—"আমার অন্যায় হয়ে গেছে—তুমি আমাকে ক্ষমা করো—" তাহার দুই চোখের মধ্যে করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

তাহার হাত ধরিয়া ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সহিত আমি বলিলাম, "প্রথম অপরাধ—সুতরাং মাপ করাই গেল। কিন্তু কেন?"

এবার সাহস পাইয়া কিরণ বলিল,—"তোমার যে রকম সন্দিগ্ধ স্বভাব—তুমি হয় ত একটা কদর্থ ক'রে ফেলতে—তাই জানাই নি। বেচারা সুরেশ বাবুকে একটু উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলাম—সেটা তোমারি কর্ত্তব্য ছিল—কিন্তু তুমি যেরূপ বন্ধুবৎসল—বলতে ভরসা হয় নি—" বলিয়া আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। সস্নেহে তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম, "দেখ কিরণ, আমার ইচ্ছে করছে, আমি গল্প লিখি—"

কথাটা কিরণের বিশ্বাস হইল না। দুই চোখ এতবড় করিয়া কিরণ বলিল—"তুমি গল্প লিখবে?"

ছি ছি, কিরণ আমাকে কি মনে করে? আমি কি এতই অপদার্থ! মনের বেদনা মনে চাপিয়া আমি বলিলাম, "কেন, আমি কি পারি নে?"

অম্লান-বদনে কিরণ বলিল, "না—তুমি পারো না।" আমি বলিলাম,—"আর যদি তোমার ঐ 'বিশ্ববন্ধু'র পৃষ্ঠায় আমার ছাপা গল্প দেখাতে পারি—তা হ'লে কি পুরস্কার দেবে?"

কিরণ বলিল, "তা হ'লে আমার গলার হার ভেঙ্গে তোমার সোনার চশমা ক'রে দেব—আর—আর—আর একটা খুব দামী ফাউণ্টেন—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"আমার সোনার চশমা ও দামী ফাউণ্টেনে কায নেই—আমি আর একটি মহার্ঘ জিনিষ প্রার্থনা করি—"

কিরণ বলিল,—"কি বলো? তোমাকে ত আমার অদেয় কিছুই নেই—"

পরিহাস করিয়া আমি যে প্রস্তাব করিলাম, তাহা শুনিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া কিরণ বলিল,—"যাও, তুমি বড় বেহায়া! অমন কর ত আর তোমার সঙ্গে কথা কব না।" বলিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

গম্ভীর হইয়া আমি বলিলাম—"সাহিত্য-রসিকা শ্রীমতী কিরণবালা দেবী যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে আমি গল্প ছাপাইব না।"

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কিরণ বলিল, "তুমি আগে গল্পই ছাপাও—তার পর—"

আমি বলিলাম—"তার পর?"

"যাও, আমি জানি না" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে কিরণ বাহির হইয়া গেল।

কে বলিবে কিরণ চব্বিশে পদার্পণ করিয়াছে! তাহার হৃদয়-বৃত্তি এখনও তন্বী ষোড়শীর মত সরস আছে।

কিরণকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া আমি সুখী হইয়াছি। এখন কিরণের কাছে যাহাতে লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারি—সেই চিন্তা মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

আপাততঃ কিছুদিনের জন্য অর্থচিন্তা মূলতবী রহিল।

* * * *

আবার উঠিয়া পড়িয়া গল্প লিখিতে সুরু করিলাম। স্থানীয় লাইব্রেরীর ম্যানেজারের কাছ হইতে একগাদা পুরান মাসিক-পত্র আনিয়া বাছিয়া বাছিয়া গল্পের প্লট স্থির করিতে লাগিলাম। একটাও মনোমত হয় না।

নিজের লেখা আসে না—শেষটা কি পরের জিনিষ চুরি করিতে হইবে? ভাব-চুরি চলিতে পারে, কিন্তু ভাষা চুরি করিলে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। শুনিয়াছি, পরের গল্প চুরি করিয়া বে-মালুম নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়া ইতিপূর্ব্বে দুই এক জন সাহিত্যজগতে অপদস্থ হইয়াছেন। কিন্তু হায়, যে হতভাগ্যের নিজের এক কলম লিখিবার ক্ষমতা নাই, অথচ লেখক হইবার সাধ আছে, চুরি করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর কি? প্রতীচ্যের অনেক ক্লারা, এলিস, মেরী, হেলেন, ষ্টেলা এবং ডিক, স্মিথ, হেনরী, পিটার্স ও রবার্টসকে—দিব্য শাড়ী-সেমিজ ও ধুতি-চাদর পরিয়া কল্পনাকুশলী বাঙ্গালী লেখকের কৃপাতে বঙ্গ-সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে চলিতে ফিরিতে দেখিয়াছি। তবে আর দোষ কোথায়? চুরিই করিব—এমন সাফাই হাতে চুরি করিব—যাহাতে কেহ সন্দেহমাত্র না করিতে পারে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মফঃস্বলের কোন ক্ষুদ্র সহর হইতে "কাম-ধেনু" নামে একখানি সামান্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বছর দুই চলিয়া কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত "কাম-ধেনুর" কয়েক খণ্ড আমার হাতে আসিয়াছে। বহুদিন লুপ্ত এই মাসিকখানির একটি গল্প আমার নামে "বিশ্ববন্ধু"তে ছাপাইয়া দিলে কি কেহ ধরিয়া ফেলিবে? এখনকার অধিকাংশ পাঠক হয় ত কাগজখানির নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। গল্পগুলি একটু সেকেলে ধরণের হইলেও যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। কি গুরু-গম্ভীর ভাষা—এক একটা শব্দের মানেই জানি না—ঐ গল্পটি পড়িবার সময় পাঠকদিগকে সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা ভাষার অভিধান রাখিতে হইবে। খুব সম্ভব কলিকাতায় ঐ গল্পগুলির প্রচার না হইয়াই থাকিবে।

"বিশ্ববন্ধু"র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের চোখে ধূলা দিয়া নিজের নাম জাহির করিবার এই এক ফন্দী বাহির করিলাম। ফন্দীটা খুব যে উচ্চাঙ্গের—তাহা নহে।

কিরণের কাছেও মান থাকিবে—লেখক বলিয়াও পরিচিত হইব। তার পর সাহস বাড়িলে এই বিদ্যার জোরে আরও কত খেলা খেলিব।

খান পাঁচেক "কামধেনু" নিজের কাছে রাখিয়া বাকীগুলি লাইব্রেরীর ম্যানেজারকে ফেরৎ দিয়া আসিলাম। ইচ্ছা এই যে, গল্প আমার নামে ছাপা হইলে এই মূক সাক্ষীগুলিকে ভস্মে পরিণত করিব।

সেকালের অনেক মাসিকপত্রে লেখকদিগের নাম ছাপা হইত না—"কামধেনু"তেও লেখকের নাম প্রকাশিত হইত না। তখনকার অনেক সুধী লেখক নাম জাহির করাটা পছন্দ করিতেন না। যাহা হউক, ইহাতে আমার সুবিধাই হইল। অতিরিক্ত বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সেকালের কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি গল্পের ভাব ও ভাষা সমস্তই যথাযথ বজায় রাখিয়া—গল্পের শেষে নিজের নামটি লিখিয়া "বিশ্ববন্ধু" আফিসে ছাপাইতে পাঠাইয়া দিলাম। শীঘ্র মতামত জানিবার জন্য সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দিতেও ভুল করিলাম না। সমস্ত সংবাদ কিরণের কাছে গোপন রাখিলাম—একবারে ছাপা গল্প দেখাইয়া অবাক করিয়া দিব। এ গল্প যে সুবিখ্যাত মাসিকপত্র "বিশ্ববন্ধু"র বিরাট অঙ্কে স্থান লাভ করিবে—তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। এ ধরণের গল্প আজকাল দেখাই যায় না।

উত্তরের প্রত্যাশায় মনে মনে দিন গণিতে লাগিলাম।

* * * *

উক্ত ঘটনার দেড়মাস পরে এক দিন বৈকালবেলা আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি—কিরণবালা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটু পূর্ব্বে সে যে কাঁদিয়াছিল, তাহা তাহার অশ্রু-গম্ভীর মুখের পানে তাকাইলেই বোঝা যায়। হাস্যকৌতুকময়ী সুরসিকা কিরণবালার আজ কি হইয়াছে? বসন্তের পুষ্পমঞ্জরী যেন এক রাত্রিতেই শুকাইয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিতেই একখানি লেখা পোষ্টকার্ড ও একটি বুক-প্যাকেট আমার হাতে দিয়া মুখ লুকাইয়া কিরণ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বুক-প্যাকেটটি হাতে তুলিতেই মনে হইল পৃথিবীটা যেন ধীরে ধীরে পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া চৌকীতে বসিয়া চিঠিখানি পড়িলাম—

"বিশ্ববন্ধু আফিস
কলিকাতা, ৯-৩-২৯

সবিনয়-নিবেদন,

অধুনালুপ্ত "কামধেনু"তে প্রকাশিত আমার গল্পটির প্রতি আপনার অনুরাগ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। দুঃখের বিষয়, গল্পটি বহুদিন পূর্ব্বে ছাপা হইয়া গিয়াছে—সেইজন্যই পুনরায় আর মনোনীত করিতে না পারিয়া ফেরৎ পাঠাইলাম। এক-সময়ে মফঃস্বলের কোন ক্ষুদ্র সহরে আমি "কামধেনু" নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলাম—দীর্ঘকাল পরে এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত—
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বিঃ সঃ"

* * * *

তার পর কিরণের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিরণকে কি আমি আজও চিনিতে পারি নাই? ঐ পোষ্টকার্ড ও বুকপ্যাকেট সম্বন্ধে কিরণ এ পর্য্যন্ত আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রথম প্রথম দুই এক দিন খুব ভয়ে ভয়ে থাকিতাম, না জানি কিরণ কখন্ সেই কথা পাড়িয়া বসে। এখন বুঝিয়াছি, কিরণ সে দিক্ দিয়াও যাইবে না। সব জানিতে পারিয়াছে, তবু এমন ভাবে আমার সম্মুখে চলা-ফেরা

করিতেছে—যেন সে কিছুই জানে না। পাছে আমি লজ্জিত হই—পাছে আমি ব্যথা পাই, সেই জন্যই সব জানিয়াও না-জানার ভান করে।

নিজের অপকর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আমার অন্তরাত্মা কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কিরণ কিন্তু আর ভুলিয়াও আমার কাছে গল্প-লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না। ঐ ঘটনায় আমি যে কি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছি—মরণাধিক লজ্জা অনুভব করিয়াছি—কিরণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া সব দিক্ দিয়াই আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—যেন আমি কিছুই করি নাই।

* * * *

আমার ক্ষতহৃদয়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য চব্বিশ বৎসরের কিরণ অকস্মাৎ তরুণী কিশোরীর মত সৌন্দর্য্যে, লাবণ্যে, হিল্লোলে ভরপুর হইয়া উঠিয়া দ্বিগুণ বলে আমার মনকে টানিতে লাগিল। তাহার অন্তরের সুধা-ধারায় আমার দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গেল।

আজ আর আমার মনে গল্প লিখিতে না পারার জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই। সুরেশের প্রতিও কোন আক্রোশ নাই।

রহস্যময়ী মধুরহৃদয়া কিরণবালার এই অভিনব রূপে আমার মন ভুলিল। বত্রিশ বৎসর বয়সে নূতন করিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলাম!

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংশয়

সে দিনের কত আর বাকি?
আশ্বাসে রয়েছি ব'সে, লয়ে যাবে নিজে এসে,
পথপানে তাকাইয়া থাকি।
কত দূরে সে দেশ না জানি,
জগতের পরপার, সেথা কার অধিকার?
কি সমৃদ্ধ তাঁর রাজধানী?
কিবা নাম কোথায় সে থাকে?
কিবা শক্তি সেই ধরে,কারে সে আপন করে,
সে কি কারে দেখা দিয়ে থাকে?
পরদুঃখে দুঃখ সে কি পায়?
সে কি কারো কাছে আসে?
সে কি কা'রে ভালবাসে?
প্রাণ কি মাখানো মমতায়?
সাধ যায় বুঝি তার প্রাণ।
ঘুচাতে দুঃখীর দুঃখ,পায় কি সে মনে সুখ,
কিম্বা হিয়া কঠিন পাষাণ!
সেখানে কি নাহি কোন ভয়?
হতাশের দীর্ঘশ্বাসে,সে তো নাহি উপহাসে?
নিঃস্বার্থ কি তাহার হৃদয়?
নাহি সেথা ইতর-বিশেষ?
যে যায় তাহার দেশে,
সে তো নাহি ফিরে আসে,
এতই কি ভাল সেই দেশ?
নিশি-দিন মনে ভাবি তাই।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব নাহি সেথা?
ব্যথীরে দেয় না ব্যথা,
আত্মপরভেদ সেথা নাই?
সকলের সমান যতন?
যে যায় তাহার পাশে, পুলকেতে সদা ভাসে,
ঘুচে যায় আঘাত-বেদন?

সে দেশ কি শুধু মধুময়?
নাহি মান অভিমান,
পুলক-পূরিত প্রাণ,
সুস্নিগ্ধ মলয় সদা বয়?
আলো সদা—নাহিক আঁধার?
সেখানে কি ফুল ফুটে,ফুলে কি মধুপ জুটে,
সে ফুলে কি পূজা হয় তাঁর?
বাসে করি চিত্ত-বিনোদন,
দুটো দিন শোভা ধ'রে,সে ফুলও কি যায় ঝরে,
প্রভাতে মিলায় যথা নিশার স্বপন!
বসন্ত কি সেথা চির-স্থির?
সেখানে কি ঝাঁকে ঝাঁকে,
লাখে লাখে পাখী ডাকে?
স্পর্শে নাক' দুঃখ পৃথিবীর?
অথবা সেথায়—
দুদিনের হাসি-খেলা দুদিনে ফুরায়?
অবিরাম ঝঞ্ঝাবাতে, তরঙ্গের প্রতিঘাতে,
জানায় বজ্রের নাদে কিছু কিছু নয়।
সেথায়ও কি এইরূপে আয়ুঃশেষ হয়?
শত হাহাকার করে, রাখিতে পারে না ধ'রে
কে জানে কাহার ধন কেবা লয়ে যায়?
কাহার বুকের নিধি কোন্ চোরে লয়
যে নিল আমার ধন সে কি মোর মহাজন?
সাধ হয় দেখি তারে মনে লাগে ভয়।
বিশ্বগ্রাসী গ্রাস তার উদর বিস্তার
সবল দুর্ব্বল নাই, সবই এক তার ঠাঁই
যাহারে সমুখে পান নাহিক নিস্তার।
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা কম্পিত তরাসে
সদা যাই যাই শব্দ, জীবকুল ভয়ে স্তব্ধ
অনাথ-দুঃখীর দুঃখ তারে না পরশে।

মনে হয় সে নহে মহান্,
গরলেতে ভরা তার প্রাণ,
করে নাই কোন শিক্ষা,মেলেনি কাহারও দীক্ষা
তাই যদি তাঁহারই বিধান!
মন্ত্রবলে ভৌতিক ঘটান।
রজনীর অন্ধকারে, পশি সকলের ঘরে
চুরি করে লয়ে যান যার যাহা পান।
সবাকার ঘরে ঘরে ঘটান প্রমাদ
নাহি,তাঁর যশোগান, নাহি মান অপমান
কায তাঁর চুরি করা শত সুখসাধ।
তোমার বারতা কোথা পাব?
জানাব যা আছে মোর, হও সাধু হও চোর
চুপে চুপে দুটো কথা শুধাইয়া লব।
পথের সম্বল মোর হাতে কিছু নাই
এসেছিনু শুধু হাতে ফিরে যাব তব সাথে,
কেবল একটি কথা ভেবে ভয় পাই।
কি বলিয়া দাঁড়াইব তোমার সভায়,
তুমি দাও দেহে শক্তি,তুমি দাও মনে ভক্তি,
রিক্ত নিঃস্ব দীনতম ভিখারীর প্রায়।
এক দিন সত্য বটে দিয়েছিলে সব,
আজ তার অবশেষ কণামাত্র আছে শেষ,
সকলি হারায়ে এবে হয়ে আছি শব।
আমি তো রাখিনি আশা চাহিনিকো দান,
সবই যদি ফিরে নিলে,কেন তবে অত দিলে?
বেদনার ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙ্গে দিতে প্রাণ!
এ কথা শুধাবো ভগবান্।—
এক দিন দিয়েছিলে যারে সর্ব্বসুখ,
আজ দীনতমবেশে যখন দাঁড়াব এসে
চেয়ে দেখে মোর পানে ফাটিবে কি বুক?
অথবা রহিবে চির-নিশ্চল নিশ্চুপ?

শ্রীমতী ধরাসুন্দরী দেবী।

এভারেষ্ট ও গৌরীশঙ্কর *

এভারেষ্ট—হিমালয় পর্ব্বতমালার একটি শিখর এবং উচ্চতায় অদ্যাবধি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে —বিদ্যালয়ের বালক হইতে শিক্ষিত সকল ব্যক্তিই ইহা অবগত আছেন। প্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত এই রহস্যময়, আশ্চর্য্য এবং অত্যুচ্চ মিনারটির শিখরদেশে পৌঁছিবার যে কিরূপ বিপুল আগ্রহ মানুষের মধ্যে জাগিয়াছে এবং বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ অজ্ঞাত বিভিন্ন বিবরণ প্রকাশের জন্য যে কি প্রকার অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন, তাহা ইহার আবিষ্কারকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অভিযানগুলির বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। ইহার দুর্গমতা ও দুরারোহতা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য বহুবার ব্যর্থ করিলেও বিংশ শতাব্দীর অসামান্য বিজ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন মানুষ ইহাতে দমে নাই। বিফলতা তাহাকে তাহার লক্ষ্যপথে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিতেছে। আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যৎ অভিযানে ইহার অজ্ঞাত আরও বহুতত্ত্ব আমাদের গোচরপথে আসিবে।

প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে আমরা এভারেষ্ট অভিযান সম্বন্ধে বহুবিষয় অবগত হইয়াছি, সুতরাং এ স্থলে সে বিষয়ের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়—প্রথমতঃ এভারেষ্টের দুই বা ততোধিক নাম আছে কি না ও দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রকৃত উচ্চতা কত?

প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরে যে কোনও ছাত্র অনায়াসে বলিবে, "এভারেষ্টের অন্য নাম গৌরীশঙ্কর"। কেবল বালকরা কেন, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, এমন কি, এদেশী অধিকাংশ ভূগোল প্রণেতা ঐ কথা বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের লিখিত পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিতে তাঁহারা এভারেষ্টের অন্য আখ্যা—গৌরীশঙ্কর দিয়াছেন। এইরূপে বহুদিন হইতে গৌরীশঙ্কর এভারেষ্টের দেশীয় নামরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ঐ সকল ভৌগোলিক নাম ব্যবহার করিয়া ছাত্রমহল ও শিক্ষিত সমাজ একটি প্রকাণ্ড ভুল সংক্রামিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত গৌরীশঙ্কর যে এভারেষ্টের দ্বিতীয় নাম নহে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না। কেবলমাত্র যে আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত ঐ ভ্রমের বশবর্ত্তী, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বহু বিদেশীয় ভৌগোলিক এভারেষ্টের দ্বিতীয় নামের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেহ তাহাকে দেবধুঙ্গ, কেহ বা গৌরীশঙ্কর বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। আজও পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ মানচিত্রে এভারেষ্টের স্থানে গৌরীশঙ্কর (২৯০০২ ফুট) বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে যত দূর জানা গিয়াছে, তাহা হইতে এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ঐ উভয় নামের কোনওটি এভারেষ্টের চূড়ার দেশীয় নাম নহে এবং ভারতীয় বা নেপালী কোনও নাম উহার নাই।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, এভারেষ্ট যখন বিদেশীয় নাম, তখন উহার দেশীয় নাম গৌরীশঙ্কর থাকিলে তাহাতে এমন কি মারাত্মক ভুল হইতে পারে? পরন্তু বহু দিন হইতে ঐ নাম ব্যবহৃত হইয়া আসায় যখন উহার গৌরীশঙ্কর নাম এভারেষ্টের ন্যায় প্রচলিত ও খ্যাত হইয়া গিয়াছে, তখন উক্ত নাম দ্বিতীয় ও দেশীয় নাম হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু গঙ্গাকে যমুনা বলিলে যে ভুল হয়, হিমালয়কে বিন্ধ্য বলিলে যে ভুল হয়, এভারেষ্টকে গৌরীশঙ্কর বলিলে ঠিক সেই প্রকারের ভ্রমই হইবে। যে হেতু গৌরীশঙ্কর হিমালয়ের অপরাপর শৃঙ্গের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শৃঙ্গ। মূল নিহিত এই সত্যটি জানা না থাকায় ঐ প্রকার ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। কি সূত্রে এবং কাহা দ্বারা এভারেষ্ট শৃঙ্গের দেবধুঙ্গ ও গৌরীশঙ্কর নাম প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে সে বিষয় আলোচনা করিব।

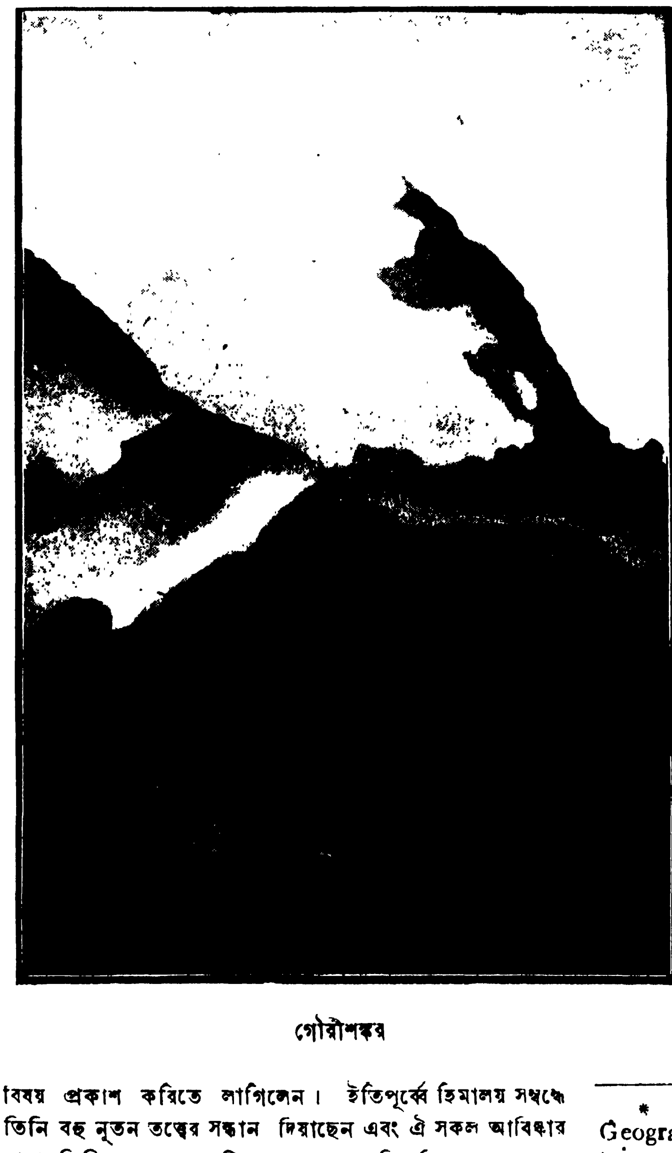
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ট্রিগোনোমিকাল সার্ভের কর্ম্মচারিগণ সমতল ভূমি হইতে হিমালয়ের চূড়াগুলির উচ্চতার পরিমাপ গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক চূড়ার উচ্চতা নির্ণয় করিয়া অনুসন্ধানে প্রাপ্ত দেশীয় নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিতে লাগিলেন এবং যে স্থলে কোন চূড়ার দেশীয় নামের সন্ধান হইল না, সেই স্থলে সেইগুলিকে রোমক সংখ্যক দ্বারা মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ প্রকারে তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া হিমালয়ের চূড়াগুলির আবিষ্কার ও পরিমাপ করিতে থাকেন। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত Chief Computer এক জন বাঙ্গালী এক দিন হঠাৎ তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সার এনড্রু ওয়াঙ্গকে জানাইলেন যে, তাঁহারা এযাবৎ হিমালয়ের যে শিখরটিকে xv সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, উহাই জগতের আবিষ্কৃত শৃঙ্গগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। * সার এনড্রু এই বিস্ময়কর অচিন্তিতপূর্ব্ব সংবাদে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন; অতঃপর প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল সার এভারেষ্টের নামানুসারে উহাকে "মণ্ট এভারেষ্ট" আখ্যা দিয়া জগতে প্রচার করিলেন। সেই সময় মিঃ হডসন নেপালের Politcal officer ছিলেন; তিনি সার এনড্রু ওয়াঙ্গএর ঐ নূতন নাম প্রদানের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তুলিলেন, এবং এ বিষয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া তাহাতে সার এনড্রু যে উক্ত নূতন নাম প্রয়োগ করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন। ঐ সকল লিপিবদ্ধ বিবরণীতে তিনি প্রকাশ করেন যে, উক্ত নাম-প্রয়োগ সর্ব্বপ্রকারে আইন-বিরুদ্ধ; যেহেতু উক্ত শিখরের স্থানীয় নাম দেবধুঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে কোনও নবাবিষ্কৃতের

---

* রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটীর এসিষ্টাণ্ট ম্যাপ কিউরেটর (Assistant Map Curator) মিঃ এফ য্যালেন এই প্রবন্ধের তত্ত্ব সংগ্রহে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

* Iutroduction to Col. Howard-Bury and other member's—Mount Everest—the Reconnaissance 1921, by Sir Francis Younghusband, K, C. S. I., K. C. I. E., President, Royal Geographical Society, London.

স্থানীয় মূলনাম পরিহার করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বকল্পিত অথবা অন্য কোন নূতন নাম-প্রয়োগ সত্যই আপত্তিজনক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মিঃ হডসন্ নিজেই বিষম ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি একটি সম্পূর্ণ দ্বিতীয় চূড়াকে ওয়াঙ্গ-বর্ণিত এভারেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিলেন না যে, তিনি যাহাকে দেবধুঙ্গ বলিতেছেন, তাহা মাউণ্ট এভারেষ্ট-সন্নিহিত হিমালয়ের অপর একটি শিখর। মিঃ হডসন এই ভ্রমপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজের মত ও অভিজ্ঞতার



গৌরীশঙ্কর

বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে হিমালয় সম্বন্ধে তিনি বহু নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন এবং ঐ সকল আবিষ্কার দ্বারা তিনি যে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; সুতরাং তিনি যে ভ্রান্ত, এ ধারণা অতি অল্পলোকেরই হইল। উহার বহুদিন পরে মিঃ বার্য়ার্ড এবং মিঃ হেডেন হিমালয়ের ঐ সকল সমস্যা-সমাধানের জন্য অভিযান করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হডসনের ভাগ্যে এভারেষ্ট-দর্শন আদৌ ঘটে নাই।

কিছু দিন পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে Heimann de Schlagintweit নেপালের কাটমাণ্ডুর সন্নিহিত কৌলিয়া নামক একটি পর্ব্বত হইতে হিমালয়ের কতকগুলি তুষারমণ্ডিত চূড়াকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন এবং বহু প্রচেষ্টায় তিনি যাহাকে এভারেষ্ট বলিয়া চিনিলেন, ঠিক কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাকেই মিঃ হডসন্ দেবধুঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু Schlaginweit মিঃ হডসনের দেবধুঙ্গ নাম সমর্থন করিলেন না। তিনি ঐ নাম সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ সহ প্রচার করিলেন যে, উহার স্থানীয় নাম গৌরীশঙ্কর। বহু দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিক তদবধি Schlaginweit এর মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারই মতানুসারে জগতের উচ্চতম শিখরটিকে গৌরীশঙ্কর বলিয়া জানেন। *

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন উড, লর্ড কার্জ্জন এর আদেশে উল্লিখিত কৌলিয়া পর্ব্বতে গমন করেন এবং Schlagintweit যাহাকে গৌরীশঙ্কর বলিয়াছেন, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই পর্ব্বতটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ট্রিগোনোমিকাল সার্ভে বিভাগের Computerগণ যেখানে কোনও পর্ব্বতের স্থানীয় নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সে স্থলে তাহাদিগকে রোমক সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছিলেন। ক্যাপ্টেন উড দেখিলেন যে, বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতের জরীপ বিভাগের মানচিত্রে যাহাকে সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং যাহার উচ্চতা ২৩৪৪০ ফুট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই Schlaginweit কথিত গৌরীশঙ্কর; এবং ঠিক এই চূড়াটিকেই মিঃ Hodgson দেবধুঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। † Wood-প্রদত্ত বিবরণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, Schlagintweit ও Hodgson উভয়ে **xx** (২৩৪৪০) পর্ব্বতকে এভারেষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু **xv** (২৯০০২) শিখরটিই Waugh-বর্ণিত এভারেষ্ট এবং প্রথমোক্ত চূড়া হইতে শেষোক্ত চূড়াটির দূরত্ব ৩৬ মাইল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দেবধুঙ্গ বলিয়া কোনও চূড়া হিমালয়ের নাই। Burrard

* Burrard & Hayden's "A sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet" p, 20.

† Wood's report on the Identification and Nomenclature of the Himalayan peaks as seen from Katmandu, 1904, also in his narrative report 1903-04.

ও Hayden বলেন—This name may probably be a mythological term applied to the whole snowy range by the natives of certain part of Nepal.

এভারেষ্ট চূড়ার ভারতীয় বা নেপালী কোনও নাম যে নাই, তাহা এখন দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উহার অবস্থিতিই তাহার একমাত্র কারণ। ভারত ও নেপাল হইতে ইহাকে দেখা যাইলেও হিমালয়ের বহু পশ্চাতে থাকায় নেপাল-অধিবাসিগণ অপেক্ষা তিব্বতীগণ বহুদিন হইতে উহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। জেনারেল Bruce ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটীতে এভারেষ্ট অভিযান সম্পর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ অঞ্চলের তিব্বতীগণ উহাকে চোমো-লুঙমো (Chomo-lungmo) বা পর্ব্বতের দেবমাতা বলিয়া অভিহিত করে।

নামের অনুসন্ধান করা হয়, তখন মাত্র দুইটি নাম প্রয়োজ্য বলিয়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এইবার তিব্বতী নাম অনুসন্ধানে এই নামকরণসমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এ যাবৎ সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি নাম "এভারেষ্টের" স্থান গ্রহণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে :—১। চোমো কঙ্কর (Chomo kankar) ২। চো-লাঙ্‌বু (Chho lungbu) ৩। চোমো লাঙ্‌মো (Chomo lungmo) ৪। চোমো লাঙ্‌মা (Chomo lnngma) ৫। চোমো উরি (Chomo uri)। তন্মধ্যে চোমো লাঙ্‌মো ও চোমো লাঙ্‌মা শব্দ শেষের দুইটি স্বরবর্ণের পার্থক্য ব্যতীত একরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র দাস ও কর্ণেল ওয়াডেল (Colonel Waddell) চোমো কঙ্কর নামের আবিষ্কার করেন এবং freshfield উহা সমর্থন করিয়া বলেন যে, উহাই "মাউণ্ট



স্যাণ্ডাকফু হইতে এভারেষ্টের (২৯০০২ ফুট) দৃশ্য

যখন দেবধুঙ্গ ও গৌরীশঙ্করের প্রয়োগ এইভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং এখন এই তিব্বতী নামের সন্ধান হওয়ামাত্রেই তাঁহারা উহার প্রচলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হইয়া ঐ নাম ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। স্বেন হেডিন (Sven Hedin) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "মাউণ্ট এভারেষ্ট" পুস্তকে "এভারেষ্টের" পরিবর্ত্তে চোমো-লাঙ্‌মা (Chomo-lungma) নামের প্রয়োগ যথাযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে সার স্বেন হেডিন, সার ফ্রান্সিস এভারেষ্টের উপর একটু কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই; তিনি লিখিয়াছেন—"By sheer accident withont a trace of want of breath he has become undying"। যাহা হউক, আমরা অবগত আছি যে, যখন এভারেষ্টের এদেশীয়

এভারেষ্টের" তিব্বতী নাম। কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, তিব্বতীরা "এভারেষ্টের" জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করে বলিয়া শুনা যায় না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে "চো-লাঙ্‌বু"র আবিষ্কার হইল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে উহাও ব্যর্থ হইয়া গেল।

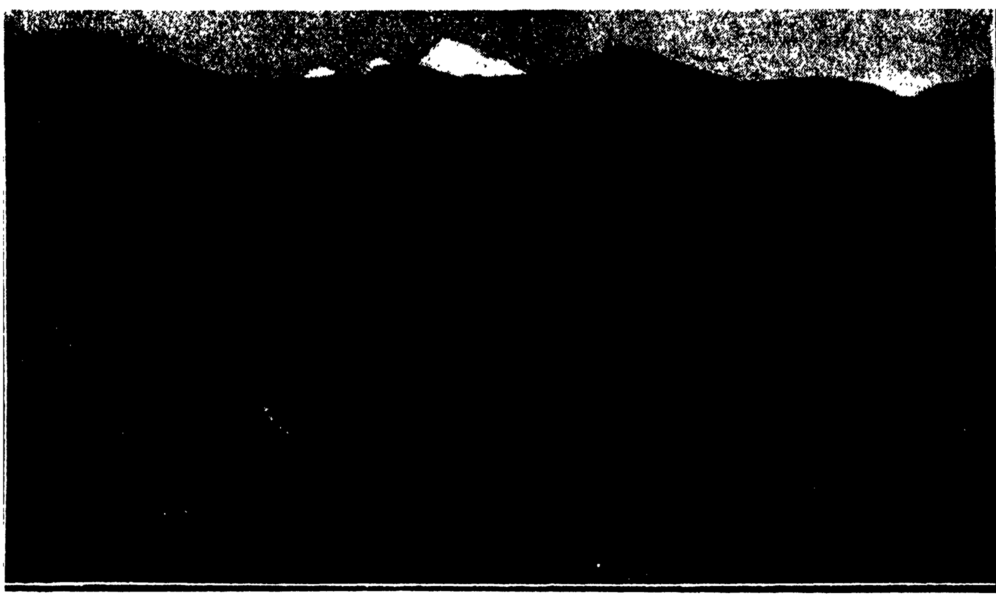
১৯২১ খৃষ্টাব্দের অভিযানে কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরি দুইটি নামের প্রয়োগ দেখিতে পান—চোমো-উরি ও চোমো-লাঙ্‌মা। চোমো-উরির প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ প্রমাণ না থাকায় উহাকেও বর্জ্জন করা হইল,—বাকি থাকিল চোমো-লাঙ্‌মা।

যত দূর জানা যায়, স্বেন হেডিন শেষোক্তটি অর্থাৎ চোমো-লাঙ্‌মা ব্যতীত ঐ নামগুলির একটিও এভারেষ্টের তিব্বতী নাম বলিয়া সমর্থন করেন নাই। বর্ত্তমানে তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ়নিশ্চিত হইয়াই বলিয়াছেন যে, উহাই মাউণ্ট এভারেষ্টের প্রকৃত তিব্বতী

নাম। তাঁহার ঐ মতের সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা অবশ্য খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং সম্প্রতি Burrard যদি সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে তাঁহার ঐ পুস্তকের সমালোচনা না করিতেন, তাহা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায় হয় ত উক্ত নাম গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। স্বেন হেডিন তাঁহার এই মতের অনুকূলে যে সকল প্রমাণ দৃঢ় বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি সর্ব্বপ্রধান।

১। ১৭১১-১৭ খৃষ্টাব্দে লামাগণ তিব্বতের ঐ অঞ্চল জরিপ করিয়া যে মানচিত্র অঙ্কন করে, তাহা D' Auville কর্তৃক প্যারী নগরে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় এবং উক্ত মানচিত্রে যে স্থলে চাউমন্ লাঙ্মা (Tchoumen lancma) পর্ব্বতের চোমোলাঙমা শব্দের ব্যবহার করে না। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এভারেষ্ট যে স্থলে গর্ব্বিত-মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, সেই পার্ব্বত্যভূমির জন্য তাহারা উক্ত নাম ব্যবহার করে। মিঃ বারার্ড সার্ভের ও D' Auvilleএর দুইটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এভারেষ্টের অবস্থান হইতে লামাগণের চাউ-মন্ লাঙ্কমার (Tchouman lancma) অবস্থান বহুদূরে এবং প্রকৃতপক্ষে D' Auville একটি বৃহৎ পর্ব্বতমালাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন—তাহাতে তিনি কোনও শিখরের অবস্থাননির্দ্দেশ অথবা তাহার নামকরণ করেন নাই।

হাওয়ার্ড বেরি কর্তৃক প্রাপ্ত অনুমতিপত্রে স্বেন হেডিন যে আস্থাস্থাপন করিয়া উক্ত নাম গ্রহণে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন,



টাইগার হিল হইতে এভারেষ্টের দৃশ্য

অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের মানচিত্রের এভারেষ্ট সেই স্থানে দণ্ডায়মান।

২। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্রস শারপা ভোটিয়াদিগের মধ্যে চোমো-লাঙ্মো (Chomo Lungmo) নামের প্রচলন দেখিতে পান।

৩। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অভিযানে তিব্বতী লামাগণ কর্ণেল হাওয়ার্ড বারিকে যে অনুমতিপত্র দেন, তাহাতে তিব্বতী ভাষায় লিখিত ছিল যে, "সাহেব চা-মো-লাঙ্মা (Tcha-mo-lungma) পর্ব্বত দেখিতে ইচ্ছা করেন।"

স্বেন হেডিন তাঁহার এই শেষোক্ত প্রমাণটিকে অকাট্য বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, জগতের উচ্চতম পর্ব্বতটির এতদ্দেশীয় নাম যে চোমো-লাঙ্মা, তাহা এই অনুমতিপত্রটি বিশেষভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু মিঃ বারার্ড কর্তৃক উহার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তিব্বতীরা এভারেষ্ট অথবা কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট চূড়ার নামকরণে সেই পত্র সম্বন্ধে সার চার্লস্ বেলএর মন্তব্য হইতে লামাগণ কি অর্থে চামো লাঙ্মা (Cham lungma) ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সার চার্লস্ উক্ত অনুমতিপত্র গ্রহণ করিবার জন্য লাসাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং ঐ পত্রে তিব্বতীগণ তাঁহাকে "মহান্ মন্ত্রী বেল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সার চার্লস লিখিয়াছেন—

"আমি লাসাতে পৌঁছিবার এক কি দুই সপ্তাহ পরে দালাই লামা তিব্বতী ভাষায় লিখিত এভারেষ্ট অভিযানের অনুমতি-পত্রখানি আমার হস্তে সমর্পণ করেন। পরে লাসাতেই দালাই লামার অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী অসামান্য জ্ঞান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এক ব্যক্তি আমার দলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহারই নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে, চা-ঝি-মা-লাঙপা (Cha-DZI-ma-lungpa) শব্দটি সংক্ষেপে চা-মা-লাঙ-(Cha-ma-lung) রূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার অর্থ

'পক্ষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রদেশ'। তিনি আরও বলেন যে, প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় মা-নি-কা-বুম্ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বহুপুরাকালে অর্থাৎ ৮৫০ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বহুসংখ্যক পক্ষীকে রাজব্যয়ে এই অঞ্চলে আহারাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন এই চা-মা-লাঙ শব্দ দ্বারা 'উপত্যকা'-সমন্বিত একটি অঞ্চল বুঝায়, কিন্তু আবার অধিকাংশ সময় এই 'লাঙ' কেবলমাত্র উপত্যকার জন্যই ব্যবহৃত হয়; সুতরাং ইহা কোনও প্রকারে পর্ব্বত-শিখরের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং ইহাও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব যে, একটি পক্ষীদের আশ্রয়স্থান উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে হইবে। বস্তুতঃ চা-মা-লাঙ (যাহা চা-ঝি-মা-লাঙ পা এর সংক্ষিপ্ত ব্যবহার) কখনও একটি পর্ব্বতের নাম হইতে পারে না এবং দালাই লামা ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী উহাকে উক্ত অর্থে ব্যবহার করেন নাই। আমি নিজে কখনও চোমো-লাঙ্ বা চোমো-লাঙ্মা শব্দ শুনি নাই। চোমো শব্দটিকে সাধারণতঃ পর্ব্বতের নামের সহিত প্রয়োগ হইতে দেখা যায় বলিয়া লোক হয় ত চামো শব্দটিকে 'চোমো'তে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু দালাই লামার উক্ত পত্রে বাস্তবিক 'চা' শব্দটিই ছিল—'চো' নয়।" *

সার চার্লসএর প্রদত্ত উল্লিখিত বিবরণ হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, চা-মা-লাঙ্ একটি পার্ব্বত্য অঞ্চলকে বুঝাইতেছে, কিন্তু ঐ পার্ব্বত্যভূমির উপর দণ্ডায়মান অন্যান্য পর্ব্বতের ন্যায় এভারেষ্টের জন্য উহা ব্যবহৃত হয় নাই। কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরি তিব্বতীগণকে যে কেবলমাত্র এভারেষ্টকেই চোমো-লাঙ্মা নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছিলেন, এমন নহে,—তিনি দেখিয়াছিলেন যে, উহারা মাকালু পর্ব্বতটিকেও উক্ত নামে অভিহিত করে। মালোরিও (Mallory) উক্ত পর্ব্বতটিকে "প্রথম চোমো-লাঙ্মা" বলিতে শুনিয়াছেন। মিঃ বারার্ড সর্ব্বদিক আলোচনা করিয়াই উক্ত নাম সমর্থন করেন নাই। বাস্তবিক একটি পার্ব্বত্য অঞ্চলের নাম একটি শিখরের জন্য প্রয়োগ করিয়া পরে বিফলমনোরথ হওয়া অপেক্ষা এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তবে এ যাবৎ সর্ব্ববাদিসম্মত কোনও নাম আবিষ্কৃত হয় নাই এবং অন্য কোনও তিব্বতী নামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া এভারেষ্ট নামের পরিবর্ত্তনসাধন করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিব্বতীগণের নিকট হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, উক্ত চূড়ার কোনও নাম নাই। যাহা হউক, যদি কোনও নাম পরে আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে "এভারেষ্টের" পরিবর্ত্তে উহাকে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, প্রাপ্ত নামটি উহার মূলনাম কি না। কারণ, তিব্বতীরা যখন জগতের এই উচ্চতম পর্ব্বতের সম্বন্ধে বহির্জগতের এত আগ্রহের কথা জানিতে পারিবে, তখন হয় ত তাহারা চোমো সংযুক্ত কোনও শব্দ উহার জন্য ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া উহাকে মূলনাম স্বীকার করিয়া এভারেষ্ট আখ্যার পরিবর্ত্তন সঙ্গত হইবে না।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরিও ঐ নামের ব্যবহার দেখিতে পান। নামটি সত্যই উহার উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এত কাল পরে উক্ত নামের সন্ধান হওয়ায় বিশেষ কোনও ফল হইল না—কারণ, অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইতে জগতে উহার এভারেষ্ট নাম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সুদীর্ঘ দিনের পর অন্য কোনও নাম ওভাবে প্রসারলাভ করিতে পারে না; সুতরাং ঐ মূল নামের আবিষ্কার হইলেও উহা প্রচলনের কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট ইয়ং হাসব্যাণ্ড চোমো-লুঙ্মো নাম প্রচলনের চেষ্টা সম্পর্কে বলিয়াছেন—"সমগ্র জগতে মাউণ্ট এভারেষ্ট নাম এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, এখন ঐ নামের পরিবর্ত্তন-সাধন অসম্ভব। সুতরাং ঐ নামই নির্দ্দিষ্টরূপে প্রচলিত হইল।"

এইবার ইহার উচ্চতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। সকলেই জানেন যে, এভারেষ্ট-শিখরের উচ্চতা ২৯০০২ ফুট। উচ্চতায় আর কোনও পর্ব্বত ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; কিন্তু স্বভাবতঃই মনে হয়, এই দুই ফুট কেন? পুরাপুরি ঊনত্রিশ হাজার রাখিলেই ত অনেক সুবিধা হইত! এই দুই ফুট রাখিবার যে কি সার্থকতা আছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অনেকে মনে করেন, ২৯০০২ ফুটের স্থানে দুই, চারি ফুট কম বা বেশী লিখিলে ভুল হয় না। কারণ, উহাকে দূর হইতে মাপিয়া উহার উচ্চতা নির্ণয় করা হইয়াছে, সুতরাং দুই চারি ফুটের ভুল হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত বাঙ্গালা মাসিকে দেখিলাম, উহার উচ্চতাকে ২৯০০৩ ফুট বলা হইয়াছে। আমার মনে হয়, তাঁহারা ঐ ধারণারই বশবর্ত্তী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পর্ব্বতের উচ্চতাই তাহার একমাত্র পরিচয়; কোনও নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের খ্যাতি তাহার নির্দ্দিষ্ট উচ্চতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এক কথায় উচ্চতাই তাহার একমাত্র গুণ। সুতরাং উহার নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা মানিয়া চলা সর্ব্বতোভাবে উচিত। হিমালয়ের চূড়াগুলির উচ্চতা পরিমাপ-কালীন বারার্ড এবং হেডেন ঐ কথাই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পর্ব্বতের নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা বজায় রাখার যে সার্থকতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য। সম্প্রতি কেহ কেহ এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯১৪০ ফুট * বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; তাঁহাদের বিশ্বাস, ২৯০০২ ফুট বহুপূর্ব্বের হিসাব, গত অভিযান সময়ে পুনরায় হিসাব করিয়া উহার উচ্চতা ২৯১৪১ ফুট হইয়াছে। বাস্তবিক ২৯১৪১ ফুট অভিযানের বহুপূর্ব্বকার মাপের ফল; তবে কি কারণে ২৯০০২ ফুটের পরিবর্ত্তে উক্ত ফল ধরা হয় নাই, তাহা পরে বলা যাইতেছে। বিগত অভিযানগুলির সময় নূতন করিয়া কোনও মাপ হয় নাই এবং অভিযানকারিগণ ভারতীয় জরীপ বিভাগের প্রথম পরিমাপের হিসাব অনুসারেই প্রস্তুত মানচিত্রে ২৯০০২ ফুটই রাখিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতীয় জরীপ বিভাগের

* "চো"—দেবতাদিগের প্রভু, "মো" শব্দ যোগে উহা স্ত্রীলিঙ্গ হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, চোমো শব্দটি সাধারণতঃ পর্ব্বতের জন্য ব্যবহার হয়।

* প্রকৃতপক্ষে উহা ২৯১৪১ ফুট হওয়া উচিত।

কর্ম্মচারীরা ছয়টি বিভিন্ন স্থান হইতে উহার উচ্চতার পরিমাপ গ্রহণপূর্ব্বক ২৯০০২ ফুট প্রাপ্ত হন, তৎপরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারার্ড ও হেডেন পুনরায় সংশোধন করিয়া ২৯১৪১ ফুট নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু কি কারণে তাঁহারা উক্তফল বর্জ্জন করেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে। নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা হইতে কি প্রকারে দুইটি ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

যে স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে।	যে বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে।	যে স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার উচ্চতা	এভারেষ্ট হইতে সেই স্থানের দূরত্ব	দৃষ্টিরেখার বক্রগতি সংশোধন না করিয়া প্রাপ্ত উচ্চতা।	সমতলভূমিস্থ স্থানগুলি হইতে দৃষ্টিরেখার বক্রগতি সংশোধনের জন্য ০·০৭ হইতে ০·০৮ সংখ্যা গ্রহণ করায় মিঃ waugh কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ফল।	পর্ব্বতোপরিস্থ স্থানগুলি হইতে দৃষ্টিরেখার বক্রগতি সংশোধনের জন্য ০·০৫ সংখ্যা গ্রহণ করায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে প্রাপ্ত ফল।	সমতলভূমিস্থ স্থানগুলি হইতে দৃষ্টিরেখার বক্রগতি সংশোধনের জন্য ০·০৬৪৫ সংখ্যা গ্রহণ করায় প্রাপ্ত ফল।
		ফুট	মাইল	ফুট	ফুট	ফুট	ফুট
জিরোল	১৮৪৯	২২০	১১৮·৬৬১	৩০৩৬৬	২৮৯৯১·৬		২৯১৪১
মির্জ্জাপুর	১৮৪৯	২৪৫	১০৮·৮৭৬	৩০১৬৫	২৯০০৫·৩		২৯১৩৫
জাঙ্গপাতি	১৮৪৯	২৫৫	১০৮·৩৬২	৩০১৪১	২৯০০১·৮		২৯১১৭
লদ্দনিয়া	১৮৪৯	২৩৫	১০৮·৮৬১	৩০১৭১	২৮৯৯৮·৬		২৯১৪৪
হারপুর	১৮৪৯	২১৯	১১১·৫৩২	৩০২২১	২৯০২৬·১		২৯১৪৬
মিনাই	১৮৫০	২২৮	১১৩·৭৬১	৩০২৮২	২৮৯৯০·৪		২৯১৬০
সুবারকুম	১৮৮১	১১৬৪১	৮৭·৬৩৬	২৯৫৭৬		২৯১৪১	
ঐ	১৮৮৩	১১৬৪১	৮৭·৬৩৬	২৯৫৭২		২৯১৩৭	
টাইগার হিল	১৮৮০	৮৫০৭	১০৭·৯৫২	২৯৬৮০		২৯১৪০	
স্যাণ্ডাক্‌পু	১৮৮৩	১১৯২৯	৮৯·৬৬৬	২৯৬২০		২৯১৪২	
ফালুত	১৯০২	১১৮১৬	৮৫·৫১৩	২৯৫৮৯		২৯১৫১	
সিঙ্গাল	১৯০২	৮৫৯৯	১০৮·৭০৩	২৯৯৪১		২৯১৩৪	
গড়	...	...	...	...	২৯০০২	২৯১৪১	২৯১৪১

মিঃ বারার্ড ও হেডেন-প্রদত্ত ঐ তালিকায় ২৯০০২ ফুট ও ২৯১৪১ ফুট নির্ণয়ের কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত তালিকাটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ২৯০০২ ফুটের বহু পরে ২৯১৪১ ফুটের হিসাব হইল; কিন্তু তথাপিও তাঁহারা ২৯০০২ ফুট পরিবর্ত্তন করিয়া ২৯১৪১ ফুট গ্রহণ করেন নাই—কারণ, কোনও মাপ যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। প্রথমতঃ থিওডোলাইট-যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংযুক্ত দূরবীক্ষণটি হয় ত নির্দ্দোষ নহে। কোনও যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না এবং পর্য্যবেক্ষণকারী নিজে হয় ত সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে নির্দ্দিষ্ট চূড়াকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, অবশ্য ইহার জন্য ১০ ফুটের অধিক ভুল নাই। অধিকন্তু যে স্থান হইতে উহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, সেই স্থানের উচ্চতা পরিমাণে অনেক সময় ভুল থাকে। এ সকল কারণ ব্যতীত আরও বহু কারণ আছে, যাহার জন্য কোনও পর্ব্বত-শিখরের উচ্চতা-পরিমাপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শীতকালে তুষারপাত হয় ও গ্রীষ্মের সময় উহা গলিতে থাকে, সুতরাং উক্ত দুই সময়ের গৃহীত পরিমাপ স্বতঃই দুই প্রকারের হইবে। আবার তুষারপাতের অল্পতা ও আধিক্য অভিন্ন ফল প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়। প্রকৃত উচ্চতা নির্ণয়ের পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিশ্চয়তার কারণ বায়ুমণ্ডল-অবস্থান-জনিত দৃষ্টি-রেখার বক্রগতি (Atmospheric refraction)। দর্শক যে চূড়াটির পরিমাপ গ্রহণের জন্য তাহার শীর্ষভাগ লক্ষ্য করে, সেই চূড়া হইতে আগত আলোকরশ্মি কখনও সরলপথে দর্শকের দৃষ্টিপথে আসিয়া পৌঁছায় না। উহা একটি ধনুকের ন্যায় বক্র আকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই বক্র-পথেই দর্শক পর্ব্বত-চূড়াটিকে লক্ষ্য করে বলিয়াই উহাকে অধিকতর উচ্চ দেখায়। সুতরাং ঐ বক্রগতি সংশোধন করা আবশ্যক, কিন্তু ঐ বক্রতার পরিমাণ কতটুকু এবং সংশোধনের জন্য কত রাশি গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা ঠিক করা বড়ই সুকঠিন। উদ্ধৃত তালিকায় ৫ম স্তম্ভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যদি ঐ বক্রতা সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে এভারেষ্টের উচ্চতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৩০৩৬৫ ফুট ও সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন ২৯৫৭২ ফুট হয়। ইণ্ডিয়ান সার্ভের Computer-গণ ঐ বক্রতা সংশোধন করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ৬ নং স্তম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। বায়ুস্তর পরিমাপ কার্য্যে যে কিরূপ বিঘ্ন ঘটায়, তাহা আমরা উক্ত ৫নং স্তম্ভ হইতে বেশ বুঝিতে পারি। জিরোল, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি সমতল ভূমিস্থ স্থানগুলি হইতে

মাপ লওয়ায় এভারেষ্টের উচ্চতা ৩০ হাজার ফুটের অধিক হইল, কিন্তু যখন উহাকে পর্ব্বতোপরিস্থ স্থানগুলি হইতে মাপা হইল, তখন কোনও ফলই ৩০ হাজার ফুট হয় নাই। ইহার কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ু পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানের বায়ু অপেক্ষা অনেক গাঢ়; এবং ঐ গাঢ় বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আসিবার সময় দৃষ্টিরেখা অধিকতর বক্র হইয়া পড়ে; ফলে চূড়াটিকে অধিকতর উচ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। মিঃ ওয়াঙ্গ ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে সংশোধনের জন্য যে সংখ্যা গ্রহণ করেন, তাহা অত্যন্ত কম, সুতরাং উহার উচ্চতা ২৯০০২ ফুট অপেক্ষা বেশী। ৭ ও ৮ নং স্তম্ভে দেখা যাইবে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সংশোধন করা হইল এবং ঐ সংশোধনের ফলে ২৯১৪১ ফুট ফল পাওয়া গেল। কিন্তু ২৯০০২ ফুট বহুদিন হইতে এভারেষ্টের উচ্চতা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে এবং ২৯১৪১ ফুটও সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাব নহে। সেই কারণে এই পরবর্ত্তী পরিমাপ গ্রহণ করা হয় নাই। যদিও ২৯০০২ অপেক্ষা ২৯১৪১ অধিকতর নির্ভরযোগ্য ফল, তথাপি ঐ সামান্য কয়েক ফুট পার্থক্যের জন্য উহা বর্জ্জন করিয়া বিশ্বখ্যাত ২৯০০২ ফুটই রাখা হইয়াছে। মিঃ বারার্ড এবং মিঃ হেডেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ ফল বাহির করিয়াও ঐ কারণে উহা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। *

মিঃ বারার্ড ও মিঃ হেডেনএর উক্ত উক্তি ইয়ং হাসবাণ্ডও পূর্ণ সমর্থন করেন। তাঁহার মতে যত দিন পর্য্যন্ত কোনও নূতন ভবিষ্যৎ পরিমাপের ফলের সহিত ২৯০০২এর পার্থক্য বহু বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত উহাই জগতের উচ্চতম পর্ব্বতের উচ্চতা নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার।

* Burrard & Hayden's—"Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet P. 16."

"লহ মোর শেষ নমস্কার"

জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিল, মলিন আঁখির আলো,
আজি পড়ে মনে, বিদায়ের ক্ষণে, যাহা কিছু বাসি ভালো।
সুন্দর এই ধরা,
রূপ-রস-গুণ-গানে-গন্ধে, প্রাণে দিয়াছিল সাড়া।
স্তিমিত আঁখির পল্লব আগে সকলি জাগিয়া উঠে,
নিত্য যে সুধা করিয়াছি পান ধরার ওষ্ঠপুটে।

জীবন-প্রভাতবেলা,
ধরণীর কোলে লুটিয়া আবেশে করিয়াছি কত খেলা।
হেরেছি মুগ্ধ মানস-নেত্রে উজ্জ্বল শ্যামল ছবি,
সবুজ প্রাণের প্রতি স্পন্দনে বিপুল পুলক লভি,
ফুটিত সরস অধরপ্রান্তে কিবা অমলিন হাসি,
ছায়াছবিসম হৃদিপটে আজি সকলি উঠিছে ভাসি।

শৈশব কাটিয়া গেছে,
জীবনের ভ্রম পরিণতি শেষে মোরে হেথা আনিয়াছে।
পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছি যাহা, জড়িত আঁখির আগে,
রূপের মোহন অঞ্জন মাখি সবই অপরূপ লাগে।
তার যত ব্যথা, দুঃখ, তাপ, শোক, সেও যে সুন্দর অতি,
অন্ধে আড়ালে জড়াইয়াছিল, অরূপ রূপের ভাতি।

চপল বিহ্বল আঁখি,
গতির আবেগে বোঝেনি তখন, জীবনের এই ফাঁকি।
জগতের কত ব্যথা-শোক-তাপ, পুঞ্জিত করে আনি,
মোরে যদি আজি দেয় উপহার, তাহা আশীর্ব্বাদ মানি—
শিরে তুলে নিব, তার বিনিময়ে চাহিব শুধুই আমি,
ধরণীর এই কল-কোলাহল শুনিব দিবস-যামি,

নিভৃতে একা বসি,
শ্যামল ধরার অঞ্চল যেথা ছড়াইছে রূপরাশি।
সফল কামনা হবে না আমার জানি ইহা আমি ভালো,
আমারে পাগল করিয়াছে ওগো, ধরার উজ্জ্বল আলো।
বিদায়ের বেলা আঁখি দুটি মেলি, ধূসর দৃষ্টিপথে,
আজি শেষ দেখা, চিরবিচ্ছেদ হইবে ধরার সাথে।

খেয়ার তরণী আসে,
মোরে নিয়ে যাবে, সে কোন্ সুদূর, অচিন অজানা দেশে,
নিয়ে যায় শুধু, সে তরণী আর নাহি কভু ফিরে আনে,
সে তরীর নেয়ে কারু বাধা আর আকুলতা নাহি মানে।
নিভিয়া আসিছে জীবনের আলো, ঘনাইছে ঘোর অন্ধকার,
হে প্রিয় ধরণী, বিদায়ের বেলা, লহ মোর শেষ নমস্কার।

শ্রীচন্দ্রনাথ সেন।

২৩

উল্লিখিত ঘটনার এক দিন পরে সরোজ অপরাহ্ণের দিকে আসিয়াছিল; গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পুষ্পিতার সঙ্গে একটা পরামর্শও করিয়াছিল। সেই উপলক্ষেই আসা। পুষ্পিতার ইচ্ছা, নূতন গ্রন্থাদি আর বেশী প্রকাশ করিয়া কায নাই। সরোজ বলিয়াছিল, তাহা হইলে যে ভাবে গ্রন্থাগার চলিতেছিল, সে ভাবে চলিবে না। নূতন গ্রন্থের নিয়মিতভাবে প্রকাশকার্য্য না চালাইলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয় না। তাহা ছাড়া হিমাদ্রির শেষ ইচ্ছা—পুস্তকের প্রকাশ যেন চলে।

ক্রমে উভয়ের কথাবার্ত্তা পূর্ব্বকার মত বেশ সহজ হইয়া আসিল। মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছিল। কথায় কথায় পুষ্পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নূতন বাসা কেন করলেন, বিশেষ যখন ও বাড়ীটা খালি প'ড়ে রয়েছে?"

সরোজ বলিল, "ও বাড়ীতে গেলেই আপনার বড় কষ্ট হয়; আপনার মনেও আঘাত লাগে। তা' ছাড়া ইদানীং আমি এলেই আপনার মনে কষ্ট হয়, আমি দেখছি। সেজন্য আমি একটু দূরেই স'রে গিয়েছি।"

কথাটা সত্য। কিন্তু সরোজের স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় কথাটার মধ্যে অভিযোগের ছন্দাংশও ছিল না।

পুষ্পিতার মন ইহাতে একটু আহত হইল। সত্যই সরোজের ত বিন্দুমাত্র দোষ নাই, অথচ বিনা কারণে সে মনে মনে সরোজকেই দোষী করিয়া আসিয়াছে। সরোজ তাহাকে ভালবাসিত, শুধু বাসিত নহে, বাসেও—সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সরোজ সে কথা অমাবস্যার আকাশে তারাগুলির মতই অন্তরের মাঝে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। তাহার স্বামী সরোজকে সে কথা বলিবার একপ্রকার পূর্ণ অধিকার দিয়া গেলেও, সরোজ সে অধিকার দাবী করিবার দিক্ দিয়াও কোন দিন যায় নাই।

পুষ্পিতার চিত্ত নিরপরাধ সরোজের প্রতি কোমল হইয়া আসিল। সে বলিল, "আপনি বাসা করেছেন ব'লে বুঝি ভাবছেন, আমি সেখানে যেতে জানি নে?"

সরোজ একবার ম্লান হাসি হাসিল মাত্র; তাহাতে যেন এই কথা বলিল, তুমি কেন সেখানে যাইতে গেলে?

সরোজের ম্লান হাসি ও কাতর মুখ দেখিয়া পুষ্পিতার মনে বোধ হয় অনুতাপ জাগিয়াছিল। সে বলিল, "আমাকে আপনার বাসায় নিয়ে চলুন ত একবার। আপনার বাসা দেখে আসি।"

সরোজ বলিল, "বেশ, যে দিন ইচ্ছা যাবেন।"

পুষ্পিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বেশ ত! নিয়ে চলুন মানে বুঝি পাঁজী দেখে নিয়ে যাওয়া। আজই নিয়ে চলুন।"

সরোজ বলিল, "ভাল, তাই চলুন।"

পুষ্পিতা উঠিয়া বলিল, "দাঁড়ান, আমি মাকে ব'লে আসি।"

চপলাকে জানাইতে তিনি বড় খুসী হইলেন। একবারে সরোজের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি আজকাল বড় কম আস। এমনি ক'রে মাঝে মাঝে পুষ্পিতাকে নিয়ে যদি বেড়াও, তবে' না ওর মন একটু ভাল থাকে। তুমি এলে তবু ও দুই একটা কথা কয়।"

উভয়ে বাড়ীর বাহিরে আসিল। সদর রাস্তায় পড়িয়া সরোজ বলিল, "কিসে যাবেন? ট্যাক্সিতে?"

পুষ্পিতা বলিল, "যাতে হ'ক চলুন।"

সরোজ বলিল, "ট্যাক্সি ঠিক আমার বাসার সামনে পর্য্যন্ত যাবে না। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সেখান থেকে মিনিট দুয়ের পথ। হেঁটে যেতে হবে।"

পুষ্পিতা বলিল, "তাতে আর কি, চলুন।"

একখানি উত্তরগামী খালি ট্যাক্সি থামাইয়া দুই জনে উঠিয়া বসিল। সরোজ ঠিকানা বলিতে ট্যাক্সি ছাড়িল।

হিমাদ্রির মৃত্যুর পর হইতে পুষ্পিতা নিজের মোটরে আর চড়িত না; প্রাণ ধরিয়া বিক্রয়ও করিতে পারে নাই। পিত্রালয়ে গাড়ীখানা পড়িয়া আছে। পুষ্পিতার পিতা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের একটা ছোট গলির সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিতে তাহারা নামিল। সরোজ ভাড়া চুকাইয়া

দিলে, গাড়ী চলিয়া গেল। উভয়ে গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

২৪

একটা ছোট ভাঙ্গা একতলা বাড়ীর সম্মুখে সরোজ আসিয়া দাঁড়াইতে পুষ্পিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী না কি ?"

"হাঁ—" বলিয়া সরোজ দরজার তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

দুইখানিমাত্র ঘর। তাহা ছাড়া একটি রান্নাঘর এক পাশে, ছোট উঠানও একটু আছে।

পুষ্পিতা বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিল।

সরোজ প্রথম ঘরের দুয়ার খুলিয়া বলিল, "আসুন, ভিতরে একটু বসুন।"

পুষ্পিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও বিস্মিত হইল। ঘরে আসবাবের মধ্যে একখানা চৌকি। তাহাতে একটা অতি সামান্য বিছানা। অন্য আসবাবের মধ্যে একটা অতি সস্তায় কেনা টেবিল ও একখানা টুল।

পুষ্পিতা বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এই বাসায় আপনি থাকেন ?"

সরোজ বলিল, "হ্যাঁ।"

পুষ্পিতা বলিল, "তাই আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "আপনার চেয়ে নয়।"

পুষ্পিতা বলিল, "আমার শক্ত অসুখ হয়েছিল, তাই একটু রোগা হয়েছি ; কিন্তু আপনি কেন হলেন ?"

সরোজ একটু হাসিল মাত্র। কিছু বলিল না।

পুষ্পিতা বলিল, "চলুন, আপনার রান্নাঘর দেখে আসি।"

সরোজ বলিল, "বেশ, আসুন।"

রান্নাঘরের দুয়ারে শিকল তুলিয়া দেওয়া ছিল। সরোজ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল।

ছোট ঘর। চটা উঠা—ইটের মেঝে। ছোট একটি উনান। তৈজসপত্রের মধ্যে একটি ছোট মাটীর হাঁড়ি, একখানা সরা, একখানি মাঝারি থালা, একটা গ্লাস, একটি পিতলের ঘটী। একটা ছোট চুপড়িতে গুটিকয়েক আলু, একটি কাঁসার পাত্রে খানিকটা সৈন্ধব লবণ। একধারে একটি বালতি।

পুষ্পিতা চারিদিক্ বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "এই বুঝি আপনার ঘর-সংসার ?"

সরোজ বলিল, "একা মানুষের এর চেয়ে আর কি বেশী দরকার বলুন ?"

পুষ্পিতা আর একবার জিনিষগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আর সব কিসে রান্না হয় ?"

সরোজ বলিল, "আর সব কি ?"

পুষ্পিতা বলিল, "তরকারী-টরকারী ?"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "ঐ যে আলু আছে, নুণ আছে আর কি চাই বলুন ? ক্ষুধাই হচ্ছে আমার তরকারী।"

পুষ্পিতা এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার বড় ক্ষুধা, তা ত আপনার চেহারার বহরেই বুঝতে পারছি। আপনি এই রকম ক'রে আহার ক'রে থাকেন, তাই আপনার এই রকম শরীর হচ্ছে আজকাল।"

সরোজ বলিল, "চলুন, ওঘরে গিয়ে বসি গে। রান্না-ঘর তেমন স্বাস্থ্যকর স্থান নয়।"

পুষ্পিতা বলিল, "আপনার বসবার বা শোবার ঘরও ত যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর !"

পুষ্পিতা অগ্রসর হইল। "তবু ত এ ঘরের চেয়ে ভাল,"—বলিয়া সরোজও ঘর হইতে বাহির হইয়া শিকল তুলিয়া দিল।

দুই জনে ধীরে ধীরে অন্য ঘরে আসিয়া বসিল।

পুষ্পিতা চাহিয়া দেখিল, ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও দারিদ্র্যের চিহ্নে পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কাযকর্ম্ম সব করে কে ?"

সরোজ বলিল, "কিই বা আমার কাযকর্ম্ম ! আমি নিজেই করি !"

পুষ্পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না, বাসন মাজা—সব ?"

সরোজ বলিল, "বাসন ত দেখলেন, একখানি থালা ও একটি গেলাস। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজে ফেলি।"

পুষ্পিতা বলিল, "আর রান্না ?"

সরোজ বলিল, "রান্না চড়িয়ে দিলেই হয়ে যায়। আলু-ভাতে ভাত চড়িয়ে দিয়ে, একটু পড়াশুনা করতে করতেই হয়ে যায়। ঠিক খানিকটা পড়ে উঠে এসে নামিয়ে ফেলি একসঙ্গে ভাত আর তরকারী তৈরী হয়ে থাকে।"

পুষ্পিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল, সরোজ বাবু ত দরিদ্র নহেন। তাহার স্বামী উইলে বন্ধুর জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত সরোজ বাবু দাসদাসীপূর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতে পারেন। তথাপি তিনি এ ব্যবস্থা কেন করিয়াছেন? জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ রকম ছোট পুরানো ও ভাঙ্গা বাড়ীতে কেন থাকেন? কলিকাতার বিখ্যাত গ্রন্থালয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারীর বাসভবন এর চেয়ে একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল।"

সরোজ বলিল, "আমার বাসস্থান ভাল কি মন্দ, এ আর কেউ জান্‌ত না, জানবেও না। আপনিও জান্‌তেন না, যদি না আজ আপনার এখানে আসার দুর্ব্বুদ্ধি হ'ত।"

পুষ্পিতা বলিল, "দুর্ব্বুদ্ধি কেন বলছেন?"

সরোজ বলিল, "কোনই লাভ নেই, দর্শনীয় কিছুই নেই, মিছামিছি আসা, সেই জন্যে।"

পুষ্পিতা বলিল, "মিছামিছিই বা কেন বল্‌ছেন? এখানে এলাম, তাই না জানা গেল, মানুষ বিনা কারণে নিজেকে কতখানি কষ্ট দিতে পারে। কেন আপনি এ রকম ক'রে থাকেন বলুন—বল্‌বেন না?"

সরোজ তথাপি নিরুত্তর রহিল।

পুষ্পিতা আবার বলিল, "আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া ক'রে বলুন।"

সরোজ ধীরে ধীরে বলিল, "আমার এর চেয়ে বেশী সঙ্গতি নেই।"

পুষ্পিতা বলিল, "কেন? গ্রন্থাগারের সিকি অংশ আপনার প্রাপ্য। তাতে আপনি এর চেয়ে ভাল যায়গায় থাকতে বা ভাল খেতে পারেন না?"

সরোজ বলিল, "আমি সে আয়ের অধিকারী নই। আমি গ্রন্থাগারের জন্য যেটুকু খাটি, তারই মূল্য আমার প্রাপ্য। সেইটুকুই আমি নিই।"

পুষ্পিতা বলিল, "কেন আপনি সে আয়ের অধিকারী নন্? আপনার বন্ধু ত এ কথা উইলে স্পষ্ট উল্লেখ ক'রে গেছেন।"

সরোজ বলিল, "এ কথার আর উল্লেখে দরকার নেই। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে, আবার সেই পূর্ব্ব-কথা মনে এসে পড়বে। সেই হিমাদ্রির মৃত্যু, তার অনুরোধ, সব কথা উঠবে—যার জন্য আপনি আমার উপর এত দিন বিরূপ হয়েছিলেন।"

পুষ্পিতা বলিল, "না, আপনি বলুন। আপনার প্রতি আমার ব্যবহার অন্যায় হয়েছিল। আমার সে সময়কার অবস্থা মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন।"

পুষ্পিতা কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

পুষ্পিতার অশ্রু দেখিয়া সরোজ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। কাতর-স্বরে বলিল, "আপনি আমার সামনে চোখের জল ফেলবেন না। হিমাদ্রির কোন অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি। আপনাকে আজ আমি সব কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের বিবাহের কথা সে ব'লে যায়; এ কথায় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনি যেন দুঃখ না পান, আমি যেন আপনাকে সর্ব্বদুঃখ থেকে রক্ষা করি। ঐ বিয়োগের গভীর দুঃখ, ঐ শোকের স্মৃতি চিরদিন বহে আপনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবেন, এ সে সহ্য করতে পারে নি। তাই সে ওই অনুরোধ ক'রে যায়। ঠিক কেন সে এ কথা বলেছিল, এ কথা দৃঢ় নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। কারণ, সে কথা সে ছাড়া আর কেউ জানত না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাই। যত দূর তাকে আমি জেনেছিলাম, তাতে আমার এই মনে হয় যে, আপনাকে সে এতটুকু দুঃখ দিতে চাইত না, আর আমাকে হয় ত সে আপনার পরই সব চেয়ে ভালবাস্‌ত ও বিশ্বাস করত। তাই সে মৃত্যুকালে ঐ কথা ব'লে যায়। কিন্তু আমি আপনাকে কোন দুঃখ থেকে বাঁচাতে পারি নি। হিমাদ্রি বেঁচে থাক্‌তে আপনার উপর যেটুকু অধিকার ছিল, তার এক কণাও আজ আর অবশিষ্ট নেই—যার বলে আপনাকে আমি এতটুকু আনন্দ দিতে পারি। যখন হিমাদ্রির মনের কোন ইচ্ছা আমি সাধন করতে পারি নি, আপনার কোন কাযে আমি আজ পর্য্যন্ত লাগি নি, তখন শুধু শুধু তার কষ্টার্জ্জিত অর্থের ভাগ আমি নিতে পারি নে।"

পুষ্পিতা স্তব্ধ হইয়া সরোজের মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সরোজের কথা শেষ হইলে পুষ্পিতা আপনার চোখের অশ্রু মুছিয়া বলিল, "আপনি কেন আমার জন্য এত দুঃখ সহ্য করছেন? আমি আপনার এর অর্দ্ধেক দুঃখেরও যোগ্য নই।"

এবার সরোজ যেন আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, একটু উত্তেজিত-কণ্ঠেই কহিল, "আমি জীবনে এর চেয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছি; তার তুলনায় এই ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকা বা নিজে রেঁধে খাওয়া কিছুই নয়।"

পুষ্পিতা বলিয়া ফেলিল, "সে দুঃখ ত আপনি আমারই জন্য পেয়েছেন। তা হ'লে আমি কি চিরদিন আপনাকে দুঃখ দিতেই থাকব?"

সরোজ চমকিত হইয়া পুষ্পিতার মুখের পানে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া রহিল।

পুষ্পিতা বলিল, "আমি সে কথা জেনেছি। আপনি বহু দিন আগে বাবাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা' আমি কাল দেখেছি। আমি আপনার অনেক দুঃখের কারণ হয়েছি, আমাকে আপনি মার্জ্জনা করবেন।"

সরোজ বলিল, "আপনি মার্জ্জনার কথা আর বলবেন না। আপনি ইচ্ছা ক'রে আমাকে কোন দুঃখ দেন নি। আপনার কোন দোষ নেই। আমার দুঃখ আপনি জেনেছেন, কিন্তু সে দুঃখ যে কত গভীর, তা আপনার জানবার প্রয়োজন নেই। আপনাকে যে দিন প্রথম আমি দেখি, সেই দিন থেকে আমি আপনাকে দেবীর মত মনে মনে পূজা করি। আপনার আমি উপযুক্ত হব কি না, আপনাকে সুখে রাখতে পারব কি না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নি। তাই আপনার বাবার কাছে আমি প্রথমটা বল্‌তে পারি নি। তার পর যখন মনের মধ্যে এ কথা চেপে রাখবার আর শক্তি ছিল না, তখন তাঁকে বলি। তিনি আমার প্রস্তাবে মত দেন এবং আপনাকে এ কথা বলি বলি মনে করেও, মুখে বল্‌তে পারি নি। যেন এ কথা বল্লেও, আপনার নির্ম্মলতা, শুভ্রতা একটু ম্লান হবে মনে হ'ত। ভাবতাম, যদি এ কথায় আপনি ব্যথা পান্। তার পর এক দিন আপনার বাবার পত্রে জান্‌লাম, আপনি হিমাদ্রিকে ভালবাসেন এবং তাঁর সঙ্গেই আপনার বিবাহে তিনি মত দিয়েছেন। নিজের দুঃখ যত বড়ই হোক, ভাল ক'রে ভেবে দেখলাম, এ বিবাহে আমার সুখী হওয়া উচিত। কারণ, হিমাদ্রির চেয়ে যোগ্য পাত্র মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আপনিও তার সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রী।"

পুষ্পিতা নত-নেত্রে সকল কথা শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার মুখে কোনও ভাবান্তর না দেখিয়া সরোজ বলিল, "এ প্রসঙ্গের আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার ছিল না! আপনার পীড়াপীড়িতে বল্‌তে হ'ল। কিন্তু একটা নিবেদন ক'রে রাখি, আমার সব সহ্য হবে, শুধু আপনার বিরাগের দুর্ভাগ্য যেন আমার না ঘটে। হিমাদ্রি যা ব'লে গেছে, আপনি সব মেনে নেবেন, এমন দুরাশা আমার নেই। শুধু আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না! এইটুকুই আমার প্রার্থনা।"

করুণায় পুষ্পিতার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সরোজের আত্মত্যাগ, অসাধারণ ধৈর্য্য, বন্ধুপ্রীতি, বিশ্বস্ততা তাহার চিত্তকে বিচলিত করিল। সে সরোজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনাকে দুঃখ দেবার অধিকার আমার মোটেই নেই। তাঁর শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমার গেছে; ইচ্ছাও লোপ পেয়েছে। আপনি আমার সকল ভার গ্রহণ করুন।"

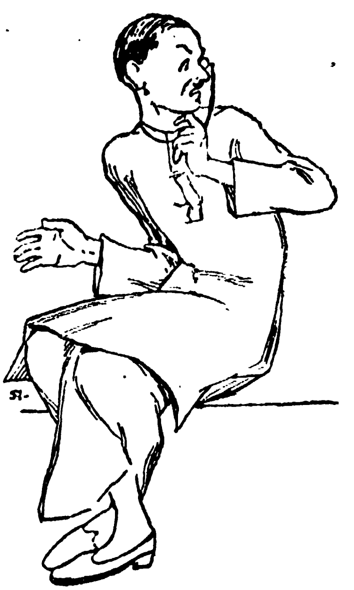
পুষ্পিতার সে কণ্ঠস্বরে সরোজ মুগ্ধ হইল। তাহাতে যেন একটা নির্ভরতার সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

সরোজের নয়নে যে দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহাতে লোভ বা লালসার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। এত দিন পরে, সত্যই কি ভগবান্ তাহার আবেদনে কর্ণপাত করিয়াছেন? তাহার মানস-লক্ষ্মী, তাহার আরাধ্যা দেবী সত্যই কি প্রসন্ন হাস্যে তাহার ললাটে তাঁহার কোমল করাঙ্ক-স্পর্শে তাহাকে ধন্য করিতেছেন?

বিমূঢ় সরোজের হাত ধরিয়া পুষ্পিতা ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য।





মিলন

১

রাণীহাটের মেলাটাকে সাঁওতালদের একটা বড় গোছের উৎসব বলিলেও চলে। প্রতি বৎসর সহরের বহু বাঙ্গালী—পুরুষ ও নারী মেলাক্ষেত্রে রঙ্গ দেখিতে শুভ পদার্পণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের মত এবারও তাঁহারা তামাসা দেখিবেন বলিয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু তামাসার পরিবর্ত্তে অনেকেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আবিষ্টের মতই চাহিয়া রহিলেন।

যে দুইটি তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া সকলের বিস্ময় সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা অভিজাত বংশেরও নহে, নিম্নশ্রেণীরও—নহে তাহারা সাঁওতাল।

অল্পদিন হইল ইহাদের বিবাহ হইয়াছে; বয়সে উভয়ে প্রায় সমান। বোধ করি কুড়ি কি একুশ বৎসরের বেশী বয়সও ইহাদের নহে। রং কালো। কিন্তু দেখিলে মনে হয়, সেই দম্পতিযুগলের দেহ বিধাতা যেন পাথর কাটিয়া তাঁহার নিপুণ হস্তে কুঁদিয়া কুঁদিয়া গড়িয়াছেন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ অবয়ব এবং দেহের ভিতর যিনি আমরণ বাস করেন, তাঁহার বিকাশ যদি মানুষের রূপ হয়, তবে এ রূপের আর তুলনা নাই। এ যেন স্রষ্টার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তরুণী তাহার স্বামীর হাতে হাত, চোখে চোখ রাখিয়া এবং তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছিল। তাহার সমবয়সী এক সখী অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করিল, "তোর এই পুরুষটির মনে তোকে ধরল ?"

রঙ্গীয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া ঘাড় দোলাইয়া কহিল, "বল না রে তোর মনটির কথা।" বলিয়াই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পুরুষটির নাম শঙ্করা। শঙ্করা বাঁশী বাজাইতেছিল, "মনটির কথা" সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিল না বটে, কিন্তু তাহার সেই মুখের বাঁশী অকস্মাৎ অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়া যেন মধু বৃষ্টি করিতে লাগিল। অধরোষ্ঠ তাহার চাপা হাস্যে দুলিতে লাগিল। মুখের বাঁশী তেমনই ভাবে বাজিতে থাকিল। আর তাহারই সঙ্গে তাহার দুই বড় বড় চক্ষু তালে তালে নৃত্য করিয়া, তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, যত কিছু সঞ্চিত স্নেহ ভালবাসা, যেন অঞ্জলি পূরিয়া প্রিয়তমার উদ্দেশে দুই হাত উজাড় করিয়া ঢালিতে লাগিল।

রঙ্গীয়ার তরুণ বুকের ভিতর তখন আনন্দের বান ডাকিয়াছিল। সে আত্মবিস্মৃতভাবে অকস্মাৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু মেলার সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির আঘাত কল্পনা করিয়াই লজ্জায় সে যেন একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

অদূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটি বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা নির্নিমেষ নয়নে এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রঙ্গীয়া আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তাঁহাদের স্বজাতিদের সম্মুখে এ সকল ব্যাপার লজ্জাকর নহে। কিন্তু ঐ কয়টি বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলার মুখের পানে চাহিয়া ব্রীড়াবনত মুখে যে দ্রুতপদেই সরিয়া যাইতেছিল। শঙ্করা খপ করিয়া স্ত্রীর হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ না রে, মনটি আমার কি রকমটি করছে ?" রঙ্গীয়া স্বামীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া কহিল, "যা" !

শঙ্করা চট করিয়া সেই মুখখানি একবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "নেই শুনবি ত কাকে বোলব ?"

রঙ্গীয়া লজ্জায় ও আনন্দে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সে ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে স্বামীকে শাসন করিতে গিয়া আর পারিল না। হাসি চাপিতে চাপিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া একটা দোকানের পাশে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কখন যে সে অন্যমনস্কভাবে দোকান হইতে চিরুণী তুলিয়া বার বার চুলের ভিতর গুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে খেয়াল তাহার ছিল না।

দোকানদার দুই তিনবার মূল্য চাহিয়া বিরক্ত হইয়াছিল। সে রুক্ষস্বরে তাড়া দিয়া উঠিতেই রঙ্গীয়া ফিরিয়া চাহিল, শঙ্করা তখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার পর দোকানদার তাহার মূল্যের জন্য যতই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, ততই স্বামী ও স্ত্রীতে নিরুপায়ের মত পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক আসিয়া ঘিরিয়া ধরিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পয়সা তাহাদের ছিল না। সাধারণতঃ এ সকল ক্ষেত্রে সাঁওতালরা নৃত্য করিয়া গান গাহিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখন হাস্য-পরিহাসের তীব্র আঘাতে, তাহারা যে কি করিবে, কেমন করিয়া সরিয়া যাইবে, ইহার কোন কূল-কিনারাই তাহারা করিতে পারিল না।

রঙ্গীয়ার চক্ষু দুইটি ছল-ছল করিতে লাগিল। পরিহাসের তাড়নায় দুই চারি ফোঁটা অশ্রুও মাটীতে ঝরিয়া পড়িল। শঙ্করার বুকের ভিতর তখন ঝড় বহিতেছিল। এ দৃশ্য সে আর সহ্য করিতে পারিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রঙ্গীয়া চিরুণীখানি ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল। শঙ্করা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল "বাং।"

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ তখন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। দলে দলে সাঁওতাল যুবক "লেবার কোরে" ভর্ত্তি হইয়া ট্রেঞ্চ কাটিতে ফ্রান্সে চালান হইতেছিল। অদূরেই কুলি-চালানের ডিপো। শঙ্করা অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া চিরুণীর মূল্য পরিশোধ করিয়া দিল।

রঙ্গীয়ার সমস্ত মুখ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মড়ার মুখের মত রক্তহীন হইয়া গেল। ত্রাসে ও দুর্ভাবনায় ডিপোর দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে দেখাইয়া সে কাঁদ কাঁদ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ঐ ডিপুটাতে যাবি না ত! ওখানে নামটি ত তোর লিখাস নি?" বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর যেন তাহার অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন করুণ উদাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে, অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাও সমবেদনায় আকুল হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহারই মত উদ্গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

শঙ্করা বিবর্ণ-মুখে অস্ফুটস্বরে কহিল, "হুঁ"।

"এঁ্যা" বলিয়াই স্বামীর মুখের উপর বিহ্বল-দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল তাকাইয়া মাথাটাকে দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রঙ্গীয়া অকস্মাৎ অদূরস্থিত পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে সকল বাবু তামাসা দেখিয়া হাসিতেছিলেন, তাঁহারা নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। জঙ্গলী সাঁওতাল বলিয়া যিনি বিদ্রূপ করিতেছিলেন, তাঁহার মুখের উপর কে যেন একপোঁচ কালি লেপিয়া দিল। এক জন প্রবীণ ব্যক্তি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "দেখলেন মশায় কাণ্ড! এত বড় স্বামিপ্রেম ও শিখল কোথা থেকে?"

অপর ব্যক্তি কহিলেন, "ও-বস্তু কাকেও শেখাতে হয় না। যিনি সব শেখানর মালিক, তিনি নারীর বুকে ঐ সুধা ভ'রে দিয়ে তবে সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। আর মশায় ওরাও ত তাঁরই অংশ, স্রষ্টা ত এক জনই।"

যাহাদের লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, তাহারা ইতিমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। আর কোন সন্ধানই তাহাদের পাওয়া গেল না। শুধু অদূরস্থিত ঘন বনাকীর্ণ পাহাড়ের শিখর হইতে নারী-কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ বন-জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া এখানকার সভ্য ভদ্রমণ্ডলীকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল।

২

ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রচার হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, শঙ্করা শেষ রাত্রিতে পলাইয়া গিয়া কুলি ডিপোতে নাম লিখাইয়াছে।

রঙ্গীয়া পিতৃ-মাতৃহীনা। শুধু একমাত্র বৃদ্ধ মাতামহ ছিল। গাঁয়ের পাঁচ জন আসিয়া শঙ্করাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ রকমের মন্তব্য সহ যাহার যাহা খুসী নিন্দা-মন্দ করিতে লাগিল। স্বামীর এই অপমান রঙ্গীয়া আর বরদাস্ত করিতে পারিল না। অপরাধের সমস্ত বোঝা নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তীব্র প্রতিবাদ সহ সকলকেই সে বুঝাইতে লাগিল যে, তাহার স্বামীর এক বিন্দুও অপরাধ নাই। অভাবের তাড়নায় নিজেই সে একরূপ জোর করিয়া তাহাকে ডিপোয় পাঠাইয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে শঙ্করার প্রেরিত অর্থ তাহার হস্তগত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ সেইগুলি এখন সে সকলকেই দেখাইতে লাগিল।

এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনেকেই রঙ্গীয়ার উপর বিরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাকে তাহারা দুর্ব্বাক্য বলিতে ইতস্ততঃ করিল না। দুই চারি জন ক্রোধভরে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু অন্তর্য্যামীই কেবল জানিয়া রাখিলেন, স্বামীকে সে অর্থের লোভে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, এই অসত্য বাক্য মুখ দিয়া বাহির করিতেই কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাই না এই নিঃসহায়া নারী নিঃশব্দ সহ্য করিতেছিল। নিজের পুঞ্জীভূত আক্ষেপ সে দমন করিয়াই রাখিল, একবিন্দুও বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিল না।

গ্রামের ফাগু মারান্তির সহিত রঙ্গীয়ার বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বে একবার হইয়াছিল। ফাগুর জননী আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "ফাগুকে তুই তোর পুরুষ ক'রে নে রঙ্গি, শঙ্করা আর নেই ফিরবে।"

দাওয়ার খুঁটিটায় পিঠ দিয়া উদাসভাবে রঙ্গীয়া বসিয়া ছিল। সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কিন্তু বিভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার কাহাকেও দেখিবার জন্য যেন চতুর্দ্দিকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বৃদ্ধা পুনশ্চ কহিতে লাগিল,—"ফাগু তোকে আর নেই ছাড়বে, তুই দেখে নিবি।" রঙ্গীয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মন তখন তাহার কোথায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও তাহার ঠিক জানা ছিল না। এই হিতোপদেশের এক বর্ণও তাহার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অদূরস্থিত বেড়ায় গোঁজা বাঁশীটি হাতে তুলিয়া লইল। বাঁশীর স্পর্শে তাহার সমস্ত দেহের একটা বিপুল স্পন্দনবেগ অনুভূত হইল। এ বস্তুটি তাহার স্বামীর অতিশয় প্রিয়। কত দিন—কত মাস—কত অসংখ্য রজনী এই বাঁশী কত ভাবে কত সুরে আর কত ছন্দেই না তাহার দুই কাণে মধু ঢালিয়া দিয়াছে। সেই সুখের স্মৃতি অকস্মাৎ মনে পড়িয়া যাইতেই বাঁশীটিকে সে স্বীয় অধরোষ্ঠে সবলে চাপিয়া ধরিল। সমস্ত দেহ তাহার অবশ হইয়া গেল। তাহার মাথার ভিতর ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল, কিন্তু এই স্পর্শে সুখ তাহার বিভ্রান্ত চিত্তকে যেন মাতাল করিয়া নাচাইতে লাগিল। কোনমতেই আর সে সোজা হইয়া বসিতে পারিল না। সে মাথাটাকে

দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিল।

ফাগুর মা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। জননী গিয়া তাহার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার নন্দনটি আসিয়া বোধ করি রঙ্গীয়ার অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া টানিয়া দিয়াছিল। তরুণী আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ তীব্র তড়িৎস্পর্শে মানুষ যেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, এই নারীও তেমনই করিয়া সোজা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। ফাগু তখন হিঃ-হিঃ করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু রঙ্গীয়ার মুখের পানে তাকাইতেই তাহার হাসি একবারে দাঁতের ফাঁকে মিলাইয়া গেল।

মুখ দিয়া রঙ্গীয়ার স্বর ফুটিল না; কিন্তু তাহার সমস্ত আনন অকস্মাৎ আরক্তিম হইয়া পরক্ষণেই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় কঠোর হইয়া উঠিল।

ফাগু ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল, সে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। অবাধ্য ছাত্র যেমন গুরু মহাশয়ের কাছে প্রহৃত হইয়া বিবর্ণ-মুখে স্বস্থানে ফিরিয়া যায়, এই প্রেমিক ছাত্রটিও ঠিক তেমনই করিয়াই অধোবদনে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পরদিবস সকালবেলা কুলী সকল চালান হইয়া যাইবে এবং ইহার পূর্ব্বে তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবগণ ইচ্ছা করিলেই দেখা করিতে পারিবে, এই আদেশ চৌকীদার প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল।

রঙ্গীয়া এ সংবাদে অধীর হইয়া উঠিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার ছিল না, ঘর-বাড়ীর মায়াও তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। সে উন্মাদিনীর ন্যায় একবারে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গোটা দুই কুকুর এই অবসরে ঘরে ঢুকিয়া তাহার আহার্য্যগুলি উদরসাৎ করিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছিল। রঙ্গীয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সে ডিপোর দিকে ছুটিয়া চলিল।

৩

অপরাহ্নে সাহেবের কুলী-পরিদর্শনের কথা। তাহারা তখনই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠিক এমনই সময় রঙ্গীয়া আসিয়া স্বামীর হাত টানিয়া ধরিয়া কহিল, "নেই যেতে দিব তোকে!"

কুলীরা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কতকগুলি সাঁওতাল-নারী তাহাদের আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; তাহারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ সকল হাস্যবিদ্রূপ রঙ্গীয়াকে আজ স্পর্শও করিতে পারিল না। রঙ্গীয়া দ্রুতপদে বড়বাবুর পায়ের কাছে স্বামীর প্রেরিত টাকাগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া ফেলিয়া দিয়াই দুই হাতে বুকখানি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। স্বামীকে ডাকিয়া কহিল, "নেই পারছি রে, তুই চল ওড়া।"

শঙ্করার বুকের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার দুই বন্ধু এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে খোঁচা দিয়া শঙ্করাকে কহিতে লাগিল, "পুরুষ না হলে লড়াইয়ের কামটি নেই পারবে!" বলিয়াই রঙ্গীয়াকে দেখাইয়া কহিল, "তুই ঘর যা ওর সঙ্গে, শঙ্করা।" নির্ভীক সাঁওতাল জাতির রক্তস্রোত শঙ্করার ধমনীতেও বর্ত্তমান। সেই শোণিত-প্রবাহ অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া শঙ্করার মাথায় চড়িয়া বসিল। লড়াইয়ের ভয়ে সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে?

শঙ্করা গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "বাং, নেই যাব ঘর।"

রঙ্গীয়ার মাথার ভিতর চড়াং করিয়া উঠিল। একে সে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সমস্ত দিন জলবিন্দুও তাহার পেটে পড়ে নাই। তার পর স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান। তাহার সমস্ত দেহমনে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল। সে স্বামীর কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল, "নেই যাবি ঘর? নেই রাখবি আমার কথাটি?" বলিতে বলিতে ভিতরের পুঞ্জীভূত জ্বালা আপনারই তেজে তাহার দুই অধরোষ্ঠ ফাঁক করিয়া বাহির হইয়া আসিল—"দে আমাকে তুই ছেড়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে কুলীরা প্রবল হাস্যে স্থানটাকে কাঁপাইয়া তুলিল। পাঁচ সাত জন শঙ্করাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতে সুরু করিল।

বাবুরা রঙ্গ দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। ছোট বাবু রঙ্গীয়াকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই মেঝিয়ান! নিয়ে যা তোর পুরুষটাকে ধ'রে।" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে অপর বাবুটির গায়ের উপর গিয়া গড়াইয়া পড়িলেন।

অত বড় অপমানের কথা শঙ্করা জীবনে কখনও শুনে নাই। তার পর এই হাস্য-বিদ্রূপে সে ক্ষিপ্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল, "দিলাম তোকে ছেড়ে।" ইহার পর রঙ্গীয়ার আর হিতাহিতজ্ঞান রহিল না। আম্রপল্লব সম্মুখে ছিন্ন করিয়া দিলেই ইহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই এ জাতীয় সামাজিক প্রথা। রঙ্গীয়া বিদ্যুদ্‌বেগে অদূরস্থিত বৃক্ষ হইতে একটা পাতা আনিয়া শঙ্করার হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিল, "দে আমাকে ছেড়ে। দে তুই ছিঁড়ে এই পাতাটি।" শঙ্করার মাথার ভিতর তখন বিষের জ্বালা আরম্ভ হইয়াছিল। সে দুই হাতে পাতাটি ছিঁড়িতে না ছিঁড়িতেই রঙ্গীয়া দুম্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। মানুষকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার পর, খাড়া করিয়া রাখিলে যে অবস্থা হয়, এই নারীও ঠিক তেমনই ভাবেই এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। এখন সে স্বামীর দুই পায়ের তলায় পড়িয়া বলিদানের পর শিরোহীন পশু-দেহটার মত হাত-পা ছুড়িয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল।

যে যেখানে ছিল—চৌকীদার, কনষ্টেবল, সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া রঙ্গীয়াকে বাহির করিয়া দিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। এমন সময় সাহেব তাহার অফিস-ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া ভীষণ-কণ্ঠে কহিলেন, "উস্কো রোনে দেও, নেহি তো ও মর যায়েগা"। শঙ্করা ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়াছিল। সেই ভাবেই ঠিক নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চক্ষু অশ্রুর উৎসে প্লাবিত হইয়া হু হু করিয়া ধারা নামিতে লাগিল।

৪

কুলীদের আজ বিদায় হইবার কথা। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই তাহাদের আত্মীয়-বান্ধব এবং পরিজনবর্গ সমস্ত ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সেই সরল,

উদার মুখমণ্ডল আজ মলিন বিষাদাচ্ছন্ন। দুঃখের গুরুভারে এই বিপুল জনতা আজ নীরব, নিস্তব্ধ, ম্রিয়মাণ। বোধ করি, প্রাণটা তাহাদের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়া সেই বিদায়-মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

তাহাদের বুকে চাপা হাহাকার। আনত চক্ষু দুইটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত। যেন পরস্পরের মুখের পানে চাহিতেও পুঞ্জীভূত বেদনার ভারে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শুধু মাঝে মাঝে তাহাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভিন্ন এতগুলি প্রাণের আর কোনই সাড়া ছিল না। অনতিবিলম্বে কুলীরা দলে দলে আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি মানুষ যে আর্ত্তনাদ সুরু করিয়া দিল, তাহা একবারে অসহ্য। অতি বড় নির্ম্মমও বোধ করি, এ দৃশ্যে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া পারে না।

শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী,—যে যেখানে ছিল, অকস্মাৎ এক-সঙ্গে যেন আছড়াইয়া মরিতে লাগিল। জননী গিয়া পুত্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃদ্ধ পিতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বুক চাপড়াইতে থাকিল। স্ত্রী তাহার বাহুপাশ হইতে কোন-মতেই স্বামীকে মুক্তি দিতে চাহে না। পুত্র-কন্যা আসিয়া পিতাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল। মুহূর্ত্তে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসহনীয় আর্ত্তনাদে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই ভিতর দিয়া শঙ্করা ধীরে মন্থরগমনে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে যেন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ—এ সকলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সামান্য একটা রাত্রির ব্যবধান, কিন্তু এইটুকুর ভিতর কি পরিবর্ত্তনই না তাহার দেহ ও মনে দেখা দিয়াছে! যেন প্রাণের প্রিয়তম পাত্রটিকে দাহ করিয়া সমস্ত রাত্রি চিতাপার্শ্বে জাগিয়া এইমাত্র সে ফিরিয়া আসিতেছে। সম্মুখের এত বড় করুণ দৃশ্যও যেন শঙ্করার চোখে পড়িল না। এই আকুল আর্ত্তনাদও তাহার কাণে গেল না।

তাহার নিজের দুঃখ-বেদনা এই সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছিল। গাড়ীর জানালার পার্শ্বে বসিয়া দূর শূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত সে স্তব্ধের মত বসিয়া রহিল।

ঠিক এমনই সময় রঙ্গীয়ার অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ দাদা-মহাশয় বুঢ়ন সর্দ্দার ক্ষিপ্তের মত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমার রঙ্গী! রঙ্গীকে কোথায় ছেড়ে গেলি, শঙ্করা?"

অতর্কিতে গুলীর আঘাতে আহত জীব যেমন করিয়া পাক খাইয়াই পরক্ষণেই কম্পিত-দেহে লুটাইয়া পড়ে, শঙ্করাও ঠিক তেমনই ভাবে ছিটকাইয়া উঠিয়াই অবসন্ন দেহে ঢলিয়া পড়িল। বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া সে জবাব করিতে গেল, পারিল না। কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাঁদিতে গেল—অশ্রু নাই, প্রবল ধিক্কারে ও আত্মগ্লানিতে চোখ-মুখ দিয়া তাহার তখন আগুন ছুটিতেছিল, অথচ এক ফোঁটা চোখের জল বাহির করিবার জন্য এই হতভাগ্যের মুখ-চোখ—এমন কি, সমস্ত দেহ-মন আকুল হইয়া কি আর্ত্তনাদই না সুরু করিয়া দিল!

অকস্মাৎ এক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ শঙ্করার রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া তীব্র জ্বালার মত বাহির হইয়া আসিল। পর-মুহূর্ত্তে সেখানকার আকাশ-বাতাস চিরিয়া চিরিয়া খান খান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজিল। পাখা পড়িল, গার্ডের হাতের নীল নিশান দুলিতে থাকিল। কুলীরা আসিয়া গাড়ীতে স্থান অধিকার করিয়া বসিল। বিপুলভার, বিরাট লৌহযান বার কয়েক গর্জ্জন করিয়া বৃহৎ অজগরের ন্যায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ধীরে মন্থর-গমনে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রঙ্গীয়া ঝড়ের মত আসিয়া ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। ট্রেণ তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই চলন্ত ট্রেণের উপরেই সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকজন 'গেল গেল' রবে আর্ত্তনাদ তুলিয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিল।

শঙ্করা গাড়ীর শেষের দিক্‌টায় বসিয়াছিল। সে অংশটি তখন ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এবার রঙ্গীয়া একবারে মোরিয়া হইয়া উঠিল। আট দশ জন লোক হিম-সিম হইয়া গেল। রঙ্গীয়ার দেহটা তখন ক্ষত-বিক্ষত। কপালটা ফাটিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ত্রস্ত-বিপর্য্যস্ত কেশপাশ কপালে, মুখে, পিঠে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গের বসন ছিন্ন ভিন্ন, ধূলা-কাদায় মাখা। কপালের সেই ক্ষতটা দিয়া তেমনই ভাবে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। রঙ্গীয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া এক ঝাপটা মারিতেই লোকগুলি ছিটকাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শঙ্করাও উন্মত্তের মত জানালা গলিয়া লাফাইয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে সকলে ধরিয়া ফেলিল। অর্দ্ধদেহ তাহার ঝুলিয়া রহিল। গাড়ীর দেয়ালে মাথা কপাল আছড়াইতে থাকিল। আর ইহারই ফাঁকে বাহির হইবার জন্য সে দুই হাত উঁচু করিয়া প্রবল চেষ্টা সুরু করিয়া দিল। ভূপতিত দেহটাকে পা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলে যে অবস্থা হয়, গাড়ীখানাও ঠিক তেমনই করিয়াই এই হতভাগ্যকে লইয়া উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিল।—এ দিকে গাড়ীর গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া যতই ট্রেণখানি দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, ততই ভিতরের উত্তেজনা নিভিয়া আসিয়া রঙ্গীয়ার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিল।—পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তরালে পড়িয়া গাড়ীখানি আর দেখা গেল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ রঙ্গীয়ার সমস্ত দেহটা প্রবলবেগে বার দুই ঝাঁকানি দিয়াই ঘাড়টা ভাঙ্গিয়া মাথাটা আসিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল।—

ডিপোর ডাক্তার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ওঃ'—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"শেষ"! সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বুঢ়ন ডাক্তারের মুখের কাছে মুখ লইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "নেই বাবু! রঙ্গী তার পুরুষটির কাছে চ'লে গেল!"

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। রুমাল দিয়া মুখ আবৃত করিলেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

সে কালের স্মৃতি

সে কালের স্মৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, যদিও তাহা ৩৩।৩৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা এবং সেই সময় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পরিণতবয়স্ক যুবক, তাঁহাদের অনেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে এখন যশস্বী, প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বহুজনসম্মানিত; তথাপি সেই সময়কে সে-কাল বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সে সময় আমরা ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক যুবক; কিন্তু আমাদের বাল্যকালকেই প্রকৃতপক্ষে সে-কাল বলা উচিত। এই জন্য অর্দ্ধ-শতাব্দী বা তাহারও কিছুকাল পূর্ব্বে সুখশান্তিপূর্ণ, ছায়াশীতল, শ্যামল পল্লীবক্ষে আমাদের শৈশব-জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, এই দীর্ঘকাল পরে তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সেই প্রাচীন পল্লীর আবেষ্টন ও প্রভাবের ভিতর কি ভাবে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, তাহার আলোচনা উপলক্ষে অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য; লেখকের পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা মনে হইলে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ দয়া করিয়া সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। দেশের স্বনামধন্য বিখ্যাত লেখকগণ স্ব স্ব জীবন-স্মৃতিতে যে সকল আত্ম-কথার আলোচনা করেন, নানা কারণে তাহা উপভোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু অখ্যাত ক্ষুদ্র লেখকের আত্ম-কথার আলোচনা পাঠক-পাঠিকাগণের অপ্রীতিকর, এমন কি, বিরক্তি-জনক হইবারই আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে-কালের পল্লীর পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে নানা কারণে তাহার পরিবর্জ্জন অসাধ্য হইয়া উঠে।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে যে পল্লী দেখিয়াছিলাম, যে পল্লীতে শান্তিপূর্ণ নিরুদ্বেগ শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত করিয়াছিলাম, গত পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে সেই পল্লীর কি ঘোর পরিবর্ত্তন! ইহা যে আমাদের সেই সুখময় শৈশবের পল্লী, এখন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; পল্লীগ্রামে সে-কালের নর-নারীর সহিত এ-কালের নর-নারীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, রুচিপ্রবৃত্তির কি আকাশপাতাল প্রভেদ! অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে বঙ্গপল্লীর কি বিস্ময়াবহ বিশাল পরিবর্ত্তন! আমাদের শৈশবের সেই পল্লীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়াছে! সহরের ছায়ায় সকলই আচ্ছাদিত।

আমাদের বাসপল্লী মেহেরপুর নদীয়া জেলার উত্তর-প্রান্তস্থিত মহকুমা। ইহার উত্তরসীমা পদ্মা নদীর দক্ষিণ-তটভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত। সঙ্কীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী জলঙ্গী বা খ'ড়ে নদী মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে নদীয়াকে পৃথক্ করিয়াছে। পদ্মার সহিত জলঙ্গী নদীর সংযোগস্থলে, মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্বসীমাপ্রান্তে জলঙ্গী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি বহু প্রাচীন। এই গ্রামের নাম হইতে জলঙ্গী নদীর নামকরণ হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু জলঙ্গী নদী যেখানে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, বহুদিন পূর্ব্বে সেই স্থানটি পলি পড়িয়া এরূপ ভরাট হইয়াছিল যে, সেখানে নদীর মোহনার চিহ্ন-মাত্র ছিল না। কৃষকরা সেই পলিমাটীর উপর লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া ধান্য রোপণ করিত। নদীর উভয় দিকের উচ্চ পাড় দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইত, এক সময় সেখানে নদী ছিল। কিন্তু কয়েক মাইল দূরে এখনও জলঙ্গী নদীর ক্ষীণ জলধারা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে তাহাতে পদ্মার জল প্রবেশ করে। এই জলঙ্গী বা খ'ড়ে নদীর অবশিষ্টাংশে বর্ষা ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময়েও জল থাকে; সেই জলধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুসংখ্যক গ্রাম, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্রের প্রান্ত দিয়া নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীর জলস্রোতের সহিত মিশিয়াছে। কৃষ্ণনগরের অদূরে, মুর্শিদাবাদ রেল-লাইনের একটি সেতু এই নদীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্ধনে জলঙ্গী নদীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। রেল-পথের উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় বাঙ্গালার অধিকাংশ নদীর স্রোতের বেগ ও বিস্তার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে দিন কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী যাইতে হইয়াছিল; বহু দিন পরে পদ্মার লৌহ-শৃঙ্খল 'হার্ডিং ব্রীজ' বা 'সাঁড়ার পুল' দেখিলাম। উহার দক্ষিণতীরে নদীয়ার ভেড়ামারা ষ্টেশন, উত্তরতীরে পাবনা জেলার পাক্সী ষ্টেশন। উভয় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী 'ব্রীজ' পার হইতে তিন মিনিট সময় লাগিল। কিন্তু পুলের

নীচে বিশালকায়া পদ্মার অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হইল। বহুদূর-প্রসারিত চর স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ জলরেখা বুকে লইয়া কঙ্কালসার মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া আছে! নদীচরে অগণ্য বাবলাগাছ। এই সাঁকো-নির্ম্মাণের সময় শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য যে নগর বসিয়াছিল, এখন তাহা বাবলার একটি বিস্তীর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে; দূরে দূরে ক্বচিৎ দুই একখানি পর্ণ-কুটীর। সুবিস্তীর্ণ পুলের উপর গাড়ী উঠিলে পুলের অতিকায় স্তম্ভ-গুলির নিম্নস্থিত বহুদূর-বিস্তৃত চরের দিকে চাহিয়া সে-কালের কথা মনে পড়িল। প্রথম-যৌবনে বরোদায় যাইবার বহু পূর্ব্বে রাজসাহীতেই আমার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। সেই সময় মেহেরপুর হইতে দুইটি বিভিন্ন পথে রাজসাহী যাইবার উপায় ছিল। একটি পথ—গরুর গাড়ীর সোজা পথ। মেহেরপুরে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদ্মাতীরবর্ত্তী আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে উপস্থিত হইতাম, এবং বেলা ১২টা বা ১টার সময় আই, জি, এস্, এন কোম্পানীর ষ্টীমারে চাপিয়া অপরাহ্ণ ৪টা বা ৫টার সময় রাজসাহীর ষ্টীমার-ষ্টেশন 'আখড়ার ঘাটে' পৌঁছিতাম। কখন কখন মেহেরপুর হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিয়া দামুকদিয়া ঘাটে নামিতাম, সেখানে প্রভাতে ৮টার সময় আই, জি, এস, এন কোম্পানীর ষ্টীমার ধরিতাম। একবার ষ্টীমার-ষ্টেশনে ষ্টীমার পাইলাম না। শুনিলাম, পদ্মার চরে ষ্টীমার দুই দিন হইতে 'ইন্‌টার্ণড'! অগত্যা দামুকদিয়া ঘাটে রেলের ষ্টীমার 'আলিগেটর' কি 'ক্রোকোডাইল' ঠিক স্মরণ নাই, অবলম্বন করিয়া সাড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর নাটোর, এবং নাটোর হইতে গো-শকটে চৌদ্দক্রোশ দূরবর্ত্তী রাজসাহীতে প্রত্যাগমন!—সেই সময় পদ্মার যে বিস্তার, তরঙ্গরাশির যে উদ্দাম নৃত্য, যে লীলাভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, এখন পদ্মার অবস্থা দেখিয়া তাহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইল! কিন্তু তথাপি পদ্মাকে বিশ্বাস নাই; কে জানে, মানুষ তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে কি না? অনেকের ধারণা, পুলের নীচে যে চর পড়িতেছে, তাহা ক্রমশঃ ভরাট হইবে, নদী বাঁকিয়া অন্য দিকে চলিয়া যাইবে; জল-স্রোত অন্য খাদে বহিবে, এবং পুল যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই অকর্ম্মণ্যভাবে দাঁড়াইয়া দূর হইতে নবপথগামিনী পদ্মার অঙ্গভঙ্গ নিরীক্ষণ করিবে! তখন হয় ত পদ্মার উপর আর একটি পুল নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হইবে, এবং সে জন্য গৌরীসেনের অক্ষয় ভাণ্ডারে টাকার অভাব হইবে না!

কথাটা মিথ্যা বা কল্পনার বিকার বলিয়া মনে হয় না, কারণ, পদ্মার গতি এইরূপই বিচিত্র! মনে পড়ে, শৈশব-কালে জলঙ্গী গ্রামে মামার বাড়ী যাইতাম। মামার বাড়ীর অট্টালিকার ছাদ হইতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বহুদূরে মুক্ত প্রান্তর এবং তাহার প্রান্তভাগে মসীলেখাবৎ একটা কালো দাগ দেখিতে পাইতাম; শুনিতাম, উহাই পদ্মা। এখন পদ্মা সেখানে নাই; কয়েক বৎসরে তিন চারি ক্রোশ সরিয়া আসিয়া জলঙ্গী গ্রামখানি গ্রাস করিয়াছে। জলঙ্গীর অট্টালিকাশ্রেণী, সুবিস্তীর্ণ আম-কাঁঠালের বাগান, পুষ্করিণী, থানা, বাজার, জেলা-বোর্ডের সুপ্রশস্ত পথ এবং পথপ্রান্তবর্ত্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট-পাকুড়ের গাছ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন আবার সেখানে চর পড়িতেছে। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন! আরও চল্লিশ বৎসর পরে হার্ডিং সেতুর কি অবস্থা হইবে—কে বলিতে পারে?

যে পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালার শেষ গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল, সেই পলাশী আমাদের মেহেরপুর মহকুমার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পলাশীর প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত এই মহকুমার সীমা প্রসারিত। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে মুর্শিদাবাদের সীমা; কিন্তু সিরাজের সহিত ক্লাইভের যুদ্ধের সময় পলাশীক্ষেত্রে যে আম্রকানন ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শুনিয়াছি, পলাশীক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি অনুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ আকাশের দিকে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত করিয়া মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও সিরাজের শোচনীয় পরাজয়ের বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই যুদ্ধের আর কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পলাশীর মাঠে "কি হ'লো রে জান! পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ"—এই করুণ গান গাহিয়া গ্রাম্য কৃষকরা হলকর্ষণ করিতে করিতে মাটীর নীচে কামানের দুই একটি গোলা পাইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। এখন ভাগীরথীর উভ



বসুমতী চিত্র বিভাগ]　　যৌবনের স্মৃতি　　[শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

তীরে রেলের লাইন ; পূর্ব্বতীরে পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথের বহরমপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি ষ্টেশন ; পশ্চিমতীরে ই, আর রেলপথের খাগড়াঘাট ষ্টেশন। এখন বেলা ৯টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া বহরমপুরে ট্রেণে চাপিলে বেলা ৪টার পূর্ব্বে কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া যায় ; কিন্তু সেকালে বহরমপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে অনেককে উইল করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইত! আমাদের মেহেরপুর হইতে গরুর গাড়ীতে দুই দিনে খাগড়ায় আসিতে হইত। সেকালে ও একালে কত প্রভেদ! কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

আমাদের গ্রামে সেকালে দুই ঘর বড় জমীদার ছিলেন। এক ঘর ব্রাহ্মণ, তাঁহারা "মুখোয্যে বাবু" নামে পরিচিত ; আর এক ঘর—মল্লিকবাবুরা বৈদ্য। এখনও এই দুই ঘর বর্ত্তমান ; কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ প্রাচীন জমীদার-বংশের যে অবস্থা, এখন তাঁহাদেরও সেই অবস্থা। বহু শরিকে বিভক্ত হওয়ায় উভয় বংশই দুর্ব্বল ও হৃত-গৌরব। তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাও ম্লান হইয়াছে।

আমাদের বাল্যকালে এই মুখোপাধ্যায়-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম। তিনি সরলপ্রকৃতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দোতলা বৈঠকখানার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে প্রায় দেড় বিঘা জমীর উপর আমাদের বসতবাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাড়ীতে মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট চারিখানি ঘর ছিল ; তাহাদের চাল ছিল উলু-খড়ের। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে আমার পিতামহ উলুখড় কিনিয়া ঘরের চালগুলি নূতন করিয়া ছাইয়া লইতেন। পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে জমীদারী সেরেস্তায় চাকরী করিতেন ; আমার দুই কাকা তাঁহার নিকট থাকিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে লেখা-পড়া করিতেন ; ছোটকাকা হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পড়িতেন। আমার পিতামহ বাড়ীতেই থাকিতেন এবং সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বাল্যকালে মুখোয্যে জমীদার বাবুর দোতলার বৈঠকখানায় গীতবাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইতাম। জমীদারবাবু পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া সঙ্গীতালোচনা করিতেন। তাঁহার দোতলা হইতে আমাদের অন্দরমহল দৃষ্টিগোচর হইত, এ জন্য আমার পিতামহ আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকে, জমীদার বাবুর দোতলার দক্ষিণদিকের দ্বার, জানালার সমান উচ্চ করিয়া দরমার বেড়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীননাথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত আমাদের পরিবারের সদ্ভাবের কখন অভাব হয় নাই ; তাঁহাদের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, সেই সময় আমার স্বর্গীয় পিতামহ এই বংশের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এ জন্য তিনি এই পরিবারকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিতেন, এবং তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও আমরা শূদ্র হইলেও আমাদের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতেন। অধিক কি, এই পরিবারে যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদিগকে 'কাকা' বলিয়া ডাকিতাম, এবং নিজের কাকার মত সম্মান ও ভক্তি করিতাম। এ কালের ছেলেরা পিতার সহোদরকেও সেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা বা ভয় করে না। তখন হিঁদুয়ানীর সদাচারনিষ্ঠা এ কাল অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল ; তথাপি স্মরণ হয়, জমীদারবাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের রান্নাঘরে একসঙ্গে বসিয়া ভাত খাইয়াছি। অবশ্য এ কাল হইলে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিত না ; কারণ, এ কালে হিন্দুধর্ম্মের প্রহরিস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের প্রবীণ সম্পাদকবাবু সত্তরের কোঠায় আসিয়াও তাঁহার রচিত ভ্রমণকাহিনীতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি খড়্গপুর ষ্টেশনে রেঁস্তোরা গাড়ীর পরম মুখরোচক অন্ন-ব্যঞ্জন তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন! যে সময় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবলবেগে সংগ্রাম চলিতেছে,—সে সময় এ কথা স্বীকার করিলে যথেষ্ট 'মরাল করেজ্' প্রদর্শিত হয় বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সময় কোন স্পষ্টবাদী গোঁড়া হিন্দু এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে আত্ম-সমর্থনের উপায় থাকে কি ?

আমার বাল্যকালে স্বর্গীয় দীননাথ বাবু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সে কালের বাবুগিরির আদর্শ কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি সোনার গড়গড়ায় দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত মূল্যবান্ তাম্রকূটের ধূম পান করিতেন, এবং গড়গড়ার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া কর্ণ-পীড়া উৎপাদন করে,

এই আশঙ্কায় গড়গড়াটি একতলায় রাখিয়া, তাহার সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে দোতলায় বসিয়া ধূমপান করিতেন! তাঁহার শয়ন-কক্ষের অদূরে তাঁহাদের খিড়কীর সীমায় দুই একটি তালগাছ ছিল। একটি তালগাছের নীচে একখানি পর্ণ-কুটীরে একটি চণ্ডালিনী বাস করিত; তাহার নাম ইচ্ছা। আমাদের বাল্যকালে ইচ্ছা বৃদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটিও চুল পাকে নাই বা দাঁত পড়ে নাই। ইচ্ছার মত ঝগড়াটে স্ত্রীলোক দেখা দূরের কথা, নাট্যকারের কল্পনা করাও কঠিন! ঝগড়া করিবার লোক না পাইলে সে বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করিত! তালপাতা বায়ু-প্রবাহে কম্পিত হইত, সন্-সন্ শব্দ করিত, সেই সঙ্গে ইচ্ছার মাথা গরম হইত; সে তালগাছ ও বাতাসকে গালি দিত! সুতরাং বলা বাহুল্য, পাড়ার স্ত্রীলোকদের সহিত সামান্য কারণে বা অকারণে তাহার ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার কর্কশ কণ্ঠের বিরাম ছিল না। দীননাথ বাবু তাহাকে বহুবার ঝগড়া করিতে নিষেধ করিয়াও তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারেন নাই; তাঁহার যেরূপ প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে ইচ্ছাকে তাহার কুটীর হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন, তাঁহার অমোঘ আদেশে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র কুটীরখানি বিধ্বস্ত হইতে পারিত; কিন্তু তিনি এই ভাবে তাহার ক্ষতি না করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য এক বিশেষ-শক্তি 'অর্ডিনান্স' জারি করিলেন; তাহা সম্পূর্ণ 'অরিজিনাল,' এবং তাহার ফল এরূপ অব্যর্থ যে, পুলিসের দারোগা বাবুদেরও তাহা অনুকরণের অযোগ্য নহে। তাঁহার আদেশে তাঁহার পাইক ইচ্ছার স্বজাতি লোহারাম সর্দ্দার একটা প্রকাণ্ড আড়াইমণী বস্তা আনিয়া, ইচ্ছার হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে তাহার ভিতর নিক্ষেপ করিল; তাহার পর একটা প্রকাণ্ড মর্দ্দা বিড়াল ধরিয়া আনিয়া, সেটাকে সেই বস্তায় পুরিয়া বস্তার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। বিড়ালটা পলায়নের পথ না পাইয়া ইচ্ছাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। ইচ্ছা গলা ছাড়িয়া যতই চীৎকার করে, লোহারাম ততই বলে, "চ্যাচা মাগী, আরও জোরে! বিড়াল যতক্ষণ তোর টুঁটি ছিঁড়ে মুখ বন্ধ না করায়, ততক্ষণ বস্তার মুখ আল্‌গা করছি নে।"—অবশেষে সে বস্তার ভিতর অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আর সে কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিবে না; বাবু আর কোন দিন তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইবেন না।—তখন লোহারাম বস্তার মুখ আল্‌গা করিল। সেই দিন হইতে ইচ্ছা চাঁড়ালনীর কলহ-প্রবৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাহার গালে, কপালে ও দেহের বিভিন্ন অংশে বিড়ালের সুতীক্ষ্ণ দন্ত-নখরের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। কেহ কেহ ইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইচ্ছে, আর যে তোর গলার আওয়াজ শুন্‌তে পাইনে?"—ইচ্ছা বলিয়াছিল, "দীনু বাবু বলেছে—এবার আর বিড়াল নয়, বস্তার মধ্যে আমাকে পূরে কুকুর ছেড়ে দেবে।"

বিড়াল ইচ্ছার পরিধেয় বস্ত্রখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দেওয়াতে বাবু তাহাকে একখানি নূতন কাপড় বক্‌শিস্ দিয়াছিলেন; ইহাতেই তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল; কিন্তু সে আর কোন দিন নূতন বস্ত্রের লোভ করে নাই।

এই মুখোয্যে-বংশের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময় মেহেরপুর অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের প্রবল প্রতাপ। বাবু মথুরানাথকে বা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রমোহন বাবুকে দেখি নাই। মথুরানাথ এই জমীদার-বংশকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন যে, সেই সময় কোন কবির দলের ওস্তাদ উৎসবের আসরে গান করিতে আসিয়া পূজার ঘটা দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"সত্যযুগে সুরথ রাজা
করেছিলেন দেবীর পূজা,
ত্রেতাযুগে রাম।
কলিযুগে মথুরানাথে
সদয় হলেন ভবানী,—
হায় কি পূজোর ঘটা—
মেহেরপুরে মহিষমর্দ্দিনী।"

এই ছড়াটি কিছু দিন পূর্ব্বেও মেহেরপুরের প্রাচীন অধিবাসীদের মুখে শুনিয়াছি। এখন তাঁহারা সকলেই পরলোকগত।

মেহেরপুর কাশিমবাজারের জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, মথুর বাবু কাশিমবাজারের স্বর্গীয় রাজা

কৃষ্ণনাথের নিকট হইতে মেহেরপুরের জমীদারী পত্তনী লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিশ্চিন্তপুর কান্সার্নের নীলকর ম্যানেজার সাহেব অনেক কৌশলে রাজা কৃষ্ণনাথকে বশীভূত করিয়া যৎসামান্য অর্থব্যয়ে এই জমীদারী ইজারা লইয়াছিলেন। মথুর বাবু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু সাহেবী চাতুর্য্য ও কৌশলের নিকট তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ পরাজয় বহুবারই ঘটিয়াছে।

মথুরানাথ মেহেরপুরের জমীদারী হস্তগত করিতে না পারিলেও তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, এই অঞ্চলের নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সমান তেজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার মথুরানাথের পুত্র চন্দ্রমোহন বাবু কৃষ্ণনগরের সদর হইতে পাল্কীযোগে মেহেরপুর আসিতেছিলেন, সেই সময় কোন নীলকুঠীর ম্যানেজার লাঠীয়াল পাঠাইয়া তাঁহার পাল্কী আটক করিয়া অপমান করিয়াছিল। এই সংবাদ শুনিয়া মথুরানাথ এক রাত্রিতে সহস্রাধিক লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সকল নীলকুঠী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কুঠীয়ালদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। পথের ধারে মথুরানাথের অট্টালিকার দেউড়ি ছিল ; শুনিয়াছি, এই অঞ্চলের নীলকর সাহেবরা সেই দেউড়ির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় ঘোড়া হইতে নামিয়া দেউড়ি পার হইতেন। একালে ইহা উপকথার ন্যায় অবিশ্বাস্য !

কিন্তু চন্দ্রমোহন অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন ; একে ব্রাহ্মণ, তাহার উপর জমীদার, গ্রামের কোন সাধারণ লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন না করিলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্বে যখন মেহেরপুরে জমীদার চন্দ্রমোহনের পরাক্রম দুর্দ্দমনীয়, সেই সময় মেহেরপুরে বলরাম চন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের নাম 'বলরামী সম্প্রদায়।' স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে এই বলরামী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম মেহেরপুরের মালো-পাড়ায় অস্পৃশ্য হাড়ীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু হাড়ীর ঘরে জন্মিয়াও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি যৌবনকালে মল্লিক জমীদারদের গৃহ-বিগ্রহ আনন্দবিহারীর দেবায়তনের রক্ষী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই চাকরী পাইয়া বলরাম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বিগ্রহের বাসগৃহে প্রবেশ করিতে না পাইলেও দূরে থাকিয়া ভক্তিভরে আনন্দবিহারীর পূজার্চ্চনা করিতেন। আনন্দবিহারীর সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, মস্তকে শিখিপুচ্ছ-শোভিত রত্ন-মুকুট ও চরণ-যুগলে সোনার নূপুর ছিল ; বলরামের প্রতি এই সকল অলঙ্কার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

বলরাম চন্দ্র এই কার্য্যের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। কারণ, সে সময় আমাদের নদীয়া জেলার জমীদারবর্গের বরকন্দাজ, পাইক বা সিপাই-শাস্ত্রীদলের মধ্যে বলরামের মত সুদক্ষ তীরন্দাজ আর এক জনও ছিল না। সেকালের প্রাচীন গ্রামবাসীরা বলিতেন, সেই সময় নদীয়া বহরমপুরে সুপ্রসিদ্ধ দস্যুদল-নায়ক বিশে গোয়ালার অত্যাচারের সীমা ছিল না। এ কালের মত সে কালের পুলিসের শক্তি ও শৃঙ্খলার তেমন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাহার উপর পুলিসের দারোগা, জমাদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ তেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল না এবং যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের অনেকের লক্ষ্য ছিল। 'চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হ'তে'—এই সর্ব্বজন-বিদিত উক্তি তাহাদের অনেকেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এ জন্য বিশে গোয়ালা 'বিশ্বনাথ বাবু' এই নাম গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সদলে দস্যুবৃত্তি করিত। সে বড় বড় জমীদারদের পত্র লিখিয়া তাহাদের বাড়ী ডাকাতী করিতে যাইত। সে পাল্কীতে যাইত, তাহার অনুচররা সশস্ত্র তাহার অনুসরণ করিত। পরাক্রান্ত জমীদাররা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে কাঁপিতেন। সে যেখানে ডাকাতী করিতে যাইত, সেই স্থান হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিত না ; কোন জমীদারের লাঠীয়াল বা পাইক-বরকন্দাজরা তাহার গতিরোধ করিতে পারিত না।

মল্লিক বাবুরা এক দিন বিশ্বনাথ বাবুর নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন। সে লিখিল, কোজাগর-পূর্ণিমার রাত্রিতে সে

তাঁহাদের গৃহে সদলে উপস্থিত হইবে, যদি ইহাতে তাঁহাদের অনিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অমুক মাঠে রাত্রি এক প্রহরের সময় কোন পাইক মারফৎ তাহাকে দুই হাজার টাকা সেলামী পাঠাইতে হইবে ; সেই টাকা পাইলে সে সদলে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গল নাই।

মল্লিক বাবুদের বাড়ীর কর্ত্তা বিশ্বনাথ বাবুর এই পত্র পাইয়া প্রমাদ গণিলেন, বিনা-মেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি প্রাণভয়ে ও মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পরে নগদ দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবারও সুবিধা হইল না।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর বলরামের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। তিনি বিশ্বনাথ বাবুকে ও তাহার অনুচরগণকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফিরাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলরামের প্রভুভক্তিতে মুগ্ধ হইলেও, এই কার্য্য তাঁহার অসাধ্য মনে করিয়া তিনি বলরামের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু বলরাম তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না ; জমীদার বাবুকে অবশেষে অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিতে হইল। বলরাম ধনুঃশর মাত্র সম্বল করিয়া 'রণ পা'য়ের' (এক জোড়া সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, তাহার গ্রন্থিতে পা রাখিয়া দস্যুরা দ্রুতবেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত) সাহায্যে মেহেরপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বনাথ বাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কোজাগর-পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বেই সেই প্রান্তরের সীমাপ্রান্তে বিশ্বনাথ বাবুর পাল্কীর বেহারাদের কণ্ঠোচ্চারিত 'হুম্-হুম্-হুক্কা,-হুম্-হুম্-হুক্কা' ধ্বনি বলরামের কর্ণগোচর হইল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুচরবর্গের ভীষণ হুঙ্কার!—বলরাম চক্ষুর নিমেষে বিশ্বনাথ বাবুর পাল্কীর বেহারাদের গতিরোধ করিলেন। বিশ্বনাথ ডাকাত বিস্মিতভাবে পাল্কী হইতে নামিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিল। বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—তিনি মল্লিক বাবুদের দ্বারবান।

বিশ্বনাথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "তোদের জমীদার বাবুকে যে দু' হাজার টাকা সেলামী পাঠাতে লিখেছিলাম—তা এনেছিস্?"

বলরাম মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এক পয়সাও আনি নি। আমি বেঁচে থাক্‌তে তুমি আমার মনিবের বাড়ীতে ডাকাতী করবে? তা হবে না বাবু, তুমি আর তোমার দলের লোক আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে আমাকে হঠাও—তার পর মেহেরপুরে ডাকাতী করতে যেও।"

বিশ্বনাথ তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "তুই ত একটা ফড়িং রে, তোকে সাবাড় করতে কতক্ষণ? কিন্তু তুই একা, আমরা সকলে মিলে তোকে খুন করবো—বিশ্বনাথ বাবু সে রকম কাপুরুষ নয়। শুনেছি, তুই ভালো তীরন্দাজ, তোর শক্তির পরিচয় দে।—ঐ ছাখ, পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে আকাশে কতকগুলা বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছে, যদি তীর দিয়ে ওদের একটাকে বিঁধে মাটীতে ফেল্‌তে পারিস্, তা হ'লে বুঝবো, তুই সত্যই বাহাদুর ; আমি পরাজয় স্বীকার ক'রে ফিরে যাব। যদি না পারিস, তা হ'লে আজ মেহেরপুরে গিয়ে তোর মনিবের সর্ব্বস্ব লুঠ করবো, কেউ তাকে রক্ষে করতে পারবে না।"

বলরাম ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলেন। কোজাগরী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে চরাচর প্লাবিত। সেই আলোকে বহু শত গজ ঊর্দ্ধে এক পাল বুনো হাঁস, যেন গগন-সাগরে সাঁতার দিতেছিল। বলরাম চক্ষুর নিমেষে ধনুকে বাণ জুড়িলেন, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বাণ ছুড়িলেন। দুই মিনিটের মধ্যে একটি হাঁস শরবিদ্ধ-বক্ষে ধরাশায়ী হইল। কয়েক গজ দূরে হাঁসটাকে মাটীতে পড়িয়া পক্ষান্দোলন করিতে দেখিয়া বলরাম তাহা কুড়াইয়া আনিলেন, এবং বিশ্বনাথ বাবুকে উপহার দিলেন। বিশ্বনাথের অনুচররা স্তম্ভিত, সকলেই বলরামের লক্ষ্যভেদের কৌশল লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাক্। বিশ্বনাথ বলরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুই একটা মানুষ। তোর শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি খুসী হয়েছি! আমার যে কথা, সেই কায। এই মাঠ থেকেই আমি ফিরে যাচ্ছি।"

বিশ্বনাথ বাবু সদলে প্রত্যাগমন করিল। শুনিয়াছি, জমীদার বাবু কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ বলরামকে পুরস্কার-দানে উদ্যত হইলে বলরাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে এক দিন রাত্রিকালে বলরামের অজ্ঞাতসারে আনন্দবিহারীর অঙ্গ হইতে তাঁহার

অলঙ্কারাদি অপহৃত হইলে প্রভুভক্ত বলরামকেই চোর বলিয়া সকলে সন্দেহ করিয়াছিল!

এই মিথ্যা অপবাদে বলরাম এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাত্রিতেই মেহেরপুর ত্যাগ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই ধারণা হইল, বলরাম মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

বহু বৎসর পরে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া বলরাম মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার কেশ-বেশ দরবেশের মত। বলরাম সুদীর্ঘ কাল তপশ্চর্য্যার ফলে তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তিনি বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহাদের অনেকে তাঁহার সঙ্গে মেহেরপুরে আসিলে ভৈরব নদের তীরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সশিষ্য সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নদতীরবর্ত্তী সেই আশ্রমটি এখনও 'দরবেশের আখড়া' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার শিষ্য ও অনুচররা সাধারণতঃ 'দরবেশ' নামে পরিচিত। এই সকল দরবেশ ভিক্ষাজীবী। তাহাদের 'আখড়ায়' স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামী দরবেশরা 'জয় বলরামচন্দ্র' বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। তাহারা যে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, সেই পাত্র আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'দরিয়াবাদ নারিকেলের খোল' নামে প্রসিদ্ধ। এ কালে বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক আর অধিক দেখা যায় না; ঐরূপ ভিক্ষাপাত্রও প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। বৎসরান্তে দোলের সময় মেহেরপুরস্থ 'দরবেশের আখড়ায়' বলরামের দোল হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গের, বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের নানা জেলা হইতে বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসক ও উপাসিকা-বৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে। তিন দিন উৎসব স্থায়ী হয়; এক দিন লুচির ফলার, এক দিন চিঁড়ার ফলার, এবং এক দিন অন্ন-মহোৎসব হইয়া থাকে। বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত সকল লোক একত্র বসিয়া আহার করে, তাহারা জাতিভেদ মানে না।

বলরাম কোন দিন নিজের উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চেলা ও শিষ্য-সেবকরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। বলরামের উদ্দেশ্যে তাহারা মস্তক নত করে, কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রণাম বা নত-মস্তকে অভিবাদন করে না।

এইবার পূর্ব্ব-কথার অনুসরণ করিব।

বলরাম সিদ্ধিলাভ করিয়া দীর্ঘকাল পরে মেহেরপুরে ফিরিলে এবং শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সহ নদীতীরে 'আখড়া' স্থাপিত করিলে মেহেরপুরের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসিবর্গের মধ্যে তুমুল আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইল। অনেকে, বিশেষতঃ উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকরা বলরামকে 'প্রতারক,, 'বুজরুক', 'ভণ্ড' প্রভৃতি শব্দে অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। বলরামের শিষ্যরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের গ্রাহ্য করে না, তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত করে না; তাহাদের এই স্পর্দ্ধা কেহই মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। বলরাম ও তাঁহার শিষ্যদের এই প্রকার অবিনয় ও 'তেজের' কথা নানা প্রকার অত্যুক্তি ও অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ভূ-স্বামী চন্দ্রমোহন বাবুর কর্ণগোচর হইল। চন্দ্রমোহন বাবু একটা নগণ্য হাড়ীর চেলাদের দম্ভের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "বটে! একটা অস্পৃশ্য হাড়ীর চেলাদের এত তেজ!"—বাবুর পারিষদরা চতুর্গুণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার একবার পরীক্ষা করলেই সব জান্‌তে পারবেন; আপনার ছিচরণে এই দুনিয়ার কে মাথা না নোয়ায়? কার ঘাড়ে তিনটি মাথা যে, আপনাকে প্রেণাম না ক'রে সাম্‌নে দাঁড়াবে? কিন্তু ঐ বলা হাড়ীর চেলারা—মনিষ্যিকে মনিষ্যি জ্ঞান করে না।—ধর্ম্মাবতার এর একটা বিহিত না করলে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের আর মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে না!"

এক দিন হঠাৎ ইহা পরীক্ষার অবসর হইল। চন্দ্রমোহন পথের ধারে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—সেই সময় বলরামের একটি ভক্ত শিষ্য লখা একটি মাটীর ভাঁড় লইয়া সেই পথে কলুবাড়ীতে তেল আনিতে যাইতেছিল। প্রত্যেক পথিক জমীদার বাবুকে বৈঠকখানায় ধূমপানে রত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল, কিন্তু বলরাম-শিষ্য লখা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, এই ভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এক জন মোসাহেব লখার ব্যবহারের প্রতি জমীদার বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "ঐ দেখুন, বলার

চেলাটা মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ধর্ম্মাবতার যেন ওর কাছে মশা-মাছির তুল্যি!"

জমীদার বাবু হুঙ্কার দিতেই সোনা ও রূপো নামক তাঁহার তুই জন বিশালদেহ অনুচর তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল। কিন্তু জমীদার বাবুকে কোন কথা বলিতে হইল না, তাঁহার মো-সাহেবের ইঙ্গিতে সোনা ও রূপো লখাকে ঘাড় ধরিয়া প্রায় শূন্যে তুলিয়া বাবুর সম্মুখে হাজির করিল।

এক জন মো-সাহেব বলিল, "বেটা, তুমি বলা হাড়ীর চেলা হয়ে কি পীর না কেষ্টোবেষ্টো হয়েছ যে, রাজার সামনে দিয়ে চ'লে গেলে, পেন্নামটা করতেও তোমার মর্জ্জি হলো না? রাজা, ব্রাহ্মণ, সব তোমার কাছে তুচ্চ! তুমি ভেবেছো কি? এক্ষুনি ওঁর পায়ের কাছে গড় হয়ে দণ্ডবত করো।"

লখা নড়িল না, মাথা নামাইল না; মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "উনি রাজা, বামুন, সব মানি। কিন্তু ছিরি বলরামচন্দরের ছিচরণে যে মাথা নুইয়েছি, সে মাথা আর কোথাও নোয়াতে পারবো না—তা তিনি যে হোন, আর যত বড়ই হোন।"

হঠাৎ বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি পড়িল। পারিষদের ইঙ্গিতে রূপো ও সোনা লখাকে বৈঠকখানার থামে বাঁধিয়া এরূপ প্রহার করিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল। তাহার দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল; কিন্তু সকলে চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণ-রাজ-চরণে তাহার উন্নত মস্তক অবনত করাইতে পারিল না। অগত্যা জীবন্মৃত অবস্থায় তাহাকে মুক্তিদান করা হইল।

লখা রক্তাক্তদেহে টলিতে টলিতে অতিকষ্টে অদূরবর্ত্তী আখড়ায় ফিরিয়া আসিল এবং বলরামের পদপ্রান্তে শোণিতাপ্লুত অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমার ছিরিচরণে যে মাথা নুইয়েছি, সেই মাথা চন্দোর-মোহনের পায়ের কাছে নোয়াতে পারি নি ব'লে তার মোসায়েবগুলার হুকুমে তার পাক-বরকন্দাজ আমার কি দুদ্দশা করেছে, দেখ ঠাকুর! আমি ত কোন অপরাধ করি নি, বিনি অপরাধে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে, আঁচড়িয়ে খাম্‌চিয়ে আমার চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে; এই দেখ রক্ত আর ঠেক মান্‌ছে না। তোমাকে এই অন্যায়ের বিচের করতে হবে ঠাকুর! আমি জানি, তুমি সব পারো। তোমার ছিরিমুখ থেকে একটা শাপ বেরুলে ওরা সবাই উড়ে-পুড়ে যাবে, সক্কলে ছাই হয়ে যাবে! তুমি শাপ দিয়ে ওদের ধ্বংস কর, ঠাকুর! তোমার ক্ষ্যামোতা ওদের একবার দেখাও, প্রভু বলরামচন্দ্র! তুমি থাকতে তোমার দাসানুদাসের এত শাস্তি?—তোমাকে প্রতিফল দিতেই হবে, ঠাকুর!"

বলরাম আহত শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "লখা, তুই নালিশ কর্‌ছিস্ কাদের নামে? শিয়াল-কুকুরে কামড়ালে কেউ কি তাদের নামে নালিশ করে? তুই বলবি, ওরা কি শিয়াল-কুকুর? ওরা যে মানুষ!—কিন্তু আমি ত দেখছি, ওরা মানুষ নয়, ওরা শিয়াল-কুকুর, না হয় বাঘ-ভাল্লুক। মানুষের চেহারার ভিতর থেকে আমি শিয়াল-কুকুরের দাঁত, নখ, শিয়াল-কুকুরের প্রবৃত্তি, হিংসুটে স্বভাব, সবই দেখতে পাচ্ছি। কেবল হাত-পা আর কথা কইবার শক্তি থাক্‌লেই কি তাকে মানুষ বলতে পারি? মানুষের কায, মানুষের ধর্ম্ম মানুষকে ভালবাসা, মানুষের তুঃখে কষ্টে কষ্ট বোধ করা, তাদের বিপদে সাহায্য করা, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া, আনন্দ দেওয়া, সদুপদেশ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষকে মানুষ করা; যারা তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে বলছিস্, মানুষের ঐ সকল গুণ তাদের কারও আছে কি? না লখা, আমার কাছে তুই শিয়াল-কুকুরের নামে নালিশ করিস্ নে। শিয়াল-কুকুরের অপরাধের বিচার করি—সে শক্তি আমার নেই। বিচারের কর্ত্তা ভগবান্। আমি তোর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তোর ব্যথা দূর হবে। তুই মনে কোন আক্ষেপ রাখিস্ নে।"

বলরামের সান্ত্বনার কথায় লখার ক্ষোভ দূর হইল, তাঁহার করস্পর্শে তাহার আঘাত-বেদনা অন্তর্হিত হইল।

এই বলরাম অস্পৃশ্য, নীচজাতীয় হাড়ী! আমাদের জন্মগ্রহণের অল্পকাল পূর্ব্বে বলরাম ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ সমাহিত বা অগ্নিতে দগ্ধ করা না হয়; তাহা যেন শিয়াল-শকুনির ক্ষুন্নিবারণের জন্য কোনও নির্জ্জন স্থানে সংরক্ষিত হয়। তাঁহার অন্তিম আদেশ পালিত হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে তাঁহার আখড়ায় একটি

মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী নদীর ঘাটটি ইষ্টকবদ্ধ করা হইয়াছিল। উক্ত অট্টালিকায় বলরামের ব্যবহৃত খড়ম, লাঠি, ছত্র এবং শয্যা সংরক্ষিত হইয়াছে। বলরামের ভক্তরা দেশদেশান্তর হইতে এগুলি দেখিতে আসে।

১২৮০ সালে আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় মাঘমাসের এক দিন প্রত্যূষে আমরা মুখুয্যে-পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া 'গোয়ালা চৌধুরী'র গড়ের নিকট বড় রাস্তার ধারে গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ্য স্থলে আমাদের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসি। সে দিন অতি ভীষণ দুর্য্যোগ, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পথ-ঘাট প্লাবিত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। সেই দিন আমাদের নবগৃহে প্রবেশ।

এই 'গোয়ালা চৌধুরী'র গড়ের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে; বাঙ্গালায় বর্গির হাঙ্গামার সহিত সেই কাহিনী বিজড়িত, পরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চণ্ডিদাস

প্রণাম তোমারে, হে আদি উৎস,
বঙ্গভাষার অগ্রদূত!
বঙ্গভারতী তোমারি কণ্ঠে
স্ফূর্ত্তি লভিল কি অদ্ভুত!
সহজ ভাষার সহজ ভাবের
ওহে সহজিয়া সহজ-প্রাণ!
তব সঙ্গীত-নির্ঝরে হ'ল
বঙ্গবাণীর প্রথম স্নান।
না ছিল দেউল, না ছিল আসন,
না ছিল মন্ত্র অর্চ্চনার;
তুমি পল্লবে রচিলে কুটীর,
তৃণ-বেদী দিলে আসন মা'র।
নব উৎপল তুলি 'সর' হ'তে
রাখিলে যতনে বেদীর পাশ,
উপচার শুধু তব কণ্ঠের
আবেগ-পূরিত গীতোচ্ছ্বাস।
দীনের কুটীরে দীনতা-নাশিনী
রূপময়ী যেন উষার রবি,
শ্বেত-বাস-পরা শ্বেতভুজা বাণী
আসিল তোমার স্বপন-ছবি।
তৃণ-বেদী'পরে বসিলা জননী,
বীণা শোভে তাঁর অতুল করে;
স্থাপিলা কোমল কমল-চরণ
তব তোলা সেই কমল 'পরে।
তুমি গাহ গান, দেবী শোনে বসি;—
ঝরে ঝর-ঝর সুধার ধারা;
হে সহজ, তব সহজ পূজনে
মুগ্ধা সে দেবী উদাস পারা।
তখনও দেবীর কুঞ্জ মুখরি'
গাহেনিকো শ্যামা, গাহেনি পিক;
তুমি এলে সেথা উষারও অগ্রে
ঝঙ্কারে ভরি' সুপ্ত দিক্।

কত না বরষ কেটে গেছে, কবি,
তবু গীতি তব হয়নি ম্লান;
তোমার পীরিতি সরল মধুর
আজও উচ্ছল আবেগবান।
তোমার প্রাচীন সে ভাষা আজিও
নহেক প্রাচীন, নবীন অতি;
আজও বাঙ্গালীর কণ্ঠে সে ভাষা
নাচে উল্লাসে ছড়ায়ে জ্যোতি।
আজ কোথা তুমি? কোথা রামী তব?
তবু দোঁহাকার পীরিতি-রীতি
প্রেমিক-হৃদয়ে দেয় যুগে যুগে
প্রেমের উদার শুদ্ধ নীতি।
মাছের ছলনে তুমি তীরে বসি',
রামী চাহে তোমা' চপল চোখে;
দোঁহে দেখাদেখি, দোঁহে রাখারাখি
হৃদয়ের প্রেম-পুণ্য-লোকে।
প্রেম সে কি শুধু দেহেরি পরশ?
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল কি ফাঁকি?
প্রেম সে কি শুধু অধরে অধর?
প্রাণে মেশে প্রাণ, মিথ্যা তা' কি?
প্রেম সে কি ভোগ-বিলাস কেবল?
দূরে দোঁহে তবু হৃদয়ে রহে:
দোঁহার ধেয়ানে দোঁহার মূরতি,
দু'টি হিয়া একই বেদনে দহে।
এই প্রেমরীতি, হে মহাপ্রেমিক,
শিখাইলে তুমি প্রেমিকগণে।
শিখালে—"মানুষ সবার উপরে,
ভালবাসা দিও জনে ও জনে।"
প্রেমিক, সাধক, অতুল গায়ক,
আদি কবি তুমি মানব-মিতা;
আদি তুমি তবু অনাদি নূতন,
প্রণাম বঙ্গভাষার পিতা!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।



আমেরিকার সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা

সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য (Public Health) আমেরিকা যে কত কি উপায় অবলম্বন করিতেছে, তাহা ভাবিতেও আনন্দ হয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কত রোগের যে ক্রমশঃ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছে, কত মহামারী বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমেরিকার প্রত্যেক সহরের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিভাগ এ বিষয়ে কার্য্য করিতেছে। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড্, যক্ষ্মারোগ আগে এ দেশে কত লোকের প্রাণ নষ্ট করিত, কিন্তু এখন প্রত্যেক রোগে মৃত্যু-সংখ্যা বহুল হ্রাস পাইয়াছে। কোন কোন রোগ সম্পূর্ণ বিতাড়িত হইয়াছে।

এ দেশের ধনী টাকা যেমন উপায় করে, তেমনই ব্যয়ও করে। ইহারা টাকা দিয়া টাকা উপায় করে। লক্ষপতি কোটিপতি হয়। সবাই যে টাকা ব্যাঙ্কে জমায়, তাহা নহে। অনেকে সৎকার্যে ব্যয় করে। অনেকে টাকার সদ্‌ব্যবহার জীবিত অবস্থাতেই দেখিয়া যায়, আবার অনেকে উইল করিয়া যায়—যাহাতে টাকা নানা সৎকার্যে ব্যয় হয়।

আরও একটা উদারতা এ দেশবাসীর মধ্যে দেখা যায়। ইহারা শুধু নিজেদের দেশের জন্যই যে দান করে, তাহা নহে। বিদেশের ও বিদেশীর জন্যও বহু লোক বহু দান করে। বহু কোটি টাকা বিদেশের জন্য, বিদেশের স্বাস্থ্যের জন্য ও বিদেশের উন্নতির জন্য আমেরিকা ব্যয় করিয়া থাকে।

আবার মাঝে মাঝে এমন উইলও দেখা যায়, যাহাতে মনে হয়, দাতার মাথা বোধ হয় একটু খারাপ ছিল। ইন্দুরের বংশ-রক্ষা, বিড়ালের বংশবৃদ্ধি, কুকুরের বিবাহের শোভাযাত্রা, তাহার মৃত্যুতে শবশোভাযাত্রার বাহার এবং শেষে তাহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার জন্য উইলের অভাব এ দেশে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ধনী তাঁহার অগাধ সম্পত্তির এক অংশ "গিনি পিগের" (Guina Pig) বংশ রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া যান। তিনি "গিনি পিগের" প্রাণ নষ্ট করিয়া মানুষের রোগের তত্ত্বানুসন্ধানের বিরোধী ছিলেন। তাই যেখানে যত "গিনি পিগ" পাওয়া যাইবে, তাহা কিনিবার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহাতে "গিনি পিগ" দিয়া (Research ও Experiment) রোগের তত্ত্বানুসন্ধান না করা হয়।

অন্য দিকে দেখা যায়, "রকফেলারের" (Rockefeller) টাকা দিয়া কত দেশে কত রকমের লোকহিতকর কায হইতেছে, কত রকমের রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা চলিতেছে। "কার্ণেগির" (Andrew Carnegi) টাকা দিয়া কত দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা ও কত লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে। "রেড্ ক্রস্" (Red Crosss) কত টাকা তুলিয়া পৃথিবীময় মানুষের সকল রকম বিপদে সাহায্য করিতেছে। এ রকম বহু নাম উল্লেখ করা যায়, যাহা মানুষের মঙ্গলের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে আনন্দ পায়।

এ দেশে শুধু যে কোটিপতি হইয়াই মানুষ দান আরম্ভ করে, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। ছোটখাট দাতার অভাব আদৌ নাই, বরং সংখ্যায় অনেকগুণ বেশী! অনেক গরীব তাহার দৈনিক খাবারের পয়সা হইতে অর্থ বাঁচাইয়া পরের সাহায্য করে। এইরূপ বহু দরিদ্রের সম্মিলিত দান সময়ে পরিমাণে বড় হয়। তাহা দিয়া বড় রকমের সৎকার্যের ব্যবস্থা করা যায়। এই রকম বহু দরিদ্রের দানের টাকা না পাইলে বোধ হয়, এ দেশের অনেক ভাল কায করা সম্ভব হইত না।

এক জন ধনী তাঁহার অগাধ সম্পত্তি যেমন লোকহিতকর কাযে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার উইলের সর্ত্ত মোটামুটি এই যে, "যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয়," কোনও বিশেষ দেশের উল্লেখ করেন নাই, জাতির নাম নাই, রংএর নাম নাই এবং এমন কি, কোনও বিশেষ রোগ বা ঐরূপ কিছুরই উল্লেখ করেন নাই। যাঁহাদের উপর ব্যবস্থার ভার আছে, সেই "ট্রাষ্টিরা" যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য, বাজার-খরচের জন্য, বা অন্য যাহা কিছু লোকহিতকর কায মনে করেন, তাহার জন্য এই "ফাণ্ডে"র টাকা ব্যয় করিতে পারেন। ইহার নাম "মিল্ ব্যাঙ্ক মেমরিয়াল্ ফাণ্ড," (Milbank Memorial fund), যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহার সুদ প্রতিবৎসর নানা রকম লোকহিতকর কাযে ব্যয় করা হয়। ইহারা একটা বিশেষরকম লোকহিতকর কায বর্ত্তমানে করিতেছেন। ইহারা স্বাস্থ্য ও অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের উপকার করিতেছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে লোকের পরমায়ু বাড়ে—সমাজের অনেক উন্নতি হয়—দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের কায করা হয়। সুযুক্তির সঙ্গে, বিবেচনা সহকারে টাকা খরচ করিলে এ সব সম্ভব হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, অনেকগুলি রোগ আমরা চেষ্টা করিলে নষ্ট করিতে পারি। যক্ষ্মারোগীর ত্যক্ত কোনও জিনিষের সঙ্গে অপর সুস্থ লোক যতক্ষণ সংস্পর্শে না আসিবে, ততক্ষণ তাহার যক্ষ্মা হয় না। সুতরাং চেষ্টা করিয়া

যদি সমস্ত যক্ষ্মারোগীকে সুস্থ লোকের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া না হয় এবং যাহাদের শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, তাহাদের উপযুক্ত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা যায়, তবে যক্ষ্মারোগ সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না। ম্যালেরিয়ার কারণ আমরা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এক বিশিষ্ট জাতীয় মশা (anopheles)। সমাজ যদি চেষ্টা করিয়া ঐ জাতীয় মশার প্রজনন বন্ধ করে ও মশার দংশনের সুযোগ না দেয়, তবে ম্যালেরিয়াও ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিবে। কলেরা, টাইফয়েড্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা এখন বেশ জানি, জল, খাবার ও সংস্পর্শ ব্যতীত ও-সব রোগ হইতে পারে না, সমাজ যদি সাবধান করার সুব্যবস্থা করিতে পারে, তবে ও-সব রোগ নিশ্চয়ই নির্ম্মূল হইবে। এই রকম ভাবে আরও যে সব রোগের তত্ত্ব চিকিৎসাশাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছে, সব সমাজ বা সব দেশ এখনও তাহা সম্পূর্ণ কাযে দেখাইতে পারে নাই। তবে চেষ্টা করিলে এ সব রোগই নির্ম্মূল করা যায়, এ বিষয়ে লোকের আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য টাকা চাই।

"মিল্‌ ব্যাঙ্ক ফাণ্ডের" কর্ত্তারা বলিলেন, এই একটা সুযোগ, আমাদের টাকা আছে। লোকের রোগ আছে। পয়সা খরচ করিয়া লোকের দীর্ঘ জীবন দেওয়া যায় কি না এবং সংক্রামক রোগ সত্যই সমাজ হইতে নির্ম্মূল করা যায় কি না, এবার তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যদিও এ কায স্থানীয় মিউনিসিপালিটী বা গবর্ণমেণ্টের, তবু তাঁহারা বলিলেন, আমরা প্রথমে প্রমাণ করি। তার পর আমাদের কায তাঁহাদের উপর ভার দিব। তখন আর লোকের সন্দেহ থাকিবে না যে, ইহা সম্ভব কি না।

প্রথমে ইঁহারা একটা ছোট সহর, তার পর অপেক্ষাকৃত বড় সহর লইয়া কায আরম্ভ করেন। সমস্ত টাকা এই ফাণ্ডেরই। ৫।৭ বৎসরই হউক আর বেশীই হউক,—ইঁহারা কায করিয়া দেখাইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন যে, উপযুক্ত চেষ্টা ও অর্থ-ব্যয় করিলে সংক্রামক রোগ নষ্ট করা যায় ও লোকের দীর্ঘায়ু দেওয়া যায়। ফল বেশ আশাপ্রদ দেখা গেল। লোকের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রচারের ফলে এ সব যায়গার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইল। এ সকল স্থানে আগের মত টাইফয়েড্‌ হয় না—বসন্ত হয় না। যক্ষ্মার সংখ্যা অনেক কম। "কুৎসিত" রোগ হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন লোক বুঝিল যে, প্রকৃতই চেষ্টা করিলে স্বাস্থ্য পাওয়া যায়।

এই সময়ে মিল্‌ ব্যাঙ্ক ফাণ্ডের কর্ত্তারা বলিলেন, "আমাদের কায শেষ হইয়াছে। আমরা যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছি। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, চেষ্টা করিলে স্বাস্থ্য ভাল করা যায়, সংক্রামক রোগ দূর করা যায়, এবার তোমরা নিজেরা কাযে লাগ। এ তোমাদেরই কর্ত্তব্য। তোমরা নিজেরা কায কর—যদি কখনও কোনও বিষয়ে আমাদের সাহায্য কোনও রকমে চাও—আমরা তাহা দিতে ক্রটি করিব না।"

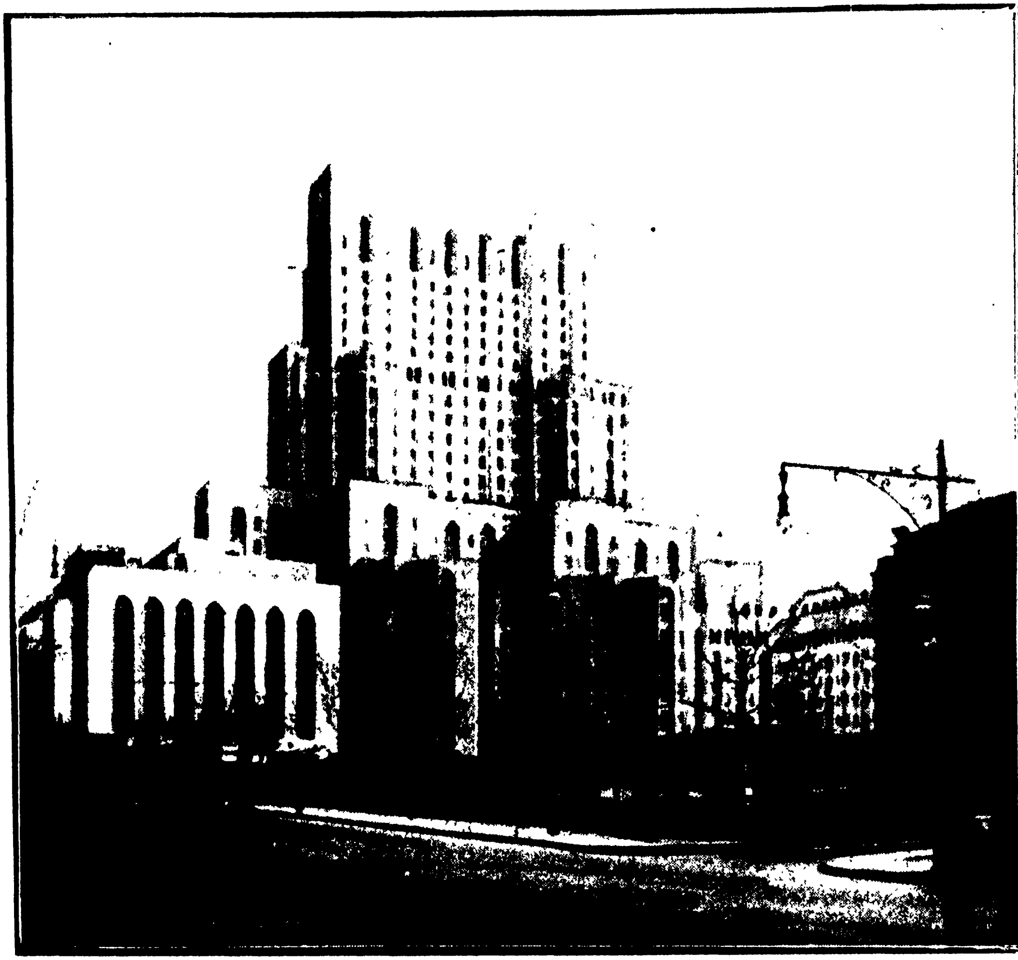
একটির পর একটি করিয়া যখন ৩টা ছোট বড় বিভিন্ন সহরে কায আরম্ভ ও শেষ হইল এবং প্রত্যেক স্থানেই সুফল দেখা গেল, তখন ট্রাষ্টিরা ভাবিলেন যে, নিউ ইয়র্কের মত বড় সহরে এবার চেষ্টা করা যাক্‌। হয় ত ছোট সহরের অপেক্ষা বড় সহরের ফল অন্য রকম হইবে। কেন না, বড় সহরের জীবন সম্পূর্ণ অন্য রকম, রীতি-নীতি অন্য রকম। নানাবিধ লোক—নানা দেশীয় লোক একত্র বাস করে। নানা অবস্থার লোক একত্রে এক পাড়ায় মাথা গুঁজিয়া থাকে। স্থান হিসাবে লোক-সংখ্যা অনেক বেশী। তাই যখন সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, তখন মহামারীতে পরিণত হয়। শেষটা অনেক আলোচনা, গবেষণা ও তর্ক করিয়া মিল্‌ ব্যাঙ্কের ট্রাষ্টিরা ঠিক করিলেন যে, নিউ ইয়র্কেই চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিউ ইয়র্ক সহরে একসঙ্গে কার্য্যারম্ভ বড় সহজ কথা নহে। প্রায় ৭০ লক্ষ লোকের বাস। পৃথিবীতে যত রকম বিভিন্ন ভাষাভাষী—বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন বর্ণের লোক আছে, তাহার বোধ হয় সব রকমের কিছু-না-কিছু লোক এ সহরে বাস করে। এত বড় সহরে একসঙ্গে কার্য্য আরম্ভ করিতে বহু টাকার দরকার। তাই তাঁহারা সহরের মাত্র একটি অংশ লইয়া কায আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে ইঁহাদের স্থানান্তরের কাযের সুফলের কথা প্রায় সকলেই জানিয়াছিলেন, তাই মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তাদের সঙ্গে বেশী তর্ক করিতে হইল না।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক সহরের বেল্‌ভিউ-ইয়র্কভিল্‌ (Belle-Vue York ville Section) পাড়ায় "মিল ব্যাঙ্ক ফাণ্ড" কায করা ঠিক করিলেন। এই পল্লীটি অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়াই তাঁহারা এখানে কার্য্যারম্ভ করিলেন। এখানকার অধিকাংশ লোক বিদেশী ও অজ্ঞ। সাধারণতঃ গরীব আইরিশ, ইটালিয়ান্‌, স্প্যানিশ্‌, ইহুদী, ইংলিশ, আমেরিকান, নিগ্রো প্রভৃতি সব রকমের লোকও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় ছিল। আর যত রকমের পার্থক্যই থাকুক না কেন, অজ্ঞতা ও দরিদ্রতায় ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। অবস্থা কাহারও তেমন ভাল নহে। বাড়ী-ঘর ময়লা, কাপড়-চোপড় খারাপ ও জঘন্য। মিউনিসিপালিটী অন্য সকল দেশের মত এখানেও গরীব পাড়া বলিয়া কোনও রকমে দায়-সারা গোছের কর্ত্তব্য পালন করিত। ধনী পাড়ার রাস্তা-ঘাট, বাড়ীঘর সব ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা পায়। সেখানে রাস্তার এক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া ফেলার জন্যও লোকের ব্যবস্থা আছে—সে আবার যেমন তেমন লোক নহে! তাহার কাপড়-চোপড় দৈনিক বদ্‌লাইতে হয়। কিন্তু গরীব পাড়ার রাস্তা ত দূরের কথা, বাড়ীতে যদি ময়লা পচিয়া দুর্গন্ধ হয় এবং তাহার জন্য মিউনিসিপালিটীকে খবরও দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধীরে সুস্থে ২।৩ দিন পরে কেহ দয়া করিয়া দেখিয়া যায়। পরিষ্কার করা তাহার কর্ত্তব্য হইলেও সে মহা হৈ-চৈ করিয়া প্রথমে বিদেশীয় লোকগুলিকে খুব ধমকাইয়া দেয়—কেন তাহারা এমন বোকা—এমন অলস, এমন অকৃতজ্ঞ! তার পর যদি অন্য উপায় না থাকে, তবে অগত্যা পরিষ্কার করে। এই সব কারণে বিবিধ সংক্রামক রোগ এই রকম গরীব পল্লীতেই বেশী হয়। ধনী পাড়ার স্বাস্থ্যের কায করিবার অপেক্ষা দরিদ্র পল্লীই প্রশস্ত। কেন না, ইহারা গরীব, ইহাদের জন্য কাহারও হৃদয় কাঁদে না। ইহারা অজ্ঞ, ইহাদের সামর্থ্য নাই। এ সব পাড়ায় যক্ষ্মা বেশী; টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ বেশী হয়, "কুৎসিত" রোগও

বেশী দেখা যায়। এরা জানে না, কেমন করিয়া পরিষ্কার থাকিতে হয়, কেমন করিয়া স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ব্যায়রাম হইলে ইহারা নিজেদের গির্জ্জায় যায়। পুরুতকে তাহারা দক্ষিণা দেয়—ভাবে, পুরুতের প্রার্থনায় ও কখনও কখনও ডাক্তারের ঔষধে রোগ নিরাময় হইবে।

স্কুলে ও শেষে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যবিষয়ের প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইল। লোকের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সহানুভূতি ও সাহায্য এ বিষয়ে "ফাণ্ডকে" যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছে।

১৯২৩ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে যে



নূতন নিউইয়র্ক হাসপাতাল

"মিল্ ব্যাঙ্ক ফাণ্ডের" কর্ত্তারা বুঝিয়াছিলেন যে, গির্জ্জার উপর যাহাদের অগাধ বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে যাওয়া বৃথা। তাই প্রথমে তাঁহারা গির্জ্জার পুরোহিতদিগের মধ্যে কায আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, কেমন করিয়া রোগ হয় ও রোগ সারা যায়—কেমন করিয়া রোগ নির্ম্মূল করা যায়। বক্তৃতা করিয়া, ছবি দেখাইয়া, চলচ্চিত্র দ্বারা ব্যাপারটা বুঝাইয়া যখন তাঁহাদের মত পাইলেন, তখন পল্লীতে কায করার সুবিধা হইল। "ফাণ্ডে"র প্রকাণ্ড আফিস ও বক্তৃতা-ঘর ও পরীক্ষাগার পাড়াতে খোলা হইল। পাড়ার গির্জ্জায় গির্জ্জায়, স্কুলে

ফল দেখা গিয়াছে, তাহাতে গর্ব্বের যথেষ্ট কারণ আছে। ক এখনও চলিতেছে। তবে এখন হইতে প্রতি বৎসর "ফা খরচের টাকা ক্রমেই কমাইয়া দিবে। ক্রমে ক্রমে নিউ ইয়র্কে বোর্ড অব্ হেল্থকে (Board of Health) কাযের দায়ি প্রদান করিবে।

এই কয় বৎসরে শুধু যে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া তাহা নহে। পাড়ার লোকের মনেও এই কার্য্যে এক নূতন ভ আসিয়াছে। ঘর-বাড়ীর চেহারা তাহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছে নিজেদের কাপড়-চোপড়ের অবস্থা—চেহারার ধরণ সব এক নূ ভাব গ্রহণ করিয়াছে। ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদিগের মধ্যে

এক নূতন উৎসাহ দেখা দিয়াছে। এখন আর কাহাকেও পরিষ্কার হইতে উপদেশ দিতে হয় না। পরিষ্কার না থাকাটাই এমন তাহাদের লজ্জার বিষয়। আগে যাহারা বাড়ীর জানালা হইতে ময়লা রাস্তায় নিক্ষেপ করিতে বা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে কদর্য্য ছবি আঁকিতে বা পাড়ার পার্কের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এখন তাহারা এ সব কাযকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চলে। পাড়ার প্রত্যেকের প্রাণে এক নূতন গর্ব্ব দেখা দিয়াছে। এখন তাহারা তাহাদের বাড়ী দেখাইতে —ঘরের আস্বাবপত্র দেখাইতে—পাড়ার সৌন্দর্য্য দেখাইতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এবং দেখাইয়া গর্ব্ব বোধ করে। তাহারা গর্ব্বস্ফীত-হৃদয়ে বলে, "দেখেছ, আমরা কেমন আধুনিক হয়েছি ?"

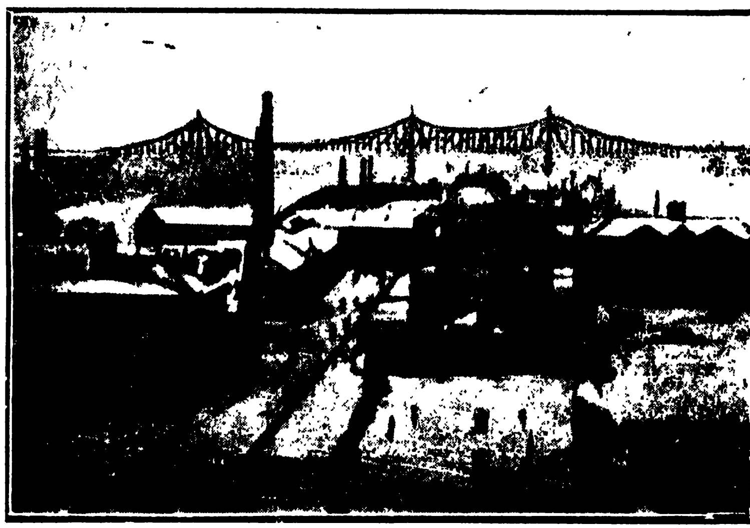
এই ব্যাপারে কি ব্যয় পড়িয়াছে ? দশ বৎসরে মোট খরচ হইয়াছে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯ শত ১০ ডলার। ইহার মধ্যে "মিল্ ব্যাঙ্ক ফাণ্ড" দিয়াছে— ৮ লক্ষ ২০ হাজার ১শত ২১ ডলার। বাকী ২৯ হাজার ৭ শত ৮৮ ডলার অন্য প্রকারে আসিয়াছে। ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য যে, ইহারা লোককে বা সমাজকে বা গভর্ণমেণ্টকে স্বাবলম্বী হইতে শিখাইবে, দায়িত্ব তাহাদেরই।

"ফাণ্ডের" বাড়ীতেই একটা আদর্শ পরিষ্কার খাওয়ার যায়গা আছে। এখানে বিনা লাভে বা কোনও কোনও জিনিষ সামান্য লাভে বিক্রয় করা হয়। এই সামান্য লাভ হইতে কিছু টাকা জমিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদ হইতেও কিছু পাওয়া যায়। এই সব মিলাইয়া ঐ বাকী ২৯ হাজার ৭শত ৮৯ ডলার পাওয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এত টাকা ব্যয়ে কি ফল পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্ যে একবারে নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সহরের এই পাড়ায় এ সব রোগ যত বেশী হইত, এবং যত লোক মরিত, এই কয়েক বৎসরে ক্রমশঃ বহুলাংশ হ্রাস পাইয়াছে। বসন্ত ত একবারে নাই বলা যায়। টাইফয়েড্ গত ৮ বৎসরে আদৌ দেখা দেয় নাই। অথচ সহরের অন্য পাড়ায় অর্থাৎ যেখানে এ রকম কায হয় নাই, সেখানকার অবস্থার পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। সংক্রামক ব্যাধির মৃত্যুসংখ্যা এ পাড়ায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সাধারণ স্বাস্থ্য অনেক ভাল।

এ পাড়ায় আর একটা কায হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। নিউ ইয়র্কের মত বড় সহরে—মোটর বোঝাই রাস্তায় প্রতি বৎসর বহু লোক,—বিশেষতঃ বহু শিশু মোটর চাপা পড়িয়া মারা যায়। এ পাড়াতেও বহু শিশু এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শিক্ষার ফলে আজ এই দফায় "মৃত্যু" একবারে নাই বলিলেও চলে। ছেলেরা এখনও রাস্তা পার হয়—তবে সাবধানে; ছেলেরা এখনও খেলা করে—তবে রাস্তায় নহে, পার্কে; —ছেলেরা এখনও দৌড়াদৌড়ি করে—তবে স্থানবিশেষে। শিক্ষায় ইহা সম্ভব হইয়াছে।

"মিল্ ব্যাঙ্ক ফাণ্ডের" নানারকম বিভাগ আছে। রোগ হউক আর নাই হউক, মাঝে মাঝে নিয়মমতভাবে পরীক্ষা করা দরকার। যাহার যে রোগ আছে, যে সমস্যা আছে, তাহাকে সেই সেই বিভাগে পাঠান হয় এবং যাহাতে সে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, তাহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা হয় না। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যত আছে, তাহাদের সকলেরই বুকের "এক্স্রে" (X Ray) লইয়া দেখা হয়। যেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়, সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়—যত দিন না সে রোগী আরোগ্য হয়।



"ওয়েল ফেয়ার আইল্যাণ্ড"—সিটি হাসপাতাল

মিল ব্যাঙ্ক ফাণ্ডের বাড়ী যেখানে অবস্থিত, সহরের সেই অংশের রাস্তাগুলির প্রতি বাড়ীর প্রতি লোকের স্বাস্থ্যের হিসাব রাখা, কতগুলি লোক সুস্থ, কতগুলি লোক অসুস্থ, কতগুলি যক্ষ্মারোগী, কতগুলি "সামাজিক" (কুৎসিত) রোগী, তাহাদের কবে রোগ আরম্ভ হয়, কি করে, কোথায় যায়, কি ব্যবসা, কত উপায় ইত্যাদি "নাড়ী-নক্ষত্রের" ইতিহাস সব লেখা আছে। যাহার কাপড় নাই বা কাপড় কেনার সঙ্গতি নাই, অথচ কাপড়ের দরকার, তাহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করা হয়। জুতা, মোজা, খাবার ইত্যাদি সব বিষয়েই ঐ এক রকম। ইহাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রতা নষ্ট করা, রোগ নষ্ট করা, রোগ যাহাতে না হয়, সকলের স্বাস্থ্য ভাল রাখা ও মানুষকে দীর্ঘায়ু করা।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রচার ইহাদের একটা বড় বিভাগ। যত রকম উপায়ে সম্ভব পাড়ার সকলকে স্বাস্থ্যবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। ঘরে ঘরে গিয়া নার্স বা লোককে উপদেশ দিতেছে। কেমন করিয়া পরিষ্কার থাকিতে হয়—কেমন করিয়া রোগ হয়, কেমন করিয়া ভাল খাবার সস্তায় তৈয়ার করিতে পারা যায়,

কেমন করিয়া সন্তান পালন করিতে হয়, সমস্ত বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

টাইফয়েড্ রোগের কথায় একটা ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এই কথা শুনি। ঘটনাটির এক ভাগ ঘটে কলম্বিয়াতেই। কেমন করিয়া যে অসাবধানতায় টাইফয়েড রোগ নিরীহ প্রাণ নষ্ট করে, ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ। তাই ঘটনাটি এখানে বলিতেছি। মেরী নামক এক আইরিশ রাঁধুনী ছিল। রাঁধুনী খুব পাকা ও ভাল। মেরীর একবার "টাইফয়েড্" হয়। আরোগ্যলাভের পর মেরী টাইফয়েডের বাহক হয় অর্থাৎ তাহার শরীরের মধ্যে টাইফয়েড জীবাণু বাস করিতে থাকে। অথচ তাহার নিজের আর কোনও ক্ষতি করিতে পারে না বা কোনও টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা যায়



রক্ ফেলার "মেডিক্যাল সেণ্টার"

না। রাঁধুনী ভাল বলিয়া মেরীর চাকুরীর অভাব হয় না এবং সাধারণতঃ যাহারা ভাল বেতন দিতে পারে অর্থাৎ বড় লোকের বাড়ীতেই চাকুরী হয়। মেরীর চাকুরী লওয়ার অল্পদিন পরেই সেই বাড়ীতেই টাইফয়েড্ আরম্ভ হয়। যে দিন হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, টাইফয়েড্ জীবাণু শরীরে কোনও রকমে না প্রবেশ করিলে কাহারও টাইফয়েড্ হইতে পারে না, সেই দিন হইতেই এ দেশে চেষ্টা হইতেছে যে, টাইফয়েড্ হইলেই যতটা সম্ভব তাহার আদি কারণ খুঁজিয়া বাহির করা। ইহার জন্য বহুবার এ দেশ বহু লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছে।

মেরী যে বাড়ীতে পাচিকার কার্য্য করে, সেই বাড়ীতেই টাইফয়েড্ হয়। অনেকে ভোগে—কেহ কেহ মারাও যায়। মারা যাওয়ার পর মেরী অন্যত্র চাকুরী খোঁজে, হয় ত মেরী প্রথম প্রথম নিজেই জানিত না যে, সে-ই এ সব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, কিন্তু আবার সন্দেহ হয় যে, হয় ত সে জানিত, নহিলে চাকুরী-স্থানে যেই টাইফয়েড্ আরম্ভ হইত, সেই সে অন্যত্র চাকুরীর চেষ্টা করিত কেন? তাহা ছাড়া সে কখনও স্বীকার করিত না যে, পূর্ব্বে তাহার টাইফয়েড রোগ হইয়াছিল। একবার এক বিখ্যাত ধনীর বাড়ীতে তাঁহার মেয়ে ও স্ত্রী দুইটিই মারা যায়। মেরী অমনি স্থানান্তরে পলায়ন করে। কিন্তু ক্রমে সন্দেহ বাড়িতে থাকে। মেরী ছদ্ম নামে অন্যত্র চাকরী গ্রহণ করে; সুতরাং তাহাকে ধরাও সহজ হয় না। যাহা হউক, যখন একের পর আর এক যায়গায় টাইফয়েড, মেরীকে ক্রমাগত অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন মেরীর মল-মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সে এক জন বাহক। স্বাস্থ্য-বিভাগে বন্দী করিয়া পৃথক্ হাঁসপাতালে মেরীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। মেরী কিন্তু বন্দী হওয়ার পূর্ব্বেই পলাতক। কিছু দিন গা-ঢাকা দেওয়ার পর মেরী আবার নূতন নাম দিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। নিউ ইয়র্ক বড় যায়গা। এক পাড়ার লোক আর এক পাড়ার লোককে চেনে না। এক পাড়ার স্বাস্থ্য-বিভাগের লোক আর এক পাড়ার স্বাস্থ্য-বিভাগের লোককেও না চিনিতে পারে। তাহা ছাড়া মেরী কাছাকাছি ষ্টেটের নানা সহরেও চাকুরী করিয়াছে, যেখানে মেরী কায করিয়াছে, সেইখানেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, টাইফয়েড্ যেন মেরীকে ছাড়িতে চাহে না। দুর্ঘটনা যেন মেরীকে ছায়ার মত অনুসরণ করিতে থাকে। বড় যায়গা বলিয়া মেরী কখনও ধরাও পড়ে নাই।

এই সময়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-নিবাসের জন্য এক জন রাঁধুনীর দরকার হয়। মেরীই এ কায পাইল। অবশ্য সে ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছিল। ছাত্র, ছাত্রী, নার্স, ডাক্তার সবাই তাহার রন্ধনের প্রশংসা করে। মেরীর আদর বাড়িল। বড়-দিনের সময় সবাই বলিল, মেরীকে একটা খুব বৃহদাকার "কেক্" তৈয়ার করিতে হইবে। মেরীও খুব আনন্দের সহিত প্রকাণ্ড একটা "কেক্" তৈয়ার করিল। সকলেই বড়দিনের আনন্দে মত্ত; মেরীকে বহু ধন্যবাদ জানাইয়া বার বার কেক খাইল। কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। উপযুক্ত সময়ে যত লোক "কেক্" খাইয়াছিল, সকলেই শয্যা-গত হইল। সকলেরই টাইফয়েড্। "কলম্বিয়ার" বিখ্যাত হাঁসপাতাল, যেখানে টাইফয়েডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়া উচিত—সেখানেই টাইফয়েড! যাঁহারা ডাক্তার হইয়া টাইফয়েড ধ্বংস করিবেন, তাঁহারাই আজ টাইফয়েডের কৃপার পাত্র। হঠাৎ টাইফয়েডের রোগীর সংখ্যা হাঁসপাতালে এত বাড়িয়া গেল যে, যায়গার অভাবে অন্য রোগীকে সরাইয়া টাইফয়েডের বিছানা পাতা হইল। তদন্ত আরম্ভ হইল। শুধু বোর্ড অব্ হেলথ্ (Board of Health) নহে, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষদেরও আতঙ্ক কম নহে! টাইফয়েডের সূত্রপাত কোথায়, কেমন করিয়া আরম্ভ হইল, কে প্রথমে আনিল ইত্যাদি

বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। রান্না-ঘরেই যে সূত্রপাত, তাহার সন্দেহ রহিল না। মেরী যখন জানিতে পারিল যে, তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে এবং রান্নাঘরের দিকেই তদন্ত আসিতেছে, তখন তাড়াতাড়ি পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু এক জন পুরাতন তদারক ডাক্তার মেরীকে পলাতক মেরী বলিয়া আগেই চিনিতেন। তিনি দেখিলেন, মেরী তাড়াতাড়ি পাইখানাতে প্রবেশ করিতেছে। তখন জোর করিয়া মেরীকে বন্দী করা হইল। পরীক্ষায় সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পাইল। মেরীকে বুঝান হইল, কেন সে এত প্রাণ নষ্ট হওয়ার কারণ হইবে? কেন সে এত লোকের বিপদের কারণ হইবে? প্রথমে মেরী কিছুতেই তাহার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না; কিন্তু শেষে যখন প্রমাণ হইল যে, সেই-ই বিভিন্ন নাম লইয়া ২০।২৫ যায়গায় রাঁধুনীর কায করিয়াছে এবং সকল স্থানেই সে টাইফয়েড্ ছড়াইয়াছে, তখন মেরী আর অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলা হইল যে, সে ইচ্ছা করিয়া কখনও এমন নির্দ্দয় কায করে নাই, তবে তাহার অসাবধানতায় এমন হইয়াছে। মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হয় ত ময়লা হাতে খাবার জিনিষ ধরিয়াছে—তাহা হইতেই টাইফয়েডের বিস্তার হইয়াছে। যত দিন সম্পূর্ণ টাইফয়েড্-জীবাণুশূন্য না হইতেছে, তত দিন তাহার কোনও খাবার জিনিষ ধরা অন্যায়। এ কথাও বুঝাইয়া বলা হইল যে, তাহাকে আর শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করা যায় না, কেন না, সে কখনও তাহার প্রতিজ্ঞা রাখে নাই।

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শেষটা মেরী নরম হয়। কর্ত্তৃপক্ষও মেরীর দুর্ভাগ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু উপায় কি? রান্না ছাড়া যে জীবনে সে আর কোনও কায শিখে নাই, আর কোনও রকম কায করে নাই। সে আজ যদি তাহার সেই একমাত্র বিদ্যা—একমাত্র জীবিকা, উপায়ের পথ হঠাৎ হারায়, তবে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কি করিয়া?

শেষটা কর্ত্তৃপক্ষ মেরীকে আজীবনের জন্য এক নূতন চাকুরী দিলেন। যত দিন সে বাঁচিবে, সে মেয়েদের পাগ্‌লা গারদের পাহারা দিবে। কায কঠিন নহে, মাহিনাও মন্দ নহে, চাকুরী হারাইবার ভয় নাই—অথচ অন্য কাহারও বিপদের আশঙ্কা কম। মেরীকে অনেক উপদেশ দেওয়া হইল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল! মেরী অগত্যা রাজী হইল। মেরী এখন "টাইফয়েড্ মেরী" নামে পরিচিতা। আজ পর্য্যন্তও মেরী ঐ কায বহাল রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার মলমূত্র পরীক্ষা করা হয়। মেরী এখনও "টাইফয়েড-বাহক"। তাই রান্নার কাযে এখনও নিরাপদ নহে। কত সামান্য অবহেলায় কত বড় ভীষণ কাণ্ড হইতে পারে, ইহা হইতে তাহা প্রমাণ হয়।

টাইফয়েড্ যে সংক্রামক রোগ এবং সংক্রমণের সূত্র নষ্ট করিতে পারিলে এ রোগ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করা যায়, তাহার প্রমাণ এ দেশে অনেকবার দেখান হইয়াছে। তাই অনেক সময় ছাত্রদিগকে টাইফয়েড় জীবাণুর আকার দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়। টাইফয়েডের রোগী আর প্রায়ই দেখা যায় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি)

—

জার্ম্মাণীর পুনর্জ্জন্ম

মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জার্ম্মাণী একবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয় পড়িয়াছিল। মিত্রশক্তিগণ তখন তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিল, বিশেষতঃ ফ্রান্স বহুদিনের অপমান ও ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। ভার্সাইল-সন্ধিই তাহার প্রমাণ, উহার কল্যাণে জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চল মিত্রশক্তিদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। যত দিন জার্ম্মাণী যুদ্ধ-জনিত ক্ষতি-পূরণের টাকা না দিতে পারে, তত দিন জার্ম্মাণীর একাঙ্গ শত্রুর দ্বারা অধিকৃত হইয়া রহিবে এবং জার্ম্মাণী দেশরক্ষার জন্য নামমাত্র সামরিক পুলিস রাখিয়া স্থল, জল ও ব্যোমপথের সৈন্য ও রণসম্ভার ধ্বংস করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে, যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রবল শক্তিসম্পন্ন আত্মাভিমানী অপরাজেয় বলিয়া পরিগণিত জার্ম্মাণীর পক্ষে উহা কিরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক ও অপমানজনক হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও জার্ম্মাণী ধীরে ধীরে কিরূপে ধ্বংসস্তূপ হইতে পুনরুত্থান করিয়াছে, জার্ম্মাণীর গণতন্ত্রশাসন মন্ত্রের কর্ণধাররা কিরূপে প্রবল মিত্রশক্তিদের মুখের উপর জবাব দিয়াছে যে, জার্ম্মাণীকে সমপর্য্যায়ে তুলিয়া না লইলে জার্ম্মাণী অস্ত্রসংবরণে সম্মত হইবে না, তাহা আধুনিক ইতিহাসই বলিয়া দিবে। এখন জার্ম্মাণী ক্রমে আপনার প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করিয়া লইতেছে, প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জের দশ জনের এক জন হইবার দাবী করিতেছে। প্রবল মিত্রশক্তিরাও এখন জার্ম্মাণীকে না লইয়া অস্ত্রসংবরণ প্রমুখ বড় বড় সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেছেন না, ইহাতেই সে কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণদের রাজনীতিক রিস্ বা পার্লামেণ্টের মন্ত্রিসভার নির্ব্বাচনে কত গণ্ডগোল হইল, বুঝি গণতন্ত্রশাসন ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়ে, এমনই সম্ভাবনা হইল, কিন্তু তথাপি জার্ম্মাণ জাতি কোনরূপে আপনাদের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইল। অবশ্য নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সর্ব্বেসর্ব্বা হইল, এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি রাজতন্ত্রশাসনের পুনরভ্যুদয় হইল না, প্রেসিডেণ্টকেও জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনে অনুমতি দিতে হইল,—নবীন জার্ম্মাণীর ইহাই বৈশিষ্ট্য। নূতন গভর্ণমেণ্ট স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল, যথা,—(১) রাজবন্দীদের মুক্তিদান, (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতাদান, (৩) জার্ম্মাণ কাইজারকে মুক্তিদান, ও জার্ম্মাণীতে আসিয়া অন্যান্য প্রজার ন্যায় বসবাস করিবার অনুমতি প্রদান। অনেকেই হয় ত ভূতপূর্ব্ব কাইজারের জার্ম্মাণী-প্রবেশের নাম শুনিলেই আঁতকাইয়া উঠিবে; কিন্তু জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট অবস্থা ও নিজের শক্তি না বুঝিয়া এ ব্যবস্থা করেন নাই। এখন আর জার্ম্মাণ কাইজারের বিষ-দন্ত নাই; ভগ্ন, জীর্ণ, আশাহত সম্রাট এখন সামান্য গৃহস্থ ভদ্র লোকের মত দিনযাপন করিয়া থাকেন; তিনি যে মহাযুদ্ধের মূল কারণ, ইহা এখন অনেকে অস্বীকার করেন; যুদ্ধের জন্য কে দায়ী, এ বিষয়ে এখন মতভেদ দেখা দিয়াছে। তাহার উপর জার্ম্মাণ প্রজারা এখন গণতন্ত্র-শাসনে অভ্যস্ত হইয়াছে।

এ অবস্থায় এখন জার্ম্মাণীতে তিনি পুনঃ প্রবেশ করিলে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, ইহাই জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস।

কিন্তু মিত্রশক্তিরা, বিশেষতঃ ফ্রান্স যে ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! ফ্রান্স ও বৃটেন কিছুতেই জার্ম্মাণ কাইজারকে জার্ম্মাণী প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত ছিলেন না, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, জার্ম্মাণী এখন কোন শক্তিকেই আপনার 'প্রভু' বা 'নিয়ন্তা' বলিয়া মনে করে না।


কাইজার

কেন প্রবলশক্তিরা নীরব, তাহার একটা মস্ত কারণ আছে। তাহারা সকলেই জানিত ও বুঝিত যে, জার্ম্মাণ মার্কের মূল্যহ্রাস হেতু জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, এত মন্দ যে, কোন্ দিন জার্ম্মাণী ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই; জার্ম্মাণী ভাঙ্গিয়া পড়িলে য়ুরোপের অন্যান্য অংশেরও ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণীতে যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আবার বিশ্বব্যাপী বিরাট যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এই সকল কারণে জার্ম্মাণী য়ুরোপের ভবিষ্যৎ বিপদের কারণ হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপ এ কথা জানে বলিয়াই কোনরূপে যাহাতে জার্ম্মাণী দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার চেষ্টা করিতেছে।

জার্ম্মাণীর অবস্থা জগতে বাণিজ্যের অবনতি ও মার্কের অবনতি হেতু মন্দ হইলেও জার্ম্মাণ জাতি এত চমৎকাররূপে আপনাদিগকে সংযত করিয়া চলিতেছে এবং নানা দিক দিয়া বিদ্যাবিজ্ঞানের কৌশলে নিত্য নূতন ধনাগমের চেষ্টা করিতেছে যে, জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিলে দেখা যায়, যেন কোথাও কোন অভাব নাই। সহরগুলি সুন্দর, ভোজ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা ভাল, বাহুল্য নাই, অথচ অভাবও নাই, কলকারখানাও আছে, কিন্তু কোথাও জমী অনুর্ব্বর পড়িয়া নাই; কৃষি ও বাণিজ্যের পরস্পর মিলা-মিশায় আসল বাণিজ্যের অভাব পূর্ণ হইতেছে। এ দিকে কোন বিজ্ঞান-প্রসারে, গবেষণা-কার্য্যে, নূতন তথ্য আবিষ্কারে, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলবিধানের নূতন উপায় উদ্ভাবনে জার্ম্মাণী ঠিক পূর্ব্বের জার্ম্মাণীই রহিয়াছে। অচির-ভবিষ্যতে এই জার্ম্মাণী যে আবার প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

পারস্য ও বৃটেন

পারস্যের তৈলের খনির ইজারা লইয়া এ্যাংলো-পারস্য অয়েল কোম্পানীর ও তথা বৃটিশ সরকারের সহিত পারস্য সরকারের মতবিরোধ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এখন উভয় শক্তিই জাতিসঙ্ঘের দরবারে ব্যাপারটা আপোষে মিটাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন, নতুবা এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাতে অনেকে মনে করিয়াছিল, বুঝি বা কথার কলহ অস্ত্রমুখে মীমাংসিত হইবারই সম্ভাবনা হইয়াছে।

অধুনা কয়লা বা কাঠ হইতে তৈল নানাক্ষেত্রে জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। জাহাজে, ষ্টীমারে, মোটরে, মোটরলঞ্চে, উড়োকলে,—কোথায় না তেলের ব্যবহার হয়? রণক্ষেত্রে তৈলের প্রয়োজন সমধিক। এই হেতু জগতের নানা দেশে ভূগর্ভস্থ তৈল উত্তোলিত করিয়া কার্য্যে নিয়োজিত করা হইতেছে। এতদুপলক্ষে নানা স্থানে তৈলের খনি, তৈলের কোম্পানী, তৈলের কারখানা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ব্যবসায় হেতু রেলে জাহাজে তৈল বহিবার বন্দোবস্ত হওয়ায় রেল, মোটর, জাহাজ কোম্পানী বিশেষ যানবাহন নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপে নানা দিকে নানা ভাবে নানা লোক এই ব্যবসায়ে করিয়া খাইতেছে এবং নানা ব্যবসায়ী লক্ষপতি হইতেছে। মেক্সিকোর ট্যাম্পিকো নামক স্থান, রাশিয়ার বাকু, ব্রহ্ম ও আসামের দুই একটা স্থান এবং পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার দুই একটা স্থান তৈলের খনির জন্য প্রসিদ্ধ।

ভূতপূর্ব্ব পারস্য সরকারের আমলে সরকার এক বৃটিশ তৈল-ব্যবসায়ী কোম্পানীকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট জমীতে তৈল-খনি করিয়া ব্যবসায় চালাইবার অধিকার দিয়াছিলেন। উহা Darcy Concession বলিয়া পরিচিত। নির্দ্দিষ্টকালের জন্য একটা হারে খাজনা দিয়া তৈলের ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন, কোম্পানী এই সর্ত্তে পারস্য সরকারের নিকট ইজারা পাইয়াছিলেন। ইজারার নির্দ্দিষ্টকাল এখনও ফুরায় নাই, কিন্তু শাহ রেজা খাঁ পেল্‌ভির সরকার কোম্পানীর ইজারা নাকচ করিয়া দিয়া নূতন সর্ত্তে ইজারা লইতে বলিলেন। কোম্পানী বলিলেন, ইহা আইনসঙ্গত নহে, উহাতে সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইতেছে, উহা আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য। পারস্য জবাব দিলেন, "ভূতপূর্ব্ব দুর্ব্বল পারস্য সরকারের উপর চাপ দিয়া Con-ces-sion আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানী অভাবনীয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু পারস্য সরকারকে তাহার কোন ফল


রেজা খাঁ পেল্‌ভির

উপভোগ করিতে দেন নাই। অথচ পারস্য সরকার কোম্পানীর খনির অঞ্চলকে দস্যুভয় হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন।" বৃটিশ সরকার বৃটিশ তৈল কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলিলেন, "কোম্পানী কোটি কোটি মূলধন ফেলিয়া পারস্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। যেখানে পারস্যের কোন বাণিজ্য ছিল না বলিলেই হয়, সেখানে কত বড় একটা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মূলধন পারস্যেই রহিয়া গিয়াছে, হাজার হাজার পারস্যবাসী উহা হইতে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, কোম্পানীর লোকজনের অনেক টাকা পারস্যেই ব্যয় হইয়া যাইতেছে। প্রথম প্রথম কোম্পানীকে প্রভূত লোকসান দিতে হইয়াছে। বহু অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিবার পর এখন লাভ হইতেছে, ইহা ছাড়া কোম্পানী খনি অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া স্থানটিকে নিরাপদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী করিয়াছেন। এখন কোম্পানীর ইজারার সময় উত্তীর্ণ না হইতেই Concession বন্ধ করিয়া দেওয়া বে-আইনী কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। বৃটিশ সরকারেরও কোম্পানীর সেয়ারে স্বার্থ আছে, তাহা ছাড়া বৃটিশ জাতীয় লোকের স্বার্থ-হানি যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে বৃটিশ সরকার ন্যায়তঃ বাধ্য!"

এইরূপ কথা-কাটাকাটির পর বৃটিশ সরকার হেগের শান্তি-সভায় বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইতে বলেন। পারস্য তাহাতে সম্মত হন নাই। আসল কথা, শাহ রেজা খাঁ নবীন তুর্কীর গাজী মুস্তাফা কামাল পাশারই মত দেশপ্রেমিক শাসক, তাঁহার দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করিবার অনেক পরিকল্পনা আছে, এই হেতু তিনি বিদেশীকে তাঁহার দেশের অর্থ শোষণ (exploitation) করিতে দিবেন না বলিয়া এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তবে তিনি নূতন করিয়া Concession দিতে সম্মত আছেন।



কামাল পাশা

বৃটিশ সিংহও পারস্যের এ দম্ভ সহ্য করিতেন না, যদি না সময় মন্দ হইত! মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে হইলে বৃটিশ পারস্য-সাগরস্থ রণতরীর বহর এখনই পারস্যের বন্দরসমূহ আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া রাখিত, বৃটিশ নৌ-সেনা পারস্যের কাষ্টম হাউস দখল করিয়া রাখিত।

যাহা হউক, এখন যদি ভালয় ভালয় আপোষে বিবাদ মিটাইয়া লওয়া হয়, তবেই জগতের মঙ্গল। এই অর্থ-দুর্ভিক্ষের বাজারে নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলেই সর্ব্বনাশ!

ভারতের অভিভাবক

কোনও ইংরাজ-মহিলা বলিয়াছেন, "ভারতে এখন যেমন ইংরাজের প্রতি বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়, লর্ড রবার্টসের আমলে তাহা ছিল না। লর্ড রবার্টস সত্য সত্যই ভার ভালবাসিতেন, ভারতের কৃষ্টি ও শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার আমলে সদ্বংশজাত ভাল ঘ ছেলেরা ভারতে চাকুরী করিতে যাইত, এখন যে পরীক্ষায় প করে, সেই যায়। কাযেই উভয় জাতির মধ্যে প্রীতির ভ নাই।" সার তেজ বাহাদুরও বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে উভ জাতির মধ্যে যে ছাড়াছাড়ি ভাব দেখা যায়, তিনি তাঁহার দী জীবনের ইতিহাসে তাহা কখনও দেখেন নাই।



তেজ বাহাদুর

বস্তুতঃ এক পক্ষে যেম রাজনৈতিক দাবীর চ বৃদ্ধি হইয়াছে, অপর প তেমনই কঠোর শাসননীতি প্রবর্ত্তন হইয়াছে, ফ একটা ব্যবধানের প্রাচী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কারণ এই যে, মি মেয়ো-শ্রেণীর ড্রেণ-ইনস্পেক্টররা বিদ্বেষ-প্রসূত মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয় অবস্থাটা আরও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের কোন ধার ধারে না, ভারতের কোন খবর রাখে না, এমন এক শ্রেণীর ইংরাজ দাবী করে যে, তাহারাই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত সুহৃদ, অভিভাবক। তাহারাই প্রচার করে যে, ভারতের আন্দোলনকারীরা বিরাট অজ্ঞ জনসাধারণের placid contentment নির্ব্বিকার সন্তোষের সাগরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া চঞ্চল করিয়া দিয়াছে।

সে দিন ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবেতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মৃতি-উৎসব ছিল। তদুপলক্ষে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্কুলের হেড মাষ্টার ছাত্রগণ সঙ্গে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মৃতিস্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতে গিয়াছিলেন। পাদরী ডাক্তার ডিয়ারমার বক্তৃতাকালে বলেন,—"এই বৃটেন যে অসীম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এসিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করেন, তখন হইতেই এই দায়িত্ব আরম্ভ হয়। এই নূতন রাজ্য প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেণ হেষ্টিংসই প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা এই অভিভাবকত্ব (Trusteeship) কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারি না, করিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। অন্ততঃ যত দিন পর্য্যন্ত ভারতের সামাজিক পাপসমূহ দূর না হয়, ভারতের সন্তান-জননীদের মধ্যে মৃত্যুর অত্যধিক হার না হ্রাস হয়, বাল্য-বিধবাদের ভয়াবহ পরিণামের কারণ উচ্ছেদ করা না হয়, হিন্দু বিধবাদের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহারের অবসান না হয়, শ্বাসরুদ্ধকর পর্দা-প্রথা দূর না হয় এবং অত্যাচারমূলক ধর্ম্মাচার-সমর্থিত অস্পৃশ্যতা-পাপের নাগপাশ হইতে ৬ কোটি পারিয়া-দিগের মুক্তিসাধন না হয়, তত দিন ত নহেই!"

কোন ইংরাজ-মহিলা বলিয়াছেন, "ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের মত পবিত্র ধর্ম্মস্থানে এমন মিথ্যাপ্রচার করা ধর্ম্মের ও ভগবানের

অপমান করারই সমতুল। কোমলমতি বালকদের মনে এখন হইতে ভারতবাসীর সম্বন্ধে এমন মিথ্যা ধারণা করাইয়া দেওয়া কত বড় পাপ, তাহা ভারতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। ভারতীয়দের ধর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টির সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন গ্লানি প্রচার যে বিদ্বেষপ্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক্তার ডিয়ারমার আমাদের নিজের দেশের প্রসূতিদের প্রসবকালে মৃত্যুর উচ্চহারের কথা বোধ হয় কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আমাদের এই বৃটেন দ্বীপে গত বৎসর ৩ হাজার প্রসূতি প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এ দেশে বাল্য-বিবাহ নাই সত্য, কিন্তু বালক-বালিকার প্রতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার এ দেশে কিরূপ হয়, তাহা শিক্ষা-বোর্ড ও স্বাস্থ্য-বোর্ডের নিয়ামক ডাক্তার জর্জ্জ নিউম্যানের রিপোর্ট পাঠ করিলেই জানা যায়। আমাদের দেশের দরিদ্র বিধবাকে যদি বহু সন্তানসন্ততিকে মানুষ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের যে অবস্থা হয়, তাহা অপেক্ষা একান্নভুক্ত পরিবারের বিধবাদের অবস্থা অনেক ভাল। আমাদের দেশে Caste নাই বটে, কিন্তু Class আছে, সেখানকার অস্পৃশ্যতা ভারতের অপেক্ষা কম নহে। আমি এই শ্রেণীর অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কার্য্য করিতেছি। ডাক্তার ডিয়ারমার ইচ্ছা করিলে সমাজে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া যাইতে পারেন। যে সময়ে তৃতীয় গোল টেবিলে ভারতীয় সদস্যরা এ দেশের সদস্যদের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে আমাদের অভিভাবকত্বের ও তাঁহাদের নাবালকত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া এই পাদরীর পক্ষে কি চমৎকার শোভনই হইয়াছে! ডাক্তার ডিয়ারমার স্মরণ রাখিবেন যে, যাহারা কাচের ঘরে বাস করে, তাহাদের পরের ঘরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা নিরাপদ নহে।"

ডাক্তার ডিয়ারমারকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। তিনি যদি হ্যাভেলক এলিসের কেতাব পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঘরের অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আরও প্রমাণ চাহেন যদি, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা জার্ম্মাণীর মনীষী পণ্ডিত ডাক্তার আর, ডি, ক্রাফট এবিংএর "সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস" নামক অমূল্য গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণের ইংরাজী অনুবাদখানি পাঠ করিতে বলি। উহা নিউইয়র্ক সহরের মিঃ এফ, জে, রেবম্যান কর্ত্তৃক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি তাঁহার প্রতীচ্য সমাজের যৌন-সম্পর্কিত নানা চমৎকার তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং ভারতবাসী স্বপ্নেও সে সব কল্পনা কখনও করিতে পারে কি না, খোঁজ লইয়া দেখিবেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও সেই প্রকৃতির উদ্ভট ও লজ্জাজনক চিত্র নাই। অথচ সে সকল চিত্র বাস্তব জীবন হইতে—হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ধর্ম্মস্থান ইত্যাদি স্থান হইতে সংগৃহীত। এ সকল সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিতেও যদি প্রতীচ্যের জাতিরা স্বায়ত্তশাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত না হইয়া থাকে, তবে ভারতবাসীদের অবস্থা নৈতিক হিসাবে উহা হইতে শত গুণে ভাল হইলেও ভারতীয়রা বঞ্চিত হইবে কেন?

স্বরাজ-শিশু

লণ্ডনের মেট্রোপোল হোটেলে জামনগরের জাম সাহেব ক্রিকেট-বীর রঞ্জী সার স্যামুয়েল হোরের সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজ-সভায় জাম সাহেব হাইদ্রাবাদের প্রতিনিধি সার আকবর হাইদারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সার স্যামুয়েলের অশেষ গুণব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। এই প্রকৃতির ভোজ-সভার চিরন্তন নীতি অনুসারে ভোজদাতা ও অতিথির মধ্যে পরস্পরের গুণগান হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে এই ভোজ-সভাতেও তাহার ত্রুটি হয় নাই।

সার স্যামুয়েল তাঁহার ভোজের বক্তৃতায় অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে রাজন্যগণের সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। বলাই স্বাভাবিক, কেন না, ভোজ দিতেছেন এক জন খ্যাতনামা রাজন্য, আর অতিথি স্বয়ং ভারত-সচিব, বৃটিশ ও রাজন্য ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সার স্যামুয়েল হোর, বিশেষতঃ যে সময়ে স্যামুয়েলী প্যাটার্ণের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ হইতেছে তাই সার স্যামুয়েল খানাপিনার পর আনন্দ গদ্গদকণ্ঠে রাজন্যগণকে তাঁহার যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছেন,—



সার স্যামুয়েল হোর

"আপনারা আসুন, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করুন। আপনারা আসিলেই যুক্তরাষ্ট্রের অপূর্ণ অঙ্গ ষোলকলায় পূর্ণ হইবে। আপনারাই ভবিষ্যৎ ভারত সরকারে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।" এই আহ্বানের নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। ভারতে গণতন্ত্র-শাসন—শিশু ভূমিষ্ঠ হইতেছে, গোলটেবিলের সূতিকাগারে তাহার ট্যাঁ শব্দ শুনা যাইতেছে, এ সময়ে শিশুর জন্য পাকাপোক্ত ধাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ সদ্যোজাত শিশুকে ত খাঁটী দুধ দেওয়া যাইতে পারে না, শিশু নাবালক নালায়েক অবস্থায় যত দিন থাকিবে, তত দিনও নহে। এই হেতু সেয়কর্‌রা আধাআধি অথবা তিন পোয়া হিসাবে জল মিশ্রিত করিয়া শিশুকে দুধ খাইতে দেওয়া ভবিষ্যদর্শী বুদ্ধিমান্ অভিভাবকের কর্ত্তব্য। তাই সার স্যামুয়েল রাজ্যশাসনে পাকাপোক্ত রাজন্যগণকে ধাত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারাও তাঁহাদের রাজ্যশাসনের সমস্ত অধিকার কড়ায় ক্রান্তিতে সংরক্ষিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার অনুগ্রহ প্রকাশ

করিয়াছেন। সার স্যামুয়েল বলিয়াছেন,—"As a conservative, I have the greatest fear of undiluted democracy, রক্ষণশীল হিসাবে আমি খাঁটি (অমিশ্রিত) গণতন্ত্রকে বড়ই ভয় করি।" এই হেতু ভাগ্যবিধাতা সার স্যামুয়েল অনেক ভাবিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্র মিশাইয়া স্বরাজ-শিশুর উপযোগী সহজপাচ্য খাদ্য যোগাড় করিতেছেন! মাননীয় আগা খাঁ, সার আকবর হাইদারী অথবা জাম সাহেব যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভারত-সচিব আখ্যা দিয়াছেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে বলিয়াই দিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।



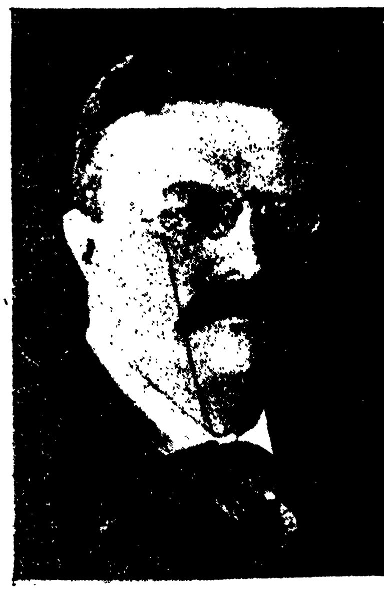
মাননীয় আগা খাঁ

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা

প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। স্পেনের বিপক্ষে যুদ্ধজয় করিয়া মার্কিণ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া লন, দ্বীপবাসীরা স্বাধীনতাপ্রিয়, তাহারা মার্কিণ-কর্ত্তৃত্বের বিপক্ষে বহুবার বিদ্রোহী হইয়াছে এবং সে জন্য বহু দুঃখ-বিপদ বরণ করিয়াছে। তাহাদের সেই বিপদ-কষ্ট নিতান্ত নিরর্থকও হয় নাই। ১ শত ৬০ বৎসর বৃটিশ শাসনের পর ভারতের জন্য রাউণ্ড-টেবিল বসিয়াছে, কিন্তু ফিলিপিনোরা মাত্র ৩৩ বৎসরের মধ্যেই স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। তাহাদের দেশপ্রেমিক নেতা এগুইনাল্ডোর স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।



প্রেসিডেণ্ট হুভার



ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট

গত বৎসর এপ্রেল মাসে মর্কিণ দেশের প্রতিনিধি-সভা ফিলিপাইনকে ৮ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে বলিয়া এক আইনের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেন। ইহার ফলে মার্কিণ ও ফিলিপাইনে খুবই আনন্দ-উৎসব হইয়াছিল। সম্প্রতি মার্কিণের সেনেট সভা প্রতিনিধিসভার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্পদিন পূর্ব্বে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হুভার এই অনুমোদন-সমর্থনে সম্মত হন নাই, তিনি ৮ বৎসরের মধ্যে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দান করিতে চাহেন না। ফিলিপিনোদের অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা ঘাটের কাছে আসিয়া তাহাদের ভরাডুবি হইবে কেন? তবে একটা সান্ত্বনা আছে। হুভারের শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছে, মিঃ রুজভেল্ট নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী এপ্রেল মাস হইতে তিনি শাসনপাটে বসিবেন। তিনি কি নীতি অনুসরণ করিবেন, তাহা এখন কেহ জানে না। সুতরাং ফিলিপিনোদের এখনও যে আশা নাই, তাহা বলা যায় না।

সমর-ঋণ

বৃটেন মার্কিণকে সমর-ঋণের ডিসেম্বর কিস্তি দিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাতে কি মার্কিণের স্বর্ণ-সঞ্চয়-ব্যবসায় মার্কিণ দেশের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারিবে?—প্রতীচ্যের বড় বড় অর্থনীতিকের মনে এখন এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই কিস্তির ঋণ পরিশোধ করিলেন না, অথচ তাঁহারা অন্য দুই একটি য়ুরোপীয় দেশের মত মার্কিণের নিকট বহু স্বর্ণমুদ্রা (ডলার) কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া জমাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসীকেই স্বর্ণ-সঞ্চয়ী বলিয়া দোষ দেওয়া হয়, কিন্তু এ বিষয়ে মার্কিণ, ফ্রান্স বা বেলজিয়ামও ত পশ্চাৎপদ নহেন!

মার্কিণ মুল্লুকের মধ্যে বর্ত্তমানে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষেরও অধিক, এত অধিক বেকার থাকিতে কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণ-সঞ্চয় করিয়াই বা কি করিবেন? সার জর্জ্জ সুষ্টার ভারতের সম্পর্কে একবার ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন,—স্বর্ণ আহার্য্য (inedible) পণ্য নহে। যে দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতিনিধিরূপে এ কথা বলায় আশ্চর্য্য নাই। সার জর্জ্জ লাঙ্গুলহীন শৃগালরূপে আর আর শৃগালের লাঙ্গুল কাটিতে পারিলে পরম সুখী হইতেন, তাহা সবাই জানে। যে সকল দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকেও দলে টানিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণকে এই ভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করার বিলক্ষণ কারণ আছে। নতুবা স্বর্ণের যদি কোন মূল্য না থাকে এবং তাহা যদি 'আহার্য্য পণ্য' না হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও মার্কিণ স্বর্ণ হাত-ছাড়া না করিতে এত ব্যাকুল কেন? বৃটেনই বা ভারতের রপ্তানী স্বর্ণ ঘরে জমা করিতেছেন কেন? বৃটেনের ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে কি তাহা হইলে এত স্বর্ণ জমা থাকিত? সার জর্জ্জ বিলক্ষণ জানেন যে, স্বর্ণ আহার্য্য পণ্য বলিয়া স্বর্ণের মূল্য ধার্য্য করা হয় না, জগতের বাজারে স্বর্ণের বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যায় বলিয়াই স্বর্ণের এত আদর। মহাকবি সেক্সপীয়রের সাইলক বলিয়াছিল, Money breeds, মুদ্রা মুদ্রা প্রসব করে, অর্থাৎ স্বর্ণ জমা থাকিলে জগতের বাজারে সুনাম থাকে, টাকা ধার পাওয়া যায়, বিনিময়ে রণসম্ভার ও অন্যান্য রক্ষাকবচ মিলে।

মার্কিণের কর্ত্তৃপক্ষ এ কথা বিলক্ষণ জানেন বলিয়াই নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও বৃটেন, ইটালী ও জেকোশ্লোভ্যাকিয়ার নিকট স্বর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ স্বর্ণ আপনার ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিতেছেন। ভবিষ্যতে উহাতে কায হইতে পারে;—এই হেতু য়ুরোপের কোনও কাকুতি-মিনতি না শুনিয়া, স্বদেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও স্বর্ণ জমাইয়া রাখিতেছেন। কিন্তু অচির-ভবিষ্যতে মার্কিণকে যে জগতের বাজারে ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্যকে অটল করিবার বিষয়ে অন্যান্য জাতিকে সহায়তা করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, মার্কিণ যদি এ পথ অবলম্বন না করিয়া ক্রমাগত স্বর্ণ সঞ্চয় করিতে থাকেন, তাহা হইলে অচির-ভবিষ্যতে যখন অন্যান্য দেশের দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইবে,—যখন তাহাদের রাজকোষে স্বর্ণ-মুদ্রার নামগন্ধও থাকিবে না এবং তাহার ফলে সত্যই তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পাদির সংরক্ষণ ও পুষ্টির নিমিত্ত স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া অন্য মান ধরিতে হইবে। ভারত যদি আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত, তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে ষ্টার্লিংএর সহিত তাহার রূপেয়ার গাঁটছড়া খুলিয়া দিত। জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া জগতের অর্থের বাজারের এই দুর্দ্দিনে স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া আপনার সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এখন যদি ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও মার্কিণ কাহারও সুখ-সুবিধার দিকে না চাহিয়া আপন ঘরে স্বর্ণ সঞ্চয় করিতে থাকেন, এবং চলতি মুদ্রার মান স্বর্ণে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাহা হইলে অচির-ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বর্ণ-সঞ্চয়ও আর বড় করিতে হইবে না, কেন না, দেনদার দেশ-সমূহের স্বর্ণ দিয়া ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতাও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ঋণের টাকা শোধ না পাইলেও মার্কিণ যুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিবার সাহস করেন না। এ বাজারে যুদ্ধে নামাও যেমন কঠিন, যুদ্ধজয়ের ফলে বিনিময়ে কিছু আদায় করাও তেমনই কঠিন। সে ক্ষেত্রে আগামী এপ্রেল মাসের মধ্যেই মার্কিণকে যাহা হয় কিছু একটা সুব্যবস্থা করিতেই হইবে। রূপেয়ার সহিত ষ্টার্লিং মুদ্রার একটা যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যমানের ব্যবস্থা যে শীঘ্রই করিতে হইবে, তাহা একাধিক অর্থনীতিবিশারদই বলিতেছেন।

পারস্য-সঙ্কট

যে তেলের জন্য পারস্য ও বৃটেন এই দুইটা জাতির মধ্যে এমন বিরোধ, তাহার একটু পরিচয় রাখা প্রয়োজন।

তেলটা যে এখন যানবাহনে লাগে, জ্বালানীতেও লাগে, তাহা নহে, যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষায় তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। অথচ বৃটেন আর সকল দিকে তালেবর হইলেও তেলে আর আর শক্তির অপেক্ষা অনেক নীচে। কারণ, তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে তেল যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা জগতের সমস্ত তেলের শতকরা মাত্র ১॥ ভাগ। নিম্নে একটা হিসাব দিতেছি:—

	১৯১৩ খৃঃ	১৯২৬ খৃঃ	১৯২৭খৃঃ
	গ্যালন	গ্যালন	গ্যালন
জগতে তেলের পরিমাণ	১ হাজার ৩ শত ৫০ কোটি	৩ হাজার ৭ শত ৯৫ কোটি	৪ হাজার ৩ শত ৮০ কোটি ৬০ লক্ষ
বৃটিশ সাম্রাজ্যের "	৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ	৬৭ কোটি ৭০ লক্ষ	৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ

কাযেই প্রতি বৎসরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহির হইতে বৃটেনকে প্রয়োজন অনুসারে তেলের আমদানী করিতে হয় এবং এই হেতু রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অনেক অধিক হয়। ১৯১৩ খৃঃ হইয়াছিল ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ গ্যালন, ১৯২৬ খৃঃ ২শত

৯১ কোটি ৯০ লক্ষ গ্যালন, এবং ১৯২৭ খৃঃ ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন বেশী আমদানী।

জগতের বৃটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া অন্যান্য দেশের তেলের উৎপাদন কি পরিমাণ, তাহার হিসাব এই :—

দেশ	১৯২০ খৃঃ জগতের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা	১৯২৫খৃঃ জগতের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা	১৯২৭ খৃঃ জগতের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা
মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ	৬৩'৮	৭১'৭	৭২'০
রাসিয়া	৩'৬	৪'৪	৫'৬
মেক্সিকো	২৩'৫	১০'১	৫'২
ভেনেজুয়েলা	০'৪	৩'৪	৫'২
পারস্য	১'৮	২'৯	২'০
রুমানিয়া	১'১	১'৫	১'৯
ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	২'৫	২'০	১'৬
ভারত (ব্রহ্ম)	১'১	০'৭	০'৬
সারাওয়াক	০'২	০'৩	০'৪
অন্যান্য	২'৪	৩'০	৫'৫

এই হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়, কেন পারস্যের তেলের দিকে বৃটেনের এত ঝোঁক। 'বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী' ২৫ বৎসর চেষ্টার পর পারস্যে তেলের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই কোম্পানী এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী সংগঠন করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ শেষোক্ত কোম্পানী তেল তুলিতে আরম্ভ করেন। পারস্য-শাহ কোম্পানীকে এ বিষয়ে ১৯০১ খৃঃ হইতে পারস্যে খনিজ পেট্রোল, ন্যাচারাল গ্যাস, এসফাল্ট প্রভৃতি তুলিতে ও বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করেন। সেই অধিকার ৬০ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার এই কোম্পানীর অধিকাংশ সেয়ার ক্রয় করিয়া লন।

এই খনিগুলি দক্ষিণ-পারস্যে পারস্যোপসাগর হইতে ১ শত মাইল দূরে অবস্থিত। কোম্পানী ১৯২২—২৩ এবং ১৯২৩—২৪ খৃষ্টাব্দে ডিভিডেণ্ট দিয়াছে শতকরা ১০ টাকা (ইহা ছাড়া সেয়ারের বোনাস শতকরা ৫০ টাকা)। ১৯২৬—২৭ খৃঃ দিয়াছে শতকরা সাড়ে ১২ টাকা। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে কায কম হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর কায হু হু বাড়িয়াছে, আরও হইবে বিস্তর। কোম্পানীর মোট লাভ এইরূপ :—১৯২৯ খৃঃ ৭৫ লক্ষ ৬ শত পাউণ্ড, ১৯৩০ খৃঃ ৬৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৯১ পাউণ্ড এবং ১৯৩১ খৃঃ ৩৪ লক্ষ ৯ শত ৫১ পাউণ্ড মুদ্রা। কোম্পানীর সম্পত্তি ও খাটান টাকার মূল্য মোট ৬০ ক্রোর টাকা!

কেন বিরোধ, এইবার বুঝা গেল কি ?

প্রশ্ন

প্রারব্ধ, সঞ্চিত কর্ম্ম, আর কর্ম্মফল
অক্ষম মানব—তার এই শুধু চলার সম্বল ?
কিসের পৌরুষ তবে ?—ব্যর্থ ক্রিয়মাণ।
পঙ্গু সে—চলে কি ? সেই অলক্ষ্য বিধান
বিচলিত করে তারে বিপদে ব্যাঘাতে,
পিছু হ'তে আপনি চালায় পদাঘাতে।
—চমৎকার !
ভগবান্ ?—কোথা ভগবান্ !
ভ্রান্তি,—অনুমান ?
নির্গুণ—নিষ্ক্রিয়,—নির্ব্বিকার !
অলঙ্ঘ্য অমোঘ সত্য শুধু সেই স্বেচ্ছাচারী অদৃষ্টাভিধান।
দয়াময় ?—দয়া কোথা !—নির্ব্বাক্,—পাষাণ !

তবু মনে এই প্রশ্ন জাগে,—ললাটে হানিয়া কর ভাবি,—
মর্ম্মন্তুদ বেদনায় মর্ম্মবন্ধ টুটে'
এই যে রোদনধারা উচ্ছুসিয়া উঠে
দৃষ্টির দু'কূল ছাপি',
দীর্ঘশ্বাসে তুলিয়া তুফান,
নিদ্রার প্রশান্তি নাশি', দীর্ঘরাত্রিমান,—
এর কোন অর্থ নাই ?
কোন ঠাঁই
মমতাকোমলপ্রাণ নাই কেহ—
পিতা হোক্, মাতা হোক্, বন্ধু, প্রভু—যার স্নেহ
একবারো ক্ষণতরে জাগি'
ব্যাকুল উন্মুখ হয় মর্ম্মাহত মানবের লাগি' ?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

অবোধ্য

বাঁকীপুরে সে দিন এক প্রকাণ্ড মণ্ডপে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। এক দিকে পুরুষদের স্থান, আর এক দিকে মেয়েদের সকলেই অবহিত-চিত্তে সেই পাঠ শ্রবণ করছিলেন।

খানিকটা পাঠ অগ্রসর হয়েছে, এমন সময় মেয়েদের দিকে একটা মৃদু গোলযোগ শোনা গেল। জানা গেল যে, এক জন স্ত্রীলোকের হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়েছে।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর মূর্চ্ছাভঙ্গ হ'ল।

এমন মূর্চ্ছা হওয়া নতুন নয়, মাঝে মাঝে এ রকম শোনা গিয়েছে। কিন্তু এই ভক্তিমতী রমণীর জীবনের ইতিহাসে একটু নূতনত্ব আছে। সে ইতিহাস শ্রবণের যোগ্য, শুনলে অনেকখানি আলো এসে পড়ে মানুষের এই একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরে, যে আলো মানুষের অন্তরে অপূর্ব্ব আশা আনে, এবং অভিনব আনন্দ দান করে।

তাঁদের অবস্থা সচ্ছল, এবং সমস্ত পরিবার-পরিজনের উপর এমনি একটি সৌজন্যের মধুর ছাপ প'ড়ে আছে যে, দেখলে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। এমন কি, তাঁদের ছেলেটি পর্য্যন্ত যেন কমনীয়তার মূর্ত্তি।

তাঁর জীবনের কাহিনী মহিলাটি যাঁকে বলেছিলেন, তাঁর কাছে শোনা। তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা যত দূর স্মরণ হয়, তাঁদের নিজের কথাতেই বলি।

মহিলাটি বল্লেন, বিবাহের আগে থেকেই মাঝে মাঝে মন যেন কেমন উন্মনা হয়ে যেত—পৃথিবীর এই প্রতিদিন-কার ধূলা-মাটী খড়-কুটা তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠে—সে যেন কোন পরম বস্তুর সন্ধান করত, যেন অচিন্তনীয় কোন মহতো মহীয়ানের সান্নিধ্য অনুভব করত। সেই অপরূপের সন্ধানে সে এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে লাগল।

বিয়ের পর মনের সেই হাতড়ে বেড়ানো, পরশ! মাণিককে খুঁজে ফেরার ভাব আরও গভীর হয়েছে—মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, যে স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করছি, দৃশ্যমান আমাদের এই প্রতিদিনকার জগৎ যেন ছায়ার মত কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে, কোন আশ্চর্য্য জ্যোতির উদয় সম্ভাবনার সামনে। শক্ত পৃথিবীর মাটীর ওপর পা যেন ফস্কে ফস্কে যাচ্ছে!

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গুমট সন্ধ্যায় এক এক সময় হঠাৎ সুদূর দক্ষিণ থেকে আসা অপ্রত্যাশিত জীবন-জুড়ান শীতল বায়ু-প্রবাহের কথা মনে পড়ে কি? মাঝে মাঝে ঠিক যেন তেমনি কিসের কোন সুদক্ষিণ হাওয়ার দমক আমার চিত্ত-তলকে অমৃতের রসে ডুবিয়ে দিয়ে মুগ্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে যেত—সেই মোহের নেশার ঘোরে বিভোর হয়ে তার পর কেটে যেত কত দিন, কত রাত্রি!

এমনি একটা নেশা অথবা স্বপ্ন অথবা মোহেরই ঘোর চলছে সে সময়, কি যে তা, আমিও ঠিক জানি না যে! এমন সময় সহসা এক দিন কাণে এল প্রাণ-জুড়ানো নূপুরের ধ্বনি;—সেই সর্ব্বনেশে নূপুরের ধ্বনি, যা, বহু যুগ পূর্ব্বে এক দিন বৃন্দাবনের বন-ভূমি থেকে বাজতে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত দিকে দিকে ধ্বনিত রণিত হয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে কত নর-নারীকে।

চোখে দেখলাম, দুই মূর্ত্তি, শ্যামা ও কনকবেশে শ্যাম-কান্ত। কি আশ্চর্য্য ভুবনমোহিনী রূপ যার, সমস্ত প্রদীপ্ত সৌর-মণ্ডল যেন পায়ের এক নোখের কোণে লুকিয়ে ম'রে আছে; কি অদ্ভুত রূপ সেই মদনমোহনের, যেন কোটি চন্দ্রের আভা বেরোচ্ছে সেই শ্যামতনু থেকে, মুখে মৃদু হাসি, পরনে পীত বাস, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মোহন বেণুটি পর্য্যন্ত ভুল হয় নি!

মানুষের এই দুটো চোখ যে এত ছোট, এত সীমাবদ্ধ, তা বুঝতে পারলাম প্রথম সেইক্ষণে! এক দিক্ দেখতে গিয়ে আর এক দিক্ দেখতে পায় না, পায়ের পানে চাইলে ধাঁধা লেগে যায়, মুখের দিকে দেখতে গেলে হারিয়ে যায় সব!

তাঁরা বল্লেন, এই যে এসেছি। কথা যে হারিয়ে গেল কোন্ অতলআকুলতায়! জিব নড়ে না, ঠোঁট সরে না।

চুপ করেই দেখতে লাগলাম—সেই অফুরন্ত রূপের মেলা যতখানি পারি দেখতে।

তার পর চেষ্টা ক'রে বল্লাম, "সত্যই কি এলে দীনবন্ধু, আমাকে ভোলালে না ত' মহামায়া!"

তাঁরা হাসলেন, সেই হাসির কিরণে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সমস্ত ঘর। বল্লেন, "ভুল নয়, আমরা যে এসেছি, তার চিহ্ন রেখে যাব তোমার পূজার ঘরে।"

তার পর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন সেই অপরূপ দুই মূর্ত্তি—কিন্তু তাঁদের আশ্চর্য্য প্রভার দীপ্তিতে ভ'রে রৈল ঘর—আমি সেই আলোর ঘোরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

গীতায় শুনেছি, অর্জ্জুনের মত অদ্বিতীয় বীরও সে রূপ সহ্য করতে না পেরে বহু প্রকারে তাঁর দীনতা জানিয়েছিলেন, আমি সামান্য নারী, কেমন ক'রে চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে রাখতে পারব—ঐ বিদ্যুদ্‌ভাসী জ্যোতির সামনে? সেই থেকেই মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলি।

ব'লে তিনি চুপ করলেন। সেই জ্যোতিরই সামান্য রেশ বোধ করি দীপ্তি দিয়েছিল তাঁর মুখ-চোখকে সেই সময়ের জন্য।

তার পর দুই হাত যোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বল্লেন, তার পরদিন সকালে পূজোর ঘরে গিয়ে দেখলাম, দু' যোড়া শ্রীপাদপদ্ম। একযোড়া বড় সামনে, তার পিছনে আর একযোড়া ছোট বালকের মত। স্পষ্ট পরিষ্কার, কে যেন তুলি দিয়ে এঁকে তুলেছে ঐ বর-পাদপদ্ম দু'খানি ঘরের মেঝেয়। সিমেণ্টের মেঝেয় গভীর ব'সে গিয়েছে তাদের দাগ।

তার আগে ত' দশ বৎসর কাটিয়েছি এই বাড়ীতে, একটি রেখাও ছিল না—প্রতিদিনই ত' পূজোর ঘর ধুয়েছি, পাট করেছি।

সেই শ্রীপাদপদ্মের কাছে মাথা রেখে কত কাঁদলাম—'ঠাকুর, এ কি দয়া তোমার, এ অভাজনের জন্য কত দুঃখ সইলে তোমরা! এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত কৃতী, এত সাধু থাকতে এ দীনার ঘরে তোমাদের করুণার অমর চিহ্ন রাখলে; এ কি কৃপা, দয়াল!'

ব'লে আবার খানিকটা তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

আমি বল্লাম, "অতি বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর দয়ার, তাঁর প্রকাশের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে?"

মেয়েটি হাসলেন, বল্লেন, "অথচ ভেবে দেখুন, একেবারে অহেতুক। আমি সাধারণ গৃহস্থের বধূ, সংসারে ডুবে আছি—ঠিক আর দশজনেরই মত। কি আমার সুকৃতি আছে, যার জন্যে এতবড় দয়ার পাত্রী হব আমি? আমি নগণ্য। বাইরের কথা ছেড়ে দিন, এই পাটনা সহরেই জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ভগবদ্‌-ভক্তিতে আমার চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, অথচ তাঁর খেয়াল হ'ল আমাকেই এই অসাধারণ সৌভাগ্য দান করতে! কিছুই ত বুঝতে পারি না!"

আমি বল্লাম, "না, বোঝা যায় না—সে চেষ্টা ক'রে বৃথা পণ্ডশ্রম না করাই ভাল বোধ হয়। আমাদের বোঝবার মাপকাঠী—যে বুদ্ধি, সে হয় ত আঙ্গুলখানেক হবে, তাই নিয়ে সমুদ্রের অগাধ তল মাপতে যাওয়া নিরবচ্ছিন্ন ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি?"

তিনি হাসলেন। বল্লেন, "হবে, সেই কথাই বোধ হয় ঠিক। তাঁর তরফের কথা, তাঁর কৃপার হেতু না হয় নাই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার নিজের দিক্‌টা ত' বোঝা উচিত! আমার কি হ'ল?

এই যে এতবড় সৌভাগ্য—যা লাভ করবার জন্যে যুগ-যুগান্তরের কাহিনীতে পড়েছি, বড় বড় সাধক-তপস্বীরা শত শত বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা করেও ব্যর্থকাম হয়েছেন বহু সময়, এই যে অতি অমূল্য দেব-দর্শন, সেই আমি লাভ করলাম, যার চেয়ে বড় কাম্য কারুর থাকতে পারে না কোনও দিন, অথচ আমার ওপর এর কি ফল হ'ল? আমি যা ছিলাম, আজও সেই মানুষই আছি। একটুও বড় হলাম না, সংসার আমাকে তেমনি মুগ্ধ করছে, কামনা-বাসনার জাল খ'সে পড়ল না ত'! এত বড় যে প্রাপ্তি, সে আমাকে সার্থক করলে কি ক'রে? ভয় হয়, এত বড় কৌস্তুভ-মণির আলো আমার মত মাটীর ঢেলার ওপর প'ড়ে নিষ্ফল না হয়ে যায়—কিছুই ত বুঝতে পারি না।"

আমি বল্লাম, "বোঝাবুঝির ব্যাপারে আমি যে আপনার চেয়ে উঁচু স্থান অধিকার করি, এমন কথা আমার মনে হয় না, মা। তবে এইটুকু উপলব্ধি করি যে, যে যায়গাটা আমরা বুঝতে পারি না, সেই রহস্যতলে আপনার সুকৃতির পরিমাণ বোধ করি হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে আছে। তা নইলে এত বড় সৌভাগ্য হয় না। কৌস্তুভ-মণি যে কি আলো দিলে বা না দিলে, তা বুঝব কেমন ক'রে আমরা অন্ধরা, সে ধরা পড়বে সেই চক্ষুর জহুরীর কাছে, যিনি মণির আলো পরখ করতে করতে নিজেই হলেন নীলকান্ত!"

মেয়েটি হাসলেন, মাথায় হাত ঠেকিয়ে বল্লেন, "সত্যি

কথা, সে জহুরীর পরখের কায়দা আমরা একেবারেই বুঝি না। কিন্তু শুধু যে শ্রীপাদপদ্ম ফুটে উঠল, তা নয়, তার পর আরও আছে।"

"আরও ?"

তিনি বল্লেন, "হাঁ! পাদপদ্মর কথা পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল, তাদের দেখতে বহুলোক আসতে লাগলেন। আমার এক জন বন্ধু বল্লেন, 'দিদি, তোমার পূজোর ঘর নিকে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে দেব কি' ?"

ভাবলাম, এমনি করেই ওঁর সেবার বাসনা হয়েছে, কেন বাধা দোব আমি ? আমাকে উপলক্ষ ক'রে তিনি প্রকাশ হলেন সবার কাছে,—সবাই তাঁকে পাক্ না। বল্লাম, 'হাঁ, বোন্, ইচ্ছা হয় ত কর।'

জানতাম না যে, তার মনে ছিল অন্য অভিসন্ধি, সে চেয়েছিল সেই পাদপদ্মকে কোনও কঠিন বস্তু দিয়ে ঘষে মুছে দিতে। কিন্তু তার অভিলাষ পূর্ণ হ'ল না, মাটীতে গভীর ব'সে যাওয়া সেই শ্রীপাদপদ্মের দাগ কিছুতেই মুছল না।

তার দুই এক দিনের মধ্যেই কিন্তু মাছ কুটতে গিয়ে আঙ্গুলে কাঁটা ফুটে হাতের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠল। কিছুতেই সারে না, তার তাড়সে জ্বরও হ'ল। ডাক্তার এসে দেখে শঙ্কিত হলেন, হাতে পচ ধরেছে, শেষ পর্য্যন্ত কি যে দাঁড়াবে, কিছুই বলা যায় না।

এই ব্যাপারে এবং হাতের অসহ্য যন্ত্রণায় আমার বন্ধু ভয় পেয়ে গেল ; সে অবশেষে ব'লে ফেল্লে যে, সে ঐ হাত দিয়েই শ্রীপাদ-পদ্ম মুছে ফেলতে চেয়েছিল, এবং আমাকে খবর দিতে বল্লে।

শুনে কান্না এল, এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এতটুকু জিনিষও তোমার চোখ এড়াতে পারে না, না প্রভু !

সে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, তাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। বল্লাম, ভুল না হয় করেছ, অন্যায়ই না হয় করেছ, তাতে হয়েছে কি ? অন্যায়কে ক্ষমা করবার জন্যে ত তিনি সব সময়েই প্রস্তুত রয়েছেন বোন্, তা নইলে কি দুনিয়া একটি দিনও চলতে পারত ?

তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে সেই শ্রীপাদপদ্মকে প্রণাম ক'রে বল্লাম, ঠাকুর, সারিয়ে দেও ওর হাতের যন্ত্রণা, হাতের পচ। ও তোমারই ওপর লোভের জন্য ঠাকুর ! তোমার পাদ-পদ্মকে কামনা করেই ত' ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করেছে। তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম যদি ওর ঘরে ফুটত ত' ও ত' তাকে মুছতে যেত না, ওর ঘরে না ফোটার তীব্র হতাশাই ত' ওকে এ কাষ করিয়েছে। তোমার ওপর অতি ভালবাসাই ত' ওকে বিপথে নিয়ে গেছে—এ যদি তুমি না দেখো ত' কে দেখবে, ঠাকুর। সারিয়ে দেও প্রভু, ওর হাত সারিয়ে দেও।

তাকে সেই পাদ-পদ্মের জল খাইয়ে দিলাম, মাথায়, মুখে, হাতে দিলাম। তার পর সেরে গেল তার সেই হাতের দারুণ যন্ত্রণা, সেই পচ ধরা।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ নর,
স্বদেশ-কল্যাণে আত্মনিবেদিত-প্রাণ,
সরস্বতী-বরপুত্র বৈজ্ঞানিক-বর
দ্বিসপ্ততিতম বর্ষে আজি আগুয়ান।

জয়ন্তী-উৎসব তাঁর প্রতি প্রতিষ্ঠানে
মহানন্দে আজি তাই হয় অনুষ্ঠিত,
কিন্তু তিনি সর্ব্বকালে আর সর্ব্বস্থানে
প্রশংসা বা নিন্দায় নহেন বিচলিত।

ল'য়ে সদানন্দময় বালকের প্রাণ
একাগ্র-মনেতে নিজ সাধনায় রত,
শুধু মানবের হিত উদ্দেশ্য মহান্
একমাত্র তপ তাঁর জীবনের ব্রত !

কামিনী-কাঞ্চনে তপ টলে না কো তাঁর,
স্থির লক্ষ্য অচল অটল নির্ব্বিকার।

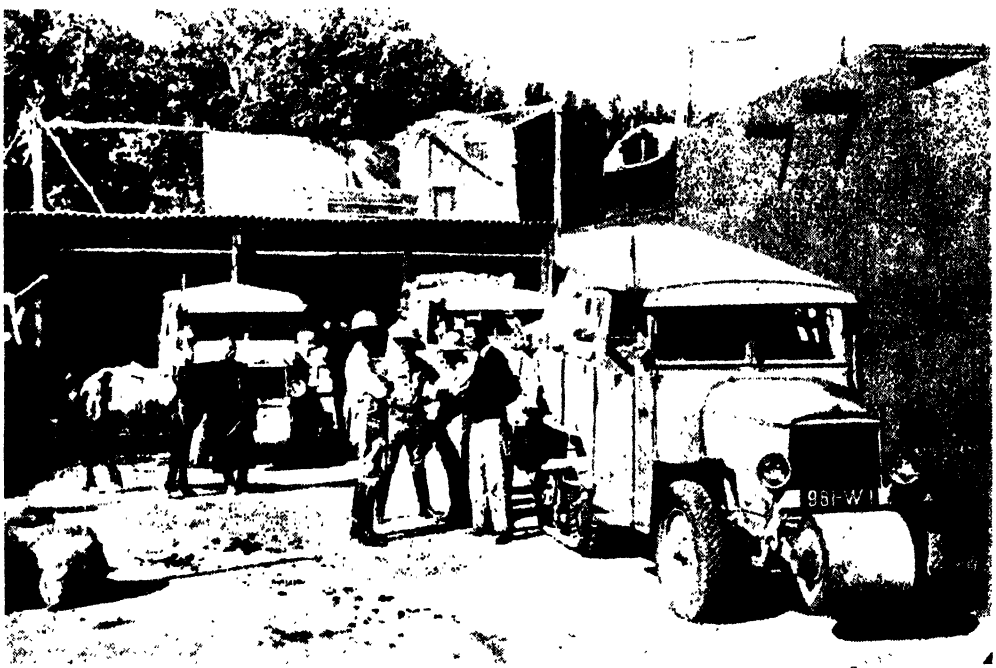
শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মধ্য-এসিয়া

আমেরিকার "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্ সোসাইটীর" এক দল প্রত্নতাত্ত্বিক সিট্রোন্ মোটর-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মধ্য-এসিয়ার মরু-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভূমধ্যসাগর হইতে যাত্রা করিয়া পীত নদ পর্য্যন্ত মোটরযোগে গমন করিয়াছিলেন। এই অভিযানে তাঁহারা বহু অজ্ঞাত দেশ ও অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। দলের অন্যতম নেতা মিঃ মেনার্ড ওয়েন উইলিয়মস্ এ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। "মাসিক বসুমতীর" পাঠকবর্গের জন্য সংক্ষেপে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল।

অভিযানকারীরা চীনদেশ অতিক্রম করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। উহা প্রথমতঃ না-মঞ্জুর হয়। কিন্তু পরে আবার তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু সিন্‌কিয়াং নামক স্থানের শাসক স্বৈর শাসনের ভক্ত। দুরতিক্রম্য মরু-প্রান্তর তাঁহার জনপদকে অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া তিনি অভিযানকারীদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই দলটি খনিজ তৈল, কিংবা প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত মূল্যবান্ দ্রব্যাদির সন্ধানে আসিয়াছে। অথবা সার্ব্বভৌম টুরাণী শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন কিংবা চীনের রাষ্ট্রনীতিকে ব্যর্থ করিবার কল্পনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; এমন কি, সিন্‌কিয়াংএর শাসককে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে, এমনই ভাবের নানাবিধ বিষয়ে এই দলটির সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। শেষকালে তিনি এমনও ভাবিয়াছিলেন যে, জাপানীদিগের জন্য দলটি সাজোয়া গাড়ী লইয়া পাইপিং অভিমুখে চলিয়াছেন।

অবশ্য সিন্‌কিয়াংএর শাসকের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। য়ুরোপীয়গণ এ সকল স্থানে সম্পূর্ণ নিরুপায়। যাহা হউক, অবশেষে শাসক তাঁহাদিগের অগ্র-গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মধ্য-যুগে য়ুরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং ব্যবসায়ীরা মধ্য-এসিয়ায় সমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন।



অভিযানকারীরা আকৃসু ত্যাগ করিতেছেন

মরু-সমুদ্রে তিন দিন মোটর চালাইয়া অভিযানকারীরা কিজিলের গুহা-সন্নিস্থিত মালভূমিতে উপনীত হইলেন। এখানকার মন্দির-সমুহ অতিপবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। কিজিলের কোনও গুহা-মন্দিরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্যানুসন্ধান নিষিদ্ধ। গুহামন্দিরগুলির মধ্যে গান্ধার ও বামীয় শিল্পকলার অজস্র নিদর্শন আছে।

কোনও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অশোক বুদ্ধকে ভূমি বা পৃথিবী উৎসর্গ করিতেছেন। একটি চিত্রে দ্বিমুখ ঈগল পক্ষী গানীমিডের মত একটি মূর্ত্তিকে ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কঞ্চুলিকা-পরিহিতা নারীর পীনদ্ধ দেহ স্বচ্ছ গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া দর্শককে মুগ্ধ করে, এমন চিত্রও প্রাচীরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অভিযানকারীরা তাড়াতাড়ি এই সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া কুচা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে কিজিল যেরূপ দর্শনীয়, নৃতত্ত্ববিদের কাছে কুচাও সেইরূপ মূল্যবান্ ও দর্শনীয়।

ইতিহাসে কুচা প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এক সময়ে উহা মধ্য-এসিয়ার প্রধান সহর ছিল। ট্যাংসদিগের রাজসভায় কুচার সঙ্গীতজ্ঞ এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকীর সমাগম হইত। কুচায়িয়াস্ ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য অনুবাদিত হইয়া সুদূর প্রাচ্যে প্রসারলাভও করিয়াছিল।

কুচার জনসঙ্ঘ পূর্ব্বে কখনও মোটর-গাড়ী দেখে নাই। কাযেই অভিযানকারীরা যখন নগর হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন পথে ভিড় জমিয়া উঠিতেছিল। তরুণী তুর্ক-রমণীরা স্বাধীনভাবে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না; তথাপি তাহাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না।

কারা সহর চীন অধিকার-সীমার অন্তর্গত। অভিযানকারীরা কারা সহরে পৌছিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা চীন-সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণ তুর্ক। এখানে চীনা মন্দির বিদ্যমান। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অভিযানকারীদিগকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন

তথা হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা টোকোসন্এ আসিলেন। এইখানে তাঁহারা, লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার ভিক্টর পয়েন্ট, পেট্রো ও চভেটএর দলের সহিত মিলিত হইলেন। এই শেষোক্ত দল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে টিনসিন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য পথে মধ্য-এসিয়ার অন্যান্য অংশ দর্শন করিয়া আসিবেন কথা ছিল।



কারাখোজয় অভিযানকারিগণ

কম্যাণ্ডার পয়েণ্ট কি প্রকারে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাধা করেন, তাহার সমগ্র কাহিনী মিঃ মেনার্ড ওয়েন উইলিয়ামস্ প্রভৃতিকে বর্ণনা করেন। তাঁহারাও মোটর-গাড়ী ও মোটর-লরী লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত চীন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারীর দলও যোগ দিয়াছিলেন। ডাঃ মু মিং ই কুয়োমিণ্টাং দলের এক জন প্রতিপত্তিশালী সদস্য। দুই জন চীনা সামরিক কর্ম্মচারীও তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—জেনারেল ইয়াও এবং লেফটেনাণ্ট কর্ণেল তাও। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ মিঃ লিও, ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ ইয়ং এবং এক জন সাংবাদিক, এক জন ছাত্র এবং জনৈক সেক্রেটারীও সে দলকে পুষ্ট করিয়াছিলেন।

মে মাসের শেষে ঐ দল গোবি মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ করেন। ১২ শত ৫০ মাইল পথ মরু-সমুদ্রের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার উপযোগী প্রচুর গ্যাসের প্রয়োজন। তাঁহারা সেই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, পাইপিং হইতে ফরাসী দুতনিবাসের কর্ত্তা বে-তার-বার্ত্তায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সিন্‌কিয়াং সীমান্তপ্রদেশে তাঁহাদের দুই প্রস্থ রসদাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে। উনিশ দিন পরে অতি কষ্টে তাঁহারা সুচৌ সহরে গমন করেন।

সেখানে পৌছিয়া বেতার-বার্ত্তায় ফরাসী দুত-নিবাস হইতে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, সিন্‌কিয়াংএর শাসক তাঁহাদিগকে সে অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দিবেন, কিন্তু সর্ত্ত এই যে, কোনও চীনা প্রবেশ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় সংবাদ—সিনকিয়াংএ মুসলমান-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। সুতরাং অভিযানকারীরা বিব্রত হইয়া উঠিলেন। সহকর্ম্মী চীন ভদ্রলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া গেলে চীনরাজ্য দিয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হইবে।



দুর্গম পথে অভিযানকারীরা

পরদিন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, সেনাপতি তাঁহাদিগকে সুচৌ পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বেতার-বার্ত্তা অথবা সরকারী তার-বিভাগের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা জগতের সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত হইলেন। পরদিবস তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, বিদ্রোহজনিত অবস্থায় পথ-ঘাট বিপজ্জনক বলিয়া



মোটর-গাড়ীর জন্য পথ প্রস্তুত হইতেছে



মুর্টুকের বালকদল।



মুর্টুকের জননী ও শিশুর দোলা



সিন্‌.কিয়াংএর একটি দৃশ্য

তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে না। তবে মরু-ভূমির মধ্য দিয়া সিন্‌সকিয়াংএ প্রবেশ করা যাইতে পারে।

হিমাই বা কুয়োমূল অঞ্চলে বিদ্রোহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। টুংগানরা (কান্‌সুর চীনা মুসলমান) জেনারেল মাচুংইংএর দ্বারা চালিত হইয়া সিন্‌কিয়াং অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায়ও অভিযানকারীরা অশান্ত সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিলেন। তাই চীন-শাসকের আদেশ অমান্য করিয়াই কম্যাণ্ডার পয়েণ্ট সদলবলে (চীনা বন্ধুদিগকে লইয়া) অগ্রসর হইলেন।



সান্ সান্ ও কোমুলের পথে

পাঁচ দিন ধরিয়া তাঁহারা মাসুন্‌সান্ পর্ব্বতমালার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, তার পর সিন্‌কিয়াংএর সন্নিহিত হইলেন। সেইখানে শেষ সার্থবাহ-দল একটি কূপ-সন্নিধানে সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। যদি কাহারও বিপদে পড়িতে না ইচ্ছা হয়, তবে পর্ব্বতমালার দিকে যেন তাহারা পলায়ন করে। কিন্তু অভিযানকারীরা ভীত না হইয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি চীনা পল্লীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, পল্লী জনশূন্য। একটি বৃদ্ধা অশ্রুপ্লুত-নেত্রে সংবাদ দিল যে, হামির প্রবেশপথে যে কোনও মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বাধিতে পারে।

মোটর-গাড়ী দ্রুত চলিল। কিছু দূর গিয়া তাঁহারা যুদ্ধের নিদর্শন দেখিতে পাইলেন। মৃত অশ্ব, ভূ-শায়িত শকট, মৃতদেহ পথের ধারে ধারে পড়িয়া আছে। নারী ও শিশুরা বিশৃঙ্খলভাবে এক এক স্থানে জড় হইয়া রহিয়াছে।

চীনা মুসলমানরা (চ্যাণ্টো) অব্যর্থলক্ষ্য। সুতরাং চীনারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অভিযানকারীদিগের ৯খানা মোটরগাড়ী অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়ায় আক্রমণকারীরা ইতস্ততঃ করিয়া বালিয়াড়ীর পশ্চাতে আত্ম-গোপন করিয়াছে। তাহা না হইলে চীনাদের সকলকেই তাহারা হত্যা করিত। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই চীনারা নূতন সেনাদলের সাহায্য লাভ করিল পথ বাধামুক্ত জানিয়া অভিযানকারীরা পুনরায় যাত্রারম্ভ করিলেন।

চীনা তুর্কীস্থানের তিনটি পবিত্র স্থানের মধ্যে হামি অন্যতম। এখানে দুইটি দুর্গ আছে। তন্মধ্যে একটি চীনাদের। কুয়োমূলে পূর্ব্বে এক জন মুসলমান রাজ

ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতাপ! সিয়াংকিংএর শাসক, উক্ত মুসলমান রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে যুবরাজ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সেই স্থানে এক জন চীনা রাজকর্ম্মচারীকে বসাইয়াছিলেন। উহা এক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এই ব্যাপার উপলক্ষে এই বিদ্রোহের অভ্যুদয়।

কুয়োমুলে পৌছিয়া তাঁহারা যুবরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, চ্যাণ্টোদিগের দ্বারা তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না। এই বলিয়া তিনি নিজের দূতের দ্বারা চারিদিকে সেই মাত্র একখানি মোটরগাড়ী চড়িয়া তথায় গেলেন। বাকিগুলি তুর্ফানে রাখিয়া গেলেন। সেখানে রীতিমত অভ্যর্থিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মোটর-গাড়ী চাহিয়া তাঁহারা উহা পাইলেন না। শাসকের সঙ্গে দেখা করিবারও অনুমতি মিলিল না।

তিন দিন পরে সিংকিয়াংএর পররাষ্ট্র-সচিব তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তুর্ফান হইতে বাকী দল ও গাড়ীগুলির জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কম্যাণ্ডার পয়েন্ট জানাইলেন যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহ সেখান



গোবি মরুভূমি-মধ্যস্থ কূপ

সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অভিযানকারীরা মরুভূমির পথে হামি ত্যাগ করিলেন। কিছু দূর যাইবার পর চ্যাণ্টো অশ্বারোহীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। গাড়ীর মধ্যে চীনা পণ্ডিতরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। পর-দিবস সকালবেলা কোনও অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ মিলিল না।

তুর্ফানে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। সেখানে সিংকিয়াংএর শাসকের নিকট হইতে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে সদলবলে উরুম্চি যাইতে হইবে। কমাণ্ডার পয়েন্ট চীনাপণ্ডিতগণের সহিত হইতে নড়িবে না। পররাষ্ট্র-সচিব তাঁহাকে বলিলেন যে, তবে তিনি সেই আদেশলিপি পাঠাইয়া দিন। কিন্তু কম্যাণ্ডার পয়েন্ট তাহাতে সম্মত হইলেন না।

এক সপ্তাহ আবদ্ধ থাকিবার পর, অগত্যা তাঁহাকে আদেশ দিতে হইল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, নানকিং হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এ সময়ে অভিযানকারীরা যাত্রা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, কোথাও যাইতে পাইবেন না। মিঃ হার্ডকে সংবাদ দিবারও উপায় রহিল না। সেনাদল তাঁহাদের প্রত্যেক গতিবিধি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল।



কুয়োমুলের কারুকার্য্য



কুয়োমুলের মোহর ক্ষোদাই



মধ্য-এসিয়ার উষ্ট্রযূথ



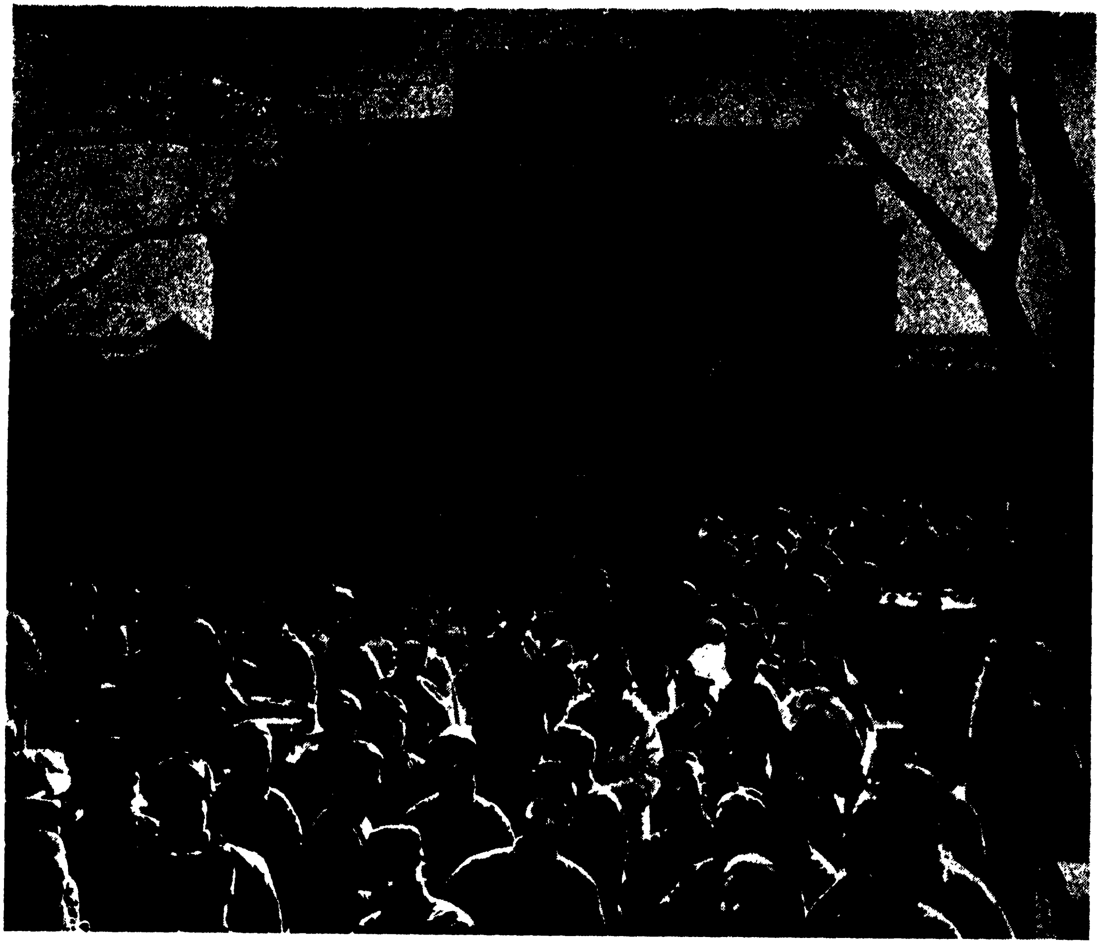
বিদুষী মঙ্গোল রাজকুমারী



খৃষ্ট মন্দির-সংলগ্ন দিনপঞ্জিকা



চীনা কবর



স্বচৌ—দেবতার সম্মুখে অভিনয়

অবশেষে এক মাস পরে মোটর-গাড়ীর শব্দে বেতার-বার্ত্তার শব্দকে গোপন করিয়া তাঁহারা পামীর দল এবং ফরাসী বৈদেশিক কার্য্যালয়ে বেতার-বার্ত্তায় সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া গভর্ণরকে বুঝাইয়া অবশেষে ৯খানি গাড়ীর মধ্যে ৪খানি গাড়ী কাশগরের পথে মিঃ হার্ডের জন্য পাঠান হইল। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য কম্যাণ্ডার পয়েণ্টকে বেতার যন্ত্র লইয়া যাইতে হইবে স্থির হইল।

পরের দিন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, হার্ডের দল কারা সহর ত্যাগ করিয়াছেন। তাই তিনি সদলবলে টোফোসনএ চলিয়া আসিয়াছেন।

কম্যাণ্ডার পয়েণ্টের নিকট সকল সংবাদ শুনিয়া মিঃ মেনার্ড ওয়েন্ উইলিয়ম্স্ সদলবলে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। তার পর তাঁহারা উরুম্চি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিয়াংকিয়াংএ পৌছিয়া গবর্ণরের নিকট তাঁহারা বিশেষ সমাদর লাভ করিলেন। কম্যাণ্ডার পয়েণ্ট-এর সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সেরূপ ব্যবহারের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

উরুমুচিতে তাঁহারা কয়েক দিন যাপন করিলেন। সেখানে এক জন মোঙ্গল রাজপুত্রীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে। ইনি বিদুষী—ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রতীচ্য জাতি কেন প্রাচ্য জাতিকে পছন্দ করে না অথবা প্রাচ্য প্রতীচ্যকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না, এই আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে উত্থিত হয়। এই



সুচৌএর মন্দির-সম্মুখে নরকোৎসব

বিদুষী নারী বলেন, "আপনারা বিদেশীকে আপনাদের ক্লাবে বা গৃহে সকল সময় প্রবেশাধিকার দেন কি ? প্রাচ্য অবশ্য তাহাদের বিরাট প্রাচীর তুলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য জাতি তাহাতেও নিরাপদ নহে। প্রাচ্য জাতি তাহাদের শুধু সম্পত্তি নিরাপদ রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহে, তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও যাহাতে নিরাপদ হয়, ইহাও তাহাদের বাসনা। আপনাদের জীবনযাত্রার প্রণালী হয় ত আপনাদের পক্ষে উপযোগী ; কিন্তু উহা আমাদিগের জীবনযাত্রাপ্রণালীর পক্ষে বিশেষ শঙ্কার কারণ। আপনারা সব কায তাড়াতাড়ি করিতে চাহেন, সেজন্য আপনারা অনেকটা বর্ব্বরস্বভাব-সম্পন্ন। আপনারা যন্ত্রপুত্তলের দ্বারা মুগ্ধ, কিন্তু তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আপনারা সরলতা ভালবাসেন বটে ; কিন্তু যখন ঠিক বুঝিতে পারেন না, তখনও বাহিরের শিষ্টাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগতের আদর্শকে আপনারা চালাইতেছেন ; কিন্তু উহার সহিত আমাদের আদর্শের বিশেষ পার্থক্য আছে।

মহিলাটি বলিয়া চলিলেন, "আপনারা রেল, মোটর-গাড়ী, রেডিও লইয়া কারবার করেন। এ দেশে আসিয়া আপনারা দেখেন যে, পথ-ঘাট নাই; দ্রুতগতি নাই, সংবাদপত্র তেমন নাই। পরিচিত ন্যায়বিচার প্রভৃতি নাই। সুতরাং আপনারা চীনাদিগকে করুণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু তাহারা স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছে। আপনাদের প্রগতি অন্ধতমসাবৃত, অন্ততঃ প্রাচ্যবাসীর কাছে। কারণ, প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল্য আপনারা এখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা মোঙ্গল জাতি অল্পে সন্তুষ্ট—একটি ঘোড়া এবং ভগবানের আকাশতলে সুবিস্তৃত প্রান্তর। উহাই আমাদের কাম্য।

"আমার এক খুল্লতাত আছেন। তিনি বুদ্ধের এক জন পূজারী। প্রতীচ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সংস্রব নাই। অনেকের নামই তিনি জানেন না। তিনি বলিয়াছেন, প্রতীচ্য জাতির মধ্যে জীবনস্পন্দন আছে, কিন্তু এখনও



চীনা কথক

আলোকের সাক্ষাৎ পায় নাই। তবে এক দিন পাইবে। এখন তাহারা বস্তুতান্ত্রিকতার মোহে বিমূঢ়—তাই আলোক প্রদীপ্ত হইতে পারিতেছে না।"

উরুমচি হইতে পাইপিংএর দূরত্ব ২ হাজার ৩ শত মাইল। অভিযানকারীদিগের তুই দল রসদবাহীকে আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী নেতা মাচংইং অভিযানকারীদিগের জন্য পথে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বহু রসদ সে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।

উরুমচি হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা বাজাকুলিকএ

গমন করিলেন। এইখানে বহু বৌদ্ধ-গুহা আছে। সেই গুহাগুলি দর্শনের পর তাঁহারা মুটু‍্কএ পৌছিলেন। সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহারা কারাখোজা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইখানে অভিযানকারীদিগের প্রধান দলের সহিত তাঁহাদের সম্মেলন হইল।



কানচাউ সহরের মুণ্ডহীন দেবতা

পথে কদাচিৎ তাঁহারা শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। দিনের পর দিন তাঁহারা মোটরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন! প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতেও চালক মোটর চালাইতে লাগিল। সুচৌ, নিঙ্গসিয়া, পাওটৌ, পেলিংমিয়ও, কালগান এবং নান্‌কাউ প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট আশ্রয় পাইলেন। মোটরগাড়ী সমস্ত দিবস চালান হইত, শুধু রাত্রি ২টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত মানুষ ও গাড়ী বিশ্রামের অবকাশ পাইত।

মোটরগাড়ীর সঙ্গে রন্ধনশালার গাড়ী সন্নিবদ্ধ ছিল। শীতের রাত্রিতে গরম গরম ঝোল ও খাদ্য পাইয়া অভিযানকারীরা যথেষ্ট আনন্দ পাইতে লাগিলেন।

কুয়োমুলে আসিয়া তাঁহারা একটি তুর্কীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১ শত মাইল দূরবর্ত্তী হিংসিংসিয়া পৌছিলেন। মরুপথের সর্ব্বত্রই যুদ্ধের অবশেষ দেখিতে দেখিতে তাঁহারা চলিয়াছিলেন। আন্‌সি তখন মাচুংইংএর দখলে রহিয়াছে। সোজা পথে চলিলে, তাঁহারা যেখানে মৃত্তিকানিম্নে গ্যাসোলিনের আধারগুলি পূর্ব্ব হইতেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় যাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্রোহী নেতা মাচুংইংএর হাতে পড়িবার ভয় আছে। অভিযানকারীদিগের এক জন সাহসে ভর করিয়া একখানি মোটরগাড়ী লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোন বাধা ঘটিল না। প্রচুর তৈল লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহারা তখন সুচৌ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহারা দলে দলে পলাতকদিগকে দেখিতে পাইলেন। সুচৌএ সৈন্যাধ্যক্ষ সম্প্রতি একটি চতুর্দ্দশী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অভিযানকারীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, একবাক্স মোটরে ব্যবহৃত তৈল পাঠাইয়া দিলে তাঁহারা কিরূপে অগ্রসর হইতে পারেন, সে জন্য তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা চলিতে পারে।

ইতিমধ্যে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, বিদ্রোহী নেতা মাচুংইং সদলবলে ক্রমেই নিকটে আসিয়া পড়িতেছে। পরদিবস অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযানকারীরা অগ্রগমনের অনুমতি পাইলেন। তাঁহারা সহর ত্যাগ করিবার ২৪ ঘণ্টা পরে মাচুংইঙ্গের সেনাদল সুচৌ প্রবেশ করে।

অভিযানকারীরা ততক্ষণে কাওটাইএ পৌছিয়াছিলেন। নগরের তোরণদ্বারে একটি দস্যুর মস্তক ঝুলিতেছিল।



চীনা বালকদল



কান্‌চাউ সহর হইতে বড়দিনের ভেট প্রেরণ



কানচাউ সহরের প্রাতরাশ



নিংসিয়ার মন্দির



চুংস্থই বিরাট প্রাচীরের সন্নিকটে অভিযানকারীরা



নদী ও বালিয়াড়ী—পথের সন্ধানে অভিযানকারীরা



গর্দ্দভ-সাহায্যে বালিয়াড়ী অতিক্রম



সান্‌চেন্‌ ফুং নগর

তাঁহারা তথা হইতে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলেন। কানচৌ সহর তখনও শান্ত ছিল। মন্দিরদেবতাগুলির শান্তি তখনও অব্যাহত ছিল। সেনাদল "নিদ্রিত বুদ্ধের" প্রকাণ্ড মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল।

কানচৌ হইতে লিয়াংচৌ পর্য্যন্ত পথ নিরুপদ্রব ছিল না। পশ্চাতে মাচুংইং লুণ্ঠনের আশায় আসিতেছে, কাযেই অভিযানকারীদিগের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। চলিতে চলিতে তাঁহারা দস্যু-অধ্যুষিত একটি গ্রামে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিলম্ব করা চলিতে পারে না। বিপদের আশঙ্কা আছে। সুতরাং মোটর-চালিত গাড়ীগুলি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। একক্রমে ৫২ ঘণ্টা গাড়ী চালাইয়া তাঁহারা লিয়াংচৌ পৌছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা সংবাদপত্রের মুখ দেখিতে পাইলেন। "নর্থ চায়না ষ্টার" নামক সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় তাঁহারা দেখিলেন, উহাতে ২০ দিন পূর্ব্বের সংবাদ মুদ্রিত।

লিয়াংচৌএ বিশ্রাম করিবার পর অভিযানকারীরা অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন। এখন তাঁহাদিগকে উত্তরাভিমুখে যাইতে হইবে। উরুমচি হইতে পাইপিং যত পথ, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র তাঁহারা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাকী পথই দুর্গম। মোটরে যে পথ ভাল রাস্তায় ৬ ঘণ্টায় অতিক্রম করা চলে, তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন, সে স্থানে ৬ দিন লাগিবে। জনমানববর্জ্জিত অধিকাংশ স্থান এমনই দুর্গম যে, সে পথে মোটর চালনা করা সহজসাধ্য নহে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহারা টাটসিং নামক স্থানের একটি অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পান্থশালায় উপনীত হইলেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া হংসুই নামক একটি গ্রামে তাঁহারা পৌছিলেন। এখানে শীত প্রচণ্ড—গ্রাম সুপ্তিমগ্ন। কোনও চীনা সহরে বিদেশীরা যদি রাত্রিকালে আগমন করে, তখন নিঃশব্দে থাকাই সঙ্গত। তাঁহারা হুংসুইএ পৌছিলে সুষুপ্ত গ্রাম সহসা জাগিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের গাড়ীগুলির কাছে বেশ একটা



লিয়াংচাউএর পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসপ্রায় তীর্থস্থান

জনতা হইল। চীনের প্রাচীর পার হইয়া তাহারা দেখিতে আসিয়াছে, বিদেশীরা কিরূপ শ্রেণীর মানুষ—ইহাদের সঙ্গে কি প্রকারের যন্ত্র রহিয়াছে।

বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। পাটুন নামক স্থানে আসিয়া তাঁহারা একটা স্মৃতি-প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। খৃষ্টান সেনাপতি ফেং, ৩৩ জন সহচর সহ এখানে একটি পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কাইটংজি পার হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বালিয়াড়ীর

দর্শন পাইতে লাগিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বালিয়াড়ীর আকার ততই বাড়িতে লাগিল। কোন কোনটির উচ্চতা ৬ শত ফুট হইবে। এইরূপ বালিয়াড়ীর জন্য পথে তাঁহাদের অগ্রগমনে বিঘ্ন ঘটিতেছিল।

পথিমধ্যে এক জন সেনাপতির সমাধি-মন্দির তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। ২ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সমাধি-সৌধটি এখনও ভাল অবস্থায় রহিয়াছে।



মঙ্গোল দর্শক

নিংসিয়ার ২০ মাইল দক্ষিণভাগে তাঁহারা আর একটি মন্দির দেখিতে পাইলেন। এই মন্দিরের আলোক-চিত্রও তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। এই মন্দিরের বর্ণ-সমাবেশ অতি চমৎকার। নিংসিয়া সহর নূতন ও পুরাতনের মিলনক্ষেত্র। পূর্ব্বে যেখানে কনফিউসীয়দিগের মন্দির ছিল, এখন সেখানে প্রথম প্রাদেশিক মধ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিতলের ড্রাম টাওয়ারে সান্ ইয়াট্‌সেনের একখানি ছবি আছে। এইখানে তাঁহার প্রধান কার্য্যালয়। অনেকগুলি মন্দির পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরে সেনাদল বাস করিতেছে।

অভিযানকারীরা নিংসিয়া ত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ীগুলি মন্থরগতিতে চলিতেছিল। সহসা তাঁহারা এক জন চীনা যুবককে বন্দুক ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলেন। ক্রমে দেখিলেন, এখানে সেখানে চীনারা ওত পাতিয়া বসিয়া আছে।

তাঁহারা ক্রমে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহারাও আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে কলের কামান আছে, এই ধারণা জন্মাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা উপর্য্যুপরি চারিবার বন্দুক ছুড়িলেন। একটু থামিয়া আবার ৪ বার গুলী নিক্ষিপ্ত হইল। আবার একটু পরে পুনরায় উপর্য্যুপরি গুলী ছুড়িবার পর দেখা গেল, চীনা বারিকে একটি পতাকা উড়িতেছে। তখন উভয় পক্ষের লোকজন পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। অবশেষে জানা গেল যে, একটু ভুল বুঝিয়াই চীনারা প্রথমে গুলী ছুড়িয়াছিল।

পথে নদী পড়িল। তক্তার নৌকায় গাড়ীগুলিকে পার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এক দিনে ৩ খানির অধিক গাড়ী পার করা চলিবে না।

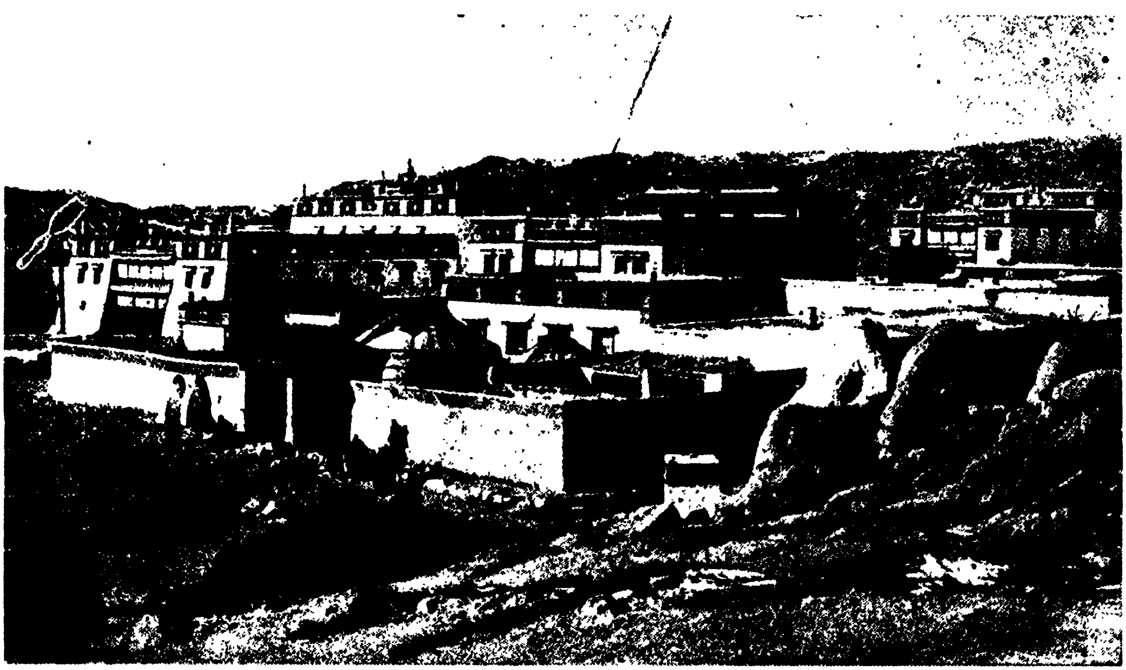
কোনও ক্রমে নদী পার হইয়া তাঁহারা আবার চলা পথ পাইলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, অধিবাসীদিগের পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। একটিও ভিক্ষুক তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। সুবেশধারী মানুষ দ্বিচক্রযানে চড়িয়া যাইতেছে, এ দৃশ্যও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।



লিয়াংচাউএর মূর্ত্তি



এক জন মঙ্গোল রাজপুত্রী



সারামুরেন্‌—লামা উপনিবেশ



লিয়াংচাউ সহরের বহির্ভাগস্থিত পরিত্যক্ত দেবমূর্ত্তি



লিয়াংচাউ—পথিপার্শ্বস্থ পুস্তকের দোকান



মঙ্গোল জলবাহী গাড়া



পাইপিংএ অভিযানকারিগণ



নিংসিয়ার একটি প্রসিদ্ধ রাজপথ

যাহা হউক, চীনা সামরিক কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া চা পান করাইলেন। তথা হইতে অভিযানকারীরা পাওটো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা বিদ্যুতের আলো ও রেলের গাড়ীর বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন। ৭ মাস এ দৃশ্য এবং এই শব্দ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন।

পাইপিংএর ফরাসী দূতনিবাসে অভ্যর্থিত হইলেন। মরুভূমির মধ্য দিয়া নানাপ্রকার বিপজ্জাল অতিক্রম করিয়া অভিযানকারীরা যে দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

অভিযানকারীদিগের উদ্যোক্তা জর্জ্জেস্ মারাই হার্ড হংকং সহরে ১৬ই মার্চ্চ তারিখে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণ-



নিংসিয়ার সন্নিহিত মন্দিরের কতিপয় পতাকা

সেখান হইতে মঙ্গোলীয় মালভূমি অভিমুখে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। পেলিংমিয়াও নামক স্থানে গিয়া তাঁহারা লামাদিগের একটি উৎসবের আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আলোকচিত্রাদি গ্রহণের পর অভিযানকারীরা পাইপিং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহারা

ত্যাগ করেন। উষ্ট্রারোহণে মরুভূমি অতিক্রম অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু ৩০ জন মানুষ ও ১৩ শত ৭৫ মণ দ্রব্য-সম্ভারসহ মোটরযানে আরোহণ করিয়া মরুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া—বেরুথ হইতে পাইপিং পর্য্যন্ত গমন, সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অভিযানকারীরা যে-সকল দৃশ্যের চিত্র সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা যেমনই দুর্লভ, তেমনই বিচিত্র।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নর-লীলার সহচরগণের মধ্যে অন্যতম শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী বা খোকা মহারাজ গত ১৬ই অগ্রহায়ণ ৬৫ বৎসর বয়সে বেলুড়-মঠে মহা-সমাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ একে একে সকলেই প্রায় তিরোহিত হইয়াছেন, যে কয়েক জনমাত্র এখনও জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে আবার এক জনকে তিনি তাঁহার অভয়ধামে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তাঁহার সাধন-লীলার অবসানে যুগধর্ম্ম-সংস্থাপনপ্রয়াসী হইয়া, ঐ কার্য্যের সহায়ক তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত সম্মিলনের জন্য অধীর আগ্রহে দক্ষিণেশ্বরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সেই ঐশ আকর্ষণে একে একে শ্রীবিবেকানন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ আসিয়া যখন তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছিলেন, খোকা মহারাজও তখন ঐরূপে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বাড়ীর নাম ছিল সুবোধ। কলিকাতার ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ শঙ্কর ঘোষ তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি তখন বিদ্যালয়ের বালকমাত্র হইলেও অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝিলেন, তিনি তাঁহার আপনার জন—তাঁহারই কাযের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। সুবোধও বুঝিলেন যে, এই অদ্ভুত পুরুষপ্রবর তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম সুহৃদ্, মুক্তিদাতা, জীবনের একমাত্র আশ্রয়।

সুবোধ সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান ছিলেন, কিন্তু গৃহ-সংসারের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। বড় চুম্বকের আকর্ষণে ছোট চুম্বকের আকর্ষণ পরাহত হইয়াছিল। ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত সুবোধ সন্ন্যাস-পন্থাকে জীবনের আদর্শ করিয়া লইলেন। স্থূলদেহে যখন ঠাকুরের অদর্শন হইল, তখন বরাহনগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত সুবোধ সন্ন্যাসিবেশে সম্মিলিত হইলেন। ধীর-স্থির ভাব আজীবন তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই স্বামীজী তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'সুবোধানন্দ।'

ভগবদনুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া যখন এই নবীন সন্ন্যাসিবৃন্দ অহোরাত্র সাধন-ভজনে ব্যাপৃত, খোকা মহারাজও তখন তাঁহাদের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন।

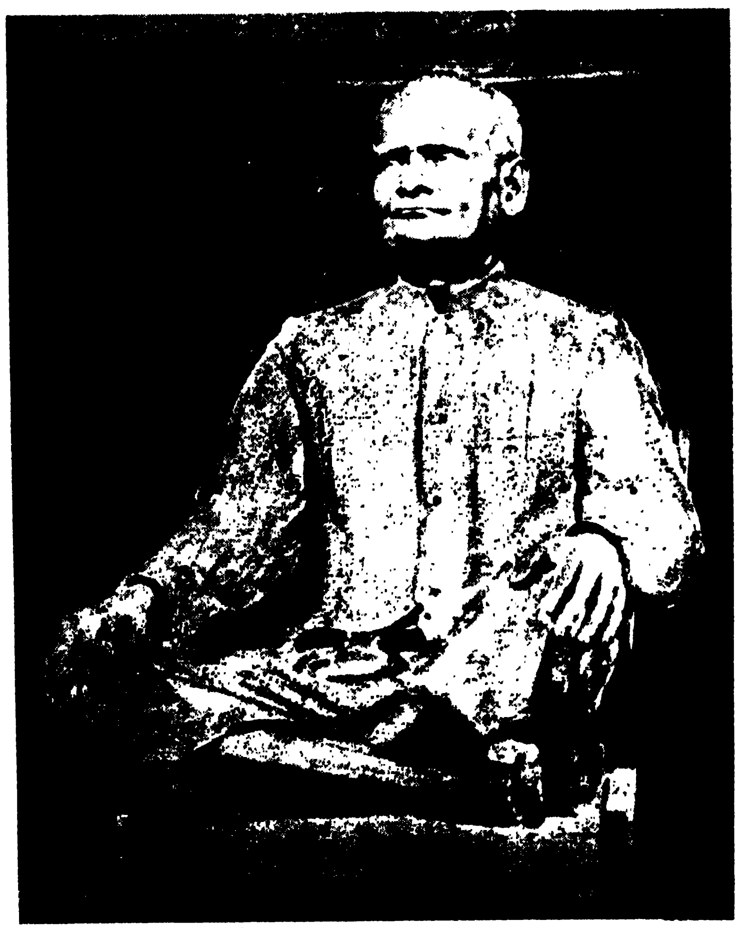
নিঃসঙ্গ নিরবলম্বন পরিব্রজ্যাতেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। শ্রীভগবান্‌কে লাভের আশায় পুরুষকার-সহায়ে খুব কঠোর তপস্যা করিতে হইবে, তাঁহার ব্যক্তি-গত ভাব বোধ হয় এই ধারণার বিরোধী ছিল। শ্রীভগবানে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকাই বুঝি তিনি অধিক পছন্দ করিতেন। বানরের ছানা পুরুষকার অবলম্বন করিয়া তাহার মায়ের নিকট লাফাইয়া যাইতে চাহে; বিড়াল-শাবক কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহার মায়েরই উপর নির্ভরশীল, তাহার মা তাহাকে যেখানে রাখিয়া যায়, সে সেখানেই পড়িয়া মিউ মিউ করিয়া তাহার মায়ের স্মরণ করে মাত্র। ঠাকুর বলিতেন, সাধকও ঐরূপ দুই প্রকার। আমাদের খোকা মহারাজ শেষোক্ত প্রকারের ভক্ত ছিলেন;—নিজের গতি-মুক্তির ব্যবস্থা সব তিনি ঠাকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে একবার ধ্যান-ধারণা করিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন—"ও সব করতে পারব না। ও সব যদি করতে হয়, তবে তোমার কাছে এসেছি কেন?" ঠাকুর তাঁহার ঐ উত্তরে প্রীতহাস্যে স্বামীজীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"এ শালা বলে কি রে!"

তাহার পর খোকা মহারাজকে বলিলেন,—"আচ্ছা, যা, তোর ও সব কিছু করতে হবে না—তুই দুবেলা কেবল একটু স্মরণমনন ক'রে নিস্।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সুবিজ্ঞ মালাকার। নানা বর্ণের—নানা গন্ধের পুষ্পের একটি সুদৃশ্য মালার ন্যায় তিনি বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন জীবন দিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব পার্ষদসঙ্ঘ রচনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে দেখিতে পাইলেন, কেহ কঠোর তপস্বী, কেহ শাস্ত্র-বিচারশীল, কেহ নিঃসঙ্গ যোগী, আবার কেহ বা একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত। পূজনীয় খোকা মহারাজ ছিলেন একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত। আজীবন তিনি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের "খোকা"টি হইয়াই থাকিতে চেষ্টা করিতেন। 'খোকার'

নিজের ভাবনা কিছুই নাই—যখন যাহা দরকার, মা আসিয়া ঠিক করিয়া দিবেন, ইহা ধ্রুব জানিয়া সে নিশ্চিন্ত-মনে খেলা করিতে থাকে। খোকা মহারাজও তাই তাঁহার ভবিষ্যতের ভার ঠাকুরকে দিয়া নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সারা জীবনে তাঁহাকে কেহ কখনও চঞ্চল হইতে দেখে নাই। নির্ম্মম ব্যাধি এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাস্য সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। শেষ শয্যায় যখন দীর্ঘকালব্যাপী মারাত্মক পীড়ার প্রকোপে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াছে, সামান্যমাত্রও নড়িবার সামর্থ্য নাই, তখনও প্রণাম করিতে গেলে তিনি সেই প্রসন্ন হাস্যের সহিত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মঠের ভক্তদের কত জনের কত সংবাদ লইয়াছেন—আবার ঠাকুর স্বামীজী প্রভৃতির পুরাতন প্রসঙ্গ তুলিয়া আনন্দ করিয়াছেন; নিজের রোগের কষ্টের কথা কিছু শুনা যাইত না, বরঞ্চ উহা লইয়া সময়ে সময়ে আমোদ করিতেন। মৃত্যুও যেন খোকার একটি খেলা!



স্বামী সুবোধানন্দ

তাঁহার অপূর্ব্ব ভগবদ্বিশ্বাসের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শোনা যায়। একবার তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় একাকী কোন এক স্থানে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। ঐ অবস্থায় তিনি ঘটীতে করিয়া একটু জল খাইবার চেষ্টা করিতে দৌর্ব্বল্যবশতঃ হাত হইতে ঘটীটি পড়িয়া গিয়া সব জলটুকুই নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি অভিমানভরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকেন, "ঠাকুর, এই জনহীন-স্থানে একা অসুখে পড়িয়া আছি, তুমি ত কোন ব্যবস্থাই করিলে না, একটু জল খাইতে গেলাম, তাহাতেও বাধা দিলে।" সুবোধ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই এক জন অপরিচিত লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, সে স্বপ্নে তাঁহার সেবাদি করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে।

আর একবারও এক স্থানে ঐরূপ একাকী পীড়িত হইয়া পড়িলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোর কি চাই বল্, আমি সব বন্দোবস্ত করিতেছি।" তিনি বলিলেন, "কিছুই চাই না, এইটুকু প্রার্থনা, যেন আপনাকে সর্ব্বদা মনে থাকে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জামতাড়ায় তাঁহার কঠিন রক্তামাশয় হয়। চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন হঠাৎ তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠেন। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী তাঁহার শয্যার

পার্শ্বে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, এখন তাঁহার শরীর যাইবে না। আরও কয়েক বৎসর তাঁহাকে থাকিতে হইবে। তিনি তাঁহাদের সহিত যাইবার জিদ করিলে স্বামীজী বলিলেন, "থাক্ না শালা, তুই বরাবরই বড় ব্যস্তবাগীশ।"

খোকা মহারাজের মুখে শুনিয়াছি যে, ঐরূপ ঘটনা কত স্থানে আরও কতবার হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন তাঁহার নিকট সনাতন প্রত্যক্ষ সত্য। তাই পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিবার উদ্যম তিনি করিতেন না। মহাপুরুষদিগের ভাব বাহিরের আচরণ দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না। শ্রীখোকা মহারাজ কি গভীর ঈশ্বরপ্রেম লইয়া আমাদের মধ্যে নিয়ত বিচরণ করিতেন, তাহা বাহির হইতে আমরা কি ধারণা করিব? তিনি বরাবরই খুব চাপা ছিলেন। আপনা হইতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বা ঐরূপ কিছু করিতে তাঁহাকে বড় একটা দেখা যাইত না। কিন্তু কেহ কোন কথা তুলিলে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও নির্ভরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধন-ভজন হইতে নিষ্কৃতি দিলেও "তুবেলায় একটু স্মরণ-মনন ক'রে নিস্," এই যে কথাটি তাঁহাকে বলিয়াছেন, তাহা তিনি সারাজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখা যাইত যে, জরাজীর্ণ উত্থানশক্তি-রহিত দেহে যখন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবারও সামর্থ্য নাই, তখনও রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তিনি অতিকষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া শিয়রস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর দিকে চাহিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং করযোড়ে নমস্কার করিতেছেন। তিনি জানিতেন যে, সাধনভজন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেও ভক্তি-নিবেদনে বঞ্চিত করেন নাই। নিশিদিন তিনি তাঁহার হৃদয়মন জুড়িয়া বসিয়া আছেন; একবার বা তুবার প্রণাম করা তাঁহার নিকট নিরর্থক,—তবুও ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী পাছে মিথ্যা হয়, তাই সর্ব্বপ্রযত্নে বাহিরের ঐ প্রণামের অনুষ্ঠানটুকু বজায় রাখিতে চাহিতেন। শেষশয্যায় তাঁহাকে প্রায়ই সহাস্যে বলিতে শুনা যাইত—"শরীরটা যাবে, তাতে আর হয়েছে কি? ড্যাং ড্যাং ক'রে ঠাকুরের কাছে চ'লে যাব।" এক দিন বলিয়াছিলেন, "যে দিন সন্ন্যাসী হয়েছি, সেই দিন থেকে মৃত্যুকে ভয় করি না।" আর তাঁহার এই উক্তি যে কতদূর সত্য, তাহা যাঁহারা শেষ সময়ে তাঁহার নিকট ছিলেন, তাঁহারা ভালরূপেই অবগত আছেন। কি ধীর স্থির প্রশান্তভাবে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহা ভাবিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রজ্ঞানে নয়, উৎকট তপশ্চরণে নয়, নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠানে নয়—উহা জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অনুরাগে, আড়ম্বরহীন ভোগবিমুখতায়—অভিমান-অহঙ্কারের নিঃশেষ বিসর্জ্জনে। পূজনীয় খোকা মহারাজের নিরভিমানিতা বাস্তবিকই শিখিবার বিষয় ছিল। যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় ত্যাগী সঙ্গী ছিলেন, এই হিসাবে তাঁহার স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অতিশয় উচ্চে হইলেও তিনি নিজে বোধ হয় স্বপ্নেও কোনও দিন কোন বিশেষ অধিকারের দাবী করেন নাই। শরীরত্যাগের মাত্র কয়েক বৎসরে পূর্ব্বে অতিবৃদ্ধবয়সেও তিনি সকলের সহিত পংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়াছেন—শিষ্যস্থানীয় কত সেবক থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাস্নানান্তে নিজের বস্ত্রাদি নিজেই ধৌত করিয়াছেন, নিজেই তামাক সাজিয়া খাইয়াছেন। মাত্র দেড় বৎসর পূর্ব্বেও—যখন তাঁহার কালরোগের সূত্রপাত হয় নাই, তাঁহাকে সাধু ব্রহ্মচারীদের সহিত মঠের মাঠের চোর-কাঁটা তুলিতে—উৎসবের তরকারী কুটিতে দেখা গিয়াছে। "একটি লোক আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে," এই সংবাদ দিলে "তাহাকে এখানে লইয়া এস" না বলিয়া তিনি নিজেই অনেক সময় নীচে নামিয়া আসিতেন এবং সহাস্য-মুখে—"কে কে গো" বলিয়া আগন্তুকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন। কেহ সসম্মানে প্রণাম করিলে তিনি যেমন নির্ব্বিকার থাকিতেন, কেহ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাকেও তেমনই নির্ব্বিকার দেখা যাইত। শেষ-শয্যায় এই নির্ব্বিকারভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা যাইত। এক দিন বলিয়াছিলেন, "দেখ,—কার মুখের দিকে চেয়ে থাকব? মিষ্টি কথা বল্লে কাছে আসবে, আর তা না বল্লে ভুলেও এ দিক মাড়াবে না—এই ত মানুষের মন। কেবল এক ভগবানের দিকে চেয়ে আছি।" আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, চারি পাশে এত সব বাড়ী, লোকজন—সাধু-সন্ন্যাসী—সব যেন মনে হচ্ছে ছাইয়ের গাদা সাজান রয়েছে—কোনও কিছুরই উপর আর আকর্ষণ অনুভব করছি না।" অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা সংসার

অশ্বত্থের মূলগুলি নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়া মহানির্ব্বাণের জন্য বুঝি প্রস্তুত হইতেছিলেন !

বেলুড়-মঠ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। মঠের গাছ-পালা, বাগান প্রভৃতি তিনি প্রত্যহ বেড়াইয়া বেড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। একবার অসুখের পর শরীর খুব দুর্ব্বল হইলে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে জনৈক ধনী ভক্তের গৃহে যাইবার কথা উঠিলে বলিয়াছিলেন, "মঠে শাক-ভাত খাইয়া যদি থাকিতে পারি, সেই আমার উত্তম; ধনীর ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন কি ?" স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম মঠ-প্রতিষ্ঠা করিলে খোকা-মহারাজ বহুদিন মঠের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। তিনিও স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। স্বামীজী কোনও কারণে কখনও গম্ভীর হইলে অপর গুরুভ্রাতারা কেহ তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিতেন না; মাত্র এক খোকা-মহারাজের উপরই সে গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গাইবার ভার পড়িত। খোকা-মহারাজ আদর-আবদার বা দরকার হইলে ঠাট্টা-ইয়ারকী করিয়াও স্বামীজীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতেন। তাঁহাকে অনেকবার বলিতে শুনা গিয়াছে, "স্বামীজী হচ্ছেন শিবের অবতার।"

অপরাপর গুরুভ্রাতৃগণের উপরও তাঁহার অগাধ ভালবাসা ছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি "প্রণাম হই" বলিয়া বেলুড়-মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও প্রীতিসম্ভাষণাদি করিয়া আসিতেন। যখন রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহাকে লাইব্রেরী-বাড়ীর উপরে আনা হইয়াছে এবং চিকিৎসকগণ নড়াচড়া একবারে নিষেধ করিয়াছেন, তখনও তিনি মহাপুরুষজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। গত বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের দিন তিনি সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ নীচে নামা। তিনি বলিতেন, "আমরা দু'জনে (তিনি এবং মহাপুরুষজী) পাল্লা দিচ্ছি—কে আগে যাব।" ঠাকুর তাঁহাকেই আগে ডাকিয়া লইলেন।

পুরাণ তাঁহার অতিশয় প্রিয় গ্রন্থ ছিল। দ্বিতলের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া তাঁহাকে প্রায়ই কোনও না কোন পুরাণ পড়িতে দেখা যাইত। "বেশ সচ্চিন্তা নিয়ে থাকা যায়—সময় ত কাটাতে হবে।" শেষ অসুখের সময় নিজে আর পড়িতে পারিতেন না, লোকদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত, কথামৃত এবং উপনিষৎ শ্রবণ করিতেন। উপনিষৎ শ্রবণ করিয়া বলিতেন,"ব্যাখ্যাকাররা যে যতটা বুঝেছে, ততটা ব'লে গেছে, সবটা কি আর লেখায় প্রকাশ করা যায় ?" "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই মন্ত্রটি শুনিয়া এক দিন বলিয়াছিলেন, "এই বল মানে কি জান ? ব্রহ্মচর্য্য। খুব পাকা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত এ সব তত্ত্ব ধারণা হয় না।"

তিনি অনেক নরনারীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গুরুর অভিমান কোনও দিন তাঁহার ছিল না। বলিতেন, "আমরা ত কিছুই করি না—ঠাকুরই সব করেন। যারা তাঁর আশ্রয়ে আসবে, সকলকেই তিনি মুক্ত করিবেন—দুদিনে আগে বা পিছে, এই তফাৎ।" ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার অশেষ কৃপা ছিল। দুরন্ত রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া নিয়ত তাহাদের কল্যাণচিন্তা করিতেন। দেহরক্ষা করিবার পূর্ব্বরাত্রিতে বলিয়াছিলেন, "আমার এই অন্তিমকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আমাদের সঙ্ঘের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।"

তাঁহার পবিত্র পুণ্যজীবনের অবসান হইয়া গেল। নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি প্রিয়তম প্রভুর সহিত কত আনন্দ করিতেছেন। শেষ-শয্যায় এই চরম শুভ সম্মিলনের জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এক দিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে বল্‌ছি আর কেন ? এইবার গেলেই ত হয়। তা ঠাকুর বলছেন—থাক্ থাক্, আরও কিছু দিন থাক্।"

জীব-কল্যাণের জন্য এই সকল নিত্য মুক্ত মহাপুরুষের শরীরধারণ—প্রেমে তাঁহাদের জগতের ব্যাধি, জরা, দুঃখকষ্ট স্বীকার। আজ তাঁহার অশরীরী আত্মার নিকট প্রার্থনা, হে করুণাময় মহারাজ, তোমার মহান্ জীবনের আদর্শ যেন আজীবন আমাদিগকে লক্ষ্যে অপ্রমত্তভাবে চালিত করে—তোমার প্রেম, করুণা, বিশ্বাসের স্মৃতি যেন ক্ষণে ক্ষণে এই ভয়সঙ্কুল সংসারে আমাদিগকে অভয় আলোক প্রদর্শন করে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মচারী বিমল।

২০

"আচ্ছা, বেটা টাকা পেলে কোথা? এ সব কেসে পুলিস ত ছেড়ে দেয় না।" কথাটা বলিয়া কালীনাথ জিজ্ঞাসুনেত্রে গুপীনাথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গুপীনাথ হাসিয়া বলিল, "ও বেটাকে ছাড়লেই বা কি ধরলেই বা কি! বেটা চাকর বৈ ত নয়।"

তারক বলিল, "দেখুন কালীবাবু, ওকে ধরিয়ে দেওয়াটাই অন্যায় হয়েছে! আহা, ও বেচারী কিছুই জানে না। সকল নষ্টের গোড়া যে, তাকে শাস্তি দিন, তাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিন, তবেই ত' ন্যায়-বিচার হবে।" বলিতে বলিতে তারকের চক্ষু ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার নয়নে হিংসার যে আগুন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহা এত কোমল বয়সে সম্ভব হইতে পারে, কালীনাথ এ ধারণাই করিতে পারিতেছিল না। গুপীনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "ভাবিস কেন, তারক। শালাকে জেলে পুরছি এই দেখ না। এখন কালীবাবু আর কিছু ছাড়লেই হয়।"

কালীনাথ ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল, "আবার কি? আমায় টাকার গাছ পেয়েছিস না কি? আবার কিসের টাকা?"

গুপীনাথ বলিল, "বটে না কি? টাকা কিসের জান না তুমি, না? বাবা ফাঁকীতে এ সব চলে না—তোমার কেস একটা মুখের কথায় ফাঁস ক'রে দিতে পারি জান ত!"

কালীনাথ ইঙ্গিতে গুপীনাথকে নীরব হইতে বলিয়া তারককে লক্ষ্য করিয়া বলিল,"কি হে ছোকরা, কাশীতে কি ক'রে এলে, তা ত বল্‌লে না।"

তারক বলিল, "কেন, গুপীদাকে ত সব বলেছি।"

গুপীনাথ বলিল, "হাঁ, হাঁ, বলেছে বটে। তা তুমি ঐ সোনা বেটার কথা তুল্‌লে—কায গুছিয়ে এসেছে ছোকরা। এখন বেড়াজাল ফেলা তোমার হাত। তাই ত বলছি, কিছু টাকা ছাড় বাবা, ওকে কাশী পাঠাতে পয়সাকড়ি যা ছিল—গিয়েছে—"

কালীনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, হাঁ, সে সব দিচ্ছি ঠিক ক'রে, গুপীনাথ। ওর জন্যে ভাবনা কি? বাড়ী চিনে এসেছো, তারকনাথ? কাশীর বাড়ী?"

গুপীনাথ তারককে জবাব দিবার অবসর প্রদান না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠিক যে ক'রে এসেছে, এমন কথা বলতে পারি নে, তবে লোক লাগিয়ে এসেছে ছোকরা।"

কালীনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে? মুঠো মুঠো টাকা খরচ ক'রে এলো—আর বাড়ী ঠিক করতে পারে নি?—বাঃ, খুব কাযের ছেলে ত! বাঃ!"

কালীনাথের মুণ্ডমণ্ডল বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আর আমি ত এখানে কেমন দুদিনে ঐ ভবেন বেটাকে ওর হুগলীর মামার বাড়ী থেকে টেনে বার করলুম। কায চাই, জানলে—কায চাই, কথায় শুধু কায হয় না।"

গুপীনাথও তাহার অনুকরণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক, শুধু কথায় কায হয় না, কথা ছাড়া আরও কিছু ছাড়তে হয়, বাবা। হুগলীর কাযটাও মশাই করলে ত ঐ ছোকরা।"

কালীনাথ বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ! বলছি ত হবে'-খন। হাঁ বল ত ছোকরা, কাশী গিয়ে কি ক'রে এলে—"

এবার আর গুপীনাথ বাধা দিল না, তারক বলিতে লাগিল, "গুপীদার কথামত ওদের পেছু নিয়ে হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়ে ওদেরই পাশের কামরায় চেপে বসলুম—"

কালীনাথ অধীরভাবে বলিল, "আহা, ও সব ত জানি—হুগলীতে পৌছে ওর বন্ধু ঐ ভবেনবাবু নেমে গেল, তুমি ওর সঙ্গে কাশীতে গিয়ে নামলে পরের দিন সকালে—"

তারক বলিল, "ওর সঙ্গে? ওর পাশের গাড়ীতে বলুন।"

"হাঁ, হাঁ, তাই হলো। তার পর?"

গুপীনাথ এতক্ষণে বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, তুমিও যেমন! সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইতে বসলো, নাও আমি ব'লে যাচ্ছি। ঐ তার পর ছোঁড়া ওর ট্যাক্‌সীর পেছনে আর একটা ট্যাক্‌সীতে চ'ড়ে চললো। মিছরি-পোখরার কাছে নেমে বাবু ত চললেন। বেশ যাচ্ছিল বরাবর, হঠাৎ মাঝে পড়ল এক কেত্তনের দল—তারা মড়া নিয়ে যাচ্ছিল—কেমন না, তারক?"

তারক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, তাই বটে। দল

ছাড়িয়ে ঐ বেটার পেছনে গিয়ে উঠবো, অমনই দেখি, আর মানুষ নেই—একেবারে অন্তর্দ্ধান! যা! এত কষ্ট—এত পরিশ্রম—"

গুপীনাথ বলিল, "বাঃ, শুধু পরিশ্রম? তার সঙ্গে রুধির—রূপেয়া?"

কালীনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "যাক গে। তার পর কি করলে?"

তারক বলিল, "তার পর পাগলের মত কেদারঘাটের দিকে ছুটলুম। কোথায় বা সে, আর কোথায় বা তার চুলের টিকি! হন্যে হয়ে এধার ওধার চারিধারে ছুটোছুটি ক'রে ঘামে ভিজে গেলুম; এ গলি, সে গলি, কত গলি খোঁজ ক'রে বেড়ালুম, দু'চারটে লোককে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিয়ে গেলুম, কেউ গাল দিলে, কেউ মারতে এল তেড়ে, কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই এলো না। বুনো মোষের মত"—

গুপীনাথ মুখে চুমকুড়ি দিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—"ভ্যালা মোর বাপধন রে! বেঁচে থাক, বাবা!"

কালীনাথ বিরক্তিভরে বলিল, "আঃ, থাম তুমি। তার পর?"

তারক পুনরায় বলিল, "কেঁদে ফেললুম। তখন এক জন বাঙ্গালী ময়রা ডেকে বললে, 'কি হয়েছে হে ছোকরা, কাউকে খুঁজছো?' আমি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে বললাম, 'হাঁ মশাই, বাবুর সঙ্গে আসছিলুম, এই বরাবর এসে কেত্তনের দল মাঝখানে পড়লো, আর খুঁজে পেলুম না তাঁকে—কোথায় যাব, জানি নি।' দোকানদার বললে, 'ওঃ, তুমি বুঝি নতুন এসেছ? দেখ, ছুটোছুটি ক'রে কাশীর গলিতে হারানো মানুষ ফিরে পাবে না। বরং এইখেনে দাঁড়িয়ে থাক, হয় ত তোমার বাবু তোমায় না পেয়ে এদিকে ফিরে আসবেন। আচ্ছা, কি রকম দেখতে তোমার বাবু বল দিকি?' আমি বললুম, 'খুব লম্বা দোহারা মানুষ'—দোকানদার বললে, 'হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল?' আমি আশার আলো দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'হাঁ, হাঁ, ব্যাগ আছে'—দোকানদার বললে, 'তবে হয়েছে। ঐ যে আগে লণ্ঠনটা, ওরই পাশ দিয়ে গলি গেছে, ঐখেনে গিয়ে খোঁজ করো, পাত্তা মিলে যাবে।' তারই কথামত গলিটায় ঢুকলুম। কি বিশ্রী নোংরা সরু গলি! অনেক বার যাওয়া আসা করেও কোন খোঁজ পেলুম না। ফিরে এলুম দোকানদারের কাছে। দোকানদার বললে, 'দেখ, একটু জিরিয়ে নাও। চানটান ক'রে জল খেয়ে না হয় খোঁজ কোরো।' তাই হ'ল। দোকানী হোটেল চিনিয়ে দিলে। সেই দিন থেকেই গলিটায় পায়চারী করতে লাগলুম, রাতে হোটেলেই শুতুম। কিন্তু সে যেন ভোজ-বাজীর তাসের মত উপে গেল। দোকানদারের পরামর্শে দশাশ্বমেধ-ঘাটে সন্ধ্যার সময় খোঁজ করলুম। সাত দিন কাটলো, কোন ফলই হ'ল না। সেই সময়ে গুপীদার চিঠি পেলুম এখানে ফিরে আসতে।"

গুপীনাথ বলিল, "তা কি করব, কালীবাবুর জরুরী হুকুম, হুগলীর কাযটার জন্যে—ঐ যে ভবা বেটার শ্রাদ্ধের যোগাড়—"

কালীনাথ অধীর হইয়া বলিল, "আঃ, ও সব কথা পরে হবে। বলতে দাও না, শেষটা কি হ'ল?"

তারকনাথ বলিল, "তার পর আর কি হবে? আসবার আগে কেষ্টকে ব'লে এলুম নজর রাখতে গলিটার উপর। ব'লে দিলুম, তারা দুজন, বাবু আর—"

তারকের মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল—সে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব হইল।

কালীনাথ তাহাকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "হাঁ হাঁ, বেশ বুদ্ধি খাটিয়েছিলে, ছোকরা। কিছু দিয়েছিলে তাকে?"

তারক বলিল, "কাকে? কেষ্টোকে? হাঁ, সে আমার মত তিনটে তারককে কিনতে পারে। তবে তার ছোঁড়া চাকর আছে একটা, ঝাঁটপাট দেয়, উনুন ধরায়, রস জ্বাল দেয়, তাকে ঐ কাযে লাগিয়ে দিয়ে এলুম দুটো টাকা হাতে দিয়ে, আর খবর নিতে পারলে আরও পাঁচ টাকা দেবো ব'লে এলুম তার মামা কেষ্টোকে, ঠিকানাও আমার দিয়ে এলুম—"

কালীনাথ বলিল, "বাঃ, ছোকরা, বেশ করেছ তুমি। তা, কিছু খবর পাওনি তার পরে?"

তারক বিষণ্ণমুখে বলিল, "ঐ যা কিছু যৎসামান্য কেষ্টো মামা লিখেছে ফিরে যেতে—"

কালীনাথ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, কি লিখেছে দেখি! কিছু ত বল নি।"

গুপীনাথ এতক্ষণ তারকনাথকে চক্ষুর সঙ্কেতে কত কি বলিতেছিল, নির্ব্বোধ তারকনাথ তাহা বুঝিতে পারে নাই, এইবার গুপীনাথ তারকের উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই বলিল, "ওঃ, খবর ত ভারি! দেখেছে ঘাটে এক দিন, কিন্তু বাড়ী ঠিক করতে পারে নি—"

এই সময়ে বেহারা আসিয়া একখানি পত্র দিল। পত্র আসিয়াছে, রেজেষ্ট্রি ডাকে। পত্র পাঠ করিতে করিতে কালীনাথের মুখ গম্ভীর হইল, সে মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট প্রকটিত হইয়া উঠিল। গুপীনাথ বলিল, "কি ওখানা?"

কালীনাথ বলিল,"উকীলের চিঠি। তোমরা এখন যাও।"

গুপীনাথ হাত পাতিয়া তারকের দিকে নজর রাখিয়া নিম্নস্বরে কালীনাথকে বলিল, "টাকা?"

কালীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি ত পালাচ্ছি না, টাকাও না, যাও এখন। কাশী ফিরে যাচ্ছ ত আজই, ছোকরা? খরচের টাকাকড়ি হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়ে দিয়ে আসবো।"

গুপীনাথ তারককে লইয়া নিম্নতলে নামিয়া গেল। কালীনাথ পত্রখানা আবার পাঠ করিল। ক্ষণপরে তাহার অধর হাস্যরেখাঙ্কিত হইল। আপন মনে বলিল, "উঃ, ভয়ে ত ম'রে গেলুম। বাবা, কালীনাথ সে ছেলে নয় যে, কাঁচা কায করবে। এমন কত রুই-কাতলা খেলিয়ে এলুম, এ ত একটা বাচ্ছা, গলা টিপলে দুধ বেরোয়!"

চিঠিখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কালীনাথ কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইল; কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখমণ্ডল নানা রেখায় অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার ধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। সে তাহাকে উকীলের চিঠি দিবার কে? যাহার বিষয়—সে তাহাকে মোক্তার-নামা দিয়া ভার দিয়াছে! সে তাহার স্ত্রী। স্ত্রী—কিসের স্ত্রী? যাহাকে মালিক স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে না, যে স্ত্রী হইয়াও স্ত্রী বলিয়া সমাজে গণ্য নহে, সে কিসের স্ত্রী? ওঃ, গোখরোর মত ফণা! বিষ নাই, তার কুলার মত চক্র!

আচ্ছা, জ্যোৎস্নাময়ী বিষয়ের দাবী করে কি হিসাবে? উহার পিতা ত ঐ বিষয় বিষ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, কন্যাকেও করাইয়াছে—তবে? তবে কি সে অন্তরে বাপের মতের বিরুদ্ধভাব পোষণ করে? কিন্তু না, সে ত যতদূর সম্ভব মিশিয়াছে, যতদূর সম্ভব উহাদিগকে মিষ্ট কথায় বশ করিয়াছে, নানা ভাবের কথার আলোচনায় বুঝিয়াছে, কন্যা পিতারই ইঙ্গিত মানিয়া চলে। তবে? হঠাৎ এ বিদ্রোহ কেন? এ উকীলের চিঠি সে কাহার পরামর্শে দিয়াছে? রাজেশ্বর বাবুর পরামর্শে যে নহে, তাহা সে শপথ করিয়া বলিতে পারে। তবে?

কালীনাথ আবার চেয়ারে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল, আলোকের সম্মুখে পত্রখানি খুলিয়া আবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিল। পত্রখানিতে এই ভাবের কথা লেখা ছিল:—"আমি আমার মোয়াক্কেল চাঁপাপুকুরনিবাসিনী শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর উপদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে আপনি যদি তাঁহার চাঁপাপুকুরস্থ বাগানবাটী ও তৎসংক্রান্ত ভদ্রাসন, জমীজমা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া না দেন এবং উক্ত সাত দিনের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার এই ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তিতে দখলীকার স্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমার মোয়াক্কেল উক্ত শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী তাঁহার উকীলের পরামর্শ অনুসারে এ বিষয়ে আপনার সহিত আর কোনও লেখালেখি না করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। এতদ্দ্বারা আপনাকে ইহাও জানান যাইতেছে যে, বাগানবাড়ীর পুরাতন মালী সনাতনকে আমার মোয়াক্কেল শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী বাগানের তত্ত্বাবধানে বাহাল করিতেছেন। অতঃপর তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া না দেওয়া তাঁহার বিবেচনা-সাপেক্ষ। সুতরাং তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করার জন্য আপনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন জানিয়া রাখিবেন।"

কালীনাথের ললাট হিংসা ও ক্রোধে রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। দারুণ হিংসা ও ঘৃণাভরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে আপন মনে বলিল, "এঃ! একবারে নবাব সেরাজুদ্দৌলা এলেন আর কি! কে তুই?"

কালীনাথ দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার চিন্তাস্রোতঃ অবিরাম-গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই হতচ্ছাড়া সোনা মালীটা উহার কে? জ্যোৎস্না কত দিনই বা এই গ্রামে আসিয়াছে? রাজেশ্বর ত জামাতার

মুখদর্শন করেন না, কন্যাকেও করিতে দেন না, তবে জ্যোৎস্না স্বামীর বিষয়ে অধিকারিণী হয় কিরূপে? এত কৌশলে তরী ভিড়াইয়া তটপ্রান্তেই কি ভরাডুবি হইবে? রাজেশ্বরের ক্রোধের অগ্নিতে এত ইন্ধন যোগান দেওয়া কি বৃথা যাইবে? তবে তাহার কন্যাটা এমন বিপথে চালিত হইল কিরূপে? সে স্বামীর বিষয়ের অধিকারিণীরূপে কলহ বাধাইতে আসে কোন্ সাহসে, কাহার ভরসায়?

বাগান-বাড়ীতে রাজত্ব করিবে সোনা মালী? হাঃ হাঃ হাঃ! কালীনাথ! যে অস্ত্র আছে তোমার হস্তে, দেখি, কে সেই অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে আগুয়ান হয়!

২১

সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে রাজেশ্বর বাবু চমকিয়া উঠিলেন, চায়ের পেয়ালাটা হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম করিল। উঃ, কি ভীষণ সংবাদ! সংবাদটি এইভাবের—

"গতকল্য মিছরিপোখরায় এক লোমহর্ষণ হত্যার চেষ্টা ও আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইতে এই পল্লীর এক দ্বিতল গৃহে একটি বাঙ্গালী যুবক ও যুবতী স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিতেছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর একটি কিশোর-বয়স্ক বাঙ্গালী গৃহস্বামীর ভৃত্যকে বলে যে, সে কলিকাতা হইতে এক জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছে, তখনই বাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। গৃহস্বামী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যখন পত্রপাঠে মগ্ন, তখন আগন্তুক হঠাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনটি গুলী করে। ভৃত্যটি ভয়ে একরূপ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। গৃহস্বামীও প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া কোন বাধা দিতে পারেন নাই। প্রথম গুলী তাঁহার বামহস্ত ঘর্ষণ করিয়া প্রাচীরে বিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় গুলীও ব্যর্থ হয়। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি যুবতী আর্ত্তনাদ করিয়া উভয়ের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। গুলীটি তাহার বক্ষঃপার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সেই সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। লোকটা যখন গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তৃতীয়বার পিস্তল তুলিয়া ধরে, তখন জলন্ত উল্কার মত একটা প্রকাণ্ড কুকুর ভীষণ চীৎকার করিয়া কক্ষমধ্যে উপস্থিত হয় এবং লম্ফ দিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। আগন্তুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সেই গুলী কুকুরের মস্তিষ্ক ভেদ করে। আহত যুবক তৎক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং কৌশলে পিস্তলটি ছিনাইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দেন। ধস্তাধস্তির সময় আততায়ী একবার আপনার কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে, সেই গুলী হত্যাকারীর কণ্ঠ ভেদ করে। এই ভয়াবহ শোচনীয় কাণ্ডে কাশী সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। পুলিস এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহিতেছে না। তাহারা ইহার রহস্য-ভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। গৃহের ভৃত্যের বিবরণে এই সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সে বলিয়াছে, গৃহস্থ কলিকাতার ধনবান্ জমীদার।"

সম্ভ্রান্ত জমীদার, প্রকাণ্ড কুকুর, বালক আততায়ী, সন্দেহজনক জীবন যাপন,—সবই ত মিলিয়া যাইতেছে! কুক্ষণে তাঁহার প্রাণসমা কন্যাকে এই অভিশপ্ত বংশে সম্প্রদান করা হইয়াছিল! সাহারার শুষ্ক মরুর মত তাহার এই নিঃসঙ্গ জীবনের পরিণাম কোথায়? হতভাগ্য যুবক—অভিশপ্ত বংশে জন্ম—তাহার মুকুলিত জীবন ব্যর্থতার তপ্ত-শ্বাসে অকালে শুকাইয়া গেল। আজ সে গৃহহীন, চরিত্রহীন, সে আজ আততায়ীর করাল দণ্ডের লক্ষ্য—হয় ত ইহারও অপেক্ষা ভীষণ শাস্তি তাহার ললাটে লিখিত আছে। এই অভিশপ্ত জীবন হইতে তিনি তাঁহার কন্যার জীবনধারাকে অন্য ধারায় চালিত করিয়া কি অন্যায় করিয়াছেন?

না, তিনি পিতার কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ কি ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন! কি পাপে আজ তাহার এই শাস্তি! সে ত স্বেচ্ছায় তাহার ভাগ্যসূত্র এই অভিশপ্তের সহিত গ্রথিত করে নাই। সে কি তাহার শ্বশুরকুলের পাপের জন্য দায়ী?

"রাজু বাবু, বাড়ী আছেন না কি?"

রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আজ্ঞে, আমি কালীনাথ। একবার বাহিরে আসবেন কি?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "আরে কালীনাথ, তুমি? কদিন দেখিনি যে? এস, এখেনেই এস, তোমায় লজ্জা করবার কে আছে? বিশেষ, জ্যোৎস্না এই খানিক আগে সুধাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। এস হে, ভয়ঙ্কর খবর।"

কালীনাথ ভিতরে আসিয়া বলিল, "শুনেছি সব, কাশীর ত?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "হাঁ, কাশীর। হতভাগা প্রাণে মরে নি, এই যা। বৌটার কি হ'ল?"

কালীনাথ বলিল, "কিছুই জানি না। কাগজে যা পড়েছেন আপনি, আমিও তাই জানি। থাক্, সে পরের কথা। দেখুন দিকি, এ চিঠিখানার কিছু জানেন কি?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "চিঠি? দেখি।"

কালীনাথ বলিয়া যাইতে লাগিল, "জানেন ত, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সে দিয়ে গেছে আমার উপর ভার, নহিলে আমার কি মাথাব্যথা? আমায় এ উকীলের চিঠি দেওয়া কেন?"

রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত নেত্র উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "তাই ত—এর আমি ত কিছুই জানি না। সব কথা আমায় বলে—এটার বেলা ত আমার পরামর্শ নেয় নি। তুমি চিঠি পেলে কবে?"

কালীনাথ বলিল, "দিন সাত আগে। তখনই চ'লে আসছিলুম, কেবল কটা ঝঞ্চাট মিটুতে ছিল, তাই দেরী হ'ল। আজ সকালে এখানে আসবার সময় ষ্টেশনে কাগজ কিনে পড়লুম কাশীর ব্যাপার। মনটা একেই চিঠি পেয়ে খারাপ ছিল—তার উপর—যাক্ গে, এ চিঠি দিয়ে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য কি? বলছেন, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে নি। তবে জ্যোৎস্না এ উকীলই বা পেলে কোথায়, চিঠিই বা লিখলে কেন, তা ত বুঝতে পারছি না—জ্যোৎস্না—"

কালীনাথ হঠাৎ নীরব হইল, যাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছিল, সেই জ্যোৎস্নাময়ীই দ্বারে উপস্থিত। রাজেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, ফিরে এলে যে? সুধা কোথায়?"

জ্যোৎস্না সম্মুখে স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া মুখের অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সে পরিষ্কার-কণ্ঠে জবাব দিল, "সুধা প'ড়ে গিয়েছে, পাটা মচ্‌কে গিয়েছে, সোনাদার বাড়ী রয়েছে, ফিরে এলুম খবর দিতে। তাকে এখনই আনবার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

রাজেশ্বর বাবু চমকিত হইয়া দারুণ উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "এ্যাঁ, প'ড়ে গিয়েছে, কোথায়?"

রাজেশ্বর বাবু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাইবার সময় শুনিলেন, জ্যোৎস্না বলিতেছে, "সোনাদার বাড়ীর কাছ বরাবর ছিরু বারুইদের বরোজের পাশে।"

জ্যোৎস্না কালীনাথকে বলিল, "আপনি আমার কথা কি বলছিলেন? ঘরে ঢোকবার সময় যেন শুনলুম—"

কালীনাথ বলিল, "হাঁ, তোমারই কথা হচ্ছিল, জ্যোৎস্না। দেখ দিকি এই চিঠিখানা কি তুমিই দিয়েছো?"

জ্যোৎস্না অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ।"

কালীনাথ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া ঈষৎ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তুমি? তুমি জ্যোৎস্না? তোমার এ চিঠির মানে?"

জ্যোৎস্না গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "মানে চিঠিতেই আছে। যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, তা হ'লে আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি, আজ হ'লে চিঠির ৭ দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। এখনও যদি আপনি বাগানবাড়ী সোনাদার হাতে ছেড়ে না দেন, তা হ'লে—"

কালীনাথ এইবার সত্যই রুষ্টস্বরে বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে কি করবে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? ওঃ, তবু যদি মালিক তোমায় ঘরে নিত!"

জ্যোৎস্না শেষ অবধি কোন বাধাই দিল না, কথাগুলি নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার পর ধীর স্থির অবিচলিত স্বরে বলিল, "যে পরের অন্নদাস, সে অসহায় নারীকে এমনই ক'রে অপমান ক'রে থাকে বটে। যাক্, আমার সময় নেই, শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি। এ বিষয়ের মালিক আমি, তার দলীল দস্তাবেজ আছে। দেখতে চান, আমার উকীলের কাছে সন্ধান নেবেন। উকীলের নাম ঠিকানা চিঠিতেই আছে। আমার কথাও যে, কাযও সে, এটা জেনে রাখবেন।"

জ্যোৎস্না কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গর্ব্বিত-পাদক্ষেপে, মহিমময়ীরূপে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। কালীনাথ রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত নীরবে আহত হৃদয়ে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)



বসুমতী চিত্র-বিভাগ — ঘরের পথে — শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

কীর্ত্তনের স্বরলিপি

মাথুর বিরহ

মুড়াব মাথার কেশ, ঘুচাব অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি নাহি মোর এল।
ইহ নব যৌবন, পরশ-রতন বিনে,
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় আছেন নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যেখানেতে পাব, শ্যাম গুণনিধি,
বাঁধিব বসন দিয়ে॥

আপন বঁধুয়া, আনিব বাঁধিয়া,
কে বা রাখিবারে পারে।
যদি কেহ রাখে, ছাড়িব এ দেহ,
নারী-বধ দিব তারে॥
আবার ভাবি মনে, বাঁধিব কেমনে,
সে হেন দুর্ল্লভ হাতে।
বাঁধিয়ে পরাণ ধরিব কেমনে,
সেই সে ভাবিছে চিতে॥
জ্ঞানদাসের, বিনয়-বচন,
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
বিষম কুলের বাধা॥

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{রগা মগা রসা | রগা মগা রসা | রগা মগা রা | রা -া -া | রা -া মা | মা মা মা | মা মা গা | রমা গরা সা}
{মুড়া ০ ০ ০ | ব ০ ০ ০ ০মা | থা ০ ০ র্ কে | শ ০ ০ | ০ ০ ঘু | চা ব অ | ঙ্গে র বে | ০ ০ ০ ০ শ}

আখর—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{সা -া মা | গা রা সা | রগা মগা রা | রা ণ্া ণ্সা | সা সা সা | -া সা রগা | সা রা মা | গা রজ্ঞা রসা}
{০ ০ মু | ড়া ব মা | থা ০ ০ র্ কে | শ আ মার | বে শ ভু | ০ ষ ণে ০ | কা জ কি | আ ছে ০ ০ ০}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{সা -া মা | গা রা সা | রগা মগা রা | রা রা গা | মা পা পা | পধা ণধা পমা | মা পা মা | গা রা সা}
{০ ০ মু | ড়া ব মা | থা ০ ০ র কে | শ আ মার্ | বে শ ভূ | ষ ০ ০ ণে ০ ০ | কা জ কি | আ ছে ০}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{-া -া মা | গা রা সা | রগা মগা রা | রা ণ্া ণ্সা | সা সা সা | -া সা রগা | সা রা মা | গা রজ্ঞা রসা}
{০ ০ মু | ড়া ব মা | থা ০ ০ র কে | শ আ মার | দে হে র | ০ ভু ষণ | ছে ০ ড়ে | গ্যা ছে ০ ০ ০}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{-া -া মা | গা রা সা | রগা মগা রা | রা রা গা | মা পা পা | পধা ণধা পমা | মা পা মা | গা রা সা}
{০ ০ মু | ড়া ব মা | থা ০ ০ র কে | শ আ মার্ | দে হে র | ভূ ০ ০ ষ ০ ণ | ছে ০ ড়ে | গ্যা ছে ০}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{-া -া মা | গা রা সা | রগা মগা রা | রা -া -া | -া -া মা | মা মা মা | মা মা গা | রমা গরা সা |
০ ০ মু | ড়া ব মা | থা ০ ০ র্ কে | শ ০ ০ | ০ ০ ঘু | চা ব অ | ঙ্গে র বে | ০ ০ ০ ০ শ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{-া -া মা | মা মা মা | -া -া গা | মা গা রা | সা -া -া | রা গা -া | রা গা মা | গা রা সা}
{০ ০ পি | য়া য দি | ০ ০ না | হি মো র | এ ০ ০ | ০ ০ ০ | ল ০ ০ | ০ ০ ০}


আথর—
১ম বার
২য় বার
আথর—
১ম বার
২য় বার


আখর—
আখর—
তান—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা | সা রা সা | ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সরা জ্ঞা রা | সা -া -া}
{ম থু রা | ন গ রে | প্র তি ঘ | রে ঘ রে | খুঁ জি ব | যো গি নী | হ॰ ॰ ॰ | য়ে ॰ ॰}

আভোগ—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| মা মা মা | জ্ঞা রা রা | ণ্‌া সা সা | সা রা গা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা | মা মা মা |
| ম থু রা | ন গ রে | কো ন্‌ ধ | নি ধ’ রে | রে ॰ খে | ছে গো॰ ॰॰ | ম থু রা |

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
জ্ঞা রা রা | ণ্‌া সা সা | সা রা গা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা | {মা মা মা | জ্ঞা রা রা |
ন গ রে | কো ন্‌ ধ | নি ধ’ রে | রে ॰ খে | ছে গো॰ ॰॰ | {ম থু রা | ন গ রে |

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
মা মা মা | পধণর্সা ণধা পমা | মা পা মা | মা মজ্ঞা রসা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা}
আ মার্‌ বঁ | ধু॰॰॰ কে॰ ॰॰ | কো ন্‌ ধ | নি ধরে ॰॰ | রে ॰ খে | ছে গো॰ ॰॰}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা | সা রা সা | ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা সা -া | -া -া -া} I
{ম থু রা | ন গ রে | প্র তি ঘ | রে ঘ রে | খুঁ জি ব | যো গি নী | হ য়ে ॰ | ॰ ॰ ॰}

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা পা পা | পা পা পা | মা পা পা | পা দা পা | মা পা মা | মা মা মজ্ঞরসা | সরা জ্ঞা রা | সা -া -া}
{যে খা নে | তে পা ব | শ্যা ম গু | ণ নি ধি | বাঁ ধি ব | ব স ন॰ ॰॰ | দি॰ ॰ ॰ | য়ে ॰ ॰}

তান—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| মা পা পা | পা পা পা | -া পা ণা | ধা ণা া | -া -া -া | ণা ধা পা | -া পপা পা | ধা ধা ধা |
| যে খা নে | তে পা ব | ॰ স খি | রে ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ আমি যে | খা নে তে |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
ধা ধা -া | -া -া -া | -া -া -া | ধণা ধপা মা | রা মা রা | মা পধা ণধা | পধা পা -া | -া -া -া |
পা ব ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰॰ ॰॰ ॰ | শ্যা ম গু | ণ নি॰ ॰॰ | ॰॰ ধি ॰ | ॰ ॰ ॰ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা পা পা | পা পা পা | মা পা পা | পা দা পা | মা পা মা | মা মা মজ্ঞরসা | সরা জ্ঞরা | সা -া -া}
{যে খা নে | তে পা ব | শ্যা ম গু | ণ নি ধি | বাঁ ধি ব | ব স ন॰॰॰ | দি॰ ॰ ॰ | য়ে ॰ ॰}

আভোগ—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| সা -া -া | -া রা গা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা | {ণ্‌া সা সা | সা রা গা | সা রা মা | গা রজ্ঞা রসা}
| ॰ ॰ ॰ | ॰ ভ য় | ক র ব | না গো॰ ॰॰ | {রা জা ব | লে ভ য় | ক র ব | না গো॰ ॰॰}

০ ১ ২´ ৩
মা পা মা | মা মা মজ্ঞরসা | সরা জ্ঞা রা | সা -া -া II
বাঁ ধি ব | ব স ন॰॰॰ | দি॰ ॰ ॰ | য়ে ॰ ॰ II

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{রা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা | সা রা রা | ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা সা -া | -া -া -া}
{আ প ’ন | বঁ ধু য়া | আ নি ব | বাঁ ধি য়া | কে বা রা | খি বা রে | পা রে ॰ | ॰ ॰ ॰}

তান—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| রা মা মা | জ্ঞা রা রা | -া রা মা | গা মা া | া -া -া | গমা পধা ণধা | পা ধা পা | মা পা মা |
| আ প ন | বঁ ধু য়া | ০ স খি | গো ০ ০ | ০ ০ ০ | ০০ ০০ ০০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
গা মা গা | রা জ্ঞা রা | সা -া া | -া া -া | সা সা -া | -া -া া | সা ণ্া ধা | ধ্া ণ্সা ররা |
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | আ মি ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | গ রব্ করে |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
রা রা রা | রা রা -া | সা -া রা | জ্ঞা জ্ঞা রা | মা রা -া | রসা সণ্া ধ্প্া | ধ্া ণ্া সা | সা সা -া |
ব ল তে | পা রি ০ | সে ০ ই | কৃ ষ্ণ ০ | ০ ০ ০ | আর কার নয় | আ মার্ বঁ | ধু য়া ০ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ রা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা | সা রা সা | ণ্া ধ্া ণ্া | সা সা -া | -া -া -া } I
{ আ প ন | বঁ ধু য়া | আ নি ব | বাঁ ধি য়া | কে বা রা | খি বা রে | পা রে ০ | ০ ০ ০ }

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| মা পা পা | পা পা পা | মা পা পা | পা দা পা | মা পা মা | মা জ্ঞা রা | সরা জ্ঞা রা | সা -া -া }
| য দি কে | হ রা খে | ছা ড়ি ব | এ দে হ | না রী ব | ধ দি ব | তা০ ০ ০ | রে ০ ০ }

আখর—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| সা -া -া | -া সা রগা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা || { ণ্া সা সা | -া সা রগা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা }
| ০ ০ ০ | ০ ব ধের্ | ভা গি ক | রি ব০ ০০ || { না ০ রী | ০ ব ধের | ভা গি ক | রি ব০ ০০ }

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ মা -া মা | পধণসা ণধা পমা | মা পা মা | মা মা মজ্ঞরসা | ণ্া সা সা | -া সা রগা | সা রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা রসা }
{ ব ০ ন্ধ | নে০০০ যে০ ০০ | বা ধা দে | বে তা রে০০০ | না ০ রী | ০ ব ধের্ | ভা গি ক | রি ব০ ০০ }

০ ১ ২ ৩
| মা পা মা | মা জ্ঞা রা | সরা জ্ঞা রা | সা া -া ||
| না রী ব | ধ দি ব | তা০ ০ ০ | রে ০ ০ ||

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ১ম বার ৩ ২য় বার
{ রা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা | সা রা সা | ণ্া ধ্া ণ্া | সা সা -া | (-া -া -া) } (-া রা গা) } I
{ আ বার্ ভা | বি ম নে | বাঁ ধি ব | কে ম নে | সে হে ন | দু র্ল ভ | হা তে ০ | (০ ০ ০) } (০ তা রে) } I

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ মা পা পা | পা পা পা | মা পা পা | পা দা পা | মা পা মা | মা জ্ঞা রা | সরা জ্ঞা রা | সা -া -া }
{ বাঁ ধি য়ে | প রা ণ | ধ রি ব | কে ম নে | সে ই সে | ভা বি ছে | চি০ ০ ০ | তে ০ ০ }

তান—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| মা পা পা | পা পা পা | -া পা ণা | ধা ণা -া | -া -া -া | ণা ধা পা | া পধা ধা |
| বাঁ ধি য়ে | প রা ণ | ০ স খি | গো ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ সখি গো |

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
-া -া -া | ধণা ধণা ধণা | ধণা ধপা না | মা পধণা ধপা | ধা পা পা | { মা পা পা |
০ ০ ০ | ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০ | বাঁ ধি০০ য়ে০ | প রা ণ | { বাঁ ধি য়ে |



আকারমাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন। স্বাভাবিক স্বরাক্ষর, যথা—স, র, গ, ম, প, ধ, ন। কোমল—ঋ, জ্ঞ, দ, ণ। কড়ি—হ্ম। উদারা—হসন্ত চিহ্ন (্) যথাঃ—স্। মুদারার কোন চিহ্ন নাই। যথাঃ—স। তারা—রেফ্ চিহ্ন (´) যথাঃ—র্স। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন গুম্ফ বন্ধনী { }। যথা :—{ সা রা গা মা } সম্ (২´) ফাঁক (০)। মাত্রা চিহ্ন (-া) যথা :—সা।

হারমোনিয়মের স্কেল্। স্ত্রী-কণ্ঠে মুদারার সি সার্প অথবা ডি সার্প, অর্থাৎ মুদারার কোমল ঋ কিম্বা কোমল গ-কে মুদারার সা সুর করিয়া গাহিতে হইবে। পুরুষ-কণ্ঠে এফ্ সার্প অথবা জি সার্প অর্থাৎ উদারার কড়িমধ্যমকে কিম্বা কোমল ধ-কে মুদারার সা সুর করিয়া গাহিবে।

সুর ও স্বরলিপি :—সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিনতা-সংবাদ

আরো দু'দিনে পরিমলের অসুখটা একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার কহিলেন,—খুব ভালো রকম মালিশ করতে হবে, এবং পুল্টিশের ব্যবস্থা প্রয়োজন। না হলে বাঁচানো শক্ত হবে!

অনন্ত প্রমাদ গণিল। তার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে নার্শ আনিয়া পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করে! অথচ অনূঢ়া তরুণী, পরের মেয়ে—ডাক্তারের কথা-মত পরিচর্য্যা করায় পুরুষের বহু বিঘ্ন! দাসীটাও সময় বুঝিয়া কামাই করিতে সুরু করিয়াছে—দম্‌কা হাওয়ার মত কখন্ আসিয়া উদয় হয় এবং চোখের পলক ফেলিতে কখন্ পলায়, বুঝিবার জো থাকে না।

সে মার কাছে কথাটা তুলিল। মা কহিলেন,—আমি গিয়ে দেখাশুনা করতে পারি। দেখা উচিতও। কিন্তু যে তোমার কাকার মেজাজ···

অনন্ত কহিল,—মাথা কেটে ফেলবেন না তো!

—তা ফেলবে না। কিন্তু কত কৈফিয়ৎ, কত ফৈজৎ···

সে কথা ঠিক! অনন্ত বুঝিল, ফিলানথ্রপি করিতে গেলে মনের বাসনা বা স্বাধীনতা থাকিলেই চলে না—সেই সঙ্গে পার্থিব বহু বস্তুর প্রয়োজন হয়!

সহসা মনে হইল, প্রভাত তো আছে। ঠিক! এ দায় শুধু তার একার নয়। প্রভাত তো কলেজের পর আসিবে, তাকে এ কথা বলিবে।

কাল হইতে অনন্তর কলেজ কামাই হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তি জাগে। তরুণ বয়সের কল্পনা মনকে মাঝে মাঝে রঙাইয়া তুলিলেও সে রঙ চারিদিক্‌কার দৈন্যের আবহাওয়ায় কেমন থিতাইতে পারিতেছিল না। তাই কখনো মনে হয়, পরি সারিয়া উঠিলে সে তার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা করিবে—যেমন করিয়া হোক, তার পাশ করা চাই। না করিলে সারা ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে! তার কি রোমান্স সাজে! না, বাঙালীর জীবনে রোমান্সের কোনো সুযোগ আছে! ও-সব গল্পে-উপন্যাসেই লিখিতে-পড়িতে ভালো। রোমান্স আর জীবন—দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ! বিবাহও মুখের কথায় হয় না। তার পূর্ব্বে কত ব্যবস্থার প্রয়োজন! যদি পয়সা থাকিত, তাহা হইলে কোনো দিকে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিত না! সত্যকার জীবনে পয়সা না হইলে কিছু করিবার উপায় থাকে না! কাজেই ও-সব কথা ভাবিয়া ফল নাই! Fact—কঠিন সত্য—সেই সত্যের সহিত বুঝাপড়া করিয়া চলিতে হইবে!

ডাক্তার মালিশের ঔষধ-পত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলা আনিতে যাইবে, এমন উপায়ও নাই। রোগী থাকিয়া থাকিয়া কেমন চমকিয়া উঠিতেছে—ক্ষণে ক্ষণে তীব্র পিপাসায় জল চাহিতেছে, জল খাইয়া আবার সেই আচ্ছন্ন ভাব! বহুবার ডাকিলে তবে সাড়া মিলে। এমন রোগীকে একা রাখিয়া ঔষধটুকু আনিতে যাইতেও ভয় করে!

বেলা তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, পরির টেম্পারেচার লইয়া অনন্ত দেখে, জ্বর প্রায় ১০৪ ডিগ্রী।

সর্ব্বনাশ! ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, ১০২ ডিগ্রীর উপর উঠিলে মাথায় আইস্-ব্যাগ দেওয়া চাই! আইস-ব্যাগও একটা কিনিয়া আনিতে হইবে। চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা! ইহার মধ্যে রোগীর সেবা চলে না!

সে স্থির করিল, দাসীটা যদি একবার আসে, তাকে কিছু পয়সার লোভ দেখাইয়া পরির কাছে রাখিয়া চকিতের জন্য বাহির হইয়া পড়িবে। ঔষধ-পত্র কেনা—এবং ঔষধ লইয়া ফিরিবার মুখে যেমন করিয়া হোক মাকেই আনিবে। মেজকাকা যদি আপত্তি করেন? বহিয়া গেছে। চাল কাটিয়া তুলিয়া দিবেন, এমন অবস্থা সত্যই তার নয়!

এমনি পাঁচ কথা ভাবিতেছে, পরি ঠোঁট নাড়িল, অস্পষ্ট মৃদু স্বরে কহিল,—জল!

জলের গ্লাশ কাছে ছিল। অনন্ত পরির মুখে গ্লাশ ধরিল। জল পান করিয়া পরি অনন্তর হাতখানা চাপিয়া ধরিল, রোগের ঘোর—অনন্ত তাহা বুঝিল।

অনন্ত পরির পানে চাহিয়া ডাকিল—পরি…

পরি চাহিল,—চোখ শুধু জবাফুলের মত লাল নয়, দৃষ্টিতে কেমন যেন নেশার ঘোর!

অনন্ত কহিল,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

চোখের পাতা কষ্টে নাড়িয়া পরি জানাইল,—হাঁ।

অনন্ত কহিল,—কোথায় বেশী কষ্ট হচ্ছে?

কষ্টে পরি কহিল,—বুকে।

এইটুকু বলিয়া আবার সে চক্ষু মুদিল। অনন্ত পরির পানে চাহিয়া রহিল, কি করুণ ম্লান মূর্ত্তি! এই পরিকে বাঁচানো কি সম্ভব হইবে? অনন্তর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পরির হাতে তার হাত, সে-হাত সরাইল না; তেমনি ভাবেই চোখের করুণ দৃষ্টি মেলিয়া সে পরির পানে চাহিয়া রহিল।

সহসা দ্বারে স্বর জাগিল,—আজ খপর কি রকম?

চমকিয়া চাহিয়া অনন্ত দেখে, প্রভাত। অনন্ত বর্ত্তাইয়া গেল। ইশারায় প্রভাতকে বসিতে বলিল। প্রভাত বসিল।

অনন্ত কহিল,—খুব বেশী অসুখ! ডাক্তার বলে গেল, প্যাচ্‌টা বেড়েচে। এখন টেম্পারেচার নিলুম। প্রায় ১০৪। বুকে পিঠে মালিশ দরকার, পুল্‌টিশ দরকার। কি করে কি হবে…

উদ্বেগাকুল নেত্রে প্রভাত অনন্তর পানে চাহিয়া রহিল।

অনন্ত কহিল,—ওষুধ আনতে যাবো, যেতে পারচি না। এই রোগীকে একা রেখে কি করে যাই! তা ছাড়া এ সেবা অনেক পয়সার খেলা ভাই। কি বিপদেই যে পড়েচি! ঝীটা ছিল, সেও সময় বুঝে সরেচে!

প্রভাত নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। অনন্তর হাত পরির হাতে আবদ্ধ, প্রভাতের লক্ষ্য এড়াইল না!

অনন্ত কহিল,—একজন ভালো নার্শ পাওয়া যেতো, তা হলে সারিয়ে তোলবার কিছু আশা থাকতো! কিন্তু কাকে আনি, জানি না। তাছাড়া তাতে বহু পয়সার দরকার, এক দিন আধ দিনও নয়…

প্রভাত কহিল,—নার্শ! ঠিক বলেচো। আমার জানা এক জন নার্শ আছেন, ভারী ভালো। আমি এখনি তাঁর ওখানে যাচ্ছি…

অনন্ত কহিল,—তা হলে ভাই, ঐ কাচের টেবিলের উপর প্রেসক্রপ্‌শনটা আছে—নিয়ে যাও। ওষুধটাও অমনি এনো। তোমার কাছে টাকা আছে?

—আছে।

অনন্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আঃ! তোমার কথাই ভাবছিলুম…তা এর মধ্যে তুমি আসবে, সেটুকু শুধু ভাবতে পারি নি!

প্রভাত কহিল,—কলেজে মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে গেল। কাল রাত্রে ওঁর অত জ্বর দেখে গেছি, তুমি একা আছো, কলেজে যাওনি, তাই কেমন ভাবনা হলো…

অনন্ত কহিল,—তা হলে তুমি যাও ভাই, ওষুধটা আর নার্শ…এখনি দরকার।

প্রভাত কহিল,—হ্যাঁ, আমি এখনি যাচ্ছি…

কথাটা বলিয়া প্রভাত বাহির হইয়া গেল।…

পথে বাহির হইতেই ট্যাক্সি মিলিল। ট্যাক্সি করিয়া আসিয়া কাছাকাছি যে ডিস্‌পেন্সারির দেখা মিলিল, সেই-খানে ঔষধটা তৈয়ার করিতে দিয়া সে ছুটিল বিনতার গৃহে।

বিনতা গৃহে ছিল না। ভৃত্য কহিল, ফিরিতে দেরী হইতে পারে!

প্রভাতের অস্বস্তি ধরিল। প্রভাত কহিল—কোথায় গেছেন, জানো? তাঁকে আমার এখনি দরকার।

ভৃত্য কহিল, কোথায় গিয়াছেন, সে জানে। বলিয়া গিয়াছেন, জরুরি ডাক আসিলে তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়।

প্রভাত কহিল—তুমি তা হলে আমার ঐ গাড়ীতে করেই যাও। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।···এখনি ডেকে আনবে। বলবে, জরুরি কল্···অনেক টাকার কল্!

ভৃত্য প্রভাতকে বাহিরের ছোট ঘরে বসাইয়া ট্যাক্সি করিয়া বিনতার সন্ধানে গেল।

এ ঘরে প্রভাত কখনো আসে নাই। সেদিন দ্বারপ্রান্তে বিনতাকে নামাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিনতা বহু অনুরোধ করিয়াছিল—একটিবার আসুন···এক পেয়ালা চা খেয়ে যান···প্রভাত সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। তার মন তখন উন্মুখ হইয়া ছিল অনন্ত ও পরিমলের সংবাদের জন্য!

এখন এ-ঘরে বসিয়া প্রভাত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। ছোট হইলেও ঘরখানি বেশ সজ্জিত। দেওয়ালের গায় পশমে বোনা কয়েকখানি ছবি,—ওদিকে ছোট একটি টেবিল—টেবিলের উপর একখানি ফটো। ফটো বিনতার। বিনতার পাশে বসিয়া একজন পুরুষ—চেহারা বদ···দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া ছবি তুলাইয়াছে। ঘরের একধারে ছোট একটি শেল্‌ফ—শেল্‌ফে ক'খানা বই—ইংরাজী ও বাঙলা। একখানা বই টানিয়া প্রভাত তার পাতা উল্টাইতে লাগিল। বহিখানি বহুকালের ছাপা কাব্যগ্রন্থ। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—শ্রীমতী বিনতা দেবীকে প্রীতি-উপহার···তলায় সহি—শ্রীকুণাল চৌধুরী।

প্রভাত বহিখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। দু' চারিটা কবিতার ছত্রে পেন্সিলের দাগ। বহিখানা তবে পড়া! দাগ-দেওয়া ছত্রগুলা প্রভাত পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মনের সামনে এক মায়াময় কল্পলোক তার বিচিত্র রমণীয়তায় ফুটিয়া উঠিল। সেই কল্পলোকে প্রবেশ করিয়া সে যেন সব ভুলিয়া গেল—পরির রোগশয্যার কথা, বিনতার পরিচর্য্যার কথা—সব!

কল্পলোকে সে যখন তন্ময়, তখন দ্বারে ওদিকে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে বিনতা আসিয়া কহিল,—আপনি! তার স্বরে বিস্ময়!

প্রভাত কহিল—এই যে···এসেচেন! আঃ! বাঁচালেন! বড্ড দরকার···এখনি আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে···

প্রভাত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনতা কহিল—বসুন···যাবো বৈ কি! আপনি নিজে এসেচেন! ···তা, কোথায় যেতে হবে?

প্রভাত নিমেষের জন্য থ হইয়া রহিল—কোথায় যাইতে হইবে ফশ্‌ করিয়া সে কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না। বিনতা কহিল,—বসুন। অতিথি···গরীবের কুঁড়েয় যখন পদার্পণ করেচেন, তখন এক পেয়ালা চা অন্ততঃ··· চায়ের সময়ও হয়েচে···

প্রভাতকে আবার বসিতে হইল। বিনতা ডাকিল—ভজু···

ভৃত্যটা আসিল। বিনতা কহিল—তুই চায়ের জল চড়িয়ে দে।···খুকী এসেচে স্কুল থেকে?

ভজু কহিল—না।

বিনতা কহিল—আচ্ছা। চায়ের জল চড়িয়ে তুই তার স্কুলে যা···তিনটে বাজে!

—তিনটে! প্রভাত চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে আসিয়াছে! তাইতো!

বিনতা কহিল,—চমকে উঠলেন যে! তিনটে বাজবার সময় কি হয় নি?

প্রভাত কহিল,—তা নয়। মানে, আমি এতক্ষণ বসে আছি!

বিনতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কি করবেন, বলুন! নেহাৎ গরজ যে! সেদিন একটু চা খেয়ে যেতে বলেছিলুম, শুনতে পারলেন না! এই অবধি বলিয়া বিনতা থামিল, থামিয়া একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া সে কহিল,—আমি যে গিয়েছিলুম অনেক দূরে—সেই শ্যামবাজারে। তাই দেরী হলো।

প্রভাত শুধু কহিল—ও!

বিনতা কহিল,—কি করছিলেন এতক্ষণ! এমন তন্ময় যে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, সেদিকে হুঁশ নেই!···

প্রভাত কহিল,—এই বইখানা পড়ছিলুম। কাব্যগ্রন্থ! কবির নাম কখনো শুনিনি!

বিনতা বইখানার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—কবির আসল নাম ও নয়—ছদ্ম নাম। আসল নাম বললেও চিনবেন না!—হুঁঃ, ভজুয়াকে এত বলি, ও জঞ্জালগুলো আর জড়ো করে রাখিস নে রে, ফেলে দে! তা শোনে না।

বলে, না মা, থাকুক, অনেক ভদ্দর বাবু-লোক আসেন, চুপ-চাপ বসে থাকেন, এ তবু দু'একখানা টেনে পড়ে সময় কাটাতে পারবেন! তাই রয়ে গেছে।

প্রভাত কহিল,—এ বইখানি প্রীতি-উপহার! লেখা রয়েচে, দেখলুম। এই যে…বলিয়া প্রথম-পৃষ্ঠা খুলিয়া সেই লেখাটুকুর পানে ইঙ্গিত করিল।

বিনতা সে লেখা দেখিল, দেখিয়া নিমেষের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

প্রভাত তার পানে হাসি-ভরা দৃষ্টিতে বারেক চাহিয়া একটু স্নেহের স্বরেই কহিল,—উপহারের জিনিষ ফেলতে নেই, বিনতা দেবী! বিশেষ, প্রীতি-উপহার!

বিনতার ঠোঁটের আগে কি একটা জবাব আসিয়াছিল; কিন্তু সে-জবাব না দিয়া সে কহিল,—হুঁ!…কত পাগলামিই যে মানুষ করে, জীবনে কত ভুল!…তা যাক, অসুখ কার? কোথায় যেতে হবে?

প্রভাত কহিল,—অসুখের জন্যই যেতে হবে, এ ধারণা কেন হলো, বলুন তো? আমায় দেখলে কি রোগের বাহন বলে মনে হয়?

বিনতা কহিল,—ছি, ছি—কি যে বলেন!…তা নয়। সত্যি বলুন, আমার ভাবনা হচ্ছে…বিশেষ, আপনি নিজে এসেচেন! মামাবাবুর ওখানে না কি?

প্রভাত কহিল,—না।

—তবে? বিনতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রভাতের পানে চাহিয়া রহিল।

একটা ঢোঁক গিলিয়া প্রভাত কহিল,—সেই মেয়েটি…মানে, বুঝচেন না? সেই যে চিঠি লিখেছিল আমার বন্ধু অনন্ত…সেই যাকে আশ্রয় দেছেন!…তাঁর খুব বেশী অসুখ। আপনি না গেলে তাঁর সেবা-পরিচর্য্যাই হবে না! রোগ নিউমোনিয়া।

—বটে!…

বিনতা প্রভাতের পানে চাহিয়া রহিল। তার মুখে কথা নাই!

প্রভাত কহিল,—কি ভাবচেন?

বিনতা কহিল,—বাড়ীর ব্যবস্থা করে যেতে হবে, তাই! দু' এক দিনের জন্যও যাওয়া নয় তা হলে! নিউমোনিয়া বলচেন!…এই মেয়েটা…বিনতার চোখের দৃষ্টি উদ্বেগাকুল!

প্রভাত কহিল,—সত্যি, আপনার সঙ্গে এত দিন একত্র বাস করলুম—এমন আলাপ হলো—অথচ আপনার পরিচয় কোনো দিন নিলুম না!

হাসিয়া বিনতা কহিল,—ভারী তো মানুষ আমি! আমার আবার পরিচয়! শিক্-নার্শ—পয়সা পেলে কাবুল-কান্দাহার পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে হয়…

হাসিয়া বলিলেও কথাটায় বেদনার ক্ষীণ আভাস! প্রভাত তাহা বুঝিল। বিনতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আর বেশী পরিচয়ের জন্য আকুল হবেন না! সে না হয় আর এক সময় হবে'খন! হ্যাঁ, এখন…আপনি উপরে আসুন তাহলে যদি আপত্তি না থাকে! আমি এখনি তৈরী হয়ে নেবো। আপনার চাটুকু তৈরীকরা, আর এই কাপড়খানা বদলানো—সেই সঙ্গে বাড়ীর ব্যবস্থা-পত্র…আসুন উপরে … আপত্তি আছে?

প্রভাত কহিল,—না। আপত্তি কিসের!

প্রভাতকে আনিয়া বিনতা দোতলায় নিজের শয়ন-কক্ষে বসাইল। এ ঘরখানিও খুব প্রশস্ত নয়। না হইলেও ভারী পরিপাটী ছাঁদে সজ্জিত। এক ধারে একখানি খাট… খাটে দুটি শয্যা; একটি বড়, অপরটি ছোট! নিজের আর মেয়ের! অপর ধারে ছোট একটি ড্রেশিং টেবিল, তার উপর এক শিশি পোমেড, ক্রিম, চিরুণী, ব্রশ,—ফুলদানী। ফুলদানীতে একটি তাজা গোলাপ অবধি রহিয়াছে। এ ঘরের দেওয়ালেও পশমে বোনা ছবি এবং কখানা ফটোগ্রাফ।

বিনতা কহিল,—আপনি এই চেয়ারে বসুন—আমি চায়ের জোগাড় করি। কথাটা বলিয়া বিনতা চলিয়া গেল।

প্রভাত চেয়ারে বসিল। তার কৌতূহলের সীমা নাই! এই বিনতা—এমন রহস্য-রেখায় আপনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে! কোনো দিক হইতে তার পরিচয় অনুমান করারও সম্ভাবনা নাই! কথায় আলাপে হাস্যে সহজ প্রাণের সরল স্বাচ্ছন্দ্য লীলায়িত হইয়া আছে, সারাক্ষণ! মনের কোনো কোণে দুঃখ বা ক্ষোভ আছে বলিয়া মনে হয় না! হৃদয়ের দিক দিয়া ঐশ্বর্য্যময়ী, অথচ এই হাসি, এই

তারুণ্যের বিনিময়ে নিজে কি পাইয়াছে, কিং-বা পায় নাই, আভাসেও তাহা জানা যায় না! নিজে এবং মেয়ে···বিবাহ হইয়াছে, নিশ্চয়! নহিলে ঐ মেয়ে খুকী···

কিন্তু স্বামী? বাঁচিয়া আছেন তো? নিশ্চয়!

বেশে-ভূষায় কৈ বিধবার চিহ্নও নাই! স্বামী তবে কোথায়? কি করেন? স্বামীর কথা ঘুণাক্ষরে কোন দিন বিনতা প্রকাশ করে নাই! অত দিন তাদের বাড়ীতে গিয়া বাস করিল, মেয়ের লেখা চার-পাঁচখানা পোষ্ট কার্ড গিয়াছিল,—নিজেও বিনতা চিঠি লিখিয়াছে! শুধু মেয়েকে! ব্রাহ্ম? তাও নয়! এ-ঘরের দেওয়ালে পশমে বোনা ঐ যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি! শুধু আর্টের খাতিরেই নয়, মনে হয়! বিনতার সিঁথিতে প্রভাত সিঁদুরও লক্ষ্য করিয়াছে। হিন্দুই! তবে···?

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিশুর হাসি

সমুদ্র-মন্থনে যবে সুধার কলস হাতে দিলেন কমলা দেখা
সারা বিশ্বে জাগিল কি অপূর্ব্ব বিস্ময়!
তারি লাগি বহিল যে ক্রুদ্ধ দেব-দানবের উষ্ণ রক্তস্রোতোরেখা
ধরণীতে কোথা তার রহিল সঞ্চয়।

অমৃত কি দেবতার একেলার একান্ত আপন ধন
আর কারো নাহি তাহে কোন অধিকার?
মৃত্তিকার কাল কোলে চিরদিন ক্লিষ্ট মানুষের মন
করিবে কি পিপাসায় রুদ্ধ হাহাকার?

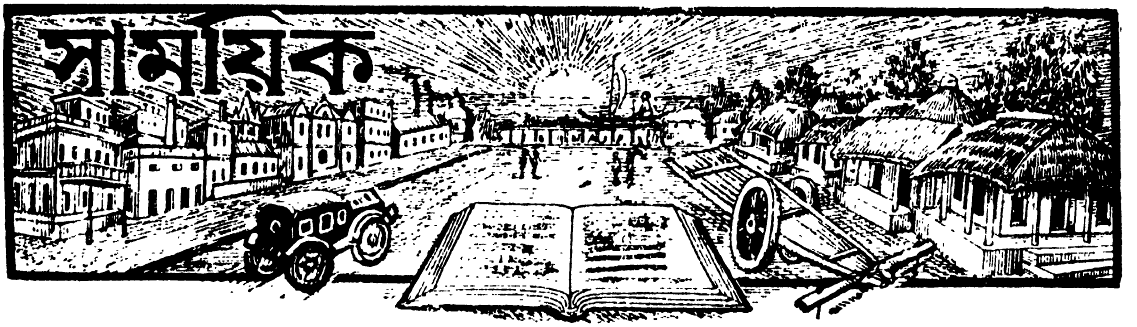
সান্ত্বনা নাহি কি তার চিরন্তন অভিশাপ করিবে জর্জ্জর নিত্য
আনন্দের সুর কোনো বাজাবে না বাঁশী?
নহে নহে কভু ওরে, পাষাণে গঠিত শুধু নহে বিধাতার চিত্ত
দিলেন অমৃত-ধন শিশুমুখে হাসি।

অমৃত শাশ্বত দান, নাহি তায় পুলকের আয়োজন
ব্যর্থ তাই সে অমৃত ধূপছায়া চাহে,
নিত্যদিন সুখ-দুখ নবরূপে চিত্ত করে আলোড়ন
শিশু হাসি সুধা ঢালে সেথা গাঢ় স্নেহে।

মৃত্যুলোক পিছে চলে, জেগে ওঠে পাশে, মঙ্গল জ্যোতির তরি
পুঞ্জীভূত ব্যথা-রাশি করি বিস্মরণ,
নব জীবনের আলো আনে শিশু যুগে যুগে অমিয় হাসিটি ভরি
ক্লান্ত ধরণীতে বহি নব জাগরণ।

ব্যথাতুর ওরে জীব কোথা যাস শাশ্বত সান্ত্বনা মাগি,
ঘরে তোর আছে ঢাকা ক্ষয়হীন সুধা,
মধুর সুধার চেয়ে শিশু-হাসি নিত্য রহে তোর লাগি
মিটাইতে জীবনের তৃপ্তিহীন ক্ষুধা।

শ্রীযতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।



পালা শেষ

এ দেশের মডারেটরা দেশবাসীর অভিমতের বিরুদ্ধে যে বৈঠকে গিয়া ওপারের কর্ত্তাদের সহিত সহযোগ ও সাহচর্য্য করিয়া স্বাধীনতার কায়ারূপ মাল আনিতে সাগরে পাড়ি দিয়াছিলেন, সেই তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পালা সাঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারা নগদ বিদায় পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীদের মধ্যে অধিকাংশই কারারুদ্ধ থাকিতে এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে 'মাল' দিতে যিনি সমর্থ, সেই মহাত্মা গান্ধীর মতামত উপেক্ষিত থাকিতে কোনও আপোষই যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে না—অন্ততঃ বৈঠকের সিদ্ধান্তমত কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপযোগী সহযোগ-প্রয়াসী যথার্থ কর্ম্মী পাওয়া যাইবে না—ইহা জানিয়াও যে মডারেটরা বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের সাহসের পরিচয় ত পাওয়া যায়ই, পরন্তু তাঁহাদের অফুরন্ত আশারও পরিচয় ইহাতে পরিস্ফুট। যেমন রণক্ষেত্রে কৌশলী সেনাপতি প্রবল অপরাজেয় শত্রুর সম্মুখীন হইয়াও আশার হাল ছাড়েন না, পরিখার পর পরিখা হইতে হঠিতে হঠিতে শেষ পরিখা পর্য্যন্ত হঠিয়া একবার শেষ পরীক্ষা করিয়া লন যে, শত্রুর উদ্দেশ্য কি এবং তিনিই বা কোথায় দাঁড়াইয়া আছেন, মডারেট নেতা সার তেজ বাহাদুর সপ্রুও তেমনই আশাহত হইতে হইতেও শেষ পর্য্যন্ত বাহিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বা কোথায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর শাসকজাতিই বা কতটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এ হিসাবে তাঁহার ধৈর্য্য ও আশাবাদিতা অসাধারণ, তাঁহার দেশপ্রেমও অবিসংবাদিত, তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত তর্কবিতর্কের যুদ্ধও স্মরণীয়। তিনি শেষ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন, যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তাঁহার দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না, কোনও কোনও বিষয়ে অধিক অধিকার, কোনও কোনও বিষয়ে বাঁধনকষণের শিথিলতা এবং সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিয়া তাঁহার সহিত রফা না করিলে কোন সিদ্ধান্তই সফল হইবে না। সার তেজ বাহাদুর মডারেট হিসাবে যতটুকু করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি নিশ্চিতই ধন্যবাদের পাত্র এবং তাঁহার মানসিক শক্তি যে সকল ভারতীয় সদস্য হইতে অধিক, তাহা বৃটিশ পক্ষের প্রধান প্রতিনিধি ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরের পক্ষ হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সকল কথার জবাব দেওয়াতেই সপ্রমাণ। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি সার স্যামুয়েলের মুখে ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের যে কল্পনার কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যদি দেশবাসীর অভিপ্রায় অনুসারে বৈঠকে না যাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত; জগতের নিরপেক্ষ লোকমাত্রেই তখন ভারতবাসীর যথার্থ মনোভাব বুঝিতে পারিত! বাছিয়া বাছিয়া যে কয় জন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানকে বৈঠকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের কথা তুলিব না, কেন না, তাঁহারা ভারতের দাবী লইয়া যান নাই, গিয়াছেন নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দাবীর বোঝা মাথায় বহিয়া!

কি দেওয়া হইতেছে

দেখিতে হইবে যাচাই করিয়া, ওপার হইতে ভারতকে কি দেওয়া হইতেছে। যে জন্য মহা আড়ম্বরে অর্থ ও সময় নিয়োগ করিয়া এত বড় বৈঠক তিন তিনবার বসান হইল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি না, সেইটুকুই ভারতবাসীর পক্ষে আলোচ্য। শাসক-জাতির পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের বক্তৃতা হইতেই উহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। গোল টেবিলে সার তেজ বাহাদুর সপরুই স্পষ্ট ভাষায় কয়টি দাবী করিয়াছিলেন। সে দাবীগুলি সংক্ষেপে এইরূপঃ—(১) ভারতবাসী পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত কেন্দ্রীয় দায়িত্বের অধিকার চাহে, কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহে না, (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্ব বড় জোর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে, (৩) যদি রাজন্যরা ঐ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে সম্মত হন, ভালই, নচেৎ তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া এখন কেবল বৃটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার পর রাজন্যরা যখন ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। (৪) যতটুকু বাঁধনকষণ রাখিলে স্বায়ত্তশাসনের বা কেন্দ্রীয় দায়িত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, ততটুকু রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে ভারতকে আর্থিক, সামরিক, বৈদেশিক ইত্যাদি ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা দিতে হইবে, (৫) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দেশরক্ষা, সরকারী চাকরী এবং আইন-সভার ভোটাধিকার ও সদস্যপদ সম্পর্কে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের মূল নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গণের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইবে।

সার স্যামুয়েল হোর ইহার উত্তরে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া খুবই প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। তিনি রাজস্বরাজ্যের সার আকবর হাইদারী ও জামনগরের জাম সাহেবের ভোজ-সভায় খুবই বাহবা পাইয়াছেন। তিনি

তাঁহাদের নিকট 'শ্রেষ্ঠ ভারতসচিবের' আখ্যা লাভ করিয়াছেন, পরন্তু ভারতের নূতন ইতিহাস গঠন করিয়াছেন বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। বিলাতের 'টাইমস' প্রমুখ সংবাদপত্র এবং ভারতের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহেও তাঁহার জয়ঢক্কা নিনাদিত হইয়াছে; কোনও কোনও পত্র এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোনও উদারনীতিক বা শ্রমিক সরকারের ভারত-সচিবের মুখে এরূপ দ্রুত ও অসম্ভব সংস্কারের আশার আভাস পাওয়া যাইত না।

কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় আছে কি? তাঁহার আশার বাণী অস্পষ্ট—দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীতে পূর্ণ। উহার মধ্যে বিশেষ 'মাল' দিবার কোন আভাস নাই। যাঁহারা উহা হইতে কিছু 'সার' পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। তিনি বৈঠকের সদস্যদের সহযোগ ও সাহচর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, ভারতের অবস্থার অনেক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই হেতু অধিকারলাভে ভারত যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু বলিয়াছেন, জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে 'শূন্য আসন' দেখিব না, এইরূপই আশা করি। অর্থাৎ তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে, যাহা ভারতকে দেওয়া হইতেছে, তাহা আসল 'মাল' এবং সেই হেতু কমিটীতে শ্রমিক দলের ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের যোগদানের সম্ভাবনা রহিয়াছে।



লর্ড স্যাঙ্কি

গাল-ভরা কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার ভিত্তি কি? লর্ড স্যাঙ্কিকে গোল-টেবিলের কয়েকটি কমিটী রিপোর্ট দিয়াছেন, কথা শুনা গিয়াছে; কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে, এ কথা সার স্যামুয়েলের বক্তৃতা হইতে জানা যায় নাই। তৃতীয় গোল টেবিলে যেন ভারতীয় 'মনোনীত প্রতিনিধিরা' মোগল দরবারে এত্তেলা দিতে গিয়াছিলেন এবং মোগল বাদশাহ ধীরচিত্তে তাঁহাদের আরজী শুনিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন, এখন কর্ত্তব্য সার্ব্বভৌম শক্তি অবধারণ করিবেন, এইরূপ বুঝা গিয়াছে। তৃতীয় গোল টেবিল বসাইবার যে একটা বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত। পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুই গোল টেবিলে বাঁধনকষণের যে সব ফাঁকি রহিয়া গিয়াছে, এবার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম সদস্যগণকে ও রাজন্য প্রতিনিধিদিগকে সহায় করিয়া সেইগুলি পূর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হইবে কি? হইলে কখন্ দেওয়া হইবে? বক্তৃতায় ইহার কোন স্পষ্ট জবাব নাই, কেবল বলা হইয়াছে, রাজন্যরা না আসিলে সে কথা ঠিক করা যায় না। কি ভাবের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব বা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা হইবে, তাহাও বৃটেন স্থির করিবেন। ভারত-রক্ষার অধিকার কি ভারতের থাকিবে? ভারত-সেনার খরচা নির্দ্ধারণ করা ভারতীয় আইন-সভার থাকিবে? ভারত সেনাদলে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ কি ভারতীয়দের অধিকারভুক্ত থাকিবে, না ওপারের ওয়ার-আফিসের হুকুমমত উহা সম্পন্ন হইবে? ভারত কি তাহার আর্থিক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বাধিকার পাইবে? এ সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতে পারেন কি যে, ভারত এক শত বৎসরেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাইবে?

আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকিলে কোন জাতিরই স্বায়ত্তশাসনলাভ কথাটার সার্থকতা থাকিতে পারে না। সার তেজ বাহাদুর এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের বড়কর্ত্তার সহিত বোঝাপড়া করিতে গিয়া সাফ জবাব পাইয়াছিলেন যে, জগতের বাজারে ভারতের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতের আর্থিক ব্যাপার বৃটেনের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা চাই-ই। দেশরক্ষা, সেনা-বিভাগ, বিদেশের সহিত সম্পর্ক, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়, সেনাবিভাগে ভারতীয় নিয়োগ,—এ সকল ব্যাপারেই হোয়াইট হল ও দিল্লীর কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অর্থাৎ সিপাহী-যুদ্ধের পর হইতে বৃটেন যে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভারতকে দেখিয়া আসিতেছেন, সেই অবিশ্বাস অনুযায়ী এবং বৃটিশ বাণিজ্যাদি স্বার্থ সংরক্ষণের প্রবল বাসনানুযায়ী করিয়া সংস্কার-ব্যবস্থা করা হইবে, এইরূপই বুঝা যায়। তবে গোল টেবিলে ভারতীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এ কথা বলা হইয়াছিল কেন, বুঝা যায় না। সেই 'সাহায্য' দানের বিনিময়ে ভারতের ভাগ্যে 'হুকুম' লাভ হইল।

সার স্যামুয়েলের দান যে 'ভুয়া দান,' তাহা 'মর্ণিং পোষ্টের' মত টোরী পত্রকেও অম্লানবদনে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এ পত্র বলিয়াছেন, কড়া বাঁধন-কষণ রাখিয়া অধিকার-দান স্বায়ত্তশাসনাধিকার-দান নহে। ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী লর্ড সিডেনহামও ঠিক এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, টোরীরা থাকিতে ভারতের স্বায়ত্তশাসনলাভের আশা নিরর্থক। সার তেজ-বাহাদুরের মত এখনও যাঁহারা 'হোয়াইট পেপারের'—সরকারী ঘোষণার আশায় চাতকের আকাশপানে তাকাইয়া থাকার ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের আশার বলিহারি যাই! এখনও আশা?

তবে বাছিয়া বাছিয়া যে কয় জন স্বার্থসর্ব্বস্বকে 'প্রতিনিধি'-রূপে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদের আশা স্বপ্নাতীতরূপে পূর্ণ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। সিন্ধুদেশকে কোন সর্ত্ত না রাখিয়া বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন করার ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে (হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্য উড়িষ্যার সম্পর্কেও ঐ ব্যবস্থা করা হইয়াছে); কিন্তু কোথা হইতে উহাদের খরচা উঠিবে, তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সে খরচা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানকেই যোগাইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মোটা

মাদ্রাজের গভর্ণর ও সিভিলিয়ান চাকুরীয়ারও বন্দোবস্ত হইবে, ইহাও দেখিবার বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলমানদের শতকরা ৩৩টি পদ প্রাপ্তির আশা দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটিতে এলাহাবাদ মিলনবৈঠকের সিদ্ধান্তের জবাব দেওয়া হইয়াছে। প্রদেশসমূহেও, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে, মুসলমানদের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতেও বৈঠকের মুসলিম সদস্যরা তাঁহাদের পরিশ্রমের এবং তদ্বির ও যোগাড়ের পুরস্কার পাইয়াছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ভারতে আছেন কি না, তাহাও বোধ হয় ওপারের কর্ত্তারা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের অন্তর্জলি করিয়া ভারতকে অত্যদ্ভুত স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে, এ কথা বলিলে বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইতে হয় কি?

বাঙ্গালী ও একতা-বৈঠক

কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্যই না কি একটা একতা-প্রতিষ্ঠা হইতেছে না। বাঙ্গালী হিন্দুর নামে এ অপবাদের কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া কোন নিরপেক্ষ বিচারক স্বীকার করিবেন না। বর্ত্তমানে যত প্যাক্ট (চুক্তি) বা মিলন-প্রস্তাব হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে তাহার কথাবার্ত্তার সময় দূরে রাখা হইয়াছে অথবা অতি নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দু যে একবারে নির্দ্দোষ, আমরা তাহা বলিতেছি না। কিন্তু তাহারা করিবে কি? ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার পক্ষ হইতে যাহারা কথা কহিবার উপযুক্ত, আজ তাঁহারা সকলেই জেলে। অন্যান্য প্রদেশে পণ্ডিত মদনমোহন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সম্প্রতি বিচারাধীন বন্দী) ও রাজাগোপালাচারীর মত এখনও বহু নেতা জেলের বাহিরে রহিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় কে আছে? সুতরাং পুনা-চুক্তির সময় বাঙ্গালী হিন্দু একরূপ বাদই পড়িয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন ও প্রাণদানের আশঙ্কা থাকায় বাঙ্গালী হিন্দুরা সে সময়ে চুক্তি মানিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ যখন সে সময়ে বাঙ্গালার কোন প্রতিনিধিই সেই চুক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর পক্ষের যুক্তি-তর্ক কিছুই উপস্থাপিত করেন নাই, তখন গতানুশোচনায় কোন ফল নাই। এলাহাবাদের বৈঠকে বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষ হইতে এমন কোন ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট নেতা যান নাই, যিনি অগণ্য দেশের বড় বড় নেতার নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার পক্ষের কথা গুছাইয়া বলিতে পারেন। কাযেই অন্যান্য প্রদেশের সুযোগ-সুবিধার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইলেও বাঙ্গালার কথা প্রায় বৈঠক আলোচনা করিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কাযেই তখন বাঙ্গালী হিন্দুর অনুমোদন না থাকিলেও একটা চুক্তি গৃহীত হইয়াছিল।

যদি সেই চুক্তি অনুসারেও কার্য্য হইত, তাহা হইলে কথা ছিল না, বাঙ্গালী হিন্দু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশের মঙ্গলের জন্য আইন-সভায় আপনাদের ন্যায্য অধিকারের অংশ ছাড়িয়া দিতে পারিত। বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যদি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী পদদানব্যবস্থা অস্বীকার করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে শতকরা ৪৪'৭ পদ দেওয়া হয় এবং য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বলিয়া কহিয়া ২টি পদ ছাড়িয়া দিতে সম্মত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী মুসলিমদিগকে শতকরা ৫১টি পদ দেওয়া হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ নেতারা বাঙ্গালায় আসিয়া য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো--ইণ্ডিয়ানদের নেতৃবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া সে বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইলেন,—য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণে প্রাপ্য পদের একটিও ছাড়িবেন না। এ দিকে বাঙ্গালী মুসলিমরাও দৃঢ়স্বরে বলিলেন, য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ২টি পদ ছাড়ুক বা নাই ছাড়ুক, তাঁহারা শতকরা ৫১টি পদের কম কিছুতেই মিলনে সম্মত হইবেন না।



মদনমোহন মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহন এখনও হাল ছাড়েন নাই। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুরাই বা কি অপরাধ করিল? য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা, অথবা মুসলমানরা কেহ কাহারও এতটুকু স্বার্থ ছাড়িবেন না, কেবল বাঙ্গালী হিন্দুরা কি ক্রমাগতই ত্যাগ স্বীকার করিয়া একতা-প্রতিষ্ঠা সফল করিয়া দিবে? একতার জন্য বাঙ্গালী হিন্দু অনেক ত্যাগ করিয়াছে, সে জন্য তাহারা কোন স্তুতির প্রত্যাশা রাখে না, কেন না, তাহারা জানে যে, দেশসেবার পুরস্কার বলিয়া কোন কথা নাই। তবে দেশনায়ক জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়ার কিরূপে বলেন যে, "বাঙ্গালী হিন্দুর অভিযোগ কাল্পনিক?"



রাজেন্দ্রপ্রসাদ

হিন্দুরা শতকরা ৪৪'৭ পদ এবং মুসলমানরা ৫১টা পদ পাইলেই

মিশ্র নির্ব্বাচন-প্রথা অব্যাহত থাকিবে কি? যে জাতীয়তার জন্ম এত চেষ্টা, তাহা ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে কি? সরকার যদি মিশ্র নির্ব্বাচন-প্রথা না মানিয়াই মুসলমানদিগকে ৫১ পদ দেওয়াই মীমাংসার সর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করেন, তখন হিন্দুর ত্যাগের কথা কাহার স্মরণ থাকিবে? তবে হিন্দুকে স্বার্থের পর স্বার্থ ত্যাগ করিতে বলা হইতেছে কেন? আর হিন্দুরা তাহা না করিলেই অমনই সকল দোষের বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন?

অস্পৃশ্যতা

হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-পাপ বর্ত্তমান, এই হেতু হিন্দুরা স্বায়ত্তশাসন অধিকার পাইবার উপযুক্ত নহে, এই অভিযোগ খৃষ্টান প্রতীচ্য জাতিদের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। হিন্দুদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মিস মেয়োর দল হিন্দুজাতিকে জগতের সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু খৃষ্টানদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা যে কোথায় কম, তাহা ত দেখা যায় না। শ্বেতকায় খৃষ্টানরা এসিয়াবাসী বা আমেরিকাবাসী খৃষ্টানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে? তাহাদের অনেক দেশে হোটেলে, রেস্তোঁরায়, ক্লাবে, কলেজে কালা খৃষ্টানদের অথবা পীতকায় খৃষ্টানদের প্রবেশ নিষেধ, সমাজে ধোপা-নাপিত বন্ধ। আমাদের এ দেশেও অনেক দেশীয় খৃষ্টান আছেন, মাদ্রাজে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, এই দ্রাবিড়ী খৃষ্টানদিগের প্রতি য়ুরোপীয় খৃষ্টানরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? সম্প্রতি ত্রিচিন-পল্লীর দ্রাবিড়ী খৃষ্টানরা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে Holy Redeemer অর্থাৎ পবিত্র ত্রাণকর্ত্তা যীশুখৃষ্টের গির্জ্জা-সমূহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। গির্জ্জাসমূহের সম্মুখে যে লোহার রেলিং বা বেড়া আছে, তাহার বাহিরে পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রবেশাধিকার আছে, মধ্যে নাই। এই হেতু তাঁহারা মাদ্রাজের Lord Bishop বা বড় পাদরীর নিকট অনুযোগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যত দিন তাঁহাদিগকে গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া ভজনা করিতে না দেওয়া হয়, তত দিন তাঁহারা তাঁহাদের গৃহের দ্বারে সত্যাগ্রহ করিবেন। সম্প্রতি মনীষী জর্জ্জ বার্ণার্ডশও বলিয়াছেন যে, ইংরাজ অস্পৃশ্যও (শ্রমিক) বিস্তর আছে।

এ দেশের য়ুরোপীয় খৃষ্টান সংবাদপত্র-সমূহ ইহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

সুরাবর্দ্দী-দাউদী তামাসা

কলিকাতার হালিডে পার্কে বেশ এক তামাসা হইয়া গেল! সুরাবর্দ্দী ও সফি দাউদী প্রমুখ কয় জন গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান 'নেতা' কেবল মুসলমান-স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টায় ঐ স্থানে তথাকথিত 'নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের' এক অধিবেশন করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ্ণৌএ ভারতের সকল শ্রেণীর মুক্তিকামী মুসলমানরা যে বৈঠক বসাইয়া মিশ্র নির্ব্বাচনের ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ও এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, পাছে উহাই ভারতের মুসলমানের অভিমত বলিয়া অন্যত্র গৃহীত হয়, সেই আশঙ্কায় তোড়জোড়ও যোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ি এই বৈঠক বসান হইয়াছিল। বৈঠকে যাঁহাকে সভাপতির পদে বসান হইয়াছিল, এযাবৎ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কি কায করিয়াছেন, অথবা তাঁহার কাছে মুসলিম সমাজই বা কি সেবা পাইয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। বস্তুতঃ তাঁহার নামের সহিতই কাহারও পরিচয় নাই। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার বাহির হইতে মুষ্টিমেয় কয় জন মুসলমানকে 'প্রতিনিধি' করিয়া আনা হইয়াছিল। অথচ বাঙ্গালার মুসলমান প্রতিনিধিদিগকে—বিশেষতঃ তরুণ মুসলিমগণকে—সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, সে জন্ম সভার উদ্যোক্তৃগণ বিশেষ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। ইহাকে মুসলিম-প্রতিনিধি-সভা বলিয়া জগতে জাহির করা হইতেছে এবং এই ভাবের সাম্প্রদায়িকতা জাগাইয়া রাখায় যাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বৈঠকের সভাপতি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মীদিগকে আপনাদের স্বার্থ বুঝিয়া প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে এবং এলাহাবাদের একতার প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই হইল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ধারণা, ইহাই হইল দেশপ্রেম! ছায়াবাজীর পুতুলের মত যাহারা যন্ত্রচালিত হইয়া নাচিয়া থাকে, তাহাদের নিকটে দেশ ইহার অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে?

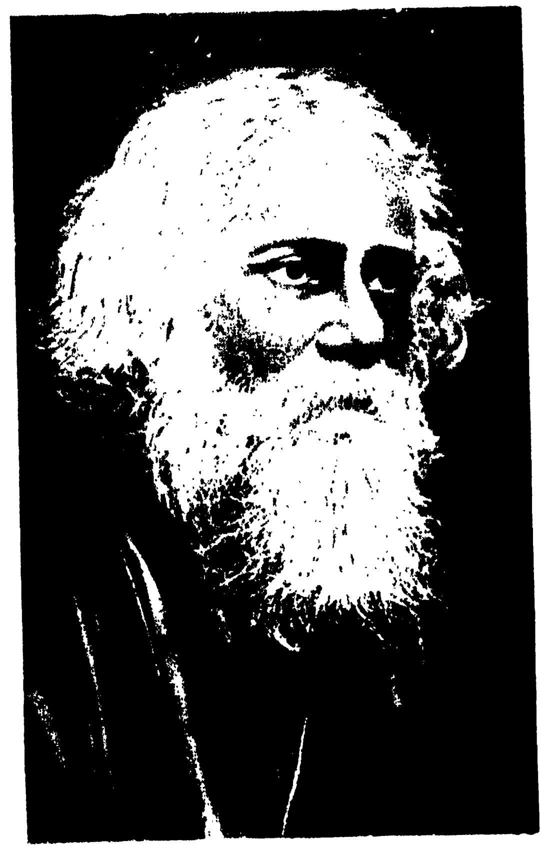
কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুসলিমরাই এই অভিনয়ের মুখোস খুলিয়া দিয়া ইহার স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতারই এলবার্ট হলে এই বৈঠকের পর সকল শ্রেণীর মুসলমানদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেখ আবদুল মজিদ উহার সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটী, জমিয়তে-উলেমা-হিন্দ, আফগান জিরগা, মজলিস-ই-অরহর, নিখিল ভারত মুসলিম তরুণসঙ্ঘ এবং অন্যান্য অনেক প্রাদেশিক মুসলিম প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকে এই সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। সভায় "তথাকথিত মুসলিম কনফারেন্স বেআইনী, অনিয়মানুগ এবং প্রকৃত মুসলমানের প্রতিনিধি-সভা নহে" বলিয়া মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। সভায় বহু মুসলিম বক্তা "এই কনফারেন্সে পর্দ্দার আড়ালে কায হইয়াছিল ও পুলিসের সহায়তায় অপর সমস্ত মুসলিমকে তফাৎ রাখা হইয়াছিল" বলিয়া কনফারেন্সের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। দিল্লীর ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য মিঃ আজহর আলি, মুর্ত্তাজা সাহেব এবং আলি সাহেব এক বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, "লক্ষ্ণৌ মুসলিম বৈঠকের সিদ্ধান্তে সার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী কোম্পানীর মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি এই প্রহসনের অভিনয় করা হইয়াছে। উহার সহিত দেশহিতকামী কোন মুসলমানের সংস্রব নাই।" সুববাসুল মুসলিমিনের সভাপতি এই কনফারেন্সের উদ্যোক্তৃবর্গকে "Mis-leaders" আখ্যা দিয়াছেন। নবাব সার জুলফিকার আলি খাঁ ও এডভোকেট মালিক বরকৎ আলি খাঁও হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ সকল রহস্যভেদের পর আর কি সার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী ও মিঃ সফি-দাউদীর চক্রান্তকারী দলের অথবা তাঁহাদের 'হিতৈষী' অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র সমূহের কারচুপি টিকিবে?

রবীন্দ্রনাথের পৌষের বাণী

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে বরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার মনীষা তাঁহাকে বিশ্ব-মান্য করিয়াছে। তিনি দেশ ও সাহিত্যকে অনেক কিছু দান করিয়াছেন, তাহার প্রভাব কিরূপ ও কতকাল স্থায়ী হইবে, তাহার বিচারের সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসবের অনুকরণে তিনি যে পৌষের বাণী দেশবাসীকে দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিরাট মস্তিষ্কের পরিচয়ের অভাব না থাকিলেও মনে হয় যেন কোথায় কি একটা বড় অভাব রহিয়া গিয়াছে, যেন হৃদয়ের দিক্ দিয়া তিনি দেশের ভাব বা প্রাণধারা হইতে কোথায় দূরে সরিয়া গিয়াছেন। বয়সের পরিণতির সহিত এই বিচ্যুতির কোন কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিদ্যমান কি না, তাহা এখন বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তিনি অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে বলিয়াছেন, "সত্যের ধর্ম্ম যে আচারানুষ্ঠানবহুল ধর্ম্ম অপেক্ষা মহত্তর, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমাদের নিজ নিজ অন্তরে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব না কি?" কথাটা শুনিয়াই যেন কেমন একটা অস্বস্তির ভাবের উদয় হয়। যেন মনে হয়, এই ভাবে 'আচারানুষ্ঠানবহুল' হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা, তাঁহার বয়সের ধর্ম্ম নহে, উহা তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মনে পড়ে, যৌবনে এক দিন এই রবীন্দ্রনাথই কলেজ ষ্ট্রীটের 'ইয়ং মেনস্ খৃষ্টান এসোসিয়েশন' হলে বহু হিন্দুর মনে ব্যথা দিয়া বলিয়াছিলেন,— 'সীতা লাঙ্গলের ফলা মাত্র, রামচন্দ্র আর্য্য ক্ষত্রিয় হিসাবে অনার্য্য দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতারূপ কৃষিবিদ্যা আমদানী করিয়াছিলেন।' যেন বুড়া বাল্মীকি গাঁজার ছিলিম চড়াইয়া এক মিথ্যার জাহাজ রচিয়া রামায়ণ গান করিয়াছিলেন! এমন ধৃষ্টতা খৃষ্টান মিশনারীরা এক সময়ে হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে প্রচার করিতেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও নিন্দা প্রচার করিতেন বলিয়া এখনও বোধ হয় বয়োবৃদ্ধরা স্বীকার করিবেন! যাহা বিদেশী বিধর্ম্মীদের মুখে শোভা পায়, রবীন্দ্রনাথ এদেশের ও এদেশীয় ধর্ম্মেরই সন্তান হইয়া কিরূপে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণকে রচা-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহা সে সময়ে অনেকে ধারণা করিতে পারেন নাই। সহস্র সহস্র বৎসর ভারতের নরনারী যে রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলীকে জাগ্রত সত্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, যে রচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া কালিদাস ভবভূতি হইতে আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ নিত্য নূতন রচনাসম্ভারের অর্ঘ্য সাজাইয়া বাণীর চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, যে রচনার নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক প্রভাব জাতিকে এখনও জীবন্ত প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র যুবজনোচিত ঔদ্ধত্যেই সম্ভব, ইহা মনে করিয়া অনেকে তখন ঐ উক্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু পরিণত-বয়সে এ আবার কি? রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, সুতরাং তিনি হিন্দুর পৌত্তলিকতা মানিতে না পারেন, আচারানুষ্ঠান মানিতে না পারেন, কিন্তু সে মনোভাব প্রকট করিয়া অজ্ঞ মিশনারীর আদর্শে হিন্দুর আচারানুষ্ঠানকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন কেন? তাঁহার বা অন্যান্য ধর্ম্মের আচারানুষ্ঠান নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? ভগবান্ ত' অবাঙ্মনসোগোচর, তবে তাঁহার জন্য ব্রাহ্মমন্দির, পুরোহিতের বেদী, নামকীর্ত্তন, মাঘোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় কেন? তিনি গুণাতীত গুণময়—রূপের অতীত বলিয়াই ত' অরূপ—তবে তাঁহার 'চরণে' নিবেদন হয় কি করিয়া?—তাঁহার 'মঙ্গলকর' মলিন মর্ম্ম মুছাইয়া দেয় কিরূপে, তাঁহার পায়ের সাড়াই বা পাওয়া যায় কিরূপে? হিন্দুর মন শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্যের গুণগ্রাহী,



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

তাঁহারা সাধারণভাবে অনন্তের ধারণা করিতে পারেন না, কেন না, তাঁহারা জানেন যে, মানব-মন নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। পরন্তু ইহাও জানেন,—শুদ্ধ ও শুচি হইয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে হয়, একনিষ্ঠভাবে একাগ্র-সাধনা করিতে হয়,—এজন্য বহিরাচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। হিন্দুর বেদান্তবিদ্‌ও রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া থাকেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কিন্তু তাঁহারাও নেতি নেতি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়াই বহু প্রতীকের মধ্য দিয়া

তাঁহাকে ধারণা করিবার চেষ্টা করেন—কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তিমার্গ দিয়া সাধনা করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পান। সে জন্য সাংসারিক নানা বাধাবিঘ্ন চিন্তাভাবনাকে বেড়া দিয়া দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "চারা গাছটাকেই বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, গাছ বড় হ'লে বেড়ার দরকার হয় না।" মহাপুরুষের এই উক্তিও কি হাসাইয়া উড়াইয়া দিবার?

রবীন্দ্রনাথ আরও পরিষ্কার করিয়া মনের আক্রোশ ব্যক্ত করিয়াছেন, "আচার নিয়ম অনুষ্ঠান একান্তভাবে ধরিয়া থাকিলে ধর্ম্মের যথার্থ প্রাণ বিনষ্ট এবং সামাজিক জীবনের পরিবর্দ্ধন বিলুপ্ত হয়। আমরা আমাদের বহু স্বদেশবাসীকে মানুষের সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি, এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে।" এই উক্তিতেও যেন গোঁড়া খৃষ্টান পাদরীর গোঁড়ামীর বোটকা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। আচার নিয়ম অনুষ্ঠান যে মানব-সমাজমাত্রেই প্রয়োজন, তাহা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিবেন কিরূপে? সকল সমাজেই আচার নিয়ম অনুষ্ঠান আছে। খৃষ্টান সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য হিসাবে গীর্জ্জাবিভাগ নির্দ্দেশিত আছে। পরম একেশ্বরবাদী মুসলমানরা যেখানেই থাকুন, মক্কার দিকে মুখ করিয়াই নামাজ করেন, নামাজের নানারূপ ওঠাবসা এবং অঙ্গচালনা পালন করেন, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইয়া উপাসনায় বসেন। আবার মহরমের সময় সিয়ারা শোভাযাত্রার অশ্বের পদে জলদান করেন, অশ্বকে আহার করান, এমন কি, অশ্বখুরসিক্ত জল ঘরে লইয়া যান। এইরূপ সকল ধর্ম্মেই আচার অনুষ্ঠান আছে। আবার সকল ধর্ম্মেই মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে। অসাধারণ মনীষী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত পেঁচো ধোপা ব্রাহ্মসমাজে কখনই এক আসন প্রাপ্ত হইতে পারে না, অথচ উভয়ের মধ্যেই ত' ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। মান্দ্রাজে আদি দ্রাবিড় খৃষ্টানদের কোন কোন গির্জ্জায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি এই প্রভেদ না থাকিত, ধনিক শ্রমিকে ও সাদায় কালায় ভেদাভেদ থাকিত না। কোথাও বা জন্ম-কৌলীন্য, কোথাও বা বর্ণ-কৌলীন্য, আবার কোথাও বা কাঞ্চন-কৌলীন্য,—কোন না কোন রূপেই মানুষের সাধারণ অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইতেছে,—তাহার জন্য কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয় না ত'! মার্কিণ দেশে জাপ-চীনের মত শক্তিদের প্রজারাও মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত, কালা ভারতীয় বা কাফ্রিদের ত' কথাই নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও অনেক হোটেলে কালা আদমীদের প্রবেশ নিষেধ। সাংহাই সহর চীনের দেশেই অবস্থিত, অথচ সেখানেও সাধারণের ভ্রমণের উদ্যানে নোটিশ বোর্ডে লেখা থাকে,—Dogs and Chinese are not allowed—কুকুর ও চীনাদের এ বাগানে প্রবেশ নিষেধ। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, বিশ্বপ্রেম প্রচার করিয়া থাকেন। আগে তিনি জগতের এ সব পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করুন, তাহার পর হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের সদুপদেশ প্রদান করিবেন!

নারী মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

শ্রীমতী সুশীলা শ্রীবাস্তব। ইনি এবার কানপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে তিনি ভোট-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি কানপুরের মহিলা সমিতির সম্পাদিকা। ইহা ছাড়া তিনি কানপুরের ও অন্যান্য স্থানের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কমিটীর সদস্যা। শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।



নারী কমিশনার

পুরুষ ও নারীর ভোট-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারী ভোটার্থিনী যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে তাঁহার যে জয়লাভ হয়, শ্রীমতী সুশীলা শ্রীবাস্তব মহাশয়ার নির্ব্বাচনই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মান্দ্রাজে ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর ন্যায় এখন যে অন্যান্য প্রদেশেও নারী নানা নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতেছেন, তাহা ক্রমশঃই পরিলক্ষিত হইতেছে।

খৃষ্টানদের বিশ্বপ্রেম

মুক্তি-ফৌজের সেনাপতি জেনারল হিগিন্স ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণরের অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বড়দিন পর্ব্বোপলক্ষে বাপাতলা নামক স্থানে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "যদি খৃষ্ট এবং খৃষ্টের প্রেমমন্ত্র জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইত, তাহা হইলে জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইত।"

কথাটা সত্য হইতে পারে; অন্ততঃ খৃষ্টানদের দিক হইতে এ কথা বলা সম্ভব। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, খৃষ্টের উপাসকরা কি বর্ত্তমানে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মানেন, না তাঁহার বিশ্বপ্রেম, সৌভ্রাত্র, শান্তি ও সদিচ্ছার উপদেশ অনুসারে চলিয়া থাকেন? এখনকার শক্তিশালী খৃষ্টানরা যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদ, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি ও ইজ্জতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ক্রমশঃ মারণাস্ত্র বৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তার করিতেছেন, তাহাতে ত এ কথা মনে হয় না। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁহারা খৃষ্টকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথায় রণদেবতা ও ধনদেবতাকে বসাইয়াছেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী কাশীধামে ৭২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী নামে বাঙ্গালার সাহিত্য ও কর্ম্মক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ কর্ম্মী পুরুষ সে সময়ে এ দেশে বিরল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকারের আর্ট স্কুলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে তিনি যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া ভারতীয় আর্ট স্কুলকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কর্ম্মশক্তি প্রস্ফুট হইয়াছিল; পরন্তু যে বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাহাতে জলসেক করিয়া তাহাকে প্রথমে অঙ্কুরে ও পরে ক্ষুদ্র বৃক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন, আজ তাহাই বিশাল মহীরুহরূপে আপন শক্তি-সামর্থ্যে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে,—বাঙ্গালী মনীষীর এই কৃতিত্বের প্রশংসা শতমুখে করিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার কর্ম্মচেষ্টার পরিচয় পদে পদে পরিস্ফুট। বহু প্রাচীন 'সাহিত্য-সম্মেলন' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত—সেই সম্পর্কে তাঁহার পরিচালিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্র "শিল্প ও সাহিত্য"ও একসময়ে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। চিত্রাঙ্কনে, আলোকচিত্র-বিজ্ঞানে, রেখাঙ্কনে,—বহুদিকেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "চিত্রবিজ্ঞান" "আলোক-চিত্রণ," "ছায়াবিজ্ঞান" প্রমুখ অমূল্য গ্রন্থরাজি তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কিন্তু তাঁহার ইহলৌকিক জীবলীলাভিনয়ের সকল অঙ্কই এই ভাবে অভিনীত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—বিধাতা তাঁহাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক কর্ম্মকাণ্ডে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দ ও শ্রীমদ্ বালানন্দ স্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের ন্যায় তিনিও কিছুকাল পরে সিদ্ধযোগী হইয়া নির্জ্জন অরণ্যচারীর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার গুরু শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী; তাঁহারই মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি কর্ম্মজীবনের অবসানে চুণারের আশ্রমে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমদ্ ঠাকুর সদানন্দদেব সরস্বতী তাঁহার মাতামহ। মাতৃকুল হইতে যে তিনি শাস্ত্রবিশ্বাস ও পাণ্ডিত্য উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপত্যকায় পতিতপাবনী সুরধুনীতটে নির্জ্জন বনানীমধ্যে যেখানে মহামুনি দত্তাত্রেয়ের আশ্রম ছিল, সেই স্থানেই তিনি তাঁহার তপশ্চর্য্যার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন,



স্বামী সচ্চিদানন্দ

আজ উহাই চুণার "আনন্দ আশ্রম" নামে বাঙ্গালী ও পশ্চিম-প্রদেশীয় ধর্ম্মান্বেষিগণের নিকট সুপরিচিত। কত শত বাঙ্গালী ও পশ্চিমপ্রদেশীয় তাঁহার পাদমূলে বসিয়া ভবৌষধিরূপ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, কত শত মানুষ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাহিত্যে তাঁহার সাধনা যেমন নানা সাহিত্যিক গ্রন্থে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিশ্বাসে তাঁহার সাধনা "গুরুপ্রদীপ," "পূজাপ্রদীপ," "জ্ঞান ও সাধনপ্রদীপ" এবং "পুরশ্চরণ প্রদীপ" প্রমুখ নানা ধর্ম্মগ্রন্থে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া-ছিল। তাঁহার "ষটচক্র চিত্র," "গুরুপাদুকা," "আত্মলয়" প্রভৃতি অমূল্য চিত্র সাধকদিগের অন্তরে বিমল আনন্দ প্রদান করে।

এক আলৌকিক ঘটনা তাঁহার সংসারত্যাগের মূল। কোন সময়ে নৈনিতালে বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া আরণ্য প্রদেশ-পরিভ্রমণে গিয়া তিনি পথিভ্রষ্ট হন। সন্ধ্যার

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আরণ্য হিংস্র পশুগণের নিকট হইতে আত্মরক্ষার্থ তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রজনীযাপন করেন এবং সেই অরণ্যেই দুই দিন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীতে এক আঁটি ছোলাগাছ (ঝগুরি) ভাসিয়া যাইতেছিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি উহা ধরিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত যথাসম্ভব প্রসারিত হইলেও ধারণে সক্ষম হইল না। তখন তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বয়ং মহামায়া রূপ পরিগ্রহ করিয়া উহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি তিনি আর সংসারাশ্রমে থাকিতে সম্মত হইলেন না।

পূর্ব্বাশ্রমে তিনি সদা সহাস্যানন, সৌম্যদর্শন, প্রশান্ত উদারান্তঃকরণ, স্বজন ও বন্ধুবৎসল, স্বল্পভাষী, পরোপকারী, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। আমরা বহুদিন তাঁহার সংস্রবে আসিয়া তাঁহার মধুর চরিত্র ও বন্ধুবাৎসল্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। সন্ন্যাসীর দেহরক্ষায় শোক করিবার কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার বিয়োগে সংসারী আমরা যেন একটা বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সাধের "আর্ট স্কুল"টিকে সমৃদ্ধ ও ফলভারাবনত করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখুন, ইহাই কামনা।

পরলোকে ললিতমোহন দাস

দেশহিতব্রত কংগ্রেসকর্ম্মী ধর্ম্মপ্রাণ ললিতমোহন দাস গত ১২ই পৌষ ৬৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আজীবন তিনি সত্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বরিশালে বাল্যেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ—সে সময়ে তিনি বরিশালের স্বনামধন্য জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও ধর্ম্মপ্রীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, ললিতমোহনও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তদবধি বিশ্বাসী এবং সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মরূপে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, অকপট ও অমায়িক ব্যবহার এবং প্রবল দেশপ্রেমের জন্য ছাত্র ও জনসাধারণের প্রীতিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গকালে তিনি অশ্বিনীকুমার, সুরেন্দ্রনাথ ও অম্বিকা মজুমদার প্রমুখ দেশনেতৃগণের সহায়করূপে দেশসেবা করিয়াছিলেন এবং পরে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল—পরিণতবয়সে তিনি আর সেই আঘাত হইতে মুক্তি পান নাই। আজ বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি তাঁহার ন্যায় অকপট, সত্যনিষ্ঠ, ঐকান্তিক কর্ম্মী হারাইয়া যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ সান্ত্বনা লাভ করুন যে, তাঁহাদেরও ন্যায় দেশবাসী তাঁহার বিয়োগব্যথা আত্মীয়ের বিয়োগব্যথারই ন্যায় অনুভব করিতেছে।

—

সাংবাদিকের লোকান্তর

বহু প্রাচীন বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সময়ের' প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস গত ৭ই পৌষ কাশীধামে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরলোকগত এটর্ণি শ্রীনাথ দাসের পুত্র। যে স্বর্গীয়া বিদুষী মহিলা বসন্তকুমারী পত্নীরূপে তাঁহার নানা লোকহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগের পর হইতেই তাঁহার দেহমনের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন।

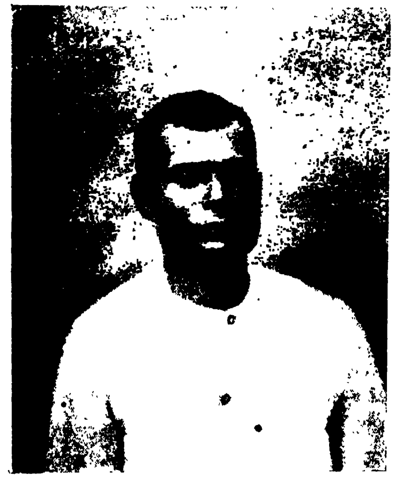

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস

শিক্ষার্থিরূপে তিনি কলিকাতা বিশ্ব--বিদ্যালয়ের সমস্ত উচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এম, এ বি, এল হইবার পর তিনি কিছুদিন ব্যবহারাজীবের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার জন্য অন্য কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চা ও লোকশিক্ষাদানই তিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ বৎসরকাল তিনি 'সময়' পত্রের সম্পাদনে ও পরিচালনে যে অসাধারণ শ্রম ও অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার একমাত্র রচনা 'ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার সুরচিত বহু রচনা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ তাঁহার অভাবে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যদি তাঁহার সাধের 'সময়' পত্রিকাখানিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সত্যই তাঁহার স্মৃতির সম্মান রক্ষিত হইবে।

—

চিকিৎসকের লোকান্তর

স্বনামখ্যাত কবিরাজ, সাহিত্যসেবী সত্যরঞ্জন সেন কবিরঞ্জন গত ৭ই পৌষ, ৫৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে সুরধুনীতটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিপুরের সান্নিধ্যে হরিপুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজীও শিক্ষা করেন। 'সাবিত্রী', 'কেরাণীবাবু', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিয়া তিনি বাণীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে যিনি আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন—সেই প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের সহকারীরূপে সত্যরঞ্জন বাবু অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের এবং পরে বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভৈষজ্য-মণি-মালিকা, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, কায়চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 'কায়চিকিৎসা' গ্রন্থখানি তাঁহার বহু বৎসরের গবেষণার সুফল—তিনি গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কায় শেষাংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিরাজী বহু পত্র সম্পাদনেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁহার বিয়োগে কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাধ্যায়িগণ যে একটি যথার্থ কর্ম্মী হারাইলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।



কবিরাজ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন

নবোঢা

উদার মধুর দিন স্নিগ্ধ অনাবিল,
নারিকেল-ছায়াবলী-অঙ্কিত অঙ্গন
বিম্বফল রক্তরাগ-রঞ্জিত রঙ্গন
সঞ্চারী পঞ্চমস্বরে গায়িছে কোকিল।

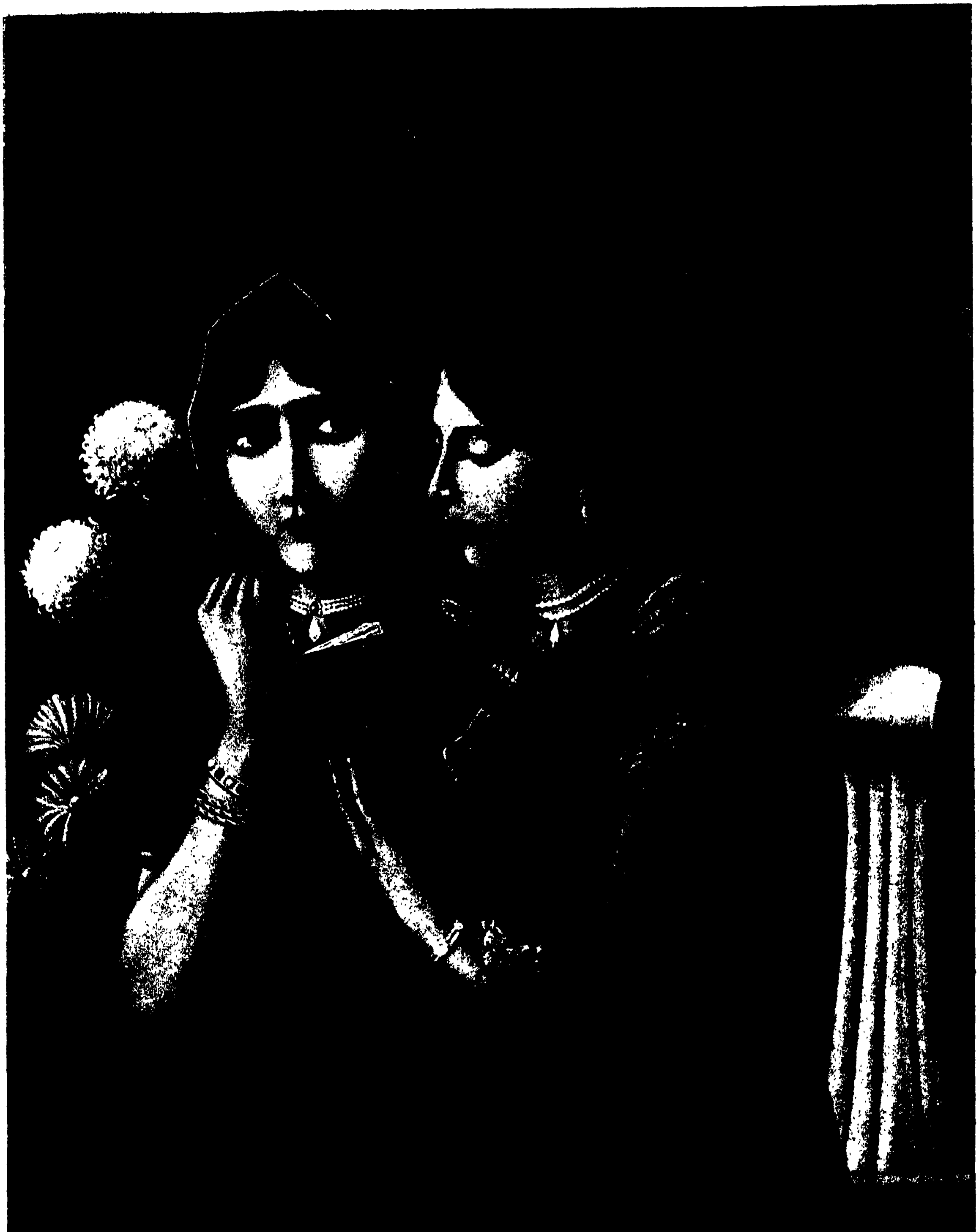
তরুলতা তোরণেতে রক্ত-রেখাফুল
মন্দার-মুকুল-শোভা সরস তরুণ
কুন্দকান্তি মুখচ্ছবি আধ-লজ্জারুণ
মুক্তাফল মুখপদ্ম মধুপ ব্যাকুল।

কিশোরী চলিয়া গেল, কঙ্কণে মঞ্জীরে,
প্রণয় মঙ্গলধ্বনি মৃদুমৃদু বাজে
কোন শুভহাসি আঁখি মুকুরিতা মাঝে
চঞ্চল অঞ্চল ডাকে বসন্ত-সমীরে।

নূতন প্রণয় কাব্যে সে নব কবিতা
নিত্য মাধুরীর স্বপ্ন প্রেম-সুখস্মিতা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বসুমতী চিত্র-বিভাগ]　　উপন্যাস-পাঠে　　[শিল্পী—৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ ।



সচিত্র মাসিক

বসুমতী

১১শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৯ [৪র্থ সংখ্যা

সরস্বতীর ছলনা

এস এস উঁকি মেরে কেন লো লুকাও ?
অমৃত ঢালিতে এসে কোথা চ'লে যাও ?
ছলনায় ললনার এতই আদর।
আনিয়া কাণের কাছে সরাও অধর !
অপ্সরী কিন্নরী হোন্ দেবী অমরার।
নারীপ্রাণে ধরা আছে ধারাটি ধরার॥
কটাক্ষে কাঁপায়ে বক্ষ দোলাইয়া অঙ্গ।
যান্ যান্ ফিরে চান ভেবে ভারি রঙ্গ॥
ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে বেণী দোলে পিঠে।
প্রেমিকে লোটায় পায় সাধ নাহি মিটে॥
কবিতা ছুহিতা তব কমলে বসতি।
সঙ্গীত-সঙ্গিনী রঙ্গে নাম সরস্বতী॥
নয়নে শয়ন ক'রে আছে নবরস।
চরণ শরণে নৃত্য, করে বীণা বশ॥
অমরার ভূমি বুঝি বেজেছে কঠিন।
তরল সরসী-জলে তাই ঝাপ দিন॥
কোমল কমল হ'তে সুললিত কায়া।
বরণে বিমল বিভা কর্পূরের ছায়া॥
হেন আবরণ মাঝে রাজে যেই মন।
তাও কি গো ধরণীর নারীর মতন !

অ-প্রকাশিত] রসরাজ অমৃতলাল বসু।

উইল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপাল বক্‌শী মদনের চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের ছোট। দুই ভাইয়ের প্রকৃতি দু-রকম। মদন যেমন কৃপণ, গোপাল তেমনই খরচপত্রে আল্‌গা। উড়ন-চণ্ডী না হলেও বে-হিসাবী, কোন বিষয়ে আঁট নেই, সব এলো-ধাবাড়ী রকম। সরলার বিয়েতে অনেক খরচপত্র ক'রে কিছু ধার হয়েছিল, সে ধার এখনও শোধ যায় নি। তার পর তত্ত্বতাবাসও খুব ধূম-ধামের। সে তিন চার বছরের কথা। সরলারও বিশেষ তেমন কিছু ভাল বিয়ে হয় নি। তার শ্বশুর সামান্য গৃহস্থ, তিন চারটি ছেলে। সরলার স্বামী প্রমথনাথ বি, এ, বি, এল, কিন্তু ওকালতীতে কিছুই হয় না। তাতে আবার প্রমথ গল্প-গুজবের আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়, কায-কর্ম্মে বড় একটা মন নেই।

গোপাল একটা অল্প মাইনের চাকরী করৃত, এখন তাও নেই। কিন্তু এখনও সংসারে টানাটানি নেই। কর্ত্তা গিন্নী দু'জনেই সমান। গোপাল মুখে বড় একটা কাউকে কিছু বল্‌ত না, কিন্তু ভারী একগুঁয়ে, কারুর কথা কি পরামর্শ শুন্‌ত না। আর কাদম্বিনীর মুখের সামনে কার সাধ্য দাঁড়ায়? মদন আর শৈলবালা সব কথাই জানতেন, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে কিংবা জায়ে জায়ে কোন কথাই হ'ত না। মনান্তর অনেক দিন থেকে, প্রথমে ভাইয়ে ভাইয়ে, তার পর জায়ে জায়ে। কেবল সরলা ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে থাক্‌ত না। সে জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমার কাছে যখন তখন যাওয়া-আসা করৃত। এ বাড়ীর কথা ও বাড়ী বলা তার অভ্যাস ছিল না। জিজ্ঞাসা করলেই বল্‌ত, আমি কিছু জানি নে। মদন ও শৈলবালা দু'জনেই তাকে ভালবাস্‌তেন, তবে তাঁরা নিজেরা কোন কথা প্রকাশ করতেন না, সরলার কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা করৃতেন।

এক দিন মদন সরলাকে জিজ্ঞাসা করৃলেন, হ্যাঁ সরলা, তোমার বাবা না কি তার বাড়ীর অংশ বাঁধা দেবে?

—তার আমি কি জানি, জ্যাঠামশায়?

—কথা কিন্তু বাইরে রটেছে। বাঁধা দিলে ত ছাড়াতে পারবে না।

—জ্যাঠামশায়, ও সব কথা আমাকে কেন বল? আমি কবে এ বাড়ীতে আছি, কবে নেই। আর ও সব কথায় আমি থাক্‌তে যাব কেন? বাবা আমায় কিছু বলেন না। বাবা মা'র বাড়ী, তাঁরা বুঝবেন।

—তোমার বাবা ত আমাকে কিছু বলে না, তাই তোমাকে বল্‌ছি।

—যদি ও কথা বল জ্যাঠামশায়, তা হ'লে তুমিও ত বাবাকে কিছু বল না? তুমি হ'লে বাড়ীর মাথা, যা বল্‌বার, তুমি ত আগে বল্‌বে।

মদন বক্‌শী একটু চুপ ক'রে রইলেন। আবার বল্‌লেন, তোমার বাবাকে বলো যে, আমি বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেছি। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা কইতে বলো।

—আমি পারব না, জ্যাঠামশায়, যদি বাবা রাগ করেন?

—রাগ করবে কেন? তুমি আমার নাম ক'রে বলো আমি বল্‌তে বলেছি।

—তা তুমি যখন বল্‌ছ, তখন আমাকে বলতেই হবে, কিন্তু জ্যাঠামশায়, আমি কিছু জানি নে, কিছুতে থাকি নে, আমার সব তাতে ভয় করে।

—এতে আবার ভয় কি? আমি যেমন বল্‌ছি তেমনই বল্‌বে। বাপ-জ্যাঠার কথা শুন্‌লে ছেলে-মেয়ের দোষ কি?

সরলা কি করে, গিয়ে বাপকে বল্‌লে। গোপালের ভয়ানক রাগ হ'ল, কিন্তু সে ত চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে না, আর সরলার উপর রাগ করেই বা কি হবে! তার কি দোষ? গোপাল চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লে, খুব সু-খবর, তাই দাদা তোমাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন।

কাদম্বিনী সেইখানে দাঁড়িয়ে। বল্‌লেন, আর কাকে বল্‌বেন? কে ওঁর বাড়ী মাড়ায়? সকালবেলা নাম করৃলে ত হাঁড়ি ফাটে।

সরলা বল্‌লে, বাবা, আমি ত ও সব কথা শুন্‌তেও চাই নি, বল্‌তেও চাই নি। কিন্তু যখন জ্যাঠামশায় তোমাকে বল্‌তে বল্‌লেন, তখন আমি অবাধ্য হই কেমন ক'রে?

—তোমার কি দোষ? দাদার আক্কেলের কথা বল্‌ছি।

সরলা ত উঠে গেল। স্বামি-স্ত্রীতে অনেকক্ষণ সেইখানে ব'সে পরামর্শ হ'ল।

সন্ধ্যার পর গোপাল বক্‌শী বড় ভাইয়ের বাড়ী গেল। মদন উঁচু হয়ে ব'সে, দাড়ীতে আর হাঁটুতে এক ক'রে একটা খেলো হুঁকায় তামাক টান্‌ছিলেন, মাঝে মাঝে খক্ খক্ ক'রে কাস্‌ছিলেন। পাশে একটা ডাবর ছিল, তাইতে গয়ার ফেল্‌ছিলেন। গোপালকে দেখে বল্‌লেন, এমন সময় গোপাল কি মনে ক'রে ?

—আমি আবার কি মনে ক'রে ? তুমিই ত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ।

—ঠিক ডেকে পাঠান নয়, কেন না, তোমার উপর ত আমার জোর কিছু নেই, আসা না আসা তোমার ইচ্ছা। তবে আমাদের কিছু কথা হ'লে দুই পক্ষেই ভাল।

এমন সময় শৈলবালা এলেন, কি ঠাকুরপো, ভাল আছ ত ? ছোট বউ ভাল আছে ?

গোপাল হেসে বল্‌লে, তা কি তুমি জান না ? এই ত সরলা যখন-তখন আসে।

—তুমি আস না কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।

হুঁকোটা দেয়ালের কোণে রেখে দিয়ে মদন বক্‌শী বল্‌লেন, আমাদের একটু নিরিবিলি কথা আছে।

—এই যে আমি যাচ্ছি, ব'লে শৈলবালা চ'লে গেলেন ; কিন্তু বেশী দূর গেলেন না। আর একটা ঘরের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে একটা দরজার আড়াল থেকে কাণ পেতে সব কথা শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

গোপাল বল্‌লে, তুমি যে সরলাকে দিয়ে আমার বাড়ীর অংশ বাঁধা দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছিলে, সেটা কি ভাল ? সে ছেলেমানুষ, শুনে কি মনে করবে ?

—তার কাছ থেকে কতক্ষণ লুকিয়ে রাখ্‌বে ? এই যে আমি শুনেছি, তুমি কি আমায় বলেছ ? এ রকম কথা চাপা থাকে ক দিন ?

—আমি কথাটা তেতো ক'রে বল্‌তে চাই নে, কিন্তু তোমাকে ব'লে কি কোন ফল আছে ? তোমার কাছে কোন সাহায্য চাইতে পার্‌ব না, চাওয়াও মিথ্যে। বাড়ীর আমার অংশ আমি বিক্রী করি, বাঁধা দি, সে কথা তোমাকে জানিয়ে কি হবে ? দু দিন পরে এম্‌নেও পাঁচীল উঠ্‌বে অমনেও উঠ্‌বে, তা বাড়ী থাকুক আর না থাকুক।

—সে হিসাবে কোন কথা আমাকে বলবার কোন দরকার নেই। আমি সে কথা ভাবিও নি। বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ আমার ব'লে যে আমার কোন দাবী আছে, তাও বল্‌ছি নে। তোমার নিজের দিক্ থেকেই কথাটা ভেবে দেখ্‌তে বল্‌ছি। বাড়ী বাঁধা দেবার কথাটা আগে ভাব। কেন বাঁধা পড়্‌বে, তোমার কি রকম আর্থিক অবস্থা, তা তুমি নিজে জান, আমি কিছুই জানতে চাই নে। কিন্তু যদি বাড়ীর অংশ বাঁধা দাও, তা হ'লে ছাড়াতে পারবে কি না, বুঝে দেখ। যদি না পার, তা হ'লে সুদে আসলে বাড়ী বিক্রী হয়ে যাবে। এখন তুমি বুঝে দেখ যে, বাড়ী বাঁধা দেওয়া কিংবা বিক্রী করা ভাল। আমার শুধু এই কথা বল্‌বার ছিল। তুমি আমার কাছে বাঁধা রাখ্‌বে না, আমাকে বিক্রীও করবে না, তা জানি, কিন্তু আমি তোমাকে যা বল্‌লাম, তাতে দোষের কিংবা রাগের কোন কথা নেই।

—তা কেন থাকবে ? তবে যদি তোমার কাছে বাঁধা রাখি, তা হ'লে কি তুমি রাখ্‌বে, যদি বিক্রী করি, তা হ'লে কি তুমি কিনবে ?

—আমাকে একটু ভেবে দেখতে হয়।

—বেশ, তুমি ভেবে দেখ, আমিও ভেবে তোমাকে এর পর বল্‌ব।

—এ বেশ কথা। আজ তবে এই পর্য্যন্ত।

সে দিন এই পর্য্যন্ত কথা রইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিষ্টার রায় বল্‌লেন, বসাকদের আর মুস্তফীদের এক দিন ডিনারে নিমন্ত্রণ না করলেই নয়। তাদের বাড়ীতে দু' দিন আমরা খেয়ে এসেছি।

মিসেস রায় বল্‌লেন, ডিনারে যে খরচ ! তাদের কি বল, কত টাকা রোজগার করে, খরচ কর্‌তে গায় লাগে না। আমাদের যে দিন দিন মুস্কিল, চারিদিকে বাকী প'ড়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যাবে ?

—বক্‌সীর টাকাগুলো পেলে আর কোন ভাবনা থাকে না !

—সে টাকা কেমন ক'রে পাবে ?

—তাকে দিয়ে একটা উইল করিয়ে নাও না ? বুড়া আর কত দিন টেঁকবে ?

—দিদি নেই ? আর বক্‌শী মশায়ই বা এখনি মর্‌তে গেলেন কেন ?

—তোমার দিদির একটা মাসোহারা হলেই হবে।

—তুমি ত মনে মনে কত কি কর্‌ছ। বক্‌শী মশায়ের টাকার আশায় ব'সে থাক, কিন্তু এখন কি হবে ?

—সে যা হয় হবে, এই ডিনারটা ঠিক কর।

—বেশী ধুমধাম হবে না, তবে মন্দ থাকবে।

—শুধু হুইস্কি ?

—এক বোতলের বেশী আমি বার কর্‌তে দেব না।

—তারা কি মনে করবে ?

—যা ইচ্ছে হয় কর্‌বে, আমার তাতে বয়ে গেল।

—তোমাকে ত বোঝাবার জো নেই! খাবার কি হবে শুনি ?

—স্থপ, একটা কি দুটো entree, একটা side dish, pudding কিংবা custard।

—বাস্ ?

—আবার কি ? তাই ঢের হবে।

—আচ্ছা, তবে শনিবারে নিমন্ত্রণ ক'রো।

—শনিবার ত কাল। আজকেই তা হ'লে অর্ডার দিতে হয়।

—তাই দাও।

—খানসামা! (গলার স্বরটা মেমেদের মত সাধা)।

—হাজির, মেম সাহেব!

তার পরদিন খানায় কি কি তৈরি হবে, মেম সাহেব ফরমায়েশ দিলেন। খানসামা চাকরদের ঘরে ফিরে গেল, সেখানে বেয়ারা আর আয়া বসেছিল। খানসামা বল্‌লে, তলব দেবার বেলা ত টাকা নেই, আর এ দিকে খানা দেওয়া হচ্ছে।

আয়া বল্‌লে, কবে ?

—কাল্‌কে। দো সাহেব আওর দো মেম সাহেব।

বেয়ারা বল্‌লে, দো মাহিনা তলব নহি দিয়া।

খানসামা বল্‌লে, চুপ ক'রে থাকলে তলব পাওয়াও যাবে না।

আয়া বল্‌লে, এই বেলা বল্ না। তলব না দিলে কাল কেমন খানা হয় দেখব, আমরা কেউ থাক্‌ব না।

খানসামা বল্‌লে, কে বল্‌বে ?

বেয়ারা বল্‌লে, সকলে একসঙ্গে চল্।

দরওয়ানকেও সঙ্গে নিয়ে চার জনে সাহেব মেমের সম্মুখে গেল।

দল-বল দেখে সাহেব-মেমের মনে একটু খটকা লাগল। মেম সাহেব বল্‌লেন, কেয়া হুয়া ?

দরওয়ান মুখপাত। বল্‌লে, হুজুর, দো মাহিনা তলব নাহি মিলা। হমলোগ কয়সে কাম করেগা ?

মিষ্টার আর মিসেস রায় ইংরাজীতে কথা কইতে লাগলেন, যাতে চাকররা না বুঝতে পারে।

মিষ্টার রায় বল্‌লেন, সব কটাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দাও।

—তা হলেও মাইনে দিতে হবে, নইলে নালিশ করবে, আর কাল কি হবে ? শুধু তাই নয়, এরা যদি জোট ক'রে চ'লে যায়, তা হ'লে অন্য লোক পাওয়া মুস্কিল হবে। আজ-কাল চাকর-বাকরের কাণ্ড দেখছ ত ?

—তা হ'লে এক মাসের মাইনে দিয়ে ওদের থামিয়ে রাখ।

—দেখি যদি পারি। তুম সব এক সাথ আয়া কেও ? আচ্ছা, অভি এক মহিনা কা তলব দেগা।

—নহি মেমসাহেব, আজকাল সব মহঙা হুয়া, গরিব লোগ্‌কা তলব রোকনা নহি চাহিয়ে।

অনেক বুঝিয়ে স্থঝিয়ে মেমসাহেব চাকরদের এক মাসের মাইনে দিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তাদের উপর তখন রাগ কর্‌বার সময় নয়। খাতা বের ক'রে তাদের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে কালি মাখিয়ে ছাপ নিলেন। এখন যে সময়, কাউকে বিশ্বাস নেই। এ রকম প্রমাণ না রাখলে চাকর-বাকর মাইনে পেয়েও তার পর স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পারে যে, মাইনে পায় নি।

মুস্তফীরা আর বসাকরা একটু সকাল সকাল এলেন। নিতান্ত ইংরাজী রকম কর্‌তে গেলে একবারে ঠিক খাবার সময় আস্‌তে হয়, কিন্তু ওঁরা অতটা কায়দা কর্‌লেন না। খানিকক্ষণ সকলে ব'সে নানা রকম কথাবার্ত্তা হ'ল। সময়টা বেশ ভাল, বেশ শীত পড়েছে, বড়দিনের সময় কে কোথায় যাবে, প্রথম এই কথা নিয়ে আরম্ভ। তার পর ঘোড়দৌড়ে কার কত হারজিত হ'ল, তার হিসাব, তার পর সাহেব তিন জন গোল কামরা থেকে উঠে গেলেন। মিষ্টর

রায়ের বস্‌বার ঘরে গিয়ে বেয়ারার ডাক পড়্‌ল। সে এলে হুকুম হল, হুইস্কি সোডা লাও।

এক একটা পেগ নিয়ে তিন জনে বেশ স্ফূর্ত্তিতে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। তার পর তিন জনে উঠে আবার ড্রয়িংরুমে গেলেন। সেই সময় খানসামা দরজা-গোড়ায় এসে বল্‌লে, খানা মেজপর হ্যায়। সকলে গিয়ে ডিনার-টেবিলে বস্‌লেন। কোলের উপর ন্যাপ্‌কিন্ রেখে স্থপ আরম্ভ হ'ল। স্থপ ত তোমার আর মাছের ঝোল নয় যে ভাতের সঙ্গে মেখে শুপ্‌শাপ্ ক'রে মুখের শব্দ ক'রে খাবে! চাম্‌চে প্লেটে ঠেকে শব্দ হবে না, মুখে স্থরুয়া খাবার সময় কোন শব্দ হবে না। মিসেস বসাক ছিলেন এককালে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তাঁর এ সব নতুন ধরণ-ধারণ তেমন সড়গড় হয় নি। তাঁর মুখে একটু একটু শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। অমনি মিসেস রায়ের দিকে চেয়ে মিসেস মুস্তফী চোখ টিপ্‌লেন। অপরাধ অজ্ঞাতে হলেও খেতে ব'সে এ রকম মুখে শব্দ করা অসভ্যতা।

ভুলটা চেপে নেবার জন্য মিষ্টার মুস্তফী বল্‌লেন, আমাদের যে কত রকম বিশ্রী কুসংস্কার আছে, তার সংখ্যা নেই। এই ধর না হবিষ্যি করা। বাপ মরেছে, তা সে জন্য এত দিন হবিষ্যি ক'রে কি হবে? আমি মালসা পুড়িয়ে খেয়ে টা-টা ক'রে থাক্‌লে আমার কি ফল? আর বাপ ত মরেছেন, আমি শুকিয়ে থাক্‌লে তাঁর কি লাভ? তা ছাড়া মরণের পর যে কিছু আছে, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

মিষ্টার রায়—ও কথায় একটা মজার গল্প মনে প'ড়ে গেল। মল্লিককে জান, বিশ্বনাথ মল্লিক? আমরা তাকে বিশু ব'লে ডাক্‌তাম। বছর তিনেক হ'ল, তখন মল্লিক মাস ছয়েক বিলেত থেকে ফিরে এসেছে—তার মা মারা যায়। মল্লিক বড় ছেলে, তাকে শ্রাদ্ধ করতে হবে। সে ত এমন ফাঁপরে পড়ল যে, বলা যায় না। কাছা ত কোনমতে গলায় দিলে, তাও অর্দ্ধেক সময় ধুতি প'রে পেণ্টুলুনের মত টান্‌ত। পেণ্টুলুনের পকেটে হাত দেওয়া অভ্যাস, যখন-তখন ভুলে কাছার ভিতর হাত দিত। তার পর হবিষ্যির বেলা তার চোখ ফেটে জল আস্‌ত। ভেবে চিন্তে উপায় ঠাহরালে কি জান? আলু ভাতে দেবে ব'লে চুপি চুপি দুটো মুরগীর ডিম ভাতে দিত। এই সব উপায় ক'রে কোন রকমে সে মাতৃদায় থেকে উদ্ধার হ'ল।

মিসেস মুস্তফী বল্‌লেন, মিষ্টার রায়, আপনি আর জ্বালাবেন না, আপনার যত সব আজগুবী গল্প।

—কথাটা আপনি বুঝি বানানো মনে করছেন, কিন্তু আমাদের ক্লাবের সকলে জানে।

মিষ্টার বসাক বল্‌লেন, এতে আর বিচিত্র কি? এ দেশে যেমন সব অদ্ভুত প্রথা, বিলেতে গিয়ে মানুষ সে সব কেমন ক'রে মানতে পারে? কাযেই একটা না একটা অব্যাহতির উপায় খুঁজে বের করতে হয়।

দেশের কুপ্রথার দিকে মিসেস বসাকের একটু টান ছিল, তিনি একেবারে পুরা-দস্তর মেমসাহেব হ'তে পারেন নি। বল্‌লেন, আগেকার সব জিনিষের নিন্দা করলে চল্‌বে না। এত কাল ধ'রে ত এই সব প্রথা নিয়েই দেশের লোক আছে।

তা হ'লে বলুন না কেন, আগেকার সবই ভাল ছিল, কিছুই বদ্‌লাবার দরকার নেই। কথাটা মিষ্টার মুস্তফী কিছু বেগের সহিত বল্‌লেন।

গতিক ভাল নয় দেখে মিসেস বসাক চুপ ক'রে রইলেন।

যতক্ষণ সকলে টেবিলে ব'সে রইলেন, ততক্ষণ এই রকম কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগল। প্রমাণ হ'ল যে, দেশের পুরানো প্রথা কিছু ভাল নয়, হিঁদুয়ানীর কিছু ভাল নয়। সেগুলা ছাড়াই হ'ল মানুষের কায, আর সেই জন্য সকলের বিলেত যাওয়া দরকার।

যাবার সময় মিষ্টার মুস্তফী বল্‌লেন, মিসেস রায়, আর শনিবার স্যর ত্রৈলোক্যনাথের গার্ডেন পার্টির কার্ড পেয়েছেন ত?

—কৈ, না।

—তা হ'লে বোধ হয় সব চিঠি পাঠান হয় নি। আমি কালই গিয়ে আপনাদের কার্ড পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয় যাবেন, জর্ম্মাণী থেকে এক জন না কি অদ্ভুত রকম হরবোলা এসেছে।

—আমরা কার্ড পেলেই যাব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বঙ্গ-বিদূষণ

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীর রবীন্দ্র-বিদূষণের কথা আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এই বিদূষণ কখনও নীরবে সহ্য করেন নাই; পাল্টা অবিরত বঙ্গ-বিদূষণে রত রহিয়াছেন। এই বিদূষণ-বাণী এত দিন কবিতায়, গল্পে, নাটকে প্রকারান্তরে প্রকাশ পাইতেছিল; ইদানীং "পত্রধারায়" সোজাসুজি চলিতেছে। বাঙ্গালীর রবীন্দ্র-বিদূষণের মত রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-বিদূষণও ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা উচিত, এই বিদূষণের মূল কি এবং মূল্য কত। বর্ত্তমান সনের ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"তোমার পত্রে একটা প্রশ্ন ছিল, নিজের খ্যাতি বিস্তার করিবার জন্য আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেচি কি না। এ রকম সন্দেহ কেবল বাঙ্গলা দেশেই সম্ভব। এই দেশেই লোকে কানাকানি করে, যে, কোনো বিশেষ কৌশলে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েচি এবং আমার যে ইংরেজী রচনা বেরিয়েচে সেগুলো কোন ইংরেজকে দিয়ে লেখা। তথাপি এদেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পূজা চাইনে। যদি সত্যই চাইতুম তাহলে এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হত না। আমি যাঁর পূজায় প্রবৃত্ত, অন্যদের কাছে তাঁর পূজাই চেয়েচি। তুমি আবিষ্কার করেচ আমি ঈশ্বর নই। আমি শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি কাকে ঈশ্বর বলো জানিনে—ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে—তিনি সর্ব্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন, আমি যে সে ঈশ্বর নই সে কথা মুখে উচ্চারণ করবারও দরকার ছিল না।" (৫৯৫ পৃ:)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার খ্যাতি-বিস্তারের জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখিয়াছেন এই সংবাদের বাহক যে কে বা কাহারা, তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না। মিথ্যা বা কল্পিত সংবাদ-প্রচারকের অভাব যে পৃথিবীর কোন দেশেই নাই, এ কথা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ অবগত নহেন, তাই তিনি কুৎসার মহলে বাঙ্গালীর একচেটিয়া দখল আবিষ্কার করিয়াছেন! বাঙ্গালার বাহিরে, অন্তত: আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যেও যে এক সময় সন্দেহমূলক কুৎসা-রটনা সম্ভব ছিল, রামায়ণে সীতার আখ্যানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম কুৎসার খবর পাইয়া কি করিয়াছিলেন? রাম কুৎসাপরায়ণ জনগণের রঞ্জনের জন্য সীতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কি খবরের কাগজের রিপোর্টারগণকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন? যে পত্রখানি হইতে উপরের বচনটি তোলা হইয়াছে, তাহা ১৩৩৮ সনের বিজয়া-দশমীর দিনে লিখিত। তাহার পরেও যে খবরের কাগজের দূতরা রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পার্শ্বচরগণের নিকট অবাধে যাতায়াত করিতেছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দুর আদর্শে এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শে এতটা তফাৎ। এ ক্ষেত্রে হিন্দুর আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য আদর্শের খুব বেশী তফাৎ নাই। Caesar's wife must be above suspicion এই প্রবচনই তাহার প্রমাণ।

নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে কানাকানি পত্রধারায় প্রচার লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য নহে! বাঙ্গালীরা যে কেবল সন্দেহমূলক কুৎসা রটনা বা কানাকানি করে, তাহা নহে, সময় সময় দুটা একটা ভাল কথাও বলে। তাহার মধ্যে একটা কথা এই প্রবাদ—

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"

আমার স্মরণ হয়, এই প্রবাদটি আমি প্রথম পড়িয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" বা এমনই কোন একটা পুস্তকে। রবীন্দ্রনাথের হাসিয়া উড়াইবার শক্তি নাই বলিয়াই তিনি এই সকল কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহারা বিশ্ব-সাহিত্যের এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কার্য্যপ্রণালীর সহিত অপরিচিত, এমন অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে নোবেল প্রাইজ পাইবার জন্য বিশেষ কৌশলের কল্পনা অসম্ভব নহে, এবং এরূপ কল্পনা কানাকানির সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে মতভেদের কি অবকাশ নাই? নোবেল প্রাইজ বিতরণ লইয়া হতভাগ্য বঙ্গদেশের বাহিরেও কানাকানি কেন, লেখালেখিও যে সম্ভব, তাহার প্রমাণস্বরূপ কিপ্লিং সম্বন্ধে এ, জি, গার্ডিনারের একটি উক্তি তুলিয়া দিলাম—

"Mr. Rudyard Kipling is the first Englishman to be awarded the Nobel Prize for Literature. He is the first Englishman to be crowned in the Court of Literary Europe.

He is chosen as our representative man of letters, while George Meredith, Thomas Hardy, and Algernon Charles Swinburn are still amongst us. The goldsmiths are passed by and the blacksmith is exalted. We do not know the grounds of decision; but we do know that Mr. Kipling is not our king." *(Prophets Priests and Kings).*

এখানেও লিখিত হইয়াছে, "কি কারণে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, জানি না; কিন্তু এ কথা জানি, কিপ্লিং আমাদের সাহিত্য-রাজ্যের রাজা নহে।" বাঙ্গালার জীবিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে রাজাধিরাজ, এ কথা কোন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সাহিত্যরাজ্যের শাসনবিধি রাজতন্ত্র নহে, গণতন্ত্র; সাহিত্য-রাজ্যের প্রজারা পেশকস্ দিতে অপারগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পেশকস্ বাবদ দাবী করেন অনেক—দাবী করেন সর্ব্বস্ব। কাযেই বিরোধ এবং বিদূষণ। কবি-সার্ব্বভৌমের দরবারের প্রধান দরবারীরা বাঙ্গালা সাহিত্যের তৌজি হইতে প্রাগ্রবীন্দ্র সাহিত্যের নাম খারিজ করিয়া দিতে চাহেন। এই প্রস্তাবে অনেক সাহিত্যিক সম্মত হইবেন সন্দেহ নাই; কেন না, তখন তাঁহারা অনেক উচ্চ আসন শূন্য পাইয়া জুড়িয়া বসিতে পারিবেন। কিন্তু প্রাগ্রবীন্দ্র সাহিত্যের রসমুগ্ধ পাঠকের এখনও অভাব নাই। শঙ্করাচার্য্যের "মোহ-মুদ্গর" যখন ধন-জন-যৌবনের মোহ নাশ করিতে পারে নাই, তখন বীরবলের মোহ-মুদ্গর যে প্রাগ্রবীন্দ্র সাহিত্যের মোহ একবারে নাশ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করা যায় না।

যাঁহারা তাঁহার পবলিসিটি বা খ্যাতিবিস্তার বিভাগের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান, অথবা যাঁহারা তাঁহার নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে কানাকানি করেন, এই দুই শ্রেণীর বাঙ্গালী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন ভক্ত। অবশ্য, "যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তথাপি এ দেশেও আমার ভক্ত আছে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং তাঁহার ভক্তগণ বাঙ্গালায় থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য বঙ্গদেশের বিদূষণের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, এই ভক্তগণ সংখ্যায় কম, এবং অভক্তের সংখ্যা অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-বিদূষণ-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত ভক্তি যে কি পদার্থ, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আবার পাঠকগণকে মনে করিয়া দিব—

"তথাপি এদেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পূজা চাই নে। যদি সত্যই চাইতুম, তা হ'লে এই ধর্ম্মমুগ্ধদেশে অবতার হয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হ'ত না।"

এখানে দেখা যাইতেছে, ভক্ত অর্থে রবীন্দ্রনাথ এমন সকল লোক মনে করেন, যাঁহারা তাঁহাকে পূজা করিতে প্রস্তুত; তিনি চাহিলেই যাঁহাদের কাছে পূজা পাইতে পারেন। কিন্তু তিনি পূজা চাহেন না, অর্থাৎ ভক্তগণকে পূজার অবকাশ দিতে প্রস্তুত নহেন। এখন জিজ্ঞাস্য, যে পূজা রবীন্দ্রনাথ চাহিলেই পাইতে পারেন, তাহা কি পাশ্চাত্য ধরণের বড়মানুষ পূজা (lordlatroy), না হিন্দুধরণের নর-নারায়ণের পূজা? রবীন্দ্রনাথ যখন লিখিয়াছেন, যদি তিনি সত্যই পূজা চাহিতেন, তাহা হইলে "এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে উঠা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসাধ্য হত না," তখন বুঝিতে হইবে যে, তিনি হিন্দুর ধরণের পূজার কথাই বলিয়াছেন। অবশ্যই সেই পূজা দিবার কষ্ট তাঁহার কোন ভক্তকে স্বীকার করিতে হয় না; কেন না, রবীন্দ্রনাথ পূজা লইতে প্রস্তুত নহেন। এই সকল কথার নির্গলিতার্থ এই, এ দেশে রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্ত আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে অবতার মনে করেন, তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা দিতে চাহেন, কিন্তু তিনি সেই পূজা চাহেন না বলিয়া তাঁহার পুরাদস্তুর অবতার হওয়া ঘটে নাই।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ভক্ত বোধ হয় আরও এক সিঁড়ি উপরে উঠেন, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর মনে করেন, এবং ইহার ফলে ভক্তগোষ্ঠীতে বোধ হয় মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া বিজয়া-দশমীর এই বিদূষণ-বাণী প্রচার করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর-বাদের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"তুমি আবিষ্কার করেচ আমি ঈশ্বর নই। শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি কাকে ঈশ্বর বলো জানিনে—ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে—তিনি সর্ব্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন, আমি যে সে ঈশ্বর নই, সে কথা মুখে উচ্চারণ করবারও দরকার নাই।"

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

উপনিষদের এই সুপ্রসিদ্ধ পংক্তির রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মূলানুগত নহে, ভুল। বস্ ধাতু উত্তর বিধি অর্থ-বোধক "ণ্যৎ" প্রত্যয় করিয়া "বাস্যম্" ক্রিয়া-পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "বাস্যম্" অর্থ—আচ্ছাদনীয়। এই পংক্তির আক্ষরিক অনুবাদ হইবে—

"এই জগতে যৎকিঞ্চিৎ জগৎ বা চরাচর বস্তু আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয়।"

ঈশ্বরের দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্তই হউক আর ব্যাপ্যই হউক, কোন মানুষবিশেষ এই ঈশ্বর কি না, এইরূপ তর্ক একালের আর কোন লেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ উপরে উদ্ধৃত বচনে মাত্র দুই শ্রেণীর বাঙ্গালীর পরিচয় দিয়াছেন। এক শ্রেণী,—যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি-বিস্তারের প্রণালী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, এবং নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তি কৌশলের বা চালাকির ফল মনে করেন, অর্থাৎ যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিখ্যাত হইবার যোগ্য কবি মনে করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণী—যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত; যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরের অবতারকল্প মনে করিয়া পূজা করিতে চাহেন। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গুণে মুগ্ধ, কিন্তু দোষ সম্বন্ধে অন্ধ নহেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গ-বিদূষণ-বাণী পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি এই তৃতীয় শ্রেণীর লোককেও শত্রুই মনে করেন। তাঁহার যেন ধারণা, যে তাঁহার ব্যক্তিগত ভক্ত নহে, সেই তাঁহার শত্রু। আর একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"যাই হোক্, আমাকে তোমার গুরু ব'লে গণ্য ক'রো না, আপনার লোক বলেই জেনো।...আমার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা থাকাই তোমার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত ছিল, আমার দেশের লোকের অনেকেরই তাই আছে। কিন্তু অভ্যাসের আচারের মতের নানা প্রকার বাধা সত্ত্বেও সে-সমস্ত পার হয়েও তুমি আমার কাছে আসতে পেরেচ, সে তোমার বুদ্ধির অসামান্য উদারতা বশতঃ।" (প্রবাসী, ১৩৩৯, জ্যৈষ্ঠ, ৪৬৪ পৃঃ)।

এখানে রবীন্দ্রনাথ বিদূষণের সুর ছাড়িয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা দেশের অনেক লোকের পক্ষেই স্বভাবসঙ্গত; এবং এই কঠোর বিরুদ্ধতার মূলে অভ্যাসের—আচারের—মতের ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু এত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার পত্রলেখক বা লেখিকা বুদ্ধির যে অসামান্য উদারতা দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সেই উদারতা নাই; তাই দেশের অনেক লোক স্বভাব-সঙ্গত কঠোর বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া তাঁহার কাছে পৌছিতে পারে না বলিয়া তিনি অবিরত বিদূষণ বর্ষণ করিতেছেন।

১৩৩৯ সনের পৌষের 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত একখানি পত্রের বিদূষণের সুর কিছু নরম। বিদূষণের মূল কারণ নির্দ্ধারণের জন্য এই পত্রের কতক অংশ উদ্ধৃত করিব—

"মোটামুটি এইটুকু তোকে বলে রাখচি যে, পুরানো বিশ্বাস-গুলিকে আঁকড়ে থাকলে কিম্বা নির্ব্বিকার অন্ধভাবে স্থূলবস্তুকে অবলম্বন করে পূজার্চ্চনা করে গেলে তাতে যে কোনই লাভ নেই তা বলতে পারিনে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব ত একটা সঙ্কীর্ণ পদার্থ নয়। কেবল নিষ্ঠা করে পূজা করে গেলেই ত মানুষের সকল দিকের পূর্ণতা হয় না। শিশু ধুলোবালি নিয়ে খেলা করে, কেউ বলে না, এতে সে আনন্দ পায় না, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের বিবিধ কাজকর্ম্ম ও ভাবনা-চিন্তায় সেই আনন্দ নেই, কিন্তু তাই বলে কেউ বলে না মানুষ চিরদিন মৃত্যু পর্য্যন্ত খোকা হয়ে থাকলেই তার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হয়।...মূঢ়তার মধ্যে এক দিকে যত সুবিধা থাক্, অন্ধভক্তির মধ্যে একদিকে যত আরাম থাক, তবু সেই মোহজালের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে অন্তরে বাহিরে আমাদের দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। সেই দুর্গতি চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে—আমাদের জড়তা, ভীরুতা, অকর্ম্মণ্যতার অবধি নেই—এমনি বিচ্ছিন্নতায় আমরা পদে পদে বিভক্ত যে, কোন মতেই কোন কাজেই আমরা একত্র হতে পারচি নে—সকল অনুষ্ঠানই পণ্ড হয়ে যাচ্চে—হাজার রকমের অদ্ভুত অসঙ্গত মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে দুর্ব্বলতার শেষতলায় এসে ঠেকেছি, এখন কি হিসাব-নিকাশের দিনে কেবল এইটুকু মাত্র দেখেই খুসী থাকব যে, আমাদের কোন স্ত্রীলোক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বিল্ব-গঙ্গাজলে শিবের পূজা ক'রে থাকে? এই কি আমাদের সমস্ত সম্পদ? অন্যদিকে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে, তার পূরণ কি এইটুকুতে হয়ে যাবে? সমস্ত মনুষ্যত্বকে যে সব দিক দিয়েই জাগাতে হবে—শুধু কেবল গুরু ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে অহোরাত্র খাওয়া-ছোওয়া বাঁচিয়ে মালা ঘুরিয়ে বেলা কাটিয়ে দিলেই ত আমরা রক্ষা পাব না। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, এ সমস্তের কি কোনো মূল্যই নাই, থাকতে পারে, কিন্তু সে মূল্যে বড় জোর চিতার কাঠ কিনতে পারবে বেঁচে থাকবার সম্বল তাতে জুটবে না।" (১৬৩-১৬৪ পৃঃ)।

এই উক্তিতে কতকগুলি অমূলক কথা উত্থাপন করিয়া মূল কথা ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "কেবল নিষ্ঠা করে পূজা করে গেলেই ত মানুষের সকল দিকের পূর্ণতা হয় না" স্বীকার করিলাম। কিন্তু নিষ্ঠা ক'রে পূজা' না করিলেই কি সকল দিকের পূর্ণতা হয়? যাঁহারা নিষ্ঠা-পূজা ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা কি সকলেই পূর্ণতা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, না পূর্ণতা-লাভের চেষ্টা ভিন্ন আর

কিছু করেন না? ধরিয়া লইলাম, স্থূলবস্তুর পূজার্চ্চনা ছেলেখেলা। কয় জন বৃদ্ধ ছেলেখেলা একবারে ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? স্থূলবস্তুর পূজার সঙ্গে গান আছে, নাচ আছে, বাদ্য আছে, অভিনয় আছে, চিত্র আছে, ভাস্কর্য্য আছে, স্থাপত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ এই সকল কলার অনুশীলন স্বাস্থ্যকর মনে করেন না কি? দিনের কতটা সময় স্থূলবস্তুর পূজার্চ্চনায় অপব্যয়িত হয়? অনেক ক্ষেত্রে বাকী সময়ের কতক অংশ খবরের কাগজ, জীবন্ত মহাপুরুষগণের বাণী, বক্তৃতা, নাটক নবেল কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতার সাধনেই ব্যয়িত হইতেছে। তবে কেন সুফল ফলিতেছে না? দেশের কোন কোন স্ত্রীলোক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বিল্ব-গঙ্গাজলে শিবের পূজা করে বলিয়াই কি শিবপূজা ত্যাগী হিন্দুর মধ্যেও জড়তা, ভীরুতা, অকর্ম্মণ্যতা, বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়? যাহারা "শুধু কেবল গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে অহোরাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচিয়ে মালা ঘুরিয়ে বেলা কাটিয়ে" দেয়, উনবিংশ শতাব্দে তাহাদের সংখ্যা যত ছিল, তুলনায় বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। কুলগুরুঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া যাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন আরও কমিয়া যাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে বিলাতফেরতগণ অস্পৃশ্য গণ্য হইতেন; এখন তাঁহারা চল হইয়াছেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহাকে সানকি মহাপ্রসাদ বলিতেন, সেই মহাপ্রসাদভোজীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। যাঁহারা খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়া চলে, এমন লোকের সংখ্যা যেমন কমিতেছে, সেই অনুপাতে জড়তা, ভীরুতা, অকর্ম্মণ্যতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা-জনিত একত্র কায করিবার শক্তির অভাব কমিতেছে কি? উনবিংশ শতাব্দে যে সকল বিলাত-ফেরত লোক অস্পৃশ্য গণ্য হইতেন, তাঁহাদেরই অনেকে এখন দেশের নেতা এবং পূজার দেবতা। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলেও রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদিগকে "আমরা"র সামিল মনে করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও একত্র কায করিবার শক্তি বাড়িয়াছে কি? তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন না কেন? এক জন কল্যাণীয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি লিখেচ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমায় ও তোমাদের অনেকের একটা বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারে নি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেচি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারি, আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুচট খেয়ে পড়ে, সেটা আমার স্বভাবের দোষে, না তাদের চলনের ত্রুটিতে, সে তর্ক ক'রে কোন লাভ নাই, এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।" (প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, ৪৬৮ পৃঃ)।

তর্কে জয়ের সান্ত্বনা না থাকিলেও, লাভ ছাড়া লোকসান নাই। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী বন্ধুগণকে মোকাবেলা তর্কে পরাজিত করিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না, এবং কেহ কেহ হয় ত তাঁহার অনুকূল হইতেন। আর যদি তিনি স্বয়ং তর্কে হারিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেন, তবে আপাতবিরোধী বন্ধুরা সাদরে তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিত। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদীর সহিত তর্ক করিতে পারেন না; আবার নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া প্রতিবাদীর মনোভাব বুঝিয়া সকল দিক্ হিসাব করিয়া বিচারও করিতে পারেন না। সুতরাং বিরোধ আরম্ভ হইলে আর তাহার বিরাম হয় না, এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিরপরাধ দেশশুদ্ধ লোকের বিদূষণ আরম্ভ করেন। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইহাই চলিয়াছে। গত অগ্রহায়ণের "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত "গোড়ার কথা এবং শেষের কবিতা" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, "রবীন্দ্রনাথ 'নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিয়া' অতরুণ হিন্দুর মনোভাব বুঝিতে চাহেন না বা পারেন না বলিয়া তিনি দেশগুরুর পদলাভ করিতে পারেন নাই।" "আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারেনি," "বুঝতে পারি, আমি যেখানকার লোক, সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ", ইত্যাদি বাক্যে রবীন্দ্রনাথও এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার কারণ আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার এক কারণ, তাঁহার নিজের স্বভাব তাঁহার অভ্যাসের সঙ্গে ছন্দ মিলাইতে পারে নাই; তিনি নিজের সঙ্গে নিজে বেখাপ।

রবীন্দ্রনাথের স্বভাব রবীন্দ্রনাথকে কোন্ দিকে চালায়, তাহা তিনি ১৩৩৮ সনের ১৯শে বৈশাখে লিখিত একখানি পত্রে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কিন্তু কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না, তারা যে কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেছে, তাতেই আনন্দ পায়।......আমরা লিখি রূপস্রষ্টার জন্যে, তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক্ থেকে যাচাই ক'রে দেখেন রূপের আবির্ভাব হ'ল কি না। আমার রূপকার বিধাতা সেই জন্যে আমাকে নানা রসের, নানা ভাবের, নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান, নিজের মনকে নানান্‌খানা ক'রে নানা চেহারাই গড়তে হয়।... উপদেশ দেওয়া, উপকার করা গৌণ, রচনা করাই মুখ্য। সেই জন্যেই আমি সবাইকে বার বার ক'রে বলি, দোহাই তোমাদের, হঠাৎ আমাকে গুরু বলে ভুল ক'রো না। আমি কর্ম্মীও বটে, কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে, আমি কারুকর্ম্মের কর্ম্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চেও অভিনয় করি, নাচি, নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে কোন একটা মাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায়, তাদের পদে পদে খট্‌কা লাগে। আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাকত, তবে কোন্ দিন হয় ত ভাল আমলের এক জন অবতার হয়ে পড়তুম" (প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, ৪৬৬ ৪৬৭ পৃঃ)।

এই প্রবন্ধের গোড়ায় যে বচনটি তুলিয়াছি, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যদি সত্যই চাইতুম, তা হ'লে এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হত না।" কিন্তু উপরে উক্ত উদ্ধৃত বচনের শেষটুকু পাঠ করিলে মনে হয়, এই হতভাগ্য ধর্ম্মমুগ্ধ দেশের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে রবীন্দ্রনাথ অবতার হইতে চাহেন নাই, ঠিক তাহা নহে; তাঁহার এই স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা সেই পথে বাধা দিয়াছে। কিন্তু, নানা কারণে তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারে এবং সমাজসংস্কারে হাত না দিয়া পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক (Secretary) ছিলেন। গোল্ডেন বুক অব টাগোরে (Golden Book of Tagore) যে রবীন্দ্রনাথের জীবনপঞ্জী আছে (A Tagore Chronicle 1861—1831), তাহাতে এই তারিখটি আছে (P. 366)। কিন্তু গোড়ার তারিখ, ১৮৮৭, বোধ হয় ভুল। প্রথমবর্ষের 'প্রচারে' প্রকাশিত "আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" নামক বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধে দেখা যায়, ১২৯১ সনে (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে) রবীন্দ্র-নাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং সাবালক হওয়ার অল্পপরেই রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্মকর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যদি কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে, তবে ক্রমান্বয়ে ২৮ বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধর্ম্মপ্রচার এবং সমাজসংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারেন নাই। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, প্রচারকার্য্য করিতে হইয়াছে; আদি ব্রাহ্মসমাজের আব-হাওয়া তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষকে দুর্দ্ধর্ষ প্রচারক করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ—আত্মপ্রকাশরত গীতিকবি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তি অত্যন্ত প্রখর; কল্পিত বিষয়ের অনুভব-শক্তি অত্যন্ত প্রবল; এবং আত্মানুভূতিকে ছন্দোবদ্ধ বাঙ্গালায় প্রকাশের শক্তি অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে এবং উৎকৃষ্ট খণ্ড-কবিতা পড়িতে পড়িতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষণেকের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হয়। যে কবি কল্পনা-নয়নে যাহা ইচ্ছা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি প্রমাণ যাচাই করিয়া অনুমান করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবেন কেন? যিনি কল্পিত বস্তুকে কবিতায় শ্রোতার বা পাঠকের প্রায় প্রত্যক্ষ-গোচর করাইতে পারেন, তিনি সাধারণ প্রচারকের মত যুক্তিতর্ক করিয়া প্রতিবাদীকে বুঝাইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহিবেন কেন? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রখর হইলেও পঙ্গু। সেই কল্পনার উর্দ্ধে উড়িবার পাখা আছে, কিন্তু মাটীতে হাঁটিবার পা নাই; সুতরাং তাহা অন্য মানুষের অনুভূতির এবং অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে পারে না। এইরূপ প্রচারকের ধর্ম্মব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য হইবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া-ছেন, "আমি কখনও কাউকে আদেশ করিনে, তার কারণ, আমি গুরু নই, আমি কবি" (প্রবাসী, ১৩৩৮, পৌষ, ৩৩৯ পৃঃ)। আবার লিখিয়াছেন, "প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাবসঙ্গত, প্রচার করা একেবারেই নয়।" (প্রবাসী, ১৩৩৯, শ্রাবণ, ৪৫২ পৃঃ)। শেষ কথাটি ঠিক নহে। প্রচার করা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসঙ্গত নহে, কিন্তু অভ্যাসসিদ্ধ। প্রকাশ আত্মতৃপ্তি-সাধনের জন্য আত্মগত কথা; অপরের মতপরিবর্ত্তনের জন্য প্রকাশের নাম

প্রচার। শান্তিনিকেতনে নিয়মমত ধর্ম্মব্যাখ্যান এবং পত্রধারায় বাদ-প্রতিবাদ এবং উপদেশ প্রচার ছাড়া আর কিছু নহে। "এ কথা আমাকে জানাতেও হবে—কিন্তু গুরু হয়ে উঠে কাউকে মানাতেই হবে, এমন আমার স্বভাব নয়" (প্রবাসী ৪৫৩ পৃঃ)। জানানও প্রচার, মানানও প্রচার। নামজারী এবং ডিক্রিজারী, দুইই জারী। নামজারীতে এবং ডিক্রিজারীতে যে প্রভেদ, জানানতে এবং মানানতে সেইটুকু মাত্র প্রভেদ। "কাউকে মানাতেই হবে" এমন ভাব রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসঙ্গত নহে; কিন্তু যে মানিবে না, তাহাকে কঠোর ভাষায় বিদূষণ তাঁহার অভ্যাসসিদ্ধ। এখন দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ কোন্ ধর্ম্ম (religion) প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম বা রিলিজিয়নের কথা উঠিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম মনে আসে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি মনে করতে পার যে, তার কারণ আমার মন ব্রাহ্ম-সংস্কারে চালিত—একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো সংস্কারে আমাকে কোনো দিন বাঁধেনি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন করে বেরিয়ে চলে এসেচি—আমার জায়গা হয় নি" (প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, ৪৬৭ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নহেন, এ কথা শুনিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যদি ব্রাহ্ম না হয়েন, তবে তাঁহার ধর্ম্ম কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার গত কয়েক বৎসরের "পত্রধারা" এবং ব্যাখানধারা পড়িয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ইংরাজী পুস্তক, হিবার্ট লেকচার, Religin of Man পাঠ করিলাম। এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা দেবাদিদেব ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের আসনে মহামানব, চিরমানব বা বিশ্বমানব নামধেয় মানবাতিমানবকে বসাইয়া এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। এই ধর্ম্মের যাহা লক্ষ্য, তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং, নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপী বটে, কিন্তু মানবাতীত ব্রহ্ম নহে, বিশ্বমানব বা শাশ্বত মানব। এই ধর্ম্মের স্বরূপ অল্পকথায় বুঝান অসম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, ইংরাজী পুস্তকে (Religin of Man) তাহা খোলসা করিয়া বলা হইয়াছে। এই পুস্তকের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নব-মানবধর্ম্মের উৎপত্তির ও পরিণতির কাহিনী লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে এই ধর্ম্ম আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়াছে (process of growth); ইহা উত্তরাধিকারিসূত্রে লব্ধ বা আমদানী করা (inheritance or importatin) বস্তু নহে। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি-রহস্য রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"I was born in a family which, at that time, was earnestly developing a monotheistic religion based upon the philosophy of the Upanishads" (p 91).

আমি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, যে পরিবার সেই সময় উপনিষদের দার্শনিক মতকে ভিত্তি করিয়া আগ্রহের সহিত একেশ্বরের উপাসনাপর ধর্ম্ম গঠন করিতেছিলেন।

Monotheistic religion কথাটি রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার লক্ষ্য হয়, তবে স্বনামপ্রসিদ্ধ বস্তুকে এইরূপ অনুবাদের ভঙ্গিমায় আচ্ছাদন করা সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে সমসময়ের ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। যদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তবে যে আকর হইতে রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই আকর ভ্রমপূর্ণ বলিতে হইবে। ব্রহ্মোপাসনার ঝরণা খুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন রামমোহন রায় এবং তাঁহার দেশত্যাগের এবং বিদেশে অকালমৃত্যুর পর সেই ঝরণার ক্ষীণ ধারাটি মুক্ত রাখিয়াছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি নামে বিশ্রুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষৎপাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সমাজ নবজীবন লাভ করিয়াছিল; ব্রহ্মোপাসনার ক্ষীণধারা খরস্রোতার আকার ধারণ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি দূরগামী ছিল; তিনি সাবধানে, প্রতিপদক্ষেপে অগ্রপশ্চাৎ হিসাব করিয়া অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিশ বৎসর-বয়স্ক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবক

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই যুবক উপনিষদের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের রচনা পাঠ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যুবকের নাম কেশবচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম-গড়নের কারখানা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে কলুটোলা সেনের বাড়ী "সঙ্গতসভা" গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। "সঙ্গতসভার" ব্যবস্থা অনুসারে এই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাড়ীর দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া দুর্গামণ্ডপকে পারিবারিক প্রার্থনা-গৃহে পরিণত করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত গুস্করা নামক গ্রামে নির্জ্জনবাসের সময় দেবেন্দ্রনাথ দৈববাণীর দ্বারা কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিযুক্ত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি দান করিয়াছিলেন।* রামমোহন রায় শাস্ত্রবচনের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের আচার্য্য-নিয়োগ সম্পর্কে নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত ভারতবাসীর ইতিহাসে দৈববাণীর প্রথম প্রবেশ। তাহার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্রে আস্থাহীন শিক্ষিত সমাজে মোটের উপর এই দৈববাণীর বা ঈশ্বরের বাণীর শাসনই চলিয়াছে। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" হিন্দু যতই শিক্ষিত হউক, যুক্তির এবং অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার শক্তি তাহার নাই; তাই ঐশী বাণীর জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন তাহার গতি নাই। সে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ এই লেকচারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কোনও ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কোনও শাস্ত্রের বা সঙ্ঘবদ্ধ উপাসকগণের অনুমোদিত ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার মনকে তিনি বাঁধিতে চাহেন নাই। তার পর ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে (বারো-তের বৎসর বয়সে) তাঁহার উপনয়ন এবং গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে গায়ত্রী-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অবশ্য রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। সে কালে গায়ত্রীর আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথকে প্রশান্ত পুলকে পূর্ণ করিত (produced a sense of serene exaltation)। রবীন্দ্রনাথ আনন্দময় অন্তর্জ্জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। এক দিন প্রত্যুষে রবীন্দ্রনাথ গাছের আড়ালে লুক্কায়িত প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালা দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়—

"I suddenly felt as if some ancient mist had in a moment lifted from my sight, and the morning light in the face of the world revealed an inner radiance of joy" (p, 94).

আমি সহসা অনুভব করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাচীন কুয়াসা যেন আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত প্রাতঃসূর্য্যের আলো অন্তর্জ্জগতের আনন্দের জ্যোতি প্রকাশিত করিল।

রবীন্দ্রনাথ চারি দিন ধরিয়া এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তার পর তাঁহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল। পরে এই প্রকার স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁহার ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছিলেন। Relegion of Man নামক পুস্তকের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম্ম-জীবনের যে ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের নামমাত্রও নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত এক সময় রবীন্দ্রনাথের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাকে তিনি সত্যের জীবন্ত আকৃতি লুকাইবার মুখোসের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এবং ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, মুখোস ফেলিয়া দিয়া আপনার সত্যধর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"After a long struggle with the feeling that I was using a mask to hide the living face of truth, I gave up my connection with our church" (p. 110).

এই ইংরাজী পুস্তকে প্রকাশিত বক্তৃতাগুলি অক্সফোর্ডে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (১৩৩৭ সনের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) পঠিত হইয়াছিল। তাহার কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর পূর্ব্বে, ১৩৩৫ সনের ৬ই ভাদ্র, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসবে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে রবীন্দ্রনাথ প্রধান আচার্য্যরূপে

---

* Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, vol. I, Calcutta, 1911, p. 137.

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উপদেশের পর রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উপদেশের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

"আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই পতাকা বহন ক'রে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম পূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ ক'রেছি, আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ" (প্রবাসী, ১৩৩৫, আশ্বিন, ৮৫৭ পৃ:)।

তার পর হিবার্ট লেক্‌চরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"At the outburst of an experience which is unusual, such as happe ed to me in the beginning of my youth, the puzzled mind seeks its explanation in some settled foundation of that which is usual, trying to adjust an unexpected inner message to an organised belief which goes by the general name of religion, And. therefore, I naturally was glad at that time of youth to accept from my father the post of secretary to a special section of the monotheistic church of which he was the leader. I took part in the services mainly by composing hymns which unconsciously took the many-thumped impression of the orthodox mind, a composite smudge of tradition. Urged by my sense of duty I strenuously persuaded myself to think that my new mental attitude was in harmony with that of the members of our association. although I constantly stumbled upon obstacles and felt constraints that hurt me to the quick" (p. 109).

যৌবনের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি এখানে inner message, অন্তর্জগতের সংবাদ বলিয়াছেন; তাহা বাহির হইতে—রামমোহন রায়ের নিকট হইতে লওয়া—এমন কথা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। তাহার পর এই অনাহূত আন্তরিক সুসমাচারকে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত একটা বিধিবদ্ধ ধর্ম্মের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য তাঁহার পিতার নিকট হইতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া যে ধর্ম্মের কর্ম্মকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি বলিয়াছেন,—

"A composite smudge of tradition."

ইংরাজী অভিধানে (The Concise Oxford Dictionary তে) smudge শব্দের অর্থ লেখা আছে—

Outdoor fire with dense smoke made to keep off insects etc.

মশা তাড়াইবার ধূঁয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ঘরের বাহিরে (এদেশে গোশালার বাহিরে) যে আগুন জ্বালান হয়, তাহার নাম 'স্মাজ'। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়া যে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সাবেকী যত ধর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে পরবাদী ইচ্ছা করিলেই 'স্মাজ' বলিতে পারেন; রামমোহন রায় বাঁচিয়া থাকিলে "কবিতাকারে"র এই নূতন ধর্ম্মকে খুব সম্ভব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলেন, রামমোহন তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। কিন্তু রামমোহন রায় কখনও সত্যদৃষ্টির দাবী করেন নাই। ধর্ম্মান্দোলনে ব্রতী হইয়া "বেদান্ত গ্রন্থের" "অনুষ্ঠানে"র শেষে নিজের সত্যনিরূপণের প্রণালী সম্বন্ধে রামমোহন রায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহা অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।"

অবশ্যই রামমোহন রায় শাস্ত্রের এই দোহাই দিয়াছিলেন এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে (১৭৩৭ শকাব্দায়—১৮১৫ খৃষ্টাব্দে), এবং বর্ত্তমান যুগের যাঁহারা যুগাবতার, তাঁহারা য়ুরোপের সাম্যবাদের বিরোধী হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাকে নিতান্ত বকেয়া কুসংস্কার মনে করেন। যাঁহাদের রুচি না হয়, তাঁহারা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ না মানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু সত্যদ্রষ্টার এবং দৈববাণী-বাহকের উচ্চ বেদীতে বসিয়া জনসাধারণকে শাস্ত্র উপেক্ষা করিতে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের অবশ্যই স্মরণ করা উচিত যে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাক আর না থাক, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্র আমাদের জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এই অভিজ্ঞতারাশিকে একবারে উপেক্ষা করিয়া য়ুরোপীয় শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ অনুসারে হিন্দু সমাজকে সহসা ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করিলে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। রামমোহন রায় এমন কায করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহার শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এইরূপ সমাজ-বিপ্লবসাধনে সম্মতিদান করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লোক

মহর্ষি বলে। বর্ত্তমান কালে এই সকল প্রাচীন উপাধি অনেক অপাত্রের উপর অপব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং এখন মহাবীর কর্ম্মবীর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহর্ষি বলিতে গেলে তাঁহার অসম্মান করা হয় বলিয়াই আমি মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা ভাষায় রামমোহন রায়ের নিকট ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া দেড় বৎসর পরে ইংরাজী ভাষায় তাহা অস্বীকারের তাৎপর্য্য যাহাই হউক, তিনি যখনই রামমোহন রায়ের নাম করিয়াছেন, তখনই মনের সাধে রামমোহন রায়ের হতভাগ্য দেশবাসীর বিদূষণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবের যে সারমন (sermon) হইতে উপরে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সারমনেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আজ যাঁকে আমরা স্মরণ ক'রছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিলো। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান ক'রেছিলেন—সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বি.ক্ষতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিলো তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দ্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয় নি। আজ পর্য্যন্ত তাঁর অবমাননা চ'লেছে। তিনি যে সত্যকে বহন ক'রে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি" (প্রবাসী, ১৩৩৫, আশ্বিন, ৮৫৬ পৃঃ)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট লেক্‌চর্‌এ রামমোহন রায়ের নাম না করিয়া তাঁহাকে যে অবমাননা করিযাছেন, তাহার তুলনা সুলভ নহে। রামমোহন রায় যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনেকটা এ দেশবাসী গ্রহণ করিয়াছে; উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন এবং ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন—অধ্যাপন—অনুশীলন এদেশে খুব চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধতা বলেন, তাহার জন্য দায়ী দুটি লোক—কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একের বক্তৃতায় এবং অপরের কবিতায় বিশেষ মুগ্ধ, এবং তাঁহাদের বিদেশীয় খ্যাতিতে ততোধিক মুগ্ধ, শিক্ষিত বঙ্গবাসী এই দুই জনকে রামমোহন রায়ের দ্বারা স্থানচ্যুত দেবপ্রতিমার রত্নবেদীতে বসাইয়া ব্রহ্মোপাসনা ভুলিয়া তাঁহাদেরই পূজা করিয়াছে এবং করিতেছে। সুতরাং রামমোহন রায়ের অনুসরণ করিবে কে?

রবীন্দ্রনাথ যেমন বিদেশে ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়ের নাম লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনই স্বদেশে বাঙ্গালা গদ্যের জনক রামমোহন রায়ের নাম লোপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। য়ুরোপীয়গণের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর মধ্যে শাস্ত্রের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহার অল্প পরে বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত সংবাদপত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গদ্য-রচনা পুষ্টিলাভ করে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত, বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাদানুবাদের ফলে। এই বাদানুবাদে রামমোহন রায়ের প্রতিবাদী মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নামও স্মরণীয়। সুতরাং রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামমোহন সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎকালের বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সমূহের সম্পাদকগণও প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং সে কালের বাঙ্গালা গদ্যে "তৎসম" বা অবিকল সংস্কৃত শব্দ অনেক ব্যবহৃত হইত। তাহার পর বাঙ্গালা গদ্যে "তৎসম" শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, এবং "তদ্ভব" অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন চলিত বাঙ্গালা শব্দের এবং দেশী বা খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। এই খাতে চলিয়া আদর্শ বাঙ্গালা গদ্য ১৩১৯ সনে (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার নমুনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "কবি য়েট্‌স্" নামক প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি তুলিব—

"ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্ চাপা পড়েন না। তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় ইঁহার যেন" ইত্যাদি (প্রবাসী, ১৩১৯, কার্ত্তিক, ৪৪ পৃঃ)।

রামমোহন রায়ের গদ্যের তুলনায় এই গদ্যে "তৎসম" শব্দের সংখ্যা কম, এবং "তদ্ভব" এবং দেশী শব্দের সংখ্যা বেশী। কিন্তু ভাষার ইতিহাসের হিসাবে রামমোহন রায়ের গদ্যের ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত গদ্যের ভাষা একই স্তরবর্ত্তী। কথিত ভাষা আর একস্তর অগ্রসর হইয়াছে; সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়াপদ সঙ্কুচিত হইয়া কলিকাতার কথিত ভাষায়—

তাঁহার	হইয়াছে	তাঁর
কেহ	"	কেউ
বলিয়া	"	বলে
লইয়া	"	লয়ে
ছাড়াইয়া	"	ছাড়িয়ে
গিয়েছে	"	গেছে
দেখিলে	"	দেখ্‌লে
ইহার	"	এর

বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য জেলায় এই সঙ্কোচের ফলে সর্ব্বনামের এবং ক্রিয়ার রূপ কতকটা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। লিখিত গদ্যে সর্ব্বনামাদির এই যে সকল রূপ, তাহা প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যেও দেখা যায়। সুতরাং লিখিত বাঙ্গালার বয়স তিন শত বৎসরের কম হইবে না। ১৩২০ সনের কার্ত্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ আসে। তার পরই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষারও রূপান্তর লক্ষিত হয়। "একটি মন্ত্র" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্চে, অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন? সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে" (প্রবাসী, ১৩২০ চৈত্র, ৮৫৭ পৃঃ)।

এখানে চলিত লিখিত গদ্যের "হইতেছে"র স্থানে আছে "হচ্চে"; "পারিয়া"র স্থানে আছে "পেরে" ইত্যাদি। ১৩২১ সনের বৈশাখ হইতে "সবুজপত্রে"র প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই পত্রে চলিত গদ্যের ভাষা বর্জ্জন করিয়া কলিকাতার কথিত ভাষার সঙ্কুচিত সর্ব্বনামের রূপ, ক্রিয়ার রূপ, এবং অকারের স্থানে ওকার আদেশ লিখিত গদ্যে চালাইবার উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রকাশ হইতে থাকে। এই ভাষা-বিপ্লব যে কত কঠিন, তাহার দুইটমাত্র প্রমাণ দিব। কথিত ভাষায় অচল সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করা পাকা লেখকের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু "তৎসম" শব্দের এমনই মোহ যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত "প্রদোষ" শব্দের অর্থ বার ঘন্টা পিছাইয়া দিয়া শব্দটি ব্যবহার করিবেন, তথাপি তাহার পরিবর্ত্তে "তৎসম" বা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতে চাহেন না। অসঙ্কুচিত সর্ব্বনামের এবং ক্রিয়ার রূপের মোহও নিতান্ত কম নহে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে কর্পোরেশনের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং জয়ন্তী-উৎসব পরিষদের অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাক্-নোবেল-প্রাইজ গদ্যই ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ রচনা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তির পর হইতে নিয়ম হইয়াছে, জোড়াসাঁকোর কথিত ভাষা গদ্য সাহিত্যে চালাইতেই হইবে। জোড়াসাঁকোর ভাষা বিশেষ করিয়া বলার কারণ, কলিকাতার ভাষা বলিলে ঠিক এক রকম বাঙ্গালা বুঝায় না; কলিকাতায় অনেক রকম বাঙ্গালা কথাই চলিত আছে। যেমন ঢাকাপটীতে ঢাকাই কথা।

সময়ের নৈকট্য হিসাব করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তির সহিত তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা-বিপ্লবের একটা সম্বন্ধ অনুমান করা অসম্ভব নহে। তাঁহার মধ্যে যে ধর্ম্ম-বিপ্লব চলিতেছিল, তাহার বাহ্য পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় কয়েক বৎসর পরে, ১৩২৪ সালের 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত "আমার ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সকল মানুষেরই" আমার ধর্ম্ম বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি।......নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্ম্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

* * * * *

"তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে' আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করে" (সবুজ পত্র, ৪র্থ বর্ষ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা, ৩৬৮—৩৬৯ পৃঃ)।

এখানে একরূপ খোলসা করিয়াই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ালে স্থিত একটি বিশিষ্ট বস্তু। এই বিশিষ্ট ধর্ম্মটি চোখে পড়িয়া যাওয়াতেই তিনি আর নিজেকে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সামিল মনে করিতে পারেন নাই। সুতরাং ১৩২০ সালের পর হইতে কি ভাষার ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ যেন বিশ্বামিত্র ঋষির মত একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্বামিত্রের তপোবলের ন্যায় তাঁহার প্রতিভার বল এবং প্রতিপত্তি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও যেন বশিষ্ঠের

প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান যুগের বিশ্বামিত্রের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। বাঙ্গালার এই বশিষ্ঠ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের দুই মূর্ত্তি। তাঁহার এক মূর্ত্তি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর এক মূর্ত্তি শাশ্বত বাঙ্গালীর মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে রামমোহন রায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন, তান্ত্রিক বীরভাবকে এবং কুলাচারকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং শৈববিবাহ এবং শাস্ত্র-বিধিমত মদ্যপান এবং মৎস্য-মাংস আহার সমর্থন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতার রূপ রামমোহন রায়ের বিশ্বরূপ; বাঙ্গালীর স্মৃতি এবং বাঙ্গালীর তন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের সেই রূপ তাঁহার বিশেষ রূপ। এই দুই রূপই শাশ্বত রূপ। রাজা রামমোহন রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শতবার্ষিক শ্রাদ্ধে রবীন্দ্রনাথই অবশ্য পৌরোহিত্য করিবেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদী রামমোহন এবং তান্ত্রিক বাঙ্গালী রামমোহন এখনও মরেন নাই এবং বোধ হয় কখনও মরিবেন না। আমার আশঙ্কা হয়, এই শাশ্বত ব্রহ্মবাদী এবং শাশ্বত বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি নষ্ট করিয়া দিবে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (বি, এ)।

ব্যর্থ-প্রেম

নীরবে কেটে গেছে দীর্ঘ কত দিন
তোমারি আশাপথ চাহি' গো।
কত যে মধুযামি' একেলা পোহায়েছি
উষ্ণ আঁখি-জলে ভাসি' গো।
দারুণ কত ব্যথা সখা গো, সহিয়াছি
তোমারই স্মৃতি বুকে ধরিয়া!
মরমে যত দাগা দিয়েছ অকাতরে
সয়েছি বঁধু, তোমা লাগিয়া।
নিরাশি' অবলারে হে প্রিয়, পেয়েছ কি
প্রমোদ, ছিলে কি গো কুশলে?
প্রেমিকা-সহবাসে এ প্রেমহীনারে কি
ভাবিতে কোন দিন বিরলে?
যে দিন মধুমাসে মলয় চুরি করি'
আনিত ফুলবাস গোপনে,
চাঁদিনী যামিনীর মদন-উপহারে
সাজিত ফুলবালা কাননে,
সে দিন প্রিয়তম, মিলন-মদিরায়
কামিনী-ভুজপাশে শিহরি'
উঠিয়া, চকিতে কি স্মরণ কর নাই
অতীত স্বপনের কুহেলি?

বঁধু, এ অভাগীর সঙ্গ লভি' কি গো
কখনো কোন সাধ মেটেনি?
বুঝি হে সখা, তব যে ফুলে অভিলাষ,—
এ হৃদে সে কুসুম ফোটে নি!
তরুণ হৃদি মাঝে পুলক-শিহরণ
জাগে নি কখনও কি বল না!
তবে কি সবি বৃথা—বৃথা এ আয়োজন,
বৃথা এ অর্ঘ্যের রচনা!
আজি এ অধীনীর কেন এ সমাদর,
কেন এ মনগড়া ছলনা?
ছি! বঁধু, এত কেন মিনতি দুখিনীরে,
কেন হে আজি ক্ষমা-যাচনা?
চাহ, কি দিব আর, এ শুধু ছেঁড়া হার
কেমনে তব গলে পরাব?
কণ্ঠ ভেঙ্গে গেছে কাঁদিয়া দিবানিশি
কেমনে আর গান শুনা'ব?
শুকা'য়ে গেছে প্রিয়, প্রেমের সরোবর,
আশার শতদল ফোটে না;
ব্যর্থ বাসনার বৃথা এ উপায়ন,
বৃথা হে সখা, সুখ-কামনা।

শ্রীবাসন্তীকুমার ভট্টাচার্য্য (বি-এ)।

তবে এ কথা নিশ্চয়, ভগবান্ যাকে দণ্ড দিবার ইচ্ছা করেন, তার কামনা পূর্ণ হয়।

তা হ'লে বল, কল্পতরু নাম একটা ফাঁদ। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাবের সংসারে মানুষ কাতর হয়ে তাঁকে ডাক্‌বে, তিনি গোটাকতক টাকা তাকে দিয়ে চাবুক হাঁক্‌রাবেন!

তাঁর দণ্ডও যে দয়া, ভাই!

রক্ষা কর! ভিক্ষায় কায নেই, কুত্তা বোলায় লেও।

দেখ, গোকুল, তুমি শুধু আমার সতীর্থ নও, সুহৃদ্। আমার জীবনের সবই ত জান। সুন্দরী কুমারী দেখে মজ্‌লুম। ভগবানের কাছে মন খুলে মনের বাসনা জানালুম। তাকে পেলুমও। দেখে মজেছিলুম, এখন পেয়ে আরও মজ্‌লুম। এক দণ্ড না দেখ্‌লে সে কি ছট্‌ফটানি! তার পর না-বলা, না-কওয়া, এক দিন সে আমায় ফেলে পালালো। ডাক্তার বল্‌লেন, হার্টফেল। অত প্রেমপূর্ণ হৃদয়—সে হার্টফেল্ করলে! চোখের আড়াল হ'লে যে বুক ধুক্-পুক্ করত, সে বুক আর ধুক্-পুক্ করে না। চোখের ইঙ্গিতে যে ছুটে আস্‌ত, এত কান্নাকাটি ডাকাডাকিতে সে একটা সাড়াও দিলে না! এক জন সাধু বল্‌লেন, "গুরু ঘরকা চোট্টা তুমি দীক্ষা নাও।" নিয়ে কিছু দিন পরে বুঝ্‌লুম ঠকিনি। ভগবান্ দণ্ড দিলেন সত্য, দিয়ে আপনার ক'রে নিলেন। মানুষ অন্ধ। কিসে মঙ্গল হবে, জানে না! কেউ বল্‌ছে, মারো কচেবারো, মারো ছতিন-নয়। কি দান পড়লে শেষে জিত হবে, কেউ ত জানে না। এক জন তাই বল্‌ত—"পাশা, এক সুবিধে।" সে কখন হারে নি।

গোকুলচন্দ্র জমীদার। বলিলেন, কি জানো, আমরা বিষয়ী লোক, তোমার মতন গেরুয়া নিতে পারি নি। আমাদের চাইতেও হবে, পাবার জন্য চেষ্টাও করতে হবে। সংসারে কোন অভাব ছিল না। মনের মত স্ত্রী—যাকে বলে, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কেবল এক অভাব, ছেলে নেই, বিষয় ভোগ করে কে? অভয়ার যত বয়স হ'তে লাগ্‌ল, মনে ততই হাহাকার, একটি ছেলে আমায় উপহার দিতে পারলে না। তার নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার জন্য না হ'ক, অভয়ার প্রাণের এই দুঃখ মোচন করবার নিমিত্ত যে যা বলেছে, তাই করেছি। পুত্রেষ্টি যাগ-যজ্ঞ করলুম, গ্রহফাঁড়া কাটালুম, আরও কত কি, তা তোমায় কি বল্‌ব।

গোকুল, এত করলে যে ভগবান্ পেতে, ভাই! তারপর?

তার পর মথুরাপুরে জাগ্রত বলাইচাঁদ আছেন, সেখানে পায় হেঁটে গিয়ে মানত করতে হয়। আমাদের কুলগুরু দাদা-গোঁসাই গিয়ে মানত ক'রে চরণ-তুলসী এনে অভয়াকে খাইয়ে দিলেন। সন্তান হ'ল—যেন ছ'মাসের ছেলে! মোটা-সোটা, হৃষ্টপুষ্ট, মাথায় একমাথা চুল, যেন রাজ-পুত্তুর! দাদা-গোঁসাই বল্‌লেন, এ আর কেউ নয়, বলাই-চাঁদ আপনি এসেছেন। রূপ যেন ফেটে পড়ছে! এখন সেই ছেলেকে দেখ্‌লে তোমার চোক ফেটে জল আসবে। সে রং নেই, হাত-পা প্যাঁকাটি, চুল সব উঠে গিয়েছে, একটু কাঁদে না পর্য্যন্ত।

কি অসুখ?

ডাক্তাররা বল্‌লেন, marasmus—(ম্যারোস্মাস্) কি না ক্ষয়। কবিরাজ মহাশয়রা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়লেন, তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। প্রবীণরা বল্‌লেন, দৃষ্টি লেগেছে। রোজা ডেকে ঝাড়লে, জলপড়া দিলে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন গোকুলচন্দ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমা-দের দেশে একটা মেয়েলী কথা আছে—সন্তান না হওয়ায় এক জ্বালা, হওয়ায় শতেক জ্বালা।

তা ভাই, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। আচ্ছা, দৃষ্টিলাগা তোমার বিশ্বাস হয়?

নিশ্চয়! তুমি মান না না কি?

কিছু বুঝতে পারছি না, ভাই! শুনলুম, এক দিন একটা ভিখারী স্ত্রীলোক এসেছিল। সে এমন কট্‌মট্ ক'রে খোকার পানে চাইলে যে, অভয়া তাড়াতাড়ি ছেলে নিয়ে ছুটে পালালো। এ তুমি মানো?

খুব মানি, গোকুল!

কিন্তু সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ত আমাদের কোন শত্রুতা ছিল না।

শক্রতা কি বলছ গোকুল ? কদাচ কখন এমন দেখেছি, মায়ের স্নেহ-লোলুপ, প্রখর দৃষ্টি সন্তান সইতে পারে না। এমন কোমল ধাতও আছে। তবে ডাক্তার সাহেবরা এ প্রত্যক্ষ সত্যও মানবেন না। কিন্তু আমি দেখেছি। যাক্! এখন উঠলুম। ভগবান্কে ডাক, যতদূর বুঝছি! তিনিই এখন একমাত্র ভরসা।

ছেলের কল্যাণে রোজ তুলসী দেওয়া হচ্ছে, স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি।

মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা—

শান্তং পাপং! শান্তং পাপং! সন্ন্যাসী ঠাকুর—দূরমপসর, দূরমপসর! বলিতে বলিতে দাদা-গোঁসাই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গোঁসাই বলিলেন, ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়লুম, নইলে মজিয়েছিল আর কি ?

গোকুল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন, কি হয়েছে ?

হয়নি, হব-হব হয়েছিল। সেই ল্যাংটা জটে ভিকিরির পূজা! সর্ব্বনাশ! ওরা ঐ সব ফন্দি ক'রে পয়সা আদায় করে। মণ-দশেক গাঁটি গাওয়া ঘি লেয়াও, আউর বিশ মণ চাউল, আউর আট হাজার তে-ফেড়্কা পাতা। এমনি কত ফ্যারেকা!

সে কি, প্রভু! ও যে আমার বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে অনেক দিন পড়েছে—

এই মরেছে! সে ত আরও সর্ব্বনাশ! ওর কথা ধ্রুব বিশ্বাস করবেন, বড়বাবু! যাক্! ও কথা ছেড়ে দিন। এখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—

কি কি ? খোকা বাঁচ্বে ?

একটু সুরাহা হ'তে পারে। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি ? ছেলে বাঁচবে, তার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সর্ব্বস্ব দেওয়া নয়, এ স্বপ্নের ব্যাপার।

কি বলুন না ?

আজ ভোরে নিতাই-চাঁদ এসেছিলেন।

কোথা ?

আমার ওখানে।

আপনাদের বাড়ীতে ত নিতাই-চাঁদের বিগ্রহ রয়েছেন, তবে আর আসাআসি কি ?

সে বিগ্রহ আর এ সশরীরে।

সশরীরে! ধন্য আপনি।

গোকুলচন্দ্র যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন।

সবটা শুনুন আগে।

বলুন, দাদাগোঁসাই, আমার গায় কাঁটা দিচ্ছে!

দেবেই ত, বড়বাবু, দেবেই ত! ভীষণ গৌরাঙ্গ-বংশে জন্ম! স্বপ্নে আপনার বিশ্বাস হয় ?

হয় বৈ কি!

আমার ত হয় না! তবে এ না কি দেবস্বপ্ন—

ঠিক! দেবস্বপ্ন কখন মিথ্যা হয় না।

নিতাই-চাঁদ এলেন, ঘরখানা তাঁর রূপের ছটায় দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। ভাবলুম, ঘরে আগুন লাগল বুঝি। ছুটে পালাব মনে করছি, চাঁদ ধরলেন চেপে! ছাড়, ছাড়, ব্রহ্মহত্যা ক'র না। কাণে যেন বাঁশী বাজ্ল।

কি, চেপে ধরতে ?

ব্যস্ত হবেন না। আগাগোড়া শুনুন! প্রভু ডাক্লেন, দাদা-গোঁসাই!

আপনাকে দাদা-গোঁসাই বল্লেন ?

বল্বেন না ? আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে—আপনার গুরু প্রভুকে যে নিতাই বাবা ব'লে কত আবদার করতেন!

হাঁ হাঁ, শুনেছিলুম বটে, শ্রীগুরুদেবকে তিনি পিতৃসম্বোধন করতেন, তাঁর হাতে চিঁড়ের পায়েস খেতেন।

খাবেন না! তিনি মহাপুরুষ ছিলেন! সেই মহাপুরুষের রক্ত আমার গায়। আমার কি হ'ল, বড়বাবু!

প্রভু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। গোকুলচন্দ্র কাহারও কান্না সহিতে পারিতেন না। অনেক প্রজা, অর্থি-প্রার্থী তাঁর এই নারীসুলভ সুকোমল স্বভাবে ঘা দিয়া আপনাদের সুবিধা করিয়া লইত।

প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, কাঁদ্ব না ? কেন কাঁদ্ব না ? অবশ্য কাঁদ্ব! আমার প্রাণঢালা পূজা কি তাঁর মনে ধরে না ? নিতাই রে! আহা-হা!

স্থির হন, দাদা-গোঁসাই! প্রভু কাল স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, এক দিন সশরীরে দেখা দেবেন, স্বপ্নে কি বল্লেন, বলুন ?

কি স্বপ্ন ? কিসের স্বপ্ন ? কার স্বপ্ন ? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। গোকুলচন্দ্র আর কোন প্রশ্ন না করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু দেখলেন, বিপদ্! বার কয়েক নিতাই-নিতাই করিয়া বলিলেন, হাঁ, কি বল্‌ছিলেন, বড়বাবু? বড় অধীর হয়ে পড়েছিলুম! হাঁ, স্বপ্ন আর সশরীর। দুটতে কিছুই প্রভেদ নাই। আমাদের মনের ফের।

তা ত বটেই! কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? প্রভু কি বল্‌লেন?

প্রভু বল্‌লেন, অত মাথা খোঁড়ার ধূম কেন? রোজ হাজার আশীবার মাথা খোঁড়ো কি জন্যে?

বল্‌লুম, প্রভু অন্তর্যামী, আপনি ত সবই জানেন।

জানি। কিন্তু উপায় কি?

কি উপায় করতে হবে, বলুন? প্রাণ দিয়ে করব।

তা জানি। কিন্তু তুই প্রাণ দিলে কি আমার প্রাণরক্ষা হবে? যখন বলাইরূপে পৃথিবীতে আসি, মা রোহিণী কৃষ্ণা গাভী না হ'লে আমায় তাঁর দুধ কি মাখম-ছানা খেতে দিতেন না। তার পর বিশ্বরূপ হয়ে জনার্দ্দন পণ্ডিতের বাসায় জন্ম নিলুম। কানাইকে আন্‌বার জন্য তপস্যা করতে গেলুম। কৃষ্ণ এল গৌর-বেশে। আমিও নিতাই নাম নিয়ে তাঁর সঙ্গ নিলুম। বলাই সেজে কৃষ্ণের সঙ্গে হা-রে-রে-রে করতুম, এঁর সঙ্গে নিতাই সেজে হরি হরি, কখনও গৌর-হরি করি। সে লীলা সাঙ্গ হ'ল। তার পর ফের আবার বন্ধন গলায় দিলি। বলাইচাঁদের চরণ-তুলসীর সঙ্গে আমার সত্তাকে আকর্ষণ ক'রে আমাকে আঁস্তাকুড়ে এনে ফেল্‌লি!

আমি ভয়ে-ভয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, আঁস্তাকুড়ে!

প্রভু বল্‌লেন, ঐ হ'ল! একে গর্ভ-যন্ত্রণা, তার উপর শাক্তনারীর জঠরে! না সইতে পারি তার দৃষ্টি, না খেতে পারি তার স্তন-দুগ্ধ। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাও না? চোখ নেই?

প্রভু, এ কথা আগে বলেন নি কেন?

প্রভু একটু হেসে রহস্য ক'রে বললেন, বলব কি! তোর নাক ডাকার জ্বালায় কি ঘেঁষতে পারি!

আমি বলমুম, নিতাই ভাই, আর যাতে নাক না ডাকে, তার উপায় করব!

কি করবি?

নাকটা বনাব।

বনাবি কি? ছেদন? না, অতটা করতে হবে না।

এখানে একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। অভয়ার পিতৃকুলের গুরু কি এক তর্কালঙ্কার—নামটা মনে নাই—অভয়া যখন দশমবর্ষীয়া বালিকা, তাহার পিতার আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা দেন। ইনি প্রকৃতই ষট্‌সম্পত্তি-সম্পন্ন ত্যাগী সাধু ছিলেন। শিষ্যের কল্যাণ ভিন্ন আর কিছুই চাহিতেন না। তাঁর উপর দাদা-গোঁসাই প্রভুর দারুণ ঈর্ষা। তর্কালঙ্কার কিছু চান না বটে, কিন্তু যা পান, তা প্রভুর অপেক্ষা অনেক বেশী। বড়লোক হ'লে কি হয়! পূজা-দক্ষিণা সম্বন্ধে খাতায় লেখা বাঁধা বন্দোবস্ত। লক্ষ্মী-পূজায় দু'গণ্ডা পয়সা, বাৎসরিক শ্রাদ্ধে অষ্টগণ্ডা আর দেদার অষ্টরম্ভা! কিন্তু তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে বাঁধা ব্যবস্থা নেই। অভয়ার ইচ্ছামত দান—দরাজ হাত! এইবার প্রতিযোগীকে উচ্ছেদ করিবার পরম সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু একা হইবে না। এক জন পেটোয়া লোক আবশ্যক। গোকুল-চন্দ্রের এক আমলা, অতি দরিদ্র, তর্কালঙ্কারের প্রাপ্যের আধাআধি বখরা চায়। শেষ দশ আনা ছয় আনায় রফা।

আমলা ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, হুজুর!

হুজুর বলিলেন, দাওয়ানজীর কাছে যাও। আমি এখন ব্যস্ত আছি।

হুজুর, আপনাকেই একটা কথা বলতে এসেছি। খোকাবাবুর জন্যে কাল আমাদের বাড়ীতে হরিল্লোট দেওয়া হয়েছিল। তাই চারখানি বাতাসা এনেছি। আর—

গোকুলচন্দ্র বাতাসা চারিখানি লইয়া মস্তকে ঠেকাইয়া অন্দরে পাঠাইয়া দিলেন। প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি খোকার জন্য হরিল্লোট দাও না কি?

হুজুর, রোজ পারি না, বড় গরীব—

ছেঁড়া কাপড় পর কেন? ওতে যে লক্ষ্মী ছাড়ে।

কোথায় পাব, হুজুর?

যাও, দাওয়ানজীকে বল গে, দু'জোড়া কাপড়, দু'জোড়া চাদর খোদের নামে খরচ লিখে তোমাকে আনিয়ে দিন।

দাদাগোঁসাই চোখে চোখে ইঙ্গিত করিলেন, তার একজোড়া আমার।

গোকুল জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ, আর কি বলছিলে?

আমলা এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া মস্তক অবনত করিল।

গোকুল বলিলেন, কি বল না?

হুজুর অভয় দেন ত বলি।

বল না।

হুজুর, আজ ভোরে স্বপ্ন দেখলুম, একটি শ্যামা—

শান্তং পাপং! শান্তং পাপং! আমলা মশাই, দূরমপসর, দূরমপসর!

আমলা থামিয়া গেল। গোকুল বলিলেন, কথাটা শুনুনই না, প্রভু!

প্রভু বলিলেন, বল—কিন্তু মুখসাম্‌লে।

আমলা বলিল, একটি স্ত্রীলোক—ঘাসের মত রং—মঞ্জরীর মত কপালের ওপর চুলগুলি—

প্রভু বলিলেন, আরে, এ যে আমাদের মহারাণী—তুলসীমঞ্জরী! তার পর, তার পর?

আমলা বলিল, মা বললেন, হরিল্লোট দিয়ে মাথা খুঁড়লেই কি ছেলে ভাল হবে? আমড়া-আমে কি জোড়-কলম বাঁধে, না, তাতে ফল ভাল হয়? বলেই মা অন্তর্ধান করলেন।

গোকুল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ আবার কি হ'ল? এ কথার মানে কি? আপনি কিছু বুঝলেন, প্রভু?

প্রভু বলিলেন, গোপন কথা। আমলাকে যেতে হুকুম দিন।

আমলা চলিয়া গেল। প্রভু বলিলেন, মানে আমিও যে ঠিক বুঝেছি, তা বলতে পারি নি। তবে, আপনার বিবাহের সময় আমার পরলোকগত পিতাঠাকুর আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে অনেক ক'রে নিষেধ করেছিলেন, "এ কায করবেন না, কর্ত্তা! মেয়েটি খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু শাক্ত বংশের। দশমবর্ষে কন্যার দীক্ষাও হয়ে গেছে, শুনেছি। আপনারা পরম বৈষ্ণব, ওঁরা ঘোর শাক্ত। আমে আর আমড়ায় জোড়-কলম বাঁধে না, কর্ত্তা!" স্বর্গীয় কর্ত্তার তখন যে কি জেদ হ'ল!

প্রভু একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—যেন আহত ভুজঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিলেন, বড়বাবু, এ কি কম দুঃখের কথা! আপনার অর্দ্ধাঙ্গ, তাঁর হাতের দান আমি গ্রহণ করতে পারি নি।

কেন, তাতে দোষ কি?

আরে, আমরা যেমন ভোজন-পাত্রের উপর একটি তুলসীপত্র দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নি, ওঁরা তেমনি কারণ ছিটিয়ে দেন।

গোকুল বলিলেন, সব ত বুঝ্‌লুম। এখন আর উপায় কি? ছেলে বাঁচ্‌বার সম্বন্ধে যেটুকু আশা ছিল, তা আজ নির্ম্মূল হ'ল।

গোকুলের চোখ দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন, অধীর হবেন না, বড়বাবু! এমন রোগ নাই, যার ঔষধ নেই।

কালে ধরেছে—এর আর ঔষধ কি?

স্বর্গীয় পিতাঠাকুর এমনি এক সঙ্কটে প'ড়ে পুনর্দীক্ষা দিয়েছিলেন। আর এক ঘরে দুই গুরুও ভাল নয়, মহা অকল্যাণ হয়। তর্কালঙ্কারকে ডাকিয়ে এর একটা যুক্তি স্থির করুন না। তাঁকে ত মানেন?

খুব মানি। কিন্তু তিনি ত এ দেশে নেই।

প্রভু ভাবিলেন, বেটা না থাক্‌তে থাক্‌তে কায হাঁসিল করতে হবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা গেছেন?

তিনি মধ্যে মধ্যে তপস্যায় গমন করেন। আত্মীয়-স্বজন পরিবারও জানে না, কোথায় থাকেন। কোন খবর দেন না, নেন না। আর থাক্‌লেই বা কি হ'ত? পাছে স্ত্রীর কথায় ভুলে আমি শাক্ত হই, বাবা তাই মৃত্যুশয্যায় আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, বৈষ্ণব মন্ত্র ত্যাগ করব না। তার ওপর আর এক কথা। আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। উইল ক'রে গেছেন, স্বধর্ম্মত্যাগী হ'লে তাঁর বিষয় ছোটতরফ্‌ পাবে! কিন্তু এতই বা ভাবি কেন? অভয়াকে বৈষ্ণবমন্ত্র দিলেই ত হবে?

প্রভু বলিলেন, তিনি কি রাজি হবেন?

নিশ্চয়। আগে কথাটা আমার মনেই ওঠে নি। আমার কথা সে আদেশ মনে করেই শিরোধার্য্য করবে। তার উপর ছেলের এই সঙ্কট অবস্থা। আপনি কবে তাকে দীক্ষা দেবেন, দিনস্থির করুন। যত শীঘ্র হয়। ইতিমধ্যে আমি মহামৃত্যুঞ্জয়—

ঐটি করবেন না, বড় বাবু, আমার মাথার দিব্য! নিতাই-দা তা হ'লে আরও চ'টে যাবেন। একে ত এই বিভ্রাট! তিনি, দৃষ্টি লেগে, না-খেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন! তার ওপর ঐ নেংটার পূজা—

সে কি, প্রভু? নিতাই নিজে ত অবধূত ছিলেন।

সে যখন ছিলেন, তখন ছিলেন। এখন ত তিনি বড় তরফের বংশধর!

আচ্ছা, পূজা না হয় না-ই হবে। দীক্ষার দিন আপনি শীঘ্র স্থির করুন।

দাদা-গোঁসাইকে তথাপি চিন্তান্বিত দেখিয়া গোকুল বলিলেন, আপনি কেন ভাব্‌ছেন? অভয়া আমার ধর্ম্মমত গ্রহণ করতে আনন্দিত হবে। তার উপর খোকার জীবন-সঙ্কট!

প্রভু বলিলেন, তবু—যাক্, বহু পরিশ্রম! ওঁর মনের শাক্ত সংস্কার দূর করতে বিস্তর পুরশ্চরণ করতে হবে।

গোকুল জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি!

প্রভু বলিলেন, বুঝছেন না, বড়বাবু? ওঁর মা বলা অভ্যাস, নিতাইদাকে কোন্ দিন ব'লে ফেলবেন, মা নিতাই। কি কেলেঙ্কারিটা হবে, বলুন দিকি! এ কি মা গোঁসাই?

বড়বাবু বলিলেন, ওঃ, তা বটে! তা বেশ ত! পুরশ্চরণের যা খরচ, দাওয়ানজীর কাছ থেকে নিয়ে যান।

প্রভু কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কহিলেন, শান্তং পাপং শান্তং পাপং! খোকার জন্য খরচ আমি দাওয়ানজীর কাছ থেকে নেব! একে শিষ্যবংশ বড় তরফের কুলপ্রদীপ, স্তন-দুগ্ধের অভাবে তৈলহীন পিদ্দিমের মত নিব-নিব! খরচ! নিতাই-দাকে মুখ দেখাব কেমন ক'রে! আমি দৈত্য-দানব, পিশাচ-প্রেত না ব্রহ্মদৈত্য?

বলিয়া প্রভু অভিমানভরে পশ্চাৎ ফিরিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। তাঁহার বিকৃত বদনে একটা গর্ব্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল—এইবার—তর্কালঙ্কার!

গোকুলচন্দ্র অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অভয়া পুত্র কোলে করিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। গোকুল শিহরিয়া উঠিলেন। এই স্নেহ-দৃষ্টিই সর্ব্বনাশ করবে! উঃ, অবস্থাবিশেষে অমৃতও বিষ হয়!

গোকুল মৃদুস্বরে ডাকিলেন—অভয়া!

অভয়া চমকিয়া উঠিল।

গোকুল বলিলেন, ভয় নেই, আমি। চম্‌কে উঠ্‌লে কেন? কি ভাবছিলে?

হ্যাঁ গা! খোকার সে রং, সে মুখ, সে চুল কোথায় গেল! ভাল হবে ত?

সে তোমারই হাতে। তুমি অত ক'রে ওর মুখের পানে চেয়ে থেক না। অত মুখ-চাওয়া ছেলে ফাঁকি দিয়ে পালায়।

তুমি আমায় অন্ধ ক'রে দাও। বাছা আমার বেঁচে থাক।

আমি ত ত্রুটি করছিনি, অভয়া! কিন্তু ডাক্তার-বদ্যি সব হার মেনেছে। আমার বংশধর, পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ডের ভরসা!

তবে কি খোকা ভাল হবে না?

বল্‌ছি ত সে তোমারই হাতে। শোন অভয়া! তুমি অতি ভাগ্যবতী!

ভাগ্যবতী হ'লে আমার এই খোকার!

শোন! তোমার এ ছেলে কে জানো?

আমার ছেলে, আর কি জান্‌বো?

এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। বলাইচাঁদের ওষুধ খেয়ে জন্মেছে—এ স্বয়ং তিনি। জান ত ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে নিতাইচাঁদের বিগ্রহ আছে। জাগ্রত ঠাকুর। দাদা-গোঁসাইকে স্বপ্ন দিয়েছেন, তিনিই এসেছেন।

অভয়া বিস্ফারিত-চক্ষে, উৎকর্ণে শুনিতে লাগিল। অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, নিতাই-চাঁদ! তবে কি এ ছেলে আমি ধ'রে রাখ্‌তে পারব?

তুমিই পারবে, অভয়া!

কেমন ক'রে, বল, বল!

বল্‌ছি। শুধু দাদা-গোঁসাই নয়, আমাদের দিনু আম্‌লাও স্বপ্ন দেখেছে। ওরা সব তোমার ছেলের জন্য হরিল্লোট দেয় কি না!

দিনু কি স্বপ্ন দেখেছে?

দেখেছে, একটি শ্যামা স্ত্রীলোক এসে বলছেন, আমে-আমড়ায় জোড়-কলম বাঁধে না। তার ফল ভাল হয় না।

সে কি?

কি জান, অভয়া! তুমি শাক্ত, আমি বৈষ্ণব, এ বিবাহের ফল ভাল হবে না।

তবে কি হবে?

আমি দাদা-গোঁসাইকে দিন দেখতে বলেছি, তোমাকে দীক্ষা দেবেন।

অভয়ার মুখের দীপ্তি যেন সহসা নিবিয়া গেল। অতি কাতরস্বরে বলিল, গুরুত্যাগ করতে হবে?

অভয়া এই দাদা-গোঁসাইটির চরিত্র ভালরূপেই অবগত

ছিল। তাহারই এক পরিচারিকা সদরমণি এঁর শিষ্যা এবং উপভোগ্যা।

গোকুল বলিল, উপায় ত নেই, অভয়া! যেমন ক'রে হ'ক, খোকার জীবন ত রক্ষা করতে হবে। তুমি ইতস্ততঃ করছ, কিন্তু আমি শাক্ত দীক্ষা নিতুম। বাধা এই, মৃত্যুশয্যায় বাবার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছি, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করব না। উইল ক'রে গেছেন, যদি করি, বিষয় ছোট-তরফ পাবে। তুমি এ সঙ্কটে আমায় রক্ষা করতে পারবে না, অভয়া?

অভয়ার কণ্ঠ দিয়া একটিমাত্র যন্ত্রণার স্বর নিঃসৃত হইল—মা!

গোকুলচন্দ্রও কাতর হইয়া বলিলেন, অভয়া, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী। আমার যে ধর্ম্ম, তোমার সেই ধর্ম্ম

কিন্তু তুমি জেনেই ত আমায় গ্রহণ করেছ।

বাবার জেদে। শেষ-জীবনে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, নইলে অমন উইল করতেন না। যাই হ'ক, অভয়া, বড় আশা ক'রে তোমায় বলছি, আমায় নিরাশ ক'র না।

অভয়া নিরুত্তর।

চুপ ক'রে রইলে কেন? আমার কথা রাখবে না? আমি দাদা-গোসাইকে কথা দিয়েছি। তিনি কি মনে করবেন?

অভয়া অন্যমনস্কে জিজ্ঞাসা করিল, কি মনে করবেন?

মনে করবেন, স্ত্রী আমার অবাধ্য। আর সত্যিই ত! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার যে ধর্ম্ম, তোমার সেই ধর্ম্ম। কি! এখনও চুপ ক'রে আছ? কথা কচ্ছ না কেন?

কি কথা?

কি আশ্চর্য্য! তোমাকে যে এত ক'রে বল্‌তে হবে, এ কখনও ভাবি নি।

সহসা অভয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো, আমায় মাপ কর! আমি গুরুত্যাগ করতে পারব না।

আমার মুখ চেয়ে, খোকার মুখ চেয়েও নয়?

অভয়া নীরব। কেবল গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বুঝ্‌লুম, তুমি মা নও—ডাইনী, স্ত্রী নও—পিশাচী, মানুষী নও—রাক্ষসী। তোমার ভালবাসা—ভাণ, তোমার প্রাণ—পাষাণ! কিন্তু আমি নির্দ্দয় নই। ছেলের জন্য আমি শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নেব। বিষয় যাক্, বাবার কাছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হ'ক, আমার বংশধরকে আমি যেমন ক'রে পারি রক্ষা করব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। গুরুই তোমার বড় হ'ল—স্বামী নয়! ছেলেও নয়?

গোকুলচন্দ্র দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মন কেবলই বলিতেছে, মা, এ কি সঙ্কটে আমায় ফেল্‌লে! এক দিকে স্বামী, এক দিকে গুরু, তার উপর সন্তানের জীবন! মা, রক্ষা কর, রক্ষা কর! স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রে গেলেন! যার জন্য সন্তানের আদর। তাঁর অনাদর আমি কেমন ক'রে সইব? আমার চব্বিশ বৎসরমাত্র বয়স, এরই মধ্যে সংসার শূন্য হয়ে গেল! মধ্যদিনে সূর্য্য অস্ত গেলেন! দ্বাদশ বৎসর আমার বিবাহ হয়েছে, এক দিনের জন্য আমাকে একটা রূঢ় কথা বলেন নি। সে ভালবাসা, সে আদর, সে সোহাগ মুহূর্ত্তে ফুরাল! ওঃ, এই সংসার! ফুল-শয্যার রাত্রিতে বলেছিলেম, তোমায় দেখে—তোমার কথা শুনে তৃপ্তি হয় না! সেই আমি আজ ডাইনী, পিশাচী, রাক্ষসী! বুঝ্‌লুম, যত দিন আমি মন যুগিয়ে চল্‌বো, তত দিন আমি ভাল—ভালবাসা। আমায় ত্যাগ ক'রে গেলেন! সত্যিই ত ত্যাগ ক'রে গেলেন। সাদাসিধে, সরল, মিছে কথা কন্ না। খোকা—চাঁদ আমার, মাণিক আমার, আমার বারো বছরের তপস্যার ফল, আমার সাধনার সিদ্ধি, আরাধনার আশীর্ব্বাদ, কামনার ধন, আমার সাগর-ছেঁচা রতন, তুই এসে আমায় স্বামিপরিত্যক্তা, সর্ব্বস্বান্ত কর্‌লি! শ্যামা, আমি তোমার দাসী! শিবে, আমায় যে দণ্ড দেবে, মাথা পেতে নেব! আমার স্বামী পুত্র সুখে থাক্!

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং! এ কি শুন্‌ছি, বড়বাবু? বড় গিন্নী, আমার কাছে দীক্ষা নেবেন না।

আপনি কার কাছে শুন্‌লেন?

প্রভু একটু ফাঁপরে পড়িলেন। পরিচারিকা সদর-মণি—যে তাঁহার অন্তরঙ্গ চর, স্বামি-স্ত্রীর মনান্তরের সময় দ্বারের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল, সে কথা প্রকাশ করা মুস্কিল। বলিলেন, এ কথা কি ছাপা থাকে! নিতাই-দা আভাস দিলেন।

আমি শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নেব।

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং! পিতৃবাক্য, তার ওপর এতটা বিষয়—

তার উপায় কি! ছেলের প্রাণ ত রক্ষা করতে হবে। পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড ত আর লোপ করতে পারি নি।

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং! তাঁরা শাক্তের হাতের পিণ্ড গ্রহণ করবেন কি? তাঁরা ত সব প্রচণ্ড বৈষ্ণব ছিলেন।

কি রকম?

বুঝ্‌ছেন না, বড় বাবু? ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান হ'লে কি স্বধর্ম্মত্যাগীর সঙ্গে পংক্তি-ভোজন চলে? এখন অস্পৃশ্যতা নিবারণের চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু—

কিন্তু কি? স্বর্গে যাবার অধিকার সকল জাতেরই আছে।

দাদা-গোঁসাই বুঝিলেন, অস্পৃশ্যতার কথা তোলা ভাল হয় নাই। বলিলেন, আমরা মানুষ, কি বুঝি!

নিতাই-দাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

ঠিক ত! উত্তম কথা!

প্রভু পরদিনই বলিলেন, ও ছেলে যদিও বাঁচে, পিণ্ড দিলেও ত পিতৃপুরুষরা গ্রহণ করবেন না। ওর অর্দ্ধেক শাক্ত।

ওকে বৈষ্ণবদীক্ষা দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলেই হবে।

কিন্তু বড়গিন্নী কি রাজি হবেন?

তাঁর রাজি অরাজিতে কি এসে যায়? আর তাঁর মতামত চায়ই বা কে? তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আমি মুছে দিয়েছি।

কিন্তু এ ত জলের দাগ নয় যে, সহজে মুছা যায়! মুখের কথা অনায়াসে বলা যায়, মন থেকে ত্যাগ বড় কঠিন।

বড়বাবু অন্তঃপুর ছাড়িলেন। দাসী সদরমণি খোকাকে বাহিরে লইয়া আসে। কিন্তু আহারের সময় বড়বাবুর মন অজ্ঞাতে যেন কার প্রতীক্ষা করে। একটু পদশব্দ, একটি সুমিষ্ট স্বরের জন্য কর্ণ যেন উৎকর্ণ হইয়া থাকে। ব্যঞ্জন সবই অলবণ—বিস্বাদ! পাচক তিরস্কৃত হয়। বেচারা কিছুই ঠিক করিতে পারে না। গৃহিণী বলেন, ঠাকুর সব তরকারি নুণে পুড়িয়েছে। বাবু বলেন, সব নুণ বেটা একলাই খেয়েছে! বধূ বলেন, আধ-সিদ্ধ ভাত খাইয়ে বাবুর অসুখ ধরিয়ে দেবে। বাবু বলেন, ভাতগুল গলিয়ে বেটা জীয়ন্তে আমার পিণ্ডির ব্যবস্থা করেছে! পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মাঝে উভয়েই উপবাসী। দুই জনকেই যেন অকাল-বার্দ্ধক্য আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছে, সংসারের সব ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে, বোঝা-পড়া, দেখা-শুনার আর কিছু বাকী নাই; এখন বসিয়া বসিয়া কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা, তাও যে কত দিনে আসিবে, কে বলিতে পারে? এ অনিচ্ছার জীবনভার আর কত দিন বহিতে হইবে! সংসারের একচক্র রথ আর কত দিন তিনি একা টানিবেন?

দূরে একটা বিবাহের বাদ্য উঠিল। দূর-আকাশে আলোকের দীপ্তি প্রতিফলিত। অভাগা! জানে না, আজ আলো, কাল অন্ধকার! আমারও জীবনে এমনই এক দিন গিয়েছে! সবই মিথ্যা, ভালবাসা কথার কথা—কেবল ব্যথা!

গোকুল বাতায়নপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি রমণীয়া রাত্রি! অবনী-অম্বর চন্দ্রকরভরা! কোন্ আনন্দ-লোক হইতে আসিতে আসিতে নিশা যেন দিশা হারাইয়া এক রাত্রির জন্য পৃথিবীতে অতিথি হইয়াছে! সমগ্র স্বভাব যেন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ-গন্ধে তাহার তুষ্টিসাধন করিতেছে। সব পূর্ণ—পরিপূর্ণ, কেবল আমার হৃদয় শূন্য—মহাশূন্য! এ শূন্য আমি পূর্ণ করিব কি দিয়া?

গোকুলচন্দ্রের মনে হইল, কে যেন তাঁহার অতি সন্নিকটে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হায় হায় করিতেছে! গোকুল চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। বুঝিলেন না, এ অস্ফুট হাহাকার তাঁহার অন্তরের! গোকুল অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না; কিন্তু অনবধানে তাঁহার পদযুগল তদভিমুখেই টানিয়া লইয়া যায়। এমনই অবস্থায় এক দিন অন্দরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া গোকুল চমকিয়া উঠিলেন, কে এ স্ত্রীলোক! কেশ বিন্যাসবিহীন—আলুথালু, শীর্ণ, পাণ্ডুর গণ্ড! দেখিতে অভয়ার মত, কিন্তু ঠিক সে নয়! তার সে বর্ণ কোথা? সে নয়—গোলাপকলি কি অপরাজিতায় পরিণত হয়?

অভয়ার এখন নিরন্তর ধ্যান—স্বামী। যে সন্তানের চিন্তা অনুক্ষণ তাহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল, জননীর মনের উপর এখন আর তাহার সে একাধিপত্য নাই।

স্বামী—স্বামী—স্বামী! দুই জনেরই বিরহ-বিধুর হৃদয় মিলনের জন্য নিয়ত ব্যগ্র, উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে ব্যবধান—নিদারুণ অভিমান।

এক দিন প্রভু আসিয়া বলিলেন, বড়বাবু, কাযটা ভাল হয় নি। স্ত্রী-বিয়োগ!

বড়বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, অভয়া ত বেঁচে আছে, দাদা-গোঁসাই! বিয়োগ কি? মরে নি ত!

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং! ঐ হ'ল! যোগ আর বিয়োগ ত? ও কথা যাক্। নিতাই-দা ত ভেবেই আকুল।

কেন?

পিতৃপুরুষ এক গণ্ডুষ জল পাবেন না?

তার উপায় ত করেছি। আমি শাক্তদীক্ষা নেব।

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং! নিতাই-দা বলেন, তা কি হয়? গোকুল কেন আর একটা বিবাহ করুক না। বৈষ্ণবী কন্যাকে।

বড় বাবু ব্যথিত হইয়া বলিলেন, বিবাহ! তা কি হয়?

কেন হবে না? নইলে আপনি কাটাবেন কেমন ক'রে? চিরজীবন সন্ন্যাসীর মত সংসারে বাস করবেন? ভবিষ্য-জীবনটা একবার ভেবে দেখুন দিকি!

বড় বাবু দেখিলেন, সত্য! বিস্তীর্ণ মরুভূমি! কিন্তু অভয়াকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে তার স্থলে নূতন বৃক্ষ রোপণ! কিন্তু উপায় কি? অভয়ার বড় তেজ, অতিশয় দর্প! দাদা-গোঁসাই, আমি প্রস্তুত। কিন্তু সে যদি বন্ধ্যা হয়?

শান্তং পাপং—শান্তং পাপং। আমার জানত বৈষ্ণব-বংশের মেয়ে আছে, তারা তের বোন্, একেক বোনের আটটা দশটা ক'রে ছেলে।

বেশ, আপনি ঠিক করুন।

বেশ! আপনি কন্যাদর্শন করুন।

কিছু আবশ্যক নাই—এ ত আর বিবাহ নয়। বিবাহ করেছিলুম অভয়াকে। ফের বিবাহ—কাণা হ'ক, খোঁড়া হ'ক, পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা—বৈষ্ণবী হলেই হ'ল।

ভীষণ বৈষ্ণব—তিলক-সেবা না ক'রে—জল খায় না। কুলতিলক প্রসব করবে।

কথা কাণে হাঁটে। অভয়া যখন শুনিল, একবারমাত্র অতি কাতর স্বরে ডাকিল,—গুরুদেব!

ইতিমধ্যে সদরমণি বলিল, গোঁসাই-প্রভু বল্‌ছেন, বড় বাবু আপনার আশীর্ব্বাদী হারছড়া চাইছেন।

অভয়া বলিল, সে হার আমি বড় বাবুর হাতে দেব।

অভয়ার অন্তর এখন দিবারাত্রি ডাকিতেছে—গুরুদেব, গুরুদেব!

দুই এক দিনের মধ্যে তর্কালঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাতর আহ্বান কখন ব্যর্থ হয় না।

প্রশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, দেখিলে মাথা আপনি নত হয়। তর্কালঙ্কার স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন, এ কি, মা, তোমাকে এমন মলিন, শীর্ণ দেখছি কেন?

বাবা!—অভয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুপাতে তর্কালঙ্কারের চরণ ধৌত করিতে লাগিল।

পরে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তর্কালঙ্কার বলিলেন, ভাল কর নি, মা! রামচন্দ্রের আদেশে সীতা অগ্নিপ্রবেশ করেছিলেন। তুমি সহধর্ম্মিণী, স্বামীর আজ্ঞাপালন তোমার কর্ত্তব্য।

দাদা-গোঁসাই দীক্ষা দেবে? বাবা, আপনাকে ত্যাগ করব কেমন ক'রে?

ত্যাগ করবে কেন, মা! তুমি ত্যাগ করলেও আমি ত্যাগ করব না। আমি তোমাকে বৈষ্ণব-দীক্ষা দেব।

আপনি বৈষ্ণব-দীক্ষা দেবেন?

তর্কালঙ্কার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গোকুলচন্দ্র।

কেন দেব না, বাবা! যেখানে শিষ্যের কল্যাণ, সেখানে সবই করা কর্ত্তব্য। আরও বুঝে দেখ, সবই ত এক। তোমরা বিষ্ণুভক্ত, এঁরা শাক্ত। শ্যাম আর শ্যামা ত প্রভেদ নয়। তার পর নিত্যানন্দ যদি ভগবানের অংশ হ'ন, তিনি তোমার বংশনাশ করবেন? দয়ার সাগর নিতাই—যিনি পাষণ্ড জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, আচণ্ডালে প্রেম বিলিয়েছিলেন, উদ্ধারণ দত্তের হাতে খেয়েছিলেন, তিনি এই সাধ্বীর স্তনদুগ্ধ পান করতে পারছেন না! এ গোঁড়ার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম উদার বস্তু। তোমার ইষ্ট, আমার ইষ্ট বস্তুতঃ আলাদা নয়। ঘোর অন্ধকারে না চিন্‌তে পেরে পরস্পরে কলহ-বিবাদ করছি। শ্রীরাধিকা পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন, আয়ান ঘোষ শাক্ত। শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ ক'রে দেখালেন, দুই এক। গোকুল,

বিবাহ করবার ইচ্ছা হয়, কর। কিন্তু পুত্রের জন্য বিবাহ আবশ্যক নেই। তোমার এই পুত্রই রক্ষা পাবে।

এই সময় অভয়া খোকাকেও আনিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিল। তর্কালঙ্কার মাথায় গায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, এর ক্ষয় নয়, কালাজ্বর। নূতন ঔষধ উঠেছে। আরাম হবে।

অভয়া বলিল, বাবা, আমি বেশী ভরসা করি আপনার আশীর্ব্বাদের।

তর্কালঙ্কার বলিলেন, সে ত বেশ, মা! কিন্তু রোগে ঔষধ-প্রয়োগ-বিধি শিববাক্য। যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, ঔষধও সৃষ্টি করেছেন তিনি। গোকুল, মনে ক'র না, শিষ্যার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে যা তা বোঝাচ্ছি। অভয়া সহ্য করতে পারবে, তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ কর।

আপনার আদেশ শিরোধার্য্য বলিয়া গোকুল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তর্কালঙ্কার প্রস্থান করিলে অভয়া অঞ্চল হইতে হার মুক্ত করিয়া পতির হাতে দিয়া বলিল, যাকে বে করবে, এই হার নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দিও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে স্বামি-সোহাগিনী হ'ক।

অভয়ার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। গোকুল তাহারই কণ্ঠে হার পরাইয়া দিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শরণ

ক্ষীণশক্তি ক্ষুদ্র আমি—অণোরণীয়ান্!—
দীনদৃষ্টি বদ্ধ জীব—তুচ্ছ অহঙ্কার।
সর্ব্বশক্তি,—সর্ব্বদ্রষ্টা,—ষড়ৈশ্বর্য্যাধার
তুমি স্রষ্টা—মহান্—মহতো মহীয়ান—
মহেশ্বর।

মনে কর একবার যদি,
মুহূর্ত্তেই মরু হয় নীলোর্ম্মি নীরধি;
সিন্ধু—মহামরু। গিরি হয় সমভূমি;
সমতল—গিরি। প্রভু কৃপা করি' তুমি
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও কূট; মাটীর টিলায়
পূর্ণাঙ্গের গতি রোধি,' ভ্রূভঙ্গলীলায়
চূর্ণ কর দর্প কভু। কোথা শিলা ভাসে;
রণচক্রনেমি কারো শুষ্ক ভূমি গ্রাসে

পুরুষকারের স্পর্দ্ধা আজি নাহি আর;
আমার পৌরুষ প্রার্থী আশ্রয় তোমার

সর্ব্বদ্রষ্টা তুমি—একা অন্ধকার ঘরে
বদ্ধ-দ্বার-অন্তরালে যাহা ভাবি আমি
মনে মনে, নাহি রয় তব অগোচরে—
তুমি সব জানো, বোঝো—তুমি অন্তর্য্যামী

মোর সব ছদ্মবেশ, মায়া-আবরণ
যত মিথ্যা, যত ভাণ, ব্যর্থ আচরণ
পিছে রাখা বুকে ঢাকা ফিঁকে, ফাঁকা, ফাঁকি
সব-কিছু অহরহ দেখে তব আঁখি

তন্দ্রাহীন অপলক। ভ্রান্ত—ভাবে যারা
যুক্তির প্রাচীর তুলি,' রচি' তর্ক-কারা,
উচ্চ বাক্‌পটুতায় রাখিবে গোপন
ন্যায় বলি' অন্যায়ের স্বার্থ সমর্থন।

মুখে কিছু কহিব না প্রভু তব ঠাঁই;
আমার বেদনা কোথা—অজানা কি তাই?

অন্ধকারে খুঁজিয়াছি পথ ফিরে' ফিরে'
ধূমাঙ্কিত দীপাধার উত্তরীর নীচে;
আলো বলি' ছুটিয়াছি আলেয়ার পিছে,
অন্ধকার আসিয়াছে আরো ঘিরে' ঘিরে'।
সত্য পথ কই?—নাই আঁধারের শেষ!
শুধু বহি শ্রান্তিভার—পাথেয় নিঃশেষ;
কিন্তু চলি—পথ চলি'

গর্ব্ব ছিল ভারি,
অবশ্যই দিব এই মৃত্যুপথ পাড়ি।
শক্তি আছে,—বুদ্ধি আছে—আর আছি আমি
সমুন্নত; তোমা পানে চাহিনি'ক স্বামি,
ডাকি নাই!—মোহ!—মোহ!—আজি হয় ভয়,
দুর্ব্বোধ্য দুর্দ্দৈব—বুঝি ঘটে পরাজয়!

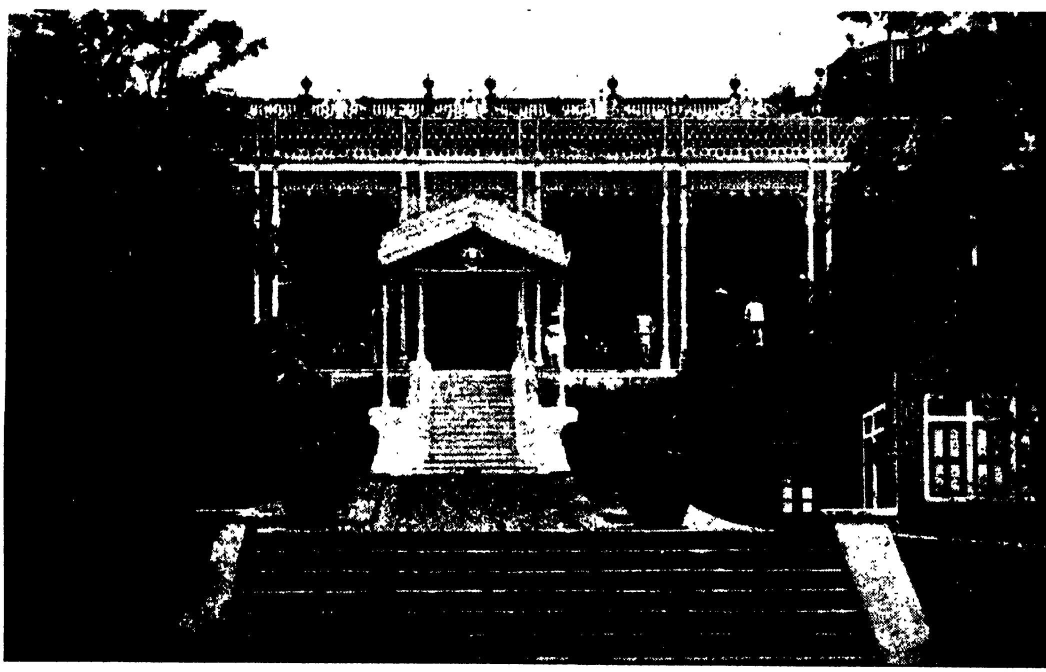
মোহ-ভঙ্গ—অন্তর্য্যামি! রঙ্গ দেখ তবু?
তোমা লাগি' ঊর্দ্ধমুখে আছি জাগি,' প্রভু!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

শিপ্রি বা শিবপুরী

গোয়ালিয়রের 'শিপ্রি' বা 'শিবপুরী'তে সেবারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ইতিহাসে 'শিপ্রি'র প্রচুর খ্যাতি। গোয়ালিয়রের রাজধানী লস্কর হইতে ৭৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, সমুদ্রতট হইতে দেড় হাজার ফুট উচ্চে আগ্রা-বম্বে রোডের উপর শিপ্রি অবস্থিত। সৌন্দর্য্যের সহিত মানবের কৃতিত্বের প্রাকৃতিক মিশ্রণে শিপ্রি সত্যই নয়নাভিরাম। দেখিলে পথশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে হয়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ও শৈলরাজি-বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র সহরটিকে শোভা-সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পরলোকগত মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া (বর্ত্তমান নাবালক মহারাজের পিতা) অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইহা একটি নগণ্য সহর ছিল। তিনি ইহাকে 'শিবপুরী' নামে অভিহিত করিয়া যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য-যুক্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজধানী হইতে তাঁহার এই মানসপুরী পর্য্যন্ত রেল-লাইন স্থাপন, চতুর্দ্দিকে মোটর-চলাচলের উপযোগী চমৎকার পথঘাট নির্ম্মাণ ও তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগ এবং সুরম্য প্রমোদোদ্যান, সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি এবং মনোহর সরোবরাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিজ রাজধানী অপেক্ষা শীতাতপের প্রকোপ অনেকটা কম বলিয়াই বোধ হয় বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী সহ তাঁহার এই মানসপুরীতেই অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইহাকে একরূপ দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তদুপযুক্ত রাজ-অট্টালিকা, দপ্তরখানা, সভাগৃহ, হোটেল, পান্থশালা, নাট্যশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

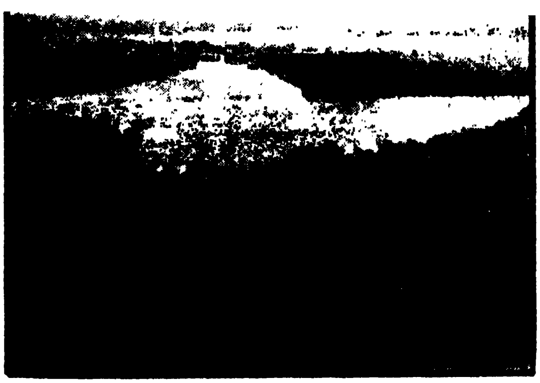
সমগ্র গোয়ালিয়র রাজ্যের দুইটি বিভাগে ১১টি জেলা বর্ত্তমান। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে অর্থাৎ উত্তর-গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ৭টি জেলা যথা—গোয়ালিয়র গির্দ, তওঁরগড়, ভিণ্ড, শিউপুর, নরবর, ভিলসা ও ইসাগড় এবং ২য় বিভাগে অর্থাৎ মালবপ্রান্তের অন্তর্গত ৪টি জেলা যথা—উজ্জয়িনী, সাজাপুর, মান্দসর ও আমঝেরা। পূর্ব্বকথিত শিপ্রি বা শিবপুরী উক্ত নরবর জেলার সদর। তজ্জন্য এখানে কাছারী, জেলখানা, হাঁসপাতাল ও মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি আছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে ইংরাজের একটি ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ পুরাতন ব্যারাকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।



শিপ্রির রাজপ্রাসাদের একাংশ

এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বস্তু পরলোকগত মহারাজার 'ছত্রী' অর্থাৎ সমাধি-মন্দির ও তৎসংলগ্ন এক বিরাট উদ্যান। কারুকার্য্যবিশিষ্ট শ্বেত মর্ম্মরের এই স্মৃতি-সৌধটিকে ক্ষুদ্র তাজমহল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়া সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। এই উদ্যানমধ্যে তাঁহার মাতারও সুদৃশ্য ছত্রী বর্ত্তমান। অপর দ্রষ্টব্য বস্তু 'চাঁদপাটা' নামক হ্রদ। প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়া একটি স্রোতস্বিনীর জলপ্রবাহ আবদ্ধ করিয়া বহু ব্যয়ে এই হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বাষ্পীয় তার সকল ভাসাইয়া নানা

দিগ্‌দেশাগত অভিজাত-বংশীয় অতিথিগণ সহ জলবিহার করিতেন। হ্রদের চতুর্দ্দিকে জলযান-সংযোজিত জেঠী রচিত হইয়াছে। তটস্থিত সুসজ্জিত ক্লাব ঘরটি এবং তৎসংলগ্ন শৈল-চূড়াস্থিত "জর্জ্জ ক্যাসেল" নামক প্রমোদভবন তাঁহারই কল্পনা হইতে রচিত। এই হ্রদের আশপাশের গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি প্রচুর, এ জন্য শিকারের বহু সুযোগ। এ জন্য স্থানে স্থানে শিকারমঞ্চও গঠিত হইয়াছে। শিপ্রির নিকটবর্ত্তী জঙ্গল-সমূহে সখ করিয়া তিনি বহু জীব-জন্তু ছাড়িয়া আইন দ্বারা উহাদের অবাধ-বিচরণ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে হিংস্র জন্তু মধ্যে মধ্যে মোটর-ভ্রমণকালে রাস্তাঘাটে সহসা দৃষ্টিপথে



চাঁদপাটা হ্রদের একাংশ

পড়ে। বর্ষা ঋতুতেই এ অঞ্চলের সুষমা উৎকর্ষলাভ করে, তখন শুষ্কপ্রায় নদী-নালায় জলস্রোত প্রবাহিত হয় এবং বনানীর হরিৎশোভার অন্তরালে পশুপক্ষীর আনন্দকেলি নয়ন গোচর হয়। যথাতথা মৃগযূথের নির্ভীক বিচরণ ও ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যের অভিনব দৃশ্য নয়ন-মন হরণ করে।

পরলোকগত মহারাজার ব্যবসা-বুদ্ধি প্রখর ছিল,—তাহার পরিচয় তাঁহার স্থাপিত কলকারখানা, দোকানপাট, হোটেল ও রেললাইনে পাওয়া যায়। কারণ, এই সকল প্রতিষ্ঠানে বাহিরের বণিক্-সম্প্রদায়কে রাজ্যের ধন-সম্পদ্ লুণ্ঠনে উৎসাহ দেওয়া হইত না। লস্কর হইতে শিবপুরী পর্য্যন্ত স্থাপিত রেলের আয় কমিয়া যাইবে বলিয়া আগ্রা-বম্বে রোডের এই অংশে মোটর, 'লরি' বা 'বাস্' চলিতে দেওয়া হয় না, অথচ ঐ পথে অবস্থিত ঝাঁসি, গুণা প্রভৃতি সহরে শিবপুরী হইতে রীতিমত মোটরযান চলাচলের ব্যবস্থা আছে। এই কারণে শিবপুরীতে ট্যাক্সি পাওয়া দুর্ঘট, তবে অল্পসংখ্যক 'টাঙ্গা' চলে। রাজ্য-শাসন-তন্ত্রে ইংরাজ সরকার-প্রচলিত পদ্ধতিই ক্রমশঃ অনুসৃত হইতে-ছিল। কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত উন্নতির পথে বাধা পড়িয়াছে।

শিবপুরীর নিকটবর্ত্তী অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিম্নে বিবৃত করিতেছি।



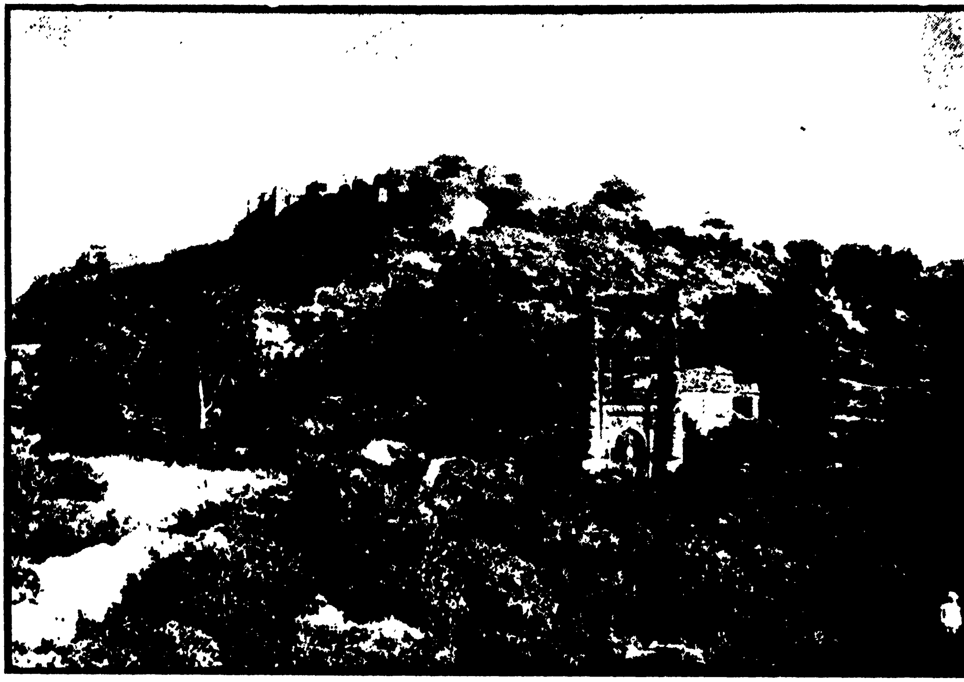
মাধবরাও সিন্ধিয়ার ছত্রীর উদ্যান-বীথি

১। সহরের প্রান্তস্থিত বৃহৎ উদ্যানবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ, বহুমূল্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত।

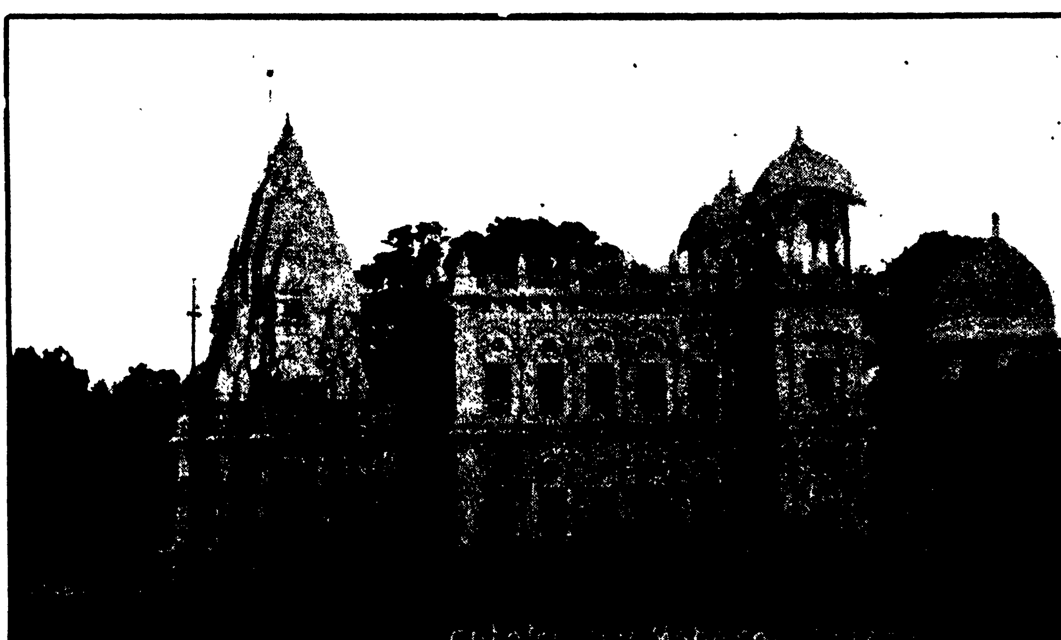
২। সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মাধব রাও ও তাঁহার মাতার 'ছত্রী'।

৩। সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে চাঁদপাটা হ্রদ।

৪। বিজয় ধর্ম্মসূরী নামধেয় এক ধর্ম্মপ্রাণ জৈন সাধুর সমাধি-মন্দির-সংশ্লিষ্ট একটি ব্রহ্মচারি-বিদ্যালয়। এই মন্দির রেল-ষ্টেশনের নিকটে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া নানা দেশীয় ছাত্র সংখ্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে ইহাকে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের পরিচালকরা স্বার্থত্যাগী শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা ছাত্রদের জৈনধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষা-দীক্ষা



চণ্ডেরী দুর্গ



ভূতপূর্ব্ব মহারাণীর ছত্রী



জর্জ্জ ক্যাসেল



বর্ত্তমান নাবালক মহারাজ



চাঁদপাটা ক্লাব

সম্পাদন করিতেছেন। এমন কি, কয়েক জন য়ুরোপীয় ভক্ত নর-নারীও এই আশ্রমভুক্ত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

৫। উক্ত হ্রদের এক প্রান্তে অবস্থিত 'ভাদইকুণ্ড' অর্থাৎ পাহাড়ের কোলে এক জলকুণ্ড। একটি নির্ঝরের জলধারা পাষাণগাত্রে নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সোপানশ্রেণীযুক্ত প্রকোষ্ঠের ছাদে পড়িয়া বিস্তারলাভে বর্ষার বারিপাতের ন্যায় নিম্নস্থিত কুণ্ডে অবিরাম ঝরিতেছে এবং তথা হইতে স্রোতস্বিনী আকারে পুনরায় প্রবাহিতা হইয়াছে। এই নির্ঝরের জল স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বোতলে ভরিয়া দেশ-দেশান্তরে চালান হইত। বন-ভোজনের পক্ষে এই স্থানটি আদর্শস্বরূপ বলা যায়।

৬। প্রায় সাত মাইল দূরে নিবিড় অরণ্য-মধ্যস্থিত 'হাস্‌মৎকুণ্ডী' নামক জলকুণ্ডবিশেষ। মালভূমি হইতে ক্রমশঃ নিম্নগামী স্রোতস্বিনীর ধারা পাষাণময় গহ্বরে আবদ্ধ হইয়া এক কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় নিষ্কাশিত হইয়াছে। এই কুণ্ডে হিংস্র জন্তু জলপানার্থে আসিয়া থাকে। তজ্জন্য কুণ্ডের উপরিস্থ পাহাড়ের ধারে এক পাকা শিকারমঞ্চ নির্ম্মিত আছে। এই মঞ্চোপরি বসিয়া রাজ-অতিথিগণ ব্যাঘ্রাদি শিকার করিয়া থাকেন। বনমধ্যস্থ পাকা রাস্তা দিয়া মোটরে গমনকালে শম্বর নামক বৃহদাকার মৃগযুগল পথিপার্শ্বে দেখিয়াছিলাম।

৭। প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে ঐরূপ বিজন কাননমধ্যে গভীর খাদে প্রবাহিতা এক নির্ঝরিণীর ধারে মহাদেবেশ্বরের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিগত মহারাজা পূজা করিতে আসিয়া খাদের ধারে বনজাত দ্রব্যে নির্ম্মিত এক নিভৃতালয়ে মধ্যে মধ্যে কিছু দিন যাপন করিয়া বনবাস-জনিত সুখ-দুঃখের আস্বাদন লইতেন। আগ্রা-বম্বে রোড হইতে নির্গত ৭ মাইল ব্যাপী 'ক্রফটস্' রোড নামক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শাখা-রাস্তার পার্শ্বেই এই মন্দিরটি অবস্থিত, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত সাধন-ভজনের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এখানে আসিলে স্বতঃই ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়। রাস্তার নিকটস্থ মালভূমি হইতে মন্দিরে অবতরণ জন্য প্রস্তর-রচিত সোপানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া মোটরে ভ্রমণকালে নানা জাতীয় হরিণ, নীলগাই, খরগোস ইত্যাদি পথের ধারেই বিচরণ করিতেছে, দেখিলাম। অনতি-উচ্চ একখণ্ড শৈলের প্রায় চতুষ্পার্শ্বেই এই রাস্তাটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পথিমধ্যে ঐ নির্ঝরিণীর উপর একটি সুদৃশ্য সেতু পার হইতে হয়। শিবপুরী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের গঠন-কার্য্যের সৌষ্ঠব দেখিলে মনে হয়, পরলোকগত মহারাজা বুঝি বা আলাদীন-প্রদীপের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

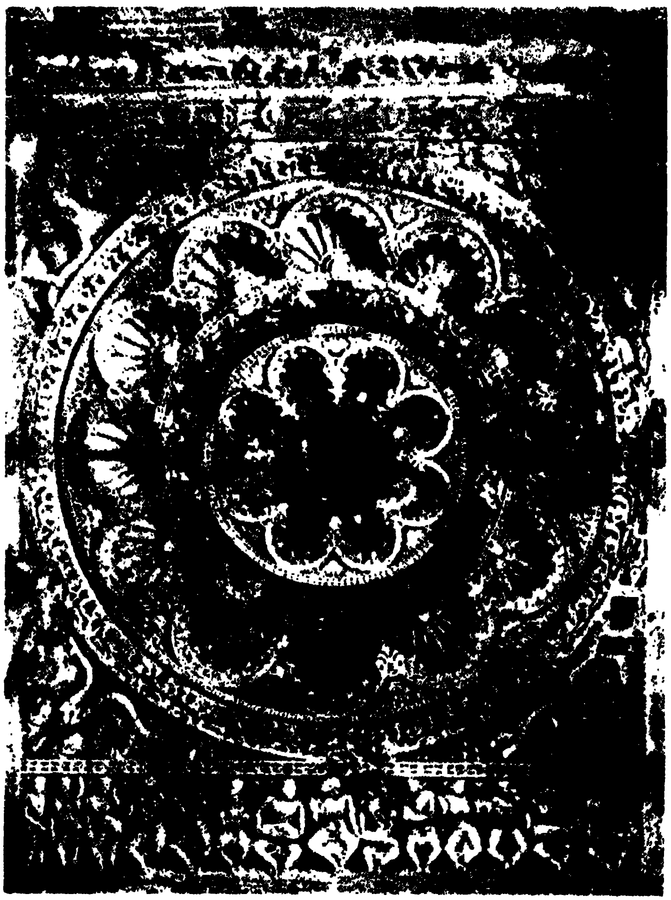
পূর্ব্বোক্ত দর্শনীয় স্থান-সমূহ ব্যতীত কিছু দূরে কতিপয় প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে—যাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে মূল্যবান বলিতে হইবে। যথা—১। ঝাঁসি শিপ্রি রোডের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত 'সুরবায়া' নামক ক্ষুদ্র গ্রামের বহির্ভাগে একটি পুরাতন দুর্গের অভ্যন্তরে রাজদরবার কর্তৃক সযত্নরক্ষিত মধ্যযুগের প্রস্তর-নির্ম্মিত হিন্দু মঠ ও তৎপ্রাঙ্গণস্থ ৩টি বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এই মন্দিরগুলির পাষাণময় গাত্রে ও অলিন্দে যে সূক্ষ্ম তক্ষণ-কার্য্যের পরিচয় এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মধ্য-যুগের প্রতিষ্ঠিত—হিন্দু মঠের চিহ্ন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।



সুরবায়ার বিষ্ণু-মন্দির

২। পূর্ব্ব-কথিত 'নরবর' বর্ত্তমানে একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। ইহার বিগত গৌরবের সাক্ষি-স্বরূপ ক্ষুদ্র সহরটির প্রান্তস্থিত শৈল-শেখরে এক বিরাট দুর্গের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। প্রবাদ, ইহা মহাভারত-যুগের নলরাজার স্থাপিত নগরী ছিল। শিপ্রির ১০ মাইল উত্তরে আগ্রা-বম্বে রোডের ধারে সতানওয়াড়া নামক ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বোত্তর

দিকে নরবর পর্য্যন্ত ১৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। সিন্ধু নামক পার্ব্বত্যনদের সান্নিধ্যে বিন্ধ্যগিরির এক শাখা-শৈলোপরি উক্ত দুর্গমধ্যে ঐতিহাসিক যুগের এক বিশাল রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিবার যোগ্য। এই গিরিদুর্গটি প্রত্নতাত্ত্বিকরা পুরাণ-কথিত নাগরাজদের অধীনস্থ ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক যুগের ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা 'কচ্ছ' রাজপুতদের কবলস্থ হয়। ১২৫১ খৃঃ ইহা প্রথম মুসলমান বাদশাহের অধিকারভুক্ত এবং পরে বহুবার হস্ত-পরিবর্ত্তনানন্তর, শেষে উনবিংশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়ার হস্তগত হয়। তজ্জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজাদের কৃত ইমারতাদি এই দুর্গমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সিকন্দর লোডি বাদশাহের বৎসর-কালব্যাপী অবস্থানকালে এখানকার হিন্দু আমলের বহু পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসসাধন ঘটে। দুর্গমধ্যে 'মকরধ্বজতাল' ও 'কটোরাতাল' নামক প্রাচীন কালের দুইটি বিচিত্রদর্শন শুষ্কপ্রায় সুগভীর জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত সোপানশ্রেণী সংযোজিত ২।৩টি চত্বর আছে. তাহার ধারে ধারে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সারি এখনও বিদ্যমান। পর্ব্ব উপলক্ষে তখন এখানে মেলা বসিত। ইহাদের শুষ্ক তলদেশে একাধিক কূপ থাকা সত্ত্বেও জলশূন্য অবস্থা ইহাদের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। পুরাকালের হিন্দুরাজাদের বহু লুপ্ত গৌরবচিহ্ন এই দুর্গস্থিত রাজপুরীতে বর্ত্তমান। গিরিদুর্গে উঠিবার রাস্তাটি সহরের এক প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া শৈলোপরি গিয়াছে এবং উহার বিভিন্নস্তরে গোয়ালিয়র দুর্গের ন্যায় প্রকাণ্ড ফটক অতিক্রম করিয়া শৈলশিখরস্থ রাজপুরীতে পৌঁছান যায়। শিপ্রি হইতে প্রায় সমস্ত পথই জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমির উপর বিসর্পিত, তজ্জন্য চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলী চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ ১৮ মাইল পরে এই রাস্তাটি যেখানে হঠাৎ বক্রগামী হইয়া উপরি-উক্ত সিন্ধুনদের উপত্যকায় ক্রমশঃ অবতরণ করিতে থাকে এবং অদূরে বাদশাহী আমলের খিলানযুক্ত সেতুটি নয়নগোচর হয়, তথাকার দৃশ্য বর্ণনাতীত। এ অঞ্চলের জঙ্গলে মোগল বাদশাহরা বন্যহস্তী শিকারার্থে আসিতেন। একদা আকবরশাহ এইরূপ এক হস্তিযূথ শিপ্রির নিকটস্থ জঙ্গল হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে হরিণ শিকারই শিকারীদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে; কারণ, এ প্রদেশ হইতে গজবংশ বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। নরবর সহরের পরিচ্ছন্নতা উল্লেখযোগ্য। এখানে ডাকঘর, থানা ও পান্থশালাও আছে। উপরি-উক্ত দুর্গ-বিরাজিত শৈলশেখরে ভ্রমণ নিরাপদ নহে; কারণ, ব্যাঘ্র ও সর্পের উপদ্রব খুবই আছে।



বিষ্ণুমন্দিরের সিলিংয়ের কারুকার্য্য

৩। শিপ্রির ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নরবর জেলার অন্তর্গত প্রকৃতির ক্রোড়স্থিত 'পওড়ী' নামক স্থানটি বর্ণনাযোগ্য। তিন দিকে গভীর খাদ ও অনত্যুচ্চ শৈলমালা-বেষ্টিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ মানুষের জিঘাংসার পরিচয়স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। বিগত ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পওড়ীর বিদ্রোহী কচ্ছ-রাজার এই দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া সিন্ধিয়ার করতলস্থ করা হয়। তদবধি ইহা শূন্যপুরীরূপে বিরাজমান। তবে এখানকার 'জল-মন্দির' ও গিরি-গহ্বরস্থ কেদারনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন এবং বনজাত দ্রব্য সকল ক্রয়-বিক্রয়ার্থে শিপ্রি হইতে লোক-সমাগম হয়। এতদর্থে প্রত্যহ মোটরবাস্ চলাচল করিয়া থাকে। জল-মন্দির অর্থে বৃষ্টির জলধারা-সঞ্চিত চতুষ্কোণ জলকুণ্ডের মধ্য-স্থিত মন্দির। এইরূপ মন্দির এ প্রদেশের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। শিপ্রিতেও একটি দেখিয়াছি। এখানকার মন্দিরটি বেশ সুরক্ষিত। কুণ্ডে অবতরণ জন্য বাঁধাঘাট ও মন্দিরাভ্যন্তরে গমন জন্য সেতু সংযোজিত আছে। কেদারনাথের গহ্বরটি দুর্গম গিরিগাত্র-সংলগ্ন। শিবলিঙ্গের উপর ছাদ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা অবিশ্রান্ত ক্ষরিত হইয়া নিম্নস্থিত গভীর খাদে পতিত

হইতেছে। ঐ গহ্বরে পৌছিবার সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্মটি অরণ্যবাহী ও শ্বাপদসঙ্কুল। ইহার মধ্যপথে নির্ঝরের উপলখণ্ডের উপর এক ফকিরের সমাধি ও সম্মুখেই তাঁহার গিরিকন্দরস্থ ধ্যানকক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পউড়ীর পাহাড় ও জঙ্গলের অবস্থান দেখিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বে এখানে কোনও দস্যুদলপতির আড্ডা ছিল।

৪। নরবর জেলায় বেতোয়া (বেত্রাবতী) নদীর সান্নিধ্যে শৈলমালার উপর 'চণ্ডেরী' বা 'চণ্ডেলী' নামধেয় পুরাতন সহর ও সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত। বীণা-কোটা রেল লাইনের মুঙ্গৌলী নামক ষ্টেশন হইতে ২৪ মাইল সোজা মোটরের রাস্তা আছে। অবশ্য শিপ্রি হইতেও মোটরে যাওয়া যায়, কিন্তু সে পথ ৩৯ মাইল ঘুরিয়া গিয়াছে বলিয়া স্থানটি আমার দেখার সুযোগ ঘটে নাই। ইহা চেদিরাজ্যের অধীশ্বর শিশুপালের রাজধানী ছিল বলিয়া এক প্রবাদ আছে। কিন্তু মহাভারত-কথিত উক্ত রাজধানীর নাম ছিল 'শুক্তিমতী'। যাহা হউক, মধ্যযুগের পূর্ব্বের কোনও পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন এখানে বিদ্যমান নাই। চণ্ডেল রাজপুত-বংশীয় রাজাদের স্থাপিত মন্দির ও ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু এখনও আছে। তবে মালব সুলতানদের রাজত্বকালে ও পরে বাদশাহী আমলে ইহার উন্নতি যে চরম সীমায় পৌছিয়াছিল, তখনকার রচিত ইমারতাদিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-গৌরবচিহ্ন সকল ধারণ করিয়াও চণ্ডেরী অধুনা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত-প্রায় হইয়াছে।



বিষ্ণুমন্দিরের প্রবেশদ্বার



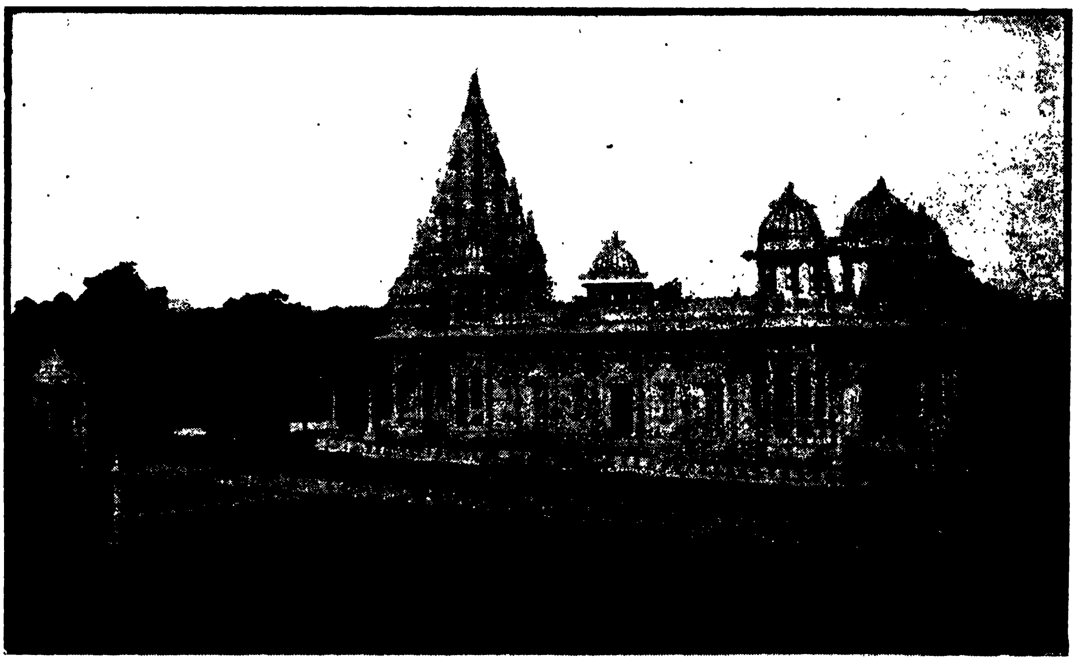
ছত্রীর প্রবেশদ্বার

এই স্থান প্রধানতঃ বয়ন-শিল্পের জন্য প্রখ্যাত, কিন্তু তাহারও এক্ষণে দ্রুত অধোগতি হইতেছে। স্থানীয় শিল্পী রচিত সূক্ষ্ম "মস্‌লিন" ও রঙ্গীন রেশমী কাপড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

৫। নরবর জেলার বাহিরে গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা ইতঃপূর্ব্বে বহু বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছে, যথা জগদ্বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ ও সহর, সিপ্রাতটস্থ উজ্জয়িনী, বৌদ্ধযুগের গৌরববাহী 'বাগ' গুহা ও 'ভিলসা' বা বিদিশা নগরী।

গোয়ালিয়র রাজ্যের উত্তরাংশ শীতাতপ-পীড়িত, কিন্তু দক্ষিণাংশ মালব-প্রদেশের মালভূমির অন্তর্গত বলিয়া শীতাতপ-ক্লিষ্ট নহে। প্রতি বৎসর বর্ষাঋতুর দুই মাস লস্কর হইতে উৎপন্ন হয়। সরিষার চাষ নাই বলিলেই চলে। তিল-তৈলেই রন্ধনকার্য্য চলিয়া থাকে। ঘি, দুধ, দই ও আটা উত্তম পাওয়া যায়। মাছ দুর্লভ ও খাওয়ার রীতি নাই। মাংসাহারীর পক্ষে কিন্তু এ প্রদেশ ভারী লোভনীয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের যাবতীয় উন্নতি বিগত মহারাজার আমলেই সংসাধিত হয়। নিজের পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া সাধারণ লোকের সহিত মেলামেশার ক্ষমতাও তাঁহার অদ্ভুত ছিল। সর্ব্বপ্রকার কায স্বহস্তে শিক্ষা করার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ তাঁহার ছিল। তাঁহার স্বহস্ত-রচিত চুলা এখনও শিবপুরী রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণে দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আত্মীয়স্বজন সহ মিলিত হইয়া রন্ধনকার্য্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতেন।



ভূতপূর্ব্ব মহারাজার ছত্র

শিবপুরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। এখানে স্থায়ী অধিবাসীরা রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী শিপ্রি নামক 'যাদোসাগর' (সরোবর)-তটস্থ পুরাতন সহরে অবস্থিতি করেন। স্থানীয় বাজারটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং রেল-ষ্টেশনও শিপ্রির মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এ রাজ্যে ভিখারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষ-আবাদের পরিমাণ কম নহে। জুয়ার, বাজরী, মকাই, গম, ছোলা, ইক্ষু, তিল ও তুলার চাষই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এ রাজ্যের অহিফেন-চাষ বিখ্যাত। উজ্জয়িনী সহরই উহা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান আড়ৎ এবং তথা হইতে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান-চালও অল্প-পরিমাণে রাজদরবার কর্ত্তৃক স্থাপিত-রেল-লাইনে এঞ্জিন-চালকের কার্য্যও অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা এ প্রদেশে অত্যন্ত কম। পূর্ত্ত-বিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মোরার-নিবাসী রায় সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বাহাদুরের আতিথ্যে এ অঞ্চলে কিছুকাল আমার বাস করার সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাঁহার সহৃদয়তা ভুলিবার নহে। লস্কর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী মোরার সহর পূর্ব্বে ইংরাজের সেনানিবাস ছিল বলিয়া এখানে বহু সমৃদ্ধিশালী ইংরাজের বাস ছিল। এখন রাজদরবারের খাস সৈন্যদল এবং ইংরাজ রেসিডেণ্টের আবাসমাত্র আছে। হেমন্তকালই এ প্রদেশ পর্য্যটনের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়।

২৫

সরোজ পুষ্পিতাকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল।

সুন্দরীমোহন ও চপলার কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "তোমার ক্ষমতা আছে স্বীকার কচ্ছি।"

চপলা হাসিয়া বলিল, "আগে কাষ শেষ হোক্, তার পর ক্ষমতার প্রশংসা ক'রো।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "না, আর ভয় নেই। আসল কথা মনের পরিবর্ত্তন করা। মন থেকে শোকের পাষাণ-ভার সরিয়ে ফেলা। তা যখন হয়ে গেছে, তখন আর ভয়ের কারণ নেই।"

চপলা বলিল, "তুমি বল্লে ভয় নেই, কিন্তু আমার ভয় বিলক্ষণ আছে। শোককে তুমি পাষাণের সঙ্গে তুলনা করলে, আমি কিন্তু তা করি নে। বিশেষতঃ মেয়েমানুষের মনের শোক। আমি বলি, শোক অবশ্য আছে। তার শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলে, তার বাহিরের চিহ্ন লুপ্ত ক'রে দিয়ে ভাবি, শোক আর নেই। কিন্তু তার কঠিন মূল হৃদয় ভেদ ক'রে এতদূর চ'লে যায় যে, সে হৃদয় তুলে না ফেল্লে আর শোকের মূল বার হয় না। তার এই উপরকার শাখা-প্রশাখা কেটে তাকে উপর থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে কিছুদিন চুপ ক'রে থেকে দেখ দেখি, আবার যেমন ছিল, তেমনই শাখা-প্রশাখায় ভ'রে যাবে। পুরুষের বেলা ও উপমা ঠিক খাটে না কি না, তাই তুমি ঠিক ওকে বুঝ্‌তে পারছ না।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "কেন, পুরুষের কি শোক নেই?"

"থাক্‌বে না কেন? যখন আসে, সে শোক খুবই তীব্র। কিন্তু সেই খালি যায়গায় কাউকে বসাবার জন্য পুরুষের মনের আকাঙ্ক্ষাও তীব্র হয়। কাযেই ভুল্‌তে তাদের দেরী হয় না। পুরুষ শোক ভুলবার জন্য ব্যগ্র। নারী তাকে আঁকড়ে থাক্‌তে চায়।"

চপলা স্বামীর দিকে চাহিয়া কথাগুলি শেষ করিল।

সুন্দরীমোহন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "মেয়েমানুষের মনের কথা তোমার জানবার অধিকার আছে, মানলাম। কিন্তু পুরুষের মনের খবর তোমরা কি জান?"

চপলা বলিল, "এখন ও সব মনস্তত্ত্বের কথা ছেড়ে দাও। তোমার কথাই যেন ঠিক হয়। এতে যেন আর কোন ব্যাঘাত না ঘটে। আমার মনের কথা তোমায় বলি—আমার এ-মাসেই বিবাহের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মেয়ে যখন বল্‌লে 'আর কিছু দিন পরে', তখন আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না। কিন্তু ভয় আমার যায় নি।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "এ ভয় তোমার অমূলক। প্রথম বৎসরটা পুষ্প কি রকম মুষড়ে গিয়েছিল ও সর্ব্বক্ষণ একা থাক্‌ত, দেখেছো ত? এখন আর সে ভাব নেই। সরোজের উপর এখন টান হয়েছে।"

চপলা বলিল, "তাতে সন্দেহ নেই। পুষ্প নিজেই আমাকে সে দিন বল্‌ছিল, যত দিন সরোজ এখানে এসেছেন, গ্রন্থালয়ের সমস্ত কাযকর্ম্ম দেখেছেন, কিন্তু মাসে পারিশ্রমিক নিয়েছেন মাত্র ১০০৲ টাকা ক'রে, অথচ উইল অনুসারে মাসে ওঁর ভাগে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা পড়ে। এই একশ টাকার মধ্যে কাকাকে পাঠাত ৫০৲, বোন্‌কে ২৫৲ আর নিজে রাখত ২৫৲, তার মধ্যে বাড়ীভাড়া যেত ১৫৲ আর অন্যান্য খরচ চল্‌ত ১০ টাকায়। অদ্ভুত মানুষ বটে! এই সব জান্‌তে পেরেছিল, তাই না পুষ্পর মন নরম হয়েছে। নইলে তুমি যে বল্‌ছিলে, এ বড় শক্ত কাষ, সে ঠিকই।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "যাক্, তুমি যে এটা স্বীকার করেছ, সেও ভাল।"

চপলা বলিল, "স্বীকার কেন কর্‌ব না? তবে তুমি যে ভয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলে, সে ভাল হচ্ছিল না। তাই না আমাকে নাম্‌তে হ'ল। এত দিনে কাষ একটু সহজ হয়েছে মাত্র।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "একটু কেন, অনেকটাই সহজ হয়েছে। রোজ দুজনে একত্র বেড়াতে বার হচ্ছে। পুষ্পর অনুরোধে সরোজ সে বাসা ছেড়ে দিয়ে শ্যামবাজারের দিকেই বেশ একটা ভাল বাসা নিয়েছে। মাঝে মাঝে দুজনে সেখানে যাচ্ছেও। গ্রন্থাগারে গিয়েও দুজনে কাষ-কর্ম্ম দেখছে। আর ভয় ক'রো না।"

চপলা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভয় যেন নাই-ই থাকে। কিন্তু শরীরটা এখনও সারছে না পুষ্পের, সেটা দেখেছ? কিছু দিন যদি দু'জনকে কোন ভাল যায়গায় পাঠান হয় ত সবদিক্ থেকেই ভাল হয়।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "আর ২।১ দিন দেখা যাক, তার পর না হয় সেই ব্যবস্থা করা যাবে।"

এমন সময় বাহিরের দিকে কে ডাকিল—"কাকীমা আছেন না কি ভিতরে?"

চপলা বলিল, "অনন্তের গলা না? ভেতরে আয়, অনন্ত! বাহিরে কেন?"

অনন্ত ভিতরে আসিয়াই বলিল, "তোমরা কথাবার্ত্তা কইছ, না অনুমতি নিয়ে কি ক'রে ভিতরে আসি? কাকা ও তুমি দু'জনেই চিরকাল আধুনিক!"

সুন্দরীমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তোর ত আরও আধুনিক হওয়া উচিত।"

অনন্ত ভিতরে আসিয়া বলিল, "না কাকাবাবু, আমি একেবারে পুরাতনপন্থী। সময়ের ঢের পিছনে আমি প'ড়ে আছি। আর যে সময় চ'লে গেছে, সতৃষ্ণনয়নে তার পানে চেয়ে আছি।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "তোমার আদর্শবাদকে আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তা গ্রহণ করি নে। কারণ, আদর্শের দাম শুধু আদর্শ হিসাবে। সংসারের ভিতর তার প্রয়োগ করতে গেলে ঠকতে হবে এবং আপশোষও করতে হবে।"

অনন্ত কথার আর উত্তর না করিয়া চপলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, পুষ্পের বিয়ের কথা সত্যি কি?"

চপলা বলিল, "এখন কিছু বলিস্ নে, বাবা। আগে হোক। যে তোর বোন্,—কখন্ বেঁকে বসবে, সেই আমার ভয়। এ কি, চল্‌লি যে?"

অনন্ত কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "যে খবরের জন্য এসেছিলাম, তা মিল্‌ল; আর কেন থাকা?"

চপলা একটু বিস্মিত হইল। ডাকিয়া বলিল, "ও অনন্ত, শোন, বাবা! কি হ'ল তোর? রাগ কল্লি কেন? একটা কথা বলি, আয়।"

অনন্ত ফিরিয়া আসিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইল; বসিল না।

চপলা অনুনয় করিয়া বলিল, "রাগ করিস্ নে। যাতে এ কাযটা নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যায়, তাই কর, বাবা! এতে বাধা দিস্ নে।"

অনন্ত বলিল, "না কাকীমা, আমি তোমাদের শুভকর্ম্মে বাধা দিতে চাই নে। তবে সাহায্য করবার ক্ষমতা ত আমার নেই।"

চপলা বলিল, "কেন বাবা! তোরা লেখাপড়া শিখেছিস্, তোদের ত এতে সহানুভূতি থাকা উচিত। তোরা কোথা সমাজ-সংস্কার করবি, তা না, তোরাই সমাজকে পিছিয়ে দিতে চাস!"

অনন্ত বলিল, "দোহাই কাকীমা, সংস্কারকের গৌরব আমার কোন দিন ছিল না; তাতে আমার লোভও নেই। বিধবার বিবাহই বল, আর বিপত্নীকের বিবাহই বল, কোনটাই আমার ভাল লাগে না। বিশেষতঃ যারা পরস্পরকে ভালবেসেছে, অন্ততঃ কিছুকাল একসঙ্গে মনের সুখে বাস করেছে, তাদের বিবাহ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে।"

চপলা বলিল, "তোরা বিদ্বান্ বাবা, তোদের বোঝাব, এ স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু বিপত্নীককেই বল আর বিধবাকেই বল, পুনরায় বিবাহ না করতে বাধ্য করার মধ্যে সমাজের কি কল্যাণ আছে, আমি বুঝতে পারি নে।"

অনন্ত বলিল, "ঠিক কথা, কাকীমা। কিন্তু যে বিধবা বা যে বিপত্নীক বিবাহ করতে চায় না, মৃত স্বামী বা স্ত্রীর স্মৃতির মূল্য বোঝে ও সেই স্মৃতিকে সম্মান করতে চায়, তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করাতেই বা কি সার্থকতা বল?"

সুন্দরীমোহন এতক্ষণ নীরবে স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন। বলিলেন, "সার্থকতা এই যে, সমাজকে বৃথা অপচয় থেকে আর নর-নারীকে বৃথা শোকের হাত থেকে বাঁচানো হয়।"

অনন্ত বলিল, "আপনি গুরু, আমি আপনার কাছে অর্ব্বাচীন মাত্র। আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার সাজে না। সমাজের লাভ কোন্‌টি বা সমাজের ক্ষতি কোন্‌টি, আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। প্রত্যেক বিপত্নীক বা বিধবাকে যদি বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়, তা হ'লে সমাজের শুধু এইটুকু কল্যাণ হয় যে, কিছু লোকবল ও সঙ্গে সঙ্গে অর্থবল হয় ত বাড়বে আর দুঃখ বা অশান্তি বাড়লেও

শোকের ভাগ একটু কমে। আর সমাজের ক্ষতি যা হয়, তাও কম নয়।"

সুন্দরীমোহন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি ক্ষতি হয়, বল ?"

অনন্ত বলিল, "তাই বলছি, কাকা! ক্ষতি এই হয় যে, সমাজের বন্ধন খুব বড় হয়, কিন্তু আলগা রয়ে যায়।"

সুন্দরীমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এটুকু প্রমাণ কর।"

অনন্ত প্রশান্তস্বরে বলিল, "একনিষ্ঠ ভালবাসা হচ্ছে সমাজের বা সংসারের প্রাণ। সে ভালবাসা স্বামি-স্ত্রীর মধ্যেই হোক, ভাই-ভাইয়ের মধ্যেই হোক, পিতাপুত্রের মধ্যেই হোক্ আর বন্ধুদের মধ্যেই হোক্। পিতা যদি ভাবেন, আমি মারা গেলে ছেলে আমাকে ভুলে যাবে, আমার ইচ্ছামত আর কিছুই করবে না, আমার নামও মুখে আনবে না, পিতার মনে তখন কি ভাব আসে বলুন ? স্বামী বা স্ত্রী যদি ভাবে, এক জন গেলে অপরে স্বচ্ছন্দে শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে শোকের ভার লাঘব ক'রে সমাজকে ধন্য করবে এবং চোখের সামনে যদি অহরহ সেই দৃষ্টান্তই দেখে, তা হ'লে কি একনিষ্ঠ প্রেমের সুন্দর আদর্শ সমাজ থেকে চ'লে যায় না ?"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "যায় না, যদি ভালবাসায় শুধুই স্বার্থচিন্তা না থাকে। যদি দুই জনেরই শুধু এই চিন্তা থাকে, কিসে অপরকে সুখী করবে ও সুখী রেখে যাবে, তা হ'লে স্বামী বল, স্ত্রী বল, দুজনেরই এই ইচ্ছা হবে যে, এক জনের অবর্ত্তমানে অপরে যেন শোক বা দুঃখ বা কষ্ট পায় না। আমি চ'লে যাচ্ছি—অতএব আমার চিন্তায় সে দিন-রাত ব্যাপৃত থাক্ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করুক, এই যদি এক জনের প্রেমের নিদর্শন হয়, তা হ'লে সে প্রেম কত উচ্চ অঙ্গের, তা সহজেই বুঝতে পার। এই যে তোমার নিঃস্বার্থের আদর্শ—কোথায় রইল ?"

অনন্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "এক জনে এ ইচ্ছা করবে না—অথচ অপরে এইটুকু না ক'রে পারবে না, এই হচ্ছে এ ভালবাসার বিশেষত্ব। আপনি যাকে নিঃস্বার্থের আদর্শ বলতে চান, সে হিসাবে ত কৌলীন্যের যুগে যখন এক জন পুরুষ শতাধিক স্ত্রীরও পাণিপীড়ন করতেন এবং পাণিপীড়িতারা বৎসরে একবার ক'রে স্বামীর চরণসেবা ক'রে ধন্য হতেন, সেই যুগকেই ত শ্রেষ্ঠ যুগ বলা উচিত।"

সুন্দরীমোহন কিছু বলিবার পূর্ব্বে চপলা বলিল, "এ বাদানুবাদের শেষ নেই। কারণ, কম-বেশী দুদিকেই যুক্তি আছে। যা নিয়ে তোমাদের এই তর্কের সৃষ্টি, সেই কথাই আমি বলছি এখন। পুষ্পের বিবাহের কথাও আমি মুখে আনতাম না, যদি ওর একটি ছেলে বা মেয়ে থাকত। কত দিন ওকে এখনও বাঁচতে হবে। সে দীর্ঘকাল শুধু শোকের স্মৃতি বুকে নিয়ে ও বেঁচে থাকে, এই কি তোর ইচ্ছা, বাবা ? বাপ-মায়ের এতে কি কষ্ট, একবার ভেবে দেখ্ দিকি! তোর যদি ছেলে-মেয়ে থাকত, ত হ'লে বুঝতে পারতিস্ ছেলে-মেয়ের ম্লানমুখ দেখ্লে মা-বাপের বুকে কি রকম বাজে।"

চপলার নয়ন আর্দ্র হইল। সে অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলল।

অনন্ত একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "কাকীমা, তুমি এ ভাবের কথা বললে আমাকে নিরুত্তর হ'তে হয়। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য আমি কোন কথা বলি নি। কিন্তু আমি যখন হিমাদ্রিবাবুর কথা ভাবি, কি রকম সুখে, আনন্দে ও মনের মিলের সঙ্গে ওঁরা ছিলেন, এ কথা যখন আমার মনে পড়ে; তখন পুষ্প দিদির আর কারও সঙ্গে বিবাহ হবে —হিমাদ্রিবাবুকে পুষ্পদিদি ভুলে যাবে, এ চিন্তা আমার অসহ্য হয়ে উঠে। আমার এ কথায় যখন তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে কাকীমা, এ কথা আর না তুলে আমি বিদায় নিচ্ছি।"

অনন্ত ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল। সে সময়ে হঠাৎ দেওয়ালে একটা শূন্য স্থান দেখিয়া একটু ভাবিল। তার পরে বলিল, "কাকীমা, একটা জিনিষ আমায় দেবে ?"

চপলা তৎক্ষণাৎ বলিল, "কি বল্, দেব।"

অনন্ত দেওয়ালের একটা স্থান দেখাইয়া বলিল, "ওখানে যে ছবিখানি থাকত, সেখানা বোধ হয় তুলে রেখে দিয়েছ। সে খানার ত তোমাদের আর দরকার নেই। আমায় দেবে ?"

চপলা একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ, নিয়ে যা। যদি ওখানে টাঙ্গানোও থাকত, তা হ'লেও তুই চাইলেই দিতাম।"

চপলা পাশের ঘরে গিয়া একটা বাক্স খুলিয়া একখানা ছবি আনিয়া দিল।



বসুমতী চিত্র-বিভাগ] গৃহলক্ষ্মী [শিল্পী—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

ছবিখানি হিমাদ্রি ও পুষ্পিতার। অনন্ত সেখানি বেশ যত্ন করিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে ছবির পানে চাহিয়া—সেখানি গায়ের কাপড়ের ভিতর ঢাকিয়া লইল। বলিল, "তা হ'লে চল্লেম। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করেছি মনের দুঃখে। কিছু মনে ক'রো না, কাকীমা! ক্ষমা ক'রো।"

সঙ্গে সঙ্গে চোখে দুফোঁটা জল আসিয়াছিল, অনন্ত তাহা মুছিয়া ফেলিল।

সুন্দরীমোহন ও চপলার মুখে আর কোন কথা আসিল না। অনন্ত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২৬

হঠাৎ 'কাশী' হইতে একখানা পত্র আসিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বড় দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। পুষ্পিতার হাতে পত্রখানি পড়িতেই সে কম্পিতহস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল :—

"বৌমা,

অনেক দিন তোমার হাতের লেখা পত্র পাই নাই। তুমি ছাড়া সংসারে আমার আর কেহ নাই; তাই বোধ হয়, তোমার জন্য মন এত চঞ্চল হইয়াছে। হিমাদ্রির কথাতেও কোন দিন কলিকাতা যাই নাই। আজ তোমার মুখখানি দেখিবার জন্য তাও যাইতে এক একবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তোমার সেই হাসি-হাসি মুখখানি আর যে নাই, মা! কি করিয়া তোমার ম্লান মুখের পানে চাহিব, মা? সেই ভয়ে আমি তোমাদের সেই হাসি-মুখখানি মনে করিয়া কাশীতেই পড়িয়া আছি। মাঝে মাঝে আমায় পত্র দিও।

তোমার মা।"

পত্রখানি পড়িয়া পুষ্পিতা নীরবে কাঁদিতেছে, এমন সময়ে সেখানে চপলা আসিল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা? কাঁদছ কেন?"

পুষ্পিতা কিছু বলিল না। শুধু পত্রখানি মায়ের হাতে দিল।

চপলা পত্রখানি পড়িয়া দুঃখিত হইল। কিন্তু দুঃখের তুলনায় তাহার ভাবনা হইল বেশী। এই ভাবের পত্র, কথা বা চিন্তা যদি পুষ্পিতার মনে বেশী করিয়া জাগে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত হিমাদ্রির স্মৃতির উপরেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িবে। সে স্থির করিল, যাহাতে এ সব হইতে অন্ততঃ কিছুকাল কন্যাকে দূরে রাখা যায়, তাহাই করিতে হইবে।

কন্যার চক্ষু মুছাইয়া সে বলিল, "এ ভেবে আর কি কর্‌বে, মা? ওঁর দুঃখের কথা ভাব্‌তে গেলে কি আর মানুষের জ্ঞান থাকে? এ সব আর ভেবো না, মা। মনকে আর ভাবনায় ফেলো না।"

পুষ্পিতা বলিল, "এঁর চিঠি পেলে মনে হয় যে, আমি কাশী গিয়ে শেষ-জীবন ওঁর কাছেই থাকি।"

চপলা বলিল, "কিন্তু তাতেই কি তাঁর দুঃখ ঘুচ্‌ত, মা? তোর মুখ দেখতেন আর তাঁর বুকটা হু হু ক'রে উঠ্‌ত। এ রোগের যে ওষুধ নেই, মা; তুমি কি কর্‌বে? তুমি ওঁর কাছে গিয়ে থাক্‌লে ওঁকে তিল তিল পুড়িয়ে মারা হবে। একা আছেন—তবু ঠাকুর-দেবতার চিন্তা নিয়ে এক রকম শোক-তাপ মাঝে মাঝে ভুলে থাকেন।"

পুষ্পিতা বলিল, "এ কথা শুন্‌তে পেলে উনি কি ভাববেন। ওঁর যে আরও দুঃখ বাড়বে, মা।"

পুষ্পিতার চোখে আবার জল আসিল। চপলা বলিল, "লক্ষ্মী মা, চুপ কর্‌। মন স্থির কর। ওঁর যে দুঃখ, তার শেষ সীমা পৌঁছেছে। এর বেশী দুঃখ আর মানুষ পায় না। তিনি যে দুঃখ সহেছেন, তার কাছে এ ত দুঃখই নয়।"

মাতা পুষ্পিতাকে উঠাইয়া আবার অশ্রু মুছাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়া আপনার কাছে বসাইল, চিঠিখানি চপলা আপনার কাছে রাখিল। মনে মনে স্থির করিল, আর এ ভাবে মেয়েকে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। কখন্ কোন্ সময়ে এই রকমের একটা আঘাত পাইবে আর সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

স্বামী আসিলে তাঁহাকে পত্রখানি দেখাইয়া সে তাঁহার পরামর্শ চাহিল। সুন্দরীমোহন বলিলেন, "যেমন বল্‌ছিলে, দুজনকে নিয়ে দিনকতক বেড়িয়ে এসো। আর আমার মনে হয়, সেইখানেই বিবাহের ব্যবস্থা কর্‌লেই ভাল হয়। এখানে থাক্‌লেই নানা স্মৃতি ওর মনকে আলোড়িত কর্‌বে।"

চপলারও এ পরামর্শ ভাল লাগিল। বলিল, "তাই বন্দোবস্ত ক'রে দাও। কোথায় যাবে বল দেখি?"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "যেতে ত যে কোন ভাল যায়গায় পারে। যায়গা ভাল হয় অথচ কাছাকাছি হয়, সেই হলেই ভাল হয়। আবার ভাল বাড়ী পাওয়া যায় সেও দেখতে হবে।"

চপলা বলিল, "অত দেখ্‌তে শুন্‌তে দেরী হয়ে যাবে। দেরী করাটা আমি আর ভাল মনে করি নে।"

সুন্দরীমোহন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার এক মক্কেলের হাজারিবাগে বাড়ী আছে। সেখানে গেলে শীঘ্র যেতে পার। সে বাড়ী আমার দেখা। তা ছাড়া শীতের সময় এখন বেশ স্বাস্থ্যও ভাল অথচ নিরিবিলি।"

চপলা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তবে আবার কেন ভাব্‌ছ? ঐ যায়গায় ঠিক ক'রে ফেলো।"

সুন্দরীমোহন বলিলেন, "তুমি তা 'হ'লে এ দিকের সব গুছিয়ে নাও। সরোজ ও পুষ্পিতাকেও রাজী কর। আমি কাছারী থেকেই যার জিম্মায় বাড়ী আছে, তাকে টেলিগ্রাম ক'রে দেব।"

এই ব্যবস্থাই ঠিক থাকিল।

পরদিন সরোজ আসিতে পুষ্পিতার সম্মুখেই চপলা হাজারিবাগের বাড়ীর কথা সরোজকে জানাইল। বলিল, "তোমাদের দুজনেরই শরীর খারাপ, বাবা! উনি বলছেন, আজকেই টেলিগ্রাম ক'রে বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বেন। এখন হচ্ছে চেঞ্জের সময়। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তোমরা আজই একবার গ্রন্থাগারে গিয়ে মাস-খানেকের জন্য কাযকর্ম্মের ব্যবস্থা ক'রে এসে। আজই আমি গোছগাছ ক'রে দিচ্ছি। কাল কি পরশু রওনা হ'তে হবে।"

পুষ্পিতা বলিল, "তোমায় কিন্তু সঙ্গে যেতে হবে, মা।"

চপলা বলিল, "তা না হয় যাব'খন। সপ্তাহখানেক থেকে আমি আস্‌ব। আবার দিন ১৫ পরে ফিরে গিয়ে ওখানেই বিবাহের সব ব্যবস্থা করা যাবে।"

পুষ্পিতা অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকাইল। চপলা স্থির করিয়াছিল, আর লুকোচুরি ভাল নহে। স্পষ্টভাবে জোরের সহিত সব কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিয়া ফেলাই ভাল।

কথামত সব ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। দুই দিন পরে এক জন ভৃত্য ও একটি পাচক লইয়া তিন জনে অপরাহ্নের ট্রেণে হাজারিবাগ যাত্রা করিলেন। সুন্দরীমোহন সকলকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় সুন্দরীমোহন চুপি চুপি চপলাকে একটা কথা বলিয়া দিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

বন-ছায়া

আকাশের সীমা হ'তে মিলায়েছে ধীরে ধীরে ধীরে
আলোকের শেষ-স্বর্ণরেখা! দূর বনে বনান্তরে
ঘনায় করুণ ছায়া অগভীর সাঁঝের তিমিরে।
তারার প্রদীপ-শিখা কাঁপিতেছে দিগঙ্গন 'পরে
বক্ষের স্পন্দন সম; দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশি-লেখা
লুপ্ত মেঘ-অন্তরালে, ক্ষীণ-স্রোত নদীটির তীরে
গ্রামখানি করে ছল ছল, প্রান্তরের পথ-রেখা
মিলায়েছে হিম-ম্লান অন্ধকারে! উত্তর-সমীরে
নিরুদ্ধ-রোদন যেন কার দীর্ণ সুরে বারে বারে
তীক্ষ্ণসূচীসম বিঁধে নিশীথ-নিলীন স্তব্ধতারে!

কি যেন কি চঞ্চলতা মর্ম্মে মোর গিয়াছে সঞ্চারি;
ঐ বন-ছায়াতলে কবে কার যেন কোন্ ধন
গিয়াছে হারায়ে—আজও দিশা যেন মিলে নাই তাঁরি!
শুনিতেছি বিশ্ব-ভরা সেই তার অশান্ত ক্রন্দন।

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।

বান্নুর পথে

(ভ্রমণ-কাহিনী)

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত কোন সেনাদলের এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী 'ব্রেভেট' এই ছদ্মনামে লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে তাঁহার ও তাঁহার কোন বন্ধুর যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা এরূপ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক যে, 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকাগণের তাহা চিত্তাকর্ষক হইবে এই আশায় নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অনাবশ্যক বোধে ইহার প্রথমাংশ পরিত্যক্ত হইল।

উক্ত ভ্রমণকারীর সহচরের নাম জিমি লরেন্স। এতদ্ভিন্ন হাসান নামক একটি বিশ্বাসী ওয়াজিরী যুবককে তাঁহারা তাঁহাদের পথি-প্রদর্শনের জন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন।

মিঃ ব্রেভেট লিখিয়াছেন, আমরা মোটর-সাইক্লের সঙ্গে 'সাইড-কার' লইয়া রাজমাকের পথে যাত্রা করিলাম। এই পথটি ৪০ মাইল দীর্ঘ। আমাদের মোটর-সাইক্ল সবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে হাসান অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল এবং গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল, তাহার উচ্চ কণ্ঠের রাগিণীতে ইঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ ডুবিয়া গেল! তাহাকে গান গায়িতে দেখিয়া তাহার সঙ্গীত-স্পৃহা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইল, আমি ও জিমি একত্র সঙ্গীতালাপ আরম্ভ করিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর যতই উচ্চে উঠিল, আমাদের সাইক্লের গতিবেগও সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত হইল। আমি শকটের বেগমান যন্ত্রের কাঁটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সাইক্ল তখন ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল বেগে ছুটিতেছিল।

আমরা দশ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি সেতু দেখিতে পাইলাম, তাহা একটি নদীর উপর প্রসারিত ছিল। আমরা মনের আনন্দে গান গায়িতে গায়িতে সেই সেতু অতিক্রম করিতে লাগিলাম, কিন্তু নদী পার হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ আমাদের গান বন্ধ হইল, সম্মুখে চাহিয়া দেখি সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীচে নদীর জল-স্রোতঃ, সম্মুখে আর কয়েক গজ অগ্রসর হইলেই সাইক্ল সহ নদীগর্ভে পড়িয়া আমাদিগকে প্রাণ হারাইতে হইত।

আমি তৎক্ষণাৎ সাইক্লের ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিলাম। এ জন্য আমাকে দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে হইল।

যাহা হউক, আমরা সেই ভাঙ্গা সেতুর উপর দিয়া অতি কষ্টে নদী পার হইলাম। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, আমাদের সাইক্লের চাকা ফস্কাইয়া যাওয়ায় আমরা নদীগর্ভের প্রায় পনের ফুট উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলাম; কিন্তু আমরা আহত হইলাম না। আমাদের সাইক্ল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার পশ্চাতের একটি টায়ার ফাঁসিয়া গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন গাড়ীর অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। হাসান এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়াছিল। আমরা নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আল্লা আকব্বর!"

আমাদের সঙ্গে অতিরিক্ত টায়ার ছিল, তদ্দ্বারা অকর্ম্মণ্য টায়ার টিউব পরিবর্ত্তন করিতে অধিক সময় লাগিল না বটে, কিন্তু সেই ভারী সাইক্ল লইয়া নদীর উচ্চ পাড়ের উপর উঠিতে আমাদের কষ্টের সীমা রহিল না। হাসান গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া সম্মুখে ঠেলিতে লাগিল। গাড়ীর চাকা পিছলাইয়া নীচে গড়াইয়া যাইতে পারে—এই আশঙ্কায় জিমি একখান পাথর লইয়া পশ্চাতের চাকায় ঠেকো দিতে দিতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আমি ধীরে-ধীরে ইঞ্জিন চালাইতে লাগিলাম।

আমাদের সাইক্ল লাফাইয়া পথে উঠিতেই এক পাল ছাগলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম; ছাগরক্ষী আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে ভয় পাইয়া তাহার ছাগলের পাল ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যূথভ্রষ্ট ছাগলগুলা পথ ছাড়িয়া চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। আমাদের সাইক্ল ছাগলের গায়ে বাধিয়া কাত হইয়া পড়িল। আমি পথের উপর নিক্ষিপ্ত হইলাম, 'সাইড কার'খানি আমার দেহের উপর উল্টাইয়া পড়িল। ছাগলটা আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, আমাকে কয়েকবার তাহার পদাঘাত সহ্য করিতে হইল, তাহার পর ছাগলটা অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া জিমি ও হাসান হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল, তাহার পর তাহারা আমাকে টানিয়া তুলিল। আমি তাহাদের সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ছাগলগুলা পার্শ্বস্থ পাহাড়ের উচ্চতর অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া করুণ নয়নে আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছিল।

হাসান বলিল, "সাহেব, আমাদের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে, এখন কি ইঞ্জিনটাকে বশীভূত করিতে পারা যাইবে না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ যাইবে।"—তাহার পর গাড়ী হইতে যে সকল জিনিস পথে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া গাড়ীতে রাখিয়া দিলাম।

এবার আমরা একটা ঘুরো পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম, দুইবার আমাদিগকে কতকগুলি ফৌজের আড্ডা পার হইয়া যাইতে হইল, আর একবার বৃটিশ শিবিরের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান একজন শান্ত্রী প্রহরীকে অতিক্রম করিতে হইল। সকলেই সবিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কেহই আমাদের গতিরোধের চেষ্টা করিল না।

অবশেষে আমরা সেই পথের একস্থানে আসিলে হাসান বলিল, সে পথ ছাড়িয়া আমাদিগকে অন্য দিকে যাইতে হইবে। সে আমাদিগকে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখাইয়া বলিল, অতঃপর সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমি সভয়ে সেই দিকে

দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম, পথটি পাহাড়ের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কিছুদূর যাইবার পর অদৃশ্য হইয়াছিল। সেই পথের কোন কোন অংশ এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, তাহা ছাগের গমনাগমনের পথের অনুরূপ। সেই পথে কিরূপে সাইক্ল চলিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি হাসানকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

হাসান আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন অসুবিধা হইবে না সাহেব, সব ঠিক হইয়া যাইবে, অদূরে পাহাড়ের নীচে একখানি গ্রাম আছে; সেই গ্রামে আমার অনেক দোস্ত আছে। সেখানে ইঞ্জিন রাখিয়া আমরা টাট্টুর পিঠে সওয়ার হইয়া চলিতে থাকিব।"

হাসানের কথা শুনিয়া জিমি হতাশভাবে আমাকে ইংরাজীতে বলিল, "ঘোড়ায় চড়িতে হইবে? সর্ব্বনাশ! আমি জীবনে কখন ঘোড়ায় চড়ি নাই!"

আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, "কুছ্ পরোয়া নাই, জিমি! যদি পাহাড়ের উপর ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভবযন্ত্রণার অবসান হইবে; তবে যদি দৈবাৎ ছাগলের পিঠে পড়িবার সুযোগ পাও, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ নাই।"

যাহা হউক, আমরা সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে সাইক্ল চালাইতে আরম্ভ করিলে 'সাইড্ কার' ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল, এক একবার তাহা উল্টাইয়া পড়ে আর কি! আমি ক্রমাগত 'গিয়ারে' ভর দিয়া চলিয়া আমার বন্ধুটিকে পতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম; কিন্তু হাসান আছাড় খাইবার ভয়ে ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে দুই এক বার আত্মরক্ষার জন্য লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, তাহার পর নতমুখে তাহার ঢিলা পায়জামা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "আবার কি ফ্যাসাদে পড়িলে, হাসান?"

জিমি হাসিয়া বলিল, "উহার ঢিলা পায়জামার ভিতর হয় ত কিছু ঢুকিয়াছে।"

হাসান আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "মাজবিল্লা! ইঞ্জিনটা শয়তানের গোলাম। উহা আমার পায়জামা মুখে পুরিয়াছে!"

মুহূর্ত্তপরে 'সেলুলইড' পুড়িবার গন্ধ পাইলাম। তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। জিমি মুঠা ভরিয়া বালি আনিতে ছুটিল; আমি হাসানের সাহায্যে অগ্রসর হইলাম, এবং তাহার পায়জামার আগুন নিবাইয়া দিলাম। হাসান দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ইঞ্জিনকে গালি দিতে লাগিল, আমি পুস্তু ভাষায় সুপণ্ডিত নহি, সুতরাং তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারিলাম না। ইতি মধ্যে জিমি আসিয়া অর্দ্ধদগ্ধ 'একুমুলেটারের' অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল।

হাসান বলিল, "ইঞ্জিনের উপর শয়তানের ভর হইয়াছে সাহেব! আমাকে উহার পছন্দ হয় নাই। আপনারা ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে থাকুন, আমি নামিয়া আপনাদের সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইব। আমরা গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি।"

যাহা হউক, জিমি তাহাকে গাড়ী হইতে নামিতে না দিয়া স্বয়ং 'পিলিয়ন সিট' অধিকার করিল; কারণ, ইঞ্জিনের 'ব্যাটারী বক্স' 'পিলিয়ন সিটে'র ঠিক নীচে থাকায় হাসানকে ঐরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল। হাসান গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে সম্মত না হইলেও জিমি তাহাকে জোর করিয়া 'সাইড কারে' বসাইয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে হাসানের পরিচ্ছদ ঢিলা ছিল বলিয়া তাহার শরীরে আগুনের আঁচ লাগে নাই। অতঃপর আমরা নির্ব্বিঘ্নে অবশিষ্ট পথটুকু অতিক্রম করিলাম।

আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়া আমরা সেই গ্রামখানি দেখিতে পাইলাম। হঠাৎ গাড়ীর চাকায় 'ফটাস্' করিয়া একটা শব্দ হইল; বুঝিলাম, আর একটা টায়ার ফাঁসিয়া গেল। আমরা বহু কষ্টে 'সাইড কারের' চাকা ঠেলিতে ঠেলিতে অবশিষ্ট কয়েক গজ অতিক্রম করিলাম। সেই সময় গাড়ী খুব দুলিতে আরম্ভ করায় ইঞ্জিনের প্রতি হাসানের অবিশ্বাসের হ্রাস হইল না; আমাদের গাড়ী থামিবা মাত্র সে 'সাইড কার' হইতে নামিয়া পড়িল। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ অঙ্গ প্রসারিত করিল। গাড়ী হইতে নামিতে পাইয়া সে খুশী হইল।

আমি ও জিমি সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়ায় হাসানের মতই আনন্দিত হইলাম। এতদ্ভিন্ন আমাদের আনন্দের অন্য কারণও ছিল। ধূলারাশিতে আমাদের সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, শরীর তাতিয়া উঠিয়াছিল এবং পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছিল।

আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া এক দল ওয়াজির আমাদের গাড়ীর কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদিগকে পরিবেষ্টিত করিল। তাহারা হাসানকে দেখিয়া সানন্দে তাহার অভ্যর্থনা করিল এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে গ্রামের 'মালিক' (সর্দ্দার) 'মোল্লা' (পুরোহিত) সহ আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে হাসান তাহাদের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল। গ্রামের মালিকটি বয়সে প্রৌঢ়, তাহার দেহ স্থূল। সে যৌবনকালে কয়েকটি ইংরাজী শব্দ শিখিয়া রাখিয়াছিল; সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে সেই শব্দগুলি সগর্ব্বে ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিল,—আমাদের ভাষায় সে অনভিজ্ঞ নহে। সে সেই সকল ইংরাজী শব্দ কিরূপে কোথায় শিখিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে জানিতে পারিলাম, যৌবনকালে সে কোন অপরাধ করায় তাহাকে কিছু দিন বান্নুর জেলখানায় বাস করিতে হইয়াছিল, সেই সময় সে ইংরাজী ভাষায় ঐরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল।

যাহা হউক, লোকটিকে আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হইল এবং সে তাহার গ্রামের পক্ষ হইতে অতিথি-সৎকারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু মোল্লাটির ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমাদের ধারণা হইল, সে আমাদিগকে শত্রুচর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। আমরা গ্রামের পথে অগ্রসর হইলে মোল্লা আমাদের অনুসরণ করিল এবং অস্ফুটস্বরে যে সকল কথা বলিতে লাগিল, তাহা তাহার গোঁফে বাধিয়া গেল।

জিমি পশ্চাতে চাহিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমাকে বলিল, "ঐ লোকটাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, ও সুযোগ পাইলেই আমাদের পিঠে ছুরী বসাইয়া

দিবে!" জিমির মন্তব্য শুনিয়া আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে বলিলাম, "চুপ কর, গাধা! লোকটা সম্ভবতঃ ইংরাজী কথা বুঝিতে পারে।"

কিন্তু জিমি আমার কথা কাণে না তুলিয়া বলিল, "লোকটা ইংরাজী কথা বুঝিতে পারুক না পারুক, ও যে একটা বুড়া বদমায়েস, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সেই গ্রামের অধিবাসীরা আসিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে এরূপ ভীড় করিয়া দাঁড়াইল যে, গ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে তাহাদের ধাক্কা খাইতে খাইতে আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। তাহারা কৌতূহলবশে আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। তাহাদের কোন দুরভিসন্ধি ছিল বলিয়া মনে হইল না।

জিমি বলিল, "উহাদের গায়ের গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রের প্রীতিকর না হইলেও উহাদিগকে বন্ধুভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে।"

আমরা যখন সেই গ্রামের 'হুজরা' অর্থাৎ অতিথিশালার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখনও সেখানে অতিথি-সৎকারের আয়োজন শেষ হয় নাই। অতিথিশালার আঙ্গিনায় একটি উনানের উপর তখন রন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল। একটি স্ত্রীলোককে চা প্রস্তুত করিতে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম বটে, কিন্তু সেই সময় সহসা তিনখানি 'চারপাই'এর আবির্ভাবে আমার বন্ধু দমিয়া গিয়াছিল—তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

জিমি হাসানকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে হাসান, এই সকল শয্যা এখানে বহিয়া আনিবার কারণ কি? আমরা কি এখানে ঘুমাইতে আসিয়াছি? কি বল তুমি?"

হাসান তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "হাঁ সাহেব, কয়েক মিনিটের মধ্যে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। ইয়াকুব খাঁর নিকট শুনিলাম, বদমায়েসের দল অদূরে বাস করে। এই জন্য আজ রাত্রে এই গ্রামেই বাস করা সঙ্গত, কাল সকালে আমাদের গ্রামে যাত্রা করিলেই চলিবে।"

অদূরে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোল্লাটিকে দেখিতে পাইলাম; সে তখনও তীব্রদৃষ্টিতে আমাদের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জিমি বলিল, "হুঁ, আশা করি, কেহ আমাদের ঐ কদাকার বন্ধুটির আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।"

আমরা পথে চলিবার সময় ধূলি-ধূসরিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই ধূলা অপসারিত করিয়া পরিচ্ছন্ন হইবার জন্য আমাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইল না; কারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য, ওয়াজিরিরা ইহা ধারণা করিতে পারে না। স্বাস্থ্যরক্ষার এই বিধান তাহাদের অজ্ঞাত। মালিক আমাকে ও জিমিকে তাহার দুই পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল, তাহার অভিপ্রায় অনুসারে হাসান আমার ডান পাশে বসিল। গ্রামের মাতব্বর অধিবাসীরা স্ব স্ব পদোচিত গৌরব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন করিল; কিন্তু জনসাধারণ সেই আঙ্গিনায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অতঃপর 'বাল্‌ঘামি' নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য পেয়ালায় চায়ের পরিবেশণ আরম্ভ হইলে মালিক ইংরাজের আচার-ব্যবহারে তাহার অভিজ্ঞতা সপ্রমাণ করিবার জন্য দুধ ও চিনি স্বতন্ত্র পাত্রে পরিবেষণ করিবার আদেশ প্রদান করিল। ওয়াজিরিরা সাধারণতঃ চায়ের পাত্রে তাহার সহিত দুধ ও চিনি মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থ পেয়ালায় ঢালিয়া পান করে, এবং তাহার সহিত নানাপ্রকার মশলা মিশ্রিত করিয়া এরূপ অদ্ভুত পদার্থে পরিণত করে যে, সাধারণ য়ুরোপীয় রুচি অনুসারে তাহা পানের অযোগ্য হইয়া উঠে।

সেই চায়ের স্বাদ কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া জিমিকে ইঙ্গিতে জানাইলাম—সে যেন চায়ের পেয়ালায় ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তাহার তারিপ করিতে ভুলিয়া না যায়। জিমি আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মাথা নাড়িয়া মুক্তকণ্ঠে চায়ের প্রশংসা করিতে লাগিল।

অতঃপর আমাদের যাহা আহার করিতে দেওয়া হইল, তাহা সত্যই মুখরোচক; দুম্বার রোষ্ট, পোলাও, এক এক ডিস্ মুরগীর চপ্, কারি, দ্রাক্ষা, নানাপ্রকার মশলা প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইল। সকলের শেষ হালুয়া ও চা আনীত হইল। দুম্বার মাংস আমাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মানের নিদর্শন, এবং উহা এই সকল পার্ব্বত্য জাতির আতিথেয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ। পার্ব্বত্য পল্লীসমূহের মালিকরা তাহাদের সম্মানাস্পদ অতিথি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দুম্বার মাংস দ্বারা অভিনন্দিত করে না।

আমাদের আহার শেষ হইলে মালিক আমার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ আমি দুই রকমে ধন্য হইয়াছি। সাহেবরা দয়া করিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন এক জন মহা পবিত্র সাধু পুরুষের দর্শনলাভ করিয়াছি, তিনি মান্‌কি মুল্লা নামে বিখ্যাত, কিস্‌মতের গুপ্তরহস্য তাঁহার সুবিদিত। মানুষের ভাগ্যে কি লেখা আছে—তাহা তিনি বলিয়া দিতে পারেন।"

জিমি গ্রাম্য সর্দ্দারের কথা শুনিয়া বলিল, "সেই সাধুটা কি এখানে আছে?"

ইয়াকুব খাঁ বলিল, "না সাহেব, তিনি দুই দিন উপর্য্যুপরি কিছুই পানাহার করেন না, তাঁহার কণ্টক-শয্যাও ত্যাগ করেন না।"

জিমির হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তির লেশমাত্র ছিল না; সে সাধুর কথা শুনিয়া বলিল, "নির্ব্বোধ গাধা!" তাহার পর মালিককে পুস্তু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না?"

মালিক বলিল, "সাহেবরা যদি আমার সঙ্গে আসেন, তাহা হইলে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে পারি।"

মালিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাসান সেই স্থানেই বসিয়া রহিল। আমরা মালিকের সঙ্গে 'হুজরা' ত্যাগ করিলাম। তাহার পর নির্জ্জন আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরবর্ত্তী একখানি গৃহের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। এজন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইতে আমাদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইল। আমরা সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইলে কে যেন সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল,—

"লা ইলাহাইল্লা ল্লাহু মহম্মদ রসুলুল্লা"

আমরা সেই গৃহের একটা কোণ ঘুরিয়া সম্মুখে যাইতেই দুইটি ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোকে একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাহা এক জন ফকিরের মূর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বয়স কত অনুমান করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ-রাশি ও দাড়িতে তাঁহাকে সম্মানাস্পদ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। একখানি কৌপীন ভিন্ন তাঁহার পরিধানে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। তাঁহার বাহুতে চর্ম্ম-নির্ম্মিত ফিতা দ্বারা আবদ্ধ ধাতু-নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র চোঙ দেখিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ তাহাতে মুল্লাগণের প্রীতিকর কোন প্রকার কবচ সংরক্ষিত ছিল।



আমরা গৃহকোণে দাঁড়াইলাম

কিন্তু তাঁহার শয্যার বিশেষত্ব দেখিয়াই আমি অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহার সেই শয্যা ঊর্দ্ধমুখী গজাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন! একখানি তক্তার উপর গজালগুলি ঊর্দ্ধমুখে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেই তক্তার নীচে চারি মুড়ায় চারিটি কাঠের চাকা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই তক্তার দুই পাশে দুইটি অনুচ্চ কাঠের হাতা ছিল।

মানকি মুল্লার শীর্ণ দেহ কঙ্কাল-সার। তাঁহার দেহের প্রতি গ্রন্থির অস্থিগুলি এরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যে, কোন্ মুহূর্ত্তে তাহা চর্ম্ম ভেদ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে! তথাপি তিনি সেই সকল ধারালো কিন্তু মরিচা-ধরা গজালের উপর এরূপ নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়াছিলেন যে, দেখিয়া মনে হইল, তাহাতে তিনি বেশ আরাম উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি তখন একখানি কেতাব পাঠ করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা কোরাণ।

আমরা তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি কেতাবখানি বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর সুদৃঢ় অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "থামো, আর আমার অধিক কাছে আসিও না।" তাঁহার সেই সতেজ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা যত না বিস্মিত হইলাম, তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে সুস্পষ্ট স্বরে কথাগুলি বলায় ততোধিক বিস্মিত হইলাম।

আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। ইয়াকুব খাঁ সম্ভ্রমভরে আরও দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর মুল্লাজি আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিলেন, এত দিন পরে আমি তাহা স্মরণ করিয়া ঠিক বলিতে পারিব না; তবে যত দূর আমার স্মরণ আছে, তাহা এইরূপ—

"সাহেবরা আমার কাছে আসিয়াছেন, কৌতূহল ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণ নাই; তাঁহাদের মন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর বহু দিন পর্য্যন্ত আমার কথা স্মরণ রাখিবে। প্রথমতঃ আমার কথা তোমাদের মর্ম্মস্পর্শী হইবে, এমন কি, যে সাহেবটা সম্মান করিতে জানে না, তাহাকেও আমার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে।"

এই শেষোক্ত কথাগুলি আমার সঙ্গীকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সন্দেহ নাই। কথাটি যে সত্য, ইহা সে বুঝিতে পারিলেও তাহার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না।

ফকির গম্ভীর স্বরে, মুহূর্ত্তের জন্য না থামিয়া, তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিলেন। কথাগুলি তাঁহার সতেজ কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু ওষ্ঠ অতি অল্পই নড়িল। দৈবজ্ঞেরা যে ভাবে ভাগ্যফল বলিয়া থাকে, সেই ভাবেই তিনি আমাদের অতীত জীবনের উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনার কথা বলিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে সেই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং সেই সকল ঘটনা উপলক্ষে আমাদিগকে যে সকল লোকের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল—তাহা তিনি এরূপ নির্ভুলভাবে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম। তাহার পর তিনি আমাদের ভবিষ্যতের কথা বলিতে লাগিলেন, আমাদের জীবনে অল্পদিন পরে কি ঘটিবে, তাহা বলিলেন, বহুদিন পরে কি ঘটিবে—তাহাও বলিয়া দিলেন।

এই ফকিরের সহিত সাক্ষাতের পর আমি অনেকের নিকট তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহা শুনিয়া অনেকে বলিয়াছিলেন, সেই ফকির নানাভাবে মানুষকে সম্মোহিত করিতে পারিতেন। এই শক্তির সাহায্যেই তিনি আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের এই যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; কারণ, ফকির আমার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার একটিও মিথ্যা হয় নাই, তাহা এমন ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে আমাকে স্তম্ভিত হইতে

হইয়াছিল। এখনও তাঁহার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে বাকি আছে; কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাহা সফল হইবে।

ফকির প্রথমে জিমিকে সম্বোধন করিয়া তাহারই ভাগ্যফল বলিয়া দিলেন। তিনি তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা এই যে, তাহাকে আর অতি অল্পদিন সীমান্ত-প্রদেশে বাস করিতে হইবে; সে সরকারের নিকট হইতে সম্মানলাভ করিবে, তাহার পর দেশান্তরে 'অগ্নিকাণ্ড ও ভীষণ আঘাতের ফলে' তাহার মৃত্যু হইবে!

আমার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, আমি যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম—সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, এমন কি, আমি প্রশ্ন-পত্রের উত্তর লিখিয়া কত নম্বর পাইব, তাহা পর্য্যন্ত তিনি বলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমি স্বদেশ হইতে কোন দুঃসংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিব, তাহার পর আমি সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিব, আমি দীর্ঘজীবী হইব, অবশেষে সাতাত্তর বৎসর বয়সে আমার মৃত্যু হইবে!

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জিমি সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। জিমি খ-পোত-বিহারে অসাধারণ সাফল্য-লাভ করায় সরকারের নিকট সম্মানের নিদর্শনসূচক পদক উপহার পাইয়াছিল; তাহার পর তাহাকে খ-পোত-পরিচালন-কার্য্যে ইরাকে বদলী হইতে হইয়াছিল।

আমার সম্বন্ধে তাঁহার গণনা এরূপ সত্য হইয়াছিল যে, আমার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে, আমি যে নম্বর পাইয়াছিলাম, তাহা আনাইয়া দেখিলাম, ফকির যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তত নম্বর পাইয়াছি!

জিমি ইরাকে বদলী হইলে আমি স্বদেশ হইতে যে তার পাইলাম, তাহাতে জানিতে পারিলাম, আমার কোনও নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে, এজন্য অবিলম্বে আমার ইংলণ্ডে যাত্রা করা অপরিহার্য্য হইল। স্বদেশে উপস্থিত হইবার পর এরূপ কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা ঘটিল যে, যদিও আমি সরকারী চাকরীতে ইস্তফানামা দাখিল করি নাই, কিন্তু আমাকে স্বদেশেই থাকিতে হইয়াছে। এখন আমি ফকির সাহেবের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি তাঁহার অসাধারণ যোগশক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।

যাহা হউক, আমাদিগকে বিদায় দান করিবার সময় এই অদ্ভুত লোকটির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা দেশভ্রমণে বাহির হইয়া হাসানের জন্মস্থান কট-আলি পর্য্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ফকির সাহেব আমাদের মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন—আমরা কট-আলির পথে অগ্রসর না হইয়া যেন পরদিন বান্নুতে প্রত্যাগমন করি। তিনি এ কথাও বলিলেন যে, আমরা আমাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত না করিলে তাহার ফল শোচনীয় হইবে। আমাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

তাহার পর তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন, এবং তাঁহার কেতাব খুলিয়া পূর্ব্ববৎ সুর করিয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। অতঃপর আমরা ধীরে ধীরে মালিকের নিকট আসিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে অতিথিশালায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

আমরা অতিথিশালায় প্রত্যাগমন করিলে হাসান আমাদের নিকট বিদায় লইয়া সেই বৃহৎ কক্ষের অন্য প্রান্তে তাহার চারপাইএর উপর দীর্ঘ দেহভার প্রসারিত করিল। আমি ও জিমি দ্বারের কাছে বসিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমরা মান্কি মুল্লার আদেশ পালন করিব, না, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হাসানের সহিত আমাদের সঙ্কলিত পথে অগ্রসর হইব?

আমার ধারণা হইয়াছিল, ফকিরের কথা লরেন্স গ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু দেখিলাম, তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ফকির তাহার হৃদয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ফকিরের



পাহাড়িয়া বন্দী

আদেশ অগ্রাহ্য করিতে প্রথমে লরেন্সের সাহস না হইলেও অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিল, "বুড়ো ভিখারীটার কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আমরা যে কতকগুলা অসভ্য পাহাড়িয়ার ভয়ে আমাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিব—ইহা হইতেই পারে না। আমরা যাহা স্থির করিয়া বাহির হইয়াছি, তাহা করিতেই হইবে।"।

আমি বলিলাম, "বেশ, তাহাই হইবে!"—তাহার পর আমরা হাসানের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলাম।

প্রত্যুষে হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কয়েক মিনিট পরে দুইটি স্ত্রীলোক চা, চাপাটি এবং ডিমসিদ্ধ লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আর একটি স্ত্রীলোক একটি বৃহৎ মৃৎ-কলসে ঝরণার নির্ম্মল জল লইয়া আসিল। তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। সেই পানীয় জলে আমরা হাত-মুখ প্রক্ষালন করিলাম দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরে আমরা হাসানের নিকট জানিতে পারিলাম, সেই জল চার মাইল দূর হইতে আনীত হয় বলিয়া তাহারা সেই জলের ঐরূপ অপব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল।

অতঃপর আমরা অতিথিশালার আঙ্গিনার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ আমাদের বিদায় দেখিতে আসিয়াছে। নিকটেই একটা খুঁটায় তিনটি দৃঢ়কায় ক্ষুদ্র অশ্ব আমাদের জন্য বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল।

হাসান আমাদের পথি-প্রদর্শকরূপে অগ্রগামী হইল, লরেন্স তাহার অনুসরণ করিল। এই পনিগুলি পার্ব্বত্য ছাগের ন্যায় পার্ব্বত্য পথ-ভ্রমণে সুদক্ষ। আমরা ঘোড়ার পিঠে স্থিরভাবে

বসিয়া রহিলাম, ঘোড়াগুলি স্বেচ্ছায় হাসানের ঘোড়ার অনুসরণ করিল।

বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা একটি গিরিচূড়ায় আরোহণ করিয়া সেখানে ঘোড়া থামাইলাম। উপত্যকার অপর পার্শ্বে কতকগুলি কুটীর দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—উহাই কট-আলি।

অল্পকাল পরে বিপরীত দিকের পাহাড়ের কোন স্থান হইতে রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলী আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল; তাহার পর দ্বিতীয়বার রাইফেলের গুলী চলিলে বুঝিতে পারিলাম, আমরাই তাহার লক্ষ্য। আমরা ঘোড়াগুলিকে লইয়া তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলাম। অনন্তর গুল্মপরিবেষ্টিত একটি নিম্নভূমিতে আমরা অবতরণ করিলাম।

জিমি রুদ্ধশ্বাসে হাসানকে বলিল, "এ কি ব্যাপার, হাসান! ইহাই কি তোমাদের গ্রামের লোকের অভিনন্দনের রীতি?"

হাসান বলিল, "ইহা বোধ হয় আমার পিতার জ্ঞাতিভ্রাতা চাচার কীর্ত্তি। সে আমাদের পরিবারস্থ কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য বহুদিন হইতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আপনারা এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিলে আমি ইহার কারণ জানিবার চেষ্টা করিতে পারি।"—হাসান তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

হাসানের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইলাম। সেই সময় অদূরবর্ত্তী ঝোপের ভিতর কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মনে হওয়ায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথমে ভাবিলাম, হাসানই হয় ত ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমরা সেই ঝোপটি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা পত্রান্তরালে শুভ্র পরিচ্ছদের উর্দ্ধে একযোড়া কালো চোখ দেখিতে পাইলাম। একটা লোক সেখানে লুকাইয়া থাকিয়া নির্নিমেষ-নেত্রে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। আমিও কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; একবার ইচ্ছা হইল, লোকটাকে গুলী করি। কিন্তু হঠাৎ গুলীবর্ষণ না করিয়া মৃদুস্বরে জিমির মত জিজ্ঞাসা করিলাম।

জিমি বলিল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর।"—তাহার পর সে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে পুস্তু ভাষায় বলিল, "নিরস্ত্র সাহেবদের দেখিয়া যে লুকাইয়াছে—সে কাপুরুষ। কে ওখানে লুকাইয়া আছ, বাহিরে এসো,—আমরা তোমাদের বন্ধু লোক।"

কিন্তু কেহই আমাদের সম্মুখে আসিল না। তখন আমি দৃঢ়পদে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম; লরেন্সও অন্যদিক হইতে সেই গুল্ম লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। তথাপি সেই কালো চোখ দুইটি সেই ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে আমরা সেই গুল্মের নিকট উপস্থিত হইলাম, জিমিও আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি সম্মুখস্থিত লতা-পাতা সরাইয়া ফেলিতেই সেই কালো চোখের নির্ব্বাক্ মালিক হঠাৎ বাক্শক্তি লাভ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'থালাম, মহারাজা থাহিব!'

দেখিলাম, সে চারি পাঁচ বৎসর-বয়স্ক একটি হৃষ্টপুষ্ট ওয়াজির বালক! সে মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দেহে একটি ক্ষুদ্র সাদা সার্ট, চক্ষুতে কৌতূহল, বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ভাব পরিস্ফুট।

এই দৃশ্যে আমার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল। আমি গম্ভীরভাবে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তাহার নাম আলম গুল্। তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে সে কট-আলির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। ছেলেটিকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। শীঘ্রই তাহার সঙ্গে আমাদের মিতালী হইয়া গেল।

আরও আধঘণ্টা পরে হাসান ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আমরা আলম গুলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছি। আলম গুল তখন জিমির পিঠে চড়িয়া হাসিতেছিল।



বান্নুর বাজার

হাসানকে দেখিয়া আলম গুল খুসী হইতে পারিল না। হাসান তাহাকে এত দূরে আসিতে দেখিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। কিন্তু সে তাহার আদেশ পালন না করিয়া বলিল, সে 'মহারাজা থাহিবে'র কাছে থাকিবে, বাড়ী যাইবে না। কিন্তু আমরা তাহাকে বিদায় করিলাম, সে ক্ষুন্নমনে কট-আলির দিকে প্রস্থান করিল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

বালকটিকে তাড়াইয়া দিয়া আমাদের বড় দুঃখ হইল, কিন্তু হাসানের বিলম্বের কারণ জানিবার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম, আলম গুল অদৃশ্য হইলে লরেন্স হাসানকে বলিল, "ব্যাপার কি, হাসান? তুমি কি তোমার সেই দুষ্ট চাচার দেখা পাও নাই?"

হাসান মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভারী মুস্কিল বাধিয়াছে, সাহেব!"—তাহার পর সে যে সকল কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, সরকারের (বৃটিশ সরকার) সহিত গ্রামের

লোকের বিরোধ চলিতেছে, কারণ, তাহারা কয়েক জন ফেরারী আসামীকে আশ্রয় দান করিয়াছে। সরকার সেই সকল আসামীর দাবী করিয়া জানাইয়াছেন, যদি তাহাদিগকে সরকারের হস্তে অর্পণ করা না হয়, তাহা হইলে গ্রামের সকল লোকের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হইবে; জরিমানা আদায় না হইলে এরোপ্লেন হইতে তাহাদের গ্রামের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হইবে।

এই অবস্থায় গ্রামের মালিকের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত। ওয়াজিরদের আতিথেয়তার নিয়ম অনুসারে শরণাগত অতিথিকে তাহারা সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ সেই সকল অপরাধী কোন কোন সমর-নিপুণ দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য জাতিরও প্রিয়জন, তাহারাও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এ অবস্থায় ওয়াজির গ্রামবাসীরা যদি অপরাধীদিগকে সরকারের হস্তে অর্পণ করে—তাহা হইলে ঐ সকল পার্ব্বত্য-জাতির সহিত তাহাদের বিরোধ অপরিহার্য্য হইবে। অথচ সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে কি ফল হইবে, তাহাও তাহাদের অজ্ঞাত নহে। বস্তুতঃ, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাসানের চাচা গুলীবর্ষণ করে নাই, আমরা সরকারের গুপ্তচর সন্দেহে অন্য লোক আমাদের উপর গুলী চালাইয়াছিল।

আমরা হাসানের নিমন্ত্রণেই তাহাদের গ্রামে যাইতেছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে এইভাবে বিপন্ন করিবার চেষ্টা হওয়ায় এবং হাসানের আশা পূর্ণ না হওয়ায় হাসানের অত্যন্ত 'সরম' বোধ হইল, সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। আমরা তাহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। অবশেষে আমরা অশ্বে আরোহণ করিয়া ফিরিয়া চলিলাম। সেই সময় মানকি মোল্লার ভবিষ্যদ্বাণী আমার স্মরণ হইল।

রাত্রি আটটার সময় আমরা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া ক্লান্ত-দেহে ইয়াকুব খাঁর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। আমাদের আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ শুনিয়া তাহার প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। কিন্তু সে আশা করিল, আমরা সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করায় কট-আলির মালিক তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। ইয়াকুব খাঁ সেই রাত্রিতেও তাহাদের গ্রাম্য অতিথিশালায় আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া অতিথি-সৎকার করিল বটে, কিন্তু আমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইল—পরদিন প্রত্যূষেই আমরা তাহাদের গ্রাম ত্যাগ করিব। সেই রাত্রিতেই গ্রামের সকল লোক আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জানিতে পারিল, সুতরাং গ্রামের কোন লোক পূর্ব্ববৎ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। আহারে বসিয়া দেখিলাম—না ছিল দুম্বার মাংস, না ছিল পোলাও, কেবল ডিমসিদ্ধ, চাপাটি ও পানীয় জল এ যাত্রায় অতিথি-সৎকারের উপকরণ! আমি জানিতাম, যে ওয়াজির কোন নিরস্ত্র অতিথির সহিত আহার করিয়াছে, সে কোন কারণে তাহার অনিষ্ট করিবে না; এই জন্য আমরা আহারান্তে নিঃশঙ্কচিত্তে কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম, আমাদের প্রাভাতিক খানা প্রস্তুত; পূর্ব্বেই হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। জিমিকে তাহার শয্যা হইতে ঠেলিয়া তুলিতে কষ্ট হইল, সে অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল। সে অতিকষ্টে উঠিয়া আহারে বসিল এবং দেহের বেদনায় মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

অতঃপর আমরা মালিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের মোটর-সাইক্লের নিকট ফিরিলাম, সাইক্লের অবস্থা দেখিয়াই আমাদের চক্ষুঃস্থির! পাহাড়ে পথে চলিয়া টায়ারের ভিতরের টিউব এভাবে নষ্ট হইয়াছিল যে, তাহা মেরামত করিবার উপায় ছিল না, বিশেষতঃ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সাইক্লের যে গতি হইয়াছিল—তাহা তখন ধরা পড়িল।

হাসান তাহাদের গ্রামের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আর আমাদের সঙ্গে থাকিতে সাহস করিল না; সে বলিল, আমাদিগকে বড় রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদের নিকট বিদায় লইবে। কিন্তু আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দান করিলাম। সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অতঃপর আমরা কোন রকমে সাইক্ল লইয়া সেই গ্রাম ত্যাগ করিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা বান্নু-রাজমাক রোড দিয়া বান্নুর পথে অগ্রসর হইলাম।

আমি এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার কয়েক সপ্তাহ পরে জানিতে পারিলাম, জিমি যে এরোপ্লেনে আকাশে উঠিতেছিল, তাহাতে হঠাৎ আগুন লাগিয়াছিল, সেই অর্দ্ধদগ্ধ এরোপ্লেন সবেগে জলশায়ী হওয়ায় জিমি নিহত হয়। তাহার অপমৃত্যু সম্বন্ধে মানকি মোল্লার ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



অল্প একটু গল্প

ছুটী! ছুটী!

এক্স্‌মাসের ৯ দিনের সঙ্গে, পনের দিনের ছুটী মঞ্জুর হইয়া গেল। মোট ২৪ দিন অর্থাৎ প্রায় এক মাস। পরিপূর্ণ অন্তরে সকাল সকাল আফিস হইতে বাহির হইয়া বরাবর একবারে হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম এবং দুইখানি ওয়ালটেয়ারের টিকিট কিনিয়া ফেলিলাম। কুসুমের ওয়ালটেয়ার এই প্রথম। খুব আহ্লাদ হইবে নিশ্চয়ই। চব্বিশটা দিনই যে ওয়ালটেয়ারেই কাটাইব, তাহা নয়, কনারক, চিল্কা, পুরী, ভুবনেশ্বর, এগুলাও কুসুমকে দেখাইয়া আনিতে হইবে।

কন্‌-কনে শীত। সর্ব্বাঙ্গ আলোয়ানে ঢাকা, তবুও হাত-পা আর নাকের ডগা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিতেছে—কাশীর ওদিকেই না কি এবার বরফ পড়িতে সুরু করিয়াছে।

বাড়ীতে আসিয়া কুসুমকে বলিলাম,—"কিসি, ছুটী পেয়েছি। চল্লিশ দিন। একটি দিনও কিন্তু এখানে বাজে কাটালে চলবে না অর্থাৎ কালই বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি একেবারে টিকিট পর্য্যন্ত আজ কিনে এনেছি।"

"কোথাকার?"

"ওয়ালটেয়ার; ফেরবার সময় অমনি চিল্‌কা, কনারক, পু—"

"ও সব না। দার্জ্জিলিং যাব।"

চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম,—"এই দুর্জ্জয় শীতে দার্জ্জিলিং!"

"হ্যাঁ" বলিয়া কুসুম খাটের তলা হইতে দুধের বাটি হাতে লইয়া, বোধ হয়, নীচে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ ধরিয়া বিস্মিত হইয়া আমি তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু অবশেষে স্থির করিলাম যে, দার্জ্জিলিংয়েই যাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কুসুমের কথার প্রতিবাদ করা চলিবে না। দার্জ্জিলিংয়ের পরিবর্ত্তে যদি ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড বলে, তাহা হইলে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেই যাইতে হইবে। তাহার কারণ বলিতে হইলে গত বৎসরের একটা গল্প বলিতে হয়। গল্পটি অত্যন্ত ছোট। সুতরাং বিনা আপত্তিতে স্বচ্ছন্দেই তাহা বলিতে পারা যায়। গল্পটি—অবশ্য গল্প নহে, সত্য ঘটনা—এইরূপ :—

ফাল্গুন মাস। বসন্তের মলয়-বাতাস লাগিয়াও ভালর বদলে শরীরটা হঠাৎ বড় মন্দ হইয়া পড়িল। বিকালের দিকে প্রত্যহই যেন একটু জ্বরভাব, চোখজ্বালা, নিশ্বাসটা অল্প গরম, মাথাটা একটু টিপ্‌ টিপ্‌। ডাক্তার বলিলেন,—"ম্যালেরিয়া ব্যাসিলি।"

কবিরাজ বলিলেন,—"পিত্তপ্রকোপ।" আমি মনে মনে বলিলাম,—অ্যাও নয়, অ-ও নয়। আসল কথা বাঙ্গালীর ৪০ বৎসরের দেহ। ভাঙ্গন লাগিয়াছে; এ ওই ভাঙ্গনেরই এক একটা মৃদু কোমল করস্পর্শ। নাম যাহার যাহা ইচ্ছা দিবার আপত্তি নাই, দিউক। তবে ঈশ্বর গুপ্তের—'ভাঙ্গন ধরিলে গাঙ্গে রাখে সাধ্য কার?' সুতরাং মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। ঔষধও খাওয়া চলিল। ওঁদের 'antimalarico', এঁদের ত্রিফলার জল, মকরধ্বজ। কিন্তু ফলে কিছুই বুঝিলাম না। অবশেষে আর এক নবীন চিকিৎসক আসিলেন—কুসুম। কুসুম কহিল—"দু'মাসের ছুটী নাও। হাওয়া বদল না করলে শরীরের এ ভাবটা কাটবে না। এ রকম ঘুস-ঘুসে জ্বর ত ভাল নয়। কালই ছুটীর দরখাস্ত ক'রে দাও।" কাহারও পরামর্শ ও ব্যবস্থা কখন অগ্রাহ্য করি নাই, সুতরাং নূতন চিকিৎসকের পরামর্শও পালন করিলাম। দুই মাসের ছুটী লইলাম।

কুসুম কহিল,—"চল, এই সময়টা পুরী খুব সুন্দর—পুরীতেই যাই।"

আমি কহিলাম,—"পুরী নয়, কাশী যাব।"

কুসুমের মুখে একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল, কহিল,—'পড়লো ফাগুন ত উঠলো আগুন'—এ সময় কাশী? পুরীতেই যেতে হবে। কেমন দক্ষিণের ঝির্‌-ঝিরে বাতাস, সমুদ্দুর, কেমন না-গরম, না-ঠাণ্ডা, কেমন—"

বাধা দিয়া কহিলাম,—"না—না, পুরী অন্য সময়ে হবে। এবার কাশীতেই চল।"

কুসুম আর কোন বাদ-প্রতিবাদ করিল না। বিরক্তিটা মনে মনে তাহার যে চরমেই উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিতে

আর বাকী রহিল না, কারণ, বিবাহের পর এই ছয় বৎসর ধরিয়া তাহার স্বভাবের সহিত ভালরূপেই পরিচিত হইয়াছি। যাহা হউক, বিরক্তিটা শেষে মনেই চাপিয়া কুসুম কহিল,—"বেশ, চল।"

সুতরাং কাশীতেই আসা হইল। পুরাতন ভৃত্য দয়ালের উপর বাটীর ভার দিয়া পরদিনই কুসুমকে লইয়া কাশী-যাত্রা করিলাম। সরকার মহাশয়ও যাহাতে এই দুইটা মাস তাঁহার বাসায় না থাকিয়া আমার এখানেই থাকেন, সে ব্যবস্থাও করিলাম। দয়ালকে সাবধানে থাকিতে উপদেশাদি দিতেও ভুলিলাম না। সব ঘর যেন প্রত্যহ ঝাড়া-পোঁছা হয়, সদরের দরজা যেন সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এক জ্ঞাতি-মামা লক্ষীকুণ্ডায় থাকিতেন, তাঁহারই বাসার কাছে বাসা লওয়া হইল। অনেক দিন পরে মামার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, তিনি খুব খুসী হইলেন। বিবাহ হওয়া অবধি মামীমা কুসুমকে দেখেন নাই। তিনি বলিলেন,—"সকলকে লুকিয়ে যেমন বিয়ে করেছিলি, তা বউ এনেছিস বটে বাবা; সভার মাঝে বসিয়ে দেওয়া যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী আছে ত?"

বলিলাম—"শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী নেই।"

"বৌমার আর ভাইবোন্ ক'টি? ছোট বোন্-টোন আর নেই আইবুড়ো? হরকালীর মা হরকালীর জন্যে সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, এই রকম মেয়ে পেলে তা হ'লে ত ওরা বর্তে যায়!"

"না মামীমা, এ রকম ও রকম কোন রকমই আর নেই। ভাই একটি ছিল শুনেছি, মনের দুঃখে তিনি আজ ছ'বছর বিবাগী।"

"বলিস কি রে! বিবাগী! কেন, বৌমা?" মামীমা উত্তরের জন্য যাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম,—"কি জানি মামীমা। তিনি কুসুমের চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলেন এবং কুসুমের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত বেশই ছিলেন। কুসুমের বিয়ের পর হঠাৎ তাঁর কি হ'ল—"

কুসুমের শরীরের রক্ত-কণিকাগুলি বোধ হয় তাহার মুখে আসিয়া জমা হইল। বুঝিলাম, তাহার ভয়ানক রাগ হইতেছে। সুতরাং অন্য কথার প্রসঙ্গ তুলিয়া কথাটাকে চাপা দিলাম।

এইরূপে কাশীবাসের প্রথম দিনগুলি আমার কাটিতে লাগিল।

* * * *

ছুটীর দুই মাসের এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। বসন্তের অপরাহ্ণ। বাহিরের দিকে একখানা প্রশস্ত ঘর ছিল। সেইখানাকেই বৈঠকখানার মত করিয়া লইয়াছি। মেঝেতে একখানা মাদুর পাতিয়া, তাকিয়া হেলান দিয়া, খোলা দরজার ফাঁকে প্রকৃতির বাসন্তীরূপ—না, প্রকৃতির কোন রূপই এই জনবহুল গলিটির ভিতর নাই। আছে সম্মুখের দিকে সারি সারি কয়খানা খাপরার ঘর; তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি। ঘরের মালিকরা বেনারসী কাপড় বোনে। তাহাদেরই তাঁতের ঠক্-ঠকানি মধুর অপরাহ্ণ ভেদ করিয়া কাণে আসিয়া লাগিতেছে। এ পাশে একটা আদ্যকালের প্রকাণ্ড নিমগাছ ছিল। মানুষের বৃদ্ধকালে যৌবন লাগে কি না, তাহা মানুষ বলিতে পারে, কিন্তু এই প্রাচীন বৃক্ষটির শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে নব-যৌবনের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহার কচি কচি রক্তাভ পাতাগুলি বসন্তের যে গোপন সংবাদটি আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই সমগ্র বৃক্ষটির গায়ে পুলক যেন ধরিতেছে না। ঐ দিক্ হইতেই মাঝে মাঝে এক এক ঝলক মৃদু বাতাস গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল আর যেন বলিতেছিল,—"তোমার দিন গেলেও আমার যায় নাই। আমি আছি। যারা আছে, তাদের জন্য আছি, অনন্তকাল ধ'রে থাকবো।"

হঠাৎ দরজায় কাহার ছায়া পড়িল।

একটি গৌরবর্ণ, সুন্দর ছিপছিপে পুরুষ। ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পদ। মাথার চুলগুলি কুঞ্চিত, অবিন্যস্ত, রুক্ষ। পরিধানে শুভ্র থানের বস্ত্র ও উত্তরীয় অর্থাৎ অশৌচের বেশ। কিন্তু উত্তরীয়ের উপর গলায় বেড় দিয়া একখানি সুদৃশ্য টারকিশ টাউয়েল্ তাঁহার বক্ষ ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছিল।

অতি মৃদুপদক্ষেপে দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি অতি ধীর-কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আসতে পারি কি?"

কণ্ঠে কোমলতাও যতখানি, কাতরতাও ততখানি।

আমি তাঁহার বিমর্ষ মুখের দিকে তাকাইয়া তাকিয়া পরিত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম, বলিলাম,—"আসুন। কাকে চান আপনি?"

"আপনার কাছেই এসেছি। আমি বিদেশী এবং বিপন্ন। আপনাকে একটু দয়া করতে হবে।"

শেষের কথা কয়টি যেন তাঁহার অন্তরের ব্যথার সমুদ্রে সিক্ত হইয়া বাহির হইল। তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন সেখান পর্য্যন্ত সে সমুদ্র উচ্ছ্বাসে ভরিয়া আসিয়াছে। পুরুষ বলিয়াই হউক অথবা আর যাহার জন্যই হউক, কূল ছাপাইয়া তাহা গড়াইল না। বলিলাম, "—বসুন আপনি। আমার কাছে আপনি কি চান ?"

প্রায় ৫।৭ মিনিট ধরিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, তিনি দিল্লীতে মেসার্স হেনরি টমসান কোম্পানীতে সামান্য ৩৫৲ টাকা মাহিনার চাক্‌রী করেন। বুড়া মা শেষবয়সে কাশীবাস করিতেছিলেন। হঠাৎ মায়ের কঠিন অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি সাহেবের কাছে ১৫ দিনের ছুটী ও প্রাপ্য এক মাসের বেতন চাহেন। সাহেব খুব রাগী লোক। প্রথমতঃ দু'য়ের কোনটাই দিতে রাজী হন নাই। অবশেষে আরও পাঁচ জনে তাঁহার হইয়া সাহেবকে ধরাধরি করিলে, সাহেব ১৫ দিনের ছুটী মঞ্জুর করেন। তার পর এর ওর তার কাছ হইতে একশ'টি টাকা যোগাড় হয়। ইহাতে দিল্লীতে তাঁহার ১৫ দিনের দুই দিন কাটিয়া যায়। তার পর তিন দিনের দিন কাশী আসিয়া তিনি মাতাকে আর দেখিতে পান না। তাঁহার শ্মশানের দাহস্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও তথাকার মৃত্তিকা মাথায় ঠেকাইয়া মাতার শ্রাদ্ধের আয়োজন ও অপেক্ষায় থাকেন। আগামী কাল মাতার শ্রাদ্ধ। কিন্তু গত রাত্রিতে ঘর হইতে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধের সম্বল, অতি কষ্টে যে সঞ্চিত সেই একশটি টাকা চুরি গিয়াছে।

বিপদের কাহিনী মোটামুটি জানাইয়া তিনি কহিলেন, —"বিদেশ, বিভুঁই। এখানে কোন লোকের সঙ্গে জানা-শোনা নেই। এ দিকে সময়ও আর নেই যে, দিল্লী চ'লে গিয়ে যোগাড়-পত্তর ক'রে আনবো। রাত পোহালেই শ্রাদ্ধ। ভট্‌চাযি্য মশাই বলেন, যা' তা' ক'রে সারলেও ২০।২৫ টাকা লাগবেই। অকূল পাথারে পড়েছি, মশাই।"

প্রথমটা আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, হয় ত পেশাদার ভিক্ষুক, কিন্তু সে শ্রেণীর লোক দেখিলেই এবং তাহাদের কথা বলিবার ভঙ্গী ইত্যাদির দিকে একটু মনোযোগ দিলেই ধরিতে পারা যায়। লোকটির দুঃখে সত্যই আমার মন আকৃষ্ট হইল।

তিনি অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন,—"দেখুন, কাশীতে লোক অনেক আছেন, কিন্তু কারুর কাছে যেতে সাহস পাই না। হয় ত সকলে বিশ্বাস করবে না, জোচ্চোর মনে ক'রে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। ভদ্র ঘরের ছেলে, কারুর কাছে কখনও হাত পাতি নি, তাই বিদেশে এই বিপন্ন অবস্থায় লোকের কাছে যেতে পা দুটো যদি বা রাজী হয় ত মন যেন দশখানা হাত বার ক'রে দশ দিকের পথ আগলে রাখে।"

ইহার পর আবার একটু নীরবে থাকিয়া তিনি কহিলেন, —"আপনার কাছে আসবার আগে, দু'চারটি ভদ্দর লোকের কাছে গিয়েছিলুম, কিন্তু বলি বলি ক'রে লজ্জায় শেষ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি। বড় ভয় হয়, কি জানি যদি—আপনাকে দেখে কি জানি কেন আমার সাহস হ'ল, তাই সব ব'লে ফেললুম।"

"আপনার বাড়ী কোথায় ?"

"দেশ আমাদের বরিশাল। তবে ছেলেবেলা থেকেই পশ্চিমে কাট্‌ছে।"

বরিশাল! তা হ'লে আমার একদেশেরই লোক। তাঁহার দুঃখে দুঃখ আমার পূর্ব্বাপেক্ষা যেন গাঢ়তর হইল। আমি তাঁহাকে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া বলিলাম, —"আর দু' এক যায়গায় চেষ্টা-চরিত্র ক'রে বাকী টাকাটা যোগাড় ক'রে নিন্।"

তিনি কৃতজ্ঞতাভরা চোখে আমার দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, আবার তাঁহার চোখের প্রান্তে জলের রেখা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

* * * *

দিন দুই পরে এক দিন সকালবেলা গোধুলিয়ায় এক পরিচিত ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, দেখিলাম, সেই ভদ্রলোকটি আসিতেছেন। মনে হইল, যেন তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং আমার দিকেই আসিতেছেন। তাঁহার বেশ প্রায় সে দিনকারই মত। সেই কুঞ্চিত কেশরাশি ঠিক তেমনই আছে; শুধু আজ তাহা এলোমেলো ও রুক্ষ নহে, আজ তাহা তৈলাক্ত ও সুবিন্যস্ত। থানের বস্ত্র ও

উত্তরীয়ের বদলে একখানি ধবধবে ধুতি ও গায়ে একটি গেঞ্জী মাত্র। কিন্তু গেঞ্জীর উপর সেদিনকার সেই টার্কিশ টাওয়েলখানি ঠিক তেমনই ভাবেই বক্ষে জড়ানো। বেশীর মধ্যে, সেদিনকার নগ্ন পায়ে আজ সুদৃশ্য স্যাণ্ডেল। লোকটিকে দেখিয়াই হঠাৎ আমার মনে ভয়ানক একটা সন্দেহ হইল। কাছে আসিলে কহিলাম,—"আপনি না বলেছিলেন, আপনার মায়ের শ্রাদ্ধ, কিন্তু মাথার চুল আপনার—"

আমার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি যাহা বলিয়া উঠিলেন, তাহার স্বর ও ভঙ্গী সেদিনকার মতই ধীর, নম্র, বিনয়পূর্ণ। বলিলেন,—"আপনার দয়াতেই মায়ের কাযটি কোন রকমে করতে পেরেছি। আপনার ওখানেই এখন গিয়েছিলুম, শুনলুম, আপনি ওষুধ আনতে এসেছেন। আমার ছুটী ফুরিয়ে এসেছে, আজকেই আমাকে দিল্লী রওনা হ'তে হবে। দেখুন, এত দিন মা ছিলেন, আজ আমি মা-হারা হয়ে এখান থেকে চললুম। মৃত্যুসময়ে যদি তাঁকে একটিবার দেখতেও পেতুম! তবে তা পাবার জো নেই। এদিককার সূর্য্য ওদিকে উদয় হ'লেও এ জিনিষটি আমাদের বংশে কারো ভাগ্যে ঘটবে না!"

সে দিনের মত তাঁহার কাতর চক্ষুর ব্যথিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়িল। এ দৃষ্টি যেখান হইতে আসিতেছে, সেই স্থানটি যে পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেই পারে না। প্রথমটা হঠাৎ একটু সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে শুনিয়া সে সন্দেহটুকু দূর হইল। তিনি কহিলেন,—"আমাদের বংশে তিনটি নিয়ম আছে, যার কথা শুনলে আপনি আশ্চর্য্য না হয়ে যাবেন না। পুরুষানুক্রমে এ নিয়ম তিনটি চ'লে আসছে।—মার মৃত্যুসময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না। কিছুতেই হবে না। কতবার এটা উল্টে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই হয় নি। বাবা আমার ঠাকুর-মায়ের বড় ছেলে। ঠাকুর-মার মৃত্যুসময়ে তিনি গোঁ ধ'রে তাঁর মাথার শিওরে ব'সে রইলেন, না স্নান, না আহার, না নিদ্রা। কিন্তু এমনি দৈবের ব্যাপার, আমার ছোট ভাই সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে রক্তারক্তি। বাবা ছুটে যেতেই দালানের চৌকাঠ এমনি লাগলো তাঁর মাথায় যে, তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে বিছানায় প'ড়ে রইলেন, ঠাকুরমা কখন্ যে মারা গেলেন, তা জানতেও পারলেন না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি যেন বহুকালের কোন একটি বিশেষ দিনের স্মৃতির মধ্যে আত্মস্থ হইয়া পড়িলেন। তার পর হঠাৎ একটু শিহরিয়া উঠিয়া, যোড়-হাত কাহার উদ্দেশে মাথায় ঠেকাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"ঐ গেল এক। আর একটি হচ্ছে যে, বংশের কেউ ভিটের মধ্যে পাঁচীল তুলতে পারবে না। বাড়ীর আব্রুর জন্যে রাস্তার দিকেও না। দরকার হ'লে ঘর তুলে আড়াল করতে হবে। শুনেছি, ঠাকুরদাদার এক ভাই না কি এ সব না মেনে জোর ক'রে উঠানে পাঁচীল তুলেছিলেন। কিন্তু তার ফলও তিনি না কি হাতে হাতে পেয়েছিলেন। তিন দিনের মধ্যেই তাঁর এক গোয়াল গরু গো-বসন্তে মারা গিয়েছিল, চারটে ধানের মরাই পুড়ে গিয়েছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর একটা নিয়ম কি?"

তিনি কহিলেন,—"আর একটা নিয়ম হচ্ছে যে, বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে মাথার চুল ফেলতে কেউ পাবে না। শুধু তিন কাঁচি চুল কেটে নিয়ে গঙ্গায় হোক্, নদীতে হোক্, পুকুরের জলে হোক্, ফেলে দিতে হবে।"

মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন,—"মশাই, আমার মত দুঃখী জগতে নেই। ছেলেবেলা থেকেই দেশ-ছাড়া। ৩২টা বছর জীবনের ওপর দিয়ে শুধু দুঃখ দিয়েই চ'লে গেছে। সব শুনলে, চোখের জল না ফেলে থাকতে পারবেন না। সান্ত্বনার একটা জিনিষ ছিল—মা। এত দিনে তাও হারালুম।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আনত চোখ দুটিতে অশ্রু আসিয়া জমা হইল।

আমি কহিলাম,—"আজই তা হ'লে চ'লে যাচ্ছেন?"

"আজই না গেলে উপায় নেই। সাহেব আমার ওপর যে রকম রোখা, তাতে এক দিন দেরী হলেই হয় ত চাক্‌রী-টুকুই—। কিন্তু যাব যে কি ক'রে, তাই ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না। সব খরচ-পত্তর ক'রে সিকে পাঁচেক পয়সা ত পুঁজি আছে। ট্রেণ-ভাড়াটা—"

ভদ্রলোক কিন্তু আমার কাছে আর চাহিতে পারিলেন না। তখন আমার সঙ্গেও টাকা-কড়ি কিছু ছিল না।

আসিবার সময় রিষ্টওয়াচ আর মণিব্যাগ লইয়া, মুখ ধুইবার ঘরে ঢুকিয়াছিলাম। সেগুলা তাকের উপর রাখিয়া মুখ ধুইয়াছি, কিন্তু তার পর তাড়াতাড়ি সেইখানেই সেগুলি ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি! ২।১টা জিনিষ কিনিবার আবশ্যক ছিল, ডাক্তারখানা হইতে দশটি টাকা ধার করিয়া লইয়াছিলাম। ভদ্রলোকটিকে এই সব বলিয়া, সেই দশ টাকা হইতেই একটি টাকা দিতে গেলাম। তিনি এক টাকা লইতে রাজী না হইয়া কহিলেন,—"চলুন আপনার সঙ্গে আপনার বাসাতেই যাব এখন। এ আপনার খরচের টাকা। আপনার দয়ার কথা জীবন থাকতে আর ভুলতে পারবো না।"

সে দিন এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে সিকরোল যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিলাম। এ বেলা আর বাসায় ফিরিব না। এই কথা তাঁহাকে বলাতে, টাকাটি লইয়া তিনি সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। কলিকাতায় সরকার মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। পকেট হইতে পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া কহিলাম,—"যাবার সময় ঐ মোড়ের বাক্সটাতে ফেলে দিয়ে যাবেন ত।"

চিঠিখানা হাতে লইয়া তিনি আর একবার নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৈকালে সিক্‌রোল হইতে বাসায় ফিরিয়া বরাবর মুখ ধুইবার ঘরে যাইয়া দেখি, তাকের উপর রিষ্টওয়াচ আর মণি-ব্যাগ নাই। কুসুমের এই গুণটি ছিল যে, সব দিকেই তাহার নজর থাকিত। কোন জিনিষ বাড়ী হইতে হারাইবার উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ঘড়ী ও ব্যাগের কথা তাহাকে বলিতেই কুসুম কহিল,—"কেন, নন্দা ত তাকে তখনই দিয়ে দিয়েছে?"

"কাকে গো?"

"সকালে যাকে পাঠিয়েছিলে। ডাক্তারখানার সেই লোকটাকে?"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মেঝের বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া নন্দা চাকরকে ডাকিয়া কহিলাম,—"ঘড়ী আর ব্যাগ কাকে দিয়েছিস্?"

"যাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন, সেই বাবুটিকে। কেন, আপনি পান নি?"

কুসুমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লোকটার চেহারা কি রকম?"

কুসুম বিরক্ত হইয়া কহিল,—"আমি বুঝি তাকে বাইরে গিয়ে দেখতে গিয়েছি!"

যুগপৎ রাগে এবং দুঃখে আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। উচ্চকণ্ঠে নন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লোকটা দেখতে কি রকম?—ছিপছিপে, ফরসা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মাথায় কোঁকড়া চুল?"

"আজ্ঞে।"

"গায়ে গেঞ্জির ওপর তোয়ালে জড়ানো?"

"আজ্ঞে। আর পায়ে একটা স্যাণ্ডেল জুতো।"

মিনিটখানেক আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বাহির হইল না। তার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে বলিয়া উঠিলাম,—"উঃ! আচ্ছা ঠকান্‌টা ঠকালে ত!"

কুসুম কহিল,—"জোচ্চোরে ঠকিয়ে নিয়েছে বুঝি? বেশ হয়েছে! যেমন আমার কথা না শুনে পুরী না গিয়ে এখানে এলে। ঠিকই হয়েছে।" তার পরও খানিকক্ষণ ধরিয়া কুসুম আরও কি বলিতে লাগিল; আমার কাণে তাহা পৌঁছিল না। আমার চোখের সম্মুখে তখন শুধু একটি মূর্ত্তি ভাসিতে লাগিল,—ছিপ্‌ছিপে, গৌরবর্ণ, সুন্দর পুরুষ; মাথার চুলগুলি কুঞ্চিত, অবিন্যস্ত, রুক্ষ। থান কাপড় ও উত্তরীয় এবং তাহারই উপর একখানি টার্কিশ টাওয়েল। তাহার ব্যথিত চিত্ত মথিত করিয়া দুঃখের বাণী তাহার নিরুদ্ধ কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতেছে,—"হয় ত কেউ বিশ্বাস করবে না। জোচ্চোর মনে ক'রে দু'টো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। তাই বিদেশে এই বিপন্ন অবস্থায় লোকের কাছে যেতে পা দু'টো যদিই বা রাজী হয়, ত মন দশখানা হাত বার ক'রে দশদিকের পথ আগলে রাখে।"

* * * *

প্রায় দুই মাসকাল কাশীতে কাটাইয়া ঘণ্টাখানেক হইল কলিকাতার বাটীতে আসিয়াছি। কুসুম কাপড়-চোপড়, গয়না-গাঁটি সব গুছাইতে বসিল। আমি নন্দাকে চায়ের জন্য বলিয়া স্নানের ঘরে যাইলাম। সেখান হইতে কুসুমের বকাবকি শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া

আসিয়া কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অত চেঁচামেচি কচ্ছ কেন, কি হয়েছে?"

খোলা আলমারীর দিকে চাহিয়া কুসুম কহিল,—"আমার নীলার আংটীটা রেখে গিয়েছিলুম, দেখতে পাচ্ছি না। সেটা ত আমি আঙ্গুলে প'রে যাইনি। ওরে ও দয়াল! দয়াল!—তোমার সোনার বোতাম সেট্‌ও ত রেখে গিয়েছিলুম, দেখি, সেটা আছে ত? ও মা! সে বোতামও ত নেই দেখছি।"

আমি তাড়াতাড়ি আলমারীর তাক হইতে আমার ছোট সুট্‌কেশটি বাহিরে আনিয়া খুলিলাম। কাশী যাইবার সময় তাহাতে আমি আড়াইশো টাকার নোট রাখিয়া গিয়াছিলাম। দেখি,—তাহাতে কিছুই নাই!

মাথা ঘুরিয়া গেল! কি কুক্ষণেই কাশী গিয়াছিলাম! কুসুমের মুখে সেই পুরানো কথা,—"হয়েছে কি, আরও হবে। আমার কথা না শোনবার এই সব ফল। কাশী যাওয়ার সুখ বেরুচ্ছে, আরও বেরুবে!"

নন্দা চায়ের পিয়ালা দিয়া গেল। বারান্দার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। ঝন্‌ঝন্ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।

দয়াল হাত যোড় করিয়া কহিল,—"মু কিমতি জানিব পারা। এত্তে বরষ আছ, একটি অধলা পয়সা মোর সামনে থেকে যায় নি। চৌবিশ ঘণ্টা ত মু কুলুপ দেইকি কি বসেছি। খালি ঐ বাবু যোন্ দিন আসিথিল, সেই গোটা দিনো মু খোলা রাখিথিলা।"

"বাবু? বাবু কে?"

"যোন্ বাবুকে আপনি এঠি পাঠায় থিলা। সরকার বাবুকে চিঠি দিইকিরি লিখিথিলা।"

"চিঠি?"

সরকার মহাশয় কহিলেন,—"কাশী থেকে যে চিঠি আপনি আমায় দিয়েছিলেন, তারির একধারে যে লিখে দিয়েছিলেন যে, আমার একটি আত্মীয় বাবু ওখানে গিয়ে দু'একদিন থাকবেন, তাঁকে আমার ঘর খুলে দেবে।"

ওরে সর্ব্বনাশ! ব্যাটা এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে! উঃ! সেই চিঠি, যা তাকে ফেলিতে দিয়াছিলাম! ওঃ! কি সাংঘাতিক চোর রে বাবা!

সরকার মহাশয়কে কহিলাম,—"নিয়ে আসুন ত পোষ্টকার্ডখানা।" দয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি রকম চেহারা? পাত্‌লা, ছিপছিপে, গায়ের রং খুব ফর্সা?"

"আইজ্ঞা।"

"মাথার চুল কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া?"

"আইজ্ঞা।"

"কি রকম কাপড়-চোপড় পরা?"

"বেশ ভদ্দর লোক হব। খাসা চেহারা।"

"ধুতি পরা ছিল?"

"আইজ্ঞা।"

"গায়ে শুধু গেঞ্জী ছিল ত?"

"আইজ্ঞা।"

"গেঞ্জির ওপর কি ছিল?"

"আইজ্ঞা, তোয়ালিয়া। আর পায়ে স্যান্—"

পুলিসে ডায়েরী লিখাইবার জন্য তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

দিন আষ্টেক পরে এক দিন সকাল-সকাল আফিস হইতে ফিরিয়া আমার শয়নঘরে ঢুকিতে যাইতেছি, দেখি, আমার খাটের বিছানার উপর তাঁকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া সেই মূর্ত্তি! ধব্‌ধবে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, তার উপর টার্কিস তোয়ালেখানা তেমনই ভাবে কাঁধে ফেলা। সেই কুঞ্চিত বড় বড় কেশগুলি তেমনই সুবিন্যস্ত। আর পায়ে সেই স্যাণ্ডেল! কাটারীর কোপ বসাইব কি বন্দুক দিয়া গুলী করিব ভাবিতেছি, পিছনে কুসুমের গলা পাইয়া ফিরিয়া দেখি, এক হাতে জলখাবারের থালা, এক হাতে জলের গেলাস লইয়া কুসুম বারান্দা দিয়া এই ঘরের দিকেই আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল,—"দাদা এসেছে। আজ ছ' বছর পরে বাবার উপর দাদার রাগ পড়লো।"

কুসুম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া সেইখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পর চা খাইতে খাইতে তিন জনের মধ্যে হাসির হর্‌রা চলিল। কুসুম বলিল,—"তোমার মনে নেই? আমাদের বিয়ের পরদিন সকালে একটা লোক এসে দাদার কাছ থেকে ৫০টা টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায়। তুমি শুনে বলেছিলে যে, ম্যাড়া, বোকাকান্ত, নেবে না ত কি! আমাদের কাছ থেকে কেউ নিয়ে যাক্ দেখি ফাঁকিবাজি

ক'রে। দাদা সেটা শুনেছিল। কথাটা দাদার মনে ছিল; এত দিনের পরে সুবিধে পেয়ে দাদা তারই শোধ তুলেছে।"

চায়ের টেবিলের উপরেই রক্ষিত ছিল—একখানি দশ টাকার নোট, টাকাশুদ্ধ মণিব্যাগ, নীলার আংটী; সোনার বোতাম এক সেট, আর ২৫০ শ টাকার নোট সমেত ছোট একটি সুটকেশ!

আমি কহিলাম,—"দাদাকে ত আমি দেখিনি। কি ক'রে চিন্‌তে পারব বল।"

কুসুম কহিল,—"বিয়ের রাত্রিতে দেখেছ দু' একবার, অত আর মনে ক'রে রাখনি। তার পরই ত বাবার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে বিদেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।"

অতঃপর তিন জনে বসিয়া হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব, আলোচনা ইত্যাদি করিতে লাগিলাম। সে সকলের আর অবতারণার কোন আবশ্যক এখানে নাই। সুতরাং কাশীর গল্পের এইখানেই শেষ।

গেল বছরের ঐ ব্যাপারের পর,—এ বছর এই দুর্দ্দান্ত পৌষ মাসে, যখন কুসুম দার্জ্জিলিং যাইবার কথা বলিল, ভাবিলাম, ইহাতে আর অমত করিব না। ওবার না হয় আসল শ্যালকের হাতে পড়িয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, এবার যে নকল শ্যালকের হাতে পড়িব না, তাহারই বা ভরসা কি? তবে, কুসুমের হঠাৎ দার্জ্জিলিং যাইতে চাহিবার কারণটা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। তাহার মাসতুত ভগিনীপতি রাজসাহী স্কুল হইতে এবার দার্জ্জিলিংয়ে বদলী হইয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক সেখানেই আছেন। দিনকতক হইল, দার্জ্জিলিং হইতে কুসুম তাহার বিনু দিদির চিঠি পাইয়াছে। তাই মনে মনে স্থির করিলাম, আপত্তি করিব না, দার্জ্জিলিংই যাইব। তবে আমার নিজের জন্য চাঁদনী হইতে কাল সকালেই এককুড়ি 'রেডিমেড' লেপ কিনিয়া লইব।

কিন্তু, কিন্তু,—হরিবোল হরি! সব উল্‌টিয়া গেল! সকালবেলাতেই খবর পাওয়া গেল, হরেনবাবু সস্ত্রীক এক্‌স্‌মাসের ছুটীতে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। সুতরাং আর আমাদের দার্জ্জিলিং যাইতে হইল না। তার পরিবর্ত্তে—

ওয়ালটেয়ার!—ওয়ালটেয়ার—ওয়ালটেয়ার!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অনাগত ও আমি

তোমারে খুঁজেছি আমি হে অজানা বন্ধু, স্বপ্ন-সাথী,
যৌবন-জগতে মোর সুবিচিত্র মর্ম্মের মুকুরে,
মিলনের স্বপ্ন লয়ে কাটায়েছি লক্ষ দিবারাতি
মনের মাণিকখানি পাই নাই তবু,—তুমি দূরে।

ফুটন্ত যৌবন-বনে স্বপ্নাতুর আজো বারে বারে
কামনা-কস্তুরী-গন্ধে ঘুরিতেছি মত্ত মৃগসম,
আনন্দের হাসি-আলো বেদনার অশ্রু-অন্ধকারে
তুমি এস হে সুন্দর অনাগত ভূমানন্দ মম!
আমার এ তিক্তচিত্ত-গুহামাঝে দুঃশঙ্কার রাতে
আঁখির অমৃতবর্ত্তি জ্বালায়েছি তোমার সন্ধানে,
অন্তরের মহাভাব এ তৃষ্ণায় মোর রিক্ত হাতে
অমৃতের ভাণ্ড দাও, তৃপ্তি দাও সঙ্গ-সুধা-দানে।

অনন্ত অভাব মোর;—অন্তহীন প্রেমের পূজারী
আমি তাই দেহ-পদ্মে খুঁজিতেছি 'মধু'-র আস্বাদ,
কুৎসিত কল্পনা এ-তে করিও না বন্ধু তৃষাহারী,
এ নহে দেহের ক্ষুধা;—বঞ্চিতের প্রেম-আর্ত্তনাদ!
চিত্তের চাঞ্চল্য এই;—এরে যদি তনুর তর্পণ
বলে কেহ, কায়া-কীট কামনার ক্রীতদাস আমি,—
তোমারে পাবার গর্ব্বে তুচ্ছ সব, হে বাঞ্ছিত ধন
তুমি নর কিংবা নারী সে সন্ধান জানে অন্তর্যামী।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।



সহজিয়া পদ-সংগ্রহ

আমাদের আলোচ্য সহজিয়া গানগুলি, যশোহর ঝিনাইদহ মহকুমার জয়দীয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে, একখানি পুরাতন তুলোট কাগজের জীর্ণ-প্রায় গানের খাতাতে পাওয়া গিয়াছে। খাতাখানিতে মোট ২১ খানি পত্র আছে, প্রতিপত্রের উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা। উহাতে অন্যান্য নানা বিষয়ক গানের মধ্যে আমরা বর্ত্তমান সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট সহজিয়া গানগুলি পাইয়াছি। এই জয়দীয়া যশোহর জেলার একখানি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এখান হইতে ব্রাহ্মণদিগের পারিহাল মেলের সৃষ্টি হয়।

বর্ত্তমানে এই গানগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা সহজিয়া মত সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে দুই একটি কথা বলিব। কিন্তু এই নিগূঢ় সাধনা-রহস্য সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। বোধ হয়, এই মতের সাধকগণ ছাড়া অপর সকলের পক্ষেই ইহা এইরূপ অল্পবিস্তর দুরূহ। আর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা আমাদের প্রয়োজনেরও বাহিরে।

"সহজিয়া" শব্দটি সংস্কৃত "সহজ" বা "সহজাত" (Inborn) শব্দ হইতে আসিয়াছে। "রাগানুগ"দর্পণ নামক একখানি অপ্রকাশিত সহজিয়া পুঁথিতে এই "সহজিয়া" শব্দের বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। Post Chaitanya Sahajiya cult" নামক গ্রন্থের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, উক্ত পুঁথিখানি 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের নিকট আছে। এই পুঁথি হইতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থপ্রণেতা "সহজিয়া" শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"সহজ-ভজন শব্দের অর্থ এই যে, জীব অনুচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহা তাহার সহজ।"

সহজিয়াগণের মতে মানবের মধ্যেই ভগবানের যাবতীয় বৃত্তি ও যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানব ভগবানেরই প্রতিকৃতিস্বরূপ। জন্ম পরিগ্রহ করাতে মানব রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভগবৎসুলভ বৃত্তিগুলি আদৌ হারায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত একখানি সহজিয়া পুঁথিতে আছে :—

"এইমত মনুষ্য ঈশ্বর জ্ঞাতিগণ।
লুকাইতে নাহি পারে স্বভাব কারণ।
ঈশ্বর স্বভাব যদি মনুষ্য স্বভাব হয়।
স্বভাবের গুণে তারে ঈশ্বর কহয়।"

ইহা আমাদিগকে সেই "Human body is the highest temple of God." উক্তিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। সহজিয়া মতে মানবের মধ্যস্থিত ভগবৎসুলভ বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রেমই সর্ব্বপ্রধান। মানবের মধ্যেই পরম রসানন্দ বা বৈষ্ণবগণ-কথিত 'নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি' বিরাজমান। তাই এই প্রেম-ধর্ম্মের অনুশীলন এবং সাধনা দ্বারা মানুষের মধ্যস্থিত দেবত্বের বিকাশসাধন করাই এই সাধনার মর্ম্মকথা। সহজিয়াগণ যে প্রেমবৃত্তির পরিপূর্ণ উদ্বোধন দ্বারা মানুষের মধ্যস্থিত দেবত্বের আস্বাদন করিতে চাহেন, তাহা চণ্ডীদাসের নিম্নোক্ত সহজিয়া পদটি হইতেই জানিতে পারা যায় :—

"শুন হ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

সহজিয়া মতে এই নিগূঢ় ভাবসাধনা করিতে হইলে প্রত্যেক সাধককেই আদর্শের হিসাবে রমণী সাজিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুঁথিতে আছে,—

"স্ত্রীমূর্ত্তি বলিব কারে কেমন লক্ষণ।
তাহার বিশেষ কথা শুনহ এখন।
আপনি স্ত্রী অঙ্গ হব আনুকূল্য করি।
আপনার নারী দিয়া আপনি সেবারী।"

সহজিয়াদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্যে আছে, "পুরুষ হয়ে নারী সাজা, তার বেশী নেইকো সাজা (শাস্তি)" এই সকল উক্তি হইতে আমরা সাধকের আদর্শের হিসাবে রমণী সাজিবার কথাই পাইতেছি। আত্মাকে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে লইয়া যাইতে হইলে যে আদর্শতঃ রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। পাশ্চাত্য মনস্বী মহামতি নিউ-ম্যান সত্যই বলিয়াছেন,—"If thy soul is to go on in to higher spiritual blessedness it must become a woman, yes, however manly you may be among men." আমাদের বৈষ্ণব মহাজনগণ আদর্শের হিসাবে রাধা সাজিয়াই বিশ্বের চরম সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বা তাঁহাদিগের কথিত শ্যামসুন্দরের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। আদর্শের হিসাবে এই রাধাভাবের অনুশীলনই চৈতন্য-লীলার প্রাণ। ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনায় যথার্থই গাহিয়াছেন,—

"তিন ভাব এক করি,
স্বাদিতে নিজ মাধুরী,
রাধার স্বরূপ ধরি,
নবদ্বীপে অবতরি।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে "নবীনা বুদ্ধিবিহীনা বালিকা বধূ" সাজাইয়াই তাঁহার চিরজনমের 'জীবনদেবতার' উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন।

সহজিয়া মতেও যে আদর্শের হিসাবে রমণী সাজিবার কথা আছে, তাহা আমরা সহজিয়া পুথির বিবরণেই দেখিয়া আসিলাম। এখন একটু মনোযোগ করিলেই দেখিতে পাইব, সহজিয়া মতে যে নায়িকা-সাধন ও নায়িকা-পূজার বিধি আছে, উহার উদ্দেশ্য কি এবং উহার সার্থকতা কোথায়? আত্মাকে রমণী সাজাইতে হইলে বা নিজে তত্ত্বতঃ রমণী সাজিতে হইলে, ক্রমে ক্রমে আপনার পুরুষভাব বিদূরিত করিয়া, রমণীর সান্নিধ্যে আসিয়া, রমণীসুলভ ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে। এইরূপে সাধক উত্তরোত্তর নিজে রমণীভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন। সাধক যে পুরুষ আর নায়িকা যে রমণী, এ ভাব আর সাধকের থাকিবে না। তিনি ও নায়িকা যে অভিন্ন, সর্ব্বদা ইহাই মনে করিতে থাকিবেন। ইহার প্রমাণের জন্য পাঠককে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না, চণ্ডিদাসের কয়েকটি সহজিয়া পদের মধ্যেই ইহার সন্ধান মিলিবে,—

(১) "তুমার চরণে, আমার পরাণে,
একত্র করিঞা থুব।
হিআর মাঝারে, রতন কমল,
তুমারে করিঞা নিব॥
আচ্ছেঅ হইয়া, সিক্ষা সে করিব,
দুই মন একু করি।
তুমি যদি কৃপা, করহ আমারে,
রূপেতে মিসিতে পারি॥"

(২) "যতন করিঞা, প্রেম বাড়াইয়া,
রতি শুদ্ধ দিনে তাঅ।
আপন করিঞা, রাখিবে আমারে,
আপনা করিয়া রাঅ॥"

(৩) "চইত রূপার, সব রতি সার,
ছাঁরূপ মঞ্জরী হঅ।
নারীর মিসালে, নারী হঞা যদি,
মানুষ সোধনে রঅ॥"

(বসুমতী সংস্করণের শেস ভাগে সন্নিবিষ্ট চণ্ডিদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী)।

এইরূপ সাধক তাঁহার নায়িকাকে লইয়া স্বহস্তে বসন পরাইয়া দিতেছেন, স্বহস্তে গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতেছেন অথচ সাধকের মন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। এই ধরণের সাধকের বিবরণ পুথিগত-ভাবেই অনেক পাওয়া যাইতেছে। তান্ত্রিক সাধনার একটি স্তর আছে, যেখানে সাধক এইরূপ আপনাকে শক্তি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন মনে করিতে থাকেন। সহজিয়া সাধকগণ যে উত্তরোত্তর সাধনার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রমণীসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন, তাহার নিদর্শন চণ্ডিদাসের পদাবলীর নায়িকার পূর্ব্বরাগের সহিত নায়কের পূর্ব্বরাগ পাশা-পাশি ধরিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। দেখা যায়, নায়িকার হৃদয় চণ্ডিদাস যেমন করিয়া খুলিয়া দিয়াছেন, নায়কের হৃদয় তেমন করিয়া খুলে নাই। চণ্ডিদাসের পদাবলীর নায়িকা-হৃদয়ের অভিব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়—জগতের আর কোন সাহিত্যে ইহার তুলনা আছে, তাহাও এই মূর্খ লেখকের অপরিজ্ঞাত। চণ্ডিদাস উচ্চতম সহজিয়া সাধক ছিলেন, রমণী-হৃদয় নিজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ।

সহজিয়াগণ আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ ও কর্ত্তাভজা এই কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য কিছু কিছু আছে।

আমাদের আলোচ্য গানের অধিকাংশই বাউল সম্প্রদায়ের সহজিয়াদিগের। এখানে "বাউল গান" সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আজকাল বাউল গান নামে অভিহিত যে সকল গানের প্রচলন আছে, তাহার অধিকাংশই সহজিয়া গান নহে। সেগুলিকে সহজিয়া পর্য্যায়ে ফেলিতে হইলে, নিতান্ত জোর করিয়াই ফেলিতে হয়। ফিকিরচাঁদ ফকির (কাঙ্গাল হরিনাথ), পাগ্‌লা কানাই, দীনে বাউল প্রভৃতির যে সকল গান এ যাবৎ ছাপা হইয়াছে, তাহা সহজিয়া গান নহে। সাধারণ পাঠকগণের অনেকেই "দেহতত্ত্বের" গান দেখিলেই তাহাকে সহজিয়া আখ্যা দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন; কিন্তু এই দেহতত্ত্বের গান অনেক মতের আছে। তন্মধ্যে তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের অনেকগুলি মূল্যবান্ গান এখনও লোকমুখে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। তবে আর কিছু দিন পরেই এগুলির অস্তিত্ব পাওয়া দুরূহ হইবে। এই তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের মধ্যে এমন অনেক গান দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলিতে বর্ণিত ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও উহাতে রচয়িতৃগণ ঐ প্রসঙ্গে "শরীরবিদ্যা" বা Anatomyতে যেরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আমাদের সন্নিবিষ্ট সহজিয়া গানগুলি বিভিন্ন রচয়িতা কর্ত্তৃক রচিত। ভণিতাতে আমরা কুবের গোঁসাই, মদন, প্রাণকৃষ্ণ, তারাচাঁদ গোঁসাই, গোবিন্দচাঁদ গোঁসাই, হীরালাল প্রভৃতি সহজিয়াভক্তগণের নাম পাইতেছি। ইহার মধ্যে কয়েক জনের সম্পর্কে আমরা যে সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহা পরে পৃথক্‌ভাবে সবিশেষ আলোচনা করিব। এই কুবের গোঁসাইএর ভণিতাযুক্ত বহু সহজিয়া গানের প্রচলন নানা স্থানে দেখা যাইতেছে। নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত এই জাতীয় সমুদয় সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে, বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের একটি লুপ্ত-প্রায় সম্পদের সন্ধান মিলিবে।

আমাদের আলোচ্য গানগুলির মধ্যে ২, ৫ ও ৬ সংখ্যক গান তিনটি সহজিয়া মতের জটিল হেঁয়ালি, ইহাদের অর্থ গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর।

২ সংখ্যক গানটি বিশেষ জটিল ও দুরূহ। তাই বর্ত্তমানে আমরা ইহার কোনও ব্যাখ্যা সন্নিবেশ না করিয়া, সহজিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের উপরই এই ভার অর্পণ করিতেছি।

৬ সংখ্যক গানটিতে কবি বলিতেছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সংযোগেই মানবত্বের উৎপত্তি। সন্তান যেমন জননীগর্ভে নিহিত থাকে, তেমনই এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির মধ্যেই মানবত্ব নিহিত ছিল। "তারা তিন জন নারী, অতি পরম সুন্দরী, যেমন মাতা তেমনি ছেলা গঠন॥" সন্তানের মধ্যে যেমন মাতার গুণ ও ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, মানবের

মধ্যেও তেমনই এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশমান। "ভেবে মদন কথায় কয়, যদি ছেলা সত্য হয়, সাধন ভজন তেজ্য করে ধরি ছেলার পায়।" বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই ত্রিগুণান্বিত মানবই যদি সত্য হয়, তবে অন্য সাধনের আশ্রয় না লইয়া, মানবের মধ্যস্থিত সেই পরম রসানন্দ আস্বাদন করিতে প্রয়াস পাওয়াই শ্রেয়ঃ। "ছেলা সবারে কয় মজার কথা, আমায় কয় না প্রাণ গেলে।" কত রসিক সুজন এই মানবকে অবলম্বন করিয়াই পরম রসানন্দ আস্বাদন করিতেছেন, কিন্তু কবির সে সামর্থ্য নাই, তাই তিনি আক্ষেপ করিতেছেন।

৫ম সংখ্যক গানটিতে কবি বলিতেছেন যে, এই মানবদেহই শান্তিপুর। ইহার মধ্যেই পরম রসানন্দ বা রসরাজ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু বাহিরের লোক তাঁহার সন্ধান জানে না, তিনি কেবলমাত্র রসিক-সুজন-বেদ্য। "হাত পা নাই চর্ম্মে ঘেরা, ক্ষণেক জ্যান্ত, ক্ষণেক মরা।" তিনি স্থূলত্ববিহীন এবং সূক্ষ্মভাবময়। "চর্ম্মে ঘেরা"—অরসিকতা বা অজ্ঞানতার অন্ধকার তাঁহাকে সাধারণের নিকট আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। "ক্ষণেক জ্যান্ত ক্ষণেক মরা"—কখনও কখনও শুভ মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি, আবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি। এই অংশটুকুর উপনিষদ-মতে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা হইতে পারে। উপনিষদ ব্রহ্মের দুইটি বিভাব (Aspect) উল্লেখ করিয়াছেন। একটি নির্ব্বিশেষ ভাব, অপরটি সবিশেষ ভাব। যে ভাব কোনও লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, কোনও চিহ্নের দ্বারা পরিচয় দেওয়া যায় না, ধারণা করিবার মত কোনও গুণের দ্বারা উল্লেখ করা যায় না, তাহাকে নির্ব্বিশেষ ভাব বলে। আর যে ভাব তাহার বিপরীত,—যে ভাবকে লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত করা যায়, চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যায়, তাহা সবিশেষ ভাব। ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ ভাবসম্পন্ন, তখন তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, আর যখন সবিশেষ ভাবসম্পন্ন, তখন তিনি প্রণিধানসাপেক্ষ। এই অর্থে "ক্ষণেক জ্যান্ত ক্ষণেক মরা।" "পাছায় দাড়ি বিউনি করা সপ্তসাগর, তার উদরে" তিনি পরম রসানন্দস্বরূপ, সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রসানন্দ আস্বাদন করিতেছে। "পাছায় দাড়ি বিউনি করা"—অংশটিও উপনিষদমতে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কঠোপনিষদ বলিতেছেন, ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" এই সংসার বা বিশ্বসৃষ্টি একটি অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ। ইহার মূল ঊর্দ্ধদিকে অর্থাৎ ব্রহ্মে সন্নিবিষ্ট। এখানে এই রূপক অশ্বত্থবৃক্ষকে "পাছায় দাড়ি" বলা যাইতে পারে। গানটির—

"হাত পা নাই তার দেহেতে দাঁড়িয়ে রয় অবহেলে।
চক্ষু নাই পায় দেখিতে নাসিকা নাই পোঁটা পড়ে।
গোঁসাইরাম চাঁদে বলে কাণ নাই ভাগবত শুনে।"

অংশে আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত কথাই পাইতেছি,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্‌।"

নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত তরুণদল আমরা এই সহজিয়ার নাম শুনিয়াই নাসিকা কুঞ্চন করিতে থাকিব। আমরা সর্ব্বত্রই পরের মুখে ঝাল খাইতে অভ্যস্ত। কোনও জিনিষ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান, আলোচনা ও বিচার না করিয়াই আমরা আপাত-দৃষ্টিতে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। এই সহজিয়া মত বিকৃত অবস্থায় আসিয়া যে অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল, তাহা সত্য। এই সহজিয়ার ন্যায় তন্ত্রও সমাজের সাধারণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অনেক উচ্চাঙ্গের সাধনা আছে, যাহা জনসাধারণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় না, সেগুলি কেবল বিশিষ্ট উপযুক্ত সাধকগণের পক্ষেই অবলম্বনীয়। এই সকল নিগূঢ় সাধনার প্রবর্ত্তকগণও বিশেষ উপযুক্ততা বিবেচনা না করিয়া কাহাকেও দীক্ষিত করেন না। আমাদের তান্ত্রিক আচার্য্যগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি না হইলে তাঁহারা কাহাকেও এই মতে দীক্ষা দিতেন না। এই সকল সাধনাকে যদি জনসাধারণ পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহা যে বিকৃত করিয়া ফেলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাখালের হাতে পড়িলে শালগ্রামশিলার মর্য্যাদা থাকে না, ইহা ত জানা কথা। শুধু তন্ত্র ও সহজিয়াই নহে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞগণ কোনও নিগূঢ় রহস্যের কথাই হাটে-বাজারে প্রচারের ব্যবস্থা দেন নাই। উপনিষদে দেখা যায়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বিশেষভাবে উপযুক্ততা পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ দিতেন না। ইহার দৃষ্টান্ত উপনিষদে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থী হইলে, যম তাঁহাকে কিরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে এই অমৃততত্ত্ব দান করিয়াছিলেন, তাহা উপনিষদপাঠকমাত্রেরই বিদিত। চৈতন্য মহাপ্রভুও বৈষ্ণবসাধন-নিগূঢ়-তত্ত্ব বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। সাধারণে কেবল মাহাত্ম্য শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তনের অধিকারী ছিল। তাই চরিতগ্রন্থকার লিখিতেছেন,—

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্ত্তন।"

১

মানুষ কি কথায় পাওয়া যায়।
মনে প্রাণে ঐক্য করে নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়।
ও তার নাই কোন রূপ রূপের স্বরূপ চেনা বিশেষ দায়।
বাহ্য দশা তেজ্য করে, দুটি নয়ন দিও রূপের দ্বারে,
থাকতে হবে রূপ নেহারে মৎস্য-রাঙ্গা পাখী যেমন রয়।
ও যে ঠিকের ঘরে বেঠিক হলে পলকে হারায়।
ঠিক রেখ মন গুরুর চরণ, ভুল না রে ও আমার মন,
করতে হবে রাগের করণ দুজনা করে ভাবাশ্রয়।
হিংসা নিন্দা তমো বাঞ্ছা কিছু মনে নাই।

২

মামাশ্বশুর ভাগনা-বৌ এর কোলে ব'সে রয়েছে।
বাজা নারী এই তিন জনা সেই তিন গর্ভের ছেলে সে।

অষ্টমীতে একাদশী পূর্ণ হ'ল কাল শশী,
বিধবা তায় বড় খুসী টেনে ধরে রয়েছে।
সে স্বামীর নাইকো কসুর, দিনে ভাসুর রাতে শ্বশুর,
জানাচ্ছে সে ধর্ম্মের পশুর নিশান তুলে রয়েছে।
এক জন মাগী তিন জন মিনসে, ধনেমেতে তারাই কাঁদছে,
এক জন পুত্র এক জন স্বামী তিন সম্বন্ধ পাতিয়েছে।
সতীর গর্ভে পতির জন্ম সাধনে সুখ্যাতি * ।
গোপাল চাঁদের দুষ্টমতি দেখে ফিরে * * ।

৩

শুদ্ধ রসিক হলে সিদ্ধ হবে সাধনে।
যার যেমন পায় তেমনি ধন যার নাই জ্ঞান,
পদার্থতত্ত্ব জানবে কেমনে।
যে জন্মে জানে না সাঁতার, পার হতে চায় অকূল পাথার,
ঝাঁপ দিলে সে ভেসে যায় ভবনদীর তুফানে।
বামন হয়ে আশা করে, গগনচন্দ্র ধরিবারে,
পঙ্গু কি লঙ্ঘিতে পারে সে গিরি গোবর্দ্ধনে।
যার গুরুমন্ত্র নাই উপাসনা, মনেতে করে বাসনা,
সে বাসনা পূরায় সাধুর করণে।
জানে না বীজমন্ত্র মনে, ধরতে চায় কাল ফণে,
দংশিয়ে মরে তখনে কাল-বিষের জ্বলনে।
রসিক ময়রা হলে পরে, রস মেরে রস ভিয়ান করে,
নানা দ্রব্য হয় গো রসের ভিয়ানে (১)
অরসিক তিউড়ি (২) জ্বেলে, জ্বালাতে রস বিগুড়ে ফেলে,
চরণ ভেবে কুবের বলে রস পালো সব উনুনে।

৪

প্রেম-পাথারে দেয় সাঁতারে, তার মরণের কি ভয় আছে।
শুদ্ধ অনুরাগের করণ,
নাইকো তাতে বেদের ধরম,
রসরাজ রসিকের করণ বেদ-বিধি তার কিসে লাগে।
পাগল নয় পাগলের পারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
ঐ রসরাজ রসিকের ধারা, ধারায় ধারা মিশিয়ে গেছে।

৫

মজার এক মানুষ আমি দেখে এলাম শান্তিপুরে।
কাউকে সে কয় না কথা সর্ব্বদা থাকে গুমারে।
হাড়-গোড় নাই চর্ম্মে ঘেরা, ক্ষণেক জ্যান্ত ক্ষণেক মরা,
পাছায় দাড়ি বিউনি করা, সপ্ত সাগর তার উদরে।
হাত পা নাই তার দেহেতে দাঁড়িয়ে রয় অবহেলে।
চক্ষু নাই পায় দেখিতে নাসিকা নাই পোঁটা পড়ে।
গোঁসাই রামচাঁদে বলে, কাণ নাই ভাগবৎ শোনে,
প্রতাপ ভাবে মনে মনে ইহার মানে করি কেমনে।

৬

আহা-মরি তিন গর্ভে আছে এক ছেলে।
বিনা বাপে ছেলে পয়দা (৩) বিনা বীজ বিনা ফুলে।
তারা তিন জন নারী, অতি পরম সুন্দরী,
যেমন মাতা তেমনি ছেলা গঠন * ।
ছেলার চিকণ নজর চিকণ বুদ্ধি চিকণে চিকণ মেশে।
ভেবে মদন কথায় কয়, যদি ছেলা সত্য হয়,
সাধন ভজন ত্যেজ্য করে ধরি ছেলার পায়।
ছেলা সবারে কয় মজার কথা আমার কয় না প্রাণ গোজা।

৭

সহজ মানুষের রূপ * চমৎকার।
ও সে চমৎকার চমৎকার।
রাগ অনুরাগী যে জন বেদবিধিপার করণ তার।
ইক্ষু হতে রসের পোলা, রস হইতে রসের পেড়া,
হয় না জেনো ভিয়ান করা খুব হবে মন হুসিয়ার।
রস কসে টিকলে পরে হবে ওলা মিশ্রীর প্রায়।
ষড় অষ্ট শতদলে হৃদ্‌কমলে প্রকাশিয়ে
যদি মনের মানুষ মিলে দর্পণেতে কাজ কি তার।
অধঃপদ ঊর্দ্ধপদ নিতাএর পদ ধরা ভার।
প্রেম-রসের রসিক না হলে, ফল ধরে কি শুষ্ক ডালে,
নদী না হলে ভাবের জাহাজ ডাঙ্গাতে কি যায় চ'লে।
কোথায় আছে সে রসিক সুজন কর রে মন খবর তার।
গোঁসাই তারাচাঁদে ভাবে, রসের কুলুপ গেছে ফেঁসে,
ভিয়ান ভাই আর করবি কি গুড় হলো না * সার,
এবার কাকের ঘরে কোকের বাসা,
ভবে আসা যাওয়া মাত্র সার।

৮

মনের মানুষ এই মানুষে আছে নাও গো চিনে।
রসিক যে জন জানবে সে জন অরসিকে জানবে কিসে,
সমুদ্রে রত্ন পাওয়া যায়, রসিক ডুবার (১) সে রত্ন তুলে নেয়,
জেনে শুনে জান না কেন যে মন থাকে তার মাছ ধরণে।
নীর ক্ষীর এক যোগেতে রয়, রসিক হংস হলে সে নীর
বেছে ক্ষীর খায়,
পাকা আম শৃগালে খায়না মন থাকে তার কুভজনে।
এ গুড়েতে কেহ ভিড়া বানায় রসিক ময়রা হলে,
মিশ্রির তাক নামায়,
মদন বলে তাক না জেনে বেতাক মলাম ভিয়ানে।

৯

মন হলো না কথার বাধ্য সাধ্য কি আর সাধনে।
সাধ্য কি আর সাধনে, মন সাধ্য কি আর সাধনে।
মন রয়েছে স্থূলের দেশে,
সাধন ভজন হবে কিসে,
পাক বেঁধেছে মাকড়সার জাল যেতে হবে শ্মশানে।
রূপ সনাতন নারদাদি,
তারাই ভাবে নিরবধি,
কত ভাবছে বসে যোগী ঋষি দোষ ধরেছে দোষ সাধনে।

১০

চমৎকার গৌর-প্রেমের সরভাজা।
খেলে ভবক্ষুধা যাবে প্রাণ জুড়াবে বাঁকা মন হবে সোজা।

---

(১) মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাক করা।
(২) উনান বা চুল্লী।
(৩) সৃষ্টি।

(১) ডুবারি।

এ জিনিষ যে খেয়েছে, মনের কি তার ময়লা আছে,
মহারসে মেতে গিয়েছে নাই কিছু তার বৈদিক পূজা ॥
ও তার রসে মাখা মাখা মাখা তনু নয়ন দেখলে চিনা।
হালুইকর বলিহারি, জিনিষ তৈয়ারী করি,
রেখেছে সারি সারি মোণ্ডা মিঠাই খাসা গজা,
ও তা চিনে খায় সুরসিক যারা পেয়েছে তারি মজা ॥
গোঁসাই কুবিরের বাণী, ছালা-পূরা আছে চিনি,
যাদুবিন্দু দিন রজনী বলদ হয়ে বচ্ছে বোঝা।
খাই কপালগুণে কাল চুলা খড় যেমন কাজ তেমনি সাজা ॥

১১

আর কত দিনে আমার মন আমার কথা শুনবে।
শ্রীগুরুপাদ নেহার রেখে চরণ ধ'রে কাঁন্দিবে।
(বল্‌বে আমায় পার কর হে)
কামাদি ছয় বলি দিয়ে মানবদেহ জরিপ করে আউরস্থিতি করবে,
আবার পঞ্চবাণ সাধন করিয়ে ভবনদী পার হবে।
অষ্ট-শক্তির এক শক্তির রূপ দর্শন করিবে ॥

১২

হরিনামের তুল্য ধন জগতে কি আছে।
ও মন বলি তোমারে, হরি বল প্রেম কর রে সাধুর সঙ্গ ধরে ॥
সাধুর সঙ্গ করলে পড়বে না ফেরে ॥
ও মন হরি বলে নেচে গেয়ে প্রহ্লাদ জীবন পেয়েছে ॥
দেহের উত্তর আর দক্ষিণ পূর্ব্ব আর পশ্চিম
নিত্য ধ্যানের তত্ত্ব নইলে মন হবে উদাসী
বলিকে পাতালে রেখে দ্বারের দ্বারী হয়েছে।
* কোনখানেতে রয়, কেমন তার আশ্রয়,
কোন নদীর জল মাঝে মাঝে পৃথিবী পড়য়,
প্রাণকৃষ্ণ বলে সেই জলে নদী ভেসে যায় ॥

১৩

স্বাধীন রাজা নবদ্বীপে রসরাজ গৌরাঙ্গ হরি।
কল্লেন সাঙ্গোপাঙ্গ সৈন্য সঙ্গে নামব্রহ্ম সার অস্ত্রধারী ॥
হরিনামের কামান ছেড়ে,
দমন কল্লেন পাষণ্ডেরে,
নিতাস্ত রণবাদ্য বাজে রূপের মৃদঙ্গ ;
তার রণসজ্জা হাতী ঘোড়া,
ভাব মহাভাব দুজন তারা,
গোরার যুদ্ধে পড়ল ধরা জগাই মাধাই ভজন-বৈরী ॥
রণস্থলী গঙ্গা-তীরে,
ফৌজ থাকে শ্রীরূপের ঘরে কেল্লাতে
তারা সময় বুঝে আসে যুদ্ধে জয়ী হতে।
তার সেনাপতি নিত্যানন্দ,
শ্রীকৃষ্ণ রণ কল্লেন বন্ধ
ছত্রিশ বর্ণ একানন্দ—জাত রেখেছেন বিচার করি ॥
উদয়গিরি অস্তগিরি
ভবসিন্ধু দখল করি গৌরাঙ্গ,
চিন্ময় পুর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ—

নেপাল ভূপাল যতই রাজা,
গৌরাচাদের স্বাধীন প্রজা,
হীরালাল কয় তাদের সাজা ভক্তি আইনজারি করি ॥

১৪

মাছ ধরতে যদি পারবি না বিল গাবালি কেনে,
গাবালি কেনে ওরে বিল গাবালি কেনে।
বাগ না জেনে ক্ষেপলা ফেলে ছুটরে পড়িস বাউবনে ॥
কাটা-খসা খাই-কাটা জালে,
মাছ ধরে মাছ ফসকে গেল আনাড়ী জেলে,
কোসে কোসে বাঁধলি বোঝা তুলবে কোন্ জনে,
ও তোর ভিজে কম্বল আরো ভারী হলো রে দিনে দিনে ॥

১৫

আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে।
দিয়ে অঞ্জেনেরি পারা, ঠিক রেখ তুই নয়নতারা,
রূপরসেতে আছে পূরা দেখতে পায় নয়নে ॥
মনের মানুষ মনছাড়া কেউ করো না,
কলে বলে ষোল আনা—হিসাবে গোল করো না,
বাটপাড় বসে আছে দুজনা,
তারা পূর্ব্বধন সব নেবে হরে ফেলিবে অকূল পাথারে,
সাথীরা সব যাবে ছেড়ে কাঁদিবা বসে নির্জ্জনে।
খুট ধরে বসে আছে যে জনা,
যাঁতার ঘিস লাগবে না গায়,
কতই তুফান বয়ে যায়—
তাতে ভয় নাই—যেমন চূণে হলুদ দিলে পরে,
দুই রং যায় আপনি সরে,
সে যে এক লাল রং ধরে ঠাওরে দেখ নয়নে ॥
গুরুবস্তু করে মত্ত হলো যে জনা,
গুরু-শিষ্য এক আত্মা,
যার হয়েছে পরমাত্মা,
সৃজন করেছে কর্ত্তা দুজনে,
গোঁসাই গোবিন্দচাদ কয় গেল বেলা,
ভাঙ্গ রে মন রসের খেলা,
ভাবসাগরে দাও মেলা কায কি অন্য সাধনে ॥

১৬

তরী বানালে কত দিনে বসে কোন্‌খানে,
প্রথম শনিবারে যাত্রা করে দাড়া পত্তন ভাসালে
দরিয়ার মাঝখানে ॥
শোণিত শুক্র চক্র মূলাধার,
তরী ত্রিগুণ সঞ্চার,
চৌদ্দ পোয়া গঠন সারা তার
গঠনদার গঠেছে যতনে।
একবার দিগনিরূপণ কর দেখি মন আপন ধড় জেনে ॥
আনর ঠিকানা আর চাপা ডালি,
মাল ডহরা রেখেছে খালি কেবল সেই মালেরি সন্ধানে।
কত জলুই প্রেক লাগিয়ে বাঁক হিকমতের গুণে।
সাদ কেটে জাদ লাগিয়েছে কসে,
বানি বন গেছে মিশে

জল ঝরে ডহরার চারি পাশে আমি তাই ভাবছি মনে মনে।
কুবের বলে আসি অন্তিমকালে সেই রাঙ্গাচরণ পড়ে মনে ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভক্তি

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ পরমপুরুষার্থ বা মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ"। ভাগবত ১১।২০।৬। এই ভগবদ্-বাক্যে অষ্টাঙ্গযোগও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, "মন একত্র সংযুঞ্জ্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের কথিত বিষয়ই অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ যে জ্ঞানযোগের অন্তর্গত, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত যাবতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মই কর্ম্ম-যোগের অন্তর্গত। এই কর্ম্মসকল দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় বলিয়া তত কাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবে, যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য না জন্মে; অথবা ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না হয়। চিত্তের মলিনতা পাপ, ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়, এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ দূরীভূত হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। ঐ চিত্ত যাহার দ্রবীভূত হয় না, তাহার বৈরাগ্য জন্মিলে পর জ্ঞানমার্গের আলোচনা, মনন ও ঐকান্তিকতা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, আর যাহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহাদের ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জন্মিলে পর উহাতে রতি, তৎপরে ভক্তি হইয়া থাকে, এবং ঐ ভক্তিই মুক্তির সাধিকা। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি এই দুইটিই পুরুষার্থ হইতে পারে, উভয় পুরুষার্থসাধন করিতেই চিত্তের বিশুদ্ধি প্রয়োজন, বিশুদ্ধ চিত্তেই অষ্টাঙ্গযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ঐ অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছেদে ভগবানের একটিমাত্র রূপজ্ঞান-যোগ্য একাগ্রতা মনের সম্পাদন করিতে হইবে। তদ্দ্বারা অভিমান অহঙ্কার দূর হইয়া জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই জ্ঞানযোগের ফলে স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, এমন কি, দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতেও আসক্তি থাকে না।

অথবা মনের দৌরাত্ম্য দূর করিতে হইলে ভক্তিযোগই অবলম্বন করিবে। নিরন্তর ভগবদ্ভজন দ্বারা হৃদয়ের নিখিল বাসনার নাশ হয়, সাধনভক্তিনিষ্ঠা দ্বারা সকল বিষয় হইতে চিত্ত যখন একমাত্র ইষ্টনিষ্ঠ হয়, তখন তাহার অন্য অবলম্বন থাকে না বলিয়াই এবং ভগবৎকৃপাবলে বাসনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

এমন অনেক দুর্ভাগ্য আছে, যাহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, তাহাদের ভক্তি বা জ্ঞানের আবশ্যকতাও নাই। আবার এমন অনেক ভাগ্যবান্ আছেন, যাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য জন্ম জন্ম রাশীকৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয় না, অথচ উঁহারা ঐকান্তিক সাধনভক্তিনিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের বিষয় হইতে মনকে বিমুখ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং তাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণে কীর্ত্তনে বা স্মরণে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া, গলিয়া যাওয়া, এই ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে, ইহা বহু সৌভাগ্যের ফল; কাহারও পূর্ব্বজন্মের সাধনায়, কাহারও বা ভগবৎসাধন-নিষ্ঠা দ্বারা জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ দ্রবীভূত চিত্তই ভগবদাকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব-সংযোগে পরমানন্দস্বরূপ ভক্তিরস ভাগ্যবান্ মানবের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়।

বিভাব আলম্বন ও উদ্দীপনভেদে দুই প্রকার। আলম্বন-বিভাব ভগবান্; উদ্দীপনবিভাব তুলসী, চন্দন, ভগবৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি; অনুভাব নেত্রবিকারাদি; ব্যভিচারভাব—বৈরাগ্যাদি। এই সকল হইতে যে রস ভাগ্যবানের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়, উহার নাম "ভক্তিযোগ"। রসিকগণ উহাকেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া থাকেন।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩১—৩৬ শ্লোকে আছে—"অতএব হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যোগীর জ্ঞান বা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃ নহে," "কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম এবং অন্যান্য শ্রেয় দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, সেই স্বর্গ, মোক্ষ বা মদীয় স্থান যদি কিছু আমার ভক্ত ইচ্ছা করে, তবে অনায়াসে এই ভক্তিযোগ দ্বারা সে তাহা লাভ করে। কিন্তু ধীর সাধু ঐকান্তিক মদ্ভক্তগণ কিছুই বাঞ্ছা করেন না, এমন কি, আমি যদি তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করি, যাহাতে জন্ম-মরণ তিরোহিত হয়, তাহাও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কিছুর অপেক্ষা না রাখাই আত্যন্তিক পরমমঙ্গল, সুতরাং নিষ্কামী নিরপেক্ষ মানবের আমার প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত, সাধু, সমচিত্ত এবং বুদ্ধির পরবর্ত্তী যে জিনিষ, তাহাকে পাইয়াছেন, তাঁহাদের গুণ বা দোষাদ্ভূত গুণ হয় না অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টি করে না।" এই সকল প্রমাণই সেই রসের অনুভবকর্ত্তার পরমানন্দানুভূতির সাক্ষ্য দান করে, এবং এই জন্য ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাৎ-কারে সমর্থ হইলে ভগবান্ যখন তাহাকে বর দিতে উদ্যত হয়েন, তখন সে বলে—"স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি, বরং ন যাচে"।

"যে সুখে দুঃখের সম্পর্ক নাই—সেই সুখই পরমপুরুষার্থ" ইহাই সকল দার্শনিকের সিদ্ধান্ত। তবে এমন কথা হইতে পারে যে, সাধারণতঃ লোক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটিকেই পুরুষার্থ বলে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, "কৃষিই আমার জীবন" সে ক্ষেত্রে যেমন জীবনধারণের উপায়কে জীবন বলা হয়, এখানেও সেইরূপ সুখের সাধনকেই পুরুষার্থ বলা হইয়াছে, পরন্তু নিরতিশয় সুখই যে পরমপুরুষার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? সুতরাং যাঁহারা সুখকে পুরুষার্থ বলেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিকগণ বলেন, সুখ ও দুঃখাভাব দুইটিই পুরুষার্থ, সে কথাটি আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, সুখমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিলে যখন চলে, তখন পৃথক্রূপে দুঃখাভাবকে পুরুষার্থ বলার আবশ্যক হয় না, পরন্তু দুঃখাভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে মানিতেই হইবে, সুখের পরিচায়ক হিসাবে তাহার উপযোগিতা।

এই কথার উত্তরে তার্কিকরা বলেন, সুখের ন্যায় দুঃখা-ভাবকেই বা পরমপুরুষার্থ কেন বলিব না? যখন একের পক্ষে

অধিক প্রমাণ নাই (অর্থাৎ বিনিগমনা নাই), তখন উভয়কেই নিরপেক্ষভাবে পুরুষার্থ বলিতে হইবে।

বৈদান্তিকগণ ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, যে দুইটিকে বিনিগমনাহীন তুল্যরূপে তখনই গ্রহণ করা যায়, "যেখানে দুঃখাভাব, সেইখানেই সুখ, যেখানে সুখ, সেইখানেই দুঃখাভাব" এইরূপ যদি একটি নির্দ্দোষ সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাপ্তি থাকিত, কিন্তু তাহাতে প্রধান অন্তরায় ঘটিয়াছে যে, প্রলয়কালে কিম্বা সুষুপ্তি-সময়ে দুঃখাভাব আছে, কিন্তু সুখ নাই।

নৈয়ায়িকগণ ইহার উত্তরে বলেন, যদি সুখই পুরুষার্থ হইবে, তবে ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তি বা সর্ব্বদুঃখশূন্য মোক্ষকে তোমরা কি করিয়া পুরুষার্থ বলিবে?

ইহার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, তোমাদের দুঃখাভাব-রূপ মোক্ষ যে পুরুষার্থ, এ কথা আমরা মানি না। কারণ, আমরা পরমানন্দরূপ মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলি।

আমরা এ স্থানে ন্যায় ও বেদান্তের কলহ পরিত্যাগ করিয়া 'সুখ যে পুরুষার্থ' এই সর্ব্ববাদিসিদ্ধ কথামাত্র বলিলে বোধ হয়, কাহারও আপত্তি হইবে না, এবং কেহই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অন্তর্গত নয় বলিয়া সুখকে অপুরুষার্থ বলিবেন না, এবং আমরা ভগবদ্‌ভক্তিযোগকে দুঃখসম্পর্কহীন সুখ বলিয়া পরমপুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিতে পারি, ইহাতেও বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না।

বস্তুতঃ আর একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহারা স্বতঃসিদ্ধ, কেহই পুরুষার্থ নহে। পরন্তু সুখসাধন বলিয়াই পুরুষার্থ, সুতরাং সুখমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিলাম।

ভক্তিসুখ সমাধিসুখের ন্যায় মোক্ষের নিকটবর্ত্তী বলিয়া মোক্ষের অন্তর্ভূত, অথবা ভাগবত ধর্ম্মজন্য বলিয়া ধর্ম্মান্তর্গত, এ কথা ভগবদস্তিত্বে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ভক্তি, ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত কিম্বা স্বতন্ত্র হইলেও যে পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া মানবমাত্রেরই কাম্য, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই।

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ভাগবতে আছে যে, এই সংসারে প্রবিষ্ট জীবের ইহা অপেক্ষা মঙ্গলময় পথ আর হইতে পারে না—ভগবান্ বাসুদেবে যেরূপে ভক্তি হয়। ২।২।৩৩।

মানবের সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম যদি হরিকথায় রুচি না জন্মায়, তবে উহা শ্রম মাত্র বুঝিতে হইবে। ১।২।৮

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গলময় অনুষ্ঠান দ্বারা কৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয়।" ১০।৪৭।২৪।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির পরম্পরায় পুরুষার্থতা বলা হইয়াছে, কেন না, এ স্থানে ভক্তি তত্ত্বজ্ঞানের উৎপাদিকা, তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ-সাধক। এই স্থানেও কোনরূপ বিরোধ নাই। কারণ, ভক্তিশব্দে ভজন অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভগবদাকারতারূপ প্রাপ্তি, এইরূপ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন ভক্তিশব্দে ফল, এবং ভজ্যতে অনয়া এই করণ-বাচ্যে নিষ্পন্ন ভক্তিশব্দে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধনকে ভক্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিশব্দে সাধন ও ফল দুই বুঝায়, সুতরাং ভক্তি সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় পুরুষার্থ বলিয়া গীতোক্ত শ্লোকেও বিরোধ হইল না।

যেমন একই বিজ্ঞান শব্দে বিজ্ঞপ্তি ও অন্তঃকরণ দুইকে ভাব এবং করণনিষ্পন্নভেদে বুঝাইয়াছে, যথা—"বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম" বৃহদারণ্যক উপনিষদ, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" তৈত্তির উপনিষৎ।

সাধুগণ "পাপরাশিনাশক হরিকে সঞ্জাত ভক্তি দ্বারা স্মরণ করত এবং ভক্তি দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিয়া রোমাঞ্চিত শরীর ধারণ করেন" এই ভাগবতের—১১।৩।৩১ শ্লোকে দুইবার ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রথমবার করণবাচ্যে নিষ্পন্ন সাধনার্থে—দ্বিতীয়বার ভক্তিশব্দ ভাববাচ্যে ফলার্থে।

এই সাধনভক্তি যদি অপর কোন ফলের সাধন হইত, তবে "তাহারা নির্বৃতি লাভ করিয়া রোদন, হাস্য বা কথায় গান করে" ১১।৩।৩২ শ্লোকে পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া নির্বৃতিপ্রাপ্ত, তাহারা তূষ্ণীভূত হয়, এইরূপ কৃতার্থতা নির্দ্দেশ থাকিত না। পরন্তু তাহার পর অপর অনুষ্ঠেয়ের কথা নির্দ্দেশ থাকিত, অথচ সেইরূপ কোন নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং ভক্তি সাধন ও ফল-ভেদে দ্বিবিধ হইলেও উহার বোধক বচন সকলের বিষয়-বিভাগ নিবন্ধন বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। 'অহং ধ্রুবন্তি কার্ংস্ন্যেন' ইত্যাদি স্থলে ফল ও সাধন উভয়ই সমান, "মানবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান প্রভৃতির ইহাই সত্য অর্থ যে, উত্তমশ্লোকের গুণানুবর্ণন করা" ১।৫।২২; ইত্যাদি স্থলে সাধনপর ভক্তি ফলরূপার্থে বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে নামান্তরে ব্রহ্মবিদ্যাকেই ভগবদ্‌ভক্তি বলা হইল, এইরূপ শঙ্কা করা যায় না, কারণ, স্বরূপ, সাধন, ফল, অধিকারিভেদে ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রভেদ আছে।

"চিত্তের দ্রবীভাব পূর্ব্বক সবিকল্পভগবদাকারবৃত্তির নাম ভক্তি" "চিত্তের দ্রবীভাব না হইয়া একমাত্র আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্প মনোবৃত্তির নাম ব্রহ্মবিদ্যা", ইহাই স্বরূপগত প্রভেদ। ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক গ্রন্থশ্রবণের নাম ভক্তিসাধন। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মবিদ্যাসাধন। ইহাই সাধনভেদ ভগবদ্বিষয়ে প্রেমের উৎকর্ষ ভক্তির ফল এবং সকল অনর্থের মূল অজ্ঞাননিবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফল। ইহা ফলগত প্রভেদ।

প্রাণিমাত্রই ভক্তির অধিকারী। সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন পরমহংস পরিব্রাজক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী, ইহাই অধিকারিভেদ।

তবে বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতরাশি দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়, এই বিষয়ে দুই সমান। সুতরাং স্বরূপসাধনফল অধিকারিভেদে ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ভক্তিকে পরমপুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। স্বর্গাদি যেমন নিয়ত—দেশ কাল পাত্র শরীর ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য, পরন্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভোগ করা যায় না এবং স্বর্গসুখ যেমন বিনশ্বর ও পরাধীন বলিয়া দুঃখের সঙ্গে জড়িত, ভক্তি সেরূপ নহে। ভক্তিসুখধারা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বশরীরেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করা যায় এবং এই সুখধারা বিনশ্বর বা পরাধীন বলিয়া দুঃখজড়িতও নহে। সুতরাং ভক্তিকে নিরতিশয় পুরুষার্থ বলিতে কোন বাধা নাই।

"যে জন মুকুন্দসেবী, সে সাধারণের ন্যায় কখনও সংসারে গমন করে না, ভগবৎপাদপদ্মসঙ্গ-সুখ স্মরণ করিয়া উহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু উহাতে তাহার রসবোধ হইয়াছে" ১।৫।১৯।

"যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে কৃষ্ণগুণানুরাগী চিত্তকে একবারও নিবিষ্ট করিয়াছে, তাহারা যম বা যমভৃত্যকে স্বপ্নেও দর্শন করে না, কারণ, তাহারা যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত" ৬।১।১৯। অতএব পরিণামে বিরস স্বর্গাদির সহিত ভক্তির তুলনা হয় না, এবং লৌকিক রসের সহিতও হয় না। ভক্তির উৎকর্ষ ক্রমশঃ দেখান যাইবে।

ভক্তিসুখানুভূতি হইলে বৈরাগ্য হয় না, এবং বৈরাগ্য না জন্মিলে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না, এতদুত্তরে ভক্তগণ বলেন যে, যাহারা ভক্তিসুখে আসক্ত, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার চাহে না, তবে ভজনীয়স্বরূপনির্ণয়ের জন্য ভক্তেরও বেদান্তবিচার আবশ্যক, ভক্তিসুখলাভ হইলে বৈরাগ্য হয় না, এই আপত্তিটিকে তাঁহারা নিজের অভিলষিতই মনে করেন। "আত্মারামাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তেরও ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বলবৎসংসারাসক্তিনিপীড়িত ব্যক্তির অতি কঠোর শমদমতিতিক্ষা উপরতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় ক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ঐ সব ব্যক্তি জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। এখন দেখা যাউক, ভক্তি কাহাকে বলা যায়, ভক্তিকে পূর্ব্বে পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। এইবার তাহার সামান্য লক্ষণ বলা যাইতেছে, যথা—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।"

ভগবদ্গুণানুশ্রবণে দ্রবীভূত চিত্তের ধারাবাহিকরূপে সর্ব্বেশ্বরে যে বৃত্তি হয়, উহার নাম ভক্তি।

এই স্থানে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই ভগবদ্গুণ শ্রবণ করিতে হইবে, এরূপ অর্থ লক্ষণকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে।

"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"

ভাগবত—৭।১।৩১।

তাই যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মন সন্নিবিষ্ট করিবে। এই শ্লোকে "কেনাপি উপায়েন" এই পদের অর্থ 'ধর্ম্মবুদ্ধি'তে অনুষ্ঠিত অথবা অযত্নসিদ্ধ ভগবদ্গুণশ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণে মন সন্নিবিষ্ট করিবে। এইরূপ অর্থ করায় দ্বেষবুদ্ধিতে শিশুপাল কৃষ্ণকে ভাবিয়া মুক্ত হইল। এই স্থানেও ভক্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি অর্থাৎ লক্ষ্যে লক্ষণের অগমন হইল না। ভগবদ্গুণশ্রবণে কামক্রোধের উদ্দীপনা হয় এবং তদ্দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হইলে উহার যে ধারাবাহিক সর্ব্বেশ্বরবিষয়ক বৃত্তি অর্থাৎ ভগবদাকারতা, উহার নাম ভক্তি, এই ভক্তি দর্শনে সর্ব্বত্র ভগবদাকারতাই বৃত্তিশব্দার্থ বুঝিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন।

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে,
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।"

ভা।৩।২৯।১১।১২—

আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান আমাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনোগতি, যেমন সমুদ্রে গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন ধারা, সেইরূপ উহাই ভক্তিযোগের লক্ষণ।

এই স্থানের অবিচ্ছিন্ন পদ ধারাবাহিকত্ব অর্থ দেখাইয়াছে। দৃষ্টান্তে গঙ্গাজলের দ্রবাবস্থার ন্যায় দার্ষ্টান্তিকেও মনের দ্রবাবস্থা বুঝিতে হইবে, 'ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে মনোবৃত্তিঃ" এই বাক্য দ্বারা অদ্রবাবস্থায় ধারাবাহিক বৃত্তিও দ্রবাবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সে ভক্তি নহে, ইহা বিস্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য চিত্তের স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতেছে।

"চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে।"

চিত্ত স্বভাবতঃ জতু (গালার) ন্যায় কঠিন, তাপক-বিষয়যোগে দ্রবত্ব লাভ করে।

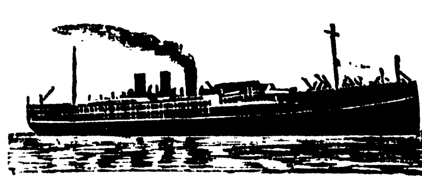
গালা আগুনের তাপ না পাইলে গলে না, সৌরকিরণে শিথিল মাত্র হয়, দ্রবীভূত হয় না, এ কথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। এইরূপ চিত্তরূপ গালাও কামাদিরূপ বিষয়াগ্নি-সংযোগে গলিয়া যায়, সাধারণ বিষয়-সংযোগে শিথিল হয় মাত্র, গলে না। তাপক কাহারা—

"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ।"

যে বিষয়ে কামাদির উদ্রেক হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের দ্রবীভাব হয়, আবার বিষয়ান্তরসঞ্চারে কামাদির তিরোভাব ঘটিলে চিত্ত পুনরায় কঠিন হইয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেকের উদাহরণ চিত্তদ্রবীভাবের প্রয়োজন প্রভৃতি পরে বলা হইবে।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।



প্রচারক মহাশয়ের কায *

প্রচারক মহাশয় আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। ভূতের গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের সঙ্গে বুঝি কখনও সাক্ষাতের সুবিধা হয়নি?

নিভন্ত কলিকাশুদ্ধ হুঁকোটা নামিয়ে রাখতে রাখতে প্রচারক মশায় বল্লেন, বিলক্ষণ,—সুবিধা ব'লে সুবিধা, প্রায় সমস্ত রাত ধ'রেই মোলাকাৎ।

কি রকম হয়েছিল ব্যাপারটা?

তিনি বল্লেন, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল একটু সঙীন ধরণেরই। বছর পাঁচেক আগেকার কথা। মুর্শিদাবাদ জেলার এক অজ গ্রামে যাবার কথা, প্রচার-কাযের সাহায্য হিসাবে কিছু মোটা টাকা পাবার সম্ভাবনা ছিল। গোরুর গাড়ী ক'রে সমস্ত দিন হটর-হটর ক'রে চ'লে দেহ অবসন্ন। মন ক্লান্ত। বড় বড় মাঠ, জঙ্গল, জলা পার হয়ে হয়ে কচিৎ একটা গ্রাম, আবার চল্লো সেই মাঠ আর জঙ্গলের মেলা। কত দূরে যে আমার সেই বাঞ্ছিত গাঁ, তার হদিস্-ই পাওয়া যায় না।

বিকালবেলা হয়ে গেছে—সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরী নেই। একটা গ্রামের উপান্তে এসে পড়লাম। বাকর মিঞা গাড়োয়ানকে বল্লাম, গাড়ী থামিয়ে একটু তামাক সাজ দিকিনি বাবা—আর ত পারিনে। বোধ করি, আর আজ যাওয়া চলবে না, তামাক খেয়ে রাত্রিতে একটু আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে।

বাকর তামাক সাজ্‌তে সাজ্‌তে গাঁয়ের দিকে চেয়ে বল্লে, এ গাঁ-টা যেন কেমন কেমন ঠেকছে কর্ত্তা বাবু! মানুষ-জন নেই—লক্ষ্মী-ছাড়ার পারা।

আমিও চেয়ে দেখলাম, কথা সত্যি। রাস্তায় লোক-চলাচল নেই বল্লেই হয়—হুমড়ি খাওয়া গাছ-গুলোর তলায় যেন অন্ধকার এরি মধ্যে জমাট হয়েছে—এঁদো-পড়া পুকুর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে সুরু করেছে!

অস্বস্তি বোধ হ'ল। কলকেটা বাকরের হাতে দিয়ে বল্লাম, আমি এগোচ্ছি, ঐ সামনে যে কোঠা-বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখেনে যাচ্ছি, তুইও গাড়ী নিয়ে আয়।

বেশী ডাকাডাকি করতে হ'ল না, এক জন বাবু বেরিয়ে এসে বল্লেন, কি চান আপনি?

আমি বল্লাম, আমি—র পক্ষ থেকে প্রচার কাযে বেরিয়েছি, অমুক গাঁয়ে যেতে চাই। কোন্ রাস্ত দিয়ে গেলে সে গাঁয়ে পৌছব আর কতক্ষণ লাগবে? বাবুটির মুখ শুকনো, তবুও হাসলেন। বল্লেন, এই রাস্তা দিয়ে গেলে বেশীক্ষণ লাগবে না, অবিলম্বেই যে অতি উৎকট প্রচারকটির সঙ্গে দেখা হবে, তার প্রচারের বিষয় এবং পন্থাও খুব সোজা সরল,—সেই আপনাকে দেখিয়ে দেবে পথ, সিধে বরাবর, কিন্তু সে এই ভব-নদীর পারের।

তাঁর এই আশ্চর্য্য আতিথেয়তার ধরণে আমি যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করলাম। লোকটা পাগল না কি? বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে ত, কিন্তু এত বিষয় থাকতে হঠাৎ ভব-নদী পার হবার সহজ পন্থা ব'লে দেবার মত এ রকম ঔৎসুক্য ত আর কারও দেখিনি!

আমি সংক্ষেপে বল্লাম, অর্থাৎ?

তিনি বল্লেন, অর্থাৎ বাঘ।

বাঘ?

হাঁ মশাই, বাঘ। প্রচণ্ড ঔদরিক। প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেছে সে, আমাদের এই গাঁ আর আশে-পাশের আরও বহু গাঁ তার দাপটে তটস্থ! রোজ আসে রাত্রিতে এবং চেঁচা-বেড়ার সামান্য অবরোধ তার কাছে কিছুই নয়। এই দেখুন না, এখনই আসতে আরম্ভ করবে গাঁয়ের যত লোক। গাঁয়ের মধ্যে মাত্র আমারই আছে তিনটি কোঠাঘর, নীচে দুটি, ওপরে একটি। নীচের দুটিতে গাঁয়ের লোকরা থাকে তাদের মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে, আর ওপরের ঐ ছোট ঘরটিতে কাটাই আমরা সপরিবারে। ভালও লাগে না দিনের পর দিন এমনই ভয়ে ভয়ে কাটান, —মানুষের প্রাত্যহিকার জীবনের কায একদম সব বন্ধ। কেউ মারে না কেন? প্রথমতঃ ভয়ানক ধূর্ত্ত সে বাঘ, তার গতিবিধি কেউ বুঝতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই পাঁচটা গাঁয়ে আছে একটি মুঙ্গের গাদা বন্দুক আর গোটা তিনেক মরচে-ধরা সড়কী। এ রকম একটা জানোয়ারের পক্ষে যথেষ্ট হাতিয়ার নয় বুঝতেই পাচ্ছেন।

---

* প্রচারক মহাশয় বলেন, কাহিনীটি আগাগোড়া সত্য।

সদরে খবর পাঠান হয়েছে, কর্ত্তাদের দয়া এখনও হয়নি। তাই বলছিলাম যে, আপনার প্রচার-কার্য্যের পক্ষে এ সময় অথবা যায়গা কোনটাই বেশ অনুকূল নয়।

আমি দ'মে গিয়েছিলাম ভয়ানক, বল্লাম, নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু আজ রাত্রির জন্যে একটু আশ্রয় দিতে হবে যে!

ভদ্রলোক হাসলেন, বল্লেন, অগত্যা। কিন্তু কোটা-ঘরে হওয়া কঠিন।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রৈলাম। বাকর আলি এসে পৌছে সব কথাই শুনে ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিল, এই কথায় তার হাত স্তব্ধ হয়ে দাড়িতেই আটকে রৈল।

তিনি বল্লেন, কোটাঘরগুলোয় আর ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। তা ছাড়া ওতে পাড়ার মেয়েছেলেরাও থাকেন, আপনাদের থাকতে দেবে কেন?

আমি হতাশ হয়ে বল্লাম, তবে?

লোকটি স্বচ্ছন্দে তার চণ্ডীমণ্ডপ দেখিয়ে বল্লে, কেন, আমার ঐ চণ্ডী-মণ্ডপে।

আমি বল্লাম, ওর দেওয়ালও ত ছেঁচা-বেড়ার,—ওতে থাকলে ত নিশ্চয় মৃত্যু।

তিনি হাসলেন, বল্লেন, নিশ্চয় না-ও হ'তে পারে। অন্ততঃ গরুর গাড়ীতে রাস্তার মাঝখানে থাকার চেয়েও ভাল। তা ছাড়া ওর দেওয়ালগুলো শক্ত আছে—আগা-গোড়া মাটী লেপা পুরু ক'রে। আর ব্যাঘ্র মশায়ের গতি-বিধির ত' ঠিক নেই, হয় ত বা দয়া ক'রে আজ আমাদের এ গাঁয়ে না-ও আসতে পারে।

আমি লোকটার হৃদয়হীনতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বোধ করি, প্রতিদিনকার কঠিন বিপদের আওতায় তার মন একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এত বড় বিপদের মধ্যে প'ড়ে অপরের মনের যে কি ভাব হ'তে পারে, তা কল্পনা করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েছিল। একবার মুখে এলো যে বলি, মশাই, আপনার চণ্ডীমণ্ডপ যদি এতই নিরাপদ এবং বেড়া এতই মজবুত ত' দয়া ক'রে আজ স্বয়ং সপরিবারে রাতটা ঐতেই কাটিয়ে দেখুন না। কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না, কারণ, তা হ'লে ঐ সামান্য আশ্রয়টুকুও হারানো সুনিশ্চিত।

বাকর আলি বল্লে, হুজুর, আমার জানোয়ার দুটো? লোকটা আবার হাসলে, বল্লে, ওদের জন্যে একটুও ভেবো না, মিঞা সাহেব। আমাদের এই দেবতাটি মানুষ-খেকো, যাকে বলে আসল ম্যান-ইটার, তোমার ঐ বলদ-যোড়া যদি তার মুখেও গুঁজে দেও, তবুও ওদের খাবে না। বেশ নিশ্চিন্তে ওদের যেখানে ইচ্ছে রেখে দিতে পার। তা না হয় চণ্ডী-মণ্ডপের ঐ পাশের ঘরটাতেই রেখে দিও।

তার পর আমার দিকে ফিরে বল্লে, যাই মশাই, খাওয়া-দাওয়া ক'রে আবার তৈরী হয়ে নিতে হবে ত'।

ব'লে লোকটা ভিতরে চ'লে গেল।

বিপদই হ'ল সব-চেয়ে বড় কষ্টি-পাথর, ওরই গায়ে মানুষের মূল্য যাচাই হয় কড়ায় গণ্ডায়। এ লোকটি নিজে গেল খেতে, কিন্তু সমস্ত দিনের পর আমরা যে অভুক্ত তার বাড়ীতে এসে পৌছলাম, তার একবার খবর পর্য্যন্ত নিলে না, এমন কি, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার কথাও মনে পড়ল না, এমনই কঠিন হয়ে গেছে ওর মন!

ভয়ানকত্বে কে যে বড়, মানুষ অথবা বাঘ, তা বলা সত্যিই শক্ত!

তখন সন্ধ্যা হয়েছে; ভারী সিরসিরে বাতাস লেগে যেমন দেহ, তেমনই মনও যেন বিকল হবার মত হচ্ছে। আমি বল্লাম, বাকর, চিড়ে-টিঁড়ে আছে ত'?

বাকর বল্লে, আছে বাবু, ভুরোও আছে। কিছু খেয়ে নিয়ে চলুন, আমরা যায়গাটা ঠিক ক'রে নি।

বাকর সব আয়োজন ক'রে দিলে—সামনে পুকুর থেকে জল এনে খাওয়া ত' যো-সো ক'রে সারা গেল। চণ্ডী-মণ্ডপে ঢুকে দেখা গেল, মানুষের প্রবেশ বহুদিন হয়নি। চামচিকের একটা চিমসে গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ, মেঝে অপরিষ্কার। মন বেশী দমল না এবার, কারণ, বাসর-ঘরের আয়োজন ত' প্রত্যাশা করিনি।

বাকর কোথায় গিয়েছিল, খানিক পরে বিরাট একটা পাকাটির বোঝা নিয়ে উপস্থিত হ'ল, বল্লে, কাযে দিতে পারে, বাবু।

আমি বল্লাম, দেবেই ত'! ছোট ছোট আঁটি বাঁধ দিকিনি কতক-গুলো।

আঁটি বাঁধতে বাঁধতে বাকর বল্লে, বাবু, এই কতকগুলো কাঠও রয়েছে দেখছি। এইগুলো ঐ উঁচু আড়ায় বিছিয়ে মাচান ক'রে তারই ওপর থাকলে আমাদের তবুও কতকটা

ভয় কম, ব'লে সে আড়ার উপর উঠে গেল, আর আমি নীচে থেকে তাকে একটা একটা ক'রে কাঠ তুলে দিতে লাগলাম।

বাইরে তখন পাড়ার লোকদের আসার চাপা-শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রবল-পরাক্রম অত্যাচারীর ভয়ে সব জিনিষই আস্তে, সন্ত্রস্ত! সবাই নিজের নিজের প্রাণ, নিজের স্বার্থ নিয়ে অতি ব্যস্ত!

বাহিরের ক্ষীণ পর্দ্দা-টুকু উঠে গিয়ে মনুষ্য-প্রেমের একেবারে অবাধ প্রকাশ!

তোড়জোড় ঠিক ক'রে মাচায় উঠলাম। সঙ্গে পাকাটির ছোট আঁটি কয়েকটা রাখা হ'ল। দেশলাই দু' জনের সঙ্গে ছিল দুটো।

ভাবছিলাম, কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছি যে, সন্ধ্যা তাগাতাগি এমনি ক'রে সাক্ষাৎ যমের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকতে হ'ল।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তারই অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকার মত যন্ত্রণা বোধ করি মৃত্যুও দিতে পারে না!

অথচ ভরসা হচ্ছিল যে, যদি সে আজ দয়া ক'রে না আসে। আমি ব'সে ব'সে দুর্গা-নাম করতে লাগলাম, এবং বাকর দীন-দুনিয়ার মালিক তার আল্লাকে ডাকতে লাগল। বাঘের ভয়ে আজ একই মাচায় সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়!

বাড়ীর সেই তিন-কোঠার মৃদু গুঞ্জরণ আস্তে আস্তে থেমে গেছে!

সবটা মিলে এমনই একটা ভীষণ চিত্রপট তৈরী হয়েছে—যাকে পূর্ণ করতে বাকী রয়েছে শুদ্ধ মাত্র সেই মহাভয়ঙ্করের মূর্ত্তি!

রাত দশটা হবে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে এবং মনের ক্লান্তিতে দু'চোখ জোড়বার মত হয়েছিল।

এমন সময় আকাশ-বাতাস, জল-স্থল বিদীর্ণ ক'রে শোনা গেল এক অশ্রুত-পূর্ব্ব ভীষণ গর্জ্জন—যার গভীর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঘ-গর্জ্জনের মত বারম্বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। সেই নিনাদের সঙ্গে আমাদের ঘর যেন ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

চুপ ক'রে ব'সে রৈলাম। বিপদের আসন্নতায় মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে!

কাণ খাড়া ক'রে রৈলাম। আবার গর্জ্জন এবং তার পর আমাদের ছেঁচা-বেড়ার দেওয়ালে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত দেওয়ালটা থর থর ক'রে উঠল।

সুরু হ'ল মহা-ভয়ঙ্করের অভিসার। দেখতে দেখতে ছেঁচা-বেড়ার খানিকটা ফুটো হয়ে গেল, এবং তার ভিতর থেকে অস্পষ্ট নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একটা মুখ এবং তাতে দুটো তীব্র জ্বালাময় চোখ!

বাকর মিঞা একটা পাকাটির আঁটি জ্বালিয়ে তার মুখের কাছে বাড়িয়ে দিল। বাধা পেয়ে সেই ভীষণ নর-খাদক এমনই চীৎকার ক'রে উঠল যে, আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

খানিকটা অন্তর্দ্ধান এবং তার পর আবার সেই বেড়ায় দ্বিগুণ জোরে লম্ফ-প্রদান। আবার সেই পাকাটির আগুন—আবার পিছিয়ে যাওয়া, আবার গর্জ্জন এবং আবার লম্ফ!

বাতাসে শরের মত কাঁপতে লাগল সেই ঘর এবং তার সঙ্গে আমাদের প্রাণ!

মৃত্যুর সঙ্গে সেই খেলা, তার বুঝি তুলনা নেই! এই খেলার নেশায় ভ'রে উঠল আমাদের দেহ-মন—পাকাটির উপর পাকাটি জ্বালিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিবারণের এই মর্ম্মান্তিক খেলা! বাইরে ঘন ঘন গম্ভীর গর্জ্জন, এবং ছেঁচা-বেড়ার অন্তরালটুকুকে ধূলিসাৎ করবার প্রচণ্ড আয়াস, এবং ভিতর থেকে চলতে লাগল জীবন-মরণের শেষ প্রচেষ্টা!

আমি বল্লাম, বাকর, সাবধান, যদি ঘর জ্ব'লে ওঠে, ছেঁচা-বেড়া বৈ ত' নয়।

বাকর বল্লে, জ্বলুক না! বাবু! আগুনেই না হয় মর্‌বে সবাই, ও-ব্যাটারও ত' নিস্তার নেই।

বাকরের তখন খুন চেপেছিল।

এমনই ক'রে চললো সেই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যুদ্ধ—তিন-ঘণ্টা কি চার-ঘণ্টাই হবে। চেয়ে দেখলাম, মাত্র দুটি আঁটি আর বাকী আছে, বাকী সবই পুড়ে গেছে!

আমি বল্লাম, বাকর, আর মাত্র দুটি আঁটি বাকী,—কি হবে এ পুড়ে গেলে?

বাকর বল্লে, খোদা জানেন। ব'লে জ্বলন্ত আঁটিটা বাঘটার মুখে ঠেসে ধরলে।

একটা তীব্র গর্জ্জন—তার পর চুপচাপ। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন বোধ হয় কাণে পর্য্যবসিত হয়েছিল—আমরা প্রাণপণে তার গতি-বিধি শুনতে লাগলাম।

কোনও সাড়া নেই।

এমনি ক'রে পনর মিনিট কাটলো। আমি বল্লাম, চ'লে গেছে বোধ হয়।

বাকর বল্লে, হবে, কিন্তু আবার আসবে, এ নিশ্চয় কথা। বাঘের গোঁ বাবু,—সমস্ত রাত আমাদের খাবার চেষ্টা করবে। বাকী পাকাটিগুলো মেঝে থেকে নিয়ে আসি।

ব'লে সে নেমে গেল। আমি জ্বলন্ত একটা আঁটি সেই বেড়ার ফুটোর কাছে ধ'রে রৈলাম।

বাকর বাকী সমস্ত পাকাটি আমার হাতে দিয়ে উপরে এসে বসল। যুদ্ধের সময় যেমন ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে গোলা-গুলী তৈরীর হাঙ্গামা প'ড়ে গিয়েছিল, আমরা তেমনই ক্ষিপ্রহস্তে পাকাটির আঁটির পর আঁটি তৈরী করতে লাগলাম।

বাকর বল্লে, কটা বেজেছে বাবু?

ঘড়ীতে দেখলাম আড়াইটা।

বাকর বল্লে, আসবে নিশ্চয়ই। চৌপর রাত না দেখে সে যাবে না। এবার আরও ভয়ানক লড়াই হবে। কি হবে, খোদার মর্জ্জি!

আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমনই সময় আবার সেই বিপুল গম্ভীর গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত কেঁপে উঠল।

বাকর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কান্নার স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল, আল্লা!

অর্থাৎ সম্ভাবনা থাকলেও মনে মনে বোধ করি আমরা খুবই প্রত্যাশা করেছিলাম যে, হয় ত' সে আর আসবে না। যখন সে আবার এলো, তখন অন্তরের দারুণ হতাশা কান্নার মত ক'রেই বাকরের মুখ দিয়ে বেরুলো।

দেহের সমস্ত রক্তের মধ্য দিয়ে যেন একরাশ পিঁপড়ে আনাগোনা করতে লাগল।

এবার প্রচণ্ড লম্ফে বেড়ার আরও অনেকখানি খ'সে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হৃদয়-বিদারক গর্জ্জন!

এবার সে আর পাকাটির আগুনও মানতে চায় না। একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে যে ভয়ানক লাফ দিলে, তাতে সমস্ত দেওয়ালটা মড়মড় ক'রে উঠল।

তার পর কি যে হ'ল, ঠিক বুঝতে পার্‌লাম না। বাইরে যেন কিসের শব্দ হ'ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা অশ্রুত-পূর্ব্ব ভীষণতর গর্জ্জন ক'রে উঠলো, এবং তার পর দেওয়ালের মড়-মড় শব্দ এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড বাঘ তার সমস্ত দেহের দৈর্ঘ্যে ঘরটা পরিপূর্ণ ক'রে ঠিক আমাদেরই মাচার দু' হাত নীচে দাঁড়িয়ে, অতি প্রচণ্ড গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে দিগ্বিদিক্ আলোড়িত ক'রে তুলছে!

কলে যেমন ঘড়ীর কাঁটা চলে, তেমনই কলেরই মত আমরা দু' জনে দুটো জ্বলন্ত আঁটি তার দিকে এগিয়ে ধ'রে পাষাণের মত ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলাম, একটিমাত্র বিরাট লম্ফের, এবং আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠল তার পর কার সকরুণ চিত্র, যখন বনে প্রান্তরে ধাবমান সেই নরখাদকের বিরাট দংষ্ট্রায় আমরা দুটি নিরাশ্রয় ইন্দুর-শাবকের মত ঝুলছি!

সে একবারমাত্র অবহেলাভরে মাচার দিকে দেখলে, কিন্তু তার ক্রোধের বস্তু দেখলাম বাইরে। সেই দিকে চেয়ে সে উন্মত্তের মত গর্জ্জন করতে লাগল।

জানি না, এর পরের লক্ষ্য কে বা কারা, কিন্তু এমন অপরূপ দৃশ্য কখনও দেখিনি, বোধ করি, কোনও দিন আর দেখব না। আমাদের দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে সেই উন্মত্ত—করাল মৃত্যু, তার দেহ ঢেউয়ের মত আন্দোলিত হচ্ছে, এবং মুখ থেকে যে গর্জ্জন বেরোচ্ছে, তার কাছে বজ্র-গর্জ্জনও নীরব! সেই অপূর্ব্ব ভীষণের সামনে মাথা নত হয়ে এল—মন নিস্পন্দ হয়ে গেল।

আর একবার বিশ্ব-প্লাবী গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে বেড়ার আধ-খানা ভেঙ্গে চুরে ফেলে দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল।

তার পর কি হ'ল, ভাল বুঝতে পারলাম না, বাইরে ব্যাঘ্রগর্জ্জনের সঙ্গে বজ্র-গর্জ্জনের মত আওয়াজ পেলাম। তার পর কিছুক্ষণ আর কিছুই অনুভব-শক্তি ছিল না—শুধু মনে হচ্ছিল, যেন বাইরে শত দৈত্যের ভীষণ তাণ্ডব লেগে গিয়েছে।

খানিক পরে বাকর ডাকলে, বাবু!

কি রে?

—মারা পড়েছে।

—মারা পড়েছে? কে মারা পড়ল?

সেই বাঘটা।

উঠে বসলুম। বাঘটা? কে মারলে বাকর?

সদর থেকে শিকারীরা এসে। কাল সেই যে ঘরে ঢুকেছিল, সে তানাদের গুলী খেয়ে।

বাইরে গিয়ে দেখলাম, দেশের লোক ভেঙ্গেছে। মূর্ত্তিমান কালের মত সেই প্রকাণ্ড বাঘ প'ড়ে রয়েছে। শিকারীরা খবর পেয়ে রাত্রিতে গ্রামে আসেন, এবং সুবিধা-মত মাচা বাঁধবার সুযোগ পান তখন—যখন বাঘটা মাঝে চ'লে যায়। তার পর সে ফিরে আসতেই তাঁরা গুলী করেন, কিন্তু সেটা সাংঘাতিক হয় না। সেই রাগে ও যন্ত্রণায় সে ঘরে ঢুকে পড়ে, তার পর শিকারীদেরই লক্ষ্য ক'রে লাফ দেয়। তখন আর আমাদের কথা তার মনেই ছিল না।

বন্দুকের গুলীর সামনে তাকে আর বেশীক্ষণ যুঝতে হয় না।

আশ্চর্য্য অপলক দৃষ্টিতে সেই ভীষণ সুন্দরের দিকে চেয়ে রইলাম। মৃত্যুতেও যেন সেই দৃপ্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষয় হয় নি।

বল্লাম, বাকর, গাড়ী ঠিক কর, চল, রওনা হই। তখন উদীয়মান সূর্য্যের কিরণে দিগ্‌দিক্ সবে মাত্র লাল হয়ে উঠেছে। আজকের এই অপ্রত্যাশিত নবীন সূর্য্যালোক দেখলাম, যাঁর কৃপায় সেই সর্ব্বশক্তিমানকে দুই হাত যোড় ক'রে প্রণাম করলাম।

বাকর বললে, বাবু, কিছু খেয়ে নেবেন না?

আমি বললাম, সে সব পরের গাঁয়ে হবে, বাকর! তুই রওনা হ'।

বাকর আমাদের রাত্রির আশ্রয় সেই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে একবার চেয়ে বললে, সেই ভালো কথা, বাবু!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সে কোথায়!

কুসুম ঝরিয়া পড়ে তারকা খসিয়া ঝরে
জ্যো'স্নার হাসিটি মিলায়!
সে কোথায়, সে কোথায়!

আঁখি করে ছলছল আশা করে টলমল
ঝঞ্ঝায় দীপ নিভে যায়!
সে কোথায়, সে কোথায়!

জীবন বহিয়া চলে সুখে ও নয়ন-জলে
দিগন্তে আঁধার ঘনায়
সে কোথায়, সে কোথায়!

আজি বড় একা লাগে কেহ নাই রাত জাগে
পাশে প'ড়ে সকলে ঘুমায়
সে কোথায়, সে কোথায়!

এসেছিল হাসি গানে মোর বাঁশী কলতানে
হরিণীর মত লঘু-পায়,
সে কোথায়, সে কোথায়!

ছোট দুটি করপুটে মালা লয়ে এলো ছুটে
তুলে দিতে আমার গলায়—
কোথা মালা,—সে কোথায়!

নিঠুরা নিয়তি তারে রেখে দিল এক ধারে
ফুলগুলি সুরভি বিলায়—
কোথা ফুল,—সে কোথায়!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

সে কালের স্মৃতি

৩

১২৮০ সালের মাঘ মাসে আমরা মুখুয্যেপাড়ার পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া নূতন বাড়ীতে আসিলাম। যে জমীতে এই বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের লাখরাজ। আমার কাকার কাছে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর নাম-স্বাক্ষরিত একখানি দানপত্র দেখিয়াছিলাম। তাহা হরিদ্রাভ তুলট কাগজে লেখা। তাহার মাথার দিকে 'শ্রীরাণী ভবানী' এই স্বাক্ষর ছিল। মোটা মোটা অক্ষর; কতকাল পূর্ব্বের লেখা; কিন্তু কালী জল্-জল্ করিতেছিল। জানি না, নাটোরের এই সম্পত্তি কত দিন পরে কি উপলক্ষে কাশিমবাজার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আমাদের নূতন বাড়ীর সীমার মধ্যে অনেকগুলি আম-কাঁটালের গাছ এবং কতকগুলি খেজুরগাছ ছিল। বাড়ীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় কয়েক ঝাড় বাঁশ ছিল। তখন শীতকাল। নবীন বাগ্দী নামক এক জন 'গাছী' আমাদের বাড়ীর খেজুরগাছগুলি চাঁচিয়া তাহা হইতে রস সংগ্রহ করিত। নবীন এক এক দিন সায়ংকালে আমাদিগকে এক এক ঘটি 'জিরেন কাটে'র রস উপহার দিয়া যাইত। শীতের সন্ধ্যায় সেই রস পান করিয়া আমাদের বুকের ভিতর কাঁপুনী ধরিত। আমরা গৃহকোণে মৃৎপ্রদীপের আলোকে পুরু কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িতাম। দীর্ঘ শীতের রাত্রি সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া যাইত। এই জীবন-সন্ধ্যায় নিরুদ্বেগ শৈশবের সেই সুখময় সন্ধ্যার কথা স্মরণ হইলে কি এক অব্যক্ত বেদনায় বুক টন্-টন্ করিয়া উঠে। যাঁহাদের স্নেহে ও আদর-যত্নে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলাম, আজ তাঁহারা কোথায়? যৌবনে যাঁহাদিগকে লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা আজ কোথায়? সকলই স্বপ্ন মনে হয়!

আমাদের বাসগৃহগুলি ছিল মাটী-কোঠা। এ কালে পল্লী-গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীতে সেরূপ মাটী-কোঠা কদাচিৎ দেখিতে পাই। এ কালে যাহাদের আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল, তাহারা ছোটখাটো ইষ্টকালয়, অভাবে টিনের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে উলুখড়ের ছাউনিও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কারণ, তাহাতে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ অগ্নিভয়। সে কালে গোপপল্লীতে শীতকালে গরুর ঘরে সাঁজাল দেওয়া হইত। শুষ্ক কাঠ, ঘাস স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। সেই অগ্নির উত্তাপে গরু-বাছুরের শীত-নিবারণ হইত; দরিদ্র গৃহস্থরা সায়ংকালে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসিয়া সুখদুঃখের গল্প বলিত, এবং কলিকায় 'দা-কাটা' তামাক সাজিয়া তৃপ্তির সহিত ধূমপান করিত। কিন্তু তাহাদের অসতর্কতায় কখন কখন সাঁজালের আগুন গো-শালার বাঁশের বেড়ায় ধরিয়া যাইত, অবশেষে তাহা গো-শালার মট্কায় উঠিয়া বায়ুবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, এবং পল্লীর বহু গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইত কখন কখন গৃহস্থ-রমণীরা ধান সিদ্ধ করিতে বসিয়াও এইরূপ বিভ্রাট ঘটাইত। যেখানে ধান সিদ্ধ হইত, তাহার অদূরে পাকাটীর স্তূপ, আশে-পাশে বিচালীর গাদা। কৃষক-রমণী কোন কারণে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সময় উনানের আগুন পাকাটীতে ধরিয়া বিচালীর স্তূপ বিধ্বস্ত করিত, এবং জ্বলন্ত বিচালী উড়িয়া বাসগৃহের চালে পড়িত, তাহার পর সমগ্র পল্লী অগ্নিময় হইয়া উঠিত! প্রতিবৎসর এই ভাবে বহুসংখ্যক চাষী গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিতে হইত। ঘরের চালে আগুন লাগিলে তাহাতে শুষ্ক বাঁশের সাজ জ্বলিয়া উঠিত, দুম্দাম্ শব্দে 'উখো' অর্থাৎ বাঁশের শুষ্ক গ্রন্থিগুলি ছুটিয়া প্রতিবেশীর গৃহের চালে পড়িত ও 'মট্কা'য় সেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত। গৃহস্থরা ঘরের চালগুলি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালের উপর কলাপাতা, মানগাছের পাতা, ভিজা কাঁথা প্রসারিত করিয়া কলসপূর্ণ জল লইয়া ঘরের মটকার পাশে বসিয়া থাকিত, তথাপি 'উখো'র আগুন হইতে চাল রক্ষা করিতে পারিত না। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে তাহার প্রতিবেশীরা সেই অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া স্ব স্ব ঘর বাঁচাইবার চেষ্টা করিত; কিন্তু সম্মিলিত চেষ্টার অভাবে প্রায় কাহারও ঘর অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইত না। বিশেষতঃ পাড়ার দুই চারিটা কূপের জলে পল্লীব্যাপী অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত না। চল্লিশ পঞ্চাশ ঘড়া জল তুলিবার পর কূপগুলিতে

আর ঘড়া ডুবিত না। তখন নিরুপায় পল্লীবাসীরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিত। তাহাদের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইত।

গৃহস্থিত আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রাদি রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা মাটীকোঠা নির্ম্মাণ করিত। মাটীর দেওয়াল, সেই দেওয়ালের উপর কাঠের 'আড়া' (কড়ি)। পল্লীগ্রামের গৃহস্থরা কাঁটাল-গাছের, জাম বা কড়ুই গাছের গুঁড়ি চিরিয়া এই সকল 'আড়া' প্রস্তুত করিত। অতি অল্পসংখ্যক গৃহস্থেরই শাল-কাঠের আড়া ব্যবহারের সৌভাগ্য ঘটিত; সাধারণতঃ অট্টালিকাতেই শালকাঠের আড়া ব্যবহৃত হইত; কারণ, পল্লী অঞ্চলে শালকাঠের আড়া দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য ছিল। আমাদের ঘরগুলিতে কাঁটাল-কাঠের আড়া ছিল। মাটীর দেওয়ালের উপর প্রত্যেক ঘরে ছয়টি বা আটটি আড়া প্রসারিত থাকিত, তাহার উপর খাটালে খাটালে আম, জাম, কাঁঠাল-কাঠের তক্তা পাতিয়া গৃহের অভ্যন্তর-ভাগে দেওয়া হইত। সেই তক্তার উপর কয়েক ইঞ্চি পুরু মাটীর আবরণ থাকিত। তাহার উপর উলুখড়ের চাল। ঘরের ভিতর অগ্নি প্রবেশ করিতে না পারে, এ জন্য দ্বার-জানালার সমান আকারের 'মাটীঝাঁপা' প্রস্তুত রাখা হইত। কতকগুলি বাঁশের বাখারী পর পর সাজাইয়া সেগুলি রজ্জুবদ্ধ করা হইত, এবং তাহার উপর পুরু করিয়া মাটী লেপিয়া তাহা শুকাইয়া রাখা হইত। পল্লীর কোন বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড হইলে 'মাটীকোঠা'র মালিক সেই সকল 'মাটীঝাঁপা' দ্বারা রুদ্ধ দ্বার-জানালা আচ্ছাদিত করিত এবং তাহাদের কিনারাগুলি কাদা দিয়া দ্বার-জানালার প্রান্তবর্ত্তী দেওয়ালের সঙ্গে আঁটিয়া দিত। অগ্নিতে ঘরের চাল ও চালের নিম্নস্থিত বাঁশের সাজ ভস্মীভূত হইলেও ঘরের ভিতরে কোন সামগ্রী নষ্ট হইত না। অগ্নিকাণ্ডের পর দ্বার-জানালা হইতে 'মাটীঝাঁপা' অপসারিত হইত, এবং মাটীকোঠার উপর পুনর্ব্বার বাঁশের সাজ দিয়া, উলুখড় দ্বারা তাহা ছাইয়া লওয়া হইত। সেই সকল বাঁশের সাজ গর্ত্তের জলে পচাইয়া লওয়ায় সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হইত এবং তাহাতে সহজে ঘুণ ধরিত না। এই সকল মাটী-কোঠায় কাঠের খুঁটি ব্যবহৃত হইত। কাঠের খুঁটি ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেকে বাঁশের মোটা খুঁটি ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঁশের খুঁটি মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত। খড়ের চালের অন্য অসুবিধাও ছিল; প্রবল ঝড়ে তাহা উড়িয়া যাইত, বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টি হইলে খড়গুলি পচিয়া যাইত; উই-পোকাতেও চাল নষ্ট করিত। খড়ের ঘরের এই সকল অসুবিধা ছিল বলিয়া অনেক গৃহস্থ বহু কষ্টে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দুই একখানি 'পাকাঘর' নির্ম্মাণ করিত। এইরূপে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামে বহু-সংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

নবীন বাগ্দী শীতকালে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য শতাধিক খেজুরগাছ 'কাটিত'। গৃহস্থ প্রত্যেক গাছের খাজানাস্বরূপ দুই সের খেজুরে গুড় পাইত। সেই দুই সের গুড় দিয়া সে কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত রস লইত। তিন দিন রস গ্রহণের পর তিন দিন গাছকে বিশ্রাম বা 'জিরেন' দেওয়া হইত। চতুর্থ দিন যে রস সঞ্চিত হইত, তাহাই 'জিরেন কাটে'র রস। সেই রস অতি মধুর। খেজুরের চারা-গাছের রস অপেক্ষা পরিণত-বয়স্ক বৃক্ষের রস অনেক অধিক মিষ্ট; তাহার পরিমাণও অধিক হইত। কোন কোন সতেজ গাছে এক রাত্রিতে প্রায় এক ঠিলি রস সঞ্চিত হইত। নবীন শীতকালে বেলা প্রায় তিনটার সময় গাছ বাঁধিতে আসিত। একগাছা মোটা দড়া মালার মত তাহার দুই কাঁধে ঝুলিত; মনে হইত, তাহার উভয় স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া একটা 'দাঁড়াস' (ঢোঁড়া) সাপ ঝুলিতেছে। সে মালকোঁচা আঁটিয়া কাপড় পরিত এবং অর্দ্ধহস্ত-বিস্তৃত লোমাবৃত ছাগচর্ম্ম কোমর-বন্ধের মত কোমরে জড়াইত; তাহাতে আবদ্ধ চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি তাহার পশ্চাতে ঝুলিত; সেই থলির ভিতর বক্রমুখ তীক্ষ্ণধার কাটারী ও দুই চারিটি কঞ্চির নলি থাকিত; কঞ্চি চিরিয়া পাঁচ ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এক একটি নলি প্রস্তুত করা হইত। উক্ত থলির সঙ্গে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা বাঁকা 'হুক' থাকিত; নবীন খেজুরগাছে যে ঠিলি বাঁধিত, সেই ঠিলির গলার দড়ি সেই হুকে বাধাইয়া সে গাছে উঠিত কিন্তু গাছে উঠিবার সময় দুই হাত লম্বা একটি বংশদণ্ড ও তৎ-সংলগ্ন দীর্ঘরজ্জু তাহার সঙ্গে থাকিত। তাহার পর কাঁধে যে মোটা দড়ি থাকিত, তাহা কাঁধে লইয়াই সে গাছে উঠিত; তাহার পর দুই হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডটি গাছের সঙ্গে আড় করিয়া বাঁধিয়া তাহার দুই পাশে দুই পা রাখিয়া

দাঁড়াইত, এবং সেই মোটা দড়ি দিয়া গাছের সঙ্গে শরীর আবদ্ধ করিত; সেই সময় সে পশ্চাতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িত ও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া ঠোঙ্গা হইতে কাটারী বাহির করিয়া গাছের ত্বক্ অপসারিত করিত। কিছু কাল চাঁচিবার পর স্থূল 'চোঁচা' অপসারিত হইলে ক্ষতস্থানে বিন্দু বিন্দু রস দেখা যাইত; তখন সে বাঁশের নলিটি চালু করিয়া তাহাতে বিঁধাইয়া দিত। অতঃপর চামড়ার ঠোঙ্গা-সংলগ্ন আংটা হইতে মাটীর ঠিলি খুলিয়া লইয়া রজ্জু দ্বারা তাহা নলির নীচে ঝুলাইয়া দিত। নলি দিয়া রস গড়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহা সারারাত্রি সেই ঠিলিতে সঞ্চিত হইত। ঠিলিটি নলির মুখ হইতে কোন কারণে সরিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে খেজুরগাছের পশ্চাদ্বর্ত্তী শাখা টানিয়া সম্মুখে আনিয়া তাহা চিরিয়া তদ্দ্বারা ঠিলির গলা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত। তাহার ঠোঙ্গায় কখন কখন চাকা চাকা করিয়া কাটা মানকচু থাকিত; সে তাহা কোন কোন ঠিলির ভিতর ফেলিয়া রাখিত। সন্ধ্যার পর গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা কোন খেজুরগাছে উঠিয়া রস চুরি করিত; কিন্তু ঠিলিতে মানকচু থাকিলে কেহ সেই রস চুরি করিত না। মানকচু-সিক্ত রস পানের অযোগ্য, তাহা পান করিলে গলা কুটকুট করে।

নবীন রাত্রিশেষে অন্ধকার থাকিতেই খেজুরগাছ হইতে ঠিলি খুলিয়া লইয়া যাইত। একখানি বাঁশের বাঁকের দুই ধারে রসপূর্ণ ঠিলিগুলি ঝুলাইয়া লইয়া সে তাহার 'বাইনে' উপস্থিত হইত। সে ঠিলি সংগ্রহের জন্য গাছে উঠিবার সময় তাহার 'ইউনিফর্ম' সঙ্গে রাখিত না। কেবল গাছ কাটিবার বা চাচিবার সময় ঐ সকল সরঞ্জাম সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন হইত। সে বাঁকের দুই দিকে দশ বারোটা ঠিলি ঝুলাইয়া লইতে পারিত। রস-সংগ্রহের জন্য এই সময় তাহাকে দুই একটি এপ্রেন্টিস বা সহকারী রাখিতে হইত; তাহারাও ঠিলি পাড়িয়া বাইনে লইয়া আসিত, পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু কিছু গুড় পাইত। তাহারা নানাভাবে নবীনকে সাহায্য করিত।

আমরা তখন বালকমাত্র; নবীনের বাইনের টাট্‌কা গুড়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। বেলা আটটা না বাজিতেই আমরা পাড়ার এক পাল ছেলে শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নবীনের বাইনে উপস্থিত হইতাম। তখনও সুলভ মূল্যের 'র‍্যাপার' বা আলোয়ানের প্রচলন হয় নাই; ফরাসী ছিটের 'দোলাই' ভিন্ন আমাদের অন্য কোন শীতবস্ত্র ছিল না।

নবীন একখানি জীর্ণ অনুচ্চ খড়ের ঘরে বাস করিত। তাহার ঘরে মাটীর প্রাচীর ছিল না; প্রাচীরের পরিবর্ত্তে চারিদিকে কঞ্চির বেড়া, তাহার উপর গোবর-মিশ্রিত মাটীর প্রলেপ। এই কুটীরের এক পাশের চাল-সংলগ্ন একখানি পর-চালা। সেই 'পরচালা'খানি তাহার 'ঢেঁকিশালা' বা 'ঢিসকেল'।—সে চাষী গৃহস্থ; দুই এক বিঘা জমী চষিত, তাহাতে যে ধান পাইত, তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে ঢেঁকি না রাখিলে চলিত না। তাহার আঙ্গিনাখানি ধূলাবর্জ্জিত পরিচ্ছন্ন। তাহারই এক প্রান্তে উনন, সেই উননে ধান সিদ্ধ হইত; রন্ধনের কাযও চলিত। আঙ্গিনার এক পাশে বাঁশের খুঁটিতে শিমের 'টাল'। তাহার শিমগাছে প্রচুর শিম ফলিত। অদূরে একটি পেঁপে গাছ, কয়েকটা লঙ্কা-মরিচের গাছ, একঝাড় বাঁশ, একটা কাঁটালগাছ। তাহার বাড়ীর চারিদিকে জামাল-কোটার বেড়া। সেই বেড়া ঘেঁসিয়া তাহার গুড়ের 'বাইন'।

গুড় প্রস্তুতের স্থানটির নাম 'বাইন'। একটি বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া রস জ্বাল দেওয়ার জন্য সেই 'বাইনে' উনন করা হইয়াছিল। বাইনের চারিদিকে বাঁশের খুঁটি, তাহার উপর খর্জ্জুর-পত্রের আচ্ছাদন। উননের এক পাশে রসের ঠিলিগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখা হইত। নবীন উননে একখানি বৃহৎ মাটীর 'খোলা' চাপাইয়া তাহাতে সকল ঠিলির রস ঢালিয়া দিত; তাহার পর শুষ্ক আস্সাওড়া, ভাঁট, কালকাশিন্দা প্রভৃতি আগাছা দ্বারা রস জ্বাল দিত। এই গুল্মগুলি সে নানা স্থান হইতে কাটিয়া আনিয়া শুকাইয়া বাইনে সঞ্চিত রাখিত। রস অগ্নির উত্তাপে ঈষৎ ঘন ও লোহিতাভ হইলে তাহাকে 'তাতরসা' বলা হইত। পল্লী-রমণীদের অনেকে ঘটী আনিয়া নবীনের নিকট হইতে সেই রস চাহিয়া লইয়া যাইত। উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট পায়স হয়। শীতকালে অনেকেই রসের পায়স রাঁধিত।

দুই ঘণ্টার মধ্যে খোলার রস ঘন গুড়ে পরিণত হইত। গুড় ঘন হইলে নবীন খোলা নামাইয়া তাহার ভিতর গুড়ের 'বীজ' দিত। ঐ 'বীজ' শুষ্ক গুড় ভিন্ন অন্য কিছুই

নহে। খেজুর-শাখার দণ্ড দ্বারা সেই শুষ্ক গুড় খোলার গায়ে মাড়িয়া খোলার গুড়ের সহিত তাহা মিশ্রিত করিলে খোলার গুড় বেশ ঘন হইত। তখন নবীন ঠিলিগুলির মুখ একখানি ময়লা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া এক এক হাতা গুড় ঠিলির মুখের কাপড়ের উপর ঢালিয়া দিত, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা জমিয়া শক্ত হইত। বাতাসার আকার-বিশিষ্ট সেই গুড় 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' নামে প্রসিদ্ধ। নবীনের গুড় জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে সে আমাদের পাতা আনিতে বলিত; আমরা জামাল-কোটার পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতাম। সে প্রত্যেক পাতায় অল্প-পরিমাণ গুড় দান করিত। আমরা পরম তৃপ্তির সহিত তাহা লেহন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতাম। নবীন তাহার 'সরাগুড়'গুলি 'কুলোয়' বা ডালায় তুলিয়া রাখিয়া রস সংগ্রহের ঠিলিগুলি সেই উননের চারিদিকে উপুড় করিয়া সাজাইয়া রাখিত। ঠিলিগুলি এই ভাবে তাতাইয়া লইলে সঞ্চিত রস ভাল থাকে। নবীন সরাগুড়গুলি কুলোয় সাজাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। প্রত্যেকখানির মূল্য এক পয়সা। তাহার গুড় ফরসা হইত, স্বাদও ভাল হইত; এ জন্য তাহার 'সরাগুড়'গুলি শীঘ্রই বিক্রয় হইত। কোন কোন 'গাছী' গুড় জ্বাল দেওয়ার সময় তাহাতে সোডা মিশাইয়া গুড় ফরসা করিত; কিন্তু তাহাতে গুড়ের স্বাদ বিকৃত হইত। নবীন গুড়ে সোডা মিশাইত না। কখন কখন মশলা-চূর্ণ মিশাইত। আমাদের বাড়ীর কয়েক শত গজ উত্তরে কালী-বাজার। গ্রাম্য দেবতা মা কালীর বাসগৃহ এই বাজারের পূর্ব্বে সংস্থাপিত। তাঁহারই নামানুসারে বাজারটি 'কালী-বাজার' নামে পরিচিত। সাহেব জমীদার-কোম্পানী এই বাজারের মালিক। জমীদার-কোম্পানী প্রতি বৎসর স্থানীয় কোন লোককে বাজার ইজারা-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা বাজারে শাকশব্জী ও মাছতরকারী বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট হইতে বহু লোক 'তোলা' আদায় করে। জমীদারের 'ইজারাদার' তোলা লইয়া প্রস্থান করিলে বাজার-পরিষ্কারক মেথর তোলা লইয়া গেল; তাহার পর আসিলেন—কালী-মন্দিরের সেবাইৎ (পুরোহিত); মা কালীর প্রাপ্য তোলায় তাঁহারই অধিকার। তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া মা কালীর পূজার উপাদান সংগ্রহ করেন। শনি-মঙ্গলবারে মা কালীর পূজা উপলক্ষে বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক ভক্ত নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে; তাহারা নির্জ্জলা দুধ, নানাপ্রকার ফল-মূল, ছানা, ক্ষীর, চিনি, সন্দেশ দিয়া মা কালীর পূজা দিয়া যায়। তাহা বিক্রয় করিয়া পরমসুখে পুরোহিত মহাশয় পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার তোলা লওয়া শেষ হইলে আসিলেন 'সাতালয়ের দরগার' ফকির। পীরের দরগায় সিন্নি দেওয়ার জন্য তাঁহারও তোলা তুলিবার অধিকার আছে। শুনিয়াছি, আরও দুই এক জন গাঁয়ের জোরে তোলা লইয়া যায়। বাজারে তাহাদের জুলুম চলে।

এই কালী-মন্দিরের অদূরে মহাদেবের এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ না কি বহুদিন পূর্ব্বে বর্গীরা (মারাঠা দস্যুরা) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে বর্গীরা মেহেরপুর লুঠ করিতে আসিয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহাদের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কথিত আছে, বহুকাল পূর্ব্বে মুরশিদাবাদের কোন নবাব শিকার উপলক্ষে নদীপথে মেহেরপুর আসিয়াছিলেন। মেহেরপুরের প্রান্তবাহী ভৈরবের অবস্থা তখন শোচনীয় হয় নাই; ভৈরব তখন আকারে ভৈরব ছিল। নবাবের বজরাগুলি ভৈরবতটে নঙ্গর করা হইলে রাত্রিকালে সহসা এরূপ ঝড়-বৃষ্টি ও দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল যে, নবাব পারিষদ-বর্গ সহ বজরায় বাস করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

প্রচণ্ড ঝটিকায় বজরা ডুবিবার উপক্রম দেখিয়া নবাব বাহাদুর সদলে বজরা ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলেন। নদী-তীরে কিছু দূরে এক ঘর সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাস ছিল। গৃহ-স্বামিনীর নাম রাজু ঘোষাণী। এই গোপাঙ্গনার খোঁয়াড়ে বিস্তর গো-মহিষ ছিল। দুগ্ধের ব্যবসায়ে তাহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল। সে অতিথিবৎসল ছিল এবং নিরাশ্রয় গরীব-দুঃখীকে অন্ন বিতরণ করিত। মা কমলা তাহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। সেই ঘন-ঘোর রাত্রিতে দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে নবাব বাহাদুর রাজু ঘোষাণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, রাজু নবাবের পরিচয় জানিতে না পারিলেও পরম সমাদরে অতিথি-সৎকার করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট সরু ধানের সুগন্ধযুক্ত চিঁড়া, "গুকো'

দই, পাকা মর্ত্তমান কলা এবং সুস্বাদ গুড় দ্বারা সে নবাব ও তাঁহার অনুচরবর্গের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া সেই রাত্রিতে তাঁহাদিগকে তাহার গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল। বিপন্ন নবাব রাজু ঘোষাণীর গৃহে আতিথ্য লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ;—ঘোষাণীকে পুরস্কার-দানের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

নবাব বাহাদুর পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, আকাশ নির্ম্মল, আর কোন দুর্য্যোগের আশঙ্কা ছিল না। নবাব রাজুর নিকট বিদায়-গ্রহণের সময় রাজুকে নিজের পরিচয় দিয়া তাহার উপকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ কাল হইলে রাজু তাহার সহৃদয়তার পুরস্কারস্বরূপ হয় ত একখানি 'সার্টিফিকেট অফ অনর' বা তাহার পুত্র 'রায় বাহাদুর' অথবা ঐ রকম খেতাব দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইত ; কিন্তু সে কালের নবাব-বাদশাহদের বুদ্ধি কিছু স্থূল ছিল, তাঁহাদের পুরস্কার-দানের প্রণালীও বিভিন্ন রকম ছিল। নবাব বাহাদুরের আদেশ শুনিয়া রাজু ঘোষাণী করযোড়ে নিবেদন করিল, তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে এক রাত্রি নবাব বাহাদুরের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিল ; সে গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। সে সাধারণ গৃহস্থ-রমণী, নবাব বাহাদুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে, সে শক্তি তাহার নাই ; এজন্য সে কুণ্ঠিত। সে কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হইল না। যাহা হউক, অনেক পীড়াপীড়ির পর সে অবশেষে বলিল, তাহার বিস্তর গরু-বাছুর ও মহিষ আছে, কিন্তু সেগুলিকে সে চরাইতে পারে, এরূপ বিস্তৃত গোচারণ-ক্ষেত্র নাই। নবাব ইচ্ছা করিলে তাহাকে গোচারণের উপযুক্ত কিছু জমী দান করিতে পারেন। সেই জমীতে তাহার গরুর পাল চরিয়া বেড়াইবে।

অতঃপর নবাব বাহাদুরের আদেশে রাজু ঘোষাণীর গো-চারণের জন্য বিনা করে একটি বৃহৎ পরগণা প্রদত্ত হইল ; রাজু ঘোষাণীর নামানুসারে এখন সেই পরগণা 'রাজপুর পরগণা' নামে পরিচিত।

রাজু ঘোষাণী বিনা করে এই সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি পাইয়া অল্পদিনে বহু অর্থের অধিকারিণী হইল। তাহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বেই স্বচ্ছল ছিল, এইবার সে রাজার মত সমারোহে বাস করিতে লাগিল। রাজু ঘোষাণীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা 'গোয়ালা চৌধুরী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা মেহেরপুরে একটি গড় নির্ম্মাণ করেন। সেই গড় এখন বর্ত্তমান নাই, কিন্তু যে স্থানে সেই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান এখনও 'গড়বাড়ী' নামে পরিচিত। এই গড়ের পার্শ্বেই একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল ; এখন তাহার আকার সঙ্কুচিত হইয়াছে ; তাহা পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ নাই। তাহা 'গড়ের পুষ্করিণী' নামে পরিচিত এবং এখন তাহা মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি, 'রিজার্ভড্ ট্যাঙ্ক'।

রাজু ঘোষাণীর উত্তরাধিকারীরা দস্যুভয়-নিবারণের জন্য এই গড়ের নীচে একটি 'পাতালঘর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; সেই পাতালঘর কিরূপ দীর্ঘ ও কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের বাল্যকালে এই গড়ের কিয়দংশ খুঁড়িয়া দেখা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, সেই সময় মেহেরপুরের কোন ইংরাজ সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সেই কাযটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি কে, মিঃ এফ, এ, শ্লাক, কি জে, ডি, এণ্ডারসন—তাহা স্মরণ নাই ; মিঃ এণ্ডারসন বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; তিনি 'ইন্দ্রসেন' বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন এবং ভারতীয় সিভিলসার্ভিস পরিত্যাগ করিয়া অক্সফোর্ডে আমাদের দেশীয় ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সদাশয় ও দেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রাজপুরুষ ছিলেন।

আমরা বাল্যকালে গড়-বাড়ীর ভূগর্ভস্থ অংশ কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। ছোট ছোট পাতলা ইট বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাহা দেখিয়া পাতালঘরের ছাদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু ছাতের নীচে যে অংশ ছিল, তাহা কোন দিন খুঁড়িয়া দেখা হয় নাই। দীর্ঘকাল তাহা একই ভাবে পড়িয়াছিল। এত কাল পরে তাহা খুঁড়িয়া দেখিলে পাতালঘরের অনাবিষ্কৃত অংশের সন্ধান হইতে পারে ; কিন্তু সে জন্য আর কেহ কোন চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল অট্টালিকার অদূরে 'কালাচাঁদ মেমোরিয়াল' হলের পূর্ব্বে যেখানে এখন একটি ছোটখাট কাঁটাল-বাগানের অস্তিত্ব বিরাজিত, এবং যাহার ছায়ায় ডোমরা মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে একটি ক্ষুদ্র

উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেই স্থানে মাটীর নীচে উল্লিখিত পাতালঘরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহা সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

রাজু ঘোষাণীর বংশধররা দীঘি খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম পার্শ্বে পাতালঘর নির্ম্মাণ করাইলেও তাঁহারা সেখানে সর্ব্বদা বাস করিতেন না; প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত আমদহ নামক গ্রামে তাঁহারা প্রাসাদোপম বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে বাস করিতেন। এখন সেখানে তাঁহাদের বাস্তুভিটার চিহ্নমাত্র নাই; একটা জলাশয়ের ধারে একটি উচ্চ ঢিপি সেই অট্টালিকার অস্তিত্বের স্মৃতি বহন করিতেছে; কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছিল,—সেই স্থানের অবস্থা দেখিয়া তাহা অনুমান করা কঠিন। কৃষকরা এখন সেখানে ধান্য এবং অরহর, সর্ষপ, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের আবাদ করে। আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ সেই ঢিপির ভিতর হইতে বিস্তর অনুসন্ধানের ফলে দুইখানি ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে দেবনাগরী হরপে কাহারও নামের আদ্যক্ষর লিখিত ছিল। এই সকল স্থান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণার যোগ্য।

শুনিয়াছি, গোয়ালা চৌধুরীদের আমদহের এই বাসভবনের সহিত মেহেরপুরস্থ উক্ত পাতালঘরের যোগ ছিল। তাঁহারা সুড়ঙ্গপথে তাঁহাদের বাসভবন হইতে অন্যের অদৃশ্যভাবে গড়ের পাতালঘরে যাইতে পারিতেন। দস্যুর আক্রমণ হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের টাকা, মোহর ও অলঙ্কারাদি উক্ত পাতালঘরে লুকাইয়া রাখিতেন। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহারা সপরিবার সুড়ঙ্গপথে পাতালঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এরূপ কিংবদন্তীও বাল্যকালে শুনিতে পাইতাম।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে বর্গীর দল তাহাদের অন্যতম অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনঃপুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল; তাহারা দক্ষিণ-বঙ্গের বহু পল্লী লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল—ইহা কাল্পনিক কাহিনী নহে। "ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?"—ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইবার এই ছড়া বাল্যকালে বহু পল্লী-গৃহিণীর মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতাম। আমাদের গ্রামে এই ছড়ার প্রভাব একটু বেশীই ছিল। মেহেরপুর অঞ্চলেও বর্গী দস্যুর শুভাগমন হইয়াছিল। তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া রাজু ঘোষাণীর বংশধররা তাঁহাদের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি সহ আমদহের বাসভবন হইতে পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গপথে মেহেরপুরের গড়ের পাতালঘরে পলায়ন করিয়া সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। দস্যুরা তাঁহাদের বাসগৃহের বিভিন্ন অংশ খুঁজিতে খুঁজিতে পাছে সুড়ঙ্গ-পথ দেখিতে পায় ও সেই পথে পাতালঘরে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সেই পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। মেহেরপুরস্থ গড়বাড়ীতে পাতালঘরে প্রবেশের ও তাহা হইতে বাহির হইবার একটি দ্বার ছিল। গৃহস্বামী পরিজনবর্গ সহ পাতালঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া গড়ের সন্নিহিত একটি প্রাচীন ও সুবৃহৎ তেঁতুলগাছে উঠিয়া লুকাইয়া থাকে। বর্গীরা তাঁহাদের আমদহের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না, ধনাগারে ধনরত্নাদি কিছুই ছিল না। তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, মেহেরপুরের গড়ে তাঁহাদের যে বাড়ী আছে, তাঁহারা সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। বর্গীর দল আমদহ হইতে মেহেরপুরে আসিয়া গোয়ালা চৌধুরীদের গড় আক্রমণ করিল; কেহই তাহাদিগকে বাধা দিল না। কিন্তু তাহারা গড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন গৃহে পুরবাসীদের সন্ধান পাইল না। অগত্যা তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া মেহেরপুর ত্যাগ করিল। কিন্তু দুই এক জন বর্গী দস্যু তখনও গড়ের সন্নিহিত বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল।

যে বিশ্বস্ত ভৃত্য তেঁতুলগাছের ডালে বসিয়া গড়ের চারিদিকে বর্গীদের দাপাদাপি ও লাফালাফি লক্ষ্য করিতেছিল, সে যখন দেখিল, বর্গীরা বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে তেঁতুলগাছ হইতে নামিয়া প্রভুকে সুসংবাদ জানাইতে গড়ের দিকে অগ্রসর হইল। যে দুই জন বর্গী গড়ের অদূরবর্ত্তী বনের ভিতর ঘুরিতেছিল, তাহারা সেই ভৃত্যকে দেখিবামাত্র তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া গুপ্ততথ্য জানিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্য শত অত্যাচারেও নির্ব্বাক্ রহিল। তখন ক্রুদ্ধ বর্গী পদাতিকদ্বয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার

মুণ্ডচ্ছেদ করিল। অতঃপর কি হইল, সে সম্বন্ধে দুই প্রকার জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতির মর্ম্ম এই যে, বর্গী দস্যুদ্বয় সেই ভৃত্যের পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিয়া পাতালঘরের চাবী দেখিতে পায় এবং পাতালঘরের দ্বার আবিষ্কার করিয়া, সহযোগিবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া সদলে পাতালঘরে প্রবেশ করে; তাহারা পাতালঘরের অধিবাসিবর্গকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। দ্বিতীয় জনরবের মর্ম্ম এই যে, প্রহরীকে হত্যা করিয়াই তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করে। প্রহরীর মৃত্যুতে পাতালঘরের অধিবাসীরা সেই রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ, এ কাল পর্য্যন্ত পাতালঘরের গুপ্তরহস্যভেদের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে স্থান খনন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাতালঘরের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল, সেই স্থান খনন করিলে হয় ত একালেও কোন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। শুনিয়াছি, আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ দিনাজপুর অঞ্চল হইতে মেহেরপুর আসিয়া গোয়ালা চৌধুরীদের দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। তাঁহারা গড়বাড়ীর অদূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামায় গোয়ালা চৌধুরীরা নির্ব্বংশ হইলে তাঁহারা মেহেরপুরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। মেহেরপুরে শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহারা বসন্তপুরের যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানে একটি পুষ্করিণীর শেষ চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; পুষ্করিণীর অদূরে এখনও উচ্চ ভিটা পড়িয়া আছে, কিন্তু ইষ্টকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই, মাটী খুঁড়িলে অনেক ইট পাওয়া যায়।

গোয়ালা চৌধুরীদের গড়বাড়ী গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত; তাহার উত্তরে কালীবাজার এবং দক্ষিণে বৌ-বাজার। এতদ্ভিন্ন স্কুল, বোর্ডিং, দাতব্য চিকিৎসালয় ও সুবৃহৎ হাসপাতাল, মিউনিসিপাল আফিস, ডাকঘর, কালীবাড়ী ইহার অদূরে সংস্থাপিত; কিন্তু এই স্থানটি ফাঁকা পড়িয়া আছে, অথচ মেহেরপুরের অলিতে গলিতে নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, জমীর দর ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে, কোথাও একটু জমী পড়িয়া থাকিবার যো নাই; আর এই গড়বাড়ীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া এরূপ প্রকাশ্য স্থানে কেহই বাস করে না—দেখিয়া অনেক আগন্তুক বিস্ময় প্রকাশ করেন! শুনিতে পাওয়া যায়, গোয়ালা চৌধুরীরা এখানে নির্ব্বংশ হওয়ায় গ্রামবাসীদের ধারণা, যে গৃহস্থ পরিবার এই গড়ের সীমার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবে, তাহাদের বংশলোপ হইবে। এই গড়ের সীমার মধ্যে এখন স্কুল-সংলগ্ন মুসলমান বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন গৃহস্থের বাসভবন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই গড়ের সীমার মধ্যে কিছু কাল পূর্ব্বে তিন জন গৃহস্থ প্রচলিত প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক জনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্ররা বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। ডাক-বিভাগের এক জন পদস্থ কর্ম্মচারী চাকরী হইতে অবসর-গ্রহণের পর এখানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে একটি দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় পতিপ্রাণা পত্নী ও একমাত্র পুত্র এই বাড়ীতে বাস করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তাঁহাদের ধারণা, এই নিষিদ্ধ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাতেই তাঁহাদের সুখের সংসারে আগুন লাগিয়া গেল। সেই বাড়ীতে এখন ডাকঘর হইয়াছে। ডাকঘরটি পূর্ব্বে অন্য একটি একতলা বাড়ীতে ছিল। এই গড়ের বাড়ীতে ডাকঘরটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য আমি আমার স্বর্গীয় সুহৃদ ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়কে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলাম; ইহাতে আমারও একটু স্বার্থ ছিল, কারণ, উহা আমার বাড়ী হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে অবস্থিত। এই বাড়ীতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে পোষ্ট-মাষ্টাররা ইহার দোতলায় বাস করিতে থাকেন, একতলায় ডাকঘর। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে কয়েক জন পোষ্ট-মাষ্টার এই বাড়ীতে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পরিবারবর্গের কাহারও না কাহারও প্রাণহানি হইয়াছে; কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কেহ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান পোষ্টমাষ্টার এখনও নিরাপদ আছেন। তৃতীয় অট্টালিকার গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র স্থানান্তরে বাস করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করায় তাঁহারা এই বাড়ীর

সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া উহা কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ভাড়া দিয়াছেন। কোন গৃহস্থ এই বাড়ী ক্রয় করিতে চাহেন নাই। এক জন নব্য উকীল এই গড়ের সীমার উত্তরে বাসের জন্য জমী লইলেও সেখানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করেন নাই।

আমার স্মরণ আছে, আমাদের বাল্যকালে এখানে গ্রামস্থ জমীদার স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের প্রমোদ-ভবন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক মহাশয় মল্লিক-বংশের অলঙ্কারস্বরূপ, গ্রামস্থ প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেরই তিনি প্রাণস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যেরূপ বিলাসী ছিলেন, যেরূপ আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন, এ কালে তাহা উপকথার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমাদের বয়স যখন আট দশ বৎসর মাত্র, সেই সময় গ্রামস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির উদ্যোগে, বিশেষতঃ স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ বাবুর আন্তরিক চেষ্টায় গোয়ালা চৌধুরীদের উক্ত গড়বাড়ীতে 'বাসন্তী মেলা' প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ মহা সমারোহে তাহা সুসম্পন্ন হয়—এই দীর্ঘকাল পরেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এখনও স্মরণ আছে—এই মেলাক্ষেত্রের উত্তরাংশে একটি বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা আসিয়া দ্রৌপদীর বিবাহ-সভার আদর্শে বহু পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সভাস্থলে যে ক্রমোচ্চ গেলারী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার এক দিকে গান্ধার হইতে জলধি-সীমা; ভারতের বিভিন্ন প্রকার রাজ-পরিচ্ছদে ও তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের বিশেষত্বসূচক শিরস্ত্রাণে মণ্ডিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে উপবিষ্ট, অন্য দিকে নানা দেশের ব্রাহ্মণ; তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখিতে আসিয়াছেন। কাহারও মুখ গম্ভীর, কেহ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে রূপ-লাবণ্যবতী দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া আছেন, গভীর বিস্ময়ে মুখ-বিবর ঈষৎ উন্মুক্ত; কেহ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিতেছেন, মুখ দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিতেছেন, "এ কি তোমার সাধ্য? কেন বাপু, লোক হাসাইতে আসিয়াছ?"

গেলারীর সম্মুখে সমতলভূমিতে কয়েকটি মূর্ত্তি;—প্রথমেই নীলাভবর্ণ অর্জ্জুনের দীর্ঘদেহ ও অবনত মুখের প্রতি দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অর্জ্জুনের পদপ্রান্তে একটি আধারে জল, তিনি সেই জলে উর্দ্ধস্থিত মৎস্যের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার উভয় বাহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, এক হাতে ধনু, অন্য হস্তে 'তিনি আকর্ণ পূরিয়া' জ্যা আকর্ষণ করিয়া তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিতেছেন, মুখে গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট, দেখিলেই কবিবর কাশীরাম দাসের সেই বর্ণনাটি মনে পড়ে,—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি, কত শুচি করিয়াছে শোভা।"—ইত্যাদি

কিছু দূরে পদ্মপলাশনেত্রা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, পট্টবস্ত্র-মণ্ডিতা, অপরূপ-রূপলাবণ্যবতী পাঞ্চালী;—এক হাতে ফুলের মালা, অন্য হস্তে দধিভাণ্ড, যেন 'পার্থেরে বরিতে যান দ্রুপদের বালা।' তাহার পশ্চাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভগিনীকে সভাস্থলে পরিচালিত করিতেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত তখন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, দ্রৌপদীর স্বয়ং-বরের এই দৃশ্য দেখিয়া স্থান, কাল, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতাম। পৌরাণিক যুগের এক গৌরবময় দৃশ্য মানস-নেত্রের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

এই মণ্ডপের বিপরীত দিকে—দক্ষিণে আর একটি মণ্ডপ; সেখানেও মৃন্ময় মূর্ত্তির নানা দৃশ্য। প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বের কথা—সকল দৃশ্য ঠিক স্মরণ নাই। এক স্থানে দাবা-খেলার দৃশ্য, দুই জন দাবারু, এক জন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বড়ে টিপিতেছে, পরিধেয় বস্ত্র শ্লথ, কাছা খুলিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে ডাবা হুঁকা, সে গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে টানিতে প্রতিযোগীর চা'ল নিরীক্ষণ করিতেছে; পাশে এক জন দর্শক উপবিষ্ট, সে লুব্ধনেত্রে হুঁকার দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইতেছে, হুঁকাধারীর পশ্চাতে একটি দুষ্ট বালক—সে তাহার সম্মুখোবিষ্ট দাবারুর মাথার সুদীর্ঘ শিখাটি বাঁ হাতের দুই আঙ্গুলে আয়ত্ত করিয়া ডান হাতের কাঁচি দিয়া শিখার মূল স্পর্শ করিয়াছে, বালকের মুখ প্রফুল্ল, চক্ষুতে দুষ্টমীপূর্ণ হাসি।

এই দৃশ্যের পার্শ্বেই নবীন-এলোকেশীর মৃন্ময় মূর্ত্তি। এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি কর্ত্তৃক এলোকেশী-ধর্ষণের মামলা শেষ হইয়াছিল। গ্রামে

গ্রামে এলোকেশী-মোহান্ত-ঘটিত কাহিনী লোকের মুখে মুখে আলোচিত হইতেছিল। বসন্তমেলায় তাহারই সং। এলোকেশীর স্বামী নবীন বঁটী উচাইয়া এলোকেশীকে কাটিতে উদ্যত, এলোকেশী সভয়ে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া মাথা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে ; পাশে 'তেলী-বৌ, বামন পিসী' এবং 'মুক্তকেশী' দাঁড়াইয়া আছে, কেহ আতঙ্কে বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া, নারী-হত্যা অপরিহার্য্য বুঝিয়া দাঁত দিয়া জিভ কাটিতেছে, কেহ নবীনের হাতের বঁটী কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইতেছে। নবীনের অঙ্গে ডবলব্রেষ্ট সার্ট, মুখে গোঁফ, মাথায় বাঁকা টেরী, চক্ষু হইতে ক্রোধ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।—কিছু দূরে মাটীর ঘানী-গাছ, মাধব গিরি মোহান্ত কয়েদীর জাঙ্গি পরিয়া কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া ঘানী টানিতেছে। ঘানীর এক পাশে একটি নল, সেই নলের নীচে মৃৎকলস। সেই নল দিয়া ঘানীর তেল কলসীতে পড়িতেছে, এই ভাবে কলসীটি সংরক্ষিত।

কিছু দূরে আর একটি মণ্ডপের অভ্যন্তরে জগৎসিংহের সহিত ওস্‌মানের অসিযুদ্ধ চলিতেছে। আহত ওসমানের জানু দিয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ; অদূরে নবাব-দুহিতা আয়েষা দাঁড়াইয়া উভয়ের যুদ্ধ-কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছে।—এই দৃশ্য প্রদর্শনের একটু কারণ ছিল। এই মেলায় থিয়েটারের 'ষ্টেজ' বাঁধা হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল—সেই রঙ্গমঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে অভিনীত হইবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর খ্যাতি তখন পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। এই থিয়েটারের সাহায্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল, এই উদ্দেশ্যে সাধারণের কৌতূহল উদ্রেকের জন্যই এই সংএর অবতারণা। ইহা দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপনমাত্র। মেলার পাণ্ডাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

এই থিয়েটারের জন্য মেলার পরিচালকবর্গকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। কারণ, তাঁহারা গ্রামস্থ সখের থিয়েটার দ্বারা দর্শকগণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যয়সাধ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজকাল যেমন গ্রামে গ্রামে দুই একটি সখের থিয়েটারের দলের এবং লাইব্রেরীর আবির্ভাব হইয়াছে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে পল্লী অঞ্চলে তাহাদের অভাব ছিল। এই মেলায় যে থিয়েটার হইয়াছিল, তাহাই আদর্শ করিয়া অনেক দিন পরে মেহেরপুরে একটি 'এমেচিয়র থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার পূর্ব্বে এই খেয়াল কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই।

মেহেরপুরের 'বসন্ত-মেলা' উপলক্ষে যে থিয়েটারের দল আনীত হইয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব, এবং মেহেরপুরের ন্যায় সুদূর মফঃস্বল পল্লীর পক্ষে তাহা অসাধারণ ব্যাপার! কেবল মুখোয্যে বাবুদের চেষ্টায় উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে জমীদার স্বর্গীয় বাবু চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছি। তিনি যে কেবল প্রবলপ্রতাপ তেজস্বী জমীদার ছিলেন, এরূপ নহে, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সদ্ভাব ও আনুগত্য ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী স্বর্গীয় আশুতোষ দেব অর্থাৎ 'ছাতু বাবু'র সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। বাঙ্গালা ১২৬২ সালের মাঘ মাসে ছাতু বাবুর মৃত্যু হয়, চন্দ্রমোহন বাবু তাহার কিছু দিন পরেই প্রাণত্যাগ করেন ; এ জন্য মনে হয়, উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। সম্ভবতঃ উভয় পরিবারের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় ছাতু বাবুর কনিষ্ঠ দৌহিত্র স্বর্গীয় বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার খ্যাতনামা অভিনেতা ; কলিকাতায় সখের রঙ্গমঞ্চে তিনি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং পরে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে জগৎসিংহের ভূমিকা লইয়া অভিনয়ের যে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাটকাভিনয়ের ইতিহাসে তাঁহার সেই গৌরব চিরস্মরণীয়। শরৎ বাবুর সহিত স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহার অনুরোধে শরৎ বাবু মেহেরপুরে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন, এবং সদলে দুর্গম মেহেরপুরে পদার্পণ করিয়া 'বাসন্তী মেলা'র 'ষ্টেজে' দুর্গেশনন্দিনী এবং পুরুবিক্রম নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে তখন মেহেরপুর যাইতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া, পথের কথা ভাবিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিতে হইত! কারণ, চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মেহেরপুর যাইতে গরুর গাড়ী ভিন্ন অন্য যান-বাহন ছিল না। মধ্যে দুইটি নদী পার হইতে হইত। আমরা চুয়াডাঙ্গায় অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়

কলিকাতাগামী 'চাটগাঁ এক্সপ্রেস্' ট্রেণ ধরিবার আশায় বেলা ৯টার পূর্ব্বে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া ছৈয়ের ভিতর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিতাম, এবং গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সর্ব্বাঙ্গ বেদনাপ্লুত করিয়া পাঁচটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে উপস্থিত হইতাম ; নদী পার হইতে বিলম্ব হইলে ট্রেণের আশা ত্যাগ করিতে হইত। আর এখন মোটর-বাসের অনুগ্রহে অপরাহ্ণ ৪টার পরেও মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় আসিতে পারিতেছি। কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে শরৎ বাবুর মত মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সদলে গরুর গাড়ীতে মেহেরপুর যাইবেন, ইহা আশা করা অন্যায়। এ জন্য মেলা-সমিতি বহুব্যয়ে তাঁহাদের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে দিন অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা, শরৎ বাবু ও অন্যান্য অভিনেতা তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই মেহেরপুরে উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্র বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাঁহারা অধিক দৃশ্যপটাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই, এ জন্য শরৎ বাবু স্থানীয় চিত্রশিল্পীর সাহায্যে মেহেরপুরেই কয়েকখানি দৃশ্যপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ সহোদরের বৈঠকখানা-বাড়ীতে শরৎ বাবুর উপদেশে সেই সকল পট অঙ্কিত হইতেছিল। আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অঙ্কন-কৌশল নিরীক্ষণ করিতাম, এবং কি গভীর সম্ভ্রমের সহিত শরৎ বাবুর সৌম্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। শরৎ বাবু তখন যুবা পুরুষ, তাঁহার ন্যায় পুরুষ তাহার পূর্ব্বে আর এক জনও দেখিয়াছিলাম কি না স্মরণ নাই

যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হইল। টিকিটের মূল্য এক টাকার কম ছিল না ; এক একখানি 'রিজার্ভড' আসনের মূল্য পাঁচ টাকা। মহকুমার অধিকাংশ জমীদার এবং পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা 'রিজার্ভড' আসন অধিকার করিয়াছিলেন ; দুই টাকা ও এক টাকা মূল্যের টিকিট এত অধিক বিক্রয় হইয়াছিল যে, দরমার ঘেরের ভিতর তিলধারণেরও স্থান ছিল না। বারো বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকরা অর্দ্ধমূল্যে 'হাফ টিকিট' পাইয়াছিল। কাকা আমাকে আট আনা দিয়া টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পাশে বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছিলাম। সময় আর কাটে না, ঐকতানিক বাদ্য নীরব হইলে যবনিকা উত্তোলিত হইল। শরৎ বাবু মহামূল্য পরিচ্ছদে একটি বৃহৎ ওয়েলারে আরোহণ করিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, ইনি সত্যই জগৎসিংহ। কিন্তু বালক আমরা, বিদ্যাদিগ্‌গজের অভিনয়েই আমরা অধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

এই মেলা উপলক্ষে অর্থের অপব্যয়ও অল্প হয় নাই। বাবুরা বাই, খেমটা প্রভৃতির আয়োজনে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেকগুলি খেমটাওয়ালীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বাইজীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। সে কালে উচ্চশ্রেণীর পুরুষদের নীতিজ্ঞান একাল অপেক্ষা অল্প ছিল। গভীর রাত্রিতে মেলার আসরে খেমটা আরম্ভ হইলে সুরার স্রোত বহিয়াছিল, ছেলেদের কৌতূহল প্রবল, এক রাত্রিতে কয়েক বন্ধুতে চুরি করিয়া খেমটা দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ধরা পড়িয়া কাকার কাছে যে প্রহার লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বহুদিন স্মরণ ছিল। যিনি আগ্রহভরে আমাকে থিয়েটার দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, 'খেমটার নাচ' দেখিতে যাওয়ায় তিনি কি জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি দিলেন, তাহা বুঝিবার মত তখন আমার বয়স হয় নাই, কিন্তু বাবুরা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া খেমটাওয়ালীদের সঙ্গে প্রকাশ্য আসরে যে অভদ্র রসিকতা করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিয়াছিলাম।

মেলাস্থলে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নাগরদোলা, ঘোড়াবাজি প্রভৃতি আসিয়াছিল ; চাষীরা পাণ চিবাইতে চিবাইতে নাগরদোলায় উঠিয়া পাক খাইতেছিল। দুই তিন জন সমস্বরে গাহিতেছিল—

"যায় বুজি যৈবনের তরী অকুল তুফানে,
মদনেরই ঢেউ নেগেচে রাখ্‌তে পারিনে।"

এক পয়সায় কুড়ি পাক, কেহ কেহ দুই তিন পয়সার পাক খাইতে লাগিল। কাহারও পাশে পল্লীবারবিলাসিনী। কালো কুচকুচে রং, পায়ে মল, কটিতটে রূপার গোট বা চন্দ্রহার, দাঁতে মিসি, হাসিলে মনে হয় টিকায় আগুন ধরিয়াছে ! ত্রিশ বৎসরের গতযৌবনা অভাগিনীর নাকে নোলক ! কপালে টিপ,—কি বিশ্রী চেহারা ! মদনের ঢেউই বটে !

এই শ্রেণীর পতিতাদের জন্য মেলার এক অংশে কুটীর-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে যথেষ্ট

খাজনা আদায় হইত ; সে দিকে গ্রাম্য চাষীদের দলের কি ভীড় ! মেলায় নানা স্থান হইতে দোকানী-পসারী আসিয়াছিল। এক দিন এক পয়সা দিয়া কাটামুণ্ডের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ীর পাশেই মেলা, শেষ রাত্রিতে নহবতে যে সঙ্গীতালাপ হইত, আধঘুমে তাহা বড় মধুর মনে হইত। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত জুয়ার আড্ডায় 'তেতাস' ও 'কুপন' খেলার ধূম—আর সেই দিকেই পল্লীবিলাসিনীদের 'কোয়াটার।'

আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একটি যুবক বন্ধু তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র, তিনি মুখুয্যে-পরিবারের রত্নস্বরূপ ছিলেন ; পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং কলেজে অধ্যাপনা করিতে করিতে সরকারের বৃত্তি লইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সহোদরের মতই স্নেহ করিতেন। তিনি এই মেলায় অর্থের অপব্যয় ও দুর্নীতির স্রোত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গুরুজনের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার 'টাইটেল'-পৃষ্ঠার উপর হেমবাবুর একটি কবিতার কিয়দংশ 'মটো'রূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল—

"এক দিন অনশনে যদি দিন যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায় ?" ইত্যাদি।

আমরা ছেলের দল অবশেষে মেলার বিরুদ্ধে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাখালের বাঁশী

বাজে রাখালের বাঁশী—
কোথায় রাখাল বসি কোন্ সুরে কি বাঁশী বাজায় !
কার তরে আত্মহারা—কি আনন্দে কিবা বেদনায়।
কে জানে রহস্য তার—সারা বিশ্বে কোথা কিছু নাই।
পাগল রাগিণী শুধু ঘুরে ফেরে আপনার ঠাঁই।

বাজে রাখালের বাঁশী—
প্রতিধ্বনি তুলিবারে মহাকাশ জাগিল স্পন্দনে,
গ্রহতারা ঝঙ্কারিয়া ছুটে চলে সুরের প্লাবনে।
নব নব পরমাণু তরঙ্গিত আদিম প্রভাতে—
ছন্দে ছন্দে প্রাণ পেয়ে বাজে সুর সুরের আঘাতে।

বাজে রাখালের বাঁশী—
রাখাল আজিকে আর আপনার নাহি পায় সীমা,
খণ্ড সুরগুলি তার মত্ত ল'য়ে আপন মহিমা।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আজ পাসরি সে আদি ঐক্যতান,
ভাঙ্গে গড়ে সেই সুরে—কিন্তু তার না জানে সন্ধান।

কাঁদে রাখালের বাঁশী—
সুর-রাজ সারা বিশ্বে খুঁজে ফেরে আপনার জন,
অভিমানে বিশ্বপ্রাণ নবতানে করে আকর্ষণ !
নিত্যরাস-নৃত্যরসে উদ্বেলিত তার আত্মদান,
নিখিলের ভাবস্রোতে নিরন্তর বহায় উজান।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

স্পর্শের প্রভাব

২৩

বহুক্ষণ পল্লীর গৃহস্থ-গৃহগুলি দীপ নিভাইয়া প্রকৃতির নিবিড় তিমিররাজ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। চারিদিকে সুপ্তির গাঢ় নীরবতা। কিন্তু জ্যোৎস্নার নয়নে আজ নিদ্রার কোন সম্বন্ধই ছিল না। অদূরে সুধাংশু শয্যায় শুইয়া ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। পার্শ্বস্থ কক্ষে পিতার নাসিকাধ্বনি সহকারে সুনিদ্রার পরিচয় জ্যোৎস্নার মানসিক দুশ্চিন্তাকে যেন আরও উদগ্র করিয়া তুলিতেছিল।

শয্যা হইতে উঠিয়া সে বাতায়নের ধারে জলচৌকীর উপর বসিল। মুক্ত বাতায়নপথে নক্ষত্রভরা উদার আকাশের শ্যামরূপ দেখা যাইতেছিল। ধ্যানমগ্না নিশীথিনীর নিস্পন্দ-রূপ জ্যোৎস্নার অন্তরে সহস্র প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিল।

তাহার সমগ্র অতীত জীবনে এমনই নিস্পন্দ ধ্যানমূর্ত্তি তাহার অন্তরে ছায়াপাত করে নাই কি? বর্ত্তমানও ত এইরূপ দীপ্তিহীন, গাঢ় অন্ধকার রাজ্য তাহার অন্তরে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনেও কি গাঢ়তমিস্রার পরিবর্ত্তে চন্দ্রালোকিতা, পুষ্পবাসসুবাসিতা রজনীর মহিম-ময়ী চিত্ররেখা ফুটিয়া উঠিবে?

কি বিচিত্র তাহার জীবন! নারীচিত্তের জাগরণের পূর্ব্বেই সে দাম্পত্য-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল। সে যুগের, সেই জীবনপথে প্রবেশের কোনও স্মৃতিই তাহার নাই বলিলেই চলে। যাহা আছে, তাহাতে শুধু একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন কয়েকটি রেখাচিত্রমাত্র—তাহাতে অন্তর কোন একটা অবলম্বন পায় না।

অথচ সত্যই সে বিবাহিতা পত্নী; শালগ্রামশিলা, দেবতা ও অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া শত শত নরনারীর সম্মুখে মানব-জীবনের ঈপ্সিত, সেই পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠতর পুণ্যকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। অতি বাল্যকালে দৃষ্ট স্বামীর মুখাবয়ব মনে না পড়িলেও, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'আয়তি'র লক্ষণগুলি তাহার চিত্তে স্বামীর অস্তিত্ব, বিবাহিত জীবনে হিন্দুনারীর অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া দিয়াছিল।

মানুষের মন সকল অবস্থাতেই কোন না কোন অবলম্বনকে আশ্রয় করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। যৌবন ত অবশ্যই চাহে। জ্যোৎস্নার মন তাহার বিবাহিত জীবনের অস্পষ্ট স্মৃতিকে কি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে নাই? সহোদরের প্রতি স্নেহ, পিতার প্রতি ভক্তি, অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ পরিপূরক হিসাবে কায করিয়া চলিয়াছিল। ইহা কি সত্য নহে?

হাঁ, জ্যোৎস্না তাহা জানে। তাই দুষ্প্রাপ্যকে পাইবার ক্ষীণ আশা এত দিন তাহার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিতে দেয় নাই। কিন্তু পিতার নিকট হইতে সকল কথা সুস্পষ্ট-রূপে জানিবার পর হইতে তাহার মনের উপর যে জটিল সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত চিত্ত দোলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিত স্বামীর সহিত আকস্মিক পরিচয় এক দিকে যেমন তাহার মনের এক প্রান্তে একটা নূতন আলোকপাত করিয়াছিল, আবার সেই স্বামীর সহিত তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধ রহিত করার প্রস্তাবও আকস্মিকভাবে তাহার চিত্তকে আলোড়িতও করিয়াছিল। তার পর যখন সে জানিতে পারিল, তাহার স্বামী চরিত্রের পবিত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তখন বিভিন্ন ভাবপ্রবাহে তাহার ক্ষুদ্র অন্তর অস্থির হইয়া উঠিল। তার পর স্বামীকে হত্যার চেষ্টা—চারিদিক্ হইতে যেন একটা বিরাট অন্ধকার তাহার ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

কি তাহার কর্ত্তব্য? কোন্ দিকে পথের সন্ধান সে পাইবে?

তাহার স্বামী রণেন্দ্রনাথ দুশ্চরিত্র, মদ্যপ। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আবার মহৎ হৃদয়, উদার, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু ইহজীবনে সে পিতৃদ্রোহিণী হইবে না, জন্মদাতা, স্নেহময় পিতার নিদারুণ ক্ষোভের কারণ হইবে না বলিয়া নিজের অন্তরের কাছে সে অঙ্গীকারবদ্ধ।

যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও কি সে এই অধঃপতিত পুরুষকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত?

জ্যোৎস্না বসিয়া থাকিতে পারিল না। উত্তেজনার আতিশয্যে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দূরে—উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কোনও পথের ইঙ্গিত লক্ষিত হইতেছে কি? নিশীথ-রজনীর অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে কোনও অদৃশ্য বাণী কি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে?

মানুষ দেবতা নহে। সত্য, সত্য—মানুষই অপরাধ করে।

আজ যে পথে রণেন্দ্র নামিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অংশতঃ সেও কি দায়ী নহে?

স্বামী তাহার সন্ধান, পরিচয় পাইয়া তাহারই কাছে আশ্রয়প্রার্থিরূপে ছুটিয়া আসে নাই কি? সে তাহার কি উত্তর দিয়াছিল?

সত্য বটে, স্বামী বলিয়া ভালবাসিবার অবকাশ তাহার ঘটে নাই। সত্য বটে, উভয়ের পবিত্র সম্বন্ধকে চরিতার্থ করিবার কোনও সুযোগ তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু—

উভয় করপুট বক্ষোদেশে স্থাপিত করিয়া অনন্ত চিন্তা-সমুদ্রের মধ্যে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল।

রণেন্দ্রের প্রতি সত্যই কি তাহার চিত্তের কোন আকর্ষণ জাগে নাই?

জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল। বোটানিক্যাল উদ্যানের সেই কুক্কুরশঙ্কা হইতে মুক্তকারী তরুণ যুবকের স্পর্শের স্মৃতি তাহার অন্তরকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তখন মুহূর্ত্তের জন্যও যে পুলকসঞ্চার সে অনুভব করিয়াছিল, তাহা কি শুধু যৌবনের স্বধর্ম্ম-সঞ্জাত ক্ষণিক বিস্মৃতি, অথবা অতীতের অন্য কোনও ইঙ্গিত? তার পর, তার পর সে দিন, মিনতি-ব্যাকুল স্পর্শের স্মৃতি?

জ্যোৎস্না দুর্ব্বলতার মোহকে অতিক্রম করিবার জন্য দুই চারিবার ঘরের মধ্যে পরিক্রম করিয়া বেড়াইল।

ঘুমের ঘোরে সুধাংশু একবার "দিদি" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না তাহার শয্যার কাছে দাঁড়াইল। আর কোন শব্দ হইল না। তখন তরুণী আবার লঘুচরণে বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিপুল রহস্যময়ী রজনীর মতই তাহার সমস্ত জীবনটা রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। কোনও দিক্ হইতে সমাধানের কোন ইঙ্গিত আসিতেছে না! সে কি করিবে? কোন্ পথে চলিবে?

তরুণী আপনাকে অত্যন্ত নিঃসহায় মনে করিয়া জানু পাতিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। সে বাল্যকালে দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিয়াছিল। দেবমন্দিরে গিয়া সে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করিতে কোনও দিন কুণ্ঠিত হয় নাই। সে নানাগ্রন্থে পড়িয়াছে, বিপদে পড়িলে ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। আজ সে আপনার অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহারই শরণ লইল।

নিমীলিত-নেত্রে সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার দুই নয়ন বহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল। শান্তি সে পাইল কি না, সেই জানে। কিন্তু কিছুকাল পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

২৪

'কালীদা!'

গভীর নিশীথে সেই বাণী যেন বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষের মত ভীষণভাবে কালীনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল, পুলিসের দারোগার পত্র ও মামলার নথি-পত্র পাঠে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত কালীনাথ আতঙ্কে চমকিত হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রগতিতে কাগজগুলি টানার মধ্যে লুকাইয়া চারিদিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কালীনাথ কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "কে?"

"আমি—রণেন্দ্র, দোর খোল।"

কালীনাথের মুখখানা অমানিশার মত কালো, আঁধার হইয়া গেল। তাহার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তার পর সযত্নে আপনাকে সংবরণ করিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিতচরণে দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বলিল,—"রণেন, তুমি? এত রাত্রে তুমি কোথা থেকে?"

রণেন্দ্র একখানা কেদারায় শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ এলাইয়া দিয়া বলিল, "সে ঢের কথা। সোনাদা কোথায়? ওহো, সে ত রাত্রিতে বাড়ীই যায়। থাক্, কিছু খেতে দিতে পার? এই যে কুঁজোয় জলও আছে—আঃ!"

কালীনাথ নীরবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে রণেন্দ্র বলিল, "ভাবছ, দোতলায় উঠলুম কি ক'রে? ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যাস আছে। বাঃ, ব'সে রইলে যে, কিছু খেতে দিতে পার না? কিছু নেই? দুটো মুড়ী-মুড়কী? তাও না? ফল-ফুলুরী?"

কালীনাথ বলিল, "এলে কোত্থেকে? কাশীর হাঁসপাতাল থেকে ছাড়লে যে বড়—"

"পালিয়ে এসেছি। গুলী শুধু ছাল তুলে নিয়ে চ'লে গিয়েছিল, লেগেছিল সামান্য। তবে প্রথম দিনটা জ্বরে বেহুঁস হয়ে ছিলুম। জ্ঞান হ'লে শুনলুম, পুলিসের লোক হাঁসপাতালের লোকের সঙ্গে কথা কইছে—আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে, ভবাকে ধরেছে, আমার বাড়ীতে না কি বোমা আবিষ্কার করেছে! চমৎকার গল্প! চমৎকার!"

ততক্ষণ কালীনাথ কিছু ফল-মূল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়াছিল। রণেন্দ্র বুভুক্ষু দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত কতকটা খাদ্য এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া জলপান করিয়া তৃপ্তির সহিত বলিল, "আঃ!"

কালীনাথ মনে মনে দুর্গানাম জপিতেছিল, না জানি, কি হইতে কি হয়! কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "তার পর পালালে কি ক'রে?"

রণেন্দ্র বলিল, "পালালুম কি ক'রে? যেমন ক'রে পালায়। হাঁসপাতালের পাশেই ছিল একটা বাগানবাড়ী, তারই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল এসে পড়েছিল হাঁসপাতালের বারান্দার গায়ে। ভাবলুম, যদি না পালাই, পুলিস একবার ধরলে শীগ্‌গীর ছাড়বে না, হাজতে পচিয়ে মারবে। তা হ'লে ভবাকেও বাঁচানো হবে না, আমারও মুক্তি নেই। চাই টাকা, টাকায় সব হয়। কাছে যা কিছু ছিল, হাঁসপাতালে জ্ঞান হবার পর দেখি, সব ধুয়ে মুছে নিয়েছে, কিছু নেই। বাসাবাড়ী পুলিস তালাবন্ধ ক'রে পাহারা বসিয়েছে দেখে বল্লভরাম পাণ্ডার কাছ থেকে কিছু ধার ক'রে নিয়ে অনেক ঘুরে ছোট রেল, বড় রেল, ষ্টীমার, একা ক'রে, দিনে লুকিয়ে, রাতে চ'লে এখানে আসছি। জানি এখানে এসে সবই পাব। ভাল কথা, এত রাত্রিতে তুমি জেগে ব'সে আলো জেলে কি করছিলে?"

কালীনাথ প্রমাদ গণিল—বুঝি সব কথা সে জানিয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ও কিছু না, জমী-জমার হিসাব দেখছিলুম। কিন্তু তুমি ত এখানে এসে ভাল কর নি।"

"তার মানে?

"মানে আর কি? এখানেও এ বাড়ীর উপর পুলিস নজর রেখেছে। তুমি যে কি ক'রে সে নজর এড়িয়ে এখানে এসে উঠলে, তা ভেবে পাচ্ছি না। কাল আমিই এখানে থাকতে পাই কি না সন্দেহ।"

"তুমি থাকতে পাবে না, সে কি?"

"তোমার গুণধর শ্বশুর এই কাণ্ড বাধিয়েছেন—নইলে পুলিসের হাঙ্গামা কেন? আর তোমার পতিব্রতা পত্নী এ বাড়ীর স্বত্ব-সাব্যস্তের নালিশ জুড়ে দিয়েছেন আমার নামে।"

রণেন্দ্রের নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "হুঁ।"

কালীনাথ রোষ ও হিংসা-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "আদালতের ডিক্রী হ'লে—" হঠাৎ কালীনাথ চমকিত হইয়া নীরব হইল। রণেন্দ্র বলিল, "কি হ'ল?"

কালীনাথ বলিল, "বোসো, দেখে আসি, একটা যেন খট ক'রে আওয়াজ হ'ল না?" কালীনাথ বাহিরের বারান্দার দিকে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "চার দিকে পুলিসের চর—উঃ, কি শত্রুই তোমার জুটেছে! বলেছে কি জান? জেল খাটিয়ে ছাড়বো, তবে আমার নাম রাজেশ্বর!"

রণেন্দ্রের ললাট কুঞ্চিত হইল, মুখমণ্ডল দীপ্ত রোষ ও অভিমানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কঠিন স্বরে বলিল, "বেশ ত, দেখাই যাক না, শক্তির পরীক্ষাই হয়ে যাক্।"

তাহার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, মুখে দ্রুত শ্বাস নির্গত হইল।

কালীনাথ অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "ছোঁড়াটাকে হাত ক'রে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে এই অনর্থ বাধিয়ে দিলে—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তাই না কি? উঃ, কি শয়তান! ছেলেমানুষ, এই বয়সেই প্রাণ হারালো! কিন্তু টাকায় যদি শয়তানীর উপর শয়তানী করা যায়, জেনো কালীদা, তার ত্রুটি হবে না। প্রতাপের মরণের পথ যে কাছে এনে দিয়েছে, আমার কাছে তার ক্ষমা নেই!"

রণেন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কালীনাথ অন্তরে আনন্দ চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে সোজাভাবেই বলিল, "তাও কি ওদের একটাও ভাল? যেমন বাপ, তেমনই মেয়ে।"

রণেন্দ্র জিজ্ঞাসুনেত্রে কালীনাথের দিকে তাকাইল, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন নয়নে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কালীনাথ বলিয়া যাইতে লাগিল, "ও মা, কোথাও কিছু নেই,

বাগান-বাড়ীতে পুলিসের হানা ? ব্যাপার কি ? অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজেশ্বর বাবু ও পুলিস বাড়ী সার্চ্চ করতে এসেছে —না কি পুরোনো দিক্‌টায় বোমা-পিস্তল লুকানো আছে। এ কি হিংসা বাপু !"

রণেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "এ রকম একটা কিছু হবে ব'লে বুঝেছিলুম, তাই পালিয়ে আসছি চক্রান্ত ভেঙ্গে দেবো ব'লে। নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে কতক একায় চ'ড়ে কতক হেঁটে আবার এপারে এসে ছোট রেল ধ'রে পদ্মার উত্তরের দেশে এসে উঠেছিলুম। তার পর মহানন্দা দিয়ে গঙ্গায় প'ড়ে শিয়ালদার রেল ধ'রে নৈহাটীতে নেমেছি—সেখান থেকে নৌকোয় দেশের ঘাটে এসে উঠেছি।"

কালীনাথ বলিল, "পুলিসও তোমার সন্ধানে ঘুরছে,—শ্যামপুকুরে, এ বাড়ীতে, পৈতৃক ভিটেয়, সব যায়গায় পুলিসের পাহারা আছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হচ্ছে, তারা এসে পড়লো ব'লে। তাই বলছি, এখনই পালাও—"

রণেন্দ্র বলিল, "পালাবো ? কখনও না। আগে এর একটা বিহিত করি—হাঁ, ভাল কথা, রাজেশ্বরের কন্যার কথা কি বলছিলে ?" কথাটা বলিবার সময় রণেন্দ্রের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল।

কালীনাথ বলিল, "তিনিই ত নাটের গুরু ! বাপকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মামলা জুড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাকে জন্মের মত সরিয়ে দেবার জন্তে এই পুলিসের কাণ্ড বাধিয়েছেন। উঃ, কি মেয়েমানুষ !"

রণেন্দ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, সে বলিল, "মামলাটা কি ? মামলার কথা বার বার বলছ—কিসের মামলা, কার নামে ?"

কালীনাথ বলিল, "তুমিই ত এর গোড়া পত্তন ক'রে দিয়েছ, তুমি জান না ?—বিষয় দান ক'রে দিয়েছ, এখন বিষয়ের মালিক আগেকার মালিককে তাড়িয়ে দেবে না ? এই দেখ না উকীলের চিঠি—এই ত ওর হাতের সই—"

কি জানি কেন রণেন্দ্রের নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ব'লে যাও।"

"বলবার আর বড় কিছু নেই। কে এক ওর বাপের জানা ছোঁড়া উকীল আছে, এখন তার সঙ্গে বড় ভাব ! ওঠা-বসা—ও কি, অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন ?" কালীনাথের নয়নে গভীর আতঙ্কের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল, "দেখ, রাত শেষ হয়ে এলো—চল, একটু শোবে চল,—চার পাঁচ রাত ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, চল, চল।"

রণেন্দ্র সে কথা কি শুনিতে পায় নাই ? ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে এই উকীল ? লক্ষ্ণৌএ প্র্যাকটিস করতো আগে—"

"হাঁ, হাঁ, তাই যেন শুনেছি। ওরই সঙ্গে মেয়েটার বাপ মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা পেড়েছে না কি, ঐ রকমের কথাও শুনিছি। ওদের বাড়ী এখন ছোঁড়াটার ঘর-বাড়ীই হয়ে পড়েছে, ঐখানেই যাওয়া আসা রাতদিন, কলকাতায় যাবার নামই ত করে না এখন—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "বস্‌! চুপ। শুতে দেবে বলছিলে কোথায়, কালীদা ?"—

কালীনাথ অনুযোগের সুরে বলিল, "মানবে না কথা ? এখনও বলছি, এ দেশ ছেড়ে পালাও।"

রণেন্দ্র তাহাতে বিচলিত না হইয়াই বলিল, "বাড়ী ছেড়ে পালাবো কেন ? ভয়ে ? কিসের ভয় ? সত্যি ত আমি কোন অন্যায় কায করি নি।" রণেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর বলিল, "সে ভাবনা আমার, তোমার না। যখন নেমেছি, তখন কত জল না দেখে উঠবো না। চল।"

রণেন্দ্র পার্শ্বের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। যাইবার পূর্ব্বে বলিল, "সোনাদার কি অপরাধ হয়েছে ? সে কি বোমা বোঝাই করছিল ?" রণেন্দ্রের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল।

কালীনাথ সে হাসির মর্ম্ম না বুঝিয়া বলিল, "না, না, তা কেন ? ঐ ভাঙ্গা মহলটায় তোমরা দুজনেই যাওয়া আসা করতে কি না, আর ঐ ভবেন-টবেন—"

রণেন্দ্র কেবলমাত্র একটা "হুঁ" দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নিশীথের অন্ধকারে কালীনাথের মুখে ক্রূর হাসির সহিত কি ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা দিল, তাহা রণেন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

২৫

বিমলচন্দ্রের পিতা মীরাটে মিলিটারী একাউণ্টস অফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরী করিতেন। সরকার তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ রায় সাহেব খেতাব দিয়াছিলেন।

রায় সাহেব সত্যশরণ মীরাটে কেন, পশ্চিম অঞ্চলে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন। এই জনপ্রিয় বাঙ্গালী চাকুরীয়ার সহিত মীরাটে অবস্থানকালে রাজেশ্বর বাবুরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্রেরও রাজেশ্বর বাবুর গৃহে অবাধ গতিবিধি ছিল। সে সুধা ও জ্যোৎস্নার 'বিমল দাদা' ছিল, অনেক সময়ে সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের শিক্ষকতাও করিত।

যে বৎসর রাজেশ্বর বাবু মীরাট ত্যাগ করিয়া লাহোরে যান, সেই বৎসর বিমলচন্দ্র এলাহাবাদে ওকালতী পাশ করে। সেই সময় রায় সাহেবেরও পেন্‌সন হয়, তিনি সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া যান। সুপারিশের ফলে বিমলচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। সত্যশরণ বাবু চাকুরী করিয়া এবং ফ্রান্সে ও মেসোপটেমিয়ায় গিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উহা হইতে ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার ভবানীপুর বকুল-বাগানের পৈতৃক জরাজীর্ণ আবাসগৃহ সুসংস্কৃত করেন। তদবধি বিমলরা ঐ গৃহেই বাস করিতেছে।

রাজেশ্বর বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর দুই পরিবারের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। তবে জ্যোৎস্নাময়ীরা তাহাদের পৈতৃক গ্রামে গিয়া বাস করিবার পর হইতে তাহাদের মধ্যে আর বড় দেখাশুনা হয় নাই। বিমল ওকালতী লইয়াই ব্যস্ত থাকিত—বিশেষতঃ এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে সে সংসার ও পসার লইয়া এত অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময়ে মিলামিশা হইয়া উঠে নাই। জ্যোৎস্নারাও দেশে গিয়া বসবাস করিয়া দেশের মানুষই হইয়া গিয়াছিল, সহরে আসিয়া বিমলদা'দের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা ঘটিয়া উঠিত না।

আরও এক কারণে জ্যোৎস্না বিমলদা'দের সহিত মিলা-মিশা করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিতা ছিল না। তাহার পিতাই এই লজ্জা ও সঙ্কোচের কারণ হইয়াছিলেন। কেন, তাহা জানিয়া রাখা ভাল।

বিমলচন্দ্র সহরের সম্পন্ন গৃহস্থ, সে শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম উকীল, সুতরাং তাহার এই ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সে অবিবাহিত থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার পিতা ইহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তিনি কতকটা মনোদুঃখেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজেশ্বর বাবু তাহার পিতৃতুল্য ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ে বহুদিন সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। এমন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ রূপৈশ্বর্য্যবান্ যুবক ভদ্র কায়স্থ-পরিবারে সহজে কি পাওয়া যায়? তবে ইহার বিবাহ হয় না কেন? বহু বিবাহযোগ্যা সুরূপা কন্যার পিতা সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বিমলচন্দ্র অটল—তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, সে বিবাহ করিবে না, এখন ত নহেই। ইহার কারণ কি, রাজেশ্বর বাবুও অন্য সকলের মত বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার মনে মাঝে মাঝে দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হইত—যদি তাঁহার কন্যা বিবাহিতা না হইত! বিমলের মত সুপাত্রে কন্যাদান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইত, জাতি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কন্যাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিলে কি ক্ষতি হয়? কিন্তু কন্যাকে এ কথা বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না।

বিমলচন্দ্র কনিষ্ঠা ভগিনীসমা জ্যোৎস্নার প্রতি অন্তরে যে ভাবই পোষণ করুক, বাহিরে তাহা কখনও প্রকাশ করিত না। একটি বিষয়ে সে বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। মীরাটে থাকিবার কালে বালিকা-বয়সেও জ্যোৎস্নাকে সে নিত্য নিয়মিতভাবে সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু ধারণ করিতে দেখিয়াছিল। এ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়া সে জ্যোৎস্নাকেই প্রশ্ন করিয়াছিল, জ্যোৎস্না আরক্ত আনন নত করিয়া নীরবে স্থানত্যাগ করিয়াছিল। এ কথা সে ভুলিতে পারে নাই। এক দিন সে রাজেশ্বর বাবুকেও এই প্রশ্ন করিয়া বসিল। রাজেশ্বর বাবু কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পর জ্যোৎস্নাময়ীর বাল্যজীবনের ঘটনাবলী একে একে বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ তাঁহার কন্যার পুনরায় পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তিনি জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। বিমলচন্দ্র ভাবভঙ্গীতে তাঁহাকে এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, যাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিমলচন্দ্রও তাঁহার মত সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতি ত্যাগ করিতে অসম্মত নহে।

রাজেশ্বর বাবু কন্যার নিকট এক দিন এই প্রস্তাবের আভাস দিয়াছিলেন। অমনই তাহার আয়ত নয়ন দুইটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ দিনও সে নীরবে স্থানত্যাগ করিয়াছিল। রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এত অল্পবয়সে তাঁহার মাতৃহীনা কন্যার এই ধারণা কোথা হইতে আসিল? স্বামিপরিত্যক্তা হইয়াও সে পতিব্রতা সতীর মত সীমন্ত সিন্দুররঞ্জিত করিতে এক দিনের জন্য বিস্মৃত হয় নাই। ইহা কি হিন্দু নারীর সহজাত সংস্কার? ইহা কি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন? কিন্তু যাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহার প্রতি নিষ্ঠা ও প্রেমের সঞ্চার কি স্বাভাবিক? কিন্তু এই অভিজ্ঞতার পর রাজেশ্বর বাবু কন্যার সমক্ষে বিবাহের কথা আর কখনও উত্থাপন করেন নাই।

যে সময়ে রাজেশ্বর বাবু জামাতার বিপক্ষে জমী-সংক্রান্ত মামলা রুজু করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই সময়ে বিমলচন্দ্র চাঁপাপুকুরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। জ্যোৎস্না তখন তাহার সহিত কনিষ্ঠা ভগিনীর মতই পূর্ব্ববৎ সরল স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিত। চাঁপাপুকুরের অধিবাসীরা বিমলচন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার একত্র ভ্রমণ ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দেখিয়া গোপনে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিত,—সে বিরুদ্ধ অভিমতের কথা পূর্ব্বেই রণেন্দ্রের কর্ণেও পৌঁছিয়াছিল।

তাহার পর যে দিন সনাতন মালীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিল, সেই দিন জ্যোৎস্নার সমস্ত হৃদয় কালীনাথের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার পিতা কালীনাথের প্রতি সদয় হইলেও পূর্ব্ব হইতেই কি জানি কেন তাহার মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, বাগানবাড়ীতে পুলিসের হানা ও সনাতনের গ্রেপ্তারের মূলে কালীনাথের চক্রান্ত আছে। তখনই তাহার সুপ্ত নারী-শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

তখন আবার বিমলচন্দ্রের ডাক পড়িল। এবার কিন্তু রাজেশ্বর বাবু এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। জ্যোৎস্নার সহিত বিমলচন্দ্রের গোপনে অনেক কথা হইল। তাহার ফলে সামান্য একটু তদ্বিরেই সনাতন খালাস পাইল,—পুলিস তাহার বিপক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পারিল না বা প্রমাণ থাকিলেও প্রমাণ দিল না, তাহা অবধারণ করিবে কে? কালীনাথ মনে মনে গুমরিয়া উঠিল।

আজ প্রভাতে বিমলচন্দ্রের সহিত তাহার সেই কথাই হইতেছিল। আদালত তাহার পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন, কালীনাথকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। দানপত্র তাহার স্বামী যে দিন হইতে রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আদালতের হুকুম তামিল করিতে হইবে।

বিমলচন্দ্র বলিতেছিল, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার—ও রকম গোঁয়ার্তুমিতে কি ফল হবে? বিষয় ত সামান্য নয়, হিসেব ক'রে দেখলুম, খুব কম করেও তিন লক্ষ টাকা দামের সম্পত্তি—এটা সমস্তই তোমার স্বামী দান করেছেন। অবশ্য তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আরও দুইগুণ। কাযেই তিনি ন্যায় বুঝেই তোমায় একটা অংশ দান করেছেন। এ দান হেলায় হারাতে আমি কখনই উপদেশ দেব না।"

জ্যোৎস্না ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি এ বিষয় নিয়ে কি করবো, বিমলদা?" তাহার মুখের জ্যোৎস্নাদীপ্তি ম্লান হইয়া আসিয়াছিল।

বিমলচন্দ্র ব্যথিত স্বরে বলিল, "বুঝেছি। কিন্তু তা হ'লে দুষ্টের দমন হয় না, তোমারও ত্রুটি রয়ে যায়।"

জ্যোৎস্না নীরবে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলচন্দ্রের নয়ন-পল্লব কম্পিত হইতেছিল, সে প্রায় বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমরা যা ব্যবস্থা নিজেরা করি, তার পরেও যে বিধাতার বিধান, এটা মান ত?"

জ্যোৎস্না অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি করতে বল তুমি?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "বিধাতার বিধানে যা তোমার হাতে এসেছে, তার সদ্ব্যবহার কর—করবার জগতে অনেক কিছু আছে।"

"দিদিমণি—দিদিমণি!"

উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে করিতে সনাতন ছুটিয়া আসিল। জ্যোৎস্না ও বিমল চমকিত হইয়া উঠিল—অনিশ্চিত আশঙ্কায় জ্যোৎস্নার বক্ষ সহসা কাঁপিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না ভীতি-ব্যাকুল-নেত্রে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সোনাদা, অমন করছ কেন?"

সনাতন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, দিদিমণি! কি কাল-সাপই পুষে গেছলো বাবু আমার শোবার ঘরে গো! বাবু! বাবু! ওগো দাদাবাবু গো!" সনাতনের বোধ হয় তখন বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল—কক্ষে যে অপর কেহ উপস্থিত আছে, তাহার সে জ্ঞানও ছিল না।

জ্যোৎস্না অনিশ্চিত আশঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিয়া দ্বারপ্রান্ত ধরিয়া বসিয়া পড়িল—সে কি যেন বলিতে গেল

কিন্তু তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল, একটি কথাও বাহির হইল না।

একা বিমলচন্দ্রই তখন প্রকৃতিস্থ ছিল. সে তাড়াতাড়ি একটা ধমক দিয়া বলিল, "কি, হয়েছে কি? একবারে যে মড়া-কান্না জুড়ে দিলে হে! বুড়ো মিন্সে একটু আক্কেলও নেই। কি হয়েছে, আগে তাই বল, তার পর বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদো।"

সনাতন ধমক খাইয়া দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "ওগো, আমার দাদাবাবুকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে! আহা, বেচারা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কিছু জানে না—কারুর মন্দয় থাকে না। কাল রাতে এখানে এসেছে শুনলুম। ঐ অনামুখো হতচ্ছাড়াই পুলিস ডেকে এনেছে, নইলে আর ত কেউ জানতো না।'

বিমলচন্দ্র সনাতনকে যত না হউক, জ্যোৎস্নাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এই কথা! ও হরি, আমি ভাবছি, না জানি কি হয়েছে। ও এখখুনি খালাস ক'রে আনছি। রাজু কাকা সদর থেকে ফিরলেই সব বন্দোবস্ত করছি, তার জন্যে ভাবনা কি? যাক, ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব গুছিয়ে বল দিকি, সনাতন।"

সনাতন হাসি-কান্নার মাঝে ঘটনার বিষয়ে যত দূর শুনিয়াছিল, বলিয়া গেল। সে বেলা ৯টার পর নিজের ক্ষেত খামার দেখিয়া ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময় শুনিল, পুলিস বাবুদের বাগানবাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। এমন আরও একবার হইয়াছিল, তাহাতে সেও স্বয়ং ভুগিয়াছিল, সুতরাং সে তাহাতে অধিক আগ্রহান্বিত হয় নাই। কিন্তু পরে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। বাবু কাল রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন, রাত জাগিয়া তিনি আজ প্রভাতে অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এমন সময়ে পুলিস হৈ হৈ করিয়া বাড়ী ঘেরাও করে। তাহারা তখনই খানাতল্লাস করিয়া কিছু জিনিষ ও তাঁহাকে লইয়া সদরের থানায় গিয়াছে। শুনিয়াই সে ছুটিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পুলিসের সিপাহী তাহাকে বাবুর নিকট যাইতে দেয় নাই বা কথা কহিতে দেয় নাই। কেবল সে বাবুকে বলিতে শুনিয়াছিল, "সোনাদা, ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না, যা হবার, তা হবে, তাতে আমিই বাধা দেব না।" সনাতন তখন বাবুর মুখে চোখে যেন একটা "মরিয়া" হইবার ভাব দেখিয়াছিল। সে তাহার পর ছুটিয়া গ্রামে দিদিমণিকে খবর দিতে আসিয়াছে।

সনাতন এইবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "কি হবে দিদিমণি; কি হবে বাবু?"

বিমলচন্দ্র পুনরায় ধমক দিয়া বলিল, "আবার নাকি-কান্না কাঁদে! কচি খোকা আর কি! হবে আবার কি? যা ব্যবস্থা করবার, আমরা কর'বখন। যাও, পালাও।"

সনাতন তথাপি নড়িল না। কাতরকণ্ঠে বলিল, "মা, লক্ষ্মি, সবই ত জানি। যে বংশের বউ তুমি, তার অপমান হ'তে দিও না মা, সন্তানের এইমাত্র ভিক্ষে, মা জননি!"

সনাতন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না এতক্ষণ কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, তাহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু নাই। তাহার বাহ্যজ্ঞানও ছিল কি না সন্দেহ।

বিমলচন্দ্র হাসিবার ভাণ করিয়া বলিল, "এ কি জ্যোৎস্না! তুমি এত বুদ্ধিমতী, তুমিও এই চাকরটার কথায় ট'লে গেলে? ছিঃ ছিঃ, চল, ওঠ। এর যা বিহিত হয় করা যাবে'খন। "এর জন্যে এতটা—"

জ্যোৎস্না ভীতিব্যাকুল নেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি হবে, বিমলদা! এর জন্যে যা করতে হয় কর, দাদা। এই বিষয়-সম্পত্তি, যার জন্যে আমায় অনুরোধ করছিলে—সব বিক্রী ক'রে নিতে হয় নাও—আমি—আমি—" কথা শেষ হইল না, জ্যোৎস্নার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চরণ দুইটি থর থর কম্পিত হইতেছিল; তাহা বিমলচন্দ্রের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

বিমলচন্দ্র সেই সঞ্চারিণী লতার মত চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। গভীর শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসিল। আপনা হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—"দেবি! তোমাদের তুলনা এ জগতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য

আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাকে বাথরুম বা অসংযত সহিত্য বলা যাইতে পারে। এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কোন্ শ্রেণীর লোকের উপকারার্থে, কোন্ পাঠক-পাঠিকার উন্নতি-কল্পে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইতেছে, তাহা আবিষ্কার করা সাধ্যাতীত। ইহা আবর্জ্জনাপূর্ণ, পঙ্কিল, কুৎসিত প্রবৃত্তির উদ্দীপক। ইহা যে কলা-সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণকল্পে রচিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই শ্রেণীর সাহিত্যে নীচ মনোবৃত্তির উদ্দীপন করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ও আমেরিকান্ কুৎসিত প্রবৃত্তিমূলক রচনার অনুকরণে এই জঘন্য ও অমেধ্য রচনাগুলি প্রকাশিত হইতেছে। পেশার অনুরোধে এই সকল লেখা আমাকে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা ভাষায় বলিয়া জানান যায় না। মফঃস্বলের মিউনিসি-প্যালিটীর ময়লা-পোতা জমীর নিকট দিয়া চলা-ফেরার পীড়া সহ্য করা বরং সম্ভবপর, কিন্তু এইরূপ সাহিত্যপাঠের কষ্ট সহ্য করা একবারেই অসম্ভব। মরা পচা জানোয়ার যে স্থানে ফেলা হইয়াছে, সে স্থানে চলাফেরা করা যেরূপ ন্যক্কারজনক, এরূপ সাহিত্যপাঠেও সেইরূপ বমন উদ্গারের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যের ভিত্তি নারীর সতীত্ব-ধর্ম্মের অবমাননার উপর স্থাপিত। যে সকল দেশে সতীত্বের বিশেষ আদর নাই, যেখানে দিন কতকের জন্য বিবাহ চলে, সে সকল দেশের অসৎ সাহিত্যের অনুকরণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইবার কোন কারণ নাই। যে দেশের আদর্শ-নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সে দেশে এরূপ আবর্জ্জনাময় সাহিত্য বিশেষ অনিষ্টকর।

প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব অনুষ্ঠান আছে, যেমন ইটালী নগরে সঙ্গীতবিদ্যা ও কলাবিদ্যা, স্কটল্যাণ্ডে অতিথি-সেবা, স্বজাতিপ্রেম, ইংলণ্ডের প্রগতি, আমেরিকার অর্থ-সংগ্রহের সঙ্কল্প ইত্যাদি, সেইরূপ ভারতবর্ষে সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সতীত্ব-ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস। স্ত্রীলোকের যত ধর্ম্ম আছে, সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য। রাজপুত-রমণীরা স্বদেশ-প্রেম ও সতীত্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষই বহুপুরাকাল হইতে সতীত্বকে ধর্ম্ম নামে আখ্যায়িত করিয়াছে, শুধু সতীত্ব বলে না, সতীত্বধর্ম্ম বলে; আর এই নূতন শ্রেণীর ছাগ-সাহিত্যিকরা সুবিধা পাইলেই সতীত্ব-ধর্ম্মের উপর শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে না। তাহাদের মতে সতীত্বটা কিছুই নহে। কতকগুলি পুরুষ নিজ নিজ সুবিধার জন্য ইহার অনেক গুণগান করিয়াছে; তাহাদের মতে সতীত্বের প্রশংসা করিবার বিশেষ কারণ নাই। স্ত্রী-পুরুষের যত দিন সুবিধা হয়, তত দিন একত্র থাকুক, অসুবিধা হইলেই পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারিবে, ইহাতে ধর্ম্মের কোনও সংস্রব নাই।

যে সকল সমাজে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র, সুবিধার জন্য লোকসমাজে উহার প্রচলন, অসুবিধা হইলেই ব্যবচ্ছেদ আছে, সে সকল সমাজে সতীত্ব শব্দের অর্থ অন্যরূপ—যত দিন ধরিয়া একটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষকে ভালবাসিবে, তত দিন তাহারই প্রতি আসক্ত থাকিবে, অন্য সকলের প্রতি অনাসক্ত থাকিবে, তাহা হইলেই সেই স্ত্রীলোক স্বামীর প্রতি রত রহিল, সেই সময়ের জন্য সে এক পুরুষের প্রতি আসক্ত রহিল। তাহাদের মতে এক পুরুষের প্রতি অনন্যমনে সাময়িক আসক্তি সতীত্বপদবাচ্য। অবনিবনাও হইলেই বিবাহচ্ছেদের কারণ হইবে।

আমেরিকায় এক জন স্বামী নাচিবার সময় স্ত্রীর পা মাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই অজুহাতে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিলেন। জজ সাহেবও বিচার করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দিয়া এই অসভ্য লোকটির হস্ত হইতে এই রমণী-রত্নটিকে রক্ষা করিলেন।

আমাদের সমাজে বিবাহ সমস্ত-জীবনব্যাপী, ইহার ব্যব-চ্ছেদ নাই, কাচের বাসনের মত ইহা হস্তচ্যুত হইলেই ভাঙ্গিয়া যায় না; আমাদের এই হিন্দুসমাজে সতীত্বধর্ম্মের স্থান অনেক উচ্চে। এই সতীত্বধর্ম্মের রক্ষার জন্য সাধ্বী স্ত্রীলোকরা অবাধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কাযেই সতীত্ব-ধর্ম্মকে আমরা যে ভাবে দেখি, অন্য দেশের সাহিত্য সেরূপ ভাবে দেখে না। দেশ, কাল ও সংস্কারের বিষয় একবারে না ভাবিয়া আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রের কালা-পাহাড়রা সময় অসময়ে সতীত্ব-ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া টিটকারী দিতে

ছাড়ে না! ইহাদের মতে রমণীকে সুখী হইতে হইলে অন্ততঃ তাহার ৪।৫টি প্রেমিকের প্রয়োজন। এই শ্রেণীর সাহিত্যের নির্ঘণ্ট করিয়া দেখা যায়, ইহাতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি থাকা চাই :—

১। এক দুই অথবা ততোধিক যুবতী, প্রত্যেকের বয়স ১৫ হইতে ২৪, নায়িকা হইতে হইলে বয়স কম হইলেও চলিবে না, বেশী হইলেও চলিবে না।

২। প্রত্যেক যুবতীর দুই বা ততোধিক প্রেমিক বা স্তাবক থাকা চাই।

৩। একটি রান্নাঘর থাকা চাই।

৪। একটি চায়ের কেট্‌লী থাকা চাই ও নায়িকাকে যখন-তখন চা প্রস্তুত করা চাই।

৫। স্তাবকের রসুই-ঘরে আসিয়া যুবতীর রন্ধনশালার কার্য্য-বিষয়ে সাহায্য করা চাই।

৬। যুবতীর অভিভাবক বা অভিভাবিকার নিন্দাবাদ করা চাই, কেন না, কুসংস্কার ও কুপরামর্শের ফলে তাহারা নায়িকাকে নূতন নূতন নায়কের হাতে বিলাইয়া দিতে আপত্তি আছে বা বাধা দিতেছে। একটি নায়িকার যদি ৪।৫ জন নায়ক না রহিল, তবে সে নায়িকা কিসের?

৭। সর্ব্বক্ষণ সতীত্ব-ধর্ম্মের উপর শ্লেষ-উক্তি থাকা চাই।

৮। প্রত্যেক গৃহে এক জন গৃহশিক্ষক থাকা চাই।

এই কয়েকটি বিষয় একত্র করিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিলেই অনেক ছাগ-সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। অবশ্য এই কয়টি বিষয়ের পরিবৃদ্ধি সমবায় থাকা চাই। এই শ্রেণীর লেখকদিগের মাতা, মাতামহী, পিতামহী, সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহা সত্ত্বেও এই সকল লেখক সতীত্ব-ধর্ম্মের উপর এত বিদ্বেষ জ্ঞাপন কেন করেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা সকলের নাই।

আমাদের দ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের অন্দর-মহল। এখানে রমণীরা দেবীস্বরূপা। সকলকেই নত-শিরে তাঁহাদের হুকুম মানিতে হয়। তাঁহারা সেই মন্দিরের একচ্ছত্রী দেবী। কেহ তাঁহাদের হুকুম অমান্য করিতে সাহস করেন না। তাঁহারা ক্ষেতেও চাষ করিতে যান না, কলেও জোগাড় দিতে যান না, অফিসেও চাকরী করিতে যান না, জামা-কাপড়ের দোকানেও সহকারীর কার্য্য করেন না কিম্বা কোনও প্রকার অফিসের কোনরূপ কার্য্য করেন না। স্বামী, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, আর অন্তঃপুরের রমণীরা সেই অর্থে সংসারের সুখ-সম্পাদন করেন। ছোট ছোট পুত্র-কন্যাদের মানুষ করা, তাহাদের রোগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা, পুরুষদিগের জন্য সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা, রোগ হইলে পথ্যের ব্যবস্থা করা, এই সকল স্ত্রীসুলভ কার্য্যে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেন আর পুরুষদের জীবনকে সুখময় করেন।

এক শ্রেণীর লাঙ্গুলহীন লোক আছে, যাহাদের নিজেদের অন্দরমহল নাই, বা যাহারা অন্দরমহলের সুখভোগ করে নাই। যাহারা ছাত্রাবাসে বর্দ্ধিত-পালিত, আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীলোকের সংস্রব হইতে দূরে বর্দ্ধিত, তাহাদের মতে ছাত্রাবাস-জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, না হয়, অন্ততঃ হোটেল-জীবনই তাহাদিগের হৃদ্য। অন্দরমহল তাহাদের অসহ্য। তাহারা মনে করে, অন্দরমহলের স্ত্রীলোকরা অবরুদ্ধা পক্ষিণীদের ন্যায় চিরজীবন কষ্টভোগ করে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই ষষ্ঠী দেবী। আজ হইতে ২০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালাদেশে যত বড় লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অন্দর-মহলের দেবীদের দ্বারা লালিত-পালিত।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল দেশেই সব জাতির মধ্যে সকলেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, খালি এই বাঙ্গালাদেশে তাহার অভাব দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালাদেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আমি জানিতে চাই, দেশে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যদি তাঁহার বাটীতে অন্দরমহল থাকে তো সেই অন্দরমহলকে তিনি লাঞ্ছিত করিতে সাহস করিয়াছেন?

জুলিয়স্ সীজরএর মাতা অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন। তিনিও সীজারের পত্নী—যাঁহার সম্পর্কে প্রবাদ, সীজারের পত্নীতে সন্দেহ সম্ভবে না (Ceaser's wife is above suspicion), সেই পম্পিয়ার উপর প্রভুত্ব চালাইয়াছেন, আর সেই প্রভুত্ব সংসারের মঙ্গলের জন্যই পরিচালিত হইয়াছিল। আমি এক ঘটনা জানি, যেখানে বাড়ীর কর্ত্তা হাইকোর্টের জজ ছিলেন; তাঁহার পত্নী অন্দরমহল হইতে তাঁহার উপর প্রভুত্ব চালাইতেন। তাহা সংসারের মঙ্গলের

জজ। এই জজসাহেব ভবানীপুরে থাকিতেন. তাঁহার বহির্ব্বাটীর একটি ঘরে তাঁহার অন্নপালিত এক মাতুল থাকিতেন, আর তাহার পরবর্ত্তী ঘরে, অন্দরের দিকে তিনি আসিয়া কাপড় ছাড়িতেন। মাতুল ভাগিনেয়ের কাছে প্রায় তিরস্কৃত হইতেন যে, মাতুলটি বিশেষ মেধাবী নহেন। জজ ভাগিনেয় প্রায় বলিতেন, মামা, তুমি কোন কাযের নও, তুমি অতি বোকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাগিনেয়ের অন্নে পুষ্ট-শরীর মাতুল চুপ করিয়া সহ্য করিতেন। এক দিন জজসাহেব আদালত হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, স্ত্রী পোষাক পরিবর্ত্তনের সাহায্য করিতেছেন, আর কথোপকথন হইতেছে। এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে জজ-রমণী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এই বুদ্ধি লইয়া জজিয়তি কর? তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নাই।" পরবর্ত্তী ঘর হইতে মাতুল এই কথা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না,—বলিয়া উঠিলেন, "বল ত মা লক্ষ্মি, একবার সত্যি কথাটা বল ত, আমার জজ ভাগনা প্রত্যহই আমায় দোষারোপ করে আর কটু-কাটব্য বলে। তুমি মা, আজ সত্য কথা বলিয়া সত্যের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছ।" ভাগিনেয়-বধূ এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদনে দৌড়িয়া অন্দর-মহলের দিকে চলিয়া গেলেন, জজ ভাগিনেয়ের একবারে মাথা হেঁট! তিনি অন্দরমহলে যাইয়া নিজের সহধর্ম্মিণীকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

বাঙ্গালীর ঘরে যে সকল পুত্র-কন্যা ছেলেবেলা হইতে বয়, বাবুর্চ্চি ও খিতমতগারের নিকট লালিত-পালিত, তাহাদের অন্তঃকরণে কোমলতা অনেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। রমণীর কোমলতা অন্দরমহলে যত বিকাশ পায়, এত আর কোথাও নহে। আর আজকালকার অসংযত সাহিত্যে এই অন্দরমহলের প্রতি নির্লজ্জ কটাক্ষ! যে সকল পুত্র-কন্যা পিসী-মাতা, খুড়ী-মাতা, জ্যেঠাই-মাতা প্রভৃতি আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাস করিয়া লালিত-পালিত, তাহাদের স্বভাব-মাধুর্য্য একবারেই বিকৃত হয় না। কতকগুলি কায আছে, যাহা স্ত্রীলোকেই পারে, পুরুষে পারে না; চরিত্র-বিকাশ, হৃদয়ের কোমলতা, সকলের প্রতি দয়া ও দাক্ষিণ্য, ইহা মাতৃকুলের নিকটেই বিশেষ পরিস্ফুট হয়। তাই আমার সকাতর প্রার্থনা, আমাদের এই সাধের অন্দরমহল কেহ ভাঙ্গিবেন না বা ভাঙ্গিবার সাহায্য করিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল,—আমি যখন জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউশনে এল্‌এ পড়িতাম, তখন যিনি আমাদের অধ্যক্ষ এবং ন্যায় ও দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার নাম ছিল রেভারেণ্ড স্মিথ। অধ্যক্ষ স্মিথ বিশিষ্টরূপে ভাল শ্রেণীর অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার প্রায়ই সামাজিক বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা চলিত। তিনি আমাদের সামাজিক বিষয়ের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং আমাদের সামাজিক বন্ধনের বিষয় শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, সমাজে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া জুটে, জোর করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকে, আইনের দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডকে নোয়াইয়া রাখে, কিন্তু সব সময়ে সেগুলি আমরা সহ্য করিতে রাজী নই! বাল্য-বিধবার বিবাহ ভাল, কিন্তু যাঁহাদের অনেকগুলি করিয়া পুত্র-কন্যা আছে, তাঁহাদের পক্ষে বিধবা হইবার পর বর্ষীয়সী অবস্থায় বিধবা-বিবাহ বিশেষ অশোভন। এক পাল ছেলে লইয়া বা ছেলের মাতা হইয়া দ্বিতীয় পতিপরিগ্রহ বিশেষ অবাঞ্ছনীয়।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "তারক, যদি আমার মাতাঠাকুরাণী পুনরায় পতিপরিগ্রহ করেন, আমি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিব না সত্য। কারণ, আইন অনুযায়ী সে বিষয়ে তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু পুনরায় পতিপরিগ্রহের পর তাঁহাকে এখন যেমন ভক্তির ও স্নেহের চোখে দেখি, বিবাহের পর আমার সে ভক্তি ও স্নেহ তাঁহার প্রতি থাকিবে না।"

তাই বলিতেছিলাম, সতীত্বধর্ম্মের উপর বা আমাদের অন্দরমহলের উপর লেখনীর দ্বারা কেহ যেন না আঘাত করে; যখন তাহারা দেখিবে, তাহাদের স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীর উপর অপরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে না, তখনই তাহারা মনে করিবে, কি অন্যায় করিয়াছি, কি ভুল করিয়াছি।

ইহা স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরিবার মতই শোচনীয়।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

নাগপাশ

ক্ষুদ্র একটি ঘটনায় সব উল্টাইয়া গেল। উমা বলিয়াছিল, "ও-বংশের খবর আমি ভালই জানি—তোমার চেয়ে।"

অসীম তর্ক তুলিয়াছিল, "না, তুমি জান না।"

যে বংশ লইয়া তর্ক, তাহারই এক ছেলে অসীমের সতীর্থ। চারি বৎসর অসীমের সঙ্গে তাহার একই কলেজে ও একই হোষ্টেলে কাটিয়াছে। সুতরাং, ভাল করিয়া জানার দাবী অসীম যে জোর গলাতেই করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তাহার গ্রাম হইতে হরিপুর ক্রোশখানেকের ব্যবধান। ছেলেবেলা মাঠে বনে বৈঁচিফল, কাঁচা আম ও সোঁদাল-ফুল সংগ্রহ করিতে সে চারি পার্শ্বের দুই এক ক্রোশ দূর গ্রামে দিনে তিন চারিবার যাতায়াত করিত। সন্ধ্যার অন্ধকারেও ভয় পাইবার মেয়ে সে ছিল না। বড় তেঁতুলগাছটার অন্ধকার-মাখা কোল দিয়া, ছোট ছোট আস্‌শেওড়ার ঝোপ ঠেলিয়া, বনের আনন্দ বুকে ভরিয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিত। সুতরাং, অভিজ্ঞতার দাবী সে-ই বা ছাড়িবে কেন? তর্কটা বাধিয়াছিল উমার বোন্ ঊষার বিবাহ লইয়া। অসীম আপন সতীর্থের নাম করিয়া বলিতেছিল, রূপে, গুণে, অর্থে ও বিদ্যায় এমন পাত্র দুর্ল্লভ।

উমা হাসিয়া বলিয়াছিল, "রূপ ও বিদ্যার কথাটা মানি, কিন্তু আর্থিক অবস্থা ওদের মোটেই ভাল নয়।"

তার পরেই তর্ক।

তর্কে উমাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অসীম ঈষৎ উচ্চস্বরেই বলিয়াছিল, "তোমাদের কাছে ঐ একটা দিক্‌ই যে সব চেয়ে বড়, তা জানি।"

এই কথায় উমা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, "জগতের লোকে এটা মানে,—বিশেষতঃ এই হা-অন্নের দেশে। ছেলে ভাল হোক, মন্দ হোক, পণের টাকার কামড় কোন পাত্রপক্ষের আলগা নয়।"

অসীম অনলবর্ষী দৃষ্টিতে উমার পানে চাহিয়া গুম্‌গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া কক্ষত্যাগ করিয়াছিল।

অবস্থা খারাপ না হইলেও অসীমের পিতা তিন কন্যার বিবাহ দিয়া বহুদিন হইতেই নিঃশেষিত টাকাটার অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে একটা খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃতবিদ্য পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট কোন দাবী না জানাইয়া (?) খরচের আঁকটা একবারমাত্র শুনাইয়া দিয়াছিলেন। উমার পিতা মিনতি করিয়াছিলেন, অসীমের পিতার হাসির বর্ম্মে ঠেকিয়া সে মিনতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বেশী টাকা খরচ হইয়াছিল বলিয়া বেশী আলোচনায় এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মেয়ে-পুরুষে কোলাহল তুলিয়াছিল। সে কোলাহলের মর্ম্ম জানিয়া উমার মুখও ক্ষণেকের তরে ম্লান হইয়াছিল।

তার পর নবজীবন প্রবেশ-পথের বৈচিত্র্য। অর্থের আঁক কসিবার বয়স তাহার ছিল না, সুতরাং ম্লান মুখ উজ্জ্বল হইতে একটুও বিলম্ব হয় নাই।

বছর তিনেক পরে কথায় কথায় সেই বিলীয়মান মালিন্য অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করিল দেখিয়া উমাও কম বিস্মিত হয় নাই।

বাপ নাই। অসীমই অভিভাবক। ঊষার বিবাহ-সম্বন্ধ সেই স্থির করিয়াছে। পাত্র বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, ভবিষ্যতে উপার্জ্জন সে করিবেই। অথচ উমা তর্কের খাতিরে তাহার আর্থিক অবস্থাকে কটাক্ষ করিতে ছাড়ে নাই!

তর্ক করিতে করিতে বাল্যকালের অপরিপুষ্ট ছায়াহীন দুঃখ আকার লাভ করিয়া তিনটি বৎসরের অপরিমেয় আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে তাহার কুৎসিত দেহ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আবির্ভাবের সঙ্গে—অগ্নির প্রবাহ—বায়ুর বেগ। একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত সুদীর্ঘ তিনটি বৎসরের পরমায়ুকে যেন এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিল। বিস্মিতা উমা ব্যথা পাইল। স্বচ্ছ কালো ভাসা চক্ষু দুইটি বাষ্পে সুকোমল হইয়া উঠিল। ছোট একটি নিশ্বাস বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই সে জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিল।

উমা কাঁদিল না।

তর্ককে তর্ক না বুঝিয়া মর্ম্মান্তিক বলিয়া যে গ্রহণ করিল—তাহার জন্য চোখের জল ফেলা দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কি!

তিনটি বৎসরের অসংখ্য কথা, অসংখ্য কৌতুক-হাসি

আনন্দের টুকরা দিয়া যে জিনিষটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তাসের প্রাসাদ? তর্কের ভরও সহিল না?

বিবাহের পর সোনার রাজপুত্র হইয়াই অসীম দেখা দিয়াছিল। ঘুমন্ত রাজকন্যা সোনার সোহাগ-কাঠির স্পর্শে চোখ মেলিয়াছিল। তাহার সোহাগ-সরোবরে অন্তহীন দিনমণির কিরণস্নাত হইয়া অম্লান-গৌরবেই উমা-পদ্ম ফুটিয়াছিল।

তাই সে ভাবিতেছিল,—বিগত রাত্রি ও দিনের অসংখ্য মুহূর্ত্তগুলিকে।—সেই আলোককে, অন্ধকারকে, সুখকে এবং দুঃখকে। তাহারা সকলেই যে উৎসবের সঙ্গী, সকলেই যে তাজ গড়িবার ধবল মর্ম্মর। না, মিথ্যা এ ভাবনা। অসীম এখনই ফিরিয়া আসিবে। আর একবার তিন দিন পরে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেবার একটা সোনার ব্রূচ লইয়া ঝগড়া। ব্রূচটা উমার পছন্দ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় উমা হাসিয়া বলিয়াছিল, হয় নাই।

অসীম পুনঃ পুনঃ একই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহাকে রাগাইয়া কৌতুক অনুভব করিতে উমা সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। এই আর যায় কোথায়? আজিকার মত গুম গুম করিয়া পা ফেলিয়া অসীম বাহির হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমটা উমা কত কি ভাবিয়াছিল। অবশেষে প্রতি মুহূর্ত্তের হিসাব-নিকাশ কষিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তিনটি দিন পরে হিসাবে উমারই হইল জয়। অসীম ফিরিল। সে দিনের কণ্ঠলগ্না উমার আনন্দের তুলনা দিবার জিনিষ পৃথিবী ও স্বর্গে কোথায়ই বা ছিল!

কিন্তু আজ কথাটা কি খুব রূঢ় হইয়া গিয়াছে? কৌতুক ত নহেই, অন্তরালে বহু দিনকার সঞ্চিত সত্যের এক টুকরা অঙ্গার। যেখানটায় পড়িয়াছে, পুড়াইয়া দিয়াছে। অসীম রাগ করিয়া একটি কথাও ত বলিয়া গেল না!—সেবার যেমন বলিয়াছিল, এই চলিলাম, আর আসিব না।

বর্ষার নিঃশব্দ মেঘ-সঞ্চারকেই উমা বেশী ভয় করে। কাল-বৈশাখীর তর্জ্জন-গর্জ্জনে মানুষের উল্লাসই জাগে।

না, না, ভাবনা মিথ্যা। তিনটি বৎসরের মধ্যে যতগুলি দিন-রাত্রির অস্ত হইয়াছে, সবগুলিই যে বসন্ত-ঋতুর রশ্মিঘেরা। উমার আকাশ সেই বর্ণ-সমারোহে রক্তিম। এই নব-যৌবন-জাগরণের দিনে গ্রীষ্ম বা বর্ষার কল্পনায় আকাশ অন্ধকার করিলে চলে কি?

অসীম ফিরিবেই।

বড় জোর তিন দিন। তার পর, মুখের ভাষা স্তব্ধ করিয়া চোখের ব্যাকুলতায় ফুটিয়া উঠিবে সেই নিরুদ্ধ আবেগের উন্মদ আনন্দ। সেই ভাবী অত্যুল্লাসের বীজ আজিকার দুঃখের ভূমিতেই ত উপ্ত হইয়াছে।

উমার দেহে শিহরণ জাগিল। কল্পনায় সে অসীমকে ঘিরিয়া মান-অভিমানের একটি মধুর পদাবলী রচনা করিল। মানিনী হইয়া কতবার কত ভঙ্গীতে ফিরিয়া বসিল, কতবার কত ছলে চুরি করিয়া কল্পিত প্রিয়ের মুখে বেদনা-ব্যাকুল রেখাগুলি দেখিয়া লইল; মনে মনে কত কথাই ভাঙ্গা-গড়া করিল।

কিছুই যেন মনোমত হয় না। তিনটি বৎসরের দৃঢ় রজ্জু প্রতিনিয়ত আশ্বাস দিতেছে; অথচ সে আশ্বাসের তলায় সন্দেহ, ভয়, 'যদির' একটা কালোছায়া!

উমা জোর করিয়া হাসিল। জোড়া মনের দশাই এই; সে দিনও কি এমনই হয় নাই? ভাল করিয়া সে দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে সে ধরিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অত্যুগ্র আনন্দের মাঝে যে বেদনা একদা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কম কঠিন নহে।

উঃ, চোখের জলও এ সময়ে শত্রুতা সাধে? বুকের নিশ্বাস কেবলই ভারী হইয়া বাতাসকে রোধ করিতেছে। না, বসিয়া থাকিলেই যত জ্বালা! জোর করিয়া উমা উঠিল।

কোন কাষ না পাইয়া বড় আলমারীটা খুলিয়া দামী কাপড়-জামাগুলি বাহির করিয়া মেঝের উপর ইচ্ছা করিয়াই ছড়াইয়া দিল। একটা তীব্র মধুর পুষ্পসার-গন্ধে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল এবং সেই ঘনীভূত গন্ধের মধ্যে যেন অসীম আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা, বকুল, হেনা, চম্পকের মধ্যে অসীমের নিশ্বাসও মিশিয়া গেল।

উমা চক্ষু মুদিয়া অনুভব করিতে লাগিল, এই ক্ষুদ্র কক্ষের গন্ধভরা বায়ু বিগত দিনের আনন্দকে বহন করিয়া আনিয়াছে। এখানে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে ও অসীম।

জানালাপথে জ্যোৎস্নাহসিত আকাশের টুকরা, আলোহীন ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার। মুখ দেখা



বসুমতী চিত্র বিভাগ]

উপেক্ষিতা

[শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

যায়, মন দেখা যায় এবং কথা না কহিয়াও বাণী বুঝা যায়। মুখামুখি দুজনে—রাত্রি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরই মনের একান্ত প্রার্থনায়। অলক উড়াইয়া বায়ু খেলা করিতেছে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে সুন্দর ও সুরভি কিছু মিলিয়া যাইতেছে। করের উষ্ণতায় প্রাণের আবেগ ভরা। সে কি বিদ্যুৎ, না, বহ্নি? না বিদ্যুদ্বহ্নির ধাঁধাঁ ও দাহহীন এমন কিছু উষ্ণ রমণীয় সৌন্দর্য্য!

চক্ষু চাহিয়া উমা শিহরিয়া উঠিল।

এ সে করিয়াছে কি? সুরভিত শান্তিপুরের কাপড়খানিকে কম্পিত ওষ্ঠের উপর চাপিয়া ধরিয়া কোন্ দুরান্তরের স্বপ্ন দেখিতেছে?

দূর হউক, স্মৃতি কি তাহাকে কোনমতেই নিষ্কৃতি দিবে না? এগুলি গুছাইয়া রাখা যাক্।

গুছাইতে গুছাইতে আবার চক্ষু মুদিয়া আসিল। আবার গন্ধময় জগতে অসীমের আবির্ভাব। কাপড়-জামার ইতিহাসে উমা নূতন করিয়া সেই পুরাতন দিনগুলিকে যেন ফিরিয়া পাইল। ইচ্ছা হইল, এগুলির উপর সে শুইয়া পড়ে, চক্ষু মুদিয়া খানিক ভাবে। রক্তমাংসের অসীমের ক্রোধ আছে, অভিমান আছে, কিন্তু গন্ধভরা অতীতের আছে—বিহ্বল করা ঝঙ্কার। আছে—উষ্ণতাহীন আলো, আছে—অবসাদহীন চাঞ্চল্য। একটা জীবন এই সব স্মৃতির সৌন্দর্য্য লইয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া চলে।

বাহিরের শব্দে উমার চমক ভাঙ্গিল। সে কি সত্যই পাগল হইয়াছে? সত্য সত্যই যে কাপড়-জামার উপর শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে সে চক্ষু মার্জ্জনা করিল। কাপড়গুলির পানে চাহিতেও আর সাহস হয় না যেন। ও-গুলি অস্তমান চন্দ্রের চারিধারে ঘনীভূত অন্ধকারের মত বেগবান ও চিরস্থায়িত্বের বিভীষিকায় ভরা। চন্দ্রহীন সুবিস্তীর্ণ আকাশে ঐ প্রকার অন্ধকারের যবনিকাতলে অসংখ্য নক্ষত্রদ্যুতির মতই—অতীতের অনুজ্জ্বল স্মৃতিগুলি সারি বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের ঠেকাইতে অন্য কোন আগন্তুক অন্ধকার ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাপড়-জামা মেঝের উপর ছড়ানই রহিল—উমা ড্রেসিং-টেবলের সম্মুখে গিয়া বসিল।

ড্রয়ারের মধ্যে ছিল অঙ্গরাগের উপকরণ; অসুন্দরকে সুন্দর করে,—সুন্দরকে করে অনুপম। হৃদয়ের দ্বন্দ্ব জয় করিতে অঙ্গরাগে মনোনিবেশ করিতে ক্ষতি কি? উমা টেবলের উপর ক্রীম, পাউডার, পাফ্, রুজ, এসেন্স, লিপষ্টিক ও আলতা সাজাইয়া রাখিল। এলো চুলটায় একটা আলগা ফ্যাশানের এলো খোঁপা বাঁধিল। তার পর সৌন্দর্য্য-সাধনে যত্নবতী হইল।

কপালের মাঝে টিপটিকে সে দুইবার পরিল—দুইবারই তুলিয়া ফেলিল। অসীম এক দিন পাড়াগাঁর মেয়ে বলিয়া ঠাট্টা করিয়া ঐ টিপটি কি কৌশলে তুলিয়া দিয়াছিল—তাহা ভাবিতে গেলেই আনন্দে উমার দেহ দুলিয়া উঠে। মা গো! কি বেহায়া! উষ্ণ ওষ্ঠ দিয়া কপালের টিপটিকে তুলিয়া ফেলিয়া—উমা চক্ষু মুদিয়া সেই উষ্ণ স্পর্শটি যেন অনুভব করিয়া লইল।

তার পর ঠোঁটের রাঙ্গা রং মুছিবার জন্য সে কি উৎপীড়ন। দুইজনের টানাটানিতে কাণের দুলটা ছিটকাইয়া মেঝের উপর পড়িল; দামী পাথরটা সেই আঘাতে গেল ভাঙ্গিয়া, কিন্তু নিষ্ঠুর বিজয়ী জয়ের উল্লাসে সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া হাসিতে লাগিল। শব্দহীন হাসি, শুধু চোখের তারায় তাহার নৃত্য। ক্ষতির ক্ষতকে স্নিগ্ধ করিয়া উমার চক্ষুও আবেশে মুদিয়া গিয়াছিল। শিরায় শোণিতে—সারা দেহে সে কি অননুভূত অবসাদ।

মা গো! ভাগ্যে ঘরে জোরালো আলোটা ছিল না। কিন্তু চোখের তারার যে দীপ্তি ছিল—সে আলো—অন্ধকারেও মুখ দেখিতে সাহায্য করে। তথাপি সে আলোয়ও লজ্জা জাগে না। সর্ব্বস্ব সমর্পণের পূর্ব্বে যে সঙ্কোচ—ব্রীড়া, ভয় ও উৎকণ্ঠা, পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাঝে সে সকলকে জয় করিয়া জ্বলিয়া উঠে নয়ন-দীপে ঐ হৃদয়-জ্যোতির বিন্দু। পৃথিবীর অত্যুজ্জ্বল বা অতি স্নিগ্ধ প্রদীপ-শিখায় তেমন রমণীয় জ্যোতি, কৈ, আর ত দেখা যায় না।

উমা আবার মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।—আবার চক্ষু মুদিয়া, মন হারাইয়া, বর্ত্তমান ভুলিয়া কোন্ অতলে ডুব দিয়াছিল। নিষ্ঠুর লোকের মধুর স্মৃতি। উমা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনকে বাঁধিয়া ছড়ানো কাপড়-জামাগুলি পায়ে দলিয়া দলিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। যে তাহাকে আঘাত দিয়া গিয়াছে, তাহাকেও আঘাত

করিতে সুস্থ সবল অন্তরে ক্রোধের ধূম সঞ্চিত করিয়া রাখা চাই। এগুলি পায়ে দলিয়া দুর্ব্বল মুহূর্ত্তকে জয় সে করিবেই। মৃত অতীতকে লইয়া নাড়াচাড়া করে যে নারী,—সে কল্পনা-বিলাসিনী।

টিপয়ের উপর একখানা নভেল পড়িয়াছিল। হাসিমুখে যেন কিছুই হয় নাই, এমনই ভাবে সেখানা তুলিয়া লইয়া উমা জানালার ধারে বসিয়া—তাহাতে মনোনিবেশ করিল। দুই এক লাইন পড়িতে না পড়িতে আবার সেই দুর্ব্বলতা। কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দুইটি চোখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'বল দেখি কে ?'

যে রহস্য করে, সে-ও জানে, এমন নির্জ্জনে পরিচিত অতিপ্রিয় করের স্পর্শ ছাড়া একাকিনী পাঠিকার মগ্ন চৈতন্যকে বাহিরের কোন অপরিচিত আকর্ষণ করিতে পারে না, এবং পাঠিকারও সে স্পর্শ বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না। তথাপি এমন অমূল্য কৌতুক জগতে আর কোথায়? যে নাম বলিতে নাই—সেই নামকেই জানিবার জন্য প্রিয়ের আগ্রহ বেশী। শুধু কি স্পর্শ? কণ্ঠস্বর ও পায়ের ধ্বনি?

অমন স্বর লক্ষ লোকের কোলাহলেও কাণ দিয়া বুকের মাঝে গিয়া অত্যন্ত সহজেই আশ্রয় লাভ করে। নারী-জনোচিত কোমল নহে, কর্কশ, কিন্তু পৌরুষ-মাখানো। দৃঢ়-চরিত্রের অনেকখানিই যে স্বরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। মেঘের গুরু গর্জ্জনে শিখীর অন্তর বুঝি অমনই ফুলিয়া নাচিয়া উঠে।

বইখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িতেই উমা ত্রস্তে চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চোখ রাঙ্গাইয়া মনকে শাসন করিল—বাহিরের আসন্ন অন্ধকার অবসিতপ্রায় দিবসকে যেমন করিয়া ভ্রূকুটি দেখাইতেছে!

আকাশে চাঁদ নাই, অন্ধকার বিশ্বগ্রাসের আয়োজন করিতেছে। গৃহের মাঝে প্রদীপ জ্বালিয়া উহার অগ্রগমনে বাধা দিবার প্রয়োজন কি? আসুক সগৌরবে সমারোহে। বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে ক্ষুদ্র এই গৃহতল পরিপ্লাবিত হইয়া যাউক। পরিপ্লাবিত হউক,—মন, স্মৃতি, দৌর্ব্বল্য। উমা সেই অন্ধকারের বুকে নিশ্বাস ফেলিয়া দুইদণ্ডের তরেও অন্ততঃ ভাবিতে পারিবে, আমি সুখী, আমি বন্ধনহীন। সেখানে অনধীন মন ক্রোধে, অভিমানে, তেজে বা আনন্দে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করিবে—যাহার অধীশ্বরী সে নিজে।

আলো সে জ্বালিল না। অন্ধকারে শয্যায় আসিয়া শুইল। বায়ুর সঙ্গে পুষ্পসার-সৌরভ। উমা দুর্ব্বলতা-বশে সে গন্ধকে নির্ব্বাসিত করিতে নাকে কাপড় চাপা দিল না; বুক ভরিয়া নিশ্বাস টানিল। চোখ বুজিয়া কল্পনা করিল, সে জয়ী।

চোরের মত. সন্তর্পণে কে তাহার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছে! চোরের মতই সন্ত্রস্ত তাহার কম্পিত করের স্পর্শ! আলগোছে উমার চুলকে স্পর্শ করিতেছে! চোরের মতই সে কাপড়-জামার খস্‌খস্ শব্দকে চাপা দিতে সমস্ত মুখ আশঙ্কায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে। চোরের মতই তাহার চাপা নিশ্বাস। দেখা যাক্ না, চোর করে কি? উমা ত তাহাকে প্রশ্রয় দিবে না। মনের অতলে ডুবিয়া গিয়া, চক্ষু-কর্ণ বন্ধ করিয়া, সমস্ত চৈতন্যকে সমাধিস্থ করিয়া শুধু একটি অনুভূতিকে সে তীক্ষ্ণভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছে। অতঃপর লোকটি করিবে কি?

ও হরি! উমার এই নিশ্চলতায় লোকটি দুঃসাহসিক হইয়া উঠিতেছে যে! চুলের সন্তর্পিত স্পর্শ ছাড়িয়া বলিষ্ঠ বাহু কণ্ঠের নিকটে নামিয়া আসিল! মৃদুতর চাপা নিশ্বাস মুখের অতি সন্নিকটে; ওষ্ঠের উষ্ণতায় সে সান্নিধ্য যেন বুঝা যায়! মুখ-চোখ আগুনে ভরিয়া উঠিতেছে। নিশ্বাস আটকাইয়া অতি কষ্টে উমা পড়িয়া রহিল। লোকটার সাহসের সীমা সে দেখিবেই।

অবশেষে সীমা দেখা দিল। কোথা দিয়া কি হইল, উমা জানে না।—একটা তরল অগ্নিপ্রবাহের স্পর্শ—অকস্মাৎ স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণে ভরিয়া উঠিল। মধ্যাহ্ন-কিরণের পরেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবন। উমার ক্রোধ গেল, অভিমান গেল, স্বাতন্ত্র্য গেল, জয়-কামনা গেল। সেই চিরপ্রিয় নিষ্ঠুর আগন্তুকের বক্ষোবিলীন হইয়া—অসহ্য সুখে উমা ঘুমাইবার আয়োজন করিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রী-শিক্ষা

যে শক্তিপ্রভাবে আমাদের বালকগণ ধর্ম্মভাববর্জ্জিত ও অনাচারী হইয়াছে, বালিকাগণকেও সেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। বালকদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা না দিয়া উপায় নাই। তাহাদিগকে চাকুরী করিতে হইবে, ওকালতী ও ডাক্তারী করিতে হইবে। বালিকাদিগকে চাকুরী করিতে হইবে না, সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা না দিলেও চলে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রথম দোষ,—ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। শিক্ষার বিষয় হইতেছে, ইংরাজী, গণিত, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি। বিষয়গুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—ইংরাজী। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় যে ইংরাজী, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে ইংরাজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে নবীন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর মনে দাসজনসুলভ মনোভাব এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব স্বতঃই আবির্ভূত হয়। তাহারা মনে করে, ইংরাজী ভাষা যখন শ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়, তখন যাহারা এই ভাষায় কথা বলে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ জীব; ইংরাজদের বেশভূষা আচার-ব্যবহার সকলই শ্রেষ্ঠ, অতএব অনুকরণীয়; পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মের কথা স্কুলে কিছু পড়া যায় না, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মধ্যেও ধর্ম্মভাব বিশেষ কিছু দেখা যায় না; সুতরাং ইহাদের চক্ষুতে ধর্ম্ম কুসংস্কারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে।

ভূগোল পড়িয়া দেখা যায়, পৃথিবীতে ইংরাজ-অধিকৃত দেশই বিস্তৃততম; স্বাধীন ও সভ্যদেশের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান; স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নাই বলিলেই চলে। ইতিহাস পড়িয়া শিক্ষা হয়—ইংরাজ আসিয়া আমাদের দেশে শান্তি-স্থাপন করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে কিছু দিন ধরিয়া কেবলমাত্র মারামারি কাটাকাটি হইত। এই অরাজকতার পূর্ব্বে ছিল মোগল-রাজত্ব, তাহার পূর্ব্বে পাঠান-রাজত্ব; তাহার পূর্ব্বে দুই চারি জন বড় হিন্দু রাজা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানা নাই; বরং খুব বড় বৌদ্ধ রাজা কয়েক জনের অনেক কথা জানা যায়।

স্কুলের বালক শিখিল না যে, ইংরাজের পূর্ব্বপুরুষগণের যখন বাসগৃহ ছিল বনজঙ্গল বা পর্ব্বতগুহা, পরিধেয় ছিল পশুচর্ম্ম, জীবিকা ছিল পশু-শিকার, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন গ্রাম ও নগরে সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেন, কৃষিকর্ম্ম করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, তপস্যা করিতেন, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহারা শিখিল না যে, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় সম্বন্ধে হিন্দুগণ অতি পুরাকালে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তে অন্য কোনও জাতি উপনীত হইতে পারে নাই। একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচারিত হইয়াছিল যে, ক্ষুদ্রতম জীবেরও প্রাণ পবিত্র, প্রাণিহিংসা মহাপাপ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ঋষিগণ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্যে মানবের তৃপ্তি হইতে পারে না, এজন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা—ভোগ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য নিযুক্ত না করিয়া অমৃতত্বলাভের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহারা শিখিল না যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষি-মুনি এই পবিত্র ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিখিল না যে এই প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিদ্যা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে এবং ভারতের রাজনৈতিক অধীনতার যুগেও শ্রীচৈতন্যদেব, ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা শিখিল না যে, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী নানা কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন। প্রথম তিনি যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ-কীর্ত্তনই বেশী থাকে, ভারতীয় সভ্যতার গুণকীর্ত্তন অতি সামান্যই থাকে; নিন্দাবাদই বেশী

থাকে। দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রেয়মূলক, ভারতীয় সভ্যতা শ্রেয়োমূলক। উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"অন্যচ্ছ্রেয় অন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে
পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তে অর্থাৎ য উ
প্রেয়ো বৃণীতে।"

শ্রেয় এবং প্রেয় বিভিন্ন স্বভাবের বস্তু। তাহারা বিভিন্ন প্রয়োজন জন্য পুরুষকে বন্ধন করে। যাহারা শ্রেয় গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয়। যাহারা প্রেয় বরণ করে, তাহারা ইষ্টবস্তু লাভ করিতে পারে না।

প্রেয় বস্তু আপাততঃ মনোহর, কিন্তু অবশেষে কষ্টদায়ক। আর শ্রেয়বস্তু প্রথমে কষ্টদায়ক, কিন্তু শেষে সুখদায়ক। গীতায় শ্রেয়কে সাত্ত্বিক সুখ এবং প্রেয়কে রাজসিক সুখ বলা হইয়াছে।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।"

যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায়, তাহা সাত্ত্বিক সুখ, যথা—সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা।

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥"

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখের উৎপত্তি, যাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় মধুর, কিন্তু পরিশেষে বিষের ন্যায় কষ্টদায়ক, তাহা রাজসিক সুখ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র বিষয়সুখভোগ। অভাব যত পার বাড়াইয়া যাও। থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেডিও, গ্রামফোন, মোটর, এয়ারোপ্লেন, নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ। ভাল বেশ-ভূষা কর, যাহা ভাল লাগে, তাহাই খাও, হোটেলে রেস্তঁরায় যেখানে সেখানে যাহার তাহার দ্বারা পরিবেষিত অন্ন ভোজন কর, জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কি? সপ্তাহে একবার সুসজ্জিত হইয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য ভজনালয়ে গিয়া বসিলেই ধর্ম্মের ঋণ শোধ হইবে। হিন্দুর সভ্যতা অন্যরূপ। জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য এই ভাবে অনুষ্ঠান করিবে—যাহাতে মন ভগবদভিমুখ হয়। প্রভাতে উঠিয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া শয্যাত্যাগ করিবে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে, সদাসর্ব্বদা তাঁহার নাম জপ করিবে, যাহা কিছু আহার—তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ মনে করিয়া ভোজন করিবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, চিত্তবিনোদনের জন্য ধর্ম্মসঙ্গীত, যাত্রা-কথকতা শুনিবে। এই দুই পথের মধ্যে কোন্ পথ ভাল? প্রথম পথ আপাতমধুর। যাহা আপাতমধুর, মানব স্বভাবতঃ তাহার জন্যই ব্যগ্র হয়। তাই আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী।

আর এক কারণে ইঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী। ইংরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত। সুতরাং ইংরাজদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ, আমাদের সভ্যতা নিকৃষ্ট। যে পরিমাণে আমরা ইংরাজী সভ্যতার অনুকরণ করিতে পারিব, সে পরিমাণে আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনুকরণ মৃত্যুর পথ, স্বতন্ত্রতা-রক্ষাই স্বাধীনতার পথ। ঐ বৃক্ষপত্রটি মাটীর উপর পড়িয়া আছে, যত দ্রুতভাবে উহা মৃত্তিকার অনুকরণ করিবে, তত শীঘ্র উহার মৃত্যু হইবে। আর ঐ যে বীজ মাটী-চাপা আছে, উহা মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেছে না, নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিতেছে না, উহা মরিবে না, কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে। ইংরাজ শাসনের ফলে আমরা যদি তাহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় মৃত্যু অদূরবর্ত্তী। যদি যত্নপূর্ব্বক আমাদের ধর্ম্ম-জীবন রক্ষা করিতে পারি, তবেই শত বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন বিকাশিত হইবে।

ইংরাজী শিক্ষা এবং সভ্যতার মোহে আমরা আমাদের জাতীয় জীবন, আমাদের ধর্ম্মজীবন হারাইতে বসিয়াছি। ধর্ম্মজীবনের কি মূল্য, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তাই বালিকাদিগকেও এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি। যত দিন রমণীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল, তত দিন আমাদের ধর্ম্মভাব জাগ্রত ছিল। কারণ, গৃহে রমণীর প্রভাবই সমধিক।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" আবাসস্থানকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ।

তাই পুরুষগণ ইংরাজী-শিক্ষিত হইলেও ভারত-রমণী ব্রত, পূজা, পার্ব্বণ অনুষ্ঠানে গৃহে গৃহে ধর্ম্মভাব জাগ্রত রাখিয়াছেন, এবং সন্তানগণের কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইংরাজী-শিক্ষাও চলুক, ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষা

দেওয়া হউক, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। বালক বা বালিকারা যতগুলি বিষয় শিখিতে পারে, তাহার একটা সীমা আছে। যে পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা হৃদয় অধিকার করিবে, সে পরিমাণে ভারতীয় সাধনা হৃদয় হইতে বাহিরে থাকিবে। একটি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মা তাঁহাকে "সীতা" নাটক দেখাইতে লইয়া যাইবার সময় বলিতেছিলেন, মেয়ে ত রামায়ণ পড়িবার সময় পান নাই, নাটক দেখিলে রামায়ণ গল্পটা শিখিতে পারিবেন! বোধ করি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মেয়েই রামায়ণ-মহাভারত পড়িবার অবসর পান না।

আমাদের মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাতে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে হইবে। ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত শিক্ষা বেশী মূল্যবান্, এই ধারণা স্থির রাখিতে হইবে। রামায়ণ-মহাভারত বার বার পড়িয়া এই দুইটি গ্রন্থের শিক্ষা তাহাদের অস্থিমজ্জাগত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পড়ুন সংস্কৃত কাব্য, ইতিহাস, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষদ, বেদান্ত। সংস্কৃত-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর ইংরাজী কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান শিখাইবার বন্দোবস্ত থাকুক আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে নিপুণতা এবং অনুরাগ রমণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার চাপে এই নিপুণতা এবং অনুরাগ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।

গ্রামের পথ

আধেক ঘাসে ঢাকা
পথ সে আঁকা বাঁকা।
সারাটি গ্রাম ঘিরে
গেছে সে নদীতীরে।

দুধারে শোভে তার,
কুটীর ও ঝোপ ঝাড়,
যেন রে ছবিখানি
এঁকেছে তুলি টানি।

প্রভাত ও সন্ধ্যায়,
শ্যামল বীথিকায়,
বিহগের নহবৎ,
ঝরে সেথা সুধাবৎ।

ফাগুনে বকুল ঝরে'—
পড়ে তার বুক 'পরে,—
শরতে শেফালি রাশি,
লোটায় সেথা হাসি।

তারি বুকে শিবিকায়,
নববধূ আসে যায়,
মেয়েরা দলে দলে,
সাঁঝে প্রাতে জলে চলে।

ওই পথখানি দিয়ে,
কত প্রিয়জন নিয়ে,
দিয়েছি চিতার 'পরে,
চিরতরে—চিরতরে।

যেন দেব হৃষীকেশ!
এ জীবনও হয় শেষ,
ঐ পথখানি পাশে,
ক্ষুদ্র মোর পল্লীবাসে!

শ্মশান-বান্ধব যারা
শবদেহ লয়ে তারা,
বোল 'হরি হরি' রবে
ঐ পথে যাবে সবে।

দুই ধারে সারি সারি,
গ্রামবাসী নর-নারী,
সজল নয়নে সবে,
মোর পানে চেয়ে রবে।

ছার দেহ ভস্ম করে,
সাথীরা বিষাদ ভরে,
আসিবে ফিরিয়া গাঁয়
ওই পথে পুনরায়।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

পথের কাঁটা

১

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিল। তার পর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াসা-বর্জ্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল্ করিতেছিল। বাড়ীর তেতলার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে সহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্ম্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ী-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুই জন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্ত্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানালার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, "কিছু দিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ্য করেছ ?"

আমি বললাম, "না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিত ভাবে ব্যোমকেশ বলিল, "বিজ্ঞাপন পড় না ? তবে পড় কি ?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়! ওসব প'ড়ে লাভ কি ? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তা হ'লে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্ত্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম, "ও—তাই না কি ? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা ত তা হ'লে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভ'রে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রী হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাযের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার ক'রে দিনে-দুপুরে ডাকাতী করছে, কে চোরাই মাল প্রচার করবার নূতন ফন্দী আঁটছে,—এই সব দরকারী খবর যদি পেতে চাও ত খবরের কাগজ পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটি কি শুনি।"

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র চার লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

"পথের কাঁটা

যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্প-পোষ্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।"

দুই তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ল্যাম্পপোষ্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে! এ বিজ্ঞাপনের মানে কি ? আর পথের কাঁটাই বা কি বস্তু ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। বিজ্ঞাপনটা তিনমাস ধ'রে ফি শুক্রবারে বার হচ্ছে, পুরোনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি ? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ত লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে! এর ত কোনও মানেই হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপাততঃ কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই ব'লে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে বিজ্ঞাপন দেয় না। লেখাটা পড়লে একটা জিনিষ সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"কি ?"

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা। প্রথমতঃ দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়! সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তার পর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়,—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন

দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বলছেন—'ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও ত অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো,—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।'—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর, তুমি এ জিনিষটি চাও। তোমার কর্ত্তব্য কি? নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তার পর কি হ'ল?"

"কি হল?"

"শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঐ যায়গায় কি রকম লোক-সমাগম হয়, সেটা বোধ হয় তোমাকে ব'লে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটটোয়ে লেড্‌ল, ও-দিকে নিউ মার্কেট, চারিদিকে গোটা-পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস্‌। তুমি ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে আধ-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হ'ল না,—কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হ'ল না। তুমি বিরক্ত হয়ে চ'লে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভূয়ো। তার পর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি! চোরে কামারে দেখা হ'ল না অথচ সিঁধকাটি তৈরী হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপন-দাতার সঙ্গে তোমার লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "যদি তোমার যুক্তিধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে কি প্রমাণ হয়?"

"এই প্রমাণ হয় যে, 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান, এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হ'তে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল, "আরে, অনুমানই ত আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব'লে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence ব'লে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চ'লে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম না। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ ব্যোমকেশের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন কায। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরও জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখী কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, ঐ পাখীটা কি চায় বলতে পার?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম, "কি চায়! ওঃ, বোধ হয়, বাসা তৈরী করবার একটা যায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো? কোন সন্দেহ নেই?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল, "কি ক'রে বুঝলে? প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ আর কি! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায়?"

দেখিলাম, ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি। কহিলাম, "না,—তবে—"

"অনুমান! পথে এস! এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন?"

"দেয়ালা করি নি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, চড়াই পাখী সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে?"

"কেন নয়?"

"তুমি যদি কুটো মুখে ক'রে এক জনের জানালায় উঠে ব'সে থাক, তা হ'লে কি প্রমাণ হবে যে, তুমি বাসা বাঁধতে চাও?"

"না। তা হ'লে প্রমাণ হবে যে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কি?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল, "চটাতে পারবে না। কিন্তু কথাটা তোমায় মানতেই হবে,—প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তিসম্মত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।"

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম, "কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সে তোমার মনের দুর্ব্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মত এই যে, লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল। কাল শনিবার, বিকেলে কোনো কাযও নেই। কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেব।"

"কি ভাবে?"

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল—"অপরিচিত ব্যক্তি—প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না—হাতে লাঠি আছে—কে ইনি? নিশ্চয় আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তে-তলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল,—"ভেতরে আসুন—দরজা খোলা আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সী স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রূপার

মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবন্ধ কোট, পরিধানে কোঁচানো থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তেতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপাল মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল, "অনুমান! অনুমান!"

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এ ক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোকটি দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডিটেক্‌টিব ব্যোমকেশ বাবু কার নাম?"

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বসুন। আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেক্‌টিব কথাটা আমি পছন্দ করি না; আমি এক জন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড় বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্‌, তার পর আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে গ্রামোফোন পিন-রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কিরূপ সম্ভব হইল, তাহা একবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মত ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি —আপনি জানলেন কি করে?"

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান মাত্র। প্রথমতঃ আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়তঃ আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়তঃ আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা—আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং"—কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা সহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিষ্ট্রী' নাম দিয়া সহরের দেশী-বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকের মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের জল্পনা উত্তেজনায় একবারে দড়ি ছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই,—মাস দেড়েক পূর্ব্বে সুকীয়া ষ্ট্রীট নিবাসী জয়হরি সান্ন্যাল নামক জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে যাইবার জন্য তিনি যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল যে, তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কিসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে আর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিস অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক্‌ হইতে বক্ষের চর্ম্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃতব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কি না এবং যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ইহা সঙ্ঘটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গভীর গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না,—এই হত্যার উদ্দেশ্য কি এবং যে হত্যা করিয়াছে, তাহার ইহাতে কি স্বার্থ! সরকারের পুলিস যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজীরা ফতোয়া দিলেন যে, ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভাল সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে সহরের সকল সংবাদপত্রে দেড় ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙ্গালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল,—

আবার গ্রামোফোন পিন্‌!

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য!

কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়?

'কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে জয়হরি সান্ন্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামফোন পিন্‌ বাহির হয়, এবং ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা

সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি রোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্ণে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়ীতে তুলিল, কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই পুলিস আসিয়া পড়িল। কৈলাস বাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ছিল, পুলিস তাঁহার বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাস হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাস বাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামোফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূরকর্ম্মা নরঘাতক কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

কৈলাস বাবু অতিশয় হৃদয়বান্ ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাস বাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাস বাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

পুলিস সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাস বাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হৈ-চৈ চলিল। পুলিস সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়া দূরের কথা, গ্রামোফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

পনর দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণ-বণিক্ সম্প্রদায়ের এক জন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্ম্মতলা ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট হৈ-হৈ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মত একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িং-রুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তার পর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটা অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা সহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কি করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাযে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিটেক্‌টিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুতঃ সে যে এক জন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভালরকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুই জনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না, জানি না; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন্ সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুকু সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয়, তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, এক দিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

২

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে, আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিস কিছু করতে পারছে না। দেখুন না, চোখের সামনে দিনে দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি? আমিও ত প্রায় গিয়াছিলাম, আর একটু হলেই"—তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—"আপনি বিচলিত হবেন না! পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন। আমাকে গোড়া থেকে সমস্ত কথা খুলে বলুন, অ-দরকারী ব'লে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারী কিছু নেই।"

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার নাম শ্রীআশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি। আঠারো বছর বয়স থেকে সারাজীবন ব্যবসা উপলক্ষে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি—বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেণ্ডি-গেণ্ডি আমি ভালবাসি

না, তাই কোনও দিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয়নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয় নি—আসছে মাঘে একান্ন বছর পূরবে। প্রায় বছর দুই হ'ল কাযকর্ম্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জ্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চ'লে যায়। বাড়ী-ভাড়াও দিতে হয় না, বাড়ীখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার সখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "অবশ্য পোষ্য কেউ আছে ?"

আশু বাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। আত্মীয় বলতে বড় কেউ নেই, তাই ও হাঙ্গাম পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বয়াটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ী ঢুকতে দিই না !"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, "ভাইপোটি কোথায় থাকেন ?"

আশু বাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন,"আপাততঃ শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামী করার জন্যে এবং পুলিসের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে ছ'মাস জেল হয়েছে।"

"তার পর ব'লে যান।"

"বিনোদ ছোঁড়া আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক'দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গাম ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্টও করিনি ; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন্ রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হ'ত না, ভাবতাম, সব গাঁজাখুরী। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে।

"কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই, জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গান-বাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী ফিরে আসি, হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ী ফিরছি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়ীতে তখন ঠিক সওয়া ন'টা। রাস্তায় তখনও গাড়ী-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস ক'রে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হ'তে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হ'ল, আমার বুক-পকেটের ঘড়ীর ওপর কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন ক'রে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়ীটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ী বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ী বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচখানা গুঁড়ো হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়ীটাকে ফুড়ে মুখ বার ক'রে আছে।"

আশু বাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ীর বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন সেই ঘড়ী—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গান-মেটালের পকেট ঘড়ী বাহির করিল। ঘড়ীর কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; এবং তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামোফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়ীটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃ-সংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবলের উপর রাখিয়া আশু বাবুকে বলিল, "তার পর ?"

আশু বাবু বলিলেন, "তার পর কি ক'রে যে বাড়ী ফিরে এলাম, সে আমিই জানি আর ভগবান্ জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারি নি। ভাগ্যে পকেটে ঘড়ীটা ছিল, তাই ত প্রাণ বেঁচে গেল—নইলে আমিও ত এতক্ষণ হাঁসপাতালে মড়ার টেবলে শুয়ে থাকতাম—" আশু বাবু শিহরিয়া উঠিলেন—"এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কি ক'রে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রিতে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম, আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়ীতে চ'ড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয় নি—কি জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশু বাবুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল,—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর কোন ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তা হ'লে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।"

আশু বাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, —"এ ত খুব ভাল কথা। সবশুদ্ধ তা হ'লে তিন হাজার হ'ল—গভর্মেণ্টও দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগ্ল, ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন ?"

"কি রকম শব্দ ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ।"

আশু বাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—"না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কোন রকম শব্দ ?"

"আমি ত কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশু বাবু বলিলেন,—"রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই শুনেছিলাম। আর মনে হচ্ছে যেন—যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইকেলের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেন নি ?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন আরম্ভ করিল,—"আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে ?"

"না। অন্ততঃ আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেন নি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আশু বাবু বলিলেন,—"না।"

"উইল করেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন ?"

আশু বাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ঐ প্রশ্নটি করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—প্রাইভেট—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশু বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল,—"আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিস—তিনি যে-ই হোন—আপনার উইলের কথা জানেন কি ?"

"না। আমি আর আমার উকীল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয় ?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—"হয়।"

"আপনার ভাইপো কত দিন হ'ল জেলে গেছে ?"

আশু বাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন,—"তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আজ তা হ'লে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঐ ঘড়ীটা রেখে যান; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশু বাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে ত কোন ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ী থেকে বেরুবেন না।"

আশু বাবু পাণ্ডুর-মুখে বলিলেন,—"বাড়ীতে আমি একলা থাকি,—যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল, "না, বাড়ীতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, এক জন দরোয়ান রাখতে পারেন।"

আশু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ী থেকে একেবারে বেরুতে পাব না ?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার, রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোনও দায়িত্ব থাকবে না।"

আশু বাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"তুমি ভাবছ, আমি আশু বাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন, এবং বাড়ীতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি ক'রে ?"

চকিত হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল, "গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিষ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ—সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়, রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কি হ'তে পারে, ভেবে দেখেছ ?"

"না। কি কারণ ?"

"এর দু'টো কারণ হ'তে পারে। প্রথম, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম,—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন কি অস্ত্র হ'তে পারে ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম, "আচ্ছা, এমন কোন বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরী করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোড়া যায় ?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু' একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিম্বা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন ? সে ত নির্জ্জন স্থানই খুঁজবে। বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে, কথায় বলে—শব্দে শব্দ ঢাকে—গন্ধ ঢাকে কিসে ?"

আমি বলিলাম, "মনে কর, যদি এয়ার-গ্যন হয় ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, "এয়ার-গ্যন ঘাড়ে ক'রে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।—না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক, ছোড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কি ক'রে ?"

আমি বলিলাম,—"তুমিই ত এখনই বলছিলে,—শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল,—"ঠিক ত—ঠিক ত—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি হ'ল ?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বলিল,—"কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন্ রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সুতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

"কি রকম ?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল,—"প্রথমতঃ দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশু বাবু—যিনি ঘড়ীর কল্যাণে বেঁচে গেছেন—তিনিও প্রৌঢ়। তার পর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান্ লোক ছিলেন,—হ'তে পারে, কেউ বেশী ধনী, কেউ কম ধনী, কিন্তু গরীব কেউ নয়। তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের চোখের সামনে খুন হয়েছেন ; এবং শেষ কথা—এইটেই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য—তাঁরা সবাই অপুত্রক—"

আমি বলিলাম,—"তুমি তা হ'লে অনুমান কর যে—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান এখনও আমি কিছুই করি নি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরিজীতে যাকে বলে premise."

আমি বলিলাম, "কিন্তু এই ক'টি premise থেকে অপরাধীদের ধরা—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একেবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজওয়ালারা 'মার্ডারাস্ গ্যাং' ব'লে যতই চীৎকার করুক, গ্যাংএর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্ এবং যজমান। এক কথায় পরব্রহ্মের মত ইনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—"এ কথা তুমি কি ক'রে বলতে পারো ? কোন প্রমাণ আছে ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি পাঁচ জন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে ? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে,—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয় নি। আশু বাবুর কথাই ধর, ঘড়ীটি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি ?—এমন টিপ কি পাঁচ জনের হয় ? এ যেন চক্রাচ্ছিদ্রপথে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করার মত,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে ত ? ভেবে দেখ, সে কায একা অর্জ্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা এক জন বৈ দু'জনের ছিল না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল—সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুতঃ এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী, মিউজিয়াম ও গ্রীনরুম। আশু বাবুর ঘড়ীটা তুলিয়া লইয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাততঃ স্নানের বেলা হয়ে গেছে।"

৩

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কি কাযে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ঐ কার্য্যটা একত্র না করিলে মনঃপূত হইত না।

একটা চুরোট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল ; বলিল,—"আশু বাবু লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয় ?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম,—"কেন বল দেখি ? আমার ত বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়—নিরীহ ভালমানুষ গোছের—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আর নৈতিক চরিত্র ?"

আমি বলিলাম, "মাতাল ভাইপো'র উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র ত ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্থ লোক। বিয়ে করেন নি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রে থাকেন ত অন্য কথা; কিন্তু এখন আর ওঁর সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, "বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশু বাবু নিত্য গানবাজনা ক'রে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ী। স্ত্রীলোকের বাড়ী বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। কারণ, বাড়ীর ভাড়া আশু বাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দু'টি প্রাণীর বৈঠককে কোনও মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে ! বুড়োর প্রাণে ত রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তের বছর ধ'রে আশু বাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ ক'রে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠতার অভাব নেই, আশু বাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম, "তাই না কি ! সঙ্গীত-পিপাসু সেজে ঢোকবার মৎলব করেছিলে বুঝি ? নাগরিকাটির দর্শন পেলে ? কি রকম দেখতে শুনতে ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "একবার চকিতের ন্যায় দেখা

পেয়েছিলুম ; কিন্তু রূপ-বর্ণনা ক'রে তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না! এক কথায়, অপূর্ব্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড় জোর উনিশ কুড়ি। আশু বাবুর রুচির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ আশু বাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা দুর্ব্বলতা। তা ছাড়া, আশু বাবুর উইলের ওয়ারিস সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল—"

"ইনিই তা হ'লে আশু বাবুর উত্তরাধিকারিণী ?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে আর একটি ভদ্র লোকের দেখা পেলুম, ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দরোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চ'লে গেলেন। কিন্তু ও কথা যাক্। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশু বাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোম-কেশ ও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনই ভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘড়ীটা থেকে কিছু পেলে ?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "ঘড়ী থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক—গ্রামফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন, দুই—তার ওজন দু'-রতি, তিন—আশু বাবুর ঘড়ীটা একবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম, "তার মানে দরকারী তথ্য কিছুই পাও নি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "তা বলতে পারি না। প্রথমতঃ বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোড়বার সময় হত্যাকারী আর আহত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশী হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হালকা জিনিষ যে, সাত আট গজের বেশী দূর থেকে ছুড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হ'তে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কি রকম অভ্রান্ত, তা ত দেখেছ। প্রত্যেকবার তীর একবারে মর্ম্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম, "সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয় ত দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয় ত নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে ; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না। কি ক'রে সে এমন ভাবে আত্মগোপন করলে ?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম, "আচ্ছা, এমন ত হ'তে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায়—যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোড়া যায়। তার পর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারু সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যদি হ'ত, তা হ'লে ফুটপাথের ওপরেই ত কায সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন কোনও যন্ত্র আমার জানা নেই—যা নিঃশব্দে ছোড়া যায় অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলী একটা মানুষের শরীর ফুটো ক'রে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম, ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, শেষে বলিল, "বুঝতে পারছি, এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মত ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত-মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় গিছলে ?"

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল, —"উকীলের বাড়ী।" তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্নের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কায করিতেছিল, একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটার সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, "—ওহে, কাল কি ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে ? 'পথের কাঁটার' প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে উপস্থিত।"

সত্যই 'পথের কাঁটার' কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এস এস, তোমার একটু সাজসজ্জা ক'রে দিই। এম্নি গেলে ত চলবে না।"

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,—"চলবে না কেন ?"

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারী খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স হইতে ক্রেপ কাঁচি, স্পিরিট-গাম্ ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুষ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গাম্ লাগাইতে লাগাইতে বলিল, "অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কি না, তাই একটু সতর্কতা।"

মিনিট পনের পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি, কি সর্ব্বনাশ! এ ত অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও চুঁচোলো গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিন্‌কালেও ছিল না। বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে? যদি পুলিসে ধরে?"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, "মা ভৈঃ! পুলিসের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর,—অজিত বাবু কোথায় থাকেন!"

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম, "না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।"

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল, "কি করতে হবে, তোমার ত জানাই আছে,—শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এসো, পেছু নিতে পারে।"

"সে সম্ভাবনাও আছে না কি?"

"অসম্ভব নয়। আমি বাড়ীতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এসো।"

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু সাহস হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পাণ খাইতাম, খোট্টা পাণওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পাণ চাহিলাম। লোকটা নির্ব্বিকার-চিত্তে পাণ দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভাল করিয়া দৃক্‌পাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এস্‌প্লেনেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মত নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুইএর গুঁতা নির্ব্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সং-এর মত ল্যাম্প-পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার অন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্ন-ভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয় ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কেন দাঁড়াইয়া আছ? কি করি, ফুটপাথের ধারেই হোয়াইটোয়ে লেডলর দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানালায় নানাবিধ বিলাতী পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম।

ঘড়ীতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোষ্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দুটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই। নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে! এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে হইবে! এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এসপ্লানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

"ছবি নিবেন, বাবু!"

কাণের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গি পরা নীচ শ্রেণীর এক জন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খাম খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ছবির ব্যবসা কলিকাতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি, লোকটা নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গিপরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক্ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট হাসির শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এক জন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গী ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙ্গালায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন,—"চিঠি ত পেয়ে গেছ দেখছি, এবার বাড়ী যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে ক'রে হাওড়ার মোড় পর্য্যন্ত, তার পর ট্যাক্সিতে ক'রে বাড়ী যাবে।"

সার্কুলার রোডের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত সহর মাড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম-কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগার টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম,—"সাহেব, কখন্ এলে?"

ব্যোমকেশ ধূম উদ্গিরণ করিয়া বলিল,—"মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম,—"আমার পেছু নিয়েছিলে কেন?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"যে কারণে নিয়েছিলুম, তা সফল হ'ল না, এক মিনিট দেরী হয়ে গেল।—তুমি যখন ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করছিলুম। 'পথের কাঁটার' ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ ক'রে থাকবে, বিশেষতঃ তুমি যে-রকম ছট্‌ফট্ করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চ'লে যাবার পর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরী হয়েছিল—তারি মধ্যে লোকটা কায হাঁসিল ক'রে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পৌঁছলুম, তখন তুমি খাম হাতে ক'রে ইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ।—কি ক'রে খাম পেলে?"

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকটাকে ভাল ক'রে দেখেছিলে? কিছু মনে আছে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সেটা আসল নয়—নকল। তোমার গোঁফদাড়ির মত।—যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়ি-গোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ্ত উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চিঠিতে কি দেখলে? কিছু পেয়েছ না কি?"

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "শুধু একটি কথা অজিত, একটি ছোট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক্ থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পন্‌টুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কি ক'রে জোড়া লাগল? চিঠিতে কি আছে?"

"তুমিই প'ড়ে দেখ" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

> "আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্‌কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখদিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর গগ্‌ল্ দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময় আপনি সংবাদ পাইবেন।
>
> পত্রব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমান্টিক—তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বরিত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার বল দেখি! আমি ত এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপন করবার চেষ্টার মধ্যে হয় ত কোন বদ মৎলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর ত আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ! অতবড় জিনিষটা দেখতে পেলে না?—" ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল, "আশু বাবু। এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই—" বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পূরিল।

আশু বাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামাকাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে কালি, যেন অকস্মাৎ কোনও মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। কাল সদ্য মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মাণ দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি, ব্যোমকেশ বাবু। আমার উকীল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল, "সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধ হয় খবর পেয়েছেন।"

আশু বাবু হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি—আপনি সব জানেন?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল, "সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককেও দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড় চলছিল—আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরী করবার পরই বিলাস উকীল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধ হয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তার পর ক্রমে—যা হয়ে থাকে। তারা এত দিন সুযোগ অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশু বাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হ'ল,…অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই—এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশু বাবু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তার মানে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দুজনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল; তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা সহরেই এক জন লোক আছে—যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি—অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচ জন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে

নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশু বাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কাউকে দোষ দেবার নেই!—আটত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করেছিলাম, তার পর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। এক দিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিন অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে এক দিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হ'ল না, কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তের বছর তাকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে ত আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে—কোনও দিন সন্দেহ হয়নি। বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হ'তে পারে না!—যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয় ত পরজন্মে কাযে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা—তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না। আর সে জেনেও কোন লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশু বাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয় ত নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন। মনের দিক্ থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্ম্মল থাকতে পেরেছেন, এইটেই আপনার সব চেয়ে বড় প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হ'তে পারত না।"

আশু বাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ব্যোমকেশ বাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু আপনার কাছে আমি আজ যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ঙ্কর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্দ্ধেক বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে। আর বেশী কি বলব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

আশু বাবু বিদায় লইবার পর তাঁহার অদ্ভুত ট্র্যাজেডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্ব্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আশু বাবুকে খুন করবার চেষ্টার পেছনে যে বিলাস উকীল আর ঐ স্ত্রীলোকটা আছে, এ কথা তুমি কবে জানলে?"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল,—"কাল বিকেলে।"

"তবে পালাবার আগে তাদের ধরলে না কেন?"

"ধরলে কোনও লাভ হ'ত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হ'ত না।"

"কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামোফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"তা যদি সম্ভব হ'ত, তা হ'লে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।"

"তুমি তাদের তাড়িয়েছ?"

"হ্যাঁ। আশু বাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকীলের বাড়ী গিয়ে ইসারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা স'রে না পড়েন ত হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকীল বুদ্ধিমান্ লোক, সন্ধ্যার গাড়ীতেই বমাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।"

"কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হ'ল?'

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকীল শুধু-হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নয়, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তাঁর কাছে ছিল, সমস্তই সঙ্গে নিয়েছেন; এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্দ্ধমানের পুলিস তাঁকে হাজতে পুরেছে—আগে থাকতেই তারা খবর জানত কি না! যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু'বচ্ছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসীই তার উচিত শাস্তি, তবু, তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু'বচ্ছরই বা মন্দ কি?"

৪

পরদিন প্রাতঃকালে এক জন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজার কড়া নাড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল,—"কে? ভেতরে আসুন।"

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়িগোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়স ত্রিশের মধ্যেই—চেহারা দেখিলে মনে হয়, এক জন অ্যাথ্‌লেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল,—"কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়—আমি এক জন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট।" বলিয়া অনাহূতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল,—"আমাদের জীবন বীমা করবার মত পয়সা নেই।"

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক এক জন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পাণখোর, কারণ, দেখিলাম, দাঁতগুলা পাণের রসে রক্তাভ হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়।

প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমি বীমা কোম্পানীর লোক বটে, কিন্তু ঠিক বীমার কাযে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই।—আপনারই নাম ত ব্যোমকেশ বাবু?—বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—"

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল,—"পরামর্শ নিতে হ'লে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিল,—"আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়—তবু"—বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া স্বরে বলিল,—"উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"বেশ ত, বেশ ত। উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কিসের? আপনার নামটি—? মাফ করবেন, অজিত বাবু, আপনি যে ব্যোমকেশ বাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনি ভাগ্যবান্ লোক মশায়, সর্ব্বদা এত বড় এক জন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম বিচিত্র Crimeএর মর্ম্মোদ্ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্ত্তও বোধ হয় dull নয়! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বীমার কায ছেড়ে আপনার মত জীবন যাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া একটা পাণ মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ ক'রে বলেন, তা হ'লে সব দিক্ দিয়েই সুবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"এই যে বলি।—আমি বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, তা ত আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি কায করি। কোম্পানীর হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কায আমি করেছি, তাই কোম্পানী খুসী হয়ে আমাকে কল্‌কাতা অফিসের চার্জ্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস দুই বেশ কায চালিয়েছিলাম মশাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বীমা কোম্পানীর একটা লোক আমার পেছনে লাগল। চুনো-পুঁটির কারবার আমি করি না, দু' চার হাজারের কায আমার অধীনস্থ এজেন্টরাই করে, কিন্তু বড় বড় খদ্দেরের বেলা আমি নিজে কায করি। এই লোকটা, আমার বড় বড় খদ্দের—ভাল ভাল লাইফ—ভাঙ্গাতে আরম্ভ করলে। আমি যেখানে যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়—কোম্পানীর নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড় বড় লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এই ভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানী থেকে তাগাদা আস্‌তে লাগল, কিন্তু কি করব, কেমন ক'রে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মামলা-মোকর্দ্দমা করাও সহজ নয়—তাতে কোম্পানীর ক্ষতি হয়; অথচ ছিনে-জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাসখানেক কেটে গেল, লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মনি-ব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দুটি চিরকুট বাহির করিয়া, ছোট টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল,—"দিন বারো চোদ্দ আগে এই বিজ্ঞাপনটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধ হয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয়। কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হ'লে কি হয়, মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল! পথের কাঁটা আর কাকে বলে! ভাবলাম, দেখি ত আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না! মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না।"

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পড়লেন ত? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি ত নির্দ্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবারে—কদমতলায় কেষ্ট ঠাকুরের মত ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধ'রে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও কেউ নেই। ডিস্‌গ্যাস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি!"

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল,—"এই দেখুন সে চিঠি।"

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ঠিক আমার পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্ত্তে আগামী সোমবার ১১ই মার্চ্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দ্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল,—"একে ত পকেটে চিঠি এল কি ক'রে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি প'ড়ে অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিষ্ট্রি ভালবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিষ্ট্রি। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখিনি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন ত?"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—"উনি কি মনে করেন, সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন? আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাব-গতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভাল নয়। এ রকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি? আমি নিজে গত দশবারো দিন ধ'রে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি; অথচ যেতে হ'লে মাঝে আর একটা দিন বাকী। তাই কি করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"দেখুন, আজ আমি আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারলুম না। আপনি এই কাগজ দুখানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা ক'রে আমি আপনাকে যথাকর্ত্তব্য ব'লে দেব।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"কিন্তু কাল সকালে ত আমি আসতে পারব না, আমাকে এক যায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রিতে সুবিধা হবে না কি? মনে করুন, আটটা কি নটা'র সময় যদি আসি?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাযে ব্যস্ত থাকব—আমাকেও এক যায়গায় যেতে হবে"—বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।"

"বেশ, তাই আসব"—পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দুটা পাণ মুখে পূরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"পাণ খান কি? খান না!—আমার এই একটা বদ্ অভ্যাস, কিছুতেই ছাড়তে পারি না; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পাণের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা, আজ উঠি তা হ'লে, নমস্কার।"

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া প্রফুল্ল রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"পুলিসে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয়? আমার ত মনে হয়, পুলিসে যদি তদন্ত করে, লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া বলিল,—"পুলিসের সাহায্য যদি নিতে চান, তা হ'লে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্য্যন্ত পুলিসের সঙ্গে কায করিনি, করবও না।—এই নিয়ে যান আপনার টাকা।" বলিয়া টেবলের উপর নোটখানা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

"না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তা হ'লে—" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিল, তার পর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সে ভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্নকণ্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ পাশের ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু একটা ইংরাজী শব্দ কাণে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল, তার পর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাকে ফোন করলে?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল এস্‌প্লানেড্ থেকে ফেরবার সময় এক জন তোমার পেছু নিয়েছিল, জানো?"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম,—"না! নিয়েছিল না কি?"

ব্যোমকেশ বলিল, "নিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কি অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।" বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এতবড় দুঃসাহসিকতা কি আছে, তাহা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরূহ হেঁয়ালির মত হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল, শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু ভেবে দেখি নি।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতে-ছিল, ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল,—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"সে আবার কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বাঃ, পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?"

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।"

"আমি ত যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।"

"কিন্তু না গেলেই কি নয়? পথের কাঁটার সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা হ'লে যে ঢের কায হ'ত।"

"হয় ত হ'ত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন ত আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার মত কিছু খবর ত চাই।"

"কিন্তু দু'জনে গেলে ত হবে না। চিঠিতে যে মাত্র এক জনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজাল-প্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবার সোল্ জুতা পরিল। তার পর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যস—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোষাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবলের উপর দু'টি চীনামাটীর প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল, "সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম—"এ সব কি হচ্ছে?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, "অভিসারে চলেছ, কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েষ্ট কোটের ভিতরে পুরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপে বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে কয়েকটা জিনিষ পকেটে পুরিতে পুরিতে ব্যোমকেশ বলিল, "চিঠি নিয়েছ? কি সর্ব্বনাশ, নাও নাও, শীগ্‌গির একখানি সাদা কাগজ খামের মধ্যে পূরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দ্দেশমত হু হু করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়ীতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী।

কি করিতে হইবে, গাড়ীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আমি আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী! রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রাসাদ থাকিলে আলো প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্দ্ধেক তেজ গ্রাস করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্ত্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেস্‌কোর্সের সাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সহরের অন্য ঘড়ীগুলাও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়ীর শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর কাণের কাছে ফিস্-ফিস্ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পৌঁছিতে তখনও প্রায় অর্দ্ধেক পথ বাকী আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোক-বিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কাণের কাছে শব্দ হইল,—"আসছে—তৈরী থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, পিচ-ঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খাম সমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের মধ্যে আসিল; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুট-পরিহিত আরোহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগ্‌লের ভিতর দিয়া আমাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে সাইক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া সাইক্লের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা পাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তার পর নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্ম একবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটী হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

আমি পৌঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল, "অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার ক'রে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটা শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "ব্যস্, হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়! আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগল খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল, "ব্যোমকেশ বাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল, "অজিত, এর পকেটগুলো ভাল ক'রে দেখে নাও ত, অস্ত্র-শস্ত্র কিছু আছে কি না।"

এক পকেট হইতে একটা অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পাণের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পাণ রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ব্যোমকেশ বাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্। কারণ, আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আপনি করেন নি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই, এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাযে লাগাবার ফুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিস হুইস্‌ল বাহির করিয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিল, তার পর আমাকে বলিল, "অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘন্টিতে হাত দিও না, বড় ভয়ানক জিনিষ।"

প্রফুল্ল রায় হাসিল, "সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাই ত আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন, নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক্ দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি ব'লে আমার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিষ্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ ক'রে আজ সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোসটাই দেখেছিলাম!—যাক, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন।"

প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—"তাও ত বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাণের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"একটা পাণ পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পাণ খাওয়াবার রীতি নেই, সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হ'ত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টা পাণ তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম। পাণ চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল,—"ধন্যবাদ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছে করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিসের আগমনশব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। দূরে মোটর-বাইকের ফট্‌ফট্ শব্দ শুনা গেল। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পুলিস ত এসে পড়ল। আমাকে তা হ'লে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"ছাড়ব কি রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল,—"পুলিসে দেবেনই?"

"দেব বৈ কি!"

"ব্যোমকেশ বাবু, বুদ্ধিমান্ লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারবেন না।" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, এক জন ইউনিফর্ম্ম-পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল,—"What's up? Deed?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল,—"এ যে খোদ কর্ত্তা দেখছি! টু লেট্ সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশ বাবু, পাণটা খেলে ভাল করতেন, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনার মত লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একলরী পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার শিয়র হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে।"

৫

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে চেয়ারে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়া সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল। ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবলের উপর একখানা সরকারী খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘন্টির মাথাটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র যে তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্য্যন্ত কারও মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিংএর! কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটিই হচ্ছে এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলী বেরোয়! আর এই ঘোড়া টিপলে দু' কায একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলীও বেরিয়ে যায়; ঘন্টির শব্দে স্প্রিংএর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে—সে দিন কথা হয়েছিল—শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কত বড় বুদ্ধিমান্, সেই দিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন্ যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কি ক'রে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রমশঃ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ওদুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলছে? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে ত সে তা দূর ক'রে দেবে—অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এটা যে তার অনাহারী পরহিতৈষী নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। তার পর এ দিকে দেখ, যারা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন! আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ, যে কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা ব'লে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না ক'রে থাকা যায় না যে, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশু বাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বুঝা যায় না কি?

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন বাইরে পৃথক্ হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙ্গা পাথরবাটির দুটো অংশ যেমন সহজে জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিষ প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাযের সাদৃশ্য। এ দিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ও দিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। পিনটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

আমি বলিলাম,—"হয় ত পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এ সব ত খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশু বাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—লোকটা কে? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা প্রফুল্ল রায়কে টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে, তারাও জানতে পারে নি, লোকটা কে এবং কি ক'রে সে খুন করে! আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান ধর্ম্ম। আমি তাকে কস্মিন্‌কালেও ধরতে পারতুম কি না, জানি না, যদি না সে আমার মন বোঝবার জন্যে সে দিন নিজে এসে হাজির হ'ত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যে দিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, সে দিন তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তার পর অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করলে। তুমি যখন এই বাড়ীতে এসে উঠলে, তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত। আশু বাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জানত, কাযেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, আমি অনেক কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হ'লে কি করত, বলা যায় না—হয় ত এ কায ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস—সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটা সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানতে এল। এতে তার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না, কারণ, প্রফুল্ল রায়ই যে পথের কাঁটা এবং গ্রামফোন-পিন, তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না!—শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।"

"কি ভুল?"

"সে দিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারে নি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।"

"তুমি জানতে! তবে আসবা-মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?"

"কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকর্দ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হ'ত না। সে যে খুনী আসামী, তার প্রমাণ কিছু ছিল কি? তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল—যাকে বলে in the act, রক্তাক্ত হস্তে। আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে যে দু'জনে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?

"যা হোক, প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে, আমি অনেক কথাই জানি—শুধু বুঝতে পারলে না যে, তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ ক'রে গেল,—যেন রাত্রে রেডকোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিস সঙ্গে নিয়ে যাই! তাই সে পুলিসের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিসের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় বুঝলে, গ্রামোফোন পিনের আসামী ধরবার সমস্ত গৌরব এবং পুরস্কার আমি একলা আত্মসাৎ করতে চাই। সে খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল; যাবার সময় আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

"বেচারা ঐ একটা ভুল ক'রে সব মাটী ক'রে ফেললে। শেষকালে তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয় নি, এ কথা সে দিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তোমার মনে আছে, প্রথম যে দিন আশু বাবু আসেন, সে দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘন্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তার পর 'পথের কাঁটার' চিঠি যখন পড়লুম, এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কি জানো—বাইসিক্ল।

"বাইসিক্লের কথা কেন যে তখন পর্য্যন্ত মাথায় ঢোকেনি, এই আশ্চর্য্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে স'রে যাবার জন্যে ঘণ্টা দিয়েই পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। তুমিও মাটীতে প'ড়ে পটলোৎপাটন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কারণ, সে দু'হাতে হ্যাণ্ডেল ধ'রে আছে—অস্ত্র ছুড়বে কি ক'রে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

"একবার পুলিস ভারী বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফোন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লাল-বাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিস সমস্ত ট্রাফিক্ বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায় তখন মনে মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্এর মাথা খুলে দেখবার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসেনি।" বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেল্‌টি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেবিলের উপর হইতে সরকারী লম্বা খামখানা হাওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পুলিস-কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিস এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তার পর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, যদিও এতে তাঁর খুসী হওয়াই উচিত ছিল। কারণ, গভর্ণমেণ্টের অনেক খরচ এবং মেহনৎ বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিস-সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জ্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাস কেউ সনাক্ত করতে পারেনি, জুয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোকরা লাস দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদের প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম্ম উপলক্ষে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠির উপসংহারে পুলিস-সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন—এই ঘন্টিটি ফেরৎ দিতে হবে। এটা না কি এখন গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওটার ওপর তোমার ভারী মায়া প'ড়ে গেছে—না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?"

ব্যোমকেশও হাসিয়া ফেলিল,—"সত্যি, দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘন্টিটা বক্‌শিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক, প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কি?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখানা। সেটাকে ফ্রেমে ক'রে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ টাকারও বেশী।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘন্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজেষ্ট্রী চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙীন কাগজের টুকরা বাহির করিল, তার পর তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রীআশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক্।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।



চয়ন

সরকারী মালখানা রক্ষার কৌশল

আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের সরকারী বিরাট মালখানা বা গুদাম-ঘরে বহু মূল্যবান্ দ্রব্য রক্ষিত থাকে। সতর্ক প্রহরীরা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু অগ্নিভয়, দস্যু-তস্করের উপদ্রব আছে। এজন্য বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ একটা নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রহরীরা মালখানার চারিদিকে ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছে কি না অথবা কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত



মার্কিণ মালখানা-রক্ষার কৌশল

হইতেছে কি না, তাহা নবোদ্ভাবিত সঙ্কেত-জ্ঞাপক প্রণালীতে ধরা পড়িয়া যায়। প্রহরী কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট সময়ে পর্য্যবেক্ষণে বিলম্ব করিলেই বিপদ-জ্ঞাপক যন্ত্রে তাহা তখনই রেখাপাত করিবে। যেখানে এই যন্ত্র সংস্থাপিত আছে, তথায় পর্য্যবেক্ষক উপস্থিত থাকেন। নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে জানিবামাত্রই সুইচ বোর্ডের কেন্দ্রস্থলে তখনই একটা সাঙ্কেতিক আলোক জ্বলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। সেই শব্দে উক্ত সুবৃহৎ মালখানার যাবতীয় রক্ষক ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায়।

সর্ব্বজাতীয় বাতিদান

এডলফ্ ষ্ট্রাক্ নামক এক ব্যক্তি আমেরিকায় সকল জাতির বাতিদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংগ্রহে রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, দস্তা, সীসা, মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাতিদান পৃথিবীর সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ৩ শত বৎসরের পুরাতন



সর্ব্বজাতীয় বাতিদান

বাতিদানও এই সংগ্রহে আছে। উহা ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইয়াছে। সংগ্রাহক প্রত্যেক বাতিদানে বাতি বসাইয়া প্রদর্শনী বসাইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদের প্রতীকার-ব্যবস্থা

পাছে কেহ মিথ্যা অগ্নি-সংবাদ জ্ঞাপন করে, তাই প্রতীকারব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কোন স্থানে আগুন লাগিয়াছে, এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিতে হইলে, নূতন ব্যবস্থায়, একটি বাক্সের ভিতর দিয়া হাত চালাইয়া কল



মিথ্যা সংবাদের প্রতীকার-ব্যবস্থা

ঘুরাইতে হইবে। কিন্তু হাত চালাইয়া কল ঘুরাইলেই একজোড়া হাত-কড়া আসিয়া মণিবন্ধকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। তখন আর সেই ব্যক্তির পলায়নের উপায় থাকিবে না। অগ্নি-নির্ব্বাণ-কারীদিগের কাছে হাতকড়া খুলিবার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট চাবী থাকে। তাহারা আসিয়া চাবী খুলিয়া দেয়। যদি মিথ্যা সংবাদ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাধীর পরিত্রাণের উপায় থাকে না। সত্য হইলে, শুধু কিয়ৎকাল সংবাদদাতাকে বন্ধনদশায় থাকিতে হয়।

দশহাজার কাষ্ঠখণ্ড-নির্ম্মিত টেবল

কালিফোর্ণিয়ার কোনও সূত্রধর ত্রিশ বৎসরের সঞ্চিত কাষ্ঠখণ্ড-গুলির সাহায্যে

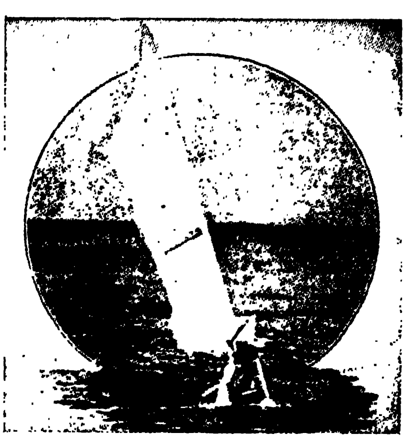


দশ হাজার কাঠের টুক্‌রার টেবল

একটি টেবল নির্ম্মাণ করিয়াছে। সূত্রধরটি ৬ মাস ধরিয়া টেবল নির্ম্মাণের নক্সা প্রস্তুত করে। তার পর কাঠের টুকরাগুলি সাজাইয়া টেবলটি নির্ম্মিত হয়। ছত্রিশ প্রকারের দশ হাজার টুকরা কাঠে এই টেবল প্রস্তুত হইয়াছে।

সন্তরণে সুবিধা

সন্তরণকারারা তাহাদের দেহের সহিত একটি পাল সংলগ্ন করিয়া রাখিলে, দীর্ঘ সন্তরণের পর ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হইতে পারে, জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারটি উদ্ভাবন করিয়াছেন।



পালের সাহায্যে সন্তরণে সুবিধা

দেহের সহিত পালটিকে কি ভাবে এবং কোথায় আবদ্ধ করিয়া খাড়া ভাবে রাখিতে পারা যায়, তাহা স্থির করিয়াছেন। সাঁতার দিতে দিতে যখন সন্তরণকারী অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখন তিনি পালটিকে উপরে তুলিয়া ধরেন। তখন তাঁহার ক্লান্তি অপনোদিত হয়।

কাগজ-নির্ম্মিত জার্ম্মাণ সাজোয়া গাড়ী

ভার্সেলের সন্ধি-সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণী প্রকৃত সাজোয়া গাড়ী রাখিবার অধিকারী নহে। কিন্তু যুদ্ধ-প্রদর্শনীতে সাজোয়া গাড়ী দেখান চাই। তাই জার্ম্মাণী কার্ডবোর্ড দ্বারা আচ্ছাদিত

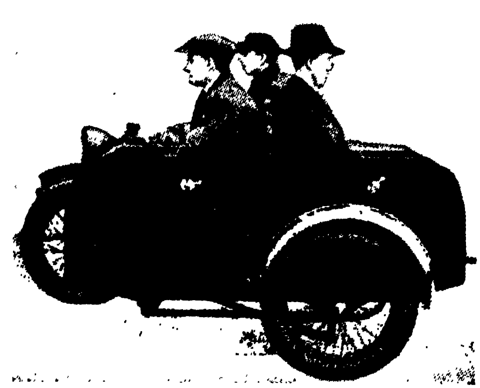


কাগজের সাজোয়া গাড়ী

সাজোয়া গাড়ীর সাহায্যে সে অভাব পূর্ণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধব্যাপারে এই গাড়ীর কোনও সার্থকতাই নাই।

নূতন ধরণের মোটর দ্বিচক্রযান

স্পেনের বে-সামরিক রক্ষি-সেনাদল মোটর-চালিত একপ্রকার নূতন দ্বিচক্রযানে চড়িয়া পথে পথে পাহারা দিয়া বেড়ায়। এই দ্বিচক্রযানের পরেই একখানি গাড়ী সংলগ্ন থাকে। সেই



নূতন ধরণের মোটর-চালিত দ্বিচক্রযান

গাড়ীতে দুই জন লোক দুই দিকে মুখ রাখিয়া বসিয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় পথের সকল দিকে তাহারা দৃষ্টি রাখিতে পারে। দুই জনের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং উভয় পার্শ্ব, কোন দিক্ হইতেই তাহারা আক্রান্ত হইতে পারিবে না, অথবা সকল দিকে দৃষ্টিরক্ষার ফলে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে পাইবে বলিয়া এইরূপ দ্বিচক্রযানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

হস্তীর আকার-বিশিষ্ট বাসগৃহ

মার্গেট-নগরে হস্তীর আকার-বিশিষ্ট একটি বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভবনটি আট মাইল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। বিরাটাকার হস্তী যেন আহার করিতেছে, এমনই অবস্থায় নির্ম্মিত। হস্তিদেহে ছয়টি বাসযোগ্য কক্ষ আছে। হস্তীর



হস্তীর আকার-বিশিষ্ট বাসভবন

পশ্চাদ্ভাগের দুইটি পদের মধ্য দিয়া দুইটি ঘোরান সোপান-শ্রেণী আছে। প্রত্যেক কক্ষ সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ১৮ বর্গফুট স্থানে গৃহগুলি নির্ম্মিত। হস্তীর পৃষ্ঠদেশে হাওদা বা পর্য্যবেক্ষণ-কক্ষ। উহা ভূমি হইতে ৬৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। হস্তীর দেহটি ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং পরিধিতে ৮০ ফুট। চরণগুলি ২২ ফুট দীর্ঘ, চক্ষুযুগলের ব্যাস ১৮ ইঞ্চ। উহাতে কাচ বসান আছে। সমগ্র বাড়ীতে ২২টি বাতায়ন। ১২ হাজার বর্গ-ফুট টিন সমগ্র দেহটিকে আচ্ছন্ন করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অদাহ্য পরিচ্ছদ

এক জন ফরাসী যুবতী অদাহ্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন। অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া যুবতী প্রকাশ করিয়াছেন। একটি ঝোপে আগুন দিয়া, উক্ত ফরাসী যুবতী তাঁহার উদ্ভাবিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করেন। তার পর পরিচ্ছদ সুরার দ্বারা আর্দ্র করিয়া তিনি তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে বলেন। তাহাতেও বস্ত্রে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, অথচ পরিচ্ছদ-ধারিণী অঙ্গে অগ্নির উত্তাপ পর্য্যন্ত অনুভূত হয় নাই। এই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রবল অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়া গতায়াত করিবার পরীক্ষা দিয়া উক্ত যুবতী দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন।



অদাহ্য পরিচ্ছদ

প্ল্যাষ্টার-নির্ম্মিত নর-কপাল

লস্ এঞ্জেলেসের লিওন জিরি চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের জন্য প্ল্যাষ্টার-নির্ম্মিত নরকপাল প্রস্তুত করিতেছেন। আসল নরকপালের ন্যায় নকলগুলি পালিস করা এবং দেখিতে মনুষ্য-অস্থির মত। বৎসরে এই জাতীয় ৩ হাজার সংখ্যক নরকপাল নির্ম্মিত হইয়া যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিকিৎসাগার ও চিকিৎসক কৃত্রিম নর-কপাল-গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং সেই নর-কপালগুলির সাহায্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন।



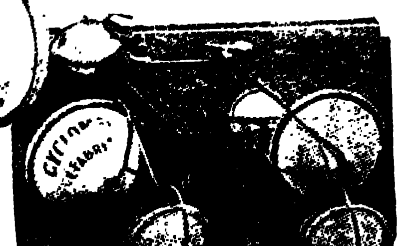
প্ল্যাষ্টার-নির্ম্মিত নর-কপাল

জলচর ও স্থলচর দ্বিচক্রযান

প্যারী সহরে একপ্রকার দ্বিচক্রযান দেখা দিয়াছে, উহা জল স্থল, উভয় স্থানেই সমান ভাবে চলিতে পারে। ইহার নাম "সাইক্লোমার"। পিপার আকার-বিশিষ্ট দুইটি বৃহৎ চক্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট। প্রত্যেক চক্রের সহিত দুইটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোলক সংলগ্ন। এই গোলকগুলিকে ইচ্ছামত নীচে নামানো বা উপরে উঠানো যায়। নীচে নামাইয়া দিলে জলের উপর দ্বিচক্রযানকে উহারা স্থিরভাবে রাখে। স্থলে চলিবার সময় গোলক-চতুষ্টয়কে উপরে তুলিয়া রাখা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এই দ্বিচক্রযান সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন হইতে এইরূপ দ্বিচক্রযানে চড়িয়া আরোহী জলস্থলে বিহার করিতে পারিবেন।



উভচর দ্বিচক্রযান



অতিকায় সরীসৃপ

লণ্ডন পশুশালায় এক জোড়া সরীসৃপ আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ইহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপদিগের ঘনিষ্ঠ বংশধর। ইহাদের বর্ত্তমান নাম কোমেডো ড্রাগন। যবদ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্র-গর্ভস্থিত দ্বীপে ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের লাঙ্গুলাংশ ক্ষুদ্র হইলেও, দৈর্ঘ্যে ইহারা দশ ফুট হইবে। কুম্ভীরের সহিত ইহাদের আকারগত সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সরীসৃপ পৃথিবীতে ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে। অনেক যত্নে লণ্ডন নগরস্থ পশুশালার অধ্যক্ষ এই যুগ্ম ড্রাগনকে সংগ্রহ করিয়াছেন। সরীসৃপ-কুলকে এই প্রকারে সযত্নে প্রতিপালন করা হইতেছে।



অতিকায় সরীসৃপ

রুসীয় উদ্যানে শত্রুর কুশ-পুত্তলিকা

মস্কো সহরে শ্রেষ্ঠ প্রমোদোদ্যানে সোভিয়েট সরকার শ্রমিকদিগের যাহারা শত্রু, তাহাদের কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া উদ্যানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম-মন্দির অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা পাদরী, সমরপ্রিয় ব্যক্তি এবং ফ্যাসিষ্ট—এই তিন শ্রেণীর লোক শ্রমিকদিগের শত্রু। তাই এই তিন শ্রেণীর সোভিয়েট-শত্রুর ব্যঙ্গ-মূর্ত্তি রচনা করিয়া রুস সরকার মস্কো উদ্যানে রাখিয়া দিয়াছেন।



রুসিয়ার শ্রমিক-শত্রুর কুশপুত্তল-মূ



জার্ম্মাণীর মেয়ে গুপ্তচর

চিত্তচমৎকারক দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের বিবরণের মধ্যে অতীব আশ্চর্য্যজনক বিবরণ জার্ম্মাণীর মেয়ে গুপ্তচরদের। জার্ম্মাণীর গুপ্তচর-বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী কয়েকটি লোমহর্ষণ কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ গুপ্তচর মাতা হরি নাম্নী জার্ম্মাণ নর্ত্তকী বারবনিতার কাহিনী আছে, এডিথ ক্যাভেল নাম্নী মহিলার কাহিনী আছে, আর সর্ব্বোপরি আছে শ্রীমতী ডাক্তার নামে পরিচিতা অ্যান্ মারী লেসার নামক এক রমণীর কাহিনী। এই রমণীর তুল্য চতুর আর কোনও চর জার্ম্মাণীর চর-বিভাগে ছিল না, এমন কি, মাতা হরিও ইহার কাছে পরাস্ত মানে।

অ্যান্ মারী লেসার তাহার পিতা-মাতার অমতে তাহাদের অনভিপ্রেত এক যুবকের প্রতি অনুরক্ত হওয়াতে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। তাহার প্রণয়ী কার্ল্ ফন্ হ্বিনান্কী জার্ম্মাণ চর-বিভাগে নিযুক্ত ছিল, মারী লেসারও তাহার প্রণয়ীর সহিত চার-কর্ম্মের দুঃসাহসিকতায় আস্বাদ লাভ করিতে লাগিল। এক দিন এক যাত্রায় ফন্ হ্বিনান্কী মারা পড়ে। তখন তাহার প্রণয়িনী মারী লেসার নিজের প্রিয়তমের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করে। সে নিজের সমস্ত শক্তি, উৎসাহ, চতুরতা, কৌশল এবং বুদ্ধি স্বদেশের সেবায় নিয়োগ করিল, এবং শীঘ্রই নিজের দুঃসাহসিক দক্ষতার জন্য গুপ্তচরদের মধ্যে এক জন গণ্য-মান্য প্রধান হইয়া উঠিল। সে শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে বহু কঠিন বিপজ্জনক কর্ত্তব্যের ভার পাইয়াছে, এবং তাহা সুকৌশলে সুসম্পন্ন করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছে। সে স্বদেশে ফ্রাউলাইন ডক্টর নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে গিয়া কতবার ধরা পড়িয়াছে, কতবার তাহাকে শত্রুরা বন্দী করিবার জন্য তাড়া করিয়াছে, কতবার সে মৃত্যুর সহিত মুখামুখী হইয়াছে, কিন্তু নিজের অসামান্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

২

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে অ্যান্ মারী লেসার তাহার অনন্ত পরিভ্রমণে নির্গত হইল। এবার তাহার গন্তব্য স্থান বেল্‌জিয়ামে। স্যাঁ-সেবাস্তিয়াঁ নামক ক্ষুদ্র নগরের পারিপার্শ্বিক স্থানের ও ডাচ সীমানার নিকটে বেভারলু শিবিরের অবস্থান ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য সে প্রেরিত হইল। ইহা ব্যতীত বেল্‌জিয়ামের দুর্গ-শক্তি-সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে করিবে; বিশেষ করিয়া লিয়েজ্ দুর্গে কয়টি কামান আছে, তাহাদের আকার, আয়তন, শক্তি কি, সেখানে জল জোগানোর ব্যবস্থা কিরূপ, সেখানকার নদী ও খাল কি ভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, যুদ্ধ বাধিলে ঐ দুর্গের অবস্থা কি হইবে, এবং সেখানকার রেল-পথেরই বা অবস্থা-ব্যবস্থা কিরূপ, ইহা নির্ণয় করিতে হইবে।

কতকগুলি বেল্‌জীয় সেনাপতি ব্রুসেল্‌স্-এর 'হোটেল আংলে' নামক হোটেলের বাগানে উদ্যান-সম্মিলন করিয়া আমোদ করিতেছিল। সেই সময়ে মারী লেসার সেই হোটেলের এক টেবিলে বসিয়া খাইতেছিল। সে সেই হোটেলে নিজের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া ফরাসী মহিলার নাম ধারণ করিয়াছিল, এবং তাহার নিকটে ফরাসী

দেশেরই ছাড়-পত্র ছিল। তাহার টেবিলের ধার দিয়া বেল্‌জিয়ামের এক জন যুবক লেফ্‌টেন্যান্ট্ চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই গুপ্তচরের হাত হইতে একটা কাচের গেলাস মাটীতে পড়িয়া গেল। অমনই সেই রমণী মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার হাত একটু কাটিয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা রক্ত টেবিলের শুভ্র আস্তরণে লাগিল। বেল্‌জিয়ামের রাজার সেনা-নায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট্ রেনে অষ্টিন ভব্য ভদ্রলোক, সে শীঘ্রই আহত মহিলার পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে ভোজনগৃহের বাহিরে লইয়া গেল, এবং একটু তুলা ও আঠা-লাগানো পটী সংগ্রহ করিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া দিল। তাহার পরে তাহারা উভয়ে হোটেলের বারান্দায় দুখানি আরাম-চেয়ারে বসিয়া হাসিতে লাগিল।

রেনে অষ্টিন বলিল—ভাঙ্গা কাচ সৌভাগ্যের সূচনা করে।

অ্যান্ মারী লেসার হাসিয়া উঠিয়া বলিল—সেই রকম আশা করা যায়।

ভাঙ্গা কাচে সৌভাগ্য আসে, আর সেই উপলক্ষে তাহাদের দুজনের পরিচয় হইয়া গেল। যুবা অফিসার জানিতে পারিল যে, তাহার নব-পরিচিতা এক জন ভব্যা চিত্রকারিণী, সে বেল্‌জিয়ামের রাজধানীর চিত্রশালিকাগুলির সব নামজাদা ছবি নকল করিতে আসিয়াছে, এবং এখানে সে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহারা একটা দিন-ক্ষণ স্থির করিল, তাহারা এক চিত্রশালিকায় আবার মিলিত হইবে। ইহার পর তাহারা আবার 'বোয়া দ্য লা শাম্বর্' মিউজিয়ামেও মিলিত হইল। এইরূপে তাহারা উভয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইল, এবং রেনে অষ্টিন এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে, সে এই সুন্দরী রমণীর সঙ্গ পরিহার করিয়া অধিকক্ষণ দূরে থাকিতে পারিতেছিল না।

এক দিন দ্বিপ্রহরে একটি নিতান্ত আধুনিক ধরণের টাট্‌কা-নূতন সুন্দর মোটর-গাড়ী হোটেলের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অ্যান্ মারী লেসার এই গাড়ীখানি খরিদ করিয়াছে, এবং রেনে অষ্টিন মোটর চালাইতে ওস্তাদ। মারী লেসার দেশপর্য্যটন করিয়া ফরাসী দেশের সব দর্শনীয়-স্থান ও বস্তু দেখিয়া যাইতে চায়। মারী লেসারের প্রণয়ে পাগলপ্রায় হইয়া অষ্টিন আট দিনের ছুটী লইল, এবং তাহার নবপ্রণয়িনীকে লইয়া দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা বেভারলুর শিবিরের সকল দিক্ হইতে শিবিরের সংস্থান-সন্নিবেশ বেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লইল। অ্যান মারী নিজেকে এক জন প্রাচীন ফরাসী সেনা-নায়কের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের কৈফিয়ৎ ও অজুহাত দিল। সে অষ্টিনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল। অষ্টিনকে দিয়া দুর্গে প্রবেশের পাস সংগ্রহ করিয়া দুর্গের ভিতরে সকল দিকের প্রাকারে চড়িয়া চড়িয়া সমস্ত দেখিয়া লইল। ষষ্ঠ দিনে তাহারা যখন ডাচ সীমানার ধারে ধারে চলিতেছিল, তখন মোটরের কল একটু বিগ্‌ড়াইয়া গেল। অষ্টিন গাড়ী থামাইয়া মেরামত করিতেছিল, এবং অ্যান তাহার নোটবুক বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা এই কয় দিনে কত গ্যালন তৈল পুড়াইলাম ? কত মাইল পথ অতিক্রম করিলাম ?

ছেঁড়া কাগজখানা অ্যানের হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল, এবং বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িয়া চলিল। রেনে অষ্টিন সভ্য ভব্য লোক ; এক জন মহিলার কাগজের টুকরা উড়িয়া যায় দেখিয়া সে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

অ্যান্ বলিয়া উঠিল—উহা যাইতে দাও, ও বাজে কাগজ, উহাতে কিছু দরকার নাই।

কিন্তু সেই রমণীর প্রিয়কারী লেফ্‌টেনাণ্ট্ যুবক ছেঁড়া কাগজের পিছনেই ছুটিয়া চলিল, কাগজের অধিকারিণীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সে পলাতক কাগজকে গেরেপ্তার করিতেই ধাবিত হইল। বাতাস কাগজখানাকে উড়াইয়া পথ হইতে মাঠে লইয়া গেল। অ্যান মারীও সেই কাগজের পশ্চাতে ছুটিল। সেই হয় ত আগে ধরিতে পারিত, কিন্তু কাগজখানা উড়িয়া একটা পগারের মধ্যে পড়িয়া গেল। সেই লেফ্‌টেনাণ্ট্ পগারের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং কিছুক্ষণের জন্য সে মারীর দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল, কারণ, তাহাদের উভয়ের মাঝখানে একটা বেড়ার ব্যবধান ছিল। অবশেষে রেনে অষ্টিন পথে উঠিয়া আসিল এবং বলিল—কাগজখানা পাওয়া গেল না, উহা একটা জলার মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে!

সে আর কিছুই বলিল না। তাহারা উভয়ে মোটর

গাড়ীতে চড়িল, গাড়ী ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিল। অ্যান দেখিল, তাহার সঙ্গী অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। সে চোখের কোণ দিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, অষ্টিনের মুখ পাঁশের মতন ফ্যাঁকাশে হইয়া গিয়াছে, সে ঠোঁট কামড়াইয়া মনের প্রকাশোন্মুখ কথা দমন করিতেছে। অ্যান্ মারী নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিল, সে কোণঠাসা বিড়ালীর মত টান হইয়া বসিয়া রহিল, হয় সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবে, নয় সে মৃত্যু পর্য্যন্ত লড়িয়া দেখিবে।

গাড়ীর গতি অল্প হ্রস্ব হইল, তাহারা একটা গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল, আর এক শত গজ দূরে এক জন চৌকীদার দাঁড়াইয়া আছে দেখা গেল। রেনে অষ্টিন হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক কষিয়া দিল, এবং গাড়ী আর্ত্তনাদ করিয়া ঝোঁক খাইয়া থামিয়া গেল। অ্যান মারী অষ্টিনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ ক্রোধে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। রেনে অষ্টিন গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং চৌকীদারের দিকে যাইতে যাইতে বলিয়া উঠিস—চৌকীদার, চৌকীদার, শীঘ্র এস, ধরো ধরো!

তৎক্ষণাৎ অ্যান মারী গাড়ীর ব্রেক খুলিয়া ক্ষিপ্র হাত-পা চালাইয়া গাড়ীতে গতি দিল, গাড়ী গ্রামের ভিতর দিয়া গতির ভীষণবেগে চীৎকার করিতে করিতে উল্কার ন্যায় ছুটিয়া চলিল।

মোটর-গাড়ী উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। অ্যান মারী মোটর চালাইতে জানিত না, সে মোটরের গতি সংযত করিতে পারিতেছিল না, মোটর পুরা দমে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সে একটা বনের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে পথে মোটর চলে না। কেমন করিয়া মোটর থামাইতে হয়, তাহা ত তাহার জানা নাই, সে হঠাৎ ধাকা দিয়া ব্রেক কষিয়া দিল। গাড়ী টোক্কর খাইয়া একটা গাছে গিয়া ধাক্কা লাগাইল। অ্যান গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, এবং গাড়ী তখনও সম্পূর্ণ গতিতে থাকাতে রাস্তা পার হইয়া বাঁকিয়া গিয়া একটা পগারে পড়িয়া গেল। মোটর-গাড়ী উল্‌টাইয়া পড়িল, এবং তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল।

অ্যান মারী জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। তাহার জীবন বিপন্ন, সে প্রাণের দায়ে যে পথ সাম্‌নে পাইতে লাগিল, সেই পথ ধরিয়া বন অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে পলায়ন করিতে করিতে একটা খালের ধারে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাকে থামিতে হইল, সে আর দৌড়াইতেও পারিতেছিল না, তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া দম লইতে লইতে দেখিল যে, একখানা বড় বজরা ছোট একটা কলের জোরে ধীরে ধীরে খাল দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। অ্যান তাহার কাগড়-চোপড় খুলিয়া একটা পুঁটুলি বাঁধিল, এবং সেই পুঁটুলিটি পিঠে বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কয়েকবার হাত-পা চালাইয়া সাঁতার দিয়া সে গিয়া বজরার পাশ ধরিল, এবং নিজেকে নৌকার উপর টানিয়া তুলিয়া সে হামাগুড়ি দিতে দিতে নৌকার পিছন দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহার ভয় হইতেছিল যে, পাছে তীর হইতে কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে, তাই সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে সাহস পাইতেছিল না।

অ্যান মারী হামাগুড়ি দিতে দিতে নৌকার পিছন দিকে গিয়া উপস্থিত হইল। এক জন বুড়ালোক তাহাকে ঐরূপ প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, তাহার মুখ হইতে তামাকের নল খসিয়া পড়িয়া গেল। মারী তাহার অবস্থা সত্বর বুঝিয়া লইয়া বলিল—তিন হাজার টাকা বক্‌শিশ। এই দেখ, নগদ নোট আছে। এগুলি একটু ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিবে ঠিক। তুমি যদি আমাকে বেশ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া তোমার নৌকায় করিয়া সীমানা পার করিয়া দাও, তাহা হইলে এই টাকা তোমার। সীমানার ঘাঁটিদার ঘাটোয়ালরা আমার সন্ধান করিবে, কারণ, আমি হীরা চুরি করিয়া রপ্তানী করিতেছি। এই লও হাজার টাকা আগাম।

বুড়া তাহার বুড়ীকে ডাকিল। সব সত্বর ঠিকঠাক হইয়া গেল। নৌকার খোলে ডহরার ভিতর অনেক মাল-পত্রের পশ্চাতে একটি দরজা খুলিয়া গেল। এই নৌকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়া চোরাই মাল বহন করা যে এই নূতন ব্যাপার নয়, ইহা যে তাহাতে হামেশা হয়, তাহা সেই বেমালুম চোরা দরজা দেখিয়াই মারী বুঝিতে পারিল। সেই দরজার আড়ালে চোরা কুঠুরীর মধ্যে কিছু কম্বল

আর বালিস ফেলিয়া দেওয়া হইল। মারীর ভিজা কাপড়গুলি বুড়ী সরাইয়া লইয়া গেল, এবং অনেক পেয়ালা চা আর অনেক বুক-ধড়ফড়ানির মধ্যে লেসার নিরাপদে সীমানা পার হইয়া গেল।

রেনে অষ্টিন পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিয়াছিল। সে এবং তাহার সঙ্গী চৌকীদার পোড়া মোটরগাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহারা মনে করিল যে, গুপ্তচর মেয়েটা মোটরের তলে চাপা পড়িয়া পুড়িয়া মারা গিয়াছে। কিন্তু সেখানে সেই রমণীর কোনও চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তাহাদের সন্দেহ যে অমূলক, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন তাহারা নিকটের পুলিস-ফাঁড়িতে খবর দিল। পুলিস ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাদের গন্ধানুসন্ধানী কুকুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, কাযেই কুকুর আর গন্ধ শুঁকিয়া পলাতক আসামীকে সন্ধান করিতে পারিল না।

৩রা আর ৪ঠা আগষ্টের রাত্রিতে জার্ম্মাণদের একটা গোপন ঘাঁটীর সৈনিকরা বেলজিয়াম-জার্ম্মাণীর সীমানা পার হইয়া গমনোদ্যত একটি রমণীকে গ্রেপ্তার করিল। সেই রমণীর পরনে ছিল চাষার মেয়ের পোষাক, তাহার মাথা বেড়িয়া একটা রুমাল বাঁধা, পায়ে মোটা পুরু মোজা, কিন্তু সৈনিকরা লক্ষ্য করিল যে, তাহার পায়ের জুতাজোড়া অতি দামী মোলায়েম চামড়ার, মহিলার পরিধানযোগ্য। তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তখন রাত্রি নিশীথ। তাহারা এক জন লেফটেনাণ্টকে ঘুম হইতে জাগাইল। ঘুমন্ত চোখে সেই সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া সেনানায়কের মনে সন্দেহ জাগিল। এক জন ধাত্রীকে ডাকিয়া আনানো হইল। সেই মহিলা জোরের সহিত বারম্বার বলিতেছিল যে, সে সেনাপতিদের কাহারও সহিত এখনই দেখা করিয়া কথা বলিতে চাহে, বিশেষ দরকারী কায আছে, কিন্তু কেহই তাহার সেই কথায় কর্ণপাত করিল না।

সেই দাইয়ের দ্বারা পরীক্ষা ও তল্লাস করাতে রমণীর নিকটে একটি বেলজিয়ামের ছাড়চিঠি আর অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল, কিন্তু সেগুলি সব সাঙ্কেতিক কোডে লেখা।

রমণী ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া লেফটেনাণ্টকে বলিল— আরে আহাম্মক কোথাকার, আমি ত গুপ্তচর বটেই, কিন্তু আমি জার্ম্মাণীর গুপ্তচর। তুমি যদি আমাকে এখনই তোমাদের কোনও সেনাপতির কাছে লইয়া যাইতে না পার, তবে অন্ততঃ বার্লিনের সমর-বিভাগে টেলিগ্রাম কর যে, তোমরা ১ এবং ৪ নম্বরের জি এবং ডবলুইউ এজেণ্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছ।

সেই রমণীকে দাই আর দু'জন চৌকীদারের পাহারায় রাখা হইল। লেফটেনাণ্ট তাহার ক্যাপ্টেনকে ঘুম হইতে জাগাইল। জরুরী সরকারী টেলিগ্রাম বার্লিনে রওনা করা হইল। এক ঘণ্টা পরে সদরের সমর-বিভাগের এক জন সচিবকে বহন করিয়া একখানা মোটরগাড়ী সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লেফটেনাণ্ট তাহার বোকামির জন্য খুব বকুনি খাইল। তখনই সেখান হইতে বার্লিনে টেলিফোনে জানানো হইল, ফ্রাউলাইন ডকটর কি খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। বার্লিনে সেই খবর কথায় কথায় লিখিয়া লওয়া হইল, সেই সব সাঙ্কেতিক কোড্ ব্যাখ্যাত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেনাদলে হুকুম জারি হইয়া গেল, তাহাদের অতঃপর কি করিতে হইবে, কেমন ভাবে চলিতে হইবে।

৪ঠা আগষ্ট জার্ম্মাণ সৈন্য বেলজিয়ামের সীমানা পার হইয়া লিয়েজ আক্রমণ করিল, এবং যে সংবাদ আগে অ্যান মারী লেসারের কাছে পাওয়া গিয়াছিল, তদনুসারে যুদ্ধ করাতে মাত্র দুই দিনে ৬ই তারিখে লিয়েজ দুর্গ জার্ম্মাণদের করতলগত হইয়া গেল।

৩

বার্লিনে বাসকালে অ্যান্ মারী শুনিল যে, কনষ্ট্যাণ্টাইন কোডোয়ানিস নামে এক জন গ্রীক ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফল আমদানী করিয়া বিক্রয় করে; সে সেখানে গুপ্তচরের কায করিতে চায়। ফ্রাউলাইন ডক্টর কাযেই তাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্য ফ্রান্সে গেল। ফ্রাউলাইন ডক্টর কিছু দিন প্যারিসে থাকিয়া কিছু কিছু কায করিল, সে কথা কোডোয়ানিস কিছুই জানিল না। এক রবিবারে ফরাসী গোয়েন্দা গুপ্তচর বিভাগের এক জন অফিসারের সহিত শ্রীমতী ডক্টরের সাক্ষাৎ ঘটিল; দু'দিন পরে সেই অফিসার একেবারে সুন্দরীর কাছে আপনাকে

বিকাইয়া দিল। তাহার কাছ হইতে শ্রীমতী অনেক খবর সংগ্রহ করিল, সেই খবর বার্লিনে চালান হইয়া গেল, এবং সেই খবর পাইয়া জার্ম্মাণ সেনাপতিরা আবার আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কারণ, সেই সব খবর যেমন বিশ্বাস্য, তেমনই জরুরী।

ফরাসী গুপ্তচরটি অ্যান্ মারী লেসারের প্রণয়ে মস্‌গুল হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। মারী তাহাতে নিজের সম্মতি দিল, কিন্তু তাহার পিতামাতার সম্মতি না পাইলে সে বিবাহ করিতে পারিবে না জানাইয়া সে তাহাদের সম্মতি পাইবার জন্য রওনা হইল। সে বলিল যে, তাহার পিতামাতা স্পেনের সীমানায় একটা গ্রামে থাকে।

সে তাহার প্রণয়ীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথম রাত্রি এক জন জার্ম্মাণ অফিসারের বাড়ীতে যাপন করিল, সেও জার্ম্মাণী হইতে গুপ্তচররূপে প্যারিসে প্রেরিত হইয়াছে। এই অফিসারটি অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দিল।

মারী ফরাসী সীমানা ছাড়াইয়া গেল, কেহ কোনও সন্দেহ করিল না। সে জার্ম্মাণদের সেনাপতির এক জন চরকে অনেক সংবাদ দিয়া আবার প্যারিসে ফিরিয়া আসিল। মারী তাহার প্রণয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার অফিসের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে সত্বর বাহির হইয়া আসিল, এবং শ্রীমতী ডক্টরের পিতামাতা যে তাহার বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন, ইহা জানিয়া সে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিল। কিন্তু এই হর্ষ সত্ত্বেও তাহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চকিত মনে হইল।

অ্যান মারী জিজ্ঞাসা করিল,—প্রিয়তম, তোমার কি হইয়াছে?

অফিসার উত্তর দিল—আজ আমরা বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি। আমাদের দুজন এজেণ্ট খবর দিয়াছে যে, আমাদের তালিকায় গুপ্তচর বলিয়া পরিগণিত এমন এক জন স্ত্রীলোককে তাহারা ফ্রান্সে দেখিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বড় ভয় ও ভাবনার কথা। কারণ, সেই স্ত্রীলোকটি বড় ধূর্ত্ত বুদ্ধিমতী।

মারী প্রশ্ন করিল—স্ত্রীলোক? তাহার নাম কি?

—তা ত আমরা জানি না। আমাদের কাছে অনেক কালের একখানা পুরানো অস্পষ্ট ফটোগ্রাফে জার্ম্মাণ অফিসারদের সঙ্গে তাহার চেহারা আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া লোক চেনা কঠিন। তবে তাহার নাম না কি মাদ্‌মোয়াজেল দক্‌তেয়ার!

পরদিন সরকারী ইস্তাহারে প্রচার করা হইল যে, এক জন জার্ম্মাণ মেয়ে গুপ্তচর সেই দেশে আসিয়াছে; যে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সেই দিন মারী লেসার কোডোয়ানিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কোডোয়ানিসের এক জন প্রণয়িনী ছিল নর্ত্তকী। বোর্দ্দো নগরে যে সব জাহাজ নৌকা আসে, তাহার সন্ধান প্রভৃতি জানিবার জন্য জার্ম্মাণরা তাহাদের এক জন চর সেখানে রাখিতে চাহিতেছিল। বোর্দ্দোতে একটা নাচের থিয়েটারে এক জন নর্ত্তকীর আবশ্যক। কোডোয়ানিস তাহার প্রণয়িনীকে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল দক্‌তেয়ার অচল অটল, তাহার আদেশ অমান্য করা চলে না। টেলিগ্রামে থিয়েটারের সঙ্গে চাকরী স্থির করিয়া নর্ত্তকীকে যাইতে হইল। এত সস্তায় সে চাকরী লইল যে, থিয়েটারওয়ালারা আগ্রহ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মতি জানাইল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে মারী লেসারকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। তাহার প্রণয়ী অফিসার আসিল, কিন্তু সে দিনও সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। সে মারীকে বলিল—এক জন লোক আমাদের কাছে আসিয়া প্রস্তাব করিতেছে যে, সে মাদ্‌মোয়াজেল দক্‌তেয়ারকে ধরাইয়া দিবে, কিন্তু সে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার চায়। সেই লোকটার নাম কোডোয়ানিস, সে গ্রীক। আমরা তার অজ্ঞাতসারে তাহার পিছনে লোক লাগাইয়া দিয়াছি, আমাদের চররা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিছু লইয়াছে।

মারী লেসার মোহিনীর ভাবে প্রণয়ীর গা ঘেঁষিয়া প্রেম-গদ্‌গদস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সেই মেয়েটাকে ধরিতে পারিলে তোমার সুনাম হইবে না; ইহার জন্য তোমার চাকরীতে পদোন্নতি হইবে না।

সেই রাত্রিতে মারী লেসার কোডোয়ানিসকে গিয়া বলিল—তুমি আজ অমুক সময়ে অমুক কাফেতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।

কোডোয়ানিস যখন সেই কাফের দিকে যাইতেছিল, পথে লেসার তাহাকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বলিল —প্যারিসের বাহিরে এক জন জার্ম্মাণ এজেণ্ট তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, তাহাকে এই এনভেলাপখানা দিলে সে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে।

কোডোয়ানিস লেসারের কথার গূঢ় অর্থ বুঝিল। পরস্পরে বুঝাপড়া হইয়া যাইতেই গাড়ী থামাইয়া লেসার নামিয়া পড়িল। সে দেখিল, কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। সে ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এবং সত্বর তাহার পিছুধরা লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া সে সরিয়া পড়িল।

সেই রাত্রিতে ফরাসী গোয়েন্দা-অফিসে যেন ব্যোম্ ফাটিল। সেখানে টাইপ-কলে পরিষ্কার লেখা একখানা পত্র আসিয়াছে যে, কোডোয়ানিস এক জন জার্ম্মাণ চর। লেখক নিজের নাম দেয় নাই, সে যদিও এক জন স্বদেশ-হিতৈষী ফরাসী, তথাপি সে জার্ম্মাণদের ভয় করে, তাই সে নাম গোপন রাখিল। তাহারা যদি তাহার কথা বিশ্বাস না করে, তবে পরদিন প্রত্যূষে যেন তাহারা প্যারিসের বাহিরে গিয়া দেখে, কোডোয়ানিস এক জন জার্ম্মাণ এজেণ্টের কাছে পত্র লইয়া গিয়া তাহার অপেক্ষা করিবে। আর ইহাতেও যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তবে তাহার প্রণয়িনী বোর্দোর থিয়েটারে নর্ত্তকী, তাহাকে এই রাত্রিতে গ্রেপ্তার করিয়া জেরা করিলে পত্র-লেখকের কথার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় হইয়া যাইবে।

পরদিন কোডোয়ানিস গ্রেপ্তার হইল। তাহার কাছে জার্ম্মাণ এজেণ্টের নামের পত্র পাওয়া গেল। তাহার নর্ত্তকী প্রণয়িনীও সব কবুল-জবাব করিল।

কয়েক দিন পরে কোডোয়ানিসের প্রতি মৃত্যুদণ্ড হইল। সে মৃত্যুর সময়ে পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে জার্ম্মাণদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রকাশ করিল না।

মৃত্যুর রাত্রিতে যখন ডঙ্কা বাজাইয়া সৈন্যদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলা হইল, তখন সে তাহার কারাকক্ষের ক্যাপ্টেনকে বলিল—ক্যাপ্টেন,একটা খবর আপনারা জানিয়া রাখিলে হয় ত আপনাদের কাযে লাগিতে পারে। এক জন মেয়েলোক আমাকে এই মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া পাঠাইয়াছে। সে ভয়ানক ও আশ্চর্য্য মেয়ে। যেমন তাহার বুদ্ধি, তেমনই তাহার উৎসাহ। তাহার মোহিনী শক্তির মায়া হইতে কাহারও অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। সে বড় বড় উচ্চপদবীর সেনাপতিকেও মোহে ভুলাইয়া বশ করে। সে যে এই কায করিতেছে, তাহা কোনও লাভের লোভে নহে, এই দুঃসাহসের কায করায় তাহার আনন্দ, তাহার ইহা ব্যসন! ক্যাপ্টেন, খবরদার, এই মেয়েলোকটির খপ্পরে আপনি কখনও যেন না পড়েন।

যখন কোডোয়ানিসের জীবন পরলোকে পৌঁছিল, তখন অ্যান মারী লেসার বার্লিনে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

৪

১৯১৮ খৃঃ বসন্তকালের শেষে অ্যান মারী লেসার দক্ষিণ-আমেরিকার অদ্ভুত রকমের পোষাক পরিয়া স্পেনের বার্সিলোনা সহরে আবির্ভূত হইল। সে না কি এক জন দক্ষিণ-আমেরিকার চাষী জমীদারের স্ত্রী, সে স্পেনের রেড-ক্রসে সেবা-কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে আসিয়াছে। সে তাহার স্বামীর জমীদারী হইতে আহত পীড়িতদের সেবায় নিবেদন করিবার জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। তাহার উৎসাহ দেখিয়া স্পেনীয় কয়েকটি মহিলাও সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিল। এক দেশ হইতে অপর দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা করিতে যাইবার জন্য পরদেশের অনুমতি লইতে কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে অনুমতি মিলিল।

সাত জন স্পেনীয় মহিলা মারী লেসারের সঙ্গে সেবিকা হইয়া চলিল। তাহাদের এক জনও সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, এই ধনবতী বুদ্ধিমতী আদর্শবাদিনী রমণীর প্রকৃত স্বরূপ কি।

তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত পশ্চিম সীমান্তটা পরিভ্রমণ করিল। এক স্থান হইতে অপর স্থানে এই দয়াময়ী মহিলারা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অফিসাররা সমাদর ও সম্মান করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছিল। এক স্থানে অনেক ফরাসী সৈনিক আহত হইল, তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক মাইল পশ্চাতে সরাইয়া আনা হইতে লাগিল। স্পেনীয় মহিলাদিগকে ডাক্তাররা সাহায্য করিতে আহ্বান করিল। আহত সৈনিকরা আশাতীত সেবা-শুশ্রূষা পাইতে লাগিল।

একটা ঘরে শতাবধি বিছানা পাতা হইয়াছে। আহত-দিগকে অপারেশান-কক্ষে অস্ত্র করিয়া গুলী নিষ্কাশিত করা হইতেছে, জখম অঙ্গ ছেদন করা হইতেছে, ক্ষত ধৌত করিয়া সেলাই করা ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছে। তাহার পার্শ্বের এক শিবিরে শতাবধি বিছানা পাতা হইয়াছে। আহতদের যেমন যেমন অস্ত্র করা হইয়া যাইতেছে, অমনই তাহাদের আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইতেছে। খাটিয়া-বাহকরা অস্ত্রাগার হইতে দুই জন অফিসারকে বহন করিয়া আনিল, তাহাদের এক জন ফরাসী ক্যাপ্টেন, আর এক জন বেল্‌জিয়ামের লেফ্‌টেনাণ্ট্‌। তাহাদের বহন করিয়া খাটিয়া বিছানার নিকটে আনা হইলে এক জন সেবিকা সেই ক্যাপ্টেনকে বিছানায় শোয়াইতে গেল, এবং মারী লেসার সেই বেল্‌জীয় লেফ্‌টেনাণ্ট্‌কে বিছানায় শোয়াইতে সাহায্য করিতে গেল। মারী লেসার তাহার মাথার তলায় বালিস ঠিক করিয়া দিল। তখন সেই অফিসারের চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একটা সিগারেট চাহিল, সিগারেট তাহার জামার পকেটে আছে। মারী লেসার যখন তাহাকে সিগারেট দিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া সিগারেট জ্বালাইয়া দিতে গেল, তখন তাহার মুখ দেখিয়াই সেই লেফ্‌টেনাণ্ট্‌টি চম্‌কাইয়া উঠিল এবং তাহার মুখ পাশের মত সাদা হইয়া গেল। সে মারী লেসারের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, সে রূঢ়ভাবে তাহার হাত ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, এবং চীৎকার করিয়া উঠিল—হুঁশিয়ার ভাই সব! শীঘ্র এসো! এখানে এক জন জার্ম্মাণ গুপ্তচর!

তাহার পাশের বিছানায় শয়ান আহত ক্যাপ্‌টেন তাহার দৈহিক পঙ্গুতা ও যাতনা ভুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বল কি? কোথায় গুপ্তচর?

বেল্‌জীয় অফিসার মারী লেসারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

মারী লেসার বলিল—কি আবোল-তাবোল বকিতে-ছেন! আমি ত দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে আসিয়াছি, আমি রেড ক্রসের সেবিকা।

মারী লেসার মধুর মমতা-ভরা মুখে হাসিয়া বলিল—আপনি বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন।

সে মুখে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। সে চিনিতে পারিল যে, যে-লোক তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে, সে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত রেনে অষ্টিন। একবার তাহার কবল হইতে সে পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, আবার তাহারই কাছে ধরা পড়িয়াছে।

রেনে অষ্টিন কিছুতেই তাহার কথায় শান্ত হইতে চায় না। সে নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিল, এবং সে এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে, সেখানে যত আহত অফিসার ও সৈনিক ছিল, সকলে তাহাদের মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে দেখিতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল—আমি ইহাকে খুব ভালো রকমে জানি। এ জার্ম্মাণীর স্পাই। এর নাম মাদ্‌মোয়াজেল্‌ দক্‌তেয়ার।

ফরাসী ক্যাপ্টেন সেই নাম শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল, সে বলিল—যদি আপনি এতই নিশ্চিত হন, তাহা হইলে আমরা খুব একটা বড় আর ভাল শিকার পাইলাম, বন্ধু।

উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া রেনে অষ্টিন বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সে কেমন করিয়া একবার ইহার পূর্ব্বে তাহার মুখোস খুলিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অতর্কিতভাবে অসম্ভাবিত ঘটনা ঘটিয়া গেল। মারী লেসার চট করিয়া অবনত হইয়া ফরাসী ক্যাপ্টেনের কোট-বেল্‌ট্‌ এবং রিভল্‌ভার-সহিত পেটী তুলিয়া লইল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাঁবুর এক পাশে ছুটিয়া গেল, এবং সেই তাঁবুর কানাত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং তড়িৎগতিতে মোটরগাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেবা-শিবিরে যত ডাক্তার ছিল, সকলে তাহার পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। চারিদিকে তাড়াহুড়া আর চীৎকার পড়িয়া গেল—পাকড়াও, পাকড়াও, স্পাই, গুপ্তচর!

মোটর-গাড়ীর কাছে পাহারায় নিযুক্ত দুজন সান্ত্রী তাহাদের বন্দুক তাক করিল। পলায়মানা রমণী তাহার নার্সের সাদা কাপড়ের বহিরাবরণ ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া সান্ত্রীদের মাথার উপর ফেলিয়া দিল, এবং অবিশ্বাস্য শক্তি ও ক্ষিপ্রতার সহিত একটা বেড়া টপ্‌কাইয়া পার হইয়া চলিয়া গেল।

সে বেড়ার ওপারে গিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, আবার

তৎক্ষণাৎ উঠিল এবং কয়েক পা দৌড়াইয়া এক জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহার পশ্চাতে গুলী আসিয়া পড়িতে লাগিল। গুলী তাহাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছিল, কিন্তু লেসারের সমস্ত পেশীকে যেন কশাঘাত করিয়া করিয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পলায়নে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল।

মারী লেসার শুনিতে পাইতেছিল, তাহার অনুসরণকারীরা তাহার নিকটে আসিয়া পড়িতেছে। সে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহার বাম স্কন্ধে ক্যাপ্টেনের কোট আর তাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার রিভল্‌ভার, যে কোনও মুহূর্ত্তে গুলী ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত।

তাহার জীবন ও স্বদেশের সুবিধা তাহার এই পলায়নের উপর নির্ভর করিতেছে। সে ছুটিতে ছুটিতে বন হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে পথ পার হইয়া তাহার গতির মুখ বদল করিল। যে দিক্ হইতে কামান-বন্দুকের আওয়াজ আসিতেছিল, সেই যুদ্ধের দিকে সে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সে একটা মাঠ পার হইয়া অপর একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তাহার সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়, তাহার ওপার হইতে মেশিনগানের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। সে সেই পাহাড় পার হইবার জন্য পাহাড়ে চড়িতে লাগিল। সে দুই শত গজ উপরে উঠিয়া গেল, সেখান হইতেও সে তাহার অনুসরণকারীদের শ্রান্ত নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। দুই জন সৈনিক হাতে বন্দুক লইয়া গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাহার পিছনে দৌড়াইয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে গিয়া আত্মগোপন করিল, অনুসরণকারী সৈনিকরা একটা পরিষ্কার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি মারী লেসারের রিভলভার হইতে ঘন ঘন কয়েকটা গুলী ছুটিয়া গেল।

এক জন লোক পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহার পায়ে ফরাসী সৈনিকের জুতা, তাহার গা ফরাসী অফিসারের কোটে আবৃত, সেই কোটের গায়ে সেনাপতির চিহ্নস্বরূপ যে ডোরাকাটা থাকে, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারতম্য না রাখিবার জন্য এইরূপই করা হইতেছিল। একটা যোদ্ধার টুপীতে সেই লোকটির মুখ ঢাকা। সেই লোকটি ধীরে ক্লান্তভাবে পাহাড়ে চড়িতেছিল। সে একএকবার থামিতেছিল, আর পিছু ফিরিয়া তাকাইতেছিল।

সেই সময়ে জার্ম্মাণীর পদাতিক সৈনিকরা তাহাদের ব্লাডহাউণ্ড কুকুর সঙ্গে লইয়া পলাতকের গন্ধ অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল, এবং সারা বন যেন চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া পাতি পাতি করিয়া তল্লাস করিতেছিল। তাহারা হঠাৎ কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। তাহারা তাহাদের রিভল্‌ভার বাগাইয়া ধরিয়া গুলী ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই একটা গাছের ঝোপের পিছনে লুকাইল। তাহারা দেখিল, এক জন ফরাসী সেনাপতি আলোকিত স্থানে আসিয়াছে। জার্ম্মাণ অফিসার আদেশ করিল—থামো। হাত তোলো।

যদি শত্রু তাহার আদেশ না শুনে, তাহা হইলে গুলী করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

ফরাসী অফিসারটি তৎক্ষণাৎ থামিল, এবং তাহার দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াইল।

সেই জার্ম্মাণ অফিসার তাহার কাণের উপর হাত চাপা দিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল যে, বনের মধ্যে আরও লোক আসার কোনও শব্দ শোনা যাইতেছে কি না। যখন সে দেখিল, বনে আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই, বন নিস্তব্ধ, তখন সে এক লাফ দিয়া ফরাসী সেনানীর কাছে আসিয়া বলিল—বন্দী!

ফরাসী অফিসার তাহার টুপী খুলিয়া ফেলিল। একটি রমণীর মধুকণ্ঠের স্বর শোনা গেল—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! আমাকে শীঘ্র নিকটের কোনও সামরিক অফিসারের কাছে লইয়া চলুন।

নির্ভুল চোস্ত জার্ম্মাণ ভাষায় এই কথা শুনিয়া জার্ম্মাণ অফিসার ত অবাক্। ফরাসী-অফিসারের পোষাক-পরিহিতা স্ত্রীলোকটি অসহিষ্ণু ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল,—চটপট, চটপট! আমি জার্ম্মাণ গুপ্তচর! আমি অনেক দরকারী খবর লইয়া আসিয়াছি!

৫

যখন অস্থায়ী সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, যখন জার্ম্মাণীতে অন্তর্বিপ্লবের কামানধ্বনি পথে পথে শুনা যাইতেছিল, তখন জার্ম্মাণের যুদ্ধ-সচিব আর অ্যান মারী লেসার উভয়ে

মিলিয়া অনেক কাগজ-পত্র পোড়াইতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা কাগজ-পত্র, প্ল্যান, ম্যাপ, পেন্‌সিল, কম্পাস সব অগ্নিসাৎ করিয়া দিল। সব কায চুকিয়া গিয়াছে, সব আয়োজনের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে!

অ্যান মারী লেসার একটি গ্রাম্য উদ্যানবাটিকায় বাস করিতে চলিয়া গেল। নিরন্তর ভয়ে ভয়ে থাকিয়া, ধরা পড়িবার—মারা যাইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে থাকিতে, তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে এখন মানব-সমাজের সঙ্গে সকলসম্পর্কবর্জ্জিত। ডাক্তাররা তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, প্রথমে মনে হইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষায় হয় ত তাহার কিছু উপকার হইবে। কিন্তু শেষে সকল আশা বিসর্জ্জন দিতে হইল। আফিং আর কোকেন খাইয়া খাইয়া সে মনের শঙ্কা উত্তেজনা দমন রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে তাহার বুদ্ধি আর স্নায়ু নষ্ট হইয়া গেল। অল্পদিন পরে সে বিদেশী সেবিকাদের হেফাজতে সুইজার্ল্যাণ্ডে চলিয়া গেল, এবং একটা পাগলা-গারদের ফটক তাহাকে চিরবন্দী করিয়া বন্ধ হইল।

সেই রমণী এখনও সেখানে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহার মন-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যখন রাত্রিকালে পাহাড়ের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া গারদের দেয়ালে আছাড় খাইয়া খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তখন তাহারও আর্ত্তনাদ সেই সঙ্গে শুনা যায়। সে ক্রমাগত কতকগুলি নাম নৈশ বাতাসে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে থাকে—সে কখনও কোডোয়ানিস নামের কোনও এক জন লোককে যেন ফরাসীদের গুলীর মুখ হইতে রক্ষা করিতে চাহে, কখনও বা যেন তাহাকে ফরাসী সৈনিকরা তাড়া করিয়া বনে জঙ্গলে খুঁজিয়া ফিরিতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে, আর কখনও বা সে যেন হ্বিনান্‌কি নামক এক জন কাহার গোরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুলিবিকুলি করিয়া কাঁদিতে থাকে। তখন গারদের রক্ষীরা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে। যে এক দিন জার্ম্মাণীর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ প্রধান স্পাই বা গুপ্তচর ছিল, তাহাকে কবরের মত পাগলাগারদ চিরদিনের জন্য কপাট আঁটিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। *

* ফরাসী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র Vn হইতে সঙ্কলিত।

ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিক

নভেল সমাজের দর্পণ। ইংরাজী নভেলে সমাজের ছবি যেমন হুবহু প্রতিফলিত দেখা যায়, এমন আর অপর কোনও দেশের নভেলে নহে। ইহার কারণ ইংরাজ-সমাজের রীতি-নীতি সব ধরা-বাঁধা, দস্তুর-মাফিক। এই জন্য ইহার চিত্র অঙ্কন করা সহজ। এই জন্য ইংরাজী নভেলে মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা তাহার আচার-ব্যবহারই অধিক বর্ণিত দেখা যায়। ইংরাজ নায়ক-নায়িকারা সকলে যেন ছাঁচের পুতুল, তাহাদের যেন নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি-বিচার কিছু নাই।

ফিল্‌ডিং, ষ্টার্ন্‌, এবং স্মোলেটের নভেলের মধ্যে আমরা তাঁহাদের সময়ের ইংরাজী-সমাজের নিখুঁত ছবি দেখিতে পাই। ভিক্টোরিয়া-যুগের নভেলগুলিতে সেই সেই ছবি আরও উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডিকেন্স ও থ্যাকারে উভয়েই বর্ণনা-পটু আর্টিষ্ট, কিন্তু তাহার উপরে তাঁহারা সামাজিক সমালোচক এবং ইহা ইংরাজ-চরিত্রের একটা লক্ষণ। যুদ্ধের আগে বহু বিদেশী সমালোচক ইংরাজী সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়া কটু সমালোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু এখন যদি ডিকেন্স জীবিত থাকিয়া তাঁহার নভেল লিখিতেন, তাহা হইলে বিদেশী সমালোচকরা সকলে একবাক্যে সমাজ-গত বৈষম্য ও সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের প্রতি তাঁহার কঠিন কশাঘাতকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

যুদ্ধের পূর্ব্বকালের সমস্ত নভেলেই সমাজের বর্ণনা ও সমালোচনা দেখা যায়। কিন্তু সেই সময়ের বিদেশী নভেলে কেবল রস-চর্চ্চা ও সৌন্দর্য্য-বর্ণনা প্রধান স্থান দখল করিয়া আছে। গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট এবং বার্ণার্ড শ প্রভৃতির রচনার মধ্যে যুদ্ধের প্রাক্‌কালের সমাজের চিত্রই আমরা দেখি, কিন্তু তাহাতে সামান্য ও সাধারণ নরনারীর জীবনের সুখ-দুঃখ দেখিতে পাইবার যো নাই, এমন কি, সাম্যবাদী ওয়েল্‌স্‌ ও শ'র পুস্তকেও নহে।

গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি নিপুণ বর্ণনাকুশলী লেখক, এবং তাঁহার বাক্য-চিত্রের পটুতার জন্যই তিনি জার্ম্মাণী প্রভৃতি বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি যেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ইংরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে কেমন করিয়া জীবন যাপন করে, কি খায়, কি পরে, কেমন করিয়া কি কায করে, তাহারই একটা পাঁজি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

ওয়েল্‌স্‌ অধিকতর চিত্তাকর্ষক। তাঁহার পুরাতন পুস্তক কিপ্‌স্‌ এবং টোনো বাঙ্গে সাধারণ সামান্য অবস্থার ভদ্র পরিবারের সুখ-দুঃখের ও মানব-জীবনের জাল-জঞ্জালের দরদ-ভরা চমৎকার চিত্র।

বেনেট তাঁহার প্রথমকার পুস্তকগুলিতে পাড়াগেঁয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের চিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে-রকম সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা লণ্ডনের লোকের কাছে অজানা।

বার্ণার্ড শ মধ্যবিত্ত সমাজের কুসংস্কার ও অসামঞ্জস্য সমালোচনা করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা এমন কটু ও দরদহীন এবং এত বেকেয়া বিষয়ের

যে, তাঁহার পুস্তক সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। ভবিষ্যৎবংশীয়রা তাঁহার রচনা কেবল তাঁহার সময়ের সমাজের চিত্র হিসাবে পাঠ করিবে, তাহার মধ্যে চিরন্তন মানব-চরিত্রের কোনও পরিচয় তাহারা পাইবে না।

যুদ্ধের পরে ফ্রান্স্ ও জার্ম্মাণীতে যে-সকল নভেল রচিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের সমালোচনা তীক্ষ্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী নভেলে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। সেখানকার সাহিত্য অত্যধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ইংরাজী সমাজে ক্রমশঃ সমষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তিপ্রাধান্য দেখা দিতেছে, ব্যক্তির সুখদুঃখ ও ইচ্ছা নভেলের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়ী দেশ, অথচ তাহার সেই বাণিজ্যিক তৎপরতার পরিচয় তাহার সাহিত্যে বা আর্টে ফুটিয়া উঠে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা এবং মুটে-মজুর শ্রেণীর সাধারণ লোক কেবল-মাত্র আর্থিক লাভ-লোকসানের দিকে ছাড়া ইংরাজের আর কোনও রকমে মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। অফিস আর কারখানা ইংরাজের কাছে খুব দুঃখের স্থান নয়, আবার তাহার কথা মনে করিয়া অতি-আনন্দে নৃত্য করিবার মতও নয়, সেই জন্য তাহার সাহিত্যে তাহাদের বর্ণনা স্থান পায় না। এই নিত্যকার একঘেয়ে পরিবেষ্টন ছাড়াইয়া সে কল্পনার কোনও নূতন রাজ্যে বিচরণ করিতে চায়।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই কল্পনার রাজ্যে বিচরণের ইচ্ছা অতিমাত্রায় প্রকট দেখা যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে সমাজের বর্ণনা অথবা সমালোচনা নাই বলিলেই হয়। গত বিশ বৎসরে সাহিত্য হইতে ভবিষ্যৎকালের পাঠকরা ইংরাজী সমাজের কোনও পরিচয় পাইবে না; ইংরেজী সমাজ অতি ধীরে ধীরে কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে। পরিবর্ত্তন ধীর মন্থর হয় বলিয়া তাহার কোনও রূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না যে, তাহার প্রতিরূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে। সেই জন্য এখানকার নভেলে মানুষের সুখ-দুঃখ বা আদর্শের কোনও অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন বর্ণিত হয় না, তাহার মধ্যে সামাজিক সংস্কার লইয়া কোনও রকম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। সামাজিক আর্থিক আর পলিটিক্যাল সমস্যা হইতে ইংরাজ আর কোনও রস বা আনন্দ পায় না, তাই সে সেই পথ ত্যাগ করিয়া কেবল নিছক কল্পনার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহিতেছে।

এত বড় একটা মহাযুদ্ধ যে হইয়া গেল, তাহাতেও আর এখনকার ইংরাজের কোনও আকর্ষণ নাই। আধুনিক ইংরাজ মনে করে যে, যুদ্ধটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার ব্যাপার এবং রাসিয়ার বিপ্লবটাও নিরর্থক পণ্ড হইয়াছে। এই জন্য সে যুদ্ধকে ঘৃণা করে, এবং তাহার পরিচয় পাওয়া যায় রিচার্ড আর্লিংটনের 'ডেথ অফ এ হিরো' এবং ওস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল্ লিখিত 'বিফোর্ দি বম্বার্ডমেণ্ট' নামক পুস্তকদ্বয়ে।

ইংরাজরা সংসারের যাবতীয় পদার্থের দিকে পিছন ফিরিয়া তাহাদের বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহারা সংসারটাকে অতি কদর্য্য স্থান মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই জন্য তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংসারের যত কিছু অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অসম্ভাব্য, ক্ষেপামিভরা সামাজিক ব্যবহার আবিষ্কার করিতেছে, এবং তাহা লইয়া তাহারা রঙ্গ-তামাসা করিতেছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী সকল নভেলের এই এক উদ্দেশ্য, ইহা যে কোনও লেখকের নভেল হইতেই প্রমাণ করা যায়, নর্মান্ ডগলাস্, অ্যালডাস্ হাক্‌স্‌লী, উইলিয়াম গের্‌হার্ডি এভেলিন ওয়াঘ প্রভৃতি লেখককে নমুনাস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। গের্‌হার্ডি সুদূর বার্লিন আর মুক্‌ডেনে সমাগত এক পাগলা পুতুল-নাচওয়ালার ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন। অপররা সপ্তাহান্তে কোনও এক আমোদের স্থানে সমবেত অপরিচিত নিঃসম্পর্কিত নর-নারীর হুড়াহুড়ি হুল্লোড় বর্ণনা করিয়াই খালাস, তাহারা কোনও সমাজের লোক নয়, তাহাদের মধ্যে কোনও সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হয় না, তাহারা নিরুদ্দেশ্য জীবনে খানিক মজা লুটিয়া আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইবে, কর্ম্মক্লান্ত জীবনটাকে একবার সপ্তাহান্তে চাঙ্গা করিয়া প্রভাতের কাকের মত কলরব করিতে করিতে দিগ্‌দেশে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই বইগুলির মধ্যে যৌবনের জয়-ঘোষণা আছে, যে যৌবন সকল কিছুকে অগ্রাহ্য করে, প্রথা, নিয়ম, নিজের সুখ-শান্তি, অপরের সুখ-শান্তি, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত। যদি কোনও লেখক এই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে রচনা করেন, যেমন হাক্‌স্‌লী তাঁহার শেষের দিকের বইয়ে করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি সমাজ ও সংসারটাকে অত্যন্ত দুঃখময় করিয়া চিত্র করেন, পাঠকের মনে একটা অবসাদ ও বিষাদ আনয়ন করেন, এবং এক মিথ্যা কাল্পনিক সমাজ সৃষ্টি করিয়া পাঠককে মনে করাইয়া দেন যে, হুল্লোড়ের জীবন ছাড়া জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রে একটুও আনন্দ নাই। এই নব বোকাচিও সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান হাল্কা ও রঙ্গভরা লেখক বোধ হয় দুটি তরুণ লেখক—এভেলীন ওয়াঘ, এবং ন্যান্‌সী মিট্‌ফোর্ড।

অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েরই প্রতিপ্রসব আছে। যুদ্ধ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া উত্তম উত্তম নভেল লেখা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলিও ত সামাজিক উপন্যাস নহে, সমাজের কোনও বিষয় ত তাহাদের বর্ণনীয় নহে। কয়েক জন অতি নিপুণ সূক্ষ্ম-মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক লেখক আছেন, যেমন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ষ্টেলা বেন্‌সন, এবং এডওয়ার্ড স্যাক্‌ভিলওয়েষ্ট। কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক সমাজের কোনও চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। আধুনিক ইংরাজ সমাজ তাঁহাদের নভেলে কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু ইংলণ্ডে এখন নবযুগের সূচনা হইতেছে। অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি লোকের অরুচি দেখা দিয়াছে। পাঠকদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াতে লেখকরাও তাঁহাদের মন ও হাত অন্য দিকে চালনা করিতে বাধ্য হইতেছেন। এখন সমস্যার দিকে তাঁহাদের নজর পড়িয়াছে, শিল্প-সংরক্ষণ-শুল্ক, সাম্রাজ্য-সহযোগিতা, এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এখন সকলের মন দখল করিয়াছে। ইহা যে লোককে কোন্ পথে লইয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন, তবে একটা নূতন পথ যে নির্দ্দেশ করিবে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

ইহা বার্লিনের লিটেরারিশ হ্বেল্ট নামক সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় জার্ম্মাণ সমালোচকের অভিমত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্ম্মুখ

দুইটা লেন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, দুই বিভিন্ন দিকে কৃশ দুইটি বাই-লেন বাহু বাড়াইয়া দিয়া চৌগলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌগলির ঠিক কাঁধের উপর সেই পুরাতন ত্রিতল লাল বাড়ীটা। দোতলার দেয়ালের পশ্চাতে, লোহার তারের সঙ্গে ঝুলানো একটি নাতিবৃহৎ চকমকে সাইনবোর্ড—মোটা মোটা লাল হরফে এ্যান্টিক ধাঁজে লেখা, "চতুর্ম্মুখ।" বাহিরের দিকে, নীচের তলার এক প্রত্যন্তে টিনের খুপরী-আঁটা একটি পাণ বিড়ির দোকান, অন্য প্রান্তে বাড়ীর প্রবেশদ্বার। পাণ-বিড়ির দোকানের সম্মুখে, খানিকটা পীচ-ঢালা রাস্তা পাণের পিচে রক্তবর্ণ। বাড়ীটির অবস্থান ও আবেষ্টনের সঙ্গে "চতুর্ম্মুখ" নামটা বেশ খাপ খাইয়াছে!

কিন্তু ঐ পুরাতন লাল বাড়ীটার জন্য ঐরূপ নামকরণ হয় নাই, যদিও পৌরাণিক 'চতুর্ম্মুখ' দেবতাটিও সুপ্রাচীন ও রক্তবর্ণ বলিয়া বিদিত। সাইনবোর্ডের কাঠের ফ্রেম এখনও বিবর্ণ হইতে সুরু করে নাই এবং বর্ণ-বিন্যাসের কাঁচা রঙ এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই, দেখিয়া সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, উহার উত্থানকাল অধিক দিনের নহে,—অতি আধুনিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সে দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত লাল বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারে ছোট-খাট একটি ভীড় জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষগুলির গুম্ফহীন মুখ ও মাথায় লম্বা চুলের বহর দেখিয়া স্বতঃই মনে করিতে ইচ্ছা হয়—উহারা বুঝি কীর্ত্তনীয়ার দল এবং উহাদের অধিকাংশের দৃষ্টিশক্তিও কম-বেশী কিছু কিছু খাটো—নাকের ডগায় নানান্ ভঙ্গীর চশমা। অপিচ,—বেশ আপ-টু-ডেট কীর্ত্তনিয়ার দল ত'—বাঃ! কেমন সুন্দর বাগাইয়া চুরুট ধরিতে শিখিয়াছে ইহারা! দুই চারি জন আবার রিক্সাতে চাপিয়া আসিয়া থামিল—নামিল; ভাড়া লইয়া রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দুই এক জনের বচসা হইল। রিক্সাওয়ালারা ভারী দুষ্ট! তার পর একে একে সকলেই প্রবেশ-দ্বার পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া চলিল।

দোতলার বৈঠকখানা-গৃহের চৌকাঠের মাথায় ছাপানো প্ল্যাকার্ড মারা—চতুর্ম্মুখ সংকৃষ্টি-পরিষদ। সম্পাদক—স্বয়ং শ্রীশ্যামচাঁদ দাঁ, গৃহাধিকারী। চতুর্ম্মুখের সুগম্ভীর পরিচয়!

পারিষদবর্গ পরিষদ্-গৃহের বারান্দায় পদার্পণ করিয়া, এক মুহূর্ত্তেই হাসিয়া চেঁচাইয়া নাম-গাম্ভীর্য্যের মুণ্ডপাত করিয়া দিল। শ্যামচাঁদ তাহার অন্য তিন জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত বসিয়া পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সিঁড়ি ও বারান্দার সন্ধিস্থলে প্রবল পাদুকাধ্বনি শ্রবণমাত্র বন্ধু-চতুষ্টয় একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বারবর্ত্তী হইল,—অভ্যাগতদিগকে সমুচ্চ সমস্বরে চতুর্ম্মুখে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল—স্বাগতম্! অগ্রবর্ত্তিগণ হাসিয়া দক্ষিণকরাগ্রে ললাট স্পর্শ করিল; পশ্চাদ্‌বর্ত্তীরা স্মিতহাস্তে ঈষৎ মাথা হেলাইল। সভ্যতানুমোদিত সুন্দর প্রত্যভিবাদন!

মীরাট-প্রবাসী তরুণ সাহিত্যিক, প্রসিদ্ধ রসকলা-সমালোচক শ্রীনবনীধর ধর সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন—কয়েক দিন পর ফিরিয়া যাইবেন। চতুর্ম্মুখ সভার মুখপাত্র ও প্রতিষ্ঠাতা মিঃ দাঁ'র আমন্ত্রণে তিনি ও তাঁহারই মণ্ডল রচনা করিয়া স্থানীয় স্বনামধন্য কতিপয় উদীয়মান সাহিত্যিক এই সভাকে সৌষ্ঠব দান করিবার জন্য আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীনবনীধরকে মধ্যাসনে উপবেশন করাইয়া মাল্যদান করা হইল—অন্যতম দাঁ-সহচর তাঁহার দিকে চুরুটদান্ আগাইয়া দিল।

চেয়ার-টেবিল-কৌচে সুসজ্জিত, কার্পেট-আচ্ছাদিত কক্ষটি বৈদ্যুতিক দীপালোকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে, এমন সময় কবি কনক পাল উঠিয়া তর্জ্জনী আন্দোলন আরম্ভ করিল,—"মিঃ দাঁ, কিছুক্ষণ সভার কায স্থগিত রাখতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে আমাদের,—কারণ, আমরা ভারতীয় রসকলার পরিপন্থিভাবে কার্য্যারম্ভ করতে পারি না ত? কি বলেন, নবনী বাবু?"

রসকলা-গর্ব্বী নবনী উৎসুক জিজ্ঞাসু-নেত্রে কনকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

কনক চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সুইচ টিপে লাইট নিবিয়ে দিন এক্ষুণি মশাইরা! কৈ পিদীম,—বাঙ্গালার নিজস্ব সৃষ্টি মাটীর পিদীম আমাদের কোথায়?"

সভাস্থ সকলে এবং স্বয়ং নবনীধরও প্রথমটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বক্তার প্রতি বিস্মিত-দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই গ্রীবা দুলাইয়া শ্রীনবনী গলিয়া পড়িলেন,—"চমৎকার ইঙ্গিত! কলায়িত পরিকল্পনা! বাঙ্গালা মায়ের মৌলিক প্রদীপ—মাটীর পিদীম দিয়েই আজ সভার উদ্বোধন হোক্, শ্যামচাঁদ বাবু!"

সভায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কোথায় পিদীম, মাটীর পিদীম কৈ রে! মার্কেটটাও আবার নিকটে নহে,—আর সেই রসকলানুমোদিত মাটীর পিদীম যে পাওয়াই যাইবে সেখানে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কেহ কেহ ঘড়ী খুলিয়া সময় দেখিতে লাগিল—ন'টার শো'র সিনেমা মিস না হয় শেষে।

মাটীর পিদীম বরাতে হইল না,—শ্যামচাঁদের অন্তঃপুর হইতে আনীত পিল্‌সুজ-সংলগ্ন পিত্তল-প্রদীপেই সভারম্ভ সূচিত হইল। আনুষঙ্গিক, প্রথানুমোদিত প্রস্তাব ও সমর্থন-শেষে, শ্রীনবনীধর ধর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতিপদে বৃত হইলেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে প্রথমতঃ রসকলার বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভাগ-সম্পর্কীয় অনেক অপূর্ব্ব সারগর্ভ কথা বলিলেন—কতক বোধ্য, কতক বা দুর্ব্বোধ্য—উৎকট। কিন্তু শ্রোতার বোধহীনতা বক্তার অপরাধ নহে নিশ্চয়ই! অতঃপর প্রসঙ্গ-পর্য্যায়ে ছোট গল্পের কথা আসিয়া পড়িল। বক্তা বলিলেন, রসকলার চরম প্রকাশ হইতেছে এই ছোট গল্প,—এক কথায় ইহাকে রসকলার পরম মোহানা বলা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ উপমা উৎপ্রেক্ষায় বক্তব্যকে আচ্ছন্ন-উদ্‌ভ্রান্ত,

ভারাক্রান্ত করিয়া, ফুল ও ফুলকপির সহিত, ধূপ ও গন্ধের সহিত, দেহ ও আত্মা, কাম ও প্রেম, বাদি-বিসম্বাদী সুর—'হারমনি'র সহিত তুলক সমালোচনার তরঙ্গায়িত ধাপে ধাপে ওঠা-নামা করিতে করিতে, ছোট গল্পকে সহসা আনিয়া নামাইয়া দিলেন তিনি বস্তি-সাহিত্যের বাস্তব পঙ্কক্ষেত্রে!—পরিশেষে টেবল চাপড়াইয়া সজোরে শেষ-বাণী নিক্ষিপ্ত হইল—এই পবিত্র পঙ্ক ছানিয়া তুলিয়া ললাটে আমাদের তিলক কাটিতে হইবে—উত্তীর্ণ হইতে হইবে বিশ্ববাণীর মহা পঙ্কজ-তীর্থে!

সভাপতি উপবিষ্ট হইলেন। চটপট খর-করতালিধ্বনিতে কয়েক মুহূর্ত্ত সভাগৃহ ধ্বনিত হইতে থাকিল। সুবিচিত্র বক্তৃতা। চিত্তে কতখানি রসানুভূতি উদ্রিক্ত হইল, পরিমাপ করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু সভাসদমণ্ডলী সত্যই অভিভূত হইল,—চমৎকৃত হইল। হ্যাঁ,—উত্তম বক্তৃতার ইহাই ত' লক্ষণ! ইহারই নাম সাত্ত্বিক অভিভূতি!

ইহার পর পর্য্যায়ক্রমে দুই জন সাহিত্যিক উঠিয়া দুইটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিল—এক জনের বিষয় 'একাঙ্ক নাটিকা', অপরের 'শিশু-চরিত্রে যৌন ইঙ্গিত'। একাঙ্ক নাটিকার প্রবন্ধকারের মতে সেক্সপীয়র, গিরীশ ঘোষের স্থূল ও দীর্ঘ নাটকীয় ষ্টাইলের মন্থন হিমরাত্রি-শেষে এই 'একাঙ্ক নাটিকা'র বাসন্তী উষোদয় সূচিত হইয়াছে দেশে। দুঃখ করিলে চলিবে না,—কর্ম্মচঞ্চল যুগমানব আজ আয়তনের স্থূলতাকে অতিক্রম করিয়া প্রাণচেতন সূক্ষ্ম শিখালোকে উপনীত হইতে চায়,—এই 'একাঙ্ক নাটিকা' সেই স্বাহা-সরস্বতীর বোধন-শঙ্খ বাজাইতেছে। সূর্য্যালোকে জন্মলাভ করিয়া প্রজাপতি যেমন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মধ্য দিয়া যৌবনের জয়টিকা পরিবার ইঙ্গিত দিয়া যায়,—এই 'একাঙ্ক নাটিকা' সেইরূপ স্বল্পকালস্থায়ী, কিন্তু যৌবন-গরিমাদৃপ্ত অমৃত-আলোকবিন্দু পরিবেষণ করিয়া মৃত্যুশীল মানবজীবনকে ধন্য করিবে, অমর করিবে।—ইত্যাদি। 'শিশুচরিত্রে যৌন ইঙ্গিত' প্রবন্ধে শিশুর হাস্য, চুম্বন, স্তন্যপান, মাতৃবক্ষশয়ন প্রভৃতির মধ্যেও অচিন্ত্য বাৎস্যায়ন-সূত্রীয় সূক্ষ্মতম কামনা-বয়নের নিগূঢ় ইঙ্গিত আলোচিত হইয়াছিল।—শিশু-ভোলানাথের সুযোগ্য বন্দনা!

'মসী ও অসি' পত্রিকার পক্ষ হইতে পিঙ্গলপ্রকাশ বাবু উভয় প্রবন্ধই ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইলেন। এই একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি এক একবার উচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"এটি যাচ্ছে মাঘে, এটি যাবে ফাল্গুনে।"

উভয় প্রবন্ধকারের দক্ষিণ-করতল যুগপৎ সমসূত্রে প্রসারিত হইল,—'দক্ষিণা,—আমাদের দক্ষিণা?''

বরাভয়দান-ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া পিঙ্গলপ্রকাশ বলিলেন,—"ভয় কি? সবুরে মেওয়া ফলে।''

সভ্যবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সভাপতি বলিলেন,—"আপনারা আর কেউ কিছু বলতে চান?''

গল্পলেখক ভানু ভট্ট উঠিয়া দাঁড়াইল। বক্তৃতার বিষয়—'প্লটের চাষ'।—"মামুলি থোড়-বড়ি-খাড়ায় গল্পের ঝুড়ি বোঝাই করবার দিন-কাল আর নেই। বুড়োরা তাতে খুসী হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা কেউ তাকে আমল দেব না আদৌ। এখন কথা উঠছে, নিত্য নতুন ধাঁজের প্লট আমরা পাই কোথায়? বিদেশী বৈ থেকে নিছক আমদানী করতে বলছি না তাই ব'লে;—যদিও গোড়ার দিকে অনুকরণটা অপরিহার্য্য ব'লেই মনে করি এবং সেজন্যে হনুকরণ ব'লে প্রবীণরা যতই না কেন নাক সিঁটকোন। আমি বলছি, প্লটের চাষ করতে হবে আমাদেরই সমাজের মধ্যে নানান ভাবে নানা দিক থেকে। সমাজের জীর্ণ ভিত্তির মধ্যে লাঙ্গলের ফলা চালিয়ে আমরা জাগিয়ে তুলব কামনার সীতাকে নব কামায়নের বাস্তবরাজ্যে,—সজীব প্লটের সবুজ সবজী চারিয়ে তুলব এখানে সেখানে,—ছাড়িয়ে চলব পাশ্চাত্য সাহিত্যকেও মৌলিক প্লটের অলৌকিকতায়। কেন,—নিজ গৃহে, নিজের পরিবারে, স্ব-স্ব পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যেও কি আমরা বিচিত্র প্লটের বিভিন্ন অঙ্কুর উদ্গত ক'রে তুলতে পারি না অনায়াসেই? কিন্তু তার জন্যে চাই ঘরকে নিয়ে চলা বাইরে, বাইরকে ব'য়ে আনা ঘরে। ভুললে চলবে না, প্লটের চাষে বেণো জল হচ্ছে প্রথম কথা। তার পর—"

চতুর্ম্মুখ-মুখপতি শ্যামচাঁদ স্বীয় গৃহবিধানে অত্যধিক রক্ষণশীল, পারিবারিক পর্দ্দার অতি পক্ষপাতী এবং স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে অতীব সন্দিহান। বেণোজলের কথা তাহার আদৌ মনঃপূত হইল না, বিশেষতঃ স্বগৃহেই যখন পরিষদের চৌমুখো খাল কাটা হইয়াছে! বৈঠকখানা পর্য্যন্ত বাহিরের ধাক্কার পূর্ণ-সমর্থন করে সে অবশ্য,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই,—ভিতরের চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার হুকুম নাই। শ্যামচাঁদ বাধা দিয়া বলিল,—"ভট্ট মহাশয় যা বলছেন, তা আংশিক সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের কথা বিবেচনা করতে হবে তার জন্যে। ঘর-বাইরের মিকশ্চার না করেও আমরা প্লটের চাষে তথা আর্টের চাষে অগ্রসর হ'তে পারি না কি?—সেই বিষয়েই আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই আজ এখানে।"

চতুর ভানু ভট্ট মনে মনে হাসিয়া, কুশলী নাবিকের মত ধাঁ করিয়া বক্তৃতার গল্পই বিপরীত বাঁকে ফিরাইয়া দিল।—কোন্ কলাবিদ্ কবে পুত্রহারা শোকাতুরা মাতৃমূর্ত্তিকে রূপদান করিবার জন্য পীড়িত পুত্রের চিকিৎসায় পরোক্ষে বাধাদান করিয়া শিশুর মৃত্যু ঘটাইয়াও বেদনাময়ী ক্রন্দসীকে ভাবের পটে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল কেমন করিয়া,—পরদেশী কথাসাহিত্য হইতে সংগৃহীত সেই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া ভট্টজী বলিল, প্রকৃত আর্টিষ্ট তথা 'প্লটিষ্ট'কেও হইতে হইবে এইরূপই সংস্কারশূন্য নির্ম্মম সত্যনিষ্ঠ।—সত্যই ত'! এহেন পন্থা অবলম্বন করিয়া, অন্যের অনুকরণমাত্র না করিয়াও, প্রত্যক্ষভাবে আমরাও যে অনেক কিছু করিতে পারি!—চমৎকার সাসেস্‌শান!

সভাপতি নবনী বাবু বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া, উঠিয়া বলিলেন,—"সভা অনুমতি করলে আমি এখানে আমার এমনি একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার বিষয় নিবেদন করতে পারি, এবং তা একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে বলেও আমার মনে হয় না।"

এই সময়, পূর্ব্বে যাহারা একবার ঘড়ী খুলিয়া ন'টার শো'র সিনেমার কথা স্মরণ করিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু নবনীধরের স্বাভিজ্ঞতার আস্বাদন লইতে তখনই আবার বসিয়া পড়িল।—যাক্, আজ না হয় সিনেমায় যাওয়া না-ই হইল!

রোমাঞ্চকর সেই নবনীধরের অভিজ্ঞতা! সে অভিজ্ঞতার কথা শুনিলে, শিহরিয়া সচেতন হইতে হয় যে, তরুণ দেহের অন্তরালে অমন অকরুণ হৃদয় কেমন করিয়া লুকাইয়া আছে!—কিন্তু আর্টিষ্টকে যে নির্ম্মম হইতে হইবেই।

নবনী বাবু বলিলেন, "মীরাট থেকে আমরা একখানা হাতে লেখা 'মাসিক' কিছু দিন বের কর্‌তুম, নাম দিয়েছিলুম 'মীরা'। কাগজটার 'মীরা' নামকরণ কেন হয়েছিল—মীরাটের 'ট' লুপ্ত ক'রে দিয়ে কিম্বা অন্য কারণে তা এখানে নাই বল্‌লুম। সেখানে 'মীরাক্ল' ক্লাবের কয়েক জন মাতব্বর সভ্য মিলে আমাদের সেই প্রয়াস। 'মীরাক্ল'এর 'ক্ল' বাদ দিয়েও 'মীরা' নামের ব্যাখ্যা চল্‌তে পারে। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় হসন্তহীন 'ক্ল-র' অর্থ জানেন ত'?—থাবা। আমরা 'মীরাক্ল' ক্লাবের ছোটগল্প-নবীশ সাহিত্যিক সভ্যরা ছোট গল্পের প্লটের সন্ধানে সর্ব্বদা সেই 'ক্ল' উঁচিয়ে চল্‌তুম। তার পর এক দিন এক সুন্দর মৃগ এসে আমাদের থাবার নীচে পড়ল। আমার আজকার কথা সেই মৃগয়ার কথা।"—বক্তা এইখানে একটু থামিয়া মৃদুহাস্য করিলেন।

"মৃগাঙ্ক মিত্র চাকরীর সূত্রে মীরাটে যখন প্রথম এল, তখন আমরা ক'জন মিলে পূর্ব্বোক্ত কাগজখানার পরিকল্পনা-মাত্র সুরু করেছিলুম,—ভাবী শিশুর নামকরণ হয় নি। নতুন বাঙ্গালী সেখানে কেউ এলে কদাচ আমাদের দৃষ্টি এড়াত না। শীগ্‌গিরই তাকে ক্লাবের সভ্য ক'রে নেওয়া হ'ল। সভ্য ক'রে নেবার সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাকে শিকারী করাই—শিকার করা নয়। কিন্তু ফলে হ'ল উল্টো।

"বন্ধুবৎসল সরল লোকটি—যদিও তার স্বভাব-সরলতাকে আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বলেই মনে কর্‌তুম। সাহিত্যিক প্রতিভা মন্দ ছিল না, তবে সেই সেকেলে ধরণের—বঙ্কিমী যুগের। যা হোক্, লোকটাকে দিয়ে আমরা বেশ কায পেয়েছিলুম। সেই হাতে লেখা কাগজখানির প্রধান লিপিকারের ভার সে নিতে সম্মত হওয়াতেই অবশেষে আমাদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হ'তে পেরেছিল। মৃগাঙ্ক মীরাটবাসী হবার মাস-দুই পর 'মীরা'র প্রথম-প্রকাশ প্রারব্ধ হ'ল। মৃগাঙ্ক গোড়ায় নাম দিতে চেয়েছিল 'উষসী'—সেই প্রাচীন বৈদিক শব্দের জন্যে তাকে উপহসিত ক'রে আমি দিলুম নাম 'মীরা'। মৃগাঙ্ক মুখে হাস্‌লেও হয় ত' ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আর, কিছু মনে না করাও তার মত নির্ব্বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কারণ, তখন সে হেসে বলেছিল,—'মীরা নয়, মীরা স্নো।' আমি তার উত্তর দিয়েছিলুম,—'কেন মীরা-বাঈ হ'তে ক্ষতি কি?' সে গম্ভীরভাবে চুপ ক'রে গিয়েছিল। বন্ধুরা বলেছিল, 'মীরা নামে মৃগাঙ্কের এত বিতৃষ্ণা কেন?' আমি বলেছিলুম, 'কি জানি।'

"মৃগাঙ্ক মীরাটে আস্‌বার পরই আমি তার পারিবারিক আত্মীয়তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মিলতে চেষ্টা করেছিলুম। দু'একবার নিমন্ত্রণ ক'রেও খাইয়েছিল আমাকে,—কিন্তু পরে কেন জানি না, সে আমাকে পরিহার করে। এখানে সে কথা থাক্।

"আমাদের ক্লাবে এক দিন আমি জার্ম্মাণ কবি 'গ্যেটে ও শীলার' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ কর্‌লুম। তার মৌলিকতার দাবী কর্‌তেই মৃগাঙ্ক হঠাৎ ব'লে ফেল্‌ল, "বেশ হয়েছে প্রবন্ধ আপনার নবনী বাবু, কিন্তু ওরিজিন্যালিটির কিছু নেই রচনায়—এ ত' 'হার্পার ম্যাগাজিনের' ব্যাক-ইস্যু থেকে নেওয়া একটা প্রবন্ধের আমূল অনুবাদ।"

"শ্রীনবনীধর ধরের নেই ওরিজিন্যালিটি?—আমার পক্ষ নিয়ে অধিকাংশ সভ্য মৃগাঙ্কের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। তর্ক যখন বিতর্কের মুখে গড়িয়ে চলেছে, আমি দিলুম থামিয়ে। শুধু বল্‌লুম, 'মৃগাঙ্ক, তুমি আমার সমালোচনা-গ্রন্থ পঞ্চমুদ্রা এখনও পড় নি—আমি তোমাকে সে দিন দিয়েছি।' মৃগাঙ্ক বল্‌ল, 'বেশ ভাল বই; সব পড়িনি'।"

এমন সময় পিঙ্গলপ্রকাশ বাবু উঠিয়া বলিলেন,—"সংক্ষেপে সারুন। নবনী বাবু দয়া ক'রে—এদিকে ন'টা বেজে দশ।"—সহসা পিঙ্গলপ্রকাশের সম্বন্ধে এমন ত্বরান্বিত হইবার কারণ,—চতুর্ম্মুখ পরিষদের আমন্ত্রণে জলযোগের নিমন্ত্রণ বিজ্ঞাপিত না হইলেও, তাঁহার ধারণা ছিল, যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা আছেই হয় ত। অতএব—শুভস্য শীঘ্রং!

"সংক্ষেপেই শেষ কর্‌ছি যথাসম্ভব"—পিঙ্গলপ্রকাশের দিকে চাহিয়া নবনী বাবু বলিলেন।—

"এর পর ক্লাবের সভ্যরা মিলে তাকে জব্দ করবার চেষ্টায় মেতে উঠল। আমি বল্‌লুম, 'ভাই সব, তার ওপর আর্টের মৃগয়া করতে চাও ত আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জব্দ নয়।' 'তথাস্তু' ব'লে মৃগয়ার নামে তারা লাফিয়ে উঠল। আমি আরও—"

উত্তেজিত ভানু ভট্ট চেয়ারের উপর এক পা উঠাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মৃগ না মৃগী?"

নবনীধর ভট্টজীর দিকে একবারমাত্র বক্রকটাক্ষে তাকাইয়া বলিয়া চলিলেন, "আমি আরও সভ্যদের বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিলুম, মৃগাঙ্কের অন্তঃপুরের দিকে বৃথা দৃষ্টিক্ষেপে কাল-ক্ষেপ না করতে—জানতুম, সেখানে কোন আর্টের ফাঁক নেই—এ আমার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, যার কথা সংক্ষেপে প্রারম্ভে বলেছি। আর্টের পরীক্ষা চলল মৃগাঙ্কেরই ওপর।

"পঞ্চাশ টাকা মাইনের ক্ষুদে চাকুরে মৃগাঙ্ক। ঐ টাকাতেই তাদের গণ্ডাখানেক লোকের চ'লে যেত কেমন ক'রে জানি না, হয় ত' আমাদের মত বিলাসিতা বা বাজে ব্যয় ছিল না বলেই। কিন্তু তাকে অচল না করলেও মৃগয়া চলে না। উপায় কি? নানাপ্রকার ফন্দী-ফিকির চল্‌তে লাগল।

"দয়া ক'রে দৈব হলেন অনুকূল। মৃগাঙ্কের তরুণী স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতার একসঙ্গেই সেবার হ'ল অসুখ। মা শীগ্‌গির সেরে উঠলেও, স্ত্রীর অসুখ গড়িমসি ক'রে গড়িয়ে চল্‌ল পক্ষাধিক কাল পেরিয়ে। তার পর এক দিন অফিস-ফেরৎ বেতনের টাকা পকেটে নিয়েই সে গেল আমাদের বীরেন ডাক্তারের দাওয়াইখানায়। ডাক্তারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে পরামর্শ ক'রে, নতুন প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধ-পত্তর নিয়ে দাম দিতে গিয়ে দেখে—পকেট আছে 'পাকেটস' নেই! তখনকার মত ওষুধ-পত্তর নিয়ে চ'লে গেলেও, বড় বিপদেই পড়্‌ল সে—ডাক্তার বলেছেন, স্ত্রীর জন্যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার চাই। মৃগাঙ্ক

সেই দিনই আমাদের ক্লাবে এসে কেঁদে পড়্‌ল। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লুম, আমাদের কাছে টাকা হবে না, তবে টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যেতে পারে কাল। পরদিন তাকে খাঁ-কোম্পানী থেকে অনেকগুলো টাকা হ্যাণ্ডনোট নিইয়ে দিলুম। খাঁ-কোম্পানী—হাঃ! হাঃ! হাঃ!—খাঁ-কোম্পানী, অর্থাৎ বুঝেছেন কি না কাবুলী দাওয়াই!—সুদ প্রতি রোজ হু'টাকা করে, একশ' টাকা!—মাসে মাসে সুদ শোধ কর্‌লে আর কোন হাঙ্গামা নেই। সহজ ব্যবস্থা। এম্‌নি ক'রে আসন্ন বিপদ থেকে মৃগাঙ্ককে উদ্ধার কর্‌লুম আমরা।

"স্ত্রী তার মর্‌ল না বটে, তবে সার্‌লেও না একেবারে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হ'ল দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস। এক দিকে সুদের লাঠি,—অপর দিকে সংসারের বাড়ন্ত খরচ। এম্‌নি ক'রে মাস-ছয় গেল। এই ছ'মাসে খাঁ-কোম্পানীকেই মৃগাঙ্ক দিল নগদ একশ' কুড়ি টাকা সুদ। এর পর থেকে এক দিকে বাড়ী-ভাড়া, অন্যদিকে সুদ পড়্‌তে লাগ্‌ল বাকী,—মাথার ওপর ঘুরতে থাক্‌ল পাকা আফগানী লাঠি,—অধিকন্তু লোকলজ্জা, অপবাদ, অপমান। তখনও আমরা 'মীরা'র লিপিকারকে তার নিয়মিত প্রকাশের জন্য নিয়মিত-ভাবে চাপ দিতে ছাড়ি নি। আমাদের মৃগাঙ্কের অবস্থা হ'ল ঠিক 'ব্যাধ-বিতাড়িত' ভীরু মৃগের মত!—'মীরাক্ল' ক্লাব একদৃষ্টে এই আর্টের মহান্ পরিণতি লক্ষ্য করতে লাগল।

"মৃগাঙ্ক তার সযত্নবর্দ্ধিত সুদীর্ঘ গোঁফ-জোড়া সঙ্কুচিত ক'রে নাকের ডগায় আন্‌লে,—মাথার লম্বা চুল ছোট ক'রে ছেঁটে ফেল্‌লে, গালের জুলপী কামিয়ে কাণের ওপর তুলল এবং রাতা-রাতি বাসা বদল করল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে দেখল,—খাঁ-সাহেবদের অনুসরণের হাত তখনও এড়াতে পারে নি সে। বাসায় ফিরে সেই দিনই গোঁফ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল ক'রে ফেলল—পোষাকের ভোল ফেরাল।—পরম উপভোগ্য এই আর্টের পরিণতি!

"এক দিন আমরা ক্লাবে ব'সে আছি—মৃগাঙ্ক আমার পাশে, খাঁ-কোম্পানীর চর এসে হাজির। সে জানতে চায়, মৃগাঙ্কের নতুন বাসার ঠিকানা। আমরা তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম। মৃগাঙ্কের ভোল-ফেরান চেহারায় কোম্পানীর চর তাকে চিনতে পারে নি বোধ হয়,—ফিরে গেল। মৃগাঙ্ক ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। আমরা তাকে পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করতে উপদেশ দিলুম।"

এই সময় বক্তা একবার তাঁহার হাতঘড়ী ঘুরাইয়া দেখিলেন—ওঃ! সাড়ে ন'টারও বেশী।

"মৃগাঙ্কের অফিসে গেল প্রথমে বেনামী চিঠি,—পরে ধীরেন ডাক্তার এক দিন গোপনে অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। বড় সাহেব আমাকে এক দিন ডেকে পাঠালেন। কয়েক দিন পর মৃগাঙ্ক তার অফিসের টেবিলে দেখল—ত্রৈমাসিক নোটীসের ত্রিশূলের বিভীষিকা!

"আরো মাস দুই এই আহত মৃগকে নিয়ে আমরা খেলালুম। খেলাটা একঘেয়ে হয়ে পড়ে দেখে অবশেষে একদা খাঁ কোম্পানীতে' গিয়ে তার পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তির চৌহদ্দী এবং নতুন বাসার ঠিকানা দিয়ে এলুম অযাচিতভাবে।

"এর পর দিন-দুই মৃগাঙ্ক আমাদের ক্লাবে এল না। তৃতীয় দিন শুন্‌লুম—পটাস সাইনাড গলাধঃকরণ ক'রে সে সুইসাইড করেছে।"

নবনীধর থামিতেই একসঙ্গে অনেকে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—"তার পর? তার পর?"

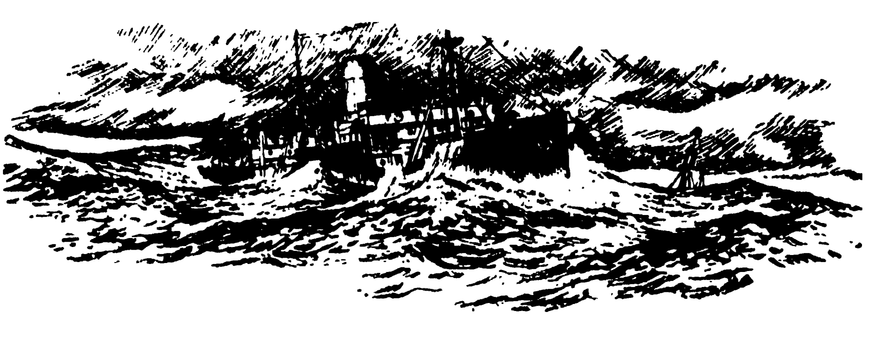
"তার পর দেশ থেকে ক'দিন পর তাদের কোন্ এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এসে মীরাটের বাসার স্ত্রীলোক ও বালকদের নিয়ে দেশে চ'লে গেল। এবং—"

"ভট্টজী জিজ্ঞাসা করিল,—'এবং কি?'

"এবং মৃগাঙ্কের স্ত্রীর নাম ছিল 'মীরা'।"

চৌগলিটা জনহীন, নিস্তব্ধ। লালবাড়ীর সদর-দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দোতলা অন্ধকার,—তেতলার শয়নগৃহ হইতে যে আলোকরশ্মি এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, তাহাও নির্ব্বাপিত হইল। নীচের তলার পাণ-বিড়ির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ—খুপরীর ভিতর বসিয়া দোকানী কেবল তখনও বিড়ি তৈয়ার করিতেছে, আর ঝিমাইতেছে। একটা গ্যাস্‌পোষ্টের আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেই 'চতুর্ম্মুখ পরিষদের' সাইন বোর্ডটার লাল হরফের উপর—যেন কাহারও বুকের খানিকটা তাজা রক্ত কেমন করিয়া ছিটকাইয়া আসিয়া লাগিয়াছে ঐখানে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।





ডেনমার্কের কৃষি ও রাষ্ট্র

ডেনমার্কের কৃষি ও সমবায় নীতি আজ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ডেনমার্ক অতি ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডকে অন্ন জোগাইতেছে অথচ যন্ত্রপাতির রাজা হইয়াও জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ড ডেনমার্কের আমদানীর উপর চড়া শুল্ক বসাইয়াও ডেনমার্কের সঙ্গে নিজের উৎপন্নে নিজের দেশেই প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতেছে। ইংরাজ ও জার্ম্মাণ বলে, ডেনমার্কে শ্রমিক সস্তা ও জীবনযাত্রার মাপকাঠি (Standard of living) নীচু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাপকাঠি মোটেই নীচু নহে। তবে শ্রম সস্তা, শ্রমের সময় দীর্ঘ, কিন্তু ইহাই কি ডেনমার্কের কৃষি-উন্নতির মূল ভিত্তি? ডেনমার্কের কৃষির উন্নতির মূলে আছে দেশের রাষ্ট্র। ডেনমার্ক খনিজ পদার্থে বা অন্য স্বাভাবিক সম্পদে সমৃদ্ধ নহে, কাযেই তাহার বাঁচিবার একমাত্র অবলম্বন কৃষি—তাই দেশের রাষ্ট্র ও যথাশক্তি কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং আজ ডেনমার্ক তাহার ফল উপভোগ করিতেছে। রাষ্ট্র ছাড়াও দেশের জনসাধারণ নিজেদের অন্নসমস্যায় মাথা ঘামাইয়াছে—সমবায় আন্দোলন মূলতঃ জনসাধারণ দ্বারাই প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত। এ দেশের লোক হা অন্ন কোথায় অন্ন বলিয়া বসিয়া থাকে না—অন্নের জন্য পরিশ্রম করে ও মাথা ঘামায়। ড্যানিশ কৃষির উন্নতির ও বর্ত্তমান পদ্ধতির আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে, সেই জন্য রাষ্ট্রশক্তি দেশের কৃষিকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

বর্ত্তমানে যদিও ডেনমার্ক রাজতন্ত্র বলিয়া কথিত, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা পুরাপুরি গণতান্ত্রিক বা কৃষকতান্ত্রিক। কৃষক-পরিচালিত রাষ্ট্র উপলব্ধি করিল যে, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাবলম্বী কৃষক সৃষ্টি না করিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে না। পূর্ব্বে দেশের রাজগণ নিজেদের প্রিয়পাত্র এবং জারজ সন্তানদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জায়গীর দিয়া গিয়াছিলেন, আইনমত উহা দান-বিক্রয় করা চলিত না এবং বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান ব্যতীত অপর কেহ ঐ সম্পত্তির মালিক হইত না। এই ভূসম্পত্তি ছাড়া বংশের জন্য পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত একটি ধন-ভাণ্ডারও তাহার হাতে আসিত, কাযেই ঐ জমীর উৎকর্ষসাধন করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টাই হইত না, সাধারণতঃ উহা ভাগে বা ঠিকা বিলিতে বন্দোবস্ত করা হইত। এই জমী ছাড়াও বহু গির্জ্জার অধীনে দেবসম্পত্তি ছিল। এই সকল জমীর উৎকর্ষ-বিধানের জন্য মোহন্তগণ কোন চেষ্টাই করিতেন না। কৃষক-শক্তি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভের পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করিয়া ঐ সকল সম্পত্তির ও ধনভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লয় এবং ঐ সকল সম্পত্তি দানবিক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করে। ঐ সকল বাজেয়াপ্ত জমী পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিলি করা হয়। যাহাতে সাধারণ মজুর ও দরিদ্র কৃষক নিজেদের নিজস্ব ক্ষেত্র করিতে পারে, এজন্য রাষ্ট্রতহবিল হইতে ধার দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষক জমীর মূল্যের ১/১০ অংশ দিলে বাকী ৯/১০ অংশ রাষ্ট্র হইতে ধার পাইতে পারে। এই ধার সাধারণতঃ ৪০।৪৫ বৎসরে পরিশোধের ব্যবস্থা এবং সুদ শতকরা তিন টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে হইতে রাষ্ট্র হইতে দেশে ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র ও কৃষক বাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কারণ, মজুর নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র পাইলে যেমন পরিশ্রম ও যত্ন করে, মজুরী খাটিবার সময় তেমন করে না, ফলে কৃষির অবনতি হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২টি দাদন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়—উহার জন্য রাষ্ট্র দায়িত্ব লয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র কৃষক বাড়াইবার জন্য আইন প্রণীত হয়—এই আইনমত এক কোটি ক্রোণ (ড্যানিশমুদ্রা—প্রায় ১ শিলিং) রাষ্ট্র হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য শ্রমিকদিগকে ধার দিবার জন্য বরাদ্দ হয়। এক হাজার ক্রোণের বেশী ধার পাইতে পারে না এবং ঋণকারীকে ১/১০ অংশ দিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ঋণের অর্দ্ধেক টাকা শোধ না যাইত, তত দিন সম্পত্তি অন্য কোনও দায়সংযুক্ত করা চলিত না। কিন্তু এই আইনমত যাহারা সম্পত্তি খরিদ করিল, দেখা গেল, তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ একটি পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী নহে—ফলে অন্যত্র কায করাও প্রয়োজন হইয়া পড়িল এবং বাধ্য হইয়া জমীর দিকে ষোল আনা মন ও শ্রম দেওয়া সম্ভব হইল না। এজন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ক্রোণ করা হইল এবং দেড় কোটি ক্রোণ পুনরায় ধার দিবার জন্য বরাদ্দ হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া সাড়ে ছয় হাজার (কোথাও হাজার পর্য্যন্ত) করা হয় এবং দুই কোটি ক্রোণ ঋণ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কেবল কৃষি শ্রমিকরা (farm labourer) ঋণ পাইবার অধিকারী ছিল, এই বৎসরে অবিবাহিত স্ত্রীলোক ও অন্যান্য কয়েক শ্রেণীকে ঐ অধিকার দেওয়া হয়। উক্ত ঋণ হইতে পূর্ব্বে যাহারা ঋণ লইয়াছে, তাহাদিগকেও জমীর পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ও জমীর উন্নতির জন্য পুনরায় ঋণ দেওয়া হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আড়াই কোটি ক্রোণ ঋণ বরাদ্দ হয় ও ঋণের পরিমাণ হাজার ক্রোণ করা হয় এবং জমীর ন্যূনতম পরিমাণ ১ হেক্টর (প্রায় ২।০ একর) ধার্য্য হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জমীর পরিমাণ বাড়াইয়া

২ হেক্টর ও ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ক্রোণ করা হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ২০ লক্ষ ক্রোণ কৃষকদিগকে ঋণ না দিয়া দাতব্য করা হয়; এই দাতব্যের টাকা মিনিষ্ট্রী অব এগ্রিকালচার বিবেচনামত দিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। পরে ক্রমশঃ প্রতি বৎসরে এই দাতব্যের টাকা ধীরে ধীরে কমাইয়া আনা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনমত জমী ও বাড়ী শেষ করিবার পূর্ব্বে কেহ ঋণ পাইত না (ঋণ পাইলে কন্‌ট্রাক্টর ও জমী-বিক্রেতাকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা হইত), ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া জমী কিনিবার ব্যবস্থা হইল ও বাড়ীর ছাদ পড়িয়া গেলে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে উক্ত আইন-সমূহের সামান্য সামান্য কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু আইনের ধারা অনুসরণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কাযেই তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া অযথা কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। মোটা টাকা ধার পাইয়া অন্যায় উচ্চমূল্যে যাহাতে কৃষক জমী ক্রয় না করে, তাহা দেখিবার জন্য Standing committee on the Laws for Acquisition of Land এবং Commission on small Holdings নামে রাষ্ট্রের দুইটি বিভাগ আছে। রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯০১-২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৩ হাজার ১ শত ২৯টি ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোট (১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রিপোর্টে প্রকাশ) ১ কোটি ১৫ লক্ষ ক্রোণ ধার ও দাতব্যে খরচ হইয়াছে এবং ইহা ব্যতীত ১ কোটি ৬০ লক্ষ ক্রোণ পূর্ব্বের কৃষকদিগকে সাহায্য করা হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা ব্যতীত রাষ্ট্র হইতে কৃষির উন্নতির জন্য আর একটি প্রচেষ্টা হয়। যে সকল অনুর্ব্বর জমী রাষ্ট্রের অধীনে ছিল, তাহা ও বাজেয়াপ্ত জমী একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী করিয়া বিভক্ত করিয়া বিলি করা হয়। ঐ সকল বিভক্ত অংশের ক্রেতাদিগকে নগদ কোনও মূল্যই দিতে হয় নাই। জমীর ধার্য্য মূল্যের উপর কেবল সুদ দিতে হয় এবং রাজস্বের জন্য সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণের সময় যখন যেরূপ মূল্য বাড়িবে, তাহারই উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া যাইতে হইবে, নিজের শ্রম দ্বারা বা অর্থ দ্বারা উৎকর্ষসাধন হইলেও জমীর বর্দ্ধিত মূল্যের উপরই সুদ দিতে হইবে। ইহার উপরও বাড়ীঘর তৈয়ারী জন্য রাষ্ট্র হইতে $\frac{9}{10}$ অংশ ঋণ কৃষক পাইতে পারে। যে সব প্রদেশে বাজেয়াপ্ত বা অনুর্ব্বর জমী যথেষ্ট নাই, সে সকল যায়গায় জমী কিনিয়া কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য ৩০ লক্ষ ক্রোণ বরাদ্দ হইয়াছে (পরে ইহা বাড়িয়াছে কি না, সঠিক জানিতে পারি নাই)। এই সকল ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের গড় আয়তন ৭ হেক্টর। যে কোনও পুরুষ বা স্ত্রী যে দিনমজুরী বা মাহিনা-করা ভাবে কোনও কৃষিক্ষেত্রে কায করে বা নিজের ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র আছে বা গরীব ব্যবসায়ী (যাহার অবস্থা কৃষি শ্রমিকের সমান), ইট প্রস্তুতকারক বণিক, সহরের শ্রমিক প্রভৃতি উক্ত কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারে। রাষ্ট্র হইতে এইভাবে সাহায্য পাওয়ার ফলে দেশের প্রত্যেক গরীবই এক দিন নিজস্ব ক্ষেত্রের অধিকারী হইবার সঙ্কল্প রাখে। প্রথম জীবনে দিনমজুরী করিয়া কিছু টাকা করিতে পারিলেই রাষ্ট্রের সাহায্যে ক্ষেত্র কেনা সহজসাধ্য— তাই এখানকার মজুরজীবন একঘেয়ে নিরাশাময় নহে। প্রত্যেকেই সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা রাখিয়া কায করিয়া নিজের কৃষিক্ষেত্র, ছোট একটি বাড়ী, সেবাপরায়ণা দুটি মধুর কোমল হাত, বালকণ্ঠনিনাদিত প্রাঙ্গণ—এই স্বপ্ন দেখিয়া দেশের দরিদ্র মজুর কায করিয়া যাইতেছে এবং এক দিন সে স্বপ্ন সার্থক হয়। এই গেল কৃষিকে রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ দান, ইহা ছাড়া কৃষিকলেজ, বিদ্যালয়, কৃষি-উপদেশক (গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়), অন্যান্য কৃষিঋণ, সমবায় আন্দোলনে সাহায্য ইত্যাদি বহুদিক দিয়া পরোক্ষভাবে ড্যানিশ কৃষি রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করে। জগতের সকল দেশ বিরাট আকারে চাষ করিতে চলিয়াছে, কিন্তু ডেনমার্ক চলিয়াছে ভিন্নমুখে তথাপি সে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। অবশ্য রাষ্ট্রিক সাহায্যগুলিও ইহার অন্যতম, কারণ সমবায়নীতি; কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোপেনহেগেন হইতে)।

চাল মাৎ

ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের জন্য যাঁহারা এ যাবৎ নানারূপ দাবার চাল দিতেছিলেন, তাঁহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, তাঁহাদের চাল মাৎ হইয়াছে। ব্রহ্মের অধিকাংশ অধিবাসীই বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বিচ্ছেদকামীদের শেষ আশা ছিল যে, ব্রহ্মের আইন-সভায় চাল চালিয়া বিচ্ছেদ-বিরোধীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। যোগাড় ও তদ্বিরের অথবা প্রলোভন-প্রদর্শনের ত্রুটি কিছুই হয় নাই, কিন্তু উহা সত্ত্বেও ব্রহ্মের আইন-সভা অতিমাত্রায় ভোটাধিক্যের ফলে ভারতের সহিত ব্রহ্মের যোগাযোগ রাখিবার পক্ষে মত দিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি এখন একবার বিচ্ছেদ-বিরোধের পক্ষে মত দেয়, তাহা হইলে আর তাহার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপায় থাকিবে না, এমন ভয়ও দেখান হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, এ ভয় সত্ত্বেও ব্রহ্মবাসীরা ভারতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে সম্মত হইল না! রক্ষণশীল টোরী সংস্কার-বিরোধীদের এবং তাঁহাদের পোষ্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের বুকে শেল হানিয়া ব্রহ্মবাসীরা বিচ্ছেদের বিরোধিতাই করিলেন! ভারতীয় ভ্রাতাদের সহিত একই সুখ-দুঃখের তরণীতে শাসনসংস্কার-সমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মের বনজ, খনিজ, কৃষিজ এবং শিল্পবাণিজ্যিক ধন-সম্পদের উৎস এখনও সম্যক্‌রূপে উৎসারিত হয় নাই। সে সকল ব্যাপারে ব্রহ্মবাসী এখন হইতেই আপনার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ করিবার পথ করিয়া লইল। তাহার পর রাজনীতির দিক্ দিয়াই ব্রহ্মের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য আছে। ব্রহ্মদেশ প্রাচ্যের শক্তি-সামঞ্জস্যের চাবীকাঠিস্বরূপ সিঙ্গাপুরের নৌ-শক্তি আড্ডার সন্নিকটে অবস্থিত। এ হিসাবে ব্রহ্মের strategic position অথবা সামরিক হিসাবে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা সামান্য নহে। বৃটিশ শক্তি প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-শক্তি

সামঞ্জস্য-বিধানের মূল চাবিকাঠি এইখানে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আর প্রাচ্যের বাজারের ও উপনিবেশের মূল্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এডেন ও সুয়েজ খালের চাবিকাঠি রাখা যেমন ভারতরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বারের পথে ব্রহ্মের প্রয়োজনও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। এই হেতু ব্রহ্মবাসী আপনাদের কদর বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু আছে কি ?

আর এক দিক্ দিয়াও ব্রহ্মের strategic positionএর মূল্য খুবই বেশী। বৃটিশ শক্তির প্রাচ্যের সাম্রাজ্য-সীমানা হইতেছে ব্রহ্মদেশ। ভারত-সাম্রাজ্যের রাজনীতিক আত্মানুভূতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অধিকারের নিরাপত্তা সংশয়সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু ব্রহ্মকে ভারত হইতে পৃথক্ রাখার মূলে রাজনীতিক প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণই আছে। এই জন্য ব্রহ্মবাসীর বিচ্ছেদ-বিবোধিতা সাম্রাজ্যবাদীর মনে কণ্টকের মত বিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু উপায় কি ? প্রাচ্যের ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে চমকিত হইলে চলিবে কেন ? সে যে কালের খেলা !

কিন্তু উপসর্গ আছে। বলা হইতেছে, ব্রহ্মবাসীরা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ কবিবার সর্ত্ত দিয়াছে, তাহা যদি পূর্ণ হইবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ অনুসারেই কার্য্য করা হইবে।

স্বার্থ বড় চীজ

ম্যাঞ্চেষ্টার সহর বিলাতের মস্ত বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র। সেখানে যে কেবল বস্ত্রশিল্পের প্রধান আড়ত অবস্থিত, তাহা নহে, অন্যান্য অনেক ব্যবসায়েব কেন্দ্রও ম্যাঞ্চেষ্টার। সম্প্রতি সেখানে প্রায় সকল প্রকার বিলাতী ব্যবসায়ের মালিক ও ম্যানেজার-ডিরেক্টবদের এক সভা হইয়াছিল। সভায় অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে এই মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল ;—"কেবল রাজস্বের জন্য (revenu purposes) কিছু শুল্ক ধার্য্য করা ব্যতীত ভারতে যে সকল বৃটিশ পণ্য আমদানী হইবে, তাহার অধিক কোনরূপ শুল্ক সেই সকল বৃটিশ পণ্যের উপর ধার্য্য হইতে পারিবে না, এই মর্ম্মে যেন বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের উপর হুকুম দেন। আর তাহা ছাড়া যাহাতে ন্যায্য প্রতিযোগিতা চলিতে পারে, সেই ভাবে ভারতে আমদানী সকল প্রকার বিদেশী পণ্যের উপর যেন শুল্ক ধার্য্য করা হয়, এই মর্ম্মেও ভারত সরকারকে কাষ করিতে বলা হয়।"

ইহা অবশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে বৃটিশ বণিক্‌দেব মনোবৃত্তি কিরূপ, তাহা এই ব্যাপার হইতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষটা কি তাঁহাদের খাস জমীদারী যে, নায়েবের দ্বারা প্রজার নিকট পাঠা আদায় করা হইবে ?

আমাদের মনে আছে, অটোয়া বৈঠকে বৃটিশ প্রতিনিধিরা ভারতীয় তুলাক্রয়-ব্যাপারে ভারতকে preference বা বিদেশ হইতে অধিক সুবিধা দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অসম্মতির মূলে যে মাঞ্চেষ্টারের ইঙ্গিত ছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অথচ এই ম্যাঞ্চেষ্টারী বণিক্‌রা আপনাদের মাল ভারতে সুবিধায় কাটাইবার জন্য ভারত সরকারের শুল্ক আইনের পরিবর্ত্তন চাহিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই ! ভারতের বাজার হইতে জাপানী সস্তা মাল তাড়াইবার জন্য যে, 'সাধু' প্রচেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু ভারতের শিশু বস্ত্রশিল্পও যে ইহাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, তাহাও তাঁহারা যে জানেন না, তাহা কে বলিবে ?

ফিলিপাইনের সৌভাগ্য

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সিনেট এবার যথার্থই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিভূর ন্যায় মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ফিলিপাইন দ্বীপবাসীদিগকে ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই অনুমতি-প্রদানের মূলে একটু রহস্য আছে। ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মার্কিণ রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট হুভার ফিলিপাইন দ্বীপবাসীদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বিল নামঞ্জুর (veto) করিয়াছিলেন। মার্কিণ কংগ্রেস হইতে এই বিল ইতিপূর্ব্বে আর একবার পাশ হইয়া প্রেসিডেণ্টের অনুমতির (Sanction) জন্য প্রেরিত হইয়া তাঁহার দ্বারা না-মঞ্জুর হইয়াছিল। এবারও বিল তাঁহার নিকট অনুমতির জন্য প্রেরিত হইলে তাঁহার দ্বারা উহা না-মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ শাসনতন্ত্রের (Constitution) আইন অনুসারে সিনেটের ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্য প্রেসিডেণ্টের না মঞ্জুর আদেশ না-মঞ্জুর করায় বিল পাশ হইয়া গেল।

এই বিলের একটু ইতিহাস আছে। স্পেনের সহিত মার্কিণের যুদ্ধের ফলে স্পেন পরাজিত হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণকে দিতে বাধ্য হন ; তৎপূর্ব্বে বহু শতাব্দী ঐ দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধীন ছিল। ইহা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মার্কিণ প্রথমাবধিই দ্বীপবাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহারা তাহাদিগকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কতকটা autonomy কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন বটে, তবে স্বাধীনতা দেন নাই। বর্ত্তমানের শাসনতন্ত্র অনুসারে এই নিয়ম বাহাল আছে :—

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট সিনেটের অনুমতি না লইয়া দ্বীপপুঞ্জের এক জন গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেন। গভর্ণর জেনারলের অধীনে ৬টি শাসন-বিভাগ আছে ; তাহার একটি ছাড়া আর সকল বিভাগের কর্ত্তাই ফিলিপিনো। আইন-সভা দুই ভাগে বিভক্ত ;—সিনেট ও হাউস অফ রেপ্রেসেণ্টেটিভজ। দুইটির ২ ও ৯ জন গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারা মনোনীত হন, বাকী নির্ব্বাচিত। এই শাসন ও আইন-সভা ছাড়া একটি Council of State (রাষ্ট্রীয় পরিষদ) আছে, এই সভা কেবল পরামর্শ দিয়া থাকেন। গভর্ণর জেনারলের আইন-সভার বিল veto নামঞ্জুর করিবার অধিকার আছে। যদি ভিটোর পরেও বিল আবার পাশ হয়, তবে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট শেষ সিদ্ধান্ত করেন। মার্কিণ কংগ্রেসেরও ফিলিপাইন আইন সভার বিল না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা আছে।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, ফিলিপাইনের অবস্থা ভারতেরই

অনুরূপ। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্ট্যাটুটের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহ যে প্রকার autonomy স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করিত; ইহা তাহারও সমতুল নহে। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট হুভারের "ভেটো' ভিটো অর্থাৎ না-মঞ্জুর হওয়ার ফলে ফিলিপিনোরা যদি ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যেও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহাও তাহাদের ভাগ্য বলিতে হইবে।

নিজস্ব ভিটোর সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হুভার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার, সকল সাম্রাজ্যবাদী রাজ-নীতিকের মুখে ঐ একই কথা শুনা যায়। প্রাচ্যের অরাজক অবস্থা (chaotic condition), এবং ফিলিপাইন দ্বীপের সান্নিধ্যে বিপুল জনসঙ্ঘ (immense neighbouring population),—এই দুই প্রবল কারণেই না কি ফিলিপিনো-দিগকে স্বাধীনতা দেওয়া সমীচীন নহে! প্রেসিডেণ্টের মতে এখন ফিলিপাইনে মার্কিণের প্রভুত্ব কিছুতেই খর্ব্ব করা সঙ্গত নহে। তবে প্রেসিডেণ্ট এইটুকু দয়া দেখাইতে রাজী আছেন যে, "আজ হইতে ২৫।৩০ বৎসর পরে ফিলিপিনোদের মতামত লইয়া যদি বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বাধীনতা চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের অবস্থার এমন উন্নতিসাধন করিতে হইবে, যাহার ফলে তাহারা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে।"

নাবালক জাতি, কাষেই ঈশ্বর-প্রেরিত জাতির রাষ্ট্রনায়ক তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের উপর সহজে ছাড়িয়া দিতে পারেন কি? এ ভাবনাটা আমাদের স্থানীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র 'ভারত-বন্ধু' ষ্টেটশম্যানেরও হইয়াছে, তাহা তাঁহার রচনাতেই সুপ্রকাশ। সিনেট স্বাধীনতাটা ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে দিয়া ফেলিলেন,—এই ভাবনায় 'ষ্টেটশম্যানের' ঘুম হইতেছে না। তিনি তাই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন,—"সিনেট কি সর্ব্বনাশই না করিলেন! এখন এক ভরসা, ফিলিপিনোরা যদি সুবোধ বালকের মত আসন্ন সর্ব্বনাশের কথা বুঝিয়া এখনও সিনেটের এই দান গ্রহণ না করে। বৃটনদের ত্যাগ করিয়া রোমানরা যখন চলিয়া গিয়াছিল, তখন বৃটনদের যে অবস্থা হইয়াছিল, ঠিক ফিলিপিনোদেরও তাহাই হইবে।"

নাবালক জাতি যদি 'স্বাধীনতা'-পোলাও খাইয়া বদ্‌হজম করিয়া বসে! সে ভাবনা যদি অভিভাবক সাম্রাজ্য-বাদীরা না ভাবেন, তবে ভাবিবে কে? কিন্তু বৃটনদের যখন অসহায় অবস্থায় রাখিয়া রোমানরা সরিয়া পড়িয়াছিল এবং স্কট, পিক্ট, অ্যাংলো-স্যাক্সন ও ডেনরা যখন বৃটনদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া-ছিল, তখন বৃটনরা মরে নাই, বরং অন্যান্য জাতিকে আপনাদের মধ্যে গ্রাস করিয়া বৃটিশ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল,—ইতিহাসই ত এই কথা বলে। সেই বৃটিশ জাতিই না এখন ধনে মানে জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে? তবে?

তবে ষ্টেটশম্যানের গাত্রদাহের কারণ নাই, তাঁহার সাগর-পারের জ্ঞাতি-ভ্রাতারাও একবারে দয়াপরবশ হইয়া কাযটা করেন নাই। ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা পাইলে মার্কিণ কৃষাণ-দের নাকি মহা সুবিধা হইবে। সুতরাং তাহাদের চাপেই সিনেট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রতীচ্যে বিবাহ

প্রতীচ্যের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্যে কতকটা ধর্ম্ম-বিবাহ আছে বটে, কিন্তু অন্য খৃষ্টানদের বিবাহ ঐহিক চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জায় বর-কনে পাদরীর সম্মুখে বাইবেল সাক্ষী রাখিয়া বিবাহকালে এ কথাটা বলে,—Until death do us part, মৃত্যু পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধ অটুট থাকিবে; এ জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই। কিন্তু অন্যান্য খৃষ্টানদের মধ্যে এখন Companionate Marriage অথবা সাহচর্য্য-বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত। এই বিবাহ বড় চমৎকার,—যত দিন খুসি পুরুষ ও নারী একত্র স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করিতে পারে, তাহার পর উভয়ের মধ্যে কাহারও অপরের প্রতি বিতৃষ্ণা হইলে 'বিবাহ' ভাঙ্গিয়া যাইবে!

যখন এইরূপ স্বচ্ছন্দ বসবাসের ব্যবস্থা আছে, তখন রোমান ক্যাথলিক বিবাহের সম্বন্ধেই বা কেন কড়াকড়ি রাখা হইবে? পশু-পক্ষীরা যেমন Natureএর Law মানিয়া চলে, তখন মানুষই বা সে সুবিধা গ্রহণ করিবে না কেন? মার্কিণ, ফ্রান্স প্রভৃতি 'উন্নত' দেশের ত কথাই নাই, পোলাণ্ড প্রদেশও এ বিষয়ে 'উন্নতির' চরম শিখরে উপনীত হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছে। Polish Hierarchy অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর সম্প্রতি রাজধানী ওয়ার্সাতে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পোলাণ্ডের নূতন Legal Code আইন বিধির বিশেষ নিন্দা করা হইয়া-ছিল। করিবারই কথা, সকল দেশের ধর্ম্মযাজক পাদরীরা 'গোঁড়া', তাঁহারাই বর্ত্তমানের 'উন্নতি' বা প্রগতিতে যাহা কিছু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। না হইলে প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীর প্রগতি-গোলাপে আর কোন কাঁটা থাকিত না, কেমন সুন্দর primerose path of dalliance খুলিয়া যাইত!

এখন এই যে Marriage Code রচিত ও প্রস্তাবিত হইয়াছে, উহা যদি বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পোলাণ্ডে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা একবারে চরমে গিয়া দাঁড়াইবে। (Worst in Europe), বোধ হয় য়ুরোপের অন্য কোন দেশে (সোভিয়েট রাসিয়া ছাড়া?) সে সুবিধা নাই এবং হইবারও উপায় নাই।

বর্ত্তমানে পোলাণ্ডের রাষ্ট্র (state) গির্জ্জায় খৃষ্টান বিবাহ সমর্থন করে। কিন্তু নূতন আইনে ব্যবস্থা হইতেছে যে, বর ও কন্যা যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহ আইন-সঙ্গত করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমে এক Civil ceremony অর্থাৎ সামাজিক (যাহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই) উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি বর-বধূ অতঃপর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহে, তাহা হইলে কেবলমাত্র উভয়-পক্ষের অনুমতি থাকিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হইতে পারিবে, সে জন্য কোন যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না। উভয়ের মধ্যে Violent exchange of words গরম কথা-কাটাকাটি হইলেই উহা সম্ভবপর হইবে। ইহা ছাড়া যদি ৩ বৎসরের মধ্যে দম্পতির সন্তান না হয়, তাহা হইলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হইতে পারিবে। কেমন চমৎকার ব্যবস্থা!

এ দেশেও নারী সমাজের কোন কোন বৈঠকে বিবাহ-বিচ্ছেদ

আইনসঙ্গত করিবার আন্দোলন হইতেছে। যদি প্রতীচ্যের অনুকরণেই সমাজ গড়িয়া তোলা বর্ত্তমানের 'প্রগতির' অনুযায়ী বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে একবারে চরমে গেলেই ত ভাল হয়। পোলাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার কথাটা 'প্রগতিশীলা' নারীরা ভাবিয়া দেখিবেন কি? উহাতে নারীর অধিকার আরও সুস্পষ্ট-ভাবে স্বীকৃত হইবে। প্রগতির ঘোড়দৌড়ে পিছাইয়া থাকা ভাল কি?

চীন-জাপান সমস্যায় জাতিসঙ্ঘ

মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া জাতিসঙ্ঘ একটা রফার চেষ্টা করিতেছিলেন। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের উদ্যোগে যে 'স্বাধীন' রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, সেই রাষ্ট্রগঠন সঙ্গত কি অসঙ্গত, মাঞ্চুরিয়ায় জাপান যে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত,—এই ভাবের সমস্যা-সমাধানের জন্য জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে লীটন-কমিশন বসিয়াছিল। সেই কমিশনের রিপোর্ট জাপান গ্রাহ্য করেন নাই। এই হেতু জাতিসঙ্ঘ ১৯ জন সদস্যকে লইয়া পুনরায় এক কমিটী গঠন করেন; সেই কমিটীর রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসঙ্ঘ জাপানকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে উত্তরদানের জন্য চরমপত্র (Ultimatum) দিয়াছিলেন। জাপান তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, মাঞ্চুরিয়ার রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে তিনি সম্মত নহেন, পরন্তু জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত জাতি-সমূহের প্রতিনিধি ব্যতীত, অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে জাপান রফার কথায় থাকিতে দিবেন না।

জাতিসঙ্ঘ এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল; কেন না, এমন চোখ রাঙ্গাইয়া চরমপত্র দিতে জাতিসঙ্ঘ এ যাবৎ সাহস করেন নাই। সুতরাং এবার তাঁহাদের যে 'কোমরের জোর' আসিয়াছে, ইহা বেশ বুঝা গিয়াছিল। কোথা হইতে এই জোর আসিল? আসল কথা, মার্কিণ যুক্তরাজ্য এবার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে ভিতরে ভিতরে বেশ চাপ দিয়াছিলেন। উভয় দেশই মার্কিণের কাছে দেনদার, কাযেই এইবার ব্যাপার শক্ত দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকেও একটু শক্ত হইতে হইয়াছে। তাহার ফলেই লীগের মারফৎ এই চরম-পত্র। কিন্তু জাপান ত তাহা একরূপ অগ্রাহ্যই করিলেন। এমন অপমান প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্য আর কখনও হইয়াছেন কি না, জানি না। অবশ্য রুস-জাপান যুদ্ধে প্রতীচ্যের উচ্চ মাথা হেঁট হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতীচ্যের সম্মিলিত শক্তির নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তখন জাপানের হয় নাই, এ কথা বেশ বলা যায়। কিন্তু এ সাহস এখন হইয়াছে, জাপান মোলায়েম ভাষায় নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াছেন। জাপানের মনের কথা, (১) জাপান আয়তনে ক্ষুদ্র, তাহার লোকসংখ্যা উহাতে কুলাইতেছে না, পরন্তু অন্যান্য শক্তির যেমন বাণিজ্য ও লোক-বিস্তারের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজনের, জাপানেরও তাই, (২) এসিয়া মহাদেশে জাপান মার্কিণে মনরো-নীতির মত জাপানী নীতি রাখিতে চাহে, (৩) রাসিয়ার সোভিয়েট-বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় আড্ডা গাড়া দরকার, (৪) মাঞ্চুরিয়ায় সকল জাতির বাণিজ্য-স্বার্থরক্ষা এবং সকলের শান্তি ও সন্তোষ-বিধানের জন্য দস্যুদলসমূহের উচ্ছেদসাধনে জাপানী সৈন্য রাখা দরকার। মোটের উপর এই কথা। কিন্তু দুষ্ট লোক বলে, আসলে মাঞ্চুরিয়ার জমী এবং বনজ ও খনিজ ধনসম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টিই যত অনিষ্টের মূল। পরন্তু মাঞ্চুকোর ব্যবসায়-বাণিজ্যটাও ত কম লোভনীয় নহে।

জাপান ত নির্দ্দেশ মানিলেনই না, পরন্তু গরম হইয়া বলিলেন, যদি রাসিয়া ও মার্কিণকে সালিসি করিবার জন্য ডাকা হয়, তাহা হইলে তিনি লীগের সংস্রব ছাড়িয়া দিবেন। এ যেন কতকটা বাড়ীর দরজা ময়লা করিবার পর আবার চোখ রাঙ্গানি! মিঃ ল্যান্সবারি বেশ কথাটি বলিয়াছেন, "লীগ পর পর কেবল হটিয়া যাইতেছেন আর জাপানের মন রাখিবার নূতন উপায় ঠাওরাইতেছেন, আর ওদিকে জাপান বেশ 'রহুলে সহলে' চীন মহাদেশের গর্ব্বে আপনার স্থান করিয়া লইতেছেন।" বাস্তবিকই চরমপত্র জাপান প্রত্যাখ্যান করিবার পরেও লীগ জাপানের পক্ষ হইতে 'নূতন প্রস্তাবের' প্রতীক্ষা করিতেছেন!

চীন দুর্ব্বল, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া চীন সহজে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িবে না, প্রাণপণে আক্রমণকারীকে বাধা দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে এবং এতদর্থে সীমানায় যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। নানকিং ও পিকিং মিলিত হইয়া দেশের শত্রুকে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সুতরাং লীগ যদি নামে লীগ না হন, যদি যথার্থই জগতের বিরোধে মধ্যস্থতা করা তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এখনও লীগ সত্যই শক্তির পরিচয় দিতে পারেন, নতুবা ভবিষ্যতে লীগের নাম শুনিলেই লোক একটা হাসিবার উপাদান পাইবে।

সভ্যতার আত্মহত্যা

সভ্যতা অর্থে এখানে প্রতীচ্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রতীচ্য জগতে জন্মের হার হু হু কমিয়া যাইতেছে, এজন্য প্রতীচ্যেরই বহু মনীষী চিন্তান্বিত হইয়া বলিতেছেন, ইহার গতি যদি নিয়ন্ত্রিত না হইয়া এইভাবেই চলে, তাহা হইলে আর চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রতীচ্য দেশসমূহ জনশূন্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে!

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের রেজিষ্ট্রার-জেনারলের হিসাবে গত মার্চ্চ মরসুমে (quarter) জন্মের হার হইয়াছিল লোকসংখ্যার অনুপাতে হাজারকরা ১৫·৩টি। গত বৎসরের মত এত অল্প হার আর কখনও হয় নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হার ছিল হাজার-করা ৩৬·৩টি! অবস্থা কিরূপ শোচনীয় বুঝিয়া দেখুন। এই ভাবে জন্মের হার যে সাময়িক, তাহা নহে, প্রতি মাসেই এই ভাবে কম বেশী কমিতেছে। লণ্ডনে ঐ মার্চ্চ মরসুমে জন্মের হার হইয়াছিল আরও কম, হাজার-করা ১৪·৬টি। ইংলণ্ডের বড় বড় ১ শত ১৭টি সহরে জন্মের হার ঐ সময়ে হইয়াছিল হাজার-করা ১৫·৬টি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাতি হিসাবে ইংরাজ ওয়েলসম্যান কোথায় গিয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশের বড় বড় সহরের জন্মের হার এইরূপ :—

বার্লিন ৮'৮টি, ড্রেসডেন ৮'৯টি, লায়েপজিক ১০'৮টি, মিউনিক ১১'০টি, হামবুর্গ ১১'১টি, অস্লো ৮'৯টি, প্যারী ১৪'৫টি, নিউ ইয়র্ক ১৫'৯টি, সিকাগো ১৪ ৩টি।

ফ্রান্সের অবস্থা এত সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এক জন বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, "১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সৈন্যশ্রেণীতে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার তরুণকে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জন্মের হার যদি বর্ত্তমান গতিতে কমিতে থাকে, তাহা হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পাওয়া যাইবে মোটে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার! ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গড়পড়তায় প্রত্যেক ফরাসী পরিবারে ৪টি করিয়া সন্তান জন্মিত, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মিত ৩টি, আর বর্ত্তমানে মাত্র ২'২টি। এইরূপ কমিতে কমিতে ৭৫ বৎসরে ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা এখনকার অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে!"

জার্ম্মাণীতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মের হার হাজার-করা ১৬, ইটালীতে হাজার-করা ২৫ (১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ছিল ২৭, ১৮৮৪ খৃঃ ছিল ৩৯, ১৯০০ খৃঃ ছিল ৩৩টি)।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ১৯২১ খৃঃ জন্মের হার ছিল হাজার-করা ২৪ ৩টি, ১৯৩০ খৃঃ হইয়াছে ১৮'৯টি। বড় বড় ১৪টি সহরের জন্মের হার-হ্রাস ভয়াবহ, ১৯৩১ খৃঃ বোষ্টনে শতকরা ২২, ডেট্রয় সহরে ১৭টি! একমাত্র পিটসবার্গ সহরে হাজারকরা ২০টি জন্মের হার দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেখানেও ১৯৩০ খৃঃ ও ১৯৩১ খৃঃ মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, জন্মের হার শতকরা ৬টি কমিয়াছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন,—Western civilization committing suicide, প্রতীচ্য সভ্যতা আত্মহত্যা করিতেছে! আপনার পাপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া প্রতীচ্যের মনীষী বিশেষজ্ঞরা এই ভীষণ রোগের প্রতীকারোপায় চিন্তা করিতেছেন। মিস মেয়ো, মিস কেণ্ডাল, মিস সোরাবজীর মত ভারতের নর্দ্দামা-ঘাঁটার দল ইহার উত্তরে কি বলেন?

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নবিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার স্পেঙ্গলার প্রতীচ্যের জন্মের হারের কয়টি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—(১) Birth control movement (জনন-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন), (২) Dissipation of religious beliefs (ধর্ম্মবিশ্বাসের অবনতি), (৩) Psychological unrest (মানসিক অশান্তি), (৪) Emancipation of women (স্ত্রী-স্বাধীনতা), এবং (৫) Economic factors (আর্থিক সমস্যা)।

আমাদের আধুনিক সংস্কারপ্রয়াসী ভাঙ্গনকামীরা কি বলেন? যাঁহারা পদাঘাতে সমস্ত প্রাচীন জীর্ণ বাধানিষেধের ধর্ম্মাচার-বেড়া ভাঙ্গিয়া দিতে সদাই সমুৎসুক, এবং যাঁহারা বিবাহের বাঁধন দূর করিয়া cousin-মারী মিলনের নূতন নূতন মুখরোচক গল্প রচনা করেন, তাঁহাদেরই বা ইহার উত্তরে কি বলিবার আছে?

ডাক্তার স্পেঙ্গলার বলেন, একমাত্র Roman catholicরা জনন-নিয়ন্ত্রণ আদি বীভৎস্য পাপের প্রশ্রয় দেয় না। অবশ্য জনন-নিয়ন্ত্রণেরও একটা ভাল দিক্ আছে। বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি, আহার্য্যের ভাগীদার-বৃদ্ধি প্রভৃতির রোধ করা ইহাতে সম্ভব হয় বটে : পরন্তু জন্মের হার কমিলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যের সংখ্যাও হ্রাস হইবে, উহাতে শান্তির পথ সু-গম হইবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে রোগের বৃদ্ধি করিয়া এই পাপ অনুষ্ঠান করা ছাড়া আর কোন পথ নাই কি? ইহা অপেক্ষা আমাদের দেশের বুড়া ঋষিদের সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ-গুলা গঙ্গার জলে একবারে ভাসাইয়া না দিলেই ত হয়: রোমান ক্যাথলিকরা একটু ধর্ম্ম মানে, বিবাহের বন্ধনটাকেও ধর্ম্মের বলিয়া মানে। তাই স্পেনের মাদ্রিদ্ সহরে মার্চ্চ কোয়ার্টারে জন্মের হার হাজারকরা ৩১'১টি এবং রায়ো-ডি জেনিরো সহরে হইয়াছিল ২৮'১টি—প্রতীচ্যের সকল দেশের সকল সহরের অপেক্ষা অনেক বেশী!

শান্তির চেষ্টা

প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জ জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া জগতে গণতন্ত্র নিরাপদ করিবার জন্য এবং জগৎ হইতে চিরতরে যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন এবং উহা হইতে নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধবিরতির বৈঠকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারই ফলে জানা যাইতেছে যে, প্রতীচ্যে একাধিক দেশে বিষবাষ্প প্রস্তুত হইতেছে এবং কে কত অধিক পরিমাণে কম খরচায় অধিক মারাত্মক বাষ্প প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার পাল্লাপাল্লি চলিতেছে! ইহা ছাড়া রণসম্ভার প্রস্তুতের কারখানাগুলিও অবাধে চলিতেছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার এই যে, এই সকল বাষ্প ও রণসম্ভার প্রস্তুতের কারখানাগুলি তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের দ্বারা উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

যখন জেনিভা প্রোটোকোল স্বাক্ষরিত হয়, তখন মার্কিণ হইতেই বিষবাষ্পের চলন নিষিদ্ধ হইবার দাবী উপস্থিত হইয়াছিল। অথচ বর্ত্তমানে মার্কিণ মুল্লুকেই ১৪ শত টন বিষবাষ্প মজুত রহিয়াছে। ইহার সবটাই যে প্রাইভেট কারখানার টাকায় সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা নহে, ষ্টেটও "এজউড" নামক স্থানে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় করিয়া এক বিশাল বিষবাষ্প কারখানার কল (plant) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন! যাহাতে শতকরা এক শত পরিমাণ বিষবাষ্প ভাল উৎপন্ন হয়, তাহারই জন্য এইমাত্র চেষ্টা! এই এজউড কারখানার মধ্যে ২ শত ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন কারখানা আছে, ঐ সকল প্রকাণ্ড গৃহে পণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারখানায় ২১ মাইল দীর্ঘ রেল-লাইন, ১৫ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তা এবং ১১ মাইল দীর্ঘ ইলেকট্রিক ট্রাম লাইন আছে। প্রত্যেক দিনে ঐ স্থানে ৩ শত টন বিষবাষ্প উৎপন্ন হয়, আর বর্ত্তমানে ১৪ শত টন মজুত আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৃটিশ সরকার সেণ্টনোম নামক স্থানের এক পল্লীতে বিষবাষ্প-কারখানা নির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সল্সব্যারি প্লেনের পোর্টন নামক স্থানে তাঁহাদের বিষবাষ্পের এক পরীক্ষামূলক কারখানা আছে

কি চমৎকার শান্তির চেষ্টা!

ডি ভ্যালেরার জয়

আইরিশ সাধারণ নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরারই জয় হইল। তাঁহার শত্রুপক্ষ বলিতেছেন, জয় সূক্ষ্মসূত্রের উপর ঝুলিতেছে, কেন না, তাঁহার দলের এমন জয় হয় নাই, যাহাতে তিনি তাঁহার পক্ষের absolute majori y অর্থাৎ নিশ্চিত ভোটাধিক্যের বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন।

তাহা না হউক, কিন্তু এই জয়ের ফল দেখিয়া ইহা ত নিশ্চিত হইয়া বলা যায় যে, আয়া ্যাণ্ডে রাজনৈতিক মতবাদের হাওয়া কোন্ মুখে বহিতেছে? ডি ভ্যালেরার নীতি সুস্পষ্ট, তন্মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, যথা,—(১) রাজানুগত্য শপথ-বর্জ্জন, (২) ইংলণ্ডের বাণিজ্যাধীনতা ও অর্থব্যবস্থাধীনতা পরিহার, (৩) দেশের শান্তিরক্ষায় আত্মনির্ভরতা, (৪) সাম্রাজ্যের মধ্যস্থ থাকা না থাকা ইচ্ছাধীন হইবার কথা।

ইহাকে একরূপ স্বাধীনতাই বলা যাইতে পারে। অন্যান্য উপনিবেশ এখনও রাজানুগত্যের শপথ মানে, কিন্তু ডি ভ্যালেরা তাহাও মানিতে চাহেন না। আর তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের ঋণ শোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত ও সালিস চাহেন। এ সকল কথায় বৃটেনের আপত্তি থাকিবেই। কিন্তু যখন সাধারণ নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার জয় হইল, তখন আয়ার্ল্যাণ্ড-বাসীরা, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক—কি চাহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রহ্মের বেলায় যেমন বলিতেছেন, উহারা নিজের মঙ্গল বুঝে না (কারণ, তাহারা বিচ্ছেদ-বিরোধী), তেমনই আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলায়ও বলিবেন, আইরিশরা নিজের মঙ্গল বুঝিতেছে না?

কিশোরীর বিস্ময়

বেদনার ধন তুই কোথা বাঁধি কোথা থুই,
হেরে তোরে ভাসি আঁখি-জলে,
সাধনার ধন, তোরে পেয়ে মোর বুক ভ'রে,
সুধারস হৃদয়ে উথলে।

জীবনের সব আশা তোর চোখে বাঁধে বাসা,
সব দুখে সান্ত্বনা যে পাই,
হেরি তোর ও আনন উদ্বেগে ভরে যে মন
ভয় হয় হারাই হারাই।
নহে হর্ষ, নহে ব্যথা সব চেয়ে বড় কথা,
তুই মোর বিস্ময়ের ধন!
কি অপূর্ব্ব! কি অদ্ভুত! ওরে শিশু স্বর্গ-দূত!
ছিলি নাকি এ দেহে গোপন?
বিস্ফারিত দুনয়ন বিস্ফারিত এ জীবন,
স্তম্ভিত এ চঞ্চল হৃদয়,

স্বপ্ন লভে সার্থকতা মূর্ত্তি ধরি', একি কথা
অলৌকিক এ কি এ বিস্ময়।
মূর্চ্ছাপন্ন মোহ-ঘোরে আমি যবে ছিনু প'ড়ে,
জানি না কে ছিল মোর পাশে,
কাঁদনের শব্দ পেয়ে চোখ মেলি দেখি চেয়ে
এসেছিস্ সেই অবকাশে।
এর থেকে কি বিস্ময় আছে আর, বিশ্বময়
পাই নাক খুঁজে এর জুড়ী,
আমারই জীবন-পথে নেমেছিস্ স্বর্গ হ'তে,
এই দেহ বিস্ময়ের পুরী।

মাঝপথে দেহ-বনে ছিলি কোথা সংগোপনে
মূর্ত্তিমান্ অপূর্ব্ব বিস্ময়,
তারি লাগি হৃতজ্যোতিঃ এই দেহটার প্রতি
হইয়াছে শ্রদ্ধার উদয়।

শ্রীকালিদাস রায়



ক্যানানোর—তীরবর্ত্তী ধীবর-কুটীর-শ্রেণী, এখানে পোর্ত্তুগাল পোতবহর সমবেত হইয়াছিল

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মানোয়েল পোর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফার্দ্দিনান্দ ম্যাগেলান তখন পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের কিশোর। এই কিশোরই অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জলপথে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ অপূর্ব্ব ব্যাপার। বহু জ্ঞাতব্য তথ্য তাই ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই বালক এক দিন পল্লীগ্রাম হইতে লিসবন সহরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম জাহাজ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন হইতেই বালকের মনে অর্ণবযান সম্বন্ধে একটা নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজা মানোয়েল সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পৃথিবীর সকল স্থানেই রাজ্যবিস্তারের বা ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে নূতন স্থান আবিষ্কারের উচ্চাশা পোষণ করিতেন। এ জন্য পোর্ত্তুগালের বন্দর লিস্‌বনে জাহাজ নির্ম্মাণের এবং সমুদ্র-যাত্রার বিশেষ আয়োজন হইতেছিল।

ফার্দ্দিনান্দ ম্যাগেলান—কিশোর পোর্ত্তুগীজ তখন



কলম্বো—মালপত্র বহনের জন্য বলদবাহিত গাড়ী

লিসবনেই থাকিতেন। সমুদ্রযাত্রার অদম্য নেশায় বিভোর হইয়া কিশোর ম্যাগেলান জাহাজের "কেবিন-বয়" হিসাবে কায গ্রহণ করেন। ১৪৯৫ হইতে পর পর ৯ বৎসর তিনি কি ভাবে কায করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিশদভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নাম ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে।



ম্যাগেলানের অধুনা ব্যবহৃত গরুর গাড়ী

ভারতবর্ষ, ইথিওপিয়া, আরব ও পারস্যদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচার এবং স্থান-সংগ্রহকল্পে পোর্ত্তুগালের বন্দর হইতে যে অর্ণবপোত-বহর সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল, তাহাতে ম্যাগেলান ছিলেন। ক্যানানোরের অদূরে যে শত্রুপোতের সহিত পোর্ত্তুগীজ নৌবাহিনীর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ম্যাগেলানের নাম আহতদিগের তালিকাভুক্ত হয়।

মুরদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া—পোর্ত্তুগীজদিগকে তাহারাই বাণিজ্যের প্রধান শত্রু বা প্রতিযোগী বলিয়া গণনা করিয়াছিল—প্রত্যেক বন্দর হইতে নৌ-বহর কালিকটের সান্নিধ্যে সমবেত হয়। ১১খানি পোর্ত্তুগীজ জাহাজকে আক্রমণ করিবার জন্য ৮৪ খানি দেশীয় জাহাজ এবং ১২৫খানি পোত সমবেত হইয়াছিল।

সমুদ্রে রক্তস্রোত বহিয়া চলিল। মৃতদেহ পরদিবস উপকূললগ্ন হইতে লাগিল। জেতৃগণ মৃতদেহের সংখ্যা গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্ষান্ত হইল। ৩ হাজার ৬ শত সংখ্যা গণনা করিবার পর আর মৃতদেহ গণনা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও রহিল না। পোর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে ৮০ জন নিহত হইয়াছিল, ২ শত জন আহত হইয়াছিল। সেই দলে ম্যাগেলানের নাম ছিল। মুরগণ পোর্ত্তুগীজদিগের হতাহতের সংখ্যা যাহাতে জানিতে না পারে, সে জন্য পোর্ত্তুগীজরা মৃতদেহগুলিকে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত করিল। আহতগণকে তীরে লইয়া গিয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা হইল।

আহতগণ আরোগ্যলাভ করিলে ম্যাগেলানের জাহাজ কোচিনে ফিরিয়া গেল। তখন দেশীয় নৃপতিগণ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গন্ধ-মশলার জাহাজগুলি বিনষ্ট হওয়ায় মিশরের সুলতানের প্রাপ্য শুল্ক আহৃত হইল না। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করিলেন। প্রথম যুদ্ধে রাজপ্রতিনিধি আলমিডার প্রিয় পুত্র লোরেঙ্কো নিহত হন।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এবং পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আলমিডা ডিউ অভিমুখে পোতবহরসহ ধাবিত হইলেন। "হোলি ঘোষ্ট" নামক পোতে ম্যাগেলান

ছিলেন। উহার অধ্যক্ষ পেরিরা শত্রুপক্ষের পোত আক্রমণ করিলেন। কামানের গোলায় বিপক্ষপোত বিধ্বস্ত হইল। পরে হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে বিপক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল। কিন্তু পেরিরাও যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। ম্যাগেলান পুনরায় আহত হইলেন। কিন্তু পোর্ত্তগালের শক্তি প্রাচ্যসমুদ্রে স্বীকৃত হইল।

ম্যাগেলান পুনরায় কোচিনে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় পোর্ত্তগাল হইতে আর এক প্রস্থ অর্ণবযান আসিয়া পৌঁছিল। উহার অধ্যক্ষ ছিলেন ডায়োগো সেকুইরা। এই পোতবহর মলক্কা দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিল। চারিখানি পোত পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া আলমিডা আর একখানি পোত প্রেরণ করিলেন। গার্সিয়া ডি সুসা উহার অধ্যক্ষ। ম্যাগেলান এবং ফ্রান্সিস্কো সেরাও সেই পোতের আরোহী ছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে বিশ্বের মানচিত্রের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়।



ম্যাগেলান-পরিচালিত পোতবহর

এই ক্ষুদ্র পোত-বহর সিংহল হইয়া সুমাত্রায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়া ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মলক্কায় উপনীত হয়। ইহার পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপীয় পোত এই সমুদ্রে পাড়ি দেয় নাই। য়ুরোপ বহুদিন হইতেই মলক্কার গন্ধ-মশলার স্বপ্ন দেখিত। পোর্ত্তগীজগণ যখন আরব, বর্ম্মা, যবদ্বীপবাসী এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যবসায়ীদিগের সহিত তীরে অবতীর্ণ হইল, তখন সেখানে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ব্যবসায়ীরা, দালালরা, গুদামদার, বাঙ্গালী বণিক্, সকলেই কালিকটের কাহিনী শুনিয়াছিল। কোচিন, কালিকট পোর্ত্তগীজকে বাধা দিতে গিয়া কি ফল লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল।

মলক্কার রাজা ম্যানোয়েলের দূতগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এমন শিষ্টাচারের সহিত তিনি দূতগণকে অভ্যর্থনা করিলেন যে, কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইল না। লঙ্কাব্যবসায় উপলক্ষে দেশীয়গণ দলে দলে জাহাজের চারিপার্শ্বে সমবেত হইল। গার্সিয়া ডি সুসা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। তিনি মলক্কার রাজার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সেকুইরার জাহাজে ম্যাগেলানকে পাঠাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।



লিসবনের ফেরিওয়ালা

নৌ-সেনাপতি তখন দাবা খেলিতেছিলেন। ৮ জন ভীমদর্শন মলয়বাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া খেলা দেখিতেছিল। ২৪ বৎসরবয়স্ক ম্যাগেলান,



ম্যাগেলানের সময়ে মম্বাসার কাফ্রী নর্ত্তক

নৌ-সেনাপতির কাণে কাণে সতর্ক-বাণী জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বাহ্য অবিচলিতভাবে এক জন নাবিককে সতর্ক হইতে বলিলেন। কিন্তু দাবার ছক হইতে মুখ তুলিলেন না।

নাবিক উপর হইতে দেখিল, এক জন মালয় সিকোয়েরার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কিরীচ অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া রহিয়াছে। আর এক ব্যক্তি তাহাকে সঙ্কেত করিল, এখনও হত্যার আদেশ আসে নাই। সেই নাবিক আবার দেখিল, সেরাও সদলবলে তীরাভিমুখে দৌড়িয়া আসিতেছেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতক!" সিকোয়েরা এক লম্ফে পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। নাবিকগণ তাঁহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল। মালয়রা জাহাজ হইতে পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে সেরাও একখানি নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। দেশীয় নৌকাগুলি উঁহার চারি পার্শ্ব বেষ্টন করিল। তখন ম্যাগেলান আর এক জন সঙ্গীর সহিত নৌকা করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ দ্রুত ধাবিত হইলেন। পোর্ত্তুগীজ নৌ-সেনাপতি যাবতীয় পোর্ত্তুগীজ পোতকে নোঙ্গর তুলিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। পোর্ত্তুগীজ কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্রদেশীয় নৌকাগুলি মোচার খোলার মত সমুদ্র-সমাধি লাভ করিল।

এই ঘটনায় ম্যাগেলানের সহিত সেরাওর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সংকল্প এই বন্ধুত্ব অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিল।

ম্যাগেলান উল্লিখিত ঘটনার পর পুনরায় প্রাচ্যদেশে প্রেরিত হইলেন। মলক্কা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। কোচিনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাকে দেশে ফিরিবার আদেশ দেওয়া হইল। লিস্‌বনগামী পোতবহরের দুইখানি জাহাজ লাক্কাদ্বীপের কাছে চড়ায় বাধিয়া গেল। তন্মধ্যে একখানি জাহাজে ম্যাগেলান ছিলেন। ছোট ছোট নৌকাগুলিতে জাহাজের নাবিকদিগকে তীরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু নৌকাগুলিতে সকলের স্থান-সংকুলান হইল না। তখন তর্ক উঠিল, কাহারা অগ্রে যাইবে? কাপ্তেন, পদস্থ ব্যক্তিরা বা সাধারণ নাবিকগণ?

ম্যাগেলান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নাবিকগণ সহ প্রতীক্ষা



মাডুরাদ্বীপের বস্ত্রশিল্প

করিতে চাহিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারত হইতে তাঁহাদের জন্য সাহায্য প্রেরিত হইবে। নাবিকগণের সঙ্গে সেরাও সেই দলে ছিলেন। এই-রূপে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হইল।

মলক্কার সুলতানের ব্যবহারের প্রতিশোধ দিবার জন্য নূতন ভাইসরয়, আলবুকার্ক রণপোতবহর সাজাইয়া যখন মলক্কার অভিমুখে প্রেরণ করেন, তখন সেরাও এবং ম্যাগেলান সেই দলে ছিলেন। পোতবহর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া যখন কামান দাগিল, তখন দূত জাহাজে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ইহা যুদ্ধের আয়োজন, না শান্তি?

আলবুকার্ক উত্তর দিলেন, "যাহা অভিরুচি।" সুলতান এক কাণে মুরদিগের কথা শুনিতে লাগিলেন, অন্য কাণ দিয়া পোর্ত্তুগীজদিগের আবেদন শুনিলেন। চীনারা বুদ্ধিমান্, তাহারা অবস্থা বুঝিয়া সত্বর অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে তরী ভাসাইয়া দিল। আলবুকার্ক তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বিরাট যুদ্ধাভিনয় দেখ। তার পর পোর্ত্তুগালের কাহিনী চীনদেশে প্রচার করিও।"



যবদ্বীপের ফল-বিক্রেতা



মলক্কাবন্দরে মাল-বোঝাই

স্থলপথে আক্রমণের জন্য আল্‌বুকার্ক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পোর্ত্তুগীজ ইতিহাস-লেখক যুদ্ধের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, সুলতানের ২০ হাজার সৈন্য, মুর এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির সেনাবলের সাহায্যে ১৪ শত পোর্ত্তুগীজকে বাধাপ্রদানের জন্য প্রস্তুত হইল। মালাবারী



সিলিবিস্‌ দ্বীপের তরুণীরা অশ্বারোহণে কাযে যাইতেছে

পোর্ত্তুগীজরা যোদ্ধবর্গকে আক্রমণ না করিয়া চলমান হস্তিযুথকেই আক্রমণ করিল। কতকগুলি সৈনিক হস্তিযুথের আঘাতে ভূপতিত হইল। অনেকগুলি হস্তী সেনাদলকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিল, বাকীগুলি ভয়ে অরণ্যে পলায়ন করিল। সুলতানের পরাজয় ঘটিল।

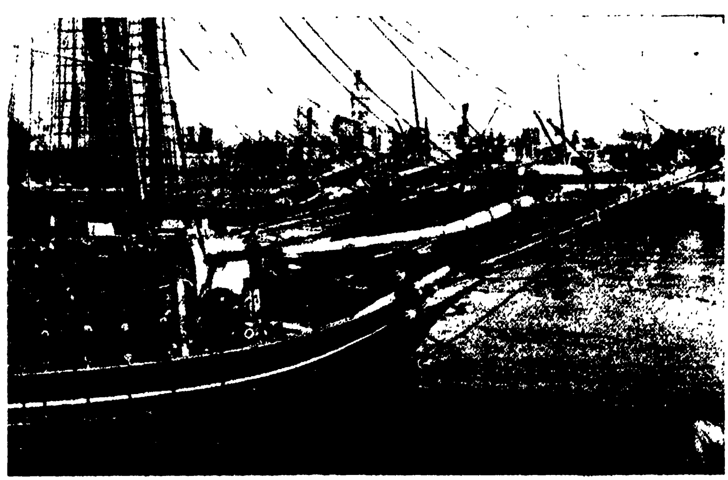
নগর লুণ্ঠন করিয়া পোর্ত্তুগীজরা এত ধনরত্ন পাইল, যাহা তাহারা কখনও কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। বহু মূল্যবান্ অস্ত্র, বর্ম্ম, মহার্ঘ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আধার, পিত্তলনির্ম্মিত তৈজসপত্র, ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি এবং একটা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত কামান পোর্ত্তুগীজরা অধিকার করিল।

তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লাভ হইল মলক্কা দ্বীপ। ইহার বন্দরে অসংখ্য প্রাচ্যদেশীয় পোত পণ্য-সংগ্রহের জন্য সমবেত হইত। মলক্কাজয়ে পোর্ত্তুগীজরা ক্যাথে প্রভৃতি স্থানে অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল। তখন আরও পূর্ব্বভাগে পোর্ত্তুগীজ নৌ-বহর

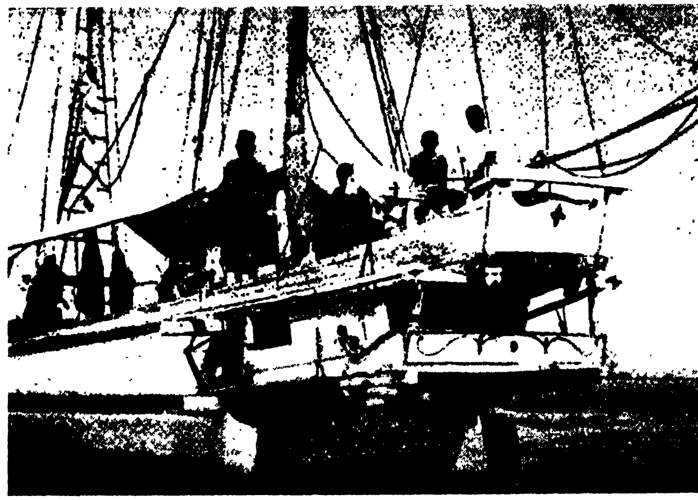
তীরন্দাজরাও সুলতানের পক্ষে যোগ দিয়াছিল।

যবদ্বীপের যোদ্ধগণ পতাকা উড্ডীন করিয়া অলঙ্কৃত বস্ত্র ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। সুলতানের হস্তিযুথ তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। সুলতান স্বয়ং রত্নখচিত হাওদার উপর বসিয়াছিলেন। পদাতিক সেনাদল সুলতানের দেহরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

হস্তিযুথের সহিত যুদ্ধ পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট অভিনব ব্যাপার।



মনটিভিডিও বন্দরে মাল-বোঝাই



ম্যাগেলানের সমুদ্রযাত্রায় এই জাতীয় পোত ব্যবহৃত হয়

পাল উড়াইয়া চলিল। আলবুকার্ক গোয়ায় ফিরিয়া গেলেন।

যে সকল পোত পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিল, ইতিহাসপাঠে জানা যায়, তাহার একখানির অধ্যক্ষ ছিলেন, ম্যাগেলান। আর একখানি জাহাজের কর্ত্তা ছিলেন ফ্রান্সিস্কো সেরাও। উত্তর-যবদ্বীপ এবং মাডোয়েরা (মাদুর) পরিভ্রমণ করিয়া পোতগুলি সিলিবিস দ্বীপ দেখিতে পাইল। তখন জাহাজ-গুলি বান্দা সমুদ্রে যাত্রা করিল। আম্বোইনা ও বান্দা হইতে লবঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য জাহাজগুলি বোয়েরোদ্বীপে নোঙ্গর করিয়াছিল। পোতগুলি দ্রব্যসম্ভারে এমন পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, তাহারা তখন আর টার্ণেট দ্বীপে যাইবার সুবিধা পাইল না। পোতবহর মলক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বান্দা দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে সেরাও-পরিচলিত পোত জলমগ্ন হয়। এইখানে একটা দ্বীপ ছিল। জলদস্যুগণ এইখানে আশ্রয় লইত। সেরাও কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়া পরবর্ত্তী কালে টার্ণেট দ্বীপের শক্তিশালী রাজার পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। এইখান হইতে তিনি লিস্‌বনে ম্যাগেলানের নিকট অসংখ্য পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রগুলি পাইয়া ম্যাগেলান পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত হন। কিন্তু সে সময়ে তিনি উত্তর-আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আফ্রিকার মুরগণ জানিয়াছিল যে, পোর্ত্তুগীজরা প্রাচ্যদেশে তাহাদের পণ্য লইয়া যাইতেছে। এ জন্য তাহারা বিদ্রোহী হইয়া পোর্ত্তুগীজকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। রাজা ম্যানোয়েল এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করিবার জন্য প্রবল রণপোত-বহর তথায় প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ম্যাগেলান চরণে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। বর্শার আঘাতে জানুর নিম্নভাগে এমন ভাবে তিনি আহত হইয়াছিলেন যে, তাহার ফলে তিনি জন্মের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছিলেন।



বান্দা দ্বীপে জয়ত্রী শুষ্ক করা হইতেছে

ম্যাগেলান, সমুদ্রযাত্রা—সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। লিসবনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি মনে করিলেন, রাজার নিকট তিনি প্রাচ্যদেশে থাকিবার প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবী আবিষ্কারের সংকল্পের কথা প্রকাশ করিবেন না। রাজাকে তিনি আবেদন করিলেন। রাজা কিন্তু তাঁহার এই আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি



বোর্ণিওর বারিটোনদীতে কুম্ভীরের আধিক্য

জন প্রতিপত্তিশালী ও ধনী পোর্ত্তুগীজের গৃহে অভ্যর্থিত হইলেন। বার্ব্বোসা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়াট্রিস নাম্নী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। ম্যাগেলান দুই মাস পরে বিয়াট্রিসের পাণিগ্রহণ করেন।

ম্যাগেলান তাঁহার পরিকল্পনার কথা স্পেনের ভারতীয় বিভাগে পেশ করিলেন। উহা অনতিবিলম্বে উপেক্ষিত হইল। কিন্তু সেই কার্য্যালয়ে এক জন দূরদর্শী কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম জুয়ান ডি আরাণ্ডা। তিনি কিন্তু ম্যাগেলানের প্রস্তাবে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ম্যাগেলান সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় লইয়া তিনি ম্যাগেলানের প্রস্তাবিত বিষয় সার্থক করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

স্পেনের কিশোর রাজা পঞ্চম চার্লসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, কিন্তু ব্যয়ভার বহন করিবে কে? রাজার তহবিল তখন শূন্যপ্রায়। ম্যাগেলান দরিদ্রের ন্যায় ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ফেলিরো দরিদ্র ছাত্র মাত্র। সেই সময় ক্রিষ্টোফার ডি-হারো নামক এক জন প্রচুর অর্থশালী ব্যক্তি

ম্যাগেলানকে জানাইলেন, অপেক্ষা কর; এত ব্যস্ত কেন? ভাস্কো ডা গামা ১৮ বৎসর অপেক্ষার পর তবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সুতরাং ম্যাগেলানের আবেদন পরিত্যক্ত হইল।

ম্যাগেলান মনে মনে আহত হইলেন, কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি সামুদ্রিক ব্যাপার লইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সেরাও তখন মলক্কায় ছিলেন। ম্যাগেলান তাঁহাকে লিখিলেন, আমি শীঘ্র তোমার সহিত মিলিত হইব। পোর্ত্তুগাল হইতে যদি যাইতে না পারি, স্পেন হইয়া যাইব।

বহুকাল গবেষণার পর ম্যাগেলান স্পেন দরবারে তাঁহার সংকল্পের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। একাই তিনি স্পেনরাজের সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবিদ্ ফেলিরোর সহিত তিনি দীর্ঘকাল এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাগেলান তাঁহাকে এ যাত্রা সঙ্গে লইলেন না। পরে তিনি ম্যাগেলানের সহিত মিলিত হইবেন, এইরূপ কথা রহিল।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সেভিলিতে আসিয়া তিনি ডাকযোগে বর্ব্বোসা নামক এক



বর্ত্তমানের প্যাটাগোনীয় ইণ্ডিয়ান

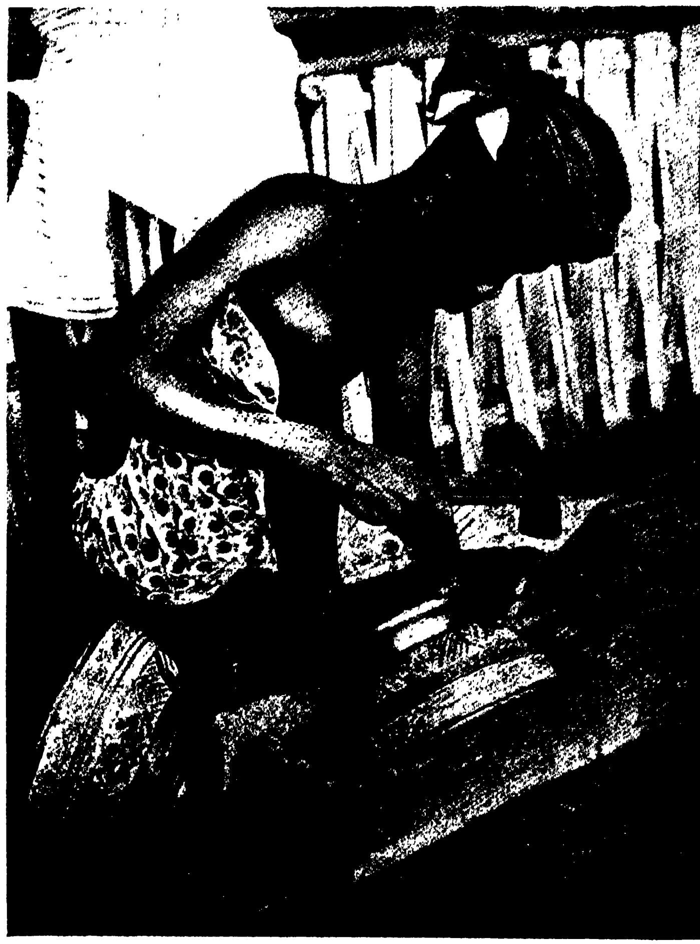
স্পেনে আসিলেন। পোর্ত্তুগালের উপর তাঁহার ভীষণ ক্রোধ ছিল। তাঁহার পণ্যপূর্ণ একটি পোতবহর রাজার জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। পোর্ত্তুগালের রাজার নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিয়া তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। তিনি ম্যাগেলানের প্রস্তাব শুনিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অর্থ-সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্পেনের রাজার সহিত আলোচনার পর তিনি ম্যাগেলানকে অনুমতি দিলেন। স্থির হইল, ম্যাগেলান ৫ খানি জাহাজ পাইবেন। ২ শত ৩৪ জন নাবিকও তিনি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। দুই বৎসরের জন্য ম্যাগেলান তাহাদের কর্তৃত্ব করিবেন। দশ বৎসরের জন্য ম্যাগেলানের পথে অন্য কোনও অভিযান তিনি প্রেরণ করিবেন না। কিন্তু এই পোতবহর কোনও মতেই তাঁহার পরমাত্মীয় পোর্ত্তুগালরাজের অধিকৃত কোনও দেশ আক্রমণ করিতে পাইবে না।

জলযাত্রার ফলে যাহা লভ্য হইবে, তাহার ২৫ ভাগের এক ভাগ ম্যাগেলান ও ফেলিরো পাইবেন। যদি ৬টি দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়, তবে তাহার যে কোনও দুইটিতে পণ্য-সম্ভার প্রেরিত হইবে বা তথা হইতে আহৃত হইবে, তাহার লভ্যাংশের এক-পঞ্চদশাংশ ম্যাগেলান ও ফেলিরো পাইতে পারিবেন। রাজা এক জন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। তিনি লাভ-লোকসানের হিসাব রাখিবেন। ম্যাগেলান ও ফেলিরো পোতবহরের প্রধান অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইলেন।

বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাত্রা সুরু হইল, পঞ্চ জাহাজ ক্রয় করা হইল: এণ্টোনিও, ট্রিনিডাড, কন্সেপ্সন্, ভিক্টোরিয়া, স্যান্টিয়ানো। ম্যাগেলান ট্রিনিডাড পরিচালনের ভার লইলেন, ফেরিও স্যান্টিয়ানো পরিচালন করিবেন স্থির হইল।

১৫১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র পোতবহর সান্‌লুকারএ পৌছিল। ৬ দিনে ক্যানারি দ্বীপে জাহাজ পৌছিলে পর ডায়োগো বর্ব্বোসা গোপনে ম্যাগেলানের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন যে, কার্টাগেনা নামক ক্যাপ্টেন ম্যাগেলানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে।



যবদ্বীপের শিল্পী

ম্যাগেলান শ্বশুরকে জানাইলেন, নাবিকগুলি ভালই হউক বা মন্দই হউক, উহাদিগকে লইয়াই তাঁহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে।

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ হইতে পোতবহর দক্ষিণাভিমুখে গিয়া ক্রমে দক্ষিণপশ্চিমদিক্ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। এক দিন সকালে দেখা গেল, এণ্টেনিওর ক্যাপ্টেন কার্টাগেনা অভিযোগ করিল যে, ম্যাগেলান যে

পথে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সে পথ হইতে অন্যদিকে চলিয়াছেন। ম্যাগেলান আদেশ করিলেন, তাঁহার পোতের পতাকা অনুসরণ করিয়া সকলকে অনুগামী হইতে হইবে।

দুই সপ্তাহ অনুকূল পবনে, তিন সপ্তাহ স্থিরসমুদ্রে পোতবহর চলিল। তার পর এক মাস ধরিয়া ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে পোতবহর চঞ্চল হইয়া উঠিল। গতি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হওয়াতে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল হ্রাস পাইল। এ জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন প্রাপ্ত বরাদ্দের হার কমান হইল। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থা দাঁড়াইল কার্টাগেনার ব্যবহারে। এক দিন অপরাহ্ণে ম্যাগেলানকে অভিবাদন করিবার সময় তাঁহার পদবী ইচ্ছাপূর্ব্বক উচ্চারণ না করিয়া কার্টাগেনা ম্যাগেলানকে অপমান করিল। ম্যাগেলান এ জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। উত্তরে কার্টাগেনা জানাইল, ভবিষ্যতে এক জন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিবে; সেই ম্যাগেলানকে অভিবাদন করিবে।



সুমাত্রার বাটকগ্রাম

ম্যাগেলান কোন কথা বলিলেন না। কয়েক দিন পরে জাহাজের ক্যাপ্টেনগুলিকে ম্যাগেলানের জাহাজে আহ্বান করা হইল। সেখানে সামরিক বিচার হইবে। ম্যাগেলান তাহার অপমানজনক কথায় নীরব থাকায় কার্টাগেনা প্রকাশ্যভাবে ম্যাগেলানের নৌ-পরিচালন-বিদ্যার সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সমবেত হইলে, ম্যাগেলান কার্টাগেনার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলিলেন, "তুমি বন্দী।" ক্যাপ্টেন তাহার অনুচরবর্গকে প্রতিশোধ দিবার জন্য আহ্বান করিল। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। এণ্টোনিও ডি কষ্টা তখন এণ্টোনিও জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

পোতবহর চলিল। ক্রমে দক্ষিণ-আমেরিকার পার্নাম্বিউকো বা রেসিফির নিকট উপস্থিত হইল। পাহাড়-বেষ্টিত একটি বন্দরে পোতবহর প্রবেশ করিল। অন্তরীপের নাম ফ্রিও, বন্দরের নাম রায়ো। ম্যাগেলান উহার নাম রাখিলেন সাণ্টা লুসিয়া উপসাগর। এখান হইতে জাহাজে কাষ্ঠ ও জল সংগ্রহ করা হইল। মুরগী, মিঠা আলু, আনারস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এখানে মিলিল। সকলে পরিতোষসহকারে সুখাদ্য ভোজন করিল। দেশীয়দিগের সহিত পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ঐ সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল।

বড়দিনের পরদিবস পোতবহর সে স্থান ত্যাগ করিয়া

দক্ষিণদিকে যাত্রা করিল। সাণ্টামারিয়া অন্তরীপের কাছে আসিয়া জাহাজগুলি থামিল। তখন সমুদ্রে ঝড় ছিল। জাহাজ দেখিয়া দেশীয়গণ ডোঙ্গা করিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। ডিঙ্গী করিয়া নাবিকগণ তীরে পৌছিতেই দেশীয়রা উভরড়ে পলায়ন করিল।

রাত্রিকালে এক জন ইণ্ডিয়ান্ চর্ম্মাবৃত-দেহে ম্যাগেলানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইল। তিনি আগন্তুককে তুলার জামা এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল একটি কোট দিলেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত একটা পাত্রও তাহাকে দেখাইলেন। আগন্তুক সঙ্কেতে জানাইল যে, রৌপ্যের ব্যবহার তাহাদের দেশে আছে।

ম্যাগেলান নদীর অধিকাংশ স্থান ১৫ দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুপেয় জল আবিষ্কার করেন। জুয়ান ডি-সলিন পূর্ব্বে এই স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অকালে সে কার্য্য বন্ধ হয়।

তথা হইতে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়া পোতবহর এমন অনেক জলপথ আবিষ্কার করিল, যাহার সাহায্যে মলক্কা দ্বীপ অভিমুখে যাওয়া যাইতে পারে। সমুদ্রের একটি অংশকে ম্যাগেলান "সান্ মাটিয়াম" উপসাগর নামকরণ করেন। এই উপসাগরের উপকূলভাগ হইতে পোতবহর কাষ্ঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়াছিল। এইখানে পেন্গুইন-জাতীয় আরণ্য বা সমুদ্রচর হংস আবিষ্কার করেন।



টার্নেট দ্বীপের পুরাতন দুর্গের অংশ—সেরাও এখানে ছিলেন

ঝটিকাবর্ত্তে পীড়িত ও বিপন্ন হইয়া পোতবহরগুলি "পুয়ের্টো সান্ জুলিয়ান"এ আশ্রয় লইল। এইখানে ম্যাগেলানকে একটা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। নাবিকগণ দীর্ঘকাল সমুদ্র-যাত্রার ফলে গৃহে ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সমুদ্রপথে নানাপ্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া তাহারা এমনই মানসিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, গৃহসুখলালায়িত চিত্তগুলি বিক্ষুব্ধ এবং নিরুৎসাহ হইয়া উঠিতেছিল। শীত আসন্নপ্রায়, আটলাণ্টিক সমুদ্রে অভিযানের নীরস চিত্র তাহাদিগকে অত্যধিকমাত্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ম্যাগেলান ইহা বুঝিয়াছিলেন। মৎস্য এবং পক্ষি-মাংস প্রচুর মিলিবে, ইহা অনুমান করিয়া তিনি রুটী ও মদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ নাবিকগণের ব্যবহারে প্রকাশ পাইল। তিন জন ক্যাপ্টেন নাবিকগণের সহিত যোগ দিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, যে প্রণালী আবিষ্কারের জন্য এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ, সেরূপ প্রণালী নাই। ম্যাগেলান উত্তরে জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই প্রণালী

আছে এবং তাহা আবিষ্কার করিতেই হইবে; রাজার সেইরূপ হুকুম। সে কায শেষ না করিয়া কাহারও ফিরিবার উপায় নাই।

ইষ্টার পর্ব্বের দিন ম্যাগেলান জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকগণ—সকলকেই তাঁহার জাহাজে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শুধু এক জন সে আহ্বানে সাড়া



সেভিলির সজ্জী

দিলেন। তাঁহার নাম মালবারো ডি মেস্‌কুইটা। তিনি সম্পর্কে ম্যাগেলানের ভ্রাতা। এণ্টোনিও জাহাজে তিনি সম্প্রতি অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন।

পরদিবস প্রভাতে এণ্টোনিও জাহাজের কতিপয় নাবিককে তীর হইতে জল আনয়ন করিবার জন্য ম্যাগেলান একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এণ্টোনিও জাহাজের কাছে যাইবামাত্র জাহাজ হইতে উত্তর আসিল যে, পোতবহরের কর্ত্তা ম্যাগেলান নহেন, কোয়েসাডা।

নৌকা ফিরিয়া আসিয়া ম্যাগেলানকে সংবাদ দিল। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। সান্টিয়াগো জাহাজ ব্যতীত অন্য পোতগুলি হইতে বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। অবশেষে চরম সর্ত্ত লইয়া একখানি নৌকা ম্যাগেলানের জাহাজে আসিল। যদি পুরা আহার্য্যের বন্দোবস্ত হয় এবং পোর্ত্তুগালে ফিরিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবেই সকলে আবার তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া লইবে।

আলোচনার জন্য তিনি সকল ক্যাপ্টেনকে আপনার জাহাজে আহ্বান করিলেন। তাহারা বলিয়া পাঠাইল যে, তিনি এণ্টোনিও জাহাজে আসিলে সে কার্য্য হইতে পারিবে। ম্যাগেলান নৌকাখানিকে গ্রেপ্তার করিলেন। কোয়েসাডা কার্টাগেমা এবং জুয়ান্‌ডেল কানো ৩০ জন সশস্ত্র নাবিক লইয়া এণ্টোনিও জাহাজে রাত্রির অন্ধকারে আরোহণ করিল এবং বিশ্বস্ত মেস্‌কুইটাকে তাঁহার কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিল। এই সংঘর্ষে জাহাজের প্রধান পরিচালক লরিয়াগাকে আকৃষ্ট করিল। বিশ্বস্ত বাস্ক বিদ্রোহীদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করিল। বিদ্রোহীরা তাহাকে তখনই ছোরার আঘাতে হত্যা করিল। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাহাদের আক্রমণে পরাভূত হইল। জাহাজের ভাণ্ডার-ঘর খুলিয়া তাহারা রুটী ও মদ্য পান করিতে লাগিল।

কোয়েসাডা এণ্টোনিও জাহাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিল। কার্টাগেনাকে তাহার নিজের জাহাজে পাঠাইয়া দিল। মেনডোজা গোড়া হইতেই বিদ্রোহী ছিল। সে ভিক্টোরিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিল। [illegible]

পোত, অপর দিকে দুইখানি। এক দলে ৯৮ জন, অপর দিকে ১ শত ৭০। দুইখানি জাহাজ তিনখানিকে আক্রমণ করিতে পারে না। ম্যাগেলান কৌশল অবলম্বন করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি একখানি ছোট ডিঙ্গীতে ৫ জন লোক পাঠাইলেন। এস্পিনোজা তাহাদের নেতা। তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিল। নৌকাখানি ভিক্টোরিয়া জাহাজের দিকে চলিল। কারণ, সে জাহাজে খুব অল্প-সংখ্যক স্পানিয়ার্ড ছিল। মেনডোজাকে টি নিডাড জাহাজে যাইবার জন্য পত্র লইয়া তাহারা গেল। মেন-ডোজা উহা পড়িয়া হাসিল এবং আদেশ পালন করিবে না জানাইল। ম্যাগেলানের উপদেশানুসারে এসপিনোজা তখনই তাহাকে ছোরার আঘাতে মারিয়া ফেলিল। ঠিক সেই সময়ে আর এক-খানি বড় নৌকায় ১৫ জন সশস্ত্র লোক ম্যাগেলানের জাহাজ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল।

অধ্যক্ষের মৃত্যুতে ভিক্টো-রিয়া জাহাজের নাবিকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে অনেকেই ম্যাগে-লানের প্রতি অনুরক্তও ছিল। সুতরাং ভিক্টোরিয়া জাহাজ টি নিডাডের পার্শ্বে ভিড়িল। সান্টিয়াগোও তাহার পার্শ্বে আসিল। তখন জাহাজগুলি একটি বন্দরে প্রবেশ করিতেছিল। অপর দুইখানি জাহাজ অবস্থা দেখিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। ম্যাগে-লান তাহা বুঝিয়া প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের জাহাজে পাথর, লাঠি এবং বর্শা প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত হইল। রাত্রিকালে বিদ্রোহীরা সরিয়া পড়িতে পারে; সুতরাং ম্যাগেলান প্রস্তুত হইলেন।

সেই রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকাও দেখা দিল। ঘোর অন্ধকারে সতর্ক প্রহরীরা দেখিল, এন্টোনিও জাহাজ নোঙ্গর তুলিতেছে। সেই সময় ঝটিকাবেগে জাহাজখানি টি নি-ডাডের পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। ম্যাগেলানের জাহাজের নাবিকগণ তখনই বিদ্রোহী জাহাজের উপর দ্রুতবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল।



গুয়ামদ্বীপের রাজার কন্যা

কোয়েসাডা একখানি ঢাল ও একটা বর্শা লইয়া নিজের দলের নাবিকগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। সে বাস্তবিক এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ম্যাগে-লান কিন্তু প্রস্তুতই ছিলেন। বিদ্রোহীরা তখন অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, আর উপায় নাই। তখন তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল। কোয়েসাডা ও তাহার মতাবলম্বীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মেসকুইটাকে মুক্তি দেওয়া হইল।

৪ খানি জাহাজ যখন পঞ্চম জাহাজকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল, তখন কার্টে-গেনা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। বিচার হইল; ৪০ জন অপরাধী, বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল; কিন্তু ম্যাগেলান তিন জন ছাড়া আর সকলকেই ক্ষমা করিলেন। কোয়েসাডাকে হত্যা করা হইল, কার্টেগেনাকে সমুদ্রতীরে পরিত্যাগ করা হইল। তৃতীয় ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইল।

বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা হইলেও তখনই মুক্তি দেওয়া



গোয়া—পোর্ত্তুগালের ভারতীয় উপনিবেশ

হইল না। তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইল। এপ্রেলের শেষভাগে বিশ্বস্ত সেরাওকে সান্টিয়াগো জাহাজ লইয়া দক্ষিণ উপকূল-সমূহের সন্ধানে ম্যাগেলান প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৩৭ জন বাছা-বাছা লোক ছিল।

সেরাওর পোত চলিতে চলিতে একটা নদীর মোহানায় আসিল। সেখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া গেল। সীল মৎস্যের আকার এত বড় যে, নাবিকগণ বিস্মিত হইল। এই সময়ে একটা আকস্মিক ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত পোতখানিকে তীরাভিমুখে লইয়া চলিল, তাহার হাল ভাঙ্গিয়া গেল। এক জন ছাড়া যাবতীয় নাবিক তীরে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল।

নাবিকগণ বিপন্ন হইয়া পড়িল। জাহাজের কাঠগুলি তীরে ভাসিয়া আসায় তাহারা উহা সংগ্রহ করিল। অবশেষে একখানি ছোট ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া দুই জন নাবিক পুয়োর্টো সান জুলিয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল। ১১ দিন ধরিয়া নাবিক-যুগল গাছের সংগৃহীত পাতা ও মূল খাইয়া কোনমতে জীবন ধারণ করিল। তাহারা অবশেষে ম্যাগেলানের পোতবহরের কাছে পৌছিল। আকাশ তখন এমন মেঘাচ্ছন্ন যে, ম্যাগেলান অন্য পোত পাঠাইতে সাহসী হইলেন না। নদীতীরে নির্ব্বাসিত নাবিকগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ১২ জন নাবিককে বিসকুট ও মদ্যসহ কয়েকখানি নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও বহুকষ্টে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া, ভেলা বাঁধিয়া সকলকে লইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিল।

সেরাওকে তখন "কন্‌সেপসন" জাহাজের অধ্যক্ষ করা হইল। সান্টিয়াগো জাহাজের নাবিকগণকে অন্য পোতগুলিতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। সান জুলিয়ানে



বর্ত্তমান বিউয়েনস্ এয়ারস্ বন্দর

দুই মাস যাপনের মধ্যে নাবিকগণ দেশীয় কোনও মানুষের সাক্ষাৎ পায় নাই। অবশেষে এক দিন এক দানবাকার উলঙ্গ লোক তীরে আসিল। সে নাচিতেছিল, গাহিতেছিল এবং বালুকা লইয়া মাথায় ছড়াইয়া দিতেছিল। কৌশলে ম্যাগেলান তাহাকে জাহাজে আনাইয়া একটি গাত্রাবরণ প্রদান করেন।

ম্যাগেলান ঐ জাতীয় লোক পরে আরও দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের বৃহৎ চরণের জন্য তাহাদের নাম প্যাটাগন রাখিয়াছিলেন। এখনও তাহারা ঐ নামে পরিচিত। করেন। তার পর বসন্তের আগমনে আবার যাত্রা আরম্ভ হয়। যে প্রণালীর সন্ধানে ম্যাগেলান আসিয়াছিলেন, এখন হইতে স্বয়ং তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সমুদ্রকূল লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটা উপসাগরের মুখ দেখিতে পাইলেন। এই উপসাগরের নাম 'ম্যাগেলান' বলিয়া অধুনা পরিচিত। সেই পথে দুইখানি পোত অগ্রে প্রেরিত হইল। নিশ্চয় এই জলপথ দিয়া তাঁহারা অভীপ্সিত প্রণালীর সন্ধান পাইবেন।

এণ্টোনিও এবং কন্‌সেপসন অগ্রে যাত্রা করিয়াছিল।



বোর্ণিওদ্বীপের রণনৃত্য—নারী ঢাক বাজাইতেছে

তাহারা ইন্দুর খাইতে ভালবাসে, ইহা ম্যাগেলান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এক জন প্যাটাগন তাহার স্ত্রীর বিরহে বড় কষ্ট পাইতেছিল। ম্যাগেলান নাবিকগণকে পাঠাইয়া সেই রমণীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে সমর্পণ করেন। ইহাতে দেশীয়রা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে থাকে। নাবিকগণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে; কিন্তু দেশীয়দিগের নিক্ষিপ্ত তীর বিষাক্ত থাকায় এক জন নাবিকের প্রাণ-বিয়োগ হয়।

ম্যাগেলান শীতের শেষ কয় মাস সাণ্টা ক্রুজএ যাপন ম্যাগেলান পশ্চাতে রহিলেন। চারি দিন পরে তাঁহারা কন্‌সেপসন জাহাজের দেখা পাইলেন; কিন্তু এণ্টোনিও জাহাজ কোথায়? ম্যাগেলান চিন্তিত হইলেন। জাহাজখানি কি পলায়ন করিল, না ডুবিয়া গিয়াছে? তাহাতেই বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্যাদি যে সঞ্চিত আছে!

প্রণালীর সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এণ্টোনিওর কোনও সংবাদ না পাইয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। উত্তরদিকে চলিতে চলিতে ম্যাগেলান উপকূলভাগে নানাবিধ চিহ্ন রাখিয়া যাইতে লাগিলেন।

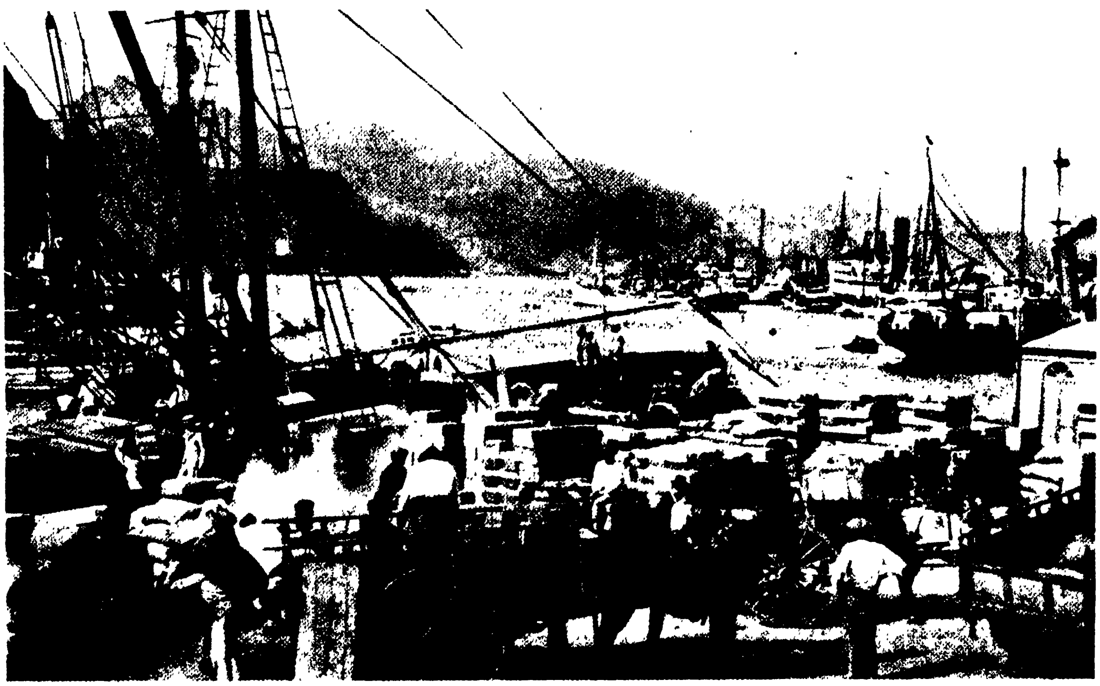
তিন সপ্তাহ চলিয়া ক্ষুদ্র পোতবহর সমুদ্রে পড়িল। দুই মাস ধরিয়া নাবিকগণ কোনও জমীর সাক্ষাৎ পাইল না। কিন্তু সমুদ্র তখন শান্ত। ইহাতে সকলে সুখী হইল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী দূরে এক টুকরা জমী দেখা গেল। অমনই আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। জমীর উপর গাছপালা দেখা যাইতেছিল। কিন্তু মনুষ্যের সাড়া-শব্দ নাই. দৃষ্ট ভূমির 'সেন্টপল' নামকরণ করিয়া পোতবহর চলিতে লাগিল।

১১ দিন পরে একটা দ্বীপ মিলিল; কিন্তু উহা জীবজন্তু-বর্জ্জিত। পানীয় জল বা খাদ্য কিছুই সেখানে মিলিল না। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে বহু হাঙ্গর দেখা গেল। ম্যাগেলান উহার নাম রাখিলেন "সার্ক"-দ্বীপ।

নাবিকগণ তখন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। পানীয় জল দুর্গন্ধময়, বিস্কুটগুলি পোকায় পূর্ণ। কিন্তু ম্যাগেলান দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করিলেন, অগ্রসর হইতেই হইবে। জাহাজের চামড়া ভক্ষণ করিয়াও যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, তথাপি যাইতে হইবে। সত্যই তাহা ঘটিল। চামড়াগুলি তিন চারিদিন ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাই রুটীর মত সেঁকিয়া খাইতে লাগিল। জাহাজে বহু মূষিক ছিল। তাহার মাংসও শেষে সুখাদ্য বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল।

এইভাবে ডাঙ্গা দেখিতে পাইবার আশায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল। ৯৮ দিন পরে মার্চ্চ মাসে তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত সমুদ্রবক্ষে একটা দ্বীপ দেখিতে পাইল। উহা গুয়াম দ্বীপ। জাহাজ দেখিয়া দ্বীপের অধিবাসীরা দেশীয় নৌকায় করিয়া জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল। দেশীয়গণ জাহাজে বানরের ন্যায় আরোহণ করিল। ম্যাগেলান তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেও তাহারা নড়িল না। অবশেষে অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করায় কয়জন দেশীয় প্রাণত্যাগ করিল। দেশীয়রা একখানি নৌকা চুরি করিয়া পলায়ন করিল।

ম্যাগেলান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ডাঙ্গায় উঠিলেন। সঙ্গে একদল নাবিক চলিল। তাহারা তীর, ধনু ও বল্লম লইয়া গিয়াছিল। দেশীয়দিগকে তাড়া করা হইল। নাবিকগণ ডাঙ্গায় কদলী, নারিকেল প্রভৃতি পাড়িয়া ভক্ষণ করিল। ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চর্ব্বণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল।



বর্ত্তমানের ক্যানারীদ্বীপের বন্দর—ম্যাগেলান এইখানে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন

তার পর জাহাজগুলি আরও ৭ দিন চলিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইল। প্রথমতঃ সামার দ্বীপ তাহারা দেখিতে পাইল। এইখানে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ম্যাগেলান তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দেশীয়দিগের সহিত দেখা হইল। নানাবিধ মশলার নমুনা পাওয়া গেল। দেশীয়গণ অবশেষে এক জন সর্দ্দারকে লইয়া আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে উল্কী, কর্ণে স্বর্ণা-ভরণ, করপ্রকোষ্ঠে ভারী স্বর্ণ-কঙ্কণও ছিল। উহারা ম্যাগেলানকে কমলালেবু এবং মোরগ উপহার দিল।

নাবিকগণের মধ্যে যাহারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা নিরাময় হইলে ম্যাগে-লান জাহাজ লইয়া যাত্রারম্ভ করিলেন। লি মা-সোয়া দ্বীপে পোতবহর নোঙ্গর করিল। আবিষ্কারকগণ বুঝিলেন যে, তাঁহারা প্রাচ্য-দেশেই আসিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দ্বীপগুলিতে প্রচুর পণ্য আছে, তাহাও তাঁহারা বুঝিলেন। মলক্কা হইতে যে ক্রীতদাসকে ম্যাগেলান আনিয়া-ছিলেন, তাহার মালয় ভাষা লি মা-সোয়ার অধিবাসীরা বুঝিতে পারিল। দেশীয়রা অত্যন্ত লাজুক। কিন্তু ম্যাগেলান্ কৌশলে তাহা-দিগের লজ্জা ভাঙ্গাইলেন। ভাল ভাল জিনিষপত্র দিয়া তাহাদিগের লোভের উদ্রেক করিলেন। দেশীয়দিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। দেশীয় রাজা এবং ম্যাগেলান পর-স্পরের দেহের রক্তবিন্দু বাহির করিয়া পরস্পর পান করিলেন। উহাই স্থায়ী বন্ধুত্বের নিদর্শন!

ম্যাগেলান তাঁহার নাবিকগণকে অস্ত্র-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। দেশীয় রাজা তাহাতে খুসী হইলেন। অবশেষে দুই জন কর্ম্মচারীকে ম্যাগেলান রাজার দেশ দেখিবার প্রস্তাব করিলেন। পিগাফেটা তাঁহার কাগজপত্র লইয়া দলের সহিত যাত্রা করিলেন।

অবশেষে ম্যাগেলান আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লি মা-সোয়ার রাজা স্বয়ংপথ দেখাইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে তিনি দেশীয় নৌকায় পথ দেখাইয়া চলিলেন। সেবুর উপকূলভাগে বহু গ্রামের বসতি দেখা গেল। তীরে নোঙ্গর করিয়া ম্যাগেলান কামান দাগিলেন। দেশীয়গণ তাহাতে ভয় পাইয়া গেল! ম্যাগেলান দূত পাঠাইয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তিনি বন্ধুত্বের নিদর্শন জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র।



টায়রাডেল ফিউগোর তীরন্দাজ

স্থানীয় রাজা হয় ত ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, পোতগুলি বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু রাজাকে কিছু উপঢৌকন দিতে হইবে। এক জন শ্যামদেশীয় বণিক্ তথায় ছিল, সে পোর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে প্রাধান্যের কথা জানাইল। লি মা-সোয়ার রাজাও বলিলেন যে, ইহারা সাধারণ ব্যবসায়ী নহে। সেবুর রাজা ম্যাগেলানের সহিত



সাণ্টাক্রুজ উপকূল-ভাগে সামুদ্রিক সিংহ

সতর্ক করিয়াছিলেন যে, এ কার্য্য করিলে ভাল হইবে না।

নাবিকের সংখ্যা তখন অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এক জন লোকও যদি যুদ্ধে মারা পড়ে, তাহাতে জাহাজ পরিচালনের ক্ষতি হইবে। কিন্তু ম্যাগেলান কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। বাছা বাছা ৫০ জন লোক তিনখানি নৌকায় ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল রাত্রিকালে সেবুর জলবিস্তার অতিক্রম করিল। তাহাদের পশ্চাতে গোপনে ৩০ খানি ডোঙ্গায় ১ হাজার দেশীয় যোদ্ধা অনুসরণ করিল। সেবুর রাজা স্বয়ং

মিত্রতা সম্পাদন করিলেন। স্পেনদেশ তাঁহার রাজ্যে ব্যবসায়ে একাধিপত্য করিতে পারিবেন, এইরূপ সনন্দ প্রদান করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ম্যাগেলান ব্যবস্থা করিলেন। রাজা ও অনেক সর্দ্দার নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে ম্যাগেলান অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার মনস্কামনা সব দিক্ দিয়াই সার্থক হইল। সেবুর রাজার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ এবং বন্ধুত্ব যাহাতে অন্যান্য দ্বীপেও ঘটিতে পারে, এ জন্য তিনি অন্যান্য দ্বীপেও সংবাদ পাঠাইলেন। সকলেই স্বীকৃত হইল। ম্যাক্টান্ দ্বীপের একটি গ্রাম ইহাতে সম্মত হইল না। ম্যাগেলান এক দল লোক পাঠাইয়া তখনই সে গ্রাম পুড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ইহাতে ভয় পাইল না। এক জন সর্দ্দার প্রতিশোধগ্রহণ-স্পৃহায় বলিয়া পাঠাইল যে, তাহারা ম্যাগেলানের প্রস্তাবে রাজি নহে।

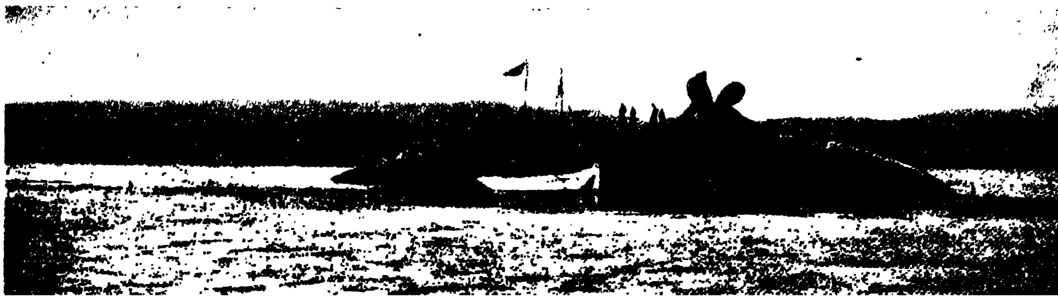
ম্যাগেলান তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। সেবুর রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাগেলান কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন সেবুর রাজা তাঁহাকে সাহায্য পাঠাই-লেন। সেরাও কিন্তু ম্যাগেলানকে

নৌ-বাহিনী পরিচালন করিলেন। ম্যাগেলান বলিয়া পাঠাইলেন, বিদ্রোহী সুলতান বশ্যতা স্বীকার করিলেই ভাল, নহিলে স্পেনের বল্লমের আঘাত সহ্য করিতে হইবে। সুলতান বলিয়া পাঠাইলেন যে, বল্লম তাঁহাদেরও আছে এবং তাহা বেশ শক্ত এবং লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। তবে একটা প্রস্তাবও সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন যে, আক্রমণ যেন রাত্রি-কালে না ঘটে, দিনের বেলা হইলেই ভাল হয়। ম্যাগেলান ও সেবুর রাজা বুঝিলেন, নূতন সেনাবলের সাহায্য পাই-বার আশায় এই বিলম্বের জন্য প্রার্থনা।

সুলতান আক্রমণ অনিবার্য্য ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই গর্ত্ত,



প্রশান্ত-মহাসাগরস্থিত দ্বীপে [illegible]



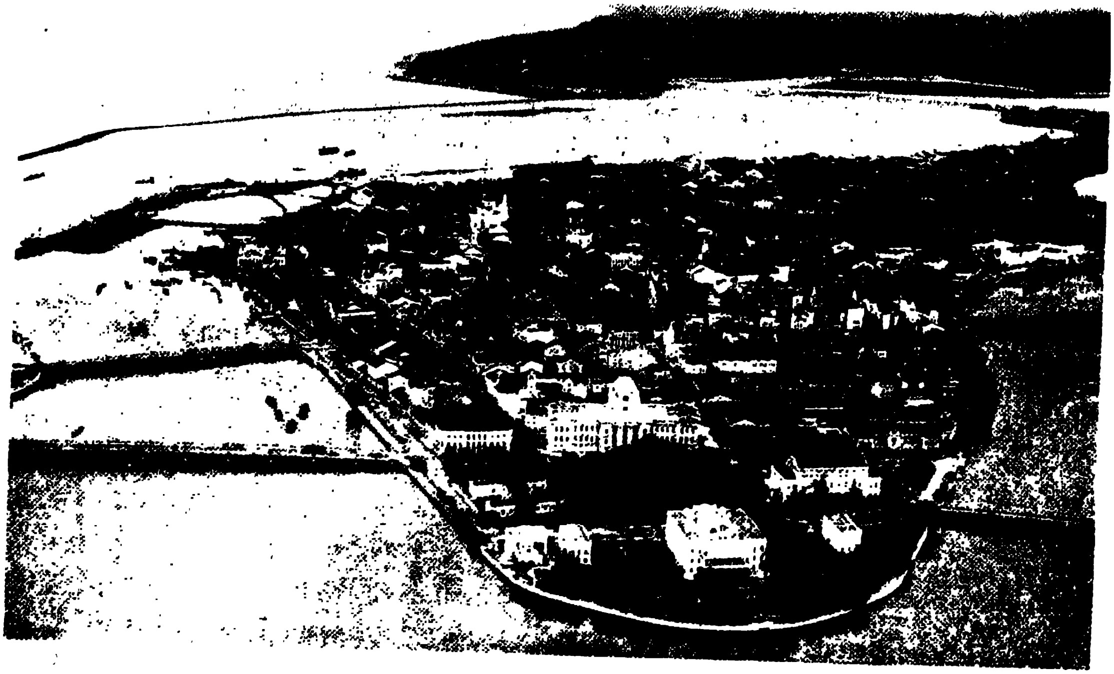
টারায়াডেল ফিউগো—জলমগ্ন শৈল-কণ্টকিত জল-বিস্তার

খাদ কাটাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে আক্রমণ করিলে দেশীয়দিগেরই সুবিধা। সেবুর রাজা দিবার আলোক দেখা দিলে বলিলেন যে, তাঁহার সেনাদল পথঘাট চিনে, সুতরাং তিনিই আগে যাইবেন। ম্যাগেলান তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, রাজা সেনাদল সহ ডোঙ্গায় অপেক্ষা করুন এবং স্পানিয়ার্ডের রণকৌশল পরীক্ষা করুন।

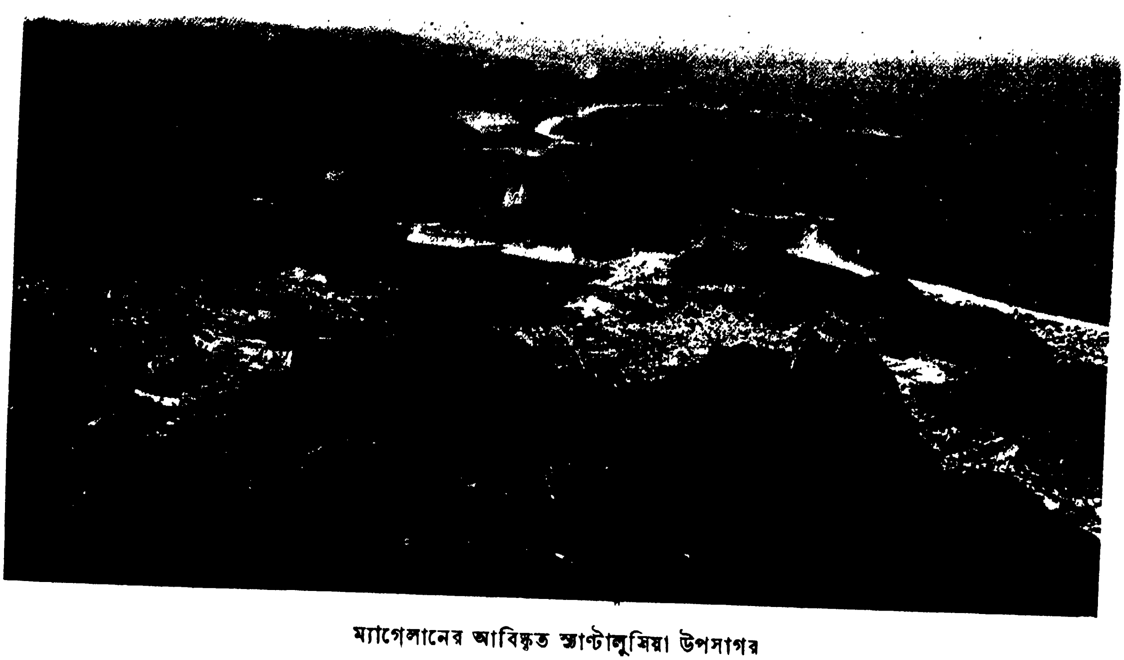
তীরের কাছে জল আছে। সেনাদল কোমর-জল ভাঙ্গিয়া তীরে পৌছিবার পূর্ব্বেই দেশীয়গণ দলে দলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এক দিকে ৪৯ জন য়ুরোপীয়, অপর দিকে দেড় হাজার হইতে ৬ হাজার। ম্যাগেলান এই ক্ষুদ্র দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। বন্দুকধারীরা ও তীরন্দাজরা অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া গুলী ও তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কদাচিৎ দেশীয়দিগের কেহ কেহ আহত হইল। তাহাদের কাঠের বর্ম্ম ভেদ করিয়া গুলী দেহে প্রবেশ করিল। কিন্তু ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সম্মুখ ও পার্শ্ব হইতে ক্রমে তাহারা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। বর্শা, টাঙ্গী এবং তীর মুহুর্মুহুঃ পড়িতে লাগিল।



গুয়াম দ্বীপবাসীরা আবিষ্কারকের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে সমবেত



ম্যাগেল্লানের আবিষ্কৃত পার্ণাম্বিউকোর বর্ত্তমান অবস্থা।



ম্যাগেল্লানের আবিষ্কৃত স্যান্টালুসিয়া উপসাগর

ম্যাগেলান গ্রামে আগুন ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া দেশীয়গণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বর্ম্মাবৃত স্পানিয়ার্ডদিগের দেহ ভেদ করা সম্ভব নহে দেখিয়া তাহারা নগ্নপদ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একটি বিষাক্ত তীর ম্যাগেলানের পদে বিদ্ধ হইল। ম্যাগেলান সেনাদলকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন পলায়নে পরিণত হইল। ৭।৮ জন মাত্র ম্যাগেলানের পার্শ্বে ঘিরিয়া রহিল।



টুয়ামোটু সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত-দৃশ্য

কয় জন সমগ্র আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে তীরাভিমুখে ধীরে ধীরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। অবশেষে ম্যাগেলানের দক্ষিণ হস্ত বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হইল। আর এক জনের বর্শা ম্যাগেলানের পদ বিদ্ধ করিল। ম্যাগেলান পড়িয়া গেলেন। দেশীয়গণ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার দেহের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। পোতবহর দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া সেবুতে ফিরিয়া গেল। ম্যাগেলানের দেহ উদ্ধারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

সেবুর রাজা অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ডুয়ার্টে বর্ব্বোসা ও জোয়াওকে সেরাও (ফ্রান্সিস্‌কো সেরাও নহে) তীরে লইয়া গিয়া হত্যা করে। ১ শত ১৫ জন নাবিক তখন অবশিষ্ট ছিল। তাহারা বোর্ণিও উপকূল ধরিয়া ব্রুনেতে পৌছিল। স্পানিয়ার্ডদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহার পরিকল্পনায় এই অসাধ্যসাধন ঘটিল, তিনি প্রাণ হারাইলেন। য়ুরোপীয়গণ অবশেষে ফ্রান্সিস্কো সেরাওএর সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। টাইভোরদ্বীপে স্বর্গীয় পক্ষী তাঁহারা প্রথম আবিষ্কার করেন।

কলম্বাস ও ভাসকো-ডা-গামা বহুস্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাগেলানের আবিষ্কার ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ম্যাগেলান জীবনই আহুতি দিলেন, ফলভোগের সুবিধা স্বজাতির জন্য রাখিয়া গেলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নারী-শক্তি

ব্যথাভরা নিরাশার দুঃসহ বেদনা-ভার বহি'
ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা তিলে তিলে এ অন্তর দহি,'
নিমীলিত নেত্র-পাতে লভিল না আলোর পরশ ;
কাল যবনিকা টানি' মুছিল কে মনের হরষ ;
তন্দ্রাঘোর নয়নের ঘুচিল না মোহ-আবরণ ;
হৃদয়ের জ্যোতীরেখা বারিবহ ঢাকে অকারণ।
দুর্জ্জয় সে দুর্নিবার দিকে দিকে ঘোষে রণজয়,—
দুর্ব্বলের ভগ্ন হিয়া সহসা লভিল বরাভয়।
দেবীর চরণ-স্পর্শে মিলিল যে পথের নিশানা,
রমণীয় যাত্রাপথে অজানারে গেল আজ জানা।
তুমি শুধু নারী নহ, নহ শুধু প্রণয়ের স্থল ;
তোমার অন্তরে জাগে অমৃতের স্নিগ্ধ শতদল।
তাহারি পরশ লভি' যাত্রাপথ সর্ব্বহারাদের
হইয়াছে আলোকিত, সব ভীতি গেল বন্ধনের ;
শক্তির অমোঘ মন্ত্রে তুমি নারী জাগো শক্তিরূপে
তাদের টানিয়া তোল, রহে যারা ঘোর অন্ধকূপে।
নারী নহ, তুমি দেবী, অলসেরে দাও উন্মাদনা,
মৃত্যুভয় ঘুচে যেন, ঘুচে যেন সকল বেদনা ;
যুগ যুগ ধরি' যারা, ক'রে গেছে নারীর সম্মান—
দাসত্ব-নিগড়ে রাখি' সে সম্মানে দিয়ু অপমান।
তাই বুঝি দেখা দিলে বিদ্রোহের মূর্ত্তিমতী বেশে ;
মোহ-মুগ্ধ জড় দেহে নবীন প্রেরণা দিলে শেষে।
নরের আবেশ-ঘুম ভাঙ্গাল যে, তুমি সেই নারী ;
স্নেহ প্রেম-দয়া দিয়ে বর্ষিলে অমৃতময় বারি।

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ।

বাঙ্গালী কোথায় গেল ?

এই প্রবন্ধের শিরোনামা পাঠ করিয়া হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন। কেন না, এই বৎসরের সেনসাস্ রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, বাঙ্গালী সংখ্যায় পৌনে পাঁচ কোটি হইতে বাড়িয়া পাঁচ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং এ প্রকার প্রশ্নের অর্থের মর্ম্ম গ্রহণ করা দুরূহ।

আজ ২৫ বৎসর যাবৎ আমি বাঙ্গালীর অর্থ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ৬২ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন চাঁপাতলা গোলদীঘির ধারে ও অখিল মিস্ত্রী লেনের সম্মুখের বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। তখন ইহা অবশ্য শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হয় নাই। পটলডাঙ্গার ন্যায় প্রকৃতপক্ষে এখানে দীঘি ছিল। এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছুতারপাড়া অবস্থিত ছিল, এখনও ছুতারপাড়া লেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এতদ্ভিন্ন অখিল মিস্ত্রীর গলির পূর্ব্বাঞ্চলেও অনেক ছুতারের বসতি ছিল; ছুতারপাড়া ও এ সকল অঞ্চলে হিন্দু ছুতারগণ নানাবিধ কাঠের কাযে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত এবং এই সকল স্থান জম্‌জম্ করিত। আজ কলিকাতায় হিন্দু ছুতার খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যাহা বাঙ্গালী মুসলমান ছুতার আছে, তাহারাও সংখ্যায় দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহারা হাওড়া আমতা অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু তাহারা চীনা ছুতারগণের প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটিয়া যাইতেছে এবং সংখ্যায় কমিতেছে।

সেই সময় কলিকাতায় যাবতীয় গোয়ালা বাঙ্গালী হিন্দু ছিল। আমাদের যে দুধ যোগান দিত, সেও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ!" আজ বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় সংখ্যায় কয় জন ?

৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যত বড় বড় কাঠের গোলা ছিল, সে সমস্তই ছিল বাঙ্গালীর কারবার। প্রায়ই এইগুলি নিমতলায় অবস্থিত। চাঁপাতলা ও ইটিলিতেও কিছু কিছু ছিল ও আছে। তাহার মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারকনাথ প্রামাণিকের গোলাগুলি উল্লেখযোগ্য। আজ কলিকাতার যাবতীয় বড় বড় কাঠের গোলা মাড়োয়ারীগণের করায়ত্ত। কেবল ৺মহেশচন্দ্র কোলের পুত্রগণ ও অপর দুই চারি জন তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের মান রক্ষা করিতেছেন। আজ কলিকাতার যাবতীয় রজক পশ্চিমদেশীয়। বাঙ্গালী কোথায় গেল ? আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী নাপিতেরও সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, পশ্চিমারা তাহাদের স্থান দখল করিতেছে। সে সময় কলিকাতায় যতগুলি বাজার ছিল, তখন তথায় বাঙ্গালী—হিন্দু ও মুসলমান-ব্যাপারী বিরাজ করিত। আজ যদি কেহ বাঙ্গালীটোলায় — এমন কি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যান ত দেখিবেন, পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। বিশেষতঃ আলুর মহাজনী ব্যবসা মাড়োয়ারী ও পশ্চিমাগণের একচেটিয়া। নইনীতাল, দার্জ্জিলিং, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু জন্মে, তাহা দাদন দিয়া এই শেষোক্ত অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা করতলগত করিয়াছেন। তখন কলিকাতায় মুদী ও ময়রার দোকান সমস্ত বাঙ্গালীদিগের হাতে ছিল। আজ দেখা যায়, যত বৃহদায়তন মুদীখানা—যেখানে ঘি চিনি ময়দা খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয় হয়, সমস্তই অ-বাঙ্গালীর দ্বারা অধিকৃত। আর দাল-কলাইয়ের ত কথা নাই। আহিরীটোলায় পাইকারী ও বাঙ্গালীটোলায় খুচরা সমস্তই অ-বাঙ্গালীর।

কলিকাতায় যত পাচক ও ভৃত্য আছে, তাহার শতকরা ৯৫ জন হয় পশ্চিমা না হয় উৎকলবাসী—ইহারা মফঃস্বল সহরে গিয়াও ঢুকিয়াছে। যত পাল্‌কির বেহারা সমস্তই হয় উড়িয়া না হয় পশ্চিমা। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে ও ষ্টিমার-ঘাটায় যাবতীয় কুলি পশ্চিমা। গঙ্গার ঘাটে এমন কি নৈহাটী, শ্যামনগর প্রভৃতির ঘাটেও যত মাঝি মাল্লা সমস্তই প্রায় অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় এই প্রকার নানা ব্যবসায়ে ও রোজগারে প্রায় ২২ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। ফলকথা, আমার আত্মচরিতে হিসাব দিয়াছি যে, যাবতীয় অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ প্রদেশে প্রতি মাসে গড়ে ১০ কোটি এবং বৎসরে ১২০ কোটি টাকা প্রেরণ করে। ইহা শুনিলে অনেকে হয় ত স্তম্ভিত হইবেন, কিন্তু সত্য গোপন করিলে মন কি প্রবোধ মানিবে ?

কলিকাতার সমস্ত অলি-গলি ও বড় রাস্তার উপর পাণ বিড়ি প্রভৃতির দোকান—যাহা সংখ্যায় কয়েক সহস্র

হইবে, তাহার দুই একটি ছাড়া সবই বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত নহে। এই পাণের দোকান—যেগুলি প্রশস্ত রাস্তার ধারে, সেইগুলিতে বরফ লেমনেড ও সরবৎ গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহার এক একটি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, দোকানীরা প্রত্যহ এক সরবৎই বিক্রয় করে এক শত দেড় শত টাকার। এখন মাছের ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত পশ্চিমা, উড়িয়া, মাড়োয়ারীরা নামিয়াছে। মাছ অবশ্য জেলেরা ধরিয়া আনে; কিন্তু ইহারা ধনী (capitalist) হিসাবে সেই সব মাছ পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার ষ্টেশনে বরফ ভর্ত্তি করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেছে।

ভবানীপুর অঞ্চলে পাঞ্জাবীগণের বড় বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মোটার-পরিচালন ও মোটার মেরামতি করতলগত করিয়াছে। তা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক ফিটিংও পাঞ্জাবীগণের একচেটিয়া। এই কলিকাতায় ৫।৭ হাজার পাঞ্জাবী এই প্রকার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের হোটেলখানা ও ধোপা-নাপিত, মুদিখানা—সমস্তই পাঞ্জাবীর। এমন কি, শুনিতেছি ডাক্তারও পাঞ্জাবী। ইহারা বাঙ্গালীর কোন তোয়াক্কাই রাখে না। জল, ড্রেন, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগে যাবতীয় মিস্ত্রী উড়িয়া—একটিও বাঙ্গালী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর কেরাণীগিরি অন্ততঃ একচেটিয়া ছিল, ইহাদিগের মুখের গ্রাস মাদ্রাজীরা আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। একজন মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট অম্লানবদনে ২৫।৩০ টাকার কেরাণী—বিশেষতঃ টাইপ রাইটারী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সঙ্গে পাইলে বাঁচিয়া যায়। কারণ, ইহাদের মাসিক খোরাক সাড়ে ৪ টাকার উপর হইবে না, একটু 'রসন'—মানে তেঁতুল-জল লবণ, ও পাতলা ঘোল অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে তাহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। এখন কলিকাতায় অন্ততঃ ৫।৭ হাজার মাদ্রাজীর উপনিবেশ আছে। ইহাদিগের স্বতন্ত্র দোকান পাট, মায় স্কুল পর্য্যন্ত আছে। কলিকাতা হাতীবাগান অঞ্চলের তেলের কলগুলিও বহুলাংশে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

ইহা ত হইল খুচরা ব্যাপারের কথা। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল এবং অনেক বড় বড় মহাজনী ব্যবসাও বাঙ্গালীর হাতে ছিল। তখনও বড় বড় হৌসের অনেকগুলি মুৎসুদ্দি পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর আয়ত্ত ছিল। কিন্তু আজ সমস্ত বড়বাজার অঞ্চল—এমন কি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত। অধিক কি, এ সমস্ত জমীর মালিকানী স্বত্বও বাঙ্গালীর হাত হইতে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আর এই অঞ্চলে বৎসরে যে কোটি কোটি টাকার আমদানী-রপ্তানী হইতেছে, তাহার শতাংশের এক ভাগও বাঙ্গালীর আছে কি না সন্দেহ।

এই ত গেল কলিকাতার কথা। সমস্ত বাঙ্গালা ও আসাম জুড়িয়া যত ধান, পাট, সরিষা ভুষিমাল—এমন কি, সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ব্যবসায়,—তাহা য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারীর একচেটিয়া। তা ছাড়া যত আমদানী মাল—যথা—বিদেশী ও বোম্বের কাপড়, কেরাসিন তেল, লবণ, লোহা ইত্যাদি সমস্তই অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া চলে। কলিকাতার যাবতীয় ব্যাঙ্কে প্রত্যহ লাখ লাখ টাকার হুণ্ডী চেক ড্রাফট ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, তাহাও মূলতঃ বাঙ্গালীর হাত দিয়া নহে। বেল পাকিলে কাকের কি! হায়! হতভাগ্য বাঙ্গালী! ইহার শতকরা কয়েক অংশ তোমার, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)।



গোলটেবিলের ফল

গোলটেবিল বৈঠকের ফেরত সদস্যদের মুখে উহার ফলাফল সম্বন্ধে দুই রকম কথাই শুনা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, আহা মরি, বেশ! আবার অপরে বলিতেছে, মোটের উপর অষ্টরম্ভা! প্রধান পাণ্ডা সার তেজ বাহাদুর ও তাঁহার গ্রামোফোন শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রথমে আসিয়া নৈরাশ্যের কথাই কহিয়াছিলেন, —বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতা, বৈদেশিক, সামরিক ও আর্থিক বাঁধনের কসাকসি, ইত্যাদি। তিনি যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশান) সম্বন্ধেও বিশেষ আশার কথা কহেন নাই। যদি রাজন্যরা রাজী না হন, তবে কেবল বৃটিশ ভারতেই হউক, পরে তাঁহারা ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিলে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে আর বিলম্ব করা চলিবে না। তাহার পর আরও একটা কথা, প্রাদেশিক অধিকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দিতেই হইবে, নতুবা সার তেজ বাহাদুর কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ভারতবাসীও করিবে না। ইহাই তাঁহাদের ও অধিকাংশ টেবিল-ওয়ালাদের মোট কথা।

তবে তাঁহারা আপাততঃ বাঁধন-কষণে সায় দিয়াছেন, কেহ কম, কেহ বেশী। বর্ত্তমান অবস্থায় না কি নাবালক ভারতের উহা প্রয়োজন। বস্! এইটুকু হইলেই আর স্বায়ত্তশাসনের চাকা চলিতে মোটেই বিলম্ব হইবে না। তবে সার তেজ বাহাদুরের মতে আরও একটা কায করা চাই,—দেশে শান্তির আবহাওয়া বহাইবার জন্য এবং সেই আবহাওয়ায় শাসনসংস্কারের আলোচনার জন্য—মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে মুক্তি দেওয়া চাই। তাঁহার এ প্রার্থনা কিরূপ মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা তিনিও যেমন বুঝিতেছেন, দেশবাসীও তেমনই বুঝিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ও তাঁহার বন্ধু টেবিলওয়ালারা নাছোড়বান্দা, তাঁহারা বাজই পড়ুক আর আকাশ ভাঙ্গিয়াই চুরমার হউক, সংস্কার না লইয়া ছাড়িবেন না। তাই তাঁহারা একে একে দেশবাসীকে হাঁক দিয়া বলিতেছেন,—"ভাই সব! এমন সুযোগ হেলায় হারাইও না। যতই অসুবিধা থাকুক, আর যতটুকুই পাও, এ দান ছাড়িও না, তাহা হইলে চিরকালের জন্য পস্তাইবে।" তাঁহাদের বাঁধা তারে সুর মিলাইয়া Behar united partyর মত একে একে অনেক ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান সংস্কার সফল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বাহ্বাস্ফোটন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আগুয়ান। এ পথে বাধাবিঘ্ন কত, তাহা তাঁহারা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সপ্রু, জয়াকর, কেলকার, সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর,—একে একে সকলের মুখেই সেই মর্ম্মে কাতরোক্তি নির্গত হইয়াছে। এমন কি, মিশরে বা ইরাকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, হোম-মার্কা অধিকারে তাহারও পূর্ণ চেহারা নাই। তথাপি তাঁহাদের পাহাড়ে আশাবাদের নিবৃত্তি নাই! এই কি টেবিলের অভিজ্ঞতার ফল?

কম্যুন্যালিষ্ট র‍্যালি

ফল যে এইরূপই হইবে, তাহা জানাই ছিল। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি অবরুদ্ধ, বাকী যাহারা জাতীয়তাবাদী, তাহারাও দূরে পরিত্যক্ত। কেবল কতকগুলি সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোককে বাছিয়া টেবিল বসাইলে এই ফলই হইবে। গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই এই সংখ্যাল্পগণের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। মডারেটরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ আঁকড়িয়া ধরিয়া নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহারা কয় জন? দেশে তাঁহাদের প্রভাবই বা কতটুকু? সে কথা ত তাঁহারা নিজেই স্বীকার করেন। সুতরাং গোলটেবিলে ভিড় করিয়াছিল সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের গোঁড়া স্বার্থসর্ব্বস্বরা, আর তাহাদের কথাকেই ভারতের কথা বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এই গোঁড়াদের মধ্যে মুসলমানরাই প্রধান। তাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন যে, সংখ্যাল্পরা সরকারী চাকুরীর শতকরা ৪০টা পাইবে, আর তন্মধ্যে মুসলমানদের ভাগে থাকিবে শতকরা ৩৩⅓ টা। লর্ড মর্লের সময়ে ব্যুরোক্রাটদের নীতি ছিল Rally the moderates, সে দিন গিয়াছে, এখন সার স্যামুয়েলের আমলের কর্ত্তাদের নীতি হইতেছে Rally the comunalists. ইহা দ্বারা কর্ত্তারা বেশ সুবিধাও করিয়া লইয়াছেন। মডারেটরা ছিলেন মুষ্টিমেয়, কিন্তু কম্যুন্যালিষ্টরা জনসংখ্যার শতকরা ৪০ জন বলিয়া দাবী করে। কাযেই এখন কম্যুন্যালিষ্টদের rally করিতে পারিলে যতটা লাভ হয়, ততটা মডারেট rally করিলে হইত না। কিন্তু সে পথেও কাঁটা পড়িল বলিয়া। তরুণ মুসলিমরা যে ভাবে জাগ্রত হইতেছেন, তাহাতে আর অধিক দিন কম্যুন্যালিষ্টদের rally করাও সুবিধা হইবে না।

সুবিধাবাদী

সার মহম্মদ ইকবাল ও ডাক্তার সাফায়েৎ আমেদ প্রমুখ গোঁড়া কমুন্যালিষ্টরা যে সুবিধাবাদী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার মহম্মদ কবি, তাই কল্পনালোকে ভ্রমণ করিয়া বেলুচিস্থান হইতে দিল্লী এবং করাচী হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার সাফায়েৎ আমেদ কিন্তু টেবিল

হইতে ফিরিয়া বলিলেন, মুসলিমরা ন্যায্য অধিকার চাহে, উত্তর-ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা কেহ বলেন নাই। এমন করিয়া একবারে সাপের বিষ উড়াইয়া দেওয়া সুবিধাবাদীদের মত কেহ পারে না। বোধ হয়, ওপারে মনের মত দক্ষিণা পাইয়া এখন প্রাণে ফূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাই সার ইকবালের কথাটা সুবিধামত বিস্মৃত হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। লক্ষ্ণৌ বৈঠকে খিলাফতী ও (জাতীয় মুসলিম ব্যতীত) অন্যান্য কর্ত্তারা এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকের কত গুণই না বর্ণনা করিলেন এবং উহাই ভারতের একমাত্র মুক্তিপথপ্রদর্শক বলিয়া ঘোষণাই করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালার হিন্দুরা স্বার্থ ছাড়িতে ছাড়িতে যতটা সম্ভব সবই ছাড়িলেন, কেবল বলিলেন, যদি অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায় হিন্দুদের ২টা সদস্য-পদ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে ৫১টি দিতে সম্মত আছেন। এই কথাতেই লক্ষ্ণৌএ সর্ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু য়ুরোপীয় বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যখন একটি পদও ছাড়িতে সম্মত হইলেন না, তখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানরা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। খিলাফতীদেরও মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দুর অমতে এলাহাবাদে যে প্যাক্ট হইয়াছিল, বাঙ্গালী হিন্দুরা একতার খাতিরে তাহাতেও সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এপার হইতে খবর আসিল যে, গোলটেবিলে কাম ফতে হইয়াছে—১৪ দফারও অধিক আদায় হইয়াছে, অমনই এপারে লক্ষ্ণৌ বৈঠকের "একতা-প্রয়াসীরা" ফতোয়া দিলেন, য়ুরোপীয়রা ২টা পদ দিক বা না দিক, বাঙ্গালী হিন্দুরা যখন ৫১টা দিবে না, তখন এলাহাবাদের বৈঠক বিফল, আর প্যাক্ট হইতে পারে না। বস্! সব ফাঁসিয়া গেল। ভারতের স্বরাজ একেবারে ফড়ফড় গজাইয়া উঠিল।

কিন্তু সুবিধাবাদীদের এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, ওপারের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া যে মাকা-মারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই হউক না কেন, দেশের সংখ্যায় অধিক লোকের সহিত সদ্ভাব না রাখিলে, কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যই সফল করা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ সেই অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে যখন দেশের গণ্য-মান্য শীর্ষস্থানীয় মনীষী শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিই অধিক।

গুণগান

হোর-মার্কা স্বরাজের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরাও তাহা দেখাইয়া দিয়াছি। কিন্তু লর্ড স্যাঙ্কি মহা আশাবাদী, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশানের সভায় বলিয়াছেন,—অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে সত্য, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের জীবদ্দশায় আইনগ্রন্থে নূতন India act ভারত শাসন-সংস্কার আইন সন্নিবেশিত হইবেই এবং উহার ধারাগুলিতে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে পূর্ণ হইবে। তাঁহার মতে রাজন্যরা বিলম্ব না করিলেই অতি সত্বর ভারতের স্বরাজ দেখা দিবে।

এই আশাবাদের জবাব গোলটেবিলওয়ালারাই অনেকে দিয়াছেন। সপ্রু-জয়াকর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—The picture is not yet complete, এখনও পূর্ণ ছবি আঁকা হয় নাই, অর্থাৎ white paper বাকি, তাহার পর জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্ট আছে। যদিও তাঁহারা এখন মুসলমান গোঁড়া সুবিধা-বাদীদের সহিত সুর মিলাইয়া হোর-মার্কা স্বরাজের পক্ষে প্রচার চালাইতেছেন, কিন্তু প্রথমে ত একবারে উহার বিপরীত ভাবেই সুর ধরিয়াছিলেন। Federation ও central responsibility এখনও আকাশের চাঁদ, উহার কোন স্থিরতা নাই। সম্প্রতি বড়লাটের যে সকল বিশেষ ক্ষমতার কথা সরকারী ঘোষণায় বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে স্বরাজের স্বরূপও বেশ বুঝা যায়। বোম্বাইয়ের সার চিমনলাল শীতলবাদ প্রমুখ মডারেট নেতারা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাতে হোর-মার্কা স্বরাজের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ দিকে লর্ড লয়েড, লর্ড সিডেনহাম, সার মাইকেল ওডয়ার, সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক প্রমুখ ভারতের পেন্‌সনভোগী ঝুনা 'ভারত-হিতৈষীরা' এই মার্কা-মারা স্বরাজ দানেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা পার্লামেণ্টের সদস্যদের ঘরে ঘরে চিঠি পাঠাইয়া সাম্রাজ্যের 'বিপদের' বার্ত্তা জানাইতেছেন, যদি এখনও দান নাকচ হয়!

অবস্থা ত এই। তবে এখনই গুণগান কেন? যাঁহারা প্রকৃতই দেশের মুক্তিকামী, তাঁহারা ছায়া বা খোসা পাইয়া লাফান না, বগল বাজান না,—কলিন্স ও কসগ্রেভের মত স্বাধীনতার কায়া না পাওয়া পর্য্যন্ত যথাশক্তি ন্যায্য দাবী মঞ্জুরী করাইয়া লইবার দিকে আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহাই দেশ-প্রেমিকের কর্ত্তব্য। আজ লর্ড স্যাঙ্কি পিঠ চাপড়াইতেছেন বলিয়া আত্মবিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

বিচার-রহস্য

যুক্তপ্রদেশের মীর্জ্জাপুর জেলার রাইয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিচার-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দায়রা জজ আসামী শুকুল পাণ্ডে ও অপর ৭ জন আসামীকে দাঙ্গায় লিপ্ত থাকা এবং নরহত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অপর ২৪ জনকে হত্যাচেষ্টা আদি অপরাধে দীপান্তর দণ্ড দান করেন। যে শুকুলের প্রাণদণ্ড হয়, ফরিয়াদী পুলিস তাহাকে দাঙ্গায় পালের গোদা বলিয়া অভিহিত করে।

মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্টে অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি টম ও ইয়ং তাহাদের সকলকেই মুক্তিদান করিয়াছেন। কিরূপ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুলিস আসামীদিগকে চালান করিয়াছিল, এবং নিম্ন আদালতে দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হাইকোর্ট রায়ে শুকুলের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সাক্ষ্যে দেখান হইয়াছে যে, শুকুল মুসলমানদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের খাপরার চালে উঠিয়া তন্মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করে। কিন্তু শুকুলের বয়স ৭০ বৎসর, তাহাকে দুই জন পাহারাওয়ালা ধরাধরি করিয়া আদালতে হাজির করিয়াছিল। কি চমৎকার সাক্ষ্য! এই ভাবেই পুলিস সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিল।

বিচারপতিরা রায়ে বলেন যে, পুলিস আদালতের ভৃত্য, সুতরাং আদালত যাহাতে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, সেই

ভাবে পুলিসের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহারা কেবল দণ্ড দিবে কিসে—এই কথা মনে রাখিয়া সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিল! তাহার পর আসামীদের অনুকূলে যতটুকু সাক্ষ্য পাওয়া যায়, পুলিসের তাহা সংগ্রহ করাই উচিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। নিম্ন আদালতের (ম্যাজিষ্ট্রেট বা দায়রা জজ) পক্ষেও আসামীর স্বার্থ দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলায় ইহার প্রয়োজন সমধিক। শেষ কথা এই যে, এই ভাবের মামলায় আসামী সনাক্ত করাতেও অনেক গলদ থাকিয়া যায়।

এখন যাঁহারা পুলিসের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার ও পুলিসকে পুলিস মেডেল দিবার সময় পুলিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, তাঁহারা যদি পুলিসকে প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কর্ত্তব্যের কথাটাও স্মরণ করাইয়া দেন, তবেই ত প্রশংসার অর্থ থাকে। অন্যথা? যে পুলিস রক্ষক, জনসাধারণ তাহার ত্রিসীমায় যাইতে চাহে না কেন, ইহার কারণ কি কর্ত্তৃপক্ষ জানেন না? না জানিলেও এই ভাবের বিচারের রায় হইতেও কি তাঁহাদের চক্ষু ফোটে না?

——

নারী-প্রগতি

নারী সন্তানজননী, তাঁহার ক্রোড়েই ভবিষ্যৎ জগৎ লালিত-পালিত হয়, প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ইংরাজীতে বলে, The hand that rocks the cradle rules the world, অর্থাৎ শিশুর ধাত্রী জননীর হস্তই জগৎ শাসন করিয়া থাকে। সুতরাং নারীর উন্নতি সাধিত না হইলে যে জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, সমাজের একাঙ্গ পঙ্গু থাকিলে যে অন্য অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সকলেই জানে। সুতরাং নারী-প্রগতি সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, ইহাও সকলে স্বীকার করে। কিন্তু কথা এই, কোন্ পথে সেই উন্নতি সাধিত হইলে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়? সকল জাতির ভাবধারা সমান নহে, সুতরাং প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাবধারা অনুসারে নারী-প্রগতি হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অধুনা এ দেশের এক শ্রেণীর লোক প্রতীচ্যের নারী-প্রগতির দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া সেই দৃষ্টান্তে এ দেশের নারীর উন্নতিবিধান করিতে চাহেন। তাঁহারা এ দেশেও Co-education চাহেন, অর্থাৎ বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণী একত্র শিক্ষালাভ করিলে দৃষ্টির প্রসারতা ও উদারতা বৃদ্ধি হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। শ্রীমতী হেনা সেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি লেডী আরউইন নারী কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ। তাঁহার বিশ্বাস,—Co-education বা পুরুষ ও নারীর একত্র শিক্ষালাভ ভারতের ভবিষ্যৎ নর-নারী নাগরিকের চরিত্রগঠনের পক্ষে আদর্শ। তবে তিনি তাঁহার নিজের কলেজে উহা প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষপাতী নহেন, কারণ, তথায় কতকগুলি বাধা আছে। কিন্তু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সম্ভব, সেখানে Co-education [illegible]

তাঁহারই ভাবের ভাবুক নারীরা লক্ষ্ণৌ নারী-সম্মেলনে সমবেত হইয়া এ দেশের প্রচলিত প্রথা-সমূহকে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ মত-পোষক বলিয়া বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে উদার যৌবন-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি প্রথাকে জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমানে এ দেশের এক শ্রেণীর নারী যে নারী-প্রগতির অর্থ অতি উদার প্রতীচ্যের ভাবেই প্রভাবিত হইয়া করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু প্রতীচ্যের ত এখন পরীক্ষার যুগ চলিতেছে। তাহার সভ্যতা খরগামিনী সত্য, কিন্তু উহা ধোপে টিকিবে কি না, তাহা ত সে দেশের মনীষীরাই এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না। সে জন্য এই সভ্যতার বিরুদ্ধে সেখানে তীব্র প্রতিবাদও উত্থিত হইতেছে। সে দেশের Night clubs, Nude clubs, Picnicks, Platonic love, Companionate marriage, Co-education প্রভৃতি প্রথায় যে মোটের উপর সমাজের উপকার না হইয়া জাতির ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইতেছে, এখন অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাহা স্বীকার করিতেছেন এবং করিয়া চিন্তায় আকুল হইতেছেন। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের "Carolina Magazine" লিখিয়াছেন,—The results of a questionaire answered by the students revealed some startling facts. The average man had affairs with six girls. 87-7 of the girls were necked and about 60. p. c. girls necked at also proved that the same girl went round to several men and was necked by a number of them. ইহা হইল co-education প্রথায় চালিত স্কুলের কথা! সংবাদপত্রখানি ইহার উপর মন্তব্য করিতেছেন,—"The school-girl and the school-boy at co-educational institutions, thrown together in an atmosphere of vice, drug and cocktail, indulge in the dissipations that have become now recognised as part of school life." ইহার পর College-girl ও Collegeboyএর Co-educationএর কথা শুনিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইবে কি?

এই Co-education এ দেশে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, না হইলে নারী-প্রগতি হয় না! জলপাইগুড়ির 'ত্রিস্রোতা' পত্র তাঁহার ৯ই মাঘ সংখ্যায় এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন,—"বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীগণের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলিতেছে বলিয়া সহরের নানা স্থানে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। আমাদের পরিচিত জনৈক বিশিষ্ট নাগরিক এইরূপ পত্র দেখিতে পাইয়াছেন।" জলপাইগুড়িতে যখন ইহা সম্ভব হইয়াছে, তখন কলিকাতায় কি হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং প্রত্যক্ষত: ট্রামে বাসে লেকে, গার্ডেনে উহা দেখা যাইতেছে। যে সাহিত্যে রক্ত-সম্বন্ধের পর্য্যন্ত বাছাবাছি নাই, যাহাকে ছাগসাহিত্য বলিলেও অপরাধ হয় না, তাহার প্রভাব আজ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুভূত

তাহার পর নারীকে শিক্ষিতা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এ দেশ ও বিদেশের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। এ দেশে এখনও নারীর স্বয়ং জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজন হয় নাই, যদিও সামান্য-রূপে বর্ত্তমান সমাজের প্রয়োজনে নার্স, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে। কিন্তু প্রতীচ্যে সেই প্রয়োজন বহুলপরিমাণে অনুভূত হইতেছে বলিয়া সেখানে নারীকে পুরুষের মত জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইতেছে। তাহার ফল কি হইয়াছে? ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীর এক সংবাদে জানা যায়,—"ফ্রান্সে শতকরা ২৫ হইতে ৩০টি ছেলের মা ছেলের বাপের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। ফ্রান্সে সন্তানহীনা জননীর কায জোটে বটে, কিন্তু সন্তান-জননীর জোটে না। তাই তাহাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে তাহাদের (প্রসবের পর) স্বাস্থ্যোন্নতি হইলেই আর থাকিতে দেওয়া হয় না। কাযও জোটে না, স্বামীও গ্রহণ করে না, তাহারা যায় কোথা? কাযেই পাপের পথটা সহজেই উন্মুক্ত হয়। ইহাই সমাজের অবস্থা! আবার মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যুবতী কন্যা-বধূরা গ্রাম হইতে সহরে চাকুরীর সন্ধানে যায়, বিফল হইয়া গৃহে ফিরিতে গেলেও অভিভাবকরা স্থান দেয় না। কাযেই তাহাদের পক্ষেও একই পথ উন্মুক্ত।

এ দেশেও কি Co-education চালাইয়া নারীকে প্রথম জীবনপ্রভাতেই পাকাপোক্ত করিয়া সংসারে চাকরী বা পেশার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? হইলেও ত ফ্রান্স ও মার্কিণের দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান!

শাসক ও শাসিত

ভারতের শীর্ষস্থানীয় শাসক বড়লাট লর্ড উইলিংডন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনের দিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে নূতন কথা কিছু নাই, বরং তিনি যে নীতি এ যাবৎ অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাহাই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেই প্রসঙ্গে হোর-মার্কা শাসন-সংস্কারের উপকারিতা, আইন-ভঙ্গ রোধের জন্য দমননীতি অবলম্বনের সার্থকতা, তাঁহার সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে দেশে আর্থিক অবস্থার উন্নতির নিশ্চয়তা এবং জগতের বাজারে ভারতের সুনাম-বৃদ্ধির কথায় মসগুল হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, বিলাত ও ভারতের সরকার ঐকান্তিকতার সহিত শাসন-সংস্কার গঠন ও প্রবর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং এ-দেশবাসীর মনে সেই বিশ্বাস দেখা দেওয়ার ফলে তাহাদের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে আইনভঙ্গের প্রবৃত্তিও বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আইনভঙ্গকারীরাও শীঘ্র গঠমমূলক রাজনীতির জীবন্ত শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন এবং নূতন রাষ্ট্রগঠনের কাল যতই আসন্ন হইবে, ততই তাঁহারা তাহার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবেন,—ইহাও তাঁহার বিশ্বাস।

বড়লাট এটুকুও বলিয়াছেন যে, জোড়াতাড়া দিয়া প্রথমে প্রাদেশিক ও পরে কেন্দ্রীয় ও সংহিত রাষ্ট্রশাসনের অধিকার দেওয়া সরকারের অভিপ্রেত নহে, প্রকৃত সংহিত দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করাই সরকারের উদ্দেশ্য। অতএব সকল শ্রেণীর ভারতীয়েরই সেই দিকে শক্তি নিয়োগ করিয়া উহা সফল করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস ভাঙ্গনের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া গঠনের দিকে মন না দিলে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইবে না। কেন না, লর্ড উইলিংডন দেশে রাষ্ট্রগঠনের সাজ-সরঞ্জাম ঠিকমত চলিবার অনুকূল আবহাওয়া বহাইবার জন্য ভাঙ্গন নীতির উপাসকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বিরাট গঠনের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিতে চাহেন না।

শাসক পক্ষের এইরূপ বিশ্বাস থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শাসিতের সে বিশ্বাস নাই। দমননীতি ও রাষ্ট্রগঠননীতিরূপ যুগল ব্যবস্থার ফলে দেশে আইন-ভঙ্গের প্রবৃত্তি দূর হইয়াছে এবং দেশবাসী শাসন-সংস্কারের দিকে একবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এই বিশ্বাস লইয়া শাসকপক্ষ মনে সান্ত্বনা লাভ করুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি শাসিতের মনের কবাট খুলিয়া দেখাইবার সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা তথায় কি দেখিতে পাইতেন? বাহিরে প্রশান্তভাবই যে ভিতরেরও প্রশান্তভাবের লক্ষণ, তাহা প্রকৃতির খেলাতেও দেখা যায় না।

লর্ড আরউইনের শাস্তি ও আপোষের নীতি হইতে এই যুগল নীতি যে কোনমতেই শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা বিলাতের বহু মনীষী রাজনীতিক এবং শক্তিশালী সংবাদপত্রই বলিয়াছেন। যে ভাবের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতেছে, তাহার কতক আভাস সরকারের প্রকাশিত বিরাট বিবৃতি কয়টি হইতে দেশবাসী বেশ ভাল রকমই বুঝিয়াছে। লর্ড স্যাঙ্কি যতই বলুন, উহাতে স্বায়ত্তশাসনের বীজ নিহিত আছে, যাহারা বৃটিশ উপ-নিবেশ-সমূহের স্বায়ত্তশাসন লাভের ইতিহাস অবগত আছেন,— এমন কি, মিশর ও ইরাকের স্বায়ত্তশাসন লাভের ইতিহাসও অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, তাঁহার কথার মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে। এই ভিত্তির উপর আপোষের চেষ্টা,—তাহাও মডারেট ও মুসলমান সুবিধাবাদীদিগকে লইয়া? উহা কি নিতান্তই আকাশকুসুম নহে?

গভর্ণর ও ম্যালেরিয়া

বাঙ্গালার সর্ব্বনাশা রোগ ম্যালেরিয়া। বাঙ্গালী জাতি উহার কল্যাণে নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রতিষেধ ও প্রতীকার সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয় শাসক-সমূহের মুখে কথার আভাস পাইলে বাঙ্গালী আশার ক্ষণিক আলোকে দীপ্ত হয় বটে। তাই বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন ম্যালেরিয়ার অন্যতম শ্রীপাট বর্দ্ধমানে গিয়া যখন ম্যালেরিয়ার কথা পাড়িয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীমাত্রেই উৎকর্ণ হইয়াছিল, না জানি কি নূতন আশার কথাই না পাইব! অবশ্য কতকটা আশার কথা যে লাটমুখে পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে, তবে তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাঁহার সরকারের তহবিলে অর্থা-ভাব হেতু তিনি যে রোগ-প্রতিষেধের আসল উপায় অবলম্বন করিবার আশা দিতে পারেন নাই, তাহা বুঝা গিয়াছে। তবুও ইহা মন্দের ভাল।

গভর্ণর বাঙ্গালা হইতে ম্যালেরিয়াকে একবারে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন, ইহা নিশ্চিতই আনন্দের সংবাদ। যদি বিলাত, ইটালী এবং চীন ও আমেরিকা প্রমুখ দেশে উহা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে এখানেই বা হইবে না কেন ? (১) মশকধ্বংসের ব্যবস্থা, (২) কুইনিন ও সিঙ্কোনা ব্যবহার, (৩) বন্যার জল প্রবাহিত করা, (৪) জলনিকাশের ব্যবস্থা করা,—এই চারিটি ব্যবস্থাই ম্যালেরিয়া-নাশের প্রধান অস্ত্র। সার জন বলেন, মশক-নাশের চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। কুইনিন ও সিঙ্কোনা রোগ উপশম করে, কিন্তু রোগ একবারে তাড়াইতে পারে না। জলনিকাশের ও বন্যার জল বহাইবার ব্যবস্থা বহুব্যয়সাপেক্ষ। ডাক্তার বেণ্টলি ও সার উইলিয়াম উইলকক্সও এ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ কোথায়, অথচ ধরিতে গেলে উহাই সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। তাই সহজে যাহাতে রোগ দূর হয়, সার জন সেই পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া দেখা দিবার পূর্ব্বে যাহাদের দেহে ম্যালেরিয়া-বিষ আছে, তাহাদিগকে তিন দিন পর পর কুইনিন ও প্ল্যাজমোকুইন খাইতে হইবে। তাহাতে তাহাদিগকে মশক দংশন করিলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া অন্যত্র বিষ ছড়াইতে পারিবে না। গভর্ণরের কথামত পরীক্ষা চলিবে নিশ্চিত। হয় ত তাহার ফলও শুভ হইবে। কিন্তু আসলে দেশের জলনিকাশের কি কোন ব্যবস্থাই করা যায় না ?

মীরাট মামলা

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলও হইয়াছে। এই মামলার বিরাটত্ব অসাধারণ, এক বঙ্গভঙ্গযুগে মাণিকতলা বোমা মামলা ছাড়া এত বড় বিরাট প্রকৃতির রাজনীতিক মামলা এ দেশে হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। ইহাতে যত সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে এবং সাধারণের যত অর্থ সরকার পক্ষ হইতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৬ লক্ষ টাকা সামান্য কথা নহে। এই মামলা ৪ বৎসরের উপর চলিয়াছিল। বিচারক ইহার রায় লিখিতে ৫ মাস সময় লইয়াছেন। ১০ হাজার পাতায় রায় মুদ্রিত হইয়াছে। বিচারে ১ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ১৫ জন আসামীর যথাক্রমে ৫ হইতে ১২ বৎসর দ্বীপান্তর, এবং ১১ জন আসামীর যথাক্রমে ৩ হইতে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে এদেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মনীষী ভদ্রসন্তান ছিলেন একাধিক। কেহ কেহ এদেশ ও বিদেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয়ও ছিলেন। এই সকল কারণে এই মামলার কথা দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মামলা এখনও বিচারাধীন, এজন্য আমরা রায়ের বা দণ্ডের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিব না।

শাসকের মনোভাব

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার ম্যালকম হেলির অভিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ শাসক বলিয়া শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্যাতি। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সেই মহলে যে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে। সম্প্রতি ঝাঁসীর ক্ষত্রিয় সভার প্রতিনিধিমণ্ডলী তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে সার ম্যালকম অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ভারতে যে নূতন হাওয়া বহিতেছে, উহা পরে অতি শীতল ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।" কথাটা তিনি জমীদার ও ধনিক শ্রেণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "অন্যান্য শ্রেণীর লোকের অধিকারের বিপক্ষে উপরে উক্ত শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে, এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র অধিকাংশের শাসনতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। নূতন সংস্কারে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে নির্ব্বাচনকেন্দ্রের বহু-বিস্তৃতির ফলে জনগণই প্রাধান্য-লাভ করিবে, ধনিক ও জমীদার সম্প্রদায় সুবিধা করিতে পারিবেন না। জনগণ কর্ত্তৃত্ব পাইলে জমীদার ও প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল আইন আছে, তাহা গণতন্ত্রের অনুযায়ীই হইবে।" ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে কি ?

নারীর সতীত্ব

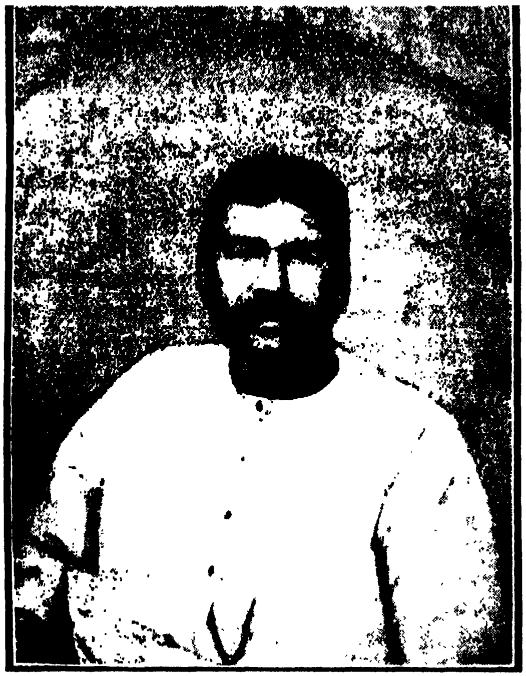
ঢাকার শ্রীমতী সুখদেবী সতীত্ব-রক্ষার জন্য সামসুদ্দীন নামক এক জন মুসলমান লম্পটকে হত্যা করিয়া দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুখদেবী ধামরাই থানার অন্তর্গত কাঁটাহাটি গ্রামের ২৫ বৎসরবয়স্কা হিন্দু বিধবা। গত ভাদ্র মাসের এক দিন রাত্রিকালে কয়েক জন লম্পট নরপশু সুখদেবীর গৃহদ্বারে করাঘাত করে। সুখদেবীর চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসে বলিয়া সুখদেবী সে যাত্রা রক্ষা পান। তাঁহার গৃহে পুরুষ অভিভাবক নাই, তাঁহার এক মূক ও বধির বিমাতাই তাঁহার অভিভাবক। গত ৬ই আশ্বিন রাত্রিকালে সামসুদ্দীন বলপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সতীত্ব হরণের চেষ্টা করে। সুখদেবী তখন অনন্যোপায় হইয়া রামদা দিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত নরপশুকে হত্যা করেন। ইহাই অভিযোগ।

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে মামলার বিচার হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়া জুরী গঠিত হইয়াছিল। জুরীরা একমত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে এক জন মুসলমান জুরী বলেন, "সতীত্ব নষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুখদেবী যে সৎসাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।" দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া সুখদেবীকে মুক্তি দিয়াছেন।

মামলা সম্পর্কে মুসলমান জুরীদের হিন্দু জুরীদের সহিত একমত হওয়া এবং মুসলমান জুরীর মুখে এইরূপ উক্তি প্রকাশ হওয়া বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই ভাবে যদি মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে কোনও সম্প্রদায়ের কামান্ধ নরপশুর বিপক্ষে তীব্র অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ রাহা

সুপ্রসিদ্ধ আর লগিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ রাহা ১৭ই জানুয়ারী পুরীধামে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন



নগেন্দ্রনাথ রাহা

জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। প্রথম জীবনে নগেন্দ্রবাবু সামান্য চাকরী করিতেন—পরে একটিমাত্র ঔষধ 'হিলিংবাম' আবিষ্কার করিয়া—তাহার প্রচারে ঐকান্তিক যত্ন করিয়া—সাধুতার মূলধনে চরম সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার আদর্শ গুরুভক্তি সাফল্যের অন্যতম কারণ। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গঙ্গার ঘাটে ভূতানন্দ স্বামী নামে এক যোগী থাকিতেন—তিনি অসামান্য যোগশক্তি ও বিভূতির অধিকারী ছিলেন। নগেন্দ্রবাবু ভূতানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভূতানন্দ স্বামী পুরীধামে দেহত্যাগ করেন। নগেন্দ্রবাবু সেই সময় হইতে প্রতি পার্শ্ব একাদশীর দিন গুরুদেবের স্মরণোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। পুরীধামকে তিনি তীর্থরাজ মনে করিতেন। পুরীর স্বর্গদ্বারে বহু ব্যয়ে গুরুদেবের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গোবর্দ্ধন মঠের উপর তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করেন—মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মঠের শঙ্করাচার্য্য মধুসূদন তীর্থস্বামীর নিকট মাসিক মোটা টাকা সাহায্য পাঠাইতেন। নগেন্দ্রবাবু পুরীধামে মধ্যে মধ্যে গিয়া প্রতিবারে ৭।৮ হাজার টাকা ব্যয়ে বিরাট ভোগ প্রদান করিয়া সাধুসজ্জন—সহস্র সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতেন। পুরীধামেই তিনি গুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। শেষ জীবনে নগেন্দ্রবাবু ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্মসাধনায় মগ্ন থাকিতেন। কর্ম্মজীবনে থাকিয়াও যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়—আদর্শ গুরুভক্তিই যে সাফল্যের শ্রেষ্ঠ সোপান, নগেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন সাধনায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ গুরুভক্তি অনুকরণযোগ্য।

বাণী-বন্দনা

বনদেবী আজি সাজিয়া দাঁড়াল সুরভি কুসুম-ভারা,
নৃত্যরঙ্গে উঠেছে হাসিয়া সরসী—সরোজ-হারা;
উজলি' উঠেছে আগমনে কা'র ধরার অঙ্গখানি—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী জননী মোদের ধ্যানের রাণী।

তোমারে ঘেরিয়া আরতি করিছে রবি-শশি-গ্রহ তারা;
তব মন্দির নিখিল বিশ্ব—পুলকে আত্মহারা;
করে বিঘোষিত বিপুল মহিমা জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী জননী মোদের ধ্যানের রাণী।

সাজায়ে এনেছি আজিকে মোদের এ পূত অর্ঘ্যডালা
ভকতি-কুসুম করিয়া চয়ন গাঁথিয়া এনেছি মালা;
রাজে যেন সদা বক্ষে মোদের ও রাঙ্গা চরণখানি—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী জননী মোদের ধ্যানের রাণী॥

কি আছে মোদের তোমায় দিবার বিনা এ মর্ম্ম-গাথা,
বীণা-গঞ্জিত মঞ্জু-ভাষিণী বিদ্যাদায়িনী মাতা;
শুভ্রহাসিনী সরোজবাসিনী অমলা ধবলা বাণী—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী জননী মোদের ধ্যানের রাণী॥

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে'

বসুমতী-চিত্রবিভাগ] [শিল্পী—মিঃ জে, টমাস



সচিত্র মাসিক

বসুমতী

১১শ বর্ষ]   ফাল্গুন, ১৩৩৯   [৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জয় জয় রামকৃষ্ট   অতিশয় শুভাদৃষ্ট
করি দৃষ্টি নর-দেহে হরি-নারায়ণ।
কলির কলুষরাজ্য   এ কথা না করি গ্রাহ্য
কোন যুগে বার বার আকার ধারণ॥

প্রথমে সাজিয়া বুদ্ধ   শাস্ত্র-অর্থ ল'য়ে যুদ্ধ
বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীক্ষা দয়াধর্ম্ম শিক্ষা।
জন্মে রাজপুত্র হয়ে   কৈশোরে সন্ন্যাস লয়ে
নির্ব্বাণ করিলে দান ল'য়ে অন্নভিক্ষা॥

মীমাংসা কে করে এই   তুমি কি না পুনঃ সেই
শঙ্কররূপেতে যেই আইল ধরায়।
ঘুচায়ে বুদ্ধির ভ্রান্তি   বিগ্রহে দানিল শান্তি
শিব শিব শিব রব উঠে পুনরায়॥

ওদিকে ইহুদিগণ পাপপঙ্কে নিমগন
বর্ব্বর পাশ্চাত্য জাতি হইল স্মরণ।
করুণা করে আকৃষ্ট নাম ধ'রে যীশুখৃষ্ট
কুমারী মেরীরে মাতা বল নিরঞ্জন॥

ক্রুশে দিয়ে আত্মবলি রক্ত রেখে গেলে চলি
সেই রক্তে হ'ল মুক্ত ধরা-পাপভার।
মৎস্যজীবী শিষ্যদল লঙ্ঘি' সিন্ধু-চলাচল
য়ুরোপে খ্রীষ্টানধর্ম্ম করিল প্রচার॥

হেথা পঞ্চনদ-তীরে স্বধর্ম্মে জাগাতে বীরে
নানক গুরুর রূপে মন্ত্র করে দান।
ধর্ম্মভ্রাতা শিখ জাতি মর্ম্মতেজে ওঠে মাতি
স্বেচ্ছাচার অনাচার হ'ল অন্তর্ধান॥

পরে হের পুনরায় বঙ্গভূমে নদীয়ায়
গৌরাঙ্গ-লীলায় রঙ্গ ল'য়ে ভক্তদল।
আলো ক'রে শচী-কোল হরি বলে হরিবোল
প্রেমেতে মাতিল জীব ধরা টলমল॥

চণ্ডাল, পাষণ্ড, হীন, বাঙালী ভিখারী দীন
দুঃখীর দুয়ারে প্রভু প্রেম ভিক্ষা করে।
রাজা ত্যজি' সিংহাসন নষ্ট ভ্রষ্ট দুষ্ট জন
প্রেমদায় প্রভুপায় লুটায় কাতরে॥

জীবভাবে হৃষীকেশ দেখালেন কৃপাশেষ
কাঙালের বেশে আসি তাপিতে তারিতে।
এত প্রেম পেয়ে নরে যদি ভোলে নটবরে
উপায় হবে না তা'র সন্তাপ বারিতে॥

অমৃতলাল বসু।

উপনিষদের ভূমা

সামবেদীয় ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষৎ ভাষার সারল্যে—ভাবের গভীরতায় ব্রহ্মবিদ্যা-শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যমণির ন্যায় দীপ্তিমান। ইহার সপ্তম প্রপাঠকে ভূমার তত্ত্ব প্রাঞ্জল আখ্যায়িকা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গভীর চিন্তা ও অনুধ্যানের দ্বারা সেই সুগভীর তত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। সেই মধুর আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছি, শ্রদ্ধাসম্পন্ন পাঠক ধ্যান-ধারণায় ইহার অন্তর্নিহিত বাণী অনুভব করিবার প্রয়াস পাইবেন।

দেবর্ষি নারদ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। অনুপম সাধনসম্পৎ-সমৃদ্ধ তিনিই শিষ্যরূপে মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট সমুপস্থিত। জিজ্ঞাসাই সত্য ও নিঃশ্রেয়সলাভের একমাত্র উপায়। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ তাহাই বিনয়-নম্রচিত্তে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসু হইতে উপদেশ দিয়াছেন। নারদ সেই সনাতন-নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া ব্রহ্মিষ্ঠ সনৎকুমাকে প্রণতি জানাইয়া বলিলেন—"অধীহি ভগবঃ" হে ভগবন্, আমায় শিক্ষা দিন।

সনৎকুমারের প্রশ্নে আপন অধিকার বলিলেন। নারদ চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, দৈবশাস্ত্র, ভূগর্ভস্থরত্নজ্ঞানশাস্ত্র, তর্ক ও নীতি, শিক্ষাকল্পাদি-বেদাঙ্গ, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যনির্ম্মাণকলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, শিল্পাদি ও জ্ঞান প্রভৃতি এই সমস্ত বিদ্যা জানিয়াও আত্মবিৎ হইতে পারেন নাই।

"তরতি শোকমাত্মবিৎ।" যে আত্মাকে জানে, সেই শোকসাগর পার হইতে পারে। নারদ সেই পরাবিদ্যা-লাভের অভিলাষী।

সনৎকুমার শিষ্যের অভিমান নিরসন করিবার জন্য এবং শিষ্যের জ্ঞাত স্থূল বিষয়ের মধ্য দিয়াই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ, তাহা নাম মাত্র।"

অভয়কামী শিষ্যকে গুরু বলিলেন, শ্রুতির কথাই বলিলেন, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।"

শ্রুতি বলিয়াছেন—বিকার বাক্যারব্ধ নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সনৎকুমার উপদেশ দিলেন—"তোমার অধীত ঋগ্বেদাদি বিদ্যা নামরূপ মাত্র। নামকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর, যে নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে যে পর্য্যন্ত নামের গতি, সে পর্য্যন্ত যথাকাম অধিকার লাভ করে।"

শিষ্য তৃপ্ত নহেন, প্রশ্ন করিলেন, "অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি।" নামের চেয়ে বড় কিছু আছে কি?

উত্তর হইল—"আছে বৈ কি।"

নারদ কহিলেন—"হে ভগবন্, আমায় তাহা বলুন।"

"নামমাত্রই বাগিন্দ্রিয়ের অধীন, অতএব বাক্য নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বাক্‌ই সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বস্তুর প্রকাশক। যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য কিছুই প্রকাশিত হইত না, বাক্যই এই সমস্ত বুঝাইয়া দেয়, অতএব বাক্যের উপাসনা কর। বাক্যকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা কর, বাক্যের রাজ্যে তাহা হইলে অপ্রতিহত অধিকার হইবে।"

শিষ্যের তৃপ্তি নাই, উচ্চতর সত্যের সন্ধানী তিনি। গুরু তাই পুনরায় বলিলেন:—"মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। মন বাক্ ও নামকে হস্তামলকবৎ ধারণ করে। মনের সত্তায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিষ্পন্ন হয়, অতএব মনই আত্মা, মনই লোকপ্রাপ্তির উপায়; অতএব মনই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনের উপাসনা কর, তাহা হইলে মনের যতদুর অধিকার, ততদুর যথেচ্ছ ক্ষমতা জন্মিবে।"

তথাপি প্রশ্ন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

"সংকল্প মন হইতে বড়। সংকল্প হইতে চিন্তা, চিন্তা হইতে বাক্য, বাক্য হইতে নাম এবং তাহা হইতে মন্ত্র ও কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। মনঃ প্রভৃতি সমস্তই সংকল্পাত্মক, সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত, সংকল্পে লয়শীল। দ্যাবা, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং তেজ যেন সংকল্প করিয়াছিল, সেই সংকল্প হইতে বৃষ্টি জন্মে। বৃষ্টির সংকল্পে অন্ন, অন্নের সংকল্পে প্রাণ, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্র, মন্ত্রের সংকল্পে কর্ম্ম, কর্ম্মের সংকল্পে লোক এবং লোকের সংকল্পে সর্ব্বসংকল্প করে। সংকল্পের এইরূপ সর্ব্বাতিশায়ী মহিমা। অতএব তুমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে সংকল্পের উপাসনা কর।"

শিষ্য উচ্চতর সত্যের প্রার্থী। সনৎকুমার বলিলেন:—

"চিত্ত, অতীতানাগতবিষয় নিরূপণ-সামর্থ্যরূপ যে বুদ্ধি, তাহা সংকল্পশক্তির চেয়ে বড়। সংকল্পাদি চিত্তোদ্ভব এবং চিত্তেই লয় প্রাপ্ত হয়। বহু বিষয়ে পণ্ডিত হইয়াও যদি মানুষ বিবেচক না হয়, তাহা হইলে কেহই তাহাকে শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু অল্পজ্ঞ ব্যক্তি যদিও চিত্তবান্ হয়, যদি বিবেচনাশীল হয়, লোকে তাহার কথা শোনে। অতএব ব্রহ্মবুদ্ধিতে চিত্তের উপাসনা কর, তাহা হইলে ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি হইবে।"

কিন্তু জিজ্ঞাসা থামে না। গুরুর বাক্যামৃত বর্ষিত হয়।

"ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা মহৎ। পৃথিবী যেন ধ্যান করে, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, জল, পর্ব্বত, দেবতা ও মনুষ্যগণ যেন ধ্যানই করিতেছে। এই একাগ্রতাই মহত্বলাভের হেতু। চঞ্চল ব্যক্তিরা বিবদমান, কলহপ্রিয়, পরদোষপ্রকাশক এবং পরের স্তুতিশীল। কিন্তু যাহারা প্রভু, তাহারা স্থিতধী, শান্ত ও ধীর। অতএব তুমি মহিমাময় ধ্যানের উপাসনা কর।"

এখানেই শেষ নয়, মহত্তর বাণীর জন্য নারদ উদ্‌গ্রীব।

গুরু বলিলেন, "ধ্যান অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানমূলক যে বিজ্ঞান, তাহা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানই সমস্তকে জানায়। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই জ্ঞানলভ্য; অতএব তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হও।"

শিষ্য অতৃপ্ত। গুরু বলিতে লাগিলেন, "বলই বিজ্ঞানের চেয়ে শক্তিসম্পন্ন। বলী ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া গুরুপরিচর্য্যা করে। উপসন্ন হইয়া গুরুর নিকট শ্রবণ, মনন ও বোধ করে, পরে সেই বোধানুরূপ কার্য্য করে। বলই সকলের আশ্রয়, দ্যুলোক এবং ভূলোক বলেই অধিষ্ঠিত; অতএব তুমি বলের উপাসনা কর।"

নারদ আরও উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে চান।

গুরু উত্তর দিলেন, "বলের চেয়ে অন্ন মহৎ। অন্নই বল-লাভের হেতু। উপবাসী থাকিলে মানুষের দৃষ্টি, শ্রুতি, মনন, বুদ্ধি, ক্রিয়া এবং উপলব্ধি প্রভৃতি শক্তি চলিয়া যায়, অন্ন গ্রহণ করিলে পুনরায় মানুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা এবং বিজ্ঞাতা হয়। অতএব অন্নের উপাসনা কর।"

নারদ প্রশ্ন করেন—"ইহার উপরে যদি কিছু থাকে বলুন।"

সনৎকুমার প্রত্যুত্তর দিলেন—"আছে। অন্নোৎপত্তির কারণ জল অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ। সুবৃষ্টি হইলে প্রাণিগণ সুখী হয়, না হইলে নিরানন্দ হয়। জলই বিবিধ আকারে অবস্থিত। জলের পরমাণু সংহত হইয়াই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ, দেব, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতিরূপে মূর্ত্ত হয়। সমস্তের মূর্ত্তরূপ জলের উপাসনা কর।"

পুনরায় প্রশ্ন উঠে—পুনরায় উত্তর আসে।

"জল অপেক্ষা তেজ বরীয়ান্। কারণ, তেজের প্রভাবেই জল উৎপন্ন হয়। তেজ বায়ুকে ভর করিয়া তাপ দেয়, তাপ হইতে বৃষ্টি হয়। তেজই ঊর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুৎসমূহের মাঝে মেঘধ্বনিরূপে বিরাজ করে। তেজের পূর্ব্বাভিব্যক্ত রূপ হইতে বৃষ্টি জন্মে। অতএব তেজের উপাসনা কর, তাহা হইলে তেজস্বী, জ্যোতির্ম্ময়, ভাস্বৎ ও অপহততমস্ক হইবে।"

"তেজ হইতে আকাশ শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত তেজোময় পদার্থ আকাশেই অবস্থিত। লোকে আকাশের সাহায্যেই আহ্বান করে, আকাশের স্পন্দনশক্তিতেই শ্রবণ করে এবং প্রত্যুত্তর দেয়। আকাশেই আমাদের রতি এবং বিরতি, আকাশেই জন্ম, আকাশ অভিমুখেই অঙ্কুরাদি কার্য্যপদার্থ জন্মিয়া থাকে, আকাশ না থাকিলে জন্ম ও বৃদ্ধি সম্ভব নহে, অতএব এই সূক্ষ্ম আকাশশক্তির উপাসনা কর। তাহা হইলে প্রকাশবান্ আকাশবৎ পরিসর, অসংবাধ এবং আকাশগতির অধিকার-লাভ হইবে।"

নারদের জিজ্ঞাসা থামে না।—প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, আরও মহত্তর কথা বলুন।"

সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন, "আকাশ-শক্তি অপূর্ব্ব এবং অপ্রমেয়, কিন্তু স্মরণ আকাশের স্পন্দনশক্তির চেয়ে উচ্চতর। স্মরণ আছে বলিয়াই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন চলে। স্মরণ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব তুমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে স্মরণের উপাসনা কর।"

"আশা স্মরণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আশাই স্মরণকে প্রবৃত্ত করে। আশাই মানুষকে মন্ত্রে এবং কর্ম্মে নিয়োগ করে; অতএব তুমি এই শ্রেষ্ঠ আশার শরণাপন্ন হও।"

নারদের প্রশ্নগতি থামে না। অক্লান্ত সনৎকুমার বলিয়া যান :—

"প্রাণই আশার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। স্মৃতি, কামনা প্রভৃতি সকলই প্রাণ-শক্তিতে রথ-শলাকার মত গ্রথিত। প্রাণ-শক্তিই সর্ব্বশক্তির মূলাধার। রথ-শলাকা যেমন চক্রনাভিতে যুক্ত থাকে, সেইরূপ নামাদিও প্রাণ-শক্তিতে অর্পিত রহিয়াছে। প্রাণই ব্রহ্ম-চৈতন্যের সংকল্প। প্রাণই প্রাণের সাহায্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে এবং প্রাণের উদ্দেশেই দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ। যেমন আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমন ভাবেই পরব্রহ্ম নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার জন্যই জীবাত্মরূপে প্রাণ-শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট। মন্ত্রী যেমন রাজার সকল কায করেন, প্রাণও তেমনই পরমাত্মার সর্ব্বার্থসম্পাদক। চক্রনেমি যেমন শলাকায়, শলাকা যেমন চক্রনাভিতে গ্রথিত থাকে, সমস্ত ভূতমাত্রা তেমনই প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত, প্রজ্ঞামাত্রা-সমূহ আবার প্রাণশক্তিতে অর্পিত। এই প্রাণই সেই প্রজ্ঞাত্মা। ছায়া যেমন কায়ার অনুসরণ করে, প্রাণও তেমনই পরমেশ্বরের অনুগামী, অতএব সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ তাই পরাধীন নহে, প্রাণ স্বাধীন।

কেহ যদি পিত্রাদি গুরুজনকে অনুচিত কথা বলে, লোকে তাহাকে পিতৃহা বলে, কিন্তু মৃত পিত্রাদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেও কেহ পিতৃহা ইত্যাদি বলে না। অতএব প্রাণই সকল সম্বন্ধের মূল।

যিনি এই প্রাণ-তত্ত্বকে জানেন, যিনি আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগতের আত্মস্বরূপ প্রাণ-বিষয়কে অবগত হন, যিনি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করেন এবং এই পরমতত্ত্ব অনুভব করেন, তিনি অতিবাদী হন।

এইরূপ উপাসক স্থাবরজঙ্গমে প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়া নামাদি তত্ত্ব-নিচয়ের ঊর্দ্ধতম তত্ত্ব সম্যক্ অনুধ্যান ও অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়া অতিবাদী হন।

কিন্তু এই প্রাণ-শক্তিকে লইয়া থাকিলে মানুষের জয়যাত্রা সার্থক ও সুন্দর হইবে না। অনন্তের দিকে মানব-মনের প্রগতি, অসীমের দিকে তাহার প্রসৃতি। প্রাণ-শক্তি ত বিকারাত্মক, পরিণামশীল। ব্রহ্ম বিকারাতীত, অপরিণামী। প্রাণকে তাই যিনি জানেন,তাঁহাকে আপেক্ষিক-ভাবে অতিবাদী বলা যায়, কিন্তু যিনি পরম সত্যকে জানেন না, যিনি ভূমাকে জানেন না,তিনি প্রকৃত অতিবাদী নহেন।

নারদ এই প্রাণশক্তিকে যথেষ্ট মনে করিলেন। সর্ব্বত্র এই প্রাণস্পন্দনের লীলা অনুভব করিয়া নারদ পরমানন্দ-রসে মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিলেন, জিজ্ঞাসার শেষ এইখানে, প্রশ্নের পরিণতি এইখানে। কিন্তু যোগীশ্বর সনৎকুমার তাঁহাকে পূর্ণতত্ত্ব বুঝাইতে সমুৎসুক, অল্পকে লইয়া, ক্ষুদ্রকে জানিয়া, খণ্ডকে মানিয়া যে সুখ নাই, অখণ্ডকে জানিলেই পূর্ণানন্দ, সেই ভূমার তত্ত্ব তাই অজিজ্ঞাসিত হইয়াও কল্যাণভাজন শিষ্যকে প্রদান করিলেন। তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "হে ধীমন্, প্রাণবিৎ হইলেই প্রকৃত অতিবাদী হয় না, এ অতিবাদিত্ব আপেক্ষিক, যে ভূমাকে, সর্ব্বাতিশয় পরমার্থকে জানে, সেই যথার্থ অতিবাদী।"

নারদ ক্ষণিক অবসাদ হইতে জাগিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হইতে চাই।"

সনৎকুমার বলিলেন—"তাহা হইলে সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্, সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

নারদ বলিলেন—"সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস।" হে ভগবন্, আমি সত্যকেই জানিতে চাই।

তাহার পর অমৃতত্বের সুধাধারা গুরু-শিষ্যের সংলাপে ক্ষরিত হইল।

সনৎকুমার বলিলেন—"পুরুষ যখন বিশেষরূপে পরমার্থ সত্যকে জানিতে পারে, তখন বিকারপদার্থ ত্যাগ করিয়া সমস্ত বিকারপদার্থে অনুস্যূত যে সৎপদার্থ, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সত্যই বলিয়া থাকে। এই পরমার্থ সত্যকে না জানিলে সত্য বলা চলে না। যে কেবল এই পরম সত্যকে জানে, সেই কেবল ইহা প্রকাশ করে, অতএব সেই সত্যবিজ্ঞানই পরম প্রার্থিতব্য বস্তু।"

নারদ বিনয়নম্রভাবে বলিলেন—"গুরুদেব! আমি এই বিজ্ঞানকে জানিতে চাই।"

"পুরুষ যে সময় জ্ঞাতব্যের জন্য তর্ক ও বিচারের দ্বারা মনন করে, তখনই জ্ঞেয়কে জানে, মনন না করিলে কিছুই বুঝিতে পারে না; অতএব মতিকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

নারদ ভক্তিনত-চিত্তে উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি এই মননকে জানিতে চাই।"

"মানুষ যখন শ্রদ্ধাবান্, তখনই শ্রদ্ধার বিষয়ে মনন করে, শ্রদ্ধাহীন কখনই মনন করে না। যাহার আস্তিক্য-বুদ্ধি আছে, সেই-ই কেবল মনন করে, অতএব শ্রদ্ধাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

একান্ত অনুগত শিষ্য বলিলেন, "ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকেই জানিতে চাই।"

গুরুদেব বলিলেন, "মানুষ যখন নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই তাহার শ্রদ্ধা জাগে। গুরুশুশ্রূষাদির দ্বারা যাহার নিষ্ঠা স্থির নহে, সে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তৎপর নিষ্ঠালু মানুষই শ্রদ্ধাবান্। অতএব নিষ্ঠাকে জানা চাই।"

নারদ বলিলেন—"আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই।"

সনৎকুমার বলিলেন, "মানুষ যখন ইন্দ্রিয়সংযমে যত্নবান্ হয়, তখনই নিষ্ঠা লাভ করে। অসংযমী নিষ্ঠাবান্ নহে। সংযম ও একাগ্রতাই কৃতি, সেই কৃতি থাকিলে নিষ্ঠালাভ হয়, অতএব কৃতিকে জানা চাই।"

নারদ বলিলেন—"কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস" হে ভগবন্, আমি কৃতিকে জিজ্ঞাসা করি।

স্তরে স্তরে পর্দ্দায় পর্দ্দায় আমরা আধ্যাত্মিক জগতের মণিময় প্রাসাদের সোপান আরোহণ করিতেছি। কৃতির উৎস সুখ, সুখ না পাইলে চেষ্টা ও যত্ন করিব কেন, কাযই বা করিব কেন? তাই সনৎকুমার বলিলেন—"যখন মানুষ সংযম ও সাধনায় সুখলাভ করে, তখন সংযমশীল হয়, সুখ না পাইলে কেন সংযম করিবে? সুখ-লাভের জন্যই মানুষ কৃতিসাধন করে, অতএব তুমি সুখকে জানিবে।"

নারদ বলিলেন—"প্রভু, সেই সুখকে জানিতে চাই।"

তখন জলদগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মনিষ্ঠ সনৎকুমার রহস্যবাণী বলিলেন :—

"যো বৈ ভূমা, তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" যাহা ভূমা, যাহা মহান্, যাহা নিরতিশয়, তাহাই সুখ। যাহা অল্প, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই পরমানন্দস্বরূপ, এই ভূমাকে জিজ্ঞাসা কর।"

নারদ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিতে চাই।"

শিষ্যমঙ্গলপ্রার্থী করুণাময় ঋষি তখন বলিলেন :—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যে বৈ ভূমা তদমৃতম্; অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্ স ভগব কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি।"

যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। যাহাতে অন্যবস্তু দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান হয়, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত; যাহা অল্প, তাহা মরণশীল। যত দিন অজ্ঞান থাকে, তখনই পদার্থকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়া ভুল করি, যখন জ্ঞান হয়, তখন সর্ব্বব্যাপক ভূমাকে দেখি। ভূমার সীমা নাই, পরিমিতি নাই, তাই সেখানে দ্বৈত নাই, ভূমাকে জানিলে অদ্বৈত-জ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ ও ধন্য হয়।

এই ভূমার প্রতিষ্ঠা কোথায়? নারদের এই প্রশ্নে গুরু বলিলেন—যদি তুমি উত্তর চাও ত বলি, আপন মহিমায়, আপন বিভূতিতে, কিন্তু যদি সত্য চাও, তবে বলি, ভূমাই ভূমার প্রতিষ্ঠা। সাংসারিক বস্তুর মাহাত্ম্য অন্যবস্তুনির্ভর, কিন্তু ব্রহ্মের মহিমা নির্ভরশীল নহে।

এই ভূমাই অধোভাগে, তাহাই উপরে, তাহাই অগ্রে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে, তাহাই এই সমস্ত জগৎ। ভূমাতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ভূমাই সর্ব্বময়, কাযেই ভূমার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই।

এই ভূমা ও দ্রষ্টা পুরুষ অভিন্ন। মানুষ ও ভগবান্ এক। কাযেই আমি বলিতে পারি—আমিই উপরে, আমিই নীচে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সমস্ত। এই ভূমাই আত্মরূপে বিরাজমান। আত্মাই অধঃ ও উর্দ্ধে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত জগৎ।

আত্মাকে এইরূপ সর্ব্বময় দর্শন, মনন ও অনুভূতি করিয়া মানুষ আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মানন্দ, আত্মমিথুন হয়। সে স্বরাট হয়। সেই পুরুষ জীবৎকালে স্বারাজ্যে সম্রাট, দেহপাতেও আত্মনাথ, সেই জন্যই সকল লোকে তাহার ইচ্ছাগতি। কিন্তু যাহাদের এই জ্ঞান হয় না,

তাহারা ক্ষয়শীল ও মরণশীল ফল ও লোক লাভ করিয়া থাকে।

যাঁহার এই অদ্বৈতবোধ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার জ্ঞানে সমুদায় পদার্থই আত্মা হইতে উৎপন্ন ও আত্মাতেই বিলীন হয়। তাঁহার আত্মা হইতে প্রাণ, আশা, স্মৃতি, আকাশ, তেজ, বারি, আবির্ভাব-তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সংকল্প, মন, বাক্য ও নাম, মন্ত্রসমূহ, এমন কি, এই সমস্ত জগৎই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানী পুরুষ এই বিশ্বচক্রের মূল সুর শুনিতে পান, তাঁহার নিকট ব্রহ্মনিরপেক্ষ আত্মনিরপেক্ষ কোন কিছুরই সত্তা থাকে না।"

এই আত্মদর্শীর অবস্থা সম্বন্ধে সনৎকুমার এক শ্লোক বলিলেন :—

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি
স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা,
সপ্তধা, নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ
শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।"

তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দেখেন না, রোগানুভব করেন না, দুঃখবোধ করেন না! এই আত্মদর্শী ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সকলপ্রকারে সকল বিষয় প্রাপ্ত হন। সেই বিদ্বান্ পুরুষ বিভিন্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে এক থাকিয়াও সৃষ্টিকালে অনন্ত প্রকার ভেদরূপ গ্রহণ করেন, আবার পুনরায় সংহারকালে একরূপ হইয়া যান।

নারদ মুগ্ধচিত্তে এই অমৃতকাহিনী শুনিলেন। আত্মজ্ঞানের পুণ্য মন্দাকিনীধারায় স্নান করিয়া তিনি নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গুরু শুধু সত্যস্বরূপকে দেখাইয়া ক্ষান্ত নহেন, সত্যলাভের পন্থা বলিতেছেন :—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র না হইলে ভগবৎজ্ঞান তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সেই জন্যই আহারশুদ্ধি করিয়া, যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার-শব্দাদি ভোগ্যবিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাই আহার, রাগদ্বেষাদি দোষরহিত হইলেই আহারশুদ্ধি হয়, আহারশুদ্ধি হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা হয়, বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইলেই ভূমার সম্বন্ধে ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতিধারা উপস্থিত হয়, আর ধ্রুবা স্মৃতি আসিলে জন্মজন্মান্তরের বাসনার যে গ্রন্থিজাল, তাহা নাশ হইয়া পুরুষের পরমকৈবল্যলাভ হয়।

ইহাকেই অন্যত্র বলা হইয়াছে :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ভগবান্ সনৎকুমার উপসন্ন নারদকে এইরূপ অমৃততত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। মৃদিতকষায় নারদ সনৎকুমারের কথিত তত্ত্বানুভব করিয়া অবিদ্যাতমসা পার হইয়া পরমার্থলাভ করিয়াছিলেন।

পরমজ্ঞানী পরমভাগবত অমৃততত্ত্বোপদেষ্টা সনৎকুমারকে প্রাচীন ঋষিরা স্কন্দ বলিয়া অভিহিত করিতেন। জ্ঞানবৈরাগ্যের অভ্যাসেই চিত্তের কষায় ক্ষালিত হয়, সেই জ্ঞান-বৈরাগ্যের—সেই ধ্যানধারণার আশ্রয় লইয়াই এই পরমতত্ত্বের, এই গুহ্যাতিগুহ্য আত্মবিদ্যার উপলব্ধি হয়।

এই ভূমার বাণী ভারতীয় সাধনার পরম ও চরম সম্পদ্। জীবনের চারি পাশে নিত্যকার জীবনের ধূলি-ধূম যে অপরিসর স্থান আমাদিগের জন্য নিয়ত রাখে, তাহাতে আমরা তৃপ্ত থাকিতে পারি না, আমাদের মন বিস্তার চায়। আমাদের মনের সীমা আপনাকে আয়ত্ত করিতে চাহে। আমিত্বের প্রসারই আমাদের ধর্ম্মের সাধন বলিয়া কথিত।

আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবধর্ম্ম। তাহা ছাড়াইয়া যখন অপরের জন্য ভাবিতে শিখি, তখনই আমিত্বের প্রসার হয়। এই প্রসারকে ক্রমে ক্রমে স্বার্থ-বুদ্ধির জগৎ হইতে, করুণা, মৈত্রী, মুদিতার দ্বারা সর্ব্বত্র বিকাশ করিতে হইবে। কালে বিশ্ব ও আমার মধ্যে অভেদ ঐক্য অনুভব করিয়া শাশ্বত আনন্দ লাভ করিব।

ভূমার বোধ ব্রহ্মানুভূতির বোধ। নিজেকে যখন খণ্ড ও পরিচ্ছিন্ন মনে করি, যখন জগৎস্মৃতির সহিত নিজের যোগকে ভুলিয়া যাই, তখন আত্মহত্যা করি। কারণ, আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বগ, তাই সকলের সহিত আত্মীয়তার বন্ধন যখন স্থাপন না করিয়া ভেদ ও বৈষম্যের প্রাচীর তুলি, তখন আমরা পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হই।

সুখের জন্যই ভূমাকে জানিতে হইবে। অল্প লইয়া যদি আমরা থাকি, তাহা হইলে রিক্ততা ও দৈন্যই আমাদের সম্বল হইবে, যে রাজৈশ্বর্য্যে আমাদের জন্মগত অধিকার, তাহাতে আমরা বঞ্চিত হইব।

ভূমার বোধ মানুষকে অখণ্ডতা এবং পরিপূর্ণতার মাঝে জাগ্রত করে। মুকুল যেমন বিকচ সুষমার জন্য দিনে দিনে আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, জীবনের নানা আয়োজন ও চেষ্টার মাঝেও আমাদিগকে সেইরূপ চিত্তকে ভূমার অভিমুখীন করা উচিত।

ভেদ ও ছেদ লইয়াই জীবন। অসীম ও অনন্ত যখন সীমা ও সান্তের মাঝে ধরা দেন, তখনই লীলা আরম্ভ হয়। কিন্তু তবুও প্রতি পলে পলে, আমাদের অন্তর আপন স্বরূপ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মনের গোপন কোণে অসীমের সুর বাজিয়া উঠে।

মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার Mysticism in Bhagavat Gita নামক উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The mystic is a seeker of the vastness which is its final stay and source. It does not know when its nativity begins, but it feels that it cannot have rest and peace until and unless it has come back to the source. The intensive attraction and clinging to the expanse clearly indicate its true and essential nature and have its confinement in the concrete form as only a temporary, though a distressing, phase of its history and existence."

অর্থাৎ মরমী ভূমার পথিক, কারণ, ভূমাতেই উৎপত্তি ও লয়। মরমী জানে না, কখন্ তাহার ভূমার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু একান্তভাবে অনুভব করে যে, ভূমার কাছে ফিরিতে না পারিলে তৃপ্তি ও শান্তি নাই। ভূমার প্রতি এই একান্ত আগ্রহ ও আকর্ষণ হইতে বুঝি, মানুষের আত্মা ভূমারই অংশ এবং যতই দুঃখময় হউক না কেন, এই পার্থিব জীবন আমাদের অস্তিত্বের ক্ষণরূপ মাত্র।

ভূমার এই কল্পনা, এই আদর্শ ভারতবর্ষের নীতি ও ধর্ম্মকে বিচিত্র ও বিপুল করিয়া তুলিয়াছিল। সাধকের অনুভূতির ফলে লব্ধ এই পরম তত্ত্ব আমাদের পরম আশ্রয়। এই ভূমাকে লাভ করিবার জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে অতীত সাধনায় সেই বিচিত্র অবদান আজিও আমরা হারাইয়া ফেলি নাই। আজ যখন বিশ্ব-জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিকট ও দৃঢ়তর হইতেছে, তখন ক্ষণিকের এই খেলাঘরও যাহাতে আমাদের এই তপোলব্ধ ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

মানুষ নিজে ভূমা, এবং তাহাকে ভূমা লাভ করিতে হইবে, ইহার অপেক্ষা বড় কথা আর কি হইতে পারে? এই বোধ জাগ্রত হইলে মানুষের সমস্ত সম্পর্ক আনন্দ ও মৈত্রীতে মধুর হইয়া দেখা দেয়, সমস্ত নীতি সত্য ও সার্থক হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত সমাজবন্ধন কল্যাণ ও সাম্যে পবিত্র ও হৃদ্য হইয়া উঠে।

এই বৃহতের বাণী কেবল ছান্দোগ্যে নহে, অন্যান্য উপনিষদেও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মুগ্ধ এবং ভক্তিনত চিত্তে এই অগাধ অপার শাস্ত্র-বারিধির কূলে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত হিরণ্ময় সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতজিজ্ঞাসু পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন :—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভাতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি! এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।"

যেখানে দুই আছে, সেখানে একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রবণ, মনন বা স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু ইহার নিকট যখন সকলই আত্মা হইল, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, অভিবাদন, শ্রবণ, মনন বা স্পর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে জানিবে। যাহা দ্বারা এই সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে। এই আত্মাকে নেতি নেতি করিয়া জানিতে হয়। ইনি অগৃহ্য, ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ, কিছুতেই লিপ্ত হন না, ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা

পান না কিংবা বিদ্বিষ্ট হন না। অয়ি, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ?

হে মৈত্রেয়ি, আমার অনুশাসন এই পর্য্যন্ত, অমৃতত্ত্ব এই পর্য্যন্ত। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য চলিয়া গেলেন।"

অজ্ঞেয় যে অমর আত্মা, তাহাকে আমরা সীমার জীবনে কেমন করিয়া জানিব ? জানিতে পারি না, তথাপি আকাঙ্ক্ষার অবধি নাই। যাহা অসীম, যাহা অনন্ত, যাহা ভূমা, তাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা অজ্ঞেয়। সীমা ও সান্তের মাঝে, খণ্ড ও অল্পের মাঝে ধরা দিয়াই সীমা ও অসীমের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে।

আমাদের জীবনকে সীমা ও খণ্ডতায় যদি বিকৃত করিয়া তুলি, যদি ক্ষুদ্রতায় ও সঙ্কীর্ণতায় অসুন্দর করিয়া তুলি, তবে অসীমের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিব।

এই কারণেই উপনিষদের ঋষি জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন :—

"যো বৈ ভূমা তৎ বৈ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রাত্যহিক জীবনের বন্ধনের মাঝে তাই আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না, আত্মীয়তার ছন্দে সমগ্র জগৎকে বাঁধিয়া জীবনে অসীমের প্রকাশকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—"স একো মানুষ আনন্দঃ।" সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আনন্দ। পৃথিবীর দুঃখজ্বালাময় পাত্রে আনন্দের যে কণাটুকু যেখানে দেখি, সে তাহার আনন্দের অংশ। ভূমাকে লাভ করিতে পারিলে আমরা এই নিখিলানন্দরসে মগ্ন হইয়া যাইব। এই আনন্দের জন্যই আমরা চিরকাল লালায়িত। সে নিগূঢ় আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, মানুষের ভাষা বা মন সেই আনন্দের কণাকেও দেখিতে পারে না, তথাপি কস্তূরীগন্ধব্যাকুল মৃগের মত আমরা কেবলই ছুটিয়া বেড়াইতেছি। জীবনে ভূমার অভিব্যক্তি চাই। ক্ষুদ্রতাই আমাদের বন্ধন,—আমাদের দুঃখের নাগপাশ। ভূমা অভিব্যক্ত হইলে আমাদের জীবন সার্থক ও সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূমার সাধনা সত্যের সাধনা। দৃশ্যে অদৃশ্যে, অন্তরে বাহিরে আমরা যদি পূর্ণতাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের অনুভূতি দিনে দিনে সম্পন্ন ও সার্থক হইয়া উঠিবে। আমাদের দৈনন্দিন হাজার কাযের মাঝে যেন আমরা আত্মাকে অবনমিত না করি, যেন দৃপ্তচিত্তে বলি—"হে ভূমা! তুমি সুস্পষ্টরূপে আনন্দসত্তারূপে অপ্রতিহত এবং অব্যাহত আছ, তোমাকে আমি প্রণতি জানাই।

জীবনে যে তামসিকতা আছে, অজ্ঞানের ও ভয়ের যে গাঢ় অন্ধকার আছে, ভূমার প্রকাশের আলোকে তাহা দূর হইয়া যায়। আমাদের সমস্ত মনকে, সমস্ত চেষ্টাকে, সমস্ত ছন্দকে ভূমার সুরে যোগ করিতে হইবে। জীবনের যত দ্বন্দ্ব, বিপ্লব, যত গ্লানি ভূমার সত্য মন্ত্রে তাহা পরাভূত হইবে এবং যে পরিমাণে আমরা অন্তরে ভূমাকে উপলব্ধি করিয়া চলিব, সেই পরিমাণে আমরা জ্যোতির ও আনন্দের লীলাতরঙ্গে ভাসমান হইব।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)

সন্ধি

(গল্প)

১

ব্যাপার খুবই তুচ্ছ, এই তুচ্ছ ব্যাপারের পরিণামই⋯!

দুনিয়ার পানে চাহিলে দেখি, ঐ এক নিয়ম! সকল বড় ব্যাপারের মূলে থাকে অতি তুচ্ছ হেতু! এক-টুকরা কালো মেঘ যে-ঝড় বহিয়া আনে, সে ঝড়ে বড় বড় গ্রাম-নগর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়; সাগরের জলে সে ঝড় যে তরঙ্গ তোলে, তাহাতে মণি-মাণিক্যপূর্ণ বড় বড় জাহাজ উল্টিয়া জল-তলে বিলীন হয়! এবং⋯

এ সব দার্শনিক কথা। দার্শনিক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ভূমিকা দীর্ঘ করিবার কোনো হেতু দেখি না!

নির্ম্মলের কথা বলিতেছিলাম। চার বৎসর সে ওকালতি সুরু করিয়াছে। পশার হইতেছে। পশার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে মনকে সে-পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়াছে, ভিতরের দিকে মন ঠিক ততখানি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। না হইয়া উপায় নাই! মানুষের মন, তার একটা সীমা আছে! পয়সার দিকে সে-মন ছুটিলে দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধের পানে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না! নির্ম্মলের মনের অবস্থা ঘটিয়াছিল, ঠিক তেমনি!

নির্ম্মলের মনের এ সঙ্কোচে ব্যথা পাইল তার স্ত্রী অমলা! তরুণী সুন্দরী—এ-কালের লেখাপড়া-জানা মেয়ে! শুধু তাই নয়। স্বামি-স্ত্রীর সাম্য, অধিকার সম্বন্ধে নির্ম্মলই তার চিত্তকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই অন্দর ছাড়িয়া নির্ম্মলকে সদরের সম্মানে ব্যস্ত দেখিয়া অমলা নিশ্বাস ফেলিল।

ভাবিল, নিজের দিকে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটিয়াছে? দিনের নিত্য কর্ম্মের তালিকা ঘাঁটিয়া অমলা সন্ধান লইল, কোথাও কোনো বিচ্যুতি নাই! নির্ম্মলের ওকালতি সুরু করার ক্ষণ হইতে যে রুটীন দু'জনে বসিয়া বাঁধিয়াছে, সেই রুটীন আজো সমানে সে মানিয়া আসিতেছে! সকালে মুখ-হাত ধুইয়া নির্ম্মল দোতলার ছোট্ট বারান্দায় বেতের চেয়ারে আসিয়া বসে; চেয়ারের সামনে টীপয়, অমলা নিজের হাতে চা তৈয়ার করিয়া পেয়ালা আনিয়া নির্ম্মলের সামনে ধরিয়া দেয়, নিজেও এক পেয়ালা চা আনিয়া পাশের চেয়ারে বসে।

এ সময় দু'জনে আগে কত কথা হইত! অমলা তার মনের স্বপ্ন-কাহিনী খুলিয়া বলিত, নির্ম্মল হাসি-মুখে সে-কথা শুনিত। অমলার ছোটখাট বায়না ছিল নিত্য,—ছোট একটা কাচের আলমারি ত্যাখোনা গা—পুতুল-টুতুল-গুলো গুছিয়ে রাখি। কোনো দিন বলিত,—ও বাড়ীতে রেডিওতে গান হয়, শুনি। তুমি মক্কেলদের সঙ্গে নীচেয় বসে কাজ করো, আমি একা ঐ গান শুনে সময় কাটাবো!

হাসিয়া নির্ম্মল বলিত,—একটা রেডিও শেট চাই?

হাসি-ভরা দৃষ্টি নির্ম্মলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া অমলা বলিত, না। তবে খুব বেশী দাম যদি না লাগে⋯

নির্ম্মল বলিত,—না, না, এমন বেশী দাম নয়⋯

অমলা জবাব দিত,—তা হলে বেশ হয়। সত্যি, একালের ঘর-কর্ণায় একটা রেডিও শেট না হলে⋯

অমলার কথা শেষ হইত না, চারিদিকে চাহিয়া নির্ম্মল তার অধরে অধর রাখিয়া অমলাকে বাক্য-হারা করিয়া দিত!

হাসি-খুশীভরা দিনগুলি চমৎকার কাটিতেছিল⋯কিন্তু হঠাৎ আজ ক'মাস একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! চায়ের টেবিলে বসিয়া নির্ম্মল অন্য কথা ভাবে। অমন যে হাসি-গল্প—সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

অমলা এক দিন প্রশ্ন করিল,—কি ভাবচো?

নির্ম্মল উত্তর দিল,—একটা শক্ত মকর্দ্দমার কথা। একজনের নামে তার মনিব নালিশ করেচে⋯

অমলা কহিল,—থাক বাবু, ও মকর্দ্দমার কথায় আমার রুচি নেই!

অমলা উঠিয়া টবের গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরাইয়া ফেলে, নয় মাটীটুকু খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দেয়, নির্ম্মল আইনের নাগপাশ হইতে মক্কেলকে মুক্ত করিবার উপায় খোঁজে!

নিত্যকার যে কাজগুলিতে স্বামি-স্ত্রীর সহজ যোগ ছিল, এখন সে সব ব্যাপারে নির্ম্মলের যোগ-সূত্র

কাটিয়াছে। বাহিরে তার আহ্বান সারাক্ষণ লাগিয়া আছে। দু'দণ্ড ঘরে বসিবে, অবসর নাই! হাসিয়া নির্ম্মল বাহিরে ছোটে, অমলার পানে চাহিয়া বলে,—এরা একটু বিশ্রাম দেবে না, দেখছি!

অমলার বুকের মধ্যে অশ্রুর গোপন পাথার উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, কোনো মতে নিশ্বাস চাপিয়া সে গিয়া পাখীর খাঁচার সামনে দাঁড়ায়। উদাস নেত্রে খাঁচার পাখীর পানে সে চাহিয়া থাকে!

টবে ফুলের গাছ, খাঁচায় ক্যানারি, জাভা স্প্যারো, মুনিয়া; ঘরে রেডিও শেট্, গ্রামোফোন—এ-সবে তার আজ কোনো আকর্ষণ নাই। তারা আজ নির্জীব প্রাণহীন – পাথরের গায়ে খোদা অতীত গৌরব-সমৃদ্ধির মৌন মূক স্মৃতির স্তূপ মাত্র!

নির্ম্মল টাকার পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছে, তার দীপ্তিতে বুক আলো হইয়া আছে! দুনিয়ার কোনো কোণে কালো আঁধার আছে, সে জ্ঞান তার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

এমনি ভাবে চিরদিনের নীল নির্ম্মল আকাশে কালো মেঘের ছায়া জমিয়া উঠিতেছিল! সে ছায়ায় অমলার তরুণ মনের আলোটুকু ম্লান হইয়া গেল! দুনিয়ার যত রঙ তার চোখে মিলাইয়া আসিতেছিল! কিন্তু উপায় কি! উপায়…!

২

সেদিন এক উপসর্গ ঘটিল।

ভূষণ নির্ম্মলের বন্ধু। ভূষণের স্ত্রী প্রতিমার সঙ্গে অমলার সখিত্ব ছিল নিবিড়। প্রতিমা এখন দূরে গিয়াছে, স্বামীর সঙ্গে। স্বামী বিদেশে মুন্সেফি করে।

প্রতিমা আসিয়াছিল বাপের বাড়ী; ফিরিবার আগে সখীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। প্রতিমাকে অমলা বুকে চাপিয়া ধরিল। তার পর দু'জনে নানা কথা। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া প্রতিমা কহিল,—ঘরের আসবাব-পত্রে তোর আর সে-দৃষ্টি নেই!

একটা নিশ্বাস অমলার বুকে ঠেলিয়া আসিল। সে নিশ্বাস কষ্টে চাপিয়া মুখে হাসির রেখা আঁকিয়া অমলা কহিল,—কিসে দেখলি?

প্রতিমা কহিল,—সব জিনিষে।…এইটুকু বলিয়া সে পুতুলের আলমারির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—আলমারির মধ্যে পুতুলগুলো সাজিয়ে রাখতে পারিস নে! সব জড়ো হয়ে পড়ে আছে এক-জায়গায়…

অমলা চাহিয়া দেখিল। মনে পড়িল, সেদিন বৈকালে পুতুলগুলা ঝাড়িয়া মুছিয়া আলমারিতে সাজাইবে বলিয়া পাড়িয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নির্ম্মল আসিল কাছারি হইতে; আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া কহিল,—চট্ করে এক পেয়ালা চা আমাকে দাও। এখনি ছুটতে হবে বালী থানায়, এক মক্কেলের জামিনের জন্য…

অমলাকে যেন বন্দুকের গুলি মারিল! সেদিন সন্ধ্যায় তার জন্মদিন উপলক্ষে ছোট একটু উৎসবের আয়োজন ছিল। নির্ম্মল বলিয়াছিল, তাকে লইয়া বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবে।…

কিন্তু নিজের বেদনা লইয়া অভিমানের ঘটা করিবে, বা কাঁদিয়া সে-বেদনা নিবেদন করিবে, অমলার মন এমন ছাঁচে গড়া নয়। বেদনায় ভাঙ্গিয়া গেলেও সে-বেদনার কথা কাহারো সামনে প্রকাশ করিয়া মাটীতে সে মিশিতে পারে না, এ স্বভাব তার চিরদিন!

নির্ম্মলের কথায় অমলা চা তৈয়ার করিয়া পেয়ালা আনিয়া তার সামনে ধরিল, কহিল,—দু'টুকরো রুটী টোষ্ট করে দি?

নির্ম্মল কহিল,—না, না…

নির্ম্মল চা পান করিল, অমলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসি-মুখে কহিল,—ষোল টাকা ফী দেবে…

ব্যস্! কথার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র উৎসাহে নির্ম্মল নামিয়া গেল। আর অমলা ম্লান মুখে, মলিন চোখে জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে পথ। পথে ট্যাক্সি। নির্ম্মল ট্যাক্সিতে চড়িল, সঙ্গে ময়লা পাগড়ী আঁটা তিন-চারি জন মোটা মাড়োয়ারি।

পথের ওধারের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতে-ছিল। একটা ছত্র…

নয়ন মোছো হায়,
চলে যে যায়, আর আসে না ফিরে!

প্রতিমার কথায় সে-দিনের এ ঘটনা তার করুণ শ্রীতে চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমলা কহিল,—হুঁ!

প্রতিমা কহিল,—তার পর নিজের এ কি শ্রী! কি বেশ! চুলগুলোয় চিরুণী পড়ে নি কত কাল?

প্রতিমা তার শিথিল কবরী ধরিয়া টানিল।

অমলা কহিল,—কি করিস!

প্রতিমা কহিল,—চুল বেঁধে দি—আয়! যে জট্ পাকিয়েচিস্…

মুখে ম্লান হাসি, অমলা কহিল,—বয়স হচ্ছে তো!

হাসিয়া প্রতিমা কহিল,—হুঁ। বয়সে একেবারে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি হয়েচিস—না?

প্রতিমা ছাড়িল না; টেবলের উপর হইতে চিরুণী পাড়িল, তেলের শিশি পাড়িল, কহিল,—নির্ম্মল বাবুর এদিকে দৃষ্টি নেই বুঝি!

অমলা কহিল,—তাঁরও তো বয়স হচ্ছে! তা ছাড়া কাজ আছে, দরকারী কাজ।

প্রতিমা কহিল,—এঁর বুঝি কাজ নেই! গাধার মোট রোজ ঘরে বয়ে আনেন—রাজ্যের ছেঁড়া দলিল, মকর্দ্দমার নথি-পত্তর। তাই নিয়ে পঙ্কোদ্ধারে বসেন। আমি বলি, ও ধোপার মোট বাড়ীতে না আনলে নয়? তা বলেন, একটু সাহায্য করো গো! এ দলিলটায় কি লিখেচে, পড়ে দাও তো…। তাও আমায় দেখতে হয়। তবু সাজগোজ আজো ছাড়তে পারি নি ভাই! মেয়ে-মানুষের এ সাজ ছাড়া চলে না। স্বামীদের মনে চিরদিন বিভ্রম জাগিয়ে রাখতে হবে। ওদের মন বড় অস্থির। যত কাজ করুক, কাজের ফাঁকে চোখ তুল্লে ওরা চায় রূপের জোলুশ্! জানিস না, সেই গান—

এ যে গো রঙ্গ-হাসি, এ যে গো সজ্জা মোহন—
বোঝো না কেন এ-সব? না হলে উড়বে যে ধন!
আমাদের অস্ত্র কি আর? সাধে কি পিছে ফেরো!

প্রতিমা ছাড়িল না। সখীর চুল বাঁধিয়া মাজিয়া ঘষিয়া তার মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া প্রতিমা কহিল,—গ্যাখ্ দিকি এবার আয়নায় চেহারাখানা।…

আয়নার সামনে অমলাকে দাঁড়াইতে হইল—প্রতিমা নহিলে ছাড়ে না!

প্রতিমা কহিল—তবে মোটা হয়েচিস্! এইটের সম্বন্ধে সাবধান! মাংসপিণ্ড হলে স্বামীদের ভারী বিরাগ ঘটবে। ওরা চায়, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব! মোটা হলে চলবে না লো—রোগা হ, রোগা হ…

অমলা হাসিল; হাসিয়া কহিল—ভগবানের উপর কারসাজি চলে না তো!

প্রতিমা কহিল,—খুব চলে। আমি মোটা হচ্ছিলুম। উনি তামাসা করতেন,—বলতেন, ফুলের চারা মহীরুহ হয়ে উঠচো যে! এমন লজ্জা হলো! খাওয়া ছাড়লুম—exercise ধরলুম। তার পর একটা কবরেজী ওষুধ। গ্যাখ্ দিকি, গায়ে কোথাও চর্ব্বি আছে? এমনি চিরযৌবনা থাকবে স্ত্রী—স্বামীদের সাধ!

আলাপে-কথায় আঁধার মুহূর্ত্তে খানিকটা আলো ছিটাইয়া প্রতিমা বিদায় লইল।

প্রতিমাকে বিদায় দিয়া অমলা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে ভালো করিয়া দেখিল—ঠিকই তো! তার দেহে এ কি বিশ্রী মেদ-মাংস জড়ো হইয়াছে!… মাংস-পিণ্ড! তবে কি এইজন্যই স্বামীর এমন বিরাগ!…

অমলা আবার নূতন করিয়া বিজয়িনীর বেশে নিজেকে সাজাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইল। চাকরকে দিয়া প্রতিমার সেই ঔষধ আনাইল—আহার ছাড়িল—শুধু দু'বেলা দু' পেয়ালা চা।

একমাসে তার শ্রী হইল তপশ্চারিণীর মত,—মলিন, বিশুষ্ক!

৩

রবিবার দুপুরবেলা নির্ম্মলকে সেদিন মক্কেলের দল আসিয়া পাকড়াও করে নাই। কি খেয়াল হইল, দোতলার ঘরে নির্ম্মল তার আলমারির ড্রয়ার টানিয়া পুরানো কাগজ-পত্র গুছাইতে বসিল…

আলমারির মাথায় সহসা চোখ পড়িল। পড়িতে দেখে, একটা শিশি। শিশির গায়ে লেবেল আঁটা,—"পল্লব-দ্রব"। তলায় ছোট হরফে লেখা, "এ দ্রব নিত্য ব্যবহার করিলে শরীরের মেদ কমে। স্থূলত্ব ঘুচিয়া ক্ষীণত্ব লাভ হয়।" এ আবার কি বস্তু? কোথা হইতে আসিল? শিশিটা পাড়িয়া বিস্ময়ে সে হতবাক্, এমন সময় অমলা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

নির্ম্মল কহিল—এটা কি গা?

অমলা কহিল—ওতে তোমার কি দরকার? দাও…

অমলা শিশি হাতে লইল। নির্ম্মল কহিল—বলো···

বার-বার অনুরোধ! অমলা সব কথা খুলিয়া বলিল।

নির্ম্মল কহিল,—এমনি করে নিজেকে হত্যা করতে বসেচো!

অমলা কোনো কথা কহিল না। নির্ম্মল কহিল—এ কি চেহারা হয়েচে! যেন কতকাল ধরে রোগ ভোগ করচো!

অমলা কহিল—তুমি পুরুষ মানুষ। মেয়েদের সকল কথায় তোমার কথা কওয়া সাজে না।

নির্ম্মল কহিল—কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী!

অমলা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সে কথা আমি অস্বীকার করেচি কখনো?

নির্ম্মল কহিল—তোমার শুভাশুভ আমি দেখবো না?

অমলা কহিল—কে বলচে, দেখবে না!

দাসী আসিয়া কহিল—চায়ের জল ফুটেচে বৌদি···

অমলা কহিল—যাচ্ছি! তুই যা।

নির্ম্মল কহিল—দুপুর বেলায় চা!

অমলা কোনো কথা কহিল না।

দাসীর পানে চাহিয়া নির্ম্মল প্রশ্ন করিল,—এত বেলায় চা কে খাবে রে?

দাসী কহিল,—বৌদি!

নির্ম্মল অবাক্! কহিল,—বৌদি!

দাসী কহিল,—হ্যাঁ। বৌদি আজ এক মাসের উপর দু'বেলা শুধু চা খাচ্ছে—ভাত-টাত খাওয়া ছেড়ে দেছে! কবিরাজে কি নাকি ওষুধ দেছে···

ওষুধ! নির্ম্মলের পায়ের নীচে হইতে দুনিয়া সরিয়া যাইতেছিল। নির্ম্মল কহিল,—এ'ও বুঝি রোগা হবার জন্য?

হাসিয়া অমলা কহিল,—তাই।

নির্ম্মল কহিল,—এ ব্যবস্থা তোমায় ছাড়তে হবে।

করজোড়ে অমলা কহিল,—মাপ করো! লক্ষ্মীটি···

নির্ম্মল কহিল,—আমার কথা শুনবে না?

অমলা কহিল,—সব কথা শুনচি, শুনি, শুনবো—শুধু এইটি ছাড়া।

নির্ম্মল কহিল,—তার মানে?

অমলা কহিল,—এ হলো আমার জীবন-মরণের কথা!

অমলার চোখে জল আসিয়াছিল, স্বর বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল। সে-ভাব সম্বরণ করিবার জন্য অমলা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দু'দিন পরের কথা। মামলা জিতাইয়া দেওয়ায় এক মক্কেল নির্ম্মলকে দু'টা বড় হাঁস পাঠাইয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে লোকটার কোয়েল ও হাঁসের ষ্টল আছে। নির্ম্মল আসিয়া অমলাকে ডাকিল,—ওগো···

অমলা কহিল,—কি?

নির্ম্মল কহিল,—দুটো হাঁস এসেচে। রোষ্ট করবে?

অমলা কহিল,—তুমি তো কারী ভালোবাসো···

নির্ম্মল কহিল,—কিন্তু তুমি যে রোষ্টটাই পছন্দ করো!

অমলা কহিল,—আমি মাংস খাবো না।

নির্ম্মল কহিল,—তার মানে? সন্ন্যাস নিয়েচো না কি? নির্ম্মল হাসিল।

অমলা কহিল,—তা নয়। গায়ে বড্ড চর্ব্বি হয়েচে। এত চর্ব্বি ভাল নয়। শেষে কি ফেটে মরে যাবো? অমলা কথার শেষে হাসিল। ম্লান হাসি!

—বটে!···ও! সে ওষুধ খাওয়া ছাড়ো নি?

অমলা কহিল,—শরীরকে তো রাখা চাই।

নির্ম্মল কহিল,—ও ওষুধ খেলেই শরীর থাকবে? না হলে যাবে?

অমলা কহিল,—এখনই এই···আরো মোটা হলে ঘরে কি জায়গা পাবো?

কথায় হেঁয়ালি! নির্ম্মল এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিল না, অমলার পানে চাহিয়া রহিল।

অমলা কহিল,—ষ্টোভটা জ্বালি।···তা হলে কারীই করবো তো?

নির্ম্মল কহিল,—তুমি খাবে না?

অমলা কহিল,—না:

নির্ম্মল কহিল,—সত্য বলচো?

অমলা কহিল,—তোমার কাছে কখনো মিথ্যা বলেচি?

নির্ম্মল স্তব্ধ দৃষ্টিতে অমলার পানে চাহিয়া রহিল। অমলা খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

নির্ম্মল ডাকিল,—অমলা···

অমলা স্বামীর পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

নির্ম্মল কহিল,—তুমি যেন নতুন মানুষ হয়েচো!

কম্পিত স্বরে অমলা কহিল,—চিরদিন কি মানুষের সমান যায়···কথাটা বলিয়া সে আবার হাসিল। মুখে হাসিলেও মন অশ্রুসজল!

নির্ম্মলের মুখ গম্ভীর!

অমলা কহিল,—পালকগুলো ছাড়ানো আছে তো?

নির্ম্মল কহিল,—জানি না! তার স্বরে ঝাঁজ।

অমলা কহিল,—রাগ করচো কেন?

নির্ম্মল কহিল,—রাগ নয়।

—তবে?

—আমি হাঁস খাবো না!

অমলা হাসিল, কহিল,—বাঃ! খেতে ভালোবাসো···

নির্ম্মল কহিল,—না, বাসি না।

অমলা কহিল,—তবে নিলে কেন?

নির্ম্মল কহিল,—নষ্ট করবো বলে। যাও, হাঁসদুটো ফেলে দাও গে···

অমলা কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার চোখের সামনে আলমারি, ছবি, দেওয়াল—সব ঘুরিতে সুরু করিয়াছে!

এ ঘোর বেশীক্ষণ রহিল না। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, জহরমল আসিয়াছে!

জহরমল দালাল, অনেক কেশ আনে। নির্ম্মল কহিল,—ও, বসতে বল্।···সঙ্গে লোক আছে? না, একলা এসেচে?

ভৃত্য কহিল,—দু'জন মাড়োয়ারী সঙ্গে আছে।

—ও! বালকরাম তা হলে এসেচে! আমার শ্লিপার দে। কনশাল্‌টেশনে যেতে হবে, ডি-সিল্‌ভার বাড়ী।

শ্লিপার আসিল। নির্ম্মল মক্কেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

এনামেলের পাত্রে পালক-ছাড়ানো মাংসখণ্ড লইয়া অমলা ঘরে ঢুকিল। ঘরে কেহ নাই।

অমলা ডাকিল,—মনুয়া···

ভৃত্য আসিল।

অমলা কহিল,—বাবু কোথায় রে?

মনুয়া কহিল,—মক্কেলের সঙ্গে বাইরে গেছেন।

অমলা পাত্র রাখিয়া মোড়ায় বসিল। বাহিরে আকাশ ঘিরিয়া তখন সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে।

মনুয়া কহিল,—মাংস?

অমলা কহিল,—ফেলে দে।

৪

সাত দিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া নির্ম্মল সদ্য পথ্য পাইয়াছে।

অমলা কহিল,—আজ তা বলে কাছারি বেরুনো হবে না।

তাচ্ছল্যের স্বরে নির্ম্মল কহিল,—পাগল!

অমলা কহিল,—পাগল নই। ডাক্তারের বারণ।

নির্ম্মল কহিল,—ডাক্তারের কি, বলো! এই সাত দিনে কতগুলি টাকা লোকশান হলো—জানো?

অমলা কহিল,—এ শরীরে কাজ করে আবার পড়লে লোকশান আরো বেশী হবে।

হাসিয়া নির্ম্মল কহিল,—একেই বলে,—স্ত্রীবুদ্ধি!

কথাটা অমলাকে আঘাত করিল। সে কহিল,—স্ত্রী-বুদ্ধিকে এত তাচ্ছল্য করো না!

নির্ম্মল কহিল,—কেন করবো না? দুশো বার করবো। স্ত্রীবুদ্ধি না হলে হাতুড়ে দাওয়াই খেয়ে রোগা হবার আশা রাখো!

অমলা কহিল,—থাক্! জানো, ঐ ওষুধে প্রতিমা শরীরটিকে কেমন রেখেচে, ছিপছিপে—যেন কত কম বয়স!

নির্ম্মল কহিল,—এ বয়স কম দেখাবার হেতু?

অমলা কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না; তার পরিবর্ত্তে কহিল,—তা নয়। শরীরে জুৎ থাকে। মোটা হলে মানুষ অথর্ব্ব হয়—কোনো কাজ করবার শক্তি থাকে না।

নির্ম্মল কহিল,—তোমায় তো ধান ভাণতে হবে না! ভগবানের আশীর্ব্বাদে দু'চারজন দাসী-চাকর যখন রাখতে পারচি···

বাধা দিয়া অমলা কহিল,—না। মেয়েমানুষের উচিত নয়, রাজা-বাদশার মত সিংহাসনে বসে থাকবে! সময় কাটবে কি করে কাজ না করলে?

নির্ম্মল কহিল,—সময় কাটাবার বুঝি আর কোনো উপায় নেই?

এ প্রশ্নে অমলার বুকের সেই ব্যথা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যথার কথা প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়! অমলা কহিল,—না—নেই!···

—তুমি তাহলে ও ওষুধ ছাড়বে না? সঙ্গে সঙ্গে আহারও পরিত্যাগ করেচো।

অমলা কহিল,—যে ওষুধের যে ব্যবস্থা···

নির্ম্মল কহিল,—এ তোমার ভুল!

—হোক্ ভুল! এ ভুল নিয়ে আমি যদি আরাম পাই···

নির্ম্মল চুপ করিল। অমলা এমন ছিল না—নির্ম্মল যাহা বলিত, তাহাই শিরোধার্য্য করিত। এখন তর্ক তোলে। নির্ম্মল ভাবিল, সংসারে বুঝি ইহাই নিয়ম! রোমান্সের সংক্ষিপ্ত দিনগুলা কাটিলেই সংসার তার স্ব-রূপে আসিয়া দেখা দেয়! ইহা লইয়া দুঃখ করা চলে না, অভিমানও নয়! যে যার কাজ করিয়া যাইবে—সব কাজ মিলিয়া তবেই না সংসারকে শৃঙ্খলিত, পরিপূর্ণ করিবে!···

শেল্‌ফে সেই শিশি—'পল্লব-দ্রব'! নির্ম্মল ভাবিল, অমলার খেয়াল! এ খেয়াল লইয়া যদি সে তৃপ্ত থাকে, ক্ষতি কি! তবে আহার ত্যাগ করিয়াছে—দুবেলা শুধু দু' পেয়ালা চা—গোলযোগ এইখানে!

এ ব্যাপার লইয়া তর্ক তুলিয়া কোনো ফল হইবে না—হয় নাই। এ তর্কে অমলার পণ আরো দুর্জ্জয় হইয়াছে! তার চেয়ে···

রাত্রে নির্ম্মল কহিল,—জ্বর গেল, গলার ব্যথাটুকু কিছুতে যাচ্ছে না! শেষে ক্যান্সার হবে নাকি!

অমলা কহিল,—কি যে বলো!···কথা তো শুনবে না! ডাক্তার বললে, রোজ স্প্রে করতে···

নির্ম্মল কহিল,—তাতে ছাই সারবে!

অমলা কোনো কথা বলিল না। নির্ম্মল কহিল,—কোর্টে অবিনাশবাবু বলছিলেন, তাঁর এক কবিরাজ একটা বড়ি দেন, খেলে টন্‌শিল্ সারে।

অমলা কহিল,—না, না,···যে-সে হাতুড়ের ওষুধ তোমায় খেতে দেবো না আমি।

নির্ম্মল কহিল,—তুমি কি করে জানলে—হাতুড়ে! অবিনাশ বাবুরা রোগ হলে তাঁকেই ডাকেন। তাঁর চিকিৎসাতে সেরেও আসচেন সব! তা ছাড়া বিশ্বাস! এই যে তোমার বিশ্বাস পল্লব-দ্রবে!

অমলা স্বামীর পানে চাহিল।

৫

চারু অমলার কি এক সম্পর্কে ভাই হয়। চারু ডাক্তার। আলিপুরে বদলি হইতে, বাক্স-প্যাটরা-সমেত সে আসিয়া উঠিল নির্ম্মলের গৃহে। দু'দিন ঘুরিয়া ভবানীপুরের দিকে একটা বাসা খুঁজিয়া লইবে।

বৈকালের দিকে চারু জিনিষ-পত্র গুছাইতেছিল, ঘড়ির মত একটা বিচিত্র বস্তু দেখিয়া অমলা কহিল,—ওটা কি?

চারু কহিল,—ওজন হবার যন্ত্র।

—কি ওজন হয়?

—মানুষ!

—হুঁ!···দ্যাখো তো আমার ওজন।

—এর উপর উঠে দাঁড়া···

অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। অঙ্ক দেখিয়া চারু কহিল,—একমণ বত্রিশ সের।

অমলা কহিল,—ও মা! দেড় মণের উপর! ছি ছি···

চারু কহিল,—ছি ছি কেন! এই তো ঠিক ওজন!

অমলা কহিল,—মাগো! দেড়মুণী লাশও হার মানে! কি লজ্জা!

চারুর সামনে এইটুকু মাত্র ব্যাপার! আড়ালে অমলা ব্যবস্থা করিল, এক পেয়ালা চা; দ্বিতীয় পেয়ালা বন্ধ হইল। ওজন কমিবে! তার উপর "পল্লব-দ্রবের" মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

তিন দিন পরে নির্ম্মল ডাকিল,—ওগো···

অমলা আসিল।

নির্ম্মল কহিল,—দাঁড়াও তো এটার উপর! ওজন নিয়ে ভেবে খুন হও! কত ওজন, দেখি।

অমলা কহিল,—থাক! ওজন দেখে না!

নির্ম্মল কহিল,—দেখি না তোমার 'পল্লব দ্রবের' গুণ।

অমলা কহিল,—বেশ···

অমলা দাঁড়াইল। স্কেলের কাঁটা নড়িয়া দুলিয়া থামিল। অঙ্ক দেখিয়া নির্ম্মল কহিল,—একমণ তেত্রিশ সের।

অমলা চমকিয়া উঠিল,—এঁ্যা···

চারু কহিল,—সত্যি রে, তিন দিনে ওজনে এক সের বেড়েছিস্···

অমলার চোখে অশ্রুর বাষ্প আসিয়া জমিল

অমলা কহিল,—এক পেয়ালা চায়েও ওজন বাড়চে!

নির্ম্মল কহিল,—পল্লব-দ্রব আছে সেই সঙ্গে···বলো···

চারু কহিল,—পল্লব-দ্রব?

নির্ম্মল কহিল,—কবিরাজী দাওয়াই। তা খেলে শরীর রোগা হয়…

চারু কহিল,—খবর্দ্দার! ও-সব ওষুধ খাসনে রে। ওষুধগুলো সব বোগাস্…

অমলা কহিল,—এভাবে মোটা হলে বাঁচবো না, চারুদা…

চারু কহিল,—আমি ব্যবস্থা দেবো'খন।

নির্ম্মল কহিল,—শুধু দু'পেয়ালা চা খেয়ে আছে। কথা শোনে না…

চারু কহিল—লিভারের মাথা খাচ্ছিস্! ও সব নয়। plain diet বা rich dietএ এসে যায় না, exercise চাই। আর চাই পরিশ্রম, মন ভালো রাখা…

সন্ধ্যার পর 'পল্লব-দ্রব' খাইবার কথা। শেল্‌ফে শিশি নাই। কোথায় গেল?…আলমারীর মাথায়।

কে রাখিল? অমলা তো এখানে রাখে নাই। সেই প্রথম দিনের তর্কের পর হইতে…অথচ…

নির্ম্মল আসিল, কহিল,—চুপ করে দাঁড়িয়ে…?

অমলা কহিল,—শিশিটা শেল্‌ফ থেকে পেড়ে তুমি? এখানে রেখেচো?

—আমি!

তার মুখের ভাব দেখিয়া অমলা বুঝিল, নির্ম্মলের কাজ। কিন্তু কেন?

অমলা কহিল,—এর মানে?…

অমলার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল, নির্ম্মল গলিয়া গেল, কহিল,—আমায় মাপ করো অমলা…

—মাপ!

নির্ম্মল কহিল,—তুমি যখন আমার সঙ্গে তর্ক ছাড়লে না, তখন অগত্যা আমায় কৌশল অবলম্বন করতে হলো!

—কৌশল!

—হাঁ। তোমার শিশির আরক ফেলে দিয়ে স্রেফ লিমনজুস ও-শিশিতে পুরে রেখেচি! পল্লব-দ্রব বলে যা খাচ্ছো…

অমলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্ম্মল কহিল,—কি ভাবচো?

অমলা কহিল,—যা ভাবচি, বললে রাগ করবে না?

নির্ম্মল কহিল,—না। বলো…

অমলা কহিল,—তোমার টন্‌শিলের জন্য যে কবিরাজী ওষুধ এনেছিলে, তার সম্বন্ধে আমি এই অপরাধ করেচি…

নির্ম্মল কহিল,—তার মানে?

অমলা কহিল,—সে বড়ি ফেলে দিয়ে আমি চ্যবনপ্রাশ আনিয়ে তার বড়ি তৈরী করে শুকিয়ে শিশিতে ভরেচি…

নির্ম্মল কহিল,—তা হলে সন্ধি…

অমলা কহিল,—সর্ত্ত আছে, পালন করতে হবে।

—বলো তোমার সন্ধির সর্ত্ত…

অমলা কহিল,—আমার পানে চাও না কেন? আমি কুশ্রী মোটা হচ্ছি বলেই তো…?

নির্ম্মল কহিল,—পাগল!

—তবে?

নির্ম্মল কহিল,—বুঝেচি! কিন্তু পয়সার সাধনা না করলে যে নয় অমলা। তাও এ সাধনা কেন? তোমায় আরামে রাখবার জন্য! না হলে আমার নিজের কতটুকু প্রয়োজন?

—আর আমারি বুঝি রাজ্য, সিংহাসন না হলে চলবে না—তোমায় বলেচি?

—তোমায় যাতে সব দিক্ দিয়ে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারি—তা করবো না?

অমলা কহিল,—না। আমার স্বাচ্ছন্দ্য পয়সা-কড়িতে নয়। এই খানে…বলিতে বলিতে তার স্বর বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল। সে নির্ম্মলের বুকে মাথা রাখিল; তার মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে বলিল,—তোমার সঙ্গ আমার সব চেয়ে কাম্য। পরস্পরের মধ্যে টাকার পাঁচিল তুলো না গো। সত্যি আমি তা হলে মরে যাবো!

অমলার চোখে আবার জল আসিল। ইদানীং চোখ দু'টা এমন হইয়াছে…

নির্ম্মল কহিল,—তুমি বদ্ধ পাগল! আচ্ছা, সন্ধির সর্ত্ত রইলো, এ ব্যাধি যাতে আর না আক্রমণ না করে, লক্ষ্য রাখবো…সারাক্ষণ! আর…

অমলা তার পর পানে চাহিল। নির্ম্মল কহিল,—আমার গলার ব্যথা সত্য নয়,—তোমায় ভয় দেখাবার জন্য বলেছিলুম। তুমি যদি যা-তা ওষুধ খাও, আমিও…

হাসিয়া অমলা কহিল,—ভারী দুষ্টু হয়েচো তুমি! এটা সংসর্গ-দোষে কিন্তু। ঐ মক্কেলগুলো…

নির্ম্মল কহিল,—চুপ, ও কথা বলতে নেই,…মক্কেল আমাদের লক্ষ্মী!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিবর্ত্তন

১৩

মুটে এ দিন সঙ্গে আসে নাই, হাঁড়ি বহনের জন্য মুটের ব্যবস্থা, চালের মোট কর্ম্মীরা নিজেরাই পিঠে করিয়া বয়, অনিমেষও তার পিঠে ফেলা চালের বোঝাটার ভারে কতকটা কাত হইয়া পড়িয়াই পথ হাঁটিতেছিল। গ্রামের পথ শেষ হইয়া গিয়া এবারে তাকে মাঠের পথে আঁকা-বাঁকা আলৃগা মাটীর আলের উপর দিয়া হাঁটিতে হইতেছিল। চালের ভার এখানে এই প্রথম বারের সংগ্রহে বেশ একটু ভারীই হইয়াছে। অনিমেষের মত বলিষ্ঠ লোকের পক্ষেও তাহা বহন করা কষ্টকর হইতেছিল, তাই খানিকটা পথ চলার পর ধানক্ষেতের শেষে কতকটা খোলা জমী পাইয়া একটা গাছতলায় সে তার ঝোলাটা নামাইয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িল, আপনার শরীরের শ্রান্তিতে আপনিই সে একটু বিস্ময় বোধ করিল। এইটুকু ভার বহিতেই তার পা অচল হইল, আর গরীব কুলীরা কত ভারী ভারী মোট মাথায় বহিয়া লয়, তাদের কত পথই না হাঁটিতে হয়। অথচ অনিমেষের ত এ সখের কুলীগিরি, ইচ্ছা না হয়, না করিলেও পারে, কিন্তু তাদের শরীর-মনের কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাগ করার পথ নাই, সেই তাদের জীবিকা। কপালের উপর ঘর্ম্ম-বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কোমরে জড়াইয়া বাঁধা কোঁচার কাপড় খুলিয়া সে তাহা ঘষিয়া মুছিল, তার পর তার সম্মুখে এবং এক একবার করিয়া এপাশে ওপাশে চাহিয়া দেখিল।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, শীতকাল হইলে এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, কিন্তু শরতের আকাশ অত শীঘ্র কাহাকেও অধিকার ছাড়িয়া দেয় না। অনিমেষ যে দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, সেইটাই পশ্চিমদিক্; রং সেখানে নানান্ 'সেডে' স্তরে স্তরেই ফুটিয়া রহিয়াছে; ঘন রংটা ফিকা হইতেছে বটে, কিন্তু বাহারের দিক্ দিয়া তাহাতে কোনই ত্রুটি পাওয়া যায় না। বামে দক্ষিণে সুদূর-বিস্তৃত মাঠের শেষ পর্য্যন্ত যত দূর দৃষ্টি পড়ে, নব-কিশলয়-শ্যাম-শরতের শস্য-সম্ভারে ধরিত্রীর বক্ষ যেন ঝলমল করিতেছে। অস্তরাগে সেই শ্যামলিমার কোথাও কোথাও যেন ধূপ-ছায়ার রং খেলিতেছে। মৃদু মৃদু সান্ধ্যবাতাসে তাদের শিরগুলি ঈষৎ নর্ত্তিত হইতেছে। এদিক্ ওদিক্ হইতে কিসের যেন একটা চেনা-চেনা গন্ধ আসিতেছে। অনেক দূর হইতে গ্রামিকের গলার একটুখানি গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, অনিমেষ একবার আজিকার দিনের সমস্ত ঘটনাগুলাকে আগাগোড়া ভাবিয়া লইল। প্রতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই দীর্ঘ মেঠো পথ ভাঙ্গিয়া এই গ্রামের অভিমুখে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল। ভোরের পাখী তখন এখনকার মত নিঃসাড়া ছিল না, নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিশ্বদেবতার বন্দনা-গান গাহিতেছিল, রাত্রির গুমোট কাটিয়া ভোরের বাতাস অতি মধুর শীতলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, অনিমেষের মনটাও ছিল এদেরই মত সমান তাজা, বুক-ভরা আনন্দ ও উৎসাহ লইয়া সে সদ্য ঘুমভাঙ্গা পাখীর মতই লঘু চঞ্চলগতিতে এই পথ দিয়াই তার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকেন্দ্রের অভিমুখ হইয়াছিল।

কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের সহিতই সে অনুভব করিল, এই অবসানোন্মুখ স্থবির তপনের ম্লান ছায়া-ভরা মনঃক্ষুণ্ণা প্রকৃতির মতই তার সমস্ত মনটাও যেন কেমন একটা অবসাদের ভারে সমাচ্ছন্ন ও বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গে রূপ-শোভার অভাব নাই; বরং আরও তাহা নূতনভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রভাতের সেই আনন্দমুখরতা এই সায়াহ্নের ক্লান্ত অবসন্নতায় যে মিলাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই প্রভাব যেন অনিমেষেরও কর্ম্মো-দ্দীপনায় ভরা চিত্ততলে জমাট বাঁধিয়াছে। অনিমেষ বিস্মিত হইল। বাস্তবিকই তার পক্ষে এ একটা বিস্ময়ই বটে। এ কাযে- এই দশের কাযে জনের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা—এ তার এই দু'দিনের খেয়ালের ব্যাপার নয়। এম, এ পাশ করার প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই সে এক দিন সি, আর, দাশের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বসিল। তার পর নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া শেষে আজ বৎসর দুই হইতে যায় এই জনমঙ্গল সমিতিটিকে সে তার অক্লান্ত চেষ্টা-যত্নে এবং অসীম কর্ম্মোদ্দীপনা দ্বারাই গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার পরিত্যক্ত অথবা অনাদৃত পল্লীগুলির পুনঃ সংস্কার এবং সেইগুলিকেই আদর্শভাবে গঠন করা

ব্যতীত যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব নহে, এ কথা সে তার গুরুর সহিত আলোচনা করিয়াই বুঝিয়াছিল এবং যে দিন ইহা বুঝিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিজের মন, প্রাণ এবং ধন সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়াই এই কর্ম্মযোগেরই সাধনায় অনন্যচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। এর জন্য কত ধনীর গৃহদ্বারে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কত জনের নিকট হইতে তীব্র বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আত্মীয়জনের—বন্ধু-বান্ধবের কঠোর তিরস্কার এবং তদপেক্ষাও সুকঠিন উপহাসের ও উপেক্ষার মর্ম্মভেদী শেলাঘাত তাহাকে যথেষ্টরূপেই সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু কোন কিছুতেই তাহাকে কোন দিন সঙ্কল্প-বিচ্যুত করিতে পারে নাই; তার উৎসাহের জোয়ারে কোন দিনই ত তার জন্য ভাটার টান ধরে নাই, বরঞ্চ যতই বাধা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রাণের টানকে সে যেন শতগুণে বাড়াইয়া গিয়াছে। আজ তাই নিজ মনের এই বিষণ্ণতায় নিজেই সে ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিল। মনের যে তার হঠাৎ এমন দুর্গতি কেন ঘটিল, সে যেন তাহা ভাবিয়া পাইল না। তার পর হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল—সুচারুর নিকট হইতে শ্রুত সেই কাহিনী; অতিশয় করুণ, অত্যন্তই হৃদয়বিদারক—যেন বর্ষাজলে ভেজা স্খলিতপত্র একটি বাসী ফুলের মতই তাহা সকরুণ। মনটা তার সহানুভূতিতে আর্দ্র এবং ব্যথায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। উঃ, মানুষ কি! যে নারী প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মীর রূপ ধরিয়া তাহাকে শোভায় ও সম্পদে বিভূষিত করিয়া তোলেন, বস্তুতঃ দেখিতে গেলে প্রত্যেক সংসারের এবং সমষ্টিভাবে সমাজেরও যিনি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রী-শক্তি, সেই সতী গৃহিণী এবং স্নেহময়ী জননী জগতের সর্ব্বাপেক্ষা এই দুইটি মহাশক্তির যিনি আধার-স্বরূপা, সেই তিনি—উঃ, সেই তিনি তাঁর অতবড় মহৎ পদমর্য্যাদাকে একেবারে ধূলি-লাঞ্ছিত করিয়া দিয়া কি না, না না, এও কি জগতে সম্ভব? বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষের উচ্চসমাজের হিন্দু-নারীর পক্ষে? পতি-পুত্র-হীনা শোকাকুলা অভাগিনী বরং হিতাহিতজ্ঞান ও ধৈর্য্য হারাইয়া অবৈধ উপায়ে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারেন; কিন্তু কখনই তিনি অবৈধপ্রেমের উন্মাদনায় অস্থির হইয়া সেই অকাল অপসৃত পতিপুত্রের স্মৃতিকে মসীলিপ্ত করিতে—কুলত্যাগিনী হইতে পারেন না। না, নিশ্চয়ই না, কখনই না। এ যদি সত্য হয়, তবে হিন্দুসমাজের অবস্থা বাস্তবিকই আধুনিক বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক-বর্ণিতভাবে অধঃপতনের অভিমুখে অতি তীব্র-বেগেই অবনত হইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সত্যদ্রষ্টা ঋষি তবে সত্যই কি দেখিতে পাইতেছেন, যে ভাবে ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বর্ত্তমানেও কি তাহারই সূচনা দেখা দিয়াছে? অর্থাৎ একনিষ্ঠ সতীপ্রেম ও সুপবিত্র মাতৃস্নেহই যথার্থ নারীধর্ম্ম নহে; নারীধর্ম্ম বলিতে দৈহিক ভোগস্পৃহাকেই বুঝায়? প্রবল দেহ-বিলাসই কি মানব-জীবনের সর্ব্বেসর্ব্বা?

অনিমেষের সমস্ত শরীর-মন যেন ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় গুটাইয়া এতটুকু হইয়া গেল, সর্ব্বশরীর তার যেন একটা কি রকম আতঙ্কে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল। খানিকক্ষণ সে যেন চিন্তা-বিমুখ অবসন্নবৎ থাকিয়া তার পর সহসা সদ্যোজাগ্রতের মত দুই হাতে চোখ মুছিয়া মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। দুই হাত যোড় করিয়া সে ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া ভয়-পাওয়া বালকের মতই একান্ত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সবেগে বলিয়া উঠিল;—"না না, এ যেন হয় না, হে ভগবান্! নিজে হাতে সৃষ্টি করা এমন জিনিষটিকে এমন ক'রে ধ্বংস হ'তে দিও না, দিও না প্রভু! উচ্চ-নীচের প্রভেদ রাখো, বড়কে বড় থাকতে দাও, ছোটকে বড় কর। ক্রূরকর্ম্মা অসংযমীদের এই প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা-প্রসূত সমাজসংস্কারস্থলে আত্মকর্ম্মসমর্থনের গূঢ় উদ্দেশ্য যেন সফল হয়ে ওঠে না, হিন্দুর সনাতন আদর্শ রক্ষা পাক। পৃথিবী এর অনুসরণ করুক, সমস্ত সভ্যজগতে সতীধর্ম্মের জয় হোক্, উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা যেন সভ্য-নারীর আদর্শ হয় না। পশু-ধর্ম্মে ও মানব-ধর্ম্মে ঐটুকু প্রভেদ থাকতে দাও।"

কতক্ষণ যে এমনই ভাবের উত্তেজনায় তার কাটিয়া গিয়াছে, তার কোন হিসাবই নাই। যখন সেই গভীর ভাবোন্মাদনার তন্ময়তা হইতে জাগিয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া অনিমেষ দেখিল, ততক্ষণে বিলীয়মানপ্রায় দিবালোকের শেষ রেখাটুকু নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে মসীলিপ্ত আকাশের গাঢ় নীলিমার উপরে নক্ষত্রের ফুলকারী খচিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্নার একটুখানি শীর্ণ রেখা সেই নক্ষত্রালোক হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই অর্দ্ধস্ফুটভাবে সেই

শস্য-শ্যামলিমায় ভরা ফসলক্ষেত্রের পথখানি পরিদৃষ্ট হইতেছিল মাত্র।

অনিমেষ একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তার পরিত্যক্ত চালের বোঝাটাকে ঘাড়ের উপর তুলিয়া লইয়া মোটা লাঠিটাকে সহায় করিয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মনটা তার তখন অনেকখানিই যেন শান্ত এবং লঘু হইয়া গিয়াছে, সে তাহা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিতেছিল। মানুষ যখন মানুষের কাছ হইতে তার সব চেয়ে বড় বিশ্বাসের যায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন সে তার সেই আহত চিত্তকে যদি জগদতীতের পায়ের তলায় নিবেদন করিয়া দিতে পারে, নিজের হাতে তার ব্যর্থ প্রতীকারচেষ্টা না রাখিয়া সেই সর্ব্বফলের কাছেই অভিমানশূন্যভাবে নালিশ জানাইতে পারে, তবে সে যথার্থ ই শান্তিলাভে সমর্থ হয়। অনিমেষও তাই পাইয়াছিল।

১১

তিলপুর গ্রামখানি আকারেও ছোট, প্রকারেও সে তেমন বড় নয়। গ্রামবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ দুই ঘর এবং বৈশ্য এক ঘর মাত্র—এর বাহিরে জনকয়েক মাত্র কলু, তেলী, মালী এবং অধিকাংশ বাগ্দী, মুচি, মেথর এবং দুলে, কাওরা, ডোম, বলিতে গেলে এরাই এর প্রধানতম অধিবাসী। এক পাশে দুই চার ঘর নমঃশূদ্রেরও বাস আছে। ব্রাহ্মণ যে দুটি ঘর আছে, তার মধ্যে এক ঘরের লোকদের সঙ্গে আর এক ঘরের লোকদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এত বেশী ছিল যে, তেমন বড় একটা দেখা যায় না। এখন কিন্তু এই বছর দুই হইতে আরও অনেক কিছুর মতই এঁদের ভিতরেও গভীরভাবে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এঁদের মধ্যে এক ঘর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ এবং আর এক বাড়ীর কর্ত্তার উপাধি ঘোষাল। চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণটি এ গাঁয়ের পূর্ব্বাপর বাসিন্দা, যে ঘর কয়েক তেলী, তাম্লী, গয়লা এবং কলুর বাস আছে, ঐ ওদেরই পৌরোহিত্য উপলক্ষেই এখানে এঁদের আগমন কোন্ এক অতীতকালে ঘটিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া জানা না গেলেও এবং সে খবরটা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার মত গুরুতর বিষয় কেহ মনে না করিলেও এই এঁদেরই ঘর-বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যতটুকু আন্দাজ করা যায়, তাহাতে এইটুকু বলা অসঙ্গত হয় না যে, সেও প্রায় শতাব্দীর কাছ ঘেঁষিয়া আসিতেছে। বাড়ীখানির ইটগুলি যে সময়কার, তখন এখনকার মত বারো ইঞ্চি ইটের গাঁথনির রেওয়াজ হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী কর্ত্তার নাম ঘনশ্যাম। নামটি তাঁর রূপের সহিত মিলাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই যেন মনে হয়। তবে শ্যামের বর্ণনায় কোথাও নাকি সাম্নের দিকের দাঁতগুলির কি রকম মাপ ছিল, তার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই, তাঁর চিত্রকররাও সে বিষয়ে নীরব, আমাদের ঘনশ্যাম চক্কোত্তীর পুরুষের পক্ষে সুলক্ষণ বলিয়া কথিত একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া দন্তবক্র নহেন, আর পৌরাণিক নবঘনশ্যামের মত তাঁর উরু বাঁকা, বা ভুরু বাঁকাও নয়। এযাবৎকাল দুই তিন পুরুষ ধরিয়াই এঁরা যজন এবং যাজন করিয়াই উদর পুরণ করিয়া আসিতেছেন, তবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, প্রমাণ কেহ পাইতেও কোন দিন চাহে নাই।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারটির প্রাচীনত্বর কোন দাবী আছে বলিয়া জানা যায় না। এক দিন হঠাৎকারেই এঁদের এ গ্রামে আগমন ঘটিয়াছিল এবং সেই হইতেই খানকয়েক গোলপাতায় ছাওয়া গোময়মৃত্তিকায় লিপ্ত অতি পরিপাটীভাবে গোছান ঘরকন্না পাতিয়া এঁরা দুই পতি-পত্নীতে এখানে থাকিয়া গিয়াছেন। এ বাড়ীর কর্ত্তাটির নাম স্বরূপপ্রকাশ, একহারা লম্বা গড়নের ছিপছিপে লোক, মাথার চুলগুলি কাঁচায়-পাকায়, ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল প্রসন্নতাময়, স্বল্পভাষী এবং সদালাপী। এঁর স্ত্রী আসমানতারার চেহারাটি তাঁর নামের যোগ্য না হইলেও তাঁর পরিপুষ্ট গঠনে ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহে বেশ একটি কমনীয়তা ছিল। মুখখানিতে হাসি যেন মাখান রহিয়াছে, চোখ দুটির ভাব বেশ ঢলঢলে, সাংসারিক কাযকর্ম্ম সমস্তই নিজের হাতে করেন; তার পরও যথেষ্ট অবসর পড়িয়া থাকে। সন্তানাদি হয় নাই।

আসমানতারা চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীকে বয়সের হিসাবেও বটে, গৌরবের পদ বলিয়াও বটে, প্রথমাবধি দিদি বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং শুধু ঐ ডাকই নয়, এখানে

আসার পর হইতেই ছোট বোনের মতই সে ঐ বয়োজ্যেষ্ঠা এবং বহু পরিবারপ্রযুক্ত কণ্ঠভারনিপীড়িতা গৃহিণীটিকে যথেষ্টরূপেই সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। নিজের ঘরের বাসিপাট তার ভোরে উঠিয়াই শেষ হইয়া যায়, ঘরকন্না গোছগাছ করিয়া রাখিয়া একবারটি চক্রবর্ত্তি-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে বউ-ঝিদের ছেলেগুলিকে না ধরিলে তারা কাযে হাত দিতে পারিতেছে না, আসমানতারা গোটাকতককে সঙ্গে লইয়া, একটা দুইটাকে কোলে কাঁখে পুরিয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কিরও অভাব নাই, ছোট ছোট ধামী রথের বাজারে নিজে গিয়া কিনিয়া আনিয়াছিল, একটি করিয়া সবগুলির হাতে পড়িল। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় তারা মহানন্দে খাইয়া ও খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আসমানতারা গেল ঘড়া-কাঁখে জল-আনিতে। রান্না-বান্না সারিয়া গিয়াছে চক্রবর্ত্তি-বাড়ী বেড়াইতে, গিয়া দেখে, তখনও সে বাড়ীতে রান্না হয় নাই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা রান্নাচালের দরজার কাছে জটলা করিয়া কান্না লাগাইয়াছে আর তাদের ঠাকুমা পিসীমা তারস্বরে তাদের গালিবর্ষণ করিতেছেন। আসমানতারা তাড়াতাড়ি গিয়া সব্বের ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইল, বয়স কম হইলে কি হয়, মায়ের দুধ তার আসন্ন ভাই-বোনের কার জন্য জানি না বন্ধ, এদিকে পেট-ভরা পিলে-লিভার, ভাত দুটি তাকে দিতেই হয়। মেয়েটি আসমানীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার কাছে নালিশ জানাইল, "ভা' দিত্তে না, ভা' কাবো।"

আসমানতারা তার চোখ, গাল, নাক মুছাইয়া সেই রোগশীর্ণা কচি মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দিল, "ভাত খাবে, খাবে বৈ কি, এসো দেখি দিকি, কে তোমাকে ভাত দিচ্ছে না।" অগ্রসর হইয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল, কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া যে দৃশ্যটা দেখা দিল, তাহাতে ভাতের হাঁড়ি চোখে পড়িল না। "ওমা তাই তো, ভাত দিচ্ছে নাই তো বটে! হ্যাঁগা, বড় বৌমা! কি মেয়ে তুমি বাছা? এত বেলা হলো, এখনও ভাত চড়াও নি, দোষ তোমার মায়ের কাল বঁটি দিয়ে নাক কাণ কেটে সুর্পণখা ক'রে।"

বড় বৌমা কাঁচা কাঠের ধোঁয়ার জ্বালায় নাকের জলে চোখের জলে হইতেছিলেন, তদবস্থাতেই ঝাঁকিয়া উত্তর করিলেন, "তা' দেবেন বৈ কি, আমার মায়ের নাক না কেটে নাক ছেড়ে কাণ শুদ্ধ কাটুন গিয়ে ঐ আপনার ছেলেদের; যারা শস্তা হবে ব'লে রাজ্যির কাঁচা কাঠ কিনে এনেছে। সকাল থেকে নাকানি-চোখানি খেয়ে যাচ্ছি।"

"আহা সত্যিই তো, পোয়াতি মানুষ! ঠিক বলেছ, মা! ঐ ওদেরই শ্বশুর ব্যাটাদের নাকগুলো না কাটলেই দেখছি নয়। তা' বউ-মা! এক কায করবি মা! কাউকে পাঠিয়ে আমার ওখান থেকে খানকতক শুকনো কাঠ আনিয়ে নিবি? তোদের জন 'মিনষেদের' একটাকে ডেকে আনতো, ক্ষেন্তি!"

বড় বউ-মা ভিতর হইতেই কৃতজ্ঞ স্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বাবাঃ! ভাগ্যে আমরা এমন কাকীমা পেয়েছিলুম।"

"নৈলে এত দিনে পৃথিবীতে রসাতল এসে যেত! কি যে তোমরা বল, মা! কিই বা আমি তোমাদের করতে পারি। ভগবান্ কর্ব্বার যোগ্যতা আর কতটুকুই বা দিয়েছেন!"

চক্রবর্ত্তীর বিধবা কন্যা গিরিজা ধুচুনিতে করিয়া পুকুর-ঘাট হইতে চাল ধুইয়া আনিতেছিল, কথাগুলা কাণে গেল, চালের ধুচুনি দোর-গোড়ায় রাখিয়া বলিল, "করছো নাই বা কি, কাকীমা! সামর্থ্য ভগবান্ তোমায় কমই বা কি দিয়েছেন? যে দিকে জল পড়ছে, সেই দিকেই তো ছাতা ধরছো।"

আত্ম-প্রশংসায় সলজ্জ হইয়া উঠিয়া আসমানতারা কথা উল্‌টিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কোলের মেয়েটা এমন সময় তাহাকে একটা পথ দেখাইয়া দিল, সে বলিল, "ভা' নাই, ঐ—টা (চাল) আত্তে, তোমা বাই ভা' কাবো।"

"আহা তাই তো রে, ঠিক বলেছিস! পোড়া মনেও তো পড়ে নি! চল চল তাই চল, আমার ভাত তো হয়ে গ্যাছে, তাই দুটি দুটি মুখে দিয়ে আনি গে আয়। ওলো পুঁটি, নেত্য শালাটা গেল কোথায়? খুকি, আয়, সাতুটাও চলুক, দু'জনকার ভাতই বাড়া আছে, কুলুয়ে যাবে ওদের।"

আসমানতারা দলবল টানিয়া লইয়া গৃহাভিমুখী হইল।

গিরিজা মাঝখানে বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ কাকীমা! আমার কাকার ভাতগুলো শুদ্ধ এদের গিলিয়ে দেবে, তিনি এসে কি খাবেন? তোমার না হয় যা হয় হলো, আর

আমাদের—এঁদের কৃপায় ত অর্দ্ধেক দিন তোমার জোটেই না, খেতে বসলেই ভাগ নিতে যায়।"

আসমান ঈষৎ বিব্রত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ মা হ্যাঁ! ওরাই আমার সর্ব্বস্ব খেলে! দেখছিস্ না, না খেয়ে খেয়েই তোদের কাকীমার কত বড় গতর, খেলে না জানি কি হ'তো! তা মা! তোর কাকাবাবুকে দুটো সেদ্ধ করেই দোব'খন, তাঁকে কিছু আর উপোস করিয়ে রাখবো না, হয় নয় গিয়ে একবার দেখেই আসিস্ না, মা! পরের মেয়ে কাকীর উপর যদি পেত্যয়ই না থাকে।"

দুই পক্ষেরই হাসির মধ্য দিয়া আসমানতারা তার শিশুবাহিনী-পরিবৃতা হইয়া চলিয়া গেল। পিছনে বড় বউ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও বলিতে হয় হিসাবেই বলিতে লাগিল,—"মা গো! ছেলেমেয়েগুলো কাকীমাকে যেন পেয়ে বসেছে! সকাল থেকে উঠেই কখন ও-বাড়ী যাবে ঐ ওদের চিন্তে। আর ছেলেমেয়েগুলি এক একটি যেন ক্ষুদ্দুর রাক্ষস! ক্ষিধেও যেন ওদের সর্ব্বদাই লেগে রয়েছে। যেমন হাঁসের পাল, তেমনি হাঁসের মতই—"

আসমানতারা পিছন ফিরিয়া রূঢ়কণ্ঠে বকিয়া উঠিল, "বড়-বৌমা! কি যে তুমি বল বাছা! ও-সব কি বলতে আছে, মা! মা ষষ্ঠী কখন স্থানে থেকে কাণে শোনেন, ক্ষণে অক্ষেণের কথা! মায়ের দান মাথায় তুলে নিতে হয়, একটা ছেলেমেয়ের জন্যে যে লোক মাথা খুঁড়ে মরছে—পাচ্ছে কি?" উঁহারা চলিয়া গেলেন।

মেজ-বউ দুধ জ্বাল দিতে দিতে বড় জাকে বলিল, "সত্যি ভাই, কাকীমার মতন মানুষ কখনও দেখিনি, পরের ছেলের উপর এত যত্ন! নিজেরই লোকে পারে না।"

বড়-বউ উত্তর করিল, "এ যে দিল্লীর লাড্ডু রে! ঐ যে ব'লে গেলেন, 'একটা ছেলেমেয়ের জন্যে লোক মাথা খুঁড়ে মরছে—পাচ্ছে কি?' শুন্‌লি নে?"

"হুঁ"—বলিয়া মেজ-বৌ নিজ কার্য্যে নিরত রহিল, আসমানতারা বন্ধ্যা বলিয়াই ত পরপুত্রের উপর তার এতটা দরদ? হ্যাঁ, এ কথাটা কতকটা সমীচীন বটে! নতুবা এতখানি পরার্থপরতা—এ যেন দেখিলেও বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করিলেও যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। এত বেশী দান যে দেয়, সে হয় ত হাসিমুখেই দেয়; কিন্তু নেওয়ার পক্ষে সুখ-সুবিধা সবই থাকে বটে, তথাপি একটা যেন কুণ্ঠা দেখা যায়।

তা সত্ত্বেও এই নেওয়া-দেওয়া চলিতেই লাগিল। বর্ষার পর মেঘ কাটিয়াছে, কড়া রৌদ্রে ভিজা মাটী খটখটে হইয়া উঠিল, আর্দ্রতার সোঁদা গন্ধটুকু বিলুপ্ত হইয়া গিয়া পায়ে তাত ঠেকিতেছে, আহার সারিয়া পাণ দোক্তা মুখে পুরিয়া একখানা আধতৈরি কাঁথায় পদ্ম শালুক বক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাতী পাখী মায় ঘোড়ায় চড়া সিপাই নানা রংয়ের সুতা দিয়া সেলাই করিতে করিতে আসমানতারা চক্রবর্ত্তি-বাড়ী যেমন পা দিয়াছে, চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসেছিস্, আহা, বাঁচলুম! এদের তো সাত করতেই দিন যায়, দু'টো রেঁধে-বেড়ে পেটে দেওয়াতেই দিন রাত্তির কাবার, ঘর-সংসারের কোন কিছু যে করবেন, সে যোটি নেই। আমার এই বুড়ো গতরে আর কত হয় বল? তা' বোন, তোর যদি কায না থাকে, ওই গোবরগুলো আর চারটি মাটী দিয়ে দুটো গুল পাকিয়ে দিবি? দেখ না কেমন রোদটা হয়েছে, মনটা যেন আনচান করতে লেগেছে। তা পোড়া হেঁটোর বাতের জ্বালায় চার দণ্ড পা মুড়ে ব'সে যে ওসব করবো, তার তো আর উপায় রাখেন নি ভগবান্।"

আসমানতারার তখন আর নোংরা কাযে হাত দিবার ইচ্ছাটা ছিল না, কিন্তু দিদির আদেশ—তৎক্ষণাৎ সে সেলাই-পত্র ফেলিয়া তথা কার্য্যেই নিযুক্ত হইল। ঘণ্টা দুই পরে কর্ম্ম সমাপনান্তে হাত পা ধুইয়া ফিরিয়া আসিলে দিদি-স্থানীয়া রোদে পা মেলিয়া পায়ে মালিস লাগাইতে লাগাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আহা বোন! তোর গতর সুখে থাক, মনের সুখে থেকো, একশ বছর পেরমাই হোক, পাকা মাথায় সিঁদূর পরো।"

এইটুকুই পরম পারিতোষিক। আসমানতারা সকৃতজ্ঞ চোখে চাহিয়া দিদির সেই তৈলসিক্ত ব্যথা-ধরা পায়ের ধূলা মাথায় লইল এবং শুধু তাই নয়, 'আপনি নিজে কেন মালিশ করছেন, আসুন আমি ক'রে দিই' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদিকার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আর একচোট আশীর্ব্বাদ লাভ করিল।

বড়-বউমার আঁতুড় আসিতেছে। বউটি ঈষৎ কুণ্ঠিত

মুখে কাছে আসিয়া উস্‌খুস্ করিতেছে, ভাব বুঝিয়া আসমান নিজেই তাকে পথ করিয়া দিল, সস্নেহে বলিল, "কি গো, বড় মানুষের বেটীর সব গোছ-গাছ হয়ে গ্যাছে তো? বেটা বেটী যে দিন আমার আসবে, ধাই আসতে তো স্বর সইবে না।"

বউ বলিল, "না কাকীমা, কোন কিছুই ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। ন্যাকড়া কানি কিছুই নেই, ভরা বর্ষায় হবে, না আছে গায়ের কিছু, না আছে পাতবার কম্বল, ঠাকুরুণ বলছেন, একটা ছেঁড়া মাদুর দেবেন।"

আসমানতারা তার কথা শেষ করিতে দিল না, তাড়া দিয়া উঠিল, "শুনিস্ কেন মা, দিদির কথা! ও মাগীর ভীমরতি ধরেছে, ওর কথা যেতে দে; পুরণো কম্বল কাঁথা একখানা দিয়ে যাবো, গায়ের চাদরও দোব'খন। এখন কোন কথায় কায নেই, সেই তখন এনে দোব। নৈলে যদি দিদি মানা ক'রে বসেন, তখন মুস্কিল হবে।"

বড় বধূ জানিত বলিয়াই ইহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেল। এম্‌নি করিয়াই এই পল্লীবাসিনী মেয়েটি পরকে আপন করিয়া তুলিয়াছিল যে যথার্থ আপনের চেয়েও লোকে তাকে বেশী আপনার বলিয়াই জানিয়াছিল। আত্মার সম্পর্কেই যদি আত্মীয় হয়, তবে এ তাদের পর কিসে? আত্মজন হইতেও আত্মীয়তরতায় তাদের সকল সুখে দুঃখেই সে তাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল।

ছেলেদের আলুই তৈরি, আঁতুড়ের ঝাল কোটা, আচার-কাসুন্দির আম ছাড়ানো, অন্নপ্রাশনের, সরস্বতী পূজার 'শ্রী'গড়া, বরণডালা সাজানো, পিঁড়ি আলপনা, নৈবেদ্য করা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের উদ্যোগ হইতে রান্নাঘরের তোলো হাঁড়ি নামানো,—পরিবেষণ একে একে সবই আসিয়া পড়িল এই বাড়ীর পাতানো কাকীমাটির উপরে। এ ডাকিতেছে "কাকীমা!" সে হাঁকিতেছে "কাকীমা কোথায় গেল?" এমন কি বাড়ীর কর্ত্তাও কোন সময় বাড়ীর গিন্নীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো শুন্‌ছো? তোমার ভগ্নীকে ব'লে দাও, চারটি আতপ দিয়ে একটি ভুজ্জি তৈরি ক'রে দিয়ে যান।" যেন ঐ একটি মানুষ ছাড়া দেব-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার যত কিছু খুঁটি-নাটী কাণ্ড সে আর কাহারও দ্বারাতেই সম্ভব নয়! আবার এরই ভিতর সাতবার কাপড় ছাড়িতে হয়, হঠাৎ হয় ত আকাচা কাপড়জামা শুদ্ধ একটা ছেলে কি মেয়ে পিছন হইতে তার পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুহাতে তার গলাটা জড়াইয়া ধরিল, সে হয় ত বা তখন নৈবেদ্যের সাজ করিতে আখ কাটিতেছে, আচম্‌কা বঁটিতে হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া গলা কাটিয়া মরিতে পারিত! তা মরিল না বটে, তবে ঐ হাতের আকগাছা লুকাইয়া ওদেরই দিয়া আবার হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিতে হইল। অন্যের চোখে পড়িয়া গেলে এ সব অপরাধ সহজে ক্ষমাই হয় না বটে; কিন্তু আসমানতারাকে যদি তারা দিনে সাত বারও কাপড় ছাড়ায়, তবু সে তাদের উপর রাগ করিতে পারে না। লোক অবাক্ হইয়া গিয়া ভাবে, হায় রে, পোড়া বিধাতা এমন মানুষকেও ছেলে দেয় না! কেহ বলে, "আর জন্মের পাপ, নইলে ঐ হলো আসল মা, আর ওরই কি না কোল খালি।"

মীমাংসা কিছুই হয় না, দিন কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কাটিয়া যায়। চক্রবর্ত্তি-বাড়ীর বছর-বিয়ানী বউরা হয় ত বা মনে মনে ভাবে, বিধাতার বুদ্ধি আছে, ভাগ্যিস্ কাকীমা বাঁজা হয়েছিলেন, তাই আমরা বেঁচে আছি!

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সে কালের স্মৃতি

৪

বহুকাল পরে সে দিন একটি বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম—লেখা-পড়ায় তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না, কিন্তু বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার চেষ্টায় মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে একজন 'প্রাইভেট টিউটার' রাখিয়া দিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের বেতন প্রথমে তিন টাকা ছিল, বন্ধু এক এক কেলাশে তিন বৎসর থাকিয়া পাকা হইয়া প্রমোশন পাইয়া যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, সেই বার মাষ্টার মহাশয়ের বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায় উঠিল। আমার কথা শুনিয়া একালের কলিকাতার পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় বিদ্রূপের হাসিতে ওষ্ঠে বিজলী খেলাইয়া বলিবেন—'পাঁচ টাকা মূল্যে প্রাইভেট টিউটার মেলে?' একালে শিক্ষার ব্যয় যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে—তাহা দেখিলে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু আমি যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার পল্লীর কথা বলিতেছি। কি একখান ইংরাজী কেতাবে পড়িয়াছিলাম, ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইয়া এ দেশে আসেন, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা! সে কালে আয় অল্প হইলেও ব্যয় অতি সামান্য ছিল। একালের মত হাজার রকম বিলাসিতা গৃহস্থ-পরিবারে প্রবেশ করিয়া সমাজ-দেহটিকে সুপক্ব মাকালে পরিণত করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। বাল্যকালে গ্রাম্য বাজারে কড়ির প্রচলন দেখিয়াছি। পাঁচ কড়ার শাক, দশ কড়ার বেগুন কিনিলে সংসার চলিত। বর্ষাকালে বানের জল বাড়িলে স্থানীয় মালোরা (জেলে) তাহাদের জেলে-ডিঙ্গি বোঝাই করিয়া নদীর ঘাটে মাছের আমদানী করিত, আমি স্বয়ং এক পয়সায় পাঁচ ছয়টি 'বাট্‌কে' ও আট দশটি মৃগেল মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছি, ওজনে চারি পাঁচ সের—বহিয়া লইয়া যাইতে কষ্ট হইত। আমার ঠাকুর দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার পিতৃদেবের অন্নপ্রাশনে তিনি দুই টাকার তেল কিনিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম—'দুই টাকার তেলে অন্নপ্রাশনের ভোজ!' তিনি বলিলেন, 'দুই টাকায় বত্রিশ সের তেলে একটা ভোজ হবে না?'—আমরা তখন টাকায় চারি সের তেল ও আড়াই সেরের অধিক ঘি কিনিতে পাইতাম না। আমাদের গ্রামের মধু নাপিত আমাদের পারিবারিক নাপিত ছিল, সমগ্র পরিবারস্থ সকলকে কামাইয়া সে বার্ষিক এক টাকা বেতন পাইত; অক্ষয় ধোপা আমাদের কাপড় কাচিত। তাহার বেতন ছিল বার্ষিক পাঁচ টাকা। অথচ অক্ষয়ের বাড়ীতে সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। 'বৈয়ে' (বৈকুণ্ঠ) কলু একখানি ঘানী পিড়িয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিত। মধু নাপিত একদিন ঠাকুর দাদাকে কামাইতে আসিল, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাক্লিষ্ট। ঠাকুর দাদা বলিলেন, 'খবর কি মধু, মুখ অতো ভার ভার দেখছি যে!' মধু ঠাকুর দাদার গালে সজল হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আর কর্ত্তা, ছেলেপুলেদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া দায় হ'য়ে উঠলো! মাধব চাটুয্যের চা'লের দোকানে শুনে এলাম, চালের মণ হয়েছে পাঁচ সিকে!'—সেই চাউল একদিন এক মণ আট টাকায় কিনিয়াও পরিবার প্রতিপালন করিয়াছি। আমার বড় মাসীমার শ্বশুরকে গ্রামের জমিদার পদ্ম মল্লিক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সা'জি, এবার মুগের জোগাড় করতে পারি নি, চাটি মুগ পাঠিয়ে দিও।'—মাসীমার শ্বশুর তাঁহাকে চারিটি বলদের পিঠে আট বস্তা মুগ পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ কটি মুগ আপনার সেবার জন্যে দিলাম, ওর আর দাম দিতে হবে না।'—এ সকল কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। জিনিষপত্র সস্তা, কিন্তু দেশে টাকা নাই; তখনও ছিল না—তবে?

যে বাল্যবন্ধুর কথা বলিতেছিলাম, তাঁহার কথাটা শেষ করি।—বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার আগ্রহের অভাব দেখিয়া তাঁহার পিতার কোন বন্ধু বলিলেন, "তোমার সোনার টাট থাকতে ছেলেটাকে মা সরস্বতীর বাহন করবার চেষ্টা করছ কেন? ওকে দোকানে ভর্ত্তি ক'রে নেওয়াই ভাল।"—বন্ধুর পিতা কুণ্ডু মশায় বলিলেন, "ব্যবসা-কর্ম্ম ত আছেই; একটু 'গোব্যরস' ওর পেটে পড়ুক। 'গোব্যরস' কি না 'ইঞ্জিরি' বিদ্যে এক-আধটু পেটে না পড়লে কেউ মানতে চায় না হে! আমি কারবারী মানুষ, দরকার হ'লে 'যদিস্যাৎ' ডেপুটী মুনসোফ্‌দের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাহলে শা—রা একবার বস্‌তে বলে না হে! আর আমার উকীল হরিশ তরঙ্গ ডেপুটী হাকিমের কামরায় ঢুকতেই 'বসেন বসেন' ব'লে কেদারা দেখিয়ে দিলে! অথচ আমি ও রকম ডেপুটি মুনসোফ দু' পাঁচটাকে চাকর রাখ্‌তে পারি।'—আমার ইচ্ছে ছোঁড়াটাকে উকীল করি। নিজেরও ত মামলা-মকদ্দমা আছে।"—আমার বন্ধুটি উকীল হওয়া দূরের কথা, প্রবেশিকার গোষ্পদও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহার সহপাঠীদের কেহ কেহ উকীল হইলেও তাঁহাদের অবস্থা 'অদ্য ভক্ষ্যঃধনুর্গুণঃ'; আর বন্ধুটি এখন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবারের মালিক; তিনি স্বয়ং কারবারের টাকায় যে জমীদারী করিয়াছেন, তাহার আয় বার্ষিক পনের কুড়ি হাজার টাকা! তাঁহার আমোলে মেহেরপুরের বাজারে একজনও মাড়োয়ারী প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন যাঁহারা মেহেরপুরের বাজারের প্রধান ব্যবসাদার ছিলেন, তাঁহাদের পৌত্র ও দৌহিত্ররা এখন মাড়োয়ারীদের দোকানে পনের কুড়ি টাকা বেতনের চাকরী করিতেছে। কেহ কেহ উকীলের মুহুরী বা আদালতের আমলা। মেহেরপুরের বাজারে এখন মাড়োয়ারীরাই নেতৃত্ব করিতেছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। সাধে কি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, 'ল-কলেজ উঠাইয়া দাও, উচ্চশিক্ষা বন্ধ কর।'

কিন্তু সেকালে ইংরাজী অর্থকরী বিদ্যা ছিল। 'যেমন তেমন চাকরী—দুধ-ভাত'—কথাটা সকলের মুখেই শুনিতে পাইতাম। সেকালে ইংরাজী না শিখিয়াও কেবল 'কেতাবতি বিদ্যা'র জোরে

অনেকে চাকরী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রামনারায়ণ নাজীর আমাদের সমাজের চাঁই ছিলেন; তিনি তিনি মুন্সেফী আদালতে নাজীরি করিয়া যে অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অনেক সহপাঠী এবং শিশুর দল মুন্সেফী আদালতের নাজীরিকেই চাকরীর আদর্শ মনে করিত; তাহাই তাহাদের যৌবনের তপস্যার বিষয় ছিল। আমাদের গ্রামের হরিনাথ চক্রবর্ত্তী কেবল বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কোন প্রবলপ্রতাপ বিখ্যাত জমিদারের সদর নায়েব হইয়াছিলেন, এবং নায়েবী করিয়া কেবল যে মহাসমারোহে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করিতেন এরূপ নহে; তিনি একটি বৃহৎ জমিদারীও রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রথ, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি এখন হতশ্রী হইলেও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। আমার বাল্যকালে আমার কাকা যখন মেদিনীপুর জেলায় মহিষাদল এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, সে সময় তিনি উক্ত নায়েব মহাশয়ের অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা বেতন পাইলেও বেতনাতিরিক্ত অর্থগ্রহণে এরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিলে আমাদের সমগ্র পরিবারকে অন্নাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল; অথচ তাঁহার যিনি 'সব ম্যানেজার' ছিলেন, তিনি গল্প করিতেন, প্রথম যৌবনে তিনি মহিষাদল এষ্টেটে মাসিক আট আনা বেতনে চাকরী আরম্ভ করিয়াছিলেন; যখন তিনি সব-ম্যানেজার—সেই সময় তিনি একটি বড় জমিদারীর মালিক, এতদ্ভিন্ন তিনি একটি হাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্ষিক বারো হাজার টাকা আয় ছিল! মেহেরপুর জমিদারীর তাৎকালিক ইংরাজ মালিক 'নিশ্চিন্তপুর কান্‌সার্ণের' জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের সদর নায়েব মৃত্যুকালে তিনলক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন! সুতরাং সেকালে বাঙ্গালানবীশরাও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

আমার পিতৃদেব বাঙ্গালানবিশ ছিলেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল; সে সময় মেহেরপুরে তাঁহার মত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারিতেন না; তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, তিনি সাধারণতঃ কৃষ্ণনগরেই থাকিতেন; তাঁহার যৌবনকালে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এ জন্য তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি ও ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আস্থাহীন না হইলেও ঘরে বসিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি, তিনি আসনে বসিয়া করজোড়ে 'অলখ নিরঞ্জনের' উপাসনা করিতেন, তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুর প্রবাহ বহিত, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার উপাসনার শেষ হইত না। আমাদের বাল্যকালে 'পদ্যপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা স্বর্গীয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার মেহেরপুর গিয়াছিলেন; মেহেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় ব্রজরাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্যালক ছিলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলে আমরা ছেলের দল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহার রচিত পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের 'সন্ধ্যা' নামক কবিতার কিয়দংশ মনে পড়িয়াছিল,—

"দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁসর,
যে বলে বলুক ঐ কাঁসরে কর্কশ;
আমার নিকট উহা শ্রুতি-সুখকর,
হৃদয়েতে আবির্ভাব করে শান্ত-রস।

জ্ঞানী নই, পাই নাই পরমার্থ-জ্ঞান,
বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে;
জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণনিচয়ে।

জানি এই, যোগী যারে ধেয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্ণ সময়ে
সুখী হই ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া।"

এ প্রকার সরল, হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছ্বাসপূর্ণ, শান্ত-রসাস্পদ কবিতা একালের 'মিষ্টিক' কবিতার কুজ্ঝটিকা-জালের ভিতর একটিও খুঁজিয়া পাইয়াছি কি না সন্দেহ। সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, সাহিত্য-সাধনাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, ইহাতেই জীবনের সকল সুখশান্তি পর্য্যবসিত; তাই বুঝি লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এসো না এ দীনজন-কুটীরে।' —কে জানিত, মা লক্ষ্মী ভবিষ্যৎ জীবনে এ ভাবে বিমুখ হইবেন? পিতৃদেব তাঁহার প্রথম যৌবনে 'কুসুম-কামিনী' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যদুগোপাল বাবুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যদুগোপাল বাবুর সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল, এবং মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজে তাঁহার কবিত্ব-শক্তিরও কিঞ্চিৎ খ্যাতি হইয়াছিল। পিতৃদেবই মেহেরপুরের প্রথম গ্রন্থকার। আমি এই পৈতৃক সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী। গ্রন্থরচনা করিয়া পিতৃদেব কাহারও কাহারও উপহাসভাজন হইয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাতে বিরত হইলেও একখানি খাতায় 'অকিঞ্চনের মনের কথা' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহাতে সেই সময়ের সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা, ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে আমি সেই খাতাখানি তাঁহার দপ্তরে দেখিতে পাই নাই; সম্ভবতঃ কাহাকেও পড়িতে দিয়াছিলেন, আর ফেরত পাওয়া যায় নাই।

মেহেরপুরে আমাদের বাড়ীর অদূরে গোয়ালা চৌধুরীদের গড়ের মাঠে যে বসন্ত-মেলা হইয়াছিল, এক বৎসর পরে পুনর্ব্বার সেই মেলা বসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বৎসর অর্থাভাবে তেমন সমারোহ হয় নাই; দশভুজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বাসন্তী-পূজা হইয়াছিল, এবং মেলা উপলক্ষে কতকগুলি দোকান বসিয়াছিল. বারোয়ারীর আসরে যাত্রাগান, ঢপ, কবি, কীর্ত্তন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কিন্তু সে সকলই স্থানীয়। মেহেরপুরের চারি মাইল দক্ষিণে মোনাখালী নামক গ্রামে সেই সময় একটি নূতন যাত্রাদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবার মেলায় সেই দল বায়না করা হইয়াছিল। দলপতির নাম স্মরণ নাই; কিন্তু সে 'সীতার বনবাস' পালায় হনুমান্ সাজিয়াছিল; সে যখন আসরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে সাধারণের গমনাগমনের পথ ত্যাগ করিয়া, আসরের বাঁশের খুটী বহিয়া নামিয়া

আসল হনুমানের মত 'হুপ্‌হাপ্‌' শব্দ করিতে করিতে আসরের ভিতর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এই দৃশ্য আমাদের ছেলের দলের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল।

সেই সময় আমাদের গ্রামের কোন কোন সমৃদ্ধ লোকের বাড়ী শীত ও বসন্তকালে দুই তিন মাস ধরিয়া কথকতা চলিত। কথক ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মেহেরপুরেরই অধিবাসী ছিলেন; তিনি সুকণ্ঠ ও সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার সরস রসিকতায় শ্রোতার দল প্রাণ ভরিয়া হাসিত, এবং তাঁহার মধুর ধর্ম্মোপদেশ সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। তিনি যখন করুণ-রসের অবতারণা করিতেন, তখন পুরুষ ও রমণী সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত। একবার চাটুয্যে-গিন্নী তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া আসিয়া বাড়ীতে তিন মাস 'কথা' দিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে তাঁহাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় বাঁশের 'চ্যাটাই'এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নীচে দক্ষিণপ্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে 'উত্তরমুখো' হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অনুচ্চ টুলে শালগ্রাম-শিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরঞ্চীতে বসিয়া শ্রোতারা কথা শুনিতেন। আঙ্গিনার উত্তর-সীমায় একখানি খড়ো ঘর ছিল; তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লীরমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন।

অপরাহ্ণে চারিটার সময় কথারম্ভের সংবাদ প্রচারের জন্য চাটুয্যে-বাড়ীতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। আমরা ছেলের দল সেই শব্দ শুনিয়া কথা শুনিতে ছুটিতাম। বিলম্ব হইলে স্থানাভাব হইতে পারে ভাবিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া 'ফরাস' অধিকার করিতাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকরা মাটীতে বসিয়া নিস্পন্দভাবে কথা শুনিত। কথক ঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চ্চিত, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক; শিখার গ্রন্থিতে একটি ফুল। দেহ রেশমী নামাবলি দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য। তিনি তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাঠের আবরণাবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন; কখনও হাসাইতেন, কখন কাঁদাইতেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রান্তি-বোধ হইলে ট্যাঁক হইতে নস্যপূর্ণ শামুক বাহির করিয়া দুই এক টিপ নস্য লইতেন, এবং সম্মুখস্থিত তো-করা গামছাখানি দ্বারা নাকমুখ মুছিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গীতের সুরে কথা আরম্ভ করিতেন।

এই কথকতা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপরিপ্রাপ্তিও মন্দ হইত না। সন্ধ্যার পর কথা শেষ হইলে কোন দিন তিনি চিকের অন্তরালস্থিত পুরমহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "মা সকল, কাল রামের বিবাহ, বিবাহে 'নকুতা' দিতে হয়, —তা যেন মনে থাকে।"—কোন দিন বলিতেন, 'কাল লক্ষ্মণ-ভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।'—কেহ নূতন কাপড় দিত, কেহ কাঠের 'বারকোশ' পূর্ণ করিয়া সিধা দিত, কেহ নূতন কাঁসার ডিসে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিত; এতদ্ভিন্ন ডাব, পেঁপে, তরমুজ, সুপক্ক কলা, এবং নানাবিধ তরকারিও তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইত।—এই ভাবে এক এক বাড়ীতে দীর্ঘকাল কথকতা চলিত।—এ কালে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের এই সুন্দর প্রথাটি বিলুপ্ত হইয়াছে; আমাদের পল্লী হইতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাঁহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, এ কালে তাঁহাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গার্ল স্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া সেকেলে রামায়ণ, মহাভারত আর স্পর্শ করেন না; এখন তাঁহারা সাহিত্যে 'আর্ট' ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকদিগের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, রামায়ণে আর মন উঠে না।

ঘরে বসিয়া কাকার কাছে কথামালা পড়িলাম; কিন্তু 'বাঘ ও বকের' গল্প পড়িয়া সময় নষ্ট করিতেছি দেখিয়া ঠাকুরদাদা আমাকে অধিকারী পাড়ার পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শ্রীচরণ অধিকারীর চণ্ডীমণ্ডপে সেই পাঠশালা বসিত। সীতানাথ অধিকারী সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু তিনি বেতের সাহায্যে বিদ্যার অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ন্যায় ঔদরিক ফলারে ব্রাহ্মণ গ্রামে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তাঁহার বাঁ পাখানি অন্য পা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ছিল; এ জন্য হাঁটিবার সময় তাঁহাকে একটু খোঁড়াইতে হইত। কেহ কেহ বলিত, যৌবন-কালে তিনি পরকীয়া-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—ইহা তাহারই ফল! তিনি সামান্য কারণে বা অকারণে যে সকল পড়ুয়াকে বেত্রাঘাত করিতেন, তাহারা তাঁহার অদৃশ্য থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত,—

"খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং,
কার হাঁড়িতে ফ্যান্ খেয়েছিস,
কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং?"

কে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এইভাবে উপহাস করিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না; এজন্য পাঠশালায় আসিয়া অধিকাংশ পড়ুয়াকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেন। দুই এক জনের অপরাধে প্রায় সকলেই শাস্তি পাইত।

স্নেহ-মমতাহীন, বেত্রমাত্র-সম্বল এই লুব্ধ গুরু মহাশয়ের হাতে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল; তিনি আজ পরলোকে, বিশেষতঃ গুরুনিন্দা মহাপাপ, কিন্তু এখানে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার এই স্মৃতি-কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেকেলে গুরু মহাশয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী একালে উপকথার বিষয় হইয়াছে, অধুনালুপ্ত যে সকল জীবের অস্তিত্ব এখন কেবল কল্পনাতেই স্থান পাইতেছে, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ কদাচিৎ কোন যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেকালের পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী এবং সেকেলে গুরু মশায়দের রীতি-প্রকৃতি ও চরিত্র-চিত্র একালের সাহিত্যে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।

আমি আমার পাঠ্যপুস্তক কথামালা ও শ্লেট-পেন্সিল লইয়া যে দিন সীতানাথ অধিকারীর পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিনের কথা এখনও আমার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রহিয়াছে।

অধিকারী পাড়ার ও মুখুয্যে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাই এই পাঠশালায় পড়িতে আসিত। আমরা আমাদের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়াতে আমাকে ভিন্ন পাড়া হইতে আসিতে হইত। গুরু মহাশয় আমার হাতে কথামালা ও শ্লেট দেখিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন; তাহাতে কতখানি বিস্ময় ও বিরক্তি ছিল, তাহা ঠিক বুঝাইতে পারিব না। তিনি কথামালাখানি নাড়িয়া চাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বিদ্যেসাগর এই সকল বই লিখে ছেলেগুলার মাথা খাচ্ছে, না হে বাপু, ঐ সব 'বাগের' আর 'বগের' কেচ্চা এখানে চল্‌বে না। তোমাকে একখান শিশুবোধক কিন্‌তে হবে। শটকে, কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পোণ শিখতে হবে; আর তালপাতে লিখতে হবে। কাল থেকে পাততাড়ি, খাগের কলম, এক দোয়াত ঝিউনীর কালী, আর বস্‌বার জন্মে ছোট একখান 'পাটী' কি কুশাসন আন্‌বে।"

কেঁচে গণ্ডুষ! আমি বিপদে পড়িলাম। কোথায় কিরূপে পাততাড়ি সংগ্রহ করি? সৌভাগ্যক্রমে আমার কাকার শ্বশুর-বাড়ীতে তালগাছ ছিল, তাঁহার শ্যালক মণি পালকে মুরুব্বী করিলাম; তিনি তাঁহাদের কৃষাণকে আদেশ করায় সে তালগাছে উঠিয়া দুই তিনটা ডেগ্‌রো কাটিয়া দিল। তাহারই সাহায্যে কতকগুলি পাতা পাততাড়ির উপযোগী করিয়া কাটিয়া লইলাম; কিন্তু টাটকা পাতা সবুজবর্ণ, তাহার উপর কালী ফুটে না। পাঠশালার পড়ুয়াদের উপদেশে সেই পাতাগুলি একত্র বাঁধিয়া, পাতকূয়ার পাশে যেখানে বাড়ীর মেয়েরা স্নান করিতেন, সেই স্থানের মাটী খুঁড়িয়া কাদার ভিতর পুতিয়া রাখিলাম। সঁ্যাতা মাটীর ভিতর চারি পাঁচ দিন প্রোথিত থাকায় তালপাতাগুলির রঙ্ ফিকা হইল, মসৃণতাও কমিয়া গেল। মহা উৎসাহে সেগুলি ধুইয়া শুকাইয়া লইলাম। সরস্বতী-পূজার সময় জলচৌকীর উপর ঠাকুরদাদার রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পূজার জন্য দেওয়া হইত; সেই সময় মাটীর দোয়াতে দুধ ও খাকের কলম দেওয়ার নিয়ম ছিল, পল্লীগ্রামের গৃহস্থ-গৃহে সরস্বতী-পূজার সময় এই নিয়মটি এখনও পালিত হয়। ঠাকুরদাদার দপ্তরে ঐরূপ খাকের কলম অনেকগুলি ছিল, তাহাই একটা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইলাম। কাকা লিখিবার জন্য "বিলাতী কালী" প্রস্তুত করিয়াছিলেন; একখানি লোহার কড়ায়ে বাবলার ছাল, হীরাকস প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ জলে ভিজাইয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইত, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ কষ বাহির হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে গাঢ় হইলে তাহাই লিখিবার কালীরূপে ব্যবহৃত হইত। এই কালাকে 'কষ কালী' বা 'বিলাতী কালী' বলা হইত। একটা মাটীর দোয়াতে সেই কালী ঢালিয়া লইয়া একখানি নূতন শিশুবোধক, পাততাড়ি, একখানি মাদুরের আসন ও সেই দোয়াতসহ মহা উৎসাহে পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। গুরুমহাশয় আমার দোয়াতের কালী পরীক্ষা করিয়া ক্রোধে মুখ বিকৃত করিলেন, তাহার পর আমার পিঠে দুম্ করিয়া এক কিল মারিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোর ঝিউনীর কালী?—এ ইংরাজী কালীতে তালপাতায় লেখা চল্‌বে না। এ কালী ফেলে দিয়ে কাল ঝিউনীর কালী আন্‌বি, দোয়াতের ভিতর 'কেঠো' দিবি, আর একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে বালি আন্‌বি, বালি না দিলে তালপাতের লেখা ধ্যাবড়া হয়ে যাবে।"

'কেঠো' জিনিষটি কি, তাহা হয় ত একালের ইংরাজী-নবিশ পাঠকরা বুঝিতে পারিবেন না।—উহা এক টুকরা ছেঁড়া ন্যাকড়া, তাহা দোয়াতের ভিতর রাখিলে হঠাৎ দোয়াত উল্টাইলে কালী নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, এবং কলমে অধিক কালী উঠিয়া লেখা ধ্যাবড়াইয়া যায় না।

'ঝিউনীর' কালী প্রস্তুতের কৌশল জানিতাম না। আমাদের পাঠশালার সর্দ্দার পোড়ো সতীশ স্বর্ণকার আমাকে তাহা শিখাইয়া দিল। অর্দ্ধদগ্ধ আতপ-চাউলকে আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'ঝিউনী' বলে। তদ্দ্বারা কিরূপে কালী প্রস্তুত হয়, তাহা এই 'ফাউণ্টেন পেনের' যুগে এবং যে সময় বাজারে দেশী ও বিদেশী পঞ্চাশ রকম কালী কিনিতে পাওয়া যায়, সে সময় এ কালের ছেলেদের না জানাই সম্ভব। কিন্তু সে কালে ঝিউনীর কালী ভিন্ন বাঙ্গালা-নবীশদের লেখা চলিত না; দোকানদারদের খাতাপত্রও সেই কালীতেই লেখা হইত। মা আমার আবদার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া 'কাঠখোলায়' (অর্থাৎ খোলা-হাঁড়িতে বালি না দিয়া) এক খোলা আতপ চাউল ভাজিয়া দিলেন। ভাজিতে ভাজিতে খোলা হাঁড়ি হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হইতে লাগিল, এবং চাউলগুলি পুড়িয়া কালো হইল। আমি সেই পোড়া চাউলগুলি একটা বাটিতে ভিজাইয়া রাখিলাম। আট দশ ঘণ্টা ভিজিবার পর সেই জলের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ হইল। তখন খানিক চুল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা খোলা হাঁড়ির গা ঝাড়িয়া খানিক 'ভুষো কালী' একখানি কাগজে সঞ্চিত করিলাম। তাহার পর একটা পাথরের খোরায় সেই ভুষো ঢালিয়া তাহাতে অল্পপরিমাণ ঝিউনীর জল দিয়া একটা ঘোটনার সাহায্যে ঘুঁটিতে লাগিলাম। কালীটা অত্যন্ত গাঢ় হইল দেখিয়া তাহাতে আরও খানিক ঝিউনীর জল, কিঞ্চিৎ হীরাকস ও গঁদের আটা দিয়া দশ পনের মিনিট ঘুঁটিতেই সেই কালী ব্যবহারযোগ্য হইল। সেই কালী মাটীর দোয়াতে ঢালিয়া দোয়াতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার 'কেঠো' দিলাম। খাকের কলম দিয়া সেই কালীর সাহায্যে তালপাতায় যখন আমার আঁকা-বাঁকা ছোট-বড় হরফগুলা ফুটিয়া উঠিল, তখন এত আনন্দ হইল যে, তাহা ঠাকুরদাদাকে না দেখাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঠাকুরদাদা সস্নেহে বলিলেন, "লেখায় যখন তোর এত যত্ন, তখন তুই বড় হয়ে ভাল লিখ্‌তে পারবি।"—আমরা সে কালে হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতাম, এ কালের ছেলেরা তাহা পণ্ডশ্রম মনে করিবে। যখন ইংরাজী স্কুলে ক্লাশে পড়িতাম, তখন ক্লাশের শিক্ষক মহাশয় 'কাপি বুক' দেখিয়া খাতায় প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া আনিতে বলিতেন; আমার প্রতিবেশী বন্ধু ও সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ও লেখার টান আমার অপেক্ষা ভাল ছিল। মাষ্টার মহাশয় আমাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য হস্তাক্ষরে নম্বর দিতেন, সুরেন্দ্রনাথ ২০ নম্বরের মধ্যে ১৬।১৭ পাইতেন, আমি ১৪।১৫ পাইতাম। আমি বন্ধুর হস্তাক্ষরের হিংসা করিতাম। তিনি এখন মফঃস্বল কোর্টের বড় উকীল, বড় বড় ব্যারিষ্টারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মামলা জিতিয়া আসেন; মান-সম্ভ্রম ক্ষমতা-প্রতিপত্তিতে

কে তাঁহার সমকক্ষ ? আর আমি ? মাতৃভাষার নগণ্য সেবক, অসহায় বার্দ্ধক্যে জীবনের যুদ্ধে পরাভূত। তথাপি সে কালের সেই বাল্যবন্ধুত্বের কথা স্মরণ হইলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। প্রথম জীবনে যাহাদের সহিত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারা আজ কোথায় ? সন্ধ্যার স্তিমিত দীপালোকে একাকী গৃহকোণে বসিয়া নিজেকে নিতান্ত নির্ব্বান্ধব ও নির্ব্বাসিত বলিয়া মনে হয়। কোথায় বাল্যের সেই সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি !

কিন্তু তথাপি শৈশবে গুরু মহাশয়ের বেত খাইয়া পাঠশালার বিরুদ্ধে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তিনি একাদশীর উপবাসের পর দ্বাদশীর পারণ করিবেন, সে জন্য তিনি সকল পড়ুয়াকে সিধা আনিতে বাধ্য করিতেন। সিধায় চাউল, ডাল, তরকারীর পরিমাণ অল্প হইলে বেত চলিত। পড়ুয়াদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত নামক একটি ছাত্র গুরু মহাশয়ের প্রিয় পাত্র ছিল। তাহার বাবার মশলার ও তামাকের দোকান ছিল। মধুসূদন গুরু মহাশয়ের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ সকল জিনিষ তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে দোকান হইতে আনিয়া গুরুমহাশয়কে উপহার দিত। বিশেষতঃ অম্বুরী তামাকে গুরুমহাশয়ের অত্যন্ত লোভ ছিল। গুরুমহাশয়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া মধু আমাদের দলপতি হইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমরা তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতাম না। এজন্য মধু আমাদের বিরুদ্ধে গুরুমহাশয়ের কাছে 'ঠকামী' করিত; তাহার কথায় আমরা শাস্তি পাইতাম। শেষে আমরা দল বাঁধিয়া মধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলাম। মধুকে ক্ষ্যাপাইবার জন্য একটি ছড়া রচিত হইল, তাহা এই—

"মোদো খায় খোদোর বীচি,
নীলমণি খায় ফ্যান্।
মোদোর বাপের দাড়ি ধ'রে,
নাচ্‌বে কোলা ব্যাং।"

এই ছড়া শুনিয়া মধু রাগিয়া আগুন। সে গুরু মহাশয়ের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। সীতারাম অধিকারী গুরুমহাশয় ভিজা গামছাখানি তো করিয়া মাথায় দিয়া টুলে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে আমাদের বিচার আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "মশায়, ও ছড়ায় মধু ক্ষ্যাপে কেন ? 'মোদো' মধুর নাম নয়, 'খোদোর বীচি' যে কি জিনিষ, তা আমাদের জানা নাই, নীলমণি কে, তাও জানি না, আর ফ্যান খাওয়াও দোষের কথা নয়। বিশেষতঃ, মধুর বাপের দাড়ি-গোঁফ নাই, কোনও ব্যাংও দাড়ি ধ'রে নাচে না।"—গুরুমহাশয় এই সুস্পষ্ট জবাবের উত্তরে আমার পাঁজরে শপাং করিয়া বেত মারিলেন, এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তোর বাবা কেতাব লেখে, তুই তারই ছেলে ত! ও ছড়া তুই-ই বেঁধেছিস্!"—সঙ্গে সঙ্গে হাতে মাথায় পিঠে শপাশপ বেত পড়িতে লাগিল। সেই বেতের চোটে কি না, বলিতে পারি না, সেই রাত্রিতে আমার জ্বর আসিল। রংটা একটু ফরসা ছিল, বেতের আঘাতে পিঠে দড়ার মত দাগ হইয়াছিল। বাবার এক বিধবা পিসী আমাদের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, কারণ, আমার জন্মের পূর্ব্বেই পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গত ৭০ বৎসরের মধ্যে আমাদের বৃহৎ পরিবারে আমার পিতা ঠাকুরের প্রথমা পত্নী (আমার মাতা ঠাকুরাণীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী) ব্যতীত সধবা অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হয় নাই! দিদিমা আমার পিঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া খোঁড়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা রহিত করিলেন। ঠাকুর-দাদার 'খড়ে' হইতে তাঁহার তামাক কি কারণে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইত, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন ; সুতরাং তিনিও আর আমাকে অধিকারী পাড়ার পাঠশালায় পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। সেই স্থানেই আমার ধারাপাত শিক্ষার খতম, এবং শিশুবোধকের 'গুরুদক্ষিণাতেই' পাঠশালার গুরুদক্ষিণা শেষ হইল। ১৩০৪ সালে যখন 'বসুমতীর' কর্ণধার কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ 'বসুমতীর' গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করেন, সেই সময় পূজার অবকাশে আমি মেহেরপুরে গিয়াছিলাম, সে সময় অধিকারী মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া-ছিলেন ; তিনি কোমরে চাদর বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিলে তিনি আমাকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া-ছিলেন, এবং হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাপু হে, আমার বেতের গুণেই আজ মা সরস্বতী তোমার 'পৃতি' সদয়। এখনও আমি 'গুমোর' ক'রে সকলকে বলি, আমিই গাধা পিটিয়ে তোমাকে ঘোড়া করেছি। তা বাপু, পুকুরে ঘোড়া নয়, মস্ত বড় তাজী ঘোড়া।" ইত্যাদি—আমি তাঁহাকে সবিনয় জানাইলাম—তাঁহার বেতের মহিমা কখন ভুলিতে পারিব না।

পাঠশালা ডিঙ্গাইয়া বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। সেই স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া হইত। সেখানে কিছু দিন পড়িয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। আমার কাকা তখন রাজমহলের স্কুলের চাকরী ত্যাগ করিয়া আসিয়া মেহেরপুরের ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেকের তিন পুরুষকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ইংরাজী স্কুলে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

ইংরাজী স্কুলে আমার সহপাঠীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। আমাদের প্রতিবেশী, মুন্সেফী আদালতের উকীল দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মনোমোহন ওরফে মুনু বা মনু তিন চারি বৎসর এক এক শ্রেণীতে পাকা হইয়া যেবার আমাদের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইল, সেবার মনু এমন এক কীর্ত্তি করিয়া-ছিল যে, সে কথা কোন দিন ভুলিতে পারিব না। মনু তখন দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠকায় ষোল সতের বৎসর বয়সের কিশোর। তাহার নষ্টামীর সীমা ছিল না। তাহার জিহ্বাটি মুহূর্ত্তের জন্য মুখ-বিবরে আবদ্ধ থাকিত না, এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্তভাবে লালা নিঃসারিত হইত। তৃতীয় শিক্ষক জানকী মাষ্টার ক্লাশে অঙ্ক কষিতে দিয়াছেন, আমরা শ্লেটে অঙ্ক কষিতেছি ; মনু মনোযোগ সহকারে একটি বানর আঁকিয়া তাহার নীচে লিখিল—"থার্ড মাষ্টারের আসল চেহারা।"—আমরা সকলেই অঙ্ক দেখাইলাম, মনু আর শ্লেট নামায় না। জানকী মাষ্টার বেত্র-প্রয়োগে আমার বাল্যের গুরুমহাশয় সীতারাম অধিকারীর

জোড়া ছিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতিবেশী, এবং জ্ঞাতি; সম্বন্ধটা ঠিক স্মরণ নাই। জানকী মাষ্টার বেত উঠাইয়া বলিলেন, "এই মুন্নু, অঙ্ক হয়েছে?"—মুন্নু লালাবর্ষণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হয়েছে, ল্যাজটুকু বাকী।"—"ল্যাজ বাকী কি রে? অঙ্কর ল্যাজ!"—তিনি মনুর সম্মুখে আসিয়া তাহার হাতের শ্লেট টানিয়া লইয়া দেখিলেন, মুন্নু বানর আঁকিয়াছে! তিনি উহা নিজের প্রতিকৃতি বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও যখন দেখিলেন, মুন্নু তাহার নীচে মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছে—"থার্ড মাষ্টারের আসল চেহারা"—তখন তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মুন্নুর সর্ব্বাঙ্গে সবেগে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। মুন্নু সবেগে প্রচুর লালা নিঃসারিত করিতে করিতে দেহের নানা ভঙ্গী করিয়া আক্রমণে বাধাদানের চেষ্টা করিতে লাগিল। মারের চোটে কচার ডাল ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু মুন্নুর দুষ্টমীভরা মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখা গেল না, চক্ষুতে এক বিন্দু অশ্রু নাই। ক্রুদ্ধ জানকী মাষ্টার শ্লেটখানি লইয়া হেড্‌মাষ্টার রাখাল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাখাল বাবু আমাদের ক্লাশে আসিয়া মুন্নুকে বেঞ্চির উপর 'নীল ডাউন' করিয়া দিলেন। মুন্নু চারিদিকে চাহিয়া তাহার পার্শ্বস্থ সহপাঠীর কাণে কাণে বলিল, "ল্যাজটা ছোট হয়েছে ব'লে ম্যাষ্টার মোশায়ের রাগ।"

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়িলে আমরা ক্লাশে প্রবেশ করিবার সময় একখানি কাগজ সেই কক্ষের সম্মুখস্থ দেওয়ালে ঝুলিতে দেখিলাম, তাহাতে মোটা মোটা হরফে লেখা—

"হেড্ মাষ্টার মদে কামড়।
তার নীচেতে প্রবোধ ধামড় ॥
প্রবোধ ধামড়ের নেই কো রাগ।
তার নীচেতে জানকী বাঘ॥
জানকী বাঘের দাঁত কিটিমিটি।
তার নীচে বেজা টিক্‌টিকি॥
ফোর্থ মাষ্টার গুলী খান।
ফিফ্‌থ মিট্‌মিটে শয়তান॥"

স্কুলের পাচ জন শিক্ষকের গুণ-বর্ণনা! হেড মাষ্টার রাখাল বাবু বহুদর্শী সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার ছিলেন; কিন্তু দেবী সুরেশ্বরীর উপাসক বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। এক এক দিন সন্ধ্যার পর তাঁহারা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সম্মিলিত হইয়া গল্প-গুজোব করিতেন। আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এক দিন আমাকে শ্লেট লইয়া অঙ্ক কষিতে দেখিয়া বলিলেন, "বল্ ত চারের অর্দ্ধেক কত?"—আমি বলিলাম, "দুই, ও আর কে না জানে?" রাখাল বাবু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোর কিছু হবে না, গাধা!—চারের অর্দ্ধেক দুই না শন্নি?" আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে তিনি বলিলেন, "শন্নি নয়?—ভ্যাখ।"—তিনি আমার পেন্সিলটি হাতে লইয়া একটা '৪' লিখিলেন, এবং নীচের আধখানা মুছিয়া ফেলিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, বলিলেন, "এটা কি '২' না '০'?"

আমার কাকা দ্বিতীয় শিক্ষককে কেহ কখন রাগ প্রকাশ করিতে দেখিত না; অত্যন্ত গুরু অপরাধ ভিন্ন তিনি ছাত্রদের উপর বেত চালাইতেন না, তথাপি স্কুলের ছেলেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি আদর্শ-শিক্ষক ছিলেন, এবং প্রাচীন কালের অধ্যাপকের আদর্শে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় শিক্ষক জানকী অধিকারীর বেতের চোটে ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইত, এবং তিনি যখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিতেন, তখন বাঘের সহিত তাঁহার তুলনা চলিতে পারিত। বস্তুতঃ, সেই ছড়ায় স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকের বিশেষত্বের উল্লেখ ছিল, এবং উহা মুন্নুর রচিত—এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুন্নু অপরাধ স্বীকার করিল না; তাহার হস্তাক্ষরও অন্যরকম। তাহার পিতা উকীল ছিলেন, তাঁহার নিকট মুন্নুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মুন্নুর অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া উহাকে শাস্তি দিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" কিন্তু মুন্নুর অপরাধ প্রতিপন্ন হইল না। ক্লাশের কোন ছাত্র অপরাধ করিয়া ধরা না পড়িলে সকল ছাত্রের 'ফাইন' করিবার প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দুষ্টমীতে মুন্নু একটি 'জিনিয়াস' ছিল। আমাদের পাড়ায় মুন্নুদের বাসার কয়েক শত গজ পশ্চিমে হারাধন সরকার নামক এক জন ভদ্রলোক বাস করিতেন; তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তিনি মধ্যাহ্নে আদালতের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কোন বিদেশী লোক মামলা-মোকর্দ্দমা উপলক্ষে আদালতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার উকীল ঠিক করিয়া দিতেন, পারিশ্রমিক লইয়া দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, কোন মামলায় সাক্ষী জুটাইয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিতেন; এইরূপ উপার্জ্জনে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'গাছতলার মোক্তার' বলিত। তাঁহার একটি ছেলে ছিল, নাম রজনীকান্ত। আমাদের এক পাড়ায় বাস; রজনী আমাদের সঙ্গে খেলা ও আমোদ-প্রমোদ করিত।

মুন্নুর কয়েকটি হাঁস ছিল। কিন্তু আমাদের পাড়ায় শৃগালের উপদ্রব অধিক থাকায় হাঁসগুলি একে একে অদৃশ্য হইয়াছিল। এ জন্য মুন্নু শিয়াল মারিবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু বন্দুকের অভাবে গুলী করিয়া মারিবার সুযোগ হইল না। রজনী বলিল, তাহাদের আড়পাড়ায় আখের গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু শিয়ালে গুড় খাইয়া যায় বলিয়া কৃষকেরা ফাঁদ পাতিয়া শিয়াল ধরে, তাহার পর লাঠাইয়া মারিয়া ফেলে। রজনী সেইরূপ ফাঁদ পাতিয়া শিয়াল ধরিয়া দিতে চাহিল; রজনীর উপদেশে মুন্নু একটি সুদীর্ঘ ও সরল বাঁশের 'আগালে' লইয়া আসিল, তাহার অগ্রভাগ সুদৃঢ় সরু, সহজেই নোয়াইতে পারা যাইত। রজনী সেই বংশদণ্ডের অগ্রভাগে একগাছা শক্ত শণের দড়ি বাঁধিয়া, তাহার গোড়াটা প্রায় এক হাত মাটীর ভিতর পুতিয়া দিল; তাহার পর সেই বংশদণ্ডের এক পাশে একটি গর্ত্ত কাটিয়া সেই গর্ত্তের ভিতর পাকা কাঁটালের 'ভুতুড়ি' রাখিল, এবং পূর্ব্বোক্ত শণের দড়ির প্রান্তে একটি ফাঁস প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গর্ত্তটি পরিবেষ্টিত করিল; তাহা এ ভাবে আট্‌কাইয়া

রাখিল যে, শিয়াল কাঁটালের 'ভুতুড়ির' লোভে গর্ত্তে মুখ দিলেই সেই ফাঁস তাহার গলায় আঁটিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশদণ্ডের অগ্রভাগ সরলভাবে ঊর্দ্ধে উঠিবে, এবং শিয়ালটা ফাঁসে আবদ্ধ হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে। তাহার পর বংশদণ্ডটি উৎপাটিত করিয়া লাঠি মারিয়া শিয়ালটিকে হত্যা করা কঠিন হইবে না বুঝিয়া আমরা আনন্দে নাচিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ফাঁদ পাতা হইল। ফাঁদের ভিতর গর্ত্তে পাকা কাঁটালের ভুতুড়ি রাখিয়া আমরা সকলেই মুনুদের বৈঠকখানায় উঠিয়া দেওয়ালের আড়ালে লুকাইলাম, এবং অধীরভাবে শৃগালের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

রজনীর পিতা হারাধন সরকার অত্যন্ত সতর্ক লোক ছিলেন; তিনি পুত্রের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সে আমাদের মত দুষ্ট ছেলের দলে মিশিয়া বখিয়া না যায়, এ জন্য তাঁহার চেষ্টা-যত্নেরও অভাব ছিল না। কিন্তু রজনী সুযোগ পাইলেই তাহার পিতার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিত। তাহার পিতা তাহাকে ধরিতে আসিলে সে পলায়ন করিত, বা কাহারও 'মাটীকোঠা'য় উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত।

সে দিন অপরাহ্নে হারাধন সরকার কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিয়া রজনীকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সাড়া না পাইয়া যখন অদূরবর্ত্তী পথে আসিয়া আমাদের কলরব শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল, তাঁহার পুত্ররত্ন আমাদের দলে মিশিয়া কোন অপকর্ম্মের ফন্দী আঁটিতেছে!

তিনি পথে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন, "রজনী—রোজো—রজা!—হারামজাদা আছে ওখানে, সাড়া দেবে না! যাচ্ছি—তোর কাণ ধ'রে—"

ক্রোধে সরকারজীর কণ্ঠরোধ হইল। তিনি তাঁহার ছেঁড়া চটিজোড়াটার 'ফটাং ফটাং' শব্দে সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া, হেলিয়া পড়া জামগাছটার তলা দিয়া মুনুদের বৈঠকখানার পশ্চাতের আঙ্গিনায় আসিতেই তিনি মুনুকে দেখিতে পাইলেন; তাহাকে উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাঁদরটা এখানে আছে?"

মুনু ভাল মানুষের মত বলিল, "আপনি বাঁদর পুষেছেন না কি? কৈ, কোনও দিন ত দেখি নি। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে বুঝি? না, এ দিকে আসে নি।"

সরকার বলিলেন, "আমার ছেলে রজনীর কথা বল্‌ছি। সেটা যদি বাঁদর না হবে ত তোমাদের দলে মিশ্‌বে কেন? সে কোথায় লুকিয়েছে বল। জু'তো মেরে—"

মনু বাধা দিয়া বলিল, "সরকার মশাই, মুখ সামলিয়ে কথা বল্‌বেন; আপনি কায়েত, আর আমরা বামুনের ছেলে; আপনার এত 'আস্পর্দ্ধা,' আপনি আমাদের বাড়ী এসে জুতো মার্‌তে চা'ন!"

সরকার বলিলেন, "আমি বল্‌ছি আমার ছেলেকে।—সে এখানে কর্‌ছে কি? তোমরা একদল যণ্ডামার্ক এক যায়গায় জুটেছ, কার বাগান লুঠ কর্‌বে? সর্ব্বনাশের ফন্দী আঁটছো কার?"

মুনু আঙ্গিনায় নামিয়া বলিল, "মানুষের নয়, শিয়ালের। দেখুন সরকার মোশাই, আমার ছ'টা হাঁস ছিল, একে একে সবগুলো শিয়ালের পেটে গিয়েছে, তাই শিয়াল মারবার জন্যে ঐ দেখুন ফাঁদ পেতে রেখেছি। আমরা ত শিয়াল ধরবার ফাঁদ পাত্‌তে জানি নে। রজনী ফাঁদটা পেতে দিয়েছে।"

এ কথায় হারাধন সরকারের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে গিয়েছে, নেকাপড়া ছেড়ে শিয়াল মারবার জন্যে ফাঁদ পাত্‌তে এসেছে? তার ফাঁদের মুখে মারি লাথি!"

সরকার মহাশয় ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে অদূরবর্ত্তী ফাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া উত্তেজিতভাবে সেই ফাঁদের গর্ত্তে কাঁটালের ভুতুড়ির উপর সবেগে পদাঘাত করিলেন! আর কোথায় যাবে? মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হাঁটুর নীচে ফাঁস বাধিয়া গেল; বাঁশের আগা তীরবেগে সোজা হইল, এবং সেই সুদৃঢ় শণের দড়িতে আবদ্ধ হইয়া দশ হাত ঊর্দ্ধে তিনি হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে ঝুলিতে লাগিলেন! তাঁহার ছেঁড়া চটি জোড়াটা পা হইতে খসিয়া নীচে পড়িল। তিনি দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মলাম, আমাকে নামিয়ে নে, বাবা! আমার পায়ে ফাঁসি! রক্ষে কর, রক্ষে কর!"

আর 'রক্ষে কর!' তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই যে দিকে পারিলাম, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পাশেই আমাদের বাড়ী, আমি আমাদের বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে লুকাইলাম।

আমাদের প্রতিবেশী যদু ঘোষ মনুদের বৈঠকখানার পার্শ্বস্থিত জামগাছতলার গলিপথ দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। হারাধন সরকারের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ফাঁদের নিকট উপস্থিত হইল। সে সরকারকে হেঁটমুণ্ডে বাঁশের মাথায় আবদ্ধ দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া ব্যাপার কি ঠিক বুঝিতে পারিল না। গোপনন্দন কিঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি। সে সবিস্ময়ে বলিল, "হঃ, সরকার মোশাই যে! আপনি শিয়াল মারা ফাঁদের দড়িতে ঝুল্‌চো! কাঁটালের ভুতুড়ি খেতে এয়েলে না কি? বড্ডা নাকাল হচ্চেন ত তোমার।"

সরকার কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা যদু, আমাকে শীগ্‌গির নামিয়ে নে। আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার যো হয়েছে।"

যদু বলিল, "আপনি অত খানি উচুতে ঝুল্‌চো, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাব না যে!—দুই হাত নীচে বাড়িয়ে একটা ঝাঁকুনী দাও সরকার মোশাই!"

যদু ঘোষ সরকারের হাত দুইখানি ধরিয়া নীচে টানিয়া আনিল ও ফাঁদের মুখ আলগা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল। তিনি যদু ঘোষের দুই হাত ধরিয়া কথাটা গোপন রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যদু ঘোষ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেও মুনু সেই দিনই কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিল।

এই ঘটনার বহুদিন পরে আর একবার মুনু তাহাদের গ্রামের এক সুদখোর বাবাজীকে জব্দ করিয়াছিল। বাবাজী তাহাদের গ্রামের এক প্রান্তে বাস করিত; কিন্তু তাহার জমীজমা

ও সেবাদাসী ছিল, গ্রাম্য চাষীদের চড়া সুদে সে টাকা ধার দিত, এবং এক পয়সা সুদ ছাড়িত না। মুনু তাহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল; কিছু দিন পরে সুযোগ জুটিল।

একবার তাহাদের গ্রামে বাঘের উপদ্রব হওয়ায় গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া গ্রামের জমীদারদের সাহায্য প্রার্থনা করে। বাঘটা অনেকগুলি গরু ও ছাগল-ভেড়া বধ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে গুলী করিয়া মারিবার সুযোগ না থাকায় তাহাকে ধরিবার জন্য একটি বাগানের নিকট পুষ্করিণীর পাড়ে একটি খাঁচা পাতিয়া রাখা হইল। খাঁচার ভিতর একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে নধরদেহ একটি ছাগ সংরক্ষিত হইল। সকলেরই আশা হইল, ছাগলের লোভে বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করিবে। কিন্তু ধূর্ত্ত বাঘ দুই দিনের মধ্যে খাঁচার নিকট ঘেঁসিল না। ছাগশিশুর আর্ত্তনাদে স্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরদিন মুনু চরণদাস বাবাজীর আস্তানায় উপস্থিত। চরণদাস উকীল বাবুর পুত্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এটা কি ভাল হচ্ছে, বাবাজী?"

চরণদাস তাহার প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি ভাল হচ্ছে না?"

মুনু বলিল, "তোমার মত পরম বৈষ্ণব গ্রামে থাকতে—এই জীবহত্যে? বাঘের খাঁচায় অবোলা কৃষ্ণের জীবটিকে পুরে রাখা হয়েছে। বাঘ খাঁচায় প্রবেশ করলেই ত ওটাকে সেবা করবে।"

চরণদাস বাবাজী বলিল, "হাঁ, কথাটা সত্যি বটে, নিরুপায় কৃষ্ণের জীবকে বাঘের মুখে তুলে দেওয়া—মহাপাপ বটে, কিন্তু গাঁয়ের সব লোক এক দিকে, আমি একা কি করতে পারি?"

মুনু বলিল, "তুমি একা কেন? আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমরা গোস্বামীর শিষ্য, গুরুগিরী আমাদের পৈতৃক ব্যবসা; তাই আমরা অধিকারী। বাবা উকীল হয়ে মুখুয্যে হয়েছেন, তবু গ্রামের সকলেই বাবাকে ছ্যারী অধিকারীই বলে; হাকিম-টাকিমগুলো মুখুয্যে বলে বটে। আমি কি এই জীবহত্যের কথা শুনে চুপ ক'রে থাকতে পারি?—এই কৃষ্ণের জীবটির উদ্ধারে তোমার সাহায্য পাব বুঝেই তোমার কাছে এসেছি, দাদা!"

বাবাজী বলিল, "তা হ'লে কি করা যায়?"

মুনু গলা খাটো করিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার আগে তোমাতে আমাতে খাঁচার কাছে যাব। তার পর কৃষ্ণের জীবটিকে খাঁচা হ'তে বের ক'রে—মেহেরপুরে নিয়ে গিয়ে বিক্রমপুর পাঠানো যাবে।"

বাবাজী বলিল, "বিক্রমপুর? সে আবার কোথায়?"

মুনু বলিল, "আরে, বাগদীপাড়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে ফেলবো। গাঁয়ে ঢুকতেই বাগদীপাড়া, হুটু সর্দ্দারের অনেক ছাগল, ঝাঁকে মিশলে, কেউ ধরতে পারবে না। আড়াই টাকা দাম বে-ওজর পাওয়া যাবে। সেই টাকায় মালসাভোগ! টাকাটা সৎকাযে লেগে যাবে।"

চরণদাস পরম ভক্তিভরে বলিল, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছে। কিন্তু ধরা পড়বার ভয় নেই ত?"

মুনু বলিল, "কি যে বল! সকালে গাঁয়ের লোক দেখবে, বাঘ খাঁচা ভেঙ্গে পাঁটাটাকে মুখে ক'রে নিয়ে স'রে পড়েছে।—পাঁটা কি খাসী, ঠিক জানিনে; খাসী হ'লে দাম আরও কিছু বেশী হবে।—জীবহত্যে বন্ধ ক'রে টাকাটা যদি প্রভুর ভোগে লাগে—তাতে তোমার আপত্তি কি?"

লোভী চরণদাস আপত্তির কোন কারণ দেখিল না। সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুনু চরণদাসের মাথায় একখানি নামাবলী বাঁধিয়া ও গলার মালায় হরিনামের ঝুলীটি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া পুকুরের ধারে চলিল।

চরণদাস বলিল, "নামাবলী, কুড়োজালি—এ সকল সঙ্গে নেওয়ার 'প্রিয়জন'?"

মুনু বলিল, "বুঝলে না? হঠাৎ পথে দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না; ভাববে, শ্রীরাধাগোবিন্দ-দর্শনে যাচ্ছ।"

নির্জ্জন বাগান, পুষ্করিণীতীরে জনমানবের সমাগম নাই। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, তাহার উপর বাঘের ভয়।

খাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া মুনু বাবাজীকে বলিল, "খাঁচায় ঢুকে পড়,—আরে, ওটা যে খাসী! দশ বারো সের ভারী, তিন টাকা দর আর দেখতে হবে না। খাসীটাকে দড়ি বেঁধে আমার হাতে দাও।"

চরণদাস কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি ত কখন বাঘের খাঁচায় ঢুকিনি, কোন্ দিক দিয়ে কৃষ্ণের জীবটাকে বের ক'রে দিতে হবে, তাও জানিনি, তুমিই ভিতরে যাও, আমি বাইরে থাকি।"

মুনু বলিল, "বোকামী ক'রো না। তুমি বাইরে থেকে খাসীটার গলার দড়ি ধ'রে নিয়ে যাবে, হঠাৎ যদি কারও নজরে পড়?"

চরণদাস বলিল, "হাঁ, সে একটা কথা বটে; কিন্তু কোন্ পথে খাঁচায় ঢুকে ছাগলটাকে বের করতে হবে, তা ত জানি নে।"

মুনু বলিল, "জানাজানি আর কি? ঐ ত কাঠের দরজা উপরে তোলা আছে, ঐ ফাঁকে ঢুকে পড়। দেখছো না, ঐ কোণে খাসী?"

চরণদাস মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া খাঁচায় প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে 'ধপাস্' শব্দে কাঠের দরজা পড়িয়া গেল। চরণদাস খাঁচায় বন্দী হইল।

খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া ভয়ে বাবাজীর শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে খাঁচার দরজা তুলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বাঘের খাঁচার দরজা এ ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, তাহা টানিয়া তোলা তাহার অসাধ্য হইল।

মুনু তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া,—"খাঁচায় বাঘ পড়েছে, কে কোথায় আছ—এসে দেখ।" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহার ষড়যন্ত্রে গ্রামের পাঁচ সাত জন লোক বাগানে লুকাইয়া ছিল, তাহারা খাঁচার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা সেই খাঁচা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের সকল লোককে 'মানুষ বাঘ' দেখাইবে বলিয়া বাবাজীকে ভয়প্রদর্শন করিল। অবশেষে বাবাজী যখন নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, গ্রামের যে সকল দরিদ্র কৃষককে অসঙ্গত সুদের লোভে সে টাকা ধার দিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিবে না, তখন বাবাজীকে খাঁচা হইতে মুক্তিদান করা হইল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মফঃস্বলের পল্লীতে এই সকল কাণ্ড ঘটিত, এ কালে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় না। এই জন্য ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। গল্পটা মুনুর কাছেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গ্রাম-পথে

পার হয়ে মেঠো নদী খালি পায়ে আলি-পথে
চলিয়াছি দ্রুত,
জন্মভূমি জননীর স্নেহ-সম্ভাষণখানি
হয় অনুভূত।
দু'ধারে ধানের শীষ নুয়ে পড়ে, লীলাভরে
করে পথ-রোধ,
ঠেলিয়া চলিতে গায় কোমল পরশ পাই
হয় সুখবোধ।
মেঠো পুকুরের কোণে ঢেউ খেলে কাশবনে
জাগে বাল্যস্মৃতি—
অমনি দুধের ঢেউয়ে দুলিয়া শুনেছি ঘুম-
পাড়ানিয়া গীতি।
চিকণ ধানের ক্ষেতে শরতের রোদখানি
পিছলিয়া পড়ে,
ছাতিমতলাটি দিয়ে যাইতে মাথার'পরে
ফুলদল ঝরে।
বাঁ পাশে গাঁয়ের বিল ফুটে আছে থরে থরে
কুমুদ কমল,
উড়ে ঘুরে শঙ্খচিল, সহসা 'নবীন' জেলে
শুধায় কুশল।
চলিয়াছি বার বার অঙ্গে লভি ভেরেণ্ডার
কোমল পরশ,
হাতে দুটি শরফুল তারা যেন এ মনের
ফুটন্ত হরষ।
কেয়াবনে ঝোপঝাড়ে কিংবা শেয়াকুল-ডালে
গায়ে লাগে ছড়,
ব্যথালেশ নেই তায় যেন কচি শিশুটির
নখের আঁচড়।
দুই পাশে ক্ষেত কাঁপে, ভেকশিশু লাফে ঝাঁপে
করে কোলাহল,
গুব্‌গাব খল-খলে সারা মাঠখানি জলে
জীবন-চঞ্চল।
মুখ-বাঁধা গোরুগুলি চলিয়াছে পর পর
চকিত চাহনি,
ক্ষেতে নামি তাড়াতাড়ি তাহাদেরে পথ ছাড়ি
দিলাম তখনি।

কই মাছ কাণে হেঁটে এসেছিল নালী ছেড়ে
পলায় পিছলি,
কাঁকড়া পথের'পরে নির্ভয়ে বিরাজ করে,
বাঁচাইয়া চলি।
সাপ গেছে দাগ এঁকে গায়ের খোলস রেখে
পথের উপর,
শামুক বিথারি মুখ নীরবে ধরিছে শুয়ে
ঘাসের মাকড়।
জালি কাঁধে জেলেনীরা ক্ষেতে নামি দেয় পথ
ছাড়িয়া সম্ভ্রমে,
দেহে শাড়ী টানা-টানি লাজে তবু মুখখানি
ঢাকে কোনক্রমে।
মাঝে মাঝে জল-কাদা তাপিত পদের ক্লান্তি
করিছে হরণ,
দুই পাশে ঘন ঘাসে শিশিরকণারা হাসে,
ধোওয়ায় চরণ।
বাঁ পাশে আখের ক্ষেত আজি সে অরণ্য হয়ে
ঢাকিয়াছে নালী,
তার মাঝ হ'তে উড়ে মধুর সাহানা সুরে
দাশুর পাঁচালী।
সম্মুখে গ্রামের দীঘি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত কল-
কলস চঞ্চল,
মাছরাঙা চখাচখী হাঁস বক, সখা-সখী
করে কোলাহল।
হেথা হ'তে পাই মা'র মমতা সেফালিকার
মধুর সৌরভে,
প্রীতিভরা আমন্ত্রণী গীতিভরা আপ্যায়নী
শানায়ের রবে।
একে একে চেনা মুখ পুলকি তুলিছে বুক,
একান্ত আপন
সবি মোর, চারি ধারে স্নেহভরা কৌতূহল,
সাদর ভাষণ।
মা বলিয়া কে ডাকিল ? ও যে মোর চেনা গলা,
চোখে আসে জল,
সুখস্বপ্নে করে ভোর, সর্ব্ব-অঙ্গ করে মোর
রোমাঞ্চ-চঞ্চল।

শ্রীকালিদাস রায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাদের টাকা নেই, তাদের টাকার ভাবনা নেই, সুতরাং গোপাল বক্শীর স্ত্রী কাদম্বিনী পৌষ মাসে এক দিন যখন কালীঘাটে যাবার কথা পাড়্‌লেন, তখন ছোট কর্ত্তা কোন রকম আপত্তি ওজর করলেন না, কোত্থেকে গাড়ী-ভাড়া ইত্যাদি আস্‌বে, সে কথাও উঠ্‌ল না। হাজার হোক, এক কালে তাঁদের অবস্থা ভাল ছিল আর কাদম্বিনীর হাতে কিছু না কিছু থাকত। কাদম্বিনী মেয়েকে ডেকে বল্‌লেন, একবার গিয়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ দেখি, তিনি কি আমাদের সঙ্গে কালীঘাটে যাবেন? আমি না হয় দুখানা গাড়ী ভাড়া করব, তাঁকে কিছু দিতে হবে না। আর তিনি যদি আর কাউকে নিয়ে যেতে চান, তা হলেও গাড়ীতে যায়গা হবে।

কাদম্বিনীর বড় জায়ের উপর হঠাৎ এত টান হবার কারণ, ভাসুরের কাছে বাড়ীর অংশ বাঁধা রেখে টাকা ধার নেবার কথা হচ্ছিল।

সরলা মেয়ে যেমন ভাল, তার বিবেচনাও তেমনই। বল্‌লে, মা, তুমি নিজে গিয়ে জ্যাঠাইমাকে বল্‌লে হ'ত না? শুধু আমি গেলে যদি কিছু মনে করেন?

—বেশ ত, আমিও যাব এখন। তুই গিয়ে একবার জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ না, আর বল্‌ গে, আমি এই আচারের হাঁড়ি-গুলো ছাদে রোদ্দুরে দিয়ে আস্‌ছি।

সরলা গিয়ে শৈলবালাকে বল্‌লে, জ্যাঠাইমা, মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কালীঘাটে পৌষ-কালী দর্শন কর্‌তে যাবে? তিনিও নিজে বল্‌তে আস্‌ছেন।

—মা কালী মাথায় থাকুন। আমি গাড়ী-ভাড়ার টাকা কোথায় পাব?

—মা বল্‌লেন, তিনি দুখানা গাড়ী ভাড়া করবেন, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আর গাড়ীতে অনেক যায়গা হবে, তুমি আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও ত নিও।

—তা হ'লে ওঁকে একবার জিজ্ঞেসা করি।

দোতলার ঘরে তক্তপোষে ব'সে মদন বক্শী মাস-কাবারের জিনিষের দামের হিসাব করছিলেন আর আপনার মনে কথা কইছিলেন। আর মাসে চাল ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা ক'রে মণ, এ মাসে তিন আনা বেড়েছে। দোকানদারগুলো হয়েছে ডাকাত, আমাদের সব লুটেপুটে না নিয়ে ছাড়বে না। সোনা-মুগের ডাল ছিল চার আনা ক'রে সের, এখন হয়েছে ছ'আনা। ও আর কেনা হবে না, শেষে কি ভিটেমাটী বিকিয়ে যাবে? মাসে মাসে খরচ বাড়ছে অথচ খেতে ত আমরা দুটি মানুষ। বাজার ত নিজে করি, ঝিকে ত বিশ্বাস নেই, কিন্তু এ মাস থেকে খুব টানাটানি না করলে আর চল্‌বে না।

এমন সময় শৈলবালা এসে সামনে দাঁড়ালেন। মদন বক্শী বল্‌লেন, এই দেখ দেখি, মাসে মাসে খরচ বেড়ে যাচ্ছে, এ রকম ক'রে ত পারা যাবে না, খরচ না সামলালে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব যাবে, শেষে কি এই বুড়ো বয়সে পথে দাঁড়াব?

শৈলবালা এসেছিলেন নিজের মতলবে, এ সময় রাগারাগির কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন? খুব মিষ্টি ক'রে বল্‌লেন, তা ত সত্যি কথা, সত্যি কথা, দিন দিন যে কাণ্ড হচ্ছে, তাতে ত আর গেরস্তের ঘর করা পোষায় না। তা তুমি ত সব নিজে দেখ, আমিও খুব টেনেটুনে করি, আমার নিজের ত কোন খরচই নেই। তা হলেও তুমি যে দিকে কমাতে বল্‌বে, তাই করব।

—না না, আমি ত তোমার কোন দোষ দিচ্ছি নে। সবতাতে যেন আগুন লেগে যাচ্ছে, কোন জিনিষে হাত দেবার জো নেই। আমরা ত বড় মানুষ নই, আর জমী-জমাও নেই, তাই ভয় হয়। এতে আর তোমার দোষ কি?

—তোমার কি মনে নেই, আমি কত টেনে করি? এই যখন সরলা ছোট ছিল, সে সময় কত সাবধানে থাক্‌তে হ'ত! হয় ত তোমার জন্য দুখানি কচুরি ভাজ্‌ছি, অমনি সরলা এসে সামনে দাঁড়াত। ওর একটা গুণ বরাবর ছিল—কখন কিছু চাইত না, কিন্তু চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ত। আমি কোন ছুতো ক'রে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে, আঁচল ঢাকা দিয়ে কচুরি নিয়ে গিয়ে ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে রাখ্‌তুম। আমাদের কি এমন বিষয়-আশয় আছে যে, আমরা সব দিয়ে থুয়ে বিলিয়ে দেব?

বড় কর্ত্তা খুসী হয়ে বল্‌লেন, মনে আছে বৈ কি! তুমি ত বরাবরই খুব হিসাবী, আর তা না হ'লে চল্‌বে কেন? যাকে রাখ, সেই তোমায় রাখে। টাকা রাখ্‌লে তবে ত টাকা তোমায় রাখ্‌বে।

তখন ভরসা ক'রে বড় গিন্নী কর্ত্তার কাছে একটু ঘেঁসে এলেন। আঁচলের চাবিগোছা হাতে ক'রে নেড়ে চেড়ে বল্‌লেন, তোমাকে একটা কথা জিগ্‌গেস্‌ কর্‌তে এসেছি।

অমনি কর্ত্তার প্রসন্ন মুখ বদ্‌লে গেল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শৈলবালার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, কি কথা?

—এমন কিছু নয়। ছোট বউ আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যেতে চাইছে, তার সঙ্গে যাব? পৌষ-কালী দর্শন অনেক দিন হয় নি।

—সে যে অনেক খরচ! গাড়ী-ভাড়া, ভিখিরী, পূজো, কত কি! সে সব হবে-টবে না।

—আমার কি সে আক্কেল নেই? আমি এক পয়সাও খরচ কর্‌ব না। গাড়ী-ভাড়া আর অন্য খরচ ছোট বউয়ের। দুখানা গাড়ী-ভাড়া কর্‌বে, গাড়ীতে ঢের যায়গা আছে। তুমি যদি বল, তা হ'লে তরুকেও নিয়ে যাই।

—মেম-সাহেব? তারা সাহেবদের গির্জ্জায় যাবে না কালীঘাটে যাবে? যায় ত নিয়ে যাও! ছোট বউমার ঢের টাকা হয়েছে কি না, তাই কালীঘাটে বেড়াতে যাবেন। এ দিকে ত গোপাল বাড়ী বাঁধা দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কথা আর না বাড়িয়ে শৈলবালা নীচে নেমে এলেন, কাদম্বিনীও সেই সময় এসে উপস্থিত। সরলা দাঁড়িয়েছিল। কাদম্বিনী বল্‌লেন, দিদি, কালীঘাটে যাবে?

—যাব না কেন? পৌষ-কালী দর্শন কত ভাগ্যে হয়। গাড়ীতে যায়গা আছে বল্‌ছ, তা তরুকে নিয়ে যাব?

—তা বেশ ত। তবে তাঁরা যে সাহেব।

—যায় যাবে—না যায় না যাবে। বল্‌লে ক্ষতি কি?

—তাঁরা গেলে ত বেশ হয়। ব'লে পাঠাও না।

শৈলবালা ঝিকে দিয়ে তরুবালাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন। চিঠি হাতে ক'রে তরুবালা তাঁর স্বামীর কাছে গেলেন। মিষ্টার রায় শুনে বল্‌লেন, কালীঘাটে আবার মানুষে যায়?

—না গেলে যদি দিদি কিছু মনে করেন? এ দিকে তুমি ত কেবল বল যে, তাঁর আর বক্‌শী মশায়ের মন জুগিয়ে আমাদের চলা উচিত।

—সে কথা ঠিক। তবে যেও। ছেলেদের নিয়ে যাবে না কি?

—তা নিয়ে যাব বৈ কি! ওরা আবার এঁটো-কাঁটার বিচার জানে না, ওদের সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।

—সে কথা তুমি বোঝ।

চিঠির উত্তরে তরুবালা লিখলেন যে, তাঁরা কালীঘাটে যেতে রাজি, আর ছোট বোনকে মনে ক'রে যে শৈলবালা নিয়ে যাবেন, তাতে সকলের আহ্লাদ হয়েছে।

কালীঘাট যাবে শুনে মিষ্টার রায়ের ছেলেরা লাফালাফি কর্‌তে লাগ্‌ল। কালীঘাট কভি নহি দেখা! হুঁয়া বক্‌রি কাট্‌তা হ্যায়। আয়া, তুম সাথ জায়গা?

মিসেস রায় বল্‌লেন, আয়া-টায়া কাউকে নিয়ে যাওয়া হবে না। ওরা সব মোছোনমান, আমাদের সেখানে খুব হিঁদুর মত যেতে হবে।

ছেলেদের আবার শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। কি রকম ক'রে কালীকে প্রণাম কর্‌তে হয়, জুতো প'রে মন্দিরে যেতে নেই, দু হাত দিয়ে খেতে নেই, এঁটো হাত গায় কিংবা কাপড়ে দিতে নেই, খেয়ে আঁচিয়ে কি রকম ক'রে গামছায় হাত মুছতে হয়—মিসেস রায় মেয়ে আর দুই ছেলেকে সে সব অনেক ক'রে শেখালেন। বাঙ্গালা যে তারা বল্‌তে জানে না—তা নয়, তবে কেমন ঐ এক বদ্‌ অভ্যাস, কেবলই হিন্দী বল্‌ছে। তাও ভাল হিন্দী হ'লে না হয় বুঝতাম যে, ছেলেবেলায় একটা নতুন ভাষা শিখলে। অতি বদ্‌খৎ কদর্য্য হিন্দী, বেহারী চাকরগুলা যে রকম কয়। তরুবালা ত অনেক কাণমলা আর চড়চাপড় দিয়ে কতক কতক তাদের হিন্দী কথা কহা ছাড়ালেন, কিন্তু অভ্যাস, বিশেষ বদ্‌ অভ্যাস, যাবে কোথায়?

শেষে ত কালীঘাটে যাবার দিন এল। তরুবালা ছেলেমেয়েদের ধুতি-সাড়ী পরিয়ে, তাদের পায়ে চটি জুতা দিয়ে সকালবেলা বড় ভগিনীর বাড়ী এলেন। নিজে শুধু পা, সাড়ী শেমিজ ব্লাউজ পরা, দেখে কে বল্‌বে যে, নিজের ঘরে তিনি মেম সাহেবের মতন থাকেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুপ্রভা বড়, সুরেনের বয়স দশ বছর আর দেবেনের

আট। বক্‌শীদের বাড়ীর সাম্‌নে দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাস ঠিকা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী ঢুক্‌তেই কাদম্বিনী, সরলা, শৈলবালা তরুবালাদের আদর ক'রে ডেকে নিলেন। সকলে প্রস্তুত, বড় কর্ত্তার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে। বারান্দার এক দিকে মদন বক্‌শী শুধু গায়ে একখানা ময়লা কাপড় প'রে পিঁড়ের উপর ব'সে সেই থেলো হুঁকোয় তামাক টানছিলেন। তরুবালাকে দেখে ফোঁক্‌লা হাসি হেসে বল্‌লেন, এই যে মেমসাহেব, তুমি কি কালীঘাটে গিয়ে মুরুগী বলি দেবে?

তরুবালা ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লেন, শোন বক্‌শী মশায়ের কথা! আমি কি কখনো কালীঘাটে যাই নি না কি?

—এর মধ্যে ত নয়। কবে কোন্ কালে গিয়ে থাকবে। সাহেব মেম হ'লে কি আর কালীঘাটে যায়?

—শৈলবালা বল্‌লেন, আমরা এখন চল্‌লুম। ঝি ত বাড়ীতে রইল, তোমার তামাক সেজে দেবে।

কর্ত্তা বল্‌লেন, আজ আর আমি বাড়ী থেকে বেরুব না। তোমাদের ফির্‌তে বেশী রাত হবে না ত?

—তা কেন হবে? বেলা থাক্‌তে সেখান থেকে বেরুব। তোমার জন্য একটা পাটার মুড়ো নিয়ে আস্‌ব?

—না, না, অত খরচ-পত্রে কায নেই। এখন যে দাম বেড়ে গিয়েছে।

কাদম্বিনী ভাসুরকে দেখে এক গলা ঘোম্‌টা দিতেন না, মাথার কাপড় টানা ছিল এই পর্য্যন্ত। বল্‌লেন, তুমি কেন কিন্‌তে যাবে, দিদি? বড়ঠাকুরের জন্য আমি কচি পাটার মুড়ী নিয়ে আস্‌ব।

মদন বক্‌শী বল্‌লেন, তা বেশ, তা বেশ।

গাড়ীতে ওঠ্‌বার সময় সরলা তরুবালার তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে একখানা গাড়ীতে উঠ্‌ল, ঝিও সেই গাড়ীর পিছনে বস্‌ল। গিন্নীবান্নী তিন জন আর একখানা গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

মোটর কি ট্যাক্সি হ'লে শাঁ শাঁ ক'রে বেরিয়ে যেত, ছ্যাকড়া গাড়ীর দৌড় আর কত হবে বল? ভিতর থেকে এক গাড়ী থেকে সরলা আর এক গাড়ী থেকে তার মা চেঁচান, ও গাড়োয়ান, হাঁকিয়ে চল্! গাড়োয়ান অমনি জিব দিয়ে টক্ টক্ কোরে শব্দ করে, পাদানে ঘস্ ঘস্ কোরে পা ঘষে, আর ভাঙ্গা চাবুক দিয়ে বেতো ঘোড়াগুলোকে ছপাৎ ছপাৎ কোরে ঠ্যাঙ্গায়। সে উত্তেজনা আর তাড়নায় পক্ষিরাজ ঘোড়ার বংশধররা দু চার পা ট্যাঙ্গস্ ট্যাঙ্গস্ ক'রে একটু জোরে চলে—আবার যে কে সেই, সেই বনেদি চালে ধীরে সুস্থে চলেছে।

সারাটা পথ সুপ্রভা, সুরেন আর দেবেন টীকা, টিপ্পনী, আলোচনা সমালোচনা কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। মা'র সে শিক্ষা, অনুশাসন, পই পই ক'রে বারণ সমস্ত ভুলে গিয়ে তারা অনর্গল তাদের দো-আঁসলা হিন্দী বল্‌ছে। হোয়াইটওয়ে লেডলকা দুকান, আর দেখো দেখো, কয়সা মোমকা ছোটা বাবাকো সেলর সুট পহনায়া। ফিন দেখো তিন পহিয়াকা গাড়ী পর মিসি বাবা! অরে ময়দান মে ঘোড়া দৌড়তা হ্যায়! ই কা ভয়া, ওহো! পণ্টন যাতা—কুইক্ মার্চ্চ! গুঁ গুঁ, অই সুরেন, কিল্লাকে উপর এয়রোপ্লেন উড়তা হ্যায়!

খানিকক্ষণ শুনে শুনে সরলা বল্‌লে, তোমরা হিন্দীতে কথা কইছ কেন? বাঙ্গালা কইতে পার না?

তিন ভাই-বোন একেবারে স্তব্ধ, এ ওর গা টেপে। সুপ্রভা ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌লে, ইয়াদ নহি, মমী কেয়া শিখায়া? বাঙ্গালা বোলো। সরলাকে বল্‌লে, আমরা ত বাঙ্গালা বলি। চাকরদের সঙ্গে হিন্দী ব'লে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

কালীঘাটে গিয়ে সকলে গাড়ী থেকে নেমে হালদার-দের একটা বাড়ীতে গেলেন। বক্‌শীরা তাদের যজমান। তারা ত যথারীতি আপ্যায়ন করলে। কাদম্বিনী বল্‌লেন, ধুলো পায়ে দর্শন ক'রে এসে তার পর বসব, কি বল দিদি, কি বল তরুবালা?

বাড়ীর গিন্নী বছর কুড়িকের একটি মেয়েকে ডেকে বল্‌লেন, যা ত বিধুমুখি, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে দর্শন করিয়ে নিয়ে আয় ত।

বিধুমুখী একখানা রাঙা পেড়ে ডুরে কাপড় প'রে সেইখানে দাঁড়িয়েছিল, মুখে এক গাল পাণ। বল্‌লে, এস আমার সঙ্গে, তোমাদের দর্শন করিয়ে আনি।

কালীঘাটে ত আর পরদা আড়ালের হাঙ্গামা নেই, যার যে দিকে খুসী ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বেরিয়ে শৈলবালা বল্‌লেন, এ যে সব বদ্‌লে গিয়েছে, আমি কিছুই চিন্‌তে পারছি নে।

তরুবালা বল্‌লেন, আমি যে কবে এসেছিলাম, আমার ভাল মনেই নেই।

কাদম্বিনী বল্‌লেন, আমি বছরে অন্ততঃ একবার আসি, তবু রোজ রোজ এত বদ্‌লে যাচ্ছে যে, হঠাৎ দেখ্‌লে অনেক যায়গা চেনা যায় না।

বিধুমুখী একটু এগিয়ে ছিল। বল্‌লে, এ সব কোম্পানীর কাণ্ড, কোথায় ভাঙ্‌ছে, কোথায় গড়্‌ছে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

শৈলবালা—কিন্তু এখন বেশ বড় বড় রাস্তা হয়েছে, আগের সে এঁধো গলিগুলো গিয়েছে—ভালই হয়েছে।

বিধুমুখী—তা কেন, তীর্থস্থানে কি হাত দিতে আছে? এখানে যা আছে, সব ভাল। যেমন চিরকাল আছে, তেমনি বরাবর থাক্‌বে।

কাদম্বিনী—তা কি আজকাল কেউ বোঝে? সব ভাঙ্‌তে চুর্‌তে হবে, সব নতুন ক'রে গড়্‌তে হবে।

তরুবালা এ-দিক্ ও-দিক্ দেখ্‌ছিলেন, চুপ করেই থাকা ভাল বিবেচনা ক'রে কোন কথা কন নি। এখন বল্‌লেন, ঐ ত সাম্‌নে মন্দির, তা মন্দিরের দেয়ালে ও রকম বড় বড় অক্ষরে সব বিজ্ঞাপন লেখা কেন? এ কি কল্‌কেতার সদর রাস্তা, না রাস্তার ধারের বাড়ী যে, দেয়ালে বিজ্ঞাপন লেখা? দেবীর মন্দির পবিত্র স্থান, মন্দিরের গায় ও সব কি?

কাদম্বিনী—সত্যিই ত, তুমি ত ঠিক দেখেছ, আমাদের চোখে ত পড়ে নি। ও কি রকম, মন্দিরের দেয়ালে এ রকম লেখা?

বিধুমুখী হাত নেড়ে বল্‌লে, না পারে লোকে আজকাল এমন কাযই নেই। টাকার জন্য কি না করে? টাকা নিয়ে ঐগুলো মা'র মন্দিরে লিখ্‌তে দিয়েছে। যাত্রীরাও কিছু বলে না, কেউ কোন আপত্তিও করে না।

মন্দিরে গিয়ে আশপাশের লোকদের ধমক-চমক দিয়ে ভিড় সরিয়ে বিধুমুখী সকলকে কালী দর্শন করালে। শৈলবালা আর কাদম্বিনীর দেখাদেখি তরুবালাও গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা অবাক্ হয়ে হাঁ ক'রে সব দেখছিল, কালীর মূর্ত্তি দেখে ছোট ছেলে দেবেন ত প্রথমে ভয় পেয়ে স'রে আস্‌ছিল, তার পর মা'র ধমক খেয়ে সকলে প্রণাম করলে। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বিধুমুখী সকলকে সঙ্গে ক'রে নকুলেশ্বরে নিয়ে গেল। পথে ভিখারীর ভিড়, ভিখারী মেয়েরা 'ও মা, একটা পয়সা দিয়ে যা, মা কালী তোকে রাজ-পুত্তুরের মত ব্যাটা দেবে,' ব'লে ব্যস্ত করতে লাগল। কোথাও ছাইমাখা কপ্নীপরা বাবাজী ধুনি জ্বেলে ব'সে গাঁজা টান্‌ছে, কোথাও উর্দ্ধবাহু হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, হাতখানা শুকিয়ে গেছে, নখগুলা বড় বড় হয়ে পাকিয়ে জড়িয়ে গেছে। কোথাও এক জন ফকীর মাথা নীচু ক'রে পা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কোথাও উঁচু উঁচু পেরেক-তোলা তক্তার উপর নেংটি-পরা সন্ন্যাসী স্বচ্ছন্দে যেন তুলার গদীর উপর ব'সে রয়েছে। এক ধারে একটা বামন হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে, আর কুষ্ঠরোগীরা যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তরুবালা ত সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন, কিন্তু কি করেন, যখন এসেছেন, তখন নিরুপায়।

একটা ফুলুরীর দোকান থেকে কাদম্বিনী গরম গরম বেগুণী আর ফুলুরী কিনে ছেলেদের হাতে দিলেন। তারা ত যা দেখে, তাই কিন্‌তে চায়। বেণে পুতুল, টিনের রেল-গাড়ী, রবারের ফুলো বাঁশী, চিনে মাটীর কুকুর, বেরাল—সব তাদের চাই। কাদম্বিনী তাও দু'টো চারটে কিনে দিলেন। তরুবালা গালার চুড়ী আর পাখা কিনে সরলার হাতে দিলেন। কেবল শৈলবালার পয়সার রং কেউ দেখতে পেলে না। তিনি গরীব মানুষ, কোথা থেকে পয়সা পাবেন যে, মুঠো মুঠো ছড়াবেন? আর সকলেই জানে যে, তাঁর হাত দিয়ে জল গলে না।

বাসায় ফিরে এসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে সকলে আদি গঙ্গায় নাইতে গেলেন। এত লোকের সাক্ষাতে ঐ রকম নোংরা জলে স্নান? তরুবালা ত কিছুতেই জলে নামলেন না, ছেলেমেয়েদেরও নাইতে দিলেন না। মাথায় শুধু জল স্পর্শ ক'রে ফিরে এলেন। বাসায় এসে সকলে খিচুড়ী প্রসাদ পেলেন। খুব গর্‌গরে রান্না, খিচুড়ীতে গোল-মরিচ লঙ্কা, আলু বেগুন বড়ি ভাজা, ইলিসমাছ গরম গরম ভাজা, ঝাল দিয়ে পারসে মাছ, কচি পাঁটা ভাজা। ঝালে ত ছেলেরা হু হা করতে লাগল, কিন্তু খেতেও ছাড়লে না। এঁটোকাঁটার বিচার তারা ত মোটেই জানে না, তরুবালা যত চোখ রাঙ্গান, তারা ততই ভেবড়ে যায়।

হালদারদের গিন্নী খুব সেয়ানা কি না, বল্‌লেন, তা হোক্ গে, ওরা ছেলেমানুষ বৈ ত নয়। আর এখানে তীর্থস্থানে অত বাচ-বিচারেরই বা আবশ্যক কি? এখানে মার কল্যাণে সব শুদ্ধ।

খেয়ে উঠে সকলে এক একটা ডাব খেলেন। আস্‌বার সময় কাদম্বিনী ভাসুরের জন্য পাঁটার মুড়ী, ছাড়ানো নারিকেল আর প্রসাদ নিয়ে এলেন।

বাড়ী ফিরে তরুবালা বল্‌লেন, আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি আর কখনও কালীঘাটমুখো হব না।

মিষ্টার রায় বল্‌লেন, কেন? যায়গাটা ঠিক লাট সাহেবের ড্রয়িং-রুমের মত পরিষ্কার নয়, না? কিন্তু গরজ বড় বালাই।

—গরজ কার, তোমার না আমার?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধোপাপাড়ায় রাধিয়ার বাপ এক জন প্রধান লোক, কেন না, তারা অনেক দিনের বাসিন্দা, অনেক ঘর তাদের বাঁধা, আর রাধিয়ার বাপ গিরধারী লোকও ভাল, পাড়া-পড়সীর আপদ-বিপদে খোঁজ খবর নেওয়া আছে, সময় অসময়ে পাশের অন্য ধোপাদের দু' চার টাকা ধার-ধোরও দেয়। রাধিয়া এক মেয়ে, তাই বড় আদুরে। বছর আষ্টেক যখন তার বয়স, সেই সময় তার বিয়ে হয়। তার স্বামী লছমন প্রায় তার সমবয়সী, বছরখানেকের কি বছর দুই বড় হবে। তারা থাকে আর এক পাড়ায়। লছমনের বাপ নেই, মা এতওয়ারিয়া দজ্জাল পাড়াকুঁদুলী, কথায় কথায় রাধিয়াকে ঠেঙ্গায় ব'লে মেয়েটা বাপের বাড়ী পালিয়ে আস্‌ত, শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করতে চাইত না। লছমনটাও লক্ষ্মীছাড়া, মদ খেয়ে—জুয়া খেলে বেড়াত, আর মায়ের দেখাদেখি স্ত্রীকে ঠেঙ্গাত। গিরধারী কতবার তাকে ডেকে নিজের সঙ্গে কায করতে বল্‌ত, ছোঁড়া কিছু দিন করত, আবার পালিয়ে যেত। এই সকল কারণে রাধিয়ার শ্বশুর-ঘর এক রকম করাই হয় নি, বাপ-মায়ের কাছে থেকে তাদের সঙ্গে কায করত। তাতে বাপ-মা কিছু মনের অসুখে থাকত, কিন্তু রাধিয়া সোমত্ত মেয়ে, সে স্বামী শাশুড়ীর কোন পরোয়া করত না। তাদের নামে জ্ব'লে যেত, উদ্দেশে তাদের গালি দিত, তাদের কাউকে দেখলে কথাই কইত না।

রাধিয়া দেখতে মন্দ নয়। মেয়েমানুষের পক্ষে বরং লম্বাটে আড়া, চোখ-মুখ ধারালো, মাটো মাটো রং, আঁটালো অথচ মোলায়েম গড়ন, হাসি হাসি মুখ, এক মাথা চুল আর নতুন যৌবনের চটক ত আছেই। সে ঘরে থাকলেই কিম্বা ঘাটে একলা পেলে পাড়ার দু' চার জন যুবক তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা কর্‌ত, কিন্তু রাধিয়ার যেমন ঝাঁজ, তেমনই মুখের ধার, তার কাছে কেউ বড় একটা এগোতে পারত না। তবে আলোর চার ধারে পতঙ্গ ভোঁ ভোঁ করলে যেমন আলোর কোন বিরক্তি হয় না, সেই রকম রাধিয়াও পতঙ্গ-রূপ যুবকদের ভন্‌-ভনানিতে মনে মনে বিরক্ত হ'ত না।

দিন কতক আগে আর কোন্ দেশ থেকে এক ঘর নতুন ধোপা এসেছিল। যে পথ দিয়ে গিরধারী কাপড় কাচতে যেত, সেই পথে গাঁয়ের এক ধারে তারা একখানি পুরানো খোলার ঘর ভাড়া করেছিল। মা আর ছেলে, তাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না। মার নাম রুক্মিণী, ছেলের নাম সহদেব। রুক্মিণীর বয়স পঞ্চান্ন হবে, কিন্তু এখনও বেশ শক্ত। সহদেবের বয়স বাইশ, দেখতে বেশ আর খোলা গা দেখলেই বোঝা যেত, সে বেশ বলবান্। তারা নতুন এসেছে ব'লে পাঁচ সাত দিন কোন কাযকর্ম্ম পেত না, কিন্তু রুক্মিণী অন্য ধোপাদের বাড়ী গিয়ে ইস্ত্রী করবার জন্য কিছু কিছু কাপড় চেয়ে আনতে আরম্ভ করলে। সহদেব ঘরের ভিতরে বাহিরে পরিষ্কার ক'রে বেশ ঝর-ঝরে ক'রে তুল্‌লে। যা কায পেত, মা ব্যাটা বেশ মন দিয়ে পরিষ্কার ক'রে করত, অল্পদিনের মধ্যেই তারা অল্প অল্প কায পেতে আরম্ভ করলে।

এক দিন গাধার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে গিরধারী সেই পথ দিয়ে ঘাটে গেল, রাধিয়ার মা সুভাগী কিছু পিছিয়ে পড়েছিল। সে যখন রুক্মিণীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যায়, তখন রুক্মিণী খানকতক কাচা কাপড় ঘাসের উপর মেলিয়ে দিচ্ছিল। সুভাগী দাঁড়িয়ে বল্‌লে, তোরা কোথা থেকে এসেছিস্? ঘাটে যাসনে কেন?

—আমরা গাজীপুর জেলা থেকে এসেছি। পাট

নেই ব'লে ঘাটে যাই নি। আজ আমার ছেলে পাট কিন্‌তে গিয়েছে, কাল থেকে ঘাটে যাব।

—তোর ছেলে আর কে আছে ?

—আর কেউ নেই। পাঁচ বছর হ'ল মরদ ম'রে গিয়েছে।

—আবার সাগাই করিস নি ?

—বুড়া বয়সে আবার সাগাই কি ? ছেলে আছে, তার বউ ঘরে আসবে।

—আমি ঘাটে গিয়ে ধোপাকে বলব। তোর ছেলে আমাদের কাছে চাকরী করবে ?

—ছেলে ফিরে এলে তাকে বলব।

ধোপা-বউ সুভাগী ঘাটে চ'লে গেল। সহদেব যখন পাট মাথায় ক'রে এল, তখন তার মা সুভাগীর সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হয়েছিল বল্‌লে।

সহদেব বললে, আমি কারুর চাকরী করব না, আমরা নিজেরা কায কর্‌ব।

—নতুন নতুন কিছু দিন চাকরী করলে দোষ কি ?

—তা সে কাল তখন দেখা যাবে।

ভাত খাওয়া হ'লে রুক্মিণী কাপড় ইস্ত্রী করতে আরম্ভ করলে। সহদেব বেরিয়ে গিয়ে পথের ধারে একটা আম-গাছতলায় ব'সে গান গাইতে লাগল। তার গলা বেশ মিষ্টি আর খুব জোর, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

সেই সময় রাধিয়া একখানা থালায় ঢাকা দিয়ে বাপ-মায়ের খাবার ভাত ঘাটে নিয়ে যাচ্ছিল। গান শুনে সেই দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তাকে দেখে সহদেবও গান বন্ধ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইল। দু'জনে চোখো-চোখি হ'ল। রাধিয়া দাঁড়াল না, কিন্তু আগের চেয়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগল।

তার পরদিন যখন রুক্মিণী আর সহদেব ঘাটে গেল, তখন গিরধারী, সুভাগী ও রাধিয়া কাপড় কাচছে। গিরধারী সহদেবকে ডেকে বল্‌লে, তুই আমাদের কাছে চাকরী করবি ? তোকে মাসে সাত টাকা মাহিনা দেব।

সহদেব রাধিয়ার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, করব।

রুক্মিণী শুনে মনে করলে, ছেলেটা কালই বা চাকরী করতে চায় নি কেন, আর আজই বা এক কথায় রাজি হ'ল কেন ? ছেলে ছোকরার মেজাজের ঠিক নেই।

সেই দিন থেকে সহদেব আর তার মা গিরধারী ধোপার কায করতে আরম্ভ করলে। রুক্মিণী আলাদা মাহিনা পেত না। কিন্তু সে যা অন্য যায়গা থেকে কাপড় আনত, সে কায সেরেও তার সময় ঢের থাকত, তাই সে ছেলের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে ছেলের কাযের সহায়তা কর্‌ত। তাদের কাযকর্ম্ম দেখে গিরধারী আর সুভাগী খুসী হ'ল। রুক্মিণী কারুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি কর্‌ত না, সহদেব তামাক তাড়ি কিছুই খেত না, ছোঁড়াদের সঙ্গে আড্ডা দিত না।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গাধার পিঠে কাপড়ের মোট চাপিয়ে সহদেব ঘাট থেকে গিরধারীর বাড়ীর দিকে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে রাধিয়া। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লছমন, সঙ্গে গোটা দুই বদমায়েস লোক। লছমন সহদেবকে দেখে রাধিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, এ কে ?

—বাবা একে চাকর রেখেছে। আমাদের কায করে।

—উঃ, ভারি ত নবাব, আবার চাকর রেখেছে !

—মুখ সামলে কথা কোস বল্‌ছি! খবরদার, যদি আমার বাবাকে কিছু বল্‌বি।

—তোর বাবার ভয়ে আমি ত ম'রে গেলাম! এ ব্যাটা কে যে তোর সঙ্গে যাচ্ছে? চল্ তুই, আমার সঙ্গে।

—মার খাবার জন্য ? না, আমি তোর সঙ্গে যাব না।

—তোর ঘাড় যে সে যাবে। এই ব'লে লছমন রাধিয়ার হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগল। তার দুই সঙ্গী হেসে উঠল।

রাধিয়া কিছুতেই যাবে না, লছমনও তাকে কোনমতে ছাড়বে না। ভাবগতিক দেখে সহদেব বল্‌লে, এখানে রাস্তার মাঝখানে গোল ক'রে কি হবে? বাড়ী গেলে ওর বাপ-মাকে ব'লে নিয়ে যাস্।

লছমন বল্‌লে, তুই শালা কে রে? আমার জরুকে আমি যেখানে পাব, সেইখান থেকে নিয়ে যাব।

সহদেব বল্‌লে, সে সব আমি কিছু জানি নে। ও যখন আমার সঙ্গে রয়েছে, আমি ওকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেব। তার পর যা খুসী করিস।

লছমন রাধিয়াকে ছেড়ে সহদেবকে মারলে এক চড়। সহদেবও রেগে পাল্টা এক ঘুষি মারলে। লছমন ত চিৎপাত হয়ে পড়ল, তার দুই বন্ধু আস্তে আস্তে স'রে পড়ল। সহদেব রাধিয়াকে সঙ্গে ক'রে তার বাপের বাড়ী

নিয়ে গেল। পথে রাধিয়া বল্‌লে, আমার মনে থাকবে। সহদেব চুপ ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একগাছা মস্ত জোট-পাকানো দড়ী যদি দশ পাক পায়ে জড়িয়ে যায়, তা হ'লে স্থির হয়ে ব'সে আস্তে আস্তে সেটা খোলা যায়; কিন্তু একবার ধারের মহাজালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড় কঠিন।

গোপাল বক্শীর অনেকটা সেই রকম হয়ে আসছিল। এখন যে রকম অবস্থায় সে থাকত, তাতে বিশেষ ধার-ধোর হবার কথাও নয়, তবে ঐ যে একবার জড়িয়ে পড়েছিল, আর উদ্ধার হবার বিশেষ চেষ্টা করে নি, তাইতে দিন দিন আরও গোল বাধ্‌ছিল। চেষ্টা করলে যে কিছু উপার্জ্জন করতে পারত না, তাও নয়, তবে চেষ্টা ব'লে জিনিষটাই যেন তার ভিতরে মুসড়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থাতেও যদি কেউ তার পিছনে থাক্‌ত, তাকে উৎসাহিত উত্তেজিত ক'রে তার নিশ্চেষ্টতা জড়তা দূর ক'রে দিয়ে তাকে মাথা তুলে দাঁড়াবার পরামর্শ দিত, তা হলেও হয় ত গোপাল ঋণপঙ্ক থেকে মুক্ত হ'ত, পঙ্কে ডুবে যেত না। যে চির-সঙ্গিনী, সেই পত্নীই কেবল এমন সুপরামর্শ দিতে পারে, কিন্তু গোপাল বক্শীর ললাটে বিধাতা তা লেখেন নি। যে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, হাতে ধ'রে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন স্বামীকে টেনে তুল্‌তে পারে, কাদম্বিনী সে ধাতেরই স্ত্রীলোক নয়। গিন্নীপনার যে একটা শোভন সুশৃঙ্খলতা আছে, তা তাঁর মোটেই ছিল না, সব দিকে এলোকাড়া আর রাগ ত লেগেই আছে। স্থির হয়ে ভাবা কিংবা ভেবে-চিন্তে দু'টো কথা বলা তাঁকে দিয়ে হ'ত না। স্বামী কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে এলে হয় রেগে-মেগে উঠতেন, না হয় কেঁদে-কেটে অনর্থ করতেন গোপাল ত একে নিজে আল্‌গা, তার উপর কোন কিছুতে স্ত্রীর সহায়তা না পেয়ে আরও শিথিল-চিত্ত হয়ে উঠছিল।

আসলে সুদে মিলে গোপালের প্রায় দশ এগার হাজার টাকা ধার হয়েছিল। কাদম্বিনীর চার পাঁচ হাজার টাকা গহনা ছিল, সেগুলা বিক্রী করলে ধার সুদ দুই ক'মে যায়, কিন্তু গোপালের এমন সাধ্য ছিল না যে, সাহস ক'রে সে কথা তাঁর কাছে পাড়ে। বাড়ীর অংশ বেচতে গেলে হয় ত কুড়ি হাজার টাকা হয়, কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা যায়গা ত চাই, আর পিতৃ-পিতামহের বাড়ী বেচতে সহজে মনও সরে না। বাড়ীর অংশ বাঁধা দেবার কথা হচ্ছিল, সে কথা মদন বক্শীরও কাণে উঠেছিল, কিন্তু গোপালের ত একে মনের স্থিরতা ছিল না, তাতে আবার ভাল পরামর্শদাতা কেউ ছিল না। যদি জামাই মানুষের মত হ'ত, তা হ'লে তার সঙ্গে পরামর্শ করবার কথা, কেন না, গোপালের ত ছেলে ছিল না, থাক্‌বার মধ্যে ঐ এক মেয়ে, যদি কিছু রেখে যেতে পারে, তা হ'লে মেয়ে-জামাই পাবে। কিন্তু জামাই কি বেহাই, কারুর সঙ্গে কোন কাযের কথাবার্ত্তা হ'ত না। সরলার শ্বশুর মনে করুতেন যে, তিনি অবস্থাপন্ন নন ব'লে বৈবাহিক তাঁকে অগ্রাহ্য করেন, গোপাল মনে করত যে, কুটম্বের যেমন করা উচিত, বেহাই সে রকম করেন না। উভয় পক্ষে এই রকম বোঝবার ভুলে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল।

দুই পক্ষের মাঝে বন্ধন সরলা। বয়স অল্প হ'লে কি হয়, তার মত সুবুদ্ধি না ছিল বাপ-মায়ের, না ছিল স্বামি-শ্বশুরের। কিন্তু সে একে শান্ত আর ছেলেমানুষ ব'লে কোন বিষয়ে কোন কথা কইত না। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাই বা করে কে? কেবল ঝাল ঝাড়্‌বার বেলা তার খোঁজ পড়্‌ত। তার স্বামী বাপের মুখে শ্বশুরবাড়ীর নিন্দা শুনে শুনে শ্বশুরবাড়ীর উপর চটা, শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে ঠেস দিয়ে কথা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সে সব কথার দুচারটে সরলাকেও শুন্‌তে হ'ত, শুনে নীরবে সহ্য করুত, কিন্তু তার মুখে একটা যাতনার ভাব লক্ষ্য ক'রে প্রমথ অনেক সময় নিজেকে সাম্‌লে ফেল্‌ত, তীব্র ইঙ্গিতের তিক্ত ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যেত। সরলার শাশুড়ী নেই, তার শ্বশুরঘরই করুবার কথা; কিন্তু প্রায় বাপের বাড়ীই থাক্‌ত, শ্বশুরও বড় একটা তাকে নিয়ে যাবার কথা তুল্‌তেন না। সরলা নিজে বুঝতে পারুত যে, এটা ভাল নয়, কিন্তু একে ত মুখ ফুটে কোন কথা বলা তার অভ্যাসই নেই, আর এমন বিষয়ে সে ত কোন কথা বল্‌তেই পারে না।

গোপাল বাড়ী বাঁধা দেবার চেষ্টায় ছিল। কয়েক-বার সে জন্য এটর্ণীদের আফিসেও হাঁটাহাঁটি করেছিল।

কিন্তু বাড়ীর অংশ বাঁধা রেখে কেউ পাঁচ সাত হাজার টাকার বেশী দিতে চায় না। সে টাকায় ত সব ধার শোধ যায় না। এক দিন কথায় কথায় গোপাল কাদম্বিনীর কাছে কথাটা পাড়লে। শুনে কাদম্বিনী বল্‌লেন, তা আমাকে কি কর্‌তে হবে বল? আমার বাপ ত আর আমার জন্য টাকা রেখে যায় নি যে, তোমাকে দেব।

—তুমি রেগে উঠলে কিছুই হবে না। একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ, যদি ধারটা কোন রকমে শোধ যায় অথচ বাড়ীর অংশ একেবারে না হাত-ছাড়া হয়। আমার ত শুধু তোমার জন্যই ভাবনা, আমি গেলে ত তোমার একটা উপায় হওয়া চাই। আমি একলা হ'লে কিছুই ভাবতাম না।

—আমার জন্য যদি তোমার কোন ভাবনাই থাক্‌বে, তা হ'লে এমন অবস্থা হবে কেন? তুমি কি চেষ্টা কর্‌লে কিছু রোজগার কর্‌তে পার না?

—আজকাল যে সময় পড়েছে, কোথাও কিছু পাওয়া যায় না, তবু আমি খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু তা হ'লেও ত ধারটা আগে শুধতে হবে।

—এই যে বাড়ীর অংশ বাঁধা দেবে বল্‌ছিলে?

—টাকা যে কেউ বেশী দিতে চায় না। বাড়ীর অংশের যা দাম, তাতে ত বাঁধা রেখে স্বচ্ছন্দে দশ বারো হাজার টাকা পাওয়া উচিত। অত টাকা কেউ দিতে চায় না।

—বড়্‌ঠাকুরের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তার কি হ'ল?

—তাঁকে ত আর কিছু বলি নি। ভাইয়ের মত ভাই হয় ত বল্‌তে ইচ্ছেও করে। উনি যদি মনে কর্‌তেন, তা হ'লে কি আমার এই ধার শোধ দিতে পার্‌তেন না? না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে, বাড়ীতে ত ছেলে-মেয়ের মধ্যে এক সরলা। তাই কি ওঁরা দু'জন কখন ভাবেন? কেবল টাকা, টাকা, টাকা!

—আঁটকুড়ের মায়া টাকার উপর, তা কি জান না? টাকাই হ'ল ওদের সব, দিন দিন আরও টাকার মায়া বাড়বে। এর পর ও টাকা কে খাবে?

—তাই বলে কে! দাদার সঙ্গে কি আর একবার কথাটা পাড়ব না কি?

—তাতে আর দোষ কি? হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, এখনই বা কোন্ সর্ব্বস্ব ঢেলে মেপে দিচ্ছেন?

—তুমি একবার বড় বউর সঙ্গে কথা কয়ে দেখ।

—আমিও তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু আজকাল বড় দিদির মেম সাহেব বোনের উপর যে টান দেখছি, তাইতে সাহস ক'রে কোন কথা পাড়ি নি। তরুবালার নাম সব সময় বড় দিদির মুখে লেগে রয়েছে। তরুবালাও বোন্ আর বোনাইয়ের খুব খোষামোদ করে। কখন একটা কপি, কখন গল্‌দা চিংড়ী, কখন কমলা নেবু পাঠিয়ে দেয়। তাতে বড়্‌ঠাকুর আর বড় দিদি দু'জনেই খুব খুসী। মেম সাহেবের একটা কিছু মতলব আছে।

—তা আর বুঝতে পারছ না? রায় সাহেব আর তাঁর মেম সাহেব, দু'জনেরই নজর দাদার টাকার উপর। সাহেব হলেই ত আর হয় না, হাতী হ'লে হাতীর খোরাক চাই। ওরা কিছুতেই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারে না।

—বড়্‌ঠাকুরের টাকা ওরা কেমন ক'রে পাবে?

—বোধ হয়, লেখাপড়া ক'রে নেবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু দাদাকে হাত করা বড় শক্ত।

—বড়্‌ঠাকুর হাজার কৃপণ হোন, ওঁর ত একটা বিবেচনা আছে। তাঁর বিষয় ওদের দিতে গেলেন কেন, ওরা ওঁর কে? আমরা আর সরলা কি ভেসে যাব?

—ওঁর টাকা, উনি যা ইচ্ছে কর্‌তে পারেন, কিন্তু মদন বক্‌শী নরেন রায়কে দশবার হাটে বেচে আস্‌তে পারে। রায় সাহেব এখনও আমার দাদাকে চেনেন নি।

—আমাদের কি এ রকম তফাৎ তফাৎ থাকা ভাল? সরলা ত প্রায় ওঁদের কাছে যায়। তুমি মাঝে মাঝে দু'দণ্ড বড়্‌ঠাকুরের কাছে গিয়ে ব'স না কেন?

—এইবার থেকে যাব। তুমিও বড়-বউর কাছে যেও।

—তা বেশ ত, আমরা সবাই যাব।

আজ কাদম্বিনী আদপে রেগে ওঠেন নি। তার কারণ, রায় সাহেবদের কথা উঠেছিল আর কাদম্বিনীর গহনার কোন উচ্চবাচ্য হয় নি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দেবতা ও উপাসনা

হিন্দুধর্ম্মে দেবতার এবং উপাসনার কথা যেরূপ আছে, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা নাই। উহার মূলতত্ত্ব অন্য সকল ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব হইতে প্রভিন্ন। সেই জন্য নব্য যুগের হিন্দুদিগের পক্ষে ত তাহা বুঝিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা ঘটে। উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের চিন্তার দ্বারা বুঝিতে হয়। সাধারণতঃ লোক ধর্ম্ম বলিলে যাহা বুঝে, হিন্দুধর্ম্ম তাহা নহে। অন্য সকল ধর্ম্ম বলেন যে, এই বিশ্বস্রষ্টার বা পরমব্রহ্মের পূজা বা উপাসনা কর, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন কর, প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই তোমার পারলৌকিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্ তোমার উপর তুষ্ট হইবেন। হিন্দুধর্ম্ম ঠিক সে কথা বলেন না। হিন্দুধর্ম্ম বলেন যে, ভগবান্ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা নহেন। তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। তিনি আছেন বলিয়া বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন :—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

অর্থাৎ অগ্নি এক, কিন্তু তিনি যেমন দাহ্যবস্তুর রূপভেদে তদ্রূপ হইয়া আছেন,—অর্থাৎ নানাবিধ দাহ্যপদার্থরূপ ধরিয়া আছেন, সেইরূপ একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্ব-প্রকার বস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধরিয়া আছেন, আবার তাহাদের বাহিরেও আছেন। অর্থাৎ এই চরাচর বিশ্বে যত কিছু দ্রব্য আছে,—সমস্তই সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এখন এই চরাচর বিশ্ব যে ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং পূর্ণ হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত। কাযেই আমাদিগকে সেই ধারণাতীত বস্তুকে পরিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। এই বিশ্বের যে সকল বস্তু আমাদের এই সসীম ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, তাহাও ত সসীমরূপেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে। উহা অসীম কি সসীম, তাহা আমরা স্বরূপতঃ না জানিলেও আমা-দের নিকট উহা সমস্তই সসীম বলিয়া প্রতীয়মান। আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই অসীমকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ নহে। সেই জন্য আমরা সসীমভাবেই সেই পরম ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করি। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যাহারা বলেন যে, তাঁহারা অসীম, অনন্ত, জ্ঞানাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রতারণা করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, যে সান্ত, যাহার ধীশক্তি সান্ত, সে কখনই অনন্তকে মনের মধ্যে ধারণা করিতে পারে না। একটা পিপীলিকা যেমন একটা অতিকায় হস্তীর সমস্ত দেহটাই গ্রাস করিতে পারে না,—সেইরূপ মানুষের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ পরব্রহ্মকে ধারণা করিতে অর্থাৎ বুদ্ধির মধ্যে পূরিতে (comprehend) পারে না। পিপীলিকা হয় ত হস্তিদেহের অতি ক্ষুদ্রাংশ ভোজন করিয়া মনে করিতে পারে যে, সে সব হাতীটাই খাইয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু সেটা তাহার ভ্রম। সে এতদ্দ্বারা কেবল আত্মপ্রতারণাই করে। সেইরূপ মানুষ যত বড় ধীশক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান্ হউক না কেন, সে যদি মনে করে যে, সে অনন্ত পরমব্রহ্মকে ধারণার মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে সে আত্মপ্রতারণাই করে। এরূপ অবস্থায় মানুষ যদি উহাকে পরিচ্ছিন্নভাবে ভাবে বা ভাবিবার চেষ্টা করে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। সেই জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার বলিয়াছেন,—

> একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
> বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতো বিশ্বং তদন্বিতম্।

সমস্ত জগতে একমাত্র পরমব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, এবং তিনিই যখন জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন, তখন এই বিশ্বের (বা বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছিন্ন শক্তির) অর্চ্চনা করিলে সেই পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়।" ইহার অর্থ, এই বিশ্ব মানুষের নিকট ভগবানেরই মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাসিত। আমাদের বুদ্ধি এমনভাবে গঠিত যে, আমরা বস্তুগত (concrete) ব্যাপার ভিন্ন কোন বিষয়ই চিন্তা করিতে পারি না। বস্তুত্ব ব্যবকলিত (abstract) ব্যাপার আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না, আসিতে পারে না। গুণ যেমন পদার্থকেই আশ্রয় করিয়া থাকে,

সেইরূপ শক্তিও পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে,—ইহাও আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্য আশ্রয় করিয়া আমাদের জ্ঞান বস্তুকে গজাইয়া উঠে; গুণ এবং শক্তির আধারকে চিন্তার ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরা উহা চিন্তা করিতে পারি না। শিক্ষা এবং অভ্যাস দ্বারা আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে গুণাশ্রয়ের এবং—শক্তিধরের অস্তিত্বকে কতকটা ক্ষীণ করিয়া দিতে পারি,—কিন্তু একবারে তাড়াইয়া দিতে পারি না। দয়া, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা যতই বিষয়-ব্যাবৃত (abstract) ভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি না কেন,—উহার মধ্যে সাধারণভাবে একটা দয়ালু, ক্রোধী বা লোভী ব্যক্তির বা জীবের ধারণা অতি ক্ষীণ বা অনুপলব্ধ-ভাবে থাকিয়াই যায়। তাই একই বস্তু অণু অপেক্ষা অণীয়ান্, মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান্ বলিয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। কারণ, ঐরূপ কোন বস্তু আমরা এই পৃথিবীতে কোথাও দেখি না। বিশেষ অভ্যাস দ্বারা উহার কতকটা ধারণা (apprehension) আমাদের জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে সাকল্যজ্ঞান (comprehension) হয় না। সেই জন্য সাধককে প্রাথমিক অবস্থায় ভগবানের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া চিন্তা করিতে হয়। কাযেই ভগবান্ একটা রূপ ধরিয়া ভক্তকে দেখা দিয়া থাকেন। ইহাই হিন্দুর ধারণা। সাধককেও সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় একটা রূপবান্ ভগবানের আরাধনা করিতে হয়। যে কোন পার্থিব বস্তুতে ভগবানের বিভূতি কল্পনা করিয়া ভগবানের পূজা করিতে পারা যায়। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

যিনি চিন্ময় অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ যিনি ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় কোন সত্তাই নাই, যিনি নিষ্কল অর্থাৎ যাঁহার অংশ নাই এবং যিনি অশরীরী অর্থাৎ যাঁহার অবয়ব নাই, যিনি নিরবয়ব, সেই ব্রহ্ম উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ নিজ রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য নামরূপ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মের নামরূপবিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয়। আবার শাস্ত্র অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সাধকদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপকল্পনা। সাধকদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত এ কথা বলিলে কি বুঝিব? পূজা করিলে সাধকদিগের মঙ্গল হইবে বলিয়া, (ভগবানের বা পরব্রহ্মের প্রীতি হইবে বলিয়া নহে)। কারণ, তাঁহার প্রীতি ত নাই-ই, অপ্রীতিও নাই। এখানে একটা কথা পাওয়া গেল যে, পূজার দ্বারা সাধকের বা উপাসকদিগের হিত সাধিত হয় এবং কার্য্য-সিদ্ধিও হইয়া থাকে। পূজা করিবার নিমিত্ত-কারণ পূজকের হিত এবং কার্য্যসিদ্ধি। দ্বিতীয় কথা ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা। এখানে হিন্দুরা বলেন, ব্রহ্মের (ব্রহ্মণঃ) কর্ত্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার রূপের কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই আরাধ্য দেবতার রূপ তিনিই স্বয়ং পরিগ্রহ করিয়াছেন। মানুষ বা সাধক আপনার সুবিধার জন্য সেই রূপের কল্পনা করিয়া লয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা পাশ্চাত্যভাবে অল্পবিস্তর প্রভাবিত, তাঁহারা মনে করেন,—সাধকরাই আপনাদের সুবিধার জন্য, অথবা ঋষিরা সাধারণ স্বল্পবুদ্ধি মানুষের উপকারের জন্য ভগবানের এক একটা মূর্ত্তি কল্পনাপূর্ব্বক সাধনার এই সহজ উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার কোন্ কথাটা সত্য, তাহা বুঝিতে হইলে গোড়ায় কতকগুলি জটিল বিষয় বুঝিতে হইবে। সেই জন্য পরে এই কথাগুলি বলিব মনে করিয়াছি।

আমরা দেবতার পূজা করি কেন? সকল কার্য্যেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যহীন কার্য্য—কার্য্যই নহে। সুতরাং পূজারও একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথাই বলিবেন। অনেকেই বলিবেন যে, ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনের জন্যই আমরা তাঁহার পূজা করি। তিনি স্তবে তুষ্ট এবং নিন্দায় বা উপেক্ষায় রুষ্ট হন। হিন্দু অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী সনাতনীরা সে কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ তুষ্টির ও রুষ্টির অতীত। তিনি সদানন্দ। সুতরাং তাঁহার রোষ হইতেই পারে না। তবে আমরা তাঁহার বা তাঁহার অংশরূপ অন্য দেবতার পূজা করি কেন? উত্তরে হিন্দুশাস্ত্র বলেন, মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনই পূজার উদ্দেশ্য। এই মনুষ্যত্ব কি? মানুষের অন্তর্নিহিত কতকগুলি দৈব গুণ আছে। যখন এই বিশ্বের সকল কিছুই ব্রহ্ম বা ভগবান্,—তখন জীবমাত্রই ভগবান্; সুতরাং মানুষমাত্রই ভগবান্।

অতএব মহাশক্তির মায়ায় আবদ্ধ মানুষের ভিতর সেই ভগবানের বিভূতি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় রজোগুণ এবং তমোগুণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া আছে। পূজাদি কার্য্য দ্বারা সেই ভস্মরাশি উড়াইয়া দিয়া ভিতরকার অগ্নির ন্যায় সেই অন্তরস্থ আধ্যাত্মিক শক্তিকে বাহির করিতে বা বিকসিত করিয়া লইতে হয়। সেই যে আধ্যাত্মিক ভাব, তাহার প্রাথমিক অবস্থাই মনুষ্যত্ব। গভীর ভস্মে আচ্ছাদিত বহ্নির উপরকার ভস্মরাশি ক্রমে ক্রমে যত উড়িয়া যাইতে থাকে, ততই যেমন উহার ভিতরকার বহ্নির তাপ অনুভূত হয়, তেমনই পূজাদি ধর্ম্মসাধন দ্বারা যতই রজস্তমোগুণ-রাশি ক্ষীণ হইয়া পড়িতে থাকে, ততই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বা মনুষ্যত্বের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। পূজা সাধন-ভজনেরই অঙ্গ। উহা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করে। মানুষ যখন নিম্নস্তরে অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন থাকে, যখন তাহার ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণই অতি প্রবল, রজোগুণ কতকটা প্রবল এবং সত্ত্বগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে, তখন সে আধ্যাত্মিকভাবে পূজা করিতেই পারে না। তখন তামসী পূজা বা পূজার বাহ্যাড়ম্বরের দিকেই সে আকৃষ্ট হয়। ঢাক-ঢোলের বাদ্য, পশুবলি, নিহত পশুর রুধিরাপ্লুত দেহে নৃত্য প্রভৃতিতে সে মাতিয়া থাকে। ক্রমে সে ইহা উপলব্ধি করিতে থাকে যে, তাহার সম্মুখে দেবমণ্ডপে যে প্রতিমা রহিয়াছে, সেই প্রতিমার ভিতর তাহার পাপপুণ্যের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বিরাজ করিতেছেন। তখন সে পাপের এক জন দণ্ডদাতা আছেন বলিয়া পাপ-কর্ম্ম করিতে ভয় পাইতে থাকে। সে পাপকর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করে। বারংবার চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ সে পাপকর্ম্ম পরিহার করিতে সমর্থ হয়। প্রবাদ আছে যে, বাল্মীকি 'মরা মরা' জপ করিতে করিতে রাম নাম জপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রায় হিংস্রপশু-ভাবাপন্ন মানবও সেইরূপ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পশুত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহ-জন্মে সে যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে না পারে, পরজন্মে সে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। কেহ বা দুই চারি জন্মে পারে। হিন্দুধর্ম্মে পরলোক এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেই হইবে। যাহার সে বিশ্বাস নাই, সে হিন্দু হইতেই পারে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পার্থিব যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের পূজা করা যাইতে পারে। কারণ, বিশ্বের অর্চ্চনাই বিশ্বরূপের অর্চ্চনা। কিন্তু তাহা হইলেও সে অর্চ্চনা বা পূজা এমন ভাবে করিতে হইবে যে, তাহা যেন মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায় হয়। সকল কাযই একটা বিচারসঙ্গত পদ্ধতি ধরিয়া করিলে তবে তাহাতে শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ সে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন। দৈহিক বলের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে স্যাণ্ডোর পদ্ধতিমতে অথবা ঐরূপ কোন বিশেষজ্ঞের প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে বলের অনুশীলন করিলে তবে শীঘ্র ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কারণ, শারীরস্থানবিদ্যার সহিত ঐক্য করিয়া ঐ সকল পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ছেলেদিগকে বর্ণবোধ ও বস্তুবোধ প্রভৃতি শিক্ষা দান করিতে হইলে অনেকের মতে কিণ্ডার গার্ডেন পদ্ধতিই ভাল, কারণ, উহা বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরিকল্পিত। সেইরূপ অত্যন্ত দুরবগাহ আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ করিতে হইলে,—আধ্যাত্মিকতার উন্নতিসাধক কার্য্য করিতে হইলে—যাঁহারা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, তাঁহা-দের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে; তবে তাহাতে সাফল্যলাভ সম্ভবে; নতুবা ঐ বিষয়ে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইবে। আমরা ব্যবহারিক জীবনে দেখিতে পাই, ব্যাধি হইলে আমরা তাহার প্রতীকারের জন্য উকীল কিম্বা এঞ্জিনিয়ারকে ডাকি না। উকীল যদি স্বর্গীয় ডাক্তার রাসবিহারীর ন্যায় ব্যবহারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন,—এঞ্জিনিয়ার যদি লেসলীর ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, তাহা হইলেও কেহ তাঁহাকে সামান্য সর্দ্দি-জ্বর বা মাথা-ধরা চিকিৎসার জন্য ডাকিবে না,—ভাল ডাক্তার না পাইলে বরং এক জন গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসককে ডাকিবে, সেও ভাল। বাঙ্গালা-দেশে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিক জ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন,—দেশের লোক রাজনীতিক জ্ঞানে তাঁহাদের নেতৃত্ব অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করিতেন,—কিন্তু তাহা হইলেও কেহ তাঁহাদিগকে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও—শালগ্রামশিলা পূজা করিবার জন্য আহ্বান করিতেন না। কারণ, পূজাবিষয়ে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন-ব্যাপারে—তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। সেই জন্য অতি

জটিল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা মনে করেন যে, মানুষের সহজজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম-কার্য্যসাধন করা বা উপলব্ধি করা সম্ভবে, তাঁহারা ঐ বিষয়ে অত্যন্ত অজ্ঞ অথবা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

হিন্দুর মতে পূজা প্রভৃতির একটা ক্রম আছে। প্রাথমিক পূজা হইতেছে বাহ্যপূজা। শাস্ত্রে বাহ্যপূজাকে অধমাধম বলা হইয়াছে, কারণ, উহাকে অত্যন্ত প্রাথমিক (Rudimentary) অবস্থার সাধনা বলা যায়। উহা আধ্যাত্মিক সাধনার গোড়ার ব্যাপার। আমি গত আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বাহ্যপূজায় শালগ্রামে, জলে, প্রতিমায়, ঘটে-পটে, শিবলিঙ্গে দেবতার আবাহন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিশ্বের সকল বস্তু অবলম্বন করিয়াই বাহ্যপূজা করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও মনের উপর পবিত্র ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে, এমন পদ্ধতি অনুসারে সেই বাহ্যপূজা করা আবশ্যক। যিনি দেবতা অর্থাৎ যাঁহাকে পূজা করা হয়, তাঁহাতে কেবল মনে মনে ভাগবত-ভাবের আরোপ করিলে হইবে না, সত্য সত্যই প্রতিমাদিতে তাঁহার দৈবীশক্তির আবাহন করিতে হইবে। উহাতে যাহাতে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহাও করিতে হইবে।

ঘট-পটাদিতে দেবতার আবাহনই হইতেছে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। মানুষ তাহার শুদ্ধ ভাব ও দৈবশক্তিবলে দেবতাকে ঘট-পটাদিতে আকর্ষণ করিতে পারে। আজ-কালকার শিক্ষিত সমাজের পনর আনা বা তাহারও অধিক লোক তাহা বুঝেন না বা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা মনে করেন, ওটা একটা বুজরুকী অথবা বড় জোর সাধারণের মনে একটা পবিত্র ভাব জাগাইবার জন্য মিথ্যাচার। ইহা তাঁহাদের প্রকাণ্ড মূর্খতা। হিন্দু কর্ম্মকাণ্ডে কোন প্রকার মিথ্যাচার বা ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের উপাসনা প্রভৃতি করিবার গোড়ার কথা শ্রুতিতে এই ভাবে বলা হইয়াছে—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ
যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।" মুণ্ড-উ—৩।১।৬

ইহার স্থূল অর্থ—"সংসারে সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা কখনই জয়ী হইতে পারে না, দেবযান পন্থা অর্থাৎ দেবতার নিকট যাইবার পথ * সত্যাশ্রয় দ্বারাই প্রশস্ত হইয়া থাকে, মিথ্যাকে আশ্রয় করিলে দেবতার নিকট যাওয়া যায় না, ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হয় না। আপ্তকাম (ভোগতৃষ্ণাবর্জ্জিত) ঋষিরা যাহার দ্বারা অর্থাৎ যে দেবযান অবলম্বন করিয়া সত্যের সেই পরম নিধান বা ফলপ্রাপ্তির স্থানে গমন করেন।" সুতরাং অসত্যকে আশ্রয় করিয়া কেহই আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা মিথ্যা বা বুজরুকী নহে।

তবে সকলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। কেবল বেগার শোধ করিবার মত, "ইহাগচ্ছ" "ইহা তিষ্ঠ" বলিলে দৈবী শক্তি বা দেবতা তথায় আসেন না। আপনাকে পূর্ণ দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে দেবতাকে প্রতিমা বা ঘটে-পটে আকর্ষণ করা যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"নাদেবো পূজয়েদ্দেবং দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"

অদেব হইয়া, অর্থাৎ আপনাকে সম্পূর্ণ দেবভাবে উন্নীত না করিয়া, দেবতার পূজা করিতে নাই,—দেবতা হইয়া, অর্থাৎ দেবভাবে সম্পূর্ণ বিভোর হইয়া, দেবতার পূজা করিতে হয়। কথাটা নিতান্ত সহজ নহে। সকলে তাহা পারেন না। কতকটা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে তাহা পারেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে পঞ্চ-শুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। সেই পঞ্চশুদ্ধি হইতেছে স্থানশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি এবং মন্ত্রশুদ্ধি। পূজা করিতে বসিয়া—সর্ব্বপ্রথম পূজায় বসিয়া—যে আচমন করিতে হয়, তাহাতেই পূজক আপনার মধ্যে বিষ্ণুকে অনু-ভব করিতে পারেন। আচমনের সময় প্রধান ভাবনা সেই বিষ্ণুর পরমপদ বা প্রধান স্থান অর্থাৎ বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব বা জগৎব্যাপকত্ব পণ্ডিতরা বা মহৎ ব্যক্তিরা সদাই দেখিতে পান—কেমন ভাবে দেখিতে পান? না—আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বা দর্শনশক্তির ন্যায়, (মতান্তরে সূর্য্যের ন্যায়)। ভগবান্ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, আমাতেও তিনি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন,—এই ভাব মনে জাগাইয়া তুলিয়া

* দেবযান অর্থে দেবতাকে পাইবার পথ বা ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তির পথ। কেনোপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন,—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।" কেন ৪।৮

তবে পূজার আরম্ভ করিতে হয় * তাহার পর পঞ্চশুদ্ধি। এই শুদ্ধিতত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন। অনুষ্ঠান দ্বারাই উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। যুক্তি-তর্ক দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে হইলেও হাতে-হাতিয়ারে কতকগুলি অনুষ্ঠান করাইতে হয়, তবে উহা বুঝান যায়। একবার বরিশাল কলেজের দুইটি ছাত্র তাঁহাদের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন,—'সার, সন্ধ্যা-বন্দনা করিলে কি লাভ হয়?' উত্তরে উক্ত অধ্যাপক বলেন,—'তোমরা আগে ১৫ দিন প্রাতে উঠিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে একান্তমনে সন্ধ্যা কর, তাহার পর আমি তোমাদিগকে উহার উপকারিতা বুঝাইয়া দিব।' তাঁহারা উভয়ে তাঁহার কথা অনুসারে ভক্তিসহকারে এক-পক্ষকাল প্রাতে উঠিয়াই শুচিভাবে সন্ধ্যা-উপাসনা করিতে থাকেন এবং পরে আবার অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে ঐ প্রশ্ন করেন। তিনি ছাত্রদ্বয়কে আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা এই ১৫ দিনে কিছু বুঝিলে কি?' উভয়েই উত্তর করেন যে, মনটা যেন একটু ভাল হয় বলিয়াই মনে হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা আর এক মাস ঐরূপ ঐকান্তিকভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে থাক।' তন্মধ্যে এক জন (শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ) পরীক্ষা সন্নিহিত বলিয়া সন্ধ্যাহ্নিক ত্যাগ করিয়া পাঠে অবহিত হইলেন, আর এক জন শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরাবর সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া এখন আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে অবহিত হইয়াছেন। সুতরাং সেইরূপ ঐ পঞ্চশুদ্ধিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ঐকান্তিকভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধাতে ভাবনা পূর্ব্বক ঐ কার্য্যগুলি করিতে হইবে। উহাই পূজার জীবন। † উহার অভাব হইলে পূজাই হইবে না। কারণ, উহাই পূজার সর্ব্বস্ব। পাতঞ্জল-দর্শন বলেন, চিত্তের অনন্ত সমাপত্তি হইলে আসনজয় হয়। আসনজয় হয় অর্থে আসনশুদ্ধি। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে ব্যাসক্ত (অতিমাত্র আসক্ত) থাকে। তাহাকে সেই সকল পার্থিব বিষয় হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া পূজায় একমুখ করার নাম অনন্ত সমাপত্তি। এই কয়টি শুদ্ধির মধ্যে আত্মশুদ্ধিই অত্যন্ত কঠিন। ইহা মানুষকে ক্ষণিক-ভাবে দেবত্বে উন্নীত করে। মন্ত্রের অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া এবং সত্যাশ্রয়ী হইয়া সেই অর্থানুকূল ভাবনা করিলেই পূজা সিদ্ধ হইবে। নতুবা কেবল তোতা পাখীর মত "পৃথ্বি ত্বয়া" প্রভৃতি মন্ত্রগুলি আওড়াইয়া গেলে পূজা হইবে না, প্রতিমাপূজা পুতুলপূজায় পরিণত হইবে। পুরোহিত ঠাকুরপূজায় বসিয়া কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আপনার মাথায় যে একটি ফুল দিয়া থাকেন, ইহা হইতেছে—দেবতা বোধে আত্মপূজা। যদি আপনাকে দেবতা মনে করিয়া পূর্ণ-মাত্রায় ভাবিতে পারা যায়, তাহা হইলেই পূজা করিবার অধিকার জন্মে। শাস্ত্রকার এই জন্য বলিয়াছেন, অদেব হইয়া দেবপূজা করিবে না, দেবতা হইয়া দেবপূজা করিবে। দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁহার ইষ্টদেবতাকে শালগ্রাম-শিলায়, ঘটে, পটে, মন্ত্রে বা যন্ত্রপুষ্পে আকর্ষণ করিতে পারেন। যদি তিনি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সে পূজা প্রকৃত পূজা না হইয়া পুতুলপূজাই হইবে। ঐরূপ শ্রদ্ধাভক্তিবিহীন পূজা যদি সফল হইত, তাহা হইলে মানুষ স্বপ্নে রাজ্য পাইলেই রাজা হইতে পারিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, দেবতা কাহাকে বলে? সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন, তিনি এই বিশাল জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার জন্য আপনাকে মানবীয় দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। 'এক আমি বহু হইব' ব্রহ্মের সিসৃক্ষার মূলে এই সঙ্কল্পই ছিল। তাই ব্রহ্ম হইতে শক্তি উদ্ভূত হইয়া যে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন, তাহাতে যেন তিন দেবতা তিন কার্য্যে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা রজোগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতে, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া পালন করিতে এবং শিব তমোগুণ অবলম্বন করিয়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হন। অথবা পরব্রহ্মের যে অংশ শক্তিসনাথ সৃষ্টি, যে অংশ পালন, এবং যে অংশ সংহারকার্য্যে নিযুক্ত, সেই অংশকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অনন্তের বা অসীমের প্রতি অংশই অসীম হইবেই।

* আচমনমন্ত্র যথা—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

† ভক্তিঃ শ্রদ্ধা ভাবনা চ পূজানাং জীব উচ্যতে মেরুতন্ত্র। অহির্বুধ্ন সংহিতাকার বলিয়াছেন,—দেবতার চরণে সর্ব্বতো-ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার পূজার ফললাভ হয়। একান্তমনে 'হে দেব! আমি অতি অভাজন অকিঞ্চন, তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই।' এইপ্রকার ভাবনাই—ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণই পূজার জীবনী-শক্তি। ঐ ভাব লইয়া যে পূজায় বসে, তাহার দেবতা তাহার ঘটে-পটে ও প্রতিমায় আবির্ভূত হইয়াই থাকেন। পঞ্চশুদ্ধির দ্বারা ঐ ভাবই মনে জাগাইয়া দেওয়া যায়।

সে অসীমত্বও মানুষ ধারণা করিতে পারে না। কারণ, তাহা ত মানবের ধারণাশক্তির অতীত। সেই জন্য মানুষ কার্য্যবিভাগের দিক্ দিয়া পরিচ্ছিন্নভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিবার চেষ্টা পায়। কার্য্য হিসাবে স্বতন্ত্রীকৃত ভগবানের এক একটি সত্তাই হইতেছেন এক এক জন দেবতা। এইরূপ যে ব্রাহ্মী শক্তি অপের বা জলের অধিপতি, তিনি বরুণ, যিনি তেজের অধিপতি, তিনি অগ্নি, যিনি মরুতের অধিপতি, তিনি পবন, যিনি জীবের মৃত্যুর অধিপতি, তিনি যম—এই ভাবে হিন্দুর দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দু ইঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকে।

সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানব এই ভাবে ভগবানের ও দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহা বাহ্যপূজা। ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (গীতা ৯।২৬)

যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু প্রদান করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের সেই সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই হেতু সাধক সাধনার প্রথম স্তরে ভগবান্‌কে বা ইষ্টদেবতাকে পুষ্প, পত্র, ফল, জল দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এই বাহ্য-পূজায় প্রধান প্রয়োজন পূজায় নিষ্ঠা এবং ভক্তি। তাহা না থাকিলে সমস্তই পণ্ড এবং পূজা ব্যর্থ হইয়া যায়।

বাহ্য পূজায় দেবতা এবং পূজক বা পূজাকর্ত্তা উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে। উহা প্রাথমিক অবস্থায় কাম্য পূজা। পূজাকর্ত্তা আরোগ্য, ধন প্রভৃতি কামনা করিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভাবনা থাকিলে সিদ্ধকামও হয়েন। পূজায় অপবিত্র ভাব মনে জন্মিলে ভাব বা ভাবনা-সঙ্ক্ষণে ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং উহাতে পূজার বিঘ্ন ঘটে। সেই হেতু পবিত্রভাব রক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

বাহ্যপূজা হইতে আন্তরপূজা বা মানসিক পূজায় অগ্রসর হইতে হয়। সে কথা পরে বলা যাইবে। তবে এখানে এই কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাহি যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে পূজা তিন প্রকার হইয়া থাকে। গীতায় ত্রিবিধ কর্ত্তার (কর্ম্মকর্ত্তা মানুষ) কথা বলা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ কর্ত্তার জন্য স্থলে স্থলে ত্রিবিধ পূজার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। একই দেবতার পূজায় কর্ত্তার সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে ত্রিবিধ পূজাপদ্ধতি লক্ষিত হয়। বটুকভৈরব প্রভৃতির পূজাতে ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিবিধ ধ্যান পর্য্যন্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ পদ্ধতি। ইহা ভিন্ন অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবার্চ্চনার ব্যবস্থাও আছে। সেই জন্য মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র বলিতেছেন :—

"অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি! প্রবৃত্তিঃ কামসঙ্কুলে॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্তু যত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ॥
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥"

ইহার অর্থ:—"যাহাদের জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একত্বজ্ঞান হয় নাই,—যাহারা সকল সময়ে কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই ব্যস্ত, সেই শ্রেণীর মানুষের স্বভাব অনুসারে নানাবিধ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। তাহাদের মধ্যে যে সকল লোক (কামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে) ধ্যান, জপ ও পূজা করিতে ভালবাসে, এবং ঐ সকল কার্য্য করিলে তাহাদের শ্রেয়ঃ হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, আমার (মহাদেবের) ইচ্ছা, তাহারা ঐ সকল কাযকে (পূজা ধ্যান জপ প্রভৃতি করাকে) তাহাদের ইষ্টসাধক বলিয়া জানুক। তাহাদের হিতের জন্যই আমি বহুবিধ নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছি এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য আমি অনেক প্রকার কর্ম্মবিধান (অর্থাৎ পূজাদির ব্যবস্থা) বলিয়া দিয়াছি।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পূজাদি কর্ম্ম নিম্ন স্তরের অধিকারীদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। কাম্য এবং বাহ্যপূজার ইহাই রহস্য। চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে দেহশুদ্ধি অর্থাৎ শৌচ অবলম্বনও করিতে হয়। শৌচের ব্যাঘাত ঘটিলে পূজা সিদ্ধ হয় না। অতএব বাহ্যপূজায় শৌচাচার অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে উচ্চতর পূজায় (মানসপূজা প্রভৃতিতে) অধিকার জন্মে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

২৭

হাজারিবাগের বাড়ীটি বেশ বড় ও ভাল। চারিদিকে খোলা মাঠ, দূরে কাছে ছোট বড় পাহাড় উপর হইতে বেশ দেখা যায়। শীত বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার উপর পৌষমাস; কাযেই প্রখর শীত। শীতের জন্য প্রথমটা যেন একটু অসুবিধা হইয়াছিল। ৩।৪ দিন পরে শীত অভ্যাস হইয়া যাইতেই ভাল লাগিতে লাগিল।

চপলা সাত দিনের যায়গায় ১০ দিন থাকিয়া গোছগাছ করিয়া দিল। সরোজের কক্ষ, পুষ্পিতার কক্ষ, দুই জনের বসিবার ঘর; অনেক বই সঙ্গে আনা হইয়াছিল, সেগুলি দিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাগার ইত্যাদির সব সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। কখন্ দুই জনে বেড়াইতে বাহির হইবে, কখন্ ফিরিবে ইত্যাদি সবিস্তারে উভয়কে বুঝাইয়া দিল। তার পর সে মাঘের প্রথমেই বিবাহের দিন স্থির করিল। হাজারিবাগে বিবাহের প্রস্তাবে কোন পক্ষ হইতে আপত্তি হইল না।

সমস্ত স্থির করিয়া চপলা কলিকাতা ফিরিয়া গেল। হাজারিবাগ হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন ঘণ্টাখানেকের পথ, ট্যাক্সিতে আসিতে হয়। পুষ্পিতা ও সরোজ দুই জনেই সন্ধ্যার ট্রেণে চপলাকে উঠাইয়া দিয়া আসিল। ফিরিবার পথে দুজনে পাশাপাশি ফিরিতেছিল। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "মন কেমন করছে?"

পুষ্পিতা ম্লানমুখে বলিল,—"একটু করছে বৈ কি।" সরোজ পুষ্পিতার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া মৃদুস্বরে বলিল,"আমি চাই—তুমি যেন কোন আঘাত না পাও, কিন্তু আমার যতখানি ইচ্ছা, তার অর্দ্ধেকও শক্তি নাই, তাই তোমায় এতটুকুও আনন্দ দিতে পারিনে।"

পুষ্পিতা একটু হাসিল; কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান। সে বলিল, "কেন, তোমার ত কোন দোষ নাই। মানুষে যা কিছু পারে, তুমি সবই করছ।"

আজকাল দুজনেই দুজনকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে।

অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখে তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া ট্যাক্সি দ্রুতবেগে চলিতেছিল। উচ্চ হইতে নীচের দিকে নামিবার সময়ে এবং হঠাৎ মোড় ফিরিবার সময় দুজনে পরস্পরের গায়ে হেলিয়া পড়িতেছিল; আবার সোজা হইয়া বসিতেছিল। দীর্ঘ পথ, প্রবল শীতের বায়ু, নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, অন্ধকারের নির্জ্জনতার মাঝে পাশাপাশি দুই জনে বসিয়া। পুষ্পিতার হঠাৎ মনে হইল, এই ত কিছু-কাল আগে আর সে এক জনের আরও নিকটতম হইয়াছিল। সে ত আজ নাই। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। পর পর দুই ফোঁটা অশ্রু সরোজের হাতের উপর পড়িল। সরোজ চমকিত হইয়া বলিল,—"তুমি কাঁদছ? কেন?"

বড় মৃদুস্বরে বড়ই স্নেহের সহিত সরোজ কথা কয়টি বলিল। তাহাতে পুষ্পিতাকে অনেকখানি সান্ত্বনা দানের প্রয়াস ছিল। কিন্তু আরও কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া সরোজের করতল সিক্ত করিল। সরোজ এক হাতে তাহার হাত ধরিয়া লইল, অপর হাত দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল। সরোজ প্রথমে নামিয়া পুষ্পিতাকে নামাইয়া লইল ও ট্যাক্সির ভাড়া মিটাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

শীতের রাত্রি, ৯টা বাজিয়াছিল। দুজনে আসিয়া দুজনের শয়নঘরের মধ্যবর্ত্তী সজ্জিত কক্ষে আসিয়া পাশাপাশি দুইটি আসনে বসিল। ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা আনিবে কি না।

সরোজ পুষ্পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগেছে, খাবে চা?"

পুষ্পিতা বলিল, "না, তুমি খাও।"

সরোজ বলিল, "তা হ'লে থাক, চা আর চাইনে।"

পুষ্পিতা তখন বলিল, "তা হ'লে যাও দুপেয়ালা নিয়ে এস।"

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অল্পসময়ের মধ্যে দুই পেয়ালা চা আনিয়া সম্মুখের টিপয়ের উপর রাখিল। তার পর চলিয়া গেল।

সরোজ বলিল,—"মায়ের সমস্ত কাযে এমন শৃঙ্খলা, যেন কলে সমস্ত হয়ে যায়; এমন সুব্যবস্থা আমি দেখিনি।"

পুষ্পিতা বলিল,—"মায়ের মত পাকা গিন্নী খুব কম আছে। কোন জিনিষ মায়ের লক্ষ্য এড়ায় না। যখন

আমাদের নিয়ে মামার বাড়ী যেতেন, চাকর-বাকরদের এমন ক'রে কায বুঝিয়ে দিয়ে যেতেন যে,ঠিক ঘড়ীর কাঁটার মত সব কায হয়ে যেত। বাবা বল্‌তেন, খেতে বস্‌বার সময় ছাড়া বোঝবার সাধ্য ছিল না যে, তুমি বাড়ী নেই। বাবার খাবার সময় মা সব কায ফেলে বাবার কাছে বস্‌তেনই। বাবার ইচ্ছা ছিল, সকলে একসঙ্গে খেতে বস্‌বেন—মা সেটি শুনতেন না। বলতেন, "তোমার কি চাই না চাই, না দেখে বস্‌ব না। মা কাছে থাক্‌লে বাড়ীর কারও কোন ভাবনা থাকে না।"

সরোজ বলিল, "মা ত আবার শীঘ্র ফিরবেন।"

কেন শীঘ্র ফিরবেন, তাহা সরোজ ও পুষ্পিতা উভয়েই জানিত। মায়ের ফিরিয়া আসার উল্লেখ করিতেই উভয়েরই বোধ হয় সে কথা মনে পড়িল। সরোজ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার পুষ্পিতার পানে চাহিল, সরোজের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিবামাত্র পুষ্পিতা চক্ষু নামাইয়া লইল।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ের চা-পান শেষ হইয়া গেল।

সরোজ কহিল, "কিছু পড়ব, শুন্‌বে ?"

পুষ্পিতা বলিল, "পড়।"

পুষ্পিতা কবিতা ভালবাসে। সরোজ বিভিন্ন কবির গ্রন্থ হইতে বাছিয়া কবিতা পড়াইয়া শুনাইতে লাগিল।

সব শেষ রবি বাবুর বিখ্যাত কবিতা বাহির করিয়া পড়িল—

"কোথা হ'তে দুই চক্ষে ভ'রে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার !
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার ?
হেথায় প্রান্তরপারে নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে জ্বালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্যমনে একাকিনী বাতায়নে
ব'সে আছি পুষ্পাসনে বাসরের রাণী ;—
কোথা বক্ষে বিঁধে কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী।
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি ?"

কবিতা পড়িতে পড়িতে ও শুনিতে শুনিতে বক্তা ও শ্রোত্রী দু'জনেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

পুষ্পিতা বলিল, "বড় সুন্দর ! কিন্তু থাক, আর এখন পোড়ো না।"

সরোজ আপনার অশ্রুপূর্ণ-নেত্র পুষ্পিতার দিকে একবার স্থাপন করিয়া পুস্তক বন্ধ করিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠিবার সাড়া পাইয়া বর্ষীয়সী পাচিকা আসিয়া বলিল, "এবার খাবার দিই, মা !"

অনুমতি পাইয়া পাচিকা আহারের ব্যবস্থা করিতে গেল। আহার শেষ করিয়া সরোজ পুষ্পিতাকে তাহার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল ; কিন্তু সে কক্ষে প্রবেশ করিল না। দুয়ার হইতে বলিল, "আমি তা হ'লে এখন যাই, তুমি দুয়ার বন্ধ ক'রে দাও।"

পুষ্পিতা দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল ; তার পর ধীরে ধীরে আপন শয্যায় ফিরিয়া গেল।

সরোজ বহুক্ষণ বাহিরে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, যেন পুষ্পিতার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ সে সেখান হইতে শুনিতে পাইতেছে। তাহার মনে হইল, সে যদি পুষ্পিতার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার দেখিতে পাইত যে, পুষ্পিতার অনাবৃত বাহু বা কণ্ঠ ঘুমের ঘোরে উষ্ণবস্ত্রের বাহিরে আসিয়া পড়ে নাই, আতপ্ত কোমল নীড়ে বিহগীর মত সে নিশ্চিন্ত-মনে সুপ্ত আছে, দুঃস্বপ্নে তাহার মধুর অধর কাঁপিতেছে না, শ্রান্তিভরে তাহার বক্ষঃ দুলিতেছে না, তাহা হইলে তৃপ্ত-চিত্তে সে আপন শয্যায় ফিরিতে পারিত। সরোজ মনে মনে অনুভব করিল, আজ তাহার এই দুয়ার পর্য্যন্তই আসিবার অধিকার ; কক্ষের ভিতরে প্রবেশের অধিকার সে আজিও পায় নাই। অধিকারের বেশী সে এক বিন্দু কোন দিন চাহে নাই, আজিও চাহিবে না।

একটা শ্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া সরোজ ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে ফিরিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। মনে মনে পুষ্পিতার কথাই ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

২৮

কয়টা দিন অনেকটা আনন্দেই কাটিয়া গেল। সকাল-সন্ধ্যা একত্র ভ্রমণ, অধ্যয়ন, কথোপকথন, একত্র কাব্যচর্চ্চা—ইত্যাদির ফলে সম্ভবতঃ আগেকার সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। পুষ্পিতার হৃদয়ের ভারও বোধ হয় অনেকটা

লঘু হইয়া গেল। পুষ্পিতা অনুভব করিল যে, সে সরোজকে লইয়া হয় ত সুখী হইতে পারিবে।

পৌষ শেষ হইয়া গেল। বিবাহের আর মাত্র ১০ দিন দেরী রহিল। চপলা পত্র লিখিয়াছে, বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে তাহারা হাজারিবাগ পৌঁছিবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার হইতে ম্যানেজারের কাছ হইতে একটি টেলিগ্রাম আসিল যে, এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লইয়া একটু গোল-যোগ ঘটিয়াছে, শীঘ্র একবার সরোজের এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসা প্রয়োজন।

সরোজ টেলিগ্রাম পড়িয়া পুষ্পিতার হাতে দিয়া বলিল, "আমায় তা হ'লে আজই যেতে হয়। একটি দিনের জন্য তোমাকে একা থাক্‌তে হয়। কাল রাতেই আমি ফিরবো।"

পুষ্পিতা বলিল, "যখন কায পড়েছে, তখন কি কর্‌বে, যাও।"

সরোজ সেই দিনই সন্ধ্যায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাক্স, ড্রয়ার ইত্যাদির সমস্ত চাবি পুষ্পিতার হাতে দিয়া দিল। যাইবার সময় পুষ্পিতাকে বলিল, "তোমায় ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন কর্‌ছে। এবার ফিরে এসে আর তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব না। তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার অধিকার এখনও পাইনি। পেলে একা কলিকাতা যেতাম না।"

পুষ্পিতার কি বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, তুমি লইয়া গেলে আমি যাইতে পারি? লজ্জার আতিশয্যে কি সে কথাটা বলিতে পারিতেছিল না?

সরোজ একটুখানি অপেক্ষা করিয়া বলিল, "তা হ'লে যাই, ট্যাক্সি এসেছে। সময়ও আর বেশী নাই।"

পুষ্পিতা একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে সরোজের পানে চাহিল। সরোজ ধীর-চরণে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

ট্যাক্সি হইতে পুষ্পিতার কক্ষের পানে চাহিতে সরোজ দেখিল, পুষ্পিতা বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহার যাত্রাপথের পানে চাহিয়া আছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পুষ্পিতার মনে হইল, সরোজ আজ রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিবে। পুষ্পিতা স্থির করিয়া রাখিল, সরোজ আসিলে তাহাকে এই কথাটা বলিবে যে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া সে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলে সে যাইত।

সরোজের কোন কায করিবার জন্য আজ পুষ্পিতার প্রাণ যেন চঞ্চল হইল। আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে সে সরোজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সরোজের শয়নকক্ষে সরোজের অসাক্ষাতে আজ সে প্রথম প্রবেশ করিল। সরোজের শয্যা একটু অগোছান ছিল। পুষ্পিতা সযত্নে তাহা ঝাড়িয়া রাখিল। তাহার অনাবৃত টেবলের উপর অনেকগুলি বই বিক্ষিপ্ত ছিল। পুষ্পিতা ভাবিল, একখানি টেবল-ক্লথ বিছাইয়া তাহার উপর বইগুলি গুছাইয়া রাখিবে। বইগুলি সযত্নে—অঞ্চল দিয়া মুছিয়া পুষ্পিতা ধীরে ধীরে সেগুলি নীচে নামাইয়া রাখিল। তার পর ভাবিল, কোথা হইতে টেবল-ক্লথ লইবে, তাহার নিজের কাছে টেবল-ক্লথ ছিল না। সরোজের কোন একটা বাক্সে টেবল-ক্লথ ছিল, তাহা সে জানিত। বাক্সের চাবিও সরোজ রাখিয়া গিয়াছে। পুষ্পিতা আপন ঘরে গিয়া তাহার নিজের বাক্স খুলিয়া সরোজের চাবির গোছা লইয়া আসিল। একটা বাক্স খুলিয়া দেখিল, তাহাতে নাই। তার পর একটা বড়গোছের বাক্স খুলিয়া উপরেই বেশ সুন্দর একখানি টেবল-ক্লথ পাইল। ধীরে ধীরে সেখানি তুলিয়া লইল। তুলিয়া লইতে তাহার হাত উঠিল বটে, কিন্তু দৃষ্টিকে আর সেখান হইতে সরাইতে পারিল না। অগাধ বিস্ময় ও গভীর বেদনাভরা নেত্রে সে তাহার নব-লব্ধ বস্তুর পানে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টি আর সেখান হইতে উঠিল না। ক্রমে পুষ্পিতার বক্ষ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হইল। শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে এক হাত দিয়া বাক্সের এক দিক্ ধরিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল; অপর হস্তে সেই অপ্রত্যাশিত বস্তুটিকে ধরিয়া বাক্স হইতে বাহির করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

সেখানি হিমাদ্রি ও পুষ্পিতার একসঙ্গে তোলা সেই ফটো!

মেঝের উপর রাখিয়া পুষ্পিতা সেই ফটোখানিকে সম্মুখে স্থাপিত করিল। তাহার সারা দেহ যেন চক্ষু হইয়া ছবিখানির পানে চাহিয়া রহিল। হিমাদ্রির সেই শান্ত স্থির সুন্দর মূর্ত্তি, সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সেই বিশাল উদার বক্ষঃ! পার্শ্বে পুষ্পিতার নিজের ছবি, দক্ষিণ হস্তখানি হিমাদ্রির স্কন্ধের উপর রক্ষিত, বাম হস্ত হিমাদ্রির জানুর উপর, মুখখানি হিমাদ্রির দিকে ঈষৎ ফিরানো। নীচে সরোজের নিজের হাতের লেখা "নির্ভরতা।"

মনের মধ্যে বিদ্যুচ্চালিত স্মৃতিসাগর-মথিত ছবিগুলি একে একে খেলিয়া গেল। কত দিনের আগেকার সেই সূর্য্যাস্তের কাল, তরুশিরে গৃহচূড়ায় সেই সূর্য্যের শেষ রক্ত-রশ্মি, সে আর হিমাদ্রি পাশাপাশি বসিয়া, সরোজ তাহাদের পানে চাহিয়া ফটো তুলিতেছে। সেই সরোজ বলিতেছে, "এই রকম চমৎকার নির্ভরতার ছবি মুখে থাকা চাই; আমি যে কাছে আছি, দু'জনে ভুলে যাও, আমি কোথাও নেই, কোনখানে নেই: শুধু তুমি আর হিমাদ্রি সারা পৃথিবীর মধ্যে আছে। আর কোথাও কেউ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, কি তাঁহার অসীম প্রেম, জীবনব্যাপী কি তাঁহার গভীর অনুরাগ! জীবনে কোন দিন কোন ইচ্ছা, কোন অভিলাষ অপূর্ণ রাখেন নাই। দিয়াই তাঁহার তৃপ্তি ছিল, আনন্দ ছিল। লইবার কথা কখন ক্ষণেকের জন্যও ভাবিতেন না। আর কি ছিল তাঁহার বিশ্বাস! এত অনুরাগ যে, মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়া গেলেন, তুমি বিবাহ করিও, আমার শেষ অনুরোধ, ইহাতেই আমার আত্মার তৃপ্তি। পাছে আইনমতে সম্পত্তিতে কোন গোলযোগ হয়, উইলেও উল্লেখ করিয়া গেলেন—পুনরায় বিবাহ করিলেও দত্ত সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইবেন, তাহাতে তাঁহার দান-বিক্রয়ের সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে।

তিনি না হয় ভালবাসিতেন তাই, তাহার ম্লানমুখ কখন সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই বলিয়া গেলেন; কিন্তু সে হতভাগিনী তেমন প্রেম কি করিয়া ভুলিল? কোন্ মুখে সে আবার বিবাহে সম্মতি দিল? সে সময়ে তাহার পোড়া মুখ আগুনে কেন পুড়িয়া গেল না? এমন প্রেমের সে এই প্রতিদান দিল!

পিতামাতা—তাঁহারা ত তাঁহাদের স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিবেন। আমি তাঁহার কাছে কতখানি পাইয়াছি, তিনি আমার কতখানি ছিলেন, তাঁহারা সে কথা জানিবেন কি করিয়া? সে কেন বলিল না—বিবাহ সে করিবে না—তাহার স্বামী তাহার কোন অভাব রাখেন নাই। সেই পবিত্র প্রেমের স্মৃতিটুকু বুকে রাখিয়া সে বাকী জীবনটা হাসিমুখেই কাটাইয়া দিবে। সে যে প্রেম একজন্মে পাইয়াছে, তাহার মূল্যস্বরূপ প্রেমাস্পদকে সে ভুলিতে চলিয়াছে! অন্যকে তাঁহার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে!

পুষ্পিতার মন হইতে অন্য সকল বিষয়ের চিন্তা দূরে সরিয়া গেল, পিতামাতার কষ্ট, সরোজের দুঃখ-বেদনা সব মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। সেই কক্ষতলে লুটাইয়া হিমাদ্রির ছবির পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া সে বার বার বলিতে লাগিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। বারেকের জন্য তোমায় ভুলিয়া তোমার প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়াছি, আপনার হৃদয়কে অপবিত্র করিয়াছি। আমি ভুল করিয়াছি, পাপ করিয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা কর।"

পুষ্পিতার অবিরল অশ্রুধারায় কঠিন হর্ম্যতল সিক্ত হইতে লাগিল।

২৯

গভীর রাত্রিতে সরোজ কলিকাতা হইতে ফিরিল। সঙ্গে করিয়া সে পুষ্পিতার জন্য খান কয়েক বই আর একটি সুনির্ব্বাচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও দুইখানি মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য কঙ্কণ আনিয়াছিল। পুষ্পিতার যে হাতখানি সে অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই হাতের জন্য সে কঙ্কণ কিনিয়া আনিয়াছে। সরোজ স্থির করিয়া আসিয়াছে, আজ রাত্রিকালেই নিজ হাতে পুষ্পিতাকে এই কঙ্কণ দুই-গাছি পরাইয়া দিবে।

বস্ত্রমণ্ডিত পরিচ্ছদ ও কঙ্কণ দুইগাছি হাতে লইয়া সে তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। দাস-দাসীরা উৎকণ্ঠিত মুখে যে কিছু বলিতে-যাইতেছিল, তাহা সে লক্ষ্যও করিল না।

উপরে উঠিয়া সরোজ পুষ্পিতাকে না দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইল। তাহা হইলে পুষ্পিতা এখনই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? কিন্তু তাহার উদার চিত্তে সে ক্ষোভ বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে স্থির করিল, বসিয়া বসিয়া নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়াছে।

ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি শোবার ঘরে?"

পাচিকা সম্মুখে আসিয়া কাঁদিয়া কহিল, "বাবা, মা আজ সন্ধ্যার আগে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, এখন পর্য্যন্ত

ফেরেন নি। এরা সব সেই থেকে সমস্ত সহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও তাঁর দেখা পায় নি।"

সরোজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি অপ্রত্যাশিত সংবাদ! সে ব্যস্ত হইয়া পুষ্পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ভাবিল, কক্ষে হয় ত এমন কিছু পাইবে, যাহাতে পুষ্পিতার সন্ধান মিলিতে পারে। সেখানে গিয়া দেখিল, কক্ষের কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কোন সন্ধানের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই!

কি হইল? পুষ্পিতা তবে কোথায় গেল? সরোজ কম্পিতপদে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। মনে হইল, তাহার শয্যাটি কে যেন সযত্নে ঝাড়িয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও কি, উপধানের উপর একখানা পত্র না?

এক প্রকার দৌড়াইয়া আসিয়া সরোজ পত্রখানি হাতে তুলিয়া লইল। কম্পিত হস্তে খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভিতরকার পত্রখানি বাহির করিয়া কম্পিত-বক্ষে পড়িল—

"তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমায় অনেক দুঃখ দিয়াছি, আজ শেষ দুঃখ দিয়া চলিলাম, আমায় ক্ষমা করিও।

তুমি চলিয়া গেলে আজ দুপুরে তোমার কক্ষটি গুছাইতে আসিয়াছিলাম। তোমার বাক্স খুলিয়া টেবল-ক্লথ বাহির করিতে গিয়া সেই ফটোখানি—যাহা তুমি তুলিয়াছিলে, বহু দিনের পরে দেখিলাম। মুহূর্ত্তে সব মনে পড়িয়া গেল। কি করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়াছি ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এই ভালবাসা—মরণে যাহার বিনাশ নাই! তোমার নিজের হাতের লেখা "নির্ভরতা" কথাটি পরিহাস-পূর্ণ তিরস্কারের মত চক্ষুকে বিদ্ধ করিল—মনকে আঘাত করিল!

এত কাল পরে তাঁহার ছবি দেখিয়া সমস্ত সংসার ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার দেবদুর্লভ সুন্দর ও পবিত্র মুখের পানে চাহিয়া, তাঁহার উদার প্রেমের কথা ভাবিয়া, ধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাই আমি আজ এখান হইতে চলিলাম। কলিকাতাতেও আমি আর ফিরিব না। সেখানে গেলে মায়ের কথায় আবার হয় ত আমার চিত্তের বল হারাইব। আবার হয় ত তাঁহার কাছে অবিশ্বাসিনী হইব। তাঁহার স্মৃতির মূল্য না বুঝিয়া তাঁহার আত্মার অবমাননা করিব। তাই আজই আমি আমার শাশুড়ীর কাছে চলিলাম। তিনিও তাঁহার পুত্রের স্মৃতি বুকে করিয়া সেখানে পড়িয়া আছেন—আমিও আমার স্বামীর স্মৃতি বুকে ধরিয়া সেখানে তাঁহার কাছে থাকিব।

তোমায় না বলিয়া এই ছবিখানি তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। এই ছবিখানি সম্বল করিয়া আমি চলিলাম। ইতি—

পুষ্পিতা।"

পত্র শেষ করিয়া সরোজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পত্রে পুষ্পিতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছে—অথচ সে প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই! যাহার কথা ভাবিয়া পুষ্পিতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে যে তাহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তম বন্ধু। তেমন অকৃত্রিম বন্ধু যে জগতে দুর্লভ। চোখের সম্মুখে খেলিয়া গেল তাহাদের দুই জনের কৈশোরের যৌবনের কত মধুর ছবি। কোথা গেল সেই সুধাভরা মুহূর্ত্তগুলি—যাহার মধ্যে দুই জনে মিলিয়া কত সুন্দর স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, কত অভিনব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে—রামধনুর মত কত বিচিত্র বর্ণের ভাবরাশি অনুভব করিয়াছে!

সরোজের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বিন্দু বিন্দু করিয়া সেই অশ্রু, যে কক্ষতলে পুষ্পিতার অশ্রু ঝরিয়াছিল, সেখানে ঝরিতে লাগিল। কিন্তু কাহার জন্য? যে বন্ধুকে সে জীবনে কোন দিন ভুলে নাই, তাহার জন্য, না, যে একমাত্র নারীকে সে জীবন ভরিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য, না, তাহার নিজের জন্য? কে বলিবে, আজিকার দিবাভাগে ও নিশাকালে এই কক্ষে অভিনীত দৃশ্যদুইটি দেখিয়া তাহাদের দুই জনই যাহাকে ভালবাসিত, সেই হিমাদ্রির মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়াছিল, না দুঃখের অশ্রু ঝরিয়াছিল?

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

সমাপ্ত

নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সমীপেষু,—

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে আপনার প্রবন্ধ "নারীর কর্ত্তব্য" পাঠ করিলাম।

মা, আপনার বিদ্যাবুদ্ধি সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেই সার্থক হইত, যেমন শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর হইয়াছে। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের এবং দুঃখের বিষয় যে, আপনি কোথায় শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর এই শুভ চেষ্টায় তাঁহার সহায় হইবেন, তাহা না হইয়া আপনি অতিশয় উষ্ণতার সহিত তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আপনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না, তাঁহার ভাষা বড়ই শ্রুতিকটু, তাঁহার রচনার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই, তাঁহার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এ সব কিছুই তিনি জানেন না। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে আক্রমণ করিবার আগ্রহে আপনি কতকগুলি ভ্রান্ত বাক্য বলিয়াছেন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন,—এক ভাগ নর, অপর ভাগ নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও এ কথা নাই। এই প্রসঙ্গে আপনি অশোভন উল্লাসের সহিত শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, পূর্ব্বমীমাংসা, এবং শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও মনীষীর গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কোথাও এই অপরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব দেখা যায় না। অথচ বৃহদারণ্যক উপনিষদেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাওয়া যায়।

"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্"

১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

"তিনি (প্রজাপতি) এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল।"

দেখা যাইতেছে যে, আপনি আপনার প্রবন্ধে বেদবেদান্ত এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ সে সকল গ্রন্থ পড়েন নাই। ইহা মনে করিবার আর একটি কারণ এই যে, আপনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিরোধ দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় থাকিলে আপনি এ ভুল করিতেন না। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসৃষ্টির পর প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত বিরাট দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভুল দেখাইতে গিয়া আপনি এইরূপ শোচনীয়ভাবে নিজ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পরই বলিয়াছেন, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর এই ভাবে যেখানে সেখানে বেদান্তবাক্য ভ্রান্তভাবে উদ্ধৃত করা, হোলির সময় বালকদের যেখানে সেখানে অশ্লীল গান গাহিয়া বেড়ানর মতই অশোভন হইয়াছে। বলিতে বাধ্য হইলাম যে, এই উপমাটি বড়ই কুরুচির পরিচয় দিতেছে। অধিকন্তু ভুল শ্রীমতী অনুরূপা দেবী করেন নাই, ভুল আপনিই করিয়াছেন। দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। আর একটি আপনার ভুল দেখাই। আপনি একটি বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"একোঽহং বহু স্যাম্"। এরূপ বাক্য বেদান্তে নাই, আছে "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়"।

আপনার বহু অবান্তর-কথায় পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে বক্তব্য বিষয় এই,—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পরিণতবয়সে বিবাহ, স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং যৌথ-পরিবারপ্রথা লঙ্ঘন করা—এইগুলির নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে আপনার বড় ক্রোধ হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, "মুসলমান শাসনের মধ্যযুগে তদানীন্তন দেশকালের প্রয়োজনবোধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নবপ্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সনাতন শাস্ত্রীয় বিধান ব'লে প্রচার" করা হইতেছে। ইহা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে প্রথাগুলির নিন্দা করিয়াছেন, মনুসংহিতাতে প্রায় সবগুলিরই নিন্দা আছে। অতএব আপনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, এগুলি মুসলমান যুগের নিদর্শন? মনু বালিকার বিবাহের বয়স ৮ হইতে ১২ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরিণতবয়সে নহে। ৯।৯৪। স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ (৩.৩২), মনু গান্ধর্ব্ব বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন (৩।৪১)। ইহাকে দুর্ব্বিবাহ বলিয়াছেন। (৩।১২) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা। ৩।১৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রা স্ত্রী নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৩।১৫ শ্লোকে হীনজাতি হইতে স্ত্রী গ্রহণ করার অত্যন্ত নিন্দা করা হইয়াছে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে ৫।১৬০। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।" * বিবাহ-বিচ্ছেদের নিন্দা আছে ৫।১৫৬, ৫।১৬৩। অবশ্য মনুর বিধান আপনি মান্য করিবেন, এরূপ আশা করি না। তথাকথিত প্রগতিশীল দলের মধ্যে অনেকে হয় ত মনে করেন, বিবাহ একটা অনুন্নত যুগের প্রথা, উহা উঠাইয়া দিয়া অস্থায়ী চুক্তি প্রবর্ত্তন করাই উচিত। সুতরাং মনুর বচন তুলিয়া আপনাদের মত-পরিবর্ত্তন করা যাইবে, এ আশা নাই। তথাপি যে তুলিলাম—তাহার কারণ, আপনার ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া; আপনি যে বলিয়াছেন, হিন্দুর

---

* ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

মনু ৯।৬৫

"বিবাহবিধিতে বিধবার পুনরায় বিবাহের কথা কোথাও নাই।"

ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ মৃতে পরস্য তু।

মনু ৫।১৫৭

"পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না।"

বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা-সমূহ প্রাচীন প্রথা নহে, মুসলমান যুগে এই সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আপনার এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকটি স্বয়ম্বরের দৃষ্টান্ত আছে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে যুগে বালিকা-বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। অধিকন্তু সে সকল স্থলেও মনুর অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করা হয় নাই। মনুর অভিপ্রায় এইরূপ যে, ঋতুর পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ হইবে (৯।৯৪)। বড় জোর ঋতুর পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায় (৯।৯০)। যদি তাহার মধ্যে কন্যার পিতা বা অভিভাবকগণ তাহার বিবাহ না দিতে পারেন, তাহা হইলে কন্যা আর অপেক্ষা করিবেন না, স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবেন। স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করা, নিন্দনীয় (মনু ৩।৪১)। কিন্তু বিলম্বে বিবাহ আরও নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে যাহা কম নিন্দনীয়, মনু তাহারই বিধান দিয়াছেন। ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহই সাধারণ নিয়ম, (৯।৯৪)। বিলম্বে বিবাহ এবং স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত বিবাহ ইহার ব্যতিক্রম। *

আপনি লিখিয়াছেন, সীতা স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত পতি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? সীতার পতি তাঁহার পিতা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রীতিমত বাল্যবিবাহই হইয়াছিল।

* মনু ৯।৮৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

"কন্যা ঋতুমতী হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত গৃহে থাকুক, ইহাও ভাল, কিন্তু গুণহীন পাত্রে ইহাকে কখনও অর্পণ করিবে না।" এই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সদ্‌গুণসম্পন্ন পাত্র না পাওয়া গেলে ঋতুর পরেও বিলম্ব করা যায়। ৯।৯০ শ্লোকে মনু বলেন,

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্‌।

কুমারী ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে স্বজাতীয় পতি স্বয়ং বরণ করিবে।

ইহার পরের শ্লোক এই:—

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌ যদি স্বয়ম্‌।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।

"পিতা প্রভৃতির দ্বারা বিবাহ দেওয়া না হইলে, কন্যা যদি স্বয়ং পতিবরণ করে, তাহা হইলে তাহার কোনও পাপ হয় না, বরেরও কোনও পাপ হয় না।"

এই শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সচরাচর পিতা বা অন্য অভিভাবকই পাত্র মনোনয়ন করিবেন; পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কন্যা স্বয়ং পাত্র মনোনয়ন করিলে পাপ হইবে। কিন্তু ঋতুর পর তিন বৎসরের মধ্যেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাতে দোষ হইবে না।

তখন শ্রীরামচন্দ্রের বয়স ছিল পনের—"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ" এবং সীতার বয়স ছিল সাত।

আরণ্যকাণ্ড, ৪৭ অধ্যায়, ৪, ১০, ১১ শ্লোক।

আপনি পরাশরের শ্লোক তুলিয়াছেন,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

আপনি বলিয়াছেন যে, এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা divorce-এর বিধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যেরই প্রশংসা করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।"

"স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্মচারীর ন্যায় মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।" মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থেও স্বামী জীবিত থাকুন, অথবা মৃত হউন, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের নিন্দা আছে। সেই সকল বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আপনার উদ্ধৃত পরাশরবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নচেৎ সেরূপ ব্যাখ্যায় পরাশরের নিজের বাক্যগুলিই পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যে মনুস্মৃতিকে পরাশরের গ্রন্থের প্রারম্ভে অত্যন্ত প্রশংসা করা হইয়াছে, সে মনুস্মৃতির সহিত বিরোধ হয়, সেরূপ ব্যাখ্যা কখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এইভাবে সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হইবে যে, উক্ত শ্লোকে "পতি" অর্থে বিবাহিত স্বামী নহে, যাঁহার সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া বাগ্‌দান করা হইয়াছে, "পতি" শব্দের অর্থ এরূপ ব্যক্তি। এ ব্যাখ্যা আপনার বোধ হয় মনঃপূত হইবে না। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা সমর্থন জন্য আপনি প্রাচীন ভারতে আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি? অতএব আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন;—তাহাতে দুইটি দোষ হইতেছে [১] পরাশরের অন্য বাক্যের সহিত এবং মন্বাদি প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারের বাক্যের সহিত বিরোধ হইতেছে, [২] আপনার ব্যাখ্যানুযায়ী কোনও দৃষ্টান্ত প্রাচীন আর্য্য সমাজে পাওয়া যায় না। অপর ব্যাখ্যার কেবল এইমাত্র দোষ যে, পতি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে হইতেছে। সুতরাং কাহার ব্যাখ্যার দোষ বেশী? অপর বাক্যের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য শব্দবিশেষের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, ইহা সুবিদিত। ব্রহ্মসূত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আপনি নব্য তান্ত্রিকদের ধর্ম্মগুরুরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি-প্রতিপাদিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অসবর্ণ-বিবাহ, এ সকল কোথাও সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েদের লজ্জা ও ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং প্রগতিশীল যে সকল নারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি যা কিছু ভক্তি দেখান, তাহা কেবলমাত্র মৌখিক ভক্তি, উহা কখনই আন্তরিক ভক্তি নহে।

আপনি বলিয়াছেন, "ভারতের তপোবনবাসী ঋষিগণের দীর্ঘসাধনলব্ধ যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, তা শাশ্বত সত্য।" কিন্তু



বসুমতী-চিত্রবিভাগ] তন্ময় [শিল্পী—কুমারী আশালতা দাস।

[সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ৺প্রিয়গোপাল দাসের কন্যা]

আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে সকল ঋষি এইরূপ দীর্ঘ-সাধন দ্বারা অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সমাজের কল্যাণের জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ উপনিষদুক্ত জ্ঞান এবং উপনিষদ্‌বাক্যে পরিপূর্ণ। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ঋষিদের সাধনালব্ধ দিব্যজ্ঞান বিদ্যমান আছে, আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া বলিয়াছেন, সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক বিধি যুগে যুগেই পরিবর্ত্তনশীল। সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা সকল পরিবর্ত্তনশীল, আপনার এই উক্তি যথার্থ নহে। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষেধ, অসবর্ণ-বিবাহ নিষেধ এ সকল মনুর সময় হইতে প্রচলিত আছে, রঘুনন্দনের নূতন ব্যবস্থা নহে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পরবর্ত্তী স্মার্ত্তকার কেবলমাত্র স্থানবিশেষে অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছেন, কোথাও নূতন অধিকার দেন নাই। যেমন পূর্ব্বে নিয়োগপ্রথার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে উহা নিষিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, কলির মানব দুর্ব্বলচিত্ত, পূর্ব্বে যে কার্য্য করিলে পাপস্পর্শের আশঙ্কা ছিল না, এক্ষণে সে কার্য্য করিলে চিত্ত মলিন হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল কোনও কোনও স্থলে পরিবর্জ্জন হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ কিছু পরিবর্জ্জন হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, তাহার কিছুই মানিবার প্রয়োজন নাই, যেরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকেই যুগোচিত পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে করিতে হইবে,—এ সকল বাক্য স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। এইরূপ পথে চলিলে সমাজের সমূহ অকল্যাণ হইবে। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা স্মৃতিগ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাধু পুরুষগণ কেহই সে সামাজিক ব্যবস্থার নিন্দা করেন নাই। দার্শনিক সিদ্ধান্ত লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা-বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। সকলেই গীতার বাক্য মানিয়াছেন. গীতা বলিয়াছেন, "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" "কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা উচিত নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ"—নিজ নিজ বুদ্ধি প্রমাণ হইতে পারে না।

যে সকল ব্যবস্থার ফলে আত্মসংযম, পরোপকার, ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি হয়, বিলাস, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সঙ্কুচিত হয়, প্রাচীন ঋষিগণ গভীর চিন্তা সহকারে সেইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কখনই প্রয়োজন হয় না। খৃষ্টান ধর্ম্মে যে দশটি অনুশাসন আছে (ten Commandments), তাহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল কোনও কোনও জনপ্রিয় পাশ্চাত্য লেখক প্রচার করিতেছেন বটে যে, এই সকল আদেশ মানিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী *। খৃষ্টানধর্ম্মের দশটি অনুশাসন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদের ঋষিগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, উহা এক দিকে বিপথে যাইবার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবে, অপর দিকে পদস্খলনের সম্ভাবনা কমাইয়া দিবে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকল সাধুপুরুষ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। সামাজিক বিধি-নিষেধ মানুষকে জড় করিয়া দেয় না, বাহ্যবিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি কমাইয়া দিয়া অসীম আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ উপস্থিত করিয়া দেয়।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলিয়াছিলেন, "আর কোনও দেশ এমন ক'রে মতবিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পায় নি।" আপনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বিবিধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিবিধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ত শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অস্বীকার করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এত বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবার কারণ এই যে, বিভিন্ন মানবের প্রবৃত্তি বিভিন্ন, এক সাধনপথ সকলের উপযোগী নহে। শাস্ত্রকারগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই বিভিন্ন পথ—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "কোলাহল মারামারি দাঙ্গার" কথা আপনি বড়ই অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। দেশী বিদেশী সকল সমালোচকই হিন্দুজাতির শান্তিপ্রিয়তা ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছেন। অথচ তাহা আপনার দৃষ্টিতে পড়ে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

আপনি লিখিয়াছেন, "যে দেশে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র ও ষড়্-দর্শনের মত উচ্চ অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হয়েছিল, সে দেশে অস্পৃশ্যতাবাদের মত হীন সংকীর্ণতার অস্তিত্ব কি বিস্ময় ও বেদনাকর নয়?" আপনার এই মত, আপনার প্রবল হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষের পরিচায়কমাত্র। অস্পৃশ্যতাবাদ হীন সংকীর্ণতা নহে। ইহা সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর স্বাভাবিক নিয়ম। ইহার ফলে উচ্চ জাতির পক্ষে শৌচাচার রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা নীচজাতিকে উচ্চজাতির আক্রোশ হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। বিলাতী হোটেলের ভোজনপাত্রগুলি আপাততঃ পরিষ্কার দেখায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে সেগুলি উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণায় পরিপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যহ ধৌতবস্ত্র পরিত্যাগ করা, মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচাচার পালন করা, প্রাতঃকালে দন্তমঞ্জন করা, প্রত্যহ স্নান করা, এই সকল বিষয়ে হিন্দুদের প্রথা পাশ্চাত্যদেশীয় প্রথা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আচারহীন ব্যক্তিদিগের সহিত অবাধে মেলামেশা করিলে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের পক্ষে এই সকল শৌচাচার রক্ষা করা সম্ভব হইত না। যে ব্যক্তি বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করে না, তাহার হাতে যদি জল খাই, তাহা হইলে আমার নিজের পক্ষে মলত্যাগের পর বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের কোনও সার্থকতা থাকে না। অস্পৃশ্যতা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক

* এক জন বিখ্যাত আধুনিক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, যেখানে শাস্ত্রের আদেশ আছে Thou Shalt, সেখানে আধুনিক নরনারী প্রশ্ন করিবে Why should I? যেখানে আদেশ আছে Thon Shalt not, সেখানে তাহারা প্রশ্ন করিবে—why should I not?

বস্তুজাতীয় লোক জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। পাশ্চাত্যে অস্পৃশ্যতা নাই, কিন্তু lynch law আছে, অস্পৃশ্যতা নাই, কিন্তু Red Indian, Hottentot প্রভৃতি আদিম জাতি বন্যপশুর ন্যায় নিহত হইয়া প্রায় সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দিলেই যে lynch law আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমি ইহা বলিতেছি না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অস্পৃশ্যতা থাকা সত্ত্বেও আদিম জাতির প্রতি হিন্দুর ব্যবহার পাশ্চাত্য-জাতির ব্যবহার অপেক্ষা ভাল। অসভ্য লোকদের কতকগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, তাহাদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিলে সেই দোষগুলি বড় উগ্রভাবে দেখা দেয়, তাহার ফলে সমাজে তাহাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পায়। সম্প্রতি Bernard Shaw বলিয়াছেন, বিলাতেও ধনিগণ শ্রমজীবিগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অস্পৃশ্যকে ঘৃণা করিবে না, নিজ শৌচাচার-রক্ষার জন্য তাহার স্পর্শ এড়াইয়া চলিবে। অবশ্য অস্পৃশ্যতার বিকৃতি হইলে ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু বিকৃত হইলে সকল ভাল দ্রব্যই ত' খারাপ হইয়া থাকে। অস্পৃশ্যতা প্রথা বিকৃত হইলে যে খারাপ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। অস্পৃশ্যতা না থাকিলে মুসলমান-বিজয়ের পর বিজিত হিন্দুজাতি মুসলমানের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইত—ইংলণ্ডে যেরূপ হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, হইলে স্ত্রী রজঃস্বলা হইলে স্পর্শ করিবার নিষেধ থাকিত না; স্নান করিয়া শুচি বস্ত্র পরিয়া ব্রাহ্মণ পূজা করিতে যান, তখন তিনি পুত্রকেও স্পর্শ করেন না, তাহার কারণ ঘৃণা নহে; বিধবা ভোজনের সময় নিকটতম আত্মীয়কেও স্পর্শ করেন না, তাহাও ঘৃণাপ্রসূত নহে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন,—হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি মহাপ্রভুর অপর ভক্তদের সহিত একত্র বসিতেন না, "পিণ্ডার তলে" বসিতেন, অপর ভক্তগণ "পিণ্ডার উপরে" বসিতেন। অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে আছে, যে শ্রীচৈতন্যদেব—

"পিণ্ডার উপরে বসিলা লৈয়া ভক্তগণ।
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে।"

মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে আছে—

"হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
* * * *
এই কথা লোকে গিয়া প্রভুকে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল।"

অস্পৃশ্যতা যদি "হীন সংকীর্ণতা" হইত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে "অস্পৃশ্যতার" অস্তিত্ব দেখিয়া সুখী হইতেন না। বলা বাহুল্য, হরিদাস, রূপ, সনাতনের মন্দিরপ্রবেশ নিষেধ হইলেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু কম হয় নাই।

ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ভিন্ন মন্দির, নিম্নবর্ণের ভিন্ন মন্দির; পাশ্চাত্যদেশে ধনীর ভিন্ন ভজনালয়, দরিদ্রের ভিন্ন ভজনালয়। জন্মকৃত অধিকারভেদ তুলিয়া দিলে অর্থগত অধিকারভেদ আসিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। ধর্ম্মবিষয়ে অর্থকৃত ভেদ সুশোভন নহে। নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া যে হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাহার মন্দিরপ্রবেশ-নিষেধ ঘৃণার পরিচায়ক নহে।

আপনি লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেব যদি যবন হরিদাসকে না কোল দিতেন, অস্পৃশ্যদের না বুকে টেনে নিতেন, তা হলে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ আজ মুসলমান হ'য়ে যেত।" ইহা লিখিবার সময় আপনার ধারণা ছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব অস্পৃশ্যতা-প্রথা সমর্থন করিতেন না। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আপনার এই ধারণা ভ্রান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নীচজাতিকে স্পর্শ করিতেন, আলিঙ্গন করিতেন, কারণ, তিনি সন্ন্যাসী; অতএব বিধিনিষেধের অতীত। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-প্রথার অস্তিত্ব দেখিয়া তিনি এই প্রথার নিন্দা করেন নাই, সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব সমর্থন করিয়াছিলেন। তার পর আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবেই সমস্ত বাঙ্গালা দেশ মুসলমান হইয়া যায় নাই। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা কম হইত এবং অন্য প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ও পঞ্জাব ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাই অনেক বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম; বাঙ্গালা ও পঞ্জাবে হিন্দুর সংখ্যা কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশী। অতএব আপনার যে ধারণা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙ্গালা-দেশের লোক মুসলমান হয় নাই, ইহাও সম্পূর্ণ ভুল।

আপনি এক স্থানে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশংসা করিয়াছেন, আবার অন্যত্র বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, আদি, নববিধান, ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি "বর্ষার ভেক-ছত্রের মত নিয়ত ভারতবর্ষের বুকে গজিয়ে উঠেছে।" আপনার মতির স্থিরতা দেখা যায় না।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ভারত-নারীকে "জগৎপূজ্যা" বলাতে আপনি যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের কোনও নারী জগৎপূজ্যা হন নাই। আপনি বলিয়াছেন, "জগৎপূজ্যা হ'তে হ'লে প্রাণটা বিশাল হওয়া চাই, * * * জগতের সঙ্গে তাঁর মনের আদান-প্রদান হওয়া দরকার।" আপনি আরও বলিয়াছেন যে, "শ্রীমতী অনুরূপা দেবী দেশপূজ্যা এবং জগৎপূজ্যায় গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।" গোলমাল তিনি কিছু করেন নাই। আপনিই জগৎপূজ্য এবং জগৎপূজিত এই দুইটি কথায় গোলমাল করিয়াছেন। পূজ্যা অর্থাৎ পূজার যোগ্য পূজা-মর্হতীতি পূজ্যঃ—অর্হার্থে ণ্যৎপ্রত্যয়। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক আর্য্য-রমণীগণ যে জগতের পূজার যোগ্যা ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, ধর্ম্মের জন্য শত দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন সানন্দচিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারেন, তিনিই জগতের পূজার যোগ্য হইয়া থাকেন। জগৎ-পূজ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি খৃষ্টের নাম করিয়াছেন। কিন্তু আপনি বলিতে পারেন কি, তাঁহার জীবিতকালে তিনি জগতের কত বিভিন্ন দেশের, কত বেশী লোকের সহিত তাঁর "মনের

আদান-প্রদান" করিতে পারিয়াছিলেন ? বুদ্ধদেবই বা তাঁহার জীবিতকালে ভারতের বাহিরে জগতের কত লোকের সহিত তাঁর মনের আদান-প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন ? তথাপি ইঁহারা জগৎপূজ্য হইলেন কেন ? কারণ, ইঁহারা ধর্ম্মের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। সীতা ও সাবিত্রী ধর্ম্মের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ অপরূপ সৃষ্টি দেখাইতে পারেন কি ? রামায়ণের সীতা এবং ইলিয়ডের হেলেন উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই কি ? হেলেনকে অন্য পুরুষ ধরিয়া লইয়া গেল। হেলেন স্বচ্ছন্দে তাহাকে বিবাহ করিল। আর সীতা সহস্র নির্য্যাতন এবং প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্র শ্রীরামচন্দ্রেরই চিন্তা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার এ সকল কথা বোধ হয় আপনার অভিমত হইবে না। আপনার ন্যায় নব্যতান্ত্রিকার দৃষ্টিতে বোধ হয় সীতা অপেক্ষা হেলেনের আদর্শই বড় বলিয়া বোধ হইবে। কারণ, আপনাদের দলের লোকের মুখে আজকাল শোনা যায়—সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব বড়। সতীত্ব অপেক্ষা যদি নারীত্ব শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নারীত্ব অপেক্ষা পশুত্বকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কারণ, যেমন সতী অপেক্ষা নারী বড় জাতি (genus), সেইরূপ নারী অপেক্ষা পশু বড় জাতি। সীতা ও সাবিত্রীর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য আপনার চোখে বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তাই আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিয়াছেন, "ভারতনারী আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও কায করতে পারেন নি—যার জন্য সমস্ত জগৎ তাঁকে পূজা দিতে পারে। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতীর প্রাণত্যাগ আমাদের কাছে হয় ত খুব বড় আদর্শ; কিন্তু জগৎ আজও এটাকে মনে করে অমানুষিক বর্ব্বরতা।" আপনার মতটা বোধ হয়, "তথাকথিত" জগতের মতেরই অনুকূল। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুশোকে সকল সুখ আশা বিসর্জ্জন দেন, যে পৃথিবীতে স্বামী নাই,সেখানে জীবনধারণ করাও অসম্ভব মনে করেন,যাঁহার মন স্বামীর চিন্তায় এরূপ তন্ময় হইয়া যায় যে, আগুনের মধ্যে হাত দিয়া হাত পুড়িয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁহার মধ্যে বর্ব্বরতা কোথায় ? বর্ব্বর ত কেবল ইন্দ্রিয়সুখভোগ চাহে। সহমৃতা সতী স্ত্রীর ইন্দ্রিয়সুখভোগাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কল্পনাতীত অসহ্য দুঃখভোগকে তিনি গ্রাহ্য করেন না; তাঁহাকে বর্ব্বর বলা যায় কোন্ কারণে ? আপনি বলিয়াছেন, "জগৎ আজও ওটাকে মনে করে অমানুষিক বর্ব্বরতা।" আমরা ত জানি, বহু বিদেশী ব্যক্তি সহমৃতা রমণীর অলৌকিক সহ্যশক্তি এবং তন্ময়ভাব দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ত' ইহা বর্ব্বরতা বোধ হয় নাই, আপনাদের ন্যায় নব্য তান্ত্রিকদের চক্ষুতেই এরূপ বোধ হয়।

আপনি লিখিয়াছেন, "আজ যুগদেবতার দুর্নিবার গতিবেগে দেশকালের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটেছে।" আমরা ত জানিতাম যে, কুসংস্কার-গ্রস্ত হিন্দুই বহু দেবতার কল্পনা করে, এবং আপনাদের ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী "একমেবাদ্বিতীয়ং" একমাত্র ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এখন দেখিতেছি, আপনাদেরও মতে ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন যুগদেবতা। আরও দেখিতেছি, বর্ত্তমান যুগের যিনি দেবতা, তাঁহার "গতিবেগ" "দুর্নিবার"—অর্থাৎ তিনি ভয়ঙ্কর রকমের ছুটাছুটি করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহাকে থামান যাইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আধুনিক যুগের এই অস্থির যুগদেবতাটি কে ? ইঁহারই কি অপর নাম পাশ্চাত্য-সভ্যতা-জনিত মোহ, যিনি নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ দিয়া এবং স্বেচ্ছাচারিতার নূতন নূতন পথ দেখাইয়া ইংরাজীশিক্ষিত আধুনিক যুবক-যুবতীকে উন্মার্গগামী করিতেছেন, এবং "মাতেব হিতকারিণী" মাতার ন্যায় মঙ্গল-কারিণী শ্রুতি, এবং শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতি ভারতের তপোবনের তাপসকুটীরে যে স্নিগ্ধ প্রদীপালোক জ্বালিয়া পরিপূর্ণ স্নেহ ও কল্যাণকামনা লইয়া বসিয়া আছেন, কিছুতেই সে দিকে নব্যযুবক-যুবতীকে ফিরিতে দিতেছেন না ?—নিজেও ছুটাছুটি করিতেছেন, অনুচর তরুণ-তরুণীদিগকেও ছুটাছুটি করাইতেছেন ? এই অস্থির যুগদেবতার অনুসরণ করিয়া পরিণামে কি ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না ? শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

আগুনের উপর ঘি ঢালিলে যেমন আগুন নিবে না, বেশী জ্বলে, সেইরূপ উপভোগের দ্বারা কামনার তৃপ্তি হয় না, কামনা বাড়িয়া যায়।

এখনও আপনারা সময় থাকিতে সাবধান হউন। ঐ অস্থির যুগদেবতার পশ্চাতে মিথ্যা সুখের আশায় ছুটিয়া ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিবেন না।

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পঙ্কে নেমে এসেছে।" আপনি কেন আপনার উপাস্য যুগদেবতার অপমানকর এ কথা বলিলেন,তাহা বুঝিলাম না। প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া আপনাদের যুগদেবতার কল্যাণে ভারতের ত প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। সকলেই জানেন, বায়স্কোপের দুর্নীতিপরায়ণ চিত্র দেখিতে কি অসম্ভব ভীড় জমা হয়; গলিতে গলিতে রেস্তরাঁ, চা-বিস্কুট, চপ-কাটলেটের দোকান খোলা হইয়াছে; আধুনিক যুগদেবতার বরপুত্র তরুণ কবি ঔপন্যাসিকগণের প্রচারের ফলে শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তিদের ত আর কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ কুসংস্কার, অত্যাচার, অবিচারে পরিপূর্ণ, যে সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বই বড়, সদাচার মানবকে জড়ে পরিণত করে, কদাচার মানবের মহত্ব বাড়াইয়া দেয়; নামাবলী এবং শিখা ত আজকাল উপহাসের বস্তু; মন্ত্রজপ ত বুজরুকি; সিভিল ম্যারেজ এক্ট, সর্দ্দা এক্ট পাশ হইয়াছে; বিবাহবিচ্ছেদ এক্টও ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াছে; রামায়ণ-মহাভারত না পড়িয়াই আমাদের কুললক্ষ্মীগণ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, সভা করিয়া, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিয়া, দ্বিপ্রহর নিশীথে তরুণ বন্ধুর সহিত গড়ের মাঠের নৈশ নীরবতা উপভোগ করিয়া 'বাসে' উঠিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন; মন্দিরে যাওয়া আমাদের শিক্ষিত লোকরা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, তবে আজকাল অস্পৃশ্যদের লইয়া হয় ত মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যাইতে হইবে; ধর্ম্মগ্রন্থের আজকাল আদর নাই, ব্যভিচারের

কাহিনীপূর্ণ উপন্যাসগুলি বড়ই জনপ্রিয়; এত উন্নতি, এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তবুও আপনি বলিবেন, "ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পঙ্কে নেমে এসেছে?" ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

আপনি বলিয়াছেন, "কৃতী সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য সে কালের মায়েদের কারুরই স্বোপার্জ্জিত গৌরব নয়। ওটা তাঁদের পক্ষে ছিল তখন একেবারেই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা।" আপনি এখানে ভ্রমবশতঃ মনে করিয়াছেন যে, পুস্তকপাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় না করিলে কাহারও চরিত্র মহৎ হয় না, এবং এইরূপ শিক্ষা না পাইলে জননীরা সন্তানদের চরিত্রগঠন-বিষয়ে কোনও প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারেন না। এত পুস্তক পাঠ করিয়াও যদি আপনার প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এরূপ শোচনীয় অজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে আধুনিক উচ্চশিক্ষার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা হয়। আপনি কি ইহা জানেন না যে, চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব কে কয়খানি পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বা কয়খানি গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করে না,—করে, ধর্ম্মভাবের উপর? আপনি কি ইহা জানেন না যে, পুস্তক পাঠ না করিয়াও মানব-চরিত্রে উচ্চ ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে পারে? পুস্তক পাঠ করেন নাই অথচ শান্ত, সংযত, শুদ্ধচিত্ত, বিলাসহীন, সেবানিরত, কর্ম্মকুশল, গৃহের সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র,—এরূপ হিন্দু রমণী আপনার দৃষ্টিতে পড়ে নাই, ইহাই কি সত্য? আপনি কি ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, এইরূপ আদর্শ-চরিত্র রমণী আধুনিক অপেক্ষা সেকেলে যুগেই বেশী ছিল, উচ্চশিক্ষিত রমণী অপেক্ষা অশিক্ষিত রমণীর মধ্যেই বেশী ছিল? আপনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইতিহাস মুখস্থ না থাকিলেও পুরাণের ধর্ম্মোপদেশগুলি কিরূপ ইহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে, এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে বিকশিত হইয়া থাকে? আপনি কি ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, Political Economy না পড়িলেও ইহারা কত অল্পব্যয়ে কত নিপুণতা সহকারে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন? এবং যাঁহারা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমোদ-প্রমোদে অনর্থক এবং অনিষ্টকর ভাবে কত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন? অহল্যা বাঈ ও রাণীভবানী যে ক্ষমতা ও পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া অর্জ্জন করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের পত্নী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কয় জন বিদুষী মহিলা তাহা আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে পরদুঃখমোচনের আগ্রহ সঞ্চার করিতে তাঁহার নিরক্ষর জননীর কি কোনই প্রভাব ছিল না? ইংরাজী পড়িয়া আপনি জাতীয় আত্মসম্মান এরূপ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে, মাতৃকুলকে অবজ্ঞা করিয়া ইহা বলিতে আপনার একটুও সঙ্কোচ হইল না যে, কৃতী সন্তানের জননী হওয়া তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত গৌরব নয়, ইহা একেবারে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা?

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

এ কি গো নিঠুর জ্বালা!

সিন্দুর নাই কপালে বালার হাতে নাই রুলি শাঁখা,
পরনে তাহার নাহি লাল শাড়ী, চরণে আল্‌তা আঁকা;
বিম্ব-অধরে রক্তিমরাগ মুছে গেছে চিরতরে,
শোকের শেফালী ঝরিতেছে তার সোণালী দেহের 'পরে।
হিন্দুর কুলবালা—
অল্পবয়সে যোগিনী সেজেছে এ কি গো নিঠুর জ্বালা!

মধুপূর্ণিমা যামিনী তাহার এসেছিল এক দিন,
শরতের চাঁদ আকাশ হইতে করেছিল ব্যথা লীন;
কুমারী-পরাণে কুসুম ঢালিতে এসেছিল এক জন,
সে যে গো তাহার ক্ষীরোদ-সাগর উর্ম্মি-মথন ধন।
হিন্দুর কুলবালা—
চ'লে গেছে সেই, তাই স্মৃতি নিয়ে বহিছে বেদন-জ্বালা!

যে খোঁপাতে তার জাতী যুথি কত ফুটে ছিল মিঠে গন্ধে,
যে বুকের 'পরে মধুচ্ছন্দা নেচেছিল নানা ছন্দে,
আজি সেই বেণী দিয়াছে সঁপিয়া চিতায় আহুতি দিয়ে,
আজি সেই বুক শুকায়ে গিয়াছে শ্মশান করেছে হিয়ে।
হিন্দুর কুলবালা—
অল্পবয়সে যোগিনী সেজেছে এ কি গো নিঠুর জ্বালা!

তারে নিয়ে কভু এয়োতী নারী যায় নাক' জল সইতে—
বরণে তাহার নাহি অধিকার মঙ্গলঘট লইতে।
অর্ঘ্য-ডালা সাজাতে বালার নাহি কোন দাবী-দাওয়া,
শুভ কাযে যত সে থাকে গো দূরে বরাতে আঁধার ছাওয়া।
হিন্দুর কুলবালা—
অল্পবয়সে যোগিনী সেজেছে, এ কি গো নিঠুর জ্বালা!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রেতপুরী

(রহস্যোপন্যাস)

প্রথম সোপান

খোঁড়ার পা খালে

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লণ্ডনের সমৃদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী জন ডিয়ারবর্ণ সেণ্টপল্‌স্ চার্চ্চ ইয়ার্ডে যে অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা তাহার পণ্যশালা হইলেও সে সেখানে যে সকল রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিক্রয় করিত, তাহাদের অধিকাংশই অবৈধ পণ্যব্যবসায়ীরা রাজকর্ম্মচারীদের অজ্ঞাতসারে গোপনে তাহার দোকানে সরবরাহ করিত। তাহাদের এই কার্য্য সুশৃঙ্খলাক্রমে সম্পন্ন করিবারও ব্যবস্থা ছিল। দোকানঘর বলিয়া সেখানে বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল না, তাহার গঠন-প্রণালীতে শিল্প-নৈপুণ্যেরও কোন পরিচয় ছিল না।

অট্টালিকাটিতে চারিখানি বৃহৎ ঘর বা কক্ষ ছিল। কক্ষগুলি গুদাম-ঘরের অনুরূপ, জানালাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশের পথগুলিও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কক্ষগুলি আলোকবর্জ্জিত, ভিতরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতর হু হু শব্দে হাওয়া আসিত। সেই বাতাসে দ্বার-জানালাগুলি হইতে ক্যাঁ-কোঁ শব্দ উত্থিত হইত ; তাহা অত্যন্ত কর্কশ, যেন তাহা প্রেতলোকের রহস্যের আভাস বহন করিয়া আনিত।

এই দোকানের কারবারের অবস্থা যখন অত্যন্ত উন্নত, সেই সময় এই অট্টালিকার একটি গুপ্ত কক্ষে যে সকল লোকের সমাগম হইত, তাহারা অত্যন্ত ভীষণ-দর্শন ও কর্কশ-প্রকৃতি। তাহাদের কণ্ঠস্বর কোমলতাবর্জ্জিত, এবং কার্য্যেও রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহারা সমুদ্রচর বোম্বেটে। তাহারা যে সকল জাহাজে অবৈধ পণ্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিত, সেই সকল জাহাজের মাস্তুলে কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উড়িতে দেখা যাইত, দেখিলে মনে হইত, তাহা শয়তানের বিজয়-কেতন।

অবশেষে কোন বিশ্বাসঘাতক অর্থলোভে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই নিষিদ্ধ পণ্য-ব্যবসায়ের রহস্যভেদ করিলে রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এক দিন রাত্রিকালে সশস্ত্র শান্ত্রীদলের সাহায্যে এই অট্টালিকা আক্রমণ করেন ; তাঁহাদের সঙ্গে লালকুর্ত্তিধারী দুই দল জাহাজী গোরা ছিল।

দোকানের মালিকরাও হীনবল ছিল না ; তাহারা গুপ্তপথে পলায়ন না করিয়া আততায়িগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা পাঁচ জন জাহাজী গোরাকে ও এক জন সার্জেণ্টকে গুলী করিয়া মারিল। কিন্তু দোকানের মালিক বৃদ্ধ রোজার ডিয়ারবর্ণ অজস্র শোণিতপাত করিয়াও আত্ম-রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে সামরিক আদালতে প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহার বিচার হইল না, তৎপরিবর্ত্তে লালকুর্ত্তিধারী গোরারা তাহাকে বাঁধিয়া তাহার নিজের জেটিতে লইয়া গেল, সেই জেটিতেই নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যগুলি জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া যাইত। সেই জেটির উপর তাহারা রোজার ডিয়ারবর্ণকে বিনা বিচারে ফাঁসী দিল। সেই সময় হইতে সেই জেটির নাম হইয়াছে "জল্লাদের জেটি।"

সেই সময়েই এই সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবারের কারবারটি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। তাহারা গোপনে যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিল, তাহা নষ্ট না হইলেও তাহাদের অবৈধ কার-বার বন্ধ হইল। রোজারের বিধবা পত্নী বাণিজ্যব্যবসায় বন্ধ করিয়া হাত-পা গুটাইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। সে তাহার অভ্যস্ত বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করিল না বটে, কিন্তু তাহার পুত্র-কন্যাগণের অধিকাংশই আর সেখানে বাস না করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বংশের অধিকাংশ লোক পিতৃপিতামহের বাসভবন ত্যাগ করিলেও সেই বংশের প্রধান শাখা সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল। কিন্তু এই অট্টালিকায় সুদীর্ঘকাল বাস করিলেও তাহাদের বংশবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ বংশ-লোপের উপক্রম হইল। অবশেষে জুলিয়ান ডিয়ারবর্ণ বৃদ্ধাবস্থায় সেখানে একাকী বাস করিতে লাগিল, তাহার একমাত্র পুত্রও নরহত্যা করিয়া সেই অট্টালিকা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। বৃদ্ধ জুলিয়ান অত্যন্ত কোপন-স্বভাবের লোক ছিল ; সে পুত্রের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিত, এবং এরূপ কৃপণ ছিল যে, তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া কখন একটি পয়সাও গলিত না। পল্লীবাসীরা তাহাকে 'কৃপণের জাসু' বলিয়া ঘৃণা করিত। অনেকের

ধারণা ছিল, সকালে তাহার মুখ দেখিলে বা নাম করিলে সে দিন অনাহারে কাটিবে। অদ্ভুত সংস্কার! আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ডেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রাত্রিতে কদাকার বৃদ্ধ জুলিয়ান ডিয়ারবর্ণ ড্রেসিং গাউনে মণ্ডিত হইয়া একাকী অগ্নিকুণ্ডের নিকট স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল। অগ্নিকুণ্ডের আগুন হইতে উত্তাপ অপেক্ষা চিমনীর ভিতর দিয়া এক একবার ঠাণ্ডা বাতাসের যে দমকা আসিতেছিল, তাহারই তীব্রতা তাহার অধিকতর দুঃসহ মনে হইতেছিল। সেই সঙ্গে সে তাহার সঞ্চিত বিত্তরাশির পরিণাম চিন্তা করিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র অর্থচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইত না। সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত, ততক্ষণ সে ভাবিত, তাহার সঞ্চিত অর্থগুলি সে কি উপায়ে রক্ষা করিবে? সে জানিত, অর্থই এ জগতে মানুষের একমাত্র উপাস্য দেবতা, সেই দেবতা যদি তাঁহার দুর্ভেদ্য লৌহমন্দির হইতে অন্তর্দ্ধান করেন, তাহা হইলে সে কি এক দিনও সেই শোক সহ্য করিতে পারিবে? কাহার আকর্ষণে সে আর সেই প্রেতপুরীতে বাস করিবে?

জুলিয়ান নিস্তব্ধভাবে বসিয়া নতমস্তকে এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, সহসা সে সন্ত্রস্ত শকুনির ন্যায় তাহার কেশবিরল সঙ্কুচিত মাথাটা ঊর্দ্ধে তুলিল। তাহার চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত হইল এবং সে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ইহার কারণ ছিল। সে হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সেই অট্টালিকার দ্বার-জানালাগুলি সর্ব্বদাই বায়ুপ্রবাহে ক্যাঁ-কোঁ বা দুম্‌দাম শব্দ করিত; সেই পরিচিত শব্দে সে অভ্যস্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার কাণে বাধিত না, এবং অস্বাভাবিক বলিয়াও তাহার মনে হইত না; কিন্তু কোন দিকে অন্য কোন রকম শব্দ শুনিলে শিকারী কুকুরের মত সে উদ্যত-কর্ণে চারিদিকে চাহিত, এবং তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িত।

সেই কক্ষের পশ্চাতের প্রাচীরের ঊর্দ্ধে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়নের দিক্ হইতে যে শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহাই তাহার ত্রাসের কারণ। সেই শব্দ কর্কশ বা আকস্মিক নহে, কয়েক মিনিট পূর্ব্ব হইতে 'টুং-টাং-ঠুং' 'টুং টাং-ঠুং'—এইরূপ সুকোমল মৃদুশব্দ সে শুনিতে পাইতেছিল। বস্তুতঃ তাহা অতি ধীরে ও সতর্ক-ভাবে জানালার শার্শি ভাঙ্গিবার শব্দ।

জুলিয়ানের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে দেওয়ালের গায়ে একখানি বড় আয়না ঝুলিতেছিল। আয়নাখানি এ ভাবে সংস্থাপিত ছিল যে, জুলিয়ান যে চেয়ারে বসিয়াছিল, সেই চেয়ারে বসিয়াই সে মাথা না ঘুরাইয়া আয়নার দিকে চাহিয়া, তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সকল অংশ সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইত। সে ক্ষণকাল সেই আয়নার দিকে চাহিয়া শুষ্ক, কুঞ্চিত, বিবর্ণ মুখ বিকৃত করিল, তাহার কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু যেন ঠেলিয়া বাহির হইল। সে তাহার পরিহিত গাউনের প্রশস্তমুখ পকেটে শিরাবহুল শীর্ণ হাতখানি পূরিয়া দিল। যে প্রাচীন বংশে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—সেই বংশে সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না, জুলিয়ানও কাপুরুষ ছিল না, এবং তাহার বার্দ্ধক্য ও জড়তা বশতঃ কেহ তাহার চক্ষুর উপর তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা সে অসহ্য মনে করিত। এ জন্য সে তাহার সঞ্চিত বিত্ত রক্ষা করিবার জন্য দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল। তাহার দেহের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, এবং অনাস্বাদিতপূর্ব্ব উদ্দীপনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার জরাগ্রস্ত দেহে সে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য অনুভব করিল। সেই উন্মাদনা নূতন বলিয়া তাহার মনে হইল। নির্জীব, অবসন্ন ব্যক্তির পেটে উগ্র ব্রাণ্ডি পড়িলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবস্থাও তখন অনেকটা সেই রকম।

সে চক্ষু না ফিরাইয়া আয়নার দিকে চাহিয়াই পশ্চাতের দেওয়ালস্থিত জানালায় একটি চতুষ্কোণ ফুকর দেখিতে পাইল; সেই স্থান হইতে শার্শির কাচ অপসারিত হইয়াছিল। সেই ফুকর হইতে জানালার ছিটকিনি প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে ছিল। জুলিয়ান সেই ফুকরের ভিতর রক্ত-মাংসের একখানি হাত দেখিতে পাইল, হাতখানি ছিটকিনি স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল, তাহার পর এক একবার এক এক চুল করিয়া শার্শির পাল্লা তুলিতে লাগিল।

বৃদ্ধ জুলিয়ান সম্মোহিতের ন্যায় অসাড়ভাবে বসিয়া রহিল। ছিটকিনির মাথা ঘুরাইয়া দিয়াই হাতখানি জানালার বাহিরে অপসারিত হইয়াছিল। তাহার পর

সেই অদৃশ্য হস্তের ধাক্কায় জানালাটি অতি ধীরে উদ্ঘাটিত হইল। অবশেষে চোর-বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দপদসঞ্চারে এক জন লোক সেই পথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

লোকটি দীর্ঘদেহ, কৃশ; একটি প্রকাণ্ড ছতরিওয়ালা হ্যাটের ছায়ায় তাহার মুখমণ্ডল আবৃত থাকায়, বিশেষতঃ টুপীটা সে ভ্রূর উপর নামাইয়া দেওয়ায় তাহার মুখ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহার গলায় একটা কালো 'স্কার্ফ' ছিল, তদ্দ্বারা তাহার মুখের নিম্নভাগ আচ্ছাদিত হইয়াছিল।

লোকটা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, নির্ম্মল আকাশ, কোন দিকে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। মুক্ত বাতায়ন-পথে শুভ্র চন্দ্রালোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই অনাহূত অতিথির সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লাবিত করিতেছিল। সুদীর্ঘ কোটে তাহার দীর্ঘদেহ আচ্ছাদিত; তাহার কোটের কলার উল্টাইয়া তদ্দ্বারা সে কর্ণমূল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। জুলিয়ান আয়নার দিকে চাহিয়াই আগন্তুকের হাতের পিস্তলটি দেখিতে পাইল। চন্দ্রালোকে তাহার দেহ ভাস্কর-ক্ষোদিত দীর্ঘ মূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইল।



বৃদ্ধ জুলিয়ান আয়নায় পশ্চাতের দৃশ্য দেখিতেছে

জুলিয়ানের বার্দ্ধক্যের জড়তা চক্ষুর নিমেষে অন্তর্হিত হইল; সে চেয়ার হইতে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং আগন্তুক আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের পূর্ব্বেই জুলিয়ান তাহার ললাটে পিস্তলটি উদ্যত করিল, তাহার মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নমস্কার মিঃ চোর-চূড়ামণি, মিঃ সিঁধেল, অথবা তস্কররাধিরাজ,—অথবা এই সম্ভ্রান্ত পেশা অনুসারে তুমি যে নামেই পরিচিত হও, আমার নৈশ অভিবাদন গ্রহণ কর, প্রভু!" তাহার বিদ্রূপের সুর কণ্ঠস্বরের কোমলতায় প্রচ্ছন্ন রহিল না।

আগন্তুক ধরা পড়িয়া গিয়াছে বুঝিয়া তাহার হাতের পিস্তলটা মুহূর্ত্তমধ্যে জুলিয়ানের বুকের উপর উঁচু করিয়া ধরিল। কিন্তু জুলিয়ান তাহাকে পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার অবসর দিল না। সে তৎপূর্ব্বেই আগন্তুকের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিল। সেই আঘাতে পিস্তলটা তাহার শোণিতাপ্লুত মুষ্টি হইতে খসিয়া পড়িল। পুনর্ব্বার গুলী খাইবার ভয়ে সে পিস্তলটা বাঁ-হাত দিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল না। হাতের যন্ত্রণায় তাহার মুখ ঈষৎ বিকৃত হইল। জুলিয়ান ডিয়ারবর্ণ যৌবনকালে সমগ্র য়ুরোপে দ্রুত লক্ষ্যভেদে অসাধারণ দক্ষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; বার্দ্ধক্যের জড়তায় তাহার সেই শক্তি হ্রাস হইলেও অতীতের শিক্ষা সে বিস্মৃত হয় নাই; সুতরাং তাহার ন্যায় অসামাজিক, আত্মসমাহিত ব্যায়াম-বিমুখ বৃদ্ধের এই প্রকার তৎপরতায় বিস্ময়ের কারণ ছিল না।

সেই সুপ্রাচীন অট্টালিকাটি আধুনিক যুগের ব্যয়সাধ্য বিলাসিতার বা বর্ত্তমান কালের রুচি-প্রবৃত্তির অনুযায়ী কোন সৌখীন আসবাবপত্রের অথবা সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজের অপরিহার্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। জুলিয়ান অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছিল বটে, কিন্তু অপব্যয়ের আশঙ্কায় সে কোন কক্ষে প্রায় কোন দিন সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিত না। আজ সে সম্মানিত অতিথিকে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৈদ্যুতিক আলোকে তাহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না।

জুলিয়ান বামহস্তে তাহার পার্শ্বস্থ দেওয়াল-সন্নিবিষ্ট সুইচ টিপিয়া সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করিল; তাহার পর অতিথিকে উদ্যত পিস্তলের নল দিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া, তাহাতে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া শ্লেষের সহিত বলিল, "হে জানালা ভাঙ্গিয়া ঘর-ঢোকা মহাপুরুষ! অনুগ্রহ করিয়া যখন এই অকিঞ্চনের ভাঙ্গা ঘরে শ্রীচরণের পাদুকারজ দান করিয়াছেন, তখন দয়া করিয়া ঐ চেয়ারে বসিলে এই দাসানুদাস কৃতার্থ হইবে!"

চেয়ারখানি অগ্নিকুণ্ডের অন্য ধারে সংস্থাপিত ছিল, এবং জুলিয়ানের গৃহরক্ষিকা সেনাইল সারা আপ্‌স ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সেই চেয়ারে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিয়াছিল।

চোরচূড়ামণির গুলীবিদ্ধ মুষ্টি হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল, এবং সেই আঘাতে হাতখানি অবশ হইয়াছিল। সে বামহস্তে আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে নির্দ্দিষ্ট চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সেই সময় তাহাকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার পদপ্রান্ত-নিক্ষিপ্ত পিস্তলটির দিকে চাহিতে দেখিয়া জুলিয়ান বলিল, "না, তাহা হইবে না। তুমি পিস্তলটা কুড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিও না। কারণ, আমার হাত এ রকম নিস্‌পিস্‌ করিতেছে যে, তুমি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাঁ হাতে ঐ পিস্তল স্পর্শ করিবামাত্র আমার পিস্তলের গোড়ায় আঙ্গুলের চাপ পড়িবে, আমি ইচ্ছা করিলেও আঙ্গুলটা বশে রাখিতে পারিব না; তখন তোমার বাঁ হাতখানিরও ঐ রকম দুর্গতি হইবে। আমার পিস্তলের গুলী অত্যন্ত নির্লজ্জ, রক্তমাংসের শরীর ভেদ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না!"

বৃদ্ধ জুলিয়ানের কথা শুনিয়া আগন্তুক নিস্তব্ধভাবে পূর্ব্বোক্ত চেয়ারের নিকট উপস্থিত হইল। সে বাঁ-হাতে অন্য হাতের আহত মুষ্টিতে হাত বুলাইতেছিল, অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া সে আহত হাতের পরিচর্য্যা বন্ধ করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডের নিকট প্রসারিত করিল; অসাড় হাত উত্তপ্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

সেই সময় উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার সুগঠিত শুভ্র করতল ও সুদীর্ঘ অঙ্গুলিগুলিতে বৃদ্ধ গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং কেহ হঠাৎ সম্মুখে ভূত দেখিলে তাহার মুখকান্তি যেরূপ হয়, বৃদ্ধের মুখেও সেই ভাব পরিস্ফুট হইল। বৃদ্ধ জুলিয়ান যে হাতে পিস্তল ধরিয়াছিল, সেই হাত কাঁপিতে লাগিল। সে কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, এবং সে যথাসাধ্য চেষ্টায় মন সংযত করিতে সমর্থ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল।

আগন্তুক চেয়ারে বসিলে বৃদ্ধ গৃহস্বামী হাতের পিস্তলটি তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত রাখিয়াই তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং বাম হস্তে আগন্তুকের বাম করতল আকর্ষণ করিয়া নির্নিমেষনেত্রে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আগন্তুকের অঙ্গুলিগুলির কোন অংশও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে তাহার অঙ্গুলিগুলি ঘুরাইয়া, বাঁকাইয়া, টিপিয়া দেখিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে তাহার হাতখানি সবেগে ঠেলিয়া ফেলিল।

আগন্তুক বৃদ্ধ গৃহস্বামীর এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কোন কথা বলিল না; স্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ গৃহস্বামী তাহার চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে অস্ফুট স্বরে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি বলিল, তাহার পর কাসিয়া—গলা পরিষ্কার করিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "আজকাল কৃষিকর্ম্মের অবস্থা শোচনীয় বলিয়া চাষ-বাস উঠাইয়া দিয়াছি, এজন্য আমার গোশালায় গরুর বাছুর নাই; থাকিলে আমাদের এই হৃদয়স্পর্শী পুনর্ম্মিলন উপলক্ষে তোমার অভ্যর্থনার জন্য একটা বাছুর জবাই করিতাম। বিশেষতঃ আমি যখন প্রমাণ পাইলাম, আমার পুত্রের যে মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহা অতিরঞ্জিত। তবে এই সংবাদ যে সত্য নহে, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতেছি।"

আগন্তুক স্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

জুলিয়ান বলিল, "আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র এই দীর্ঘকাল পরে রঙ্গালয়ের কোনও নরাধম নায়কের ন্যায় ছদ্মবেশে গোপনে আমার গৃহে ফিরিয়া আসিবে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার বংশের সহিত তাহার শোণিতের সংস্রব আছে, তাহা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া আমি মুহূর্ত্তমধ্যে জানিতে পারিয়াছি।"

আগন্তুক ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "তুমি বা অন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না।"

জুলিয়ান বলিল, "কিন্তু আমার অনুমান, পুলিসের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্যই প্রধানতঃ উহার প্রয়োজন হইয়াছিল; তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তাহা জানিবার

জন্য আমার যে কৌতূহল হইয়াছে, সেই কৌতূহল তোমাকে নিবৃত্ত করিতেই হইবে। নরহত্যার জন্য তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তথাপি তুমি গ্রেপ্তারের ভয় তুচ্ছ করিয়া কি লোভে এখানে আসিয়াছ?"

আগন্তুক মুখ না তুলিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।"

জুলিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিল, "তোমার মা তোমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে সকল ধনরত্ন তোমার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে বলিয়া আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহাই তুমি আত্মসাৎ করিতে আসিয়াছ—এই কথা বলিতে চাও?"

আগন্তুক হিলারী ডিয়ারবর্ণ বলিল, "হাঁ, তুমি আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়াছ। গত চারি শত বৎসর হইতে যে সকল হীরকরত্ন, মধ্য-যুগের যে সকল স্বর্ণ-রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র আমার মাতামহ-বংশের অধিকারে ছিল, এবং তুমি আমার মাতাকে বিবাহ করিলে আমার মা সেই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ যাহার অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহা তোমার ঘরেই গচ্ছিত আছে; তাহাতে তোমার কোন অধিকার নাই। আজ রাত্রিতে আমি আমার প্রাপ্য সম্পত্তি লইতে আসিয়াছি। তুমি সেই মহামূল্য দ্রব্যরাজির লোভেই আমার মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলে এবং তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ করিবার জন্য সুদীর্ঘকাল আমার মাতাকে কঠোর উৎপীড়িত করিয়াছিলে, তোমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে মা আমার কি কষ্টই না পাইয়াছেন! কিন্তু তথাপি তিনি তাহা তোমাকে দান করেন নাই, তোমার নামে লেখা-পড়া করেন নাই। তাঁহার এবং তোমার পুত্র তাহা ভোগ করিবে, এই আশায় তিনি তোমার ক্রোধ, বিদ্বেষ, কঠোর ব্যবহার সমস্তই সহ্য করিয়া তাহা তোমার ঘরে তোমার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।"

বৃদ্ধ পুত্রের কথা শুনিয়া দুই এক মিনিট নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া গভীর আগ্রহভরে বলিল, "তুমি জান? সেই সকল মহামূল্য ধনরত্ন সে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল—তাহা তুমি সত্যই জান?"

হিলারী ডিয়ারবর্ণ তাহার পিতার মুখের উপর তাচ্ছীল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি আমার তাহা জানা থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?"

বৃদ্ধ জুলিয়ান রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "তোমার তাহা জানা থাকিলে সে কথা তোমাকে আমার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। হাঁ, আমি তাহা তোমার নিকট শুনিতে চাই, যদি সে কথা আমার নিকট প্রকাশ না কর, তাহা হইলে"—সে কথা শেষ না করিয়া পিস্তলটি এ ভাবে তাহার বক্ষঃস্থলে তুলিয়া ধরিল যে, তাহার পিস্তলের নলের মাথা তাহার বক্ষঃস্থলের দুই ইঞ্চি মাত্র দূরে রহিল।

হিলারী ডিয়ারবর্ণ বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শে পিস্তলের গুলীতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইতে পারে; কিন্তু প্রাণভয়ে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, তাহার নির্নিমেষ চক্ষুতেও আতঙ্কের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না; সে অবজ্ঞাভরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তুমি আমাকে গুলী করিয়া মারিবে?"

বৃদ্ধ দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিঃসন্দেহ। তোমাকে হত্যা করিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিব না, এবং তোমাকে হত্যা করিলে আমার বিপদেরও আশঙ্কা নাই। তোমার মৃত্যুসংবাদ ত পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, সরকারী কাগজপত্রেও তোমার মৃত্যুসংবাদ বিঘোষিত হইয়াছিল। এ সকল কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে? আর আমি চিরদিন তোমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি—তাহাও তোমার অজ্ঞাত নহে।"

হিলারী ডিয়ারবর্ণ তাহার পিতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "উত্তম, আমি তোমাকে সেই গুপ্তস্থান দেখাইয়া দিতেছি। ঐ অগ্নিকুণ্ডের প্রশস্ত লৌহ-বেষ্টনীর ঈষৎ বামে মেঝের উপর যে অনুচ্চ বেদী দেখিতেছ, উহার মধ্যস্থলে গোলাকার ক্ষুদ্র একখানি ডালা আছে। সেই ডালার নীচে তাহা দেখিতে পাইবে।"

লোভে বৃদ্ধের চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল; উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে সেই অনুচ্চ বেদী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গোলাকার ডালাখানির দিকে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ডালার নীচে? কিন্তু ডালা খুলিবার উপায় কি?"

হিলারী ডিয়ারবর্ণ বলিল, "হাতের চাপ পড়িলেই উহা বেদীর মুখ হইতে সরিয়া যাইবে।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আনন্দে ও উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু আসল কায ভুলিল না। সে পিস্তলটা পূর্ব্ববৎ তাহার পুত্রের বক্ষঃস্থলে ধরিয়া রাখিয়াই বাঁ হাতে সেই ডালাখানিতে ধাক্কা দিতে লাগিল; কিন্তু তাহা নড়িল না। তাহা সেই বেদীর মুখে আঁটিয়া বসিয়া রহিল। লোভ ও সন্দেহ তাহার জীর্ণ বক্ষের অন্তরালে যেন তুফান তুলিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সে পরিশ্রান্ত-দেহে ঘর্ম্মাক্ত-ললাটে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার পর পিস্তলটি সেই ভাবেই ধরিয়া রাখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, "কৈ, ডালা ত খুলিল না, উহা নড়াইতেও পারিলাম না! উহা খুলিবার কৌশল তোমার সুবিদিত; তুমি খুলিয়া দাও।"

হিলারী ডিয়ারবর্ণ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আমাকে খুলিয়া দিতে হইবে? আমি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমার পিতা আমার বাল্যকালে যে সকল গুণে আমার ভক্তি ও সম্মান আহরণ করিয়াছিলেন, এত কাল পরে তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহার সেই সকল গুণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! সেই উদারতা, বিশ্বাস, তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রতি সেই অকপট স্নেহানুরাগের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই! কে বলে, কালে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়? ইহা অপরিণামদর্শী মূঢ়ের উক্তি।"

পুত্রের এই মর্ম্মভেদী শ্লেষোক্তিতে বৃদ্ধ জুলিয়ান ডিয়ারবর্ণ যেন ক্রোধে ও বিরাগে ক্ষেপিয়া উঠিল। সে এরূপ বিচলিত হইল যে, সেই মহার্ঘ্য হীরা-জহরতের লোভ বিস্মৃত হইল, সে কম্পিত হস্তে পিস্তল ধরিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কি বলিলে? আমার পুত্রের প্রতি আমার স্নেহানুরাগ? হাঁ, তোমার প্রতি আমার স্নেহ, আমার পুত্রবাৎসল্য এতই প্রবল ছিল যে, যদি তোমাকে চূর্ণ করিবার অব্যর্থ উপায় স্থির করিয়া রাখিতে না পারিলাম, তোমাকে মুঠায় পুরিয়া কীটের মত পিষিয়া মারিতে পারিব—এ বিশ্বাস যদি আমার না থাকিত, তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে তোমার পলায়নের সংবাদ শুনিতে পাইয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম, সে জন্য আমার অর্থ বা সময় নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তোমাকে ধরিয়া আনিতাম, এবং তোমাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিতাম। নরহত্যার আসামী তুমি, তাহার কি ফল হইত, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।

"কিন্তু তোমার মাতামহবংশের সেই সকল মহামূল্য হীরাজহরৎ ব্যতীত তোমার মাতা অন্যান্য মহার্ঘ্য দ্রব্যও সেই সঙ্গে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; সেগুলি বহুমূল্য ও বহুপ্রাচীন দুর্লভ শিল্পদ্রব্য; প্রাচীন শিল্পের অনুরাগী যে কোন ধনকুবের সেগুলি ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের ধনভাণ্ডার উজাড় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সেই সকল শিল্পদ্রব্য এরূপ দুষ্প্রাপ্য ও সুদৃশ্য যে, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময় আকর্ষণ করিবে। আমি জানিতাম, তুমি ফেরারী আসামী, পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে, এই জন্য তুমি কখন এখানে আসিতে সাহস করিবে না, তুমি তাহা অধিকার ও ভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু অন্য কেহ তাহা অধিকার ও ভোগ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম জান? আমি তোমার পিতৃব্যপুত্র উইলিয়মকে যৎসামান্য অর্থ দান করিয়া তোমার অনুকূলে উইল করিয়াছিলাম। সেই উইল অনুসারে আমার যে ব্যাঙ্কে যত টাকা সঞ্চিত আছে, বিভিন্ন কার-বারে আমার যে সকল সেয়ার আছে, যেখানে আমার যত ভূ-সম্পত্তি আছে, তুমি—কেবল তুমিই সেই বিপুল বিত্তের মালিক: সুতরাং আমার মৃত্যুর পর তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ; তুমি ক্ষুধিত, ক্ষুধায় তোমার পেট জ্বলিতেছে, তোমার সম্মুখে রাশি রাশি সুখাদ্য স্বর্ণপাত্রে সজ্জিত আছে, কিন্তু তোমার তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি নাই। তোমার ক্ষুধার যন্ত্রণা শত গুণ বর্দ্ধিত হইলেও তোমাকে অনাহারে থাকিতে হইবে। সব তোমার, অথচ কিছুই তোমার স্পর্শ করিবার উপায় নাই!"

পিতার সকল কথা শুনিয়া হিলারী উন্নত-মস্তকে স্তব্ধ-ভাবে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্কোচহীন প্রদীপ্ত নেত্রে বীর পুরুষের শৌর্য্য-বীর্য্য উদ্ভাসিত হইল, তাহার মুখে আত্ম-নির্ভরতা ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল, এবং তাহার সম্মুখে তাহার বৃদ্ধ পিতা অধিকতর কদাকার,

জরাজীর্ণ, স্থবির ও মনুষ্যত্বহীন ঘৃণিত নরপশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অতঃপর হিলারী পূর্ব্বোক্ত বেদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ডালায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। সে কি কৌশলে ডালাখানি অপসারিত করে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার বৃদ্ধ পিতা লোলুপ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় তাহার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, হাতের পিস্তলের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহাকে তাহা হিলারী ডিয়ারবর্ণের বুকের নিকট হইতে অপসারিত করিতে হইয়াছিল।

হিলারী বক্র দৃষ্টিতে তাহার পিতার হাতের দিকে চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া ডান পাখানা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরাইয়া বৃদ্ধের হাতে এরূপ আঘাত করিল যে, সেই আঘাতে তাহার হাতের পিস্তল খসিয়া দশ ফুট দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধও চিৎ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের অদূরে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ ক্রোধে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু উঠিয়া বসিবার পূর্ব্বেই হিলারী এক লম্ফে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, এবং আর এক লম্ফে পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের নিম্নস্থিত দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া যেরূপ নিঃশব্দে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে সেই পথে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিল, এবং ভগ্ন বাতায়নের দিকে চাহিয়া যখন বুঝিতে পারিল, তাহার পুত্র তাহার সকল আশা বিফল করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তখন ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া লগুড়াহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কিন্তু তখন উত্তেজিত হইয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া সে যথাসাধ্য চেষ্টায় মন স্থির করিল এবং কি উপায়ে সেই পলাতক অপরাধীকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কিন্তু এক দিকে বদ্ধমূল ঘৃণা, অন্য দিকে দুর্দ্দমনীয় লোভ দুই দিক্ হইতে তাহার জীর্ণ হৃদয় আক্রমণ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সুইচ্ টিপিয়া দীপালোক নির্ব্বাপিত করিল। সে অন্ধকারে তাহার চেয়ারে বসিয়া চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। অগ্নিকুণ্ডস্থিত অগ্নির লোহিতালোক তাহার চোখে মুখে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া শুভ্র চন্দ্রকিরণ সেই কক্ষের কিয়দংশ আলোকিত করিল। ভাঙ্গা জানালা সেই রাত্রিতে মেরামত করিবার উপায় ছিল না।

চতুর্দ্দিকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজিত।

সহসা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। হিলারী পলায়নের সময় ভাঙ্গা শার্শির কপাট টানিয়া দিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার নিঃশব্দে অতি ধীরে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। কিন্তু চিন্তামগ্ন বৃদ্ধ জুলিয়ান ডিয়ারবর্ণ তাহা দেখিতে পাইল না; তাহার দৃষ্টি তখন তাহার সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে সন্নিবিষ্ট। সেই সুযোগে একটি কৃশ, দীর্ঘমূর্ত্তি মুখোসে মুখ ঢাকিয়া এবং দীর্ঘ পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু সতর্কভাবে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আসিবামাত্র সে একখানি চেয়ারে বাধিয়া গেল, তাহার জানুর আঘাতে চেয়ারখানি সশব্দে কয়েক ইঞ্চি সরিয়া গেল। সেই শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ জুলিয়ান বুঝিতে পারিল, অন্য কোন তস্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার পিস্তলটি কুড়াইয়া লইল, এবং তাহা তাহার গাউনের পকেটে রাখিয়া বাতায়ন-অভিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সে সেই শব্দের কারণ স্থির করিবার জন্য সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল, এবং অদূরে একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইল; কিন্তু সে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিবার পূর্ব্বেই সেই মুখোসধারী মূর্ত্তি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বৃদ্ধ জুলিয়ানের দেহের উপর লাফাইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিশ্বকবির অনধিকার-চর্চ্চা

বিশ্বকবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুর উপাসনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। 'প্রবাসীতে' মাসে মাসে একটি মহিলাকে লিখিত তাঁহার যে "পত্রধারা" বাহির হইতেছে, তাহাতে তিনি অজস্র বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছেন। এই মাঘ মাসের 'প্রবাসীর' পত্রধারায় যে সকল ভক্তসাধক বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় তন্ময় থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য। এটা যে হ'তে পেরেছে, তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবণ স্বভাব। সর্ব্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র! যাদের এই রকমের প্রকৃতি, নিজের মধ্যে এই ভাবরসকে উদ্বেল ক'রে তোলাই তাদের ধর্ম্ম-সাধনার চরম লক্ষ্য। তারা আপন হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থতা দেবার জন্যেই নিজের দেবতাকে ব্যবহার করে। এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভুলে থাকলেই তারা ধার্ম্মিকতা ব'লে মনে করে। এই পানগোষ্ঠীর বাইরে তাদের পক্ষে সমস্তই অশুচি, সমস্তই পরিত্যাজ্য। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন তৈরি হয়েছিল, এ ভুল করেছিল কে? ভোজ্য আয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপদীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্ত্তন-ভজনে নিত্য মুখরিত, আত্মবিস্মৃত এই এক একটি সঙ্কীর্ণ রসমণ্ডলীর বাইরে যে বিপুল সংসার পড়ে আছে, ভক্তি-ভাবাকুলদের পক্ষে সেখানে যেন দেবতার অরাজকতা,—সেখানে বিশ্ববিধাতার কোনো দাবি নেই, কোনো আনচান নেই। এই রকম মনোভাবটি মেয়েলি—সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্ব্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্ত্তিত। একে স্বার্থপরতা যদি বা না বলি, তবে একে বলা যায় আত্মপরতা।

"বাঙ্গালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্যে তার এত বেশী ভাবাকুলতা। তার মানসক্ষেতের এই অতিরিক্ত আদ্রতা যদি না ঘোচে, তা হ'লে সে ভাবোদ্বেগে মরিয়া হ'তে পারবে, কিন্তু কিছুই সৃষ্টি ক'রতে পা'রবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর এক দিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষাবিদ্বেষ কলহপরতা (ঠিক ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে যেরূপ হইয়াছিল লেখক) কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্ত্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর। অন্ততঃ পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্য্যাদাকর, এবং দেশের পক্ষে এটা সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা-জনক মনে করি। ভারতবর্ষে এ রকম সন্ন্যাসী আছে যারা শুষ্কতার মরুভূমির মধ্যে নিরুদ্দেশ, আর এক রকম ভক্ত বৈরাগী আছে যারা সিক্ততার তারল্যের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। এদের কাছে যারা দীক্ষা নিচ্ছে, মানুষের বিধাতা তাদের হারালেন। তবে তারা মানুষের ঘরে জন্মালো কেন? মানুষের কাছে জ্ঞানে ভাবে ভোগে তাদের যে অপরিসীম ঋণ, তার কী শোধ ক'রলে? আমি ত বলি, থাক ভক্তি, থাক পূজা, মানুষের সেবায় দেবতার যথার্থ প্রসন্নতা যেন লাভ করি।"

আজ রবীন্দ্রনাথের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহ বলিতেছে, তিনি বিশ্বগুরু, কেহ বলিতেছে, তিনি ঋষি, কেহ বলিতেছে, তিনি মহামানব; আবার এক দল ভক্ত ভক্তির প্রাবল্যে প্রাচীন মুনি-ঋষিদিগকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার পদতলে বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও বিদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি ভারতীয় সাধনতত্ত্বের যে ভাবধারার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, * রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহা হয় "শুষ্কতার মরুভূমি" নয় ভাবের "গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা"।

সকলেই জানেন, স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রাপ্তির দুইটি প্রশস্ত মার্গ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার একটির নাম জ্ঞানমার্গ, অপরটির নাম ভক্তিমার্গ। যাহাকে কর্ম্মযোগ বলে, তাহা এই দুইটি মার্গের সহায়। জ্ঞানমার্গের সাধক প্রধানতঃ বিষয়বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মার সন্ধান করেন; আর ভক্তিমার্গের সাধক ভগবান্‌কে "রসো বৈ সঃ" জানিয়া সেই রস-স্বরূপে

* ভগিনী নিবেদিতা, মিঃ সিঃ এস্, এন্‌ড্রুস্, উড্‌রোফ সাহেব প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

আপন চিত্তবৃত্তি নিমজ্জিত করেন। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক ঋষি ইহার কোন মার্গই পছন্দ করেন না। বহু পূর্ব্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" আবার এখন বলিতেছেন,—

"কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই ভক্তির মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্ত্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর।"

কিন্তু আজ তিনি ভোজ্য-আয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপদীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্ত্তনে ভজনে নিত্যমুখরিত··· ভক্তিভাবাকুলদের প্রেমভক্তিকে মেয়েলি ভাব বলিয়া নিন্দা করিতেছেন, একসময়ে তিনি ইহাকেই চরম সার্থকতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, যথা—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি (conpession) হইতে আমরা কি বুঝিব? আমরা বুঝিব, তিনি যেমন জ্ঞানমার্গের অধিকারী নহেন, সেইরূপ ভক্তিমার্গেরও অধিকারী নহেন। তবে সাধনপথে তাঁহার সম্বল কি? তিনি বলেন,—"আমি ত জানি, যাক ভক্তি থাক পূজা, মানুষের সেবায় দেবতার যথার্থ প্রসন্নতা যেন লাভ হয়।"

এখানে ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে বলি, আপনারা শুনিয়া রাখুন, আপনাদের ব্রাহ্মসমাজের চূড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিতেছেন, যাঁহারা উপাসনা-মন্দিরে খোল-করতাল-সহযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতামাতি করেন—কেহ কেহ বা প্রেমাশ্রু-ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করেন, "বিধাতা তাদের হারালেন"---অর্থাৎ তাঁহাদের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান খেয়াল অনুসারে, মানুষের সেবাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই সেবা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে? আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রনাথ কি তবে এই শেষ বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য হইলেন? স্বামী বিবেকানন্দ এক জন মহাপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহার শিষ্য হওয়া দোষের কথা নহে। তবে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রকার দরিদ্রনারায়ণের সেবা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ নরনারীকে অন্নবস্ত্র-দান, আর্ত্ত ও রোগগ্রস্তের চিকিৎসাবিধান প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই সেবা-ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন,—রবীন্দ্রনাথ কি সেইরূপ নর-সেবা করেন? তিনি এ পর্য্যন্ত এই প্রকার কার্য্যে কতগুলি পয়সা, টাকা নহে, ব্যয় করিয়াছেন? তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ জমীদারীর দুঃস্থ প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য এ পর্য্যন্ত কয়টি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন?

ইহার উত্তরে হয় ত' কেহ বলিবেন,—তিনি বিশ্বমানবের অর্থাৎ humanity'র সেবা করেন। তাঁহার নর-সেবা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। চমৎকার কথা, কিন্তু কেবল কথাতে ত চিঁড়ে ভেজে না—কায চাই।

ইহার উত্তরও আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া নরসেবা করিতেছেন, বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়া নরসেবা করিতেছেন, পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ও বক্তৃতা করিয়া নরসেবা করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত খেয়াল-চরিতার্থতাকেও কি ধর্ম্মসাধনা বলিতে হইবে? এ সকল ত যশঃ, মান, খ্যাতিলাভের চেষ্টা—এক কথায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এইরূপ প্রতিষ্ঠাকে "শূকরবিষ্ঠা" বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহা স্বার্থপরতা না হইলেও "আত্মপরতা"। ইতিপূর্ব্বে "arm chair politician"এর কথা বলিয়াছিলাম, ইহাও আরামচৌকী-বিলাসীর নরসেবা। জানি না, ইহাতে দেবতা প্রসন্ন হইবেন কি না। তবে আমাদের শাস্ত্রমতে দেবতাকে প্রসন্ন করিবার উপায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—প্রেমভক্তি-সাধক তাঁহার রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসার ভুলিয়া থাকেন—যেন এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারি করিয়া বিধাতা ভুল করিয়াছেন। এই প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য নাই, বুদ্ধির সর্ব্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। ইহা স্বার্থপরতা না হইলেও আত্মপরতা।

আমরা এইরূপ বিশ্বসংসার ভুলিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সর্ব্বদা কালযাপন করিতে এক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা পড়িয়াছি, আর এই যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনেকেই

দেখিয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে স্বার্থপর না আত্মপর বলিব? ইঁহারা স্বার্থপর বা আত্মপর হইলে আজ সহস্র সহস্র নরনারী ইঁহাদিগের চরণে নত হইতেছে কেন?

কিন্তু এই বর্ত্তমান যুগে আরও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভক্তিপ্রেমাসক্ত না হইয়াও ঐ সকল ভাববিলাসীদের দলের লোক। তাঁহারাও কবিতা লেখেন না, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন না, বিপুল সংসারের বড় ধার ধারেন না। তাঁহারা কোন বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক তত্ত্ব লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং তাহাতেই জীবন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন, হয় ত বা সৌভাগ্যক্রমে কেহ কেহ কোন নূতন তত্ত্বও আবিষ্কার করিতেছেন, যেমন পাশ্চাত্য জগতে ছিলেন এডিসন, আর আমাদের দেশে আছেন সার জগদীশ বসু। ইঁহারাও কি স্বার্থপর না আত্মপর?

আমার বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ যে মাপকাঠি দিয়া এই সকল লোকের বিচার করিতে চান, তাহার নাম First person singular অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালায় বড় হাতের I, সেই জন্যই তিনি ইঁহাদের জীবনে "বিচিত্র নিরর্থকতা" দেখিতে পান। কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে যে সকল বড় বড় আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, এবং বিশ্বমানবের নানাপ্রকার সুখ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা এই সকল সংসারে উদাসীন, একান্তচিত্ত, ভাববিলাসী লোকদিগের জীবনব্যাপী গবেষণার ফল।

ধর্ম্মজগতে যাঁহারা ঈশ্বরলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, তাঁহাদিগকে সংসারের অন্য কথা ছাড়িয়া প্রতিনিয়ত কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাকিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"অন্যা বাচো বিমুঞ্চত, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" যদি ঈশ্বরকে পাইতে চাও, তবে অন্য সব কথা পরিত্যাগ কর, তিনি অমৃতের সেতুস্বরূপ।

শ্রুতি বলেন, সংসারের প্রায় সকল লোকই ত বহির্ম্মুখ, তাহাদের চিত্ত বাহিরের বিষয়ে সর্ব্বদা আসক্ত আছে,

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

তাহাদের মধ্যে কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ত্ব-লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার অভিমুখে তাহাদিগকে প্রেরণ করেন।

"পরায়ঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততামপাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥"

অর্থাৎ যাহারা বালস্বভাব, তাহারাই পৃথিবীর ধন, মান, যশঃ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থের অনুসরণ করিয়া বারম্বার মৃত্যুর জালে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা অমৃতের আস্বাদ পাইয়া কখনও অনিত্য বস্তুসমূহের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্রুতি আরও বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

এই আত্মা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না, বহু বেদাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, আত্মা তাঁহার নিকট স্বস্বরূপে প্রকটিত হন।

কিন্তু তিনি কাহার প্রতি কৃপা করেন?

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

হাজার প্রজ্ঞা থাকিলেও যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, যে অসমাহিত, যাহার চিত্ত অশান্ত, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, যিনি সমাধিস্থ হইতে পারিবেন বা পারেন, কেবল তিনিই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও ভগবান্ নানা স্থানে নানা ভঙ্গীতে সাধককে অনন্যচিত্ত হইয়া সেবা করিতে বলিয়াছেন, যথা—

"ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি" হইয়া আমার সেবা কর,
"অনন্যভাক্" হইয়া আমার সেবা কর,
"অনন্যচেতাঃ" হইয়া আমার সেবা কর,
"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" হইয়া আমার সেবা কর,

"মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ" হইয়া আমার সেবা কর,
"অনন্যাশ্চিত্তয়ন্তো মাং" হইয়া আমার সেবা কর,
"মচ্চিত্তঃ সততং ভব" সর্ব্বদা আমার প্রতি চিত্ত রাখিয়া সেবা কর,
"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" অন্য বিষয়ে অনাসক্ত ভক্তি দ্বারা আমার সেবা কর,
সর্ব্বশেষে ভগবান্ সাধককে বলিতেছেন,—
"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

* * * *

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

আমার প্রতি চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন অর্থাৎ উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর······ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার শরণাপন্ন হও।

রবীন্দ্রনাথ সময় সময় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নিজের মনের মত তাহার ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু গীতার দিক্ দিয়াও তিনি যান না, কারণ, গীতার এই সকল উপদেশ তাঁহার মতের অনুকূল নহে।

তিনি লিখিয়াছেন,—এইরূপে ভাবোদ্বেগে মরিয়া হইলে তুমি ত কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিবে না; পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্য্যাদাকর, দেশের পক্ষে সাংঘাতিক দুর্ব্বলতাজনক।

কিন্তু যে ভক্ত ভগবদ্‌ভক্তিতে "মরিয়া" হইয়া অনন্য-চিত্তে তাঁহার সেবা করেন, তাঁহার আর কিছুর প্রয়োজন আছে কি? কাব্যকলার সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার জন্যে নহে। তিনি দেশের সেবা না করিলেও দেশ তাঁহাকে জন্ম দিয়া ধন্য হয়। এইরূপ প্রেমভক্তির সাধন পুরুষের পক্ষে অমর্য্যাদাজনক কিসে, বুঝা যায় না। অর্জ্জুন অবশ্যই এক জন বীরপুরুষ ছিলেন, ভগবান্ তাঁহাকেই ত ভক্তি-সাধনায় উপদেশ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে রামানুজ, তুকারাম, তুলসীদাস, শ্রীরামকৃষ্ণদেব—ইঁহারাও ভক্তির সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে পুরুষের অমর্য্যাদাকর কোনও ভাব ত দেখা যায় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমভক্তি-সাধনায় পাঁচটি ভাব আছে—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহার মধ্যে এক মধুর ভাবের সাধনাই স্ত্রীজনোচিত, আর কোনটার মধ্যে পুরুষের অমর্য্যাদাজনক কিছুই নাই। তবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া থাকিতেন, ইহা দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদাহানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, প্রেমভক্তিতে "মরিয়া" হইয়া অনন্যচিত্তে ভগবানের সেবাকল্পে এরূপ সাধক বা সাধিকার সংখ্যা নিতান্ত বিরল। ইহা দেশের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। সুতরাং এ জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। আমরা লক্ষ লোকের মধ্যে ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন তামাকও খাই, আবার দুধও খাই। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথও এবার তাঁহার স্বীকারোক্তির দ্বারা ঋষি-পদবী ছাড়িয়া আমাদের দলে মিশিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দ্রাবিড় জাতিকে মেয়েলিভাবাপন্ন বলিয়াছেন। আমি এই কাশীতে যে পল্লীতে বাস করি, সেখানে অনেক মাদ্রাজী ও মহারাট্টি লোক বাস করে, ইহারাই ত দ্রাবিড়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ত মেয়েলি ভাব বড় দেখি না। ইহাদের স্ত্রীলোকরা পর্য্যন্ত পুরুষভাবাপন্ন, তাহাদের চেহারা এক একটা অসুরের মত, তাহাতে কোন স্ত্রীজনোচিত কোমলতা নাই। কেদারঘাটে মেয়েদের স্নান করিবার পৃথক্ ঘাট আছে; কিন্তু ইহারা সে ঘাটে প্রাণান্তে যায় না, পুরুষদের ঘাটে, পুরুষদের সঙ্গে মিশিয়া স্নান করে, আমাদের নিষেধ কিছুতেই মানে না। মাদ্রাজী ও মহারাট্টারা এখানে "মহাদেবা"র পূজা করে, কেদারনাথের মন্দিরটিই মাদ্রাজীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আবার ইহাদের দেশে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্‌সিতেও ইহারা প্রধানতঃ নৃসিংহা-বতার অথবা অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর এবং শিবের উপাসনা করে। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈবই বেশী, কেবল মাদুরায় শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর উপাসনা করা হয়। দ্রাবিড়-দেশবাসী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও ভগবান্ রামানুজ ইঁহাদের কাহাকেও মেয়েলিভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ যে বাঙ্গালী জাতিকেও দ্রাবিড়-জাতির ন্যায় মেয়েলিভাবাপন্ন বলিয়াছেন, এ কথা আমি স্বীকার করি। তাহার প্রধান প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার গীতাঞ্জলিতে তিনি বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে ভগবান্‌কে নায়ক কল্পনা করিয়া যে সকল নায়িকার উক্তি রচনা করিয়াছেন, এইগুলিতেই তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। কেবল কবিতায় নহে, রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার নিজের জীবনে,—তাঁহার মিহিসুরে, তাঁহার লালফুলে, তাঁহার বেশবিন্যাসে, তাঁহার মেয়েলি ছাঁদের ফুলের কেতায়—হাতের লেখায়, ইত্যাদি অনেক হাবভাবে এক সময়ে মেয়েলিভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার অনুকরণকারী চেলারাও সেগুলি অনুকরণ করিতে যাইয়া দেশের লোকের নিকট হাস্যাস্পদও হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে কবি বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে লালফুল, সেমিজের মত লাল পাঞ্জাবী ইত্যাদি না হইলে চলিত না। সুতরাং বাঙ্গালী যে অনেক বিষয়ে মেয়েলি-ভাবাপন্ন, তাহা মিথ্যা নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, রবীন্দ্রনাথ যদি সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ উভয় পন্থাই অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার ঐ সকল সাধনা সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করা অনধিকারচর্চ্চা নহে কি ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

জীবনের গতি

কেমনে জীবন কাটিয়া যাবে
কেমন করিয়া বলি ?
স্রোতো-মুখে ভেসে এসেছি আজি
দূরে—বহু দূরে চলি' !

কোথা প'ড়ে র'ল কূলের দিশা,
কোথা আত্মীয়-জন—
কোথা যাবো ব'লে করিনু আশা,
কোথায় রহিল পণ !

ঘূর্ণীর জলে ঘুরায়ে তরী
কোন্ পথে এল নিয়া—
এ কোন্ বিধাতা আড়ালে রহি'
চলেছে বিড়ম্বিয়া !

স্রোতো-নীরে নেমে যাহার আশে
যাত্রা করিনু সুরু,
সে আশা নিভেছে সুচির তরে—
ঝঞ্ঝা গরজে গুরু !

ধ্রুবতারা গেছে হারায়ে নভে,
শ্রাবণের ধারা ঝরে !
জ্যোছনা-যামিনী জীবনে মম
লুকায়ে গিয়েছে ডরে !

তরী চলিয়াছে বন্যা-মুখে
চারিদিকে ঘোলা জল—
অকূল সলিলে চলেছি ভেসে
কোথাও হেরি না স্থল !

ধ্বংসের মুখে এ ভাতি-বেগ,
কাহার সাধ্য রাখে
ভিতরে বাহিরে আলোক নাহি
গিলিছে ঘূর্ণিপাকে !

কোন্ পথ দিয়া এ কোন্ দিকে
কোথায় যাইব শেষে,
—কা'রে বা শুধাই, জলের রাশি
উঠিছে অট্টহেসে !

আকাশে শ্রাবণ, তরীতে তাই,
বুকেও শ্রাবণ ছেয়ে—
আঁখির শ্রাবণে ছাপায়ে সব
এ দেহ উঠিছে নেয়ে !

অভিশাপ ব'য়ে চলেছি আজি
নাহিক পরিত্রাণ—
শৃঙ্খলভার অঙ্গে বহি'
তবু গাহিতেছি গান।

কারা-প্রাচীরের অন্তরালে
বন্দীরা গাহে জয়,
মন্দিরা বাজে শ্মশান-ভূমে—
দেব-মন্দিরে নয় !

ভেবেছিনু ভেসে যাবার কালে
আসিব সোনার দেশে
আমারে দেখিয়া রাজার মেয়ে
হরষে উঠিবে হেসে !

ফুল-উপবনে তাহার সনে
যামিনী যাপিয়া যবে
করে ধরি' কর চোখের জলে
বিদায় লইতে হবে,

তখন গাঁথিয়া কথার মালা
কেমনে আসিব চ'লে,
হয় ত তাহারে সঙ্গে ল'ব
পথের পাথেয় ব'লে !

হয় ত আমার জীবন ভরি'
উঠিবে তাহারি গানে,
হয় ত আমার ফুলের তরী
ভাসিবে সুধার বানে !

হায় কোথা গেল সুখের ছবি,
রূপসী রাজার মেয়ে—
কখন্ না জানি ডুবিল রবি,
শ্রাবণ ফেলিল ছেয়ে !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

বৈরাগীর চর

গ্রামের পাদসীমায় পদার্পণ করিয়াই বৈরাগী তাহার গুপীযন্ত্রের তারে করাঙ্গুলীর মৃদুঘাত করিতে করিতে মধুর কণ্ঠছন্দ বাজাইয়া তুলিল—'হরিবোল ! হরিবোল !'

হরিবোল ?—সর্ব্বনাশ !

শাক্তের গ্রাম শক্তিপুর। গ্রাম জুড়িয়া শক্তিচর্চ্চার আনুরক্তি। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ—উচ্চ নীচ সকল গ্রামবাসীই লাঠি খেলিয়া, সড়্‌কি ও ঢালের কসরতে হাত পাকাইয়া, কুস্তি করিয়া, রামঠ্যাঙ্গায় চড়িয়া স্বগ্রাম শক্তিপুরের নাম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। কে এসেছে, না শক্তিপুর গাঁয়ের লোক ; ব্যস্‌, এক পরিচয়েই সব পরিচয় শেষ হইয়া যায় এবং প্রশ্নকর্ত্তার মানসচক্ষুর পুরোভাগে সজীবভাবে জাগিয়া উঠে বিশেষ একটা লোক—গাঁট্টাগোট্টা হেইয়া জোয়ান, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাব্‌রি চুল,—দাঙ্গাবাজ, লাঠিয়াল।

পাঁচ ক্রোশ দূরের হাটের দোকানী যে, সেও শক্তিপুর গাঁয়ের নগণ্য লোকটির সঙ্গেও জিনিষের দাম লইয়া দরদস্তরের বাঁকা চাল্‌ চালিতে সাহসী হয় না, যেহেতু হাজার লোকের মধ্যেও সেই একাই অনায়াসে তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া তাহাকে ঘায়েল করিয়া দিতে পারে, পরে তাহার যাহাই কেন হউক্‌ না।

গ্রামের নেতা—গ্রামের জমীদার শম্ভু মৈত্র। মৈত্রকুলের কুলপুরোহিত আগমবাগীশকে মৈত্র চক্রতন্ত্রের প্রধান চক্রীও বলা যাইতে পারে। অন্য গ্রামের লোকরা বলাবলি করে, মৈত্র বাবুরা না কি গোপনে ডাকাতীও করিয়া থাকেন। আগমবাগীশ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ আছে—শ্মশানে মড়ার উপর বসিয়া, মড়ার খুলিতে মন্ত্রীকৃত কারণবারি পান করিতে করিতে তিনি দুঃসাহসিক শক্তিসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রতি অমাবস্যায় মৈত্রপুরীসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন কালীবাড়ীতে মহাধুমধামে মহাকালীর পূজা হয় এবং সে দিন নিশীথরাত্রিতে সেখানে না কি নিয়মিত নরবলিও হইয়া থাকে।

শাক্তের গ্রাম—শক্তিপুর। মূর্খ বৈরাগী পথ ভুলিয়াই বুঝি সেই গ্রামে মরিতে আসিয়াছিল ! হরিবোল ?—সর্ব্বনাশ ! সে কি জানিত না, হরিবোল শ্মশানযাত্রীরও শেষ-বোল ?

গ্রামের প্রবেশ-পথের উপরই কামারশালা। বেলা তখন প্রহরখানেক হইবে। মৈত্র-বাড়ীর ভৈরব পাইক আসিয়া সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছে—নূতন যে একখানি খাঁড়ার জন্য কয়েক দিন হইতে ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, আজই সে উহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেই,—চাই-ই চাই। কামারশালার হাপর হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, লোহা পিটাইবার কাণভাঙ্গা শব্দ কিছুক্ষণ হইল এই একটু থামিয়াছে,—এখন খাঁড়ায় ধার দেওয়া চলিতেছে, কিন্তু ইস্পাতে উকা ঘষিবার একটানা ঘেষ্‌-ঘেষানি, সেও বড় কম অসহ্য নহে।

সহসা ভৈরব-হুঙ্কারে ভৈরব লাফাইয়া উঠিল—কামারশালার কায এক মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল।—ব্যাপার কি ?

—'হরিবোল ! হরিবোল !'

ভৈরব একলম্ফে কামারশালার বারান্দা হইতে ঝাঁপাইয়া পথে পড়িয়া, বজ্রমুষ্টিতে বৈরাগীর হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া ধমক ছাড়িল,- "এই—চোপ্‌ রহ্‌ !"

ভূতো কামার আসিয়া তখন ভৈরবের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সে-ও তাহার পেশীবহুল দক্ষিণ বাহু আস্ফালন করিয়া হাঁকিল,—"এই—চোপ রহ্‌ !"

কামারশালার সকল কারিগর মিলিয়া বৈরাগীকে চারিদিক্‌ হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক জন বলিল,—"নে বাবাজীর গুপীযন্ত্র কেড়ে—!"

আর এক জন বলিল,—"দে তাড়িয়ে গাঁয়ের বাইরে।"

ভৈরব বলিল,—"না, চল্‌, শালাকে নিয়ে বামাল-সমেত খাস কাছারীতে।"

এই বলিয়া ভৈরব রহস্যপূর্ণভাবে ভূতোর দিকে একবার চাহিল—একটু হাসিল। পরে চুপি চুপি বলিল,—"আজ অমাবস্যা —জানিস্‌ ত ?"

ভূতো উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"জয় মা কালী !"

সকলে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল—"জয় মা কালী !"

বৈরাগী কি কিছু বুঝিল ? সে যে ভয়ে কম্পিত হইতেছে, তাহাকে দেখিয়া এরূপ বোধ হইল না। মুখভাব গম্ভীর—মলিন।

মৈত্রবাবুদের খাস-কাছারীতে প্রতি অমাবস্যার দিন প্রভাতে বিশেষ অধিবেশন বসিয়া থাকে। সাধারণ কাছারী-বাড়ী—একটা বৃহৎ আটচালা ঘর। সেখানে সাধারণতঃ সামাজিক ও ভৌমিক শাসন-বিচারাদির কায হইত। সাধারণ কাছারী-বাড়ী হইতে একটু দূরে খাস কাছারী-গৃহ—একটা একতলা কোঠা,—কক্ষতল ভূমিতল হইতে অনেকখানি নীচে, অনেকটা ভূগর্ভস্থ কক্ষের মত ! কক্ষপ্রাচীরে কতকগুলি বাঘের চামড়া, হরিণের চামড়া, বুনো মহিষের শিং, হরিণের শিং, গণ্ডারের চামড়ার ঢাল, আড়াআড়িভাবে রক্ষিত একজোড়া বাঁকা তলোয়ার, জোড়া দুই রামদা, খানকয়েক ভোজালি প্রভৃতি লট্‌কানো। এক দিকে অনেকগুলি লাঠি ও সড়্‌কি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্যদিকে একটি ছোট খাঁজকাটা চৌকীর উপর বসানো তামার খোলের একটি ডঙ্কা—ডঙ্কার গায় তেল-সিঁদূর মাখানো।

আজ অমাবস্যা—খাস কাছারীতে আজও অধিবেশন বসিয়াছে। শম্ভু মৈত্র ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া আড হইয়া বসিয়া সুদীর্ঘ গুম্ফযুগল বামহস্তে সুবিন্যস্ত করিতেছেন। পিতা হইতে কিয়দ্দূরে সরিয়া, পুত্র মহেশ রূপা দিয়া উভয় প্রান্ত বাঁধানো একটি একহাতী কোঁৎকার উপর ভর দিয়া বসিয়া আছে,—এটি তাহার প্রিয় সহচর, এবং এই সহচরের অধিকারী এক জন বিজয়ী কোঁৎকা-ক্রীড়ক বলিয়া বিখ্যাত।

ফরাসের দক্ষিণ দিকে, ফরাসের সমান উঁচু করিয়া প্রস্তুত একটি ইষ্টকবেদী ; সেই বেদিকার উপর একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন পাতিয়া, ফরাসের দিকে মুখ করিয়া আগমবাগীশ মহাশয় জোড়াসন হইয়া বসিয়াছেন।

কক্ষতলে ফরাসের সম্মুখে শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া আছে—দুই ভাই সোনা সর্দ্দার ও রূপা সর্দ্দার,—প্রচণ্ড দুই জোয়ান, লাঠিয়াল। প্রকাণ্ড দুইটি বাঁশের গিটতোলা পাকা লাঠি শতরঞ্চের উপর লম্বমান।

আগমবাগীশ বলিলেন,—"সত্যি হে শম্ভু, গোপালগঞ্জের বায়দের ত' স্পর্দ্ধা কম নয়,—মৈত্রবাড়ীর সামনে দিয়ে ডঙ্কা মেরে বিশ-দাঁড় পান্‌সীতে বাজ মেরে যাওয়া?—ছেলেখেলা আর কি!—কালী! কালী!"

শম্ভু মৈত্র বলিলেন,—"দেখুন ত' আগমবাগীশ মশাই,—কি স্পর্দ্ধা! এর নাম কি ইচ্ছে ক'রে অপমান ক'রে যাওয়া নয়?"

মহেশ তাহার কোঁৎকাটি উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল,—"অপমান করা নয়? শুধু আমাদের অপমান কেন, সারা গাঁর শুদ্ধ অপমান!"

আগমবাগীশ বলিলেন, "তা হ'লে আজকের শিকার চলুক্ ঐ গোপালগঞ্জের উপরই।"

রূপা ও সোনার দিকে চাহিয়া শম্ভুচন্দ্র আদেশ করিলেন,—"শিকারীদের খবর দেওয়া হোক্, হুঁসিয়ার থাক্‌তে।"

রূপা ও সোনা বাম মুষ্টিতে লাঠি আকড়াইয়া ধরিয়া, যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নত হইয়া ভূমিতে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া, করতল উল্টাইয়া মাথার উপর রাখিল।

মহেশ ফরাসের উপর হইতেই টান হইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া কক্ষকোণে রক্ষিত ডঙ্কাটির উপর এক ঘা কোঁৎকা কসিয়া দিল—"ডুম্!"

"ডুম্!"—ডঙ্কারবের শেষ-রেশ মিলাইবার পূর্ব্বেই বৈরাগীকে লইয়া ভৈরব আসিয়া খাস কাছারীর দুয়ারে দাঁড়াইল।

হুজুরের প্রশ্নের উত্তরে ভৈরব ধৃত অপরাধকারীর কৃত অপরাধের বিষয় অতিরঞ্জনে রঞ্জিত করত এইরূপ নিবেদন করিল যে, বহুবার বারণ সত্ত্বেও এই ধৃষ্ট বৈরাগী ঘৃণ্য গুপীযন্ত্র-সংযোগে ভক্তিদুষ্ট সঙ্গীতের এমন বিশ্রী সঙ্গত জুড়িয়া দিয়াছিল এবং শক্তিপুরের পবিত্র মৃত্তিকাকে নৃত্যশীল পদতাড়নায় এমনই উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, ভৈরব তাহাকে অবিলম্বে হুজুরে হাজির না করিয়া আর থাকিতে পারে নাই।

মহেশ বলিল,—"নতুন খাঁড়াটা আনো নি?"

আগমবাগীশ কহিলেন,—"এত বড় গুরুতর ব্যাপারে ভৈরব, তোমার খাঁড়ার জন্যে কামারশালায় ব'সে না থেকে ভালোই করেছে, মহেশ।"

ভৈরব বলিল,—"দণ্ডখানেকের মধ্যেই খাঁড়া এসে এখানে পৌছবে, হুজুর!"

শম্ভুচন্দ্র রোষকষায়িত-নেত্রে বৈরাগীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি করেছিলি, বল্ ব্যাটা বৈরাগী?"

বৈরাগী ধীরস্বরে বলিল,—"শুধু বলেছিলাম, 'হরিবোল'।"

হরিবোল?—সর্ব্বনাশ! মৈত্রবাবু তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন,—আগমবাগীশ তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া তাঁহার বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—ক্রুদ্ধ মহেশ সহসা বৈরাগীর ললাট লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল তাহার সিদ্ধ-অস্ত্র কোঁৎকা।

বৈরাগী করতলে ললাট চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

—"ম'ল না কি ব্যাটা!"

"না, মরিনি"—বৈরাগী ম্লান হাসি হাসিয়া, ললাটরক্তসিক্ত করতল প্রসারিত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"রক্ত—।"

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!—রক্ত! রক্ত! রক্ত!"—মহেশের হাসির হুল্লোড়ে যোগ দিয়া শম্ভুচন্দ্র, আগমবাগীশ দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন,—কাছারীর সমস্ত লোক সে হাসিতে যোগ দিল।

অতঃপর হুকুম হইল—"বৈরাগীকে ফাটক-ঘরে আটক ক'রে রাখ্।"

মৈত্রান্তঃপুরে অকস্মাৎ হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

শম্ভুচন্দ্র ও মহেশ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন—মৈত্রগৃহিণী ভবশঙ্করী স্বহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন। রন্ধনগৃহের দ্বারপার্শ্বে মৈত্রকন্যা গৌরী বসিয়া পরিবেষণরতা জননীর দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু শুধুই কি চাহিয়া থাকা?—মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান হয়, সে যেন ভবশঙ্করীর প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিবাহের পর স্বামিগৃহ-দর্শন এ পর্য্যন্ত গৌরীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বৈবাহিক পক্ষের সহিত সামান্য কি খুঁটি-নাটি কারণ লইয়া শম্ভুচন্দ্রের যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় অর্থাৎ স্বভাবকোপন শম্ভুচন্দ্রই স্বয়ং অকারণ যে আকস্মিক গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলেন, তাহাতে বধূকে না লইয়াই বরপক্ষ স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন; এবং একপক্ষে বরের পিতা আপনাকে অপমানিত বোধ করেন ও বরের মুখ ম্লান-গম্ভীর হইয়া পড়ে,—অন্যপক্ষে বধূ ও বধূর জননী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করেন। তার পর অর্দ্ধবৎসরকাল কাটিয়া গিয়াছে। অপমানিত বরের পিতা তাঁহার জীবনকালে বধূকে আর স্বগৃহে আনিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং পুত্র সতীনাথের পূর্ণ অমত সত্ত্বেও তাহাকে অন্যত্র বিবাহিত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার জীবনের মেয়াদ অলক্ষিতে ফুরাইয়া আসিয়াছে। এমন সময় এক দিন অতর্কিতে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি পরলোকপথগামী হইলেন। তার পর মাস দুই গত হইয়াছে। ভবশঙ্করীর আপ্রাণ চেষ্টায় সতীনাথ শাশুড়ীর আমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করিয়া শীঘ্রই শক্তিপুরে আগমন করিতে স্বীকৃত হইয়াছে—হয় ত' আজকালের মধ্যেই আসিয়া পৌছিতে পারে। গৌরী জননীর দিকে এই প্রত্যাশায় চাহিতেছিল যে, তিনি কখন সতীনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে গৌরীর স্বামিগৃহগমনে সন্তুষ্টির সহিত সম্মত করাইবেন।

অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা-বাটিগুলি একে একে স্বামী ও পুত্রের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, একখানি পাখা লইয়া আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে মৈত্রগৃহিণী বসিলেন। শুক্তো, দাল, ভাজা শেষ হইয়া আহার যখন মৎস্যপথে অগ্রসর হইল, তখন ভবশঙ্করী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার নিকট সতী-নাথের প্রসঙ্গ উত্থাপনের উপক্রমণিকাস্বরূপ হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার গোঁফ জোড়া যেমন এদিকে বাড়ছে, গাল দুটো তেম্‌নি ওদিকে রোগা হয়ে তুবড়ে পড়ছে!"

শম্ভুচন্দ্র হাতের গ্রাস মুখে না তুলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বাম হস্তের অগ্রকরতল দ্বারা উভয় কপোল স্পর্শ করিয়া হাসি থামাইয়া বলিলেন,—"বুড়ো হয়ে পড়েছি কি না, সেই জন্যে, গোঁফের দোষ নয়।"

ভবশঙ্করী বলিলেন,—"বুড়ো তোমাকে কে বল্‌ছে?—সে কথা নয়। দেখ, তোমাকে একটা কথা বল্‌তে চাই—।"

শম্ভুচন্দ্র কাঁটা বাছিয়া এক টুক্‌রা মাছ মুখে দিয়া বলিলেন,—"কি কথা, বলই না।"

ভবশঙ্করীর কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠপুটে প্রথম ধ্বনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গলায় ভাত বাধিয়াই হউক্ বা অন্য যে কারণেই হউক্, খাইতে খাইতে হঠাৎ মহেশ এক বিষম বিষম্ খাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে হিম্‌সিম্ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল এক অস্বাভাবিক কাসির বেগ এবং তৎক্ষণাৎ নাক-মুখ ছাপাইয়া সবেগে রক্তবমন হইতে আরম্ভ হইল। বিমূঢ় মহেশ, সে যে খাইতে বসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াই ব্যঞ্জনসিক্ত দক্ষিণ করতল তুলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—বমন নিবারিত হইল না; কিন্তু রক্তে তাহার করতল আরক্ত হইয়া গেল এবং মূর্চ্ছিতের মত সে সেই রক্তাক্ত হাত এলাইয়া আসনের উপর কাত্ হইয়া পড়িল।

শম্ভুচন্দ্র স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—আত্মস্থ হইবামাত্র আসন ত্যাগ করিয়া মহেশকে গিয়া জাপটাইয়া ধরিলেন। ভবশঙ্করী ও গৌরী থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—দাসদাসীর দল চারিদিক্ হইতে দৌড়াইয়া আসিল,—কেহ কেহ কবিরাজের নিকট ছুটিয়া চলিল।

তার পর বারকয়েক—অনেক কয় ঝলক রক্তবমনের পর—বমনের বেগ কমিয়া আপনিই থামিয়া গেল।

মহেশের প্রসারিত রক্তাক্ত করতল দেখিয়া শম্ভুচন্দ্রের অন্তশ্চক্ষুতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল—মহেশ-প্রহৃত বৈরাগীর রক্তাঙ্কিত করপ্রসারণের চিত্র। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গল-আশঙ্কায় মনে মনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

"উর্দ্ধগ রক্তপিত্তের প্রথম আক্রমণ—ভয় নাই" বলিয়া পারিবারিক ভিষক্ শম্ভুচন্দ্রকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলেও তাঁহার মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল না এবং বারম্বার সেই বৈরাগীর কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভীষিকার মতই মনে আসিতে লাগিল।

তিনি আগমবাগীশকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিলেন। আগমবাগীশ প্রথমতঃ একচোট খুব হাসিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন,—"সেই মুষিকটার কথা ভাব্‌ছ? ছিঃ! তোমার দুর্ব্বলতা দেখে বিস্মিত হচ্ছি, শম্ভু।"

শম্ভুচন্দ্র কহিলেন,—"দেখুন আগমবাগীশ মশাই, হয় ত' এ আমারই দুর্ব্বলতা; কিন্তু আপাততঃ তাকে এখন আটক করেই রাখা যাক্,—আর কিছু নয়।"

আগমবাগীশ বলিলেন,—"আজকের মহাকালী-পূজার বলি?"

শম্ভুচন্দ্র আগমবাগীশ মহাশয়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে শম্ভুচন্দ্র মহাকালীর পূজা অসম্পূর্ণ রাখ্‌বে না, জান্‌বেন। গোপালগঞ্জে শিকারে যাচ্ছি,—বলির অভাব হবে কেন?"

—"শিকার যদি ফস্‌কে যায়?"

—"কোন দিন ফস্‌কেছে কি?"

আগমবাগীশ একবার হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, চোখ বুজিয়া 'তারা, তারা' স্মরণ করিলেন, তার পর শম্ভুচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তা'ই হোক্—তোমার কথাই থাক্।"

এই বলিয়া আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহার পার্শ্বস্থিত কারণ-বারিপূর্ণ একটি নাতিবৃহৎ ভাণ্ড দুই হাতে ধরিয়া সরাইয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন,—"সর্ব্বাগ্রে তোমার মনের অপ্রসন্নতা দূর করা আবশ্যক, শম্ভুচন্দ্র। এস, শক্তিপ্রসাদ গ্রহণ করা যাক্।"

ভৈরব পাইক দুয়ারে দাঁড়াইয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে-ছিল। আগমবাগীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"শিকারীদের জন্যে ক' ভাঁড় গেছে, ভৈরব?"

—"আজ্ঞে, ছ' ভাঁড়।"

কক্ষস্থিত আরও একটি বৃহৎ ভাঁড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আগমবাগীশ আদেশ করিলেন,—"ভৈরব, এ ভাঁড়টাও সোনা সর্দ্দারের জিম্মা ক'রে দিয়ে ব'লে এস, শিকারীরা ছিপ নিয়ে তৈরি হয়ে থাকুক্।—তোমার প্রসাদ এখানেই প্রস্তুত আছে,—শীগ্‌গির এস।"

ইহার পর গুরু ও শিষ্য শক্তিচক্রে বসিলেন।

শিকারীরাজ শিকারীদের লইয়া শিকারে বাহির হইয়া যাইবার পর, অনেক রাত্রিতে আবার মহেশের ঝলক-দুই রক্ত-বমন হইল। সাতঙ্ক উদ্বেগ সত্ত্বেও ভবশঙ্করী ও গৌরী রোগীর মাথায় বাতাস করিয়া ও কবিরাজ-প্রদত্ত ঔষধাদি সেবন করাইয়া বহুকষ্টে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। সমানভাবে মাথায় বাতাস ও কপালে হাত বুলাইয়া দেওয়া চলিতেই লাগিল; অনেকক্ষণ পর মহেশ যেন প্রকৃতই আরাম পাইয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেশ ঘুমাইয়া পড়িবার পর ভবশঙ্করী গৌরীকে বলিলেন,—"মা গৌরী, তুমি গিয়ে এখন ঘুমিয়ে নাও একটু—দরকার হ'লে আমি ডাক্‌ব।"

—"না মা, আমি থাকি। আর, একলা আমি শুতেও পার্‌ব না—ভয় কর্‌বে।"

মা আর কন্যাকে নিষেধ করিলেন না। তিনি জানিতেন, রোগীর শিয়রে বসিয়া থাকিতে আজ তাঁহারও ভয় করিবে। আজ অমাবস্যা—মহাকালীর পর্ব্বপূজা। ভবশঙ্করী নিজের অজ্ঞাতেই যেন একবার শিহরিয়া উঠিলেন! কন্যার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, একবার চাহিলেন পীড়িত পুত্রের দিকে, তার পর অন্যমনস্কার মত তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গৌরী মৃদুস্বরে বলিল,—"মা, হঠাৎ দাদার এ কি হ'ল?—বউঠাকরুণও রইলেন তাঁর বাপের বাড়ীতে—।"

মা বলিলেন,—"কেমন ক'রে বলব মা!—কত অনিয়ম, অত্যাচার,—কি যে করে, কোথায় যে যায় ওঁর সঙ্গে—।"

গৌরী মনে মনে সব বুঝিল। বলিল,—"আগমবাগীশ মশাইয়ের কাছে দাদা না কি আবার কি সব মন্তর-তন্তরও শিখ্‌তে সুরু করেছেন ?"

ভবশঙ্করী বলিলেন,—"হ্যাঁ, ঐ আগমবাগীশ ঠাকুর—"

বলিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, —"গৌরী, আমার আর এ সব ভালো লাগে না, মা।"

গৌরী সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া মায়ের মুখের দিকে শুধু নীরবে মলিন-মুখে চাহিল।

মহেশ বোধ করি নিদ্রাঘোরে কোন স্বপ্ন দেখিতেছিল—দুঃস্বপ্ন। হঠাৎ সে কাহার উদ্দেশে বিড়্‌বিড়্ করিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিয়াই গোঙাইতে আরম্ভ করিল। গৌরী ভয় পাইয়া জননীকে স্পর্শ করিল। ভবশঙ্করী ডাকিলেন,—"মহেশ, ও মহেশ!"

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু গোঁঙরানি থামিয়া গেল। মাতা ও কন্যা উভয়েই বুঝিলেন, মহেশ স্বপ্ন দেখিতেছে। গৌরী বলিল, "মা, দাদা নিশ্চয়ই খারাপ স্বপ্ন দেখ্‌ছেন,—ডেকে জাগিয়ে দাও।"

ভবশঙ্করী কহিলেন,—"না, আর বক্‌ছে না ত'—চুপ করেছে। ওর যে অসুখ, ডেকে জাগাতে নেই।"

কক্ষকোণে দীপালোক নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল; গৌরী উঠিয়া পিল্‌সুজ-সংলগ্ন পিত্তল-প্রদীপে খানিকটা সর্ষপ-তৈল ঢালিয়া, সলিতা উস্‌কাইয়া দিয়া আসিল। নিশীথ রাত্রি—নিস্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করিতেছে। নিদ্রিত পীড়িতের শিয়রে মা ও মেয়ে জাগিয়া বসিয়া আছেন। দুজনেরই চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল।

কোথা হইতে যেন ঢাকের বাজ্‌না কাণে আসিতেছে না?—খুব বেশী দূরের শব্দ নহে। মা ও মেয়ে সজাগ ও সোজা হইয়া বসিলেন। গৌরী দৃঢ়ভাবে ভবশঙ্করীর করপ্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"মা, শুনছ ?"

ভবশঙ্করী বলিলেন,—"মহাকালীর পূজা হচ্ছে—।"

—"হ্যাঁ, বলির বাজনা।"

ভবশঙ্করী এক হাতে গৌরীকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, অন্য হাত মহেশের মাথায় রাখিলেন।

মহেশ কি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল?—ঐ যে আবার গোঙরাইতে আরম্ভ করিয়াছে! হঠাৎ সে সবলে পাশবালিস ঠেলিয়া ফেলিয়া, সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া অদ্ভুত চীৎকার জুড়িয়া দিল—"বৈরাগী! বৈরাগী!"

ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর মহেশকে ভবশঙ্করী ও গৌরী স্পর্শ করিতেই স্বপ্ন টুটিয়া মহেশ জাগ্রত হইল ও আপনিই ক্লান্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িল। ভবশঙ্করী উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন,—"মহেশ, মহেশ, অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস্ কেন?—কি হয়েছে ?"

মহেশ মাতার একখানি হাত শিথিলভাবে ধরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"মা, বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি, শুনবে ?"

গৌরী বলিল,—"থাক্ দাদা, থামো। এখন তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো,—কাল শুনব।"

মহেশ চুপ করিল না। ধীরে ধীরে বৈরাগী-ঘটিত সকল কথাই সে জননী ও ভগিনীর নিকট বর্ণন করিতে লাগিল—তাঁহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া গেলেন।

—"শুনলে ত' মা, সব ?"

একটি কথাও ভবশঙ্করীর মুখ হইতে বাহির হইল না। গৌরী বলিল,—"বৈরাগী ছাড়া আর কেউ তোমায় নীরোগ করতে পারবে না, দাদা, এ আমি শপথ ক'রে বলছি।"

মহেশ বলিল,—"কালই আমি বাবাকে বলব।"

শেষ-যামের অন্তিমপাদে, ক্লান্ত ও শক্তিপ্রসাদবিহ্বল শম্ভুচন্দ্র নিঃসাড়ে ভৈরবসহ আসিয়া খাস কাছারীর প্রান্তসংলগ্ন চোর-কুঠরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মদবিহ্বলতা হইতেও সে দিন তাঁহাদের ক্লান্তি হইয়াছিল অপরিসীম। গোপালগঞ্জের বায়-বাড়ীতে শিকার করিতে যাইয়া শিকারীরা শুধু ব্যাহত নহে, কেহ কেহ আহতও হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্রের জীবনে ঐরূপ অপমানকর শোচনীয় পরাজয় একাধিকবার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না।

তার পর নদপথে উঠিল প্রবল ঝড়—অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে শিকারীবাহী ছিপ কয়খানি বাঁচিল বটে, কিন্তু এক জন বিশিষ্ট শিকারী সেই যে জলতলে পড়িয়া হারাইয়া গেল, আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

জগদম্বা মান রক্ষা করিলেন। শক্তিপুরের বাঁক-তিন উজানে মিলিয়া গেল এক পান্‌সী। বাহাজানি-শেষে পান্‌সীর আরোহীকে বাঁধিয়া মহাকালী-মন্দিরে ধরিয়া আনা হইল—মাতৃপূজার আর অঙ্গহানি হইল না। কিন্তু মাঝখানে এমন এক হাস্যকর ব্যাপার অভিনীত হইল যে, অতি-গম্ভীর আগমবাগীশ মহাশয় পর্য্যন্তও হাস্যসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাদেবীর পবিত্র বলিরূপে নির্দ্দিষ্ট সেই ভীরু মানব-প্রাণীটি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পরিশেষে চমৎকার এক ফন্দী পাকাইয়া বলিল,—সে হইতেছে শম্ভুচন্দ্রেরই জামাতৃরত্ন! আসবপ্রমত্ত শম্ভুচন্দ্র তাহার দুই গালে প্রচণ্ড দুইটি চপেটাঘাত করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, মানুষ না চিনিয়া শ্বশুর-পাতানো সকল সময় নিরাপদ ও নিরুপদ্রব হয় না। তার পর,—কিন্তু সে অবান্তর কথায় কায কি ?

অনেক বেলা পর্য্যন্ত সভৈরব শম্ভুচন্দ্র পড়িয়া পড়িয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইলেন। নিদ্রাভঙ্গে ভৈরব পাইক উঠিয়া, হাই তুলিয়া, চোখ কচ্‌লাইয়া চাহিয়া দেখিল—খাস কাছারীর দিকের জানালার শার্শির সরু ফাঁক দিয়া একটি উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণ-রেখা আসিয়া কক্ষের মেঝেয় পড়িয়াছে। সে শম্ভুচন্দ্রের পদতলে হস্তার্পণ করিয়া জোরে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—"কর্ত্তা, উঠুন—উঠুন, অনেক বেলা হয়েছে।"

কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—ভৈরব উঠিয়া দুয়ার খুলিতে গেল। কর্ত্তা ধম্‌কাইয়া উঠিলেন,—"আঃ ভৈরব, তোর মাথা খারাপ হ'ল না কি! আগে জিনিষগুলো সামাল ক'রে রাখি, তার পর—"

ভৈরব ফিরিয়া দাঁড়াইল। শম্ভুচন্দ্র বলিলেন,—"ঐ জানালার শার্শিটা তুলে দে।"

ভৈরব শার্শি তুলিয়া দিয়া হুকুম তামিল করিল। ঝরণার ধারার মত খানিকটা শুভ্র আলোর ঝলক আসিয়া পড়িয়া পলকে কুঠরীটির কিয়দংশ আলোকিত করিয়া তুলিল। শম্ভুচন্দ্র গত রজনীর লুঠের মাল গুছাইতে বসিলেন। কতকগুলি সিক্কা টাকা, দুইখানি মোহর, একটি রৌপ্যনির্ম্মিত পাণের ডিবা, একটি মকরমুখো রূপা-বাঁধানো লাঠির মাথার দিকটা, একটি ধূমপানের উদ্দেশ্যে তৈয়ারি সোণার মুখনল, একটি সোণার নূতন দড়াহার—বোধ হয়, আরোহী তাহার কোন প্রিয় পরিজনের জন্য প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন,—এক একটি করিয়া হাতে তুলিয়া লইয়া, এক একবার চোখ বুলাইয়া পরে জিনিষগুলি একে-একে একটি সুড়ঙ্গের মত ভূমধ্যস্থ আধারের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছিল।

এখন কেবল কয়েকটি অঙ্গুরীয় মাত্র বাকী। একটি আংটী অষ্ট ধাতুর,—আর দুইটি সোণার। তন্মধ্যে একটি পলতোলা আংটীতে মূল্যবান্ পাথর বসানো। সেই আংটীটি হাতে তুলিয়া লইতেই সেটিকে শম্ভুচন্দ্রের কেমন পরিচিত বলিয়া মনে হইল—কোথায় যেন দেখিয়াছেন। ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার তিনি দেখিতে লাগিলেন। -এ কি! তাঁহার হাত কাঁপিতেছে কেন?—কি হইল? আংটীটির উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণাক্ষরে কি যেন লেখা! শম্ভুচন্দ্র পড়িয়া দেখিলেন—সুস্পষ্ট একটি নাম 'সতীনাথ'। সতীনাথ—সতীনাথ—তাঁহার জামাই সতীনাথ—গৌরীর স্বামী? অঙ্গুরীয় যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়া তাঁহার হাতে কাটিয়া বসিতে লাগিল,—সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতই আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিয়া তিনি সেটি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

ভৈরব চমকিত হইল—বুঝিতে পারিল না, কর্ত্তা অমন করিতেছেন কেন? অকস্মাৎ কোন ব্যাধি কি তাঁহাকে আক্রমণ করিল?—উহা কি মূর্চ্ছার লক্ষণ?

—"কর্ত্তা,—কর্ত্তা, কি হ'ল?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে রে ভৈরব! শীগ্‌গির দৌড়ে তুই আগমবাগীশ মশাই'র কাছে যা'—এখনি তাঁকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে আয়।"

হঠাৎ এমন কি সর্ব্বনাশ হইল, ভৈরব তাহা বুঝিতে পারিল না এবং প্রভুকে অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না; সে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, চোরকুঠরীর আলো-আঁধারীর ভিতর শম্ভুচন্দ্র একাকী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

খরস্রোতস্বী নারদ নদ। এই নদ বারেন্দ্র-রাজভূমি নাটোরের অভ্যন্তরভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া জোয়াড়ী, বড়াইগ্রাম, লক্ষীকোল প্রভৃতি পল্লীজনপদ-সমূহ অতিক্রম করিয়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলার প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া যেখানে বিখ্যাত চলন হ্রদের অভিমুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটতীরবর্ত্তী গ্রাম—শক্তিপুর। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় যে কালের কথা বর্ণিত হইতেছে, তাহা পরম সাধক বারেন্দ্র মহারাজ রামকৃষ্ণের তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল এবং নাটোর তখন অন্যতম পীঠস্থানের মতই বিশিষ্ট দেবীক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে তখন নবাবী আমল শেষ হইয়া ইংরাজী আমল কেবল ভূমিষ্ঠ হইতেছে মাত্র। সেকালে সারা বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া বহুলভাবে শক্তিসাধনা ও শক্তিচর্চ্চা হইত। অনেক ক্ষেত্রে উহার অপব্যবহার ও বিকারও যে পরিদৃষ্ট হইত না, তাহা নহে;—শক্তিপুরের শক্তিতন্ত্র তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

নারদ নদের তটে, শক্তিপুরের ঘাটে সে দিন প্রথম-প্রত্যুষেই একখানি সুবৃহৎ সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীকে দূর-জলযাত্রার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থান করিতে দেখা গেল। আগমবাগীশের পরামর্শ-চালিত শম্ভুচন্দ্র পীড়িত পুত্র মহেশ সহ সপরিবারে কালীস্থান নাটোরের দিকে তীর্থযাত্রিরূপে চলিয়াছেন। নাটোর জয়কালী-মন্দিরে ও বাক্‌সর শ্মশানকালী-মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা মানস আরাধনাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই আবার শক্তিপুরে ফিরিয়া আসিতেছেন, এইরূপ প্রকাশ।

বৈরাগীকে মুক্তিদান করিয়া মহেশের নিরাময়-ভার তাহার উপর অর্পণ করায় বৈরাগী সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছে যে, কবিরাজ-নির্দ্দিষ্ট ঔষধই নিয়মিতভাবে চলুক্, কারণ, সে চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুই জানে না। তবে তাহার বিশ্বাস, এ ব্যাধি মহাপাপজনিত;—পাপীর পাপশান্তির জন্য সে অবশ্য ভগবানের নিকট নিত্যই প্রার্থনা করিবে। মহেশের হস্তে প্রহৃত ও আহত হইয়া তাহার মনে অজ্ঞাতেও যদি কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই বিক্ষোভ যদি মহেশের বর্ত্তমান পীড়ার পরোক্ষ আংশিক কারণও হয়, সে জন্যও সে ভগবানের করুণাভিক্ষা করিতে কদাচ অবহেলা করিবে না। কিন্তু এই উভয়রূপ প্রার্থনার জন্যই তাহাকে দিনান্তে একবারও অন্ততঃ গুপীযন্ত্রযোগে নামকীর্ত্তন করিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। আপত্তিকর হইলেও, মহেশের মঙ্গলের জন্য তাহা সাময়িকভাবে সমর্থিত হইয়াছিল। আগমবাগীশ শুধু বৈরাগীর প্রতি অলক্ষ্যে ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ওষ্ঠাধরে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তার পর এক দিনের মধ্যেই নৌযাত্রার প্রস্তাব সূচিত হইয়া আয়োজন সমাপ্ত হইয়া গেল—পরদিন প্রত্যুষেই যাত্রা। মহেশের সঙ্গিরূপে বৈরাগীকে জলযাত্রার সহযাত্রী করিয়া লইয়া যাইবার অভিমতে আগমবাগীশ প্রথমতঃ মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিলেও অবশেষে চুপ করিয়া গেলেন।

অঙ্গুরীয়-ঘটিত ব্যাপারে শম্ভুচন্দ্রকে আগমবাগীশ মহাশয় সান্ত্বনা দিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, বিরাট বাঙ্গালাদেশে 'সতীনাথ' নামের অভাব নাই এবং একটি অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ আর একটি অঙ্গুরীয় যে কোথাও নির্ম্মিত হইতে পারে না, তাহাও নহে। তিনি শম্ভুচন্দ্রকে অঙ্গুরীয়টি গোপনে সঙ্গে লইতে বলিয়াছিলেন; গৌরীর বিবাহের প্রাক্কালে নাটোর রাজধানী হইতে যে পরিচিত স্বর্ণকারের দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইয়া আনা হইয়াছিল, উক্ত অঙ্গুরীয়টি তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত কি না, তাহা পরীক্ষিত হইলেই প্রকৃত সত্য নিরূপিত হইবে। সত্য-নিরূপণের পূর্ব্বে অঙ্গুরীয়-রহস্য অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে আগমবাগীশ দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—শম্ভুচন্দ্রও তাহা সাবধানে গোপন রাখিয়াছিলেন।

ভবশঙ্করী জানিতেন, শীঘ্রই শক্তিপুরে জামাই আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু মহেশের ব্যাধিশান্তির জন্য তিনি মহেশের অনুগামিনী হইতে বাধ্য হইলেন এবং গৌরীকেও অভিভাবক-অভিভাবিকাহীন অবস্থায় একাকিনী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত ও সম্ভবপর নহে বলিয়া সঙ্গে লইতে হইল। অন্যদিকে স্বামীর নিকট জামাতৃপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সুযোগও তিনি আর পাইলেন না। কয়েক দিন হইতে শম্ভুচন্দ্র যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছেন—হয় ত' একমাত্র পুত্র মহেশের অতর্কিত পীড়ার জন্যই—তাহাতে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে কিছু অনুরোধ করিতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, বৈবাহিক-কুলের সহিত সেই সাংঘাতিক মনোমালিন্য তাঁহার দিক হইতে এত দিনেও এতটুকু শিথিল হইয়াছে বলিয়া সামান্য প্রমাণাভাসও কোন ফাঁকে পাওয়া যায় নাই। পুরবাসী জন কয়েক আশ্রিত পরিজন ও পুরীরক্ষক দাসদাসীগণকে ভবশঙ্করী গোপনে আদেশ দিয়া আসিলেন যে, জামাইকে যেন মহেশের পীড়াশান্তি হেতু জলযাত্রার কথা বলিয়া সানুরোধে জ্ঞাপন করা হয়, অত্যল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা আবার শক্তিপুরে ফিরিয়া আসিতেছেন—সে কয় দিন যেন সে অবশ্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে।

গৌরী গম্ভীর নতমুখে নৌকারোহণ করিল।

সমারোহের সহিত শক্তিপুরাধিপতির ময়ূরপঙ্ক্ষী নোঙ্গর তুলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইল, কিন্তু সেই সমারোহের তলে তলে যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলের ছায়া, একটা ভাষাতীত বৃহৎ বিষাদের মলিনতা যাত্রাপথে ছড়াইয়া পড়িল—গড়াইয়া চলিল।

লক্ষ্মীকোল পার হইয়া একটি বটচ্ছায়াশীতল নিভৃত স্থান দেখিয়া সেখানে নৌকা ভিড়াইয়া নোঙ্গর করা হইল। বটবৃক্ষ-তলে খানিকটা যায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া, মধ্যাহ্নভোজনের উদ্দেশ্যে রন্ধনের আয়োজন করা হইতে লাগিল।

নদপথের উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহের জন্যই হউক বা কবিরাজ-প্রদত্ত উত্তম ঔষধসেবন-ফলেই হউক, মহেশ আজ সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কাহারও সাহায্য না লইয়াই কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া বেড়াইল, তার পর ছায়ায়-পাতা একটি জলচৌকীর উপর বিশ্রামোদ্দেশ্যে উপবেশন করিল। একবার অন্যমনস্কভাবে সে তাহার উভয় হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল—প্রিয় সহচর কৌৎকাটির কথা আপনা আপনিই যেন মনে পড়িয়া গেল,—যাহার সহিত কয়েক দিন হইতে তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছে। দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—বৈরাগী দূর হইতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। সে উঠিয়া আবার পদচারণা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রন্ধনকার্য্যের জন্য এক জন ব্রাহ্মণী সঙ্গে থাকিলেও ভবশঙ্করী নিজেই রন্ধন করিতে বসিয়াছিলেন; গৌরী মাতাকে সাহায্য করিতেছিল। গৌরী বলিল,—"মা, দাদা যেন আজ এক দিনেই কেমন সেরে উঠেছেন।"

ভবশঙ্করী বলিলেন,—"বৈরাগী বলেছে, সেরেই ত উঠবে।"

গৌরী বলিল,—"আমাদের কবরেজ মশাই'র ওষুধও কিন্তু খুব ভাল, মা!"

ভবশঙ্করী বলিলেন,—"নিশ্চয়ই।—আহা! মহেশ আমার শীগ্‌গির এখন সেরে উঠুক্।"

গৌরী বলিল,—"আগমবাগীশ মশাই ও বাবা বলেন, নাটোরের কালী-বাড়ীতে মানস-পূজা দিলেই ও-অসুখ একেবারেই ভাল হয়ে যাবে।"

ভবশঙ্করী ও গৌরী উভয়ে হাত তুলিয়া উদ্দেশে মহাদেবীকে প্রণাম করিলেন। গৌরী বলিল,—"দাদার কথা আর ভেবো না মা,—দাদা ভাল হয়ে গেছেন বল্‌লেই হয়। ঐ দেখ না, কেমন দিব্যি পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন!"

ভবশঙ্করী গৌরীর মুখের দিকে চাহিলেন—গৌরী যেন আরও কিছু বলিতে চায়, লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না। কি বলিতে চায়, তিনি বুঝিলেন। সস্নেহ-স্বরে বলিলেন,—"আমরা দিন-কয়েকের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব গৌরী,—বেশী কিছু দেরী হবে না—জামাই নিশ্চয়ই এর মধ্যে ফিরে যাবে না।"

গৌরীর গাল দুটি একবার আরক্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিল,—"ও-কথা কে ভাবছে মা, সে যা হয় হবে।"

ভবশঙ্করী হাসিলেন, আঁখি করুণার্দ্র হইল।

প্রধান রন্ধনস্থান হইতে কিছু দূরে, একটা আমগাছের পশ্চাতে বৈরাগী তাহার স্বপাক-হবিষ্য প্রস্তুত করিতেছিল। মুখখানি স্মিতসুন্দর, কিন্তু গম্ভীর এবং তাহাতে যেন একটা মলিন ছায়ার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে। বৈরাগী চোখ তুলিয়া মাঝে মাঝে দূর-আকাশের দিকে চাহিতেছিল—নির্ম্মল স্বচ্ছ-নীল প্রসার। আকাশ-অবকাশে চাহিয়া সে কি দেখিতেছিল?—সেখানে কি অবোধ্য ভবিষ্যতের ছায়াপাত হইয়াছে?

অন্যদিকে, আরও দূরে একটা তেঁতুলগাছের তলায় ঢেউতোলা শিকড়ের বেদীর উপর বসিয়া আছেন আগমবাগীশ ও শম্ভুচন্দ্র,—অদূরে গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে ভৈরব। সম্মুখে অল্প খানিকটা সরিয়া মাঝি-মাল্লারা দুইটি তোলা-উনুনে তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কেহ কেহ নদকূলে দাঁড়াইয়া সন্তর্পণে জল তুলিয়া স্নান করিতেছে—জলে নামিতেছে না, এই অংশটিতে বড় কুমীরের ভয়।

আগমবাগীশ বলিলেন,—"শম্ভু, বৈরাগীর বাহাদুরী আছে বল্‌তে হবে।"

ভৈরব বলিল,—"আর ভারী ধড়িবাজ্, হুজুর!"

শম্ভুচন্দ্র চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—"তুই থাম্ ভৈরব,—তোকে কে সর্দ্দারী কর্‌তে বলেছে?"

অপ্রস্তুত ভৈরব নতমুখে হাত কচ্‌লাইতে লাগিল। আগমবাগীশ বলিলেন,—"মিছে ধম্‌কাচ্ছ; ভৈরব ঠিক্‌ই বলেছে,—ভারী ধড়িবাজ ঐ বৈরাগী! কব্‌রেজ মশাই'র ওষুধে আরোগ্য লাভ করছে মহেশ, আর ব'সে ব'সে বাহাদুরী নিচ্ছে বৈরাগী।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন,—"চুলোয় যাক্ বৈরাগী!—কিন্তু কি জানি কেন, মনটা আজ আমার বড়ই খারাপ হয়ে আছে, আগমবাগীশ মশাই।"

আগমবাগীশ ভৈরবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভৈরব, একটা ভাঁড় নৌকা থেকে নামিয়ে নিয়ে আয় না।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন,—"এই অসময়ে?"

আগমবাগীশ তিরস্কার করিলেন,—"আমার শিষ্যের মুখে এ কথা শোভা পায় না—কোন শক্তিসেবকের মুখেই নয়।"

শম্ভুচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ভৈরব ভাঁড় আনিতে গেল। সে যখন গামোছার আড়ালে লুকাইয়া ভাঁড় লইয়া নৌকা হইতে নামিয়া আসিতেছিল, গৌরী চাহিয়া দেখিল। সে ভবশঙ্করীকে বলিল,—"মা, আজকে দিন-দুপুরেই—"

ভবশঙ্করী চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি ?"

—"ভাঁড়।"

ভবশঙ্করী একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বলিলেন,—"থাম্ গৌরী, শুন্‌তে পেলে খুন-খারাবি ঘটিয়ে ছাড়বে !"

গৌরী ম্লান-মুখে নীরব হইয়া গেল।

কয়েকবার কারণচক্র আবর্ত্তিত হইবার পর ভৈরব গিয়া মাঝিকে চক্রস্থানে ডাকিয়া আনিল। প্রধান মাঝি করযোড়ে আসিয়া শম্ভুচন্দ্র ও আগমবাগীশের সম্মুখে দাঁড়াইল। আগমবাগীশ হাত তুলিয়া তাহাকে আরও নিকটে আগাইয়া আসিবার ইঙ্গিত করিলেন। মাঝি সরিয়া আসিল। আগমবাগীশ বলিলেন,—"ব্যাটা, হাঁ কর্—অতটুকু নয়, আরো বড় ক'রে।"

মাঝি হাঁ করিলে, আগমবাগীশ ভাঁড় উঁচু করিয়া তুলিয়া আল্‌গোছে অনেকখানি শক্তিসুধা তাহার কণ্ঠ-গহ্বরে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন। সে মুখ বিকৃত করিয়া, উভয় করতলে ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিয়া সেই তরল তীব্রতা কষ্টে গলাধঃকরণ করিল, খানিকটা কস্ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

শম্ভুচন্দ্র আদর করিয়া মাঝির পিঠে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়া বলিলেন,—"সাবাস্ ব্যাটা !"

তার পর আগমবাগীশ ও শম্ভুচন্দ্র দুই জন মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ ধরিয়া মাঝিকে কোন নিগূঢ় বিষয়ে উপদেশ ও আদেশ প্রদান করিলেন। আগমবাগীশ কয়েকবার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নদতটাস্তৃত বিপুল বালুকারাশি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে কি দেখাইলেন। তার পর মাঝি করযোড়ে নতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

ইহার পর কয়েক জন মাল্লাসহ মাঝি নৌকা খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট বালুকাভূমির দিকে লইয়া গিয়া আবার নোঙ্গর করিল।

মধ্যাহ্নভোজন শেষ হইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইল। আরোহীসহ নৌকা বাহির-নদের গভীর জলে বাহিত হইল।

বৈরাগী প্রথম লক্ষ্য করিল—নৌকার উপরিভাগ যেন অনেকটা নদতলে নামিয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে। অকস্মাৎ নৌকার ভারবৃদ্ধি হইল না কি ?—কিন্তু কেন,—কেমন করিয়া ? বৈরাগী অন্যমনস্কভাবে কল্লোলিত স্রোতোজলের দিকে একবার চাহিল, একবার দৃষ্টিপাত করিল উর্দ্ধে—আকাশের দিকে।

হঠাৎ প্রধান মাঝি চীৎকার করিয়া মাল্লাদের সতর্ক করিয়া দিল,—"হুঁসিয়ার সব ভাইরা,—নৌকা তলিয়ে যাচ্ছে।"

নৌকা তলাইয়া যাইতেছে ?—ভয়ানক কথা !—আরোহিগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মাঝি সকলকে গোড়াতেই অত ভয় করিতে নিষেধ করিয়া অনুরোধ করিল যে, তাঁহারা যেন এ সময় অনর্থক হৈ-চৈ করিয়া প্রকৃতই অনর্থের কারণ না ঘটান। আগমবাগীশ ও শম্ভুচন্দ্র বারবার সকলকে সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। গৌরী ও ভবশঙ্করী মহামায়াকে মনে মনে স্মরণ করিতে এবং পাচিকা ব্রাহ্মণীটি মহামায়ার নাম ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহেশ বিস্মিত হইল—নূতন ময়ূরপঙ্খীতে ছিদ্র আসিল কোথা হইতে ? বৈরাগীর মুখের ভাব থম্‌থমে—সে হাত বাড়াইয়া তাহার গুপীযন্ত্রটা হাতে তুলিয়া লইল। ভৈরব নির্ব্বাক্ ভাবে আগমবাগীশের প্রতি চাহিয়াছিল।

অনুমানে ছিদ্র সমর্থিত হইল, কিন্তু আবিস্কৃত হইল না। অজ্ঞাত অদৃশ্য কোন্ ছিদ্রপথে কেমন করিয়া জল উঠিয়া তরী ভরিয়া ফেলিয়াছে, ফেলিতেছে। নৌগর্ভ হইতে সেচনী দ্বারা জল সেচিয়া ফেলা হইতে লাগিল—সর্ব্বনাশ ! শুধু জল নয়, স্রোতাবর্ত্ত উত্থিত ঘন বালুকাকণাও জলের সহিত মিশিয়া আরোহিবাহী ময়ূরপঙ্খীকে অতিভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে যে ! কি উপায়,—উপায় কি ? কিন্তু শীঘ্রই কোন উপায় নির্ণয় করিতেই হইবে—বাঁচিতে হইবে এবং বাঁচাইতে হইবে। মিলিত-পরামর্শে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত এবং প্রচারিত হইল—ভারমোচন কর, ভারমোচন কর, যত শীঘ্র পার, ভারমোচন কর !

কতকগুলি হাঁড়িকুঁড়ি, কিছু জ্বালানি কাঠ, দুই-চারিটা আজে-বাজে জিনিষ সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। পাচিকা ব্রাহ্মণীটি 'রাখ্, রাখ্' করিতে করিতে মহেশের পথ্যের জন্য আনীত কয়েকটা পুরাতন কুষ্মাণ্ড, এক হাঁড়ি সরু দাদখানি চাল, সোনামুগের দাল এক হাঁড়ি, এক ঝাঁকা পটল, কয়েকটা পেঁপে তাড়াতাড়ি জলে ফেলিয়া দিয়া ভারমোচন করিল।

জল সেচিবার জন্য কাঠের পাটাতন তুলিয়া স্থানে স্থানে নৌগর্ভ উন্মুক্ত করা হইয়াছিল। এক যায়গায় পাটাতনের নিম্নে খোচা-খোচা কাটা বাঁশের মাচার মত একটা খুপ্‌রী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে কারণ-বারিপূর্ণ কয়েকটা ছোট-বড় ভাঁড় বসানো ছিল। গৌরী ভৈরবকে ডাকিয়া আদেশ করিল, "ঐ ভাঁড়গুলো ফেলে দে জলে।"

ভৈরব দৌড়াইয়া গিয়া আগমবাগীশকে গৌরী দেবীর আদেশ-বাণী নিবেদন করিল। আগমবাগীশ শম্ভুচন্দ্রের দিকে চাহিলেন। শম্ভুচন্দ্র ভৈরবকে হুকুম করিলেন,—"এখনই দৌড়ে নিয়ে আয় গোটা তিনেক ভাঁড়।"

ভৈরব তৎক্ষণাৎ দুই হাতে করিয়া দুইটা ও বুকের সঙ্গে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া একটা—তিনটা ভাঁড় লইয়া আসিল। শম্ভুচন্দ্র দুইটা ভাঁড় মাল্লাদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য মাঝির জিম্মা করিয়া দিয়া, একটি ভাঁড় আগমবাগীশের হাতে তুলিয়া দিলেন। আগমবাগীশ, শম্ভুচন্দ্র, সর্ব্বশেষে ভৈরব তিন জনে মিলিয়া সেই শক্তিসঞ্চারিণী সঞ্জীবনী-সুধার পূর্ণাস্বাদ গ্রহণ করা হইলে শূন্যাধার নদগর্ভে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইল। ওদিকে মাল্লারাও ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের মতই অপর দুইটি ভাঁড় নিমেষে নিঃশেষ করিয়া নৌকার বাহিরে দূরে ছুড়িয়া ফেলিল।

গৌরী তাহার শুভেচ্ছার বিপরীত পরিণতি লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়া ভবশঙ্করীর দিকে তাকাইল। ভবশঙ্করী গৌরীর একখানি হাত ধরিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শুধু বলিলেন, "মা—!"—আর কিছু তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হই না। ঘটনার কুটিল দ্রুতগতি দেখিয়া মহেশ পর্য্যন্ত

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার বুকের যে-ব্যথাটা সারিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, সেই ব্যথাটা সে আবার নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

বৈরাগী গুপীযন্ত্রটা বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তেমনই আকাশের দিকে চাহিয়াই ছিল। এক কোণে যেন একটি ক্ষুদ্র ঘনকৃষ্ণ বিন্দুর মত কি দেখা যাইতেছে না?—বিন্দুটি ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বৈরাগীর মুখ আরও বিষাদগম্ভীর হইয়া পড়িল—পরের দুঃখে, পরের বিপদে মানুষের মুখে যে বেদনাময় করুণ গাম্ভীর্য্য নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে, ইহা সেই গাম্ভীর্য্য।

আগমবাগীশ ও শম্ভুচন্দ্র যেখানে শক্তিমদদৃপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, হস্তপ্রসারণ করিয়া সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া মাঝি উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"এখনও নৌকো হাল্‌কা হ'ল না, হুজুর,—আর বুঝি একে বাঁচানো যায় না—"

আগমবাগীশ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন,—"বাঁচানো যায় না কি, বাঁচাতেই হবে—যেমন করে'ই হোক্‌ কমাতেই হবে ভার! কি বল হে শম্ভুচন্দ্র, ভারমোচন—"

শম্ভুচন্দ্র ঘূর্ণিতনেত্রে বৈরাগীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বৈরাগী,—ঐ বৈরাগীই সব সর্ব্বনাশের মূল। ও যে দিন এসে শক্তিপুরের মাটীতে পা দিয়েছে, সে দিন থেকেই ত' মৈত্রকুলের কূলে ভাঙ্গন ধর্‌ল! আর, আজকের এ বিপদ—এও ঐ বৈরাগীই ডেকে এনেছে।"

শম্ভুচন্দ্র তারস্বরে বলিলেন,—"অলক্ষুণে হতভাগাটা!"

আগমবাগীশ বলিলেন,—"এ অলক্ষুণে ভারটা এবার কমাতেই হবে—কমাবই আমরা!"

দূর হইতেই বৈরাগী এই সব তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিল। দুর্দ্দৈবের দুর্ব্বার গতি রোধ করিবে কে? সে হাসিল—সেই ম্লান গম্ভীর হাসি। উপরে পূর্ব্বদৃষ্ট নিঃশব্দ কালো ছায়া, কালো মেঘ অর্দ্ধাকাশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কালবৈশাখীর বেলা; বাতাস স্তব্ধ, স্তম্ভিত;—নিম্নে ভারাক্রান্ত তরণীর উপর এক দিকে মদোন্মত্ত ক্রুর কলরব, অপর দিকে পীড়িত মহেশকে লইয়া ভয়ার্ত্তা বাক্যহারা তিনটি নারী—ভবশঙ্করী, গৌরী ও পাচিকা ব্রাহ্মণীটি। আরও নিম্নে খরস্রোতোবাহী কল্লোলিত নারদ নদ—এখনই কখন্ উদ্দাম ঊর্ম্মি-তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়া কালবৈশাখীর অভিনব অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িবে।

বৈরাগী ধীরে ধীরে শম্ভুচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া মাথা নত করিয়া বলিল,—"মৈত্র মশাই, আমি এবার আমার নিজের ভার কমাতে চাই।"

বৈরাগীর অশঙ্ক অকম্পিত স্বরে শম্ভুচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। বৈরাগী নদমধ্যোত্থিত অদূর-সম্মুখবর্ত্তী এক চরের প্রতি করপ্রসারণ করিয়া বলিল,—"আমাকে নামিয়ে দিন ঐখানে—ঐ চরে।"

বাহির-নদের বিস্তৃত জলপ্রবাহের মর্ম্মস্থলে অনতিবৃহৎ অর্দ্ধোত্থিত এক চর—ঐ যে দুইটি কুম্ভীর বালুকাস্তরের উপর পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিল, একটি এখনই জলে নামিয়া গেল। উহাকে চর না বলিয়া মৃত্যুদ্বীপ বলাই সঙ্গত। নৌকা তখন সেই মৃত্যুদ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইয়া চলিতেছিল—টলিতেছিল।

আগমবাগীশ ভৈরবকে কি ইঙ্গিত করিলেন। ভৈরব প্রধান-মাঝির হাত ধরিয়া এক হেঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া দিল,—তার পর দুই জন বৈরাগীর দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৈরাগী শম্ভুচন্দ্রকে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বলিবার অবকাশ পাইল না,—ভৈরব ও মাঝি দুই জন আচম্বিতে বৈরাগীর দুই হাত ধরিয়া উঁচু করিয়া টানিয়া তুলিয়া সেই চর লক্ষ্য করিয়া শূন্যে শূন্যে তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তালিম-দেওয়া মাল্লারা অমনই হল্লা করিয়া লাগি ফেলিয়া চরের দিক্ হইতে ঠেলিয়া ময়ূরপঙ্খীকে দূরে সরাইয়া আনিল—সেই হল্লার হড়্‌কায় ভবশঙ্করী ও গৌরীর আর্ত্তনাদ ভাসিয়া গেল এবং কেহ জানিল না, উত্তেজিত মহেশের নাক-মুখ দিয়া রক্ত উদ্গীরিত হইয়া সে অচেতন হইয়া পড়িল।

আগমবাগীশ ও শম্ভুচন্দ্র শঙ্কিত-বিস্ময়ে শিহরিয়া দেখিলেন—নক্রদল চক্রাকারে বৈরাগীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই,—গুপীযন্ত্র বুকে করিয়া বৈরাগী ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া আছে!

কালবৈশাখী—এল, এল কালবৈশাখী,—ঐ আসিয়া পড়িয়াছে রে!—সামাল! সামাল! সামাল!

সর্ব্বনাশ!—বালুকাভূমি হইতে গোপনে যে চর্ম্মাধারসমূহ ভরিয়া প্রচুর বালুকারাশি তরীগর্ভে উত্তোলিত হইয়াছিল, কালবৈশাখীর প্রথম আলোড়নেই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আধারচ্যুত হইয়া তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি উঠাইয়া ফেলিয়া তরীকে ভারমুক্ত করা যাইবে কেমন করিয়া?—প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া শেষে মহা আতঙ্কে পরিণত হইল।

ঝড় বাড়িয়াই চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র নৌপৃষ্ঠ আহত কূর্ম্মের মত টলিতে লাগিল, ঘুরপাক খাইতে লাগিল—আরোহীরা সোলার পুতুলের মতই এখানে সেখানে এ উহার গায়ে টাল খাইয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল—একাধিক ব্যক্তি ছিট্‌কাইয়া গিয়া নদবক্ষে পড়িয়া ভাসিয়া বা তলাইয়া গেল।

তার পর প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত্তের সবল আকর্ষণে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দুমড়াইয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া একটি সামান্য মোচার খোলার মতই সেই সুবৃহৎ ময়ূরপঙ্খীখানি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

একটি মাত্র নাবিক সেই জলতাণ্ডবে ত্রাণ পাইয়া প্রাণ লইয়া শক্তিপুরে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। মহেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী পত্নী পিত্রালয়ে ছিলেন—তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন; সেই শিশুপুত্র হইতেই কালে মৈত্রকুলের বংশধারা প্রবহমান। সেই কালীবাড়ী এখনও আছে, কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম হইয়াছে এখন বৈষ্ণবী-কালী। সেখানে এখন প্রাণিবলির পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড-বলিদান অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই চর—এখনও তাহা 'বৈরাগীর চর' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। নারদ নদ কালক্রমে শুকাইয়া গিয়াছে—দূরে সরিয়া আসিয়াছে। চর-সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে লোকের বসতি হইয়াছে। স্থানীয় লোকরা বলে, এখনও সেই চরে গভীর রাত্রিতে বিদেহী বৈরাগী আসিয়া প্রত্যহ তাহার গুপীযন্ত্র বাজাইয়া যায়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

২৬

হুগলীর হাজতের অন্ধকূপে কয় জন রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত আসামী বসিয়াছিল। কেহ গুণগুণ স্বরে গান করিতেছিল, কেহ বা সরস গল্প ফাঁদিয়া আসর জমকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক জন কিন্তু আপন মনে এক কোণে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। সে রণেন্দ্রনাথ।

ভবেন্দ্র গল্পে মাতিয়া সকলের সহিত হাস্য-রোলে কক্ষটি সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের সেই চীৎকার ভেদ করিয়া ওয়ার্ডারের "এই চুপ" শব্দ মাঝে মাঝে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। কিন্তু গৃহকোণে উপবিষ্ট ব্যক্তির তন্ময়তা এত গণ্ডগোলও ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

হঠাৎ ভবেন্দ্র উঠিয়া গিয়া রণেন্দ্রের স্কন্ধদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া হাস্যবিজড়িত স্বরে বলিল, "কি রে রণা—ব্যাপারখানা কি? এমনই ক'রে মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকলেই বুঝি তোর কসুর মাপ হয়ে যাবে? ওরে বাবা, চিল যখন পড়েছে, তখন কুটোগাছটা নিয়েও উড়বে জেনে রাখো।"

রণেন্দ্র বিরক্তির সুরে বলিল, "আমি ত কসুর মাপের জন্যে ধরণা দিচ্ছি নি। দ্বীপান্তরই দিক বা ফাঁসীই দিক, আমার ত সবই সমান।"

"বটে না কি? তা এত বৈরাগ্য কেন? পৈতৃক প্রাণটার উপরে মায়া রাখলে ক্ষতি কি? যাক গে, যা হবার, তা ত হবেই, তার জন্যে ভেবে ভেবে কি করবি? তবে যতক্ষণ পারি, আয় না মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকা যাক্।"

"স্ফূর্ত্তির অভাবটা আমার কি দেখলি? গান গাবো, না ধেই ধেই নাচবো? বাস্তবিক মনটা খারাপ হয় কেবল তোর জন্যে ভেবে, নইলে সত্যিই স্ফূর্ত্তিতে যোগ দিতুম। তোর কি শাস্তি বল দিকি? কোনও কিছুতে তুই ত নেই, তবু আমার সঙ্গে মিশেই তোর আজ এই দশা—"

"চমৎকার! লেকচার ত আমরাই দিতুম,—তোর এ অভ্যাস হ'ল কবে থেকে রে?"

"না, না, ঠাট্টা না। সত্যি বল দিকি, তুই আজ হাজতে কেন?"

ভবেন্দ্র হঠাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিল, বলিল, "দেখ ত রণা, ভাবি, তোকে ভগবান্ কি দিয়ে গড়েছিলেন, তুই আপনার কথা কখনও ভেবেছিস্ ব'লে ত মনে হয় না। তোর অপরাধ কতটুকু, তাও কি জানিনে? তা ছাড়া ভেবে দেখ, তোর কিসের অভাব। ইচ্ছে করলে হাজতেই তুই রাজার হালে থাকতে পারিস—"

"আঃ, আবার ঐ সব জ্যাঠামি। বলি শোন, আমি যা ষ্টেটমেণ্ট দেবো, তুই তাতে আপত্তি করিস নি। আমার যা কিছু আছে, তা দিয়ে তোকে যদি খালাস করাতে পারি, তা হলেও বুঝি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুই নির্দ্দোষ—"

"আর তুই?"

রণেন্দ্রের অধরের কোণে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি মহাপাতকী—"

ঝন্ ঝন্ শব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, হাজতের অধ্যক্ষ একটি ভদ্রলোককে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি রণেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রণেন বাবু, ইনি আপনার ষ্টেটের উকীল, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। যা বলবার, আমার সাক্ষাতে বলতে হবে।" কথাটা বলিয়া হেড ওয়ার্ডারকে বলিলেন, "বাকী কয়েদীদের ৬ নং রুমে নিয়ে যাও, আধ ঘণ্টা পরে এদের এখানে নিয়ে এস।"

রণেন্দ্র বলিল, "সবাই যাবেন আমি ছাড়া?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "হাঁ, তাই।"

রণেন্দ্র পুনরপি বলিল, "ভবেন?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "সবাই।"

রণেন্দ্র বলিল, "তা হ'লে আমি রমেশ বাবুকে একটা কথা জানাতে চাই। এই লোকটির নাম ভবেন, আমার বন্ধু, এঁকে চিনে রাখুন।"

ওয়ার্ডার অন্যান্য কয়েদীকে লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। উকীল রমেশ বাবু বলিলেন, "ভবেনকে ত আমি চিনি, রণেন্দ্র। আমি তোমার পিতামহের আমল থেকে তোমাদের ষ্টেটের কায ক'রে আসছি। সেই পুরানো সম্বন্ধের জোরে জিজ্ঞাসা করছি, যা ঘটেছে, সত্যি সব বলবে ত? জানি, তুমি মিথ্যা বল না। তা হ'লেও ব'লে

রাখছি, খুঁটিনাটি-টি পর্য্যন্ত সব সত্যি বল্‌লে মামলার সুব্যবস্থা করতে পারবো, রেখে ঢেকে বললে কোনও ফল হবে না।"

রণেন্দ্র বলিল, "হুঁ।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "মামলাটা খুবই ঘোরালো। তোমার ঘরে বোমা রিভলভার বেরিয়েছে! সে ঘরে—ঘরে কেন, সে মহলটায় তুমি আর ভবেন ছাড়া আর কেউ যেতো না বা তার চাবী আর কেউ ব্যবহার করতো না, তা প্রমাণ হয়েছে। তোমার পুরাতন চাকর সোনা মালীও তা স্বীকার করেছে। একটা সিন্দুকের ভেতর থেকে এমন সব কাগজ-পত্র পাওয়া গেছে, যাতে দাগী এনার্কিষ্টদের মস্ত এক লিষ্ট বেরিয়েছে। তুমি বড় লোক, জমীদার, তুমিই অর্থ-সাহায্য ক'রে এই দলটাকে চালাচ্ছ, পুলিস এইটা প্রমাণ করতে চায়। অথচ আমি জানি, তুমি এ সবের ধার ধারো না। কিন্তু আমি বল্‌লেই তা প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য হবে না। কাযেই তোমায় সব ব্যাপারটা ভেঙ্গে বল্‌তে হবে।"

রণেন্দ্র বলিল, "ব'লে যান।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "তোমার কেউ শত্রু আছে কি—আপনার লোক, যে তোমার সংসারের সব খোঁজ রাখে?"

রণেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "না।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কেউ না? তোমার জেল বা দ্বীপান্তর হ'লে যে জমীদারী ভোগ করবার সুবিধা পাবে?"

রণেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, কেউ নেই। আমিই এ সব করেছি।"

রমেশ বাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি? দেখ, এ আগুন নিয়ে খেলা ক'রো না, সত্যি যা হয়েছে, বল।"

রণেন্দ্র বলিল, "এ ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে এই ভবেনের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বল্‌তে পাব কি?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের দিকে সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তা পারেন।"

রণেন্দ্র বলিল, "আমার এই ব্যাপারের সঙ্গে শ্যামপুকুরের বন্ধুদের বা আখড়ার কারুর সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। ভবেন মাঝে মাঝে আমাদের দেশের এই বাড়ীতে আসতো বটে, কিন্তু পুরোনো মহলে কখনও যায় নি—সে জানতো, এটা পোড়ো বাড়ী, ওখানে সাপ-পোকড়ের বাসা। যখন আমি সবই খুলে বল্‌লুম, তখন এটাও যে মিথ্যে বল্‌ছি নে, এটা জেনে রাখুন।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। উকীল বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মুখের কথায় যদি মামলা খাড়া করা যেতো, তা হ'লে ভাবনা ছিল না। যাক্, তোমার সম্বন্ধে তা হ'লে কি করতে বল?"

রণেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বিশ্বাস হ'ল না? হয় না হয়, পুলিসকেই জিজ্ঞাসা করুন, ওরা আমায় যে দলের ব'লে ধরেছে, সে দলে ভবেনরা আছে কি না—সে দলেরই কথা ওরা জানে কি না—আমার কথা স্বতন্ত্র।" রণেন্দ্র উকীল বাবুর ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইল। আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া উকীল বাবুর হাত দুইখানি ধারণ করিয়া কাতর মিনতিভরা স্বরে বলিল, "রমেশ বাবু, আপনি আমাদের বংশের উকীল, বন্ধু, অভিভাবক! আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি জানেন, আমাদের বংশে কেউ কখনও মিথ্যে ব'লে আপনার স্বার্থ গুছিয়ে নেয় নি। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি বলছি, ভবেন নির্দ্দোষ—তাকে বাঁচান—রমেশ বাবু, যত টাকা লাগে, তাকে বাঁচান।"

রমেশ বাবু তাহার উত্তেজনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও অভিভূত হইলেন। রণেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—দারুণ উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভাব তাহার আয়ত নয়ন দুইটিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। এরূপ উত্তেজিত হইতে রমেশ বাবু তাহাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "বন্ধুপ্রীতিটা খুবই ভাল সন্দেহ নাই, রণেন্দ্র, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি ত মামলার হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচাবার হ'লে অবশ্যই বাঁচাবো। বাঁচায় সাক্ষ্যপ্রমাণ। তা যদি পাই, তবে আর উপরোধ অনুরোধে ফল কি? কিন্তু যা দেখছি, তাতে—"

রণেন্দ্র বিক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় কঠোর স্বরে বলিল, "তা হ'লে কোন উপায় নেই?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কেমন ক'রে ভরসা দিই? তবে যদি তোমার কথাটা সব সত্যি বলতে—"

রণেন্দ্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আর আমার কিছু বলবার নেই, আপনারা যেতে

পারেন।" কথাটা বলিয়া রণেন্দ্র আবার কক্ষের কোণে গিয়া বসিল। তাহাকে আর কেহ কথা কহাইতে পারিল না।

২৭

রাজেশ্বর বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া কথা হইতেছিল। উকীল বিমলচন্দ্র বলিতেছিল,"মস্ত ভুল করেছেন রাজুকা—আপনার নারীর মন বুঝতে বোধ হয় এখনও অনেক বাকী।"

রাজেশ্বর বাবু টেবলের উপর হাত দুইটি রক্ষা করিয়া জানালার বাহিরে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে কাতরতা যেন শূন্যতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল।

বিমলচন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, "আগে বুঝি নি। মনের কথা নিজের মুখেই স্বীকার করছি, জ্যোৎস্নাকে আমি আগে অন্য দৃষ্টিতেই দেখেছি—সেটা কতকটা আপনার ভাবভঙ্গী দেখেই বটে। মনে হয়েছিল, আপনি জ্যোৎস্নাকে বিবাহিতা হ'লেও অনূঢ়ার মত দেখতেন—তাকে আবার পাত্রস্থা করবার ইচ্ছা পোষণ করতেন—আমাকে ইঙ্গিতে এ আভাসও দিয়েছিলেন। আমিও মনে করেছিলুম, যদি তাকে পাই, তা হ'লে সমাজধর্ম্মও মানবো না, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী যা হয় হয়ে যাক। কিন্তু যে দিন তার হাতের লেখায় তার মনের কথার পরিচয় পেলুম,—সেই দিন থেকে—"

রাজেশ্বর বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "সে এক দিন—যে দিন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে উঠেছিল, যে দিন জেনেছিলুম, আমাদের এই বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—যাদের আমরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে মনে করি—যারা ঘরের বাইরে পা দিলে লজ্জায় ম'রে যায় ব'লে আমরা যাদের চেলীর পুঁটুলী ব'লে তামাসা করি, সেই বাঙ্গালীর মেয়ের মন কি ধাতু দিয়ে গড়া! সে দিন মনে হয়েছিল, জ্যোৎস্নার আধখানা এই মাটীর পৃথিবীর হলেও আর আধখানা স্বর্গের। ও জাতের মধ্যে যে এত প্রচ্ছন্ন, এত গভীর প্রেম লুকিয়ে থাকতে পারে, সে দিন তা যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলুম।"

রাজেশ্বর বাবুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি বলিলেন, "কি আবোল-তাবোল বকছো, বিমল?"

বিমলচন্দ্র বলিল, "আবোল-তাবোল মোটেই নয়, সত্যি যা, তাই বলছি। সে দিন আপনার মামলার সম্বন্ধে একটা জরুরী পরামর্শের জন্যে এখানে এসেছিলুম, খবর দেবারও সময় হয় নি। এসে দেখি, আপনি জ্যোৎস্নাদের নিয়ে কি একটা কাযে কলকাতায় গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। করি কি? তিন চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় ফেরবার গাড়ী নেই, কাযেই আপনার বসবার ঘর, ছেলেদের পড়বার ঘর, কেতাবের ঘর ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগলুম। পড়বার ঘরে ছেলেদের কেতাবের ডেস্কটার টানা খুলে দুই একখানা বই টেনে বার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের এডিশনের একখানা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল দেখলুম। কেতাবখানা আমার বড় প্রিয় ছিল। তখনই বার ক'রে নিয়ে পড়তে বসলুম। দেখলুম, পাতায় পাতায় মার্জ্জিনে মুক্তোর অক্ষরে নোট লেখা—সে লেখা যে জ্যোৎস্নার, তা দেখেই চিনতে পারলুম, কেতাবে নামও লেখা 'শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।' তা ছাড়া শেষের পাতায় লেখা ছিল কি জানেন ?—'হে অন্তরের দেবতা! ব'লে দাও, আমি অজ্ঞান বালিকা, এ স্পর্শের প্রভাব অনুক্ষণ আমায় জ্বালা দেয় কেন? সেই যে দিন আমার করে ধ'রে কাতর অভিমানাহত ছলছল নয়ন আমার মুখের উপর তুলে বলেছিল, বিচার করবে না, কি দোষে আমি দোষী,—সে দিনের স্পর্শ ত ইহ-জীবনে ভুলতে পারবো না—সে ছলছল নয়নের কাতর ভিক্ষার দৃষ্টির স্মৃতি ত কখনও মুছে যাবে না। বেশ ত ছিলাম, কি কুক্ষণে বাবা এখানে আনলেন!' এই রকম আরও কত কি!"

রাজেশ্বর বাবুর পাষাণ-হৃদয় থর্‌থর্ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণে টেবলের পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নয়ন স্পন্দনশূন্য।

বিমলচন্দ্র আবার বলিলেন, "তখন বুঝলুম, এ দেশে নারী কি ধাতু দিয়ে গড়া। কেতাবে পড়েছি, পাঠানরা বংশের অপমান ভোলে না, বংশের একটা লোকও যত দিন বেঁচে থাকে, তত দিন বংশের অপমানের প্রতিশোধ নেয়—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! কিন্তু এ যুগের ভদ্র শিক্ষিত সভ্য বাঙ্গালীরও যে এই প্রবৃত্তি থাকতে পারে, তা ত জানতুম না। ভেবে দেখুন দেখি,

আপনাদের এই বংশগত বিবাদ পুষে রেখে কি সর্ব্বনাশ করেছেন—আপনাদের পাপের জন্য নিরীহ নির্দ্দোষ দুটি তরুণ হৃদয়কে আঘাতের উপর আঘাত দিয়ে দলিত-পিষ্ট করেছেন—আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? উঃ, যখন ভাবি, আমাদের ঘরের এই লক্ষ্মীদের কি অসাধারণ সহ্যগুণ—কি কল্পনাতীত ত্যাগস্বীকার,—অন্তরের অন্তস্তলে যে কামনা আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠছে, তাকে দমন ক'রে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে, আপনাদের বংশের মান রক্ষা করছে—আর তারই ফলে দুটি সংসার জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তখন ব্যর্থ আক্রোশে, রুদ্ধ রোষে আর জীবন-ভরা আপশোষে মনের মধ্যে তুষের আগুন জ্ব'লে ওঠে—"

রাজেশ্বর বাবুর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বিমল, বিমল, এ বৃদ্ধকে আর কত শাস্তি দেবে? বল, বল, কি করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

বিমলচন্দ্রের নয়নও অনার্দ্র ছিল না। সে আপনাকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তার ব্যবস্থা আমিই করছি। যে দুটি নদী পরস্পর মিলিত হবার জন্য পরস্পরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের মিলিয়ে দিতে হবে, এইটেই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। তাতেও যে আপনাদের সকল পাপের ক্ষয় হবে, তা বল্‌তে পারি নে।"

রাজেশ্বর বাবু বাষ্পাকুল-নয়নে বিমলচন্দ্রের দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তবে তাই কর বিমল, আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। জ্যোৎস্নার মনের ভাব ত কিছুই বুঝতে পারি নি। যখন রণেন বিষয় লেখাপড়া ক'রে দিতে এসেছিল, তখন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই ত শুনেছিলুম। সে যে মনে মনে তার প্রতি অনুরাগিণী, তা ত ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তার সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার সঙ্কল্প হ'তে তাকে যখন টলাতে পারেন নি, তখনই কি বুঝতে পারেন নি, হিন্দুর মেয়ে একবার বিবাহিত হ'লে আর তার বিবাহ ফেরে না?"

রাজেশ্বর বাবু নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ম্লান-মুখে বলিলেন, "না, তা পারি নি, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। ভেবেছিলুম, লোকাচার হিসাবে ওরকম করছে। যাক্, এখন আমায় কি করতে হবে, বল—আমার সর্ব্বস্ব দিলেও যদি জ্যোৎস্নার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, আমি তাতেও প্রস্তুত।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি ফল হবে, বলতে পারি নে। তবে মানুষের চেষ্টায় যত দূর হয়, তা করতে হবে বৈ কি। জানেন কি, রণেন বাবুর কেসটা কি ভাবে গ'ড়ে উঠলো? কেউ তার শত্রুতা ক'রে নিশ্চয় এ কায করেছে, না হ'লে রণেন বাবু এনার্কিষ্ট হবে, এটা ত মনে ধারণাই করতে পারছি না।"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "আমি ত কিছুই জানি না, একটা খুচরো চুরি ধরতে গিয়ে পুলিস ঐ বাড়ীতে বোমা পেয়েছে শুনেছি। ডণ্ড বৈঠক, জিমনাষ্টীক কুস্তী করতো, লাঠি খেলতো বটে, কিন্তু ও যে বোমাওলাদের সঙ্গে কখনও মিশেছে বা ওর বাড়ীতে সে রকম লোকের যাতায়াত ছিল, তা শুনি নি।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "তবে? কে ওর শত্রুতা সাধলে? আশ্চর্য্য!"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "ওদের উকীল রমেশ বাবু বল-ছিলেন, ও না কি স্বীকার করেছে যে, ও বোমার কারখানা করেছে, ও এখানকার এনার্কিষ্ট দলের চাঁই। ভবেন ব'লে ছোকরাকে কিন্তু ও খুব ভাল বলেছে, অথচ ভবেনই ওর এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতো ব'লে ধরা পড়েছে।"

বিমলচন্দ্র বলিলেন, "তাই ত, কিছু বুঝতে ত পারছি না। যাই হোক্, কেসটা নিতে হবে হাতে ভাল ক'রে। একবার তার আগে ওর সঙ্গে দেখা করবার দরকার। কিন্তু আমায় ত চেনে না। তা আপনি নিয়ে চলুন না জেলে। আমি আজই হাকিমের সঙ্গে দেখা ক'রে অনুমতি চেয়ে নিয়ে আসছি।"

রাজেশ্বর বাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "আমি ত এখনই যেতে সম্মত, কিন্তু আমি গেলে হয় ত নাম শুনেই সে আমাদের কারুর সঙ্গেই দেখা করবে না।"

বিমল বলিল, "তবেই ত! একবারে নামটা জ্বালিয়ে রেখেছেন তার কাছে দেখছি যে।"

রাজেশ্বর বাবু অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবো বলেই ত! আমার মা—আমার জ্যোৎস্না—"

দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলচন্দ্র বিস্মিত হইল, সে তাঁহাকে কখনও এমন বিচলিত হইতে দেখে নাই। বিমল তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত দুইটি চক্ষু হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ, আপনি জ্ঞানী, আপনি এত উতলা হ'লে চল্‌বে কেন? চলুন, একবার জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।"

রাজেশ্বর বাবু যেন আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায় চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, আমি যাই—তুমি জ্যোৎস্নাকে যা হয় বুঝিয়ে বোলো, তার কাছে এগুতে আমার সাহসে কুলাচ্ছে না।"

রাজেশ্বর বাবু আর দাঁড়াইলেন না, বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলেন।

বিমলচন্দ্র কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিল। আজ জ্যোৎস্নার সহিত তাহার সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। সংবাদ লইয়া তিনি জানিলেন, জ্যোৎস্না সুধাংশুকে লইয়া কি একটা কাযে বাহির হইয়াছে, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। বেহারা বলিল, দিদিমণির আজ বাগানবাড়ী যাওয়ার কথা আছে, কেন না, সে বাগানবাড়ীর ঘর-দ্বার খুলিয়া রাখিবার হুকুম পাইয়াছে, তাহার স্ত্রী বাগান-বাড়ীতেই দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হয় ত দিদিমণি আর কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাগানবাড়ী হইয়া ঘরে ফিরিবেন।

বিমলচন্দ্র ভাবিল, বাগানবাড়ীতে হঠাৎ কি এত প্রয়োজন? মাত্র দিন পাঁচ সাত বাগানবাড়ী জ্যোৎস্নার দখলে আসিয়াছে, সে মামলা চালাইয়াছিলও ত তাহারই উপদেশে। তবে এ সম্বন্ধে সে তাহার সহিত কোন পরামর্শ করিল না কেন? বিমলচন্দ্র বাগানবাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইল। ফটক পার হইয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল, জ্যোৎস্না দাসীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বিমলচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে শুনলুম, সুধাংশুকে নিয়ে বাগান-বাড়ীতে রয়েছ? এস, অনেক কথা আছে।"

গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে করিতে জ্যোৎস্না বলিল, "সুধাংশুকে নিয়ে সোনাদা কাছারীবাড়ীতে গিয়েছে, সেখানে কি সব কাণ্ড বেধেছে, কালী বাবু আর কলকাতার কে গুপীনাথ বাবুকে না কি পুলিস শ্যামপুকুর থেকে ধ'রে নিয়ে এসেছে।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তার মানে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে সোনাদা বলছিল, সদর-নায়েব মশাই বলেছেন, নাম জাল করেছে—"

জ্যোৎস্না বলিতে বলিতে নীরব হইল, তাহার মুখ নত হইল।

বিমলচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "জাল, কার নাম জাল করেছে? ওহো, বুঝেছি। যাক, ও সব পরে শুনবো। সত্যিই যদি এদের সঙ্গে কালী বাবুর মামলা বাধে, তা হ'লে জমীদারকে ত ছাড়িয়ে আনতে হবে আগে।"

জ্যোৎস্না নীরবে রহিল। বিমলচন্দ্র হঠাৎ বলিল, "কি যেন সব ওলট-পালোট হয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কি হয়েছে, জ্যোৎস্না, খুলে বলবে কি? রণেন বাবুকে খালাস করতে হ'লে সব খুঁটিনাটি জানা চাই।"

জ্যোৎস্না গম্ভীর স্বরে বলিল, "ঘরে চল, কথা আছে, বিমলদা!"

বিস্মিত বিমলচন্দ্র জ্যোৎস্নার সহিত তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্না অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাকে একখানি কাষ্ঠাসন দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বোসো। সবই বল্‌ছি।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "হাঁ, সবটা জানবার দরকার হয়েছে—আজই হোক্ বা কালই হোক, হাজতে গিয়ে একবার রণেন বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

জ্যোৎস্নার ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল। কি বলিতে গিয়া লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মুখ অবনত করিল।

বিমলচন্দ্র বলিল, "দেখ জ্যোৎস্না, তুমি আর বালিকা নও, তোমার ভাল-মন্দ বুঝবার বয়েস যথেষ্টই হয়েছে। এ সময়ে মিথ্যে লজ্জা বা সঙ্কোচের ভয় ক'রে নিজের ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ ক'রো না। কি হয়েছে, সব খুলে বল।"

জ্যোৎস্না অবনত-মুখেই বলিল, "কি বলবো, বিমলদা! সবই ত বুঝছো। আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বোমার আড্ডার গোড়া আর এই লোকটাই পুলিস নিয়ে এসে ধরিয়ে দিয়েছে।"

বিমলচন্দ্র বলিল, "তা যেন হ'ল ; কিন্তু রণেন বাবু নিজের অপরাধ স্বীকার করছেন কেন তাঁর উকীলের কাছে ?"

জ্যোৎস্নার মুখখানি আরও অবনত হইল। সে একবারে বুকের মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া ফেলিল। ক্ষণপরে কম্পিতকরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা বাহির করিয়া বিমলচন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল, "প'ড়ে দেখ, সবই বুঝতে পারবে। এই চিঠিখানা আগে পড়।"

জ্যোৎস্না কথাটা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্পিতচরণে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

বিমলচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল সেই খাতা ও পত্রখানা ধারণ করিয়া বসিয়া রহিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিল। দেখিল, খাতা নহে, সেখানা একখানি ডায়েরী।

প্রথমেই পত্র। পত্রখানি আসিতেছে কাশী হইতে। পত্রখানি এই—

"মরণের দ্বারে পৌঁছে আর স্থির থাকতে পারলুম না। নিজে লিখতে পারি নে, এক দয়াবতী বাঙ্গালী নার্সকে দিয়ে লেখাচ্ছি। কত লুকিয়ে—কত ঘুষ দিয়ে এ পত্র পাঠাচ্ছি, তা তুমি জানবে না। যাক, আসল কথা বলি। তোমার স্বামী—কি কারণে স্বর্গের আসন থেকে এই নরকের পথে নেমে এসেছেন, তা যদি জানতে চাও, তা হ'লে তাঁর চাঁপাপুকুরের বাগানবাড়ীতে তাঁর ডায়েরীখানা খুঁজে বার ক'রে পড়ো। আমি এক দিন লুকিয়ে কাশীর বাড়ীতে তাঁর পকেট থেকে বার ক'রে ঐখানা পড়েছিলুম। এবার দেশে ফেরবার সময় সেখানা নিশ্চয় নিয়ে গেছেন, কেন না, সেখানা অষ্টপ্রহর কাছেই রাখতেন। তাঁর সোনাদার কাছে খোঁজ ক'রো, কোথায় তিনি দরকারী কাগজ-পত্তর লুকিয়ে রাখেন। সেখানা প'ড়ে যদি এখনও তোমার চোখ ফোটে, তবু সুখে মরতে পারবো যে, তিনি শেষকালে তোমায় পেয়ে সুখী হয়েছেন। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ, তাঁকে চিনতে পার নি, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ। কত দিন কাশীর বাড়ীতে রোগশয্যায় শুয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য—কেবল তোমার নাম ক'রে ডেকেছেন। তার পর ডায়েরীখানা প'ড়ে যখন বুঝতে পারলুম, তখন সত্যিই ইচ্ছে হয়েছিল, তোমায় নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলি! উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি! যাঁর এতটুকু ভালবাসা পেলে আমি পৃথিবীটাকে স্বর্গ ব'লে মনে করতুম, যাঁর ভালবাসা পাব ব'লে মিথ্যে আশায় কুলত্যাগ ক'রে এসেছিলুম, তুমি এত বড় পিশাচী রাক্ষসী—তাঁর সেই অযাচিত ভালবাসার দান পায়ে ক'রে দলেছ! তাঁকে ত আমি পাই নি, কেবল তোমায় ভোলবার জন্যে শেষে নেশা-ভাঙ্গ ধরেছিলেন, নরকে নেমেছিলেন, কি করেছেন, বুঝবারও তখন মাথা ছিল না। ছিঃ ছিঃ, তুমি নারী—তুমি স্ত্রী?

"যাক, চিঠি বাড়াবো না, সে ক্ষমতাও নেই, প্রতি মুহূর্ত্তে আয়ুঃশেষ হয়ে আসছে। মরবার সময়ে মিথ্যে কিছুই বলবো না। বাবু পাড়ার রাজা ছিলেন, সবাই তাঁর কাছে উপকার পেয়েছে। রোজ তাঁকে বাড়ীর পাশ দিয়ে আখড়ায় যেতে দেখতুম। বাড়ীতে স্বামীর অনাদর, শাশুড়ীর গঞ্জনা অত্যাচার, তাঁকে পাবার লোভ, তাই যাকে তাকে নিয়ে কুলত্যাগ করেছিলুম। কাশীতে নেমে সে লোকটার চোখে ধূলোও দিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁকে দিতে পারি নি। তিনি আমাদের জানতেন, আমার দেওরকে বড্ড ভালবাসতেন—ছোট ভায়ের মত। তার মুখে আমার কথা শুনেই জলের মত টাকা খরচ ক'রে সন্ধানের পর সন্ধান নিয়ে কাশী এসেছিলেন। আমায় খুঁজে বার ক'রে, ছোট বোনের মত আদরে যত্নে রেখেছিলেন, বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করেছিলেন। আমি পোড়ারমুখী কেবল তাঁকে কাছে রাখবার জন্যে ছলের পর ছল ধরেছিলুম। সরল মানুষ তিনি, আমাদের শয়তানী বুঝবেন কি ক'রে?

"শেষ অনুরোধ করছি, আমি মরণ-পথের যাত্রী। এখনও সময় আছে, তাঁকে ফিরিয়ে সংসারী কর। আর যদি এখনও অহঙ্কারের মাচায় ব'সে থেকে তাঁকে অনাদরে দূরে ঠেলে রাখ, তা হ'লে উচ্ছন্ন যাও!

ইতি— তরলা"

বিমলচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া নীরবে রহিল। ওকালতী ব্যবসায় করিতে করিতে সে লোকচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, জীবনে অনেক ঘটনাও দেখিয়াছিল, কিন্তু এ কি অভাবনীয় ঘটনা, কি আশ্চর্য্য নারীচরিত্র!

ধীরে ধীরে বিমলচন্দ্র ডায়েরীখানির পাতা উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। একের পর এক জীবনের ঘটনা—বাল্যে পিতৃপিতামহের আদর, ব্যায়ামে আসক্তি, কৈশোরে বিবাহ, ফুলশয্যার রাত্রি, অসামান্যা সুন্দরী বালিকা বধূ, প্রথমাবধিই অনুরাগ, দুই বংশে বিরোধ ও বিচ্ছেদ, বধূদের দেশত্যাগ, বধূর স্মৃতি, সংসারে শোক-বিয়োগ, কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব, ব্রহ্মচর্য্য, বাণী-সেবা ও বন্ধু-সঙ্গ, জীবনের এই প্রথম অধ্যায়। তাহার পর বোটানিক্যাল গার্ডেনে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, পূর্ব্ব অনুরাগের সুপ্ত স্মৃতির শত ধারে বিস্তৃতি, মিলনের আন্তরিক চেষ্টা, প্রাণ দিয়া ভালবাসা, প্রত্যাখ্যান, জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথমে রূপের মোহ, পর অধ্যায়ে অবিনাশী দুর্জ্জয় প্রেম, প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান, অপমান-লাঞ্ছনার বৃশ্চিক-দংশন, জীবনে দুর্ব্বিষহ ভার, কালীনাথের সহবাসে অধঃপতন, পরিণাম—মৃত্যু! মৃত্যুই এ অভিশপ্ত জীবনে একমাত্র বন্ধু!

বিমলচন্দ্র বস্তুতন্ত্রের উপাসক—তাহার মনে এক বিন্দুও ভাবপ্রবণতার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তাহার নয়নপ্রান্তে অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দৃঢ় মুষ্টিতে ডায়েরীখানি ধারণ করিয়া সে অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব'লে দাও ভগবান্, কি করলে এ দু'টি প্রাণের পবিত্র মিলন সম্ভবপর হয়!" [ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

ফাগুন-সাঁঝে

ফাগুন-সাঁঝে আজি পরাণ খুলি
তটিনী-বুকে নাচে তরণীগুলি
উজল কালো জলে
মরাল দলে দলে
ভাসিছে ধীরে ধীরে বদন তুলি
মধুর কলরবে আপনা ভুলি।

হাসিছে কমলেরা সরসী-নীরে
ধবল রূপরাশি ছড়ায়ে ধীরে
চাঁদের পথ চাহি
পরাণ গীতি গাহি
চকোর-আঁখি ঝরে গগন-তীরে
সবুজ পাতাভরা বিটপি-শিরে।

ধরার বুকে আজি শিহর জাগে
শীতল জল ভরা শিশির-রাগে
আঁধারে বনতলে
জোছনা ঝল্‌মলে
বিরহী করযোড়ে মিলন মাগে
প্রিয়ার সাথে ঘন রজনী-ভাগে।

ধবলগিরি আজি হরষে হাসে
গগন পানে চাহি নীরব ভাষে
ও পারে ফুলবনে
মলয়-সমীরণে
আকুল করে হিয়া বকুল-বাসে
আজি এ সুধাঝরা মধুর মাসে।

পথিক ফিরে চলে ঘরের পানে,
মুখর করি দিশি অমিয় গানে
সুদূরে নদীকূলে
শীতল বটমূলে
আকুল বাঁশী বাজে করুণ তানে
জাগায়ে ব্যাকুলতা বিরহি-প্রাণে।

কলসী কাঁখে বধূ চলিছে একা
গ্রামের পথে আঁকি চরণ-রেখা
জলের ছিটা লাগি
পুলক উঠে জাগি
কোমল মুখখানি যায় না দেখা
কেবলি জাগে বুকে স্মৃতির লেখা।

অদূরে কুঁড়েঘরে জ্বলিছে আলো
দু'পাশে ঘন বন নিকষ কালো
গোপনে গাছে থাকি
কোকিলা উঠে ডাকি
মধুপ গীতি কাণে লাগিছে ভালো
এস রে কবি হেথা পরাণ ঢালো!

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

কাশ্মীরের গেছো ভূত

(অলৌকিক রহস্য)

মিঃ পি, ই, এক্স, টর্ণবুল বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী; প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কৌতুকাবহ বিবরণ সংপ্রতি লণ্ডনের কোন বিখ্যাত সচিত্র মাসিকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দেশবিদেশের অনেক লোকই ভূস্বর্গ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, কোন কোন সুলেখক কাশ্মীর-ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের সুলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্ব স্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মিঃ টর্ণবুলের ন্যায় কোন অলৌকিক রহস্যের আভাস দিতে পারেন নাই। এই বিস্ময়াবহ বিবরণটি 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকাগণের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করিবে এবং যাঁহারা ভূত মানেন না, তাঁহারা এই অলৌকিক রহস্যের কারণানুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন—এই আশায় মিঃ টর্ণবুলের অভিজ্ঞতা-কাহিনী তাঁহারই কথায় ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের দেশের লোকের কথা হইলে অনেকে ইহা গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা ইংরাজের—যে সে ইংরাজ নহে, লড়াইয়ে গোরার লিখিত সত্য ঘটনার বিবরণ, কেহ কি ইহা গাল্পগল্প বলিয়া অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িতে সাহস করিবেন?

মিঃ টর্ণবুল লিখিতেছেন—"১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ-ভাগে আমি সুদৃশ্য কাশ্মীর উপত্যকার অপূর্ব্ব সুষমাপূর্ণ রাজধানী শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনটির কথা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। তখন গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। মেঘসংস্পর্শবিরহিত নীলাকাশ হইতে অপরাহ্ণের তপন যে ঈষদুষ্ণ কিরণধারা বর্ষণ করিতেছিল, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য; তাহা ঝিলম্ নদীর অচঞ্চল স্বচ্ছ সলিলরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছিল। যে সকল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে এই উপত্যকা পরিবেষ্টিত, সেই সকল শৃঙ্গের বরফস্তূপ না গলিলেও অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ গিরি-শৃঙ্গ হইতে শীতকালের সঞ্চিত বরফরাশি তৎপূর্ব্বেই বিগলিত হইয়াছিল।

আমি স্থির করিয়াছিলাম, একখানি 'হাউস-বোট' লইয়া ডালহ্রদের কোন অংশে আমার কর্ম্মহীন অবসরটুকু অতিবাহিত করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি ডাল-গেটে উপস্থিত হইতেই এক দল দেশীয় মাঝি আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল; তাহাদের সঙ্গে দর কষাকষি ও বাগ্ বিতণ্ডা করিতেই আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে আমি 'মে-ফ্লাওয়ার' নামক একখানি মধ্যমাকৃতি বোট ভাড়া লইবার সঙ্কল্প করিলাম। এই বোটের মাঝিটাকে দেখিয়া অন্যান্য বোটের মাঝি অপেক্ষা একটু কম বদমায়েস বলিয়া মনে হইল।

অতঃপর আমার মালপত্রগুলি বোটে তুলিবার জন্য ডজনখানেক কুলীকে লাগাইয়া দেওয়া হইল। অল্পকাল পরেই আমার বোটখানি 'প্রাচ্য ভিনিসে'র বিভিন্ন খালের ভিতর দিয়া হ্রদের অভিমুখে গুণের সাহায্যে পরিচালিত হইল। আমি প্রশান্তচিত্তে উপরের ডেকে বসিয়া পরিশ্রান্ত কুলীদের গুণটানা দেখিতে লাগিলাম। আমার স্পানিয়েল কুকুরটা আমার পদপ্রান্তে বসিয়া রহিল।

সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ অন্যান্য হাউস-বোটের বিশেষতঃ শ্রীনগরের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া অধিক দূরে যাইতে ইচ্ছা হইল না; এই জন্য মনের মত একটি আশ্রয়স্থানের সন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি হ্রদের কিনারা হইতে অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই মনের মত একটা ভাল যায়গা দেখিতে পাওয়ায় ভাবিলাম, 'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।' তীর হইতে কয়েক গজ দূরে একটি অপ্রশস্ত খালের বাঁকের মুখে একটা প্রকাণ্ড চেনার গাছ দেখিতে পাইলাম, সেই গাছের নীচে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য আমার আগ্রহ হইল, কারণ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান আর কোথাও মিলাইতে পারিব বলিয়া মনে হইল না। সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে খালের দিক্ হইতে বাতাসের ঝাপ্টা আসিবে না এবং চেনার বৃক্ষের নিবিড় পল্লবরাশি ভেদ করিয়া রৌদ্রও আমার দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না—ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমি মাঝিকে বলিলাম—'বোটখানি ঐ প্রকাণ্ড গাছটার তলায় লইয়া গিয়া বাঁধিবার জন্য গুণটানা কুলীদের আদেশ কর।'

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাঝি আমার আদেশে কর্ণপাত না করিয়া অত্যন্ত চিন্তিতভাবে আমার বেয়ারা গুলামের সঙ্গে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল! তাহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করিতে বলিলাম। আমার সেই সক্রোধ চীৎকার শুনিয়াও মাঝিটা নড়িতে চাহিল না। মুহূর্ত্ত পরে বেয়ারাটা আমার সম্মুখে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, 'সাহেব, মাঝি বলিতেছে, এটা ভাল যায়গা নয়। অন্য কোন যায়গায় যাইলেই ভাল হয়।'

বেয়ারার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, 'তোমার ও-কথার মানে কি?—আবি আলবৎ বোট লে যানে হোগা।'

বেয়ারা আমার তাড়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিহ্বল হইয়া কাতরভাবে বলিল, 'কিন্তু সাহেব, মাঝি বলিতেছে এ ভারী খারাপ যায়গা, এখানে থাকা চলিবে না।'

সেই সময় মাঝিও আমার সম্মুখে আসিয়া কাশ্মীরী বুলি আওড়াইতে লাগিল; সে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্-বক্ করিয়া কি বলিল, এবং পুনঃ পুনঃ হাত নাড়িয়া সেই চেনার গাছটি দেখাইতে লাগিল। আমি তাহার কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া আমার বেয়ারা তাহার কথাগুলা তর্জ্জমা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল,—'মাঝি বলিতেছে—সাহেব, এই যায়গাটা ভূতের আড্ডা। ভূতগুলা

ঐ গাছে থাকে। যখনই কোন বোট ওখানে যায়, তখনই তাহাকে বিপদে পড়িতে হয়! একবার একখান বোট পুড়িয়া গিয়াছিল; আর একখান বোটের সাহেব মনিব পটল তুলিয়াছিল। এই রকম কোন-না-কোন বিপদ সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখা যায়; এ জন্য মাঝি বলিতেছে, সে ওখানে যাইবে না।'

তাহার এই কাকুতি-মিনতিতে আমি টলিলাম না। আমার মনে বিন্দুমাত্র কুসংস্কার না থাকায় তাহার এই প্রকার অবাধ্যতায় আমার জিদ আরও বাড়িয়া গেল। আমার সঙ্কল্প-পথে এইরূপ অসঙ্গত বাধা উপস্থিত হওয়ায় সেই স্থানটি যেন দ্বিগুণবেগে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি প্রশান্তভাবে আমার ডেক্-চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া আমার বেয়ারাকে বলিলাম, 'বেশ, ভাল কথা, যদি এই মাঝি ঐ গাছের তলায় বোট ভিড়াইতে রাজী না হয়, তাহা হইলে ওখানে উহার যাইবার প্রয়োজন নাই। উহাকে বল, আমাকে ডাল-গেটে ফিরাইয়া লইয়া যাউক, সেখানে ফিরিয়া গিয়া আমি অন্য একখান বোট ভাড়া করিব।'

আমার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মাঝি ভড়্কাইয়া গেল, এবং আমার কথার প্রতিবাদে বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার বেয়ারা বলিল, 'সেই কথাই ভাল, সাহেব!'—সে তৎক্ষণাৎ মাঝিটাকে আমার সম্মুখ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। আমি ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহারা বোটের ডেকের নীচে উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত স্বরে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল; আমি তাহাদের কলরব শুনিতে পাইলাম। অল্পকাল পরে বেয়ারা একাকী ডেকের উপর ফিরিয়া আসিল।

সে বলিল, 'মাঝি বলিতেছে, সাহেবকে সে-ই লইয়া যাইবে; কিন্তু হুজুরকে এই খেয়াল ছাড়িতে দেখিলে সে খুব খুসী হইবে।'

কয়েক মিনিট পরে কুলীরা আমার আদেশ পালন করিল; বোটখানি সেই বৃহৎ চেনার বৃক্ষের নীচে লইয়া যাওয়া হইল।

সায়ংকালে উপরের ডেকে বসিয়া আমি ভোজন শেষ করিলাম। সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি। চন্দ্রালোক-সমুদ্ভাসিত ডাল-হ্রদ যে না দেখিয়াছে, সে কোন দিন এই হ্রদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। হ্রদের জলরাশি তরল রজতবৎ প্রতীয়মান হইল। দূরে আলোকমালা ঝিকমিক্ করিতে লাগিল, এবং গিরিপাদমূল কুজ্ঝটিকাবরণে ধীরে ধীরে সমাচ্ছাদিত হইল।

যে বৃক্ষ মাঝির হৃদয়ে এরূপ গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল, সেই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বৃক্ষটি এই জাতীয় বৃক্ষের নিখুঁত আদর্শ; তাহার শাখাগুলির আকার কি সুবিশাল! বিশেষতঃ বোটের উপর যে শাখাটির ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার আকার আরও অনেক বৃহৎ। আমি সেই দিকে চাহিয়া একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, আমাদের বোটের মাঝি পরিচারকদের ডোঙ্গার বাহিরে আসিল; তাহার হাতে একখানি বৃহৎ থালায় এক থালা ভাত। মাঝি সেই ভাতের থালা লইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তীরে নামিল, এবং সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

মাঝি অতি সন্তর্পণে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল। তাহার পর সে সেই স্থানে জানু নত করিয়া বসিয়া একখানি ক্ষুদ্র শিলার উপর ভাতের থালাখানি রাখিয়া দিল। মাঝি এই কাযটি শেষ করিয়াই এক লাফে বৃক্ষমূল ত্যাগ করিল এবং রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ডোঙ্গায় ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত্ত পরে আমি ডেকের তলা হইতে ডুগডুগির একঘেয়ে বাজনা শুনিতে পাইলাম। চেনার গাছে যে ভূতের আড্ডা বলিয়া মাঝির ধারণা ছিল, সে সেই ভূতটাকে ভাতগুলি পূজোপহার দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া আসিল—এইরূপ অনুমান করিয়া আমি বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিলাম।

আমি হাসিতে হাসিতে আমার স্প্যানিয়েল কুকুরটার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম; তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, সে অসুস্থ হইয়াছে। কুকুরটা তখন জোরে জোরে হাঁপাইতেছিল। আমি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, তাহার নাক অত্যন্ত গরম হইয়াছে ও শুকাইয়া উঠিয়াছে! আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় তাহাকে তুলিয়া লইয়া র‍্যাগ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিলাম, এবং আমার ক্ষুদ্র শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া তাহার এক পাশে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলাম। আমি আলোটা নিবাইবার পূর্ব্বে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার অবস্থা তখন একটু ভালই মনে হইল।

পরদিন প্রভাতে বেয়ারা আমার জন্য চা আনিয়া সেই কামরার পর্দ্দাগুলি তুলিয়া দিলে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণধারায় আমার শয়নকক্ষ প্লাবিত হইল; সর্ব্বপ্রথমে কুকুরটার কথাই আমার মনে পড়িল। আমি এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইয়া, কুকুরটা কেমন আছে, দেখিবার জন্য বেয়ারাকে আদেশ করিলাম। গুলাম হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, 'কুকুরটা যে মরিয়া গিয়াছে, সাহেব!' আমি তৎক্ষণাৎ একলম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই কোণে উপস্থিত হইলাম। তাহার কথা সত্য, কুকুরটা মরিয়া পড়িয়া ছিল!

আমি সতর্কভাবে কুকুরটার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, অনেক পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল; তখন তাহার দেহ একদম্ ঠাণ্ডা। আমি কুকুরের রোগনির্ণয় করিতে পারি বলিয়া আমার একটু অহঙ্কার ছিল; কিন্তু তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কোন কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। আমি গুলামকে কুকুরটার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিয়া, তাহার আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে গুলামের মত জিজ্ঞাসা করিলাম।

গুলাম বলিল, 'হুজুরের কুকুর কেন মরিল, তাহা আমার জানা নাই। এই যায়গাটা ভারী খারাপ। এখান হইতে আমাদের যাওয়াই ভাল।' তাহার কথা শুনিয়া আমি বিরক্ত হইলাম এবং তাহার কুসংস্কারের জন্য তাহাকে গালি দিলাম। গুলাম আমার তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরে ডোঙ্গা হইতে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। গুলাম সেখানে আমার কুকুরের মৃত্যুসংবাদ জানাইতে গিয়াছিল।

কুকুরটা আমার বড় প্রিয় ছিল, তাহার মৃত্যুতে আমি বিচলিত হইলাম। তাহার জন্মদিন হইতেই আমি তাহাকে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছি। বেয়ারাটা নীচে গিয়া মাঝিকে বলিবে—ভূতের হাতেই কুকুরটা মারা গিয়াছে, এবং

মাঝিও সে কথা বিশ্বাস করিবে ভাবিয়া আমার মানসিক চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল।

আমি যখন আমার প্রাতরাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় চেনার গাছের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, শিলাখণ্ডের উপর সংরক্ষিত থালার ভাতগুলির অর্দ্ধেক অদৃশ্য হইয়াছে!—গুলাম আমার খানা আনিলে আমি তাহাকে রহস্য করিয়া বলিলাম, 'ভূতটার ক্ষুধা পাইয়াছে।' আমার মন্তব্য শুনিয়া গুলাম আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে দিন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। আমি একখানি শিকারা লইয়া সারাদিন হ্রদে জলবিহার করিলাম। শিকারাওয়ালা দাঁড় বহিয়া সুদীর্ঘ পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণী অতিক্রম করিল, এবং রাশি রাশি পদ্মসমাচ্ছন্ন জলে শিকারা চালাইতে লাগিল। সায়ংকালে আমি হাউস-বোটে প্রত্যাগমন করিলাম; তখন আমি সেই বৃক্ষ ও তৎসংক্রান্ত সকল রহস্যের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই রাত্রি গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত হইল।

সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; জাগিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পথে আলোক প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষটি আলোকিত করিয়াছিল। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম, প্রভাত হইয়াছে। সেই সময় আমার হাউস-বোট-



কম্বলাবৃত মৃতবালকের দেহ ঘিরিয়া মাঝিরা কাঁদিতেছে

সংলগ্ন ডোঙ্গা হইতে করুণ রোদনধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ নানাকণ্ঠের কলরব ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া দ্রুতবেগে ডেকে উপস্থিত হইলাম, এবং গুলামকে সেখানে দেখিতে পাইলাম।

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'এ সকল কি ব্যাপার—?' কিন্তু গুলামের আতঙ্কবিহ্বল বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি হঠাৎ নীরব হইলাম; আমার প্রশ্ন অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

গুলাম স্খলিত স্বরে বলিল, 'সাহেব, রাত্রিতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছে! মাঝির ছেলেটি মারা গিয়াছে। ছেলেটি হঠাৎ কেন মরিল, তাহা মাঝি বুঝিতে পারে নাই; আপনার কুকুরটার মতই, তাহারও মৃত্যুর কারণ জানিতে পারা যায় নাই।'

আমি সক্রোধে বলিলাম, 'তুমি ক্ষেপিয়াছ!'—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই হঠাৎ আমার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল; একটা দ্বিধার—সন্দেহে হৃদয় পূর্ণ হইল; ভাবিলাম, মাঝি যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, হয় ত তাহা সত্য। তাহা সম্পূর্ণ অমূলক কুসংস্কার না হইতেও পারে। ডোঙ্গাখানি আমার বোটের পশ্চাতে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই ডোঙ্গায় উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাইলাম।

নীলাভ ধূমে ডোঙ্গার ক্ষুদ্র কক্ষটি পূর্ণ, সেই ধূমে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়াই একটি বালকের কম্বলাবৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। মাঝি ও অন্যান্য চাকররা বালকটির দেহ ঘিরিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল। সেই কক্ষের এক কোণে কৃষ্ণাবগুণ্ঠনমণ্ডিতা একটি রমণী উপুড় হইয়া পড়িয়া যন্ত্রণাকাতর পশুর ন্যায় অধীরভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

আমি বালকটির দেহ পরীক্ষা করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। মাঝির নিকট শুনিতে পাইলাম, পূর্ব্বদিনও বালকটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিল।

আমি এই দুর্ঘটনার জন্য বালকের শোকাতুর পিতার নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে চলিয়া যাইতে বলিল। সে দৃঢ়স্বরে এ কথাও বলিল যে, আমরা যেখানে বোট রাখিয়াছি, সেই স্থানটি ভূতের আড্ডা; যদি আমরা অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ না করি, তাহা হইলে আমাদের সকলকেই ভূতের হাতে মরিতে হইবে। আমি যদি নিজের গোঁ না ছাড়ি, তাহা হইলে সে আমার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া বোট লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে—এ কথাও সে দৃঢ়তার সহিত বলিল।

কিন্তু আমি তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না। (পুত্র-শোকাতুর পিতার শোকে 'মিলিটারী' বাবাজীর কি উৎকট সহানুভূতি!—অনুবাদক) আমি তাহার সকল যুক্তিতর্ক পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এবং আমি জানিতাম, সে যাহাই বলুক, আমার মত ভাল ভাড়াটেকে হাতছাড়া করিয়া মোটা ভাড়ার লোভ সে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

যদিও আমি মুখে ভয় প্রকাশ করিলাম না, এবং সেই স্থানটি ভূতের আড্ডা, এ কথা স্বীকার করিলাম না; কিন্তু উহা বিশ্বাস না করিলেও আমার মন দমিয়া গিয়াছিল। আমার কুকুরটির আকস্মিক মৃত্যুর পর মাঝির পুত্রও হঠাৎ প্রাণত্যাগ করায় আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি আমার কামরায় ফিরিয়া খানিক হুইস্কি মাত্রা চড়াইয়া গলায় ঢালিলাম, তাহার পর মনে আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার সন্দেহ হইল, আমার কুকুর এবং সেই বালকটি হয় ত কোন রকম জ্বরে আক্রান্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, কোন ডাক্তারের অভিমত জানিবার সঙ্কল্প করিলাম।

অতঃপর এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা বিস্মৃত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, এবং আমার ক্ষুদ্র শিকারায় উঠিয়া ডাল-হ্রদের উষ্ণ জলে স্নান করিতে চলিলাম। এইরূপ স্নানাদি কার্য্যে প্রভাতটা কাটিয়া গেল।

সায়ংকালে আমার একটি বন্ধু আমার বোটে আসিয়া আমার সহিত ভোজন করিবেন—এইরূপ স্থির ছিল। আমি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই সায়ংকালের সকল ঘটনাই আমার বেশ স্মরণ আছে। সমগ্র প্রকৃতি এরূপ প্রশান্ত ছিল যে, কাশ্মীরের পক্ষেও তাহা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। বায়ু এরূপ অচঞ্চল যে, তাহা হ্রদের মুকুরতুল্য স্বচ্ছ-জলরাশিকে বিন্দুমাত্র আন্দোলিত করে নাই; হ্রদের তীরবর্ত্তী চেনার বৃক্ষের একটি পত্রও কম্পিত হইতে দেখিলাম না। অপরাহ্নের তপন পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হওয়ায় যদিও দিবালোক ধীরে ধীরে ম্লান হইতেছিল, তথাপি ঈষদুষ্ণ বায়ু বেশ প্রীতিকর বলিয়াই মনে হইতেছিল।

আমি রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খানা প্রস্তুত রাখিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বন্ধুটি তখন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। সাড়ে আটটার পর আরও পাঁচ মিনিট অতীত হইল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই! তখন আমি তাঁহার সন্ধানে হাউস-বোটের উপরের ডেকে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটি আমার উপবেশন-কক্ষের ঠিক উর্দ্ধে অবস্থিত। আমার ভোজন-কক্ষে তখন খানা আনীত হইয়াছিল, এবং সর্ব্বপ্রথমে যাহা আহার করিতে হইবে, তাহা টেবিলে পরিবেষণ করা হইয়াছিল।

পৌনে নটা বাজিল, তখনও বন্ধুটি আসিলেন না দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি হয় ত নিমন্ত্রণের দিন ভুল করিয়াছেন। ঠিক সেই সময় আমি আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম: চাহিয়া দেখি—সেই সঙ্কীর্ণ খালের এক কোণে একখানি শিকারা ভিড়িয়াছে, এবং তাহার মাথায় আমার বন্ধুটি বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগ্রহভরে নীচের ডেকে দৌড়াইয়া আসিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম; সেই শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঝটিকার কি প্রচণ্ড বেগ! সেই ঝটিকা হাউস-বোটের উপর দিয়া এড়োভাবে বহিয়া গেল। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়ঙ্কর শব্দে আমার কর্ণ যেন বধির হইল; তাহার পরই কাঠ ভাঙ্গিবার মড়্-মড়্ শব্দ দড়া-দড়ি ছিঁড়িবার 'ফটাং-ফটাং' শব্দের সহিত একযোগে আমার কর্ণগোচর হইল। ডোঙ্গার দিক্ হইতে আতঙ্কপূর্ণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার শ্রবণবিদারক মড়্-মড়্ শব্দের ভিতর বিলীন হইল।

সেই মুহূর্ত্তে আমার পিঠে যেন সবেগে একটা বিশাল হাতুড়ির ঘা পড়িল! সেই ধাক্কায় আমি ডেকের উপর উল্টাইয়া পড়িলাম। তাহার পর জলস্রোত প্রচণ্ডবেগে আমার দেহ প্লাবিত করিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, হাউসবোটখানি ঘুরিয়া গিয়া তীর-সন্নিহিত অগভীর জলে প্রবেশ করিয়াছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়; আমি পায়ে ভর দিয়া কোনও রকমে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সেই উদ্দাম ঝঞ্ঝার যেমন আকস্মিক আবির্ভাব, সেইরূপ অল্পকালমাত্র তাহার স্থিতি! তাহা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইলে সমগ্র প্রকৃতি সম্পূর্ণ অচঞ্চল ভাব ধারণ করিল, বায়ু-প্রবাহের আর কোন চিহ্ন রহিল না। কিন্তু আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারের নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।



প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখায় বিধ্বস্তপ্রায় হাউসবোট

দেখিলাম, সেই বৃক্ষের একটি অসাধারণ স্থূল শাখা—যে শাখার নিম্নে আমার হাউস-বোটের ডেক অবস্থিত ছিল, এবং যাহার ছায়ায় হাউস-বোটখানিকে আশ্রয় দান করিয়া আমি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, চেনার বৃক্ষের সেই শাখাটি ভাঙ্গিয়া হাউস-বোটের ভোজন-কক্ষের ছাদ চূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহা হাউস-বোটখানিকে ভাঙ্গিয়া দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছিল। আমি সেই বিধ্বস্ত অংশের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, যদি আমার বন্ধুটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সেই কক্ষে আমার সঙ্গে ভোজন করিতে বসিতেন, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই ঘটিত!

পরদিন আমি আর একখানি হাউস-বোট ভাড়া করিলাম; কিন্তু বলা বাহুল্য, সেই দুর্ঘটনাস্থলে আর ফিরিয়া আসিলাম না। আমি সতর্কভাবে চারিদিক্ পরীক্ষা করিয়া সেই হ্রদের অপর তীরে একটি স্থান মনোনীত করিলাম, এবং দ্বিতীয় হাউস-বোট সহ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই স্থানটি ভূতের আড্ডা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

এই ত ব্যাপার, এখন ইহাকে কি বলিবেন? আকস্মিক দুর্ঘটনা?—হইতেও পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ আমাকে

সতর্ক করে, তাহা হইলে আমি আর কখন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ বিপদরাশিকে আলিঙ্গন করিব না।"

মিঃ টর্ণবুল সাহসী সামরিক কর্ম্মচারী। তিনি ভূত মানিতেন না; গেছো ভূতের কবলে পড়িয়া অনেকেই বিপন্ন হইয়াছিল, এ কথা শুনিয়া তিনি তাহা অশিক্ষিত কালা আদমীর কুসংস্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার ধৃষ্টতার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল, কোন প্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। ডাল-হ্রদের তীরবর্ত্তী সেই ভগ্নশাখ চেনার গাছ এখনও বর্ত্তমান আছে এবং আমাদের পাঠকগণের মধ্যে ভবিষ্যতে যাঁহারা কাশ্মীর-ভ্রমণে যাইবেন, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলে সেই গাছটি দেখিতেও পাইবেন। তাঁহাদের কেহ কি মিঃ টর্ণবুলের মত হাউস-বোট ভাড়া করিয়া সেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিবেন? না, কোন হাউস-বোটের মাঝি ভাড়ার লোভে সেই ভূতুড়ে গাছের নিকট বোট রাখিতে সম্মত হইবে? কাশ্মীরেও 'মাসিক বসুমতীর' গ্রাহকের অভাব নাই; এই চেনার বৃক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কি না, জানিতে আগ্রহ হয়। যাঁহারা ভূত মানেন না, তাঁহারা এই অলৌকিক রহস্যের কি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন? মিঃ টর্ণবুল সরলভাবেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি কাশ্মীর-প্রবাসী কোন বাঙ্গালী পাঠক ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহা হইলে আশা করি, সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, এবং তাহা পাঠ করিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল ও আগ্রহেরও অভাব হইবে না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ঈশানের তপোভঙ্গ

কে হানিল অগ্নিবাণ বুকে?
তপ যায় টুটি—
ঈশানের বিশাল নয়নে
ঘণায় ভ্রূকুটি।
নির্ধূম হোমাগ্নি হ'তে
উঠে ধূম ব্যোমপথে,
দিগন্ত কুটিল হ'ল
জটায় জটায়;
ভস্মীভূত পুষ্পধনু
রোষাগ্নিছটায়।

ভূতকুল পলায় চৌদিকে
বিহ্বল সত্রাস;
ঝঞ্ঝা বহে ভস্ম উড়াইয়া
রুদ্রের নিশ্বাস!
ত্রিশূল ডমরু নাড়ি
তপের আসন ছাড়ি
প্রলয়-ভূকম্প সম
উঠে নটরাজ।
ধরা পদভরে টলে
—কি ঘটিবে আজ?

বেদীতলে ঊর্দ্ধমুখী উমা
"কাঁদে—আশুতোষ,
সম্বর সংহারমূর্ত্তি তব
কার প্রতি রোষ?'
শঙ্কর ফিরিয়া চাহে—
নয়নের অগ্নিদাহে
কুমারী উমার মুখ
উঠে উদ্ভাসিয়া—
সিক্ত দুটি আঁখিপুট
দুরু দুরু হিয়া।

নিভে যায় নয়নাগ্নি-শিখা
ভ্রূকুটি ভয়াল
ব্যাকুল উমার মুখপানে
চাহে মহাকাল।
মরি মরি কি মূরতি।
ফিরিয়া এল কি সতী
পাগল ভোলার কোল
করিতে উজ্জ্বল!
কেঁপে উঠে হরতনু
আবেগ-বিহ্বল।

তার পর ত্রিনয়ন ভরি
নামিল আসার,
আকাশ ছাইল মেঘে মেঘে
আইল আষাঢ়!
প্রবল বহিল ধারা,
আকুল আপনহারা
গুমরিয়া গুমরিয়া
কাঁদিল শঙ্কর।
নিভিল নয়ন-জলে
দীপ্তি ভয়ঙ্কর!

ঊর্দ্ধমুখ পিপাসিত আঁখি
চেয়ে আছে উমা
জটা হ'তে পড়ে তার মুখে
চন্দ্রকর-চুমা!
মহেশের মহাশোকে
উমার মরম-লোকে
মুকুলিয়া উঠে নব
আনন্দ-অঙ্কুর,
হাসে উমা হাসে সতী
প্রণয়-ভঙ্গুর।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচয়

১

প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন উঠান বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। রাশি রাশি ফুলের মালা চারিদিকে গন্ধ বিতরণ করিতেছে। দামী আসবাব ও ততোধিক মূল্যবান্ শাড়ী, ব্লাউজ আদি, রূপার বাসন, সোণার চায়ের সেট, বৃহৎ ট্রেতে রাখা হীরা-মুক্তার সুন্দর বহুমূল্য গহনা, রূপার পাখা ইত্যাদি; সেই পুরান দিনের ঠাকুরমা-দিদিমার বলা গল্প—পাতালপুরের সোণার বাড়ী, হীরার খাট এবং সুন্দরীশিরোমণি রাজকন্যার কথাই স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিতেছিল। ধনকুবের জমীদার কমলাকান্তর মা-হারা একমাত্র দুহিতার বিবাহে গ্রামশুদ্ধ লোক মিলিত হইয়াছিল। হীরা-জহরতের বাহুল্য দর্শনে গরীব পিতার সন্তান বরের দৃষ্টিপথে অদেখা স্বপ্ন-রাজ্যের রাজকন্যার পুরীটুকু ভাসিয়া উঠিল। ফুলের মিষ্ট গন্ধ ও আতরের উন্মদ সুবাস অসীমের মাথার শিরাগুলিকে পর্য্যন্ত আবেশে অবশ করিয়া দিল। সে অলস, অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে সম্মুখে উপবিষ্টা, রূপালী-তারের কারুকার্য্যযুক্ত বেনারসী শাড়ীর অঞ্চলে অবগুণ্ঠিতা বধূর দিকে চাহিল। তাহার ছোট কালে শোনা গল্প কি আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে? বিবাহে যৌতুকস্বরূপ সে কলিকাতার প্রাসাদ তুল্য বাড়ী পাইয়াছে, তাহার উপর অনুরূপ আসবাবপত্র। রাজকন্যার পিতার অর্থে শীঘ্রই বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাইবে। শ্বশুর বলিয়াছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই রাজভোগ্য সম্পত্তি তাহারই স্ত্রীর হইবে; সুতরাং ভবিষ্যতে অতুল ঐশ্বর্য্য তাহারই অধিকারে আসিবে।

কমলাকান্ত হাঁকিলেন,—"ভবানী, একখানা পাখা পরী-রাণীর কাছে নিয়ে আয়।" পরী—পরী রাণী! কি মিষ্ট মধুর নামটুকু। আচ্ছা, অসীম তাহাকে কি বলিয়া ডাকিবে, শুধু পরী না রাণী? মনে মনে বারকতক নাম উচ্চারণ করিয়া অসীম আকুল আগ্রহে পরী রাণীর দিকে চাহিল। কিন্তু মুখের কোন দিকই দেখা গেল না। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল—পরীর হাতের দিকে। সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শুভ্র অলঙ্কারের ফাঁকে ফাঁকে ও কি দেখা যাইতেছে? গায়ের রঙ? এত কালো!

বিরক্তি ও ক্রোধে সহসা অসীমের সুন্দর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। খানিক বাদে সে মনে মনে হাসিল,—শ্বশুর মহাশয় সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য কালো রংয়ের চুড়ী পরাইয়া-ছেন বুঝি? সম্ভব! বেচারা জমীদার কিরূপে জানিবেন,—জামাতা কালো বস্তুকে কি গভীর ঘৃণা করে। জানিয়া শুনিয়া পিতা কালো মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে পারেন না। ইহা যেমনই অসম্ভব, তেমনই হাস্যকর। স্নেহময় পিতা জানেন, সে কালো পাড়ের ধুতি কোনও দিনই পরে না।

এক কালো বিড়াল যে দিন উহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া মাছের মুড়া লইয়া পলাইয়াছিল, সে দিন হইতে প্রায় মাসাবধি অসীম মাছ স্পর্শ করে নাই। গরীবের সন্তান হইলেও পিতামাতা একটিমাত্র পুত্রের অনভিপ্রেত জানিয়া সকল প্রকার কালো কুৎসিত বস্তু তাহার নিকট আসিতে দিতেন না। জীবনে সে কখনও কালো মাছ খায় নাই। সংসারের বহু অনাটনের মাঝেও পুত্রের বিলাসিতার ব্যবস্থা অব্যাহতই থাকিত। মনে পড়িল,—এম, এ পরীক্ষা দিবার সময়, বিছানার চাদর মলিন হওয়ায় জ্বর লইয়াও মাতা সাবান দিয়া উহা কাচিয়া দিয়াছিলেন। আর,—

চিন্তায় বাধা পড়িল,—শুভদৃষ্টির সময় আগত। আশা-অবসাদ-উদ্বেলিতবক্ষে—অসীম উঠিয়া দাঁড়াইল। আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতে কল্পনার মাঝে বিপ্লব বাধিল। পতনোন্মুখ দেহকে কোনও রূপে খাড়া রাখিয়া আবার সে চাহিল,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নহে, শ্যামা নহে, কালো। আবার চাহিল, সে দেখিল,—দুইটি আয়তনয়নের বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ। নিদারুণ বিরক্তিভরে অসীম মুখ ফিরাইয়া লইল।

এত বড় বিস্ময় পরী-রাণীর জীবনে কখনও ঘটে নাই। ঐ শ্রীমান্, বলিষ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ তাহারই স্বামী? ঐ পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকারিণী আজ হইতে সে! কুমারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ, নির্ম্মল, চয়িত পুষ্প,—অর্ঘ্যরূপে—নীরবে পরী স্বামীর চরণে নিঃশেষে ঢালিয়া দিল।

স্বামী,—স্বামী!—এত ভাল, এমন সুন্দর তুমি! চকিতে পরীর মনে হইল,—ঐ যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখখানা যত সুন্দরই হউক, কিন্তু ঐ চক্ষু-যুগলের দৃষ্টি ঐ মুখে কোনক্রমেই মানাইতেছে না। সে দৃষ্টি,—সে দৃষ্টি কি? ঘৃণা? হাঁ, উহা ঘৃণায় পূর্ণ; বিরক্ত, আশাহত দৃষ্টি। সে ছোট নহে,—কলেজে অবাধে মেলা-মেশা করিয়াছে। যদিও শ্বশুর জানেন, বধূ নিরক্ষরা, কিন্তু সে যে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছে, ইহা ত মিথ্যা নহে। শ্বশুর মেয়েদের লেখাপড়া ভালবাসেন না বলিয়া,—পিতা, জামাতার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া বৈবাহিকের শিক্ষাসম্বন্ধীয়-প্রশ্ন প্রকারান্তরে এড়াইয়া গিয়াছিলেন। পলকমাত্রে নারীর নেত্রে পুরুষের দৃষ্টি ধরা পড়িল। সে বুঝিল, সে কালো বলিয়াই স্বামীর নয়নে ঘৃণা ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

লজ্জায়, অপমানে পরী মাথা নত করিল। কি লজ্জা—সে কালো! কিন্তু কালো,—ইহা কি তাহার অপরাধ? ভগবান্ তাহাকে রূপ দেন নাই, সে জন্য সে কি করিতে পারে? ইহা ব্যতীত সকল দিক্ দেখিয়াই ত উনি বিবাহ করিয়াছেন। তবে কি শ্বশুর স্বামীকে কিছু বলেন নাই?

বাসরঘরে স্বামীর নীরবতা পরীকে বিদ্ধ করিল। সঙ্গিনী ও গ্রামের নারীগণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন,—রাজপুত্রের মত চেহারা হইলে কি হইবে—জামাই যেমনই অহঙ্কারী, তেমনই গোঁয়ার। বড়লোক জমীদার হাত-পা বাঁধিয়া মেয়েকে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন।

২

সর্ব্বপ্রথম দে-গৃহিণী গান্ধারী যে দিন উহাদের একতলা, অন্ধকার, বায়ুহীন গৃহের বাস উঠাইয়া বৈবাহিক-দত্ত, ফল-ফুল-ভরা

বাগানযুক্ত প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহে আসিয়া উঠিল, সে দিন স্থূল দেহভারে অবনত গান্ধারী প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া ছোট শিশুর ন্যায় গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটাছুটি করিয়াও নীচে উপরের গৃহ, দালান, বারান্দা প্রভৃতির সংখ্যা ঠিক করিতে পারিল না। যতবার গৃহ হইতে গৃহান্তরে গিয়াছে, মনে হইয়াছে, এগুলা গণনার মধ্যে স্থান পায় নাই। নূতন চকচকে আসবাবপত্র চতুর্দ্দিকে ইতস্তত: রক্ষিত। গরীব গৃহিণী হইলেও গান্ধারী পিত্রালয়ে লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছিল। চলনসই ইংরাজী ও বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে পারিত। কিন্তু এরূপ সৌখীন জিনিষ ব্যবহার করা ও বৃহৎ বাড়ীতে বাস করা অদৃষ্টে কোন দিন জুটে নাই। ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত-দেহে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া অঞ্চল দ্বারা স্বীয় গাত্রে বাতাস করিতে লাগিল।

কর্ত্তা ডাকিলেন,—"কোথায় গো, ঝি-চাকর এসেছে,—কথা ব'লে নাও।"

গান্ধারী বলিল,—"এই ঘরে এস, আমি আর উঠ্‌তে পারি না বাপু।"

গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে কর্ত্তা মহাশয় নিম্ন কণ্ঠে কহিলেন, "সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরও ত কোন দিন ক্লান্ত হও নি, আজ বড় বাড়ীতে এসেই বুঝি বড়মানুষী রোগে ধরলো?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া দে-গৃহিণী জবাব দিল, "সে ছিল দুখানা ঘর, এ তোমার ছেলের রাজার বাড়ী, সকাল থেকে ওঠা-নামা করতে করতেই পা নাড়তে পারছি না।"

অবাক্‌ভাবে খানিক চাহিয়া থাকিয়া দে মহাশয় কহিলেন, "সেই সকাল থেকে তুমি শুধু বসেই আছ? রান্না কর নি?"

"কৈ আর করলুম। বল্লে বিশ্বাস করবে না, এখনও সব ঘর, সব জিনিষ দেখা হয় নি। হাঁ-গা, তা ঐ আলমারীতে আয়না দেওয়া কেন?"

ক্ষুধার তাড়নায় কর্ত্তা অস্থির হইলেও ক্রোধ ভুলিয়া স্ত্রীর বাক্যে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। আহা—অভাগী নারী,—দরিদ্রের হাতে পড়িয়া কোন কিছুই জানিতে পারে নাই।

"ওর ভেতরে কাপড় থাকে, আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় পরতে হয়। তবে এখন দোকান থেকেই লুচি-টুচি আনিয়ে নি।"

"তাই নাও। না, থাক, সেই উঠতেই হবে, যাই দেখি সকালের ব্যবস্থা ক'রে রাখি, নটায় ত আফিস।"

স্ত্রীর গমনে বাধা দিয়া দে মহাশয় কহিলেন,—"পাগল, এখনও চাকরী করব না কি?"

"করবে না?"

"না গো না, সে সব ছেড়ে দিয়েছি। বেহাই আমার অবস্থা বুঝে অসীমের নামে ওঁর এক তালুক লিখে দিয়েছেন। তার আয় অনেক। নগদ টাকা বিয়ের দিন দেবেন। ওঁর অবর্ত্তমানে সবই বৌমার।"

আশ্চর্য্যভাবে গান্ধারী কহিল, "এত দেবে? কিন্তু কেন? অসীমের চেয়েও ভাল ছেলের অভাব ত ছিল না।"

"আঃ, বড় বোকা তুমি। বেহাই যে ঠিক এই রকমটিই চেয়েছিলেন—তা ছাড়া ঐ একটিমাত্র মেয়ে, টাকা আর কাকে দেবেন? গরীবের ছেলে, এম, এ পাশ, মেয়েকে কোন দিন কষ্ট দেবে না। মেয়েরও জোর থাকবে স্বামীর ওপর।"

"অ মা, তাই না কি? কায নেই আমার বড়মানুষের মেয়েতে। আমাদেরও বৌর কাছে হাতজোড় ক'রে থাকতে হবে। ছেলেও বৌ নিয়ে সুখী হবে না। কায নেই, চল, ফিরে যাই সেই কুঁড়েঘরে। ছেলে মুখ্যু নয়, কায করবে। তোমার দুঃখ চিরকাল থাকবে না।"

"পরশু বিয়ে, এখন কি বন্ধ করা যায়? আজকাল অমন হাজারো এম, এ, বেকার ব'সে আছে, খবর রাখ, গিন্নি? মেয়ে নিজে দেখেছি—নম্র, শান্ত, লক্ষ্মী মেয়ে।"

আশ্বস্তা হইয়া গান্ধারী কহিল, "বড় ঘরের মেয়ে নম্র ত হবেই, বৌমা লেখাপড়ায় কত দূর?"

"ঐটি হবে না, তুমি বরাবর জান, মেয়েদের ইংরাজী পড়া আমার দুচক্ষের বিষ। বিশেষ ক'রে আজকালের শিক্ষা। সে কথা আগেই বেহাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।"

হাসিয়া গান্ধারী কহিল, "জানি গো জানি, তোমার ঘরে এসে পর্য্যন্ত একখানা বই হাতে করতে দাও নি। পড়তে গেলে এখন হয় ত একটা অক্ষরও বুঝব না। তবে ছেলের ব্যাপারে ভয় করছে। সবাই সমান হয় না। তুমি ভালবাস না, কিন্তু জান ত অসীমের মতামত? সে মূর্খ বউ কোন দিন পছন্দ করবে না। কেন এ করলে তুমি?"

"বাজে ব'ক না গিন্নি, অনেক ভেবে এ কাযে হাত দিয়েছি। ধনের অধিকারিণী ইংরাজী পাস-করা মেয়ে আসলে—সে কি অসীমকে মেনে চলত? তোমার আমার কথা ত স্বতন্ত্র, আমাদের গ্রাহ্যই করত না।"

ধীরে ধীরে গান্ধারী কহিল, "লেখাপড়া-জানা মেয়ে অত খারাপ হয় না। সত্যিকার যদি শিক্ষা থাকে, নারীচরিত্র তাতে উন্নত, উজ্জ্বল, প্রশস্ত হয়। ইংরাজী পড়লেই মেয়েরা বয়ে যায় না। কোন দিন তোমার কথার প্রতিবাদ করিনি। যেমন রেখেছ, তেমনই রয়েছি। কিন্তু সে ছিল আমার ব্যক্তিগত নিজের কথা। তবে সন্তানের কথা আলাদা, তার মতামতও দেখতে হয়। তুমি এ ভাল কর নি।"

রাগিয়া দে মহাশয় কহিলেন, "ঐ ত তোমাদের দোষ, দুপাতা পড়েই পণ্ডিত। শুধু তর্ক। এই জন্যেই এ সব পছন্দ করি না।"

"কিন্তু অল্পবিস্তর আমিও যে পড়েছিলুম, সে ত মিছে নয়—কোন দিন কি তোমার মতের বিরুদ্ধে কায করেছি? না আমায় নিয়ে কিছু অসুবিধা হয়েছিল?"

বিরক্ত-কণ্ঠে দে মহাশয় উত্তর দিলেন, "তোমার সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা ক'র না গিন্নি, গরীবের মেয়েরা—"

গৃহিণীর অশ্রুভারনত নয়নের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই দে মহাশয় থামিলেন,—"আঃ, কি মুস্কিল, কাঁদ কেন? ছেলের অকল্যাণ হবে। যাও ওঠ—ঝি-চাকরদের কায বুঝিয়ে দাও। জিনিষ সব এখুনি এসে পড়বে, সেগুলোর ব্যবস্থা করো। সময় কম, সেই জন্যে বেশী লোক এনেছি। তোমার মাসী, বকুল ফুল, বিন্দির মা, কদমের পিসী, আরও অনেকে ৬টার মধ্যে এসে পড়বে। ঠাকুর দুটোকে রান্না বুঝিয়ে দাও।"

চক্ষু মুছিয়া গান্ধারী উঠিল। স্তব্ধভাবে দে মহাশয় বসিয়া রহিলেন।

৩

মেয়েদের শুভ উলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খ-রোলের মাঝে, শ্বেত মার্ব্বেলের উপর, সূক্ষ্ম আলিপনায় বর-বধূকে আনিয়া দাঁড় করান হইল। গান্ধারীর পিসীমাতা ভীড় ঠেলিয়া উপরে উঠিলেন,—"অ মা গান্ধারী, শীগ্ গির আয়, ছেলে-বৌ এসে গেছে, বরণ করবি কখন্?"

নবক্রীত ঝক্‌ঝকে গহনাগুলা তখনও সব কটা পরা হয় নাই। গান্ধারী ব্যস্ততা বশতঃ অনন্ত-জোড়া একই হাতে প্রবেশ করাইয়া নামিয়া আসিল। বরণডালা লইয়া মুখ তুলিতেই তাহার হস্তদ্বয় আর উপরে উঠিল না। মাত্র দুই দিনে মানুষ এতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? পুত্রের পাংশু, বিবর্ণ, গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী জননী বিচলিতা হইলেন। জননীর দৃষ্টির সহিত স্বীয় দৃষ্টি মিলিত হওয়ায় অসীমও মস্তক নত করিল। বধূর দিকে চাহিতে গিয়া গান্ধারী কাঁপিয়া উঠিল। পুত্রের গাম্ভীর্য্যের কারণ এতক্ষণে সে বুঝিল। টাকার লোভে স্বামী এ কি করিয়াছেন? অর্থ-লোভে মানুষ একমাত্র বংশধরের এত বড় সর্ব্বনাশও করিতে পারে? মহিলাগণ উহাকে ঠেলিয়া বলিল, "কি করছ গিন্নীমা, বউ-ছেলে বরণ ক'রে ঘরে তোল।" উহাদের মাঝে এক নারী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "অমন কালো কুচ্ছিত বউ ঘরে তুলবে কি গা!" চতুর্দ্দিকের মন্তব্যগুলা পরীর কাণে বিষ ঢালিতে লাগিল,—লজ্জায় অপমানে সে আড়ষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিল,—"মুখে আগুন অমন টাকার! টাকার লোভে বুড়ো হীরের টুকরো ছেলেকে পাঁকে ফেলে দিলে গা!"

অপরা কহিল, "হোক বাপু কালো, বৌয়ের ছিরি আছে, মুখখানি যেন দুর্গা-প্রতিমা। ভালবাসতে ইচ্ছে করে, কালো মনিষ্যি কি আর জন্মাতে নেই?"

গৃহিণীর চোখের জল মুছাইয়া অসাড় হাত দুইটাকে উপরে তুলিয়া পিসী কহিলেন,—"এখন বরণ ক'রে নে মা,—ভাবিস না। হেরম্বর মেয়ে নিখুঁত সুন্দরী,—মাস দুই বাদে তাকে ছেলের বৌ করিস।"

পরীর সহিত পুরাতন ঝি পদ্মা আসিয়াছিল। বহুক্ষণ নীরবেই সে সকলের মন্তব্যগুলি শুনিতেছিল; কিন্তু এইবার নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। প্রভুর একটিমাত্র দুলালীর অদৃষ্টে এত বড় বিড়ম্বনা সে সহিতে পারিল না। ঝঙ্কার দিয়া পদ্মা কহিল,—"মেয়ের রং নীরেসই হোক আর যাই হোক, আপনারা তা দেখে শুনেই বিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ত্তা নিজেই যে কতবার যেতেন, তার সংখ্যা নেই। তখন কি চোখ দুটো বন্ধ ক'রে মেয়ে দেখা হয়েছিল?"

"আ মর, ছোটলোক মাগীর আস্পদ্দা দেখ, তুই ঝগড়া করবার কে রে? গান্ধারী, তোর বড়লোক বেহাইয়ের বাড়ীর ঝিকে বারণ কর, না হ'লে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড হয়ে যাবে।"

"হাঁ গা, মারবে না কি? কর্ত্তাকে তখুনি বলেছি, গরীবের ঘরে মেয়ে দিও না, তারা এ সোণার প্রতিমার মর্য্যাদা বুঝবে না। মা গো মা, এমন ছোটলোক দেখিনি।"

"তবে রে—"

ক্ষিপ্রকরে অসীম পিসীমাতার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর-নেত্রে মাতার দিকে চাহিয়া ডাকিল—"মা!"

গৃহিণী উভয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পিঁড়ার উপর দাঁড়াইয়া পরী কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ উহার ঘামে ভিজিয়া উঠিল।

গোলযোগ শুনিয়া কর্ত্তা অন্দরে আসিলেন। ব্যাপার শুনিয়া গান্ধারীকে অপমানিতা করিয়া—বিনীতভাবে পদ্মাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্ত্তার আগমনে নীরবে অপরাপর অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ হইল। কোনও রূপে নিয়মগুলা পালন করিয়া অসীম স্বীয় কক্ষদ্বার ভেজাইয়া বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে নিজের অবস্থা ভাবিবার সে সময় পাইল। ঐ কালোকে লইয়া সারাটি জীবন কাটাইতে হইবে, উপায় নাই। পিতা—পিতা—স্নেহময় পিতা, তুমি এ কি করিলে? কিন্তু নিষ্কৃতির পথ কোথায়? ঐ কালোকে লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। স্ত্রী যখন নিকটে আসিবে, কালো হাতে অঙ্গ স্পর্শ করিবে—তখন?

ভাবিতে গিয়া অসীম বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। কাহার স্নেহময় স্পর্শে চাহিয়া দেখিল। গান্ধারী স্নেহে পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইল—"বাবা অসীম আমার!" মাতা-পুত্রের মিলিত অশ্রু দুঃখভার কতক লাঘব করিলে গান্ধারী সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"যা হবার, তা হয়েছে, বাবা, ওঁর উপর রাগ ক'র না, অসীম। বুড়ো হয়ে ওঁর ভীমরতি হয়েছে। এবার কারুর কথা শুনব না। সুন্দর দেখে বৌ ঘরে আনব।"

"না, ছিঃ।"

অপ্রস্তুতভাবে গান্ধারী কহিল, "ছিঃ নয় অসীম, একের পাপে অন্যের শাস্তি হ'তে পারে না, জানি—তুই ওকে কোনও দিন ছুঁতেও পারবি না। বৌকে তাড়াব না, তবে তোকে বিরাগী ক'রে রাখতে পারব না। আমার যে এক ছেলে তুমি।"

ম্লান হাসি অসীমের মুখে ফুটিয়া উঠিল,—"একের পাপে অন্যের শাস্তি যদি সইতেই না পারবে, তবে বৌয়ের শাস্তি কি ক'রে সইবে? ওর ত কোন দোষ নেই, মা। বাবা তাকে দেখে ইচ্ছে করেই ঘরে এনেছেন যে।"

গৃহিণী ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল,—"তা হোক, মেয়েরা সব সইতে পারে—স্বামীর সুখের জন্যে তারা না করতে পারে, এমন কায পৃথিবীতে নেই।"

"সে সব দিন আর নেই মা, আর এ সম্ভবও নয়।"

"আছে—আছে, ওরে, এখনও আছে।"

"ও সব নিরক্ষরা গ্রাম্যনারীরা হয় ত পারতে পারে। কিন্তু—"

"কর্ত্তা বলছিলেন, বৌমা লেখাপড়া জানে না।"

বিংশ শতাব্দীতে এতবড় বিস্ময় থাকিতে পারে? অসীম অবাক্ হইল। পরীর উপর ঘৃণায় অন্তর ভরিয়া উঠিল।

ধৈর্য্যমতী শান্তস্বভাবা গান্ধারী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। স্বামীকে একান্তে ডাকাইয়া বিনা আড়ম্বরে প্রশ্ন করিল, "আমাদের এমন সর্ব্বনাশ তুমি কেন করলে?"

ধীরকণ্ঠে দে মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"কি?"

"বুঝতে পারছ না? কালো কুচ্ছিত বৌ কেন আনলে? ছেলে বিবাগী হয়ে গেলে টাকা দিয়ে কি করবে?"

স্ত্রীর আচরণে কর্ত্তা অসন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ হইতে দিলেন না,—"ওঃ, এই কথা? শোন গিন্নি, কাছে এস, এই যে বুকের এই খানটায় হাত দিয়ে দেখ। তোমাদের বলি নি, মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। ডাক্তার দেখিয়েছিলুম,—বলেছে, বেশী দিন বাঁচব না। তোমাদের কিছু করতে পারি নি, পারবও না—শেষে কি দোরে দোরে ভিক্ষে করবে? বৌয়ের রঙ্গ ময়লা ব'লে দুঃখ ক'র না—শ্রী আছে। আমি বলছি—ওকে নিয়ে তোমরা সুখী হবে। অনেক ভেবে তবে এ কাযে হাত দিয়েছিলুম, গান্ধারি।"

মুহূর্ত্তে গান্ধারী ক্রোধের পরিবর্ত্তে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শঙ্কিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে থেকে তোমার এ অসুখ হয়েছে? ওঃ, তাই মাঝে মাঝে সারারাত ব'সে কাটিয়েছ? কেন—কেন আমায় লুকিয়েছ এতদিন?"

আদরে স্ত্রীর অশ্রু মুছাইয়া দে মহাশয় কহিলেন, "মিছে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? এ যে সারবার নয়, গান্ধারি।"

"না—না, সারবে। কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তার দেখাব।"

"কিন্তু টাকা পাবে কোথায়?"

গান্ধারী অধোমুখী হইল। ধীরে ধীরে কহিল, "এই এত টাকা—"

"না—না, ছিঃ! নিজের চিকিৎসার জন্যে ঘরে টাকা আনি নি গান্ধারি, হাঁ, শোন—বৌমাকে অযত্ন করো না।"

রাত্রিতে সঙ্কুচিতা বধূকে ফুলের আভরণে সজ্জিতা করিয়া অসীমের পার্শ্বে বসাইয়া—ফুলশয্যার নিয়মগুলা পালন করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মেয়েরা চলিয়া গেল। অসীম বড় বিপদে পড়িল,—একটু সরিয়া বসিল। একই শয্যায় বধূর সহিত শুইতে হইবে জানিয়া সে আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল। বারকতক গৃহে পদচারণা করিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়া হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অসীমের সকল আশঙ্কা, বিরক্তি দূরীভূত করিয়া মৃদু সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে বধূ কহিল, "আপনি বিছানায় গিয়ে ঘুমুন, আমি কৌচে শোব।"

৪

তিন বৎসর হইতে চলিল, অসীম বিলাতে পড়িবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কুড়ি দিনের মধ্যেই সে গিয়াছে। পরীরাণী সেই যে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল, মাঝে মাস দুয়েকের জন্য দে মহাশয়ের মৃত্যুর সময় গিয়াছিল, আর যায় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পিতা শ্বশুরকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন—জামাতা যত দিন বিলাতে থাকিবে, কন্যা তাঁহার নিকট থাকিবে। পদ্মা কোন কথাই ক্রোধী মনিবের নিকট প্রকাশ করে নাই। পিতা মনে ব্যথা পাইবেন বলিয়া পরী তাহাকে অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। ইহা ব্যতীত দে মহাশয় ও দে-গৃহিণী বহু প্রকারে পদ্মাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—বাহিরের যে যাহাই বলুক, তাঁহারা পছন্দ করিয়াই বধূ গৃহে আনিয়াছেন।

কলেজ হইতে ফিরিয়া হাত-মুখ ধুইয়া পরী রাণী একখানা খোলা চিঠি হাতে বসিয়া রহিল। সম্মুখের খাবারগুলা অভুক্ত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। সে এখন এম, এ ক্লাসের ছাত্রী। পিতার জুতার শব্দে পরীর লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, ক্ষিপ্রহস্তে আহারে মন দিল। পিতা কহিলেন,—"পরী মা, চিঠি পড়েছ কি?" পরী সম্মতিসূচক মস্তক নাড়িল।

"দুচার দিন বাদেই যেতে হবে—আর ত ধ'রে রাখতে পারব না মা,—রাখতেও চাই না। তুমি সুখী হও, তাই দেখে তোমার মা স্বর্গ থেকে খুসী হবেন। বেয়ান লিখেছেন—জাহাজ থেকে নামবামাত্র অসীমকে এখানে আসতে লিখেছেন। বড় ভাল তোর শাশুড়ী—না রে খুকী? সে যেমন তার কায করেছে, আমারও তা করতে হবে। এখানে অসীমকে বেশী দিন রাখব না। বেচারা মা এখনও দেখেনি। সকালে এলে বিকালেই ফেরত পাঠাব। তুমিও তৈরী হয়ে নাও, রাণী।"

পরী নীরবে নতমুখে প্লেটের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পিতা চলিয়া গেলেন। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—বিবাহ হইতে আজ এই দীর্ঘ তিন বছরের কথা—দশশ পঁচানব্বই দিনে উহার কতটুকু সংগ্রহ হইয়াছে? কিছু না, কিছু না। অথচ সেই কয় দিনের দেখায় সে তাহাকে ভালবাসিয়াছে—গভীরভাবে ভালবাসিয়াছে। যে তাহাকে ঘৃণা করে—অবহেলায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, উহাকেই সে ভক্তি করে—তাহারই স্মৃতিতে অন্তর পূর্ণ। অদৃষ্টের কি এ পরিহাস! শ্বশুরের অসুখের সময় গিয়া শ্বশ্রূর নিকট হইতে নানাপ্রকারে স্বামীর শিশু অবস্থা হইতে এখনকার গল্প শুনিয়া শুনিয়া পরী উত্তমরূপেই স্বামীর অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়াছিল। যে সৌন্দর্য্যের উপাসক, কালো বস্তুর বিদ্বেষী—তাহাকে পাওয়া যে কতবড় অসম্ভব ব্যাপার, বুদ্ধিমতী পরী ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহাকেই সে অন্তর ভরিয়া ভালবাসিত। তাহার নারীত্ব আত্মাভিমানকে রক্ত-দৃষ্টিপাতে সে শাসিত করিয়াছে,—আত্মমর্য্যাদা মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছে,—দুদিনের দেখা, তবুও পরী সেই সুন্দরদর্শন পুরুষকে গোপনে স্নেহে, প্রেমে পূজা করিতেছে। আগে শ্বশুরের প্রতি ক্রোধ হইত—কেন তিনি সকল জানিয়া তাহার নারীজীবন ব্যর্থ করিয়া দিলেন? কিন্তু যে দিন শ্বশুরের রুগ্ন শয্যা-পার্শ্বে সে আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই দিন ক্রোধের পরিবর্ত্তে স্নেহে, ভক্তিতে, সম্মানে রুগ্ন মানুষটির প্রতি পরীর বিমুখ চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

দে মহাশয় আদরে বধূকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং পরীর স্বহস্ত-প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি খাইতে চাহিয়াছিলেন। পরীরাণী রাঁধিতে জানিত না, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও প্রকারে কিছু করিয়া দিয়াছিল। পরীর মনে পড়িল, কি গভীর আগ্রহে সেই অখাদ্য খাইয়া কত উচ্চ প্রশংসাই ন[illegible] তিনি করিয়াছিলেন। আরও মনে পড়িল, মৃত্যুর দিন তিনি পরীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—সে সুখী হইবে, তাহার মত লক্ষ্মী মেয়ে কোন দিন অসুখী হইতে পা[illegible] না। আরও বলিয়াছিলেন—পরীরাণী এই গৃহ ও গৃহস্বামী[illegible] অধিকারিণী, এ কথা সর্ব্বদা যেন স্মরণে রাখিয়া সেই অনুযায়ী

কায করে। অশ্রু মুছিয়া পরী উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে পিতার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে বিস্মিতা হইল,—"বাবা, এ কি করেছ? এত সব শাড়ী, ব্লাউজ কি হবে?"

স্মিত হাস্যে পিতা জবাব দিলেন, "তোর সঙ্গে দেব, মা।"

প্রবাহিত অশ্রুধারা চাপিতে চাপিতে পরী সে গৃহ হইতে পলায়ন করিল,—হায়—এ শাড়ী, এ প্রসাধন কাহার নিমিত্ত করিবে সে?

পরের দিন, দীর্ঘদিন পরে পরীর স্বামি-সম্ভাষণ হইল—"ভাল ছিলে ত?" কম্পিত কণ্ঠ সংযত করিয়া পরী জবাব দিল, "হাঁ।"

স্বামী পাঠে মন দিলেন। সঙ্কুচিতভাবে—মোটা গালিচার উপর চাদর মুড়ী দিয়া পরী শুইয়া পড়িল।

প্রভাতে পিতার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া সে বিদায় লইল। বিদায়-মুহূর্তে স্নেহান্ধ পিতা জামাতার হস্তে কন্যার হাত রাখিয়া বলিলেন,—"আমার খুকীকে কোন দিন উঁচু কথা ব'ল না অসীম, বড় অভিমানিনী ও। আজ থেকে পরীর সম্পূর্ণ ভার তোমার ওপর।"

স্বামীর শিহরণ স্পষ্ট অনুভব করিয়া লজ্জায় অপমানে পরী হাত টানিয়া লইল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলে,—ওগো নিষ্ঠুর, ওগো অবিবেচক, কালো কুৎসিতা হইলেও অমন অনিচ্ছাকৃত, ঘৃণাপূর্ণ স্পর্শের কাঙ্গালিনী নহে সে,—সে স্পর্শ যত বাঞ্ছনীয়, যত মধুরই হউক।

মেয়ে-গাড়ীতে পরীকে তুলিয়া দিয়া অসীম পুরুষ-গাড়ীতে বসিল। কতক জিনিষ অসীমের গাড়ীতে, কতক পরীর নিকট রহিল।

রাত্রিতে খাবার বাক্স খুলিয়া যাহা পারিল অসীম খাইল—অবশিষ্ট কুলীকে দিয়া বাসন পরিষ্কার করাইয়া লইল। পরের দিন ষ্টেসনে ট্রেণ থামিলে সঙ্গী একটি যাত্রী খাবার কিনিল। পরিমাণ দেখিয়া হাসিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিল,—"এতগুলো খেয়ে নেবেন?"

"না ভাই—ও-গাড়ীতে স্ত্রী আছে।"

সহসা অসীমের সংজ্ঞা হইল। কাল হইতে তাহার স্ত্রীও অভুক্তা। শ্বশুর-প্রদত্ত আহার্য্য দিব্য আরামে সে খাইয়াছে ও ফেলিয়া দিয়াছে। স্ত্রীর কথা মনেও পড়ে নাই। ছিঃ ছিঃ, মানুষ ত সে-ও। তাড়াতাড়ি উঠিতে দেখিয়া সহযাত্রী প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছেন?"

"বাইরে।"

শুভ্র পরিচ্ছদধারী খানসামার আহ্বানে পরী মুখ তুলিল, "ক্যা মাঙ্গতা?" খাবার ট্রে বেঞ্চের উপর স্থাপিত করিয়া সে উত্তর দিল—ও কামরার সাহেবের আজ্ঞামত সে খাবার আনিয়াছে। বেদনায় পরীর বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাল হইতে উপবাসিনী, স্বামী খোঁজ লন নাই, সহযাত্রী মেয়েটির স্বামী কতবার আসিয়া স্ত্রীর সংবাদ লইয়া গিয়াছে, স্নেহে, সোহাগে খাবার আনিয়া খাওয়াইয়াছে।—আর সে? সে আহত-চিত্তে উহাদের ক্ষণিক মিলন, মুখের সেই মিঠা হাসি,—চোখের সেই আপনহারা দৃষ্টি দেখিয়া দেখিয়া অন্তরে গুমরিয়া মরিয়াছে।

পরী খানসামাকে খাবার লইয়া যাইতে কহিল। লোকটি জানাইল—আহার করিয়া লইলে অপর ষ্টেশনে বাসন নামাইয়া লইবে। কঠোর কণ্ঠে পরী কহিল,—সে মুসলমানের হাতে খায় না। যদিও ইহা মিছা কথা, তবুও পরী জোর দিয়া বারম্বার কহিল—সে খায় না।

খাদ্য উঠাইয়া খানসামা প্রস্থান করিলে সহযাত্রিণী বধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মুসলমানের ছোঁয়া খাও না, এ কি তোমার স্বামী জানেন না, ভাই?"

তাচ্ছীল্যভরে পরী জবাব দিল, "কে জানে।"

"স্বামীর কথা ওকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? কেমন আছেন, এখন হয় ত জ্বর বেশী হয়েছে।"

কাল হইতে এই মেয়েটির সহিত মিছা বলিয়া বলিয়া পরীরাণী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিথ্যা বলিতে তাহার অন্তর যতই সঙ্কুচিত হইতেছিল, ততই সে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বাহিরের সম্মান বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। উহার প্রশ্নে সে ভারী গলায় উত্তর দিয়াছিল—স্বামী সঙ্গে আছেন। কিন্তু তিনি পীড়িত, সেই জন্যে খোঁজ লইতে পারিতেছেন না।

বধূ আবার প্রশ্ন করিল, "কেন জিজ্ঞাসা করলে না, ভাই? আহা, হয় ত—"

মেয়েটির প্রশ্নে পরী উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—"কেন বলুন ত সবতাতে আপনার দরকার? সবাই মিলে এমনই ক'রে বিরক্ত করলে বাধ্য হয়েই আমায় নেমে যেতে হবে।" পরী কাঁদিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। অবাক্ বিস্ময়ে বধূ চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর বিচারের কথা শুনিয়া অসীম বিরক্ত হইল। সর্ব্বগুণে গুণবতী। অশিক্ষিতার নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে!

পরের ষ্টেশনে এক খাবারওয়ালার নিকট খাবার কিনিয়া তাহারই হাতে পাঠাইয়া দিয়া অসীম স্বামীর কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আরামে চুরুট ধরাইয়া বসিল।

খাবারওয়ালার আহ্বানে উদাসদৃষ্টি মেলিয়া পরী চাহিয়া রহিল। ট্রেণ ছাড়িলে জানালা গলাইয়া খাবারগুলা বেঞ্চে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। ট্রেণের ঝাঁকুনীতে কতক পান্তুয়া, রসগোল্লা গড়াইয়া পড়িল, কতক সহযাত্রিণী বধূর পুত্র খাইল। পরী তেমনই বসিয়া রহিল। প্লাটফর্ম্মে ট্রেণ থামিলে অসীম কুলী লইয়া জিনিষ নামাইতে আসিয়া মিষ্টান্নের অবস্থা দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

৫

নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে পরীরাণীর দিনকতক কিছু অসুবিধা হইলেও সে নিজেকে স্বামীর সংসারে মানাইয়া লইল। শ্বশুরালয়ের কতক নিয়মাদি সে নিজের মনের মত করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিল ও স্বীয় অভ্যাস কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল। শাশুড়ী যে তাহাকে স্নেহ করেন, এ কথা সে বুঝিত। কিন্তু একমাত্র সন্তানের অমনোযোগিতা—মায়ের প্রাণ পুত্রের দুঃখে ব্যথিত হইত, তাই সময় সময় বধূর প্রতি তিনি বিরূপ হইয়া উঠিতেন। পরীর কষ্ট হইত শাশুড়ীর জন্য।

দিনকতক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পরী গৃহদ্বারের শ্রী ফিরাইয়া দিল। গৃহস্থালীর সকল কায, ঝি-চাকরের সুবিধা অসুবিধা সবই সে দেখিত—শুধু স্বামী হইতে অনেকখানি ব্যবধান রাখিয়া চলিত।

আহারের সময় দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং রাত্রিতে অসীমকে খাট ছাড়িয়া দিয়া কোণের কৌচে শুইত।

সংসারের কায সবই ঝি-চাকরে করিত, সে নিয়ম করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কাযের রীতি তাহাদের শিখাইয়া দিত। অবসর-সময় পরী ছবি আঁকিত। পিতা যত্নপূর্ব্বক বিখ্যাত শিল্পীর নিকট কন্যাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। উপরের একটি ঘরে সে অয়েল পেন্টিংয়ের সমস্ত জিনিষ সাজাইয়া রাখিয়াছিল —অধিকাংশ সময় এই গৃহেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরী থাকিত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া অসীমের দিনগুলি আমোদে আনন্দে ভালই কাটিতে লাগিল। বিশেষ, বিকালের দিকে—বিবাহিত অবিবাহিত বন্ধুদের হাসি, গানে, গল্পে গৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিত। অবশ্য অধিকাংশ বিবাহিত বন্ধু সপত্নীক আসিতেন। প্রত্যহই পরী চায়ের বৃহৎ আয়োজন অন্তরালে থাকিয়া করিয়া দিত।

নিরামিষ ঘরের কচুরী মিষ্ট শেষ করিয়া—পরী বাহিরের দালানে আসিয়া দাঁড়াইতে গান্ধারী কহিল,—"অমন পেত্নীর মত হয়ে থেক না, বৌমা। গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় প'রে এস।"

"রোজই ত পরি মা, আজ একটু দেরী হয়ে গেছে—যাই।"

"আর শোন—ঐ যে সব গোলাপী, সাদা, রং-টং বেরিয়েছে, তাই কদমকে দিয়ে দুশিশি আনিয়েছি, মুখে আর হাতে বেশ ক'রে মেখ।"

পার্শ্বে উপবিষ্টা গৃহিণীর মাসীমাতা কহিলেন,—"তাই মাখ, কালো রং একটু সাদা দেখাবে। অসীম ত মুখের দিকে একবার চেয়েও দেখে না। শাশুড়ী যা বলে, তোরই ভালর জন্যে।"

শিশি দুটা গান্ধারী বধূর দিকে আগাইয়া ধরিল—"নাও, ধর, বৌমা।"

শক্ত আড়ষ্টভাবে পরী দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, "রকম দেখ,—ধর না গা।"

কম্পিত-কণ্ঠে পরী কহিল, "ও-সব আমি মাখতে পারব না, মা।"

মাসী উত্তেজিতা হইলেন,—"কেন, কেন পারবে না শুনি ?"

গান্ধারীর দিকে চাহিয়া বধূ উত্তর দিল, "কালো রং মিছে ক'রে সাদা দেখাবার জন্যে এ আমি পারব না, মা। ছিঃ!"

পরী ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেল। পার্শ্বের কক্ষে চিঠি লেখা বন্ধ রাখিয়া অসীম মনোযোগ দিয়া সকল কথা শুনিল। পরীর কথায় তাহার প্রতি আজ প্রথম সে একটুখানি সম্ভ্রম অনুভব করিল।

বৈকালে চায়ের মজলিসে মৃগেন বসু জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে, তোমার স্ত্রী পর্দ্দায় থাকবেন না কি ? কই—আজও যে তাঁর দর্শন পেলুম না।"

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে মিসেস ঘোষ বলিল, "তিনি সুন্দরী, শিক্ষিতা, বড় লোকের স্ত্রী, আমাদের সঙ্গে মিশতে ঘৃণা করেন—না মিষ্টার দে ?"

অসীম বিপদে পড়িল। এই শিক্ষিতা সুন্দরীদের মাঝে সেই কুৎসিতা অশিক্ষিতাকে স্ত্রী পরিচয়ে বাহির করা একবারেই অসম্ভব। জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া অসীম কহিল, "সে এখানে নেই।"

জিতেন মাষ্টারের আই, এ, পাশ ভগিনী, রূপের রাণী মিস ফুল্লরা সেন মধুর হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা মিসেস দে, অর্থাৎ আপনার স্ত্রী কি খুবই সুন্দরী ?"

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অসীম জবাব দিল,—"না"।

আবার প্রশ্ন হইল,—"কতদূর পড়েছেন ?"

"কিছুই না।"

"এখানে কবে আসবেন ?"

"শ্বশুর বড় লোক—শীগ্‌গীর মেয়ে পাঠান না।"

আব্দারের সুরে ফুল্লরা কহিল, "তাকে আনাও মিষ্টার দে, আমি দেখব।" উহার বলার ভঙ্গীটুকু অসীমের বড় মিঠা লাগিল। ক্রমে একে একে সকলে গৃহে ফিরিল। মাত্র ফুল্লরা বসিয়া রহিল। এমন প্রায়ই সে বসিয়া থাকিত। কারণ, ভ্রাতা টিউসানী শেষে রাত ১০টায়, অসীমের শ্বশুর-প্রদত্ত চকচকে "কারে" ভগিনীকে লইয়া গৃহে ফিরিত।

মাসকতকের মধ্যে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে পরী ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল।

৬

আঁধার আলোর মাঝে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে পরীরাণী বিছানায় উঠিয়া বসিল। আজ মস্ত ভোজ। স্বামীর বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। রন্ধনের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এক দিন সে রন্ধনের কিছুই জানিত না, পিতৃতুল্য স্নেহময় শ্বশুরকে অভক্ষ্য রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু পিত্রালয়ে ফিরিয়াই সে মনোযোগের সহিত অসীম আগ্রহে রান্না শিখিয়াছিল। পুরাতন ঠাকুর, বৃদ্ধ খানসামা বাধা দিতে আসিলে হাসিয়া পরী তাহাদের সরাইয়া দিত। পিতার অনুযোগে আব্দার ধরিত—সে তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে। শ্বশুর বুঝাইয়াছিলেন,—নারীর প্রধান সৌন্দর্য্য প্রধান তৃপ্তি রন্ধন করিয়া স্বামীকে ও তাঁহার পরিজনদের খাওয়াইয়া। পরী একান্তমনে রন্ধন-শিক্ষায় ব্রতী হইয়া সফল হইয়াছিল।

পরী খাটের দিকে চাহিল। এই গৃহে, এই গৃহ, শয্যা এবং সুদৃশ্য খাটে শয়ান শ্রীমান্ পুরুষ—সবেরই ন্যায়তঃ অধিকারিণী সে। কিন্তু এই সত্যের আড়ালে লুকান বড় মিথ্যাটাই তাহাকে বিশেষভাবে বঞ্চিত করিয়াছে।

অসীমের দিকে চোখ পড়িলে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

আহারের তখনও বিলম্ব ছিল। মৃগেন কহিল,—"বাড়ীটা চমৎকার। ওপর নীচে সবটা দেখা হয় নি। আজ খাওয়ার পরে দেখা যাবেখন। চল না হে, ততক্ষণ বাগান দেখে আসি। কি বলেন, মিস্ সেন ? আর দত্ত তুমি ?"

বাড়ীর সম্মুখভাগে কতকগুলি ফুলের গাছ ছিল; দুই পার্শ্বে প্রশস্ত বাগান। অন্দর দিয়া বাগানে যাইবার পথ, অসীমকে বাক্যব্যয়ের অবসর মাত্র না দিয়া আমন্ত্রিতগণ পর্দ্দা সরাইয়া

অন্দরে ঢুকিল। অগত্যা অসীমকেও তাহাদের অনুসরণ করিতে হইল।

উঠানের পাশের দালানে উপবিষ্টা পরীরাণী বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিল। ছাঁচে সন্দেশ তোলা বন্ধ করিয়া বাঁ হাতে মাথায় কাপড় তুলিয়া পরী পুনরায় নিজের কাযে মনঃসংযোগ করিল। দালানে উঠিয়া ফুল্লরা উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। মৃগেন জিজ্ঞাসা করিল,—"হঠাৎ এত হাসির কারণ কি হ'ল, মিস্ সেন?" ফুল্লরা ইসারায় পরীকে দেখাইয়া দিল।

"বুঝলুম না, মিস্ সেন।"

ফুল্লরা ইংরাজীতে কহিল—"কাল হাতে হীরের ঝক্‌ঝকে চুড়ি কেমন মানিয়েছে দেখুন, মৃগেন বাবু।"

পরীর পিতা কন্যাকে হীরা-মুক্তা ব্যতীত অপর কিছু পরিতে দিতেন না। অসীমের মুখ কাল হইয়া উঠিল। মৃগেন বলিল, "ছিঃ মিস্ সেন, উনি যদি ইংরাজী বুঝতে পারেন, কি মনে করবেন? রং কাল হলেও চেহারা সুন্দর, প্রতিভাপূর্ণ। ভালবাসতে ইচ্ছা করে।"

ফুল্লরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল—"ইনি ইংরাজী বোঝেন নাকি, মিষ্টার দে?"

"না।"

হাসিভরা চোখে অসীমের দিকে চাহিয়া ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে, মিষ্টার দে?"

কোন কিছু না ভাবিয়া হঠাৎ অসীমের মুখ দিয়া বাহির হইল, "ঝি"।

কথাগুলি সবই ইংরাজীতে হইতেছিল। পরীর মুখখানা শক্ত হইয়া উঠিল।

গভীর বিস্ময়ে ফুল্লরা বলিল, "ঝি! ঝির এত হীরা-মুক্তা, এমন সুন্দর শান্তিপুরের শাড়ী, ব্লাউজ সর্ব্বদা পরবার? আশ্চর্য্য ত!"

"আমাদের বাড়ীর এই রকম নিয়ম, মিস্ সেন।"

ফুল্লরা মনে মনে গর্ব্বিতা হইল, এত বেশী অর্থ-শালীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে বলিয়া। হাসির শব্দে গান্ধারীও আসিয়া দাঁড়াইল, ইংরাজী সে বুঝিত ও চলনসই বলিতেও পারিত। ইংরাজীতে পুত্রের ত্রুটী সারিয়া সে বলিল, "ঝি নয়, ছেলেমানুষ অসীম জানে না, মেয়েটি আমাদের আত্মীয়া।"

"ওঃ, তাই বলুন, এখানেই থাকেন নাকি?"

"হাঁ।"

"মাথায় সিঁদুর আছে দেখছি—তবে স্বামীর ঘরে যান না কেন?"

তাড়াতাড়ি অসীম বলিল, "ওঃ, মনে পড়েছে—ওঁর স্বামী নিরুদ্দেশ।"

"ভারি ভুলো আপনি, ভদ্রলোকের মেয়েকে বলেছিলেন ঝি।"

পরীর অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার কথা শুনিয়া মৃগেনের চিত্ত উহার প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। পরীর সহিত আলাপ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—"সন্দেশগুলো খুব সাদা হয়েছে—আপনি করেছেন বুঝি?"

পরী নিজেকে যথাশক্তি সামলাইয়া লইয়া অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

ব্যস্তভাবে অসীম বলিল, "আঃ, চল না হে, শুধু শুধু দেরী করা।"

"তোমরা যাও—আমি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলি।"

"তাই হোক্, চলুন, মিষ্টার দে।" ফুল্লরা অসীমের হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু অসীম নড়িল না।

"আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে—"

পরী মুখ তুলিল,—"মাপ করবেন, আমি এখন যেতে পারবো না।"

"কেন বলুন ত?"

হাসিয়া পরী জবাব দিল, "একটু কায আছে।"

"কাযের নাম না বললে আমি কিন্তু নড়ছি না।" মৃগেন মাটীতে পরীর অদূরে বসিয়া পড়িল।

"রান্নাগুলো দেখিয়ে দিতে হবে, আপনারা যান না বাগানে।"

"এটা কিন্তু বড় স্বার্থপরের কায হবে—এক জন আমাদেরই জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে আর আমরা হাওয়া খেয়ে বেড়াব। কি বল, দত্ত?"

"নিশ্চয়।"

প্রতিবাদ করিয়া পরী কি বলিতে গেল, কিন্তু দত্ত বাধা দিল,—"আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। চায়ের টেবিলে আপনার হাতের তৈরী চমৎকার কচুরী, মিঠাই, রোজ পেট ভ'রে খেয়ে থাকি—সেই অদৃশ্য সেবাকারিণীর দর্শনই যদি পেলুম আজ, এতটুকু একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসরও কি দেবেন না?"

সলজ্জে মিষ্ট হাসিয়া পরী কহিল, "কি যে বলেন আপনি, ভারি ত মিষ্টি। না না, ঐখানে মাটীতে ব'সে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, উঠুন।"

"কোন কষ্টই হচ্ছে না, আচ্ছা আন্দাজ কি ঠিক করি নি? সেই রাশি রাশি খাবার আপনিই রোজ করেন, না? ভারি আশ্চর্য্য লাগছে। এক দিনও আপনি আমাদের সামনে আসেন নি—মিষ্টার দে ত পর্দ্দার বিরোধী। তবে আপনার স্বামী—"।

বাধা দিয়া গান্ধারী কহিল, "ও সব কিছু নয় বাবা, মেয়ে বড় লাজুক, বেশ, এবার থেকে যাবে এখন।"

কাযের মাঝে একান্তে পরীকে ডাকিয়া অসীম দাঁড়াইল,—মৃদুস্বরে ডাকিল—"শোন।"

বিস্মিতা পরী ফিরিয়া দাঁড়াইল, এ কি অসম্ভব ব্যাপার আজ!

"ও ভাবে সামনে বসবার কি কোন দরকার ছিল?"

শক্ত কণ্ঠে পরী উত্তর দিল, "বাড়ীর অন্দরে বসাও যে নিষিদ্ধ, এ কথা আগে জানান উচিত ছিল।"

গমনরতা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া অসীম উত্ত্যক্ত-কণ্ঠে বলিল, "এ সব আমি পছন্দ করি না।"

স্তম্ভিত অসীম শুনিল, "সে জন্য আমি নিরুপায়।"

৭

চায়ের টেবলে বসিয়া মৃগেন কহিল, "কাল থেকে যে তিনি পলাতকা, ব্যাপার কি হে?"

তাচ্ছীল্যভরে অসীম জবাব দিল, "কে জানে।"

"চল না হে দত্ত, বাড়ীর ভেতর তাঁর সন্ধান নেওয়া যাক।"

বিরক্ত-কণ্ঠে ফুল্লরা কহিল, "যান আপনারা, আমরা নড়ছি না। কালকের অমন সুন্দর দিনটাই মাটী ক'রে দিয়েছিলেন।"

অসুস্থতার জন্য মিসেস দত্ত কাল আসিতে পারে নাই, কিন্তু স্বামীর মুখে সেই কর্ম্মিষ্ঠা কালো মেয়েটির সন্ধান পাইয়া এক অদম্য কৌতূহল অসুস্থ অবস্থাতেও আজ তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে কহিল, "চলুন, আমিও যাব।"

বাধ্য হইয়া অসীমকেও ইহাদের সহগামী হইতে হইল। নীচের সকল ঘর খুঁজিয়াও যখন তাহার দেখা মিলিল না, তখন উপরতলার ঘরগুলি ঘুরিয়া এক রুদ্ধদ্বার কক্ষের সম্মুখে পলাতকার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। মিসেস দত্ত জানালার ফাঁক দিয়া ভিতরে চাহিল। উহার অনুকরণ অনেকে করিল। অপর সকলে জানালা ও দ্বারের ফাঁকে ভিতরের দৃশ্য দেখিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। সমুদায় দৃষ্ট না হইলেও যতদূর দেখা গেল, সুন্দর সুন্দর তৈল-চিত্রে গৃহের দেয়াল শোভিত। তাহারা দেখিল, নিবিষ্ট-চিত্তে অসীমের আত্মীয়া সম্মুখের ছবিখানাতে তুলির রেখা টানিয়া দিতেছে। ছবির অবয়ব দর্শনে ফুল্লরার মুখ আঁধার হইল,—"এ যে মিষ্টার দের ফটো।"

উৎফুল্ল-মুখে মৃগেন কহিল, "বাঃ তোমার আত্মীয়া কি চমৎকার পেণ্টিং করতে পারেন। যদিও সব দেখা যাচ্ছে না—তবুও দেখ—দেখ কাশ্মীরের সীনারীগুলো কি চমৎকার হয়েছে। আর তোমার ছবিখানা কি সুন্দরভাবে সজীব ক'রে তুলেছেন, দেখ অসীম।"

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে ফুল্লরা বলিল, "আর পত্নপুরুষের ফটোর সামনে ব'সে ঐ সজীব চোখের জলটুকু—এর তুলনাই হয় না। কি বলেন, মৃগেন বাবু?"

কথার শব্দে পরী দ্বার খুলিল, "এ কি আপনারা!"

দরদভরা কণ্ঠে মিসেস দত্ত কহিল, "তোমার সাধনা লুকিয়ে দেখছিলুম ভাই,—কি সুন্দর আঁকতে পার—সার্থক তোমার শিক্ষা। ঘরের ভেতর যেতে পারি কি?"

আরক্তমুখে ধীরে ধীরে পরী কহিল, "আজ মাফ করুন।"

"তা হ'লে এখন আর তোমায় বিরক্ত করব না, নিজের কায শেষ কর, কাল যেন বঞ্চিত না হই।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সহসা ফুল্লরা ফিরিয়া দেখিল, অসীম নাই। অপর নরনারী নামিয়া গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া যেখানে অসীম অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, সেস্থানে আসিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—"এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকবে?"

অসীম নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "না, চল যাচ্ছি।"

শ্লেষের সহিত ফুল্লরা কহিল,—"এখন তোমার গিয়ে কায নেই, না—আর তোমায় বিরক্ত করব না,—ওর চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দাও গিয়ে—" একটু থামিয়া ফুল্লরা পুনরায় কহিল,—"আশা করি, শেষ মিলনের অঙ্কের আনন্দের অংশে আমরা বাদ যাব না, অসীমবাবু।"

পরী গৃহের মধ্যেই ছিল। সুন্দরীর চোখের জলে অসীম আত্মবিস্মৃত হইল। সে পরম আদরে ফুল্লরার হাত ধরিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিল—"শোন ফুল—যেও না, ও ঘরে চল।"

ফুল্লরা হাত টানিয়া লইয়া অশ্রুভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া নামিয়া গেল।

স্ত্রীর গুণের পরিচয়ে অসীমের চিত্তে সবেমাত্র যে সম্ভ্রমটুকু জাগিয়াছিল, ফুল্লরার চোখের জলে সেটুকু ভাসিয়া গিয়া ক্রোধে অন্তর ভরিয়া উঠিল। কি প্রয়োজন ছিল তাহার ফটো আঁকিবার। ফুল্লরার অভিমানাহত মুখখানা বিপ্লব বাধাইয়া দিল, চোখের জলটুকু উহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

ক্ষিপ্তবৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া পরী কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই স্বীয় ফটোখানা বাহিরে আনিয়া পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। উন্মাদিনীর ন্যায় পরী স্বামীর অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমার ছবি কেন তুমি ছিঁড়লে?"

"কেন—কার হুকুমে কিসের অধিকারে তুমি ঐ ফটো আঁকলে?"

পরী নীরবে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিল।

অসীম বলিল, "বাপ যদি ভুল করে, তার জন্যে সন্তান দায়ী নয়। বিয়ে হলেই সব অধিকার হ'তে পারে না। আজ পাঁচ বছর তোমায় কোন দিন ছুঁইনি, ছুঁতে পারব না। সব জেনে কিসের স্পর্দ্ধায় কোন্ অধিকারে এ ছবি এঁকে সবার কাছে আমায় হাস্যাস্পদ করলে?"

দীপ্তকণ্ঠে পরী জবাব দিল, "ভালবাসা তোমার ছবি আঁকবার অধিকার দিয়েছে আমায়। আমি ভালবাসি। স্ত্রীর অধিকার চাই না। তোমার স্পর্শ বা দুটি মিষ্টি কথার জন্যে আমি লালায়িত নই। তোমার কাছে চাইবার দরকার হয় নি, এ ভালবাসা আমার নিজস্ব সম্পত্তি,—প্রতিদানের জন্যে কোনও দিন ভিখারিণীর মত তোমার দ্বারস্থ হব না। এ আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক দিক্। আমার যে এক ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা আছে, সেখানে আমি রাণী। এর বিষয় প্রশ্ন করবার দুনিয়ার কারুর কোন অধিকার নেই। কিন্তু তুমি কেন, কিসের অধিকারে আমার বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা ছবি ছিঁড়লে? বল, উত্তর দাও—আমার—আমার ছবি কেন তুমি ছিঁড়লে?"

অসীমের অন্তর ব্যাপিয়া কিসের শিহরণ—কিসের পুলক জাগিল। উহার চতুর্দ্দিকে পরীর সেই কথাগুলি ঘুরিয়া মরিতে লাগিল,—ভালবাসা এ অধিকার দিয়েছে। এক নারী তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নীরবে দূরে থাকিয়া তাহাকেই দিতেছে, হউক সে কালো,—অশিক্ষিতা, কিন্তু সে ভালবাসে তাহাকেই।

পরী স্বামীর আনত মুখের দিকে চাহিল—অর্দ্ধছিন্ন ছবির উপর দৃষ্টি পড়িতে সে কঠোর হইয়া উঠিল,—"যাও, স'রে যাও আমার সামনে থেকে। কোন দিন এ দিকে এস না।"

রাত্রিতে অনেক ডাকিয়াও গান্ধারী বধূর রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করাইতে পারিলেন না। অসীম আসিয়া জানালার ফাঁকে দেখিল—পরী আবার একখানা তাহারই আকৃতি আঁকিতে বসিয়া গিয়াছে। সে ধ্যান ভাঙ্গাইতে অসীমের সাহসে কুলাইল না।

রাত্রির ন্যায় পরদিনও শ্বশ্রূর সাধ্য-সাধনা বিফল হইল। বধূ দুই দিবস উপবাসিনী। পরের দিন অগত্যা নিরালায় দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিয়া চমৎকৃতা হইলেন।

গৃহের চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য ছবির মাঝে বধূ সম্প্রতি স্বামীর অর্দ্ধসমাপ্ত চিত্র রাখিয়া উমার ন্যায় কঠোর সাধনায় লিপ্ত। গান্ধারীর নয়নে শ্রাবণ-ধারা বহিল।—"বৌমা, ওঠো মা—দুদিন যে কিছু খাও নি।" গান্ধারীর বারম্বার আহ্বান বাহ্যজ্ঞান-হীনা বধূর কর্ণে প্রবেশ করিল না। তন্ময়ভাবে চিত্রাঙ্কনে নিমগ্না রহিল।

বিরক্ত হইয়া অসীম বলিল,—"মরুক গে, তুমি চ'লে এস, মা।"

তৃতীয় দিন সকালে ভগ্নদ্বারপথে অসীম গৃহে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইল। সারারাত্রি বসিয়া থাকিয়া পরী চিত্রখানাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাহার শিথিল হাতের তুলির স্পর্শ আর যেন ঠিকমত ফুটিতেছে না। তিন দিন উপবাসে পরীকে বড় যেন নির্জ্জীব দেখাইতেছিল। অসীমের ভয় হইল,—যদি হার্টফেল করে। আহা বেচারা। সে ধীরে ধীরে হাতের তুলিটি টানিয়া লইল। স্বামীর দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া পরী ঢলিয়া পড়িল। তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বাহিরে আনিয়া অসীম গান্ধারীকে ডাকিল। পরীর আচ্ছন্ন ভাব কাটিলে গান্ধারী সযত্নে বধূকে স্নান করাইয়া আহার করাইয়া নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

৮

"না, আপনি ভুল বলছেন, মৃগেন বাবু। লাভ মেরেজের আমি পক্ষপাতিনী।"

"আর ডিভোর্স?"

"তারও।"

"বেশ, বেশ, আপনার মতের সঙ্গে কিন্তু কোন দিন আমার মতের মিল হবে না।"

দত্ত কহিল, "কে জানে লাভ মেরেজ-টেরেজ দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এই ত বাবা বিয়ে দিয়ে গিছলেন। কোন দিন আমাদের অবনিবনাও হয় নি।"

স্ত্রীর দিকে স্নেহে চাহিয়া দত্ত হাসিতে লাগিল।

অসীম কহিল, "এক আধটা কায অমন দেখা গেছে, কিন্তু অধিকাংশ তা নয় হে, দত্ত। স্ত্রী আছে, অথচ এমনও দেখা গেছে—পাঁচ ছ' বছর হ'লেও তারা স্ত্রীকে গ্রহণ করে নি।"

হাসিয়া দত্ত কহিল,—"যথা—মিষ্টার দে।"

ফুল্লরা কহিল, "সেইজন্যেই বলছিলুম—আমাদের ডিভোর্স-প্রথা থাকলে কত ভাল হ'ত।"

দত্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিল। মৃগেন গম্ভীর হইল। মিসেস দত্ত কহিল,—"তাতে আর আটকাচ্ছে কি, ভাই। পুরোনো স্ত্রী একদিকে প'ড়ে থাকছে, নতুনকে নিয়ে আমোদ চলছে—কোথাও বা গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যে। এ দৃষ্টান্ত ত বিরল নয়। ডিভোর্স নেই, তাই রক্ষে, না হ'লে পুরুষরা রোজ একটা ক'রে বদলাতো।"

"তাই ব'লে সেই অমনোনীতাকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে, এ যে বড় জোর-জুলুম, মিসেস দত্ত।"

মিসেস দত্ত জবাব দিল, "বাপমায়ের দেওয়া বরকে যদি মেয়েদের মনে ধরতে পারে, তবে পুরুষেরই বা তা ধরবে না কেন?"

"তার মানে পুরুষদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বেশী আর তাদের জীবনীশক্তি মেয়েদের মত এখনও নির্জ্জীব হয়ে পড়েনি।"

মৃগেন হাসিল।

"হাসলেন যে?"

"ভারি মজার কথা মনে হচ্ছে, আচ্ছা, ধর দুটো বিয়ে করা গেল—তার পর দুই বৌয়ে যখন স্বামীর ভাগ নিয়ে ঝগড়া করবে, ওঃ, কি মজা!" মৃগেন একাই হাসিতে লাগিল।

গম্ভীর মুখে অসীম উত্তর দিল, "যখন কোন উপায় নেই, তখন যাতে তাদের ঝগড়া না হয়, তেমন কিছু করতে হবে।"

"অর্থাৎ?"

"অমনোনীতা স্ত্রীর খাবার পরবার সংস্থান ক'রে দিয়ে আলাদা রাখতে হবে।"

"তবুও বিয়ে করা চাই—বেশ।"

"তুমি কি বলতে চাও যে, মা-বাপের দেওয়া সেই জন্তু-বিশেষকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে হবে?"

ফুল্লরার দিকে অসীম চাহিল—দেখিল, তাহার স্বপ্নাভিভূত মুগ্ধদৃষ্টি উহারই মুখের উপর নিবদ্ধ। কথাগুলি মিসেস দত্তর ভাল না লাগায় সে বলিয়া উঠিল, "সে দিন থেকে আপনার আত্মীয়ার দেখা নেই, তিনি কি চ'লে গেছেন?"

"না—সে অসুস্থ।"

"কোথায় তাঁর দেখা পাব—ওপরে?"

"সম্ভবত এখন বাগানে আছেন।"

বেলফুলের মোটা মালা গাঁথিয়া, পার্শ্বে রাখিয়া, বাগানের পরিষ্কার পাথরের উপর পরী রবিঠাকুরের চয়নিকা খুলিয়া বসিয়াছিল। পশ্চাৎ হইতে মিসেস দত্ত চোখ টিপিয়া ধরিল—"কে আমি বল ত, ভাই।"

"আপনি সেই—সেদিনকার তিনি।"

"নাঃ—হ'ল না, তিনি কি,—নাম বল।"

"জানি না যে।"

"তুমি ত আমার চেয়ে ছোট, প্রমীলা দি বল—কেমন?"

"প্রমীলা দি।" হাসিয়া সে পাশে আসিয়া বসিল। মৃগেন আসিয়া দাঁড়াইল, "বাঃ বাঃ, চমৎকার মালা।" মৃগেন গলায় মালা পরিতে পরীর মুখে বিরক্তি ফুটিল। "কি বই ওখানা দেখি।"

"চয়নিকা।"

"বুঝতে পারেন সব?"

দত্তর প্রশ্নে পরী মুখ টিপিয়া হাসিল—"চেষ্টা করি।"

"তবে যে শুনলুম—"

ইসারায় স্বামীকে নিষেধ করিয়া প্রমীলা কহিল, "তোমার ছবিগুলো দেখাবে কবে, পরী।"

"কাল দেখাব, দিদি।"

ফুল্লরার সহিত অসীম মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে বাগানে

প্রবেশ করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়িল মৃগেনের গলার মালার উপর। তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

ছবি ছিঁড়িবার পর হইতে পরী অসীমের গৃহে শুইত না। কত দিন রাত্রিতে অসীম লুকাইয়া চিত্র-গৃহে দেখিয়াছে—একটি শুভ্র মোটা ফুলের হার অসমাপ্ত চিত্রখানার উপরে ঝুলিয়া থাকিতে। ছবির প্রাপ্য মালা কি না আজ পরী অনায়াসে মৃগেনের কণ্ঠে পরাইয়া দিল! দূর হউক ছাই—সে কি করিল না করিল, এ দেখিয়া তাহার লাভ!

ফুল্লরাকে লইয়া অসীম বাগানে বেড়াইতে লাগিল। সকলে বিদায় লইলে পরী উঠিল, ফুল তুলিয়া আবার মালা গাঁথিতে হইবে। সম্মুখের গাছে ফুল সব তোলা হইলে কোণের দিকে চলিল। কিন্তু সহসা সম্মুখের দৃশ্য তাহার গতি রোধ করিল—অঞ্চলের ফুলগুলি মাটীতে পড়িয়া গেল,—শরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় চকিতে পিছন ফিরিয়া প্রায় নিশ্বাস রোধ করিয়া সে ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িল।

অসীম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ফুল্লরার হাতখানা কাঁধ হইতে সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—"চল ফুল, ঘরে যাই।"

৯

অর্গানের সহিত ফুল্লরা গাহিতেছিল। সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া মুগ্ধ অসীম আপনা ভুলিয়া শুনিতেছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুর দল বাহবা দিতেছিল। গীত সমাপ্ত হইল—গানের কথাগুলা অসীমের প্রাণে স্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল। অভ্যর্থনার উচ্চ শব্দে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। হাসিয়া পরীরাণী প্রমীলার পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মৃগেন কহিল,—"সাধ্যসাধনা করেও যে দেবীর দর্শন মেলে না, আজ না চাইতেই বারিপতন—ব্যাপার কি বলুন ত।"

"দিদি এসেছেন যে।"

"তাই বলুন, দিদি আপনার সব, আর আমরা কেউ নই।"

জবাব দিল প্রমীলা,—"সত্যি ত, দিদির সঙ্গে কি আর আপনাদের তুলনা হ'তে পারে, কি বলেন মিস সেন?"

ফুল্লরার নয়নের মূর্ত্ত হিংসা দেখিয়া প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল। পরীর পরিহিত দামী কমলারংয়ের শাড়ী ও সোণালী তারের ব্লাউজের দিকে ফুল্লরা চাহিয়া রহিল। প্রমীলা কহিল,—"আজ বেশীক্ষণ বসব না, বোন্,—উনি থাকবেন, আমি দিদির বাড়ী থেকে ফেরবার সময় এঁকে নিয়ে যাব।"

প্রমীলার সঙ্গে সঙ্গে পরীকে উঠিতে দেখিয়া মৃগেন তাহাকে বাধা দিয়া বসাইল—"বাঃ, বেশ মজার লোক ত, দিদির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হবেন না কি?"

প্রমীলা নাই, পরী সঙ্কুচিতা হইল। সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে সে কহিল, "কাল বসব'খন।"

অসীমকে উহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ফুল্লরা অধীরকণ্ঠে বলিল,—"চল অসীম, সিনেমায় যাব।"

"চল, তোমরাও চল।"

পরীর পথ আগুলিয়া মৃগেন কহিল, "সে কি, আপনি যাবেন না?"

"না কায আছে।"

"আপনার কায ত সেই ছবি আঁকা। একদিন বন্ধুদের অনুরোধে নাই বা আঁকলেন, চলুন চলুন।"

অসীম বাধা দিল,—"চল না হে, কেন তোমরা দেরী করছ?"

"বাঃ, একজনকে ফেলে যাব?"

"উনি বাড়ী থাকুন, মাও আজ বাড়ী নেই।"

মৃগেন গম্ভীরমুখে বলিল, "তা হ'লে আজ কেউ যেও না। হয় ওঁকে সঙ্গে নাও, না হ'লে যাওয়া বন্ধ কর।"

বিরক্তকণ্ঠে অসীম কহিল, "ওকে নিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার, আমরা যাব না।"

"বেশ,—চলুন।"

পরী কহিল, "আজ থাক মৃগেন বাবু—আর একদিন যাব।"

মিনতিপূর্ণ কাতরকণ্ঠে মৃগেন কহিল,—"বন্ধু হিসাবে কি এইটুকু দাবীও আপনার কাছে করতে পারি না? আজ জোর ক'রে নিয়ে যাব।"

সহসা অসীমের ক্রুদ্ধকণ্ঠ বড় অশোভন শোনাইল,—"ভেতরে যাও, কে তোমায় এখানে আসতে বলেছিল? দিন দিন ভারি অবাধ্য হয়ে উঠ্‌ছ।"

অসীমের অভদ্র রূঢ় আচরণে দত্ত ও মৃগেন স্তম্ভিত হইল। শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে পরী কহিল, "চলুন যাব।"

সভ্যসমাজে এবং ততোধিক সভ্য লোকগুলির সম্মুখে অসীম ইহা কি করিয়া বসিল? অন্তরে লজ্জিত হইলেও সে পরীর উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল। যত অনিষ্টের মূল ঐ নারী। "আমি গৃহস্বামীর অধিকারে বলছি, তুমি ভেতরে যাও।"

দত্তর দিকে চাহিয়া পরী উত্তর দিল, "যে মিথ্যে ক'রে অধিকারের আস্ফালন করে, কিন্তু সত্যিকারের অধিকারের মর্য্যাদা যে রাখে না, তার কথা না মানলেও কোনও ক্ষতি হবে না। চলুন মৃগেন বাবু, মিষ্টার দত্ত, আপনিও।"

কোনও দিকে না চাহিয়া সে মোটরে উঠিয়া পড়িল। এত কাণ্ড হইবে জানিলে মৃগেন সিনেমার প্রস্তাবই করিত না। গৃহস্বামীর অমতে উহাদিগেরই আত্মীয়াকে লইয়া যাওয়া উচিত কি না, ভাবিবারও সময় পাইল না। দত্ত বন্ধুকে ঠেলিয়া গাড়ীতে তুলিল।

রাত্রিকালে গৃহে ফিরিলে গান্ধারী পরীর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইল। কথা না কহিয়া পরী উপরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আহারের জন্য ডাকিলে ক্ষুধায় অনিচ্ছা জানাইল। পরের দিন ফুল্লরাকে লইয়া সিনেমা যাইবার সময় কতকগুলি ডাকের চিঠির সহিত মেয়েলি হাতের লেখা খামের উপর স্ত্রীর নাম দেখিয়া ফুল্লরা পাছে জানিতে পারে ভাবিয়া অসীম চিঠিখানা পকেটে রাখিল। "চিঠিখানা খুল্‌লে না, অসীম?" "থাক, পরে দেখব। দেরী হয়ে যাবে।" "কাল থেকে তোমায় বড় গম্ভীর দেখছি।"

জোর করিয়া হাসিয়া অসীম বলিল, "কৈ, না, চল, চল দেরী হয়ে যাচ্ছে।" একা ফিরিবার পথে অসীম অন্যমনস্কভাবে চিঠি খুলিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বিস্ময় তাহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। ঐ যে নারী কিছু না জানিবার ভাণ করিয়া থাকে, সে বিদ্যায় তাহা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের স্থানে এক সংখ্যা অসীমের নিকট বাড়িয়া গেল। পরীর বন্ধু লিখিয়াছিল,—

"পরী, স্বামীর সঙ্গে তোর কেমন আলাপ হ'ল, সে সব কথা প্রতিবারেই বাদ দিয়ে যাস কেন? যাই বলিস্, আমার কিন্তু তোর জন্যে দুঃখ হয়, রাণী। কেন যে তুই এম, এ, পরীক্ষা দিলি না! কেন, সে তুই-ই জানিস। স্বামীকে বুঝিয়ে বললে তিনি কি তোকে পড়তে বারণ করতেন? না,—এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। নীরোজা, প্রীতি, তুই আর আমি একসঙ্গেই কলেজে ঢুকি। আমরা বি, এ, ফেল ক'রে ফিরে এলুম, আর তুই সবাইকে ছাড়িয়ে ভাল ভাবে পাস ক'রে এম, এতে গেলি। তোর মেধা দেখে আমাদের হিংসে হ'ত, মনে পড়ে সে কথা? যাক্ গে—স্বামীর সব কথা লিখিস। আমি এখন স্কুলে পড়াচ্ছি। বড় চিঠি চাই।"

চার পাঁচবার পড়া হইলেও অসীম বারে বারে চিঠি পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা অসীমের পকেটে পকেটেই ঘুরিতে লাগিল।

চেষ্টা করিয়াও সে পরীর দেখা পাইল না। বিকালের আসর তেমনই জমিতে লাগিল। বন্ধুদের হাসি-গল্প অবিরাম চলিতে লাগিল। কিন্তু সিনেমা যাইবার পর হইতে পরী নিজেকে লুকাইয়া রাখিল। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মৃগেন কহিল, "তোমার আত্মীয়া কি আমার ওপর রাগ করেছেন, অসীম?"

"কৈ, আমি কিছু জানি না ত।"

প্রমীলা গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে কথাগুলি শুনিতে পাইয়া কহিল, "কেন বলুন ত?"

"আজ ক'দিন থেকে তিনি এদিকে আসেন নি।"

"এই ত কাল দুপুরে তাকে আমাদের বাড়ী ধ'রে নিয়ে গিয়ে গান শুনলুম, চমৎকার গায়, না অসীমবাবু।"

অসীম কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "শুনি নি।"

দত্ত স্ত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া একটু হাসিল।

"উনি গান গাইতে পারেন না কি?"

"কেন, আপনি কি বিশ্বাস করতে পারছেন না, মিস সেন?"

ফুলরা উত্তর দিল না। সত্যেন সরকার আগ্রহভরে বলিল, "তাঁকে ডাকুন, মিসেস দত্ত।"

একটু ভাবিয়া প্রমীলা কহিল, "এখানে সে আসতে পারে, অসীমবাবু?"

মাথা চুলকাইয়া অপ্রস্তুত অসীম জবাব দিল, "তিনি যদি ইচ্ছে করেন, আসুন না—আমি কেন বারণ করব? গানও শোনা যাবে। সন্ধ্যেটা ভাল ভাবেই কাটবে।"

প্রমীলা পরীকে প্রায় একরূপ জোর করিয়াই টানিয়া আনিয়া অর্গানের সম্মুখে বসাইয়া দিল। গান্ধারীও গৃহে আসিয়া ঢুকিল। সকলের অনুরোধে পরী বিব্রতভাবে গান্ধারীর দিকে চাহিল। বধূর মনোভাব বুঝিয়া গৃহিণী কহিল, —"বেশ ত, গাও না মা, এত ক'রে সবাই বলছেন।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সবাই শুনিতে লাগিল—পরী সাধা-কণ্ঠে মিঠা গলায় গান ধরিল। শুদ্ধ তানলয়ে গিটকারী-মূর্চ্ছনায় রাগিণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতশেষে পুলক-বিস্মিত-কণ্ঠে অসীম বলিল, "সত্যি এমন কখন শুনি নি।" চতুর্দ্দিকের অনুরোধ ঠেলিয়া নতমুখে পরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ মাপ করুন, আর পারব না।"

১০

দিনের আলোকে ম্লান করিয়া নব বধূর ন্যায় কুণ্ঠিত-ধীরপদে আঁচল বিছাইয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে বিরক্তভাবে অসীম শয়নকক্ষের খাটের উপর উঠিয়া বসিল। আজ তিন চারি দিন হইতে অসীম জ্বরে পড়িয়াছে। আজ যদিও জ্বর নাই, কিন্তু মাথায় বড় বেদনা। গান্ধারী পুত্রের জন্য দুধ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, "দুধটুকু খা, ব্যথা এখন কেমন আছে?"

"কিছু কমেছে। শুয়ে শুয়ে ভাল লাগছে না, মা।"

"ওরা সব এখুনি এল ব'লে, ততক্ষণ না হয় একটা কোন গল্পের বইটই প'ড়ে শোনাই।"

"কি পড়বে মা?"

"যা হয় দে।"

"ব্রাউনিংএর বই পড়তে পারবে?"

"না বাবা, ওসব পারব না। ফুল এল ব'লে, সেই পড়বে অখন।"

"পাগল মা, ফুল কি ব্রাউনিং পড়তে পারে? আর ওরা দেরী ক'রে আসবে, রবিবার কি না। ততক্ষণ তোমার বউকে বল না পড়ে শোনাক।"

"বৌমা পড়বে! কি বলছ, অসীম?"

"ঠিক বলছি মা, ও লেখা-পড়া করেছে, এম, এ, পর্য্যন্ত পড়েছে।"

"তাই না কি? কি দুষ্ট মেয়ে, আমায় কিছু বলে নি।"

খুসী হইয়া গান্ধারী বধূকে পাঠাইয়া দিলেন।

"ডেকেছ?"

খাট দেখাইয়া অসীম কহিল, "এইখানে ব'সে বইটা প'ড়ে শোনাও।"

"আমি?"

হাসিয়া অসীম কহিল, "হাঁ, তুমিই পড়বে। দেখ ত, এ চিঠিখানা তোমার কি না।"

পরী চিঠি পড়িয়া একটুকু হাসিল। চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া সে বই তুলিয়া লইল।

অসীমের মুখ শুকাইয়া গেল—বলিল, "এইখানে বসতে কি বাধা আছে?"

কোন দিকে না চাহিয়া পরী কহিল, "এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত।"

পরীর ব্যবহার অসহনীয় হইলেও ক্রোধ চাপিয়া অসীম নীরবই রহিল। পরী পড়িতে লাগিল।

পরী যখন পড়ায় নিমগ্ন, অসীম তন্ময়, তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। বন্ধুর দল অসীমের অসুস্থতার সংবাদে তাহাকে দেখিতে আসিতেছে।

পরীরাণী অসীমকে ইংরাজী কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছে দেখিয়া নিঃশব্দে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

পরীরাণী পড়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃগেন বলিল, "ওখানা কি বই?"

অসীম বলিল, "ব্রাউনিং।"

ফুল্লরা সবিস্ময়ে বলিল, "ব্রাউনিং উনি বুঝতে পারেন ?"

তিক্ত-কণ্ঠে প্রমীলা কহিল,—"বুঝতেই যদি না পারত, তবে কি শুধু শুধু চোখ বুলুচ্ছিল এতক্ষণ ?"

"তবে যে অসীম সে দিন বললে, উনি লেখাপড়া জানেন না।"

"অসীম বাবু সম্ভবত জানতেন না।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে ফুল্লরা কহিল, "আপনাকে ত ওঁর হয়ে ওকালতী করতে বলছি না, মিসেস দত্ত।"

দত্ত উদ্গত হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইল। রবিবারের ছুটী হেতু ফুল্লরার ভ্রাতাও আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে ভগিনীর পিঠে হাত দিয়া স্নেহে কহিল,—"শান্ত হও, ফুলরাণী।"

ভ্রাতার হাত সরাইয়া দিয়া ফুল্লরা পরীকে প্রশ্ন করিল,—"লেখাপড়া কত দূর করেছেন ?"

উত্তর দিল দত্ত—"এম, এ, পর্য্যন্ত।"

খুসী হইয়া মৃগেন পরীকে নমস্কার করিয়া কহিল,—"অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল। সত্যি, কি দুষ্ট আপনি। এই আনন্দের দিনে আপনার সব গোপন বিদ্যা দেখাতে হবে কিন্তু। ঐ বন্ধঘরে না-জানি কত কি লুকান আছে। সব কটা অয়েল পেন্টিং দেখাতে হবে—না দেখান, বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে জোর ক'রে দেখব।"

দত্ত কহিল,—"শুভস্য শীঘ্রম্। উঠে পড়—অনুমতি নেবার দরকার নেই। চল হে, অসীম।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া ছোট শিশুর ন্যায় আনন্দে মৃগেন লাফাইয়া উঠিল,—"এই ফটোখানা ?"

পরী কহিল,—"এঁর বাবার।"

"অর্থাৎ, অসীমের বাবার। বাঃ বাঃ, মার্ভালাস এঁকেছেন। এইটা ?"

"আমার বাবার।"

যে সময় পরী ছবি কয়টির পরিচয় দিতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে ফুল্লরা অসীমের বস্ত্রাবৃত ফটোর আবরণ সরাইয়া হাতে তুলিয়া লইল,—"কি সুন্দর, এ আমি নিয়ে যাচ্ছি, অসীম।"

পরী ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"না না, ও আমি দেব না।"

পরীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ফুল্লরা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল,—"নিয়ে চল্লুম, অসীম।"

সংজ্ঞাহীনার ন্যায় স্বামীর হাত ধরিয়া পরী জড়িতকণ্ঠে কহিল, "আমার ছবি ফিরিয়ে দাও।"

সকলের উপস্থিতি ভুলিয়া সাদরে স্ত্রীকে একহাতে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অপর হস্তে উহার মুখ উন্নত করিয়া অসীম কহিল,—"এখনও কি ফটোর দরকার আছে, রাণী ?"

সাশ্রুলোচনে পরী কহিল, "আমার—আমার ফটো আমি কাউকে দিতে পারব না।"

কক্ষমধ্যে মৃদুগুঞ্জন উঠিল, "ছিঃ, এ সব কি !"

শুধু প্রমীলা ও দত্ত হাসিতেছিল। পরীর কাণে কথাগুলি আসিতে সে লজ্জিতভাবে স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

অসীম কহিল, "ও ফটো পরী দিতে পারবে না, মিস সেন।"

আরক্তমুখে ফুল্লরা প্রশ্ন করিল, "কেন এ রাখবার কি ওর কোন অধিকার আছে ?"

"আছে, কারণ, এই ছবির মধ্যে দিয়েই পরী তার নিরুদ্দেশ স্বামীর সন্ধান পেয়েছে।"

"তা হ'লে পরী তোমার—তোমার—"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—আমার গৃহলক্ষ্মী।" অসীম ফুল্লরার হাত হইতে চিত্রখানি লইয়া স্বয়ং বড় বড় সোণালি অক্ষরে লিখিল, "পরিচয়"।

শ্রীমতী ঊষা মিত্র।

কিশোরী

কাঁচাসোনা আর সোঁদালি ফুলেরে নিন্দি' বরণ তার,
তারও চেয়ে ভালো নবনীতে গড়া মু'খানি শিল্পসার;
বিশাল নয়ন দুটি,
পদ্ম-ভুরুতে ঘন কালো রোম—ভ্রমর আসিছে ছুটি।

ক্ষীণা তনুলতা সহজে আ-নতা পুলকিত অবয়ব,
বাহু দুটি আর চরণ-যুগল সুস্থ সবল সব;
বেণীটি খুলিয়া ফেলে,
ঘন কুঞ্চিত দীঘল চিকুর রাখা দায় অবহেলে।

কণ্ঠে গ্রীবায় চিবুকে অধরে দশনে কাণের কাছে,
কহা নাহি যায় কি যেন মাধুরী জড়ায়ে ছড়ায়ে আছে;
যতটুকু দেখা যায়,
নীল অম্বরে রামধনু রঙে বিদ্যুৎ চমকায়।

নয়নে বচনে নব আশা ভাষা, কণ্ঠে নবীন সুর,
বিস্ময় নব চকিত চাহনি সঙ্কোচে ভরপুর;
সুষমার সার ভাগ,
ভীত লজ্জিত কিশোরী মনের প্রথম সে অনুরাগ।

শ্রীগোপাললাল দে (বি, এ)

চয়ন



শূন্যপথে খেয়াপার

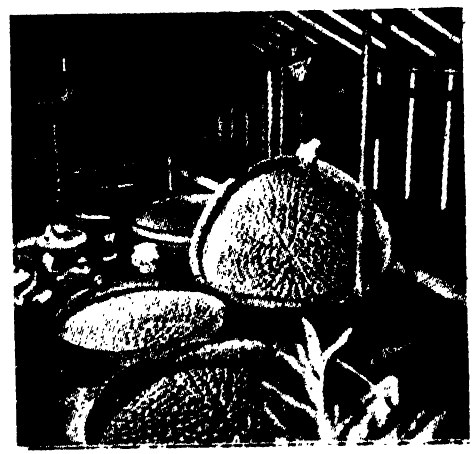
কলোরাডো নদের ৫ শত ফুট উপর দিয়া শূন্যপথে খেয়ার ব্যবস্থা আছে। শীর্ণ একটি তার-বাহিত যান এপার হইতে ওপারে প্রতিবার বহুসংখ্যক শ্রমিককে পারাপার করিয়া থাকে। দর্শক এ দৃশ্যে বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলেও শ্রমিকরা ইহাতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত হয় না। নিত্যই তাহারা এই-ভাবে খেয়াপার হইয়া কর্ম্মস্থলে গতায়াত করিয়া থাকে।



শূন্যপথে খেয়াপার

বিদ্যুতালোকে নলিনীর পরিপুষ্টি

আমেজন নদে যে জলজ নলিনীর জন্ম হয়, তাহার নাম প্রসিদ্ধ—ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। ওহিওর এক 'নার্সারি' বা উদ্ভিদ-লালনা-গারে এই প্রসিদ্ধ নলিনীর বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সূর্য্যালোকের পরিবর্ত্তে এই লালন-বাটিকায় ৩ শত ওয়াট-শক্তিবিশিষ্ট বিদ্যুতালোক সাহায্যে সূর্য্যোত্তাপের অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে। এই নলিনী স্বাভাবিক আলোক, বাতাস এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে স্বয়ংই ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সুষমা হারাইয়া ফেলে। এ জন্য ওহিওর পুষ্পতত্ত্ববিদ্ ভিক্টোরিয়া রিজিয়াকে তাহার মাতৃক্রোড় হইতে



বিদ্যুতালোকে নলিনীর পরিপুষ্টি

সরাইয়া আনিয়া তাহাকে সজীব ও সুস্থ রাখিবার জন্য আয়োজনের কোনও ত্রুটি করেন নাই। বিশেষ শক্তিশালী বিদ্যুতালোকের সাহায্যে রাত্রিকালেও এই সুন্দরী নলিনীর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি ও অঙ্গ-পরিপুষ্টি সমানভাবেই চলিতেছে।

পকেটে রখিবার ছাইদানী

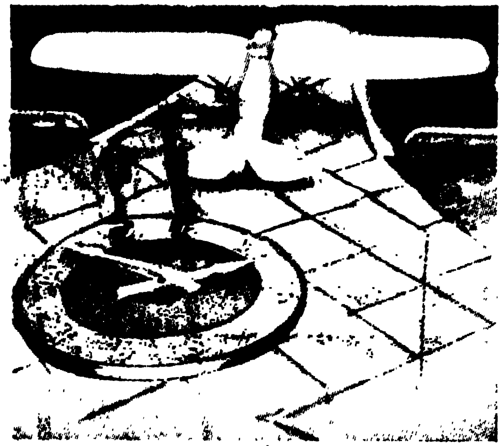


পকেট-ছাইদানী

বাজারে এক প্রকার ছাইদানী বাহির হইয়াছে। উহার বহির্ভাগ এমন-ভাবে নির্ম্মিত যে. অগ্নির উত্তাপে উহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে না। উহা পকেটে অনায়াসে রাখা যায়। শুধু ছাই নহে, জ্বলন্ত চুরুট, চুরুটিকা অথবা দীপশলাকা ঐ আধারে অনা-য়াসে রাখিয়া পকেটস্থ করিলে, দগ্ধ হইবার কোনও আশঙ্কাই থাকে না। দীপশলাকার বাক্স রাখিবার স্থানও উহাতে বিদ্যমান।

ভূ-লগ্ন বিরাট ঘটিকাযন্ত্র

লণ্ডনের কোনও বিমানবন্দরে, বিমানযাত্রীদিগের জন্ত একটি ঘটিকাযন্ত্র সংস্থাপিত আছে। উহা ভূ-সংলগ্ন, বিমান যে স্থানে



ভূ-লগ্ন ঘটিকাযন্ত্র

অবতীর্ণ হয়, তাহারই সন্নিকটে উহা সংস্থাপিত। ষোল ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ঘটিকার চক্র রাত্রিকালে আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হয়। ঘড়ীর অক্ষরগুলি বহু উচ্চস্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর আলোক-চিত্র

ইদানীং যে কোনও আলোকচিত্রের কাচ হইতে কাপড়ের উপর ছবি তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একপ্রকার আরক কাপড়ের উপর ঢালিয়া দিলে ছবি নির্ব্বিঘ্নে উঠে। রুমাল প্রভৃতি যে কোনও বস্ত্র-খণ্ডে এইভাবে ছবি তোলা হইতেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্য ইহাতে প্রয়োজন। কিন্তু এজন্ত অন্ধকার ঘর প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। এক হইতে ৪ মিনিটের মধ্যেই মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হয়। এইরূপ ছবি কোনও কালেই মলিন হয় না।



বস্ত্রখণ্ডে আলোকচিত্র মুদ্রণ

ধাবমান মোটরে বিমান হইতে অবতরণ

বিপৎকালে বিমান হইতে কোন মানুষ যাহাতে ধাবমান মোটর-গাড়ীর ছাদে নামিতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিমান যখন কয়েক ফুট উপর দিয়া চলিতেছিল, সেই সময় চলচ্চিত্রের অভিনেতাটি মোটর-গাড়ীর ছাদে নামিয়া পড়েন। এই ব্যাপারে তাঁহার কোনও আঘাত লাগে নাই।



ধাবমান মোটরে বিমান হইতে অবতরণ

স্প্রীং-পুত্তলীর কবিতা-রচনা

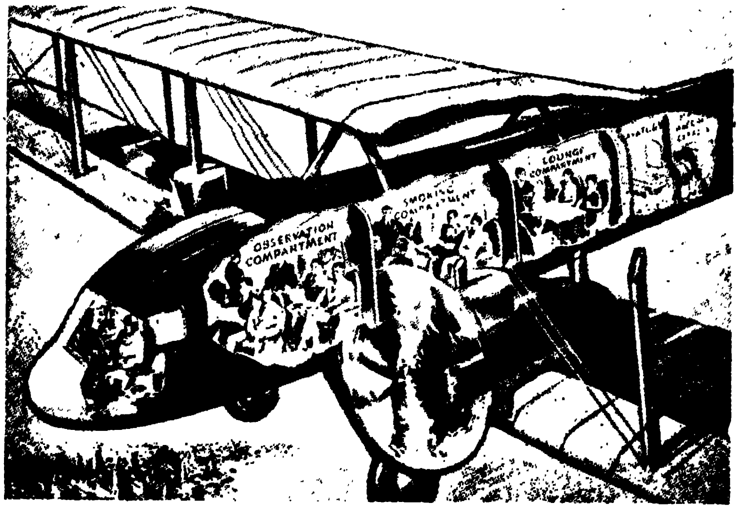
১ শত বৎসরের পুরাতন একটি ফরাসী পুত্তলীর স্প্রীং চাবি দিয়া ঘুরাইয়া দিলে, সেই পুত্তলিকা কবিতা রচনা করিতে পারে, ছবি আঁকিতে পারে। কার্য্য শেষ হইলে স্প্রীং-পুত্তলী শির নত করিয়া নতিও জানায়। কল-কৌশলের গুণে পুত্তলীর চক্ষুও কাগজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ইনষ্টিটিউটের সংগ্রহালয়ে এই অপূর্ব্ব পুত্তলের স্থাননির্দ্দেশ হইয়াছে। মিঃ জন ডবলু ব্রক উহা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনিই উহা উক্ত সংগ্রহালয়ে উপহার দিয়াছেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ব্রকএর পিতা উহা ক্রয় করিয়াছিলেন।



স্প্রীং-পুত্তলীর কবিতা-রচনা

দীর্ঘাকার বিমান

নিউইয়র্ক হইতে দক্ষিণদিকে যাত্রি-বহন কার্য্যে আমেরিকার যে বিমানগুলি নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রতিবারে আঠারো জন যাত্রী বহন করিয়া থাকে। ব্যোমপথের এই জাহাজগুলি



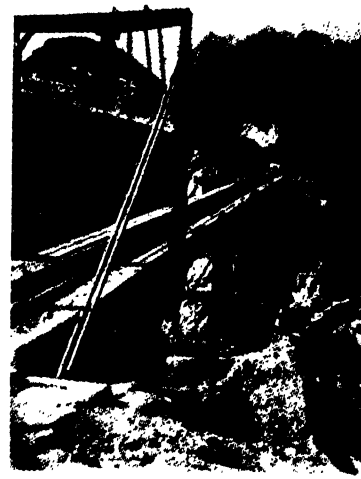
দীর্ঘাকার বিমান

৫৭ ফুট দীর্ঘ, কিন্তু ইহাদের পক্ষ ৯১ ফুট বিস্তৃত। মাটীর উপর যখন উহা দাঁড়ায়, তখন উহার উচ্চতা দ্বিতল গৃহের ন্যায়। দুই জন চালক এই পোত চালনা করে।

নকল মানুষ-রক্ষী

ভার্জ্জিনিয়ার কোনও কারখানা চৌকী দিবার জন্য রাত্রিকালে একটা নকল মানুষকে রক্ষী করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। ত্রিতলের একটি আলোকিত বাতায়নের পশ্চাতে নকল মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া প্রহরীর কার্য্য করে। এই মূর্ত্তি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাকে সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মিবে।

ভাঁজকরা সেতু



ভাঁজকরা সেতু

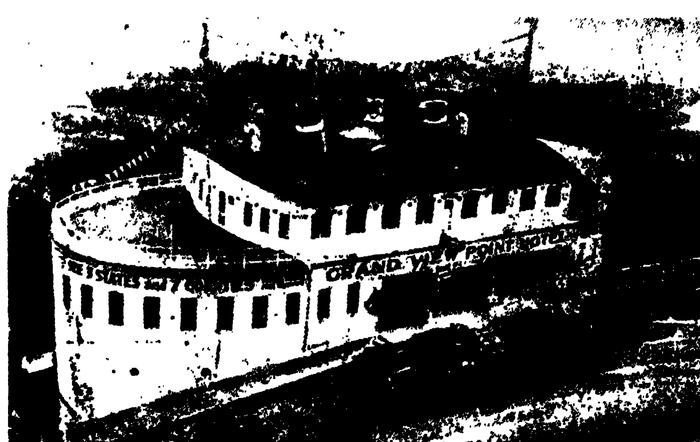
সুইজারল্যাণ্ডে ভাঁজকরা সেতু আছে। রেলপথবাহী একটি সেতু এমনভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাকে প্রয়োজনের সময় ভাঁজ করিয়া রাখা যায়। দারুণ শীতে বরফ পড়িয়া তাহার চাপে সেতু ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সময় উক্ত সেতুকে ভাঁজ করিয়া বরফের চাপ হইতে রক্ষা করা হইয়া থাকে।

ষ্টীমারের আকার-বিশিষ্ট পান্থনিবাস

পিটসবার্গের পূর্ব্বভাগে এলিঘেনি পর্ব্বতমালার এক স্থানে একটি পান্থনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। ২ হাজার ৪ শত



নকল মানুষ-রক্ষী



ষ্টীমারের আকার-বিশিষ্ট পান্থনিবাস

৬৪ ফুট উচ্চে উহা নির্ম্মিত। পান্থনিবাসের আকার বাষ্পীয়-পোতের ন্যায়। উহার ডেক হইতে ভ্রমণকারীরা ৭টি জেলা ও ৩টি রাজ্য দেখিতে পান। এখান হইতে দৃশ্যগুলি পরম উপ-ভোগ্য।

জন হাউয়ার্ড পেইনের জন্মগৃহ

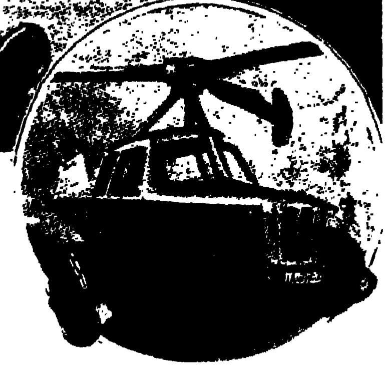
জন হাউয়ার্ড পেইন ইষ্ট-হ্যাম্পটনএ জন্ম-গ্রহণ করেন। বিপ্লব-সমরের পূর্ব্বে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে স্থানে বসিয়া কবি হোম্, "সুইটহোম্" নামক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই গৃহ এখনও সেই অবস্থায় বিদ্যমান। ঐ মন-মাতান গান সর্ব্বপ্রথম অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কভেণ্ট উদ্যানে গীত হইয়াছিল। উল্লিখিত গৃহ সংগ্রহালয় হিসাবে এখন রক্ষা করা হইয়াছে। প্রতীচ্যদেশে কবির প্রতি দেশ-বাসীর শ্রদ্ধা অতুলনীয়।



কবি জন হাউয়ার্ড পেইনের জন্মগৃহ

উভচর বিমান





উভচর বিমান

জার্ম্মাণীতে একপ্রকার নূতন ধরণের বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নবোদ্ভাবিত বিমান ত্রিচক্র মোটর-গাড়ীর ন্যায় ভূমির উপর অনায়াসেই ব্যবহৃত হইতে পারে। অতি অল্পপরিসর স্থানে অতি সহজেই এই বিমান অবতীর্ণ হয়। বিমান-স্বামী ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অবস্থাতেই উহাকে মোটর-গাড়ীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, ইহাতে কোনই অসুবিধা হয় না। মাটীর উপর দিয়া চলিবার সময় বিমানের বিস্তৃত পক্ষগুলি গুটাইয়া রাখা হয়। চারি জন স্বচ্ছন্দে লটবহর লইয়া এই উভচর-যানে থাকিতে পারে। উপরের চিত্র হইতে বিমানের উভয় প্রকার আকার বিশদভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যোমপথে উড্ডয়নকালে পাখাগুলি বিস্তৃত রহিয়াছে। আবার যখন ভূমিতলে নামিয়া মোটর-গাড়ীর ন্যায় চলিতেছে—পাখা গুটান, তাহাও বুঝা যাইবে।

ভাই-ফোঁটা

১

"মা, আজ ভাই-ফোঁটা, না মা ?"

"হাঁ মা।"

"মন্টুকে আজ আমি ফোঁটা দেব, না ?"

"হাঁ মা।"

"ফোঁটা দেব আর কি দেব মা তাকে ?"

"কাপড় দেবে, খাবার দেবে।"

"খুব ভাল কাপড়, খুব ভাল খাবার কিন্তু এনে দিতে হবে আমায়, আমি আজ মন্টুকে খাওয়াব, কাপড় দেব, বাঃ রে, কি মজা !"

কন্যার উচ্ছল আনন্দে কর্ম্মনিরতা জননীর সহাস্য মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

একদৃষ্টে জননীর মঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজনের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া উমা আবার প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মা, ভাইকে ফোঁটা দিলে কি হয় ?"

"ভাইয়ের তাতে মঙ্গল হয়, তার আয়ু বাড়ে।"

"তা হ'লে সে অনেক দিন বাঁচে ?"

"হাঁ মা।"

"আচ্ছা, তা হ'লে সে বাবার মত—না না, বাবার চেয়েও ঢের বেশী দিন বাঁচবে ?"

"হাঁ মা।"

"আচ্ছা।"

আনন্দে বালিকার সমস্ত দেহ-মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া ভাইয়ের নিকট চলিল। এ আনন্দ-সংবাদ তাহাকে না দিলে যে আনন্দ পূর্ণ হয় না। মা কন্যাকে ডাকিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তও তাহার আর বিলম্ব করা চলে না, পথেই দাঁড়াইয়া সে সাড়া দিল, "কেন মা ?"

"দেখিস্, কিছু খাস্‌নে যেন আবার, ফোঁটা না দিয়ে কিছু খেতে নেই কিন্তু, মা।"

"আচ্ছা।"

বালিকা আবার ছুটিল। কন্যার সে আনন্দ-চঞ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া জননীর অধরপ্রান্তে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মন্টু বাহিরের বারান্দার এক পাশে বসিয়া একান্ত মনোযোগ সহকারে তাহার খেলার মটর-গাড়ীটার কলকব্জা পরীক্ষা করিতেছিল। রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "জানিস্ রে, মন্টু !"

মটর-গাড়ীটা তখন তাহার মন-প্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাই সে বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, "ছাড় দিদি, বলছি, ভাল হবে না কিন্তু।"

উমা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার বলিল, "জানিস্ রে মন্টু, আজ ভাই-ফোঁটা।"

মনোযোগ, বিরক্তি মন্টুর নিমিষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। হাতের খেলার গাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়া বিস্ফারিত-লোচনে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, "আজ, সত্যি না কি ?"

"হাঁ রে !"

"চল্ ত মাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।"

"যা, জিজ্ঞেস ক'রে দেখ গে। এই ত আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে এলুম। আজ আমি তোকে ফোঁটা দেব, আরও কত কি দেব দেখিস্।"

"আর কি দিবি, দিদি ?" উৎসুক বিস্ফারিত-লোচনে সে প্রশ্ন করিল।

"এখন কিছু বলব না, যখন দেব, তখন দেখবি।"

"না দিদি, বল্ না, আর কি দিবি, বল্।"—আদরে মন্টু দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল।

"এই কাপড় দেব, খাবার দেব—কত ভাল ভাল দেখে, দেখিস্।"

"সত্যি ?" পুলকে মন্টুর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"হাঁ রে, এই না আমি মাকে জিজ্ঞেস ক'রে এলুম।"

"বাঃ রে, কি মজা" আনন্দে মন্টু হাততালি দিয়া উঠিল।

উমা তখন তাহার জ্যেষ্ঠত্বের পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্য লইয়া মন্টুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে মন্টু, বল ত, ভাইকে ফোঁটা দিলে কি হয় ?"

"কি হয়, দিদি ?"

"এও জানিস্ না, বোকা আর কি, তাতে ভাইএর আয়ু বাড়ে, এই তোকে আমি ফোঁটা দিলে তুই অনেক দিন বাঁচবি, বুঝলি ?"

মনুটু মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে। কিন্তু অনেক দিন বাঁচার প্রলোভন তাহার মন স্পর্শও করিল না; নূতন কাপড় ও ভাল খাবারের সংবাদই তাহার ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিল, সে দিদিকে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, আমায় খুব সুন্দর কাপড় দিদি ত, দিবি ?"

"হাঁ রে, দেখিস্ সে কি চমৎকার !"

"তোর সে জরীর কাপড়টার মত সুন্দর ?"

উমা দিদির কণ্ঠে উত্তর দিল, "ধ্যেৎ বোকা, সে ত সাড়ী, বেটাছেলে কি সাড়ী পরে রে ? তবে দেখিস, তোকে আমি খুব ভাল কাপড় দেব। আমার সে সাড়ীর চেয়েও ঢের—ঢের ভাল হবে তা।"

"আচ্ছা, খুব সুন্দর পাড় হওয়া চাই কিন্তু, নইলে আমি নেব না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।" তৃপ্তির গর্ব্বে বালিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"কখন্ দিবি, বল না, দিদি ?"

"এই আর খানিক পরেই। তুমি স্নান ক'রে এলে তার পর ফোঁটা দিয়ে দেব।"

"আচ্ছা বেশ, আমি এখনই যাচ্ছি, তুই এই মটর-গাড়ীটা একটু ধর ত, দিদি" বলিয়া দিদির হাতে গাড়ীটা দিয়া সে খেলার অন্যান্য সরঞ্জাম গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল। বিলম্ব আর তাহার সহিতেছিল না।

২

পনর বছর পরে আর এক এমনই স্নিগ্ধ হেমন্তের প্রভাতে ক্লান্তচরণে, বিষণ্ণ-বদনে মনুটু ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল, "না মা, এলো না।"

"সে কি রে ?"

"হাঁ মা, এগারটার গাড়ী পর্য্যন্ত দেখে এলুম, কিন্তু দিদি ত এল না, দিদি আজ আসবে না।" চক্ষু তাহার ছলছল্ করিয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জননীর দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া সে ক্লান্ত দেহ শয্যায় এলাইয়া দিল।

আজও ভাই-ফোঁটা। দিদি লিখিয়াছিল, আজ সে আসিবে, আসিয়া তাহাকে ফোঁটা দিবে। দিদির আসার আশায় আজ সে ভোর হইতে এগারটা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে বসিয়াছিল। কিন্তু ১১টার গাড়ীতেও যখন উমা আসিল না, তখন নিদারুণ দুঃখ ও বেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ১টার গাড়ী পর্য্যন্ত আর সে ব্যর্থ অপেক্ষায় থাকিতে পারিল না, বেদনাহত হৃদয়ে ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল।

আজ ভাই-ফোঁটা। পাড়ায় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হুলু-ধ্বনির মাঙ্গল্য-নিনাদে প্রতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। শুধু তাহাদের বাড়ীই আজ নিস্তব্ধ। তাহারও দিদি আছে, কত স্নেহময়ী ভগিনী তাহার। যে অবস্থায় যেখানেই থাক না কেন, প্রতি বৎসর এই দিনটিতে সে পিতৃগৃহে ছুটিয়া আইসে—তাহার স্নেহের ভাইটিকে ফোঁটা দিবার জন্য, দিদির স্নেহাশীর্ব্বাদে ভাইয়ের জীবনের পথের সমস্ত বিপদ ধুইয়া মুছিয়া তাহা শুভ্র ও পবিত্র করিয়া তুলিতে। কত না ঈপ্সিত—কত না পবিত্র এই দিনটি তাহার। আজ এক মাস সে ইহারই জন্য দিন গণিয়াছে। কিন্তু এত আশা, আনন্দ, উৎসাহ তাহার আজ এক মুহূর্ত্তে একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল,—দিদি আসিল না।

সে বিলাত যাইবে। কত দিন এই পবিত্র দিনের মাধুর্য্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবে। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মুখে তাহার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ লইয়া এই পবিত্র দিনে দিদি আসিয়া একবার কনিষ্ঠ ভাইটিকে তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া গেল না ? কষ্টে মনুটুর অশ্রুধারা ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল।

কত দিন সে কল্পনা করিয়াছে, দূর-প্রবাসে বসিয়া কেমন করিয়া এই মধুময় দিনটিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, দূর হইতে কেমন করিয়া মনে মনে এই দিন-টিতে সহোদরার অলক্ষ্য পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইবে, কেমন করিয়া মনে মনে এই দিনটিতে তাহার গভীর ভ্রাতৃপ্রেমের অর্ঘ্য সহস্র যোজন দূর হইতে ভগিনীর কম্পিত পদতলে অর্পণ করিয়া হৃদয় তৃপ্ত ও কৃতার্থ করিবে। কত দিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, আজ পাঁচ বৎসরের জন্য সে দিদির আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইবে, পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার চন্দন-তিলক কপালে পরিয়া লইবে, দিদি সমস্তই জানেন, তবু আসিলেন না, অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যের এই অতি আকাঙ্ক্ষিত দিনটির কথা, কি তৃপ্তি, কি মাধুর্য্য না তখন ইহার প্রতি অঙ্গে ছড়ান থাকিত! এই দিনটিতে তখন দিদির হৃদয়ে ছিল কি অপূর্ব্ব আগ্রহ, প্রবল উৎসাহ, তীব্র ব্যাকুলতা, সুগভীর স্নেহ-ভালবাসা! এত দিনের মধ্যে সে ভালবাসার একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই, এই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া সে জাগ্রত আগ্রহ এক বিন্দু ম্লান হয় নাই, অথচ আজ এ কি! আজ পাঁচ বৎসরের জন্য সে বিদেশে যাইতেছে, ইহা জানিয়াও দিদি তাহার আসিলেন না। অভিমানে হৃদয় তাহার বার বার ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, পাশের বাড়ীতে তখন পূর্ণ উদ্যমে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

অভিমান আর বেদনার দ্বন্দ্বে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। এ অসময়ে পুত্রকে এমন ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "এ অসময়ে শুয়ে কেন, বাবা! যাও, স্নান ক'রে এসো গে।"

মন্টু এ কথার কোনও উত্তর দিল না, শুধু ম্লান-মুখে চাহিয়া বলিল, "মা, দিদি এলো না, আজ ভাই-ফোঁটা—"

কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল। পুত্রের ম্লান মুখ দেখিয়া জননীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, কি তীব্র ব্যথা, কত কঠোর আশাভঙ্গ আজ পুত্রের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিয়াছে। অথচ উপায় নাই। পুত্রের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতাও আজ তাঁহার নাই। আজ ভাই-ফোঁটা, কন্যা আজ আসিবে নিজেই লিখিয়াছিল, কিন্তু আসে নাই, কেন কে জানে। ভাইএর প্রতি তাহার কি গভীর স্নেহ, তাহা ত তাঁহার অজানা নাই। বাল্যে কন্যার হৃদয়ের যে ভ্রাতৃস্নেহের মুকুল, তাহার স্নিগ্ধ সৌরভে এক দিন তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছিল, সে মুকুল ত ধীরে ধীরে বিকসিত হইয়া তাহার নন্দন-পরিমলে তাঁহার হৃদয় স্বর্গের সুষমায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ত জানেন, এক দিনের জন্য কন্যার সে সুগভীর স্নেহ এক বিন্দু ম্লান হয় নাই, কন্যার সে স্নিগ্ধ ভালবাসা লেশমাত্র শিথিল হয় নাই, তবে আজ এ কি! কন্যা আসিল না, একটা সংবাদ পর্য্যন্ত প্রেরণ করিল না। থাকিয়া থাকিয়া এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার মাতৃ-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই ত! মন হইতে শত চেষ্টায়ও সে আশঙ্কা তিনি সরাইতে পারেন নাই। তিনি জননী, তাই পুত্রের ব্যথাতুর মুখের পানে চাহিয়া সে শঙ্কাও তাঁহার চাপিয়া রাখিতে হইল। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে বসিলেন; নানা কথায় তাহার চিত্তের ভার লাঘব করিতে প্রয়াস পাইলেন।

* * * *

মাতা-পুত্রে কথোপকথন চলিতেছিল, এমন সময় "মা" ডাক দিয়া ত্রস্তপদে আসিয়া উমা গৃহে প্রবেশ করিল। যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে মাতা-পুত্রের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল।

"এত দেরী দেখে আমরা মনে ভেবেছিলুম, তোর বুঝি আর আসা হলো না।"

"তাই প্রায় হয়ে উঠেছিল, মা। কাল দুপুরে খোকার জ্বর এলো।"

"খোকার জ্বর, কেমন আছে সে?"

"আছে ভাল, কাল দুপুরে হঠাৎ জ্বর এলো, ভাবলুম, আর বুঝি আমার আসা হ'ল না। কিন্তু আজ সকালে জ্বর সেরে গেল, তাই দেখে ঠাকুরপোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম, আজ বিকেলেই আমায় আবার ফিরে যেতে হবে।"

"খোকার অসুখ, তাকে একলা ফেলে আস্‌লি, না আস্‌লেই পারতিস্‌।"

"না মা, ভাবনার কিছু নেই, নইলে কি আর আস্‌তে পারতুম?"

"তবু, খোকার অসুখ সারলে দু'দিন পরেই না হয় আস্‌তিস, মা।"

"মন মানলো না যে, মা। আজ ভাই-ফোঁটা, মন্টু বিদেশে যাচ্ছে, কত দিন ত আর তাকে ফোঁটা দেওয়া হবে না, তাই আজ এলুম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে মন্টুর হৃদয়ের সমস্ত মান, অভিমান, গ্লানি, বেদনা অন্তর্হিত হইয়া এক গভীর পুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ভক্তিতে তাহার মাথা জ্যেষ্ঠার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। তাহার বোন্‌, সে কি আজ না আসিয়া পারে! তাই এত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও শুধু মাত্র তাহাকে ফোঁটা পরাইবার জন্যই আজ সে ছুটিয়া আসিয়াছে। সহোদরার স্নেহের গর্ব্বে তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিল, বাল্য-কৈশোরের সে স্নেহময়ী বোন্‌ তাহার আজও তেমনই স্নেহময়ীই আছে!

৩

ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মন্টু এখন আর সে মন্টু নাই, এখন সে মিষ্টার রায় হইয়াছে। গোটা দুই বিলাতী ডিগ্রী আর সঙ্গে ব্যারিষ্টারী খেতাব লইয়া আজ মাস দশেক হইল, সে দেশে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারী সুরু করিয়াছে। এক প্রবীণ ব্যারিষ্টারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দিব্য সাহেবী ফ্যাসানে বাড়ী সাজাইয়া সহরের কোলাহল হইতে দূরে বালীগঞ্জের এক নিভৃত কোণে সে বাস করিতেছে। আজন্মের শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রী লীলা সাহেবী ফ্যাসানের পক্ষপাতী। তাই স্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি আর অবিচ্ছিন্ন সাবধানবাণীর ছায়াতলে বসিয়া পাঁচ বৎসরের ইংলণ্ডের জীবনে সে যতটুকু সাহেব বনিতে পারে নাই, আজ মাস পাঁচেকের মধ্যেই ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, আজ তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পিতা-মাতা আজ বাঁচিয়া নাই, তাই বাধা দিবার কিম্বা অনুযোগ করিবার তাহার আর কেহ নাই। পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সে, তাই অর্থের অস্বাচ্ছল্য তাহার নাই, আর স্ত্রীর সতর্ক গৃহিণীপণায় ফ্যাসানেরও ত্রুটি নাই। জীবন তাহার নবীনতার অপূর্ব্ব মাদকতার পূর্ণ আবেশে আর অনাগত ভবিষ্যতের সম্মোহন মাধুর্য্যে স্বপ্নের মত স্বচ্ছগতিতে কাটিয়া যাইতেছিল।

রাত্রিতে খাওয়ার টেবলে বসিয়া স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। লীলা বলিল, "হাঁ, ভাল কথা, দিদি আজ এসেছিলেন।"

"কখন্?"

"এই সন্ধ্যাবেলা, তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন।"

"কেন, কি বল্লেন তিনি?'

"কাল তাঁরা মোটরলঞ্চে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বেড়াতে যাবেন। আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে গেলেন। শুনেছি, এ ভ্রমণটা না কি খুব মধুর হবে। যাক্, বেশ সুযোগ পাওয়া গেল। কাল ভোরেই কিন্তু তিনি মোটর পাঠিয়ে দেবেন।"

"তা বেশ, যেও।"

"তা যেতে হবে বৈ কি; কিন্তু তুমি দেখি একেবারে উদাসীন। এমন খবরটা দিলুম, কোথায় ধন্যবাদ দেবে, তা নয়, একটা শুষ্ক জবাব 'যেও'।"

"উদাসীন! না না, তা আমি মোটেই নই। এমন একটা আমোদের সুযোগ, তা'তে উদাসীন হব আমি!"

লীলা হাসিয়া জবাব দিল, "আচ্ছা, মেনে নিলুম তোমার কথা। কাল সকাল সকাল প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমাদের জন্য যেন সবাইকে অপেক্ষা করতে না হয়।"

"এই ত মুস্কিল করলে, কাল যে আমার যাওয়া হয় না। নেমন্তন্ন করেছেন, তুমি যেও, তা হ'লেই চলবে।"

"সে অসম্ভব, তা হয় না। দিদি থাকবেন, মিষ্টার বোস্ থাকবেন, আর আমি বুঝি যাব একলা, তা হ'লে আমোদটাই সব মাটী, সে হতেই পারে না, তোমায় যেতেই হবে। আর কাল তোমার যাওয়া হবে না কেন? কাল ত কোর্ট নেই।"

"না, কোর্ট নেই বটে,তবে একটু দরকার আছে, একটু বিশেষ কায আছে। কালকের দিনটা আমায় ক্ষমা কর।"

"কিসের এমন বিশেষ কায যে, কালকে তোমার যাওয়া হ'তে পারে না? সে কায কালকের জন্য বন্ধ রাখ! কালকে এ ভ্রমণে যেতেই হবে। আচ্ছা, তোমার বিশেষ কাযটা কি, শুনি?"

"কাল দিদির ওখানে একবার যেতে হবে, দিদি ব'লে পাঠিয়েছেন।"

"আচ্ছা, সে আর এক দিন যেও, সেজন্য এমন আমোদ নষ্ট করা চলে না।"

"তা হয় না, কালই যাওয়া আমার দরকার, আর আমি যাব ব'লে কথাও দিয়েছি তাঁকে।"

"কথা দিয়েছ বলেই যে কথা ঘুরান চলে না, তার কোনও মানে নেই। তুমি আমাদের এ নেমন্তন্নটা জানতে না, তাই কথা দিয়েছ। যাক, সেখানে কাল না গিয়ে অন্য দিন গেলেই চলবে। প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের অনেক কাযকর্ম্মের ধারা বদলে ফেলতে হয়।"

"তা হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বদল করা চলে না।"

"কেন, কথাটা খুলেই বল না, শুনি।"

মিষ্টার রায় একটু ইতস্ততঃ করিল, একবার চামচটা দিয়া প্লেটের উপর অনাবশ্যক একটু টুং-টাং শব্দ করিল, তার পর একবার দরজার দিকে চাহিয়া যেন একটু অনন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল, "কাল ভাই-ফোঁটা, তাই দিদি নেমন্তন্ন করেছেন।"



মানের পালা

[শিল্পী—৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ ।

"ও, তাই" লীলা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল, "কাল ভাই-ফোঁটা, তাই বুঝি ফোঁটা পরতে যাবে? বোনের একটা ফোঁটা প'রে যদি অবাধ স্বর্গভোগের একটা সনদ পাওয়া যায়, তবে সে সুযোগটা ছাড়ে কে! কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, আজ পর্য্যন্ত তোমার ওসব কুসংস্কার গেল না।" কথাটা বলিয়া মিসেস রায় স্বামীর প্রতি এক গর্ব্বিত শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মিষ্টার রায়ের মুখ কালো হইয়া গেল। বহু দিন স্ত্রীর নিকট আবাল্য-বর্দ্ধিত বহু সংস্কারের জন্য সে উপহাস-বাক্য শুনিয়াছে, বহু দিন সে হয় ত হাসিয়াই তাহা উড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু আজ তাহা সে পারিল না। আজিকার এই উপহাস তাহার মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। পরিবর্ত্তন তাহার যাহাই হইয়া থাকুক, দিদির জন্য অন্তরে তাহার এক প্রবল আকর্ষণ আজও প্রচ্ছন্ন ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনে পড়িয়া আজ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব অনেকের নিকট হইতে সে আজ দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অতীতের একটা অংশ আজ তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে হইয়াছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠা সহোদরার একান্ত স্নেহ, সুগভীর ভালবাসা আজও সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তাই লীলা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের সহিত সম্পর্ক রাখার ঘোর বিরোধী বলিয়াও লীলার অজ্ঞাতসারেই ভগিনীর সহিত এক ক্ষীণ সম্পর্কের রেখা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাই আংশিক সংস্কার আর আংশিক সহোদরার প্রতি ভালবাসার সম্মান রক্ষার জন্যই স্বচ্ছন্দ-চিত্তে দিদির সে আমন্ত্রণ সে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারই জন্য যে স্ত্রীর নিকট ধরা পড়িয়া যাইবে, আর স্ত্রীর মার্জ্জিত রুচির নিকট সে এতটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবে, তাহা সে কল্পনাই করিতে পারে নাই। কিন্তু লীলার আজিকার এই উপহাস তাহার হৃদয়ের এক প্রচ্ছন্ন তারে গিয়া আঘাত করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষ করিয়া অতীতের বহু দিনের বহু মধুর স্মৃতি তাহার স্মৃতির দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল। স্ত্রীর প্রতি এক কঠোর বিরক্তিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল, একটু তিক্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিল, "সব নিয়েই হাসি-ঠাট্টা ঠিক নয়, এ তোমার বড্ড বিশ্রী স্বভাব।"

স্বামীর একটা উৎকট ত্রুটি সম্বন্ধে তাহাকে একটু সচেতন করিতে গিয়া প্রতিদানে এ কঠোর তিরস্কার লাভ করিয়া লীলার অভিমান-পূর্ণ চিত্ত রোষে গর্জ্জাইয়া উঠিল! সে একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জবাব দিল, "আমার সবই বিশ্রী। যাক্।" তার পর প্লেটটা নিজের দিকে আর একটু টানিয়া লইয়া অতি মনোযোগের সহিত খাবারগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, লীলার দিক্ হইতে আর কোনও সাড়া-শব্দই আসিল না, শুধু শোনা যাইতে লাগিল তাহার কাঁটা-চামচের ক্রুদ্ধ টুং-টাং শব্দ। মিষ্টার রায় আড়চোখে ৩।৪ বার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সেই ক্রুদ্ধ মুখ হইতে দ্বিতীয় কথার যখন কোনও সম্ভাবনাই আর রহিল না, তখন নিজের হৃদয়ের গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া মিষ্টার রায়ই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আরম্ভ করিল, "একটুতেই যদি অমন চ'টে যাও, তা হ'লে চলে কি ক'রে?"

"না চলে, তার আমি কি করব?" ক্রুদ্ধ উদাস কণ্ঠে লীলা জবাব দিল।

মিষ্টার রায় খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিল, মনে মনে হয় ত ছিন্নসূত্র যোজনা করিবার উপায়টা একবার আওড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল, "এ রাগের কথা নয়। ওঁরা ব'লে গিয়েছেন, না গেলে ভাল দেখায় না, অথচ আমার যাওয়ার উপায় নেই, তাই আমি বলি, তুমি একলাই যাও।"

কিন্তু লীলার দিক্ হইতে ইহার কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া মিষ্টার রায় আবার বলিল, "কি, চুপ ক'রে রইলে যে, তোমার ইচ্ছেটা না হয় খুলেই বল।"

"না, থাক, আমি যাব না, কাল গাড়ী এলে আমি তা ফিরিয়ে দেব।"

"সে হয় না লীলা। যেতেই হবে।"

"আমি একলা যাব না। এ একটা আমোদ বৈ ত নয়। না হয়, না-ই গেলুম। যাওয়ার প্রয়োজনটা তোমার দিক্ থেকে হয় ত নেহাৎ সামান্য, কিন্তু আমার কাছে তার একটা গুরুত্ব আছে। দিদি আর মিষ্টার বোস্ এতে কি ভাববেন, তাই শুধু আমি ভাবছি। তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও আমরা যদি না যাই, তবে তাঁদের কতটা ক্ষুণ্ণ করা হয়, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি?"

গায় পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে গিয়াও লীলার দিক্ হইতে তিক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া মিষ্টার রায়ের মন আবার বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। লীলার শেষ কথাটা তাহার হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিল। সে একটু শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠেই এবার জবাব দিল, "তোমার দিদির নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে না গেলে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়, আর আমার দিদির বেলা বুঝি তা হয় না, কেমন, না ?"

"তোমার দিদি আর আমার দিদি !—মানুষের একটা সামাজিক পদমর্য্যাদা ত আছে।" বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া স্বামীর প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভোজন তাহার সবেমাত্র শেষ হইয়াছিল।

অতর্কিত প্রবল আঘাতে মানুষ যেমন হতভম্ব হইয়া যায়, লীলার এ ক্রূর আঘাতে মিষ্টার রায়ের অবস্থা তাহাই হইল। সে শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে লীলার সরোষ পদক্ষেপের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তীব্র অপমানে হৃদয় তাহার তখন কালিমাময় হইয়া গিয়াছে।

* * * *

আজ ভাইফোঁটা। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া অবধি তাহারই নিপুণ আয়োজনে উমা আজ বিব্রত রহিয়াছে। কবে কোন্ জিনিষ খাইতে মনুটুর ভাল লাগিয়াছিল, কবে কি খাইয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সে বলিয়াছিল, 'চমৎকার করেছ দিদি এটা', তাহারই হিসাব নিকাশ করিয়া তাহারই ব্যবস্থায় সে আজ মগ্ন হইয়া আছে। আজ তাহার অবসর নাই, অবকাশ নাই! ছয় বৎসর পরে আবার আজ সে ভাইকে ফোঁটা দিবে! প্রবাসী ভাইটিকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর এই দিনটিতে সে তাহার হৃদয়ের একান্ত আশীর্ব্বাদ সেই দূর-বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত তাহার হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে নাই, কিসের অভাব যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে অতৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সেই ভাই দেশে ফিরিয়াছে। আজ তাহার ভাই কত বড়, কত তাহার সম্মান, কত তাহার পরিবর্ত্তন!—কিন্তু তাহার কাছে ত সে চিরদিনের সেই স্নেহের ছোট ভাইটি! সকলের কাছে আজ সে মিষ্টার রায়, কিন্তু তাহার কাছে সে সেই ছোট বেলাকার মনটু!—তৃপ্তির গর্ব্বে উমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের সেই মধুর স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল—বাল্যে একবার ফোঁটা পরিয়া মনটু মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "মা রোজ রোজ ভাইফোঁটা হয় না কেন মা, তা হ'লে বেশ হয়!" কথাটা আজ মনে পড়িয়া উমার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। বিবাহের কথা তাহার যে দিন স্থির হইয়া গেল, তাহার দিন চারেক পরেই ছিল ভাইফোঁটা, সেবার ফোঁটা পরিতে বসিয়া মনটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "দিদি, এবার ফোঁটাটা ভাল ক'রে দিয়ে নিও, এর পর কি আর ভাইএর জন্য এ টান থাকবে?" কথাটা শুনিয়া উমা স্মিত হাসি হাসিয়াছিল, সে দিন কোনও জবাব দেয় নাই, নিদারুণ লজ্জা আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আজ হইলে সে ইহার জবাব দিত, আজ প্রথম যৌবনের সে স্মিত লজ্জা তাহার নাই। এই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া এমনই খুঁটিনাটি অনেক কথাই আজ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল!

কাযের অবকাশে এক একবার সে দরজায় যাইয়া দেখিয়া আসিতেছিল—মনটু আসিতেছে কি না। এক একবার উদ্গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল—এখনও আসিতেছে না কেন?

স্নেহাতুরা কর্ম্মনিরতা স্ত্রীর পানে চাহিয়া স্বামী রমেন একবার একটু উপহাস করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। দুষ্টহাসি হাসিয়া বলিল, "আজ যে আর কারুর দিকেই চাইবার অবকাশ হচ্ছে না। আচ্ছা বেশ, বোঝা যাবে এর পর।"

স্মিতহাসি উমার মুখে খেলিয়া গেল। হাতের পিঠ দিয়া কপালের বিস্রস্ত চুলের রাশি সরাইয়া স্বামীর মুখের পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া উমা জবাব দিল, "আজকের দিনটা যে আর কারু নয়, আজ কারুর অভিযোগ অচল।"

"বেশ, বোঝা যাবে।" তার পর খানিকক্ষণ স্ত্রীর পানে তাকাইয়া থাকিয়া রমেন প্রশ্ন করিল, "তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এত যে আয়োজন, সাহেব ভাইটি আসবে ত?"

"আসবে না? আজ যে ভাইফোঁটা।"

ভাই আসিবে, ফোঁটা পরিবে, আয়োজনের ত্রুটি ধরিয়া

আগেকার মতই দিদিকে অনুযোগ দিবে, এ যে সত্যের মত ধ্রুব, ইহাতে সংশয় করিবার, দ্বিধা করিবার তাহার কিছুই নাই।

বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, মন্টুর দেখা নাই। উমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এত দেরী করিবার ত কথা ছিল না, সে বলিয়া পাঠাইয়াছিল. ১০টায় আসিবে। হাতের কায তাহার আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। বারবার উঠিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াও যখন এ বিলম্বের মীমাংসা করিতে পারিল না, তখন স্বামীর নিকট গিয়া বলিল, "কৈ, বেলা ১২টা বেজে গেল, এখনও যে মন্টু এল না!"

স্ত্রীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া এবার আর স্বামীর মুখে উপহাস জোগাইল না, স্নিগ্ধ-কণ্ঠে সে জবাব দিল, "ভাবছো কেন উমা, সে আসবে। হয় ত কোনও কাযে আটকে পড়েছে, তাই দেরী হচ্ছে। কথা যখন দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই আসবে, ভেবো না তুমি।"

উমার মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। সে আবার গিয়া আরব্ধ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

বেলা ১টা বাজিয়া গেল। মন্টুর দেখা নাই। অজানিত আশঙ্কায় উমার বুক এবার কাঁপিয়া উঠিল, এখনও আসিল না কেন, তবে কি কোনও বিপদ-আপদ—মনের ভিতর চিন্তাটা সে শেষ হইতে দিতে পারিল না, জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তবু যেন কিসেরই সংশয় বারবার মন তাহার পীড়িত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার ভাই,—শত বাধা, শত বিঘ্নও ত আজ তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। এ দিনটি যে তাহার নিকট কতবড় প্রলোভনময়, সে কথা ত উমার জানা আছে। গত বৎসর এই ভাইফোঁটা দিনটিকেই উপলক্ষ করিয়া সে বিলাত হইতে দিদিকে লিখিয়াছিল, "দিদি, কত দিন তোমার ফোঁটা পরিনি। তোমার সে দিনের সে আশীর্ব্বাদটির জন্য হৃদয় আমার উন্মুখ হয়ে আছে। আসছে বছর তোমার ফোঁটা আবার পরব, তোমার আশীর্ব্বাদ আবার নেবো,—এ চিন্তাও আমার হৃদয় কি তৃপ্তিতে ভ'রে দেয়, তা যদি জানতে, দিদি।" চিঠির সেই কথাগুলি আজ এত দিন পরে যেন সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার কাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সেই মন্টু, স্নেহের একমাত্র ভাইটি তাহার,—সে কি আজ না আসিয়া পারে! তবু এখনও আসিল না—স্বামীর কথাগুলি সে মনে মনে আওড়াইতে লাগিল, "কথা যখন দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।"

বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না, বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার দেহমন অবশ হইয়া আসিল। চিন্তা করিবার, বিচার করিবার, মীমাংসা করিবার শক্তি তখন আর তাহার রহিল না। ভৃত্যকে একখানা ট্যাক্সি ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। দুর্ভাবনায় বুক তাহার তখন শুকাইয়া গিয়াছে।

* * * *

মিষ্টার রায়ের ফটকের কাছে গাড়ী যখন থামিল, তখন সে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছিল না। শঙ্কিত বেদনায় বুক তাহার উথলিয়া উঠিতেছিল। কম্পিতহস্তে গেটটা খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

ত্রস্তপদে যখন সে বারান্দায় পৌঁছিল, তখন সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বারান্দায় উঠিলে নূতন বেয়ারারা জানাইল, "মেমসাহেব বাড়ী নেই।"

"সাহেব?"

"সাহেবও নেই।"

"সাহেব গিয়েছে কোথায়?"

"মেমসাহেবকে নিয়ে গঙ্গায় বেড়াতে সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরবেন।"

উমা আর দাঁড়াইতে পারিল না। সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দুলিয়া উঠিল। সে দেওয়ালের উপর দেহভার এলাইয়া দিল। আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্য তাহার শিথিল হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

* * * *

গঙ্গাবক্ষে লঞ্চের মধ্যে ডিনার টেবলে তখন হাসির রোল উঠিয়াছে। মিষ্টার বোসের হাসির গল্পে উচ্ছ্বসিত হইয়া লীলা তখন বলিয়া উঠিল, "Oh how pleasant it is! এ charming দিনটার কথা চিরকাল মনে থাকবে।" এ হাসির মজলিশেও মিষ্টার রায় সহসা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উন্মনাদৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।



ভক্তি

২

পূর্ব্বপ্রবন্ধে ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছি, এইবার চিত্তের দ্রবীভাব প্রভৃতির আলোচনা করিয়া উহার রসস্বরূপতা প্রভৃতির আলোচনা করিব।

লাক্ষা যেমন অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, নিজের স্বাভাবিক কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া গলিয়া যায়, চিত্তও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদি বিষয়াগ্নির তাপে গলিয়া যায়, ঐ দ্রবীভূত চিত্তে যে আকার নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকে সংস্কার, বাসনা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, যে সকল বিষয়ের সংযোগে মন দ্রবীভূত হয় না, পরন্তু সৌরকিরণতপ্ত গালার ন্যায় শিথিল মাত্র হয়, সেই সকল বিষয়-সংযোগে মনে বাসনারূপে কোন বস্তুও প্রবিষ্ট হয় না। মনের দ্রবত্বাবস্থায় যে বস্তু তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, পুনরায় চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও উহাকে পরিত্যাগ করে না। গালাকে গলাইয়া উহাতে হিঙ্গুলাদি রং যাহা প্রবিষ্ট করান যায়, পরে কাঠিন্যপ্রাপ্ত সেই গালাকে গলাইলেও সে হিঙ্গুলাদির রং পরিত্যাগ করে না। পরন্তু সৌরালোকে শিথিলীভূত লাক্ষায় প্রবিষ্ট রং কিন্তু সেরূপ হয় না। এইরূপ দ্রবীভূত চিত্তে যে বস্তুর স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া চিত্ত কঠিন হয়, পরে ঐ চিত্ত পুনরায় বিষয়ান্তর-সংযোগে দ্রবীভূত হইলে বিষয়ান্তরকে গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করে না। উহাকে বাসনা বলে। শৈথিল্যাবস্থায় প্রবিষ্ট বস্তু কাঠিন্যাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে, এবং বিষয়ান্তরগ্রহণসময়ে ত্যাগ করেও না, উহাকে বাসনাভাস বলে।

অতএব একবারমাত্র যাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে উহাতে ভগবানের আকার প্রবিষ্ট হয় এবং সর্ব্বদা উহার ভাস হয়, সেই মানব ধন্য এবং কৃতকৃত্য হয়। এই কথা ভাগবতেও কথিত হইয়াছে, "যে মানব সর্ব্বভূতে ভগবান্ এবং ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম।" ১১।২।৪৫।

গালার সহিত কোন রং মিশ্রিত করিলে ঐ গালা দ্বারা যাহাই করা যাউক না কেন, সেই রং সর্ব্বদাই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ এইটি মানব, এইটি পশু, এইটি পক্ষী এইভাবে সর্ব্বজীবের অগ্রহণসময়ে দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট ভাগবদাকারের প্রকাশ হয় বলিয়া সর্ব্বভূতে ভগবানের ভান হইতে কোন বাধা ঘটে না, সেই ব্যক্তি ভাগবতোত্তম। এতাদৃশ সংস্কারও বিনাশশীল, এই জন্যই ভাগবতোত্তমই ব্রহ্মবিৎ, এ কথা বলা চলে না, ব্রহ্মবিদের চিত্তদ্রবাবস্থার অপেক্ষা নাই, এই কারণেই উত্তম, মধ্যম, প্রাকৃত ভক্তমধ্যে তাহার গণনাও নাই। এই দ্রবাবস্থার পরিপুষ্টি হইলে সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনাদি অবস্থায় ভাগবতোত্তম, ঈষদ্দ্রবাবস্থায় বাসনাভাস নিবন্ধন মধ্যম, "ঈশ্বর-ভক্ত মূর্খ ও শত্রুতে যিনি ক্রমান্বয়ে প্রেম, মৈত্রী, করুণা ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম, ১১।২।৪৬।" এই কথা ভাগবতে বলিয়াছেন। যাহার চিত্ত দ্রবীভূত হয় নাই বা ঈষদ্দ্রবীভূতও হয় নাই—পরন্তু নিজেই তাহার জন্য ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রদ্ধা-সহকারে করে, সে প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়। যে মাত্র হরির মূর্ত্তিতেই শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করে, পরন্তু হরিভক্ত বা অন্য কাহাকেও পূজা করে না, সে প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়, ১১।২।৪। প্রকৃতি শব্দে আরম্ভ, সেই অবস্থায় বর্ত্তমানকে প্রাকৃত বলে অর্থাৎ সম্প্রতি যে ভক্তির সাধনানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই চিত্তের দ্রবাবস্থাকে প্রণয়, অনুরাগ, স্নেহ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

যেমন 'প্রণয়রশনাধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ' চিত্তের দ্রবাবস্থাই প্রণয় এবং উহাই রজ্জুর ন্যায় ভগবান্‌কে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ, কেন না, সেই দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট ভগবদাকারের লাক্ষাপ্রবিষ্ট রংএর ন্যায় নির্গমসম্ভাবনা নাই, কর্দ্দমমগ্ন করীর ন্যায় ভক্তচিত্ত-কর্দ্দমে নিমগ্ন গজেন্দ্রমোক্ষণকারী হরিও বাঁধা পড়িয়া থাকেন, এ কথা দেবর্ষি নারদ ব্যাসকে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তকথনকালে কিরূপে তিনি ভগবত্তত্ত্ব লাভ করেন, উহার বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। আমরা এ স্থানে সেই শ্লোক দুইটি দেখাইতেছি—

"ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ।
প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে।" ১।৬।১৭।১৮

ভাবাবিষ্ট চিত্তে ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে উৎকণ্ঠায় অশ্রুতে নয়ন পরিপূর্ণ হইল এবং ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে হরি আবির্ভূত হইলেন; অত্যন্ত প্রেমভরে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইল, আমি পরমনির্বৃতি লাভ করিলাম, হে মুনিবর! আমি আনন্দসাগরে মগ্ন হইলাম, তার পর ভগবান্ বা আমি এতদুভয়ের কাহাকেও দেখিলাম না।

এই শ্লোকদ্বয়ে সাধনাভ্যাসপরিপাকে উত্তম ভূমিকালাভ সূচিত হইয়াছে, চিত্তের দ্রবাবস্থায় প্রবিষ্ট বিষয় যদি বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়, তবে উহাকে স্থায়ী শব্দ প্রয়োগও মুখ্যই হয়, পারিভাষিক নহে, অতএব দ্রবীভূতচিত্তে যে অবিনশ্বর বস্ত্বাকার

প্রতিভাত হয়, উহাকে স্থায়িভাব বলা হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তাবস্থায় পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ নিজে পরমানন্দস্বরূপ, তিনি মনোগত হইয়া পরমানন্দরূপ রসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

বিম্ব কোন উপাধিতে প্রতীয়মান হইলে প্রতিবিম্ব বলে, পরমানন্দ ভগবান্ মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্বলাভ-পূর্ব্বক রসত্ব সম্পাদন করেন, ভক্তিরস যে পরমানন্দস্বরূপ, তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই এবং আলম্বনবিভাব ও স্থায়িভাব দুই পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া উভয়ের ঐক্য হইল, এরূপ আশঙ্কা করা যায় না, বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদ ব্যবহারসিদ্ধ, যেমন ঈশ্বর ও জীবে ভেদ।

এই সিদ্ধান্ত করিলে আলম্বন ও স্থায়িভাব পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া ভক্তিরসের পরমানন্দস্বরূপতা মানিয়া লইলেও কান্তাদি-বিষয়ক শৃঙ্গারাদি রসের কিরূপে পরমানন্দরূপতা হইতে পারে?

উত্তরে বলা যায় যে, তাহাতেও সেই পরমানন্দই আছে। আনন্দ যখন জগতের উপাদান, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রেও ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপাদানকারণ হইতে কার্য্য সকল অভিন্ন—যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট অভিন্ন।

অতএব কান্তাদি-বিষয়ক শৃঙ্গারাদি রসের আনন্দরূপতায় আপত্তি হইতে পারে না। পরন্তু ঐ আনন্দ অখণ্ড অদ্বিতীয়রূপে ভান হয় না, ইহা সকলেই জানেন ও অনুভব করেন। উহার কারণ মায়া জন্য আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ, বিক্ষেপ, মায়া এই কথা কয়েকটির অর্থ দেওয়া যাইতেছে। মায়া শব্দে অজ্ঞান, বিক্ষেপ শব্দে অকার্য্যের কার্য্যরূপে ভান, বস্তুর স্বরূপে অভান আবরণ। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সে স্থলে রজ্জুর অজ্ঞান হইতে আবরণ ও বিক্ষেপ জন্মিয়া আবরণশক্তি রজ্জুর স্বরূপ জানিতে দেয় না, আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, বিক্ষেপশক্তি নূতন সর্প সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সেই পর্য্যন্ত থাকিবে, যতকাল না রজ্জুর জ্ঞান হয়। ভাগবতেও বলিয়াছেন, বিষয় ব্যতীত যাহা প্রতীত হয়, উহাই মায়া বলিয়া জানিবে। মায়া অজ্ঞান একই কথা, এই মায়া সৎ কি অসৎ, ইহা নির্ব্বাচন করা চলে না এবং প্রকাশময় জ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। সুতরাং মায়া অনির্ব্বাচ্য। লৌকিক বিষয়ানুভূতিতেও আনন্দ পাই, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তিরসাস্বাদনে আনন্দের প্রাচুর্য্যের কারণ তাহার আলম্বন অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্, তিনিই চিত্তে স্ফুরিত হয়েন বলিয়া লৌকিক রসে বিষয়ভাব হয় বলিয়া আনন্দের ন্যূনতা থাকে, যেটুকু বিষয়ের স্ফুরণ হয়, উহাই আনন্দাল্পতার কারণ; বৈদান্তিক ভাষায় তাঁহারা বলেন, নিরবচ্ছিন্ন চিদানন্দঘন ভগবানের স্ফুরণ হয় বলিয়া ভক্তিরসে আনন্দের অত্যন্তাধিক্য পরিলক্ষিত হয় এবং লৌকিক রসে বিষয়াবচ্ছিন্ন চিদানন্দাংশের স্ফুরণ হয় বলিয়া আনন্দের ন্যূনতা থাকিয়া যায়। সুতরাং পূর্ণানন্দ অনুভব করিবার জন্য দুঃখতপ্ত সংসারক্লিষ্ট সকল মানবেরই কর্ত্তব্য, বিষয়সুখের অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বপ্রাণে ভক্তিরসের সেবা করা, ইহাতে নিরন্তর সুখানুভূতি হইয়া থাকে। এইভাবে বেদান্তসিদ্ধান্তসম্মত ভক্তির রসস্বরূপতা বলা যায়। সাংখ্য সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া এইবার স্থায়ী ভাবের রসস্বরূপতা বলা যাইতেছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় এক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুখদুঃখ-মোহাত্মকরূপে যেহেতুক উহারা প্রতীয়মান হয়, যে পদার্থ যদাত্মকরূপে প্রতীয়মান হয়, তৎপদার্থ তদাত্মক সামান্যপ্রকৃতিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে যেমন মৃত্তিকা সামান্য-প্রকৃতিক, ঘট শরাব প্রভৃতি মৃত্তিকাসামান্য হইতে অনতিরিক্ত এবং এই সকল বস্তু সুখদুঃখমোহাত্মকরূপেও প্রতীয়মান হয়; সুতরাং সুখ-দুঃখ-মোহ-প্রকৃতিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে যাহা সুখ, উহা সত্ত্ব যাহা দুঃখ, উহা রজঃ, যাহা মোহ, উহা তমঃ, সুতরাং প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

যদি বলা যায় যে, উক্ত অনুমান ঠিক নহে, কারণ, সুখ-দুঃখ-মোহ অন্তরের বস্তু, বাহ্যবিষয় ঘটপটাদির সহিত উহাদের অভেদ হইতে পারে না, যদি উহা সম্ভব হয়, তবে সকল বস্তুই অনুভবকর্ত্তার নিকট সুখ, দুঃখ, মোহ এই তিন আকারে প্রতীয়মান হইত।

ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, অনুভবকর্ত্তা মানবগণ নিজের মানসসঙ্কল্পভেদে ত্রিগুণাত্মক একই বস্তু তিন আকারে দেখিয়া থাকেন, সুতরাং আন্তর বাহ্য বিষয়ের অভেদ অসম্ভব নয়, কারণ, বাহ্য বস্তুই মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া আন্তর হইয়া থাকে এবং সকল ব্যক্তির নিকট তুল্যরূপে প্রতীয়মান না হওয়ার কারণ তাহাদের সঙ্কল্পভেদ। এই কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যেমন একটি সুন্দরী যুবতী যাহার পত্নী এবং অনুরাগের পাত্রী, তাহার পক্ষে এই যুবতী সুখের মূর্ত্তি, কারণ, তাহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে সুখের উপলব্ধি হয়, এইপ্রকার সপত্নীর নিকটে ঐ যুবতী দুঃখময় মূর্ত্তিতে তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় এবং তদীয় অন্তঃকরণের দুঃখময় অবস্থাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। আবার কোন কামান্ধ যুবকের হৃদয়ে ঐ যুবতী মোহময় বা বিষাদময় মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া মোহময় বা বিষাদময় অবস্থার অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যাচার্য্যগণ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, ঐ যুবতী সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ত্রিগুণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি থাকিল না। একই পদার্থে বাসনাভেদে যে ভানভেদ হয়, তাহা প্রাচীনগণের সিদ্ধান্ত। যথা—"পরিব্রাট্-কামুক-শুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ। কুণপঃ কামিনীভক্ষ্যমিতি তিস্রো বিকল্পনা।" এক মৃত রমণীর দেহ দর্শনে সন্ন্যাসীর শববুদ্ধি, কামুকের কামিনীজ্ঞান, কুকুরের ভক্ষ্যবুদ্ধি এই তিন বিকল্প দেখা যায়।

এইরূপ সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইলে যে সময়ে মনে সুখাকার প্রবিষ্ট হয়, তখন সে স্থায়িভাবত্ব লাভ করিয়া রস হয়। ক্রোধাদি ভাবেরও রজস্তমোমিশ্রণ থাকা নিবন্ধন চিত্ত দ্রবীভূত হয় বলিয়া সুখময়তা। কারণ, সত্ত্বগুণ ব্যতীত চিত্তদ্রব হয় না, এবং চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে স্থায়িভাবও হয় না, সত্ত্বগুণেরই সুখস্বরূপতা—সকল পদার্থের সুখরূপতা হইলেও রজোগুণ তমোগুণ মিশ্রিত বলিয়া ঐ সুখের তারতম্য হইয়া থাকে, অতএব সকল রসে তুল্যসুখানুভব হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বহু প্রশ্নই হইতে পারে। তন্মধ্যে দু-একটির আলোচনা করিব। যদি বলা যায়, যুবতী সুখের

কারণ হইতে পারে, সুখ হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, বাহ্য বস্তু সুখময় না হইলে বাহ্য বিষয়ের অনুভব দ্বারা সুখানুভূতি হইতে পারে না, বাহ্য বস্তুই মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুভূত হয়। সে যে স্বরূপ, তদ্রূপই অনুভূত হইবে।

এই সম্বন্ধে তার্কিকগণ বলেন, মন নিত্য নিরবয়ব অণুপরিমাণ, তাহার সাবয়ব পদার্থের দৃষ্টান্ত দ্বারা দ্রবীভাব এবং বিষয়াকারে পরিণতি কিরূপে সমর্থন করা যায় ? নিরবয়ব পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং উক্ত স্থায়িভাবনিরূপণ সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যাহাদের মত মন পরমাণুস্বরূপ, বিষয়াকারে পরিণত হয় না, সেই মত অন্য কোন দার্শনিকের নয় বলিয়া উপেক্ষা করা যায়, অর্থাৎ একমাত্র তার্কিকের এই সিদ্ধান্ত অপর সকল দার্শনিক গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ৺পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে ভক্তির রসস্বরূপ বিচারাবসরে উপেক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ মনের বিভুত্ব যাঁহাদের মত, উহাও উপেক্ষিত। তবে করণত্ব নিবন্ধন পরমাণুর ন্যায়—ইন্দ্রিয়ত্ব নিবন্ধন চক্ষুরাদির ন্যায় মনের মধ্যমপরিমাণত্ব অনুমান করা যায়, অণুত্বানুমানে কোনও হেতু নাই। যে ইন্দ্রিয় যে ভূতের গুণগ্রাহক, সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতের গুণযুক্ত হয়, এই ব্যাপ্তি অনুসারে যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চক্ষুর্গ্রাহকরূপ যুক্ত তেজঃস্বরূপ ভূতোৎপন্ন, সেইরূপ মন পঞ্চমহাভূতগ্রাহক বলিয়া তদ্‌যুক্ত নিশ্চয় করা যায়। বিজাতীয় ভূতপঞ্চকের অনারম্ভক মন, ইহাই বিশেষ, এমনও বলা চলে না। বিজাতীয় সুবর্ণ-সূত্র, পট্ট-সূত্র ও কার্পাস-সূত্র দ্বারা বস্ত্রনির্ম্মাণ দেখা যায়। সেই স্থলে অবয়বী স্বীকার না করিলে অন্যত্র সকল স্থলেই অবয়বী স্বীকারের আবশ্যক হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্তে দেহপরিমাণ মন মানিতে হয়, সুখদুঃখ-ইচ্ছাও জ্ঞানের আশ্রয় মনকে স্বীকার করা হইয়াছে এবং উহারা সর্ব্বশরীরব্যাপী বলিয়াই উপলব্ধ হইয়া থাকে। উহাদের আশ্রয় মনও সর্ব্বশরীরব্যাপী। যদি বল, মনের অণুত্ব স্বীকার না করিলে যুগপৎ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে এবং নানাজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, অথচ এক ইন্দ্রিয়জন্য একটি জ্ঞানই একসময়ে হয়, ইহাই নিয়ম এবং এই নিয়ম সকলের নিকটই সমান, না হইলে যুগপৎ চাক্ষুষ জ্ঞানদ্বয় একদা হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা যায়—যুগপৎ নানা ইন্দ্রিয়জন্য নানা জ্ঞান হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি। দীর্ঘ একটি পিষ্টকভক্ষণকালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের যুগপৎ অনুভব হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের প্রতি ত্বঙ্‌মনঃসংযোগকে কারণ—তার্কিককেও স্বীকার করিতে হইবে, না হইলে 'সুষুপ্তি' হইতে পারে না। ত্বঙ্‌মনঃসংযোগ না থাকায় সুষুপ্তি সম্ভব হয়, রসনাদেশের ত্বক্ ও মনের সংযোগকালে গুড়ের স্পর্শ ও রসের অনুভব যে হয়, উহাকে বারণ করা মনের অণুত্ববাদী তার্কিকেরও অসম্ভব। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিসিদ্ধ আমাদের স্বীকৃত দেহপরিমাণ মনের সম্বন্ধে অন্য কোন বিরুদ্ধ ধারণার সম্ভব নাই। যাঁহারা বলেন যে, একটির পর একটি জ্ঞান হয়, একসঙ্গে সূচী দ্বারা একশত পদ্মের পাপড়ী বিদ্ধ করিলে উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য যেমন অতিসূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ জ্ঞানেরও পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, এই মতের যুক্তি না থাকায় উপেক্ষণীয়।

সুতরাং স্বচ্ছস্বভাব সাবয়ব মন, দর্পণের ন্যায় বিষয়াকার গ্রহণ করে, ইহাই সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রে নিরূপণ করা হইয়াছে। উহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়—মন বিষয়সংযোগে বিষয়াকার গ্রহণ করে, ইহাই বেদান্তের ও সাংখ্যের পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন।

যদিও সাংখ্যমতে মন আহঙ্কারিক, বেদান্তমতে ভৌতিক, এইরূপ বিশেষ দেখা যায়, তথাপি উভয় মতেই মন বিষয়াকার গ্রহণ করে—ইহাতে কোন বিবাদ নাই, তুল্যভাবে এ কথা উভয় মতেই উপন্যস্ত হইয়াছে। তবে মন দ্রবীভূত হইয়া বিষয়াকার গ্রহণ করা সম্বন্ধে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"মূষা-সিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
ঘটাদি ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং জায়তে ধ্রুবম্।"

যেমন পুটপাকাদিযন্ত্রে স্থিত তাম্রাদি ধাতুদ্রব্য বিজাতীয় উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীভূত হইলে উহাকে যে ছাঁচে ঢালা যায়, সে সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনুরাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি দ্বারা দ্রবীভূত চিত্ত চক্ষুরাদি দ্বারা যে পদার্থে সিক্ত হয়, সেই পদার্থের আকার সেই চিত্তও হইয়া যায়। যদিও ভাষ্যকারের বাক্যে মাত্র দ্রবীভাবের কথাই আছে, তথাপি অনুভববলে রাগদ্বেষাদি বিষয়েও ঐ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে এইরূপ অনুমান করা যায়—মন বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় বিষয়গত আবরণনিবর্ত্তকত্ব নিবন্ধন। এই সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, যেমন আলোক পদার্থের অভিব্যঞ্জক পদার্থগত আবরণ নিবৃত্তি করে বলিয়া, সেইরূপ বুদ্ধিও সকল বিষয়ের অভিব্যঞ্জক বলিয়া বিষয়াকার গ্রহণ করে, এ কথা মানিতে হইবে। ভগবৎপূজ্যপাদ ভাষ্যকারের ন্যায় বার্ত্তিককার এবং বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে আছে—

"অতো মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী।"

মনোময়াকার ভেদ ব্যতীত একটি ভৌতিক পিণ্ডে ভেদজ্ঞান হইতে পারে না, এই ভেদপ্রতীতি সকলেই মানিয়া থাকেন। যথা—

"ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
জামাতা শ্বশুরঃ পুত্রঃ পিতেত্যাদি পুমানপি।"

যেমন একই স্ত্রী কাহারও ভার্য্যা, কাহারও পুত্রবধূ, কাহারও ননদ, কাহারও যা, এবং একই পুরুষ কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও শ্বশুর, কাহারও জামাতা হয়, এবং এইরূপ ভেদ দেখা যায়, সেইরূপ এ স্থানেও বুঝিতে হইবে।

এই বাহ্যবিষয়ের নাশ হইলে কিম্বা দেশকালাদির দ্বারা ব্যবধান হইলেও মনোময় সেই পদার্থের নাশ বা ব্যবধান হয় না; সুতরাং মনোময় ও বাহ্যবস্তু পৃথক্, ইহা সিদ্ধ এবং এই জন্যই ঐ মনোময়কে স্থায়ী ভাব বলিয়া বিদ্বান্‌গণ নিরূপণ করিয়াছেন। মনোময় বিষয়াকার অবিনাশী বলিয়া উহাকে স্থায়ী বলা হইয়াছে, ঐ স্থায়িভাব রতি, হাসাদি ভেদে অনেক প্রকার, যেহেতুক দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়াকার অবিনশ্বর, সেই জন্যই সে স্থায়ী।

যিনি সর্ব্বদেশব্যাপক, সর্ব্বকালব্যাপক, অদ্বিতীয় জ্ঞানসুখ-স্বরূপ ভগবান্, তাঁহাকে যদি দ্রবীভূত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারা যায় অর্থাৎ ভগবদাকার মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অনাদিকাল হইতে অসংখ্য বিষয়াকার গ্রহণ করিয়া মন যে ব্যাকুল ছিল, অসংখ্য যাতনা ভোগ করিত, তাহা হইতে চির-অব্যাহতিলাভ ঘটে। ঐ মূর্ত্তিমাত্রের পরিস্ফুরণ হইলে জীব কৃতকৃত্য হয়, তাহার আর কিছু করিবার আবশ্যকতা থাকে না, তাহার নিত্যসুখানুভূতি হওয়ায় সে অমৃতসাগরে নিমগ্ন হয়।

কঠিন কিম্বা শিথিল চিত্ত বিষয়াকার গ্রহণ করে না বা বিষয় দ্বারা অনুবাসিত হয় না, অর্থাৎ কোন সুগন্ধিদ্রব্য কোন স্থানে রাখিয়া অপসারিত করিলেও যেমন কিছু সময় ঐ সুগন্ধ সেই স্থানে থাকে, সেইরূপ হয় না। কঠিন পদার্থের ঈষদ্ দ্রবীভাবকে শিথিল বলা যায়, সাত্ত্বিকভাব হইতে ঐ শিথিলভাব হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকভাব আটটি;—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়। এই জন্যই ভগবদ্‌বিষয়ে চিত্তের কাঠিন্য নিন্দিত। সেই হৃদয় পাষাণ সদৃশ—যাহা ভগবান্নাম-গ্রহণে বিকৃত না হয়। ঐ বিকার নেত্রে জল, এবং শরীরে রোমাঞ্চ। ভাগবত ২ স্কন্ধ ৩ অং ২৪ শ্লোক।

চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে ভক্তি কিরূপে হইতে পারে? রোমাঞ্চ আনন্দাশ্রু ব্যতীত চিত্তই বা কিরূপে দ্রবীভূত হইতে পারে? ৬।১১।১৪।২৩। ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, যাহা সুখ বা দুঃখসাধন নহে, তাহা উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহা কোন সংস্কারই জন্মায় না, চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে সংস্কার জন্মিতে পারে না।

সকল শাস্ত্রের ইহাই রহস্যভূত অর্থ যে, চিত্তের বিষয়াকারতা নিরাকরণ পূর্ব্বক ভগবদাকারতা সম্পাদন করা, সকল শাস্ত্রই এই কথা নানাভাবে বুঝাইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনাদিকাল হইতে দ্রবীভূত চিত্তে যে কোটি কোটি বিষয় প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহা দূরীভূত হইবে কিরূপে? যদি উহা যায়, তবে জলের শৈত্য, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর সঞ্চরিষ্ণুতাও নিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই স্বভাবের অথচ কোন দিনই ব্যতিক্রম হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, এই জন্যই বিষয়ে চিত্তের কাঠিন্য ও ভগবৎপদে দ্রবত্ব বুধগণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নানাবিধ উপায়ে সম্পাদন করিবেন।

অভ্যাস দ্বারা ধীরে ধীরে চিত্তের বিষয়াকারতা দূর করিতে হয় এবং সাধনার দ্বারা সমূল উচ্ছেদ করিতে হয়। যেমন স্বর্ণকে অগ্নিতে পোড়াইলে সে মলবর্জ্জিত নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্ত বিষয়াকারতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদাকার গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন যেমন ভগবৎপুণ্যকথা শ্রবণ কীর্ত্তন মনন করা যায়, তেমন তেমন চিত্ত মার্জ্জিত হয় এবং সূক্ষ্ম দর্শনে সমর্থ হয়। যেমন কজ্জলব্যবহারে চক্ষু সূক্ষ্মবস্তু দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে। বিষয়চিন্তা করিলে চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয়, আর ভগবান্‌কে ভাবিলে চিত্ত ভগবানেই লীন হয়। সুতরাং অসৎ পদার্থের চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবান্‌কেই চিন্তা করা উচিত। কপিলদেব তাঁহার মাতাকে বলিয়াছেন, তীব্র ভক্তিযোগ, বলবৎ বৈরাগ্য, এবং জ্ঞান দ্বারা দিবানিশি দহ্যমান স্বাভাবিক বিষয়াকারতা তিরোহিত হইয়া থাকে।

ভাগবতে এই বিষয়ে সনকাদি প্রশ্ন করিয়াছেন, গুণে চিত্ত আবিষ্ট হয় ও গুণ চিত্তে প্রবেশ করে। মুমুক্ষু কিরূপে এই পরস্পর সম্বন্ধকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, মন, বাক্য, দৃষ্টি দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, উহা আমি ব্যতীত কিছুই নহে, ইহাই তত্ত্ব বুঝিবে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, উহা হইতে জীব বিলক্ষণ—এবং বহু অহঙ্কারকৃত, জ্ঞানী বৈরাগ্যলাভ করিয়া সংসারচিন্তা ত্যাগ করিবেন। যে পর্য্যন্ত নানাবিষয়িণী বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা নিবর্ত্তিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে স্বপ্নে জাগরণের ন্যায় জাগিয়া ঘুমায়। এই সব বিবেচনা করিয়া অনুমান, সদ্‌যুক্তি ও তীক্ষ্ণ জ্ঞান-অসি দ্বারা বিষয়াসক্তি ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা কর। ভাগবত ১১।১৩।

ফল কথা, ভগবদতিরিক্ত কোন পদার্থেরই পারমার্থিক সত্তা নাই, এই বিশ্বসংসার সকলই তাঁহাতে অধ্যস্ত, সকলই তাঁহার সত্তায় সৎ বলিয়া প্রতিভাত, বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র ইহাদের অস্তিত্ব শুধু তাঁহারই মহাসত্তায় পরিস্ফুরিত হয় মাত্র। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।' ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, একমাত্র ভগবান্ হইতেই সব উদ্ভূত, তাঁহাতেই স্থিত এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন মৃত্তিকায় ও ঘটে ভেদ নাই, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জাগরণে বাধিত হয়, ইহারাও মহাজাগরণে জ্ঞানালোকপ্রাপ্তের নিকট তেমনই বাধিত হয়, তাই বলিতেছিলাম, ভগবদাকারস্ফুরণে ঐ সব বিষয় তিরোহিত হইয়া সদ্রূপ হয়, কারণ, অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহার জ্ঞান হইলে—যেমন ঝিনুককে রজত, দড়ীতে সাপজ্ঞান—ঝিনুক ও দড়ীর জ্ঞান হইলেই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভগবদ্‌জ্ঞানে সকল সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং এইরূপ হইলে স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্রাদিতে যে সকল প্রেম, তাহা ভগবানেই অর্পিত হয়, কারণ, ভগবদতিরিক্তের স্ফুরণ হয় না। ঠিক এইরূপ অবস্থাই প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! অবিবেকী সংসারীর বিষয় সকলে (স্ত্রী-পুত্রাদিতে) যে অবিনশ্বর প্রীতি পরিলক্ষিত হয়, তোমাকে স্মরণ করিবার সময়ে যেন আমার হৃদয় হইতে সেই প্রীতি দূরীভূত হয় না।" সুতরাং এই সকল যুক্তির অনুসন্ধান করিলে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-রূপী ভগবান্‌ই যে সকল বিষয়ের অধিষ্ঠান, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় এবং এই নিশ্চয়ের সঙ্গেই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় জাগরণ-কালীন প্রতিভাত সমস্ত বিষয়ই যে মিথ্যা, ইহাও উপলব্ধি হয়, তখন অতি তুচ্ছ এই সংসারে বশীকার নামক মহাবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, এই কথাই ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"

ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য হয়। এই বৈরাগ্য যতমান, ব্যতিরেক, ইন্দ্রিয়, বশীকার সংজ্ঞাভেদে চারি প্রকার। 'আমি মহা প্রয়াসেও চিত্তের দোষ সকল দূরীভূত করিব,' এইরূপ অধ্যবসায়স্বরূপ প্রথম যতমান-সংজ্ঞক বৈরাগ্য। তার পর নিরন্তর চিত্তদোষ দূর করিবার নিমিত্ত উপায় অনুষ্ঠান করিলে পর ইদানীং এতগুলি দোষ ক্ষীণ হইয়াছে এবং এতগুলি দোষ অবশিষ্ট আছে, এইরূপ চিকিৎসকের ন্যায় প্রতিক্ষণে অবধান দেওয়ার নাম দ্বিতীয় ব্যতিরেক-সংজ্ঞক বৈরাগ্য। এইরূপ প্রতিক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাদ্বয়ের অভ্যাস

করিলে পর অন্তঃকরণের বাসনা থাকিতে যে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে অপ্রবৃত্তি, তাহার নাম তৃতীয় ইন্দ্রিয়সংজ্ঞক বৈরাগ্য। এইরূপে ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাস হইতে যে ঐহিক বনিতা-পুত্র-ধনাদিতে ও পারত্রিক স্বর্গাদিতে ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহ্যমাণ বিষয় সকলেও দোষ-দর্শনজন্য অস্পৃহারূপ চিত্তবৃত্তি হয়, উহার নাম বশীকার-সংজ্ঞক চতুর্থ বৈরাগ্য। এই চতুর্থ বৈরাগ্যও দুই প্রকার;—পর ও অপর। আত্মজ্ঞানের পর শব্দাদিবিষয়ে যে বিতৃষ্ণা, উহার নাম পরবৈরাগ্য, উহার পূর্ব্বে অপরবৈরাগ্য, সে অবস্থায় অন্য কোন স্পৃহা না থাকিলেও মোক্ষস্পৃহা থাকে। এই অপরবৈরাগ্য মুচুকুন্দ রাজার হইয়াছিল, যখন ভগবান্‌কে সে জানিতে পারিল, তখন সে এই বর চাহিয়াছিল, "হে বিভো! যাহার কিছু নাই, সেই দরিদ্রগণের প্রার্থনীয় তোমার পাদসেবার অতিরিক্ত অন্য বর কামনা করি না। হে হরি, মুক্তিপ্রদ তোমাকে আরাধনা করিয়া কোন্ আর্য্য নিজের বন্ধন-বর প্রার্থনা করেন? হে ঈশ, তাই সকল আশীর্ব্বাদ—সর্ব্বপ্রকার ঐহিক পারত্রিক সুখভোগকামনা পরিত্যাগ করিয়া নির্লেপ নির্গুণ অদ্বয় জ্ঞানরূপ পরমপুরুষ তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে আশ্রয়দাতা! হে পরমেশ! চিরদিন এই সংসারে পাপপীড়িত আমি ত্রিতাপতপ্ত, আমার কামাদি ছয় রিপু চিরভোগেও অবিতৃপ্ত, তাই কোনরূপে শান্তি লাভ করিতে পারি নাই, তাই ভয়-মৃত্যু-শোক-রহিত তোমার পাদ-পদ্মের আশ্রয় লইয়াছি, তুমি শরণাগত ত্রিতাপদগ্ধ আশ্রিতকে রক্ষা কর।" ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৫১ অঃ ৫৫—৫৭। এইরূপ অবস্থায় ভগবৎ-প্রেমানন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। মুচুকুন্দকে ভগবান্ বলিয়াছেন:—"হে রাজন্! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মৃগয়ায় বহু জীবকে হত্যা করিয়াছ, তাই তপস্যায় একাগ্র হইয়া ঐ পাপ নষ্ট কর, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" ভা ১০ স্কন্ধ—৫১ অঃ ৬২-৬৩।

অপরবৈরাগ্য দ্বারা প্রেমপরাকাষ্ঠা লাভ হয় না এবং কৃতার্থও হওয়া যায় না। কারণ, এই দুইটিই পরবৈরাগ্য দ্বারা লাভ হইয়া থাকে, পরবৈরাগ্য কোন ফলের অপেক্ষা রাখে না, উহার পরিণতি মোক্ষ পর্য্যন্ত। যথা—

"এই লোক ও পরলোকগামী আত্মার অনুগ যে ধন পশু গৃহ প্রভৃতি, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপী আমাকে অনন্য-ভক্তি সহকারে যাহারা ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি মৃত্যুর হাত হইতে পার করি।" ভা—৩ স্কন্ধ ৩৫ অঃ ৩৯—৪০

"আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি দিলেও তাহা গ্রহণ করে না।" ভা—৩ স্কন্ধ ২১ অঃ ১৩।

"যাহারা আমার সেবারত এবং আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা একাত্মতাও (মুক্তি) ইচ্ছা করে না।" ৩।২৫।৩৪

"যাঁহার পদরজে আশ্রিত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপদ বা ইন্দ্রপদ, সার্ব্ব-ভৌম রাজত্ব, যোগসিদ্ধি, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্তও বাঞ্ছা করে না।" ১১।১৪।১৪

"প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে প্রভো! আমি কামনাহীন তোমার ভক্ত এবং তুমি নিরপেক্ষ প্রভু, রাজা ও সেবকের ন্যায় আমাদের মধ্যে ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার প্রয়োজন নাই।" ৭।১০।৬

এইরূপ বহু উদাহরণ ভাগবতমধ্যে আছে। পৃথু ইন্দ্র মহিষীগণ শ্রুতিসকল বৃত্র ধ্রুব ইহার স্তুতিমধ্যে সকলফলনিরপেক্ষ ভক্তি দেখা যায়, সেই সকলই পরবৈরাগ্যের লক্ষণ, ফলান্তর থাকিলে প্রেম হয় না, স্বার্থলুব্ধ ব্যক্তির প্রেম অসম্ভব, সে চায় তাহার ইন্দ্রিয়প্রীতি—প্রেম চায় না, প্রেমাধিকারী বৃত্র ব্যাকুলভাবে বলিয়াছেন—"হে পদ্মপলাশনয়ন! অজাতপক্ষ পক্ষিগণ যেরূপ মাতাকে দেখিতে চায়, ক্ষুদ্র বৎসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ স্তন্য কামনা করে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রিয়তমা যেমন নিজ প্রিয়কে দেখিতে ব্যাকুল হয়, আমার মনও সেইরূপ তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে," ৬।১১।২৬। পরবৈরাগ্যও জ্ঞান ব্যতীত হয় না এবং পরবৈরাগ্য ব্যতীত প্রেমপরাকাষ্ঠালাভ হয় না, সুতরাং প্রেমপরাকাষ্ঠালাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য দৃঢ় করিতে হইবে। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে আছে—

"জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্॥"

যাঁহারা ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, পুণ্যকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের প্রথমে ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তার পর পরবৈরাগ্য হয়, তাহার পর প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মে। এই কথা একাদশে উদ্ধবকে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন।

ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর কিরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ব্বক ভগবানে ভক্তি জন্মে, তাহা নিম্নে ভাগবত হইতে দেখান যাইতেছে,—

"ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্॥
শ্রদ্ধাঽমৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিসর্জ্জনম্।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থে যদ্ব্রতং তপঃ।
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥"
১১।১৯।১৯—২৪

হে নিস্পাপ! পূর্ব্বেই আমি প্রীতির পাত্র তোমাকে ভক্তিযোগ বলিয়াছি, পুনর্ব্বার ভক্তির পরম কারণ বলিব, অমৃততুল্য মদীয় কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্ত্তন, পূজাতে পরিনিষ্ঠা, স্তুতিপাঠ, পরিচর্য্যাতে সমাদর, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, মদীয় ভক্তপূজা, সর্ব্বভূতে আমার জ্ঞান, আমারই জন্য শারীর চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকথন, আমাতে মনের অর্পণ, সকলকামনাত্যাগ, আমার উদ্দেশ্যে ভোগ অর্থ ও সুখের পরিত্যাগ, দান যজ্ঞ তপস্যা জপ ব্রত সকলই আমার জন্যে হইবে। হে উদ্ধব! এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা যে মানবগণ আমাকে আত্মনিবেদন করে, তাহাদের আমাতে ভক্তি জন্মে, উহাদের আর কোন বিষয় বাকী থাকে না।
ভা—১১।১৯।১৬—২৪

সুতরাং শাস্ত্রীয় উপায় দ্বারা মনঃশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্রীয় উপায় সকল পরে বলিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্ক-পঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।

রামশিলা পাহাড়ের বাঘ

গয়ার রামশিলা পাহাড় সহরের মধ্যেই অবস্থিত। তারই পাশে স্থানীয় জমীদারের বাংলো। তাঁর এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী থাকতেন সেই বাংলোয়।

সবে-মাত্র ভোর হয়েছে। সূর্য্যোদয় হয়নি,—কিন্তু তার সূচনা আকাশের লালিমায় প্রকাশ পাচ্ছে। পাহাড় থেকে প্রভাতে শান্ত সুশীতল বাতাস ব'য়ে আসছে—নিদ্রাক্লান্ত নগরীর ধীরে ধীরে জাগরণ সুরু হয়েছে।

বাংলোর বাবু ওঠেন সকালেই এবং উঠেই জলের প্রয়োজন। বাংলোর কম্পাউণ্ডের এক পাশে পাহাড়ের ধারেই কূপ।

চাকর সৌখীয়া জল ভর্‌তে এসেছে সেই কূয়োয়। প্রথম এক ডোল জল তুলে কূয়োর ধারে বসেই মুখ ধুয়ে 'কুল্লা' ক'রে নিয়ে, তার মন প্রফুল্ল হ'ল। তখন সে আনন্দিত-মনে গান ধরলে।—পিয়া পানিয়া ভরনেকো ন দাঁউ—উ-উ—এবং তারি তালে তালে ঘড় ঘড় ক'রে নেমে চল্লো জল তোলার ডোল কূয়োর ভেতর।

বোধ করি, সৌখীয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সুদূর একখানি গৃহকোণে কলসী-কক্ষে জল ভর্‌তে গমনোদ্যত তার প্রিয়ার শান্ত মুখচ্ছবি। মন করুণার্দ্র হয়ে উঠেছিল, এবং প্রভাতের সেই শীতল বাতাসে তার সুর স্পষ্ট কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

তার চোখ ছিল তখন স্বপ্ন-রাজ্যে, নইলে একটু চেষ্টা করলেই সৌখীয়া দেখতে পেত যে, ঠিক যে সময়ে সে প্রিয়ার মুখের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়েছিল, সেই সময়েই পাহাড়ের ওপর একটি বৃহৎ নরখাদক তাকেই লক্ষ্য ক'রে প্রকাণ্ড একটি লাফ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

তার পরে যখন কূয়ো থেকে ডোল উঠিয়ে সৌখীয়া তার বন্ধন খুলছে, এমন সময়—একটা বিজাতীয় শব্দ—বাপ রে বাপ, একটা প্রকাণ্ড ভারী বস্তুর পতন, এবং তার পর কূয়োর ভেতর ভীষণ শব্দ যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল—এবং জলের সবেগ আন্দোলন।

অর্থাৎ বাঘ যখন আচমকা কূয়োর একেবারে পাড়ে দণ্ডায়মান সৌখীয়ার ঘাড়ে অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ল, তখন সৌখীয়া এমনই প্রকাণ্ড একটা বেগ এবং ভার গ্রহণ করবার জন্যে ঠিকমত প্রস্তুত ছিল না, এবং তার ফলে সৌখীয়া এবং বাঘ উভয়েই হুড়মুড় ক'রে পড়ল সেই কূয়োর ভেতর।

কূয়োয় জল ছিল মন্দ নয়, সুতরাং তার ভেতরে বাঘ এবং মানুষের নাকানি-চোবানি, সে একেবারে অপরূপ দৃশ্য।

জল জিনিষটাকে বাঘ স্বভাবতঃই পছন্দ করে না, বিশেষ এমনি ক'রে চুবুনি খাওয়া। কোথায় সে এই টাটকা সতেজ মানুষটিকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে এতক্ষণে, তা না হয়ে এ কি বিপর্য্যয় কাণ্ড! সৌখীয়ার চোখের সামনে থেকে তার প্রিয় গৃহকোণ এবং প্রিয়তমার মুখচ্ছবি নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে ফুটে উঠল প্রচুর সবজে ফুল!

পড়বার সময়ে সৌখীয়ার সেই যে বাপ রে বাপ চীৎকার, তার ফল হয়েছিল। সে শব্দ গিয়ে বাবুর কাণে পৌঁছুল এবং তিনি ব্যাপার কি জানবার জন্যে দ্রুত কূয়োর ধারে উপস্থিত হয়ে সৌখীয়াকে দেখতে না পেয়ে শুদ্ধমাত্র জলের ডোল দেখে, বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, কারণ, জলের ভেতর তুমুল কোলাহলের শব্দে সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে কূয়োর ভেতরে দেখলেন।

সেখানে যে কি ব্যাপার হচ্ছে, তা চট ক'রে বোধ-গম্য হওয়া কঠিন। মনে হ'ল, যেন তার ভেতর গোটা-কতক জল-ছেটাবার এঞ্জিন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেগুলো ভীষণ শব্দ ক'রে অনবরত জল ছেটানোর কায ক'রে চলেছে, তিলমাত্র বিরাম নেই। প্রবল ঝুল-পুটি এবং জলের ভীষণ আন্দোলন।

ভয়ানক একটা কিছু হয়েছে বোঝা গেল, কিন্তু সে যে কি, তা ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে বাবু জলের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলেন—"সৌখীয়া আছিস্ রে?"

প্রায় কান্নার স্বরে জবাব এলো—"বাবুজী, বাঁচান আমাকে! বড়া শের।"

সে কথা শুনে কূপের ওপর থেকেই বাবুর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। "শের কি রে? শের ওর ভেতর কেন?"

সৌখীয়া অর্দ্ধেক কথায় অর্দ্ধেক ক্রন্দনে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়ে দিলে।

তখন প'ড়ে গেল ডাকাডাকি হাঁকাহাকি। মিনিট কতকের ভেতরেই বহু লোক জ'মে গেল, এবং সবাই মিলে কি যে উপায় করা যায়, সেই ভেবেই অস্থির হয়ে উঠল। কারণ, বাঘকে নিয়ে এ-রকম সঙ্কট ইতিপূর্ব্বে কারুর অভিজ্ঞতাতেই ঘটে নি। বাহাদুর খাঁ পাকা শিকারী, বহু বাঘ মেরেছে এবং বহু ভয়াবহ অবস্থায় বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এসেছে, এমন অহঙ্কার তাকে প্রায়ই করতে শোনা যেত; কিন্তু সে সব ত' ডাঙ্গায়, বাঘ যদি মানুষকে আলিঙ্গন ক'রে পাতালের কাছাকাছি একটা অপ্রশস্ত অন্ধকার কূপের মধ্যে—আড়াই হাত জলের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে থাকে ত' তার যে কি ফিকির বার করা যায়, এ ত' বড় শক্ত কথা। বাহাদুর খাঁ ঘন ঘন তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে তার যে অবস্থা ক'রে তুল্লে, তা খোদাই জানেন, কিন্তু দেরীও ত করা যায় না।

বন্দুক ত' চলতেই পারে না। অবশেষে বাহাদুর বল্লে, "দড়িই ফেলে দাও।"

এক জন অপেক্ষাকৃত ভীত লোক বল্লে, "দড়ি ধ'রে সৌখীয়া না উঠে যদি বাঘই উঠে পড়ে, তা হ'লে?"

কথাটায় ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। ব্যাপার যদি তাই দাঁড়ায় ত' সেটা কারুর পক্ষে সুবিধা না হবারই কথা। ভীড়ের ভেতর থেকে দু' এক জন লোক বোধ করি সেই অপ্রীতিকর ভবিষ্যতের কথা মনে ক'রে রাস্তায় গিয়ে উঠল।

বাহাদুর তাড়া দিয়ে উঠল, "কম্‌বখত কোথাকার। তা হ'লে তোকে তুলে নিয়ে যাবে। ফেল্ দড়ি।"

দড়ি ফেলা হ'ল। বাবু বল্লেন, "সৌখীয়া, ভয় নেই, তোকে বাঁচাব আমরা। তুই শক্ত ক'রে দড়ি ধর।"

বাহাদুর চীৎকার ক'রে বল্লে, "ডরো মৎ, সৌখীয়া!"

সৌখীয়া বল্লে, "দড়ি ধ'রেছি হুজুর।"

দড়ি ধ'রে টানাটানি, কিছুতেই ওঠে না, এমনই ভীষণ ভারী। দশ পনর জন লোক ধ'রে টানাটানি করতে করতে ইঞ্চিখানেক বহু কষ্টে উঠে, ঝপাং ক'রে ভারী একটা শব্দ, তার পর দড়িটা হঠাৎ এমনই হাল্কা হয়ে সড়সড় ক'রে উঠল যে, এই আকস্মিক গতি-তারতম্যে সেই দশ-পনর জন ব্যক্তি মুহূর্ত্তে কুয়োর পাশে ধুলোয়—কাদায় প'ড়ে গড়াগড়ি, এবং দড়ির শেষ প্রান্ত সবেগে ঘিরনির কাছে এসে পৌঁছল।

চুনোট করা চূড়ীদার কাদায় কাদা, দাড়ীতে খানিকটা গোবর, খানিকটা জল। তাদের ঝাড়তে ঝাড়তে সাফ্ করতে করতে বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "তোবা তোবা, বড়া হায়রান কিহিস ইয়া শের!"

বাবু বল্লেন, "কি হ'ল রে, সৌখীয়া!"

হ'ল আর কি! মানুষের সঙ্গে কর্ম্ম-দোষে একই যায়গায় একই রকম বিপদে প'ড়ে, বাঘের সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা মানুষ সৌখীয়ারই মত অন্তর্দ্ধান হয়ে একমাত্র বেঁচে ওঠার প্রবৃত্তিই তীক্ষ্ণ জাগরূক হয়ে উঠেছে, এবং সে বুঝতে পেরেছে যে, তার বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৌখীয়া। সেই জন্যে সে তাকে আগেকার মত ক্ষুধার আলিঙ্গনে বদ্ধ না ক'রে প্রেমের আলিঙ্গনে সুদৃঢ় বদ্ধ করেছে এবং তারই ফলে সৌখীয়া তাকে নিয়েই বহু কষ্টে ইঞ্চিখানেক উঠে, ভারের গুরুত্বে দড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় কুয়োর ওপরকার এই প্রহসন।

মৃত্যুভয় এমনই অপরূপ পদার্থ যে, সে বাঘে মানুষে গলাগলি করায়।

বাঘের এই নতুন উপদ্রব ওপরে আবার একটা ভীতির সঞ্চার করলে! বহু-কষ্টে—অনেক দুঃখে যদি সৌখীয়াকে ওপরে তুলে দেখা যায় যে, ব্যাঘ্র মহাশয়ও তার সৎসঙ্গ লাভ ক'রে কুয়োর পাড়ে পৌঁছেছেন, তা হ'লে সমবেত এই জন-মণ্ডলীর দশা যে কিরূপ শোচনীয় দাঁড়াবে, এই ভেবে ভীড়ের মধ্যে আবার একটা মৃদু গুঞ্জরণ সুরু হয়ে গেল, এবং যারা আবার দড়ি ফেলবার আয়োজন করছিল, তাদের হাত শ্লথ হয়ে গেল।

চিন্তার কথা বটে। বাহাদুরের হাত তার গোবরজল-মাখা দাড়ির ভেতর ঘন ঘন সঞ্চালিত হ'তে লাগল।

বাঘের কোন শাস্ত্রেই যে এত বড় সঙ্কটের কথা লেখে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষ-খেকোর সাহচর্য্যে কতকখানি

বা সৌখীয়াকে রাখা চলে, কারণ, কখন্ যে সেই নরখাদকের প্রেমের পরিবর্ত্তে বুভুক্ষার উদয় হবে, তাও ত' বলা চলে না।

বাহাদুর অবশেষে কথা কইলে। বল্লে, "কোশিস্ (চেষ্টা) ত করতে হয়। বাবুজী, গোটা দুয়েক মশাল চাই।" মশাল এলো।

তখন বাহাদুরের মাথায় মতলব খুলেছে। সে জনমণ্ডলীর স্পষ্ট নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে বল্লে, "এ হয় না, বাহাদুর খাঁর চোখের সামনে এমনি ক'রে একটা মানুষ নাহক মারা পড়বে?—নামাও রশি!"

আবার রশি নামল।

বাহাদুর কুয়োর ভেতর ঝুঁকে প'ড়ে বল্লে,"এ ভাই সৌখী, কুছ ডর নেই। আচ্ছা ক'রে রশি ধরবি, কোমরে খানিকটা বেঁধে নিস্—যাতে এবার ফস্কে না যায়। শালা শের বা যদি তোর সঙ্গে ওঠে ত কুছ ডর করবি না। আমরা দেখে নেবো হারাম-জাদাকে। হিম্মৎ রাখ মরদ কি বেটা!"

মরদ্ কি বেটা তার উত্তরে ভেতর থেকে অর্দ্ধেক গোঙানী অর্দ্ধেক কান্নার সুরে যে জবাব দিলে, তাতে আর যাই হক, আপাততঃ তার হিম্মতের অবস্থা যে শোচনীয়, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল।

আবার ঘড়-ঘড় ক'রে রশি উঠল—বহু কষ্টে আস্তে আস্তে। কারণ, বাঘ এবারও সৌখীয়ার সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করে নি। বাহাদুর একবার ভেতরটা দেখে নিয়ে, আরও জোরে টানবার ইঙ্গিত ক'রে বল্লে, "মারো জোয়ান্ হেঁইয়ো।

"হেঁইয়ো"—ঘড়-ঘড় ঘড়-ঘড় ক'রে বাঘে মানুষে উঠল প্রায় আধখানা।

বাহাদুর দুই হাত উঁচু ক'রে ইঙ্গিত ক'রে বল্লে, "ব্যস!"—মুহূর্ত্তে দড়ি-টানা থেমে গেল, এবং দড়িটাকে একটা শক্ত গাছে পাক্ দিয়ে রাখা হ'ল।

মানুষ এবং বাঘ কুয়োর মাঝখানে ঝুলতে লাগলো।

তখন বাহাদুর মাটীর ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে খোদার কাছে তার প্রার্থনা জানিয়ে নিলে। তার পর একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে বসল। বল্লে, "সৌখীয়া! ভাই, কুছ ডর নেই। হারামজাদা শেরকে দেখে নেবো। তুই চোখ বুজে থাক্—আল্লার কিরে, তোর এতটুকু নোকসান হবে না।"

ব'লে চালিয়ে দিলে সেই মশালটা কুয়োর ভেতরে—অতি ক্ষিপ্র। তার পর ঝুঁকে প'ড়ে খুব ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে হঠাৎ সেটাকে সবেগে বার কতক বোধ করি বাঘেরই গায়ে ঠেসে ঠেসে ধরতে লাগল।

একটা আকাশ-ভেদী গর্জ্জন, তার পর একটা বিরাট পতনের শব্দ!

কুয়োর পাড় থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে প'ড়ে বাহাদুর নাচতে লাগলো—"ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা," আর সেই লোকদের চেঁচিয়ে বল্লে, "উঠাও ভাই, উঠাও জলদি! শালা গির গিয়া—অন্ধা শালা।"

অর্থাৎ সে সেই জ্বলন্ত মশাল ঠেসে ধরেছিল বাঘের চোখে এবং তারই ফলে বাঘ নিরুপায় হয়ে সৌখীয়াকে ছেড়ে দিয়ে কুয়োয় প'ড়ে গিয়াছে।

সৌখীয়া যখন উঠল, তখন অচৈতন্য। কিন্তু আঘাত সামান্য। ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ বাঘের তখন বজ্রভেদী গর্জ্জন।

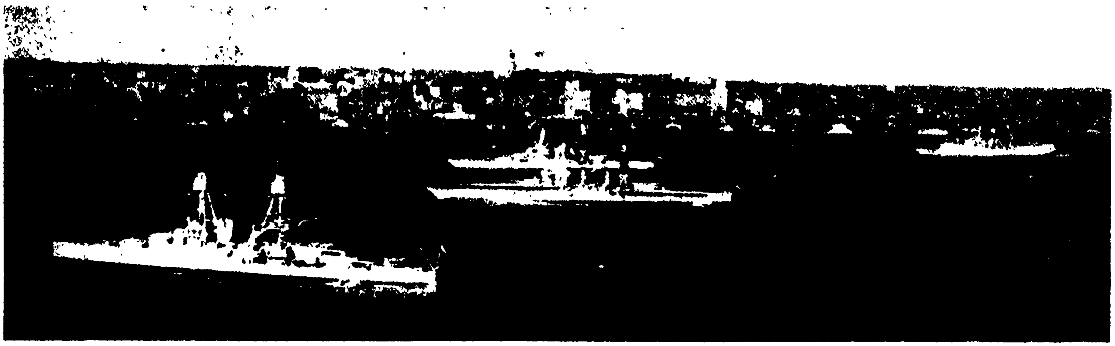
এক জন লোক তখন সৌখীয়ার চৈতন্যসম্পাদনে ব্যস্ত। বাহাদুর আর একবার দীনদুনিয়ার মালিকের কাছে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্লে, "লে আও পাথল।"

পাথরের পর পাথর মেরে তার ওপরে বাঁশের ঘন ঘন তীব্র খোঁচা মেরে মেরে বাঘের গর্জ্জন ক্রমশঃ গোঙানীতে দাঁড়াল—তার পর চুপ। যখন ঘণ্টা চারেক পরে তাকে তোলা হ'ল, তখন দেখা গেল, বিরাট নরখাদক, এবং তার চোখ দুটো প্রায় ঝলসে গেছে। বাহাদুরী আছে বাহাদুর খাঁর।

সৌখীয়ার সম্পূর্ণ সারতে মাস দুই লেগেছিল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তৃণহরিৎ রাজ্য



এলিয়ট উপসাগরের দৃশ্য

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর তারিখে চব্বিশ জন শ্বেতাঙ্গ—দ্বাদশজন পূর্ণবয়স্ক নর-নারী এবং দ্বাদশটি বালক-বালিকা এলিয়ট উপসাগরের উপকূলভাগে এক নির্জ্জন স্থানে পোত হইতে অবতরণ করেন। সেই সময়ে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ছিল। উপনিবেশকামীরা এখানে আসিয়া দেখিলেন যে, স্থানটি আনন্দবর্জ্জিত। জলের ধারে গাছের নীচে বালক-বালিকারা অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল, পুরুষগণ তাঁহাদিগের আসবাবপত্র নামাইয়া লইতে লাগিলেন। পোতখানি তাঁহাদিগকে নামাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

এক জন তরুণী তাঁহার দুই মাসের শিশুপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একখণ্ড কাষ্ঠের উপর বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে তৃণহরিৎ দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্য প্রসারিত, দূরে দূরে তুষারশীর্ষ পর্ব্বত! এরূপ জনহীন স্থান তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু তরুণী তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, যে স্থান দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইতেছিল, কালক্রমে সেইখানে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে এবং ২৪ জনের পরিবর্ত্তে এক দিন তাহা ৪ লক্ষ নর-নারী, বালক-বালিকার কলরবে মুখর হইয়া উঠিবে! সে দিনের দৃশ্য দেখিবার জন্য তাঁহার ক্রোড়স্থিত দুই মাসের শিশু বাঁচিয়া থাকিবে? এই স্থানটি এখন সিয়াটেল নামে বিশ্ববিশ্রুত, ওয়াসিংটন রাজ্যের উহা প্রধান নগর।



সিডার বৃক্ষের মধ্যে বিসর্পিত মাউণ্ট বেকার রাজপথ



গম্ভুমময় শৈলের চূড়াদেশ

সিয়াটেল যেমন বসতিপূর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছে, সমগ্র ওয়াসিংটন রাজ্যও প্রায় তদ্রূপ। এক শত বৎসরের কম সময়ে অরণ্যভূমি হইতে তৃণশ্যামল রাজ্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে। ওয়াসিংটন রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী নগর স্পোকেন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উহার পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে ওয়াসিংটন রাজ্যের লোকসংখ্যা মাত্র ১২ হাজার ছিল; বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৫ লক্ষ।



সিয়াটেল প্রতিষ্ঠাতৃগণের অবশিষ্ট প্রাচীন শ্বেতাঙ্গ মিঃ ডেনি

ওয়াসিংটন রাজ্যের অন্তর্গত সান্‌জুয়ান দ্বীপপুঞ্জ। জনৈক নাবিক ঘটনাক্রমে এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সান্‌জুয়ান দ্বীপে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার নামানুসারেই উক্ত দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সরকারী আলোকগৃহ বা বাতিঘর নির্ম্মিত হয়।

জুয়ান ডি-ফুকা প্রণালীর এক প্রান্তে স্মিথ দ্বীপ অবস্থিত। এখানেও একটি বাতিঘর আছে। উল্লিখিত বাতিঘর নির্ম্মাণের কয়েক বৎসর পরে কয়েক দল ইণ্ডিয়ান পুনঃ পুনঃ উহা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের আক্রমণের চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত লৌহদ্বারে বিদ্যমান।

সান্‌জুয়ান দ্বীপপুঞ্জে যতগুলি দ্বীপ আছে, সকলের আয়তন সমান নহে। কোন কোনটির পরিধি ৫৮ বর্গ-মাইল হইতে আরম্ভ করিয়া একখানা কম্বলের আয়তনের অপেক্ষা বৃহৎ নহে। সান্‌জুয়ান নামক দ্বীপটির আয়তন ৫৫ বর্গ-মাইল। কিন্তু সেই স্থানের মধ্যে বড় বড় রাজপথ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রচি বন্দরে তৃণশ্যামল ক্ষেত্র-সমন্বিত শ্বেতধবল অট্টালিকাগুলি কবির স্বপ্নকেও যেন সার্থক করিয়া তুলে।

সান্‌জুয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অর্কাস্ দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানে মোরান্ পার্ক নামক একটি রমণীয় উদ্যান আছে। এখানে হরিণ, ভল্লুক এবং অন্যান্য আরণ্য জীব নিরাপদে প্রতিপালিত হয়। সরকার-রক্ষিত এই উদ্যান বা অরণ্য দেখিতে পরম রমণীয়।

ওয়াসিংটন রাজ্যে দ্বীপ ও পর্ব্বতশিখর পাশাপাশি বলিলেই চলে। উত্তর-আমেরিকায় সুকশাল পর্ব্বতের উচ্চতা ৯ হাজার ৩৮ ফুট। ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পর্ব্বত। উহার শিখরদেশ তুষারাচ্ছন্ন থাকে। এখানে ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

বেকার আগ্নেয়গিরি ১০ হাজার ৭ শত ৫০ ফুট উচ্চ।



প্রশান্ত মহাসাগরকূলে স্নান

বেলিংহ্যাম্ ওয়াসিংটন রাজ্যের চতুর্থ নগর। এই সহরের একটি পথ অতি মনোরম। সমগ্র রাজ্যে এমন চমৎকার রাজপথ আর নাই। নগরের মধ্যে বহু তৃণ-হরিৎ ক্ষেত্র বিদ্যমান। এই সহরে প্রচুর মৎস্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রতিদিন ৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের মৎস্য টিনে পূর্ণ করিয়া প্রেরিত হয়। অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে মৎস্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভোজনোপযোগী অবস্থায় টিনে পূর্ণ করা হইয়া থাকে। মৎস্য হইতে অনেকগুলি সহরের প্রচুর আয় হইয়া থাকে।

বেকার পর্ব্বত হইতে এখনও মাঝে মাঝে ধূম্রজাল নির্গত হইয়া থাকে। উহার শীর্ষদেশে চিরস্থায়ী তুষাররাজি বিরাজিত। "মাউন্ট বেকার ন্যাশনাল ফরেষ্টএর" পরিধি ১৫ হাজার বর্গ-মাইল। এই অরণ্য সুরক্ষিত। বেকার পর্ব্বত হইতে প্রশস্ত পথ বিস্তৃত হইয়া পর্ব্বতমালাকে বেষ্টন পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথ ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। 'হোয়াটকম্ কাউন্টি' নামক স্থানটি আমেরিকার হল্যাণ্ড নামে পরিচিত। এখানে প্রচুর বাল্‌ব বা আলোকগোলক তৈয়ার হইয়া থাকে। বিশ বৎসর ধরিয়া এতদঞ্চলে এই শ্রমশিল্প চলিতেছে। শুধু লিডেন নামক একটি ছোট সহর হইতেই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৪ খানা গাড়ী বোঝাই বাল্‌ব চালান গিয়াছিল। এতদঞ্চলে পুষ্পের প্রাচুর্য্য এবং এই বৈচিত্র্য পরম উপভোগ্য বলিয়া প্রতীচ্য দর্শকগণ বলিয়া থাকেন। ডচ্ ক্ষেত্রপতিগণ সস্ত্রীক, পুত্রকন্যাগণ সহ ক্ষেত্রে কায করিয়া থাকেন। সকলেরই চরণে কাষ্ঠ-পাদুকা। উক্ত কাষ্ঠ-পাদুকাগুলি ক্ষেত্রে কায করিবার সময় ব্যবহৃত হয়।



প্রায় শত বৎসরের পুরাতন ইংরাজ শিবির



সামুদ্রিক মৎস্য-শিকার

এতদঞ্চলে পক্ষিপ্রতিপালনব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার। বৎসরে অর্থাৎ ৩ শত ৬৫ দিনে প্রত্যেক কুক্কুটী ৩ শত ৫০টি ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এমন ব্যাপার কানাডার মুরগী ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ। সুতরাং ডিম্বের ব্যবসায়ও এতদঞ্চলে খুব জোরে চলিতেছে।

টাকোমায় যদিও অনেকগুলি বাহাদুরী কাঠের কল আছে, কিন্তু লংভিউ নামক স্থানের ঐ জাতীয় কলই প্রধান। বড় বড় কাঠ এখানে রপ্তানী হইবার জন্য আনীত হইয়া থাকে। লংভিউ সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হাজার

৫ শত ৬২। ৭০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বড় বড় কাঠ জলে ভাসাইয়া আনান হইয়া থাকে। ট্রেণে করিয়াও অনেক কাঠ আমদানী করা হয়। কলগুলিতে কি ভাবে কাঠ-চেরাই কাষ চলে, তাহা উপভোগ্য। অতি অল্পসময়ের মধ্যে বৃহদাকার কাঠগুলিকে চিরিয়া সমচতুষ্কোণ করিয়া ফেলা হয়।

কলম্বিয়া নদের অপর পারে ভাঙ্কুভার ওয়াসিংটন রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত উর্ব্বর। এখানে বড় বড় ক্ষেত্রে প্রচুর ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। ক্লার্ক কাউন্টি



কাষ্ঠ চালানের ব্যবস্থা

নামক স্থানে ৭ হাজার একর-পরিমিত ভূমিতে ফল উৎপাদিত হয়। তাহা ছাড়া সাধারণ কৃষিজাত পণ্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভাঙ্কুভারএর প্রাচীন দুর্গ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সেনা-বাহিনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেই সময়ে হড্‌সন উপসাগর কোম্পানীর জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ওয়াসিংটন রাজ্যে ভাঙ্কুভারই প্রথম শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ।

সিয়াটেল নগরকে প্রথমতঃ নিউইয়র্ক নাম দেওয়া হয়, কিন্তু পরে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সিয়াটেল নাম



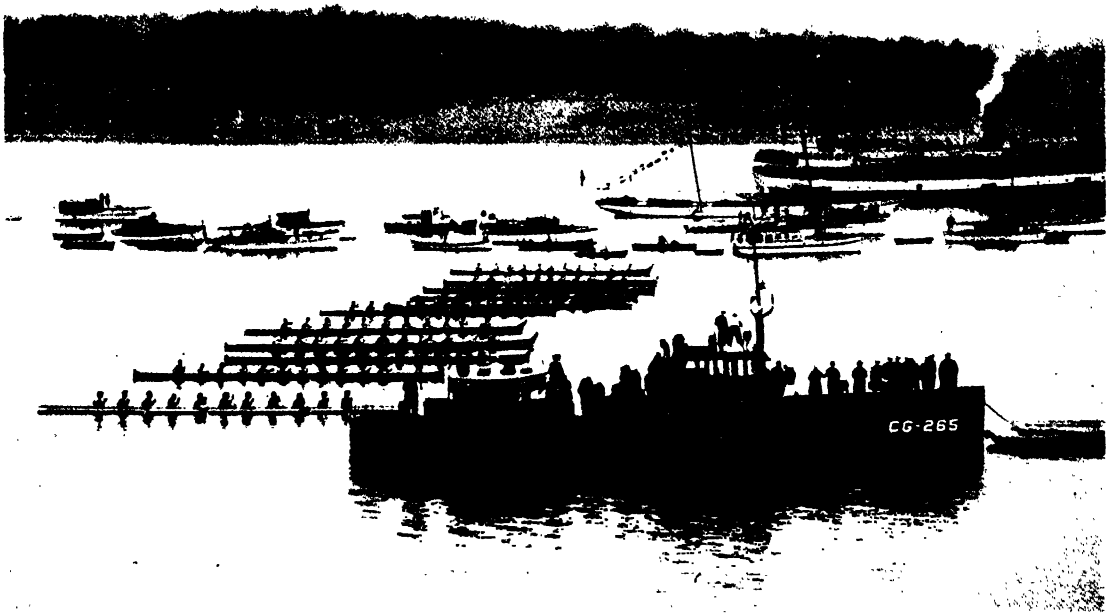
প্রাচীন যুগের পণ্যবাহী পোত

ধারণ করে। ঐ নামের এক জন ইণ্ডিয়ান্ ঔপনিবেশিক-দিগকে যুদ্ধকালে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ শোচনীয় আকার ধারণ করিত। সেই সময়ে যুক্তরাজ্যের একখানি রণপোত ছিল বলিয়াই রক্ষা। রণপোতখানি বর্ব্বর আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া না দিলে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকামীরা জয়লাভ করিতে পারিতেন না।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাস্কা হইতে প্রথম স্বর্ণপূর্ণ জাহাজ সিয়াটেল নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে সিয়াটেলের বিশেষ উন্নতি ঘটে। আলাস্কা যাইতে হইলে সিয়াটেলই প্রধান বন্দর বলিয়া দলে দলে এখানে মানুষ আসিতে থাকে। কিন্তু সে দিনের কথা এখন সিয়াটেলের মনে নাই। এখন নগরটি আপনার পায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া অতীত যুগের কথা চিন্তা



লংভিউ বন্দরে বিভিন্ন জাতীয় পোতে কাষ্ঠ বোঝাই



দেশীয় ইণ্ডিয়ানদিগের ডোঙ্গা

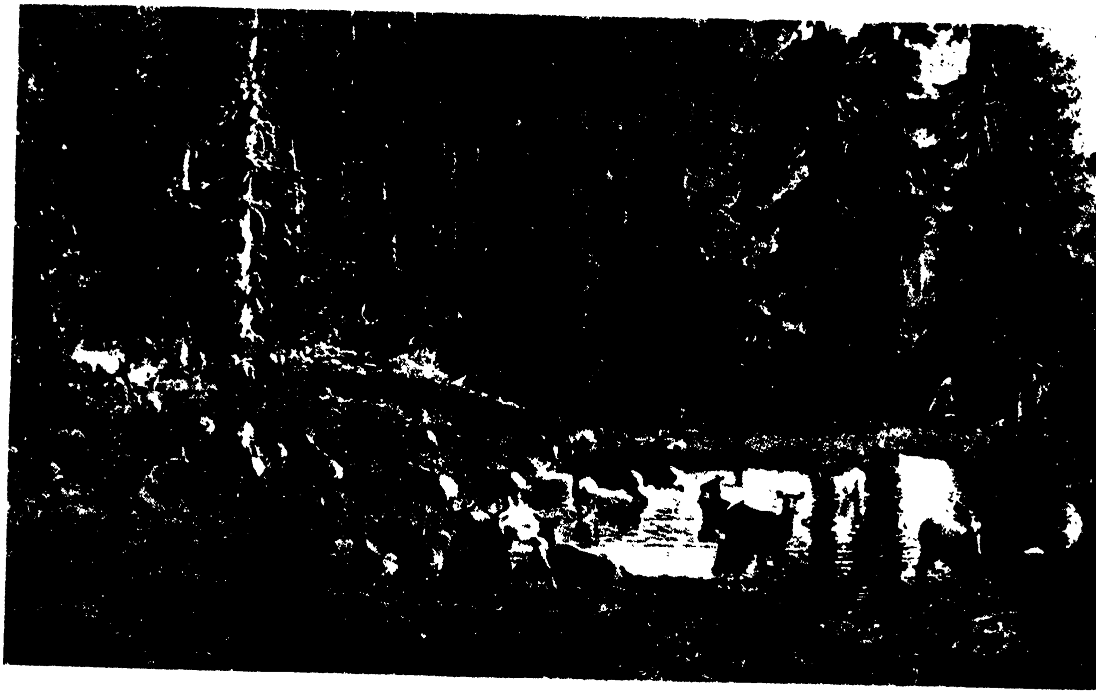
করিবার অবসর কোথায়? সিয়াটেলের কর্ম্মব্যস্ততা দেখিলে মানুষ বিস্মিত হইবে।

সিয়াটেলএ ৫ শত ৮২ একর-পরিমিত জমীতে ষ্টেটের বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ৭০টি প্রকাণ্ড অট্টালিকা তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন হইয়া দণ্ডায়মান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান অরণ্যপূর্ণ ছিল। এখনও কিয়দংশ স্থানে স্বাভাবিক অরণ্য আছে—উহা স্বেচ্ছাকৃত। ৭ হাজার ছাত্র এই অরণ্যে আসিয়া বনানী-সম্পদ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। সিয়াটেল নগর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া যখন সন্নিহিত জলবিস্তারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন মন আনন্দরসে মগ্ন হইয়া পড়ে।

এই নগরের ১ শত ৯৩ মাইল পর্য্যন্ত লবণাক্ত ও মিষ্টজলের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দর হইতে ১ শত ৯টি বিভিন্ন বাষ্পীয় পোত-শাখার পোতগুলি সমগ্র জগতে যাত্রা করিয়া থাকে। ইলিয়ট উপসাগরে যুক্তরাজ্যের ২ খানি রণপোত একসময়ে নোঙ্গর ফেলিয়াছিল। উপসাগরের গভীরতা ১ শত ৫০ ফুট হইতে ৯ শত ফুট পর্য্যন্ত। জলবিস্তারের অনতিদূরস্থ ভূভাগের উপর বোয়িং বিমান



লিণ্ডেনের কাষ্ঠপাদুকা-নির্ম্মাতা



মাউণ্ট অলিম্পসের অরণ্যে মৃগযূথ



তুষার-নদী অতিক্রম

কোম্পানীর কারখানা। এইখানে প্রায় এক হাজার শ্রমিক বিমান-নির্ম্মাণে রত। এত বড় বিমান-কারখানা যুক্তরাজ্যের কুত্রাপি নাই।

পাইক্ প্লেস্ নামক বাজারটি সমগ্র রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম। এই বাজারে সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। জাপানী তরুণীরা বাজারে রাঙ্গামাছ কাচের আধারে করিয়া বিক্রয় করিতেছে দেখা যাইবে। জার্ম্মাণ বিক্রেতারও অভাব নাই। ইণ্ডিয়ানগণকে রাজপথে দেখা না গেলেও বাজারে তাহাদের দর্শন মিলিবে।

ব্রিমার্টন সহর হইতে কঙ্করকঠিন রাজপথ অলিম্পিক মালভূমির দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই মালভূমিতে পাহাড় আছে, হ্রদ আছে, নদীও আছে। বৃহৎ অরণ্যানী সুদুর্গম। এখন এই মহারণ্যের মধ্য দিয়া পথ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। ব্রিমার্টন হইতে দক্ষিণদিকে হুডখাল বেষ্টন করিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার ধারে তৃণশ্যামল অরণ্য পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসৃত। পথের ধারে মনোরম গ্রাম, শস্যক্ষেত্র এবং ফলফুলের বাগান বিদ্যমান। জলের ধারে অনেক গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। অলিম্পস্

পাহাড় চির-তুষারে আচ্ছন্ন। টাউনসেণ্ট বন্দরে ওয়ার্ডেন দুর্গ আছে। এই দুর্গে কামান সংস্থাপিত আছে। কানাডা রাজ্যে প্রয়োজনকালে এখান হইতে গোলা নিক্ষেপ করা চলিতে পারে। এখানে কাঠের ব্যবসায় আছে।

এঞ্জেলেস্ বন্দরে তীরধনুক নির্ম্মিত হয়। দেশের প্রসিদ্ধ তীরন্দাজরা মাঝে মাঝে এখানে ধনুর্বিদ্যার ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইয়া থাকে। এঞ্জেলেস্ বন্দরের পর লোকের বসতি ক্রমেই অল্প দেখিতে পাওয়া যাইবে। অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা পর্য্যটককে বিমুগ্ধ করে। পাহাড়ে মাঝে মাঝে হরিণের দল দেখিতে পাওয়া যায়।

এলহোয়া নদীর তীরব্যাপী গভীর অরণ্য বিদ্যমান। ভল্লুক, মৃগ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তু এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোন উচ্চ পর্ব্বতে উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান। এই স্থানের বিস্তৃত অরণ্যে সভ্যতার কোনও আলোকই প্রবেশ করে নাই।



হোয়াটকম্ দেশীয় কুকুটী

ওয়াসিংটন রাজ্যের সর্ব্বত্রই শিক্ষার প্রচলন সমধিক। বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এজন্য অনেকে বহু অর্থও দান করিয়া থাকেন। রাজ্যের জনসাধারণের শতকরা এক জন, ১০ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক পড়িতে জানে না। কিন্তু যে সকল দেশীয় শ্বেত-সন্তান আছে, তাহাদের শতকরা ১জনের দশ ভাগের তিন ভাগও সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। এই শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য শিক্ষকগণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক না লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। যুক্তরাজ্যের মধ্যে অলিম্পিক মালভূমিতে অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। বৎসরে এতদঞ্চলে ৬০ ইঞ্চ হইতে ২ শত ৫০ ইঞ্চ বারিপাত হইয়া থাকে, অবশ্য স্থান-ভেদে। অলিম্পস্ পর্ব্বতশীর্ষে ২ শত ৫০ ইঞ্চ বারিপাত হয়। উক্ত মালভূমির অন্তর্গত বহু অরণ্যানী এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অনেক অরণ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল ও সেগুন গাছ বিদ্যমান আছে।



ইয়াকিমার রেলপথের একটি দৃশ্য

যে সকল শ্বেতাঙ্গ পূর্ব্বে এই সকল স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চাষবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী বিস্ময়োদ্দীপক। এফ, এন, ষ্ট্রীটার নামক এক জন শ্বেতাঙ্গ আলুর চাষ করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে স্তব্ধ হইতে হয়। সমুদ্রকূল হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে পৌঁছিয়া উক্ত অধ্যবসায়ী



শীতকালে সুড়ঙ্গপথে পান্থনিবাস প্রবেশ

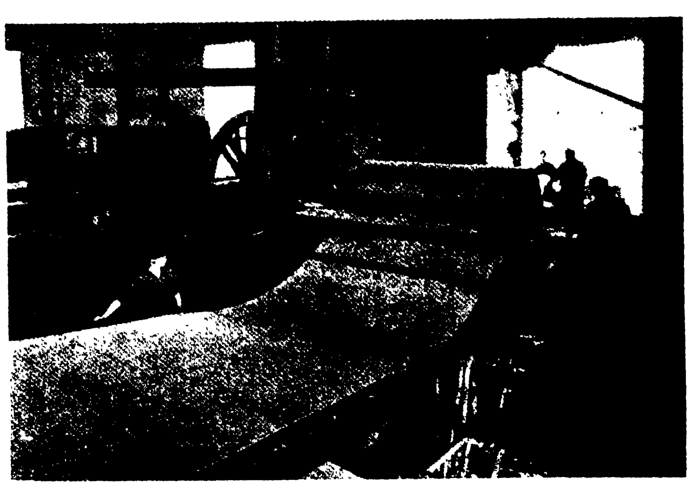
শ্বেতাঙ্গ আলুর চাষ আরম্ভ করেন। তার পর তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যান। সে সময় উক্ত ৬০ মাইল পথ শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া ষ্ট্রীটার-পত্নী পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

কোয়েনণ্ট নামক হ্রদের ধারে আবার্ডিন ও হোকোয়েয়াম্ নামক দুইটি নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দুইটি নগর বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং মৎস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। দুইটি নগরের মধ্যে মাত্র একটি রাজপথ ব্যবধান রচনা করিয়া রহিয়াছে !

অলিম্পিক অঞ্চলের প্রধান নগর অলিম্পিয়া। এখানে যে সকল সরকারী ভবন বিদ্যমান, সেগুলি যেমন প্রিয়-দর্শন, তেমনই বৃহৎ। এখানে অনেক মিল আছে, সেখানে কাঠ হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সিয়াটেল হইতে কেহ যদি মোটরযোগে দীর্ঘপথ যাত্রা করিতে চাহে, তবে তাহাতে কোন বাধা পাইতে হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়াও অনায়াসে মোটরযোগে পথ চলিতে পারা যায়। সিয়াটেল হইতে ইয়াকিমা পর্য্যন্ত মোটরযোগে যাইবার ইচ্ছা হইলে, ৩ হাজার ফুট উচ্চ স্নোকোয়ালিম নামক গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া মোটরে পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়। উহাতে ৬ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। স্নোকোয়ালিম ব্যতীত আরও পাঁচ ছয়টি গিরিসঙ্কট আছে। সে সকল পথেও অনায়াসে মোটরে গতায়াত করা যায়।

চিকাগো, মিলওয়াকি এবং সেণ্টপল রেলপথ এবং নর্থারণ প্যাসেফিক রেলবর্ত্ম স্নোকোয়ালমি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া অন্যান্য পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া বিস্তৃত। তন্মধ্যে একটি টানেল আছে, উহার দৈর্ঘ্য পৌনে ৮ মাইল। কাসকেডের উপর দিয়া মিলওয়াকি রেলপথ বিস্তৃত। উহার ২ শত ২০ মাইল পর্য্যন্ত বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত থাকে। পর্ব্বতমালা বাধার সৃষ্টি না করিয়া রেলপথের সাহায্যই করিতেছে।

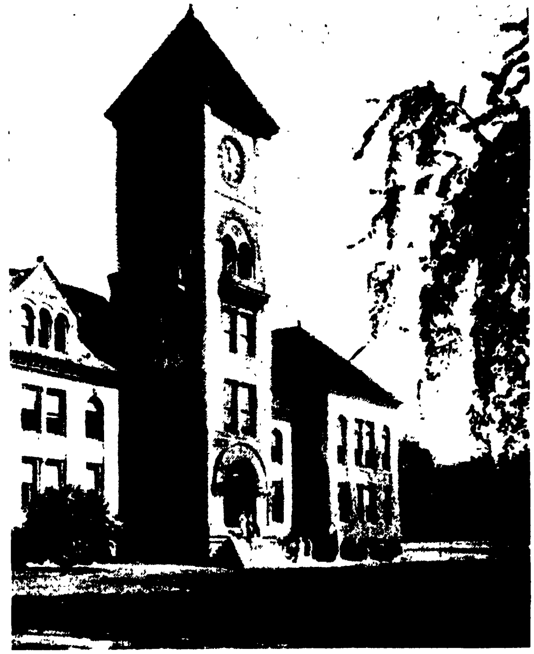


কাষ্ঠ হইতে কাগজের ন্যায় পাতলা চাদর বাহির হইতেছে

স্নোকোয়ালিম্ পথে—সিয়াটেল হইতে ইয়াকিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথে, স্নোকোয়ালেম নামক জলপ্রপাত আছে। উহা দেখিতে অতি মনোরম। ইয়াকিমা উপত্যকা হইতে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা কিচিলস্ নামক একটি কৃত্রিম হ্রদে সঞ্চিত হয়। উহার জল ফল-ফুলের গাছ রক্ষার



ভল্লুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি



হুইটম্যান কলেজ

জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তৃণশ্যামল অরণ্য ও ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পথ ক্রমে ধূসর অনুর্ব্বর প্রান্তরের মধ্য দিয়া মরুভূমি পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পথের ধারে ধারে জলস্রোত আছে। বন্ধুর শৈলময় খাতের মধ্য দিয়া স্রোতোধারা বহিয়া চলিয়াছে।

এই ভাবে কিছু দূর চলিবার পর আবার শ্যামল ক্ষেত্র, তৃণ-হরিৎ প্রান্তর, ফল-ফুলপূর্ণ উদ্যান নয়নপথে পতিত হইবে। শ্যামল ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মেষ চরিয়া বেড়াইতেছে, সে দৃশ্যও নয়ন-মনকে মুগ্ধ করিবে। তখন মনে হইবে, এবার স্বর্গোদ্যানে পৌঁছিয়াছি। ইহার নাম কিটিটাস্ জেলা।

কিটিটাস্ জেলার প্রধান সহরের নাম এলেন্‌স্‌বার্গ। এখানে সরকারী নর্ম্মাল স্কুল বিদ্যমান। প্রশস্ত মাঠের মধ্যে, বৃক্ষরাজিবেষ্টিত এই বিদ্যালয় দেখিতে মনোরম। এ স্থানে আসিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে, সহরের কয়েক মাইল দূরে মরুভূমি বিদ্যমান। এখন যে সকল



শীতকালে তুষারমণ্ডিত শিবিরের উপর আরোহণ



করাতের সাহায্যে বাহাদুরী কাষ্ঠ ছেদন



সুবৃহৎ কোয়াশ ফল

স্থান তৃণহরিৎ-ক্ষেত্রে সুশোভিত, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় অনুর্ব্বর মরুভূমি বিদ্যমান ছিল।

ইয়াকিমা নদীর পাশাপাশি রাজপথ বিস্তৃত। এলেনস্‌বার্গের দক্ষিণে ফলপরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যান বিরাজিত। পরিপক্ক আপেলগুলি গাছের ডালে ডালে ঝুলিতেছে, নানাবিধ ফল উদ্যানকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইয়াকিমা হইতে ৫২ হাজার গাড়ী-বোঝাই ফল জাহাজে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে



ইয়াকিমা উপত্যকায় ২০ ফুট উচ্চ গাছ



সালমন মৎস্য শিকার

এখানে মাত্র একটি কাঠের ঘর ছিল। বহুবৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্র পল্লীটি গৃহপালিত পশুতে পূর্ণ ছিল। জলের সুবিধা হইবা-মাত্র উহা বৃহৎ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অবলেট ফাদাররা প্রথম এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় এতদঞ্চলে প্রথম ফলের চাষ হয়।

ওয়াসিংটনের আপেল ফল দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয়। এজন্য উহাদিগকে মসৃণ কাগজে মুড়িয়া বাক্সবন্দী করা হয়। নারীরাই প্রধানতঃ এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। বাক্স-বোঝাই হইলে সেগুলির উপরে পেরেক মারিবার জন্য শ্রমিকদিগের কাছে বাক্সগুলি কলে নীত হয়।



স্পোকেমের নদীতীরস্থ রাজপথ

আপেল চাকা চাকা করিয়া টিনে বন্ধ করিবার প্রথাও বিশেষভাবে প্রচলিত। যে সকল প্রকাণ্ড ঘরে এই কার্য্য হয়, তাহা বাষ্পপ্রবাহের দ্বারা প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর ধৌত করা হয়। তার পর গরম জল ও শীতল জলে ঘরের প্রসাধনকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

ইয়াকিমা সহর আপেলের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপেল-নগরের নাম উইনাট্‌চি। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ১২ হাজার। এক বৎসরে এই নগর হইতে ২৪ হাজার ৩ শত ৮৬ গাড়ী বোঝাই আপেল রপ্তানী হইয়াছিল। ইয়াকিমা ও উইনাট্‌চি উভয় সহর হইতে ৪৫ হাজার ২ শত ২১ গাড়ী বোঝাই আপেল-ফল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী হয়। সমগ্র দেশের শতকরা ৪০ ভাগ এই দুই সহর হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে উইনাট্‌চি সহর হইতে মাত্র ২ গাড়ী বোঝাই আপেল প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কয় বৎসরে সেই নগরের অসম্ভব উন্নতি ঘটিয়াছে। ফলের উদ্যানপূর্ণ উইনাট্‌চি নগরের মধ্যে সুদৃশ্য বাংলো-গৃহগুলি ছবির মত দেখায়। প্রত্যেক বাংলোর পার্শ্ব দিয়া আঁকা-বাঁকা পথ চলিয়া গিয়াছে। উইনাট্‌চিতে বিমান-বন্দর আছে।

উইনাট্‌চির অনতিদূরে তুষারনদী এবং তুষারশীর্ষ গিরিমালার মধ্যে চেলান হ্রদ বিদ্যমান। ওয়াসিংটনের মধ্যে এই হ্রদই বৃহত্তম। উহার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল, প্রস্থ দেড় মাইল হইতে ৩ মাইল হইবে। হ্রদের উৎপত্তিস্থান অপেক্ষা শেষের অংশই বৃহৎ—৩ মাইল প্রশস্ত। এই হ্রদ এত



মটরশুঁটির ক্ষেত্র



উইট্‌নাচির কলম্বিয়া নদের বাঁধ



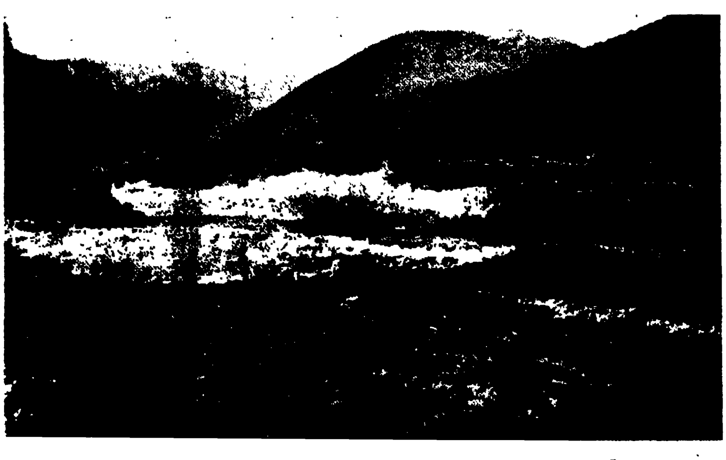
তুষারাবৃত সেণ্ট হেলেন পর্ব্বতের শীর্ষদেশস্থিত কক্ষ



গলিত তুষার হইতে উৎপন্ন হ্রদ

গভীর যে, কোন কোন স্থান সমুদ্রবক্ষ অপেক্ষা ৪ শত ফুট নিম্নে অবস্থিত।

উইনাট্‌চি হইতে ট্রেণে চাপিলে একবেলার মধ্যে ওয়াসিংটন রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী স্থানে উপনীত হওয়া যায়। এতদঞ্চলের নাম স্পোকেন। এখানে হ্রদ এবং নদ-নদীর বাহুল্য আছে। দেবদারু-অরণ্য, রহস্যপূর্ণ মরুভূমি, ছাগ-মেষপূর্ণ মালভূমি—সমস্তই এদিকে বিদ্যমান। ফল-ফুল-পূর্ণ উপত্যকাভূমি, সূর্য্যালোকসমুজ্জ্বল পর্ব্বত ও তাহার সানুদেশ, কোন কিছুরই অভাব এখানে নাই। স্পোকেনের প্রাচীন বংশের গৃহের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। নর্থওয়েষ্ট কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক



চেলান হ্রদ—ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অবস্থা

ডেভিড্ টমসন্ এখানে প্রথম ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রথমেই এই অঞ্চলের স্পোকেন জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা প্রচার করেন।

প্রথমতঃ এখানে ৪০ জন ঔপনিবেশিক ছিলেন; তাঁহারা স্পোকেন প্রপাতের সন্নিহিত স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুকের ভীষণ উৎপাত ছিল; গৃহপালিত পশুদিগকে প্রায়ই তাহারা মারিয়া ফেলিত। শত্রুরূপী ইণ্ডিয়ানরা



অলিম্পিয়ার সরকারী প্রাসাদ

যাহাতে শ্বেতাঙ্গগণকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য গ্রামের লোকরা রাত্রিকালে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

কিন্তু এখন স্পোকেন ওয়াসিংটন রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। ইণ্ডিয়ানগণ মেলার সময় আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে আসে। তাহা ছাড়া অন্য সময় তাহাদের দেখা পাওয়া যায় না। যে সকল পাহাড়ে হিংস্র জন্তু বিচরণ করিত, এখন সেখানে সুদৃশ্য ভবন এবং মনোরম উদ্যান-সমূহ [illegible]

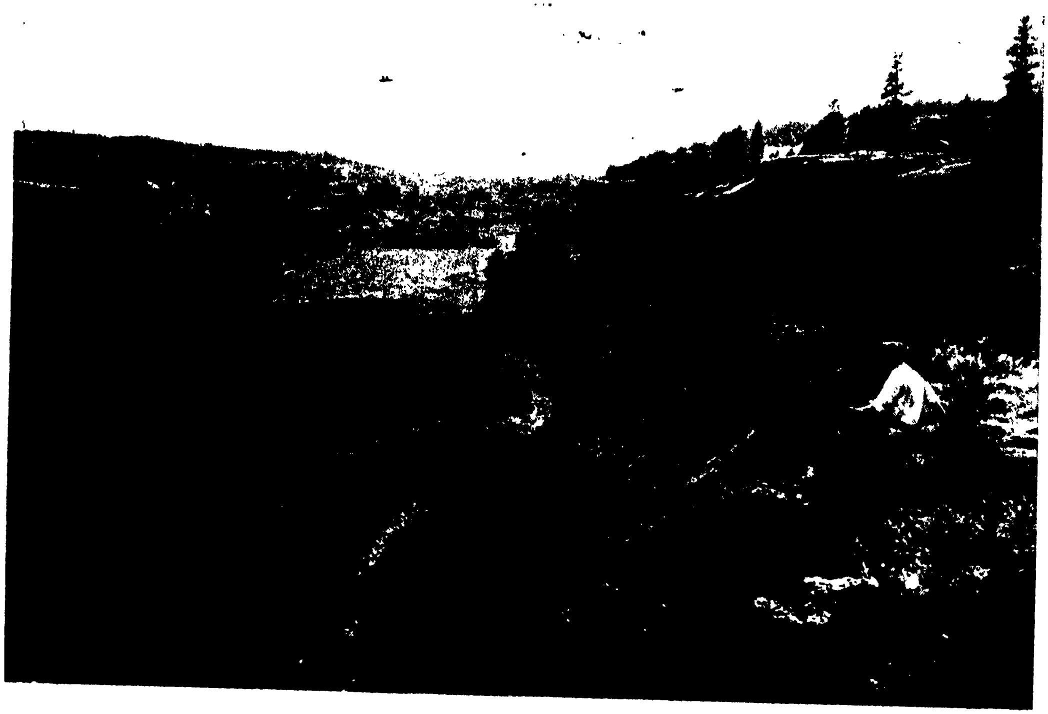
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সহরের ব্যবসাপ্রধান অংশে আগুন লাগিয়াছিল। তাহাতে ৩২টি পল্লী ভস্মীভূত হয়।

স্পোকেন অঞ্চলে, প্রায় ৫০ মাইলের মধ্যে ৬৫টি হ্রদ আছে। এই সকল হ্রদে ছিপে মৎস্য ধরিবার ধুম পড়িয়া যায়। বহু লোক মাছ ধরিবার জন্য এই সকল হ্রদে গমন করিয়া থাকে।

উত্তাল-তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণা স্পোকেন নদী সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। স্পোকেনের উপত্যকাভূমি অত্যন্ত

পুলম্যান্ সহরে ওয়াসিংটন সরকারের কলেজ আছে। পাহাড়বেষ্টিত স্থানে এই সুবৃহৎ কলেজ বিদ্যমান। কৃষি-বিদ্যা এবং পূর্ত্তবিদ্যাশিক্ষা এখানে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পুলম্যান এবং দক্ষিণপশ্চিমে ওয়ালা-ওয়ালা নগর। এই নগর ঐতিহাসিক বিবরণে পূর্ণ। ওয়ালা-ওয়ালার সন্নিহিত ওয়াইলাট ধর্ম্মপ্রচারকেন্দ্র। ডাঃ মার্কস্ হুইটম্যান এখানে সদলবলে থাকিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানরা তাঁহাকে সদলবলে (১৩ জন) হত্যা করে। উল্লিখিত



মরুভূমি শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত

উর্ব্বর। এজন্য শাক-সব্জী এবং ফল-ফুল তথায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সহরে কাঠের কল, কাগজের কল এবং দীপশলাকার কারখানা আছে। বিমানপোতাশ্রয়ও এখানে প্রসিদ্ধ।

মেটোলিন জলপ্রপাতের কাছে সীসা ও দস্তার খনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিগুলি যেখানে অবস্থিত, সে স্থান অরণ্যবহুল এবং শৈলবন্ধুর।

ধর্ম্মযাজকের বন্ধু রেভারেণ্ড কুসিং ইলস্ হুইটম্যান-নামক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বন্ধুর বীরত্বের স্মৃতিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন।

ওয়াসিংটন রাজ্যে ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটে নাই; অতি দ্রুত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এখনও উন্নতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। জীবন্ত কর্ম্মশক্তি যে কার্য্য করিতেছে, তাহা ওয়াসিংটন রাজ্য দেখিলেই যে কেহ বলিতে বাধ্য হইবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সত্যান্বেষী

১

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন ১৩৩১ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম, কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব।—এই সময়টাতে বাঙ্গালীর সন্তান অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে,—যদিও সে-স্বপ্ন ভাঙ্গিতেও বেশী বিলম্ব হয় না!

যাঁহারা কলিকাতা সহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয় ত জানেন না যে, এই সহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার ঘরের বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্য্যক্‌চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে, ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। ৮টা বাজিতে না বাজিতে দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়; তখন কেবল দূরে দূরে দু'একটা পাণ বা বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্ত্তির মত সঞ্চরণ করে এবং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে, সে-ও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই, এবং মেসের দ্বিতলে একটি বেশ বড় আলো-বাতাসভরা ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্তত: একবার করিয়া পুলিস-রেড্ হইয়া থাকে, তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষত: সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাযেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ীর বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ ছিল না; তাই ব্যক্তিগত-ভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপর তলায় সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে এক জন ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরীজীবী এবং বয়:স্থ; শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইঁহারা অনেক দিন হইতে এই মেসে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি এক জন কায হইতে অবসর লইয়া বাড়ী চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত—সেই সময় মেসের অধিবাসী-দের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনী বাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন,—তাঁহার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঘনশ্যাম বাবু। ঘনশ্যাম বাবু হারিয়া গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তার পর ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে, আহার প্রস্তুত, তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিরুদ্ঘাত শান্তিতে মেসের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল; আমিও আসিয়া নির্ব্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নীচের তলার ঘরগুলি লইয়া বাড়ীওয়ালা নিজে থাকিতেন। ইনি এক জন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—নাম অনুকূল বাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয়, বিবাহ করেন নাই, কারণ, বাড়ীতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনিই মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটী-ভাবে তিনি সমস্ত কায করিতেন যে, কোনও দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়ীভাড়া ও খোরাকী বাবদ পঁচিশ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়ীতে বড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করিত। আমিও অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা ১০টার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিস চলিয়া যাইতেন, বাসায় আমরা দুই জনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায়ই একসঙ্গে হইত, তার পর দুপুরবেলাটাও গল্পে-গুজবে সংবাদ-পত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত। ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিও তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা

শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন,—"আর ত কোনও কায নেই, ঘরে ব'সে ব'সে কেবল বই পড়ি। আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর, এক দিন বেলা আন্দাজ ১০টার সময় আমি ডাক্তার বাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনী বাবু পাণ চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন; তার পর ঘনশ্যাম বাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়া ঔষধ ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকী দুই জনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবুর কাছে তখনও দু'এক জন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশ্‌মাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাগজে কিছু খবর আছে না কি?"

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় পুলিসের খানাতল্লাসী হয়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে ত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হ'ল?"

"কাছেই'—৩৬ নম্বর। শেখ আবদুল গফুর ব'লে একটা লোকের বাড়ীতে।"

ডাক্তার বলিলেন,—"আরে, লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।—কি জন্যে খানা-তল্লাসী হয়েছে, কিছু লিখেছে?"

"কোকেন। এই যে পড়ুন না" বলিয়া আমি 'দৈনিক বসুমতী,' তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তার চশ্‌মা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"গতকল্য—অঞ্চলে ৩৬ নং—ষ্ট্রীটে সেখ আবদুল গফুর নামক জনৈক চর্ম্মব্যবসায়ীর বাড়ীতে পুলিসের খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে—সেখান হইতে সর্ব্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্তভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"কথাটা ঠিক, আমারও সন্দেহ হয়, কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু'একবার তার ইসারা আমি পেয়েছি—জানেন ত, নানা রকম লোক ওষুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।—কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে ত আমার কোকেনখোর ব'লে মনে হয় না। বরং সে যে পাকা আফিং-খোর, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি। সে যে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা অনুকূল বাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তার ত খুব সহজ কারণ রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ ক'রে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্ব্বদাই ভয়—পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে যান, তা হ'লে আপনাকে বাঁচ্‌তে দেওয়া আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস ক'রে দেন, তা হ'লে আমি ত জেলেই যাব, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি কি তা হ'তে দিতে পারি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম,—"আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি!"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাই ব'লে আমাকে অপরাধীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব'লে মনে করবেন না যেন।" বলিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি, পায়ের জুতা-জোড়াও কালীর অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক্ হইতে অনুকূল বাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শুনলুম, এটা একটা মেস্,—যায়গা খালি আছে কি?"

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূল বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না। মশায়ের কি করা হয়?"

লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"উপস্থিত চাকরীর জন্যে দরখাস্ত দেওয়া হয় আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগা সহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই—সব কানায় কানায় ভর্ত্তি হয়ে আছে।"

সহানুভূতির স্বরে অনুকূল বাবু বলিলেন,—"সীজ্‌নের মাঝখানে মেসে-বাসায় যায়গা পাওয়া বড় মুস্কিল। মশায়ের নামটি কি?"

"অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত চাকরীর সন্ধানে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটী-বাটি বিক্রী ক'রে যে-কটা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে এল—গুটি পঁচিশ-ত্রিশ বাকী আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন? তাই একটি ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশী দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে

যাবে—এই ক'টা দিনের জন্যে দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু যায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।"

অনুকূল বাবু বলিলেন, "বড় দুঃখিত হলাম অতুল বাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্ত্তি।"

অতুল একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি উড়েদের আড্ডায় একটু যায়গা পাই।—আর ত কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয় ত টাকাগুলো সব চুরি ক'রে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন ?"

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—"আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আপত্তি ? বলেন কি মশায়,—স্বর্গ হাতে পাব।" তাড়াতাড়ি ট্র্যাঁক হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল,—"কত দিতে হবে ? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভাল হ'ত না ? আমার কাছে থাকার—"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম,—"থাক, টাকা পরে দেবেন অখন—তাড়াতাড়ি কিছু নেই—" ডাক্তার বাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম,—"ইনি সঙ্কটে পড়েছেন, তাই আপাততঃ আমার ঘরেই না হয় থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্‌গদ স্বরে বলিল,—"আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি! কিন্তু বেশী দিন আমি কষ্ট দেব না—ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও যায়গা পেয়ে যাই, তা হ'লে সেখানেই উঠে যাব।" বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনার ঘরে ? তা—বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি আর কি বলব ? আপনার সুবিধাও হবে—ঘর-ভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"সে জন্যে নয়—উনি বিপদে পড়েছেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে ত বটেই।—তা আপনি আপনার জিনিষপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুল বাবু। এইখানেই আপাততঃ থাকুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিষপত্র সামান্যই—একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দরোয়ানের কাছে রেখে এসেছি—এখনই নিয়ে আসছি।"

আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ—স্নানাহার এখানেই করবেন।"

"তা হ'লে ত ভালই হয়"—কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূল বাবু অন্যমনস্কভাবে কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ভাবছেন, ডাক্তার বাবু ?"

ডাক্তার চমক ভাঙ্গিয়া বলিলেন,—"কিছু না।—বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

২

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূল বাবুর কাছে একটা বাড়্‌তি তক্তপোষ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিশে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দুজনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে নিত্য ওঠা-বসা; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তার পর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূল বাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর ভীড় কমিয়া গিয়াছিল; দু' এক জন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল। অনুকূল বাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। বিশেষ উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ' টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন,—"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তা হ'লে ওর কোমরে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেত না।—আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল; কোকেন কিনতে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয় ত তাদের পুলিসের ভয় দেখায়, blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যাস্, খতম্।"

অতুল বলিল,—"কে জানে মশায়, আমার ত ভারি ভয় করছে। আপনারা এ পাড়ায় আছেন কি ক'রে ? আমি যদি আগে জানতুম, তা হ'লে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"তা হ'লে উড়ের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি ত দশবারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না ব'লে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয় নি।"

অতুল ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন—না?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনী বাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"কি হয়েছে অশ্বিনী বাবু? আপনি এ সময় নীচে যে?"

অশ্বিনী বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"না, কিছু না—অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে—" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। প্রৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনী বাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম—তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম, অশ্বিনী বাবু পূর্ব্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটা চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর কেবল একটা বালিস ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে, মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না—তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও তাগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয় ত অতুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই, অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোনও অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনী বাবুর ঘর; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম, ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই ত! এত রাত্রিতে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইল,—হয় ত ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রিতে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনী বাবু কথা কহিতেছেন। একবার লোভ হইল, কাণ পাতিয়া শুনি, কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম,—হয় ত অশ্বিনী বাবু গোপনীয় কোনও রোগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ব্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল,—"কি, অশ্বিনী বাবু ঘরে নেই?"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"না। তুমি জেগে ছিলে?"

"হ্যাঁ। অশ্বিনী বাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন?"

"তুমি জান্‌লে কি ক'রে?"

"কি ক'রে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিসে কাণ রেখে মাটীতে শোও।"

"কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

"মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্ত্তার শব্দ কাণে আসিতে লাগিল। তার পর পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম। অনুকূল বাবু বলিতেছেন,—"আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।"

উত্তরে অশ্বিনী বাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু'জনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমিও ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম,—"ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল ত? অশ্বিনী বাবুর হয়েছে কি?"

অতুল হাই তুলিয়া বলিল, "ভগবান্ জানেন। রাত হ'ল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি মাটীতে শুয়ে-ছিলে কেন?"

অতুল বলিল, "সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হ'ল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্ত্তায় চটকা ভেঙ্গে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনী বাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়ীতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনী বাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল,—"ওহে, ওঠ ওঠ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"অশ্বিনী বাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস—" বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনী বাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূল বাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনী বাবু এত বেলা পর্য্যন্ত কখনও ঘুমান্ না। তাহা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন?

অতুল অনুকূল বাবুর নিকটে গিয়া বলিল,—"দেখুন, দরজা ভেঙ্গে ফেলা যাক। আমার ত ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বল্‌তে! ভদ্রলোক হয় ত মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন? আর দেরী নয়, অতুল বাবু, দরজা ভেঙ্গে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের শক্ত দরজা, তাহার উপর "ইয়েল্ লক্" লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই তিন জন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতী তালা ভাঙ্গিয়া পণ্ পণ্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনী বাবু উর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো ক্ষুর তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে।

নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনী বাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"কি ভয়ানক, শেষে অশ্বিনী বাবু আত্মহত্যা করলেন!"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তার পর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "আত্মহত্যা নয়, ডাক্তার বাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিস ডাকতে চললুম—আপনারা কেউ কোনও জিনিষ ছোঁবেন না।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"বলেন কি, অতুল বাবু—খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল,—তা ছাড়া ওটা—" বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন।

অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"তা হোক, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন—আমি এখনই পুলিস ডেকে আন্‌ছি!"—সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,"—উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হ'ল!"

৩

পুলিসের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজেহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না—যাহাতে অশ্বিনী বাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনী বাবু অত্যন্ত নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া যথানিয়মে অফিস্ করিতেন। দশ বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছু দিন হইতে তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতেছিলেন; এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূল বাবুও এজেহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনী বাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবানবন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনী বাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী আফিসে কায করতেন, একশ কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই ক'রে থাকেন।

"অশ্বিনী বাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোন বদ খেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই, মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি। তিনি গত কয়েক মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোন লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়েনি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তার-খানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনী বাবু এসে বললেন, 'ডাক্তার বাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি কথা?' তিনি এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চাপা গলায় বললেন, 'এখন নয়, আর এক সময়' বলেই তাড়াতাড়ি আফিস চ'লে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর আমি, অজিত বাবু আর অতুল বাবু আমার ঘরে ব'সে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিত বাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী বাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোন গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হ'ল অশ্বিনী বাবুর?

"তার পর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মত চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি আবল্-তাবল্ নানারকম কথা বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় ব'কেই চললেন। শেষে আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বললুম, 'আজ রাত্রিতে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি তখন ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,—তার পর আজ সকালে এই কাণ্ড! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

অনুকূল বাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা?"

অনুকূল বাবু বলিলেন, "তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? তবে অতুল বাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়—অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয় ত বেশী জানেন, অতএব তিনিই বল্‌তে পারবেন।"

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনিই না অতুল বাবু? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে?"

"আছে।"

"কি কারণ?"

"নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাস দেখেছেন,—ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।"

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

"না।"

"হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি?"

অতুল রাস্তার দিকের জানালাটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ জান্‌লাটা হত্যার কারণ।"

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন,—"জান্‌লা হত্যার কারণ? আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ঐ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল?"

"না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার বোধ হয় স্মরণ নেই যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

"স্মরণ আছে।"

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "তবে কি অশ্বিনী বাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন?"

"না, হত্যাকারী অশ্বিনী বাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।"

"সে কি ক'রে হ'তে পারে?"

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অনুকূল বাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ত! ঠিক ত! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকেনি। দেখছেন না, দরজায় যে 'ইয়েল্‌লক' লাগানো।"

দারোগা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তাও ত বটে—"

অতুল বলিল, "দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ভিতর থেকে ছাড়া খোলবার উপায় নেই।"

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "সে ঠিক। কিন্তু একটা যায়গায় খট্‌কা লাগছে। অশ্বিনী বাবু যে রাত্রিতে দরজা খুলে শুয়েছিলেন, তার কি কোন প্রমাণ আছে?"

অতুল বলিল,—"না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণ আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলেন।"

আমি বলিলাম,—"আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।"

দারোগা বলিলেন, "তবে? অশ্বিনী বাবু রাত্রিতে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও ত সম্ভব ব'লে মনে হয় না।"

অতুল বলিল, "না। কিন্তু আপনার বোধ হয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনী বাবু গত কয়েক মাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।"

"রোগে ভুগ্‌ছিলেন?—ওঃ! ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন অতুল বাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।" দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন, "আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না! এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন।—কিন্তু এ দিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তা হ'লে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁসিয়ার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের সন্দেহ হয়?"—বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূল বাবু বলিলেন, —"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায়ই একটা-দুটো খুন হয়, এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সামনে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সূতোয় গাঁথা,—একটার কিনারা হলেই অন্যটারও কিনারা হবে।—অবশ্য যদি অশ্বিনী বাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড ব'লে মেনে নেওয়া হয়।"

দারোগা বলিলেন,—"তা হ'তে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় ব'সে থাকলে বোধ হয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

অতুল বলিল, "দারোগা বাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তা হ'লে ঐ জানলাটার কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন,—"সব কথাই আমাদের ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে, অতুল বাবু।—এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাস করতে চাই।"

তার পর উপরে নীচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না- যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে পারে। অশ্বিনী বাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু' একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরটা তাঁহার নিজের, এটা অবশ্য প্রমাণ হইয়া গেল। কারণ, ক্ষুরের শূন্য খাপ্‌টা বিছানার পাশেই পড়িয়া ছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য্য করিতেন, এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনী বাবুর মৃতদেহ পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল—অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয়া শিল-মোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনী বাবুর বাড়ী 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্ররা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনী বাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীরভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়, কি? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দ্দিনটা কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধ-গম্ভীর-মুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিন্ত মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম,—"বাসার সকলেই ত মেস ছেড়ে চ'লে যাবার জোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূল বাবু বলিলেন,—"তাঁদের ত দোষ দেওয়া যায় না, অজিত বাবু। এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন!—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—একে খুন বলা যেতে পারে কি ক'রে? আর যদি খুনই হয়, তা হ'লে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা ত খুন সম্ভব হ'তে পারে না। প্রথমতঃ হত্যাকারী উপরে উঠ্‌ল কি ক'রে? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ ত আপনারা সকলে জানেন। যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল,—কিন্তু সে অশ্বিনী বাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করলে কি ক'রে? এ কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয়নি, এ কথা নিশ্চিত। তা হ'লে বাকি থাকেন কারা?—যাঁরা মেসে থাকেন! এঁদের মধ্যে অশ্বিনী বাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি? সকলকেই আমরা বহুকাল থেকে জানি—কেউ এ কায করতে পারেন না। অবশ্য অতুল বাবু অল্পদিন হ'ল এসেছেন—তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"অতুল—?"

ডাক্তার বাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—"অতুল বাবু লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

আমি বলিলাম,—"অতুল? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনী বাবুকে—"

ডাক্তার বলিলেন,—"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কায করতে পারেন না। তা হ'লে বাকি থাকে কি?—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও ত একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে—কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে, এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে?—এই সম্প্রদায়ের সর্দ্দার কে, তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ—মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এখন মনে করুন, অশ্বিনী বাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দ্দার হ'ন?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—"সে কি? তাও কি কখনও সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন,—"অজিত বাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রিতে অশ্বিনী বাবু আমাকে যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয়।—খুব সম্ভব, তিনি যে এই দলের সর্দ্দার, তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তাইতে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বল্‌তে পারে, হয় ত এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন!—ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না?"

এই অভিনব থিয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম,—"কি জানি, ডাক্তার বাবু, আমি ত কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিসকে খুলে বলুন।"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"কাল তাই বল্‌ব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

৪

দুই তিনটা দিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। মনের একান্ত অশান্তির উপর সি আই ডি বিভাগের বিবিধ কর্ম্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পলাই পলাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পলাইতেও সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিস তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইসারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল—পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না ত!

সে দিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্‌এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকার ছাপ মারা ছিল;

ডাক্তার বাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকা কিম্বা জার্ম্মাণী হইতে ঔষধ আনাইয়া লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অর্দ্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আপনি বিদেশ থেকে ওষুধ আনান্ কেন? দেশী ওষুধ কি ভাল হয় না?"

ডাক্তার বলিলেন,—"দেশী ওষুধও ভাল, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় না।"

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল,—"এরিক্ এণ্ড হ্যাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরী করে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?"

অতুল বলিল,—"হয় ত রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে, ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কায হয় কি না।"

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে না কি?"

"আছে" বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম,—"হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোন কিনারা হয় নাই; পুলিসের সি আই ডি বিভাগ এই হত্যা-রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।"

"ছাই হবে! ঐ আশা করা পর্য্যন্ত!" ডাক্তার বাবু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! দারোগাবাবু—"

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুই জন কনেষ্টবল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত দারোগা; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোন ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যাণ্ডকফ্ লাগাও।" এক জন কনেষ্টবল ক্ষিপ্র অভ্যস্তহস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল,—"এ কি!"

দারোগা বলিলেন,—"এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। আপনারা দু'জনে একে অতুলচন্দ্র মিত্র ব'লে সনাক্ত করছেন?"

নিঃশব্দে অভিভূতের মত আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়।—অজিত, কিছু ভেবো না—আমি নির্দ্দোষ।"

একটা ঠিকা গাড়ী ইতিমধ্যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিস সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন,—"অতুল বাবুই তা হ'লে—! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।"

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্দের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে, ক্ষোভে, মর্ম্মপীড়ায় আমি যেন দিগ্ভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে, লোকটা এতবড় একটা—"

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিষ-পত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভালবাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে, সে নির্দ্দোষ। তবে কি পুলিস ভুল করিল! আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রিতে অশ্বিনী বাবু হত হ'ন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝেয় বালিসের উপর কাণ পাতিয়া ডাক্তারের সহিত অশ্বিনী বাবুর কথাবা । শুনিতেছিল। কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তার পর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—একেবারে সকালে ঘুম ভাঙ্গিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি—

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে যে, এ খুন—আত্ম-হত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসী পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিম্বা, এমনও ত হইতে পারে, সে নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এ কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিস ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে, এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপ নানা চিন্তায়, উদ্ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বেলা ৩টা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকীলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত, কিছুই জানা ছিল না, উকীলও কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকীল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি—সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ—অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দ্দোষ, এ আন্দোলন মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে এক জন জামীন পাওয়া গেল—তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হ'ত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম, "উকীলের বাড়ী।"

অতুল সস্নেহে আমার একটা হাত চাপিয়া দিয়া বলিল,—"আমার জন্যে তার আর দরকার নেই, ভাই। আপাততঃ কিছু দিনের জন্যে ছাড়ান্ পাওয়া গেছে।"

দুজনে ঘরের মধ্যে আসিলাম। অতুল ময়লা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"উঃ, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া নেই। তুমিও ত দেখছি নাওনি খাওনি! বেচারি! চল চল, মাথায় দু'ঘটী জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দেওয়া যাক। নাড়ী একেবারে চুঁইয়ে গেছে।"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম,—"অতুল,—তুমি—তুমি—"

"আমি কি? অশ্বিনী বাবুকে খুন করেছি কি না?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল—"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটাও ধরেছে দেখ্‌ছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল,—"অনুকূল বাবু, ঘষা দোয়ানীর মত আবার আমি ফিরে এলুম। ইংরাজীতে একটা কথা আছে না—bad penny, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম,—পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"অতুল বাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিস আপনাকে নির্দ্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর—আপনার—। বুঝতেই ত পারছেন, পাঁচ জনকে নিয়ে মেস্। এম্‌নিতেই সকলে পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই—কিন্তু—"

অতুল বলিল,—"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা ত যায় না, পুলিস হয় ত শেষে আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জ্জে ফেল্‌বে।—তা, আজই কি চ'লে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন,—"না, আজ রাতটা থাকুন; কিন্তু কাল সকালেই—"

অতুল বলিল,—"নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব,—শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়া হোটেল আছেই।" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন, থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসা-ভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,—"অতুল বাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি—কিন্তু উপায় কি বলুন? একে ত মেসের বদ্‌নাম হয়ে গেছে—তার উপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি,—সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক, এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম,—"তা আপনার মেস, আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান-ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম; ডাক্তার লজ্জিত বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল,—"ওহে, দেখ ত, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখিলাম, বিলাতী তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "বিলিতী তালার ঐ মুস্কিল, ভাল আছেন ত বেশ আছেন, খারাপ হ'লে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দিশী হুড়কো ভাল। যা হোক, কালই মেরামৎ করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে অতুল বলিল, "অজিত, মাথা ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে—কি করি বল ত?"

আমি বলিলাম,—"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাও না।"

অতুল বলিল, "হোমিওপ্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে?—আচ্ছা চল, দেখা যাক—হুমো পাখীর জোর।"

আমি বলিলাম, "চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল,—"আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে—কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডাক্তার খুসী হইয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! পারি বৈ কি! পিত্তি প'ড়ে মাথা ধরেছে—বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারী হইতে নূতন ঔষধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া দিলেন—"যান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।—অজিত বাবু, আপনার চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না—উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে, না? শরীর টিস্-টিস্ করছে? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন—শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল,—"ডাক্তার বাবু, ব্যোমকেশ বক্সী ব'লে কাউকে চেনেন?"

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"না। কে তিনি?"

অতুল বলিল,—"জানি না। আজ থানায় তাঁর নাম শুন্‌লুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না, আমি তাঁকে চিনি না।"

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম,—"অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।"

"কি বলব?"

"তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না, সব কথা খুলে বলতে হবে।"

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তার পর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"আচ্ছা বলছি, এস, আমার বিছানায় ব'স। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম। আজ আমি নিজেই বলতুম।"

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতেই ছিল, ভাবিলাম, সেটা খাইয়া নিশ্চিন্ত-মনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল,—"এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তার পর খেয়ো।"

সুইচ তুলিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া অতুল আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিয়া অতুল বলিল,—"আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল সব কথা খুলে বলব।" রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।"

৫

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিজের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। অতুল যে জিনিষটি দিয়াছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোন শব্দ শুনিলাম না, কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইসারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় আসন্ন হইয়াছে।

তার পর কখন্ দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না; সহসা অতুলের বিছানার উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডাণ্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আলোর সুইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনই বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া—ডাক্তার অনুকূল বাবু!

অতুল বলিল,—"বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তার বাবু, আপনার মত পাকা লোক শেষকালে পাশবালিস খুন করলে!—ব্যস! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন! হ্যাঁ, নড়েছেন কি গুলী করেছি। অজিত, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দাও ত—বাইরেই পুলিস আছে।—খবরদার—"

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাঁহার চোয়ালে হাতুড়ির মত লাগিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটীতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল,—"বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি!"

"অপরাধ কি একটা, ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিস অফিসে তৈরী হয়েছে—ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাততঃ—"

চার পাঁচ জন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া দারোগা ও ইনস্‌পেক্টর প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল,—"আপাততঃ, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করবার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ্দ করছি। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু, ইনিই আসামী।"

ইন্‌স্‌পেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে,—আমারও টাকার অভাব নেই।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা ত নেই-ই। এত কোকেন বিক্রীর টাকা যাবে কোথায়!"

বিকৃত-মুখে ডাক্তার বলিল, "আমি কোকেন বিক্রী করি, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে বৈ কি ডাক্তার! তোমার সুগার অফ্ মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।"

জোঁকের মুখে নুণ পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্ত্তমধ্যে তেমনই কুঁকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল, এ যেন আমাদের সেই সাদাসিধা নির্ব্বিরোধ অনুকূল বাবু নহে, একটা দুর্দ্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এত দিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি, ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ওষুধ আমাদের দু'জনকে দিয়েছিলে, ঠিক ক'রে বল দেখি, ডাক্তার? মর্ফিয়ার গুঁড়ো—না? বলবে না? বেশ, বলো না,—কেমিকাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।" একটা চুরুট ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল,—"দারোগা বাবু, এবার আমার এজাহার লিখুন।"

* * * *

ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানাতল্লাস করিয়া দু'টি বড় বড় শিশিতে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "এখানে ত সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়—সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।"

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীর তে-তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী
সত্যান্বেষী

ব্যোমকেশ বলিল,—"স্বাগতম্। মহাশয় দীনের কুটীরে পদার্পণ করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্যান্বেষীটা কি?"

"ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিব কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি—সত্যান্বেষী। ঠিক হয় নি?"

সমস্ত তে-তলাটা ব্যোমকেশের—গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একলাই থাকো বুঝি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—"দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ?"

"প্রায় বছরখানেক,—মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্যে তোমাদের বাসায় স্থানপরিবর্ত্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি ষ্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আঃ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধ'রে ফেলেছিল।—দোষ অবশ্য আমারই!"

"কি রকম?"

"পুলিসের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা প'ড়ে গেলুম।—বুঝতে পারছ না? ঐ জানলা দিয়েই অশ্বিনী বাবু—"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আচ্ছা, তাই বল্‌ছি। কতক ত কাল রাত্রিতেই শুনেছ—বাকিটা শোন।—তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়ে চলেছিল, তা দেখে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্ণ্মেণ্ট, অন্য দিকে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে আরও অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বল্লুম,—'আমি এক জন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিব, আমার বিশ্বাস, আমি এই সব খুনের কিনারা করতে পারব।' কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন; সর্ত্ত হ'ল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জান্‌বে না।

"তার পর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুট্‌লুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জান্‌ত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই যায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশী ভালমানুষ ব'লে মনে হয়েছিল এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয় নি।

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হ'ল অশ্বিনী বাবু মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধ হয়, সে দিন রাস্তার উপর এক জন ভাটিয়ার লাস পাওয়া গিয়েছিল? ডাক্তার যখন শুনলে যে, তার ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য এমন একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তার পর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনী বাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে, অশ্বিনী বাবু আমাদের কথা শুনতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চ'লে গেলেন।

"অশ্বিনী বাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হ'ল, হয় ত তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কাণ পেতে যা শুনলুম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখেছেন। তার পর সে-রাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোনও কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকে রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনী বাবু নিজের জানলা থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন; আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝ্‌তে পারছ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জান্‌তে দিত না যে, সে এই কাযের সর্দ্দার। যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এই ভাবে সে এত দিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবতঃ ডাক্তারের দালাল ছিল, হয় ত তারই মারফতে বাজারে কোকেন সরবরাহ হ'ত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হ'তেও পারে। সে দিন রাত্রিতে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয় ত লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্টা করে—পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই—যেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছন পিছন গিয়ে তাকে শেষ ক'রে দেয়।

"অশ্বিনী বাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার বশে সে-কথা ডাক্তারকে বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয় ত তাকে সাবধান ক'রে দিতে চিয়েছিলেন। ফল হ'ল কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রিতেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না, বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে বললুম যে, ঐ জান্‌লাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, তখন সে বুঝলে, আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি। সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারেই ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সাবধানে দিন্ কাটাতে লাগলুম।

"তার পর পুলিস এক মস্ত বোকামি ক'রে বস্‌ল, আমাকে গ্রেপ্তার করলে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি আবার মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা;—কিন্তু সে-ভাব গোপন ক'রে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদারতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না।

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্য্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাসী ক'রে কোকেন বার ক'রে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হ'ত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে সুরু করলুম। দরজার তলায় পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ ক'রে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল—আমরা রাত্রিতে দরজা বন্ধ ক'রে শুতে পারব না।

"তার পর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দু'জনকে দু'পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমুব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি?"

* * * *

আমি বলিলাম,—"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?"

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা ত তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হ'ত না? এ বাসাটাও নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—"না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক যায়গায় না থাকলে আর মন টিঁকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ্‌-অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বল্‌ছ?"

"সত্যি বল্‌ছি!"

"তবে তুমি থাকো, আমি আমার জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসি।"

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল,—"সেই সঙ্গে আমার জিনিষ-গুলো আনতে ভুলো না যেন।"

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল)।

সন্ধ্যাপরী

দিবসের হোমশেষ তিলক পরি,
মন্দ-চরণে নামে সন্ধ্যা-পরী।
গুঞ্জরি-ঝিল্লীর মঞ্জীর ধীর,
কুঞ্জে লাগাল সে যে পূরবীর মীড়।

গায়ে তার তারাদার নীল জামিয়ার,
গলে দোলে জোনাকীর জড়োয়ার হার।
বিকচ কুমুদ চুমে তারি পদতল,
থাকি থাকি আগমনী গায় পাখীদল।

তারি তরে ঘরে ঘরে বাজে শুভশঙ্খ,
ঝাটেপাটে জলছাটে, হাসে গৃহ-অঙ্ক।
পল্লীর বধূ জালি উজ্জ্বল দীপ,
ললাটে পরায় তার সিন্দুর-টীপ।

গলে দিয়ে অঞ্চল জুড়ি দুই হাত,
ধূপ-ধূমে পূজি তারে করে প্রণিপাত।
কাল তার কেশরাশি এলায়ে ধীরে,
ত্বরা সে যে ঢেকে দিল ধরা-খানিরে।

আলুগোছে চুপি চুপি চোখের পাতায়,
এইবার যেন সে গো হাতটি বুলায়।
ঢুলু ঢুলু আঁখি তাই ঘুমের নেশায়,
নিদালীর মিঠে সুরে নদী গান গায়।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।



বিপ্লববাদ

বিপ্লবী হিংসাবাদীর জিঘাংসা-নীতির জন্ম প্রতীচ্যে, প্রাচ্যে কোন যুগে ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া ইতিহাস পরিচয় দেয় না। বর্ত্তমানে ইহা এ দেশে আমদানী হইয়াছে এবং চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে বিপ্লবীর হিংসালীলার অভিনয় হইতেছে। ইহার কারণ কি? প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাকে মানুষের একটা রোগ বলিয়া মনে করেন। বিকৃতমস্তিষ্ক অসন্তুষ্ট মানুষ সমাজের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহে, সমাজের কোন ব্যবস্থা ইহার জন্য দায়ী নহে, ইহা সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝাইতে চাহেন। কিন্তু সমাজের ব্যবস্থার যদি কোন দায়িত্ব না থাকে, তবে সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বিপ্লবী আততায়ী গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিল কেন? মার্কিণ গণতন্ত্রমূলক শাসনভারপ্রাপ্ত স্বাধীন দেশ। সেখানে সমাজের ব্যবস্থায় জনসাধারণ সন্তুষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তথাপি এরূপ হত্যা চেষ্টা হয় কেন? আর ইহা প্রথম হত্যা-



প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

চেষ্টা নহে, ইহার পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট আততায়ীর অস্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত আছে। যে এনার্কিষ্ট মিঃ রুজভেল্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নাম জো জিঙ্গারা, সে জাতিতে ইটালীয়ান। সে নাকি বলিয়াছে যে, সে পূর্ব্বে ইটালীর রাজাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও সে বলিতেছে, সে সমস্ত প্রেসিডেন্ট ও সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবে। কেন? সমাজের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলে সে এমন কথা বলিত না, এমন কাযও করিত না, ইহা নিশ্চয়। রাসিয়ার নিহিলিষ্টরা জার-শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না বলিয়াই জিঘাংসাপরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বলশেভিক শাসনে জনগণ সন্তোষ লাভ করিয়াছে বলিয়া 'নিহিলিজম্' আর নাই। ইটালী ও সিসিলির বিপ্লবীরাও এই শ্রেণীর লোক, তাহারাও স্বৈরাচার-শাসনে সন্তুষ্ট নহে, তাহারাও নরহত্যা দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে চাহে। জো জিঙ্গারা যে তাহাদেরই দলের দশ জনের এক জন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেসিডেন্টের প্রতি তাহার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না, সে সকল প্রেসিডেন্টকেই হত্যা করিতে চাহে। অর্থাৎ এনার্কিষ্টরা সমাজের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাহে। সে পরিবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত হউক বা না হউক, তাহা তাহারা দেখিতে চাহে না বলিয়া মনে হয়।

এরূপ মনোবৃত্তি যেখানে, সেখানে দূরবিসারী ধর্ষণনীতি চালাইলে কোন সুফল দেখা দেয় কি? জার-শাসিত রাসিয়ায় ধর্ষণনীতির চরম হইয়াছিল। তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? মার্কিণ যুক্তরাজ্যের চিকাগো প্রমুখ বড় বড় সহরে 'গ্যাংষ্টাররা' করে না, এমন পাপ কায জগতে নাই বলিলেই হয়। লিণ্ড-বার্গের শিশু-হরণ ও হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়া ধনী মহাজনের কাছে টাকা আদায় পর্য্যন্ত পাপকায মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যতটা আচরিত হয়, ততটা জগতের কুত্রাপি হয় কি না সন্দেহ। তাহার পর মোটর-ডাকাতী, ব্যাঙ্ক-লুঠ, ব্যাঙ্কফেল, রেল-ডাকাতী,—এ সব ত আছেই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এমন দেশে কেহ অর্ডিনান্সের কথা মুখেও আনে না। অথবা যত্রতত্র ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী বা বিচারে অব্যাহতিলাভের পরেও গ্রেপ্তার ও আটক প্রভৃতি ব্যবস্থার বালাইও নাই! সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সে দেশে এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক থাকিতেও ছেলের পাপে বাপের দণ্ডের মত অদ্ভুত শাস্তির আইন আজিও আবিষ্কৃত হইল না।

তাজে অপব্যয়

'নেচার' পত্রের সম্পাদক সার রিচার্ড গ্রেগরী তাঁহার কাগজের এক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে যে টাকাটা অপব্যয় করা হইয়াছে, তাহা ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্নের অন্নসংস্থানে ব্যয়িত হইলে কত সুখের হইত!

'নেচার' পত্রখানি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পূর্ণ থাকে, সার রিচার্ডও স্বয়ং বৈজ্ঞানিক, সুতরাং মানুষের পেটের সংস্থানের পক্ষে যত প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যাইতে পারে, তিনি

সেই দিক্ দিয়াই জগতের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। পাউণ্ড শিলিং পেন্সের সদ্ব্যবহার কোন্ দিকে হয়, তাহা তাঁহাদের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই ভাবে সিদ্ধান্ত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া মানুষ-মারা বিষবাষ্প ও অন্যান্য মারণাস্ত্র আবিষ্কারেও কি মানুষের পেটের অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভাবিত হয় বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন ?

কেবল বিজ্ঞান লইয়াই মানুষ বাঁচিতে পারে কি না, তাহাও ত বিবেচ্য। সাহিত্য ও শিল্পকলাও কি মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে ? তাঁহাদের দেশেও কি চিত্রশিল্প, ভাস্কর-বিদ্যা, পার্থিব প্রেমের স্মৃতিরক্ষা প্রভৃতির কোন মূল্য নাই ? তাঁহারই দেশের কোন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার মৃত্যুর স্মৃতি তাজের ন্যায় স্মৃতিসৌধের মারফতে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি এই দণ্ডে মরিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহারই দেশের সৌন্দর্য্যের উপাসক তাজকে 'মর্ম্মর-স্বপ্ন' (a dream in marble) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং মানুষের পেটের খোরাক ছাড়া মনের তৃপ্তির খোরাকেরও যে প্রয়োজন নাই, এ কথা তিনি কিরূপে বলেন ? যদি তাঁহার কথাই মানিতে হয়, তাহা হইলে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের কি প্রয়োজন ছিল ? নয়া দিল্লী, কার্জ্জন পার্ক, ইডেন উদ্যান, হাইড পার্ক, নেলসন মনুমেণ্ট, অক্টারলোনি মনুমেণ্ট প্রভৃতিরই বা কি প্রয়োজন ? এ সকলে কি মানুষের পেটের অন্ন-সংস্থান হয় ?

প্রায় দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের লোক দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে মোগল আমলেও যে তাহাদের সেই অবস্থা ছিল, তাহার প্রমাণ তিনি দিতে পারেন না। তখন লোক অন্ন যে অন্নবিধাই ভোগ করুক, দুই বেলা দুই মুঠা পেট পূরিয়া খাইতে পাইত। দুর্ভিক্ষও তখন ঘন ঘন দেখা দিত না। এ কথার প্রমাণ আছে। সুতরাং সে সময়ে প্রেমিক সমর্থ স্বামীর পক্ষে প্রেমময়ী পত্নীর স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করা অপব্যয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি ? এরূপ সৌধ-নির্ম্মাণে বিস্তর লোক অর্থার্জ্জন করিয়া পেটের অন্নসংস্থান করিত। অযোধ্যার কোনও নবাব এক দুর্ভিক্ষের সময়ে লক্ষ্ণৌ সহরে এক ইমামবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে দিনে যতটুকু নির্ম্মিত হইত, রাত্রিতে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। আবার পরদিন নূতন করিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করা হইত। উজীর ইহাতে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, যদি ইহা না করা হয়, আর যদি শীঘ্র নির্ম্মাণকার্য্য সাঙ্গ হয়, তবে কারিগর মজুররা এই দুর্ভিক্ষের সময় কোথায় কায পাইবে, কিরূপেই বা উদরান্ন সংস্থান করিবে ? এই হেতুই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' কথাটির সার্থক অস্তিত্ব ছিল।

বর্ত্তমানের কলকারখানার যুগে অতিরিক্ত mechanisation ও industrialismএর ফলে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অতি-মাত্রায় অধিক হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, কাযেই বেকার ও নিরন্নের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কাযেই এ দেশে 'তাজ' নির্ম্মিত না হইলে বরং বেকারের অন্নসংস্থানের উপায় আবিষ্কৃত হয় না, পরন্তু সার রিচার্ডের দেশে 'ইণ্ডিয়া আফিস' নির্ম্মাণে এ দেশের লোকের উপকার সাধিত হয় না, সার রিচার্ড এ কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

নির্ব্বাচনের ফল

মিঃ ডি ভ্যালেরা সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে ২৮টি ভোটের জোরে (তাঁহার ৮৪টি, বিপক্ষদের ৫৬টি) দ্বিতীয়বার আইরিশ ফ্রি-ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে এবং উহার প্রচারকার্য্যে যে সকল সভা হইয়াছিল, তাহাতে নারীর সংখ্যা সমধিক হইয়াছিল। সুতরাং বুঝা যায়, মিঃ ডি ভ্যালেরার জনপ্রিয়তা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। অধুনা রাজনীতিক্ষেত্রে নারীর প্রভাব অসামান্য, ইহা প্রায় সকল দেশেই দেখা যাইতেছে। তাই মনে হয়, মিঃ ডি, ভ্যালেরার এই জয় ক্ষণ-স্থায়ী হইবে না, এখন কিছুদিন তিনিই আয়র্‌ল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত মূল নীতি কি হইবে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।



মিঃ ডি, ভ্যালেরা

মিঃ ডি, ভ্যালেরা পূর্ব্বাপর যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, "ভবিষ্যতে তিনি (১) উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের মিলনের এবং এক অখণ্ড জাতীয়তাবাদী আয়ার্‌ল্যাণ্ড গঠনে উদ্যোগী হইবেন, (২) রাজানুগত্য শপথ পরিহার করিবেন এবং (৩) যতক্ষণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সালিশের দ্বারা ব্যবস্থার পথ নির্দ্দিষ্ট না হয়, ততক্ষণ ভূমিঘটিত বাৎসরিক দেয় বৃটেনকে দিবেন না।"

সুতরাং আইরিশ সমস্যা জটিল হইয়াই রহিল বলিতে হইবে। তবে পরিণামে ন্যায় ও সত্যের জয় যে হইবেই, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়।

প্রচারকার্য্য

লর্ড নর্থক্লিফ ও লর্ড রেডিং এবং তাঁহাদের পরে লর্ড বিভারব্রুক ও লর্ড রদার-মিয়ারের দল বিলাতের বাহিরে নানাদেশে ভারতের বিপক্ষে এবং বৃটিশ শাসনের পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মিস মেয়ো ও মিস কেণ্ডালের নর্দ্দামা ঘাঁটার দলও আছেন। বিশ্বদূত রয়টার তাঁহাদের কথাগুলি তারে সর্ব্বত্র ছড়াইতে ক্রটি করেন নাই। যাহাতে ভারতের কুৎসা-গ্লানি প্রচারের উপযোগী মালমশলা আছে এবং যাহা জানিতে পারিলে জগতের নিরপেক্ষ জাতিরা ধারণা করিতে পারে যে, ভারতবাসী এখনও স্বায়ত্তশাসনাধিকারের উপযুক্ত হয় নাই,—তাহা প্রচার করিতে এত আগ্রহ আর কাহারও দেখা যায় না।



শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল

কিন্তু মজা এই যে, ভারতের পক্ষে কেহ দু'কথা বলিলে রয়টার অমনই বধির হন! সুবিধাবুঝিয়া বধির হওয়ার রোগ কাহারও কাহারও আছে। রয়টারের এই রোগের ফলে ভারতের ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল মার্কিণ দেশে গিয়া ভারতের পক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই এ দেশের লোক জানিতে পারে নাই। তিনি বহু জনাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বহু মার্কিণ নরনারী একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড উহা না জানাইলে আমাদের তাহা জানিবার সম্ভাবনা হইত না। তিনি বলিয়াছেন, এ যাবৎ বহু ভারতীয় শ্রীযুক্ত পেটেলের পূর্ব্বে ভারতের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ভারতের প্রাণের কথা এমন ভাবে কেহই বলিতে পারেন নাই। ভারতের শাসনব্যাপারে তিনি যতটা ওয়াকিবহাল, এতটা আর কাহারও পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নিরপেক্ষ দর্শকের নিকট বলা যতটা সম্ভবপর, এতটা আর কেহ বলিতে পারিবেন, এমন মনে হয় না।

কিন্তু যিনি সারা বিশ্বে সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য পয়সা লইয়া ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, সেই রয়টার এ বিষয়ে কূটস্থ চৈতন্যের মত নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ কেন?

দেবতার বেলা লীলাখেলা

ধনী মালিকদের ব্যবস্থার প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করা সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর, পরন্তু শান্তি-শৃঙ্খলার বিষম অন্তরায় বলিয়া প্রতীচ্যের রাজনীতিশাস্ত্রে বিবেচিত। তাহা ছাড়া ধর্ম্মঘটমাত্রেরই মূল যে রাসিয়ার কম্যুনিষ্ট চক্রান্ত, ইহাও জগতের লোককে জানান হয়। সকল সময়েই যে ধর্ম্মঘটীরা নিরীহ নির্দ্দোষ, এমন কথা কেহ বলে না। হয় ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের আন্দোলনের মূলে অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অতিরঞ্জনও ভয়প্রদর্শন থাকিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়েই অপরাধী, আর মস্কোএর ষড়যন্ত্রই যে তাহাদের উত্তেজনার মূল, এ কথা বিশ্বাস্য নহে।

ধর্ম্মঘটের সহিত কম্যুনিজম, অথবা কখনও কখনও রাজদ্রোহও জড়ান হয়। কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্সের সিভিল সার্ভিসের—ষ্টেট ও পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের রাজকর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিল, উহার মূলেও কি রাসিয়ার কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র অথবা ষ্টেট বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ আছে? এই রাজকর্ম্মচারীদের বেতন কর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছিল। অমনই তাহারা একযোগে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষম হুজুগ বাধাইল। প্যারী সহরের টেলিফোঁর তার কাটা গেল, ফলে বাহিরের জগতের সহিত প্যারীর সম্বন্ধ কিছু কালের জন্য ঘুচিয়া গেল। বাস-ট্রাম ইত্যাদি ১০ মিনিটের জন্য বন্ধ হইল। সরকারী দপ্তর-সমূহের কর্ম্মচারীরা একই সময়ে একযোগে ১ ঘণ্টাকাল কলম ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইয়া সিবিল সার্ভাণ্টরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মুসিয়ে ডিলাডিয়ে রুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন,—"সিবিল সার্ভ্যাণ্টরা ষ্টেটের কাছে চুক্তিবদ্ধ হইয়া কায গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদরূপে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতে পারে না, করিলে ষ্টেট তাহা গ্রাহ্য করিবে না।"

ধমক ত দেওয়া হইল। কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, আন্দোলন ভঙ্গ করিবার জন্য, সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্য এখানে ত বন্দুক-বেয়নেটের বা লাঠি-বেটনের আবির্ভাব হইল না। দেবতার বেলায় লীলাখেলা বলিয়া কি?

জেহোলে চীন জাপান

প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে চীন ও জাপানে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিণাম জগতের পক্ষেও ভয়াবহ হইতে পারে। এই দুই প্রাচ্য জাতি পরস্পরের প্রতিবেশী, উভয়েরই একই

মঙ্গোলীয় জাতি হইতে উদ্ভূত, উভয়ে একই ধর্ম্মের উপাসক, আচার-ব্যবহারেও প্রায় এক। বিশেষতঃ প্রবল প্রতীচ্য শক্তিগণের লোলুপ রসনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে উভয়ে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিধির বিধানে ইহার বিপরীত হইয়াছে, স্বার্থের বিকৃত কল্পনা করিয়া জাপান চীনের রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই উভয় জাতির যুদ্ধও অদ্ভুত। সাংহাই ও উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় যখন উভয় পক্ষের মনোমালিন্য ও মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গুরু প্রতীচ্য শক্তিগণের প্রথা অনুসরণ করিয়া ডিপ্লোমেসি ও আলটিমেটারের পঁয়তাড়া কসে নাই, একবারে সরাসরি রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এবারেও তাই হইয়াছে।

শুনা গেল, জাপান জাতিসঙ্ঘের গঠিত উনবিংশতি কমিটীর রিপোর্ট মানিবে না, অথবা মাকিণ বা রাসিয়ার ন্যায় জাতিসঙ্ঘের বাহিরের লোকের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে না। ইহাতে যদি তাহাকে জাতিসঙ্ঘের সদস্যগিরিও ছাড়িতে হয়, তাহাও স্বীকার। জাপান জাতিসঙ্ঘের দরবারে জানাইল, তাহার লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, আর সকলের ক্ষুদ্র জাপানে স্থান হয় না, সকলের সে দেশে অন্নসংস্থানেরও সুযোগ ও সুবিধা হয় না। কাযেই তাহার গুরুদের প্রদর্শিত উপনিবেশ রাজ্যের ও বাণিজ্যের বিস্তার অন্যত্র না হইলে আর চলে না। ইহার চরম সুবিধা পার্শ্বের বিরাট চীনসাম্রাজ্যে। কোরিয়া দেশ ও লাইওইয়াং উপদ্বীপ ত মুখবিবরগ্রস্ত হইয়াছেই, কিন্তু উহাতেও আর কুলাইতেছে না। এই জন্য উহার পার্শ্বের মাঞ্চুরিয়াটা পাইলেই হইল। সেখানে চীনা ডাকাতদের বড় উপদ্রব, বিদেশীরা স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ও অবাধে বাণিজ্য করিতে পায় না, বিশেষতঃ জাপানীদের বিরুদ্ধে সেখানে বয়কট চালান হইতেছে। অতএব সেখানে গুরুদের মহৎ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা চাই। জাপানও রাসিয়ার সহিত যুদ্ধের পর জাতে উঠিয়াছে, সেও এখন প্রতীচ্যের ঈশ্বরজানিত অভিভাবক জাতিদের দশজনের একজন হইয়াছে, সুতরাং তাহার রাজ্যের সান্নিধ্যে অশান্তি দেখা দিলে তাহাকে পুলিসের কায ত করিতেই হইবে।

প্রথমটা উত্তর-মাঞ্চুরিয়া। সেখানে 'শান্তি' স্থাপিত হইল। তাহার পর মাঞ্চুকুয়োর 'স্বাধীন' রাজ্য প্রতিষ্ঠা। দুষ্ট চীন কিছুতেই মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতা মানিবে না, সে বলে, মাঞ্চুকুয়ো 'আমার'। এত বড় অত্যাচার বেচারী জাপান সহ্য করে কিরূপে? কাযেই বাধ্য হইয়া জাপান ঘোষণা করিল,—মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ সীমানার জেহোল অঞ্চলটা চীনকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নতুবা ২৫শে ফেব্রুয়ারী জেহোল দখল করা হইবে। জাপানের প্রতিনিধিরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যটাও জাতিসঙ্ঘকে বুঝাইয়া দিলেন,—"জেহোল অভিযানের উদ্দেশ্য হইল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের ওদিকে আমাদের অভিযান করার অভিপ্রায় নাই। তবে যদি নেহাৎ সামরিক সুবিধার জন্য উহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগত্যা দায়ে পড়িয়া উহা করিতে হইবে বৈ কি"! সাধু!

জাপানে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অবসরপ্রাপ্ত ৩০ হাজার সেনা সমবেত হইয়া মন্দিরের সম্মুখে শপথ করিল, হয় জেহোল জয়, না হয় প্রাণ-বিসর্জ্জন! কিন্তু চীন জাপানের কাছে ডিপ্লোমেসি অথবা 'সাধুতায়' নাবালক হইলেও কামারের এক ঘা দিয়া জগৎকে চকচকাইয়া দিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী দেখা দিবার পূর্ব্বেই তাহারা ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই চেও-ইয়াংসু নামক স্থানে জাপানকে বেশ এক ঘা বসাইয়া দিল। সেখানে জাপানীদের এক সামরিক আড্ডা ছিল। জাপানীরাও চিনচাও হইতে ঐ স্থানে বহু সৈন্য আনিয়া ফেলিল। কাইলু নামক স্থানে চীন দস্যু-সেনার (Irregulars) বড়কর্ত্তা জেনারল লিউ চ্যানটাঙ্গ আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি জেহোল রক্ষার্থে মাঞ্চুরিয়ার জাপানী প্রভাবের অংশের রেলের পুল ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

চীনারাও নবজাগ্রত মুক্তিকামী জাতি। তাহারাও বলিতেছে, যদি রাজধানী নানকিংও জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হয়, তাহা হইলেও আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকিতে আমরা জাপানকে বাধা দিতে ছাড়িব না। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম জাপান সাংহাইএর যুদ্ধে জেনারল থাই (সাই) এর নিকট পাইয়াছে। সে শিক্ষা জাপান সহজে ভুলিবে কি? তবে হয় ত সেই অপমানের প্রতিশোধের জন্য জেহোলে অভিযানের অভিনয় করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

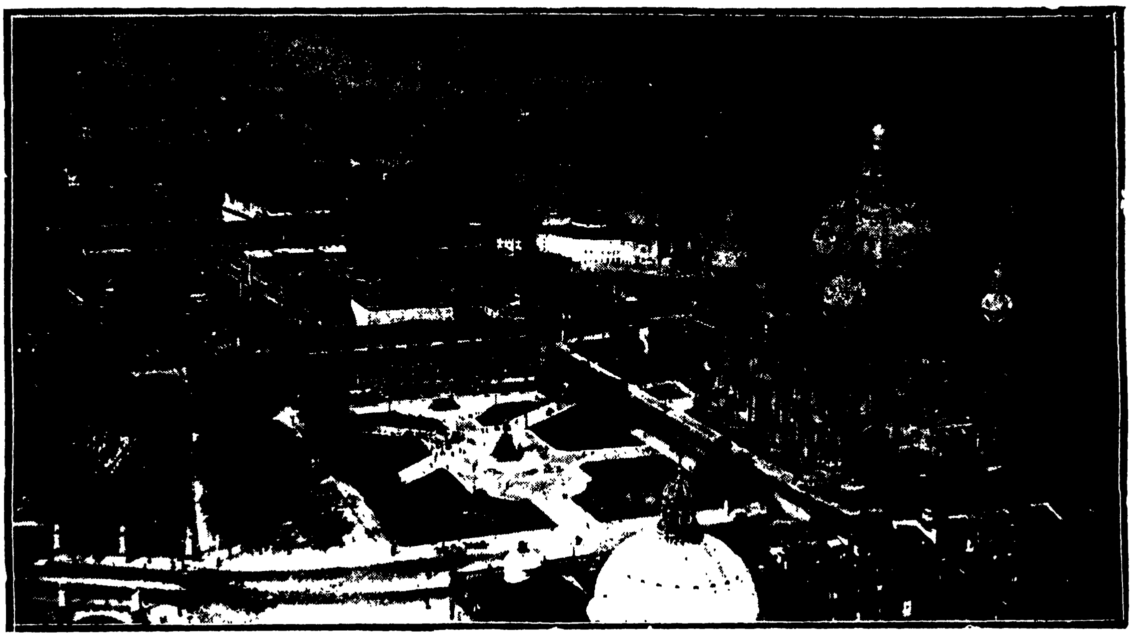
তবে জাপান শেষ মুহূর্ত্তে একটু নরম হইয়াছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার অভিযোগ এই যে, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কেহ বুঝিল না। প্রাচ্যে তিনিই একমাত্র শান্তিরক্ষক। এ কথা যে জাতি বুঝেন, তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে সম্মত আছেন। জাতিসঙ্ঘে জাপ প্রতিনিধি মিঃ মৎসুয়োকা মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, বৃটেনের সহিত জাপানের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইল, এ দুঃখ জাপানের রাখিবার স্থান নাই। তিনি প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিলেন। সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, জাপান যখন জাতিসঙ্ঘের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতেছেন, তখন বৃটেনের সহিত সম্বন্ধ স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হইবে।

মুখে জাপান যাহাই বলুন অথবা জাপান তাঁহার প্রতিনিধি মৎসুয়োকার কার্য্য সমর্থন করুন বা না করুন, কাযে জাপান আপনার পূর্ব্ব-ঘোষণার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেছেন! ঠিক ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতেই তাঁহার বাহিনী জেহোলের মধ্যে হানা দিয়া কাইলু অধিকার করিয়া লইয়াছেন এবং চিয়েং ও নিংওয়ান নামক দুইটি প্রধান গিরিসঙ্কট দখল করিয়াছেন। জোহালও দখল হইয়াছে। জাপান জয়ী হইয়াছেন। ইহার পর যে প্রাচ্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং সেই সংঘর্ষে জগতের কোনও শক্তি যে সংশ্লিষ্ট হইবেন না, তাহাও কেহ স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারেন না।

—

বার্লিনে শিল্প-প্রদর্শনী

জার্ম্মাণ জাতির সমরপ্রিয়তার কথা সর্ব্বজন-বিদিত। এখন জার্ম্মাণীর সে দুর্নাম নাই বটে, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় হইতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আগামী ১৮ই মে হইতে ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত 'শিল্প সপ্তাহের' দিন ধার্য্য হইয়াছে। এই সূত্রে 'মাস্কড্‌বল', 'ফ্লাইং ডাচম্যান', 'এরিয়াড্‌নি' প্রমুখ কয়খানি প্রসিদ্ধ গীতিনাট্যের অভিনয় হইবে। এতভিন্ন চার্লোটেনবুর্গ প্রাসাদের 'গোল্‌ডেন গ্যালারী'তে ৬টি কনসার্ট এবং অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি কনসার্টের



বার্লিন—শিল্প-প্রদর্শনী

জার্ম্মাণ জাতির মনীষা শিল্পসাহিত্যের বিষয়ে কোন দিনই অমনোযোগী নহে। বিশ্ব-যুদ্ধকালেও জার্ম্মাণী সাহিত্যশিল্প ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় কোন দিনই পরাঙ্মুখ ছিল না। সম্প্রতি এই রাজনীতিক তাণ্ডব-লীলার সময়েও জার্ম্মাণ জাতি তাহাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। বার্লিন সহরে তাহাদের ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শিল্প প্রদর্শনা'র উদ্বোধনের আয়োজন হইতেছে। আয়োজন হইয়াছে। এসেনেও জলক্রীড়ার নানারূপ আয়োজন হইতেছে, উহা ১৩ই এপ্রেল হইতে ২৩শে এপ্রেল পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। স্বাধীন জাতি, জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে কেবল রাজনীতি বা যুদ্ধ লইয়াই থাকে না, জার্ম্মাণীর এই উদ্যম তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

মিনতি

বেদনা যখন দিয়েছ হে নাথ,
সহিবারে দেহ শকতি।
সংসার-ক্লেশে হারিয়ে না ফেলি,
তোমারি উপর ভকতি।
নির্ম্মম, তব সুকঠোর দান,
রাখি যেন আমি তারো সম্মান ;
নিজেরে না করি প্রতি পদে যেন
অপমান, এই মিনতি।

ব্যথা আছে বড়, সেও তব দান,
থাক্ জ্বালাময় মমতা।
নিভে গেছে হাসি, দুখের অনলে,
জ্বেলে নিতে দিও ক্ষমতা।
ক্ষোভ যেন কভু বড় নাহি হয়
তার চেয়ে যাচি ভাল সঞ্চয়,
পরাজয় (ও) যেন জয়ী হয়ে করে,
জীবন-পথের আরতি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেবা-পরিচর্য্যা

বিনতা আসিয়া রোগীর পাশে বসিল, পরি তখন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিনতা কহিল,—ওষুধ খাইয়ে দি।

প্রভাত কহিল,—এই যে মিকশ্চার··

বিনতা কহিল,—টেম্পারেচারের একটা চার্ট তৈরী করতে হবে।

অনন্ত কহিল,—এই খাতায় আমি লিখে রেখেচি।

একখানা এক্সারসাইজ বুক আনিয়া অনন্ত বিনতার হাতে দিল।

খাতা দেখিয়া বিনতা কহিল,—পুলুটিসের ওষুধটা দিন তো। একটু গরম জল চড়াতে হবে।

অনন্ত কহিল,—সে ব্যবস্থা আমি করচি।

অনন্ত ষ্টোভ জ্বালিতে গেল।

বিনতা প্রভাতের পানে চাহিল; প্রভাত রোগীর পানে চাহিয়াছিল। বিনতা কহিল,—বসুন ঐ চেয়ারটা টেনে···

প্রভাত বিছানার প্রান্তে বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, বিনতা কহিল,—না, না, ওখানে নয়। যত ভালো-বাসাই থাকুক, infection বাঁচিয়ে চলা বোধ হয় খুবই সঙ্গত!

প্রভাতের মাথায় রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। সে চেয়ারে বসিল।

তার পর সুরু হইল বিনতার পরিচর্য্যা। সেবায় এক তিল বিরাম নাই। প্রভাত ও অনন্তকে কিছু দেখিতে হয় না!···

রাত সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। বিনতা কহিল,—দুটি বন্ধুতে মুখোমুখি বসে চিন্তা করলে কোনো ফল হবে না তো! যান, বাড়ী যান, গিয়ে খেয়ে-দেয়ে আসতে ইচ্ছা হয়, আসবেন। না এলেও ভাবনার কারণ নেই; আমি আছি।

প্রভাত কহিল,—আপনারও খাওয়া-দাওয়া আছে।

বিনতা কহিল,—দু'পয়সার মুড়ি আনিয়ে দিতে পারেন, যদি কুণ্ঠা হয়!···বিনতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—চায়ের ব্যবস্থা আছে। এক পেয়ালা চা তৈরী করে খাবো'খন··· যদি প্রয়োজন হয়।

প্রভাত কহিল,—আর আমরা চর্ব্ব-চোষ্য ভোজন করে নিদ্রার জোগাড় দেখবো, এই তো বলতে চান?

বিনতার চোখে হাসির বিদ্যুৎ! বিনতা কহিল,—আমাদের এ-সব সয়। আপনাদের সইবে না!

অনন্ত কহিল,—আমরা অক্ষম, সে কথা মানি! কিন্তু এতখানি নীচ স্বার্থপর বলে আমাদের সম্বন্ধে ধারণা আপনার মনে কেন জাগলো, বুঝচি না!

বিনতা অপ্রতিভভাবে কহিল,—ছি ছি, তা বলবেন না! আপনাদের নীচ স্বার্থপর ভাবচি, এমন কথা কি করে বলেন! এ ধারণা কেনই বা আমার হবে—চোখের সামনে দুই বন্ধুর এতখানি করুণা, মমতা, দরদ যখন জ্বলজ্বলে দেখচি!

কথার সঙ্গে সঙ্গে শয্যাশায়িনী পরির পানে বিনতা দৃষ্টির ইঙ্গিত করিল।

প্রভাত কহিল,—তর্ক-বিতর্কে প্রয়োজন নেই! আমি কিছু খাবারের সন্ধান করি। আর অনন্ত···তুমি ভাই, তিন পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা ভাখো।

বিনতা কহিল,—না, না—কেন এ হাঙ্গাম করচেন! আমি খাবো না। খাবার প্রয়োজন বোধ করচি না! আমার জন্য…

হাসিয়া প্রভাত কহিল,—আপনার জন্য নয়। আমাদের জন্য খাবার চাই!

হাসিয়া বিনতা কহিল,—কিন্তু এ কষ্ট কেন করবেন! বাড়ী যান—বাড়ীতে ভাববার লোক আছে তো! আমার হাতে রাত্রের জন্য রোগীকে বিশ্বাস করে ছেড়ে যেতে পারবেন না?

অনন্ত কহিল—কি যে বলেন আপনি!…তা নয়; বাড়ী যাবার প্রয়োজন নেই অন্ততঃ আমার। আমি ছুটী নিয়ে এসেচি।

বিনতা কহিল—কিন্তু আপনার বন্ধু…? ওঁর মামাবাবুকে আমি তো জানি—কি রকম ব্যস্ত হবেন, ভাগনেটির সন্ধান না পেলে! তিনি তো জানেন না, উনি এখানে রোগীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত আছেন।

এ কথায় অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, ডাকিল—প্রভাত…

প্রভাত চুপ করিয়া বসিয়াছিল—কি ভাবিতেছিল। অনন্তর আহ্বানে সাড়া দিল—উঁ…

অনন্ত কহিল—তাই করো। তুমি রাত্রের মত বাড়ী যাও…কাল সকালে বরং আবার এসো।

প্রভাত একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—না…

বিনতা তার নিশ্বাসটুকু লক্ষ্য করিল—'না' বলার ভঙ্গীটুকুও সেই সঙ্গে নজর এড়াইল না। প্রভাতের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিনতা কহিল—তা হলে থেকেই যান! বুঝচি, মন দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে আছে—রোগীকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। তা হলে যান্, খাবার-দাবারই কিছু কিনে আনুন…

করুণ নয়নের দৃষ্টি মেলিয়া প্রভাত কহিল,—তা হলে থাকবার অনুমতি পেলুম, বিনতা দেবী…!

বিনতা মুখ ফিরাইয়া রোগীর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—দেখুন তো অনন্তবাবু, আপনার বন্ধুর কথা বলার ভঙ্গী! আমি ভাড়া-করা নার্শ। অনুমতি-টনুমতির কথা তুলে আমায় এ ভাবে ব্যঙ্গ করার কি দরকার আছে, বলুন তো?

হাসিয়া অনন্ত কহিল—ও ঠিক ওজন বুঝে কথা কইতে পারে না। চিরদিনই এই রকম।…কখনো বিনয়ের ভারে নুয়ে পড়ে, কখনো বা গাম্ভীর্য্যে এমন অটল থাকে যে মানুষ সে-গাম্ভীর্য্যকে অহঙ্কার বলে ভুল করে। অথচ ও অহঙ্কারী নয়, একান্ত বিনয়াবনতও নয়!

বিনতা কহিল—আপনি দেখচি, আপনার বন্ধুকে রীতিমত 'ষ্টাডি' করে ফেলেচেন!

এমনি অবান্তর কথা-কাটাকাটির মধ্যে প্রভাত বাহির হইয়া গেল।

অনন্ত কহিল—আমার একটা নিবেদন আছে…

বিনতা কহিল—যা বলবার আছে, বলুন! দোহাই আপনাদের, এখন ক'দিন একসঙ্গে বাস করতে হবে, বুঝচি না…এর মধ্যে যদি কথায় কথায় দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করেন, তাহলে উভয়-পক্ষেই গোলযোগ ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

হাসিয়া অনন্ত কহিল,—আপনি চমৎকার কথা বলেন…

বিনতা কহিল—কি করি বলুন! যে ব্যবসা গ্রহণ করেচি, তাতে ভাষা-বিন্যাসটা ভালো রকম না শিখলে নয়—ব্যবসার শ্রী ফিরবে কেন?…তা, কি বলতে চান, বলুন…

অনন্ত কহিল—এসে অবধি আপনি যে পরিশ্রম করচেন …দেখে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হচ্ছি। তাই,…যদি…মানে, একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে…

বিনতা কহিল—আবার! বলুন, কি বলবেন ভূমিকা রেখে…

অনন্ত কহিল—রাত্রে আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। আমরা দু'জনে পালা করে রোগীর কাছে থাকবো। দরকার বোধ করি, আপনাকে ডাকবো।

বিনতা কহিল—সে দেখা যাবে'খন। তার জন্য এখন থেকে ব্যস্ত নাই হলেন!

অনন্ত কহিল—ব্যস্ত হওয়া নয়…

বাধা দিয়া বিনতা কহিল,—যান্, চা তৈরী করবেন বলছিলেন, চায়ের জল চড়িয়ে দিন গিয়ে। আপনার বন্ধু কি কাণ্ড করে ফেরেন—দেখা যাবে, তিনি এলে…

অনন্ত দাঁড়াইল না; পাশের ঘরে গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।…

বিনতা রোগীর শিয়রে বসিয়া রহিল, পরির মাথায় আইস ব্যাগ চাপাইয়া।···চমৎকার মেয়েটি! তরুণ বয়সের যত শ্রী সারা অবয়বখানিকে অপরূপ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে! রোগের এমন প্রতাপ, তবু যেন সদ্য-ফোটা ফুলের মত! এ-রূপ দেখিয়া প্রভাত যদি বিহ্বল হইয়া থাকে···

বিনতার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইল। অনন্ত আসিয়া কহিল,—আপনার জন্য কোকো তৈরী করলে কি হয়? ভাঁড়ারে কোকো আছে। তা হলে ভোজ্য-পানীয় দুই হয়, কি বলেন?

বিনতা কহিল—আবার ব্যস্ত হচ্ছেন! আমার কোনো বস্তুতেই রুচি বা অরুচি নেই···আমি আপনাদের অতিথি—যা দেবেন, তাই আমি খুশী-মনে শিরোধার্য্য করবো।

হাসিয়া অনন্ত কহিল,—ভাষার অপপ্রয়োগ হলো এবার। চা বা কোকোকে শিরোধার্য্য করা চলে না, গল-ধার্য্য বলা উচিত ছিল।

হাসিয়া বিনতা কহিল,—ক্ষমা করবেন। আমি সাহিত্য রচনা করি না, কাজেই এ ভুল মারাত্মক নয়!···

প্রভাত অচিরে ফিরিল। সঙ্গে কুলি; কুলির হাতে মস্ত চ্যাঙারিতে লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন। বিস্কুটের টিন, পাউরুটী, টিনে-ভরা মাখন—কোনো জিনিষ সে বাকী রাখে নাই!

দেখিয়া বিনতা কহিল,—আপনি দেখচি, মহোৎসবের ব্যবস্থা করতে চান। এ কি কাণ্ড করেচেন, বলুন তো!

প্রভাত কহিল,—যস্মিন্ দেশে যদাচার! যার যা রুচি, সে তাই খাবে।

বিনতা কহিল,—নিজেকে তো পয়সা রোজগার করতে হয় না, পয়সার দরদ বুঝবেন কি করে! ছি, ছি, এ কি করেচেন! লুচি-তরকারী আনলেন যদি তো এগুলো আবার কেন! এখানে সাহেব তো কেউ নেই।

প্রভাত কহিল,—বিস্কুট নষ্ট হবে না, রুটী-মাখন দু'দিন চলতে পারে। অপব্যয় কোন্‌খানে করেচি, দেখিয়ে দিন।

বিনতা কহিল,—পাশের ঘরে ও-সব রাখুন, এ ঘরে নয়। তারপর আমি ব্যবস্থা করচি।

অনন্ত কহিল,—সে কষ্ট আপনাকে নাই দিলুম! এদিক-কার ব্যবস্থা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন···

বিনতা কহিল,—তা হয় না। এ কাজ নারীর।

বিনতার সহজ অনায়াস যুক্তির উপর প্রতিবাদ চলে না, কাজেই দু'জনে নিরস্ত হইল।

বিনতা হাত ধুইয়া দু'টা প্লেটে লুচি-তরকারী সাজাইয়া অনন্ত ও প্রভাতকে ডাকিল, কহিল,—সাবানে হাত ধুয়ে দু'জনে খেতে বসুন।

প্রভাত কহিল,—আপনি?

বিনতা কহিল,—এখানেও নারীর পালা আপনাদের পরে। আপনারা খেয়ে নিন···

চাঙারির পানে চাহিয়া অনন্ত কহিল,—কিন্তু শাল-পাতাগুলো নিশ্চয় মানুষের খাদ্য নয়···

বিনতা কহিল,—না···এ-কথার মানে?

অনন্ত কহিল,—শালপাতা ছাড়া অবশেষ কিছু দেখচি না তো।···

বিনতা কহিল,—এই দেখুন···

চ্যাঙারিতে রক্ষিত দু'খানা মাত্র লুচি ও একটু তর-কারীর প্রতি বিনতা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

প্রভাত ও অনন্ত প্রতিবাদ তুলিল—না, তা হয় না···

এমনি বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া ভোজনের পালা চুকিলে বিনতা আব্দারের স্বরে কহিল,—পাশের ঘরে দু'টিতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। রোগী এখন ভালো আছে··· জ্বর একটু নেমেচে, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

প্রভাত কহিল,—তা হবে না। আপনি নিদ্রা দিন, আমরা দু'জনে পালা করে জাগি।

ক্রোধের ভাণ করিয়া বিনতা কহিল,—তা হলে আমাকে বিদায় দিন। শুয়ে বসে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিতে আমি পারবো না!

এ-কথার হুল প্রভাতের বুকে বিঁধিল। সে কহিল,—কি বলতে চান আপনি?

বিনতা কহিল,—আমি নার্শ—আমি watch করবো, ঘুমোবো না। আপনাদের দু'জনকে ঘুমোতে হবে।

অনন্ত কহিল,—আমি একটা প্রস্তাব করবো?

বিনতা কহিল,—করুন। কিন্তু রাত এগারোটা বেজে গেছে···মনে রাখবেন।

অনন্ত কহিল,—মানে, আমরা দু'জনে পালা করে জাগি আপনার সঙ্গে। অর্থাৎ···

বিনতা কহিল,—অর্থাৎ আপনারা যখন জেগে-জলা,

মনিব, তখন আপনাদের আদেশ আমাকে শিরোধার্য্য করতে হবে, এই তো ?

এ কথায় অনন্ত ভড়কাইয়া গেল ! বিনতার স্বরে এমন তেজ, এমন দৃপ্ত ভঙ্গী যে তার কথা একেবারে মর্ম্ম স্পর্শ করে।

অনন্ত কহিল,—রাগ করবেন না। আপনাকে বন্ধু বলে জেনেচি···তাই নিবেদন জানাচ্ছি। মেঝেয় এক জন গড়াই, আর এক জন পাশের ঘরে···ভাগাভাগি করে এ কাজ চলবে। এখানে যে থাকবে, সে থাকবে আধ-ঘুমন্ত···

হাসিয়া বিনতা কহিল,—বেশ, তাই হোক। আমি আর তর্ক তুলবো না ! সত্যি, আপনারা কি ভাবচেন ! ভাড়া-করা নার্শের এতখানি আস্পর্দ্ধা সাজে না··· •

ম্লান মুখে অনন্ত কহিল,—রাগ করলেন ?

বিনতা কহিল,—না, না, সত্যি, রাগ করিনি···

তাই হইল। প্রভাতকে ঠেলিয়া অনন্ত পাশের ঘরে পাঠাইল। ঘড়িতে এ্যালার্ম দেওয়া হইল, রাত্রি তিনটায় প্রভাত এ ঘরে আসিবে, অনন্ত তিনটা পর্য্যন্ত রোগীর ঘরে মেঝেয় মাহুর পাতিয়া শুইবে !···

ঘড়ির এ্যালার্ম বাজিতে প্রভাতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে আসিয়া দেখে, অনন্ত একটা বই লইয়া বসিয়া আছে, রোগীর শিয়রে বসিয়া বিনতা—চামচে করিয়া পরির মুখে ডাবের জল দিতেছে।

তার পানে চাহিয়া বিনতা কহিল,—ঘুম খুব বাধ্য তো !

প্রভাত কহিল,—অনন্ত ওঠো, শোও গে, এক মিনিট বিলম্ব নয়···

অনন্তকে উঠিতে হইল।

প্রভাত মাহুরে বসিল, বসিয়া বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভালো আছে এখন ?

বিনতা কহিল,—হ্যাঁ ···আপনি শুয়ে পড়ুন—সারা দিন যে রকম ছুটো-ছুটি করেচেন···

প্রভাতও তাহা বুঝিতেছিল। চোখ দু'টাকে খুলিয়া রাখা যায় না ! সে কহিল,—ঘুমিয়েচি বেশ।

বিনতা কহিল,—তা হোক। দরকার হলে আমি ডাকবো। আপনি চোখ বুজে শুয়ে পড়ুন।

চোখ আপনা হইতে বুজিয়া আসিতেছিল, সেজন্য কশরতের প্রয়োজন ছিল না। প্রভাত শুইয়া পড়িল, শুইতেই চক্ষু মুদিয়া আসিল।···

একটা স্বপ্ন ! পরিদের সেই গৃহ—পরি গান গাহিতেছে—প্রভাতের চোখ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, গান অস্পষ্ট, আরো অস্পষ্ট···পরি গান থামাইয়া তার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল,—ঘুমোচ্ছেন ?

প্রভাত বলিল,—না···

সে চোখ চাহিবার চেষ্টা করিল।

চোখ চাওয়া যায় না ! সহসা কাঁটার মত গায়ে কি বিঁধিল···সঙ্গে সঙ্গে কপোলে মৃদু করাঘাত ! পরির এ কি খেলা ! হাসিয়া প্রভাত চোখ চাহিল। চোখ চাহিতে দেখে, দুটি কালো তারা ! প্রভাত ডাকিল—পরি···

তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এ চোখের তারা পরির নয়—বিনতার। মাহুরে বসিয়া প্রভাতের মুখের পানে বিনতা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

প্রভাত চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিল—কি হয়েচে ?

বিনতা কহিল—আপনার কি ঘুম ! উঃ ! শরীরখানি ঘিরে মশাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলেছে···আপনি দিব্যি ঘুমোচ্ছেন !···আমি থাকতে পারলুম না, বাতি জ্বেলে মশা তাড়াচ্ছি আর মারচি !

প্রভাত দেখে, তার পাশে বাতির অসংখ্য কৌটা এবং একরাশ মশা মরিয়া পড়িয়া আছে। প্রভাত কহিল,—রাত কটা ?

বিনতা কহিল—পাঁচটা বেজে বারো মিনিট। আমি ওদিকে রোগী দেখচি, আর এদিকে এসে মশা মারচি···

প্রভাতের বড় আনন্দ হইল ! এই অনায়াস পরিচর্য্যা··· চমৎকার ! প্রভাত চক্ষু মুদিল।

—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনন্ত

সকালে প্রভাতকে গৃহে ফিরিতে হইল। বিনতা কহিল,—না, এত উদাসীন হলে চলবে না। বাড়ী-ঘর আছে,—সেখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবার অধিকার আপনাদের নেই, সত্যি !

অনন্ত কহিল,—আমার খবর দেওয়া আছে বাড়ীতে…

বিনতা কহিল,—তাহলে আপনি যান প্রভাতবাবু… কোনো কথা শুনবো না। সেখানে কত ভাবনা-চিন্তা বেধে গেছে…! আমি তো আছি। নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না?

পরি কথা কহিল,—তার স্বর ক্ষীণ। সে কহিল—বাড়ী যান,—সত্যি। বলে-কয়ে না হয় আসবেন।

প্রভাত কহিল—ঘুরেই আসি তাহলে!

বিনতা কহিল—আমি চা তৈরী করে দি…চা খেয়ে যান্।

বাধা দিয়া অনন্ত কহিল—না, না—সে ভার আমার থাকুক!

চা পান করিয়া প্রভাত বাহির হইতেছিল, বিনতা আসিয়া কহিল—একটা কথা আছে…

প্রভাত বিনতার পানে চাহিল। বিনতা কহিল,—যদি অসুবিধা না হয়, একবার আমার ওখানটায় চোখ বুলিয়ে আসবেন! আজ আমি বাড়ী ফিরতে পারবো না। তবে রোগীর সম্বন্ধে এ-আশ্বাস দিতে পারি, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ ঘটেনি!

প্রভাত কহিল—আপনি এসে যখন উদয় হয়েচেন, তখনই আমার ভয় কেটে গেছে।

বিনতা কহিল—আপনার তারিফ করবার শক্তি অদ্ভুত…সে পরিচয় বহু পূর্ব্বেই আমি পেয়েচি!…ও কথা থাক। যা বললুম…অবশ্য যদি কোনো অসুবিধা না ঘটে…

প্রভাত কহিল—না। অসুবিধা আবার কি!

পথে প্রভাতের মন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার আলোচনা পাড়িয়া বসিল। রোগের সেবা-পরিচর্য্যা এমন সুমধুর আশ্বাসে ভরিয়া উঠিতে পারে, এ জ্ঞান তার ছিল না। উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই! কি অনায়াস হাসি-গল্পের মধ্যে সময় কাটিয়া চলিয়াছে! কোনো শুভ উৎসবেও বুঝি মন এমন পরিপূর্ণ থাকে না! সে চলিয়া আসিয়াছে, তবু মন তার সে-বাড়ীর সান্নিধ্য-কামনায় আকুল হইয়া আছে!

মাতুলালয়ে দুশ্চিন্তার হাওয়া! মামা বলিলেন—সারা রাত ভাবনায় কেউ ঘুমোতে পারে নি। ব্যাপার কি?

প্রভাত কহিল—একজন বন্ধুর অসুখ! একা…তাকে দেখবার কেউ নেই। মহা বিপদ! কাজেই…ইত্যাদি, ইত্যাদি…

মামিমা বলিলেন,—একটা খপর দিতে হয়, বাবা…

প্রভাত কহিল—কাকে দিয়ে খপর পাঠাবো মামিমা! অবস্থা তাদের ভালো নয়। শেষে ঐ নার্শ বিনতা সেন—তাঁকে ধরে নিয়ে যাই…। চমৎকার লোক। সারা রাত রোগীর শিয়রে বসে সেবা। তাঁর হাত পড়তেই ভাবনা একটু কমেচে…

মামিমা কহিলেন—বটে!

মামা সদাশিব কাজের মানুষ—তিনি চলিয়া গেলেন। প্রভাত মামিমার কাছে আবেদন জানাইল, এই বন্ধুটির অসুখ না সারা পর্য্যন্ত তার পক্ষে সেখানে থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। বিনতা সেন যে দেখাশুনা করিতেছেন, এ শুধু মামাবাবুর খাতিরেই তো! প্রভাত সেস্থলে মামাবাবুর প্রতিনিধি…ইত্যাদি…

মামিমা অনুমতি দিলেন, তবে সতর্ক করিয়া দিলেন… দেখাশুনা করিতে পারো, কিন্তু রোগী লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি বেশী করিয়ো না! তাছাড়া একেবারে ঘর-ছাড়া হইয়া থাকিলে তাঁদের ভাবনা কমিবে না!

প্রভাত জানাইল,—মাঝে মাঝে আসবো। তবে না এলে তোমরা ভেবো না…

এমনি করিয়া প্রভাত মাণিকতলা-বাস কায়েমি করিয়া লইল।…

তিন দিন পরে পরির অবস্থা একটু ফিরিল। বিনতা কহিল,—এবার আমার একটু-আধটু ছুটী বোধ হয় মিলতে পারে।

প্রভাত কহিল—সে-বোধ আপনার। আপনি যদি মনে করেন…

অনন্ত কহিল—আপনার দয়া ভুলবো না…

হাসিয়া বিনতা কহিল—কবিতা লিখে ফ্রেমে এ দয়ার কথা বাঁধিয়ে রাখবেন!…

বেলা দশটায় বিনতা ফিরিল—ফিরিয়া পরির ঘরে আসিল। পরি ঘুমাইতেছে…অনন্ত একখানা বই লইয়া মেঝেয় মাদুরে বসিয়া; আর প্রভাত রোগীর শিয়রে বসিয়া তাকে পাখার বাতাস করিতেছে।

বিনতা কহিল.—ছুটি বন্ধুতে কলেজ ছেড়ে বেশ সেবা-সদন খুলেচেন। এ-বিদ্যা দুজনের বেশ আয়ত্তও হয়েচে।···

অনন্ত কহিল—তা হয়ে থাকলে ভাগ্য বলে মানবো!

বিনতা একবার পরির পানে চাহিল, চাহিয়া একটু শ্লেষের-স্বরে কহিল,—সে কথা ঠিক বটে! নাহলে বিশেষ রোগীর প'রে দরদ জাগানোয় বিশেষত্ব নেই!···

কথাটা বলিয়া প্রভাতের পানে একবার সে চাহিল। এ কথা প্রভাতের মর্ম্মে কাঁটার মত বিঁধিল।

অনন্ত কহিল,—মাপ করবেন। আপনি যদি এ দরদের সমস্ত বৃত্তান্ত শুন্‌তেন···

বিনতা কহিল—ছি ছি! মাপ আপনি চাইবেন না—আমারি মাপ চাওয়া উচিত! নিজের পদ আমি ভুলে গেছলুম!

অনন্ত কহিল—আপনার এ-কথায় বড় আঘাত পাই। ইচ্ছা করেই এ-আঘাত দেন, না···

বাধা দিয়া বিনতা কহিল—আমি লোকটি খুব ভালো নই। আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। আমার কথায় হুল থাকে বিলক্ষণ···

অনন্ত এ-কথার কোনো জবাব দিল না—কথায় কথা বাড়িবে বৈ আর কিছু হইবে না। অথচ এ-সব কথায় ফল কি!···

আর একদিনের কথা। পরির জ্বর ছাড়িয়াছে—পথ্য এখনো পায় নাই। শরীর বড় দুর্ব্বল—চলিতে-ফিরিতে পারে না, শুইয়া থাকে। বিনতা দু'বার আসিয়া দেখা দিয়া যায়—গা মোছানো প্রভৃতি যে কাজগুলা তার দ্বারা না হইলে হইবার উপায় নাই, আসিয়া করে! নিজে হইতেই সে বলিয়াছে,—আমি রোজ আসবো—থাকবার প্রয়োজন নেই, তবে যদি আপনারা বলেন···

এ কথায় প্রভাত ও অনন্ত দুজনেই বলিয়াছিল—না, না, আবশ্যক যদি না থাকে···

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বিনতা আসিয়াছিল। পরি শুইয়া আছে, পাশে বসিয়া প্রভাত কি একখানা বই পড়িতেছে। অনন্ত গৃহে নাই।

বিনতা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল নিঃশব্দে—এমন নিঃশব্দে যে পরি বা প্রভাত জানিতে পারিল না। প্রভাত কাব্য পড়িতেছিল -রবীন্দ্রনাথের রচনা—'সাজাহান।' তার স্বরে আবেশ! পরির চোখেও সুগভীর আবেশ—দৃষ্টি প্রভাতের মুখে নিবদ্ধ—অকম্পিত, অপলক দৃষ্টি! সে দৃশ্য দেখিয়া বিনতার পা কাঁপিল···নিমেষের জন্য! তখনি হাসিয়া সে কহিল,—চমৎকার!

সে স্বরে পরি চমকিয়া চক্ষু মুদিল, প্রভাত বিনতার পানে চাহিল। বিনতা কহিল,—খুব ভালো পরিচর্য্যা! এতে রোগীর স্বাস্থ্য ফিরবে—সত্য!···তার পর আজ কেমন আছো?

পরি কহিল—ভালো···

বিনতা কহিল—যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে···

হাসিয়া পরি কহিল—তাই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো!

বিনতা কহিল—সেটা মস্ত লাভ···না?

পরি কহিল—নয়?

বিনতা কহিল,—হুঁ!

পরি কহিল,—সেরে উঠে তাই দুঃখ হচ্ছে, আপনাকে আর পাবো না হয়তো···

বিনতা কহিল,—আমাকে পাওয়া কামনার বস্তু নয়! তার চেয়ে যে পাওয়া পেয়েচো···

কথার অর্থ না বুঝিয়া পরি সরল ভাবেই প্রশ্ন করিল,—কি পেয়েচি?

প্রভাত বিনতার পানে চাহিল, বিনতা প্রভাতের পানে চাহিয়াছিল। প্রভাতের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার মৃদু বিদ্যুৎ!

বিনতা তাড়াতাড়ি কহিল,—স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েচো, সেই কথাই বলচি।

প্রভাত মুখ নামাইল!

বিনতা কহিল,—আপনাকে এবার একটু উঠতে হবে। আমি পরির চুল বেঁধে দি, মুখ ধুইয়ে দি···আজ আবার তাড়া আছে। যেতে হবে সেই খিদিরপুরে। ডেলিভারী কেশ আছে।

প্রভাত বিনাবাক্যে উঠিয়া গেল।···পাশের ঘরে গিয়া 'সাজাহান' কবিতার উপরই মনোনিবেশের প্রয়াস পাইল, মন কিন্তু আর কবিতার ছত্র স্পর্শ করিতে চায় না!···

আধ ঘণ্টা পরে বিনতা আসিল, কহিল,—যেতে পারেন এবার। আমিও চললুম।

প্রভাত কহিল,—একটা কথা ছিল···

—কি কথা? বলুন···

প্রভাত কহিল,—আপনার ফী সম্বন্ধে একটা আইডিয়া যদি দেন···

বিনতা তীব্র দৃষ্টিতে প্রভাতের পানে চাহিল।

প্রভাত কহিল,—কথাটা বলতে কুণ্ঠা বোধ করচি। আপনার উপকারের পরিমাণ টাকা-কড়িতে হয় না, জানি। তবু···

বিনতা কহিল,—সে-উপকারের মূল্য দিতে চান?

প্রভাত কহিল,—সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে যদি রাগ না করেন···

বিনতা কহিল,—কি দিলে খুশী হন?

প্রশ্ন করিয়া প্রভাত ভড়কাইয়া গেল।

বিনতা কহিল,—টাকা দিতে চান? কত টাকা আপনি উপার্জ্জন করেচেন? পৈতৃক অর্থ নিয়ে বড়াই করচেন! কথার শেষে বিনতার চোখে ভ্রূকুটি!

প্রভাত কহিল,—অপরাধ হয়েচে।

বিনতা কহিল,—একশো বার!···দরদ, মমতা আপনা-দেরই একচেটে, ভাবেন?···আমি দায়ে পড়ে অর্থ উপার্জ্জন করি বলে আমার মনুষ্যত্ব একেবারে গেছে···না?

প্রভাত কহিল,—ক্ষমা চাইছি। এমন অবিনয় আর কখনো প্রকাশ পাবে না। আমায় ক্ষমা করুন···

বিনতা হাসিয়া ফেলিল হাসিয়া কহিল,—আপনার শিষ্টাচারের এ ভঙ্গীগুলো ছাড়ুন! আমায় ঠিক প্রোফেশনা-লের মত ভেবেছিলেন বলেই আমার কাছে সে দিন গিয়েছিলেন?···না···

কথা বাধিয়া গেল। প্রফেশনাল নয়, তবে কি? সে কথা আভাসে স্ফুটবামাত্র বিনতা চমকিয়া থামিয়া গেল। সে কি পাগল হইয়াছে?

প্রভাত কহিল—কিন্তু এই যে নিজে গাড়ী ভাড়া খরচ করে রোজ আসচেন···

বিনতা কহিল—সে কটা পয়সার অভাব আজও হয়নি। যাক্, কথা কাটাকাটি করবো না। আপনি ভাববেন, তর্ক ছাড়া বিনতা আর কিছু জানে না! তা নয়, প্রভাত বাবু··· আপনি যে বলেছিলেন, এ-মেয়েটির কথা···সেই দেশের বাড়ীতে···আমি তা ভুলিনি। সেই কথাই বলতে এসেচি···

প্রভাত কহিল—বলুন···

বিনতা কহিল—পরিকে আমি প্রশ্ন করেছিলুম—যদি বিয়ের ঘটকালী করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারলুম না।

প্রভাতের মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। কপোলে লজ্জার রক্তিম আভা! প্রভাত মাথা নামাইল। বিনতা কহিল—পরি শুধু বললে, না···কেন না—বহু প্রশ্নে তা জানতে পারি নি।···তা যাক্, আপনার মামা বাবুর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। ঝামাপুকুরে একটা কেশ্ দেখতে গিয়েছিলুম···তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী···তিনিও এসেছিলেন। আমায় আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, কার অসুখ? তা আমি অতটা খেয়াল করতে পারি নি। আমি বলেচি, একটি মহিলার···অসহায় মহিলা!

প্রভাতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জা, ভয় একসঙ্গে বুকটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। কুতূহলী দৃষ্টিতে সে বিনতার পানে চাহিল।

বিনতা কহিল—পরে অবশ্য সামলে নিয়েচি। বললুম, এক বন্ধুর বোন্ হন। বন্ধুটির আর কেউ নেই—অবস্থাও ভাল নয়···

বিবর্ণ মুখে প্রভাত প্রশ্ন করিল—মামা কি বললেন?

বিনতা কহিল—কিছু বললেন না। তা আমি কথাটা আপনাকে বললুম—যদি তিনি এ-সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনো কথা তোলেন, তাই।···তাহলে আজ আসি। কাল আসবো বেলা ন'টায়···এসে স্পঞ্জিং করিয়ে যাবো—পথ্য কাল ডাক্তার বাবু দিতে বলেচেন। সে ব্যবস্থাও আমি এসে করবো—আপনাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই!

কথাগুলা চট্‌পট্ বলিয়া বিনতা উত্তরের প্রত্যাশামাত্র না করিয়া বিদায় লইল। প্রভাত গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিতে চায়—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়া কিসের চিন্তা, কোনো সূত্রই ধরিতে পারিতেছিল না, উদাস-মনে বসিয়া রহিল।

সহসা পরির স্বর কাণে গেল—ক্ষীণ স্বর। পরি বলিতে-ছিল,—আপনি একবার আসবেন?

প্রভাত আসিল। পরি কহিল,—আমায় একটু জল দিন না···বড্ড তেষ্টা পেয়েচে।

প্রভাত জল আনিয়া দিল, পরি পান করিয়া কহিল,—এত ঘুম পাচ্ছে কেন, বলুন তো?

প্রভাত কহিল,—দুর্ব্বল শরীর। তাই!

পরি কহিল,—ঘুমোলে আবার অসুখ করবে না?

প্রভাত কহিল,—না।

—একটু ঘুমোই?

—ঘুমোন।

পরি চক্ষু মুদিল।

প্রভাত তার পানে চাহিয়া মেঝেয় বসিয়া রহিল।··· অনেক কথা মনের দ্বারে ভিড় করিয়া আসিল। পরি সুস্থ হইয়াছে। এর পর? তাহাকে আগলাইয়া দিন-রাত বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই! অথচ এখান হইতে চলিয়া যাইবার কথা মনে হইলে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়! অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইলেও পাগলের মত শূন্য মনে পড়িয়া থাকা চলে না। অনন্ত থাকে, কারণ আছে। তাহাকেই পরি আশ্রয় করিয়াছে!

এ কথা মনে হইবামাত্র আরো মনে হইল, কিন্তু অনন্ত কত কাল এমনি পাহারা দিবে! তার কাজ আছে, লেখাপড়া আছে, বিধবা মা আছেন। পরীক্ষা পাশ করিয়া পায়ে ভর দিয়া তাকে দাঁড়াইতে হইবে! পরির ভার গ্রহণ করিবে, এমন শক্তিও তার নাই! তবে!

অনন্ত যদি পরিকে বিবাহ করে? ··এ চিন্তায় মন হু-হু করিয়া উঠিল। তাহা হইলে অনন্তর বধূ হইয়া পরি তার গৃহের অন্দরে গিয়া বসিবে, পরির সঙ্গে তার দেখাও হইবে না!···

কিন্তু বিবাহ কি করিয়া হইবে? বিবাহের ব্যাপারে নানা সন্ধান, নানা উপসর্গ আছে। অনন্তর কাকা রাজী হইবেন কেন? যদি রাজী না হন, পরি?···পরির সমস্ত ভবিষ্যৎ?···সে ভবিষ্যৎ কি হইবে? ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া দুস্তর সাহারা মরুর ছবি তার মনে উদয় হইল। সে মরু-প্রান্তর অসীম, ধূ-ধূ করিতেছে। তার কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই। ছায়া-তরু কি, পায়ে দিয়া দাঁড়াইবার মত স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণ-পল্লবেরও চিহ্ন নাই!···

এমনি চিন্তার পর চিন্তা জড়ো হইয়া প্রকাণ্ড সরীসৃপের মত মনের পথে চলিতে সুরু করিল। পথ যেমন সীমাহীন, চিন্তার সূত্রও তেমনি জটিল, দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে। সে চিন্তা-সরীসৃপ বিরাট-দেহ অক্টোপাশের মত প্রভাতের মনটাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কষিয়া বাঁধিতে লাগিল। প্রভাতের জগৎ সে-পাশে চাপা পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তার অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাত্রি প্রায় দশটা। বাহিরে পথে লোকের কলরব কখন্ থামিয়া গিয়াছে। শুধু দু' একটা গাড়ীর কর্কশ শব্দ···তার পর সুগভীর স্তব্ধতা!

রাত্রি প্রায় এগারোটা। পরি চমকিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া ডাকিল,—মিসেস সেন···

প্রভাতের চমক ভাঙ্গিল। সে উঠিয়া পরির কাছে আসিয়া কহিল,—মিসেস সেন তো নেই, বাড়ী গেছেন।

পরি প্রভাতের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—ও!

প্রভাত কহিল,—কি চাই, আমাকে বলুন···

পরি কহিল,—অনন্ত বাবু নেই?

প্রভাত কহিল,—না। সে বাড়ী থেকে ফেরেনি এখনো!

—কেন? পরির স্বরে বিস্ময় ও আতঙ্ক সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল।

প্রভাত কহিল,—তা তো বলতে পারচি না। সন্ধ্যার সময় আসবে বলে গেছলো···

—কোনো বিপদ হলো না তো? পরির স্বরে সেই আতঙ্ক!

প্রভাতের বুক একটু দুলিল। প্রভাত কহিল,—না, বিপদ আবার কি হবে!

—এলেন না কেন?···এখন রাত কত?

ঘড়ির পানে চাহিয়া প্রভাত কহিল,—সাড়ে এগারোটা বাজে।

—তবে?···

পরির চোখে আতঙ্কের ছায়া—প্রভাত তাহা দেখিল।

প্রভাত কহিল,—হয়তো কোনো কাজ পড়েচে···

—না।···

প্রভাত পরির পানে চাহিয়াছিল। মনে একটু বিরক্তি!

আমি আছি, আমায় বলিলে চলে না, কি এমন কথা! অনন্তর জন্য এত আকুল···

মনকে পা দিয়া চাপিয়া মুচড়াইয়া প্রভাত কহিল,—আপনি ভাববেন না···

পরি কহিল,—আমি ভারী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেচি···

প্রভাত আবার বিরক্ত হইল। সে কহিল,—স্বপ্ন সত্য নয়···

—না, না, আপনি বুঝচেন না···পরির স্বরে অসহ্য আকুলতা! সে আকুলতায় স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

বিরক্ত স্বরে প্রভাত কহিল,—খপর নেবো?

—আমি একলা থাকতে পারবো না। ভারী ভয় করচে!···

প্রভাতের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। এত মায়া! ইহার উপর তুই বসিয়া কল্পনার রঙীন মালা গাঁথিতেছিস্!···তার লোভ হইল, বড় লোভ, একটা প্রশ্ন! কিন্তু না, সে ভারী অশোভন হইবে! তবু···তবু···

প্রভাত আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল,—অনন্তকে আপনি খুব ভালোবাসেন···তাঁর অদর্শন সহ্য করতে পারচেন না···না?

প্রভাতের অধরে ম্লান হাসি! মনে···সে যে কি, প্রভাত ঠাহর করিতে পারিল না—তবে এ-স্বরে নিজে সে চমকিয়া উঠিল!

পরি জবাব দিল না, চক্ষু মুদিল! সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা নিশ্বাস পড়িল!···প্রভাত নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।···

রাত্রি একটা। প্রভাতের চোখে ঘুম নাই—পরি চক্ষু মুদিয়া সেই যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···

সহসা পরি ডাকিল—অনন্তবাবু···

প্রভাত কহিল—অনন্ত আসেনি। আপনি ঘুমোন,—ভোর হলেই আমি যাবো—গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো।

পরি প্রভাতের পানে চাহিয়া রহিল—উদাস দৃষ্টি—কোনো কথা কহিল না! এবং চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কখন্ আবার ঘুমে তার দু'চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।···সে নিদ্রাচ্ছন্ন শীর্ণ পাণ্ডুর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রভাতের বুকে মমতার পাথার উথলিয়া উঠিল—বেচারী, বেচারী···আহা!···

সকালে পরি চোখ চাহিল,—কিন্তু অনন্তর কথা মুখে উচ্চারণ করিল না। না করিলেও প্রভাত বুঝিল, ব্যথায় পরি একান্ত কাতর!

সকালের দিকে ছোটখাট পরিচর্য্যা আছে···অনন্ত নিত্য করে। প্রভাত সব জানেও না···সারা রাত তার চোখে নিদ্রা আসে নাই—মাথা ঘুরিতেছে! প্রভাত কহিল—জল আনি, মুখ-চোখ ধুয়ে নিন্···

পরি কহিল—থাক্···

প্রভাত কহিল,—আপনাকে একটু ঠিকঠাক না করে আমি যে অনন্তর কাছে যেতে পারচি না···

উদাস স্বরে পরি কহিল—যাবার দরকার নেই!···

প্রভাত কোনো কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ!

পরি কহিল—আপনাকে কাল ভারী জ্বালাতন করেচি···বুঝি নি···মাপ করবেন!

এ কথার করুণতা প্রভাতকে বিঁধিল। প্রভাতের মমতা হইল। প্রভাত কহিল—না, না, সে কি! আমি ঘুমিয়েচি তো···

—না···আপনার চোখ···কথাটা শেষ হইল না!···

প্রভাতের কিছু ভালো লাগিতেছিল না। অনন্তকে সেও চাহিতেছিল। কেন সে আসিল না···? ভাবনার কথা বটে!···কিন্তু পরিকে একা রাখিয়া বাড়ী ছাড়িয়া কি বলিয়া সে বাহির হয়?···হয়তো অনন্ত কোনো কাজে পড়িয়াছিল। হয়তো এখনি আসিবে···

এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে কখন্ যে নটা বাজিয়া গেছে, বিনতা আসিয়া দেখা দিল।

প্রভাত কহিল—একটা নিবেদন আছে···

হাসিয়া বিনতা কহিল—সারাক্ষণ এ অভিনয়ের কৌশল নাই দেখালেন প্রভাতবাবু···

প্রভাত কহিল—অভিনয় নয়। একটু বিপদ ঘটেচে···

—বিপদ! পরি কেমন আছে?

প্রভাত কহিল—তা নয়। পরির কথা নয়। পরি ভালো আছে। তবে অনন্ত ফেরেনি এখনো পর্য্যন্ত। পরি কাল কি দুঃস্বপ্ন দেখে থেকে থেকে চম্‌কে উঠেচে। তাই আমি ভাবছিলুম, আপনি তো এখন কিছুক্ষণ আছেন এখানে···আমি একবার চট্ করে গিয়ে তার খপরটুকু নিয়ে আসি।

বিনতা কহিল,—বেশ !···কিন্তু অহেতুক দেরী করবেন না। আমার সেই খিদিরপুরের কেশ্ আছে···আবার যেতে হবে। একটু পরে অবশ্য···

—আমার দেরী হবে না !

প্রভাত পথে বাহির হইল। পরিকে বলিয়া গেল না ! কি প্রয়োজন ? তার কল্পনার আকাশ কালো হইয়া গিয়াছে ! সে কালোর আড়ালে সব রঙীন স্বপ্ন চাপা পড়িয়াছে !

অনন্তর গৃহে আসিতে তার কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা। কাকাবাবু তাকে চিনিতেন, কহিলেন,—এই যে প্রভাত ! তুমিও তো সেবা-সদনে জুটেচো !

কথা শুনিয়া প্রভাত অবাক্ ! তবু কোনো মতে সে প্রশ্ন করিল—অনন্ত ?···তার—

তার মুখের কথা লুফিয়া কাকাবাবু কহিলেন,—অনন্তর ফিলানথ্রফিক স্পিরিটকে একটু চাপা দেওয়া দরকার হয়েচে। তাকে বাড়ীর বার হতে দেবো না। বেচারী মা কেঁদে সারা,—লেখাপড়া চুলোয় গেল···কোথাকার কার রূপসী কন্যার সেবা-পরিচর্য্যা নিয়ে নির্লজ্জ মাতন চলেছে ! ···শুনচি, তুমিও ঐ ব্রত গ্রহণ করেচো ! এ বয়সে এ-ফিলানথ্পি সাজে না, বাপু। লেখাপড়া করো, মানুষ হও ! মা-বাপ বিশ্বাস করে পাঠিয়েচেন যে-কাজের জন্য···সে কাজ করো ! তাঁদের বিশ্বাস ভঙ্গ করো না !

প্রভাতের পায়ের তলা হইতে মাটী সরিয়া যাইতেছিল —তার সর্ব্বাঙ্গ টলিতেছিল ! অতর্কিতে মুখের উপর এমন সব কথা···

কাকাবাবু বলিলেন,—অনন্তকে বিদেশে পাঠাচ্ছি—বাঁদরামির একটা সীমা আছে···! Sex-চর্চ্চা চলবে না। আমরা এখনো মাথার উপর আছি···আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে সমাজে ! লাটুর রক্ষিতা উপপত্নীর মেয়েকে মাথায় তুলে হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ—গৃহস্থ-ঘরে চলে না। তুমিও এ প্রবৃত্তি ছাড়ো···আর পারো, লাটুর রক্ষিতার মেয়েকে বলো, তাঁর মায়া-জাল এ গরীব বিধবার ছেলের উপর বিস্তার না করেন ! তুমি সেইখানেই ফিরবে না কি ?···আমার কথা শোনো—মন চঞ্চল হয়, দেশে যাও—মা-বাপের কাছে। লেখাপড়া না হয় দু'দিন বন্ধ থাক্।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

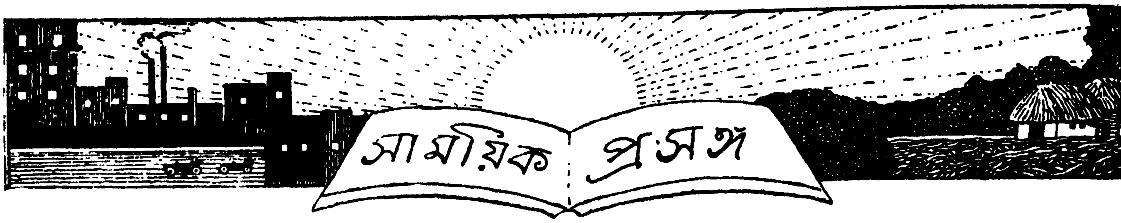
প্রেমের স্মৃতি

তুমি কি আমার আঁধার হিয়ার নিশি-গন্ধার গন্ধ ?
বিরহের মাঝে চির-ফিরে-পাওয়া তুমি কি মিলনানন্দ ?
চোরের মতন চুপি চুপি এসে চুপি চুপি কেন চ'লে যাও ?
ঘন-যামিনীর হে অভিসারিকা ! কাণে কাণে কিছু ব'লে যাও—
সঙ্গীতে হানো ক্রন্দন কম হিন্দোল-দোল-ছন্দ
ওগো ও আমার আঁধার হিয়ার নিশি-গন্ধার গন্ধ !

তুমি কি আমার হারানো দিনের ফুরানো প্রেমের স্মৃতিটুক্ ?
তুমি কি ব্যথার বাঁশীটি বাজাও জুড়ে বসে' এই ভাঙাবুক ?
এ হৃদয়—এই ছিন্ন শিক্ত রক্ত-সিক্ত শতদল ;
তুমি তা'রি মাঝে অরুণ ব্যথার পরাগ-মিশানো পরিমল ?
তা'রি মাঝে বাজে অতীত-আশার অলি-গুঞ্জন-গীতিটুক্ ?
রহ, কাছে রহ ফুরানো দিনের শুধু স্মৃতিটুক্ ভরি বুক্।

আমার সকল ভুবন ভরিয়া রহ, চিরদিন রহ গো !
তুমি জীবনের উষার বারতা সন্ধ্যার কাণে কহ গো !
ঝরে পড়া ফুল, খসে পড়া মালা, ভুলে যাওয়া দুটি কথা রে,
ব্যর্থ বাসর, তৃষিত অধর, নিষ্ফল আকুলতা রে,
কুড়া'য়ে কুড়া'য়ে পাষাণী দেবীর আরতির ডালা রহ গো !
পুলকে-বেদনে আমার জীবনে, আমার ভুবনে রহ গো !

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।



ঝাকড়-থোকড়

সরকারী রেলের ধলা কটা মেটে চাকুরীয়াদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাবিধান বাবদে সরকারী তহবিল হইতে কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ হয়, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সরকার পক্ষ হইতে যে জবাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, ইহার জন্ম বার্ষিক ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৭ টাকা ব্যয় হয়। আর কালা কর্ম্মচারীদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যয় হয়? তাহার উত্তরে সরকার পক্ষ বলিয়াছেন, ৬৭ হাজার ৩ শত ২৩ টাকা ঐ বাবদে ব্যয় হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সরকারী রেলকর্ম্মচারীদের মধ্যে ধলা ও কালার সংখ্যার অনুপাত কিরূপ, তবেই মুস্কিল! এ সুবিধা ভোগ করিতে পাইলে কটা ও মেটেরা কেন 'ভারতীয়ের' খাতে নাম লিখাইতে চাহিবে? যখন দরকার হয়, তখন কর্ণেল গিডনির মুখে শোনা যায়, তাঁহার ভাই-ব্রাদাররা 'ইণ্ডিয়ান'; কিন্তু রেলের চাকুরীর সময়ে? কাষ্টম, টেলিগ্রাফ বা মেসারার বিভাগেও তাই। আর আধা-সরকারী পোর্ট কমিশনারদের কাছেও এই একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ। ইস্পাতের কাটামো বজায় থাকিতে এ ব্যবস্থার এক চুল নড়চড় হইবে না, ইহা ধলা কটা ও মেটেরা বিলক্ষণই জানে।

—

বেত্রদণ্ড

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতেই বেত্রদণ্ড উঠিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। কোনওরূপ দৈহিক দণ্ড অধুনা সভ্য জগতে বর্ব্বর-প্রথা-সম্মত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বোধ হয় জগৎছাড়া, না হইলে এখানে বেত্রদণ্ডটিকে ঘি-তেল খাওয়াইয়া আরও পুষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে কেন? রাজনীতিক অপরাধে অপরাধী বালকের বা কিশোরের কোন কোন ক্ষেত্রে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। এ বিষয়ে আইন সভায় কাঁদাকাটা যথেষ্টই হয়। কিন্তু অন্যান্য কাঁদাকাটায় যে ফল হয়, ইহাতেও তথৈবচ! রাজবন্দীদের আন্দামানে চালানী উঠাইয়া দিবার সকল বন্দোবস্তই ঠিক হইয়াছিল। সরকারের নিযুক্ত কমিটিই ঐ সুপারিশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মতে আন্দামানের স্বাস্থ্য ভাল নহে, কাযেই সেখানে ভদ্র-বন্দীদের পাঠানো উচিত নহে। কিন্তু পরে হঠাৎ প্রয়োজন অনুসারে আন্দামানের স্বাস্থ্য গজাইয়া উঠিয়াছে, রাজবন্দী ও রাজনীতিক বন্দীদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম তথায় চালান দেওয়া হইতেছে। এ বিষয়েও আইন সভায় বিস্তর কাঁদাকাটা হইয়াছে। কিন্তু উহাও অরণ্যেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত অপরাধীর বেত্রদণ্ডের কথা উঠিয়াছে। কথাটা বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার। সেখানে নিত্য দাঙ্গা লাগিয়াই আছে, এ কথা সত্য। কলিকাতা, কানপুর, আগ্রা প্রভৃতি সহরেও যে দাঙ্গা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু বোম্বাইয়ে উহার বহরটা যেন কিছু বেশী। বোম্বাই Gateway of India অর্থাৎ ভারতে প্রবেশের দ্বার বলিয়া তথায় জগতের নানা দেশের নানা জাতির লোক প্রবেশ করে;—হাবসী, মেমন, বোরা, খোজা, মাওয়ালী, মারাঠা, কচ্ছী, গুজরাটি, পার্শী,—এমন কত জাতি। কাযেই যেখানে নানা জাতি নানা ধর্ম্মী লোকের বসতি, সেখানে পরস্পর স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাই সেখানে সাম্প্রদায়িক বা বে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়া থাকিবারই কথা।

সুতরাং সেখানে দাঙ্গা দমনের জন্ম আইনের কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়াস স্বাভাবিক; কিন্তু বেত্রদণ্ড ছাড়া আর কোনও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা যায় না কি? বোম্বাইএর গত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিস্তর লোক নিষ্ঠুরতা আচরণের জন্য ধরা পড়িয়া বিচারার্থ চালান হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের লঘু দণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে সংবাদপত্রে তাহার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে যদি লঘু দণ্ডের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ বা কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে গুণ্ডাদের ভয় হইত। কিন্তু সে ব্যবস্থা না করিয়া এখন আইনের সাহায্যে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার ব্যবস্থা করারই অনুরূপ। কিন্তু দাঙ্গাকারী অপরাধীদের প্রতি বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেই কি দাঙ্গার পথ বন্ধ হইবে? উত্তেজনার মুখে যখন লোক দাঙ্গায় মাতে, তখন কি তাহারা বেত্রদণ্ডের কথা মনে রাখিয়া দাঙ্গায় নামিবে, না বেত্রদণ্ডের ভয়ে ক্রোধ ও হিংসা বিসর্জ্জন দিয়া আইনভীরু শান্তিপ্রিয় লোক বনিয়া যাইবে?

—

নারী-প্রগতি

ভারতে নারী-প্রগতি দ্রুতই চলিয়াছে। পাঞ্জাবে নারী-শিক্ষা-মন্দিরের নারী অধ্যক্ষ Co-education দাবী করিয়াছেন। সেখানে বালক-বিদ্যালয়ে ৫ বৎসর পূর্ব্বে বালিকা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার। এ বৎসর সংখ্যা ৫৪ হাজারে উঠিয়াছে। সুতরাং বালক-বালিকার Co-educationএর প্রগতি বেশ দ্রুতই হইতেছে বলিতে পারা যায়। যুক্তপ্রদেশে নিখিল ভারত নারীসম্মেলনে নারীর যৌবন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিসূচক মন্তব্য ত গৃহীত হইয়াছিলই, পরন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধেও প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রতীচ্যের সভ্য স্বাধীন জাতিদের নারী-প্রগতির সহিত পাল্লাপাল্লিতে আমরা যে পিছাইয়া পড়িতেছি, এ কথা এখন আর কেহ বলিতে পারেন না। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় পুরুষ মন্ত্রী শ্রীযুত কৈলাস শ্রীবাস্তব মহাশয় নারী-প্রগতিতে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন। অদ্ভুত ধৃষ্টতা বটে! কিন্তু এই স্বার্থপর পুরুষের

বাধারূপ মত্তমাতঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার নারী-সদস্যার দুর্ব্বার জাহ্নবীস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। এই নারী-সদস্যা স্বয়ং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সুশীলা শ্রীবাস্তব। শ্রীমতী প্রস্তাব করেন যে, যখন ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইতেছে, তখন ছাত্রীদেরও অবশ্য করিতে হইবে। ইহা ত অতি যুক্তি-যুক্ত কথা, কেন না, এখন জগতের সর্ব্বত্রই নর-নারীর equal rights মান্য হইতেছে। শ্রীমান্ কিন্তু ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু অজাযুদ্ধে অথবা ঋষিশ্রাদ্ধে যাহা হইয়া থাকে, এ ব্যাপারেও (দাম্পত্য-কলহে) তাহাই হইয়াছে, পুরুষকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় আগে ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরে ছাত্রদের ব্যবস্থা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহাতে নারী-প্রগতির অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তই পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালায় প্রগতিটা আরও দ্রুত। এখানে স্যাণ্ডাল ও ববড্ হেয়ারের ফ্যাসান যতটা চল, ততটা গুজরাট মারাঠা মদ্রেও দেখা যায় না। এখানে ট্যাবলো, মিউসিক্যাল সয়ার, থিয়েটার অভিনয়, নৃত্যগীতের প্রগতিও বিশেষ লক্ষ্য করিবার। কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর মুখে শুনা গিয়াছে যে, তিনি কোন বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া নারী-মজলিসের কক্ষ-সম্মুখস্থ অলিন্দে পাদচারণা করিতে করিতে কক্ষটি সিগারেটের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা hearsay evidence, গ্রহণীয় না-ও হইতে পারে। তবে স্কোয়ারে বা ট্রামে বাসেও ববড্ হেয়ার ও সিগারেট বাহার যে নিতান্ত দুর্লভ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী কিছুতেই বলিতে পারিবেন না।

কয়েক দিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' পুরী একসকার্শানের একটা বর্ণনা বাহির হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া জানা যায়, কোন Co-education কালেজের কয় জন তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রী পুরীর সমুদ্রতটে excursionএ গিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিতই ওপারের river pictureকে পাল্লা দিতে পারে। তবে ওপারের mixed bathingএর মত পুরী excursionএও mixed bathing ছিল কি না, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তথাপি যতটুকু হইয়াছে, তাহাতেও বাঙ্গালায় নারী-প্রগতির দ্রুতত্বের কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর বাঙ্গালায় এত দিন কালেজে ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস-সমূহে Co-education অর্থাৎ তরুণ-তরুণীর একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের Co-educationএর ব্যবস্থা ছিল না। এই ত্রুটি এইবার দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। শুনিতেছি, বাঙ্গালার ৬৭টি শিক্ষাকেন্দ্র হইতে স্কুলকর্ত্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব ঐ সকল স্কুলে কিশোর-কিশোরীর Co-educationএর একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তবে যদি একান্তই সে ব্যবস্থা এখন করার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে স্বতন্ত্র নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর সুবিধা হইলেই Co-education চাই-ই। সুতরাং নারী-প্রগতির জন্য আর মাথাব্যথার কোনও প্রয়োজন নাই, আর বাঙ্গালী কবিরও আর 'না জাগিলে' ইত্যাদি বলিয়া আপশোষ করিবার কোনও কারণ নাই।

প্রগতি-প্রার্থীদের জয়যাত্রার পথ ক্রমে মসৃণ হইয়া আসিতেছে। প্রগতির ক্ষুধারও কিছু কিছু নিবৃত্তি হইতেছে। তবে প্রগতির আদিস্থান মার্কিণ মুল্লুকের প্রগতি-পাণ্ডারা 'যুগল-শিক্ষা'র ব্যবস্থায় বর্ত্তমানে যে ডিস্পেপ্সিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার পরিচয় দিতেছেন এবং বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ সমাজতত্ত্ববিদ্ হেকিম কবিরাজদের শরণাপন্ন হইতেছেন, সে রোগ এ দেশের জয়যাত্রীদের দেখা না দিলেই ভাল।

ভারতীয় পল্টন

ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যাদব ভারতীয় পদাতিক পলটনে দক্ষিণ-ভারতীয়দিগকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিণামে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সম্পর্কে বিশেষ কৌতুকপ্রদ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। প্রস্তাবক বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ-ভারতীয়রা সমরদক্ষ, তাহাদের সাহায্যে এ দেশে ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল। আর্কট জয় তাহারাই করিয়াছিল এবং ক্লাইভ তাহাদের সাহায্যে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। উত্তরে উত্তর-ভারতের কোন সদস্য বলিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতের পাঠান, রাজপুত, গুর্খা, শিখ প্রভৃতিরাই সমরদক্ষ, তাহাদের সাহায্যেই ইংরাজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব-প্রতিষ্ঠায় কে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা লইয়াই তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, আসলে ভারতীয়ের অধিকারের কথাটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখানেও ভাগাভাগি। ভারতের অদৃষ্টলিপিই এইরূপ।

আরও আছে। উত্তর-ভারতের কোন সদস্য বলেন, রামচন্দ্র দক্ষিণ-ভারত জয় করিয়াছিলেন। উত্তরে দক্ষিণ-ভারতীয় কোন সদস্য বলেন, রামচন্দ্র দক্ষিণ-ভারতীয় সৈন্য সাহায্যে দক্ষিণ-ভারত ও লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। যদি ইহাও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সামরিক ব্যাপারে উত্তর-ভারতের লোকের মস্তিষ্কের প্রাধান্য আছে। সে হিসাবে প্রস্তাবক বাঙ্গালীর কথা তুলিলেন না কেন? বাঙ্গালী বে-সামরিক জাতি, ইংরাজ আমলেই এ কথাটা তোলা হয়। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে বাঙ্গালী মোহনলাল অথবা দক্ষিণ-কালিকাতার ফৌজদার বলরাম বসু (যাঁহার নামে এখনও ভবানীপুরে বলরাম বোস ঘাট ষ্ট্রীট প্রসিদ্ধ এবং যাঁহার একটা কামান কীর্ত্তি মিত্রের ভবনে ছিল) যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাহার পূর্ব্বে পাঠান ও মোগল আমলেও বাঙ্গালী কালাচাঁদ (কালাপাহাড়), রাজা গণেশ, সীতারাম রায়, কেদার রায়, চাঁদ রায় এবং রাজা প্রতাপাদিত্যেরও বাঙ্গালী সৈন্য ছিল এবং তাঁহারাও সেই সৈন্যের সাহায্য লইয়া প্রবল রাজশক্তিকে বাধা দিয়াছিলেন, ইহাও ইতিহাসের কথা। আর বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের আমলে বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়, রাজা শশাঙ্কের বাঙ্গালার বাহিরে রাজ্যবিস্তার প্রভৃতির পরিচয়ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। আর এই কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা পল্টন (৪৯ বেঙ্গলীস) ইরাকে ও কুর্দ্দীস্থানে যে শৃঙ্খলা ও সমরশিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা উপরওয়ালা ইংরাজ সেনানীদের ভূয়সী প্রশংসা হইতে জানা যায়। ভার্দুনে বাঙ্গালী গোলন্দাজ সেনা (ভারতের ফরাসী প্রজা বাঙ্গালী)

অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে বাঙ্গালীও তাহার শক্তিসামর্থ্য ও মস্তিষ্কের পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তবে নূতন করিয়া দেশীয় পল্টন গঠন করিবার কথা উঠিলে বাঙ্গালীরই বা তাহাতে নাম উঠে না কেন? ব্যয়-বাহুল্যের খাতিরে পল্টনের ৪০ হাজার লোক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রস্তাবও সেজন্য প্রত্যাহৃত হইল। কিন্তু সময় ভাল হইলে নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিলে বাঙ্গালীকে তাহাতে স্থান দিতে হইবে, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল

ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিলের আলোচনাকালে পরিষদের বহু বে-সরকারী সদস্য বলিয়াছেন যে, এই অভিনব কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ভারতের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন নহে, বিলাতের জেনারল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মন রক্ষা করাই হইতেছে উহার মূল উদ্দেশ্য। এ কথাটা যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা এ দেশের শীর্ষস্থানীয় ডাক্তাররা প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়।

যে ভাবে মেডিক্যাল কাউন্সিল গঠন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে উহার অধিকাংশ সদস্যই সরকারের মনোনীত অথবা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইবেন। অথচ বিলাতের জেনারল মেডিক্যাল কাউন্সিলের ৩৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন মনোনীত। ব্যবস্থার এ তারতম্য কেন করা হইবে? তাহা পর বিলে লাইসেনসিয়েণ্টদিগকে রেজিষ্টারভুক্ত করিবার ব্যবস্থা নাই, পরন্তু পাটনা, অন্ধ্র ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষার ডিগ্রী মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না।

কথা এই, যে ব্যবস্থায় এ-দেশকে চিরদিনই বিলাতের আঁচল ধরিয়া চলিতে বাধ্য করা হইবে, সে ব্যবস্থার যতই উপকারিতা থাকুক, তাহা ভারতবাসী কিছুতেই স্বেচ্ছায় মানিবে না। বর্ত্তমানে এ দেশে এমন সব ডাক্তার আছেন, যাঁহাদের চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা জগতের কোন জাতির অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাঁহারাও কি নিজের দেশে ডাক্তারী শিক্ষার standard ঠিক রাখিতে সমর্থ নহেন? আর 'দুই দিন' পরে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে বলিয়া জোর কাঠিতে ঢাক পেটা হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে এই বিল পাশ করাইয়া লইবার জন্য সরকার এত ব্যস্ত কেন? যদি বিলের প্রয়োজনীয়তা অধিকই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের 'স্বরাজ' গভর্ণমেণ্ট ত তাহা হইলে উহা পাশ করিতে পারেন।

সুয়োরাণীর আবদার

সার ব্যামফিল্ড ফুলার ভাল কথাটাই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সরকার যে ভাবে সুবিধাবাদী মুসলমানদের লইয়া হুলোমালা করিতেছেন এবং সেই আদরে ঐ শ্রেণীর মুসলমানরা যে ভাবের অসম্ভব আদর আবদার কাঁড়াইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে সার ব্যামফিল্ডের বর্ণিত সুয়োরাণীর পদবাচ্য হইতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতেই লোক লইয়া সরকার গোলটেবিলে গোটা ভারতের মুসলিম প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করিলেন এবং তাঁহাদেরই আবদার রাখিয়া প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের বিরোধ-আপেল (apple of discord) ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের পিপাসা মিটিতেছে না, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব তাঁহাদের মনোরথের গতির আর নিবৃত্তি নাই, হয় ত কোন্ দিন সত্যই চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া তাহার চক্রস্পর্শ হইবে। আবার মজা এইটুকু যে, যেখানেই দু' পাঁচটি মুসলমানের সমাবেশ হয়, অমনই খবরের কাগজে বড় বড় হরপে ঘোষণা করা হয়,—"বিরাট মুসলমান সভায় গোটা ভারতের মুসলিম সম্মেলন!' এবং উহাতে টুলী ষ্ট্রীটের ৩ দরজী ৩ শত দরজীরূপে বলেন যে —"ভারতের মুসলিমরা ইহার কমে সন্তুষ্ট হইবে না, ভারতের মুসলিমদের এই কয়টা দাবী একবারে অকাট্য," ইত্যাদি।

সম্প্রতি গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে এই শ্রেণীর এক 'বিরাট' 'নিখিল ভারতীয়' মুসলিম পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল ও তথায় কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া এক 'বিরাট' সংবাদ রটিত হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, এই 'বিরাট' সভার লোকসংখ্যা হইয়াছিল সর্ব্বসাকল্যে ৪২টি! কিরূপ বিরাট, একবার বুঝিয়া দেখুন।

প্রস্তাবগুলি কিন্তু সত্যই বিরাট। তাহার বহর দেখুন:—

(১) বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সদস্যের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজন্য 'বিরাট' মুসলমান শঙ্কিত। যাহাতে বাঙ্গালার বিশেষ নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে আরও ৮টি সদস্য পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত হয়, তাহা করিতেই হইবে।

(২) উড়িষ্যাকে যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইতেছে, তখন খাস বেহারের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানরা যাহাতে শতকরা ৩০টি সদস্য-পদ পাইতে পারেন, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ যে কবির বর্ণিত "পেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে"র চেয়েও বাড়াবাড়ি আবদার! জল-ঝড়ের সময় উট দরজীর কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার আস্তানায় কেবল তাহার মাথাটা কোন গতিকে রাখিতে পাইয়াছিল। ক্রমে সে গলাটা, তাহার পর পেটটা, সব শেষে সমস্ত দেহটাই দোকানে ঢুকাইয়া দিয়াছিল, শেষে দরজী বেচারীরই স্থান হয় না! এও যে তাই।

বাঙ্গালায় হিন্দুদের সদস্যপদ মাত্র ৮০টি। তন্মধ্যে পুণা চুক্তিতে ৩০টি পদ তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। বাকী ৫০টির মধ্যে কতকগুলি শেষোক্ত সম্প্রদায় সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভিতর দিয়া দখল করিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ ২০টি ক্ষেত্রে এইরূপ হইবে; অন্ততঃ ১৫টি পদ ত তাঁহারা এই ভাবে পাইবেনই। তবেই অন্য হিন্দু ও অন্যান্য জাতির জন্য রহিল একুনে ৩৫টি পদ। যদি শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি

জাতিরা ৫টি পদ পান, তবে 'উন্নত' হিন্দুদের ভাগে পড়িল মাত্র ৩০টি! ইহাতেও কিন্তু এই সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী ৪২টি মুসলমানের ভয় ঘুচে নাই,—যদি বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলীরও কয়েকটা পদ দুষ্ট হিন্দুরা দখল করিয়া বসে! অতএব আর ৮টা চাই-ই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, যদি তাঁহাদের যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তার এলেম থাকে, তবে এত ভয় কেন?

বেহারে মোট ১৫০ সদস্যপদের মধ্যে সরকার মুসলমানদের জন্য ৪২টি দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও কুলাইতেছে না, ইহার উপর বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মারফতে আরও ৩টি পদ অধিক দিতে হইবে! সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতেও তাঁহাদিগকে শতকরা ৩০টি পদ দিতে হইবে। কেন? বেহারের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ জন কি মুসলমান? বর্ত্তমানে বেহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা মোট ৪ কোটি ২৩ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৪২ লক্ষ! তবে এই আকাশের চাঁদ হাতে চাওয়া কেন? চাহিয়া চাহিয়া বুক বলিয়া গিয়াছে বলিয়া কি? জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মুসলমানরা ত এমন অসম্ভব আবদার করাকে মুসলমান সমাজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন।

সুবিধাবাদী মুসলমানদের ভাবগতিক দেখিয়াই কি সার এলফ্রেড ওয়াটসন লিভারপুলে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন,—"যত দিন ভারতে ৯ কোটি মুসলমান এবং তাহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যসমূহ থাকিবে, তত দিন ভয় কি? ইহাদের উপর যত দিন নির্ভর করিতে পারা যাইবে, তত দিন কংগ্রেসকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই"?

—

কালেজী কৃষিশিক্ষা

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ছেলেদের কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি কমিটীও নিযুক্ত হইয়াছে। অধুনা কালেজী বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, এই ভাবে একটা নূতন কিছু করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, না করিলে ছেলেরা যায় কোথা, দাঁড়ায় কিরূপে? কেবলই গাদা গাদা উকীল, মোক্তার বা ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার গড়িয়া ফল কি? উহাতে দেশে নিত্য নূতন ধনাগমের উপায় হয় না, দেশের টাকাই নাড়া হয়, হাত-ফেরাফিরি হয় মাত্র। এ জন্য এই বৈশ্যযুগে—যে যুগে শিল্প-বাণিজ্যই সকল উন্নতির মূল, সেই যুগে ছেলেদের কেতাবতি বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই বা লাভ কি?—বরং তাহার উপর শিল্প-বাণিজ্য—না হয় 'তদর্দ্ধ' কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিলে হয় ত সুফল ফলিতে পারে, এইরূপ অনেকের ধারণা। কৃষিপ্রধান ভারতে কথাটার মূল্য যে কিছু নাই, তাহা নহে।

বর্ত্তমানে প্রতীচ্যের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত দেশসমূহে কৃষিলব্ধ ফসল এবং কৃষিজপণ্য দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে, এ কথা সত্য। আর আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলের কৃষিকার্য্যই চলিয়া আসিতেছে। সার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন এই হেতু বেকার ভদ্র যুবকদের সাহায্যে সুন্দরবনে উন্নত প্রথায় কৃষিকার্য্য করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন ও নবীন প্রথার মধ্যে কোন্‌টা, ভাল কোন্‌টা মন্দ, ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কোন ফল নাই। যদি এ দেশের বেকার ছাত্রদের কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া একটা নূতন আয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহাতে দেশের উপকার হইতে পারে। কিন্তু সকল সভ্য দেশেই সরকারের বিশেষ সাহায্য দানের ফলে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছাত্ররা দেশে নূতন ধনাগমের উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কি সেরূপ কোন সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন? নতুবা কমিটী কমিশনে বা নিছক শিক্ষাদানে কোন ফল নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছেলেরা কৃষিবিদ্যা লাভের পর কি করিবে, তাহা পূর্ব্বে স্থির করা উচিত। আমরা জানি, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু ও তাঁহার সমসাময়িক ভূপালচন্দ্র বসু বিলাতে গিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরিয়া তাঁহারা সেই শিক্ষার পরিচয় দিবার কোন অবসর পান নাই।

আর একটা কথা। দেশের কৃষকদের অন্নে ইহাতে হাত পড়িবে না ত? কৃষকদের বজায় রাখিয়া যদি কালেজের ছাত্রদের কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপত্তি নাই। এ দেশের চাষের জমী খণ্ড খণ্ড হওয়ার ফলে কৃষির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহার উপর যদি সেই জমীর উপরেও কৃষক ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের নজর পড়ে, তাহা হইলে দেশের লাভ কি? তদপেক্ষা যদি এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাহার ফলে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছাত্ররা কৃষকদের সহিত সহযোগ করিয়া কৃষির উন্নতির চেষ্টা করে অথবা পতিত অথচ উর্ব্বর জমীতে নূতন ফসল বানাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলেও উপকার হইতে পারে। কৃষি-কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

—

খাদি-সংরক্ষণ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংএর খাদিসংরক্ষণ আইনের খসড়া সম্বন্ধে বাদানুবাদের পর সরকার পক্ষে সার জোসেফ ভোর জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিলখানি নূতন নহে, এই ভাবের বিল পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। জাপানী ও অন্যান্য নকল খদ্দরের প্রচলনে আসল খদ্দরের উৎপাদনে ও প্রচারে বাধা পড়িয়াছে বলিয়াই আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। ফলে কৃষক ও শ্রমিকরা, পরন্তু ভদ্র দরিদ্র গৃহস্থরাও অবসরকালে চরকা চালাইয়া যতটুকু অর্থ অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা হইতে বহুলাংশে তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে। কাযেই বিলে আপত্তির কোন কারণও থাকিতে পারে না। সরকার পক্ষও আপত্তি করেন নাই। তবে সার জোসেফ ভোর বিলখানি সিলেক্ট কমিটীর হাতে না দিয়া জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন কেন? ইহাতে কি অনর্থক বিলম্ব হইবে না? এ সম্বন্ধে জনমত কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে কি?

—

অবিচারের দৃষ্টান্ত

জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ভারতের পল্টন ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সে প্রথম জার্ম্মাণ আক্রমণের প্রবল বেগ প্রতিহত করিয়াছিল, তাহাদের নেতা সেনাপতি জেনারল রলিনসন স্বয়ং এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে শিখ গুর্খা পাঠানদের সুখ্যাতিতে বিলাতী পত্র ভরিয়া গিয়াছিল। সেই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ ভারতকে অনেক কিছু—এমন কি, আকাশের চাঁদও ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নদী পার হইলে কুমীরের ভয় কি? যে সব ভারতীয় সেনা সেই বিপদের দিনে বন্ধু হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে রণস্থলে মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আবার অনেকে আহত ও বিকলাঙ্গ হইয়া অকর্ম্মণ্য ও উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে দেশে ফিরিয়া অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, ব্যবস্থা পরিষদে তাহাদের পেন্সনের কথা উঠিয়াছিল। অক্ষম সৈনিকদিগের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত কমিটী নিয়োগের প্রস্তাবকালে মিঃ আজহর আলি বলেন যে, যুদ্ধে ৪ লক্ষ সৈন্য অপটু হইয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র ১।০ লক্ষের পেন্সনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা সুবিচার নহে।

সরকার পক্ষ কমিটী নিয়োগে আপত্তি করেন। ব্যয়সঙ্কোচ যে সময়ে অত্যধিক প্রয়োজন, সে সময়ে চারিদিকে বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যয় করা কর্ত্তব্য, ইহাই মূল কৈফিয়ৎ। কিন্তু সকল সময়ে এই 'সুবিচারের'—বা সূক্ষ্ম বিচারের উদাহরণ পাওয়া যায় না কেন? বাঙ্গালার অতীব দুর্দ্দিন, তাহার বাজেটে ১ ক্রোরের উপর ঘাটতি। তবে এই সময়ে বাঙ্গালার পাটের দরুণ প্রাপ্য টাকাটা বাঙ্গালাকে দিয়া বাঙ্গালার প্রতি সুবিচার করা হয় না কেন? নয়া দিল্লী বানাইবার সময়, শৈলবিহারের সময়, পুলিসের খরচা বাড়াইবার সময়, হাজার হাজার লোককে জেলে পুরিয়া খাওয়াইবার ও তদারকের ব্যবস্থা করিবার সময়, রাজনীতিক মামলায় ১৬ লক্ষ ১৮ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দিবার সময়, কেন্দ্রে কেন্দ্রে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করিবার সময়,—টাকার অনাটনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালার শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের সময় অথবা অভাবগ্রস্ত অক্ষম সেনাদের পোষণের সময় তহবিলে টাকার অভাব হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা!

সরকারী আয়-ব্যয়

ব্যবস্থা পরিষদে এ বৎসরের বাজেট আলোচনাকালে রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার অম্লানবদনে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর অবস্থা কিছু উন্নত হইয়াছে। বোধ হয়, এইটুকু ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন বলিয়াই সার জর্জ্জ প্রজার করভার বিন্দুমাত্রও লাঘব করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কার্য্যকাল ফুরাইয়াছে, ইহাই তাঁহার শেষ বাজেট বক্তৃতা; সুতরাং অনেকেই আশা করিয়াছিল, হয় ত বা শেষ মুহূর্ত্তে তিনি অন্ততঃ অন্যায়রূপে ধার্য্য ও গৃহীত আয়কর ও অন্যান্য কয়েকটি করভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়া যাইবেন। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। এ স্বচ্ছলতার নিদর্শন কিন্তু অভাগা প্রজারা তাঁহার রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থায় দেখিতে পাইল না!

অন্য দেশকে যে দারুণ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে আর ভারতকে করিতে হইতেছে না, এ ধারণার মূল কোথায়? সার জর্জ্জের ধারণা, ভারত তাহার মজুত স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া কষ্টের দায় এড়াইয়াছে। সার জর্জ্জ সুদূর পল্লীর সংবাদ রাখেন কি না জানি না, রাখিলে দেখিতে পাইতেন যে, সেখানে কি দারুণ অর্থ-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অতি সস্তা দরেও উৎপন্ন মাল বিক্রয় হইতেছে না, বাজারে ক্রেতা নাই। কাঁচা মাল বা পণ্য যোগানের অভাব নাই, কিন্তু তাহার বাজার কোথা? যদিও তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, মজুত সোণা বাজারে ছাড়িয়া লোক অর্থকষ্ট এড়াইয়া সস্তায় মাল কিনিয়াছে, তাহা হইলেও তাহারা কয় জন? কয় জনের ঘরে মজুত সোণা ছিল? আর যাহারা ঘরের সোণাদানা যাহা কিছু ছিল কুড়াইয়া বাজারে বেচিয়াছে, তাহারা পুঁজি ভাঙ্গাইয়া খাইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহাদের নির্ভর করিবার কি থাকিবে? এ দেশের লোকের ব্যাঙ্ক ত ঐ মজুত সোণাদানা। তবে?

সার জর্জ্জ দেখাইয়াছেন যে, সরকারের নূতন ঋণের টাকা দেখিতে দেখিতে সংগৃহীত হইল। ঘরে টাকা না থাকিলে টাকা আসিত কোথা হইতে? কিন্তু টাকাটা কি দেশের জনসাধারণের ঘর হইতে দেওয়া হইয়াছে? যাহাদের টাকায় ছাতা ধরে, যাহারা এই মন্দার বাজারে টাকা খাটাইতে পারিতেছে না, যাহারা প্রতি বৎসরেই 'কোম্পানীর কাগজ' ক্রয় করে, তাহারাই টাকাটা দিয়াছে। ইহার দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সূচিত হয় না।

দেশের লোক আমদানী পণ্য কিনিতেছে, ইহাও সার জর্জ্জের একটা যুক্তি। কিন্তু দেশের অবস্থার উন্নতির কথা বিচার করিতে হইলে আমদানী রপ্তানী দুই দিকের সামঞ্জস্য বজায় আছে কি না দেখিতে হয়। বিশেষতঃ দেশজাত শ্রমশিল্পজ অথবা কারুশিল্পজ পণ্য যদি অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা হইলেই বরং দেশের অবস্থা উন্নত হইয়াছে বলিয়া বোঝা যায়। ভারতের তাহাই হইতেছে কি? কেবল আমদানী পণ্য ক্রয় করিলে, বোঝা যাইবে, দেশের অবস্থা ভাল নহে, দেশে বিদেশের ধনাগম হইতেছে না। কিন্তু উহাই সমৃদ্ধির লক্ষণ।

ভারতের গৃহস্থ দারুণ অর্থকষ্ট না হইলে ঘরের সোণা বাজারে বাহির করিত না, পুঁজি ভাঙ্গিয়া পেটের ভাত, পরণের কাপড় যোগাড় করিত না। আজ ২ বৎসর ধরিয়া তাহারা এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আর তাই কোটি কোটি টাকার সোণা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কলসীর জল গড়াইলে কতদিন থাকে? অথচ সার জর্জ্জ বলিতেছেন, এখনও যে সোণা ভারতের মজুত আছে, যাহা গিয়াছে—ইহা তাহার ৩ গুণ হইবে। পাট ধানের দর বাড়িলে আবার সোণা মজুত হইবে, কিন্তু সে কবে? সোণা খাইলে পেট ত ভরে না, অতএব দরকারের সময় সোণা বেচা উচিত, সার জর্জ্জ এই যুক্তিও দিয়াছেন। তবে বৃটেন, মার্কিণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দরকার

হইলেও সোণা ছাড়িতেছে না কেন? বরং সোণা তাহারা মজুত করিতেছে। যে দেশের যত সোণা মজুত থাকে, বাজারে তাহার তত আর্থিক সুনাম হয়, এ কথাও কি সার জর্জ্জ অস্বীকার করিবেন?

সার জর্জ্জ বলিতেছেন, দেশের লোক অনাবশ্যক মজুত সোণা বেচিয়া ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিতেছে অথবা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিতেছে। কিন্তু উহা সত্য নহে। বর্ত্তমানে দেশের টাকার ও ব্যবসায়ের বাজার মন্দ বলিয়া লোক সাহস করিয়া অন্যত্র টাকা খাটাইতে চাহিতেছে না, তাই টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিতেছে বা উহা দ্বারা ক্যাস সার্টিফিকেট কিনিতেছে।

দেশের লোক ১০ হাজার গজ অধিক কাপড় কিনিয়াছে, পরন্তু কেরোসিনও অধিক কিনিয়াছে, ইহাও সার জর্জ্জের মতে তাহাদের অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু সার আব্দার রহিম দেখাইয়াছেন যে, গত ১০ বৎসরে দেশের লোকসংখ্যা ৩ কোটি বাড়িয়াছে, কয়েক গজ কাপড় বিক্রয় বৃদ্ধি হইলে তাহাতে অবস্থার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। আর লোক বিজলীবাতির খরচ কমাইয়া দিয়াছে বলিয়াই কেরোসিন বেশী কিনিতেছে।

সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া আয়করের প্রাপ্যটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা কর ধার্য্য হইয়াছিল। সার জর্জ্জের মতে সময় ভাল হইয়াছে; কেন না, তাহা না হইলে সরকারী চাকুরীয়াদের শতকরা ১০ টাকা বেতন কর্ত্তনের মধ্যে ৫৲ টাকার কর্ত্তন কমাইয়া দেওয়া হইল কেন? ইহার বেলা যখন সরকারী নেক-নজর দিবার সুযোগ হইল, তখন আয়কর ও অন্যান্য কয়টা করের বেলায়ই বা হইল না কেন?

আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার কথাটাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণর এই প্রদেশের আয়ব্যয়ের আলোচনাকালে বাঙ্গালার অবস্থা শোচনীয় চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। যাহাকে কেন্দ্র হইতে দান গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে হয়, কেন্দ্রেরই শোচনীয় অবস্থা হেতু সে কোনও সাহায্যের আশা না পাইলে উপায় কি হইবে? অবশ্য গভর্ণর বাঙ্গালা পাট ও আয়কর হইতে কেন্দ্রে দেয় খাজনার কিছু রেহাই পাইবার আশা করিয়াছেন, কিন্তু উহা কতটুকু?

গত বৎসর বাজেট প্রণয়নকালে সরকার পক্ষ আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব করিয়াছিলেন, এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহা সত্য হইবে না, আয়-ব্যয় কসিয়া বৎসরের শেষে অনুমান ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি টাকা সরকারী তহবিলে ঘাঁটতি হইবে! ইহার মামুলি কারণও দেখান হইয়াছে:—(১) ব্যবসায়ের বাজার মন্দা, (২) শস্য-মূল্যের হ্রাস, (৩) আইন অমান্য ও বিপ্লব আন্দোলনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়। বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পাট, ধান, চা প্রভৃতির দর অসম্ভব পড়িয়া যাওয়ায় কৃষক ও অন্য দরিদ্র অধিবাসীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে, জমীদার, মহাজন ও রায়তদেরও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এ দিকে রাজস্ব-মন্ত্রীর বাজেট-হিসাব হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সহিত তুলনা করিলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার কৃষকদের এক পাটের ব্যবসায়েই ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় কমিয়াছে, ধানে ৮৮ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর এই প্রধান দুই ফসলের আয় ১ শত ২২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কমিয়াছে! ইহা ছাড়া মুগ, কলাই, গুড়, তামাক, তৈলবীজ, তরিতরকারী বাবদও অনেক আয় কমিয়া গিয়াছে। চা আসামে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রধানতঃ কলিকাতা হইতেই বণ্টিত হয়। এ দিকেও বাঙ্গালার আয় কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা ইহাতেই জানা যায়। অথচ কেন্দ্র হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। বাঙ্গালী বলিতেছে, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

এই অবস্থার জন্য আগামী বৎসর বাঙ্গালীর জাতিগঠনমূলক কার্য্যে বাঙ্গালা সরকার শিক্ষার খাস বিভাগের জন্য ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন না, এবং শিক্ষার বিলি বিভাগের জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চিকিৎসা বিভাগে ৫০ লক্ষ ৭১ হাজার, সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে ৩৯ লক্ষ ৭৭ হাজার, পল্লীর পানীয় জল সরবরাহে ২ লক্ষ, শিল্প-বাণিজ্য বাবদ ১২ লক্ষ ৫ হাজার ব্যয়িত হইবে। বাঙ্গালার মত 'ছোটখাটো' দেশে এরূপ প্রচুর ব্যয় করিলে বাঙ্গালা হাঁপাইয়া উঠিবে না? কিন্তু ইহা ত হইবেই। কারণ, শান্তিরক্ষা বাবদে হিমালয়-প্রমাণ ব্যয়ের জন্য বাঙ্গালীই দায়ী!

অথচ বাঙ্গালা যে পথে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে বার বার পরামর্শ দিতেছে, তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। বাঙ্গালীর ভাগ্য!

সোঽহং ও রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কমলা" বক্তৃতায় 'মানুষের' সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম যেভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে আশাহত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বকবির নিকটে মানুষের সম্বন্ধে নূতন কথা শুনিবার আশা স্বাভাবিক। সে আশা সফল হয় নাই। তাঁহার ধারণার মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন।

তাঁহার মূল কথা এই যে,—"অতি-মানব (Superman) মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ অথবা লক্ষ্য। মানুষের ইতিহাস এই চরম আদর্শেরই বিকাশ করিয়া থাকে। ইহা স্রোতস্বিনী নদীর মত সাগরে আপনাকে মিশাইয়া দেয়, সাগরেই তাহার আত্মানুভূতি পূর্ণতা লাভ করে। নদী যেমন তাহার তটদ্বয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, অথচ যেমন সেই নদী সাগরে মিশাইলে তাহার আর কূল-কিনারা থাকে না, তেমনই মানুষের বাধাগুলি যখন অদৃশ্য হয়, তখন তাহার আত্মা বিশ্বাত্মায় লীন হয়; সেই অবস্থা বিশ্বানুভূতিরই নামান্তর। ইহাতেই মানুষের অসীমত্ব অনুসূচিত হয়।

"সাধারণ ধারণা এই যে, অতি অল্পসংখ্যক মনোমত মানুষই এই আত্মানুভূতির অধিকার লাভ করিতে পারে, 'সোঽহং' বলিতে পারে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সবার

পরমাত্মাকে জানিতে চাও, তাহা হইলে আত্মদর্শন কর। উপনিষদের 'সোহং' ইহারই নামান্তর।

"সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের কিন্তু 'সোহং' বলিবার অধিকার নাই। তাহারা জগতের অন্যান্য মানবের সহিত সংস্রব ও বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। তাহারা মানুষের সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য কার্য্য করে না। তাহারা জগতের দুঃখশোক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। সুতরাং উপনিষদের উপদেশ অনুসারে জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবার অধিকারী তাহারা হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করিয়াছেন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার অন্যান্য অনেক উক্তির মত ইহা অসাধারণ। ভারতের ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ উপনিষদের উপদেশ অনুযায়ী জীবনের পূর্ণতা লাভ করিবার অধিকারী নহেন, সোহং বলিবার অধিকারী নহেন, দুঃখবিপদ বরণ করিতে ভয় পান এবং বিশ্বমানব-মঙ্গলের জন্য কিছুই করেন না,— এই উক্তি অসাধারণই বটে! যাঁহারা ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা-কৃষ্টির মর্ম্ম-কথা কিছুই বুঝেন না, যাঁহারা ভারতের সংসার-ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী বলিতে পথের ভিখারী চিমটাধারী এক পয়সা দেলায় দে রাম সন্ন্যাসীদেরই জানেন, প্রতীচ্যের সেই শ্রেণীর 'পণ্ডিত' ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের মুখেই এ কথা শোভা পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তাঁহার ন্যায় দেশের ও জাতির গৌরব মনীষী সাহিত্য-মহারথের মুখে এ কি কথা? সত্য বটে, তিনি বিশ্বকবি, তাঁহার বিশ্ব-ভারতী বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে, তিনি বিশ্বপ্রেমেরই বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন, বিশ্বমানব-মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ভারতের অতীত ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক রাখেন না, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাসকে রূপকথার রচা কথা বলিয়া মনে করিতে পারেন, রামচন্দ্র উত্তর-ভারতের আর্য্য-সভ্যতার নিদর্শন কৃষিবিদ্যা দাক্ষিণাত্যের আমমাংসভোজী অসভ্য বর্ব্বর নিরক্ষর জাতিদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সীতা লাঙ্গলের ফলা ব্যতীত কিছুই নহে ও সীতা কৃষিভূমিরই সন্তান—এ কথাও তিনি স্বচ্ছন্দে প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া রামায়ণ-মহাভারতে চিত্রিত মহান্ চরিত্র-সমূহের (তাঁহার মতে কল্পিত চরিত্র হইলেও) আদর্শ ও অস্তিত্ব তিনি কিরূপে অস্বীকার করিতে পারেন? তিনি কি নারদাদি দেবর্ষি, দধীচি আদি মহর্ষি অথবা জনকাদি রাজর্ষির আদর্শ চরিত্রের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন? তাঁহারা সংসার-ত্যাগী হইলেও সংসারের মঙ্গলকামী ছিলেন না, মানবের মঙ্গলকামনা করিতেন না, এ কথা তিনি কিরূপে বলিতে পারেন? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ, কবীর প্রভৃতি তপস্বী সন্ন্যাসীও মানব-মঙ্গলের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সংসারেও ছিলেন। তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ,—কত নাম করিব? তাঁহারাও কি সোহং বলিবার অধিকারী ছিলেন না? পদ্মপত্রে জলের মত এই থাকিয়াও না থাকা—এই যে অনাসক্ত নির্লিপ্ত ভাব,—ইহা প্রতীচ্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক না বুঝিতে পারে, কিন্তু গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির ভাবপ্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের মুখে এ কথা শোভা পায় কি? তিনি অমর কবি চণ্ডিদাসের এ পদটি ভুলিয়াছেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যায়,—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

ঢাক পিটিয়া অথবা সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াই যে কেবল বিশ্ব-প্রেম বা মানব-মঙ্গল সাধন করা যায়, তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরা ধরা-ছোঁওয়া দেন না, নীরবে ঘরকে বাহির করিয়া বাহিরকে ঘর করেন, আপনাকে পর করিয়া পরকে আপন করেন। আমাদের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা মানব-মঙ্গলের জন্য সংসারে চলাফিরা করেন, কিন্তু জগতের লোককে না জানাইয়া! এইখানেই প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মধ্যে প্রভেদ। এই জন্যই এ দেশে Howard the philanthropist বা Father Damienর মত সন্ন্যাসীর নাম প্রচার নাই।

প্রবাসে সুভাষচন্দ্র

ব্যথা-বেদনাভরা অন্তরের গুরুভার বহন করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চির-আদরের সুভাষচন্দ্র ভগ্নদেহে ভগ্নমনে শ্যামা জন্মদা



জাহাজে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

বঙ্গজননীর স্নেহশীতল ক্রোড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রবাসে স্বাস্থ্যকামনায় যাত্রা করিলেন। আবার কবে বঙ্গজননী সদা হাস্যানন সুদর্শন একনিষ্ঠ সেবক সন্তানকে সুস্থ সবল দেহে ক্রোড়ে ফিরিয়া পাইবেন, তাহা বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন!

সমগ্র দেশের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ, আত্মীয়স্বজনের আকুল আবেদন-নিবেদন, বর্ষীয়ান জনকজননীর কাতর প্রার্থনা,—সবই বিফল হইল! সরকারের অমোঘ বিধান তাঁহাকে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাদের চরণবন্দনায় নিরাশ করিয়া দিল। শেষ মুহূর্ত্তে বোম্বাই সরকার ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিবের নির্দ্দেশমত প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই,—তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনেরও সহিত স্বাধীনভাবে সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই,—এ কথা সুভাষচন্দ্রের বিদায়বাণীতেই ব্যক্ত।

সুভাষচন্দ্র সাগরবক্ষ হইতে ২রা মার্চ্চ দেশবাসীকে যে বাণী দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন তাহারা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যেন ভগবানের অপার দয়ায় তাহাদের জন্মভূমি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়াও নবজীবন লাভ করিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেশবন্ধুর বাঙ্গালা হইতে যেন নূতন বাঙ্গালার জন্মলাভ হয়! তাঁহার স্বপ্নলোকের ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা যেন সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বদ্বেষের অতীত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—সকলেরই জন্মভূমিরূপে আবির্ভূত হন!

সুভাষচন্দ্র আবেগভরে নিবেদন করিয়াছেন,—আপনাদের ক্ষুদ্র গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া যান, আপনাদের ব্যক্তিগত মতানৈক্য পরিহার করুন, বাঙ্গালাকে মিলিত ও মহান্ করিবার চেষ্টা করুন। আপনাদের নিকটে জন্মভূমির মহত্ত্বই যেন চরম সুখ ও গৌরবের বিষয় হয়!

সুভাষচন্দ্র আমাদের বড় সাধের এই কলিকাতা মহানগরীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পৌর কর্ম্মকর্ত্তারূপে সাধ্যমত কলিকাতার সেবা করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসীকেও সম্বোধন করিয়া তিনি মেয়রের পত্রে বলিয়াছেন,—কলিকাতা হইতে আমাকে কত দিন দূরে থাকিতে হইবে, বর্ত্তমান ব্যাধি হইতে কত দিনে মুক্ত হইব, তাহা জানি না। বিদেশে অবস্থানকালে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে যে কোন ভাবে আমি যদি কলিকাতার কোন সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিব।

আজ মায়ের সেবক যে ইঙ্গিত করিয়া গেলেন, বাঙ্গালী কি তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারিবে? গৃহ-বিবাদে

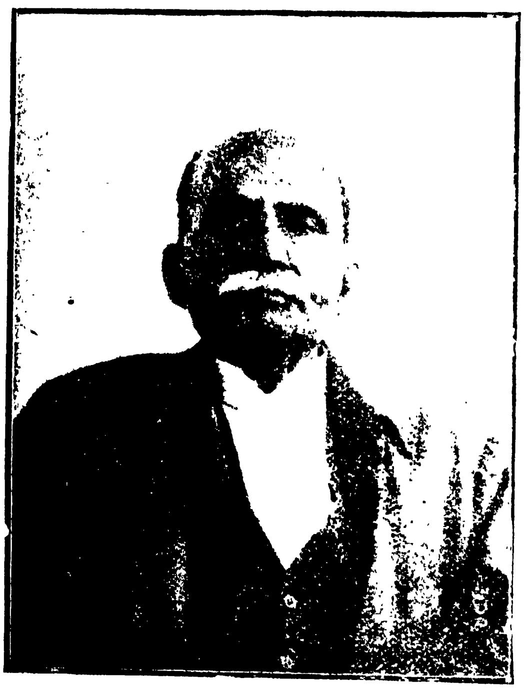


বোম্বায়ে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মোটরগাড়ী হইতে গঙ্গে জাহাজে নীত হইতেছেন।

বাঙ্গালী শতধা ছিন্ন, তাহার শক্তির এতই ক্ষয় হইতেছে যে, সে আজ কোথায় কোন্ নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় তাহাদের ধারণারও অতীত! সুভাষচন্দ্রের বিদায়বাণী যদি তাহাদের এই মোহঘোর দূর করিতে পারে, তাহা হইলে অমঙ্গল হইতেও—তাঁহার নির্ব্বাসন হইতেও—মঙ্গলের উদ্ভব হইতে পারে। সুস্থ সবল দেহমনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুন, আসিয়া তাঁহার অসমাপ্ত মাতৃসেবার ভার গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার দেশবাসীর আন্তরিক কামনা।

প্রবাসী বাঙ্গালীর মহাপ্রয়াণ

গত ১৬ই মাঘ রাঁচির স্বনামধন্য চিকিৎসক নরেশচন্দ্র মিত্র ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, নরেশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। রাঁচির এমন কোন



নরেশচন্দ্র মিত্র

প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার সহিত কোন না কোনওরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। একাদিক্রমে ৩৮ বৎসরকাল তিনি রাঁচির মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং পরে চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি বেহার ও উড়িষ্যার মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ রেজিষ্ট্রেশানের নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। ইদানীং কয় বৎসর তিনি সরকারী মনোনীত সদস্যরূপে কায করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতের লোকান্তর

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজের প্রতিভাগুণে পরে এ দেশের সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত এবং হিন্দু সমাজের প্রকৃত হিতকামী বন্ধু ছিলেন। অধ্যাপনায় তাঁহার কৃতিত্বের কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজটি ব্যয়-সংকোচের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত নিষ্ঠাবান এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের তিরোধানে বাঙ্গালা ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই।

সাহিত্যিকের অকালমৃত্যু

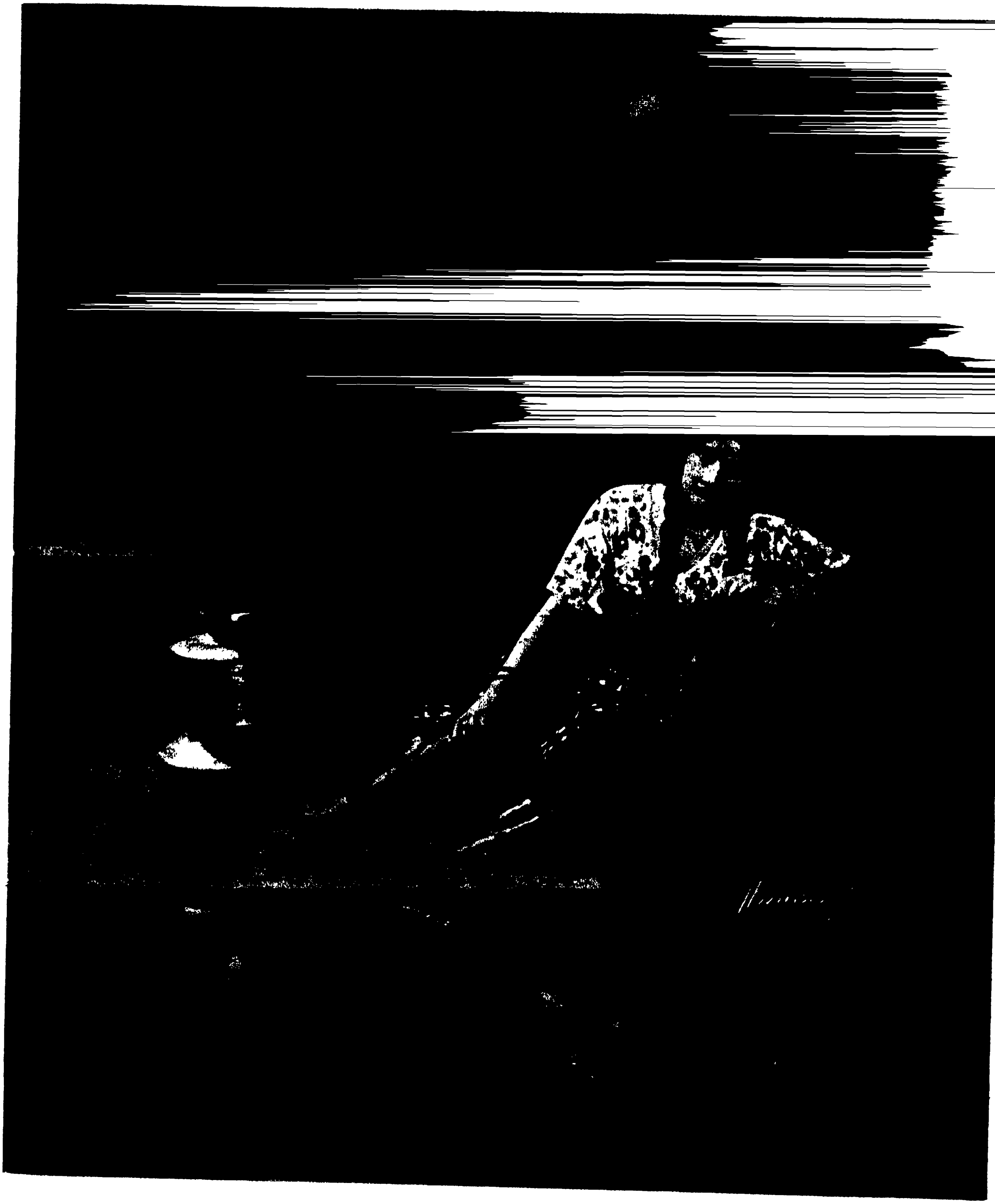
উদীয়মান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি একখানি মাত্র প্রহসন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' লিখিয়াই নাট্যামোদী সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত তাঁহার বেনামী ব্যঙ্গ কবিতা ও রঙ্গরহস্য বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। হাস্যরস-রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। তিনি সামাজিক, বন্ধুবৎসল ও সদালাপী ছিলেন। নবীন সাহিত্যিকের এই অকালমৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার বর্ষীয়সী জননীকে এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

পরলোকে কিশোরীলাল

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কিশোরীলাল ঘোষ মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিশোরীলাল হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। কিন্তু ব্যবহারাজীবের পেশায় তাঁহার আসক্তি ছিল না, সংবাদপত্র-সম্পাদনে এবং শ্রমিক সঙ্ঘ গঠনেই তিনি জীবনের সমস্ত আগ্রহ উৎসাহ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে কায়মনে আত্মনিয়োগ করার ফলে সমাজ-বিপ্লবী কমিউনিষ্টরূপে তিনি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিলেন। হাজত আসামী-রূপে অবরুদ্ধ থাকা কালে সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি তিনি এইটুকু স্বীকার করেন যে, তিনি কমিউনিষ্ট নহেন এবং হইতে ইচ্ছাও করেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু তেজস্বী কিশোরীলাল প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্ত হইতে চাহেন নাই।

আমরা তাঁহার অকালপ্রয়াণে প্রিয়জনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার বর্ষীয়সী জননী, অনাথা বিধবা ও সন্তান-সন্ততি এবং পরম আত্মীয় সাহিত্য-সুহৃদ ফণীন্দ্রনাথ পালের এই দারুণ শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



"যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে,"—রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

[শিল্পী—মিঃ জে, টমাস।



সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৌদ্ধধর্ম্মে শক্তিবাদ

শক্তিবাদ ধর্ম্মজগতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশই বিশ্বস্রষ্টাকে স্বীয় জননীজ্ঞানে পূজা করিয়া ধন্য হয় নাই। মাতৃভাবের এরূপ পূর্ণবিকাশ ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে আর হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দুইটি সেমিটিক ধর্ম্ম, যথা ইস্‌লাম ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রধানতঃ জগৎপিতার উপাসনায় পর্য্যবসিত। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশা-জননী মেরি ম্যাডোনার পূজা প্রচলিত থাকিলেও উহা খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয় নাই। প্রাচীন মিশরে দেবীপূজা প্রসিদ্ধ ছিল ; পরন্তু উহাই মিশরকে পিরামিড বা মামি অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শক্তিবাদ মিশরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইস্‌লাম, পার্শীধর্ম্ম ও তাও-ধর্ম্মে শক্তিবাদের বীজও অঙ্কুরিত হয় নাই বলিলেও চলে।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার "Introduction to Buddhist Esotericism" নামক গ্রন্থে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুগ হইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ হউক, ভারতীয় ধর্ম্মে শক্তিবাদ স্বদেশজাত নহে ; উহা বিদেশ হইতে সম্ভবতঃ শক পুরোহিত ম্যাজীদের দ্বারা আমদানী। ইতিহাস এই মতের কতদূর সাক্ষী ও পরিপোষক, তাহা বলিতে পারি না। তবে বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেও বাঙ্গালায় পঞ্চোপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল, এইরূপ জানা যায়। এমন কি, বৈদিক যুগেও যে শক্তিবাদের বীজ শুধু অঙ্কুরিত নহে, এমন কি পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সামবেদীয় কেন উপনিষদে। তাহাতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপিণী বহু শোভমানা দেবী উমা হৈমবতী দেবতাদের গর্ব্ব চূর্ণ

করিতে মরলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎসমক্ষে বায়ু যখন সর্ব্বশক্তিপ্রয়োগে একটি কুশাগ্র নড়াইতে ও অগ্নি তৎপর উহা দহন করিতে পারিল না, তখন উমা হৈমবতী তাহাদের এই শিক্ষা দিলেন যে, অসুরদের উপর দেবগণের এই বিজয় ঐশী শক্তিতে হইয়াছে—স্বশক্তিতে নহে। ঋগ্বেদোক্ত মহর্ষি অম্ভৃণের বাক্ নামক ব্রহ্মবিদুষী কন্যা সমাধিতে বিশ্ব-শক্তির সহিত ঐক্য অনুভব করিয়া বলিলেন, "আমি ঈশ্বরী, ভগবতী, রাষ্ট্রী, আমি শক্তিরূপে সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বজীবে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, আমিই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করি", তখন আমরা শক্তিবাদের উদ্ভব বৈদিক যুগেই পাই। শ্রেষ্ঠ বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রীর আবাহানে, গায়ত্রীকে ব্রহ্মযোনিরূপে স্তব করার প্রথা বৌদ্ধপূর্ব্ব-যুগেই সৃষ্ট। তবে এই বৈদিক শক্তিবাদ যে বৌদ্ধধর্ম্মে অসম্ভবরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত, তাহা নিঃসন্দেহ।

বাঙ্গালাই প্রাচীন কাল হইতে শক্তিসাধনার পাদপীঠ। এই বাঙ্গালার মাটীতেই বৌদ্ধধর্ম্মের বজ্রযান শাখা বা বৌদ্ধ-তন্ত্র বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দু-তন্ত্রের সৃষ্টি না হউক, অন্ততঃ যে এই নবীনরূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ৭ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তন্ত্রযুগের পূর্ণ প্রভাব চলিয়াছিল। প্রথমে বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু দেবদেবীগণকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, পরে বৌদ্ধতন্ত্রের পূর্ণ সমৃদ্ধি হইলে হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের সমগ্র প্যান্থিয়নকে গ্রাস করিয়া ফেলে। প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্র 'তন্ত্রসার', 'তারাতন্ত্র' "মহাচীন সারতন্ত্র" "রুদ্রযামল" "ব্রহ্মযামল" প্রভৃতি গ্রন্থে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে, তৎসমুদায় যে বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী,—'তারা'র এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। সরস্বতী ও কালী—বাঙ্গালার জনপ্রিয় এই দেবীদ্বয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুদের অধিকাংশ তান্ত্রিক মন্ত্রই বৌদ্ধ তন্ত্র-সৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ।

ভগবান্ বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক প্রোটেষ্ট্যান্ট। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে দূর করিতে যাইলেন বটে, কিন্তু অঘটন-ঘটনপটীয়সী কালের এমন মহিমা যে, তাঁহার ধর্ম্ম কালক্রমে গুপ্তক্রিয়া-কলাপের ডিপো বা খনি হইয়া উঠিল। যে সিদ্ধাই বা অলৌকিকত্ব তিনি ধর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিতে চাহিলেন—তাঁহার জীবদ্দশাতেই উহা আবার তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীতে সংক্রামিত হইল। ব্রহ্মজালসূত্রে, ও বিনয়-পিটকের মহাভাগে বিভূতিলাভের ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা এবং বুদ্ধ শিষ্যগণের অলৌকিক শক্তিলাভ ও প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। পরে "গুহ্যসমাজে" আমরা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রথমবিকাশ দেখিতে পাই। এই গুহ্যসমাজ প্রথম বৌদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থ এবং সম্ভবতঃ ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত হয়। এমন কি, পালিগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ছন্দ, বীর্য্য, বীমাংসা ও চিত্তম্ এই ৪টি উপায়ে তিনি ঋদ্ধিলাভের উপদেশ দিতেছেন। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মে হীনযান শাখা অত্যন্ত অনুর্ব্বর ও মরুসম শুষ্ক—তাই হীনযান গতিহীন। কেবলমাত্র তিব্বত, চীন ও জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহাযান শাখাই গতিশীল ছিল বলিয়া তৎতৎদেশে ইহা এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তন্ত্রই মহাযান শাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। স্থবিরগণের মহাসাঙ্ঘিকগণ সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ বৌদ্ধসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাযানের সৃষ্টি করেন। আর প্রাচীনদল বা স্থবিরগণ হীনযান রহিয়া গেলেন।

"সন্ধিতির" আকারেই বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের যেমন আছে যে, শিব পার্ব্বতীকে গোপনে তন্ত্র-রহস্য বিবৃত করিতেছেন, তদ্রূপ বৌদ্ধ তন্ত্রে আছে ভগবান্ বুদ্ধ অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর সমক্ষে তন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় তন্ত্রের উদ্দেশ্য একই। হিন্দু তন্ত্রের যেমন দক্ষিণাচার ও বামাচার নামক দুই বিভাগ আছে, বৌদ্ধ-তন্ত্রের তদ্রূপ চারিটি বিভাগ। দক্ষিণাচারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি পালন বাধ্যতামূলক। দক্ষিণাচারে পঞ্চ 'ম'কারের প্রবেশ নিষেধ। পরে সাধক উন্নত হইলে বামাচার অভ্যাস করিতে পারে। বৌদ্ধ-তন্ত্রের ক্রিয়াতন্ত্র ও চর্য্যাতন্ত্র নামক প্রথম বিভাগ হিন্দু দক্ষিণাচারের মত শুদ্ধ। পরে যোগতন্ত্র। যোগতন্ত্র ঠিক বামাচারের মতই কঠিন। বামাচার বা যোগতন্ত্র যে অভ্যাস করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে অনেক সাধকের সাধ্বী স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য ব্যতীত সুপ্তকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রের উপর যে আমরা অযথা দোষারোপ করি, তাহা নিতান্ত অমূলক;

হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের লক্ষ্য মুক্তি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন দ্বারা সমাধিতে সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মবস্তু-লাভই হিন্দুতন্ত্রের উদ্দেশ্য। জীবাত্মাকে বৌদ্ধগণ বোধিচিত্ত বলেন, আর পরমাত্মাকে বলেন শূন্য। তাই বৌদ্ধতন্ত্রের লক্ষ্য বোধিচিত্ত ও শূন্যের মিলন। ইহাই নির্ব্বাণ। তাই নির্ব্বাণে শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ—এই ত্রয়াত্মক অখণ্ড বস্তু লাভ হয়। বৌদ্ধযোগী বলেন, নির্ব্বাণের সময় চিত্তাকাশে শূন্য হইতে স্পষ্ট বীজমন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই এক একটি বীজমন্ত্র হইতে আকৃতিবিশিষ্ট দেবদেবীগণের আবির্ভাব। বৌদ্ধতন্ত্রমতে অসংখ্য দেবদেবী এই মহাশূন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। এই শূন্যই নিরাত্মা এবং এই শূন্যই এক দেবী—যাঁর অখণ্ড আলিঙ্গনে বোধিচিত্ত তাঁর ক্রোড়ে মহানাদনিদ্রায় চিরাভিভূত থাকেন।

হীনযানের আদর্শ, ব্যক্তিগত মুক্তি। কিন্তু মহাযান প্রচার করিলেন, অপরের—দশের মুক্তি—সমষ্টির মুক্তির জন্য আত্ম-মুক্তি বলিদান করিতে হইবে। তাই মহাযানের আদর্শ অনন্ত-করুণাময় অবলোকিতেশ্বর—যিনি সুমেরু পর্ব্বতচূড়ায় নির্ব্বাণ-লাভের প্রাক্কালে জনৈক জীবের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন না শেষ জীবটা পর্য্যন্ত নির্ব্বাণের অধিকারী হইবে, তত দিন তিনি নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিবেন। এই করুণাবাদই মহাযানের বিশেষত্ব। এই মুমুক্ষু বোধিসত্ত্ব জীব-কল্যাণের জন্য গর্হিত কর্ম্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বৌদ্ধতন্ত্র ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম করেন। তাঁহারা ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া সান্ধ্যভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তৃতীয় শতাব্দীতে মৈত্রেয়-নাথ কর্ত্তৃক আরম্ভ হয়। তাহাদের মত—এই বাহ্যজগৎ মিথ্যা; স্বপ্নবৎ অলীক। বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে জ্ঞেয়াবরণ ও কলশাবরণ দূর করিতে হইবে। নির্ব্বাণলাভের উপায় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হইতেছে জগতের অলীকত্বজ্ঞান—উপায় করুণা। এই দুই লাভ হইলে নির্ব্বাণলাভ সহজ হয়। বাঙ্গালার কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল।

বৌদ্ধতন্ত্রের মুদ্রা, মণ্ডলী, স্তব, হোম, সাধনা, ধারণী ও মন্ত্র প্রভৃতির বিভিন্ন বিভাগ আছে। হিন্দুতন্ত্রের যেমন যামল ও আগম নামক ২টি বিভাগ আছে, তেমনই বৌদ্ধতন্ত্রেরও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ রুশদেশীয় তিব্বতীভাষায় পণ্ডিত ও প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ডাঃ জর্জ্জ রোরিক তাঁহার Urusvati Journalএ প্রকাশ করিতেছেন। ভবিষ্যতে পাঠককে উহা উপহার দিবার বর্ত্তমান লেখকের ইচ্ছা রহিল। উক্ত তিনটি বিভাগ ব্যতীত বৌদ্ধ-তন্ত্রের মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, ভদ্রযান প্রভৃতি নানা অংশ আছে। কিন্তু বজ্রযানই প্রধানতঃ তন্ত্রসম্বন্ধীয়। বৌদ্ধতন্ত্রের মন্ত্র বিভাগের বেশ বাহুল্য আছে, যথা—বীজহৃদয়, উপহৃদয়, পূজা, অর্ঘ্য, পুষ্প, দীপ, ধূপ, নৈবেদ্য, নেত্র, শিখা, অস্ত্র, রক্ষা ইত্যাদি।

বৌদ্ধতন্ত্র-সাহিত্য অতীব বিশাল। অধিকাংশই তাহাদের সিদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত এবং হস্তলিপির আকারে দেশ-বিদেশের লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত। সম্প্রতি কয়েকটি প্রধান তন্ত্র ভারতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধকপালতন্ত্রের লেখক রাহুলভদ্র, নাগার্জ্জুন, সবরপা, লুইপা, বজ্রঘণ্টা, কচ্ছপা, পদ্মবজ্র, ললিতবজ্র, জালন্ধরিপ, অনন্দবজ্র, ইন্দ্রভূতি, কৃষ্ণাচার্য্য, লীলাবজ্র, লক্ষিংকার, দ্বারিকাপাদ ও দোম্বি হেরুক প্রসিদ্ধ। দোম্বি হেরুক বলেন যে, নির্ব্বাণজাত মহাসুখের ৪টি প্রকার আছে:—আনন্দ, পরমানন্দ, বিরামানন্দ ও সহজানন্দ। কয়েক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য বাঙ্গালী ছিলেন।

নির্ব্বাণ ব্যতীত সিদ্ধাইলাভও তন্ত্রের এক প্রধান উদ্দেশ্য। সিদ্ধিগুলি এই :—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশ, সর্ব্বজ্ঞত্ব, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বাক্‌সিদ্ধি, প্রাণদান প্রভৃতি ২৪টি। সিদ্ধি ৫ প্রকারের যথা,—তপোজ, সমাধিজ, ঔষধজ, জন্মজ ও মন্ত্রজ। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান ৮টি সিদ্ধি এই :—খড়্গ, অঞ্জন, পাদলেপ, অন্তর্দ্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল। এতদ্ব্যতীত শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ লাভ করাও বৌদ্ধ তন্ত্রের উদ্দেশ্য। মন্ত্রোচ্চারণের বিভিন্ন প্রকার আছে, যাহাতে মন্ত্র বিভিন্নফলদায়ক হয়, যথা :—গ্রথন, বিদর্ভ, সম্পুত, রোধন, যোগ ও পল্লব। বিশেষ বিশেষ সিদ্ধির জন্য মন্ত্রসাধনের স্থান, কাল ও বিধি আছে। তন্ত্রসাধনের জন্য বৌদ্ধগণ গুরুকরণের অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন। গুরুকে ভগবান বুদ্ধের দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে শ্রদ্ধা ও পূজা করা বিধি।

নির্ব্বাণপথে বোধিচিত্ত দশ ভূমিতে আরোহণ করে। দশ ভূমি যথা—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অরিষ্মতী, সদুরজয়া, অধিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতি ও ধর্ম্মমেধা। এইগুলি হিন্দুতন্ত্রের সপ্তভূমি, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর,

অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার প্রভৃতির ন্যায়। বিশেষ বিশেষ দেবদেবীকে ধ্যানান্তে ধ্যেয় বস্তুর সহিত ধ্যাতার ঐক্য চিন্তা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধতন্ত্রের মতে শূন্যতা ও করুণার সংমিশ্রণকে অন্বয় কহে। জলেতে লবণের সংমিশ্রণের ন্যায় এই অন্বয়কে তুলনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের ধ্যান-বিধি অতি চমৎকার। হৃদয়পদ্মে জ্যোতির্ম্ময় পদ্মে দেবী আর্য্যতারার ধ্যান করিতে হয়। পরে ভাবিতে হয়, সেই দেবীশরীরস্থ জ্যোতিতে সাধকের শরীরস্থ লোমকূপ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, এবং সেই জ্যোতি জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। শেষে ভাবিতে হয়, ধ্যেয় দেবী বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধক নিজেকে ও অপরকে স্বভাবশুদ্ধ, নিত্যপূত জ্ঞান করিবেন। নিজের বা অপরের সম্বন্ধে অপবিত্রতাকে আদৌ স্থান দিবেন না। উপরি-উক্ত ধ্যেয় দেবী আর্য্যতারার পরিবর্ত্তে ভগবতী বা অন্য দেবীর ধ্যান করাও যায়। ধ্যানশেষে সাধক ভাবিবেন, তিনি ভগবতী হইয়া গিয়াছেন এবং এই জগৎ সেই ভগবতীর অভিন্নরূপ।

বৌদ্ধতন্ত্রে দেবদেবীর সংখ্যা অসংখ্য। সংখ্যাতীত দেবীর উদ্ভব এই ভাবে হইয়াছে। মহাশূন্য হইতে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধের সহিত এক একটি শক্তি যুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধ ৫ স্কন্দের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রভু। যথা—বিজ্ঞানের অধীশ্বর অক্ষোভ্য, রূপের অধীশ্বর বৈরোচন, বেদনার প্রভু রত্নসম্ভব, সংজ্ঞার প্রভু অমিতাভ এবং সংস্কারের প্রভু অমোঘসিদ্ধি। শূন্য হইতে প্রথম বীজমন্ত্র, বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব, পরে বিম্ব হইতে দেবদেবীর মূর্ত্তি আসিয়াছে। জম্ভল, যামরী ও মহাকাল প্রভৃতি রুদ্রমূর্ত্তি দেবদেবীর সম্বন্ধে বৌদ্ধতন্ত্র বলেন যে, তাঁহাদের অন্তর করুণাময়, কেবল জীবকল্যাণের নিমিত্ত এই বহিরুগ্র-রূপ। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহারা অধিকাংশ বৌদ্ধ দেবদেবীর পদতলে হিন্দু দেবদেবীকে রাখিয়াছেন, কাহাকেও বা দ্বারপাল, কাহাকেও বা সেবকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারও করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্ট প্রথমে গান্ধার দেশে (বর্ত্তমান কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান) কেন্দ্রীভূত হয়। পরে মথুরা, তৎপরে মগধ ও শেষে বাঙ্গালাদেশে মিলিত হয়। আর্য্য সভ্যতা যেমন প্রথম আর্য্যাবর্ত্ত, পরে ব্রহ্মাবর্ত্ত, পরে বৃন্দাবন, তৎপরে অযোধ্যা, তৎপরে নবদ্বীপ হইয়া গঙ্গার স্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালায় মিলিত হয়, বৌদ্ধতন্ত্রও তদ্রূপ। বাঙ্গালার এক বিশেষ কাল্‌চার আছে—সমগ্র জগৎ, এমন কি, সমগ্র ভারত হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

উপরি-উক্ত ৫টি সশক্তিক ধ্যানী বুদ্ধ হইতে ৫টি দেব-দেবীর কুল সৃষ্টি হইয়াছে। যথা,—দ্বেষ, মোহ, রাগ, চিন্তা-মণি ও সময়। এই সমস্ত দেবদেবীর কাহারও কাহারও ২ বা ৪ বা ৬ হইতে ২৪টি পর্য্যন্ত হাত এবং ১, ২, ৩ হইতে ১২টি পর্য্যন্ত মস্তক আছে। বজ্রযান প্রধানতঃ বাঙ্গালাদেশে সমৃদ্ধ বলিয়া উহা বাঙ্গালা হইতে জাভা প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের একেশ্বরবাদের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র আদিবুদ্ধ বজ্রধর নামক এক দেবীর সৃষ্টি করেন—যাহা হইতে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছে। আদিবুদ্ধকে হৃদয়পদ্মস্থ নির্ব্বাত দীপশিখার সহিত তুলনা করা হয়। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধকে পদ্মাসনোপরি আসনস্বরূপে কল্পনা করা হয়। অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধের রং নীল, মুদ্রা ভূস্পর্শ, বাহন হস্তী ও বজ্র যুক্ত-কর। বৈরোচনের রং শ্বেত, মুদ্রা ধর্ম্মচক্র, বাহন রাক্ষস, চক্র-হস্ত। অমিতাভের রং লাল, মুদ্রা সমাধি, বাহন ময়ূর, পদ্মহস্ত। রত্নসম্ভবের রং হরিদ্রা, মুদ্রা বরদ, অশ্ব বাহন, মণিহস্ত। অমোঘসিদ্ধির রং হরিৎ, অভয় মুদ্রা, গরুড় বাহন, বিশ্ববজ্রহস্ত।

অক্ষোভ্যের শক্তি লোচনা। অক্ষোভ্যে দ্বেষকুলের হেরুক, হয়গ্রীব, যামরী ও বজ্রপাণি দেবগণ প্রধান। একজটা ও নৈরাত্মা এই দেবীদ্বয় এই কুলের শক্তি। বৈরোচনের শক্তি বজ্রধাত্রীশ্বরী। ইনি মোহকুলের প্রধান। দেবদেবী হইতেছেন মারীচি, বজ্রবরাহী ও সুমন্তভদ্র। অমিতাভের শক্তি পাণ্ডারা। এঁর রাগকুল হইতে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর ও কুরুকুল্লার সৃষ্টি। সিংহনাদ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি করুণাময়, এমন সৌম্য ও সুন্দর মূর্ত্তি বৌদ্ধ পান্থিয়নে বিরল। রত্নসম্ভবের শক্তি যামকী। ইহার চিন্তা-মণি কুল হইতে জম্ভল ও বসুধরা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের শক্তির নাম আর্য্যাতারা। ইহা হইতে বোধিসত্ত্ব বিশ্বপাণি, খদিরা-বানীতারা ও পর্ণশবরী প্রভৃতির উদ্ভব।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

মান-ভঞ্জন

(গল্প)

১

লেখাপড়া শিখিয়া চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলে যা হয়, যোগীন্দ্রর তাই ঘটিয়াছিল। কাব্য-চর্চ্চা, হেথা-সেথা ঘুরিয়া বেড়ানো—এক দিকে বন্ধুর দল, অপর দিকে তরুণী পত্নী মনোরমা! এই দুই সীমার মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অবিরাম দোল খাওয়া! পাঁচ জনে বলিত, খাশা আছে! কোনো ভাবনা নাই, চিন্তা নাই! তারা তখন কীট্‌শ্-শেলিকে বুকে কবর দিয়া জীবন-সংগ্রামে নামিয়া পড়িয়াছে! তরুণ বয়সে মন চায়, বসন্তের পুষ্পমঞ্জরী! সংসার কিন্তু হাঁকিয়া বলে, ওদিকে চাহিবার সময় নাই!

কোন্ কবি না দার্শনিক বলিয়াছেন, বিরোধে প্রেম নিবিড় হয়। যোগীন্দ্ররও সে বিশ্বাস ছিল; সম্প্রতি টলিয়াছে। মনোরমার সঙ্গে খুঁটিনাটি লইয়া কি বুঝি বিরোধ বাধে। মনোরমা মুখ ভারী করিয়া বসিয়া থাকে, যোগীন্দ্র আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাবে, এমন মেঘ! এ মেঘে সোহাগের অজস্র ধারা এখনই বর্ষিত হইবে! কিন্তু তা হয় না! শুধু বজ্র-বিদ্যুৎ চমক দিয়া যায়! যোগীন্দ্রর বুক সে বজ্রাগ্নিতে ঝল্‌সিয়া ওঠে!

এমনি বিরোধের মধ্যে যোগীন্দ্র সারা সকালটা গুম্ হইয়া রহিল; মনোরমাও তাই। যোগীন্দ্রর অস্বস্তির সীমা নাই! মনোরমার মনের অবস্থা কেমন, অন্তরাল হইতে সে লক্ষ্য করে! লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারে না! শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, কবির কথাই ঠিক! নারী-চরিত্র সত্যই অদ্ভুত! আমার প্রাণ বেদনায় ফাটিয়া যায়, আর মনোরমা পাষাণে মন বাঁধিয়া বসিয়া আছে! এই বয়সেই যখন এমন ভাব…

নিশ্বাসের ঝড়ে চিন্তার রাশি ফাঁশিয়া চূর্ণ হইয়া যায়!

অমল আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। অমল কবি। সব কবিকে টপ্‌কাইয়া অচিরে সে রবীন্দ্রনাথের আসন টলাইয়া দিবে, বন্ধু-মহলে এ ধারণা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে! নর-নারীর মনের অলি-গলির এত খবর সে রাখে!

অমল কবিতা পড়িতেছিল—

রাগ করেচো! নাইকো মুখে বাণী!
চোখের কোণে বজ্র-লিখা,
অধরে ঐ অনল-শিখা!
তা হোক, মনে অশ্রু-পাথার দেখচি আমি রাণী!

যোগীন্দ্রর মন উদাস! কবিতার দিকে সে ফিরিতে চায় না!

অমল লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া কহিল,—কি হয়েচে তোমার! কোনো response পাচ্ছি না আজ!

নিশ্বাস ফেলিয়া যোগীন্দ্র কহিল—হুঁ…

—ব্যাপার কি?

যোগীন্দ্র ব্যাপার বলিল।

অমল কহিল,—বটে! তার মুখে চিন্তার রেখা!… নিমেষের জন্য! ক্ষণ-পরে হাসিয়া অমল কহিল,—এতে বিচলিত হয়ো না! দুটো বিরোধী শক্তির সংঘর্ষেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সে ক্রিয়ার ফলে মোটর চলে, এরোপ্লেন ওড়ে, আলো জ্বলে, পাখা দোলে। অর্থাৎ সকল অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়। এ'ও তেমনি! দুটি চিত্তের সংঘর্ষে হৃদয়ের প্রেম দানা বাঁধে, প্রীতি নিবিড় হয়, এই প্রীতি-প্রেমে সংসারে শৃঙ্খলা ইত্যাদি…

নানা যুক্তি-তর্কে স্থির হইল, আঘাত দেওয়া চাই! বিষে বিষক্ষয়! তাহারি নাম প্রতিঘাত, প্রতিক্রিয়া! অতএব…

রাত্রের ট্রেণে অমলকে সাথী করিয়া যোগীন্দ্র পুরী যাত্রা করিল। ভাবিয়াছিল, যাত্রা-লগ্নে মনোরমা বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে মিনতি ভরিয়া তার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে, পড়িয়া বলিবে,—মার্জ্জনা, ওগো মার্জ্জনা করো!

সে-সম্ভাবনার কল্পনায় সে ভাবিয়াছিল, বিদায়-লগ্নটুকু নাট্যশালার নাটকের শেষাঙ্কের মত অনেকখানি কমনীয় হইবে! কিন্তু হায়রে!…

পথের নানা বিপদ-আপদের ছবি যোগীন্দ্র আপন-মনে রচিয়া চলিল—সে যেন বাতাসের গায়ে অসি-প্রহার!

মনোরমার মুখ তেমনি অবিচল, চোখের দৃষ্টি তেমনি কঠিন রহিয়া গেল! মিনতি দূরে থাকুক, গদ্‌গদ ভাবে মনোরমা এ কথা বলিল না—পৌঁছে বাড়ীর যাকে হয় পৌঁছুনো খপরটুকু দিয়ো!

পাষাণ! পাষাণ! পাষাণে বিধি তোমায় রচনা করিয়াছে! যোগীন্দ্রর প্রাণ-ঢালা প্রীতিতেও যদি ও পাষাণ না গলে, তার গলিবার কোনো আশা নাই!

২

তবু ভালো কি লাগে? প্রকৃতির এই অবাধ মুক্তি···সাগরের ঢেউয়ে মুক্তির গান···আকাশে মুক্তির ঐ অসীম প্রসার! যুগ-যুগ ধরিয়া মানুষ বন্ধন কামনা করিয়াছে! বন্ধনেই সে তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, তৃপ্তি পাইয়াছে! মুক্তি যদি চাহিয়া থাকে তো সে ভুল! কথামালার কাঠুরিয়া যেমন মরণ মাগিয়া যমকে ডাকিয়াছিল···যম আসিলে তাকে বলিয়া বসিল,—তোমায় চাহিয়াছিলাম? হাঁ, আমাকে লইবার জন্য নয়—আমার ঐ কাঠের বোঝাটা মাথায় তুলিয়া দিবে, সেইজন্য! মানুষও মুক্তিকে যদি চাহিয়া থাকে, তেমনি! মুক্তি আসিলে তাকে বলিবে,—আমার বাঁধনটুকু আরো কষিয়া দিয়া যাও, বন্ধু!···

সমুদ্রের ধারে মস্ত বাড়ী। বাড়ীটি দোতলা। চারিদিক খোলা! ফটকের সামনে পাথরের ফলকে লেখা, "নীল-সমুদ্র"।

অমল বসিয়া সমুদ্রের পানে চাহিয়া কবিতা লেখে,—

রে সাগর, দিকে দিকে বহিছ ফুঁশিয়া তরঙ্গে উচ্ছুসি,
শুভ্র ফেনপুঞ্জ ফোটে, ঝরে পুনঃ বেদনায় শ্বসি!
আবার নূতন ফেন···ফোটে লোটে। জানে না বিরাম!
মানুষের চিত্তে যেন আশা-নিরাশার সেই পতন-উত্থান!

তার একটু দূরে বসিয়া যোগীন্দ্র আকাশের পানে চাহিয়া থাকে—আকাশের বুকে সুদূর গৃহ-কোণের ছবি ফুটিয়া ওঠে···সে কোণে বসিয়া দুর্জ্জয় অভিমানে মানিনী মনোরমা—চোখে তার রোষের বিদ্যুৎ···সেই পাথরে খোদা দেবতার মত—সে-মুখে হাসি নাই, ভাষা নাই!

'নীল-সমুদ্র' হোটেল। আরো কয়েকটি বাঙালী এখানে বাস করে। হোটেলের মালিক অনসূয়া গুপ্তা। তাঁর স্বামীর চা-বাগান ছিল। স্বামী মারা গেলে সে ব্যবসা বেচিয়া অনসূয়া গুপ্তা এখানে আসিয়া বাঙালী ভদ্র পরিবারদের সুবিধার জন্য হোটেল খুলিয়াছেন। নিজের একটি ছেলে আছে—হরেন। হরেন বিলাতে—ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছে।

হোটেলটির বন্দোবস্ত ভালো। অনসূয়া দেবী নিজে দেখা-শুনা করেন। অতিথিদের যত্ন করেন মায়ের মত! এ কথা লোকের মুখে-মুখে দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে,—হোটেল তাই কোন দিন খালি থাকে না। অল্প খরচে এমন আরাম—বিদেশে বাড়ী ভাড়া করিয়া মেলে না—মিলিতে পারে না!···

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা।

ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া যোগীন্দ্র সমুদ্রের পানে চাহিয়া ছিল, অমল আসিয়া ডাকিল,—যোগীন···

যোগীন্দ্র কহিল,—কেন?

অমল কহিল—এক অপরূপ সুন্দরী হে···

যোগীন্দ্র কহিল—কোথায়?

অমল কহিল—পথে। পথের বাঁকে ঐ ছোট্ট বাঙলা—সে বাঙলায় এইমাত্র এসেচেন। লগেজ-পত্র সামান্য···গাড়ী থেকে লগেজ নামচে—দেখে আসচি!···

যোগীন্দ্র অমলের পানে চাহিয়া রহিল।

অমল কহিল—মাথায় চমৎকার idea এসেছে! কবিতা লিখবো···

যোগীন্দ্র কহিল—পর-নারী!

অমল কহিল—পরকীয়াই কাব্যের প্রাণ! ঘরের গৃহিণী যে-খোরাক জোগান, তা এই স্থূল বপুখানির রক্ষা-কল্পে! মনের খোরাক জোগাতে জানেন শুধু ঐ পরকীয়া!

যোগীন্দ্র কোন কথা কহিল না!···

অমল কাগজ আনিয়া কবিতা লিখিতে বসিল। যোগী আবার আকাশের পানে চাহিল।

কবিতা লিখিয়া অমল কহিল—আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে যদি নিশ্বাস ফেলবে তো এখানে এলে কেন?

যোগীন্দ্র কহিল—তাকে ভুলবো বলে এসেচি।

অমল কহিল—কিন্তু এতে যে তিনি আরো মনে গেঁথে বসবেন! তাঁর চিন্তা যদি নিমেষের জন্য না ছাড়ো···

যোগীন্দ্র কহিল—সেই চেষ্টাই করচি…

অমল কহিল—No success !

একটা নিশ্বাস যোগীন্দ্রর বুক চাপিয়া ধরিল। হাসিয়া অমল কহিল,—তারে ভোলা হলো এ কি দায়! কবি কি সাধে গেয়েছেন!

যোগীন্দ্র কহিল—বিদ্রূপ করো না!

অমল কহিল—বিদ্রূপ নয়! যদি ভুলতে চাও তো এ তার শ্রেয় পন্থা নয়…

কুতূহলী দৃষ্টিতে যোগীন্দ্র অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল—তরুণ মন একটা অবলম্বন না পেলে বাঁচবে কেন?

—অর্থাৎ?

অমল কহিল—পরকীয়ার চিন্তা ধরো…। বিপুলা পৃথ্বী। কবিতা লেখা সুরু করো। কিন্তু তার আগে… শোনো আমি কি লিখেচি!

অমল কবিতা পড়িল।…

বৈকালের দিকে অমল ডাকিল—যোগীন…

ঘরে বসিয়া যোগীন্দ্র একখানা নভেলের পাতা খুলিয়াছিল। ছাপা হরফের গহনে পাঠাইয়া মনোরমার দিক হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিবার অভিপ্রায়ে! অমলের আহ্বানে বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া যোগীন্দ্র কহিল,—কি বলচো?

—দেখে যাও।

অমল ছিল বারান্দায়। যোগীন্দ্র বারান্দায় আসিল। অমল কহিল,—ঐ ছাখো…

যোগীন্দ্র দেখে,—অদূরে সমুদ্রের ধারে বালির বুকে দুটি তরুণী, একজন পুরুষ; সবার পিছনে একটা ভৃত্যের কোলে ছোট একটি শিশু।

অমল কহিল—যেন সাগরের বুক থেকে দেবী লক্ষ্মীর উদয়! না?

যোগীন্দ্র কহিল—Rascal !

—কেন?

অমল কহিল—ওটি আমার পত্নী…মনোরমা!

—সে কি! তোমার ভুল!

যোগীন্দ্র কহিল,—কাঁটার মত যাঁর চিন্তা…

অমল কহিল,—তা বটে!…সঙ্গে তাহলে?…

যোগীন্দ্র কহিল—আমার শ্যালিকা আর শ্যালীপতি!

—বটে!…

যোগীন্দ্র স্তব্ধ! হাসিয়া অমল কহিল—বন্ধু-পত্নীকে লক্ষ্য করে প্রণয়-কবিতা লেখা একালে চলে গেছে। সুতরাং…

যোগীন্দ্র আবার কহিল,—রাস্কেল!…

অনেক কথা তার মনে জাগিল—রাগ? অভিমান?

এত তেজ! আমার উপর এমন অভিমান যে আসিবার সময় একটা কথা কহিতে পারিলে না! একবার যদি বলিতে,—ওগো না, যেয়ো না! কিম্বা যদি বলিতে, সঙ্গে আমি যাবো! কিম্বা কিছু না বলিয়া নিজে সাথী হইতেও পারিতে! গাড়ীতে চড়িয়া বসিলে আমি কি তোমার হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতাম? না, রাগিয়া বাড়ী মাথায় করিতাম! সকল কথা শিরোধার্য্য করিয়া যখন চলো না—আমি এদিকে ফিরিতে বলিলে ওদিকে ফেরো—তখন এ কাজটুকু করিলে…

মহাভারত অশুদ্ধ হইত না—নিশ্চয়! তবে? আর কি হইতে পারিত?…হয়তো আমি তোমায় মাথায় তুলিয়া লইতাম। হয়তো…ভাবিতে ভাবিতে দুই চোখের পিছনে বেদনার অশ্রু একেবারে উথলিয়া আসিল! সারা বুক অশ্রুর তরঙ্গে ভরিয়া গেল! হারে তরুণ প্রাণ!…

কিন্তু না…এতখানি বিরূপতা! এখানে আসিলে ভগ্নীপতিকে আশ্রয় করিয়া! উঁহারাই তোমার আপনজন! আসিবার পূর্ব্বে নিশ্চয় অনুরোধ-উপরোধ-মিনতি… না হইলে সহসা উঁহারা তোমায় লইয়া এখানেই বা আসিবেন কেন!…হয়তো ভাবিয়াছ, গল্প-উপন্যাসের নায়িকার মত আমায় ভুলাইয়া…

কিন্তু না! আমি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেলেও…না, না…আমি স্বামী, আমি স্বামী, আমি স্বামী! স্বামি-তেজ লইয়া তোমার এ অবিবেচনার সাজা আমি তোমায় দিব! নহিলে স্বামীর ইজ্জৎ থাকিবে কেন? না, করুণা নয়, মায়া নয়, মমতা নয়…

যোগীন্দ্র ঘরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। লাঠির ঘায়ে কে যেন তাকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এমনি ভাব!…

অমলের কথায় তার চেতনা ফিরিল।

অমল কহিল,—এর মধ্যে প্লট আছে, বোধ হয়!···কিন্তু তুমি···

যোগীন্দ্র কহিল,—আজ রাত্রে পুরী ছাড়বো!

অমল কহিল,—ঠিক কথা বলেচো! অনসূয়া দেবীকে বলে সেই ব্যবস্থাই করি—কেমন?···

যোগীন্দ্র কহিল,—করো। স্ত্রীর এত তেজ···

তার মুখের কথা লুফিয়া অমল কহিল,—যা বলেচো—অসহ্য!

৩

কিন্তু পুরী ত্যাগ করা গেল না!

জানা নাই, শুনা নাই, ফশ্ করিয়া এই রাত্রে কোথায় যাইবে? এখানে এমন নিশ্চিন্ত আরাম! তাছাড়া ঐ নীল সাগরের অপরূপ শোভা···এমন মুক্ত আকাশ! তাছাড়া টাইম-টেবল্‌খানা পাওয়া যাইতেছে না! কোথায় গিয়া শেষে রোগে পড়া বিচিত্র নয়। গেলেও বাড়ী বা হোটেল মিলিবে কি না, ঠিক নাই! তার উপর···

অমল আসিয়া বলিল,—অনসূয়া দেবী বলচেন, পুরা মাসের ভাড়া দেওয়া তাঁর হোটেলের নিয়ম। আজ তো সবে এ মাসের দশ তারিখ।···এ ক'দিনের ভাড়াটা বাজে খরচ হবে?

যোগীন্দ্র কহিল,—তাহলে?

অমল কহিল,—এখানেই থেকে যাও! তুমি না হয় ওঁদের সঙ্গে দেখা করো না! ইজ্জৎ আছে তো। রাজী?

যোগীন্দ্র কহিল,—হুঁ!

তার মন চাহিতেছে, এখান হইতে নড়া নয়! কথা না কহি, ইচ্ছা হইলে চোখের দেখা মিলিবে তো!

তরুণ মন!···

ঘরে বসিয়া থাকিতে অসহ্য বোধ হয়! ও-বাড়ীতে উহারা কি করিতেছে?···হাসি? গল্প? হায়, সে হাসি-গল্পে তার আজ যোগ নাই! সে অসহায়···তার আজ আসন নাই!

দুপুর বেলায় অমল গিয়াছিল পোষ্ট-অফিসে। একা ঘরে বসিয়া সমুদ্র-গর্জ্জন আর শুনা যায় না! একঘেয়ে রব, মামুলি মাতন···সেই সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে একই লীলা! অন্য লীলা, অন্য সুর জানা নাই, যাহা দিয়া যোগীন্দ্রর মনের এ অশান্তি দূর করিতে পারো? অথচ তোমারি মহিমা-গানে কবির কণ্ঠ নির্লজ্জ হইয়া ওঠে! শোভা? তাই বা কোথায়? বিরাট দেহ মেলিয়া পড়িয়া আছো অতিকায় দৈত্যের মত! রত্ন-গর্ভা? এমন কোনো রত্নের সন্ধান তো আজও মিলিল না!···

একা···নিঃসঙ্গ···বইগুলা সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তাহাতেও সেই একঘেয়ে মামুলি সুর! দুনিয়ার সর্ব্বত্র তাই! মানুষের প্রাণ এ বৈচিত্র্য-হীনতায় বাঁচিতে পারে কখনো!···

নিঃশব্দে যোগীন্দ্র পথে বাহির হইল। ঐ সে বাঙলো-খানা!···ফটকের মাথায় পাতা-বাহার লতা, গোলাপী ফুলের গুচ্ছে ভরা! ফটকে নাম লেখা আছে, আরাম-নীড়!

আরাম-নীড়ই বটে! যোগীন্দ্রর যত আরাম বুঝি ঐ নীড়েই!

একবার মনে হইল, কিসের পণ! কিসের মান! নিজের স্ত্রী!···জোর আছে! জোর করিয়া সে তার বুক হইতে প্রীতি-আদর লুঠ করিবে!···কেন? কেন করিবে না?···

ফটকের সামনে আসিতে বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল! না, না। মনোরমা যদি একা থাকিত, তাহা হইলে কোনো দ্বিধা, কোনো সঙ্কোচ রাখিত না! গিয়া চোখের জলে তার মান ভাসাইয়া দিত, বলিত—পাষাণী···পাষাণী···

তা হয় না। ওখানে অপর লোক আছে! তার এ ভালোবাসা, তার এ আকুল মিনতি···তারা বুঝিবে না! বিদ্রূপের তীরে বিঁধিয়া সে ভালোবাসা, সে প্রীতি উহারা জর্জ্জরিত করিয়া দিবে!···

বাঙলোর মধ্যে গান হইতেছিল,—

ফাগুন এলো এলো ফিরে!
তোমায় তবু আঁখির তীরে
পাই না কেন? হায় গো প্রিয়,
রইলে কোথায় ভুলে!

এ কণ্ঠ মনোরমার। এ গান সে নিত্য গাহিত—যখন তাদের মিলন-আকাশ চাঁদের জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ ছিল—মান-অভিমান, তর্ক-বিরোধের মেঘে-মেঘে সে আকাশ যখন মলিন কালো বিপর্য্যস্ত হয় নাই···

তার মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া বলে,—এই যে, এই আমি আসিয়াছি! ফাগুনের এই পুষ্প-মঞ্জরীর গন্ধে আকু

প্রাণ লইয়া—তোমার দ্বারে—তোমার আঁখির তীরে—তোমার প্রিয়, তোমার···

বাঙলোর মধ্যে স্বর হাঁকিল—রঘুয়া···

সাড়া উঠিল—জী···

—চট্ করে আয়। চিঠিখানা ডাকে দিয়ে আসবি···

যোগীন্দ্রর বুক কাঁপিল। আর নয়···চোরের মত এখানে দাঁড়াইয়া পরের বাঙলোর পানে চাহিয়া থাকা!

পর? পর বৈ কি!

ধরা পড়িয়া গেলে···

সে পা চালাইয়া একেবারে সমুদ্রের ধারে বালির উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। রৌদ্র-ঝলকে চারিদিক চোখের সামনে অস্পষ্ট বোধ হইতেছিল! সারা পৃথিবীর উপর রৌদ্রের আবরণ পড়িয়া তার মূর্ত্তিটাকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে!···

জীবনটা একেবারে বিশ্রী এলোমেলো হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে মন বসে না—যখন-তখন একা সে বাহির হইয়া পড়ে···খাওয়ার টাইমেও তার দেখা পাওয়া দায়!

অমল কহিল—এ যে বিরহের ধ্যানে উদাসী হয়ে উঠলে হে! কবির সেই বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী!

মলিন হাসি যোগীন্দ্রর অধরে উথলিয়া ওঠে! কম্পিত ভাষে সে বলে,—ধেৎ! একখানা উপন্যাস লিখবো—তারি প্লট ভাবচি!

—বটে!

যোগীন্দ্র বলে,—একটা কাজ তো চাই!

উচ্ছ্বসিত চিত্তে অমল বলে,—তা যদি লেখো তো আমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বলবো,—এমনি দুর্জ্জয় মানেই মানিনী তুমি থাকো সখী···বাঙলা সাহিত্য যোগীনের দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক!

হাসিয়া যোগীন্দ্র বলিল,—সবতাতে তোমার বাড়াবাড়ি!···

আর এক দিন।···

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যোগীন্দ্র দেখে, চক্রতীর্থের কাছে বালির স্তূপে বসিয়া মনোরমা—একা!

চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তার মনটাকেও তেমনি···

সে আসিয়া ডাকিল,—মনোরমা! তুমি!···

মনোরমা তার পানে চাহিল। তার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিল না! সেই দুর্জ্জয় পণের বহ্নি-রাগ? না, আর কিছু?··· সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যোগীন্দ্র ঠিক বুঝিতে পারিল না!

সে আবার কহিল,—তুমি পুরীতে এসেচো!

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিয়া যাইতে চায়, এমনি ভাব!

যোগীন্দ্র কহিল,—যেয়ো না!···

যোগীন্দ্র পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমা কহিল,—পথ ছাড়ো···

যোগীন্দ্রর সারা দেহ-মন বেদনায় মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল, বুঝি, সে পড়িয়া যাইবে! কি করিয়া আপনাকে খাড়া রাখিল, রহস্য! সে ডাকিল,—মনোরমা···

মনোরমা কহিল,—কে মনোরমা! আমি মনোরমা নই!

সত্যই তাই? যোগীন্দ্রর ভুল? দিবানিশি মনোরমার চিন্তা করিয়া করিয়া এমন সে উন্মাদ হইয়াছে···

কিন্তু···

না, তা কখনো হয়? মনোরমাকে সে ভুল করিবে?

প্রাণ তার ফাটিয়া যাইতেছিল! কিসের মান? কিসের পণ? নিজের স্ত্রী···প্রাণের কামনার ধন! যুগ-যুগের বাঞ্ছিতা প্রেয়সী···

দুই হাত বাড়াইয়া যোগীন্দ্র ডাকিল,—আজো ক্ষমা মিলবে না?···

মনোরমার এক পা টলিল!···ও কি? নিশ্বাস? না, বাতাস?

বাতাস নয়! আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, চারিদিকে গুমট ভাব! দুনিয়া যেন কিসের আশঙ্কায় গুম্ হইয়া আছে! বাতাস নয়! তবে?···

নিশ্বাসই!···মনোরমার পণ টলিয়াছে?···

মনোরমা দাঁড়াইল না—চকিতে চলিয়া গেল। একটু গিয়াই···ও কি, ছোটে কেন?

যোগীন্দ্রর এই কাতর মিনতি···এত উপেক্ষা!···

ক্ষোভে যোগীন্দ্রর মন কহিল,—পলাও পলাও নারী··· চির দিন-রাত করো পলায়ন!···

পা দু'টা তার দেহের ভার বহিতে পারিতেছিল না। অনেক ঘুরিয়াছে, তার উপর এত বড় আঘাত! এই অপমান!

যোগীন্দ্র বালির উপর শুইয়া পড়িল।···

৪

একটু পরে ঝড়-বৃষ্টি···প্রচুর, অজস্র-ধারে! বুঝি, পৃথিবী-খানা ঐ সাগরের জলে উল্টাইয়া পড়িবে! যেন প্রলয় নামিয়াছে!···

যোগীন্দ্র ভাবিতেছিল, পথের বাঁকে ছোট বাঙলোখানা এ প্রলয় ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া টিঁকিতে পারিবে তো?···

দশটার পর ঝড়-বৃষ্টি থামিল। আকাশে চাঁদ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ধারায় দুনিয়া ভরিয়া উঠিল··· দুনিয়া স্বপ্ন-লোকের বেশে দেখা দিল!

অমল বিছানায় পড়িয়া আছে। যোগীন্দ্রর মাথায় যেন কে লোহার কারখানা খুলিয়াছে! সেখানে হাতুড়ির আঘাত, বহ্নির স্ফুলিঙ্গ, জলের ধারা, কর্কশ রব···মুহুর্মুহু! সে এক বিপর্য্যয় ব্যাপার!···

ঘড়িতে ক্রমে এগারোটা বাজিল, তার পর বারোটা। বাহিরে সমুদ্রের সেই অশ্রান্ত গর্জ্জন—একটানা একঘেয়ে সেই সুর! সে সুরে জীবন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে!···

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া যোগীন্দ্র বাহিরে আসিল! 'নীল-সমুদ্রের' ভৃত্য প্রহরী স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের স্পর্শে ঘুমে অচেতন। যোগীন্দ্র ফটকের চাবি খুলিয়া পথে নামিল।

জ্যোৎস্নার আলোয় পথের ধারে 'আরাম-নীড়'খানিকে দেখাইতেছে, মায়া-কুঞ্জের মত—স্বপ্নে রচা! স্বপ্নে ভরা!···

নীচু ফটক···যোগীন্দ্র ফটক টপকাইয়া সে-নীড়ে ঢুকিল। সামনে খোলা দালান। দালানের কোলে ঘর। ঘরের খড়খড়ি খোলা। ঘরে শয্যায়···মনোরমা! জ্যোৎস্নার রাশি মুখে পড়িয়াছে···মুখখানি সে জ্যোৎস্নায়···

মনোরমাকে যোগীন্দ্র এমন সুন্দর কখনো দেখে নাই!

খড়খড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নিনিমেষ নয়নে সে চাহিয়া রহিল। মনোরমা ঘুমাইতেছে। নিশ্বাস! বেদনার নিশ্বাস, না?···মুখ অমন মলিন কেন? প্রাণে মমতা জাগিল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বার লোভ!···

আকাশে ছোট এক টুকরা মেঘ ঝাঁপাইয়া আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল।

যোগীন্দ্রর মন উতলা, অস্থির। মন্ত্র পড়িয়া কে যেন তাকে বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে!

কখন্ সে আসিয়া মনোরমার শয্যার পাশে বসিয়া তার হাতখানি হাতে লইয়া সেই কুন্দশুভ্র অধরে··· রহস্য!

দারুণ কলরবে চেতনা ফিরিতে যোগীন্দ্র দেখে, একটা খোট্টা চাকর তাকে কষিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে···এবং দু-চারিটা ঘুষিও···

পিঠ তাই জ্বলিতেছে? ঠিক!

মনোরমা ভয়ে ঘরের কোণে পড়িয়া আছে···মূর্চ্ছিতার মত। তার মুখ-চোখ আতঙ্কে নীল!···ওদিক দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এক পুরুষ, তাঁর পিছনে এক তরুণী··· যোগীন্দ্র চিনিল, মনোরমার ভগ্নী! ভগ্নীপতি!

ভগ্নীপতি কহিল—পুলিশে নিয়ে চ। তার আগে পিছমোড়া করে বাঁধ···

ভগ্নী কহিল—এই নে কাপড়···

আল্না হইতে মনোরমার একখানা শাড়ী টানিয়া তিনি রঘুয়ার হাতে দিলেন, দিয়া ডাকিলেন—মনো··· মনো···

ভগ্নী তিলোত্তমা মনোরমার কাছে বসিলেন; মনোকে দেখিয়া স্বামীকে কহিলেন—ওগো জল আনো। মনো অজ্ঞান হয়ে গেছে!···

স্তব্ধ রাত্রে বিষম দুর্য্যোগ!

পাশের বাঙলো হইতে সাড়া জাগিল!···মনোর ভগ্নী-পতি অনুকুলবাবু কহিলেন—চোর!

রঘুয়া যোগীন্দ্রকে বাঁধিতেছিল। যোগীন্দ্র হতভম্ব···বাধা দিল না!

অনুকুলবাবু কাছে আসিলেন। যোগীন্দ্র কহিল—আমি যোগীন···

—যোগীন?

—হাঁ, মনোরমার স্বামী!

—চুপ রও!···

লোক-জন আসিল। দেশে ডাকিলে যাদের সাড়া মিলে না, বিদেশে না ডাকিতে তাঁরা আসিয়া উদয় হন। সাধে আমরা ছুটী পাইলে বিদেশে ছুটি! বিদেশের হাওয়াই স্বতন্ত্র!

ব্যাপারটা জলের মত সাফ হইয়া গেল—যোগীন্দ্রকে তখন বাঙলোর বাহিরে আনা হইয়াছে!···

অমলও গোলমাল শুনিয়া আসিয়া হাজির—সঙ্গে সঙ্গে নীল সমুদ্রের যত নর-নারী। অনসূয়া দেবীরও এত রাত্রে কষ্ট করিতে দ্বিধা হয় নাই!

বিদেশের এ সুখ—বিদেশকে এমন রমণীয় করিয়াছে!

ব্যাপার শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কেহ বলিল—আধুনিক যুগের ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ বলিল—এমন বেকুব মানুষে হয়।···

যারা রসিক, তাঁরা বলিলেন—নভেলী কাণ্ড! সকল বিষয়ে যাঁরা সন্দিগ্ধ, তাঁরা বলিলেন—চেপে যাও। ওঁর স্বামীর কাণে এ কথা দুণাক্ষরে না প্রবেশ করে!

দু'একজন মডার্ণ তরুণ ছিলেন; তাঁরা বিদায় লইলেন গানের কলি গাহিতে গাহিতে,—

মন যা চায়, তাতে বাধা দিস্ নে!
রূপ দেখে মন মজে যদি,
কোনো বাধা মানিস্ নে!

··· ··· ···

তিলোত্তমা কহিলেন—ঠিক চিনেছিস মনু? আমার কিন্তু সন্দেহ কাটচে না! বহুদিন না দেখলেও যোগীনকে চিনতে পারবো না?

অনুকূলবাবু কহিলেন—মানের ভরে দেখো দিদি, প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে আইনের প্রাচীর লঙ্ঘন করো না। পেনাল কোড্ ভারী নিষ্ঠুর। মানুষের প্রাণ-মনের সুখ-দুঃখের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা নেই!

হাসিয়া মনোরমা কহিল—তোমার ওকালতি আদালতে গিয়ে করো···

অনুকূল কহিল—ঠিক চিনে থাকো তো আমার বলবার কিছু নেই! মোদ্দা দু-জনের চেহারায় সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়। একালেও এমন ঘটে থাকে। সেকালে ঘটেছিল—ব্রজবালাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডুপ্লিকেট্ উদ্ধবকে ব্রজধামে পাঠিয়েছিলেন···

অনুকূলের পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া মনোরমা কহিল,—যান্, চালাকি করবেন না! ভারী জোরে মারবো—ফের যদি এই বিশ্রী তামাসা করেন!···তার চোখে সলজ্জ হাসির স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ!

তিলোত্তমা যোগীন্দ্রর পানে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—তুমিই যোগীন? মানে, আমাদের যোগীন?···

তাঁর কথা লুফিয়া অনুকূল কহিলেন,—মানে, যে যোগীন এই তরুণী শ্যালিকার হৃদয়ে পাষাণ হেনে বৈরাগ্য নিয়ে বনের পথে অগ্রসর হয়েচেন?···

তিলোত্তমা কহিলেন,—এ হলো মনোর মান-ইজ্জতের কথা! শেষে আমাদের যোগীন এসে দেখা দিলে একটা বিশ্রী গোলমাল না বেধে যায়! তাই বলা।

হাসিয়া যোগীন্দ্র কহিল,—আর আমায় লজ্জা দেবেন না দিদি···

তিলোত্তমা কহিল,—ঢেঁকিকেল দিয়ে কটক যাত্রার কথা গল্পে শুনতুম···তোমার কল্যাণে চোখে দেখলুম।···স্বামি-স্ত্রীতে মান-অভিমান হয়, হওয়ায় দুঃখ নেই। কিন্তু তা থেকে এমন তিলে তাল গড়বার চেষ্টা কি উচিত!··· তাছাড়া মান-অভিমানের মধ্যে স্বামীর ইজ্জৎ রাখবার কথাও মনে হয়?

আরো ঘণ্টাখানেক পরের কথা। ঘরে তখন কেহ নাই—শুধু যোগীন্দ্র আর মনোরমা।

মনোরমা কহিল,—কি কাণ্ড করলে বলো দিকিন! ছি! এ-দেশে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো আর?

যোগীন্দ্র কহিল,—তোমার জন্যই···

—আমার জন্য?

—নয়?···সন্ধ্যাবেলা চক্রতীর্থের সামনে দেখা হলো, মিনতি জানালুম, তুমি গ্রাহ্য করলে না।

মনোরমা কহিল,—বা রে! আমায় দিদি যে মানা করেছিল।···

যোগীন্দ্র কহিল,—হুঁ···

যোগীন্দ্রর পানে মনোরমা ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,—আর তোমার কোনো দোষ নেই···?

—কি দোষ, বলো···

মনোরমা কহিল,—রাগ করে পুরী চলে আসা হলো কেন? আমার রাগ হয়েছিল, রাগ করে কথা কইনি। তুমি সেজন্য বকলে না কেন? কাছে ডাকলে না কেন? একবার আদর করলে না কেন?···তাতে আমার দুঃখ হয় না বুঝি? আমি মানুষ নই?

তার স্বর বাষ্পে রুদ্ধ হইল, দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

যোগীন্দ্র তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল…

সকাল-বেলা।

চায়ের টেবিলে অমলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তার হাতে পেয়ালা দিয়া মনোরমা গলবস্ত্র হইয়া অমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

যোগীন্দ্রর বিস্ময়ের সীমা নাই!

হাসিয়া অনুকূল কহিল,—বুঝচো না, উনি তোমার সংবাদ পাঠাতেন। এ বাঙলো উনিই জোগাড় করে দেন। তার পর আমরা এসে তৃতীয় অঙ্কে উদয় হই। উনি অন্তরাল থেকে তোমার মনের গতির সংবাদ দিচ্ছিলেন। তবে উপসংহারটুকু আমরা অন্যভাবে রচনা করবো, ভেবেছিলুম…হতোও তাই! যদি…

হাসিয়া অমল কহিল,—আজ দু'দিন ধরে যোগীন সবেগে এক উপন্যাসের প্লট ভাবছিল। আমি পাশে বাস করচি, এমন অকৃত্রিম কবি-বন্ধু, আমাকে আমোলই দিচ্ছিল না…

হাসিয়া যোগীন্দ্র কহিল,—তাই তুমি এ কাণ্ড গড়ে তুলেচো! বিশ্বাসঘাতক!

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া অমল কহিল,—জানো না তো, কাল সারা রাত "নীল সমুদ্রে" কারো চোখে ঘুম আসে নি। মস্ত সভা বসেছিল। সে সভায় কতখানি পরিশ্রমে এ কাহিনীর মর্ম্ম-কথা সকলকে বোঝাতে হয়েচে! তারা না হলে বিশ্বাস করে কি। এক সাধ্বী সতীর মান-ইজ্জতের ব্যাপার!…মোদ্দা, তুমি বাঁকা পথে এসেছিলে, বন্ধু…

অনুকূল কহিল,—তা হোক, short cut বটে…একেবারে হৃদয়-প্রাঙ্গণের মধ্যে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা

অমিত প্রভায় প্রকাশ যথায় পাইল ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান,
ধর্ম্ম যথায় মর্ম্ম উথাড়ি' পূর্ণ প্রতাপে মূর্ত্তিমান,
প্রাচীনতম সে ভারতবর্ষ, ভুলিল আপন পরমাদর্শ,
প্রতীচ্য হ'তে ছুটে এল যবে অবিশ্বাসের অন্ধকার!
তুমিই তখন খুলিলে আবার ধর্ম্ম-সাধন-হর্ম্ম্য-দ্বার!
সমাধি-মগ্ন! ব্রহ্মলগ্ন! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

শুদ্ধ-সত্ত্ব-মহিমা-দীপ্ত পুণ্য জীবন-আধারে তব
প্রকটিত হ'ল ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যানুভূতি নিত্য নব!
অপূর্ব্ব কথা-অমৃতধারা পানে সংসার সংশয়-হারা!
লভিয়া সরস শ্রীকর-পরশ, হে ভব-জলধি-কর্ণধার!
দেখিল অন্ধ, শুনিল বধির, লঙ্ঘিল গিরি পঙ্গু আর!
নিত্য যুক্ত! জীবন্মুক্ত! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

নির্ব্বিকল্প সমাধি-প্রভাবে দ্বৈত-জ্ঞানেরে করিয়া জয়
বিশ্বে হেরিলে হৃদয়-পদ্মে, ব্রহ্মে হেরিলে বিশ্বময়!
একই লক্ষ্য, শত শত পথ! একই তত্ত্ব, বিভিন্ন মত!
সাধনা-সহায়ে শিখালে সবারে সমতান্ সেই সত্য সার!
লক্ষ ভেদের বক্ষে গাঁথিলে সমন্বয়ের পুষ্পহার!
অপাপবিদ্ধ! স্বভাবসিদ্ধ! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

সাধনা তোমার অরূপে করিল মমতা-মধুর মূর্ত্তি দান!
অপোগণ্ড শিশু সন্তান সম করিলে মায়ের স্তন্যপান!
প্রদীপ্ত করি প্রতিমৃৎ-কণা, দেখিলে ব্যাপ্ত দিব্য চেতনা!
জড়ের বুকেতে দেখিলে নৃত্য চিৎ-স্বরূপিণী বিশ্বমা'র!
অভেদ তত্ত্ব, মাতা ও পুত্র, মিলন-মাধুরী চমৎকার!
প্রজ্ঞান-রবি! চিদ্ঘন ছবি! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

তোমার মাঝারে জীবন লভিল সকল দেশের তত্ত্ব-গ্রন্থ!
তোমাতে পাইল মূর্ত্ত প্রকাশ বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্র!
"কথামৃতের" ক্ষুদ্র বিন্দু নিখিল জ্ঞানের গভীর সিন্ধু!
নিমেষে নাশিল মন্ত্রের মত জ্ঞানের পিপাসা দুর্নিবার!
অন্তর-জ্যোতি ফুটালে নাশিয়া অন্ধতমসা অবিদ্যার!
সংসার-মরু-নন্দন-তরু!—বন্দি তোমারে যুগাবতার!

অন্তরে তব বহিল, দেবতা! চিন্তা-প্রবাহ কত বিচিত্র!
কখনো নিবিড় ধ্যানেতে মগ্ন! কখনো চপল বালক-নৃত্য!
দেখি মনে হয় সর্ব্বাবতার, তোমার মাঝারে আসি একাকার!
তুমিই "বুদ্ধ"! তুমি "শঙ্কর"! তুমিই "গৌর" করুণাধার!
প্রতি যুগে যুগে তুমিই আসিলে লাঘব করিতে ধরার ভার!
ভুবন-পাবন! করুণা-ভবন! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

সন্দেহ-দ্বিধা-তর্ক-বিচার বাক্যে তোমার পাইল লয়!
চরণ-তরণী-বরণে পলান শরণাগতের মরণ-ভয়!
ভক্তের ভার বহিলে মস্তে, পরশি অভয়-বরদ হস্তে,
বাজালে ভুবন-মোহন স্বরেতে ভক্ত-হৃদয়-বীণার তার!
বিশ্ব মানব-মানস মোহিল সঙ্গীত তব চমৎকার!
প্রণত-ভক্ত-চিরানুরক্ত! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

কাম-কাঞ্চন-মরীচি-মুগ্ধ ভোগ-প্রমত্ত বর্ত্তমান!
ত্যাগ-মহিমায় তুমিই দেখালে পন্থা লভিতে পরিত্রাণ!

তোমারি জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা, জ্বলে উদ্ভাসিত দূর আমেরিকা!
মুখরি' ধরণী উঠিতেছে ধ্বনি ছন্দ-মধুর বন্দনার!
"শ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি! বিজয়ী বিবেকানন্দ শিষ্য যার!"
সাধু-শিরোমণি ক্ষমা-ক্ষেমখনি! বন্দি তোমারে যুগাবতার!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ (কবিরত্ন)।



চয়ন

সক্রিয় আগ্নেয়-গিরির গহ্বরে প্রবেশ

আগ্নেয়-গিরি হইতে যখন অগ্ন্যুৎপাত হইতে থাকে, তখন উহার অভ্যন্তরভাগের অবস্থা কিরূপ হয়, ইহা অবগত হইবার জন্য জনৈক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ঐরূপ একটি ক্রিয়াশীল আগ্নেয়-গিরির ৮ শত ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছিলেন। আস্‌বেসটস্ রজ্জুর সাহায্যে তিনি গিরিগহ্বরে নামিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এবম্বিধ অসমসাহসিক কার্য্য করিতে কেহই সাহসী হন নাই। বড় জোর কেহ গুহামুখ হইতে সাবধানে উঁকি মারিয়াছিলেন। অথবা অগ্ন্যুৎপাত থামিবার পর গুহার মধ্যে সামান্য দূর পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক এই অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাঁহার নাম এম্, আর্পাদ কিনার। সিসিলি এবং ইটালীর মধ্যবর্ত্তী ষ্ট্রমবলি দ্বীপের আগ্নেয়-গিরিকেই পরীক্ষার জন্য মনোনীত করেন। অবশ্য পরীক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে যে সকল আয়োজন প্রয়োজন, তজ্জন্য বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি আস্‌বেসটস্-নির্ম্মিত একটি পরিচ্ছদ, দস্তানা, জুতা এবং শিরোভূষণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার উপদেশানুসারেই ঐগুলি যথোপযুক্তভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আগ্নেয়-গিরি-নিঃস্রাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অক্সিজেন-পূর্ণ একটি শিরোভূষণও সংগৃহীত হইয়াছিল। আস্‌বেস্‌টস্ রজ্জু এবং দুই প্রস্থ চোঙ্গার আকারবিশিষ্ট ইস্পাতের বর্ম্মও তিনি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কয়েক জন বন্ধু এবং দ্বীপবাসী জন কয়েক লোককে সঙ্গে লইয়া তিনি আগ্নেয়-গিরির শীর্ষদেশে আরোহণ করেন। বর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ভূষণ ধারণ করিয়া একটি তাম্র-নির্ম্মিত কোমরবন্ধে আসবেস্‌টস্ রজ্জুর এক প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া তিনি গুহামুখে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হন। গুহামুখের এক স্থানে কপিকল লাগাইয়া তিনি নীচে অবতরণ করেন। রজ্জুর সহিত বিদ্যুৎশক্তিবাহী তার এবং আলোক ছিল। কথা ছিল, বোতাম টীপিবামাত্র বাতি জ্বলিয়া উঠিলেই, তখন তাঁহাকে টানিয়া তোলা হইবে। বৈজ্ঞানিক এইভাবে ক্রিয়াশীল আগ্নেয়-গিরি-গহ্বরে নামিয়া গিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। গুহাতলের জমীতে তাঁহার পদ পৃষ্ঠ হইয়াছিল। উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং



বর্ম্মাবৃত বৈজ্ঞানিক, দক্ষিণের চিত্রে অবতরণের দৃশ্য, বামের নিম্নস্থচিত্রে ঊর্দ্ধমুখী লাভা

বায়ুমণ্ডল গ্যাসে পরিপূর্ণ। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস থাকায় তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় নাই। তখন মহাশব্দ করিয়া গলিত-ধাতু নিঃস্রাব চলিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি যে দিকে ছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে গর্জ্জন ও নিঃস্রাব চলিতেছিল। তিনি বহুবর্ণসমন্বিত কুয়াসাস্তবের নিম্নে প্রদীপ্ত এবং ফুটন্ত লাভা দেখিয়াছিলেন। তাহার আলোড়ন অতি ভয়ানক। বৈজ্ঞানিক নিরাপদে উপরে উঠিয়া আসেন। তার পর ইস্পাতের বর্ম্ম পরিধান করিয়া তিনি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

রেলগাড়ীর মধ্যে স্নানের কুণ্ড

নিউ ইয়র্ক হইতে ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত যে ট্রেণ চলাচল করে, তাহাতে একখানি গাড়ীর মধ্যে সন্তরণাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। একটি বৃহৎ চৌবাচ্চায় জল পূর্ণ থাকে। তন্মধ্যে নামিয়া অবগাহন-স্নান ও সন্তরণ করা চলে। যন্ত্রচালিত অশ্ব আছে, তাহাতে ব্যায়াম করা যায়। যাত্রিগণকে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।



গাড়ীর মধ্যে স্নানের চৌবাচ্চা

মোম-নির্ম্মিত মুখাকৃতি

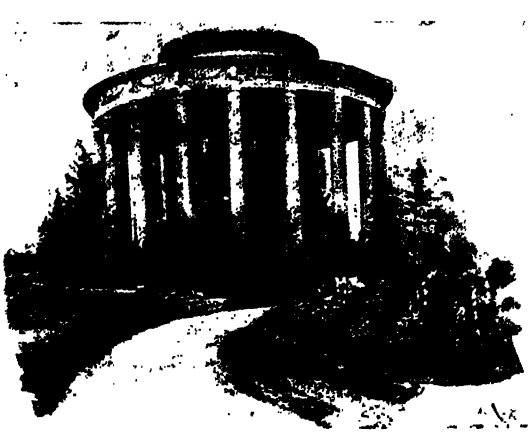
লস্ এঞ্জেলেসের একজন শিল্পী পৃথিবীর ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের মুখমণ্ডল মোমের সাহায্যে যথাযথভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মুখমণ্ডলীর মধ্যে নেপোলিয়ান, কনফ্যুসস্ এবং আরও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মুখমণ্ডল রচনা করিয়াছেন। অসাধারণ শক্তিশালী শিল্পী প্রত্যেক মুখমণ্ডলকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। কোনও চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের জন্যই শিল্পীর এই প্রচেষ্টা। বহু দিন চেষ্টার পর তিনি প্রকৃত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক মুখমণ্ডলের ভাব-ভঙ্গী তিনি যথাযথভাবে বিন্যাস করিতে পারিয়াছেন। দেখিবামাত্র যে কেহ বলিয়া দিতে পারে,কোন্‌টি কাহার মুখ।



রচিত মুখমণ্ডলগুলির মধ্যে শিল্পীর নিজের মুখও আছে

প্রাচীন মন্দিরাকৃতি বাসভবন

বাম্মিংহামের একটি পাহাড়ের উপর একটি মন্দিরাকৃতি বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। রোম নগরের বহির্ভাগে ভেষ্টাল ভার্জ্জিন



মন্দিরাকৃতি বাসভবন

নামক একটি মন্দির অবস্থিত ছিল। তাহারই অনুকরণে এই মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাসভবনের চারিদিকে ষোলটি স্তম্ভের উপর একটি গোলাকার গম্বুজ অবস্থিত। উহার অভ্যন্তরে তিনটি কক্ষ আছে। একটি মাটির নীচে, আর একটি উপরে, গম্বুজের চাঁদনীর নিম্নস্থ ভূমির তলে তৃতীয় কক্ষ—রন্ধনাগার অবস্থিত। ভবনের চারিদিকে মনোরম উদ্যানরাজি।

মোটরের গতি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

কালিফের সান্টা বার্ব্বারার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে মোটর চাপা না পড়ে, এজন্য রাস্তার মধ্যস্থানে ইস্পাতের নকল পুলিস-প্রহরীর মূর্ত্তি রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই মনে হইবে, সজীব পুলিস-প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। মোটর-চালকগণ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া গতি মন্দীভূত করিয়া থাকে। যে যে স্থানে বিদ্যালয় আছে, সেইখানের রাজপথে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে।



নকল পুলিস-প্রহরী

নকল হেডেলবার্গ দুর্গ

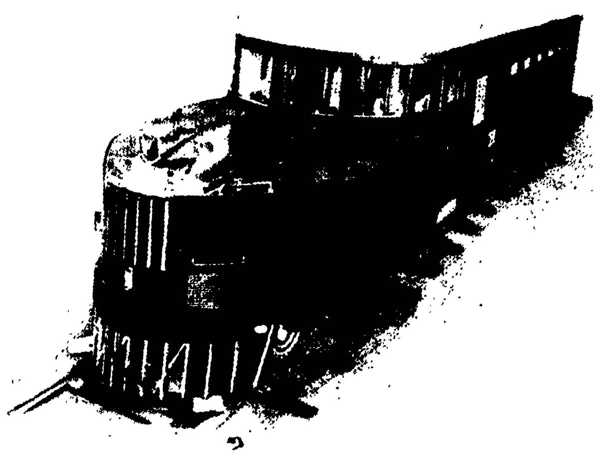
জার্ম্মাণীর হেডেলবার্গ দুর্গ প্রসিদ্ধ। উইলিয়ম্ হ্যাকার নামক হেডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তরুণ স্থপতি শিল্পী উক্ত দুর্গের একটি ক্ষুদ্রাকার সংস্করণ রচনা করিয়াছে। স্কেলে মাপিয়া দুর্গের প্রত্যেক অংশ যথাযথভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে চিকাগোর "শতবার্ষিকী উন্নতিপ্রদর্শনী" ক্ষেত্রে উক্ত নক্সা পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।



নকল হেডেলবার্গ দুর্গ

ধূলিনিবারক রেলগাড়ী

আমেরিকায় ধূলি, উত্তাপ, শীত এবং শব্দনিবারক এক প্রকার



ধূলি-নিবারক দ্রুতগামী রেলগাড়ী

রেল গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। টর্পেডো আকার বিশিষ্ট সম্মুখভাগে এঞ্জিন অবস্থিত। চারিদিক্ অবরুদ্ধ থাকায় পাছে যাত্রীদিগের কষ্ট হয়, এজন্য কামরাগুলির মধ্যে প্রতি ৩ মিনিট অন্তর বায়ুর পরিবর্ত্তনসাধনের ব্যবস্থা আছে। এই গাড়ী ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে।

রেলপথ ও খোলা রাস্তায় চলিবার মোটরগাড়ী

সম্প্রতি মোটরগাড়ীকে রেলপথ এবং সাধারণ পথে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গাড়ীতে দুই শ্রেণীর চাকা থাকে। একটা সাধারণ রবারের চাকা, অপরটি ধাতুনির্ম্মিত খাঁজকাটা চাকা। শেষোক্ত চাকা রেলপথের উপর দিয়া চলিবার উপযোগী। চালকের আসনের কাছে চাপ দিবার যন্ত্র আছে। ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে এক-শ্রেণীর চাকা উপরে তুলিয়া, অপর শ্রেণীর চাকায় গাড়ী দৌড়ায়। চিত্র হইতে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যাইবে।



তস্কর-বিতাড়নের নূতন ব্যবস্থা



রেলপথ এবং সাধারণ রাস্তায় চলিবার মোটর গাড়ী



নূতন আকারের পেট্রলের দোকান

নূতন আকারের পেট্রলের দোকান

ভাৰ্জ্জিনিয়ার এক জন পেট্রল-ব্যবসায়ী "জগ" বা জলপাত্রের আকারবিশিষ্ট একটি দোকানঘর তৈয়ার করিয়া তথায় পেট্রলের ব্যবসা চালাইতেছেন। দোকানঘরটি দ্বিতল। উপরের তলায় গুদামঘর, নীচে দোকানঘর।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য



৩টী থাক-বিশিষ্ট কলার ছড়া [শ্রীযুত হরিহর শেঠের সৌজন্যে)

তস্কর-বিতাড়নের নূতন ব্যবস্থা

পল্লীভবনগুলিতে প্রায় চোরের উৎপাত ঘটে। রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থভবনে তাহারা হানা দেয়। এজন্য পল্লীভবনের ছাদের ধারে "সার্চ্চ লাইটের" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটা বোতাম টিপিলেই আলোকাধার চারিদিকে প্রখর আলোকপাত করিতে থাকে। শয়নগৃহে শয্যার পার্শ্বেই বোতাম টিপিবার যন্ত্র বিদ্যমান। বোতাম টিপিবামাত্র ছাদের চারিদিকের আলো জ্বলিয়া উঠে। সেই আলোকে চোরগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন চোর সহসা আত্মগোপন করিবার উপায় খুঁজিয়া

বিবর্ত্তন

১২

দিন ভালই কাটিতেছিল, এমনই ভালই কাটিতে পারিত, চাই কি, আরও ভাল কিছু ঘটিতেও যে না পারিত, হয় ত তাও না। অর্থাৎ এ বাড়ীতে চুপি চুপি একটা কাণাকাণি চলিতেছিল যে, বড় বউএর মেজোছেলে পুঁটেকে হয় ত আসমানতারা তার পোষ্যপুত্র লইবে। কেন না, দেখা গিয়াছে যে, সকলকেই অপক্ষপাতে আদর-যত্ন করিতে থাকিলেও ঐ বিশেষ ছেলেটির উপরেই যেন তাদের পতি-পত্নী দুজনকারই বিশেষ একটু টান দেখা দিয়াছে। অন্য ছেলেদের জন্মতিথি-পূজায় মিলের ধুতি বরাবরই দেয়, এর বেলায় তাঁতের পোষাকী ধুতি মায় একটি ভাল ছিটের সার্ট দেওয়া হইল; দুপুরবেলা সব ক'টাকেই ঘোষাল মহাশয়ই পড়িতে বসান, আর সবার ছুটী মিলিলেও পুঁটে ওরফে পূর্ণচন্দ্রের ছুটী সহজে মিলে না। এ সব কিসের লক্ষণ?

বাড়ীর লোকরা মনে মনে খুসীই হইয়াছিল, তা বেশ জানা যায়। বাড়ী ওরা বড় করিয়া করে নাই বটে; তবে আসমানতারার কাছে খবর তারা পাইয়াছে যে, বাড়ী তাদের তারকেশ্বর লাইনের হরিপালের কাছে কোন একটি গ্রামে আছে। মস্ত বড় তাদের সে বাড়ী, চকমেলানো বাড়ী, ৩টা উঠান। বাগান-বাগিচা। সেখানে ওর ছোট দেওর জা সবাই আছে, তারা এদের বৈমাত্র। সৎমার মুখের ধার বড়ই বেশী, তাই স্বরূপ সেখানে থাকিতে চায় না। আসমানতারা অবশ্য বাড়ীতে থাকারই পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু শ্বশুর মরার পর বিষয়-ভাগ লইয়া সৎমা এমন সব কথা শুনাইয়াছিলেন যে, তার পর স্বামীকে সেখানে থাকিতে সে আর কিছুতেই সম্মত করিতে পারিল না।

ব্যাপারটা এইরূপই বটে! যে কথাগুলা আসমানতারা বলে নাই, তাহা এই—স্বরূপ খুব বেশী রকম রাগ করিয়া বলিল,—"তুমি তা হ'লে গুরুজনের সেবা কর, আমি এমন দেশে গিয়ে থাকবো—যেখানে এদের নামও কখনও শুনতে হবে না।" আসমানতারা শেষটা কাঁদিয়া কাটিয়া তার সঙ্গ লইল। টাকাকড়ির ভাগ বাপই করিয়া গিয়াছিলেন, তাদের অংশে কিছু মন্দ ছিল না, আর সবই পিছনে পড়িয়া রহিল, ভাইকে বলিয়া আসিল, দান-বিক্রীর অধিকার রহিল না, তবে ভোগ করবার অধিকার তোমার রইলো। ভাই হেঁট হইয়া পায়ের ধুলা লইল, মার চেয়ে সে মানুষ ভাল। সৎমা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গাল দিয়া বলিলেন, "যেমন ছ্যামাক দেখিয়ে যাচ্ছেন, এই যাওয়াতেই যেন ওঁর শেষ যাওয়া হয়।" আসমানতারা তার পরও সৎ-শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইতে দ্বিধা করে নাই। ছোট জা বড় ভালবাসিত, আসমানের বুকে মুখ গুঁজিয়া সে চোখের জল বিস্তর খরচ করিয়াছিল, আসমান তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে মাথা নাড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "যাচ্ছো যাও, আমার মর্‌বার খবর পেলেও কি ফিরে না এসে থাকতে পারবে?" আসমান চম্‌কাইয়া উঠিল আর তার মাথার উপর গভীর স্নেহে হাতখানি রাখিল, "বালাই ষাট্‌! ও-সব কি কথা, ছোট বউ? বলতে আছে?"

ছোট বউএর রোগামুখে একফোঁটা ক্লিষ্ট হাসি বৃষ্টির ভিতর রৌদ্রের মতই ফুটিয়া উঠিল, "না দিদি, বলতে ত নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু হ'তে ত আর তার জন্যে বাধে না? এই যে বছর-বিউনি মানুষ আমি, তুমি না থাকলে আমার যত্ন হবে? সেবা হবে? আঁতুড়ে ত প্রত্যেকবারই মরতে মরতে বেঁচে উঠি, সে কার জন্যে? এবার আমায় কে দেখবে বল ত? মরতে হবে না ভেবেছ? দেখো।"

আর পারিল না, কাঁদিয়া আসিয়া সৎশাশুড়ীকে বলিল, "মা, আপনার ছেলেকে একবার বলুন যে, এই ক'টা মাস থেকে যাক, ছোট বউএর আঁতুড় তুলে দিয়েই আমি চ'লে যাব। একলা আপনি কি সব দিক সামলাতে পারবেন?"

সৎশাশুড়ীর ত আসমানতারার বিদায় হওয়ার ইচ্ছা কোন দিনই ছিল না, এই রকম দশ কথা শুনিবে, বিষয়-সম্পত্তির কোন খবরই থাকিবে না, আবার বাড়ীতে থাকিয়াই এদের ষোল আনা করনা করিবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। স্বরূপ বিষয়ভাগের কথা তোলাতেই না এত কাণ্ড ঘটিল। আঁটকুড়ো লোকের আবার বিষয়ভাগ কেন? ভাইপোরাই ত পরে সবই পাইবে, ভাগ করিলেই কোন দিক্ দিয়া খরচ হইয়া যাইবে বৈ ত নয়। অন্ধকার মুখে জবাব দিলেন:—

"আমি কি তোমাদের যেতে বলেছি যে, থাকতে বলবো ? তোমাদেরই বাড়ী, তোমাদেরই ঘর, থাকবে সে আর বেশী কি কথা ?"

বলিতে পারিলেন না, 'প্রেষ্টিজে' বাধিল। অবশেষে ছোট বউ নিজেই আড়ালে দাঁড়াইয়া তার পাঁচ বছরের বড় মেয়ে মেনিকে দিয়া ভাসুরের কাছে নিজের আরজি পেশ করিল। ছোট্ট মেয়েটা চোখ পিট্ পিট্ করিতে করিতে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া অর্দ্ধেক কথা ভুলিয়া গিয়া কোনমতে বলিল,—"জ্যেঠাবাবু! মা বলছে", তার পরের বক্তব্যটা তার মনে পড়িল না।—"কি বলছেন রে, মা ?" বলিয়া স্বরূপ একটু যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, হ্যাঁ, এ-বাড়ীতে তাদের মতনই ঐ আর একটা জীব আছে বটে! যার কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয় ত তার যথার্থ আত্মীয়দের চাইতেও তাদেরই বেশী আছে।

"কি বলবো, মা ?" বলিয়া মেয়ে দ্বারের কাছে ঘেঁসিয়া গেল। মা একটু বিপন্ন বোধ করিতেছিল। এখনই শাশুড়ী বা স্বামী যদি এ দৃশ্য দেখিয়া ফেলেন, রক্ষা থাকিবে না। বৌ-মানুষ, তাতে ভাদ্দর-বউ, এমনভাবে যে পুরুষ মানুষ, তা'তে ভাসুর, তার কাছাকাছি আসিয়া একটা ছোট মেয়ের দৌত্যে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে, এর মত নির্লজ্জতা নিশ্চয়ই মাপ করিবার মত তুচ্ছ নয়! সে তখন মরিয়া হইয়া গিয়াই বেশ একটু স্পষ্ট স্বরেই তাড়াতাড়ি কোনমতে বলিয়া ফেলিল, "বল্ না মেনি, দিদি এখন চ'লে গেলে এবার আমারও শেষ হবে, এটা জেনেই যাবেন, আমি মরলে আমার ছেলেমেয়েদের ভার কিন্তু আপনা-দেরই ত নিতে হবে, আর কে নেবে ?"

স্বরূপের সকল তেজ ফুরাইয়া গেল, বিপন্নভাবে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা এখন থেকেই গেলুম, মা! তুমি ব্যস্ত হয়ো না।" বলিতে বলিতে সেখান হইতে একরকমে পলাইয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিল,—"নাঃ, এ ক'টা মাস থেকেই যাও, নেহাৎ ছোট বউমাটাকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া সঙ্গত হয় না।" স্বরূপ এর পরের দিনই হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেল, ইচ্ছা, ভবিষ্যতের বাসস্থান নির্ব্বাচন করা। আসমানতারা খুসী হইয়াই যথাপূর্ব্ব সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল।

দিল্লী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও স্বরূপপ্রকাশ তার ভবিষ্যতের বাসযোগ্য স্থান কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। বড় বড় ইমারত, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্ন ও অভগ্ন অসংখ্য চিহ্নরাজী, নব্যসভ্যতার অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রায় দীক্ষিত সৌখীন নরনারী-সমাজ তার মনকে যেন বর্ত্তমান সভ্য জগতের উপর বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিল, আবার অতুল ঐশ্বর্য্যমহিমায় মণ্ডিত অতীতের বিধ্বস্ত রূপকেও সে সহ্য করিতে পারিল না, মনে মনে বলিল, "থাক্, ওরা আমার কল্পনার মধ্যেই থেকে যাক্, সেরশা, আক্‌বর, সাজাহান, রূপসী নুরজাহান, মমতাজ, এ সবের স্মৃতিই ভাল, সেই সব স্মৃতির ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদর্শন নিয়ে কাল কাটানো, সে শ্মশান-সিদ্ধিরই মতন, আমি বাপু শব-সাধনার সুদৃঢ় সাধক নই, ক্ষুদ্র প্রাণী।"

অবশেষে তিলপুরা ঐ যে ছোট্ট গ্রামখানি, না আছে যা'তে দুচার ঘর উচ্চশ্রেণীর অধিবাসী; ধোবা, নাপিত, কলু, তেলী, মালী আর অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর জল-অনাচরণীয় অতি দরিদ্র অধিবাসী। খানকয়েক চালা-ঘর তুলিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া সে স্ত্রীকে লইয়া আসিল। ছোট বউয়ের কোলের ছেলের তখন অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে।

আসমানতারার ইচ্ছা ছিল, বড় মেয়ে মেনি আর মেজ ছেলে তুলেকে সে সঙ্গে আনে; কিন্তু স্বরূপ সম্মত হইল না। তাদের কাঁচা বাড়ী, দেশে একটা ডাক্তার নাই, পরের ছেলে, তার পর হয় ত সংস্কারও মত হইবে না। কায কি এ সব বন্ধনে ? কথা রহিল, মেনির বিবাহের সময় তার জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠাইমা তার বর দেখিতে আসিবেন।

সমস্ত বিয়োগব্যথার মতই প্রথমে অতি তীব্র থাকিয়া ক্রমেই কালের প্রলেপে জুড়াইয়া আসিল। এখন আবার ঐ চক্রবর্ত্তি-পরিবারের ছেলেমেয়েগুলাকে লইয়াই তারা তাদের আপনার ঘরের ছেলেমেয়েদের অভাব মিটাইয়া আনিয়াছিল। স্বরূপের কি হইত, বলা যায় না, তার মনের কোন কথাই বাহিরে বড় একটা প্রকাশ পায় না। আসমানতারা যে ভিতরে ভিতরে এখনও তাদের কথা ভুলিতে পারে নাই, তা সময়ে অসময়ে তার চোখ ছলছল করা, একলা ঘরে বিমনা হইয়া যাওয়া, ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলা—এই সব হইতেই টের পাওয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে ছোট বউএর চিঠি আসিত। সাতবার করিয়া সেখানি পড়িয়া সেখানিকে সে নিজের পরিপাটী করিয়া

সাজান হাতবাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিত, আবার কোন দিন অবসর থাকিলে সেখানি ও আগেরগুলি বাহির করিয়া পড়িত। অথচ লেখিকার যেমন হস্তাক্ষর, তেম্‌নি বর্ণাশুদ্ধি, বলিতে গেলে চিঠিগুলি একেবারে অপাঠ্য।

এমন সময় এক দিন হঠাৎ যেন ব্যাপারটা আর এক-রকম হইয়া দাঁড়াইল। এদের জীবনটাই এই রকম। জীবনাকাশে হঠাৎকারেই যেন শনি রাহু কেতু কোন্ মহাজন দেখা দেন, জীবনযাত্রার প্রণালীটা শুদ্ধ যেন আমুল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এবারও ঠিক তাই হইল।

সে দিনের দুপুরবেলাটা মেঘ-রৌদ্রে মিলিয়া বেশ একটু ছায়ার মধ্যে মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল; শীত-শেষের ঠাণ্ডা বাতাস অল্প অল্প শিহরণ শরীরের মধ্যে আনিয়া দিতেছে, স্বরূপ একখানা পাতলা র‍্যাপারে গা ঢাকিয়া নিজের শোবার ঘরের বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কাব্যপুস্তক কি এই রকমেরই কিছুরই একটা পড়িতেছিল, আর তারই খোলা দরজার কাছে বসিয়া আসমানতারা একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া ছাড়াইতেছিল একগাদা কড়াইসুঁটি। সন্ধ্যা নাগাদ মেঘটা আর একটু ঘনাইয়া আসিবে, হয় ত এক পশলা বৃষ্টিও নামিতে পারে, বাতাস ত ঠাণ্ডা হইয়া বহিবেই, গরম গরম কড়াইসুঁটির খিচুড়িটি ঠিক এম্‌নি দিনেরই উপযুক্ত। বিশেষ, ও-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আসমান-তারার হাতে ভুনি-খিচুড়ি যে কি ভালই বাসে!

বাহিরের দিক্ হইতে কে এক জন ডাকিল,—"বাড়ীতে কেউ আছেন?" স্বরটা যেন পরিচিত না?

আসমানতারা সেই দিকে কাণ পাতিয়া স্বামীকে বলিল, "ওগো, শুনছ, কে এক জন ডাকছে, একবারটি দেখে এসো না।"

স্বরূপের তখন বিছানা এবং পুস্তকপাঠ এ দুটির একটি-কেও ত্যাগ করার ইচ্ছা ছিল না, সে পুস্তকের খোলা পৃষ্ঠার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আলস্য-শিথিল কণ্ঠে জবাব দিল, "কে আবার ডাকবে, ঐ ওঁদের বাড়ীর কেউ হবেন হয় ত, যাও না, তুমিই দেখে এসো না।"

আসমানতারা উঠিল না, বরং সংশয়জড়িত কণ্ঠে কহিল, "না গো না, ও-বাড়ীর কেউ নয়; তা হ'লে ও কথা বলবে কেন? বাড়ীতে যে আমরা আছি, সে ত তারা জানেই।"

"কিন্তু ওরা না হ'লে আর কে এ বাড়ীতে আসবে? তবে হ্যাঁ, হ'তে পারে কোন রুগী, হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে এসেছে।"

স্বরূপপ্রকাশের একটি হোমিওপ্যাথিকের বাক্স এবং একটি ঐ বিষয়েরই বই ছিল, এ গাঁয়ে সে সংবাদটা চাপাও ছিল না।

"তুমি একবার গিয়ে দেখেই এসো না, বাপু।"

"নাঃ, না উঠিয়ে আর ছাড়লে না! যদি চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর লোক হয়, তা হ'লে কিন্তু ফিরে এসে তোমার দুটি গালে চারটি চড়, তা ব'লে দিচ্ছি।"

"বেশ, রাজী! কিন্তু যদি না হয়, তা' হ'লে কি? সেটাও ব'লে দাও।"

"দু'খান কচুরী বেশী ক'রে খাওয়া, আবার কি?"

আসমানতারা রাগিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, "তাই বটে! একেবারে কাজীর বিচার! এ যেন সেই আমাদের গল্পের পণ্ডিতী বিধান, 'মাকড় মেলে ধোকড় হয়, আর চালতা খেলে বাকড় হয়।' তা পুরুষরা চিরদিন এই রকম ক'রে নিজের কোলেই ঝোল টেনে এসেছে।"

স্বরূপ ততক্ষণে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া র‍্যাপারখানা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে চটি জুতাটির মধ্যে পা গলাইয়া দিয়া হাসি-হাসি-মুখে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "মা ভৈঃ! যদি হারি, দু'খানা কচুরি বেশী খাবো না, নিজের ভাগের থেকে তিনখানা তোমায় খাওয়াবো, কেমন, খুশী ত?"

সে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল, আসমানতারা তার উদ্দেশ্যে রাগ দেখাইয়া তখন বলিতেছিল, "ও মা, আমি কোথায় যাবো, কথার একবার ছিরি দেখ! ওঁর ভাগের কচুরিগুলো কেড়ে খাবার জন্যেই যেন আমি এত ক'রে কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে মরছি, কি ঘেন্না, মা!"

এমন সময় তার কাণে ঢুকিল, স্বরূপ কাহাকে যেন বলিতেছে—"তুমি কোত্থেকে?"

অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া সে দোরের দিকে ছুটিল।

নিশ্চয়ই তবে অন্য কোনখানের লোক! নিশ্চয়ই খুব তাদের পরিচিত, সেই জন্যই না তার প্রথম শুনিয়াই গলার স্বরটাকে চেনা চেনা বোধ হইয়াছিল! কে হইবে? ঠাকুরপো? হয় ত সেই, সে ছাড়া আর কে হইবে? কিন্তু সে যে বড় হঠাৎ এখানে আসিল? সবাই ভাল আছে ত?

অনেক দিন ত আর চিঠিও আসে নাই, আজকাল বড় একটা আসেও না, দু' তিনখানা দিবার পর অতি সংক্ষিপ্ত একটুখানি পোষ্টকার্ডের লেখা পাওয়া যায়।

ভয়ে, সংশয়ে এবং তার সঙ্গে সমান ওজনেরই পরমানন্দে পরিপ্লুতচিত্ত লইয়া সে যার সম্মুখীন হইল, তাহাকে দেখিয়া তার মুখের ভাব এক নিমেষেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভাল করিয়া তার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বিস্ময়মিশ্র সন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া ফেলিল, "এ অনি নয়? হাঁ, অনিমেষই ত? হ্যাঁ রে, তুই কোথা থেকে এখানে এলি?"

অনিমেষ ইতিপূর্ব্বে বোধ করি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, এবং দিতে আরম্ভও করিয়াছিল, কিন্তু এবার সে তার কৈফিয়ৎ দাখিল না করিয়াই হাসিয়া প্রতি-প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আমি ত ভবঘুরেই, সর্ব্বত্রই ঘুরে বেড়াই, কিন্তু তুমি ছোট পিসী! তুমি এই বন-জঙ্গলে ব'সে কি করছো? তোমাদের যে একটা মস্ত বড় বাড়ী, মোটা মোটা থামওলা ঠাকুরদালান এই সব একবার এসে দেখে গেছলুম, সে সব কোথায় গেল?"

অনিমেষ সকৌতূহল বিস্ময়ে একবার তার আশ-পাশে ত্বরিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

আসমানও কৌতুকস্মিত প্রসন্ন হাসি হাসিল, "সে সব আছে বাবা, কিচ্ছু হারায় নি। নে, তুই ভেতরে উঠে আয়।"

অনিমেষ বলিল, "যাচ্ছি, কিন্তু আগে বল, সে সব আছে ত, এখানে তোমরা কি করছো? এই অজ পাড়া গাঁ—একটা ভদ্র বাসিন্দে পর্য্যন্ত যেখানে নেই!"

আসমানতারা বলিল, "সে আমাদের পোষাকী বাড়ী, এইটেই হয়েছে আটপৌরে, এইখানেই আমরা এখন বাস করছি যে।"

অনিমেষ যেন অবাক্ হইয়া গেল, এই তিলপুরায়? "এখানে ত বাস করবার মত কোন আকর্ষণই টের পেলুম না, তবে হাঁ, যদি কায করতে চাও, তা হ'লে অবশ্য এই রকম যায়গাতেই তা' করতে হয়! পিসেমশাই! আপনি এখানে করেন কি? অর্থাৎ দিন কাটান কি ক'রে, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

স্বরূপ তার কথার জবাবে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "কৈ আর তেমন কিছু করি। শুয়ে বসেই প্রায় দিন কাটে, তবে রোগী পেলে একটু ওষুধ-বিষুধ দিই, আর এঁর কটি পোষ্য আছে, তা'দেরও বাগে পেলে এক আধ দিন পড়াতেও চেষ্টা করি, এই আর কি!"

কথা কহিতে কহিতে তিন জনেই ছোট উঠানটুকু পার হইয়া তিনটা মাটীর ধাপ উঠিয়া পরিষ্কারভাবে নিকানো রোয়াকটিতে উঠিয়া আসিয়াছিল। অনিমেষের পাদুটির ধূলার ছাপ সেই মসৃণ করিয়া নিকানো মাটীতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, আসমানতারা সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "হাঁ রে, অনু! তোর বুঝি দুপাটী জুতোও জোটেনি? মা গো! পা-দুখানা একেবারে ধুলো-কাদায় ভ'রে আছে। ছি ছি, আয়, আগে পা ধুবি আয়।"

অনিমেষ ঈষৎ যেন চিন্তাকুল হইল. তখনই তখনই আর এ সব কোন কথা তুলিল না, পিসীমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া পা ত ধুইলই, হাত-মুখ ধোয়াও তার বাকি পড়িল না এবং তার পরের ব্যাপারটাও বেশ সযত্নে এবং সাগ্রহে সম্পাদিত হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে আসমানতারা তাহাকে যখন আহ্বান করিল, অনিমেষ একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দু'একবার মৃদু আপত্তি করিয়া যখন দেখিল, তার ছোট পিসীমাটি জিদের বিষয়ে তার পিতৃস্বস্থপদের নেহাৎ অযোগ্যা নন, তখন অগত্যাই সত্য কথাটা তাহাকে স্বীকার করিতে হইল। সসঙ্কোচে সে জানাইল, তার চালের থলিতে যে অল্পপরিমাণ চালগুলি আজ সংগ্রহ হইয়াছে, তার মধ্যে কলু তাঁতি মালীর বাড়ীরই শুধু নয়, হাড়ি ডোম এবং মুর্দ্দাফরাসের বাড়ীর চালকেও সে এর মধ্যে সমান সম্মানে স্থান দিয়াছে। এর জন্যে যদি পিসীমার আপত্তির কোন কারণ না থাকে, সে খুসী মনেই ঘরে ঢুকিতে প্রস্তুত আছে।

এ কথা শুনিয়া জবাব দিবে কি, আসমানতারার ত চক্ষু স্থির হইয়া আসিল। অবাক্ হইয়া গিয়া গালে হাত দিয়া সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"এ আবার সব কি কাণ্ড রে, অনি! দাদা যা রেখে গেছলেন, তার ওপর তিন চারটে পাশ করেছিস, কি করলি বাবা সে সব? ভিক্ষে, তাও আবার ডোম-ডোকলার বাড়ী,—তুই কি আমাকে রাগাবার জন্যে ঠাট্টা করছিস?"

অনিমেষ হাসিতে লাগিল, বলিল,—"ঠাট্টা করবো কেন, সত্যিই বলছি, ওরা বড় গরীব কি না, তাই ওদের কাছে মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে এলুম, শুধু হপ্তায় হপ্তায় একমুঠো ক'রে ওরা চাল দেবে, আর তার বদলে—ভাল কথা ছোট পিসেমশাই! আপনি যে অমন নির্লিপ্তের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন, আপনার যেন কারু জন্যে কিছুই করবার নেই? আমার মাথায় বেশ একটা প্ল্যান এসেছে, আপনাকে আমি কিন্তু একটু খাটাবো।"

স্বরূপ অনিমেষের মুষ্টি-ভিক্ষার ব্যাপারটা কতক বুঝিয়াছিল,—তাই সে আসমানতারার উদ্বেগ দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, স্মিতমুখে উত্তর করিল,—"তোমার ঐ ভিক্ষের ঝুলিটি আমারও কাঁধে ঝোলাবে? তা হ'লে তোমার পিসী কিন্তু আমার টিকি ধ'রে বাড়ীর বার একেবারেই ক'রে দেবেন, উনি দান করেন, গ্রহণ করেন না।"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "আপনিও তাই করবেন, দানই করবেন; চলুন না আমার প্ল্যানটা নিয়ে একটু 'ডিস্কাস্' করা যাক; কিন্তু ঘরের মধ্যে যাব কি না, তা' ত কৈ ছোট পিসী কিছু বল্লে না?"

আসমানতারাও মনে মনে বুঝিতেছিল যে, তার সম্মানিত পিতৃবংশের ছেলে সুশিক্ষিত অনিমেষের এই ভিক্ষাবৃত্তির ভিতরকার কথাটি নেহাৎই ক্ষুন্নিবৃত্তিমূলক নয়, কিছু একটা মহৎ, কোন একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য এর ভিতরে নিহিত আছে। কহিল,—"বা রে ছেলে, ঘরে যাবি না ত কি ডুলে-বাড়ীর চাল নিয়েছিস ব'লে ডুলে-পাড়াতেই বাস করবি? ঝোলাটা এই রকের একধারে রেখে হাতটা ধুয়ে ফেলে ভেতরে আয়; এই নে, জলটা ঢেলে দিই। নারায়ণ! নারায়ণ!"

অনিমেষ উপদেশমত কায সারিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে হাসিয়া বলিল, "যাক্! ছোট পিসী নারায়ণকে ডেকে ভাইপোকে শুদ্ধ ক'রে নিলে।"

আসামানতারা তাড়াতাড়ি একটা পাটি পাড়িয়া দিয়া তার বিছানা-পত্রকে অছুত রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে উত্তর করিল, "ওদের হাত, গা, ঘর-করুনা নোংরা কি না বাবা, শুদ্ধাচার ত ওরা জানে না, সেই জন্যেই আমাদের ভয় করে। যে সব রোগের বিষ ওদের মধ্যে আছে, ওরা তা হজম করছে, তোমরা তা' পারবে কি সইতে?"

অনিমেষ পিসে পিসী দুজনকার দিকেই এক একবার করিয়া চাহিয়া লইয়া জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল; বলিল, "সেই কথাটাই ত পিসেমশাইকে বলতে চাইছি; আপনার ত সময়ের অভাব নেই, আপনি ওদের একটু মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলুন না? শুদ্ধাচার শেখান, নীতিজ্ঞান শেখান, কাণ্ডজ্ঞান শেখান, যদি পরে সম্ভব হয়, একটু একটু লেখাপড়াও শিখিয়ে নেবেন। আর—"

আসমানতারা তখন দালানে বঁটি পাতিয়া বাড়ীর পেঁপে, কলা, বাতাবি নেবু কাটিয়া কুটিয়া থালায় সাজাইতেছিল, ঘরে করা ক্ষীর ও নারকেল-ছাপা আছে, বাহির করিয়া আনিয়া এক পাশে দিতে দিতে বলিল, "বলিস কি রে, অনি! ওদের নীতিশিক্ষা, বিদ্যে শিক্ষা দেবেন ইনি? এঁর গুরুঠাকুর এলেও পারবেন না। ওরা কি না সেই পাত্তর!"

অনিমেষ বলিল, "কঠিন বৈ কি, তবে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, ছোটপিসী! সেবারে রাঁচি যাওয়া হয়, সেখানে কত খৃষ্টান, কোল আর সাঁওতাল দেখেছিলে বল ত? তাদের মিশনারীরা কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলেছে? অবশ্য রীতিমত ওদের নিয়ে খাটতে হবে, দুবেলা যেতে হবে, নিজের হাতে ক'রে ওদের বস্তির ময়লা সাফ করতে হবে, ওদের ময়লা কাপড় ক্ষারে কেচে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তাড়ি-ধেনো না খেয়ে তারই একটা পয়সা খরচ করলে হপ্তায় এক দিন তাদের কাপড় ক'খানা ক্ষারে ফুটিয়ে কাচা হয়ে যেতে পারে। প্রত্যহ গোবরমাটী দিয়ে ঘর নিকোতে খুব বেশী গতর লাগে না, আবর্জ্জনা ছড়িয়ে না রেখে একটু দূরে একটা গাড়া ক'রে সেখানে ফেলতে শেখানো খুব বেশী শক্ত নয়; তার পর ধর, ঘা-পাঁচড়া ওদের খুব বেশী হয়; নিমপাতার জল সিদ্ধ ক'রে ঘা ধোয়া, নিম-তেল লাগানো, কেটে গেলে গাঁদাপাতার প্রলেপ দেওয়া, আঁতুড়-ঘরের একটু পরিচ্ছন্নতা, রোজ একবার ক'রে হরি,দুর্গা, কালী, শিব যে নাম যার মনে লাগে, সেই নামের দশবার ক'রে জপ করা, কারু আগ্রহ দেখলে সেই মূর্ত্তির একটি ছবি এনে দেওয়া, আর মদ না খাওয়া, মরা পশুর মাংস না খাওয়া, ময়লা কায ক'রে হাত-পা না ধুয়ে ঘরে না ঢোকা, প্রত্যহ স্নান করা—এই প্রাথমিক শিক্ষাগুলি দিতেই হবে, ওদের অবশ্য এতগুলি শেখানো এম্নি একটি কথায় এক দিনেই হবে না, কিন্তু

সঙ্গে লেগে থেকে তোমরা দুজনে মিলে যদি কর, হয় না ?"

আসমানতারা চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, স্বরূপ আস্তে আস্তে কহিল, "হয় না হয়, অন্ততঃ চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, তোমার প্ল্যানটা মন্দ লাগছিল না।"

অনিমেষ প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল, তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোজা হইয়া বসিয়া উৎসাহস্মিত-মুখে সে বলিতে লাগিল, "তাই দেখুন, পিসেমশাই! তাই আপনি করুন; আপনাদের ভগবান্ যখন এদের মধ্যেই বিশেষ ক'রে টেনে এনে দিয়েছেন, তখন তাঁর এ ইঙ্গিতকে আপনারা ব্যর্থ হ'তে দেবেন না। কায আরম্ভ করুন; দিন এসেছে এদের মানুষ হবার, মানুষ করবার ভার এবার হিন্দুর উপরেই এসে পড়েছে। মুসলমান, খৃষ্টান এদের জন্যে যেটুকু করেছে, হিন্দু তা করেনি; দরকার মনে করেনি, তাই ওরা দলে দলে হিন্দুধর্ম্মের বাইরে চ'লে গিয়ে হিন্দুকে দুর্ব্বল ক'রে দিচ্ছে, হিন্দু ওদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত, তাই ওরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেও সেই নির্লিপ্ততার শোধ তুলছে। যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, হিন্দুই মার বেশী খায়; কারণ, তার গুণ্ডাংশের কতক হয়েছে মুসলমান, কতক আছে নির্লিপ্ত! আজ আর আমাদের নির্লিপ্ত থাকার দিন নেই, ওদেরও থাকতে দিলে চলবে না। কাছে গিয়ে কাছে টেনে নিতে হবে।"

আসমানতারার ফল ছাড়ানো শেষ হইয়াছিল, থালাটা ও একগ্লাস খাবার জল ভাইপোর সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল, "নে, মুখে আগে একটু জল দে, তার পর খাবারটা ক'রে ফেলি, খেয়ে, না, আজ তা' বলে যেতে দিচ্ছিনে, সারা দিন রাত ব'সে ব'সে তখন পিসেকে ভজাস।"

সকলেই হাসিল, অনিমেষ ফলের পালা টানিয়া লইয়া শুভকার্য্যারম্ভ করিয়াই কহিল, "শুধু বুঝি পিসেকে? পিসীও কি বাদ পড়বেন না কি? তোমায় ওদের মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে না? তুমি ছোটদের পড়াবে, মেয়েদের জপ করতে শেখাবে, চরকা কাটতে শেখাবে, সুতো কাটতে শেখাবে, সেলাই করতে শেখাবে,—"

আসমানতারা ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া বাধা দিল, "মা গো! আমি বাপু ওদের ঐ সব নোংরা অনাচারের মধ্যে যেতে প্যারবো না, আমার গা বমি বমি করবে। তোরা কি জাত-জন্ম কারু রাখবি নে? সেই যে শুনেছিলুম,—'কলি শেষে একবর্ণ হইবে যবন', তা এই বুঝি সেই সময় এসেছে?"

অনিমেষ পিসীমার বিরাগে ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিল, আজই ভিক্ষাব্যপদেশে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরিয়া শেষে এক প্রান্তের এই অতি দরিদ্র বস্তিগুলি তার নজরে পড়ে; অনেকখানি মাঠ ভাঙ্গিয়া একটা আধ-মজা খাড়ির ধারে এই তিলপুরায় সে আসিয়া পৌঁছিয়া এখানের অনাচরণীয়দের অবস্থা সে যাহা দেখে, তাহাতে তার প্রাণ তাদের জন্য সহানুভূতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে। তার মনে হয়, আর সব কায ছাড়িয়া দিয়া সে যদি এই একখানি গ্রামেরও অন্ততঃ এতগুলি ঘর অমানুষকে মনুষ্যত্বদানে জন্ম সার্থক করিতে পারিত! কিন্তু কেমন করিয়া তা' হয়? সর্ব্বদা এদের কাছে না আসিলে, কেবল একটি দিন ঘটা করিয়া শুচিবাস পরাইয়া এদের দ্বারা পরিবেষিত পায়সান্ন ভোজন করিলেই এদের উদ্ধারসাধন সম্ভব হইবে না। অথবা মেথরের একটি সুন্দরী কন্যাকে কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি নিকা বা বিবাহ করেন, তাহাতেও মেথরকুল দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা-মুক্ত হইতে পারিবে না। ব্যষ্টি ধরিয়া সংস্কার অনর্থক, সংস্কার করিতে হইলে সমষ্টিগতভাবেই করিতে হইবে। তাদের মধ্যে তাদেরই এক জন হইয়া খাটিতে হইবে, গৃহ-সংস্কার, দেহ-সংস্কার, তার পর চিত্ত-সংস্কার করাইয়া তাদের উচ্চাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা দান করিতে হইবে। সেদিনে নিজেদের নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার দ্বারা অনায়াসেই তারা সকল মানুষের মাঝখানের আসন, দাবী করার পূর্ব্বেই পাইবে! হঠাৎ এই অপুত্রক, অবস্থাপন্ন এবং ভোগসুখে বীতরাগ এই আত্মীয় দম্পতির দর্শন পাইয়া অনিমেষের এই নূতন প্ল্যানটা তার মনকে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরে, তাকে আশা দেয়, তার আগ্রহ হয় ত বিধাতা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক নহেন,—কিন্তু পিসী যদি তার বাধা দেয়?—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"না ছোট পিসী! জাত-জন্মে আমরা ত কারু হাত দেব না, সে যার যা' আছে—ঠিকই থাকবে; এই ধর, তোমরা ময়না পুষে কি তাকে পরিচ্ছন্ন রাখ না? হরেকৃষ্ণ বলতে শেখাও না? এদেরও তাই করবে, তাতে তোমাদের জাত যাবে কেন বল ত? গরু ঘোড়া ছাগলের সেবা করলে জাত যায় না, আর অভাবগ্রস্ত মানুষের সেবা করলেই জাত যায়?"

"তবে যে কেউ কেউ বলে, জাত বিচার ছেড়ে দিয়ে সব এক হয়ে যেতে হবে ?"

"বলে অনেকে অনেক কিছু, সে ত আর হয় না, হবেও না। যতটুকু হয়, নিশ্চিতরূপেই হয়, ততটুকুই আগে ত হোক; পাঁচকোটি অস্পৃশ্যকে আগে স্পর্শ করবার যোগ্যতা দান করো, মানুষ ব'লে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখাও, তারপর জাতিভেদ ওঠা-না-ওঠার কথা ভাবা যাবে তখন। আমাদের হয়েছে সব স্বপ্ন-বিলাস; কায যখন কম হয়, কথা তখন বেশী চলে। কিছু করবার দিন এসেছে, তাই অনেক কিছুই ব'লে ফেলছি। যাক্, ও সব বড় কথায় আমাদের কায নেই, আমরা ছোট মানুষ, ছোট-খাট যতটুকু করতে পারি, ক'রে যাই। কি বলেন, পিসেমশাই ?"

স্বরূপ অনিমেষের সব কথাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল, সংক্ষেপেই বলিল, "আমার ত তোমার মতটি ভালই মনে হচ্ছে।"

১৩

সে রাত্রিও আসমানতারা তার হঠাৎ-পাওয়া ভাইপোকে কিছুতেই ছাড়িল না। কাযের ক্ষতির কথা বলিতেই সে বলিয়া বসিল, "যা তবে, যা তুই, তোর কায কর গে যা; এখানের কায তোর কে করে, দেখে নিচ্ছি! বেটা বড় চালাক, পিসী পিসেকে ড্রেণ সাফ করতে লাগিয়ে দিয়ে উনি চল্লেন টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজারী করতে! সে হবে না, অনি! নিজে থেকে দুদিন কাযকর্ম্ম দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে যাও ত করবো, নৈলে বয়ে গেছে।"

অনিমেষ তার প্রায় সমবয়সী দুচার বছরের মাত্র বড় এই পিসীটিকে ভালভাবেই চিনিত। যেমনি সে ভাল, তেমনি জেদী। তা ছাড়া তার থাকার প্রয়োজনীয়তা সেও বুঝিতে পারিল। এত বড় একটা জটিল অভূতপূর্ব্ব নূতন কায, কর বলা যত সোজা, কাযে করা তত সহজ নয়। এ সব কাযে লীডারের চাইতে কর্ম্মীর অভাব বেশী এবং যথার্থ কৃতিত্ব তাদেরই। বিশেষতঃ বাহিরের লোক আসিয়া যতটুকু করিতে পারে, গাঁয়ের মধ্যে বসিয়া এ সব কায করিতে গেলে বিপদে পড়িতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী। হয় ত যে করিতে যাইবে, তার ধোবা-নাপিতই বন্ধ হইবে, আরও অনেক কিছু হওয়াও অসম্ভব নয়! অনিমেষ রহিল। বৈকালে গরম কচুরি, রাত্রিতে ভুনি-খিচুড়ি বেশ পরিপাটীরূপে রাঁধিয়া বাড়িয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া আসমানতারার মনটা যেন গভীর সুখে ভরিয়া উঠিল। অনিমেষ তার পিসের সঙ্গে এত বড় একটা কাযের কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যেও তার পিসীমাতার রান্নার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতে সে ভুল করিল না, সেইটুকুই আসমানতারাকে পরম প্রীত করিয়া তুলিল। আজ এত দিন পরে তার মনে হইল, এই জন্যেই আপনার লোক বলে! কৈ, এমন ক'রে কি কেউ কোন দিন খেয়ে খুসী হয়েছে? খাইয়েছি ত অনেককেই। বহুদিনের অদেখা ভাইপো নিতান্তই যে আপনার ধন, তাকে এমন অতর্কিত অপ্রত্যাশিত কাছে পাওয়ার আনন্দে আসমানতারা আজ তার সর্ব্বস্ব দানও করিতে পারে, ভাইপোর প্রবল ইচ্ছার আকর্ষণকে নিজের উপর হইতে পরিহার করিবে সে কেমন করিয়া? তার মনে হইল, আমরা যদি ওর কায নিই, সেই উপলক্ষে ওকে ত আমাদের কাছে সদাসর্ব্বদাই আসতে হবে, আমার পক্ষে এ কি কম লাভ? ওর মুখখানি ত তবু মাঝে মাঝে দেখতে পাব। সাতজন্মে কখনও ত বাপের বাড়ী যাওয়াই ঘটে না, বিশেষ এ গাঁয়ে এ পর্য্যন্ত ত একলা রেখে যাবার উপায় নেই ব'লে একটি দিনের তরেও আর কোথাও যাইনি। অনিমেষকে সে তাদের পাশের ঘরে পরিপাটী করিয়া বিছানা পাতিয়া দিয়া রাত্রিতে পিপাসা পাইলে পান করিবার জন্য জল, মোমবাতি, দেশলাই, গায়ের গরম কাপড় সব কিছু জোগাইয়া দিয়া শুইতে বলিয়া নিজে তার বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে, অমনই সুর করিয়া বলিল,—"ভাল কথা, আমাদের যে ওই বিতি-কিচ্ছিরি চাকরীতে ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছিস, তা নিজে তুমি দিনকতক থেকে এর সব বিলি ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে গেলে আমরা কি ও-সব করতে পারবো? তোমার এখন ভিক্ষের ঝুলিটি তা হ'লে ছাড়তে হবে।"

অনিমেষ সুখস্পর্শ শয্যায় আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সুখ সে তাহাতে ঠিক অনুভব করিতে পারিতেছিল না; ভাল খাওয়া ও ভাল শোওয়া তার নিয়ম নয়,

কিন্তু ভাগ্যক্রমে মধ্যে মধ্যে তার তা' গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, নিরুপায়েই তাকে এ-সব গ্রহণ করিতেও হয়। পিসীমাকে সে আগেই বলিয়াছিল যে, তার জন্য বিছানার কোনই প্রয়োজন নাই, দু'খানা কম্বল বা একখানা মাদুর এবং একখানা কম্বল হইলেই যথেষ্ট হইবে, শুনিয়া পিসীমা যে রকম মুখ করিলেন, তার পর আর বেশী কিছু আব্দার করিতে তার ভরসা হইল না; পিসীমাদের কাছে তা'কে যথেষ্ট কায আদায় করিতে হইবে, যার কাছে প্রচুরতররূপে পাইতে চাই, তাকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দিতে ত হইবেই! গোড়ার দিক্ হইতেই মতের সংঘর্ষ হইলে কায পাওয়া হয় ত বা কঠিনতরই হইয়া পড়িবে।

অনিমেষ কহিল, "ভিক্ষের ঝুলি ছাড়লে কখনও হয়, পিসীমা! বরং ঝুলির সংখ্যা আরও গোটা কতক বাড়াতে পারলেই ভাল হয়; ঝুলি ছাড়লে কায হবে কি দিয়ে?"

"ঐ এক আধ মুটো চাল দিয়েই তোমার সব হবে? কে কত চাল দেবে শুনি?"

"যে যতই দিক, তবু দেবে ত কিছু? টাকা পয়সা যে আরও দেবে না, এটা তবু যে যেমন অবস্থার হোক সাতমুঠো থেকে একমুঠো পর্য্যন্ত দিতে পারবে, আর ওই তিল কুড়িয়ে তাল ক'রে যতটুকু সম্ভব কায করবো। তার পর যদি একটু কিছুও দাঁড় করাতে পারি—তখন ভগবানের দয়া হবে, দাতার দেখা পেয়েই যাবো।"

আসমানতারা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিল, তার মনে পড়িল, তার এই ভাইপোটি তার আশৈশব হইতেই আশাবাদী। এককালে তাদের অবস্থা খুব ভালই ছিল, প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ী—ইদানীং সংস্কার অভাবে নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে, কেহ তা' লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে শিশু অনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "দাঁড়াও না, আমি আগে বড় হই, চাকরী করি, আবার সমস্ত বাড়ী মেরামত করবো, ঠাকুর-দালানে ঠাকুরপূজো হবে, কত লোক খাবে, ভোঁপোঁ ভোঁপোঁ ক'রে বাজনা বাজবে।" এখন তার দুর্গাপূজার রীতি বোধ হয়, এই রকমেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! নিজের উপর আর সে পূজার বাজনা বাজাইবার ভরসা নাই, এখনও তবু আশা আছে, দাতার দেখা পাওয়ার!

ভাবিতে গিয়া তার ঠোঁটের কোলে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল, প্রদীপের আলো আসিয়া তা'র মুখে পড়িয়াছিল, অনিমেষের চোখ সেই হাসির উপর পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া ঈষদুত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল,—"হেসো না, পিসীমা! তুমি হেসো না। তোমার কি বিশ্বাস, ভিক্ষার ধনে কোন কায হয় না? হয় বৈ কি, নিজে না খেয়ে ফেল্লেই হয়, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ভাল কায হয়েছে, সবই ত ভিক্ষার ধনে। অবশ্য কোথাও মুষ্টিভিক্ষা, কোথাও ধামা-ভরা ব্যাঙ্ক নোট; তার তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু ধন সে ভিক্ষারই। এই যে পল্লীসংস্কার আর অস্পৃশ্য হয়ে যারা ঠেলা রয়েছে, তাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলে তাদের মানুষের অধিকার দান করা, এর জন্যে সহর থেকে টাকা কুড়িয়ে এনে কায করতে গেলে কোন দিনই কায হবে না, এর কায ত বড় সোজা নয়, সামান্যও নয়, ব্যাপকভাবে এর কায চালাতে হবে এই সব পল্লীগ্রামে বসেই এবং এদেরই মধ্যে থেকে সামান্য কিছু ক'রে উঠিয়ে। টাকার চাইতে এ সব কাযে প্রাণের প্রয়োজন বেশী, যারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ ক'রে দিতে পারবে, একেবারে ওদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে মিশে যাবে।"

সভয়ে আসমানতারা বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কি রে! আমাদের কি ওদের হাতে খেতে হবে না কি? না বাপু, তা কিন্তু পেরে উঠবো না, কায়স্থ-বৈদ্যের হাতেই খাই না, তাঁরা ত ব্রাহ্মণের মতই উঁচু জাত, আর ওদের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান নেই, ওদের হাতেই বা খেতে গেলুম কেন? তোদের কি সকলই বাড়াবাড়ি! হয় ওদের ছোঁব না, আর না হয় ত রাঁধিয়ে খাবো!"

অনিমেষ হাসিল, "না পিসীমা! আমি কারু মতের বিরুদ্ধে হাতে খাওয়ার পক্ষপাতী নই। আর তোমরা ওদের হাতে খেলেই ওরা উদ্ধার হয়ে যাবে না। সে রকম রাঁধিয়ে শুচিবস্ত্র পরিয়ে হাতে খাওয়া ত আধুনিক অনেক নব্য-তান্ত্রিক বাড়ীতে বা হোটেলে করেই থাকে, তার জন্যে আর ওদের কোটি কোটির কি উন্নতিটা হলো? জাতিভেদ নষ্ট করার সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূর করার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের ক'রে তুলতে হবে ওদের পঞ্চম থেকে চতুর্থ; আগে আচার-ব্যবহার শুদ্ধি শিক্ষা করুক, সৎশূদ্র হয়ে দাঁড়াক, তার পর জল খাওয়া চলবে, ভাত খাবার কথায় কায কি, সেটা আগে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেই চলুক।"

"ওরে আমার গোপাল রে! বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হ, আমার ত ভয় ধ'রে গেছলো,—কি জানি, আমাদের দেশের সংস্কারগুলি এই রকমই অদ্ভুত কি না। 'হেলে ধরে না এরা কেউটে ধরতে যায়।' সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই হাতের ভাত চলে না, মেথরের হাতে ভাতের ব্যবস্থা হলো। সকল ব্রাহ্মণে বিয়ে অচল, অসবর্ণ বিয়ে—হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে চালাবার জন্যে প্রস্তাব ওঠে, দু'পাঁচ সাতটা হাতও ওঠে। যারা কর্ম্মের স্খলনে পতিত হয়ে আছে, তাদের সেই কর্ম্মসংস্কার ক'রে তুলতে হবে, উঁচু করতে হবে, তার পর প্রাকৃতিক নিয়মে তারা বড় হলেই উঁচু যায়গা পাবে, এ ত সঙ্গত কথাই! তবে উঠে দাঁড়াবার জন্যে তাদের কাছে গিয়ে হাত ধ'রে তোলা আর পথ বাৎলে দেওয়া—এগুলি প্রাণের সঙ্গে করা চাই বৈ কি! চৈতন্যদেবও ত আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু জাতিভেদ তুলে দেন্ নি ত?"

অনিমেষ পিসীর কথায় তার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া পরমোৎসাহে কহিল, "জাতিভেদ তোলা কি পিসীমা চারটিখানি কথা? তাছাড়া কথা হচ্ছে কি, সংস্কার করা দরকার নীচুকে উঁচু করবার জন্যেই, উঁচুরা এখনও যতটুকু উঁচু আছে, তাদের তার থেকে আরও নীচু করার এই যে প্রাণপণ চেষ্টা চলছে, এটা নিছক অপদার্থতার —চিন্তাহীনতার লক্ষণ, দূরদৃষ্টির অভাব। বরঞ্চ উঁচুদের সেই উঁচুতে রাখবার জন্যই চেষ্টা করার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল। অথচ সমাজ যখন সেই চেষ্টা করছিল, তখন সমাজকে 'ওরে দুষ্ট দেশাচার' ব'লে যথেষ্ট গালিগালাজ আমরাই করেছি, আজ ত সে মরতে বসেছে! যাক্, তোমার সে ভয় নেই, আমি সে কালাপাহাড়ী দলের নই; আমি চাই, ওই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অর্দ্ধপশু কোটি কোটি লোক পরিচ্ছন্নতা, নীতি-ধর্ম্ম শিক্ষা পায়, মানুষের মত বাঁচতে পারে, মানুষের অধিকার দাবী করবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে নিতে সমর্থ হয়। ওদের জন্য খাটলুম না, কিছুই না, সস্তায় একদিন ঘটা ক'রে নাম কিনে নিয়ে তর্ক ক'রে বেড়ালুম যে, সকলকার সমাজে সমান অধিকার থাকা উচিত! তার পর আমি চড়ে বেড়ালুম, মোটরকার আর সে পিষে মরলো তার চাকার তলায়; আমি খেলুম চপ কাটলেট, সে ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করলে; এমন সাম্যবাদ আমার মত সাম্রাজ্যদের জন্যে নয়!"

আসমানতারা কহিল, "তা হ'লে আমি তোর দিকে, আমায় দিয়ে যা' করাবি, করতে রাজী আছি। নিজের দেশের লোকের উন্নতি হয়—সেটা কে না চায়? তবে অদ্ভুত রকম ব্যবস্থা শুনলে আর এগুতে হাত-পা আসে না, মনে হয়, ও আকাশকুসুমেরই সামিল।"

তাহাই হইল, অনিমেষের কল্পনা এত দিন যাদের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল, এই যেন সেই তার কল্পনায় গড়া আদর্শ দম্পতি। অথচ এরা তারই অত্যন্ত নিকটতম আত্মীয়, একেই বলে, কাণে কলম গুঁজিয়া খুঁজিয়া মরা। স্বরূপপ্রকাশ আর আসমানতারা অনিমেষের মন্ত্রে নিজেদের দীক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রস্তুত হইল। কথা রহিল, অনিমেষ প্রথম মাসখানেক তাদের কাছেই থাকিবে, কেবল প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সে তার অন্য গ্রামের কাযে বাহিরে যাইবে মাত্র। তারপর কার্য্যের গতি বুঝিয়া ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

বাহির হইতে মনে হয়, এ এমন কি বড় কথা, এ কায ত অতি সহজেই করা যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আসিয়া এই ঘোষাল-দম্পতি দেখিল যে, যেটাকে তারা তাদের পক্ষে অতি সহজ বোধ করিয়াছিল, সে জিনিষটা তেমন বেশী সহজ ত নয়ই; অপরন্তু বেশ একটু কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার! তাদের প্রাথমিক কার্য্য হইল, এই গ্রামের সমুদয় অস্পৃশ্যের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া। তাদের বুঝাইয়া দেওয়া যে, তোমাদের জন্য আমরা এই কাযগুলি করিতে চাই; কি উদ্দেশ্যে এ সব করিতে চাওয়া হইতেছে অর্থাৎ ভদ্রলোকদের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যাহাতে তাহারা ভদ্রয়ানা শিখিয়া ভদ্রলোক হইতে পারে, তারই জন্য যে এই চেষ্টা করা হইতেছে, অপর কোন উদ্দেশ্য নাই; এইটুকু বুঝানর জন্যই প্রথম দু' এক দিন বিশেষ যত্ন লইতে হইল। তার পর তাদের অত্যন্ত ময়লা দুর্গন্ধ কাপড়-চোপড়গুলি ক্ষার দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাচিতে শেখানো, প্রতি হপ্তায় একবার করিয়া কাচান, প্রত্যহ স্নান করা, ছেলেদের কাটা, পোড়া, ছড়া এবং নানাবিধ সাধ্য অসাধ্য ক্ষত প্রভৃতি নিমপাতা-সিদ্ধ-জলে ধুইতে শেখান, গোবর-মাটী দিয়া ঘর লেপা, আর হরিনাম, দুর্গানাম, রামনাম জপ করিতে শেখা, তাড়ি মদ খাওয়া, পচা মাংস খাওয়া, সর্ব্বদা কুৎসিত গালিবর্ষণ না

করা—এইগুলি শিক্ষা দিতে গিয়াই ইহারা তিন জনে দেখিল, কায খুব বেশীই কঠিন। ঘর বলিতে মনে হয়, যেন এক একটি পশুর খোঁয়াড়, নিত্যকার ময়লা আবর্জ্জনা ঘরের সামনেই ছড়ানো, নোংরা জল পড়িয়া পাঁক হইয়া আছে, সে সব বরং শোধরানো যায়। নিজের হাতে কোদাল দিয়া মাটী কোপাইয়া সমস্ত সাফ করিয়া অনিমেষ তাদের দেখাইয়া দিল যে, বাড়ীর অদূরে একটা গর্ত্ত কাটিয়া যদি তারা তাতেই আবর্জ্জনা ফেলে, ঐ জলাসেঁতা জমীগুলার উপর কিছুদিন উনানের ছাই ঢালিয়া যায়গাটাকে একটু উঁচু করিয়া নেয়, অনেক সুবিধা হয়; তারাও সেটা সহজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু গোল বাধে স্নান করিয়া কাপড় বদলানো আর কাপড় সঙ্গে রাখা লইয়া। এই সব শ্রেণীর লোকরা অত্যন্তই গরীব, একখানার বেশী দুখানা কাপড় এদের প্রায়ই থাকে না, প্রত্যহ কাপড় কাচিতে গেলে অন্ততঃ দুখানা কাপড়ের প্রয়োজন, ছেলে-মেয়েগুলা যত দিন পারে উলঙ্গ অবস্থাতেই থাকে, নেহাৎ যখন না হইলে নয়, তখন মা-বাপদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া ট্যানা পরে। এই টুকরা কাপড়কে বলে ফ্যাড়ানি (ফাড়া কাপড় হইতেই বোধ করি এই নামকরণ হইয়াছে!) সেগুলি আবার আরও নোংরা, আরও অপরিচ্ছন্ন; কিন্তু উপায় কি? এদের আর্থিক অবস্থা এতই মন্দ যে, মানুষের মত থাকার তাহা সম্পূর্ণরূপেই পরিপন্থী। তার উপর নেশা করারও বিলক্ষণ অভ্যাস আছে! যাও বা দুচার পয়সা পাইল, এক ভাঁড় ধেনো মদ বা তাড়ি খাইয়া খুব হাল্লা করিয়া ফুর্ত্তি জমাইল। ফলে হয় ত পরিবার-বর্গের সঙ্গে বিষম কলহ, উভয় পক্ষ হইতে কুৎসিত গালির স্রোত বহিয়া গেল, সময় সময় দৈহিক বলেরও পরীক্ষা হইতে বাধিল না, অবশ্য এ বীর্য্য-পরীক্ষায় সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষপাতিতায় অপরাধীরই জয় হওয়া অনিবার্য্য! তখন আবার আর এক চোট গালি-সংযুক্ত ক্রন্দনের তীব্র ভাষায় সারা বস্তি মুখরিত হইয়া উঠে এবং শ্রোতৃবর্গকে পরম সন্তোষ এবং উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে।

এ দেশের বাগ্দীদের অবস্থা এ রকম নয়; তারা যথেষ্ট সভ্য জাতি। আচার-ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণেই মার্জ্জিত; অনিমেষ ও স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল, এই দুলে-কাওরাদের সঙ্গে এ দেশের বাগ্দী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি কেন এক শ্রেণীভুক্ত হয়! আচার-ব্যবহার শুদ্ধ যাহাদের, তাহারা কেন জলচল না হইয়া অনাচারীদের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত থাকিয়া যায়? এদের কাছে পুরুষদের কায তেমন বেশী নয়, আসমানতারা এদের মেয়েদের অবসরকালে সুতাকাটা, কাঁথা সেলাই, একটু একটু লেখাপড়া শেখানো এবং যথাজ্ঞান নীতিধর্ম্মের উপদেশ, দেশের অবস্থার কথা, ভূগোল ইতিহাসের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গল্প করিয়া করিয়া শেখানো প্রথমাবধিই আরম্ভ করিয়া দিল। আর সব চেয়ে বেশী করিয়াই শিখাইতে লাগিল মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের ও ছেলেদের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সে পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাদের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় গল্প করিত, সদালাপ হইতে অজস্র বড় বড় উদাহরণ জোগাড় করিয়া সকল দেশেরই ভাল লোকদের কথা তাদের জানাইত। সে দেখিত, এ সব শোনার আগ্রহ তাদের মধ্যে কোন ভদ্রসন্তানদের অপেক্ষা একটুও কম নয়।

দুলে, কাওরা, হাড়ি ও মেথরদের মধ্যে মেথররাই সমধিক সভ্য এবং তাদের অবস্থাও কতকটা ভাল। তারা কাপড়-চোপড় মন্দ পরে না, ফরসা কাপড়ও পরে, কিন্তু এ গাঁয়ে মেথর বিশেষ নাই, এক ঘর মাত্র আছে, সে তার নূতন পাঠশালায় তাদের ভর্ত্তি করিয়া লইতে গিয়া দেখিল যে, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যে শুধু ব্রাহ্মণদের অব্রাহ্মণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে, তা মোটেই নয়, এই অস্পৃশ্যতা অতি নিম্নস্তরেও অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। মেথরের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বাগ্দীদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে বসিয়া পড়িতে চায় না, আবার মুচীদের ছোঁয়া জল মেথরে খায় না, বলে, "আমি মেথর আছি, মেথরই আছি, মুচি ত নই, ওরা মরা জন্তুর চামড়া নিয়ে কায করে, আমরা যা করি,সে ত সকল জাতের মায়েও ক'রে থাকে, আমরা ওদের সঙ্গে সমান কিসে?"

অনিমেষকে আসমানতারা বুঝাইল, অস্পৃশ্যতা দূর করা পর্য্যন্ত আমাদের কাযের সীমানা থাক, জল-চল করার কায থাক ভবিষ্যতের হাতে।

শনৈঃ পন্থা ভাবিয়া অনিমেষও তাহাতে আর আপত্তি করিল না। তারা দু'জনে পরমোৎসাহে বস্তির নোংরা এবং নোংরামী-সংস্কারেই নিযুক্ত হইয়া রহিল। অনিমেষ মধ্যে মধ্যে চলিয়া যায়; ক্রমশঃ তার যাওয়া বেশী এবং আসা ও থাকা কম হইয়া আসিতে লাগিল, স্বরূপ এখন

একাই অনেকটা কায চালাইতে পারে, হোমিওপ্যাথিক বই ও বাক্স আর তার সঙ্গে কিছু টিঞ্চার, তুলো এবং কুইনিন আনাইয়া লইয়া সে এই শরৎ হেমন্তের ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে আর তার অনুসঙ্গী ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিকে মহোৎসাহে ঠেকাইবার কার্য্যে মনোযোগী হইয়া পড়িল।

এ দিকে গোল বাধিয়াছিল—চক্রবর্ত্তি-পরিবারে। আসমানতারা যখন লজ্জা-সরমের এবং ঘৃণা-পিত্তের মাথা খাইয়া তার একটা ভবঘুরে ভাইপোর পাল্লায় পড়িয়া যত সব ছোট লোকের দল লইয়া মাখামাখি আরম্ভ করিয়া দিল, এ বাড়ীতে তখন হইতে নিষ্ফল আক্রোশের অগ্নিশিখা তার বিরুদ্ধে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ভাল কথায় তাহাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা নেহাৎ কমও হয় নাই, তার পর যথোচিত ভাবে ভয় দেখানও চলিয়াছিল, তাহাতেও যখন দৃঢ়সঙ্কল্প দম্পতির মতিচ্ছন্নতা দূর হইল না, তখন রুদ্ধ রোষে চক্রবর্ত্তি-পরিবার ওবাড়ীর সঙ্গে বয়কটের প্রাচীর তুলিয়া দিল। আসমানতারা চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তারা ত অস্পৃশ্যদের হাতে খায় না,তবে মানুষকে মানুষ করার চেষ্টায় জাতি-পাতের কি আছে? মুসলমান ও ইংরাজকে ছুঁইলে, পড়াইলে, কথা বলিলে, যদি না জাত যায় ত এদের জন্য কায করিলে জাত যাইবে কেন? এরা অপরিচ্ছন্ন, সেই জন্য না হয় এদের ছোঁয়া-ছুঁয়ির পর কাপড় ছাড়িয়া ফেলিয়া শুচি হইলেই হইল, যেমন সংক্রামক রোগী ছুঁইলেও করিতে হয়,—জাত কেন যায়? মেয়েও দিতেছি না, ভাতও খাইতেছি না। কিন্তু এ আবেদনে যুক্তি যতখানিই থাক, চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর মন তাহাতে নরম হইতে পারে, কর্ত্তার হইল না। কঠিন কণ্ঠে কহিয়া দিলেন, "ও সব কথার ফাঁদে ভোলাতে কেউ এ শর্ম্মাকে পারছে না, আমার বাড়ীতে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ, এই কথা ভাল ক'রে জানিয়ে দেবে, এর আর নড়চড় হবে না।"

আসল কথা, যে আশায় এ-বাড়ীরা ও-বাড়ীর গুণের বালাই লইয়া মরিতেও প্রস্তুত ছিল, এই ঘটনায় সেই আশা-লতার মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়াছিল কি না, স্বরূপপ্রকাশ ঐ ছুলে-মালাদের উপর যে রকম খরচপত্র আরম্ভ করিয়াছে, অবৈতনিক পাঠশালা, দাতব্য ঔষধালয় ইত্যাদি সে না কি বরাবরের জন্যই করিয়া দিবে শুনা যাইতেছে, এ অবস্থায় অনর্থক ওদের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া লাভ? অনর্থক এই অনাচারীদের স্পর্শ ঘটিতে দেওয়া কেন? চক্রবর্ত্তীর যুক্তিটা অনেকটাই ঐ ধরণের ছিল, নতুবা প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম কোন দিনই পতিতকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিবার যুক্তি দেখান নাই, হিন্দুর দেবতার নাম পতিতপাবন। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা এক বস্তু কখনই নয়। মাত্রা-জ্ঞান ঠিক রাখিয়া অস্পৃশ্যতা দূর করা অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের স্পর্শযোগ্যতা দান করার কাল, মহাকালের নিকট হইতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছিয়াছে তার জন্য প্রত্যেককে প্রাণপণে খাটিতে হইবে। সময়, শক্তি এবং অর্থব্যয় যথোচিতভাবেই করিতে হইবে, কেবল এক দিন ঘটা করিয়া হাতে খাইয়া অথবা দেবমন্দিরে জবরদস্তিতে তাদের ঢুকাইয়া দিয়াই তাদের প্রতি প্রত্যেকের কঠিন কর্ত্তব্যপাশ হইতে বিমুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না। অনিমেষের সঙ্গে তাদের এই কথাই হইতেছিল। স্বরূপ বলিল, "অনেক কথা জানিনে, আমার কায আমি নিশ্চয়ই ক'রে যাবো।"

কর্ম্মের প্রেরণায় দিন হুহু করিয়াই কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আসমানতারার মনের মধ্যে সুখের লেশও রহিল না। সে করে সবই, কিন্তু স্বস্তি পায় না। সে যে তার দেওর-ঝিদের ছাড়িয়া আসিয়াই সেই উন্মত্ত স্নেহ দিয়া এদের বুকে টানিয়া লইয়াছিল! এ অভাব সে যেন এত কাযের মধ্যেও ভুলিতে পারে না।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।



কচি ছেলে—তার পর কি ?

কয়েক মাস পূর্ব্বে জার্ম্মাণ ভাষায় একখানি নভেল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্লাইনের মান—হ্বাস মুন ? অর্থাৎ ছোট মানুষ—এখন কি ? ইহার রচয়িতার নাম হান্স্ ফাল্লাডা। ইনি পূর্ব্বে সাদা কলারের কারখানায় কায করিতেন। তিনি সেই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সাধারণ দরিদ্র লোকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেগুলিকে সুচিত্রিত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অন্ধ, কেহ বা খোঁড়া, আর কেহ বা মৃতবৎসা মরুঞ্চে পোয়াতির মরা ছেলে। কিন্তু তাহাদের সবগুলিরই একটি বিশেষত্ব তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিশুগুলি যেন এক একটি বেঙাচি, তাহাদের আশা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, সম্ভাবনা, দারিদ্র্য ইত্যাদির লেজটুকু নাড়িয়া ক্ষণিকের জন্য খেলা করে—যে পর্য্যন্ত না সংসার-সমুদ্রের কোনও রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সংহার করে। তাহাদের পিতা-মাতারা যে দুর্যোগ ও দুর্ব্বিপাকের সময়ে জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে তাহাদের সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দিবার মতন তাহাদের অবসর ও সুবিধা নাই বলিলেই হয়।

এই বইয়ের নায়ক পিন্নেবের্গ একেবারে সমাজের অন্ত্যজ নহে, সে এক জন কেরাণী, সাধারণ কেরাণীর উপযুক্ত লেখাপড়াও জানে, তাহার হাতের লেখা পড়া যায়, এবং তাহার চেহারাও নেহাৎ মন্দ নহে। সে কর্ম্মিষ্ঠ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, বয়সে যুবা, সে পরিণামের ভাবনা ভাবে না, তাহার আশা অসীম, এবং অল্পেই বিরক্ত ও বিহ্বল হয়। তাহার একটি স্ত্রী আছে, একটি ছেলেও হইয়াছে।

তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য সে যে কাযে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাতে তাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সেই সঙ্গে যেন ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছে। লোকের অভাব-পূরণের জন্য বড় বড় কারখানা সৃষ্টি হইয়াছে এবং লোকের অভাব মোচন করিয়া সেই সব কারখানা বেশ চলিতেছে বটে, কিন্তু সেই কারখানা চলিতেছে কত মানবাত্মা-গলানো তৈল নিষেক করিয়া, কত লোকের দীর্ঘনিশ্বাসের হাপর চালাইয়া, কত অশ্রুপাতে শীতল করিয়া, কত প্রাণের বিলাপে বেদনায় প্রতপ্ত করিয়া।

যুবা চটপটে খর্ব্ব পিন্নেবের্গ তাহার স্ত্রী লেম্খেন্‌কে ভালবাসার ঝোঁকে এক অসাবধান মুহূর্ত্তে সন্তানের জননী করিয়া দিয়াছে। তাহারা তিন জনেই পরস্পরকে ভালবাসে এবং তাহাদের যতটুকু শক্তি, তাহা প্রয়োগ করিয়া কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাদের জীবনযাত্রার পথে অনর্থ অর্থের ফাঁদ ত পাতাই আছে।

কিছু দিন পরে তাহাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল, পিন্নেবের্গ রক্ত বমন করিতে লাগিল, এবং তাহার স্বপ্নে সে কেবলই ভয় পাইতে লাগিল—যেন কে তাহাকে একটা ফাঁদে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। ক্রমে তাহার চাকরী গেল, সে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, সে এখন নাজির দলেই ভর্ত্তি হইবে অথবা কম্যুনিষ্টের দলভুক্তই হইবে।

ফাল্লাডা তাঁহার পুস্তকে যতগুলি চরিত্র অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বেশ জীবন্ত সত্যকার লোক

হইয়াছে, তাহাদের যেন আকার আছে, তাহারা প্রকৃত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক-একটি বিশিষ্টতা আছে। এই নভেলের মধ্যে এই বিষয়টিই ভাল করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, বিশিষ্ট গুণশালী এবং আত্মিকশক্তিসম্পন্ন লোকরাও কেমন করিয়া আধুনিক সমাজের জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়, এবং যেন লোকগুলা সমাজ-রাক্ষসের খাদ্যরূপে পরিণত হইবার জন্য জাঁতা-কলে পড়িয়া পিষিয়া কিমা হইয়া যাইতেছে। যেহেতু এই পুস্তকের লোকগুলা সত্যকার জীবন্ত মানুষ হইয়াছে, সেই জন্য তাহাদের দুঃখ-দুর্ভাগ্য অধিক মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। তাহারা দুর্ভাগ্যের কাস্তের এক এক পোচে কাটা পড়িতেছে দেখিয়া বাস্তবিক ক্লেশ হয়। দুর্ভাগাদের হৃদয়ও ধক্‌ধক্ করে, কিন্তু তাহার উপর যে দুর্ভাগ্যের হাতুড়ির ঘা পড়ে, তাহাতে সেই হৃদয়ের স্পন্দনের ছন্দ যতি-ভঙ্গ হইয়া যায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। মানুষ ত নানা ছাঁচে গড়া, কিন্তু সংসারের জগদ্দল পাথরের চাপে সকলে পিষিয়া একসা হইয়া যায়।

লেখক ফাল্লাডা চরিত্র-অঙ্কনে যেমন দক্ষ, বাক্যালাপ-রচনায় তেমনই পটু। কথোপকথনের ভাষা ও ভঙ্গী যেমন সরল সহজ, তেমনই স্বাভাবিক, যেন সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মুখ থেকেই কথিত হইতেছে মনে হয়। কিন্তু যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন। বাক্য কখনও পাত্র-পাত্রীর বুদ্ধি, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া অস্বাভাবিক হইয়া যায় নাই, এবং প্রত্যেক চরিত্র যদিও একটি একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তথাপি তাহারা অতি আশ্চর্য্য রকমে প্রকৃত জীবন্ত মানুষে পরিণত হইয়াছে। চরিত্রগুলির মুখে যে কথাবার্ত্তা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি স্বাভাবিক বলিয়া তাহা যেন লোকগুলির শিরায় ধমনীতে সত্যকার রক্তসঞ্চার করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাদের আকৃতিতে জীবনের রং ও প্রকৃতিতে বিশেষত্ব আনয়ন করিয়াছে।

এই পুস্তকে পাঠক হঠাৎ দেখিবেন যে, অনেক নর-নারী মহাপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। তাহারা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া মরিতেছে, তাহারা নিজের নিজের অস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া মরিতেছে, কিন্তু সকলকে চোরা-বালি নির্ব্বিচারে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, সেখানে প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান। এই সুন্দর উপন্যাসখানির একটি পরিচ্ছেদের পরিচয় আমরা নিম্নে দিতেছি।

ছেলের অসুখ

এক রাত্রিতে পিন্নেবের্গ-দম্পতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এমন বাঁশীর সুর শোনা ত তাহাদের অভ্যাস ছিল না। তাহাদের খোকা মুর্কেল জাগিয়া উঠিয়া কান্না ধরিয়াছে।

লেম্‌খেন্ ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—'মুর্কেল কাঁদ্‌ছে।' স্বামীকে এ কথা বলিয়া জানানোর কোনও দরকার যদিও ছিল না।

পিন্নেবের্গ্ ধীর-স্বরে বলিল—"হঁ্যা।" তাহার পরে সে এলার্ম্ দেওয়া ঘড়ীটার উজ্জ্বল ডালাটার দিকে চাহিয়া বলিল—"তিনটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।"

তাহারা উভয়ে চুপ করিয়া খোকার কান্না শুনিতে লাগিল। লেম্‌খেন্ আবার ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"ও ত এর আগে এমন কখনো করে নি। তার ক্ষিদে পাবারও ত কথা নয়।"

পিন্নেবের্গ বলিল—"ও এখনই থেমে যাবে, দেখো। আমরা আবার এখনই ঘুমাতে পারব।"

কিন্তু ঘুমানো অসম্ভব।

একটু পরে লেম্‌খেন্ বলিল—"আলোটা জ্বাল্‌লে হয় না? ও যে বড্ড ককিয়ে কাঁদ্‌ছে!"

কিন্তু মুর্কেলের সম্বন্ধে পিন্নেবের্গ্ বড় কড়া মানুষ। সে বলিল—"না না, কিছুতেই না। বুঝলে? কিছুতেই না। আমরা ত নানা ধান্ধায় হায়রান হয়ে উঠেছি। আবার রাত্রিতে ওর কান্নাকাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারা যায় না। আমরা যদি ওকে সাড়া-শব্দ না দিই, তা হ'লে ও মনে করবে যে, অন্ধকার হ'লেই ঘুমোতে হয়।"

লেম্‌খেন্ বলিতে আরম্ভ করিল—"হ্যাঁ, তা—কিন্তু—"

পিন্নেবের্গ কথায় জোর দিয়া বলিল—"না না, কিছুতেই না। যদি আমরা একবার ঢিল দিতে আরম্ভ করি, তা হ'লে রোজ রাত্রিতেই আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হবে। সেই প্রথম রাত্রির কথা তোমার মনে নেই? সে দিন ত আরও বেশি অনেকক্ষণ ধ'রে কেঁদেছিল, শেষে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

"কিন্তু এখন ও এমন অন্য রকম ক'রে কাঁদ্‌ছে! এ কান্না যেন কষ্টের কান্না। ওর যেন কিছু কষ্ট হচ্ছে।"

"এ আমাদের বরদাস্ত করতে হবে। লেম্‌খেন্‌, অবুঝ হয়ো না।"

তাহারা উভয়ে অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া ছেলের কান্না শুনিতে লাগিল। সে ক্রমাগত কাঁদিয়াই চলিয়াছিল। ঘুম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সে নিশ্চয় থামিবে, তাহার থামিয়া যাওয়া উচিত অন্ততঃ। কিন্তু সে ত থামিল না। পিন্নেবের্গের মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল যে—ছেলেটা আগের চেয়ে আরও কাতর-স্বরে কাঁদিতেছে কি? ইহা ত স্বাভাবিক কান্নার শব্দ নয়, সে ত ক্ষুধা লাগিলে বা ক্রুদ্ধ হইলে এমন করিয়া কাঁদে না কখনও। নিশ্চয় তাহার কোনও কষ্ট হইতেছে।

লেম্‌খেন্‌ ধীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বোধ হয়, ওর কিছু কষ্ট হচ্ছে।"

পিন্নেবের্গ পাল্টা প্রশ্ন করিল—"কষ্ট হবে কেন? আর হয়ই যদি, তা আমরা কি করতে পারি? কিছুই না।"

"আমি ওকে একটু চা ক'রে দিতে পারি। চা খেতে পেলেই ওর কান্না থেমে যায় দেখেছি।"

পিন্নেবের্গ কোনও উত্তর দিল না। হ্যাঃ, ছেলে মানুষ করা অমনি সোজা কি না। মুর্কেলকে মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ নষ্ট করিতে দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। তাহার শিক্ষা-তরিবতে কোনও রকমের ভুলচুক করা হইবে না। উহাকে মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। পিন্নেবের্গের মনটা কিন্তু চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিল। "আচ্ছা, ওঠো, ওকে একটু চা ক'রেই দাও।"

এবং লেম্‌খেনের চেয়ে ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল এবং আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

আলোকের উজ্জ্বলতা দেখিয়া খোকা মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিল, আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

লেম্‌খেন্‌ খোকার দোলনার উপর ঝুঁকিয়া সেই ছোট্ট পুঁটুলিটাকে কোলে তুলিয়া লইতে লইতে বলিল—"আহা বাছা রে মুর্কেল আমার! মুর্কেলখেন—কচি মুর্কেল—কষ্ট হচ্ছে? কোথায় ব্যথা করছে বাবা, মাকে দেখিয়ে দাও ত?"

মায়ের কোলের উত্তাপ পাইয়া এবং নাড়া পাইয়া মুর্কেল চুপ করিল। তাহার গলা একবার ঘড়্‌ঘড় করিয়া উঠিল।

মুর্কেলকে আবার তাহার দোলনায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

পিন্নেবের্গ আবার ঘড়ীর দিকে দেখিল। "ঠিক চারটে বাজল। আর একটু ঘুমিয়ে নিতে হ'লে এখনই শুয়ে পড়তে হয়।"

আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল। পিন্নেবের্গ-দম্পতি আবার ঘুমাইয়া পড়িল। আবার তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। মুর্কেল কাঁদিতেছে। চারিটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইয়াছে।

পিন্নেবের্গ বিরক্ত হইয়া বলিল—"ঐ নাও! দেখ্‌লে? আমাদের ওঠা একদম উচিত হয় নি। ও এখন মনে করছে যে, এই রকম হর্‌দম করতে থাক্‌বে। সে একটু কাঁদলেই হলো, আর আমরা অমনি উঠে তার কাছে যাব।"

লেম্‌খেন্‌ নামের মানে ছোট ভেড়া; লেম্‌খেন্‌ নামে ও স্বভাবে সমানই ছিল; আর সে বুঝিত যে, যে লোক সারা দিন দোকানে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়া হায়রান হইয়া বাড়ীতে আসে, তাহার মেজাজ একটু রুক্ষ আর খিটখিটে হইবারই কথা। সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। আর মুর্কেল কাঁদিতেই লাগিল।

পিন্নেবের্গ একটু ব্যঙ্গভরা স্বরে বলিতে লাগিল—"প্রেয়সি, ব্যাপারটা হ'তে চল্‌ল কি? কাল সকালে যে আমি দোকানে কেমন ক'রে তাজা হয়ে যেতে পারব, তা ত জানি না।" বলিতে বলিতে সে রাগিয়া গেল—আমি আবার এত পিছিয়ে প'ড়ে আছি! ঐ কান্নার নেই কিছু করেছে!

লেম্‌খেন্‌ চুপ করিয়া শুইয়াই রহিল আর মুর্কেল কাঁদিয়া চলিল। পিন্নেবের্গ এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সে শুনিতে লাগিল। আবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, খোকার কান্নাটা বাস্তবিকই ব্যথার কান্না। তাহার মনে হইল যে, এখনই যে সব কথা সে বলিল, তাহা নিতান্ত বোকার কথা, এবং লেম্‌খেন্‌ও তাহার বোকামি টের পাইয়াছে; সে নিজের বোকামির জন্য নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল। এখন তাহার স্ত্রীর কিছু ভাল মিষ্ট কথা বলার সময়। ইহা লেম্‌খেন্‌ও বুঝিতেছিল, সে বুঝিতেছিল যে, রাগ প্রকাশ করার পরে তাহার স্বামী

নিজে কোনও কথা আরম্ভ করিতে পারিবে না। তাই সেই কথা বলিল—"আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় নি যে, ওর গাটা গরম হয়েছে ?"

পিন্নেবের্গ বিড়বিড় করিয়া বলিল—"আমি ত কৈ লক্ষ্য করি নি।"

"কিন্তু কি রকম লাল হয়ে গেছে।"

"কেঁদে কেঁদে বোধ হয়।"

"না, গায়ে ত লাল লাল কি সব বেরিয়েছে বোধ হলো। আচ্ছা ধর, যদি ওর সত্যিই অসুখ ক'রে থাকে ?"

"ওর কি অসুখ হ'তে পারে ?" কিন্তু এই সম্ভাবনা ত নূতন, কাযেই সে গোঁ-গোঁ করিতে করিতে বলিল, "তবে আলো জ্বালো। তুমি ত কিছুতেই তুষ্ট হবে না !"

আলো জ্বলিল। মুর্কেল আবার মায়ের কোলে উঠিল। সে চুপ করিল।

পিন্নেবের্গ বিরক্ত হইয়া বলিল, "নাও, দেখ, যে মুহূর্ত্তে তুমি ওকে কোলে তুলে নিচ্ছ, অমনি সে চুপ করছে। এ কেমন অসুখ ? ওর অসুখ-ফসুখ কিছু নয়, ওর সয়তানি।"

"ওর ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুখানি ছুঁয়ে দেখ, কি গরম !"

"কিন্তু তাতে হলো কি ?" পিন্নেবের্গ ধৈর্য্য হারাইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—"হাত গরম, কেবল কেঁদে কেঁদে ! ভেবে দেখো ত, যদি আমি ঐ রকম ক'রে এতক্ষণ চেঁচাতাম, তা হ'লে আমার কত ঘাম ছুটত ! আমার পিঠের কোনও যায়গা কি শুক্‌নো থাকত ?"

"কিন্তু এর হাত দুখানি সত্যিই বড় গরম লাগছে, আমার মনে হয়, মুর্কেলের অসুখই করেছে।"

পিন্নেবের্গ খোকার হাতের উপর হাত দিয়া তাহার গায়ের উত্তাপ দেখিল। অমনি তাহার গলার স্বর বদল হইয়া গেল—"হ্যাঁ, তাই ত! সত্যিই ত খুব গরম ! সত্যিই যদি এর জ্বর হয়ে থাকে ?"

"আমরা এমনি বোকা যে, একটা থার্ম্মোমিটার কিনে বাড়ীতে রাখি না।"

"অনেক দিন থেকেই ত কিন্‌ব কিন্‌ব করছি, কিন্তু কিন্‌তে ত পয়সা লাগে।"

লেম্‌খেন্ বলিল—"হ্যাঁ, তা ত বটেই। খোকার কিন্তু গা বেশ গরম হয়েছে।"

পিন্নেবের্গ্ জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি ওকে একটু চা ক'রে দেবে না কি ?"

"না, তা হ'লে ওর পেট ভ'রে যাবে। জ্বরের মধ্যে কিছু খাওয়া ঠিক নয়।"

পিন্নেবের্গ বলিয়া উঠিল—"কিন্তু ওর যে সত্যিই কোনও অসুখ করেছে, এ আমার মনে হয় না। ও কেবল তোমার কোলে আসবার জন্যে চেঁচাচ্ছে।"

"কিন্তু আমরা ত এর আগে কখনও ওকে এমন ক'রে কোলে তুলে আস্কারা দিই নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে। ওকে দোলনায় এখন শুইয়ে দাও ত, দেখ্‌বে, ও এখনই চেঁচাতে আরম্ভ করবে।"

"কিন্তু——"

"লেম্‌খেন্, ওকে দোলনায় শুইয়ে দাও বল্‌ছি। আচ্ছা, আমার কথাটা একবার শোনো, দাও শুইয়ে, তা হ'লেই তুমি দেখ্‌তে পাবে।"

লেম্‌খেন্ একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পরে খোকাকে দোলনায় শোয়াইয়া দিল। ঘরে আলো নিবাইয়া দিবার আবশ্যক হইল না, কারণ, খোকা অমনি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

যুবা পুরুষটি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ্‌লে ? আচ্ছা, এখন কোলে তুলে নিয়ে দেখ, ও এখনই চুপ ক'রে যাবে।"

লেম্‌খেন্ খোকাকে দোলনা হইতে কোলে তুলিয়া লইল। খোকার বাবা আগ্রহান্বিত আশায় খোকার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিন্তু মুর্কেল কাঁদিয়াই চলিল। পিন্নেবের্গ্ শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। খোকা কাঁদিতেই লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পিন্নেবের্গ্ বলিল—"এই দেখ। তুমি ওকে কোলে নিয়ে নিয়ে ওর স্বভাব একদম বিগ্‌ড়ে দিয়েছ। এখন মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজের জন্যে আমাদের কি করতে হবে ?"

লেম্‌খেন্ মৃদু কোমল স্বরে বলিল—"এর কিছু অসুখ করছে।" লেম্‌খেন্ খোকাকে কোলে লইয়া দোল দিতে লাগিল, এবং তাহার কান্না একটু চুপ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "ওগো,

তুমি এক কাষ কর, তুমি শুয়ে পড়, দেখ যদি একটু ঘুমাতে পার।"

"ঘুম! এর মধ্যে! একদম অসম্ভব!"

"আচ্ছা, তুমি শোও ত। তুমি শুলে আমি একটু নিশ্চিন্ত সুখী হব। লক্ষীটি যাও। আমি ত সকালে একটু গড়িয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারব, কিন্তু তোমাকে ত আপিসে যেতে হবে, তোমাকে ত একটু ঘুমিয়ে তাজা হয়ে নিতে হবে।"

পিল্লেবের্গ্ পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পরে সে স্ত্রীর পিঠ চাপ্ড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা লেম্খেন্, আমি শুচ্ছি। কিন্তু কিছু দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে তুলো!"

কিন্তু ঘুমানো অসম্ভব। একবার এ একটু বিছানায় শোয়, ও খোকাকে লইয়া দোল দিতে দিতে পায়চারি করে; আবার ও বিছানায় গিয়া শোয়, আর এ খোকাকে লইয়া বেড়ায়। তাহারা খোকাকে লইয়া বেড়ায়, দোলায়, গান গাহিয়া তাহাকে ভুলায়। কিছুতেই কিছু হয় না। কখনও কখনও খোকা চাপা স্বরে গোঁগাঁয়, আবার পরক্ষণেই তাহার গোঁগানি স্পষ্ট প্রবল হয়।

অবশেষে পিতা-মাতা উভয়েই খোকার কাছে আসিল। পিল্লেবের্গ বলিল—"কি ভয়ঙ্কর! ওর না জানি কি দারুণ কষ্টই হচ্ছে!"

"আহা! ও না জানি কি মনে করছে। এই ত ওর জীবনের প্রথম কষ্ট! এতটুকু ছোট প্রাণী—এত কষ্ট কেমন ক'রে সহ্য করছে?"

লেম্খেন্ হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—"আহা! আমি যদি এর কষ্ট নিজে নিতে পারতাম! বাবা মুর্কেল, বাছা মুর্কেল, আমি কি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি?"

কিন্তু মুর্কেলের কান্নার বিরাম নাই।

পিল্লেবের্গ বিড়বিড় করিয়া বলিল—"ব্যাপার কি?"

"এ ত আমাদের তা বলতে পারবে না। আহা, যদি এ আমাদের বলতে পারত বা দেখিয়ে দিতে পারত—কোথায় তার ব্যথা করছে। বাবা মুর্কেল, তোমার মাকে দেখিয়ে দাও ত বাবা, কোথায় তোমার লাগ্ছে।"

পিল্লেবের্গ ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমরা নিতান্ত আহাম্মক! আমরা যদি কিছু জানি! আমরা যদি বুঝতে পারতাম, তা হ'লে হয় ত ওকে আমরা একটু আরাম দিতে পারতাম!"

"আর আমরা ত এখানে কাউকে জানিও না, চিনিও না যে জিজ্ঞাসা করব।"

"আমি যাই, এক জন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।" পিল্লেবের্গ পোষাক পরিতে লাগিল।

"কিন্তু ডাক্তার ডাকার সার্টিফিকেট ত তোমার নেই।"

"না থাকুক, পরে সার্টিফিকেট নিলেই হবে। ডাক্তারকে ডাক্‌লে সে নিশ্চয় আসবে।"

"এই ভোর পাঁচটার সময় কোনও ডাক্তার এখানে আসবে না। যেই তারা শুন্‌বে, রোগীর ফাণ্ডের কথা অমনি তারা বলবে—রোসো, আগে সকাল হোক!"

"তাকে আস্‌তে হবে। সে আলবৎ আসবে।"

"দেখ, তুমি যদি তাকে এখন জেদ ক'রে নিয়ে আস, আর তাকে মই ভেঙে আমাদের এই টঙে উঠ্‌তে হয়, তা হ'লে মহা মুস্কিল হবে। সে বিশ্বাসই করবে না যে, এখানে সত্যিই আমরা বাস করি। সে মনে করবে যে, তুমি তাকে কোনও বিপদে ফেলবার মৎলবে এখানে ডেকে এনেছ, আর এই মনে ক'রে সে ওপরে উঠ্‌তেই চাইবে না।"

পিল্লেবের্গ বিছানার কিনারে বসিয়া পড়িল আর বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ওগো, আমাদের অবিশ্বাস করবার মতন সব বন্দোবস্ত আমরা বেশ ক'রে রেখেছি। আমরা ত এ-সব কথা এর আগে ভেবেও দেখি নি।"

লেম্খেন্ বলিল—"তুমি ও-রকম মুষড়ে প'ড় না। এখন সব কিছুই খারাপ লাগছে, কিন্তু আমাদের অবস্থা ভাল হয়ে উঠবে।"

পিল্লেবের্গ বলিল—"কিন্তু মুস্কিল কি জানো? আমাদের ত কিছুই মূল্য নেই। আমরা একেবারে নির্বান্ধব একলা। সংসারে এমন একলা লোক অনেক আছে। সকলে নিজের নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত, কে কার খোঁজ রাখে! এর চেয়ে যদি আমরা মুটে-মজুর হতাম। তারা পরস্পরকে সাঙ্গাত ব'লে ডাকে, পরস্পরকে সাহায্য করে।"

"না না, এ কথা ঠিক নয়। বাবা সর্ব্বদা যে কথা

বলতেন আর তিনি যে কষ্ট সহ্য ক'রে গেছেন, তা যখন মনে করি, তখন তোমার কথা ঠিক মনে হয় না।"

পিল্লেবের্গ বলিল—"হ্যাঁ, সত্যি, তা আমি জানি। তারাও কেউ ভালো নয়। তবে অন্ততঃ তারা নোংরা থাকতে পারে, আর আমরা কেরাণীরা মনে করি যে, আমরা ভদ্রলোক।"

মুর্কেল কাঁদিয়াই চলিয়াছিল। তাহারা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল, সূর্য্যোদয় হইতেছে, ফরসা হইয়া গিয়াছে। তাহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহারা মলিন বিবর্ণ ক্লান্ত দেখাইতেছে।

লেম্‌খেন্ বলিল—"ওগো!"

পিল্লেবের্গ বলিল—"কি?"

তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল।

লেম্‌খেন্ বলিল—"হ্যাঁ, সবই এমন কিছু খারাপ নয়।"

পিল্লেবের্গ স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বলিল—"না, অন্ততঃ যত দিন আমরা পরস্পরে একে অন্যকে না হারাচ্ছি।"

তাহারা উভয়ে ঘরের মধ্যে এদিক্ ওদিক্ করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

লেম্‌খেন্ বলিল—"আমি ত ঠিক করতে পারছি না কিছুই। ওকে কি আমার মাই খেতে দেবো? যদি ওর পেট কামড়ায়, তা হ'লে ত দুধ খেয়ে খারাপই হবে!"

পিল্লেবের্গ হতাশভাবে বলিল—"হ্যাঁ, তা ত বটে। কিন্তু কিই বা করা যায়। প্রায় ছটা ত বাজল।"

লেম্‌খেন্ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে! সাতটা বাজলে তুমি শিশুমঙ্গলালয়ে যাও—সে এখান থেকে ত মোটে দশ মিনিটের পথ। তুমি কাকুতি-মিনতি ক'রে ব্যাগার্ত্তা ক'রে যেমন ক'রে পার, এক জন ধাত্রীকে ডেকে নিয়ে এসো গে।"

সে বললে—"হ্যাঁ, তাই করলেই হবে। তার পরে আমি ঠিক সময়েই আমার কাযে যেতে পারব।"

"তা হ'লে আমরা খোকাকে সেই সময় পর্য্যন্ত কিছু খেতে দেব না। তাতে ওর বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না।"

ঠিক ৭টার সময়ে এক জন মলিন বিবর্ণ যুবক মিউনিসিপ্যাল শিশু-মঙ্গলালয়ের মধ্যে এদিকে ওদিকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ সব এলোমেলো হইয়া আছে। শিশুমঙ্গলালয়ের মধ্যে সর্ব্বত্র কেবল সাইনবোর্ড টাঙানো আছে—পরামর্শের সময় এতটা হইতে এতটা—এবং এই সময়টা তবে পরামর্শের সময় যে নয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। সে চিন্তিত-মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল। লেম্‌খেন্ ত একাকিনী পীড়িত খোকাকে লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু সে ত অসময়ে ধাত্রীদের বিরক্ত করিতে পারে না। এখনও যদি তাহারা ঘুমাইয়া থাকে? তবে সে এখন কি করিবে? এক জন স্ত্রীলোক তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সে মোটা, তাহার বয়স হইয়াছে, ইহুদী ছাঁচের চেহারা।

পিল্লেবের্গ ভাবিল—এর চেহারাটা ভাল নয়। একে কিছু জিজ্ঞাসা করা চলবে না।

সেই স্ত্রীলোকটি আরও এক সিঁড়ি নামিয়া আসিল। তাহার পরে হঠাৎ ঘুরিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। সে পিল্লেবের্গের একেবারে স[illegible]খে আসিয়া থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি, খোকার বাবা, কি খবর?" ইহার পরে সে হাসিল।

খোকার বাবা, আর তাহার সঙ্গে হাসি। বাস, ঠিক হইয়াছে। আঃ ভগবান্, মেয়েটি কি ভাল লোক! হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, অনেক লোকেই এমনই বুঝিতে পারিত যে সে কে, এবং সে কেন এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। কত হাজার হাজার পিতা এই সিঁড়ির ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে। এখন সে সাহস পাইয়া সেই মেয়েলোকটিকে সকল কথা বলিতে পারিল, এবং সেও অতি সহজে সব অবস্থা বুঝিয়া লইল, এবং সে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—"ও! হ্যাঁ।" তাহার পরে সে একটা ঘরের কপাট খুলিয়া ডাকিল—"এলা, মার্থা, হেলেন!"

কয়েকটা মাথা ঘর হইতে উঁকি মারিল।

"তোমাদের মধ্যে কেউ এক জন এই যুবা বাবার সঙ্গে যাও, যাবে কি কেউ? এর বাড়ীতে অসুখ।"

সেই মোটা মেয়েলোকটি পিল্লেবের্গকে মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল এবং বলিল—"সুপ্রভাত। ওতে বিশেষ কিছু ভাবনার কারণ নেই।"

এবং সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে এক জন ধাত্রী বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল—"চলুন, যাওয়া যাক।"

পথে পিন্নেবের্গ ধাত্রীকে সমস্ত কাহিনী বলিয়া শুনাইল। ধাত্রী মাথা নাড়িয়া বলিল—"তা এতে কোনও ভয়ের কারণ নেই। আমরা দেখ্‌লেই বুঝতে পারব।"

যাক, এমন কেউ তাহাদের খোকাকে দেখিতে যাইতেছে যে, এই সব বিষয় বেশ জানে। মই বাহিয়া উপরে উঠার দুশ্চিন্তাও অনাবশ্যক হইয়া গেল। ধাত্রী সেই মই দেখিয়া কেবল বলিল—"কি, এই কাকের বাসায় থাকা হয়। আচ্ছা, আপনি আগে উঠুন।"

ধাত্রী তাহার পিছনে পিছনে চামড়ার ব্যাগ হাতে লইয়া পুরাতন নাবিকের মতন মই বাহিয়া উপরে উঠিল অনায়াসে।

তখন লেম্‌খেন্ আর ধাত্রী একত্র হইয়া ধীরভাবে কথা বলিতে লাগিল এবং মুর্কেলকে দেখিতে লাগিল। মুর্কেল তখন চুপ করিয়াছিল। লেম্‌খেন একবার পিন্নেবের্গের সহিত কথা বলিল—"ওগো, তুমি যাবে না? তোমার ত আপিসে যাবার সময় হয়েছে।"

পিন্নেবের্গ অস্ফুট স্বরে বলিল—"না, আমি একটু থেকে যাই। যদি কিছু আন্‌তে হয়।"

তাহারা খোকাকে দোলনা হইতে তুলিল। সে চুপ করিয়াই রহিল। তাহারা উহার গায়ের তাপ পরীক্ষা করিল। না, তাহার জ্বর হয় নাই। গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপের চেয়ে একটু বেশি। তাহারা উহাকে জানালার ধারে লইয়া গেল এবং তাহার মুখ হাঁ করাইয়া দেখিতে লাগিল। খোকা তখনও চুপ করিয়াছিল। ধাত্রী হঠাৎ কি বলিল এবং তাহা শুনিয়া লেম্‌খেন্ চমকাইয়া উঠিল।

তাহার পরে সে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"ওগো, ওগো, এইখানে শীগ্‌গির এসো, শীগ্‌গির এসো! আমাদের মুর্কেলের প্রথম দাঁত উঠছে!

পিন্নেবের্গ্ আসিল। সে হাঁ-করা মুখের মধ্যে দেখিল, মাড়ি লাল হইয়া উঠিয়াছে। লেম্‌খেনের অঙ্গুলি মাড়ির একটা স্থানের ফুলার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। সেই ফুলা মাড়ি হইতে একটা কি ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। পিন্নেবের্গ্ ভাবিল—ঠিক যেন মাছের কাঁটা, মাছের কাঁটা! কিন্তু সে কিছুই বলিল না। স্ত্রীলোক দুজন তাহার দিকে এমন আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল যে, সে অবশেষে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, তবে আমরা এখন যে যার কাযে যেতে পারি। সব ভাল ত? প্রথম দাঁতই ত?" সে মিনিটখানেক চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল—"এ রকম কতগুলি ওর উঠবে?"

ধাত্রী বলিল—"কুড়িটা।"

পিন্নেবের্গ্ বলিয়া উঠিল—"ঐ অতগুলো। সব কটার বেলাই ও এই রকম ক'রে চেঁচাবে?"

ধাত্রী উত্তর করিল—"সব দাঁত উঠবার বেলাই সবাই কাঁদে না।"

"আচ্ছা বেশ, এই রকম ব্যাপার আগে যদি জানা থাক্‌ত"—এই বলিতে বলিতে সে হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার এমন আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন কিছু মহৎ আর অত্যাবশ্যক ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে নত হইয়া মাথা ঝুঁকাইয়া বলিল—"নার্স, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের এ সব কিছু জানা ছিল না। লেম্‌খেন্, ওকে এখন তোমার মাই দাও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির দাও, ওর নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আমি একদৌড়ে এখন আপিসে যাই। নার্স, আপনাকে ধন্যবাদ! লেম্‌খেন্, আমি চল্লাম, আসি। মুর্কেল, লক্ষ্মীটি, শান্ত হয়ে থেকো।"

সে চলিয়া গেল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



কুল-দেবতা

সু-উচ্চ দেবমন্দিরের পিত্তলচূড়ায় সূর্য্যালোক পড়িয়া স্বর্ণ-দীপ্তি ছড়াইতেছিল। নহবৎখানায় বাঁশী সারং রাগিণীতে আলাপ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, নাটমন্দির ভরিয়া নর-নারীর বিচিত্র কলরব। মন্দিরের সম্মুখে শিকলে ঝুলান সুবৃহৎ ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের পিঠে কাঠি পড়িয়া আরতির বাজনা মহা নিনাদ করিয়া উঠিল। শতকণ্ঠের উদ্দাম কলরব মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল—জনতার চকিত দৃষ্টি দেবতার দিকে ন্যস্ত হইল। বিগ্রহের সম্মুখে কারুকার্য্য-করা পিতলের দরজা আড়াল করিয়া কাহাকেও দাঁড়াইতে দেওয়া হয় নাই—পাছে বাহিরের দর্শকদল দর্শনে বঞ্চিত হয়।

পুরোহিত শান্ত গাম্ভীর্য্যে রৌপ্যদীপঝাড় দক্ষিণ করে তুলিয়া লইলেন। দীপালোকে বিগ্রহের অঙ্গে মণি-মুক্তা-স্বর্ণালঙ্কার যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। বদ্ধাঞ্জলি নর-নারীর ভক্তিপ্লুত দৃষ্টি মুগ্ধ হইয়া গেল।

দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া আরতি শেষ হইল। রৌপ্য-চামর দোলাইয়া পুরোহিত দেবতাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শব্দ-আড়ম্বর থামিল। একটা সীমাহীন মহা নীরবতায় দশদিক্ যেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিমেষে ডুবিয়া গেল। পুরোহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চিত্রিত জনতাও নত হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিল। যেন একটা নূতন পটক্ষেপ হইল। যে শ্রবণ-বধির শব্দ-তরঙ্গ নভস্তলকে স্পর্শ করিতে ঊর্দ্ধলোকে উঠিতেছিল, বাতাসে ভর করিয়া সীমাহীন দিগন্তে ছুটিতেছিল, সে আরাধনা বাহ্য-জগৎকে ছাড়িয়া অন্তর্জগতে যেন স্থিতি লাভ করিল।

মন্দিরের বাহিরে একটি স্তম্ভকে আশ্রয় করিয়া কৈশোর-যৌবনে জড়িতা একটি নারী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। জীবনের এই অদৃষ্ট ব্যাপারকে নিরীক্ষণ করিয়া আত্ম-বিস্মৃতের মত পলকহীন দৃষ্টিতে সে শুধু চাহিয়াছিল। নিটোল স্বল্প মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতে তাহার নেত্র-কোণে টলমল করিতেছিল এবং নিজের ভারে নমিত হইয়া সে দুটি যখন স্থানচ্যুত হইল, মেয়েটির বাহ্যজ্ঞান তখনই ফিরিয়া আসিল। ত্রস্তে সে একবার চারিদিকে চাহিল, এবং প্রণত জনতার অনুকরণে সেও একটা প্রণাম দেবতাকে নিবেদন করিল। কি প্রার্থনা যে তাহার বুকের মাঝে জাগিল, তাহা জানিল শুধু তাহার অন্তর্য্যামী।

জনতার মাঝ হইতে একটু পথ সংগ্রহ করিয়া মেয়েটি বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু মুক্তি চাহিলেই ত তাহা পাওয়া যায় না। নাটমন্দিরে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত যে জনতা দেবতাকে লইয়া এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল, তাহারা এই অপরিচিতা মেয়েটির দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া তাহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিল। এতক্ষণ কাহারও দৃষ্টি এই অপরিচিতা মেয়েটির উপর পড়ে নাই বা কেহ তেমন ভাবে লক্ষ্য করে নাই। নিজের স্থানটা দখলে রাখিতেই তখন সকলে ব্যস্ত ছিল।

"তুমি কে গা?" প্রথমা নারী-কণ্ঠের এই প্রশ্ন অনেকের কণ্ঠেই যেন সংক্রামিত হইল। পুরুষ দর্শকগণের মধ্যে মাতব্বরগোছ কয়েক জন বলিয়া উঠিল, "তুমি কোথায় থাক? তোমাকে ত এ গ্রামে দেখি নি।"

মেয়েটি প্রস্থানে উদ্যতা হইয়াও থামিয়াছিল। অনেকগুলি চোখের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিভ্রান্ত বোধ করিল।

এক জন বলিয়া উঠিল, "ওকে আজ সকালে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। বোধ হয়, অনাদি সরকারের মেয়ে।"

তরুণী আত্মসংবরণ করিয়া জড়িমাহীন শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যা, আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত অনাদি সরকার।"

উত্তেজিত জনতা মুহূর্ত্তে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তরুণীর এই নির্ভীক, শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর নিমেষে যেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল, পরিপূর্ণ দাবীর উপর দাঁড়াইয়া সে কথা কহিতেছে।

অকস্মাৎ জনতার সকলেরই যেন মনে হইল, মেয়েটি যেন একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

উত্তেজনায় মানুষ অধীর হয়, ন্যায়-অন্যায়-বিচার-বুদ্ধিকে হারাইয়া ফেলে বলিয়াই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথীর মুখে চিরকালের জন্য কালী লেপিয়া গিয়াছে। পরাজয়ের অসহনীয় আঘাতটাই বিবেকবুদ্ধিকে কাড়িয়া লয়। তাই ক্রুদ্ধকণ্ঠে এক জন বলিল, "তোমার যীশুখৃষ্টের পূজা হেথা হচ্ছে না। এটা মন্দির, গির্জ্জা নয়। এখানে তুমি কোন্ সাহসে আস?"

কে এক জন তিক্ত-কণ্ঠে কটূক্তি করিল, "খৃষ্টানী এসেছে আমাদের পূজার সব নষ্ট করতে।"

তরুণীর সুগৌর মুখখানি মুহূর্তে সিঁদুরের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কি একটা কথা বলিতে গিয়া সহসা নিরস্ত হইল।

দর্শকদিগের মধ্যে এক জন গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিল, "এখনই চ'লে যাও বাছা, আর কোন দিন এখানে এসো না।"

তরুণী এবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মানুষের চেয়ে দেবতা বড়, এটা যদি মানেন, তা হ'লে এমন কথা বলতেন না।"

মেয়েটি নিজের গন্তব্যমুখে চলিয়া গেল। অশ্রাব্য কটূক্তিগুলি তাহার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইলেও সে বিন্দুমাত্র চপলতা প্রকাশ করিল না। চলিতে চলিতে সে শুনিতে পাইল, নারী-কণ্ঠে কে যেন বলিতেছে—"এমন ক'রে অপমানটা করা কিন্তু ভাল হ'ল না।"

তরুণী উত্তর শুনিবার জন্য কিন্তু মুহূর্তমাত্রও দাঁড়াইল না।

* * * *

কোকোর পেয়ালাটা দুর্ব্বল হাতে টেবলের উপর রাখিয়া অনাদি ডাকিলেন, "রুবি!"

"কি বাবা" বলিয়া রুবি পিতার চেয়ারের নিকট সরিয়া আসিল।

কয়েক মুহূর্ত মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটা বক্ষোভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া অনাদি কহিলেন, "আজ ঠাকুর দেখতে গেছলি?"

মন্দিরের ঘটনাটা তখনও রুবির মনের মাঝে আগুনের মত জ্বলিতেছিল। তীব্র অপমানের স্মৃতি সে ভুলিতে পারে নাই। তাই অপ্রসন্ন-মুখে সে কহিল, "হ্যাঁ, গেছলুম।"

অনাদি শিশুর মতই আনন্দে অধীর হইয়া উল্লসিত-কণ্ঠে কহিলেন, "দেখলি মা, ঐ আমাদের কুলদেবতা রাধানাথ। দেখলি তাঁর ঐশ্বর্য্য, দেখলি তাঁর পূজার ঘটা? সে কি এখনও সেই আগেকার মত আছে? বল না রুবি, চুপ ক'রে আছিস কেন?"

পিতার উৎসাহ আনন্দে মেয়ের মুখের দীপ্তি ফুটিল না, শুধু জনকের আগ্রহ-আতিশয্যে নিস্পৃহ-কণ্ঠে রুবি কহিল, "আগে কেমন ছিল, তা ত দেখিনি, বাবা। তবে এখন—হ্যাঁ, ঘটা আড়ম্বর আছে বৈ কি। অনেক লোকও জমেছে।"

কন্যার নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বর ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টির পানে চাহিয়া কিছু অনুমান করিবার মত অনাদির চিত্তের তখন অবস্থা ছিল না। হঠাৎ পুরাতন দিনের স্মৃতি চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বর্ষার নদীর মত অন্তরটাকে কূলে কূলে ভরাইয়াছিল; দৃষ্টির শেষ সীমায় সরিয়া যাওয়ার মত বর্ত্তমানটা চোখে ঝাপসা হইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "সাদা মার্ব্বেলের মন্দির ধব্‌ধব্‌ করছে। রাধানাথ বাঁশী হাতে প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে আছেন। রুবি, ওকেই বলে পদ্ম-পলাশনেত্র। দেশবিদেশ হ'তে ভক্ত সাধক রাধানাথকে দেখতে আসত। বলত, সরকারদের রাধানাথের মুখের মত বৃন্দাবনচন্দ্রেরও মুখ নয়। জানিস রুবি, ঐ রাধানাথের গল্প—"

"আমি ত কিছু জানিনি, বাবা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে, মা। সে গল্প তোকে বলিনি মা।"

পিতার উত্তেজিত মুখ, উজ্জ্বল চোখের পানে চাহিয়া রুবি কহিল, "থাক না বাবা, অন্য সময় শুনব।"

"না মা, এখনই না বললে আমার স্বস্তি হবে না" বলিয়া অনাদি আরম্ভ করিলেন—

"বাবার বয়স হ'ল! সন্তান হ'ল না! মনে সুখ নেই! বড় মাকে নিয়ে বৃন্দাবন গেলেন। ইচ্ছা, বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছেই শেষ জীবনটা কাটাবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তা ছিল না।

বড় মা স্বপ্ন দেখলেন, রাধানাথ বলছেন, আমায় পূজা কর, আমি তোদের।

বাবা দেশে ফিরে এলেন। কারিকর ডেকে ঠাকুর গড়বার আদেশ দিলেন। সে মস্ত ধুম-ধাম। কিন্তু ঠাকুর আসবার আগেই বড় মা বিদায় নিলেন। তাঁর সাধের মন্দির আরম্ভই দেখে গেলেন, শেষ দেখা হ'ল না। বাবার শোকের সান্ত্বনা দিতে অনেকেই বললে, বিয়ে কর। নিঃসন্তান থেকো না। এত বড় দেবত্র করছ, সেবায়েত কর নিজের বংশধরকে।

বংশের মাঝ দিয়ে, নিজেকে জাগিয়ে রেখে রাধানাথকে সেবা করবার ইচ্ছাটা বাবার মনে চেপে ধরল। আমার মা এলেন।

রাধানাথের প্রতিষ্ঠার সময় আমার আবির্ভাব ঘটল।



আমার মুখ দেখে বাবা সব বিষয় রাধানাথকে দিতে পারলেন না। অর্দ্ধেক রাখলেন তাঁর অনাদিনাথের জন্য। রুবি, ছোটবেলায় বাবার হাত ধ'রে আমি ঐ রাধানাথকে নিত্য নমস্কার করতে যেতুম। আরতির সময় বাবার পাশে যোড়হাত ক'রে দাঁড়াতুম। পুরুতঠাকুর বাবাকে আশীর্ব্বাদ দিতেন, আমাকেও দিতেন। বড়মার যত গয়না সব রাধানাথকে দেওয়া হয়েছিল, তাই অত হীরা-মতি তাঁর গায়ে।"

অনাদির দুই চোখ দিয়া মতির বিন্দু গড়াইয়া পড়িল। অস্পষ্ট অতীতটা দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের প্রৌঢ় বেলায় স্বর্ণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। পরপারে পাড়ি দিবার দিন যত নিকটবর্ত্তী হয়, পুরাতন প্রসঙ্গটাই মানুষের নিকট তত প্রিয় হইয়া উঠে।

* * * * *

অনাদিনাথ আচারপরায়ণ বৈষ্ণব-বংশে জন্মিয়াও খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্ম-বিতৃষ্ণায় নহে। চপল যৌবনের আত্মহারা ভালবাসার নেশায় সে দিন মাধুরীর অপেক্ষা কোন বস্তুই তাঁহার চোখে বড় হইয়া উঠে নাই বলিয়া।

অরুণ দত্ত ছিলেন অনাদিদের কলেজের অধ্যাপক। মেধাবী, সুদর্শন জমীদারপুত্র অনাদির প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি একটু অনাদির পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, এবং সখ্যতা করিতেও তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। কারণ, অনাদি তাঁহাকে সকল বিষয়েই আদর্শ মনে করিয়া নিজেকে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুকরণে গঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

অরুণ দত্ত অনাদিকে ফ্রেঞ্চ-ভাষা শিক্ষা দিবেন প্রতি-শ্রুতি দিলেন, এবং নিজের সুবৃহৎ লাইব্রেরীটা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। শেষে ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তায় পরিণত হইল। দত্ত-পরিবারের সকলেই অনাদিকে আলোকে আনিতে ব্যস্ত ও বদ্ধপরিকর হইলেন। মাধুরী নিজে অনাদিকে পিয়ানো শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

নূতন অনুভূতির বেগ বড় প্রবল হয়। অনাদি কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন; ছুটীতে দেশে যাইতেন। নূতন বস্তুতেই মানুষের আকর্ষণ বেশী। অনাদি পিতামাতার আহ্বানকে এড়াইতেন পড়ার দোহাই দিয়া।

অনাথবন্ধুর অন্তর শরতের মেঘহীন আকাশের মতই ছেলের প্রতি সংশয়হীন ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, পাঠের আকর্ষণে ছেলে দেশে আসিতে পারে না। পরীক্ষার আর কয় সপ্তাহ বাকী, তাহাই হিসাব করিতেন।

এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইল। অনাথবন্ধু পুত্রকে লিখিলেন, রাধানাথের দয়ায় এইবার আমরা পুত্রবধূর মুখ-দর্শন করিব। কন্যা নির্ব্বাচিত করিয়াছি, তুমি সত্বর আসিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অনাদি বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িলেন। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণেক আড়ষ্ট হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আত্মস্থ হইয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পিতাকে লিখিলেন, "আমায় ক্ষমা করুন, দেশের জল-হাওয়া বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে না। কারণ, পরীক্ষার কঠোর পরিশ্রমে শরীর আমার বিশেষ খারাপ বোধ হইতেছে। কয়েক সপ্তাহ দার্জ্জিলিং থাকিব মনে করিতেছি। জন কয়েক বন্ধুও যাইতেছে। আমারও অনেক দিনের সাধ—পাহাড়টা একবার দেখিয়া আসি। দয়া করিয়া আপনি অনুমতি দিবেন, এই আমার একান্ত মিনতি।"

পুত্রের পত্রখানিতে অনাথবন্ধু ক্ষুব্ধ হইলেন, তথাপি পুত্রের নামে সেই দিনই একটা মোটা টাকার মনি-অর্ডার পাঠাইয়া লিখিলেন, "তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন 'না' বলতেও পারলুম না। কিন্তু তোমার গর্ভ-ধারিণী বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন জানবে।"

গোটা কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অভ্যাসমত অনাথবন্ধু সে দিন সংবাদপত্রে চোখ বুলাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা যায়গায় বড় বড় হরপগুলার উপর তাঁহার দৃষ্টি বাধিয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িলেন,—

"ধর্ম্মান্তর গ্রহণ এবং শুভ বিবাহ।

অনাদিনাথ সরকার এম, এ মাদ্রাজ * * গীর্জ্জা হইতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারে অধ্যাপক অরুণ দত্তের বিদুষী কন্যা কুমারী মাধুরী দত্তের সহিত খৃষ্টধর্ম্মে পরিণীত হইলেন। ঈশ্বর নব-দম্পতির কল্যাণ করুন।

রাজপুরের জমীদার অনাথবন্ধু সরকার এক জন গোঁড়া হিন্দু বলিয়াই জনসমাজে পরিচিত। অনাদিনাথ সরকার তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য বংশধর।"

একবার, দুইবার, তিনবার অনাথবন্ধু কাগজখানি পড়িলেন। বিভীষিকা-দর্শনের তীব্র আতঙ্কের মত দুই

চক্ষু-তারকা যেন তাঁহার ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। ওষ্ঠের কাঁপুনি দাঁত দিয়া চাপিয়া নিবারণ করিতে ওষ্ঠাধরে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি অনাথবন্ধু কাঠের মত শক্ত হইয়া কাগজখানিকে বার বার পড়িতেছিলেন।

স্বামীর ফলের রেকাবীখানি হাতে করিয়া উর্ম্মিলা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অনাথবন্ধুর পানে চাহিয়া চমকিত হইলেন। ভীতকণ্ঠে কহিলেন, —"ও কি—"

পত্নীর পানে চাহিয়া অনাথবন্ধু একটা বুক-ফাটা চীৎকার করিয়া, চেয়ারের উপর হইতে ভূমিতে গড়াইয়া পড়িলেন। আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া তপ্ত তরল ধারা চারিদিক্ যেন বিধ্বস্ত করিতে চাহিল। ধূমে গন্ধে যেন উজ্জ্বল দিনটাকে কালো করিয়া সংহারের তাণ্ডব চলিল।

* * * *

ডাক্তারদের অনেক পরিশ্রমের পর, অনাথবন্ধুর লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দেখা গেল, তাঁহার শরীরের দক্ষিণ অঙ্গটা পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া গিয়াছে।

অনাদির ধর্ম্মান্তরগ্রহণটা কোন আত্মীয়েরই অবিদিত ছিল না। তাই জনকের এই কঠিন পীড়ার সংবাদটা তাহার অগোচর রহিল। অনাদি যেন এ বাড়ীর কেহ ছিলেন না, এমনই করিয়াই প্রত্যেক প্রাণী তাঁহার নামটা অবধি মুখে আনিত না। এমন কি, গর্ভধারিণী উর্ম্মিলা অবধি না। যাহাকে সহজে ভুলা যায় না, তাহাকেই ভুলিবার পাগলামিতে এই পন্থাটা অবলম্বিত হইয়াছিল কি না, কে জানে। কিন্তু যাহা সত্য, শিলালিপির মত তাহা অক্ষয়।

আষাঢ়ের মেঘস্তরের মাঝে সূর্য্য যে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহা যেমন অন্ধকারের গাঢ়তার দিকে চাহিলে বুঝা যায়, তেমনই কঠিন মর্ম্মপীড়ার মাঝে অনাথবন্ধুর পরমায়ু যে শেষ হইয়া যাইতেছিল, তাহা ব্যাধির প্রকটতায় উর্ম্মিলার চোখে নিশ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সুখে হউক, দুঃখে হউক, মানুষকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। তাই উর্ম্মিলার বুক ফাটিয়া গেলেও, মনের সঙ্কোচটাকে দুই হাতে সরাইয়া, স্বামীকে এক দিন কহিলেন, "আমার একটা অনুনয় আছে।"

যন্ত্রণামাখা দৃষ্টি পত্নীর মুখের পানে ফিরাইয়া ক্লান্তকণ্ঠে অনাথবন্ধু কহিলেন, "কি চাই, নতুন বৌ? কিসের এত কুণ্ঠা?"

হাতযোড় করিয়া উর্ম্মিলা কহিলেন, "রাধানাথকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছিলে, তা আর করো না।"

মেঘাচ্ছন্ন দিনের ম্লান আলোর মত একটা নিষ্প্রভ হাসি অনাথবন্ধুর ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তা হ'লে আমার অন্যায় হবে, নতুন বৌ! শেষবয়সে ক্ষতি আমি কারুর করতে চাই না। জীবনে ও কায আমি করি নি।"

দীপ্ত রবিরশ্মির মত উর্ম্মিলার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কঠিন-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "একে কি ক্ষতি করা বলে? অন্যায়ের দণ্ড না দিলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন। যে তোমাকে এমন ক'রে হত্যা করলে, তাকে তুমি ক্ষমা করতে চাইছ? অপাত্রে দান করতে নেই।"

অনাথবন্ধু ক্ষণেক চোখ বুজিয়া রহিলেন। মুদিত নেত্রের সম্মুখে বোধ করি একখানি পরিচিত প্রিয় মুখই ভাসিয়া উঠিল। তাই কোঠরগত নেত্রের দুই পাশ দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বুকের আমূল পর্য্যন্ত বেদনায় তরঙ্গায়িত হইয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বিশ্ববুকে ছড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে চোখ খুলিয়া অনাথবন্ধু কহিলেন, "ক্ষমার যোগ্য অযোগ্য নেই। অপরাধ আছে বলিয়াই ক্ষমা বেঁচে আছে।"

উর্ম্মিলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অকৃতজ্ঞ ধর্ম্মত্যাগী সন্তানের উপর ক্রোধের অন্ত ছিল না। শাস্তি তিনি পুত্রকে কঠোর করিয়াই দিতে চাহিতেন। স্বামীর রোগযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরটা গর্ভজাতকে অভিসম্পাত করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চাহিলে সীমা-হারা ক্রোধের প্রচণ্ড প্রতিশোধ-স্পৃহাটা থমকিয়া দাঁড়াইত। মর্ম্ম-পীড়ার যন্ত্রণাটা নিজের মাঝে উপলব্ধি করিয়া, অনাথবন্ধু যে পরম স্নেহাস্পদকে সে অগ্নিজ্বালার হাত হইতে কত করিয়া রক্ষা করিতে চাহিত, প্রতি পলে উর্ম্মিলা তাহা অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন।

অনাথবন্ধু কহিলেন, "আমি 'উইল' ক'রে তার প্রাপ্য গণ্ডা তাকে দিয়ে যাব। তা না হ'লে সে পাবে না।

আর এই বাড়ীখানা যত দিন তুমি বেঁচে থাকবে, তোমার। তুমি অবর্ত্তমানে তার অধিকারে যাবে। নতুন-বৌ, এই ভিটেতেই সে জন্মেছিল।"

উর্ম্মিলা কহিলেন,—"এখানে সে যে ম্লেচ্ছপানা করবে, অনাচার আনবে।"

অনাথবন্ধু একটুখানি হাসিলেন। তার পর কহিলেন,—"সে কর্ত্তব্যের ভার তার উপর। ভবিষ্যতের পথরোধ কর্‌তে যাওয়া ভুল। রাধানাথ আমায় পরীক্ষা করছেন। আমি হাত খুলে দান কর্‌তে পারি কি না দেখছেন।"

* * * * *

মধু-বাসর মধুময় হইয়া কাটিতে পাইল না। অনাদি পিতৃ-বিয়োগ-সংবাদ পাইলেন। অমিত তখন মাতৃগর্ভে। তড়িতাহতের মত এই প্রচণ্ড দুঃসংবাদটা অনাদির দেহ-মনকে ভয়ানক বিকল করিয়া তুলিল। পিতৃ-শোকটা শুধু পিতৃ-শোক হইয়াই সম্মুখে দাঁড়াইল না; সে যেন কৃত কর্ম্মের নির্ম্মম দণ্ডদাতার রূপ ধরিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। অনাদির মাকে মনে পড়িতে লাগিল। স্বামি-পুত্রহারা আজ নিঃসহায় হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় হয় ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। মরণে হিমশীতল কোলই শোক-তপ্ত দেহখানা জুড়াইবার জন্যই রাধানাথের পায়ে একান্ত প্রার্থনা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অনাদির মানস-নেত্রের সম্মুখে এই কল্পিত ছবিটাই বার বার প্রতিফলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

জননীর সহিত দেখা করিবার জন্য অনাদির সমস্ত চিত্তটা অস্থির হইয়া উঠিল। নিজেকে কিছুতেই তিনি আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

অনাথবন্ধুর পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন তখন নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সুবৃহৎ প্রাসাদে একটা বিরাট কর্ম্মানুষ্ঠানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কাযে অকাযে কত লোক ঘুরিতেছে—গোল পাকাইতেছে। তাহাদের সম্মুখ দিয়া নিজের পিতৃ-ভবনে ঢুকিতে অনাদির সাহস হইল না। রাত্রির অন্ধকারকে তিনি আশ্রয় করিলেন। অধি-কারকে একবার ত্যাগ করিলে সে আর জীবনে ফিরিয়া আসে না। শত চেষ্টায়ও সে পরিত্যক্ত পূর্ব্বরূপ লইয়া সম্মুখে দাঁড়ায় না। তাই চোরের মত পা টিপিয়া, লজ্জিত-মুখে অনাদি নিজ গৃহে—জন্মস্থানে প্রবেশ করিলেন। পরিচিত ঘর, দ্বার, বারান্দা, দালান ঠিক তেমনই আছে। আসবাবপত্র যেখানে যেমন সাজান ছিল, তেমনই রহিয়াছে। জননীর কক্ষ-দ্বারে অনাদির হাতে আঁকা ছবিখানা অবধি ঝুলিতেছে। শুধু অনাদিই ছিল না। অকস্মাৎ তিনি যেন মৃত্যুর রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যে গৃহে তিনি এক দিন সর্ব্বময় ছিলেন, সেইখানকার কোন প্রয়োজন আজ অনাদির পানে চাহিয়া থাকে না। তাঁহার স্মৃতি-স্মরণে এ গৃহের বাতাস বেদনায় ভারী হইয়া উঠিবেই বলিয়া তাঁহার নাম অবধি এখানে কেহ করে না।

খোলা দরজা-পথে অনাদি কক্ষ-অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তড়িতাহতের মত পা হইতে মাথার চুল অবধি কাঁপিয়া উঠিল। নিজের পতনের সম্ভাবনাটা নিবারণ করিতে অজ্ঞাতে যে কপাটটা চাপিয়া ধরিলেন, তাহারই শব্দে চাদরের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া উর্ম্মিলা ইস্ততঃ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। বোধ করি, পরিচিত পদশব্দ তাঁহার শোকাহত চিত্তের মাঝে সংশয়-সঙ্কট লইয়া নিবিড় উদ্‌গ্রীবতাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

বুক-ফাটা একটা আর্ত্তনাদের কান্নায় "খোকা" বলিয়াই উর্ম্মিলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনতিদূরে আশে-পাশে যাঁহারা ছিলেন, ত্রস্তে ভিড় করিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিলেন এবং অপ্রত্যাশিত অনাদিকে দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না বা কোন মুখে প্রসন্নতার ক্ষীণ চিহ্ন ফুটিল না।

অনাদির তখন এই আত্মীয়মণ্ডলীর মেঘাচ্ছন্ন মুখের অন্তরালে যে অর্থ নিহিত ছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিবার মত অবসর ছিল না। সন্তানহারা জননীর শুশ্রূষা করিতে সকলে তখন ব্যস্ত।

কিন্তু অনাদির কথা কহিবার অবকাশ না থাকিলেও অপর পক্ষের যে থাকিবে না, এমন ত নহে। সাপের বিষের অপেক্ষাও মানুষের জিহ্বার বিষ বেশী। সাপের বিষের জ্বালায় মানুষ কিছুক্ষণ অস্থির হইয়া মরণের হিম-শীতল কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। মানুষের জিহ্বার বিষ বাঁচিয়া মরার মত রহিয়া রহিয়া মানুষকে জ্বালাইতে থাকে।

দুষ্ট রোগের মত বংশধরের মাথায় অবধি সে জ্বালা ছড়াইয়া পড়ে।

অনাদির এক আত্মীয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"অনাদি, তুমি আর নতুন বৌয়ের মুখে চোখে জল দিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। কে আবার বাইরে থেকে দেখবে, এই শ্রাদ্ধের সময় হাঙ্গামা বাধাবে।"

অনাদির হাতটা শিথিল হইয়া গেল। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বুকে সবলে বিদ্ধ করিয়া দিলে, মরণাহতের চোখে যেমন একটা গভীর যন্ত্রণা ঘনীভূত হইয়া উঠে, আততায়ীর দিকে সে যেমন একবার চাহে, তেমনই যন্ত্রণার্ত্ত দৃষ্টিতে অনাদি একবার চাহিলেন।

আততায়ী যদি আহতের যন্ত্রণা একবার নিজের বুকে সামান্য উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ করি, অনেক নিষ্ঠুর ঘটনা পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া যাইত। নিজের নীচতাকে কেহ বুঝিতে পারে না।

অনাদি মাকে ছাড়িয়া সরিয়া বসিলেন। গর্ভধারিণীর অস্পৃশ্য তিনি। মানুষের দেওয়া গণ্ডী ভগবানের দেওয়া সম্বন্ধটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উর্ম্মিলার লুপ্ত সংজ্ঞাকে পরে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যাহার স্পর্শে এই শোকাহতা দুর্ভাগা রমণীর সন্তপ্ত দেহটা ক্ষণেক শীতল হইতে পারিত, সেই শুধু পরের মত দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ব্যথায় বিশ্ব-দেবতার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল কি না, কে জানে।

উর্ম্মিলার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। 'খোকা' বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বুকের ভিতর যে নামটা অনুক্ষণ জাগিত, শাসনের উপর শাসন দিয়া যাহাকে তিনি ওষ্ঠে ফুটিতে দিতেন না, মর্ম্মন্তুদ বেদনা আজ শাসনকে তুচ্ছ করিয়া ক্ষিপ্তের মত সেই নামটাকে বার বার উচ্চারিত করিতে লাগিল।

অনাদির সম্মুখেই উর্ম্মিলাকে শান্ত করিতে, সান্ত্বনা দিতে একবাক্যে সকলেই কহিল, "নতুন বৌ, রাধানাথ বৈ আর তোমার কেউ নেই। তাঁর পায় মতি রাখ আর পাঁচ জনকে ভুলে যাও। যেন তারা তোমার শত্তুর।"

এক জন আত্মীয় কহিল, "অনাদি, শেষ শাস্তিটা এমন ক'রে দিতে কি আসতে হয়? বুক তোমার কাঁপল না?"

অনাদি কি একটা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার শুষ্ক রসনা দিয়া কথা বাহির হইতে চাহিল না। মানুষ যেখানে সর্ব্বময় হয়, সেখানে অনুগৃহীতের মত দাঁড়াইবার অপেক্ষা বড় দুঃখ জগতে আর কিছু নাই।

* * * *

অমিত এক বছরের শিশু। তাহার প্রবাল-রাঙ্গা ওষ্ঠাধরের হাসি, আধ আধ বাণীতে যেন স্বর্গ-সুধা ঝরিয়া পড়ে। সোণার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গাইবার মত অনেক বিস্মৃত স্মৃতি সে হাসিতে অনাদির বুকে জাগিয়া উঠে। উর্ম্মিলা বলিতেন, "অনুর ছেলে কোলে ক'রে লোকেদের আমি গিনি বক্‌সিশ করব।"

প্রবল ইচ্ছা দ্বিধার মেঘকে অপসৃত করে। অনাদি নিজের কুণ্ঠা কাটাইয়া পত্নীকে এক দিন সুস্পষ্ট কহিলেন, "মাধু, অমিতকে মা দেখেন নি।"

দীপ্তিহীন একটা হাসির রেখা ওষ্ঠে ফুটাইয়া মাধুরী কহিলেন, "সে আমাদের দুর্ভাগ্য।"

অনাদি কহিলেন, "খোকাকে একবার মাকে দেখিয়ে আনা উচিত। তাঁর আশীর্ব্বাদের চেয়েও বড় কি আছে? চল না মাধু—"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মাধুরী কহিলেন, "তিনি কি কলকাতায় এসেছেন?"

—"না, মা রাধানাথকে ছেড়ে কোথাও নড়েন না। কলকাতায় তিনি কি ক'রে আসবেন? তুমি দেখবে মাধু আমাদের রাধানাথকে?—" বলিয়াই অনাদি থামিয়া গেলেন। তাঁহাদের রাধানাথ কি? তিনি ত মৈত্রী-পুত্রের উপাসক। বিগ্রহ ত পুতুল। তাহার দৃষ্টিতে কুসংস্কার। লজ্জায় অনাদির সুগৌর মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মাধুরী স্বামীর পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তি বা বিস্ময়ের ছায়াপাত হইল না। বরঞ্চ একটা গভীরতর সহানুভূতির চিহ্নই তাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিল। ক্ষণপরে মৃদুকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"খোকাকে তিনি স্পর্শ করবেন?"

অনাদি চমকিয়া উঠিলেন। মাধুরীর মৃদুকণ্ঠের উচ্চারিত প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ তীরের মতই যেন অন্তস্তলে বিঁধিয়া বসিল। মুখ তাঁহার বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজের সন্তানকে ক্রোড় করিয়া জননীর কোলে বসাইয়া দিবার দাবী ত তিনি নিজে খর্ব্ব করিয়াছেন এবং এই ক্ষতি যে কত বড়, তাহার প্রবিয়া

তিনি নিজে ছাড়া কেহই জানিতে পারে না। তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইবার পন্থা অনাদি খুঁজিয়া পান না। অন্তর শুধু নিরন্তর বুকের মাঝে কাঁদিয়া মরে।

স্বামীর বিষণ্ণ মুখ, চিন্তিত দৃষ্টির পানে চাহিতেই মাধুরীর বুকে একটা ব্যথার মোচড় দিল। স্বামী মুখ ফুটিয়া নিজের বেদনাটা কোন দিন প্রকাশ না করিলেও পতি-প্রাণার কাছে তাহা অগোচর থাকে না। তাই দুঃখের সঙ্গে একটা গর্ব্বও মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিত শুধু তাঁহাকে পাইবার জন্যই অনাদি আত্ম-পরিজনের মাঝ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন।

মাধুরী কহিলেন, "তুমি খোকাকে মার কাছে নিয়ে যাও, বুঝেছ ?"

পত্নীর পানে চাহিয়া অনাদি কহিলেন,—"তুমি—" বলিয়াই অনাদি থামিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচ্চারিত বাণীর অর্থটা মাধুরীর কাছে অসম্পূর্ণ রহিল না। মাধুরী কহিলেন,—"না, সে হয় না। আমি তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি। নিজে ছেলে কোলে ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারব না।"

* * * *

অতীতের বেদনা কালের প্রলেপে মুছিয়া যায়

অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অনাদি নিজের সমাজের সঙ্গে নিজেকে বেশ মানাইয়া লইয়াছেন। দৃষ্টির শেষ সীমার দৃশ্যের মত পূর্ব্ব-জীবনের দৃশ্য তাঁহার চোখে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল। শুধু দুর্গাষষ্ঠীর দিন যখন উর্ম্মিলার নিকট হইতে শান্তিপুরে ধুতি-চাদর তাঁহার নিকট পার্শেল হইয়া আসে, তখনই কয়েক মুহূর্ত্ত জননীর জন্য সমস্ত প্রাণটা তাঁহার একবার আকুল হইয়া উঠে মাতাপুত্রের দুর্ভেদ্য ব্যবধানের মাঝে এই ক'টি দিনই যেন পরস্পরের কাছে নিবিড় হইয়া জাগিয়া উঠে কিন্তু উর্ম্মিলা এক ছত্র লিখিয়া অবধি পুত্রের কুশল-সংবাদ লইতেন না। নিগূঢ় ব্যথায় অনাদির বুক ভরিয়া থাকিলেও উপযাচক হইয়া তিনিও কোন দিন মায়ের বার্ত্তা লইতেন না। একটা দুরতিক্রমণীয় অভিমান একটা প্রাচীরের মতই মাতা-পুত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত।

অমিতকে লণ্ডনে ম্যাট্রিক পড়াইবার জন্য মাধুরী জেদ ধরিল। অমিতেরও আগ্রহের সীমা নাই। শুধু যাহার মুখের কথার উপর যাওয়াটা নির্ভর করিতেছিল, তিনিই সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ রহিলেন এবং মাধুরীর অনেকখানি পীড়াপীড়িতে যখন কথা কহিলেন, বলিলেন, "এত ছোট বয়েস, ও কোথা যাবে ?"

মাধুরী হাসিয়া ফেলিলেন। অমিতের মুখেও হাসির আভাস দেখা দিল। মাধুরী কহিলেন,—"ষোল বছর বয়সেও ছেলেমানুষ। এমনি ক'রে ডানা চাপা দিয়ে আমরা বংশধরদের ভীরু দুর্ব্বল ক'রে রাখি ব'লে পৃথিবীর সঙ্গে নিজেদের ভালমন্দ নিয়ে ওরা পরিচিত হয়ে উঠতে পারে না।"

অনাদি কহিলেন, "আচ্ছা, ও ছেলেমানুষ নয়, স্বীকার কচ্চি। কিন্তু যখন এখানে পড়া চলে, তখন এত শীগ্‌গির ওদেশে যাবার আবশ্যক কি ?"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অত্যাশ্চর্য্যকে প্রত্যক্ষ করবার মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া মাধুরী কহিলেন,—"আবশ্যক কি ? তুমি যেমন ফার্ষ্ট ক্লাশ এম, এ হয়েও কোন কিছু করবার একটা আবশ্যক খুঁজে পেলে না, শুধু শুধু ঘরে ব'সে বই প'ড়ে কাটালে।"

এই বহুবার শ্রুত অনুযোগ ও বিস্ময় প্রকাশে অনাদি এতটুকু বিচলিত হইলেন না ; শুধু ঈষৎ হাসিলেন। নিজের মনের কৈফিয়ৎ অকপটে মানুষ কোন দিনই মানুষের কাছে দিতে পারে না।

মাধুরী কহিলেন,—"না না, হাসছ কি ! আমার ভয়, ও আবার তোমার হাওয়া পাবে। ও দেশে না গেলে মানুষ ঠিক মানুষ হ'তে পারে না। নিজেকে মজবুত করতে গেলে, য়ুরোপটা একবার ঘুরে আসা চাই। বাবা বলেন,—যত দীর্ঘকাল ওখানে বাস করবে, ওদের ভাল-মন্দ আলো-অন্ধকার চোখে ধরা পড়বে নিজেকে তৈয়ারী করতে।"

বিরক্তিভরা কণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "উচ্ছন্নেও যাবে।"

তর্কের সুরে মাধুরী কহিলেন, "গণ্ডীর বাইরে পা দিলে যে উচ্ছন্ন যাবে, বেড়া দিয়ে তাকে ধ'রে রাখবার মত কিছু নেই।"

মর্ম্মপীড়াই ভিতরের সত্যটাকে টানিয়া বাহির করে। বেদনার মুখেই আত্মবিস্মৃত হইয়া মানুষ [illegible] নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া ফেলে। হঠাৎ [illegible] অনাদি কহিয়া উঠিলেন, [illegible]

আবেগময়। তার বন্যায় কোন বাঁধনই দাঁড়াতে পারে না। সে যখন,—" অনাদি কথাটাকে শেষ না করিয়াই থামিয়া গেলেন। কিন্তু অসমাপ্ত বাণীর মাঝে যে ইঙ্গিতটাকে তিনি গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, ভাষায় অনুচ্চারিত হইলেও, তাহা কিন্তু মাধুরীর কাছে অজ্ঞাত রহিল না।

আঘাত করিলেই প্রতিঘাত বাজে। মাধুরী কহিলেন, "তুমি ভাবছ, বিলেত গিয়ে ও বিয়ে করবে। তাতে আমাদের ধর্ম্মে বাধবে না। আর যদি বাধ্‌ত, তবুও আমি ক্ষমা করতুম, বলতুম, অমি তার বাপের ধাত পেয়েছে। ছেলে-মেয়েদের বিচার করবার আগে, তাদের দোষগুণের আগে নিজেদের আগে বিচার করতে হয়।"

* * * * *

তখনকার মত অমিতের ইংলণ্ড যাবার প্রস্তাবটা চাপা পড়িল। তবে সঙ্কল্পটা মুছিয়া গেল না এবং বছর কয়েক পরে ভিতরে ভিতরে সুদৃঢ় হইয়া সে যখন আত্মপ্রকাশ করিল, তখন অমিত বি, এ পাশ করিয়াছে এবং কথাটা শুধু একা অমিতের নাম নহে, রুবির নাম লইয়া উঠিল।

অনাদি কথাটাকে প্রথমেই হাসির ফুৎকারে উড়াইতে গিয়াছিলেন, অমিতের পাগলামি বলিয়া। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। মাধুরীর ইচ্ছা এবার তীব্রতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনাদির সমস্ত চিত্তটা বর্ষার দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই অপ্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। একটা হারানর শঙ্কা ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসের মত অন্তরটাকে নিমেষে প্লাবিত করিয়া দিল। ঈষৎ উদ্দীপ্তকণ্ঠে তিনি পুত্রকে কহিলেন, "আমি তোমাকে বিলেত যেতে মত দিচ্ছি, কিন্তু রুবিকে নয়। সে যদি যায়, তোমাদের ইচ্ছায় যাবে। এ নিয়ে আমাকে বোঝাতে এস না।"

মাতা-পুত্র নীরব হইয়া গেল। গল্পের আসরে হঠাৎ কলহ হইয়া একসঙ্গে সকলে চুপ করিয়া গেলে নিস্তব্ধতাটা যেমন অশান্তিকর হইয়া খোঁচার মত বিদ্ধ করে, তেমনই এই আকস্মিক মৌনতায় শুধু অমিতদের মাতা-পুত্রকে নহে, অনাদিকেও ভিতরে ভিতরে বিদ্ধ করিল এবং ক্ষণপূর্ব্বে তাঁহার কণ্ঠস্বর যে অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেইটাই এখন অপ্রতিভতায়, লজ্জায় কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। তাই এই নীরবতাকে ভাঙ্গিতে অনাদিই আগে কথা কহিলেন; বলিলেন, "মাধু, মা বেঁচে আছেন। তাই তোমাদের এতখানি ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি বিলেত যাই নি। তোমাদেরও যেতে দিতে পারছি না। শুধু অমিতের ক্ষতি হবে বলেই তাকে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে অমিত কহিল, "আপনি ত কখনও সেখানে যান না।"

—"না, তা যাই না। কিন্তু প্রতীক্ষা করি, যে দিন তিনি ডাকবেন, সে দিন ত হাজির হ'তে হবে।"

* * * *

মানুষের ভাল-মন্দ হাসি-অশ্রুর ডালি লইতে বৎসরগুলি যেমন দ্রুতগতিতে আসে, তেমনই দ্রুতগতিতে চলিয়া যায় এবং তাহাদের পায়ের রেখায় রেখায় জীবের পরমায়ুর রেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়।

অনাদি জননীর আহ্বান-লিপি 'তারে' পাইলেন। ঊর্ম্মিলার জীবন-সন্ধ্যা রাত্রির গাঢ়তার মাঝে মিশিতেছে। পুত্রকে তিনি সপরিবারে উপনীত হইতে বলিয়াছেন।

নীরব ছায়াচিত্রের মত, সমস্ত অতীতটা অনাদির চোখে ভাসিয়া উঠিল। পত্নীর পানে চাহিয়া অনাদি কহিলেন, "যাবে, মাধু?" মানুষের অন্তর যখন নিজেকে একান্ত বিপন্ন জ্ঞান করে, তখন অতি নিকটতমের উপরও জোর করিবার শক্তিটাকে সে হারাইয়া ফেলে। কণ্ঠে শুধু বেদনাভরা একটা অব্যক্ত ভিক্ষার সুর বাজিতে থাকে।

স্বামীর পানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থাটা বুঝিয়া মাধুরী কহিলেন, "নিশ্চয় যাব। তিনি যখন ডেকেছেন, তখন এই দণ্ডেই যেতে হবে। অমি থাকলে সে-ও যেত।"

"কিন্তু আমরা যদি সে বাড়ীতে থাকতে না পাই?"—তীব্রতম আতঙ্কেই বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে। একটা কথা বলিতে অবান্তর অন্য কথা ডাকিয়া আনে। মনের কথাটা দিশাহারা হইয়া পড়ে।

আশ্বাসভরা কণ্ঠে মাধুরী কহিলেন, "সম্ভবতঃ তাই হবে। কিন্তু তাতে ভয় কি? আমরা কি তাঁর বাড়ীতে থাকতে যাচ্ছি? তিনি যেতে আদেশ করেছেন, তাই যাচ্ছি, যদি দয়া ক'রে সেবা গ্রহণ করেন, দু'হাত ভ'রে তা করব। নয় ত দু'চোখ ভ'রে শুধু দেখেই আসব।"

অনাদি কহিলেন, "কিন্তু—"

বাধা দিয়া মাধুরী কহিলেন, "এর মাঝে কিন্তু নেই।

আমার উপর ভর দিয়ে এতখানি বয়স চলেছে, বিপত্তি যখন আসে নি, বাকিটুকুতেও আসবে না। নিশ্চিন্ত হও।"

অতীতে এক দিন উর্ম্মিলার সাধ ছিল, বধূ-সেবা গ্রহণ করিবেন, সে আকাশ-কুসুম বাতাসে ঝরিয়া গিয়াছে। তথাপি মাধুরীর পানে চাহিয়া, তাঁহার কোটরগত নেত্রের ক্ষীণ দৃষ্টিতে বর্ষাকালের সূর্য্যের মত আনন্দের দীপ্তি চকিতে দেখা দিল। অশ্রু-প্রবাহ পর-মুহূর্ত্তেই বহিতে লাগিল।

মাধুরীরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। পুত্রকে তিনি সুদূর প্রবাসে ছাড়িয়াছেন। উর্ম্মিলার দুঃখ সমস্ত অন্তর দিয়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন।

পুত্রের পানে চাহিয়া উর্ম্মিলা কহিলেন, "খোকা, বালিসের তলা হ'তে চাবি নে। গয়নার সিন্দুক খুলে আমার সব গয়না বউমাকে দে।" উর্ম্মিলা থামিলেন। চক্ষু বুজিয়া বুঝি অতীতটাকে একবার দেখিয়া লইলেন। তার পর কহিলেন, "ভেবেছিলুম, এ সব কিছুই তোদের দেব না। সব আমার রাধানাথের। কিন্তু তাঁর শেষ বাণী শুনতে পাচ্ছি। নতুন বৌ, যার যা প্রাপ্য, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করো না। রাধানাথ পরীক্ষা করছেন।"

* * * *

শীতের সকাল। সূর্য্যদেব উঠিবার সময় হইল। কুয়াসার মধ্য হইতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। দিনটা তাই অসোয়াস্তিতে ভরা। তথাপি অনাদির চায়ের টেবলের তর্কের কল্লোল, হাসির তুফান কিছু কম বহিতেছিল না।

অনাদি কহিলেন, "না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। আমি যার তার মেয়েকে পুত্রবধূ করব না।" তাঁহার কণ্ঠে একটা ঝাঁজ ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ ঈষৎ গরম হইল না।

হাসিমাখা কণ্ঠে রুবি কহিল,—"শ্যামলীর বাবা হাইকোর্টের জজ। আর ওর মা খাঁটি ইংরাজের মেয়ে।"

অনাদি কহিলেন,—"না, না, ওরা কখনও ভাল হ'তে পারে না। যারা জাত দেয়, তাদের তুমি কখনও বিশ্বাস করো না, মাধু।"

রুবি গম্ভীর হইয়া গেল। পিতার অন্তরের অকপট উচ্ছ্বাসের প্রতিবাদের ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। রহস্যের আবরণে ঢাকা দিয়া সত্যের সুতীক্ষ্ণ শরাঘাত সে কেমন করিয়া করিবে? কিন্তু মাধুরী নীরব রহিলেন না। স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "না, তোমার চার্চ্চে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তোমার যা কিছু সবই ত আমার জন্যে। আমি রেহাই দিচ্ছি। তুমি একটা প্রায়শ্চিত্তির ব্যবস্থা দেখ গে। নিজেকে দিন-রাত অমন ক'রে গাল দিয়ে ছোট করো না।"

মাধুরীর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

অনাদি পত্নীর রাগ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "খুব সময়েই রেহাই দিচ্ছ, মাধু। ধন্যবাদ তোমাকে। চুলগুলা এখন আমার সাদা হয়েছে।"

মাধুরী অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। সুগৌর মুখের উপর কে যেন একমুঠা আবীর নিক্ষেপ করিল। কহিলেন, "তা কেন, তোমার মন হ'তে—যাক! অমিত শ্যামলীকে, আমার মনে হয়—তুমি কি বল রুবি,—শ্যামলী ত তোমার খুব বন্ধু এক জন?"

অনাদি কহিলেন,—"সেবারের ঈষ্টারের ছুটীতে আমারও ঐ কথাটা মনে হয়েছিল। তাই শ্যামলীকে বেশ ক'রে লক্ষ্য করেছি," বলিয়া পত্নীর হাতখানা ধরিয়া অনাদি কহিলেন,—"মা-বাপকে ছেড়ে এসেছিলুম শুধু তোমার জন্যে। তোমার কাছ হ'তে আজও অশান্তি পাই নি। কিন্তু অমিত কি তা পাবে?—"

রুবি নত হইয়া সংবাদপত্রখানি নাড়িতেছিল। গোটাকয়েক লাইনের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে ঈষৎ চেঁচাইয়া উঠিল। হাত হইতে মাটীতে কাগজখানি পড়িয়া গেল।

স্বামী স্ত্রী দুই জনেই ভীষণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। কন্যার বিবর্ণ পাংশু মুখের পানে চাহিয়া, অনাদি ভয় পাইয়া কহিলেন,—"কি হয়েছে রে?" মাধুরী ত্বরিত হাতে সংবাদপত্রখানি মাটী হইতে তুলিয়া লইলেন। বন্দুকের গুলীতে আহত জীবের প্রাণান্ত-যন্ত্রণার করুণ আর্ত্তনাদের মত বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে মাধুরী কাঁদিয়া উঠিলেন—"অমি,—অমি যে এই জাহাজেই ছিল। আমাদের এ কি সর্বনাশ হ'ল!"

জীবনের চরমতম ক্ষতির মুহূর্ত্তেই আবাল্যের বিশ্বাস তাহার সব শক্তিটুকু লইয়া মাথা-খাড়া দিয়া উঠে। তাই বিপদমুহূর্ত্তে মানুষের মুখ দিয়া 'মা গো' শব্দটা সবার আগে বাহির হয়।

—"রাধানাথ, এ কি শোধ নিচ্ছ" বলিয়াই অনাদি মুখে হাত চাপা দিলেন। মাধুরী ক্ষিপ্তের মত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, "না, না, অসম্ভব,

এ জাহাজে অমি কিছুতেই থাকতে পারে না। আমি তার কচ্ছি।"

হায় রে মানুষের ব্যর্থ চেষ্টা! অমঙ্গলকে গ্রহণ করিবে না বলিয়া, দুই হাতে তাহাকে দূরে ঠেলিতে সে যত প্রয়াসই করুক, সত্য কখনও মিথ্যা হয় না।

সমুদ্রের প্রবল ক্ষুধা যে জাহাজখানিকে রাক্ষসের মত নিজের উদরে পুরিয়াছিল, তাহারই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী মিঃ অমিত সরকার "বার-এট-ল" যে ছিল না, এ কথাটা কেহ একবারও বলিল না। বরং থাকার সম্বন্ধে বহুতর প্রমাণ মাধুরীর কাছে উপনীত হইয়া পুত্রের মৃত্যুটাকে নিশ্চিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া সে যে স্বদেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল।

সৌভাগ্যকে যাহারা জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই ভোগ করেন, দুর্ভাগ্যের প্রথম আঘাতেই তাঁহাদের পরমায়ু নিঃশেষে ফুরাইয়া যায়। মাধুরী পুত্র-শোকটা বেশী দিন ভোগ করিলেন না; ঈশ্বরের শান্তি-ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

ভগবানের কাছে অনাদির নালিশ করিবার কিছু ছিল না। এই নিষ্ঠুর শক্তিশেল প্রাক্তনের ফল বলিয়াই নিজেকে তিনি বুঝাইতে চাহিতেন। তথাপি ভাঙ্গা বুকের মাঝে যে অবুঝ চিত্তটা ছিল, তাহার বেদনাটা এতটুকু উপশম হইত না। আর এই চরমতম দুর্দ্দিনে পত্নী-পুত্রহারা অনাদির অনুক্ষণ শুধু মনে পড়িত রাধানাথ।

মনের দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া কথাটা তিনি কন্যাকে বলিলেন;—"বাবার উইল অনুসারে বিষয়টা সবই আমার হয়েছে। মার অবর্ত্তমানে রাধানাথের সম্পত্তির 'এক্জি-কিউটার' তিনি আমাকেই ক'রে গেলেন। তাই মনে হচ্ছে, দূর হ'তে তাঁর সেবার ভার পাঁচজনকার হাতে দিয়ে আমি অন্যায় কচ্ছি। বাবা, মা এক দিনও রাধানাথকে ছেড়ে নড়েন নি। পাছে তাঁর সেবার ত্রুটি হয় ব'লে।"

রুবি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া কহিল,—"বাবা, ইচ্ছে কর যদি দেশে ফিরে যেতে, আমারও যেতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যাকে ছেড়ে তুমি এসেছ, তাকে ত পাবে না। পাবে শুধু লোকের অসন্তুষ্টি, অবজ্ঞা, ঘৃণা।"

বর্ষার বিষণ্ণ আকাশে শরতের সোণালি আলোকপাতে মধুর দীপ্তি ফুটিয়া উঠার মত দীর্ঘ দিন পরে অনাদির ওষ্ঠে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন,—"মা, নিজের ক্ষুদ্রতার জন্যই মানুষ পরকে গাল-মন্দ করে। তা নিয়ে যদি রাগ করি, রাধানাথের কাছে যেতে না চাই, নিজেকে আমি ছোট ক'রে ফেলব। বাবার উইল বিশ্বাস আর মহত্ব কি জিনিষ, আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।"

রুবি কিছু বুঝিতে পারিল না। পিতার মুখের পানে প্রশ্নপূর্ণ-নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

অনাদি কহিলেন,—"অনাথবন্ধুর ছেলে যে সিংহশাবক, এটুকু প্রমাণ করবার জন্যেই রাধানাথ অমিতকে আমার কাছ হ'তে কেড়ে নিলেন।"

* * * *

অনাদির স্বগ্রামে পদার্পণ করাটা শুভ বলিয়া কাহারও মনে হইল না; প্রীত কেহ হইতে পারিলেন না। ধর্ম্ম-ত্যাগী জমীদার এইবার কি অনাচারের তাণ্ডব বাধাইবে, তাহারই আতঙ্কে ভিতরে ভিতরে সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। তথাপি দেশের জমীদার যখন গ্রামে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাচ্ছীল্য করিয়া উপেক্ষা দেখাইতে কেহ সাহসী হইলেন না। খৃষ্টান হউক, ম্লেচ্ছ হউক, দেশের রাজা বলিয়া অসন্তুষ্টি গোপন করিয়া অনাদিকে তুচ্ছ করিতে, সদালাপে তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে সকলেই জমীদার-বাড়ীতে উপনীত হইলেন। শিখাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণও গেলেন, শিখাবিহীন শূদ্রও গেলেন।

অনাথবন্ধুর সুবৃহৎ বৈঠকখানা সাবেক প্রথায় সাজান হইয়াছিল। মেঝে-জোড়া ফরাস বিছানার উপর খৃষ্টান জমী-দার যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত—আদর-আপ্যায়নের সহিত সকলকে বসাইয়া অনতিদূরে নিজে স্বতন্ত্রভাবে বসিলেন।

কুশল জিজ্ঞাসার মাঝে আলাপ সুরু হইল। অনাদি কহিলেন,—"আমি আপনাদের এক জন হলেও অনেক দিন তফাতে আছি। কিন্তু জানেন ত, ঘরের মায়া বড় মায়া। যত দৌড়-ঝাঁপই করুক, ঘুমবার সময় ছেলে মার ঘরেই ছুটে আসে। সেইটাই তার প্রিয় সব চেয়ে।"

অনাদি হাসিলেন।

সত্য বলিয়া কথাটা সকলে স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেহই স্বস্তি বোধ করিলেন না। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যমের মেঘ যেন থমথম করিতে লাগিল। জন্মভূমি দর্শন করিতে যে শুধু আসেন নাই, তাঁহার

বস-বাসের সঙ্কল্পটাই বাক্যের মাঝে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল, ইহাতে আর কাহার সংশয় রহিল না।

অনাদি সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া কহিলেন, "আমি ত আপনাদের পরিচিত। আমার সঙ্গে নূতন ক'রে পরিচয় করবার কিছু আবশ্যক নেই। আর রোগে শোকে দিন আমার ফুরিয়ে আসছে। যার হাতে সব রইল, যাকে আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, তাকেই পরিচিত ক'রে দিই।"

অনাদি রুবিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সুশিক্ষিতা জমীদার-দুহিতার সহিত পরিচিত হইবার প্রলোভন অনেকের মনেই ছিল। তথাপি আগ্রহের দীপ্তিতে কোন মুখই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত করার মত মন্দির-প্রাঙ্গণের স্মৃতিটা সকলের উপর একটা ছায়াপাত করিল।

পিতার আহ্বানে রুবি আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমত যুক্তকর ললাটে স্পৃষ্ট করিয়া সমাগত-বৃন্দকে একটা নমস্কার জানাইল।

আশীর্ব্বাদের অস্ফুট গুঞ্জন মৃদুতর হইয়া মিলাইবার সঙ্গে মুখুয্যে মশাই কহিলেন,—"মা লক্ষ্মীকে সে দিন মন্দিরে দেখলুম।"

অনাদি কহিলেন,—"হ্যাঁ, ও ঠাকুর দেখতে গেছল। সে দিন বোধ হয় আপনারা ওকে চিনতে পারেন নি।" অনাদি থামিলেন, কিন্তু তাঁহার কথার মাঝে যে খোঁচাটা ছিল, তাহা সকলকে বিঁধিল।

এক জন কহিলেন,—"তখন ভিড়, আরতি—"

বাধা দিয়া অনাদি কহিলেন,—"আমি ওকে ভোগ আরতি দেখতে পাঠিয়েছিলুম। ভবিষ্যতের সব ব্যবস্থা যখন ওর হাতে পড়ছে, এখন হ'তে না দেখে রাখলে বুঝবে কি ক'রে? কি বলেন আপনারা?" উত্তর-প্রত্যাশায় অনাদি একবার নীরব হইলেন।

মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, কিন্তু পায় কতটুকু? অনাদি নিজেই আবার কহিলেন,—"ও যার স্বত্বাধিকারিণী, তার ভাল-মন্দর জন্য পরকে ত চিরদিন দায়ী ক'রে রাখা চলে না। তাতে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়।"

অনাদির এতগুলা কথায় একটা উত্তর অবধি কেহ খুঁজিয়া পাইল না; রসনাতেও কাহার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। প্রচণ্ড বিস্ময় ও তীব্রতম ক্ষতি যেন সকলকে মূক করিয়া রাখিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবতায় কাটিয়া গেল। যাহার সম্পত্তি, সেই যখন হাত বাড়াইয়াছে, ঠেকাইবে কে?

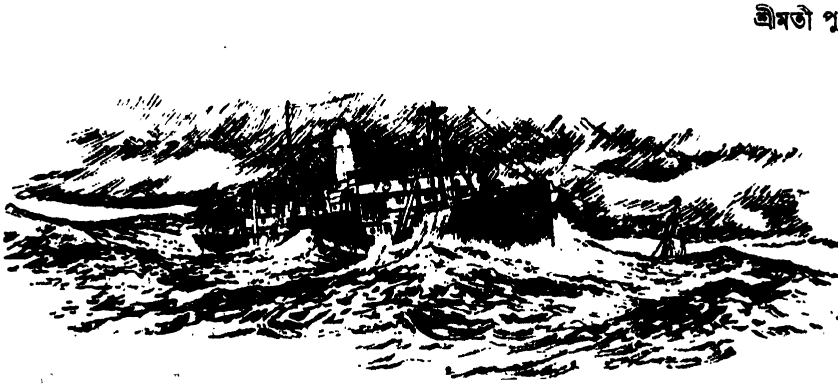
তথাপি গোঁসাই ঠাকুর কহিলেন,—"সে কেমন ক'রে হবে? হিন্দুর মন্দির—"

অনাদি তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন,— "কেন হবে না? আমার কন্যা ত দেবতার পূজা-উপকরণ ছুঁতে যাচ্ছে না।"

মুখুয্যে মশাই কহিলেন,—"তবু সে ত খৃষ্টান।"

অনাদি হাসিলেন। তার পর কহিলেন,—"যিনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর রক্তধারা যাদের দেহের মধ্যে বইছে, তাঁর কাছ হ'তে যাদের উৎপত্তি, তাদের দাবী রাধানাথের উপর সব চেয়ে বড় জানবেন। তাদের যত্ন না পেলে ওঁর তৃপ্তি নেই বলেই আমাকে এমন ক'রে এখানে টেনে এনেছেন। আমি ম্লেচ্ছ হই, খৃষ্টান হই, আমি অনাথবন্ধুর ছেলে।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।



বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম

বিশ্বপ্রেম কথাটি এখন নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বৈষ্ণব সাধক কবির বিশ্বপ্রেম কি তাহারই নামান্তর? না, অন্য কিছু? এখন সার্ব্বজনীন প্রেম, নরনারায়ণ-সেবা, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি শব্দ মানুষিকতা বা বিশ্ব-সৌভ্রাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। 'উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্' হিসাবে কথাটি প্রযোজ্য হইতেছে বলিয়াই যেন মনে হয়। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের এই যে বিরাট উদার বিশ্ব জুড়িয়া প্রেম, ইহাই কি বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম, না ইহা হইতে স্বতন্ত্র আর কিছু?

বর্ত্তমানে আমাদের দৃষ্টি প্রতীচীর দিক্‌চক্রবালে নিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা উহার সভ্যতা, শিক্ষা ও কৃষ্টির আবহাওয়ায় নরনারায়ণসেবাটাকেই—Humanityটাকেই বিশ্বপ্রেম বলিয়া বরণ করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছি। Howard the Philanthropist অথবা Father Damien কিম্বা Abraham Lincoln সেই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে মুক্তিফৌজের General Higgins এ দেশে বেড়াইতে আসিয়া খৃষ্টধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন সৌভ্রাত্রকেই বিশ্বপ্রেম বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এ দেশের শাসকশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় কোনও রাজপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রমের কোন কেন্দ্রের কর্ম্ম-কুশলতার প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, এই মানুষের দ্বারা মানুষের সেবাধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন এই ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ দেশে বিশ্বপ্রেমের অস্তিত্বই ছিল না।

কিন্তু আমি দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রমের ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন যে, এই বুদ্ধ অশোকের দেশে—দধীচি শিবির উপাখ্যানকথা নাই-ই উল্লেখ করিলাম—তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন, খৃষ্টধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া নূতন কিছুই করিতেছেন না।

বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম এই Humanityর বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রসো বৈ সঃ। মানুষিকতা (Humanity), বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম,—এ সকলই সেই রসানুভূতির নামান্তর। এই পুণ্যভূমির সাধক ধর্ম্মপ্রচারক ও সংস্কারকরা এই রসানুভূতি লাভ করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছিলেন, দেশ ও জাতিকেও ধন্য করিয়াছেন। এই বাঙ্গালার অমর বৈষ্ণব কবিরা সেই রসে স্নাত—প্লাবিত হইয়া দেশ ও জাতিকে অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করিবার সুযোগ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের মন্দাকিনীধারার পার্শ্বে Humanityর জর্ডান-ধারার সন্নিবেশ করিলে অপার্থিব ও পার্থিবের বিভিন্ন সমাবেশ বলিয়াই অনুভূত হইবে না কি?

বৈষ্ণব বিশ্বপ্রেমের বৈশিষ্ট্য

মানুষের মধ্যে মানুষের দেহ ধারণ করিয়া ভগবান্ অবতাররূপে যুগে যুগে লীলা করিয়াছেন। সেই লীলার অভিনয়ে যে মহামানবতা—যে বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হইয়াছে, তাহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সখা সখী পতি-পত্নীরূপে সম্বন্ধ পাতাইয়া শ্রীভগবান্ লীলা করিয়াছেন—অপরূপ মনোমোহন সেই লীলা, মানুষও তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জনরূপে আপনাদের মধ্যে পাইয়া তাঁহারই প্রেমরসের সাগরে ডুবিয়াছে, মজিয়াছে, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছে। ক্ষুদ্র পার্থিব প্রেম এ বিশ্বপ্রেমের তুলনায় কতটুকু? ক্ষুদ্র বিন্দু সিন্ধুতে মিশাইয়া যায়, আপনার অস্তিত্ব হারায়। কিন্তু বিন্দু সিন্ধু হইবার পূর্ব্বে লীলাময়ের লীলায় ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই লীলার রসাস্বাদনে ধন্য হয়, জন্ম সফল করে। মানুষের তুচ্ছ জগতের খেলার বিশ্বপ্রেম সেই লীলার অভিনয়কালে বিরাট বিশ্বপ্রেমে মিশাইয়া যায়, বিন্দুপ্রেম সিন্ধুপ্রেমে রূপান্তরিত হয়। আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিরা সাধনার বলে সেই লীলার আস্বাদন করিয়া আমাদের যে রসের পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন, বুঝি অন্য কোন শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির উহা ধারণারও অতীত। আজ সেই বৈষ্ণব সাহিত্য-রত্নাকরের দুই একটি রত্ন কথঞ্চিৎ ভাষান্তরিত হইয়া প্রতীচ্য জগৎকে স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত করিয়াছে; প্রতীচ্যের ভারতীর শ্রেষ্ঠ বরমাল্য তাহার কণ্ঠে অর্পিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব বিশ্বপ্রেমের ধারা

এই বিশ্বপ্রেমের বিকাশে মানুষ ভগবান্‌কে নানাভাবে হৃদয়ে ধারণ করে; অতি নিকট-সম্বন্ধে অতি নিকটে

আনিতে চাহে। ভাই, বন্ধু, পিতামাতা, সখা,'আত্মীয় সম্বন্ধ পাতিয়া তাঁহার সহিত খেলা করে, রাগ অভিমান করে, ভালবাসে, বিরহে আঁধার দেখে, উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়, কাঁধে চড়ে, উদূখলে বন্ধন করে,—এমন কি, কুলবতী লজ্জা-মান-ভয় বিসর্জ্জন দিয়া কলঙ্কিনী কুলটার মত উপপতিরূপে তাঁহাকে কামনা করে।

সাধক কবি গাহিয়াছেন,—"চিনি হতে চাইনে শ্যামা, চিনি খেতে ভালবাসি।" সত্যই প্রেমের মানুষ পরম যোগী জ্ঞানী বৈদান্তিকের মত 'সোহহং' হইয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইতে চাহে না, বরং তাঁহার প্রেমিকরূপে তাঁহার সাধক-সেবকরূপে তাঁহার সগুণ লীলায় তন্ময় হইয়া থাকিতে চাহে। সে সাধকের মত বলে,—কেবল তুমি দেখ মা আর আমি দেখি,—তুমি আর আমি এই ভেদ না রাখিলে সে এই বিশ্বপ্রেমের রসাস্বাদন করিতে পারে না।

ভক্ত কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

নির্গুণ হ্যায় সো মে পিতা হামারা,
সগুণ হ্যায় মাহতারি,
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো,
দুযো পাল্লা ভারী॥

তুলসীদাসের এই যে নির্গুণ পুরুষ আর সগুণ প্রকৃতি, এই যে শিব-শক্তি, ঈশ্বর ও তাঁহার বিভূতি,—ইহাই বৈষ্ণব কবির ভক্ত ভগবান্, তাঁহাদের নিত্যই শ্রীবৃন্দাবনে লীলা হইতেছে। শ্রবণ, মনন, ধ্যান, নিদিধ্যাসন,—এ সকলের দ্বারা সেই রসানুভূতি হইয়া থাকে। তাই পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিতেছেন,—

"যে বাক্য হরিগুণ গায়, তাহাই বাক্য ; যে হস্ত তাঁহার কায করে, সেই-ই হস্ত ; যে মন তাঁহাকে অনুক্ষণ স্মরণ করে, তাহাই মন ; যে শ্রবণ তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহাই শ্রবণ ; যে মস্তক তাঁহার চরণকমলে নত হয়, তাহাই মস্তক ; যে নয়ন অনুক্ষণ তাঁহাকেই দর্শন করে, তাহাই নয়ন ; যে অঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের পাদোদক নিত্য ধারণ করে, তাহাই অঙ্গ।"

এই ভাবেরই কথা শৌনক নৈমিষারণ্যে ঋষি-সভায় সূতকে বলিয়াছিলেন। বিদেহরাজ নিমিকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কুন্তী,—সকলেরই মুখে এই প্রেম-তন্ময়তার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরাও সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানের প্রেম অনুভূতি এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে তাহা অতুলনীয়। আমি তাহারই দুই একটি রত্ন আহরণ করিয়া রসরসিক সাহিত্যিকের রসপিপাসা তৃপ্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছি।

চণ্ডিদাস

প্রেমের কবি মহাকবি চণ্ডিদাস এ বিষয়ে সত্যই অতুলনীয়। তাঁহার রাধা অর্থাৎ ভক্ত মানুষ—শ্যাম নাম শুনিয়া আকুল অবশ হইয়া পড়েন, সে নাম মধুময়। সেই আকুল প্রাণের অবস্থা কিরূপ ?—

"মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো ?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসায়ে পরে॥

এই থাকি থাকি চমকিয়া উঠা, সঘন নিশ্বাস, সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি যায় ভাবটিই প্রেমতন্ময়তা। সে তন্ময়তার চরম অবস্থায় চণ্ডিদাসের রাধা,—

কালিয় বরণ, হিরণ পিধন,
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা॥

এ বড় বিষম ভূতে পাওয়া, এ ভূতে পাইলে ঘর-সংসারে মন বসে না। প্রেয়কে পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা সত্যই ভূতে পাওয়ার মত উন্মত্ত অবস্থা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও এমনই প্রেমোন্মাদ হইয়াছিল।

ভক্তের ত এই অবস্থা, আর ভগবানের? যমুনায় শ্রীরাধাকে যাইতে দেখিয়া চণ্ডিদাসের শ্রীশ্যামসুন্দর বলিতেছেন,—

"সজনি, ও ধনী কে কহ বটে,
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে?"

আর যখন সেই নবীন কিশোরী গৌরী স্নানান্তে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে "চলে নীল সাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর!" জগতের কোন্ সাহিত্যের কোন্ প্রেমতন্ময়তার কোন্ ভাবাভিব্যক্তির ইহার সহিত তুলনা দিব? সে প্রেমতন্ময়তা আসিলে ভক্ত ভগবান্ উভয়কেই বলিতে হয় :—

"পীরিতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পীরিতি শিথান মাথে।
পীরিতি বালিসে, আলিস ত্যজিব
থাকিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি-সরসে সিনান করিব
পীরিতি-অঞ্জন লব।
পীরিতি ধরম পীরিতি করম
পীরিতে পরাণ দিব॥"

এই sublime idealকে—বিশ্বপ্রেমের এই চরম আদর্শকে খৃষ্টান মিশনরীরা তাহাদের ধারণা অনুসারে খাটো করিয়া দেখিতে পারে, কেন না, এ রসের অনুভূতি তাহাদের জন্মজন্মান্তরসাপেক্ষ। বাঙ্গালার মাটীতে বাঙ্গালী হইয়া না জন্মিলে এ রসের আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

চণ্ডিদাসের বিশ্বপ্রেমের ধারণা করিতে অথবা পরিমাপ করিতে যাওয়া কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। সে স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে আনন্দগর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হয়, নয়ন পুলকাশ্রুপ্লুত হয় যে, এই চণ্ডিদাস আমার এই বাঙ্গালা মায়ের কোলেই জন্মিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী সাধক কবিরূপে বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে॥"

চণ্ডিদাসের রাধা ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাই পরেতে মিশিবার কালে বলিতে পারিয়াছিলেন,—"অখিলের নাথ! তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।" যোগীর আরাধ্য ধনকে আপনার অতি আপনার জ্ঞান করার ভূমানন্দের অনুভূতি, সে কেবল সাধক বাঙ্গালী ভক্ত বৈষ্ণব কবিতেই সম্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালী আমরা শ্রদ্ধানতশিরে আমাদের জাতীয় এই মহাকবির ভাবাভিব্যক্তির রস-সায়রে ডুবিতে পারি, এ প্রার্থনা কি অসঙ্গত?

গোবিন্দদাস

বাঙ্গালীর আর এক মহাকবি গোবিন্দদাস। তিনি ভগবান্‌কে কি ভাবে বুকের মাঝে টানিয়া লইতেছেন দেখুন :—

"গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া।
আভীর-বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণগুণ,
গোপী রৈল চাঁদমুখ চাঞা॥
আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যাদুমণি,
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিছ ছাড়ি,
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস॥"

বন্ধু, সখা, পুত্র, প্রিয়, সবই সেই ভগবান্। তাঁহার রূপে সবাই মগ্ন। এ কি রূপজ মোহ? না, গোবিন্দদাস বলিতেছেন ;—

"সে পদ-পল্লব, বিরিঞ্চি-দুর্ল্লভ
যোগীর ধ্যানে অতি দূর।
ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি
পায় ধরি পরায় নূপুর॥"

এ যে সিন্ধুপ্রেম। এ প্রেম-হারা হইবার আশঙ্কায় গোবিন্দদাসের গোপগোপীরা বলিতেছে :—

"হরি না কি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুলবাস জীবনে কি আর আশ
বধভাগী হইল অক্রূর॥
ছাড়িবে গোকুলচন্দ্র পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে,
সবার আগে মরিবেক রাধা॥

এ কি প্রেম ? জন্মজন্মান্তরেও ইহাতে ছাড়াছাড়ি নাই। তাই গোবিন্দদাস বলিতেছেন,—"জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।" পিয়ারও আকুলি-বিকুলি কিরূপ ? কৃষ্ণ মথুরায় ব্রজের দূতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"তাহারে পুছল ব্রজকুশল কি বাত
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত।
কৈছন কাননে চরত ধেনু
কৈছন সখীগণ পুরত বেণু।
কৈছনে যমুনা উথলেহি নীর
কৈছনে শারী শুক বোলত গীর।
কৈছনে আছয়ে ব্রজকুলনারী
কৈছনে আছয়ে রাই হামারি।"

আর ভক্তের আকুলি-বিকুলি ? গোবিন্দদাস গাহিতেছেন :—

"ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝর॥
যশোমতি নন্দ, অন্ধসম বৈঠই
সাহসে চলই না পায়।
সখাগণ বেণু, ধেনু সহ বিসরণ
রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করহি গান॥"

সর্ব্বপ্রেমমূলাধারের বিরহে ব্রজের এমনই অবস্থা! গোপীদের কথা সকলের শেষে—তাহাদের নয়নের জল—

সোই যমুনাজল অবহুঁ অধিক ভেল!

এই যে স্থাবর জঙ্গম বিশ্বচরাচর ও বিশ্বপ্রেমময়ের একাঙ্গীভাব—প্রকৃতিও যে প্রেম ও বিরহে হাসে কাঁদে—ইহাই বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম। ভক্ত ভগবানের এ প্রেমের খেলার রসাস্বাদ বৈষ্ণব কবিরাই করিয়াছিলেন, করিয়া সে রসের পরিবেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর, বিরহ, অভিসার,—এ সব ত মানুষের জীবনের নিত্য ঘটনা। কিন্তু সাধক ভক্ত কবি তাহার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তাই গোবিন্দদাস ভক্তশ্রেষ্ঠের চরণে মাথা লুটাইয়া গাহিয়াছেন ;—

"পতিতপাবনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়।
দূরে না ফেলিহ মোরে রাখিহ সখীর মেলে
মিছা কাজে এ জনম যায়॥"

এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের এ প্রেমলীলার রসাস্বাদ করিতে পারিলেন ত ? সখীর মেলে—এই ভক্ত সাধকের মেলায় পাপী তাপী বাঙ্গালীর স্থান হউক, শ্রীগোবিন্দদাসের চরণে এই প্রার্থনা!

বিদ্যাপতি

মহাকবি বিদ্যাপতিও সেই বিশ্বপ্রেমের রূপ দেখিয়াছিলেন,—তথাপি দেখিয়াও তৃপ্তি পান নাই ;—জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল! তাঁহারও দৃষ্টি মানুষের তথাকথিত বিশ্বপ্রেমের বহু উর্দ্ধে :—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়নু
মেলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি! বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥"

বেলা অবসান হইল, এই সাঁঝের বেলা আমার কি উপায় হইবে ? হে জগবন্ধু! তোমার পদনৌকায় বাঁধা থাকিলেই পার হইব। সুত মিত রমণী সংসারে কিরূপ ? সে সব তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম। হে দীনদয়াময়! তুঁহু জগতারণ। তোহারি বিশোয়াসাই একমাত্র অভয়দাতা।

এই বিশ্বাস, এই একান্ত নির্ভরতা কত মধুর! কত সান্ত্বনাদায়ক! বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে সখা, ভাই, বন্ধু, পুত্র—কত সাজে সাজাইয়াছেন, নিপট কপট বঁধুরূপেও মানিনী প্রেমিকার চরণে ধরাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিণামের দৃষ্টি কত উর্দ্ধে!

সাধক ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—তুমি দেখ মা আর আমি দেখি মা। এই সঙ্গোপনে দেখাদেখি ভক্ত-ভগবানের সাক্ষাৎকার বিশ্বপ্রেমের চরম আদর্শ। দাশরথি রায় জোর করিয়া প্রেমের স্পর্শমণিকে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন,—

আয় মা সাধন-সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে !

কি অদ্ভুত আত্মহারা অগাধ বিশ্বাস, কি চরম আত্ম-নির্ভরতা ! এ যেন গোবিন্দদাসেরই "অভয়ে তোহারই বিশোয়াসা"রই অনুরূপ উক্তি।

রায় বসন্ত

রায় বসন্তও সাধক ভক্ত বৈষ্ণব কবি। তিনিও চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের মত আরাধ্য ধনকে বলিতেছেন ;—

"অহে নাথ ! কিছুই না জানি
তোমাতে মগন দিবস-রজনী ॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখী ॥
অঙ্গ-আভরণ তুমি নয়নে অঞ্জন
বদনে বচন তুমি শ্রবণ-রঞ্জন ॥"

এখানেও কি শুকদেব বা পরীক্ষিতের, ধ্রুব বা প্রহ্লাদের, নারদ বা কুন্তীর একাঙ্গীভাব—একান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুভূতির ভাব দেখা দিতেছে না ? রায় বসন্তের 'প্রেমের পুতলী' মানুষেরই মত প্রেমিকাকে বলেন, "তোমা না হেরিয়া আমি কেমনে রহিব ?" প্রেমিকা প্রেমের পুতলীকে বলেন, —"বঁধু ! তুঁহু দয়ার সাগর ! হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর।"

আরও বলেন,—"বঁধু ! আমি পরাণ নিছিয়া দেই পীরিতে তোমার।" এ ভক্ত-ভগবানের প্রেমের খেলা—এ বিশ্বপ্রেমের চরম বিকাশ কোথায় খুঁজিয়া পাইব ? যেখানে পরাণ নিছিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে দুই এক হয়, বিন্দু সিন্ধুতে মিশায়। সে কথা রায় বসন্তও বলিতেছেন :—

"ধনি ! তুয়া কিসের গঞ্জনা
তুমি আমি একই পরাণ দুজনা ॥
তোমার আমার গতি মুরতি এক ভাব
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব ॥
তুমি মোর ত্রিজগতে বিভব বিহার
পরাণ-পুতলী মোর হিয়ে মণিহার ॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার
রায় বসন্ত পহু পীরিতির সার ॥"

এখানেও চণ্ডিদাস গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সেই প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, একাঙ্গীভাব, সেই—দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। কবিত্ব-শক্তিতে, শব্দবিন্যাসে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে হয় ত রায় বসন্ত তাঁহাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন, কিন্তু ভাবে, প্রকাশে সবাই সমান। আমাদেরই বাঙ্গালার কবি এই বিশ্বপ্রেমে ডুবিয়া তাহার রসাস্বাদ করিয়া সেই অমৃতধারা আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য অপার যে, তত উর্দ্ধে আমাদের নজর চলে না বলিয়া আমরা বিদেশ হইতে আমদানী বিজাতীয় বিশ্বপ্রেমকে তাহার উর্দ্ধে স্থান দিই। কবি সাধক ও ভক্ত না হইলে এ রস আস্বাদন করিতে পারেন না। হয় ত তাঁহার রচনায় কল্পনার ও উদ্ভাবনী শক্তির চরমোৎকর্ষ সম্ভব হয়, হয় ত তাঁহার মনীষার অদ্ভুত অনন্যসাধারণ স্ফুরণের অবসর হয়, কিন্তু সাধক ভক্ত কবির প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের বিশ্লেষণ তাঁহাতে সম্ভব হয় না, হইতে পারে না।

আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিরা আমাদিগকে যে অমূল্য সম্পদে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ, ধন্য, কৃতার্থম্মন্য। আজ যদি বাঙ্গালীর সমস্ত সম্পদ্ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও চিহ্নও ভবিষ্যতে বিদ্যমান না থাকে, কিন্তু যদি কেবল বাঙ্গালীর এই সম্পদটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর আনন্দ করিবার—গর্ব্ব করিবার সকল সম্পদই থাকে। ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, যাহাই বলি, আমরা—সকলই ভূমানন্দের নামান্তর। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি সেই আনন্দের উৎসের সন্ধান—পুরুষ-প্রকৃতির নির্গুণ সগুণ খেলার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই অতুলনীয় দান শ্রদ্ধানত শিরে ধারণ করিতে এবং তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হই, বৈষ্ণব কবিগণের চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

২৮

"আর কত দূর ?" প্রশ্নটি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছিল, সে জেলের হেড ওয়ার্ডার। সে বলিল, "এই সামনেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের খাস দপ্তর, এখানেই দেখা হবে।"

সে সেলাম করিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, বিমলচন্দ্র তাহাকে খুসী করিয়া কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইল। ওয়ার্ডার দ্বারে উপবিষ্ট প্রহরীকে ছাড়পত্র দেখাইয়া চলিয়া গেল।

"ও কি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোন্ ? এস, চ'লে এস ভিতরে।"

বিমলচন্দ্র পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যোৎস্নাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। জ্যোৎস্না স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। সমগ্র অন্তরমধ্যে এ কি প্রচণ্ড স্পন্দন! তাহার দেহের প্রতি অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া আসিল। তাহার চরণযুগল তাহাকে বহন করিতে কোনও মতেই সম্মত নহে।

বিমলচন্দ্র দুই পদ পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া সস্নেহে জ্যোৎস্নার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "এ সময়েও লজ্জা ? ছি বোন্!"

লজ্জা!—সঙ্কোচ!—মানুষ বাহির হইতে তাহার অন্তরের সংবাদ রাখিবে ? তরুণী নারীর—দৈবপীড়িতা স্বামিসঙ্গ-বর্জ্জিতা পত্নীর মনের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ইতিহাস সাংসারিক ভোগী মানুষ অনুমান করিয়া যথাযথভাবে লেখনীর সাহায্যে রচনা করিতে পারে ?

প্রবল চেষ্টায় কোনও মতে আত্মস্থা হইয়া সে কক্ষমধ্যে পা বাড়াইল। সমস্ত কক্ষটার আলোক ও বাতাস তাহার নয়নে যেন ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছিল।

পতনবেগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া সে সম্মুখের চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল।

কক্ষমধ্যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আপিসের খাতাপত্রের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, জ্যোৎস্নাকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বসিতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া ১০ নং কক্ষ হইতে ৭ নং কয়েদীকে আনিবার হুকুম দিলেন। আসন অধিকার করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, যা কথা হবে, আমার সামনেই হ'তে হবে। বোধ হয়, মিঃ দত্ত এ কথা আপনাকে জানিয়ে তার পর এখানে এনেছেন ?"

জ্যোৎস্না মাথা নত করিয়া কোনও মতে আসনে বসিয়া পড়িল। বিমলচন্দ্র জানাইল, এ কথা তাহাকে জানান হইয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি তখন বিস্মিত-নেত্রে জ্যোৎস্নার অসামান্য রূপলাবণ্য তন্ময় হইয়া সন্দর্শন করিতেছিলেন।

দ্বারপ্রান্তে প্রবেশানুমতি প্রার্থনার সঙ্কেতসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল। মুহূর্ত্ত পরেই মুক্ত দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। সাহস সঞ্চয় করিয়া সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিতে পারিল না।

অল্পদিনের হইলেও সে কণ্ঠস্বর তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তরের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই স্পন্দিত অন্তরের সমগ্র আন্দোলন যেন মন্ত্রবলে রুদ্ধ, স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে শুনিল, রণেন্দ্র বলিতেছে, "আমি ত জানিয়েই ছিলুম যে, কারও সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই। তবে আপনি অনর্থক আমায় ডেকে পাঠালেন কেন ?"

জ্যোৎস্নার হৃদয়স্পন্দন আবার আরম্ভ হইল। সে কাষ্ঠাসনের হাতল দুইটি সবলে চাপিয়া ধরিল। বিমলচন্দ্র রণেন্দ্রের দিকে চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রণেন্দ্র আশে-পাশে কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করিল না।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "বসুন, রণেন বাবু। কেন দেখা করতে বলেছি, তা এখনই বলছি। এঁরা আপনার পরমাত্মীয় বলেই জেনেছি। আইনে অভিযুক্ত আসামীকে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য সকল রকম ব্যবস্থা করার ও সুযোগ দেওয়ার নিয়ম আছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরু—হয় ত চরম দণ্ডও হ'তে পারে, তা জানেন ?"

রণেন্দ্র দাঁড়াইয়াই ছিল। সে দৃঢ় অবিকম্পিত স্বরে বলিল, "সে জন্য ত আমি প্রস্তুত।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "আপনি প্রস্তুত থাকতে পারেন, কিন্তু আইনের মর্য্যাদা যাঁরা রাখেন, সেই সরকার বাহাদুর তা পারেন না। যতক্ষণ অভিযোগ মিথ্যে ব'লে প্রমাণ হবার আশা থাকে, ততক্ষণ তার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।"

রণেন্দ্র বলিল, "আপনাদের আইনে কি আছে, জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, অভিযুক্ত আসামী যদি স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা না করে, তা হ'লে তাকে সাক্ষাৎ করতে আইনে বাধ্য করে কি?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "না, তা করে না। সাক্ষাৎ করা না করা কয়েদীর ইচ্ছাধীন।"

রণেন্দ্র বলিল, "যদি তা হয়, তা হ'লে আমায় আমার ঘরে রেখে আসতে ব'লে দিন। আমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই না, এ কথা আপনাকে শেষ জানিয়ে রাখলুম।"

জ্যোৎস্নার মাথাটা বুঝি মাটীর সহিত মিশাইয়া গেল। বিমলচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "রণেন বাবু, আমি আপনার পরিচিত না হলেও সবই শুনেছি, সবই জানি। ইনি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সহধর্ম্মিণী, এঁর কি বলবার আছে, তাও শুনতে চান না?"

রণেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কঠোর স্বরে বলিল, "আপনি আমায় আমার কামরায় রেখে আসবার কি বন্দোবস্ত করলেন?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঙ্গিত করিলেন, ওয়ার্ডার রণেন্দ্রকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। বিমলচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিল, "রণেন্দ্র বাবু, ছুটো প্রাণকে এমন ক'রে রাগে অভিমানে হাড়কাঠে বলি দেবেন না। আমি বলছি শুনুন,—শুনে রাখুন, আপনার হিতৈষী কালীদা আর গুপী গুণ্ডা আপনার নাম জাল ক'রে ধরা পড়েছে। প্রমাণ হয়ে গেছে, তারা শাস্তি ভোগ করতে যাচ্ছে। আপনাদের সর্ব্বনাশ করবার অনেক ষড়যন্ত্র—"

বিমল দেখিল, রণেন্দ্র পশ্চাতে ফিরিয়াও তাকাইল না, কোন প্রকার আগ্রহ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তখন বিমলচন্দ্র ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হার্টলেস ব্রুট!" ততক্ষণ রণেন্দ্রনাথ দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে আছিস, শীগ্‌গির জল! যা, যা, হাঁসপাতালে যে কোন নার্সকে খবর দে, যা' ছুটে যা,—"

মূর্চ্ছিতা, সংজ্ঞাশূন্যা জ্যোৎস্নার দেহ কাষ্ঠাসনের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল—প্রত্যাখ্যানের নির্ম্মম কঠোর আঘাতে সেই সুবর্ণ-প্রতিমার কোমল অন্তর বোধ হয়, চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিমলচন্দ্র তাহার মাথার উপর কম্পিত হস্ত রক্ষা করিয়া অশ্রুস্রোতে অন্ধপ্রায় হইয়া ডাকিল, "জ্যোৎস্না, দিদি!—"

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

সম্পূর্ণ

বিগত গুণীর যন্ত্র হেরিয়া

এক দিন সুনিপুণ অঙ্গুলী যাঁহার
তুলিত তোমার বক্ষে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,

ঝরাইত ঝর-ঝর সুরের নির্ঝর
সুধারসে সিক্ত করি তৃষিত অন্তর,
ফুটাইত মূর্চ্ছনায় মীড়ে বারে বার
শ্বেত-শতদলরাশি ভারতী-পূজার।

পাবে না পাবে না ফিরে মমতায় ভরা
সুকোমল সেই স্পর্শ চিত্ত দ্রব করা,
যন্ত্রী গেছে, তন্ত্রী তব বাঁধিবে না আর,
করিবে না জড় ও দেহে চেতনা সঞ্চার।

নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে ব্যথিত অন্তরে
তাই বুঝি প'ড়ে আছ আজি ধূলি 'পরে?
তোমারে হেরিয়া মোর চক্ষে আসে জল,
বক্ষে জাগে সে গুণীর মূরতি কেবল।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কুগার

আমাদের দেশের চিতাবাঘ-জাতীয় বাঘগুলি মার্কিণ মুলুকে 'কুগার' নামে পরিচিত। আমেরিকার সকল দেশে কুগার দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃটিশ কলম্বিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে ইহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু বৃটিশ কলম্বিয়ায় ইহাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, এই দেশটিকে সাধারণে 'কুগারের দেশ' বলিয়া অভিহিত করে।

সম্প্রতি এক জন ভ্রমণকারী কুগার-সংক্রান্ত কয়েকটি সত্য ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে—এই আশায় সেই বিবরণগুলি নিয়ে বিবৃত হইল। ছোট ছেলেমেয়ে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে—ইহা কি আশ্চর্য্য ঘটনা নহে?



মার্কিণের বাঘ কুগার

অন্যান্য বন্যজন্তুর ন্যায় কুগারও স্বভাবতঃ মনুষ্যের সংস্রব পরিহারের চেষ্টা করে। কিন্তু কখন কখন ইহাদের স্বভাবের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়; সুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে। ইহাদের স্বভাবের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, কুকুরগুলি ইহাদের দুই চক্ষুর বিষ। কুকুর দেখিলে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ইহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ অপরিসীম। কুকুরের ঘ্রাণ পাইলে ইহারা ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে না।

সম্প্রতি বৃটিশ কলম্বিয়ার কোন পল্লীবাসীর বারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে ছোট দুইটি ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া স্কুলে যাইতেছিল; তাহাদের সঙ্গে ছিল—একটি পোষা টেরিয়ার কুকুর। তাহারা যে পথে স্কুলে যাইতেছিল, সেই পথের দুই ধারে লোকালয় ছিল না; শালবনের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ বনপথটি প্রসারিত। সেই পথে চলিতে চলিতে শিশু তিনটি বনের ভিতর হইতে গম্ভীর 'খ্যাঁৎ-খ্যাঁৎ' শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত পরেই পীতাভ বাদামী রঙ্গের এক প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখের পথ রোধ করিল।

কুগারটাকে আচম্বিতে তাহাদের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ছেলেমেয়ে তিনটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। বাঘটা পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেল না; সে পথের উপর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া, তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল, এবং সম্মুখে শিকার দেখিয়া সে মাটীতে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

বালক-বালিকাদের সঙ্গী কুকুরটি কুকুরজাতির দুর্দ্দান্ত শত্রু কুগারটাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া ছেলেমেয়েগুলির পা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল এবং লোমাঞ্চিত-দেহে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। কুগার কুকুরটাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য এ রকম একটা লাফ দিল যে, সে বালক-বালিকা তিনটার মাথা ডিঙ্গাইয়া অন্য পাশে পড়িল।

কুগারটাকে ঐ ভাবে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া ক্ষুদ্র কুকুরটি প্রাণভয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; ইঁদুরকে পলায়ন করিতে দেখিলে বিড়াল যে ভাবে তাহার অনুসরণ করে, বাঘটাও সেই ভাবে কুকুরটাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কুকুরটি যখন দেখিল, কুগারের কবল হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন সে একটি মেয়ের পায়ের কাছে আসিয়া আশ্রয়লাভের জন্য কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। মেয়েটি নিজেদের বিপদের কথা ভুলিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আদরের কুকুরটিকে কোলে তুলিয়া লইল।

ইহাতে সেই মেয়েটির প্রতি কুগারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে মেয়েটির পাশে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার একখানি হাত কামড়াইয়া ধরিল এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া জঙ্গলের

দিকে চলিল। তখন তাহারা তিন জনেই সাহায্য-প্রার্থনায় যথাশক্তি চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু সেই অরণ্যপথে জনমানবের সমাগম ছিল না, তাহাদের কাতর আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। বালকটি তখন যে সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিল, বারো বছরের ছেলের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।

বালকটি কুগার-টাকে আক্রমণ করিবার জন্য একগাছা লাঠী বা গাছের ডাল খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু সে সেরূপ কোন হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে হঠাৎ পথের ধারে নিক্ষিপ্ত একটা খালি বোতল দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ বোতলটা তুলিয়া লইল, এবং তাড়াতাড়ি কুগারের সম্মুখে আসিয়া, সেই বোতলের গলা ধরিয়া তদ্দ্বারা বাঘটাকে এলোপাথাড়ি ঠেঙাইতে লাগিল। ছেলেমানুষ, তাহার দেহে যতটুকু শক্তি—সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে সে ত্রুটি করিল না। অন্য মেয়েটি এই কার্য্যে তাহার দাদাকে সাহায্য করিবার জন্য গাছের একটি শাখা সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া বাঘটাকে লাঠাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু দুইটি শিশুর আক্রমণে ঐরূপ প্রকাণ্ডকায় বলবান্ ব্যাঘ্রের কি ক্ষতি হইবে?—বালকের হস্তস্থিত বোতলের আঘাতে বাঘটা ক্ষেপিয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রচণ্ডবেগে এরূপ এক থাবা মারিল যে, সেই আঘাতে বালকটি উড়িয়া গিয়া পথের অন্য ধারে ঘাসের উপর নিক্ষিপ্ত হইল! কুগারটা বালকের পাঁজরায় সজোরে থাবা মারায় তাহার সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ নখরগুলি সেই স্থানে বিদ্ধ



বালকটি বোতল দিয়া কুগারটাকে ঠেঙাইতে লাগিল

হইয়াছিল। ক্ষতমুখ হইতে শোণিতরাশি নিঃসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভগিনীর জীবন-রক্ষার জন্য নিজের বিপদ ও আঘাতযন্ত্রণা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পুনর্ব্বার কুগারটাকে আক্রমণ করিয়া বোতল দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। শেষে

কুগারের শক্ত মাথায় বোতলের ঘা পড়িতেই বোতলটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। বোতলটার গলাটুকুমাত্র বালকের হাতে রহিল। কিন্তু তখনও সে কুগারটাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল না। ক্রুদ্ধ কুগার তাহাকে আরও থাবা মারিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল; বালক তখন দুই একটা সেই ভাঙ্গা বোতলের কানা দিয়া বাঘটাকে খোঁচাইতে লাগিল। অবশেষে বালকটির মাথায় এক ফন্দী জোগাইল; সে সেই বোতলের ধারালো কানা দিয়া বাঘটার এক চোখে মারিল এক খোঁচা! ভাঙ্গা কাচ শার্দ্দুলরাজের চোখের তারার ভিতর প্রায় এক ইঞ্চি বসিয়া গেল!

চোখের যন্ত্রণায় বাঘটা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেই মেয়েটির হাতখানি তাহার উন্মুক্ত মুখবিবর হইতে খসিয়া পড়িল। বালিকা তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। বাঘটা অসহ্য যন্ত্রণায় পথপ্রান্তবর্ত্তী ঘাসের উপর গড়াইতে গড়াইতে থাবা দিয়া আহত চক্ষু ঘষিতে লাগিল। সেই সুযোগে বালক-বালিকা তিনটি দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া স্কুলে উপস্থিত হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাদের ভীষণ বিপদ ও বিপদ হইতে উদ্ধারের বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর ডাক্তার আনাইয়া বালক-বালিকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে তাহারা ভাই-বোনে আরোগ্যলাভ করিল; কিন্তু ক্ষতচিহ্ন বিলুপ্ত হইল না। আরও কিছু দিন পরে এক জন শিকারী সেই গ্রামের কয়েক মাইল দূরে একটি কুগার শিকার করিয়াছিলেন। তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—তাহার একটি চক্ষু অন্ধ। কয়েক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাঘটার দেহ কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। শিকারীর গুলীতে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।

কুগারগুলা ঘোড়ার মহাশত্রু; এ জন্য কলম্বিয়া অঞ্চলে যাহারা ঘোড়ার ব্যবসায় করে, কুগারের অত্যাচারে তাহাদিগকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যে সকল ঘোড়া ইহারা হত্যা করিতে না পারে, তাহাদিগকে এ ভাবে জখম করিয়া যায় যে, সেই ঘোড়াগুলি চির-জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহারা ঘোড়ার গলা কাটিয়া রক্ত শোষণ করে, তাহার পর উদর বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে। অশ্বপালক বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া কুগার কর্ত্তৃক নিহত অশ্বের মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

কুগারগুলা এই ভাবে মেষপাল ও অশ্ব হত্যা করে বলিয়া মার্কিণ-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, কেহ কুগার শিকার করিতে পারিলে শিকারীকে প্রত্যেক কুগারের জন্য চল্লিশ ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন বৃটিশ কলম্বিয়ার মেষ-ব্যবসায়ীদের সমিতি হইতে প্রত্যেক কুগারের মস্তকের জন্য পাঁচ ডলার পুরস্কার দানের ব্যবস্থা আছে। ইহার উপর কুগারের চামড়া বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক চামড়ার জন্য দশ হইতে পঁচিশ ডলার মূল্য পাওয়া যায়। চাহিদা অনুসারে চামড়ার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চীনাম্যানরা কুগারের মাংসের পরম ভক্ত। তাহারা বলে, এই মাংস যেমন নরম, সেইরূপ মুখরোচক। এক একটা কুগারের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যে মাংস পাওয়া যায়, চীনাম্যানরা তাহা পাঁচ ডলার মূল্যে ক্রয় করে। সুতরাং একটা কুগার শিকার করিতে পারিলে শিকারীর যে অর্থলাভ হয়, তাহার পরিমাণ ন্যূনকল্পে ৪০+৫+১০+৫=৬০ ডলার। ইহা আমাদের দেশের পৌনে দুই শত টাকারও অধিক। বৃটিশ কলম্বিয়ায় কুগারের বংশবৃদ্ধি হইতেছে বটে; কিন্তু এই জাতীয় ব্যাঘ্র শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া একপাল কুকুরের সাহায্যে যদি কোন শিকারী একটি কুগার শিকার করে, তাহা হইলে সেই দুর্গম স্থান হইতে প্রকাণ্ড মৃতদেহটি লোকালয়ে বহন করিয়া আনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুগারগুলা কুকুরের মহাশত্রু; এখানে ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

বৃটিশ কলম্বিয়ায় ভিক্টোরিয়া নগরের সুকী জেলায় একটি হ্রদ আছে। এক জন লোক এই হ্রদের একটি বাঁধা ঘাটে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল। সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি মাছ গাঁথিয়া তুলিল; মাছে তাহার 'খালুই' পুরিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া শিকারী ছিপ তুলিয়া হুইলের সূতা গুটাইয়া লইল, এবং বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিতে করিতে তাহার পোষা কুকুরটাকে শিস্ দিয়া ডাকিতে লাগিল। কুকুরটাও

শিকারের সন্ধানে কিছু দূরে গিয়াছিল ; প্রভুর শিস্ শুনিয়া দূর হইতে সে 'ভৌ—ঔ—ঔ' শব্দে সাড়া দিল ; কিন্তু দুই এক মিনিট পরেই কুকুরটা হঠাৎ আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হ্রদের তীরে কিছু দূর ব্যাপিয়া লতা-গুল্মের আবরণ ছিল। সহসা সেই গুল্মরাশি সবেগে আন্দোলিত হইল, মুহূর্ত্ত পরেই শিকারী দুইটি জানোয়ারকে তীরবেগে হ্রদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে তাহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইলেও মুহূর্ত্ত পরে সে যাহা দেখিল, তাহাতে আতঙ্কে তাহার দেহ লোমাঞ্চিত হইল, তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল ; প্রকাণ্ড দেহ দেখিয়া দ্বিতীয়বার আর সে দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইল না। সে ছিপখানা ও মাছের 'খালুই' ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ হ্রদের জলে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার কুকুরের অনুসরণ করিল।

হ্রদের জল বরফের মত শীতল। সেই জলে পড়িয়া তাহার গরম মাথা ঠাণ্ডা হইলে সে বাঁধাঘাটের দিকে ফিরিয়া চাহিল। সে দেখিল, একটা প্রকাণ্ড কুগার ঘাটে দাঁড়াইয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে করিতে তাহার দিকে চাহিয়া মুখব্যাদান করিতেছে! সে কুগারটাকে ভয় দেখাইবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে উভয় হস্তে



মৎস্য-শিকারী পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার ছিপ ও মৎস্যপূর্ণ খালুই ফেলিয়া রাখিয়া হ্রদের জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার কুকুরটি প্রাণভয়ে সাঁতার দিয়া পলায়ন করিতেছে

সে দেখিল, তাহার সাদা ও কালো রঙের কুকুরটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুতবেগে সেই বাঁধাঘাটে উপস্থিত হইল, এবং তাহার দিকে না চাহিয়া বা মুহূর্ত্তের জন্য সেখানে না দাঁড়াইয়া 'ঝপাং' শব্দে হ্রদের জলে লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর সাঁতার দিয়া বহুদূর চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে পীতাভ বাদামী রঙের একটা ভীষণাকৃতি জানোয়ার বনের ভিতর হইতে দ্রুতবেগে সেই ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল ; শিকারী তাহার ভাঁটার মত চোখ দু'টি জ্বলিতে দেখিল, তাহার মুখভরা দাঁতগুলা কি ভীষণ! শিকারী সেই কুগারটার জলে আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে কুগারটা অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

কুগার হ্রদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে মৎস্য শিকারী তীরে উঠিয়া কুকুরটিকে ডাকিতে লাগিল। কুকুর ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারিল, তাহার শত্রু দূরে চলিয়া গিয়াছে ; তখন সে জল হইতে উঠিয়া তাহার প্রভুর পাশে আসিল। শিকারী ছিপ হাতে লইয়া মাছের 'খালুই' সেখানে দেখিতে পাইল না। সে বুঝিল, কুগারটা এক খালুই মাছসহ খালুইটা মুখে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান

করিয়াছে। তাহার সকল শ্রম বিফল হইল ; অধিকন্তু সন্ধ্যাকালে প্রাণভয়ে তাহাকে হ্রদের তুষার-শীতল জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া সিক্তবস্ত্রে শীতে কাঁপিয়া মরিতে হইল। সে ক্রুদ্ধস্বরে কুগারটাকে গালি দিতে দিতে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিল।

কুগারের আবির্ভাবে মৎস্য-শিকারীর এইরূপ দুর্দ্দশা হইলেও এই ঘটনার অল্পদিন পরে ঠিক এই রকম ব্যাপারে তিন জন মৎস্যজীবীর ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল।

বৃটিশ কলম্বিয়ার সন্নিহিত সমুদ্রে অনেক মৎস্যজীবী ছোট ছোট মোটর-বোট লইয়া মাছ ধরে। তাহারা মাছ ধরিবার আশায় উপকূল-সন্নিহিত বিভিন্ন জলাশয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক একখানি মোটর-বোটের দুই তিন জন অংশীদার থাকে। তাহারা মাছের ব্যবসায়ে যে টাকা পায়, তাহা অংশানুযায়ী ভাগ করিয়া লয়। এক এক ক্ষেপে তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। আবার কখন কখন তাহাদের সরঞ্জামী খরচাও পোষায় না।

একবার তিন জন জেলে এইরূপ একখানি মোটর বোট লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল ; কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহারা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কূলে আশ্রয় লইয়া সেখানে নঙ্গর করিতে বাধ্য হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা মাছ ধরিবার সুযোগ না পাওয়ায় আক্ষেপ করিতে লাগিল ; কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে তাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

প্রত্যুষে এক জন জেলে খানা পাকাইতে আরম্ভ করিল ; অন্য দুই জন ছোট ডিঙ্গীখানি লইয়া সেই দ্বীপে চলিল। প্রভাতে সেই দ্বীপে কিছুকাল ভ্রমণের জন্য তাহাদের আগ্রহ হইয়াছিল। তাহারা ডিঙ্গী ছাড়িয়া দ্বীপে উঠিল এবং চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের এক জনের মনে হইল—কেহ জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে।

তাহারা পশ্চাতে চাহিয়া জঙ্গলের ছোট ছোট গাছপালা নড়িতে দেখিল ; কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়া কে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল—তাহা তাহারা দেখিতে পাইল না।

তাহাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না ; যদি তাহারা হঠাৎ কোন শ্বাপদ জন্তুর সম্মুখে পড়ে—এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ডিঙ্গীতে উঠিয়া ডিঙ্গীখানা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। তাহারা ডিঙ্গী লইয়া কয়েক গজ মাত্র গিয়াছে, সেই সময় একটা প্রকাণ্ড কুগার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, যেখানে ডিঙ্গীখানা বাঁধা ছিল, দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তাহার পর সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া ডিঙ্গী লক্ষ্য করিয়া সাঁতরাইতে আরম্ভ করিল। বাঘটা সাঁতরাইয়া ডিঙ্গীতে উঠিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে ভাবিয়া তাহারা দুই জনে যথাসাধ্য বেগে ডিঙ্গী চালাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে তাহারা ডিঙ্গী লইয়া মোটর-বোটের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাড়াতাড়ি বোটে উঠিয়া পড়িল। তাহারা তিন জনে বোটের কিনারায় দাঁড়াইয়া দেখিল—কুগারটা সমুদ্রতরঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের বোটের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুগার মোটর-বোটের পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং বোটে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইলেও সে নিরস্ত হইল না। মোটর-বোটের তক্তার ফাঁকে নখ বাধাইয়া, মাথা তুলিয়া ও বুকে ভর দিয়া উঠিবার জন্য হাঁচড়-পাঁচড় করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহার কি ভীষণ গর্জ্জন!

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া জেলে তিন জনের হৃৎকম্প উপস্থিত। মোটর-বোটে একটিও বন্দুক ছিল না। তাহারা কিরূপে সেই ভীষণ জানোয়ারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মোটর-বোটে কয়েকখানি দাঁড় এবং 'ট্যাটা' (দীর্ঘ বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আবদ্ধ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহ-ফলক) ছিল। জেলেরা তদ্দ্বারা কুগারটাকে সবেগে আঘাত করিতে লাগিল। মাথায় পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া জানোয়ারটা নির্জ্জীব হইলে তাহারা 'লগি' দিয়া তাহাকে জলের ভিতর পুনঃ পুনঃ চুবাইতে লাগিল। এইরূপে কুগারটাকে হত্যা করিয়া তাহারা মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ; কুগারের মৃতদেহের বিনিময়ে এক দিনেই তাহারা ৬০ ডলার উপার্জ্জন করিল।

বৃটিশ কলম্বিয়াকে 'কুগারের দেশ' বলিয়া অভিহিত করিবার প্রধান কারণ এই যে, এ দেশের পল্লীগুলিতে ইহাদের অবাধ গতি দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে ইহারা গৃহস্থ-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অসঙ্কোচে আক্রমণ করে। বৃটিশ কলম্বিয়ার একখানি সুদূর পল্লীর এক গৃহস্থ এক দিন সায়ংকালে তাহার পাকশালার সন্নিহিত

বাগানে সাবল দিয়া মাটী খুঁড়িতেছিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল দেখিয়া গৃহস্থ সেই দিনের মত খনন-কার্য্য বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া যাইবে, সেই সময় সে বাহু-মূলে ঈষৎ আকর্ষণের বেগ অনুভব করিল। গৃহস্থ অবিবাহিত যুবক, বাড়ীতে সে একাকী বাস করিত; সে ভাবিল, তাহার কোন প্রতিবেশী তাহার সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে, এবং তাহাকে বিস্মিত করিবার জন্য কৌতুকভরে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়াছে।

সে হাসিমুখে প্রতিবেশীর দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মুখের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল; তাহার মুখ শুকাইল, এবং আতঙ্কে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সে 'বাপ্!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে যাহাকে প্রতিবেশী মনে করিয়াছিল—সে একটা ভীষণদর্শন প্রকাণ্ড কুগার; কুগারটা তাহার সার্টের হাতা তীক্ষ্নদন্তে চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল, এবং সেই অন্ধকারে তাহার চক্ষু দুইটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহারা উভয়েই স্তব্ধভাবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর গৃহস্থ সেই হিংস্র ব্যাঘ্রের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুগারটার পেটে দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া এক লাথি মারিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাকে এক প্রচণ্ড ঘুসি। কুগার তাহার পদাঘাত ও মুষ্ট্যা-ঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক ফুট দূরে ধরাশায়ী হইল এবং মাটীতে গড়াইতে লাগিল। সেই অবসরে ঐ গৃহস্থ সাবলখানি মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া ঘরে ফিরিতে উদ্যত হইল; সে ভাবিল, কুগারটা তাহার লাথি ও ঘুসি হজম করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবে; কিন্তু তাহার সেই আশা পূর্ণ হইল না। কুগারটা গা-ঝাড়িয়া উঠিয়া শিকারোদ্যত বিড়ালের মত বসিল, এবং গৃহস্থের গলা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। গৃহস্থ সেই মুহূর্ত্তে সাবল-দ্বারা তাহার দেহে আঘাত করিল বটে, কিন্তু কুগারের দেহের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া সে চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। কুগারটা সেই সুযোগে তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার কণ্ঠ-চ্ছেদনের জন্য দাঁত বাহির করিয়া মুখ নামাইল। গৃহস্থ তখন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া জানোয়ারটার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কুগারটা তৎক্ষণাৎ মুখ সরাইয়া তাহার বাঁ-হাত কামড়াইয়া ধরিল এবং তাহা এরূপ জোরে চিবাইয়া দিল যে, হাতের হাড়গুলি চূর্ণ হইল। ক্রুদ্ধ জানোয়ার তাহার হাতখানি এই ভাবে ক্ষতবিক্ষত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া পুনর্ব্বার তাহার কণ্ঠনালী আক্রমণের জন্য গলার দিকে মুখ বাড়াইল।

গৃহস্থ তাহার দংশন-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবৎ হইল। হাতের রক্ত তাহার চক্ষুতে ঝরিয়া পড়ায় তাহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল; তথাপি সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে না পারায় প্রাণপণে বাঘটার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে বলবান্ যুবক, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। নিরস্ত্র হইয়াও সে বাঘের দেহের গুরুভার বক্ষঃস্থলে বহন করিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে সেই যমের সহিত যুদ্ধ করিল। সে জানিত, সেই বিরলবসতি গ্রামে নিকটে কোন গৃহস্থের ঘর-বাড়ী নাই; সে সাহায্য-প্রার্থনায় চীৎকার করিলে তাহার কণ্ঠস্বর কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কুগারটার পশ্চাতের পা গৃহস্থের উরুদেশে স্থাপিত ছিল; সে সেই পায়ের তীক্ষ্নধার নখগুলি থাবা হইতে বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার উরু এরূপ জোরে আঁচ্‌ড়াইতে লাগিল যে, তাহার পাত্‌লুন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল এবং উরুর মাংস ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। বাঘটা সম্মুখের পা দিয়া তাহার কপালে ও মাথায় নখরাঘাত করিতে লাগিল। গৃহস্থ তখনও বাঘের কণ্ঠনালী আক্রমণের চেষ্টায় বিরত হইল না।

অবশেষে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইল। সে বাঘটার কণ্ঠনালী এরূপ জোরে চাপিয়া ধরিল যে, লোহার সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া ধরিলেও সে অহা অপেক্ষা অধিকতর বল প্রয়োগ করিতে পারিত না। এই ভাবে সে সেই দুর্দ্দান্ত জানোয়ারের মাথা এক পাশে সরাইয়া দিয়া অতি কষ্টে ডান পাখানির ভার অপসারিত করিল, এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া এরূপ বেগে বাঘটার দেহে পদাঘাত করিল এবং ডান হাত দিয়া তাহার ঘাড়ে এমন এক ধাক্কা দিল যে, বাঘটা তাহার দেহের উপর হইতে গড়াইয়া দূরে পড়িল। সেই সুযোগে গৃহস্থ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র ধরালুণ্ঠিত কুগার উঠিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিল। এবার সে

তাহার দক্ষিণ উরু দংশন করায় সে চক্ষুর নিমেষে পদপ্রান্ত হইতে সাবলখানি তুলিয়া লইল এবং তদ্দ্বারা বাঘের মাথায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে বাঘের মাথার চামড়া ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। বাঘটা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া শিকার ছাড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

আহত গৃহস্থের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। বাঘের সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাহার কপালে ও মাথায় যে ক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষত হইতে অবিরল ধারায় রক্ত ঝরিয়া তাহার উভয় চক্ষু ও মুখ প্লাবিত করিল। সে শোণিতাপ্লুত চক্ষু মেলিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। কুগারটা তাহার বাঁ-হাতখানি চিবাইয়া হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সেই হাত সে নাড়িতে পারিল না। তাহার উরু ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় পায়ে ভর দিয়া চলিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার সাহস হইল না; সে সাবলে ভর দিয়া ঘরের দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় কুগারটা তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য আড়াল হইতে পুনর্ব্বার তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। এবার আহত গৃহস্থ সাবলখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া সাবলের ধারালো মুখ দিয়া বাঘটার মাথায় এরূপ জোরে আঘাত করিল যে, সাবলের সেই মুখ তাহার মাথার হাড় বিদীর্ণ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। সেই আঘাতে বাঘটা যন্ত্রণায় গর্জ্জন করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল এবং গড়াইতে গড়াইতে কয়েক হাত দূরে গিয়া অসাড় হইল। আর তাহাকে উঠিতে হইল না। সাবলে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইল।

দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিয়া আহত গৃহস্থ ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। গ্রামের লোক তাহার বিপদের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার পরিচর্য্যার ত্রুটি করে নাই। তাহার দেহের ক্ষতগুলি এখন শুষ্ক হইয়াছে; এখন সে পূর্ব্ববৎ সবল হইয়াছে বটে, কিন্তু কুগারটা তাহার বাঁ-হাতের অস্থিগুলি এভাবে চূর্ণ করিয়াছিল যে, সেই হাতখানি সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

কুগারগুলা যতই ভীষণ-প্রকৃতি, হিংস্র ও বলবান্ হউক, আমাদের দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের 'রাজকীয় বঙ্গীয় শার্দ্দূল'-রাজের সহিত তাহাদের অথবা অন্য কোন জাতীয় বাঘের তুলনা হইতে পারে না। এ দেশে সাদার দেশের কুগারেরও দাদা আছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেহ নয়—

দেহের মিলন লাগি এ নহে আমার
আবাহন,—দেহ নয়, সে যে তুচ্ছ, হীন,
দাহকর মোহরূপ তৃষ্ণা দুরাশার,
আত্ম-অপমান মাত্র,—মিথ্যায় মলিন।

ভস্ম,—শেষে ধূলি-লীন; নাহি থাকে কিছু
পরাতে কালের ভালে পলকের তরে।
তৈল শেষ ভীরু দীপ মাথা করি নীচু
আপনারে সঁপে দেয় বাতাসের করে।

মানবের মনুষ্যত্ব করিবারে দূর
ছায়া সম মায়া ফিরে বিবেকের পাশে;
চির-অকলুষ হেন দেবতার পুর
দানব-গ্রাসিত দেখে বিভ্রান্ত বিশ্বাসে।

আত্মার দুয়ারে আজি আবাহন তব,
এসো প্রিয়ে—দু'য়ে সেথা এক হয়ে রব।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

নবম পরিচ্ছেদ

বাজার মদন বক্‌শী নিজে কর্‌তেন। ঝি সঙ্গে তরকারির ধামা আর মাছের চুব্‌ড়ী নিয়ে যেত, কিন্তু আনাজ-তরকারি বাছাই করা, দরদাম করা কর্ত্তা নিজে করতেন, ঝিকে অতখানি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তেন না। ডাঁটা, শাক, ইচোড়, মোচা ফড়েদের কাছে কিন্‌তেন, একেবারে যে অত রকম খরিদ করতেন, তা নয়, তবে দোকানে যারা বসে, ফড়েদের কাছে তার চেয়ে সস্তা পাওয়া যায়। আলু, পটল, পাণ এইগুলা দোকান থেকে কিন্‌তে হ'ত। দর করবার সময় ঝুলাঝুলি, আধ ঘণ্টার কম কোন জিনিষ কেনা হ'ত না। সময় সময় ফড়ে কি দোকানী চটে যেত, হয় ত ঠাট্টা করত কিংবা হু'কথা শুনিয়ে দিত; কিন্তু মদন বক্‌শী সে সব গায় মাখ্‌তেন না, দুটো কথা বল্‌লে ত আর গায় ফোস্কা পড়ে না। একটা গর্ভ-মোচা ফড়ে হয় ত বল্‌লে তিন আনা দাম। বক্‌শী মশায় বল্‌লেন, আরে, বলিস্ কি? একটা মোচার দাম দু পয়সা, গর্ভ-মোচার চার পয়সা হোক্, আর কত হবে? দে, চার পয়সায় দে। তাঁর ছেঁড়া ময়লা ধুতি আর পঁচিশটে তালি দেওয়া চটিজুতো দেখে ফড়ে বল্‌ত, যাও, যাও, তোমাকে আর এ মোচা খেতে হবে না। তোমার বাগানে ত অনেক কলাগাছ আছে, মোচা পেড়ে খেতে পার না? শুনে পাশের লোকরা হেসে উঠ্‌ত। ডেঙ্গো ডাঁটা যদি হ'ল ত পয়সায় বড় জোর দু'গাছা, বক্‌শী মশায় মোটা ডাঁটা বেছে বেছে কিন্‌তেন, তা না হ'লে ত পয়সা জলে ফেলা হয়। ঝি বলে, বাবু, ও ডাঁটা সিদ্ধ হবে কেন? বাবু বলেন, ডালে দিলেই বেশ সিদ্ধ হবে। আলু কেন্‌বার বেলা যেগুলা পোকা ধরা আর শস্তা, সেইগুলা কিন্‌তেন। ভাল বেগুন থাক্‌তে কাণা বেগুন কিন্‌তেন, দামে যে শস্তা পড়ে। ঝির গজ্‌গজানি কে শোনে? এ দিকে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবার জো নেই। বয়স হয়েছে, আর শরীর তেমন পটু নয়, একটু মাংসের যুষ খেলে শরীরে বল হয়। আবার মাংস ত চোদ্দ আনা ক'রে সের। অনেক কষ্টে, অনেক বেছে টেছে সাত পয়সা দিয়ে আধ পোয়া মাংস কিন্‌তেন, পয়সা দেবার বেলা একটি একটি ক'রে তিন-বার গুণে দিতেন। কেঠো ডাঁটা, পোকাখেকো আলু, কাণা বেগুন আর শুক্‌নো মাংস কিন্‌তে যে দম্‌কা খরচটা হ'ত, তার শোধ তুল্‌তেন মাছ কেন্‌বার বেলায়। রোজ রোজ মাছ না হলেই নয়! গিন্নীর মাছ না হ'লে হয় না। কোথাকার এক উড়ো শাস্তর যে, সধবাকে মাছ খেতেই হবে! নাই বা হ'ল রোজ রোজ মাছ! কদাচ কখন এক দিন না হয় মাছের ঝোল হ'ল, তা ব'লে কি রোজ চাই না কি? আর মাছের বাজারে যে গোল, মেছোহাটার মাগীরা ত দর কর্‌তে গেলে আঁশ-জল গায় ছিটিয়ে দেয়। ও ঝি, এই নে দু পয়সার কাদা চিংড়ী নিয়ে আয়, আমি আর ও ভিড়ের মধ্যে যাব না।

বাজার ক'রে বাড়ী এসে কর্ত্তা ক্লান্ত হয়ে তক্তপোষে ব'সে পড়্‌লেন, বল্‌লেন, ঝি, এক ছিলিম তামাক সাজ ত! গিন্নীকে সামনে দেখে বল্‌লেন, বাজারে জিনিষপত্তর দিন দিন যে রকম আগুনের দর হয়ে উঠছে, এতে ত আর কিছু দিনে আমার দেউলে নাম বেরিয়ে যাবে।

শৈলবালা বেশ জানতেন যে, কোম্পানীর কাগজের সুদ, ধারে যে সব টাকা সুদে খাটত, তা ছাড়া বাড়ী-ভাড়ার টাকা যা আসে, তার সিকিও সংসার-খরচে লাগে না; কিন্তু সে কথা বল্‌লে কি আর রক্ষা আছে! তা ছাড়া, টাকার মায়া দুজনেরই সমান, যেমন দেবা, তেমনি দেবী। শৈলবালা চুপ ক'রে রইলেন।

মদন বক্‌শী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, দেখি, এই বুড়ো বয়সে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি, শেষে কি না খেতে পেয়ে মারা যাব?

শৈলবালা বল্‌লেন, তা কেন, খুব টেনেটুনে খরচপত্র কর্‌লেই কোন রকম ক'রে চ'লে যাবে।

স্নান ক'রে কর্ত্তা যখন আহারে বস্‌লেন, সে সময় শৈলবালাও পাখা হাতে তাঁর সামনে বস্‌লেন। দু চারবার পাখা নেড়ে বল্‌লেন, আজ ছোট বউ এসেছিল।

মদন বক্‌শীর কয়েকটি দাঁত প'ড়ে গিয়েছিল, দাঁত বাঁধানর যে খরচ, সেটা লোহার সিন্দুক থেকে বাহির করা উচিত কি না, এখন পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি। ফোঁক্‌লা দাঁতে খেতে একটু দেরী হ'ত। কথাটা শুনে বল্‌লেন, হুঁ। খনিকক্ষণ মুখ থাক্‌লে মুখের গরাস গিলে

বল্‌লেন, ছোট বউ ত বড় একটা এ-মুখো হন না। আজ কি মনে ক'রে ?

—অমনি আমাদের দেখতে এসেছিল। আর যদি কিছু মনে থাকে, আমি কেমন ক'রে জানব ? আমি ত আর ওর পেটে সেঁধোই নি।

—উনি কি বিনা মতলবে এসেছিলেন ? এই দেখ না, দু চার দিনের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করি নে, সত্যি কথা বল্‌ছি। সে দিন সরলা লোহার সিন্দুকের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন ?

—ছি, ওর যেমন নাম, সত্যি ও তেমনই সরল। ওকে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করতে আছে ?

—না, না, তা আমি কিছু বল্‌ছি নে, আর লোহার সিন্দুকে যে আমার অনেক টাকা আছে, তাও নয়, তবে মানুষের যেমন মন। সিন্দুকের কাছে কারুর না যাওয়াই ভাল।

—আমি ঘরে ছিলাম ব'লে সরলা গিয়েছিল, তা না হ'লে সে কখনও যায় না।

—তা আমি জানি, তা আমি জানি। অমনি কথার কথা বল্‌ছিলুম।

ছোট বউয়ের পর বিকেলবেলা যখন ছোট কর্ত্তা এলেন, তখন মদন বক্‌শী মনে মনে হাস্‌লেন, বল্‌লেন, আমার কাছে এরা আবার উড়তে চায় ? আগে ছোট গিন্নী, তার পর ছোট কর্ত্তা। এইবার থলের ভিতর থেকে সাপ বেরুবে। মুখে বল্‌লেন, এই যে গোপাল, ব'স। তবু তোমরা যদি এক আধবার খবর নাও, তা হ'লে আমাদের অনেক ভরসা হয়। শুনলুম, আজ ছোট বউমাও এসেছিলেন।

—তা আসবে না কেন ? আমাদের ত একই বাড়ী, মাঝে পাঁচীলও ওঠে নি, রাগারাগিও হয় নি। আর আমরা মার পেটের ভাই, দাদেইজী ত নয় যে, কেবল মন কসাকসি হবে। সরলা সর্ব্বদাই আসে, তাই আমাদের ঘন ঘন আসা হয় না। আর, বড় দাদা, তুমি জানই ত, আমার মন তেমন ভাল নেই।

বড় দাদা! এ যে অতি ভক্তি, লক্ষণ ত ভাল নয়! মনে মনে কথাটা মদন বক্‌শী খুব চিপ্‌টে বল্‌লেন। প্রকাশ্যে বল্‌লেন, তা ত বটেই, হাজার হোক ভাই ভাই ত। তা তোমার মনটা খারাপ হ'ল কিসে ?

—তোমাকে ত এর আগে বলেছিলাম। এই টাকা-কড়ির টানাটানি, কিছু দেনা হয়েছে। যে সময় পড়েছে!

—ও কথা আর বলো না। আমারই সংসার চলা ভার হয়ে উঠেছে। ভাব্‌ছি, এই বয়সে একটা কর্ম্মকাযের চেষ্টা করি।

গোপাল দেখ্‌লে, এ ত গোড়া ঘেঁষে কোপ বসাবার উদ্যোগ, তা হ'লে আর টাকার কথা ওঠে কেমন ক'রে; কিন্তু সে ঠাহরে এসেছিল যে, এসপার ওসপার যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক্, দাদা ত নামেই দাদা, আর এ ত আর এমনি উপকার করা নয়, দস্তুরমত কাযের, দেনা-পাওনার কথা। বল্‌লে, সে দিনকার কথা তোমার মনে আছে, এই আমার বিষয়ের অংশ রেখে কিছু টাকা নেওয়া।

—তোমার বিষয় ? এই বাড়ীর অংশ ? তোমার আর কোন বিষয় আছে ?

—না!

—তাই বল। সে কথা আমার বেশ মনে আছে। অন্য যায়গায় তুমি অবিশ্যি চেষ্টা করেছ, তাতে কি হ'ল ?

—টাকা বড় কম দিতে চায়।

—বাঁধা রাখতে হ'লে বাড়ীর দাম হিসাবে টাকা দেয়। তোমার অংশের দাম তুমি কত ঠাওরাও ?

—বিশ পঁচিশ হাজার টাকা অনায়াসে হবে।

মদন বক্‌শী শিউরে চম্‌কে উঠ্‌লেন। জোরে ব'লে উঠ্‌লেন, তুমি কি স্বপন দেখ্‌ছ না কি ? এই বাড়ীর দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা ? আমার ত যা হয় দু চারখানা বাড়ী আছে, আমি ত বাড়ীর দর জানি। আর আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, একবার দালাল লাগিয়ে দেখ না। শুনে তখন আকাশ থেকে পড়বে।

—বাড়ীতে যেমন আমার অংশ আছে, তোমারও ত তেমনই আছে। কত দাম হবে, তুমিই বল না ?

মনে মনে মদন বক্‌শী হাস্‌লেন। বাঁধা রাখ্‌বার, কেন্‌বার বেলা এক দর, বেচ্‌বার বেলা আর এক দর। বল্‌লেন, আমার দর তোমার মনের মত না হ'তে পারে, আগে তুমি বাজার জান।

গোপাল মনে মনে বুক ঠুকে বল্‌লে, আমি এখনও ব্যাঙ্কে দেখি নি, না হয় ব্যাঙ্কে বাঁধা দেব।

মদন বক্‌শী তাঁর কুৎকুতে চোখ দিয়ে গোপালের দিকে এমন ক'রে চেয়ে রইলেন যে, গোপাল বেশ বুঝতে পারলে যে, সে একটা কিছু বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছে। মদন বক্‌শী খুঁতি এগিয়ে দিয়ে চোখ দুটো আরও ছোট ক'রে বললেন, ব্যাঙ্কে বাড়ীর অংশ বাঁধা রাখে, কোথায় শুনেছ? বাড়ীর দলীল তোমার কাছে আছে?

গোপালের মুখ চূণ হয়ে গেল। বললে, না, দলীল ত ব্যাঙ্কে, আমাদের দুজনের সই না হ'লে বের করা যায় না।

—তবে? অবিশ্যি, তোমার অংশ তুমি যেখানে ইচ্ছে বাঁধা দিতে পার, দলীল বের করতেও আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবার আশা নেই। তবু তুমি আর কারুর কাছ থেকে জেনো।

—তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, তা হ'লে আমার আর কোথাও যাবার আবশ্যক কি?

—তোমার কত টাকার দরকার?

—হাজার আষ্টেক হ'লে আমার হয়, আর সুদটা আছে। গোপাল কিছু হাতে রাখলে। একেবারে দশ বারো হাজার টাকা বললে যদি বড় ভাই পিছিয়ে যায়!

—তাই ত, অনেক টাকা। কি হিসাবে সুদ দেবে আর কোথা থেকে দেবে?

—সুদ ন্যায্যমত যা হয়, তাই দেব। একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় আছি, হ'লে মাসে মাসে সুদ ফেলে দেব।

—ও কোন কাযের কথা নয়। বাড়ীর অংশ বাঁধা দিলে তুমি আর ছাড়াতে পারবে না, শেষে সুদে আসলে বিক্রী হয়ে যাবে। তোমার পক্ষে বাঁধা রাখা ভাল কি বিক্রী করা ভাল, বুঝে দেখ।

—বিক্রী করবার কথা আমি ত ভাবি নি।

—ভাবা উচিত ছিল। আমি বেশ ক'রে সব ভেবে দেখেছি। আমার কাছে যখন তুমি এসেছ, তখন আমার কথাটা তোমার জানা ভাল। তোমার অংশ আমি বাঁধা রাখব না। তুমি সুদ বরাবর যোগাতে পারবে না, আমিও তোমার নামে নালিশ করতে পারব না। আমি তোমার ধার সুদশুদ্ধ শোধ করতে রাজি আছি, তার উপর পাঁচ বছর তোমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেব। বাড়ীর অংশ তুমি আমার নামে লিখে দাও, পাঁচ বছর পরে সমস্ত বাড়ী আমার হবে।

—তার পর কি আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে?

ভাইকে কি ভাই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়? আমি শুধু তোমার উপকারের জন্যই এতটা স্বীকার করছি।

—তোমার কথায় রাজি হওয়া ছাড়া আমি ত আর অন্য উপায় দেখছি নে।

—কিছু তাড়া নেই ত। তুমি ভেবে দেখ, ছোট বউমাকে জিজ্ঞাসা কর, আর কারুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় কর, তার পর আমাকে জবাব দিও।

গোপাল উঠে গেল। সে ত জানত না যে, বড় দাদা সব খবর রাখেন, তার কত ধার, কত সুদ সব জানেন। মদন বক্‌শী হিসাব করেছিলেন যে, হাজার পনেরো টাকায় বাড়ীখানা তাঁর হয়ে যাবে, গোপালের অংশ অপরের হাতে যাবে না। আর ৫ বছর পরে? সে তখন দেখা যাবে।

দশম পরিচ্ছেদ

সাহেব হবার আগে নরেন রায় বুঝে-সুঝে চলত, বিলাত গিয়েই সে বিষম ফেরে পড়েছিল। কোন দিকে সামলে উঠতে পারছিল না। শেষাশেষি বয়সের দিকে ছেলে-মেয়ে মানুষ হ'লে পর সংসারে টানাটানি হলেও ততটা লাগে না। কেন না, তখন মানুষ কতকটা হাত-পা-ছাড়া হয় আর বয়সের সঙ্গে সব দিকে হাঁকাই ক'মে আসে, খাবার পরবার তত তোয়াজের আবশ্যক হয় না, সব দিকে অল্প স্বল্প হলেই সন্তুষ্ট থাকা যায়। কিন্তু সাহেবের তা ত নয়, তাঁর যে সবে কলির সন্ধ্যা। ছেলে-মেয়ে ছোট আর মিসেস্ রায়ের সঙ্গে মা ষষ্ঠীর আড়ির কোন লক্ষণ দেখা দেয় নি। বছর-খানেক আগে আঁতুড়ে একটি ছেলে নষ্ট হয়েছিল। খরচ-পত্রের টাকাকড়ি নিয়ে সাহেব মেমে খেচাখেচি আরম্ভ হয়েছিল—ভাল লক্ষণ নয়। সাহেবী ধরণে থাকলে যে গৃহস্থালী হয় না, তা নয়। কেন না, সাহেবরা নিজেই খুব হিসাবী, আর সত্যি মেম সাহেবরা কেউ কেউ খুব কৃপণ হয়। সকলেরই প্রায় খরচপত্র বাঁধা, যা ইচ্ছা

হুমুড়ো সাহেব মেম কেউ খরচ করে না। নকল জিনিষটাই খারাপ কি না, তাই কালা বাঙ্গালী নকল সাহেব হ'লে এত নাকাল হ'তে হয়। এই দুই জনের যদি এতটুকু আক্কেল থাকৃত, তা হ'লে হয় সাহেবিয়ানা ছেড়ে দিত, না হয় সংসারে আঁট ক'রে সবদিক্ দেখে শুনে চল্‌ত, এরই মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌তে হ'ত না। তরুবালা তবু মাঝে মাঝে সাম্‌লাবার একটু চেষ্টা করৃতেন। কিন্তু তিনি যদি আণ্ডার খরচে দু আনা বাঁচালেন ত সাহেবের দামী দামী ইজিপ্‌শান সিগারেটে তার বিশ গুণ খরচ হ'ত।

খুচরা খুচরা ধার চারিদিকে বেড়ে যাচ্ছিল, আধা মাস না যেতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায় অথচ কারুর হিসাব চুকিয়ে দেওয়া হয় না। মুদীর দোকানে মাসকাবারের টাকা বাকি, চাকর-বাকরের মাইনে, ধোপার পাওনা বাকি, আর দোকানের বিলও পঞ্চাশ রকমের, তার মধ্যে সাহেব মেম দুজনেরই আছে; এ মাস নয় আর মাস, আর মাস নয় ও মাস, এই রকম ক'রে জড় হচ্ছে। ছেলে-মেয়ের স্কুল, বাড়ীতে মাষ্টারের খরচ, কোচম্যান সহিস সবই আছে। দেশেও কিছু নেই, যা কিছু ছিল, সরিক-দাররা কয়েক বছর আগেই কিনে নিয়েছিল। বন্ধুমহলে রায় সাহেব দু একবার চেষ্টা ক'রে দেখেছিলেন। কিন্তু হয় তাঁদেরও তাঁরই অবস্থা কিংবা তাঁরা টাকা দেবার বেলা হাত গুটোতেন। একবার তিনি মাই ডিয়ার মুস্তফীকে লিখলেন যে, পত্রবাহকের হস্তে একশো টাকা দিলে বড় সুবিধা হয়, এক সপ্তাহ পরে শোধ দেবেন। পত্র পাঠ মাই ডিয়ার রায় জবাব পেলেন যে, মুস্তফী সাহেব ব্যাঙ্কের একাউন্ট ওভরড্র ক'রে কেমন ক'রে শোধ দেবেন, সেই ভাবনায় অস্থির। মিষ্টার বসাক ত জবাব নদারৎ। একসঙ্গে একটা পেগ খাওয়া কিংবা পরস্পর নিমন্ত্রণ করা ত সমাজের সাধারণ ভদ্রতা, টাকা ধার চাওয়া কি রকম? ফলে একটু কুল্‌নেস্ হয়ে গেল। এক দিন আফিস ফেরবার পথে রায় সাহেব মদন বক্‌শীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ঝি বাইরের ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, দেখলে, দরজাগোড়ায় এক জন সাহেব গাড়ী থেকে নাম্‌ল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বল্‌লে; বাবু, আপনার সঙ্গে কে সাহেব দেখা করৃতে এসেছে।

বাবু ত সেই তেল-চিট্‌চিটে হাঁটুতোলা কাপড় প'রে, ট্র্যাঙ্কে একগোছা চাবি। বল্‌লেন, আমার সঙ্গে আবার সাহেব কে দেখা করৃতে আসবে? বাড়ী ভুল ক'রে থাকবে।

এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ ক'রে শব্দ হ'ল। বক্‌শী মশায় বাড়ী আছেন?

—এ যে চেনা চেনা গলা।

গলা শুনে শৈলবালা বেরিয়ে এলেন। ও যে নরেন বাবুর গলা! শীগ্‌গির বাড়ীর ভিতর ডেকে নিয়ে এস।

বল্‌তে বল্‌তে নরেন বাবু ওরফে মিষ্টার রায় নিজেই ভিতরে এলেন।

মদন বক্‌শী চোখ কুঁচকে চেয়ে বল্‌লেন, তাই ত, নরেন যে সাহেব সেজে! তা আমার ত চেয়ার টেবিল নেই, এই তক্তপোষে বস।

মিষ্টার রায় হেঁট হয়ে বড় ভায়রা-ভাই আর বড় শালীকে প্রণাম করৃলেন। পেণ্টুলুনে গ্যালিস্ আঁটা চড় চড় করৃতে লাগল, তা অমন একটু কষ্ট স্বীকার না করৃলে হবে কেন? বল্‌লেন, এই ত আমি বেশ বসেছি। আফিসের ফেরৃতা ব'লে কাপড় ছেড়ে আস্‌তে পারি নি।

শৈলবালা বল্‌লেন, আমাদের যে মনে পড়েছে, তবু ভাল! কত ভাগ্যি আমাদের! না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

মিষ্টার রায় হাস্‌লেন, হাসি বেশ মিষ্টি। ঠাট্টা কর, করৃবারই কথা! আমি ত নিজের দোষ অস্বীকার করৃছি নে। তবে সে দিন মিসেস্—বাড়ী থেকে ওরা এসেছিল, তাইতে আমি গড়িমষি করৃছিলাম। আমি আজ ত একটু সকাল সকাল ফিরেছি।

—তোমার সঙ্গে কি ব'লে কথা কইব, তাই ভাবছি। রায় সাহেব বল্‌তে হবে না কি?

—বিলক্ষণ, আমি ত আর বদলে যাই নি, তোমরা যেমন করৃতে, সেই রকম করৃবে। কি বলেন, বক্‌শী মশায়?

তা ত পড়েই রয়েছে, আমাদের কাছে তুমি যেমন ছিলে, তেমনই আছ।

এ-দিক্ ও-দিক্ সে-দিক্ নানারকম কথাবার্ত্তা হ'ল, কিন্তু শৈলবালা নড়তে চান না, দেখে রায়-সাহেব কাযের কোন কথা পাড়তে পারৃলেন না। ঘোর ঘোর হয়ে আসছে দেখে উঠলেন। শৈলবালা ত আর বাহির-বাড়ী যেতে পারেন না, দরজা-গোড়া থেকে ফিরে গেলেন।

বৈঠকখানার সাম্‌নে এসে মিষ্টার রায় বল্‌লেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি কথা ?

—একটু বস্‌লে হ'ত না ?

বৈঠকখানায় এক কোণে একটা মিট্‌মিটে আলো জল্‌ছিল। একটা তক্তপোষের উপর একখানা ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা। মদন বক্‌শী রায় সাহেবকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আবার বল্‌লেন, কি কথা ?

—আপনি কিছু টাকা ধার দেবেন ?

শামুক মুখ বের ক'রে চল্‌তে চল্‌তে কোন কঠিন পদার্থে তাঁর শুঁয়া ঠেক্‌লে যেমন কুঁক্‌ড়ে তার কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে, মদন বক্‌শী সেই রকম নিজের ভিতর গুটিয়ে গেলেন। সন্দিগ্ধ-মনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ধার চাই ?

রায় সাহেব কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লেন, না, আমার চাই নে। আর এক জনের কথা বলছি।

—লোকটা কে শুনতে পাই ?

—এক জন জমীদার।

—শুধু হাতে আমি কউকে ধার দি নে। জমীদারী বন্ধক রেখে টাকা দিতে পারি।

—তা না হ'লে আপনি দিতে যাবেন কেন ? সুদের যদি একটা আন্দাজ দেন, তা হ'লে আমি কথা পাড়ি।

—এখন ত বারো টাকা সুদের কমে টাকা পাওয়াই যায় না। আমি তার চেয়েও বেশী সুদে টাকা খাটাই, তবে তোমার বন্ধু বলেই ঐ বারো টাকাতেই দেব।

—সেই কথাই বলব। আর একটা কথা ছিল।

—কি, বল।

—আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার একটা উইল ক'রে রাখলে ভাল হয় না ?

—কেন, আমি কি কালই মরব না কি ?

—তা কেন, তবে আপনার অনেক বিষয়, অনেক টাকা অনেক দিকে খাটছে, একটা ব্যবস্থা ক'রে রাখা ভাল। আপনি ত সব বোঝেন, আপনাকে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। তবু একবার মনে করিয়ে দিলাম।

—উইলের নাম শুনলেই মরণের কথা মনে পড়ে, কিন্তু তুমি কথাটা বলেছ ভাল, আমি ভেবে দেখ্‌ব।

রায় সাহেব নমস্কার ক'রে গাড়ীতে উঠে চ'লে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অল্পবয়সেই অমৃতের বাপ-মার মৃত্যু হয়, সেই অবধি সে মামার বাড়ী থাক্‌ত। যে সময় তাকে মামার বাড়ী আনা হয়, তখন মদন বক্‌শী আর গোপাল বক্‌শী পৃথক্ হন নি, এক অন্নে থাক্‌তেন। তার পর যখন দুই ভাই আলাদা হলেন, হাঁড়ী আলাদা হ'ল, বাড়ীতে দুটো মহল হ'ল, তখন অমৃত ছোট মামার কাছেই রইল, বড় মামা তাকে নিজের কাছে রাখ্‌বার কথা পাড়্‌লেন না, অমৃতও ছোট মামীর ন্যাওটো, তাঁর কাছেই বেশী ভাল থাক্‌ত। অমৃত ও সরলা একবয়সী, ছেলে-বয়সে পিঠাপিঠি ভাইবোনের মত খেলাধুলা, ঝগড়াঝাঁটি করত। এখন অমৃতের বয়স কুড়ি আর সরলার আঠারো। ছেলেবেলা দু'জনেই সদা-সর্ব্বদা বড় মামার বাড়ীর অংশে যাওয়া আসা করত। অমৃত ছেলেবেলা থেকেই খুব চালাক আর সব দিকে নজর। সরলা যে সব ছোটখাট ঘটনা লক্ষ্য করত না, অমৃতের উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সব কিছুই বাদ পড়্‌ত না। সে দেখ্‌ত যে, ঘরে কিছু খাবার কিংবা ফল থাক্‌লে বড় মামী সেগুলা লুকোবার জন্য ব্যস্ত হতেন, পাছে সরলা কিংবা অমৃত দেখ্‌তে পায় অথবা চেয়ে বসে। সরলার ত তেমন স্বভাবই নয়, ছেলেবেলা থেকেই তার কোন সামগ্রীতে লোভ ছিল না। অমৃত অতশত জানে না, সাম্‌নে খাবার-দাবার দেখ্‌তে পেলে চাইত। বড় মামী অমনই কোন অছিলা ক'রে সেগুলা সরিয়ে ফেল্‌তেন। রকম-সকম দেখে অমৃত বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁষ্‌ত না, বড় মামীর কাছে আসাযাওয়াও ক্রমে ক'মে গেল। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার স্বভাব চাপা, কারুর কাছে কোন কথা সহজে প্রকাশ করত না।

স্কুলে কলেজে অমৃত বেশ ভাল লেখাপড়া করত, ক্লাসে ফী বছর প্রথম হ'ত, গাদা গাদা প্রাইজ ঘরে নিয়ে আস্‌ত, একটা পাশ করেই প্রথম শ্রেণীর জলপানি পেলে। টাকাটি পেলেই এনে ছোট মামীর হাতে দিত, নিজের খরচের জন্য একটি পয়সাও রাখ্‌ত না, কখন কিছু দরকার হ'লে চেয়ে নিত। টপ্ টপ্ কোরে তিনটে পাশ ক'রে এম-এ পড়ছিল, পাশ হয়ে কি করবে, মাঝে মাঝে সে কথা হ'ত। কাদম্বিনী তাকে পেটের ছেলের মত দেখ্‌তেন, আর অমৃতও তাঁকে ঠিক মায়ের মত করত, কিন্তু বিয়ের কথা পাড়্‌লেই

ছেলে বেঁকে দাঁড়াত, মামীকে শাসিয়ে বলত, ফের যদি ও কথা বল, তা হ'লে আমার দু'চক্ষু যে দিকে যায়, সেইখানে চ'লে যাব। গোপাল বক্শী আড়ালে স্ত্রীকে বলতেন, অমৃত এখনও ছেলেমানুষ, ওর বিয়ে দেবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন?

—অমন সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে দিলে অনেক পাওয়া থোওয়া যাবে, কোন্ না দু'চার হাজার টাকা নগদ দেবে। তোমারও ত টাকার দরকার।

—সে টাকা নিয়ে আমরা নেহাল হয়ে যাব না, তুমি মিছিমিছি যখন তখন ওর বিয়ের কথা তুলো না।

—আমার দরকার কি? তোমারই ভালর জন্য বলি— ব'লে হাত নেড়ে কাদম্বিনী ফর্‌ফরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন থেকে আর সব সময় অমৃতকে বিয়ের কথা শুনতে হ'ত না।

অমৃতের কথা কইবার ধরণ বড় মজার। এক একটা এমন কথা বলত যে, শুনে সকলে অবাক্ হয়ে যেত। সরলা বলত, দাদার কথা শুনলে হেসে বাঁচি নে।

কথার দু'একটা নমুনা তোমরা শুনবে? এক দিন কাদম্বিনীর সঙ্গে কে এক জন তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি নিজে খুব সুন্দরী, তার উপর বড় মানুষের বউ, গায় এক গা গহনা। মেয়েদের মধ্যে যেমন রূপের চর্চ্চা হয়, সুন্দর-কালোর বিচার হয়, তাই হচ্ছিল। অমৃত সেইখানে খাটে ব'সে সুপারি চিবুচ্ছিল আর পা দোলাচ্ছিল।

কাদম্বিনীর বন্ধু বলছিলেন, দত্তদের বাড়ীর নতুন বউ হয়েছে, দেখেছ?

—বেছে বেছে সুন্দরী বউ এনেছে যা হোক্। কোনখানটা যদি দেখতে ভাল! যেমন রং, তেমনই গড়ন, চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ছে, নাকের উপর কে যেন বড়ি দিয়েছে আর হাসতে গেলে মেড়ে শুদ্ধ চব্বিশ পাটী দাঁত বেরিয়ে পড়ে। কি পসন্দ বাপু, এমন বউও কেউ দেখে-শুনে ঘরে আনে?

অমৃতের পা দোলানি বন্ধ হ'ল। গম্ভীরভাবে বললে, ছোট মামী, তুমি পরমেশ্বরের নিন্দে করছ?

—সর্ব্বরক্ষের মাথায় পা! ছেলের কথা শোন! কখন্ আমি পরমেশ্বরের নিন্দে করলাম? সত্যি সত্যি আমায় ত আর ভুতে পায় নি আর আমার ভীমরতীও হয় নি। পরমেশ্বরের নিন্দে করলে পাপ হয়, তা কি আমি জানি নে?

—তাই যদি জান, তা হ'লে তাঁর সৃষ্টি করা মানুষের রূপের ব্যাখ্যানা করছ কেন? দত্তদের বউকে কুমোরেও গড়ে নি আর তুমিও তাকে তেমেটে করনি। যিনি সুন্দর সৃষ্টি করেন, তিনিই কুচ্ছিত তৈরি করেন, নানা ছাঁচে নানা রকম মূর্ত্তি ঢালেন। গিরগিটি আর কোলা ব্যাঙ যিনি করেছেন, প্রজাপতি আর ময়ূরও তাঁরই সৃষ্টি। ইচ্ছা করলে তিনি ত সবই সুন্দর করতে পারতেন, পৃথিবীতে কদাকার কালো কুশ্রী কিছুই থাকত না। কিন্তু সবই যদি সুন্দর হ'ত, সুন্দরী ছাড়া কালো মেয়ে মানুষ পৃথিবীতে না থাকত, তা হ'লে কি বড্ড একঘেয়ে হ'ত না? গাছে যেমন ফুল হয়, কাঁটাও তেমনই হয়। কুচ্ছিতের নিন্দে করলে যিনি কুচ্ছিত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিন্দে করা হয়।

কাদম্বিনী বললেন, আমরা মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, অত সব ভেবে চিন্তে কথা কইতে পারিনে।

তাঁর বন্ধু হেসে বললেন, ছেলে যেন সঙ্! কিন্তু দত্তদের বউয়ের কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আর একবার হঠাৎ এক দিন মদন বক্শীর অসুখ করেছিল। ব'সে ব'সে কি রকম মাথা ঘুরে এল, সেইখানেই শুয়ে পড়লেন, গা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। শৈলবালা তাড়াতাড়ি ঝিকে গোপালকে ডাকতে বললেন। গোপাল বাড়ী ছিল না, ঝি অমৃতকে ডেকে আনলে। অমৃত আসতেই শৈলবালা বললেন, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।

মদন তখন একটু সামলিয়েছেন, শুনে বললেন, না, না, ডাক্তার দরকার নেই, ফী কোত্থেকে আসবে?

শৈলবালা অমৃতকে চোখ টিপে দিলেন, সে চট্ ক'রে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার মদনকে অনেকক্ষণ ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললেন, আপনার শুধু দুর্ব্বলতা, কিন্তু সাবধান না হ'লে এ বয়সে একটা রোগ হ'তে পারে। আপনার পুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়া আবশ্যক। দুধ, ঘি, ফল নিয়মিত খান। এখন একটা মিক্সচার লিখে দিয়ে যাচ্ছি, কিছু দিন খাবেন, মাথা ঘোরা সেরে যাবে। মাথা ঘোরা আপনার পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়।

ডাক্তার ত চ'লে গেল। মদন বক্শী বললেন, ডাক্তার

আন্লেই খরচ, কেবল লম্বা লম্বা কথা বল্বে আর খরচান্ত কর্বে। দুধ, ঘি, ফল কিন্তেও ত পয়সা লাগে না! কি আমার নবাব-পুত্তুর এসেছেন!

অমৃত যখন বাড়ী ফিরে গেল, তখন তার মুখ বড় গম্ভীর। কাদম্বিনী বল্লেন, হ্যাঁ রে, তুই অমনতর মুখ ক'রে এলি যে? বড়ঠাকুরের কোন শক্ত ব্যামো হয় নি ত?

—অমৃত বল্লে, বড় মামার বড় কঠিন রোগ, শিবের অসাধ্যি। তাঁর নিরানব্বইয়ের ধাক্কা লেগেছে।

—সে কি রে? সে আবার কোন্ দেশী রোগ? রোজ রোজ নতুন নতুন রোগের জ্বালায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠ্ল।

সরলা দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্ছিল। বল্লে, মা, তুমি বুঝি বুঝতে পারছ না? নিরানব্বইয়ের ধাক্কা জান না? জ্যাঠামশায় বড় কৃপণ কি না, তাই দাদা বল্ছে।

কাদম্বিনী বল্লেন, ওর অর্দ্ধেক কথা আমি ত বুঝ্তেই পারি নে। কি বল্ছিস্ বাপু, পষ্ট করেই বল্ না, অমন হেঁয়ালি ক'রে নাই বা বল্লি।

—আমি বল্ছি কি যে, বড় মামার একটা শক্ত রোগ না হয়ে যায় না। এখন ব'সে ব'সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্যিস্ তক্তপোষে বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন না, তা হ'লে হয় ত মেঝেতে প'ড়ে মাথাই ফেটে যেত। তার পর ডাক্তার ডাক্তে দেবেন না, ডাক্তার যদি এল, তা হ'লে সে যা খেতে বলে, তা খাবেন না, পাছে টাকা খরচ হয়, অথচ ডাক্তার ভয় দেখিয়ে গিয়েছে যে, ভাল জিনিষ—দুধ-ঘি না খেলে শরীর বইবে না, খুব দুর্ব্বল হয়েছেন। টাকা টাকা করেই উনি মরবেন অথচ টাকা ওঁর কোন কাযেই আস্বে না। রূপকথায় যা পড়েছি, এখন চোখের উপর তা দেখছি।

কাদম্বিনী অস্ফুটস্বরে বল্লেন, আঁটকুড়ের ধন!

গোপাল যখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা কয়ে ফিরে এল, তখন অমৃত বৈঠকখানায় ব'সে পড়ছিল। তাকে দেখে গোপালের হঠাৎ মনে এল, একে সব কথা বলি নে কেন? ঐ ত আমাদের ভরসা, সব জানে, সব বোঝে, ওর সঙ্গেই ত সব পরামর্শ করা উচিত। এই ভেবে অমৃতের পাশে ব'সে গোপাল তাকে সব বল্লে, নিজের ধারের কথা, বড় ভাইয়ের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল, সব খুলে পষ্ট ক'রে বল্লে, কিছুই ঢাক্লে না।

মন দিয়ে সব কথা শুনে অমৃত বল্লে, মামাবাবু, এ সব কথা আমাকে বল্ছ কেন?

অমৃত বড় ভাইকে বল্ত বড় মামা আর ছোটকে মামাবাবু, এইতে কার দিকে তার টান বেশী, বুঝতে পারা যায়।

—এখন তুই ত সব বুঝতে পারিস্, আর তুই ত আমাদের ছেলের মত। তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। তোর ছোটমামীকে এখনও কিছু বলি নি। ওর ত একে তেমন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, আর সব কথাতেই রেগে ওঠে। তোর সঙ্গে কথা কয়ে তার পর তাকে বল্ব।

অমৃত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বড়মামা যা বলছেন, সে কথা তোমার কেমন লাগছে? বড় ভাইয়ের যেমন করা উচিত, ছোট ভাইকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, সেই রকম?

—আমার ত তাই মনে হয়। আর কারুর কাছে আমার অংশ বাঁধা রাখলে সে কি আমার ধার শোধ দিয়ে পাঁচ বছর ধ'রে মাসে মাসে আমায় পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেবে?

—তোমার যত ধার আছে, তার চেয়ে কম ক'রে বললে কেন?

—আমার ভয় হচ্ছিল, বেশী টাকা শুনে যদি দাদা পেছিয়ে পড়েন।

—তুমি এই যে বাঁধা রাখবার কথা বলছিলে, তা বড়মামা ত বাঁধা রাখবেন না, তোমার কাছ থেকে ত তোমার অংশ লিখিয়ে নেবেন, পাঁচ বছর পরে ত তাঁর হয়ে যাবে।

—তার পর সত্যিই কি তিনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন?

—সে কথা পরে হবে। অমৃতের ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিয়ে তখনই মিলিয়ে গেল। অমৃত বল্তে লাগল, তোমার বাড়ীর অংশের দাম তুমি কত মনে কর?

—আমার ত আন্দাজ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা; কিন্তু দাদা শুনে ত শিউরে উঠ্লেন অথচ তাঁর হিসাবে কত হ'লে ন্যায্য হয়, তাও বল্লেন না।

—সে ত এক জন দালাল লাগালে দুদিনে জানা যাবে। আমি ত কিছুই জানি নে, আর কি বা দেখেছি শুনেছি,

কিন্তু আমাদের সঙ্গে এক জন ছেলে পড়ে, তাদের বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ সে দিন বিক্রী হ'ল ত্রিশ হাজার টাকায়। বাড়ী এর চেয়ে মোটেই বড় নয়, এমন ভাল পাড়ায় সদর-রাস্তার উপর নয়, আর এমন গোছও নেই। তোমার আন্দাজ ত কিছুতেই বেশী মনে হয় না। বড় মামা কত দিয়ে তোমার অংশ কিনে নিচ্ছেন হিসেব ক'রে দেখেছ ?

—না।

—আমার মনে হয়, তিনি সব খোঁজ রাখেন, তোমার কত ধার আছে জানেন। তোমার বারো হাজার টাকা ধার আর পাঁচ বছরে বড় মামা তোমাকে তিন হাজার টাকা দেবেন। পনেরো হাজার টাকা দিয়ে তোমার বাড়ীর অংশ নিয়ে নেবেন।

গোপাল কিছু বল্‌লে না, ভাবছিল, অমৃত যেমন পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে নিজে ত তেমন বুঝতে পারে নি।

অমৃত বল্‌লে, পাঁচ বছরের পর বড় মামা তোমাকে কিছুই ছেড়ে দেবেন না, এ বাড়ীতেও থাক্‌তে দেবেন না। কিন্তু তিনি যা মনে করছেন, তা হবে না, আর এক জন তাঁর প্রতিবন্ধক হবে।

—কে ?

—যম।

এই রকম এক একটা কথায় অমৃত অন্য লোককে অবাক্ ক'রে দিত। গোপাল তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, কি বলছিস্ তুই, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

—বড় মামা আর পাঁচ বছর কিছুতেই বাঁচবেন না। তোমাকে আমি এই কথা বলছি, তুমি দেখে নিও। ওঁর টাকাই ওঁর যম, যম ওঁকে অল্পদিনের মধ্যেই নেবে। এখন ওঁর প্রাণের চেয়ে টাকাই বড়, টাকাই থাক্‌বে, উনি আর বেশী দিন থাক্‌বেন না।

—তা হ'লে কি দাদার কথায় রাজি হব ?

—স্বচ্ছন্দে। তোমার কোন ভয় নেই।

অমৃতের মুখের কথায় কেমন যে গোপালের বিশ্বাস হয়ে গেল, সে তার পরদিনই গিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে ফেললে। সব হয়ে গেলে পর কাদম্বিনীকে বললে। কাদম্বিনী বুঝ্‌লেন, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পথ ও পথিক

আনন্দের পৃথিবী এ ; দিবারাত্র সুখে দুখে প্রণমি তাহারে,
আমার যাত্রার গানে লীলায়িত সুর-সুধা পাথেয় মধুর
দিয়াছে ধরিত্রী এই ; বন্ধন-বেদনা যত মোর বারে বারে
অচল করিতে চায়, আমি চলি খোঁজে মোর বাঞ্ছিত বঁধুর।

নিরুদ্দেশ এ যাত্রীর যাত্রাপথ কেন হ'ল পঙ্কিল পিচ্ছিল,
জানি বন্ধু, শৃঙ্খলার ঝুট্ নামে কি শৃঙ্খল পরিয়াছি পায়,—
পৌরুষের প্রাণ-গর্ব্বে কেন করে খর্ব্ব-হিংসা নীতির নিখিল,
জানি জানি সে রহস্য যদিও হয়েছি বন্দী পৃথিবী-কারায়।
ব্যাকুল বাউল আমি ধরণীর স্নেহ-রসে গীত-মন্ত্র ভুলি'
পুলকের বন্যাবেগে প্রাণ-পুট পূর্ণ করি'
এ পথের মাখিয়াছি ধূলি।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তনের স্বরলিপি।

কলহান্তরিতা

জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর গমন করত নারী।

বংশীবট যাবট তট বনহি বন হেরি॥

শ্যামকুণ্ড মদনকুঞ্জ, রাধাকুণ্ড তীরে।

(দেখে) দ্বাদশ বন হেরত সঘন সইলো হুকিনারে॥

যাঁহা সব ধেনু-রব তাঁহা চলত জোরে।

(দেখে) শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখ ত বল বীরে॥

যমুনা-কূলে নীপতরু-মূলে পড়ি রহু বনয়ারী।

শশিশেখর ধূলিধূসর জপতহি প্যারী প্যারী॥

১ ২ ১ ২ ১ ২

II{ গা মা মা | পা পা পা | মা ধা মা | মা গা গা |} { গা মা মা | পা পা পা |

জি তি কু | ০ ঞ্জ র | গ তি ম | ০ ন্থ র | গ ম ন | ক র ত

১ ২ ১ ২

পা ধা না | র্সা -া ণা | ধা ণা র্সা | ণা ধা পা }

না ০ রী | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

আখর—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

| -া -া -া | -া পা পা | পা ধা ধা | ণা ধা -া | { মা পা পা | পা ধা ণা | পা ধা ধা | ণা ধা -া }

০ ০ ০ | ০ যে ন | ক রী ণি | যায় রে ০ | হ রি আ | নি তে ০ | ক রী ণি | যায় রে ০

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

{ র্সা -া -া | র্সা -া -া | ণা র্সা ণা | ধা ণা ধা | মা পা পা | পা ধা ণা | পা ধা ধা | ণা ধা -া }

যায় ০ ০ | রে ০ ০ | প ব নের | গ ০ তি | হ রি আ | নি তে ০ | ক রী ণি | যায় রে ০

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

| গা মা পা | পা পা পা | পা ধা ণা | র্সা ণা ধা | পা -া -া | -া -া -া | I { ণা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা |

গ ম ন | ক র ত | না ০ রী | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ব ং শী | ০ ব ট

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

ণা র্সা ণা | ধা ণা ধা | পা ধা পা | -া পা পা | পা ধা ণা | র্সা ণা ধা | পা -া -া | -া -া -া | }

যা ব ট | ০ ত ট | ব ন হি | ০ ব ন | হে ০ রি | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

আখর—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

| -া পা পা | পা ধা -া | ণা ধা -া | -া -া -া | { মা পা পা | পা ধা ণা | পা ধা -া | ণা ধা -া | }

০ খুঁ জে | খুঁ জে ০ | যায় রে ০ | ০ ০ ০ | এ কে এ | কে স ব | খুঁ জে ০ | যায় রে ০

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{ র্সা র্সা র্সা | -া -া র্সা | ণা র্সা ণা | ধা ণা ধা | পা ধা পা | পা ধা ণা | পা ধা -া | ণা ধা -া | }
{ রা ধা না | ॰ ॰ থ্ | কো থা আ | ছ ব লে | এ কে এ | কে স ব্ | খুঁ জে ॰ | যায় রে ॰ | }

১ ২ ১ ২ ১ ২
| পা ধা পা | -া পা পা | পা ধ' ণা | র্সা ণা ধা | পা -া -া | -া -া -া II
| ব ন হি | ॰ ব ন | হে ॰ রি | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ II

১ ২ ১ ২ ১ ২
{ গা -া মা | মা -া সা | মা ধা পা | মা গা গা | } { গা মা পা | পা -া পা |
{ শ্যা ॰ ম | কু ॰ ণ্ড | ম দ ন | কু ॰ ঞ্জ | } { রা ॰ ধা | কু ॰ ণ্ড |

১ ২ ১ ২
পা ধা ণা | র্সা ণা -া | ধা ণা র্সা | ণা ধা পা | }
তী ॰ রে | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | }

আখর—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
| -া পা পা | পা পা ধা | ণা ধা -া | -া -া -া | { মা পা -া | পা ধা ণা | পা পা ধা | ণা ধা -া }
| ॰ থাক্ লে | থা ক্ তে | পা রে ॰ | ॰ ॰ ॰ | { সে থা ও | থাক্ লে ॰ | থা ক্ তে | পা রে ॰ }

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{ -া -া র্সা | র্সা র্সা -া | ণা র্সা ণা | ণা ধা পা | মা পা পা | পা পা ধনা | পা পা ধা | ণা ধা -া }
{ ॰ ॰ ম | ধ্যা হ্ন ॰ | বি লা সের | স্থা ॰ ন | সে থা ও | থা ক্ লে॰ | থা ক্ তে | পা রে ॰ }

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২
{ -া -া -া | -া পা পা | পা পা ধা | (ণা ধা -া) } (ণা ধা মা) { মা পা পা | পা পা ধনা | পা পা ধা | ণা ধা -া }
{ ॰ ॰ ॰ | ॰ নৈ লে | তা ই ক | (রে ছে ॰) } (রে ছে যা) { ব লে গ্যা | ছে বু ঝি॰ | তা ই ক | রে ছে ॰ }

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{ র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা | ণা র্সা ণা | ধা ণা ধা | পা -া -া | -া পা পা | পা পা ধা | ণা ধা -া }
{ রা ॰ ধা | কু ॰ ণ্ডে | প্রা ণ ত্য | জি ॰ ব | ॰ ॰ ॰ | ॰ বু ঝি | প্রা ণ ত্য | জে ছে ॰ }

স্বরবাট—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
| -া ধধাধধা | ধণর্সা র্সা -া | ণা ধা -া | -া -া -া | ণা -া র্সা | ধা -া ণা | পা -া ধা | মা -া -া |
| ॰ বলে গ্যাছে | রা॰॰ ধে ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | এ ॰ ই | ত ॰ ॰ | আ ॰ ॰ | মি ॰ ॰ |

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
গা -া -া | রা -া -া | রা গা মা | পা ধা নর্সা | ণা ধা -া | -া -া -া | র্সা র্রা র্রা | -া -া -া |
॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | চ লি লা | ॰ ॰ ॰ম্ | গো ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | রা ॰ ধে | ॰ ॰ ॰ |

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
-া -া -া | -া -া ধা | -া ধা ধা | ধা ণা ণা | ণা র্সা -া | ধা -া ণা | পা -া ধা | মা -া পা |
॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ আ মি | রা ধা কু | ণ্ডে ॰ ॰ | প্রা ॰ ণ | ত্য ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ |

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
গা মা পা | ধা ণা র্সা | ণা ধা -া | -া -া -া | -া -া -া | -া পা পা | পা পা ধা | ণা ধা পা |
॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | জি ব ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ | ॰ বু ঝি | তা ই ক | রে ছে ॰ |


আখর—
আখর—

আখর—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
|মা পা পা| {-া সা সা|সা রা রা|রা রা গা|মা মা ধা|পা মা গমা|মা পা পা} {-া র্সা র্সা|
য মু না|০ এক টি|কা ঙা ল্|রা খা ল্|ধূ লা য়|প ড়ে ০০|য মু না|০ যে ন|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ণা র্রা র্সা|ণা ধা পা|মা গা রগা|-া সা সা|সা রা রা|রা রা গা|মা মা ধা|পা মা গমা|
ত্রি জ গ|তে উ হাব্|কে হ নাই|০ এক টি|কা ঙা ল্|রা খা ল্|ধূ লা য়|প ড়ে ০০|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
মা পা পা -া} {-া পা পা|পা ণা ধা|ণা -া -া| {র্সা র্সা র্সা|ণা ধা পা|পা ণা ধা|ণা -া -া}
য মু না ০|০ কূ লে|প' ড়ে বাঁ|শী ০ ০|দূ তী দে|খে শ্যামের্|প ড়ে বাঁ|শী ০ ০|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{র্সা -া র্সা|ণা ধা পা|পা ণা ধা|ণা -া -া} র্সা র্সা র্সা|র্সা র্সা -া|র্সা র্সা র্সা|র্সা র্সা -া|
রা ০ ধা|না মে র্|সা ধা বাঁ|শী ০ ০|সে ই বাঁ|শী তে ০|প ব ন|আ সি ০|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
র্সা -া র্সা|র্সা র্সা র্রা|ণা ণা র্সা|ণা -া ধা|পা পা -া|পা পধা ণর্সা|ণা ণা ধা|-া পা পা|
স ০ ঞ্চা|রে অম্ নি|জ য় রা|ধে ০ শ্রী|রা ধে ০|ব লে০ ০০|য মু না|০ কূ লে|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
মা ধা পা|-া মা গা|মা পা পা|পা পা পা|পা ধা ণা|র্সা ণা -া|ধা ণা র্সা|ণা ধা পা|
নী প হু|০ মূ লে|প ড়ি র|হু ব ন|য়া রী ০|০ ০ ০|০ ০ ০|০ ০ ০|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{পা ধা র্সা|র্সা র্সা|ণা র্সা ণা|ধা ণা ধা|পা ধা পা|পা পা পা|পা ধা ণা|র্সা ণা ধা পা -া -া|-া -া -া}
শ শি শে০|খ র ধূ|০ লি ধূ|স র জ|প তা হি|প্যা রী|প্যা ০ রী|০ ০ ০০ ০ ০|০ ০ ০|

আখর—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
|-া -া -া|-া পা পা|পা পা ধা|ণা ধা ধা| {মা পা পা|পা ধা ণা|পা পা ধা|ণা ধা ধা|}
০ ০ ০|০ ত বু|না ম ছা|ড়ে না ই|এ ত দু|খে ত বু|না ম্ ছা|ড়ে না ই|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
{-া ধা র্সা|র্সা -া র্সা|সা র্সা র্সা|র্সা র্সা র্সা|ণা র্সা ণা|ধা ণা ধপা|মা পা পা|পা ধা ণা|
০ রা ধা|না ০ ম্|জ প্ ক|রে শ্যা ম্|প্রা ণ্ রে|খে ০ ছে০|এ ত দু|খে ত বু|

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
পা পা ধা|ণা ধা ধা| }পা ধা পা|পা পা পা|পা ধা ণা|র্সা ণা ধা|পা -া -া|-া -া -া| IIII
না ম্ ছা|ড়ে না ই|জ প ত|হি প্যা রী|প্যা ০ রী|০ ০ ০|০ ০ ০|০ ০ ০|

হারমোনিয়মের স্কেল।—স্ত্রী-কণ্ঠে উদারার এ-সার্প অথবা মুদারার সি, অর্থাৎ উদারার কোমল নি কিম্বা মুদারার গা'কে, মুদারার সা-সুর করিয়া গাহিবে। পুরুষ-কণ্ঠে ডি-সার্প অথবা এফ্, অর্থাৎ উদারার কোমল গ কিম্বা ম'কে মুদারার সা সুর করিয়া গাহিবে।

গান—বৈষ্ণবকবি শশিশেখর। সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি

শাস্তি কি শান্তি

১

শাস্ত্র এবং ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়, ধর্ম্মেরই জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়। এ সম্বন্ধে অসংখ্য দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু অধর্ম্মের সাময়িক সাফল্য দেখিয়া লোক এই ধর্ম্মবাক্যে আস্থা হারাইয়াছে। অনেকেই ভাবে, "ধর্ম্মাধর্ম্ম" বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে? লোক ধর্ম্মের উপর এত বিশ্বাস করে কেন—যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিও জগতে কষ্ট পায়? অনেক সময়ে মানুষ ভাবে, অধর্ম্মপথে চলিতে যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহার অভাব বলিয়া লোক ধর্ম্মপথে চলে। সোজা পথ,—কোনরূপ ভাবিবার চিন্তিবার প্রয়োজন নাই, সমানভাবে চলিয়া যান, অগ্র-পশ্চাৎ দেখিবেন না, বুদ্ধি খরচ করিবেন না, কেবল সরলভাবে চলিয়া যান,—দেখিবেন, সত্যের মার নাই। সত্য কথা বলিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন নাই। সত্য ঢাকিবার জন্য মিথ্যার অবতারণারও প্রয়োজন হয় না। অনেক সময়ে মানুষ ভাবে যে, দেবতারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না, প্রতিষ্ঠিত স্থান হইতে সরাইয়া দিলে যাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন না, দেবদেবীর গাত্র হইতে অলঙ্কার চুরি করিয়া লইলে প্রতিবিধান করিতে পারেন না, তাঁহারা আবার ভক্তদিগকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা দেবতাদের দেবশক্তির অবমাননা করেন। দেবদেবীর যে কোন ক্ষমতা নাই, ভ্রান্ত যুক্তির বলে তাহা মনে করিয়া দেবশক্তিকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক। আমরা যখন দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা করি, তখন সেই পূজা পৃথিবীর স্রষ্টা রক্ষাকর্ত্তা ভগবানেরই পূজা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়প্রভাবের বিকাশ মাত্র। সেই ক্ষমতার অবমাননা করা আর ভগবানের ক্ষমতার অবমাননা করা, দুই-ই এক জিনিষ। সেই অবমাননার অভিশাপে মানুষ ধ্বংস ও নষ্ট হইয়া যায়। অধর্ম্মে সাময়িক, বৈষয়িক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মানুষকে সুখী করিতে পারে না। অধিকাংশ সময়েই মানুষ সুখী হইতে চায়, কেবল নিজের উন্নতির দ্বারা নহে, পুত্র-কন্যার উন্নতিও বিশেষরূপে কামনা করে। ক্রমান্বয়ে নিজ বংশধরের উন্নতি প্রার্থনা করে ও বলে, ভগবান্, আমার নিজের ও আমার পুত্র-কলত্রের উন্নতি, সুখ, শান্তি দিন। কিন্তু কখন এরূপ প্রার্থনা করে না যে, কিয়দ্দিনের জন্য আমার অর্থ-কৃচ্ছ্রতা নিবারণ করুন, তাহার পর যাহাই হউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

কলিকাতার এক পল্লীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। তিনি এক জন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বারো মাসে তাঁহার বাটীতে তেরো পার্ব্বণ ছিল। প্রচুর পরিমাণে তিনি দান করিতেন, অতিথি কখনও তাঁহার বাটী হইতে বিমুখ হইত না। পূর্ব্বপুরুষদের বাৎসরিক কার্য্যাদি বিশেষ সমারোহের সহিত সাধিত হইত, এলবার্ট হলে বা কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিস্টিটিউটে কয় ঘণ্টার জন্য ভাড়া লইয়া কতকগুলি কাগজ ছাপাইয়া আর কতকগুলি বক্তাকে একত্র করিয়া শ্রাদ্ধবাসরের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইত না। নিজ নিজ বাটীতে শ্রাদ্ধবাসরের অনুষ্ঠান করিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদিগের ও দরিদ্রনারায়ণের সমাদরে সেবা হইত। তিনি বাটীর অনতিদূরে একটি কালী-মন্দির স্থাপিত করেন। সেখানে প্রত্যহ মার পূজা ও ভোগাদি হইত। দরিদ্রনারায়ণের সেবারও বন্দোবস্ত ছিল। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তবে যাঁহারা এই শাস্ত্রচর্চ্চার সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা অনেকেই বলিতেন, রামেশ্বর বাবু পণ্ডিত লোক বটে, কিন্তু ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস বিশেষ গভীর নহে। তর্কের খাতিরে শাস্ত্র আওড়াইতেন; কিন্তু শাস্ত্রে বিশ্বাস বিশেষ গভীর ছিল না। যখন তিনি এই মুখোপাধ্যায়-বংশের অর্থ, অনর্থ, মান ও অপরাপর দ্রব্য এবং গুণের মালিক হইলেন, তখন মুখোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ ধনশালী। অধর্ম্ম ও অপযশ সে বংশকে স্পর্শ করে নাই।

তিনি কোন সৎকার্য করুন আর না-ই করুন, বংশ-মর্য্যাদা হিসাবে সকলে তাঁহার সুনাম করিত। সকলেই বড় গলায় বলিতেন, রামেশ্বর মুখুয্যে ধার্ম্মিক হইবেন না, রামেশ্বর মুখুয্যে বিদ্বান্ হইবেন না, রামেশ্বর মুখুয্যে পণ্ডিত হইবেন না, তবে ধার্ম্মিক—বিজ্ঞ পণ্ডিত হইবে কি শ্যামাচরণ দত্তের পুত্র? যদিও শ্যামাচরণ দত্তের কোন দোষ নাই, অধার্ম্মিকও নহে এবং কোন অন্যায় কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন না। রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় যদিও সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশেষ যশস্বী ছিলেন, ধর্ম্মের উপর তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস বা আস্থা কখনও ছিল না। জীবনের প্রারম্ভে বহুরূপ পাপকার্য্য করিয়া ষ্টেটের প্রচুর ধনক্ষয় তিনি করিয়াছিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের তিনি এক জন বিশেষ উপাসক ছিলেন, ভাল খাওয়া, ভাল পানীয়ের দিকেও তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। দেবতাকে তিনি মানুন আর না-ই মানুন, দেবতাদের অমৃত-পান বিশেষ প্রশংসনীয় মনে করিতেন। ইন্দ্রের যে সব আসক্তি ছিল, সেই আসক্তিগুলির প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন।

এই ভাবে যৌবনের ১৫ বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে, যখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, তিনি অর্থের কৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতে লাগিলেন অর্থাৎ খরচের নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন, তত টাকা তাঁহার তহবিলে থাকিত না। ফলে নগদ টাকার অভাবে তিনি এটর্ণীদের আশ্রয় লইলেন। ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে যে সকল দালাল ঘোরা-ফেরা করে, তাহারা তাঁহার বাটীতে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। রমেশ চাটুয্যে ও ক্ষুদিরাম সুর এই দুই জন লোককে কলিকাতার সকল লোকই "বাস্তু-ঘুঘু" বলিয়া জানিত। কিন্তু মানুষের স্বভাব মানুষকে এত বেশী অন্ধ করে যে, রামেশ্বর বাবু তাঁহার বাটীতে এই দুই ব্যক্তির ঘন ঘন আগমন সহ্য করিতে লাগিলেন। যাহারা কর্ম্ম করিত—ভুক্তভোগী, তাহারা রমেশ চাটুয্যে ও ক্ষুদিরাম সুরকে রামেশ্বর বাবুর বাটীতে ঘন ঘন আসিতে দেখিয়া বিশেষরূপ বিপদ গণিল। এই একজোড়া ঘুঘু যেখানে একত্রে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই দেখিয়াছে, সেই বাড়ীওয়ালার বিশেষ বিপদ। ইহাদের আগমনে গৃহস্বামীর বিপদ সুনিশ্চিত, ইহা সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল।

প্রত্যেক বৎসরে রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটি করিয়া ভাল সম্পত্তি বন্ধক পড়িতে লাগিল। সাত আট বৎসরের মধ্যে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তিই বন্ধক পড়িল। তার পর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে হাইকোর্টে বন্ধকী টাকা আদায় করিবার জন্য অনেকগুলি মামলা হইল। ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেকগুলি সম্পত্তি বিক্রীতও হইল। তাঁহার পিতার উইল অনুযায়ী কতকগুলি দানের ব্যবস্থা ছিল, ক্রমে সেই দানের টাকা দেওয়াও বন্ধ হইতে লাগিল। যদিও পিতার উইলের উল্লিখিত টাকা নালিস করিলে আদায় হয়, তথাপি এই টাকার জন্য কেহ আদালতে যাইল না, রামেশ্বর বাবুর কাছে ঘন ঘন তাগাদা করিতে লাগিল। রামেশ্বর বাবু কিছু কিছু করিয়া মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, সুবিধা হইলেই সব ফেলিয়া দিব। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবালয়ের জন্য যে সব দানের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও ক্রমে বাকি পড়িতে লাগিল। পাওনাদারের যত ঘন ঘন আগমন হইতে লাগিল, অর্থের আমদানী ক্রমান্বয়ে কমিতে লাগিল। এক দিনকার মাতা-পুত্রের কথা হইতে রামেশ্বর বাবুর অবস্থা পাঠক-পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন।

মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ রে বাবা, রামেশ্বর! আত্মীয়-স্বজনের মাসিক টাকা তুমি দিচ্ছ না কেন? তারা গরীব মানুষ, তোমাদের ষ্টেট থেকে কিছু কিছু পায়, তাতেই চলে। সে টাকা না পেয়ে তাদের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে।"

রামেশ্বর বলিলেন, "ঐ টাকা দেওয়াও ত আমার পক্ষে মুস্কিল। মা, রাগ করো না, আমাদের কর্ত্তারা দান ক'রে ষ্টেটকে ফকির ক'রে গেছেন। পুরুষানুক্রমে কর্ত্তারা দানই করেছিলেন। বরাবর যোগান যায় কোথা হ'তে? এত বড় সংসার চালান ত সোজা কথা নয়। আমার নিজেরও ত খরচপত্র আছে, চালাই কোথা হ'তে?"

মাতা বলিলেন, "কেন বাবা? আমাদের ষ্টেট ত ছোট নয়। অন্যায় অপচয় না হ'লে এ ষ্টেটে কখনও টাকার অভাব হ'তে পারে না।"

রামেশ্বর ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, "অন্যায় অপচয়ের কথা ছেড়ে দাও, ন্যায্য খরচই ষ্টেট হ'তে আর করতে পারছি না। পূজা-পার্ব্বণেই খরচ কত। এই সব ব্যাপারে অলস লোকের প্রশ্রয় বাড়ে। সকলে যদি পরিশ্রম ক'রে

খায়, তা হ'লে আমাদের বাঙ্গালায় বড় বড় ষ্টেটগুলি ধ্বংস হয় না।"

মাতা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ রে বাবা, কি বলিস তুই? পূজা, পার্ব্বণ, দান-ধ্যানে কি ষ্টেট নষ্ট হয়? ষ্টেট নষ্ট হয় অন্যায় কাযে।"

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ষ্টেট কি ক'রে নষ্ট হ'ল? পাঁচ ভূতে মিলে তাঁর ষ্টেটটি শেষ করে নি?"

মাতা বলিলেন, "আমিও তাই বলি, পূজা, পার্ব্বণ, দান, দক্ষিণায় ষ্টেট কখনও নষ্ট হয় না, পাঁচ ভূত আসিয়া ঘাড়ে চাপলে ষ্টেট নষ্ট হয়। যা হোক্, বাবা, বেলুড়ে, রমা মাসীমা তাঁর মাসহারা বাকি পড়ার জন্য ক'খানা চিঠি লিখেছেন, সেই বিধবার টাকাটা শীঘ্র দিয়ে দিও।"

কিন্তু মাতার মনে সংশয় জাগিল। এত বড় সম্পত্তির আয় গেল কোথায়? কেন গেল?

২

যখন মন্দ দশা দেখা দেয়, তখন মানুষকে কু-পরামর্শ দিবার লোকের অভাব হয় না। শকুনি মামা, কালনিমে মামা, ইত্যাদি অনেক মামাই তখন জোটে। রামেশ্বর বাবুরও সেই অবস্থা হইল। বৈঠকখানায় লোক-জনের অভাব একবারেই হইল না, তবে যে সব লোক আসিতে লাগিল, তাহাদের আগমন কুত্রাপি শুভজনক হয় নাই। পরামর্শদাতারা তাঁহার কাণে মন্ত্র দিলেন যে, পৈতৃক কালী-বাড়ীর বেশ আয় আছে। দর্শকরা যে পয়সা দেয়, জিনিষ-পত্র দেয়, ডাব, চিনি কাপড়, সোনা, রূপা, ফল-মূলাদি সেখানে যাহা প্রত্যহ ভক্তগণ উপহার দিয়া যায়, সেই সব জিনিষ যদি রামেশ্বর বাবুর বাড়ীতে আসে, অনেক উপকারে লাগে। এক জন স্তাবক বলিয়া উঠিলেন, "রাজা বাবু, এই চিনি আপনার বাড়ীতে যদি আসে, তা হ'লে, চায়ের চিনি কিনবার কোন দরকারই হবে না। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষরা চিনির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন বটে, কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা করেন নি।"

দ্বিতীয় স্তাবক সুর চড়াইয়া বলিল, "সে কি বাবা, বলভদ্র খুড়ো, যখন তাঁরা কালীবাড়ীতে পয়সা নেবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তখন চায়ের অভাব কোথায়?"

তৃতীয় স্তাবক রসান দিয়া বলিল, "রাজা বাবু, এই ঠাকুর-বাড়ীর যে বামুনটা আছে, সে ছেলে-পুলে নিয়ে ঐ ঠাকুরের আয় হ'তে সব খরচ চালাচ্ছে, আর দু'পয়সা ক'রেও ফেলেছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনার পূর্ব্বপুরুষ, তার পূর্ব্বপুরুষগণ নয়; আপনি দয়া ক'রে তাকে রেখেছেন, তাই ব'লে সে ঠাকুরের সমস্ত আয় গ্রাস করবে কেন? আপনি তাকে মাসে ২০৷২৫ টাকা দিন, বাকী সব আয় আপনি নিন। বামুনটা যেন ছিঁনে-জোঁক হয়ে ব'সে আছে। নড়বার নাম পর্য্যন্ত করে না।"

রামেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি জান হে, কর্ত্তারা একটা ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমি তাতে হাত দিতে চাই নে।"

দ্বিতীয় স্তাবক বলিয়া উঠিল, "হুজুর কি কর্ত্তাদের যা কিছু ব্যবস্থা, সবই রেখেছেন, না রাখা সম্ভব? দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে কায করতে হবে। মনু অনেক ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, রঘুনন্দন তার কত অদল-বদল করেছেন। ইংরেজ জাত ত কত বড়। এরা যে আইন করে, তার ১০৷৪ বৎসর পরে অনেক রদবদল হয় না? আপনাদের ষ্টেটের ব্যবস্থা একশ বছর ধ'রে চলছে, এখনও কি সেই মান্ধাতার আমলের নিয়ম চলবে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলাই দরকার। দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে কায করতে হয়, তবে ত সব রক্ষা পায়। ঐ কালীবাড়ীর পুরুত ঠাকুরকে সরিয়ে দিলে আপনার অনেক টাকা আয় বেড়ে যাবে।"

আসল কথা, এক দিন ঐ কালীবাড়ীতে একটা পাঁঠা বলি হয়। যে লোক পূজা দিয়াছিল, সে মুড়িটা পুরোহিতকেই দিয়া যায়। কিন্তু বলভদ্র খুড়ার সেই মুড়িটির দিকে নজর ছিল। সে প্রকাশ্যে বলে যে, মুড়িটি যেন তাহাকেই দেওয়া হয়। পুরোহিত ঠাকুর জানান যে, তাঁহার জামাতা বাড়ীতে আসিয়াছেন, সে দিন তিনি মুড়িটি দিতে পারিবেন না।

ইহাই হইল বলভদ্র খুড়ার কালীবাড়ীর পুরোহিতের উপর আক্রোশের কারণ। অনেক সময়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, নিজের স্বার্থের উপর ঘা না

পড়িলে এক জন মানুষ আর এক জন মানুষের বিপক্ষতাচরণ করে না।

রামেশ্বর বাবুকে তাঁহার স্তাবকরা আজকাল রাজা বাবু বলিয়া ডাকে। যতই তাঁহার রাজত্বের সীমা হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহার কাণে "রাজা" উপাধিটি ততই মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

স্তাবকদিগের উল্লিখিত আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখন রমেশ চাটুয্যে ও ক্ষুদিরাম স্থর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে একটা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইল। রমেশ চাটুয্যে বাটীর বাহিরে আসিবার পর ক্ষুদিরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ক্ষুদিরাম, ঠাকুরবাড়ীর দেব-সেবার উদ্বৃত্ত জিনিষগুলি যদি কারও প্রাপ্য হয়, তবে সেগুলি আমার আর তোমার। আমি হলাম চাটুয্যে ব্রাহ্মণ, আর তুমি হ'লে স্থরবংশাবতংস, বাঙ্গালার আদিস্থরের বংশধর বললেও চলে।"

রমেশ বলিল, "দেখ ক্ষুদিরাম, এই বেলা ঠাকুরবাড়ী দখল করা যাক্, পুরোনো পুরুতকে তাড়িয়ে দেওয়া যাক্, আর আমরা ঐ স্থান দখল করি, কি বল?"

তখন দুই কৌশলী ঘুঘু পুরোহিতকে তাড়াইবার উপায় উদ্ভাবনে মন দিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, এক দিন কতকগুলি গুণ্ডা আসিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে সেই ঠাকুরবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুষ্টলোক বলে, পুলিসকর্ম্মচারীও নিকটে উপস্থিত ছিল। তাহার পর পুলিসআদালতে পুরোহিত ঠাকুর ও তাঁহার দুই জন আত্মীয়ের বিপক্ষে মারপিট, অনধিকারপ্রবেশ ও চুরির মামলা রুজু হইল। আসামীগণ ধৃত হইয়া হাজতে রহিল। ফরিয়াদীর তরফ হইতে এক জন বিশিষ্ট উকীল নিয়োজিত হইলেন। মামলা কয়দিন চলিল বটে, কিন্তু সেরূপ জোরে চলিল না। কারণ, একদিকে রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লোকজন, অর্থ, পারিষদ্‌বর্গ ও বড় উকীল ও অপর দিকে গরীব পুরোহিত ও তাহার গরীব আত্মীয়।

পুরোহিত ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মা, তোমায় এতদিন ধরিয়া সেবা করিয়া আসিলাম, আমার ভাগ্যে কি শেষে চোর অপবাদ হইল!"

দুই এক জন ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গরীব ব্রাহ্মণের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রমেশ চাটুয্যের দলস্থ ২।৪ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল, "মশাই, এই পুরুতটা কি কম বদমাস! তা না হ'লে রাজাবাবুর অভাব কি! তিনি যে ওকে উচ্ছেদ কচ্ছেন, তার কারণ, তাঁর এই কালীমন্দিরটি সাধারণের উপকারের জন্য ব্যবহার করবেন। একটা চোর পুরুত সব গ্রাস করবে, তা তিনি চান না। রাজাবাবু বলেন,—এই মন্দিরটি জনসাধারণের উপকারের জন্য তিনি ছেড়ে দেবেন। পুরুত ঠাকুরই কি একা ব্রাহ্মণ? আমরা কি কেউ নই? বরঞ্চ ওর চেয়ে আমরা বড় ব্রাহ্মণ। সে ঘোষাল, আমরা চাটুয্যে মুখুয্যে ব্রাহ্মণ।"

তখন এই সব ভদ্রলোক এই উত্যক্ত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলেন। মোকদ্দমাও শীঘ্র শেষ হইয়া গেল। শেষভাগে আমি বুঝিতে পারিলাম, কাণ্ডখানা কি; বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অনুতপ্ত হইলাম। ভাবিলাম, আমরা কি ওকালতী করি—না লাঠিবাজী করি যে, পয়সা পাইলেই লাঠি চালাইব? শেষ চাটুয্যে ও স্থরকে বলিয়া রাজাবাবুকে এই সর্ত্তে রাজী করিলাম, যে পুরোহিত ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও কালীমন্দিরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় চান না তাঁর সাজা হয়। আসামী যদি লিখিয়া দেন যে, এই কালীবাড়ীতে তাঁহাদের কোন স্বত্ব স্বামিত্ব নাই এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ওখানে আসিবেন না, তাহা হইলে রাজাবাবু আর মামলা চালাইবেন না। এইরূপ একটা লেখাপড়ার পর পুরোহিত ঠাকুর ও তাঁহার লোকরা দোষ স্বীকার করিলেন। আর হাকিম ফরিয়াদী রাজা বাবুর প্রার্থনায় কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারায় তাঁহাদের মুচলেকা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া বিশেষরূপে রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে অভিশাপ করিলেন, বলিলেন, "যদি ভগবান্ থাকেন, তবে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচারের জন্য তোমাকে বিশেষ মনস্তাপ সহ্য করতে হবে। মনে করো না, এই ভগবানের রাজত্বে অর্থশালী ও বলশালী লোক গরীব ও দুর্ব্বলকে অন্যায় অত্যাচার ক'রে পিষে ফেলতে পারে। এ পাপের সাজা তোমাকে পেতেই হবে।"

ইহার পরে ক্ষুদিরাম স্থর পরামর্শ দিলেন, পুরোহিত ঠাকুর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে রাজা বাবু নিজ ব্যয়ে দেশে পাঠাইয়া দিন। দেশে যাইবার পূর্ব্বে যে দাসী দেবসেবার

কার্য্যে সহায়তা করিত, সে কাঁদিতে কাঁদিতে পুরোহিত-পত্নীর কাছে গিয়া ৫০২ টাকা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, "বামুন-দিদি, এ টাকাটি তোমার স্বামীর, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। তোমরা দেশে যাচ্ছ, আমরা এ টাকার ভার বইতে পারব না, তোমাকে দিচ্ছি, দাদা ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এমন অত্যাচার সহ্য করতে সকল লোক পারে না। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করবেন।"

৩

মানুষের অমানুষিক অত্যাচারের সাহায্যে পুরোহিত ঠাকুর মা কালীর মন্দির হইতে বিচ্যুত হইলেন। এই বিচ্যুতির কারণ, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রভূত ধনলিপ্সা। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কখনই মেটে না, মানুষের পিপাসায় যত ঘৃতাহুতি দিবে, তত আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া উঠিবে। আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না। ভোগে মানুষ কখন সুখী হয় না, সুখী হয় কেবলমাত্র ত্যাগে।

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ভোগ-লালসা যতই জাগিতে-ছিল, তাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা ততই অতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ধনপিপাসা না কমিয়া বরং অতৃপ্তির হেতু আরও বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মন্দিরচ্যুত হইলেন বটে, দেব-অর্চ্চনার ও দেবসেবার ভার রাজাবাবুর তৃতীয় পক্ষের শ্বশুরের হাতে পড়িল বটে, কিন্তু ইহাতে চাটুয্যে ও সুরের কোন সুবিধাই হইল না—অভাব কমিল না, অভিযোগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গরীব নিরীহ পূজারী ব্রাহ্মণ কোন আপত্তি না করিয়া মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে রামেশ্বর বাবুর মনোবেদনা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার পাঁচটা সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে একটার অধিকারে কিঞ্চিৎ চ্যুতি ঘটায় আমি পাশবিক অত্যাচারের সাহায্যে ব্রাহ্মণকে মন্দির হইতে উচ্ছেদ করিলাম, আর সে বিনা বাক্যব্যয়ে দেবসেবা ও দেব-মন্দিরের অধিকার ছাড়িয়া নিজ গ্রামের দুঃখ, কষ্ট ও অভাবকে বরণ করিল। আমি মন্দিরের পূর্ণ অধিকার পাইয়া কৈ সুখী ত হইলাম না? যে অশান্তি পূর্ব্বে ছিল, যে মনের কষ্ট পূর্ব্বে ছিল, সে অশান্তি ও সে মনের কষ্ট এখনও রহিয়াছে, বরং তাহা দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে। বিনা অপরাধে ব্রাহ্মণকে মন্দির হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে মনের কষ্ট, তাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন মনোবেদনার বোঝার উপর এই দুই আঁটি বোঝা আরও বাড়িয়াছে।

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে অন্যান্য অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় স্বার্থের জোয়ালে সেই শাস্ত্রজ্ঞান বলি দিয়াছিলেন। তিনি এখন ক্রমাগতই ভাবেন, কৈ, অত্যাচার ত করিলাম, অপরাধ ত করিলাম, কিন্তু শাস্তি পাইলাম কোথায়? শাস্তি কি নাই? এ পৃথিবীতে শাস্তি কি মানুষ পায় না?

রামেশ্বর বাবু জানিতেন না, শাস্তি এই পৃথিবীতে আছে। মানুষ এ পৃথিবীতে শাস্তি পায়ও, তবে ধর্ম্মপথে, অধর্ম্মপথে নহে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ অনেক সময় অধর্ম্ম করে আর সেই অধর্ম্ম ও আত্মপ্রবঞ্চনার ফলে মানুষ আরও মর্ম্মবেদনা পায়।

কয়েক বৎসর পরে রমেশ চাটুয্যে ও ক্ষুদিরাম সুর তাঁহার বাড়ীতে আরও ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিল। দাম্ভিক রামেশ্বর অতি দীনভাবে এটর্ণী অফিসে যাইয়া সময় ভিক্ষা করিলেন। এটর্ণীরাও দয়াপরবশ হইয়া দুই একটিবার সময় করিয়া দিলেন; কিন্তু ভগবান্ যাঁহার প্রতি নির্দ্দয়, মানুষের দয়া তাঁহার কি করিতে পারে? তপ্ত কটাহে দুই এক ফোঁটা জলের ন্যায় স্পর্শ মাত্রেই শুকাইয়া যায়। রামেশ্বরের সম্পত্তিগুলি একে একে নীলামে উঠিল, বিক্রয়ও হইল। শেষ সম্পত্তি বসতবাটী বিক্রয়ের পর তিনি নিরাশ্রয় হইলেন। মাথা গুঁজিবার কোন স্থান রহিল না। তাঁহার এখন সর্ব্বস্ব গিয়াছে; ধন, জন, বাসভূমি সবই চলিয়া গিয়াছে, রহিয়া গিয়াছে কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি। ধর্ম্মের স্মৃতি নহে, অধর্ম্মের স্মৃতি। তিনি যে যে অন্যায় কায করিয়াছেন, সেই সেই কর্ম্মের স্মৃতি ফণা দুলাইয়া সর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র দংশন—মন্দির হইতে পুরোহিতের উচ্ছেদসাধন। রামেশ্বর মৃত্যুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রার্থনাতে কোন জিনিষ অর্জ্জন হয় না। মৃত্যুও তাঁহার নিকট আসিল না। মৃত্যুই যদি আসিবে, তবে পাপের বোঝা কে বহিবে? দুষ্কৃতির ফলভোগ করিবে কে? রামেশ্বর পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর কালীমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক; রামেশ্বরকে সেই মন্দিরের আদায়ের কোন অংশই দিল না, নিজে সব ভোগ করিতে লাগিল। তখন রামেশ্বরের এমন অবস্থা নহে যে, শ্বশুরকে জোর করিয়া সরাইয়া দেন। তিনি ঘৃণায় ও লজ্জায় নির্য্যাতিত পুরোহিতের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কৈ, সে ত কোন দিন আমাকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে নাই, আর আমার এই গৃহ-পালিত কুক্কুর—আমার তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর আমাকে মন্দিরের আয় হইতে বঞ্চিত করিল।

তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, দেশত্যাগী হইবেন। তাঁহার সংসারের বন্ধন আর কিছুই ছিল না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সকলেই তাঁহাকে স্ত্রৈণ ও কামুক বলিয়া অভিহিত করিতেছে, যদিও তাহাদের এরূপ বলিবার কোন অধিকার নাই; কারণ, তাহাদের অধিকাংশই নিজে স্ত্রৈণ ও কামুক। রামেশ্বর ভাবিলেন, দূর তীর্থ-ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে একবার সেই পুরোহিত ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন, বলিয়া যাইবেন, তিনি যে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ফল ফলিয়াছে। তাঁহাদের অভিশাপে তিনি একবারে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি এক দিন রাত্রিতে এক প্রভুভক্ত ভৃত্য লইয়া পুরোহিতের দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার আগমনবার্ত্তা পুরোহিত, তাঁহার স্ত্রী ও অপরাপর পরিবারবর্গকে জানাইলেন। তাঁহাদের সকলেরই চোখ হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রুকণা বাহির হইল। সকলেই বলিয়া উঠিলেন, মুখুয্যে মহাশয়, আপনি যাহা কিছু অন্যায় করিয়াছেন, স্বার্থানুসন্ধী, লোভী, নীচ, তোষামোদকারীদের প্ররোচনায়। যদি আপনার বিষয়-বাসনা শেষ হইয়া থাকে, যদি সংসারের ভোগ-বিলাসে আর মন না যায়, তবে আমাদের বাটীতে যে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন-নারায়ণ-শিলা আছেন, তাঁহার প্রসাদ পান আর এইখানেই বাস করুন। যে কয়দিন বাঁচিবেন, আমার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও কন্যা আপনার সেবা করিবেন। বিষয়সম্পত্তি থাকিলেও আপনি আর কত দিন ভোগ করিতেন? তাহা অপেক্ষা এই শান্তিভূমি পল্লীগ্রামে বাস করিয়া ভগবানের নাম লউন, আর বৈভবের কোলাহল হইতে অনেক দূরে থাকুন। যেখানে বৈভবের কোলাহল আছে, সেখানে সব সময়ে শান্তি মেলে না, কিন্তু যেখানে বৈভবের কোলাহল নাই, অথচ মা, ভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়স্থানীয়া স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের যত্ন ও ভালবাসা আছে, সেখানে হয় ত শান্তি আসিলেও আসিতে পারে। অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আপনি এইখানেই থাকুন।

রামেশ্বর এইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি অনেক কষ্টে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের অতিথি-সৎকার ও দয়া দেখে আমি বিশেষ অধীর হয়েছি। তবে একটি কথা, আপনারা কি সকলে আমার অত্যাচার ভুলে যেতে পারবেন?"

পুরোহিতের মাতা বলিলেন, "বাবা, মানুষ মানুষের প্রতি অত্যাচার করতে পারে না। দুষ্টা সরস্বতীর তাড়নায় মানুষ অত্যাচারী হয়, আবার সেই দুষ্টা সরস্বতী কাঁধ হ'তে স'রে গেলে মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য ফিরে আসে। দুষ্ট বুদ্ধির দোষে তুমি অন্যায় কায করেছিলে। এখন সে বুদ্ধি নেই। তোমার পুরুত রামনারায়ণ আমার গর্ভজাত সন্তান, তুমি যদিও আমার গর্ভজাত সন্তান নও, এক সময়ে অন্নদাতা সন্তান ছিলে। তুমি আজ হ'তে এখানে বাস কর। তুমি আমার বড় ছেলে, রামনারায়ণ আমার ছোট ছেলে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন ও শেষ বয়সে শান্তি দিন।"

রামেশ্বরও অনন্য-উপায় হইয়া সেইখানে রহিয়া গেলেন। শোনা যায়, যে কয়দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, মনের শান্তিতেই ছিলেন। রামনারায়ণের বাটীর সকলে মিলিয়া রামেশ্বরের মাতা, পুত্র, কন্যার কার্য্য করিয়াছিল।

তারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

ভরা-ডুবি

১

বেলা পাঁচটা।

ক্রীমসন্, গ্রীন্ এণ্ড্ কোম্পানীর আফিসের একখানি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব কাঙ্গিলাল ফটকের পার্শ্বে দরোয়ানের ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং খোলা দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিয়া, এক পার্শ্বে রক্ষিত দড়ির খাটিয়াখানার উপর বসিয়া পড়িয়া ডাকিল,—"বাবুলাল!"

দরোয়ান বাবুলাল মিশির এক কোণে উবু হইয়া বসিয়া তাহার একটি পিতলের থালার মধ্যে হাতের শালপাতার ঠোঙা হইতে কি সব খাদ্যদ্রব্য রাখিতেছিল। কহিল,—"আইয়ে কাঁঙ্গিলাল বাবু।"

কাঙ্গিলাল থালার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল,—"দু' আনারই খালি মিষ্টি এনেছ? এতে কি আর পেট ভরবে? বললুম—পয়সা দু'য়েকের মুড়ি, আর ঐ তোমার বড় বড় ফুলুরি এক পয়সার আনবে। সারাদিনের পর এই দু'টি মিষ্টি খেয়ে কি আর—"

"দো পয়সা কা মুড়ি আউরভি এনে দোবো, বাবু?"

"আর এনে দিতে হবে না। এইতেই ত আট্টা পয়সা গেল।" তার পর দরোয়ানের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কাঙ্গিলাল কহিল,—"এই দু'আনা নিয়ে তোমার এদিককার খুচরো হ'ল তা হ'লে ৩৶১০। কেমন?"

"সো আপনিই জানেন, খুচ্রা হিসাব আমি কুচ রাখি না, কাঁঙ্গিলাল বাবু। ঐ পঁচাশটো রোপেয়া এবার দিয়ে দেবেন। কাল ত তলব হোবে। এ মাসে আর ফেলে রাখবেন না, দিয়ে দেবেন। বহুৎ রোজ হয়ে গেল।"

শেষ পানতুয়াটি উদরস্থ করিয়া, ঢক্ ঢক্ করিয়া এক লোটা জল পান করতঃ কাঙ্গিলাল পুনরায় খাটিয়ার উপর আসিয়া বসিল। তার পর পকেট হইতে একটি টিনের ডিবা বাহির করিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটি পাণ লইয়া মুখে পুরিয়া দিল এবং ডিবাটি পুনরায় পকেটে রাখিয়া অন্য পকেট হইতে একটি দিয়াশালাই বাহির করিল। তন্মধ্যে গোটা আষ্টেক কাঠি ও তিনটি বিড়ি ছিল। তাহারই একটি ধরাইয়া, প্রথম টানেই তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভস্মে পরিণত করিয়া, কাঙ্গিলাল কহিল,—"কালকের মাইনে থেকে আর হয়ে উঠবে না, বাবুলাল! কোন্ দিক্ সামলাই বল। পঁয়ত্রিশটি টাকা মাইনে পাব, পঞ্চান্ন জন পাওনাদার হাঁ ক'রে রয়েছে।—বাবুলাল, দু'পয়সার মুড়ি না হয় নিয়ে এস, আর এক পয়সার বাতাসা। এতে হ'ল না, কেন না, সন্ধ্যার এদিকে ত আজ আর এখান থেকে রেহাই পাব না।"

সুদীর্ঘ একটি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া কাঙ্গিলাল বিড়িটাতে শেষ টান দিল।

আজ কি কারণে বড় বাবু তাহার উপর চটিয়া গিয়াছেন এবং হুকুম করিয়াছেন যে, রাত পর্য্যন্ত থাকিয়া কি একটা কায সারিয়া তবে কাঙ্গিলাল আজ বাড়ী যাইতে পারিবে।

দরোয়ান দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"কাঁজিলাল বাবু, এ মাসে কিছু আমাকে দেনেই হোবে—পচাশ না হয় ত তিশ দিয়ে দিতেই হোবে। দেশে ভেজ্‌তে হোবে, কুছু নেই দেনেশে নেই চলবে।"

কাহাকে না দিয়া যে চলিবে, কাঙ্গিলাল বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। কাল তাহার মাহিনা হইবে, কিন্তু সাত দিন হইতে সে এ মাসের দেনা-খরচের হিসাব করিয়া রাখিয়াছে এবং মনে মনে প্রত্যহ বিশবার করিয়া সেই হিসাবটা সে মিলাইয়া লইতেছে।—উটনোর দোকানে বিশ, নন্দর কলেজের মাইনে আট, ঘর-ভাড়া চোদ্দ, গোয়ালা চার, বিরাজ ডাক্তারের ডাক্তারখানা তিন, সরোজিনীর মা ছ'টাকা বার আনা, কয়লাওয়ালা দুই, ধোপা পাঁচসিকে, কায়েত-গিন্নী সাড়ে তিন। ইহার ভিতর পুঁজি ঐ পঁয়ত্রিশটি টাকা আর ছেলে পড়ানোর দু' যায়গায় পাঁচ আর ছয়, এগারোটি টাকা। সকালটায় আর একটা টুইশানি করিতে পারিলে হয়, কিন্তু সময়ে কুলায় না। নয়টার মধ্যেই তাহাকে স্নানাহার সারিয়া আফিসে বাহির হইতে হয়, নতুবা মাণিকতলা হইতে ক্রীমসন্ গ্রীন্ কোম্পানীর আফিসের প্রায় দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেলা ১০॥০টার মধ্যে সেখানে পৌছানো যায় না। সুতরাং কোন দিনই তাহার ডালের সঙ্গে একটা আলুভাতে ও দু'খানা কুমড়া বা বেগুণ ভাজার বেশী হইয়া উঠে না।

এমন অবস্থায় সকালে একটা টুইশানি লওয়া অসম্ভব। সন্ধ্যার টুইশানির একটি ৬৷৷০ হইতে ৮টা, দ্বিতীয়টি সওয়া ৮টা হইতে ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত। ইহাতেই বরাবর আফিসের ফেরত তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হয়। এই ছুটাছুটি শেষ করিয়া প্রত্যহ বাসায় ফিরিতে তাহার দশটা বাজিয়া যায়। তাহার পর একটু বিশ্রামান্তে মুখ-হাত ধোওয়া, তাহার পর রুটি খাওয়া। কিন্তু এ ভাবেও সে সকল দিক্ কুলাইয়া উঠিতে পারে না,—কোনমতেই আয়-ব্যয়ের অঙ্ককে সে সমান করিয়া তুলিতে পারে না, ব্যয়ের দিক্‌টা চিরকালই বড় হইয়া তাহাকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সব চল্‌তি ছোট দেনার জন্যও তত আসে যায় না। দেশের পৈতৃক জমী-জমাগুলিও নন্দর পড়ার ও অন্যান্য খরচের জন্য কয় বৎসর হইল বাঁধা পড়িয়াছে। তাহা সুদে আসলে এত ভারি হইয়া পড়িয়াছে যে, সেগুলির আর ফিরিয়া আসিবার আশা নাই। সেখান হইতে ক্রমাগত তাগিদের পর তাগিদ আসিতেছে। সুদে আসলে সে প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। তার পর শুধু হাতে হ্যাণ্ডনোটে দত্তদের কাছে একশ পচিশ, ঘোষেদের বড় গিন্নীর কাছে একশ, দরোয়ানের পঞ্চাশ। এই বড় দেনা শোধ করিতেই ত হাজার টাকা আবশ্যক। তার পর এখানে ওখানে খুচরা দেনাও কিছু জমিয়াছে। সেগুলিও একসঙ্গে করিলে শ'য়ের কাছাকাছি হইবে। তবে, একটা সুবিধা হইয়া আসিয়াছে, এইটি ভগবান্ ঘটাইয়া দিলেই তাহার খুচরো ও পাইকারী সব ঋণ একসঙ্গে একেবারেই শোধ হইয়া যাইবে। বৈশাখে নন্দর বিবাহটা হইলেই সে একেবারে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। এই আসন্ন মুক্তির আশা ও আনন্দে তাহার মনের ভার অনেকটা কমিয়াছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে দরোয়ানের কথার উত্তর দিতে গিয়া দেখিল যে, দরোয়ান মুড়ি আনিতে চলিয়া গিয়াছে।

সে দিন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাঞ্জিলালকে আফিসের কায করিতে হইল। সকালে তাহার খাওয়া হয় নাই। স্ত্রী বিদ্যুল্লতার মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সকালে উঠিয়া উনানে আগুন দিতে পারে নাই। বেলা ৮টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া স্বামীকে কহিয়াছিল,—"তুমিই কোন্ না হয় উনুনটা ধরিয়ে ভাতে-ভাতটা রেঁধে নিতে, তা হ'লে আর মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যেত না। কেনা-দাসীর অপিক্ষেয় না থেকে নিজের হাত-পাকে না হয় একটু খাটাতে। ননীর দেহ তাতে গ'লে যেত না বোধ হয়।" আরও কিছু বেশী শুনিবার ভয়ে কাঞ্জিলাল চুপ করিয়া তাড়াতাড়ি আফিসে চলিয়া আসিয়াছিল।

সওয়া সাতটার সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া কাঞ্জিলাল যখন তাহার টুইশানিতে হাজিরা দিবার জন্য জন-বহুল পথের জনতা ঠেলিতে ঠেলিতে দ্রুতপদে চলিতেছিল, তখন বাটীতে বিদ্যুৎ নিজের জন্য পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে পাশের বাটীর বোসেদের বড় গিন্নীর সহিত গল্প করিতেছিল।

বড় গিন্নী কহিল,—"হ্যাঁ লা বৌ, নিত্যি দু'বেলা ঐ চায়ের জলগুলো খাস কি ক'রে, পেটের খোল যে একেবারে আগুন ক'রে দেবে।"

"এই চাটুকু দু'বেলা খাই বলেই ত উঠতে পারি দিদি, নইলে মাথা ধরার যন্ত্রণায় অস্থির হ'তে হয়।"

কন্যা বিন্দুবাসিনী একধারে বসিয়া পিতার মশারির দু' একটা ছেঁড়া যায়গা শেলাই করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্যুৎ কহিল,—"হ্যাঁ রে, তোর দাদার ত আজকাল আর কলেজ নেই। হাতের গোড়ায় তার এক্‌জামিন। সেই ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছে কোথায় বল্ দেখি? বোধ হয়, তা হ'লে রুবিদেরই বাড়ী গিয়েছে।"

বড়গিন্নী কহিল,—"রবি কে? অক্ষয় চাটুয্যের ব্যাটা বুঝি?"

"রবি নয় দিদি—রুবি। তুমি চিনবে না, নন্দদের কলেজে পড়ে। নন্দর সঙ্গে খুব ভাব। এইবার বুঝি দু'টো পাশের পড়া পড়ছে। খুব ভাল মেয়ে।"

"নন্দর সঙ্গে পড়ে, কত বড় মেয়ে লো?"

"নন্দর সঙ্গে পড়ে না, আরও নীচে পড়ে। নন্দ ত আমার এই মাসে বি, এ পাশ দেবে।"

"বৌ, নন্দর বিয়ের কোথায় ঠিক-ঠিকানা হ'ল? ধেড়ে ধেড়ে কলেজে-পড়া মেয়েগুলোর সঙ্গে আর ওকে মিশতে দিস নি। যাই বল্, ও সব ভাল নয়।"

"নন্দ আমার সে ছেলেই নয়, দিদি। মেয়েটি নন্দর কাছ থেকে পড়া-টড়া একটু আধটু জেনে শুনে নেয়। আর নন্দর আমার বিয়ের ত সব ঠিক্‌ঠাকই হয়ে রয়েছে।

এই পাশটা হ'লেই, বোশেখেই হোক আর জষ্টিতেই হোক, ওর বিয়ে হবে।"

"কোথায় সম্বন্ধ হ'ল ?"

"আমাদের জাঙ্গীপাড়ারই ঐ দিকে—বেলতলী। বিয়ে ত এত দিন হয়েই যেত, ওর এগজামিনের জন্মেই আটকে আছে। নন্দর আমাদের যে শ্বশুর হবে, মস্ত বড় লোক। পাঁচ হাজার এক টাকা নগদ দেবে। তা' ছাড়া ৩০ ভরি সোণা, হীরের আংটী—"

"চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে গেল, শুনতে পাচ্ছ না, মা ? বাবা ডাকছে, শীগ্‌গীর এস।" সামনের একতলা-বাটীর ছাদের উপর হইতে বড় গিন্নীর উদ্দেশে চীৎকার আসিল। মেয়ের ডাকে বড় গিন্নী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া চলিয়া গেল। হীরার আংটীর পর বাকী ফর্দ্দটুকু আর তাহার শুনিবার অবসর হইল না, আর, নগদ সম্বন্ধে সত্যকার আসল অঙ্কটি যে এক হাজার এক, বিদ্যুতের কথার দীপ্তিতেই যে তাহাতে আরও চারি হাজারের অঙ্কপাত হইয়াছিল, সেটুকুও জানিতে পারিল না।

ইহারই ঘণ্টা দুই আড়াই পরে বিন্দু ও নন্দকে খাইতে দিয়া, স্বামীর ভাত বাড়িয়া, একধারে ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া, বিদ্যুৎ যখন খাইতে বসিল, তখন কাঞ্জিলাল এক বাড়ীর পড়ান শেষ করিয়া আর এক বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

রাতের ঘড়ীতে তখন ছোট কাঁটাটি নয়টার ঘরে থাকিয়া বড়টিকে তিনটার ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

২

মগরা হইতে যে ছোট রেল-লাইনটি বরাবর তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহারই একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে এক দিন চৈত্র মাসের অপরাহ্নকালে জনৈক ব্রাহ্মণ ধূলি-ধূসরিত পদে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং কলিকাতার গাড়ী আসিতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে জানিয়া, অদূরের একটি ছায়া-শীতল আম্রবৃক্ষতলের অভিমুখে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইল।

লোকটি কিছু লম্বা। শীর্ণাকৃতি। কিন্তু হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়গুলি দেখিলে সহজেই জানা যায় যে, চিরদিনই সে এইরূপ ঢ্যাঙ্গা ও শীর্ণাকৃতি ছিল না। হয় ত, যৌবনে তাহার এই মোটা হাড়ের উপরে উপযুক্ত পরিমাণে মাংসের সদ্ভাব ছিল। গাত্রবর্ণ তাঁবাটে, শুষ্ক চক্ষুর্দ্বয় নিষ্প্রভ, মস্তকটি কেশ-বিরল, এবং সেই বিরল কেশও শ্রীহীন, রুক্ষ এবং বিবর্ণ।

বয়স তাহার কত, তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই। হঠাৎ দেখিলে তিরিশের এপারে বলিয়াই মনে হয়; তবে একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, ৩৫।৩৬এর কোঠা বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু তিরিশও নয়, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশও নয়, সঠিক বয়ঃক্রম তাহার ৪১ বৎসর পার হইয়া কয়েক মাস হইয়াছে। ক্রিমসন্ গ্রীন্ কোম্পানীর আফিসেই তাহার চাকুরী প্রায় বিশ বৎসরের কাছাকাছি হইতে চলিল।

কাঞ্জিলাল আম্রবৃক্ষতলে বসিয়া বসিয়া সম্মুখের মাঠের দিকে দেখিতে লাগিল। তথায় ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছিল। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠখানি শীতান্তে যেন গায়ের সবুজ রংয়ের মলিদাচাদরখানি খুলিয়া ফেলিয়া, আনন্দে ও উল্লাসে বহু দূর-সীমান্তে আকাশের সহিত কোলাকুলি করিতেছে। এই ষ্টেশনটির পর আর দুইটি ষ্টেশন গেলেই তাহার নিজের গ্রামের ষ্টেশন। ঐ বহুদূরে যেখানে রেল-লাইন বাকিয়া ঘুরিয়া, আবুই-হাটির জলা পার হইয়া, আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়াছে, ঐখানেই তাহার গ্রাম। আজ তিন বৎসর হইল, নিতাই বাড়ুয্যের কাছে টাকা ধার করিবার পর হইতে, তাগাদার ভয়ে আর সে গাঁয়ের মাটী মাড়ায় নাই। নচেৎ আগে সে মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া গিয়া তাহার সাত পুরুষের ভিটা, তাহার সকল তীর্থের সেরা তীর্থ, তাহার জন্মস্থান, তাহার আজন্মের পরিচিত প্রিয় হইতে প্রিয়তর গ্রামখানিকে দেখিয়া আসিত। সে মনে ভাবে, তখনই সে জীবন্ত মানুষ ছিল, এখন গ্রাম ছাড়িয়া এ যেন তাহার নির্ব্বাসন হইয়াছে। পূর্ব্বের সে যেন মরিয়া গিয়া সহরের একঘেয়ে ইট-কাঠ-পাথর, আফিসের বৈচিত্র্যহীন পরিশ্রম আর লক্ষ লোকের হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

আজ এই ট্রেণে কলিকাতায় না ফিরিয়া একবার তাহার গাঁ-খানাকে দেখিয়া আসিলে হয়। কিন্তু নিতাই বাঁড়ুয্যের টাকার তাগাদা!—চুলায় যাউক তাগাদা! কিন্তু—কিন্তু—কাল বেলা ১০টার সময় যে ক্রীমসন্ গ্রীন্ কোম্পানীর আফিস——সব চুলায় যাউক। সে না খাইয়া তাহার গ্রামে

থাকিবে। অনাহারে তাহার গাঁয়ের মাটীর উপর মাথা রাখিয়া মরিবে। তাতেও সুখ—তাতেও তৃপ্তি!

"ঠাকুর মশাই, এই ৫টার গাড়ীতে যাবেন বুঝি? গাড়ী তা হ'লে এখনও যায় নি। ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে একটি লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

গায়ের পিরাণটি খুলিয়া কাঙ্গিলাল কাঁধের উপর রাখাতে গলার পৈতাগাছটি তাহার দেখা যাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বাড়ী বাপু তোমার?"

"আজ্ঞে, এই ছিকিষ্টোপুর। ছিকিষ্টোপুর জানো আপনি?—ভুঁইপাড়ার দক্ষিণে?—ঘণ্টা হয়েছে কি ঠাকুর মশাই? টিকিস্‌খানা তা হ'লে ক'রে ফেলি।"

লোকটি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণপুর। যেখানে বড় রথ হয়। মানাদের জাত দেখিতে গিয়া এই শ্রীকৃষ্ণপুরের ভিতর দিয়া কতবার সে গিয়াছে। কতবার বাবুদের রথতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছে।

তাহাদের গ্রামের রাস্তাই বরাবর পূর্ব্বদিকে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপুরের ভিতর দিয়া মানাদের জাত-তলা পার হইয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মানাদের জাত-তলার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিমেষে তাহার মন তথা হইতে তাহার গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গাঁয়ের শেষে এক দিকে মানকীর বিল, এক দিকে দখিণ ডাঙ্গার জলা, মাঝখানে এই রাস্তা। মান্‌কী বিলে কি পদ্মটাই ফোটে! বিলের পশ্চিমে বোষ্টম-পাড়ার বাগান-খানার নীচেই একধারে তার নিজের আখের ক্ষেত, একধারে পাঁচ কাঠা আলুর ক্ষেত। চৈত্র মাসের এই সময়টা বোষ্টম-পাড়ার বাগানের ড্যাফল, মাদার, শিরীষ আর আঁসফল গাছগুলাতে রং-বেরংয়ের হাজার পাখী এসে কি কলরব আর গান জুড়ে দেয়! বুড়ো রাধু বোষ্টমের মত বেহালা বাজিয়ে গান করতে এখনও কা'কে দেখলুম না। বুড়োর বয়স একশ'র কাছাকাছি হ'ল, এখনও তার কি মিষ্টি হাত আর গলা!

আজ রবিবার। গাঁয়ের হাটের দিন। ভিন্‌-গাঁর লোকরা এতক্ষণ হাট ক'রে সব ফিরতে আরম্ভ করেছে। সাঁওতালদের মেয়েরা এলো-খোঁপায় বনের ফুল গুঁজে দলে দলে সব হাটের ফেরত যাচ্ছে। তাদের পুরুষরা দূরে কোন গাছের তলায় বা ঝোপের ধারে কিম্বা ফাঁকা মাঠের ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে কেমন একটা উদাস সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে। সুরটা দূর থেকে যেন একটা স্বপ্ন নিয়ে কাণে এসে লাগে। কি যে আছে ওদের ঐ বাঁশীর সুরে!

নদীর জল হাটতলার কাছে এখনও শুকায় নি। বোশেখ মাসের এ দিকে আর হেঁটে পার হ'তে কেউ পারছে না,—ওপারের লোকদের ঐ তাল-ডোঙ্গাতেই পার হতে হবে'খন। না—না—সেবার বুঝি বারোয়ারীর তবিল থেকে বাঁশের ভাল সাঁকো ক'রে দেওয়া হয়েছে। তার পর থেকে ত আমি আর আসি নি। আসছে হপ্তায় একবার আসব। নিতাই বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়লে, বোলবো—'জষ্টিমাসে নন্দর বিয়েতে হাজার টাকা পাব, তোমার পাই পয়সা হিসেব ক'রে ঐ সময় দিয়ে দেবো।' উঃ!—কাবুলীওলারও বাড়া। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির ক'রে মেরেছে।

"আরে মহাদেব যে! ভাল আছ ত? এখানে কোথায় এসেছিলে?"

কাঙ্গিলাল চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল—নিতাই বাঁড়ুয্যে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।—হাটু পর্য্যন্ত ধূলায়-ধূসর নগ্ন পা, এক হাতে তেলে-পাকা একটা বাঁশের লাঠি, অপর হাতে কেম্বিসের ছোট একটা ব্যাগ। তাহারই লোহার হুকটাতে ছোট্ট একরত্তি একটা হুঁকা ঝুলিতেছে। গুল-ঝাড়া একটি কলিকার নিম্নের অর্দ্ধাংশ কোমরের কাপড়ে গোঁজা। নগ্ন গা। গায়ের চাদরখানা মাথায় বাঁধা এবং স্নানের তৈল-মলিন গামছাখানা কোমরে জড়ান।

নিতাই বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—"মহাদেব যে আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে এ দিকে আসতে আরম্ভ করেছ দেখছি।"

"নন্দর জন্যে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম। এই বেলতলীতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল কি না। ৭ই জৈষ্ঠি দিন স্থির হ'ল। আজ পাকা দেখাটা—"

"দেখতে এসেছিলে? তা, ছেলের বে দিচ্ছ, পাকা দেখা দেখছ, এ দিকে বন্ধকী দলীলখানা যে কেঁচে যাবার যোগাড় হচ্ছে। আমার সঙ্গে একবার ঐ সূত্রে পাকা দেখাটা দেখলে হয় না? সুদে আসলে যে হাজারের কোঠায় এসে পড়ল। টাকা নেবার বেলায় সকলেই ভদ্দর হয়, আর

দেবার বেলায় দেখছি ছোটলোকের একশেষ। বাক্স খুলে উপকার ক'রে তার পর—"

ক্রোধে নিতাই বাঁড়ুয্যের আর কথা বাহির হইল না।

কাঞ্চিলাল ঢোক গিলিয়া কহিল—"এ দিকে কি কাযে আজ—"

"শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ; আমারও বটে—এদেরও বটে। এই তোমার সঙ্গে ব্যাপার যা, এ-ও তাই! তাগাদা। ঘর থেকে টাকা বার ক'রে দিয়ে, এখন দোর-দোর—"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা-বার্ত্তার পর নিতাই বাঁড়ুয্যের রাগ দূর হইল, মুখে তাহার হাসি ফুটিল। নিতাই কহিলেন,—"তা মহাদেব, পুত্র-ভাগ্যটা তোমার ভাল। হাজার-একের আর কিছু বেশী আদায় করতে পারলে না? বেলতলীর চাটুয্যেদের অবস্থা বেশ শাঁসে-জলে হে। তা যাই হোক, তা হ'লে দেনা-পত্তর শোধ দিয়ে হাতে আর কিছু থাকবে না। তা নাই থাক্, তবুও ঋণমুক্ত হয়ে হালকা হয়ে যাবে, মহাদেব।"

"আজ্ঞে, সে কথা আর একবার ক'রে বলতে, বাঁড়ুয্যে মশাই! দেনা-পত্তর চুকিয়ে ঐ যে শ'খানেক টাকা বাঁচবে, ঐটে লুকিয়ে পোষ্টাফিসে রেখে দেব। আমার স্ত্রী বলে যে, এর ভেতর থেকে দু'শ টাকা দিয়ে তাকে চুড়ি গড়িয়ে দিতে। সে ত, বাঁড়ুয্যে মশাই, একেবারে নাছোড়বান্দা। কিন্তু তা আমি কিছুতেই দিচ্ছি না। একশ'টা টাকা পোষ্টাফিসে আমি রেখে দেবোই।"

"তা দিও—দিও। সময়ে অসময়ে, আপদটা-বিপদটা আছে; আর—বেশ বেশ। শুনে বড় সুখী হলুম। ঐ তোমার গাড়ীর ধোঁয়া দেখা দিয়েছে, টিকিট করা আছে ত? আমি তা হ'লে ৬ই তারিখে একেবারে কওলাখানা নিয়েই তোমার ওখানে যাব। রথ দেখা কলা বেচা একসঙ্গেই হবে। বরযাত্রও যাব, পরের দিন কওলাখানা তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে টাকাটাও আনবো। আচ্ছা, এস এস।"

শব্দ করিয়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

৩

বৈশাখ মাসের মাঝা-মাঝি নন্দর বি, এ, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে কাঞ্চিলালের অন্তরে পর পর নানা রকম সুখ, উৎসাহ ও আশা আসিয়া ভরিয়া গিয়াছিল, ভবিষ্যতের রঙ্গীন চিন্তারাশিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার চোখে ঘুম আসে নাই। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই তাহার দেনা-পাওনার একটা হিসাব কাগজ-কলম লইয়া লিখিয়া ফেলিল। এই হিসাবটা আজকাল সে প্রত্যহ বিশ-বার করিয়া মনে মনে করিয়া আসিতেছে। হিসাবটা এইরূপ:—

জমা————————**খরচ**————————

১০০১৲ নিতাই বন্দ্যো—আসল মায় সুদ—
বৈশাখ পর্য্যন্ত শোধ———৪২২৲
ঘোষেদের বড় গিন্নী———১০০৲
দত্তদের হ্যাণ্ডনোট বাবদ ——১২৮৲
বাবুলাল দরোয়ান————৫০৲
মুদী, ধোবা, দুধ, বাড়ীভাড়া বিরাজ
ডাক্তার, পরেশ, সরোজিনীর মা
প্রভৃতি —————————১০০৲
বিয়ের খরচ-পত্র ——————১০০৲
সেভিং ব্যাঙ্কে জমা————১০০৲

১০০০৲

সে দিন ছিল রবিবার। সকালে একটু বেলায় উঠিয়া ফর্দ্দখানি লিখিবার পর কাঞ্চিলাল তাহার মাথার বালিসের ওয়াড় ও ফতুয়াটাতে উঠানের একধারে বসিয়া সাবান মাখাইতেছিল। মন্থরগতিতে জমাখরচের কাগজখানা হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া বিদ্যুৎ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। আসিয়া সে কি বলিবে, তাহা ঠিক করিয়াই আসিয়াছিল; কিন্তু কোন্‌খান হইতে আরম্ভ করিবে, সেটা ঠিক করিয়া আসে নাই। তাই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ পিছন হইতে কহিল—"সাবান দিচ্ছ?" গলার স্বর যতদূর সম্ভব গম্ভীর।

কাঞ্চিলাল চম্‌কাইয়া উঠিয়া, পিছন দিকে মুখ ফিরাইল, কহিল—"হুঁ।"

"ডাকঘরে যার অত টাকা, তার নিজের হাতে সাবান দেওয়া কেন, দুটো চাকর রাখলেই ত হয়।"

এই তীব্র বাণের লক্ষ্যটা যে কোথায়, কাঞ্চিলাল ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিছু একটা বলিবার বোধ হয় চেষ্টা করিতে গেল; কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া বিদ্যুৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে কহিল—"আমাকেই না হয় মাসে মাসে সিকে পাঁচেক ক'রে মাইনের ব্যবস্থা ক'রে দাও না। শুধু

পেটভাতায় আর চলে না, তাই ভাবলুম, বাবুকে একবার জানাই, যদি দয়া ক'রে কিছু—"

—বলিয়াই হঠাৎ সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনয়ের ঢংয়ে, অতি কোমল ও করুণ কণ্ঠে কহিল—"এই হাত দুখানি আপনি একবার দেখুন বাবু।"

সম্মুখের দিকে বিদ্যুৎ হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া দিল।

"হাত দু'খানা আপনি দেখুন বাবু আদ্দিকালের রুলি দু'গাছা গালা জড়িয়ে আর থাকতে রাজী হচ্ছে না, ঝাঁঝরা হয়ে সব খসে-খসে পড়ছে। সামান্য কিছু মাস-মাইনের ব্যবস্থাটা হ'লে, দু'গাছা শাঁখা বাঁধিয়ে ফেলি। সব বাবুদের বাড়ীর ঝিয়েদের আজকাল শাঁখা বাঁধানো হয়েছে।"

সাবান হাতে কপালের ঘাম মুছিতে গিয়া এক ধাবড়া সাবান কাঞ্জিলালের কপালময় লাগিয়া গেল।

কাঞ্জিলাল কহিল—"ব্যাপারটা কি, খুলে না বললে কিছু ত বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছ না?" বলিয়া হাতের মুঠার মধ্য হইতে কাঞ্জিলালের সেই হিসাবের কাগজখানা বিদ্যুৎ তাহার দিকে সজোরে ছুড়িয়া দিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল—"দেনাপত্তর শোধ ক'রে মবলগ্ একশ টাকা ডাকঘরে রাখবে, একেবারে ফর্দ্দ-টর্দ্দ লেখা কম্‌পিলিট্? কিন্তু আমি ব'লে রাখছি, চুড়ির জন্যে দু'শ টাকা আমার চাই-ই চাই। তার পর তুমি দেনাই শোধ কর আর যা-ই কর। আহা, ম'রে যাই আর কি! এর মধ্যে বাবুর আমার ফর্দ্দ-টর্দ্দ সব সারা! ফের বলছি, চুড়ির দু'শ টাকা আমার হাতে আগে দিয়ে তবে অন্য কথা, তা না হ'লে আমি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধাব।"

বিদ্যুৎএর গলার আওয়াজে সেখানকার সমস্ত বাতাসটা গম্ গম্ করিয়া উঠিল।

কাঞ্জিলাল কহিল—"এই সব দেনাপত্তর শোধ দিয়ে এর ভেতর থেকে কি আর এখন চুড়ি হয়?"

"হয় না?"

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কাঞ্জিলালের কাপড় কাচা মাথায় উঠিয়া গেল। সে কোনমতে সেইগুলি ধুইয়া তাড়াতাড়ি উঠানের দড়িতে রৌদ্রে মেলিয়া দিল এবং ঘরের আলনা হইতে জামাটা ও ছাতাটা লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত ১০টা। কাহারও কোন সাড়া-শব্দ নাই। জ্যোৎস্নার আলোতে দেখিল, রান্নাঘরের সামনে একপাশে ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসী গাদা হইয়া রহিয়াছে; শুইবার ঘরের দাওয়ার একধারে ছেঁড়া জামা-কাপড় ও কাগজপত্র জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। একপাশে মাদুর পাতিয়া বিন্দু শুইয়া ছিল। পিতার পায়ের শব্দে সে উঠিয়া পড়িল এবং কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল,—"রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছি, চল, তোমায় দিই গে। সকালে তুমি চ'লে গেলে, মা তোমার জামা, কাপড়, বিছানা, মশারি, কাগজ-পত্তর, বই-টই সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করেছে। রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছে। দিও বাবা,—ওর ভেতর থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে মাকে চুড়ি ক'গাছা গড়িয়ে দিও।"

"তোর দাদা শুয়েছে?"

"দাদা রুবিদিদিদের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে। রুবিদিদির মা নাকি বলেছে, দাদা আজ তাদের বাড়ীতেই থাকবে, বাড়ী আসবে না। সারাদিন কিছু খাও নি বাবা?"

"ভাত খেয়েছি।"

"কোথায় খেলে?

"ভবানীপুরে তোর কেষ্ট কাকার বাড়ী।"

"আমি তোমার ভাত বাড়ি গে, তুমি এস বাবা।" বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। কাঞ্জিলাল দাওয়ার খুঁটী ধরিয়া তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

পরের রবিবার।

দ্বিপ্রহরে কাঞ্জিলাল আহারে বসিয়াছে। সম্মুখে বসিয়া বিদ্যুৎ একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। বাতাস করিতে করিতে চিন্তিত-মুখে কহিল,—"চেহারাটা তোমার বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, আমার এক'পো দুধ আমি আর কাল থেকে খাব না, ও দুধ-পোয়াটা তুমিই খেও।—ভাত ক'টা অম্বলের সঙ্গে মেখে নাও। একমুঠো

ভাত দিয়েছি, তা'ও পাতে প'ড়ে থাকলো,—ও কি খেলে বল দেখি? দোকান থেকে বিন্দুকে দিয়ে দুটো মিষ্টি আনিয়ে দেবো?"

"না, গুড় থাকে ত তাই একটু দাও।"

বিদ্যুৎ উঠিল না। যেমন বাতাস করিতেছিল, করিতে লাগিল। গুড় আনিয়া দিতে বিন্দুকে হাঁকিয়া বলিল।

"ছেলে-পড়ান একটা তুমি ছেড়ে দাও। অত খাটুনি তোমার সহ্য হবে না। দেহ আগে না টাকা আগে শুনি। আমার টাকার দরকার নেই। সকলে নুণ দিয়ে ভাত খাব, সেও ভাল। খবরদার, তুমি আর অত খাটতে পারবে না।"

কথাটা এই যে, গত রবিবারের সেই ব্যাপারের পর ইহাই স্থির হইয়াছে যে, দত্তদের হ্যাণ্ডনোটের একশ আটাশ টাকা এখন শোধ না করিয়া ঐ টাকা, এবং ডাকঘরে যে একশ রাখিবার ফন্দ হইয়াছিল, ওই একশ, এই দুইশ টাকা দিয়া বিদ্যুতের জন্য আটগাছা গোখরী চুড়ি গড়ান হইবে।

ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলাসের বাকী জলটুকু পান করিয়া কাঙ্গিলাল উঠিয়া পড়িল। বিদ্যুৎ তাকের উপর হইতে পানের ডিবাটা হাতে লইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভগবানের উপর দুঃখ করিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল— "কি যে বরাতে লিখে আমাদের ভারতে পাঠিয়েছিলেন, এক দিনের জন্যে লোকে খেয়ে দেয়ে দুদণ্ড শুয়ে যে একটু বিশ্রাম করবে, তা আর ভাগ্যে হ'ল না।" তাহার পর স্বামীর উদ্দেশে কহিল—"ও ঘরে গিয়ে এখন একটু ঘুমোও। চিরকালই দৌড়-ঝাঁপ্ আর ঘুচলো না। এইবার পাশ হয়ে নন্দ একটা কাযকর্ম্ম করুক বাপু, ওকে একটু হাঁফ ছাড়তে দিক।"

বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাঙ্গিলাল বিদ্যুতের শেষ কথাটার সূত্র ধরিয়া নানারকম ভাবিতে লাগিল। ভাবিল— "সত্যি, এইবার একটু হাঁফ ছাড়তে হবে। বিয়ের পরই নন্দর পাশের খবর বেরুবে। ও যে ছেলে, পাশ নিশ্চয়ই হবে। অমন হীরের টুকরো ছেলে, বি, এ, পাশ, ৭০।৮০ টাকা মাইনের চাকুরী যেখানে হোক হবেই একটা। তখন ও একটা মেসে-টেসে থাকবে এখন, আর আমরা জাঙ্গীপাড়ায় গিয়ে থাকবো। জাঙ্গীপাড়ায় গিয়ে থাকতে পারলে আমার নব-জীবন লাভ হবে। রোজ ভোরে উঠবো। উঠে, মানকীর বিলের ধার দিয়ে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসবো। তার পর ঘরের গরুর দুধ দোওয়া হ'লে, সেই দুধের চা হবে। খিড়কীর জেওলতলার দিকে, হাড়িদের আমগাছ পর্য্যন্ত সমস্ত যায়গাটা ঘিরে ফেলতে হবে। ওখানটায় শাকসব্জী লাউ, ঝিঙে, কলা, পেপে সব দোব। মাণিকতলা থেকে কতকগুলো ইউক্যালিপটাসের চারা নিয়ে গিয়ে ধারে ধারে লাগিয়ে দিলে হয়। সকালটায় ঐ সব গাছপালার দেখা-শোনা নিয়েই থাকব। বিকেলে চণ্ডীমণ্ডপখানাতে তাসের আড্ডা ফাঁদতে হবে। জাঙ্গীপাড়ায় তাসখেলা যে কত দিন খেলি নি! আমি বাড়ীতে গিয়ে চেপে বসলে ও-পাড়ার হাবুল, রাজারাম, বামাচরণ সকলেই আসবে। কেউ 'না' বলতে পারবে না। রোজ দুটো পয়সার তামাক খরচ,—এই যা। আর একখানা দৈনিক বসুমতী নিতে হবে। আসছে শনিবার একবার গেলে হয়। রবিবারটা থেকে সোমবার ভোরের ট্রেণে— একগাছা ছিপ নিয়ে আসছে শনিবার আফিসের ফেরত যাব। নদীর দ'য়েতে এখন ছিপ ফেলবার ধুম প'ড়ে গেছে।"

কাঙ্গিলাল বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। মনসাতলার দ'য়ে মাছ ধরার কথাটা তাহার বারবার কেবলই মনে হইতে লাগিল। অনেক দিন আগে একবার দ'য়ের বাঁকের ডাল-করমচা-ঝোপের নীচে ব'সে সে ছয় সের একটা রুই গাথিয়াছিল। তখন আষাঢ় মাস। গাঁয়ের মাঠে সবেমাত্র বৃষ্টি নামিয়াছে। ওপারের ক্ষেতগুলাতে তখনও লাঙ্গল লাগে নাই। সারা মাঠটার মধ্যে একটিও কৃষাণকে কাজ করিতে দেখা গেল না। ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অতবড় মাছটাকে লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়িতে হইল। হঠাৎ মতি দুলে এ-পার দিয়ে নিড়ান হাতে তার বীজতলা নিড়াইতে যাইতেছিল, তাহাকে পাইয়া তবে ছ'সাত সের ওজনের সেই মাছটাকে কায়দা করিতে পারা গিয়াছিল।

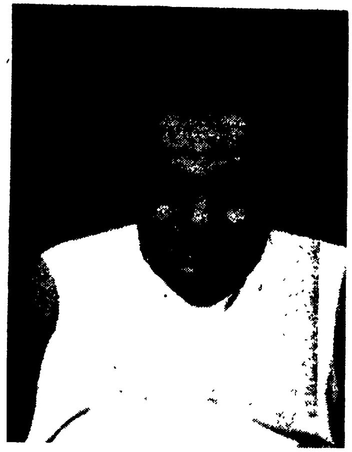
হঠাৎ তাহার মাথায় একটা খেয়াল আসিল। সে কাল বাবুলাল দরোয়ানের কাছ হইতে আরও পাঁচটা টাকা ধার করিবে। ঐ টাকাতে সে চাঁদনী হইতে একগাছা তিন পিস্ ফোল্ডিং ছিপ কিনিবে। সেই ছিপে হুইল খাটাইয়া লইয়া সে শনিবার জাঙ্গীপাড়া যাইবে। ফোল্ডিং ছিপ একগাছি তাহার অনেক দিনের সখ। পয়সা অভাবে সে এর আগে কিনিতে পারে নাই, এইবার নন্দর কল্যাণে—। বাজে ব্যয়!

হাসির হাট

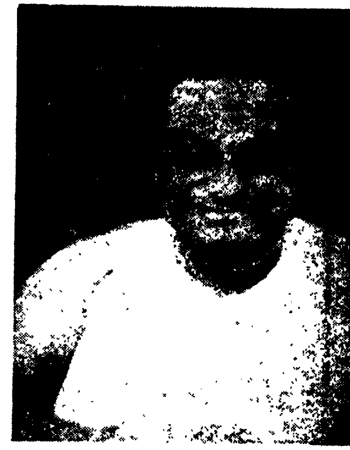
[সাজ-সজ্জা ব্যতীত এক মুখে রকমারী হাসি]



উল্লুকে হাসি



বাঁদুরে হাসি



পেচা হাসি



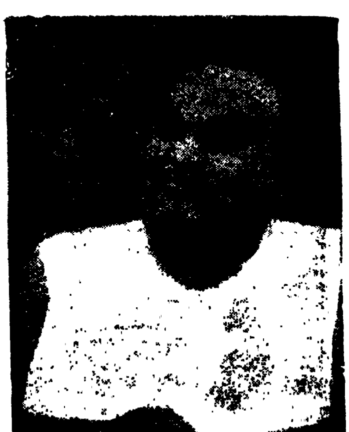
হাবার হাসি



টেরার হাসি



কাণার হাসি



দন্তখেলু হাসি



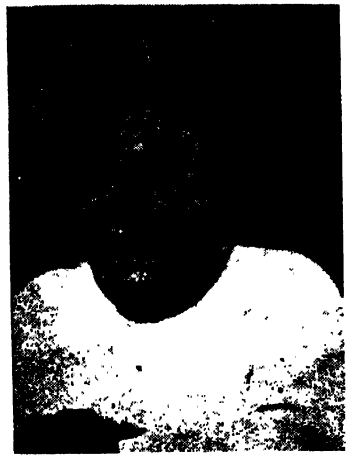
লুকোচুরি হাসি



বেজায় খুসী হাসি



বনমানুষ হাসি



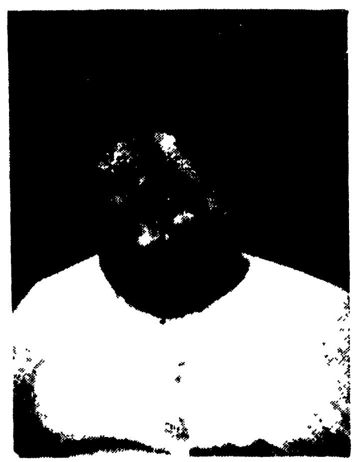
মজলিসি হাসি



খোকন হাসি



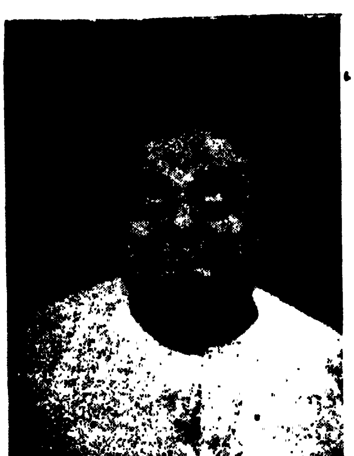
দেখন হাসি



জোয়ার ভাঁটা হাসি



ঝুলো হাসি



রাহ গভীর হাসি



মাতব্বরী হাসি



অবাক্ হাসি

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

হোক বাজে ব্যয়। হাজার টাকার ভেতর না হয় পাঁচটা টাকা চিরদিনের একটা সখের জিনিষের জন্য গেলই। জাঙ্গীপাড়ার লোকরা এ ছিপ দেখে একেবারে চমকে যাবে। এ রকম ফোল্ডিং ছিপ তারা কেউ কখনো দেখে নি।

ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় কাঙ্গিলাল শুইয়া পড়িল এবং নন্দর বিয়ে, জাঙ্গীপাড়া, সেখানকার পাড়া-প্রতিবেশী, গাঁয়ের শান্ত ছবি, তথাকার অফুরন্ত সুখ-শান্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্র পশ্চিমের জানালার ফুটা দিয়া যখন তাহার মুখে-চোখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ওদিককার দাওয়ায় তখন বিদ্যুৎ, বিন্দু ও নন্দর গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। বিন্দুকে একটা ধমক দিয়া বিদ্যুৎ বলিল—"মেয়ের সখ দেখে বাঁচি না। তোর একটু আক্কেল নেই লা, দেনায় দেনায় মাথা বিকিয়ে রয়েছে, এ সময় তোর কাণের দুল না হ'লে চলবে না?"

বিন্দু অভিমানের স্বরে জবাব দিল—"ও-ঘরের দিদিমা বললে, দশটা টাকা হ'লেই হবে।"

"দশ টাকা কি কম হ'ল বুঝি? যা পাওয়া যাবে, তা দেনা দিতেই কুলোবে না। খেটে খেটে ও সারা হয়ে গেল, ওর মুখের দিকে তোদের একটু চাইতে ইচ্ছে হয় না? এখন সখ করবার সময়?

কান্নার সুরে বিন্দু বলিল—"তা ব'লে দাদার বিয়ের সময় আমি শুধু কাণে থাকতে পারব না। দুল একজোড়া আমায় কিনে দিতেই হবে।"

বিদ্যুৎ ঝাঁকি দিয়া বলিল—"কি কঠিন পণ রে তোর, বিন্দি! সখকেও তোর বলি হারি যাই! এই টানাটানির সময়, কাণের দুল!"

নন্দ উঠানে পায়চারী করিতেছিল, মৃদু হাসিয়া কহিল,—"তোমরা ঝগড়া কর তা হ'লে, আমি চললুম।"

বিদ্যুৎ তাহাকে কহিল,—"উপীন স্যাক্‌রাকে একবার তাগাদা ক'রে যাস বাবা, যেন জিনিষটা আমার ২।৪ দিনের মধ্যেই দেয়। ওঁর নাম ক'রে বলবি, টাকা কড়ায় গণ্ডায় বিয়ের পরদিনই বেবাক চুকিয়ে দেওয়া হবে। বিয়ের আগেই যেন জিনিষটা পাই।"

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নন্দ চলিয়া গেল।

৫

ষ্টেশনে নামিয়া জাঙ্গীপাড়ার পথে, মাঠ ধরিয়া কাঙ্গিলাল চলিতেছিল। দুই পাশে শস্যহীন ধূসর মাঠ। বৈশাখের তীব্র রৌদ্রে তাহার নগ্ন-গাত্রের সর্ব্বাংশে ফাটল ধরিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দু'একখানি পটল ও আকের সবুজ ক্ষেত, মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত দেখাইতেছিল। বাঁ-দিকের সরু আঁকা-বাঁকা পথটা মাঠের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। ডান দিকের পথটা খানিকটা দূর গিয়া এক যায়গায় বড় বড় তেঁতুল, তাল, দেবদারু প্রভৃতির তলায় গিয়া শেষ হইয়াছে। সেইখানে বালি-খাতের স্বচ্ছ জলের লোভে ও-গাঁয়ের বাউরীরা আসিয়া তাহাদের ছোট ছোট দো-চালা কুঁড়ে তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছে।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছিল। কাঙ্গিলাল অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে তাহার গাঁয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।—'এটা কি? ভুঁইপাড়া? ভুঁইপাড়ার মাঠখানা পার হলেই ত তাহার গ্রাম। হাটতলার নীচে নদীর জল এখন নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে। এখন বৈশাখ মাসের শেষ, এখনও কি ওখানটায় আর জল থাকে? তবে মনসাতলার দ'য়ে বারমাসই অগাধ জল। কাল সকাল-সকাল ছিপ-গাছটা নিয়ে একবার বসতে হবে। ছিপ-গাছটা কি সুন্দরই পাওয়া গেছে দরোয়ানের খুচরোটা নিয়ে প্রায় ষাট টাকা হয়ে গেল! হোক্ গে। এইবার গা-ঝাড়া দিয়ে, সেখানে যা' আছে, সব শোধ ক'রে দেবো। আর দেনায় জড়াচ্ছি না। বাঁড়ুয্যেকে দলীলখানা শুদ্ধ পরশু একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। মাঝে ত আর পাঁচ ছ'টা দিন খালি বাকি।—কে হে? হরিদাস? ভাল আছ ত বাবা?—হ্যাঁ, এলুম একবার অনেক দিন পরে: ছেলেপুলে সব ভাল আছে?'

"দু' চারদিন থাকা হবে ত, খুড়ো ঠাকুর?"

"না বাবা, পরশুই আবার যেতে হবে, নন্দর বিয়ে কি না!"

"জমী-জারাতগুলো বাঁড়ুয্যে মশা'য়ের কাছ থেকে—"

"হ্যাঁ বাবা, এইবার সব খালাস ক'রে ফেলবো। ছিপ-গাছটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলুম, কাল দ'য়ে একবার ফেলবো।

এ ছিপ তোমরা দেখনি। ও তিন টুকরোয় ভাঙ্গা আছে—ফোলডিং, জুড়লে একটা গোটা ছিপ হয়ে যাবে।—কে যাও হে, মাইতির পো নয়? বলি, খবর সব ভাল ত?"

ছিরু মাইতি ডানদিকের চাল্‌তা-তলার পথ ধরিয়া যাইতেছিল, কাঞ্জিলালের প্রশ্নে সে ফিরিয়া দাড়াইয়া নমস্কার করিল এবং উত্তরের পরিবর্ত্তে সে-ও প্রশ্ন করিল—"কে, মহাদেব ঠাকুদ্দা না?"

গাঁয়ে ঢুকিতেই নায়েবপাড়ার সান্ধ্য সঙ্কীর্ত্তনের গান ও খোলের শব্দ কাঞ্জিলালের কাণে মধু ঢালিয়া দিল। সে অপূর্ব্ব উল্লাসে উৎসাহপূর্ণ পদক্ষেপে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পরদিন তাহার যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সোমবার প্রত্যুষে নিতাই বাড়ুয্যেকে সঙ্গে করিয়া সে আবার ষ্টেশনের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সে দিন ইচ্ছা করিয়াই কাঞ্জিলাল মিছামিছি আফিস কামাই করিল। বেলা ১০টার সময় হাওড়ার ষ্টেশনে নামিয়া নিতাই বাড়ুয্যেকে সঙ্গে লইয়া সে বরাবর মাণিক-তলায় আসিল। খালের পোলের কাছে বিরাজ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কাঞ্জিলাল তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"ভায়া, ডাক্তারবাবুকে বলবেন, আর পাঁচ-সাতটা দিন পরেই বিলটা চুকিয়ে দেবো। বড্ড দেরী হয়ে গেল, কিছু না মনে করেন।"

থানার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ঠং ঠং করিয়া ঘড়ীতে ১১টা বাজিয়া গেল। পরেশ পাশ দিয়া যাইতেছিল, কহিল—"কাঞ্জিলাল বাবু,—"

তাহাকে বলিতে না দিয়া, কাঞ্জিলাল বলিয়া উঠিল,—"বলিছি ত বাপু, এই ক'টা দিন আর তাগাদা ক'রো না, আর পাচ সাতটা দিন——"

"আজ্ঞে, সে কথা নয়। কোথায় গিছলেন?—যান, শীগ্‌গীর বাড়ী যান, গিয়ে দেখুন গে।"

আর কিছু না বলিয়া পরেশ চলিয়া গেল। দ্রুতপদে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কাঞ্জিলাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সকলের আহার হইয়া গিয়াছে। বিন্দু কলতলায় বাসন মাজিতেছে; বিদ্যুৎ মেজেয় মাতুরের উপর শুইয়া কি একখানা গল্পের বই পড়িতেছে। কাঞ্জিলালকে দেখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল এবং তাকের উপর হইতে একখানা চিঠি লইয়া তাহার উদ্দেশে মেঝের উপর ছুড়িয়া দিল। তাহার পর পুনরায় শুইয়া পড়িয়া বইখানি হাতে করিয়া লইল।

কম্পিত হস্তে পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া কাঞ্জিলাল পাঠ করিল এবং তাহার পর সেইখানে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পত্রে লেখা ছিল:—

"রুবি আর আমি, পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করিব। সে কারণ আমরা উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম। কোথায় যাইব, কি ভাবে থাকিব, তাহা অদৃষ্ট-বিধাতারই হিসাবের সামিল। ইতি— নন্দ।"

ধীরে ধীরে কাঞ্জিলালের একটি শ্বাস তাহার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া সেখানকার বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

তুষারতীর্থ—অমরনাথ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ত্রেগাম হইতেই পোষ্ট আফিসের সম্পর্ক ছাড়িব। কাযেই এখান হইতে বাড়ীতে আমাদের পৌছান সংবাদ দিলাম। স্বামীজীরা নম্বরদারকে খুঁজিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দুই জন নম্বরদারই আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া জানাইল যে, আমরা কত দিন থাকিব, কি কি দরকার, হুকুম করুন। বুঝিলাম, ইহা সেই চিঠির ফল। যাহা হউক, সময় থাকায় ত্রেগামে অনর্থক দেরী না করিয়া এখান হইতে ২।০ মাইল দূর লোদ্রোয়ানা (Lodrowana) যাওয়াই সঙ্গত মনে হইল। নম্বরদারকে আমাদের জন্য কুলী ঠিক করিয়া দিতে বলিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা এই ২।০ মাইলের জন্য ৵০ আনা হিসাবে কুলী ঠিক করিয়া দিল। এখানের প্রত্যেক কুলী দেড়মণ বোঝা লয়।

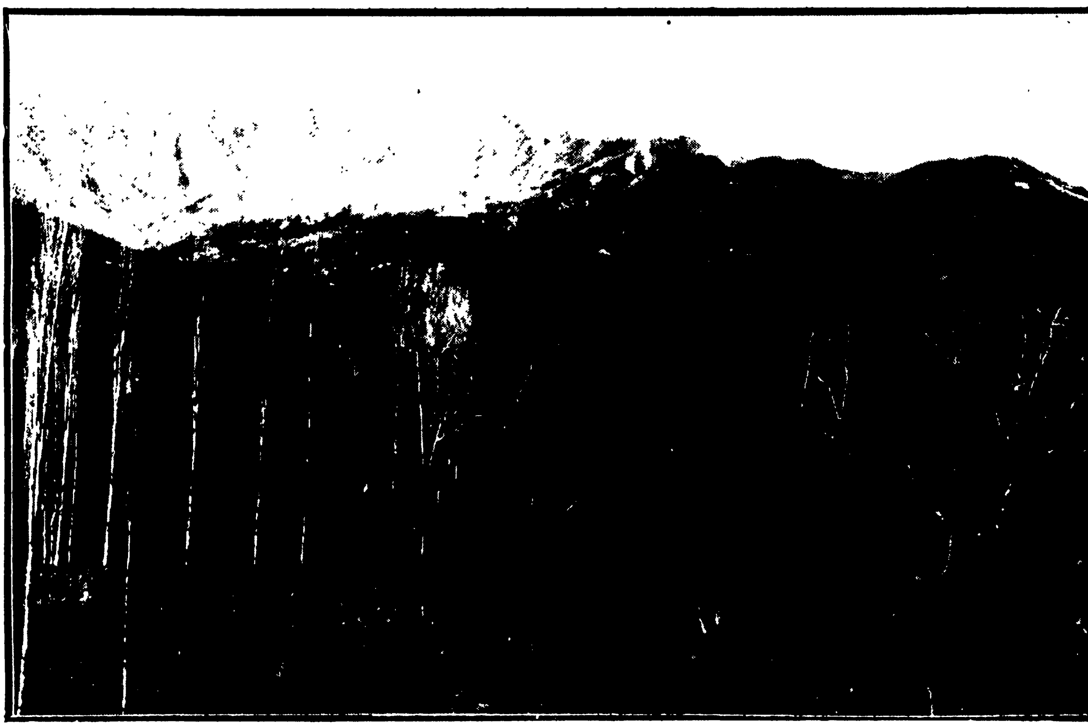
ত্রেগাম হইতেই পায়ে হাঁটা আরম্ভ হইল। কুলীরা পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শঙ্করনাথজী বহু পূর্ব্বে একবার এ পথে আসিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি লোদ্রোয়ানায় নন্দলালের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেবারের ব্যবহারে স্বামীজীর এ আশা ছিল যে, তাঁহার বাড়ী গেলেই আশ্রয় পাওয়া যাইবে। এত দিন সমতল ক্ষেত্রেই ছিলাম, এইবার আবার পাহাড় সুরু হইল—চারিদিকে মেটে রংএর দৈত্যগুলি একে একে মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে লাগিল। লোদ্রোয়ানা পর্য্যন্ত পথে কোনও পাহাড় নাই, প্রায় সমতল ও ক্ষেতের আইলের উপর দিয়া রাস্তা। রাস্তায় পাশের একটা উঁচু ঢিবিতে একটি মেয়েকে দেখিয়া আমরা সকলেই কিছুক্ষণের জন্য না দাঁড়াইয়া পারি নাই। মেয়েটি গরু চরাইতেছিল, বেশভূষাও তদনুরূপ, কিন্তু এই দারিদ্র্যও তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই—মনে হইল, মাদুর্গা গোয়ালিনীর বেশে বুঝি পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় লোদ্রোয়ানা পৌছিলাম। নন্দলালজী ও টীকারামজী এ দিকের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, কাযেই কুলীরা সহজেই তাঁহাদের বাড়ী চিনিয়া আমাদিগকে লইয়া গেল। স্বামীজীদিগকে দেখিয়া দুই ভাই-ই উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। স্বামীজীরা কল্যাণ কামনা করিয়া এই সাতটি প্রাণীর আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। দুই ভাই শশব্যস্তে আমাদের থাকিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড দোতলা ঘর ঠিক করিয়া দিলেন ও মালপত্র সেখানে তোলাইয়া দিলেন। গৃহস্বামীরা অবশ্যই ১২ বৎসর পূর্ব্বে ২।১ দিনের জন্য দেখা শঙ্করনাথজীকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই—এমনই অতিথি হিসাবেই আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইঁহারা এ দিকের মধ্যে বড় ব্যবসাদার। বৎসরে আট দশ হাজার টাকার কারবার করেন অথচ বেশভূষা চালচলন আমাদের দেশের আপিসের দরজা-শোভাকারী দোবে-চৌবের মত। বিলাসিতা-বিষধর পাহাড়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া শ্রীনগর, সোপুর পৌছিয়াছে—হিমালয়ের কোলে "আসকটও" পৌছিয়াছে, কিন্তু এখনও এ সব যায়গা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

নিজেদের ডাণ্ডা গুছাইয়া আসিয়া গৃহস্বামীদের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিলাম। বহুদিনের পরিচিতের মত আলাপ জমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর এক জন চাকর আসিয়া বসিবার যায়গার পাশে কতকগুলি আবর্জ্জনা, ভিজাকাঠ প্রভৃতিতে আগুন দিয়া ধূম্র উৎপাদন করিল। বুঝিলাম, মশা তাড়াইবার জন্য আমরা গোয়ালঘরে যে ব্যবস্থা করিয়া থাকি, ইহা তাহাই। দুই ভ্রাতারই বিরাট ভুঁড়ি লইয়া হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ হইল। শঙ্করনাথজী দুই জনকেই ঘোড়ায় চড়িয়া ভুঁড়ি কমাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের ভার বহিতে সমর্থ ঘোড়া পাওয়া যাইবে কি না, আমি এই সন্দেহ প্রকাশ করাতে সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসা প্রভৃতি লইয়া অনেক গল্প চলিল। তাঁহাদের অমায়িকতায় মুগ্ধ হইলাম। পরদিন যাত্রার জন্য ঘোড়া ঠিক করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। রাত্রিতে রাঁধিবার যায়গা দেখাইয়া দিবার জন্য বলায় দুই ভাই-ই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, আজ তাঁহাদের বাড়ীতেই খাইতে হইবে। আমরা রাজী হইলাম। একটা কথা

বলিতে ভুলিয়াছি, কাশ্মীরে সকল হিন্দুই ব্রাহ্মণ। এখানে পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের ব্যবধানের কোনও সীমা-রেখা বিশ্বামিত্র টানেন নাই। কাশ্মীরের সৃষ্টির চলিত পৌরাণিক আখ্যান আশা করি অনেকেই জানেন, তথাপি একটু বলি। বিশ্বামিত্র যখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া আর একটি নূতন পৃথিবী সৃষ্টির কল্পনা করেন, তখনই তাঁহার তপঃ-প্রভাবে কাশ্মীরের সৃষ্টি। ভারতে। তখন পৃথিবী বলিতে ভারতই বুঝাইত। যত পীঠস্থান, সব পীঠেরই সৃষ্টি কাশ্মীরে করিলেন। সে পীঠস্থানগুলি যে বর্ত্তমানে কোথায়, তাহা আমি জানি না, তবে সমগ্র কাশ্মীর ঘুরিয়া এটুকু জানিয়াছি যে, বিশ্বামিত্র শুধু ধ্বংসপ্রিয়ই ছিলেন না, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি-নিপুণ শিল্পীও ছিলেন।

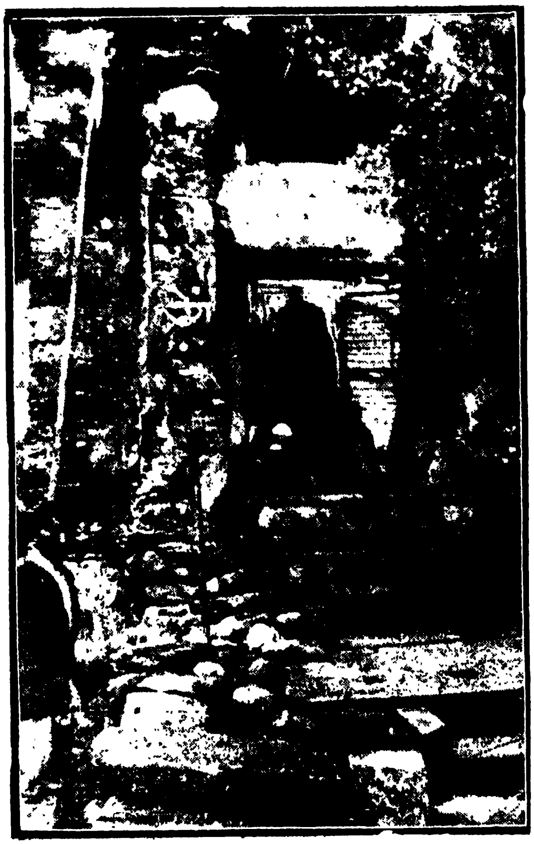
রাত্রির আহারের ডাক পড়িল। নন্দলালজীর পিছু ধরিয়া আমরা তিন তলায় গিয়া উঠিলাম। খাবারের আসনরূপে একটি লুই লম্বালম্বি পাতা আর তাহার সম্মুখে থালা দিবার জন্ম আর একটি লুই পাতা। কাশ্মীরের প্রথাই এই, খাওয়ার পর থালা লইয়া গেলেই আপদ চুকিবে, আর এঁটো পাড়িবার ঝঞ্ঝাট নাই, লুইটা ঝাড়িয়া রাখিয়া দিবে, লুই এঁটো হয় না। এ প্রথায় টেবিল-বিহারী আমাদের বিশেষ অসুবিধার কিছু নাই, কিন্তু মা মহা বিপদে পড়িলেন এবং স্বামীজীকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য স্মরণ করিলেন। স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার জন্য আলাদা হাত বুলাইয়া যায়গা করা হইল। সাধু মা ও বুড়ী মা আজ কয়েকটা বাগুগোসা (নাশপাতির ন্যায় ফল) চিবাইয়া রহিলেন, কারণ, নিজের রাঁধিবার মত শক্তি ছিল না। এই বাগুগোসার কতকগুলি টীকারামজীদের উপহার, কতক আমাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি—ত্রেগাম হইতে আসিবার পথে গাছ হইতে পাড়া। এ দিকে আখরোট ও বাগুগোসার গাছ প্রচুর। আখরোটগুলি এখন কাঁচা।



গগনচুম্বী পাহাড় (সারদা)

নন্দলালজীর বাড়ীতে সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ী অপেক্ষা আহার্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। করম-শাকের পরিবর্ত্তে এক প্রকার লাল রঙ্গের শাক ও তাহার "রসা" এবং গুচ্ছি নামে সম্পূর্ণ নূতন এক প্রকার তরকারী।

এই গুচ্ছি কাশ্মীরে খুব সম্মানার্হ ব্যক্তিদের খাদ্য; নীচে অর্থাৎ পাঞ্জাবে ইহার ৪।৫ টাকা সের। ইহা একপ্রকার 'ছাতা' শুকান। অবশ্য সাধারণ কাঠ-ছাতা বা ব্যাঙের ছাতা নহে। এ ছাতার আকার ঐ জাতীয়, তবে রীতিমত চাষ করিতে হয়। খাইতে বেশ সুস্বাদু, অনেকটা মাংসের মত লাগে। আমরা উল্লিখিত দুইটি তরকারীই পাইলাম আর মা বোধ হয় তাঁহার শুচিতার পুরস্কারস্বরূপ আর একটি বেশী জিনিষ পাইলেন—তাহা 'লসি' অর্থাৎ ঘোল।



সারদার মন্দির—মন্দিরদ্বার সম্মুখে; বামে শঙ্করনাথজী, সপুত্র পুরোহিত—দক্ষিণে সদানন্দজী—পুরোহিত-কন্যা—ছবির দক্ষিণে জনৈক যাত্রী

দুর্গম তীর্থ-পথে বিদেশীর প্রতি অশিক্ষিত এ দেশবাসীর আতিথেয়তা স্মরণে আজও কৃতজ্ঞতায় আনন্দে মন ভরিয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে পাশাপাশি ভাসিয়া উঠে তথাকথিত সুসভ্য শিক্ষিত সহুরে সমতলবাসী নাগরিকদের ছবি। বলা বাহুল্য, নন্দরাম ও টীকারামজীর পত্নীদ্বয়ই আমাদিগকে আহার্য্য পরিবেষণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতা আমাদের কাছে বসিয়া অবিশ্রাম অভ্যস্ত হাতে চরকায় লোম হইতে উলের সূতা কাটিতেছিলেন এবং নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে এই বিদেশীদের সহিত অদ্ভুত ভাষায় (মেয়েরা হিন্দী বুঝেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি) কথা কহিতে দেখিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।

পরদিন ২০শে জুলাই রবিবার টীকারামজীর ব্যবস্থামত সকালে ঘোড়া আসিয়া হাজির হইল। কেবল জিনিষগুলি উঠিল ঘোড়ার পিঠে, আমরা সকলেই হাঁটিয়া চলিলাম। আমাদের স্ত্রীলোকরা এ দিকে অন্য কোনও যান পাইবেন না, এক ঘোড়ায় চাপিবার সাহস থাকিলে আসিবেন বা পায়ের শক্তিকে বিশ্বাস করিলে আসিবেন, নচেৎ এ দিকে আসিবার চেষ্টা করিবেন না। তবে এইটুকুও বলা ভাল যে, এ দিকে ঘোড়ায় চড়ায় বাহাদুরী বা ভয়ের কিছুই নাই; চড়িবার সাহস থাকিলেই হইল। ঘোড়া দৌড়ায়ও না, লাফায়ও না, কেবল গর্দ্দভ-গতিতে চলে। ঘোড়াওয়ালারা বিশ্বাসী বটে, কিন্তু অবাধ্য, একটু কড়া ব্যবহার করিতে হয়।

রৌদ্র উঠিলে আমরা বাহির হইয়া রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃই সমতল ছাড়িয়া উঠিতেছি, তাহা পা-ই বুঝাইয়া দিতেছিল। একটি ক্ষুদ্র ঝরণার কখনও পাশে কখনও উপরে আমরা ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়া সর্ব্বানন্দজী ও মাতা ঠাকুরাণীদিগকে ধরিলাম, ইঁহাদিগকে প্রত্যূষে বাহির করিয়া দিয়া ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই দিয়া আমরা বাহির হইয়াছিলাম। সকলে একত্র হইবার কিছু পরই (আন্দাজ ২ কি ৩ মাইল; এখন মাইল আন্দাজেই বলিতে হইবে) একটি ভীষণ উঁচু পাহাড়-দৈত্যকে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আমরা ক্ষণেকের জন্য দমিয়া গেলাম; উঠিবার আগে একবার ভাল করিয়া পাহাড়ের মাথাটার দিকে সকলে চাহিলাম। উঃ, সে কি নৈরাশ্য—অবশ্য ক্ষণকালের জন্য। আকাশের কোল ফুঁড়িয়া পাহাড়টা যেন স্বর্গের তলায় গিয়া মাথা ঠেকাইয়াছে! কৈলাস-মানস-ভ্রমণকালীন পাহাড়ে চলার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, কিছুক্ষণ চলার পর কি ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা জানিতাম, তাই পূর্ব্বদিন ত্রেগাম হইতে আনীত কিছু

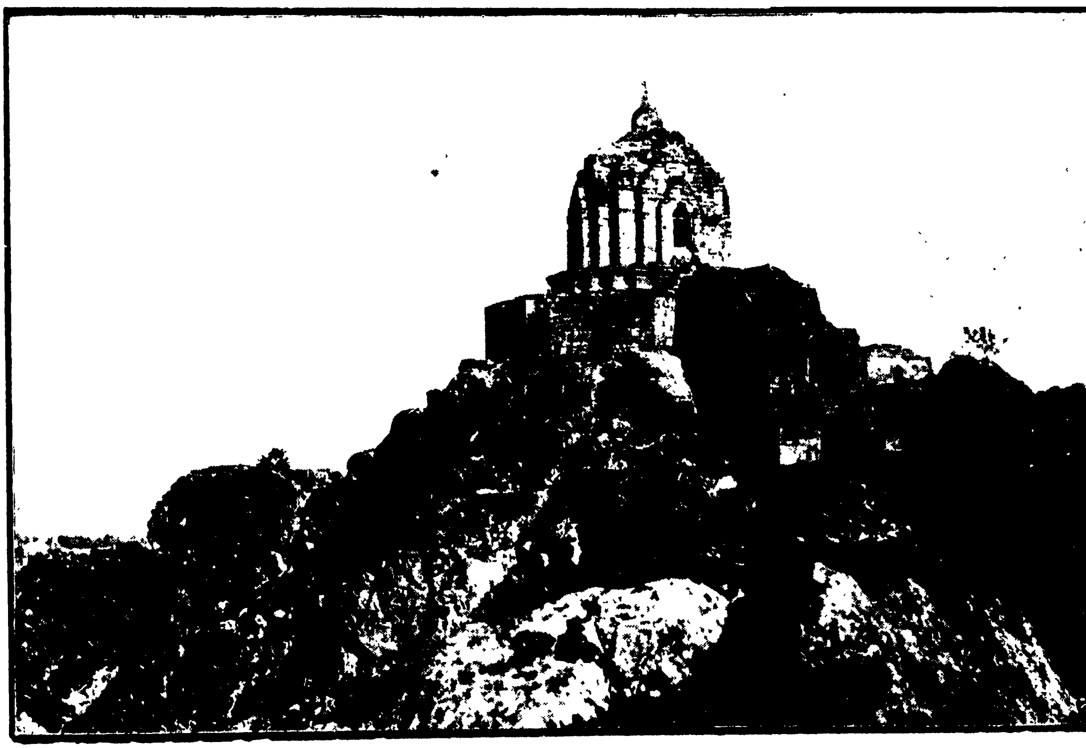
মিষ্টান্ন ও মিছরী সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। সারদা দেবীর প্রথম দ্বারীকে অতিক্রম করিবার আগে একটি ঝরণার ধারে বসিয়া সকলে কিছু কিছু খাইয়া লইলাম। তাহার পর আরম্ভ হইল প্রায় ২৷৩ মাইলব্যাপী খাড়া চড়াই। এই পাহাড়টি উঠিবার একটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও চওড়া রাস্তা আছে, কিন্তু তাহা ঘুর বলিয়া আমরা মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া একটি পাকদণ্ডী বা পাহাড়ীদের পথ ধরিলাম। ইহা আমরা খুবই ভুল করিয়াছিলাম, কারণ, ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণ নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম, কোথাও মাত্র একটি পা রাখিবার মত সামান্য আধ হাত চওড়া একটি পাথর-ফলক আর নীচে অনন্ত শূন্য, একবার পা পিছলাইলে সমস্ত তীর্থদর্শনের আশা চিরদিনের মত শেষ হইয়া যাইবে এই যায়গাটিতে আগু-পিছু আমরা দুই জন দাঁড়াইয়া মা'দিগকে পার করিলাম; কোথাও আবার সম্মুখে বুক-সমান উঁচু একখানি পাথর, উহা অতিক্রম করিয়া আবার রাস্তা। এই দিন আমাদের স্মৃতিপটে



শঙ্করাচারিয়া হইতে ডালহ্রদের ও সমতলক্ষেত্রের দৃশ্য

সামান্য ঘুর বাঁচাইতে গিয়া কষ্টের ও বিপদের সীমা ছিল না এবং সম্ভবতঃ বেশী আগেও উপরে উঠিতে পারি নাই, আর যদি বা পারিয়া থাকি, তবু সে কষ্ট ও বিপদের মূল্যে তাহা পারিয়াছিলাম, তাহাতে ভবিষ্যৎ যাত্রীদিগকে সে পথে যাইতে নিষেধই করি। ব্রাহ্মণের গলায় সরু তির্য্যক পৈতার মত বিরাট পাহাড়টির গা বাহিয়া সরু রাস্তাটি উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় স্থানে স্থানে উপর হইতে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহাও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কেবল আলুগা পাথরের উপর কৈলাসযাত্রার সময়ের এক দিনের ছবি ফুটিয়া উঠিল, তাহা ভীষণ নির্ঝরণীর (বসুমতীর পাঠক আমাদের সহযাত্রী শ্রীযুত সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্যের লিখিত কৈলাসযাত্রাতে ইহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন)। যাহা হউক, কষ্টে আমরা প্রায় দুই মাইল এই খাড়া চড়াই শেষ করিয়া যে রাস্তাটি ঘুর বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতেই আসিয়া পড়িলাম। সে রাস্তায় আরও আধ মাইল গিয়া তবে বেলা ১০॥০টায় পাহাড়ের মাথায় উঠিলাম। এই ৪॥০ ৫ মাইল রাস্তা আসিতে আমাদের আজ ৪॥০ ৫ ঘণ্টা

লাগিল। পূর্ব্বে আর কখনও এত সময় লাগে নাই। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় আসিতেই ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়া সাদরে এই বিজয়ীদের অঙ্গে তাহার আনন্দ-স্পর্শ বুলাইয়া অভিনন্দন জানাইয়া সমস্ত ক্লান্তি ৫।৭ মিনিটের মধ্যে দূর করিয়া দিল। আশ্চর্য্য গুণ এই পাহাড়ী হাওয়ার—ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন, পাহাড়ী হাওয়ায় সামান্য একটু বিশ্রাম করিলেই শরীর আবার "চাঙ্গা"। আমরা কিন্তু বেশীক্ষণ এই হাওয়ায় রহিলাম না। কি জানি, হয় ত দেবতার মায়াও হইতে পারে! পাছে মোহিনী



শঙ্করাচারিয়া মন্দির

সিংহ দরজায় মুগ্ধ করিয়া একটা রোগ বাধাইয়া দিয়া যাত্রা পণ্ড করে, এই ভয়ে আবার সবাই নীচে নামিতে লাগিলাম। এবার উতরাই—চলা সহজ, কিন্তু এই সহজ আমাদের পক্ষে কঠিনই হইয়া পড়িল। উতরাইটি আমাদিগকে যে বেগে ঘাড় ধাক্কা দিতে লাগিল, মায়েরা সে তীব্রতা বা বীরত্ব-প্রকাশ সহ্য করিতে না পারায় তাঁহারা ক্রমশঃই পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন; আর আমাদিগকে অনবরত ব্রেক কষিয়া কষিয়া নামিতে হইতে লাগিল। ফলে আমরা যে পরিমাণে পরিশ্রান্ত হইতে লাগিলাম, সে পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

উতরাই শেষ করিয়া ভাবিলাম, এইবার বুঝি আশ্রয় মিলিবে। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জুমাগণ্ড কেৎনা দূর?" সে কহিল, "নজিগই হ্যায়, কই দো ঢাই মীল হোগা।" সর্ব্বনাশ, ইহাদের নিকটত্ব-বোধের পরিচয় পাইয়া প্লীহা চমকিয়া উঠিল। এখনও দুই আড়াই মাইল! চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, পথ তবু ফুরায় না। অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তা পাওয়ায় স্বামীজী ও স্ত্রীলোক সঙ্গিনীদিগকে আগে যাইতে বলিলাম। মা বহুদিন পর আজ প্রথম জুতা পরিয়া পথ চলায় পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। কাযেই বেশী জোরে হাঁটিতে পারিতেছিলেন না। মাতাপুত্রে নিস্তব্ধ নির্জ্জন চীরকুঞ্জের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। আর পথিক দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি "জুমাগণ্ড কে মীল?" সকলেই বলে, "নজিগই হ্যায়, কই দো ঢাই মীল।" কি আশ্চর্য্য! এ দেশের দো ঢাই মীল কি ফুরায় না। চলার ত কামাই নাই, তবু সকলেই বলে ঐ এক

কথা। পরে বুঝিলাম, ইহারা অল্প-দূরত্ব বুঝাইতেই দো ঢাই মীল বলে। শ্রান্তভাবে দু'জনেই চলিয়াছি, যেন কোন অন্তহীন পথের যাত্রী। কোথায় যাইব, সে যে কতদূর, কিছুই জানি না। চলিয়াছি ত চলিয়াছি।

সহসা পথের ধার হইতে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিলাম, "এই দিকে—এই দিকে।" ফিরিয়া দেখি, সাধুমা পাশের একটি নদীর ধারে তাঁহার পূজার ঝুলি-ঝোলা লইয়া বসিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাকী সব কৈ?" তিনি বলিলেন যে, সকলের কথা তিনি জানেন না। তবে স্বামীজী তাঁহাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আমরা আসিলে আমাদিগকে লইয়া পাশের একটি পথ দিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। হরি হরি, এখনও তাহা হইলে যাত্রার শেষ নাই, আবার তিন জনেই চলিলাম, কিন্তু মুস্কিল হইল নদীটি পার হওয়া লইয়া। এক যায়গায় নদীকে অপেক্ষাকৃত শান্ত দেখিয়া তাহার বুকে পাথরে পাথরে পা দিয়া পার হইয়া বাঁক ফিরিতেই একটি বাংলো চোখে পড়িল। উচ্চৈঃস্বরে স্বামীজী-দিগকে ডাকিলাম, কোনও সাড়া নাই; আরও আগে গিয়াছেন ভাবিয়া আবার চলিলাম। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম যে, তাঁহারা নদীর ধারে বাংলোটির অপর দিকে নীচে ঘোড়া হইতে মালপত্র নামাইতেছেন। আজ তাহা হইলে এই আড্ডা। আমরা পৌছাইয়া একটু একটু গুড় খাইয়া পেট ভরিয়া নদীর জল পান করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। সঙ্গে আর কিছু ছিল না। পরে সুস্থ হইয়া স্নানাদি সারিয়া সকলে মিলিয়া রান্নার যোগাড়ে লাগিলাম। ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া আগুন ধরাইয়া যখন ভাত, আলু-সিদ্ধ ও আমচুরের টক উদরস্থ করিলাম, তখন বেলা সাড়ে ৩টা।

এক জন ঘোড়াওয়ালাকে ফরেষ্ট বাংলোটির রক্ষকের খোঁজ করিতে বলিলাম। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহে?" বলিলাম, "আজ ত হিঁয়াই ঠারেঙ্গে।" শুনিয়া তাহারা সকলেই লাফাইয়া উঠিল, "আজ আমাদের এখানে থাকিবার কথা নহে, থাকিব না, ইহা পুরা পাড়াও নহে, ইত্যাদি।" আমরা জানাইলাম যে, আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত, আজ চলিতে পারিব না। কিন্তু তবু কি তাহাদের রোখ থামে! শেষে আমি কপট ক্রোধে তাহাদিগকে ধমকাইতে ও তহশীলদারকে বলিয়া শাস্তি দিবার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলাম এবং তহশীলদার যে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও তাহাদের সীমানায় নম্বরদার যে হুকুমের চাকর ইত্যাদিও শুনাইয়া দিলাম, দেখিলাম, ঔষধ ধরিয়াছে; উত্তেজিত স্বর নামিল। ওদিকে শঙ্করনাথজী ঠাণ্ডাভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং আজকের দরুণ চুক্তি ঘোড়া পিছু এক টাকা বার আনা ছাড়াও জন পিছু ✓০ দুই আনা ও ⁄॥০ সের করিয়া আটা খোরাকী হিসাবে দিবেন বলিলেন। এক দিকে তাড়া খাইয়া ও অন্যদিকে "সম্মানজনক" সন্ধির গন্ধ পাইয়া তাহারা শেষে থাকিতে রাজী হইল। তাহাদের এক জনকে বাংলোর রক্ষকের সন্ধানে যাইতে বলিলাম, কিছুক্ষণ পর সে এক জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল এবং বলিল যে, রক্ষক অন্যত্র গিয়াছে, এ তাহার স্ত্রী। শঙ্করনাথজী তাহাকে বাংলোর চাবি খুলিয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু সে রাজী হইল না, বলিল, "হুকুম নেহি।" স্বামীজীরা তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "আজকের মত থাকিতে দাও, আমরা তীর্থযাত্রী, শ্রান্ত, সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে, এখানে অন্য বাড়ী নাই, কোথায় থাকিব? আজকের রাত্রিটা কাটাইয়া কাল ভোরেই চলিয়া যাইব।" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, সে জিদ্ ধরিয়া বসিল, "হুকুম নেহি।" আমরা বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, ঘোড়াওয়ালা রাজী হইল ত থাকিবার বাড়ী পাই না। এই বাংলোটি ও রক্ষকদের কুটীর ছাড়া এখানে আর ঘর-বাড়ী নাই। বস্তুতঃ সত্যই ইহা লোদ্রোয়ানা হইতে পুরা এক পড়াও নহে, কাযেই লোকজনের বসতি ও ঘর-বাড়ী নাই। অবশ্য এ দিকে প্রত্যেক পড়াও—এতেই যে থাকিবার প্রচুর ঘর-বাড়ী পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে পড়াওএ গেলে লোকালয়ের মধ্যে পড়া যায়। কাযেই থাকিবার আশ্রয় যেমন হউক মিলিয়া যায়। স্বামীজীরা যখন কিছুতেই স্ত্রীলোকটিকে রাজী করাইতে পারিলেন না, তখন আমি উঠিলাম, এতক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়া আমি অদূরে গাছতলায় শুইয়াছিলাম। চোখে চশমা, পায়ে জুতা-মোজা এবং নেহাৎ গেরুয়া না থাকায় আমাকে বোধ হয় একটু পদস্থ ব্যক্তির মত দেখাইতেছিল, গিয়া গম্ভীরভাবের একটু রুক্ষস্বরে

স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, “কেয়া এতনা ঝামেলা কিস্‌কো?” স্ত্রীলোকটি বোধ হয়, এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করে নাই, দেখিবামাত্র সেলাম করিল। যে মাথা নোয়ায়, তার ঘাড়টা বেশী করিয়া চাপিয়া ধরাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। বুঝিলাম, এখানে জোর চলিবে। ধমক দিয়া বলিলাম, “স্বামীজীলোক কোঠা খোলনে বোলতা হ্যায়, কাহে নেই খোলতে হো?” সে বিনীতভাবে জানাইল, “রেঞ্জার সাব মালুম হোনে সে মেরা নকরী যায়েগা।” অর্থাৎ এ বাংলোয় বাহিরের লোকের থাকিবার হুকুম নাই, যদি থাকিতে দিই, তবে রেঞ্জার সাহেব জানিতে পারিলে আমার চাকরী যাইবে। ইহার উপর জোর চলে না, এক দিকে তাহার ‘নকরী’ যায়, অপর দিকে এই পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্যে নিরাশ্রয়ে আমাদের প্রাণ যায়! আত্মানং সততং রক্ষেৎ নীতির অনুসরণে একটু মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল। বলিলাম, “তহশীলদার সাব ইস্ বাংলোমে রহোনে দেনেকোওয়াস্তে চিঠি দিয়া।” স্ত্রীলোকটি বুদ্ধিমতী, বলিল, “চিঠি কাঁহা?” তহশীলদার নম্বরদারের উপর যে চিঠিখানি দিয়াছিলেন, তাহাই তাহার হাতে দিলাম। সে উহা লইয়া কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে দেখিল, পরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া আমার দিকে চিঠিখানি ছুড়িয়া দিল, অপ্রস্তত হইলাম। ইতিমধ্যে এক জন কুলী বলিয়া উঠিল, “উ পড়নে নেই জান্‌তা।” শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। বুঝিলাম, সে যে গম্ভীরভাবে পড়িবার ভাণ করিয়াছিল, তাহার জন্যই হাসিয়াছে, আমাদের চাতুরী ধরিতে পারিয়া হাসে নাই। ভাগ্যে সে লেখাপড়া শেখে নাই, নহিলে যদি সে বুঝিতে পারিত, সে চিঠিখানি তাহার উপর আদেশপত্র নহে, তাহা হইলে সে দিন রাত্রিতে বসবাসহীন পাহাড়ের কোলে আমাদের দশা যে কি হইত, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামীই জানেন, দুর্ব্বলতা যে তাহারই পক্ষে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে খুব এক চোট ধমকাইলাম এবং চাবি খুলিয়া দিতে বলিয়া গম্ভীরভাবে বাংলোর দিকে আগাইয়া চলিলাম। সেও বিনা বাক্যব্যয়ে এবার চাবি খুলিয়া দিল। ঘোড়ার কুলীরা মালগুলি বাংলোয় দিয়া নিজেদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া বাংলো-রক্ষকের বাসায় রুটী পাকাইতে গেল। আমরাও ষ্টোভ জ্বালিয়া আগামী দিনের রাস্তার জন্য ও সেদিন সন্ধ্যায় যাহারা খাইবেন, তাঁহাদের জন্য (বেলা ৩॥০ সময় খাইয়া অনেকেরই ক্ষুধা ছিল না) আহারের যোগাড় করিতে লাগিলাম। বাংলোটির গায়ে একটি নোটিশ বোর্ডে দেখিলাম, সত্যই ইহা বনবিভাগের কর্ম্মচারী ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। এই বাংলোটি বেশ চমৎকার। চারিদিকে পাহাড়, নীচে কলস্বিনী নূপুর-নিক্কণে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, পাহাড়-জঙ্গলের স্বাভাবিক নির্জ্জনতা মাঝে মাঝে বিহঙ্গের কূজন সঙ্গে মিশিয়া এক অনির্ব্বচনীয় তপোবনতুল্য শান্তিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলোখানি আগাগোড়া কাঠের তৈয়ারী—দেয়াল, মেঝে, বারান্দা, দরজা, জানালা প্রভৃতি সবই চীর-কাঠের, কেবল জানালার মাঝে কাচের সার্সি। পাশাপাশি দুখানি ঘর; প্রত্যেক ঘরে খাট ও চেয়ার আছে।

সে রাত্রি বেশ আরামেই কাটিল। রাত্রিতে বেশ শীত করিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



সীমন্ত-হীরা

১

কিছু দিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোনও কাযকর্ম্ম ছিল না।

খুন, জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিস তাহাকে হাজৎ-জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকী সময়টুকু নিজের লাইব্রেরী-ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কায নহে, গল্প লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্য্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মত এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একেবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সে দিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম,—"কি হে, বাঙ্গালাদেশের চোর-ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"না। তার প্রমাণ ত খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা ত পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আস্‌ছে কৈ ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার, তখনি আসে, তাকে জোর ক'রে ধ'রে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি—ধৈর্য্যং রহু। আসল কথা, আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ বদ্‌মায়েস—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভাবান্ বদমায়েস খুব অল্পই আছে। পুলিস কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যারা গভীর জলের মাছ—তারা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই।"

আমি বলিলাম,—"তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁস্‌টে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিৎ যদি কেউ এখানে থাক্‌তেন, তিনি নির্ভয়ে ব'লে দিতেন যে, তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল—"তা হ'লে মনস্তত্ত্ববিৎ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কখনো নাম শোনে নি এই হচ্ছে আজকালকার নূতন থিয়োরি। তোমরা আধুনিক গল্প-লেখকের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছ।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাকপিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখদীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্রঞ্জ্-ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন্ দিয়ে আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্যমুখে আমার হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তর-বঙ্গের বনিয়াদি জমীদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্য্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমীদারী ষ্টেটের নাম। জমীদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারী ইংরাজীতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

প্রিয় মহাশয় !

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরী কার্য্যে তিনি আপনার

সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথ-খরচের জন্য ১০০৲ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেণে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"তাই ত হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরী কার্য্যটি কি, চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার ত ও সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমীদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতীটি পাশের জমীদার চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না, একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে। ভিতরে নিশ্চয় কোনো বড় রকম গোলমাল আছে।"

"ঐটে তোমাদের ভুল, বড়লোক রুগ্ন হ'লে মনে কর, ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুস্কুড়ি হ'লে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার-বৈদ্যের কথা মনেই থাকে না।"

"যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে না কি?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—"হাতে যখন কোনো কাষ নেই, তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা ত হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনো যাও নি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল, তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম,—"আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে। তোমাকে ডেকেছে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"দোষ কি? এক জনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুসীই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা ত একটা কর্ত্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে—সর্ব্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্যও কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় আমরা তিন জন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়দের কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে?"

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মশায়ের কদ্দূর যাওয়া হবে?"

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি—এই পরের ষ্টেশনেই যাব।"

ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে বলিল, "আমরাও তার পরের ষ্টেশনে নেমে যাব।"

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ী থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্ম্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন ষ্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরার জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখো-চোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"ওহে!"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়ীতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালই!"

তার পর প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌছিলাম। ষ্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে

যাইতে হইবে। একখানি দামী মোটর লইয়া জমীদারের এক জন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে চড়িয়া বসিলাম অতঃপর নির্জ্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্ম্মচারীটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু' একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন,—"আমি কিছুই জানি না, মশায়। শুধু আপনাদের ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

জমীদার-ভবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম,—সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারৎ, তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমীর বাগান, হট্-হাউস্, পুষ্করিণী, টেনিস্ কোর্ট্, কাছারি বাড়ী, অতিথিশালা, পোষ্ট-অফিস্—আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ীর সম্মুখে থামিতেই জমীদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেক্রেটারী বলিলেন,—"আপনারা মুখহাত ধুয়ে একটু জলযোগ ক'রে নিন্। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।"

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন,—"কুমার বাহাদুর লাইব্রেরী-ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে—আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজ-সকাশে যাইতেছি, এম্নি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মত সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী পরা একটি সহাস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা—ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন,—"আপনিই ব্যোমকেশ বাবু? আসুন।"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল,—"ইনি আমার বন্ধু, সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওঁকে সহজে কাছ-ছাড়া করিনে।"

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন,—"আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিত বাবু এসেছেন, আমি ভারী খুসী হয়েছি। কারণ, প্রধানতঃ ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমীদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। লাইব্রেরী-ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম, দেয়াল-সংলগ্ন আলমারিগুলি দেশী বিলাতী নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা; টেবলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরী-ঘরটি যে কেবলমাত্র জমীদার-গৃহের শোভাবর্দ্ধনের জন্য নহে, রীতিমত ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এবার কাযের কথা আরম্ভ করা যাক।" সেক্রেটারীকে হুকুম দিলেন,—"তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ্য রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

সেক্রেটারী সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আপনা-দের যে কাযের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কায যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ ক'রে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্য্যাদা জড়ানো রয়েছে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো দরকার আছে মনে করিনে, এক জন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি

যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনো বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম,—"গল্পচ্ছলেও কি কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না?"

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলবে না।"

হয় ত একটা ভাল গল্পের মাল-মশ্‌লা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনো কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন, তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তার পর বলিলেন,—"আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরৎ আছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি কিছু জানেন না—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন,—"আপনি জানেন? তা হ'লে এ কথাও জানেন বোধ হয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে হীরা চোখে দেখবার সুযোগ হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন,—"সে সুযোগ আর কখনো হবে কি না, জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল,—"চুরি গেছে!"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন,—"হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা সুরু থেকে বলি শুনুন্। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমীদার-বংশ অতি প্রাচীনকাল থেকে চ'লে আসছে। বারো ভুঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশা'দের আমলে আমাদের আদি পূর্ব্বপুরুষ এই জমীদারী অর্জ্জন করেন। শাদা কথায় তিনি একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ ক'রে পরে বাদশা'র কাছ থেকে সনন্দ আদায় করেন। সে বাদশাহী সনন্দ এখনো আমাদের কাছে বর্ত্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের রাজা উপাধি ছিল।

"ঐ 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের আদি পূর্ব্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চ'লে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যত দিন আমাদের কাছে থাকবে, তত দিন বংশের কোনো অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই একপুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন,—"জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমীদারীর উত্তরাধিকারী হয়,—এই হচ্ছে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠরা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু' বছর আগে আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমীদারী পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ান্‌স্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমীদারী থেকে পেয়ে থাকেন।

"এই ত গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন-প্রদর্শনীতে আমার হীরা এক্‌জিবিট্ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেণে ক'রে সেই হীরা নিয়ে কলকাতা গেলাম; কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে জমা ক'রে দেবার পর তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন, প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরৎ প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীরা চুরি যাবার কোনও ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাস-কেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

"সাত দিন ধরে এক্‌জিবিশন্ চল্‌ল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলুম। বাড়ী ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শো টাকা দামের মেকি পেষ্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিম্বা পুলিসকে খবর দেন নি কেন ?"

কুমার বলিলেন,—"খবর দিয়ে কোনও লাভ হ'ত না, কারণ, কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম।"

"ও:"—ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"তার পর ব'লে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন,—"এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালিখি সুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ীর লোককে পর্য্যন্ত এ কথা জানাতে পারিনি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়।

"কথাটা আরও খোলসা ক'রে বলা দরকার। পূর্ব্বে বলেছি, আমার এক কাকা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন, ষ্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন,—তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মত আশ্চর্য্য মানুষ খুব কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয়, অদ্বিতীয় মনীষী ব'লে পরিচিত হ'তে পারতেন। যেমন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস্ সম্বন্ধে কি একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন—তার ফলে 'স্যর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবতঃ আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি একজিবিট ক'রে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের উপর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না।" বলিয়া কুমার বাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরাটার দাম কত হবে ?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিষ কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই ক'রে দেখি নি। গৃহদেবতার মতই সে হীরা অমূল্য ছিল।

"সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেন নি। তার পর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন, 'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তাই যোড়হাত ক'রে কাকাকে বললাম,—'কাকা, আপনার আর যা-ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।'—কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্ম্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তার পর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

"তবে পত্রব্যবহার হয়েছে। যে দিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু প'ড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।"

চাবি দিয়া সেক্রেটেরিয়েট টেবলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,—

"কল্যাণীয়

খোকা, দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাও নি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে ব'লে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিষটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্ব্বাদ নিও—ইতি—

তোমার কাকা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়।"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরৎ দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন, "চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হীরের বাক্স বার ক'রে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের এক জন ভাল জহুরী, দেখেই বল্লেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মত গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝকমক করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙ্গুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "জহুরী ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দু'শো টাকার বেশী এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল, "তা হ'লে আমার কায হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, "হাঁ। কেমন ক'রে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই। যেমন ক'রে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত-হীরা' আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্যে ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি সর্ত্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছীল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুসী হবেন?"

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "কবে নাগাদ? তবে কি, তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন ব'লে মনে হয়?'

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, "এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রিতে দুই জনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্লান্ অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "না। আগে বাড়ীটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হীরেটা কি বাড়ীতেই আছে মনে হয়?"

"নিশ্চয়। যে জিনিষের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপো'র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিষ তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—"

"তোমার বিশ্বাস—?"

"যাক্, সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায় না।" আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, "আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাযের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ?"

"কোন্ কাযের?"

"যে উপায় অবলম্বন ক'রে তুমি হীরেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখেছি। তাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য্য।"

"তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন ত সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কায কত দূর হ'ল?"

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল, "বিশেষ সুবিধা হ'ল না। বুড়ো একটি দুর্ভেদ্য ঘুঘু।

আর তার একটি নেপালী চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারী বেরালের মত। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারী খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি।"

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ে চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়, খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়ীটা নানারকম বহুমূল্য জিনিষের একটা মিউজিয়াম বল্লেই হয়;—কর্ত্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোক-লস্করের অভাব নেই। প্রথমতঃ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢোকাই এক মুস্কিল,—ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ব'সে আছে, কেউ ঢুক্‌তে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই,—আট হাত উঁচু পাঁচীল, তার উপর ছুঁচোলা লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুসী ক'রে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ীর সদর-দরজায় নেপালী ভৃত্য উজরে সিং থাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে ব'সে আছেন,—ভালরকম কৈফিয়ৎ যদি না দিতে পার, বাড়ীতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির অবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকীদার ত আছেই, তার উপর চারটে বিলিতী ম্যাষ্টিফ্ কুকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্য্যোদ্ধার করবে, সে পথও বন্ধ।"

"তবে উপায়?"

"উপায় হয়েছে। বুড়োর এক জন সেক্রেটারী চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ' টাকা মাইনে—বাড়ীতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি,—কাল ইণ্টারভিউ করতে যেতে হবে।"

"দু'টো দরখাস্ত কেন?

"একটা তোমার, একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।"

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা ৮টার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণের ভবনে সেক্রেটারী-পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। সহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ী; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মত আরও কয়েক জন চাকরী অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ীর কর্ত্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদারদিগকে ডাকিতেছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয় ত আমাদের ডাক পড়িবার পূর্ব্বেই অন্য কেহ বাহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নূতন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্ত্তা আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন, কিন্তু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি? এতক্ষণ ত একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরাণ-পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র বসিয়া আছেন। বুল্‌ডগের মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মত মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চকচকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ দুটা বাহু বনমানুষের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে অঙ্গুলিগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলার' মত সরু ও সুদৃশ্য,—একবারে লতাইয়া না

গেলেও পশ্চাদ্ভাগে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দু'টা ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভাল ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি আমার মুখ হইতে হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইল। তার পর সেই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুল্‌ডগ হাসিতে পারে কি না, জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি, ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল,—"উজরে, দরজা বন্ধ ক'রে দাও।"

নেপালী ভৃত্য উজরে সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্ত্তা তখন টেবলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কার নাম নিখিলেশ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমার।"

কর্ত্তা কহিলেন,—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দুজনে শল্লা ক'রে দরখাস্ত করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্ত্তা কহিলেন,—"বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত প'ড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক, তুমি এম্‌-এস্‌-সি পাশ করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন্ য়ুনিভার্সিটি থেকে?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি থেকে।"

"হুঁ।" টেবলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন,—"কোন্ সালে পাশ করেছ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়!

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল,—"আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক্, একটা ফাঁড়া ত কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্ত্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তার পর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের উপর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কায চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্ত্তা কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন,"অজিত বাবু!"

"আজ্ঞে।"

বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্ত্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এই আনন্দের কি কারণ ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায়, হায়, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

কর্ত্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তার পর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,—"লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।"

আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। কর্ত্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ব্যোমকেশ বাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করি নি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি, তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।" ব্যোমকেশের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া

কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন,—"খুলির মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন্-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, ভ্যালুয়েশনের উপর সব নির্ভর করে।…হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গমুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্ম্মা কূটবুদ্ধি একগুঁয়ে। মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান্ বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শবব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশী। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ, তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশী।"

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিষ চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে ব'লে মনে হয়?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্ব্বিকার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশ বাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কায হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল,—"সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিষ তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্ত্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বটে বটে! তোমার সাহস ত কম নয় দেখছি। কি ক'রে কায হাঁসিল করবে শুনি? এখনই ত তোমাদের ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব। তার পর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরেটা বাড়ীতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্ত্তার কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুতে অন্ধ জিঘাংসা জ্বল্‌জ্বল্ করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলেও ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনই ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্ত্তা কহিলেন,—"দেখ ব্যোমকেশ বাবু, তুমি মনে কর, তোমার ভারি বুদ্ধি—না? তোমার মত ডিটেক্টিব দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাঙ্গালাদেশের বার্ট্লিঁ? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলুম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিষ। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বচ্ছর সময় দিলুম, বার কর খুঁজে।"

কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন ছাড়িলেন,—"উজ্‌রে সিং!"

উজরে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্ত্তা আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এই বাবু দুটিকে চিনে রাখো। আমি বাড়ীতে থাকি বা না থাকি, এঁরা এ বাড়ীতে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে? যাও।"

উজরে সিং তাহার নির্ব্বিকার নেপালী মুখ ও তির্য্যক্ চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্ত্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মত হাস্য করিলেন, বলিলেন,—"খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশচন্দ্র—"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে ম'রে যাবে, তবু সে জিনিষ পাবে না, বুঝলে? দিগিন্ রায় যে-জিনিষ লুকিয়ে রাখে, সে জিনিষ খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম্ম নয়।—ভাল কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামী

জিনিষ আছে, কিন্তু তোমার উপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার ষ্টুডিওতে চল্লুম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না।—আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান ক'রে দিই,—আমার বাড়ীময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাষ্টারের মূর্ত্তি ছড়ানো আছে, হীরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙ্গে নষ্ট কর, তা হ'লে সেই দণ্ডেই কাণ ধ'রে বার ক'রে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৩

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাঁকাশে গোছের একটু হাসিয়া বলিল, "চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মত লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম, "ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটী হ'ল।

ব্যোমকেশ বলিল, "বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয় নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেণের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের ষ্টেশনে নেমে যাবেন ব'লে পাশের গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক! এমনটা আর কখনও হয় নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তার পর বলিল, "বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্ব্বলতাটুকু বলেই রক্ষে,·নইলে হয় ত হাল ছেড়ে দিতে হ'ত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম, "কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিত, তা হ'লে কি হ'ত বলা যায় না। যা হোক, বুড়োর একটা দুর্ব্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্য্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন্ দুর্ব্বলতার সন্ধান পেলে, শুনি। আমি ত বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ,—লোহার মত শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র; এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্ব্বলতা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। যার যত বেশী বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছ। একটু পরিষ্কার ক'রে বল।"

"বুড়োর প্রধান দুর্ব্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কায হাঁসিল ক'রে নিয়েছি। বাড়ীতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন ত আট-আনা কায হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু হীরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়ীতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবৎ গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ঐ বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রি পুরে দেবে। যা হয় কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তা কি হয়, তোমাকেও চাই। এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কি ভাল?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কোনও বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী ষ্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ীর মধ্যে সুপারির মত একখণ্ড জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে

পারে, অন্য কেহ হইলে কোন্‌কালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমতঃ, মূল্যবান্ জিনিষপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারী কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত্ত—সে-জিনিষ সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এড্‌গার অ্যালেন্ পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস সুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারী খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীখানা চিত্র ও মূর্ত্তির একটা কলা-ভবন (gallary) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্ত্তির প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট্ সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। সর্ব্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর ষ্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জ্জন হইল, "এস।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবল চলিয়া গিয়াছে। টেবলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি হে ব্যোমকেশ বাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মত হবে দেখছি, শেষ পর্য্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, "বেশ বেশ। এই নাও চাবি। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু এই প্ল্যাষ্টার-ক্যাষ্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমার সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজরে সিং—"

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা আপনি কি করছেন?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—"আমার তৈরী নটরাজ-মূর্ত্তির নাম শুনেছ ত? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করছি। আর একটা আমার টেবলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিষটা মন্দ নয়—কি বল?"

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্ম্মিত বিখ্যাত মূর্ত্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ঐ মূর্ত্তিটাই আপনি প্যারিসে একজিবিট করিয়াছিলেন?"

স্যার দিগিন্দ্র তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন,—"হ্যাঁ। আসল মূর্ত্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্ব্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।"

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তার পর আবার খুঁজো।" ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরৎ দিল; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন, "ওহে অজিত বাবু, তুমি ত

গল্প-টল্প নিয়ে থাকো ; সুতরাং এক জন বড় দরের আর্টিষ্ট ! বল দেখি, এ পুতুলটি কেমন ?” বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্ত্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্ত্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে ! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল,—“চমৎকার ! এর তুলনা নেই।”

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“এটাও কি আপনি নিজে মোল্‌ড্‌ করেছেন ?”

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—“হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে ?”

ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—“এ জিনিষ বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয় ?”

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—“না। কেন বল দেখি ? পাওয়া গেলে কিন্‌তে না কি ?”

“বোধ হয় কিন্‌তুম। আপনি এই রকম প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করিয়ে বাজারে বিক্রী করেন না কেন ? আমার বিশ্বাস, এতে পয়সা আছে।”

“পয়সার যদি কখনও অভাব হয়, তখন দেখা যাবে। আপাততঃ জিনিষটাকে বাজারে বিক্রী ক’রে খেলো করতে চাই না।”

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,—“এখন তা হ’লে উঠি। আবার ও বেলা আসব।” বলিয়া মূর্ত্তিটা ঠক্ করিয়া টেবলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি ত আচ্ছা বেকুব হে ! এখনই ওটা ভেঙ্গেছিলে !” তার পর বাঘের মত ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিলেন,—“তোমাদের একবার সাবধান ক’রে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন্ ছবি বা মূর্ত্তি যদি ভেঙ্গেছ, তা হ’লে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে বার ক’রে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ ?”

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জ্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—“এই সব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক, ও বেলা তা হ’লে আবার আসছ ? বেশ কথা, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ—। এবার বাড়ীর কোন্ দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ ? বাগান খুঁড়িয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত ক’রে রাখ্‌তে পারি।”

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“চল, এতক্ষণে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।”

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতী বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তার পর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্য করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি হে, প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন ?”

ব্যোমকেশ বলিল,—“তুমি ত জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্ব্বলতা।”

“তা ত জানি। কিন্তু কি দেখলে ?”

“দেখলুম, প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং খুব সহজ ; যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মত ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটীর বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার ক’রে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরী করা।”

“এই ! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন ?”

“দুর্ভাবনা নেই। তবে কি জানো, একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছে। ছাঁচে প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোনও শক্ত জিনিষ সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তা হ’লে সেটা মূর্ত্তির মধ্যে রয়ে যাবে।”

“অর্থাৎ ?”

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।”

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়ীখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া

আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একবারে বেহায়া,—সে অম্লান-বদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ বুধবার। এখনও দু'দিন সময় আছে।"

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কত দিন হ'ল তৈরী করেছেন?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?"

"না—অম্‌নি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার!" বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, "এক জন তক্‌মা-পরা চাপরাসী দিয়ে গেছে।"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্র-নারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেন্সিল দিয়া লেখা, "এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্রাণ্ডহোটেলে আছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়ি-কাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুসী হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল, "এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলে ফেলে, তা হ'লেই সব মাটী। আবার নূতন ক'রে কায আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে এক ভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশা-পাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্ব্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্ব্বেল গুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যর দিগিন্দ্র মাটীতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বোধ হয় বুঝিতে পারিল, আমি জাগিয়াছি, বলিল, "দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেটা বসবার ঘরে টেবলের উপর কোন-খানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত্রি কটা?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আড়াইটে। তুমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম, "তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয়—টেবিলের দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে ত টেবলের উপরেই আছে। কি কি জিনিষ আছে টেবলের উপর? হাতীর দাঁতের দোয়াতদান, টাইমপিস্ ঘড়ী, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিণকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে যতবার ঘুম ভাঙ্গিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে এক-খানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তার পর আবার দুই জনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের

মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের পর সে মনে মনে কোনও একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন, "এই যে মাণিক-জোড়, এস, এস। আজ যে ভারী সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশ বাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি, দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় নি বুঝি?"

ব্যোমকেশ টেবল হইতে নটরাজের মূর্ত্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারি নি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল, বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রিতে তোমার ঘুম হয় নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"কেমন? হ'ল ত? কিন্তু মূর্ত্তিটা দামী জিনিষ, ভেঙ্গে নষ্ট করো না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্ত্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পুরিল।

তার পর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল,—"নাঃ, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল ত? আমি ত তোমাদের কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"নানা কারণে আমার স্থিরবিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হীরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার যায়গা আর হ'তে পারে কি? হীরেটা চোখের সামনে টেবলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্লাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে হীরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কায নয়; তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হীরেটার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেটা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দ্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হীরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক ক'রে বেরিয়েছিলুম যে, পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ ক'রে পুতুলটা আমায় দান ক'রে দিলে! কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল।—এখন আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু সময়ও ত আর নেই। মাঝে মাত্র এক দিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল,—"মাত্র এক দিন। বোধ হয়, প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হ'ল না। এ দিকে কুমার বাহাদুর এসে থানা দিয়ে ব'সে আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক্ দিয়েই হাস্যাস্পদ ক'রে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!" মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটা টেবলের উপর রাখিয়া দিল, তার পর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীতে গেলাম। শুনিলাম, কর্ত্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নূতন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজ্‌রে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজ্‌রে সিং বারান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজ্‌রে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট

হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দুজনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু হ'ল না। উজ্‌রে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান্।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে, একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল; আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল,—"কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমিও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,—"আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হ'ল না। কুমার সাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ-মূর্ত্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল,—"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি"—তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, যে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ-মূর্ত্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হ'ল?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্ত্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"দেখ, দেখ—নেই! মনে আছে, আজ সকালে পেন্সিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম? সে অক্ষরটা নেই!"

দেখিলাম, সত্যই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে? পেন্সিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও ত পারে!

ব্যোমকেশ বলিল,—"বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে। —পুঁটিরাম!"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তার পর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"তুমি শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবে,—হীরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এই টেবলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন। আপনার স্পেশাল ট্রেণ যেন ঠিক থাকে, পাবামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে থাকা বোধ হয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না। সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু ক'রে কায নেই—স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত আমি ক'রে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না—না, আপনার সেক্রেটারীকেও নয়—আচ্ছা, নমস্কার।"

তার পর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো।' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রিতে ব্যোমকেশ কখন্ ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্ত্তিটা যথাস্থানে নাই। সে দিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে তাচ্ছীল্যভরে বলিল,—"আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আসনি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।"

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল,—"আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আছেন,—তাঁকে কাল এক-রকম জানিয়েই দিয়েছি যে, তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।"

স্যর দিগিন্দ্র কিছুকাল কুঞ্চিত-চক্ষুতে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুল্‌ডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন,—"তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুসী হলাম। খোকাকে বোলো, বৃথা চেষ্টা ক'রে যেন সময় নষ্ট না করে।"

"আচ্ছা, বলব।"—টেবলের উপর আর একটি নটরাজ-মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এই যে আর একটা তৈরী করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন ক'রে রেখেছি; শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক।—কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙ্গে যায়,—আর একটা পাব কি?"

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন,—"বেশ, যদি ভেঙ্গে যায়, আর একটা পাবে। আমার বাড়ীতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এটাও কম লাভ নয়।"

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এত দিন আমার মনের ওদিক্‌টা একেবারে পর্দ্দা-ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে।—ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভাল লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?" স্যর দিগেন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টানানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্ত্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনই ভাবে তাহার একটা হাত টেবলের উপর হইতে নটরাজ-মূর্ত্তিটা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ-মূর্ত্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা," তখন কথাগুলা আমার কাণে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কস্‌রত্ না হ'ক আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল,—"এখন তা হ'লে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়,—মনে রাখ্‌বেন, আমি এক জন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চল্লুম তবে,—নমস্কার!"

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন্ একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল,—"গ্র্যাণ্ড হোটেল।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—"ব্যোমকেশ, এ সব কি কাণ্ড?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম, হীরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তার পর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্ত্তি তৈরী ক'রে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল ক'রে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট 'ব' অক্ষরটি লেখা না থাকত, তা হ'লে আমি জানতেও পারতুম না।" বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল যখন এই 'ব' অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবল থেকে নটরাজটিকে উল্টে দেখলুম, আমার সেই 'ব' মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্ত্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস! তার পর হাত-সাফাই ত দেখতেই পেলে।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি ঠিক জানো, হীরেটা ওর মধ্যেই আছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোনও সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু যদি না থাকে?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,——"তা হ'লে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য ব'লে কোনও জিনিষ নেই। শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—"কি? কি হ'ল, ব্যোমকেশ বাবু?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ-মূর্ত্তিটি টেবলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এটা ত দেখছি কাকার নটরাজ। কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—"

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে—?"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে ত? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কি বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন্ আপনার সীমন্ত-হীরা।" ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল,—তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাষ্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।—ব্যোমকেশ বাবু, আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না, আপাততঃ যত শীঘ্র পারেন, বেরিয়ে পড়ুন। খুড়ো মশায় যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তা হ'লে হীরা হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমার বাহাদুরকে ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

৪

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর-করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন্ দিয়া আঁটা। চেক্‌এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি, আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি, আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিত বাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্য্যাদা করিতে চাই না [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক!] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম পরিচয় বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—প্রতিভামুগ্ধ

শ্রীত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ রায়।"

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেতপুরী

(রহস্যোপন্যাস)

দ্বিতীয় সোপান

সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়

মাননীয় জর্জ্জ সেফোর্ড যখন 'ব্লু রিবন ড্যান্সিং ক্লাবে'র আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল। তিনি নীচের মজলিস ছাড়িয়া পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার কোট ও টুপী লইয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে সোহো স্কোয়ারে প্রবেশ করিলেন।

তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া সেই নাচের মজলিসে আসিয়াছিলেন; তিনি নৃত্যগীতের উৎসাহদাতা ছিলেন, এ জন্য তাঁহাকে অনেক সময় অনিচ্ছায় বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইত; কিন্তু তিনি কোন দিন নৃত্যে যোগদান করিতেন না। তিনি যুবতীদের উদ্দাম নৃত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার অহঙ্কার ছিল—কোন যুবতী তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারে না। তাঁহার এই অহঙ্কার মিথ্যা জাঁক নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি অনেক সময় নাচের মজলিসে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। কোন সুন্দরীর চটুল কটাক্ষ ও মধুর হাসি তাঁহার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারিত না।

জর্জ্জ সেফোর্ড পথে আসিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, আকাশ নির্ম্মল, কোন দিকে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না; নক্ষত্রপুঞ্জ শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, নৈশ সমীরণের প্রবাহ সুখস্পর্শ। জর্জ্জ গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্দেশে ট্যাক্সি না লইয়া পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চেলসিয়া পল্লীর চেনিওয়াকে তাঁহার বাসভবন। সেই স্থান হইতে তাঁহার সেই প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকার দূরত্ব তেমন অধিক নহে।

তিনি পিকাডেলির পথে অগ্রসর হইয়া নাইট্‌স ব্রীজ, স্লোন ষ্ট্রীট, কিংস্ রোড প্রভৃতি অতিক্রম করিলেন। অবশেষে তিনি যখন ওক্‌লে ষ্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়া চেনিওয়াকে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় এরূপ একটি কাণ্ড ঘটিল—যাহার ফলে কেবল তাঁহার নহে, তাঁহার কোন কোন প্রিয়জনেরও জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং যে সকল দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা ও অপরাধী অপরাধের গুরুত্বে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া ইংলণ্ডের শাসন-বিভাগের কর্ত্তব্য কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল, এই ঘটনায় তাহাদেরও অনেকে শায়েস্তা হইয়াছিল।

জর্জ্জ সেফোর্ড বিপুল বিত্তের অধিকারী হইলেও আমাদের দেশের ধনী সন্তানদের ন্যায় মোমের পুতুল ছিলেন না। ব্যায়ামে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি বলবান্ ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। দুই চারি জন গুণ্ডা তাঁহাকে একযোগে আক্রমণ করিলেও তিনি সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিতেন। তাঁহার হাত-পা সমান বেগে চলিত; তাঁহার অব্যর্থ মুষ্টি বা পদাঘাত সহ্য করিয়া কেহই তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে সাহস করিত না।

তিনি বাড়ী ফিরিবার জন্য যে পথে চলিতেছিলেন, সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিলেন। অদূরে নদীর বাঁধ; সেই বাঁধের ধারে তিনি একখানি বৃহৎ মোটর-গাড়ী দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন সেই গাড়ীর প্রায় এক শত গজ দূরে ছিলেন। সেই গাড়ীর নিকট তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা একটু অসাধারণ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; মনে হইল, সেখানে কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে। মোটর-কারের প্রায় ত্রিশ গজ দূরে বাঁধের দেওয়ালের অন্ধকারে কি রকম ধস্তাধস্তি চলিতেছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলের বা গুণ্ডাদের অত্যাচারের আভাস পাইলেন।

সহসা সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই আর্ত্তনাদে ক্রোধ, ঘৃণা ও আতঙ্ক পরিস্ফুট।

জর্জ্জ সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া গুণ্ডামীর স্থানটি লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্কট-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে

এবং মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া সেই ভাবে দৌড়াইতে শিখিয়াছিলেন। সেই দৌড়ে দুপ্-দাপ্ করিয়া পদশব্দ হইত না, কিন্তু মুক্তপ্রান্তর-প্রবাহিত বায়ুর ন্যায় তাহার বেগ। তিনি দ্রুতবেগে সেই অন্ধকারপূর্ণ স্থানটির বিপরীত দিকে উপস্থিত হইয়া কয়েক জনের জড়াজড়ি ও হুড়াহুড়ি দেখিতে পাইলেন। সম্মুখে অন্ধকার, তাঁহার মনে হইল, একাধিক লোক কাহাকেও আক্রমণ করিয়া তাহাকে অদূরবর্ত্তী মোটর-কারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তিনি ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি পথের এড়ো ভাবে চলিয়া নিঃশব্দে সম্মুখের পথ অতিক্রম করিলেন। তিনি তিন জন গুণ্ডাকে একটি যুবতীর হাত ধরিয়া গাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলেন। তাহাদের চেষ্টা সহজে সফল না হওয়ায় তাহারা এরূপ বিব্রত হইয়াছিল যে, অন্যদিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না; এ জন্য তাহারা জর্জ্জকে দেখিতে পাইল না। যুবতীর দেহেই তাহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। জর্জ্জ অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই তিন জন গুণ্ডাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের তিন জনকেই তিনি শায়েস্তা করিতে পারিবেন।

সেই তিন জন গুণ্ডা বলবান্, এবং চোয়াড়ের মত তাহাদের আকার। তাহাদের এক জন যুবতীর দুই পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয় গুণ্ডা যুবতীর মাথা দুই হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল; তৃতীয় গুণ্ডা যুবতীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তি মোটর-কারের সোফেয়ারের পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল, এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া জর্জ্জ অনুমান করিলেন—এই ব্যক্তিই গুণ্ডাদের দলপতি।

এই গুণ্ডাটা যে ভাবে যুবতীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া জর্জ্জের ক্রোধ সংবরণ করা অসাধ্য হইল। তিনি অন্য দুই জনকে আক্রমণ না করিয়া প্রথমেই তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার চুয়ালে এরূপ প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিলেন যে, সেই আঘাতে নীল-পরিচ্ছদধারী গুণ্ডাটা পনের ফুট দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ধরাশায়ী হইল। তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। জর্জ্জ এই ভাবে তাহার গুণ্ডামীর শাস্তি দান করিয়া আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, এবং সে মরিল কি জীবিত রহিল—এ চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তখন তাঁহার কেবল এই কথাই মনে হইল যে, গুণ্ডাত্রয়ের সম্মিলিত শক্তির এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইয়াছে; তখন যে দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহা তিনি কি কৌশলে চূর্ণ করিয়া তাহাদের উৎপীড়ন হইতে যুবতীকে রক্ষা করিতেই হইবে, এ জন্য তিনি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখন তাঁহার চিন্তার অবসর ছিল না। কারণ, তিনি গুণ্ডাদের দলপতিকে এক ঘুসিতে ভূতলশায়ী ও মৃতবৎ অসাড় করিয়াছেন দেখিয়া অন্য গুণ্ডাদ্বয় সেই অসহায়া উৎপীড়িতা যুবতীকে তাড়াতাড়ি পথিপ্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার দুই পাশ হইতে একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

তাহারা উভয়েই চতুর দাঙ্গাবাজ; তাহারা যে-কোন উপায়ে তাঁহাকে আহত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এক জন তাঁহার দেহে পদাঘাত করিবার জন্য ভারী বুট সহ এক পা ঊর্দ্ধে তুলিল, জর্জ্জ তৎক্ষণাৎ পা তুলিয়া সবেগে তাহার উৎক্ষিপ্ত পদে এরূপ কৌশলে আঘাত করিলেন যে, একগোছা শুষ্ক পাকাটী ভাঙ্গিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, তাঁহার পদাঘাতে সেইরূপ শব্দ হইল। আহত গুণ্ডাটা দুই হাত দূরে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, এবং পদাঘাতের যন্ত্রণায় অশ্লীল ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। তাহার আর পা নড়াইবার শক্তি রহিল না; কারণ, তাঁহার পদাঘাতে তাহার পায়ের নলীর অস্থি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গুণ্ডা ভূতলশায়ী হইবামাত্র তৃতীয় গুণ্ডা দুই হাতে জর্জ্জের গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল তাঁহার উভয় কর্ণের নিম্নস্থিত শিরার উপর চাপিয়া বসিল। ঠগী দস্যুরা কি কৌশলে পথিকের গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করে, তাহা তাহার সুবিদিত ছিল। সে তাঁহাকে সেই কৌশলে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। জর্জ্জের কণ্ঠনালীতে এরূপ জোর চাপ পড়িল যে, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, এবং তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, পৃথিবী তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে সরিয়া যাইতেছে। সেই বিষম চাপে তাঁহার চক্ষু দুটিও অক্ষি-কোটর হইতে

ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল; তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও বিলুপ্তপ্রায় হইল। ক্রমশঃ তাঁহার স্কন্ধের নিম্নভাগ হইতে বক্ষঃস্থল ও দুই পাঁজর অবশ হইয়া আসিল, তাহা তাঁহার নাড়িবারও শক্তি রহিল না। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় তখন পর্য্যন্ত অবসন্ন হয় নাই। তাঁহার পদদ্বয়ে নৃত্যে ব্যবহারোপযোগী পাতলা জুতা ছিল; কিন্তু পায়ে পাতলা জুতা থাকিলেও তাঁহার পদদ্বয়ের শক্তি ছিল অসাধারণ; তিনি রুদ্ধশ্বাসে দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার আততায়ীর হাঁটুর হাড়ের উপর পদাঘাত করিলেন।

এই আঘাতে তৃতীয় গুণ্ডা আর্ত্তনাদ করিয়া পা সরাইয়া লইল বটে, কিন্তু জর্জ্জের গলা ছাড়িল না, সে দুই হাতে তাহাতে পূর্ব্ববৎ চাপ দিতে লাগিল। জর্জ্জ তাহাকে পা সরাইয়া লইতে দেখিয়া হাঁটু তুলিবার স্থান পাইলেন, এবং মুহূর্ত্তে হাঁটু তুলিয়া তদ্দ্বারা গুণ্ডাটার তলপেটে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, তাহার হাত দুইখানি জর্জ্জের গলা হইতে খসিয়া পড়িল। সে যন্ত্রণাসূচক একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া জর্জ্জের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ নীরব হইল। বেলুন ফাঁসিলে তাহা যে ভাবে মাটীতে পড়ে, তাহার অবস্থাও তখন সেইরূপ।

জর্জ্জ কি প্রকৃতির গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, তাহাদের দলের অন্যান্য গুণ্ডা নিকটে কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এই জন্য তিনি তাহাদের তিন জনকেই ধরাশায়ী করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আরও দেখিলেন—পদাঘাতে যে গুণ্ডাটার পায়ের নলী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, সে চেতনা লাভ করিয়া পিস্তল বাহির করিবার জন্য বুকের পকেটে হাত দিতেছিল।

মুহূর্ত্ত পরে তিনি সেই যুবতীকে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তৃতীয় গুণ্ডাটার হাত জুতার সাহায্যে মাটীতে চাপিয়া ধরিয়া যবতীকে বলিলেন, "তুমি উহার পিস্তলটা কাড়িয়া লইতে পারিবে? বোধ হয়, কাযটা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না।"—অনন্তর তিনি গুণ্ডাটাকে বলিলেন, "তুমি একটু নড়িয়াছ কি আমি লাথি মারিয়া তোমার চুয়াল গুঁড়া করিয়া দিব।"—তাঁহার কথা শুনিয়া গুণ্ডাটা তাহার কোটের পকেট মাটীতে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। সে বুঝিয়াছিল, এরূপ করিলে তাহার পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লওয়া যুবতীর অসাধ্য হইবে।

জর্জ্জ যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিবার সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবতী পরমা সুন্দরী; সেরূপ সুন্দরী তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল না। নারীর রূপ কোন দিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তিনি কোন দিন নারীর রূপের উপাসক ছিলেন না। কোন নারী তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি তাহাদিগকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন, নারী পুরুষের বিলাস-সঙ্গিনী, পুরুষের জীবনের ভারস্বরূপ। এজন্য তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেন, এবং তাহাদের দুঃখকষ্টে বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও তাহা অনুকম্পা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এই বিপন্না যুবতীকে একবারমাত্র দেখিয়াই তাহার কমনীয় মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ফলকে ফটোচিত্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইল।

যুবতী তাঁহার কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র ভয় বা ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল; সে গুণ্ডাটাকে ধাক্কা দিয়া একটু সরাইয়া তাহার পকেটে হাত পুরিয়া দিল এবং পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া তাহা জর্জ্জের হস্তে প্রদান করিল।

সেই মুহূর্ত্তে একটি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি জর্জ্জের দৃষ্টিগোচর হইল। তীব্র আলোকচ্ছটায় বাঁধের বিভিন্ন অংশ আলোকিত করিয়া একখানি মোটর-গাড়ী ওক্‌লি ষ্ট্রীট হইতে সেই দিকে আসিতেছিল; সেই গাড়ী পথের মোড় ঘুরিলে জর্জ্জ তাহার মাথার আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। গাড়ীখানি দ্রুতবেগে আসিলেও তিনি তাহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তাহা কিছু দূরে থাকিতেই নিঃশব্দে দাঁড়াইল, এবং সেইরূপ নিঃশব্দেই সেই শকটের চালক গাড়ী হইতে পথে নামিয়া পড়িল। জর্জ্জ সন্দেহ করিলেন—সেই গাড়ীর সঙ্গে আহত গুণ্ডাদের কোন সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। এই সন্দেহে তিনি শকট-চালককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন। তাঁহার সন্দেহ সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তিনি সতর্কতাবলম্বনের ত্রুটি করিবেন না, এইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

মোটর-চালক জর্জ্জকে তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিতে দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে কোমল স্বরে গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারি ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে আত্মনির্ভর ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট, কিন্তু তাহাতে দম্ভের আভাসমাত্র ছিল না। যাহারা দীর্ঘকাল হইতে তাঁবেদারদের আদেশ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের কণ্ঠস্বরের তেজ ও নিঃসঙ্কোচ ভাব তাহাতে বর্ত্তমান। তাহা ধীর, স্থির ও লঘুতাবর্জ্জিত।

সেই সময় সোফেয়ারের পরিচ্ছদধারী গুণ্ডাটা চেতনালাভ করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। জর্জ্জ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সেইরূপ দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাগুলাকে আত্মরক্ষার সুযোগ দান করিলে পুনর্ব্বার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। বিশেষতঃ, তাহার সঙ্গী গুণ্ডাদ্বয় যে কোন মুহূর্ত্তে উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিত। এ অবস্থায় কেহ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, গুণ্ডাদের দলের চতুর্থ ব্যক্তি বাঁধের



মাননীয় জর্জ্জ সেফোর্ড, গুণ্ডাত্রয়ের কবলমুক্ত সুন্দরী, জর্জ্জের হস্তে নিগৃহীত গুণ্ডা স্পাইক ডব্‌সন এবং অন্যপ্রান্তে মোটরকারের আরোহী 'আগন্তুক'

আগন্তুকের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি, সাধারণতঃ পুরুষের মস্তকে যেরূপ কেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর; তাহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য সুরুচিসঙ্গত, পরিধানে মূল্যবান্ সাটীনের পরিচ্ছদ। সহসা দেখিলে মনে হয়, লোকটি কোন রঙ্গালয়ের অভিনেতা, অভিনয়ান্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

জর্জ্জকে ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া মোটর-চালক পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে পুনর্ব্বার বলিল, "আমি কি আপনাদিগকে কোন রকম সাহায্য করিতে পারি ?" জর্জ্জের হাতের উদ্যত পিস্তল সে যেন দেখিয়াও দেখিল না।

জর্জ্জ তাহার সম্মুখে দুই এক পা সরিয়া আসিলেন। দেওয়ালের পাশে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। অথচ তিনি তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া এবং আগন্তুকের সহিত আততায়ী গুণ্ডাদলের কোন সংস্রব নাই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া জর্জ্জ সৌজন্যপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আপনার আন্তরিক সদাশয়তার পরিচয়। আমার বিশ্বাস, ঐ দিকে কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। সে আমাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করা উচিত মনে করি।

আপনি তাহার ভার লইলে আমি এই গুণ্ডাগুলাকে কায়দায় রাখিতে পারি।"

কিন্তু যুবতী আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিল। তাহার পর আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি ওদিকে না যাইলেই ভাল হয়। যখন টমি আমাকে এই গুণ্ডাগুলার হাত ছাড়াইয়া অন্য দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সময় ইহারা তাহার মাথায় কোন কঠিন দ্রব্য দ্বারা আঘাত করিয়াছিল।"

এই যুবতীর কণ্ঠস্বর কি মধুর! তাহা দূরস্থ সঙ্গীত-লহরীর ন্যায় বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল বলিয়াই জর্জ্জের মনে হইল। তিনি বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি আগন্তুক মোটর-চালকের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেই যুবকও যুবতীর বিশেষত্বে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়াছিল।

অতঃপর আগন্তুক সোফেয়ারের পরিচ্ছদধারী গুণ্ডাটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি স্পাইক এই অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, আপনার এই কিশোরী বান্ধবীর কোন স্থায়ী অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যদিও আমার পরিচিত গুণ্ডাদের মধ্যে সে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও চতুর, তথাপি স্পাইক তাহার নিয়োক্তাদের আদেশ-পালনের জন্য এরূপ কোন কায করিবে না—যাহাতে তাহার নিবুদ্ধিতা প্রকাশিত হইতে পারে।"

তাহার কথা শুনিয়া জর্জ্জ বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মন সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, এই আগন্তুক গুণ্ডাত্রয়ের এক জনের সম্বন্ধে যখন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিল, তাহাকে সুস্পষ্টরূপে চিনিতে পারিল, এবং তাহাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল না, তখন ইহাকেই বা বিশ্বাস কি?

আগন্তুক জর্জ্জের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, আপনার উৎকণ্ঠার কারণ নাই। আমি দস্যু-তস্কর-সমাজে বিচরণ করিলেও তাহাদের সহিত আমার সংস্রব নাই। আমি তাহাদের দলের কেহ নহি।"

জর্জ্জ তাহার কথা শুনিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "উহাদের দলে বিচরণ করেন, অথচ উহাদের সহিত আপনার সংস্রব নাই, এ কথার অর্থ কি? কে আপনি?"

আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, "আমি? আমি দর্শকমাত্র; আমি উহাদের অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ করি, এ কথাও আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।"

আগন্তুক আর কোন কথা না বলিয়া, এমন কি, জর্জ্জ ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতীর মুখের দিকে না চাহিয়াই পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণটির দিকে অগ্রসর হইল। জর্জ্জ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, আগন্তুক সেই স্থানে একটি জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া সম্মুখে উভয় হস্ত প্রসারিত করিল।

অতঃপর জর্জ্জ যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ঐ দুটো গুণ্ডার দিকে পিস্তল উঠাইয়া দাঁড়াইয়া থাক, যেন উহারা হঠাৎ উঠিয়া আক্রমণের চেষ্টা করিতে না পারে; উহারা কোন অস্ত্র কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিব।"

তিনি তৃতীয় গুণ্ডার গুপ্ত পকেট হইতে একটি রিভলবার, সোফেয়ারের পরিচ্ছদধারী গুণ্ডার পকেট হইতে একটি অটোমেটিক পিস্তল, এবং তাহার জ্যাকেটের ভিতরের পকেট হইতে মাথা ফাটাইবার উপযোগী একটি ভারী ভাঁটা বাহির করিয়া লইলেন।

আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণটি হইতে উভয় হস্তে যে আহত লোকটিকে টানিয়া তুলিল, সে তাহার প্রায় সমবয়স্ক, দীর্ঘ দেহ, মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, লোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়। গুণ্ডারা যুবতীকে আক্রমণ করিয়া যে গাড়ীর দিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, আগন্তুক সেই আহত যুবকটিকে ধরিয়া সেই গাড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

জর্জ্জ সন্দিগ্ধ-চিত্তে ব্যগ্রভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া মোটর-চালক আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া হাত তুলিয়া বলিল, "আপনি আমাকে সন্দেহ করিবেন না, আপনার ব্যস্ত হইবারও প্রয়োজন নাই। আমি স্বয়ং এই গাড়ীখানির ভার গ্রহণ করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। কেবল এই গাড়ীর নহে, আপনাদের এবং এই গুণ্ডা-গুলারও ভার গ্রহণ করিব। সকলকেই এই গাড়ীতে তুলিয়া লইব।"

জর্জ্জ সোফেয়ারের পরিচ্ছদধারী গুণ্ডাটার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে তখন ভূমিশয্যা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া আগন্তুকের মুখে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন ; তাহার মুখ বিবর্ণ, ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

শোফেয়ার-বেশধারী গুণ্ডা মোটর-চালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমাকে দয়া করিয়া সাহায্য করুন। আমরা আপনার দলের কাহাকেও ঘাঁটাইতে গিয়াছিলাম, ইহা জানিতাম না। আমাদের কসুর মাফ করুন, কর্ত্তা!"

আগন্তুক ভদ্রলোকটি তাহার কথা শুনিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তোমাদের জানা উচিত ছিল যে, কোন অন্যায় কায করিলেই আমার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। যাহাকেই আক্রমণ কর, সে আক্রমণ আমাকেই করা হয় ; আমি তাহার প্রতীকার করিতে বাধ্য। এই মুহূর্ত্তে গাড়ীতে ওঠ।"

আগন্তুক গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া এই আদেশ করিলে গুণ্ডাটা জর্জ্জের বা যুবতীর মুখের দিকে না চাহিয়া লগুড়াহত কুকুরের মত কাতরভাবে সেই মোটর-কারে প্রবেশ করিয়া তাহার এক কোণে বসিয়া পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তে যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইল! তাহাকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া জর্জ্জ দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, যুবতীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া আগন্তুক তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং জর্জ্জের সাহায্যে তাহাকে তুলিয়া নিজের গাড়ীর ভিতর শয়ন করাইল। তাহার সেই গাড়ীখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই জন মাত্র আরোহীর বসিবার স্থান ছিল।

আগন্তুক অতঃপর অন্য দুই জন গুণ্ডার অবস্থা লক্ষ্য করিল। জর্জ্জ পদাঘাতে যাহার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, সে তখনও মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গা পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। অন্য গুণ্ডাটা উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে তলপেট ডলিতেছিল। আগন্তুক তাহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জর্জ্জকে বলিল, "ইহাদিগকে লইয়া আপনি ঐ গাড়ীতে উঠিবেন কি? উহাদের সঙ্গে আমার দুই চারিটি কথা আছে, তাহা পরে বলিলেও চলিবে। স্পাইক ডবসনকে আমি পূর্ব্বেই ঐ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছি ; তাহাকেও পরে আমার প্রয়োজন হইবে। পথিমধ্যে কোন নারীকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি উৎপীড়ন, তাহাকে অপহরণের চেষ্টা, উপেক্ষার বিষয় নহে। এইরূপ অপরাধ ভবিষ্যতে আর না ঘটে, আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সেই সময় এক জন ট্যাক্সিচালক তাহার শকটের আরোহিগণকে অদূরে নামাইয়া দিয়া সিয়েনি রো দিয়া তাহার আড্ডায় ফিরিয়া যাইতেছিল। জর্জ্জ সেই ট্যাক্সি-চালককে গাড়ী থামাইতে বলিয়া গুণ্ডাদ্বয়কে সেই গাড়ীতেই তুলিয়া দিলেন। যে গুণ্ডাটার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিতে হইল। জর্জ্জ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা ডেপট ফোর্ডে ডকিং রোডের কিছু দূরে একটা গুণ্ডার আড্ডায় বাস করিত।

আহত ভদ্রলোকটি যে গাড়ীতে ছিলেন, স্পাইক ডবসন নামক গুণ্ডাকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আগন্তুক জর্জ্জকে বলিল, "আপনার কি মোটর-গাড়ী চালাইবার অভ্যাস আছে?"

জর্জ্জ বলিলেন, "এমন কঠিন কায কি? আমি সকল রকম মোটর-গাড়ীই চালাইতে পারি।"

আগন্তুক বলিল, "তাহা হইলে আপনি এই গাড়ীতে উঠিয়া আমার অনুসরণ করুন। স্পাইক্‌স ঐ গাড়ীতে আছে ; তাহার সঙ্গে একত্র যাইতে আপনি ভয় পাইবেন না। সে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, আপনার সহিত আর অসদ্ব্যবহার করিবে না।"

জর্জ্জ হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে নাড়িয়া সে বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছে, আবার আমার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিবে? যদি উহার লজ্জা না থাকে, এবং পুনর্ব্বার মাদার গাছে দাদ চুলকাইবার সখ হয়—তাহা হইলে এবার উহাকে বরফের মত ঠাণ্ডা হইতে হইবে ; আপনি উহাকে ততখানি ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই। আপনি উহাকে শাস্তির ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা করিয়াছেন, কিন্তু আমার দাওয়াই টাট্‌কা, সদ্যঃফলপ্রদ।"—তিনি ঘুসি দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "কোথায় আমাদিগকে লইয়া যাইবেন?"

আগন্তুক যুবতীকে তাহার ক্ষুদ্র মোটর-কারে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে—জর্জ্জ তাহা জানিতেন না, এই জন্যই তিনি তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি নরকের দ্বারেও সেই যুবতীর অনুসরণ করিতে প্রস্তুত!

আগন্তুক তাহার গাড়ীতে উঠিয়া যে স্থানে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিল, তাহা ঠিক নরক না হইলেও তাহা নরকের কাছাকাছি বটে! তাঁহাদিগকে চেল্‌সিয়া দিয়া গ্রস্‌ভেনর রোডে প্রবেশ করিতে হইল; তাহার পর ল্যাম্বেথ ব্রীজ পার হইয়া তাঁহারা বরো রোড, ল্যাম্বেথ রোড, সেণ্ট জর্জ্জ রোড, নূতন ও পুরাতন কেণ্ট রোড, নিউ ক্রস্‌ রোড, হন্সডেন রোড প্রভৃতি অতিক্রম করিলেন, এবং রেলপথ পার হইয়া আরও নানা রাস্তা ঘুরিয়া ডেপ্ট্‌ফোর্ডে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা যে পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, তাহা দরিদ্রের পল্লী। ঘন বসতি, পল্লীর কুটীরগুলি জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন; পথ সঙ্কীর্ণ, আবর্জ্জনাপূর্ণ; বায়ুস্তর দুর্গন্ধাকীর্ণ। সেই পল্লীর অধিবাসীরা যে সকল কুটীরে বাস করিত, তাহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য, গৃহপালিত পশুরাও সেখানে বাস করিতে কষ্ট হইত। সেই কদর্য্য পল্লীর আঁকা-বাঁকা অপ্রশস্ত বমনোদ্দীপক পথে চলিতে চলিতে জর্জ্জের নাসিকা পুনঃ পুনঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত সেই অপরিচিতা সুন্দরীর অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

লীলার মূল্য

এখনো চন্দ্রমা উঠে প্রাণ-মন লয় লুটে
এখনো বনশ্রী লাগে ভালো,
পুলক-সঞ্চার করে বিস্ময়ে হৃদয় ভরে
এখনও যে প্রভাতের আলো।
পুষ্পিত কদম্ব-বনে বিস্ফারিত তনয়নে
অবাক্‌ হইয়া আজো চাই,
হেরি আজো মেঘোদয় নেচে উঠে এ হৃদয়
অপূর্ব্বতা তারো ঘুচে নাই।
এখনো যে এ ভুবন হয়নিক পুরাতন,
শেষ নয় বিস্ময় বিলাস,
এখনি কি যেতে হবে? এই সৃষ্টি প'ড়ে রবে?
একি তব ক্রূর পরিহাস?
নানা উপভোগ্যে ভরা পেয়েছিনু এই ধরা
কতটুকু করেছি বা ভোগ?
তিয়াসা করিতে নাশ কতটুকু অবকাশ?
ছিল শ্রম দৈন্য ভ্রম রোগ।
স্বাদে বর্ণে গন্ধে গানে স্নেহে প্রেমে ধনে মানে,
পরিপূর্ণ তব শ্রীভাণ্ডার,
কোনটি বা দূরে আছে কোনটি এসেছে কাছে
কতটুকু লভিয়াছি তার?
অধর না পরশিতে মধুপর্ক কেড়ে নিতে
হায় তব এতই উল্লাস?
হৃদয়ে জ্বলিছে ক্ষুধা প'ড়ে রবে সব সুধা
একি তব ক্রূর পরিহাস?

শিরে দেছ গুরুভার সাধ্যমত ব্রত তার
করি বহু আয়াসে পালন।
উপাদান আহরণে আয়োজন প্রয়োজনে
কেটে গেছে আধেক জীবন।
জীবিকা অর্জ্জন শ্রমে আধি-ব্যাধি বুদ্ধিভ্রমে
কতটুকু অবসর পাই?
সঙ্কল্প বাসনারাশি এখনো কল্পনাবাসী
সাধনায় যা পারি ফুটাই।
সমস্ত জীবন দিয়া তুলিবারে উদ্‌যাপিয়া
তা প্রভু দিবে না অবকাশ?
অপূর্ণ রাখিয়া ব্রত যাবো জনমের মত
একি তব ক্রূর পরিহাস?
অকালে ডাকিবে যবে এ সংসারে কেন তবে
আনিলে ভুলায়ে নানা লোভে?
তুমি সর্ব্বশক্তিমান আমি নর ক্ষীণ-প্রাণ
এ কৌতুক তোমারেই শোভে।
শোভা পায় সত্য কি তা তুমি যে গো বিশ্বপিতা
পুত্র নিয়ে তোমার কৌতুক,
আমি থাকি আমি যাই তব ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই
সমানই চলিবে সৃষ্টি-সুখ।
তুমি যারে দিলে ব্যথা কে শোনে তাহার কথা?
ভগবান্‌ নাই কি তাহার?
মানুষের বেদনার কোন মূল্য নাই, আর
যত মূল্য তোমার লীলার?

শ্রীকালিদাস রায়।

গুরুবায়ুর-সম্মেলন

ধীরে রজনী ধীরে, উপন্যাসের রজনী নহে, একটি বাস্তব রজনী আমার চোখের উপর দিয়া ধীরে অতিবাহিত হইল। বোম্বাই হইতে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক আমাকে তার করিলেন যে, 'বাঙ্গালা হইতে আপনি আমাদের দিগ্বিজয়-যাত্রায় যোগদান করুন!'

তার পড়িয়া হাসি পাইল, এ যুগে বর্ণাশ্রমের দিগ্বিজয়? সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের মাত্রাও কম হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই যাতায়াতের ব্যয়ের কথা মনে হওয়াতে হাসি-কৌতুক নিমেষে মিশাইয়া গেল। রাত্রিতে মনের মধ্যে ব্যয়ভারের চিন্তা ও নব-কৌতূহলের দ্বন্দ্ব বাধিল, নিদ্রা ছুটিয়া পলাইল, এই ভাবে গত ৩ই ডিসেম্বরের বিনিদ্র রজনী ধীরে ধীরে অতীত হইল।

পরদিন এক পত্র পাইলাম,—"বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘের সভাপতি বল্লভাচার্য্য শ্রীগোকুলনাথ মহারাজের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বোম্বাই হইতে গুরুবায়ুর পর্য্যন্ত জয়যাত্রা করিবেন। একযোগে সকলের যাওয়ার জন্য পাঁচ সাতখানি মোটর ও লরী সংগ্রহ হইয়াছে। যাত্রার পথে মধ্যে মধ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সভাধিবেশন করিতে হইবে এবং বিচারের দ্বারা বিপক্ষ মত খণ্ডন এবং স্বমতমণ্ডনও এই যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। চরম উদ্দেশ্য হইল—গুরুবায়ুরের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া মন্দির-বিভ্রাটের অবসান ও শান্তি স্থাপন করা। আপনিও এই যাত্রার সঙ্গে যোগদান করুন।" পত্র পাঠ করিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

গুরুবায়ুর! যাহার নাম আজ পৃথিবীর দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছে। যে গুরুবায়ুর কথা জানিবার জন্য জনসাধারণের উৎকণ্ঠার সীমা নাই, সেই গুরুবায়ুর যাত্রার জন্য আহ্বান! প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য'—কিছু পরেই পাথেয় খরচের ৪০৲ টাকা বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত হইলাম। হৃদয় উৎফুল্ল হইল, সহৃদয় সম্পাদককে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া এবং পূজ্যপাদ পিতৃদেবের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাই মেলে বোম্বাই রওনা হইলাম।

লক্ষ্মীরামজী চুড়িবালা এক জন প্রসিদ্ধ তুলা-ব্যবসায়ী, বোম্বাই সহরে তাঁহারই বাড়ীতে উঠিলাম। ইনিই বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘে দুইটি মোটর দান করিয়াছেন, যাহার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার আজ অনেকটা অগ্রসর।

বাস্তবিক নামের মহিমা অস্বীকার করিবার যো নাই। বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘের বহু শাখা আছে, কিন্তু বোম্বাই শাখার বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। যেমন বোম্বাই আম, বোম্বাই বারুদ; সঙ্ঘের বোম্বাই শাখাটিও তেমনই বৈশিষ্ট্য রাখে। বহু ধনী ও মানীর পূর্ণ সহযোগে বোম্বাই সঙ্ঘ নামটিও বিশেষ সার্থক হইয়াছে। যাক্, সাগর-পরিখা-বেষ্টিত চির-বসন্ত-রমণীয় বোম্বাই সহরের সুখ-সৌন্দর্য্য আমার ভাগ্যে অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে হয় নাই। সেই দিনই লক্ষ্মীরামজীর সহিত পুণায় রওনা হইতে হইল।

পুণাতেই তখন সঙ্ঘের কার্য্য চলিতেছিল। বোম্বাই হইতে আসিয়া পুণাতেই বিজয়যাত্রার প্রথম আসর পড়িয়াছিল।

রাত্রি ৮ টার সময় পুণা ষ্টেশনে এক জন সঙ্ঘের সেবক উপস্থিত ছিল, তাহার কথামত অশ্বযানে চড়িয়া এক বিরাট জনসভার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিত রাজেশ্বর শাস্ত্রী, সাঙ্গবী ও প্রফেসর দূরকালের বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে, সভা শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে শুনিলাম।

সভার স্থানটি বড় মনোরম, শিবাজী মন্দির। মন্দিরে শিবাজীর শ্বেত প্রস্তরের অর্দ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত। সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান; সেখানে দেখি, পাঁচ সহস্র শ্রোতা সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে তন্ময় হইয়া আছে।

সভায় বসিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। বারে বারে সেই প্রস্তরমূর্ত্তির দিকে চাহিতে লাগিলাম। মহারাষ্ট্রের চিত্রগুলি একে একে স্মরণপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল, হৃদয়ের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া এই একটি বাণী শুধু আমার ওষ্ঠপ্রান্তকে কম্পিত করিল, এস এস হে মহামহিম! আবার এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হও। শ্রীমান্ দেবনায়কাচার্য্যের বক্তৃতা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সভাভঙ্গ হইল এবং সনাতন ধর্ম্মের জয়-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল; আমি যেন অন্যমনস্কভাবে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম, কৌড়ে শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর ডাবরে মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে প্রীত হইলেও প্রাণের মধ্যে একটা যাতনা

অনুভব করিতে লাগিলাম—সেই পুণা, সেই শিবাজীর রাজ্য—সেই সনাতন ধর্ম্ম আর সেই ভারত—সবই আছে, অথচ আজ আমরা কোথায়? ভগবন্! যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর ভাবিতে পারিলাম না।

সদাশিব পেট পুণার একটি প্রসিদ্ধ মহল্লা,—এই মহল্লায় কবিপঞ্চানন কোড়ে শাস্ত্রীর কবিরাজী ডিস্‌পেনসারী, এখানে আমাদের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পার্শ্বেই বড় রাস্তা। আমি শয়ন করিয়াছি, নিদ্রাও আসিয়াছে, বাজনা বাজাইতে বাজাইতে একটা শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। আমি উন্মত্তের মত ছুটিয়া বারান্দায় আসিলাম, মনে হইল, শায়েস্তা খাঁর শাস্তির জন্য আবার বুঝি শিবাজী মহারাজ পুণায় আসিলেন। আকুল-চিত্তে বহুক্ষণ শয্যাকণ্টক অনুভব করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আর টের পাই নাই। একটু দূরে শ্রীবিট্‌ঠলনাথের মন্দিরে সভাপতি শ্রীগোকুলনাথজী মহারাজের সহিত পরদিন প্রাতঃকালে দেখা করিলাম। তাঁহার অনুষ্ঠান-পরিপাটীর সহিত এই যে বিজয়-যাত্রার উৎসাহ, ইহা বস্তুতই বিস্ময়াবহ। তিন ঘণ্টা প্রত্যহ জপ, পাঠ ও পূজায় অতিবাহিত করিয়াও প্রত্যহ সঙ্ঘের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি একটুও উদাসীন নহেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—"আপনি ও প্রফেসর দূরকাল আজই গুরুবায়ুর যাত্রা করুন। সেখানকার অবস্থা বুঝিয়া একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবেন—মন্দির-বিভ্রাটের সমস্ত সমাচার আমাদের তারযোগে জানাইবেন এবং তদনুসারে আমরা উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমরা পুণা ছাড়িয়া ধারোয়ার যাইব—ক্রমে দক্ষিণে যাইতে যাইতে গুরুবায়ুরে পৌছাইব। আমাকে ধারোয়ারে তার করিবেন। আপনারা উভয়েই ইংরাজী জানেন এবং আপনিও অন্যতম সম্পাদক বলিয়া এই ভার অর্পিত হইল।" আমি ও প্রফেসর দূরকাল ১১ই পুণা ছাড়িলাম।

বড় ইচ্ছা ছিল, যারবেদায় গিয়া গান্ধীজীর সহিত দেখা করি—তাহা হইল না। পরদিন মাদ্রাজে পৌছিয়া গুজরাটী ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। তখন অপরাহ্ণ প্রায় ৪টা, বাজারে বাহির হইয়াই বুঝিলাম যে, কি অন্যায়ই করা হইয়াছে! যে দেশের ভাষা একবারে বুঝিবার উপায় নাই, সেই দেশে সভা করিতে হইবে! অঙ্গুলিসঙ্কেতে না হয় চাল-ডাল ক্রয় করা যায়, সভায় বক্তৃতা করা যায় না ত?

কেহ কেহ ইংরাজী বুঝে বটে, কিন্তু অনেকেই বুঝে না। দূরকাল ও আমি উভয়েই বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মশালার গুজরাটী কর্ম্মচারীর সঙ্গে খুব খানিকটা হিন্দীতে গজ্‌ গজ্ করিয়া মনের দুঃখ মিটাইয়া লইলাম। এই সঙ্গে সনাতন-ধর্ম্মপ্রিয় কতিপয় ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানাও জানিয়া লওয়া গেল। দূরকালজী গুজরাটী ব্রাহ্মণ—ধর্ম্মশালায় একটু অধিক খাতির পাইলেন। পরদিন ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্ গোবর্দ্ধন দাস চতুর্ভুজ দাসের সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই সনাতনপন্থী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম; কেন না, তাঁহার গোঁফ জোড়াটি হাল ফ্যাসানের ল্যাজা-মুড়ো ছাঁটা, 'প্রজাপতি মার্কা' নহে—বেশ অখণ্ড—বিস্ফারিত—সযত্নে লালিত; সেকালে শিখা দেখিয়া গোত্র জানা যাইত—এখন গোঁফ ও চুল ছাঁটা দেখিয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মমত জানিতে পারা যায়। তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও গুজরাটী বলিয়া পরিচয় দিলেন—নামেও তাহা বুঝা গেল। তিনি আমাদের পাইয়া তখনই তাঁহার ভাগিনেয় কিষণদাস গিরিধরদাসকে ডাকিয়া একখানি মোটরে করিয়া আমাদিগকে মাদ্রাজ হাইকোর্টএ লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে বহু এড্‌ভোকেট ও উকীলদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা হইল। দেওয়ান বাহাদুর টী, আর, রামচন্দ্র আয়ার তখনই এক টেলিগ্রাম করিয়া গুরুবায়ুরে আমাদের গমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। সেই রাত্রিতেই আমরা দক্ষিণ-ভারত রেলওয়ে মেলে মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া গুরুবায়ুর অভিমুখে রওনা হইলাম। মেলখানিতে ইণ্টার ক্লাস নাই, কাযেই থার্ড ক্লাসেই আমাদের স্থান গ্রহণ করিতে হইল। রেঙ্গুন-ফেরৎ মুসলমানের ভিড়ে মনে হইল, পূর্ব্ববঙ্গের কোন যাত্রিগাড়ীতে চড়িয়াছি।

'সারাটি রজনী রহিব জাগিয়া, চাঁদও জাগিবে আমার সনে'—আমি সারারাত্রি জাগিলাম, কিন্তু চাঁদের পরিবর্ত্তে আশে-পাশে চা জাগিতে লাগিল। শুধু চা নহে—কফি, চুরুট ও পান রেঙ্গুন-প্রত্যাগত কৃষ্ণকায় মোপলাদিগের মুখে, আকাশে উল্কা ও ধূমকেতুর মত সর্ব্বদাই শোভা পাইতে লাগিল। পরে জানিলাম, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে এই কয়টি বিলাসই [illegible]ানভাবে পশার জমাইয়া আছে।

প্রভাতে একটি স্ব[illegible]য়া নদীকে লাইনের ধার দিয়া

বরাবর বহিয়া যাইতে দেখিলাম। ৯টার সময় সোরনুর ষ্টেশনে নামিলাম। এখানেও সুপরিষ্কৃত সৈকত-পুলিনের মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিতা। রাত্রিজাগরণে ক্লিষ্ট শরীর ঐ নদীতে অবগাহনের জন্য ব্যাকুল হইল, কিন্তু অদূরে মোটরের ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনিয়া সকল ইচ্ছা তুচ্ছ করিতে হইল। ঐ মোটর-খানিই না কি গুরুবায়ূরে যাইবে এবং ছাড়িবে অতি সত্বরই। পরবর্ত্তী মোটর আবার বৈকালে।

গুরুবায়ূর সোরনুর ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে। আমরা মালপত্র কুলীর মাথায় যেমন চাপাইয়াছি, অমনই একটি টিকিট্-চেকার আসিয়া মালের রসিদ চাহিলেন। আমি সঙ্গী দূরকালজীর মুখ পানে চাহিলাম; কেন না, মাদ্রাজ ষ্টেশনে তিনিই মাল ওজন করিতে গিয়াছিলেন। দূরকালজী চেকারকে বলিলেন,—'মাদ্রাজ ষ্টেশনে মাল ওজন করিতে গিয়াছিলাম; ডুইখানি টিকিট্ ও সামান্য জিনিষ দেখিয়া মালবাবু ওজনই করিলেন না।' টিকিট্-চেকার বেশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'এখানে সামান ওজন করিতেই হইবে।' দূরকালজী একটু নিরীক্ষণ করিয়া একবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "আপনিই না মাদ্রাজ ষ্টেশনে মাল ওজনের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন?" চেকার বলিল, "আমি ও-সব কথা শুনিতে চাই না।" আমি বলিলাম, "এ-সব কায়দা না করিলে ওদের চাকরী থাকাই যে দায়?" দূরকালজী বলিলেন, চলুন ওজন করা যাক্। ওজনে টিকিট্ বাদে একসের মাত্র বেশী হইল। কিন্তু আইন অনুসারে সমস্ত মালের ওজন ধরিয়া ৬৲ টাকা দণ্ড দিতে হইল। দূরকালজী খুব ধন্যবাদ দিতে দিতে রসিদ লইয়া সামান সহ মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমিও মোটরে উঠিলাম। মোটর চলিল।

পথে দেখিলাম, যত দোকানদার—সবই প্রায় মুসলমান। বেলা ১১টার সময়ে এক যায়গায় প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য মোটর থামিল, শুনিলাম, সে স্থানটি খৃষ্টান পল্লী। সেখান হইতে ৫ মাইল দূরে গুরুবায়ূর।

আবার মোটর চলিল। প্রায় বারোটার সময়ে বহু শঙ্খ ও সানাই বাজিয়া উঠিল এবং মোটর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। প্রায় দুই শত ব্যক্তি মোটরের দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শুনিলাম, তাঁহারা গুজরাট ও বাঙ্গালা হইতে আগত দুইটি অতিথির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছেন। আমরা একটু উৎফুল্ল ও লজ্জিত হইলাম। তাঁহাদের কথামত যেখানে নামিলাম, সেই স্থানটিই হইল গুরুবায়ূর মন্দিরের সম্মুখ। মন্দিরের সম্মুখে—তেমাথা রাস্তা, বেশ প্রশস্ত। মন্দিরদ্বারে ২০ হাত উচ্চ প্রকাণ্ড এক পিত্তল-নির্ম্মিত দীপস্তম্ভ, তাহাতে



গুরুবায়ূর মন্দির—সম্মুখে দীপস্তম্ভ

প্রায় তিন শত পিত্তল-প্রদীপ সংলগ্ন। উৎসবের সময় এই সব প্রদীপ জ্বালান হয়। এই স্তম্ভটি স্বর্ শঙ্করণ নায়ার-প্রদত্ত, ইহাও শুনিলাম। মন্দিরের গঠন—আটচালা ধরণের। তবে ছাদ কাঠের এবং কোন কোন ছাদ খোলার দ্বারা আবৃত। এখানে অবতরণ করিয়া আমরা রাস্তা হইতে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিলাম। গর্ভগৃহের অন্ধকারে থাকিলেও বিগ্রহটি দীপালোকে ঈষৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

অনাহার ও অনিদ্রায় উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী নৃত্য করিয়া উঠিল, চির-আকাঙ্ক্ষিত গুরুবায়ুর-প্রভু দর্শনে ভাবের প্রবল তরঙ্গ ছুটিল—আমি সত্যই কাঁদিতে লাগিলাম। আবেশে আপনা হইতে মুখ দিয়া বাহির হইল—

লীলাময়-তনু-ধারণ-মায়ী
নন্দ-যশোদানন্দ-বিধায়ী
জয়তি মুকুন্দো জনশুভকন্দ
শ্রীগুরুবায়ুপুরপ্রভু-চন্দ্রঃ।
শেষে শিশুরিব মন্দির-কোণে
বিলসতি লীলা ত্রিভুবনযোনেঃ।
জনয়সি মোহং মনসি বিশুদ্ধে
নটসি নবং নবভারতযুদ্ধে॥
মধ্যে ভারতমদ্ভুতকায়াং
সংহর সংহর নিজকৃতমায়াম্।
জয় জয় কেশব বাসব-বন্দ্য
শ্রীগুরুবায়ুপুরপ্রভুচন্দ্র!

লীলাময়! আবার কি কুরুক্ষেত্র-লীলার অভিনয় দেখিতে চাও? ভ্রাতায় ভ্রাতায় আবার কি বিরোধ ঘটাইবার ইচ্ছা হইয়াছে? তোমার এই অদ্ভুত মায়া সংহার কর, প্রভো! এই বলিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে শোভাযাত্রার সহিত আমরা জামোরিণের অতিথিশালায় (Guest House) উপস্থিত হইলাম।

গুরুবায়ুর নামের অর্থ শুনিলাম—এই মন্দিরটি বৃহস্পতি ও পবনদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম গুরুবায়ুপুর। পুরের অপভ্রংশ উর্, তাহা হইতেই গুরুবায়ুর হইয়াছে। গুরুবায়ুর দক্ষিণ-মালাবারের একটি পল্লীগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ-মালাবার কেরল প্রদেশ বলিয়াও খ্যাত। শুধু শীতটুকু নাই, নতুবা বাঙ্গালার অনেক চিত্রই এই মালাবারে বা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। কলা, নারিকেল, আম, কাঁটাল, গাব, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, ভেরেণ্ডার গাছ চারিদিকে। তবে বাঙ্গালার মত ভূমি উর্ব্বরা নহে—পার্ব্বত্য ও বালুকাময় প্রদেশ যথেষ্ট অধিক। নারিকেল-বৃক্ষ দাক্ষিণাত্যে ঠিক যেন কল্পতরু। এই এক নারিকেল-গাছ হইতেই সংসারের সাধারণতঃ আবশ্যক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। আমাদের দেশে যে সব কার্য্য হয়, তাহা ত জানাই আছে,—তা ছাড়া, নারিকেল-তৈলে রান্না হয়, ছোবড়া ও মালায় জ্বালানী কাঠের কায করে। নারিকেল-পাতায় ঘর ছাওয়া ও নারিকেল-শীষে দাঁতনের কায হয়। এ দেশে কলাও বহুবিধ। বানানা এক প্রকার অতি পুষ্টিকর কদলী। আমাদের অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল ও নানাবিধ কদলীর সমাবেশ হইতে লাগিল।

নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে কদলী ও নারিকেলের সদ্ব্যবহারে শরীর অনেকটা তৃপ্ত হইল। অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর বড় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আমার দক্ষিণ পদে দীর্ঘ দিনের বাত সঞ্চিত ছিল। সময় পাইয়া সেই বাতের বেদনা এমন বৃদ্ধি পাইল যে, আমি আর চলিতে পারিব না,—মনে হইল। এক জন চিকিৎসক ডাকিতে বলিলাম। গুরুবায়ুরের বহু ভদ্রলোক আমাদের পরিচর্য্যা ও সহায়তার জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কাতরতা দেখিয়া বলিলেন—চিকিৎসক ডাকিতে হইবে না, যেখানে আসিয়াছেন, বাত-রোগ উপশমের এই স্থান। আগামী কল্য আপনাকে ঔষধ দিতে লইয়া যাইব।

পরদিন স্নান-সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম। চলিলাম সেই মন্দিরেই। সূর্য্যকিরণদীপ্ত দীপস্তম্ভের পাশ দিয়া সিংহদ্বারে প্রথমে প্রবেশ করিলাম। তৎপরেই একটি প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বে যজ্ঞশালা, দক্ষিণে জামোরিণের ট্রাষ্ট অফিস্। (Trust Office) সেখানে ভোগ-পূজাদির টাকা-পয়সা জমা দিলে টিকিট পাওয়া যায়। টিকিট দেখাইলে যথাসময়ে প্রসাদ মিলে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে একটি কক্ষ,—ইহাই দ্বিতীয় আবরণ। তৎপরে আর একটি চত্বর, পার্শ্বেই ভোগের ঘর, সম্মুখে একটি বেদী, বেদীর উপর বড় বড় কয়েকটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে।

বেদীর পাশ দিয়া অগ্রসর হইলেই গর্ভগৃহের সোপান, এই সোপান দিয়া গর্ভগৃহে উঠিতে হয়। গর্ভগৃহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কিশোর-বিগ্রহ। বিগ্রহটি অতি প্রাচীন। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ বংশানুক্রমে এই বিগ্রহের সেবক। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় ও নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ এখনও বেদাধ্যয়নশীল ও সদাচারসম্পন্ন। তবে নাম্বুদ্রিবংশে কয়েকটি বিচিত্র আচার প্রচলিত আছে। দ্রাবিড়গণ তাহা দেশাচার বলিয়া উপেক্ষা করেন। নাম্বুদ্রিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যতীত অপর ভ্রাতৃগণ সজাতীয়া কন্যা বিবাহে অধিকারী নহেন। এজন্য নায়ার (সৎশূদ্র)-বংশীয়া কন্যার সহিত সংসার করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি পুরোহিত-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহাও শুনিলাম। পুত্র সত্ত্বেও ভাগিনেয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, মামাতো ভগিনীর সহিত বিবাহ দ্রাবিড়ী ও নাম্বুদ্রি উভয় সমাজেরই প্রচলিত রীতি।

কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং আমাদেরও না কি প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গুরুবায়ুর মন্দিরের অভ্যন্তরে আমি অবাধে গিয়াছিলাম, ঠিক গর্ভগৃহের দ্বার পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত সে দেশের ব্রাহ্মণদেরও প্রবেশ অনুমোদিত। আমার প্রবেশবিষয়ে আপত্তি করা ত দূরের কথা, অতি আদরের সহিত প্রসাদী চন্দন-চরণামৃত ও তিল-তৈল আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি চরণামৃত পান করিয়া ও চন্দন ললাটে ধারণ করিয়া যখন আসিতেছি, তখন আমার সঙ্গিগণ বলিলেন, ঐ প্রসাদী তৈল বেদনার স্থানে মালিশ করুন, উহাই বাতের ঔষধ। আমি তাহাই করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে মনে হইল, বেদনা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। তিন দিনমাত্র ঐ তৈল প্রয়োগে আমার ছয় মাসের বাত-বেদনা একবারে বিদূরিত হইয়াছিল। শুনিলাম, শুধু বাত-ব্যাধি নহে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তও এই গুরুবায়ুর স্থানের (দেবতার) কৃপায় নিরাময় হইয়া থাকে। সমগ্র দক্ষিণ-মালাবারে গুরুবায়ুর মন্দিরের এই অপূর্ব্ব মহিমা সুপ্রসিদ্ধ। শুধু উচ্চবর্ণ নহে, যাহারা মন্দিরপ্রবেশে



গুরুবায়ুরের—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ

অনধিকারী, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় এই দুই কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে।

এখানকার পূজার পরিপাটীও বেশ, যেমন নিয়মনিষ্ঠা, দ্রব্যসম্ভারের সমাবেশও মন্দ নহে। প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময়ে তিল-তৈলাভিষেক সম্পন্ন হয়। শ্রীবিগ্রহে তৈল ঢালা

হয়, তাহা গড়াইয়া পড়িলে পুরোহিতগণ ধরিয়া রাখেন। অর্দ্ধেক তৈল রোগীদিগকে দান করা হয়, অর্দ্ধেক বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়ের টাকা ট্রাষ্ট ফণ্ডে জমা হয়। প্রত্যহ প্রায় ৫।৭ সের চন্দন ঘর্ষণ করা হয়—এই চন্দন দ্বারা বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত হইয়া থাকে, ইহাই চন্দনাভিষেক।

তৈলাভিষেকের পর জলের দ্বারা, তৎপরে চন্দন, পুনরায় জল এবং বেলা ৮টার সময়ে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান হয়, পুনরায় জলের দ্বারা অভিষেক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভোগে পরমান্ন অর্দ্ধমণ ও একমণ তণ্ডুল সিদ্ধ হয়। বেলা ১০॥টা হইতে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। এই সময়ে শৃঙ্গারবেশ ধারণ করান হয়। দেবকার্য্যের জন্য দুগ্ধ ও ঘৃতের নিত্য প্রয়োজন বলিয়া এখানে সাধারণতঃ ঘৃত-দুগ্ধ বড়ই মহার্ঘ্য। মন্দিরের প্রয়োজনীয় জলের জন্য, একটি ইন্দারা মন্দিরের তৃতীয় আবরণের মধ্যে গর্ভগৃহের সন্নিধানে সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বের প্রাচীরসংলগ্ন একটি পুষ্করিণীও আছে। সেখানে অধিবাসিগণ ও যাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকে।

গুরুবায়ুরের একটি দৃশ্য আমাদের কাছে বড়ই বিসদৃশ লাগিত। নারীদের মধ্যে অনেক সময়ে অনাবৃত বক্ষঃ দেখা যাইত। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই পঞ্চাশবর্ষবয়স্কা পরিচারিকার নগ্ন বক্ষঃ দেখিয়া চক্ষুঃ নত করিতে হইত।

মন্দিরের পথে মুসলমান ও খৃষ্টান যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু পঞ্চমজাতির অধিকার নাই। অনেক সনাতনীও এ বৈষম্যের পক্ষপাতী নহেন।

কালিকটে একটি মন্দিরের পথ থিয়া জাতির জন্য জামোরিণ খুলিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রবেশের দ্বন্দ্ব যদি কখনও শান্ত হয়, সম্ভবতঃ পথ-চলার সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

থিয়া জাতি ও পঞ্চম জাতির প্রবেশ গুরুবায়ুর মন্দিরে কোন দিনই হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীতে যে উৎসব হয়, তাহাতেও তাহাদের প্রবেশ ঘটে না, ইহা জামোরিণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ দিন যাত্রামূর্ত্তি বাহির হইয়া থিয়া মন্দিরের সম্মুখে গমন করেন, এই যাত্রা-মূর্ত্তির দ্বারাই উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হয়। থিয়া-মন্দির গুরুবায়ুর মন্দির হইতে এক রশি দূরে। উৎসবের পর আসল বিগ্রহের যে অভিষেক হয়, তাহা অশুচিত্ব আশঙ্কায়, প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চম জাতির প্রবেশের জন্য নহে।

পঞ্চম জাতির কয়েকটি মন্দিরও মালাবারে আছে। পঞ্চম জাতির দেবতাও সাধারণ দেবতা নহে—নামের দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়,—বীরণ, ইরুলান, মণ্ডী, কেট্টারি, মোডাবান্, চামুণ্ডী প্রভৃতি। থিয়া মন্দিরেও পঞ্চম জাতির প্রবেশ নাই। এই সকল ব্যাপারে বুঝা যায়, মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন—দাক্ষিণাত্যে খুব জটিল সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে। অনেকের আশঙ্কা, হয় পঞ্চম জাতি-দিগের পুরাতন মন্দির ধ্বংস হইবে, না হয়,—সবর্ণদিগের মন্দির নষ্ট হইবে। এক পক্ষে পুরাতন মন্দিরের উপর অনাদর, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধাহানিই এই ধ্বংসের কারণ হইবে। গুরুবায়ুর আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে।

গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কেলাপ্পনের নেতৃত্বে ৮ শত সত্যাগ্রহী এই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। কেলাপ্পন নিজে জাতিতে নায়ার, (সৎশূদ্র) ও ওকালতী-ব্যবসায়ী। তিনি পঞ্চম জাতির মন্দির-প্রবেশের পক্ষপাতী হইয়া এই সত্যাগ্রহ পরিচালন করেন। কিন্তু মন্দিরপ্রবেশ করাইবে কে? ট্রাষ্টী জামোরিণ না পুরোহিত? উভয়েই প্রচলিত মন্দিরমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। কেলাপ্পন বলপূর্ব্বক মন্দির-প্রবেশের চেষ্টা করিলে কালিকটের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দেওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কোন-রূপ প্রতীকার করিতে সম্মত হন নাই। ইতিমধ্যে জামোরিণ দেশের সমস্ত মন্দিরের ট্রাষ্টীগণকে এক একখানি পত্র প্রেরণ করেন যে, এই মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এবং কেলাপ্পনকে অনুরোধ করেন যে, পত্রোত্তর না আসা পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখুন, পরে বহুমতানুসারে কার্য্য করা যাইবে। ৫০খানি পত্র বিভিন্ন জেলায় প্রেরিত হয়।

কেলাপ্পন কোন কথা না শুনিয়া সত্যাগ্রহ চালাইতে থাকিলে জামোরিণ মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন। তদনুসারে আটাশ দিন মন্দির সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পূজা বন্ধ হওয়ায় চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। পৃথক্ স্থানে যন্ত্র আবাহন করিয়া কোনরূপে পূজা চলিতে লাগিল। অগত্যা সত্যাগ্রহ উঠাইয়া লইয়া কেলাপ্পন আদালতের শরণাপন্ন হইলেন। আদালতে তিনি পরাজিত হইলে অনন্যোপায় হইয়া শেষ অস্ত্র গ্রহণ করেন। অনশনে

প্রাণত্যাগ সঙ্কল্পই তাঁহার শেষ অস্ত্র—ইহা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের কথা। তাহার পর গান্ধীজী যে ভাবে আন্দোলন পরিচালিত করেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত।

গান্ধীজী কেলাপ্পনের সঙ্কল্প স্বয়ং গ্রহণ করিবার পর হইতেই মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন বিরাট্ আকার ধারণ করে, নতুবা তৎকালেই এই আন্দোলন নির্ব্বাণ হইয়া যাইত। যেহেতু পঞ্চম জাতিও মন্দিরপ্রবেশ সম্বন্ধে তেমন আগ্রহান্বিত ছিল না। সাধারণের মত গ্রহণের (referendum) জন্য সত্যাগ্রহিগণ চতুর্দ্দিকে প্রচার আরম্ভ করিলে গুরুবায়ুরে প্রকৃত চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। ঐ সময়ে আমরা গুরুবায়ুরে উপনীত হই। রেফারেণ্ডামের বিরুদ্ধে বহু কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়। গুরুবায়ুরের পরিস্থিতি দেখিয়া আমরাও বুঝিলাম যে,—এখানে পঞ্চমজাতির মন্দিরপ্রবেশ একপ্রকার অসম্ভব। শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সমাদর না করিলে একটা বিরাট্ বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে। আমরা সম্মেলনে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা শান্তি-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিলাম। গুরুবায়ুরের মাইল দুই দূরে পুনাত্তুরের রাজার বাসভবন, তাঁহার সহিত প্রথমে দেখা করি। তিনি আমাদের খুবই আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে, 'এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তিই মন্দির-মর্য্যাদা-রক্ষায় যত্নশীল, এই মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এখানকার বহু ধার্ম্মিক সজ্জন মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতেছেন। রাজা মানবেদন, যিনি জামোরিণ নামে বিখ্যাত, তিনি গুরুবায়ুর মন্দিরের ম্যানেজিং ট্রাষ্টী, তিনি যদি সভাধিবেশনে মত প্রদান করেন, তবেই সভার জন্য অগ্রসর হইবেন। অগ্রে তাঁহার সহিত আপনারা দেখা করুন। জামোরিণ সাধারণতঃ কালিকটে থাকেন, এক্ষণে আরও নিকটে—কোটাক্কালে আছেন।' পুনাত্তুর রাজার সহোদর আমাদের সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল এবং টেলিফোন দ্বারা জামোরিণকে সংবাদ দেওয়া হইল।

পরদিন তিরুর ষ্টেশনে জামোরিণের পুত্র মোটরসহ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, দেখিলাম। তিরুর হইতে কোটাক্কাল দশ মাইল। কোটাক্কাল-প্রাসাদে নানারূপ পিঠা ও বড়া, রকমারি মিঠাই আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমরা একটু কুণ্ঠিতভাবে ঐ সকল দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া দুগ্ধ, ডাব ও কদলীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ সকল বস্তু আসিয়া পড়িল, আমরাও বেশ সপ্রতিভভাবে মধ্যাহ্নের ক্ষুধা শান্তি করিলাম।

রাজা জামোরিণকে দেখিলাম,—অনাড়ম্বর বেশে একটি অশীতিপর বৃদ্ধ, ছোট-খাট গঠনটি, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও গায়ে একটি পরিষ্কার জামা, মুণ্ডিত মস্তকে একটি শিখা, ললাটে শ্বেত চন্দনের গোল তিলক। চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের বসিতে বলিলেন, আমরাও দুইখানি চেয়ারে বসিলাম, তাঁহার ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী তরুণবয়স্ক এটেন রাজা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জামোরিণকে আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম—এই দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া—

মালাবারধরাধরেন্দ্র ! সুচিরারূঢ়ং হি ধর্ম্মদ্রুমং
গূঢ়ং রক্ষসি শাস্ত্রমূলমমলাচারপ্রসূনোজ্জ্বলম্।
আসন্নং গুরুবায়ুভূভয়মিতি ভ্রাম্যন্তু নাম দ্বিজাঃ
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণো নিত্যং ভবান্ বর্দ্ধতাম্ ॥
সামন্তরাজ ইতি সন্ততমুচ্যমানোঽ
প্যাভাসি ভাস্করসমো মহসা স্বতন্ত্রঃ।
ধন্যোঽসি ধীর ! সুরমন্দিরধর্ম্মপাতা
জীব্যাচ্চিরং প্রচুরসৌখ্যধরো ধরণ্যাম্ ॥

(হে মালাবাররাজ ! তুমি পর্ব্বতের মত চিরসঞ্জাত ধর্ম্মবৃক্ষকে গোপনে ধারণ করিয়া আছ। এই বৃক্ষের মূল হইল শাস্ত্র,—সদাচার ইহার পুষ্প। আজ গুরুবায়ু (ঝটিকা)-জনিত ভয় অথবা গুরুবায়ুপুরে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, দ্বিজগণ (পক্ষী ও ব্রাহ্মণগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি শ্রীগোবিন্দ, গোবর্দ্ধনধারী) পদারবিন্দ আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত আছ।

সামন্তরাজ (জামোরিণ) বলিয়া কথিত হইলেও তুমি তেজস্বিতায় স্বাধীন, হে বীর ! দেবমন্দিরের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া তুমি আজ ধন্য হইয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, প্রচুর সুখে সুখী হইয়া তুমি চিরজীবী হও।)

ইংরাজী অনুবাদসহ এই শ্লোক দুইটি শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমরা আমাদের সম্মেলনের কথার অবতারণা করিলাম। জামোরিণ গুরুবায়ুরে সম্মেলন হওয়া অতীব আবশ্যক বলিয়া বলিলেন এবং

তিনি নিজ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সম্মেলনে কোন পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, ইহাও সবিনয়ে জানাইলেন।

তাহার পর তাঁহার কৈফিয়ত দিলেন যে, কেন তিনি মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই। বহু লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি লজ্জিত। তিনি বলিলেন,—'আমার কর্ত্তব্য কঠোর বলিয়া কি আমি



সত্র-ভবন—প্রতিনিধিগণ এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন

তাহা অবহেলা করিব?' তিনি একটি চিঠির ফাইল আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখুন—এই প্রদেশের ৩৮ জন ট্রাষ্টী আমার প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩২ জন মন্দিরপ্রবেশের প্রতিকূলে, মাত্র ৬ জন অনুকূলে, তাহাও আবার সর্ত্তাধীন। এই ট্রাষ্টীদিগের মত উপেক্ষা করিয়া আমি কি রেফারেণ্ডাম সমর্থন করিতে পারি? ধর্ম্মবিষয়ে রেফারেণ্ডামের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ধর্ম্ম-রহস্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শিখিবার বস্তু, ধর্ম্ম সহজাত গুণ নহে, ভোটের দ্বারা ইহার স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কাযেই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, ট্রাষ্টীগণের মতানুবর্ত্তী হওয়া, এ বিষয়ে বাহিরের লোকের অনুরোধ করা অসঙ্গত নহে কি? আমি আরও বিস্মিত হইয়াছি যে, যিনি মূর্ত্তিপূজা মানেন না, তিনিও অনুরোধ করিয়াছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ। আমি তাঁহার পত্রের কোন উত্তর দিই নাই। আরও দেখুন—আমি ম্যানেজিং ট্রাষ্টী হইলেও যতদূর যাইতে আমার অধিকার, তাহার অধিক দূর কখনও আমি যাই নাই। যাইলে আমাকে কেহই বাধা দিতে পারে না; কিন্তু গুরুবায়ুর প্পনের (গুরুবায়ুপুরপ্রভুর) অমর্য্যাদা কখনই আমি করিতে পারিব না।'

আমি বলিলাম—যদি আইন হয়?

জামোরিণ খুব নিম্নস্বরে বলিলেন—সে তাঁহার ইচ্ছা! তবে, আমার মনে হয়, মন্দির-পরিচালকগণ বিগ্রহকে ব্রাহ্মণের মাথায় তুলিয়া স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিবেন—পাশববলে সতী রমণীগণের দেহ যখন শত্রুকরতলগত হইত, তখন দেখা যাইত—তাহা প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে, তেমনই আইনের বলে দেবতাহীন শূন্য মন্দিরে আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ পঞ্চম জাতিকে প্রবেশ করাইবেন!

জামোরিণের শ্রদ্ধার গভীরতায় আমরা বিস্মিত হইলাম।

সম্মেলনের স্থানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য জামোরিণ এটেন রাজাকে আদেশ করিলেন এবং সম্মেলন পর্য্যন্ত গুরুবায়ুরে থাকিবার কথা বলিয়া দিলেন।

ইহার পর আমরা গুরুবায়ুর, ত্রিচূড়, কালিকট ও পুনানিতালুকে কয়েকটি সভা করিয়া সম্মেলনের বার্ত্তা ঘোষণা করিলাম।

কাঞ্চীকামকোটি পীঠের শঙ্করাচার্য্য এক জন বিশিষ্ট সাধক, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে গুরুবায়ুর সম্মেলনের সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে একটি ভজন-পার্টীও আসিল। ডাক্তার শঙ্কর আয়ার, এডভোকেট কৃষ্ণস্বামী আয়ার তন্মধ্যে প্রধান পুরুষ। তাঁহাদের সহায়তায় সত্বর অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইল, দলে দলে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সম্মেলনে যোগদান করিতে লাগিলেন। জামোরিণের অতিথিশালা—যেখানে আমাদের বাসা হইয়াছিল—অচিরে তাহা সম্মেলনের কার্য্যালয়ে পরিণত হইল।

গুরুবায়ুর মন্দির-সন্নিধানেই সত্রভবন। প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদ। সেখানে প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্মেলনের পূর্ব্ব দুইটি দিন বিদ্বৎসভার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিল।

এ দিকে পুরীর শঙ্করাচার্য্য মহোদয় ও সভাপতি গোকুলনাথজী আসিয়া পৌছিলেন। পণ্ডিতরাজ রাজেশ্বর শাস্ত্রী দেবনায়কাচার্য্য প্রভৃতিও গুরুবায়ূরে সমবেত হইলেন। অল্পদিনেই নির্জ্জন গুরুবায়ুর পল্লী জন-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল।

বিদ্বৎসভার অধিবেশনে দুই জন বিপক্ষ পণ্ডিত জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে শাস্ত্র দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। উপনিষদে আছে—"ন বয়ং বিদ্মো ব্রাহ্মণা বা অব্রাহ্মণা বা" —ইহাই তাঁহাদের প্রমাণ। আমাদের পক্ষের উত্তর হইল, কর্ম্মগত জাতি হইলে—এইরূপ সন্দেহই সম্ভবপর নহে, কেন না, কর্ম্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এই সন্দেহের উপপত্তি করিতে গেলেই জন্মগত জাতির সমর্থন আসিয়া পড়ে। তৎপরে ভাগবতের "শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা হরিজনগণের দীক্ষাগ্রহণের পর বা ভগবন্নাম গ্রহণের পর শুদ্ধি হয়, এইরূপ প্রশ্ন হইল। তাহার উত্তরে একটি পণ্ডিত বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আরও সুন্দর বচন আছে, সে বচনের তাৎপর্য্য এই যে,—'হরিনামে এত শক্তি যত পাপ হরে। পাপীর নাহিক শক্তি তত পাপ করে॥' সুতরাং জন্মগত অস্পৃশ্যতার ন্যায় কর্ম্মগত অস্পৃশ্যতাও থাকিতে পারে না। চুরি, ডাকাতী, নরহত্যা সবই চলিতে পারে, শুধু একবার হরিনাম করিলেই সব শুদ্ধ !

সভায় হাসির রোল উঠিল। বিপক্ষ পণ্ডিত সভাসমক্ষে নিজ পরাজয় স্বীকার করিলেন। বিদ্বৎসভার বিচার দুই দিন চলিয়াছিল। অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম। এই সভায় মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রীয় সমালোচনায় সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভাবে দিগ্বিজয়যাত্রার আনন্দ পাইয়াছিলাম। ভি, ভি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বিদ্বৎসভা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সম্মেলন অতি নিপুণতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন।



শ্রীযুক্ত ভি, ভি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ)

দেওয়ান বাহাদুর টি, আর রামচন্দ্র আয়ার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে সকলকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজা বাসুদেব, পণ্ডিত রমাপতি মিশ্র (বোম্বাই), মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর শাস্ত্রী, দেবনায়কাচার্য্য শ্রীরঙ্গমের সৌম্যনারায়ণাচার্য্য, জরোয়ারের নাগেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, এম, কে, আচার্য্য, মাদুরার নটেশ আয়ার, মাদ্রাজের কৃষ্ণস্বামী আয়ার, মহালিঙ্গ আয়ার, গুজরাটের মনু'ভাই পাণ্ড্যা, লক্ষ্মীরাম চুড়িবালা, বাল সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন

পূজ্যপাদ পিতৃদেব যারবেদা কারাগারে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া গুরুবায়ুরে পৌছিবামাত্র খুব একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নানাদেশ হইতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে তার প্রেরিত হইয়াছিল—এমন কি, সিংহল হইতে যুবকসঙ্ঘ অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিয়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিল।

পুরীধামের শঙ্করাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভারতী কৃষ্ণ তীর্থস্বামী ও সভাপতি গোকুলনাথজী মহারাজের আগমনসময়ে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল—হাতী, ঘোড়া, মোটর ও বাদ্যধ্বনিতে গুরুবায়ুর মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। যে সত্রভবনে প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্নিধানেই সভার প্রারম্ভদিনে গোকুলনাথজী বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের অনন্তশায়ী বাসুদেবমূর্ত্তিযুক্ত পতাকা উত্তোলন করিয়া বড়ই উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সত্রভবনের পার্শ্বেই বিস্তৃত ময়দান। এই ময়দানে সম্মেলনের প্যাণ্ডাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুপারীগাছের খুঁটি ও বাঁশের পাড় দিয়া 'কাঠাম' করিয়া নারিকেলপাতা দিয়া এমন ভাবে ছাইয়া প্যাণ্ডাল রচিত হইয়াছিল যে, মনে হইল যেন, একটি বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

তিন দিন মহাসমারোহে সম্মেলন সম্পন্ন হইল। শুধু জন-কয়েক তরুণের সহানুভূতি আমরা পাই নাই, নতুবা প্রায় সমস্ত অধিবাসী এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলনে প্রায় ৭ হাজার টাকা চাঁদা উঠে। এই কয় দিনে মন্দিরের প্রথম আবরণের মধ্যে যে যজ্ঞশালা আছে, সেখানেই মহাবিষ্ণু-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে প্রায় ৩০ জন ঋত্বিক্ ব্রতী ছিলেন—তাঁহাদের সমস্বরে উচ্চারিত বেদধ্বনিতে সত্যই পুলকোদ্গম হইয়াছিল। পূজ্যপাদ পিতৃদেব যখন তাঁহাদের সঙ্গে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—তখন বাঙ্গালী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণের কোন পার্থক্য আমরা



সভাপতি গোকুলনাথজী পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কি দেবদর্শনে, কি যজ্ঞশালায় গুরুবায়ুরে আমরা যে ব্যবহার পাইয়াছি, তাহাতে কোনরূপ প্রাদেশিকতার গন্ধ দেখি নাই। গুরুবায়ুর-সম্মেলনের সিদ্ধিতে আমাদের দিগ্‌বিজয় যাত্রা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম, এ)।



বিশ্বপ্রেম

১

"এই কাপিটা এবারের সংখ্যায় দিয়ে দেবেন",—মিসেস রায় রচনাটি টেবলের উপর রাখিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠের হীরকবলয় দুইখানি বিজলী বাতির আলোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

অবনীনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল। টেবলের উপর একরাশি কাপি ও প্রুফ। একটা প্রুফ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে বলিল, "যে আজ্ঞে। কিন্তু যায়গা হবে কি শেষ মুখে?"

মিসেস রায়ের মুখমণ্ডল রক্তাভা ধারণ করিল, জবাবটা যেন না শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত রাত্রি রয়েছেন আজ?"

"কাযের ভিড়, হয় ত রাত বারোটাও বেজে যেতে পারে।"

"কেন, কায কি তা হ'লে জ'মে থাকে? দিনকার দিন কায শেষ ক'রে দিলেই ত পারেন।"

আসন গ্রহণ করিয়া মিসেস রায় পুনরায় বলিলেন, "এ-রকম হয় না কি? কেন হয়?"

অবনীনাথ ম্লানমুখে বলিল, "ব্লকের জন্যে দেরী হয়। তা ছাড়া লেখকদের কাছ থেকে প্রুফ ফিরে আসতেও দেরী হয়।"

মিসেস রায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ব্লকের কথা জানান নি কেন? সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু লেখকদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা ত আপনার হাতে, তা হয় নি কেন?"

অবনীনাথ প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বিনীত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, প্রুফ রেডি হলেই পাঠানো হয়, কিন্তু ফিরিয়ে পেতে দেরী হয়, তাগিদ দিয়েও সুবিধা করতে পারি না।"

"তাই না কি? আচ্ছা, এবার থেকে যাতে সে ব্যবস্থা হয়, তা করা যাবে। দেখুন, আমাদের এই 'পুরশ্রীর' পাংচুয়ালিটির একটা সুনাম আছে। আপনার হাতে সেটা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা আমরা দেখতে চাই।"

অবনীর বুকে আঘাতটা খুবই বাজিল। প্রাণপাত পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কারই বটে! বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে সে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সুনাম সে বুঝে না? নারী-প্রগতি সমিতির এই নূতন সেক্রেটারী শিক্ষিতা গুণবতী মহিলা হইলেও নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, —তাঁহার মুখে এই অনুযোগ! কি বিড়ম্বিত জীবন তাহার!

মুহূর্ত্তমাত্র এই অভিমান। অবনী প্রুফ লইয়া কাযে বসিল। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কর্ম্মচারী সে,—তাহার আবার মান-অভিমান!

নির্জ্জন কক্ষ। মাঝে মাঝে প্রিণ্টার আসিয়া প্রুফ লইয়া যাইতেছে। মিসেস রায় অবনীনাথের অলক্ষ্যে তাহার বলিষ্ঠ সুস্থ দেহের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ছিলেন। মুখে তাঁহার মৃদুহাস্য, নয়নে তৃপ্তির দীপ্তি। হঠাৎ কথাটার মোড় ফিরাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "সাহিত্যসাধনা করতে গেলে ওতেই ডুবে থাকতে হয়। আপনাতে কি তা সম্ভব হ'তে পারে?"

অবনীনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কাযে কি আমার কোন গাফিলি দেখেছেন?"

মিসেস রায় বলিলেন, "না, তা বলছি না। তবে ফ্যামিলিম্যানের পক্ষে সেটা কঠিন হয়ে ওঠে না কি? পাঁচ জনকে নিয়ে জড়িয়ে পড়লে সাহিত্য-সাধনা হয় না।"

অবনীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই ভাবের আলাপে সে সেক্রেটারীর সহিত অভ্যস্ত ছিল না। উত্তর না দিয়া সে আপন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল।

"আবার কাযে বসছেন যে? রাত নটা বেজে গেছে। না, তা হবে না, এতে আফিসের লোকসান।"

অবনীনাথ শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "লোকসান? আমার দ্বারা?"

প্রসন্ন হাস্যে সেক্রেটারীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল— সেই মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল হইলে কি সুন্দরই মানাইত! প্রসন্ন মুখে তিনি বলিলেন, "আপনার ত্রুটির কথা বলছি না, অবনীবাবু। কাগজের উন্নতির চেষ্টায় আপনার ত্রুটি হয়, এ কথা মনে ক'রে আফিসের লোকসানের কথা বলি নি।"

অবনী স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞ-নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি উন্নীত করিল। সে সময়ে সে তাঁহার চোখে মুখে

যাহা দেখিল, তাহাতে সে তাড়াতাড়ি ফাইলের রাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিতে পথ পাইল না।

মিসেস রায় বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার স্ত্রীকে যখন সংসার নিয়েই থাকতে হয়, তখন বোধ হয়, আপনার সাহিত্য-চর্চ্চায় কোন হেল্‌পই করতে পারেন না তিনি ?"

অবনী নীরব। মিসেস রায় আবার বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলেন যে ? এখানে যাতে আপনার উন্নতি হয়, তারই জন্যে এ সব কথা বলছি। আচ্ছা, তিনি বুঝি পাড়াগাঁর মেয়ে ? লেখাপড়া করেছেন কিছু ?"

ফ্যানের নীচে বসিয়াও অবনীনাথ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে মৃদুস্বরে বলিল, "করেছেন। ম্যাট্রিক পাশ।"

মিসেস রায় অপ্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "অথচ কেবল হাতাবেড়ী নিয়েই আছেন। বাঃ! ও কি, আবার কলম নিচ্ছেন যে ? না, তা হবে না, আজ আর একটি প্রুফও না। চলুন, হাওয়ায় গিয়ে মাথাটা একটু হালকা ক'রে আসবেন।" তিনি আসন ত্যাগ করিলেন।

অবনীর সারা অন্তরটা হাসিয়া উঠিল। দরিদ্র পরাধীন কর্ম্মচারী—তাহার আবার মাথা, সেই মাথার আবার ভারী আর হাল্কা! সে বলিল, "হাতের এই কটা প্রুফ"—

স্মিতমুখে মিসেস রায় প্রুফের তাড়াটি কাড়িয়া লইতে গেলেন, করে করস্পর্শ হইল। সেই স্পর্শ বিদ্যুৎশিখার মত। মুহূর্ত্তমাত্র অবনীর অঙ্গুলীর উপরে সেই স্পর্শ যেন স্বেচ্ছায় স্থানচ্যুত হইতে চাহিল না। অবনী শিহরিয়া উঠিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় আপনার হস্ত অপসারণ করিয়া লইল।

মুহূর্ত্ত মাত্র! নিমিষে সেক্রেটারীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। ভারী গলায় তিনি বলিলেন, "দেখুন, মুখ্‌খুরাই লোক দেখিয়ে কায ক'রে থাকে, শিক্ষিতরা তা করবে কেন ? আফিসের কাযের কিসে ক্ষতি হয় না হয়, সেটা বোধ হয় আমরাই বেশী বুঝবো, আপনি বুঝবেন কেমন ক'রে ? বেশী খাটলেই যে কেউ বেশী কায দিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার নেই।"

অবনীনাথ একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিসেস রায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কথাটা শেষ করতে দিন আমায়। কায করে মন। মনকে যদি আপনি জিরুতে না দেন, ব্রেণটাই যদি ওভারওয়ার্কড হয়, তা হ'লে নেচার তার শাস্তি দেবে না ? তাতে কাযও সাফার করে। সেটা আমাদের লোকসান। যাক্, কাপিটা রইলো, দিয়ে দেবেন। যায়গা কোন রকমে ক'রে নেবেন।"

অবনী কবিতার দুই চারিটি চরণের উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছিল, মিসেস রায় তখন কক্ষ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। অবনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এ সংখ্যায় সাওয়াই ত মুস্কিল। এখনও একটা ফুল পেজ কবিতা রয়েছে, আর একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত, তার ১২খানা ব্লক! তা ছাড়া সার চন্দ্রশেখরের 'বিশ্বপ্রেম' প্রবন্ধ, পুরো এক ফর্ম্মা। সেটাই ধরাবো কি ক'রে ভাবছি।"

মিসেস রায় দ্বারপ্রান্ত হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "যাই হোক, এটা যাবেই। মিঃ চোঙ্গদারের কোন লেখা এলেই আপনি দিতে চান না, এর মানে ? আমি কোন কথা শুনবো না, এটা যাওয়া চাই-ই!" মিসেস রায়ের নয়ন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল।

অবনী ধীর অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বেশ, তাই দেবো। কিন্তু তা হ'লে এবার সার চন্দ্রশেখরের লেখাটা তুলে রাখতে হবে।"

"কেন, ভ্রমণটা ?"

"ছবি তা হ'লে মোটেই যাবে না, দুতিনখানা সমিতির মেম্বরদের ছবি ছাড়া।"

মিসেস রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "দেখি কোন্‌টা ? তা, মামা ত গোড়ার দিকেই আপনাকে তাঁর প্রবন্ধের মেটিরিয়্যালস পাঠিয়ে দেন লিখতে। এবার দেরী হ'ল কেন ?"

অবনী নতমস্তকে বলিল, "এবার তাঁর সময় হয়ে ওঠে নি, দুতিন দিন হাঁটাহাঁটি করেও তাঁর কাছ থেকে প্রবন্ধের পয়েন্টসগুলো টুকে আনতে পারি নি। তাই কাল নিজেই লিখে পাঠিয়েছেন বিকেলে। সময় নেই এ দিকে, তাই আজ খেটে ওটাকে পালিস ক'রে দিচ্ছিলুম।"

নারী-প্রগতি সমিতির পেট্রন, ধনকুবের, জমীদার, ব্যারিষ্টার সার চন্দ্রশেখর সান্ন্যালের রচনা!—সর্ব্বনাশ, তাহা ত চাপিয়া রাখা যায় না! এ দিকে মিঃ চোঙ্গদারের অনুরোধ—ফ্রেণ্ডের অনুরোধ, না রাখিলে মান থাকিবে কিরূপে ? মিসেস রায় গৌরীর মত ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায়

রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "তা বেশ, মামার প্রবন্ধটাই দেবেন, এই নিন। মিঃ চোঙ্গদারের এটা কেমন লাগলো ?"

অবনী বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া বলিল, "এটা চলবে না।" এ সকল বিষয়ে তাহার ন্যায় কঠোর সমালোচক ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু সে যদি একবার কোনরূপে সে সময়ে মিসেস রায়ের মুখের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে হয় ত এতটা অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। মিসেস রায় কঠোর স্বরে বলিলেন, "দিন ওটা ফিরিয়ে। আর দেখুন, আফিসের আলোর খরচা না বাড়িয়ে বাড়ীতে গিয়ে কায করলে ভাল হয় না ?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মিসেস রায় সগর্ব্ব-পাদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অবনী ক্ষুণ্ণ-মনে আপনার কাগজপত্র গুছাইতে লাগিল।

মোটরে ষ্টার্ট দেওয়া হইতেছে, এমন সময়ে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনী শুষ্কমুখে গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিনীত স্বরে বলিল, "দয়া ক'রে আমায় হগ মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে যাবেন ?"

মিসেস রায় বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অপ্রসন্ন মনের তুষ্টিবিধানের জন্যই যে দাম্ভিক কর্ম্মচারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ক্রোধে ও ঘৃণায় তাঁহার অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। চাবুকের আওয়াজের মত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "ওঃ! বাসার কিছু কেনাকাটা আছে বুঝি ? তা, রাত বারোটা পর্য্যন্ত যদি আফিসে খাটতে হ'ত, তা হ'লে মার্কেটে যেতেন বুঝি শেষ রাতে ?"

অবনীনাথ স্তম্ভিত হইয়া অচল স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার শ্রবণপথে কেবল এই আওয়াজের পুনরাবৃত্তি হইল,—"সানি পার্ক !"

মোটর হরণ দিয়া বায়ুবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

সার চন্দ্রশেখর সান্ন্যাল, সি, আই, ই মহাশয়ের সদ্যঃ-প্রকাশিত 'বিশ্বপ্রেম' প্রবন্ধটি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পল্লী সাহিত্য-সমিতি-কক্ষে পঠিত হইতেছিল। তাঁহার প্রাসাদোপম ভবনের একটি প্রকাণ্ড হলেই সমিতির সভাগৃহ ও লাইব্রেরী অবস্থিত। সার চন্দ্রশেখর স্বয়ং বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার, পরন্তু ধনবান্ জমীদারবংশের সন্তান। সুতরাং তিনি যে বালিগঞ্জ—রাসবিহারী এভেনিউ লেক অঞ্চলের এ্যারিষ্ট-ক্রেশী-ব্যারিষ্টক্রেশীর অন্যতম হল এবং সে জন্য যে তাঁহার সার সি, সি, সানিয়াল নাম হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার পরম ভক্ত অনুরক্ত সেবকরূপে সামাজিক ব্যবহার ও চাল-চলনে খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। সমাজে কেহ তাঁহাকে সাদাসিধা ধুতি-চাদর ছাড়া অন্য সাজে সাজিতে দেখিত না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-চর্চ্চার গুণগ্রহণ করিয়া যে টুতলার বিবুধসমাজ তাঁহাকে 'সাহিত্য-বিশারদ' উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া-ছিলেন। এই বিবুধসমাজের সর্ব্বস্ব মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে তিনি এক সঙ্গীন দেইজী মামলায় জয়ী করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাই তাঁহার উপাধিলাভের ভিত্তি,—দুষ্ট হিংসুকেরা ইহা রটাইত বটে, কিন্তু পল্লী-সাহিত্য-সমিতির সদস্যরা বিলক্ষণ জানিতেন যে, উহা পরশ্রীকাতর নিন্দুকের নিছক মিথ্যা রটনা, কেন না, তাঁহারা সার চন্দ্রশেখর সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের বিদুষী ভাগিনেয়ী মিসেস্ অমিতা রায় এম, এর 'পুরশ্রী' পত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য-শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

পল্লী-সাহিত্য-সমিতির চা-টোষ্ট ও নিমকি-সিঙ্গাড়ার মজলিসে 'বিশ্বপ্রেম' প্রবন্ধটি বার বার তিনবার পঠিত হইবার পরেও আজ সার চন্দ্রশেখরের বাল্যবন্ধু রমেশ বাবুর জন্য পুনরায় পঠিত হইতেছিল। রমেশ বাবু বারাণসীর ব্যবসাদার, পরন্তু বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী। সার চন্দ্রশেখরের মত বারাণসীতে তাঁহারও 'প্রবাস-চিত্রম্' নামে হিন্দী মাসিক-পত্র ছিল এবং সম্প্রতি তিনি সেখানে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেও মনস্থ করিয়া-ছেন বলিয়া বন্ধুকে জানাইয়াছেন। তাঁহার 'বারাণসী-দর্পণ' নামক গ্রন্থখানিরও প্রবাসী বাঙ্গালী মহলে বিশেষ আদর হইয়াছে।

এটর্ণী রাসবিহারী বাবু পড়িতেছিলেন,—"বাঙ্গালী আমরা বাঙ্গালাকেই ভালবাসি। কিন্তু এখন বাঙ্গালা বলিতে বাঙ্গালার বাহিরের বৃহত্তর বাঙ্গালাকেও ধরিতে হইবে। জগতের যে দেশের যেখানেই বাঙ্গালী থাকুক,

সেই দেশের সেই স্থানটুকুকেই যে আমরা বাঙ্গালা বলিয়া ধরিব, তাহা নহে; সমস্ত পৃথিবীটাকেই বাঙ্গালা বলিয়া ধরিতে হইবে, জগতের যে যেখানে আছে, তাহাকেই বাঙ্গালী বলিয়া বুকে স্থান দিতে হইবে—"

রমেশ বাবু কেকের টুকরাটুকু গলার নীচে নামাইয়া দিবার নিমিত্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন,—"এইখানটায় তোর মতে মত দিতে পারলম না, ভাই চন্দোর। বাঙ্গালার বাইরে বৃহত্তর বাঙ্গালা আছে, যেখানে বাঙ্গালী প্রবাসী আছে, সে যায়গাটাও আমাদের বাঙ্গালা, এটা আমি মানতে রাজী আছি, কিন্তু দুনিয়ার যে যেখানে আছে, সেই বাঙ্গালী—এইটা বরদাস্ত করতে পারি নি।"

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "তা হ'তে পারে, তুমি না মানতে পার। কিন্তু তা হলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, তার মানে নেই। এখনকার কালে দুনিয়ার সঙ্গে টাচ না রেখে কোন দেশের চলবার যো নেই।"

লালমোহন ডাক্তার বলিলেন, "আপনার ও নমাস ছমাস ছাড়া বাঙ্গালায় আসা-যাওয়া নেই রমেশ বাবু, কাযেই এখানে কি অসম্ভব চেঞ্জ হচ্ছে দিন দিন, তা কাশীতে ব'সে জানবেন কি ক'রে বলুন।"

চন্দ্রশেখর বাবু রহস্য করিয়া বলিলেন, "থাকিস ছাতুর দেশে, রসবোধ করবি কি ক'রে বল।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

রমেশ বাবু দমিয়া যাইবার পাত্র নহেন, তিনিও হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন, "বটে, ছাতুর দেশ? জানিস, কাশীতে কটা বাঙ্গালী ক্লাব লাইব্রেরী আছে, কটা ড্রামাটিক ক্লাব আছে?"

তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ ভি, চোঙ্গদার সভাকক্ষ প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন, "হঃ হঃ! আপনাদের সেখানে মিউজিক্যাল সয়েরী হয়? ট্যাবলো? ওরিয়েন্টাল ডান্স? কো-এডুকেশান?"

মিঃ চোঙ্গদার অর্থাৎ বিমানবিহারী চোঙ্গদার, সার চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাঁহার জুনিয়ার, পাঁচ ছয় মাস হইল, ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে বাহির হইতেছেন।

রমেশ বাবু বলিলেন, "ও গুমোর কোরো না বিমান। ইউ পির লক্ষ্ণৌ সহরেই লেডিস কনফারেন্সে কো-এডুকেশনের মন্তব্য পাশ হয়েছিল জান? আর ডান্স? ডান্সের জন্ম দিলে যে উদয়শঙ্কর, সে কোথাকার? উদয়পুরের না?"

সার চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তা হলেও সে ত বাঙ্গালী! আমাদের এই বাঙ্গলার?"

মিঃ চোঙ্গদার বালকের মত উৎসাহভরে বলিলেন, "রাইট-ও! সার সি, সানিয়াল একটা রিয়্যাল পেটরিয়ট—"

চন্দ্রশেখর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আঃ, থাম বিমান, কি বাজে বকছো?"

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "মন্দই বা কি বলেছে? চাদর চাপা দিয়ে চাঁদের আলো ঢাকতে পারে কেউ? তোমার দেশপ্রেম তোমার লেখার ভেতর দিয়েই ফুটে ওঠে। ধর না তোমার 'বাঙ্গালীর প্রাণের সাড়া' আর্টিকলটা—"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, কাশীতে ব'সে তোমাদের কাগজে যে সব আর্টিকেল পড়ি, তার মধ্যে সত্যিই ন্যাশানলিজম ফুটে ওঠে তোমাদের এই ছোকরার লেখায়, ঐ যে কি অবনীনাথ, না কি—"

অনেকে মুখ বিকৃত করিলেন। মিঃ চোঙ্গদার কিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কে, অবনী? হঃ হঃ—কতকটা সেন্টিমেন্টাল ননসেন্স, না আছে ফ্যাক্টস, না আছে ফিগারস্! লাকিলি মিস রয় আছেন, তাই পলিস ক'রে চালিয়ে দেন রাবিসগুলো কোন রকমে।"

রমেশ বাবু এই অকারণ উষ্মার কারণ না পাইয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তাই না কি? মিস্ রয় কে?—যিনি শ্রীঅমিতা রায় এম, এ, নাম দিয়ে তোমাদের কাগজে লেখেন?"

সার চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হা রে, আমার ভাগ্নী অমিতা।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কি রকম? আমি এদ্দিন নাম শুনি নি?"

সার চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি ক'রে শুনবি? সাবিত্রী বিয়ের পরই রেওয়ায় চ'লে গেছলো, সেখানে বিনোদ ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার ছিল। অমিতার জন্ম সেইখেনেই, বিয়েও করেছে সেইখানে, ওর স্বামী ছিল ইউ পি সিভিলিয়ান।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "ছিল মানে?"

চন্দ্রশেখর বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাশঙ্কর গেল বছর টাইফয়েডে মারা যায় বেরিলিতে। যাক্, যে কথা হচ্ছিল, সত্যিই ওরা যা বলুক, অবনী লেখে ভাল, ওর লেখায় একটা লাইফ আছে।"

লালমোহন বাবু বলিলেন, "তা ব'লে তোমার 'বাঙ্গলার প্রাণের সাড়ায়' যে লাইফের পরিচয় দিয়েছ, তার কাছে কিছু না। এমন ক'রে বাঙ্গালী ছেলে বাগদীদের বুকে তুলে নিতে কে পেরেছে?—তাদের আবার লাঠি ধরতে কে উৎসাহ দিয়েছে?"

মিঃ চোঙ্গদার টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "দি আইডিয়া! আচ্ছা, সার, ওদের নিয়ে একটা কো-অপারেটিভ লাঠি-ক্লাব করলে হয় না? সঙ্গে সঙ্গে সং ডান্সও থাকবে। কি বলেন?"

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "বলছ মন্দ নয়, চোঙ্গদার সায়েব। কিন্তু সহরে ওদের পাবে কোথায়?"

মিঃ চোঙ্গদার হাসিয়া বলিলেন, "হাউ ফানি! পাব কোথায়? কেন, এই ক্যালকাটায়। ওরাই ত মর্ণিংএ রাস্তা সুইপ করে, স্ক্যাভেঞ্জিং গাড়ী হাঁকায়"—

একটা হাসির রোল উঠিল। লালমোহন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জিতা রহো, চোঙ্গদার সায়েব। সাবাস বিল্ডে! ধান-গাছের তক্তা দেখেছ?"

আবার হাসির রোল উঠিল, মিঃ চোঙ্গদার কিছু বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে ফেল-ফেল চাহিয়া রহিলেন।

বুঝি তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই সেই মুহূর্ত্তে ফটকে মোটরের হরণ বাজিল; সঙ্গে সঙ্গে সোপানে পদশব্দ। দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সার চন্দ্রশেখর হাসিমুখে বলিলেন, "বাঃ অমিতা! আরে, ঠিক সময়েই এইছিস। আমি যার নাম ক'রে থাকি প্রায়ই, সেই রমেশ বাবু কাশী থেকে এসেছেন। ইনি তোর লেখার খুব সুখ্যাতি করেন।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "এস মা, ব'স। সত্যিই তোমার লেখা আমার বড় ভাল লাগে।" মিঃ চোঙ্গদার তৎপূর্ব্বেই লাফাইয়া উঠিয়া মিসেস রায়কে একখানি আসন টানিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস রায় অভিবাদনান্তে বলিলেন, "আপনাদের ভাল লাগলেই লেখার সার্থকতা। আচ্ছা, আপনি বাঙ্গালা এত ভালবাসেন, তা বাঙ্গলায় একখানা মাসিকপত্র বার করেন না কেন? এ কথাটা অনেক দিন মামাবাবুকে বলেছি। না মামাবাবু? জানা-শুনো হ'ল, ভালই হ'ল।"

রমেশ বাবু বলিলেন, "কাযের ঝঞ্ঝাট, মা, তাই পেরে উঠি না। তোমাদের সম্পাদকটির মত একটি লোক পেতুম, তা হ'লে সুবিধে হ'ত।"

মিসেস রায়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি সহসা গম্ভীর আকার ধারণ করিল। রমেশ বাবুর সে দিকে লক্ষ্য না থাকিলেও, সার চন্দ্রশেখর এই ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। রমেশ বাবু তখন লক্ষ্য ক'রিতেছিলেন—অমিতা রায়ের বেশভূষা। তাহার অঙ্গ আভরণহীন নহে। চন্দ্রশেখর ত হিন্দু, তবে তাহার ভাগিনেয়ীর সাজসজ্জা বিধবার মত নহে কেন? মূল্যবান্ পরিচ্ছদালঙ্কার কি হিন্দু বিধবার ভূষণ? সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দুর অভাব? সে ত হিন্দু বিধবারই বিশিষ্ট লক্ষণ নহে, হিন্দু ব্যতীত সকল ধর্ম্মীরই ত সীমন্তে সিন্দূরের সম্পর্ক নাই। তবে কি অমিতারা অন্য কিছু?

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "বেশ ত, অমিতাই তোকে তা ঠিক ক'রে দেবে, ও ত সাহিত্য নিয়েই আছে, ওর বাড়ীতে তরুণ সাহিত্যিকদের মস্ত আড্ডা। এ বয়সে এতবড় একটা মিসহ্যাপ—"

মিঃ চোঙ্গদার বাধা দিয়া বলিলেন, "মোষ্ট আন-ফর-চুনেট? মিসেস রায়ের মত এজ-এ ইয়ারোপে লেডিসদের ম্যারেজই হয় না। ওঁকে দেখলে কে বলবে উইডো?"

রমেশ বাবু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, বিশেষতঃ এই নবীন ব্যারিষ্টারের আলাপ-আলোচনায়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "আজ আসি, মা। দু'চার দিন আছি, আবার আলাপ হবে।"

দেখাদেখি সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। মাতুল ও ভাগিনেয়ীর মধ্যে কোন গোপন কথা আছে, সকলেই বুঝিয়াছিলেন। যাত্রাকালে লালমোহন বাবু বলিলেন, "পুরীর এক্সকার্সানের কথাটা মনে আছে ত, অমিতা? শনিবার এক্সপ্রেস।"

মিঃ চোঙ্গদার সোৎসাহে বলিলেন, "দি আইডিয়া! লেডিসদের এ রকম আউটিং ত দিতেই হবে, না হ'লে এডুকেশান কমপ্লিট হবে কি ক'রে?"

লালমোহন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে ঠিক রইলো?"



"শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে"

বসুমতী-চিত্রবিভাগ। [শিল্পী—কুমারী কমলা দাস।

অমিতা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মিঃ চোঙ্গদার সকলের হইয়া ধন্যবাদ দিয়া সকলের সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "তার পর, কি মনে ক'রে ?"

মিসেস রায় বলিলেন, "বলছি। আগে পুরীর কথাটা শেষ করি। বড় গোল বেধেছে। গার্ডিয়ানদের চিঠি লিখে যা জবাব পেয়েছি, তাতে ত এক্সকার্সানে বিশেষ হোপফুল হওয়া যায় না।"

"কেন ?"

"মিক্স্‌ড একসকার্সানের ফরএ ত খুবই কম লোক দেখছি। কোথায় কোন্ কলেজের কো-এডুকেশন ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কি এক পার্টিতে গিয়েছিল, তাতে নাকি কাগজে লেখালেখি হয়েছে। একবারে হোপলেশ !"

"তাই ত। পদে পদে এ রকম বাধা পেলে নারী-প্রগতির কি হবে ?"

মিসেস রায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তা, যে সব লোক নিয়ে কাগজ চালাচ্ছেন, তাতে এর বেশী কি এক্সপেক্ট করতে পারেন ?"

চন্দ্রশেখর বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তার মানে ? চালাচ্ছ তোমরা, তা তোমারও যোগ্যতার অভাব নেই, অবনীরও তাই। নিজে সে ভাল লেখে, তার পর ভাল ভাল কনট্রিবিউশান যোগাড় ক'রে আনে। তবে ?"

মিসেস রায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ছাই আনে ! একবারে অচল !"

চন্দ্রশেখর বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অবনীর প্রশংসায় যে অনুক্ষণ পঞ্চমুখ, আজ সে বিরূপ কেন ? জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে অচল ? অবনী ?—না, কনট্রিবিউশান ?"

"তিনি ত বটেই। তা ছাড়া তিনি যাঁদের লেখা আনেন, তাঁরাও। বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে লেখা অচল হবেই ত। সেই কথাটাই বলতে এসেছি। আমাদের সমিতির অর্থ, শ্রম আর সময় সবই অপব্যয় হচ্ছে। যুগের লক্ষণ,—বেড়া আগল ভেঙ্গে ফেলা, অতীতের ঘাটের মড়া আগলে ব'সে থাকলে তা হয় না। দেখুন দিকি, মিঃ চোঙ্গদারের এক ফ্রেণ্ড কি চমৎকার কবিতাটি দিয়েছেন :—'এবার প্রলয় নাচন সুরু হলো, ভাঙ্গন গানের তান উঠিলো'—"

চন্দ্রশেখর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক, এর পর দেখবো'খন। কাগজের কি ব্যবস্থা করবে ঠিক করেছ ?"

চন্দ্রশেখর বাবু সাহিত্যের মস্ত সমালোচক। আর কিছু না বুঝিলেও এটা বুঝিতেন যে, আধুনিক রীতি অনুসারে নারীর নামে পুরুষের রচনার মত পুরুষের নামেও নারীর অসমসাহসিক রচনা বাজারে পাচার করিয়া দেওয়া হয়, সাহিত্যের বাজারে পুকুর চুরিও হইতেছে। সুতরাং এ রচনার উৎস কোথায়, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, নতুবা অমিতার ইহাতে এত আগ্রহ দেখা দিত না।

অমিতা বলিলেন, "ব্যবস্থা কমিটী করবে। কাল কমিটীর মিটিং কল করেছি। কত বড় ইনজাস্‌টিসটা একবার দেখুন। এমন ক্লাসিক কবিতাও অবনীবাবুর পছন্দ হয় নি, আমি হাতে ক'রে দিলুম, তাও রিজেক্টেড হয়েছে। এখনকার যুগের রেসি ষ্টাইলের গল্প, উপন্যাস না দিয়ে তিনি যে সব ফোর্থ রেটের রাবিস চালাচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছে সেই রকম কবিতা প্রবন্ধও হবে। এতে কাগজ ক'দিন চলবে ? একটা বোল্ড কনশেপমান নেই, একটা নতুন আইডিয়া নেই—"

চন্দ্রশেখর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তা না হয় নতুন বন্দোবস্ত করলেই হবে, সে ত আমাদেরই হাতে। কিন্তু ভাবছি, হঠাৎ তোর মত বদলে গেল কেন, তুই ত ওকে বরাবরই প্রেফার করতিস।"

মিসেস রায়ের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখে লেডিস পার্সটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, "আমাদের দেখতে হবে কাগজের ইনটারেষ্ট, সেখানে কারুর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দয় কিছু আসে যায় না। আমি উঠলুম। ভুলবেন না, কাল রাত্তির আটটা, কমিটী মিটিং।"

এসেন্সের সুবাসে কক্ষ আমোদিত করিয়া মিসেস রায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবুর বিস্ময় শীঘ্র অপসারিত হইল না। হঠাৎ অমিতার এই উষ্মার কারণ কি ? তবে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—

চন্দ্রশেখর বাবু চিন্তাগ্রস্ত হইলেন।

৩

অবনীনাথের চাকুরী নাই। চাকুরী নাই ! এত বড় অভিসম্পাত বুঝি শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর আর নাই। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ব্যথাও কি ইহার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ?

কমিটীর একটি কলমের আঁচড় ! ব্যস,—তাহার পক্ষে সমস্ত সংসারটাই অন্ধকার। কমিটীর মেম্বরদের বাড়ী আছে, বাগান আছে, কোম্পানীর কাগজ আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে, মোটর-ল্যাণ্ডো আছে,—পুত্র-পরিবার-ভারগ্রস্ত সহায়-সম্পত্তিহীন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর চাকুরী যাওয়ার ব্যথা-বেদনা তাঁহারা কি বুঝিবেন ?

সংসারে কয়টি বুভুক্ষ প্রাণী তাহারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সে ত ভারবহনে কাতর নহে। ভগবান্ তাহাকে যে অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, সে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কয় বৎসরেই সে সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে, সাহিত্যরথীদের স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়া তাহার রক্ত দিয়া গড়া 'পুরশ্রীর' অঙ্গশোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। একটিমাত্র কলমের খোঁচায় সে সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল ?

মিঃ চোঙ্গদার তাহার প্রতি বিরূপ, এ কথা সে জানিত। পত্রের অঙ্গপ্রসাধনে তাহার নির্ম্মম বিচারে কোন কোন সদস্য আত্মসম্মানে আহত হইতেন, ইহাও সে বুঝিত। কিন্তু পেট্রন ? তিনি ত পূর্ব্বাপর তাহাকে যোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, কতবার তাহাকে গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। আর সেক্রেটারী ? তাঁহার বাহিরটা কঠোর, কিন্তু অন্তর ? তিনি স্বয়ং উচ্চ-শিক্ষিতা সাহিত্যরসজ্ঞা সুলেখিকা, তিনিও তাহার আপ্রাণ সেবাপ্রচেষ্টা এ যাবৎ অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতা অতুলনীয়, তাঁহার কার্য্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অসাধারণ; মাত্র পাঁচ ছয় মাসে তিনি বিশৃঙ্খলা, অনর্থক কালব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের স্থানে শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা আনয়ন করিয়াছেন, 'পুরশ্রীর' উন্নতিতে তাঁহার মঙ্গল হস্তস্পর্শ সে কখনও অস্বীকার করিবে না। হঠাৎ তিনি বীতরাগ হইলেন কেন, কে তাহাকে বলিয়া দিবে ? তাহার অদৃষ্ট ? —না, অপরের চক্রান্ত ?

একটা কথা মনে পড়িল : এক দিন সেক্রেটারী তাহাকে তাঁহাদের 'জ্ঞানাঙ্কুর' সমাজের প্রচারক হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সে জন্য স্বতন্ত্র পারিশ্রমিকও দিতে চাহিয়াছিলেন। সে তাহাতে সম্মত হয় নাই—সে বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, এ প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। বিশেষতঃ এই নূতন চাকুরীর প্রধান সর্ত্ত এই যে, তাহার পত্নীকে নিয়মমত সমাজে যাইতে হইবে, উপাসনায় যোগদান করিতে হইবে,—আর তাহার বিবাহযোগ্যা আত্মীয়-কন্যাকে কালেজে পড়াইতে হইবে। এ সর্ত্ত সে পালন করিবে কিরূপে ?—তাহার অন্তরাত্মা কিছুতেই ইহাতে সায় দিতে পারে নাই। ইহাই কি তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ ?

যে দিন তাহাকে চাকুরীতে জবাব দেওয়া হইয়াছিল, সে দিনের কথা সে ইহজন্মে ভুলিবে কি ? মিঃ চোঙ্গদার ও রাসবিহারী বাবুই তাহার বিপক্ষে প্রধান বাদী। মিঃ চোঙ্গদার তাহার বিপক্ষে 'গ্রেভ এ্যালিগেশানস' করিয়াছিলেন, তাহাও এক আধটি নয়, 'নাম্বারলেস'। সে সমিতির নামে মিথ্যা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে : প্রেসিডেন্টের নামে, সেক্রেটারীর নামে, গণ্যমান্য সদস্যদের নামে। তাহার পর সে কার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছে, নিজের লোকের অপদার্থ রচনা প্রকাশিত করিতে দিয়া সদস্যদের পরিচিত নামী লেখকলেখিকার রচনা চাপিয়া রাখিয়াছে। রাসবিহারী বাবু এই অভিযোগ সমর্থন করিয়াছিলেন। সে যখন ব্যথিত-হৃদয়ে জানাইয়াছিল যে, এত দিনের যোগ্যতা যদি তাঁহাদের খেয়ালের জন্য অযোগ্যতায় পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহারা অবসর দিন,—তখন মিঃ চোঙ্গদার টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইম্‌প্যাটিনেণ্ট ! জান, তুমি পেড্ সার্ভ্যাণ্ট ?"

এ অপমানও তাহাকে মাথা পাতিয়া নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল। মিসেস রায় সত্যই সাহিত্যিক, তিনি তাহার নির্ব্বাচনশক্তির ভাল বা মন্দ দিকের সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ এই উদ্ধত যুবক ব্যারিষ্টার ? এটর্ণী ও ডাক্তার সদস্যরা তাঁহাদের পেশার শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন, কিন্তু আজন্ম সাহিত্য-সেবীর দোষগুণের বিচারের তাঁহাদের কি অধিকার ? আশ্চর্য্য ! যে পেট্রন বিদ্যোৎসাহী চন্দ্রশেখর বাবু এতদিন তাহার গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও নীরব ?—একটি কথারও ত প্রতিবাদ করিলেন না ? যাহার সাহিত্য-বৈঠকে সাহিত্যের এরিস্‌ট-ক্রেশী নাই, যাহার নিকটে ছোট বড় সকল সাহিত্যিকই সমান আদর পাইয়া থাকেন, তিনিও বাম ? তিনিই না 'বিশ্বপ্রেম' প্রচার

করেন? দুঃস্থ সাহিত্যিকের প্রতি অবিচার হইতে দেখিলে যিনি সামান্য একটি অঙ্গুলীহেলনও করেন না, তিনিই 'বিশ্বপ্রেমিক'? এ সংসারে সকলেই কি মুখোস পরিয়া লীলা করে?

একমাত্র মিসেস রায়ই গর্ব্বোদ্ধত যুবকের স্পর্দ্ধাসূচক উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—"দেখুন মিঃ চৌধুদার! এটা কমিটী মিটিং, কারও ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ দেখাবার যায়গা নয়। অবনী বাবু মিনিয়াল সার্ভ্যান্ট নন, তাঁর ত্রুটি হ'লে আমরা বড় জোর তাঁকে বলতে পারি, সেটা শুধরে নিতে, না হয় চাকুরী ছেড়ে দিতে, তাঁকে অপমান করতে পারি না।"

এই উক্তিতে অবনীনাথের অন্তর সেক্রেটারীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই যখন এই সেক্রেটারীই চিনির মোড়কে তাহাকে নিমের বড়ী খাইতে দিয়াছিলেন, তখন মুহূর্ত্তকাল তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে ঘরসংসারের কথা—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, মুহূর্ত্তেই সমান ওজনে জবাব দিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছিল। সে কথা তাহার অস্থিপঞ্জরের পরতে পরতে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছিল,—"এখন থেকে কমিটী ব্যবস্থা করছেন যে, বিষয়নির্ব্বাচন আমরাই ক'রে দেবো, আপনাকে আর সে জন্যে কষ্ট নিতে হবে না। এ জন্যে অবশ্য আপনার পারিশ্রমিকও এখনকার মত হ'তে পারে না, এ কথা বোধ হয় আপনার মত শিক্ষিত সাহিত্যিক নিজেই স্বীকার করবেন! তবে এখন থেকে প্রুফ-ট্রুফগুলো একটু মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাকে, বুঝেছেন?"

ইহার পর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, উদরান্ন-সংস্থানের ভীষণ পরীক্ষার কথা চিন্তা না করিয়া অবনীনাথ ক্ষিপ্ত গ্রহের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে সর্ত্ত গ্রহণ করে নাই, সুতরাং তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা ব্যতীত সেক্রেটারীর কি উপায় ছিল? তবু তাঁহার অনন্ত দয়া—তিনি তাহাকে মাসের বাকী কয়টা দিনের বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন! সেই ভিক্ষাদানকালে তাঁহার মুখে চোখে যে কুটিল হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অবনীনাথ তাহা জীবনে ভুলিবে কি?

তাহার পর? তাহার পর দরিদ্র সাহিত্যসেবীর অদৃষ্টে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল। লেখনীই যাহার একমাত্র সম্বল, তাহার অন্য কোথাও অন্ন জুটে না। ছয় মাস—সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল সে অদৃষ্টের সহিত সমানে সংগ্রাম করিল। চাকুরীর বাজার গরম—সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে হায়রাণ হইল। এই কয় মাস তাহার কি ভাবে কাটিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন কে জানিবে? সহর কলিকাতা,—উঠিতে বসিতে যেখানে পয়সা না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না, সেখানে বাড়ীভাড়া ও পাঁচ ছয়টি পোষ্যপালনের গুরুভার,—অথচ আয়ের খাতে শূন্য! আপনার যাহা কিছু আসবাবপত্র ছিল, একে একে সবই 'বিক্রীঅলার' হাতে গেল। বুকের রক্ত তুল্য বড় আদরের গ্রন্থসমূহ, তৈজসপত্র, বসনভূষণ,—শেষে পত্নীর যাহা কিছু সামান্য অলঙ্কার ছিল, এয়োতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সবই একে একে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ঘরে আর কপর্দ্দকও নাই, কলসীর জল গড়াইলে কত দিন থাকে? অবনী চক্ষুতে অন্ধকার দেখিল। আজ কোন প্রেসের দুইখানা প্রুফ দেখিয়া দিয়া, কাল কাহারও আবেদন অথবা পরদিন কাহারও বিলাতী ডাকের চিঠি লিখিয়া দিয়া কোনমতে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া, কোন দিন অনশনে, বেশী দিন অর্দ্ধাশনে কাটাইল। নিজের জন্য তাহার দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ ছিল না, কিন্তু পুত্র-পরিবার? বিধাতা মানুষকে যদি দরিদ্রই করেন, তবে এই শৃঙ্খল পরাইয়া দেন কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃস্তন্য হইতে বহুদিন বঞ্চিত; গোদুগ্ধও জোটে না; বালিসাগুরই বা পয়সা কোথায়? আর বড় ছেলেদের? উঃ, কলের জলই ভরসা!

সারা সহর হাটিয়া পায়ের সুতা ছিঁড়িয়াছে সে আজ, কিন্তু রিক্তহস্ত। কোন্ মুখে সে ঘরে ফিরিবে? দুই মুঠা শুক্না মুড়িও যে নাই ঘরে, দুই দিনের উপবাসী শিশুসন্তান-দের সে কি দিবে? কত বড় মহাপাপের এই শাস্তি? এক দিন সে যে পেট্রনের সাহিত্য-বিলাসের সহায়তা করিয়া শ্রদ্ধাস্নেহ অর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহারও দ্বারস্থ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহপ্রবেশে অনুমতি পায় নাই, গৃহস্বামী তখন বিশ্ব-প্রেমের চর্চ্চায় ব্যস্ত? এমন একাধিকবারই হইয়াছে।

কিন্তু আর ত চলে না, আর ত ক্ষুধাকাতর শিশুর আর্ত্তনাদ শোনা যায় না। লজ্জা, সম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদা,—এ সব ত কথার কথা। দরিদ্রের আবার এ সব মান-অভিমান কেন? অবনীনাথ যন্ত্রচালিতের মত সেক্রেটারীর

কৃপাপ্রার্থী হইতে চলিল। বহুবার বিতাড়িত হইয়াছে, কিন্তু এবার আর দেখা না করিয়া ছাড়িবে না। নারীর হৃদয়—যতই ক্রোধের কারণ থাকুক, তবুও কোমলা করুণাময়ী নারীর হৃদয়! তাহার দুঃখের সংসারের করুণ কাহিনী শুনিলে নিশ্চয়ই দয়া করিবেন তিনি!

বহুকষ্টে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটিল। কিন্তু প্রথম সম্ভাষণেই তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। "আমার কাছে? কি দরকার?"

নীরস কঠোর বাস্তব জগৎ অবনীর চক্ষুর সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। এক রাশি কাগজ-পত্রের মধ্যে নিমগ্না এলায়িত-কুন্তলা সুবেশাসুন্দরীর নয়নকোণে করুণাকণাও কি নাই?

অবনী কাতর কণ্ঠে বলিল, "সবই ত জানেন।"

মিসেস রায়ের ওষ্ঠ সঙ্কুচিত হইল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তার মানে? আপনি কি মনে করেন যে, দুনিয়া শুদ্ধ লোক তাদের কায-কর্ম্ম ফেলে আপনার কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার খোঁজে বেড়াচ্ছে? এটাকে আপনার ইম্‌পার্টিনেন্স বোলবো, না ইডিঅসি বোলবো?"

অবনীর প্রাণটা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু—দূর হউক, ভিখারীর আবার মান অভিমান!

সে পুনরায় কাতর-কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ করুন, কি বলতে কি বলেছি, মাথার ঠিক নেই। আপনি দয়াবতী, আজ ক'দিন সপরিবারে উপোস করছি—"

কথায় বাধা দিয়া অধীর হইয়া মিসেস রায় বলিলেন, "তা আমি কি করতে পারি? দুনিয়ায় অমন অনেকেই ভিখারী সেজে থাকে। সকলের আব্দার শুন্‌তে গেলে দেউলে হ'তে হয়। আর কিছু বলবার আছে?"

হা অদৃষ্ট! সেজে থাকে? দারিদ্র্য—দরিদ্র ভিক্ষুকের দারিদ্র্য—যে অপরাধের ক্ষমা নাই, সেই দারিদ্র্য—সত্যই যে দারিদ্র্যে উপবাস অনশন মুমূর্ষুর হা-হুতাশ, সেই দারিদ্র্যে যে সাজা-সাজি নাই, তাহা আজন্ম সুখবিলাসে লালিতা-পালিতা নারীকে সে কিরূপে বুঝাইবে! অবনত-মস্তকে মিনতিভরা সুরে বলিল, "বিশ্বাস করুন, আজ দুই দিন আমি সপরিবারে উপবাসী—"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে মিসেস রায় বলিলেন, "যারা ক্ষমতা না বুঝে কায করতে যায়, তাদের উপবাস হ'লে তার জন্যে দায়ী কে?"

"আমায় ক্ষমা করুন, আমার সত্যই অপরাধ হয়েছে। আমায় যে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করেন দিন, কিন্তু বাপের পাপে নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদের শাস্তি—"

"আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা করতে পারি। একবার এই অফার করেছিলুম মনে আছে? এখনও সেটা ওপন রয়েছে। সহরেই প্রচার ক'রে বেড়াতে হবে, তবে বাইরেও মাঝে মাঝে যেতে হবে।"

"আমি ত আপনাদের মতবাদের কিছুই জানি না।"

"জানবার দরকার হবে না। ছাপান প্যামফ্লেট, তাই উপাসনার পর পাঠ ক'রে শোনাবেন। মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, এখনও এতে রাজী নন। আচ্ছা, আর একটা উপায় ক'রে দিচ্ছি, আপনি এটাও করতে পারেন। আমার করেসপণ্ডেন্স, একাউন্টস্, ব্যাঙ্ক বিজনেস্, এক কথায় প্রাইভেট সেক্রেটারীর কায করতে পারবেন? মাইনে রিজনেবল পাবেন।"

অবনী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। এত দয়া! বাহিরে কঠোর, কিন্তু অন্তরে করুণার প্রস্রবণ। সাহারার মধ্যে যে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মরিতে বসিতেছে, তাহার সম্মুখে শীতল ওয়েসিস!

সে করযোড়ে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "আপনি প্রাণ দিলেন এই অভাগা দরিদ্রকে। কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব?—ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন।" সত্যই অবনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; অশ্রুসজল-নয়নে সে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

মিসেস রায়ের মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলের মত হাসিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তা হ'লে আজ থেকেই—না হয় বড় জোর কাল থেকেই আপনি এখানে চ'লে আসুন। বাসা কলকাতায় রাখবার দরকার নেই, ভাঙ্গবার যা কিছু লাএবিলিটিস আমিই দিয়ে দেবো। আমার আজই লোকের দরকার।"

কথাটা অবনী প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে রাতদিন এটেণ্ড করতে হবে?"

"তা হবে বৈ কি। প্রাইভেট সেক্রেটারী, কখন্ কি দরকার।"

"আর আমার ফ্যামিলি?"

"তাদের দেশে পাঠিয়ে দিন। সে সব খরচা আমি দেবো।" মিসেস রায়ের আয়ত নয়ন দুইটি স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল, পীনোন্নত উরস কম্পিত হইল।

"দেশে ত আমার কিছুই নেই, আপনার বলতেও কেউ নেই।"

"সে কি? আপনার স্ত্রী শুনেছিলুম না পাড়াগাঁয়ের মেয়ে? তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ীর দেশে পাঠিয়ে দিন না।"

"তাঁদের দেশই নেই, এখানে মামার বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়েছেন! মামা-মামীও নেই, মামাত ভাইরা খোঁজ খবর রাখে না।"

মিসেস রায়ের মুখমণ্ডল জলভরা আকাশের মত গম্ভীর আকার ধারণ করিল। "তা হ'লে সহরতলীতে বেলঘরে-টেলঘরের দিকে ছোট-খাটো বাড়ী ভাড়া করতে পারেন, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবেন।"

"আর বাকী দিন?"

মিসেস রায়ের নাসারন্ধ্র স্ফীত, নয়ন অরুণিত হইল, তিনি শ্লেষের সুরে বলিলেন, "যাদের পেটের ভাত জোটে না, তাদের অত চার দিক্ গুছিয়ে কায করতে গেলে চলে না। আমার এই অফার রইলো,—সাফ ব'লে দিন, রাজী আছেন কি না? মিছে বাজে সময় নষ্ট করতে পারি না।"

অবনী একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, নিতান্ত বিপন্ন আর্ত্ত-স্বরে বলিল,—"আমায় দয়া করুন, এ ছাড়া যা হয় কায দিন,—প্রুফ রিডারী, বিলিতি তর্জ্জমা—দোহাই আপনার, দুধের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে, মিসেস রায়।"

ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত মিসেস রায়ের চক্ষু দুইটি ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, ঘৃণায় তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "যাদের পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করবার ক্ষমতা নেই, তারা বিয়ে করে কেন? বেয়ারা!"

গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপ করিয়া মিসেস অমিতা রায় কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

অনাহার, দুশ্চিন্তা, পথশ্রম, বিনিদ্র রজনী, দুর্ব্বল অবসন্ন দেহ!—অবনীনাথের সত্যই শরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। তাহার উপর এই অপমানের কশাঘাত, ব্যর্থ জীবনের নিষ্ফল হাহাকার! পথে সে যখন বিতাড়িত কুক্কুরের মত নামিয়া আসিল, তখন সে ভাবিতেছিল, সত্যই কি তাহার বিড়ম্বিত জীবন বেত্রাহত কুক্কুরের অপেক্ষাও হীন নহে? পথের কুকুরও তাহার অপেক্ষা ভাল। তাহার আর পাঁচ জনের দায়িত্ব বহিতে হয় না, আপনার জন্য পথের যেখানে হোক সে একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে, এঁটো-কাঁটা কুড়াইয়া খাইতে পারে। কিন্তু আর তিন দিনের মধ্যেই যে তাহার গৃহস্বামী তাহাকে পরিজনসহ পথে তাড়াইয়া দিবে, তাহাকে যে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া বিনা সম্বলে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে,—এই কারণেই না সে মান-সম্ভ্রম লজ্জা-ভয় বিসর্জ্জন দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সাধিয়া বেড়াইতেছে? যে পথের কুক্কুর অপেক্ষাও অভাবগ্রস্ত, তাহার আবার মান অভিমান, তাহার আবার ভাল মন্দের বিচার! কেন সে মিসেস রায়ের চাকুরী গ্রহণ করিল না?

৪

বাসায় 'বজ্জির ভোজ'! প্রেসের প্রুফ দেখায় বারো গণ্ডা আর মুকুন্দ মিস্ত্রীর খাতা লেখায় আট গণ্ডা, একুনে পাঁচ সিকা,—একসঙ্গে এত পয়সার মুখ সরমা কত দিন দেখে নাই! কয় দিন অনশন বা অর্দ্ধাশনের কষ্টের পর এই সৌভাগ্যোদয়, কাযেই 'বজ্জির' আয়োজন, অন্ততঃ এক দিনও যদি ছেলে-মেয়েরা পেটটা ভরিয়া দুই মুঠা খাইতে পায়! সরমার পরামর্শমত বাজারের কেনা-কাটা করিয়া অবনীনাথ আবার বাহিরে গিয়াছে। স্থির থাকিবে সে কিরূপে? রোজই বাড়ীওয়ালা অপমান করিতেছে, এইবার সত্যই সে হাত ধরিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

ছেলেদের মুখে হাসি ধরে না। একসঙ্গে ভাত, ডাল আর মাছের তরকারী—সহজ কথা? কোনও দিন দুটি মুড়ি-মুড়কি, কোনও দিন চিঁড়ে-দই, কোনও দিন তাহাও জোটে না। মন্টু তিন বছরেরটি—সে বড় বড় গরাস তুলিয়া মুখে দিয়াই গিলিয়া ফেলিতেছিল। সরমা ভাত মাখিয়া দিতে দিতে বলিল, "ছি বাবা! অমন ক'রে খেয়ো না, এস, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

মন্টু বাহানা লইল, বলিল, "দিদিরা যে তা হ'লে বেশী বেশী খেয়ে ফেল্‌বে। রোজ রোজ ভাত দিস নি কেন মা

এমনই ক'রে, রোজ ক্ষিদে পায় যে মা, বড্ড ক্ষিদে। তুই বড় দুষ্টু মাঁ।" এই মন্টুকে তিন মাসের রাখিয়া তাহার জননী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, সরমার এক বছরের ছেলেটির মত সে কাকীমাকে মা বলিয়া ডাকিত।

সরমার আয়ত নয়ন দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অপর হাতে গ্রাস তুলিয়া দিতে দিতে সে বলিল, "দোবো বৈ কি বাবা। তুমি বড় হয়ে বস্তা বস্তা চাল এনে দেবে, আমি তোমায় এত এত ভাত রেঁধে দোবো, কেমন?"

মণ্টু বলিল, "বা রে! কাকাবাবু ত বড়, সে কেন বস্তা বস্তা চাল এনে দেয় না?"

উষা ধমক দিয়া বলিল, "থাম তুই, ভারী জেটা হইছিস। কাকামা, একটু ঝোল দিন না।" উষা মন্টুর জ্যেষ্ঠা সহোদরা। এই অনূঢ়া কিশোরীর পাত্রের সন্ধানে হুগলী জেলার এক পল্লীগ্রামে গিয়া তাহার পিতা ম্যালেরিয়া রোগ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই রোগই তাঁহার কাল হইয়াছিল, আর তদবধি তাঁহার অনাথ সন্তানগুলি অবনীর আশ্রয়ে রহিয়া গিয়াছে। উষারা তিনটি ভাই-বোন।

সরমা যখন হাত-পা ধুইয়া মাছের ঝোল পরিবেষণ করিতেছিল, তখন অবনী নিঃশব্দে গৃহপ্রবেশ করিয়া ঘরে শ্রান্তি বিনোদন করিতেছিল। এই ঘরখানিই তাহাদের ছয়টি প্রাণীর বসিবার, দাঁড়াইবার, শুইবার এবং লিখিবার পড়িবার ঘর, আর তাহারই পশ্চাতে চটের পর্দাঘেরা সামান্য বারান্দাটুকু রাঁধিবার, খাইবার ও হাত-পা চড়াইবার স্থান। এই বাসারও মাসিক ৮৲ টাকা ভাড়া।

অবনী সামনের বারান্দা দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। নিঃশব্দে, কেন না, তাহার পায়ের জুতা কিছু দিন হইল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে আধময়লা ছেঁড়া উত্তরীয়খানা দিয়া বাতাস খাইতেছিল, গায়ের ঘাম মুছিতেছিল। বারান্দায় দৃষ্টিপাত করিতেই সে মুগ্ধনেত্রে অনাহারক্লিষ্টা কৃশাঙ্গী পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল। কি অপরূপ রূপ! সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত এই মাতৃমূর্ত্তির তুলনা জগতে কি আছে! হাতে এয়োতির চিহ্ন লোহা আর শাঁখা-রুলি কয়গাছি, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু! ছিন্ন মলিন বসন, কিন্তু উহাতেও সেই রূপ উথলিয়া উঠিতেছে। অনাহার, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, ক্ষুধাতুর শিশুসন্তানগণের করুণ অন্নভিক্ষার বাহানা, অক্ষমতা, ব্যর্থ জীবনের ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কঠোর নিষ্ফলতা,—এ সমস্ত নিত্য যাহাদের অঙ্গের আভরণ, তাহাদের চোখে মুখে এই স্নেহকারুণ্য-দয়া-মমতায় ভরা স্বর্গের সুষমা কিরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে,—অবনী সেই কথাই ভাবিতেছিল। যতক্ষণ সম্ভব এ দৃশ্য উপভোগ্য,—হয় ত বিধাতা কাল আর অদৃষ্টে এই সুখ লিখিবেন না!

"কি হ'ল হে, ভাড়ার কি করলে?"—সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় জুতার শব্দ। অবনীর প্রাণ উড়িয়া গেল; কক্ষদ্বারে বাড়ীওয়ালার অকরুণ মূর্ত্তি।

"বাঃ! এই ত বেশ আরাম হচ্ছে হে। তার পর?"

মুহূর্ত্তে অবনীর পথের কষ্ট অন্তর্হিত হইল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া অভিবাদন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—"মশাই"—

"রাখ তোর মশাই! এত বড় ধড়িবাজ জোচ্চোর ত ভূভারতে দেখি নি কখনও! বলি, টাকা দিবি কি না বল্। আচ্ছা ছোটলোক ত!"

আপনি তুমিতে নামিয়াছিল, আজ তুমিও তুইতে নামিয়াছে ইহার পর আর কি আছে?

পিছনের বারান্দার কড়া নড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে উষা ডাকিল, "কাকাবাবু, একবার শুনে যান।"

দরজার পাশেই সরমা দাঁড়াইয়াছিল, চোখের জল চাপিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "এই কুড়িটে টাকা আজ দিয়ে দাও, ব'লে দাও, বাকি শীগ্‌গিরই দেওয়া হবে।"

গৃহলক্ষ্মী কি সত্যই অন্নপূর্ণা? অবনী বিস্মিত, স্তম্ভিত! কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "টাকা? কোথায় পেলে?"

"পরে বোলবো। আগে ওকে বিদায় ক'রে দাও।"

তখন বাহিরে সমান গর্জ্জন চলিতেছিল,—"দিব্বি হাঁসের পাল গেলান হচ্ছে! ভেতরে কোঁচার পত্তন, বাইরে ছুঁচোর কেত্তোন—তোমার সব উল্টো!"

"এই নিন মশাই কুড়িটে টাকা আজকের মতন।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বাড়ীওয়ালা মহাশয় অবনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। টাকা গণিয়া লইতে লইতে বলিলেন, "সোজা আঙ্গুলে কি ঘি বেরোয়, বাপধন? সেই টাকা বেরুলো। গিন্নীর হাতে টাকা জমিয়ে বাইরে ব'লে বেড়াও বাপু, পেটে ভাত নেই? বাঃ!"

"মশাই, টাকা আমাদের না, ভিক্ষে ক'রে পেয়েছি। যা পেয়েছি দিয়েছি, কাল কি হবে, জানি নি। দয়া ক'রে আর কিছু দিন সময় দিন, বাকিটা দিয়ে দেব।"

ভিক্ষা করিয়া কুড়ি কুড়িটা টাকা আদায়? —অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বাড়ীওয়ালা মহাজন বলিলেন, "ওঃ! কলিকালে তা হ'লে দাতাকর্ণ জন্মেছে দেখছি! যাক্ গে, যা করেই টাকা রোজগার কর তোমরা, আমার পেলেই হ'ল।" অন্দরের দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলেন।

অবনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে আসিয়া বলিল, "তার পর, সরমা, টাকা পেলে কোথায়?"

সরমা একখানি পত্র দিয়া বলিল, "পড়।"

অবনী সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। পত্র তাহার সতীর্থ পঙ্কজনাথের। সে লিখিয়াছে :—

"ছোট ভাইকে পাঠালুম চিঠি আর টাকা দিয়ে। যে মহানুভব দয়া ক'রে আমাদের এই বিপদে সাহায্য করেছেন, তাঁকে তুই জানিস। পাঁচ ছমাস আগে 'পুরশ্রীতে' যখন ছিলি, তখন সার চন্দ্রশেখরের মজলিসে তাঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল বোধ হয়। তার পর রমেশ বাবু কাশী চ'লে যান। আমাদের এক গাঁয়ে বাড়ী। তোর দুর্দ্দশার চরম দেখে ভেবে ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে কপালে যা থাকে ভেবে তোর কথা সব খুলে লিখি তাঁকে কাশীতে। সে আজ পাঁচ ছ দিনের কথা। আজ সকালে তাঁর কলকাতার আফিস থেকে লোক এসে চিঠির উত্তর আর এই কুড়িটে টাকা দিয়ে গেল। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, দুচারদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসছেন, এলেই তোর সম্বন্ধে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন। জানিস ত, তিনি মস্ত ধনী, প্রিণ্টার, পাবলিশার ও ব্যবসাদার। ব্যবসায়ে তাঁর অনেষ্টি সবাই জানে, আর পাবলিশার হিসেবে দুঃখী সাহিত্যিকের সর্ব্বস্ব তিনি কখনও কিনে নেন না, বরং শুনেছি, কেতাবের কপিরাইট কিনে নিয়েও ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঠিক করেছেন যে, কাশীর হিন্দী মাসিকের মত কলকাতাতে ঐ ভাবের যা হয় একখানা জমকালো রকমের কাগজ চালাবেন। বোধ হয়, সেই সম্বন্ধেই তোকে ডেকে পাঠাবেন। ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন! জানি, সরমা বড় অভিমানী; কিন্তু আমার নাম ক'রে বলিস, এটা সে যেন ভগবানের দান ব'লে মাথা পেতে নেয়, নইলে তার দাদা বড় রাগ করবে। ছেলেদের আজ ভাল ক'রে খাওয়াস।"

আরও দুই একটা কথা ছিল। অবনী ক্ষণকাল নীরব নিশ্চল অবস্থায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল রমেশ বাবুর কথা, পঙ্কজের কথা। পঙ্কজ তাহার সতীর্থ, বন্ধু, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু রমেশ বাবু? সে তাহার কে? তাহার রচনার গুণগ্রাহী? কিন্তু এমন ত আরও আছে। রচনার গুণ গ্রহণ করে, এমন লোকের অভাব নাই ত। কিন্তু দুঃস্থ বিপন্ন সাহিত্যসেবীর জন্য এমন করিয়া প্রাণ কাঁদে কয় জনের? এই টাকা আনা পয়সার জগতে কে কাহার দুঃখ-দৈন্যের তত্ত্ব রাখে? রাখিলেই বা তাহার হস্ত দরিদ্রের অভাব-দৈন্য-মোচনে অগ্রসর হয় কি? আর পঙ্কজ?

সরমা ছেলেদের খাওয়াইয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেখিল, স্বামীর নয়ন দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া অবনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সরমা, এ পৃথিবীতে মানুষের আকারে দেবতাও তা হ'লে দেখা দেন?"

সরমার সুন্দর মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে স্বামীর অংসের উপর হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "দেন বৈ কি। নইলে আমাদের মত গরীব-দুঃখীদের কে আছে?"

অবনী বলিল, "আর পঙ্কজ? হতভাগাটার আমারই মত অবস্থা। তবু ও যখনই দু'চার আনা বেশী পেয়েছে, আগে এসে আমায় তার ভাগ দিয়ে গিয়েছে, এমন কি, পেটে না খেয়েও দিয়েছে, বলেছে, তুই আবার যখন দু'চার আনা পাবি, আমায় দিবি। সত্যি বলতে কি সরমা, ও যদি এ ক'মাস যা হোক কিছু ক'রে সাহায্য না করতো, তা হ'লে ছেলেদের মুড়ি-মুড়কিও জুটত না।"

* * * *

দশ বারো দিন পরে ডাক আসিল। অবনীনাথ রমেশ বাবুর সমীপে গিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না, কণ্ঠ তাহার বাষ্পরুদ্ধ।

রমেশ বাবু দেখিয়াই বলিলেন, "এই যে অবনী বাবু, বসুন। মনে করছি, আসছে মাস থেকে একখানা সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক বার করবো, এখানেও আমার পাব্লিসিং বিজনেস আছে জানেন ত। তা, আমি কেবল মোট বয়ে

বয়ে এনে দেব, চালাবেন আপনি, আর যদি চান, তা হলে পঙ্কজ আপনাকে সাহায্য করবে। কি বলেন ?”

অবনী কোনওরূপে বলিল, “কি বলবো আপনাকে, আপনার দয়া”—

বাধা দিয়া রমেশ বাবু বলিলেন, “না, না, দয়া-টয়া এতে নেই,—এ পিওরলি বিজনেস। আপনার প্রতিভা রয়েছে, আমরা তার সুযোগ নেবো না কেন ? জগৎকে তা থেকে বঞ্চিতই বা করবো কেন ?”

“তা হ’লে”—

“হাঁ, ঐ কথাই ঠিক রইলো। আপনার কোন আপত্তি আছে কি ? যদি কোন কিছু সাজেষ্ট করবার থাকে”—

অবনীর হৃদয়ে ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল, বুঝি আর সে উদ্গত অশ্রধারা রোধ করিতে পারে না! কোনরূপে সংযত হইয়া সে বলিল, “আপত্তি ? যদি কাঙ্গাল স্বামি-স্ত্রীর অন্তরের”—

রমেশ বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, “পঙ্কজ আমাকে সব বলেছে। যার ঘরে মা অন্নপূর্ণা, তাঁর কি কোন বিপদ হ’তে পারে ?” কথাটা বলিয়াই রমেশ বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অবনী কি সত্যিই দেখিল, তাঁহার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু ?

মুহূর্ত্ত পরে রমেশ বাবু ধরা গলায় বলিলেন, “এইটে নিন অবনী বাবু, অবসরমত প’ড়ে দেখবেন, এর ভেতরে আমার স্কীম-টিম সব আছে। ন[illegible]কার।”

একখানি খাম, তাহার মধ্যে বোধ হয় চিঠি বা আর কিছু ভারী কাগজ, উপরে কিন্তু কাহারও নাম ঠিকানা নাই। অবনীর বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল, সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। পথে গ্যাসের আলোকের নীচে দাঁড়াইয়া সে কম্পিতহস্তে খামখানি খুলিয়া ফেলিল।

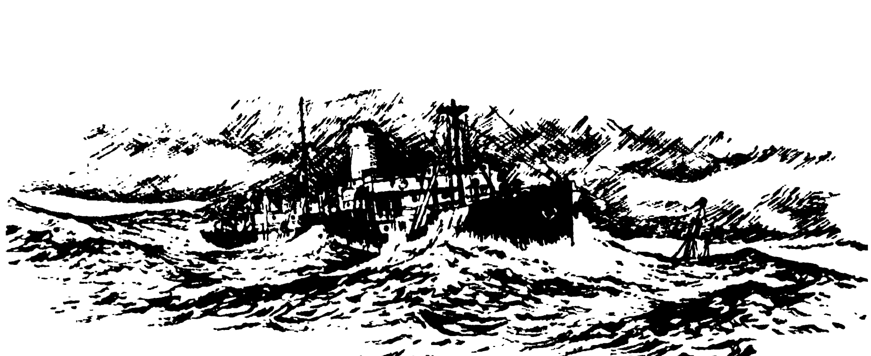
মাত্র কয়টি ছত্র।—“অবনী বাবু! নতুন কাগজ দাঁড় করাতে মেহনত আর মাথা খুব বেশী চাই জানি, টাকা আনা পাই দিয়ে তার মাপ করা চলে না। সেই জন্যে প্রথম মুখে আপনার মর্য্যাদা ব’লে মাসে একশো টাকা হ’লে চলবে কি ? গল্প বা রচনা যা দেবেন, তার আলাদা মর্য্যাদা দেওয়া হবে ‘প্রতিভা’ আফিস থেকে। এতে আপনার আপত্তি আছে কি ? আগাম তাই আফিস এইটে আপনাকে দিচ্ছে।”

লেখা আর কিছু নাই, আছে কেবল তাহার সঙ্গে একখানি এক শত টাকার ও দুইখানি দশ টাকার নোট।

অবনী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাবলিশার ত সহরে রহিয়াছে অগণিত, অনেকে রমেশ বাবুর অপেক্ষা অনেক বড় ব্যবসা করেন। অনেকে অনেক রকম বিশ্ব-প্রেম প্রচার করেন।

অবনীর অন্তরের অন্তস্তল হইতে বিশ্বনিয়ন্তার চরণে এই দরদীর জন্য মঙ্গল কামনা উত্থিত হইল, তাহার নয়নে আনন্দধারা নামিয়া আসিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



প্রাচ্যের শক্তিশালী দেশ



টোকিও নগরে সম্রাট সেনাদল পরিদর্শন করিতেছেন

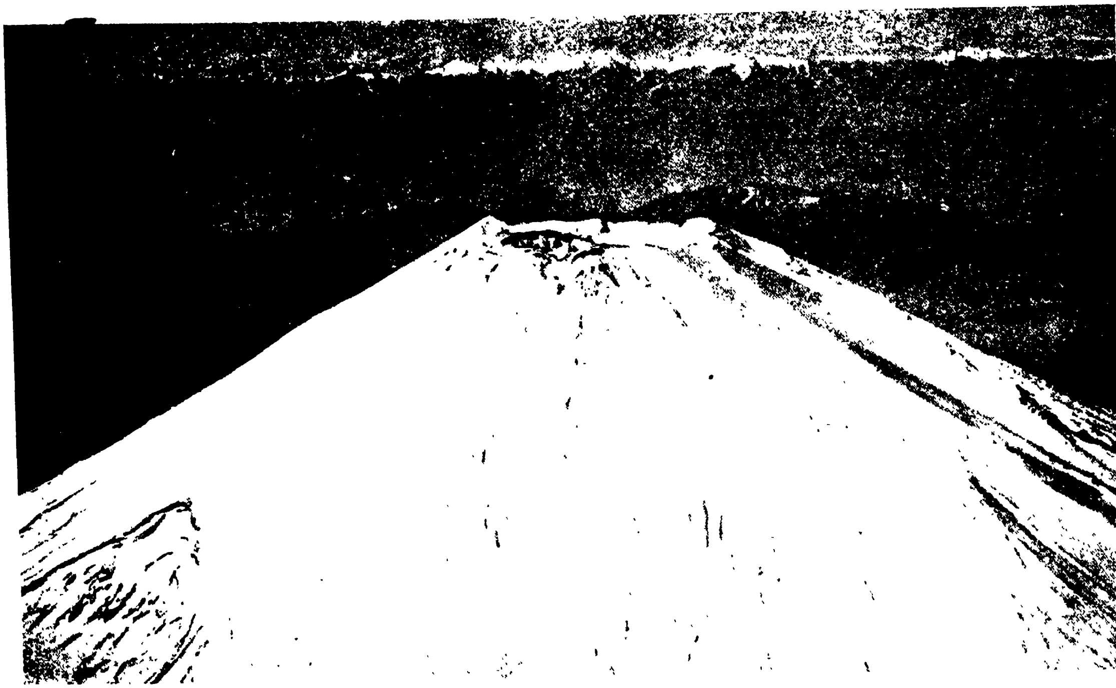
জাপান প্রাচ্য ভূখণ্ডের শক্তিশালী দেশ। চীন আকারে বড় হইলেও জাপানের তুলনায় শক্তিতে হীন। জাপান সম্বন্ধে 'মাসিক বসুমতী'তে ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, কিন্তু জাপান সংক্রান্ত এত অধিক জানিবার বিষয় আছে যে, এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেকগুলি নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইল।



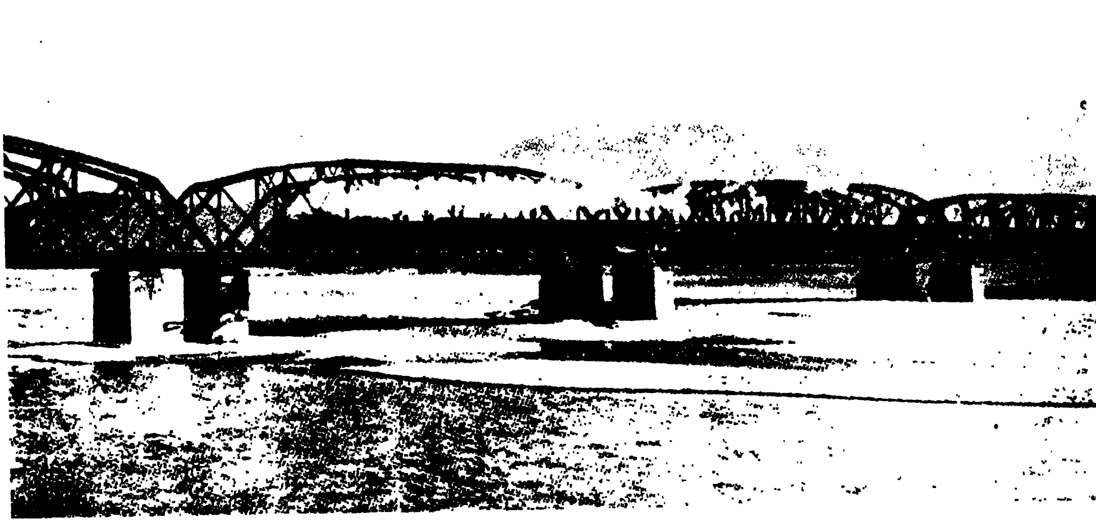
উৎসাহী সদাগরগণ সমুদ্রতীরে ব্যবসার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে

জাপান গত ৬০ বৎসরের মধ্যে এমন দ্রুতগতিতে নানাভাবে উন্নতি করিয়াছে যে, তাহাতে বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়া পড়িয়াছে। জাপান রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতিতে পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশের অনুকরণ করিয়াছে। জাপানের প্রাকৃতিক রীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বান্দাইসান নামক গিরি বহুদিন ধরিয়া শান্তভাবেই ছিল। কিন্তু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ উহার চূড়া খসিয়া গিয়া অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়। সেই ভীষণ আগ্নেয়-গিরিনিঃস্রাবে ৪ শত মানুষ প্রাণ হারায়।

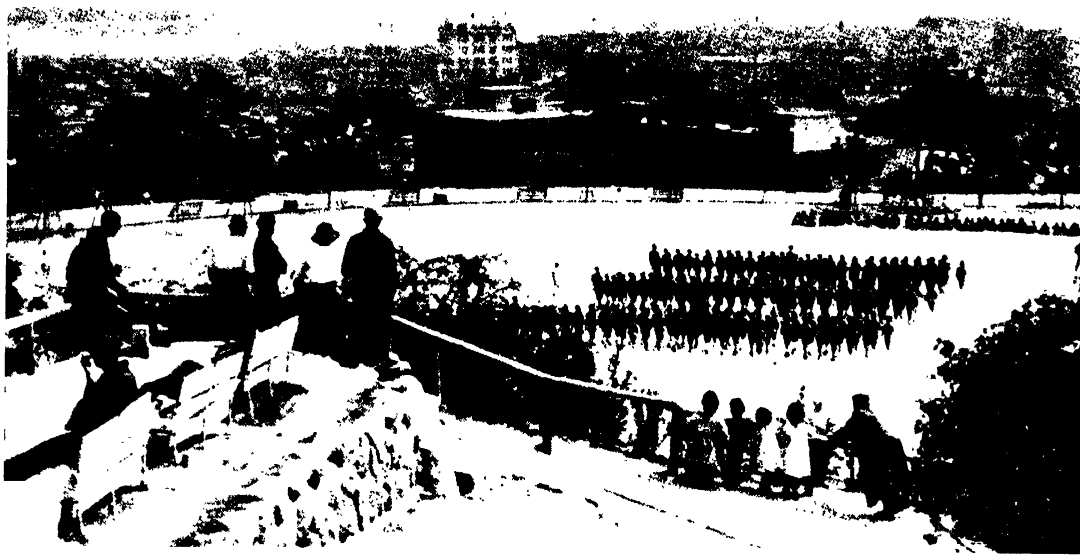
জাপানে প্রায় ২ শত নিদ্রিত আগ্নেয়-গিরি আছে। বাহির হইতে দেখিয়া কে বলিবে, এই সকল সুদর্শন, পুষ্প-শোভিত মনোরম গিরিগুলির অভ্যন্তর-ভাগে ধ্বংসের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে! যে কোন মুহূর্ত্তেই ইহারা দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে ধ্বংসখণ্ড আরম্ভ করিতে পারে।



ফুজি আগ্নেয়গিরি



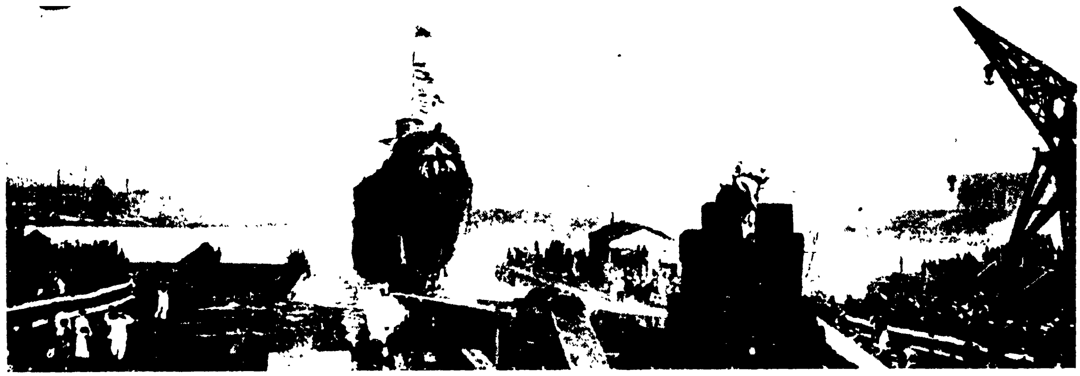
ফুজি এক্সপ্রেস, ফুজি নদী এবং দূরে ফুজি আগ্নেয়গিরি



ভাবী সেনাদল



অনুমা হ্রদের তীরে চড়িভাতি



নূতন 'ডেষ্ট্রয়ার' পোত

উল্লিখিত ২ শতের মধ্যে অন্ততঃ ৫০টি নিদ্রিত শৈল হইতে পুনঃপুনঃ অগ্ন্যুৎপাত হইবার সম্ভাবনা।

বাহ্যতঃ পর্ব্বতগুলি দেখিতে অতি মনোরম, কিন্তু তাহাদের নিশ্বাসে গন্ধকের গন্ধ রহিয়াছে। এমন কি, ফুজি যে এমন প্রিয়দর্শনা এবং কুমারীর ন্যায় লজ্জানম্রা, ব্রীড়ায় আনতমুখী, তাহাকেও বিশ্বাস করা চলে না। তৃণশ্যামল অরণ্যে আবৃতদেহ, বেণুকুঞ্জবহুল এবং অজস্র কুসুম-সমাকীর্ণ হইলেও, পর্ব্বত-মুখ অগ্নি উদ্গিরণ করিবে না, এমন আশ্বাস কে দিতে পারে ? তুষারশীর্ষমণ্ডিত হইলেও বিশ্বাস নাই। জাপান অকস্মাৎ যে কোনও মুহূর্ত্তে ক্রোধে অধীর হইয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিলেও, তাহার প্রতি কাহারও বিরূপ হওয়া উচিত নহে। কারণ, জাপান যেখানে অবস্থিত, প্রকৃতির বহ্নি-সমুদ্র তাহার নিম্নেই বিদ্যমান।

কিউস্যুর বেপ্পুতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানকার জলে অন্ন সিদ্ধ হইতেছে—অগ্নির উত্তাপে নহে, ভূগর্ভস্থ অগ্নির উত্তাপে জল তথায় স্বাভাবিকভাবেই এমনই উত্তপ্ত। বহুলোক উত্তপ্ত সমুদ্র-উপকূলের বালুকারাশিতে শয়ন করিয়া বহুবিধ পীড়া হইতে মুক্তি পায়, উত্তপ্ত জলে শয়ন করিয়া রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে।

এমনও গল্প শুনা যায় যে, জাহাজ জলে নোঙ্গর ফেলিয়া রাখিয়াছে, নোঙ্গর উঠাইবার সময় দেখা গিয়াছে, সমুদ্র-তলের সংস্রবে আসিয়া লৌহ-নোঙ্গর গলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। বেপ্পু অতি চমৎকার স্থান—বাতরোগগ্রস্ত নর-নারী এখানে আসিলেই রোগমুক্ত হইয়া থাকে।



পর্ব্বতের রক্ষা



শুক্তি-সংগ্রহকারী নর-নারী

করা যায় না। পুরুষ ও নারীরা প্রকৃতির খেয়ালকে পোষাক-পরিচ্ছদে নকল করিয়া থাকে। জাপানের কবিরাও নিসর্গকে কাব্যে ধরিয়া রাখে।

সমগ্র প্রকৃতিকে জাপানীরা ব্যক্তিত্ব-বাদে ব্যক্ত করিয়া থাকে। পর্ব্বত-গুলিতে দেবদেবীর পরিকল্পনা জাপানী-দিগের বৈশিষ্ট্য। কবিত্বশক্তি জাতির মজ্জাগত। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর সহিত জাপানীর সাদৃশ্য নিকটতম। প্রতি বৎসর জাপ সম্রাটের নির্দেশ ও আমন্ত্রণ অনুসারে সহস্র সহস্র ছোট কবিতা সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া আমীর-ওমরাহগণ সকলেই কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তার পর বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যাহারা প্রকৃত কবি, তাঁহা-দিগকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাপান বলিতে যতটুকু স্থান বুঝায়, তথায় ১৫ হাজার ৪ শত ১৩ মাইল রেলপথ আছে। নদীগুলির উপর অসংখ্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

মনে করিত। কিন্তু এই ভদ্রবেশী পাহাড় এক দিন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অগ্নি-নিঃস্রাবে ১০ হাজার নর-নারীসহ একটা নগর ধ্বংস হইয়া যায়। অথচ জাপানের সর্ব্বত্র ফল, ফুল ও শস্যের অপর্য্যাপ্ত ফসল হয়। মানুষ প্রাণ ভরিয়া আহার্য্য ও আনন্দ পাইয়া থাকে।

জাপানের নিসর্গ-দৃশ্যের বৈচিত্র্য যেমন মনোরম, জাপানী নারীর প্রসাধন-বৈচিত্র্যও তদ্রূপ। এত রকমের ফ্যাশান তাহারা জানে যে, বলিয়া শেষ



কলে চাউল ঝাড়া হইতেছে

সমুদ্রপথেও সকল দেশে যাতায়াত করিবার জাহাজ জাপানের আছে। জাপানে ৩ হাজার ৩ শত ৫০টি মোটর-চালিত পোত এবং ১৫ হাজার ৪ শত ৯৭ খানি বড় জাহাজ আছে। নদী এবং উপসাগরগুলি মোটর-জলযানে নিরন্তর মথিত হইতে থাকে। অসংখ্য বিমানও জাপান নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সামরিক বিভাগ ব্যতীত জাপানে বিমান-পরিচালন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। জাপানী বিমান-চালকগণ প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ মাইলেরও অধিক পথ বিমানযোগে অতিক্রম করিয়া থাকে। টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে দিনে দুইবার বিমান যাতায়াত করিয়া থাকে। সাংহাইয়ে যাইবার জন্যও একটা বিমানপথ-প্রতিষ্ঠায় জাপানীরা চেষ্টা করিতেছে।

জাপান ঘরোয়া বিবাদ মিটাইয়া সমগ্র জাপজাতিকে একীভূত করিয়াছে। শিক্ষার প্রসারে জাপানের সমকক্ষ কেহ নাই। এই দ্রুতশিক্ষা-বিস্তারের ফলেই জাপান রুসিয়াকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল। শুধু সামরিক আয়োজনেই নহে, জ্ঞানবিস্তারের সাহায্যেই জাপান আজ শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

সম্রাট মাৎসুহিতোর রাজত্বকালে জাপান তাহার জাতীয় ইতিহাসকে নূতন করিয়া রচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ৪টি বড় দ্বীপ এবং ৪ হাজার ক্ষুদ্রদ্বীপসমষ্টি লইয়া জাপান-রাজ্য। প্রধান দ্বীপ হনসুই জাপানের আদর্শ-কেন্দ্র। এইখানেই অধিকসংখ্যক



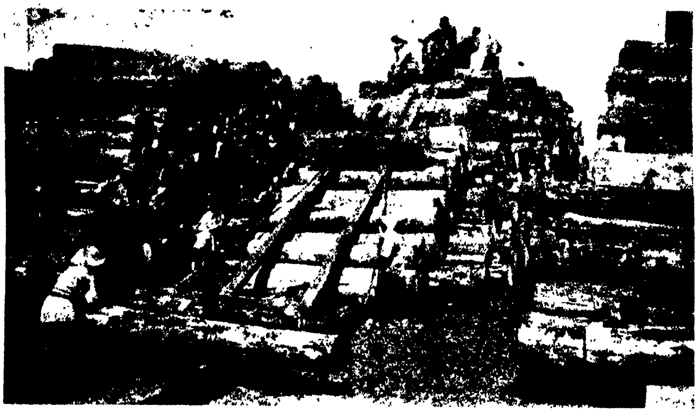
বেপ্‌পুর ধারে উষ্ণ জলে রোগ নিরাময়



আইমু জাপদিগের গল্পগুজব



অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সেতু

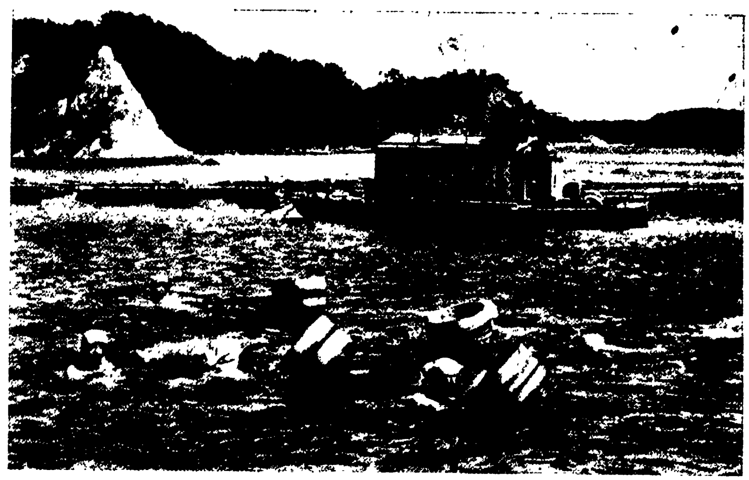


কাষ্ঠের স্তূপ

জাপানীর বাস। বড় বড় নগরও এইখানে বিরাজিত আছে। এই দ্বীপের আয়তন ৮৬ হাজার ৩ শত বর্গ-মাইল। জাপান বলিতে এই দ্বীপটিকেই প্রধানতর বুঝায়।

কৃষিবিদের কাছে জাপান আদর্শ-স্থান নহে। ২০ পুরুষ ধরিয়া মানুষ প্রাণপণ প্রচেষ্টায় জমীকে উর্ব্বরা করে। তাহা হইতে উৎপন্ন শস্যে সমগ্র জনসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রাচীন যুগের জাপানে প্রত্যেক চাষীর এক একর জমীর ভগ্নাংশ নির্দ্ধারিত ছিল। চাউল জাপানী জাতির প্রধান খাদ্য। উহা উপত্যকা-ভূমিতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। সেখানে সেচের খালের প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে সমবায়-প্রথায় জমীর চাষ হইতেছে বলিয়া অবস্থার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বহু পরিশ্রমে চাষ আবাদ করা হইলেও অনেক সময় প্রকৃতিদেবী বাদ সাধিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ বহুবার জাপানে দেখা দিয়াছিল। অনেক সময় দুর্ভিক্ষের গ্রাসে বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য



শুক্তি-সংগ্রহে নারী ডুবুরী

হইয়াছিল। মৃত্যুর হার এত বাড়িয়াছিল যে, মৃতদেহ সমাহিত করিবার স্থান ছিল না। বহু শবদেহ একসঙ্গে অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইত। কিন্তু জাপান এখন সে দুর্দ্দিনের স্মৃতি ভুলিয়াছে।

এখনও অনেক নদীতে বন্যা দেখা দেয়। সে জন্য কর্ষিত ক্ষেত্রের শস্য জলে ডুবিয়া যায়। কিন্তু মোটর-শক্তির সাহায্যে জাপান বন্যাকে জয় করিয়াছে। এখন সে জন্য বন্যাও বড় একটা হয় না, দুর্ভিক্ষও দেখা দেয় না।

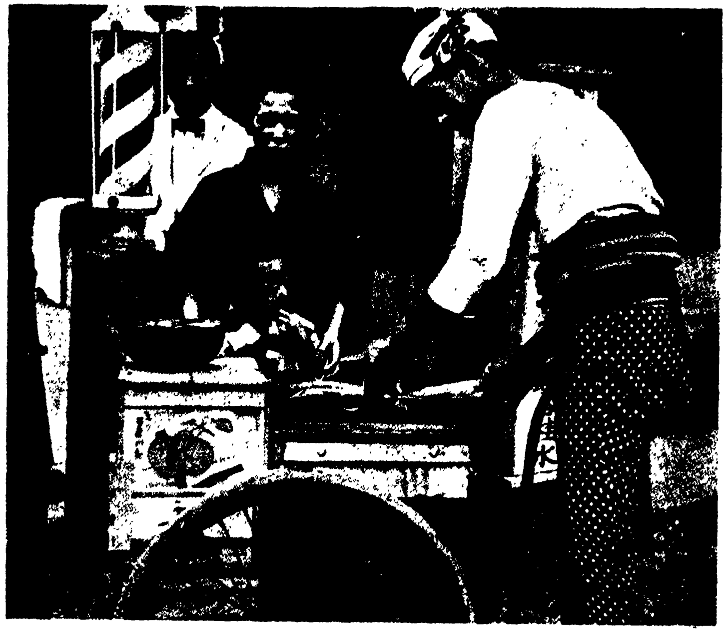


শৈলসমাকীর্ণ শিওলো অন্তরীপ

জাপানের গ্রামবাসীরা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট

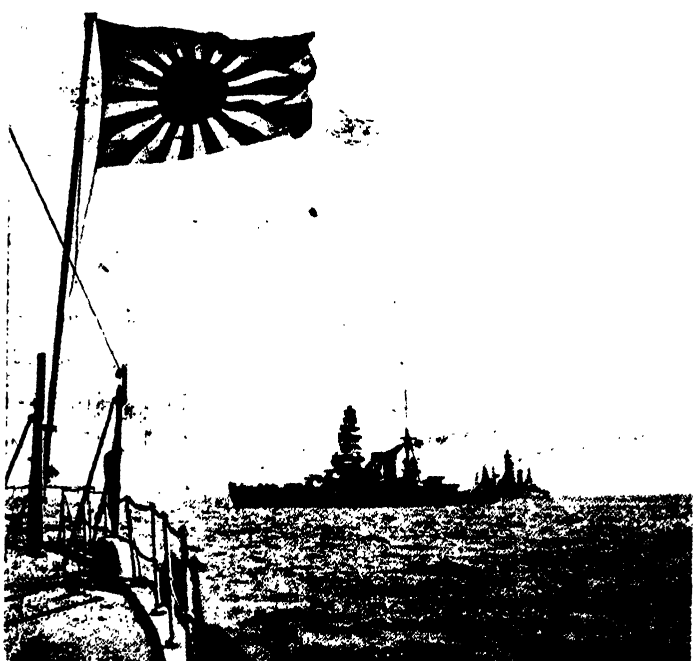
সময়ে একবার করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়া থাকে। তুষারপাতের অবসানে এবং শস্য গৃহজাত করিবার পর যে সময় থাকে, সেই সময়েই হাজার হাজার জাপানী তীর্থ পরিক্রমা করিয়া থাকে। প্রাচীন যুগে শুধু বয়স্করা তীর্থভ্রমণে বাহির হইত। কিন্তু এখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও রেলযোগে তীর্থ-দর্শন করিতে গিয়া থাকে। ইহাতে তাহারা দেশপ্রেম সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করিতে পায়।

ধর্ম্মের পুরোহিতগণ বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাব হইতে জাপ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পথের ধারে ধারে নানা তীর্থ-মন্দির নির্ম্মাণে মন দিয়াছেন।



দ্বিচক্রযানে দ্রব্য সরবরাহ

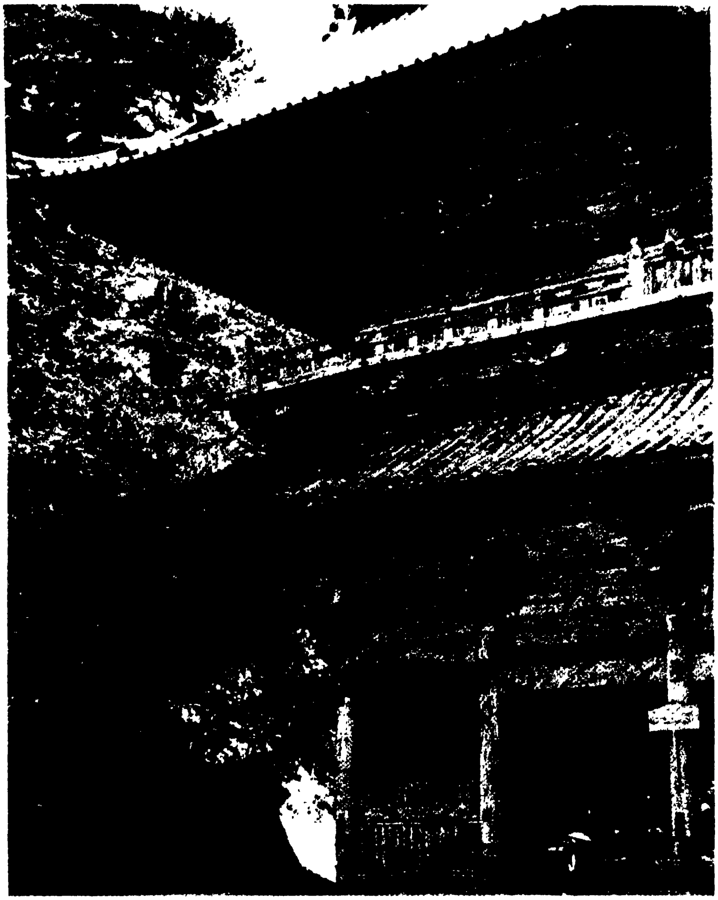
জাপানের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনার যোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভূমির বহুলাংশই মিকাডোর অধীন ছিল। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে চারিটি জাতির সম্মেলনে নাগরিক ও সামরিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলে।



জাপানী নৌ-বাহিনীর কুচকাওয়াজ

কিউটোটে জাপ সম্রাট বাস করিতেন। সোগনরা কামাকুরায় থাকিত। এইখানেই তাহাদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। সম্রাটকে সকলে ভয় করিত, সম্মান দেখাইত। শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত কামাকুরা হইতে। মিকাডোকে লোকে ভক্তি করিত, কিন্তু সোগনকে সকলে ভয় করিত।

মোঙ্গলরা জাপান জয় করিতে আসে, কিন্তু পরাজিত হয়। তার পর পোর্ত্তুগিজরা এবং স্পানিয়ার্ডরা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বে-সামরিক ভাবে জাপানে প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। তার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কামাডোর



জাপানী মঠ

ব্যতীত, ১ কোটি ৯০ লক্ষ দেশীয় লোক।

সমগ্র জাপ সাম্রাজ্যের কুত্রাপি প্রশস্ত, দীর্ঘ সমতলভূমি নাই; কারণ, সর্ব্বত্রই পাহাড়। পর্ব্বতগুলির সংখ্যা ২ শত ৩১। প্রত্যেকটির উচ্চতা সমুদ্রতট হইতে ৮ হাজার ফুট বা ততোধিক। তন্মধ্যে ৩৯টি পর্ব্বতশৃঙ্গ ফরমোজায় বিদ্যমান। ফুজি পর্ব্বতের উচ্চতা ১২ হাজার ৩ শত ৯৫ ফুট। পূর্ব্বে জাপানের মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু পরে ফরমোজার মরিসন পর্ব্বতের মাপ লইয়া জানা গেল যে, ফুজি হইতে তাহার উচ্চতা আরও ৫ শত ৬৪ ফুট বেশী। এ সংবাদে কিন্তু জাপানীরা সুখী হইতে পারে নাই। তাহাদের এই নৈরাশ্য দমন করিবার জন্য তাহারা ফরমোজার রাণীকে 'নিতাকা' নাম দিয়াছিল। নিতাকার অর্থ নূতন উচ্চ পর্ব্বত।

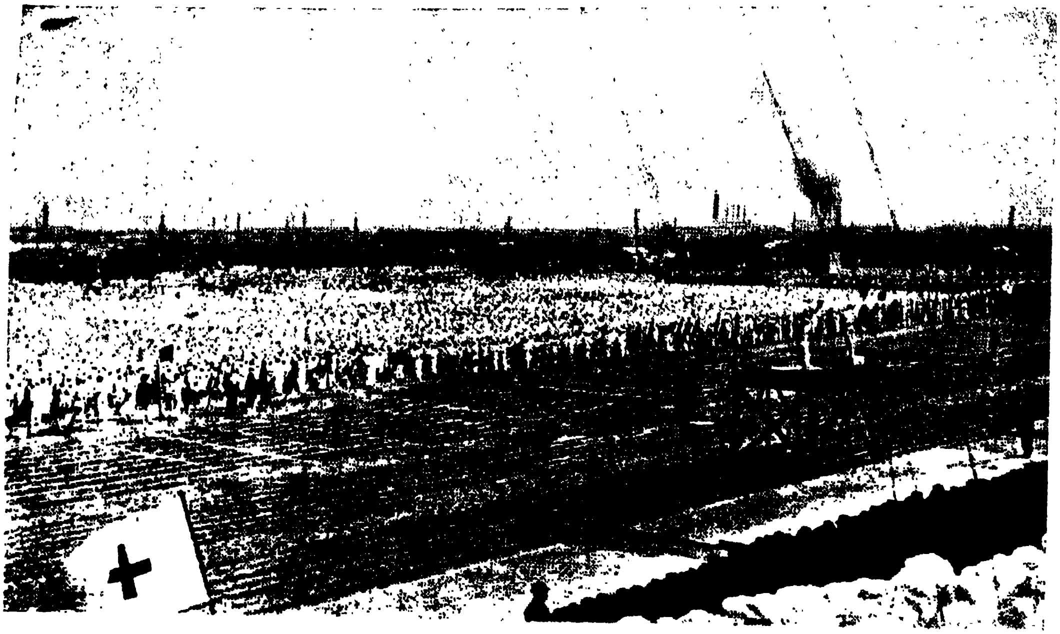
জাপানী সাহিত্যে কল্পনার দৌড় আছে; উপকথা, অন্ধসংস্কার এবং রস-চর্চ্চাতেও তাহারা কল্পনার সমাবেশ

পেরির চেষ্টায় জাপানে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়। তার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আধুনিক জাপ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে। বর্ত্তমানে জাপ সাম্রাজ্যে ৬টি বড় দ্বীপ এবং কোরিয়া রহিয়াছে। উহার সমবেত আয়তন ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত ৬৪ বর্গমাইল।

জাপ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় স্থানের জরীপ হইয়া গিয়াছে। মানচিত্রেও তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোরিয়ার জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬ শত ২৪ জন বৈদেশিক



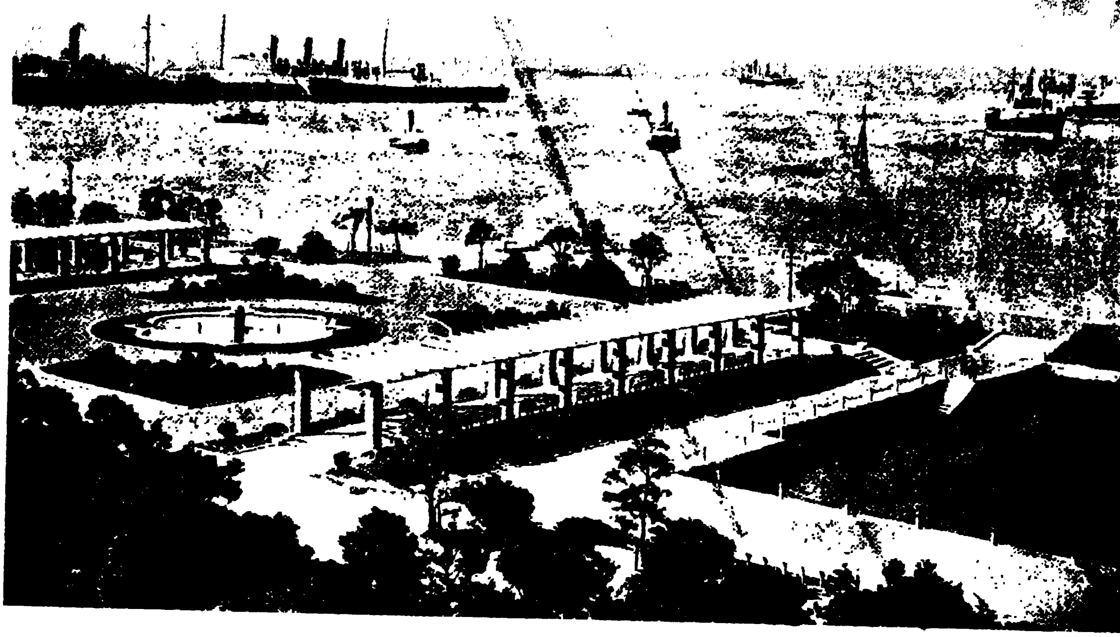
প্রিন্স আরিসুগাওয়ার প্রতিমূর্ত্তি



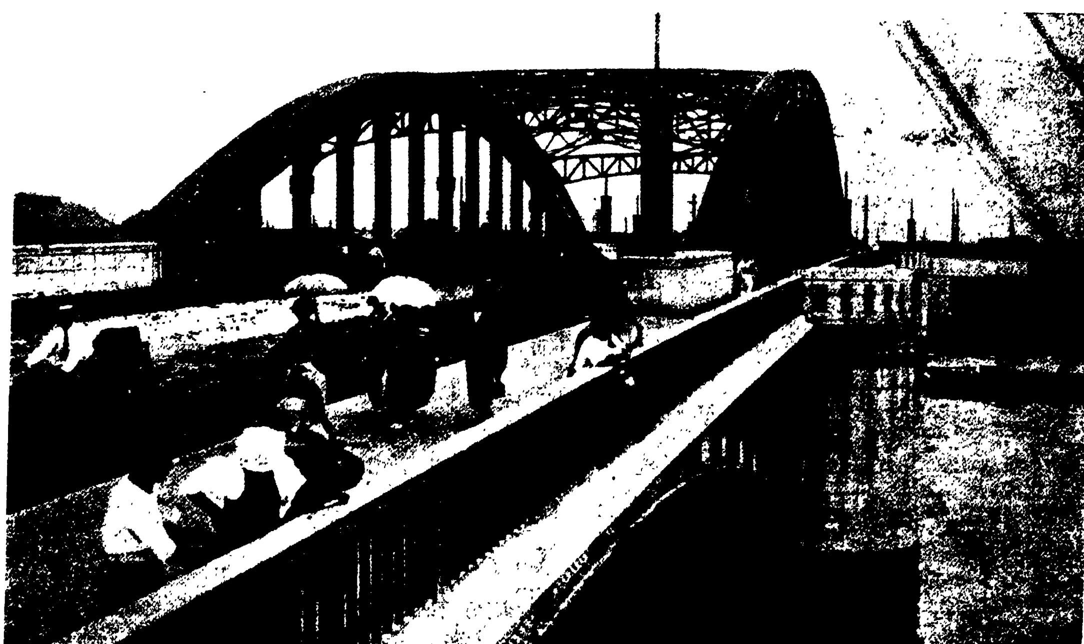
ওসাকা বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দের ব্যায়াম



রাত্রিকালে পক্ষীর সাহায্যে মৎস্য-শিকার



ইয়োকাহামার একটি দৃশ্য

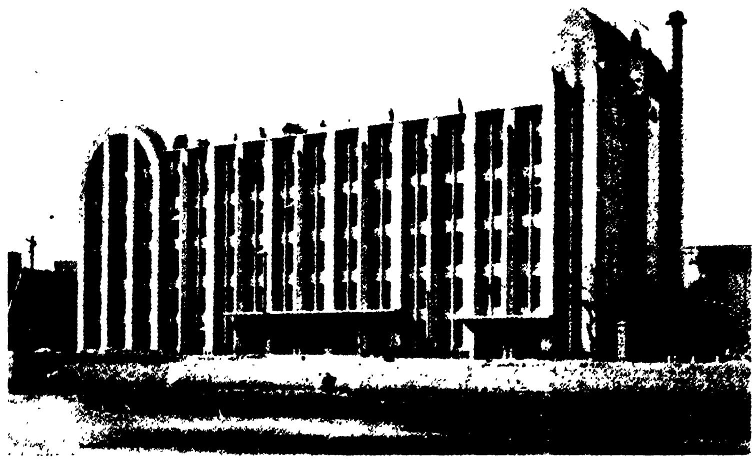


টোকিওর নদীর উপরিস্থিত বৃহৎ সেতু

করিয়া থাকে। পর্ব্বত জাপানীর কল্পনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কোরিয়া ও চীনের পর্ব্বতমালা যেমন বৃক্ষলতাদিবর্জ্জিত এবং উলঙ্গ, জাপানের উচ্চভূমি বা পাহাড়গুলি তেমন নহে। প্রত্যেক পাহাড়ই বৃক্ষাদি-সমাচ্ছন্ন। সাধারণতঃ বেউড় বাঁশের অরণ্যই অধিক। ইহাতে মেষপালের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে।

তবে এই সকল অরণ্য হইতে অর্থসমাগম হয়, বন্যার সময় নদীর বাঁধের কার্য্য করে। দীর্ঘ ও তৃণশ্যামল বৃক্ষগুলি মন্দিরগুলিকে অগ্নিভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।



আধুনিক টোকিওর অট্টালিকা

জনবহুল দেশসমূহের মধ্যে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা বনভূমিপূর্ণ। হোকাইডো নামক দ্বীপটি মূল্যবান্ বৃক্ষসমাকুল। ভল্লুকগণ এখানকার অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।



শিশু-পৃষ্ঠে জাপানী নারী

স্মরণাতীত কাল হইতে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, একটি বৃক্ষ কাটা হইলে, সেই স্থানে দুইটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে।

সর্ব্বত্র পর্ব্বতসমাকুল বলিয়া জাপানের নদীগুলি দীর্ঘ নহে, কিন্তু খরস্রোতা; সেজন্য বন্যার আশঙ্কা সকল সময়েই প্রবল থাকে। এই কারণ বশতঃ জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির পথে অনেক সময় ইহারা বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এজন্য জাপান বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া, নদীর স্রোতোবেগকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। সে জন্য প্রচুর শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে।

জলস্রোত হইতে জাপান বিদ্যুৎ সরবরাহের যে সুবিধা করিয়া লইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। এ বিষয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে। জাপানে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬ শত ৯টি আলো বিদ্যুৎ-শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার মোটর শ্রমশিল্পে ব্যবহৃত হয়—উহারাও বিদ্যুৎশক্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

জাপান ক্রমেই শিল্প উৎপাদনে মনোযোগ দিয়াছে। উহার জনসংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। মানুষের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বন্যায় যাহাতে শস্য নষ্ট হইতে না পারে, সে বিষয়ে জাপান বিশেষভাবে সচেষ্ট। অনুর্ব্বর ভূমিগুলিকে



বালকদিগের বন্দুক-চালনার শিক্ষা

উর্ব্বরা-শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য জাপান বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

যখন জুলাই ও আগষ্ট মাসে বর্ষা নামে—মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন বহু সহস্র সেতু প্রবল বন্যায় ধ্বংস হইতে পারে, হইয়াও থাকে। বাঁশের সেতু, কাঠের পুল, লৌহ-সেতু, প্রতি বৎসরই বন্যাপ্রবাহে নষ্ট হইয়া যায়; রেল-চলাচলেও বাধা ঘটে। এজন্য জাপান সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বাৎসরিক ক্ষতি বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

জাপানের হ্রদগুলি অপূর্ব্ব উৎপাদক। তন্মধ্যে বিউয়া হ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিউয়া হ্রদ দেখিতে পরম রমণীয়। এখানে আসিলেই মন আপনা হইতে কবিত্ব-মাধুর্য্যে অভিভূত হয়। প্রকৃতি এখানে মুক্ত হস্তে সৌন্দর্য্য-সম্ভার বিলাইয়া দিয়াছেন। বিউয়া হ্রদ ২ শত ৬০ বর্গ-মাইল-ব্যাপী। চুজেনজি, আশি-নো-কো নামক দুইটি হ্রদও দর্শনীয়। প্রথমটি নিক্কোতে অবস্থিত। দ্বিতীয়টি হাকোনএ বিদ্যমান।

জাপানী সাহিত্য, কবিতা, প্রবাদ-বাক্য-সকল বিষয়েই সমুদ্রের উল্লেখ আছে। সামুদ্রিক মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জাপানে কিছুকাল হইতে মুক্তা-চাষের চেষ্টা চলিতেছে। জাপান ইহাতে অনেকটা সাফল্যলাভও করিয়াছে। যাহারা মুক্তার সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া শুক্তি তুলিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অধিক। জাপানী নারীরা এ বিষয়ে অগ্রগণ্যা। পুরুষের তুলনায় তাহারা অনেকক্ষণ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে।

হ্রদ ও নদীতে মাছ ধরিবার সময় জাপানীরা একজাতীয় শিকারী পক্ষীর সাহায্য লইয়া থাকে। রাত্রিকালে এই সকল পাখীকে দড়ি বাঁধিয়া জলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মৎস্য-শিকারপ্রিয় পাখীগুলির গলদেশ এমন-ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, শিকার ধরিলেও, তাহারা মৎস্যগুলিকে ভক্ষণ করিতে পারে না।

জাপানীদিগের ধমনীতে অনেকগুলি জাতির রক্তধারা প্রবাহিত। ইতিহাসে দেখা যায়, ৪টি শক্তিশালী জাতি জাপান অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান জাপজাতির উদ্ভব। আইনিউ, মালয়, সেমিটিক এবং মাঞ্চু এই ৪টি প্রধান জাতির সমন্বয়ে জাপজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাপানীরা এত খর্ব্বকায় কেন? সমগ্র পৃথিবী এ বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত। জাপানীদিগের দন্তই বা এমন সম্মুখদিকে ঠেলা কেন? উহা কি শুধু প্রকৃতির খেয়াল? মিঃ



মার্কিণ কন্‌সল-জেনারেলের সমাধি-ক্ষেত্র

উইলিয়ম জুলিয়ট গ্রিফিস্ অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল জাপানী চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া জাপানী মাতারা সন্তানকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া বেড়াইত। শিশু মাতৃপৃষ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্রাম করিত। পৃষ্ঠদেশে পুঁটলীর মত সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকাতে শিশু হস্তপদ নাড়িতে পারিত না; কাযেই স্বাভাবিক-ভাবে রক্তসঞ্চালন শিশুদেহে হইত না। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যবস্থায় শিশুর প্রতিপালন চলিত। ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু মাতৃপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে নামিতে পাইত না। মুখমণ্ডলের ব্যায়াম—ওষ্ঠাধরের ব্যায়াম না ঘটায় ক্রমেই জাপানী মুখমণ্ডল বিকৃত আকার ধারণ করিত।

কিন্তু জাপান তাহার ত্রুটি-সংশোধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। সামরিক বিভাগের চিকিৎসকের বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে, অল্পদিনের মধ্যেই জাপান তাহার শারীরিক খর্ব্বতা দূরীভূত করিবার জন্য কিরূপ প্রচেষ্টা করিতেছে। সরকারপক্ষও এজন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া থাকেন।

জাপান যে ভাবে আকারের দীর্ঘতাসম্পাদনে, নব নব ব্যায়াম দ্বারা জাতিগঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর এক পুরুষের পরই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার জাপানী নর-নারী অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শুধু আকারে নহে, দেহসৌষ্ঠবেও জাপানী ক্রমেই উন্নতিসাধন করিতেছে। অনেকের মুখকান্তি সুন্দর ও



পার্ব্বত্য নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু

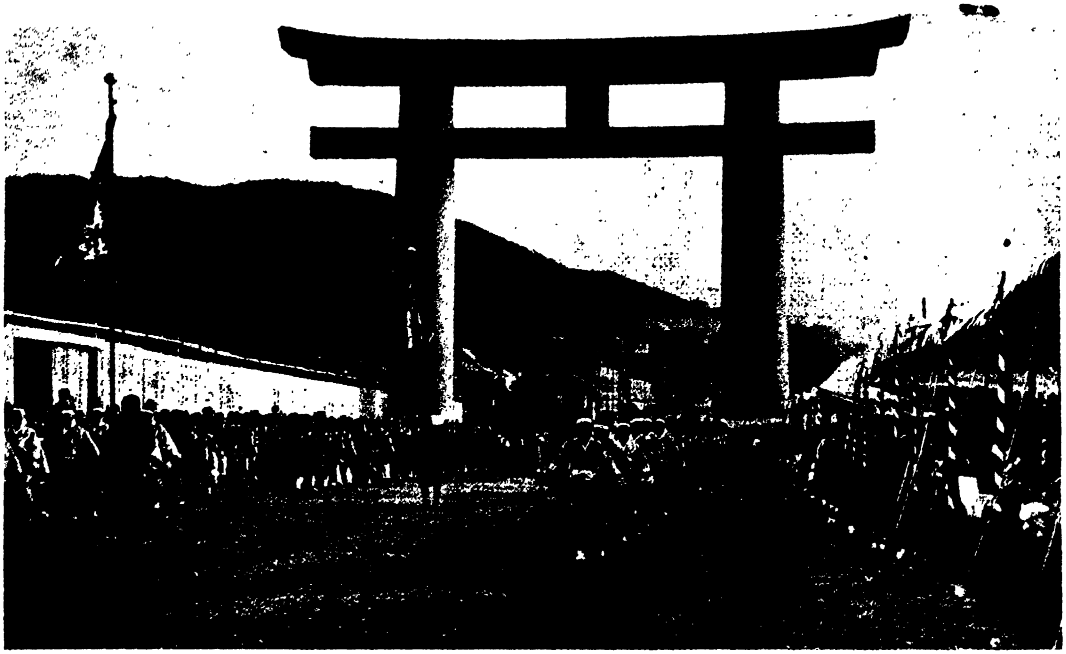
সুশোভন হইয়া উঠিয়াছে। জাপান সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার অভাব ও ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট। এমন শ্রমশীল, উৎসাহী, অদম্য শক্তিবিশিষ্ট জাতি পৃথিবীতে কমই আছে।

জাপানীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ অনেক দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। কামাডর পেরীর অভিযানের পর হইতেই জাপানীরা আপনাদের অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে পারিয়াছিল। শিক্ষা—অবাধ শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত, জাতিকে বিজয়ী করিয়া তুলা সম্ভবপর নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই জাপান আপনাকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। চীনের সহিত সামান্য পরিমাণ ব্যবসা করা ছাড়া তখন বৎসরে



জাপানী তরুণীরা ফুলের তোড়া রচনা করিতেছে



উৎসবক্ষেত্রে জাপানী কৃষককুল

একখানি কি দুইখানি জাহাজ য়ুরোপে যাইত। তখন দেশীয় জঙ্ক ব্যতীত জাহাজের সংখ্যাও বেশী ছিল না।

কিন্তু এখন? জাপানে এখন ছোট, বড়, মাঝারি ১ হাজার ৪ শত ৬৩টি বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪১টি বন্দরে বৈদেশিক জলযান থাকিতে পারে। জাপান এখন বাণিজ্যে অসাধারণ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। আধুনিক জাপানী ডকে শুধু বাণিজ্য-পোত নহে, বহু মানোয়ারী জাহাজ শোভা পাইতেছে।

পূর্ব্বে পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ অথবা মুক্ত করিয়া আরোহীরা বড় বড় সহরের রাজপথে গতায়াত করিত। বেহারারা পাল্কী বহিয়া বেড়াইত। গাড়ী যাহা ছিল, তাহার বাহন মানুষ। কিন্তু এখন টোকিও বা ওসাকার পথ চলাই দায়। যে কোনও মুহূর্ত্তে মানুষ মোটর, লরী বা বাস্ চাপা পড়িয়া মরিতে পারে। বিদ্যুৎশক্তিচালিত যানেরও অভাব নাই।



বালিকাদিগের বলখেলা

গত ৫০ বৎসরে জাপান শ্রমশিল্পে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা পরী-কাহিনীর মতই বিস্ময়কর। জাপানের জনসংখ্যা এখন দ্বিগুণিত হইয়াছে। প্রাচীন রীতিনীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নারী সেখানে উপেক্ষিতা



তুলির সাহায্যে জাপানী তরুণ-তরুণীরা লিখিতে শিখিতেছে

নহে; পুরুষের ন্যায় তাহার সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের নারী শুধু গৃহকার্য্য লইয়াই থাকিত। এখন তাহারা পুরুষের ন্যায় শিক্ষার অধিকারিণী। তাহা ছাড়া শ্রমশিল্পেও নারীর বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে। ওসাকা সহরে এই দৃশ্য বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে জাপানে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইত না, যেমন, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, মুক্তা, ঘড়ি, পকেট-ঘড়ি, ঔষধ, কাগজ এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ—ইদানীং জাপান তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। রেশম, চা, ধাতব-দ্রব্যাদি এখন অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে।

গত ৩০ বৎসরে দেশীয় তরুণ-তরুণীরা এমন ভাবে শিক্ষা পাইয়াছে যে, প্রায় কোনও বিদেশীর সাহায্য লইয়া জাপানকে কোনও কায করিতে হয় না। সভ্যতা-বিস্তারে জাপানী নর-নারীরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। এঞ্জিনিয়ারীং ও সামরিক ব্যাপারে জাপান এখন পর-মুখাপেক্ষী নহে।

সমগ্র দেশে অধুনা শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। খাটি জাপান বলিতে যাহা বুঝায়, তথায় ৫টি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়



টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়



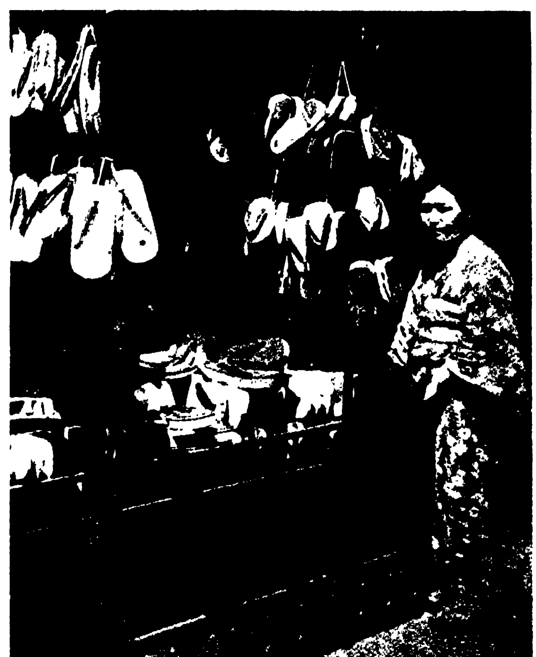
বেসবল ক্রীড়া

আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব জাপানকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা জাপানকে অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা জানেন, পশ্চিমের খৃষ্টধর্ম্মানুসারে জাপান চলিবে না। সেখানে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই দেখা দিবে। জাগ্রত জাপান সেইভাবেই আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছে। তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় তুলনা-রহিত।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও আছে। শ্রমশিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রচুর। প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গণনা করা যায় না।

জাপানীদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি, মৌলিক গবেষণা-শক্তি আছে কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। জাপানীরা এ বিষয়ে এত দিন মন দিবার অবসর পায় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকার এ দিকে অবহিত হইয়াছেন। জাপান এত দিন অনুকরণে অভ্যস্ত ছিল; এখন সে অনুকরণ ত্যাগ করিয়া উদ্ভাবনায় মন দিয়াছে।

জাপানের সৃষ্টি-শক্তি আছে। জাপান তাহার পরিচয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জাপানীরা বহু উন্নতি করিয়াছে। তাহারা আরও উন্নতিসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর। অনুকরণ-প্রিয়তা থাকিলেও, তাহারা আপনাদের উপযোগী না করিয়া কোনও জিনিষ গ্রহণ করে না। ইহা উন্নতিশীল জাতির পক্ষে একটা অসাধারণ গুণ।



জাপানী জুতার দোকান

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ



বৃটেন ও সোভিয়েট রাসিয়া

রাসিয়ান সোভিয়েট সরকারের সহিত বৃটেনের মনোমালিন্য ও সন্ধিবিচ্ছেদ একাধিকবার হইয়া গিয়াছে। তবে জিনোভিয়েফ-ঘটনার সম্পর্কে শেষ বিরোধের পর উভয়ের মধ্যে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার এক ঘটনার ফলে সেই সম্বন্ধও বুঝি ঘুচিয়া যায়। অন্ততঃ আপাততঃ অবস্থা যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাসিয়ার মস্কৌ সহরে মেট্রোপলিটান ভিকার্স কোম্পানীর কয় জন বৃটিশ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ঠিক কি কারণে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে রাসিয়ান সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহারা গুপ্তচরের কার্য্য করিতেছিলেন ও সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এইরূপ একটা কথার আভাস পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উভয় সরকারের মধ্যে পত্র ও মতের আদান-প্রদান হইয়াছিল। মস্কৌ সহরের বৃটিশ দূত এই গ্রেপ্তার সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে সোভিয়েট সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, ধৃত ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্রী। বৃটিশ দূত সেই অভিযোগ হাস্যকর বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরন্তু তিনি জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট সরকারকে এই মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়া লইতে হইবে। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে অ্যাংলো-রুস বাণিজ্য-সন্ধি আর পুনরায় ঝালাইয়া লওয়া হইবে না, আর তাহা ছাড়া বৃটেনের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক-বন্ধনও ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইবে। আগামী ১৭ই এপ্রেল পর্য্যন্ত বাণিজ্য-সন্ধির চুক্তি চলিবে, তাহার পর উহা নূতন করিয়া ঝালাইতে হইবে, নতুবা আপনিই খসিয়া যাইবে।

সোভিয়েটের বৈদেশিক সচিব মুসিয়ে লিটভিনফ জবাব দিয়াছেন যে,—ভিকার্স কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এমন অপরাধ করিয়াছে, যাহাতে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং সরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পরীক্ষা করা সরকারের কর্ত্তব্য। এমন ঘটনা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ প্রভাবিত হইবে কেন? এ সকল রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা কোম্পানীর ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিতে গেলে চলিবে কেন? রীতিমত প্রমাণ না থাকিলে এই ধরপাকড় হইত না। যদি ধৃত ব্যক্তিরা নিরপরাধই হয়, এবং বৃটেন যদি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন, তবে ধৃত ব্যক্তিদের ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের এত আতঙ্ক কেন? ধৃত ব্যক্তিরা স্বয়ং যে বিবৃতি দিয়াছে এবং তাহাদের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও বৃটেন সোভিয়েট সরকারকে তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বলিতেছেন। ইহার অর্থ কি? তবে কি বৃটিশ প্রজা রাসিয়ার মধ্যে অপরাধ করিলেও তাহার বিপক্ষে অভিযোগ ও দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে না বলিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন? কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন, কোনওরূপ ভয় প্রদর্শন অথবা চাপ, সোভিয়েট সরকারকে বৃটিশ প্রজার সুবিধার জন্য আইনের ন্যায্য গতির মোড় ফিরাইতে জোর করিয়া বাধ্য করিবে না।

এ বড় শক্ত ঠাই! জিনোভিয়েফ ঘটনাকালেও বৃটেন এই রকম একটা হুমকি দিয়াছিলেন। সেবারেও সোভিয়েট নরম হন নাই, এবারেও তাই। তাঁহারা বৃটেনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ধৃত বৃটিশ প্রজাদের তাঁহাদের সুপ্রিমকোর্টে বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিতে হইলে কেবল সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটাইলে হইবে না, তাহার উপর শক্তি-প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইবে। এই অর্থসঙ্কটের দিনে বৃটেন কি ততদূর অগ্রসর হইবেন? মনে ত হয় না। বিশেষতঃ বৃটেনের রাজপুরুষরা এখন জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জেনিভার শান্তি-বৈঠকে অস্ত্র-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য মনে হয়, হুমকি কেবল কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

রাজানুগত্য শপথ

আইরিশ সেনেটে রাজানুগত্য শপথ বিল নামঞ্জুর হইয়াছে। হইবারই কথা। কেন না, 'ডেলে' উহা পাশ হইলেও সেনেটে কসগ্রেভের দলের প্রাধান্য হেতু উহার পাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মিঃ ডি ভ্যালেরার পক্ষে ১৬ ভোট ও মিঃ কসগ্রেভের পক্ষে ২৪ ভোট হইয়াছিল।

কিন্তু এখনও সমস্যার অবসান হয় নাই। আইরিশ শাসন-তন্ত্রের আইনের একটা ধারা অনুসারে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, যদি ডেলে গৃহীত কোন বিল সেনেট ২ শত ৭০ দিনের মধ্যে পাশ না করেন, তাহা হইলে উহা ডেল ও সেনেট, উভয়ত্রই পাশ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমানে আইরিশ ফ্রিষ্টেটে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, তাহারও ধারা এইরূপ; বরং ইহা হইতে আরও সোজা। এই ধারা অনুসারে বিল সেনেটে উপস্থিত করিবার ৬০ দিন পর হইতে পাশ না হইলে আপনা আপনিই পাশ হইয়া যাইবে। রাজপ্রতিনিধিও (গভর্ণর জেনারল) উহাতে অনুমতি না দিয়া পারেন না। ১৯২২ খৃঃ যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত

ছিল, তাহার নিয়মের এক ধারা অনুসারে রাজপ্রতিনিধি অনুমতি প্রদান করিতে বা না করিতে পারিতেন ; তবে এ বিষয়ে তাঁহাকে কানাডার প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মে রাজপ্রতিনিধি তাঁহার শাসন-পরিষদের অনুমতি ব্যতীত বিলপাশে অনুমতি দিতে বা না দিতে পারেন না। বর্ত্তমানে আইরিশ ফ্রিষ্টেটের গভর্ণর জেনারলের শাসন-পরিষদ বলিতে মিঃ ডি ভ্যালেরাকেই বুঝায়। সুতরাং সেনেট বিল পাশ না করিলেও বিল তুইমাসে পাশ হইয়া যাইবেই। ডি ভ্যালেরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "বৃটিশ সরকার যদি মনে করেন যে, এই বিল পাশ হইলে অ্যাংলো-আইরিশ সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইবে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ন্যায়বিচারের যে স্থায়ী সালিস আদালত আছে, তাহার সকাশে তাঁহারা এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।"

ব্যাপারটা তাহা হইলে কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতেছেন।

অস্ত্র-সঙ্কোচ

জেনিভার বৈঠকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড অস্ত্র-সঙ্কোচের যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, তাহাতে য়ুরোপের সকল জাতিরই সৈন্য হ্রাস করিবার এবং ট্যাঙ্ক ও বৃহৎ কামানের আকার হ্রাস করিবার কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অস্ত্র-সঙ্কোচের সন্ধি ৫ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে। ঐ ৫ বৎসর একটি স্থায়ী অস্ত্রসঙ্কোচ কমিশন বসিবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পরিকল্পনার ব্যবস্থা অনুসারে রাসিয়া ৫ লক্ষ, ফরাসী ৪ লক্ষ, ইটালী আড়াই লক্ষ, পোলাণ্ড আড়াই লক্ষ এবং জার্ম্মাণী ২ লক্ষ সৈন্য রাখিতে পারিবে। ইংলণ্ডের কথা ইহাতে নাই ; কেন না, ব্যবস্থা হইতেছে য়ুরোপের কন্টিনেণ্ট সম্বন্ধে।

কিন্তু এ ব্যবস্থায় জার্ম্মাণী সন্তুষ্ট হইবে কি ? বর্ত্তমানে নাৎসী দলপতি হিটলার যেরূপ সমর-উৎসাহ দেখাইতেছেন এবং আবার জার্ম্মাণীকে য়ুরোপে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি কি প্রতিবেশী 'বন্ধু' ফরাসীর একার্দ্ধ সৈন্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন, না উহাতে সম্মত হইবেন ? তাহা ছাড়া পোলাণ্ডের মত একটা নিম্নশ্রেণীর রাষ্ট্রের আড়াই লক্ষ সৈন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে জার্ম্মাণী কি আপনার তুই লক্ষে কখনও রাজী হইবেন ? ইহাতে কি জার্ম্মাণীর জাতীয় আত্মসম্মান আহত হইবে না ?

তাহার পর মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ফ্রান্স, জাপান, ইটালী, রাসিয়া, মার্কিণ যুক্তরাজ্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকের উর্দ্ধসংখ্যায় ৫ শত খানি রণবিমান রাখিবার অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে জার্ম্মাণীর নামই নাই! সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এখনও মিত্রশক্তিদের গড়া ভার্সাইল-সন্ধি জার্ম্মাণীকে মানিয়া চলিতে হইবে। ঐ সন্ধি অনুসারে যুদ্ধার্থে জার্ম্মাণী বিমান প্রস্তুত করিতে পারে না। হিটলার এই সর্ত্ত এখনও মানিয়া চলিবেন, এ আশা তুরাশা বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পরিকল্পনা যে একটি অশ্বডিম্ব প্রসব করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই! আসল কথা, যত দিন সাম্রাজ্যবাদ এবং পররাজ্যলিপ্সা ও তুর্ব্বলের উপর প্রভুত্বের প্রবৃত্তি শাসনা জগৎ হইতে অন্তর্হিত না হয়, তত দিন এই সব বৈঠক নাট্যকে প্রহসনই রহিয়া যাইবে!

প্রাচ্যে অশান্তি

চীন, জাপান, ভারতবর্ষ,—সর্ব্বত্রই শান্তি কোথাও নাই। চীন-জাপানের সংঘর্ষ ও মনোমালিন্যের ফলে প্রাচ্যের অশান্তিটা যেন খুবই বাড়িয়াছে। জাপান এইবার সত্যসত্যই সরকারিভাবে জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। জাতিসঙ্ঘের সংস্রব ত্যাগ করার কৈফিয়তে জাপ সরকার অনেক দুঃখে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"তাঁহাদের কোন দোষ নাই, জাতিসঙ্ঘের ব্যবহারে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংস্রব ত্যাগ করিতে হইল। জাপান প্রাচ্যে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া জাতিসঙ্ঘ জাপানের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।" জাতিসঙ্ঘ বোধ হয় এত দিনে সমকক্ষ রাজনীতিকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাদেরই শেখান বিদ্যায় শিক্ষিত জাপান বলিতে পারেন যে, জাতিসঙ্ঘ প্রতীচ্যে যেমন ভগবানের মনোনীত-রূপে জগতের সর্ব্বত্র নাবালক জাতির অভিভাবকরূপে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন,জাপানও তেমনই তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্যরূপে প্রাচ্যের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন। জাতিসঙ্ঘ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানকে অভিভাবকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, জাপান তাহা সহ্য করিবেন কেন? কাযেই জাপানের আর জাতিসঙ্ঘের সংস্রবে থাকাই উচিত নহে।

এপিঠ আর ওপিঠ। তবে প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যিকতার এবং জাপানের সাম্রাজ্যিকতার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। বর্ত্তমানের জগদ্-ব্যাপী অর্থসঙ্কট জাপানকে অতিমাত্রায় আঘাত করিয়াছে। ইহার ফলে জাপানী শ্রমিকদেরই প্রধানতঃ এই তুরবস্থার ভার বহন করিতে হইতেছে। জগতের অন্যান্য ব্যবসায়ীর প্রস্তুত পণ্যের সহিত সস্তার প্রতিযোগিতায় জাপান অদ্ভুত কৌশল ও কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাতে শ্রমিকদের সুখ-তুঃখ সুবিধা-অসুবিধার মুখ চাওয়া হয় নাই। জাপানী শ্রমিকদের বর্ত্তমান বিষম তুর্দ্দশার ইহাই মূল কারণ। জগতের বাজারে মালের কাটতি হু হু কমিয়া গিয়াছে, অথচ পণ্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে প্রচুর। উহা বিক্রয় হইলে অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব, এই আশায় জাপানী শ্রমিকরা শ্রমের পুরস্কারের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আশায় তাহারা নিরাশ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আর পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন নাই বলিয়া বহু শ্রমিক বেকার বসিয়া আছে। কৃষিজ পণ্যের বাজার-দর অপ্রত্যাশিতরূপে পড়িয়া যাওয়ায় গ্রাম্য কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয়, তাহাদের উপবাস করিতে হইতেছে!

শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের এই কষ্ট হইতে মন অন্য খাতে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট দেশ-প্রেমের নামে অন্যত্র রাজ্যবিস্তারের অনুকূল যুদ্ধ বাধাইয়াছেন।

ইহাতে অসন্তুষ্ট সোসালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, সাম্রাজ্যিকতা-বিরোধী, বিপ্লবী, শিক্ষিত, কৃষকসভা, শ্রমিক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-সমূহের দৃষ্টি অন্যথাতে পরিচালিত হওয়ায় তাহারা দেশের সম্মান-রক্ষায় মাতিয়া উঠিয়াছে, এবং মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধ দেশরক্ষার যুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাই হইল জাপানের বর্ত্তমান সামরিক মনোবৃত্তির মনস্তত্ত্ব! ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জাপানের বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার স্থান সঙ্কুলান করা এবং মাঞ্চুরিয়ার ভূমিজ ও বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা ও মাঞ্চুরিয়ার বাজারে জাপানী মাল কাটাইবার সুযোগ গ্রহণ করাও অন্য উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণীর নবজীবন

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রেও হিটলার ডিক্টেটররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে তাঁহার সহিত রুজভেল্টের প্রভেদ আছে। রুজভেল্ট স্বদেশের আর্থিক দুরবস্থার অবসান করিতে অপ্রতিহত ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু হের হিটলার ধূলাবলুণ্ঠিত জন্মভূমির নষ্টগৌরব উদ্ধারের জন্য কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি ইটালীর মাসোলিনি অথবা রাসিয়ার লেনিন বা ষ্টালিনের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য।

এডলফ হিটলার এক অখ্রিয়ান কাষ্টম কর্ম্মচারীর সন্তান। এই অনাথ বালক প্রথমে এক গৃহাদি-নির্ম্মাতা ইঞ্জিনিয়ারের এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধে তিনি দেশের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ল্যান্স-করপোরালের পদ পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি মাসোলিনির মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। জন্মভূমির পতন, ভার্সাইল সন্ধির অপমানকর সর্ত্ত, জার্ম্মাণ জাতির লুপ্ত গৌরব ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তিনি জন্মভূমির মুক্তিসাধনের দৃঢ়সঙ্কল্প পোষণ করিতেন। তিনি সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাঁহারা দেশের শাসনযন্ত্রের কর্ণধার, তাঁহারা দেশের গৃহবিবাদ, অনৈক্য, ও দুর্দ্দশা ত ঘুচাইতে পারেন নাই, পরন্তু বাহিরের ভাগ্য-নিয়ন্তাদের নিকট কেবল কান্নাকাটি আর আবেদন-নিবেদন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, দেশকে যে আবার কোনকালে জগতে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথা তাঁহারা একবারও ভাবেন নাই।

মাসোলিনিই তাঁহার গুরু। জার্ম্মাণ যুদ্ধ অবসানের পর যখন প্রবল মিত্রশক্তিরা ভাগাভাগির সময় ইটালীর প্রতি অবিচার করেন, তখন মাসোলিনি তাঁহার মন্ত্র ফাসিজম ও তাঁহার অনুচর 'কালো কোর্ত্তাদের' (Black shirts) লইয়া দেখা দেন। সে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহারই ১১ বৎসর পরে ১৯৩৩ খৃ. হিটলার, তাঁহার মন্ত্র জন্মভূমির মুক্তি এবং তাঁহার অনুচর 'কটা কোর্ত্তা (Brown shirts) অথবা ন্যাশানাল সোশ্যালিষ্টদের লইয়া জার্ম্মাণ রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে হিটলার মাত্র ৭ জন অনুচর লইয়া তাঁহার দল গঠন করেন। আর আজ ? আজ 'হিটলারাইটসদের' সংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষেরও অধিক, পরন্তু হিটলার স্বয়ং জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের চ্যান্সেলার, নিয়ামক, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আর জার্ম্মাণ রীচে (পারলামেণ্টে) হিটলারের রাজনীতিক দলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল!

হিটলার কঠোর হস্তে সোসালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও ইহুদীদের শাসন করিয়াছেন। বহু লোক ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছে, বহু লোক নিহত হইয়াছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও জার্ম্মাণ জাতি আজ তাঁহার নামে উন্মত্ত হইতেছে কেন, তাঁহার আদেশপালনে বিমুখ হইতেছে না কেন ? তাঁহার ফ্যাসিষ্টরা জার্ম্মাণীতে 'নাজী' বলিয়া পরিচিত। এই নাজীদের অত্যাচারের কথায় কাণ পাতা যায় না! অথচ জার্ম্মাণ জাতি নাজীদের সমর্থন করিতেছে কেন ? ইহার মূলে আছে,—দেশপ্রেম, জাতির গৌরব!

'রীচের' উদ্বোধনের দিন হিটলার চ্যান্সেলাররূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে আছে :—"জার্ম্মাণ জাতি আপনার দুর্ব্বলতার জন্য আপনাদের অধিকার ও স্বার্থ দাবী করিতে পারে নাই। তাহারা আপন অবস্থা প্রতীকারের জন্য আকাশের তারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, পায়ের তলার জমীর কথা বিস্মৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণরা তাহাদের পুরাতন মিলিত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজনীয়তার কথাও ভুলিয়াছে। এখন একমাত্র উপায় আছে। জার্ম্মাণ ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট জাতির পুনর্গঠন করিতে আজ হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছে। আমরা আশা করি, দেশের সমস্ত রাজনীতিক দল দলাদলির প্রবৃত্তি পরিহার করিবেন। আমরা চাই একতার প্রবৃত্তি। আমরা চাই জার্ম্মাণীর জীবন। আমরা চাই জার্ম্মাণীর জাতীয়তা!"

হিটলার চারি বৎসরকাল নিয়ামক থাকিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি এই সঙ্কল্প লইয়া কঠোরহস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। দেশের স্বার্থে অন্য সকল ছোট স্বার্থই তিনি বলি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। দেশের অভ্যন্তরে একতা, অর্থ-স্বচ্ছলতা ও শান্তিস্থাপন তাঁহার কার্য্যসূচির একাঙ্গ, ভার্সাইলের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ শক্তিগণের মধ্যে জার্ম্মাণীর স্থান করিয়া লওয়া উহার অপর অঙ্গ। এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হন, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

অন্যদিকে ফরাসী ও পোলাণ্ড জার্ম্মাণীর এই নূতন চালে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে। যদি আবার কাইজার ও হোহেনজোলারণ রাজবংশ ফিরিয়া আসে ? যদি নিরপেক্ষ অঞ্চলের সহরগুলি আবার জার্ম্মাণী অধিকার করিয়া লয় ? যদি জার্ম্মাণী পোলাণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ? ফরাসী পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। জার্ম্মাণ সীমানা হইতে ৭০ মাইল দূরে "নানসি" অঞ্চলে ফরাসী সৈন্য কুচকাওয়াজ করিতেছে, রণসাজে সাজিতেছে, এ খবরও প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারী সহরের সংবাদপত্র 'একো দে প্যারী' লিখিয়াছেন,—এ সময়ে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের কথামত ফরাসী জাতি যেন অস্ত্র সংবরণ না করে। কেন না, জার্ম্মাণ জাতি আবার রণসাজে সাজিতেছে। উহাদের বিমানবাহিনী ফরাসীকে ঘুমাইতে দেখিলেই দুই ঘণ্টার মধ্যে প্যারী আক্রমণ করিতে পারে।

এ সকল দেখিয়া ফরাসীর ভাবগতি ভাল নহে বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং য়ুরোপে যে আবার যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশের রণভেরী বাজিয়া উঠিতে পারে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সর্ব্বত্রই ডিক্টেটর

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের মত গণতন্ত্র-শাসন অন্য কোন দেশে প্রচলিত নাই বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু সে দেশেও মিঃ রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট-পদে বসিবার পরেই ইটালীর মাসোলিনির মত ডিক্টেটার হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কুলিজ ও হুভার গভর্ণমেণ্ট গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। দেশের দারুণ অর্থসঙ্কট, টাকার বাজারের গোলমাল এবং বেকার-সমস্যার কোন সমাধানই এ যাবৎ হয় নাই। কত ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে, কত কলকারখানা বন্ধ হইয়াছে, কত কৃষাণ সর্ব্বস্বান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? তাহার উপর বার বার বেকারদের অভিযান। উহাতে গুলী চালাইতেও হইয়াছে, মানুষ হতাহতও হইয়াছে। য়ুরোপের নিকট সমর-ঋণের টাকা আদায়ে বিষম বাধা পাইতে হইয়াছে।

এই অবস্থার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ডিক্টেটাররূপে অপ্রতিহত ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছেন। প্রথমেই তিনি মার্কিণ কংগ্রেসকে দিয়া তাঁহার Economy Bill পাশ করাইয়া লইয়াছেন। শাসনযন্ত্র প্রায় অচল হইয়াছিল, এই আইন দ্বারা তাহা সাময়িকভাবে সচল করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর বেকারদের জন্য ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে মার্কিণ রাষ্ট্রে ১ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেকার আছে বলিয়া শোনা যায়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেস ও সেনেটকে দিয়া এমন আইন পাশ করাইতেছেন, যাহার ফলে তড়িঘড়ি এই সকল বেকারের অন্নসংস্থান হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হওয়ার আশা নাই। উহার ফলে আপাততঃ আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ বেকার পথ-নির্ম্মাণে, বনবিভাগে এবং সাধারণের অনুরূপ সেবাকার্য্যে (public utility services) কাজ পাইবে।

কিন্তু দেড় কোটি বেকারের মধ্যে মাত্র তিন লক্ষ বেকারের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া কি সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর তুল্য নহে? মহাযুদ্ধের ফলে প্রতীচ্যের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই জানা যায়। সকল দেশেরই এই দুরবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ-মারা অস্ত্র বা বাষ্প আবিষ্কার করায় বাহাদুরী এই-টুকু মাত্র? অথচ কেন যে যুদ্ধ বাধিল, তাহা কেহ জানে না। এখন প্রায় সকল দেশের মনীষীদেরই অভিমত এই যে, জগতের financiers, capitalists ও Bankersরাই যুদ্ধ ঘটাইবার মূলে ছিল নতুবা ইহাতে দেশপ্রেম, দেশরক্ষা, জগতের ছোট দুর্ব্বল জাতিকে রক্ষা করা, বা জগৎকে গণতন্ত্রের উপযোগী করিবার জন্য নিরাপদ করা, প্রভৃতি লম্বাচৌড়া কথার নামগন্ধও ইহাতে নাই!

বলশেভিকদের ব্যবহার

রাসিয়ার বলসেভিকদের বিপক্ষে মিত্র শক্তিরা প্রবল প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন, এখনও সুযোগ পাইলেই যে চালান না, তাহাও নহে। বলসেভিকরা নররাক্ষস, সমাজের ওলট-পালোট করিয়া ধ্বংসনীতি চালাইতেছে,—এই কথাই প্রচারিত হইয়াছে। যাহারা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ারের The spy অথবা 100 p. c. patriot গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, মার্কিণ মুল্লুকেও কি ভাবে বলসেভিকদের বিপক্ষে মিথ্যা প্রচার চলিয়া থাকে। জগতের ধনী মহাজন ব্যাঙ্কার ফিনান্সিয়াররা যে ইহার মূলে আছেন, লেখক ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট নেলস্ একারম্যান চরিত্রই ইহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বস্তুতঃই কি বলসেভিকরা রাক্ষস ও বর্ব্বর? রয়টার সম্প্রতি মস্কো হইতে একটি সংবাদ দিয়াছেন যে, মঙ্কহাউস নামক এক জন ইংরাজ রাজদ্রোহ অপরাধে তথায় ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি জেলে তাঁহার প্রতি অসাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। থাকিবার ঘরও যেমন ছিল বৃহৎ ও সুসজ্জিত, আহার্য্যও দেওয়া হইয়াছিল তেমনই প্রচুর ও স্বাদু। তাঁহার অপরাধের তদন্তও দীর্ঘ দিনব্যাপী হয় নাই। গ্রেপ্তার হইবার কয়েক দিন পরেই মঙ্কহাউসকে পুলিসের বড় কর্ত্তার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তিনিও অতিমাত্র ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে বলেন, "তদন্তের ফলে আমরা জানিয়াছি যে, আপনি নির্দ্দোষ ও সাধুপুরুষ। আপনি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।"

এই ব্যবহারের সহিত এখানকার ও অন্যান্য অনেক সভ্য দেশের পুলিসের ব্যবহারের তুলনা করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? বিশেষতঃ এই ভারতের? এখানে কোন কোন পুলিস ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। আর সাধারণের সহিত ব্যবহারে?—সে কথা না তোলাই ভাল। এদেশীয় হইলে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর সরকারী চাকরীয়ারাও কখনও এই শ্রেণীর পুলিসের নিকট কঠোর কথা ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা করিতে পারেন কি?

বর্ণভেদ

হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদই তাহাদের অধঃপতনের মূল, এই কথা প্রতীচ্যের "ভারতবন্ধুদে"র মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু বর্ণভেদ জগতের কোন্ জাতি যে মানেন না, তাহা ত জানা নাই। সকলেরই আছে, তবে পরস্পরের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। প্রতীচ্যের "শ্বেত" ব্রাহ্মণ এবং বাকী জগতের কালো, হলদে আর তামাটে শূদ্র,—এই দুই শ্রেণীর জাতির বর্ণভেদ নাই কি? তাহা ছাড়া, "শ্বেত"ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধনিক ও শ্রমিকের, অভিজাত ও শিল্পি-ব্যবসায়ীর মধ্যেও বর্ণভেদ আছে।

শ্বেত আর অশ্বেতের এমনই ভেদাভেদ যে, এক জন অন্য জনের অভিভাবক হয়, ভগবানের প্রেরিতরূপে অন্য জনের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকারের তারতম্য উভয়ের মধ্যে এত অধিক যে, তাহা অহরহ জাজ্বল্যমান। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। জার্ম্মাণ নাজীরা যখন ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিল, তখন চারিদিকে সোসালিষ্ট কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিরাট নির্য্যাতনের অভিযান চলিল। কত সোসালিষ্ট কম্যুনিষ্ট ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হইল অথবা নিহত হইল। ঐ সঙ্গে শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ার নামক একটি ভারতীয়ও ধরা পড়িলেন। তাঁহার কাছে কিছু কম্যুনিষ্ট সাহিত্য পাওয়া গিয়াছিল, ইহাই তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ। তিনি সেজন্য [illegible]

প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি বৃটিশ ভারতীয় প্রজা, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে শীঘ্র সুবিচারের ব্যবস্থা করা হইতেছে না কেন এবং বৃটিশ সরকার তাঁহার পক্ষ হইতে রাসিয়ার সোভিয়েট সরকারের সকাশে কেন শীঘ্র বিচারের দাবী করিতেছেন না, ইহাই প্রশ্ন। সরকার পক্ষে মিঃ ইডেন বলেন,"কোন জার্ম্মাণ বন্ধু মিঃ নাম্বিয়ারকে প্রত্যহ জেলে দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি বার্লিনের বৃটিশ দূতকে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ার বেশ সুস্থ আছেন!" বস্, ঐ পর্য্যন্ত। যেন এইটুকুই যথেষ্ট! বৃটিশ দূত নিজেও দেখেন নাই, তিনি পরের মুখে ঝাল খাইয়াই নিশ্চিন্ত। জিজ্ঞাস্য, যদি মিঃ নাম্বিয়ার কৃষ্ণবর্ণের না হইয়া শ্বেতবর্ণের হইতেন আর যদি তিনি প্রতীচ্যের কোন দেশে জন্মিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হইত?

ঠিক এই সময়েই রাসিয়ার কয় জন প্রবাসী ইংরাজ ধরা পড়েন। তাঁহারা মস্কৌএর কোন ইংরাজ ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী। তাঁহারা রাসিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করা অপরাধে অপরাধী। অপরাধ এইরূপ গুরু, অথচ বৃটিশ সরকার তাঁহাদের জন্য আকাশ-মেদিনী কাঁপাইয়া ফেলিলেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সহিত কড়া চিঠির আদান-প্রদান হইল। ভয় দেখান হইল যে, যদি ধৃত ইংরাজ বৃটিশ প্রজাদের অবিলম্বে বিচার করা না হয়, তাহা হইলে বাণিজ্য-সন্ধি ত ১৭ই এপ্রেল হইতে স্বতঃই বন্ধ হইয়া যাইবেই, অধিকন্তু রাজনীতিক সম্বন্ধও ঘুচাইয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য সোভিয়েট সরকার ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহারাও উহার কড়া জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, কাহারও হুমকি বা ভয়প্রদর্শনে সোভিয়েট সরকার কর্ত্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন করিবে না। বৃটিশ সরকার বৃটিশ শ্বেত প্রজার জন্য এত বিচলিত, অথচ কৃষ্ণকায় প্রজাদের কথাটা কাণেই তোলেন না, ইহা কেমন ন্যায়বিচারের পরিচয় দেয়? অথচ বৃটিশ শ্বেত প্রজাদের বিপক্ষে অভিযোগ রাজদ্রোহ, আর বৃটিশ কৃষ্ণকায় প্রজার বিপক্ষে অভিযোগ,—কেবল কম্যুনিষ্ট লেখা ঘরে রাখা!

ফরাসী ইন্দোচীন হইতে চারিজন চেটিয়ার ব্যবসায়ীকে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ঐ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদে এই সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। উহার ফলে জানা গিয়াছে যে, ভারতের বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারতীয় প্রজার স্বার্থের প্রতি এত সজাগ যে, পাছে ফরাসী কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় এই ভারতীয় প্রজার পক্ষ হইয়া কোন কথা ফরাসী সরকারকে নিবেদন করিতে সাহসী হন নাই! অথচ বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশানসের মধ্যে ভারতেরও সমান অংশীদারিত্বের অধিকার আছে! কথার ভাঁড়ামি কত রকমের হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় কি?

অস্ত্র-সঙ্কোচের মহিমাবোধ

বড় বড় শক্তিদের অস্ত্রসঙ্কোচ আড়ম্বরের অভিনয় দেখিয়া ছোট ছোট জাতিরা বাহিরে না হইলেও অন্তরে হাসিতেছে। এই ব্যাপারের ভিতরেও যে ফোঁপরা, তাহা বুঝিতে পারিয়াই তুর্কী তাহার দেশকে সুরক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইস্তাম্বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তুর্কী কর্তৃপক্ষ মর্ম্মর সাগরের তটে ঘিওলদ্জুক নামক স্থানে একটি নূতন দুর্গ ও একটি নৌসামরিক আড্ডা নির্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ স্থানেরই পার্শ্বে ফরাসী এঞ্জিনিয়াররা গোয়েবেন নামক সমরপোত সংস্কারের জন্য একটি জাহাজঘাটাই তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই গোয়েবেন জাহাজখানি ছিল জার্ম্মাণীর, মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগণকে বিশেষ বেগ দিয়াছিল। এখন ঐখানির মালিক তুর্কী। যাহা হউক, দুর্গ ও নৌসমর আড্ডা নির্ম্মাণ করিতে ৪০ লক্ষ তুর্কী-মুদ্রা ব্যয় হইবে, এইরূপ অনুমান। তুর্কীর আয় অধিক নহে। ইহা সত্ত্বেও যখন তুর্কী এইরূপ ব্যাপারে হাত দিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অস্ত্র-সঙ্কোচের প্রবৃত্তিটা সত্যসত্যই কিরূপ জাগিয়াছে!

প্রার্থী

করুণা কি হবে না আমারে
বুঝিবে না অন্তরের ব্যথা?
কেমনে নিবারি' বলো প্রভু
প্রাণ-ভরা এই আকুলতা?
পাবো তোমা কোন্ পুণ্য-ফলে—
সে কথা দেয়নি কেহ বলে'
তবু মন চায়, ও-চরণে ধায়—
ফেলো নাকো অবহেলে!
ঘুমাইয়া ছিনু আমি,
জানো হে জগৎ-স্বামি,—
অঘোর ঘুমেতে ছিনু অচেতন
ঘুম ভাঙ্গায়েছ তুমি!
পিপাসায় প্রাণ যায়—
[illegible]

আশার ছলনে শুধু ছুটে মরি—
এ কি হলো প্রভু দায়!
অকৃতী অধম হেরে
চরণে ঠেলেছো মোরে—
পতিতে তাজিয়া পতিত-পাবন
নাম লবে কার জোরে?
তব ধ্যানে নিমগন
বুঝেও বুঝে না মন—
মনে হয়, তুমি জনমে-জনমে
চির-সাধনার ধন!
অনিমেষ চেয়ে থাকি—
পালটিতে নারি আঁখি,—
তুলে লও প্রভু চরণে তোমার
[illegible]

জীবনের অবশেষে
কোথায় চলেছি ভেসে—
অকূল হইতে কূলে লয়ে চলো,
নয় ডুব পাবে শেষে!
বেশী কিছু নাহি চাই।
দূরে থাকো ক্ষতি নাই!
যেদিন ডাকের সময় আসিবে,
ডেকে যেন সাড়া পাই!
শেষ বিদায়ের দিনে,
এসে পথ দিয়ো চিনে।
একেলা পাঠাতে অজানার পথে,
ভয় রেখো মনে মনে!

শ্রীমতী ধরাসুন্দরী দেবী।

"মানবধর্ম্মে"র জন্মকথা

"বঙ্গ-বিদূষণ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "মানবধর্ম্মে"র একটু আভাস দিয়াছি। তার পর কমলা-কথক (lecturer)-রূপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদীর উপর বসিয়া এই ধর্ম্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং পুরা অধ্যাপকরূপেও যে তাহাই করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। গত ২৮শে কার্ত্তিকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা কাবো কারো কাছে শুনেছি, আমার বাণীতে আমি কেবল যে তাদের খুশী করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে, যাত্রাপথের পাথেয়রূপে তারা তার থেকে কিছু সংগ্রহ করেছে" (প্রবাসী, ১৩৩৯, চৈত্র, ৮০৮ পৃঃ)।

এই পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথ আর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি মনে করেন, এ দেশের কেহ যেন তাঁহার বাণীতে এ পর্য্যন্ত জীবনের অন্ন বা যাত্রাপথের পাথেয় পায়েন নাই। তিনি বলেন, "যে ভাষায় দেশের লোককে কিছু পথ্য দিতে পারতুম, সে ভাষা এবং উপযুক্ত ভঙ্গী আমার জানা নেই।" এই কথা পাঠ করিয়া মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন মনে করেন, তাঁহার ভাণ্ডারে বা তহবিলে দেশের লোকের জীবনের অন্ন এবং যাত্রাপথের পাথেয় আছে, বাহনের দোষে তাহা দেশের লোকের পেটে বা পকেটে পৌঁছিতেছে না। কিন্তু কয়েক পংক্তি উপরে রবীন্দ্রনাথ উল্টা কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি কৃপণ বলে দিইনে তা নয়, আমার হাতে তহবিল নেই বলে দেওয়া অসম্ভব। যারা দেয় তাদের চারিদিকে দলবল থাকে, দলবলের অভাবে আমি সকল কাজে অকৃতার্থ। ডাক্‌ব তাদের কী দিয়ে, খোরাক দেব কোথা থেকে? যে রঙে চোখ ভোলে তাতে তো পেট ভরে না। এই জন্যেই আমার দেশে আমি প্রায় একাই কাটিয়ে দিলুম জীবনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত।"

ধর্ম্ম আত্মার ক্ষুধার অন্ন এবং মহাযাত্রাপথের পাথেয়। এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদীর উপর বসিয়া রবীন্দ্রনাথ এই অন্ন এবং পাথেয় বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন বিচার্য্য, এই পথ্য এবং পাথেয় কি, এবং তাহা এ দেশের লোকের গ্রহণযোগ্য কি না।

এ দেশে একটা কথা আছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বৃদ্ধবয়সের জন্য। তাহার কারণ, মানুষের যত বয়স বাড়ে, তত মৃত্যু-চিন্তা বাড়ে, এবং মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হইবে, তাহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য মানুষ তত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অশুভের অভিজ্ঞতা এবং আশঙ্কা বাড়ে। অত্যাচারের অভিজ্ঞতা, মৃত্যুভয় এবং অশুভের ভয় মানুষকে ধর্ম্মে মতি দেয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মে এই সকল ভয়ের কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং তাহা নিবারণের কোন বিধিও নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে হিবার্ট-কথকরূপে প্রদত্ত "মানবধর্ম্ম" (Religion of man) নামক বক্তৃতামালার ষষ্ঠ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"Frankly, I acknowledge that I can not satisfactorily answer any questions about evil, or about what happens after death"

"আমি অকপটভাবে স্বীকার করিতেছি, অশুভ-সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের, বা মৃত্যুর পরে কি হয় এই বিষয়ক কোন প্রশ্নের, সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে পারি না।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম যে প্রবীণ লোকসমাজে বিশেষ আদর লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু যাহারা অশুভের সহিত সুপরিচিত নহে, এবং মৃত্যুভয় যাহাদের মনে এখনও স্থান পায় না, এমন তরুণ-তরুণীগণের মন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। এই আশায়ই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এত আগ্রহের সহিত পুনর্ব্বার কমলা-কথকের এবং পুরাদস্তুর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে এত কাল উদাসীন বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং এ দেশের তরুণ-তরুণীগণের হিতাহিত যাঁহারা চিন্তা করেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের আলোচনা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

অনেকের মতে ধর্ম্ম তর্কের বস্তু নয়, বিশ্বাসের বস্তু। ধর্ম্মে বিশ্বাস-অবিশ্বাস অনেক সময় মূলের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মের মূল দৃঢ় হইলে বিশ্বাসও দৃঢ় হয়; সুতরাং মানবধর্ম্মের মূল বা জন্মকথা প্রথম বিচার্য্য। হিবার্ট বক্তৃতামালার উপরি-উক্ত অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"I have already made the confession that my religion is a poet's religion. All that I feel about it is from vision and not from knowledge."

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ধর্ম্ম কবির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি যাহা আজ অনুভব করি, তাহা জ্ঞানের ফল নহে, অতীন্দ্রিয় পদার্থ দেখার ফল।"

রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতামালার (Religion of man এর) ষষ্ঠ অধ্যায়ে "মানব-ধর্ম্মের" জন্মকথা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়টির নাম Vision; রবীন্দ্রনাথ vision শব্দ বোধ হয় অতীন্দ্রিয় বস্তুদর্শন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। হিবার্ট বক্তৃতামালার এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় বিশ্বরূপ দর্শনের বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, শৈশবে তাঁহার মন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল। তাঁহার যে কোন ধর্ম্ম আছে, তখন তিনি তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এই আদিম ঔদাসীন্যের ফলে রবীন্দ্রনাথের মন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়াছিল। যথা—

"Thus my mind was brought up in an atmosphere of freedom—freedom from the dominance of any creed that had its sanction in the definite authority of some scripture, or in the teaching of some organised body of worshippers."

"এই প্রকারে আমার মন স্বাধীনতার আব-হাওয়ার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল—কোনও ধর্ম্মগ্রন্থের উপদিষ্ট মতের, বা কোনও দলবদ্ধ উপাসকগণের প্রচারিত মতের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের মন যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ স্বাধীন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল, তখন তাঁহার বর্ণপরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩১৮ সনে (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লিখিত "জীবন-স্মৃতি"তে শিক্ষারম্ভপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি;—সে দিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে, তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায়, তখনও তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কাণের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সে দিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

[illegible] "পড়ে" এবং "নড়ে"র মিলের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই মিলটাকে লইয়া শিশু রবীন্দ্রনাথের কাণের সঙ্গে মনের খেলা চলিয়াছিল, এবং তাহার ফলে শিশুর সমস্ত চৈতন্য পড়ন্ত জল এবং নড়ন্ত পাতাময় হইয়া গিয়াছিল। "জীবন-স্মৃতি" লেখার ১৯ বৎসর পরে লিখিত হিবার্ট-বক্তৃতার বিবরণে "জল পড়ে পাতা নড়ে"র সঙ্গে অতীন্দ্রিয় বিশ্বরূপ দেখা দিয়াছে। যথা—

"Suddenly I came to a rhymed sentence of combined words, which may be translated thus—"It rains, the leaves tremble." At once I came to a world wherein I recovered my full meaning. My mind touched the creative realm of expression, and at that moment I was no longer a mere student with his mind muffled by spelling lessons, enclosed by class room. The rhythmic picture of the tremulous leaves beaten by the rain opened before my mind the world which does not merely carry information, but harmony with my being. The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision."

"হঠাৎ আমি এই ছন্দোবদ্ধ বচন পাঠ করিলাম, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তৎক্ষণাৎ আমি এমন জগতে উপস্থিত হইলাম যেখানে আমি সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমি, যাহার চিত্ত বানান পাঠে আচ্ছাদিত এবং ক্লাশের ঘরে আবদ্ধ, এমন ছাত্র থাকিলাম না, আমার মন ভাষার সৃষ্টির রাজ্যে পৌঁছিল। বৃষ্টিধারার আহত কম্পমান পত্রগুলির ছন্দোবদ্ধ চিত্র আমার মনের কাছে এমন এক বিশ্বরূপ দেখাইল, যাহা কেবল সংবাদ বহন করে না, কিন্তু আমার সহিত সেই বিশ্বের ছন্দের ঐক্য সূচিত করে। অর্থহীন পৃথক্ বস্তুগুলি তাহাদের পার্থক্য হারাইয়াছিল এবং আমার মন অতীন্দ্রিয় অখণ্ডের আনন্দরসে ডুবিয়াছিল।"

এই অনুবাদ শব্দানুগত নহে, এবং অর্থানুগত কি না তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু শিশু রবীন্দ্রনাথ যে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পড়িতে পড়িতে নিজের সহিত ছন্দে মিলান অখণ্ড বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিষ্কার আভাস এখানে পাওয়া যায়। "জীবন-স্মৃতি"র বিবরণে এই আভাস নাই সত্য; কিন্তু "জীবন-স্মৃতি" কবির জীবনের চিত্র, এবং হিবার্ট-বক্তৃতার বিবরণ ধর্ম্ম-সংস্থাপকের জীবন-স্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসের দ্বিতীয় ঘটনা উপনয়নের পর গায়ত্রী-জপ। উপনয়নের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স বার কি তের বৎসর (১৮৭৩-৭৪) ছিল। উপনয়নের পরে গায়ত্রী-জপ সম্বন্ধে হিবার্ট-বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"Thus came my initiation ceremony of Brahminhood when the gayatri verse of meditation was given to me, whose meaning, according to the explanation I had, runs as follows ;—

* * * *

"This produced a sense of serene exaltation in me, the daily meditation upon the infinite being which unites in one stream of creation my mind and outer world."

অর্থাৎ যে অসীম সৎ অখণ্ড সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে আমার মনকে বাহ্য জগতের সহিত যুক্ত করে (গায়ত্রী-জপের সহিত) তাহার মনন (ধ্যান) আমার মধ্যে প্রশান্ত—পুলক উৎপাদন করিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রচারিত "মানব-ধর্ম্মে" এই অসীম সৎ (infinite being) অসীম পুরুষের বা মানবের (infinite personality) আকার ধারণ করিয়াছে। ১২।১৩ বৎসর বয়সে গায়ত্রী-জপের এবং অসীম সতের ধ্যানের কথার সহিত তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মমতের তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"Though to-day I find no difficulty in realising this being as an infinite personality in whom the subject and object are perfectly reconciled, at that time the idea to me was vague. Therefore the current of feeling that it aroused in my mind was indefinite, like the current of air."

"যদিও আমি আজ সহজে অনুভব করিতে পারিতেছি যে, এই সৎই সেই অসীম মানব—যাহার মধ্যে আত্মার এবং অনাত্মার পূর্ণ মিলন ঘটে, তখন (অর্থাৎ বার তের বৎসর বয়সে উপনয়নের সময়) এই তথ্যটি অস্পষ্ট ছিল। অতএব (গায়ত্রী) আমার মধ্যে যে ভাবের ধারা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, তাহা বায়ুপ্রবাহের মত অদৃশ্য ছিল।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপনয়নের পরই গায়ত্রী-জপের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে অস্পষ্টভাবে, অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহার গুরুজনের ব্যাখ্যাত গায়ত্রীর অসীম সৎ বস্তুর পাছে পাছে অসীম মানবের অরূপ রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল। উনসত্তর বৎসর বয়সে লিখিত এই বিবরণের সহিত "জীবনস্মৃতি"র বিবরণের বিরোধ দেখা যায়। "জীবনস্মৃতি"র পিতৃদেব নামক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়।

* * * *

"তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম, তাহা নহে।"

গায়ত্রীর তাৎপর্য্য না বুঝিয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" অবলম্বন করিয়া মনটাকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করা, এবং গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য অসীম সতের ধ্যান, এক কথা নহে। উপনয়নের পাঁচ কি ছয় বৎসর পরে, আঠার বৎসর বয়সের সময়, রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয় জগতের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। "জীবনস্মৃতি'তে এই ঘটনার এইরূপ বিবরণ আছে—

"সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। এক দিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত; আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল।"

হিবার্ট বক্তৃতায় এই ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত "জীবন-স্মৃতির" বড় প্রভেদ নাই। কিন্তু এই বিশ্বের আলোক বা বিশ্বরূপ দর্শনের ফলের সম্বন্ধে উভয় স্থানে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যেন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। জীবন-স্মৃতিতে লেখা হইয়াছে :—

"এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি নির্ব্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমি যাহাকে দেখিয়া খুসি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম—সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে—তখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল আমার এই মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল।"

পৃথিবীর কোন দেশের ভাষাতেই বোধ হয় এই ভাবকে ঠিক religious experience (ধর্ম্মের অনুভূতি) এবং

spiritual reality (আধ্যাত্মিক সত্য) বলে না, উদারতা বলে। অথচ রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"When I was eighteen, a sudden spring breeze of religions experience for the first time came to my life and passed away leaving in my memory a direct message of spiritual reality."

"যখন আমার আঠার বৎসর বয়স তখন হঠাৎ প্রথম আমার জীবনে ধর্ম্মের অনুভূতির বসন্ত-বাতাস আসিয়াছিল এবং আমার স্মৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎ-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছিল।"

আঠার বৎসর বয়সে বিশ্বের এই আনন্দরূপ দেখার পরই রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নামক কবিতাটি ঝর্‌ঝর্ করিয়া বাহির হইয়াছিল। হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"The Waterfall, whose spirit lay dormant in its ice-bound isolation, was touched by the sun and, bursting in a cataract of freedom, it found its finality in an unending sacrifice, in a continual union with the sea."

"নির্ঝরের আত্মা নির্জ্জনে তুষারাবৃত হইয়া নিদ্রিত ছিল; এবং সূর্য্যরশ্মিপাতে স্বাধীনভাবে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া অশেষ আত্মাহুতিতে সাগরের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলনে চরম শান্তি লাভ করিয়াছিল।"

মূল কবিতায় কিন্তু কবি নির্ঝরকে সাগরের সহিত মিলিত করেন নাই, সাগরসঙ্গম হইতে অনেক দূরে রাখিয়া কবিতার উপসংহার করিয়াছেন। যথা—

"কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।"

সুতরাং ভাবাবিষ্ট বা স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় যখন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন মানব কবি মহাসাগর বা মহামানব হইতে অনেক দূরে ছিলেন; তখনও তাঁহার মহামানবের সহিত মিলনের সুযোগ মিলে নাই।

সদর ষ্ট্রীটে এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে (when I grew older) বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে (শিলাইদহে) বাস করিতেছিলেন। এক দিন জুলাই মাসে পূর্ব্বাহ্ণে কায শেষ করিয়া স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ মরা নদীর খাতে প্রথম বর্ষার জলের স্রোত দেখিতেছিলেন, এমন সময় আবার তাঁহার অতীন্দ্রিয় বিশ্বরূপ-দর্শন ঘটিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে "মানব-ধর্ম্ম" প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"On that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth I felt sure that some being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an everwidening individuality which is a spiritual work of art

"To this being I was responsible, for the creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same creative mind that is shaping the universe to its eternal idea; but in me as a person it had one of its centres of personal relatio ship growing into a deepening consciousness .....It gave me great joy to feel in my life detachment at the idea of a meeting of the two in a creative comradeship. I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which the infinite became defined in humanity and came close to me so as ro need my love and cooperation."

অর্থাৎ সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাগুলির বিভিন্নতা লুপ্ত হইল, হঠাৎ তিনি তাহাদের মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল ঐক্য দেখিতে পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, তিনি এবং তাঁহার জগৎ যে তৎসৎ (being)-এর অন্তর্ভূত, সেই তৎসৎ তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া উৎকৃষ্ট রীতিতে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়া সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সদা-প্রসারিত মানবতায় মিলিত করিতেছে। এই তৎসতের নিকটই রবীন্দ্রনাথ দায়ী, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে, তাহা তৎসতেরও কার্য্য এবং রবীন্দ্রনাথেরও কার্য্য। হয় ত (it may be) এই তৎসৎই সৃষ্টিকারিণী চিৎশক্তি (mind)—যাহা জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নামক মানব তৎসতের মানবীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার, অর্থাৎ মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, একটি কেন্দ্র বা বাহন। নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কেন্দ্রজ্ঞান অর্থাৎ অবতারজ্ঞান ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। এই জ্ঞান রবীন্দ্রনাথকে নিজের মধ্যে সৃষ্টিকার্য্যে সহযোগিরূপে দুইয়ের গুপ্ত মিলনের মহানন্দ দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ

তখন অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি অবশেষে স্বধর্ম্ম—মানব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ধর্ম্মে অসীম মানবাকারে সীমাবদ্ধ বা অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা এবং সহায়তা লাভের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল।

আমি যথাসম্ভব রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী বচনের মর্ম্মার্থ দিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সকল কথা যে বুঝিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে (at a late date) রচিত "জীবন-দেবতা" নামক কবিতায় তাহা যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এই কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিব—

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি' অন্তরে মম।
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।
* * * *
আপনি বরিয়া ল'য়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম তোমার বিজন বাসে।
* * * *
কি দেখিনু বঁধু মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি,
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি।"

এই কয় পংক্তি পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, "জীবন-দেবতা" দ্বৈতভাব-প্রকাশক। এই কবিতায় অন্তরতম দেবতাকে এবং কবিকে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। কিন্তু শিলাইদহে অতীন্দ্রিয় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় রবীন্দ্রনাথ যে তৎসতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত কবির এইরূপ ভেদ ছিল না। তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার (experiences বা কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। জুলাই মাসে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় তৎসতের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে অঙ্গাঙ্গী ভাব ফুটিয়াছিল, কবিতার জীবন-দেবতার সহিত রবীন্দ্রনাথের সেই অঙ্গাঙ্গী ভাব নাই। জীবন-দেবতা আপন সিংহাসনে একেলা বসিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, অদ্বৈতভাব রবীন্দ্রনাথের "মানবধর্ম্মের" ভিত্তি। পৃথক্ মানব মহামানব হইতে অভিন্ন; বাঙ্গালী মানব বিশ্বমানব হইতে অভিন্ন; মর-মানব অমরমানব চিরমানব হইতে অভিন্ন। এই ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধি "আমিই মহামানব" এই অনুভবে; এবং পরের কাছে এই সিদ্ধির পরিচয়, "তৎত্বমসি," তুমিই সেই মহামানব, এই জ্ঞানে। সুতরাং "জীবনদেবতা" নামক কবিতাকে "মানব-ধর্ম্মের" জন্মগাথা বলা যাইতে পারে না।

"জীবন-দেবতা" পাঠ করিয়া এরূপ ধারণা যে কেবল আমারই হইয়াছে তাহা নয়। ১৩১৯ সনের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে "জীবন-দেবতা"র রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হইয়া ৺অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই কবিতায় "মানব-ধর্ম্মে"র মত কোন পদার্থের সন্ধান পান নাই। অজিতকুমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনে সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল লেখক, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও আদি ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। "জীবন-দেবতা" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অজিতকুমার প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা। বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতনমা টীতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নব পল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটীতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী ক'রে বস্‌লেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে" (৬০৪ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথের "প্রবাসী" নামক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে—

"তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, ক'ব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটী মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।"

"বসুন্ধরা" নামক কবিতায়ও একই কথা। যথা—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,

দিগ্বিদিকে আপনারে দেই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। * *
* * * শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।

এই তিনটি কবিতার রচনা কাল হিসাব করা যাউক—

"বসুন্ধরা" ১৩০০ সনে "সোণার তরী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি "নিগূঢ় জীবন-রস" বা বিশ্ব-চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন।

"জীবন দেবতা"—১৩০২ সনে রচিত এবং "চিত্রা"য় প্রকাশিত। ভগবানের নিকট ভক্তের প্রার্থনা।

"প্রবাসী"—১৩২১ সনে "উৎসর্গে" প্রকাশিত পুরাতন কবিতা। "চয়নিকা"র এবং "সঞ্চয়িতা"র সূচীপত্রে "উৎসর্গ" "নৈবেদ্যে"র (১৩০৭) এবং "স্মরণে"র (১৩০৯) মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ১৩০৮ সনকে মোটামুটি "প্রবাসী" কবিতার রচনা-কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই কবিতার উপরে উদ্ধৃত অংশে এবং আরও অনেক অংশে ("স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে") কবিকে বিশ্বচৈতন্যের ভূমিকায় দেখা যায়।

অজিতকুমার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ডারুইনের, ডারুইন-শিষ্য স্যামুয়েল বাটলারের, ফেকনারের এবং বার্গসঁর মতামত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই সকল বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক যাহাকে চিরন্তন জীবনধারা বা চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষ বা সৃষ্টিকারিণী চিৎশক্তি বলেন, রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশে এবং "জীবন দেবতা", "বসুন্ধরা" এবং "প্রবাসী" নামক তিনটি কবিতায় সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাংশে, "বসুন্ধরায়" এবং "প্রবাসী"তে এই তত্ত্বের আভাস থাকিলেও, অজিতকুমার "জীবন দেবতা"র যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমার সন্দেহ হয়, এই সকল কবিতার একবাক্যতা সাধন করিতে গিয়া এই সুযোগ্য সমালোচক "জীবন দেবতা"র উপর কতকটা জুলুম করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার লক্ষ্য সম্বন্ধে অজিতকুমার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"আমার বিশ্বাস এই এবং "জীবন-দেবতা"র আলোচনায় এ ক্ষেত্রে আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বড় কবিমাত্রেই জানিয়া এবং না জানিয়া তাঁহার কালের সকল দিক্‌কার সকল প্রয়াসের মধ্যে, সাধনার মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন। আমি যে সকল চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলাম, হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়া এই "জীবন-দেবতা"র ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে—কিন্তু তাহা না হইলেও আপনা আপনি আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য—যখন এই ভাবের বাষ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এই জন্য বড় কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে—তিনি নদীর মত তাঁহার কালের নিম্নস্তরে গভীর ভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন" (৬১১—৬১২ পৃঃ)।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে থাকিয়া এবং তাঁহার কবিতা অনুশীলন করিয়া অজিতকুমার যুগবার্ত্তা-বাহক বড় কবির পরিচয় পাইয়াছিলেন, ধর্ম্মসংস্থাপকের পরিচয় পায়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "জীবনদেবতা" কবিতা শিলাইদহে অতীন্দ্রিয় বিশ্বরূপ দর্শনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিবরণ (evide ce revealed through the self-recording instrument of poetry)। আমরা এই কবিতায় "মানবধর্ম্মের" জন্মের বিবরণ খুঁজিয়া পাই না, অজিতকুমারও পায়েন নাই। ইহার কারণ কি? হিবার্ট বক্তৃতামালার (Religion of man এর) মুখবন্ধে (preface) রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ঘটনার এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

"In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earliest products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of its growth To-day I am made conscious of the fact that the works that I have uttered are deeply linked by a unity of inspiration whose proper definition has often remained unrevealed to me."

"বস্তুতঃ, আমার অপরিণত বয়সে প্রথম রচনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, আমার অধিকাংশ রচনার মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন মানবধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাসের প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্য আমি বুঝিতে পারিতেছি, যে সকল কর্ম্ম আমি আরম্ভ করিয়াছি, এবং যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা একই অমানুষী প্রেরণা (inspiration) সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। এই অমানুষী প্রেরণার স্বরূপ আমার নিকট অনেক সময় অপ্রকাশিত রহিয়াছে।"

এই মুখবন্ধ ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত, এবং ইহাতে এই সময়ের অভিমতই দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত

হইয়াছে। এই অভিমতের তাৎপর্য্য এই, রবীন্দ্রনাথ ইদানীং আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার যৌবনের এবং প্রৌঢ়বয়সের অধিকাংশ রচনা পাঠ করিয়া এতকাল লোকে যাহাই বুঝিয়া থাকুক এবং তিনি স্বয়ং "জীবন-স্মৃতিতে" যেরূপ আভাস দিয়া থাকুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার ভিতর অবিচ্ছিন্ন ভাবে "মানবধর্ম্মে"র জন্মের কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই মত প্রতিপাদন করিবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে কবি তাঁহার পুরাতন রচনার নূতন ভাষ্য সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত। হিবার্ট বক্তৃতা এইরূপ একখানি ইংরেজী ভাষ্য। এবারকার 'কমলা-বক্তৃতা' বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষ্য। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রগুলি এই ভাষ্যানুগত টীকা-টিপ্পনী। রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" "জীবন-দেবতা" প্রভৃতি কবিতামালা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ, কাব্যরসের গভীর আধার। কাব্যরসপিপাসু বাঙ্গালী চিরকাল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিবে এবং রবীন্দ্রনাথের গীত গান করিবে। কিন্তু ক্ষুধার অন্ন এবং যাত্রাপথের পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য এ দেশের কেহ যে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কলিত ভাষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার অনুবাদে কোন কোন বিদেশী পাঠক পথ্য এবং পাথেয় দুই-ই পাইতে পারে। সরস কবিতার বিদেশী ভাষার অনুবাদ শুষ্ক রসগোল্লার মত। তাহাতে ছানা, চিনি, সুজী থাকে, কিন্তু রস বড় থাকে না। কাজেই যাহারা অনুবাদ মাত্র পড়ে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পথ্য এবং পাথেয় ছাড়া আর বেশী কিছু বোধ হয় পায় না। বাঙ্গালী পাঠকরা পেটের ক্ষুধা এবং পথযাত্রার পাথেয়ের অভাব ভুলিয়া এই সকল কবিতার কাব্যরসই পান করিবে। সূক্ষ্মদর্শী বিদেশী পাঠকরাও রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্বের অপেক্ষা কবিত্বের বেশী আদর করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়েলস্ (H. G. Wells) প্রণীত—The Ontline of Histry হইতে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব :—

"Rabindra Nath Tagure (vorn 1861) is widely known in the West, but rather as a poet than as a novelist and publicist." (Chapter 37, 319),

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত ; কিন্তু কবিরূপে সুপরিচিত, ঊপন্যাসিকরূপে বা লোক-শিক্ষকরূপে তেমন পরিচিত নহেন। *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* H. G. Wells, The Outline of History. The Fifth Revisim, London, 1931.

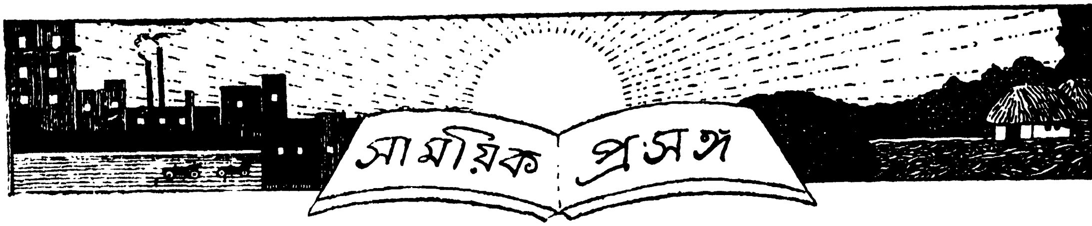
ঝরা পাতার গান

দিন আমাদের অবসান,
ঝর ঝর ঝর ঝরণের সুরে তাই মোরা গাই গান।

নবীনের আগমনী,
কোকিল-কণ্ঠে কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে আজ ধ্বনি।
মোদেরি বক্ষ 'পরে,
মঞ্জীর তার গুঞ্জরি ওঠে মৃদু মর্ম্মর স্বরে।
কোকিলের নহবৎ।
মোদেরও লাগিয়া এমনি একদা ঝরেছিল সুধাবৎ।
সে দিন ত মধুমাস,
সে দিনও এমনি মলয় বহিয়া এনেছিল ফুলবাস।
স্বাগত সম্ভাষণ,
সুমধুর স্বরে জানায়ে মধুপ করেছিল বন্দন।
মুকুল-মুকুট পরি,
পলাশে সাজায়ে বরণের দীপ ছিল বন-সুন্দরী।

সে দিন পুলকভরে,
কত না মোহন রঙীন স্বপন জেগেছিল অন্তরে।
দিনে দিনে পলে পলে,
সে স্বপন ছায় ধুয়ে মুছে গেছে তপ্ত আঁখির জলে।
গিয়াছে মাথার পর,
কত না বৃষ্টি করকা আঘাত কত না ঘূর্ণী ঝড়।
প্রখর তপনকর,
পিঙ্গল করি' দিল ক্রমে ক্রমে সুশ্যামল কলেবর।
ওই কিশলয়দল,
এমনি যাতনা সহিয়া একদা চুমিবে ধরণীতল।
সেই দুর্দ্দিন স্মরি,
আজি নবীনের বোধন আমরা রোদনের সুরে করি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।



শ্বেতপত্র

ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা সার স্যামুয়েল হোর আমাদিগকে যে শাসন-সংস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন, শ্বেতপত্রের আকারে তাহা করিয়াছেন। অবশ্য উহা যে ঐ সম্বন্ধে শেষ কথা, তাহা নহে, কেন না, এখনও পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীতে উহার আলোচনা হইবে, এবং তাহার পর খোদ পার্লামেণ্ট তাহার উপর বিচারে বসিবেন, তবে মেওয়া ফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া এবং ইহার কাটছাঁট করিয়া ওপারের কর্ত্তাদের মনের মত একটা যাহা হয় কিছু শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে।

আপাততঃ সার স্যামুয়েল যে শ্বেতপত্র বাহির করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ভাল কথা বিলাতের 'টাইমস' আর দুই একখানা লিবারল পত্র এবং এ দেশের 'ষ্টেটশম্যান', 'সিভিল মিলিটারী গেজেট' প্রমুখ দুই চারিখানা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া কাহারও মুখে শোনা যায় নাই। এ দেশের কেবলমাত্র 'পাইওনিয়ার' ও 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' পত্র উহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। 'পাইওনিয়ার' মন্ত্রি-পরিচালিত কাগজ, 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মুসলমানের কাগজ। সুতরাং উহাদের অভিমত ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য আর দুই চারি জন সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাসরক্ষক খয়েরখাঁ রাজনীতিক যে উহার গুণগান করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই কয়টি মুষ্টিমেয় লোক ও পত্র ছাড়া এদেশ কি, ওদেশ,—কোথাকারই রাজনীতিক ও সংবাদপত্র ইহাতে ভাল কিছুই দেখিতে পান নাই। অনেকে বলিয়াছেন, সাইমন রিপোর্টের সিদ্ধান্তও উহার অপেক্ষা কোন কোন অংশে ভাল ছিল। এত পরিশ্রম, অর্থ ও সময় অপচয়ের পর পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে, ইহা ভারতেরই ভাগ্য।

চার্চ্চিল পেজক্রফ্ট ক্রাডক ওডয়ারের দল এবং 'মর্ণিং পোষ্ট' 'ডেলিমেল' প্রমুখ গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী পত্র চীৎকার করিতেছেন যে, সর্ব্বনাশ হইল, শ্বেতপত্রে ভারতবাসীর হস্তে গোটা ভারত সাম্রাজ্যটাই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এটা যে ভাণ, আপোষের ঝগড়া, তাহা বেশ বোঝা যায়। যাহা আগাগোড়াই ভুয়া, তাহাকেও শাঁসাল বলিয়া পরিচয় দিয়া জগৎকে বোঝান হইল যে, ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্ট ভারতের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষারও অধিক দাবী পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন, কিন্তু উহাতে বৃটেনের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত হইল, আর ভারতকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই মস্ত সুযোগ পাইয়া সার স্যামুয়েল পার্লামেণ্টে আপনার মনের মত সিদ্ধান্ত পাশ করাইয়া লইলেন,—যেন কত বড় কি একটা বিষম জিনিষ দেওয়া হইল! এটা মস্ত রাজনীতিক চালবাজী!

কিন্তু বস্তুতঃ কায়ার পরিবর্ত্তে শ্বেতপত্রে যে ছায়া দেওয়া হইতেছে, তাহা 'ডেলি হেরাল্ড', 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান', 'নিউজ ক্রণিকল', প্রমুখ বিলাতী শ্রমিক ও লিবারল পত্রসমূহের এবং মিঃ ল্যান্সবারি, মর্গান জোনস প্রমুখ শ্রমিক দলীয় রাজনীতিকদের অভিমত পাঠ করিয়া জানা যায়। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, এই শ্বেতপত্র ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ, প্রকৃত ক্ষমতা দিল্লী ও হোয়াইট হলের হস্তেই রাখা হইতেছে, পরন্তু প্রদেশেও গভর্ণর অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। ইহাকে স্বায়ত্তশাসন বলে না, স্বায়ত্তশাসন ত নহেই, বরং উহাকে এখনকার অপেক্ষা আরও অধিক ব্যুরোক্রাটিক শাসন বলা যাইতে পারে, কারণ, উহাতে সিভিল সার্ভিসের ইস্পাতের কাঠামো পূর্ণরূপে বজায় থাকিবে। ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল বলিয়াছেন যে, "এই শ্বেত পত্রের দ্বারা ভারতের রাজপ্রতিনিধি বড়লাটকেই হোমরুল দেওয়া হইতেছে, ভারতবাসীরা কিছুই পাইতেছে না। সুতরাং ইহাতে অসন্তোষ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। অসন্তুষ্ট ভারতবাসী যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হিংসার পথ গ্রহণ করে, এই শ্বেতপত্রের দ্বারা তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।"

ভারতীয় মতামত

বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত পেটেলের এই অনুমান সার্থক না হইলেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, ভারতবাসিমাত্রেই শ্বেতপত্রে সন্তোষলাভ করিতে পারে নাই। যে পাঁচ জন মুসলমান তৃতীয় গোলটেবিলে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কি ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মধ্যে মওলানা শৌকৎ আলি ও সার মহম্মদ ইকবালকে নেতৃরূপে গণনা করা যায়। অথচ তাঁহারা দুই জনেই বলিয়াছেন, শ্বেতপত্র সন্তোষজনক নহে।

মডারেট সদস্যদের মধ্যে সার তেজ বাহাদুর সপরু ও শ্রীযুক্ত জয়াকরই প্রধান। তাঁহারা যে বিবৃতি শ্বেতপত্র সম্পর্কে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ একই কথা আছে,—উহা সন্তোষজনক নহে। তৃতীয় গোলটেবিলেও যতটুকু কথা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি ছাড়া আর সকল কথারই ওলটপালোট হইয়াছে। বিশেষতঃ সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ, জবাব, ভাতা-পেন্সনাদির ব্যবস্থার ভার গোলটেবিলে বড়লাটের উপর দেওয়া হইয়াছিল, শ্বেতপত্রে ঐ ভার ভারতসচিবের হস্তে রাখা হইয়াছে। সুতরাং জয়েণ্ট কমিটীতে এ সকল গুরুতর বিষয় যাচাই করাইয়া ভারতের প্রতি সুবিচার না করিলে শ্বেতপত্রের কোন মূল্যই মডারেটদের নিকটেও থাকিবে না। ইহা ছাড়া মডারেটদের এক ডেপুটেশান বিলাতে গিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন করিবেন, এ কথাও স্থির হইয়াছে।

হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়, জাতীয়তাবাদী মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী সম্প্রদায়, জমিয়তে-উল-উলেমা,—ভারতের এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা একবাক্যে শ্বেতপত্রের প্রতিবাদ না করিয়াছে। কেলকার, মুঞ্জে, সার আবদর রহিম প্রমুখ নেতারা ইহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা-সমূহের বে-সরকারী সদস্যগণ ইহার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ভারতের কোন সম্প্রদায়ের ও কোনও শ্রেণীর লোকই এই শ্বেতপত্রের সমর্থন করিতেছেন না। কেবল যাঁহাদের ইহাতে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হইবে, অথবা যাঁহারা জয়েণ্ট কমিটিতে নিমন্ত্রণ পাইয়া পরের খরচায় দেশবিদেশে ঘুরিয়া আসিতে পারিবেন, তাঁহারাই ইহার গুণগান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা মুষ্টিমেয়।

শ্বেতপত্রের প্রকৃতি

কেন এমন হইল? যদি যথার্থই শ্বেতপত্রের সিদ্ধান্তে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইত, যদি ছায়ার পরিবর্ত্তে কায়ার সামান্য কিছু পরিচয়ও পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এমন হইত কি?

বস্তুতঃ শ্বেতপত্রে এমন প্রস্তাব করা হইয়াছে, যাহাতে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র-সমূহ উহাকে mockery of progress বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, পরন্তু বলিতেছে যে, শ্বেতপত্র বড়লাটকে শত হিটলার ও শত মাসোলিনির ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, উহা দ্বারা চার্চ্চহিল ক্রাডক লয়েড পেজক্রফটের দলের আবদার পূর্ণ হইবে, ভারতের কোন মঙ্গলই সাধিত হইবে না। 'লীডার' পত্র মডারেট দলের শ্রেষ্ঠ পত্র। ঐ পত্র বলিয়াছেন,—"সমস্ত দরকারী বিষয়ে (essential matters) কেন্দ্রীয় সরকারে আইন সভাকে ভগ্নাংশ অধিকার প্রদান করে নাই; অন্যান্য ব্যাপারেও অসম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছে। এমন কি, প্রদেশেও ক্ষমতা হস্তান্তরিত এমন ভাবে করা হইবে, যাহাতে সেই ক্ষমতার নখদন্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।"

এখন দেখা যাউক, মডারেটদের মুখপত্রও এমন কথা বলেন কেন। একে একে আমরা কারণগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি:—

(১) শ্বেতপত্রের কোথাও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—এমন কি, দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কথা নাই, অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং ভারতে আরউইন-গান্ধী চুক্তিতে লর্ড আরউইন এই কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(২) সাইমন রিপোর্টেও বলা হইয়াছিল যে, যদি রাজন্য-ভারত সংহিত রাষ্ট্রে আসিতে না চাহে, তাহা হইলে কেবল বৃটিশ ভারতেই সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্বেতপত্রে সংহিত রাষ্ট্রের কথা আছে বটে, কিন্তু কত দিনে তাহা হইবে বা রাজন্যরা না আসিলেও উহা হইবে,—এমন কথা নাই।

(৩) দ্বিতীয় গোলটেবিলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "এই বৎসরের প্রথমে আমি তদানীন্তন (শ্রমিক) সরকারের ভারত শাসননীতি ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং এখন বর্ত্তমান (ন্যাশানাল) সরকারের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, বর্ত্তমান সরকারও সেই নীতি অনুসরণ করিবেন। সেই নীতি এইরূপ—ভারত শাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের হস্তে প্রদান করা হইবে, ইহাই সরকারের অভিপ্রায়। তবে কতকগুলি বাঁধন-কষণের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন যুগে (Period of transition) রাখা আবশ্যক হইবে, উহার মধ্যে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রাজনীতিক স্বাধীনতা-সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও বাঁধন-কষণ ও সংরক্ষণ-ক্ষমতা এমন ভাবে রচিত ও ব্যবহৃত হইবে, যাহাতে নূতন শাসন-সংস্কারের মারফতে ভারতের পূর্ণ শাসন-দায়িত্ব প্রাপ্তিতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।" এই ভাষা সহজ, সরল, বালকও ইহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু শ্বেতপত্রের আলোচনাকালে যখন শ্রমিক সদস্যরা চাপিয়া ধরেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রতিশ্রুতি-মত শ্বেতপত্রে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে বোঝা যায় যে, বাঁধন-কষণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে হইতেছে, তখন সহকারী ভারতসচিব মিঃ বাটলার বলেন, "পার্লামেণ্টের কোন আইনের সংশোধন করিতে হইলে আবার এক পার্লামেণ্টের আইন রচনা করিতে হইবে,—ইহাই সরকারের অভিপ্রায় অর্থাৎ শ্বেতপত্রের কোন অদল-বদল করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের থাকিবে।" অর্থাৎ সংরক্ষণ ও বাঁধন-কষণের ব্যবস্থা ৫ বৎসর থাকিবে, অথবা ১০ বৎসর থাকিবে, কিম্বা অনন্তকাল থাকিবে, তাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে পার্লামেণ্ট যখন বুঝিবেন, উহার সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তখন পার্লামেণ্ট তাঁহার মরজিমত যথা ইচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন,

(৪) সাইমন রিপোর্টের মত ইহাতেও কেন্দ্রে অপ্রতিহত ক্ষমতা, বিরাট দায়িত্ব, সিভিল সার্ভিসের প্রতি স্নেহ, বৃটিশ ব্যবসায়ীর সুবিধারক্ষা, সংখ্যাল্পের নামে জুজুর ভয়, সীমান্ত রক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, সঙ্কটকাল ও অর্ডিনান্স, দ্বৈতশাসন,—সবই এই শ্বেতপত্রে আছে, বরং ইহাতে ভারত-সচিবের, বড়লাটের ও প্রাদেশিক লাটদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৪) বড়লাটের সংরক্ষিত বিভাগ-সমূহে দায়িত্ব অপ্রতিহত থাকিবে; হস্তান্তরিত বিভাগে 'বিশেষ দায়িত্ব' থাকিবে; ইহা ছাড়া তাঁহার বিবেচনা করিয়া ক্ষমতা (discretionary powers) ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে,

(৫) ব্যবস্থা পরিষদ যদি বড়লাটের মতের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা (special powers) ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন,

(৬) বড়লাট যে কেবল তাঁহার মন্ত্রীদের অভিমতের বিরুদ্ধে বা অভিমত অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন না, তাহা নহে, তিনি উহার বিরুদ্ধ ভোট সত্ত্বেও কার্য্য করিতে পারিবেন,

(৭) আইন-গঠনেই কি, আর সরকারী তহবিলের বণ্টন ব্যাপারেই কি,—সর্ব্বত্রই বড়লাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে,

(৮) কোন বিষয়ে ব্যবস্থা পরিষদে তর্কবিতর্ক বা আলোচনা চলিতে থাকিলে বড়লাট ভাল বুঝিলে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন,

(৯) বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আইন গঠন ব্যাপারে নিয়ম বাঁধিয়া দিতে পারেন,

(১০) বড়লাট ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে, স্থগিত রাখিতে বা আহ্বান করিতে ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন।

(১১) বড়লাট ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিতে অথবা উহাতে অনুমতি দান না করিতে পারেন,

(১২) কতকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিবার অনুমতি বড়লাট না দিলে সেগুলি আইন সভায় উপস্থাপিত করিতে পারা যাইবে না,

(১৩) সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় বড়লাট ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ,—উভয় আইন সভাকেই আহ্বান করিতে পারেন,

(১৪) বড়লাট সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় অর্ডিন্যান্স ব্যবহার করিতে পারিবেন,

(১৫) সংহিত রাষ্ট্রগঠন সম্বন্ধে শ্বেতপত্রের ব্যবস্থা এই যে, যতক্ষণ রাজন্য রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যার অন্যূন একার্দ্ধের প্রতিনিধিরূপে এবং সংহিত রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধতন আইনসভায় (Upper Chamber) অন্যূন একার্দ্ধ সদস্য পদ পাইতে অধিকারিরূপে রাজন্যরা সংহিত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার দলীল সহি করিবেন, ততক্ষণ সংহিত রাষ্ট্র গঠিত হইবে না,

(১৬) সংহিত রাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পূর্ব্বে রাজনীতিক প্রভাববর্জ্জিত একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সভার দ্বারা গঠিত ও কার্য্য করিবার উপযুক্ত না হইলে সংহিত রাষ্ট্র গঠিত হইবে না,

(১৭) সরকারী সিভিলসার্ভিস ও অন্য চাকুরীর ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্বেতপত্রের সপ্তভাগের দশটি ধারায় যে নিয়ম করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তৃতীয় গোল টেবিলে কোন আলোচনা হয় নাই। প্রথম গোল টেবিলের সার্ভিস সাব-কমিটী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, এই সার্ভিস ও অন্য চাকুরীর লোক নিয়োগ ও বরখাস্ত বা বেতন-ভাতাদি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ভারত-সচিবের কোন ক্ষমতা থাকিবে না, ভারতের সংহিত রাষ্ট্রের হস্তে সেই ক্ষমতা বর্ত্তাইবে। কিন্তু শ্বেতপত্রের এই নূতন নিয়মে ভারত-সচিবের হস্তেই সেই ক্ষমতা রাখা হইয়াছে,

(১৮) কেন্দ্রে বা প্রদেশে শাসকদের কোন ক্ষমতার পরিবর্ত্তন করা হইবে না,

(১৯) কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের আবহাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা হইবে না। সুতরাং সাত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও আসরে নাচিবে না,

(২০) মন্ত্রিসভা ও আইনসভা সম্পর্কে বড়লাটের যে দায়িত্ব বা বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে, প্রাদেশিক গভর্ণরদেরও তাহা থাকিবে। তবে সংরক্ষিত বিভাগে বড়লাটের যে দায়িত্ব থাকিবে, কোন কোন প্রদেশের সীমান্ত সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন বিভাগে গভর্ণরের সেই দায়িত্ব থাকিবে না,

(২১) গভর্ণরের প্রদেশে আর্থিক স্থৈর্য্য ব্যাপারে তাঁহাকে বড়লাটের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার দায়িত্ব থাকিবে,

(২২) গভর্ণরের বেতন সংস্কার আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। তাঁহার ব্যক্তিগত ভাতা অথবা তাঁহার ব্যক্তিগত দপ্তর-সম্পর্কিত বেতন ও ভাতা গভর্ণর কাউন্সিলে আদেশ দিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। এ সকল বেতন ও ভাতার সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না,

(২৩) গভর্ণর তাঁহার প্রদেশে বা প্রদেশের কোন অংশে শান্তিভঙ্গের কোন গুরু কারণ বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ববলে উহা নিবারণ করিতে পারিবেন,

(২৪) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থসংরক্ষণ ব্যাপারে গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ব্যবহার করিতে পারিবেন,

(২৫) সংস্কার আইনের অভিমতে সরকারী চাকুরীয়াদের যে সকল অধিকার ও স্বার্থ থাকিবে, গভর্ণর সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন,

(২৬) গভর্ণর ব্যবসায়ক্ষেত্রে পার্থক্য রক্ষা করা নিবারণ করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক বিশেষ বিশেষ বিধি আছে। সে সাত কাণ্ড রামায়ণ। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তবে মোটামুটি শ্বেতপত্রে যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহার স্বরূপ কি, সকলেই বুঝিতেছেন। এ অবস্থায় ভারতবাসীর কি করা কর্ত্তব্য?

জয়েণ্ট কমিটী

এখন ভারতবাসীর ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে ভাবে শ্বেতপত্র রচিত হইয়াছে এবং যে ভাবে পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জয়েণ্ট কমিটীর নিকটে কোন আশা করা যায় কি না এবং জয়েণ্ট কমিটীতে আমন্ত্রিত হইয়া উহাতে যোগদান করিলে ভারতের কোন লাভ হইবে কি না। আত্মসম্মানের দিক হইতে দেখিলে সমস্যার সমাধান সহজেই হয়। কেন না, ভারতের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হন নাই, আপোস-পরামর্শে সমানের আসনও ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নাই। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, এই ভাবে উপর হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে কাহাদের সাধারণতঃ ডাক পড়ে। দ্বিতীয় গোলটেবিলে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধীর ডাক পড়িয়াছিল, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব প্রতিবাদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষীকে পরামর্শে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্তটাই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এবারও সেই একই ভাবের ডাক পড়িয়াছে।

তাহার পর সার স্যামুয়েল হোর স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে,—ভারতীয় সদস্যরা জয়েণ্ট কমিটীতে প্রায় একরূপ সাক্ষিরূপেই যাইবেন। কোন কিছু নির্দ্ধারণ করিবার সময় বৃটিশ সদস্যদের মত তাঁহাদের ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে না! সুতরাং শ্বেতপত্রের আপত্তিকর কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা হয় ত আবেদন নিবেদন জানাইতে পাইবেন, কিন্তু উহা পরিহার করা না করায় তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন না, তাঁহাদের উহাতে কোন হাত থাকিবে না। এই অবস্থায় জয়েণ্ট কমিটীর সাহচর্য্য কি ফল প্রসব করিবে?

সার তেজ বাহাদুর সপরু অথবা শ্রীযুক্ত জয়াকর শ্বেতপত্রের মর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি ও প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা জয়েণ্ট কমিটীর মোহ ঘুচাইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের এখনও

আশা আছে যে, জয়েণ্ট কমিটীতে ওপারের কর্ত্তাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া শ্বেতপত্রের অদল-বদল করা সম্ভব হইবে! এই জন্য তাঁহারা সাহচর্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

কেবল তাঁহারা কেন, ব্যবস্থা পরিষদের বে-সরকারী সদস্যরাও কোমর বাঁধিতেছেন। লোভ বড় বিষম বস্তু। এই লোভে পরিষদে তাঁহাদের শ্বেতপত্রের বিপক্ষে প্রতিবাদ প্রাণহীন হইয়াছিল,—এমন কি, সার আবদর রহিমও যেন আমতা আমতা করিয়া সারিয়াছিলেন। উহা হইতে পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের মিঃ ল্যান্সবারি ও মর্গ্যান জোন্স শতগুণ অধিক জোরে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, পরন্তু শ্বেতপত্রে একটা সংশোধন প্রস্তাবও তাঁহাদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল। সংখ্যাল্পতা হেতু তাঁহারা জয়লাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু চেষ্টার ক্রটি ত করেন নাই। আমাদের আইন সভার "প্রতিনিধিরা" কি করিলেন?

এই লোভই হইতেছে ভারতের যত অনিষ্টের মূল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের লোভ কতক লোককে দেশের বড় স্বার্থের দিকটা ভাবিবার অবসর দেয় না, তাহার উপর কর্ত্তাদের বড় বড় টোপ,—উহা কতক লোক না গিলিয়া পারে না। এইরূপে ঐকমত্য শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সুযোগ কি কেহ সহজে ছাড়ে? ভেদনীতি খেলাইবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ, অধিকার ও ক্ষমতাপ্রয়াসী ছাড়িবেই বা কেন? পূর্ব্বাপর দেশবাসীর কথামত যদি মডারেট-চড়ামণি সপরু-জয়াকর কোন টেবিলেই সাহচর্য্য না করিতেন, তাহা হইলে আজ কি হইতে পারিত?

গোল টেবিলের মত এখনও সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এখন তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন, চার্চ্চিল-পেজক্রফটের দলও নীরব হইল কেন। তাঁহারা ত প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও ইজ্জৎ গেল, মান গেল, রাজ্য গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, কিন্তু শ্বেতপত্রের প্রকাশ ও টীকাটিপ্পনীর পর আর তাঁহাদের উচ্চবাচ্য নাই, ইহার গূঢ় রহস্য কি? সুতরাং এ সময়ে ভারত যদি একবাক্যে বলিতে পারে যে, প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড আরউইন তাঁহাদের ঘোষণায় ভারতকে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, শ্বেতপত্রের রদবদল করিয়া যদি সেই প্রতিশ্রুতির অনুকূল করা না হয়, তাহা হইলে ভারত উহা স্পর্শ করিবে না, তবেই ভারত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবে, অন্যথা এখনও অনেক কষ্ট-বিপদ ভারতের ভাগ্যে রহিয়া যাইবে।

কংগ্রেস্-আতঙ্ক

গত ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রেল কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কথা বিঘোষিত হইয়াছিল। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোন কথা গোপন করেন নাই, বা লুকাচুরি করেন নাই, যাহা করিবেন, তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সরকার এই সম্পর্কে যে ভাবে ধরপাকড়, ঘোষণা, খানাতল্লাস, আটক, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দিক হইতে কংগ্রেসের মত সাদাসিধা স্পষ্ট কথা বলা বা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া কোন নিরপেক্ষ দর্শকই স্বীকার করিতে পারেন না!

ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে রেলের ষ্টেশনে, সহরের দ্বারে দ্বারে, বাসে, মোটরে, রাজপথে, পদব্রজে গমনে বাধা দেওয়া হইয়াছে, লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া ঘরে আটক, বাড়িতে আটক, গণ্ডীতে আটক, আর জেল ত আছেই। কলিকাতা সহরে করপোরেশান কর্ত্তার উপর পার্ক স্কোয়ার আদি বন্ধ করিবার আদেশ, কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদিগকে ঘরের মধ্যে থাকিতে অথবা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান না করিতে আদেশ, ঘটনার দিন পথে ঘাটে মাঠে সকল্র সাজোয়া গাড়ী, লালপাগড়ী ও লালমুখের ছড়াছড়ি, ছুটাছুটি, মৃদু লাঠি চালনা, গাড়ী বোঝাই নর-নারী চালান,—এ সব ব্যাপার দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বুঝি আবার মহাত্মা গান্ধীর প্রথম ডাণ্ডি অভিযানের দিনই ফিরিয়া আসিয়াছে। কেন না, লোক আইন ভঙ্গ না করিলে এমন অভিযানের কি প্রয়োজন হইতে পারে?

অথচ ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব সার হ্যারী হেগ এবং বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্রেণ্টিস প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায়,—(১) কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, (২) কংগ্রেসের অধিবেশন বে-আইনী কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, (৩) কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি সরকারী ঘোষণা দ্বারা নিষিদ্ধ (banned) হয় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়া কোন্ আইন ভঙ্গ করিলেন, কোন্ আইন অমান্য করিলেন? আইন অমান্য করিয়া অপরাধী হইতে হইলে কোন একটা আইনসঙ্গত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিরা বা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা কোন্ বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিয়াছিলেন? অন্ততঃ অধিকাংশ কংগ্রেস নর-নারী কোন্ বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়াছিলেন?

তবে পুলিসের বা শাসনকর্তৃপক্ষের "সভা-নিষেধ"সূচক এক আদেশ জারি হইয়াছিল বটে। মিঃ প্রেণ্টিস এইটুকুমাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে,—"The powers given in chapters 2 and 3 of the Bengal Police Security Act had been used in certain cases and that orders had been issued for the arrest of certain persons, অর্থাৎ বাঙ্গালার পুলিস নিরাপত্তা আইনের ২ ও ৩ পরিচ্ছেদে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হইয়াছে এবং কয়েক জন লোককে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।" অতি সুন্দর! যেখানে প্রতিষ্ঠান বা তাহার অধিবেশনই বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, যেখানে কোন আইন অমান্য হয় নাই, সেখানে কেবলমাত্র পুলিস নিরাপত্তা আইনের ধারা প্রয়োজন হয় কেন অথবা লোককে "বিনা কারণে" ধরিবার আদেশই বা দেওয়া হয় কেন? ইহা দ্বারা আইন ভঙ্গ করিল কে? আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণই বা করিল কে? উহার মন্দ প্রভাববিস্তারের জন্য দায়ীই বা কে?

তাহার পর যাঁহারা বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তাঁহাদের কোন্ আইনের বলে ধরিয়া আটক বা হাজত দেওয়া হইল? তাঁহারা পুলিস নিরাপত্তা আইনও ভঙ্গ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। প্রতিনিধিদিগকে এক গণ্ডীর মধ্যে থাকিবার

আদেশ দেওয়া অথবা কাহাকেও কোথাও প্রবেশ করিতে নিষেধ করাই কোন্ আইনভঙ্গের দরুণ সাজারূপে ধরা যায় ?

কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইলে পর, তথায় আইন অমান্যের অনুকূল বক্তৃতা বা মন্তব্য গৃহীত হইলে পর তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া গ্রেপ্তার ও আটক ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। অথবা পূর্ব্বাহ্নে কংগ্রেসকে বা কংগ্রেস অধিবেশনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেও হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সরকার কি বিষম ভ্রমাত্মক ও আইনবিগর্হিত কায করেন নাই ?

যাঁহাদের মুখে অনুক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কংগ্রেস মরিয়াছে, তাহার প্রভাব হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা আকুমারী হিমাচল ভারতের এই সাড়া দেখিয়া কি বলিবেন ? এই ব্যাপারে ২ হাজারেরও উপর নরনারী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কংগ্রেসের প্রভাবের এই প্রচার করিল কে ? বোধ হয় কংগ্রেস আতঙ্ক এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান বলিয়াই বাঙ্গালা কাউন্সিলের খেতাঙ্গ সদস্য মি. লেকহাট কাউন্সিলে শ্বেতপত্র সম্পর্কে তর্কবিতর্ককালে বলিয়াছেন,—"কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ রাজনীতিক দল। উহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হইলে উহা ভবিষ্যৎ সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লইবে।" ইহাই কি ভয় ? ইহাই কি অব্যবস্থার মূল ?

বাঙ্গালী ছাত্র ও রাজনীতি

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন চান্সেলাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনের অভিভাষণে বাঙ্গালী ছাত্রজীবনের সহিত বিপ্লব-বিভীষিকার সম্পর্কের কথা তুলিয়া বাঙ্গালীর সেই প্রবৃত্তি-দমনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলাবিধান যাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহার মুখে এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তিনি ঐ সম্পর্কে বাঙ্গালী ছাত্রকে রাজনীতিক উত্তেজনামূলক দলাদলিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বিপ্লব-বিভীষিকার আন্দোলন সর্ব্বথা নিন্দনীয়, উহার সহিত ছাত্রজীবনের সম্পর্ক থাকা সমীচীন নহে, এ কথা দেশহিতকামিমাত্রই স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের মুক্তি বা উন্নতিসাধনের সম্পর্কে রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত দেশের ছাত্র-সমাজের কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নহে, এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

গভর্ণর বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানে সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যায় সকলেরই আগ্রহ থাকা ভাল, কারণ, আজিকার ছাত্র কল্যকার ভোটার হইবে এবং সেই জন্য ছাত্র যত শীঘ্র নাগরিকের নানা কর্ত্তব্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইতে পারে, ততই মঙ্গল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমানের রাজনীতিক সংঘর্ষে হাতে-হাতিয়ারে যোগদান করিলে যে উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করিতে যাওয়া হয়, তাহা সফল হয় না, পরন্তু বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষণে বা চরিত্রগঠনে কোন সুযোগ ও সাহায্য পাওয়া যায় না। অথচ উহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য।" কিন্তু সত্যই কি তাই ? বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি উহাতে ব্যর্থ হইতেছে ? গভর্ণর ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের নিকট বাঙ্গালী ছাত্রের পরাভবের কথা তুলিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা অনেক অধিক হইলেও শিক্ষায় বাঙ্গালী এখন আর অন্যান্য প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারে না। পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালায় স্কুল-কলেজে ছাত্রসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, পরন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংখ্যাধিক্য বশতঃ শিক্ষাদানের উপযোগী আয় ও সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও হ্রাস হইয়াছে। কাযেই বাঙ্গালী ছাত্রকে অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞান লইয়া জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয়।" যদি ইহাই হয়, তবে গভর্ণর কিরূপে বাঙ্গালী ছাত্রের রাজনীতির সহিত সংস্রবকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন ?

কেবল ইহাই নহে, গভর্ণর স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রচলিত শিক্ষার দোষে বাঙ্গালীর আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা, বেকার-সমস্যা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অভাব দৈন্য এবং শিল্পবাণিজ্যে সুযোগ গ্রহণে বাঙ্গালী ছাত্রের শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। যে শিক্ষাপদ্ধতি অতীতে সুফল প্রদান করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।" যদি তাহাই হয়, তবে রাজনীতির সম্পর্ককে দোষী করা যায় কিরূপে ? অতীতে ক্লাইভ, হেষ্টিংস বাঙ্গালায় রাজ্য চালাইবার জন্য বাঙ্গালী কেরাণী গড়িবার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সুতরাং দোষ বাঙ্গালীর নহে। তখনকার কালোপযোগী শিক্ষা এখন অচল, এ কথা ত দেশবাসীই বলিয়া থাকে, এবং সে জন্য কালোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুক্ষণ আন্দোলন করিতেছে। তখন যে কেতাবতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলে বাঙ্গালী ছাত্র বিলাতের রাজনীতিক মুক্তির ইতিহাস অবগত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাহারা যে এক দিন রাজনীতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করিবে, হাতে-হাতিয়ারে রাজনীতিক সংঘর্ষে যোগদান করিবে, তাহা ত মেকলেই ভবিষ্যবাণী করিয়া গিয়াছিলেন। সেই বাণী আজ সার্থক হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালী ছাত্রকে অথবা শিক্ষাপদ্ধতিকে অপরাধী করিলে চলিবে কেন ? মূলে যদি শিক্ষাপদ্ধতির দোষেই বাঙ্গালী ছাত্রের অপর প্রদেশের ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় হঠিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে সেই পদ্ধতির আমূল সংস্কার করিতে হয়, রাজনীতিকে ফাঁসী দিলে উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হইবে না।

ছাত্রগণের রাজনীতিতে হাতে-হাতিয়ারে যোগদানে জগতের অন্যান্য সভ্যদেশে কি ফল হইয়াছে ? বর্ত্তমানে যে সকল দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে, তাহার ছাত্রজাগরণই সেই উন্নতির মূল। প্রতীচ্যে সকল দেশের ছাত্রশ্রেণী দেশের রাজনীতিক দলাদলিতে যোগদান করিয়া থাকে, এমন কি, তাহাদের মধ্যে নকল পার্লামেণ্ট এবং নকল লর্ডসভা-কমন্স-সভার কলহ-বিরোধ হয়। সেখানকার ছাত্ররা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বাস্থ্যের ও ব্যায়াম-ক্রীড়াদির উন্নতিতে অবহিত হয়, তেমনই রাজনীতিরও সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বিলাতের অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হ্যারো ইটন রাগবি প্রমুখ পাবলিক স্কুল-সমূহের ছাত্ররা যত অধিক সংখ্যায় সৈন্যশ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছিল, এত আর কোন শ্রেণীর লোক লিখায় নাই। যদি ছাত্ররা দেশের রাজনীতিতে ওয়াকিবহাল না হইত, যদি তাহারা শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমেও অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ না পাইত, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত কি ? চীন,

জাপান, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স, রাসিয়া কোন্ দেশে ছাত্রজাগরণ হয় নাই? সে ছাত্ররা কি কেবল শিক্ষা লইয়াই থাকে? জগতে যে নিয়ম স্বাভাবিক, বাঙ্গালায় কি তাহার ব্যতিক্রম হইবে? বঙ্গভঙ্গের যুগ হইতে বাঙ্গালী ছাত্রজীবনে যে দেশপ্রেম, যে জাগরণ আনিয়াছে, তাহা কিরূপে রুদ্ধ হইবে?

আসল কথা, বর্ত্তমান কেতাবতী শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হইয়াছিল। কিন্তু উহাকে রীতিমত চালাইতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, উহা কোথায় মিলিবে? দেশের লোক উহাতে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? দেশের সরকার যদি এ বিষয়ে অবহিত না হন, তাহা হইলে দোষ কাহার? বাজনীতির নহে।

—

সহ-শিক্ষা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের একত্র শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিবার সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। এ দেশে যে এইভাবের সমস্যার কথা উঠিতেও পারে, ইহা কালের গতির পরিচায়ক। যখন ভদ্র শিক্ষিত মহিলা সমাজের কনফারেন্সে হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও আলোচিত হইতে পারে, তখন সহ-শিক্ষার কথা দেশে না উঠিবে কেন, বুঝিতে পারা যায় না।

কালের গতি অর্থে প্রতীচ্যের অনুকরণ। জগতের সহিত "টাচ" না রাখিলে, কালের গতির সহিত তালে পা ফেলিয়া চলিতে না পারিলে দেশের প্রগতি হয় না, ইহাই এখন এক শ্রেণীর নর-নারীর ধারণা। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ভাবধারাই যে বিভিন্ন, প্রত্যেকের সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা যে স্বতন্ত্র, তাহা "বিশ্বপ্রেমের" প্রচারকরা মানিতে চাহেন না, তাই তাঁহারা জাতির অতীতের যাহা কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পদদলিত করিয়া নূতনের সন্ধানে ছুটিতেছেন। এই ধারণার অনুকূল একশ্রেণীর সাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। তাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। সুতরাং বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীর সহ-শিক্ষার জন্য যে আন্দোলন হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

Co-education, mixed bathing, mixed excursion প্রভৃতি প্রতীচ্যে—বিশেষতঃ প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যমণি মার্কিণ মুল্লুকে—কিরূপ জোর কদমে চলিতেছে এবং তাহার ফল কি হইতেছে ও প্রতীচ্যের মনীষীরাই সে জন্য জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিরূপ চিন্তাকুল হইয়াছেন, তাহার পরিচয় 'মাসিক বসুমতীতে' একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, সেই পাপই আমাদের দেশে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে জলপাইগুড়ীতে কি হইয়াছে এবং এই সহরেও কোন co-education কলেজের এক mixed excursionএ কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রের পাঠক জানেন। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ জন্য আমরা সত্যই শঙ্কান্বিত হইয়াছিলাম।

সুখের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন এক co-education-ওয়ালার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও উহা এ দেশের স্কুলকলেজে প্রবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহশিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, "কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দশ বৎসরের ঊর্দ্ধতম বয়সের বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণীর একই বিদ্যালয়ে একত্র শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে যদি কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বালিকা ও তরুণীদের শিক্ষার জন্য প্রাতঃকালে স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় হউক।

বাঙ্গালা সরকারও এ বিষয়ে অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীন এ বিষয়ে সরকারী অভিমত বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, "দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণীদিগকে একত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থার অনুমোদন না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন।"

আজ যে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সৎপন্থা অবলম্বনের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান নিশ্চিন্ত হইল, ইহা বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের কথা। যেরূপ জোর কদমে "প্রগতি" চলিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রতিদিনই ট্রামে, বাসে, ইডেন গার্ডেনে, লেকে পাওয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহার অপরূপ ফলও প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। প্রতীচ্যের মার্কিণ ও অন্যান্য দেশ যে সময়ে আর্ত্তরব তুলিয়াছেন,—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি", সে সময়ে আমাদের যে এই "জোর কদমের" প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিবার উৎকট বাসনা সফল হইবার সুবিধা পাইল না, ইহা আমাদের পরম লাভ বলিতে হইবে।

—

সরকার ও কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন এত দিন, অর্থাৎ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছিল! সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঙ্গালার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনকে ব্যুরোক্রেশীর পরিচালন-ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া নাগরিকগণের প্রতিনিধিদিগের কর্তৃত্বাধীন রাখিবার আইন রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা এক মন্ত্রীর দ্বারা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিয়াছিল, এখন অন্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়-প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয়, সরকার-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। লোক-নিয়োগ ব্যাপারে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণের কর্তৃত্ব চলিবে না। কারণ, যদি কোনও নিযুক্ত কর্ম্মচারী, কোন না কোন প্রকারে কখনও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া ৬ মাস কারাদণ্ডভোগ করিয়া থাকেন অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন, ভবিষ্যতে যদি তাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যাঁহারা এইরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর্ম্মচারীর প্রদত্ত বেতন বাবদ অর্থ আদায় করা হইবে। কর্ম্মচারীর চাকরী ত যাইবেই, অধিকন্তু অর্থদণ্ড ও কারাবাস উভয়বিধ দণ্ডও হইবে। ব্যয়ের ব্যাপারেও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের কোনও কর্তৃত্ব

থাকিবে না। কারণ, সরকারী হিসাব-পরীক্ষক যদি কোন ব্যয় অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মঞ্জুর করিতে না চাহেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সরকার যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। নাগরিকগণের প্রতিনিধিগণ বহু মতের দ্বারা যে বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত মনে করিবেন, তাহা হিসাব-পরীক্ষকের কলমের খোঁচায় বাতিল হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, সেই ব্যয়িত অর্থ কর্পোরেশনের উল্লিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে নোটীশ দিবার তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে আদায় করিয়া লওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় দিতে না পারিলে সদস্যগণের পদচ্যুত ঘটিবে এবং যতদিন না টাকা দিতে পারিবেন, ততদিন পুনর্নির্ব্বাচনের অধিকার তাঁহাদিগের থাকিবে না। শ্বেতপত্রে ভারতবর্ষ কিরূপ প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন পাইতেছে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থায় তাহার বর্ণানুলেপ আরম্ভ হইয়াছে।

নিমাই

বিশ্বের প্রেম যবে নিমায়ের
চিত্তে দিল রে দোল।
নদীয়ার পথে বাহিরিল গেয়ে
হরিবোল হরিবোল।
সুন্দরী জায়া মায়ের আদর
রাখিতে নারিল কিছু।
মুক্তির সুধা বিলাতে ধরায়
ছুটিল সবার পিছু।
পরমার্থের পুলক লভিয়া
হইয়া পাগল পারা,
আর কি তাহারে বাঁধিয়া রাখিতে
পারে সংসার-কারা ?
কোন দ্যুলোকের আহ্বান বাণী
প'শেছে তাহার কাণে,
অন্তর তার ভরি গেছে কোন
পরমানন্দ গানে।
মায়ার কাঁদন মিছে আঁখিজল
পেছনে ফেলিয়া চলে।
প্রেমের পাগল নিমাই কেবল
মুখে হরি হরি বলে।
বিপুলা ধরণী নিখিল বিশ্ব
হ'য়েছে তাহার ঘর,
ভেদাভেদ জ্ঞান গিয়াছে ভাসিয়া
কে তার আত্ম-পর ?
ন্যায় তর্কের পণ্ডিতবর,
প্রশ্ন তব,
সোজা হ'য়ে যাবে প্রেমের পরশে
ধরিবে স্ফূর্ত্তি নব।
জ্ঞান বিদ্যার স্তূপীভূত যত
অহমিকা রাশি রাশি,
নিমেষে কোথায় চোখের ধারায়
কোথা চ'লে যাবি ভাসি !
আজন্ম পাপী ল'য়ে এস তব
সঞ্চিত পাপ বোঝা,
দেখাবে নিমাই মুক্তির পথ
কিবা সুন্দর সোজা।
কে কোথা ভাবিছ তব পন্থার
নাহি আর সমতুল।
আসিছে নিমাই বাহু তু'লে নাচি
ভাঙ্গিতে তোমার ভুল।
বিশ্বের ব্যথা মুছাইয়া দিবে
নয়নের ধারা জলে।
তাই ত রে আজি আনন্দ ভোলা
গান গেয়ে গেয়ে চলে।
ধরারে স্বর্গ করিবে নিমাই
প্রেমের পরশ দিয়া,
সন্ন্যাসী তাই বাহিরিল আজি
সংসার তেয়াগিয়া।
গগন পবন কীর্ত্তন-গানে
হ'ল আজি উতরোল
চোখে ধারা বয় মুখে গান গায়—
হরিবোল হরিবোল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচিপত্র

১১শ বর্ষ] ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
তীতের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৬৪০
নাগত ও আমি	(কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৫৫৬
তিনন্দন	(কবিতা)	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচাযা	২৯৬
একটু গল্প	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৫৫০
াচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	(কবিতা)	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ	৪৫০
ামার পূর্ব্বস্মৃতি	(প্রবন্ধ)	শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)	৯০৮
মেরিকায় ভারতীয় ঠগী	(সত্য ঘটনা)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	২৪
ানের তপোভঙ্গ	(কবিতা)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬
বর	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৬৫
ইল	(উপন্যাস)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৪৩,৫০৬, ৭০০,৮৯৬
বেগ	(গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৭
পনিষদের ভূমা	(প্রবন্ধ)	শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল	৬৭১
ইচ, মিটার	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৮৫
কি গো মিঠুয় জ্বালা	(কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৭২৪
ারেষ্ট ও গৌরীশঙ্কর	(গবেষণা)	শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার	৪১২
বের মানুষ	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২১১
শোরী	(কবিতা)	শ্রীগোপাললাল দে বি, এ	৭৬৮
শোরীর বিস্ময়	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৬৩৯
র্ত্তনের স্বরলিপি		শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস (সঙ্গীতাধ্যাপক)	৪৮৫,৯০৪
ায়	(শিকার-কাহিনী)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৮৮৯
দেবতা	(গল্প)	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৮৭১
াথায় রাখি	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৩০
রোফর্ম্মের ঘোর	(গল্প)	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮
্যায়ুর-সম্মিলন	(প্রবন্ধ)	শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ,	৯৫৪
্তার কথা ও "শেষের কবিতা"	(প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ,	২৩৪
র-পথে	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৬৯৯
মের পথ	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫১৭
দাস	(কবিতা)	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৪৩৫
র্থ	(গল্প)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৬২৯
বরন্	(ভ্রমণ)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০৩
—			১৪,১৮২,৩৪৯,৬১৫,৭৬৯,৮৪৯
ত্তিকা	(কবিতা)	শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা	২৩
তর বাধা	(কবিতা)	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৪
ল-কুড়ন	(গল্প)	শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	৩৮৪
জ্যোৎস্নারাতি	(কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৭৩৬
জোড় কলম	(গল্প)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৫২১
ঝরাপাতার গান	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১০০৫
তুষার-তীর্থ—অমরনাথ	(ভ্রমণ)	শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭ ৯২৩
তীর্থ-দর্শন	(গল্প)	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	১১১
তৃণ-হরিৎ রাজ্য	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৭৮৮
"তোমারে ফুটায়ে তুলেছি কুসুম"—	(কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	২৪৩
দক্ষা	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৯৮
দপ্তর—			১১৯,৩৯২,৫৫৭,৭৮০
দিবা-স্বপ্ন	(কবিতা)	শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল বি, এ	৭৯
দীপান্বিতা	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	১৩১
দেবতা ও উপাসনা	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭০৮
দেহ নয়	(কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	৮৯৫
নবোঢ়া	(কবিতা)	মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৫০৪
নাগপাশ	(গল্প)	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৫৯১
নারীজন্ম	(গল্প)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৮৫
নারীর কর্ত্তব্য	(প্রবন্ধ)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭১৯
নারী-শক্তি	(কবিতা)	শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ	৬৬০
নিমাই	(কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস	১০১২
পথ ও পথিক	(কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৯০৩
পথ-প্রেম	(কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৪০
পথের কাঁটা	(গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৮
পরিচয়	(গল্প)	শ্রীমতী উষা মিত্র	৭৫৭
পিশাচের নাগপাশ	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	১৩২,২১২.৪০১
পূর্ণিমার চাঁদ	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৪৮
প্রচারক মহাশয়ের কায	(গল্প)	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৬৫
প্রশ্ন	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৪৪৭
প্রাচীন ফরাসী গ্রন্থে ভারতীয় চিত্র	(আলোচনা)	শ্রীহরিহর শেঠ	৮০
প্রাচ্যের শক্তিশালী দেশ	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৯৭৭
প্রার্থনা	(কবিতা)	খোন্দকার আবুল কাশেম	১২৩
প্রার্থী	(কবিতা)	শ্রীমতী ধরাসুন্দরী দেবী	৯৯৮
প্রেতপুরী	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৭২৫,৯৪৭
প্রেমের স্মৃতি	(কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮২৭
ফাগুন সাঁঝে	(কবিতা)	শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা	৭৫১
বক্কিমের বাড়ী	(কবিতা)	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	১১৭

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
বঙ্গ-বিদূষণ	(আলোচনা)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ	৫১০
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২
বড় ঘর	(উপন্যাস)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৭৩, ১৭২,৪৯১,৮১৮
বনছায়া	(কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্ল সরকার	৫৪২
বসন্ত-উৎসব	(গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৩৫৩
বাঘের চাতুরী	(শিকার-কাহিনী)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	২৪৯
বাণী-বন্দনা	(কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)	৬৮৮
বাঙ্গালী কোথায় গেল ?	(প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)	৬৬১
বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য	(প্রবন্ধ)	শ্রীতারকনাথ সাধু	৫৮৮
বায়ুর পথে	(ভ্রমণ)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৫৪৩
বিগত গুণীর যন্ত্র হেরিয়া	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৮৮৮
বিধিলিপি	(গল্প)	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	২২০
বিবর্ত্তন	(উপন্যাস)	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	২৫৫,৬৮৫, ৮৫৩,
বিরহে	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৫৫
বিশ্বকবির অনধিকারচর্চ্চা	(প্রবন্ধ)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	৭৩২
বিশ্বপ্রেম	(গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	১৬৪
বৈদেশিক—	(মন্তব্য)	সম্পাদক	৯১,২৭২,৪৩৬,৬৩৩,৮১৩,৯৯৪
বৈদেশিক সাহিত্য	(আলোচনা)	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫,৬১১,৮৬৪
বৈরাগীর চর	(গল্প)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৭৩৭
বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম	(প্রবন্ধ)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৮৮২
বে দ্ধ গয়ায়	(কবিতা)	শ্রীচরণদাস ঘোষ	২০২
বৌদ্ধ ধর্ম্মের শক্তিবাদ	(প্রবন্ধ)	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৮৩৭
ব্যর্থ প্রেম	(কবিতা)	শ্রীবাসন্তীকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ	৫২০
ভরাডুবি	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৯১৪
ভাই ফোঁটা	(গল্প)	শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৭৩
মধুরতা	(কবিতা)	মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৭২
মধ্য-এসিয়া	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৫১
মন্	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	২৪৮
মরণ ভোমরা	(গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
মান-ভঞ্জন	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৮৪১
"মানব-ধর্ম্মের" জন্মকথা	(প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ	৯৯৯
মিনতি	(কবিতা)	শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণ-তীর্থ	৮১৭
মিলন	(গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	৪২৩
মিলটন ও বঙ্কিমচন্দ্র	(কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	২৫৪
মিশরের প্রতিমা	(প্রবন্ধ)	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)	১৬৯
মুকুটমণি	(উপন্যাস)	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	৪১,২৪৪
মুক্তির বাঁধন	(কবিতা)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০০
যৌবনে জানাই আজি প্রাণের প্রণতি	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম, এ	২৬৩
রবীন্দ্র বিদূষণ	(প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ	১২৪
রাখালের বাঁশী	(কবিতা)	শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫৮০

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
রামশিলা পাহাড়ের বাঘ	(গল্প)	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৮৫
রুমা-হরণ	(গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৬
লহ মোর শেষ নমস্কার	(কবিতা)	শ্রীচন্দ্রনাথ সেন	৪১৮
লীলার মূল্য	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৯৫৩
শরণ	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫২৯
শিবনাথের গল্প	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৬
শিল্প	(কবিতা)	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯১
শিশুর হাসি	(কবিতা)	শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ-বি-এল	৪১৫
শিপ্রি বা শিবপুরী	(ভ্রমণ)	শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়	৫৫০
শ্মশানের গান	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম এ	৪০৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	(কবিতা)	অমৃতলাল বসু	৬৬১
শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৮৪৮
শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র	৩৩৭
শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ	(প্রবন্ধ)	ব্রহ্মচারী বিমল	৪৭৬
সংশয়	(কবিতা)	শ্রীমতী ধরাসুন্দরী দেবী	৪১১
সম্বরণ-প্রতিযোগিতা	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১৫১
সভ্যতা-প্রশস্তি	(কবিতা)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১৯
সত্যান্বেষী	(গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০১
সন্ধি	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৬৭৮
সন্ধ্যা পরী	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৮৭২
সরস্বতীর ছলনা	(কবিতা)	অমৃতলাল বসু	৫০৫
সাংহাই	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৩৮
সাধন	(গল্প)	শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ-বি-এল	৫২
সাময়িক	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১৫৯,৩২৮,৪৯৬,৬৬৩,৮২৮,১০০৬
সিংহল ব্রহ্মদেশ এবং বহির্ভারতের কতকগুলি প্রদেশ	(প্রবন্ধ)	শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ-বি-এল-পি-এইচ-ডি	৩৬৪
সিংহের মেলা	(শিকার-কাহিনী)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩৮০
সিরাজ ও ইংরাজ	(প্রবন্ধ)	নিখিলনাথ রায়	১০৩
সীমন্ত-হীরা	(গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩০
সুধা-কণা—অবোধা		শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪৮
সেকালের কথা	(আলোচনা)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩২১,৪২৭, ৫৭০,৬৯১
সে কোথায় !	(কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৫৬৯
স্পর্শের প্রভাব	(উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)	১৫২, ২৭৮,৪৮০,৫৮১,৭৪৫,৮৮৭
স্মৃতির বেদন	(কবিতা)	শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী	৩৪
স্মৃতির মূল্য	(উপন্যাস)	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য	১৪,২৬৯,৪১৯, ৫৩৮,৭১৪
স্বরলিপি		শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক	২৬৪
স্ত্রীশিক্ষা	(প্রবন্ধ)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ	৫১৫
হাড়্‌রানট	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	২৯৭
হিন্দুধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১
হেথা কেন আসিয়াছি আমি	(কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	৮৭

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী—বিবর্ত্তন	(উপন্যাস)	২৫৫,৬৮৫,৮৫৩
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—		
এ কি গো নিঠুর জ্বালা	(কবিতা)	৭২৪
শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় (এম. এ, বি, এল)—		
জীবন-জুড়ন	(গল্প)	৩৮৪
অমৃতলাল বসু—সরস্বতীর ছলনা	(কবিতা)	৫০৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	ঐ	৬৬১
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—		
অল্প একটু গল্প	(গল্প)	৫৫০
ভরাডুবি	ঐ	৯১৪
শ্রীমতী উষা মিত্র—পরিচয়	(গল্প)	৭৫৭
শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র—শ্রীরামকৃষ্ণ	(প্রবন্ধ)	৩৩৭
শ্রীকালিদাস রায়—কিশোরীর বিস্ময়	(কবিতা)	৬৩৯
গ্রাম-পথে	ঐ	৬৯৯
লীলার মূল্য	ঐ	৯৫৩
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—দক্ষ	ঐ	৯৮
কোথা রাখি	ঐ	২৩৩
খোন্দকার আবুল কাসেম—প্রার্থনা	ঐ	১২৩
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী—মুকুটমণি	(উপন্যাস)	৪১,২৪৪
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—		
প্রচারক মহাশয়ের কায		৫৬৫
রামশিলা পাহাড়ের বাঘ		৭৮৫
সুধাকণা		৪৪৮
শ্রীগোপাললাল দে (বি, এ)—কিশোরী	(কবিতা)	৭৬৮
শ্রীচন্দ্রনাথ সেন—লহ মোর শেষ নমস্কার	ঐ	৪১৮
শ্রীচরণদাস ঘোষ—বৌদ্ধ-গয়ায়	ঐ	২০২
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—		
ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিক	(আলোচনা)	৬২৭
কচি ছেলে—তার পর কি ?	ঐ	৮৬৪
ক্লোরোফর্ম্মের ঘোর	(গল্প)	৮৮
জার্ম্মাণীর মেয়ে গুপ্তচর	(আলোচনা)	৬১৯
জুতাওয়ালা বাটা	ঐ	৫
ধনকুবের কোর্ডের নূতন ধনোপার্জ্জনের উপায়	ঐ	৮
সোভিয়েট রাসিয়ার নূতন ঔপন্যাসিক	ঐ	১১
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—বৌদ্ধ ধর্ম্মের শক্তিবাদ	(প্রবন্ধ)	৮৩৭
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—কাজের মানুষ	(কবিতা)	২১১
ঝরা পাতার গান	ঐ	১০০৫
পূর্ণিমার চাঁদ	ঐ	৩৪৮
বিগত গুণীর যন্ত্র হেরিয়া	ঐ	৮৮৮
বিরহে	ঐ	১৫৩
সন্ধ্যা পরী	ঐ	৮১২
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)—		
যৌবনে জানাই আজি প্রাণের প্রণতি	ঐ	২৬৩
শ্মশানের গান	ঐ	৪০৫
শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)—		
আমার পূর্ব্বস্মৃতি	ঐ	৯০৮
বাথরুম বা অসংযত সাহিত্য	(প্রবন্ধ)	৫৮৮

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—		
আমেরিকার ভারতীয় ঠগী	(সত্য ঘটনা)	২৪
কাশ্মীরের গেছো ভূত	(অলৌকিক রহস্য)	৭৫২
কুগার	(শিকার-কাহিনী)	৮৮৯
পিশাচের নাগপাশ	(উপন্যাস)	১৩২,২১২,৪০১
প্রেতপুরী	(রহস্যোপন্যাস)	৭২৫,৯৪৭
বাঘের চাতুরী	(শিকার-কাহিনী)	২৪৯
বায়ুর পথে	(ভ্রমণ)	৫৪৩
সিংহের মেলা	(শিকার-কাহিনী)	৩৮০
সেকালের কথা	(আলোচনা)	৩২১
সেকালের স্মৃতি	(প্রবন্ধ)	৪২৭,৫৭০,৬৯১
শ্রীদিলীপকুমার রায়—মিলটন ও বঙ্কিমচন্দ্র	(কবিতা)	২৫৪
শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস (সঙ্গীতাধ্যাপক)—		
কীর্ত্তনের স্বরলিপি		৪৮৫,৯০৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু—জোড় কলম	(গল্প)	৫২১
শ্রীমতী ধরাসুন্দরী দেবী—প্রার্থী	(কবিতা)	৯৯৮
সংশয়	ঐ	৪১১
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)—বাণী-বন্দনা	(কবিতা)	৬৬৮
স্পর্শের প্রভাব	(উপন্যাস)	১৫২,২৭৮,৪৮০,৫৮১,৭৪৫,৮৮৭
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—		
উইল	(উপন্যাস)	৩৪৩,৫০৬,৭০০,৮৯৬
শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—অভিনন্দন	(কবিতা)	২৯৬
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	ঐ	৪৫০
নিখিলনাথ রায়—সিরাজ ও ইংরাজ	(প্রবন্ধ)	১০০
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
ডেনমার্কের কৃষি ও রাষ্ট্র	(আলোচনা)	৬৩৩
তুষার-তীর্থ—অমরনাথ	(ভ্রমণ)	৪৭,৯২৭
শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক—স্বরলিপি		২৭৪
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—		
মিশরের প্রতিমা	(প্রবন্ধ)	১২৯
শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী—বিধিলিপি	(গল্প)	২২০
কুলদেবতা	ঐ	৮৭১
শ্রীপ্যারীমোহন দাসগুপ্ত—চণ্ডীদাস	(কবিতা)	৪০৫
শ্রীপ্রফুল্ল সরকার—বন-ছায়া	(কবিতা)	৫৪৫
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়—মিলন	(গল্প)	৪২৩
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)—		
বাঙ্গালী কোথায় গেল ?	(প্রবন্ধ)	৬৬১
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ছোটর বাধা	(কবিতা)	২৮৪
শিল্প	ঐ	৩৯১
শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার—দেহ নয়	ঐ	৮১৫
হেথা কেন আসিয়াছি আমি	(কবিতা)	৮৭
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)—		
অবগুণ্ঠন প্রথা	(প্রবন্ধ)	১২২
চিদম্বরম্	(ভ্রমণ)	২০৩
নারীর কর্ত্তব্য	(প্রবন্ধ)	৭১৯
বিশ্বকবির আধ্যাত্মিক সাধনা	ঐ	৩৯২
স্ত্রীশিক্ষা	ঐ	৫১৫

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীবাসন্তীকুমার ভট্টাচার্য্য (বি, এ)—		
ব্যর্থ-প্রেম	(কবিতা)	৫২০
শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি, এ,)—দিবাস্বপ্ন	(কবিতা)	৭৯
শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রেমের স্মৃতি	(কবিতা)	৮২৭
শ্রীবিমলাচরণ লাহা (এম-এ-বি-এল-পি-এইচ-ডি)—		
সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও বহির্ভারতের কতকগুলি প্রদেশ	(প্রবন্ধ)	৩৬৪
ব্রহ্মচারী বিমল—শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ	(প্রবন্ধ)	৪৭৬
শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—অনাগত ও আমি	(কবিতা)	৫৫৬
পথ-প্রেম	ঐ	৪০
পথ ও পথিক	ঐ	৯০৩
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—মিনতি	ঐ	৮১৭
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	৬২
শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী—স্মৃতির বেদন	(কবিতা)	৩৪
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—		
প্রাচীন বঙ্গের বহির্বাণিজ্য	(প্রবন্ধ)	১১৯
শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ-বি-এল)—		
উপনিষদের ভূমা	(প্রবন্ধ)	৬৭১
শিশুর হাসি	(কবিতা)	৪৯৫
সাধন	(গল্প)	৫২
শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ভাই ফোঁটা	(গল্প)	৭৭৩
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য—		
স্মৃতির মূল্য	(উপন্যাস)	৯৪,২৬৯,৪১৯,৫৩৮,৭১৪
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ—নবোঢ়া	(কবিতা)	৫০৪
মধুরতা	ঐ	৭২
শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ—নারীশক্তি	(কবিতা)	৬৬০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ—অযথা নিন্দা	(প্রবন্ধ)	১২১
বিশ্বকবির অনধিকারচর্চ্চা	(প্রবন্ধ)	৭৩২
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (বি, এ)—		
গোড়ার কথা ও "শেষের কবিতা"	ঐ	২৩৪
বঙ্গ-বিদূষণ	ঐ	৫১০
মানব-ধর্ম্মের জন্মকথা	ঐ	৯৯৯
রবীন্দ্র-বিদূষণ	ঐ	১২৪
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বঙ্কিমের বাড়ী	(কবিতা)	১১৭
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা—চলন্তিকা	(কবিতা)	২৩
ফাগুন-সাঁঝে	ঐ	৭৫১
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—চতুষ্পুপ	(গল্প)	৬২৯
দীপান্বিতা	(কবিতা)	১৩১
প্রশ্ন	ঐ	৪৪৭
বৈরাগীর চর	(গল্প)	৭৩৭
মর	(কবিতা)	২৪৮
শরণ	ঐ	৫২৯
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়—তীর্থ-দর্শন	(গল্প)	১১১
নাগপাশ	ঐ	৫৯১
শ্রীরামেন্দু দত্ত—জীবনের গতি	(কবিতা)	৭৩৬
তোমারে ফুটায়ে তুলেছি কুসুম	ঐ	২৪৩
সে কোথায় !	ঐ	৫৬৯
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এস্ সি)—		
মুক্তির বাঁধন	ঐ	৪০০
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—		
সহজিয়া পদ-সংগ্রহ	(প্রবন্ধ)	৫৫৭
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল)—		
ঈশানের তপোভঙ্গ	(কবিতা)	৭৫৬
পথের কাঁটা	(গল্প)	৫৯৮
মরণ ভোমরা	ঐ	৩৫
রূমা-হরণ	ঐ	৩৬৬
সত্যান্বেষী	ঐ	৮০১
সীমন্ত-হীরা	ঐ	৯০০
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)—		
ঈশ্বর	(প্রবন্ধ)	২৬৫
দেবতা ও উপাসনা	ঐ	৭০৮
হিন্দু ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	(প্রবন্ধ)	১
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—নারীজন্ম	(গল্প)	১৮৫
শ্রীশ্রীজীব ন্যায়-তীর্থ (এম, এ)—		
গুরুবায়ুর-সম্মেলন	(প্রবন্ধ)	৯৫৪
শ্রীশ্যামাকান্ত তর্ক-পঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)—		
ভক্তি	(প্রবন্ধ)	৫৬২,৭৮০
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—বসন্ত-উৎসব	(গল্প)	৩৫৩
বিশ্বপ্রেম	ঐ	৯৬৪
বৈষ্ণব কবির বিশ্বপ্রেম	(প্রবন্ধ)	৮৮২
সম্পাদক—চয়ন—		১৪,১৮২,৩৪৯,৬১৫,৭৬৯,৮৪৯,
বৈদেশিক—		৯৯,২৭২,৪৩৬,৬৩৪,৮১৩,৯৯৪
সন্তরণ-প্রতিযোগিতা		১৩৮
সাময়িক—		১৫৯,৩২৮,৪৯৬,৬৬৩,৮২৮,১০০৬
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ—অতীতের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	৬৪০
উদ্বেগ	(গল্প)	১৭
তৃণহরিৎ রাজ্য	ঐ	৭৮৮
প্রাচ্যের শক্তিশালী দেশ	ঐ	৯৭৭
মধ্য-এসিয়া	(প্রবন্ধ)	৪৫১
সাংহাই	ঐ	১০৮
হাডরামট	ঐ	২৯৭
শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার—এভারেষ্ট ও গৌরীশঙ্কর	(গবেষণা)	৪১২
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস—নিমাই	(কবিতা)	১০১২
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ (কবিরত্ন)—শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা	ঐ	৮৪৮
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—		
পালরাজত্ব-সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প	(আলোচনা)	৩৯৬
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবনাথের গল্প	(গল্প)	৪০৬
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—এইচ, মিটার	(গল্প)	২৮৫
বড় ঘর	(উপন্যাস)	৭৩,১৭২,৩৯১,৮১৮
মান-ভঞ্জন	(গল্প)	৮৪১
সন্ধি	ঐ	৬৭৮
সভ্যতা-প্রশস্তি	(কবিতা)	২১৯
শ্রীহরিহর শেঠ—		
প্রাচীন ফরাসী গ্রন্থে ভারতীয় চিত্র	(আলোচনা)	৮০
শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়—		
শিপ্রি বা শিবপুরী	(ভ্রমণ)	৫২০
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়—		
রাখালের বাঁশী	(কবিতা)	৫৮০

চিত্র-সূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা
অতিকায় দুরবীক্ষণ-যন্ত্র	১৫
অতিকায় সরীসৃপ	৬১৮
অদাহ্য পরিচ্ছদ	৬১৭
অন্নুমা হ্রদের তীরে চড়িভাতি	৯১৯
অবাক্ হাসি	৯২১
অভিযানকারীরা আকসু ত্যাগ করিতেছেন	৪৫১
অরবিন্দ ঘোষ	৩২১
অর্দ্ধ-বৃত্তাকৃতি সেতু	৯৮২
অলিম্পিয়ার সরকারী প্রাসাদ	৭৯৯
অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম	৮৬
অগ্ন্যুৎপাতকালে আসামা পর্ব্বতের দৃশ্য	৯৮০
আইমু জাপদিগের গল্প-গুজব	৯৮২
আগা খাঁ	৪৪৫
আজি যে রজনী যায় [ত্রিবর্ণ] ফাল্গুন	প্রথম
আদালত-ঘরে রাম সিং রামচন্দ্রকে গুলী	২৭
আধুনিক টোকিওর অট্টালিকা	৯৮৮
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়—সাধারণ দৃশ্য	২০৯
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ	২১০
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়—ছাত্রাবাস	২১০
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্সালয়ত্রয়	২০৯
আবর্ত্তমান হাঁসপাতাল.	৩৫১
আবর্ত্তনশীল-গৃহ	৩৪৯
আমরা গৃহকোণে দাঁড়াইলাম	৫৪৬
আরববাসী কাফ্রী	৩০২
আলিঙ্গনের তরে হেসে	১৫০
সার আলি ইমাম	১৬৮
ইয়াকিমা উপত্যকার ২০ ফুট উচ্চ গাছ	৭৯৭
ইয়াকিমা রেলপথে একটি দৃশ্য	৭৯৪
ইয়াকোহামার একটি দৃশ্য	৯৮৭
ইস্পাতের খেয়া নৌকা	১৫
উইটনাচীর কলম্বিয়া নদের বাঁধ	৭৯৮
উচ্চশ্রেণীর হাডরামট নারীদল	৩১০
উৎসবক্ষেত্রে জাপানী কৃষক-কৃষ	৯৯১
উৎসাহী সদাগরগণ	৯৭৭
উপনিবেশের শিখ পুলিস	১৪৪
উপন্যাস-পাঠে [ত্রিবর্ণ] মাঘ	প্রথম
উপেক্ষিতা [ত্রিবর্ণ]	৫৯২
উড্ডচর বিমান	৭৭২
উড্ডচর দ্বিচক্রযান	৬১৮
উলার হ্রদের সাধারণ দৃশ্য	৪৭
উল্লুকে হাসি	৯২০
উ—সিংহের মুখে হাত পুরিয়া ধরিল	৩৮২
উষা [ত্রিবর্ণ] অগ্রহায়ণ	প্রথম
এক জন মঙ্গোল রাজপুত্রী	৪৭০
একটি বোতল দিয়া কুগারকে ঠেঙ্গাইতে লাগিল	৮৯০
এডিসন	১০

চিত্র	পৃষ্ঠা
এলিয়ট উপসাগরের দৃশ্য	৭৮৮
ওয়েল ফেয়ার আইলাণ্ড সিটি হাসপাতাল	৪৩৯
ওসাকা বিদ্যালয়ে ব্যায়াম	৯৮৬
কনক-সভা—চিদম্বরম্	২০৪
কবি জন হাউয়ার্ড পেইনের জন্মগৃহ	৭৭২
করাতের সাহায্যে কাষ্ঠ ছেদন	৭৯৬
কম্বলাবৃত মৃত বালকের দেহ	৭৫৪
কর্ম্মকার	৮৪
কলম্বো—বলদ-বাহিত গাড়ী	৬৪০
কলে চাউল ঝাড়া হইতেছে	৯৮১
কলের মানুষ	৩৫১
কল্কি অবতার	৮২
কাইজার	৪৪২
কাগজের সাজোয়া গাড়ী	৬১৬
কাণার হাসি	৯২০
কানচাউ সহরের মুণ্ডহীন দেবতা	৪৬৩
কানচাউ সহরের প্রাতরাশ	৪৬৫
কানচাউ হইতে বড় দিনের ভেট প্রেরণ	৪৬৪
কামাল পাশা	৪৪৩
কারাখোজায় অভিযানকারিগণ	৪৫২
কালীমন্দিরের একাংশ	৩৪২
কালো কাচের অট্টালিকা	১৮৩
কাষ্ঠ চালানের ব্যবস্থা	৭৯১
কাষ্ঠ হইতে কাগজের ন্যায় পাতলা পাতলা চাদর বাহির হইতেছে	৭৯৫
কাষ্ঠের স্তূপ	৯৮৩
কুলীরা বোঝা টানিতেছে	১৪৬
কুম্ভীর ও মানুষের লড়াই	১৮২
কূপ হইতে জল উত্তোলন	৮৫
কুয়োমূলের কারুকার্য্য	৪৫৮
কুয়োমূলে মোহর খোদাই	৪৫৮
কূর্ম্ম অবতার	৮৩
কৃষ্ণ অবতার	৮১
কৃষ্ণগঙ্গা	৫১
কৈশোর-স্বপ্ন [ত্রিবর্ণ]	৮৭২
কোয়াবার হ্রদে সমাধি	৩২০
কোয়েডন সহর	৩০০
কোলাকুলি	১৫৬
ক্যানানোর তীরে ধীবর-কুটীরশ্রেণী	৬৪০
খাদ্যদ্রব্য কালো আধারে রাখা হইতেছে	১৪
খুরাইজ নগর	৩০৩
খৃষ্ট মন্দির-সংলগ্ন দিনপঞ্জিকা	৪৫৯
খোকন হাসি	৯২১
গগন-চুম্বী পাহাড়	৯২৪
গর্দ্দভ সাহায্যে নালিয়াড়ি অতিক্রম	৪৬৭
গন্ধকাষ্ঠ	৩০১
গলিত তুষার হইতে উৎপন্ন হ্রদ	৭৯৯

চিত্র	পৃষ্ঠা
গাড়ীর মধ্যে স্নানের চৌবাচ্চা	৮৫০
গিরিশচন্দ্র বসু	৩৩৩
গুয়ামদ্বীপবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন	৬৫৮
গুয়ামদ্বীপের রাজার কন্যা	৬৫২
গুরুবায়ুর মন্দির	৯৫৬
গুরুবায়ুরের শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ	৯৫৮
গৃহলক্ষ্মী [ত্রিবর্ণ]	৫৪০
গোয়া পোর্ত্তুগালের ভারতীয় উপনিবেশ	৬৫৩
গৌরীশঙ্কর	৪১৩
গোলাপের কাঁটা [ত্রিবর্ণ] পৌষ	প্রথম
গোবি মরুভূমিমধ্যস্থ কূপ	৪৫৭
গ্রাম্য ডাকঘর	১৫
ঘরের পথে [ত্রিবর্ণ]	৪৮৪
ঘল বা উয়াজীর	২৯৯
চণ্ডেরী দুর্গ	৫৩২
চমকিত মন, চকিত শ্রবণ [ত্রিবর্ণ] কার্ত্তিক	প্রথম
চাঁদপাটা ক্লাব	৫৩৩
চাঁদপাটা হ্রদের একাংশ	৫৩১
চিদম্বরমের মন্দির	২০৩
চিদম্বরমের উৎসব-মূর্ত্তি	২০৫
চিদম্বরমের বিষ্ণু-বিগ্রহ	২০৬
চিঁড়েচ্যাপ্টা চট্টরাজ	১৫৭
চীনা নরসুন্দর	১৪২
চীনা সংবাদপত্র-বিক্রেতা	১৪৩
চীনা নৌকা স্রোতে চলিয়াছে	১৪৩
চীনা ব্যাণ্ডবাদক	১৪৫
চীনা নৌকাপরিচালন-পদ্ধতি	১৪৬
চীনা দোকানে বিজ্ঞাপন	১৫০
চীনা কবর	৪৫৯
চীনা কথক	৪৬২
চীনা বাদকদল	৪৬৪
চেলান হ্রদ	৭৯৯
ছত্রীর প্রবেশদ্বার	৫৬৩
জর্জ্জ ক্যাসেল	৫৩৩
জাপটে ধরে গ্যাসপোষ্টকে	১৫৮
জাপানী নৌ-বাহিনীর কুচকাওয়াজ	৯৮৪
জাপানী মঠ	৯৮৫
জাপানী তরুণীর ফুলের তোড়া রচনা	৯৯০
জাপানী জুতার দোকান	৯৯৩
জোলএর ছোরাধারী বেদুইন	৩০৬
জোয়ার-ভাঁটা হাসি	৯২১
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	৫০৩
ঝড়-উৎপাদক যন্ত্র	১৫
ঝুড়ি বোঝাই শূকর	১৪০
ঝুনো হাসি	৯২২
টমাস ব্যাটা	৫

চিত্র	পৃষ্ঠা
টাইগার হিল—এভারেষ্টের দৃশ্য	৪১৫
ট্যারাডেল ফিউগার তীরস্থ জাহাজ	৬৫৬
ট্যারাডেল ফিউগো	৬৫৮
টারিম নগর	৩১৩
টারিমের সহরতলী	৩১৮
টার্গেট দ্বীপের দুর্গের অংশ	৬৫০
টুয়ামোটু সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য	৬৬০
টেরার হাসি	৯২০
টোকিও নদীর উপর সেতু	৯৮৭
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়	৯৯২
টোকিও নগরে সম্রাটের সেনাদর্শন	৯৭৬
টুলে উঠেও বন্ধু না পায়	১৫৭
ডিজার আল বুথরী	৩০৪
ডি, ভ্যালেরা	২৭৩
ঢাক, ঢোল ও বাঁশী	১৮৩
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস [ত্রিবর্ণ]	৭৬
তন্তুবায়	৮৫
তন্ময় [ত্রিবর্ণ]	৭২০
তস্কর-বিতাড়নের নূতন ব্যবস্থা	৮৫২
তাহার পর তাহার মস্তকটি ছেদন করা হইয়াছিল	২৬
তিনটি থাকবিশিষ্ট কলার ছড়া	৮৫২
তুলির সাহায্যে লিখিতে শিখিতেছে	৯৯২
তুষার-নদী অতিক্রম	৭৯৩
তুষারাবৃত সেণ্টহেলেন পর্ব্বতস্থ কক্ষ	৭৯৮
তেজ বাহাদুর	৪৪৩
তৈলকার	৮৪
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী	৩৪১
দন্তপেলু হাসি	৯২০
দশ হাজার কাঠের টুকরার টেবিল	৬১৬
দানীবাবু	৩৩৬
দারুনির্ম্মিত গৃহ	১৪
দীর্ঘাকার বিমান	৭৭১
দুর্গমপথে অভিযানকারীরা	৪৫৩
দেঁপনহাসি	৯২১
দেশীয় ইণ্ডিয়ানদিগের ডোঙ্গা	৭৯২
দ্বিচক্রযানে দ্রব্য সরবরাহ	৯৮৪
দ্রুতগামী জলযান	৩৫১
দ্রুতগামী মোটরবোটে পলায়ন	৩২
ধর্ম্মপ্রচারক হুডের সমাধিদৃশ্য	৩১৯
ধাবমান মোটরে বিমান অবতরণ	৭৭০
ধুমুরী	৮৫
ধূলিনিবারক রেলগাড়ী	৮৫১
নকল পুলিস-প্রহরী	৮৫১
নকল মানুষরক্ষী	৭৭১
নকল হেডেনবার্গ দুর্গ	৮৫১
নগেন্দ্রনাথ রাহা	৬৬৮
নদী ও বালিয়াড়ী	৪৬৬
নমনীয় কাঠের চেয়ার	৫৫০
নরেশচন্দ্র মিত্র	৮০৬

চিত্র	পৃষ্ঠা
নারী কমিশনার	৫০১
নিংসিয়ার মন্দির	৪৬৫
নিংসিয়ার রাজপথ	৪৭৪
নিংসিয়ার সন্নিহিত মন্দিরের পতাকা	৪৭৫
নিখিলনাথ রায়	১৬৪
নিত্য মামলা-মকর্দ্দমায়	১৫৭
নূতন আকারের পেট্রোলের দোকান	৮৫২
নূতন ডেষ্ট্রয়ার-পোত	৯৮৩
নূতন ধরণের মোটর-চালিত দ্বিচক্রযান	৬১৬
নূতন নিউইয়র্ক হাসপাতাল	৪৩৮
নূতন ব্যায়াম-পদ্ধতি	১৮৪
নৃসিংহ অবতার	৮৪
পকেট ছাইদানী	৭৬৯
পঙ্কে পড়ে অঙ্কুরেতে	১৫৮
পঞ্চমুখী পেঁপে	১৮৪
পঞ্চবটী	৩৪২
পদচালিত 'স্লেপ' গাড়ী	১৪
পনীরের চাকা	১৮২
পরমহংসদেব ও হৃদয়	৩৪০
পরমহংসদেবের ঘর	৩৪১
পরশুরাম	৮৩
পাইপিংএ অভিযানকারীরা	৪৭৩
পাগড়ী আকর্ষণ করিতেই	২৫
পান্থনিবাস	৮৭
পার্ব্বত্য নদীর উপর সুদৃশ্য সেতু	৯৯০
পালের সাহায্যে সন্তরণের সুবিধা	৬১৬
পাহাড়িয়া বন্দী	৫৪৭
পেঁচা হাসি	৯২০
প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখায় বিধ্বস্তপ্রায় হাউসবোট	৭৫৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য্য)	৩৩৫
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে জাল-নিক্ষেপ-প্রণালী	৬৫৭
প্রশান্ত মহাসাগরকূলে স্নান	৭৯০
প্রাচীন যুগের পণ্যবাহী পোত	৭৯১
প্রায় শতবৎসরের ইংরাজ শিবির	৭৯০
প্রাচীনকালের নৌকা	১৪৭
প্রেসিডেন্ট হুভার	৪৪৫
প্লাষ্টার-নির্ম্মিত নরকপাল	৬১৭
ফুচু রাজপথে চীনা দোকান	১৪৯
ফুজি আগ্নেয়গিরি	৯৭৮
ফুজি এক্সপ্রেস—ফুজি নদী	৯৭৮
ফুটপাতেতে ঠাঁই নাই আর	১৫৬
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট	২৭২
বনমানুষ হাসি	৯২১
বরাহ অবতার	৮২
বলডুইন	২৭৪
বলরাম	৮২
বর্ত্তমান নাবালক মহারাজ	৫৩৩
বর্ত্তমানের প্যাটাগোনীয় ইণ্ডিয়ান্	৬৪৭
বর্ত্তমান ক্যানারী দ্বীপের বন্দর	৬৫৫

চিত্র	পৃষ্ঠা
বর্ম্মাবৃত বৈজ্ঞানিকের আগ্নেয়গিরিতে অবতরণ	৮৪৯
বস্ত্রখণ্ডে আলোকচিত্র মুদ্রণ	৭৭০
বাঘটি লাফ দিতেই ব্রাউন মাটিতে পড়িয়া গেলেন	২৫১
বাদলে মাদল [ত্রিবর্ণ]	১১৬
বাঁদুরে হাসি	৯২০
বাঁধাকপির ঝুড়ি	১৪১
বাঁধের দৃশ্য	১৪২
বামন অবতার	৮৩
বান্দা দ্বীপে জয়ত্রী শুষ্ক করা হইতেছে	৬৪৬
বাম্বুর বাজার	৫৪৮
বা-সুরয়ার প্রাসাদ	৩৩৭
বালকদিগের বন্দুক চালান শিক্ষা	৯৮১
বালিকাদিগের বলখেলা	৯৯১
বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র	১৭১
বিদুষী মোঙ্গলরাজকুমারী	৪৫৯
বিদ্যুতালোকে নলিনীর পরিপুষ্টি	৭৬৯
বি, ভি, আয়েঙ্গার	৯৬২
বিষ্ণুমন্দিরের সিলিংএর কারুকার্য্য	৫০৫
বিষ্ণুমন্দিরের প্রবেশদ্বার	৫০৬
বিউয়েনস্ এয়ারস্ বন্দর	৬৫৩
বিচিত্র আম্র	১৮৪
বিটলভাই প্যাটেল	৮১৫
বৃদ্ধ জুলিয়ান আয়নায় পশ্চাতের দৃশ্য দেখিতেছেন	৭২৭
বৃহত্তম বাতিদান	৩৫০
বেজায় খুসি হাসি	৯২০
বেদুইন রক্ষিদল	৩০৭
বেপ্পুর ধারে উষ্ণজলে রোগনিরাময়	৯৮২
বেসবল ক্রীড়া	৯৯০
বোর্ণিও দ্বীপের রণনৃত্য	৬৫৪
বোর্ণিওর বারিটো নদীতে কুম্ভীর	৬৪৭
বোম্বাইয়ের 'গাঙ্গে' জাহাজে সুভাষচন্দ্র বসু	৮০৫
ভাবী সেনাদল	৯৭৯
ভাঁজ করা সেতু	৭৭১
ভারতীয় লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইল	৩১
ভল্লুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি	৭৯৬
ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের দৃশ্য	৩৪১
ভূগর্ভস্থ খালে নৌ-চালনা	১৮২
ভূতপ্রেতের উপদ্রব নিবারণার্থ চীনাপুত্রের পৃষ্ঠে মন্ত্রপূত বস্ত্র	১৪০
ভূতপূর্ব্ব মহারাজার ছত্রী	৫৩৭
ভূতপূর্ব্ব মহারাণীর ছত্রী	৫৩২
ভূলম্ব ঘটিকাযন্ত্র	৭৭০
মঙ্গোল জলবাহী গাড়ী	৪৭২
মঙ্গোল দর্শক	৪৬৯
মজলিসি হাসি	৯২১
মটরশুঁটির ক্ষেত্র	৭৯৮
মৎস্য অবতার	৮৩

চিত্র	পৃষ্ঠা
মৎস্য-শিকারী জলে পড়িল	৮৯২
মদনমোহন মালব্য	৪৯৮
মধ্য-এসিয়ার উষ্ট্রযূথ	৪৫৮
মনটিভিডিওর বন্দরে মাল বোঝাই	৬৪৫
মন্দিরাকৃতি বাসভবন	৮৫০
মরুভূমি শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত	৮০০
মরুমধ্যে তিনটি দুর্গ	৩০৮
মলক্কা বন্দরে মাল বোঝাই	৬৪৪
মাউন্ট অলিম্পসের অরণ্যে মৃগযূথ	৭১৩
মাড়ুক দ্বীপের বস্ত্রশিল্প	৬৪৩
মাতব্বরী হাসি	৯২১
মাধবরাও, সিন্ধিয়ার ছত্রীর উদ্যানবীথি	৫৩১
মানের পালা [ত্রিবর্ণ]	৭৭৬
মাননীয় জর্জ্জ সেফোর্ড ও সুন্দরী	৯৫০
মার্কিণের বাঘ কুগার	৮৮৯
মার্কিণ মালখানা রক্ষার কৌশল	৬১৫
মার্কিণ সৈনিকের শিশুকে আদর	১৪৮
মার্কিণ কন্‌সালের সমাধি	৯৮৯
মাসা কোয়াটনএ সুলতানের প্রাসাদ	৩১৫
মিথ্যা সংবাদের প্রতীকার-ব্যবস্থা	৬১৫
মুকালা বন্দর	৩৯৮
মুকালার দৃশ্য	২৯৭
মুর্টুকের জননী ও শিশুর দোলা	৪৫৫
মুর্টুকের বালকদল	৪৫৪
মোটরগাড়ীর জন্য পথ প্রস্তুত	ঐ
মোটরচালিত লৌহহস্তী	৩৪৯
ম্যাগেলানের সময়ের পোত	৬৪৬
ম্যাগেলানের আবিষ্কৃত পার্ণাম্বিউকোর বর্ত্তমান অবস্থা	৬৫১
ম্যাগেলানের আবিষ্কৃত সাটোলুসিয়া উপসাগর	৬৫৯
ম্যাগেলানের ব্যবহৃত গরুর গাড়ী	৬৪১
ম্যাগেলান-পরিচালিত পোতবহর	৬৪২
যদি কলস ভাসায়ে জলে [ত্রিবর্ণ]	চৈত্র প্রথম
যদুনাথ মজুমদার	১৭৫
যবদ্বীপের ফল-বিক্রেতা	৬৪৮
যবদ্বীপের শিল্পী	৬৮৪
যমজ কাঁঠাল	১৮৪
যন্ত্রসাহায্যে পরিচ্ছদ পরিষ্কার	১৮৩
যাগযজ্ঞের যন্ত্রাদি	৮১
য়ুমান (ডাক্তার)	১৬৬
যুদ্ধবিমানে কাঁচের খাঁচা	১৫
যৌবনের স্মৃতি [ত্রিবর্ণ]	৪২৮
রকফেলার মেডিক্যাল সেণ্টার	৪৪০
রচিত মুখমণ্ডলের মধ্যে শিল্পীর মুখ	৮৫০
রঞ্জনরশ্মির প্রভাব	১৫
রবাবের নৌকা	৩৫২
রবীন্দ্রনাথ	৫০০
রত্নস্তম্ভময় নগর	৩১২
রাজেন্দ্রপ্রসাদ	৪৯৮
রাম অবতার	৮২
রামলাল চট্টোপাধ্যায়	৩৩৮
রাত্রিকালে পক্ষীর সাহায্যে মৎস্য শিকার	৯৮৬
রাহুগণ্ডীর হাসি	৯২১
রুসিয়ার শ্রমিক-শত্রুর কুশপুত্তল-মূর্ত্তি	৬০৮
রেজা খাঁ পেহ্‌লভি	৪৪২
রেলপথ ও রাস্তায় চলিবার মোটর গাড়ী	৮৫২
লংভিউ বন্দরে বিভিন্ন জাতীয় পোতে কাষ্ঠ বোঝাই	৭৯১
লিওনের কাষ্ঠপাদুকা-নির্ম্মাতা	৭৯২
লিপিকার	৮৬
লিস্‌বনের ফেরিওয়ালা	৬৪২
লুকোচুরি হাসি	৯২০
শঙ্করাচারিয়া মন্দির	৯২৭
শঙ্করাচারিয়া হইতে ডাল হ্রদের দৃশ্য	৯২৬
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬৩
শস্যক্ষেত্রে মুসলমান নারী	৩০৫
শিবম্ নগর	৩১৪
শিবমের সুলতানের প্রাচীন প্রাসাদ	৩১৩
শিবমের তুষার-ধবল মসজেদ	৩১৬
শিবমের অপর দৃশ্য	৩১৮
শিপ্রির রাজপ্রাসাদের একাংশ	৫৩০
শিল্পনিদর্শন	৩৫২
শিশুপৃষ্ঠে জাপানী নারী	৯৮৮
শিশুর অস্থায়ী ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ	১৫
শিক্ষিত অশ্বের বাহাদুরী	৩৪৯
শীতকালে তুষারমণ্ডিত শিবিরের উপর আরোহণ	৭৯৬
শীতকালে সুড়ঙ্গপথে পান্থনিবাসে প্রবেশ	৭৯৫
শুক্তিসংগ্রহকারী নরনারী	৯৮১
শুক্তি-সংগ্রহে নারী ডুবুরী	৯৮৩
শূন্যপথে খেয়া	৩৫০
শূন্যপথে খেয়া পার	৭৬৯
শৈল-সমাকীর্ণ শিওলো অন্তরীপ	৯৮৩
শ্রান্তরূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে [ত্রিবর্ণ]	১৬৮
শ্রীশ্রীভবতারিণী	৩৩৯
সতীদাহ	৮৬
সত্রভবন	৯৬১
সপ্তবর্গ	৮০
সভাপতি গোকুলনাথজী পতাকা উত্তোলন করিতেছেন	১৬৩
সমুদ্রমগ্ন শৈলের চূড়াদেশ	৭৮৮
সর্ব্বজাতীয় বাতিদান	৬১৫
সাইউন টারিমের মধ্যবর্ত্তী আরিয়ামা ধ্বংসস্তূপ	৩১৪
সাইউনের সৈয়দ প্রাসাদ	৩১৯
সাংহাই ঘোড়দৌড়ক্ষেত্র	১৩৮
সাংহাই নদের বক্ষে জল	১৩৯
সাংহাই বন্দরে চীনা নৌকা	১৪৭
সাগরেদ [ত্রিবর্ণ]	২৬৪
সাজোয়া গাড়ীর লম্ফ	১৮৩
সামুদ্রিক মৎস্য শিকার	৭৯০
সার সামুয়েল হোর	৪৪৪
সারদার মন্দির	৯২৫
সারদার পথে লতার ঝোলা ফুল	৪৮
সালমন মৎস্য-শিকার	৭৯৭
সিংটম নদী ও সেতু	৫০
সিংহের মেলা	৩৮১
সিডার বৃক্ষের মধ্যে রাজপথ	৭৮৮
সিয়াটেল প্রতিষ্ঠাতৃগণের অবশিষ্ট মিঃ ডেনি	৭৮৯
সিলিবিস দ্বীপের তরুণীরা অশ্বারোহণে কাযে যাইতেছেন	৬৪৫
সুধীরকুমার ঘোষ	১৫১
সুনীতি দেবী (মহারাণী)	১৬৭
সুবৃহৎ কোয়াশফল	৭৭৭
সুবৃহৎ জলমঞ্চ	৩৫২
সুমাবার বাটক গ্রাম	৬৪৯
সুলতানের সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ	৩১৫
সুলতানের প্রাসাদ হইতে শিবমের দৃশ্য	৩১৭
সুরবায়ার বিষ্ণুমন্দির	৫৩৪
সুসজ্জিতা [ত্রিবর্ণ]	২২৮
সুবেশ যুবক	৩০২
সূত্রধর	৮৪
সেডিলির সঙ্গী	৬৫১
সেচ দেওয়া	৮৫
স্তাওয়ারলু হইতে এভারেষ্টের দৃশ্য	৪১৪
স্পোকেনের নদীতীরস্থ রাজপথ	৭৯৭
স্প্রীং-পুত্তলীর কবিতা-রচনা	৭৭০
ষ্টীমারের আকারবিশিষ্ট পান্থনিবাস	৭৭১
হংসাকৃতি গৃহ	৩৫০
হস্তীর আকারবিশিষ্ট বাসগৃহ	৬১৭
হাডরামি পুরুষ	৩০৬
হাডরামট বেদুইন	৩০৮
হাডরামট মসজেদ-শোভিত সহর	৩১১
হাডরামি উপত্যকায় বেদুইন	৩০৯
হাল্‌জোয়ারায় ব্রাহ্মণ-পরিবার	৪৯
হাবার হাসি	৯২০
হার্ব্বার্ট সামুয়েল	১৬২
হুইটম্যান্ কলেজ	৭৯৬
হুরেডা সহরের বেদুইন রক্ষিদল	৩১২
হেনরী ফোর্ড	১
হোয়াংপু নদীবক্ষে জঙ্ক জাহাজ	১৪৮
হোয়াইট্‌সন শ্রেণীর কুক্কুটী	৭৭৪



"চমকিত মন, চকিত শ্রবণ

মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৩৯ সাল—কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত